বসুধারা

তৃতীয় বর্ষ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড
কার্তিক — চৈত্র, ১৩৬৬

7/5 6
.002+2

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা
[illegible] বাট-বাটি (বঙ্গ-রহস্য কথা) —[illegible] ১০৩, ২৮৩, ৪০০, ৫৭৩, ৭১১, ৮৬১
অঙ্কুর সিং (গল্প) —[illegible] ২০০
অনুবাদ —[illegible] ৭০৪
অন্তঃসলিলা (উপন্যাস) —[illegible] ১৮৮
[illegible] (উপন্যাস) —[illegible] চক্রবর্তী ৫৮৭
[illegible] (কবিতা) —পবিত্র চক্রবর্তী ৬৮০
[illegible] —সুবোধ ঘোষ ৭৭০
[illegible] ([illegible]) —[illegible] ৮৩০
[illegible] (জীবন-কথা) —[illegible] দেবী ১৩০
[illegible] (পুরাতনী) —সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪
একটি মিলন-কাহিনী (পুরাতনী) —[illegible] চক্রবর্তী ৬৮২
একদিন (কবিতা) —[illegible] ১০৮
একালো দৈবাৎ (পুরাতনী) —সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১৭
এখনি সন্ধ্যা নামবে (কবিতা) —সালভাতোরে কোয়াসিমোদো : অনু° [illegible] ১৮৮
ওয়াইন ও পরিপাক ক্রিয়া (নানাকথা) —[illegible] চট্টোপাধ্যায় ৮৬৯
কমল [illegible] (অল্প-কাহিনী) —সুবোধ ঘোষ ৬৬১
[illegible] (উপন্যাস) পশুপতি ভট্টাচার্য ৩৩
[illegible] (অনুক্রমী) ১৬১, ৩০৩; ৪৪০, ৫৯০, ৭৫১, ৮৬১
[illegible] কথা (প্রবন্ধ) —রাণী [illegible] ৯৯
ক্ষমা কোরো, প্রভু ! (কবিতা) —[illegible] চট্টোপাধ্যায় ৫১২
[illegible], গিয়েছিলাম বন (বিতর্ক) —[illegible] দত্ত ৮৬১
কালিগঙ্গ : পদ্মশ্রী : রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ) —অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ১০৮
[illegible] উৎসব ও [illegible] (লোককথা) —[illegible] ঘোষ
গণ-প্রতিভা (গণিত-জ্যোতিষ আলোচনা) —জীবনালী ১৫০, ২৮৭, ৪৪৪, ৫৮৩, ৭৪৩, ৮৮১
গ্রন্থ-পরিচয় (পুস্তক-পরিচয়) —কৃত্তিবাস ১৫০, ২৮০, ৮৭৯
চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ ([illegible]-কথা) —[illegible] ঘোষ ৭১৭
[illegible] একটি নব-দৃষ্টি (বিজ্ঞান-কথা) —[illegible] ঘোষ ৫৫৮
চিত্রাণী ([illegible]) —[illegible] ৬২০
[illegible] একটি [illegible] (প্রবন্ধ) —[illegible] ৭৩
[illegible] ([illegible])
[illegible] ১২, ২৩৩, ৩৫৩, ৫৭০, [illegible], ৭০৪
[illegible] (গল্প) —[illegible] পাল ৭৮১
জলখাবার কড়চা (রসরচনা) —[illegible] ১১৪, ২৭৯, ৪৩৮, ৫৫৮, ৬৯৯, ৮৫৮
জলাভূমি (ভ্রমণ-কথা) —[illegible] মুখোপাধ্যায় ১০০
জাতক (কবিতা) —[illegible] মজুমদার ৫৮০
[illegible] (গল্প) —জ্যোতির্ময়ী দেবী ১১৬
[illegible] (জীবন-কথা) —[illegible] ৫
জিজ্ঞাসা (কবিতা) —[illegible] ১২০
জীবনের মূল (কবিতা) —[illegible] দত্ত ৬৯০
[illegible] (জীবন-কথা) —[illegible] ৫৭
[illegible] (প্রবন্ধ) —সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১
তুষার-ঝড় (গল্প) —বোরিস পাস্তেরনাক : অনু° [illegible] ৫১৯
[illegible] (কবিতা) —[illegible] ৫৫৬
[illegible] (গল্প) —[illegible] দত্ত ৫৭৯
দূরাগত (কবিতা) সৌমিত্র [illegible] ১২০
দৃষ্টি-রঙ্গ (রসরচনা) —অমিত গাঙ্গুলী ৭৫৪
[illegible] (ক্রিকেট-খেলার কথা) —[illegible] ৭৮৩
নাট্যজগৎ (চিত্র-মঞ্চ সংবাদ) ১৫৭, ৩৩১, [illegible], ৫৮৫, ৭৪৪, ৮৮৮
নীড় থেকে বিদায় (গল্প) —[illegible] ৮৭১
পথের [illegible] (লোক-কথা) —[illegible] মিত্র ২০৭, ৩৭৭, ৬১৪, ৫৬১, ৬৪৮, ৭৫৭
পাতাল-প্রবেশ (রসরচনা) —ন. তু. ব. ২৪১
পুরাতনী : বিসর্জন (সংবাদ-সংকলন) ২৬১
পুরাতনী : [illegible] (") [illegible]
পুরাতনী : রাজা, দেবতা (") [illegible]
পুরাতনী : সংবাদ প্রভাকর (") [illegible]
পুরাতনী : সমাচার দর্পণ (") ৪১৫
পুরাতনী : সমাচারচন্দ্রিকা (") ৬৬৭
[illegible] ([illegible]) —[illegible] মিত্র ১৫৮, ২৭২, ৪২০, ৫৫২, [illegible], ৮৮৮
প্রকৃতি-বর্ণনে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ —[illegible] ৭৪১
প্রাচীন চিত্র (কবিতা) —[illegible] : অনু° [illegible] মুখোপাধ্যায় ১২৮
প্রেমিক রাজা (কবিতা) —[illegible] : অনু° [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible]
[illegible] (গল্প) —[illegible] দত্ত ৭২৮
[illegible] (পুরাতনী) —[illegible] ঘোষ ৫১৭
বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক [illegible] সাহিত্য (প্রবন্ধ) —[illegible] ৩০৭
বসন্ত (কবিতা) —বাণী রায় ৭০২
বাজারের [illegible]—১৩৬০-৬১ —[illegible] ঘোষ ৭৮২

বিষয় পৃষ্ঠা
বিদ্রোহী (ভ্রমণ-কাহিনী) —উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮১
বিশ্বকর্মার মার্গীয় হল (বিজ্ঞান-কথা) —শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ৮
খোঁড়া ঘোড়া (গল্প) —অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩১৮
বৈশালীর দিন (উপন্যাস) —শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০৪
বোলপুর : রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ) —অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৮২
ঘোড়া-গাড়ী (ছড়া) —সন্তু বসি ১২৩
ভারতীয় হকির গতি ও ধারা —নারায়ণ সেন ৮৮৬
ঝিনুক (গল্প) —সত্যপ্রিয় ঘোষ ২০
জলে দলে (গল্প) —কৃষ্ণকলি ৮৪০
দূরের মধ্যে মন (উপন্যাস) —দীপক চৌধুরী ৩৪২
মাতাল (গল্প) —আন্তন চেখভ : অনু: কৃষ্ণময় চন্দ্র ৮০
দুয়ারি-বাবা (গল্প) —কবরী বসু ৩২৭
নিবৃত্তি (কবিতা) —দিলীপকুমার রায় ১২২
নেনকার একটাই ইতিহাস (গল্প) —সুধন্য ঘোষ ৪৫৪
নেক-জ্যোতি (গল্প) —গোবিন্দ মিত্র ৯৭
ম্যাকমোহন লাইন সম্পর্কে চীনের দাবি (প্রবন্ধ)
—সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ১১১
নৃত্য ও নাটক —শ্রীনাথ রায় ৭৭০

বিষয় পৃ
যুগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (জীবন-কথা) —শরৎকুমার গুপ্ত ৩১
বাদিয়ার স্মৃতি (ভ্রমণ-কথা) —শান্তিলতা দাশগুপ্ত ৫২
হাসিরাশি (প্রবন্ধ) —রাজশেখর বসু ৩১
মন্টেরির দূত (পুরাতনী) —সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬
শিবপুরী একাস্তটো (ভ্রমণ-কাহিনী) —হৃষীকেশ দেব
শিল্পী শরৎচন্দ্র (জীবন-কথা) —রথীন্দ্র চক্রবর্তী ১৪
শ্রীশ্রীকালীপূজা (প্রবন্ধ) —পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
সংসার (গল্প) —সুরূপদ মুখোপাধ্যায় ৫৫
সভ্যতার গতিপথে : সংস্কৃতির পর্ব [২] (প্রবন্ধ) —রবিনারায়ণ বসু ৬
সমাজদেশে বালিকা-বিবাহ (প্রবন্ধ) —কালীচরণ ঘোষ ৪০
সমবায়ী চাষ বা 'দলী ক্ষেতি' (প্রবন্ধ) —কালিচরণ ঘোষ ৪২
সিকিমের পথে (ভ্রমণ-কাহিনী) —বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী ৮৩
সে এক দুনিয়া (পুরাতনী) —সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০
সৌন্দর্য-রসিক রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ) —গীতা ঘোষ ৯৫৪
স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙালী সংস্কৃতি (প্রবন্ধ)
—বিজয়লাল নাথ
হাসপাতাল (কবিতা) —সুশান্ত ঘোষ
হেমন্ত (কবিতা) —বাণী রায়

বর্ণানুক্রমিক চিত্র-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
'অমৃত পিয়া' গল্পের অলংকরণ	৪৬০
'অনর্থ' নাটকের একটি দৃশ্য	৭৫৪
অভিনয়রত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৭৪
'অভিষেক' নাটকে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৩৩
'[illegible]' উপন্যাসের অলংকরণ	১৯৯
'আর ঠাঁই' উপন্যাসের অলংকরণ	৫৮৭, ৫৮৮-৯
আসামের গ্রামের দুজন তরুণী : শিল্পী রেণুকা গুপ্ত	৪৩
[illegible]	৩২৫
উদয়কুমার	৬০৪
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব	১৬৪
উদ্যান-মণ্ডপ	১০৭
উমাইয়া মসজিদের অভ্যন্তর	৬৩৪
একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ	২৮০
'এই কলকাতাতেই ছিল' পুস্তকটির অলংকরণ	১৯৯
এখানে থামী	৪৬০
এলিফ্যান্টা-গুহামূর্তি : অর্ধনারীশ্বর-শিবরূপে শিব	৮৩
ঐ : গঙ্গাধর মূর্তি	৮১
ঐ : মহেশ মূর্তি	৮৭
'[illegible]' উপন্যাসের অলংকরণ	৩৪-৫
ওরা কাজ করে : শিল্পী অমল সেনগুপ্ত	১৮০
'[illegible] ঘাট' নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী	৮৩৭
কোনারকের চিত্র	৮৩৬-৭
কেশবচন্দ্র সেন	৫
ক্রেমলিন-এর 'গ্র্যাণ্ড প্যালেস'	৫১৩
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৫৩৭
'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' চিত্রে রাইচরণের ভূমিকায় উত্তমকুমার	১৬৫
[illegible]	৭৬৩
[illegible] দে	৫৮৫
[illegible] উৎসব ও নরনারী মূর্তি	১৫৭, ১৫৮
'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী	৮৪৪
'[illegible]' উপন্যাসের অলংকরণ	৫২০-১
'[illegible]সভা'র রসিকের ভূমিকায় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮৩২
'[illegible]' অলংকরণ	৭৮১
'[illegible]' রসরচনার অলংকরণ	১১৪, ২৭৮, ৫০৮, ৫৫৯, ৬৬৬, ৮৫৮
'[illegible]' গল্পের অলংকরণ	১১৬
[illegible]	৩১৯
'ডাকঘর' অভিনয়ে [illegible]ন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭১৪
ডাস্টবিন	২৭
তারাসুন্দরী	১০৭
'তুষার-বধূ' গল্পের অলংকরণ	৫২[illegible]
থমাস মোন্স্	৩২৫
দামাস্কাসের 'মার্জ স্কোয়ার'	৬৩১
দামাস্কাসের 'সুলতান সেলিম মসজিদ'	৭৭০
'দুই বেচারা' বাণীচিত্রে : চঞ্চল চ্যাটার্জী	৪৮৭
ঐ : কালী ব্যানার্জী	৪৫১
ঐ : কালী ব্যানার্জী ও অনুপকুমার	৪৮৭
ঐ : জহর রায়	৭৫১
ঐ : বাসবী নন্দী	৪৫৩
ঐ : সন্ধ্যা রায়	৫৮৭
'দুর্নীতি দেবতা' গল্পের অলংকরণ	২৮৯
'দেবী' বাণীচিত্রে ছবি বিশ্বাস	৭১০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৪৮
[illegible] হাসি	৭৪
নটীসুন্দরী	১০
নরেন্দ্রদেব [illegible]	৮৬
নির্মলেন্দু [illegible]	৮৬
'নীড় [illegible]'	৮৭
পদ্মা : শিল্পী [illegible]	৫৫০
পাঞ্জাবের লোকনৃত্য : শিল্পী [illegible]	২০
'পাতাল-প্রবেশ' রসরচনার অলংকরণ	২৪১
'পোষ্যপুত্র' নাটকে [illegible] ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী	[illegible]
'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় দানীবাবু	৮৭
প্রচ্ছদ-শিল্পী : [illegible]	
'ফাল্গুনী' অভিনয়ে [illegible] সুরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ	৭১
'ফুলবাসিনী' গল্পের অলংকরণ	৭২
'ফোটে ফোটে—তবু ফোটে না'	৫২
বই মেলেছে পুঁথিময় সাজিয়ে সরস্বতীপূজা	৫৫
বড়ার বিয়ে	১০
বলরামপুর গোষ্ঠ-নন্দী	৩১
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৮
বাউল : শিল্পী অমল সেনগুপ্ত	৫২
'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ে নাম-ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ	[illegible]
বিদ্যালয়ের একদিন	[illegible]
'বিদ্রোহী' প্রেম-কাহিনীর অলংকরণ	১১
'বিশ্বকর্মার আপন জন' বিজ্ঞান-কথার অলংকরণ	৮০
'বেতো ঘোড়া' গল্পের অলংকরণ	[illegible]
'বৈশাখীর দিন' উপন্যাসের অলংকরণ	৮০৪

বসুধারা [৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, কার্তিক—চৈত্র (১৩৬৬)

বিষয়	পৃষ্ঠা
'ডাক-গাড়ী' গল্পের অলংকরণ	১২৬-৭
'কিংশুক' গল্পের অলংকরণ	২০
'মনে মনে' গল্পের অলংকরণ	৭৫০
'মনের কথা বল' উপন্যাসের অলংকরণ	৬৫২-৩
মনমোহন পাণ্ডে	২৮৭
টুটা বিশ্ববিদ্যালয়	৪১৩
'বাজার' গল্পের অলংকরণ	৮০
'বুড়ামি-বাবা' গল্পের অলংকরণ	৩২৭
'মেঘে ঢাকা তারা' ছায়াচিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী	
'মেঘে ঢাকা তারা' ছায়াচিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী	
'মেঘনার একটাই ইতিহাস' গল্পের অলংকরণ	
'মেঘ-জ্যোতি' গল্পের অলংকরণ	
রক্তকরবী'তে তৃপ্তি মিত্র ও শম্ভু মিত্র	
বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ	

বিষয়	পৃষ্ঠা
রমেশচন্দ্র দত্ত	৩১৬
'ভাটিয়ালি সুর' পূরবীর অলংকরণ	২৩৮
শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত রেখাচিত্র	১৫১
শিলাচিত্র	৫৩
'[illegible]বিহার' ছায়াচিত্রে তৃপ্তি মিত্র	১৫৯
'শ্রীশ্রীকালীপূজা' প্রবন্ধের অলংকরণ	১
শ্যাম লাহা	৫৭৬
'সংশয়' গল্পের অলংকরণ	২৪৫
নটীতারিণী	৬০১
সাধনা রায়চৌধুরী	৪৮৫
'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের নাম-ভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)	১৩৭
'সেতু' নাটকের দৃশ্য	৬০২-৩
সে-যুগের রাইটার্স বিল্ডিং	৪২৭
স্বামী বিবেকানন্দ	৫৮৪
'হাসপাতাল' চিত্রের ভূমিকায় [illegible] মজুমদার	১৫৮

বসুধারা

বাঙলার প্রাণ-প্রবাহ

সম্পাদক
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রযনায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
অজিত গুপ্ত

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড কার্তিক, ১৩৬৬ প্রথম সংখ্যা

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব ঋতুতে স্বাস্থ্যলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন)সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

বসুধারা

তৃতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় খণ্ড • প্রথম সংখ্যা

কার্তিক, ১৩৬৬

সূচীপত্র

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীশ্রীকালীপূজা । ১
মণি বাগচি । জাতিগঠনে কেশবচন্দ্র । ৫
শিবতোষ মুখোপাধ্যায় । বিশ্বকর্মার আপন জন । ৮
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য । চেনাশোনার বাইরে । ১২
সত্যপ্রিয় ঘোষ । ভিক্ষুক । ২০
মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ । ডারউইন । ২৭
সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । জয়ের তারাপীঠ । ৩১
পশুপতি ভট্টাচার্য । ঐন্দ্রজালিক । উপন্যাস । ৩৪
শিবপ্রসাদ বিশ্বাস । চেকোস্লোভাকিয়ার কয়েকটি সামাজিক ব্যবস্থা । ৭৬
রচনা : আন্তন শেখভ ; অনুবাদ : কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র । মাতাল । ৮০
হৃষিকেশ সেন । শিবপুরী এলিফ্যান্টা । ৮৩
বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় । কীর্তন কথা । ৯৫
বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় । মেরু-জ্যোতি । ৯৭
তুলসীদাস সিংহ । পল্লীর বারমাস্যা : কার্তিক । ১০৭
যোগনাথ মুখোপাধ্যায় । ম্যাকমহোন লাইন সম্পর্কে চীনের দায়িত্ব । ১১১
অগ্নিমিত্র । জটিরামের কড়চা । ১১৪
জ্যোতির্ময়ী দেবী । অবলা । ১১৬
দিলীপকুমার রায় । মিনতি । কবিতা । ১২২
বাণী রায় । হেমন্তে । কবিতা । ১২৩
সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত । দূরাগত । কবিতা । ১২৩
পার্বতীশঙ্কর । জিজ্ঞাসা । কবিতা । ১২৩
সন্তু বস্তি । ভাঙা-গাড়ী । ১২৪
শরৎকুমার মিত্র । পূর্বস্মৃতি । ১২৮
পুরাতনী ['সংবাদ প্রভাকর' হইতে উদ্ধৃতি] । ১৩২
সূত্রধার । অথ নট-ঘটিত । ১৩৫
রবীন্দ্র চক্রবর্তী । শিল্পী শরৎচন্দ্র । ১৪১
সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । এই কলকাতাতেই ছিল । ১৪৪
অনু ঘটক । গুজরাটী নবরাত্রি উৎসব ও গরবা নৃত্য । ১৪৭
কৃত্তিবাস । গ্রন্থ-বৃত্তান্ত । ১৫০
জীবশর্মা । গ্রন্থ-বিচিত্রা । ১৫৩
নাট্যমহল । ১৫৭

Some valuable comments on

Economic Resources of India & Pakistan

—by K. C. Ghosh

"....... A dictionary of a country's economic resources is always a useful book of reference. So is Mr. K. C. Ghosh's book on India and Pakistan. —*Statesman*

"....... a most authoritative work, which takes into account the chief economic factors which go to create wealth." —*Chamber of Commerce Journal, London*

"The author has .... nicely presented all the key-factors of economic development .... No section of Indian economic .... has been left out of account and the array of statistical notes has left nothing to be desired. —*Amrita Bazar Patrika*

Answers to Questions set for Electrical Supervisors' Examination

(ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজারশিপ পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য পুস্তক)

বর্তমানে নিম্নলিখিত খণ্ডসমূহ পাওয়া যায়:

(*a*)	Part I for 1945-48	— 2·50
(*b*)	Part II & XI for 1945-48	— 2·50
(*c*)	Part III for 1945-48	— 2·50
(*d*)	Part IV for 1946-52	— 2·50
(*e*)	Part V for 1946-52	— 2·50
(*f*)	Part I (Supplement) for 1950-53	— 2·00
(*g*)	Part II (Supplement) for 1950-53	2·00
(*h*)	Part XI (Supplement) for 1950-53	2·00

ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই পুস্তক পাইবেন।

ইলেকট্রিক্যাল পকেট বুক (বাংলা ভাষায়)—শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

ইলেকট্রিশিয়ানদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং পকেটে রাখবার মতো সাইজ। মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক

কে. পি. বসু পাবলিশিং কোং

৫২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ছবি ছড়ার দেশে ৩·00

সম্পাদনায়—বিশ্বনাথ দে

"ছবিছড়ার দেশে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক কবির রচিত [illegible] এমন করে যে মালা গাঁথা হয়েছে, [illegible] শিল্পীদের তুলি ও [illegible] আর সমৃদ্ধি বাড়িয়ে দিয়েছে। শিশু কিশোর যুবা প্রৌঢ় নির্বিচারে সকল বাঙালীই যাঁরা এ [illegible] গ্রহণ করবেন, [illegible] আমার কোন সন্দেহ নেই।"

—হুমায়ুন কবির

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, [illegible] দেব, [illegible] রায়, [illegible], সুখলতা রাও, [illegible] ঘোষ, [illegible], [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] ঘোষ, [illegible] গাঙ্গুলী, আশাপূর্ণা দেবী, [illegible], [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] প্রমুখ [illegible], শৈল চক্রবর্তী, [illegible] বসু, [illegible] মিত্র, [illegible] ঘোষ প্রমুখ শিল্পীর [illegible] 'রোশনাই' [illegible] —দেশ।

রোশনাই

সম্পাদনায়—[illegible] দাস

এ-১৩২, ১৩৩
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলিকাতা—বারো
ফোন: ৩৪-২৩০৮

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৬৬

বসুধারা

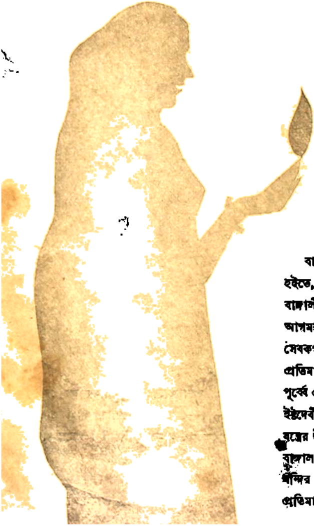

শ্রীশ্রীকালীপূজা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালায় মৃন্ময়ী প্রতিমা-পূজা প্রচলনের প
হইতে, পটুয়াদিগের প্রভাববৃদ্ধির পর হইে
বাঙ্গালীর বর্ণ-পরিচয় লোপ পাইয়াছে। কৃষ্ণান
আগমবাগীশের কালের পর হইতে, শ্রীচৈতন
সেবকগণের অভ্যুদয়ের সময় হইতে বাঙ্গালায় মাটি
প্রতিমা গড়িয়া পূজার প্রচলন বাড়িয়াছে। ইহা
পূর্ব্বে প্রত্যেক হিন্দু-গৃহস্থের গৃহে তাম্রপটের উপা
ইষ্টদেবীর যন্ত্র অঙ্কিত বা খোদিত থাকিত এবং সে
যন্ত্রের উপরে হোমাদি হইত, প্রতিমা-পূজা হইত না
বাঙ্গালায় যে-সকল পুরাতন প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবী
মন্দির আছে, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকল দে
প্রতিমার আসনের উপরে একটা করিয়া যন্ত্র অঙ্কি

আছেই। খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরে বেদীর উপরে তান্ত্রিক যন্ত্র পাইবে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রত্নবেদীর উপরে তান্ত্রিক যন্ত্র আছে। বাঙ্গালী পূর্ব্বে পূর্ণরূপে যান্ত্রিক ছিল—যন্ত্রোপাসনা করিত। বরেন্দ্রীর জগৎরাম রায় বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রথমে মাটির নির্ম্মিত সিংহবাহিনীর পূজা আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এই সংস্কার দৃঢ় ছিল যে, দশমহাবিদ্যার রূপ প্রকট করিয়া পূজা করিতে নাই। কালী দশমহাবিদ্যার আদ্যা-বিদ্যা, কালী-মূর্ত্তি গড়িয়া পূর্ব্বে কেহ পূজা করিত না। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালী-মূর্ত্তি গড়িয়া স্বয়ং পূজা করিতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালার সাধক-সমাজ অনেক দিন চলেন নাই; লোকে 'আগমবাগীশী' কাণ্ড বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত। বিশেষতঃ স্বয়ং মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা ত সহজ কথা নহে, তাই বাঙ্গালী উহার অনুসরণ করে নাই। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের পর হইতে বাঙ্গালায় কালীপূজা সাধারণভাবে অবলম্বিত হয়। মহারাজ ব্যবস্থা দেন যে, কুম্ভকারে কালী-মূর্ত্তি গড়িয়া দিলে এবং স্বয়ং অথবা শ্রীগুরুদেবকে প্রতিনিধি করিয়া কালীপূজা করিলে কালীপূজা করা হইবে। এখন সে ব্যবস্থাও উপেক্ষিত—এখন কুমারটুলি হইতে মাটির কালী-মূর্ত্তি আনাইয়া যে-কোন পুরোহিতের দ্বারা পূজা সম্পন্ন করান হয়। কিন্তু তন্ত্রের বিধান হইতেছে এই যে, কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি আদ্যা বা মহাবিদ্যার পূজা কেবল তাঁহারাই করিবেন, যাঁহারা ঐ সকল বিদ্যার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত। এ পূজা স্বয়ং করিতে হয়, নিজে অপারগ হইলে মন্ত্রদাতা গুরুকে প্রতিনিধি করিয়া পূজা করাইতে হয়। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল জাতির সাধকই পূজা করিবার অধিকারী। ভক্ত রামপ্রসাদ আগমবাগীশের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্বয়ং কালীপূজা করিতেন।

আজকালকার তথা-কথিত শিক্ষিত বাবু-সমাজ সাধনা-পূজা-সম্বন্ধে এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য খবর রাখেন না বলিয়া, অবান্তর হইলেও খবরগুলা দিয়া রাখিলাম। তোমরা পাত্রীদিগের মুখে যে-জাতিভেদের পরিচয় শুনিতে পাও, যে-পৌত্তলিকতার সমাচার জানিতে পাও, তাহা পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কখনও ছিল না। বরং এখন বাবু-মহলে, ইংরেজের আইন-আদালত-গ্রাহ্য হিন্দু-আইনের প্রভাবে কতকটা সেই জাতি-বিচার ও পৌত্তলিকতা প্রচলিত হইয়াছে বটে; পরন্তু এই উদ্ভট প্রচলনের মূলে বাবু-মহলের অজ্ঞতাই প্রবল হইয়া আছে। তোমরা দেব-দেবীর প্রণাম-পদ্ধতি ভুলিয়াছ, পূজা-প্রকরণের অর্থবোধ তোমাদের নাই, সে পুরাতন ভাষাবোধও নাই; তাই ভ্রান্ত ধারণা-বশে তোমরা যা-তা করিয়া বস! এজন্য শাস্ত্র অপরাধী নহে, সমাজও অপরাধী নহে। যাউক, এখন আসল কথাটা বলিব।

বর্ণ-পরিচয়

আমাদের আধুনিক বাঙ্গালীর বর্ণ-পরিচয় লোপ পাইয়াছে, ভাষা-জ্ঞান ক্ষীণ হইয়াছে। কালী-রূপের কোন বর্ণনায় তিনি মসীরূপিণী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তবে তাঁহার বর্ণ মসীবৎ হয় কেন? উত্তরে বলিব—শ্যামা, শ্যাম-ধোয়া, ভীমা প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ আমরা ভুলিয়াছি। তন্ত্রে আছে—মা কালী—

কালাভ্র-শ্যামলাঙ্গীং বিগলিত-চিকুরাম্

অর্থাৎ কালরূপী মেঘের ন্যায় শ্যামলাঙ্গী কালী।

কালের বা সময়ের মেঘই বা কেমন, তাহার বর্ণই বা কেমন? ভক্ত কমলাকান্ত গান করিয়াছেন—

"নব সজল জলদকায়,
দেখিলে আঁখি জুড়ায়।"

নব সজল জলদের বর্ণ কি মসীবর্ণ? ঘন-ঘোর মসীবর্ণ দর্শন করিলে ত নয়ন জুড়ায় না, উহাতে ত স্নিগ্ধতা নাই। অতএব বলিতেই হইবে, বাঙ্গালার পটুয়াগণ কালী-মূর্ত্তিকে যে বর্ণে রঞ্জিত করেন; মায়ের আমার সে বর্ণ নহে। ইংরেজিতে যেমন dark শব্দের প্রকৃত দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা আমাদের বোধগম্য হওয়া কঠিন, আমাদেরও তেমনি শ্যাম-শব্দের দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা সহজে বোধগম্য হয় না। নব-সজল-জলদ-শ্যাম, নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম, ঘনশ্যাম, চিক্কণ-শ্যাম, তপ্তকাঞ্চন-শ্যাম, নবোৎপল-শ্যাম—কত রকমের শ্যামবর্ণ যে আছে, তাহা শেষ করিয়া উল্লেখ করা চলে না। এই শ্যাম-শব্দের ব্যাখ্যার উপরে আমাদের বহু দেব-দেবীর ও অবতারসকলের বর্ণ-পরিচয় নির্ভর করিতেছে। অথচ শ্যাম-রূপ যে কেমন রূপ, তাহাই আমরা জানিতে, বুঝিতে এবং ধারণা করিতে ভুলিয়াছি।

কালী-মূর্ত্তি

কালী-মূর্ত্তি যে কেমন, তাহার নির্দ্ধারণও কঠিন। প্রত্যেক পুরাণে ও তন্ত্রে কালীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ-বর্ণনা আছে; অনেক ক্ষেত্রে কতকটা বিরোধী বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার সামঞ্জস্য ঘটান বড়ই কঠিন। তবে একটা বিষয় ঠিক যে, কোন কবি, কোন পুরাণ, কোন তন্ত্র কালীকে মসী-বর্ণা বলেন নাই; নীলবর্ণের উল্লেখ আছে বটে, সে কেবল তারা-মূর্ত্তির বর্ণনায়, শ্যামা-রূপে নহে। কালীর দুই মূর্ত্তি, এক রণ-রঙ্গিণী, অপর মহাবিদ্যা বা আদ্যা-বিদ্যা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আদ্যা-বিদ্যার রূপ-বর্ণনা আছে। আমাদের হালিসহর গ্রামে বলদে-ঘাটার ঘাটের উপরে যে অতি পুরাতন সিদ্ধেশ্বরী কালী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন, তাহা শবশিব-প্রমাথিনী, অসিধারিণী রণোন্মাদিনী কালী নহেন; ছোট্ট মেয়েটি সিংহাসনের উপরে বসিয়া আছেন। এই মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রামপ্রসাদ অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের কোন গানেই কালীর ভীমা ভৈরবী সৃষ্টি-ধ্বংসকারিণী মূর্ত্তির বর্ণনা নাই। এখন যে শ্যামা-মূর্ত্তির পূজা হয়, তাহা শ্মশান-কালী; পূর্ব্বে কখনই ঐ মূর্ত্তির পূজা গৃহস্থ-গৃহে হইত না। রামপ্রসাদ জীবনে উমার তিন রূপের সাধনা করিয়াছেন,—উমা হৈমবতী, উমা মহেশ্বরী বা পাটেশ্বরী এবং উমা সর্ব্বাণী। সে বার্ত্তা তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য 'কালী-কীর্ত্তনে' প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সন্ন্যাসী গৃহত্যাগী ছিলেন না; তিনি গৃহী ছিলেন; সুতরা শ্মশান-কালীর উপাসনা করিবার অধিকারী তি ছিলেন না। কালীর যে যন্ত্র ও মন্ত্র, সে মন্ত্রগ যে ধ্যান, তাহার অনুরূপ আধুনিক কালী নহেন রামপ্রসাদ কালীকে মনোমোহিনী রূপেই সাজাইয়া ছিলেন, কখনও ঘোরা—ভীমা-রূপে দেখেন নাই দেখানও নাই। তিনি বলিয়াছেন—"কে মনোমোহিনী ঐ? কে রে দৈত্যদলনা নলিনী নয়না দ্বিরদগামিনী ঐ?" তবে রামপ্রসাদ তাঁহা লিখিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের শেষাংশে শব-সাধনা বর্ণনা ইঙ্গিতে দিয়াছেন, তাহাতে কালীর রূপ-বর্ণন নাই। অতএব কালীর মূর্ত্তি-বর্ণনা ঠিক-মত করিতে পারিলাম না। নীলকণ্ঠ কালীর রূপ-বর্ণনা এক করিয়াছেন, তাহা এই,—

"ঐ শ্যামা গুণধামা বারণ মানে না রে—
রণে রণ-রঙ্গিণী ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে,
সমরে মগনা কালী করালবদনা ঐ।
নর নরকর কটিতটে শোভে মনোহর,
মুণ্ডমালা গলে দোলে, করে অসি এলোকেশী,
উলঙ্গিনী ঐ।"

শ্যাম ও শ্যামা

রামপ্রসাদই বাঙ্গালার প্রথম কবি ও সাধক, যিনি শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথমে গান করিয়া গিয়াছেন—

"তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে,
নাচ দেখি মা।
ব্রজে যেমন নেচেছিলে
হ'য়ে বনমালী—
অসি ছেড়ে বাঁশী ল'য়ে,
মুণ্ডমালা ছেড়ে বনমালা ধ'রে,
তেমনি ক'রে নাচ দেখি মা!"

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের মুখে, পরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখে এ গান যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার মনে একটা স্থায়িভাব আমরণ বিদ্যমান থাকিবেই। ইহা ছাড়া, রামপ্রসাদের গান—"হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে," "নটবর-বেশে বৃন্দাবনে কালী হ'লি মা রাসবিহারী" প্রভৃতি সমন্বয়ের গান অতি উপাদেয় ও অনুপম। এই ভাব-সমন্বয় ধরিয়া পরে কমলাকান্ত প্রভৃতি বহু ভক্ত কবি বহু গান রচনা করিয়া গিয়াছেন।

—'নায়ক', ১৩২৮

রামপ্রসাদের মৃত্যু

কবিদের জীবনে দুঃখের অন্ত নাই। টমাস ওটওয়ে তিনদিন উপবাস করিয়া একখানি রুটি পাইয়াছিলেন, হা হুতাশ করিয়া তাহা গিলিতে যাইয়া গলায় তাহা আটকাইয়া যায় এবং এই অবস্থায়ই তাঁহার প্রাণ যায়। কার্ক হোয়াইট অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ও কীট্স ২৫ বর্ষ বয়সে বিরুদ্ধ সমালোচনার বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আমাদের কবি চণ্ডীদাসকে গৌড়ের বাদশাহ হাতীর উপর চড়াইয়া জল্লাদ দ্বারা বেত্রাঘাত করাইতে করাইতে মাংসপেশী ছিন্নভিন্ন করাইয়া প্রাণনাশ করেন। কিন্তু ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন কি ভাবে মরিয়াছেন, তাহা কি আপনারা জানেন? কালীপূজার পর হালিসহরের গঙ্গায় কালীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়,—ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, কাঁসর বাজিতেছিল,—উদ্দাম ভক্তিভরে সেই বিগ্রহের সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রামপ্রসাদ সেন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

জাতিগঠনে কেশবচন্দ্র

মণি বাগচি

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাসে অর্থাৎ নবজাগরণের প্রস্তুতিপর্বের পর যখন গঠনমূলক চিন্তা এবং কার্যের সূত্রপাত হইয়াছে, তখনি কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটিল। কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের দুইটি প্রধান পর্ব, যথা—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয়পর্বে কেশবচন্দ্র [illegible]—শুধু সমাজ-সংস্কারকই নন, ধর্ম-সংস্কারকও। শুধু [illegible] বলিলে ঠিক হইবে না, এই পর্বে তিনি একাধারে [illegible] সংস্কারক—Reformist and revolutionary—[illegible] সর্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে। যে যুগগভীর [illegible] হইতে বিপ্লব জন্ম লয় এবং যে ইতিহাসবোধ হইতে [illegible] প্রয়াস সম্ভব হইয়া থাকে, কেশবচন্দ্রের মধ্যে আমরা [illegible] সেই জীবন-চেতনা ও ইতিহাসবোধ লক্ষ্য করি। তিনি [illegible] যুগনায়ক এবং তাঁহার যুগের অগ্রবর্তী—দুই-ই। সেই বহুভঙ্গিম চরিত্রের মানুষটির কর্মজীবনের একটি দিকের কথা সংক্ষেপে এই নিবন্ধে আলোচনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, এই দিগ্‌দর্শন বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে পাঁচ-দফা কার্যসূচী লইয়া কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে দেশে ফিরিলেন। তাঁহার বিপুল কর্মপ্রতিভা একমাসের মধ্যেই 'ভারত-সংস্কার সভা'র (Indian Reform Association) মধ্য দিয়া বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিল। জাতির সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য লইয়াই কেশবচন্দ্র এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সময়টিতে তিনি ভারত-সংস্কার সভা স্থাপন করেন, সেই কালের পটভূমিটি যদি আমাদের সম্মুখে একবার ধরিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরা কেশবচন্দ্রের প্রখর ইতিহাসবোধ দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারি না। সভার অন্যতম লক্ষ্য ছিল নৈতিক উন্নতিসাধন। হিন্দু-কলেজীয় শিক্ষার ফলে বাঙালীর সামাজিক জীবন ও নৈতিক জীবন দুই-ই যে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, ইহ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহ কিছুটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন মনে হয়, তবে এ বিষয়ে তাঁহার কোনো সুপরিকল্পিত কর্মোদ্যমের কথা তাঁহার জীবনচরিতে বা আত্মচরিতে আমরা পাই না। এই কার্যের জন প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী মানুষের। কেশবচন্দ্র সেই

মানুষ। রামমোহনের ন্যায় কেশবচন্দ্রও পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন লক্ষ্য করিলেন যে জাতির জীবনের নৈতিক ভিত্তি শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই সেই দূরদর্শী মনীষী উপলব্ধি করিলেন যে এই অবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গিয়া এই সত্যটি আরো নিবিড়ভাবেই বুঝিয়াছিলেন, তাই দেশে ফিরিয়াই ক্ষিপ্রতার সহিত তিনি এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে চাহিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন জাতির পূর্ণ উন্নতি, তিনি চাহেন নাই যে দেশের জনকতক মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া সাহেব সাজিয়া চৌরঙ্গীতে বাস করিবে। তিনি চাহিয়াছিলেন জাতির জীবনে পূর্ব-পশ্চিম উভয়দেশীয় ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে—ইহাই ছিল সেদিন কেশবচন্দ্রের সংস্কার-প্রয়াসের লক্ষ্য।

ধর্মাচার্য কেশবচন্দ্র এইবার সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার জীবনের এই দিক্‌-পরিবর্তন বিশেষভাবে অনুশীলনের বিষয়। অবশ্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ধর্মাচার্যই ছিলেন; কারণ তাঁহার জীবনেতিহাসে দেখিতে পাই যে, মানবসমাজের হিতের জন্য যতপ্রকার কার্য ও উদ্যম তিনি করিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল তাঁহার সুগভীর ধর্মপ্রাণতা। ভারতবর্ষে মহাজাতি-গঠনের পথিকৃৎ হিসাবে রামমোহনের পার্শ্বেই কেশবচন্দ্রের স্থান। ইংলণ্ডের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সে-দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ এবং সে-দেশের সামাজিক উন্নতির দ্রুত অভিযান প্রত্যক্ষ করিয়া কেশবচন্দ্র যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার মনেও স্বদেশের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষাই রূপ লইল 'ভারত-সংস্কার সভা'র বিবিধ কর্মচেষ্টার ভিতর দিয়া।

বাংলা ছিল কেশবচন্দ্রের কর্মের প্রধান ক্ষেত্র, কিন্তু তাঁহার কার্যের প্রভাব পড়িয়াছিল সর্বভারতীয় সমাজে—তিনিই তখন সর্বভারতের অবিসংবাদী নেতা। দেশে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র সুলভ-সাহিত্য, সাধারণের শিক্ষা, শ্রমজীবীদিগের শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং মদ্যপান নিবারণ প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার-কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রচণ্ড কর্মশক্তির আধার কেশবচন্দ্রের পক্ষেই ইহা সম্ভব ছিল। কেশবচন্দ্র দেখিলেন, যদি জাতি গড়িতে হয় তাহা হইলে একেবারে জাতির মূল ধরিয়া কাজ করিতে হইবে। সমাজে বিত্তবান মুষ্টিমেয় মাত্র, বিত্তহীনের সংখ্যাই তো বেশি। ইহারাই তো জাতির মেরুদণ্ড। তাই সকলের আগে ইহাদেরই হিতচেষ্টা করা আবশ্যক। অবনতশ্রেণীর অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের পূর্বে এই দেশে আর কেহ চিন্তা করেন নাই, অবশ্য হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম একটি ব্যতিক্রম। তবে হরিশচন্দ্রের কর্মোদ্যম 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং অত্যাচারিত নীলচাষীদের কথাই তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও কার্যের ক্ষেত্র ছিল ব্যাপক এবং বিস্তৃততর—উদ্দেশ্য আরো মহৎ। বিত্তহীনেরা যাহাতে মানুষ বলিয়া স্বীকৃত হয়, মানুষের অধিকার তাহারা পায়, মানুষের মর্যাদা তাহারা লাভ করে—সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি 'সুলভ-সমাচার' নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন।

'সুলভ-সমাচার' কেশবচন্দ্রের মনীষার একটি আশ্চর্য কীর্তি। কলিকাতায় কাগজ তখন আরো অনেকগুলি ছিল, কিন্তু 'সুলভ-সমাচার' সংবাদপত্র সেদিন যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছিল, আজ, এই সুদূরকালের ব্যবধানে আমরা তাহা সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিব না। এক পয়সা দামে যে কাগজ হইতে পারে এবং ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সমান আগ্রহের সহিত পড়িয়া বুঝিতে পারে এমন ভাষায় যে লেখা চলে, এ কথা কেশবচন্দ্রের পূর্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। এই কাগজের ভাষা ছিল যেমন সহজ, তেমনি সরল। যাহারা সামান্য লেখাপড়া জানিত, তাহারাও 'সুলভ-সমাচার' পড়িয়া বুঝিতে পারিত। এমন জনপ্রিয় বাংলা কাগজ সেদিন বাংলাদেশে আর দ্বিতীয় একখানি ছিল না। 'সুলভ-সমাচার'-এর স্তম্ভে বাঙালী যেদিন পাঠ করিল—"দেশের বড়লোক কাহারা? আমাদের দেশে এদেশের ছোট লোকেরা—" সেদিন সে বুঝিতে পারিল, কেশবচন্দ্র সেন কত বড়ো একজন বৈপ্লবিক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি। এই 'বড়লোক' শীর্ষক প্রবন্ধটি কেশবচন্দ্রের বিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে অন্যতম। এই প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখিতেছেন: "পৃথিবীতে এমন এক সময় আসিবে যখন ছোটলোকেরা আর চুপ করিয়া থাকিবে না, আর-চুপে মাটির শয্যায় পড়িয়া থাকিবে না। ··· যাহারা তোমাদের মধ্যে মেওত বা কারিগর আছ, সকলে একত্র হইয়া একবার গা তুলো। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তোমরা যাহাতে দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরতা, প্রজাপীড়ন বলপূর্বক থামাইতে পার, ইহাতে একান্ত যত্ন কর। তোমাদের ভালর জন্য দেখ আমরা এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি বাহির করিয়াছি। তোমরা আর নিদ্রা যাইও না। সময় হইয়াছে, উঠ। দেখ তোমাদের হইয়া বলে এমন লোক নাই। ··· তোমরাই

এ দেশের বড়লোক, তোমরা না থাকিলে দেশ ছারখার হইয়া যাইবে, তাহা কি জান না? অতএব যত্ন কর, চেষ্টা কর, জ্ঞান-বিদ্যা লাভ কর।[৯]' [সুলভ-সমাচার, ১ম খণ্ড ৪০ সংখ্যা, ৩১শে শ্রাবণ, ১২৭৮ (১৮৭১ খ্রীঃ)]

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র এই কথা বলিতেছেন, এইরকম চিন্তা করিতেছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, তখন কার্ল মার্কস্-এর 'ড্যাস ক্যাপিটাল'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সুলভ-সমাচারের পনরো বছর পরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ড্যাস ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়—কেশব-চরিত আলোচনার সময় এই তথ্যটি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। কেবল সুলভ-সমাচারের পৃষ্ঠাতেই কেশবচন্দ্র এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার মধ্যেও তিনি এইরূপ কথা বলিতেন। 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত কেশবচন্দ্রের বহু বক্তৃতার মধ্যে ইহার নিদর্শন মিলিবে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ মাসে একদিন কলিকাতায় সাতুবাবুর বাড়ির সম্মুখের মাঠে সমবেত পাঁচহাজার জনতার সভায় কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন: "এ দেশে অনেক সামান্য লোক আছেন, তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করে, এমন লোক অতি অল্প। ছোটলোক বলিয়া সকলেই ইঁহাদের ঘৃণা করেন। ... এদেশের দুই পাঁচটি ধনী, মানী ও জ্ঞানীর উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, করে সামান্য লোকদিগের উপর।" (ধর্মতত্ত্ব, ১৮৭৩ খ্রীঃ—মাঘ-ফাল্গুন)

সাধারণ লোকদের অধিকার ও মর্যাদার কথা কেশবচন্দ্র শুধু লিখিয়া আর বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। কেশবচন্দ্র বাগ্মী ছিলেন, বাক্যবাগীশ মানুষ তিনি ছিলেন না—তিনি ছিলেন কর্মী, তিনি ছিলেন কর্মবীর। ইতিহাসে তাঁহার প্রকৃত গৌরব এবং মাহাত্ম্য এইখানেই। সাধারণ মানুষদের কল্যাণের জন্য কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রমিক-বিদ্যালয় এবং কারিগরদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের বিবরণ এক গৌরবজনক অধ্যায় এবং সমাজহিতব্রতী কেশবচন্দ্রের জাতিগঠনের প্রয়াসের সহিত ইহাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান দুইটিতে শ্রমিকশ্রেণীর লোকদিগকে বাংলাভাষার মধ্য দিয়া সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ইংরেজি শিখানো হইত; আবার যাহারা শ্রমিক নহে, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, তাহাদিগকে হাতে-কলমে নানাবিধ কারিগরী কাজ শিখানো হইত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেশবচন্দ্র স্বয়ং একজন ছিলেন। ইহার ভিতর দিয়াই তিনি সেদিন অজ্ঞাতসারে শ্রেণীহীন সমাজগঠনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের ছিল প্রখর ইতিহাস-সচেতন মন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে আসিয়া তিনি হৃদয়-মন দিয়া উপলব্ধি করিলেন যে সভ্যতার অগ্রগতির পথে, বিবর্তনের পথে মানুষের নিয়তি তাহাকে একদিন একজাতিতে পরিণত করিবেই, মানুষ নিজেকে একদিন এক বৃহৎ মানবপরিবারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিবেই। *Brotherhood of man*—মানুষের এই নিয়তিকে সেদিন তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন। তাই তিনি জাতিগঠনের জন্য জাতিভেদপ্রথার অসমীচীনতা উপলব্ধি করিলেন। ধর্মের বেদী হইতে, বক্তৃতামঞ্চ হইতে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রের কণ্ঠ ছিল সরব। এইভাবে আমরা যদি কেশবচন্দ্রের কর্মজীবন গভীরভাবে অনুশীলন করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, জাতিগঠন করিতে হইলে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভৃতি যতপ্রকার মতের আলোচনা ও প্রচার করিতে হয়, কেশবচন্দ্র তাহার কিছুই বাদ দেন নাই। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারাকে পরবর্তীকালে যিনি বাস্তবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার রাজনৈতিক মানসপুত্র রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। ধর্মকে বাদ দিয়া জাতিগঠন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ভারতবর্ষে বহুবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের বসবাস। নানা শাস্ত্র, নানা তত্ত্ব, নানা মত। অথচ এক অখণ্ড জাতির জন্য প্রয়োজন একটি শাস্ত্র, একটি তত্ত্ব, একটি ধর্ম। নববিধানের ভিতর দিয়া কেশবচন্দ্র আনিলেন এক সুষ্ঠু সমন্বয়—যে সমন্বয়ের পথে বর্তমানের পৃথিবী আজ চলিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। সকল ধর্মের, সকল ধর্মশাস্ত্রের, সকল ধর্মপ্রবর্তক ও সাধু-মহাপুরুষদের, এবং সর্বোপরি সকল সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা কেশবচন্দ্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শিক্ষার অনুশীলন আজ প্রয়োজন। ঈশ্বরে বিশ্বাস জাতিকে কতদূর সংহত ও শক্তিশালী করিতে পারে, ধর্মবিশ্বাস জাতিগঠনের পক্ষে কতখানি অপরিহার্য—কেশবচন্দ্রের মহাজীবন হইতে আজ যেন আমরা সেই পাঠ গ্রহণ করিতে পারি। "For the last twenty years have I laboured in the cause of God and of India."—কেশবচন্দ্রের এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া আমরা যেন জাতিগঠনে তাঁহার বিবিধ কর্মপ্রয়াসের মর্ম অনুধাবন করিবার চেষ্টা করি।

●

বিশ্বকর্মার আপন জন

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

দিন-দুপুরে চোখের সামনে এতবড় রাহাজানিকে চুরি নয়, ডাকাতি বললেই ভালো হয়। অথচ তার এতটুকু জানতে পর্যন্ত পারলুম না। আমার নাকের ওপর দিয়ে ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর এখন টনক নড়ল। চোখ চেয়ে এখন দেখে শুধু ভাবছি এদের পেটে পেটে এত! কোথা থেকে খবর পেয়ে এমন পিলপিল করে আমারই অজান্তে আমারই বাক্সের (কিসের বলুন তো?) দিকে হানা দিতে সাহস করে! বলিহারি যাই এদের কাণ্ড দেখে, তা-ও কিনা এই চলন্ত ট্রেনের দোদুল্যমান কামরায় বসিয়ে রেখে এমন নির্লজ্জভাবে ঠকিয়ে দিয়ে গেল।

ট্রেনে যাচ্ছিলুম কলকাতার খানিক দূরে—সঙ্গে ছিল অগতির গতি কিছু মিষ্টি রসদ। যোগাযোগে শেষকালে তার থেকে হয়ে গেল চুরি। টেবিলের ওপর বাক্সটি রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারিনি (কেউ যেন ট্রেনে এমন অবস্থায় রেখে পারে!), ঘুমোবার ভান থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে মিটমিট করে দেখে নিচ্ছি ট্রেন থামলে—বাক্স বেহাত হয়নি তো? কিন্তু হঠাৎ একবার নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে-যেতেও পারলুম না। দেখলুম বাক্সের দিকে গটমট করে একটা বিরাট রেজিমেন্ট ধাওয়া করছে। তখন উঠে না বসে আর কি করা যায় বলুন? কয়েক শো পিঁপড়ের দল আমার মিষ্টির ওপর অসতর্ক আক্রমণ করেছে। কোথা থেকে এসে কেমন করে যে এরা চড়াও হলো তা ঘুণাক্ষরে টের পাইনি এতক্ষণ। ট্রেনের মধ্যে এই ভ্রাম্যমাণ ডাকাতের দল থেকে সাবধান হবার কথা কামরায় লেখা থাকে না। কাজীর কাছে এদের বিচারে পাঠালে এদের সাজা হ'ত সর্বনেশে।

স্বপক্ষ নিয়ে পিঁপড়েদের ব্যারিস্টার যদি সওয়াল করতো, তাহলে সে বলত: সব পিঁপড়ে এমন বে-আক্কেলে নয়। সব মানুষ যেমন ভালোমানুষের-পো নয়, তেমনি পাঁচটা পিঁপড়ের মধ্যেও আচরণ-বিচরণের অনেক পার্থক্য আছে। একজনকে দেখে সবাইকে বুঝবেন না। আর তা ছাড়া এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবটির সঙ্গে মানুষের কোথায় যেন এক অদ্ভুত মিল আছে। এরা মানুষের মতোই ধুরন্ধর, অনেক বুদ্ধি এদের পেটে পেটে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে এদের নাকি মন ব'লে কিছু আছে (তার সত্যি-মিথ্যে পিঁপড়েরা জানে)—তা না হলে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ এমন সুনিপুণ ভাবে এরা করতে পারে? পরের মৌচাকের দিকে ধাওয়া করা নেহাত মূর্খের কাজ নয়। মানুষ জন্মাবার বিশ-তিরিশ কোটি বছর বা তারও আগে এই পৃথিবীতে পিঁপড়েরা অবতীর্ণ হয় এবং এদের সমাজ-ব্যবস্থার অদ্ভুত এক সাফল্যের ক্রমপরিণতির ইঙ্গিত সেই থেকে পাওয়া যায়। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির যেমন সব ধাপগুলি আজ আর কারো বুঝতে বাকী থাকে না, তেমনি পিঁপড়েদের

জীবনাদর্শের মধ্যেও অনুরূপ এক ক্রমোন্নতির পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়।

মানুষের বিবর্তনের প্রথম ধাপে যে সমাজ-ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, সবচেয়ে প্রাচীনতম পিঁপড়েদের জীবনাদর্শে তার অনুরূপ প্রকাশ আজও দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় মানুষ জীবন কাটাতো শিকারীর বেশে। সবচেয়ে প্রাচীনতম পিঁপড়েদের বলা হয় ডোরিলিন (Doryline)। এরা শিকারীর (hunter) জীবনে অভ্যস্ত। এরা চোখে দেখতে পায় না—তবু তাতে কুচ-পরোয়া নেই। তবু শিকারের ফিকিরে এরা ঘোরে। এরা মাংসাশী। এদের বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ডোরিলাস লেবিয়েটাস (D. labiatus)। এরা লুঠতরাজ করে, কেড়েকুড়ে নেয়। খুব স্থূল এদের জীবনাদর্শ। এদের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান থাকে না। কখনও কখনও সেরকম জিনিসের ওপর রাহাজানি করে সটান ভেঙে পড়ে।

রাজা

ডিম

দাস

রাণী

এর পরের স্তরের যে-সব পিঁপড়েদের দেখতে পাওয়া যায়, তাদের সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের গ্রামীণ সভ্যতার অনুরূপ। গাছের রস এদের প্রধান খাদ্য। এফিড (Aphid), স্কেল ইনসেক্ট (Scale insect) প্রভৃতি পতঙ্গদের এরা গরু হিসাবে পোষে—যাদের এককথায় 'পিপীলিকা-ধেনু' বলা হয়। এইসব পতঙ্গদের দেহনিঃসৃত রস এরা গোদুগ্ধ হিসাবে পান করে। গাছের নীচে গোয়ালঘর করে এরা নিজেদের গরুকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। দুধ দুইবার সময় যে-সব শ্রমিক পিঁপড়ে গোয়ালার কাজ করে, তারা তাদের শুঁড়ের মৃদু চপেটাঘাত করে বলে—এবার ছাড়ো। এদের ডেয়ারির ব্যবস্থা দেখলে মানুষকেও অবাক হতে হয়। এই জাতের কোনো-কোনো পিঁপড়েদের খাওয়াটা মাঝে মাঝে এত বেশী হয়ে যায় যে তাদের পেট ফুলে একেবারে জয়ঢাক। তখন তারা মাটির নীচের গর্তে এসে চলৎ-শক্তি রহিত হয়ে ঝুঁকি না নিয়েই ঝুলে থাকে। এই সম্প্রদায়ের অন্যেরা, যারা প্রকাশ্যে বাইরে চলাফেরা [illegible] হলে এইসব পেটুক তাদের কাছে যখন এসে দাঁড়ায় তখন তাদের আধ-চিবনো খাবার (regurgitated food) এরা আবার খাওয়ার জন্যে পায়। আমাদের ঘরদোরের খুদে কালো পিঁপড়েরা, যাদের গালভরা নাম ক্যাম্পোনোটাস কনফুসি (Camponotus confucii) তারা এই পর্যায়ের জীব। এদের নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি থাকে।

এর পরের পর্যায়ের যে-সব পিঁপড়েদের দেখা যায়, তারা যেন প্রাচীন সভ্যতার আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে গিয়ে নিজেদের সমাজ-ব্যবস্থার বনিয়াদ তৈরি করেছে। এদের মধ্যে কোনো কোনো পিঁপড়েরা বীজ সংগ্রহ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ চাষী শ্রেণীর মতো। বিজ্ঞানীরা এদের বলেন মিরমিসাইনে (Myrmecinae)। মাটির নীচে বা ওপরে এরা ছত্রাকের চাষ করে। মনোমতো করে এরা নিজেদের পিপীলিকা-উদ্যান সাজায়। শ্রমিক পিঁপড়েরা বীজ সংগ্রহ করে আনে। চাষের জন্যে শুকনো পাতার ক্ষেত তৈরি হয়; তার ওপর পছন্দসই ছত্রাকের চাষ। বাগান সাজাতে অন্য ছত্রাকের ধার তারা ধারে না। ছত্রাক গজালে, তার মাথাগুলো কেটে এইসব পিঁপড়েরা নিজেদের খাবার হিসাবে ব্যবহার করে। ধানচাষের পর এ যেন তাদের নবান্ন উৎসব [illegible] নিজেদের রেচন পদার্থ চাষের সার হিসাবে এরা [illegible] করে। এই জাতের একরকম পিঁপড়ে আমাদের বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায়—তাদের নাম সলিনপসিস্ নাইটেনস্ (Solenopsis nitens)। মাঠে-ঘাটে এদের অনেক আত্মীয় দেখতে পাওয়া যায়। এদের একদল জাতিভাই এক নম্বর চীজ। তাদের চলতি কথায় ফায়ার-অ্যান্ট (Fire-ant) বলা হয়। কারণ বোধকরি বুঝিয়ে বলতে হবে না। কোনো অসতর্ক মুহূর্তে এদের খপ্পরে পড়লেই বুঝিয়ে দেবে কেন 'Fire' বলা হচ্ছে।

টির নীচে পিঁপড়েদের ভাঁড়ার-ঘর ; সেখানে কতকগুলি পিঁপড়ে খেয়ে-দেয়ে ফুলে ডাউস হয়ে 'জীবন্ত জালা'র কাজ করে ; ক্ষুধার্ত কোনো পিঁপড়ে এলে, 'জীবন্ত জালা' থেকে আধ-চিবনো খাবার পেয়ে খুশি হয়ে আবার চলে যায়।

অনেকে বলেন মানুষের উঁচু দিকটাতেই নাকি অধঃপাত সবচেয়ে বেশী। পিঁপড়েদের বেলায় এ-কথা সত্যি। ওদের সামাজিক জীবনের শীর্ষে যত চুরি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি। আর সব পিঁপড়েদের চেয়ে এই উচ্চপর্যায়ের অ্যারিস্টোক্রেটিক সমাজে যত প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, আস্ফালন ও উৎপাত। এই সমাজের বাস্তবচিত্রে জাতিভেদ সুস্পষ্ট। এখানে কেউ রাজা, কেউ রাণী, কেউ শ্রমিক, কেউ যোদ্ধা, কেউ দাস। একজনের ভারি আর একজনের ওপর বড্ড জোর দিয়ে পড়ে।

পিঁপড়েদের সমাজে রাণীর কদরই সবচেয়ে বেশী। যৌবরাজ্যে, রাণীর যেদিন অভিষেক হয়, সেইদিনই রাজাজির পদপ্রাপ্তি ঘটে। রাজার এই একদিন-কা-সুলতান হওয়ার একটা করুণ কাহিনী আছে। শোনাই। রাজারাণীর মিলন হয় মহাশূন্যে যখন পুরুষ আর স্ত্রী পিপীলিকা আকাশে কামনার ডানা মেলে ওড়ে। রাণীর সঙ্গ-কামনায় তার পিছু পিছু অনেক পুরুষ আকাশে ধাওয়া করে। যৌন আকাঙ্ক্ষার সেই শূন্য-বিহারের নাম নাপ্‌শেল ফ্লাইট (Nauptial flight)। মিলন মধুর না হতে হতেই রাজা মাটিতে এসে মৃত্যু বরণ করে অচিরে। আর নারী পিপীলিকাটি মাটিতে নেমে এলেই শ্রমিকরা তার ডানা কেটে তার শরীর মুচায়—পাছে আবার উড়বার দুর্বার বাসনা তাকে পেয়ে বসে। অথ বিরাট এক নারী-ঘটিত ব্যাপার। এসব রাণীর চোখে 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' নয়। সেই সব অভিসার সুখে সুখী নারী পিপীলিকাকে শ্রমিকরা নিজেদের কলোনিতে নিয়ে এসে রাণীত্বে বরণ করে। রাণী ওদের শাসন করে না—রাণীকেই এরা শাসন করে। পিঁপড়েদের রাজত্বে পদার্পণ করে অবধি রাণীর কাজ শুধু অজস্র ডিম পাড়া। যেদিন তার ডিম-পাড়া শেষ হবে সেদিন তার রাণীগিরিও সাফ—শ্রমিকরা 'দূর ছাই' করে তাড়িয়ে দেবে। রাণীর প্রসব-সৌকর্য দেখলে চমকে যেতে হয়। প্রতিদিন সে অজস্র ডিম পাড়ে, এবং তা বছর বছর ধরে চলে। পিঁপড়ে-রাজত্বে শিশু-মঙ্গলের নিখুঁত সব ব্যবস্থা আছে। শ্রমিক মাসী-পিসীরা এসে ডিমের তদারক করে এবং তাকে নিয়ে নার্সারির গ্যালারিতে রেখে আসে। মার চেয়ে মাসীর দরদই এখানে বেশী। দিনের বেলা তারা ডিম বাইরে রোদ্দুরে নিয়ে যায়, আবার রাত্রিবেলা অন্ধকার ঘনাবার সঙ্গে সঙ্গেই ডিমগুলোকে তারা গর্তের ভিতর নিয়ে আসে। এইরকম করে পরের স্নেহযত্নে রাণীর পাড়া ডিম পূর্ণাঙ্গ হয়ে ফুটে ওঠে এবং এই মাসী-পিসীর অনুকরণে জীবনধারণ করতে শেখে। কারা এইসব মাসী-পিসী? এদের মাসী-পিসী না ব'লে, সঙ্ঘমিত্রা বললেই যেন ঠিক নাম দেওয়া হয়। এরা অপরিণত স্ত্রী-পিপীলিকা (Infantile females)। এরা শ্রমিক—শুধু সেবাই এদের ধর্ম। এরা পরার্থে আত্মনিয়োগ করে। একবার ভালো খেলে-পরলে এইসব অপরিণত স্ত্রীদেহে যৌবন পুষ্পিত হয়ে উঠতে পারে। এইসব স্ত্রী-পিপীলিকার মধ্যে রাণী হওয়ার সখ জাগে। কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণী অপরিণত স্ত্রীরা সুখ-মরীচিকার সহজে ভুলতে চায় না—তারা নারীর মহিমা আর্তের সেবায় প্রতিফলিত করে ধন্য হয়।

পিঁপড়েদের মধ্যে দিক্-চেতনা বোধ প্রখর। তারা পথ চিনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। তারা জলের ওপর নিজেদের দেহ বিসর্জন দিয়ে ব্রিজ তৈরি করতে পারে। তাদের মধ্যে দলাদলি, মামলা-মোকদ্দমা হয় না। একেবারে 'যুদ্ধং দেহি' করে দু'পক্ষ দু'পক্ষের দিকে এগিয়ে আসে। কেউ সেখানে শান্তির দূত হিসাবে পারাবত উড়াবার কথা কয় না।

একই ঢিপির বা কাছাকাছি ঢিপিদের মধ্যে লড়াই বাধে। এইসব যুদ্ধের কারণ খাবার বা আশ্রয় ছিনিয়ে নেবার জন্যে বা পরাজিতদের দাস হিসাবে খাটানোর জন্যে। তারা দলবলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের মুহূর্তে লিডারশিপের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যুদ্ধের সময় কর্তাব্যক্তিরা গুঁতো দিয়ে যুদ্ধ-পরাঙ্মুখদের উত্তেজিত করে তোলে। ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, জীবন দাও ঢালি। একপক্ষ অন্যপক্ষের আক্রমণ সাধ্যমতো প্রতিহত করে। অনেক সময় *NATO, SEATO* বিভিন্ন গোষ্ঠির মতো সবল আর দুর্বল জাতের পিঁপড়েদের মধ্যে সাময়িক মিতালি হতে দেখা যায়। চুক্তিবদ্ধ হতে হয়—শত্রুপক্ষের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতেই হবে। দক্ষিণ আমেরিকার ক্যাম্পোনোটাস (Camponolus) ও ক্রিমেসটোগেস্টার (Cremastogaster)—এই দুইরকম ছোট-বড় পিঁপড়ে একই গাছে থাকে—এক আর-এককে রক্ষা করে প্রয়োজন হলে। তবে মানুষের মতো পিঁপড়েদের হাতে অ্যাটম-বোমা থাকে—এমন কথা শোনা যায়নি।

দাস হিসেবে অন্যশ্রেণীর পিঁপড়েকে খাটানোর ব্যাপার দেখলে সেই মিশরে পিরামিড-তৈরির দিনের কথা মনে পড়ে যায়। শ্রমিকরা পরাজিতদের ডিম ও [illegible] মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায় এবং পরে দাসানুদাসদের কাজ করায়। এ-কাজ স্বগোত্রীয়দের জন্য নয়—অন্যদের জন্য। দাসদের সেবার ব্যাপারে প্রভুরা একটুও উদাসীন নন। একটু কসুর হলেই প্রভু ভৃত্যের মাথায় গাঁট্টা মেরে বুঝিয়ে দেন: এই ভুলো মাৎ!

এই খুদে-খুদে জীব, যাদের দু'আঙুলের চাপে মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দেওয়া যায়, তাদের মধ্যেও জীবন সম্বন্ধে এত অভিসন্ধি—এ যেন অবিশ্বাস্য। মানুষ জন্মাবার আগেই বহুলাংশে মানুষের অনুরূপ বুদ্ধির মহড়া পিঁপড়েরা পৃথিবীতে দেখিয়েছিল। তারা কিন্তু মানুষের মতো সমান বুদ্ধির [illegible] কখনও হতে পারবে না, কারণ শ্বাস-প্রণালীর গঠনের অক্ষমতার জন্যে এদের দৈহিক বিস্তার ঘটবার আর সম্ভাবনা নেই। থাকলে কী হতো তা এখন বলা মুশকিল।

●

আধুনিকাদের জন্যে আমাদের পাঞ্জাবী মাকড়ী অনবদ্য!

দত্ত এণ্ড পাইন ব্রাদার্স
ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স
৯১/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন-৩৪-৩০৬৪

মডার্ন ডেকরেটর্স
শুভ বিবাহ ও যে কোনো উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়।
৬৫-এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট • কলিকাতা - ৬ • ফোন-বি,বি, ২৫৪৯

চেনাশোনার বাইরে

অজয়মোহন ভট্টাচার্য

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। লেপ গায়ে দিয়েও শীত যাচ্ছেনা।

তবু ঘুম আসে।

সকাল হয়।

রোদ হাসে।

বুদ্ধু ডাকে—"উঠুন উঠুন, ভটচায্যিদা—তাঁবুর মাথায় যা বরফ, ফেলে না দিলে চাপা পড়বেন।"

চারধার ঝকঝকে রোদে ভর্তি। ফুলগীয়াম চা আর পরোটা নিয়ে আক্রমণ করেছে।

পরোটা ওর হাতে সমর্পণ করে চা খেয়ে নিলাম। জুতোয় পা-টা ঢুকিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে—যষ্টি হাতে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

যেন একটা ট্রান্সের মধ্য দিয়ে চলেছি।

আমার যে আসল সত্তা বার বার আমার মনে করিয়ে দেয় আমি 'আমি'ই, অন্য কেউ নই—সেই সত্তাটি যেন অগোচরে কোথায় খসে পড়েছে, আমাকে বহন করে নিয়ে চলেছে আমার অভ্যাসগুলো। যা-কিছু করে চলেছি, সেই অভ্যাসের দাসের মতো; স্বাধীন-ইচ্ছা-বিহীন।

কাল সেই রাত, যে রাতে আমি বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলাম আমার নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়ায় ভীত। সেই অসহায়তার মধ্যে যার হাত আমায় নিরাপত্তার পক্ষপুটে টেনে নিল সে তো নারীহস্ত—সন্দেহ নাই। অথচ এ ক্যাম্পে নারী কৈ? কে এ নারী?

চট করে বলতে পারিনা কারুকে; জিজ্ঞাসা করতে পারিনা। হাসি দিয়ে ওড়াবে, নয় সন্দেহ দিয়ে পোড়াবে। চুপ করে রইলাম। এই রহস্য ভাঙতে হবে।

মনে পড়লো ডাক্তারকে। ওর কাছে যাই। ওকে দিয়ে সুবিধামতো জানাতে পারলে জানাবো।

নামতো, দেখি শ্রীমহাজন হাতে ছড়ি নিয়ে উঠে আসছেন। গোপী বললে—"ডাক্তারসাব—আমার পান চাই। মহাজনকে বলুন না আপনি।"

বিক্রম বললে—"আর তাঁবুটা ঠিক করার কথা।"

মহাজন এসেই বললেন—"অবাক কাণ্ড, এ সময় বৃষ্টি আর ঝড় কখনও দেখিনি। কী ভোগান্তিই গেল আপনাদের! আজ আকাশ দেখে মনে হচ্ছে এবার ভালো সময় এলো। তাঁবু ঠিক আছে? জল পড়ছে না তো?"

আমি বললাম—"না, ভেতরে জল নেই। বেশ আছি। তাঁবুটা বড্ড উঁচু—তাই মাটির তলা দিয়ে হাওয়া আসছে। সময়মতো লোক পাঠিয়ে দেবেন, ওটা যাতে ঠিক করে দেয়।"

শ্রীমহাজন তাঁবুটা দেখে একটু মুচকি হেসে বললেন—"ওঃ বাবা, এ গোলমাল সারতে যে বড্ড সময় লাগবে। চট্ করে হবার জিনিস নয়তো। অনেক লোকের, অনেক সময়ের কাণ্ড।"

কণ্ঠস্বরে বুঝেছিলাম রসিকতা করছেন।

বলতে বলতেই তাঁবুর প্রধান বাঁশটা, যেটা চারখানা পাথরের ওপর রাখা ছিল, সেটা সরিয়ে মাটিতে রেখে দিতেই তাঁবুটা নেমে এলো, ফাঁকটা বুজে গেলো। বোকামি করে দু'রাত শীতে কেঁপেছি।

হাসির রোল পড়লো।

এই সুযোগে আমি ঝাড়লাম—"সহজ উপায় বার করবার তো আপনি দেখছি একেবারে জার্মান ইউ-বোটের অ্যাটম-বোমা। আমার আর-একটা সমস্যার সহজ জবাবে জবাব করে দিন।"

হেসে বললেন—"বলুন—"

"দেখুন, পান এখানে পাওয়া যায় না।' অথচ পান নৈলে আমি না মরি, আমার এক বন্ধু তো মরবেই। এক বা দু'টাকার সাজা পান আপনি শিলং থেকে পাঠিয়ে দেবেন, নয়তো একটা কফিন। বন্ধুর মৃতদেহ ফেলে রেখে যাবনা।"

শ্রীমহাজন ছড়ি ঘুরিয়ে বললেন—তোবা, তোবা! পান কাল পাবেন। জীপের ড্রাইভারের কাছে খোঁজ করবেন।"

অন্ত তাঁবুর তদারকে গেলেন। আমি ছেলেদের কাজে পাঠিয়ে ডাক্তারের সন্ধানে বেরুলাম।

গোপী বললে—"যান্, আজ আপনি আমার কাছ থেকে বেড়কটা বেশী কাজ নিন।"

বিক্রম বললে—"থাঃ, বকিসনে। তোলাজ্ঞ কাজ করিস তো তোর জান যাবে কেটে। বেড় কটা!"

গোপী বললে—"জী জনাব—চলো কাজে, বেলা যাবে।"

ফুকনে চা আর গাঁইতি নিয়ে চলে গেল খুঁটিমনে।

কোদাল, শাবল, গাঁইতি, লম্বা লম্বা বাঁশ-শাবল, কেলচা, কুড়ুল, করাত—প্রভৃতি কাঁধে নিয়ে নিয়ে ছেলেরা দলে দলে বেরিয়ে গেল। এক একটা দলকে দেওয়া হয়েছে প্রায় দু'ফার্লং জায়গা। এমনি দল হয়েছে বারোটা। শেষ দলটাকে হেঁটে যেতে হয় দু'মাইল; আসতে হয় দু'মাইল। ক্যাম্পের বাঁ ধারে একমাইল, ডান ধারে দু'মাইল—এই তিন মাইল পথ কেটে চওড়া ক'রে, জঙ্গল সাফ ক'রে দিতে হবে।

দেখছি ঐ-যে যানাতে যাচ্ছে—ও তো আবেরাবাদের ডাক্তার, মুনিসিপাল কমিশনার। ওর কাঁধে বাঁশ-শাবল। ঐ যাচ্ছে যোগী—ওর সেগুনায়ের কারখানায় কাজ করে দু'শো লোক আর ও নিজে ওকালতি পড়ে। ও কেলচা আর সুঁকি নিয়ে চলেছে। আর চলেছে কনকঝাও—বেকওয়াতার পত্রিক-সভার সম্পাদক, পানের ব্যবসায়ী, অন্ধ্র-প্রদেশ গঠন আন্দোলনের একজন অগ্রণী;—ও চলেছে দু'হাতে দুটো শাবল দোলাতে দোলাতে। এবার ম্যাট্রিক দিয়ে এসেছে রামমূর্তি, এসেছে মীর্জাপুর থেকে, সে যাচ্ছে কুড়ুল কাঁধে; কালই ঐ অবিনাশ এসেছিল জিজ্ঞাসা করতে ইতিহাস মনে রাখার কী উপায়, সেটা ওকে বলে দিতে হবে—এদিকে [illegible] এম.এ.। প্রথম বিভাগে পাস করেছে। আর একটা [illegible] দিয়ে আই.এ.এস. পরীক্ষায় বসবে। ও নিয়ে [illegible] করাত—গাছ কাটবে বলে। এইসব ছেলেরা [illegible]তো, পারুক না-পারুক আসে যায় না, চলেছে এই [illegible] এই জেদ।

•

[illegible] ১০ মিনিট। নেমে এসেছি ডাক্তারের এলাকায় [illegible] ডিস্পেন্সারির সামনে কাঠি-বাখারির টেবিল পাতা। কম্পাউণ্ডার কার একটা ঘায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। ডাক্তার একটা প্রেস্ক্রিপশন লিখছে। সামনে একটা ঘোড়া বাঁধা। অনেকগুলো লোক মাটিতে উবু হয়ে বসে। রুগী। আশেপাশের গাঁ থেকে এসেছে।

ঘোড়া দেখে বললাম—"ডাক্তার কি ডাকে চললেন নাকি?"

"হ্যাঁ। যাবেন? চলুন না। এই, আর একটা ঘোড়া নিয়ে আয়।"

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললাম—"ক্যাম্প থেকে চলে যাই কি করে?"

ডাক্তার বাঁকা-চাউনিতে হেসে বললেন—"বটেই তো; সূর্য-চন্দ্র নড়িয়ে দেবার ভারও তো আপনার!"

লজ্জিত হ'লাম।

ডাক্তার বলে চললেন—"বড্ড egocentric লোক আপনি।"

লাল হয়ে গেলাম।

তখন ঘোড়া চলেছে বেগে ঢালু পথ বেয়ে। জঙ্গলটা ওপরের দিকে। নীচের পথটায় শুধু একটা পাকদণ্ডী। কিন্তু গভীর ছায়ায় ঢাকা পথ। সাক্ষ্য দেয় পথের বন্ধুরতা, সাক্ষ্য দেয় নিপীড়িত পাদস্পৃষ্ট জীর্ণপত্র, সাক্ষ্য দেয় মাঝে মাঝে খেয়ে যাওয়া পাহাড়ের ঝোড়ের মাথায় ভস্মরাশি। এ পথ পায়ে-চলার পথ—নিয়ে গেছে লোকবসতির মধ্যে। কিন্তু সে-বসতি আসতে এখনও ঢের দূর।

ডাক্তার হঠাৎ বললেন—"চলবে নাকি?"

অবাক—চেয়ে দেখি পকেটে চ্যাপ্টা বোতলে বিলিতী সুরা।

আমি বললাম—"সত্যিকথা ভাই, খাইনা; বড়ো বাজে সংস্কারে। তা ছাড়া বাবার নিষেধ মেনেই এসেছি অদ্যাবধি। আমাদের জোর কথা বোলোনা, ভাই। ভালোছেলে হবার দুরাশা ও লোভ পরিত্যাগ করতে আজও পারিনি।"

"তাইতো শিক্ষকরা বড়ো হয়না।"

"আর বড়োরা শিক্ষক হয়না।"

ডাক্তার হেসে বললেন—"বড়ো—বড়োই।"

আমি তাল পেয়ে বললাম—"শিক্ষক শিক্ষকই—বড়ো নইলে চলবে, শিক্ষক চাই। তান করার জন্যও, বুজরুকির জন্যও শিক্ষক চাই-ই।"

নামছি তো নামছিই। এর মধ্যে একেবারে ঘোলাখুপি ঘোরের মধ্যে এসে পড়েছি। দুটো পাহাড়ের ঢালের পেছুট যেখানটায় এসে গায়ে গায়ে ঠেকাবার চেষ্টা করছে, সেখানে সেখানে সজল ব্যবধান; সেখানে সেখানেই একেবারে চুলের কাঁটায় বাঁক, আর সেখানে সেখানেই বন্যরাজ্য। পাহাড় সুন্দর, বন সুন্দর, বর্ষা সুন্দর, কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে

দিন খাবার জায়গাটার মতো সৌন্দর্য খুব কম দেখা যায়। সেখান থেকে চাও, দূরে আরও দূরে চাও, দেখবে আকাশ নেমে নীচে, সমতল যেন ছুঁতে পারো চোখ বাড়িয়ে। পাহাড়ে দিগন্ত দেখা একটা কামনা, তৃষ্ণা। কথায় কথায় উন্মুক্ত প্রান্তর পিয়াসী দৃষ্টি বাধা পেয়ে ফিরে আসে। বাধা পায় বটে, কিন্তু আঘাত পায়না। এমনই শ্যামল সরসতায় ভরা সেই থেমে যাওয়া। তা ছাড়া সেই শ্যামলের দেশে নব নব পত্রপুষ্পের বৈচিত্র্য; অনুসন্ধানী মন তৃপ্তিভোজ লাভ করে।

তবু তারই মধ্যে যখন একটু গলি বেয়ে সেই দৃষ্টি প্রান্তরের পানে ছুট লাগাতে পায় তার আর কথা নেই তুলনা নেই। তাই পাহাড়ের বাঁকের চেয়েও পাহাড়ে পাহাড়ে কোলাকুলির দেশগুলো আরও অভিনব, আরও মনোহর।

ডাক্তার গ্রামটায় পৌঁছালো যখন তখন বেলা হয়ে গেছে। আমি ঘোড়ার ছোটায় ধকলে থেমে গেছি।' কিন্তু দেখলাম আতিথেয়তা ও সম্মান।

এইসূত্রে মনে পড়ে গেল আমার নৈনিতালের তরায়ে থাকার সময়কার একটা ঘটনা। ঘটনা বলি কেন, বিশেষ চিন্তনের ধারা। হাওড়া, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, চেরিং-ক্রসের তুলনায় কাশীপুর জংশন যেন মোহনবাগান টীমের কাছে তেলেনীপাড়া টীমের মতো, ফোর্ড কোম্পানির কাছে জনতা সাইকেল রিপেয়ার্স। তবু কাশীপুরের একটা বিশেষ খাতির ছিল ঐ জঙ্গল অঞ্চলে। ব্যবসাটাও বেশ জোরদার।

সেখানে ইংরাজী উচ্চবিদ্যালয়; তার প্রধান শিক্ষক আমি। এই কাশীপুরের কোর্টে যখন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ওকালতি করতেন, তখন ওই স্কুলেরই তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাই আমাদের গর্ব বড় কম ছিলনা। কিন্তু সে দেশই এমন মজার দেশ যে, লোককে খাতির করার সুযোগ পেলে বর্তে যেতো। আমরা হয়তো নাগরিক ঝাঁকের মধ্যে থেকে এইজাতীয় উৎকট আতিথেয়তাকে সোজা গ্রাম্য বলে উড়িয়ে দেবো। তবু মানবতার বাজারে এইসব গ্রাম্যতার সুর কেমন যেন সুরেলা বাজে, কেমন যেন মধুর ঠেকে।

গ্রাম আর শহরের মধ্যে চলে-ফিরে দেখলাম, *smart* হওয়ার শহরের জৌলস যেমন খোলতাই হয়, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যটুকু করতে পারলে যেন গ্রাম্য লোকের মনটা ভরে ওঠে। সাধারণভাবে বোকামিটাকে ওরা কেমন যেন মানিয়ে নিয়েও খুশি করতে পারে। শহরে সব সয়, ঠকে যাওয়া সয়না। তাই প্রাণপণে বোঝাবুঝি সেয়ানে সেয়ানে।

এই কাশীপুরের দু-একটা বোকামির কথা শুনলে হাসবেন আপনারা। এখন মনে করে আমার কান্না পায়।

অনেকদূরে একটা তেলের কল। সরষে হয় খুব কাশীপুরের আশেপাশে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে কল দেখতে গেছি। দেখে ফিরে এসেছি।' পরদিন বাড়ীতে একটিন তেল। ভেট দিলে বুঝি, ভেবে চটে গেলাম; বললাম—"ফিরিয়ে নিয়ে যা—এক্ষুনি যা"—আমরা যে শহরে চটপটে স্মার্ট। তাই সত্যসন্ধতা ও ন্যায়নিষ্ঠাটাও আমরা ঝাঁকের মধ্য দিয়ে দেখাতে ভালবাসি! সন্ধ্যাবেলায় মিল-মালিক বৃদ্ধ রঘুবরদয়ালজী এসে বললেন—"মাস্টারজী, আমি একা। আমার ছেলেপিলে কেউ নেই যে তোমার স্কুলে পড়ে এবং সেইজন্য ভেট পাঠাবো। তুমি সম্মানিত বিদেশী। এই ঘোর বনে এসেছো এদেশের বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়াতে। আমার মিলে গেলে, তোমার খাতির করব না? কি বলো? তোমার দেশে গেলে তুমি কি আমায় কলকাতার রসগোল্লা খেতে দেবেনা?"

এমনি একবার সাবিত্রী পাহাড়ে উঠেছি। তখন সবে ভোর। পাহাড়ে উঠতেই সাবিত্রী-মন্দিরের পাণ্ডা ঢিপ্ করে আমার পায়ে এক প্রণাম। পায়ে মাথা রেখে প্রণাম কেমন যেন সহ্য হয়না। তাতে তীর্থস্থান, এবং প্রণাম যিনি করলেন তিনি সেই দেবমন্দিরের পূজারী।

আমি কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন,—"রাগ করবেন না, বাবুজী। আমি কাল বিকেল থেকে আপনার অপেক্ষায় আছি। আমার লোকেরা বললে বাংগালী বাবু, খদ্দর পরা, এসেছেন, মাথায় গাঁধীটুপী—আমি সারারাত হাঁ করে বসে আছি খবর জানার জন্যে।"

বিস্মিত আমি।—"কী খবর?"

"হ্যাঁ বাবু, সামনে দেবী-মাঈ। সত্যি করে বলো তো, সুভাষবাবু বেঁচে আছেন কিনা?"

সেই একান্ত নির্ভরশীল প্রশ্নের সম্মুখে আমি আমার স্মার্টনেস দেখাতে পারিনি। আমি বললাম—"তোমার কি মনে হয়?" প্রশ্নের উদ্দেশ্য, একটু সময় নেওয়া এই আর্ত সরলতার আক্রমণ থেকে একটু আত্মরক্ষা করার জন্য।

পাণ্ডা বললো—"মরেনি বাবু, মরেনি। কালীবাড়ীর পূজারী সে। ইংরেজের বেড়া পার করেছে সে। মরেনি সে। তুমি জানো বাবু, বলো।"

আমি সুভাষবাবুর মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাইনি কখনও। কিন্তু সেদিন বিজ্ঞের মতো অটুট প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলাম —"বেঁচে আছেন তিনি। আবার আসবেন। তোমরা কাজ করে যাও—নৈলে এসে হয় বকুনি দেবেন, নয়তো অভিমান করে চলে যাবেন।"

আর একটা ঘটনা বলবো এইসব গ্রাম্যদের স্মার্টনেসের অভাব নিয়ে। ঐ কাশীপুর থেকে আসছি সপরিবার। ট্রেন-টাইমের কিছু ঠিক থাকেনা এসব লাইনে। একটা স্লিপ লিখে পাঠালাম স্টেশনমাস্টারকে—"ট্রেন-টাইমটা জানিয়ে দেবেন।" উত্তরে পেলাম একটু চিঠি—"সময় দশটা আটাশো। তা আপনি যদি দেরিতেও আসেন ক্ষতি নেই। ট্রেন ধরে রাখবো। কষ্ট করে তাড়াতাড়ি করবেন না।"

এখানে পড়তে গেলে কথাটায় হাস্যরসের সম্ভাবনা বেশী। কারণ আমরা স্মার্ট—সাহিত্যিক—দার্শনিক। কিন্তু হীরাবল্লভ যোশী, স্টেশনমাস্টার—কাশীপুর, নৈনিতাল, চাকরির কথা ভাবেনি, কোডের কথা ভাবেনি, জংশনের অন্য গাড়ীর কথা ভাবেনি। সত্যি-সত্যি ভেবেছে তার দেশের বাঙালী অতিথির কথা। তার যেন কষ্ট না হয়।

ভারতীয় আতিথেয়তা বলতে যে প্রবাদ আছে তার আসল রস এইখানে, এবং সে রস পেতে গেলে ক্যান্টিনের সিরাপ খেলে চলবেনা—গ্রামে গিয়ে রস-নিংড়ানো 'কল্‌হ'র ধারে গিয়ে বসতে হবে। গ্রামে না গেলে এই ভারতীয় রস পাওয়া যায়না।

এমনি একখানা গ্রামেই আমি আর ডাক্তার এসে পৌঁছলাম। গ্রামের নাম—কোটী। কোটীর প্রধান গ্রামীণ ধোঁধু। তিনি যে খুব সম্পন্ন তা নন। তবু সরকারের তরফ থেকে তাঁর মারফতই প্রধান খবর চলাচল করে। তিনি মুখপাত্র। কোটী খুব বড়ো গ্রাম নয়। চাষ ভালো হয়। বেশীটাই গম আর যব, কিছুটা চালও হয়। আলুই প্রধান পণ্যচাষ। থরে থরে ক্ষেত সাজানো। গমগুলো সবে বড়ো হয়ে উঠেছে। আলু প্রায় হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে লাল শাক আর সর্ষের চাষ। সবাই খাটছে মাঠ নিয়ে। গরুগুলো ছোটো ছোটো। এতো ছোটো যে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না ওদের গোয়ালঘরের দরজার সাইজ।

কাঠের বাড়ীর ওপরতলায় ওরা বসবাস করে। ওপরতলা বললে ভুল করা হবে। বাড়ীগুলোই একটু উঁচু ভিতের ওপর। ভিত অবশ্য কাঠের ফ্রেমের। ছোটো-ছোটো আট-নয় ধাপ সিঁড়ি। একফালি বারান্দায় উঠলো। বারান্দাটা বাড়ীর ঘরকে বেড় করে চারিধার দৌড়েছে। ছাতাটা টিনের বা কাঠের ফ্রেমের ওপর স্লেট-পাথরের। এ পাথরও ওদের সংগ্রহ করতে হয়। যার যতই সস্তা বাড়ী হোক, গরীবী ঢঙের হোক—বাড়ীর ফ্রেমে একটু কাজ থাকবেই। দেখতে সূক্ষ্ম ও নিপুণ। ওপরের বড়ো ঘরখানিই দরকারমতো দু'খানা বা তিনখানা করে নেওয়া।

বেশীরভাগ ছাদের ওপরেই নানা শস্যের দানা শুকুচ্ছে। তার গাঢ় সোনা-রং থেকে নিয়ে হালকা অতসী-রঙের চৌকো-চৌকো বিস্তৃতির ওপর থেকে দেখে হঠাৎ বিস্ময় লাগে। তা ছাড়া বড়ো বিচালীর স্তূপও আছে ছাদের মাথায়।

আর বাড়ীর তলাটায় গোয়াল। চারধার বন্ধ। একধারে খুব ছোটো একটা চৌকো ফাঁক। আমাদের দিকে একটা তোরঙ্গের ডালা তুললে যেমনটা দেখায় প্রায় তত বড়ো। গরু ভেতরে ঢুকছে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না, সেটা গোয়াল।

এমনি ঘর শীতের সময় ওদের বড়ো কাজ দেয়। বরফে চারধার ঢেকে যায়। এই দরজা ওরা বন্ধ করে দেয়। গরুগুলোকে খাবার দেয় ওপরতলায় মেঝের পাটাতন খুলে। এমনিতে গরম থাকে। এ নৈলে, দূরে থাকলে, গিয়ে গো-সেবা করা হয়ে উঠতো না।

ফলে গ্রামগুলো খুব নোংরা। বাড়ীগুলো ছাড়া তার সামনে পেছনে সব নোংরায় ভর্তি। হাঁটু ডুবে যায় এতো গোবর আর খড়ের স্তূপের ওপর দিয়েই চলাচলের পথ।

ওরই মধ্যে তবু মাঝে মাঝে নিকুনো জায়গা অনেকটা। এইসব জায়গাকেই ওরা 'খলিহান' বলে ব্যবহার করে। যব, গম, ধান সব মলাই-মলাই করে ছাড়ায়, ঝাড়ে, আছড়ায়, গোলাজাত করে।

এদের দেশে গোলা নেই, অর্থাৎ গোলার জায়গা নেই। বড়ো বড়ো চামড়ার শক্ত মশকের মতো। সেইগুলো ভরে-ভরে রাখে। পাট নেই, শন নেই, তাই বস্তা নেই। ঐ চামড়ার বিরাট বিরাট জালার মতো—মশকের মতো। মেয়েরা সব ঝাড়ে, পোঁছে, ভরে রাখে।

এইস্তরে ধরা পড়ে যায় এদের বৃহত্তম সমস্যার কথা সেটা বস্ত্র-সমস্যা। পশুর গায়ের ওপর ভরসা করে পশম সংগ্রহ করা যায়, পশম পাকিয়ে বুনে কাপড় যা করে চমৎকার। সব ঠিক। কিন্তু তুলোর কাপড়? সেট

পায় কোথা থেকে? সাধারণ সমাজে তাই এদের পশমী পোশাকগুলোকে সম্পত্তির মতো ব্যবহার করা হয়। তালি মেরে মেরে আসল কাপড় হয়তো লোপাট হয়ে গিয়েছে তবু কারুর ভরসা হয়না একটা উনী কাপড় ফেলে দেয়। কাচাকাচিও তাই কম। ফলে ওদের কি সামাজিক, কি ব্যক্তিগত, কি দৈনন্দিন জীবনে নোংরামির নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। এক একটা পাহাড়ী ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ির গায়ে নানা ধরনের জীবজন্তু থাকা আশ্চর্য নয়—কেউ উকুন, কেউ পিসু, কেউ কিছু কেউ কিছু, ছোটো-বড়ো কতই নাম।

স্নান ওদের করতে নেই। বাচ্চা জন্মালেও শিশু বা প্রসূতিকে ওরা স্নান করায়না বা করেনা। স্নান কথাটা ওদের ততটাই পাগলামি, না-স্নান কথাটা যেমন আমাদের। ওদের সব-কিছু পোশাক, সজ্জা, গোড়ায় এই নোংরামিকে স্বীকার ক'রে তারপর।

ফলে রোগ নানা ধরনের। তার মধ্যে যক্ষ্মা এবং [illegible]-রোগের আক্রমণ অসামান্য ও বহুল। শুনে আমার চক্ষুস্থির।

ডাক্তার বললে—"কেন, অবাক হবার কি আছে?"

"নেই? কি বলেন? আমরা বাবা দেশে ঐ সমতলে থাকি, পাহাড় বলতে অজ্ঞান। টি.বি. হলেই পাহাড়-পানে মুখ ফিরিয়ে একেবারে চোঁ-চাঁ। ভাবি এখানকার পরিষ্কার জল আর বাতাসে ঐসব রাজ্যের কীট-বীজাণুর দফা গয়া। এখানে ঐসব বৌবাজারী রোগ? বলেন কি?"

ডাক্তার বললেন—"পাহাড়ের সুনাম তার বাতাসের জন্ত; ঠিক। এই বাতাসে ধুলার অভাব, Ozone-এর উপস্থিতি, পাইনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রভাব এসব পাই বটে; কিন্তু পাহাড়ের জল তো ভালো নয়। তবু নদীর জল কতকটা। ঝর্ণার জল কবিতায় ভালো। এক একটি ঝর্ণার ব্যাপার গোটা miniature Zoological garden, মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেললে হয়—"

"তবে? ওদের দেশের পাহাড়ে শুনি…"

"হ্যাঁ, সুইজারল্যাণ্ড আর পীরানীজের কথা আলাদা। ওদের থাকার কায়দায় গরীবি নেই। আমরা যত-না দরিদ্র, তার চেয়ে বেশী আমাদের দারিদ্র্য। দরিদ্র হওয়া প্রকৃতি সহ্য করলেও, দারিদ্র্য প্রকৃতি সহ্য করেন না। এই যে ওঠা-নামা চলাচলের পথ, এই যে শ্রমসঙ্কুল জীবন, এর সঙ্গে প্রচুর খাদ্য নেই, নিয়মিত খাদ্য নেই—আর আছে অনন্ত নোংরামি। বলতে যান, এমন করে পেছু লাগবে সরকার থেকে—বদলিতে বদলিতে মেরে ফেলবে।"

"যক্ষ্মা নয় বুঝলাম অর্থনৈতিক কারণে এসে পড়েছে, বাড়লো কি করে তা?"

"কেন? ঘর তো দেখলেন। শীতের পুরো তিনমাস ঘরে বন্ধ থাকে। এক একটা ঘরে আটদশজন। একই লেপের তলায়, কম্বলের তলায় সব শোয়। ঘরের মেঝেতেই সব থুথু ফেলে। বাকী সব প্রকৃতির তাগিদ-গুলো সারতেও বেশী দূর যায়না। এরপরে তিনমাসের মাথায় যখন ওরা বেরুলো তখন ক'টা টাটকা রইলো? এই কারণে Eskimo-দের মধ্যেও এই রোগ-দুটির প্রাদুর্ভাব সাংঘাতিক মাত্রায় বেশী।"

"অন্য রোগটি কেন ডাক্তার?"

"ওটা আরও গূঢ় ব্যাপার। আপাততঃ এদের খাতির কথায় মাথাটা রেখে যাও। দুধ, ডিম, চা, যা সব এনে হাজির করেছে। ওই টিনে ওটা কি? ঘি বুঝি। সামলাও মাস্টার, সামলাও, নৈলে কি মরে, আর কি চায়ে দেবে পো-টাক ঘি ছেড়ে। সর্বনাশ হবে।"

আঁতকে উঠে বললাম—"চায়ে ঘি?"

"ওমা, জানোনা? এরা মাংস রাঁধে চিনি দিয়ে, চা রাঁধে গরমমশলা দিয়ে। বিশিষ্ট অতিথি এলে চায়ে অবশ্যই এরা ঘি দেবে। বারণ করলে ক্ষুণ্ণ হয়, গাড়োল ভাবে, আর মনে করে সভ্যতার পোষাকে কতো জানোয়ার ভদ্-মার্কা লোকই এদেশে আসে।"

চা খাবার জন্ত প্রাণ আনচান করছে। প্রকাণ্ড একটা রূপার কেটলিতে গরম জলে চায়ের পাতা। দুধটাও এলো রূপার বাটিতে। ওপরে ক্ষীর দেখা যাচ্ছে। এখন ঐ চা যদি কেউ ঘি দিয়ে গুলি-করে, চা মরুক না-মরুক, আমি মরে যাবো।

ঘিয়ের টিনটা সরিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচ জন হাঁ-হাঁ করে উঠলো। যোঁধু সর্দার তো হাত জোড় করে এসে বললো—"বাংলা-মুলুকের হিকমত্ যার আন্দর দের আপনি, ঘি খেতে এতো তকল্লুফ (formality) কেন? ঘি আপনি যথেষ্ট সেবন করতে পারেন। এ গাঁয়ের ঘি প্রসিদ্ধ—[illegible]। চায়ের সঙ্গে ঘিয়ের যেমনটি দোস্তি এমন আর কিছুর সঙ্গে নয়। আসলি ঘিয়ের পহ্চান্ই চায়ের পেয়ালায়।"

ও বাবা, এযে রীতিমতো ব্যাপার! চা খাবো ঘি দিয়ে। ঘিয়ের কলের চিবুকে কয়েকগাছা সোনারঙের দাড়ি দেখাও যে এর চেয়ে সহজপাচ্য বিষয়।

ডাক্তার অবশেষে বললো—"বাঙালীরা সাধারণতঃ ঘি ছাড়া চা খায়না সত্য—কিন্তু এই ভদ্রলোক খুব ধার্মিক ও সাত্বিক। ইনি এঁর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আলামুখীকে উৎসর্গ করেছেন। ঘি খাওয়া ইনি ছেড়ে দিয়েছেন।"

তখন ওদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার সীমা রইলনা। সকৃতজ্ঞ চোখে ডাক্তারের দিকে চেয়ে দেখি ও একটা বোতল থেকে লাল-টুকটুকে আপেলের fermented (আসবীকৃত) রস ঢালছে—আর তার মধ্যে ফেলে দিলে একতাল ঘি।

আমার পাংশু বিস্ময়ের পানে কৌতুকভরে চেয়ে বললে —"'চন্দ্রিকা'র পাতা ছিঁড়ে উনুন জ্বালাতে দেখলে এর চেয়ে কি বেশী বিস্ময় হোতো তোমার বাস্টার?"

ডাক্তারের রসবোধের তারিফ করে বললাম—"বাঙালীর হাড়ের খবর জানো দেখছি।"

হেসে বললে—"জানবোনা? বাংলায় থাকতে কতো বাঙালীর কত ভাঙা-হাড় জুড়ে দিয়েছি!"

•

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তারের ঘরে রুটি আর ডিম খেলাম। কড়া কফি খেলাম পরে।

কিন্তু কিছুতেই পাড়তে পারছিলাম না—যে-কথাটা জিজ্ঞাসা করবার জন্ত প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে। ডাক্তারের মেজাজ আজ ছিঁড়েখুঁড়ে জোট-পাকানো। ঐ কেস্ করবার পর, ঐ ধরনের কথাবার্তা চালানোর পর, একটি বোতল বিলিতী সুরায় জরানো মেজাজ নিয়ে, ঘাঁটাতে সাহস হয়না। কিন্তু আজও তো রাত হবে; আজও যে ঐ তাঁবুতে শোবো; কালকের মতো কি ভেবে-ভেবেই কাটবে: 'কার হাত গত যামিনীতে আমার হাত ছুঁয়েছিল?'

রোমান্স নিয়ে রোমাঞ্চ-বিলাসের বয়স আছে। সে বয়স বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। আর সেই শেষ হবার কথাটি টের পাওয়া যায় শেষ হয়ে গেলে। ও রোগ যতদিন থাকে ততদিনই মনে হয় এ যাবার নয়; সত্যি কথা বলতে কি, যাবার-জিনিস এ, তাই-ই মনে হয়না। যখন আর থাকেনা, খুঁজে খুঁজে পাওয়া যায়না, তখনই মনে হয় গেছে, যা-ছিল। একদিন যার চলন দেখলে মনে হতো কাব্য, আজ তার ধারে কাছে আসাও ট্রাজেডি। কৃষ্ণচূড়া-গাছের মাথায় রং দেখতে গিয়ে কাজে দেরি হয়ে যাওয়া আজ বোকামির পরিচয়; ক্লাবে গেছি শনিবার ১টায়, বাড়ী ফিরেছি সোমবার বিকেলে একেবারে অফিস সেরে, ভাবতেও মগজে বাতব্যাধি ধরে যায়। অথচ—the light that never was on sea or land দেখবার চোখের বয়স—"হায় গো হায়: চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়"—বসে থাকে না। চিত্রাঙ্গদার কথা—"চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী কারও তরে বসে নাহি থাকে; সে কাহারও সেবাদাসী নহে।" এ থাকার নয়; যাবেই। যখন-যায়, টের পাওয়া যায়-গেছে, তখন স্বীকার করি না গেছে; বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলি—"অভিজ্ঞতা বেড়েছে অনেক ঠেকে শেখার; এসব নেহাত ছেলেমানুষী।" জরাগ্রস্ত যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা পড়ে, আর নীতি-বাগীশতায় ভরপুর হয়ে উঠতে থাকে, তেমনি।

কিন্তু সে রোমান্স নয়; সত্যি কথাই আমার জান বাঁচালে কে? তাকে জানা, কেবল রোমান্স-মুক্তি নয়, রোমান্স-প্রাপ্তি নয়,—মানুষের সহজ জিজ্ঞাসায় বাধা পাবার ফলে যে আকৃতি। জানতেই হবে।

ডাক্তার পুরানোকথার জের টেনে বললে,—"শুনেছো বোধহয় বাস্টার, যে এদেশের মেয়েরা বহুবিবাহ করে?"

হঠাৎ এ প্রশ্নে চমকে বললাম,—"হ্যাঁ, তাতে তো দোষের কিছু দেখতে পাইনা, নীচে আমরা যেমন বহু-বিবাহ করি?"

ডাক্তার রাঙা চোখ-দুটো মেলে চাইবার চেষ্টা করলো পারলোনা, কিন্তু জানিয়ে দিলো।

"হ্যাঁ, বহুবিবাহ করো। তোমার স্ত্রী তিনটি পুরু নিয়ে ঘর করছেন মানতে পারো তো?"

"সে যা বাধে তা সংস্কৃতিতে; নজিরে নয়।"

"ঐ তো রোগ তোমাদের। জিনিসটা 'জল' বলবেনা বলবে H_2O। তেত্রিশ নম্বরে পাস করিয়ে করিয়ে এ ধরনের অকর্মণ্য নিরেট বুদ্ধি একচেটিয়া। আমরা সার্টিফিকেট দিইনা আমরা। আমাদের মড়া সেণ্ট পারসেণ্ট মরে, আর বাঁচাটাও তাই। তোমরা কো করবে, তবু বত্রিশ দেবে; ছোটোলোক! পাস হ ছেলেটা জানছো, তবু দিলে তিরাশিন—পঁয়তাল্লিশ,—বলে সব হিপোক্রাসি—আত্মপ্রতারকের দল। নজির কি কাজিন, নজির কি, শুনি? সংস্কৃতিটা কেমন জানোয়া বাস কোথায়? মোদ্দাকথা বাধে। বাড়ী গিয়ে গিন্নী তাড়াবে, আর দ্রৌপদীর ওপর নাটক লিখবে। পরে বাড়ীর দ্রৌপদী বেশ লাগে!! ব্যাস থেকে নিয়ে তু পর্যন্ত সংস্কৃতির বাহকগুলো পাকা-হিপোক্রিট—সে সব-ক'টাকে সার্জিকাল টেবলে চড়িয়ে ছাড়তাম।"

"আমার তো লেগেছে।"—সকৌতুকে বললাম আমি।

"আমার ছুরিগুলো বড্ড দামী হে ছোকরা, নৈলে দিতাম সেরে। লজিকে বাধেনা;—তাতে কি হে? সংস্কৃতির শিকার হয়ে মরে আছো। লজিকের রামনাম গাইবে কোন্ মুখে?"

"কিন্তু এদেশে সংস্কৃতিতে যখন বাধেনা তখন আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার বক্তব্য—লজিকের দৃষ্টি দিয়ে আমি বেশ বুঝি যে, এইজাতীয় একটা সমাজ থাকার কোনও বাধা নেই, থাকা উচিত নয়।"

"ফলে এদেশের সমস্যাগুলি ভেবে দেখেছো?"

"কী সেগুলি?"

"কল্পনা করেই দ্যাখোনা।"

•

আমায় আবিষ্কার করেছে গোপী।

"ধন্য আর আপনি! আপনার তত্ত্বাবধানে এই ক্যাম্প ডিসিপ্লিন্ড থাকবে? তোবা, তোবা! গজব করেছেন আপনি।"

"হাসতে হাসতে বললাম—"কেন। ইন্‌ডিসিপ্লিন কোথায় দেখলে?"

গোপীর ছাইরঙের স্যুটের ওপর গলাটায় একটা মাফলার পাকিয়ে বাঁধা। হাতে টর্চ আর লাঠি; মুখে পান। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বার করে দিলে; আর বললে—"দিল্লগী কথাটা আমি ডিক্সনরি থেকে সরিয়ে দেবো।"

"কেন?"—গোপীর অভিমান হয়ে গেছে।

"আরে সাব্, দিল্ লাগলে তবে তো দিল্লগী—না লাগলে আবার 'লগি' কি?"

আমাদের দেশের কথা 'যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ'-এর তর্জমা করতে চায় আর কি!

ততক্ষণে বিক্রমও হাজির। গোপীর তুলনায় ঢের 'সোবার'—গম্ভীর মেজাজের। তার পোশাকেও বেক্সার' চিহ্ন স্পষ্ট।

আমায় একটা সেলাম জানিয়ে বিক্রম নিবেদন করলো নবাবসাবের মেজাজ আজ বে-এক্তেয়ার; আমার ওপর খুব রাগ করেছে। নাচে ছিলাম না, খেলার টিফিনে নেই, লাঞ্চোত্তর আড্ডায় নেই। কোনো programme হতে পারেনি।

গোপী বললো—"হ্যাঁ মশায়, হিমালয়ের ওপর দশহাজার ফুটের মাথাতেই কি দিনগুলোকে মেরে ফেলার তোফা জায়গা পেলেন আপনি? একটা কবরাবে দিন; আহা হা, মনে হচ্ছে যেন একগ্লাস সরাবে কেউ পানের পিক্ ফেলে দিলে।" ব'লেই পিক্ ফেললে।

আমি বললাম—"বেড়াতে বেরুনো হচ্ছে বুঝি?"

জবাব করলো গোপী বিক্রমের পানে চেয়ে। "দ্যাখো একবার শান্ দেখে যাও। কেমন passive voice-এ কথা শোনো।" আমার পানে চেয়ে বললো—"ওসব হচ্ছেনা স্যার, আপনাকেও যেতে হচ্ছে। কোনও ওজর আপত্তি নয়। আমরা একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি।"

আমি বললাম—"পেখাধার বুঝি?"

বিক্রম খিলখিল করে হেসে উঠলো, আর গোপী লাল হয়ে গেল।

"আজ একটা পেখাধারের লোক সংগ্রহ করেছি। সে রাস্তা চেনে।" বললে গোপী।

আমি বললাম—"আজ তোমরা যাও। আমার অনেকগুলি কাজ বাকী—অনেকগুলো। না করে নড়তে পারবোনা।"

গোপী ভেঙে পড়ে বললো—"নেহাত বেরসিক আপনি, বাব্বার কসুর মাপ হয়। কী কাজ শুনি?"

আমি অগত্যা ওদের ক্যাম্প-অফিসে নিয়ে এলাম।

বিকেলের চা দেওয়া হচ্ছে। আমরা অফিসে বসেই চা খাচ্ছি। পারিখ গোমড়া মুখ করে বসে আছে। ভারী ছেলেমানুষ। অভিমান করেছে। কর্মচন্দ্‌জী বললেন—"মার পেটের বাচ্চাগুলো নিয়ে এসেছেন। এখন এরা পদে পদে মিসিবাবা চায়। পারিখের সংবাদপত্র বেরোয়নি বলে দুখ হয়েছে দেখুন।"

জয়ানন্দ কিন্তু ওর *Khadrolo News* ছাপছে। প্রথমবার বেরুচ্ছে। চার পৃষ্ঠা—ভালোই। সব কথাই স্পষ্ট ভাবে বলা আছে।

চা চলছে। পারিখকে বললাম—"বেশ তো হয়েছে কাগজ। ভাবনা কি?"

"আজ সকালে বেরুবার কথা ছিল। বেরুলোনা তো! রবিবার সন্ধ্যে অথচ কাগজ নেই; সবাই আমায়..." কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল।

হেসে বললাম—"ঠাট্টা করছে। পাগল তুমি? তোমায় ছেলেমানুষ পেয়ে ঠাট্টা করছে। ঘাবড়াও কেন? এর পরের রোববারে তোমার কাগজের তৃতীয় সংখ্যা বেরুবে। তাতেই হলো তো?"

গোপী অদৃশ্য। পেখাধার!! পেখাধার!!

আমি কেমচন্দ্রকে বললাম—"ডাইরেক্টর কই?"

বিরক্তিভরে কেমচন্দ বললে—"কি জানি কোথায়? আজকের ডাক দেখুন তো।"

খানকয় চিঠি। রেলওয়ে-বোর্ডের, হিমাচল সরকারের; —চিঠিগুলোর জবাব লিখে দিলাম। টুকিটাকি দু'চারটে নোটিশ সই করলাম। তারপর কাজের খাতা নিয়ে দেখলাম খানিকটা কাজ করেছে ছেলেরা। আমার যেতে হবে, কাজ দেখে আসতে চোখে। কিন্তু গোপী বসে বসে গোঙরাচ্ছে; পেথাধায়!

এমন সময় দুঃসংবাদ। মহারাষ্ট্র-দলের দুটো ছেলে জ্বরে কাতর হয়ে পড়েছে। জঙ্গলের ধারের পাইনপাতা-বেছানো তাঁবুতে ওরা থাকতে পারবেনা। তৎক্ষণাৎ আস্তাবলের ওপরের একটা ছোটো কুঠরিতে ওদের চলে আসার ব্যবস্থা করতে হলো। আস্তাবলটা আসলে ডাক-বাংলো দোতলা। ওপরটা টিনে ছাওয়া। নীচের তলায় চুল্লীতে সর্বদা কাঠ জ্বলছে। ওপরটা তাই গরম। সেখানে সাহেবদের চাকর-বাকররা থাকে, কিন্তু মহারাষ্ট্র-দল জায়গাটা পেয়ে বর্তে গেল।

ডাক্তার একটু ভয় দেখিয়ে গেল একটি ছেলেকে নিয়ে। ওর লিভার খারাপ। পূর্বে জ্বালা হয়েছিল। আবার দেখা দিয়েছে। দলটায় ছিল আমাদের ক্যাম্পের পোস্টমাস্টার-জেনারেল—অর্থাৎ ক্যাম্পের তরফ থেকে ডাক আহরণ করার ভার তার ওপর। কোঠারী—ডাক্তারির ষষ্ঠবার্ষিক ছাত্র। সে বেচারি ঘাবড়েছে বেশী। আক্রান্ত ছেলেটি তারই ছোটোভাই।

গোপী উসখুস করছে। আমার কাজ দেখতে বেরুতে হবে। তিন মাইল পথ যাতায়াত; ছ'মাইল। অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক সময় চাই। বেলা পাঁচটা। গোপী যখন বুঝলো আজ আর পেথাধায় যাওয়া হবেনা তখন ক্ষেপে গেল; কিন্তু পরেই শান্ত হলো কারণ ছেলেটা স্বভাবতঃ শান্ত। যেটুকু বিক্ষোভ দেখায় তা দেখিয়ে ও আত্মপ্রসাদ পায়। ও বিক্ষোভের দাস নয়।

রাতের অন্ধকার গভীর হয়ে এসেছে।

•

খাবার ঘরে ঢুকে দেখি মহাবিক্রমে ডাক্তার তদারক করছে সবার খানা। জলে আজ আর কেরোসিনের গন্ধ নিয়ে কেউ আপত্তি জানালোনা। এ কদিনে সয়েও গেছে, আবার খানিক রুচিও এসেছে। আমায় দেখেই ডাক্তার বললে—"গুড-সন্ধ্যা, মাস্টার। বক্তৃতা শেষ হলো?"

লাল হয়ে গেলাম লজ্জায়—"বক্তৃতাই দিই বুঝি?"

"আর নয়তো কি? চা-জুড়িয়ে রেখে দেয় মাস্টারকে—সে এক নয় বক্তৃতা, নয় মৃত্যু।"

ঘরভরা নতুন প্রাণ। মহক্ষণে উচ্ছলিত।

দুটি ছেলে একটা দরজার কোণে বসে খাচ্ছে। বাকী যথারীতি দাঁড়িয়ে।

ডাক্তার তাদের লক্ষ্য করে বললো—"ওঠো, দাঁড়িয়ে খাও; নয়তো বাল্জীকে বলে দেবো।"

আমাদের খাদ্য-সরবরাহের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল সিমলার একজন হোটেলওয়ালাকে। তার দাদা এখানে এসেছেন তদারক করতে। বাল্জী কোম্পানির ব্যাপার, তাই তাকেও সবাই বাল্জী বলেই ডাকতাম। নিশ্চয় অন্য কোনও নাম ছিল। এখন মনে নেই।

"বাল্জীকে বললে কি এমন?"

"কী এমন? বটে? আমাকে অনেক ঘুষ খাইয়ে তবে বাল্জী এই দাঁড়িয়ে খাওয়াবার ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়েছে।"

"কেন? কী ঘুষ?"

"Unconstitutional প্রশ্ন! কী ঘুষ কখনও জিজ্ঞাসা করবে না। কেন তা বলছি। দাঁড়ালে stomachটার টা ধরে; তাই ভরা যায় কম। বসলে stomach ছড়িয়ে পড়ে, তাই খোল্ বেড়ে যায়, ভরা যায়।"

আবার হাসি।

"আমরা কাল থেকে মেঝের বসে খাবো।" সমস্বরে চিৎকারে যোগ দিল সবাই।

"Unhygienic! মেঝে বড় নোংরা। আমি অনুমোদন করব না।" বললে ডাক্তার।

"আচ্ছা ঘুষ দেবো আমরাও।"

ডাক্তার ডানের হাতটা উঁচিয়ে বললো—"আচ্ছা, কাল সকালে ঘুষের নিলাম ডাকবো।"

খানা হয়েছিল কড়ায়ের ডাল, মুলোর ছেঁচকি আর আ কোফ্তা দিয়ে আলু-বেগুনের রসাদার।

বাঙালী ছেলে ক'টি প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বললে—"কাল ভাত হবে বাঙালীবাবু—"

আর আমার কানে কানে বললে—"সঙ্গে রামপাখী ঝোল।"

[ক্রমশঃ]

ভিক্ষুক

সত্যপ্রিয় ঘোষ

—'আজকে বাজারে গে পাঁচপো ইয়া-ইয়া গলদা-চিংড়ি কিনলাম। জানলি নন্দী? আর গোটা চার-পাঁচ ঘি-ওলা কাঁকড়া, ঐ তোরা যাকে লাল কাঁকড়া বলিস। আর পটরোগাগুলোর জন্যে চাট্টিখানি মৌরলা। তারপর গিন্নীকে বললাম, গিন্নী। আগে বাড়ো দিনি একটা গলদা-চিংড়ি, অন্দেস ক'রে খাই।'

ফাইলের তাকের মাথায় ভিজে ছাতাটা ঝেড়ে দিয়ে চেয়ার টেনে বসবার আগেই দাদা খুব মেজাজের মাথায় কথাটা বললেন।

এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মেজাজ এসে গেলো। আমরা যারা শুনলাম আরম্ভি কথাটা। বুঝলাম দাদাকে খোঁচালে আজ অনেক কিছু বেরোবে। বাদলা দিন, হলোই বা অফিস, না মিলুক বেগুনি কিংবা পেঁয়াজি কিংবা ফুলুরি, দাদাকে দিয়েই আজ খিস্যি জমবে। অতএব দাদাকে ঘিরে দেখতে-না-দেখতে একটা আড্ডা তৈরি হয়ে গেলো।

দাদার নাম শ্রীনৃসিংহনারায়ণ রায়চৌধুরী। যেমনি লম্বাই-চওড়াই নাম, তেমনি পালোয়ান চেহারা। আবার তেমনি দাদার গুণের বহর। দাদার অসংখ্য গুণ এ-অফিসে অসংখ্য কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছে, যা সংগ্রহ ক'রে সম্পাদনা করতে পারলে নির্ঘাৎ পাঁচ-সাত টাকার এমন একটি গ্রন্থ দাঁড়িয়ে যাবে যার ফলে প্রকাশকের গাড়ি-বাড়ি সম্ভব হবে ব'লেই মনে হয়।

এমন যে দাদা তাঁর নানান গুণ। এত, যে তার একটি পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করতে ভয় হয় পাছে পাঠকের বিচারে দাদা অবাস্তব কি অলীক বিবেচনায় বাতিল হয়ে যান।

বস্তুত, দাদা এ-অফিসে সম্ভবত এক আমার কাছে ছাড়া আর সকলের কাছে বাতিল হয়েই গেছেন। তার জন্যে দাদাই দায়ী। কারণ তাঁর যত গুণ তত দোষ। এবং দুষ্টক্ষতের চিকিৎসা না হ'লে তা যেমন পাঁচে-পাঁচে তাগড়াই পালোয়ানের শরীরকেও শোচনীয় ক'রে তুলবেই, দাদার গুণগুলিরও সেই হাল।

দোষ-গুণের কথা আপাতত তোলা থাক, সে-সব পরে দেখা যাবে যাচিয়ে। কারণ যে-গল্পটা দাদা এখন ফেঁদেছেন তা ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র এইটুকু অবান্তর কথা তবুও না ব'লে পারছি না যে, আমার একটা বড়াই আছে এই যে, মানুষকে আমি যুক্তি-তর্ক বিচার ক'রে বাজিয়ে নিয়ে তবেই তাকে গ্রহণ করি কিংবা ঝেড়ে ফেলে দিই, আমার কাছে আত্মীয়-অনাত্মীয় ব'লে বিশেষ সুযোগ-সুবিধে বা বাছাবিচার নেই, আমার আদর্শে উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই তুমি আমার আত্মীয়, নইলে নও—এই যে অনন্য অমোঘ নির্মম মানদণ্ড তা কিন্তু, আমি ভেবে নিজেই অবাক মেনেছি যে, দাদার বেলা প্রয়োগ করতে আমার বাধে। শত দোষ সত্ত্বেও আমার কাছে দাদার সাতখুন মাপ। কেন তা আমি নিজেই

ভেবে পাইনে। ফলে, অফিস-সুদ্ধ সকলের কাছে দাদা অবজ্ঞা, ঘৃণা এবং কৌতুকের পাত্র হলেও, দাদাকে প্রসন্ন মেজাজে দেখলেই তাঁর জন্যে আমার চোখে যে-লেখা ফুটে ওঠে সে হচ্ছে : স্বাগতম্।

দাদার গলদা-চিংড়ির খবরের সঙ্গেই, আমি ছাড়া আর প্রায় সকলেই নিজের নিজের ধরনে দাদাকে লক্ষ্য ক'রে অশ্লীল মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গী করেছে। কথাটা বোঝা যায় প্রায় কেউই বিশ্বাস করেনি। কারণ এখন মাসের শেষ। মল্লিকপুরের জমিদার-ঘরের শরিক হওয়া সত্ত্বেও, দাদাকেই যদি আজকে তাঁদের একান্নবর্তী সংসারে বাজার দিতে হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে গলদা-চিংড়ি বা ঘি-ওলা কাঁকড়া কেনার কথা স্রেফ গাঁজাখুরী গপ্পো ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে, এ কেউই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়।

ফলে, সবাই মিলে দাদাকে চেপে ধরলো—এইটে প্রমাণ করতে যে দাদা গুল মেরেছেন। কিন্তু দাদা সহজে দমবার পাত্র নন। গিন্নীর আবদারে ঐ-দুটো পদার্থ আজ বাজার থেকে আনা ছাড়া তাঁর যে উপায়ই ছিল না, এইটে বোঝানোর জন্যে দাদা ফেনিয়ে-রসিয়ে মেলা কথা বলতে লাগলেন। প্রত্যেকটি কথার মধ্যে সবাই নতুন নতুন মিথ্যার গন্ধ পেতে লাগলো। তাই কথাগুলোকে তারা এত কচলাতে লাগলো যে, আমার ভয় হলো, মিলে এরা সব থেঁতো ক'রে। দাদার মুখের রসালো ভঙ্গী আর মেজাজও ক্রমশ চুপসে যাচ্ছিল লক্ষ্য করছিলাম। ফলে আমার খুবই খারাপ লাগছিল।

অথচ প্রতিবাদ করতেও পারছিলাম না। প্রতিবাদ করলেই ব্যাপারটা আরো কটু আরো নীরস হয়ে যাবে। দাদার মেজাজ হয়তো তাতে একেবারেই বিগড়ে যেতে পারে। আমি চাচ্ছিলাম দাদাকে খোশমেজাজে রাখতে, যাতে ক'রে আজ দাদার গল্পে-গল্পেই দশটা থেকে পাঁচটা বাজিয়ে দেওয়া যায়। কারণ আমার টেবিল পরিষ্কার, হাতে কিছু কাজ নেই, সময়টা কাটাতে তো হবে। কিন্তু এই অবিশ্বাসীরা মিলে দেখছি সমস্ত রসকষ নিংড়ে শেষ ক'রে দিলে।

বড়োবাবুর তাড়া খেয়ে-খেয়ে সেই বেরসিকের জটলা ক্রমে পাতলা হলো, যে-যার চেয়ারে গিয়ে বসলো। ততক্ষণে জল প্রচুর ঘোলা হয়ে গেছে। দাদার মুখখানা বন্দী শাহ্জাহানের মতো চেহারা হয়ে উঠেছে।

আমি তবুও আশা ছাড়লাম না। আমার টেবিল দাদার টেবিলের পাশেই। প্রকৃতপক্ষে দাদা আমার সাব-হেড। রেলের মত কমার্শিয়াল অফিসের ছোট গুড্স্-সেকশনের ছটি-সাতেক কেরানীর ইন-চার্জ আমাদের এই দাদা। এই সুবাদে আমি আমার চেয়ার নিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে গেলাম না, দাদার পাশেই বসে রইলাম চুপচাপ। যেন লজ্জিত ক্ষুব্ধ শাহ্জাহানের শিয়রে দুঃখিত জাহানারারই মতো।

ভাবছিলাম দাদাকে কেমন ক'রে ফের মেজাজে আনা যায়। কী প্রসঙ্গ উত্থাপন করি? দাদার পাঞ্জা বা কব্জির মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে হুডিনীর কি ব্যায়ামবীরদের কথা তুলব? বা, হাতে উল্কি দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' লেখার পেছনে তাঁর স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইতিহাস? অথবা তাঁর বন্দুক-রাইফেলের কথা তুলে শিকার-কাহিনী? সেই বাঘ আর কুমীরের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই? অথবা যাত্রা-থিয়েটারে তাঁর অভিনয়ের বিচিত্র কাহিনী? নাকি ধ্রুপদ-ধামার-টপ্পা? অথবা দুষ্ট-প্রজা-দমনে সেইসব অবক্ত কাহিনী? নাকি সোজাসুজি, যাতে আমার সবচেয়ে বেশী আগ্রহ, দাদার মুখে তাঁর গিন্নী আর একমাত্র পুত্রের কথাই শুনতে চাইব?

এর যে-কোনো প্রসঙ্গেই অজস্র গল্প তাঁর মুখে ইতিপূর্বে শুনেছি। কিন্তু তাঁর বলার মধ্যেই কী জাদু আছে জানি না, বহুবার শোনা সেই একই গল্প ফের শুনতে আমার কিছুমাত্র অরুচি ছিল না।

তাঁর হাতের কব্জি আমার হাতের পাতার মধ্যে, তাঁকে খুশি করার জন্যেই, বেড় দিয়ে ধরলাম—বুড়ো আঙুলটাকে মধ্যমাটার সঙ্গে ছোঁয়ানোর চেষ্টা করতেই দাদা কব্জির পেশী ফোলালেন। ফলে কব্জিটা এমনি প্রসারিত হলে যে, আমার হাতের বেড় অনেকটা ফাঁক হয়ে গেলো, সেই ফাঁকটা বুজিয়ে ফেলার চেষ্টায় আমি দাঁতমুখ খিঁচি প্রাণপণ প্রচেষ্টার একটা ভঙ্গিমা দেখালাম; আমার শোচনী ব্যর্থতা তিনি গর্বস্ফুরিত ওষ্ঠাধরে কৌতুকবিস্ফুরিত কৃপা কটাক্ষে দেখলেন। আমি বুঝলাম কাজ হচ্ছে। শু ধরেছে। বললাম গদগদ স্বরে, 'এইর'ম একখানা শরী থাকলে তবেই বেঁচে থেকে আরাম।'

'বটে।'—আত্মশ্লাঘায় দাদার চিবুকে ঠোঁটে এখ অদ্ভুত ভঙ্গী।

এখন যে-কথাটি বললে মোক্ষম হবে সেইটিই বললাম 'আপনার এই শরীর নিয়ে বৌদি কী বলেন?'

নিমেষে তাঁর মুখের রৌদ্ররসস্ফীত নাটুকে দেখাতে ঝিমিয়ে গিয়ে সেখানে স্বাভাবিকতার রঙ ফুটলো। হা

আহ্লাদে বললেন, 'তোরা ছোঁড়ারা যেমনটি আমার কব্জি ঝাঁকড়ে-ঝাঁকড়ে ধরিস, সেও তেমনটি করে। তোর বৌদির হাত অবিশ্যি তোর চেয়ে বড়ো, মেয়েমানুষ হ'লে হবে কী। ইয়া থাবা। কিন্তু সেও হাতে পায় না। কী ক'রে পাবে বল্। আমার রিস্টের স্বাভাবিক মাপ-ই পাক্কা আট ইঞ্চি। ফ্লেক্সর-মাস্‌ল্‌টা এক্সপ্যান্ড করলে আরো ইঞ্চিটাক বেড়ে যায়। অনেক আচ্ছা-আচ্ছা রেস্‌লারেরও রিস্টে এই ফ্লেক্সর-মাস্‌ল্‌ এমনি ডেভেলপ্‌ড্‌ হয় না। আমার ওস্তাদজী, মানে গোবরবাবু আর কি, আমার এই মাস্‌ল্‌টাকে কত তারিফ করেন। আমার বাইসেপ্‌স্‌ সাড়ে পনেরো। আমি এমনি ক'রে ডানার গুলো ফুলিয়ে দাঁড়াই, আর তোদের বৌদি, বুড়ী ধাড়ি হয়েছে, ছেলেপিলের মা হয়েছে, কিন্তু এখনো সেই বয়েসকালের অভ্যেস ছাড়তে পারলে না, আমার ডানা ধ'রে ঝুলতে থাকে বাদুড়ের মতো। হাসচিস তো! ঘরে খিল এঁটে, আর বলিস কেন, এই বুড়ো-বয়সেও রোজ আমার হাতে ঝুলে-ঝুলে ঘরের এ-কোনার থেকে ও-কোনায় যাওয়া তার একটা ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোর বৌদি তো এখনো গাঁয়ের মেয়েদের লাঠিখেলা ছোরাখেলা শেখায়, সবাই বলে দেবী-চৌধুরানী, কিন্তু আমি যখন আমার এই আঙুল বাঁকিয়ে ধ'রে বলি, সোজা করো দিদি,—জিভ বেরিয়ে যায়! তোর বৌদি তো মেয়েমানুষ, আখড়ার আচ্ছা-আচ্ছা নওজোয়ানগুলোকে এই সেদিনও বললাম, এই ছোঁড়ারা, তোরা সবাই মিলে আমার এই আঙুলটাকে সিধে কর দিনি বা আমার মুঠোটা খোল দিনি বা এই মরা বুড়োর সঙ্গে কাবডি-পাঞ্জা কর দিনি—তা একটা ক'রে জিভ বেরিয়ে গেলো সব ক'টার!'

'আচ্ছা দাদা, এবার দোলের সময় নাকি বৌদি আপনাকে নাস্তানাবুদ করেছে?'

এবার দাদা একটি বিড়ি ধরালেন। একটা সুখটান দিতেই, নির্ঘাৎ বুঝলাম, দাদা পূর্ণ স্বরূপে এলেন। বললেন, 'আর বলিসনি!'—বলতেই দাদার মুখে হাসি বেরিয়ে পড়লো; অটুট উজ্জ্বল দাঁতের সারি ঝিলিক দিলো, দাদা জোরে একটা পা তুলে বেশ আয়েস ক'রে বসে বললেন, 'সপ্তমীর দোলের দিন। সেদিন আমাদের দেশের মেয়েদের পুরো স্বাধীনতা। সেদিন তারা কারুক্যে মানবে না। যাকে পাবে তাকেই-[illegible] ক'রে ধরবে। হাতের নাগালে পেলে সবাই মিলে ধ'রে চিৎ ক'রে ফেলে রং মাখাবে, গোবর-গোলা জলে চুবিয়ে দেবে, আর নাগালে না পেলে, ঢিল ছুঁড়বে। তোদের বৌদি হচ্ছে এদের রিং-লীডার। মালক আর পাশের গাঁয়ের একটা সেকশনের কতকগুলোকে নিয়ে তার দল। আমি তো ভয়ে-ভয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে সাইকেল চেপে পালিয়ে আসছি। কিন্তু এমনি বজ্জাত, তারা একটা কাঁটাঝোপের আড়ালে ঘাপ্টি মেরে ছিল। হঠাৎ একেবারে ডাকাত পড়ার মতো রে-রে-রে-রে করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লে আমার ওপর। ভাব্ দিনি কাণ্ডটা। আমি বুড়ো মদ্দ, আমার ওপর এত অত্যাচার কেন বল দিনি? বেগতিক দেখে সাইকেল ফেলে একটা পুকুরে লাফ দিয়ে পড়েছি। পুকুরের চারিধারে ছুঁড়ীতে-বুড়ীতে মিলে সে প্রায়, বললে বিশ্বেস যাবিনি, তিন-চারশো নিমেষমধ্যে জুটে গেছে। কয়েকটা তো লাফ দিয়ে জলে পড়লো আমাকে ধরবে ব'লে। আর তোদের বৌদি মা, পাড়ের থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো, উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে পাড়ে উঠতে দেবে না। আমিও তেমনি। সেদিন বিকেল থেকে তো রাতভোর চলবে আমোদ-আহ্লাদ গানবাজনা খানাপিনা, মে-মে খোল মেলেছে সবাই মিলে। তা, রোদ পড়তে-না-পড়তেই আমি আমার কেষ্ট বষ্টী-মূর্তি প'রে সেজে আগে থাকতেই খানিকটা আবীর মাখিয়ে নিয়ে গামছা-কাঁধে বেরিয়ে পড়েছি। গান ধরেছি: কোন্ ফুলে বঁধু শান ক'রে মধু হয়ে এসে বক্ষ পোড়াতে—'

চাপরাশী এসে রসভঙ্গ করলো; সেলাম ঠুকে বললো দাদাকে, 'বড়াসাব—'

অগত্যা দাদা বড়োসাহেবের ঘরে ছুটলেন।

ফিরে যখন এলেন, দাদার মুখ দেখে আমি অবাক হলাম। যাক, গালমন্দ কিছু খাননি বোঝা যাচ্ছে (বলতে বাধা নেই, দাদার কাজকর্ম সব এমনি যে, অফিসারদের কাছে তো বটেই, টাইপিস্ট-হেডক্লার্কও উঠতে-বসতে তাঁকে শোনান। আর শুধু কি তাই? এক আমি ছাড়া অফিসটার আর প্রায় সমস্ত কর্মিবৃন্দই ফাঁক পেলেই দাদার ওপর তম্বি করে এবং দাদা নির্বিবাদে তখন বাবা-[illegible] হুকুম রাজাগজাদের মতো মুরুব্বী করতে থাকেন এবং সেই দৃশ্য দেখে অফিস-শুদ্ধ হাসির হল্লোড় পড়ে যায়।)

—'হনহনিয়ে গিয়েছি তো সায়েবের ঘরে, জানলি ভাই'—দাদা চরম পুলকে বললেন, 'সায়েব চোখ ছানাবড়া ক'রে বলছে কি, "কী চৌধুরীবাবু! বাতব্যাধ কমেছে নাকি?" আমি তো হেসেই বাঁচিনে। সায়েব জানে তো, ওয়াচ-অ্যান্ড-ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টে থাকাকালীন আমি প্রাণের মায়া

এক ট্যাঁস অফিসারের গালে এক থাপ্পড় কষিয়েছিলাম, এক থাবড়াতেই সাহেব দশ হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল, গোটাকয়েক দাঁত উড়িয়ে দিয়েছিল, আর দুটি মাস বিছ্না। ঐখানেতেই তো আমার প্রমোশন হলো না। ইনভ্যালিড হয়ে গেলাম—থাকগে সে-সব পুরানো কাহিনি। তা সাহেব কী বলে জাপ দিনি, ধ্যা।'

'দাদা, আপনার রিস্টে এই উল্কিটা কিসের বল?'—দাদার কব্জির দিকে উল্কিতে আঁকা দাগটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলাম।

'ওটা উল্কি-রাখী। থার্ড-কোরে রেসলিং-এ আমি যেবার বেঙ্গল অলিম্পিক থেকে ইন্ডিয়া অলিম্পিকে গেলাম, দিল্লীতে, সেবার ছোঁড়ারা, আর বলিস কেন, সবাই ধ'রে-পাকড়ে এই উল্কি-রাখী পরিয়ে দিলে। রেসলিং-এ আমার স্পেশালিটি কী ছিল জানিস, আমাকে কেউ কোনদিন ধোবী করতে পারত না, টাং মারতে পারত না, কারণ হচ্ছে সে এই আমার রাখী। কচিৎ-কখনো এমনি জেকেলপ্ট্ রাখী হয়।'

'দাদা, আপনার ব্যায়ামের ইতিহাস বলুন শুনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাদা বললেন, 'সে-দিন কি আর আছে রে! ওস্তাদজীর আখড়ায় গিয়ে মনের বাসনা জানাতে উনি বললেন, যেদিন কমসে এগারো শো ডন আর বাইশ শো বৈঠক একনাগাড়ে দিতে পারবি সেদিন আসিস। আমি মাস দুই পরেই পরীক্ষায় পাস হ'লাম। একজন এসে হাতে কালভৈরবীর ছুরি বেঁধে দিলে। ব্যস, তারপর থেকে আর ব্যায়াম ছাড়তে পারিনি।'

'এখনো তো ব্যায়াম করেন। এখন কী কী করেন?

'আরে, এখন কি আর বেঁচে আছি! তবুও রোজ নিয়মমাফিক, প্রথমেই শুরু করেকটা, এই ধর গোটা তিরিশ-চল্লিশ বৈঠক, তাই দিয়ে নিয়ে শেষে ব্যাকিমায় চার শো, ডিপ্লিমায় দু-শো—জানলার গরাদে ধ'রে বৈঠক। আর মেঝেতো থেকে আড়াই শো ডন। আর, স্প্রিং ডাম্বল নিয়ে ডাবল্ পাক আর সিংগল্ পাক, তারপর চলবে স্কিপিং। কখনো-সখনো আবার অ্যাক্সপ্যান্ডার বারবেল নিয়ে ক্লীন অ্যান্ড [illegible] প্রেস করেকটা। ক্লীন অ্যান্ড জার্কটা আমি পছন্দ করিনে।'

'এতসব করেও আবার গানের চর্চা করার সময় পেতেন কী ক'রে?'—মুগ্ধবিস্ময়ে আমার চোখ বিস্ফারিত।

'আরে সে তো তোর বৌদির পাল্লায় প'ড়ে। নিজে তো সে মস্তবড় স্টেটোমেয়ে, কাশীর বিখ্যাত বাঈজীর কাছে গান শিখত। আহাহা, কী গলা ছিল তোর বৌদির! এক-দার্পের গমকে গলা খেলায় খেলিয়ে-খেলিয়ে নিয়ে চ'লে আসত। আহাহাহা! উদারা, মুদারা, তারার কোমল নিখাদ পর্যন্ত সিটীর গলাটি ছিল সেই-কথা। চড়ায় বলো খাদে বলো, সমান সুরেলা সমান মিষ্টি! এখনো মাঝে-মাঝে মেয়েটাকে যখন তালিম দিতে বসে না;—এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে সবাই এসে তোর বৌদির পায়ে ধরে গড়াগড়ি যায়—কী-না, তাদেরও গান শিখিয়ে দিতে হবে। আমার অবিশ্যি গানের রেওয়াজ ছিল বিয়ের আগেও, কিন্তু তোর বৌদি ফুলশয্যের রাতেই বললে, ওসব আলগা-আলগা ভাব আমি লাইক করিনে, যা করবে প্রাণপ্রাণ দিয়ে করবে। কী করি, গিয়ে নাড়া বাঁধলাম বিশ্বনাথ মাওরের কাছে, ধামারে যিনি বাটের শ্রীকণ্ঠ। কোথায় গেলো সে-সব দিন! বিল্বমঙ্গল বইতে ভিক্ষুকের পার্ট-টা যে এ-পর্যন্ত কতবার করেছি তার আর সীমাসংখ্যা নেই, তার মধ্যে ঐ গানটা: ছাড়ি যদি দাদাবাজি, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি। ভৈরবী সুরে ধং তালের গান। সেটা গেয়ে সিন্ থেকে স'রে যাব অমনি এনকোর-এনকোর! কী করি, আবার ফিরে এসে রিপিট করতে হয়েছে নির্ঘাৎ। যতবার ঐ বইতে ঐ গানটা গেয়েছি ততবার। একবার গাঁয়ে তো থার্ড টাইম এনকোর পড়তেই, অধিকারীমশা চোখ টিপে দিলে, বুঝলাম সুর বদলে গাইতে বলছে। আগে থেকে আমার অন্য কোনো সুরে গানটা তোলা ছিল না, কিন্তু বুক ঠুকে সেটা ভীমপলশ্রীতে দিব্যি জুৎসই ক'রে লাগিয়ে দিলাম। সে একটা দিন গিয়েছে রে! এখন আর সে গলাও নেই সে-দমটও নেই।'

একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়ালো এসে দাদার সামনে। দেখেই বুঝলাম দাদার শিকার। চাকরি-বাকরি কিছু জুটিয়ে দেবেন এই ভাঁওতা দিয়ে নিশ্চয়ই বেচারীর মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ কিছু ঝেড়েছেন। হ্যাঁ, বলা দরকার, এই ক্ষমতাটাও দাদার অসীম। এ-পর্যন্ত কত লোককে, কত নিরীহ গরীব ছেলেকে যে দাদা কতভাবে ঠকিয়েছেন আর হয়রান করেছেন তার কিছু কিছু আমাদের অফিসের প্রত্যেক লোকই জানে। কেউ কোনো আপত্তি করে না বা তাঁকে শিক্ষা দেবার কোনো চেষ্টাই হয় না এমন নয়। কিন্তু পাওনাদাররা বাড়াবাড়ি করলেই দাদা ডুব মারেন, দু-তিন দিন হয়তো অফিসেই এলেন না, ফিরে এসে ভীষণ কোনো দুর্ঘটনার খবর দিয়ে সবাইকে চমকে দেবার চেষ্টা করেন। সবাই দাদার সে-সব আশাপাশতলা

ধাক্কা ব'লে ধ'রে নিয়ে তাই নিয়েই মেতে যায়। তা ছাড়া অ্যাক্টিং আছে কালোমার্কা ফিল্মে মন আছে, বেগতিক দেখলেই দাদা সেই দাওয়াই টেনে আনেন, তারপর সেকশনে ব'সে বুঁদ হয়ে থাকেন, তখন বকো আর ঝকো কানে দিয়েছি তুলো, মারো আর ধরো পিঠে বেঁধেছি কুলো।

ছেলেটি এসে দাঁড়াতেই দাদা নির্ভয়ে খাটোচোখে ছেলেটিকে বললেন, 'দ্যাখো খেলাচ্ছে। আরো দুটো দিন সবুর কর। ঠিক বাগমতো পাচ্ছিনে। তিরিশ তারিখে ঐ সায়েব সাদার্ন-সেকশনে ইন্সপেকশনে যাবে, তখন ধরব। তুই বাড়ি যাস।'

'কোথায়?'—ছেলেটি সভয়ে বললো।

দাদা ভয়ানকভাবে চোখ পাকিয়ে ধমকে উঠলেন (অবিশ্যি গলা চড়ালেন না), 'কোথায় আবার! আমার বাড়ীতে। তোরা যে কবে মানুষ হবি!'

ছেলেটি পালালো। আপাতত তো প্রাণে বাঁচলো!

—'তা জানলি রে নবী'—দাদা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সহজ গলায় পরমুহূর্তেই আমাকে বলতে লাগলেন ক্রুদ্ধ হয়ে, 'ঐ তিতুমীরের-পার্ট-টা আমার মোস্ট ফেবারিট। আমার ঐ গানটা শোনার জন্যেই সেবার ক্যানিং-এ এক আসর হয়েছিল, ওঃ, পরের পর আট-দশ বার গেয়েছি, তবু লোকের আশ আর মেটেই না, শেষ পর্যন্ত হাতজোড় ক'রে পালিয়ে এসেছি। লাইফে যাত্রা-থিয়েটার করেছি কত তার আর সীমাসংখ্যা নেই। বিল্বমঙ্গলে তিতুমীর, বঙ্গেবর্গীতে ভাস্কর, শাজাহানে দারা, কঙ্কাবতীর ঘাটে নমুয়া, সীতাতে রাম, প্রফুল্লতে যোগেশ, কর্ণার্জুনে কর্ণ, মেবার-পতনে মহাবৎ খাঁ, গৈরিক-পতাকায় রঘুরাও, কণ্ঠহারে মনলাল ডাকাতটা, হরিশ্চন্দ্রে হরিশ্চন্দ্র—কত আর নাম করব বল, যা-ই করেছি তাতেই অডিয়েন্স মেতে গেছে। অডিয়েন্সকে হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। চোখে জল দেখাতে আমার কোনদিন গ্লিসারিন দরকার হয়নি, ইমোশন ফিলিং সব আমার আপ্‌সে এসে গেছে। তিতুমীর তো আমার মাস্টার-পীস, সে-কথা ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু ধর না কেন, মেবার-পতনে মহাবৎ খাঁ সেজে যখন বলছি: জানি, আমি নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন দিয়েছি আর পৈশাচিক উল্লাসে তার উত্থিত ধূমরাশি দেখেছি। আর কী? মুসলমান হয়েছি? স্বীকার করি না যে তাতে কোনো পাপ করেছি। আর তাও যদি হয়, তাহ'লে সে-পাপ কি এত ভয়ানক যে, সে-পাপ মানুষের হৃদয় থেকে সব কোমল প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে দিতে পারে?—অথবা ধর, প্রফুল্লতে যোগেশ সেজে যখন বলছি: এই যে আমার বাড়িই ঘটনা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখেনে এসেছে। এই যে ছেলে, এই যে মা, এই যে স্বজন! দেখছো, দেখছো, দেখ, মরবার সময়ও দেখবে, দেখ, দেখ! আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলো! আহা হা! আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলো!—তখন একটা লোকও চোখের জল চেপে রাখতে পারে না।…'

ইত্যাদি দাদা ব'লে যেতে লাগলেন। কিন্তু আমার আর শোনার মন ছিল না। রসভঙ্গ হয়ে গেছে। দাদার রসালো কথাবার্তা তখন আমার বিশ্রীরকম বিস্বাদ লাগছিল। ছুতোনাতা ক'রে উঠে পড়লাম।

দাদাকে আমরা প্রায়ই বলি, 'দাদা, একদিন যাব আপনার বাড়ি, গিয়ে বৌদিকে দেখে আসব, বৌদির হাতের

রান্না খেয়ে আসব।' দাদা বললেন, 'নিশ্চয় যাবি। একদিন ছুটির দিন দেখে বা রোববার সারা দিন গিয়ে কাটিয়ে আসবি সবাই মিলে। তোদের কথা বলেছি তোদের বৌদির কাছে। তা, তোদের বৌদিও তোদের যে দেখতে চেয়েছে। বলে, ছেলেগুলোর কথায় তুমি এমন পঞ্চমুখ, তা একদিন নিয়ে এসোনা সবাইকে দেখব।'

অফিসের এর-তার মুখে শুনি, বৌদির সঙ্গে দাদার আসলে সদ্ভাব বা বনিবনা নেই। বৌদির যে-সব গুণাবলী দাদার মুখে শুনি তা নাকি সবই মনগড়া, ভাওতা। বৌদি দেখতেও নাকি আহামরি কিছু নন এবং স্বাস্থ্যও নিতান্ত সাধারণ। তবে অফিসের যারা দেখেছে তাঁকে, তারা সকলেই একবাক্যে এ-কথা বলে যে, বৌদি রূপসী না হলেও লাবণ্যময়ী। দাদা বলেন, বৌদির দাপটে বাড়িসুদ্ধ সবাই তো বটেই, গাঁয়েরও আবালবৃদ্ধবনিতা ভয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপে, সকলের সব নালিশ বৌদির কাছে, এবং উনি সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করেন। কিন্তু অফিসের বাবুরা বলেন, বৌদি মোটেই কিছু খাণ্ডারনী বা রায়বাঘিনী নন, নিতান্তই শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ সেকেলেধরনের ঘোমটা-টানা বউ। এবং এঁদের মতে, বৌদির মতো মেয়ে দাদার মতো বখা লোকের পাল্লায় না পড়লেই ভগবানের সুবিচারের পরিচয় পাওয়া যেত।

দুপক্ষের কথাই শুনি। কেন জানি না, বৌদি সম্পর্কেও দাদার সব গল্প ধাপ্পা এইটে ভাবতেও আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে। জানি, দাদার কথা বিশ্বাস করবার কোনো মানেই হয় না, কিন্তু তবুও আমি অদম্য কৌতূহলে, নিবিড় আগ্রহে বৌদি সম্পর্কে দাদার সমস্ত গল্প রীতিমতো গিলি, সত্যিকথা বলতে কি, বিশ্বাস করি, এবং দাদাও লক্ষ্য করেছি বৌদির কথা আমার কাছে বলতে খুবই উৎসাহ বোধ করেন। শুধু বৌদির কথাই না, বারোবছরের ছেলেটির কথাও। তাঁর একটি মেয়েও আছে, বছর পনেরো-আঠারো বয়স হবে, কিন্তু তার কথা বলতে দাদার বিশেষ চাড় দেখি না।

অফিসের বাবুদের কাছে দাদা সম্পর্কে আর-একটা কুৎসিত খবর শুনি এই যে, দাদা হাতে বাড়তি পয়সা পেলেই বেশ্যালয়ে ছোটেন এবং প্রায়ই বাড়ি না ফিরে সমস্ত রাত কলকাতায় কোনো বারবনিতার ঘরে কাটিয়ে দেন। পরের দিন অফিসে যখন আসেন তাঁর চেহারা দেখেই সবাই গা-টেপাটেপি ক'রে সিদ্ধান্ত করে: 'দাদা জলের নর্দমা থেকে সদ্য উঠে এলেন।'

দাদার তখনকার চেহারা দেখলে অবিশ্যি এ-সন্দেহ সত্য ব'লেই মনে হয়।

—'স্ত্রী লক্ষ্মীরূপিণী, কিন্তু যদি একটু বক্তাদিনী হন, লক্ষ্মীর জায়গায় অলক্ষ্মী এসে বাসা বাঁধেন! কোন্ জায়গায় যেন পড়েছি মনে করতে পারছিনি, নন্দী—মনে করতে পারিস?'—একদিন অফিসে এসেই দাদা আমাকে বললেন।

দাদার মূর্তি দেখে বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না—দাদা প্রকৃতিস্থ নন! কাজেই আমি বিরক্তিতে চুপ ক'রেই রইলাম, যদিও কথাটা যাদের কানে গেলো তাদের কেউ কেউ মাছির মতো ভনভনিয়ে উড়ে এসে ঘিরে বসলো দাদাকে এবং তাদের পক্ষে যা স্বাভাবিক সেইসব কদর্য কথাবার্তা বলতে লাগলো।

দাদা অবিশ্যি ভাম হয়ে রইলেন। হাস্যকর গাম্ভীর্যের অদ্ভুত একটা ভঙ্গীতে দাদার মুখটা অনড় অচল হয়ে রইলো; চশমাটা চোখে নেই, সমস্ত মুখে-চোখে গ্লানি আর কালিমার ছোপ, কাপড়-জামাও বিশ্রী ময়লা।

দুপুরের দিকে যখন উঠে বাইরে চ'লে গেলেন এবং ঘণ্টা-দুই পরে ফিরে এলেন ঢুলুঢুলু চোখে, সমস্ত অফিসময় খবর হয়ে গেলো দাদা আজ আকণ্ঠ টেনে এলেন।

সারাদিন দাদা কারো সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা বললেন না।

এরপরে দিন-দুই দাদা ডুব। তার পরের দিন এসেই, হাজ্‌রে-খাতায় সই ক'রেই বললেন গিয়ে বড়োবাবুর কাছে, 'সর্বনাশ হয়েছে আমার, স্টোভ ফেটে গিয়ে গিন্নীর সমস্ত গা-হাত-পা-মুখ পুড়ে গেছে। হাসপাতালে দিইছি, কী হয় বলা যায় না, ডাক্তার বলছে কেস সীরিয়স। মেডিকেল হাসপাতালে সবাই দিতে বারণ করলে; বললে, ওখানে [illegible] মানুষ মেরে ফেলে, তাই ওখানে দিইনি। নীলরতনেও বেডিং খালি পাওয়া যায়নি। কী করি? শেষে পি.জি.-তে দিইছি। ওখানকার আর.এম. আমার বুজম ফ্রেণ্ড, [illegible] যা লেগে ব'লেই ওখানে দিলাম।...'

ইত্যাদি অনেক কথাই দাদা বললেন।

দাদার ব'সে-যাওয়া অবসন্ন মুখ, নিস্তেজ গলা, [illegible] ইত্যাদি দেখে অনেকেরই মনে হলো দাদার এই খবরটি সম্ভবত ধাপ্পাবাজি নয়। দাদার মুখে নানান দুর্ঘটনার খবর অবিশ্যি প্রায়ই পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে উনি এতবড়ো মিথ্যে গল্প তৈরি করবেন সেটা না-হওয়াই

স্তব্ধ। কেউ কেউ অবিশ্যি তখনো সন্দিগ্ধ বাঁকা কুটিল দৃষ্টিতে দাদার দিকে তাকাতে লাগলো এবং অবিশ্বাসে মৃদুমন্দভাবে ঘাড় নাড়াতে লাগলো।

আমার ভয় হচ্ছিল পাছে এই অভদ্র ঠোঁটকাটা লোকগুলোর কথাবার্তা দাদার কানে যায় এবং ফলে দাদা আরো মুষড়ে পড়েন। বিপদে পড়লে শত্রুও বন্ধু হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের অফিসের এই লোকগুলোর কি ততটুকুও কাণ্ডজ্ঞান আর বিবেক নেই!

যাই হোক, তিন দিনের ছুটি নেবার জন্যে দাদা এসেছিলেন। ছুটি মঞ্জুর হবে, বড়োবাবুর এই আশ্বাস পেয়ে দাদা কিছুক্ষণ বাদেই অফিস থেকে চ'লে গেলেন।

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল দাদাকে কিছু বলি। ওঁর কাছে-কাছেই আমি ছিলাম, যতক্ষণ ছিলেন। কিন্তু উনি আমার দিকে একবারও তাকালেন না। আমারও নিজে থেকে শেষপর্যন্ত কিছুই বলা হলো না।

২

এই তিন দিন এ-বিষয়ে কোনরকম খবরাখবর পেলাম না। আমাদের এ-অফিসের আর কেউই বারুইপুর থেকে আসে না, কাজেই খবর নেবার সহজ কোনো সুযোগও ছিল না, হাসপাতালটাও এমন জায়গায় যেখানে সচরাচর আমরা কেউ যাই না।

চতুর্থ দিনে দাদা আসবেন এই প্রত্যাশায় আমি নিজের একটা কাজ থাকা সত্ত্বেও সেকশনের বাইরে বেরোচ্ছিলাম না। কিন্তু সাড়ে এগারোটা যখন বেজে গেলো, আমি আশা ছেড়ে দিলাম। দাদার সম্বন্ধে অফিসের অন্যান্যরাও যে নির্বিকার ছিল তা নয়, বরং সকলেই প্রায় বেশ যেন একটু ভাবনায় প'ড়ে গেলো—দাদা কেন এলেন না এই চিন্তায়।

প্রায় বারোটা নাগাদ দাদা এলেন। দাদার চেহারা দেখে আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। এবং কিছুক্ষণ পরেই শুনলাম, বৌদি মারা গেছেন। গতকাল রাত্রে। দাদা শ্মশান থেকে সোজা এসেছেন অফিসে।

দাদার শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। ঐরকম ভারী মুখেও আজ চোয়ালের কঠিন রেখা কিরকম উঁচু হয়ে উঠেছে।

মনের মধ্যে খুব একটা ধাক্কা খেলাম।

দাদা আরো দিন পনেরোর ছুটির দরখাস্ত লিখে দিয়ে চ'লে গেলেন।

এর দিন পাঁচ-ছয় পরে অফিসে এসেই শুনলাম, সব ভাঁওতা!

কী ব্যাপার? না, দাদার এক ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের অফিসের সদানন্দবাবুর, গতকাল অফিস-ছুটির পরে, শেয়ালদা স্টেশনে। তাঁর কাছে সদানন্দবাবু দুঃখ প্রকাশ করতেই তিনি অবাক হয়ে যান। তারপরে রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে বিশেষ দেরি হয়নি। জানা গেছে, মৃত্যু বা স্টোভ-দুর্ঘটনা বা কোনরকম মারাত্মক দুর্ঘটনাই তাঁদের বাড়িতে গত কয়েকবছরে ঘটেনি।

সমস্ত শুনে, বলাই বাহুল্য যে, আবার একটা ধাক্কা খেলাম। কী জানি, হয়তো-বা বৌদির মৃত্যুসংবাদেও আমি এতবড়ো আঘাত পাইনি!

ভাবতে লাগলাম, দাদার ছুটি তো একদিন ফুরোবেই, সেদিন তিনি কোন্ মুখে আমাদের সামনে আসবেন! কী বলবেন অফিসে এসেই!

ভাবলাম, বৌদির এই পুনর্জন্মের সংবাদে আনন্দ প্রকাশের জন্যে আমাদের রিক্রিয়েশন-ক্লাবের উদ্যোগে একটা আসর বসানোর প্রস্তাব রাখা যায়, সেই আসরে দাদা তাঁর সেই যাত্রার-সীন ভিক্ষুকের ভূমিকা নিয়ে তাঁর সেই প্রিয় গানটি গাইবেন। দেখাই যাক—না আমরা ক'বার তাঁকে এংকোর-এংকোর দিই।

ডারউইন

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

আজ থেকে দেড়শ' বছর আগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী চার্ল্‌স্‌ ডারউইন জন্মগ্রহণ করেন। আর আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগে তাঁর 'প্রজাতির উদ্ভব' (*Origin of Species*) নামক গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এর মধ্যেই ডারউইন অভিব্যক্তিবাদের (Theory of Evolution) সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেন। তাই এ বছর নভেম্বর মাসে পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই অভিব্যক্তিবাদ-আবিষ্কারের শতবার্ষিকী উৎসব প্রতিপালন করার ব্যবস্থা হয়েছে।

চার্ল্‌স্‌ ডারউইন ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডের শ্রুসবারীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার রবার্ট ওয়ারিং ডারউইনের দ্বিতীয় পুত্র। মাত্র আটবছর বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। শৈশবে তিনি শ্রুসবারীতেই শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু স্কুলে তিনি কোনরূপ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন—"I have been told that I was much slower in learning than my younger sister Catherine, and I believe that I was in many ways a naughty boy."

পিতার ইচ্ছানুসারে ১৮২৫ সালে তিনি ডাক্তারীশাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে এডিন্‌বরায় গেলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি এই শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এখানে তিনি দুটি অস্ত্রোপচারের দৃশ্য দেখেন, এদের মধ্যে একজন রোগী হ'ল ছোট একটি শিশু। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তিনি পালিয়ে গেলেন, কোনক্রমেই তাঁকে আর-একটি অস্ত্রোপচারের সময় উপস্থিত থাকতে রাজী করানো গেল না।

ডাক্তারীশাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁর অনিচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁর পিতা তাঁকে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক বা পাদ্রি হবার জন্য শিক্ষালাভ করার উপদেশ দিলেন। ডারউইন এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছেন—"Considering how fiercely I have been attacked by the orthodox, it seems ludicrous that I once intended to be a clergyman." এই উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভের জন্য তিনি উনিশবছর বয়সে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। কিন্তু এখানে তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে এবং অঙ্কশাস্ত্রে সুবিধা করতে পারলেন না, তাই তাঁর শিক্ষায় অগ্রগতি আশানুরূপ হ'ল না। তবে এইসময়ে তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন; উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীর নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে পর্যটক-দলের সঙ্গী হ'তেন এবং সংগৃহীত নমুনাগুলি সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। কেম্‌ব্রিজে তিন বছর কাটাবার পরে, এইরূপ একটি অভিযান থেকে ফিরে এসে তিনি অধ্যাপক হেন্‌স্লোর একটি চিঠি পেলেন।

এই চিঠিতে জানা গেল যে, রাজকীয় নৌবহরের একটি জাহাজ 'বীগ্‌ল্‌' (Beagle) বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ভূপ্রদক্ষিণ করতে যাচ্ছে। এই অভিযানের নায়ক হলেন ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয়। তাঁর ইচ্ছা, তাঁদের সঙ্গে একজন নিসর্গবিদ্‌ও থাকেন। যে উৎসাহী যুবক বিনাবেতনে তাঁদের সঙ্গে যেতে সম্মত হবেন, তাঁকে তিনি তাঁর কেবিনের

কিয়দংশ ছেড়ে দেবেন। সবশেষে অধ্যাপক হেন্‌স্লো লিখলেন—"I suppose, there never was a finer chance for a man of zeal and spirit." ডারউইন এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হলেন এবং ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয়কে লিখলেন—"What a glorious day it will be for me —my second life will then commence." ১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর বীগ্‌ল্ জাহাজ ডিভন্‌পোর্ট থেকে যাত্রা করল, আর সেই থেকে ডারউইনের জীবনেরও মোড় ফিরে গেল, তিনি এক দুর্গম বনের পথে পা বাড়ালেন।

বীগ্‌ল্ প্রথমে কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জে গেল এবং সেখান থেকে অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ব্রেজিলের অন্তর্গত রিও ডি জেনেরিওতে পৌঁছাল। এখানে ছোটোখাটো উপসাগরের কূলে একটি কুটীর নির্মাণ করা হ'ল। ডারউইন সেখানে থেকে আশেপাশে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ চালাতে লাগলেন। এই সময় তিনি অনেকরকম সন্তরণকারী ব্যাঙ, [illegible]নিকী, আলোক-প্রদানকারী জোনাকি-পোকা, সবুজ তোতা, [illegible]কান, পিঁপড়ে, বোলতা, মাকড়সা প্রভৃতির নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তাদের কার্যকলাপ [illegible] দক্ষিণ আমেরিকায় তিনি মোট ২৭ রকম [illegible] অনেকরকম হরিণ ও পাখীর আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর ডারউইন বাহিয়া ব্লাঙ্কায় গেলেন এবং কিছুদিন সেখানেই থাকতে মনস্থ করলেন। এখানে এসে তিনি অতীতের অতিকায় প্রাণীদের অসংখ্য কঙ্কালের (fossils) সন্ধান পেলেন। এই অঞ্চলের পাখী এবং সরীসৃপদের সম্পর্কেও তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন।

তখন সেই অঞ্চলের রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে হঠাৎ যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেল, অথচ ইতিমধ্যে বীগ্‌ল্ চলে গেছে ৪০০ মাইল দূরে, বুয়েনস্ আয়ার্সে। এইরূপ অবস্থায় পড়েও ডারউইন ধৈর্য হারালেন না। বাহিয়া থেকে প্রথমে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলেন, কিন্তু পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ব'লে মনে হওয়ায় পরে নৌকায় ক'রে এগিয়ে চললেন এবং কোনপ্রকারে পারানা নদীর মোহনায় এসে ডাঙায় নামলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হলেন। অনেক যুক্তি ও বুদ্ধি খাটাবার পর এখান থেকে মুক্তি পেয়ে বুয়েনস্ আয়ার্স শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন। সেখানে পক্ষকাল কাটিয়ে তারপর একটি নৌকায় ক'রে মন্টিভিডিওতে গিয়ে সহযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বীগ্‌লে ক'রে সমুদ্র-ভ্রমণের সময় তিনি জাল ফেলে অনেকরকম সামুদ্রিক প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। প্যাটাগোনিয়ায় গিয়ে তিনি বহু লামার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করেন। এই অঞ্চলেও তিনি অতীতের অতিকায় প্রাণীদের অনেক কঙ্কাল দেখতে পান। এদের মধ্যে ছিল অতিকায় স্লথ, আর্মাডিলোর আকৃতি-বিশিষ্ট প্রাণী এবং লুপ্ত প্যাকাই-ডার্মাটা। অতীতের অতিকায় প্রাণীগুলি সব লুপ্ত হ'য়ে গেল কেন ?—এই প্রশ্নটি ডারউইনের চিন্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, এবং এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পেই তিনি পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"Certainly no fact in the long history of the world is so startling as the wide and repeated exterminations of its inhabitants."

বীগ্‌ল্ এরপর তিয়েরা ডেল ফুয়েগো, চিলি এবং গ্যালাপ্যাগো দ্বীপপুঞ্জ হ'য়ে তাহিতির দিকে পাড়ি দিল। সেখান থেকে নিউজীল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া হ'য়ে উত্তমাশা

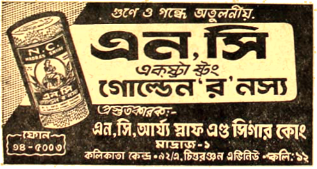
গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়.
এন,সি
একষ্ট্রা ষ্ট্রং
গোল্ডেন 'র' নস্য
প্রস্তুতকারক:-
এন,সি,আর্য্য স্নাফ এণ্ড সিগার কোং
মাদ্রাজ-১
কলিকাতা কেন্দ্র•৭২/এ,চিত্তরঞ্জন এভিনিউ •কলি:১২
ফোন
৭৪-৫০০৩

অন্তরীপ ঘুরে সেন্ট হেলেনাতে গেল এবং তারপর আবার অতলান্তিক মহাসাগর পার হ'য়ে বাহিয়াতে ফিরে গেল। এইভাবে একটানা পাঁচবছর ধরে তথ্যানুসন্ধানের কাজ শেষ ক'রে বীগ্‌ল্ দেশে ফিরল এবং ১৮৩৬ সালের ২রা অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের ফলমাউথ বন্দরে নোঙর করল।

প্রখ্যাত জীবনীকার গিব্‌সন ডারউইনের এই অভিযান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"During the voyage of the *Beagle* Darwin became impressed with certain facts which seemed to him difficult to reconcile with the idea that God had created each species separately. As the voyage proceeded and facts accumulated Darwin was convinced that the old dogma could not be upheld. He saw quite clearly that all living things had been evolved through long ages from simpler forms of life."

সাতাশবছর বয়সে ডারউইন দেশে ফিরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে বিদায় নিলেন। সুদীর্ঘ পাঁচবছর ধ'রে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে এলেন, তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আরও দু'বছর কেটে গেল। এরপর ১৮৩৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি তিনি এমা ওয়েজউড্‌কে বিয়ে করেন। এই বছরই তাঁর প্রথম গ্রন্থ *A Naturalist's Voyage in the Beagle* প্রকাশিত হ'ল। আর এরই উপর ভিত্তি ক'রে তাঁর ভবিষ্যৎ গবেষণা-জীবনের সূত্রপাত হ'ল। আরও ২০ বছর ধ'রে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এবং অসীম ধৈর্যসহকারে তিনি বিধান উৎপাদনের উপযোগী তথ্যগুলি সংগ্রহ করেন এবং তারই সাহায্যে অভিব্যক্তিবাদের সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলেন। 'প্রজাতির উদ্ভব' নামক রচনায় এই মতবাদ প্রকাশিত হ'ল—১৮৫৯ সালের নভেম্বর মাসে।

ডারউইনের মতে, বিভিন্নরকম জীবের উদ্ভব পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে হয়নি। এক বিরামহীন মন্থর ক্রম-পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সুদীর্ঘ কাল-প্রবাহে তারা উদ্ভূত হয়েছে। এরই নাম অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ (Evolution)। এই কাল-প্রবাহ কয়েক লক্ষ, কয়েক কোটি, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতকোটি বছর ব'লে হিসেব করা হয়েছে।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের প্রধান বুনিয়াদ হ'ল তিনটি—

১। পরিবর্তনশীলতা (Variation)—একই পিতা-মাতার সন্তান সকলে একই রকম হয় না, তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, তাদের জাত যে এক এ-কথা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। কেননা তাদের মধ্যে পার্থক্য যেমন আছে, সাদৃশ্য ঠিক তেমনিই আছে। ডারউইন এই পার্থক্য বা পরিবর্তনশীলতা জীবের একটি ধর্ম এ-কথা মেনে নিয়েছেন।

২। বংশগতি (Heredity)—কোনো একটি পরিবর্তন বা বৈসাদৃশ্য এক পুরুষ থেকে উত্তরপুরুষে সঞ্চালিত হয়। ক্রমে তা একটি বংশগত গুণে পরিণত হয়।

৩। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection)—প্রকৃতি উপযুক্তকেই বেছে নেয়, অর্থাৎ যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে (survival of the fittest)। অনুপযুক্তরা জীবন-সংগ্রামে হেরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, এবং অবলুপ্ত হয়।

এই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব হওয়ার পর থেকে (প্রায় শত কোটি বছর) আজ অবধি ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে জীবনধারণের অবস্থা বার বার পরিবর্তিত [illegible]। যে-সব জীব জীবনধারণের নূতন অবস্থার সঙ্গে অ[illegible]জিত হ'তে (adapted) পারেনি, অর্থাৎ নিজেকে খা[illegible]ইয়ে নিতে পারেনি, তারা লুপ্ত হ'য়ে গেছে। আর[illegible]জিত হ'তে পেরেছে, তারাই টিকে রয়েছে। ব[illegible] যে-সব প্রজাতি দেখা যায়, তারা সকলেই সুদূর অতীতে এই পৃথিবীতে যে-সব উদ্ভিদ্ বা প্রাণী ছিল, তাদেরই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত বংশধর ছাড়া আর কিছুই নয়।

জীবদেহে পরিবর্তন না হ'লে অভিব্যক্তি কখনই সম্ভব হ'ত না। কোনো একটি পরিবর্তন বংশগতি অনুসারে উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চালিত হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যেকটি পরিবর্তনই যে এইভাবে উত্তরপুরুষে সঞ্চালিত হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। জীবজগতে কোনো জাতির মধ্যে একটি পরিবর্তন বংশপরম্পরায় স্থায়ী হ'লে তবেই বলা যায় যে, অভিব্যক্তি হয়েছে। কোনো পরিবর্তন তা যত কার্যকরী বা হিতকরই হোক না কেন, যদি বংশগতি অনুসারে উত্তরপুরুষে সঞ্চালিত না হয়, তবে অভিব্যক্তি হয়েছে এ-কথা বলা যায় না।

কোন্ পরিবর্তন হিতকর ব'লে স্থায়ী হবে, অথব অহিতকর ব'লে বর্জিত হবে, তা প্রাকৃতিক নির্বাচ অনুসারে নির্ধারিত হয়। কোনো একটি জীবের মধ্যে তা পক্ষে অহিতকর কোনো নূতন বিশেষত্ব দেখা দিলে জীব অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই বিশেষত্বটি যদি হিতক হয় তবে জীবটি পূর্ণবয়স অবধি বেঁচে থাকতে এব

বংশবিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর এই নূতন বিশেষত্বটি বংশগতি অনুসারে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে নূতন বিশেষত্বটি প্রজাতিটির পরিবর্তনে এবং তার ফলে জীবের ক্রমবিকাশে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, বাহ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যে-সব জীব সহজেই অভিযোজিত হয়, তাদের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম ভাবে ঘটে থাকে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এই ব্যাপারে অলৌকিক, রহস্যময় বা ঐশ্বরিক ব'লে কিছু নেই। কাজেই ডারউইনের এই মতবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবের উদ্ভব-সম্পর্কিত ধর্মীয় মতগুলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেল।

উপরি-উক্ত গবেষণার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবেই মানুষের উদ্ভব সম্পর্কে ডারউইনের অনুসন্ধানকার্য শুরু হ'ল। সুদীর্ঘকাল ধ'রে তিনি এ সম্পর্কে এমনসব প্রমাণ সংগ্রহ করলেন [illegible] প্রতীতি জন্মে। গবেষণার ফলাফল তিনি [illegible] বিবৃত করলেন ১৮৭১ সালে 'মানুষের [illegible]' ([illegible]ent of Man) নামক গ্রন্থে। এতে তিনি [illegible] প্রমাণ করেন যে, সুদূর অতীতে বানর এবং [illegible]পুরুষ এক ছিল। অভিব্যক্তিবাদের নিয়ম অনুসারে সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে তা থেকে একদিকে সৃষ্টি হয়েছে নানা জাতের বানর, আর অন্যদিকে সৃষ্টি হয়েছে নানা জাতের মানুষ। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁর এই মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা করা হ'ল। তাই অনেকেরই ধারণা হ'ল, তিনি বলেছেন যে, মানুষের উদ্ভব হয়েছে বানর থেকে, অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল বানর। যদিও ডারউইন ঠিক এ-কথা বলেননি। এজন্য অনেকেরই আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল, তাঁরা ডারউইনের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তাই ডারউইনের এই মতবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক বাদানুবাদ শুরু হ'য়ে গেল। ধর্মযাজকগণ অচিরেই বুঝলেন যে, এই মতবাদ খ্রীষ্টধর্মের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই তাঁরা ডারউইনকে অত্যন্ত তীব্রভাষায় আক্রমণ করতে লাগলেন। তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন যে, ডারউইন বাইবেলকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ডারউইন হতাশ হলেন না বা ধৈর্য হারালেন না। প্রকৃত বীরের মতো উপযুক্ত সময়ের জন্য ধৈর্য ধ'রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতেই বিজ্ঞান-সমাজ তাঁর এই মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। সৌভাগ্যবশতঃ, আর একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী টমাস হেন্‌রি হাক্সলি-ও গবেষণার ফলে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কাজেই তিনি ডারউইনের মতবাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক হলেন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই সভ্যসমাজে এই মতবাদটি সত্য ব'লে স্বীকৃত হ'ল।

ডারউইনের স্বাস্থ্য কোনদিনই ভালো ছিল না। অত্যন্ত স্নেহশীল এবং কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রীর সাহায্য ছাড়া তাঁর বিশাল গ্রন্থগুলি রচনা করা কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। অসুস্থতার দরুন তিনি বৈজ্ঞানিক কিংবা সামাজিক সভাগুলিতে যোগ দিতে পারতেন না। কিন্তু তাই ব'লে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী অকৃত্রিম বন্ধুর কোনো অভাব ছিল না। এর কারণ, তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত উদার এবং বিনীত। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হ'তে দেখা যায়নি।

অল্প কিছুদিন যন্ত্রণাদায়ক রোগ-ভোগের পর ১৮৮২ সালের ১৯শে এপ্রিল ৭৩ বছর বয়সে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হ'ল। ২৬শে তারিখ ওয়েস্টমিন্‌স্টার অ্যাবিতে তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হ'ল। এই প্রসঙ্গে [illegible] লিখেছেন—"It was the desire of the family to have the burial a local and a private one, but the nation showed the very high regard in which they held this great biologist, and all classes of men were anxious that the funeral should be national, and that the burial should be among Great Britain's illustrious dead in Westminster Abbey. The sympathy of the public was so great that the family felt bound to accept this tribute to his memory."

তন্ত্রের তারাপীঠ

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরবাহিনী দ্বারকা নদী। নদী শুধু নামেই, জলে কিন্তু পায়ের পাতাও ভালো করে ডোবে না। সামনে শুধু বালির চড়া—ওপাশে জাম ও শেওড়ার জঙ্গল…একটা কালো কুকুর নির্বিকারভাবে নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকল। এপার থেকেই দেখা গেল ওই জঙ্গলে কারা যেন বসে রয়েছে, পাশে কাপড়ে ঢাকা কি যেন একটা—কয়েকজন মিলে একটা গর্ত খুঁড়ছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে জামগাছের উপর শকুনেরা বসে বসে যেন ঝিমোচ্ছে। স্তব্ধতা ও নৈঃশব্দকে বিদীর্ণ করে গুরুগম্ভীর স্বর শোনা গেল : তারা, তারা !—

ঝটপট করে পাখা নাড়ল গাছের শকুনেরা। নদীর তীরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমিও। সম্মুখের মন্দিরের সবটুকুই এখন দেখা যাচ্ছে, এতক্ষণ মাঠের মধ্য দিয়ে শুধু মন্দির-শীর্ষই দেখেছিলাম, এইবার এসে পড়লাম মন্দিরের সামনে। দ্বারকার তীরে উঠে এগিয়ে চললাম সামনে—জটাজুটধারী, রক্তাম্বর-পরিহিত একজন তান্ত্রিক সমাহিত দৃষ্টিতে নদীতীরে টিলার উপর বসে আছেন। একটা কালো কুকুর হাই তুলে উঠে দাঁড়াল ও মন্থরগতিতে পাশের জঙ্গলে প্রবেশ করল।

অনেক মাঠ পেরিয়ে এসে পৌঁছালাম তন্ত্রের তারাপীঠে।

হ্যাঁ, এই তারাপীঠ। সামনেই হচ্ছে তারাদেবীর মন্দির—আর ওই দ্বারকার তীরে, টিলার বাঁ পাশ থেকেই শুরু হয়েছে তারাপীঠের মহাশ্মশানভূমি।

আবার চেয়ে দেখলাম জাম ও শেওড়ার জঙ্গলে ঢাকা তারাপীঠের শ্মশানের দিকে—কয়েকজন লোক ঘিরে রয়েছে একটি শবদেহকে, আয়োজন চলছে সমাধির।

এই মহাশ্মশানভূমিতেই কত বীর সাধক তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন। তারাপীঠ-ভৈরব বামদেব—বামাখ্যাপাও সিদ্ধিলাভ করেন এই মহাশ্মশানে। বামার আগেও কত তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ সাধনা করেছেন তারাপীঠের এই শ্মশানে—কেউ-বা সিদ্ধিলাভ করেছেন, কারও বা সাধনা নানা বিভীষিকা-দর্শনে মধ্যপথেই ব্যর্থ হয়েছে। কত সাধক এই শ্মশানের আসনে স্থির থাকতে পারেননি,—ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের তপস্যা। এখনও নাকি গভীর রাত্রে শ্মশানের প্রেতবাতাসে মর্মরিত হয় গাছপালা, শোনা যায় ব্যর্থ সাধকদের কান্না ও দীর্ঘশ্বাস।

তারাপীঠের মহাশ্মশানের গাম্ভীর্য শুধু পীঠ-মাহাত্ম্যেই নয়, ভয়ঙ্করত্বেও বটে। প্রায় একমাইল ব্যাপী নরকঙ্কাল-পূর্ণ জঙ্গলে ঢাকা শ্মশান। শবহীন তারাপীঠের শ্মশান যেন কল্পনাই করা যায় না। দিনে রাতে সব [illegible] এই শ্মশানে শবের অপ্রতুলতা নেই—মহাকাল [illegible] নিত্যই নৃত্যপরা।

এখন অবশ্য শ্মশানের জঙ্গল অনেক ফাঁকা হয়ে এসেছে। আগে নাকি এখানে দিনে রাতে ছিল শুধু চাপ-চাপ অন্ধকার। লোকমুখে শুনলাম যে, চন্দ্র-সূর্যও প্রবেশ করত না এই শ্মশানে। শবদেহ কোনরকমে পুঁতে রেখে শববাহকেরা পালিয়ে বাঁচত এই মহাশ্মশান থেকে—অতিবড় দুঃসাহসী না হলে কেউ শ্মশানের মধ্যস্থলে প্রবেশ করবার কল্পনা করতেও শিউরে উঠত।

আবার চাইলাম শ্মশানের দিকে। এখন শ্মশান অনেক ফাঁকা। অনেক উৎসাহী ও কৌতূহলীরা শ্মশানের ভিতরে বেড়াতে যান এখন। এখন অবশ্য অতীতের সেই ভয়ঙ্করত্ব আর চোখে পড়ে না।

তারাদেবীর মন্দিরের আশেপাশেই যা কিছু জন-সমাগম। তারপর শুধু ধূধূ শূন্যতা ও স্তব্ধতার জমাট আবরণ। একপাশে মাঠ, অন্যপাশে দ্বারকার তীরে শ্মশান; মধ্যস্থল দিয়ে সর্পিল পথ ঘুরে রামপুরহাটের দিকে চলে গেছে। সেই পথের পাশে শ্মশানের কোল ঘেঁষে সিদ্ধপুরুষদের সমাধি ও তান্ত্রিকদের কুটির ছাড়া পথে জন-সমাগম খুবই কম। সন্ধ্যার পরে নিতান্ত কৌতূহলী যাত্রী ছাড়া বোধহয় পথে কাউকে দেখা যায় না।

তন্ত্রের তারাপীঠ।—

হ্যা, তন্ত্রের তারাপীঠই তো। বীরভূম জেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পীঠই হচ্ছে এই তারাপীঠ, পীঠের অধিষ্ঠিতা দেবী হচ্ছেন তারাদেবী। 'তারাতন্ত্রে' এই তারাপীঠের উল্লেখ, এমনকি স্থান-নির্দেশও আছে। বক্রেশ্বর থেকে পূর্বে, বৈদ্যনাথধামের দক্ষিণেই এই তারাপীঠ—তারাতন্ত্রে আরও উল্লিখিত আছে যে, বহুদিনের ব্যর্থ তপস্যার পর বশিষ্ঠ মুনি এই তারাপীঠেই তারামন্ত্রে সিদ্ধিলাভ ক'রে শিলাময়ী তারাদেবীকে প্রাপ্ত হন মন্দিরের অদূরে অবস্থিত বশিষ্ঠ-কুণ্ড থেকে।

তারাতন্ত্রে সিদ্ধিলাভ ক'রে বশিষ্ঠ শিলাময়ী তারাকে লাভ করেছিলেন বলেই, তারাপীঠের তারাদেবী হচ্ছেন: "বশিষ্ঠারাধিতা তারা ত্ব তারা শিলাময়ী"।

'বশিষ্ঠারাধিতা' তারাপীঠের তারাদেবী হচ্ছেন তাই শিলাময়ী। শুধু একখানি পাষাণফলক, মাঝে মাঝে কিছুটা খোদিত। মূর্তি বলে কিছু নেই। পাষাণশিলায় মাতৃমূর্তির কল্পনা করে নিতে হয়। মাতৃমূর্তিতে তারাদেবী শিবকে শিশুরূপে স্তন্যপান করাচ্ছেন। স্নানের পর শিলাময়ী মূর্তিকে মনোরম বস্ত্রে আচ্ছাদিত ক'রে, রূপার মুকুট ও মুণ্ড বসিয়ে সাজানো হয়। তারা-মা স্নানের পর এই মোহিনী মূর্তিতে মন্দিরে বিরাজ করেন। অপরূপ এই মূর্তি।

প্রামাণ্য ইতিহাস কিছু নেই। জনশ্রুতি ও লোকপ্রবাদই সম্বল। পাণ্ডাদের কাছে শুনলাম যে, রাণী ভবানীর পুত্র (পোষ্যপুত্র) রাজা রামকৃষ্ণও এই তারাপীঠে তন্ত্রসাধনা করতে এসে আসনে স্থির থাকতে পারেননি—প্রত্যাদেশ পেয়ে তিনি নাটোরে ফিরে যান। তারপর রাজনগরের জমিদার আসাদুল্লার কাছ থেকে অন্য একটি পরগনার বিনিময়ে এই তারাপুর গ্রাম নিজ জমিদারির এলাকাভুক্ত করেন। দেবীর সেবার ব্যবস্থাও হয় নাটোর সরকার থেকে। আজও অবশ্য তা আছে—কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নাকি খুবই স্বল্প।

তারাদেবীর প্রথম মন্দির নির্মাণ করেন রাজা উদয়নারায়ণের একজন কর্মচারী, তাঁর নাম রামনারায়ণ রায়। মুর্শীদকুলী খাঁর সময় সেই মন্দির নির্মিত হয়। বর্তমানের মন্দির সেই মন্দিরের ভিত্তির উপর শতাধিক বর্ষ পূর্বে একজন ভক্ত কর্তৃক নির্মিত হয়। মন্দিরের গায়ে ইটের উপর চমৎকার নক্সা ও চিত্র খোদাই করা আছে।

অনেক সাংস্কৃতিক গবেষকের ধারণা (বিনয় ঘোষ: 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি') যে, তারাদেবী হচ্ছেন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার যুগে (খ্রীষ্টীয় ৭ম।৮ম শতাব্দী) কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের সময়, বৌদ্ধ নাগার্জুন 'নীলতারা'র উপাসনা করেন এই তারাপুর গ্রামে। পরবর্তীকালে অনেক বৌদ্ধতান্ত্রিক দেব-দেবীর মতো বৌদ্ধদের 'নীলতারা' হিন্দুসংস্কৃতির মধ্যে তারাদেবীতে অবলুপ্ত হয়েছেন। বৌদ্ধ নাগার্জুনও রূপান্তরিত হয়েছেন বশিষ্ঠমুনিতে। যাই হোক, তারাপীঠের তারাদেবী পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বহু পুরাতনী দেবী, এবং তারাপীঠও যে বহু প্রাচীন স্থান তা অস্বীকার করা যায় না।

•

বর্তমান যুগে অবশ্য বামাখ্যাপাই তারাপীঠের মাহাত্ম্যকে আবার নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক সাধনা ও বিভূতি তাঁর জীবিতকালেই বহু মানুষকে, বহু ভক্ত ও সাধককে দূর-দূরান্তর থেকে আহ্বান করেছে এই তারাপীঠে। তারাপীঠে এখনও অনেক বৃদ্ধ আছেন, যাঁরা বামদেবকে দেখেছেন ও তাঁর সঙ্গলাভ করেছেন।

কত কথাই শুনেছি, আবার শুনলাম সিদ্ধপুরুষ বামদেব সম্পর্কে। উগ্র তপস্বী ছিলেন বামদেব। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না, আচার ও বিচারে তিনি ছিলেন মুক্তপুরুষ। শুধু বড়মা, তারা-মা ছাড়া অন্য কোনো চেতনা ও ভাবনা ছিল না খ্যাপার। কখনও শ্মশানে, কখনও

মন্দিরে পড়ে থাকতেন, কখনও নীরব, কখনও বা ভয়ানক উগ্র—সাধারণে কাছে আসতেই ভয় পেত। সঙ্গের সাথী ছিল তাঁর কুকুরগুলি। ছায়ার মতো কুকুরগুলি অনুসরণ করত খ্যাপাকে। দ্বাদশ রুদ্র রক্ষা করত ভক্ত ও সাধক বামাকে। পরবর্তীকালে বামা বালকের মতো ব্যবহার করতেন। 'বাবা' ছাড়া কথা বলতেন না কারও সঙ্গে। কত কাহিনী, কত অলৌকিক কাহিনী আছে বামা সম্পর্কে। কত মরণাপন্ন রোগী তাঁর লাথি খেয়ে বেঁচে গেছে,—কত লোককে আদেশ করেছেন আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অখাদ্য বস্তু খেতে। তাই খেয়ে তারা দুরন্ত ও কালব্যাধির হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে। পাশমুক্ত সাধক ছিলেন বামদেব। ঘৃণা লজ্জা ভয় সকলের ঊর্ধ্বে 'শিবোঽহং' ছিলেন তিনি। বামা বলতেন যে, তারাপীঠে কুকুর হয়ে জন্মানোও মহা পুণ্যের। দেবীর এঁটো প্রসাদ খেতে পেলেও মহা পুণ্য হয়।

খ্যাপার মুখে 'কট্' শুনলে হৃৎকম্প হ'ত সম্বোধিত ব্যক্তির। 'আরে, এ শালা তো কট্'—ব্যাস, যেন শিববাক্য। কতবার অভ্রান্তভাবে সফল হয়েছে 'কট্' শব্দের অর্থ।

বামদেবের সমাধি-মন্দির শ্মশানের কোণ ঘেঁষে তাঁর আসনের উপরই নির্মিত হয়েছে। উত্তরমুখী হয়ে উপবেশন অবস্থায় তিনি সমাহিত। মন্দিরের ভিতরে তাঁর উপবেশন অবস্থায় প্রস্তরমূর্তিও আছে। সমাধির পাশেই ছিল একটি বহু পুরাতন শিমুলগাছ। সেই শিমুলগাছের তলাতেই নাকি বশিষ্ঠ তারামন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছিলেন। এখন অবশ্য শিমুলগাছটি নেই—স্থান নির্দেশ করে একটি ফলক গাঁথা আছে। শোনা যায়, বণিক জয়দত্ত নাকি বশিষ্ঠদেবের পূজিতা শিলাময়ী তারাদেবীকে কুণ্ডের জল থেকে উদ্ধার করে ওই শিমুলতলাতেই প্রথম স্থাপনা করেছিলেন।

●

সামনে বাঁশঝাড়, তার মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথরেখা—চারিদিকে শুধু তান্ত্রিক সাধকদের সমাধি। থমকে দাঁড়ালাম একটি সমাধির সামনে, ফলকে লেখা: 'প্রাণেশ্বরী ভৈরবীর সমাধি'।

···তারাপীঠের মুণ্ডমালাতলা। সন্ধ্যার আবছায়ায় এইস্থান ভয়াবহ। আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন নেই—শবের পরিত্যক্ত মাদুর বিছানা দিয়ে একটি কুটিরের মতো আচ্ছাদন, সামনে একটা চাতালের উপর গোলাকারে নরমুণ্ড সাজানো। চারিদিকের অখণ্ড নিস্তব্ধতা ও শূন্যতায় বুকের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। চেয়ে দেখলাম, চাতালের উপর মুণ্ডমালার দিকে চেয়ে একজন তান্ত্রিক নীরবে বসে আছেন।

এই ভয়ানক স্থানে, চারিদিকে শুধু সমাধি;—জনমানবহীন নিস্তব্ধতা ও শূন্যতায় এই মহারণ্যে উনি একা ওই কুটিরে থাকেন? উনি কি ভয়কে জয় করেছেন, পেয়েছেন কি দেবীর কাছ থেকে অভয়মন্ত্র: মা ভৈষীঃ। —হে ভক্ত, ভয়ে ভীত হোয়ো না।

না দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে, এমন ভয়ানক স্থানে একাকী কোনো মানুষ বাস করতে পারে। যিনি পারেন তিনি নিশ্চয়ই ভয়কে জয় করেছেন, এ কথা জোর করে বলা যায়।

আমরা ভয়হীন সাধক নই, সাধারণ মানুষ। এই ভয়াবহ স্থানে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে তাই বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। চলে আসতে আসতে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম যে, তান্ত্রিক সাধক সমাহিতের মতো বসে আছেন। চাপ-চাপ গাঢ় অন্ধকার নামছে চারদিকে, আশেপাশে উঠছে শিবার ধ্বনি—যেন শ্মশান-বাসিনীদের ঘুম ভাঙছে, জেগে উঠছে ডাকিনী-যোগিনীর দল,—এবার শুরু হবে মুণ্ডমালা নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলা। বাতাস এবার হা-হা শব্দে আর্তনাদ করবে, সেইসঙ্গে উঠবে প্রেতকণ্ঠের অট্টহাসি! যিনি বীর তিনিই শুধু সহস্র বিভীষিকার মাঝে আসনে থাকবেন অটল ও অকম্পিত,—তাঁর পদপ্রান্তে শেষপর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে বিভীষিকার দল। তারপর মহাজ্যোতি দর্শন করবেন বীর সাধক, ধন্য হবে তাঁর জীবন, পূর্ণ হবে বীরভাবের সাধনা।

আবার ফিরে চাইলাম তারাপীঠের মুণ্ডমালাতলার দিকে। কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের পটভূমিকায় শুধু একটা দীর্ঘরেখার মতো অস্পষ্টভাবে কী দেখা যাচ্ছে।—উনিই কি সেই তন্ত্রসাধক?

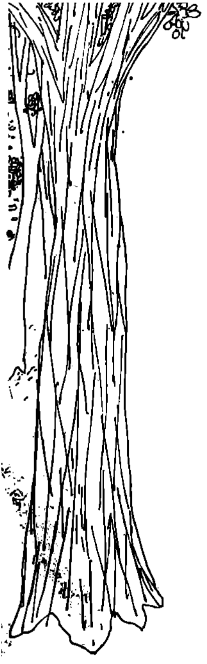

ঐন্দ্রজালিক

পশুপতি ভট্টাচার্য

নবাগত বৈরাগীর নাম ধাম পরিচয় কারো জানা নেই। অচেনা অজানা একজন পরিব্রাজকের মতো সেই বৈরাগী হঠাৎ এসে হাজির হলো গ্রামের মধ্যে। শীতের অপরাহ্ণ তখন ম্লান হয়ে এসেছে, শীঘ্রই সন্ধ্যা নামবে। বৈরাগীকে প্রবেশ করতে দেখা গেল গ্রামের ভদ্র পাড়াতে।

মানুষটিকে দেখলে বাঙালী ভদ্রসন্তানের মতো মনে হয়। তার পরিণত যৌবন, উন্নত বুক, মাথায় লম্বা লম্বা ঘন চুল, মুখে পাতলা দাড়ি-গোঁফ। বলিষ্ঠ ঋজু দেহ, চলার ভঙ্গী সতেজ, স্বচ্ছন্দ। কিন্তু বেশভূষা কিছু অদ্ভুত। কাঁধে চাপানো আছে এক কম্বল, তার উপর থেকে একটা লম্বা মস্ত ঝুলি ঝুলছে। এদিকে খালি গা, খালি পা, পরনের কাপড় হাঁটুর নীচে নামেনি, গলাতে রয়েছে কণ্ঠী। হাতে এক পিতলের ঘটি আর লোহার চিমটা। অনেকটা সাধারণ ভবঘুরে সাধুবৈরাগীর মতো।

কথাবার্তায় বেশ ভদ্র। যার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সে ব্যক্তি তাই বললে। সে একজন ভদ্রগৃহস্থ। বাড়ির ভিতর থেকে সে বাইরে বেরোচ্ছিল, এমন সময় ঐ বৈরাগী তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"এখানকার দেবীর মন্দিরে কোন্ পথ দিয়ে যাবো?"

গৃহস্থ প্রশ্ন শুনেই অবাক হয়ে গেল। এ গ্রামে দেবীর মন্দির! লোকটা বলে কি? সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, এসে ভিক্ষে চাইলে না, আশ্রয় চাইলে না, বললে কিনা দেবীর মন্দিরটা কোথায়! অথচ গ্রামের ভিতর মন্দিরই নেই।

গৃহস্বামী বললে—"এখানে কোনো মন্দির-টন্দির নেই বাপু। কিন্তু আপনি দেখছি বাঙালী, তা কোথা থেকে আসছেন?"

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বৈরাগী একটু বিস্মিত হয়েই বললে—"এখানে কোনো দেবী নেই? তবে যে

এই গ্রামের নামটি সেইরকমই যেন শুনলাম। নিশ্চয় এখানে ঐ নামের কোনো এক দেবী থাকার কথা—"

গৃহস্বামী বললে—"ও, হাঁ, হাঁ, সেই পুরাকালের কথা আপনি বলছেন? ছিল বটে এক দেবীর মন্দির, বহুকাল আগে। তার থেকেই এ গ্রামের এইরকম নাম হয়েছিল বটে। কিন্তু নামটাই শুধু আছে, সে-মন্দির এখন ভাঙা পোড়ো-মন্দির, তার চারিদিকে ভীষণ জঙ্গল, বাঘ ভালুক সাপখোপের বাসা। সে-জায়গা একেবারে গ্রামের বাইরে, দিনের বেলাতেও কেউ ওদিকে যায় না।"

বৈরাগী বললে—"আছে তাহ'লে একটা কিছু মন্দির। পোড়ো হোক আর যাই হোক, আমি সেখানেই যেতে চাইছি। পথটা যদি দয়া ক'রে দেখিয়ে দেন!"

গৃহস্বামী বললে—"অন্ধকার হয়ে এলো, আজ আর সেখানে যাওয়া যাবে না। আপনি হয়তো আজকের রাতটার মতো আশ্রয় নেবার জায়গা খুঁজছেন, তা আমার বাড়িতেই থাকুন না। কাল বরং সেখানে যাবেন।"

বৈরাগী একটু হেসে বললে—"আপনি অচেনা অতিথিকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে চাইছেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু তার উপায় নেই, কোনো গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিতে আমার বারণ। আমাকে ঐ পোড়ো মন্দিরেই যেতে হবে। আজই যদি আমাকে পথটা দেখিয়ে দেন!"

বৈরাগী এমনিভাবেই সেদিন ঐখানে এসে হাজির হয়েছিল।

যে গ্রামের কথা বলা হচ্ছে, তার নাম বিশালাগড়, আবার অনেকে বলে ঠাকুরাণগড়। ঠাকুরাণীর নামেই এ গ্রামের নাম। অতি প্রাচীনকাল থেকে।

নিতান্ত ছোটোখাটো গ্রাম নয়, সাধারণত যাকে বলে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানকার অধিকাংশ লোকে চাষবাসের কারবার নিয়ে থাকে। তার কারণ, এখানকার জমি ভালো, প্রচুর ধান জন্মায়, তাই প্রায় প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু জমি আছে। প্রত্যেক বাড়িতেই বড়ো বড়ো ধানের মরাই। আর প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দেখা যায় পরিষ্কার ক'রে নিকোনো এক এক প্রশস্ত উঠোন। সেখানে ধান মাড়াই হয়, ধান শুকোয়। ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতেও তাই।

গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের অবস্থা অল্পবিস্তর সচ্ছল। গোয়ালে গোয়ালে যথেষ্ট সংখ্যায় গরু, বাছুর, মোষ, ছাগল। নিম্নজাতীয়দের ঘরে হাঁস-মুরগিও আছে। ছোটো বড়ো কারোই কিছু বিলাসবাহুল্য নেই, কিন্তু কারো অভাব-অনটনও নেই। তবে এর মধ্যে কৃষাণ, মজুর, শ্রমিক, চাষাভুষোদের পাড়া আলাদা, আবার ভদ্র গৃহস্থদের পাড়া আলাদা। তার মধ্যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থ, এবং বাকী সব অন্যান্য জাতের লোকেরা। এরা কেউ কেউ ব্যবসাদার আর বেশ অবস্থাপন্ন। যারা তা নয় তারা চাষবাস করে কিংবা চাকরি করে। তার মধ্যে কেউ বা দেশে থেকেই নানারকম কাজ করে, কেউ বা চাকরি নিয়ে বিদেশে যায়, সপ্তাহান্তে বা ছুটিছাটায় গ্রামে ফেরে। এ ছাড়া অনেকগুলি নিষ্কর্মা যুবকের দলও আছে, তাদের বিশেষ কিছু কাজ নেই, কেবল অকাজে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামে একটি স্কুল আছে, একটি পোস্ট-অফিস আছে। অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। যারা বারো মাস গ্রামে থাকে তাদের এই গ্রামেই সব-কিছুর অভাব মিটে যায়, শহরে যাবার দরকার হয় না। ধান চাল ডাল সব প্রচুর আছে, ঘি-দুধ যথেষ্টই মেলে এবং সস্তায় মেলে, মাছ-মাংসের অভাব হয় না। গ্রামে কয়েকটি মিঠায়ের দোকান আছে, সেখানে জিলিপি, বোঁদে, গজা, খাজা প্রভৃতি প্রত্যহই মেলে, মাঝে মাঝে রসগোল্লাও পাওয়া যায়। বেনের দোকান, মশলাপাতির দোকান, মনিহারি দোকান, কাপড়-জামার দোকান, সমস্তই আছে। এমনকি মুড়ি-মুড়কির দোকানের সঙ্গে ছোটো একটি চায়ের দোকানও সম্প্রতি খোলা হয়েছে।

এ গ্রামের নাম কেন এমন হলো তার একটা ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে বলি।

বহুকাল আগের নবাবী শাসনের যুগে এ অঞ্চল এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজার রাজ্য ছিল। যদিও ক্ষুদ্র রাজা, তবু তার ভারী প্রতাপ ছিল। শোনা যায় নবাব পর্যন্ত তাকে ভয় ক'রে চলতো। সে ছিল জগদ্ধাত্রী ভগবতী মাতার পরম ভক্ত, তাঁরই কৃপাতে নাকি তার এতখানি বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। সেই রাজা আপন রাজ্যের মধ্যে এক মন্দির তুলে সেখানে তার আরাধ্যা দেবীর প্রতিষ্ঠা করে। দেবী নাকি তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, আমার নাম বিশালা দেবী, এ জায়গার নাম রাখবি বিশালাগড়। ঠিক পূর্বদিকে মুখ ক'রে আমার মন্দির গড়াবি, তার দরজা এমন জায়গাতে হবে যেন রোজ সকালে সূর্যের আলো সেই দরজার ভিতর দিয়ে আমার মুখের উপর এসে পড়ে। আমি রোজ সকালে একটু রৌদ্রস্নান করতে চাই। রাজা বড়ো বড়ো স্থপতিদের আনিয়ে ঠিক সেই নির্দেশ অনুসারে মন্দিরটা খাড়া করলে, আর নামজাদা এক ভাস্করকে আনিয়ে তাকে দিয়ে আপন পছন্দমতো তার স্বপ্নে-দেখা অপূর্ব

বিশালা-দেবীর মূর্তিটি গড়ালে। সেই থেকে এখানকার াম বিশালাগড় বা ঠাকুরাণগড়। বিশালা ঠাকুরাণীর থান স্তানা।

কিন্তু দেবীর কৃপাবলে বলীয়ান হয়ে রাজা ক্রমশ অসম্ভব কমের অত্যাচারী হয়ে উঠল। দুনিয়াতে কাউকেই স গ্রাহ্য করে না, ভদ্রাভদ্রের ধার ধারে না, ন্যায়-নীতির োয়া করে না। লোক লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে দস্যুর মতো রের রাজ্যকে আক্রমণ করে, পরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, ার কেউ তার কাজে বাধা দিতে এলে তখন তাকে-ধরে নে বিশালা দেবীর সামনে বলি দেয়। এইভাবে ওখানে ন্ত লোককে যে বলি দেওয়া হলো তার কোনো সংখ্যা নই। মানুষের রক্তে মন্দিরপ্রাঙ্গণ রক্তাক্ত হয়ে উঠল। ন্দিরের পিছনে যে প্রকাণ্ড দীঘি তার নাম বিশালাদীঘি, ন্তু মানুষের রক্ত তার জলে মিশে তা রুধিরদীঘিতে রিণত হলো। এসব অবশ্য শোনা কথা, কিন্তু এর মধ্যে ছু কিছু সত্য আছে।

রাজার সেই অত্যাচার শেষপর্যন্ত দেবীরও আর সহ্য লো না। নানা দিক দিয়ে ক্রমে ক্রমে তার পতন হতে াগল। কিন্তু তবুও তার চৈতন্য হলো না, অভাবের াড়নায় সে আরো বেশী স্বেচ্ছাচার করতে লাগল। খন রাজার রাজ্যের প্রজারা এবং আরো আশপাশের মিদারেরা সকলে একজোট হয়ে খোদ নবাবের কাছে িয়ে নালিশ জানালে। নবাব সময়মতো খাজনা া পাওয়াতে, আগের থেকেই ঐ রাজার উপর বিরূপ হয়ে ঠেছিল। তার উপর প্রজাদের কাছে সমস্ত শুনে সে রাগে জ্বলে উঠল। তখনই রাজাকে ধরে আনবার জন্যে ন অনেক ফৌজ পাঠালে। রাজা তাদের সঙ্গে প্রায় কাল ধরে সাধ্যমতো ভাবে লড়লে, কিন্তু রসদ ফুরিয়ে াওয়াতে শেষপর্যন্ত সে ধরা দিলে। তখন তারা উন্মত্ত হয়ে জবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলে, আর যেখানে যা দেখতে লে সমস্ত লুটে-পুটে নিলে। স্বয়ং রাজাকে তারা নবাবের াছে বেঁধে নিয়ে গেল। তারপরে তার কী দুর্দশা হলো -কথা কেউ জানে না।

রাজার রাজ্য ছারখার হয়ে গেল, তার কোনো চিহ্ন র্যন্ত রইল না। নবাবের ফৌজ দেবীর মন্দিরটিকেও ঙে-চুরে নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। তবে পাথরের গড়া মন্দির ল বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। দেবীর মূর্তিটিকে তারা াঙতে পারেনি, কিংবা সে-চেষ্টা তারা হয়তো করেনি।

মন্দিরের যা কিছু শোভাসমৃদ্ধি ছিল, কাল তাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে ওখানকার পাঁচিল, দালান, খিলান, থাম, নাটমন্দির সমস্তই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, কেবল আসল মন্দিরটি আছে জেগে। সে এখন পরিত্যক্ত মন্দির, পরিত্যক্ত স্থান। দেবীর কোনো পূজাও হয় না, কেউই সেদিকে যায় না। মন্দিরের ফাটলে ফাটলে গাছ গজিয়েছে; চারিপাশ বিরাট জঙ্গলে পরিণত। রাত্রে সেখানে শেয়াল ডাকে, সুযোগ পেলে গ্রামের লোকদের গরু ছাগল ধরবার জন্যে নেকড়ে বাঘ সেখানে ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকে, গাছের কোটরে অজগর সাপ থাকে। আর ঐ জঙ্গল এখন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে, লোকের গরু বাছুর মারা গেলে তারা ঐখানে ফেলে দিয়ে যায়। কেবল মন্দিরের পিছনের দীঘিটি এখনও তেমনি আছে। গ্রীষ্মের সময়েও সেখানে প্রচুর জল থাকে। গ্রামের সমস্ত পুকুর যখন শুকিয়ে যায়, দুই-একটি কুয়োতে ছাড়া কোথাও জল মেলে না, তখন কেউ কেউ বাধ্য হয়ে ঐ দীঘিতে স্নান করতে যায়। কিন্তু ঐ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাঁধানো ঘাটের দিকে তারা যেতে পারে না, পাশের মাঠ ভেঙে অনেকখানি ঘুরে তারা দীঘির অপর পারের আঘাটায় নেমে স্নান করে। তাও কেবল দিনে-দুপুরে, বিকেলের পরে কেউ আর ওদিক মাড়ায় না। দীঘিটার কথা যদিও সকলে জানে, কিন্তু ওখানে যে এখনও মন্দির আছে সে-কথা গ্রামের লোকের ততটা স্মরণ নেই। দেবীমন্দিরের কথা তারা ভুলেই গেছে।

নবাগত বৈরাগী ঐ মন্দিরের সন্ধানেই খোঁজ করেছিল, ঐ ভাঙা পরিত্যক্ত মন্দিরেই সে যেতে চেয়েছিল।

বৈরাগীর পক্ষে অবশ্য এখানকার অত পূর্ব-ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানে যে অমন একটা মন্দির থাকতে পারে, স্থানীয় লোকদেরও হঠাৎ সে-কথা স্মরণ হবে না, সেই অনেককাল আগেকার খবর এই বৈরাগী কেমন ক'রে জানলে! গৃহস্বামী এই কথা ভেবেই একটু আশ্চর্য হয়েছিল।

সে বললে—"আচ্ছা, তাই হবে, আপনি যখন কিছুতেই শুনবেন না, তখন ওখানেই না-হয় যাবেন। কিন্তু অতিথি আমার বাড়ির দরজায় এসে অভুক্ত চলে যাবে, তা কখনো হতে পারে না। এখানে আপনাকে যা হোক কিছু খেয়ে যেতে হবে। যদি এতে স্বীকার হন, তাহ'লে আমি নিজেই আপনাকে পথ দেখিয়ে দেবো।"

বৈরাগী তৎক্ষণাৎ এতে সম্মত হলো। গৃহস্বামী বাড়ির ভিতর থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসে তাকে খেতে দিলে।

একবাটি দুধও এনে দিলে। সাধুর ভদ্রলোকের মতো চেহারা দেখে আর কথাবার্তা শুনে তার একটু ভক্তি হয়েছিল।

খাওয়া শেষ হ'লে সে বললে—"চলুন এবার। একটা লণ্ঠন সঙ্গে নিচ্ছি, এটা রাত্রে আপনার কাছে রাখবেন। কাল না-হয় ফেরত দেবেন। রাত্রের অন্ধকারে কাছে আলো না থাকলে আপনি টিকতে পারবেন না, যতই সাহসী হোন। সাপে এসে ছোবল মারবে।"

বৈরাগী হেসে বললে—"ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। আসুন একটা লণ্ঠন—"

পথ দেখিয়ে জঙ্গলের কিনারা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে গৃহস্বামী তার হাতে লণ্ঠনটি দিয়ে প্রত্যাবর্তন করলে।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে পথে সে যাকে দেখলে তাকেই এই গল্পটি খুঁটিয়ে এবং বাড়িয়ে বর্ণনা ক'রে শুনিয়ে দিলে। শান্ত পল্লীগ্রামে এও একটা বেশ চাঞ্চল্যকর খবর, যারা শুনলে তারা আরো পাঁচজনকে শোনালে।

দুই

পরের দিন সকালেই কথাটা গ্রামের সর্বত্র রটে গেল। যে একজন সাধু জঙ্গলের পোড়ো মন্দিরটাতে কোথা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এ-পাড়া ও-পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তিরা কৌতূহলী হয়ে উঠল, কয়েকজন মিলে সাধুকে তারা দেখতে গেল। যুবকের দলও সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ক'রে গেল।

ওরা গিয়ে দেখে, বৈরাগী মন্দিরের ভাঙা চাতালে দরজার সামনে বসে মহা স্ফূর্তিতে গান জুড়ে দিয়েছে। ওদের দেখেই সে হাসি-হাসি মুখে সকলকে অভ্যর্থনা করলে। বললে—"আসুন আসুন, আমি এখনই যেতাম আপনাদের দোরে ভিক্ষা চাইতে। এ জায়গাটি আমার বড় পছন্দ হয়েছে। আমাকে একটি কোদাল আর একটি খুন্তি দিতে পারেন?"

"কি হবে আপনার কোদাল খুন্তি নিয়ে?"

"এখানে বড্ড বেশী জঙ্গল, কেটে খানিকটা সাফ ক'রে ফেলব।"

"আপনি তা পারবেন কেন? সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ—"

"তাতে কি হয়েছে, আমি সব কাজই পারি। এখানে এত জঙ্গল থাকা ঠিক নয়। একদিনেই সাফ ক'রে ফেলব।"

"তার দরকার নেই, আমরা দুজন মজুরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারাই এ-জঙ্গল কতকটা সাফ ক'রে দেবে। কিন্তু রাত্রে আপনি একা এখানে রইলেন কেমন ক'রে?"

"বেশ রইলাম এই মন্দিরের মধ্যে, যেন মায়ের কোলের কাছে। ভিতরে অনেক জঞ্জাল ছিল, খানিকটা সাফ ক'রে ফেললাম। লণ্ঠনটি ছিল, কোনোই অসুবিধা হয়নি। কেউই আমাকে বিরক্ত করেনি, বাঘ-ভালুকেও না, আর ভূত-প্রেতও না। এ বেশ জায়গা। পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে বৈ তো নয়।"

"এর মধ্যে কত সাপ-বিছের বাসা, তবু আপনি রইলেন কেমন ক'রে? ভয় করল না? অনেকরকম জানোয়ার থাকে এখানে।"

বৈরাগী একটু হেসে বললে—"যারা আছেন তাঁরা হয়তো জঙ্গলের মধ্যেই আছেন, মন্দিরের দিকে কেউ উঠে আসেননি। ঘর অন্ধকার আর খালি পড়ে থাকলে হয়তো আসতেন। কিন্তু মানুষকে তাঁরা ভয় করেন, আর আগুন কিংবা আলো মোটে পছন্দ করেন না। মন্দিরের মধ্যে অনেক লতাপাতার জঙ্গল জমা হয়ে ছিল, আমি তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম। তবে জঙ্গলের মধ্যে তাঁরা আসা-যাওয়া করেন বৈকি, সেইজন্যেই তো মন্দিরের চারিপাশের গাছপালা সাফ ক'রে ফেলতে চাইছি। বেগতিক দেখলেই তাঁরা এখান থেকে দূরে সরে যাবেন।"

"তা বেশ কথা, আমরা কুড়ি হাতিয়ার সঙ্গে দিয়ে মজুর পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আপনি মিছে পরিশ্রম করবেন, দু'দিন পরে আবার যে-জঙ্গল সেই জঙ্গল হ'য়ে দাঁড়াবে। এখানে বরাবর তো আর আপনি থাকছেন না।"

"থাকছি বৈকি। এখানেই আমি আপাতত রয়ে গেলাম।"

"সেকি কথা, তাই কি হয়! এই বনবাদাড়-ঘেরা ভাঙা মন্দিরে বাস! আমরা থাকতে! না না, আমরা গ্রামের মধ্যেই বরং কোনো ফাঁকা জায়গা দেখে একটা চালা তুলে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে আপনি থাকুন। এখানে কি মানুষ থাকে!"

"কিন্তু এই মন্দিরই আমার মনের মতো জায়গা। আমি এমনি একটি নিরালা আশ্রয় খুঁজছিলাম। মনে করুন, এখানেই এসে থাকবার জন্যে উপর থেকে আদেশ পেয়েছি। নইলে জানলাম কেমন ক'রে যে এখানে এই জঙ্গলের মধ্যে মায়ের এমন একটি মন্দির রয়েছে। কাল রাত্রে এখানে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ এ-কথাও মনে হলো, কত যুগ পরে বুঝি আজ দেবীর নিদ্রা ভেঙেছে, আবার হয়তো আপনাদের কাছে তাঁর পূজো নেবার ইচ্ছা হয়েছে। সেইজন্যেই হয়তো আমি এখানে ছুটে গেলাম। মনে করেছিলাম আপনাদের

দোরে দোরে গিয়ে সাহায্য চাইব, কিন্তু এই দেখুন না, আপনারা নিজেরাই এসে হাজির হলেন। হয়তো এও তাঁর ইচ্ছা।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, আপনি যদি সে-কথাই বলেন তাহ'লে আমাদের যতটুকু সাধ্য তা অবশ্যই করব। কিন্তু আপনি হয়তো ঝোঁকের মাথায় এখন এমনি বলছেন, বেশিদিন এখানে টিঁকতে পারবেন কি?"

"দেখাই যাক্-না কী হয়। আপনারা কিছু কিছু সাহায্য করুন, আমি আজ থেকেই মায়ের পুজোর কাজ শুরু ক'রে দিই। এমন একটি কাজ নিয়ে থাকতে পারব না কেন?"

"কিন্তু আপনি তো দেখছি বৈষ্ণব বৈরাগী, গলায় রয়েছে কণ্ঠী—"

বৈরাগী হো-হো ক'রে হেসে উঠল। বললে—"এই কথা? এসব নিতান্ত অজ্ঞানের কথা, এখনকার দিনে কি আর বলা চলে? বৈষ্ণব হলেও শাক্ত হওয়া যায়। যিনি বিষ্ণু তিনিই শক্তি যিনি ভগবান তিনিই ভগবতী। আপনাদের তা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই, আমার হাত দিয়ে পুজো নিতে আপনাদের মা নারাজ হবেন না।"

পল্লীগ্রামের মানুষের জীবন খুবই গতানুগতিক। বৈচিত্র্য সেখানে খুবই কম। তাই অল্প একটু কিছুতেই সেখানে হুজুগের সৃষ্টি হয়, তুমুল গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। সত্যিকার একটুখানি খবর আজগুবির ডালপালা গজিয়ে বিরাট হয়ে ওঠে। গুজব রটতে রটতে গ্রামের সকলেই শুনলে যে, এতকাল পরে বিশালা দেবী আবার জেগে উঠেছেন, একজন সাধুকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন তাঁর পুজো চাই। ধর্মের হুজুগ আমাদের দেশে সবচেয়ে আদৃত, বিশ্বাস করতে দেরি হয় না।

এতে বৈরাগীর পক্ষে বেশ সুবিধেই হলো। তাড়াতাড়ি খানিকটা জঙ্গল সাফ হয়ে গেল, তার মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। দেখতে দেখতে অনেক মেয়ে-পুরুষ এসে হাজির হতে লাগল। ফুল নৈবেদ্য প্রভৃতি সবাই এনে তাঁরা হাজির করলে। ধুপধুনা জ্বলল, শাঁখ-ঘণ্টা বেজে উঠল, একটু ঘটা করেই বিশালা দেবীর পুজার কাজ সেখানে শুরু হয়ে গেল। সবাই বললে, গ্রামের লোকের উপর দেবী প্রসন্ন হয়েছেন। আবার কেউ কেউ বললে, আরতির সময় পঞ্চপ্রদীপের আলোতে দেখা গেল, সত্যিই যেন মা হাসছেন।

বৈরাগী অতঃপর রয়েই গেল।

তিন

তারপর থেকে ধীরে ধীরে মন্দিরের নানারকম সংস্কার শুরু হলো। ফাটা-ফুটো যেখানে যা ছিল সব তালি মেরে বুজিয়ে দেওয়া হলো। ভিতরের মেঝেটা ঘষে মেজে মসৃণ করা হলো। মন্দিরের সামনে খানিকটা ছাদবিহীন ইঁট-বাঁধানো জায়গা ছিল, সেখানে ছিল আগে নাটমন্দির। কয়েকটা বাঁশের খুঁটি পুঁতে সেখানে এক চালা তুলে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, মন্দিরের চূড়াতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় কাচ-ঘেরা বাতি জ্বেলে রাখবার ব্যবস্থা করা হলো। অনেক দূর থেকে পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল যে জঙ্গলের ভিতরকার মন্দিরের মাথায় বাতি জ্বলছে। বৈরাগী নিজের হাতে দেবীমূর্তির গায়ে লাল রঙ মাখিয়ে চক্‌চকে পালিশ ক'রে দিলে। গলায় বোধহয় আগে মুণ্ডমালা ছিল, সেখানে পরিয়ে দিলে ফুলের মালা। হাতে ছিল খড়্গ, সেখানেও ঝুলিয়ে দিলে ফুলের মালা। মন্দির এমনভাবেই রচিত হয়েছিল, সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরেই দেবীর মুখের উপর সকালের রোদটি এসে পড়তো। নতুন রঙে নতুন বেশে সাজানো প্রতিমার মুখটি তখন অপরূপ জ্যোতির্ময় দেখাতো। বৈরাগী বলতো, আগেকার দিনে মা ছিলেন রণচণ্ডী, এখন হয়েছেন বৈষ্ণবী। এখন তিনি আর রুধির চান না, শুধু চান ফুল আর ফলমূলের নৈবেদ্য।

নতুন অবস্থাতে এসকল বিষয়ে মানুষের উৎসাহ প্রথম দিকে খুব প্রবল থাকে, তার পরে কিন্তু ক্রমশ তা ঝিমিয়ে আসতে থাকে। জিনিসটা তখন গতানুগতিক হয়ে দাঁড়ায়। দেশে দেবতা-মন্দিরের আবার সংস্কার হয়েছে, সেখানে নিত্য নিয়মিত পুজারতি হচ্ছে, একজন পুজারী এসে জুটেছে, সে গ্রাম থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে পুজোটি বজায় রেখেছে, এই পর্যন্ত। এর যা নতুনত্ব তা শীঘ্রই কমে আসার কথা।

কিন্তু তেমন এখানে হতে পারল না। দেখা গেল যে, বৈরাগী নিজে খুব উৎসাহী প্রকৃতির লোক। গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থেকেও সে গ্রামের সকলের সঙ্গেই একরকমের ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে ফেললে। সাদাসিধে মিষ্টভাষী মানুষ, হাসিটি সর্বদাই মুখে লেগে আছে। সকলের সঙ্গেই ডেকে আলাপ করে, তাদের আনন্দে যোগ দেয়, তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। অথচ কোনো কিছুর মধ্যেই জড়ায় না, আর নিজের সম্বন্ধে একটিও কথা বলে না। যারা আরো একটু অন্তরঙ্গ হবার জন্যে নাম ধাম পরিচয় প্রভৃতি জানতে চেষ্টা করে, তাদের বলে—"আমার আবার পরিচয় কী, আমি রাস্তার একটা ভিখিরী। আমার নাম হলো বন্ধু।

তোমাদেরও আমি বন্ধু, আর তোমরাও আমার বন্ধু। এই তো সোজা কথা। এর চেয়ে বেশী কিছু নেই।"

তাই সবাই ওর নাম রাখলে 'বন্ধু বৈরাগী'।

শুধু মিশুক নয়, সবাই দেখলে যে লোকটি বেশ কমিত-কর্মা। নানা বিষয়ে দক্ষতা ওর অসাধারণ। মন্দিরটিকে ঘিরে প্রায় আট-দশ বিঘার মতো জমি ঝোপেঝাড়ে আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, সমস্তই কেটেকুটে সাফ ক'রে সে জায়গাটাকে বেশ সমতল ক'রে ফেললে। তার মাঝ দিয়ে সুরকি-বিছানো কয়েকটা রাস্তা পর্যন্ত বানিয়ে দিলে। রাস্তার দুই পাশে ইটের খাদরি-দেওয়া ধারি বসিয়ে তাতে চুন মাখিয়ে দিলে। আর সেই রাস্তার গায়ে গায়ে ফুল-গাছের নানারকম কেয়ারি তৈরি করলে। তার কোনোটা বা গোল, কোনোটা চৌকস, কোনোটা ত্রিভুজ। শুকনো মাটিকে কোদাল দিয়ে চষে ফেলে গ্রামের গোহাল থেকে সার আনিয়ে সেই জমিকে সে উর্বরা ক'রে তুললে। প্রত্যেক কেয়ারিতে রকম রকম ফুলের গাছ লাগিয়ে দিলে, নিপুণভাবে সাজিয়ে। কোনোটাতে গাঁদা, কোনোটাতে সূর্যমুখী, কোনোটাতে জবা, টগর, গন্ধরাজ, গুলঞ্চ। আর গোলাপের গাছ তো অজস্র। কোথায় আর ঐসব গাছের চারা পাবে, গ্রামেরই এর ওর বাড়ি থেকে যেখানে যা পেলে সংগ্রহ ক'রে আনলে। আগে যেখানে দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল, সেখানে কয়েক মাসের মধ্যেই এক সুন্দর বাগান গড়ে উঠল। পাছে গরু-ছাগলে গাছ মুড়িয়ে দেয় তাই চারিদিকে কাঁটাগাছের বেড়া লাগিয়ে দিলে। প্রচুর সার ও জল পেয়ে গাছগুলি তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠল, প্রত্যেক গাছের প্রতি ডালে থাঁকে থাঁকে ফুল ফুটল। ঝলমলে রোদে নানা রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে ভরা হয়ে বাগান যেন হাসতে লাগল। আগেকার কালের কোনো গাছপালাই সেখানে আর নেই, কেবল দুটি আমগাছ আর একটি জামগাছ অবশিষ্ট ছিল, সেগুলিকে বৈরাগী আর কাটলে না।

বলা বাহুল্য, এতে খরচ ও পরিশ্রম যথেষ্টই করতে হয়েছে, নইলে এমন একটি বাগান তৈরি হয় না। গ্রামের লোকে অর্থ সাহায্য করলেও, বৈরাগীর একার পরিশ্রমে তা সম্ভব নয়। গাছ বাঁচাতে গেলেই প্রচুর জলের দরকার হয়, বৈরাগী একা কতই বা জল বইবে। কিন্তু ওখানে কমন লোকজনের বেশ আড্ডা জমে উঠেছিল। গ্রামের যত নিষ্কর্মা লোক, কিংবা যাদের কাজ থেকে আপাতত ছুটি হয়ে গেছে তারা সময় কাটাবার জন্যে প্রায়ই বাগানে এসে জমায়েত হতো। কিন্তু সেখানে বাজে জটলা বা তাসের আড্ডা জমতো না। বৈরাগী নিজে বাগানের পরিচর্যা করতে করতে হাসিমুখে সকলকে বলতো—ভাই, তোমরাও একটু হাত লাগাও না, আমি একা কি এত পারি? ছোটো বড়ো সকলকেই সে 'ভাই' বলে কথা বলতো, কাজেই কেউ তার উপরোধ ঠেলতে পারত না। যেই সেখানে আসতো সেই কোনো-না-কোনো কাজে লেগে যেত। কেউ বেড়া বাঁধা, কেউ মাটি কোপানো, কেউ আগাছা তোলার কাজে লেগে যেতো।

সবচেয়ে বেশী ক'রে সে আকর্ষণ করেছিল গ্রামের যত ছোটো ছোটো ছেলের দলকে। তাদের অন্যান্য রকমের খেলাধুলা সব ঘুচে গেল, বাগান-করাই তাদের এক খেলা হয়ে দাঁড়াল। সকালে বিকালে দুই বেলাই দেখা যেতো গ্রামের বিস্তর ছেলে দীঘি থেকে হৈ-হৈ করে জল তুলে এনে গাছের গোড়ায় ঢালছে। কে কত বেশী জল তুলবে এই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে। ঠাকুরাণতলার বাগানে এখন তারাই হলো মালী।

তবে এমনিতে তাদের খাটিয়ে নেওয়া হতো না, এর জন্যে কিছু পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। সকলেই প্রত্যহ দু'বেলা কিছু কিছু প্রসাদ পেতো। সকালে খিচুড়িভোগ, আর সন্ধ্যায় বৈকালীর ফলমূল, গুড়, বাতাসা, ভিজে ছোলা।

কিন্তু ছেলে আসতো অনেকগুলি। তাদের মধ্যে বিতরণ করতে এত জুটতো কোথা থেকে? সবই সংগ্রহ হতো ভিক্ষায়, যেদিন যেমন জোটে। বৈরাগী কয়েক বাড়ি ঘুরে যা-কিছু পেতো—চাল ডাল তরি-তরকারি সমস্তই একত্রে মিলিয়ে সে এক অপরূপ খিচুড়ি পাকাতো। কিন্তু সে ভিক্ষাই পেতো প্রচুর, একা কত খাবে, ছেলেদের মধ্যে তাই ভাগ ক'রে দিতো। সকালে ঠাকুরাণীর ভোগ হয়ে গেলেই তারা চালার নীচে পাতা পেতে সারি বেঁধে বসে যেতো। বৈরাগী ভোগটি এনে তাদের মধ্যে পরিবেশন ক'রে দিতো। তারা চেটেপুটে মহা আনন্দে তাই খেয়ে নিতো। বলতো যে, এমন সুস্বাদু জিনিস নাকি তারা নিজেদের ঘরে কখনো খায়নি।

বৈরাগীর যা কর্মপ্রণালী ছিল তা অতি অদ্ভুত। খুব সকালেই দিনের পূজো সারা, মায় ভোগ পর্যন্ত সেরে ফেলা হতো। সূর্যোদয়ের কিছু পরে যখন দিনের আলোটি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে প্রতিমার ঠিক মুখের উপর এসে পড়বে, ঠিক সেই সময়েই তাঁর ভোগের পরের আরতি হওয়া চাই। দেবীর মুখ তখন রোদের আলোর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তিনি হাসতে হাসতে সেই আরতি গ্রহণ করবেন।

এর জন্যে রাত থাকতেই বৈরাগীকে বিছানা ছেড়ে

উঠতে হতো। কি শীত কি গ্রীষ্ম, প্রত্যহই সে ঠিক ভোর চারটের সময় উঠে দীঘিতে স্নান ক'রে এসে ভোগ রাঁধতে শুরু করতো। কাঠকুটো জেলে উনুনে খিচুড়ি পাক করা হতো। পাক করা হয়ে গেলে তখন ফুল তোলার পালা। টাটকা ফুল ছাড়া আগেকার দিনের বাসী ফুলে মায়ের পূজো হবে না। ঊষাকালের আবছা আলোতে বাগান থেকে সদ্যফোটা ফুল তুলে এনে বৈরাগী নিজেই তাই দিয়ে মালা গাঁথতে বসতো। তারপর তাই দিয়ে সে নিপুণভাবে প্রতিমাকে সাজাতো। গলা থেকে পা পর্যন্ত ফুলের মালায় মালায় ঢাকা পড়ে যেতো। প্রথমে হলদে রঙের গাঁদাফুলের মালা, তার নীচে সাদা রঙের গুলঞ্চের মালা, সবশেষে ডগ্‌ডগে লাল রঙের জবাফুলের মালা। মুখটি ছাড়া মালা জড়াতে কোনোখানে বাকী থাকতো না।

সমস্ত আয়োজন হয়ে গেলে যখন সজোরে শাঁখ বাজিয়ে প্রকাণ্ড একটি ঘণ্টা নেড়ে পূজোর কাজ শুরু হয়ে যেতো, তখন শাঁখের ঘণ্টার শব্দ শুনে ছেলেরা বিভিন্ন পাড়া থেকে একে একে এসে হাজির হতো। তারা পূজো-আরতি দেখতো, ধূপ-ধুনা জেলে দিতো, কাঁসর বাজাতো। পূজো সারা হয়ে গেলেই তারা গরম গরম খিচুড়ি প্রসাদ পেতো।

তার পরেই বাগান পরিচর্যার পালা। সকলেই তখন খাটতে লেগে যেতো। বেশিক্ষণ নয়, বড়জোর ঘণ্টাখানেক, তার পর সকলের ছুটি। বৈরাগী তখন বেড়ার আগড় বন্ধ ক'রে দিয়ে ভিক্ষায় বাহির হতো। একই গ্রামে একই জায়গাতে নয়, দূরে কাছে সকল গ্রামেই সে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতো। ইতিমধ্যে আশপাশের সকল গ্রামেই সে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। যে গৃহস্থের দোরে যেদিন হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়াতো, সেখান থেকেই প্রচুর ভিক্ষা মিলে যেতো। মাত্র কয়েকটি বাড়ির বেশী তাকে ঘুরতেই হতো না।

ভিক্ষা থেকে ফিরে আসতো মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ ক'রে। তখন সে খেতো ভোগের যা অবশিষ্ট থাকতো। খাওয়ার পরেও বিশ্রাম নেই। সমস্ত বাসন প্রভৃতি পরিষ্কার করা, মন্দির সাফ করা, রাত্রের আলোবাতির পাট সারা, সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি তার অনেক কাজ।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে আসতো, তখন আবার এসে জুটতো ছেলের দল, তাদের নিয়ে বৈকালিক বাগান-পরিচর্যার কাজ শুরু হয়ে যেতো।

সন্ধ্যার আগের থেকেই আবার ফুল তোলা ও মালা গাঁথার পালা। এবার ছেলের দলই সে-কাজ করতো। বৈরাগী ব্যস্ত থাকতো সন্ধ্যারতির যোগাড় নিয়ে। সন্ধ্যার আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিমাকে সাজানো হতো মাল্যচন্দনচর্চিত এক নতুন রকমের শৃঙ্গারবেশে। তার পরেই আরতি। সে আরো বিশেষ রকমের এক জমকালো অনুষ্ঠান।

বৈরাগীর সেই সন্ধ্যারতি এক দেখবার জিনিস। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নানারকম প্রক্রিয়া ও ভঙ্গী সহকারে প্রায় নেচে-নেচে বৈরাগী ভাবে আবিষ্ট হয়ে আরতি করতো। সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ বাজতো। গ্রামের ছেলে বুড়ো আর মেয়েরা অধিকাংশই তখন সেখানে এসে জড়ো হতো। চতুর্দিকে তখন অনেক মশাল জ্বালা হতো, আলোর আলোয় স্থানটি উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিছুকাল আগেই যে এই স্থানটি অন্ধকার জঙ্গলে ঘেরা ছিল তা কারো তখন মনেই হতো না।

আরতির পরেই বৈরাগী ছেলের দলকে নিয়ে হাততালি দিয়ে দিয়ে একটি সমবেত গান শুরু ক'রে দিতো। তাদের সকলকে সেই গান শেখানো হয়েছিল, তারা সমবেতকণ্ঠে গাইত—

জয় মা বিশালা
দাও ফুলমালা
দূর করো মানুষের সব দুখ জ্বালা।

প্রান্তর ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত সে-গান প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত।

তারপর কিছু কিছু প্রসাদ নিয়ে সকলে একে এক বিদায় হয়ে যেতো। তখন বৈরাগী সেই মন্দিরপ্রাঙ্গ একেবারে একা, নিঃসঙ্গ। চুপচাপ সেখানে বসে থেকে তখ সে কী করতো তা কে জানে! কিন্তু রাত্রে অনেকক্ষ পর্যন্তই শোনা যেতো বৈরাগী তার একতারাটি বাজি উচ্চকণ্ঠে তখন গান গাইছে। সে গান হয়তো তা নিজেরই বানানো, কিংবা কোনো বাউলের কাছে শেখা সে-গান দূর থেকে ভারী মিষ্টি শোনাতো।

রাত্রে সে ঘুমোতো খুব অল্প সময়ই। দিনেও বিশ্রা নিতো খুব কমই। অষ্টপ্রহর কিছু-না-কিছু একটা কাজ নি সে লেগেই আছে। যারা ওর সঙ্গে একটু বেশিরকম ঘনি হ'তে চেষ্টা করতো, তারা বলতো—আপনি অনর্থ কাজগুলোকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে এত বেশী খাটেন। বৈরা হেসে জবাব দিতো—ওরে ভাই, তোরা জানিস না, মায়ে কাজের মজাই এমনি, যতই বেশী করা যায় ততই সব-কি বেশী-বেশী মধুর হয়ে ওঠে। সে-মধুর সোয়াদ পেলে

আর চুপ ক'রে কুঁড়ে হয়ে বসে থাকা যায়। তখন কেবলই ইচ্ছে করে আরো খাটি, আরো খাটি, এতেই জীবনটাকে ভরপুর ক'রে রাখি। কাজ মানেই তো মায়ের সেবা, তা ছাড়া আর কোন্ উপায়ে আমরা তাঁর সেবা করতে পারি ?

বৈরাগীর কাজের মাত্রা আরো বেড়েই চলল। ফুলের বাগান ছাড়াও সে রীতিমতো চাষের কাজ শুরু ক'রে দিলে। শাকসব্জি আর নানাবিধ ফসল তরকারির চাষ। ফুলগাছে আর কতই বা জায়গা জুড়বে, তা ছাড়াও অনেকখানি জমি খালি পড়ে ছিল। দেশটা রুক্ষ মাটির, আনাজ তরকারি সেখানে কিছু দুর্মূল্য আর দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যত্ন নিয়ে ফলালে প্রচুর ফলে। বৈরাগী তাই বার বার লাঙল চালিয়ে সমস্ত পতিত জমিটাকে গভীর ক'রে চষে ফেললে। সেখানে প্রচুর সার প্রয়োগ ক'রে কিছুদিন ফেলে রেখে আবার চ'ষে মাটিকে ধুলোর মতো ঝুরঝুরে ক'রে ফেললে। তারপর সেখানে আল্ তুলে তুলে বীজবপন করলে। শীতের সময় আলু, কপি, বেগুন, টোমাটো। গরমের সময় লাউ, কুমড়ো, চ্যাঁড়স, নটেশাক। প্রচুর ফলন হতে লাগল। রীতিমতো কৃষাণ-মজুরদের লাগিয়ে এই কাজ করানো হতো। আর সেইসব জিনিস তাদের দিয়ে প্রতি হাটে বিক্রি করা হতো। গ্রামে সপ্তাহে একদিন ক'রে হাট বসতো। ঠাকুরবাগ-মন্দিরের ফসল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, হাটে নিয়ে গিয়ে কিছু বেশী দাম হাঁকলেও তাড়াতাড়ি সমস্ত বিক্রি হয়ে যেতো। তাতে যা উপার্জন হতো, তার থেকে ওদের মজুরি দেওয়া হতো, তবুও কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো।

কিছুকাল পরে বৈরাগীর আরো এক বিচিত্র রকমের কাজ জুটে গেল।

চার

আমাদের দেশে অখ্যাতি যেমন ডালপালা নিয়ে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে, সুখ্যাতির বেলাতে একটু অন্যরকম ঘটে। সত্যের উপর কত মিথ্যার ডালপালা গজিয়ে চারিদিকে তা ছড়িয়ে যায়। একটা বছর যেতে-না-যেতে চারিদিকে রটে গেল যে দেবী জাগ্রতা, তিনি বরদাত্রী হয়েছেন। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক সাধুকে এনে তিনি হাজির করেছেন, সে নাকি মন্দিরে আটপ্রহর উৎসব লাগিয়ে রেখেছে, অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে। ঐ মন্দিরে গিয়ে ঐ সাধুর কাছে ধরনা দিলে অনেকরকম দুরারোগ্য ব্যাধিও সেরে যেতে পারে। দৈবের উপর অন্ধবিশ্বাস আমাদের দেশে বহুকাল থেকেই চলে আসছে, একটু কিছু সূত্র পেলেই সেটা দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে, তখন উৎসুক হয়ে অনেকেই সেদিকে ঝোঁকে। দৈব অনুগ্রহ লাভ করার লোভ অর্থলোভের চেয়ে কিছু কম নয়। *

দূর-দূরান্ত থেকে কতরকমের লোক আসতে লাগল ধরনা দিতে, বৈরাগীর কাছে দৈব ওষুধ আদায় ক'রে নিতে। কারো বা মনের ব্যাধি, কারো বা দেহের ব্যাধি। তারা মন্দিরে এসে বৈরাগীর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়তো। বৈরাগী মন্দিরে কাউকে রাত্রে থাকতে বা রাত্রিবাস করতে দিত না। দূর গ্রাম থেকে এমন কেউ প্রার্থী এলেই, দেবীর পায়ের কাছ থেকে একটি জবাফুল নিয়ে তাকে দিয়ে বলতো —"আমি ঝাড়ফুঁকও জানি না, আর দৈব-বিদ্যাও কিছু জানি না, কিন্তু এই নাও মায়ের দেওয়া আশীর্বাদী ফুল, ভক্তি ক'রে মনে জোর বিশ্বাস এনে এই ফুলটি নিয়ে ঘরে চলে যাও, যদি তোমার কিছু উপকার হয় তো এতেই হবে।" তবে বৈরাগী তাদের সকল কথাই মন দিয়ে শুনতো, যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করতো। প্রয়োজন হ'লে কাউকে কিছু কিছু ওষুধপালাও দিতো।

এতেই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কাজ হতো। কেউ কেউ যথাসময়ে রোগ থেকে আরোগ্যও হয়ে যেতো। তখন তারা আরো বিশ্বাসী হয়ে ঘটা ক'রে মায়ের পূজো দিতে আসতো। বৈরাগীকে তারা প্রচুর প্রণামী দিতো। যারা মানত প্রভৃতি করতে আসতো তারাও দিতো, যারা আশীর্বাদী নিতে আসতো তারাও দিতো, যার যেমন ক্ষমতা।

এমনি ক'রে নানা দিক দিয়ে কিছু কিছু অর্থাগমও হ'তে থাকল। বৈরাগী নিজে কখনো কিছু চাইতো না, কিন্তু কেউ অর্থ দিলে সে তা গ্রহণ করতো। মূল্য দিতে চাইলে সে তা প্রত্যাখ্যান করতো না। সোজাসুজি হাত পেতেই নিতো।

বেশ কিছু যখন সঞ্চয় হলো তখন তাই দিয়ে সে মন্দিরের পাশে একটি কুটির গড়ে তুললে। খড়ের চালের কুটির, মেঝেটা ইটের বাধনি করা। সামনে খানিকটা বারান্দা। এখানে একটি কুটিরের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মন্দিরের ভিতরে ছাড়া বৈরাগীর শোবার বসবার কোনো জায়গা ছিল না। চালার নীচে বা গাছতলাতে শীতে বর্ষায় রান্না করবারও বিশেষ অসুবিধা ছিল। তা ছাড়া জমিতে আনাজপাতিও প্রচুর জন্মাচ্ছে, সেগুলিকে রাখবার মতোও স্থান চাই। প্রথমটায় কোনোগতিকে চলছিল বটে, কিন্তু বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল।

কুটিরের মধ্যে রইল দুখানি ঘর। একটিতে বৈরাগী শোবে, অপরটিতে জিনিসপত্র থাকবে আর রান্না হবে। এইভাবে ঘর বাঁধা হওয়াতে সকলেই বুঝলে যে বৈরাগী অতঃপর এখানে স্থায়িভাবেই রয়ে গেল।

পাঁচ

পুরুষেরা মন্দিরে যাতায়াত করতে থাকলেও, প্রথম দিকে গ্রামের মেয়েরা এদিকে ততটা আসতো না। একজন অপরিচিত বিদেশী পুরুষের সামনে আসতে তারা প্রথমটায় সংকোচ বোধ করতো। কিন্তু বৈরাগীর নজর খারাপ নয়, তার ভদ্র ও নম্র ব্যবহারে গ্রামের মেয়েরা ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই নিঃসংকোচে আসা-যাওয়া শুরু করলে। বয়স্কাদের সকলকেই সে 'মা' সম্বোধন করতো, আর কমবয়সী হ'লেই 'দিদি' 'বোন'। মেয়েরা বলাবলি করতো, লোকটির কথাবার্তা শুনলে গা জুড়িয়ে যায়, একেবারে মাটির মানুষ, গুমোর অহংকার লেশমাত্র নেই। আর, কোনো লোভ নেই, বদ মতলব নেই, অথচ খালি-হাতে এখানে ভিক্ষে করতে এসে দেখতে দেখতে এই অল্পদিনের মধ্যে জঙ্গল কেটে এমন সুন্দর বাগান বানিয়ে ফেললে। এ-মানুষ বাপু কিছু ভেল্‌কি জানে। গাঁয়ের সৌভাগ্য বলতে হবে বৈকি।

মেয়েরা ছোটো বড়ো সকলেই বৈরাগীকে বেশ শ্রদ্ধা করতে শুরু করলে। নিঃসংকোচে তারা তার সঙ্গে নানারকম আলাপ আলোচনা করতো, বিনা দ্বিধায় নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলতো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা মন্দিরের কাজ ক'রে দিতো, ফাই-ফরমাসও খাটতো, আর বাড়িতে ক্ষীর দই মুড়কি মিঠাই কিছু হলে তাও ঠাকুরসেবার জন্যে অর্থাৎ বৈরাগীরই জন্যে এনে দিতো। বর্ষীয়সী মেয়েরা তাকে রীতিমতো স্নেহই করতে লাগতো। গ্রামের সকলের কতকটা যেন সে আপনার জনের মতো হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু বৈরাগী কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছিল যে ওদের মধ্যে একটি মেয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে নিত্য আসা-যাওয়া করে, অথচ যেন দূরে দূরে থাকে, কখনো কাছেও ঘেঁষে না কিংবা কোনো কথাও বলে না। মেয়েটি সকলের থেকে একটু যেন স্বতন্ত্র। বিধবা, কিন্তু শাড়ি পরে, শাড়ির নীচে আঁটোসাঁটো একটা জামাও পরা থাকে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী নয়। সর্বদাই সে একটু ছিমছাম হয়ে আসে। অতিরিক্ত কিছু প্রসাধন করে না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য, মলিন অগোছালো সাজে কখনই আসে না। মাথায় সিঁথি কাটে না, টেনে চুল বাঁধে, কিন্তু চুলগুলি সুবিন্যস্ত। মনের মতো একটি ফুল দেখলে তখনই সেটি মাথায় গুঁজে নিতে দ্বিধা করে না। রংটা একটু মাজা-ঘষা, কিন্তু দেহের গঠন সুশ্রী, পরিপূর্ণ যৌবনে নিটোল। মুখভাবের মধ্যে এক ধরনের বিশেষত্ব আছে, তার সঙ্গে দৃঢ়তাও আছে। চোখের দৃষ্টি বুদ্ধিদীপ্ত, বেশ বোঝা যায় যে কোনো-কিছুই তার নজর এড়ায় না। রূপসী তাকে কেউ বলবে না, কিন্তু রূপ ছাড়াও আরো একটা কিছু প্রাণ-লাবণ্য, যা কারো কারো মুখে চোখে চেহারাতে ঢেউ খেলতে দেখা যায়, সেই বিশেষ জিনিসটি ওর আছে। সেই জিনিসই বৈরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে দেখলে মেয়েটি একটু যেন অসাধারণ, সাধারণের মধ্যে মিশে থাকলেও, সাধারণের সঙ্গে মিশ খায় না। সাধারণকে সে পাশ কাটায়, যেন একটু অবজ্ঞাই করে। ভালোঘরের মেয়ে, হয়তো কিছু লেখাপড়াও জানে, কিন্তু নিজেকে সে তফাত ক'রে এমনভাবে কেনই বা আগ্‌লে রেখেছে, নিজের মনের গণ্ডির মধ্যে? তবে কি বৈরাগীর প্রতিও তার অবজ্ঞা? যখনই দেখে যে বৈরাগী তার দিকে চাইছে, তখনই সে চোখ নামিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, একপাশে সরে যায়। কিন্তু বৈরাগী তার দিকে না চাইলে তখন সে চেয়ে থাকে। এ এক অদ্ভুত মেয়ে। এর মধ্যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে। এর সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহল হলো।

অন্য মেয়েদের জিজ্ঞাসা ক'রে বৈরাগী তার পরিচয় জেনে নিলে। পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, বিধবা হবার পর থেকে বাপের কাছেই রয়েছে। মা নেই, বৃদ্ধ বাপের দেখাশোনা সমস্তই তাকে করতে হয়। পড়াশোনার দিকে খুব ঝোঁক, অবসর সময়ে বই পেলেই পড়ে। একটি ভাই আছে, শহরে সে চাকরি করে, সেখানেই তার শ্বশুরবাড়ি। ক্বচিৎ কখনো সে দেশে আসে। বাপ আর মেয়ে, বাড়িতে থাকে এই দুজন মানুষ। মেয়েটির নাম তটিনী। চাটুয্যে-মশাইএর মেয়ে। তাঁকে বৈরাগী বিলক্ষণ চেনে। বৈরাগী ভাবলে, এর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখা যাক, এর কেন এমন তফাত-তফাত ভাব।

যথাসম্ভব পরিচয় জেনে নেবার পরে বৈরাগী একদিন তটিনীকে হঠাৎ ডাক দিলে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সে মন্দির ছেড়ে যখন চলে যাচ্ছিল, তখন বৈরাগী তাকে পিছন থেকে ডেকে বললে—"শোনো শোনো, তোমার নাম বুঝি তটিনী? তোমার সঙ্গে গুটিকয়েক কথা আছে। এদিকে একটু আসবে?"

তটিনী ফিরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে বললে—"আপনি আমায় ডাকছেন?"

"হাঁ, তোমাকেই। যদি কোনো কাজের তাড়া না থাকে—"

তটিনী ফিরে গেল। বৈরাগী বললে—"যদি কিছু মনে না করো তবে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম। রোজই দেখতে পাই, তুমি এখানে আসো, আর শুধু-শুধুই চলে যাও। মন্দিরের কিছু কাজও করো না, প্রসাদও নাও না, আমার সঙ্গে কোনো কথাও বলো না। এর কারণ কী তাই জানতে চাইছি। যদি অবশ্য কোনো আপত্তি থাকে তাহ'লে বলবার দরকার নেই—"

"আপত্তি আর কি, এখানে আসতে ভালো লাগে তাই আসি। সকলেই যেমন আসে, আমিও তেমনি আসি। আপনার সঙ্গে কথা বলার দরকার হ'লে বলতাম বৈকি। দরকার হয়নি তাই বলিনি।"

"সকলের মতো আসা তোমার নয়, তার চেয়ে একটু অন্যরকম দেখি কিনা, সেইজন্যেই জানতে চাইছি। মায়ের উপর ভক্তি আছে, কিন্তু আমার উপর এতটা নারাজ হয়ে থাকো কেন?"

মেয়েটি এর কোনো জবাব দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

বৈরাগী আবার জিজ্ঞাসা করলে—"আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার এত সংকোচ কেন? তাই জানতে চাইছি।"

"আপনাকে আমি চিনিও না, বুঝিও না, কী কথা আপনার সঙ্গে বলতে যাবো?"

"আমাকে বোঝা কি খুব কঠিন? এতদিন তোমাদের এখানে রইলাম, গ্রামের সকলেই আমাকে বুঝলে, কেবল তুমিই পারলে না? অথচ তুমি এমন বুদ্ধিমতী চালাক-চতুর মেয়ে, শুনেছি অনেক বইটইও পড়ো—"

"তাও আপনি জেনেছেন, অথচ আমি আপনার সম্বে
কিছুই জানি না। কত লোকের মুখে কত কথা শুনি
সে-সব আমার বিশ্বাস হয় না। আপনি নাকি এখানে
আসতে মায়ের কাছ থেকে স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিলেন—"

"ঐরকমই রটেছে বটে, কিন্তু সত্যি তা নয়। ঘুরতে
ঘুরতে নিজেই এখানে এসে পড়েছিলাম। এ দেশের গ্রামে
গ্রামে কোনো মন্দির, না-হয় চণ্ডীমণ্ডপ, না-হয় একটা কি
তো থাকেই, কোথাও গেলে আগে তারই আমরা খোঁ
করি, সেখানেই আশ্রয় নিয়ে থাকি। এই গ্রামের না
শুনলাম ঠাকুরাণগড়, তাই ঢুকেই মনে হলো এখানে নিশ্চ
ঠাকুরাণীর কোনো মন্দির আছে, তারই খোঁজ করেছিলাম
তারপর জঙ্গলে-ঘেরা এই মন্দিরের কথা শুনে এখানে এ
চারিদিকে দেখতে দেখতে বেশ ভালো লাগল। আগেকা
কালের অনেক চিহ্নই এখানে দেখতে পেলাম, মন্দিরে
গায়ে অনেক অদ্ভুত লেখাই পড়ে ফেললাম। রাত্রে এখানে
শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, আনন্দময়ী এখানে এককালে কত
আনন্দলীলা দেখিয়েছেন। আবার কি এতকাল পরে তাঁ
নতুন কিছু লীলার ইচ্ছে হয়েছে? তা হতেও পারে, নইলে
আমিই বা এখানে জুটে গেলাম কেমন ক'রে। এক হাতে
তো তালি বাজে না, আরো একখানা হাত চাই। আমি
যখন এখানে এসে পড়েছি তখন আমিই যদি মায়ের নতু
লীলার কাজে যোগ দিই তো কেমন হয়। এই ভেবে
এখানে রয়ে গেলাম। তারপর দেখতেই পাচ্ছো, লীলা
কেমন ক'রে এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে হেঁয়ালি কি
নেই। ভাঙা মন্দিরকে আর মানুষের ভাঙা মনকে আমি
জোড়া দিতে চাই।"

"এ ছাড়াও আপনার নিজের ভিতরকার কী মতলব?"

শিল্পী : রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"আর কী মতলব থাকবে?"

"আপনার নিজের দিক দিয়ে কী লাভ হচ্ছে? কী ফল হবে আপনার এতে?"

"এইতো সবচেয়ে বড়ো লাভ হলো, সকলকে আনন্দ দিয়ে সেই আনন্দের কিছু ভাগ পাওয়া।"

"আপনি তাহ'লে একজন পাগল। বিনা লাভেই আপনার আনন্দ! এমন তো আজকাল কাউকে দেখি না।"

বৈরাগী হো-হো ক'রে হেসে উঠল। হেসে বললে—"এবার ঠিক বলেছ। পাগল বৈকি, আমরা সবাই পাগল, তুমি আমি সকলেই। তা যে হতেই হবে। জগৎজোড়া এই সৃষ্টির লীলাটাই তো এক পাগলামি।"

"এইগুলোই আপনাদের যত বৈরাগির কথা, আমার মাথায় ঢোকে না। বইতেও পড়েছি, কিন্তু বুঝতে পারি না।"

বৈরাগী আবার হেসে বললে—"তুমি বুঝবে না তো কে বুঝবে? তুমি এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে, আরো তোমার বুদ্ধি নিশ্চয় খুলবে। একদিন তখন সব কথাই বুঝতে পারবে।"

"কিন্তু আপনি আমাকে মাপ করবেন। আমি অতটা আপনাদের মতো বিশ্বাসী নই। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি যেন কেমন-কেমন। আমার ধাঁধা লেগে যায়। অবাক হয়ে তাই চেয়ে-চেয়ে দেখি। আপনি বলতে বললেন তাই বলছি। হয়তো অন্যায় হলো, কিন্তু কি করবো, আমার মুখের তেমন আঁট নেই, যা মনে হয় তাই বলে ফেলি।"

"বলবে বৈকি, সব কথাই সোজাসুজি বলে ফেলবে, মনের মধ্যে চেপে রাখবে কেন। একেই বলে কাচের মধ্যে হীরের টুকরো, এমনি মেয়েই তো চাই।"

"কার চাই? আপনার?"

"হাঁ, তাই। মন্দিরের কাজের জন্যে, এখানকার কাজে সাহায্যের জন্যে।"

"আমি তাতে রাজী আছি, মন্দিরের অনেক কাজই আমি ক'রে দিতে পারবো। কিন্তু যদি কিছু বুজরুকি করেন তাহ'লে তা আমার সহ্য হবে না। আগের থেকেই বলছি।"

বৈরাগী আবার হেসে বললে—"তা যদি করি, তুমিই আমাকে ধরিয়ে দিয়ো।"

এই পর্যন্তই প্রথম দিনের আলাপ। তটিনীরও ভালো লেগেছে, কিন্তু অপরিচয় রয়ে গেছে অনেকখানি। সে-ব্যবধান দূর করতে যদি দুই পক্ষেরই ইচ্ছা হয় তবে তার উপায়ও অনায়াসেই হয়ে যায়। কিন্তু যদি দুই পক্ষেরই বাধো-বাধো ঠেকে, যদি কোনো সংকোচাদির প্রতিবন্ধক থাকে, তাহ'লেই কিছু বিলম্ব হয়।

এর পর থেকে কিছুদিন পর্যন্ত চলতে থাকল নীরব চোখের চাওয়া-চাওয়ির পর্ব। তটিনীর চেষ্টা বাইরের চোখ দিয়ে ঐ মানুষের ভিতরটিকে দেখে নিতে। অথচ যাকে দেখতে চাইছি সে যেন তা আদৌ না জানতে পারে।

ওদের আলাপই শুধু হয়েছে, পরিচয় নেই। নিতান্ত প্রয়োজনের দু-একটি কথা ছাড়া বেশী কথা বলতে মুখে বাধে। জিভে একটা আড়ষ্টতা জড়িয়ে থাকে। কিন্তু চোখের খেলাতে কোনো বাধা নেই। চোখ নিজেও চেয়ে দেখতে পারে, আবার অন্যের চোখের দৃষ্টিকেও নানা উপায়ে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করতে পারে। কাজেই ওদের মধ্যে নীরবে যা চলতে থাকল তা অনেকটা এক ধরনের মূকাভিনয়ের মতো। পরিচয় নিবিড়তর হচ্ছে, কিন্তু কথা সরছে না।

তটিনী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মন্দিরের পুজোর কাজে

সাহায্য করবার ভার নিয়েছে। আপনা হতেই এগিয়ে এসে সে নৈবেদ্য প্রভৃতির গোছ ক'রে দেয়, সরঞ্জামাদি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে এনে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখে, ফুলগুলি গুছিয়ে রাখে, চন্দন ঘষে দেয়, ধূপ দীপ জ্বেলে দেয়। আরো অনেক রকমেরই কাজ সে ক'রে দেয়, যাতে বৈরাগীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়, যখন যা দরকার তা হাতের কাছে পেয়ে যায়। আর বৈরাগীও তাকে এতে সুযোগ দেয়, সাহায্যগুলি যথাসময়ে পাবার জন্যে সে প্রতীক্ষা করে। যেন এমন একজন সাহায্যকারী লোকের তার অভাবই ছিল। সাহায্যকারিণীকে পেয়ে বেঁচে গেছে।

ঐ কাজগুলির ভিতর দিয়েই তটিনী বৈরাগীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। তার প্রতি ওর দৃষ্টি যখন আপনা থেকেই একটু আকর্ষিত হয়েছে, তখন সেই সূত্র ধরেই সে তাকে আরো বাড়াতে চায়, যতটা পারা যায়। তাই সে ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব বেশভূষার পারিপাট্য ক'রে আসে। তার আচার-আচরণ ও চালচলনের ভঙ্গী আরো সাবলীল হয়, তার মধ্যে নতুন রকমের ছন্দ জাগে। তার হাতের কাজের তৎপরতার মধ্যেও সেই ছন্দ মুখর হয়ে ওঠে। তার মুখে আন্তরিকতা ও প্রসন্নতার সঙ্গে অপূর্ব এক নারীসুলভ কমনীয়তা ফুটে ওঠে। তার চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একরকমের বিহ্বলতা। কিন্তু এতেও বৈরাগীর দৃষ্টিকে বেশীমাত্রায় আকর্ষণ করা যাচ্ছেনা দেখে তখন সে আবার ছন্দ বদলায়, অন্য উপায় অবলম্বন করে। এ কিন্তু নির্দোষ ধরনের জিনিস, এমন হয়েই থাকে। পুরুষ দেখলেই মেয়েরা তাদের ছন্দ একটু বদলাবে, মেয়ে দেখলেই পুরুষেরা ছন্দ একটু বদলাবে। খুবই স্বাভাবিক।

আর বৈরাগী তন্ময় হয়ে থাকে তার নিজের মনে, নিজের কাজগুলি নিয়ে। মাঝে মাঝে সে চায় বটে তটিনীর দিকে, কিন্তু তার মধ্যে কোনোরকম বিহ্বলতা নেই। আছে কেবল একটা কৌতূহল, আছে কেবল প্রশংসা। যেন সে তার কার্যকুশলতাকে, তার বুদ্ধিমত্তাকে অভিনন্দিত করছে। কিন্তু এ-তো তারই প্রতি আকর্ষণ নয়, তার কাজের প্রতি আকর্ষণ।

সে তাই বারে বারে চেষ্টা করে তার নিজেরই দিকে বৈরাগীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে। হয়তো সে যখন পূজার সামগ্রীগুলির গোছগাছ করছে, বৈরাগী তখন অন্যমনা হয়ে অন্য দিকে চেয়ে আছে। তখন সে বাসনগুলিকে নেড়ে-চেড়ে এমন একটা শব্দ করলে, যেন কোনো কিছু তার হাত থেকে পড়ে গেল। শব্দ শুনে বৈরাগী সেই দিকে ফিরে চায়, জিজ্ঞাসা করে—"কি হলো?" তটিনী একটু যেন লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে বলে—"কৈ, কোনো কিছুই তো হয়নি।" ঐ ব্রীড়ায় ভাবটি দেখানো, এও একটা আকর্ষণ-শিল্প।

এ ছাড়া সে বৈরাগীর আহারাদির ব্যবস্থার দিকেও নজর দিতে শুরু করল। সে দেখল বৈরাগী দিনে প্রায় একবেলাই খেয়ে থাকে, রাত্রে কোনোদিন কিছু জোটে, কোনোদিন জোটে না। সে তখন নিজেদের বাড়ি থেকে বিকেলের দিকে এটা-ওটা জলখাবার মিষ্টান্ন প্রভৃতি আনতে শুরু করলে, ঠাকুরভোগের অছিলা ক'রে। ওদের বাড়িতে একটি গরু আছে, প্রচুর দুধ দেয়। প্রতিদিন বিকেলে সে আধসের ক'রে দুধও আনতে লাগল। বললে যে, এটা উদ্বৃত্ত, বাড়িতে এত দুধ খাবার লোক নেই।

এমনি ক'রে ক্রমে ক্রমে ওদের পরস্পরের মধ্যে আড়ষ্টতা দূর হয়ে বিনয়ে একটা ঘনিষ্ঠতা জমে উঠতে থাকল। ব্যবধান ক্রমশ কমে আসতে থাকল। দুজনেই নানা ভাবে দুজনের অন্তরের পরিচয় পেতে থাকল। তটিনীও জানল যে, এই মানুষটি বিশ্বাসযোগ্য এবং উদার, এর মনটি সহজ সরল ছেলেমানুষের মতো, সুতরাং সব দিক দিয়েই শ্রেয়। আর বৈরাগীও জানল যে এই মেয়েটি অসাধারণ প্রাণবতী, আর ফুলের মতো নির্দোষ। দুজনেই দুজনকে জানলে আর বিশ্বাস করলে। তখন ক্রমশ ওদের জিভের জড়তা ঘুচে গিয়ে সহজ বাক্‌স্ফূর্তি এসে গেল। খোলাখুলিভাবে দুজনেই অনেক কথা বলতে শুরু করলে। আর তখন ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠার সুযোগও কিছু এসে গেল।

দশ

কয়েকদিন আগের থেকে মন্দিরের এলাকার সামনে একটি কুয়া কাটা শুরু হয়েছিল। গ্রামে প্রায়ই পানীয় জলের অভাব হয়; যে অগভীর কুয়াগুলি আছে, দারুণ গ্রীষ্মের সময় তাদের জল শুকিয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা তাই বহুকাল থেকেই একটি গভীর কুয়া বানিয়ে দেবার জন্যে সরকারের দপ্তরে দরবার ক'রে আসছিল। সেখান থেকে এই শর্তে মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছিল যে, গ্রামের লোকেরা যদি চাঁদা তুলে অর্ধেক খরচ দিতে পারে তবে সরকারের তরফ থেকে বাকী অর্ধেক দিয়ে কুয়া বানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তেমন চাঁদা এতদিন পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। বৈরাগীর চেষ্টাতে সেই চাঁদা এতদিনে সংগৃহীত ক'রে সরকারী তহবিলে জমা দেওয়া হয়েছিল। তারই ফলে ওখানে কুয়া

কাটা হচ্ছিল, প্রকাণ্ড এক অশত্থগাছের নীচে। সে-গাছ মন্দিরের জমিটার খুব কাছেই।

গভীর কুয়াটি কাটাই হয়েছে মাত্র, তখনও তার পাড় বাঁধানো হয়নি। একদিন বিকেলে ছেলেদের দল এসে ছুটোছুটি ক'রে সবে গাছে জল দেওয়া শুরু করেছে। হঠাৎ তাদের মাথায় খেয়াল চাপলো, দীঘি থেকে জল না এনে ঐ কুয়া থেকেই তারা জল তুলবে। কোথা থেকে তারা দড়ি বালতি সংগ্রহ ক'রে আনলে। এইভাবে হুড়োহুড়ি ক'রে জল তুলতে গিয়ে দলের একটি ছেলে হঠাৎ পা ফসকে কুয়ার মধ্যে পড়ে গেল।

ছেলেরা সকলে হৈ-হৈ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল—"কেষ্টা কুয়ার মধ্যে পড়েছে—ডুবে গেল, ডুবে গেল!" সেখানে তখন ওরা ছাড়া অন্য কেউ নেই। বৈরাগী বাগানের কাজে ব্যস্ত, আর তটিনী ছিল মন্দিরের মধ্যে।

কোলাহল শুনে ওরা দুজনেই ছুটে বেরিয়ে এলো। বৈরাগী উপস্থিত-বুদ্ধির সঙ্গে তখনই জল-তোলা দড়ির একটা প্রান্ত গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে ফেলে তটিনীকে বললে—"আমি এই দড়ি ধরে কুয়ার নীচে নেমে যাচ্ছি, তুমি ছুটে গিয়ে গ্রাম থেকে আরো একটা দড়ি আর কয়েকজন লোককে ডেকে আনো।"

দড়ি ধরে বৈরাগী যখন কুয়ার মধ্যে নেমে গেল, তার অল্প কিছুক্ষণ পরেই দড়ি এবং লোকজন এসে হাজির হলো। নতুন দড়ি কুয়ার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হলো। সেই দড়ি ছেলেটির কোমরে জড়িয়ে বৈরাগী তাকে উপরে তুলে নিতে বললে। তখন উপর থেকে তাকে টেনে তোলা হলো। পরে বৈরাগীকেও সেইভাবে উপরে তুলে নেওয়া হলো।

ছেলেটি বেঁচেই ছিল। কিন্তু আকস্মিক আঘাত পেয়ে ভয়ে আতঙ্কে সে মৃতপ্রায় অবস্থাতেই অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিল। শ্বাসগ্রহণ করানোর নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হলো। তখন দেখা গেল যে, আঘাত পেয়ে তার একটা উরুতের হাড় ভেঙে গেছে। তার উত্থানশক্তি একেবারে রহিত।

বৈরাগী তাকে সন্তর্পণে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিজের কুটিরের মধ্যে নিয়ে গেল, নিজের বিছানাতে তাকে শুইয়ে দিলে। খবর নিয়ে জানা গেল, কেষ্টার মা নেই, তারা দুটি ভাই থাকে বাপের কাছে। বাপ গেছে মাঠে চাষ করতে। তখন বৈরাগী বললে—"ও আমার এখানেই থাকবে, আমিই ওর চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থা যা কিছু করবার তা করবো। ওর বাপকে তোমরা খবর পাঠিয়ে দাও।"

গ্রামের কয়েকজন বললে—ডাক্তার ডেকে আনা হোক। বৈরাগী বললে—"তার দরকার নেই, আমিই যা হয় একটা ব্যবস্থা করছি।" বাগান থেকে একঝুড়ি মাটি এনে উত্তমরূপে গুঁড়ো ক'রে সে তার সঙ্গে গোবর এবং হলুদ-বাটা মিশিয়ে নরম একটি তাল প্রস্তুত করলে। তখন কেষ্টার উরুর চামড়া পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দিয়ে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সেই মাটি দিয়ে খুব পুরু ক'রে প্রলেপের মতো লেপে দিলে, কাপড় ছিঁড়ে তার উপর ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দিলে। অন্যান্য ছেলেদের বললে—"তোমরা নদীর ধার থেকে দু-ঝুড়ি বালি নিয়ে এসো।" তটিনীকে জিজ্ঞাসা করলে—"ছোটো পাশ-বালিশ আছে কারো ঘরে?"

তটিনী বললে—"যোগাড় করতে পারি। কি হবে তা দিয়ে?"

"তিন-চারটে পাশ-বালিশের ভিতর থেকে তুলো বের ক'রে ফেলে তার খোলগুলি আমাকে এনে দাও। কাজে লাগবে।"

জিনিসগুলি এসে পড়লে সেই বালিশের খোলের মধ্যে বালি ভ'রে, সেই বালিভরা ভারী বালিশগুলি বৈরাগী ছেলেটির উরু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গটির দুই পাশে এমনভাবে শুইয়ে দিলে, যাতে তার পায়ের একটুও নড়াচড়া না হ'তে পারে। দুই পাশের ঠেক্‌নোর মধ্যে তার ভাঙা পা-টি রইল।

কাদার তালের প্রলেপ দিয়ে জড়ানো মোটা পা-খানা দু'পাশের বালির বালিশের আবরে থেকে সম্পূর্ণ অনড় হয়ে যাওয়াতে সমস্ত ব্যথাবেদনার নিবৃত্তি হয়ে ছেলেটি ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে তার মুখে হাসি দেখা দিল।

বৈরাগী বললে—"কোনো ভয় নেই রে, তুই এখানে আমার কাছেই রইলি, খুব শিগ্‌গির ভালো হয়ে যাবি। কেমন, রাজী আছিস তো?"

ছেলেটি খুশি হয়ে বললে—"খু—ব।"

তটিনী ছেলেটিকে গরম দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বললে—"এটা আপনার কি হলো! এ-সব বিদ্যেও জানেন বুঝি?"

বৈরাগী বললে—"বিদ্যে নয়, বুজরুকিই একে বরং বলতে পারো। আমাদের মায়ের যদি ইচ্ছে হয় তাহ'লে দেখবে, এতেই ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।"

এর পর থেকে বৈরাগী ছেলেটির যেমন শুশ্রূষা করতে লাগল তা দেখে তটিনী অবাক হয়ে গেল। কিছুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ না ক'রে সে ওর মলমূত্র সমস্তই দু'হাতে সাফ ক'রে

দেয়, গা হাত মুছিয়ে স্নান করিয়ে দেয়, তাকে একটুও নড়তে দেয় না, পা-টিকে নাড়াতে দেয় না। রাত্রে কাছে নিয়ে শোয়। অতি যত্নে তাকে রাখে। কোথা থেকে নানারকম গাছগাছড়া সংগ্রহ ক'রে এনে তার রস ক'রে খাওয়ায়। মাঝে মাঝে তার গা হাত টিপে দেয়। তটিনীও যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে ওকে সাহায্য করতে লাগল। তার পথ্যাদি নিজের বাড়ি থেকে রেঁধে নিয়ে আসতো। ছেলেটি উঠে বসতে পারতো না, নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দিতো। নিজের বাড়ির কাজ সেরে এসে দুইবেলাই তার কাছে বসে নানারকম গল্প করতো।

সাত

দুজন মানুষ যদি একত্রে মিলে কোনো রোগীর সেবাতে কিছুকাল যাবৎ নিযুক্ত থাকে, আর বহুবার বহু কাজে তাদের পরস্পরকে সহযোগিতা করতে হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে আপনা থেকেই অনেকখানি ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। বৈরাগী আর তটিনীর মধ্যে ঐ অল্প কয়েকদিনে সেই জিনিসটাই এসে গেল। তটিনীর ব্যবহারে তখনও পর্যন্ত একটা যে তফাত-তফাত ভাব ছিল, অচেনা-অজানার কিছু কিছু আড়ষ্টতা ছিল, তা কিছুই আর রইল না। সকল বিষয়েই সে নিঃসংকোচে কথাবার্তা বলতে লাগল, বরং একটু বেশিরকম খোলাখুলি ভাবে। গ্রামের লোকে ওকে এই স্পষ্টবাদিতার কারণেই ততটা পছন্দ করতো না। তেজী স্বভাবের মেয়ে, বড়ো কড়া কড়া স্পষ্টকথা বলে। সত্য বলতে তার বাধে না, অপ্রিয় সত্যের বেলাতেও তাই। বৈরাগীর সঙ্গে মিশতে-মিশতে সে দেখলে যে বৈরাগী তার প্রিয়-অপ্রিয় সকল কথাই হাসিমুখে শোনে, কোনো কিছুতেই তার গায়ে আঁচ লাগে না। তাই অকপটে সে সকলরকম কথাই অনায়াসে বলে ফেলতো।

একমাসের মধ্যেই খোঁড়া ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠল। পায়ের হাড় জুড়ে গিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, ক্রমে একটু একটু হেঁটে বেড়াতে লাগল। খুঁড়িয়েও নয়, মনে হলো না যে কোনোকালে তার হাড় ভেঙেছিল। ক্রমে অন্য ছেলেদের সঙ্গে সে গাছে জল দেবার কাজেও যোগ দিলে। দুর্বলতা যেটুকু ছিল তাও শীঘ্র সেরে গেল।

বৈরাগী তাকে দেখিয়ে একদিন হাসতে হাসতে তটিনীকে বললে—"দেখছো তো, বুজরুকিতেও কখনো কখনো ভালো কাজ হয়। খোঁড়া ওতেই সেরে গেল।"

তটিনী বললে—"বুজরুকি হবে কেন, আপনি নিজের যথাসাধ্য চেষ্টা দিয়ে প্রাণপণ যত্ন ক'রে ওকে সাজি তুললেন। এখন বিনয় ক'রে বলছেন বুজরুকি।"

"তুমি একবার ঐ কথাটা বলেছিলে কিনা, বুজরুক বলে আমায় সন্দেহ করতে।"

"সন্দেহ আমি কোনোদিনই করিনি। তবে এখ আপনাকে বলি, প্রথম থেকেই আমি আপনাকে চিনেছি একবার মাত্র আপনার চোখ দেখেই জেনেছি আপনি কেম মানুষ। যে যতই নিজেকে লুকোতে চেষ্টা করুক, চোখে সব ধরা পড়ে যায়। আমি তাই আগে প্রত্যেকের চোখে দিকে চাই। প্রথম দিনেই দেখলাম, আপনার দূরের-দিকে চাওয়া চোখ। কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিছুতেই যে সন্ধান মিলছে না। মুখে যখন হাসছেন তখনও চোখ-দুটি কোন্ জিনিসকে খোঁজার কাজে লেগে আছে। এমন চো যার, সে কখনো মিথ্যে-বুজরুক হতেই পারে না। আপনা চোখ খাঁটি মানুষের চোখ।"

"তবে আমাকে আগে অমন অবিশ্বাস করতে কেন; কাছে না এসে এড়িয়ে চলতে কেন?"

"আপনি বুঝতে পারেন না? নিজেকেই শাসন ক'রে রাখবার জন্যে তার দরকার হয়েছিল। নিজেকেই আমি বোঝাচ্ছিলাম, যতটা ভালো এই লোকটিকে দেখাচ্ছে ততট এ কখনই নয়,—এ একজন বুজরুক, ভণ্ড—ইচ্ছে করেই এম ভালোমানুষ সেজেছে। নিজেকে যে এমন ক'রে লুকোতে পারে, সে বড় ভয়ানক লোক, তার কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো। এমনি ক'রে নিজের মনকে আমি বুঝিয়ে রাখছিলাম, আর আপনি যখন ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তখ সেইরকম একটা কথাই বলেছিলাম। কিন্তু এখন এ-কথা লুকোবো না, আমাকেও আমি নিজের অজান্তে আপনার চোখে ধরাতে চেয়েছিলাম। তাই একটু আলাদা হ থাকতাম, আর একটু ভালো কাপড়-চোপড় প'রে সাজগুজ হয়ে আসতাম। নইলে আপনাকে দে আমার গোড়াতেই চেনা হয়ে গিয়েছিল। পরে আর চিনলাম।"

"তাহ'লে আমি এখন ধরা পড়ে গেছি বলো লুকোনো আর কিছুই নেই!"

"তা কেন, আপনার মধ্যে কোনোই লুকোচুরি নেই যেমনটি আমি খুঁজতাম। তাই বলছি, আপনি আমাকে এবার দীক্ষা দিন। আমার জীবনে কিছুই আর কমবা নেই, এবার আমি আপনার কাছে দীক্ষা নেবো। গুরু হয়ে শিক্ষা ক'রে নিন আমাকে।"

"রাম বলো! আমি নিজেই আনাড়ী, তোমাকে দীক্ষা দেবো কি। যারা তেমন পরোয়ানা পেয়েছে তারাই কেবল দীক্ষা দিতে পারে। যারা ঠিকানায় পৌঁছেচে তারাই অন্যের গুরু হতে পারে। ও-সব ভালো কথা নয়।"

"সে হতে পারে আপনাদের মতো লোকের বেলাতে। আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমার পক্ষে আপনিই যথেষ্ট। আপনাকেই আমি গুরু মনে করি, আশ্রয়ের মতো মনে করি।"

"এ-সব তোমার বইপড়া কথা। কেউ কারো আশ্রয় হয় না, মাত্র একজনই সকলের আশ্রয়। অমন কথা মুখে আনাই ঠিক নয়। ভাবাও অন্যায়।"

এ-প্রসঙ্গ বৈরাগী এইভাবে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু তটিনী কিছুতে ছাড়ে না। সে নানা ভাবে নানা প্রশ্ন করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এইরকম প্রসঙ্গেরই অবতারণা করে। তার মনে যে বিশেষ একটি আকৃতি জেগেছে, সেই কথাই সে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। লজ্জাসরম জিনিসটাই তার কম।

বৈরাগীকে সে নিজের ভক্তির পাত্র ক'রে নিয়েছে, তাকে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছে। জীবনে তার কোনো আশা-ভরসা ছিল না, উঠিয়ে পাবার কোনো পথ ছিল না। হৃদয়ে একটা চেতনা জাগতে-না-জাগতেই ভাগ্যবিধাতা একটিমাত্র নিষ্ঠুর আঘাতে তার সকল দিকের পথই বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। স্বল্পপরিণত মনের জাগরণোন্মুখ চেতনা তাতে ব্যর্থ হয়ে স্তব্ধ হয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে চেতনা একবার কতক জেগে উঠেছে—সে আর মরে না, মাথা চাড়া দিয়ে বেড়ে ওঠবার সুযোগ না পেলে তখনকার মতো মুষড়ে থাকে মাত্র। বাইরে কোনো কিছু জানতে না দিলেও সে সজাগ হয়ে বেঁচে থাকে। কোনো দিকে কিছুমাত্র ফাঁক দেখলে তখন সেই দিক দিয়েই ঠেলে বেরোতে চায়। বাধা পেলে আবার তখনই গুটিয়ে যায়। এমন অবস্থায় পড়লে অনেকের সারাজীবনে হয়তো তেমন কোনো ফাঁকই মেলে না, যে অবস্থায় এসে থেমে গেছে সেই অবস্থাতেই তাদের সারাজীবন কেটে যায়। যেমন একটা জলপ্রবাহ বন্ধ হয়ে পড়লে ডোবায় পুকুরে পরিণত হয়, কিন্তু জল মরে না। আবার যদি কোনোদিন পথ খোলা পায় তবে সবেগে সেই বদ্ধ জল আবার বইতে শুরু করে। তটিনীর আগে তাই হয়েছিল। এমন একটা পথের সন্ধান পেয়ে তটিনী হয়েছে বেগবতী নির্ঝরিণী। রুদ্ধ ও অবরুদ্ধ চেতনা লতিয়ে বেড়ে ওঠবার মতো একটা অবলম্বনের সন্ধান পেয়েছে, তাই নিয়ে মনে-মনে সে আজকাল নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কত রকমেরই স্বপ্ন দেখছে। সংকীর্ণ কূলের বাঁধন আর তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। বেঁচে ওঠার সন্ধান যখন সে পেয়েছে, জীবনকে সার্থক করার রাস্তা দেখতে পেয়েছে, মানুষের মতো একজন মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছে, তখনও কি লজ্জাসরমে মুখ ঢেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে সে বসে থাকবে।

কিন্তু বৈরাগী যেন কেমন ধরনের মানুষ। সে একেবারেই কোনো কথায় আমল দিতে চায় না। খুব বিনয় ক'রে কত কিছুই বলে, সব কথারই জবাব দেয়, কিন্তু তার কেবল ব্যাখ্যাই সার। তাই মাঝে মাঝে তটিনীর মনে জ্বালা ধরে যায়।

একদিন সে নিজের মনের জ্বালার সঙ্গে বিদ্রূপের একটু হাসি মিশিয়ে বলে ফেললে—"আমি রোজই এসে আপনাকে প্রণাম করি, কিন্তু একদিনও আপনি পায়ে হাত দিতে দেন না, তাড়াতাড়ি পা-দুটি সরিয়ে নেন। কেন বলুন তো? আমি ছুঁয়ে ফেললে আপনার জাত যাবে নাকি?"

বৈরাগী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—"তা নয়, তা নয়—সেজন্যে নয়। কিন্তু তোমার তো জানা উচিত, যে-রাস্তা আমরা নিয়েছি তাতে স্ত্রীলোকের দেহ আমাদের কাছে অস্পৃশ্য। কোনো স্ত্রীলোককেই আমি পা ছুঁতে দিই না।"

"স্ত্রীলোক জাতটা আপনার কাছে এতই বেশী নিকৃষ্ট?"

"সেজন্যেও নয়। আমাদেরই মনের ভুলের জন্যে। যতদিন পর্যন্ত মেয়েদের আমরা ভুল ক'রে চিনছি, সাক্ষাৎ মায়েরই অংশ বলে যতদিন পর্যন্ত তাদের আমরা মনে-প্রাণে না চিনছি, ততদিন পর্যন্তই এই বারণ। তোমাদের সত্য পরিচয়টা যখন আপনা থেকে মনের মধ্যে সর্বদা জেগে থাকবে, জোর ক'রে মনে করতে হবে না, তখন আর কোনোই বারণ থাকবে না।"

"এইসব বড়ো বড়ো কথা শাস্ত্রেও লিখেছে বটে, কিন্তু তাই নিয়ে তো দুনিয়া চলছে না। আপনিও একজন এই দুনিয়ার মানুষ, নাকি দুনিয়া ছাড়া?"

"তবু এই দুনিয়ার মানুষেরই মধ্যে রকম-রকমের জীবন আছে তো। মা যাকে যেমন সাজিয়ে দিয়েছেন, তাঁর যাত্রাগানে যাকে যেমন পালা গাইতে দিয়েছেন, তাই মেনেই তাকে চলতে হয়। গৃহীদের নিয়ম আলাদা, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটাই হলো নিয়ম।"

"ও-নিয়ম বুঝি সংসারে চলে? কার কাছে শিখলেন এমন খাপছাড়া কথা?"

"যিনি আমার গুরু, তাঁর কাছে।"

"যেমন বুদ্ধি চেলার, তেমনি বুদ্ধি গুরুর। আমার সামনে তিনি একবার বলুন তো—"

"অমন কথা বোলো না। তিনি একজন মহাপুরুষ। এখানে কোনোদিন যদি আনতে পারি, তাহ'লে নিজেই দেখতে পাবে। তুমি তো মানুষের চোখ দেখে চিনতে পারো।"

"তা হতে পারে, কিন্তু আপনি কি তাঁর মতো হয়েছেন? আপনি তো আমাদেরই মতো একজন গৃহী। দিব্যি ঘর বেঁধে বাস করেছেন, বাগান করছেন, আনাজ-তরকারির ব্যবসা করছেন, এইসব কাজ নিয়ে অষ্টপ্রহর লেগে আছেন। কেবল ঘরে একটা গৃহিণীই নেই। কিন্তু গৃহী ছাড়া কী বলব আপনাকে?"

"হাঁ, গৃহীর কাজই করছি বটে। কিন্তু তুমি দেখতেই পাচ্ছ, কিছুই আমার নিজের জন্যে নয়, সমস্তই পরের কাজ করছি। এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও আমার নিজের কাজটি কিন্তু আলাদা, সে-কাজ সব সময় নিজের মধ্যে চলতে থাকে। যখন চুপ ক'রে বসে থাকি তখনও করি, যখন এই-সব কাজে লেগে থাকি তখনও করি। সব সময়েই আমাকে সাবধান থাকতে হয়, যাতে নিজের ভিতরের আসল কাজের ভুল না হয়। অনেক দিনের অনেক যুগের চেষ্টাতে তবে সামান্য একটু এগোনো যায়, আর একটু ভুলচুক হয়ে গেলেই একেবারে নীচের দিকে গড়িয়ে নেমে যেতে হয়। সেই-জন্যেই এ-পথে এত কড়াকড়ি। এসব কথা কাউকে কিন্তু বলতে নেই; তোমাকেই শুধু বলছি। ভিতরের কাজ লুকিয়ে করতে হয়।"

"কী সে-কাজ আপনার? মনে-মনে মন্ত্র-টন্ত্র কিছু আওড়ানো?"

"তা কিছু নয়, তাকে বলে সাধনার কাজ।"

"সে আবার কিসের সাধনা?"

"আর কিছুই নয়, নিজেকে পুরোপুরি নিবেদন ক'রে দেওয়া—ভগবানকে বলা যে, আমি যেন আর আমার না থেকে সম্পূর্ণ তোমার হয়ে যাই, তোমার মধ্যে চলে যাই, আর তুমিও আমার মধ্যে ভরে উঠে সর্বময় হয়ে আমাকে দেখা দাও। আমাকে হাতে নিয়ে, আমাকে ভেঙেচুরে তোমার কাজের একটা যন্ত্র ক'রে নাও—যেভাবেই হোক, যতদিনেই হোক, যেমন তোমার খুশি। দুঃখ দিয়েই হোক কিংবা সুখ দিয়েই হোক—দু'হাত ভরে দিয়ে পরীক্ষা ক'রেই হোক কিংবা দু'হাত শূন্য ক'রে অভাবের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা ক'রেই হোক—পিটিয়ে গলিয়ে দুমড়ে মুচড়ে যেমন ক'রে তোমার ইচ্ছা—অকাজে খাটিয়ে নিয়েই হোক কিংবা বিনা কাজে বসিয়ে রেখেই হোক—আসল কথা, আমাকে তুমি নিয়ে নাও—বাইরের কাজ আর ভিতরের ভাবনা সমস্তই তোমার দিকে দিয়ে যেন তোমাতে মিলে এক হয়ে যাই—"

"এ খুব ভালো কথা, বড় চমৎকার কথা। কিন্তু আমিও যে ঠিক ঐরকমই চাইছি—"

"না না, কোনো মানুষের কাছে নয়, যিনি সকল মানুষের উপরকার মালিক তাঁর কাছে। যাঁর থেকে সব এসেছে তাঁকেই সব দিতে হবে, বুঝলে না?"

"যখন তাঁকে জানবো তখন তাঁর কাছেই ও-কথা বলব। যাকে হাতের কাছে আপাতত পেয়েছি, যাকে জেনেছি তাকেই এখন বলছি।"

বৈরাগী এবার অস্থির হয়ে উঠল। বিরক্তভাবে বললে—"তোমাকে হয়তো আমি বোঝাতে পারছি না। আমি যা বলতে চাইছি তা বাইরের মনের কথা নয়, ভিতরের মনের কথা। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, যা বলছ তাকে তর্কের দিক থেকে কাটতে পারা যায় না, তোমার সঙ্গে তর্কে আমি আঁটতে পারব না। কিন্তু আমি বলছিলাম ভগবানকে চাওয়ার কথা, তারই আনন্দের কথা।"

তটিনী এবার মাথা নীচু ক'রে বললে—"আনন্দের কথা যখন বললেন, তখন আমারও একটা কথা বলি শুনুন। আমি সোজাসুজি বলছি, সহজ আনন্দের কথা। দেখুন, জগতে আমাকেও আনন্দ দিতে কেউ নেই, আপনাকেও আনন্দ দিতে কেউ নেই, তাই বলছিলাম—"

বৈরাগী ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—"আমি বুঝেছি বুঝেছি, তুমি যা বলতে চাইছ। কিন্তু তোমার আমার আনন্দ পৌঁছবার ঐ রাস্তাই নয়। যা খুশি তাই কি আমরা চাইতে পারি?"

তটিনী বললে—"আমি তো একটু আনন্দই শুধু চাই অন্য কিছু নয়—"

বৈরাগী বললে—"ও তোমার ঠিক কথা হলো না। তুমি নিজে কিছুই চাইছ না, চাইছে তোমার মন। মনের চাওয়া অবোধ শিশুর মতো, আগুন দেখেও তাকে ধরতে হাত বাড়ায়। কিন্তু মনের সঙ্গে খানিকটা বোধ আর বিচারশক্তিও দেওয়া আছে, তাই দিয়ে মনকে বোঝাতে

হবে, আগুনের দিকে হাত বাড়াতে চাইলে তাকে থামিয়ে দিতে হবে।"

তটিনী একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—"আপনি হয়তো আমাকে নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবছেন। কিন্তু আমার স্বভাবই এমনি। যখন বলি না—তখন কিছুই বলি না, আর যখন বলি—তখন সবটাই বলে ফেলি। আমি আমার মনের কথাগুলোই বলেছিলাম। যাক্‌গে, আপনার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে কোনো লাভ নেই। আমিও আপনার কথা বুঝবো না, আর আপনিও আমার কথা বুঝবেন না।"

আট

বিশালা-মন্দিরের চারিপাশের জমিতে যা ফসল ফলতে লাগল তা অপর্যাপ্ত। তা ছাড়া ওখানকার বেগুন কপি মূলা বীট গাজর অতি উৎকৃষ্ট, দেখতেও যেমন বড়ো, খেতেও তেমনি সুস্বাদু। চারিপাশের গ্রাম্য চাষীরা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, এখানকার এই পোড়ো জমিতে এত উৎকৃষ্ট রকমের ফসল এত প্রচুর পরিমাণে ফলছে কেমন ক'রে। কিন্তু আট-দশ বিঘা জমির সমস্তটাই যদি উর্বর হয়, আর যদি সেখানে কিছু যত্নের সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা করা যায়, তাহ'লে অমন হওয়া খুব আশ্চর্যের কথা নয়। জমিটা অনেককাল পর্যন্ত জঙ্গল হয়ে পড়েই ছিল, সেখানে কত মৃত পতঙ্গ দেহ আর নানারকমের আবর্জনা বছরের পর বছর পড়ে পড়ে জমেছে আর পচেছে, মাটির সঙ্গে স্তরে স্তরে তা মিশে গিয়ে সেই মাটি এখন উৎকৃষ্ট সারমাটিতে পরিণত হয়েছে। কোদাল দিয়ে উপরের স্তরের মাটি একটু উল্টে দিলেই তা ফসলের পক্ষে খুব উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে যা-কিছুর বীজই ফেলা যায় তার থেকেই তাড়াতাড়ি পুষ্ট গাছ গজিয়ে ওঠে, আর তা ফলন্ত হয়ে ওঠে। উপ্ত কোনো বীজই সেখানে বৃথা নষ্ট হয় না।

এই কারণেই বারো মাস ঐ সোনার জমিতে ভালো ভালো ফসল জন্মাতে লাগল। লোকে বললে, এ-ও ঠাকুরাণীর দয়া। কেউ কেউ বললে যে, বৈরাগী খুব পয়মন্ত, যাতে হাত লাগায় তাতেই সোনা ফলে। কিন্তু কথাটা ঠিক তাই নয়। যা-কিছু হচ্ছিল তা জমিরই গুণে। তবে তার সঙ্গে মানুষের যত্নের যোগও ছিল।

প্রতি সপ্তাহেই ঝুড়ি ঝুড়ি নানারকম তরকারি এখান থেকে হাটে পাঠানো হয়। সমস্তই বিক্রি হয়ে যায়। তাতে যা অর্থাগম হতে থাকে তা নিতান্ত কম নয়। নানারকম খরচ-খরচা বাদেও সে-অর্থ প্রতি সপ্তাহেই সঞ্চিত হতে থাকে। কিন্তু কোথায় তা রাখা হবে? বৈরাগীর কোনো বাক্স-পেটরা নেই, তালা-চাবি নেই। কিছুকাল পর্যন্ত সে যেখানে সেখানে তা গুঁজে রেখে দিত, কখনো বা বিছানার তলায়, কখনো বা কোনো গর্তের মধ্যে চাপা দিয়ে। কিন্তু যখন অনেক জমে উঠল তখন আর এইভাবে তা ফেলে রাখা যায় না। একটা কোনো নিরাপদ স্থানে জমা ক'রে রাখতে হয়। আর নিজের কাছে সঞ্চিত টাকা রাখা বৈরাগীর কোনো কালে অভ্যাস নেই, তার এই নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তি হতে লাগল। সে টাকাগুলি নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠল।

একদিন সে তটিনীকে এ-কথা বললে। বললে—"আমি আর এতগুলো টাকাকড়ি নিজের কাছে রাখতে পারছি না। একা-একা এখানে থাকি, রাত্রে আমার ঘুম হয় না। আমি বলি কি, তুমি এগুলো নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখে দাও। তাহ'লে আমি বাঁচি।"

তটিনী বললে—"আমি তা পারবো না, আমারও তাহ'লে ঐ দশা হবে। তা ছাড়া সবাই এ-কথা একদিন জানতে পারবে, তখন তারা বলবে কী। বলবে যে, এরা দুজনে মিলে বেশ ব্যবসা ফেঁদেছে।"

"তবে কী করি বলো দেখি?"

তটিনী বললে—"এক কাজ করুন না, আমার বাবার কাছে গচ্ছিত রেখে দিন। গ্রামে আরো অনেক মাতব্বর লোক আছে, আমি তাদের নাম করতে পারতাম, কিন্তু কাউকে আমার বিশ্বাস হয় না। যার হাতেই দেবেন সেই কোনো-না-কোনো রকমে ঠকিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। আমি সকলকেই চিনি। তাই বলছি বাবার কাছে রেখে দিন, তাতে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।"

সেইদিনই বৈরাগী সব টাকাগুলি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে চাটুয্যেমশায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলো।

চাটুয্যেমশাই আফিংখোর মানুষ, আফিম খেলেই তিনি চাঙ্গা থাকেন, কিন্তু মনটি বেশ সরল ও উদার, কোনো মারপ্যাঁচ নেই। বৈরাগীকে বাড়িতে আসতে দেখেই তিনি বললেন—"আসুন আসুন, আজ গরিবের বাড়িতেই পায়ের ধুলো দিলেন। কিন্তু জানেন তো, আমি নিতান্তই গরিব।"

বৈরাগী হেসে বললে—"আমি কিছু নিতে আসিনি, বরং দিতে এসেছি, আমার ঘাড়ের খানিকটা বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে।"

"শুনে যে বড়ো ভয় হচ্ছে। ব্যাপারটা কী খুলে বলুন।"

বৈরাগী তাঁকে সমস্ত কথা বুঝিয়ে ব'লে টাকাগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখলে। কথা হলো যে, দেশের টাকা দেশের প্রয়োজনেই জমা রইল। যখনই সাধারণের কোনো কাজের জন্যে দরকার হবে তখনই ও-টাকা খরচ করা হবে। আর সপ্তাহে সপ্তাহে আরো যা জমবে সমস্তই চাটুয্যে-মশায়ের কাছে এনে দেওয়া হবে। উনি সেই টাকার জমাখরচের একটা হিসেব রাখবেন।

মন্দিরের জমি থেকে অর্থাগমের নিরাপদ সঞ্চয় সম্বন্ধে যখন এইসব ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, তখন এ-ব্যাপারটা যে অপর কারো নজরে পড়েনি তা নয়। সকলেই সব কিছু দেখছিল, এবং বুঝতে পারছিল যে এখানে যথেষ্টই অর্থাগম হচ্ছে। অনেকেরই এতে চোখ টাটাচ্ছিল। খবরটা নীচু মহল থেকে গ্রামের উঁচু মহলে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল।

এ-গ্রামে দুই ঘর ধনী আছে। পালিতদের ঘর আর ধাড়াদের ঘর। পালিতমশাই আর ধাড়ামশাই দুজনেই প্রায় সমান ধনী, দুজনেই সমবয়সী। পালিতের আছে মস্ত কাপড়ের দোকান, সেখানে সব রকমের কাপড় মেলে, এমনকি কাটা কাপড় পর্যন্ত। আশপাশের সকল গ্রাম থেকে লোকে এই দোকানেই কাপড় প্রভৃতি কিনতে আসে। তা ছাড়া তাঁর জমিজমাও আছে, তেজারতিও আছে। এই ব্যবসাতে তিনি ধনী হয়েছেন, মস্তবড়ো কোঠা বানিয়েছেন। আর ধাড়ার হলো সোনারুপার দোকান। তিনি গহনা বেচেন, গহনা কেনেন, গহনা বন্ধক রেখে টাকা ধার দেন। এই ক'রে তিনিও ধনী হয়েছেন। দুজনেরই তেজারতিতে সুদের হার সমান সমান। তলে তলে দুজনের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও, মৌখিক ভাবের কিছু কমতি নেই। বৈকালে দুজনে দোকানের সামনে তক্তপোশ পেতে পাশা খেলতে বসেন। তখন পাড়ার অনুগ্রহপ্রার্থী চাটুকারেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে এঁদের উৎসাহিত করতে থাকে। অনেকগুলি হুঁকোর আমদানি হয়, ঘন ঘন তামাক চলতে থাকে।

এঁদের দুজনের চোখ টাটালো সবচেয়ে বেশী।

যেখানকার যা কিছু খবর সমস্তই এঁরা যথাকালে শুনতে পান। বৈরাগীর সম্বন্ধে অনেক কথাই এঁরা শুনেছিলেন, কিন্তু প্রথমটায় কিছু গ্রাহ্য করেননি। এঁরা দুজনেই বৈষ্ণব, মাঝে মাঝে নিজেদের বাড়িতে হরিসংকীর্তন করিয়ে থাকেন। বিশালা দেবীর মন্দিরের সংস্কার হয়েছে এবং রীতিমতো পূজারতি হচ্ছে শুনেও সেদিকে কখনো যান না, শক্তিপূজার ব্যাপার ভেবে তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধও রাখতে চান না। কিন্তু ক্রমশ যা শুনতে থাকলেন তাতে এঁরা বিচলিত হয়ে উঠলেন। একজন কে ভিখিরী বৈরাগী কোথা থেকে হঠাৎ উড়ে এসে এখানে জুড়ে বসেছে, গ্রামের মানুষদের বশ ক'রে নিয়েছে, রীতিমতো ব্যবসা ফেঁদে অনেক রোজগার করছে, ওঁদের বাধ্য যত সব প্রজাদের উপরেও প্রভাব বিস্তার করছে, এতটা সহ্য করা যায় না। একটা কিছু বিহিত করতেই হয়।

দুজনে মিলে তখন মতলব এঁটে একদিন বিকেলে ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন, কয়েকজন মোসাহেবকে সঙ্গে ক'রে।

মন্দিরের চাতালের কাছে পৌঁছে উচ্চস্বরে একজন ডাক দিয়ে বললেন—"কৈ হে, কোথায় বৈরাগীমশাই, একবার এদিকে এসো, আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। এঃ, এ-যে বন কেটে খাসা বাগান বানিয়েছ হে। সেই-যে বলে, বন থেকে বেরুলো টিয়ে—"

দুজনে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

বৈরাগী এসে উপস্থিত হলো। সে এঁদের বিলক্ষণই চেনে, ভিক্ষা সংগ্রহ করতে অনেকবারই গেছে এঁদের বাড়িতে। খুব বিনীতভাবে সে বললে—"আসুন আসুন কখনো তো এদিকে আসেন না, আজ বুঝি কি মনে করে হঠাৎ এসে পড়েছেন।"

পালিত বললেন—"হাঁ হে, তোমার এইসব কাণ্ড কারবার দেখতে এলাম। ফেলে-দেওয়া ঠাকুরের পুজো করতে এসে এখন তো পুরোপুরি চাষবাস শুরু ক'রে দিয়েছ; এর থেকে অনেক টাকাকড়িও উপার্জন হচ্ছে শুনতে পাই। তা ভালোই করছ। কিন্তু কার জমিতে চাষ করছ সেটা একবারও ভেবেছ কি?"

"ভাবতে হবে কেন, সে তো জানা কথা। মায়ের মন্দির, মায়ের জমি, তাঁরই কাজের জন্যে তাঁরই জমিতে মজুর খাটছি। আমি যে তাঁর চাকর বাঁধা, এ কথা বিলক্ষণ জানি বৈকি।"

"খুব যে মায়ের দোহাই দিচ্ছ, তিনি কি তোমায় মাইনে ক'রে রেখেছেন?"

"মাইনে কিসের, আমি তাঁর বিনা-মাইনের চাকর।"

"তা যেন বুঝলাম, এখানকার সেবায়েত হয়েছ। কিন্তু এত এত সব যে টাকাকড়ি আসছে সেগুলো যাচ্ছে কোথায় কোথায় চালান দিচ্ছ?"

"আজ্ঞে না, চালান কোথাও যায়নি, এখানকার টাকা ানেই আছে।"

"এমন আল্‌গা জায়গাতে তুমি কাঁচা টাকা রেখেছ? বেই তুমি কাঁচা ছেলে। যদি সিন্দুক-টিন্দুক গড়িয়েছ, না, াঙ্কের কাছে তেজারতিতে সে-টাকা খাটাচ্ছ?"

এইসব প্রশ্নোত্তর চলেছে, এমন সময় ওঁদের গলার ায় জোর আওয়াজ শুনে মন্দিরের ওপাশ থেকে তটিনী পাশে এসে হাজির হলো।

সে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনারা কী জানতে চাইছেন পিতকাকা?"

"সে-কথা তোর জানবার কিছু দরকার নেই, এখানকার চপত্র আর টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমাদের কথা হচ্ছে। ই এখান থেকে যা।"

তটিনী তাই শুনে আরো ওদের কাছেই এগিয়ে গেল। ট চেপে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভঙ্গীতে বললে—"ও-কথার ঠিক ঠিক াব উনি তো দিতে পারবেন না। ও-কথা বরং আমাকে াসা করুন, আমিই বলছি। ওসব বিষয়ে আমিই াশোনা করি কিনা, ঠিক ঠিক সমস্ত খবর আমার কাছেই বেন।"

ধাড়া মহা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বললেন— লিস কি রে! এতখানি ব্যাপার! তুই যে এইসব ছিস, তোর বাবা সে-কথা জানেন?"

"শুধু জানেন, বলছেন কেন, এখানকার যা-কিছু কাকড়ি সব তাঁরই কাছে গচ্ছিত থাকে। এর একটা সেবের খাতাও রয়েছে তাঁর কাছে। সে-খাতা আমি জই দেখি। বলব, আজ পর্যন্ত কত টাকা জমেছে? ট ১,৯৩৭৲ টাকা নগদ আছে, ধরুন প্রায় দু'হাজার। তি হপ্তাতেই খরচপত্র বাদে যা বাকি থাকছে সমস্তই ঐ হবিলে জমা হচ্ছে। চলুন-না আমার বাবার কাছে, খানে গেলেই জানতে পারবেন আমি সত্যি বলছি, না থ্যে বলছি।"

"থাক থাক, তার কিছু দরকার নেই, তোর কথা আমরা বিশ্বাস করছি না। তা, এত টাকা নিয়ে তোরা করবি?"

"আমরা মানে? আমি আর বাবা? আমরা তার া মালিক নই, কেবল জমাই রেখেছি। কিসে তা খরচ সে-কথা উনিই বলতে পারেন। উনি যখন যে কাজের চাইবেন তখনই আমরা দিয়ে দেবো, এই হয়েছে া।"

এই কথা ব'লেই তটিনী আর দাঁড়াল না, সেখান থেকে সরে গেল।

তখন পালিত আর ধাড়া শান্ত হয়ে ও-রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরলেন। মাতব্বরিটা বজায় রাখতে হবে, তাই আবার বৈরাগীকে নিয়ে পড়লেন।

"কি হে বৈরাগী, তোমার তাহ'লে মতলবটা কি? অত টাকা কোন্ কাজে তুমি লাগাচ্ছ?"

"আপনাদের সকলের জন্তে মা ঐ টাকা রেখে দিয়েছেন, আপনারা সকলে যেমনভাবে বলবেন তেমনভাবেই তার খরচ হবে।"

"এবার তুমি পাকা কথা বলেছ। ওটা হলো বারোয়ারির টাকা। সেই ভাবেই ওর খরচ হবে, আমরা যখন চাইব তখন তার হিসেব দেবে। তা দেখ বাপু, তাহ'লে তোমায় বলি শোনো। তুমিও তো একজন বৈরাগী, তোমার গলায় রয়েছে কন্ঠী। আর এটা হলো বৈষ্ণবপ্রধান দেশ, এখানকার প্রায় সকলেই বৈষ্ণব। আমরা বারোয়ারির টাকা বারোয়ারিতেই খরচ করি, বেশী কিছু জমলেই খুব ঘটাঘটি ক'রে চব্বিশ-পহরা হরিসংকীর্তন লাগিয়ে দিই। তুমিও তাই করবে।"

"বেশ তো, সকলে যদি তাই বলেন তবে তাই হবে।"

"হাঁ, তাই বলে রাখছি। আমরা হরিনাম শুনতেই ভালোবাসি। এখনকার এই কলিযুগে হরিনামই আমাদের সম্বল। আমরা হচ্ছি ব্যবসাদার মানুষ, ব্যবসা করে খেতে হয়, তার জন্যে কত পাপকাজও করতে হয়। কিন্তু যতই খারাপ লোক হইনা কেন, তবু প্রত্যহ আমরা হরিনাম করতে ভুলি না। এই হরিনামই শেষপর্যন্ত আমাদের তরিয়ে দেয়। নামের গুণে কম উপকার হয় না। কি বলো হে, তুমিও এ-কথা মানো কিনা?"

"কেন মানবো না। ভগবানের নাম মনে স্মরণ করলেও কাজ হয়, এমনি মুখে উচ্চারণ করলেও কাজ হয়, কানে শুনলেও কাজ হয়। মানুষের বিষয়মুখী মনকে ওতে ভগবৎ-মুখী ক'রে আনে। কিন্তু শুধু হরিনাম কেন, আল্লা-নামেও সেই কাজ হয়, শিবনামেও তাই হয়, মায়ের নামেও তাই হয়। আবার—হে বুদ্ধ, হে রামচন্দ্র, হে গৌরাঙ্গ, হে রামকৃষ্ণ বললেও তাই হয়। সবই তো সেই একই জনের নাম। এখানে যেমন আপনি মহাজন আর আমি গরিব ভিখিরী, একেবারে আলাদা, ওখানে তা নয়। আপনি যদি আজ ভক্তির সঙ্গে 'হরি' 'হরি' করেন, আর কাল তেমনি ভক্তির সঙ্গে 'শিব' 'শিব' করেন, তাতে একই রকমের কাজ হবে।"

"বাঃ বাঃ, বৈরাগী, তুমি এ চমৎকার কথা বললে। কি বলেন খাড়ামশাই?"

খাড়া এবং মোসাহেবেরা সকলেই এতে একবাক্যে সায় দিলে।

"তাহ'লে তোমার সঙ্গে এই কথা রইল বাপু। যাই করো তাই করো, এখানে মাঝে মাঝে খুব ঘটা ক'রে হরিসংকীর্তন লাগিয়ে দাও। সবাই মিলে ভগবানের নাম শুনুক আর নাম করুক, দেশের লোকের তাতে মঙ্গল হবে।"

ওঁরা খুশিমনে বিদায় হলেন।

কিন্তু বাড়িতে গিয়ে নিজেদের গিন্নিদের কাছে যা গল্প করলেন, সে একটু অন্যরকমের কথা। তটিনীকে ওখানে কেমনভাবে দেখেছেন আর সে কী কী কথা বললে, কেমন কেমন ভঙ্গীতে, তারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ক'রে শোনালেন।

নয়

কর্তামহলে কথাটা যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, গিন্নি-মহলেও তার কোনো অভাব হয়নি।

কর্তাদের মজলিশ একরকম, গিন্নিদের মজলিশ আবার তার চেয়ে একটু অন্যরকম। মেয়ে-মজলিশটা বসতো খাড়া-ভবনে, কারণ ঐ বাড়িতে ছিল শান-বাঁধানো প্রকাণ্ড এক দরদালান, মেয়েরা নিশ্চিন্তে পা ছড়িয়ে বসে সেখানে গল্প-গুজব করার সুযোগ পেতো। প্রত্যহ অপরাহ্নে এবাড়ি-ওবাড়ির মেয়েরা তাই সেখানে এসে জুটতো। সেখানে কতকদিন বা চলতো তাসের গ্রাবু খেলা। কতকদিন বা গোলকধাঁধা খেলা। কতকদিন বা পড়া হতো রামায়ণ, মহাভারত, বঙ্কিমের উপন্যাস। আর কতকদিন বা চলতো শুধুই পরনিন্দা আর পরচর্চা, যখন তার কোনো একটা সূ মিলে যেতো।

এ-মজলিশে ইদানিং তটিনীর আচার-আচরণের [illegible] সবিস্তারে বর্ণিত হচ্ছিল। আগে আগে গ্রামের অন্যা অনেকের সম্বন্ধে নানা আলোচনা হলেও, এ-পর্যন্ত তটিনীর সম্বন্ধে কিছু হতে পারেনি। তার স্পষ্টবাদিতার জন্যে সকলে তাকে শ্রদ্ধাও করতো আর ভয়ও করতো। তার কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতো না। কিন্তু ইদানিং তার কারণ ঘটেছিল।

তটিনী আজকাল গ্রামের বসতি পার হয়ে ঐ মন্দিরে আর বাগানে সর্বক্ষণই যাতায়াত করছে। তার কোনো সময় অসময় নেই। ওখানে ওর কী এত দরকার নিজের পাড়া ছেড়ে, ঘরসংসার ছেড়ে ঘন ঘন ঐখানে যাওয়া —এ ভালো কথা নয়। যখন তখন দেখা যায় ও একা-একা মন্দিরের দিকে হন্‌হন্‌ ক'রে চলেছে।

কথাটা মিথ্যা নয়, যা রটেছে তা সত্যই।

দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় সে ঐখানেই কাটায়। ভোর হতে-না-হতেই সে তাড়াতাড়ি ক'রে নিজের বাপে চা মিষ্টি আর আফিম খাইয়ে দেয়। এটা নিতান্তই দরকা কারণ তিনি চায়ের সঙ্গে সকালে একবার আর বিকা একবার আফিম খেয়ে থাকেন। ঐটি খাইয়ে দি পারলেই কিছুকালের জন্যে ওর ছুটি। সুতরাং বাপের প্রাতঃস্নানটি সারা হয়ে গেলেই ও মন্দিরের দিকে ছোটে

বাপকে অবশ্য বলেই যায় যে, ও মন্দিরে গেলে তবে সেখানকার পুজোর কাজ শুরু হবে, আয়োজনাদির ভারটা তাকেই নিতে হয়েছে। বাপও সে-কথা জানে।

পুজো এবং খিচুড়ি-ভোগ বিতরণ প্রভৃতি শেষ হয়ে যাবার পরে বৈরাগী যখন বেরিয়ে যেতো ভিক্ষা-সংগ্রহে, তখন তটিনীও সেখান থেকে বাড়ি চলে আসতো। তখন সে নিজেদের রান্নাবান্না করতো, বাপকে খাওয়াতো, নিজে খেতো। তার পর কিছুক্ষণ বই-টই পড়তো, নতুবা বিশ্রাম নিতো। বিকেল চারটে বাজতে-না-বাজতেই সে উঠে পড়তো, উনুন জেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিতো। কোনোদিন জল চড়াতে পাঁচ-দশ মিনিট বিলম্ব হলে, ওর বাপই ওকে তাগিদ দিতে শুরু করতেন; পাছে তাঁর আফিম খাবার নির্দিষ্ট সময়টি উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কাজেই তাঁর বিকেলের চা-আফিম হাজির ক'রে দেওয়াতে কোনোদিনই তার বিলম্ব হতো না। এই চা খাওয়ানো হয়ে গেলেই আবার তার ছুটি। তখনই সে আবার ছুটতো মন্দিরের দিকে। ততক্ষণে বাগানের কাজ শুরু হয়ে গেছে, বৈরাগী গাছপালার পরিচর্যা করছে, অনেক ছেলে জুটে গাছে জলটল দিচ্ছে। তটিনীও তখন সেই কাজে যোগ দিত। বৈরাগীর দেখাদেখি সে গাছপালার কাজগুলি বেশ শিখে নিয়েছিল।

সন্ধ্যার আগের থেকেই সে বাগান ছেড়ে মন্দিরে গিয়ে পূজা-আরতির আয়োজন শুরু করতো। বৈরাগীও তখন বাগান ছেড়ে চলে এসেছে, অনেক ফুল এনে ঠাকুর-সাজানোর নতুন নতুন শিল্পকার্য শুরু ক'রে দিয়েছে, তাতেই তখন সে তন্ময় হয়ে আছে। তটিনীও তেমনি তন্ময় হয়ে তার নিজের কাজগুলি ক'রে যেতো। সন্ধ্যার আলোগুলি জেলে দেওয়াও ছিল ওদের দুজনের কাজ। আলোগুলি জ্বলে উঠলেই তখন সন্ধ্যার আরতি শুরু হয়ে যেতো। তাও চলতো অনেকক্ষণ পর্যন্ত। আরতি শেষ হলে তারপরে তটিনী বাড়ি ফিরতো।

এ-সমস্ত ব্যাপার মেয়েদের অনেকেরই নজর এড়ায়নি।

অবশ্য চাটুয্যেমশায়ের এতে সম্মতিই ছিল, নতুবা এতটা হতে পারে না। মেয়েকে তিনি বিশ্বাস করতেন, তার বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করতেন। আর তার মনের অবস্থার দিকে তিনি চাইতেন। তিনি দেখতেন যে এমন গুণবতী মেয়ে তাঁর ঘরে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে দু'বেলা রান্না ক'রে তাঁকে খাওয়ানো ছাড়া আর তার কোনোই কাজ নেই। সে তেমন আড্ডাপ্রিয় নয়, গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে সে মেশে না। তারাও ওর সঙ্গে মিশতে চায় না, কারণ বাজে-গল্প আর পরচর্চা ও মোটে পছন্দ করে না, ওর কাছে তেমন কিছু বলতে এলেই ও তাদের কতকগুলি কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। কাজেই ওর সঙ্গে তাদের পোট্ খায় না। ও একা-একা মুখ বুজে থাকে বিমর্ষের মতো, এমনকি বাপের সঙ্গেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশী কথা বলে না। মনের সমস্ত স্বাভাবিক কথাগুলোকে যেন ও চেপে চেপে নিকেশ ক'রে দিতে চাইছিল।

কিন্তু মন্দিরে যাতায়াতের পর থেকে উনি দেখতে পেলেন যে, তটিনীর সেই ভাবটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ওর মুখে প্রসন্নতা দেখা যাচ্ছে, কাজে স্ফূর্তি দেখা যাচ্ছে। দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলা ছাড়া ও নিজের মনোমতো একটা কিছু কাজ পেয়ে গেছে, তাতেই ওর এই ভাব-পরিবর্তন। তা, ওতে যদি ওর মনটা খুশি থাকে তবে থাকুনা কেন ঐ নিয়ে। ঐ মন্দিরসেবা আর ঠাকুরসেবার কাজ নিয়েই ও লেগে থাকুক। হয়তো ঠাকুরদেবতার উপর কিছু ভক্তির ভাব এসে গেছে। তা যদি হয় তো খুব ভালো কথা। তিনি আর ক'দিন বা বাঁচবেন, তিনি চোখ বুজলে তখন ও কী নিয়ে ওর দিন কাটাবে। ওর ভাইএর তো কেবল শ্বশুর-বাড়ির দিকে টান, সে যে তখন ওর কী ব্যবস্থা করবে তা কে জানে। খেতে পরতে দেবে অবশ্য, কিন্তু ওর ভালোর দিকে চাইবে না। সুতরাং তটিনী এমন ক'রে ঐ মন্দিরে যাতায়াত করছে, তা ভালোই হচ্ছে।

চাটুয্যেমশাই নিজেও মাঝে মাঝে মন্দিরে যেতেন। বৈরাগী যে একজন খাঁটী লোক তা উনি বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন। তার সঙ্গে উনি নানা ভাবে নানা কথা বলে দেখেছেন। সে একেবারে নিঃস্বার্থ প্রকৃতির মানুষ, তার নিজের কাজের আনন্দেই সে মেতে থাকে। পয়সা রোজগার তার উদ্দেশ্য নয়, কাজ-ই উদ্দেশ্য। এইরকম একটা কাজ পেয়ে সেও যেন বেঁচে গেছে। যদিও তার কোনোরকম পরিচয়াদি কিছুই জানা নেই, কিন্তু তবু মানুষ দেখে তো বোঝা যায়। আর ওঁর মেয়ের সে খোলাখুলিই খুব সুখ্যাতি করে, তার কর্মপটুতার ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে। স্পষ্টই বলে, আপনাদের গ্রামে এর মতো মেয়ে একটিও নেই। মন্দিরের সব কাজেই তার অকৃত্রিম আগ্রহ। তার সাহায্য মিলে গেছে বলেই এত তাড়াতাড়ি এখানকার এতটা উন্নতি হতে পেরেছে। এইসব শুনে চাটুয্যেমশাই সন্তুষ্ট হয়ে যান।

কিন্তু চাটুয্যেমশাই সন্তুষ্ট থাকলে কি হবে, গ্রামের বর্ষিয়সী মেয়েরা কেউ এতে সন্তুষ্ট নয়। এটা যেন নিতান্ত

বাড়াবাড়ির মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৈরাগী হয়তো সত্যিই ভালোমানুষ লোক, তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। দোষ হলো ঐ মেয়ের। একে বিধবা, তাতে সমর্থবয়সী, ঐ বয়সটাই অতি খারাপ। মেয়েরা মেয়েদের মনের খবর জানে, কোন্ বয়সে কেমন মনের ভাব হয়। এ-জিনিস এখন থেকেই থামিয়ে দেওয়া উচিত, নইলে এর পরে আর থামানো যাবেনা। শেষে একটা কিছু বিশ্রী রকমের কেলেংকারি হয়ে যাবে।

ধাড়াগিন্নির মেয়ে-মজলিশে এই ধরনেরই কথাবার্তা হতে থাকল। সন্দেহটা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয় তার অনেকরকমই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বৈরাগীকে দেখলেই অমনি চনমনে হয়ে ওঠা, তার সঙ্গে এমন নরম ক'রে কথা বলা যা কারো সঙ্গে ওকে কখনো বলতে শোনা যায়নি, সর্বক্ষণ তার পিছনে পিছনে ঘোরা—এগুলো প্রত্যেকেরই নজরে পড়েছে। তারা কেউ কানা নয়। একে পোড়ো-মন্দিরের ঠাকুরের উপর সু-ভক্তি বলে না, বলতে হয় ঐ পোড়া-বৈরাগীর উপরেই একটা কু-ভক্তি। এতে শেষকালে গ্রামেরই বদনাম হবে।

কিন্তু কেমন ক'রে ওকে থামানো যায়?

তটিনীকে মাসে দু'বার ক'রে ধাড়াদের বাড়িতে আসতেই হতো। ওর বাবার আফিমের জন্যে। ধাড়া নিজেও আফিম খেতেন, লোক পাঠিয়ে শহরের লাইসেন্স-করা দোকান থেকে পারমিট দেখিয়ে আফিম আনাতেন। চাটুয্যেমশাইও নিজের আফিমের পারমিট ধাড়ার কাছে দিয়ে রেখেছিলেন, তাঁর 'কোটা'র আফিমও ঐ সঙ্গে আনানো হতো। তটিনী নিজে এসে তা নিয়ে যেতো।

এবার আগের থেকেই বলা-কওয়া ছিল, তটিনী এলেই তাকে মজলিশের মধ্যে ডেকে এনে সকলের সামনে শাসিয়ে দিতে হবে।

তটিনী সেদিন আসতেই তাকে ডেকে বসানো হলো। ধাড়াগিন্নি নিতান্ত ভালোমানুষ সেজে তটিনীর গায়ে হাত বুলিয়ে খুব মিষ্টি ক'রে বললেন—"শোন্ তটিনী, তুই কিছু মনে করিস না, তোর নিজের ভালোর জন্যেই একটা কথা আমরা বলতে চাই। তুই আমাদের মেয়ের মতো, কিছু অন্যায় দেখলে আমাদেরই সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার, তাই বলছি।"

তটিনী ব্যাপার বুঝে পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে—"অত ভণিতা করবার কী দরকার আছে, সোজাসুজি ব'লে ফেলনা যা বলতে চাও।"

তার মুখভাব দেখে পালিতগিন্নি বুঝলেন, তটিনী সেয়ানা মেয়ে, ওকে অমন ক'রে বললে হবে না। একটু খোলাখুলিই বলতে হবে। তিনি বললেন—"আচ্ছা, আমি বলছি শোন্। ঐ পোড়ো মন্দিরে যে বৈরাগী মানুষটি থাকে, ও লোক ভালো নয়। কোন্ দেশের কোন্ জাতের মানুষ তা কে জানে, অজানা অচেনা মানুষকে আমাদের ছুঁতেও নেই, তার সঙ্গে কথা বলতেও নেই। আমরা হলাম বনেদী বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ে। তুই বামুনের ঘরের বিধবা হয়ে সারাক্ষণ ওর পিছু পিছু ঘুরিস কেন? লোকে তাই নিয়ে বলাবলি করছে। বেশ তো, মন্দিরে যেতে ইচ্ছে হয় যাবি, পুজো-আরতি দেখতে ইচ্ছে হয় দেখবি, কিন্তু ঐ লোকটার সঙ্গে অত মেলামেশা করবার দরকার কি আছে?"

শুনতে শুনতে তটিনীর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ ধীর ভাবেই সে বললে—"লোকে বলছে মানে তোমরাই বলছ। কিন্তু তোমরা জানোনা তাই অমন বলছ। উনি একজন বড়ো দরের সাধু মানুষ, খুব জ্ঞানী গুণী লোক। উনি যে এখানে এসে রয়েছেন, গ্রামের লোকের সঙ্গে মিশছেন, তা এই গ্র[illegible] সৌভাগ্য। গ্রামের অনেকেই তা জানে, সকলেই [illegible] ভক্তি করে, সকলেই ওঁর কাছে যায়। আমিও যাই। এতে কোনো দোষ হচ্ছে বলে আমি মনে করি না।"

"বাইরের থেকে সাধুর মতো দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু ওর মনের মধ্যে কোন্ মতলব লুকোনো আছে তা কে জানে। কাজ কি অমন বাইরের লোকের সঙ্গে মিশে, একটু তফাত তফাত থাকলেই তো হয়। আমরা তোর গুরুজনের মতো, আমরা তোকে ভালো পরামর্শই দিচ্ছি। আমাদের কথা শুনে তোকে চলতে হবে।"

"তোমরা অন্যায় কথা বলছ। অমন একজন ঈশ্বরভক্ত মানুষের সঙ্গে মিশলে লাভ আছে বৈকি, অনেক লাভ। তোমরা নিজেরা তো কখনো তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখনি, কোনোদিন যাওনি পর্যন্ত ওখানে। চলোনা কেন একদিন আমার সঙ্গে, নিজেরা একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

পালিতগিন্নি চটে গিয়ে বললেন—"ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দে, আমরা যা বলি তাই শোন্।"

এবার আর তটিনীর সহ্য হলো না, সেও রাগ সামলাতে পারলে না। চোখ পাকিয়ে ঝাঁজিয়ে বলে উঠল—"কেন, তোমরা যা বলবে তাই বা শুনবো কেন? আমার কি

নিজের বলতে কেউ নেই ? মাথার উপরে আমার বাপ রয়েছেন, তাঁর কোনো আপত্তি হলো না, তোমাদেরই বা এত গা-জ্বালা কিসের ? আমার যেতে যদি তোমাদের হিংসে হয় তাহ'লে তোমরাও যাওনা কেন সেখানে, তাতে তিনি খুশিই হবেন।"

"এমন ক'রে উড়ে বেড়াবার আমাদের সময় নেই, বাছা। নিজেদেরই সংসারে আমাদের অনেক কাজ, ঢের ঝক্কি। কথা কাটাকাটি করছিস কেন, এতই বা তোর জিদ কিসের ? আমরা সকলে মিলে যা তোকে বলছি তাই তোকে শুনতে হবে।"

"শোনা দূরের কথা, তোমাদের কোনো মতামতকে আমি গ্রাহ্যই করি না। জানোই তো সে-কথা, কেন মিছে মুখ নষ্ট করছ। আমি কেবল আমার বাবার কথাই মানি, আর কাউকেই মানি না। ওখানে আমার যাওয়া যদি সত্যিই বন্ধ করতে চাও তবে এক কাজ করো, আমার বাবাকে তাই বলোগে। তিনি যদি তোমাদের কথা শুনে বারণ করেন তবে নিশ্চয় আর যাবো না।"

দশ

আবার নতুন ক'রে মেয়েদের আলোচনা চলল। মতলব স্থির হলো। ঐ দুজন গিন্নিই সকলের প্রতিনিধি হয়ে চাটুয্যেমশাইয়ের কাছে পর্যন্ত নালিশ জানাতে গেল। মেয়েটা যে নষ্ট হয়ে যাবে, তা তো চোখে দেখা যায় না।

ওদের দেখে তিনি বললেন—"কিগো ভালোমানুষের গিন্নিরা, দুজনে মিলে জোট ক'রে হঠাৎ এই গরিবের বাড়িতে কি মনে ক'রে এসেছো ?"

"বলব আর কি, গাঁয়ের মধ্যে টিটিকার পড়ে গেছে, কোথাও কান পাতা যায় না—, আর আপনি কিছু খবর জানো না ? বলি, কানাঘুষোও তো শুনছ—"

"কিসের কানাঘুষো ? আমি কিছু শুনিনি বাপু, তোমরাই খুলে বলোনা।"

"বলব আর কি ঠাকুরমশাই, আপনার মেয়ে সামলাও। নইলে একদিন তোমার সর্বনাশ করবে, তখন গাঁ ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না।"

"কেন, মেয়ে কী দোষ করেছে ? পালাতে যাবো কেন ?"

"তা আমরা কিছু দেখিনি বাপু, কিন্তু সবাই বলছে মন্দিরের বৈরাগীর সঙ্গে ওর নাকি কিছু নটঘট চলছে। তাই সময় থাকতে তোমায় আমরা সাবধান ক'রে দিতে এলাম, এখন আপনি যা ভালো বোঝো তাই করো।"

"না না, ওসব যত ঝুটো কথা, আমি একটুও বিশ্বাস করি না। তোমরা কি বলছ গো! মেয়ে আমার তেমন মেয়েই নয়। নিজের মেয়েকে আমি চিনিনা। আর তোমরাও তো বিলক্ষণ চেনো। এ-গাঁয়ে কত লোকের নামে কত কথাই শোনা গেছে, কিন্তু আমার মেয়ের নামে কিছু শুনেছ কখনো ? আমার মেয়ে যদি নষ্ট হবার হতো তবে অনেকদিনই তা হয়ে যেতো। না না, ওসব বাজে কথা, আমি কানেই শুনতে চাই না—"

"তা একটু সাবধান ক'রে দিতেই বা দোষ কি ? মেয়েকে সামলে রাখতে বলছি বৈতো নয়। অনেকে অনেক রকম দেখেছে বলেই বলছে—যা রটে তা কতক-মতক বটে—"

"যদি কেউ কিছু দেখে থাকে তো আমার সামনা-সামনি এসে বলুক। শোন বাছা, মেয়ে আমার কচিখুকিটি নয়। তার বিয়ে-থা হয়ে গেছে, কিছুদিন ঘরকন্না করেছে, তারপর বিধবা হয়েছে। দুনিয়ার কী হালচাল তা সে বুঝে নিয়েছে। ওর বুদ্ধি আছে, নিজের ভালোমন্দ বিলক্ষণ বুঝতে জানে, আমার চেয়েও ভালো জানে। ও নিজেই নিজেকে সামলাবে, তা নিয়ে আমারও ভাবতে হবে না আর তোমাদেরও হবে না।"

চাটুয্যেমশায়ের কাছে এইভাবে ধমক খেয়ে ওরা তখন অনেক রকমের মিথ্যার ফেঁকড়া বের ক'রে এ-কথা নি চারিদিকে অশ্রাব্য রকমের গুজব ছড়াতে লাগল। এবা কুখ্যাতির পালা। এ-জিনিস প্রকাশ্যে ছড়ায় না, ফিস্‌ফিসি তলে তলে ঘুঁইয়ে ঘুঁইয়ে ছড়ায়। কিন্তু তবু এর গতি অ ক্ষিপ্র, আশ্চর্য রকমের দূরপ্রসারী। এ-কান থেকে ও-কানে তার থেকে সে-কানে যেতে মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না। গ্রা এবং গ্রামান্তরে শীঘ্রই রটে গেল তটিনীর সঙ্গে বৈরাগী অবৈধ সম্পর্কের কথা। কেউ বললে, সে নিজের চো দেখেছে, বৈরাগী তটিনীর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছি যেমনি তাকে আসতে দেখলে অমনি তাড়াতাড়ি হাতখা সরিয়ে নিলে। কেউ বললে, সে ওর চেয়েও জোরা প্রমাণ দিতে পারে, সে স্পষ্ট দেখেছে তটিনী বৈরাগী একখানা হাত ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মিথ যখন সত্যের বেশ ধরে, তখন তা সত্যের চেয়েও বে চমকপ্রদ হয়ে ওঠে।

সব কথাই যথাসময়ে তটিনীর কানে গেল। রাগে ক্ষো সে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠল। বৈরাগীকে সব কথাই শুনি দিয়ে সে বললে—"এর একটা কিছু বিহিত করতেই হবে

আপনার মতো চুপ ক'রে সব সয়ে যাওয়া আমার ধাতে নেই।"

বৈরাগী বললে—"কোন্ বিহিত এর করতে চাও? লোকের সঙ্গে ঝগড়া করবে?"

"তা কেন? সকলের চোখের সামনে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি আপনার সঙ্গে হেসে কথা বলবো, হাতছানি দিয়ে আপনাকে ডাকবো—"

"তাতে আর কী লাভ হবে, ওদের কথাই আরো সত্যি বলে প্রমাণ হয়ে যাবে।"

"তাই হোকনা। তাতে দেখিয়ে দেওয়া হবে যে আমরা ওদের কাউকে মোটে গ্রাহ্যই করি না।"

"মিথ্যা দিয়ে কি মিথ্যার কখনো শোধ নেওয়া যায়?"

"আপনি যা বলছেন তা অবশ্য ঠিকই বলছেন। কিন্তু ছি ছি, দেখুন দেখি, আপনার মতো মানুষের নামে কিনা এইসব বদনাম! অথচ আপনি এ-দেশের লোকের কত উপকারই করছেন, তাদের ভালোর জন্যে কত চেষ্টা করছেন। তার বদলে তারা এই কলঙ্কের দাম দিচ্ছে আপনাকে! এখানে আসা পর্যন্ত কতরকম ভাবে আপনার পিছনেই সকলে লাগছে।"

"উপকারের বদলে উপকার পাবো, এমন আশাই বা আমি করতে যাবো কেন? অমন কিছু আশা আমি কোনোদিনই করিনি। এইরকমই হয় জানি।"

"কিন্তু এতে মনে-মনে খুবই আঘাত পেতে হয় তো, অন্তরে যথেষ্টই দুঃখ পান এতে।"

"দুঃখ পেলেও তাকে দুঃখ বলে মানি না, আশীর্বাদ বলে মানি।"

"সে আবার কেমন কথা?"

"হাঁ, তাই। এ-পথে অনেক দুঃখ পেতে হবে, অনেক দুঃখকে মাড়িয়ে যেতে হবে, এ-কথা আগের থেকে জেনে-জেনেই এ-পথে নেমেছি। এ কথা মিথ্যা নয় যে, দুঃখ মানেই ভগবানের দয়া। যত বেশী দয়া তত বেশী দুঃখ। দুঃখের ভিতর দিয়েই দয়া নিজের পথ তৈরি ক'রে আসে। দুঃখ কষ্ট, বাধা বিপত্তি, গঞ্জনা লাঞ্ছনা, বদনাম অপমান, সমস্তকেই আমাদের মেনে নিতে হবে। হৃদয়ের ভিতরটা যখন ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে, তখনই তার ভিতরকার পাতালগঙ্গার স্রোত ছুটে বান ডাকবে, সেই বানের তোড়ে অন্তরের ভিতরকার যত কালো নোংরা আবর্জনা সমস্ত ধোলাই হয়ে যাবে। তখনই তিনি তাঁর দয়ার আলো জ্বেলে দিয়ে সমস্ত উজ্জ্বল ক'রে দেবেন। জেনে রাখো তটিনী, তুমিও অনেক দুঃখ পাচ্ছো, তোমারও তাই হবে। ছেলেবেলাতে গান শোনোনি?—বাংলাদেশে তখন পথে-ঘাটে সে গান গাওয়া হতো—

বারে বারে যে দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে কেবলই দয়া তোমার জানি গো মা দুখহরা।

এ-কথা একেবারেই নির্ভুল। বহুকাল বহু লক্ষ বছর আগের থেকে পৃথিবীর সকল দেশের মহাপুরুষেরা এই কথাই বলে আসছেন, আর এখনও বলছেন। দুঃখ না পেলে আমাদের অন্তরের কবাট খোলেনা যে, মোক্ষম ভাবে [illegible] থাকে। কবাট খুলে গেলে তবেই সেখানে আলো ঢুকতে পারে। এ-কথা নির্ভুল জেনে, দুঃখকে কখনই দুঃখ বলে ধরে নিয়ো না।"

"দুঃখকে দুঃখ ছাড়া আর অন্য কি বলব?"

"তুমি ছেলেবেলাকার সেই সোনার-কাঠি-রুপোর-কাঠির গল্পটা জানো তো? দুঃখ হলো সেই সোনার-কাঠি, যাতে আমাদের জাগিয়ে রাখে, আর দুঃখ না থাকলেই তখন রুপোর-কাঠির ছোঁয়া লেগে আলস্য আসে, আমরা অমনি ঘুমিয়ে পড়ি।"

"আপনি যে-কথা বলছেন তা আমি একটু একটু বুঝতেও

PELICAN
● SHOCK PROOF ● WATER PROOF
● ANTIMAGNETIC ● DAMP-DUST PROOF
● UNBREAKABLE MAIN SPRING
A SWISS QUALITY WATCH

পারছি, কিন্তু আমার যে তবু থেকে থেকে ভয়ানক রাগ হচ্ছে। আর খুব আপসোসও হচ্ছে। মিথ্যে অপবাদটা একেবারে চুপ ক'রে সয়ে যেতে হবে, তার কোনো প্রতিকার করা যাবেনা ?"

"প্রতিকার কিছু করা যায় বৈকি। ওর সবচেয়ে সেরা প্রতিকার কি জানো ? শুধু একটুখানি মুখবোজা হাসি। তার মানে, তোমরা যাই কেন বলো, আর যে আঘাতই দাও, কোনোটাই আমি নিলাম না, হাসিমুখে তোমাদের ফেরত দিয়ে দিলাম। যা কিছু দিয়েই তোমরা আমাকে মারতে চাইছ, কোনোটাই আমার গায়ে লাগছে না।"

"কিন্তু এতে ওদের তো জব্দ করা হবে না।"

"যারা মিথ্যা দিয়ে মারতে আসে তারা এতেই সবচেয়ে বেশী জব্দ হয়। যে-বোমাটি তৈরি ক'রে তারা ছুঁড়ে মারতে চেয়েছিল, সেটি যখন ফাটলো না, তখন তাকে কেমন ক'রে সামলাবে তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তখন নিজেরাই তাকে কোনোগতিকে চাপা দিতে পারলে বাঁচে। তাই দেখবে, অপবাদ-অপমানের জবাব দিলেই বরং তার তেজ আরো বেড়ে যায়, কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করলেই তা আপনা থেকে নিবে যায়। কেবল তার জন্যে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়।"

"তাহ'লে কি বলছেন আমি চুপ ক'রে সব সয়ে যাবো ? কোনোরকম উচ্চবাচ্য করবনা ?"

"হাঁ, তাই। তুমি কিছুদিনের জন্যে আমার কথা শুনে দেখ। কারো কথার কোনো জবাব দেবে না। কিন্তু রাগও দেখাবে না, মুখ ভারও করবে না। যার সঙ্গেই দেখা হোক, একটু শুধু হাসবে। যে কথাই কেউ তোমাকে বলতে আসুক, তাতেও একটু হাসবে, কিন্তু কোনো জবাবই দেবে না। এই নীরব হাসির অনেক বেশী দাম। তুমি শুধু এইটুকু করেই দেখ, আপনা থেকে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তার পরে কেউ এ-নিয়ে আর উল্লেখই করবে না।"

যথার্থ ই তাই হলো। প্রথম কিছুদিন কানাঘুষার মাত্রা খুবই বেড়ে উঠল। এমনকি কেউ কেউ তটিনীর মুখের সামনে বাঁকা-বাঁকা টিটকারি দিতেও শুরু করলে। তটিনীর মুখে জবাববিহীন নীরব হাসি দেখে সকলে ভাবলে, সে বুঝি পরাজয় মানলে। কিন্তু সে তেমনি দৃপ্ত তেজে মাথা উঁচু ক'রে মন্দিরে যাতায়াত করতে থাকল। এত রটনা আর গঞ্জনায় কোনোই ফল হলোনা দেখে সকলে ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ল। জগতের আন্দোলনগুলো যেন ঢেউ-এর মতো, কখনই একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। পুরোনো ঢেউ-এর পরে নতুন ঢেউ আসে, তখন পুরোনোটা কোথায় তলিয়ে যায়। তটিনী-প্রসঙ্গের ঢেউ ক্রমশ কোথায় তলিয়ে গেল, লোকে আবার অন্যদিকে মন দিলে।

এগারো

বিশালাসড়ের মানুষদের মধ্যে আবার চলতে থাকল একঘেয়ে মামুলী জীবন।

বৈরাগীকে নিয়ে কিছুকালের জন্যে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ই থেমে গেছে। বৈরাগী এখন ঐ গ্রামেরই একজন। সকলের মধ্যে এমন একটা ভাব যেন সবাই ওকে নিজেদের ঘরের লোক ক'রে নিয়েছে, ওকে নিয়ে আর কোনো রকমের গণ্ডগোল হবে না।

বিশালাসড়ের ঘরে ঘরে নিকষিত রাত্রির পরে প্রত্যহ আলো-ঝকঝকে সকাল হয়। সবাই তখন আলস্য ছেড়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। খানিকটা এ-দিক ও-দিক করে, কেউ বা দাওয়াতে ব'সে চোখ মিটমিট ক'রে থেলো-হুঁকোর তামাক টানে, কেউ বা কাঁসার গেলাসে গরম চা নিয়ে উবু হয়ে ব'সে একটু একটু ক'রে চুমুক দিতে থাকে। মেয়েরা ঘরদোর নিকোয়, উঠন ঝাঁট দেয়, গোয়াল থেকে গরু বের ক'রে বাইরে এনে বাঁধে। রান্নাঘরে তারা তাড়াতাড়ি দিয়ে ঘুঁটে জেলে উনুন ধরায়, তখনই ভাত রাঁধতে হবে, মাঠের চাষীরা একপেট ভাত খেয়ে নিয়ে মাঠে মাঠে চাষের কাজ করতে বেরোবে। রান্নাঘরের খোলার চালের ফাঁক দিয়ে তখন অজস্র ধোঁয়া উঠতে থাকে।

একটু বেলা হলেই যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ে। চাষীরা যায় মাঠে, দোকানী-পসারীরা যায় দোকানে, ছেলেরা যায় স্কুলে। রাহীরা রাস্তা চলে। সাইকেলওয়ালা ব্যাপারীরা সাইকেলের পিছনে যতটা পারে মালপত্র বেঁধে নিয়ে পাড়ি দেয় এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে। চাল ডাল গম মশলার থলে বোঝাই নিয়ে গরুর গাড়ি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলে ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ ক'রে আর রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে।

বেলা যখন ভরা দুপুর হয়, ঘরের পুরুষেরা তখন শুকনো মুখে ঘরে ফেরে। যারা ফেরে না, তাদের জন্যে পাত্রের উপর গামছা ঢাকা দিয়ে মাঠে ভাত পাঠানো হয়। যারা বাড়িতে থাকে তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে দাওয়াতে গামছা পেতে শুয়ে পড়ে। মেয়েরা যে যেখানে পারে শুয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে নেয়। রাখাল ছেলেরা প্রান্তরে তাদের

গরু-মোষ-ছাগলগুলোকে চরতে ছেড়ে দিয়ে ছায়াশীতল গাছতলায় বসে জটলা করে, কেউ বা গ্রাম্যভাষায় দু'চার লাইন গান জুড়ে দেয়, কেউ বা লম্বা লম্বা মিঠে সুরের লহর কাঁপিয়ে বাঁশের বাঁশি বাজায়।

ক্রমে বেলা পড়ে আসে, সূর্যের প্রখর আলো একটু একটু ক'রে কমে আসে। তখন গরু-মোষ-ছাগলগুলির মাঠ থেকে ঘরে ফেরার পালা। দীর্ঘ সারি বেঁধে তারা দলে দলে ঘরে ফেরে। রাখাল ছেলেরা ছোটো ছোটো লাঠি হাতে নিয়ে হৈ-হৈ শব্দে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে। স্কুলের ছেলেরা ততক্ষণে বই-সেলেট বগলে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে, মুড়ি জলখাবার খেয়ে নিয়ে নিজেদের বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে তারা হুটোপাটি ক'রে খেলায় মেতেছে।

তার পরে শান্ত স্নিগ্ধ সন্ধ্যা নামে। পল্লীর ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সকল ঘরে আলো জ্বালা হয়। গ্রামপ্রান্তে বিশালা দেবীর মন্দিরের চূড়ায় তখন আলো জ্বলে, সেখানে সজোরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজতে শুরু হয়। তখন থেকেই সেখানে সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে যায়। গ্রামের ছেলে-মেয়ে-বুড়ো অনেকেই সেদিকে দলে দলে চলতে থাকে। মেয়েদের কারো হাতে কিছু নৈবেদ্য, কেউ-বা যায় খালি হাতে। এ-জিনিস আগে ছিল না, এখন নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যারতি শেষ হবার পরেই গ্রাম নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরেই মনে হয় হঠাৎ অনেকখানি রাত হয়ে গেছে। রাত্রি আটটা-ন'টা বাজতে-না-বাজতেই গ্রামের অধিকাংশ লোকে রাতের আহারাদির পালা চুকিয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। সারা গ্রাম তখন থেকে একেবারেই নীরব হয়ে যায়, নিতান্ত দরকার ছাড়া কেউ তার পর জেগে থাকে না।

জেগে থাকে কিন্তু বৈরাগী। অনেক রাত পর্যন্ত। সে আপন মনে কত কি ভজন গান আর বাউল গান গাইতে থাকে। নিস্তব্ধ রাতে গ্রাম-প্রান্তর পার হয়ে অনেকদূর পর্যন্ত তা বাতাসে ভেসে চলে। গ্রামের লোকে অগভীর ঘুমের মাঝে অনেকেই সে-গান শুনতে পায়। এ ছাড়া মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কুকুরগুলো বিনা কারণে ডেকে ওঠে। বনের ভিতর থেকে শেয়াল ডাকে। তারপরে রাত্রি আরো একটু গভীর হলে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বনও ঘুমিয়ে পড়েছে, গ্রামও ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল সারা আকাশ জুড়ে নক্ষত্রগুলো খচিত হয়ে নীচের দিকে চেয়ে জাগতে থাকে। তখন কে বলবে যে ঐ নীরব নিস্পন্দ বনের মধ্যে কালকূট বিষে ভরা কুটিল সাপ লুকিয়ে আছে, কে বলবে যে ঘুমে এলিয়ে-পড়া গ্রামের ঐসব নিরীহ মানুষদের অন্তরের মধ্যে তেমনি বিষাক্ত হিংসা আর কুটিলতা লুকিয়ে আছে! কে বলবে যে এখন যদিও ওরা নিতান্তই নীরব নিশ্চেষ্ট নিঃসহায়, কিন্তু সুযোগ পেলে এরাই আবার অন্য মূর্তি ধরে মারাত্মক রকমের ছোবল দিতে পারে!

শীত পার হয়ে বসন্তকাল পড়ল।

শীতের মরশুমে অনেক লাভ হয়েছে। বৈরাগীর সঞ্চয়ের তহবিলে অনেক টাকা জমে উঠেছে। এবার তার থেকে কতকটা খরচ ক'রে ফেলা দরকার। গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদের কাছে বৈরাগী কথা দিয়েছিল ঐ টাকাতে বারোয়ারি হরিসংকীর্তন করাবে। এই উপলক্ষে সে একদিন তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বিকেলে সে গেল পালিতের পাশার আড্ডায়।

পালিত বললেন—"আগে তোমার ইচ্ছেটা কী তাই শুনি। টাকাটা কিভাবে তুমি খরচ করতে চাও?"

বৈরাগী বললে—"আমার ইচ্ছের কোনো দাম নেই। আমার তো কতরকমই ইচ্ছে হয়। কখনো মনে হয় মন্দিরটা আগাগোড়া নতুন ক'রে মেরামত করাই, চারিধারে একটা পাঁচিল গেঁথে দিই—"

পালিত বাধা দিয়ে বললেন—"ওসব এখন থাক থাক, ওসব ক'রে কি হবে। মানুষের মনে আনন্দ দাও, চারিপাশের লোকদের হরিনাম শুনিয়ে খুশি ক'রে দাও,—"

"আচ্ছা তাই হোক, কিন্তু তার সঙ্গে সবাইকে পেট ভরে খিচুড়িভোগ খাইয়ে দিতে চাই। কিন্তু তাতে অনেক বেশী টাকার দরকার হবে। যা জমেছে তাতে কুলোবে কি?"

"না কুলোয়, আমরা আছি, কিছু কিছু ক'রে আমরা চাঁদা তুলে দেবো, কি বলো হে? তোমরা সবাই এতে রাজী আছ তো?"

সকলেই উৎসাহের সঙ্গে এ প্রস্তাব সমর্থন করলে। বললে, শুধু একবারই বা কেন, প্রত্যেক বছরেই এটা একবা ক'রে হতে পারে।

স্থির হলো, আট দিন ধরে চব্বিশপ্রহর হরিসংকীর্তন চলবে, সঙ্গে সঙ্গে আহূত অনাহূত সকলেই প্রসাদভো পাবে।

উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। গ্রামের কর্তা ব্যক্তিরাও তাতে যোগ দিলে। সকলেই উৎসাহের স নানারকম আয়োজনে লেগে গেল।

উত্তেজনায় ব্যস্ততায় কোলাহলে গ্রাম আবার মুখর হয়ে উঠল। দোকানে বাজারে ঘুরে ঘুরে চাঁদার টাকা সংগ্রহ করা, দূর দূর গ্রামগুলিতে খবর পাঠানো, যেখানে যত সংকীর্তনের দল আছে তাদের যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা—এগুলির ভার নিলে কতকজন। বড়ো বড়ো বাঁশ কাটিয়ে এনে জড়ো করা, রান্নার জন্যে প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করা, বস্তা-বস্তা চাল ডাল কিনে মজুত করা, মন্দিরবাড়ির পিছন দিকে সারি সারি উনুন কাটিয়ে 'যজ্ঞি' রান্নার ব্যবস্থা করা—এর ভার নিলে কতকজন। পাল, শামিয়ানা, শতরঞ্জি, রোশনাই প্রভৃতির জন্যে ব্যবস্থা করা—এর ভার নিলে কতকজন। পল্লীগ্রামে কোনো উৎসবের আয়োজন করতে হলে তার জন্যে আগের থেকে অনেক কিছুই যোগাড় ক'রে আনতে হয়। দিনরাত কীর্তন চলবে, সারারাত চারিদিকে অনেক আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে, তার আয়োজন করাই পল্লীগ্রামে এক বিষম হাঙ্গামা।

কোন্ শুভ তারিখ থেকে কীর্তন শুরু হবে তার দিন স্থির হয়ে গেল। প্রত্যেক গ্রামের মাতব্বর ও জানাশোনা লোকদের বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ জানানো হলো, তারা যেন প্রত্যেকেই নিজেদের দলবল সঙ্গে নিয়ে আসে। বৈরাগী নিজের তরফ থেকেও একটি কাজ করলে। অনেক দূর-দেশে তার গুরু থাকেন, সেখান থেকে আসবার জন্যে বিশেষ ক'রে তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে একখানি চিঠি লিখে পাঠালে। তিনিও আসতে সম্মত হলেন।

নির্দিষ্ট দিন থেকে মহা সমারোহে উৎসব শুরু হলো। বিস্তীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণের চেহারা তখন একেবারে বদলে গেছে। নাটমন্দিরের জায়গাতে যে চালাটা ছিল তা একেবারে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই স্থান সমেত আরো খানিক জায়গা নিয়ে সামনের সমস্ত জমিটাকে সমতল ক'রে বেঁধে সেখানে বাঁশের মস্ত আটচালা বেঁধে তার উপর পাল-দেওয়া শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। আটচালার প্রত্যেক খুঁটির মাথায় মাথায় লাল ও হলুদ রঙের ধ্বজাপতাকা উড়ছে। খুঁটিগুলি দেবদারু পাতা দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে দেওয়া হয়েছে, তার প্রত্যেক খাটালে খাটালে ফুলের মালা দুলছে। আটচালার মধ্যে ঢালাও শতরঞ্জি পাতা, তার মাঝখানে সাদা চাদর বিছানো। সংকীর্তনের দল ভোর থেকেই মহা বজায়ে খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তনের পালা শুরু ক'রে দিয়েছে। সকাল থেকেই খুব ভিড় জমে গেছে, দলে দলে লোক আসছে কীর্তনে যোগ দিতে। গ্রামের যত ছেলেপুলেরা কীর্তনের দলকে ঘিরে বসেছে, তারা সেখান থেকে সহজে একতিল নড়তে চায় না। মাঝে মাঝে মানত ক'রে বাতাসা এনে হরির-লুট দেওয়া হচ্ছে। সকলে তখন ছুটে গিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রে তা কুড়িয়ে খাচ্ছে।

দুপুর হতে-না-হতেই ভোগ-বিতরণ শুরু হয়ে গেল। যার যখন খুশি এক এক সারি বেঁধে পাতা পেতে বসে যাচ্ছে, পরিবেশনের দল সঙ্গে সঙ্গে তাদের গরম গরম খিচুড়িভোগ পরিবেশন করছে। সকলে পেট পুরে খেয়ে নিচ্ছে। ছোটো বড়ো আর ভদ্র-অভদ্রের বিশেষ কোনো সেখানে প্রভেদ নেই। তবে মেয়েদের জন্যে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের জন্যে খানিকটা জায়গা হোগলা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। মেয়েরা সেখানে আলাদা খেতে বসছে, মেয়েদের দলই তাদের পরিবেশন করছে। তটিনী সেখানকার কর্ত্রী। তারই নির্দেশে সব-কিছুর সুব্যবস্থা হয়েছে। কেউই অবহেলিত হচ্ছে না, কেউই অভুক্ত চলে যাচ্ছে না।

কীর্তনের সঙ্গে হৈ-হৈ হট্টগোল সারাদিনই চলল খানিক রাত্রি পর্যন্ত। তার পর লোকজনের ভিড় কমে গেলেও কীর্তনের দল বরাবর আসর জমিয়ে রাখলে। রাত্রে যারা সেখানে রয়ে গেল তারা আসরে বসে ঢুলতে লাগল। অনেকগুলি ডে-লাইট আর গ্যাসের আলো এনে চতুর্দিকে জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি সারারাত সমানে জ্বলতে থাকল।

দ্বিতীয় দিনে লোকজনের ভিড় আরো কিছু বেড়ে গেল। গ্রামের মাতব্বর লোকেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে মাতব্বরি করতে লাগল। এ যেন তাদেরই নিজেদের কাজ, তাদেরই হুকুমে সব-কিছু চলছে। বৈরাগীকেও তারা কর্তাগিরি ক'রে এটা-ওটা নির্দেশ দিতে লাগল। বৈরাগী হাসিমুখে সব-কিছু নির্দেশ পালন করতে থাকল। অনবরতই সে চরকির মতো ঘোরাঘুরি করছে, একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই।

দ্বিতীয় দিনে তার গুরু এসে উপস্থিত হলেন, একজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে।

মানুষটিকে এমনিতে বাইরের থেকে দেখলে তেমন কিছুই মনে হয় না। বেশভূষায় তাঁর কিছুই বিশেষ অসাধারণত্ব নেই। খালি পা, খালি গা, অতি সাধারণ আধময়লা গেরুয়া কাপড় চাদর প'রে এসেছেন। কিন্তু দেখবার মতো চোখ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, ইনি সাধারণ রকমের কেউ নন, বিশিষ্ট একজন। মাথার লম্বা লম্বা চুলগুলি আর দাড়ি-গোঁফ সমস্তই সাদা ধবধব করছে। নিশ্চয়ই অনেক বেশী বয়স হয়েছে, কিন্তু বয়সে বৃদ্ধ হলেও তাঁকে তেমন বুড়ো দেখাচ্ছে না। প্রশস্ত বুকের ছাতি,

গোলগাল চেহারা, গায়ের রং লাল আভায় টকটক্ করছে, চোখে মুখে একটা প্রশান্ত আনন্দময় ভাব। আর চোখের দেখি দৃষ্টি! তাতে সর্বক্ষণই যেন একটা তাজা রকমের দীপ্তি জ্বলছে। সে-চোখের দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না। কিছুক্ষণ ভালো ক'রে চাইলেই চোখ নামিয়ে নিতে হয়।

কিন্তু এমন নিরীক্ষণ ক'রে কে তাঁকে দেখবে, কে তাঁকে চিনবে! কে কোথা থেকে বাইরের লোক এসে হাজির হলো, সেই হৈ-হৈ হট্টগোলের মধ্যে কে তার খোঁজখবর রাখছে। বৈরাগীও দু'একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া কারো সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলে না। আলাদা একপাশে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বসিয়ে রাখলে। কিন্তু তটিনীকে তখনই খবর পাঠিয়ে দিলে যে তার গুরু এসেছেন।

তটিনী তখন তার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু গুরুর নাম শুনেই সমস্ত কাজ ফেলে তখনই ছুটে বেরিয়ে এলো।

গুরুকে সে অনেকরকম কথা জিজ্ঞাসা করবে ভাবতে-ভাবতে এসেছিল, কিন্তু গুরুর দিকে একবার চাইবামাত্র তখনই একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। মনে-মনে তৎক্ষণাৎ স্বীকার ক'রে নিলে, ইনি অনেক বড়ো, অনেক উঁচু জায়গার মানুষ। এমন কাউকে সে তার জীবনে কখনো দেখেনি।

ধীরে ধীরে সে তাঁর কাছে এগিয়ে গেল। বৈরাগী সংক্ষেপে গুরুকে তার কিছু পরিচয় দিয়ে দিলে। তিনি হাসিমুখে ওর দিকে চেয়ে রইলেন।

তটিনী তখন একটু মুখ নীচু ক'রে অতি বিনীতভাবে বললে—"আমি কি আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পারি?"

তিনি একমুখ হেসে বললেন—"কেন পারবেনা মা।"

তটিনী আভূমি নত হয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে, দু'হাত দিয়ে পায়ে হাত বুলিয়ে সেই হাত নিজে মাথায় স্পর্শ করলে।

তিনি খুশি হয়ে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে মাথায় হা বুলিয়ে দিয়ে বললেন—"বোসো মা, বোসো, একটু আমা কাছে বোসো। মা-লক্ষ্মী তুমি, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুমি তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন আমার কাছে কি তোমার জানতে ইচ্ছা আছে। মনের মধ্যে তা চে রাখবার দরকার নেই, কী জানতে চাও স্বচ্ছন্দে বলতে পারো।"

তটিনী হেসে বললে—"আপনি ঠিক ধরেছেন। আ জানতে চাই কেবল একটি কথা। এখনও অনেক কা আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, কিন্তু কী নিয়ে আমি থাকবো আমার উপায় কী হবে।"

গুরু খুব ধীরে ধীরে শান্তকণ্ঠে বললেন—"তুমি যা অংশ হয়ে এসেছ, তিনিই তোমার উপায় ঠিক ক'রে রেখেছেন। যে মায়ের একটি সন্তান থাকে, তাকে বলে একছেলের মা, যার চারটি সন্তান থাকে, তাকে বলে চার ছেলের মা। আর তুমি হলে সব-ছেলের মা। সে তোমার কাজ—সকলকে ভালোবাসা, জগৎপ্রেম আর জগৎ সেবা। সেই রাস্তা ধরেই চলতে শুরু ক'রে দিয়েছ। আ তোমার ভাবনার কি আছে।"

তটিনী আর কোনো প্রশ্ন করলে না। আবার প্রণা ক'রে সে উঠে পড়ল। মুখে চোখে তার আনন্দ ভ উঠেছে। তার অন্তরের মধ্যে কিসের যেন একটা ঢে ঠেলে উঠছে, সেখানে এক অপূর্ব স্নেহের উষ্ণ স্পর্শটি তা দিয়ে গেছে। তার প্রশ্নের সমুচিত জবাব হলো কিন তাই নিয়ে তার মনে আর কোনো তর্ক উঠল না। প্রশ্নে জবাব নয়, এইরকম অন্তরের সান্ত্বনাই যেন সে চেয়েছিল।

মনোমত অলঙ্কার ...
জুয়েলার্স
লক্ষ্মী ব্রাদার্স
২০৮/৮, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট মোড়
কলিকাতা ২৯ • ফোন-৪৬-৩৬২৬
১, হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ • কলিকাতা-২৯

একদিন মাত্রই গুরু ওখানে ছিলেন। যেদিন এলেন তার পরের দিনই চলে গেলেন। যাবার আগে একবার নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বৈরাগীর সঙ্গে তিনি কিছু কথাবার্তা করলেন।

তিনি বললেন—"তোমার কাজ দেখে আমি খুশি হয়েছি। এতগুলি মানুষকে তুমি একজোট করতে পেরেছ, যেমন ভাবেই হোক তাদের মনকে কতক সময়ের জন্যেও ভগবানের দিকে ফেরাতে পেরেছ, এখানকার মরা-মন্দিরকে বাঁচিয়ে তুলেছ, এতে তাঁরই কাজ করা হচ্ছে। এখানে তোমার কর্মযোগের পথেই চলা হচ্ছে। কিন্তু আমি যা বলেছিলাম সে-বিষয়ে তোমার স্মরণ আছে তো?"

"সব সময়েই তা স্মরণ আছে। আপনি আমাকে অজ্ঞাতবাসে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু এইসব ব্যাপার করায় কি আমার সেই গুরু-নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়েছে?"

"এসব তো বাইরের জিনিস। আমি বলেছিলাম তোমার ভিতরের সম্বন্ধে। অজ্ঞাতবাস মানে বাইরে যাই হয় হোক, নিজের ভিতর থেকে তাতে জড়িয়ে না পড়া, কোনো দিক দিয়ে কিছু শিকড় গজাতে না দেওয়া।"

"আপনি এখানে এসে সমস্তই দেখলেন, সেইজন্যেই আপনাকে এখানে কষ্ট দিয়ে আনিয়েছিলাম। সে দিক দিয়ে কিছু অন্যায় দেখলেন কি?"

গুরু একটু মৃদু হেসে বললেন—"তোমার ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তোমার নিজের অন্তরের কাছে। নির্দেশ তো দেওয়াই আছে, তার পরে তোমার অন্তর যেমন ভাবে চলতে বলবে তেমনি ভাবে তুমি চলবে। যদি কোনো কিছু অন্যায় কাজ করা হয়ে যায়, তখন তোমার নিজের অন্তরই তোমাকে অষ্টপ্রহর খোঁচা দিতে থাকবে, তখন তুমি আপনিই বাধ্য হয়ে সে-পথ ছেড়ে দেবে। তোমার সকল কাজের বেলাতে তোমার অন্তরই হলেন গুরু, আমি নয়। নিজের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত অন্তরই তোমায় পথ দেখাবে।"

বৈরাগী একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললে—"এখানে এসে আমি অনেকদিনই রয়ে গেছি। পোড়ো-মন্দিরে মায়ের মূর্তি অবহেলায় পড়ে আছে দেখে মায়া লাগল, আবার এখানে তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা হলো, সেই উপলক্ষ নিয়েই এখানে যা কিছু কাজ করেছি। বাধাবিঘ্ন এতে যথেষ্টই পেয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত অন্যায় কিছু করেছি বলে নিজের মনে হয়নি।"

গুরু বললেন—"তাহ'লে আমার কিছুই বলবার নেই। শুধু তোমাকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে যাই। কোনো-কিছুতেই যেন তোমার গতিরোধ না করে।"

গুরু বিদায় নিলেন। যাবার সময় তটিনী এসে প্রণাম ক'রে আবার তাঁর আশীর্বাদ নিলে।

বারো

উৎসব শেষ হয়ে যাবার পরে কিছুকাল কেটে গেছে। বসন্তের পরে গ্রীষ্মকাল এসেছে। ঋতুবদল হয়ে গিয়ে হঠাৎ তখন প্রচণ্ড গরম পড়েছে।

একদিন রাত্রে তটিনীর বাড়িতে এক আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হলো।

তার বাবা চাটুয্যেমশায়ের বোধকরি রক্তচাপ-বৃদ্ধির রোগ ছিল। তিনি মাঝে মাঝে দারুণ মাথার-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়তেন, আহারাদি বন্ধ ক'রে দুই-একদিন বিছানায় পড়ে থাকতেন। তার পর আপনিই আরোগ্য হয়ে উঠতেন।

কিন্তু সেদিন রাত্রে হঠাৎ তাঁর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠল। সন্ধ্যার পর থেকে তিনি কিছু না খেয়ে শুয়ে রইলেন, কিন্তু যত রাত্রি হতে লাগল ততই তাঁর যন্ত্রণা আরো বেড়ে যেতে থাকল। শেষে মধ্যরাত্রে মেয়েকে ডেকে বললেন—"আমি আর সহ্য করতে পারছি না, এখনই আমার মৃত্যু হবে।"

মেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় বুড়োমানুষ ছটফট করছেন, এখনই তার কিছু বিহিত করা দরকার। কিন্তু এত রাত্রে কাকেই বা ডাকাডাকি করা যায়, কেই বা এসে তাঁর কষ্টের উপশম করতে পারে।

তটিনীর তখন মনে পড়ল বৈরাগীর কথা। তিনি অনেক কিছু তুকতাক বিদ্যা জানেন। এই সেদিন খোঁড়া ছেলেটার ভাঙা পা তিনি জোড়া দিয়ে দিলেন। তাঁকে ডেকে আনাই এখন সবচেয়ে ভালো কাজ হবে।

তটিনী একটা লণ্ঠন জেলে নিয়ে ছুটে চলল গ্রামপ্রান্তের সেই মন্দিরে। যদিও সেখানে গাছপালার অন্ধকারে নির্জন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি রহস্যময় ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তবু তটিনীর মনে তখন কোনো ভয়ডর নেই।

বৈরাগীর কুটিরের দরজায় গিয়ে সে জোরে জোরে ধাক্কা মারতে শুরু করলে—"উঠুন, উঠুন, শীঘ্র দরজা খুলুন।"

বৈরাগীর সজাগ ঘুম, সে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে

বললে—"কী ব্যাপার? হঠাৎ এত রাত্রে? কী হয়েছে?"

তটিনী বললে—"ভারি বিপদ। বাবা দারুণ মাথার-যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, বলছেন এখনই মারা যাবেন। আপনি শীঘ্র চলুন!"

"আমি গিয়ে কী করব? একজন ডাক্তারকে ডাকা দরকার।"

"ডাক্তার থাকে এখান থেকে অনেক দূরে। এত রাত্রে কে তাকে ডাকতে যাবে? আপনি আগে চলুন, যা করবার হয় করুন।"

"আচ্ছা, চলো।"

বৈরাগী ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। চাটুয্যেমশায় তখন যেন ধুঁকছেন। মুখটা ফুলে থম্‌থম্ করছে, চোখ-দুটো জবাফুলের মতো লাল হয়ে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, গালের কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। তিনি ভালো ক'রে কথাই বলতে পারছেন না, জড়িয়ে জড়িয়ে কেবল বলছেন, 'আমি আর বাঁচব না'।

বৈরাগী ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। মাথার মধ্যে রক্তের চাপ খুব বেড়ে গেছে, যাকে কথায় বলে 'মাথায় রক্ত চড়ে যাওয়া'। এর নিবৃত্তির উপায় হলো এখনই খানিকটা রক্তমোক্ষণ ক'রে দেওয়া। এ-বিদ্যা তার কিছু কিছু জানা ছিল।

সে দেখেশুনে বললে—"এর উপায় ডাক্তারেই করতে পারে। আমি যদি কিছু করতে যাই, সেটা নিতান্ত বুজরুকি করা হবে।"

তটিনী বললে—"তা হোক। আপনার এখন যা খুশি হয় তাই করুন। বাঁচান ওঁকে!"

"শিরা কেটে খানিক রক্ত বের ক'রে দিতে চাই। তুমি তাতে ভয় পাবেনা তো?"

"না না, আমি জানি, আপনি যা করবেন তা ভালোই করবেন।"

"তবে একটা ছুরি আর খানিকটা চুন নিয়ে এসো।"

"ছুরি নেই, তবে কাঁচি আছে। তাতে হবে কি?"

"তাই নিয়ে এসো।"

চাটুয্যেমশায়ের শীর্ণ হাতের কালো কালো রক্তশিরাগুলি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। হাতের উপরদিকে কাপড় জড়িয়ে ক'রে বাঁধন দেওয়াতে সেগুলো আরো ফুলে ফুলে উঠল। তখন তার ভিতর থেকে একটি শিরা চামড়া সমেত উঁচু ক'রে ধরে সেখানে চুন মাখিয়ে সেটি কাঁচির দ্বারা বৈরাগী ছেদন ক'রে দিলে। ক্ষতস্থান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকল। পাছে ভিতরের রক্ত জমাট বেঁধে যায় তাই মাঝে মাঝে ক্ষতের মুখে একটু চুন লাগিয়ে দেওয়া হতে লাগল।

রক্তটা একটা পাত্রের মধ্যে ধরা হচ্ছিল। খানিক পরিমাণে রক্ত বেরিয়ে যাবার পরেই দেখা গেল মুখের থমথমে ভাব কমে গেল, চোখের লাল কমে গেল, রোগী বেশ আরাম বোধ করতে লাগল।

অনেকটা রক্ত বেরিয়ে গিয়ে যখন দেখা গেল চাটুয্যেমশাই সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন, তখন হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে ক্ষতস্থানে কাপড়-পোড়ানো ছাই টিপে দিয়ে জোর ক'রে সেটা বেঁধে ফেলা হলো।

চাটুয্যেমশায়ের তখন বেশ ঘুম পাচ্ছে। এক বাটি দুধ খেয়ে নিয়েই তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

বৈরাগী তখন বললে—"উনি বেশ সুস্থ হয়েছেন। আমি এখন যাই?"

তটিনী বললে—"ক্ষেপেছেন নাকি? এত রাত্রে এই অন্ধকারে আপনার সেখানে ফিরে যাবার কী দরকার আছে? কেন, আজ রাত্তিরটা এখানেই বা রইলেন। এখানে থাকতে আপনার কোনো ভয় নেই, বরং রাস্তায় হেঁটে যেতে সাপখোপের ভয় আছে।"

"তা নয়, তবে কারো বাড়িতে রাত্রিবাস করা—"

"থাক থাক, আপনার ওসব নিষ্ঠার নিয়মগুলো আমার জানা আছে। কিন্তু কারো প্রাণ বাঁচাতে এসে তখনও অত নিয়ম মানতে গেলে কাজ চলে না। আজ আপনাকে এখানেই থাকতে হচ্ছে। যদি আবার হঠাৎ বাবার ঐরকম কষ্ট শুরু হয়?"

"বেশ, তাহ'লে আমি ওঁর কাছেই থাকি, তুমি তোমার ঘরে শুতে যাও।"

"সে ভালো কথা। এখানেই আপনার একটা বিছানা ক'রে দিই।"

তটিনী তার বাবার বিছানার পাশেই সামান্য রকম একটা বিছানা পেতে দিয়ে লণ্ঠনের আলো খুব কমিয়ে দিয়ে চলে গেল।

বৈরাগী কিন্তু শুলো না, সেখানেই জেগে বসে রইল।

ঘণ্টাখানেক পরে তটিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দ্যাখে বৈরাগী বিছানাতে শোয়নি, চুপচাপ জেগে বসে আছে।

স্থির নিশ্চল অবস্থায় সটান ঋজু হয়ে সে যেন চোখ বুজে বসে ধ্যান করছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সজাগ।

তটিনী কাছে এসে মৃদুস্বরে বললে—"একি, আপনি শুলেন না ?"

বৈরাগী চোখ খুলে তার দিকে চাইলে, তার পর একটু হেসে বললে—"না, আজ আমার নিশিপালন। কিন্তু তুমি উঠে এলে কেন ?"

"এই দেখবারই জন্যে যে, বাবা আর আপনি ঘুমোচ্ছেন কিনা।"

"উনি তখন থেকেই বেশ ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু তুমি এবার শুতে যাও।"

"বেশ কথা ! আপনি জেগে থাকবেন, আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবো ?"

"তবে কী করবে ?"

"দুজনেই যখন জেগে রইলাম, তখন বসে বসে গল্প করা যাক। এখানে নয়, বাইরের ঘরে গিয়ে বসি চলুন। নইলে গলার আওয়াজ পেয়ে বাবার ঘুম ভেঙে যাবে।"

ওরা দুজনে বাইরের ঘরে পৈঠার কাছে গিয়ে বসল।

তটিনী বললে—"আজ আপনি যে আমাদের কতখানি উপকার করলেন ! আপনি সঙ্গে সঙ্গে এসে না পড়লে বাবা আজ মারাই যেতেন।"

"এই বুঝি তোমার গল্প করা !"

"তা নয়, তবে আপনি ওঁর প্রাণটা বাঁচিয়ে দিলেন, তার জন্যে একটু কৃতজ্ঞও হবোনা ? আচ্ছা, যাক সে-কথা। এসব বিদ্যে আপনি কোথায় শিখলেন ?"

"একটু আধটু শিখে রাখতে হয় বৈকি। কত দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াই, কত কিছুই দেখতে পাই, পাঁচরকম দেখতে দেখতে কিছু শেখা হয়ে যায়।"

"সেইসব গল্পই একটু বলুন না। জীবনে কোথায় কোথায় গেছেন, কী কী করেছেন।"

"সেসব হলো অতীতের কথা। বলতে নেই। যারা আগের দিকে এগিয়ে যেতে চায় তারা কখনো পিছনের দিকে ফিরে তাকায় না। আমি সেইরকম ব্রতই নিয়েছি, আগের দিকে এগিয়ে চলার ব্রত; তাই অতীতের কোনো কথা ভাবিও না, আর সে সম্বন্ধে কিছু বলতেও চাই না। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, মন থেকে তা মুছে যাক।"

"তবে আপনার মনে এখন যে-কথা জাগছে সেই কথাই বলুন। আপনার মনের একটুখানি ভাগ দিতেই না-হয় দিলেন আমাকে। একলা-মনে কেমন ক'রে দিন কাটান ? মনকে কোন্ জিনিস দিয়ে খুশি রাখেন ?"

"সবচেয়ে যা সেরা জিনিস তাই দিয়ে।"

"আমরা সাধারণ মানুষে বলি যে, সবচেয়ে সেরা জিনিস হলো হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা। আপনার মধ্যে কিন্তু সে-জিনিসটাই নেই। আপনার সবই কেমন ছাড়া-ছাড়া।"

বৈরাগী হেসে উঠল। বললে—"এ তুমি ঠিক বলেছ। পুরোপুরি নেই বটে, কিন্তু একটু-আধটু তো আছে, তাকেই আরো বাড়াতে চেষ্টা করছি। একটু কিছু না থাকলে কিসের জোরে এতসব কাজ করছি ? ভালোবাসার প্রকাশ হয় সেবার কাজের ভিতর দিয়ে, আমি সেই উপায়েই জিনিসটাকে বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছি।"

"কিন্তু আমার মনে হয় কাউকেই আপনি ভালোবাসেন না। অর্থাৎ পারেন না।"

"ঐ জিনিসটা পুরোপুরি আসেনি বলেই তাই তোমার অমন মনে হয়। যাকে ভালোবাসি তাকে এখনও খুঁজে পাইনি। ভালোবাসা যখন পুরোপুরি হয়ে ছাপিয়ে উঠবে, তখন দেখবে যে তাকেও আমি খুঁজে পেয়েছি, আর সকল মানুষকেই তখন ভালোবাসতে পারছি। তখন প্রত্যেকেই মনে করবে যে আমি তাকে ভালোবাসি, কারণ তখন আমার কাছে সবাই হবে সেই একজন।"

"আপনি আবার আপনার সেই ভগবানের কথা বলছেন, কিন্তু আমি তার কথা বলিনি। আমি বলছি মানুষের ভালোবাসার কথা। মানুষ ভালোবাসবে মানুষকে, যাকে ধরা-ছোঁয়া যায়, কাছে পাওয়া যায়। এই যেমন ধরুন আপনি। আপনাকে আমি ধরতে ছুঁতে পারি, এখনই নিজের গায়ে আপনার হাতের স্পর্শ পেতে পারি।"

কথা বলতে বলতে কথার উত্তেজনার মুখে তটিনী অকস্মাৎ এক কাণ্ড ক'রে বসল। দু'হাত দিয়ে বৈরাগীর একখানা হাত টেনে নিয়ে সে নিজের বুকের উপর চেপে ধরল। তখনই কিন্তু বুঝতে পেরে অপ্রস্তুত হয়ে হাতখানা সে ছেড়ে দিলে।

বৈরাগী কোনো কথা বললে না। ধীরে ধীরে নিজের হাতখানি সরিয়ে নিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তটিনী অনেকটা কাঁচুমাচু হয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে—"খুব অন্যায় কাজ করলাম তো ?"

বৈরাগী শান্তস্বরে বললে—"না, তা নয়।"

"আপনার ব্রতকে নষ্ট ক'রে দেওয়া হলো বৈকি ! নারীর দেহের স্পর্শ—"

"না, তাও নয়। এ স্পর্শে আমার মনের কোনো সায় ছিল না।"

এ-কথা শুনেই তটিনী আবার যেন ক্ষেপে উঠল। তিক্তকণ্ঠে সে বললে—"কেন ছিলনা? আপনি কি অসাড়, কোনো ছোঁয়াতেই আপনার মনে কিছু দাগ লাগেনা?"

বৈরাগী তেমনি শান্তস্বরে বললে—"হয়তো লাগে। প্রাণ থাকলেই তার মধ্যে কিছু একটা সাড়া জাগে, কিন্তু তাতে অন্তরের মধ্যে কোনো ঢেউ না-উঠতেও পারে। দেখ, মিষ্টি লাগার মধ্যেও অনেক তফাত আছে। গাছের ফলও মিষ্টি, আর গুড় কিংবা মধুও মিষ্টি। কিন্তু মধুর আস্বাদ জিভে নিয়ে যদি তার পরে কোনো একটা ফল খাওয়া যায়, তখন তা আর তেমন মিষ্টি লাগবে কি? তখন মধু ছাড়া আর কোনো-কিছুকেই জিভের কাছে তেমন মিষ্টি বলে মনে হবে না।"

"কোথায় আপনি অমন মিষ্টি মধুর সন্ধান পেলেন? আমাদের ভালোবাসার চেয়ে বেশী মিষ্টি জগতে আর কোনো কিছুই নেই, তা জানেন না?"

"আছে বৈকি। সে-কথা তোমায় কেমন ক'রে বোঝাই বলো। তুমি চিরকাল নিজেদের জগতের এই গণ্ডীটুকুর মধ্যেই জীবন কাটালে, পাতকুয়ো আর পুকুর ছাড়া আরো অনেক বেশী জল যে কোথাও থাকতে পারে, তার খবরই তোমার জানা নেই। তোমাকে সমুদ্রের কথা কেমন ক'রে বোঝাই বলো। কুয়ো-পুকুরের তলা আছে, দড়ি ফেলে তা মাপা যায়। কিন্তু সমুদ্রের কোনো তলা মেলে না, তাই তাকে বলে অতলস্পর্শ। সাধারণ মানুষের মাপসই ভালোবাসাটুকুর কথাই তুমি জানো, তার বেশী আর কিছু জানো না। কিন্তু এর সমুদ্রও আছে। তোমাদের এ-জিনিসকে বলে মানবপ্রেম, আর তাকে বলে দিব্যপ্রেম। সে যে ওর চেয়ে কত বেশী গভীর হয় তার ধারণা করা যায় না। সে জিনিস আমি নিজের চোখে দেখেছি। সাধুসজ্জনদের কথা ছেড়েই দিলাম, একজন সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখেছি। তার কোনো তল পাওয়া যায় না, কার চেয়ে কারটা বেশী তার তুলনা করাও যায় না। একদিন একটা নদী পার হতে গেলাম, আমার কাছে পারানির পয়সা ছিল না। একজন বুড়ো মাঝি ঘাটে বসে ছিল, তাকে বললাম, তুমি আমায় পার ক'রে দেবে? কিন্তু আমার কাছে পয়সা নেই। সে আমার মুখের দিকে একবার চাইলে, তার পর ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, তোমায় আমি চিনেছি, তুমি আমা গোপালকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তুমিই যে আমার গোপাল তোমায় এই নদীটুকু পার ক'রে দেবনা? তার চোখ দি ঝরঝর ক'রে জল ঝরে পড়ল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম গোপালকে তুমি চেনো? সে বললে, তাকে আর চিনবনা; সকলের ভিতর থেকেই সে উঁকি মারছে। ঘুরে-ফিরে কেবলই আমাকে দেখা দিচ্ছে, এই যেমন তুমি এসে দেখ দিয়ে বললে পয়সা নেই। অমনি তোমার মধ্যে তাকে দেখতে পেলাম। এইরকমই হলো দিব্যপ্রেম, আস ভালোবাসা। এর স্বাদ পেলে তখন কি আর তোমাদে এই মাপসই ভালোবাসার মিষ্টি জিভে লাগে। আ আমার কথা বলছি না, তারই মিষ্টতার কথা বলছি।"

"তাই বলে আমাদের ভালোবাসা কি একেবারে মিথ জিনিস?"

"তা আমি বলছি না। তবে এ হলো অগভীর অস্থায়ী জিনিস। বর্ষাকালে এতে জল থাকে, গ্রীষ্মকালে একে শুকিয়ে যায়।"

"কেমন ক'রে জানলেন? কোথাও তাই দেখেছে বুঝি, ঠকেছেন বুঝি?"

"নিজে না ঠকলেও, চোখ তো রয়েছে, চারিদিকেই তা দেখতে পাই। আর এসব অভিজ্ঞতা আপনা থেকে জন্মায়। কত বার কত জন্ম ঘুরে কত রকমের অভিজ্ঞ

Stylo
The house of quality & fashionable Readymade Dresses
Renowned
TAILORS & OUTFITTERS
GARIAHAT JN.
BALLYGUNGE
CALCUTTA-27

অজান্তে জমে উঠেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আপনা থেকেই অনেক জানা হয়ে থাকে।"

"সে আপনি যাই বলুন, কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে কিছুই আপনি জানেন না। মেয়েদের হৃদয় যে কতখানি গভীর হতে পারে তা কেমন ক'রে জানবেন।"

"তাও কিছু কিছু দেখেছি বৈকি, আজও দেখলাম।"

"বলুন বলুন, যা খুশি আপনি বলুন, আমি ওতে লজ্জা পাই না। আমি খুবই বেহায়া মেয়ে। কিন্তু একটা কথা বলি, হঠাৎ ক'রে কেবল একটা বাইরের কাজ দেখেই ভিতরের জিনিসের আন্দাজ করতে যাবেন না, তাতে আপনার ভুল হবে। যাকগে, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মনের মধ্যে সত্যিকার ভালোবাসা জন্মালে তাও কি দোষের?"

"নিশ্চয়ই না। সত্যিকার কোনো ভালোবাসাই দোষের নয়, যদি তার সঙ্গে অন্য কিছু না মেশে। আসল ভালোবাসা মানে কোনো কিছু পাওয়া নয়, নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে জিনিসটাকে দখল করা নয়, ওর মানে নিজেকেই বিলিয়ে দেওয়া। ভালোবাসা কোনো কিছু চাইবে কেন? নিজেকে সে কেবল দিতেই থাকবে, দিতে-দিতে সে একেবারে ফতুর হয়ে যাবে, কিছুমাত্র পাবার কথা কখনো মনেও ভাববে না।"

"এ আপনি অনেক বড়ো কথা বলছেন, আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন, তাই। কিন্তু আমি রয়েছি ওর চেয়ে অনেক নীচে—"

"না না, ও কথা বোলো না। অনেক বিষয়ে আমি তোমার চেয়ে নীচে আছি। নিজেকে অত ছোটো করছ কেন?"

"এ আপনি নিতান্ত বাড়িয়ে বলছেন।"

"একটুও না। তোমার মনটি সাদা ঝকঝক করছে। অমন অকপট সরল মন আজকালকার দিনে খুব কম দেখা যায়। এ কথা মিথ্যা নয়।"

"তা যদি হয়, তাহ'লে এ-মনের নিবেদনকে আপনি ঘৃণা করেন কেন? আমার আত্মনিবেদন আপনি ফিরিয়ে দেন কেন? আমাদের দুজনের মধ্যে যদি অমনিই একটা হৃদয়ের সম্পর্ক দাঁড়ায়, তাতে কার কী ক্ষতি হবে? আর আপনার ভগবানই বা তাতে নারাজ হবেন কেন? ভালোবেসে আমরা তো কোনো অন্যায় কাজ করছি না।"

"শুধু ভালোবাসাতে কোনো অন্যায় হয় না, কিন্তু তার সঙ্গে নীচু মনের জিনিস কিছু মিশে থাকলে তার থেকে অন্যায় কাজ হয়ে যেতেও পারে। আমি সেটাকেই ভয় করি, নইলে তোমাকে আমি ঘৃণা করি না। কিন্তু ঐ নীচু মনের জিনিস তোমার মধ্যে থাকবে না। তুমি ওর চেয়ে অনেক উপরে উঠে যাবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। শুধু আমি কেন, তুমিও তাই বিশ্বাস করো।"

"আপনি যদিও আমাকে পছন্দ করেন তা জানি, তবুও আমাকে এমনি করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তবুও?"

"ফিরিয়ে আমি দিইনি, শুধু অপেক্ষা করছি। স্বয়ং ভগবানও আমার সম্বন্ধে তাই করছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উপযুক্ত হয়ে না উঠি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তফাত থেকে অপেক্ষা করছেন। এই বিশ্বাসকে ধরেই এ-রাস্তায় চলতে হয়।"

"মনের মধ্যে শুধু একটা বিশ্বাস নিয়ে আমার কী লাভ হবে?"

"বিশ্বাসেই তো পরম লাভ। বিশ্বাস মানেই তার পিছনে রইল একটা আশা। এ ছাড়া কি জীবনে এক পা-ও চলা যায়! সকলেই কিছু একটা বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে। আজকে যেমন হচ্ছে, কালকের অবস্থা এর চেয়েও ভালো হবে, আজ যেখানে এসে পৌঁছেছি, কাল তার চেয়ে আরো খানিক এগিয়ে যাবো, এই বিশ্বাস নিয়েই মানুষ দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, নইলে কি কেউ একটা দিনও অমন জোরের সঙ্গে কাটাতে পারতো? বিশ্বাসই আমাদের জীবনের যথাযথের সম্বল। ছোটো থেকে বড়ো হবো, মন্দ থেকে ভালো হবো, এই আশার সলতের মুখেই আমাদের দৈনিক জীবনের প্রদীপ জ্বলছে। কেবল আমি তোমাকে এই কথাটি বলছি যে, তুমি ছোটো আশা থেকে বড়ো আশাকে ধরো। ছোটো বিশ্বাস থেকে বড়ো বিশ্বাসকে ধরো।"

"বেশ, তাহ'লে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

"সাহায্যই তো করছি। সেইজন্যেই তোমাকে আমা কাজের মধ্যে টেনে নিয়েছি। ওর ভিতর দিয়েই তুমি বড়ো হয়ে উঠবে, এমনকি হয়তো আমার চেয়েও বেড়ে যেতে পারো।"

"কী যে আপনি যা-তা বলেন!"

কথা বলতে বলতে রাত্রি ভোর হয়ে এলো। সামনে গাছের ঝোপ থেকে একটা কী নাম-না-জানা পাখি মি সুরে ডাকতে শুরু ক'রে দিলে। অতি শ্রুতিমধুর সুরের তার স্বর। একবার শুনে আরো তাই শুনতে ইচ্ছে হয়।

মৈরাণী তাই শুনে বললে—"ঐ শোনো পাখিটার ক মিষ্টি ডাক। ও ডাকছে ওর প্রিয়জনকে। কিন্তু আমরা

তাই কানে শুনে মোহিত হয়ে উঠছি। ভালোবাসার ডাক এমনিই মিষ্টি, যাকে ডাকছে সেও মোহিত হচ্ছে, আর অন্য যে কেউ তা কানে শুনছে সেও মোহিত হচ্ছে।"

আরো একটু ফরসা হতেই চাটুয্যেমশায়ের ঘুম ভাঙল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন—"রাত্রে খুব ঘুমিয়েছি। আপনারা বুঝি সারা রাত জেগে কাটালেন?"

বৈরাগী বললে—"কতকটা তাই বটে। আপনার জন্যে কিছু উদ্বেগ ছিল।"

"এখন আর কোনো কষ্ট নেই, আমি বেশ সেরে উঠেছি। আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু আবার এমন হবে না তো?"

"যদি বেশ সাবধানে থাকেন তাহ'লে আর হবে কেন।"

"কেমন ক'রে সাবধান হতে হবে আমাকে বলে দিন, আপনি যা যা বলবেন সব করবো।"

"বিশেষ কিছুই নয়, আপনি খাওয়া কমিয়ে দিন। সারা-দিনের মধ্যে একাহার করবেন। একবারের বেশী আপনার দু'বার খাওয়ার কোনো দরকার নেই। অন্য সময় নিতান্ত খিদে পেলে তখন খানিকটা দুধ খেয়ে নেবেন। আর প্রত্যেক অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে উপবাস দেবেন, সেদিন কেবল দুধ আর কিছু ফল ছাড়া অন্য কিছু খাবেন না। ক্রমে ক্রমে তাও কমিয়ে আনবেন। আর নুন বেশী খাবেন না। এ যদি আপনি করতে পারেন, তাহ'লে সুস্থ হয়েই থাকতে পারবেন।"

তটিনী বললে—"বাবার খাবার লোভটা কিছু বেশী।"

বৈরাগী বললে—"ঐটি আপনাকে ত্যাগ করতে হবে।"

"আর আফিম খাওয়া?"

"ও আর কেমন ক'রে ছাড়তে বলি, আর বললেই বা তা পারবেন কেন। তবে মাত্রাটা আর বাড়াবেন না, বরং ক্রমে ক্রমে কমাতেই চেষ্টা করবেন।"

তেরো

চিরদিনই একভাবে চলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকা বোধকরি বৈরাগীর ধাতে নেই। তা যদি হতো, কোনো কিছু গণ্ডগোল বাধতো না। কিন্তু ওর কাজের পরিধি ক্রমশ আরো বাড়াতে ইচ্ছা হলো। আর তটিনীও সে-ইচ্ছায় ইন্ধন যোগালো।

বৈরাগী বললে, এখানকার ভদ্রলোকের ছেলেরাই কেবল লেখাপড়া শেখে। ছেলেবেলা থেকে তাদেরই বাড়িতে পড়ানো হয়, স্কুলে পাঠানো হয়। কিন্তু গরিব আর চাষা-ভুষোর ছেলেদের জন্যে কোনো স্কুলও নেই, আর লেখাপড়া যাতে কিছুও তারা শিখতে পারে তার কোনো ব্যবস্থাও নেই। ভদ্রলোকের ছেলেদের সঙ্গে তাদের মিশতেও দেওয়া হয় না, যাতে তারা ওদের কাছ থেকেও কিছু শিখতে পারে। সুতরাং এদের বাপ-পিতামহও যেমন নিরক্ষর, এরাও তেমনি নিরক্ষর থেকে যায়। মাইনে দিয়ে ছেলেদের পড়াবার মতো পয়সাও তাদের নেই।

অথচ এদের মধ্যেও সব-কিছুরই রীতিমতো সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার অভাবে তা মুকুলেই নষ্ট হয়ে যায়, ফুটতে পায় না। এমনকি সমুচিত শিক্ষা পেলে তার থেকে এরা এমন কিছু মৌলিক তথ্যেরও আবিষ্কার করতে পারে, যা ভদ্র শিক্ষিতেরা আজ পর্যন্ত পারেনি। এদের মধ্যেও রীতিমতো মৌলিকত্ব আছে। বৈরাগী নিজে অন্ততপক্ষে এইটুকু দেখেছে যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ের অনেক কথা এরা সহজেই বুঝে নিতে পারে, এমনকি নিজেরাই সেইসব কথা অবলীলাক্রমে বলে যায়, তত্ত্ব হিসেবে নয়, কিন্তু সরল বিশ্বাসের সঙ্গে। যেমন, অজ্ঞানতা থেকে বন্ধন-মুক্তির জন্যে আত্মার পুনর্জন্ম হয়, এ যেন তাদের জানা কথা। তারা পার্থিব বিষয়েও শিক্ষা পেলে তার থেকে অনেক উন্নতি করতে পারে। এই চাষের ব্যাপারেই সে দেখেছে, এখানে কেমন ক'রে এত ভালো চাষ হচ্ছে তা দেখে নিয়ে ওরা ইদানিং নিজেদের ফসলেরও অনেক উন্নতি করেছে। ওদের ধানের জমিতেও আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী ধান উৎপন্ন হচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ পেলে ওরা তা নিতে জানে। লেখাপড়া শেখার সুযোগ যদি ওরা পায় তাহ'লে তার থেকে ওদের খুবই উন্নতি হবে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কী।

তটিনীর দিকের কথাটি কিন্তু অন্যরকম। গুরু এসে তার মনের মধ্যে যে একটা বৃহত্ত্বের ভাব ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন, ও তাকেই ভালো ক'রে আঁকড়াতে চেষ্টা করছে। একবে ধরতে পারার সুবিধা হলোনা দেখে, বহুকে ধরার কথাটা ওর মনে লেগেছে। লতা যখন একটা খুঁটিকে ধরে বেশ লতিয়ে উঠছে তখন যদি তাকে মাঝখান থেকে মুড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে কিছুকাল পরে দেখা যায় সে ঐদিকে আর না উঠে, তার আশেপাশে বহু শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিচ্ছে। তটিনীর মনের এখন কতকটা সেই ভাব। সে খুব আগ্রহ করেই বললে, আপনি এই নাটমন্দিরের চাতা নীচেই একটা স্কুল খুলে দিন, অন্য কোনো মাস্টার রাখবে

হবে না, আমি নিজেই তাদের পড়াবো। ছেলেমেয়ের দল সবাই একসঙ্গে লেখাপড়া শিখবে। বাংলাতে অনেক-দূর পর্যন্ত আমি তাদের পড়াতে পারবো। ইংরেজী আমি জানি না, কিন্তু আঁক-কষা ভালোরকমই জানি, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ অনায়াসে শেখাতে পারবো।

তটিনীর কাছে উৎসাহ আর সহযোগিতা পেয়ে বৈরাগী তখন এ-বিষয় নিয়ে উঠেপড়ে লেগে গেল। এই গ্রামে এবং আশপাশের গ্রামগুলিতেও সে প্রত্যেক শ্রমিক ও চাষীদের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে বললে, তোমাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে মন্দিরের চাতালে একটা স্কুল খোলা হচ্ছে। তোমাদের সমস্ত ছেলেমেয়েদের সেখানে পাঠিয়ে দাও, স্কুলে তাদের ভর্তি ক'রে নেওয়া হবে, এর জন্যে একপয়সাও দিতে হবে না। এমনিই তারা পড়বে।

নিরক্ষর শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করলে, ওদের আপনি কী কী শেখাবেন। শুধুই কি অক্ষর-পরিচয়, না, আর কিছু।

এ-বিষয়েও পরামর্শ করা হয়েছিল।

তটিনী বলেছিল, বই পড়তে আর হিসাব কষতে শেখানো ছাড়াও ছেলেমেয়েদের রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলে শোনানো হবে, চাষের কাজও কিছু কিছু শেখানো হবে, আর মেয়েদের রান্না করা ও আল্পনা দেওয়া প্রভৃতি কিছু কিছু কারুকার্যও শেখানো হবে।

কথাটা শুনে সবাই খুশি হলো।

সকলেরই বৈরাগীর উপর একটা আস্থা জন্মেছিল। ঐ চব্বিশপহরার বিরাট উৎসব অমন নিপুণভাবে সম্পন্ন হবার পরে সকলের সে-আস্থা ইদানিং আরো বেড়ে গিয়েছিল। গ্রামের চাষাভুষো, কলু, কামার, জেলে, বাগ্‌দী প্রভৃতি সকলেই বৈরাগীর এ নতুন প্রস্তাবে বেশ আমোদ বোধ করলে। বললে, উনি ঠিক ধরেছেন, ভদ্রলোকের ছেলেরাই সব-কিছু শিখবে, আর আমাদের ঘরে যারা জন্মেছে তারা কিছুই শিখতে পাবে না, এই বা কেমন কথা।. উনি যখন যেচে শেখাতে চাইছেন, আর আমাদের তাতে কিছু খরচ লাগছে না, তখন এতে দোষের কী আছে। আমরা চলে যাই কাজে, আর ছেলেমেয়েগুলো ছাড়া পেয়ে সারাদিন রোদে রোদে ঘোরে আর হুটোপাটি মারামারি করে, তার চেয়ে স্কুলে গিয়ে যদি কিছু শিখে আসে, সে অনেক ভালো কথা। নাকি, বলো হে মোড়ল? গ্রামের মোড়লও পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে এ-যুক্তিতে সায় দিলে।

কিন্তু বলবার সময় কথার তোড়ে মুখে যতটা বলা যায়, কাজের সময় প্রায়ই ততটা হয় না। প্রথমে তাগিদ দিয়ে দিয়ে গুটিকয়েক মাত্রই ছেলেমেয়ে এসে জুটল। আগের থেকে যারা এসে বাগানের পরিচর্যা করতো আর প্রত্যহ প্রসাদ পেতো, তারা অবশ্য ঐ স্কুলে পড়তে এলোই, কিন্তু নতুন ছেলেমেয়ে এলো খুব কম। তা হোক, একখানি ক'রে বর্ণপরিচয় আর সেলেট হাতে নিয়ে তারা প্রত্যহ নিয়মিত আসতে লাগল। তটিনী তাদের নিয়েই কাজ শুরু ক'রে দিলে।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, তাদের খুব দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। দুই-তিন মাসের মধ্যেই তারা অক্ষর-পরিচয় আর দাগা বুলোনো শেষ ক'রে নিজেরাই সেলেটে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরগুলো নির্ভুলভাবে লিখতে সক্ষম হলো। তা ছাড়া রামায়ণের গল্পগুলিও শুনে শুনে তাদের মুখস্থ হয়ে গেল। নিজেদের বাড়িতে ফিরে গিয়ে তারা বাপ-মা ও আত্মীয়দের কাছে সেইসব গল্প শোনাতে লাগল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এতটা উন্নতি দেখে সকলেই বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল।

ক্রমে এই দেখে সম্পন্ন বা আংশিক-সম্পন্ন লোকেরাও তাদের ছেলেমেয়েদের একে একে পাঠাতে শুরু করলে। এমনকি গরিব ভদ্রসমাজের লোকেরাও ক্রমে ক্রমে তাই শুরু করলে। পয়সা যখন লাগছে না, তখন ইতর-ভদ্রের এত বাছবিচারের কোনো দরকার নেই। হাতে-খড়ি থেকে প্রথম দিকের খানিকটা জিনিস শেখা হয়ে যাক, তারপরে না হয় তখন ওখান থেকে ছাড়িয়ে এনে মাইনে দিয়ে বড়ে স্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়া যাবে। আর তা ছাড়া এখানে শেখাচ্ছে সে তো ইতরশ্রেণীর নয়, সে হলো গ্রামেরই ভ ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে। তটিনী যখন সেখানে রয়েছে, নিজে এতটা যত্ন নিয়ে শেখাচ্ছে, তখন দোষই বা কি আমাদের ছেলেমেয়ে ওখানে পাঠিয়ে।

মন্দিরসংলগ্ন অবৈতনিক স্কুলটি ক্রমশ বেশ জাঁকিে উঠল। তটিনী বাড়িতে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পা সেরে নিয়মিত সময়ে স্কুলে চলে আসে, যদিও বৈরাগী তখ থাকে না। সে একাই তখন সব-কিছু করে। রীতিমতে নাম ডাকা হয়, তারপর পড়ানোর কাজ শুরু হয়। পড়ানো লেখানো এবং আঁক কষানো। নাটমন্দিরের চাতালে নীে বড়ো বড়ো চাটাই পাতা হয়েছে, সবাই তারই উপর বসে তটিনী বসে বেদীর মতো উঁচু একটা টিবির উপর। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে তার কাছে ডেকে এনে ব্যক্তিগ ভাবে তাদের পড়া ও লেখার তদারক করে। তার প

শুরু হয় গল্পবলার পালা। শেষকালে বৈরাগী এসে হয়তো কিছু পড়ায়, নতুবা কিছু মাঠের কাজ শেখায়। চারটে বাজবার আগেই স্কুলের ছুটি দেওয়া হয়। ছুটির আগে সকলে উঠে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে গায়—

জয় মা বিশালা
দাও ফুলমালা—

সাধারণ লোকে বলাবলি করতে লাগল যে, এই স্কুলটাও এবার তাহ'লে দাঁড়িয়ে গেল। বৈরাগী যে খুব করিতকর্মা লোক সে-কথা মানতেই হবে, যা ধরে তা পুরো ক'রে ছাড়ে। বাহাদুর বলতে হবে।

কিন্তু সকলেই সন্তুষ্ট হয়নি। এতেও একটা দলের চোখ টাটালো। তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে ক্রমশ তা বেশ বেড়ে উঠল। তখন তারা একজোট হয়ে রীতিমতো ঘোঁট পাকাতে শুরু ক'রে দিলে।

চোদ্দ

পরশ্রীকাতরতা বাঙালীর এক বৈশিষ্ট্য, বিশেষত পল্লীবাসীদের মধ্যে। প্রতিবেশী একজনের কিছু উন্নতি বা প্রতিপত্তি দেখলে আর-একজন তা সহ্য করতে পারে না। পাড়ায় কাউকে বড়ো হতে দেখলে আশপাশের অপেক্ষাকৃত ছোটোরা তাকে ঈর্ষা করে। তার ছিদ্র খোঁজে, সামান্য ত্রুটিকে মস্ত বড়ো ক'রে তার সমালোচনা করে, সুযোগ পেলে তাকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না। আর বিশেষ কোনো প্রতিপত্তি দেখলে তাতে অনেকের গায়ের জ্বালা ধরে। তারা সেই মানুষটিকে আর তখন দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

এবার গায়ের জ্বালা ধরল গ্রামের যত নিকর্মা যুবকের।

এদের একটা নির্দিষ্ট আড্ডা ছিল। শীতকালে দিনে-দুপুরে আর গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় সেই আড্ডা বসতো। সেখানে গল্প-গুজব, তামাসা, রসিকতা, পরচর্চা, তাস পেটাপেটি, গানবাজনা প্রভৃতি সব-কিছুই চলতো। বৈরাগীকে নিয়ে ঘোঁট পাকানো এবার সেখানেই শুরু হলো।

এতকাল পর্যন্ত এরা ওর দিকে ততটা মনোযোগ দেয়নি। এরা তখন অন্যান্য প্রসঙ্গে মশগুল ছিল। ওটিনীর কথা নিয়ে যখন নানারকম গুজব রটে তখন এরা কেবল মজা দেখছিল, আড্ডায় বসে নিজেদের মধ্যে মুখরোচক আলাপ আলোচনা করেছিল, এই পর্যন্ত।

কিন্তু স্কুল খোলার পর থেকে এরা বিশেষ রকমে সচেতন হয়ে উঠল। স্কুলের সাফল্য দেখে এদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেল। দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত এ-ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কোথায়? ছুঁচ হয়ে ঢুকে শেষে ফাল হয়ে বেরোনো! এসেছিল কোথাকার একটা পাত-কুড়োনো ভিখিরী, মাথা গোঁজার জায়গা না পেয়ে ঢুকলো এসে জঙ্গলের পোড়ো মন্দিরে। তারপর দিব্যি বাগিয়ে বসে সকলের মাথায় হাত বুলিয়ে বাগান করলে, ঘর করলে, লোকের চোখে ফাঁকি দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিলে। তার পর ওখানে আবার একটা ইস্কুল খুলে বসেছে। এতেই কি ও থামবে মনে করেছ! তলে তলে ওর যে একটা গুরুতর রকমের মতলব রয়েছে তা বুঝতে পারছনা! সহজ কথা নয়, ও মহা মতলববাজ লোক। মন্দির আর অতখানি জমিটাকে ও এর পর নিজের সম্পত্তি ক'রে পুরোপুরি নিজের দখলে নিয়ে নেবে। ওর চারিপাশে পাঁচিল গেঁথে নেবে, সে-কথা একবার স্পষ্ট বলেই ফেলেছিল। তার পর ঐখানেই একটা কিছু মঠ বানাবে কিংবা আশ্রম বানাবে। তখন ও নিজে তার মোহন্ত হয়ে বসবে, অনেক চেলাচেলীর আমদানি হবে। অনেক কিছুই লীলাখেলা ওখানে চলতে থাকবে, শেষে মরবার সময় নিজের কাউকে মোহন্তগিরি

আপনার পণ্যের সুপ্রচারের জন্য
আজই পরামর্শ করুন
ফোন-৩৪-২৮৭৮
প্রচারবিদ্ শ্রী গৌর ভট্টাচার্য্য
১৫৮, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

দিয়ে যাবে। আমাদেরই গ্রামের জায়গা, কিন্তু আমাদের ওতে কোনোই হাত থাকবে না।

ধড়িবাজ লোকটাকে এইবেলা কষে দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ক্রমশই ও আরো বেশী বেড়ে যাবে। কিন্তু কেমন ক'রে ওকে দাবানো যায়? ও ভারি চালাক লোক, চারদিক থেকে ভালো ক'রে আটঘাট বেঁধে একেবারে ওকে চেপে ধরতে হবে, যাতে গলে বেরোবার কোনো ফাঁক না পায়। ওকে দস্তুরমতো জব্দের মধ্যে রাখা চাই, যেন কিছুতেই আর বেশিরকম মাথা-চাড়া দিতে না পারে।

ওরা সন্ধানে লেগে রইল, ধরবার মতো অছিলা খুঁজতে লাগল।

একটা অছিলা ওদের সহজেই মিলে গেল। সে ঐ মন্দিরের বাগানে বেড়া-বাঁধার অছিলা।

বাগানটিকে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল কাঁটাঝোপের বেড়া দিয়ে। তাতে আগড় দিয়ে একটা ফটকের মতো করা হয়েছিল, যাতায়াত করবার জন্তে। আগড়ের দুই দরজা সব সময় তারের একটি আটক দিয়ে মুখে মুখে বন্ধ করা থাকতো। সেই আটকটি সরিয়ে দিলেই দরজা খোলা যেতো, আবার টেনে এনে লাগিয়ে দিলেই দরজা বন্ধ হয়ে যেতো। তখন ঠেললেও খোলা যেতো না। এ-ব্যবস্থা করা হয়েছিল গরু-ছাগলকে নিবারণ করবার জন্তে, নতুবা দরজা খোলা পেলেই তারা ঢুকে পড়ে গাছপালা সব নষ্ট ক'রে দেবে। সকলেই এ-কথা জানতো, তাই সকলেই যাতায়াত করবার সময় সেই তারের আটকটি খুলে ঢুকে কিংবা বেরিয়ে আবার যথাস্থানে তা লাগিয়ে দিত। এইরকমই বরাবর চলে আসছিল, এতে কখনই কারো আপত্তি হয়নি।

ইদানিং কিছুদিন থেকে দেখতে পাওয়া গেল যে, এ-নিয়ম আজকাল প্রায়ই বজায় থাকছে না। বৈরাগী সকালে পূজার কাজ শেষ ক'রে ফটকটি বন্ধ ক'রে দিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে যায়, ফিরে এসে দেখে যে ফটক সম্পূর্ণই খোলা, গরু ছাগল ঢুকে অনেক চারাগাছ চিবিয়ে শেষ ক'রে দিয়েছে, শাকসব্‌জির ক্ষেত তছনছ ক'রে দিয়েছে। প্রথমে সে ভাবলে যে, কেউ হয়তো অন্যমনস্কে এমন করেছে, কিন্তু তার পরে নিত্যই এমন হতে থাকল।

বৈরাগীর মনে ক্ষোভ হলো। অনেক যত্নে সে গাছগুলিকে রক্ষা করছে, আর অজানিত কারো ইচ্ছায় বা অবহেলায় সেগুলি এমনভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যারা যারা মন্দিরে আসা-যাওয়া করতো তাদের সকলের কাছেই সে বার বার নালিশ জানালে, সকলেই তাতে সহানুভূতি প্রকাশ করলে, কিন্তু তবুও তাতে কিছু ফল হলো না। তখন অনেকে বললে, কে এমন করছে কিছু তো বুঝতে পারছি না, আপনি কিছুদিনের জন্তে ফটকে একটা তালা লাগাবার ব্যবস্থা করুন। সকালের দিকে যখন ভিক্ষায় বেরোবেন তখন তালাটি লাগিয়ে যাবেন, ফিরে এসে আবার খুলে দেবেন।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করা হলো। সকালের দিকে যখন বাগানে কেউই থাকতো না তখন ফটকে তালা দেওয়া হতো। তালার দুটি চাবি, একটি থাকতো বৈরাগীর কাছে আর একটি থাকতো তটিনীর কাছে। তটিনী যখন স্কুলে আসতো তখন সেই এসে তালা খুলতো।

এতে গরু ছাগল ঢোকা নিবৃত্ত হলো বটে, কিন্তু কুমতলবী যুবকেরা তাদের অভীষ্টসিদ্ধির অছিলা পেয়ে গেল। এই জিনিসটাই তারা চাইছিল, এটা তাদেরই ইচ্ছাকৃত ফন্দি। ফটকটা খুলে রাখলেই বাগানের গাছপালায় তাতে অনিষ্ট হবে, তখন বাগান রক্ষা করবার এমনি কিছু একটা ব্যবস্থা বৈরাগীকে করতেই হবে। তখনই ওকে চেপে ধরবার সুযোগ মিলবে। নিষ্কর্মা মানুষদের আর যতই অক্ষমতা থাক, কূটবুদ্ধিটা তাদের খোলে ভালো।

একদিন বিকেলে স্কুলের যখন ছুটি হয়েছে, তটিনী কিছুক্ষণের জন্তে বাড়ি চলে গেছে তার বাপকে খাওয়াতে, সেই সময় ঐ যুবকের দল সকলে মিলে লাঠি-সোঁটা হাতে নিয়ে কপট ক্রোধে অগ্নিশর্মা মূর্তি হয়ে বাগানে গিয়ে চড়াও হলো। বৈরাগী তখন বাগানে কাজ করছিল, তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে চোখ রাঙিয়ে তারা বলতে শুরু করলে—"কি মশাই, আপনি মনে করেছেন কী? যা খুশি তাই করুন, কিন্তু এই সাধারণের জায়গায় তালা-চাবি লাগাচ্ছেন কেন? এ আপনার কেনা জমিদারি নয়—"

বৈরাগী ওদের ব্যাপার দেখে একটু থমকে রইল। তার পর মৃদু হেসে বললে—"নিশ্চয়ই না, আমার কিছুই নয়। সবই আপনাদের, এ বাগানও আপনাদের। আমি শুধু আপনাদের জিনিস আগ্‌লাবার জন্তে আছি। সেইজন্তেই আমি যখন বেরিয়ে যাই, কিছুক্ষণের জন্তে তালা দিয়ে রাখি, নইলে গরু ছাগল ঢুকে সমস্ত গাছপালা নষ্ট ক'রে দেয়—"

"কিন্তু আমাদের অনেকের তাতে বিলক্ষণ অসুবিধে হচ্ছে। আমরা এই গরমের সময় আর কোথাও স্নান করবার জল পাই না, এই বাগানের রাস্তার ভিতর দিয়ে

দীঘিতে গিয়ে স্নান করি। আপনি এখানে তালা দেবার পর থেকে আমরা কেউ স্নান করতে পাচ্ছি না। শুধু তাই নয়, পাড়ার মেয়েরাও অনেকে ঐ দীঘিতে কাপড়চোপড় কাচতে যায়, তারাও যেতে পাচ্ছে না। এত লোককে ইচ্ছে ক'রে আপনি কষ্ট দিচ্ছেন, মালিকানা ফলিয়ে নিজের জমিদারি বজায় রাখছেন। এসব এখানে চলবে না। আপনি তার দিয়ে দরজা আটকাতে পারেন, যেমন আগে করছিলেন। কিন্তু তালা দিতে পারেন না।"

কথাগুলি অপমানজনক। বৈরাগীর সামলে নিতে একটু সময় লাগল। তার পরে সে বললে—"আপনারা যে আজকাল এই দীঘিতেই স্নান করতে আসছেন আর মেয়েরাও কাপড়-চোপড় কাচতে আসছে, এ-কথা আমার জানা ছিল না। এখন সবই বুঝতে পারছি। তা বেশ, তাহ'লে কাল থেকে আমি এর এক উপায় করবো। তালার চাবিটাও ঐ তালাতেই লাগানো থাকবে। যখন খুশি আপনারা এসে তালা খুলে ঢুকবেন, আবার ফিরে যাবার সময় সেটি বন্ধ ক'রে দিয়ে যাবেন। তাহ'লে এখানে মানুষ ঢুকতে পারবে, কেবল গরু ছাগল—"

কথাটা শেষ হতে-না-হতে সকলে মিলে হৈ-হৈ ক'রে উঠল। —"না মশাই, ওসব চালাকি চলবে না। এখানে তালা লাগাবার কে আপনি? জানেন, এটা বে-আইনী কাজ, এতে আপনার জেল হতে পারে! তালা-লাগানো মানেই দখল ক'রে নেওয়া, তাতে আপনার কোনো অধিকার নেই। আর আমাদের বলছেন তালা খুলে ঢুকতে, তাও বে-আইনী। কারো তালা-দেওয়া জায়গাতে সেই তালা খুলে ঢোকার অন্য কারো অধিকার নেই। আইন-কানুন না জেনে যা-তা একটা কাজ কি করলেই হলো।"

বৈরাগী একটু গুম হয়ে থেকে তারপরে বললে—"আচ্ছা, বলেন তো, আমি আরো এক কাজ করতে পারি। বাগানের ঐদিকের খানিকটা জায়গা বেড়ার বাইরে বের ক'রে দিয়ে বাইরের থেকে দীঘি পর্যন্ত একটা নতুন রাস্তা তৈরি ক'রে দিতে পারি। তাহ'লে তখন আর বাগানের ভিতর দিয়ে দীঘিতে যাবার দরকার হবে না, সোজা খোলা রাস্তায় আপনারা দীঘিতে যাতায়াত করতে পারবেন।"

ওরা চিৎকার করে বললে—"উঁহু, তাতেও হবে না। বাগানের দখল কেনই বা আমরা ছাড়বো? ওর ভিতর দিয়েই আমরা নিজেদের হক্ বজায় রেখে যাওয়া-আসা করতে চাই। ফটক অমনি খোলাই থাকবে, শুধু আগের মতো তার দিয়ে আটকানো থাকবে। আমাদের যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তবে আপনাকেই বা আমর বিশ্বাস করবো কেন। কাল থেকে তালা যেন না পড়ে।"

বৈরাগী এবার কেমন একরকম ভাবে হেসে উঠল তেমনি হেসে-হেসেই সে বললে—"আচ্ছা যে তাই হবে। আপনারা যেমন হুকুম করছেন তাই হবে কাল থেকে আপনাদের যাতায়াতের কোনো বাধাই আ থাকবে না।"

ওরা আবার শাসিয়ে বলে গেল—"দেখবেন, কথা যেন ঠিক থাকে।"

পনেরো

কিছুক্ষণ পরেই তটিনী কিছু খাবার হাতে নিয়ে বাি থেকে ফিরে এলো। এসেই দেখলে, বৈরাগীর মুখখানা গম্ভীর কেমন একটা থমথমে ভাব। দেখেই বুঝলে, একটা কি ব্যাপার ঘটেছে। বাগানে যে দু-চারজন উপস্থিত ছি তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—কী হয়েছে। তারা যেটু বুঝেছিল, সেইটুকু বললে। কিন্তু বৈরাগী কোনো কথা বললে না, সে নিবিষ্ট মনে আপন কাজে লেগে রইল।

সন্ধ্যার সময় কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে যথারীতি সন্ধ্যার হলো। প্রতিদিনের মতো অনেক মেয়েপুরুষ আর দেখতে এলো, সমস্ত শেষ হয়ে গেলে কিছু কিছু প্রসাদ নি তারা একে একে চলে গেল।

সকলের শেষে তটিনী যখন বাড়ি যাবার জন্যে প্রস্ত হলো, তখন বৈরাগী তাকে বললে—"তুমি কাল খুব ভোরে দিকে কি এখানে একবার আসতে পারবে? যদি পারে তো ভালো হয়, বিশেষ কিছু দরকার আছে।"

তটিনী আসতে সম্মত হয়ে বাড়ি চলে গেল।

পথে যেতে যেতে তটিনীর মনে নানারকম দুশ্চিন্তা হতে লাগল। রাত্রে বিছানায় শুয়েও সে নানাবিধ চিন্তা নি জেগে রইল, সারারাত ঘুমোতে পারলে না। তার অব অন্য কারণও ছিল।

তখন আশ্বিন মাস পড়েছে। দুর্গোৎসব আগতপ্রায় কয়দিন থেকে আবহাওয়াতে খুব একটা গুমট ভাব চলছিল সেদিন মধ্যরাত্রি থেকে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল যেমন মুষলধারে বৃষ্টি, তেমনি গাছপালা-ভাঙা দুর্দান্ত ঝড় কত বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছ মড়মড় ক'রে ভেঙে পড় কত লোকের ঘরের চাল উড়ে গেল। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে এ-সময়ে প্রায়ই এমন হয়ে থাকে, লোকে বলে আশ্বিনে-ঝড় বারে বারে বজ্রপাত হতে লাগল, তীব্র ছটায় বিদ্যু

চমকাতে লাগল। ঝড়ের এক একটা ঝাপট এসে তটিনীদের বাড়ির জরাজীর্ণ দরজা-জানলাগুলোকে ধাক্কার ধাক্কায় যেন উপড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলে। খিল-ছিটকিনিগুলো ঝন্‌ঝন্ ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। সেই সুযোগে দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে এক একটা বৃষ্টির ঝাপ্টা এসে তটিনীর বিছানার একটা পাশ একেবারে ভিজিয়ে দিলে। সে উত্যক্ত হয়ে বিছানাটা অন্য পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করলে। কিন্তু একে সেই দুশ্চিন্তা, তার উপর এই দুর্যোগ, এতে কি ঘুম আসে!

সারাটা রাত একরকম জেগে কাটিয়ে ভোর হবার আগেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। উঁকি মেরে দেখলে, তার বাবা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর আজ উঠতে অনেক বেশি হবে, এ কথা জেনে সে আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, ঝড়ের মাতন আর নেই, কিন্তু তখনও গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ওটুকু বৃষ্টি সূর্যোদয় না হলে থামবে না। আকাশ ঘোলাটে হয়ে থাকলেও রাত্রির অন্ধকার আর নেই। সামান্য একটু ফরসা মতন হয়েছে, রাস্তা দেখা যাচ্ছে।

তটিনী তখনই বেরিয়ে মন্দির অভিমুখে চলল।

বাগানের বেড়ার কাছাকাছি পৌঁছে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। বাগানে ঢোকবার ফটকও নেই, ফটকের আগড়ও নেই। সেগুলো ভেঙেচুরে কাৎ হয়ে একপাশে পড়ে আছে। অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল, ফটকের জায়গায় দু'পাশের বেড়াও আর নেই। বেড়াগুলোও কাৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে।

তটিনী ভাবলে, রাত্রের ঝড়ে বুঝি এই কাণ্ড করেছে।

কিন্তু সে খানিকটা ভিতরে গিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, বৈরাগী নিজেই একপাশে দাঁড়িয়ে কাটারি দিয়ে বেড়া কাটছে। এক-একটা ঝোপের গোড়াতে কোপ দিয়ে সে কেটে ফেলছে, আর লম্বা লম্বা কাঁটাগাছগুলো একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। এ তাহ'লে ওর নিজেরই কাজ!

তটিনী ওর কাছে যেতেই, ও কাটারি ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কেমন একরকম হাসিমুখ ক'রে সে বললে—"এসেছ তুমি? এতক্ষণ আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম, তোমারই অপেক্ষা করছিলাম।"

বলতে বলতেই সে দু'হাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। বিনা দ্বিধায় একেবারে তার অত্যন্ত কাছে গিয়ে পড়ল। বিনা দ্বিধায় অকস্মাৎ তাকে দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিলে। দু'হাত দিয়ে তার মাথাটি ধরে নিরুচুম্বন করলে।

তটিনী এই অপ্রত্যাশিত আচরণে ভয়ে বিস্ময়ে বিচলিত হয়ে থরথর্ ক'রে কেঁপে উঠল। তার মুখে একটিও কথা সরলো না।

বৈরাগী তেমনি হেসে বললে—"আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ? অবাক হয়ে যাচ্ছ? এবার আমারই পরাজয়ের পালা। তোমার নিবেদন যা ছিল তা আমি আজ গ্রহণ করলাম। যে-স্পর্শ তুমি চেয়েছিলে তাই তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত তোমার কথাই রইল।"

তটিনী কিছু বুঝতে পারলে না। কিন্তু একটা কিছু নিদারুণ ব্যাপার, এইটুকু মাত্র বুঝে তার মুখে কথা ফুটল; সে বললে—"একি সর্বনাশ করলেন আপনি! আপনার এতদিনের তপস্যাকে এমন ক'রে নষ্ট করলেন?"

বৈরাগী বললে—"কিছুই নষ্ট হয়নি, সব ঠিক আছে। ভিতরের কাজ বাইরের কাজের দ্বারা নষ্ট হয় না। আগে বুঝিনি, কিন্তু আজ এটুকু বুঝেছি। আগে কেবল ভয় করতাম, কিন্তু আজ জানছি যে ভয় করবার কিছু নেই।"

"কিন্তু এতে কত ক্ষতি হলো। হয়তো আপনাকে অনেক পিছিয়ে দিলে—?"

"না না, পিছোবো কেন, অনেকটা বরং এগিয়েই গেছি। তুমি তো সকল কথা জানো না, তাই ঠিক বুঝতে পারছ না। আমি দু'দিক দিয়েই ভুল কাজ করছিলাম, ভগবান আমার সেই ভুলটা ভেঙে দিলেন। এই দেখনা কেন, এখানকার এই গাছপালাগুলোর উপর আমার কতখানি মায়া মোহ জন্মেছিল। সংসারী লোকদের যেমন আপন ছেলেপুলের উপর টান হয়, আমার মধ্যে সেই জিনিসটা এসে পড়েছিল। সেখানেই ভুল। যত্ন থাক, ভালোবাসাও থাক, কিন্তু মোহ আসবে কেন? ভগবান তাই সেটা জোরে ঘা মেরে ভেঙে দিলেন। ভুল ভেঙেছে বটে, কিন্তু তবুও মোহটা কিছুতে ছাড়ছে না। তাই আজ আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে।"

তটিনী দারুণ চমকে উঠল। "চলে যেতে হচ্ছে? কী বলছেন?"

"হাঁ তটিনী, আমি চলেই যাচ্ছি। এখনই যাবো।"

"আর আমি?"

"তুমি রইলে। তাতে কি হয়েছে? চোখের আড়াল হওয়া মানেই কি সম্বন্ধটা চলে যাওয়া? তা নয়। চোখে না দেখলেও তুমি রইলে আমার কাছে, আমি রইলাম

তোমার কাছে। সেইজন্যেই তো আমার স্পর্শ তোমায় দিয়ে গেলাম, তোমার হৃদয়ের দান যে আমি নিয়েছি তার নির্ভুল প্রমাণ দিয়ে গেলাম। খুব কাছে থেকেও তোমার অধিকারে যা ছিল না, এবার থেকে তাও থাকবে। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি একবার ঘর থেকে আসি।"

বৈরাগী তাড়াতাড়ি তার কুটিরের মধ্যে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে যখন বেরিয়ে এলো তখন দেখা গেল তার আগেকার সেই পরিব্রাজকের বেশ। কাঁধে নিয়েছে তার ঝুলি কম্বল, পরনে হাঁটু পর্যন্ত তোলা খাটো কাপড়, খালি পা, খালি গা, হাতে সেই লোটা আর চিমটা।

তটিনীর কাছে এসে দাঁড়াবামাত্রই সে বললে—"আমাকেও আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন। আমি প্রস্তুত, এইভাবেই যাবো আপনার সঙ্গে।"

বৈরাগী একটু স্মিত হেসে বললে—"তা হয় না, তটিনী। আমি ততবড়ো একজন সিদ্ধ সাধুপুরুষ নই, আবার ভুল ক'রে বসবো। এই দেখনা, গুরু আমাকে বলেছিলেন অজ্ঞাতবাসে থাকতে। প্রথমটায় ঠিক রাস্তাতেই চলেছিলাম, তার পরে ভুল রাস্তা ধরলাম। কবে কখন যে ভুল রাস্তাটি ধরেছি তা জানতেও পারিনি।"

"আমি সঙ্গে থাকলে আপনার কখনই আর ভুল হবে না, সব সময় আমিই আপনাকে সতর্ক ক'রে দেবো। আমায় নিয়ে চলুন!"

"না, তা হয় না। তোমার এ-দিকটাও দেখা চাই। ঘরে তোমার বাবা রয়েছেন। তা ছাড়া তোমার অনেক কাজ রয়েছে, এখানেই তোমার কাজ। গুরু কী বলেছিলেন তা মনে নেই? সব কাজ ছেড়ে আমার সঙ্গে কোথায় তুমি ঘুরবে।"

"কিন্তু আপনিই বা চলে যাবেন কেন? কার ভয়ে?"

"ভয়ে কারো নয়, হুকুমে। মা এখানকার লোকজনের মুখ দিয়ে বারে বারে হুকুম পাঠাচ্ছেন, আমার অন্তরের ভিতর থেকেও এবার কড়া হুকুম এসে গেছে, আর কি থাকা যায়। আর একমুহূর্তও নয়।"

"কিন্তু আপনি এখানে এতদিন ধরে কষ্ট ক'রে এত কিছু গড়ে তুললেন, এত রকমের কাজ শুরু করলেন, সব-কিছুই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে—"

"দেখ, ব্যর্থতারও একটা দাম আছে, তার দ্বারাও অনেক বেশী কাজ হয়। সে হিসেবে ব্যর্থতাও একরকমের সার্থকতা। মাঝে মাঝে ব্যর্থতাও দরকার, ঠকে যাওয়াও দরকার।"

"কিন্তু তাহ'লে এত যত্নের এই বাগানটার কি হবে?"

"কি হবে? ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তাই আগের থেকেই বেড়াটেড়াগুলো ভেঙে দিয়ে গেলাম। শুধু কেবল গড়াই কি মায়ের কাজ? ভাঙাও যে তাঁরই কাজের মধ্যে। একবার তাই করেছিলেন, আবার তাই করবেন। কিন্তু আর দেরি করবো না, এবার আমি যাই।"

বৈরাগী আবার একবার তটিনীর হাতখানা ধরল। তটিনী তখনই তার সেই হাতখানি দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—"আর কি কখনই ফিরবেন না?"

বৈরাগী মুহূর্তের জন্যে আকাশের দিকে চেয়ে কী ভেবে নিলে। তার পরে বললে—"তা এখন বলতে পারছি না। যদি কোনোদিন তেমন দেখার দৃষ্টি আমি পাই, যেমন সেই পারানি-নৌকোর নিরক্ষর মাঝি পেয়েছিল, তাহ'লে আবার আসবো, সেই চোখে তোমায় দেখতে। কিন্তু এখন ছেড়ে দাও, আমি যাই।"

তটিনীর হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেল। আর বৈরাগী তখনই হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে সোজা বেরিয়ে চলে গেল। ফিরে আর চাইলে না।

তখনও গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ ঘোলাটে।

বিখ্যাত শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন. বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী. কলিকাতা-৭
ফোন ৩৪-২৯৭০
বিক্রেতা ডি.এন. হোসিয়ারী হাউস, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

ষোলো

বেলা হলো, মেঘ বৃষ্টি ছেড়ে গেল, সারা পৃথিবীতে ঝল্‌মলে রোদ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সেদিন মন্দিরে কোনো পূজার আয়োজন হলো না, শাঁখ-ঘণ্টা বাজল না। প্রত্যহ যে-সব ছেলেরা ভিড় ক'রে খিচুড়িভোগের প্রসাদ খেতে আসে, তারা এসে দেখলে বেড়া-কটক ভাঙা, মন্দির শূন্য, মন্দিরের দরজা খোলা। ফুল তোলা হয়নি, পূজার কোনো আয়োজন করা হয়নি। বৈরাগী নেই, তটিনী নেই, মন্দিরের মধ্যে কেউ নেই। তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ক'রে শেষে ফিরে চলে গেল।

যে-সব যুবকেরা আগের দিন বৈরাগীকে তাড়া ক'রে এসেছিল, তারা খবর পেয়ে ছুটে এলো। বাগানের আর মন্দিরের ঐ অবস্থা দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেল।

কর্তাদের আর মেয়েদের মহলে আবার জোর বৈঠক বসল। নানা রকমের আলোচনা চলতে থাকল। কেউ বললে, বৈরাগী এখানকার ছোঁড়াদের কাছে ঠ্যাঙানি খাবার ভয়ে পালিয়েছে। কেউ বললে, তা নয়, এর চেয়ে ভালো জায়গার সন্ধান কোথাও পেয়ে এখান থেকে সরে পড়েছে। কেউ বললে, তাও নয়, ওর স্বভাবটাই এমনি ভবঘুরে, স্থির হয়ে বেশিদিন কোথাও টিঁকে থাকতে পারে না। মেয়েরা বললে, আমরা আগেই জানতাম, মেয়েটার সর্বনাশ ক'রে, ওর দফা শেষ ক'রে দিয়ে সে সরে পড়বে। সে এখন নতুন জিনিস খুঁজতে গেল, কিন্তু ঐ মেয়েটার কী গতি হবে! ওর দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে। আহা বেচারা!

কিন্তু অতঃপর যা দেখা গেল তা অতি আশ্চর্য। তটিনীর মুখভাব একটুও ম্লান নয়। একটুও মুষড়ে যায়নি। আগেকার মতো ঠিক তেমনি ভাবেই সে মাথা উঁচু ক'রে আছে। যেন এতে তার কোনোই ক্ষতি হয়নি।

অনেকদিন কেটে গেল।

তটিনী এখন তাদের নিজেদের বাড়ির বাইরের দাওয়াতে তার স্কুল বসিয়েছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী জুটেছে, ঐ দাওয়াতে বসতে দেবার জায়গা হয় না। স্কুলের কাজ পুরোদমেই চলছে।

আরো অনেকদিন কাটল। তটিনী ভেঙেও পড়ল না, মলিনও হলো না, একটু রোগাও হলো না। বরং দেখা গেল, সে এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠেছে। তার কাজে দেখা যায় ঐকান্তিকতা, মুখে দেখা যায় প্রসন্নতা, নিশ্চিন্ততা। পাড়াগিন্নিদের দল অবাক হয়ে তাকে দেখে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে—"দেখেছিস ভাই, দুঃখে থাকা দূরে থাক, যেন কিছুই হয়নি। লজ্জাও নেই, দিব্যি মহানন্দেই আছে। বৈরাগী নিশ্চয় ওর কিছু ক'রে দিয়ে গেছে। লোকটা অনেক তুকতাক জানতো, ভেল্কি জানতো।"

আরো অনেকদিন কেটে গেছে। সেই সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন বাগান এখন আবার আগের মতোই বন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। যারা তখনকার অবস্থা দেখেছে, তাদের এখনকার অবস্থা দেখে মনে হয়, মাত্র কিছুকালের জন্যে এখানে একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ঘটেছিল—যেমনি সেই ইন্দ্রজালের কুহক ছেড়ে গেল, অমনি যা ছিল তাই হয়ে গেল।

যথার্থ ই তাই। ওখানে কোনোকালে যে একটা ভালো বাগান ছিল তা এখন বোঝাই যায় না। বললেও বিশ্বাস হয় না। কেবল ঝোপেঝাড়ে আর আগাছাতে সমস্ত জায়গাটা একেবারে ছেয়ে আছে। জনপ্রাণী কেউ সেদিকে যায় না, এমনকি সেই দীঘিতে স্নান করতেও না। রাত্রে ওখান থেকে শেয়াল ডাকে, ফেউ ডাকে। ঝোপের তলায় সাপ লুকিয়ে থাকে।

মন্দিরের দরজা খোলা পড়ে আছে। তার মধ্যে দেবীমূর্তি অনাদৃত অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু প্রত্যহ সকালে এখনও একবার ক'রে সূর্যের প্রথম আলো তার মুখের উপর এসে প'ড়ে রৌদ্রস্নান করিয়ে যায়।

আর, দিনান্তে একবার ক'রে মন্দিরের দরজায় একটি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে ওঠে। সন্ধ্যার আগে রোজ সেখানে তটিনী এসে প্রদীপটি জ্বেলে দিয়ে যায়।

চেকোস্লোভাকিয়ার কয়েকটি সামাজিক ব্যবস্থা

| শিবপ্রসাদ বিশ্বাস |

গ্রীষ্মে প্রাগে পেট্রিন্ পাহাড়ে ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে। নীচে ভ্লটাভা নদীতে ছোট ছোট নৌকোর ভীড়। পেট্রিনে আকাশের নীচে বিয়ার নিয়ে বসেছি। একটানা ব্যাণ্ড বাজছে—ছেলেমেয়েরা নাচছে। আলাপ হয়েছিল এখানে ইঞ্জিনিয়ার মারেকের সঙ্গে আর তার মেয়েবন্ধু এলিসের সঙ্গে। অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম। খুঁটিনাটি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতাম। এলিস কাজ করে এক অফিসে, অনেক ক'টা ভাষা জানে। এ কিছু নতুন নয় এখানে। প্রায় প্রত্যেকেই চেক্ ছাড়া আরও দুটো ভাষা জানে। জিজ্ঞাসা করতাম এলিসকে কত মাইনে পাও? কেমন চলে? মাইনে ওর মাসে ১,০০০ ক্রাউন (১ টাকা = ১½ ক্রাউন); ট্যাক্স যায় ৫০ ক্রাউন। একা থাকে প্রাগে, মেয়েদের হোস্টেলে। ঘরভাড়া মাসে ৭৫ ক্রাউন; তাতেই বিছানা, ঘর-পরিষ্কার সব-কিছু। ছোট একটু রান্নাঘর আছে—নিজে কিছু তৈরি করে নিতে পারে। বাপ-মা'র একই মেয়ে। তাঁরা থাকেন প্রাগের বাইরে, প্রায় ৫০ মাইল দূরে। বাপের পেনসান মাসে ৮০০ ক্রাউন, মা এখনও রোজগার করেন মাসে ৯০০ ক্রাউন। নিজেদের ছোট একটি বাড়ীও আছে। এলিস মাসে অন্ততঃ দু'বার যায় বাপ-মাকে দেখতে। ট্রেনের ভাড়াতেও পায় কনসেসন। কৌতূহলী হয়ে শুনতাম ওর আয়-ব্যয়ের হিসেব। তার একটা খসড়া না দিয়ে পারলাম না:

মাসিক আয়	মাসিক ব্যয়	
১,০০০ ক্রাউন	চাঁদা	৫০ ক্রাউন
	ঘরভাড়া	৭৫ „
	ট্রামভাড়া	৬০ „
	অফিসের ক্যান্টিনে দিনের খাওয়া	৫৫ „
	রবিবারে দিনের খাওয়া	২০ „
	সকালের ও রাতের খাওয়া	২০০ „
	সিনেমা	২০ „
	মাসে দু'দিন কফি-হাউসে খরচা	৩০ „
	বাড়ী যাবার খরচা	৩০ „
	মোট	৫৫০ ক্রাউন

মাসে থাকে তার ৪৫০ ক্রাউন। এতে জামা-কাপড়, বই আর ছুটিতে বেড়ানোর খরচ হয়। বছরের দু'সপ্তাহের ছুটিতে কোথাও না কোথাও যাওয়া চাই। শীতে স্কী, গরমে সাঁতার দিতে। সাথী মারেক্। মারেক্ রোজগার করে মাসে ১,৩০০ ক্রাউন, তবে সিগারেট আর বিয়ারের খরচার পর এলিসের থেকে বেশী তার হাতে থাকে না।

বিয়ের পথের একমাত্র অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্ল্যাটের অভাব। ফ্ল্যাট পাওয়া খুবই শক্ত, তারই অপেক্ষায় আছে। নেহাত যদি না পাওয়া যায়, বিয়ের পর মারেক্ এলিসের হোস্টেলে রোজই কাজের পর গিয়ে, খাওয়া-দাওয়া করতে পারে। সপ্তাহে দু'দিন ওখানে থাকার ব্যবস্থাও আছে। মন্দের ভালো। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "বিয়ের জন্য টাকা জমাচ্ছো না তোমরা?" দরকার নেই ওদের। বিয়ের পরই ওরা বীমা থেকে পাবে ১,০০০ ক্রাউন, তা থেকে বিয়ের পার্টির খরচা চলে যাবে। তা ছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে ধারও নিতে পারে, শোধ দিতে হবে মাসে দুজনের মাইনের ১/১০ অংশ। প্রথম বাচ্চা হবার পর আর সুদ দিতে হবে না। বিয়ের জন্য তাই বেশী অপেক্ষা করার প্রয়োজনও নেই। ২১ থেকে ২৪ বছরের ছেলেমেয়েদের বিয়ের সংখ্যা বেশী। ১৮ বছরের পরেই বিয়ের স্বাধীন মত সকলের—তার চেয়ে কম বয়সে বিয়ে করতে হলে বাপ-মা'র মত চাই। এলিসকে জিজ্ঞাসা করতাম—"বিয়ের পর চাকরি করবে তো?" বলতো—"ক'বছর করতেই হবে, তারপর দেখা যাবে।" সংবিধানের ধারায় আছে: *All citizens shall have the right to work.* চেকোস্লোভাকিয়ার ১,৩২,৫০,০০০ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই কাজ করে। কাজ-করা লোকের শতকরা ৩৭ জন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৫০ জনই এখনও ঘরের কাজই করে।

'Common Law Marriage' ব'লে এখানে যে বিয়ের প্রথা তাকে ঠিক বিয়ে বলা চলে না, তবুও বৈধ। মেয়ে-পুরুষ একসাথে বসবাস করলে তাদের পরস্পরের উপর আইনগত কিছু অধিকার জন্মে।

স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার। বিয়ের পরও স্ত্রী তার নিজের পদবি ইচ্ছা করলে রাখতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে বংশধরদের পদবি কার নামে হবে তা প্রথমে ঠিক করে নিতে হয়।

সব বিবাহই নানা কারণে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই অবস্থাবিশেষে বিচ্ছেদের প্রয়োজনও ঘটে। এক্ষেত্রে সন্তানের ভবিষ্যৎই সর্বপ্রথম দ্রষ্টব্য। বিচারে ঠিক করে দেওয়া হয় বিচ্ছেদের পর সন্তান কার কাছে থাকবে। বাপ ও মা'র দুজনেরই সন্তানের দায়িত্ব সমান; সুতরাং সন্তান যদি বাপ বা মা'র কাছে থাকে তবে অপরকে আইনমতো মাসিক অর্থসাহায্য করতে হবে। বিয়ের পূর্বে স্বামী ও স্ত্রীর অর্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর পরস্পরের দাবি নেই, কেবলমাত্র বিয়ের পর যা উভয়ের যত্নে অর্জিত হয়েছে তাতে উভয়েরই দাবি। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তা উভয়ের মাঝে সমানে ভাগ হয়। সামাজিক বন্ধন সম্বন্ধে মূল কথা —"The institution of Marriage, the family, and motherhood are under the protection of the State. The State shall insure that the family be the sound foundation of the development of Nation."

ব্রুনোর কলকব্জা-প্রদর্শনীতে আলাপ হয়েছিল ইয়ারমিলা স্টান্‌কোভার সঙ্গে। জাভা মোটর-সাইকেল প্রতিষ্ঠানে হিসাবের কাজ করে। কেরানীগিরিতে ৫৫ বছর পার হয়ে গেছে। পরের মাসেই মিলেছে বৃদ্ধবয়সের পেনসান মাসে ২২০ ক্রাউন—তা ছাড়া মাসে মাইনে ১,২০০ ক্রাউন। ত্রিশ বছর কাজ হয়েছে, পেনসান মাসে মাইনের শতকরা ৫৫ ভাগ অর্থাৎ ৬৬০ ক্রাউন। ৫৫ বছরের পরও কাজ করলে, প্রথম বছর মাইনের সাথে পেনসান হবে ⅓ অংশ। তার পরও যতদিন কাজ চলবে, পেনসান বছরে মাইনের শতকরা ৪ হারে বেড়ে ৬০ বছর বয়সে মাইনের ৭৫% হবে। ৬০ বছরের পরও যদি সে কাজ করে তবে পেনসান বছরে মাইনের ১% বেড়ে শেষপর্যন্ত হবে মাইনের ৮৫%। সংবিধান অনুযায়ী—"All working people shall be entitled to just remuneration for work done." ১৯৫৬ সালে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এক কর্মীর গড় মাসিক আয় ছিল ১,২৮৬ ক্রাউন। এই সাথে উল্লেখযোগ্য—ঘরভাড়া মাইনের ৩%-১০%, এক কিলো রুটির দাম ২·৬০ ক্রাউন, দিনের খাওয়া ক্যান্টিনে ৪ ক্রাউন, আর একটি টেলিভিশনের দাম ২,০০০ ক্রাউন।

জাভা কারখানায় কাজ করে বহুমিল্ ভোটোচেক্। বয়স ৭০ বছর। বেশী কাজ করতে পারে না। ৫ বছর আগে মাসে রোজগার করেছে ২,২০০ ক্রাউন, এখন কমে তা হয়েছে মাসে ১,৬০০ ক্রাউন। পেনসান তার হিসেব হবে শেষ পাঁচ-দশ বছরের মাইনের উপর যেটা সুবিধা হয় তার পক্ষে। ভোটোচেকের স্ত্রীর বয়সও ৬৫ হয়ে গেছে—তাই ঘরকন্নার কাজের সুবিধার জন্য তারও ভাতা মিলেছে মাসে ১০০ ক্রাউন। কুড়িবছরের চাকরির পর পুরুষের ৬০ বছরে ও মেয়েদের ৫৫ বছরে পেনসানের যোগ্যতা আসে। তারপরও চাকরি করলে মাইনে ও পেনসান দুই মিলবে। পেনসানের উপর ট্যাক্স নেই।

বেডচিক্ ইয়ারোচ্ আর স্ত্রী এডা। প্রাগে Realistic Theatre-এ এক সন্ধ্যায় আলাপ। বেডচিক্ পেনসান নিয়েছে ৬৪ বছরে। কাজ ছিল কেরানীর—পেনসান মাসে ৫৫০ ক্রাউন। ১৯৫৭-র এক বিশেষ আইনে কম পেনসান বেড়ে হয়েছে ৬০৫ ক্রাউন। স্ত্রী এডার ভাতা মাসে ১০০ ক্রাউন। মোট ৭০৫ ক্রাউনে চলে কি করে?

বাড়ীভাড়া বেশী নয়। বিশবছরের ফ্ল্যাট বেডচিকের —একখানা ঘর, ভাড়া মাসে ৬০ ক্রাউন।

খাওয়ায় খরচই বেশী। দুপুরের খাওয়া খায় দুজনে পেনসানারের ক্যান্টিনে। এমনি ক্যান্টিন আছে সব অফিস-কারখানাতেই। খাবারের দামের প্রায় ⅓ অংশই বহ করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান। পেনসানারের ক্যান্টিনে সাব্‌সিি আসে ন্যাশনাল কমিটি থেকে—এ সাব্‌সিডি কখনও কখন খরচের শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্তও, কারণ পেনসানার তা আয় অনুযায়ীই দাম দিতে পারে। প্রতিটি খাওয়া ½ থে ৪ ক্রাউন পর্যন্ত পড়ে। তাতে স্যুপ, মাংস, তরকারি, মি ও পানীয়। বেডচিকের আর তার স্ত্রীর রোজ মাথাপি পড়ে ৩ ক্রাউন। সকালের ও রাতের খাওয়া তা বাড়ীতেই খায়, তাতেও মাথাপিছু পড়ে ৪ ক্রাউন। সবশু খেতে লাগে মাসে ৪২০ ক্রাউন।

খাওয়া, ঘরভাড়া, সিগারেটে মাসে চলে যা ৫৪০ ক্রাউন। যা বাকী থাকে তাতে জামা-কাপড় অন্যান্য খরচ, বাজেট করতে হয় মাথা ঘামিয়ে। সপ্তা একদিন তাদের সিনেমায় যাওয়া চাই—অবশ্য সস্তা টিকি আছে পেনসানারদের জন্য—১ ক্রাউন।

সম্প্রতি কিড্‌নি অপারেশনের পরে বেডচিক্ অনেকদি পড়ে ছিল বিছানায়। বয়স এবার সত্যিই হয়েছে, আ

ভ করা চলে না। মারিয়ানস্কে লাযনি-র স্পা-তে কিছুদিন শ্রাম নিয়ে আবার যেন মনে হয় তার কাজ করতে হবে। তাতে রোজগারও কিছু হবে, তা ছাড়া শুধু শুধু স থেকেও ভালো লাগে না। তবু—"All working ople should have right to leisure." কতদিনের রি তার উপর নির্ভর করে বছরে সবারই ২-৫ সপ্তাহের '। মাইনে পুরোই পাওয়া যায় ছুটিতে।

সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রী-সাথে পেনসানারের ক্লাবে বসে কাটে নয় বেডচিকের। ন্যাশনাল কমিটি থেকে তৈরী এই l; চালানোর খরচাও তাদের—রেডিও, লাইব্রেরি, াবুলা। বেডচিকের খুব ভালো লাগে না, বড় আড্ডা । এখনও ইচ্ছে একটা কিছু করে। মুশকিল রোজ লে উঠতে দেরি হয়ে যায়, কাজে যাবে কি করে? ছাড়া স্বভাবই বা কিসের এত? "The right to al security is guaranteed in the Constitution." ৬ সালে এমনি পেনসানারের সংখ্যা ছিল ২০,০০,০০০। হলেও, বেডচিকের ভাবনা ছিল না। Pensioners ne আছে, যেমনি পেনসান তেমনি থাকা-খাবার খরচ চ হবে—তবে মাসে ৩৫০ ক্রাউনের বেশী নয়, তা ছাড়া ক্রাউন হাতখরচা আছে। স্বাস্থ্যে কুলালে এখানে কম ঘন্টের কাজ করে কিছু রোজগার করাও যায়। এমনি টি Pensioners Home-এ ২২,০০০ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাস হ।

সালে স্ক্যানিনপ্রাভ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার আনটোনিন্ বাভার দুর্ঘটনার কথায় আলোচনা হচ্ছিলো বান্ধবী লোতার সাথে—অর্থনীতির প্রফেসার। আনটোনিনের পায়ে ভারী লোহার রড পড়ে বেশ জখম হয়েছে। কফি-হাউসে সেদিন রবিবারের সকাল পর্যন্ত এই নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম বেনেশোভাকে। অনেক কিছু পারলাম জানতে। আনটোনিনের পায়ের প্লাস্টার খুলে দিলো দু'মাস পরে—এই দু'মাসে স্ত্রী ইয়ানাকেই করতে হয়েছে সব, ছেলেমেয়েদের নার্সারী স্কুলে দিয়ে নিয়ে আসা, বাজার করা, তার উপর নিজের কাজ তো আছেই। ইয়ানা কিন্তু ধীর, শান্ত। এ শুধু বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার জন্যই, তা না হলে দুশ্চিন্তার তার অবধি থাকতো না। এই ব্যবস্থার দুটি ভাগ। প্রথম স্বাস্থ্য-বীমা ও দ্বিতীয় পেনসান—এর জন্য মাসে মাসে যে প্রিমিয়াম তা দেয় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান। আনটোনিনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধবয়সেও পেনসানের অনেক দেরি—তবুও সে তা পেতে পারে, যদি তার দুর্ঘটনায় ভবিষ্যৎ কাজের অনুপযোগী হয়ে যায়। তখন মিলবে অক্ষম-পেনসান। যদি তার ১৫ বছরের কম চাকরি হয়ে থাকে তবে পেনসান মাইনের ৬৫%। আনটোনিনের চাকরি ১১ বছরের, গড়ে মাসে মাইনে ১,৬০০ ক্রাউন, সুতরাং পেনসান হবে ১,০৪০ ক্রাউন মাসে। যদি সে দুর্ঘটনায় অক্ষম না হয়ে কোনো রোগে অসমর্থ হয়ে পড়তো, তবে পেনসান হতো মাইনের ৫০%; ১৫ বছরের চাকরির পর পেনসান প্রতিবছরে বেড়ে যাবে নীচের উদাহরণ অনুযায়ী :

মাসিক গড় বেতন ১,৬০০ ক্রাউন

কত বছরের চাকরি	অসমর্থ-পেনসান (দুর্ঘটনায়)	অসমর্থ-পেনসান (অন্য কারণে)
১৫	১,০৪০ ক্রাউন (৬৫%)	৮১৬ ক্রাউন (৫১%)
২০	১,১২০ " (৭০%)	৮৮০ " (৫৫%)
২৫	১,২০০ " (৭৫%)	৯৬০ " (৬০%)

পরিপাটি মুদ্রণ

আর

নিখুঁত ব্লক-তৈরির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

॥ কালার স্টুডিও ॥

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

ফোন: ৫৫-৪৬-৭

পেনসান ছাড়াও আনটোনিনের মাসে মিলবে ২৬০ ক্রাউন ৬ বছরের ছেলে এডান্ ও ২ বছরের মেয়ে হেলেন্‌কার পড়ার জন্য। এর উপর ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের জন্য মাসে ১৭০ ক্রাউন।

আরও দুটো 'যদি' আছে।

দুর্ঘটনায় আনটোনিন্ যদি তার বর্তমান কাজের উপযোগী না হয়ে, অন্য কাজে সমর্থ হতো, তাহলে সেই কাজ এবং প্রয়োজনমতো বিনাব্যয়ে তার শেখার ব্যবস্থা করে দেওয়ার ভারও তার প্রতিষ্ঠানের।

দুর্ঘটনায় যদি তার জীবনান্ত হতো, তাহলে তার বিধবা স্ত্রী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পাবে ১,০০০ ক্রাউন আর তার স্বামী যে পেনসান পেতো তার ৭৫%। আনটোনিনের পেনসান ১,০৫০ ক্রাউন হলে, ইয়ানা পেতো ৭২৮ ক্রাউন—যতদিন না সে আবার বিয়ে করে বা ছেলেমেয়েরা যতদিন অনাথা ভাতার অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। অনাথা-ভাতা বন্ধ হয়ে-গেলেও ইয়ানার বয়স যদি তখন ৪৫ বছরের বেশী হয়, তবে বিধবা-পেনসান সমানেই চলবে।

ছেলেমেয়েদের অনাথা-ভাতা বাপের পেনসানের ¼ অংশ, এক্ষেত্রে হতো ২৬০ ক্রাউন। যতদিন না তাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ না হয় বা তারপরও পড়লে, ২৫ বছর পর্যন্ত এ-ভাতা চলে।

আনটোনিন্ কাজ করে ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায়। সে যদি কোনো ফাউন্ড্রি বা রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো তাহলে তার স্ত্রীর ও ছেলেমেয়েদের পেনসান আরও বেশী হতো—তার চেয়েও বেশী হতো যদি সে খনিতে বা বিমানে কাজ করতো।

প্রতি ছেলেমেয়ের (যারা স্বাবলম্বী নয়) জন্য মাসিক ভাতা পায় বাপ-মা। প্রথমের জন্য মাসে ৭০ ক্রাউন, দুজনের জন্য ১৭০ ক্রাউন, তিনজনের জন্য মাসে ৩১০ ক্রাউন, সাতজনের জন্য ১,১৫০ ক্রাউন, এবং তারপরও প্রতিজনের জন্য মাসে ২২০ ক্রাউন। এই ভাতার উপর কোনো ট্যাক্স নেই।

পা ভেঙে পড়ে থাকলো আনটোনিন্ দু'মাস। চিকিৎসা হলো কারখানার হাসপাতালে। মাইনে এলো স্বাস্থ্য-বীমা থেকে—মাইনের ৯০%। একবছর পড়ে থাকলেও, মাইনে যোগাতো বীমা-প্রতিষ্ঠান—কারণ—"Everyone should be entitled to the protection of Health."

ইয়ানার চাকরি মোট সাতবছরের। দোকানের কাজ। গত সাতবছরে কামাই হয়েছে ১১ মাস—আরও বোধহয় এর মধ্যে ছুটি নিতে হবে—তৃতীয় অতিথি আসছে ঘরে।

১৯৫১ সালে ছুটি নিতে হয়েছিলো ৪ মাস, এডান্ হবার সময়, মাইনে দিয়েছে স্বাস্থ্য-বীমা। আবার ১৯৫৪ সালে, হেলেন্‌কা হবার সময়। এবারও চারমাস ছুটি নিতে হবে। ছুটিতে মাইনে মিলবে ৯০%। তৃতীয় সন্তান হবার পর আরও মিলবে ৬৫০ ক্রাউন। এমনি মিলেছিল এডান ও হেলেন্‌কা হবার পর। বাচ্চা হবার পর অনেক কিছু খরচা—জামা, বিছানা, প্যারাম্বুলেটার।

ইয়ানাকে এ-বছর ক'বারই কামাই করতে হয়েছে একবার নিজের অসুখ, একবার স্বামীর, আর একবার এডানের। এই কামাইয়ের জন্যও মাইনে এসেছে স্বাস্থ্য বীমা থেকে।

এডানের গতবছর ভারী অসুখ—নিউমোনিয়া হাসপাতালে পাঠালেও, বীমা থেকেই সব মিলতো ডাক্তার এসে বাড়ীতেই চিকিৎসা করলো। সব খরচ বীমার। ১৯৫৬ সালে প্রতি ৬৭ জনে এখানে একজ করে ডাক্তার, আর মাথাপিছু স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয়ে ৪০০ ক্রাউন (নিযুক্ত-ধন বাদে)।

ওদের বাড়ীতে বাথরুমে ছোটখাটো ওষুধ—মুখ ধোয়া চোখের, ভিটামিন ট্যাবলেট, এমনকি ইয়ানার জন্য একবা হর্মোন-এম্প্যুল—সবই হাসপাতালের দেওয়া।

ইয়ানার চোখে চশমা। চোখ দেখানো, চশমা—সব স্বাস্থ্য-বীমার খরচায়। তা ছাড়া পরিবারের সবাই যা বছরে অন্ততঃ দু'বার দাঁতের ডাক্তারের কাছে—দাঁ থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিতে। অবশ্য এর জন্যও খরচ নে কিছু পকেট থেকে।

মানুষের আয়ু বেড়েছে। ১৯১০ সালে দি প্রতি ১০০ জনে ৬০ বছরের উপরের লোক ৮'৭, আর আ তা ১২'৫।

পত্রিকা ORBIS-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

মাতাল

রচনা : আন্তন শেখভ

অনুবাদ : কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

লোকটা পাঁড় মাতাল।

মাতাল হলেও, নামকরা কারিগর হিসেবে কম খ্যাতি ছিল না গ্রিগরীর।

রুগ্না স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সে চলেছে শহরে—'জেমস্টভোর' হাসপাতালে। মাইল কয়েক পথ, রাস্তার অবস্থা ভালো নয়। বুড়ো গ্রিগরীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, একজন পিওনেরও কাছে পথ চলা দায়। বাতাসের সঙ্গে পাক খেতে খেতে বরফের ছোট-ছোট টুকরোগুলো ঠিকরে আসছে—যেন চোখে-মুখে ছুঁচ বিঁধছে। বরফের টুকরোগুলো আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে, না, মাটি থেকে ঠিকরে আসছে সঠিক কিছু বোঝা যায় না। মাঠ, ঘাট, টেলিগ্রাফের পোস্ট, গাছপালা সব বরফে ঢাকা পড়েছে, কিছুই দেখা যায় না। এমনকি যখন দমকা হাওয়া এসে লাগে গ্রিগরীর চোখে-মুখে, তখন গাড়ীর বম্‌টাও অদৃশ্য হয়ে যায় সামনে থেকে। শরীরের সব শক্তি দিয়ে, মাথাটা যথাসম্ভব এগিয়ে বরফের ভেতর থেকে পা তুলে ঘোড়াটা থপ্‌ থপ্‌ করে গাড়ীটা টেনে নিয়ে চলেছে। গ্রিগরী ধৈর্য ধরে থাকতে পারে না, মাঝে মাঝে পিঁড়ে ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, অকারণে ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকায়।

গ্রিগরী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "কাদিসুনে, একটু সহ্য করে থাক্‌। আমরা এখুনি হাসপাতালে পৌঁছব। ওরা তোর চিকিৎসা করবে…। ডাক্তারবাবু তোকে ওষুধ দেবেন, নয়তো লোকদের বলবেন তোর শরীর থেকে কিছুটা রক্ত বের করে নিতে। কিংবা নিজেই হয়তো স্পিরিট দিয়ে মালিশ করতে আরম্ভ করবেন। তুই তো জানিস্‌, ওতে ব্যথা দূর হয়, তোকে সারিয়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন ডাক্তারবাবু। কী করবেন জানিস্‌? চেঁচিয়ে, পা ঠুকে কেলেঙ্কারি করে বসবেন। দয়ামায়ায় শরীর ডাক্তারবাবুর, ভগবান ওঁর ভালো করুন…। তুই দেখিস্‌, হাসপাতালে পৌঁছবামাত্র ডাক্তারবাবু বাইরে ছুটে এসে বলবেন—'আরে! তোরা? কী…ব্যাপার কী? আরও আগে এলি না কেন? আমি কি মাইনে-করা চাকর যে তোদের মতো শয়তানদের পথ চেয়ে সারাদিন বসে থাকতে হবে? আরো তাড়াতাড়ি এলি না কেন? যা যা, বেরিয়ে যা…। কাল আসিস্‌, আজ আর আমি দেখতে পারব না।'"

গ্রিগরী ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকায়। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই আপন মনে বলে চলে—"ভগবানের নামে শপথ করে বলছি ডাক্তারবাবু, খুব সকালেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। দেখতেই তো পারছেন, কী বিশ্রী আবহাওয়া। কি করে ঠিকসময়ে আসি আপনিই বলুন? ভালো ঘোড়া হলেও ঠিকসময়ে আসতে পারতো না—বাজি রেখে বলতে পারি। আর আমারটা। চেয়ে দেখুন, ওটা কী একটা ঘোড়া? আমার নিজেরই লজ্জা করে।"…

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুটি করে বলবেন—'আমি তোকে ভালো করেই চিনি। একটা-না-একটা কারণ তুই দেখাবিই। সত্যি করে বল্‌, আসবার সময় ক'বার শুঁড়িখানায় ঢুকেছিলি?'…

আমি বলব—"আমি কি এতই পাষণ্ড, দয়ামায়া কি আমার শরীরে নেই? আমার বউ মরতে বসেছে, আর আমি ছুটবো সরাইখানায়। চুলোয় যাক্‌ সরাইখানা! আপনি এ-কথা কি করে বললেন ডাক্তারবাবু!"…

সব শুনে ডাক্তারবাবু তোকে ভেতরে নিয়ে যেতে বলবেন। আমি ডাক্তারবাবুর সামনে মাথা নীচু করে বলব—"ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, আমাদের আপনি দয়া করুন।

চাষাভুষো লোক আমরা, আমাদের ওপর রাগ করলে কি চলে? সত্যি কথা, আমাদের মতো লোকদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। দেখুন তো, এই জলের মধ্যেও আপনাকে বাইরে আসতে হয়েছে।"…

আমার কথা শুনে ডাক্তারবাবু তেড়ে মারতে আসবেন। বলবেন—'আমার পায়ের ওপর লুটোপুটি না খেয়ে বরং মদ খাওয়া ছাড়্, হতভাগা। ওহে বোকারাম, স্ত্রীকে একটু যত্ন কর্। সত্যি বলতে কি, তোকে চাব্কানো উচিত।'…

"হ্যাঁ, আমাদের চাব্কানো উচিত! আপনি আমাদের কত উপকার করলেন, মহা বিপদ থেকে বাঁচালেন, আপনার সামনে মাথা নীচু না করে, আপনার পায়ের ওপর লুটোপুটি না খেয়ে কি করে থাকি বলুন? ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—ফের যদি মদ খাই, আপনি আমার মুখে থুথু দেবেন, ডাক্তারবাবু। আপনার কী চাই ডাক্তারবাবু? যা চাইবেন তা-ই দেবো। সিগারেটের কেস্?…কাঠের বল্? কী-না করতে পারি আপনার জন্যে? ওরা আপনার কাছ থেকে সিগারেট-কেসের দাম নিয়েছিল, আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চাই না, ডাক্তারবাবু।"…

ডাক্তারবাবু হেসে বলবেন—'আচ্ছা আচ্ছা… তাই দিস্। তোর শরীরেও দয়ামায়া আছে দেখছি!'…

মনের উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্যে গ্রিগরী বিড়বিড় করে অনবরত বকে। বকবার মতো অনেক-কিছুই হয়তো আছে, ইচ্ছে করলে অনেক-কিছুই হয়তো বলতে পারে। কিন্তু হাজার রকমের চিন্তা ওর মাথায় এসে জড়ো হয়। সব-কিছু ওর গুলিয়ে যায়, ঠাণ্ডা-মাথায় কিছুই চিন্তা করতে পারে না। এতদিন ছন্নছাড়ার মতো দিন কাটিয়ে এসেছে, মাতাল অবস্থায় যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে, সুখ-দুঃখের কোনো বালাই ছিল না তার। আজ সে প্রথম দুঃখ পেল, আজ সে প্রথম ব্যথা অনুভব করলো—উদ্বেগহীন সরল মাতালটা আজ কাজের লোক হয়ে উঠেছে। ঐ বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যেও তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ঐ আপনভোলা লোকটা।

গতকালের ঘটনাটা মনে পড়ে। সন্ধ্যের সময় মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরে অভ্যাসমতো ঘুসি পাকিয়ে চীৎকার করবার সময় স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তেই গ্রিগরী চমকে ওঠে। ওরকম চাউনি এর আগে কখনো দ্যাখেনি, বেদম-মার-খাওয়া কুকুরের মতো ভীরু চাউনি স্ত্রীর। কিন্তু গতকালের চাউনি যেন ধ্যানস্থ মুনি-ঋষির মতো নিশ্চল, মৃতব্যক্তির চাউনির মতো ধীর স্থির। ঐ চোখ-দুটো দেখেই গ্রিগরীর কষ্ট হয়। হতচকিত গ্রিগরী প্রতিবেশীর ঘোড়াটা নিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে করে হাসপাতালে রওনা হয়। গ্রিগরী আশা করে যে, ডাক্তারবাবুর চিকিৎসার গুণে স্ত্রীর চাউনি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

গ্রিগরী স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে বলে, "শোন্, ডাক্তারবাবু যদি জিজ্ঞেস করেন যে আমি তোকে মারি কিনা, বলিস্—না, স্বামী আমাকে মারে না। সত্যি বলছি, তোকে আর মারব না। ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আর মারব না তোকে। মারব মনে করেই কি মারি রে, করবার কিছু থাকেনা ব'লেই মারি। আমি তোকে ভালবাসি রে, অন্য লোক হ'লে তোকে নিয়ে এত মাথা ঘামাতো না। আমি ব'লেই তোকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি…। দেখছিস্ তো, যথাসাধ্য চেষ্টা করছি তোর জন্যে। কী বিশ্রী আবহাওয়া! হে ভগবান, সবই তোমার ইচ্ছা, প্রভু। তুমি যদি সহায় থাক, কিছুতেই আমি পথ ভুল করবো না।…এখন কিরকম বোধ করছিস্? কথা বলছিস্ না কেন? কি রে, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?"

বউ-এর মুখের ওপর বরফের টুকরো এসে পড়ছে। টুকরোগুলো কিন্তু গলছে না। ওর মুখটা কেমন যেন লম্বা দেখাচ্ছে, ময়লা মোমের মতো মেটে-রং মুখের—শক্ত যেন পাথর…গ্রিগরীর কাছে সবটাই যেন অদ্ভুত মনে হয়।

গ্রিগরী চ'টে উঠে বলে, "বুড়ী, শোন্, ভগবানকে সাক্ষী করেই বলছি এসব। আর তুই…বোকা বুড়ী কোথাকার! যাঃ, তোকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাব না।"

গ্রিগরী লাগামটা আলগা করে ধরে। ভাবতে আর পারে না সে, স্ত্রীর দিকে তাকাতে ভয় পায়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা সত্ত্বেও, স্ত্রীর কাছে কোনো উত্তর পায় না। আরও ভীত হয়ে পড়ে গ্রিগরী, মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে সে স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই ওর হাতটা ধরে—বরফের মতো ঠাণ্ডা। ছেড়ে দিতেই, পাথরের মতো শক্ত হাতটা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে।

"হায় হায়, বউ মারা গেছে!" ককিয়ে কেঁদে ওঠে গ্রিগরী।

গ্রিগরী কাঁদে (যত বেশী না কষ্ট হয়, তার চের বেশী বিরক্তিকর ব'লে মনে হয়)।

ও মনে-মনে ভাবে, জীবনের ঘটনাগুলো কত তাড়াতাড়িই না ঘটে। দুঃখের আরম্ভ না হ'তেই সব শেষ হয়ে যায়। যখন সে মনে-মনে ঠিক করছে স্ত্রীর সঙ্গে একসাথে জীবন-যাপন করবে, স্ত্রীকে মনের কথা বলবে, আদরে-সোহাগে স্ত্রীর মন পাবার চেষ্টা করবে, ঠিক তখনই স্ত্রী মারা গেল…। চল্লিশটা বছর সে স্ত্রীর সঙ্গে আছে, কিন্তু মনের মিল ওদের কোনদিনই হলো না। ঐ চল্লিশটা বছর কেটে গেল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে। মদ খেয়ে, ঝগড়া ক'রে দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ করে কী হলো তার? জীবনটা

তো শুধু কেটে গেল অলক্ষ্যে। বুড়ীটা মারা যাবার পর মনে হচ্ছে স্ত্রীকে সে সত্যিই ভালবাসতো, শুধু-শুধুই অন্যায় অত্যাচার করেছে বেচারীর ওপর। স্ত্রীকে ছেড়ে একদিনও বাঁচতে পারবে না সে।

গ্রিগরীর একে একে সব কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে স্ত্রীর ভিক্ষে করার কথা। মনে পড়ে, পয়সার জন্যে সে স্ত্রীকে ভিক্ষে করতে পাঠাতো। স্ত্রীর ওপর অত্যাচার না করলে হয়তো স্ত্রী আরো দশবছর বাঁচতে পারতো। মরবার আগে পর্যন্ত ও স্বামীকে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর ব'লেই জেনে গেল। একি কম আক্ষেপ গ্রিগরীর?···এ কোথায় চলেছি আমি? চিকিৎসার প্রয়োজন তো শেষ হয়ে গেছে। ওকে যে কবর দিতে হবে।

গ্রিগরী ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নেয়, মনের আশ মিটিয়ে ঘোড়াকে পিটোয়। থেকে থেকে পথ আরো খারাপ হয়ে উঠছে। সামনের বস্তুটা আর দেখা যাচ্ছে না। কালো-কালো ছায়ার মতো সারি সারি গাছগুলো গ্রিগরীর হাতে আঁচড় কেটে চকিতে সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। সাদা কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

গ্রিগরীর মনে হয়—জীবনটা যদি আবার নতুন করে আরম্ভ করা যেতো···। চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা মনে পড়ে ওর। ম্যাট্রিয়োনার তখন ভরা-যৌবন, বনেদী বংশের মেয়ে সে। নাম-যশ শুনে বাবা-মা ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়। স্বামী-স্ত্রীর তখন কোনো-কিছুরই অভাব ছিল না, সহজেই সুখে সংসার চালানো যেতো। কিন্তু বিয়ের পরই গ্রিগরী মদ ধরে, পাঁড় মাতাল হয়ে উঠতে থাকে দিন-কে-দিন, সময়মতো বিছানা ছাড়তে পারে না। বিয়ের ঘটনাটা কেবল মনে আছে, আর সবই গেছে ভুলে। জীবন-ভোর কেবল মদ খেয়েছে, ঘুমিয়েছে আর ঝগড়া করেছে। চল্লিশটা বছর বৃথাই কেটে গেল।···

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। কুয়াশার সাদা-মেঘ ধীরে ধীরে ধূসরবর্ণ হ'য়ে উঠছে। গ্রিগরী ভাবে—কোথায় চলেছি আমি। ওকে কবর দিতে হবে, আর আমি গাড়ী চালাচ্ছি হাসপাতালের দিকে। না, সত্যিই আমি আনমনা হয়ে পড়েছি।

চাবুক মেরে ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। ঘোড়াটা কদম চালে গাড়ীটাকে টানতে আরম্ভ করে। চাবুকের পর চাবুক হাঁকায় গ্রিগরী···। গাড়ীর পেছন থেকে ধপ্ ধপ্ শব্দ ভেসে আসে। ওদিকে না তাকিয়েই গ্রিগরী বুঝতে পারে গাড়ীর গায়ে মড়ার মাথার ধাক্কা ওটা। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসে, বাতাস আরো কন্‌কনে মনে হয়···

গ্রিগরী ভাবে—নতুন ক'রে আবার জীবন আরম্ভ করবো। নতুন যন্ত্র কিনবো···অর্ডার নেবো···বউকে টাকা দেবো।

লাগামটা ছেড়ে দিয়ে ওটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে গ্রিগরী। লাগামটা তুলে নেবার বৃথা চেষ্টা করে, হাত নাড়তে পারছে না গ্রিগরী।

গ্রিগরী মনে-মনে ভাবে—ভাগ্যে যা আছে, তাই হোক। ঘোড়াটা রাস্তা জানে, নিজে-নিজেই পথ চিনে নিতে পারবে। এখন যদি একটা চাদর পেতাম—, কবর না-দেওয়া পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নিতে পারতাম।

গ্রিগরী চোখ বন্ধ ক'রে এলিয়ে বসে।

কিছু পরেই ঘোড়াটা থেমে পড়ে। চোখ খুলে সামনে একটা কালো জিনিসের মতো কী যেন সে দেখে—কুঁড়েঘর, হয়তো বা খড়ের গাদা।

বেশ বুঝতে পারছে, গাড়ী থেকে নেমে ওর দেখা উচিত গাড়ীটা কোথায় এলো। কিন্তু সারা দেহ অবসাদে ছেয়ে আছে, নড়ে-চড়ে বসবার ক্ষমতা নেই। এমনকি ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে মরে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে···। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে গ্রিগরী।

ঘুম ভাঙলে গ্রিগরী দেখে, সে একটা সাদা-কালি-দেওয়া বড় ঘরে শুয়ে রয়েছে। জানলা দিয়ে কড়া রোদ আসছে। ঘরের মধ্যে লোকজনদের ঘোরা-ফেরা করতে দেখা যায়।

গ্রিগরী বলে, “পুরোহিতকে ডেকে বুড়ীটার সৎকার করতে হবে আমাদের।”

“আচ্ছা, আচ্ছা—তুমি একটু চুপ করে থাক।” একজন ওকে বাধা দেয়।

বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। হাত-পা-গুলো যেন নড়তেই চায় না।

“আমার পা-দুটো কোথায়? কোথায় আমার হাত দুটো?”

“ওগুলো ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গেছে। তোর হাত-পা গুলোকে বল্—বিদায় বন্ধু, বিদায়···। আরে! কাঁদছি কেন? তুই তো এখনো বেঁচে আছিস্, ভগবানকে ধন্যবাদ দে। ষাটের বেশী বয়স হয়েছে, না রে?”

“বড় কষ্ট,' ডাক্তারবাবু। আমাকে ক্ষমা করুন আরো ছ'বছর যদি বাঁচতে পারতাম।”

“কিজন্যে?”

“ঘোড়াটা আমার নয়, ওটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে··· বুড়ীকে কবর দিতে হবে···। এই পৃথিবীতে ঘটনাগুলো কত তাড়াতাড়িই না ঘটে। ডাক্তারবাবু, বার্চের নক্সা কাটা সিগারেট-কেস্, একটা 'ক্রোকেট' সেট···”

হাত নাড়তে নাড়তে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মিস্ত্রী গ্রিগরী মারা গেল।

শিবপুরী

এলিফ্যাণ্টা

হৃষিকেশ সেন

এলিফ্যাণ্টা-গুহামূর্তি : অন্ধকাসুর-নিধনকালে শি

বোম্বে বন্দর থেকে সাতমাইল দূরে আরব সাগরের বুকে ছোট একটি দ্বীপ—তার উপরে পাথরের হস্তিমূর্তি দেখে ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজরা দ্বীপটির নাম দিয়েছিল 'এলিফ্যাণ্টা'। তেরো ফিট লম্বা আর সাত ফিট উঁচু সেই [illegible] মূর্তি যদিও বোম্বে শহরের যাদুঘরে সরিয়ে এনেছেন [illegible], দ্বীপের পুরানো নাম কিন্তু সেজন্য পরিবর্তিত হয়নি। শিবের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই ক্ষুদ্র দ্বীপ বুকে করে রেখেছে 'বারোশ' বছর পূর্বের ভারতীয় শিল্পমহিমার [illegible] অমূল্য নিদর্শন।

আমাদের পাঁচজনের [illegible] দলটিতে আমি এবং আমার ভাই ইতিপূর্বে বোম্বে এলেও, এলিফ্যাণ্টা দেখা হয়নি, তাই এবারের আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। খবর পেয়েছি, গেট-অব-ইণ্ডিয়ার সামনে থেকে ভোর হতেই শুরু হয় এলিফ্যাণ্টার পথে স্টীম-লঞ্চের অভিযান। শনি-রবিবারে যাতায়াতের ভাড়া মাথাপিছু তিনটাকা, অন্যদিন দশটাকা। বলা বাহুল্য, আমরা ছিলুম রবিবারের যাত্রী।

ভোরবেলা সামান্য খাবারের ঝুলি আর জলের বোতল কাঁধে গেট-অব-ইণ্ডিয়ায় পৌঁছে দেখি, সেখানে ইতিমধ্যেই ভীড় জমেছে। অনধিক ত্রিশজনের দল হলে অথবা অর্থের অভাব না হলে, নিজেদের আলাদা লঞ্চেরও বন্দোবস্ত করা যায়। মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি ও ততোধিক মিহি ধুতিতে সজ্জিত মাড়োয়ারীদের একটি দল সকলের আগেই বেরিয়ে গেলেন নিজস্ব ভাড়া-করা লঞ্চে বিপুল বাক্সভার সাথে করে।

প্রতীক্ষমাণ জনতার মাঝে কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় মহিলা দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। মধ্যবিত্ত-প্রধান বাংলাদেশের মতো মহারাষ্ট্রেও সর্বত্র স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার বহুল প্রসার। মহারাষ্ট্রীয় মেয়েরা কিন্তু বাঙালীদের মতো অবলা নন। বোম্বে, পুনা বা নাগপুরের ট্রামে বাসে কলকাতার 'লেডিজ সীট' তাঁরা প্রত্যাশা বা দাবি করেন না, ট্রেনে একা দূরপথে পাড়ি দিতেও পিছপা নন, আবার প্রয়োজন হলে গুণ্ডা-বদমাসকে ধমকে শায়েস্তা করতেও পটু। তাঁরা সাইকেলে

আপিস-আদালত করেন বটে, কিন্তু চুলের রমণীয় ফুলসাজও বর্জন করেননি সেজন্তে। আজ ভোরে যাঁরা গেট-অব-ইণ্ডিয়াতে জড়ো হয়েছেন, স্বরূপা হয়তো তাঁদের বলা যায় না, কিন্তু পোশাকে ও সজ্জায় সুরুচির পরিচয় আছে সর্বত্রই।

যাত্রা সুরু সময় আমাদের পরিচয় হল সেন-সাহেবের সাথে—এলিফ্যাণ্টার পুরাতত্ত্ব-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। পূর্বদিন বোম্বে এসেছিলেন, আজ আবার ফিরে যাচ্ছেন। পাশে বসে অল্পসময়ের মধ্যেই আলাপ জমিয়ে তুললেন তিনি। বললেন, "আপনাদের কারু হাতে সমুদ্র-যাত্রার রেখা থাকলে কিন্তু এবারে কেটে গেল। দু'মাইল হলেও, এ-ও তো আরব সাগর।"…

আমাদের ছোট্ট লঞ্চখানা নীল জলরাশি ভেদ করে ছুটে চলেছিল দু'ধারে সাদা ফেনা ছড়িয়ে। আর নভেম্বরের প্রভাতী রোদ তার উপরে পড়ে ঝলসে উঠছিল। সমুদ্রের বুকে কোথাও দেশ-বিদেশের বিরাট জাহাজ অপেক্ষা করছে যাত্রা-দিনের, কোথাও বা বন্দর-রক্ষী নৌবাহিনীর উদ্ধতশির ঘাঁটি মৈনাক-পর্বতের মতো আছে জেগে। দূর-দিগন্তে ইতস্তত দেখা যায় ছোট ছোট পাহাড়ী দ্বীপের নীলরেখা। তাজমহল হোটেল আর গেট-অব-ইণ্ডিয়া অনেকখানি পেছনে সরে গেছে, দেখা যাচ্ছে বোম্বে বন্দরের বিস্তৃত পরিধি, পটভূমিকায় এখনো মাথা উঁচু করে আছে রাজাবাই টাওয়ার। দূরে বিলীয়মান এই তটরেখার দিকে তাকিয়ে বিদেশগামী জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়ানো কত ভারতীয় যাত্রীর আঁখি সন্ধ্যার আকাশের মতোই বিষণ্ণ হয়ে ওঠে হয়তো!

সেন-সাহেব হাত বাড়িয়ে দেখালেন, ট্রম্বের উপকূলে বার্মা-শেল ও স্ট্যানভাক-এর তৈল-শোধনাগার—ভারতের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ়ীকরণের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। প্রভাত-সূর্যের আলোয় তাদের রৌপ্য-উজ্জ্বল রূপ চোখ ধাঁধায়। পাশেই ডিম্বাকৃতি-গঠন ভারতের আণবিক গবেষণাগার। লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে চেষ্টা চলেছে মানবজাতির কল্যাণসাধনের।…

সেন-সাহেবকে প্রশ্ন করলুম, "কতদিন আছেন এখানে?"

তিনি বললেন, "তা দু'বছরের বেশী হবে। আমার পূর্ববর্তী—তিনিও ছিলেন বাঙালী—কাটিয়েছিলেন তিরিশ-বছর। অর্থাৎ, এখান থেকেই রিটায়ার করেন।"

বললুম, "একরকম নির্বাসন বলুন—"

হেসে বললেন, "তা বলতে পারেন। তবে নির্জনতারও একটা মোহ আছে। আমি আর আমার স্ত্রী আছি, আর আমাদের অনাবরের লোক। মাঝে মাঝে বোম্বে আসি প্রয়োজনে, কিন্তু লোকালয় আর তার ভীড় যেন ভালো লাগে না। তাই তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফিরে যাবার চেষ্টা করি সর্বদা। আর, বর্ষার দিনে তো অনেকসময়ই বোম্বের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে-না। এখানকার বর্ষার দুর্দান্ত বিক্রমের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষদিকে আরব সাগর থেকে আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যের মতোই মেঘেরা উঠে আসে বোম্বের আকাশে, আর তারপর যে-বর্ষণ সুরু হয়, তা অন্ততঃ মাসতিনেক না কাটলে বন্ধ হয় না। সূর্যের মুখ দেখা যায় না, রাস্তাঘাট জলে ডুবে একাকার। তার উপর বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে সাইক্লোন—তেমন দিনে লঞ্চ চালাবার সাহস করবে কোন্ ওস্তাদ সারেং?"

সখী দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "তখন হঠাৎ কোনো বিপদ-আপদ হলে?"

সেন-সাহেব হাসলেন "ভগবান ভরসা।" কিছুক্ষণ আরব সাগরের ঢেউতোলা নিঃসীম জলরাশির দিকে তাকিয়ে রইলেন চুপ করে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "বিপদ-আপদ যে না হয়, তা নয়। এইতো আমার পূর্ববর্তী যিনি ছিলেন, একটা দুর্ঘটনায় তাঁর বাচ্চা ছেলেটি একদিন আগুনে ভীষণভাবে পুড়ে গেল। তখন বোম্বের বর্ষা পূর্ণ বিক্রমে রাজত্ব করছে। শহর থেকে একজন ডাক্তারও আনাতে পারলেন না। ফার্স্ট্-এইড দিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলেটি বাঁচল না।"…

সবাই চুপ করে ছিলুম। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সেন-সাহেবই পুনর্বার সুরু করলেন, "আরব সাগরের এই অংশটুকুর দিকে তাকালেই মনে হয়, এর জলে কত সাম্রাজ্যের ভাঙা-গড়ার কাহিনীই না মিশে আছে। অশোকের বিশাল রাজত্ব ভারতের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। তাঁর মৃত্যুর পর মৌর্য-সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও, কোঙ্কন উপকূলে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছেন মৌর্য-বংশেরই উত্তরপুরুষেরা। তাঁদের রাজধানীও ছিল সম্ভবতঃ আজকের এলিফ্যাণ্টাতে, তখন যার নাম ছিল শ্রীপুরী। তারও পূর্বে একে বলা হত গড়পুরী। সপ্তম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশী—যিনি হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেছিলেন—তাঁর শত শত যুদ্ধজাহাজ নিয়ে, আক্রমণ ও দখল করলেন শ্রীপুরী। তারপর একে একে এখানে দেখতে পাই রাষ্ট্রকূট, কল্যাণের চালুক্য আর দেবগিরির যাদবদের। মুসলমান-যুগে আলাউদ্দীন খল্‌জী। ষোড়শ শতাব্দীতে আবার

পট-পরিবর্তন—এবার পর্তুগীজরা মালিক। পর্তুগীজদের হাতে যখন এল, তখনো এখানকার ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি মোটামুটি অক্ষতই ছিল। অবাক হয়ে তারা ভেবেছে এসব নিশ্চয়ই কোনো অস্বাভাবিক আধিভৌতিক শক্তির সৃষ্টি। এসময়ই শুরু হল এলিফ্যান্টার দুর্দিন। গুহাগুলি ব্যবহার হত তাদের গরু-ঘোড়ার আশ্রয় হিসেবে, ফুর্তি করত ওখানে গরু-ঘোড়ার দল। মাঝে মাঝে গুহার ভিতরে মূর্তিগুলোর উপর গোলা ছুঁড়ে হাতের টিপ ঠিক করত। কামানের আওয়াজে বিরাট প্রতিধ্বনি উঠত, আর ওরা পৈশাচিক আনন্দে উন্মত্ত হত। তাতেও খুশী না হয়ে আরো সহস্র উপায়ে মূর্তিগুলির ধ্বংসের চেষ্টা করেছে। ক্ষতির পরিমাণ ওখানকার বিকলাঙ্গ অর্ধভগ্ন মূর্তিগুলি দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।”…

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। সঙ্গী ডক্টর চৌধুরী মন্তব্য করলেন, “আর কিছুদিন পর্তুগীজদের হাতে থাকলে এখানকার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকত না। ওদের হাত থেকেই বোধহয় ইংরেজরা বোম্বের সাথে এলিফ্যান্টাও পেয়েছিল দ্বিতীয় চার্লসের বিয়ের যৌতুক?”

সেন-সাহেব হাসলেন। বললেন, “না, মাঝখানে আছেন মারাঠারা। পর্তুগীজ জলদস্যুদের শাসন করার প্রয়োজনেই শিবাজী-পুত্র শম্ভুজী ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। ইংরেজরা দ্বীপটি দখল করেন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে।”

সেন-সাহেবের সাথে আলোচনা বেশ জমে উঠেছিল। ইতিমধ্যে লঞ্চের দ্রুতগতি কমে এসেছে। দূর-দিগন্তে সমুদ্রের মাঝখানে যে সবুজ পাহাড়টা মাথা উঁচু করে ছিল, সে যে হঠাৎ কখন সামনে ছুটে এসে আমাদের দৃষ্টির পরিধিটুকু ঢেকে দিয়েছে, খেয়াল করিনি। পাহাড় থেকে একটি কাঠের সেতু নেমে এসেছে সমুদ্রের জলে, আর আমাদের জলযান গিয়ে থেমেছে সেখানে।

অন্যান্য যাত্রীদের সাথে আমরাও চললুম পাহাড়ে। সিঁড়িপথ উঠে গিয়েছে উপরে। আশা করেছিলুম সেখানে হঠাৎ দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে অপরূপ ভাস্কর্য, মন নিমেষে আপ্লুত হবে তাদের দর্শনে—যেমন হয়েছে সাঁচীতে, যেমন হয়েছে অজন্তা-ইলোরাতে, যে অনুভূতি এসেছে জ্যোৎস্নারাতে তাজের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তার পরিবর্তে যে এলিফ্যান্টার প্রবেশপথে বীভৎসের দৃশ্য অপেক্ষা করতে পারে আমাদের জন্যে, তা মোটেই কল্পনায় আসেনি। সেখানে তখন সদ্য-আগত পনেরো-কুড়িজন যুবক-যুবতীর একটি দল ‘রথং বেহি’ রূপে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের পথরোধ করে আছে পুরাতত্ত্ব-বিভাগের দু'তিনটি দ্বাররক্ষী—তাদের ভাবভঙ্গী স্পষ্টতঃই বিচলিত। ছেলেদের সকলেরই ট্রপিক্যাল পাৎলুনের উপর হাওয়াই-খ্যাত জামা। তাতে শোভা পাচ্ছে চিত্রতারকার ঠোঁট আর চোখ, বাঘ-সিংহের মুখ, প্যারীর বিজয়তোরণের আধখানা—আরো কত বিচিত্র দৃশ্য! অধিকাংশ মেয়েদেরই নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদ হাঁটু পর্যন্ত সরু প্যান্ট; উর্ধাঙ্গে হাতকাটা টাইট শার্ট, আবৃত করার পরিবর্তে, নারীদেহের সংকেত-বিস্তারেই সাহায্য করছে। নখাগ্র এবং ওষ্ঠরঞ্জনেও নেই ত্রুটি। সঙ্গে খাবারের ঝুড়ি, জলের ফ্লাস্ক, গ্রামোফোন, আরো কত কি। কয়েকজন গাছের ডাল ভেঙে তৈরী লাঠি আস্ফালন করে বিশেষ একটা উত্তেজনাময় আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা কী বুঝে দেখবার জন্যে সেন-সাহেবের সাথে আমরাও এগিয়ে গেলুম।

দ্বাররক্ষীরা তাদের কর্তাকে দেখে যেন অনেকখানি ভরসা পেয়েছে মনে হল। একজন জানালে, এই সাহেবরা ‘খানা বাজা’ সব নিয়ে গুহার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন, তাদের মানা শুনতে রাজী নন।

সেন-সাহেব দলটিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, গুহার সীমানার মধ্যে খাবার বা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। এই মর্মে পুরাতত্ত্ব-বিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তিও সেখানে বড় বড় হরফে লেখা ছিল। কিন্তু দলটি সে-সব কিছু মানতে রাজী আছে মনে হল না। দুটি তরুণ-তরুণী হাত ধরাধরি করে নাচের সাথে গান শুরু করলে:

We are the king and queen,
You all follow us.

মনে হল, সমস্ত দলটি বুঝি জোর করেই ঢুকে পড়বে। উত্তেজনায় সেন-সাহেবের সুগৌর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তিনি তাদের সামনে এগিয়ে গিয়ে দৃঢ়স্বরে ইংরেজীতে বললেন, “আমি তোমাদের কিছুতেই এ-জায়গায় মর্যাদা নষ্ট করতে দেব না।”

ইতিমধ্যে একজন বন্দুকধারী সেপাইও এসে প্রবেশ-দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দলটি একবার তাকে দেখলে। সেন-সাহেবের কণ্ঠস্বরেও হয়তো কিছু ছিল। নাচগান বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে আলোচনা হল তাদের। তারপর ধীরে ধীরে সবাই গুহার পথ ছেড়ে খানিকটা দূরের চায়ের দোকানের দিকে অগ্রসর হল এবার।

সেন-সাহেব স্মিতমুখে জানালেন এরকম অভিজ্ঞতা প্রায় প্রতি শনি-রবিবারেই তাঁকে সঞ্চয় করতে হয়। বললেন, "শুধু এখানেই নয়, কার্লা কাহ্নেরী বা বোম্বের সর্বত্রই এই একই অবস্থা। চায়ের দোকানের কাছে দেখে আছেন রক্-এন্-রোল্-এর সাথে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত উদ্দাম নৃত্য চলছে। ভদ্ররুচিসঙ্গত না এরকম আরো অনেক-কিছুও হয়ত নজরে পড়বে।"

বললুম, "এসব দেখে মনে হয় ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবার সময় তাদের সকল আবর্জনা বুঝি এই আরব সাগরের উপকূলেই পরিত্যাগ করে গিয়েছে।"

সবাই হাসলেন। সেন-সাহেব বললেন, "কিন্তু আপনারা সব দেখে আসুন এইবেলা।" বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন তাই আমাদের সাথে যেতে পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। অনুরোধ জানালেন, যেন প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁর কোয়ার্টারে আমরা অবশ্যই আসি। তাঁর নির্দেশে একজন লোক আমাদের ঝোলাঝুলি সব নিয়ে গেল সেখানে। তিনিও তার সাথে গেলেন। আমরা অগ্রসর হলুম।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, সেন-দম্পতির অতিথিপরায়ণতা আমাদের মুগ্ধ করেছিল। অতি অল্পসময়ের পরিচয় সত্ত্বেও তাঁদের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার দীর্ঘকাল মনে থাকবে। শ্রীমতী সেনও তাঁর স্বামীর মতোই উচ্চশিক্ষিতা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী তাঁর মনের সরসতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি বিন্দুমাত্র।

ইতিহাস বলে, রাষ্ট্রকূট নৃপতিদের আনুকূল্যে নাম-া-জানা ভাস্করের দল প্রস্তুত করেছিলেন দেবাদিদেব হাদেবের এই মন্দির কঠিন পাথরের পাহাড় কেটে, আর হাদেবেরই নানা কাহিনীর রূপায়ণে অলংকৃত করেছিলেন র প্রাচীরগাত্র। সে-সব ভাস্করের ব্যক্তি-সত্তা হারিয়ে গছে অতীতের কুয়াশায়, কোথাও তাঁরা রেখে যাননি কানো পরিচয়। শুধু তাঁদের সৃষ্টি আজিও দাঁড়িয়ে আছে র্শককে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে দেবার জন্যে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাস্কর ও শিল্পীদের সাথে আমাদের পরিচয় হয় জন্মান্তরের মানুষ রূপে। তাঁদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, র্মকৃতি আর আশা-আকাঙ্ক্ষা, মহত্ত্ব আর দোষত্রুটি— সবই উত্তরপুরুষদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। আর, ভারতীয় শিল্পী যেন এক রহস্যময় পুরুষ— আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে মগ্ন হয়ে আছেন তাঁর সাধনায়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছুতেই আমাদের নেই কোনো অধিকার। নিজেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে শুধু আপন সৃষ্টির মাঝে বেঁচে থাকার এই যে নির্লিপ্ত নিষ্কাম চেষ্টা, এই-ই ছিল ভারতের শাশ্বত আদর্শ।

ইলোরা এলিফ্যাণ্টা সর্বত্রই শিবের বিভিন্ন রূপকে এই ভাস্করের দল বারংবার অমর করে রাখবার চেষ্টা করেছেন কঠিন পাথরের বুকে। সপ্তম শতাব্দীতে উত্তর-ভারত যখন হূন-আক্রমণে পর্যুদস্ত হচ্ছিল, আর পতনোন্মুখ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু শক্তি নিয়ে নিরলসকর্মী স্কন্দগুপ্ত চেষ্টা করছিলেন বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধের, সে সময় যে-সব উদ্বাস্তু শিল্পী ও ভাস্কর দক্ষিণ-ভারতের পথে যাত্রা করেছিলেন, ইলোরা ও এলিফ্যাণ্টা হয়তো তাঁদেরই স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁদের শিল্পধারায় পূর্বগামী বৌদ্ধ-শিল্পীদের যথেষ্ট প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। শিবের ধ্যানময় মূর্তি—পৃথিবীর দুঃখ-দৈন্য-মালিন্য থেকে নির্লিপ্ত তাঁর মুখভাবের রূপায়ণে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি গঠনের রীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। শুধু তফাত হচ্ছে—বুদ্ধকে সাধারণতঃ দেখানো হয়েছে সন্ন্যাসীর বেশে, তাঁর মাথায় জটামুকুট, দেহ নিরাভরণ, অলংকার-বর্জিত। আর, এলিফ্যাণ্টার প্রধান গুহার প্রবেশমুখে বাঁ-দিকে যোগীশ্বর শিবের যে মূর্তি আমরা দেখতে পাই, সেখানে তিনি রাজরাজেশ্বর। তাঁর শিরশোভা বহুরত্নালংকারভূষিত কীরিট-মুকুট, কণ্ঠে রত্নহার। এলিফ্যাণ্টায় সর্বত্রই শিবের এই রূপ—এখানে তিনি বাংলাদেশের ভিখারী ভোলানাথ নন। যোগীশ্বরের কাঁধের কাছে ভাঙা দু'খানা হাত পর্তুগীজ বর্বরতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মুখে বুদ্ধের সেই শান্ত সমাহিত প্রসন্ন-শ্রী, যা দেখে এসেছি অজন্তার আর ইলোরার বৌদ্ধ গুহাগুলিতে। একই শিল্পশৈলীর ভাস্কর রাজধর্মের পরিবর্তনের সাথে আপন দক্ষতাকেও সহজেই প্রয়োগ করেছিলেন বুদ্ধের পরিবর্তে শিবমূর্তি-গঠনে। তাই বিষ্ণুর পরিবর্তে শিব ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের দিনে ভাস্করদের এত প্রিয়। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পধারায় পুনরুজ্জীবনের পথিকৃৎ হ্যাভেল-সাহেব আশ্চর্য হয়ে বারংবার ভেবেছেন, জগতে অতুলনীয় বুদ্ধের পরমস্বর্গীয় মুখভাবের আদর্শ ভারতীয় শিল্পী কোথায় খুঁজে পেলেন। অবশেষে একদা গীতার একটি শ্লোকে তিনি দেখলেন বর্ণনা রয়েছে, আত্মযোগরত সাধকের চিত্ত হবে বায়ুশূন্যস্থানে নিষ্কম্প দীপের ন্যায়। হ্যাভেল বুঝলেন, এই নিষ্কম্প দীপের আদর্শ ই অনুপ্রাণিত করেছে ভারতীয় ভাস্করকে বুদ্ধ-মুখের রূপায়ণে। যোগময় শিবের বর্ণনায় কালিদাসও বলেছেন—

এলিফাণ্টা-গুহামূর্তি : মহাযোগী মূর্তি । [illegible] শিব

জলপূর্ণ মেঘের ন্যায়, নিস্তরঙ্গ জলাধারের ন্যায়, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় তিনি শ্বাস রুদ্ধ করে তপস্যারত। মহাযোগী শিবের রূপকায়া-নির্মাণে এই ছবিই ছিল ভাস্করের চোখে।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করেছেন। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। শোকাকুল শিব দেবদারুতলে বসেছেন তপস্যায়। দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে তাঁর তপঃভঙ্গ করতে মদন এসেছেন সখা বসন্তকে সাথে করে। আড়াল থেকে মদন দেখেন যোগমগ্ন মহাদেবকে। বীরাসনহেতু তাঁর দেহ ঋজু ও আয়ত। কোলে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় দু'খানি হাত ঊর্ধ্বমুখী, আর সেজন্য উভয় স্কন্ধ ঈষৎ নমিত। তাঁর জটারাশি সর্পবদ্ধ, কর্ণলোভা রুদ্রাক্ষ, চোখে যেন কিঞ্চিৎ ঔজ্জ্বল্য, স্তব্ধ নিস্পন্দ, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর, নাসিকা অধোমুখী হয়ে লক্ষ্যে স্থির। একটু পরেই আসবেন কুমারী উমা নিত্যকার মতো ফলে-পুষ্পে পূজার উপচার সাজিয়ে স্বর্ণপাত্রে। মদনের দেখা সেই স্বর্গীয় দৃশ্যই যেন ভাস্কর অক্ষয় করে রেখেছেন এখানে চিরকালের জন্যে। চারিদিকে দেবদেবীরা বন্দনারত। সেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রকেও দেখা যাচ্ছে। ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার মনেও কালিদাসের প্রশ্নই শুধু উত্তর খোঁজে :

> স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং কেনাপি কামেন তপশ্চচার

—সকল তপস্যার ফলদাতা আজ কোন্ গুপ্ত উদ্দেশ্যে স্বয়ং তপস্যামগ্ন ?

যোগীশ্বর শিবের বিপরীত দিকে প্রবেশপথের ডানধারে

নটরাজ অষ্টভুজ শিব। দেহের নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত, হাতগুলির একখানিও আর অক্ষত নেই। তবুও সেই অর্ধভগ্ন মূর্তি তার মহিমময় কল্পনা আর অসাধারণ রূপগ্রহে দ্রষ্টাকে অভিভূত করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আজ নটরাজের নৃত্যের তালে তালে দুলে উঠেছে ধ্বংসের উন্মাদনায়, চারিদিকে বন্দনারত দেবতা, ঋষি ও কিন্নরগণ। তাঁদের মাঝে আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র—আছেন পার্বতী, আছেন শূলপাণি কুমার কার্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা গণেশ। পদমূলে বসে বাদক মৃদঙ্গতায় তুলছে বজ্রনির্ঘোষ। কিন্তু তাণ্ডব-নৃত্যরত উদাসীন শিবের নেই কোনো ভ্রুক্ষেপ। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাঁর মুখভাব প্রশান্ত, আত্ম-সমাহিত। একটি ডানহাত বুকের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে ললিত নৃত্যের ভঙ্গীতে। আর একটিতে সর্পলাঞ্ছিত দণ্ড। অন্যান্য হাতগুলির সঠিক অবস্থান আজ আর জানবার উপায় নেই। ডান পা উঠে আছে নাচের গতিতে, দ্রুত আবর্তনে চুলের রাশি লুটিয়ে পড়েছে কাঁধের উপরে, পরিধানের বস্ত্র হচ্ছে আন্দোলিত। মাথায় রত্ন-মুকুট, সর্বাঙ্গে কেয়ূর, কঙ্কণ প্রভৃতি অলঙ্কার। অর্ধভগ্ন নটরাজ-মূর্তির দিকে তাকিয়ে পরম বিস্ময়ে হ্যাভেল বলেছেন: "Though the rock itself seems to vibrate with the rhythmic movement of the dance, the noble head bears the same look of serene calm and dispassion which illuminate the face of the Buddha."

এবার আমরা প্রবেশ করলুম গুহার অভ্যন্তরে। বিরাট বিরাট স্তম্ভের সারি ভিত্তি থেকে উঠেছে। ইলোরার বিভিন্ন গুহার স্তম্ভগুলির নির্মাণকৌশল ও অলঙ্করণের সাথে এদের আছে লক্ষণীয় সাদৃশ্য।

বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগে ভারতের ইতস্তত এ ধরনের যে বিরাট গুহাগুলি নির্মিত হয়েছিল, তাদের পার্বত্য-প্রাসাদ আখ্যা দিলেই বোধহয় ঠিক হত। অমানুষিক পরিশ্রম ও অবিরাম স্থাপত্য-কুশলতার নিদর্শন এই গুহাগুলি। এদের প্রস্তুতি ও অলঙ্করণ কত বছর ধরে চলেছিল কে জানে। হয়ত যে শিল্পী ও ভাস্করের দল শুরু করেছিলেন, আপন সাধনার সমাপ্তি দেখা সম্ভব হয়নি তাঁদের। কিন্তু পূর্বসূরীদের কল্পনা ও আদর্শ অব্যাহত বহন করে নিয়েছেন নতুনের দল। অতীতের সেই নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীদের স্মরণ করে ক'জন দর্শক আজ এখানে আসেন, জানতে ইচ্ছে করে। চারদিকে শুধু ফূর্তি-অন্বেষী পিকনিকারদেরই ভীড়। তাদের মাত্রাহীন কোলাহলে নেই ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি কোনো শ্রদ্ধাশীল অনুভূতি। প্রবেশমুখে আমাদের অতিক্রম করে গেলেন একটি পাঞ্জাবী পরিবার। কানে এল, একজন মন্তব্য করছেন—"A rotten cave—শুধুই সময় নষ্ট।" ডক্টর চৌধুরী বললেন, "এসব যাত্রীরা এলিফ্যান্টাকে কি রেহাই দিতে পারেন না? বোম্বেতে পিকনিকের জায়গার তো অভাব নেই।"

চারিদিকের দেয়ালে অবিচল পাষাণ-দেবমূর্তিরা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন আজকের দিনের ক্ষুদ্র মানুষদের প্রতি, যারা চকখড়ি দিয়ে নিজেদের নাম লিখে রাখছে ইতস্তত। অমরত্ব লাভের কী হাস্যকর প্রয়াস! এদের অশোভন আচরণে উৎকট হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধাহীনতা। বললুম, "হাজার বছরেরও আগে যে শিল্পীর দল লোকালয় থেকে দূরে এই নির্জন দ্বীপে নিজেদের নির্বাসিত রেখেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে, আজকের কুৎসিত কলরবের আশঙ্কা তাঁদের মনে জাগলে হয়ত অপমানে লজ্জায় আপন সৃষ্টিকে আরব-সাগরের অতলে বিসর্জন দিতে তাঁরা দ্বিধা করতেন না। বিদেশী পর্তুগীজরাও বুঝি আধুনিক বোম্বের নায়ক-নায়িকার মতো অপমান করেনি ভারতের এই প্রাচীন শিল্প-কীর্তিকে।"

সুশান্ত দাশগুপ্ত বললেন, "এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? এই অভব্য ব্যবহারই তো বোম্বের চরিত্র, যে বোম্বের না আছে কোনো গৌরবময় ঐতিহ্য, না কোনো মননশীল বর্তমান অথবা কৃষ্টিধর্মী ভবিষ্যৎ। মহারাষ্ট্র বা গুজরাটের জাগরণের পেছনেও অনুপস্থিত বোম্বের আত্মার সংযোগ। সে-ভূমিকা গ্রহণ করেছে পুনা ও আহমদাবাদ।"

ডক্টর চৌধুরী বললেন, "ঠিক বলেছেন। এখানকার দিন করে কুবেরের আরাধনা, আর রাতে চলে মন ভোলাবার চেষ্টা বারনারীর রঙিন আলোকসজ্জায়। বোম্বেওয়ালাদের ভাগ্য ওঠা-নামা করে শেয়ার-বাজারের 'তেজী-মন্দী'র সাথে। এরা কোণার্ক-খাজুরাহো যান অশ্লীল মূর্তি দেখতে; অজন্তা-ইলোরা এদের কাছে শুধুই আউটিং মাত্র।"

মনে পড়ে অজন্তাতে দেখা পেয়েছিলাম এক অশীতিপর বৃদ্ধ ইংরেজের, যাঁর সাথে আলাপের পর নিজের ভারতীয় পরিচয়ে গর্ববোধ করেছি সেদিন। বয়স আর জরায় তাঁর দেহ প্রায় ভেঙে পড়েছে, ব্যাধিতে শিরদাঁড়া গিয়েছে বেঁকে, অথচ এখনো অদম্য উৎসাহের সাথে পরিক্রমা করে চলেছেন তিনি ভারতের শিল্প-তীর্থগুলি। তাঁর সাথে ছিল পুরাতত্ত্ব-বিভাগের একটি পিয়ন। সে-ই জানালে, ক্যামেরা নিয়ে

সাহেব হয়তো সকালে একটি গুহাতে প্রবেশ করলেন, তারপর সারাদিন কাটে সেখানেই তন্ময় হয়ে, আহারের কথা মনে থাকে না, বিশ্রামেরও অনুভব করেন না কোনো প্রয়োজন। আগ্রহ নিয়ে আলাপ করলুম ভদ্রলোকের সাথে। সাহেব জানালেন, পৃথিবীর বহু জায়গায় তিনি গিয়েছেন, আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গমতম স্থানও বাদ যায়নি। কিন্তু ভারতের প্রাচীন শিল্পকীর্তিগুলির মতো আর কিছুই তাঁকে এত প্রভাবিত করতে পারেনি। বললেন, 'সারাজীবনে যা সঞ্চয় করেছি স্মৃতিচিহ্ন, সব একদিন বৃটিশ মুজিয়মে দিয়ে যাবার ইচ্ছে রাখি।' সেই বিদেশীর নিষ্ঠা আর আন্তরিক শ্রদ্ধার পাশে স্বজাতীয়দের আচরণে লজ্জায় মাথা হেঁট করে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলুম।

বাইরের সূর্যালোক থেকে ছায়ান্ধকার গুহার ভিতরে প্রবেশ করে হঠাৎ যেন চোখের নজর ঝাপ্সা হয়ে আসে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই মণ্ডপ পেরিয়ে, আর আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক অপরূপ দৃশ্য—ভারতীয় ভাস্কর্যের পরিপূর্ণ বিকাশের নিদর্শন—ত্রিমুখ মহেশমূর্তি। শিব এখানে একাধারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ সকল গুণের আধার। এই ত্রিমূর্তিই প্রহরীরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্বোজরাজ্যে ভারতীয় উপনিবেশ-নগরী অঙ্কোরধামে। মাঝখানে শান্তসৌম্য স্রষ্টা—বাঁ-হাতে সৃষ্টির কলস, মাথায় জটারাশির উপরে শোভা পাচ্ছে মণি-মুকুট। কানে মকরকুণ্ডল, বিশাল বুকে ছড়িয়ে আছে রত্নহার। বাঁ-দিকে বিশ্বের প্রশান্তমুখ রক্ষক। শিব এখানে বামদেব—সৌন্দর্যের আধার—বিশ্বপালয়িত্রী মোহময়ী শ্রীরূপ। তাঁর কানে শঙ্খপত্র। মুক্তাখচিত শিরস্ত্রাণে বাধা মানেনি কপালের চূর্ণকুন্তল। হাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম। ডানদিকে সৃষ্টিসংহারকারী রুদ্ররূপ—অঘোর ভৈরবের ক্ষুধিত ওষ্ঠাধরে এখনো চিহ্নিত হয়ে আছে রক্তের ধারা। সদাস্থায়ী একটা অন্ধকার ছায়া সে-মুখকে করে তুলেছে আরো ভয়াল। তাঁর মাথার মুকুটের মধ্যে এসেছে বিষধর সাপ আর মৃত্যুপ্রতীক নরকপাল। ডানহাতে জড়িয়ে আছে বিস্তৃতফণা কৃষ্ণসর্প।

প্রায় আঠারো ফিট উঁচু সেই বিশাল মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা যেন অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভূত হয়। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা: পাথরের ভাষার কাছে মানুষের ভাষা এখানে পরাজিত। জানতে ইচ্ছে করে, সত্যই কি এসব মানুষের তৈরী অথবা সপ্তম শতাব্দীর তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ যে ভারতের হিন্দু-বৌদ্ধ ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলেছেন দেব-যক্ষ-নাগগণের কীর্তি—তাই সত্যি? যে অজানা মহান শিল্পীদের বিরাট কল্পনা রূপলাভ করেছে এই বিস্ময়কর সৃষ্টিতে, তাঁরা যেন শুরু করেছিলেন মানবের অমিত শক্তিতে, আর শেষ করেছেন নিপুণ শিল্পীর সূক্ষ্ম দক্ষতায়। সৃষ্টির সাথে সেই স্রষ্টাদের উদ্দেশেও মাথা নত হয়ে আসে অজান্তে, আশেপাশে অসংখ্য দর্শকের কোলাহল স্তিমিত হয়ে যায়, মনে হয় এখনই হয়ত এই গুহার প্রস্তর-প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হবে শিবমহিম্ন-স্তোত্র :

বহলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ।
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ।
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ। *

এই ত্রিমূর্তি শৈবরূপধ্যানের চরম পরিণতি। প্রকৃতির মাঝে শুধু সীমাহীন শক্তির পূর্ণবিকাশ। এই দেবতাকে উদ্দেশ করেই সংহিতার কবি প্রণাম জানিয়েছেন : "পূর্বং চ মে পূর্বতরং চ মে"—তুমি আমার পূর্ব, তুমিই আমার পূর্বতর। বৈদিক আর্যদের কিন্তু শিবের পূজা ছিল অজ্ঞাত। আফগানিস্তানের কঠিন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তাঁরা একদিন উত্তর-ভারতের সমতলে নেমে এসেছিলেন প্রবল বন্যাস্রোতের মতো ; তাঁদের সাথে ছিল গরু-ছাগলের পিঠে চাপানো যাযাবরের সংসার, আর কণ্ঠে ছিল প্রকৃতির বন্দনা-গান। ভারতের সিন্ধুনদ-বিধৌত অঞ্চলের প্রবেশ-মুখে এই যুদ্ধপ্রিয় যাযাবরদের পরিচয় হল এক অতি সুসভ্য জাতির সাথে। সুগঠিত নাগরিক জীবনের প্রতি আর্যদের ছিল গভীর বিদ্বেষ। অশ্বপৃষ্ঠে অস্ত্রহাতে মূর্তিমান ধ্বংসের মতো তাই তাঁরা নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিলেন সিন্ধু অঞ্চলের শহরগুলিকে। পরাজিত স্থানীয় অধিবাসীদের 'খর্বনাসা' 'কৃষ্ণচর্ম' বলে বিদ্রূপ করলেন আর্যরা, কারণ তাঁদের নিজেদের নাক ছিল সুগঠিত, গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল গৌর। জয়ের গর্বে বিজিতদের আখ্যা দিলেন 'দানব'

---

* রজোগুণ যোগে তুমি সৃষ্টিকর্তা,
চরণে তোমার প্রণাম লও।
তমোগুণ যোগে সংহারক তুমি,
হে হর। চরণে প্রণতি লও ;
সত্ত্বযোগে দেব সৃষ্টির পালক,
নমস্কার করি চরণে মৃড়।
নমি শিবরূপে ত্রিগুণ অতীত,
চরণে প্রণতি লহ মৃড়।

'রাক্ষস' 'দৈত্য'। খ্রীষ্টজন্মের চারহাজার বছর পূর্বের এই প্রাক্-আর্য ভারতে আরাধ্য দেবতারূপে শিবের আসন যে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত, তার প্রমাণ আছে মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত পশুপতি ও যোগীশ্বর এবং হরপ্পার নটরাজ মূর্তিতে। পুরাণে তাই দেখি অনার্যপূজিত শিব ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণের দেবতা, অসুরপতি বাণের আরাধ্য। আর্যশক্তির প্রতীক বিষ্ণু বা তাঁর অবতার বারংবার পরাজিত করেছেন এই শিবভক্তদের, ভারতে আর্য-সাম্রাজ্য প্রসারের দিনে।

কিন্তু ভারতের মাটিতে স্থির হয়ে বসবাসের সাথে অনুকূল পরিবেশে সুপ্ত আর্যমনীষা ধীরে ধীরে জেগে উঠল। বিজিত কিন্তু সজীব অনার্য-সংস্কৃতি সে-বিকাশকে করল বিশেষ প্রভাবিত। দীর্ঘদিন যে সংমিশ্রণ চলেছিল বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে, তারই পরিণতিতে ঋক্‌বেদের দেবতাদের গুরুত্ব গেল হ্রাস। আকাশের অধিপতি দ্যৌ, মেঘ ও বজ্রের অধিপতি ইন্দ্র বা বায়ুদেবতা পবনের উদ্দেশে আর উৎসর্গীত হলনা যজ্ঞভাগ। উষামুহূর্তে যে-সূর্যদেব আখ্যা পেয়েছিলেন মিত্র, অস্তগামীরূপে যাঁর পরিচয় ছিল বরুণ, আর আকাশ-পরিক্রমার পথে যিনি পূজিত হতেন বিষ্ণুনামে, তিনি পরিণত হলেন সামান্য দেবতায়, আর বিশ্বপালকরূপে আবির্ভূত হলেন তাঁরই অংশ বিষ্ণু নবপরিচ্ছদে আর বর্ধিত মর্যাদায়। ঝড়ের দেবতা রুদ্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল না বেদে, কিন্তু কালক্রমে বিদ্যুৎ ও বহ্নির অধীশ্বর অগ্নির সাথে তাঁর মিলন হল একই দেবতারূপে, আর সে আসন অধিকার করলেন শিব—তিনিই হলেন একাধারে শুভঙ্কর শিব ও প্রলয়ঙ্কর রুদ্র।

উত্তর-বেদযুগের উপনিষদে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের পরিবর্তে ধীরে ধীরে জন্ম নিল হিন্দু-দর্শন, ঋষিদৃষ্টিতে প্রতিভাত হল বহু বৈসাদৃশ্যের আবরণে একই পরমাত্মার রূপভেদ। ভারতীয় চিন্তাধারার এই বিকাশের সাথে লোকধর্মও হচ্ছিল বিবর্তিত। সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি, স্থিতির ঈশ্বর বিষ্ণু ও প্রলয়ের দেবতা রুদ্র বা শিব আবির্ভূত হলেন ভারতীয় মানসে প্রধান দেবতার আসনে। দীর্ঘদিনের অপাংক্তেয় শিব এবার আসন গ্রহণ করলেন তিন প্রধানের অন্যতম রূপে। প্রজাপতি দক্ষের সাথে সংগ্রাম শিবের এই অধিকার-অর্জনেরই ইতিহাস। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' দেবতার ভয়ঙ্কর কল্পনা বাস্তব হল শিবের ভূতপতিরূপে। গুপ্তযুগে যে হিন্দুধর্মের প্রসার হল সারা দেশে, তা বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন নয়, সম্পূর্ণ নতুন দেবতা নিয়ে আবির্ভূত নতুন ধর্ম। গুপ্ত-সম্রাটরা তাই নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন পরম-ভাগবত ব'লে, পরম-বৈদিক ব'লে নয়। সেই নবজাগরণের দিনে হিন্দুধর্ম বিষ্ণু ও শিবের উপাসকদের মধ্যেই হয়েছিল প্রধানতঃ দ্বিধাবিভক্ত। বৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণু কীর্তিত হলেন একাধারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বর রূপে, আর শৈবের নিকট শিবও সমান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন দেবাদিদেব মহাদেব রূপে, তিনিই হলেন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্তা। বিভিন্ন রূপে একই ব্রহ্মের প্রকাশ—উপনিষদের এই বাণী বাস্তব হল এলিফ্যান্টার মহেশমূর্তিতে। শিব এখানে শুধু বিশ্বধ্বংসী রুদ্ররূপেই দেখা দেননি,—তিনি বিশ্বসৃষ্টির কারক, এবং সে-সৃষ্টির সুষ্ঠু পালনও তাঁরই দায়িত্ব।

এলিফ্যান্টার সৃজনশীল ভাস্কর কিন্তু তাঁর বর্ণনধর্মী শিল্পের পূর্ণবিকাশের জন্য শিবের ত্রিমূর্তি বা যোগীশ্বর রূপ অতিক্রম করে প্রবেশ করেছেন পুরাণ আর মহাকাব্যের রত্নভাণ্ডারে। তাই মহেশমূর্তির ডানধারে রূপ পেয়েছেন অর্ধনারীশ্বর শিব, আর বাঁ-দিকে গঙ্গাবতরণের কাহিনী।

হরপার্বতীর মিলিত রূপ চতুর্ভুজ অর্ধনারীশ্বর—প্রকৃতির সকল বিরুদ্ধশক্তি সৃষ্টির প্রয়োজনে নিঃশেষিত হয়েছে এখানে এক ঐশ্বরিক মিলনে। তাঁর দক্ষিণে পৌরুষ ও কাঠিন্য, আর বামে নারী-অঙ্গের অপরূপ লাবণ্য। সেখানে :

আধ পাঁজর ধনি,   আধ বদনে হাসি,
আধহি গরল ত্রাস।
আধ চীর মোতি   আধ পাঁজর ঝরি
তপ ধরি নয়নে অনল।

মাথার চুলে, দেহের প্রতিটি অঙ্গে আর ভূষণে, অলঙ্কার-শোভিত মুকুটে—সর্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হয়েছে নারী ও পুরুষের পার্থক্য। মুখেও এসেছে শিবের আত্ম-সমাহিত ভাব ও পার্বতীর নারীসুলভ স্মিত সৌন্দর্যের বিস্ময়-জনক সমন্বয়।

বৃহদারণ্যকের ঋষি বলেছেন, আদিতে পরব্রহ্ম পুরুষ-রূপে ছিলেন একা। সঙ্গিহীন, প্রেমহীন জীবনে তিনি অনুভব করলেন সাথীর প্রয়োজন; তাই 'স আত্মানং দ্বিধা পাতয়ৎ'—তিনি নিজেকে বিভক্ত করলেন দু'ভাগে, সৃষ্টি হল প্রকৃতির—যিনি পুরুষের শক্তি। শক্তিহীন শিব তো প্রাণহীন শব মাত্র, আর শিবছাড়া শক্তি ভয়ঙ্করী প্রলয়মূর্তি। সৃষ্টির দায়িত্ব কিভাবে পালন করবেন বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি ব্রহ্মা যখন শিবের কাছে প্রার্থনা করলেন পথনির্দেশের, তখনই তাঁর সম্মুখে একই দেহে হরগৌরী—পুরুষ ও প্রকৃতি—আবির্ভূত হয়েছিলেন এই অর্ধনারীশ্বর

রূপে। ব্রহ্মা জানলেন পুরুষ ও নারীর মিলনেই পালিত হবে সৃষ্টিরক্ষার দায়িত্ব।

গঙ্গাবতরণের দৃশ্যে ত্রিমূর্তি গঙ্গা নেমে আসছেন দেবাদিদেবের মুকুট-শোভিত কুণ্ডলীকৃত জটাজালে। শিবের ঈষৎ-আন্দোলিত দেহে যেন নদীজলপ্রবাহের ইঙ্গিত। একটি হাত প্রসারিত বামে পার্বতীর প্রতি। পার্বতীর সুন্দর মুখে একটুখানি হাসির প্রলেপ। স্বামীর জীবনে অন্য নারীর আগমন কি তাঁর মনে করেছে ঈর্ষার সঞ্চার? তাই কি তিনি মুখখানি ঘুরিয়ে রেখেছেন পাশে? তাঁর ঠোঁটের রহস্যময় হাসিতে কি ভেসে উঠেছে ছলনা? মোনালিসার হাসির অর্থ ভেদ করতে আমরা ব্যস্ত, আর এই প্রায়ান্ধকার গুহার ভেতরে পার্বতীর যে-হাসি কঠিন পাথরে হাজার বছরেও অম্লান হয়ে আছে তার ব্যাখ্যা কে করে?

গঙ্গাবতরণের পাশেই হর-পার্বতীর বিবাহের এক মাধুর্যমণ্ডিত ছবি অপরূপ দক্ষতায় রূপ লাভ করেছে। ডানহাত প্রসারিত করে অপেক্ষা করছেন বরবেশে কল্যাণসুন্দর শিব—জীবনে উমার আগমনের। মাথায় জটামুকুট, গলায় রত্নহার, বুকে যজ্ঞোপবীত। ডানপাশে গিরিরাজ হিমালয় রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে নবযৌবনবতী কন্যাকে সম্প্রদান করছেন। হিমালয়ের মুখে আজ অসীম তৃপ্তি আর আনন্দ। উমার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করে আছে সখী। পাশে অমৃত-কুম্ভ নিয়ে শুভলগ্নের অপেক্ষা করছেন চন্দ্র। ব্রহ্মা বসেছেন আসনে এ বিবাহের পৌরোহিত্যে। চারিদিকে দেবগণ আনন্দে অধীর। এই মিলনের জন্যে দেবতাদের কত ষড়যন্ত্র, কত ছলনা। হরপার্বতীর মিলনজাত সন্তান হবেন দেবসেনাপতি, রক্ষা করবেন স্বর্গকে অসুর তাড়কের অত্যাচার থেকে—এইতো ছিল পিতামহ ব্রহ্মার নির্দেশ। সেজন্যে যোগমগ্ন মহাদেবকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন মদন পার্বতীর রূপ-লাবণ্যের প্রতি, আর তাই মহাযোগীর কোপানলে ভস্ম হলেন মদন। নিজেকে ধিক্কার দিলেন পার্বতী দেহগত সৌন্দর্যে মহাযোগীকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলেন বলে। স্থির করলেন, কঠিন তপস্যায় লাভ করতে হবে ভালবাসার ধনে। মুক্তাহার পরিত্যাগ করে বল্কল ধারণ করলেন বুকে, চুলের জটাজাল হল বর্ধিত, কটিতে এল তৃণবসন। বহুমূল্য বিলাসশয্যার স্থান নিল অনাবৃত কঠিন শিলাতল, আর বাহুলতা হল উপাধান। জল আর চাঁদের আলোই শুধু ছিল তাঁর আহার। গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যদগ্ধ দিনে চারিদিকে আগুন জেলে হত পঞ্চাগ্নিসাধনা, আর শীতজর্জর রাতে সারা শরীর হিমশীতল জলে ডুবিয়ে করতেন কঠোর তপস্যা।

এলিফ্যান্টা-গুহামূর্তি : গঙ্গাধর মূর্তি । গঙ্গা

সে-সাধনার সাক্ষী রইল অমাবস্যা-রাতের অন্ধকার, বর্ষার অঝোর বৃষ্টি, অশান্ত ঝড় আর তুষারপাতমুখর পৌষের দিনগুলি। বিরহী চক্রবাকের কণ্ঠে শুধু ধ্বনিত হল পার্বতীর অন্তরের কান্না। বৃক্ষশাখা থেকে ঝরে-পড়া পর্ণ বা পাতা পর্যন্ত আহারে তিনি বিরত হলেন, তাই তাঁর নাম হল অপর্ণা। কঠোর তপস্যায় তাঁর দেহ হল পদ্মের মৃণালের মতো শীর্ণা। শুধু অযত্নবদ্ধ কেশরাশির মাঝে পার্বতীর মুখখানি যেন শৈবাল-মণ্ডিত পদ্মের শোভা ধারণ করেছিল।…একদিন সেখানে এলেন এক নবীন সন্ন্যাসী। উমার যৌবন-মুকুলিত দেহের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্ন্যাসী বললেন, "সুন্দরী, তুমি নাকি শিবকে পতিরূপে লাভের জন্যে এই কঠোর তপস্যা করছ? হায় হায়, ইন্দ্রাণী হবার যোগ্যা হয়েও তুমি চাও শিবকে, যার না আছে জাত-গোত্রের ঠিক, না আছে বয়সের গাছ-পাথর। বাপের নাম বলতে পারে না, ভূত-প্রেত নিয়ে এক বুড়ো ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায় শ্মশানে-মশানে।

ধনসম্পদ যে কী আছে সে তো দিগম্বর-রূপেই প্রকাশ।" শিবনিন্দায় ক্রুদ্ধা পার্বতী সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, আর তৎক্ষণাৎ সেই তরুণ সন্ন্যাসীর পরিবর্তে আবির্ভূত হলেন সহাস্যবদন, সৌম্যদর্শন, স্ফটিকমণির ন্যায় উজ্জ্বল মহাদেব। নানা দীপ্ত অলংকারে তাঁর সর্বাঙ্গ ভূষিত, শিরশোভা শশধর, চতুর্ভুজে ধারণ করেছেন শূলসহ খড়্গ ও পরশু। হৃদয়ের অন্তরতর প্রদেশের অধীশ্বরের হঠাৎ আবির্ভাবে পার্বতী যেন আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না, উপল-অবরুদ্ধ-গতি আকুল নদীর মতো তাঁর অবস্থা তখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ'।

এত কঠোর সাধনায়, জীবনের সর্বস্বপণে লব্ধ বলেই এ মিলন বড় মধুর। গিরিরাজগৃহে তাই আজ আনন্দের অবধি নেই। লজ্জানম্রা নববধূ উমা ঈষৎ আনতমুখী, মুদিতনেত্রা। বিধাতার তুলিতে আঁকা তাঁর দুটি আয়ত চোখ বরবধূর শুভদৃষ্টিতে হবে উন্মীলিত। বায়ুতাড়িত নীলপদ্মের ন্যায় সেই দুটি অধীর নয়নের সৌন্দর্য তিনি হরিণীর কাছে পেয়েছেন, অথবা হরিণী তাঁর নয়নের সৌন্দর্য গ্রহণ করেছে—এ-প্রশ্নের জবাব কালিদাসও খুঁজে পাননি। অভীষ্টসিদ্ধা উমার অপরূপ যৌবন-প্রস্ফুটিত দেহে যেন বিশ্বের সকল মাধুর্য যোগ্যস্থানে মিলিত হয়েছে। সে-দেহের লাবণ্যমাখা প্রতিটি অঙ্গযষ্টিতেই বুঝি বিধাতার ভাণ্ডার বারংবার নিঃশেষিত হয়ে যায়। তাঁর সরু কোমরের ত্রিবলীরেখা যেন যৌবনের সোপানশ্রেণী, পূর্ণবিকশিত স্তনযুগের মাঝে মৃণালসূত্রেরও প্রবেশের স্থান নেই। গলায় মুক্তামালা—মনে হয়, ভূষণ তাঁর অলংকার না হয়ে, তিনিই ভূষণের অলংকার হয়েছেন।

জীবনের মধুরতম মুহূর্তে শিবের এই কল্যাণসুন্দর রূপের বিপরীতেই ভয়াল ভৈরব মূর্তিতে ধ্বংসের দেবতা অট্টরোল সহ—পাষাণ ভেদ করে যেন প্রচণ্ড বেগে আবির্ভূত হয়েছেন অসুর অন্ধকের বিনাশকর্তারূপে। তাঁর এক হাতে খড়্গ, অপর একটি হাতে ত্রিশূলবদ্ধ অন্ধক। আর একটি হাতে আছে পাত্র, অন্ধকের রক্ত ধারণ করার জন্যে, কারণ অন্ধকের প্রতিটি রক্তবিন্দু মাটিতে পড়লেই জন্মগ্রহণ করবে একটি করে অন্ধক। অন্যান্য হাতগুলির অবস্থান আর, শুধু আহ্বান-সাদৃশ্য। ভৈরবের শিরস্ত্রাণে নেই রত্ন বা অলংকার, তার বদলে সেখানে এসেছে নরকরোটি আর কৃষ্ণসর্প। ক্রোধবিস্ফারিত চোখে আর অনাবৃত ভয়ঙ্কর দাঁতের সারিতে মহাকাল ভীষণ রূপগ্রহণ করেছেন।

হরপার্বতীর এক পরিহাসচপল মুহূর্তের সৃষ্টি এই অন্ধক। ব্রহ্মার বরে অজেয় অন্ধকের অত্যাচারে দেবগণ স্বর্গ থেকে হয়েছিলেন বিতাড়িত। বন্দিনী দেবকন্যাদের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়াতো বাতাসে, তাদের অশ্রু ঝরে পড়তো ভূমিতে। সূর্য-চন্দ্র-পবন সব কাজ ছেড়ে অন্ধকের দাসবৃত্তি নিয়েছেন। বাসুকী তার দীপাধার। নন্দনকাননকে সে করেছে বিধ্বস্ত, আর মন্দাকিনীর জলধারাকে করেছে মলিন। তাকে দমনের সকল চেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ। আপন শক্তিতে উন্মত্ত অন্ধক এবার এল কৈলাসে পার্বতীকে হরণ করবার জন্যে। তার স্পর্ধায় শিবের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল, জাগলেন এবার মহাকাল তাঁর ভয়ঙ্কর রূপে অবিচার-অনাচার থেকে বিশ্বরক্ষার জন্যে। ত্রিশূলের আঘাতে সকল অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকরণে ব্রতী 'অন্ধকরিপু' শিবের প্রলয়ঙ্কর মূর্তিই ভাস্কর রূপায়িত করেছেন এখানে।

কল্যাণসুন্দর শিব ও অন্ধকাসুর-বধকর্তা শিব—এই দুটি দৃশ্যের মাঝখানে একটি ছোট পাথরের ঘর—তার চারিদিকে প্রবেশদ্বার, আর প্রতিটি দ্বারের দু'পাশে নানা অলংকারে সজ্জিত চোদ্দ-পনেরো ফিট দীর্ঘ বিরাটকায় দ্বারপালদের মূর্তি। তাদের আয়ত বক্ষ, নিবিষ্ট চক্ষু, মুখমণ্ডল· ভঙ্গী আর স্মিতমুখ দেখে যেন জীবন্ত বলে ভুল হয়। দ্বারপথে দেখা যায় ভিতরে উঁচু বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত শিবের লিঙ্গরূপ। শিবচতুর্দশীর পুণ্যলগ্নে এখনো ভক্তের দল আসেন এখানে পূজা-নিবেদনে। একটি দিনের জন্যে এই পরিত্যক্ত পর্বত-গুহা আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁদের আবাহন-সঙ্গীতে।

শিবলিঙ্গের কল্পনার সৃষ্টি কোথায়, সঠিক বলা কঠিন। পাশ্চাত্ত্য মতে, আর্যরা ভারতে এসে এদেশীয় অনার্যদের মধ্যে প্রচলিত *phallic worship* শিবলিঙ্গরূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। এ মতের সত্যতা তর্কসাপেক্ষ। শিব-পূজার সাথে কোথাও কোনো অশ্লীল প্রথা দেখা যায় না, যা *phallic worship*-এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিব-মূর্তির প্রাচীনতম কল্পনার যে নিদর্শন মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত শিলমোহরে দেখা যায়, সেখানে তিনি পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন মহাযোগী। তাকে রূপায়িত করা হয়েছে বিভিন্ন পশুদ্বারা বেষ্টিত পশুপতিরূপে। তাঁর শিরশোভা দুটি বিশাল শৃঙ্গ পরবর্তীকালের শিবায়ুধ ত্রিশূলের পূর্বাভাস। এখানেও তিনি ত্রিমুখ ও ত্রিনয়ন। মহেঞ্জোদারোতে যোগিবেশে ধ্যানমগ্ন আরো বহু মূর্তির আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, শিবের যোগীশ্বর-রূপই ছিল সিন্ধুসভ্যতাবাহক জাতিগুলির আদর্শ।

বৈদিক আর্যরা ছিলেন দেবমূর্তি-নির্মাণ বা মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে। কালক্রমে শিবের পূজা আর্যসমাজে প্রচলিত হলেও, শিবমূর্তির পরিবর্তে একটুকরো পাথরকে দেবতার প্রতিভূ রূপে স্বীকৃতিদানই ছিল তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন বিষ্ণুর প্রতিভূ রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল শালগ্রামশিলা। যে শিবকে আর্যরা দেবতার আসনে বরণ করে নিলেন, তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে অনির্দেশ্য, অজ্ঞেয়, অবোধ্য বলে; তিনি সর্বলোকের বিধাতা, অনন্ত মহিমার আকর এবং সকল উপমার অতীত। মহাযান মতের বৌদ্ধ ভাস্করেরা আর্যোত্তর ভারতে প্রথম প্রবর্তন করলেন মূর্তিপূজার—গ্রীকদেবতা অ্যাপোলোর অনুকরণে রূপ পেল বুদ্ধমূর্তি। গুপ্তযুগে বৌদ্ধদের অনুসরণে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি-নির্মাণ শুরু হল। প্রতীকের পরিবর্তে সেদিন শিবমূর্তির পূজাই হয়েছিল অধিক জনপ্রিয়। স্টিভেন শাড লিখেছেন, কাশীতে শতফিট উঁচু শিবের মানবিক রূপের এক মর্যাদাপূর্ণ মূর্তিই ছিল প্রধান আরাধ্য। যবদ্বীপের শৈব-মন্দিরেও শিবের মূর্তিপূজাই ছিল প্রচলিত। অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবের পরই দেশে মূর্তির পরিবর্তে শিবলিঙ্গের পূজা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বৌদ্ধধর্মের অবসান করে যখন শঙ্কর ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জীবন দান করলেন, সেদিন 'ব্যোমবৎ ব্যাপ্তদেহ' মহাদেবে নরত্ব আরোপ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। মূর্তিপূজার প্রতি বৈদিক বিরুদ্ধতাও নিঃসন্দেহে ছিল তাঁর স্মরণে, তাই ভগবানের মানবিক প্রতিমূর্তির পরিবর্তে তিনি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রতীক। অসম্ভব নয় যে, সে প্রতীকের নির্বাচনে বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল তৎকালীন বৌদ্ধ-সমাজে পূজ্য স্তূপের গঠনভঙ্গী দ্বারা, যেমন অতীতে একদিন বুদ্ধ গ্রহণ করেছিলেন ধর্মচক্রের রূপ বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের আদর্শ থেকে। কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা, শিবের ধ্যানমগ্ন মহাযোগী রূপই কল্পনা করা হয়েছে শিবলিঙ্গের রূপকে—উপরার্ধে সীমাসেনহেতু ঋজু ও আয়ত দেহ, আর নিম্নে যোগীর আসনবদ্ধ নিম্নাঙ্গ। শঙ্করাচার্যের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভারতে শিবমূর্তি-পূজার পরিবর্তে শিবলিঙ্গের পূজাই ক্রমে হল বহুলপ্রচলিত। ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত অতিক্রম করে এল সংখ্যাতীত মুসলমান আক্রমণকারীর দল। হিন্দুর দেবতাকে অসম্মান আর হিন্দুনারীর সম্ভ্রমনাশ ছিল তাদের প্রধানতম আনন্দ। মন্দির আর মূর্তি বিনাশী এই নতুন বিভীষিকার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুরা মূর্তির পরিবর্তে সম্পূর্ণভাবে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করলেন—শিবমূর্তির হল বিলুপ্তি, আর সে-জায়গায় শিবলিঙ্গের পূজাই হল সর্বত্র প্রবর্তিত।

প্রাক্-আর্য ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে *phallic worship*-এর প্রচলনের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পাতে। ঋগ্বেদে আর্যরা এদের বিদ্রূপ করে বলেছেন 'শিশ্নদেবাঃ'। বেদের দ্বারা এভাবে নিন্দিত অনার্যপ্রথা গ্রহণ এবং সকল দেবতার মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসন দান আর্যদের পক্ষে সম্ভব না থাকারই কথা। মনে হয়, যোগীশ্বর [illegible] আরাধনা ছিল লিঙ্গপূজার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পরবর্তীকালে স্থূলবুদ্ধি অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে যোগমগ্ন শিবের প্রতীক-চিহ্ন ও প্রচলিত লিঙ্গপূজার পার্থক্য অনুধাবনে অক্ষমতাই বহু মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করেছে। জনসাহিত্যে আর শিক্ষাহীন সমাজে আর্যধর্মের বহু দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বকেই এভাবে সীমিত বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যা দ্বারা বিকৃতির দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

গুহার পশ্চিমদিকের পরিক্রমা শেষ করে আমরা এলুম পূর্বভাগে। এদিকে আছে কৈলাসের দুটি দৃশ্য—দুটিই অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত—মানুষ ও প্রকৃতির যুগপৎ আক্রমণে। একটিতে পার্বতী অভিমানে মুখ ফিরিয়ে আছেন, পাশে বসে নির্লিপ্ত শঙ্কর। পাশাখেলার সরঞ্জাম সামনে ছড়ানো। অনুমান করা কঠিন নয় যে, কিছু পূর্বেই খেলার ব্যাপারে একপ্রস্থ কলহ হয়ে গেছে দেবদম্পতির মাঝে। মহাদেবের ভঙ্গী দেখে মনে হয়, তিনিই সম্ভবতঃ কিছু চতুরালির চেষ্টায় ছিলেন। বেকায়দায় হয়ে পড়ে এখন মনের ভাবটা যেন: 'মেয়েদের সাথে খেলতে বসাই ঝকমারি'।

এরই বিপরীতে লঙ্কেশ রাবণ কুড়িহাতে চেষ্টা করছে কৈলাস-উৎপাটনের। রথচালনার পথে বাধা সৃষ্টি করে কৈলাসপর্বত, তাই তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। পার্বতী ভীতমনে সরে এসেছেন শিবের বুকের আশ্রয়ে। শঙ্কর কিন্তু নিশ্চিন্ত। বামপদের বুড়োআঙুলে চেপে রেখেছেন কৈলাসকে, তাই রাবণের অসীম শক্তিও ব্যর্থ হচ্ছে শিবের আসনকে একটুখানি স্থানচ্যুত করতে। শাস্তির প্রতিফল পেয়েছিল রাবণ—বহুহাজার বছর কৈলাসপর্বতের নীচে বন্দী থেকে।

দুটি কাহিনীই ইলোরার কৈলাস-মন্দিরে অধিকতর দক্ষতার সাথে রূপায়িত হয়েছে।

প্রধান গুহার দু'পাশের অঙ্গনে একসময়ে সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠিত ছিল শিব-বাহন নন্দীর বিরাট পাথরের মূর্তি—এখন আর তাদের চিহ্নমাত্রও নেই। দু'পাশে দুটি ছোট গুহাতে আরো কয়েকটি মূর্তি আছে, তবে তাদের মূল গঠনভঙ্গী দেখে মনে হয় পরবর্তীকালে ভারতীয় ভাস্কর্যের অবনতির দিনে প্রধান গুহার মূর্তিগুলির অনুকরণের চেষ্টা হয়েছিল এখানে অপটু হস্তে।

এলিফ্যান্টার প্রধান গুহাটির আয়তন প্রায় ১৩০ বর্গফিট। এর ছাদ ও দেয়ালের কোনো কোনো জায়গায় এখনো নজরে আসে অজন্তার ধরনের ছবির ভগ্নাংশ। ইলোরাতেও এ-জিনিস চোখে পড়েছে। মনে হয়, একদিন হয়তো এদেরও সর্বাঙ্গ অলঙ্কৃত ছিল অজন্তার অনুসরণে। কিন্তু এখানে, এবং ইলোরাতেও, শিল্পীর সকল সাধনা প্রধানতঃ একীভূত হয়েছে ভাস্করের অস্ত্রে। অজন্তার ছবি দেখলে যদিও আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, এর পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি—অন্ধকারে অনভিজ্ঞের হাতড়ে বেড়ানো নয়, তবু অজন্তার সাথেই চিত্রশিল্পের এই পরিপূর্ণ ধারাটির প্রাধান্য হঠাৎ লুপ্ত হয়ে গেল। অজন্তার পর একেবারে ন'শ' বছর পার হয়ে আবার ভারতীয় শিল্পীর দেখা পেলুম যখন আকবরের দরবারে মোগল শৈলীর আবির্ভাব হচ্ছে।

বৌদ্ধ শিল্পীদের কাছে শিল্প ছিল সহজ সরল ভাবে ধর্মের কাহিনী বর্ণনা। বিষয়বস্তুও ছিল বুদ্ধদেবের জীবনী বা জাতকের কাহিনীতে সীমাবদ্ধ। বহু দূর-দূরান্তরে ধর্ম-প্রচারের জন্য ছবিই ছিল উপযোগী। গুপ্ত-সম্রাটদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি আর ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান আমাদের দেশের জনমনে যে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, তবে তা অনেকখানি প্রভাবিত করলে দেশের শিল্পধারাকেও। ছবির চেয়ে মূর্তিই এদেশবাসীর অধিকতর প্রিয় হতে সুরু করলে। মানুষের মন আর ছবিতে সন্তুষ্ট রইল না। সে চাইলে দেবতাকে রূপ দিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে—যিনি স্পর্শাতীত নন, যাঁর রূপে নয়ন সার্থক হবে। সুরু হল শরীরী দেবতার আরাধনা, মানুষেরই মতো যাঁর নয়নে আসে বেদনার্ত অভিব্যক্তি। শিল্পীর কল্পনা-প্রবাহের মাধ্যম তাই হল পরিবর্তিত। এদিকে হিন্দু পুরাণ আর মহাকাব্যগুলির সাথে নতুন করে পরিচয় শিল্পীর সম্মুখে উন্মুক্ত করে দিলে এক সীমাহীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, আর তারই রূপদান করতে গিয়ে ভারতীয় শিল্প-মনীষাও সুরু করলে আপন প্রতিভার নিত্য নব-দিগন্ত-উন্মোচন। যাগযজ্ঞ আর নতুন নতুন উৎসবের প্রয়োজনে নানারকম যন্ত্রপাতির আবিষ্কারও ভাস্কর্য-বিদ্যার উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সন্দেহ নেই। যীশুখ্রীষ্টের দু'শ' বছর পূর্বে অশোকের সময় সুরু হয়েছিল যে ভারতীয় ভাস্কর্যের, এলিফ্যান্টাতে আজ দেখলুম তারই শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

আমাদের পরিক্রমা সমাপ্ত করে পূর্ণ অন্তঃকরণে বেরিয়ে এলুম সবাই। জনাকয়েক সাগরপারের পুরুষ ও মহিলা তখন প্রবেশ করছেন। তাঁদের সাথে ভারত-সরকারের জনৈকা পথপ্রদর্শিকা। তিনি শিবের যোগীশ্বর-মূর্তির ব্যাখ্যা করে বলছিলেন: "এলিফ্যান্টাতে শিবের যত মূর্তি আছে, তার মধ্যে ত্রিমূর্তি বাদে আর শুধু এখানেই শিবের পাশে পার্বতী অনুপস্থিত। মেয়েরা ঈশ্বর-আরাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে বলেই বোধহয় এই ব্যবস্থা।" মহিলার রসবোধে আমরাও হাসলুম।

অনতিদূরে চায়ের দোকানের সামনে ভীড় জমে বেড়েছে নজরে পড়ে। উদ্দাম সঙ্গীত ও উদ্দামতর নৃত্যের আলোড়ন আভাষ ভেসে আসছে সেখান থেকে। এতক্ষ যেন এক স্বপ্নপুরীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। প্রস্তরীভূত দেব-দেবীরা চুপি-চুপি কত কথা বলছিলেন,—কানে আসছি কত গানের সুর, কত বাজনার বোল। হঠাৎ বুঝি কঠি আঘাতে সচকিত হয়ে আবার জেগে উঠলুম বর্তমানে—অনুভব করলুম কত ক্ষুদ্র, কত সঙ্কীর্ণ আর দুঃখী আজকের মানসিক পরিবেশ!

যে ভাস্কর্য দেখে মনে হয়, অন্তরের আবেগে দেবতার আরতি হয়েছে শিল্পের প্রদীপে—তার স্রষ্টার নিশ্চয়ই কোনো পার্থিব নৃপতির সন্তুষ্টি বা ধনী বণিকের পুরস্কারই ছিল ন একমাত্র কাম্য। বারংবার শুধু মনে-মনে ক্ষমা চাইলুম অতীতের সেই অমর আত্মার; আমাদের দীনতা ও হীনতার জন্যে, এ মহান উত্তরাধিকারে অযোগ্যতার জন্যে।

* * *

কীর্তন কথা

রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল, সেদিন সহজেই কীর্তন-গানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা লুপ্ত হয়নি।"

আমাদের দেশে এই কীর্তন সঙ্গীত ঠিক কোন্ কালে জন্ম নিয়েছিল তা আর আজ সঠিক করে বলা যায়না, বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবতে' বলেছেন—

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।"

অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দই সংকীর্তনের জন্মদাতা। বৃন্দাবন দাসের অভিমতে চৈতন্য-অবতারের মূল কারণই কীর্তনপ্রচার :

"কলিযুগ ধর্ম হয় হরিসংকীর্তন
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।"

মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন দোলপূর্ণিমার রাতে, তিনি এলেন আবীর-রাঙা পথে সেদিন,—

"গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল জনগণ
নিরবধি চতুর্দিকে হরিসংকীর্তন।"

সুতরাং অনুমান করা যায় যে কীর্তনের প্রচার তখনো ছিল, তবে বৃন্দাবন দাস যে-অর্থে চৈতন্যদেবকে কীর্তনের জনক বলেছেন, তার তাৎপর্য এই, মহাপ্রভু কীর্তন-সঙ্গীতে ভক্তিরসের যে জোয়ার আনলেন, তা পূর্বে ছিলনা।

মানুষের দুঃখ দূর করতে অপার করুণাবশে ভগবান নেমে আসেন ভক্তের দুয়ারে, প্রচার করেন প্রেম নাম। এমনি করেই নবদ্বীপে এসেছিলেন যুগাবতার গৌরাঙ্গদেব, মুখে তাঁর একটি বাণী—"হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নাম / কেবলম্"। এই নামমন্ত্রে সমগ্র বাংলাদেশের সেদিন ঘুম ভাঙল—বাঙালীর কর্মজীবন, ভাবজীবন, তথা সাহিত্যের নবজাগরণ সূচিত হল। প্রভু জানালেন—এ নামগান করতে হবে তৃণের চাইতে সুনীচ ও বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু হয়ে, স্বয়ং অমানী হয়ে, অপরকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে। রাগানুগা মার্গে তিনি ভজনা করলেন অনাদি অনন্ত রসরাজ ভগবানকে। নামকীর্তন সহজসাধ্য নয়, এই নাম মধুচক্রে দেহের সব বাসনাকে একত্র করতে হবে, দেহকে তুলে ধরতে হবে দেহাতীতের পানে, হৃদয় হবে মত্ত, সর্ব অঙ্গে আসবে সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ। হরিকে স্মরণ করে মহাপ্রভু বলে উঠলেন—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ·
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।"

অর্থাৎ (ভগবান) কবে তোমার নাম উচ্চারণ করতে করতে আমার নয়নদ্বয়ে প্রেমাশ্রু বিগলিত হবে, ভাবাবেগে বদনে গদগদ ভাষা নির্গত হবে, এই দেহ পুলকে হবে রোমাঞ্চিত? এইভাবে প্রভু নাম-সংকীর্তনে আনলেন ভক্তিরসের প্লাবন—তাই তিনি নবকীর্তনের ভগীরথ।

এবার আমরা ফিরে আসব কীর্তন-সঙ্গীতের পূর্বকথায়।

'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে কীর্তনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে "নাম লীলা গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষাতু কীর্তনং", অর্থাৎ উচ্চস্বরে নাম লীলা গুণাদির উচ্চারণকেই বলা হয় কীর্তন, কীর্তন অর্থ কীর্তিগান, অভিধানে সংকীর্তন শব্দের অর্থ হল সম্যক প্রকারে দেবতার নাম উচ্চারণ।

কীর্তনকে নয় প্রকার ভক্তি-সাধনের মধ্যে 'একটি' গণ্য করা হয় :

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।"

এই কীর্তন অর্থে সাধারণতঃ শ্রীহরির গুণকীর্তনই বুঝায়, অনেকের মতে পূর্বে বাংলাদেশে কীর্তন সঙ্গীতের প্রচার ছিলনা। কিন্তু আমরা জানি, বৈদিক যুগ বহন করেছে সংকীর্তন প্রথা, সামমন্ত্র তাই সামগানরূপে পরিচিত। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'ও ছন্দ ও সুরের দিক থেকে কীর্তনাশ্রয়ী, সুতরাং বর্তমানের কীর্তন সঙ্গীতকে আমরা বলতে পারি জয়দেব-গোত্রজ।

কীর্তন বলতে আমরা বুঝি রাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন ব রস-কীর্তনকে। কিন্তু এই সঙ্গীতের আর একটি বিভাগ রয়েছে, তাকে বলা হয় 'নামকীর্তন'। ভাগবতে এই নামকীর্তনের কথা আছে। 'নামকীর্তনে' খোল করতাল

বাজিয়ে চিত্তকে ভগবন্মুখী করা হয়। অষ্ট প্রহর, চব্বিশ প্রহর ধরে আজও বাংলাদেশে নামকীর্তন হয়। লীলাকীর্তন আর নামকীর্তন, কাব্যরস আর ভক্তিরস একদিন বাংলার আকাশ-বাতাসকে মাতাল করে তুলেছিল—সেই মন-মাতানো স্পর্শ আজো রয়েছে বাংলার কীর্তন-সঙ্গীতে। জীবন-সঙ্কটের এক যুগসন্ধিক্ষণে মহাপ্রভু এই 'নাম' মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন সমগ্র বাঙালী জাতিকে। এই নামগানে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচার নেই—এখানে সবাই মানবপ্রেমিক, বিষ্ণু পূজারী।

বর্তমানে কীর্তন গীতে নৃত্যের বিশেষ স্থান নেই, কিন্তু গৌরাঙ্গদেব যে নাম-সঙ্গীতের প্রবর্তন করলেন, তার প্রধান অংশই নৃত্য। অদ্বৈতাচার্যের গৃহে, নীলাচলে, নবদ্বীপে নগর-সংকীর্তনে নৃত্যই ছিল প্রচুর কীর্তনের অঙ্গ।

বাঙালী ভাবুক, বাঙালী কল্পনা-বিলাসী। এই ভাব আর কল্পনা আনে সুরের ব্যঞ্জনা। তাই কৃষ্ণের আকুল-করা বংশীধ্বনিতে শুধু মহাভাবময়ী রাধাই কাঁদেনি, আজো বেণুস্বননে কাঁদে চিরকালের রাধা ঐ কৃষ্ণেরই জন্য। পদাবলীর রসে বাঙালী পেয়েছে অফুরান আনন্দের সুর। পদাবলী রচিত হয়েছিল সঙ্গীতের উদ্দেশ্যে; কিন্তু পদাবলী শুধু সঙ্গীত নয়, এখানে রয়েছে কাব্যরসের পূর্ণ আবেদন।

এই কাব্য আর সঙ্গীতের রাখীবন্ধনে জন্ম নিয়েছে কীর্তন সঙ্গীত, বাণী ও সুরের সম্মিলিত রূপ। 'উজ্জ্বল-নীলমণি'তে কীর্তনের চৌষট্টি রসের উল্লেখ আছে। কীর্তনীয়ারা পদাবলী সাহিত্যকে পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, মান, বিরহ, মাথুর, রাস, ঝুলন, নৌকাবিলাস ইত্যাদি কয়েকটি পালায় বিভক্ত করে পরিবেশন করেছেন ঐ চৌষট্টি রসকে।

পরবর্তীকালে কীর্তন-সঙ্গীতে শোনা গেল নতুন রীতির পদধ্বনি; গরাণহাটি, মনোহরসাহী, রেনেটি, মন্দারিণী প্রভৃতি পরবর্তীকালের কীর্তন-সঙ্গীতের কয়েকটি পদ্ধতি। এইসব গানের style-ও ছিল বিভিন্ন। শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলেছেন—"গরাণহাটি ও মনোহরসাহী কীর্তনের মধ্যে প্রভেদ এই যে, গরাণহাটির সুর খুব সরল, লালিত্যপূর্ণ ও গম্ভীর, আর মনোহরসাহী কীর্তনের সুর অধিক কারুকলা-বিশিষ্ট সুললিত ও মধুর। উভয়ই উচ্চাঙ্গ কীর্তন, এবং উভয়ই প্রাচীন পদ্ধতি।"

কীর্তন গানের আলোচনায় 'জাত' এবং 'দাগী' এই দুটি শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে। মহাজন গায়ক যে মূল সুর পরিবেশন করেন, তারই নাম 'জাত' সুর। এই 'জাত' সুর চিহ্নিত গানই পরে পরিচিত পায় 'দাগী' বলে।

বৈষ্ণবের কাছে মহাপ্রভু কৃষ্ণের অবতার, তাই তিনি একই দেহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হরিনাম সংকীর্তনের তিনি আদি-পন্থা, তাই কীর্তন সঙ্গীতের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে তাঁকে স্মরণ করাই হলো চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের রীতি। এই গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন হয় খেতুরীর মহোৎসবে, এবং অনেকে মনে করেন নরোত্তম ঠাকুরই এই গানের আদি স্রষ্টা।

নাম-সংকীর্তনের পথ স্বচ্ছ সরল ও অবিনশ্বর। এ পথ আনে আলোর স্পর্শ। কবি বলেছেন—"বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া"; প্রার্থনা করি, এই প্রেম-নাম-কীর্তনে শতসহস্র নিমাই আবির্ভূত হোক, দূর হোক সর্ব অকল্যাণ, কাম্য হোক মত্তের তৃষ্ণা।

মেরুজ্যোতি

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

শেটল্যাণ্ডের বন্দর লারউইক ছেড়ে জাহাজটা দক্ষিণ-মুখে চলতে শুরু করল। নাবিকরা কাজে ব্যস্ত হয়ে ডেকের ওপর ছুটোছুটি করতে লাগল। ইঞ্জিনের চীফ-ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে নিম্নতম কর্মচারীটি পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উ নানান যন্ত্রপাতির গোলকধাঁধায়। ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লা হুইল-হাউসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগ

কোয়ার্টার-মাস্টার কো-কে। সেকেণ্ড অফিসার তার সেক্সটন প্রভৃতি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যে-রাস্তায় জাহাজ যাবে তার ল্যাটিচিউড-লংগিচিউড-এর গণনায়।

পরমেশ কেবল হুইল-হাউসের জানালা দিয়ে লারউইকের দিকে একান্ত উদগ্র দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার মুখে চোখে একটা বিমর্ষ কাতরভাব ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

লারউইক শহরের শেষপ্রান্তের সেই বরফ-ঢাকা বিরাট ঢালু চত্বরটা আস্তে আস্তে চোখের সামনে ছোট হয়ে আসতে লাগল। দু'পাশে দেখা গেল হাজার-দেড়হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের পাঁচিল। তাতে প্রত্যেকটি স্তরে যে খাঁজ উঠেছে সেখানে বসে আছে লাখে লাখে পাখী। শুধু বসে আছে বললে ভুল বলা হবে—তারা লাফাচ্ছে, চীৎকার করছে, খেলা করছে। এ যেন বিরাট আনন্দমেলা বসেছে সেখানে।

রোদে সারা আকাশ ভরে যাচ্ছে। সকালের রোদ বিশেষ করে এদেশে এক মহা দুর্লভ পদার্থ। তাই চারদিকে হঠাৎ যেন প্রাণবন্যা বইতে সুরু করেছে। গ্যানেট-গুলো লম্বা গলা বাড়িয়ে দুরন্তবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। তারপর সোঁ-সোঁ করে ছুটে চলেছে মাছের পিছু, সমুদ্রের গভীরে। বহুদিন পরে জলে আবার সবুজ রং লেগেছে। স্বচ্ছ কাঁচের মতো জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে গ্যানেট-গুলোর গতি। সোনালী বালির চড়াতে বড় বড় সীলগুলো একে অপরের গায়ের ওপর পড়ে আদিখ্যেতা জানাচ্ছে। জাহাজের নাবিকরা গান ধরেছে—ও, মাই ডারলিং ক্লেমেন্টাইন···

সকলের গলাতেই সেই গানের রেশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। এমনকি ক্যাপ্টেন ম্যাকলারেন পর্যন্ত।

সবাই ভারি হাসিখুশী—সবাই ভারী জীবন্ত আজ সকালে।

একমাত্র পরমেশ এসব কিছুতেই যোগ দিচ্ছেনা। কেবল স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে লারউইকের বিলীয়মান ফিয়র্ডগুলোর দিকে।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন ম্যাকলারেন তার পিঠে একটা চড় বসিয়ে দিতেই সে চমকে ফিরে তাকাল।

ক্যাপ্টেন বললেন,—কী চমৎকার সকাল দেখেছ? এখানে এই উত্তর-সাগরের ওপরে এরকম আবহাওয়া যদি রোজ কোনো লোক আমায় এনে দিতে পারে, তবে তোমাদের দেশের নিজামের যত টাকা আছে সব লুটে এনে আমি তাকে দিয়ে দিতে রাজী আছি।

ব'লে মনোরম হাসি হাসতে লাগলেন ক্যাপ্টেন ম্যাকলারেন। তাঁর পৌঢ় প্রশান্ত মুখের ওপর সে-হাসি ভারী অপূর্ব হয়ে ফুটে উঠল।

ম্যাকলারেন বললেন,—চলো, মঙ্কি-ব্রিজের ওপর গিয়ে বসি। রোদটাকে ভালো করে ভোগ করা উচিত হে।

ব'লেই পরমেশের হাত ধরে আর দ্বিতীয় কথা না বলে, টেনে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

জাহাজ এতক্ষণে খাড়ি পার হয়ে এসে সমুদ্রে পড়েছে। ফিয়র্ডগুলো দূরে সরে গেছে। কেবল দেখা যাচ্ছে বরফ-মাখা জায়গাগুলো রোদ পড়ে বহুদূর থেকে আয়নার মতো চকচক করে উঠছে।

মঙ্কি-ব্রিজের ওপর আসতেই পরমেশ আবার উৎসুক দৃষ্টিতে ঘন ঘন চাইতে লাগল পিছনের পানে।

ক্যাপ্টেনের মুখে একটু মৃদুহাসি খেলা করে গেল। রেলিং-এর ওপর সমস্ত দেহের ভারটা ছেড়ে দিয়ে তিনি ঝুঁকে পড়লেন পরমেশের ওপর। তারপর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন,—লারউইক তোমার কেমন লাগল?

পরমেশকে মনে হল যেন একটু চমকে উঠল এই প্রশ্নে।

মুখে একটা শুকনো হাসির রেখা টেনে সে জবাব দিল,—কেন, বেশ ভালোই তো।

ম্যাকলারেন ঝুনো ক্যাপ্টেনই শুধু নন, বহু ঘাটের জল খাওয়া একজন মনস্তাত্বিকও বটে। অত সহজে তিনি পরমেশকে রেহাই দিলেন না। বললেন,—ও-কথা তো একটা কথাই হল না। এই ক'দিনের মধ্যেই তোমার মনটা যে শেটল্যাণ্ডের রুক্ষ, ফাঁকা, পাহাড়ে জমিতে আটকে গেছে, সেটা বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছেনা, পরমেশ।

তারপর একটু মুচকি হেসে চোখ টিপে বললেন,—এ বড় সাংঘাতিক জায়গা। বিশেষ করে বিদেশীর পক্ষে। ঐ-যে ধু-ধু ফাঁকা উঁচু-নীচু বরফের মাঠ দেখে এলে—যেখানে তিন-ফুটের ওপর একটা গাছ গজায় না, সমুদ্রের ঝোড়ো-হাওয়া যার প্রত্যেকটি কোণকে সবসময়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; যেখানে দিনকে রাত বলে মনে হয় অনেক সময়, আবার রাতকে দিন বলে ভুল হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়—সেখানে কোন্‌টা যে সত্যি আর কোন্‌টা যে স্বপ্ন এ জোর করে বলা বড় শক্ত, পরমেশ। সত্যিকথা বলতে কি, আমি যতবার এখানে এসেছি, শেটল্যাণ্ডের সবটাই কেমন যেন একটা অবাস্তব ব্যাপার বলে বোধ হয়েছে আমার বরাবর। আজ সকালে এই রোদ্‌টুকু পেয়ে মনে হচ্ছে যেন আমার মনের

জড়ত্ব কাটছে। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠায় আনন্দ অনুভব করছি।

ব'লে ক্যাপ্টেন একটা আড়ামোড়া দিয়ে সমস্ত শরীরটা যেন ঝাঁকিয়ে তাজা করে নিলেন। তাঁর চোখ কিন্তু পরমেশের মুখের ওপর থেকে একমুহূর্তও সরে গেলনা। মুখেও লেগে রইল সেই হাসির রেখাটি।

সেই অবস্থাতেই তিনি পরমেশের দিকে আবার ঝুঁকে পড়ে বললেন,—ভালো-মন্দ লাগার কথা আমি তোমায় বলিনি। আমি জানতে চাইছি, শেটল্যাণ্ডে এসে তোমার অনুভূতিটা কেমন হল?

ক্যাপ্টেনের আগের কথাগুলো পরমেশের মনের মধ্যে বোধহয় কোনো আপাততৃপ্তির চিত্র এনে ফেলেছিল। সে তাতে বেশ একটু বুঁদ হয়ে বসেছিল। কাজেই ম্যাকক্লারেনের নতুন প্রশ্নটা তাকে আবার ঈষৎ বিচলিত করল।

কী বলবে সে ক্যাপ্টেনকে? লারউইকের ভিতরে বাইরে ক'দিন তার যে কেমন করে কেটেছে এ-কথা সে কাউকে বলেনি আজও।

এই সমুদ্রযাত্রায় ক্যাপ্টেন হল তার একমাত্র অন্তরঙ্গ লোক। আশ্চর্য গুণ আছে ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লারেনের। একমুহূর্তে পরকে আপন করে নেবার মন্ত্র জানেন তিনি। আর বিদেশে হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যাননি। কাজেই সব জাতের মনের গতির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আছে তাঁর। তাতেই তাঁর আরও সুবিধে হয়েছে পরমেশকে কাছে টেনে নেবার। নইলে এই কঠোর পরিশ্রমসাধ্য দীর্ঘ ছ'মাস সমুদ্রযাত্রায় পরমেশের দিনগুলো কঠিন হয়ে উঠত।

তবুও তার সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা কেমন করে বলবে সে ক্যাপ্টেনকে?

মনে আছে পর পর বত্রিশটা দিন জাহাজ নিয়ে ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লারেন উত্তর-সমুদ্রের বুকে দাপাদাপি করে বেড়িয়েছেন। কোন্ সেই আবার্ডিন থেকে যাত্রা সুরু। তারপর মারে-ফার্থ, ফার্থ-অব্-ফোর্থ, ফেয়ার আইল্স্,-ডগার্স্ ব্যাঙ্ক, ফেরো-শেটল্যাণ্ড-চ্যানেল অতিক্রম করে সোজা তারা চলে গেছে নরওয়ের দিকে।

সেখান থেকে নরওয়েজিয়ান ট্রেঞ্চ অতিক্রম করে জাহাজ নিয়ে গিয়েছেন ক্যাপ্টেন আইসল্যাণ্ডের কাছে।

আইসল্যাণ্ডের কিনারা আর তুষারভূমিকে বাঁয়ে কাটিয়ে তারা চলে গেছে উত্তর-সাগরের আরও উত্তরে।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা লড়াই করেছে ঢেউয়ের সঙ্গে। উত্তর-সাগর কোনো সময়েই শান্ত থাকেনা। সে চিরকালই অবাধ্য দুর্দম।

তারপর লড়াই চলেছে নিদারুণ ঠাণ্ডার সঙ্গে। এ অঞ্চলটা উত্তর-মেরুর সীমানার কাছে। সুতরাং থার্মোমিটারে তাপমাত্রা কখনো কখনো নেমে গেছে শূন্যের অনেক নীচে। কোনো কোনো দিন সকালে—যেদিন আলো ফুটেছে—দেখা গেছে সমুদ্রের উপর সাদা চাদরের মতো জমাট বরফের পর্দা। অপেক্ষা করেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—যতক্ষণ না সেই বরফের চাদরে চিড় খেয়ে ফাট ধরেছে। তারপর এক-একটা অংশ ভেসে গিয়ে ঢেউগুলোকে আবার চলমান করে দিয়েছে।

নাবিকরা এই দীর্ঘসময় নিশ্বাস ফেলতে পারেনি। কাজ করেছে ভূতের মতো। কিন্তু একটু অবসর পেলেই গল্প করেছে শেটল্যাণ্ডের বন্দর লারউইকের। সবাই মনে মনে উদ্গ্রীব হয়ে চিন্তা করেছে লারউইকের। ট্রলার-ম্যান জর্জি তার অত্যন্ত আদি-রসাত্মক গল্পের বান ডাকিয়ে দিয়েছে লারউইকের নামে। অপর সকলে বসে সেগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে।

শুনে পরমেশের মনে হয়েছে লারউইক যেন এদের স্বর্গ।

অবশেষে সেই দিন এলো, যেদিন তারা লারউইকে এসে পৌঁছাল।

লারউইকের ঘাটে জাহাজ ভিড়বার একঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ খালি হয়ে গেল। এক শুধু ক্যাপ্টেনই জাহাজ ছেড়ে কোথাও নড়লেন না। বাকী নাবিকরা বেড়াভাঙা খোঁয়াড়ের ভেড়ার মতো দৌড়ে বার হয়ে ভীড় জমাল শহরের রাস্তায়, রেস্তোরাঁয়, বারে আর নাচঘরে। ক'দিন তাদের বাঁধ-ভাঙা হুল্লোড় চলল—নাচে-গানে, মদে-নারীতে।

ক্যাপ্টেনকে মনে হল যেন রোদের মধ্যে বিছি দিয়েছেন সমস্ত শরীরটাকে। তাঁর শীতে-জমা শরীরের যে জড়ত্ব খুলে যাচ্ছে। পরম আরামে তিনি চোখ বুজলেন।

এদিকে পরমেশের মধ্যে এক দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব এনে দি তাঁর কথাগুলো। একবার মনে হতে লাগল ক্যাপ্টে ম্যাকক্লারেনের কথাগুলো কত সত্যি। যে দেশে এই সম শুধু দু'ঘণ্টা দিনের আলো থাকে, বাকী সমস্ত সময় থা রাত্রি—সে-দেশের সব-কিছুকেই স্বপ্ন মনে হওয়া আ বিচিত্র কী?

তবু অন্যদিকে তার মন বিদ্রোহ করে উঠল।

সমস্ত দেহ দিয়ে সে যেন উপভোগ করল একটি উষ্ণদেহের আমেজ। হঠাৎ ঝ'রে তার নাকে এসে লাগল একঝলক পরিচিত ল্যাভেণ্ডারের মিষ্টমধুর গন্ধ। বুকের কাছে যেন ছোঁওয়া পেতে লাগল দুটি অতি কোমল কপোতের। আর অনুভব করল সেই দুরন্ত আবেগ যার প্রচণ্ড ঢেউগুলো আছড়ে এসে পড়ত ওষ্ঠের কানায়-কানায়। শরীর আর মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত দুর্নিবার প্রমত্ত আক্রোশে।

এসব কি স্বপ্ন—না মিথ্যা? মনে-মনে সে বিদ্রোহীর হাসি হেসে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠল আবার।

কই, তাকে তো কোনদিন তেমন করে পাওয়া হয়নি! দিনের আলোতে তো নয়ই, পরিপূর্ণ কৃত্রিম আলোতেও তার চেহারাটা নজর করা হয়নি একবারও এই সাতদিনের মধ্যে। যখনই সে পরমেশের কাছে এসেছে—এসেছে রাতের অন্ধকারে। তার অনেকটা ধরা পড়েছে পরমেশের চোখে, বাহুবন্ধনে, কিন্তু সবটা তো নয়।

এইতো মাত্র কয়েকঘন্টা আগে ভোর তিনটেতে সে তাকে ছেড়ে এসেছে।

সব-কিছু সত্বেও এই রোদে-ভরা সকালবেলায় তাকে তো সত্যি কিছুটা স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে। বুকের ভিতরটা তার কেমন যেন করে উঠল।

আবার মনে পড়ল তাকে ছেড়ে আসার ক্ষণটা। ঐ বরফ-ঢাকা ঢালু চত্বরটার ওপর সে মুহূর্তের জন্য এসে দাঁড়িয়েছিল যখন জাহাজ ছাড়ে সেই সময়ে। অন্য কেউ তাকে দেখতে পায়নি একমাত্র সে ছাড়া। তাকে ছেড়ে আসার সময়ে সেই তার আকুলতা, সেই ব্যথাকাতর চোখের চাউনি পরমেশকেও ব্যাকুল করে তুলেছিল দারুণভাবে। যার রেশ এখনো লেগে রয়েছে তার বুকের মধ্যে।

হঠাৎ মনে হল সে বলেছিল তার ঠিকানাটা লিখে নেবে নোট-বইয়ে। বিদায়ের সময় সে-কথাটা সে একেবারেই ভুলে গেছে।

পরমেশ মনে-মনে বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল। তাহলে এখানেই কি ওর সাথে সব সম্পর্কের শেষ হয়ে গেল? কই, সেও তো তার ঠিকানা দিয়ে আসেনি।

মনে করতেই আবার ভীষণ আকুল হয়ে উঠল পরমেশ। আস্তে আস্তে ক্লিষ্টকণ্ঠে ডাক দিল,—ক্যাপ্টেন!

ক্যাপ্টেন সূর্যের দিকে মুখ উঁচু করে চোখ বুজিয়ে মন রোদের আলো পান করছিলেন। সেইরকম ভাবে থেকেই বললেন,—ইয়েস, মাই বয়। কী ব্যাপার?

পরমেশ বলল,—আপনি লারউইকের একটি মেয়েকে চেনেন?

ক্যাপ্টেন রহস্য করে বললেন,—মেয়েটি যদি চল্লিশ বছরের ওপরে হয় তবে। নৈলে যার কথা বলছ, হয়তো তার মাকে চিনতে পারি।

পরমেশ বলল,—সে কিন্তু বলেছিল, সে আপনাকে খুব ভালো করেই চেনে। দেখুন, আসার সময় তার ঠিকানাটা নিতে ভুলে গেছি। আপনি বোধহয় বলতে পারবেন তার ঠিকানাটা।

এবার ক্যাপ্টেন চোখ খুলে উঠে বসলেন। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আবার হেসে ফেললেন। বললেন,—তুমি তাকেই তোমার মন দিয়ে এসেছ তো? তোমার জানা উচিত ছিল, তুমি যতটা সেন্টিমেন্টাল, এখানকার মেয়েরা ততটা নয়। মাই বয়, এখানে মন-দেওয়া-নেওয়ার মেয়াদ কতটুকু তা যদি জানতে চাও তো অর্কির কাছে যাও। সে তোমাকে দু'কথায় বুঝিয়ে দেবে। যদিও জানি, তারপরেই তোমার কানের কাছটা লাল হয়ে উঠবে। এখানকার মেয়েরা বাইরের লোক পেলে তাদের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কিন্তু কাউকে তাদের আসল ঠিকানা দেয়না সহজে। অবশ্য একজনকে আমি জানতাম যে এর ব্যতিক্রম প্রমাণ করেছিল। যাক্গে, এখন বলো দেখি মেয়েটির নামটি কী? দেখি যদি তার ঠিকানাটা আমার জানা থাকে। তোমার অবস্থাটা তো দেখছি রীতিমতোই খারাপ।

পরমেশ বলল,—রোজালিন। রোজালিন মাথার।

নামটা কানে যেতেই ক্যাপ্টেনের আয়েসের ঝিমুনি যেন সবটুকু উবে গেল। শক খাওয়ার মতো তিনি ঝুঁকে পড়ে নিদারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,—হোয়াট কী বললে? রোজালিন মাথার? কেমন দেখতে বলো তো?

পরমেশ ক্যাপ্টেনের আচরণে কম বিস্মিত হলনা। সে মেয়েটির রূপটা হুবহু বর্ণনা করে গেল। এমনকি তার চোখের নীচের ছোট্ট তিলটা পর্যন্ত বাদ দিলেনা।

ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লারেন ভুরু কুঁচকে কিরকমবিস্ফারিত চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পরমেশের দিকে। তাঁর ঠোঁটের কোণ-দুটো দু'পাশে ঈষৎ ঝুলে পড়ল। তাঁর এই ভ্রুকুটির সামনে পরমেশ যেন ভয়ানক কুঁচকে গেল। ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর ম্যাকক্লারেন বললেন,—তুমি ঠিক বলছ তো? না, ভুল দেখেছ তাকে?

পরমেশের বিষণ্ণ মুখে এবার একটুকরো হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে নীচু অথচ দৃঢ়স্বরে বলল,—আমার এই দু'হাত দিয়ে তার অপূর্ব লাবণ্যভরা দেহকে আমি আলিঙ্গনে বেঁধেছি। তার নরম সোনালী চুলের মধ্যে মুখ ঢেকে বুক ভরে নিয়েছি মিষ্টি ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ। আমার স্নায়ুর প্রতিটি কোষে লেগে আছে তার স্পর্শ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলতে লাগল,—ক্যাপ্টেন, মেয়েটি আমাকে সত্যিই ভালবেসেছিল। আসবার আগে আমাকে বহু অনুরোধও করেছিল শেটল্যাণ্ডে থেকে যেতে। সে ওখানকার স্কুলে কাজ করে। বেশ ভালো মাইনে পায়। কাজেই দুজন লোকের খরচ সে অনায়াসেই চালিয়ে নিতে পারবে—এই আশ্বাসই দিয়েছিল আমাকে।

ক্যাপ্টেন চুপ করে সব কথা শুনে গেলেন। তারপর গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—তোমার বিশ্বাস হবে কিনা জানিনা, বছর বিশেক আগে—হ্যাঁ, এখন থেকে বিশ বছরই হবে—আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রোজালিন মারারকে কবর দিয়েছি ঐ সমুদ্রের ওপর গড়িয়ে-পড়া ঢালু বরফ-ঢাকা জমিটাতে। জানো তো, ওটা একটা কবরখানা?

পরমেশের মনে পড়ল ওরই ওপর শেষবারের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে রোজালিনকে কয়েক মুহূর্তের জন্ত।

মনে-মনে সে শিউরে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে পড়ল—নাঃ, এ কিছুতেই হতে পারে না। সেই ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ, সেই অপূর্ব সুন্দর পরিপুষ্ট অঙ্গসৌষ্ঠব—আর তার উষ্ণ আস্বাদ। সেই অরোরার আলোতে বেড়াতে-বেড়াতে গল্প করা—কিছুতেই এ মিথ্যে হতে পারে না।

সে রুদ্ধকণ্ঠে বলল,—ক্যাপ্টেন, আপনি বোধ হয় ভুল করছেন—

ক্যাপ্টেন অধৈর্যকণ্ঠে বলে উঠলেন,—না হে, না। তুমি যে বর্ণনা দিলে, হুবহু সেই মেয়ে—রোজালিন মারার। আমার চোখের সমুখেই সে ফিয়র্ডের জলে পড়ে ডুবে মরেছিল। পুলিশ-এনকোয়ারি হয়। পুলিশের কর্তা প্রমাণ করেছিল সেটা আত্মহত্যা। কিন্তু আমি জানতাম রোজালিনের মৃত্যুর জন্ত প্রকৃত দায়ী কে। আমিই তাকে জল থেকে তুলে নিয়ে যাই ওপরে। তারপর তাকে আমি নিজে কবর দিয়েছি ঐ কবরখানায়।

একটু চুপ করে থেকে ক্যাপ্টেন আবার বললেন,—সব-কিছু বাদ দিয়ে তার একটা কথা আমার মনে আছে—উঃ, ওরকম একসঙ্গে স্নিগ্ধ অথচ দুরন্ত আবেগ দিয়ে ভালবাসতে আমি দুনিয়ার কোনো মেয়েকে কোনদিন দেখিনি! সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

ক্যাপ্টেনের কথা শুনতে শুনতে পরমেশের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। আতঙ্কে আর আক্রোশে মেশামিশি হয়ে তার মনের অবস্থাটা হয়ে উঠেছে অবর্ণনীয়। ক্যাপ্টেন তাঁর পকেট থেকে একটা জিনের শিশি বার করে পরমেশের হাতে দিতেই সে সাগ্রহে কয়েক ঢোক নির্জলা জিন গলায় ঢেলে দিল। ক্যাপ্টেনও খানিকটা তাঁর নিজের গলায় ঢেলে বললেন,—আশ্চর্য, এতদিনের মধ্যেও তার আত্মা তৃপ্তি পায়নি!

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন,—পরমেশ, আজ তোমাকে সেই অতীত কাহিনীটা শোনাই। শুনলেই বুঝতে পারবে তোমার রোজালিন সত্য না স্বপ্ন?

•

আজ থেকে বিশ বছর আগে ক্যাপ্টেন ম্যাকক্যারেন স্কটিশ হোম-ডিপার্টমেন্টের চাকরি নিয়ে এসেছিল আবার্ডিনে। তারপর সেখানকার একখানা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে জরীপ করতে করতে এসে নেমেছিল শেটল্যাণ্ডের বন্দর লারউইকে দীর্ঘ একমাস পরে।

কিন্তু লারউইক দেখে ভারী হতাশ হয়েছিল ক্যাপ্টেন ম্যাকক্যারেন।

ধূ-ধূ করছে ফাঁকা—রুক্ষ-বন্ধুর, পাহাড়ে দেশ হল শেটল্যাণ্ড। গোটাকতক অতি ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি। তারই মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় লোক এসে বাস করেছে এই লারউইক শহরটায়। বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে পড়ে আছে পিট বগ। একটা বড় গাছও এদেশে জন্মায় না। বারো মাসের মধ্যে এদেশ আট মাস প্রায় বরফে ঢাকা থাকে। দ্বীপের এমন কোনো জায়গা নেই, যা সমুদ্র থেকে তিন মাইলের মধ্যে নয়। তাই সমুদ্রের হাওয়ায় সোঁ-সোঁ শব্দ শোনা যায় প্রায় সব জায়গাতেই।

পূবদেশের কিভি দ্বীপে জন্ম নিয়ে আঠারো বছর পর্যন্ত যে সেখানে বেড়ে উঠেছে—সেই ম্যাকক্যারেন কোনরকমে সহ্য করেছিল আবার্ডিনকে। লারউইককে তা একদম ভালো লাগেনি। জাহাজের কতকগুলো জরুরী কা বাকী ছিল তাই চোখ বুজে থাকতে হয়েছিল সেখানে কিছুদিন—নাহলে যেদিন সেখানে পৌঁছেছিল সেইদিনই বোধহয় জাহাজের মুখ ফেরাত ক্যাপ্টেন ম্যাকক্যারেন।

শীতের সময় এখানে মাত্র একঘণ্টা দিন থাকে। তা সেও এমন ধূসর আর ম্লান—সে দিন কি রাত কিছু বোঝা যায়না।

তবে হ্যাঁ, আলো এখানে ফোটে। সে হল অরোরার আলো। সে অদ্ভুত, অপার্থিব। সমস্ত উত্তর-দিগন্ত ব্যেপে রক্তাভ আলোর বন্যা বয়ে যায়। কখনো কখনো মনে হয় অন্ধকার দিগন্তের পারে যেন কোনো বিরাট পুরুষ এক প্রকাণ্ড জ্যোতির পুঞ্জ হাতে নিয়ে হেঁটে চলেছেন দিগন্তের এপার থেকে ওপারে। কখনো বা দেখা যায় সার্চলাইটের জোর উজ্জ্বল আলো। কখনো বা বর্ণালীর পর্দা দুলতে থাকে উত্তর-দিগন্তে। তার থাকে থাকে খেলা করে সাতরঙা তরল আলোর প্রস্রবণ।

এই আলো দেখে ক্যাপ্টেন মুগ্ধ হল। ধরাও পড়ল এই আলোতে।

দুর্দম, দুর্বার, দুরন্ত ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লারেন—ভয়-ডর কারে বলে জীবনে জানেনি। তেমনি জানেনি প্রবৃত্তিকে রাশ টেনে সংযত করতে। ত্রিশবছরের মধ্যে অন্ততঃ সে ত্রিশবার ঘোরাঘুরি করেছে—প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিকে, ভারত মহাসাগর থেকে লোহিত-ভূমধ্যসাগর—দিয়ে টপ্‌কে ইংলিশ চ্যানেলে।

সাগর যত উন্মত্ত হয়ে ওঠে, ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা যত বাড়ে, ম্যাকক্লারেনের নাকি তত স্ফূর্তি হয়।

তেমনি জীবনেও সে দুর্ধর্ষ। কোনো নারীকে তার দু'দিনের বেশী পছন্দ হয়নি। বিয়ে করেনি এই ভয়ে যে—পাছে স্ত্রী ঘরোয়া, পাঁচ-পাঁচী, ছেলেমেয়ের মা হয়ে পড়ে। এইরকম মেয়েদের সে দু'চোখে দেখতে পারত না।

সে যে-নারীকে পছন্দ করত তার মধ্যে চাইত বর্বর রকমের স্বাস্থ্য, যাতে করে পড়বে যৌন-আকর্ষণ প্রতিপদে বিনা আয়াসে। যে-লোক পৃথিবীর নানা বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছে, তার এ-ধরনের নারীর অভাব কখনও হয় না।

সমুদ্রের নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে যখন ম্যাকক্লারেন লারউইকের বন্দরে এল একমাস পরে, তখন তার অবস্থা একেবারে গুন-টানা ধনুকের মতো।

'এনি পোর্ট ইন্ দ স্টর্ম' ব'লে নাবিকদের মাঝে একটা কথা আছে। নারী যখন প্রয়োজন তখন হাতের কাছে যা পাও তাই নিয়ে নাও—বাছবিচার কোরো না।

ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লারেনের কিন্তু তা ছিল না। সে বলত, না খেয়ে মরতে পারি—কিন্তু যাতে তৃপ্তি হবেনা—এমন জিনিসে আমার রুচি কদাচ হবে না।

সেদিন লারউইকের বন্দরে নেমে ম্যাকক্লারেন দেখল—বহু মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে যাদের শরীরে যৌবনের আবেদন আছে প্রচুর। কিন্তু বহু-পোড়-খাওয়া ম্যাকক্লারেন অন্ততঃ পঁচিশজনের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারল—এদের দেহই সার। মনে-মনে এরা শেটল্যাণ্ড ভেড়ীর মতোই শান্ত গৃহপালিত। পোর্টে এসে দাঁড়ায় অর্থের জন্যে নয়, শরীরের তাগিদে।

রাত্রিবেলায় রেকাবিট-ডান্স-হলে গিয়ে সে বুঝল—এই যৌনতৃপ্তির তাগিদটা এদেশে কতো ভয়ানক।

ডান্স-হল ভরে গেছে মেয়েদের দলে। সবাই প্রায় সেমত্ত-মেয়ে—যাদের ঘর আছে, বাচ্চা-কাচ্চা আছে, আছে কিছু ক্ষেত-খামার, ভেড়া আর পনি। এরা পয়সা চায় না—চায় আর-কিছু। জোয়ান পুরুষ সেখানে যা দেখা গেল তাদের সবাই প্রায় বাইরে থেকে আসা নাবিক।

এর কারণ খুঁজে পেতে দেরি হলনা। এদেশের বেশীর ভাগ পুরুষ আঠারো বছর থেকে ষাট পর্যন্ত বেঁটিয়ে চলে যায় গ্রীনল্যাণ্ডে তিমি-শিকারে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা একঝাঁক জাহাজ নিয়ে চলে এই তিমি-ধরার কাজে। সঙ্গে চলে শেটল্যাণ্ডের পুরুষরা। তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের কন্ট্রাক্ট। খাওয়া ফ্রি। যখন তারা ফেরে তখন সঙ্গে আনে টাকার পুঁটুলি।

কিন্তু এই দীর্ঘ তিন বছর থেকে পাঁচ বছর তাদের মেয়েদের যে কী দশা হয়, কে তার খোঁজ রাখে? এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটা জোয়ান পুরুষ থাকেন দ্বীপে।

শুধু কী এই! যারা টাকা নিয়ে ফিরবে, তারাও ঘ এসে বসবে না। তখুনি চলে যাবে আয়ারল্যাণ্ড কি স্কটল্যাণ্ডে মাছের কারবারে। অথবা আবার নতু কন্ট্রাক্ট সই করবে।

কাজেই দ্বীপে যারা থাকে তারা হল স্ত্রীলোকেরা আ পুরুষ-বৃদ্ধরা—যারা জীবনে আর-সব কাজ ছেড়ে এ চুপচাপ করে বসে গ্যালনের পর গ্যালন মদ গেলাটাকে যৌবনান্তের একমাত্র পন্থা বলে ধরে নিয়েছে।

সে-রাতে রেকাবিট-ডান্স-হল থেকে ম্যাকক্লারেনকে হয়তো হতাশ হয়েই ফিরতে হতো, যদিনা তার জাহাজে আঠারো বছরের সার্ভিস-বয় বিল তার সঙ্গে আলাপ করি দিত মিসেস রসের।

বিল ছিল লারউইকের ছেলে। কাজেই রসের স

তার আলাপ ছিল আগে থেকেই। কিন্তু বয়সে তার অন্ততঃ দু'গুণ তো বটেই, হয়তো তারও বেশী। মিসেস রস ভারী অসুবিধায় পড়েছিল বিলকে ডান্স-পার্টনার নিয়ে।

আড়ে-বহরে প্রকাণ্ড, উৎকট স্বাস্থ্যের অধিকারিণী মিসেস রসের বুকের কাছে টলে-টলে পড়ছিল বিলের নেশার ভারী মাথাটা। মিসেস রসের ভুরু-দুটো বিরক্তিতে কুঁচকে উঠছিল বার বার নাচের সময়।

ম্যাকক্লারেনকে পার্টনার পেয়ে মিসেস রস যেন স্বর্গ হাতে পেয়ে গেল। ম্যাকক্লারেন এক-রাউণ্ড নাচের মধ্যেই টের পেল মিসেস রসের সেই বাস্তুবিদ্বেষী জানা আছে যাতে ক'রে পুরুষের রক্তে সে একমুহূর্তে বুনো ঘোড়ার দল ছুটিয়ে দিতে পারে।

খাঁটী একবোতল 'স্কচ' গলায় ঢেলে সে-রাতে ম্যাকক্লারেন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রসও কিছু কম ছিল না। সে সমানে তাল রেখে চলেছিল ম্যাকক্লারেনের সঙ্গে। অবশেষে ডান্স-হল থেকে ম্যাকক্লারেনকে টেনে নিয়ে এসেছিল নিজের বাড়িতে সেই গভীর রাতে।

কিন্তু পরের রাতে ম্যাকক্লারেনের হল আর এক অভিজ্ঞতা।

সে-রাতে কোনো কারণে মিসেস রস ডান্স-হলে আসেনি। ম্যাকক্লারেন তাকে না পেয়ে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে দ্বিতীয় শিকারের জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠল। একে একে পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে নাচল। কিন্তু কাউকেই শেষ পর্যন্ত ভালো লাগল না। শেষে রাত দুটোতে ডান্স ভাঙলে, নিতান্ত বিরক্তমনে পা বাড়াল জাহাজ-ঘাটার দিকে।

একটা পাহাড়ের চূড়োয় হল ডান্স-হলটা। রাস্তাটা নেমে সটান এসে পড়েছে সমুদ্রের ওপর স্ট্র্যাণ্ডে। সেখানে বাঁধা আছে ম্যাকক্লারেনের জাহাজ।

আপন-মনে নেমে আসছে ম্যাকক্লারেন। অন্ধকার রাত। অত রাতে রাস্তার বেশীর ভাগ আলোই নিভে গেছে। দূরের থেকে কেবল জাহাজের আলোর কিছুটা এসে ফিকে হয়ে পড়েছে।

প্রত্যেক মেয়েই তাদের সঙ্গীর হাত ধরে ক্রতপায়ে চলেছে ঘরের দিকে। অপ্রকৃতিস্থ পায়ের শব্দে অন্ধকার রাস্তাটা মুখর।

ক্যাপ্টেনের কেমন যেন ভালো লাগল না। দল ছেড়ে সে সরে দাঁড়াল একটা গলির মুখে। ইচ্ছে—সকলে চলে গেলে সবার পিছনে একা-একা ফিরে যাবে জাহাজে।

হঠাৎ কে যেন নরম হাত দিয়ে ক্যাপ্টেনের হাতটা চেপে ধরল। আবছা আলোয় ক্যাপ্টেন দেখল—একটি দীঘল চেহারার মেয়ে। শীতে যেন ঠকঠক করে কাঁপছে। বলল, —তোমার জন্তই তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি এতক্ষণ। আমায় ঘরে পৌঁছে দেবেনা?

ক্যাপ্টেন তো অবাক। না-জানা, না-চেনা যে-মেয়ে অন্ধকারে এসে হাত ধরে—তার মতলব সবসময়ে যে ভালো হয় না, এ তো জানা কথাই।

ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লারেন ঈষৎ রুক্ষস্বরে জবাব দিল,— তোমাকে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্ত কি আমি একবারও কথা দিয়েছিলাম? আমার তো মনেই নেই আমি তোমায় এর আগে দেখেছি কোথাও।

মেয়েটি ম্যাকক্লারেনের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। হাত দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলল,—ও ডিয়ার, ডিয়ার! সেভীল্ চয়েসের সময় আমিই যে তোমাকে দু-দু'বার পছন্দ করেছি। কাজেই আজ রাতে তুমি আমার।

ম্যাকক্লারেন যথেষ্ট অবাক হয়ে গিয়েছিল মেয়েটির অদ্ভুত কথাবার্তায়। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ম্যাকক্লারেন জবাব দিল,—জাহাজ ছাড়া রাতে আমি কোথাও থাকি না।

মেয়েটি খুলখুল করে হাসতে হাসতে বলল,—কাল রাতে কোথায় ছিলে? কোন্ জাহাজের ক্যাপ্টেনী করেছিলে?

তার হাসির বন্তায় ম্যাকক্লারেন ভেসে গেল। এতক্ষণে সে মেয়েটির দিকে তাকাল। আলো একটু বেশী করেই এবার পড়েছিল তার চোখে মুখে।

দীঘল চেহারাটা—মাথায় একমাথা সোনালী চুল চোখ-দুটো টানা-টানা, অদ্ভুত রকমে সবুজ্। চোখের নীচেই ছোট একটি তিল, নাকটি সুতীক্ষ। দেখেই মনে হয় খাঁটী নর্ডিক রক্ত আছে মেয়েটির শরীরে। এদেশে যাকে বলে 'নর্স'—অর্থাৎ যাদের পূর্বপুরুষরা নরওয়ে থেকে এসে এখানে বাসা বেঁধেছিল—এ মেয়েটি সেই গোত্রের।

তবুও ম্যাকক্লারেনের পছন্দ হবার মতো এমন কিছু নয়

যেখান থেকে জাহাজে নামবার সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে তারই উপর এসে ম্যাকক্লারেন মেয়েটিকে বলল,—এবার তুমি যাও। আমি জাহাজে ফিরব। ঐ দেখছ সামনে আমার জাহাজ।

মেয়েটি ভীত চকিত ভাবে বলল,—এত রাতে তুমি আমায় একলা যেতে বলছ? আমার বাড়ি যেতে হলে সামনের ঐ উঁচু পাহাড়ে-পথটা দেখছ—ওটা ধরে যেতে হবে। ওতে একটাও আলো জলছেনা এখন।

বলতে বলতে মেয়েটি তার হাতটা গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল।

সমুদ্রের ঝোড়ো-হাওয়া সোঁ-সোঁ করে বয়ে যাচ্ছিল। একে ভীষণ ঠাণ্ডা, তার ওপর এই হাওয়া। মেয়েটার এমন কিছু নেই যে ম্যাকক্লারেনকে গরম করতে পারে। সে নির্দয় হয়ে উঠল। একঝটকায় মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেল।

কিন্তু জাহাজে ওঠবার আগেই একটা ভীষণ চীৎকার তার কানে এসে লাগল। পিছন ফিরে সে দেখল জনাচারেক মাতাল নাবিক মেয়েটাকে হাত বাড়িয়ে ঘেরাও করেছে।

একেবারে জনহীন পথ। এখন ও-মেয়েটাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললেও কেউ ওকে বাঁচাবে না।

ম্যাকক্লারেন জাহাজে উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না। কে তাকে পিছন থেকে যেন চাবুক কষিয়ে দিল। সে একছুটে গিয়ে হাজির হল সেই জায়গাটাতে।

তারপর মাতালগুলোর হাতের ফাঁকে মেয়েটাকে টেনে বার করে নিয়ে এসে প্রাণপণে ছুট দিল ওপরের রাস্তায়। মাতালগুলো ঠিক কিছু বোঝবার আগেই ম্যাকক্লারেন চলে গেল প্রায় দু'ফার্লং।

চড়াই ওঠবার ক্লান্তিতে খানিকটা দাঁড়িয়ে একবার বুক ভরে দম নিলে সে। মেয়েটি তখনও তার বুকের সঙ্গে লেগে রয়েছে লেপ্টে—একটি ভয়ার্ত ছোট্ট পাখীর ছানার মতো তার বুকের দুরন্ত কাঁপুনিটা ম্যাকক্লারেন স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল নিজের বুকের মধ্যে।

পিছনে মাতালগুলোর হল্লা শোনা গেল কিছুক্ষণ। কিন্তু তারা আর কেউই তাদের পিছনে না এসে নিজের নিজের ডেরায় চলে গেল।

আলকাতরা-গোলা অন্ধকার রাত। রাস্তার পাশে বাঁধানো ফুটপাথের ওপর ম্যাকক্লারেন হাতড়ে-হাতড়ে একটু জায়গা দেখে সেখানে মেয়েটিকে নামিয়ে দিতে গেল। মেয়েটা আরও গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল তার গলা। বুকের মধ্যে গুঁজে দিল তার মুখ।

নীচে গভীরে শোনা যেতে লাগল শুধু সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙার শব্দ। আর ওপরে ঝোড়ো-হাওয়ার আর্তনাদ উঠতে লাগল সোঁ-সোঁ করে।

এমন সময়ে উত্তর-দিগন্তের এক কোণে দেখা গেল রক্তাভ আলোর রেখা। সেই আলো জমাট বেঁধে উঠল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তারপর দিগন্ত ব্যেপে ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটি ততক্ষণ ছেড়ে দিয়েছে আলিঙ্গনের বন্ধন। ভয় ভুলে সে সেদিকে তাকিয়ে উৎফুল্লকণ্ঠে বলে উঠল,—অরোরা! উত্তরের আলো।*

ক্যাপ্টেন অরোরার আলোর দিকে চোখ মেলে রইল অনেকক্ষণ। হঠাৎ তার মনে হল, এই অরোরার সঙ্গে রোজালিনের যেন কোথায় ভয়ানক একটা মিল আছে। সে-কথা ভাবতে-ভাবতেই সে দেখল তার বুকের ভেতর থেকে যেন একটা অন্য লোক বার হয়ে এসে এ-সমস্ত-কিছুকে অতি-প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করল। একটু আগে পর্যন্ত যে-ক্রোধ তার ভেতরটা কুরে-কুরে খাচ্ছিল, তার এতটুকু রেশও আর মনের মধ্যে রইল না।

ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লারেন বলতে লাগলেন,—সেই রাতের সেই ঘটনার পর থেকে আমার মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিবর্তন ঘটল। দৈনে সমস্ত কাজ-কর্মের মধ্যে, অন্য চিন্তার ফাঁকে হঠাৎ ক'রে সেই রাতের সেই মেয়েটির কথা কেন বার বার মনে পড়বে আমার।···

পুব-পশ্চিমের বহু মেয়ের সঙ্গে যে-লোক বহু রাত কাটিয়েছে আর পরের দিনই ভুলে গেছে তাদের প্রত্যেকের মুখের ছবিটা পর্যন্ত—তার মনের মধ্যে যে এইরকম একটা মুখ এত গভীর হয়ে বসে যাবে, এ তো কল্পনারও অতীত। কিন্তু তবুও তাকে আবার একবার না দেখা পর্যন্ত ক্যাপ্টেন মনে-মনে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পরের দিন ডান্সে গিয়ে খপ্পরে পড়ে গেল মিসেস রসের। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে নাচার পর, তাকে আর ভালো লাগল না। চারদিকে তার চোখ ঘুরতে লাগল যার দেখা পাবার জন্যে—সে তখন তার জন্য অপেক্ষা করছিল রাস্তায়। রাস্তাতেই তার সঙ্গে আবার দেখা হল। সবাইয়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তারা চলে গেল শহরের বাইরে।

সে-রাতে অরোরার আলোতে তারা দুজনে ফাঁকা পাহাড়ে-পথে হাঁটতে হাঁটতে শুধু গল্প করেই কাটিয়ে দিল—যা ক্যাপ্টেন ম্যাকক্লারেনের জীবনে কোনদিন হয়েছে বলে মনে পড়ে না। যৌবনবতী কোনো নারীকে নির্জন রাতে একান্তে কাছে পেয়ে সে তাকে নিয়ে শুধুই গল্প করে কাটাবে, এ ছিল তার ধারণার বাইরে।

যে রসের সন্ধান ক্যাপ্টেন ত্রিশবছরের জীবনে একবারও পায়নি, সেই নতুন রস আস্বাদ করে সে দিনকতক থির মেরে গেল। ডান্স-হলে যাতায়াত একদম বন্ধ করে দিল মিসেস রসের খপ্পর এড়াবার জন্য।

অথচ শোনা গেল শহরের নানা জায়গায়, ডান্স-হলে মিসেস রস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে দারুণ ভাবে। একটা সম্পূর্ণ নব সুন্দর চেহারার বলিষ্ঠ দুর্দান্ত যুবকের নাগাল পেলে রস তাকে চট করে ছেড়ে দেবে একি হয়? শেষে জাহাজ পর্যন্ত ধাওয়া করল মিসেস রস।

আর সেই জাহাজের ডেকের ওপরেই ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে তার নতুন প্রণয়িনীকে বার হতে দেখে একেবারে বাঘিনীর মতো গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মিসেস রস। অশ্লীল গালিগালাজের সঙ্গে ভীষণভাবে কীল চড় লাথি মেরে মেয়েটিকে ডেকের ওপর শুইয়ে দিল মিসেস রস।

ক্যাপ্টেন ম্যাকফারেন তাকে বাধা দিতে যেতেই, সে হিংস্র স্বরে বলে উঠল,—আমার মেয়েকে আমি শাসন করব, তোমার এতে বলবার কিছু নেই।— বলতে বলতে ভূতপূর্ব মিসেস মায়ার তার মেয়ে রোজালিন মায়ারের চুলের ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন ম্যাকফারেনের মনে হল যেন তার সর্বস্ব হৃৎপিণ্ডটা ধরে উপড়ে ফেলবার জন্য একটা হিংস্র টান লাগাল মিসেস রস।

—এর পর থেকে রোজালিন মায়ারের আমার কাছে আসাটা প্রায় দুর্ঘট হয়ে উঠল। আগের পক্ষের বাপ মিঃ মায়ার মারা গেছে। মা আবার বিয়ে করেছে মিঃ রসকে। সেই রস-ও আবার গেছে গ্রীনল্যাণ্ডে তিমি-শিকারে তিনবছরের ওপর। তাই মা হল তার একমাত্র অভিভাবক। মায়ের ভীষণ নজর এড়িয়ে আসা তার পক্ষে খুবই মুশকিল হয়ে পড়ল। কিন্তু তবুও দিনের মধ্যে একবারও সে আমার কাছে আসত। সে ভোররাতেই হোক, সকাল সন্ধ্যে আর দুপুরেই হোক। আমি তারই জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতাম আমার এই কেবিনে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে চলে যেতে হল আবার্ডিনে। তার কাছ বিদায় নেবার সময় আমার বেশ মনে আছে,’ আজ তোমার যে দশা হয়েছে, পরমেশ, আমারও ঠিক সেরকম হয়েছিল। তাইতো আজ তোমার হালচাল দেখেই সব কথা বুঝে নিতে আমার বিন্দুমাত্রও দেরি হল না।

সেবার আবার্ডিনে এসে তো হাঁসফাঁস করতে লাগলাম। যে-জীবন এখানে ফেলে গিয়েছিলাম সে-জীবন আর ভালো লাগল না। বন্ধুবান্ধব, জানাশোনা লোকেরা, পোর্টের পেশাদার জানাশোনা মেয়েরা—সবাই মিলে আমাকে ঠাট্টা করল।

একমাত্র চিঠিতে খবরাখবর ছাড়া আর কোনো পথই রইল না। বার বার মনে হতে লাগল সমুদ্রটা ঝাঁপিয়ে পার হয়ে চলে যাই লারউইকে।

মাঝে মাঝে লারউইক থেকে ফিরে আসা অন্য জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাছে শুনতাম—রোজালিন নাকি রোজ পোর্টে এসে দাঁড়ায়। দ্যাখে আমার জাহাজ এল কিনা।

ইতিমধ্যে জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলাম ভূমধ্যসাগরে। মিশর-সরকার আমাকে ধার নিয়েছিল বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে। মাইনেটা যা দিচ্ছিল তার লোভ সামলানো যে-কোনো লোকেরই পক্ষে ছিল অসম্ভব। তা ছাড়া ছিল সম্মান।

সেখানকার কাজ বেশ ভালোভাবে শেষ করে যখন আবার আবার্ডিনে এলাম তখন দীর্ঘ কয়েক মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে রোজালিনের স্মৃতিটাও খানিকটা ঝাপসা হয়ে এসেছে মনের মধ্যে। চিঠিও আর ইদানীং আসেনা। আমিও লেখার অবসর পাইনা। তবে আগের সেই বুনো-ঘোড়ার মতো উচ্ছৃঙ্খলতায় একেবারে ভাটা পড়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, আবার্ডিনে ফিরে এসেই আমাকে আর খুব বেশীদিন দেরি করতে হল না। একমাসের মধ্যেই জাহাজ সাজিয়ে নিয়ে আবার গেলাম ফেরো-শেটল্যাণ্ড-চ্যানেল সার্ভে করতে।

আবার সেই লারউইক। জাহাজটা যখন জেটিতে ভিড়ল তখন সকাল এগারোটা। শীতকাল। সবে একটু আলো ফুটেছে। বারোটার মধ্যেই আলো আবার চলে যাবে। কিন্তু তারই মধ্যে দেখি রোজালিন দাঁড়িয়ে জেটিতে। আমাকে ঘড়ি-ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠিক চিনেছে। নাড়তে শুরু করেছে রুমাল।

যে-কথা যে-মনোভাব খানিকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল—তাতে যেন আমার নতুন করে জোয়ার এল। ক'দিনে আমি মেতে উঠলাম রোজালিনকে নিয়ে। ভেবেছিলাম মিসেস মায়ারের চোখ এড়াব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। ধরা পড়ে গেলাম একদিন।

আর তার কয়েকদিন পরে এক রাতে আমি দেখলাম সেই দৃশ্যটা।

যেদিন ধরা পড়ি মিসেস মায়ারের কাছে, সেই রাতে

আমি ঠিক করেছিলাম রোজালিনকে নিয়ে লারউইকের বন্দর থেকে নোঙর তুলব। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সমস্ত রাত কেটে গেল তবু রোজালিন এল না।

তার পরের রাতও সেইরকম করে কাটল।

তৃতীয় রাতে আমি ঠিক করলাম—আজ যদি রোজালিন না আসে তবে মিসেস রসের ভয়কে অগ্রাহ্য করেই আমি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসব।

সে-রাতে একটার সময় উত্তর-দিগন্ত আলোকিত হয়ে উঠল। জোয়ার-ভাঁটার জন্য আমার জাহাজ বেঁধেছিলাম খাড়ির মাঝখানে। স্ট্র্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে। আমি সেই অরোরার আলোতে লাইফ-বোটটা ভাসিয়ে চললাম তীরের দিকে। স্ট্র্যাণ্ডে পৌঁছবার আগে যে পাহাড়ের পাঁচিলটা পড়ে তুমি সেটা নিশ্চয় দেখেছ, তারই ওপর কয়েকটা বেঞ্চি পাতা আছে, আর আছে একটা রেলিং-দেওয়া ঝুল-বারান্দার মতো পাহাড়ের খানিকটা অংশ—সেটা ঝুলে আছে একেবারে খাড়ির ওপরে।

অরোরার আলোটা জমাট বেঁধে প্রায় দিনের আলোর মতো হয়ে উঠল। সমস্ত কিছু স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। আমি নীচু থেকে দেখলাম সেই ঝুল-বারান্দায় এসে কে যেন একজন স্ত্রীলোক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খাড়ির ওপরটা দেখতে লাগল। বুঝলাম সে রোজালিন। তারপরেই স্পষ্ট দেখলাম আর-একজন প্রকাণ্ড চেহারার স্ত্রীলোক আচমকা এসে তাকে পিছন থেকে দু'হাতে ঠেলে দিল। সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফিয়র্ডের জলের মধ্যে। ঝুপ্ করে একটা আওয়াজ হল। ব্যস।

আমি রুদ্ধশ্বাসে দাঁড় বেয়ে সেখানে এসে গেলাম। তারপর দাঁড় ডুবিয়ে খুঁজতে লাগলাম মেয়েটা গেল কোথায়।

একটু খোঁজাখুঁজির পর পেয়ে গেলাম তাকে। জল সেখানে খুব বেশী ছিল না। তাকে তুলে লাইফ-বোটে শুইয়ে এনে ফেললাম জাহাজের ডেকে। আলোয় এনে দেখলাম, সে আর কেউ নয়—রোজালিন মায়ার।

প্রথমে আমার কোনো কিছুতে হাত-পা এল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেও তো চলবে না। আমি পাগলের মতো তার শরীরে জলে-ডোবার সমস্ত প্রাথমিক চিকিৎসার প্রক্রিয়া চালাতে লাগলাম। অত শীতেও আমি শেষ পর্যন্ত ঘেমে উঠলাম। কিন্তু তার শ্বাস-প্রশ্বাস আর ফিরে এল না।

পরের দিন পুলিশ-এনকোয়ারি হল। সারা শহর তোলপাড় হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হল সে আত্মহত্যা করেছে। আমি কিছুতেই পুলিশকে বোঝাতে পারলাম না যে, এটা হত্যা। আর হত্যা করেছে তার মা মিসেস রস। কোনো ভালো প্রমাণই দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

শেষে আমি জানতে চাইলাম—তার আত্মহত্যার কারণ কী।

পুলিশ অফিসার পোস্টমর্টেম-রুমে নিয়ে গিয়ে আমাকে যা দেখাল, তাতে আমি যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেলাম। রোজালিনের সমস্ত শরীরে সদ্য-মাতৃত্বের চিহ্ন। অবিবাহিত একটা মেয়ের পক্ষে আত্মহত্যার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? তবে তার মায়ের কাছ থেকে নাকি শোনা গেল—সে এসবের কিছুই জানত না। রোজালিনের সদ্য-প্রসূত সন্তান যে কোথায় তাও তার মা কিছুই বলতে পারল না। সে-সন্তান যে বেঁচে আছে তারও কোনো প্রমাণ কেউ আমাকে দিতে পারল না।

রোজালিনকে আমি কবর দিলাম ঐ কবরখানায়।

কয়েকদিনের মধ্যে সেই-যে লারউইক ছাড়লাম, তারপর এই দীর্ঘ বিশবছরে বারকতক নিতান্ত কাজের গতিকে এখানে এলেও, কোনোবার এ-বন্দরে আর আমি পা দিইনি। এবারও তো দেখেছ, এখানে আমি নামিনি। আজ সে-সব পুরোনো কথা স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, পরমেশ—তুমি কি রোজালিনের প্রেতাত্মাকে দেখে এলে? আচ্ছা, তোমার রোজালিনের বাড়িটা কোথায় বলো তো?

পরমেশ জবাব দিল,—ক্লিংকিমিন ব্রথ বলে আদিম পিক্টদের ভাঙা যে দুর্গটা আছে, তারই পাশে একটা কাঠের লগ-কেবিন। বাড়িটা আমি চিনি, কিন্তু ঠিকানাটা—

ক্যাপ্টেন চীৎকার করে উঠলেন,—আরে সেইটিই তো রোজালিন মায়ারের মা—মিসেস রসের বাড়ি। আমি সেখানে গিয়েছি যে। সেখানে এখন কে থাকে?

পরমেশ জবাব দিল,—একটা ক্যানসারের রুগী বুড়ী। সেই বুড়ীর মুখেই সে নাকি আপনার নাম খুব শুনেছে।

ক্যাপ্টেন ম্যাকফ্লারেন অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় দু'হাত চেপে ধরলেন পরমেশের। বললেন,—তুমি ঠিক জান?

তারপর কিছু অপেক্ষা না করেই হুড়মুড় করে নেমে গেলেন হুইল-হাউসে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল জাহাজের মুখ ঘুরেছে। সে আবার চলেছে লারউইকের দিকে।

পল্লীর বারমাস্যা

তুলসীদাস সিংহ

। কার্তিক ।

আম, আঁকড়, কয়েৎ, আশানের মাথাগুলো বেই হয়ে যায় অন্ধকার অন্ধকার, চালকুমড়ো লাউ আর শশা-লতায় কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা তুলসী-ঝাড়টার তন্দ্রা কেটে যায় হঠাৎ শাঁখের আওয়াজে, উঠোনটা ভরে ওঠে ধুনোর ধোঁয়ায়—তখন যাত্রা শুরু করে শিশিরেরা আকাশপুরী থেকে ধূলিপুরীর দিকে। খণ্ড খণ্ড ভাবে নয়—অখণ্ড ভাবে। কালসন্ধ্যা থেকে ব্রাহ্মমুহূর্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন থাকে তাদের এ-যাত্রা। অন্তরীক্ষের বুক আঁকড়ে ঝুলতে থাকে অসংখ্য অদৃশ্য সূক্ষ্মবর্ত্ম—শিশিরবর্ত্ম। ঐ শিশিরবর্ত্ম ধরেই নেমে আসে আনন্দ-আরোগ্য-শান্তি-শ্রী।

এর আগে নেমে এসেছে রস-রূপ-বর্ণ-গন্ধ। নেমে এসেছে ধূম্রপথ আর বাষ্পপথে। ধূম্রপথ বেয়ে নেমে এসেছে রস আর রূপ—বাষ্পপথ দিয়ে নেমে এসেছে বর্ণ আর গন্ধ।

ধূম্রপথ, বাষ্পপথ আর শিশিরপথ বেয়ে নেমে আসা স্বর্গোথের এই সবগুলো দাক্ষিণ্যই যখন একজায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে, তখনই আমাদের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে [illegible]। আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা। [illegible] বাসন্তী। মায়ের হাসিতে ভরে যেতে দেখি দশ দিক।

সে হিসাবে মায়ের আগমনী শুরু হয় দক্ষিণায়ন শুরু হওয়ারও আগে থেকে। শুরু থেকেই এ আগমনী আমি দেখে আসছি। প্রথমে দেখলাম ধূলিপুরীর গোটা বুকটা জ্বলছে দাউ দাউ করে—অসংখ্য কম্পমান অগ্নিশিখায় ছেয়ে গেছে দশ দিক। ধরিত্রীর বুকের রক্তটা ধুঁয়ো হয়ে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। আকাশপুরী আর ধূলিপুরী যোগযুক্ত হয়ে পড়লো ঐ ধোঁয়াদের মাধ্যমে। অন্তরীক্ষের বুকে রচিত হল এক অখণ্ড ধূম্রপথ। ঐ ধূম্রপথ বেয়ে নেমে আসতে দেখলাম রসকে। শুষ্ক ধূলিপুরীর বুকে রসের সঞ্চার ঘটলো। তারপর এল রূপ। ধূলিপুরী হল সবুজ। দেখলাম ধূলিপুরীর বুকটা শীতল হয়ে গেছে। ধুঁয়োর পরিবর্তে তার বুক থেকে উঠে আসছে এবার বাষ্পের মতো একটা জিনিস। শুকনো বাষ্প নয়—জলেভেজা বাষ্প। ধূম্রপথের বদলে অন্তরীক্ষের বুকে রচিত হল এবার বাষ্পপথ। ঐ বাষ্পপথ বেয়ে নেমে এল এবার বর্ণ। সবুজ হল সোনালী, শ্যামল হল ঘনশ্যাম। বর্ণ এসে আবাস গাড়লে

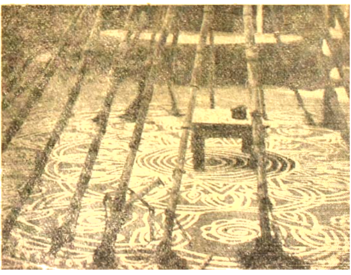

উঠান-মণ্ডন →

বিল্বে, দাড়িম্বে, মানে, ধান্তে, অশোকে, অপরাজিতায়—রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তীতে। তারপর এল গন্ধ। গন্ধ এসে আবাস গাড়লো শালুকে, পদ্মে, শেফালিকায়। বাস্পপথের এইখানেই ইতি। এবার দেখলাম রস-রূপ-বর্ণ-গন্ধ-মণ্ডিত ধূলিপুরীর বুক থেকে নিরন্তর বেরিয়ে আসছে এক শান্ত-মধুর শ্বাস। সেই শ্বাসটা গিয়ে প্রতিহত হতে লাগলো আকাশ-আয়নায়। আকাশের বুকটা ঢাকা পড়লো অসংখ্য অদৃশ্য হিমকণায়। হিমকণারা এবার অনুভব করতে লাগলো এক অদৃশ্য টান। সেই টানে নামতে শুরু করলো তারা অন্তরীক্ষ ছেড়ে। আকাশপুরী আর ধূলিপুরী যোগযুক্ত হয়ে পড়লো অসংখ্য শিশিরবর্ষের মাধ্যমে। ঐ শিশিরবর্ষ বেয়ে নেমে আসতে দেখলাম এবার আনন্দকে। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো কাশের ডগাগুলো, ধানের মাথাগুলো। আনন্দের আতিশয্যে একেবারে নীল হয়ে গেল আকাশটা—শিউলীরা একেবারে লুটিয়ে পড়লো ধুলায়। দেখলাম "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে"। শুরু হল বোধন। কিন্তু এ বোধন অকালবোধন। মায়ের বোধন নয়—মেয়ের বোধন। এ বোধন লজ্জা আর আনন্দের মূর্তপ্রতীকরূপিণী হলুদশাড়ী প'রে থাকা অবগুণ্ঠিতা কলাবৌয়ের বোধন।

হলুদ হল আনন্দের প্রতীক, ঘোমটা হল লজ্জার প্রতীক। আনন্দের সঙ্গে লজ্জা জড়িয়ে পড়লেই হয়ে যায় কলাবৌ। আনন্দটা আমাদের—লজ্জাটা আনন্দময়ীর। আমাদের আনন্দ মেয়েকে ঘরে পাওয়ার আনন্দ—আনন্দময়ীর লজ্জা অগ্রগর্ভা হওয়ায় লজ্জা, মা হতে যাওয়ার লজ্জা।

লজ্জাবতী এই লক্ষ্মী মেয়েটাকে সাধ-অন্ন খাওয়ালাম আমরা ভাদ্র-সংক্রান্তি বা আশ্বিন-সংক্রান্তির পুণ্যদিনটিতে। সাতরকমের তরিতরকারি দিয়ে সাজানো থালাভর্তি ভাত তার মুখের সামনে ধরে বললাম—

এস [illegible] বাস পাত
খাও লক্ষ্মী সাত ভাত।"

এরপর দেখলাম নেমে এল শ্রী। শ্রী এসে জড়িয়ে ধরলো আনন্দকে। হলুদ হল বাসন্তী। আনন্দময়ী হল শ্রীময়ী অন্নপূর্ণা। ধানের শীষগুলো পুরো বেরিয়ে পড়লো থোড় ছেড়ে। থোড়ের অবগুণ্ঠন খসে পড়লো। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চোখ খুলে তাকালেন। সেই সঙ্গে অবাক হয়ে দেখলাম তেত্রিশকোটী দেবতাদেরও চোখ খুলে গেল। দক্ষিণায়ন-শয্যায় শুয়ে শুয়ে হাই তুলতে লাগলেন সব। ব্রাহ্মমুহূর্তের আলো ফুটে উঠলো তাঁদের চোখে চোখে।

এবার নেমে আসবে আরোগ্য আর শান্তি। নেমে আসবে একই সঙ্গে। মায়ের চোখ খুলে গেলে, তেত্রিশকোটী দেবতাদের চোখ খুলে গেলে রোগ আর অশান্তির চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

কার্তিকের এই মিষ্টিমধুর অপরাহ্নবেলায় আমার মেটেঘরের দাওয়ায় তেলে-পাক-ধরা খুঁটিটায় হেলান দিয়ে আরোগ্য আর শান্তির আগমনী-ধ্বনি শুনবার আশায় বসে আছি। বসে থাকতে থাকতে একসময় আমার মনস্কামনা পূর্ণ হল। শুনতে পেলাম ঠিক যেন "মহাসিন্ধুর ওপার হতে" "এক মহাসঙ্গীত" ভেসে আসছে। স্পষ্ট সঙ্গীত—ঘু-ঘু-ক্ষ্‌, ঘু-ঘু-ক্ষ্‌।

বসন্ত নেমে এল কিনা তা আমরা যেমন জানতে পারি কোকিলের ডাকে—তেমনি আরোগ্য আর শান্তি নেমে এল কিনা তা আমরা জানি ঘুঘু আর শালিকদের দৌলতে। কোকিল বসন্তসখা—তেমনি ঘুঘু শান্তিসখা, শালিক আরোগ্য-সখা। কার্তিক ছাড়া ঘুঘু অন্য সময়েও ডাকে, কিন্তু সে অন্যসময়ের ডাকগুলো এমন চরমে ওঠে না। যেমন ওঠে না কোকিলের ডাক চরমে একমাত্র বসন্ত ছাড়া। কোকিলের ডাক চরমে উঠলেই যেমন জানতে পারি বসন্ত নেমে এসেছে—তেমনি ঘুঘুর ডাক চরমে উঠলেই জানতে পারি শান্তি নেমে এসেছে। চোখ বুজে শুনতে লাগলাম ঘুঘুর গলা দিয়ে বেরিয়ে-আসা সোনার ডাক, মিষ্টি ডাক, পূর্ণতার ডাক। ডাক নয়—মুঠো-মুঠো শান্তি ঝরে পড়তে লাগলো মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে, আমার মনের মধ্যে।

ঘুঘু হল শান্তিসখা, শালিক হল আরোগ্য-সখা। এরপর শালিখদিকেও দেখলাম আমগাছের মাথায় মাথায় কিচির-মিচির করে নেচে বেড়াতে। অথচ এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও চোখে পড়েনি এদিকে। মজা কি জানেন—একটানা দু'এক মাস ধরে যদি রোগজ্বালা দেখা দেয় গাঁয়ে-ঘরে, তাহলে আর চোখে পড়বে না এদিকে। বুঝতে পারে ওরা আগে হতে—রোগজ্বালা দেখা দেওয়ার আগেভাগেই সরে পড়ে সব গাঁ ছেড়ে। আর ভাদ্র মাসের গোড়া থেকে কার্তিক মাসের গোড়া পর্যন্ত সময়টা রোগজ্বালা হওয়ারই সময়। এ সময়ের মধ্যে যদি জ্বরজ্বালা না হয় কারো, তবে বুঝে নিতে হবে সে মানুষ নয়—খয়েরগাছের কাঠ। কথাতেই তো আছে—

"আশ্বিনমাসের আট থেকে কার্তিকমাসের আট
এর মধ্যে যার জ্বর হল না, সে খয়েরগাছের কাঠ।"

গাছের যেমন পোকা—মানুষের তেমনি রোগ। খয়েরগাছের

কাঠে পোকা ধরে না কখনও। সুতরাং ভাদ্র মাসের আট থেকে কার্তিক মাসের আট পর্যন্ত কারো জরজ্বালা না হলে, তাকে খয়েরগাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সাধারণতঃ এ সময়টার মধ্যে জরজ্বালা হবেই গাঁয়ে, এবং হলেই, শালিকরা পালাবে গাঁ ছেড়ে। তারপর তারা যখন ফের আসবে তখন বুঝতে হবে ফাঁড়া কেটে গেল। রোগজ্বালা বিদায় হয়ে গেল গাঁ থেকে। যমের দুয়ারে কাঁটা পড়ে গেল।

দূর্বা আর চন্দন হল আরোগ্য আর শান্তির প্রতীক। পল্লীর বোনদের হাতে-হাতে এরপর একদিন দেখলাম দূর্বাচন্দন। স্বর্গের অমরতাকে টেনে নামিয়ে আনলো তারা ভাইদের কপালে কপালে—

"ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।"

•

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চোখ খুলে তাকিয়েছেন, তেত্রিশকোটী দেবতাদেরও চোখ খুলেছে। আমাদের পিতৃপুরুষেরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলেছেন। তেত্রিশকোটী দেবতাদের সঙ্গেই যে তাঁদের আসনটি পাতা। দেবতাদের দিবারাত্রির সঙ্গে তাঁদের দিবারাত্রিটিও বাঁধা। কিন্তু পিতৃযানের পথ যে এখনও অন্ধকারে ঢাকা। ব্রাহ্মমুহূর্তের আভা দেখা দিয়েছে মাত্র—উত্তরায়ণ-দিবার আলো ফুটতে এখনও দেরি আছে যে একটু। সুতরাং তাঁদের উদ্দেশে আমরা আলো তুলে ধরলাম। অন্ধকারের পরপারে ঐ-যে জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারকা, ওদেরও ঊর্ধ্বে আছেন আমাদের পিতৃপুরুষেরা। আমাদের তুলে-ধরা ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপটির ক্ষুদ্র শিখা অন্তরীক্ষ ছাড়িয়ে উঠে পড়ে সেখানে। সারা কার্তিক মাস হল স্বর্গলোকের ব্রাহ্মমুহূর্তক্ষণ। সারা কার্তিক মাস ধরেই তাই আমরা স্বর্গবাতি তুলে ধরি। সারা মাস ধরেই এ-বাতি আলো ছড়ায় পিতৃযানের পথে পথে। মর্ত্যের মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি হলেও এ-বাতি—স্বর্গবাতি।

আলো তুলে ধরার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে এর পর। ব্রাহ্মমুহূর্ত কেটে গিয়ে ফুটে উঠবে উষার আলো। দক্ষিণায়নরূপ ঘনঘোর অমারাত্রি বিদায় নিবে। ধূলিপুরী করবে সেদিন আলোকোৎসব। একটা প্রদীপ নয়—হাজারটা প্রদীপ জেলে। ছেলে-বুড়ো সকলের হাতেই জ্বলে উঠবে পাকাটি দিয়ে তৈরী অসংখ্য আলোকখণ্ড—মেয়েদের হাতে জ্বলবে অসংখ্য মাটির প্রদীপ। ঘরে বাইরে উঠোনে আঁস্তাকুড়ে আঁচিরে-পাঁচিলে পথে ঘাটে চারদিকেই বসে যাবে আলোর হাট। একটা প্রদীপের আলো—আলো নয়, আভা—ব্রাহ্মমুহূর্তের আভা। আর হাজারটা প্রদীপের আলো, প্রদীপের আলো নয়—দিনের আলো।

বড়ার বিয়ে

•

আলোকোৎসবের আলো শুধু দিনের আলো নয়—সুদিনের আলো। গরীব ছিলাম এতদিন—গরীব থেকে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলাম, এবার আমরা বড়লোক হবো—বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন সার্থকতার পথে। সেই আনন্দেই মশগুল হয়ে উঠেছে আমাদের মনগুলো। আমাদের মনে-মনে হয়েছে আনন্দময়ীর অধিষ্ঠান। কিন্তু আনন্দকে অন্তরে ধরে রাখবার উপায় নেই। আনন্দ প্রকাশধর্মী। অন্তরে উদয় হওয়ামাত্র এ বাইরে বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে পড়ে রূপকে অবলম্বন ক'রে। বিভিন্ন রূপের মাধ্যমে ঘটে আনন্দের প্রকাশ। আনন্দময়ী জেগে উঠলেই তাই রসময়ও জেগে ওঠেন। উত্থান-উৎসবের মধ্যে রসময়ের এই জেগে-ওঠাটিই আমার চোখে মূর্ত হয়ে ওঠে। রসের প্রতীক রস-ই। উত্থান-মণ্ডপ রচিত হয় তাই আখ দিয়ে। আখের মাথাগুলোকে নিয়ে একসাথে ঝুঁটি বেঁধে দেওয়া হয়—রসময় ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে ঐ ঝুঁটিটির

উপরে চড়ে বসবেন। মণ্ডপটা তো আগাগোড়াই ধান দিয়ে তৈরি। যে জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে মণ্ডপ, সে-জমিটাও থাকে আলপনা-রসে ভরা। মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করা হয় দলবদ্ধভাবে কীর্তন-রস ছড়াতে ছড়াতে।

আনন্দ প্রকাশ পায় বিভিন্ন রসধারাকে অবলম্বন করে। আর এই রসধারাগুলি পল্লীর বুকে মূর্ত হয়ে ওঠে মুখ্যতঃ বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করেই। তেরো পার্বণের মধ্যে এই রসধারাগুলি একাত্ম হয়ে জড়িয়ে পড়েছে। এবং বারোমাসে তেরো পার্বণের তাই এত ছড়াছড়ি।

আর ছড়াছড়ি বলতে যা বোঝায় তার শুরু এই কার্তিক থেকেই। কত খুঁটিনাটি উৎসবই না চোখে পড়ে এখন থেকে। কি করে একটু আনন্দ করা যায় তা যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন নাকি বড়লোকেরা ঘটা করে কুকুর-বিড়ালের বিয়ের আয়োজন করেন। পল্লীর মানুষদের মনের অবস্থাও এখন যেন ঠিক তাই। তাঁরাও সব এ সময় ঘটা ক'রে গরুর, কলাইয়ের বড়ার বিয়ের আয়োজন করেন।

ঐ-যে ধাত্রীপূজার পরদিন জামাতৃস্বপনা বা জামাই-বান্না—ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় গাঁয়ে গাঁয়ে দেখবেন গরুর বিয়ের বাসর বসেছে। বিয়ের সময় আমরা পরি চন্দন—গরুদের গোটা গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয় গেরুমাটি-গোলা, খড়িমাটি-গোলা রঙের ছোপ। আমরা পরি সোলার টোপর—গরুদের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় ধানশীষ আর দাঁওলতা দিয়ে বোনা অপূর্ব তাজ। আমাদের বিয়েতে যেমন পুরুতঠাকুর মন্ত্র পড়েন—গরুর বিয়েতেও তেমনি পুরুতঠাকুর এসে মন্ত্র পড়েন। এবং গরুদিকেও বরণ করা হয় যথারীতি হুলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বরণডালা কপালে ঠেকিয়ে। এ বরণডালাতেও থাকে হলুদ, তেল, সিঁদুর, কাজললতা, আয়না, চিরুনি, প্রদীপ, সোনা, রূপা, ধান, দূর্বা।

আর, বড়া অর্থাৎ কলাইয়ের বড়ার বিয়ে দিই উত্থানের পরের দিনটিতে। গরুর বিয়ে হয় সন্ধ্যায়—খাঁটি গোধূলি-লগ্নে। কিন্তু বড়ার বিয়ে হয় সকালে। গরুর বিয়ে দিতে আসেন পুরুতঠাকুররা—বড়ার বিয়ে দিতে আসেন পুরুতঠাকুরদের গিন্নীরা। বিয়ের আসর বসার আগে আমাদের বাড়ীর সব গিন্নীরা পুরুত-গিন্নীর কপালে বেশ জল্‌জলে করে মাখিয়ে দেয় সিঁদুর। আমবাটিতে কলাই-বাটা তৈরি হয়ে আছে, সামনে পেতে দেওয়া হয়েছে তেলচুকচুকে টিনের পাত। পুরুত-গিন্নী এবার সকালের মিঠে রোদটিতে বসে কলাইবাটা দিয়ে দুটি বড়া তৈরি করে টিনের পাতটির উপর বসিয়ে দিলেন। ঐ দুটোর একটি হল বর—অন্যটি কনে। দুজনের মাথায় গুঁজে দেওয়া হল দু'গোছা দূর্বা—ঐ হল টোপর। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো শাঁখ।

বাঁচার ক্ষেত্রে মানুষ যার কাছ থেকে এতটুকুও সহায়তা পেয়েছে সেই হয়েছে মানুষের দেবতা। মাসে মাসে, ঋতুতে ঋতুতে মানুষ সে-দেবতাদিকে নিয়ে উৎসব করেছে, দেবতাদের প্রতি নিবেদন করেছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা। জল, হাওয়া, মাটি, শস্য, ফুল, ফল, এমনকি প্রতিটি আহার্য-বস্তুও আমাদের চোখে দেবতা। বারো মাসে তেরো পরব তাই সম্ভব হয়েছে—তাই সম্ভব হয়েছে বড়ার বিয়ে দেওয়া, গরুর বিয়ে দেওয়া। এ দেখে বিস্মিত হবারও কিছু নেই—হেসে উঠবারও কিছু নেই। আপনা থেকেই বরং মাথা নুয়ে পড়া স্বাভাবিক, যাঁরা এজাতীয় খুঁটিনাটি উৎসবের স্রষ্টা তাঁদের কথা স্মরণ ক'রে।

সামান্য কলাইয়ের বড়া—যা একটা অতি নগণ্য তরকারির পর্যায়ে পড়ে, তাকে পাতে তুলবার আগেও আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাদিকে নিয়ে উৎসব করছি। বড়া খেতে শুরু করার নিয়ম হল কার্তিকের এই বড়ার বিয়ের পর থেকেই—তার আগে নয়। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদরা দিতে পারবেন।

মাস শেষ হয়ে গেল। লক্ষ্মীমাকে মাঠ থেকে ঘরে তুলে আনবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষ্মীমাকে ঘরে তুলে আনবার আগে লক্ষ্মীমায়ের মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আমরা ভুলে যাবো না। ইতু বা মিত্রপূজার মাধ্যমে আমরা সেই কৃতজ্ঞতাই জানাই।

উর্বরতার উৎস হল সূর্যতেজ। এই সূর্যতেজ ধারণ করেই ধরিত্রীদেবী মা হয়ে ওঠেন। তাঁর কোল আলো ক'রে জেগে ওঠে লক্ষ্মী মেয়েটি। তাই আমরা আমাদের প্রাণস্বরূপা লক্ষ্মীকে ঘরে তুলতে পাই। লক্ষ্মী-মায়ের মা হল ধরিত্রী, বাবা সূর্যদেব। মাটির সত্তার মধ্যে ধরিত্রীদেবীর অধিষ্ঠান ঘটিয়ে তুলে ধরছি সূর্যদেবের দিকে। ধরিত্রী আর সূর্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে—পরে লক্ষ্মীমাকে ঘরে তুলে আনছি।

আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

ম্যাকমহোন লাইন সম্পর্কে চীনের দাবি

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

আকৃতিতে মহাচীন একটি মহাদেশের মতো বিশাল হলেও, পররাজ্যলোলুপতা তার চিরদিনই প্রবল। সুযোগ পেলেই প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে সে হয় তার আশ্রিত, না হয় অবিচ্ছিন্ন অংশ ব'লে দাবি ক'রে বসে। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ইন্দোচীন, এমনকি নেপাল, বর্মা প্রভৃতি দেশগুলির ওপর সে নানা অছিলায় তার অধিকার কায়েম রাখার চেষ্টা করেছে, এবং তার জন্যে জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স প্রমুখ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। অবশ্য ঐসকল যুদ্ধের প্রায় প্রত্যেকটিতেই চীনকে শেষপর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে, এবং আজ একমাত্র তিব্বত ছাড়া আর কোনো দেশই তার অধিকারভুক্ত নয়।

ভারতকে কোনদিন চীন তার সাম্রাজ্যভুক্ত ব'লে দাবি করার দুঃসাহস না করলেও, ভারতের উত্তর-সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলকে সে বহুকাল থেকেই বার বার নিজ মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেখিয়ে আসছে। আড়াই শ' বছর আগের মানচিত্রও এই চৈনিক পররাজ্যলোলুপতার সাক্ষ্য বহন করে। মুঘলযুগে সম্রাট শাজাহানের শাসনকালে চীন একবার লাডাক অধিকারের চেষ্টা করে। কিন্তু শাজাহান-প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে লাডাক-রাজ সে-আক্রমণ প্রতিহত করেন। এরপর আর কখনও চীন অস্ত্রবলে ভারতের ভূখণ্ড অধিকারের চেষ্টা করেনি। কিন্তু মনে-মনে তারা তখন থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূস্বামী হ'তে আরম্ভ করে।

১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যুর দু'বছর আগে হৃতবীর্য বৃদ্ধ সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন দক্ষিণ-ভারতে বিদ্রোহ-দমনে ব্যস্ত, সেইসময় চীন-সম্রাট ক্যাঙ-সি হিমালয় অঞ্চল জরিপের উদ্দেশ্যে ভারতের উত্তরপ্রান্তে এক জরিপ-দল পাঠান। সেই জরিপ-দলের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সরকার চীনের একখানি মানচিত্র প্রকাশ করেন, যাতে কাশ্মীর ও উত্তর-ভারতের বহু স্থান চীনের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেখানো হয়। ঐ মানচিত্রই আবার জেসুইট ধর্মযাজকদের হাত দিয়ে ইউরোপে চ'লে যায়, এবং চীনের মানচিত্র ব'লে পরিচিতি লাভ করে। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীর বিখ্যাত ভৌগোলিক ডি' এনভিল তাঁর মানচিত্র-সঙ্কলনে ঐ মানচিত্রটিকেই চীনের মানচিত্ররূপে প্রকাশ করেন।

কিন্তু ঐ মানচিত্রে প্রদর্শিত ভারতীয় অঞ্চলগুলি যে সেদিন সত্যই চীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তার হাজার প্রমাণ ঐ মানচিত্রটি থেকেই পাওয়া যায়। হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগের বিভিন্ন এলাকা ও পাহাড় নদনদী প্রভৃতির অবস্থিতি ওতে এমনই ভুল ক'রে দেওয়া ছিল যে, তাতেই প্রমাণ হয়ে যায় যে ঐসব স্থান সম্পর্কে কোনো ধারণাই সেদিন চীনের শাসকদের ছিল না। এমনকি, সিন্ধু ও গঙ্গা যে দুটি আলাদা নদী তাও তাঁরা জানতেন না, আর সেইজন্যে ঐ দুটি নদীকে একাকার ক'রে তাঁরা উত্তর-ভারতের ওপর দিয়ে বইয়ে দিয়েছিলেন।

ভারত সরকারের উদ্যোগে ভারতের উত্তর সীমান্ত স্থিরীকরণের প্রথম উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময়েই সর্বপ্রথম সিকিম, নেপাল, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে ভারতের অধিকারের সীমা সুনির্দিষ্ট করা হয়। এরপর ১৮৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহামের পরিচালনায় জরিপ করা হয় কাশ্মীর ও তিব্বতের মধ্যবর্তী ভারতীয় এলাকা। ভারত-সরকারের ঐ জরিপ সেদিন তিব্বতের মহামান্য দলাই লাম ও লাসায় চীনা রাষ্ট্রদূতের অনুমোদন লাভ করে। বল বাহুল্য, ভারত সরকারের উদ্যোগে রচিত ঐ মানচিত্রগুলির সঙ্গে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন-প্রচারিত মানচিত্রের অতি সামান্যই সাদৃশ্য ছিল। এইভাবে কাশ্মীর থেকে নেপা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের উত্তর সীমান্তের মানচিত্র ঊনবিং শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই স্থির হয়ে গেল। বাকি রইল শুধু ভূটান থেকে বর্মা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের উত্তর-পূ অঞ্চলের সীমান্ত নির্ধারণ।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে চীন-তিব্বত বিরোধ আবার প্রবল আকার ধারণ করতে, ঐ অঞ্চ সম্পর্কেও ভারত সরকারের পক্ষে আর নিশ্চিন্ত থাক সম্ভব হ'ল না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনের তিব্বত পুনর্দখলের প্রয়াস তিব্বতীদের প্রবল প্রতি-আক্রমণে শুধু ব্যর্থই হলে যায় না, বিপর্যস্ত চীনা সৈন্যবাহিনী পিছু হঠতে হঠতে একেবারে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার উপক্রম করে এতেই ভারত সরকার বুঝলেন যে, অনতিবিলম্বেই ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তরেখা সুনিশ্চিত ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। এই কারণে তাঁরা ভারত, তিব্বত ও চীনের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষ-সম্মেলন আহ্বানের উদ্যোগ করলেন।

তাই, সম্মেলনের আগেই, তিব্বত-রাজ্যের সীমান্ত ভারতের উত্তরে ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সে-সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার লেফ্‌টেনান্ট চার্লস বেলের নেতৃত্বে এক অভিযাত্রী-দল তিব্বত-সীমান্তে প্রেরণ করলেন। ইয়ং হাসব্যাণ্ডের তিব্বত-অভিযান-কালে চার্লস বেল ছিলেন তাঁর প্রধান সহকর্মী, আর তিব্বতী ভাষাও তিনি খুব ভালো জানতেন। তাই এ-কাজে ভারত-সরকার তাঁকেই যোগ্যতম ব্যক্তি ব'লে মনে করলেন। চার্লস বেল তাঁর সেই তথ্যসমৃদ্ধ দুঃসাহসী অভিযানের কাহিনী *No Passport to Tibet* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। ঐ গ্রন্থেরই একজায়গায় লোপা খণ্ডজাতির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"সীমান্ত-শায়ী মিগিটাম অতিক্রম ক'রে তিব্বত-রাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি লোপা খণ্ডজাতির ছিল না।" তার একটু পরেই তিনি লিখেছেন—"We found ourselves on the edge of the *No man's land* between the Tibetans and the Lopas." এই উক্তিটুকুর বিশেষ উল্লেখ এখানে এই কারণে করা হ'ল যে, এই লোপা-খণ্ডজাতি-অধ্যুষিত লদ্ধ্ এলাকার ওপর অধিকার নিয়েই ভারত ও চীনের মধ্যে বিরোধ আজ সবচেয়ে জোরালো হয়ে উঠেছে। এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে যে, লদ্ধ্ কোনদিন তিব্বত বা চীনের অধিকারভুক্ত ছিল কিনা।

কর্নেল বেলের তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে ভারত-সরকার ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় পূর্বকল্পিত ত্রিপক্ষ-সম্মেলন আহ্বান করলেন। তাতে তিব্বতের প্রতিনিধিরূপে এলেন ঐ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী লা-ত্র আর চীনের প্রতিনিধি হয়ে এলেন ইভান চেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করলেন ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারি স্যার হেনরি ম্যাকমহোন, এবং কূটনৈতিক রীতি অনুসারে তিনিই সম্মেলনের সভাপতি হলেন। কর্নেল চার্লস বেল হলেন ভারত সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা। কিন্তু সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচ্য অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সকলের চেয়ে বেশি ছিল ··· ব'লে খুব সহজেই তিনি সকলের ওপর প্রভাববিস্তারে সমর্থ হলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের একখানি মানচিত্র টেবিলের ওপর রেখে, তাতে ভূটান থেকে বর্মার উত্তরপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ৮৫০ মাইল দীর্ঘ দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ওপর একটি লাল পেন্সিলের দাগ টেনে তিনি প্রস্তাব করলেন, ঐ লাইন বরাবর ভারত-তিব্বত সীমান্ত স্থির করা হোক। তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বললেন, আসামের সমতলভূমি আর ঐ প্রস্তাবিত সীমান্তরেখার মধ্যে সর্বত্র রয়েছে একশ' মাইল বিস্তৃত দুর্গম পর্বতশ্রেণীর দুস্তর ব্যবধান। আর সেখানে বাস করে আবর, মিশমি, লোপা প্রমুখ দুর্ধর্ষ খণ্ডজাতি, যারা কোনদিনই তিব্বতের শাসনাধীন ছিল না। তাঁদের সঙ্গে তখনও পর্যন্ত সভ্যজাতের যে সামান্য যোগসূত্রটুকু স্থাপিত হয়েছিল—তা হয়েছিল ভারত থেকে যাওয়া খ্রীষ্টধর্ম-যাজকদের মাধ্যমে।

বহু তর্ক-বিতর্কের পর তিব্বত ও চীনের প্রতিনিধিগণ স্যার চার্লস বেলের প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন, এবং ঐ লাইন বরাবর ভারত-তিব্বত সীমান্ত স্থিরীকৃত হ'ল। স্যার হেনরি ম্যাকমহোন সিমলা-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন ব'লে, তাঁর নামানুসারে ঐ সীমান্তরেখার নাম হ'ল 'ম্যাকমহোন লাইন'।

কিন্তু সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির পাকা দলিলে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্যে কাগজপত্র যখন চীন সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তখন তাঁরা এক নতুন আপত্তি তুললেন। তাঁরা বললেন, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে প্রস্তাবিত 'ম্যাকমহোন লাইন'সম্পর্কে তাঁদের কোনো বক্তব্য নেই, কিন্তু তিব্বত ও চীনের মধ্যে যে সীমান্তরেখা প্রস্তাবিত হয়েছে তা তাঁরা মানতে রাজী নন। সিমলা-সম্মেলনে গৃহীত চারটি সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রথমটি ছিল ঐ সম্পর্কে। তাতে তিব্বতকে বহির্তিব্বত ও অন্তর্তিব্বত এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চু-সম্রাট ক্যাঙ-সি সর্বপ্রথম তিব্বত আক্রমণ ক'রে ঐ দেশের যে-অঞ্চলটুকু অধিকার করেছিলেন, সেই অঞ্চলটুকুর অন্তর্তিব্বত নাম দিয়ে তার ওপর চীনের পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়েছিল। আর অবশিষ্ট তিব্বতের বহির্তিব্বত নামকরণ ক'রে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। চীনে ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে চীনকে খুশি করার জন্যেই বৃটিশ সরকার তিব্বতকে ঐ ধরনের অবমাননাকর প্রস্তাবে সম্মত হ'তে বাধ্য করেছিলেন। অন্যথায় স্বাধীন তিব্বত লক্ষ লক্ষ চীনা-আক্রমণ প্রতিহত ক'রে কখনোই তার একটি অংশ ঐভাবে চীনের হাতে তুলে দিতে সম্মত হ'ত না। ভারত চীন উভয়কেই একসঙ্গে অসন্তুষ্ট করার সাহস অবশ্যই তিব্বতের ছিল না।

কিন্তু, যে-কথা আগেই বলা হয়েছে,—এত ক'রেও

ভারতস্থ বৃটিশ সরকার চীনের সাম্রাজ্যলোভী রাষ্ট্রনায়কদের মনোরঞ্জন করতে পারলেন না। সমগ্র তিব্বতের ওপর যাদের লোভ, তাদের কি আর শুধু অন্তর্তিব্বতটুকু দিয়ে পরিতুষ্ট করা সম্ভব? তাই চীন সরকার কিছুতেই সিমলা-সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির পাকা দলিলে স্বাক্ষর দিতে সম্মত হ'লেন না। ফলে, তখন শুধু তিব্বত ও ভারত-সরকারের প্রতিনিধি সিমলা-সম্মেলনের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদান করলেন, এবং 'ম্যাকমহোন লাইন' বরাবর নিজেদের সীমান্তরেখা স্থির ক'রে নিলেন।

চীনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিব্বত সরকার সেদিন যে ভারত সরকারের সঙ্গে স্বাধীনভাবে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তাতেই তর্কাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে, তিব্বতের ওপর তখন চীনের কোনই কর্তৃত্ব ছিল না। থাকলে, তিব্বতের পক্ষে চীনকে অমনভাবে উপেক্ষা করা কখনোই সম্ভব হ'ত না। যেমন সম্ভব নয় আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-সরকারের পক্ষে ভারত সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান বা নেপালের সঙ্গে কোনো চুক্তি সম্পাদন করা। পশ্চিমবঙ্গের এ ক্ষমতা থাকলে তাকে অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্র ব'লে স্বীকার করা হ'ত। যাই হোক, তিব্বত ও ভারতের মধ্যে ঐ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকে, গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধ'রে ম্যাকমহোন লাইনের দক্ষিণভাগস্থ যাবতীয় অঞ্চল ভারত সরকারের শাসনাধীন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, এবং ততদিন পর্যন্ত সে একবারের জন্যেও ম্যাকমহোন লাইনের দক্ষিণভাগস্থ এক ইঞ্চি জমির প্রত্যর্পণ দাবি করেনি। তার পরেই কমিউনিস্ট-চীনের আক্রমণে সে স্বাধীনতা হারায়।

এই অধিকারের জোরেই কমিউনিস্ট চীন আজ ভারতের শাসনাধীন প্রায় চল্লিশহাজার বর্গমাইল স্থান তার সম্পত্তি ব'লে দাবি করতে আরম্ভ করেছে। তার এই দাবির পেছনে যুক্তি হ'ল যে, একদিন ঐসব অঞ্চল তিব্বতের ছিল, এবং যেহেতু তিব্বত আজ চীনের অধীন সেইহেতু ঐসব স্থানও চীনের অধীনে প্রত্যার্পিত হওয়া উচিত। ন্যায়শাস্ত্রে 'ফ্যালাসি অব কোর চার্জ্‌স্' ব'লে একটি অনুপপত্তি আছে, যার উদাহরণস্বরূপ বলা হয়—'আমার হাত টেবিল ছুঁয়ে আছে, টেবিল মাটি ছুঁয়ে আছে; অতএব আমার হাত মাটি ছুঁয়ে আছে।' চীনের দাবির পেছনে ঐটুকু যৌক্তিকতা আছে ব'লেও কেউ স্বীকার করবেন না, কারণ টেবিলের মাধ্যমে হাতের সঙ্গে মাটির যে সম্পর্কটুকু কল্পনা করা যায়, এক্ষেত্রে সে-কল্পনারও সুযোগ নেই। কারণ ঐ স্থানগুলি কোনদিনই তিব্বতের শাসনাধীন ছিল না, এবং যতদিন তিব্বত স্বাধীন থেকেছে ততদিন একবারের জন্যেও তার পক্ষ থেকে কেউ এ-দাবি উত্থাপন করেনি। তা ছাড়া যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে, একদিন ঐসব স্থান তিব্বতের অধিকারে ছিল, তাতেই বা চীনের কি আসে যায়? তিব্বতের যেটুকু স্থান চীনের কমিউনিস্ট সরকার অস্ত্রবলে অধিকার করেছেন সেইটুকুর ওপরেই তো তাঁরা দাবি জানাবেন, না, সেই মান্ধাতার আমল থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বতের অধিকারে যখন যে-অঞ্চল ছিল তার সবই আজ তাঁরা তাঁদের রাজ্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে দাবি করবেন? তাহলে আমাদেরই বা চীনের একটি বিরাট অংশ দাবি করতে বাধা থাকে কোথায়? ভারত-সম্রাট কণিষ্কও তো একদিন চীনকে পরাস্ত ক'রে চীনের বিরাট অংশ দখল করেছিলেন, এবং চীন-সম্রাটের এক পুত্রকে বন্দী ক'রে ভারতে এনেছিলেন। আজ যদি কেউ বৃটেন অধিকার করতে পারে তাহলে কি সেই অধিকারের জোরে ভারত, বর্মা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, এমনকি ম্যার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপরও তার অধিকার কায়েম হয়ে যাবে? এমন অর্থহীন যুক্তি বোধহয় কোনো নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষেও দেখানো সম্ভব হ'ত না।

আন্তর্জাতিক আইনে কোন্ স্থান কার তার মীমাংসা হয় প্রত্যক্ষ অধিকারের ভিত্তিতে, যে-কারণে তিব্বত আজ চীনের অংশ বা আলজিরিয়া ফ্রান্সের। সুতরাং আর কোনো কারণে না হ'লেও, শুধুমাত্র এই যুক্তিতেই তো ভারত-শাসিত ঐ চল্লিশহাজার বর্গমাইল স্থান ভারতের অবিচ্ছেদ্য এলাকা।

ভারতকে এ-ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব নিতেই হবে। আন্তর্জাতিক আইনের যাবতীয় ধারা উপধারা ভারত আজ পর্যন্ত অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে, এবং তার জন্যে ক্ষেত্রবিশেষে নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করতেও সে দ্বিধা বোধ করেনি। সুতরাং এই কর্তব্যপালনের বিনিময়ে তার প্রাপ্য অধিকারটুকু সে কিছুতেই ত্যাগ করবে না। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিগত কারণে যা ভারতের সম্পদ তার ওপর অন্য কারও দাবি ভারতবাসী স্বীকার করবে না। চীন যদি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় তবে 'ম্যাকমহোন লাইন'-এর দক্ষিণভাগস্থ প্রতি ইঞ্চি জমি সর্বযুক্তিতে ভারতের সম্পদ, এ কথা স্বীকার ক'রে নিয়েই, তাকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে হবে।

জটিরামের কড়চা

অমিপ্রিয়

। ২য় অবস্থা ।

ভেংচি

আজ তিনদিন হইল ছেলেমেয়েরা আমাকে ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি, আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী চপলাসুন্দরী পর্যন্ত তাহাতে সায় দিয়াছেন! তাঁহারই আঁচলে চাবির গোছায় আমার ঘরের চাবি ঝুলিতেছে। বিকালে শেষপর্যন্ত জানালার খড়খড়ি ভাঙিয়া তাঁহাকে কতবার সাধ্যসাধনা করিলাম, কিন্তু তালা যেমন ছিল, তেমনই রহিল!

অথচ কী আমার অপরাধ? তিনদিন আগে চপলাসুন্দরীর দাদা আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। আমি তো তাহার কোনো অন্যায় করি নাই। কেবল একবার ভেংচি কাটিয়াছিলাম। তাহাতে কী এমন ক্ষতি হইল জানি না, চপলাসুন্দরী আমাকে তাড়িয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকেও ভেংচি কাটিলাম। ছেলেবেলায় এমন কতই তো করিয়াছি। চপলাসুন্দরী ইচ্ছা করিলে আমাকেও ভেংচি কাটিতে পারিতেন। একদিন আমরা দুইটি। তাহাতে বুঝিতাম প্রথম-যৌবনের প্রেম জমিয়া ক্ষীর হইয়াছে। তাহা হইল না। ধর্মপত্নী দাঁত-খিঁচুনি সহযোগে যাহা বলিলেন তাহা বড়ো নির্মম। তাঁহার দাদাও তাহাতে সায় দিতে আমার আর সহ্য হইল না। আমি আগে ভেংচি কাটিয়াছিলাম। এবারে বাছাধনের হাত কামড়াইয়া দিয়া জানাইলাম জটিরাম চাকলাদার এখনো মরে নাই।

সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতাজীর তারস্বরে চীৎকার। সবাই ছুটিয়া আসিল। ছেলেমেয়েরা তাহাদের গর্ভধারিণীর পক্ষ লইয়া এমন কাণ্ড শুরু করিয়া দিল যেন বাড়ীতে পাগল পড়িয়াছে। কী করিব, সম্পত্তি সব বেনামীতে করিয়াছিলাম। সেই বেনামী হাতের চাপেই ঘরের তালা মুখ বুজিল। কত অনুনয় বিনয় করিলাম, কিন্তু একজনও কান পাতিল না! গৃহিণী মুখঝামটা সহযোগে বিষাক্ত সংলাপ দিয়া গেলেন, 'মিনসের যতদিন না পাগলামি ছাড়ে ততদিন থাক এমনি বন্ধ হ'য়ে।' শালী ফোড়ন দিলেন, 'একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হ'য়ে গেছে যে!'

সকলে চলিয়া গেল। একা ঘরে ভাবিতে বসিলাম। সত্যই কি আমি পাগল হইয়া গিয়াছি? যদি পাগলই হইব, তবে যথাসময়মতো ভেংচি কাটিলাম কেন? কামড়াইতে পারিলাম কেমন করিয়া? আমি পাগল হই নাই। উহারা পাগল হইয়াছে তাই আমাকে পাগল বলিতে পারিল। আমার কথা শুনিলে পাছে উহাদের পাগলামি সারিয়া যায় সেই ভয়ে আমাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া গেল। সুতরাং আমার বলিবার কথা মুখে না বলিয়া লিখিয়া রাখিব। যদি কোনোদিন কোনো সুস্থ মানুষের হাতে পড়ে

তবে তাহারা বুঝিবে পাগল কে ছিল—জটিরাম চাকলাদার, না চপলাসুন্দরী-অ্যাণ্ড-পার্টি।

আমি ভেংচি কাটিয়াছি, ঠিকই করিয়াছি। আমি আদি সভ্যতার উত্তরসাধক। যেসকল পণ্ডিত বলেন, গুহা-যুগ হইতে মানব-সভ্যতার উৎপত্তি, তাহারা মিথ্যাকথা বলিয়াছেন। মানবজাতির ইতিহাস তাঁহারা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া লিখিয়াছেন। গুহা-যুগের অনেক আগেই যে উল্লুক-সমাজে সামাজিক সভ্যতার উৎপত্তি এ কথা গোপন করিয়া মানবজাতির উপর অবিচার করা হয়। কে-না জানে, উল্লুক-সমাজের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হইতেছে দলবদ্ধ ভাবে থাকিয়া কোন্দল করা? মানুষ তাহার আদিপুরুষের সেই মহান ঐতিহ্য আজও নিষ্ঠাভরে পালন করিয়া আসিতেছে। তাহা সত্ত্বেও সেই সুপ্রাচীন উল্লুক-সংস্কৃতির উল্লেখমাত্র না করিয়া যাহারা বলেন, মানুষ তাহার সভ্যতা নিজে তৈয়ারি করিয়া লইয়াছে, তাঁহাদের অবশ্যই কোনো বদ মতলব আছে। গুহা-যুগের আগে আমাদের সেই পূর্বপুরুষগণ যখন বৃক্ষশাখায় লাঙ্গুলের তিন প্যাঁচ কষিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে প্রেম করিতেন, কোন্দল করিতেন, চতুষ্পাঠী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন সে-যুগে কোনো প্রেস-ফটোগ্রাফার কিম্বা ভাড়াটে লেখক ছিল না বলিয়া কি তাঁহাদের কাহিনী বেমালুম চাপিয়া দিতে হইবে? সভ্যতার সেই বৃক্ষশাখা-যুগে হঠাৎ এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমস্ত বড়ো বড়ো গাছ মাটির তলায় চাপা পড়িয়াছিল। বাকী ছিল সামান্য কিছু গুল্ম আর ক্যাক্টাস। ক্যাক্টাসে লেজ প্যাঁচানো বড়ো কষ্টসাধ্য। তাহা ছাড়া দোল খাইবার জায়গারও অভাব। তবু একদল ছোকরা সেই চেষ্টাই করিল। অন্য দল তাহাদের মাথায় গাঁট্টা মারিয়া গুহায় চলিয়া গেল। প্রথম দল বনবাদাড়ে পড়িয়া রহিল, দ্বিতীয় দল গুহায় আসিয়া এন্তার পাথর ঠোকাঠুকি করিয়া বলিল, আইস, আমরা মানব-সভ্যতার পত্তন করি। এই তো আসল ইতিহাস। তাই গুহা-যুগের পাথরে আঁকা যে-সব ছবি এপর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার একটিতেও নবকায়ম্, হাও-লেব কিম্বা লেদাস-আলেকুয়ের চিহ্নমাত্র নাই। স্পষ্টই অনুমান করা যায়, এইসব চংগুলি পরবর্তী যুগে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। লাঙ্গুলের প্যাঁচের উপর যে-সভ্যতা কয়েক হাজার বছর ধরিয়া বৃক্ষশাখায় দোলা খাইত, সেই সভ্যতাই তো আদি ও অকৃত্রিম। সে-আমলে পত্রিকার প্রচলন ছিল না বলিয়া লাঙ্গুলের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের সন তারিখ তিথি নক্ষত্র কেহ লিখিয়া রাখে নাই। তাই বলিয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিতে হইবে?

যদি ইতিহাসকে বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ভেংচি কাটিয়া আমি অপরাধ করি নাই। পাগলামি তো নয়ই। যে উল্লুক-সংস্কৃতির বিপুল ঐশ্বর্য লইয়া আজ পর্যন্ত মানব-সভ্যতা এত পুষ্ট হইয়াছে, সেই মূল সংস্কৃতিকে ভুলিব? কেন ভুলিব? রোমবাসীরা গ্রীসবাসীকে ভেংচি কাটে নাই? কামড়ায় নাই? রোমান ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টরা কি নতুন কিছু করিয়াছিল?

যাহার জোর বেশী সে প্রথমে ভেংচি কাটে, পরে দরকার হইলে কামড়ায়। যাহার জোর কম সে ভেংচি কাটিয়া পলাইয়া যায়। আমি দুর্বল নহি। পলাইব কেন? তাই দরকারমতো কামড়াইয়াছিলাম। পুরাণকে যাহারা শাস্ত্র বলিয়া চালায় তাহারা যেমন মতলববাজ, ঠিক তেমনি মতলববাজ তাহারা—যাহারা অর্বাচীন যুগের মেকী সৌজন্য এবং বিনয়কে সভ্যতা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করে। আসল সভ্যতার নিদর্শন ভেংচি। অতএব আমি ভেংচি কাটিব। তাহাতে চপলাসুন্দরী যদি আমাকে চিরকাল ঘরে বন্ধ করিয়া রাখে তো রাখুক।

জবালা

জ্যোতির্ময়ী দেবী

পথে অসম্ভব ভিড় জমেছে। বাড়ীর সামনে বসেছে কটি নহবতখানা—বসানো হয়েছে গেটের একদিকে একটি ক করে। নিচে ছোটো বেঞ্চিতে সানাই-ওয়ালার দল বসে নাই বাজিয়ে চলেছে। একদল ব্যাণ্ডপার্টিও রাস্তার ধারে পাতা বেঞ্চিতে বসে আছে, উৎসবে জমাট হ হুম-দুড়ো বাজাবার অপেক্ষায়।

সারা পথ এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আলো ঝলমল করছে। নানা রঙের বিদ্যুতের আলো বাল্‌ব্‌, নানা রঙের পতাকায়, ফানুসের আলো উৎসব-বাড়ীখানি যেন আলতা-সিঁদুর-চন্দন-মা বেনারসী-জরী-জড়োয়ার নানা অলঙ্কার বসন পরা নতুন কনেটির মতো সেজে বসে আছে।

শহরে নতুন এসেছি। ভিড় ঠেলে যেতে যেতে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাদের বাড়ী বিয়েবাড়ী বোধ হচ্ছে। খুব বড়লোক বুঝি?'

বন্ধু বললেন, 'জানো না বুঝি? শশী ঘ ছেলের বিয়ে। লোহার কারবারী শশী ঘ লাল হয়ে গেছেন। এই সেদিন গুলজারবা মস্ত বাড়ী করেছেন। ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে নতুন বাড়ীতে এসে।'

'ও। না, আমি তো সবে এসেছি বা হতে। ওঁর নাম শুনিনি।'

অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের নানাবিধ যানবা আর পথিক দর্শকদের এবং ভিখারী যাচকদে ভিড় ঠেলে নানারকম তোড়্যশভর বা আলোকিত পথ ছাড়িয়ে পথের অন্য প্রান্তে এ পৌঁছলাম।

বাঙালী ব্যবসা ক'রে এত বড়লোক হয়ে কৌতূহল হল। 'তা শশী ঘত লোকটি কে কোথায় বিয়ে দিচ্ছেন ছেলের? বে কোথাকার? কলকাতার?'

বন্ধু বললেন, 'নাঃ, কাশীর মেয়ে। ম তাইতো, তুমি তো কিছুই জানো না শশী ঘ ইতিহাস।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'এর আবার ইতিহাস কি?'

'বেশ একটু আছে। শুনবে?'

বললুম, 'বলো।'

বন্ধু বললেন: আমারো শোনা কথা। অনেকদিনের কথা হল। বহুদিন আগে একবার এক শীতের সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এলো। পথের লোক যে যেখানে পারে আশ্রয় নিল। কেউ-বা কোনো দোকান-ঘরে, অনেকে কারুর বাড়ীর রকে, কেউ-বা গাছতলায়। ভদ্রলোক, সাধারণ লোক সকলেই ঘেঁষাঘেঁষি করে একত্র জড়ো হয়ে দাঁড়াল। বর্ষাকালের বৃষ্টি হলে তো বেশী ভাবনা ছিল না, শীতের সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভিজলে পরদিনই জ্বরে পড়তে হবে। তারপর পরিণামে হয়ত চারজনের কাঁধে চড়ে নৌকো করে বাগবাজার-ঘাটে পৌঁছতে হবে। কিন্তু অত ভিড়ের মাঝে মেয়েটিই ছিল। কি করে সে বৃষ্টির সময় সঙ্গিনীদের দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তারা বা কোন্‌দিকে গেল তা বুঝতে পারল না। নিরুপায় হয়ে সে একটা বাড়ীর সামনে একটা বড় গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। বাড়ীর রকে অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে আর উপরে ওঠেনি।

কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই খুব জোরে বৃষ্টি নামল আর মেয়েটি তার কপালের 'টিকুলী', গায়ের 'চোলী', 'ইমামী' রঙের (মহরমের উৎসবের রং) সবুজ শাড়ী সবশুদ্ধ ভিজে সপসপে হয়ে গেল। কপালের টিকুলী ভেসে গেল—শাড়ী, জামা গায়ে লেপটে গেল।

রকের ওপরের দু'একজন লোক বললে, মাইয়া (মেয়ে) উঠে আয় না? কিন্তু সিক্তগাত্রা প্রাপ্ত-ষোড়শী মেয়েটির ঐ অবস্থা দেখে রকের ওপরেরই দু'একটা ইতরশ্রেণীর লোক গুনগুন করে অশ্লীল গ্রাম্য গান গাইতে শুরু করে দিলে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে বন্ধুদের দিকে চেয়ে।

মেয়েটি বা রামপতিয়া গ্রামের মেয়ে। গ্রাম্য সঙ্গীত আর ঐ ধরনের ভাবভঙ্গী তার অজানা নয়। তার সঙ্গের সাথীজনও হারিয়ে গেছে। তারা আপনজন না হলেও, একব্যবসার লোক তো বটে।

সে নিরুপায় ভয়ে ভাবনায় চুপ করে দাঁড়িয়েই ভিজতে লাগল। যারা উপরে উঠে দাঁড়াতে বললে, তাদের কথা মতেও ভরসা পেল না ঐ গায়কদের ভয়ে। কে জানে না সহরে কেমন। বৃষ্টিও আরো জোরে নামল। [illegible] ভয়ে ভাবনায় তার চোখে বৃষ্টির ধারা নেমে এলো। এদিকে গায়কদের গান আরো উদ্দাম হয়ে উঠল।

এমন সময়ে একটা ঝকঝকে ঘোড়ার গাড়ী রকের সামনে এসে দাঁড়াল। আর, একটি ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে এসে রকের ওপর উঠলেন। একটি ভৃত্য এসে বাড়ীর দরজা খুলে দিলে। বোঝা গেল তিনি বাড়ীর লোক বা মালিক।

তিনি তীক্ষ্ণ চোখে রকের জনতাকে একবার চেয়ে দেখলেন, গাছের তলায় মেয়েটির দিকেও চোখ পড়ল।

গানটা তখন সহসা থেমে গেছে। লোকটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন। খানিক পরে যখন তিনি আবার একবার বাড়ীর রকে এসে দাঁড়ালেন তখন রক একেবারে খালি—বৃষ্টি কমে এলেও, পড়ছে। শুধু গাছতলার মেয়েটি রকের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে—তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে।

একটুখানি কী ভেবে তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি ভিতরে এসে দাঁড়াবে? বৃষ্টি থামলে বাড়ী যেয়ো।'

মেয়েটি ভিতরে এলো। সদরের গলির মধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিল। ভদ্রলোক তার দিকে চেয়ে ছিলেন। তারপর ভৃত্যকে বললেন, 'যা, আমার একটা ধুতি এনে ওকে দে। ও কাপড়টা ছাড়ুক মাথামুছে দিয়ে। তারপর ওকে একবাটি চা বানিয়ে দে।'

মেয়েটিকে বললেন, 'কাপড় ছাড়ো, চা খাও, তারপর বাড়ী যেয়ো।'

অত ভেজার ফলে মেয়েটি কাপড় ছেড়ে চা খেয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। এবারে বসবার ঘরের আলোতে দেখা গেল বছর ১৫।১৬ বয়স হবে মেয়েটির শ্যামগৌর রং। অত্যন্ত ভীত ত্রস্ত মুখখানা।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ঘর কোথায়?'

সে সহরের কাছাকাছি এক গ্রামের নাম করল।

'সেখান থেকে এতদূরে এসেছে কেন—কী কাজে?'

মেয়েটি বললে, 'আমার সখীরা সব মহরমের মেলা দেখতে এসেছিল এখানে, আমিও সেইসঙ্গে ছিলাম। তারপর এই বৃষ্টিতে তারা হারিয়ে কোন্‌দিকে গেল আর দেখতে পাইনি। তাই এইখানেই দাঁড়িয়েছিলাম।'

এবারে সে বসে পড়ল গুটিয়ে-সুটিয়ে। বেশ বোঝা গেল সে কাঁপছে। একটা কম্বল এনে সদয়ভাবে ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কাঁপছ। এই কম্বলটা নাও। মুড়ি দিয়ে একটু শুয়ে থাকো। শীত করবে।'

শীত কমল কিনা, বৃষ্টি থামল কিনা, রাত্রি কত হ'ল কিছুই আর রামপতিয়ার জ্ঞানগম্য হ'ল না।

কোনো সময়ে তার যখন চেতনা ফিরে এলো, সে তখন হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে। যে-বাড়ীতে সে ছিল, এটা সে-বাড়ী নয়। সে আবার চোখ বুজে শুলো।

বিকালবেলা সেই ভদ্রলোক তাকে দেখতে এলেন। তার জ্ঞান ফিরেছে দেখে বললেন, 'আজ তাহলে চোখ খুলেছ। ভালো আছ?' মেয়েটিকে বললেন, 'ভালো আছ? তোমার জ্বর হয়ে গেল। সেই-যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলে আর ওঠোনি। তখন আমি তোমাকে হাসপাতালে পাঠালাম আজ তিন দিন হল। তুমি একেবারে অঘোরে ছিলে।'

রামপতিয়া চুপ করে নির্বোধের মতো চেয়ে রইল। গ্রাম থেকে মেলায় আসা, হাসপাতাল, গাছতলা, লোকটির বাড়ীতে আশ্রয় সব তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে ভালো হয়ে বাড়ী যাবে। তাদের নাম-ঠিকানা বলো। তারা আসতে পারবে খবর দিলে।'

রামপতিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজলে।

লোকটি বললেন, 'আচ্ছা, আজ থাক।'

কয়েকদিন বাদে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় হলো।

ভদ্রলোক এলেন। বললেন, 'আজ তোমায় ছাড়বে ওরা। কোথায় যাবে?'

রামপতিয়া চাদর গায়ে দিয়ে ময়লা-রঙা নিজের কাপড়খানি প'রে চুপ করে খাটের ওপর বসে ছিল।

ভদ্রলোকটির কথায় প্রথমে উত্তর দিলেনা। তারপর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। একটী নার্স এসে দাঁড়িয়েছিল; বললে, 'কাঁদছিস্ কেন? আজ তো বাড়ী যাবি।'

সে চোখ মুছলে, তার পর বললে, 'আমার তো বাড়ী নেই।'

'সেকি! তোর গ্রাম দেশ কোথায়?'

রামপতিয়া গ্রামের নাম বললে, বাপেরও নাম বললে। কিন্তু বললে, 'আমার মা-বাপ তো নেই, সবাই পিলেতে মারা গেছে অনেকদিন। আমাকে আমার এক গ্রাম-সুবাদে নানীর বাড়ীতে গ্রামের লোকেরা রেখে দিয়েছিল। আমি তাদের বাড়ীর সব কাজ করতাম, গরু-ছাগলের কাজ করতাম, নানীর পা টিপতাম, তেল মাখাতাম—তারা খেতে পরতে দিত। এতদিন পরে গেলে তারা তাড়িয়ে দেবে; মারবে।

নার্স অবাক হয়ে চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তবে ননীবাবু, কি করবেন? কোথায় যাবে ও? আজ তো ওকে যেতেই হবে। আজকে তবে আপনিই নিয়ে যান।'

রামপতিয়া এবারে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বললে, 'বাবুজী, আমাকে আপনার বাড়ীতে "দাই" ঝি করে রেখে দিন—আমি সব কাজ করতে পারি। গ্রামে গেলে এতদিন পরে তারা আমাকে আর রাখবে না। জাত নষ্ট হয়ে গেছে বলবে।'

১৫।১৬ বছরের কোমল মুখখানি ক'দিনের রোগে একটু পাণ্ডুর হয়েছে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য রংটা একটু উজ্জ্বল হয়েছে। মুখটির চেহারা এতদিন স্পষ্ট ননীবাবুর চোখে পড়েনি, আজ মনে হল বড় ভীত শঙ্কিত অসহায় মেয়েটি।

কিন্তু নার্সকে বললেন, 'আমি কি করে নিয়ে যাব? আমারো তো বাড়ীতে কেউ নেই। একটা চাকর মাত্র থাকে। আমি চাকরি করি, বাড়ীতে থাকি না সারাদিন।'

নার্সটি বললে, 'আপনি কোনোখানে চাকরি করতে দিয়ে দেবেন ওকে। আপনি তো বাঙালী। কত জানা-শোনা বাড়ী আছে তারা ছেলেমেয়ের কাজে রেখে দেবে।'

রামপতিয়া চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল আনতভাবে। আর ননী দত্ত বিব্রতভাবে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে তাকে নিয়ে উঠলেন।

নাঃ, রামপতিয়া বা পাতিয়ার চাকরি কোথাও হল না।

কেউ বললেন, 'ঐটুকু মেয়ে কী কাজ করবে?

বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ কেউ-বা বললেন, 'নাঃ, ওরকম মেয়ে কে আগলে বসে থাকবে…'

কোনো রসিক বন্ধু বললেন, 'তুই-ই রাখ,—তোর ঘরে কেউ তো মেয়েমানুষ দেখাশোনা করবার নেই…'

রামপতিয়া ঘর ঝাঁট দেয়। বাসন মাজে। কাপড় কাচে সাবান দিয়ে। আর, ব্যাকুল উদাস মনে বসে থাকে আর মাঝে মাঝে কাঁদে। তাকে ননী দত্ত না পারেন তাড়াতে, আর সেও যেতেও ভয় পায়, অথচ গ্রামের জন্যও মন কেমন করে। ননী দত্তর কেউ কেউ বন্ধুরা—আমার বাবাও একজন বন্ধু ছিলেন—বললেন, 'অনাথাশ্রমে পাঠিয়ে দাও হে—বাঙালী নয়, জানা নয়, চেনা নয়—তোমার এত দায় বা দায়িত্ব কিসের?'

সেকালে অনাথাশ্রম তেমন কিছু এখানে ছিল না। হিন্দু-অনাথাশ্রম তো নয়ই। দানাপুরে একটা অনাথ-আশ্রম ছিল যেন, কিন্তু সেটি খ্রীষ্টানদের।

ননীবাবুর বন্ধুরা বললেন, 'হোক ক্রিশ্চান। তুমি দিয়ে

যাও ওইখানেই। আর ওর কি জাত-টাত বজায় থাকবে? পথে পথে চাকরিই করবে তো।'

খ্রীষ্টান অনাথাশ্রমের লোকেরা তাকে নিয়ে যাবে শুনে, রামপতিয়া আকুল অঝোর ধারে কাঁদতে আরম্ভ করলে। আর আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে কয়লার ঘরের কোণে আশ্রয় নিলে।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে ননী দত্ত ওকে সেখানে পাঠাবার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। আর কিছু করার আশা বা হাল ছেড়ে দিলেন। তবু মাঝে মাঝে বন্ধুদের বাড়ী 'দাই' বা ঝি করে রাখতে পারা যায় কিনা চেষ্টা করতেন। যদি ভদ্রভাবে দায়মুক্ত হতে পারেন।

এমন সময় মার্চের শেষে সেকালের মতোই সমারোহ ক'রে বিহারের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে প্লেগের সমাগম হল। প্রথমে দূর গ্রাম, তার পর শহরের নানা বস্তি, তার পরে ঘরে ঘরে—এর বাড়ীর কোনো সঙ্কীর্ণ কোণে জলের জালার পাশে, তার বাড়ীর ভাঁড়ারের চালের টিনের পাশে, কারুর বাড়ীর বাক্সের পিছনে—গলাফুলো অর্ধমৃত ও মরা ইঁদুর দেখা দিতে লাগল। পোড়ো মাঠ বেয়ে, নর্দামার ধার বেয়ে সারি সারি নির্জীব সজীব ইঁদুরের পলায়ন-অভিযানও দেখা যেতে লাগল।

মানুষও গলা ফুলে ওঠবার আগেই অর্ধমৃত হয়ে উঠল আতঙ্কে। দিনে রাত্রে যখন তখন বাড়ীর পাশের বসতি বা বস্তি থেকে, কাছাকাছি পাড়াঘর থেকে কখনো মৃদু কান্নার গুঞ্জন ওঠে। কখনো উত্তাল উদ্বেল কান্নায় আকাশ বাতাস ভেঙে পড়ে। আর তার পরে দেখা যায় ছোট-বড় বাক্স তোরঙ্গ পেঁটরা মাথায় অথবা জীর্ণ মলিন বিছানা আর কাপড়ের পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় হাতে নিয়ে সারি সারি আতঙ্ক-অভিভূত নরনারী—ছেলেমেয়ে শিশু কোলে নিয়ে, হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলেছে পথে—মৃত্যুর করাল প্রসারিত বাহুর সীমানা ছাড়িয়ে বাঁচার প্রয়াসে ও আশায়। কোথায় যাবে তা তারাও জানে না, আমরাও জানতুম না।

আর বস্তির সঙ্গে প্রাসাদ-অট্টালিকা থেকে নিয়ে সবরকম ঘর-বাড়ীর অধিবাসীরাও দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলেন। শোন নদের উপরে জনবিরল গ্রামে, রাজগীরের কাছে বিহারের নানা স্থানে নানা পল্লীগ্রামে যেখানে প্লেগের বিস্তৃত আলিঙ্গন তখনো পৌঁছতে পারেনি সেইসব জায়গায় ছোট-বড় ঘর-বাড়ী নিয়ে লোকেরা আশ্রয় নিলেন।

আর গ্রাম-জনশূন্য রাজপথের দু'ধারে সরকারী 'ঝোপড়ী' তৈরি করে প্লেগাক্রান্ত রোগীদের রাখা হতে লাগল। কুম্ভমেলায় সাগরমেলায় তীর্থ-ঝোপড়ীর মতো।

ননী দত্ত আপিসের সামান্য কেরানী। বাড়ীতে আর কে-বা আছে যে পাঠাবেন তাদের? নিজেরও ছুটি নেই।

বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন শোনের ধারের গ্রামে কৈলওয়ারে। পুরুষরা—উকিল ডাক্তার দোকানদার—নানা কর্মচারী—সকলেই নিজের নিজের পরিজন স্ত্রী-পুত্রদের পাঠালেন বটে, নিজেরা কিন্তু যেতে পারলেন না রুজি-রোজগারের দায়ে, চাকরির দায়ে। তাঁরা আসা-যাওয়াও করতেন। প্রাণ হাতে নিয়ে শহরেও বসে থাকতেন।

ননী দত্তও গেলেন না।

হঠাৎ একদিন তাঁর সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে প্রবল জ্বর হল। চাকরটা বাবার কাছে খবর দিতে গেল মুখ শুকনো করে। বাবা ডাক্তার নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই, তার শরীর খারাপ লাগছে তাই বাড়ী যাচ্ছে ব'লে চাকরটা পালালো।

বাড়ীতে শুধু রামপতিয়া আর রোগী। বাবাও সভয়ে ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকলেন। সে-প্লেগের যে কী ভীষণ আতঙ্ক তুমি বুঝতে পারবে না। দেখতে শুনতে সময় হতো না। শরৎ চাটুয্যের 'শ্রীকান্ত'তে নিশ্চয় পড়েছ প্লেগের একটু-আধটু অথচ স্পষ্ট বর্ণনা।

যাই হোক, বাবাও শুকনো মুখে শঙ্কিত ভাবে বন্ধুর ঘরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার নিয়ে।

ডাক্তার নাড়ী টিপে, বগল আর সব গ্ল্যাণ্ডের জায়গা দেখে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত মুখে বাবাকে বললেন, 'না, প্লেগের আক্রমণ হয়নি। মনে হচ্ছে, বসন্ত হবে। গায়ের জ্বর-ব্যথা সেইজন্যেই।'

তার পর চারদিকের আবহাওয়ায়—প্লেগ, মাঝখানে একটি বসন্ত-রোগীকে নিয়ে রামপতিয়া সাবিত্রীর মতো বসে রইল; এবং বাবা আর ডাক্তার নিয়মিত দেখাশুনা করতে লাগলেন।

তারপর ননী দত্তকে যমের মুখ থেকে একলাই ঐ মেয়েটাই টেনে নিয়ে এলো যেন। বুঝতেই পারছ, এবার সে তার ঐ 'সাবিত্রী'-ব্রতের পূর্ণফলই পেল। ননী দত্ত তাকে আর কোনো জায়গায় পাঠাবার বিশেষ চেষ্টা-চরিত্রও করলেন না। সেও রয়েই গেল। এবং ক্রমে যেন সে তাঁর একজন আপনার লোকের মতো বা ঘরের লোকের মতো হয়ে উঠল।

ধর্মরাজ যম তাকে কিছু 'বর' দিয়ে গিয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু একসময়ে তারপরে সে শতপুত্র না হোক, ননী দত্তর এক পুত্রের জননী হয়ে বসল।

এই শনী দত্তই সেই ছেলে।

বিয়ে হ'ল কিনা—সেকালে হতে পারত কিনা এখনকার মতো মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে রেজিস্ট্রি করে—ননী দত্তর মনে সে-সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছু হয়েছিল কিনা, ঠিকঠাক কিছুই আমরা শুনিনি। আর তখনকার এদেশের বাঙালী-সমাজে কতখানি তিনি পাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন বা না-ছিলেন তাও জানিনা। তবে দু'একজন তাঁর বন্ধু, যেমন আমার বাবা আর কেউ কেউ তাঁকে অপাঙ্‌ক্তেয় করেননি। এ ছাড়া তখন সেকালে এখানে সম্পন্ন লালা কায়েত (কায়স্থ), 'বাভন' (যাদের বলে জরাসন্ধের ব্রাহ্মণ) ঘরে নৈতিক চরিত্র-নিষ্ঠাতে একটু এদিক-ওদিক হলে কিছু এসে যেত না। নিন্দেও হত না। অনেকেরই প্রকাশ্যভাবেই 'অবিদ্যা' থাকত। অবিদ্যাদের সন্তানাদিও থাকত। রূপবতী দাসীদেরও পরিবারে একটা স্থান থাকত। আমাদের সেকালের বাংলাদেশের জমিদার ও ধনী মহিলাদের মতো এখানকার গৃহিণীরাও এ-সব মনস্তাপ-কষ্ট সয়ে নিতেন, সন্দেশের মতো না হোক, কুইনাইনের মতো করেই।

সুতরাং 'ননী দত্ত ও রামপতিয়া' সংবাদটাতেও মনে হয় সেকালের বাঙালী-সমাজ-তেমন মাথা ঘামায়নি। উপেক্ষা করেই গিয়েছিল। বিদেশ-বিভূঁইতে একলা মানুষ অমন করেই থাকে এই ভেবে।

যাই হোক, ননী দত্ত যে কী ভেবেছিলেন সেটা বাবাও ঠিক জানতেন না। তবে তিনি যেমন অসহায় অনাথ মেয়েটিকে তাড়িয়ে বা সরিয়ে দিতে পারেননি, সে-ও তাঁর জীবন-সংশয়ের দিনে তাঁকে ফেলে চলে যেতে পারেনি। ন উভয়তঃ মনে একটা দাগ কেটেছিল ঘটনা দুটি।

কিন্তু তারপরে যখন ঘরনী গৃহিণীর মতো হয়ে বসল, আর তার সন্তান হল—সে যেন বড়ই সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে সে ঝিয়ের (দাইয়ের) মতোই থাকত। হয়ত তার মনে হ'ত সে ঐ বাঙালী ভদ্রলোকটিকে তার সমাজ থেকে নামিয়ে সরিয়ে এনেছে। কোথায় যেন তার একটি নরম মন ছিল, পরে সেটা আরো বোঝা গেল।

ননীবাবু ছেলেটিকে কিন্তু ভালো স্কুলে দিয়ে, পিতৃনাম পরিচয় দিয়ে পড়াতে লাগলেন। 'দাসীপুত্র' বা অবিদ্যা-পুত্রের মতো রাখলেন না।

ছেলে লেখাপড়া ভালোই শিখল। বি.এ. পাসও করল। তারপর কেমন ক'রে চোদ্দ-সালের যুদ্ধের সময়ে পিতাপুত্রে ব্যবসা করে একেবারে ফেঁপে উঠল। বি.এ. পাস, টাকাকড়িও হয়েছে, এবং ছেলেরও বিয়ের বয়স হল। পিতা পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় গেলেন।

মা বা রামপতিয়া এখানেই রয়ে গেল। কী ভেবে ননী দত্ত নিয়ে যাননি কে জানে। আমার বাবা গিয়েছিলেন বরযাত্রী হিসেবে।

এই বিয়ের পরই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল। প্রায় অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার মতো মেয়ে এলো কলকাতায় বেশ সম্পন্ন এক স্বজাতির ঘর থেকে। রূপ নিয়ে, অর্ধেক রাজত্ব না হোক, বেশ-কিছু যৌতুক-গহনা-আসবাব নিয়ে।

স্ত্রী-আচার-মতে বরণ-আচার-অনুষ্ঠান আদির আয়োজন ননী দত্ত বাড়ীতে এখানকার কিছু রাখেননি। রামপতিয়াও কিছু করেনি। কিন্তু সে গ্রাম্য সরল আনন্দে বিহারের মেয়েদের মতোই কপাল অবধি সিঁদুর প'রে, চুড়ী প'রে, হলদে রঙের একখানি ভালো শাড়ী প'রে, দুটি ভরা ঘট দুয়ারের দু'পাশে রেখে নিজের মনের মতো মাঙ্গলিকের কিছু আয়োজন করে রেখেছিল। ঝি বা দাই শ্রেণীর কয়েকটি মেয়েও জড়ো হয়েছিল মঙ্গলগান গাইবার জন্য।

তারপর কয়েকখানা ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই করে যখন ছেলে-বউ নিয়ে ননী দত্ত বাড়ীতে উঠলেন—বাবা দাঁড়িয়ে দত্তর পাশে। গ্রামকন্যা রামপতিয়া হাসিমুখে সামনে এসে রূপে-সাজে ঝলমল-করা বাঙালী কনে-বৌ দেখে এত অবাক হয়ে গেল যে, এগিয়ে আর এলো না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

শনী বৌ-সুদ্ধ এগিয়ে গেল মার কাছে। মাকে প্রণাম করবে বলে বোধহয়। করলও হয়ত। কিন্তু বৌ একেবারে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সঙ্গের ঝি (সেকালে ঝি আসত বিয়ের কনের সঙ্গে) গালে হাত দিয়ে বললে, 'ও কে, জামাইবাবু? পেন্নাম করছ যে?'

অস্পষ্ট স্বরে, মাথা না নুইয়েই কনে-বৌও বলল, 'ও কে?'

বাড়ীতে আশপাশের সমবেত সামান্য লোক-ক'টির সঙ্গে শনীর বাবা, আমার বাবাও যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যেন শনীর বাবা, শনী—তাঁরাও বুঝতে পারেননি বা ভাবেননি এরকমটা হতে পারে রামপতিয়াকে নিয়ে—তার বেশভূষা নিয়ে।

ইতিমধ্যে রামপতিয়া কিন্তু চট করে কী ভেবে নিয়ে যেন সবদিক সামলে ভাঙা বাংলায় বললে, 'আমি শশীর দাই, ওকে মানুষ করেছি।'

বাবা আর ননী দত্ত বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাবা বললেন, ননী দত্তর মুখটা যেন লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর শশী? তার বৌ, তার ঝি, তারা কি ভাবল কি করল পরে সে আর আমরা জানিনা। বাবাও বাড়ী ফিরে এলেন।

তারপর আরও কিছুদিন গেল। শশী আর মাকে 'মা' বলত কিনা বা রামপতিয়া কিভাবে থাকত কেউ জানিনা। শশীদের কারবারের তখন পুরো রমরম। অবস্থা বেশ সচ্ছল।

নতুন-বউ মনে-মনে কী ভেবেছিল তাও কেউ জানেনা। কিন্তু তার অবজ্ঞার উদ্ধত উগ্র কথার ও আচরণ রামপতিয়া থেকে ননী দত্ত, শশী—সবাইকেই যেন নিজেদের বাড়ীতেই তটস্থ কোণঠেসা করে দিয়েছিল।

শুনেছি রামপতিয়া নিচের রান্নাঘর, কয়লার ঘর ছেড়ে আর ওপরে উঠতোই না সহজে। ননী দত্তও নিচের বৈঠকখানাতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। কদাচ ওপরে উঠতেন।

তাঁর ভালোমানুষ রামপতিয়া বেশিদিন আর বাঁচেনি। সামান্য কী অসুখে—বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যায়।

অসুখ হ'লে শশীর বাবা একটু দেখাশোনা করতেন। বধূ নেপথ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, 'বুড়োমানুষের আবার ঝিয়ের জন্য অত দেখাশোনা কেন? আমরা কি দেখছিনে?'…আরো অনেক কথা। কথাগুলো খুব ইঙ্গিতময় ও নোংরা।

কিন্তু ননী দত্ত তাতে আর ভয় পাননি।

আর রামপতিয়াও মারা গেল।

তারপর এলো শেষকৃত্য, শ্রাদ্ধশান্তির সমস্যা।

ননী দত্ত বিহ্বলভাবে বসে রইলেন। বাবা গেলেন তাঁর বাড়ী। তখন ওঁদের অবস্থা খুব ভালো। সেইটেই হ'ল মুশকিল। ধনী হয়েছেন—লোকজন প্রতিষ্ঠা বেড়েছে। শশীই কি শেষকাজ করবে? বৌমা তো চারজন ব্রাহ্মণ দিয়ে খাটের ব্যবস্থা করতে চাইল।

লোকেরা যেন চারদিক থেকে চেয়ে দেখছে ওঁদের বাড়ীকে। এতদিন পরে যেন ভাবছে, কে ঐ রামপতিয়া—শশীর দাই না মা?—না, বাড়ীর ঝি?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা শশী কি জানতো না রামপতিয়া ওর মা?'

'কি জানি, ছোটবেলা থেকে তো মা বলেই জানত। হঠাৎ বিয়ের পর দাই শুনে আর সে মা-ও বলেনি, চমকে গিয়েছিল যেন। কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি বাপকে। আসলে ওর বিয়ের পর বাড়ীতে সহজভাবে আর কেউ ছিল না। বড়লোকের মেয়ে এনে কেমন একটু সঙ্কোচ হয়েছিল। তা ছাড়া বেয়াই তো জাতে কুলে উঁচু ছিল। আসলে স্পষ্ট কথা শশীও জিজ্ঞাসা করেনি, ননী দত্তও বলেননি তখনো।'

'তারপর?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'তার পর—বাবা তো সব জানতেন। ননীবাবুকে বললেন, শশী যাক শ্মশানে, যা কর্তব্য মনে হয় করবে। তুমি আর কিছু বোলো না। "গোলে হরি বোল" দেওয়ার মতো শেষকাজ হ'ল। শ্রাদ্ধও হ'ল। ব্রাহ্মণ-ভোজনও হ'ল। ওরা তখন বড়লোক। লোকে ধন্য-ধন্যও করলে দাইয়ের শ্রাদ্ধে সমারোহের জন্য।'

'তারপর?'

'তারপর বেশি কিছু আর নেই। ননীবাবু বুড়ো তো হয়েছিলেনই—আরো শীগ্‌গির বুড়ো হতে লাগলেন। কয়েক বছর বাদে মারা গেলেন। সেইসময়ে একসময় শশীকে ডেকে বাবার সামনে বলে গেলেন শশীর মার জীবনের সব কাহিনীটা। নিজের দুর্বিপাকে পড়া, দয়া করা—তার পর রামপতিয়ার তাঁর দুর্যোগের দিনে জীবন-সংশয়ের দিনে সেবা ও বাঁচিয়ে তোলা…'

আমি বললাম, 'শশী কী বললে?'

'শশী কী বললে আমি কিছু শুনিনি। তবে তার উদ্ধত স্ত্রীকে সে প্রথম থেকেই ভয় করত। আর তার ছেলে-মেয়েও তো হয়েছিল। শশী হয়ত বাপের কাছ থেকে সব স্পষ্টভাবে জেনে মার জন্য দুঃখ পেয়েছিল হয়ত। কেননা বাপের মরার পর সে স্ত্রীকে বড় কেয়ার বা সংকোচ আর করত না। বোধহয় বলেছিল সব কথা। এখন লোকে কানা-ঘুষো করে—তাই নিজের ছেলেমেয়েদের বিয়েতে সে আর কলকাতায় গিয়ে ভালো কুল ঘর দেখে পাত্র-পাত্রী খোঁজ করেনি। স্বামী-স্ত্রী কাশীতে গিয়ে কিছুদিন থেকে নিজেদের মতো খুঁতওয়ালা ঘর কুল দেখে ছেলে আর মেয়েদের বিয়ের পাত্র-পাত্রী ঠিক করেছে।'

'তাহলে সে এখন জাতে উঠেছে—না অপাঙ্‌ক্তেয়?'

'ঠিক এলাকার সমাজের জাতে ওঠেনি হয়ত। কিন্তু অগাধ টাকা, ছেলেমেয়েরা সব শিক্ষিত বিদ্বান—বেশিদিন কুলদোষ থাকবেনা মনে হয়।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মেয়েটা অত আশ্চর্য মতো বুদ্ধি কেমন করে পেল ভাবছি।'

'হ্যাঁ। তবে প্রথম থেকেই তো মেয়েটা মনে হয়।'

মিনতি

দিলীপকুমার রায়

ছেড়ে বৃন্দাবন মুরারি, তুমি কোথা যাও গিরিধারী ?
তুমি কোথা যাও বলো, কোথা যাও আজ কোথা যাও বনোয়ারি ?
কোথা যাবে—যেতে দেব না হরি !
রুধি' পথ রবো চরণে পড়ি',
করিব মিনতি কাতরে শুধু
নয়নের নীরে বলিব : "বঁধু,
শূন্য করি' এ-গোকুল কোথায় যাবে আজ গিরিধারী ?
কোথা যাও বলো, কোথা যাও আজ, কোথা যাও বনোয়ারি ?"
স্তব্ধ ধেনুরা বনচারণে,
পাপিয়া নীরব ব্রজকাননে,
যমুনা ব্যাকুল ছলছলায়,
কুঞ্জের প্রতি শাখাটি গায় :
"চিরবসন্ত আমাদের ওগো কোথা যাও গিরিধারী ?
কোথা যাও বলো, কোথা যাও আজ কোথা যাও বনোয়ারি ?"
মীরার দেহের হে চিরপ্রাণ !
মনের শান্তি-সুখবিতান !
জীবনের অঙ্কুর আশা !
নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠে ভাষা !
তোমার বিরহে নিখিল বিধুর, কোথা যাও গিরিধারী ?
কোথা যাও বলো, কোথা যাও আজ, কোথা যাও বনোয়ারি ?
দেব না তো যেতে ওগো মোহন
রবো সাথে হ'য়ে মেঘ পবন
ছায়ার মতন সব সবো
ধূলি হ'য়ে ধরি' চরণ তব
দেখি আমাদের ছাড়িয়া কেমনে যাও হে মুরলীধারী !
কোথা যাবে ছেড়ে আমাদের, যেতে দেব না তো বনোয়ারি !"

ইন্দিরা দেবীর মীরা-ভজনের অনুবাদ

হেমন্তে

বাণী রায়

শীতের সহসা-ছোঁয়া লাগলো দু'ঠোঁটে,
দুইবার উন্মুখ শীতেতে জর্জর ;
বর্ষার পুবালী বায়ু তবু সুখকর ;
রোদের সোনালী আভা সোনা ফুটে ওঠে।

জাগোনা, জাগোনা তুমি, নিদালীর নদী,
রেশমী লেপের মৃদু আচ্ছাদন ছাড়ো,
অনন্ত-নিঃসীম শীত সমাগত যদি,
দুইহাতে শরতের সোনারোদ কাড়ো।

চুম্বন বিদায় হবে বিবর্ণ অধরে,
মসৃণ শিশির ঢালো শীতের প্রহরে।

দূরাগত

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

স্বপ্ন দিয়েছে পুষ্পাধার জাভার স্মরণ-চিহ্ন আঁকা
এনেছে চীনের বন্ধু সেই ছবি আমার দেয়ালে
এখানে দুর্লভ সে যে—তাই আনো রজনীগন্ধার—
রাত্রি হবে মধুময়। কৃষ্ণমন মধুর সৌরভ
এনেছে ভোরের হাওয়া। পারহীন হীরকজ্যোতির
দিগন্ত নিমেষে খোলে ; থাকে সাক্ষী একা বনস্পতি
আর রিক্ত সর্ব চরাচর। তবু তার বিপুল বিস্তারে
যেন আজ মূর্ত হল নিখিলের আনন্দিত ভাষা।

এখন সোনালি হবে, এ-প্রভাত সহসার ছবি
খুলে যেতে কত বার ; প্রিয় যারা নীরব চরণে
অতিথির হবে মনে। মহাকাশে ইন্দ্রধনু হায়
অন্ধ রৌদ্রে বর্ণময় ; হৃদয়ের তারা দূরাগত!

এ প্রভাত স্বপ্নময় সঞ্চারিত প্রীতির আবেশে
দূরের বন্ধুর লিপি পত্রদূত এনেছে সহসা।

জিজ্ঞাসা

পার্বতীশঙ্কর

বিবর্তনের ঘূর্ণী আবর্তে
আমি যে ঘুরেছি কতো
লোক হ'তে লোকান্তরে।
গতির স্পন্দন মোর
প্রতি প্রাণ ক'রেছে প্রহত
জীবনের জয় বাসরে।
আসমানের নীল হ'তে
মর্তের সমুদ্র সকল,
অনাবৃতা বেলাভূমি,
মরীচিকা বিশালা নির্জন,
অলি-পথ, গলি-পথ
আর রাজপথ।
এ-চলার বিভিন্ন বৈচিত্র্যে
আস্বাদন নয়ন ভাণ্ডার
কতো না ক'রেছে সঞ্চয়—
তবু পূর্ণ হয় নাই।
সৌন্দর্যের বেদীপীঠে
তোমার অস্তিত্ব না পাই!
বর্ণে, গন্ধে এতো সমারোহ,
এ যে শুধু কালের প্রবাহ।
দিনে দিনে দিন ক্ষয়
দিন হয় জানা,
তবু তোমার মেলে না ঠিকানা।
আমার ক্রন্দন
ছিঁড়িতে চাহিছে আজ
মাটির বন্ধন।
মনের মুমুক্ষা তাই
জাগিছে সবাই
সৌন্দর্যের পাণ্ডুলিপি পাত ;—
শাপ কবে হবে বলো
প্রতীক্ষার রাত?

ভাঙা-গাড়ী

সন্তু বক্সি

ওই হাসিটাই জ্বালিয়ে মারল !

না, গাড়ীটা বেশী ভারী নয়। হালকা কাঠের জিনিস, তার উপরে পুরনো। বেশ হালকাই গাড়ীটা, তবুও একহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে যেতে কাব্যতীর্থের হাতটা টনটন করে ওঠে। শহরের অভিজাত পল্লী ছাড়িয়ে প্রায় মাইল-পাঁচেক হবে। এ-রাস্তায় আবার বাস্‌ও নেই যে, ান্ত হলে টুক করে উঠে পড়বেন।

চাকা-গাড়ীটা কাব্যতীর্থ ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নন। হাত বদলাতেই চোখের সামনে সেই হাসিটা জ্বলে ওঠে। উঃ, কী যে বিশ্রী ওই হাসিটা! সারাটা াস্তা কাব্যতীর্থকে জ্বালিয়ে মারছে। না না, কাব্যতীর্থের ীকের হাসি নয়, কোনো তরুণীর বঙ্কিম অধরসীমায় ভাবভক্তি-বিকাশও নয়, নেহাতই মিস্টার সেনের সামান্য কটু হাসি, নিঃশব্দ অস্ফুট একটু ঠোঁটের ভঙ্গি। তাই লেছে কাব্যতীর্থের সাথে শহর ছাড়িয়ে এই পাঁচমাইল পথ। ী বিপদ বলুন তো ?

মিস্টার সেনের গতকাল পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বৃদ্ধ স্টার সেনের বেশ বয়েস হয়েছিল। তাঁর ছেলে মিস্টার সেনেরই বয়েস চল্লিশের উপরে। আর তা ছাড়া ছেলে, ী, মেয়ে, জামাই, নাতি-নাতনী সব রেখে বৃদ্ধ মিস্টার সেন োনাসী শুভদিনে সজ্ঞানে স্বর্গলাভ করেছেন। সুতরাং খ করার কিছু নেই। এ-মৃত্যু তো আনন্দের।

কাব্যতীর্থের আজ ডাক পড়েছিল শ্রাদ্ধ সম্পর্কে লোচনার জন্যে।

বড় ছেলে মৃগাঙ্ক সেন এসে বসেছিলেন নীচে বসবার র। কাঠাসনে বসা নিষেধ, তাইতে একটা পশমী লিচা বিছিয়ে আসন করা হয়েছে মেঝের উপরে। তারই পরে বসে ছিলেন মৃগাঙ্ক সেন।

আগের রাতটা প্রায় পুরোপুরিই জেগে কেটেছে। টী হিসাববিদ মৃগাঙ্ক সেনের পিতৃবিয়োগ, সহানুভূতি নাতে অনেকেই এসেছিলেন। তাঁদের জন্যে ঘাটে োতেও দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাড়ী তে ফিরতে সেই শেষরাত। রাতে ঘুম আর বিশেষ নি। একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে পশমী আসনের উপর বসে ছিলেন মৃগাঙ্ক সেন। রাত জেগে আরক্ত চোখ একটু লাল, তেল-না-দেয়া রুক্ষ চুল এলোমেলো, তবুও মৃগাঙ্ক সেন সুন্দর। চল্লিশ পার হয়ে তাঁর প্রশস্ত কপাল প্রসারে বেড়েছে, কিন্তু সে কপালে সাফল্যের রেখা আঁকা; তাঁর মসৃণ মুখে সূক্ষ্ম বলি পড়েছে, কিন্তু সে বলি দর্শকের মনে ভরসাই আনে।

পণ্ডিতমশাই বসেছিলেন মৃগাঙ্ক সেনের সামনে। রোগা মানুষটির গোরা-রঙ রোদে পুড়ে একটু তামাটে। পরনের মোটা থান-ধুতি, আর মার্কিনের পাঞ্জাবিতে ইস্তিরি নেই বটে, তবে নোংরা নয় সেগুলো। বাড়ীতে কাচা, আর নীল দেয়া হয়নি বলে একটু লালচে। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু তেল-চকচকে। শিখার প্রান্তে একটি ছোট ফুল।

আলোচনা হচ্ছিল মৃগাঙ্ক সেনের পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পর্কে। ধর্মীয় আচার আর লোকাচার, মৃগাঙ্ক সেনের সামাজিক মর্যাদা আর স্বর্গীয় সেনমশাইয়ের অক্ষয় স্বর্গলাভের সম্ভাবনা —এইসব দিক বিচার করে শ্রাদ্ধের বিধি ঠিক করা দরকার।

"হ্যাঁ, দানসাগর করার কোনো অর্থ হয় না। আজকাল দানসাগর আর কে করে?" একটিপ নস্যি নিয়ে নিস্পৃহভাবে কাব্যতীর্থ মন্তব্য করেন, "তবে ষোড়শ করতেই হয়। ষোড়শের সাথে বৃষোৎসর্গও আবশ্যিক।"

"বৃষোৎসর্গ?" মৃগাঙ্ক সেন প্রশ্ন করেন। মৃগাঙ্ক সেনের স্বাভাবিক গম্ভীর গলা রাত জেগে আরও ভারী শোনায়।

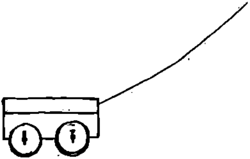

পণ্ডিতমশাই একটু চমকে ওঠেন। তবে ঘাবড়ান না। ষোড়শ-বৃষোৎসর্গের কথা বলার সময় প্রথম প্রথম পণ্ডিতমশাইয়ের একটু চক্ষুলজ্জায় বাধত। আজকাল আর

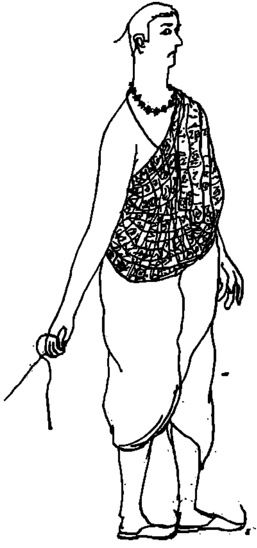

বাধে না। কেন বাধবে বলুন? মৃত আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ যিনি করতে চান তাঁর কাছে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করলে অন্যায়টা কী? তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু অপ্রিয় আলোচনা এড়িয়ে যেতে হয়। যেমন ধরুন, স্বর্গীয় দ্বিতীয় সেনের অর্শরোগ ছিল। শাস্ত্রমতে অর্শরোগ মহাপাতকজ ব্যাধি। স্বর্গীয় সেনমশাইয়ের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। কাব্যতীর্থমশাই সে-কথা উল্লেখ করেননি। অবশ্য উল্লেখ করলে, প্রাপ্তিযোগ কাব্যতীর্থমশাইয়েরই। কিন্তু শোকগ্রস্ত লোকের মনে আঘাত দিতে কার ভালো লাগে বলুন?

তবে বৃষোৎসর্গের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। শাস্ত্রে আছে—

> একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
> প্রেতলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকং স গচ্ছতি।
> আদ্যশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে বা ষষ্ঠে মাসে চ বৎসরে।
> বৃষোৎসর্গঃ কর্তব্যো বান্ধবৈঃ সপিণ্ডকৈঃ।

শ্লোকটা শেষ করে কাব্যতীর্থমশাই মৃগাঙ্ক সেনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তখন একবার মনে হয়েছিল মৃগাঙ্ক সেনের ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম বঙ্কিমরেখার পাশ দিয়ে ওটা বোধহয় হাসিরই রেখা।

কিন্তু মৃগাঙ্ক সেন বৃষোৎসর্গ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তাইতে কাব্যতীর্থ হাসিটা আর ভালো করে খেয়াল করেননি।

কাব্যতীর্থকে কিন্তু সে-হাসিটা তত জ্বালাচ্ছে না। জ্বালাচ্ছে আর একটা হাসি।

স্বর্গীয় দ্বিঃ সেনের ঘরটা ছিল তাঁর নাতি-নাতনীদের খেলাঘর। তিনি আর নেই। তাইতে সেই ঘরটা পরিষ্কার ক'রে, তাদের খেলনাগুলো চাকরটা নিয়ে এসে জমা করছিল নীচে গ্যারেজ-ঘরে। সেনেদের গ্যারেজ তিনখানা, কিন্তু গাড়ী মোটে দুটো। তৃতীয় গ্যারেজটিতে থাকে সব অপ্রয়োজনীয় অথচ অবর্জনীয় সম্পদ। চাকরের ঝুড়ি থেকে হঠাৎ একটা গাড়ী পড়ে গেল। গাড়ী মানে, দু'ইঞ্চি কার্নিশ লাগানো, লম্বা-চওড়া দু'দিকেই হাতখানেক হবে—একটা তক্তা—তার তলায় চারটে চাকা লাগানো। তক্তাটার উপরে আগে বোধহয় 'ক খ গ ঘ' কিংবা 'A. B. C. D' লেখা ছোট ছোট প্লাস্টিকের চৌকো ছিল। টুকরোগুলো হারিয়ে গিয়েছে, তাইতে গাড়ীটার আশ্রয় এখন ওই গ্যারেজ-ঘরে।

হাত দিয়ে গাড়ীটা তুলে চাকরের হাতে দিতে গিয়ে কাব্যতীর্থমশাই একটু থামলেন। একটু বেশিক্ষণ ধরেই বোধহয় দেখছিলেন গাড়ীটার দিকে। পণ্ডিতমশাইয়ের চোখে কি লোভ ছিল? কে জানে। নিজের চোখ তো

আর নিজে দেখা যায় না। তবে মৃগাঙ্ক সেনের প্রশ্নটার কথা ভাবলে তাই মনে হয়।

"গাড়ীটা নিয়ে যাবেন পণ্ডিতমশাই?"—মৃগাঙ্ক সেনের গলাটা গম্ভীর কিন্তু নম্রস্বর।

পণ্ডিতমশাই সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নেড়েছিলেন, কিন্তু কোনো কথা বলেননি।

সেইসময় একবার মনে হয়েছিল, মৃগাঙ্ক সেনের ঠোঁটের কোণের সূক্ষ্ম বলিরেখার পাশ দিয়ে নতুন রেখাটা কি হাসির? কিন্তু শ্রাদ্ধ-বিধানের আলোচনায় সে-কথাটা আবার নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। এখন বাড়ী যাবার পথে গাড়ীটা একহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে যেতে যেমনি হাতটা টনটন করে ওঠে, অমনি পণ্ডিতমশাইয়ের মনে পড়ে হাসিটা। ওই সূক্ষ্ম বলিরেখার পাশ দিয়ে সূক্ষ্মতর হাসির রেখা। আর মনটা বিষিয়ে ওঠে।

কাব্যতীর্থ হাত-বদল করেন। হাতের টনটনানি কমে। শহরতলির রাস্তায় পাশের নালা দিয়ে বর্ষার জল যায়। নীচের শ্যাওলাগুলো দুলে দুলে ওঠে। ব্যাঙগুলো লাফায়।

পণ্ডিতমশাই ভুলে যান।

কিন্তু অন্য হাতটা আবার টনটন করে ওঠে। আর অমনি মনে পড়ে যায় মৃগাঙ্ক সেনের হাসি। হাতের সাথে মনটাও টনটন করে ওঠে।

মৃগাঙ্ক সেন কী ভাবেন কাব্যতীর্থ সম্পর্কে? একটা লোভী ব্রাহ্মণ? একটা দরিদ্র ব্রাহ্মণ? ষোড়শের দান থেকে ড়া-গাড়ী পর্যন্ত কিছুই কাব্যতীর্থের চোখ এড়ায় না?

কাব্যতীর্থ হাত-বদল করেন। ও-হাতের টনটনানি কমে যায়।

সামনে অগ্রদানী তেঁতুলে-চক্রবর্তীর বাড়ী। তিন মেয়ের পর ছেলে হয়েছিল চক্রবর্তীর; মা নাম রেখেছিলেন তেঁতুল। লোকে বলে—

তিন মেয়ের পর জন্মে পুত।
সে-সংসারে লাগে ভূত।

তেঁতুলে-চক্রবর্তী কিন্তু বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। সে বোধহয় ওই তেঁতুল নামেরই গুণে।

কাব্যতীর্থের মুখে হাসি দেখা দেয়।

কিন্তু আবার হাতটা টনটন করে ওঠে।

আর অমনি মনে পড়ে মৃগাঙ্ক সেনের হাসি।

কী বিপদ বলুন তো?

হাজার হাজার সূক্ষ্ম বলিরেখার ভিতরে সামান্য একটা রেখা—যার অস্তিত্বই সন্দেহ—তার অত্যাচারে কাব্যতীর্থের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

নাঃ, কাব্যতীর্থ ঠিকই করে ফেলেন। কী হবে ওই নড়বড়ে তক্তা দিয়ে? জলচৌকি? পিঁড়ি? দরকার নেই। কালই ফেরত দেবেন মৃগাঙ্ক সেনের তক্তা, মৃগাঙ্ক সেনকে। এ-হাসির অত্যাচার আর সহ্য হয় না। আজ বিকেলে আর ফেরত দিতে যাওয়া হবে না। একটা বিয়েবাড়ীর বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের কর্ম করতে যেতে হবে। কাল সকালে উঠেই ওই গাড়ী বিদায় করবেন কাব্যতীর্থমশাই।

তা ছাড়া কাল সকালে একবার যেতেও হবে মৃগাঙ্ক সেনের বাড়ী। মৃগাঙ্ক সেনের বোন আবার 'তেরাত্রির করবেন। তার বন্দোবস্ত করতে হবে।

মন ঠিক করে কাব্যতীর্থের মনটা একটু হালকা হয়। হনহন করে এগোতে থাকেন। খোলার বাড়ীগুলো পেরিয়ে মাঠের ভেতরে পড়েন। কোন্ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী নাকি কিনে রেখেছেন এই গোটা মাঠটা। তা প্রায় শ'-খানেক বিঘে হবে। ভবিষ্যতে দাম বাড়লে ভদ্রলোক বিক্রি করবেন। তারপর ডোবাগুলো ছাড়িয়েই পণ্ডিতমশাইয়ের খোলার বাড়ী। বাড়ীটা খোলার হলেও, বেশ খোলা। মন ঠিক করেই মনটা ভালো হয়েছিল। তারপরে আবার তিনবছরের ন্যাংটো ছেলেটা "বাবা এতে গ্যাতে" ব'লে হাঁটু জড়িয়ে ধ'রে এমন হাসির তোড় ছোটাল যে, মৃগাঙ্ক সেনের সূক্ষ্মহাসি একেবারেই চাপা পড়ে গেল।

পরদিন পণ্ডিতমশাইয়ের ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। একটু তাড়াতাড়ি করতে হ'ল। সেনেদের বাড়ী যেতে হবে। একসাথে একটা বিয়ে আর শ্রাদ্ধ পড়ে যেয়ে ভারী মুশকিল হয়ে গিয়েছে।

স্নান-আহ্নিক সেরে, মুড়ি খেয়ে, বের হবার সময় কাব্যতীর্থের মনে পড়ল—তাইতো, গাড়ীটা? ঘরে এসে খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না।

রান্নাঘরে যেয়ে ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাইতো—গাড়ীটা?"

দুজনে খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না।

বড় মেয়ে পুঁটীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাইতো—গাড়ীটা?"

কাব্যতীর্থ, ব্রাহ্মণী আর পুঁটী তিনজনে খুঁজলেন। কিন্তু পেলেন না।

হতাশ হয়ে কাব্যতীর্থ রাস্তায় পা বাড়ালেন। আবার

খোঁচাতে লাগল ওই মৃগাঙ্ক সেনের হাসি। সূক্ষ্ম বলিরেখার ভিতরে সূক্ষ্মতর হাসির রেখা।

গাড়ীটা কিন্তু পেয়ে গেলেন অপ্রত্যাশিতভাবে।

রাস্তায় বেরিয়েই দেখেন গাড়ীটা। কাব্যতীর্থের তিন-বছরের খোকা তার রথের মেলায় কেনা মাটির ঘোড়াকে চাপিয়েছে ওই গাড়ীর উপরে। আর দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। তার পিছন নিয়েছে খোলার বাড়ীর আরও ছেলেরা। গাড়ীর চাকা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করছে আর ছেলেরা হাসছে। মাটির ঘোড়াটা দুলছে আর ছেলেরা হাসছে।

সেই হাসি! নালার বর্ষার জলের কলকল ছাপিয়ে, ভাঙা-গাড়ীর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ছাপিয়ে, যার সামনের আঁস্তাকুড়ের কাকের পালের কর্কশ কা-কা ছাপিয়ে কলকল করে ছড়িয়ে পড়ছে হাসি।

কাব্যতীর্থ একটু দাঁড়ান। তারপর রওনা হন গাড়ীটা না নিয়েই। কেন জানিনা—বোধ হয় গাড়ীটা মৃগাঙ্ক সেনকে ফিরিয়ে দেবার কথা ভুলে যান। শিশুদের উজ্জ্বল হাসি বোধহয় মৃগাঙ্ক সেনের সূক্ষ্ম বলিরেখার চাইতেও সূক্ষ্মতর হাসির রেখাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

পরদিন সকালে আজও মৃগাঙ্ক সেন বসে। তেল-না-দেয়া রুক্ষ চুলগুলো আজও এলোমেলো। তবে আরক্ত চোখের রক্তাভা নেই। কাল রাতে ঘুম বোধহয় ভালোই হয়েছিল।

কাব্যতীর্থ এসে দাঁড়ান। একটু ইতস্তত করেন। একটু বোধহয় ভাবেন, তারপর বলেই ফেলেন:

ওই-যে ভাঙা-কাঠের ঘোড়াটা কাল মৃগাঙ্ক সেন চ্যালাকাঠ করতে বলেছিলেন চাকরকে, ওটা কি চ্যালা করা হয়েছে?

"না, হয়নি বোধহয়"—মৃগাঙ্ক সেন বুঝতে পারেন—"আপনি যাবার সময় নিয়ে যাবেন।"

মৃগাঙ্ক সেনের স্বাভাবিক গম্ভীর গলা আজও কিন্তু সহজ। তবে ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্মহাসির রেখাটা বোধহয় আর একটু স্পষ্ট।

কিন্তু কেউ দেখতে পায়না সে-রেখা। মৃগাঙ্ক সেন দেখতে পান না—নিজের হাসি তো আর নিজে দেখা যায় না।

কাব্যতীর্থের চোখেও কিন্তু আজ আর ওই হাসিটা পড়ে না।

আঁস্তাকুড়ের পাশের ন্যাংটো ছেলেগুলোর বুনো-হাসি বোধহয় আড়াল করে রাখে মৃগাঙ্ক সেনের সূক্ষ্ম বলিরেখার ভিতরের সূক্ষ্মতর হাসির রেখাকে।

পূর্বস্মৃতি

শরৎকুমার মিত্র

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

১৮৮৩ খ্রীষ্ট

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার পিতৃদেবের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাহার কারণ প্রধানতঃ যে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই শোভাবাজার রাজবাটীতে (রাধাকান্ত দেবের বাটীতে) যাইতেন—সেখানে বড় বাহাদুরের (রাধাকান্ত দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের) বৈঠকখানায় অনেক সাহিত্যিক যাইতেন, যথা—অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, প্রভৃতি। আমার পিতৃদেব রাধাকান্ত দেবের কনিষ্ঠা কন্যার জামাতা। পিতাঠাকুরও বরাবর সাহিত্যসেবী। একদিন পিতাঠাকুর বলিলেন,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে যাইবি?" আমি সোল্লাসে বলিলাম, "নিশ্চয়।" আমি ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতাঠাকুরের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাদুড় বাগানের বাটীতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম, তিনি দ্বিতলে একটি বড় গৃহে বসিয়া আছেন। তাঁহার চতুর্দিকে আলমারিতে বই সব ভাল করিয়া বাঁধান, এবং এক রকমের বাঁধান। আমরা যাইতে পরিচয় পাইয়া আমাকে কাছে ডাকিলেন। আমি তখন বেশ ফর্সা ও হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পড়ি ও কোথায় পড়ি। আমি বলিলাম, "আপনারই স্কুলে শ্যামবাজারে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি।" তখন Entrance class-কে First class বলিত। তিনি বলিলেন,—"তোর কিছু নালিশ আছে?" আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ আছে, আমাদের পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" আমি বলিলাম,—"বর্ণের উচ্চারণ স্থান মুখস্থ বলিতে পারি নাই বলিয়া।" বলিলেন,—"বটে, তোদের হেডমাষ্টার ত মহেন্দ্র গুপ্ত।" আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ।" এই মহেন্দ্র গুপ্তই (শ্রীম বলিয়া পরিচিত) পরে 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রকা করেন। পরদিনই দেখি বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুলে গিয় আমাদের ক্লাসে উপস্থিত। তখন তারানাথ পণ্ডি মহাশয়ই পড়াইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, পণ্ডি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর্ণের উচ্চারণ স্থান মুখ বলিতে পারে নাই বলিয়া ইহাকে দাঁড় করাইয় দিয়াছিলি?" ,পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "হ্যাঁ" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"বর্ণের উচ্চারণ স্থান কি এই ক্লাসের ছেলেরা বুঝিতে পারে?" পণ্ডিত মহাশ বলিলেন,—"আপনার উপক্রমণিকা ত পাঠ্য, তাহার দ্বিতী পৃষ্ঠায় বর্ণের উচ্চারণ স্থান।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন —"তুমি অতি নির্বোধ; পাণিনি অনুসরণে উপক্রমণি লিখিত; তাই বর্ণমালার পরেই বর্ণের উচ্চারণ স্থান আছে তোমার বোঝা উচিৎ ছিল যে এই ক্লাসে ওটা বাদ দি পড়িতে হইবে।" তারপর ক্লাসের সকলকে বলিলেন, "যা তোদের কিছু শিক্ষকদের উপর নালিশ থাকে, হেডমাষ্টারে বলিয়া দিবি।" আমাকে বলিলেন, "তুই আবার দি কয়েক পরে আমার কাছে আসিস।" এই বলিয়া চলি গেলেন।

মাসখানেক পরে আবার পিতাঠাকুরের সহি

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে গেলাম। যাইতেই বলিলেন, —"আমার কাছে আয় দেখি, তুই বড় কি আমি বড়।" তারপর বলিলেন—"তুই আগেকার চেয়ে ঢ্যাঙা হয়েছিস। কিন্তু আমার চেয়ে বড় হতে পারলি না।" আবার বলিলেন—"আর মাষ্টাররা জ্বালাতন করছেন না?" আমি তখন চারিদিকে বইএর আলমারিগুলি দেখিতেছিলাম। তাঁহার কথার জবাব দিতে দেরী হইল, হয়ত দুই সেকেণ্ড। আমি বলিলাম "না"। তিনি বলিলেন—"মাষ্টারদের নামে শুধু নালিশ করলে হবে না। তাঁরা যা বলবেন যা পড়াবেন তা কিন্তু মন দিয়ে শুনতে হবে।" তারপর বলিলেন, "চারদিকে কি দেখছিস?" আমি বলিলাম,—"এত বই কি আপনি পড়েন? কখন পড়েন, আপনি খেলা করেন না?" তিনি হাসিলেন, "ও সব কি পড়ি? কিন্তু বইয়ের হাওয়া ভাল। খেলি বইকি, এইতো তোর সঙ্গে খেলা করছি।" আমি বলিলাম, "কি হয় এত বই পড়ে?" তিনি বলিলেন—"তোর বাবাও অনেক পড়ে—পড়ে পড়ে দশ হাজার টাকা পেয়েছে। তা বলে মনে করিসনি যে তোর বাবা আমার চেয়ে পণ্ডিত। আমি দশ হাজার টাকা পাইনি কিন্তু তোর বাবাকেও পরীক্ষা করি।" তিনি আমার পিতার দিকে চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—"ছেলেদের মারা আমি পছন্দ করি না। আমার স্কুলে মারা তুলে দিয়েছি।"

এমন সময় আর একটি ভদ্রলোক আসিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম।

২

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশে গিয়াছিলাম, অর্থাৎ তারকেশ্বরের নিকট পানিসেওলা গ্রামে। বোধ হয় গ্রীষ্মের ছুটিতে। ঠিক মনে নাই। তখনও তারকেশ্বর রেলওয়ে খুলে নাই। উক্ত রেলওয়ে ১৮৮৫ খৃঃ ১লা জানুয়ারী খুলিয়াছিল। তখন বৈদ্যবাটী পর্যন্ত রেলে যাইতাম। সেখান হইতে কাঁচা রাস্তায় আট মাইল পথ ঘোড়ার বা গরুর গাড়ীতে গিয়া পরে হাঁটিয়া বা পালকিতে মাঠের পথ দিয়া এক মাইল যাইতে হইত। শুনিয়াছি পিতাঠাকুরের পাঠদশায় আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় তিনি রাত্রে দেশ হইতে হাঁটিয়া বৈদ্যবাটীতে আসেন। সেখানে ট্রেন ধরিয়া হাওড়ায় আসিয়া সোজা এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন, এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার তখন পিতা ও মাতা জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পিতার জাহাজী অফিস ছিল। তাহাতে প্রায় মাসে হাজার টাকা আয় হইত। সেকালের দিনে যথেষ্ট। তাহার উপর দেশে যৎকিঞ্চিত সম্পত্তি (পাকা ছোট একতলা বাটী ও পুষ্করিণী সমেত) এবং দামোদরের উপর একটা তালুক ছিল। দামোদর তখন পানিসেওলা হইতে ষোল মাইল সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সমস্তই গোলযোগ হইয়া যায়। শুনিয়াছি পিতাঠাকুরের বিমাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—অযাত্রায় যাত্রা না করিয়া একদিন আগে যা, আর পরীক্ষা, অত হাঁটিয়া গিয়াই দিবি, তাহা কি ভাল? পিতাঠাকুর বলেন, "একদিনও আগে দেশ ছেড়ে যাবো না, সে অযাত্রাই হোক আর যাই হোক, আর খাই বা কি—ভাত আর আলু ভাতে, তেল দিয়ে এই ত। না হয় খাবার কিনে খেয়ে নেব।"

যাই হউক আমার বেশ মনে আছে, আমি আমার মাতাঠাকুরাণী, আমার মধ্যম মাতুল ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (আমা অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ও খুব দুষ্ট ছিলেন) ভোরে গাড়ীতে উঠিলাম পানিসেওলা হইতে ফিরিবার সময়। তাহার কিছু পরেই গাড়ীতে অনবরত লাঠির আঘাত পড়িতে লাগিল। গাড়ীর ভিতরে বলাবলি হইল—ডাকাত পড়িয়াছে। আমার মেজ মামা গাড়ীর ভিতর হইতে—গাড়ীর দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল কারণ, আমার মা ছিলেন—বন্দুক ছুঁড়িলেন দুইবার, তাহার পরেই ডাকাতেরা পালাইল।

৩

কলিকাতা আর্য বিদ্যালয় স্থাপন

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে পিতাঠাকুর আর্য বিদ্যাল স্থাপন করেন। তখন কলিকাতায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমই ছিল। যদিও কলিকাতার লোকসংখ্যা শীঘ্রই বাড়িয় চলিয়াছিল। কারণ, পল্লীগ্রামে রোগের অনুগ্রহে ম্যালেরিয় তখন খুবই আরম্ভ হয়। তদ্ভিন্ন চাকুরীর জন্য রেলে যাতায়াতের অসুবিধার হেতু অনেকেই দেশ ছাড়ি কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। কেবল চাকুরে শনিবার দেশে যাইতেন ও রবিবার রাত্রে বা সোমবা সকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেন। তখন ট্রাম-কার ছিল না। তবে স্কুল স্থাপন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছি শিক্ষায় নূতন ধারা প্রবর্তন। প্রথম, হিন্দুধর্ম বিষয় সুকুমারমতি বালকদের শিক্ষা। এই উদ্দেশ্যে কয়েকখান পুস্তক বাংলা ও সংস্কৃতের সঙ্কলন। স্কুলের আরম্ভেই ত পাঠ হইত। দ্বিতীয়, উচ্চ চারি শ্রেণী ছাড়া অন্য শ্রেণীতে বাংলায় পড়ান হইত। ব্যাকরণের বা অনুবাদের পাঠ

পুস্তক ছিল না—কি ইংরেজীতে কি বাংলায়। পিতাঠাকুর ইংরেজীতে ছোট একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের নূতন ধরনে ব্যাকরণ মুখে মুখে পড়ানর পথ প্রদর্শন করার ও বালকদের তিন বৎসর মুখে মুখে ব্যাকরণ পড়িয়া প্রধান বিষয়গুলি শেখান। এই স্কুলের জন্য তিনি প্রায় ৮০,০০০ আশি হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ সালে জুন মাসে আমি ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা আর্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। পূর্বে স্কুলের session আরম্ভ হইত ১লা জানুয়ারী। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে session জুন মাসে আরম্ভ হইল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ

১

শ্যামপুকুরে আমাদের বাটীর কাছে কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে পরমহংস রামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন। আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম বড় ভীড়, পশ্চাতে পড়িলাম। ছোট ছেলে দেখিয়া আমাকে সম্মুখে সকলে যাইতে দিল। আমি দেখিলাম তাঁহার হাতের উপর হইতে একখানি কচুরী গড়াইয়া পড়িয়া গেল। সকলে বলিয়া উঠিল, "কি হইল, কি হইল?" তখন একজন বলিলেন, "আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। আমি শুনিয়াছিলাম, উনি টাকা হাতে করেন না, তাই ভিতরে টাকা দিয়া কচুরী করাইয়াছিলাম, সেই কচুরী দিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি প্রবাদটা সত্য।"

২

পূজার সময় বজরায় এক সপ্তাহ বাবা, দাদা, আমার এক মাসতুতো ভাই বেড়াইয়াছিলাম। সেকালে বজরায় বেড়ান লোকে পছন্দ করিত। আমরাও দেখিতাম খুব ক্ষুধা হইত এবং nerve soothe করিত। আজকাল লোকেরা অত ধীরে ধীরে বেড়ান পছন্দ করে না। ট্রেনে করিয়া সাঁওতাল পরগণায় কিম্বা বিহারের কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বা সমুদ্রে একালে যাওয়া চলন হইল—ক্রমে ক্রমে পাহাড়ে যাওয়া। এখন মোটরকার ছাড়া কোথাও যাওয়াই পছন্দ হয় না। তাহাতেও কুলায় না, এরোপ্লেনে যাওয়া সুরু হইয়াছে। কেহ কেহ ৫।৭ দিনের জন্য গঙ্গার ধারে গিয়া থাকেন। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নহে।

সেবার আমরা কলিকাতা হইতে ৺পূজার মহাষ্টমীর দিনে বাহির হইয়া নবমীর দিনে চুঁচুড়া ক্যাকশিয়ালি আমার পিসেমহাশয়ের বাড়ী পৌছাই। সেখানে পূজা সমারোহে হইত। ওখানে একদিন থাকিয়া বিজয়াদশমীর দিন নবদ্বীপাভিমুখে চলিলাম। এখানে আমার পিসতুতো ভাই ও তাহার ভগ্নীপতি আমাদের সহিত জুটিলেন। নবদ্বীপে গিয়া দেখি জলপ্লাবন—সমস্ত রাস্তা জলের নীচে। কি করা যায়, আমাদের সঙ্গে যে পাচক গিয়াছিল তাহার ও আমার ভগ্নীপতির জন্য। বাকী কয়েকজন জল ভাঙিয়া চলিলাম। অবশেষে নিকটে এক পাকা চণ্ডীমণ্ডপ দেখিতে পাইলাম। সেদিকে যাইতে গিয়া, যে রাস্তায় পড়িলাম তাহা কাঁচা রাস্তা। পাঁকে পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল। কিছু পথ গিয়া রাস্তা জুড়িয়া লম্বা কাঁটাগাছের ডালের উপর সকলের পা পড়িল। সকলেই কষ্টে থামিয়া গেলাম কিন্তু কেহ পড়িয়া যাই নাই। কেবল আমার মাসতুতো ভাই পাঁকে গড়াইয়া পড়িল। বাবা বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক হইয়াছে, বৈষ্ণব কিনা, তুই গড়াগড়ি দিয়া নিলি। আমরা শাক্ত, আমরা ত পড়িলাম না।" কষ্টের মধ্যেও আমরা হাসিয়া উঠিলাম। এবং আমি বলিলাম যে আমার পিসতুতো ভাইও ত বৈষ্ণব। বাবা বলিলেন—"ও ত সাহেব।"

তাহার পর গিয়া সেই চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলাম। এক বাবাজী আসিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন ও বসিবার জন্য মোড়া ও মাদুর দিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি একবার মহাপ্রভুর মন্দিরে যাইব, আপনারা ঘণ্টাখানেক বসুন, আমার তিনটি সেবাদাসী আছে, তাহার মধ্যে মধ্যমা, স্বরূপা ও যুবতী, তাহাকে ডাকিয়া আনিতেছি, আপনারা দেখিয়া তুষ্ট হইবেন। সে আপনাদের আদর অভ্যর্থনা করিবে ও আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করিবে। বাঁধ ভাঙিয়া গিয়া সব ভাসিয়া গিয়াছে, খুদকুড়ি চাউল (সিদ্ধ), কেঁটে আলু, কচকচে নুন, ও ময়লা তেল পাইবেন। দাসী সব আনাইয়া দিবে ও রাঁধিয়া দিবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

দাসী ফর্সা বটে, যদিও খুব নয়, বয়স ২০।২২ হইবে। কিন্তু বাবার প্রবৃত্তি হইল না তাহার হাতে খাইতে—তিনি টাকা দিলেন চাউল ডাল প্রভৃতি আনিতে, এবং রন্ধনের ব্যবস্থা চলিল। ইটের উনান হইল, কাঠ ও প্যাকাটি আনা হইল, বাবা নিজেই ভাতে ভাত রাঁধিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সকলেই বজরা ছাড়িবার সময় সমাধান করিয়া আসিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, "আমি রাঁধিব"। বাবা আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু আমি

জিন ধরায় আমার রন্ধনের হাতেখড়ি হইল। ক্ষুধায় সব অস্থির। তখন বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। সেই মোটা লাল লাল চাল, সেই 'কেঁট আলু ও কাঁচকলা ও খ্যাসারির ডাল ভাতে, কৃষ্ণবর্ণ তেল দিয়ে মেখে খাওয়া হোলো। মনে হোলো অমৃত খাচ্ছি।

খাইবার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আমরা জলকাদা ঘাঁটিয়া বেলা ৩টায় বজরায় পৌঁছিলাম। আসিয়া দেখি মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের নায়েব আসিয়া বজরায় বসিয়া আছেন। তিনি আমাদের রাজবাটীতে যাইতে বলিলেন। কিন্তু বাবা বলিলেন, "যাওয়া সম্ভব হইবে না। জোয়ার আরম্ভ হইবে, রাত্রে নৌকা চলিতে পারিবে না। মহারাজার বাটী হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। আমি একরাত্রি নষ্ট করিতে পারিব না।" বাবার সহিত মহারাজার আলাপ ছিল না। নায়েব মহাশয় অগত্যা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় মহারাজের হাতে লেখা উপহার একখানি 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' দিয়া গেলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্ট

প্রথম বিদেশে যাওয়া হইল। আশ্বিন মাসে দেওঘর গেলাম। দেওঘরের কথার মধ্যে মনে আছে, এক এক পয়সায় খুব বড় বড় ২টা আতার কথা ও সেখানকার ছেলেগুলার অশ্লীল কথা ও প্রকাণ্ড ব্যবহার। আর মনে আছে বাবার সঙ্গে জলভরা ধানক্ষেতের আইলের উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে একজায়গায় যাওয়ার কথা। পরে শুনিলাম, শ্রীরাজনারায়ণ বসুর নিকট গিয়াছি। তিনি দাদাকে, আমাকে, আমার মাসতুতো ভাইকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। এবং আমাদের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কি পড়ি, পরীক্ষায় কি রকম হই। আমি প্রথমে উত্তর দিলাম। বলিলাম, "আমি ক্লাসে ফার্স্ট হই।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসে তুমি ভাল? ইংলিশে বা বাংলায় না অঙ্কে, না কিসে?" আমি বলিলাম,—"অঙ্কটাই বেশী ভাল লাগে। দাদা ক্লাসে ফার্স্ট হন না, কিন্তু আমার চেয়ে ইংরেজী ভাল জানে—সকলে বলেন।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তোমাদের সঙ্গে একটা খেলা করি এসো পনের মিনিট", এবং বাবাকে বলিলেন, "এ খেলায় তোমাকেও যোগ দিতে হবে। খেলাটা এই যে, ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে কথা কহা হবে না। প্রত্যেক ইংরেজী কথায় ১ পয়সা জরিমানা।" খেলা হইল। পনের মিনিটের মধ্যে আমি ৫টা, দাদা ৬টা, আমার মাসতুতো ভাই ৫টা এবং বাবা ৪টা ইংরেজী কথা বলিলেন। তিনি বাবাকে বলিলেন,—"তুমি ছেলেদের হয়ে ৫+৬+৫ = ১৬ পয়সা এবং নিজের ৪টা ইংরেজী কথার জন্য ৪ আনা দাও, মোট ॥০ আনা।" তখন আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি যে ইংরেজী কথা তিনটে বললেন, সে কি হবে?" তিনি বলিলেন, "কি ইংরেজী বলেছি?" আমি বলিলাম, "আমরা,...। বলিলেন—'টেব্‌লের কাছে এসে বোসো, চেয়ার টেনে নাও, ইংলিশে তুমি কেমন?'" তিনি বলিলেন, "ঠিক বলেছ। আমারও আট আনা জরিমানা। 'টেবিল' ও 'চেয়ার' এই দুটো কথার জন্য ৵০ আনা করে ।০ আনা ও ইংলিশ কথার জন্য চার আনা, মোট ॥০ আনা। তোমাদের ও আমার জরিমানা কাটাকাটি হয়ে গেল। যদি বলো কোন কথার জন্য ৵০, আবার কোন কথার জন্য ।০ আনা কেন? তার উত্তর দিচ্ছি ইংলিশ কথাটা বলাটা নিতান্তই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু 'টেবল' ও 'চেয়ার' কথার বাংলা ঠিক নেই এবং যদি কথা গড়ে বলা যায় বুঝতে পারবে না লোকে। এমন সব বিদেশী কথা বাংলায় এসে মিশে যাচ্ছে, তাতে ভাষার উন্নতিই হয়। সব ভাষাতেই এমন বিদেশী কথার আমদানি হয়।" [ক্রমশঃ]

'পূর্বস্মৃতি'তে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬): গত শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া তিনি যশস্বী হন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি পুস্তক রচনা করেন। বস্তুত বাংলা গদ্য, বিজ্ঞানের পরিভাষা রচনায় তিনিই অগ্রণী।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩): সরকারী ডাক-বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়াও বিদেশীর হস্তে নীলচাষীদের নিপীড়ন-নির্যাতনে তিনি বিশেষ ব্যথিত হন এবং ইহারই ফল 'নীলদর্পণ' নাটক। এই নাটকখানির প্রকাশ, ইংরেজী অনুবাদ, তাহার প্রকাশক [illegible] ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষে সার্থক ভূমিকা নেয়। তিনি আরও বহু নাটক ও কাব্য লিখিয়া বাঙালী সমাজকে শুদ্ধ, সৎ ও সবল করিতে তৎপর হন।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯): হিন্দু-কলেজের বিখ্যাত ছাত্র। তিনি যৌবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান নেতারূপে ক্রমে পরিগণিত হন। তিনি আদর্শ শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং মাতৃভাষাপ্রেমে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দু-মেলার মূল ভাবনা তাঁহারই। রিচার্ডসন-শিষ্য এবং ইংরেজী-নবীশ হইয়াও তিনি আজীবন বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'সেকাল আর একাল', 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা', 'আত্মচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা-সাহিত্যের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। অপূর্ব মননশীলতা হেতু তিনি এমন বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় রত হইয়াছিলেন, যাহার ফলে পরবর্তীকালে বহু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গঠন সম্ভব হইয়াছে।

পুরাতনী

সংবাদ প্রভাকর

প্রাত্যহিক পত্র

॥ সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলোষন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মত্তভ্রমীবদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥
॥ অন্তোস্তদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্ত চতুরস্বান্তদ্বিরেফারসং ॥

নবম ভাগ । ৮৭০ সংখ্যা শনিবার ২১ অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সাল । ইং ৪ ডিসেম্বর ১৮৮০ সাল । মাসিক মূল্য ১ টাকা মাত্র

● **বিজ্ঞানদায়িনী সভা ।**— গত বৃহস্পতিবাসরীয় মিনীযোগে বিজ্ঞানদায়িনী সমাজের সভ্য মহাশয়দিগের রমিত সভা হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবের বাদানুবাদ হয় ।

এদেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়াতে বাঙ্গালিরা সুখি না ।

এই প্রশ্নের প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার বসু মহাশয় বক্তৃতা করেন তাহা সাধারণ পাঠক মণ্ডলীর সুগোচর নিম্নদেশে প্রকাশ করিলাম ।

ইংরাজেরা বঙ্গদেশে আগমন করাতে এতদ্দেশীয় কেরা উন্নতাবস্থায় আছে কি না ।

উন্নত অধম সুখী দুঃখী প্রভৃতি কতিপয় শব্দের যথার্থ অর্থ না ব্যতীত বোধগম্য হয় না যেহেতু মনুষ্যের এক সমান অবস্থা হইলে বিপরীত অর্থ বোধক উন্নত অধম প্রভৃ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, অতএব উন্নতাব এই শব্দ ব্যক্ত করিলেই তৎ পূর্ব্বে কোন অধমাবস্থার সহকা তারতম্য বোধ করিতে হইবেক, সুতরাং এখানে ইংরা রাজা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হওনের পূর্ব্বে যবনদিগে অধীনে বাঙ্গালিরা যদ্রূপ অবস্থায় পতিত ছিল তাহার সহি বঙ্গীয় ব্যক্তিগণের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই অত্র সভার বক্তব্য বিষয় স্পষ্টরূপে বিচারিত হইতে পারে ।

যবন নৃপতিগণের অধীনে বাঙ্গালিরা যদ্রূপ দুর্দ্দশা সাগ নিমগ্ন ছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইলে কঠিন হৃদয় একেবা বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাঁহারা এদেশের রাজা ছিলেন বটে, কি প্রজারা প্রায় তাঁহাদিগের অধীনে সুখি ও স্থির চি

থাকিতে পারিতেন না বরং নিয়তই অনিয়ম ও অত্যাচারের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, যেহেতু প্রথমতঃ যখন রাজাদিগের রাজকীয় বিষয়ে বর্ত্তমান দেশাধিপতিদিগের ন্যায় সুচারু নিয়ম ও ঐক্য ছিল না, রাজধানী হইতে এতদ্দেশে (আধুনিক গবর্ণর জেনেরেলের ন্যায়) কোন প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তা প্রেরিত হইলে তিনি রাজ্যে আগমন পূর্ব্বক রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া বীরবল বিস্তারে আপনিই রাজা হইয়া বসিতেন আর আর কাহার অপেক্ষা করিতেন না, রাজার কর্ণকুহরে ঐ অত্যাচারের সংবাদ প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, তিনি ঐ দৌরাত্ম্য দমন জন্য সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং যাত্রা করত কিম্বা অপর প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক বলবাহিদ্বারা ঐ দুঃশাসনাদির নির্ব্বাণ করিতেন, এইরূপ দুর্ঘটনা পুনঃ২ ঘটিলে প্রজারা যত সুস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিতে পারে তাহা হে সভাগণ মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন, কিন্তু বর্ত্তমান সুসভ্য ইংরাজ দেশাধিপতিদিগের রাজত্বে আর সেরূপ অনিয়মের আশঙ্কা নাই তাঁহারা প্রজার সুখ ও মঙ্গল জন্য নিয়ত নব২ নিয়মস্বরূপ রজ্জুদ্বারা সমুদয় রাজকীয় বিষয় সুদৃঢ়রূপে গ্রথিত করাতে পরস্পর সকলেই অপরের অধীন হওয়া প্রযুক্ত কেহ নিয়মাতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন না, গবর্ণর জেনেরেল কদাচিৎ কোন অত্যাচার ব্যবহার করিলে সুপ্রিমকোর্টে তদ্দণ্ডে এতদ্বিষয় বিচার পূর্ব্বক তাহার দণ্ড প্রাপ্ত হয়েন এবং সুপ্রিমকোর্টে কোন অবিচার হইলে উপরিস্থিত বিচারালয়ে তদ্বিষয় প্রতির বিচারিত হয়, এইরূপ সকলেই পরস্পর অধীন থাকাতে কেহ অত্যাচার করিতে পারে না, আমরা শুনিয়াছি যে যবনাধিকারে এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ শান্তির সহিত প্রায় কখনই সাক্ষাৎ করেন নাই, একে রাজার দৌরাত্ম্য তাহাতে আবার দুর্দ্দান্ত ও দুরাচারি লোকেরা অনায়াসে দিবসে নির্ভয়ে ডাকাইতি করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিত, এবং এক২ বার বর্গির হাঙ্গামায় লোকেরদিগের ধন প্রাণ প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে, যদ্রূপ দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা স্মরণ মাত্রে আমারদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কোন সময়ে কি বিপদ ঘটিবে, এই দুর্ভাবনাতেই লোকেরা দিবারাত্রি সশঙ্কিত থাকিত, ইহাতে প্রজাগণ যদ্রূপ সুখী থাকিতে পারে, তাহা, হে সভ্য মহোদয়েরা আপনারাই বিবেচনা করুন সুচারু পথ ও বসতি বিরহে মধ্যে২ এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর স্থান ছিল যে লোকেরা দূরদেশে গমনকে প্রায় শমন ভবন গমন জ্ঞান করিত, কোন ব্যক্তির সমীপে স্থিত কোন কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অতিশয় দুর্ঘট বোধ হইত, যেহেতু তৎকালে এরূপ ডাকের
প্রথাভাবে মূল্যদ্বারা লোক প্রেরণ করাতে লোকের গমা
এবং প্রত্যাগমনে বহুকাল গত হইত এবং তাহাতে ম
ব্যয়ের সম্ভাবনা, সামান্য লোকেরা ধন বিরহে তাহা
সাহস করিতে পারিত না কিন্তু কি আনন্দের বি
ইংরাজের অধিকারে সুনিয়ম স্বরূপ অস্ত্রদ্বারা এই সমু
কণ্টক বন এতদ্দেশ হইতে প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে, দেশা
সুচারু পথ সমূহ নির্ম্মাণ এবং স্থানে২ বাজার হাট
প্রভৃতি সংস্থাপিত হওয়াতে পথিকেরা দেশের সকল স্থানে
প্রায় অনায়াসে গতি ও অবস্থিতি করিতে পারেন, ত
শান্তিরক্ষা যদিস্যাৎ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হয় তথাচ পূর্ব্বাপে
অধুনা লোকেরা স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে কালযাপন করিতে
তাহাদিগের মনোমধ্যে দিবসে ডাকাইতি ও বর্গির হাঙ্গা
অসকালের নিমিত্তে আর আশঙ্কা হয় না।

• সম্পাদকীয়।— এইক্ষণে জগদীশ্বরের করুণাব
বরিষণ দ্বারা এই রাজ্যের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর সীমার সমর
নিবারণ হওয়াতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি
যেহেতু রাজারা রাজ্যরক্ষার নিদারুণ চিন্তা হইতে অব
হইয়া আমারদিগের মঙ্গল নিমিত্ত নিয়মাদির সৃষ্টি কর
সাধারণকে সন্তোষে রাখিবেন, কিন্তু কি আক্ষেপ মহ
পাশা বাহাদুরের সহিত সিরিয়ার অধিপতি বিবাদ ক
প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং নেপালের রাজাও সুযোগযুক্ত
প্রাপ্ত হইলেই শাণিতাস্ত্র করে লইয়া সমরসাগরে
করিবেন, ইহাতে বোধ হয় যে রাজপুরুষেরা পূর্ব্বাপে
গুরুতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন অতএব আমরা প্রা
করি যে সন্ধির দ্বারা এই বিবাদ নিষ্পন্ন হউক ইতি।

• তাম্বু ক্রয়।— …বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত গবর
সাহেব অবগত হইয়াছেন যে জিলার মাজিষ্ট্রেটী
কালেক্টরী পদ যখন একজন সাহেবের হাতে ছিল এ
ঐ সাহেবের কারণ একটা দুই খুঁটির তাম্বু ক্রয় করণের নি
আট২ বৎসর অন্তরে কোম্পানির ৩৫০ টাকা দেওয়া যা
কিন্তু ঐ পদ স্বতন্ত্র২ সাহেবের হাতে অর্পণ হইলে
তাম্বু প্রায়ই কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে থাকে।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেব আপন জি
মফঃস্বলে সরকারী কার্য্যের নিমিত্তে গমন করিলে তাঁহার
ও তাঁহারদের নিমিত্ত তা থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দে
শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের মনে আবশ্যক বোধ হয় অত
তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রত্যেক দলের থাকিবার নি

৩৪০ টাকা খরচে এক খুটির তাম্বু আবশ্যকমতে ক্রয় করণের অনুমতি দিতে এবং কালেকটর সাহেবেরদের থাকিবার নিমিত্তে নূতন তাম্বুর প্রয়োজন হইলে তাহা ক্রয় করিয়া দিতে কিছু আপত্তি করিবেন না। ...

• বিজ্ঞাপন।— বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৪০ সালের ১৭ ডিসেম্বর সোমবার তারিখে বেলা ঠিক দুইপ্রহরের সময়ে কলিকাতার ইনসালবেন্ট আদালতের ঘরে এসাইনি আফিসে বোজহীন ঋণি রামকৃষ্ণ কালিয়ার অধিকার কৃত আর সত্বাধীন বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পত্তি পাবলিকসেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নিলামে এক লাটে নির্দ্ধারিত হয়ে উচ্চ মূল্য প্রদাতাকে বিক্রয় করা যাইবেক।

বিহারের অন্তঃপাতি জেলা আজিমাবাদের শামিল ও তন্মধ্যে স্থিত জগদীশপুর নামে বিখ্যাত জমিদারি ভুক্ত সমুদয় তালুক প্রভৃতি যাহাতে উপরি লিখিত অক্ষম ঋণি রামকৃষ্ণ কালিয়ার সত্বাধীন /৬।= এক আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশ আছে, তাহা বিক্রীত হইবেক।

নির্দ্দিষ্ট মূল্য ৫০০ টাকা।

অক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালতের বাটীতে এসাইনি আফিসে অনুসন্ধান করিলে এই বিক্রয়ের নিয়ম এবং অপরাপর বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

অক্ষম ঋণি রামকৃষ্ণ কালিয়ার
বিষয়ের এসাইনি।

• চীন।— এইক্ষণে চীনদেশ হইতে এমত নিশ্চয় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে তথাকার অধিপতি বাহাদুর সংপ্রতি কমিশনর লীন বাহাদুরের প্রতি রাগত হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করণে উদ্যত হইয়াছেন, এই সম্বাদ যদি সত্য হয় তবে নিশ্চয় বোধ হইল যে রাজাবাহাদুর ইংরাজদিগের ভয়ে ভীত হইয়া থাকিবেন।

• মিসর।— এইক্ষণে মিসর রাজ্য হইতে যে সকল নিশ্চয় সংবাদ আসিয়াছে তাহার মূল তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে নিম্নদেশে প্রকাশ করিলাম, তৎপাঠে পাঠক মণ্ডলী বিশিষ্টরূপে অবগত হইতে পারিবেন যে বহু দিন পরে ইংরাজ বাহাদুরেরা অতিশয় বিপদ্ গ্রস্ত হইলেন।

(ক) আলেক জণ্ড্রিয়া ১৮ আক্‌টোবর।— সিরিয়া রাজ্য শ্রীযুত মহম্মদালি পাসা বাহাদুরের হস্তান্তর হইয়াছে, আমির বেসির বাহাদুর সুলতানের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং কতিপয় শ্রেণী মিসর দেশের সেনা আপন সাহায্যকারী দলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, এবং সলিমান পাসা বাহাদুর প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছেন, কিন্তু মহা শক্তি তাহার প্রতি অবধারণ করাতে তিনি অতি ভীত রহিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বর্ত্তমান যুদ্ধে ইউরোপের প্রায় সমুদয় শক্তিবিশিষ্ট একত্র হইয়াছে, এই সঙ্কটে স্থলপথগামিদিগের রাস্তা পরিষ্কার রাখা অতিশয় সুকঠিন।

(খ) কাবেল।— কাবেল হইতে ৮ নবেম্বর তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল যে আমির দোস্ত মহম্মদ খাঁ বাহাদুরের প্রধান পুত্র শ্রীযুত মহম্মদ আপজল খাঁ বাহাদুর ঐ তারিখে শ্রীযুত স্যার উইলিএম মেকনাটন সাহেবের শরণ লইয়াছেন, কারণ দোস্ত মহম্মদের আশ্রয় লইতে ঐ পুত্রকে পত্র লিখিয়াছিলেন আমরা আর শ্রবণ করিয়াছিলাম যে দোস্ত মহম্মদ বাহাদুর অবিলম্বে আপন ভ্রাতার সহিত সিজিনি রাজ্যে উপস্থিত হইবেন, যেহেতু তথায় তাঁহার পরিবার সম্বন্ধীয় যে সকল স্ত্রীলোকেরা অধিবাস করিতেছেন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন ইতি।

অথ নট-ঘটিত

সূত্রধার

১

১৮৯৬ সালে নাট্যাচার্যরূপে এসে গিরিশচন্দ্র স্টারকে 'কালাপাহাড়' 'হীরকচূর্ণিনী' 'পারস্যপ্রসূন' 'মায়াবসান' প্রভৃতি নাটক গীতিনাট্য দিতে থাকলেন। কোনখানাই জমল না। বরং সে সময় অমৃতলাল কর্তৃক 'রাজসিংহ'র নাট্যরূপ 'বৌমা' 'গ্রাম্যবিভ্রাট' 'হরিশ্চন্দ্র' 'সাবাস আটাশ' 'যাদুকরী' কিছুটা জনপ্রিয় হল।

চিড়-খাওয়া মন, ঠিকমতো জুড়লো না; ১৮৯৯ সালে গিরিশচন্দ্র স্টার ছাড়লেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ওত পেতে ছিলেন, তিনি গিরিশচন্দ্রকে ক্লাসিকে টেনে নিলেন। গিরিশচন্দ্র এসেই 'দেলদার' নামে একখানি গীতিনাট্য দিলেন। সে সময় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'ট্রিক্' 'মজা' 'দোললীলা' প্রভৃতির অভিনয় হচ্ছিল; তার পর 'ভ্রমর'; এখন গিরিশচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত পৌরাণিক নাটক 'পাণ্ডব-গৌরব' রচনা করতে থাকলেন। গিরিশচন্দ্র মুখে মুখে বলে যেতেন, সে সময় অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তা লিখে নিতেন।

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন—

"যখন চতুর্থ অঙ্ক লেখা শেষ হইল, তখন রাত্রি আড়াইটা। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 'আজ এই পর্যন্ত থাক। তুমি শোওগে।' শোব কি, তখন আমার মনে হইতেছে যে মহানিদ্রা ব্যতীত এ-চক্ষে আর ঘুম আসিবে না। তাঁহাকে বলিলাম, 'আমার চক্ষে আদৌ ঘুম নাই, লেখা চলুক না কেন?' শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'বেশ, আমি প্রস্তুত, আমার সব সাজানো রহিয়াছে। তুমি পারলেই হল, লিখতে চাও—লেখ।' পঞ্চম অঙ্ক আরম্ভ হইল। তিনি বিভোর হইয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে লিখিয়া যাইতে লাগিলাম। নাটক সমাপ্ত হইল। সর্বশেষ সংগীত 'হের হর-মনমোহিনী কে বলে যে কালো মেয়ে!' গানখানির প্রথম তিন ছত্র সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়া তিনি বলিলেন, 'থাক, আজ এই পর্যন্ত। গানগুলি সব কাল বেঁধে দেব। তুমি দোর-জানলাগুলো খুলে দাও, ঘর বড়ো গরম হয়ে উঠেছে।' দরজা-জানলা খুলিয়া দেখি—বিলক্ষণ রৌদ্র উঠিয়াছে, ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখি—বেলা তখন

৮টা। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'যাও, যাও, বাড়ি যাও, খানাহার ক'রে সমস্ত দিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যার পর এসো।'

দুর্বাসা কর্তৃক উর্বশীকে অভিশাপ ও অষ্টবসু-মিলনে সেই অভিশাপ খণ্ডন, এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত; গিরিশচন্দ্রের এই নাটকখানি যথার্থ শিল্পসম্মত রূপ লাভ করেছে।

অভিনয়ও হল উচ্চশ্রেণীর শিল্পীদের নিয়ে—

কঞ্চুকী	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
ভীম	—	মহেন্দ্রলাল বসু
ভীম	—	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
দণ্ডী	—	হরিভূষণ ভট্টাচার্য
খেসড়া	—	নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু
সুভদ্রা	—	তিনকড়ি দাসী
দ্রৌপদী	—	হরিমতী দত্ত
উর্বশী	—	কুসুমকুমারী

'ভ্রমর' ও 'পাণ্ডব-গৌরব' অভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটার দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভ করল।

নবীনচন্দ্র সেন একদিন সস্ত্রীক 'পাণ্ডব-গৌরব'-এর—অভিনয় দেখতে আসেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে বলে গেলেন—অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছি, আমরা গিরিশের গোলাম হয়ে রইলুম।

ক্লাসিক থিয়েটার খুব জমে উঠল; কিন্তু এইসময়ে অমরেন্দ্রনাথের সহিত গিরিশচন্দ্রের মনোমালিন্য দেখা দিল।

ওদিকে মিনার্ভা থিয়েটার নগেন্দ্রবাবুর দেনায় হাইকোর্ট থেকে নিলাম হয়েছে; এক হাত ঘুরে তার মালিক হলেন খুলনা শ্রীপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ সরকার; তিনি তখন সবে সাবালক হয়েছেন; তাঁর সখ হল, থিয়েটার চালাবেন,—নিজে নাটক লিখবেন, অভিনয় করবেন। আরম্ভে সেইরকমই করলেন, নিজের লেখা 'মদালসা' নামে এক নাটক মঞ্চস্থ করলেন; নিজে নামলেন। কিন্তু দর্শক ওই নাটক নিল না। উপায়ান্তর না দেখে তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের শরণাপন্ন হলেন। গিরিশবাবু ক্লাসিক ছেড়ে মিনার্ভায় যোগ দিলেন। অমরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, শেষে তিনি injunction জারি করবার জন্যে হাইকোর্টে মকদ্দমা রুজু করলেন। ব্যারিস্টার দিলেন—জ্যাকসন, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী। গিরিশচন্দ্রের তরফে ব্যারিস্টার রইলেন—ইভান্স ও গার্থ। বিচারে গিরিশচন্দ্র জয়ী হলেন।

মিনার্ভায় এসেছেন, কিন্তু হাতে কোনও নাটক নেই। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'-এর নাট্যরূপ দিয়ে তা মঞ্চস্থ করবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

কথাটা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কানে গেল। তিনি তখনই মাকার্ড লাগালেন—ক্লাসিকে 'সীতারাম'। তখনও নাট্যরূপ দেওয়া হয়নি। নিজেই নাট্যরূপ দিলেন।

একসাথে দু'আসরে 'সীতারাম' দেখা দিল।

এইসময়ে বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে একজন বলেন—আপনারাও বাকি থাকেন কেন, আপনারাও 'সীতারাম' লাগিয়ে দিন।

—জানেননা বুঝি, এ আমরা অনেকদিন আগে করেছি; তবে আমরা যা করেছি তা গিরিশবাবু বা অমরবাবু কেউ করতে পারবে না।

—কিরকম।

—আমরা মৃন্ময়ের সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

—সে কি মশায়, জয়ন্তী যে সন্ন্যাসিনী!

—আরে মশায়, বঙ্কিমবাবু জয়ন্তীকে সমস্ত জীবন সন্ন্যাসিনী অবস্থাতে রেখে দিয়েছেন। আমরা ভাবলুম, একটা সুন্দরী যুবতী চিরকালটাই গেরুয়া পরে চিমটে হাতে ক'রে বেড়াবে! মৃন্ময়কে না মেরে তার সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে দিয়ে মেয়েটার একটা হিল্লে ক'রে দিলুম।

বঙ্কিমচন্দ্র তখনও জীবিত।

এর বহু পরে এইরকমের এক প্রস্তাব এক নাট্যকারের কাছে এসেছিল। স্টারে খুব ধুমধামের সঙ্গে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় হচ্ছে। এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথকে বললেন, চিরকুমার-সভার সভ্য শ্রীশ বিপিন পূর্ণ এদের আপনি বিয়ে দিয়ে দিলেন, কিন্তু ওই সভার সভাপতি চন্দ্রবাবুর তো কিছু করলেন না; অক্ষয়ের বিধবা শাশুড়ি জগত্তারিণীর সঙ্গে চন্দ্রবাবুর বিয়ে দিন-না; বেচারার একটা গতি হবে, আবার বিধবার বিয়ে দিয়ে সমাজ-সংস্কার করাও হবে।

উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া, কাজটা তেমন সোজা নয়। এ সুষ্ঠুভাবে তিনিই করতে পারেন—মৌলিক নাটকরচনায় যিনি সিদ্ধহস্ত। ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস; সবগুলিরই নাট্যরূপ কেউ-না-কেউ দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে-সবের মধ্যে আজ অবধি টিকে আছে গিরিশচন্দ্রের দেওয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' 'মৃণালিনী' ও 'সীতারাম' আর অমৃতলাল বসুর 'চন্দ্রশেখর' 'রাজসিংহ' ও 'বিষবৃক্ষ'।

'সীতারাম' উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র শেষ করেছেন এইভাবে। —গঙ্গারামের শব দাহ ক'রে শ্রী অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল; আর রামচাঁদ শ্যামচাঁদ তামাক খেতে খেতে জানিয়ে দিল, মুর্শিদাবাদে সীতারামকে নাকি শূলে দিয়েছে।

উপন্যাসের এরকম ভাবে শেষ করায় কোনও দোষ হয় না। কিন্তু একটা বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য তো দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করবে, আর তারই স্মৃতি বহন করে সে বাড়ি ফিরবে। অমরেন্দ্রনাথ উপন্যাসকে অনুসরণ করে শেষ করলেন; কিন্তু গিরিশচন্দ্র যা করলেন তা অতুলনীয়, উপন্যাসকে তা ছাপিয়ে গেল।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথাতেই বলি—

"সর্বহারা পরাজিত সীতারাম রণক্ষেত্র হইতে পলাইতেছেন; উদ্ভ্রান্ত সীতারাম বুঝিতে পারিতেছেন না, তিনি কোন্ সীতারাম। যবনবিজয়ী হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা সীতারাম, না শ্রীর প্রেমে উন্মত্ত সীতারাম? এমন সময় সন্ন্যাসিনী শ্রী পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইয়া বলিতেছে, 'আমায় গ্রহণ কর।' সম্মুখে শ্মশান, পশ্চাতে শ্মশান, ঊর্ধ্বে শ্মশানধূম, পদতলে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত-রঞ্জিত কর্দম, আর তাহারই মাঝখানে সেই সীতারাম, সেই শ্রী। যেন সমস্ত উপন্যাসের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত নরনারীর জীবন-আখ্যায়িকা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দর্শকের সম্মুখে তাহার পরিপূর্ণ স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। শ্রী বলিতেছে, 'মহারাজ, আমায় গ্রহণ কর।' সীতারাম বলিতেছে,—'… করবো, তোমায় গ্রহণ করবো, কিন্তু কোথায় গ্রহণ করবো? অট্টালিকায় তোমায় গ্রহণ করা হবে না, সেখানে রমা মরেচে; নগরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না, সোনার মহম্মদপুরী ভস্মীভূত হয়েচে, কুটীরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না, কুটীর শূন্য ক'রে কুটীরবাসী পালিয়েচে। করবো, তোমায় গ্রহণ করবো, আমার এখনো মমতা যায়নি, চল, স্থান খুঁজিগে চল, স্থান খুঁজিগে চল।' উন্মত্ত সীতারাম অনন্তের ক্রোড়ে স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে নদীগর্ভে আশ্রয় লইলেন। শ্রী তাঁহার অনুসরণ করিল। নাটকাকারে 'সীতারাম'-এর পরিসমাপ্তি এইখানে। নাটকের শেষ হইল, দর্শকের চিত্ত-নিবদ্ধ বিষাদ-বাণ যেন সীতারামের সঙ্গেই কোনো অনির্দিষ্ট কল্পনার রাজ্যে গিয়া গভীর অন্তরালে শূন্যে মিলাইল। এই দৃশ্যের অভিনয়ে সীতারামরূপী গিরিশচন্দ্র এবং শ্রীর ভূমিকায় বরণীয়া তিনকড়ি বা [illegible] তারাসুন্দরীকে যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে এরূপ অভিনয় জগতের যে-কোনো রঙ্গমঞ্চকে গৌরবান্বিত করিতে পারিত।"

'সীতারাম'-প্রযোজনায় অমরেন্দ্রনাথ হটে গেলেন; কিন্তু তা মেনে নেবার লোক তিনি ছিলেন না। হ্যাণ্ডবিলে নানা রকমে তা প্রকাশ পেল; ব্যঙ্গচিত্র বেরল—পাল্লায় একদিকে অমরেন্দ্রনাথ, অপরদিকে গিরিশচন্দ্র;

জয়ন্তী

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের নাম-ভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

অমরেন্দ্রনাথের দিকটা ভারে নেমে গেছে। 'থিয়েটার' নামে একখানা নক্সা লিখে মঞ্চস্থ করলেন; 'স্টেজের উপর স্টেজ' এই কথাটি বিজ্ঞাপিত ক'রে দর্শক টানবার ব্যবস্থা করলেন; বিষয়টা হল, খুলনার বাঙাল কলকাতায় এসেছে থিয়েটার করতে; শালীনতার লেশমাত্র তাতে রইল না।

ওদিকে কিন্তু নরেন সরকারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কেউ অপরকে বরদাস্ত করতে পারছেন না। অমরেন্দ্রনাথও বুঝেছেন। গিরিশচন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে তিনি ভালো করেননি। এখন গিরিশচন্দ্রের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।

অমরেন্দ্রনাথ হ্যাণ্ডবিলে লিখলেন—

"নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নটকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্তা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র! প্রায় সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীই গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় গৌরবান্বিত। তাহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম। বড়ই সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহময় কোলে আবার তিনি টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশবাবুর কোনও থিয়েটারের সহিত, এখন কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত নূতন নূতন নাটক, গীতিনাট্য ও পঞ্চরং এখন ক্লাসিকে অভিনীত হইবে। ক্লাসিক থিয়েটার ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র এখন ক্লাসিকের! নিবেদনমিতি।"

গিরিশচন্দ্র-রচিত 'অশ্রুধারা' 'মনের মতন' অভিনীত হল। এই সময়ে একদিন অমরেন্দ্রনাথ দেখলেন, পোস্টার প'ড়ে গেছে—মিনার্ভায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। তিনিও কালবিলম্ব না ক'রে পোস্টার দেওয়ালেন—ক্লাসিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। পোস্টার লাগাবার পর গিরিশচন্দ্রকে ধরে বসলেন উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে হবে। গিরিশচন্দ্র ন্যাশনালের জন্য যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন সে-খাতাখানা তো খোয়া গিয়েছে। তিনি একবারে চারজন লেখক নিয়ে 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিণত করলেন। কিন্তু সামনে মাত্র একসপ্তাহ রয়েছে, কি করে কি হয়। অমরেন্দ্রনাথের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে উপায় বেরুল। মিনার্ভায় 'কপালকুণ্ডলা' দেখতে যাবে ব'লে যে-সব দর্শক আসে স্থির করেছিল তারা চলে এল ক্লাসিক থিয়েটারে; চলে এল অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বিজ্ঞাপন দেখে। বিজ্ঞাপনে ছিল—প্রথম দৃশ্যে বালিয়াড়ির কাছে বনে সত্যিকারের বাঘ দেখা যাবে। থিয়েটার ভেঙে পড়ল, দর্শক সত্যিকারেরই বাঘ দেখল; অবশ্য বনের মধ্যে বাঘ লোহার খাঁচায় আবদ্ধ। তাতে কি আসে যায়, বাঘ তো বটে, হুংকারও ছাড়ে। ব্যাপারটা ছিল এই, সেইসময়ে কলকাতায় বোসের সার্কাস হচ্ছিল, অমরেন্দ্রনাথ সেখান থেকে কয়েক রাত্রি বাঘ আনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের 'শাস্তি' 'ভ্রান্তি' 'আয়না' 'কপির মণি' অভিনীত হল। মাঝে অমরেন্দ্রনাথের 'চাবুক' 'ভক্তবিটেল', 'লাট-গৌরাঙ্গ' ডি. এল. রায়ের 'বহুৎ আচ্ছা', হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত 'বঙ্গের শেষবীর' উপন্যাসের নাট্যরূপ একে একে দেখা দিতে থাকল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রানী' এবং 'চোখের বালি'ও অভিনীত হল। শেষে এল গিরিশচন্দ্রের 'সংনাম'। হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নিয়ে নাটকখানি রচিত; সুতরাং এতে বিরোধী সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট কটূক্তি ছিল। দ্বিতীয় রাত্রের অভিনয়ের কিছু পূর্বে মুসলমানদের একটি বিরাট দল থিয়েটার ঘেরাও করল; জানাল ওই বই-এর অভিনয় বন্ধ না করলে তারা থিয়েটার গুঁড়িয়ে দিতে যাবে। কর্তৃপক্ষ ওই নাটকের অভিনয় বন্ধ রেখে সে-রাত্রে 'প্রমদ' ও 'দোললীলা' নামালেন।

ক্লাসিক থিয়েটার খুলে অমরেন্দ্রনাথ সে-সময়কার থিয়েটারের ধারা এক এক ক'রে বাতিল করতে থাকলেন। তখন শনিবার একখানা ক'রে পঞ্চাঙ্ক নাটক হত, ৯টায় আরম্ভ হয়ে ২টো নাগাত শেষ হত। রবিবার সন্ধ্যায় থিয়েটার বসত, একখানা নাটকের সঙ্গে কখনও কখনও একটা প্রহসন জুড়ে দেওয়া হত। বুধবার—শনিবারেরই মতো। অমরেন্দ্রনাথ শনিবার দু'খানা পঞ্চাঙ্ক নাটক দিতে থাকলেন, থিয়েটার শেষ হতে ফরসা হয়ে যেতো। রবিবার আরম্ভ করলেন বেলা বারোটায়, শেষ করলেন রাত দু'টায় বা তারও পরে; দু'খানা তো বটেই, অনেকক্ষেত্রে ছোটো বই হলে তিনখানাও নামাতেন। 'রঙ্গালয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বার করলেন; বলা বাহুল্য, শখের কাগজ, আর তার সম্পাদক নিযুক্ত করলেন তখনকার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। থিয়েটারে প্রচুর অর্থাগম হতে থাকল, কিন্তু খরচ হতে লাগল তার চেয়েও প্রচুর। দেনা আরম্ভ করলেন, আর পাওনাদার মত

বাড়তে লাগল, ফ্রী-পাসের সংখ্যা তত বেড়ে যেতে থাকল।

গিরিশচন্দ্র চলে আসবার পর নরেন্দ্রনাথ সরকার আর বেশিদিন থিয়েটার চালাতে পারলেন না। মিনার্ভা থিয়েটার বিক্রি হল; যাঁরা কিনলেন তাঁদের কাছ থেকে অমরেন্দ্রনাথ পাঁচ বছরের লিজ্‌ নিলেন; একসঙ্গে দুটো থিয়েটার চালাতে রইলেন। ভাবলেন জুড়ি হাঁকাবেন, কিন্তু শেষ অবধি তাঁর দু-নৌকায় পা দেওয়া হল। মিনার্ভায় খুললেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রঘুবীর'। বই ভালো, অভিনয়ও ভালো হল, কিন্তু দর্শক নিল না। এক থিয়েটারে প্রথম বইতে নামেন, শেষ হলে, ছুটে গিয়ে অপর থিয়েটারে দ্বিতীয় বইতে অবতীর্ণ হন। ক্লাসিকের আয় বেশ কমতে লাগল। তাঁর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ধার ছিল মনোমোহন পাঁড়ে নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। সে-ধারের পরিমাণ যখন বারো হাজারে দাঁড়াল, তখন মনোমোহন পাঁড়ে হাত গুটালেন। অমরেন্দ্রনাথ মহা ফাঁপরে পড়লেন। তখন তিনি মিনার্ভার লিজ্‌ মনোমোহন পাঁড়েকে দিয়ে দিলেন। স্টেজের স্বত্বাধিকারীরা ছাড়া এই পাঁড়েমশাই-ই প্রথম—যিনি নাট্যশালা থেকে টাকা বাড়িতে নিয়ে গেছেন; আর যাঁরা এসেছেন তাঁরা বাড়ির টাকা নাট্যশালায় ঢেলে রিক্তহস্তে ফিরেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ দেনার দায়ে বসতবাড়ি অবধি বিক্রি করেছেন।

খুচরো দেনা বেড়েই চলেছে। এবার দর্শক সংগ্রহের জন্য অমরেন্দ্রনাথ বই-এর উপহার-বৃষ্টি আরম্ভ করলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে তিনি পথপ্রদর্শক নন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অবস্থায় স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রনাথ মিত্র আঙটি ইয়ারিং আয়না রুমাল সাবান প্রভৃতি উপহার দেবার ব্যবস্থা করেন। এ ছিল লটারি। প্রত্যেক জিনিসে একটা ক'রে নম্বর লাগানো থাকত; সেই-নম্বরের টিকিট-ক্রেতা জিনিস পেতেন। এমারেল্ড থিয়েটারও [illegible] অবস্থায় অনুরূপ ব্যবস্থা করে। থিয়েটারের উপরে সাজানো থাকত এককুড়ি কমলা, এককাঁদি কলা, প্রকাণ্ড একটা লাউ, দুটো কুমড়া—এইরকম সব জিনিস। এও লটারি। অভিনয়-শেষে ভাগ্যবান দর্শক মুটের মাথায় দিয়ে ওইসব জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরত। এইসময়ে বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নতুন অনেক মূল্যবান বই ছাপিয়ে গ্রাহকদের উপহার দিতেন। একসময় গ্রন্থাবলী অনেক বই থেকে গেল, রাখবার জায়গা নেই। মনোমোহনবাবু মিনার্ভা নিয়েছেন, চুনীলাল দেব সেখানে এসেছেন, এঁরা উপেনবাবুর বন্ধু, উপেনবাবু এঁদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করলেন। এবার আর লটারি নয়, প্রত্যেক টিকিটের ক্রেতা বই পাবে, টিকিটের মূল্য অনুসারে বই-এর সংখ্যা। মিনার্ভায় অসম্ভব ভিড়। এ দেখে কি অমরেন্দ্রনাথ চুপ ক'রে থাকতে পারেন। তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে চার-পাঁচ দিনে মাইকেলের গ্রন্থাবলী ছাপিয়ে তা বিতরণ করতে আরম্ভ করলেন। তার পর 'হিতবাদী'র সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করলেন। দুই থিয়েটারেই উপহার-বৃষ্টি! প্রতি অভিনয়-রাত্রে হেদুয়ার মোড় থেকে বিডন-উদ্যান অবধি এক জনসমুদ্র! রাত তিনটায় অভিনয় দেখে দর্শকগণ যেন স্কুল থেকে ফিরছে, প্রত্যেকের হাতে বই। দু'মাস এইরকম চলল। শেষ ফল দাঁড়াল এই—মিনার্ভা লাভবান হল, অমরেন্দ্রনাথ ডুবলেন—তাঁর খরচ পড়ে গেল অত্যধিক, যত বিক্রি তত লোকসান।

নরীসুন্দরী

অমরেন্দ্রনাথ insolvency নিলেন, ক্লাসিক থিয়েটার উঠল।

দশ বছর আগে ক্লাসিক থিয়েটার বন্যার মতো এসেছিল; দশ বছর ধরে বাংলার নাট্যশালাকে পর্যন্ত নাড়া দিল; বন্যার মতো চলে গেল।

ক্লাসিক থিয়েটার উঠল, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যত্র দেখা দিলেন।

সে কথায় পরে আসা যাবে।

বেঙ্গল থিয়েটারের অনেকদিনের খবর নেওয়া হয়নি। সেখানে শরৎচন্দ্র ঘোষ আর চালাতে না পেরে, পরিচালনার ভার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়কে দিলেন। ১৮৯৩ সালে প্রিন্স ভিক্টর এই থিয়েটারে একবার আসেন। তখন থেকে এর নাম হল—রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' 'রাজসিংহ' 'দেবীচৌধুরানী', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রমোদরঞ্জন' 'বভ্রুবাহন' অভিনীত হতে থাকল। ১৯০১ সালে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার উঠে গেল।

এর পর এই স্টেজে অরোরা থিয়েটার দেখা দিল। প্রথম 'কালপরিণয়', তার পর মনোমোহন রায় প্রণীত 'রিজিয়া' অভিনীত হল। রিজিয়ার ভূমিকায় নামলেন তারাসুন্দরী, আর অর্ধেন্দু মুস্তাফী ছোটো একটি পার্ট নিলেন—ঘাতক। বিপিনচন্দ্র পাল তখন ইংলণ্ড-আমেরিকা পরিভ্রমণ ক দেশে ফিরেছেন। 'রিজিয়া'র অভিনয় দেখে তিনি বললে এত উচ্চস্তরের অভিনয় পাশ্চাত্য দেশেও হয় না।

এইরকম মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছিল স্টারে, এ বহু বছর পরে। সেদিন তারাসুন্দরীর রিজিয়ার সঙ্গে ঘাত ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

অরোরা বছর-খানেক চলল; তারপর নিলে নিকে গিরি মল্লিক। এখন নাম হল ইউনিক থিয়েটার। ইউনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'তারাবাঈ' মঞ্চস্থ করল। দানীবাবু তারাসুন্দরী, তারক পালিত, চুনী দেব এই নাটকে অংশগ্রহণ করলেন।

কিন্তু দানীবাবু ক্লাসিক ছেড়ে ইউনিকে এলেন কেন; তাঁর পিতা তো তখনও ক্লাসিকে। ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট। অভিনেতা হিসেবে দানীবাবুর স্থান অমরেন্দ্রনাথ থেকে অনেক উপরে। কিন্তু হলে কি হয়, থিয়েটারের মালিক তো অমরেন্দ্রনাথ। প্রতি নাটকে তিনি নিজে নায়ক সাজবেন, দানীবাবুকে মাথা তুলতে দেবেন না। নিজের ছেলেকে নিয়ে ব্যাপারটা ব'লে গিরিশচন্দ্র এ-সম্বন্ধে কোনো কথা বলতেন না। শেষে পিতারই নির্দেশে দানীবাবু ক্লাসিক ছেড়ে গেলেন। [ক্রমশ]

শিল্পী শরৎচন্দ্র

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

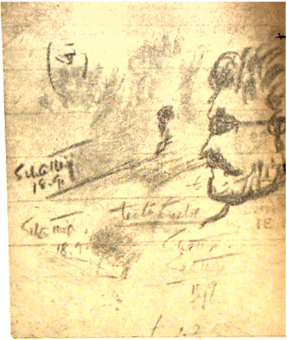

শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত রেখাচি

মানুষের মনের ইচ্ছাই মানুষকে গড়ে তোলে। বা আসে, বিপত্তি আসে—তবুও একটা নির্দিষ্ট ানার মধ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। শরৎ-দ্রের যেটাকে বলা হয় ভবঘুরে জীবন, যেটাকে া হয় শিল্পী-জীবন—সেই জীবনকে কেন্দ্র করে র যেমন সাহিত্য-প্রেরণা জেগেছিল, তেমনি রশিল্পী ও চিত্র-রসজ্ঞ হবার মনোভাবটিও গেছিল।

কিন্তু এই শিল্পী-জীবন তাঁর অজ্ঞতার জন্য, আর যে একটা খেয়ালিপনা এ-কথাটাও ঠিক বলা ল না। তার কারণ ছিল তখন সাহিত্য-স্রষ্টার ক্ষমতা। শুধু অধ্যয়নানুরাগী হয়ে বসে বসে দিন টানো তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সে-হিসাবে ল্পী-মনের পরিচয় রেঙ্গুনের বন্ধুমহলে বেশ সাড়া জাগাতে রেছিল। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র যে শিল্পী শরৎচন্দ্র হচ্ছেন—এটাও ছিল তাঁদের কাছে এক পরম গৌরবের তা। অথচ যে-সমস্ত চিত্রাঙ্কন শরৎচন্দ্র সেদিন করে-লেন, সেগুলি যদি অগ্নি-সংযোগে বিনষ্ট না হতো -তার মূল্য আজ অন্য এক স্বীকৃতি তাঁকে দিতে রতো।

১৯১২ সনে 'ভারতবর্ষ'র অন্যতম পৃষ্ঠপোষক প্রমথনাথ ট্টাচার্য মহাশয়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একখানি পত্রের য়দংশ পড়লেই বোঝা যায় উপরি-উক্ত কথার সত্যতা চ্ছে :

“… আগুনে পুড়িয়াছে সমস্তই। লাইব্রেরী এবং রিত্রহীন' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। 'নারীর ইতিহাস' প্রায় ০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম ; তাও গেছে।

ছবি বলিতে অয়েল পেন্টিং অনেকগুলি করিয়া-লাম। আমার সাধের 'মহাশ্বেতা' তাহাও ভস্মসাৎ য়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলি বাঁচিয়া গিয়াছে। আর কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও তো, তোমার কথামতো দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। Novel, history, painting—কোনটা? কোনটা আবার শুরু করি বল তো?”

শরৎচন্দ্রের অন্যতম বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটি পড়লে, শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক কথার সঙ্গে চিত্রানুরাগী শরৎচন্দ্রকে আমরা প্রকৃত শিল্পী-মানুষ বলেও চিনতে পারি।

এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

“একদিন আমাকে শরৎদা বইএর দোকানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কি কিনবো বল তো?' মুখের পানে নির্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকিয়া কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি নিজেই বলিয়া ফেলিলেন, 'এই দেখ, আজ কি কিনতে এসেছি।' বলিয়াই তিনি রং তুলি প্রভৃতি বাছাই করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ আবার কি খেয়াল মাথায় ঢুকলো শরৎদা?' 'দেখ, কি করে বসি এবার।' বলিয়া তিনি গুটিতিনেক তুলি আর দু'তিন রকম রং কিনিয়া লইলেন। আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হবে এ দিয়ে?'

উত্তর পাইলাম, 'পরশু রবিবারে আমার বাসায় গিয়ে দেখো, কি হয় এসব দিয়ে।'

"রবিবারে তাঁহার বাসায় গেলাম। ··· তথায় ঘরের ভিতর ঢুকতেই চোখে পড়িল, একটা ইজেলের উপর ফ্রেমে আঁটা ক্যান্‌ভাসের পট। তার গায়ে কেবল পেন্সিলের দাগ, কোথাও রঙের পোঁচ। ব্যাপারটা বুঝতে বাকী রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ শিক্ষায় গুরু কে দাদা?' 'এ গুরু আমি নিজে'—বলিয়াই বাম হাতের তর্জনী দিয়া নিজের কপালটি দেখাইয়া একটুখানি হাসিলেন। তারপর ছবির পারিপার্শ্বিক দৃশ্যটি কিরূপ করিলে সুন্দর মানাইবে, কোন্ রঙে ইহার effect কিরূপ বাড়িবে সেই সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। মোটের উপর, আমি তার একবর্ণও বুঝিলাম না। কেবল চুপ করিয়া বসিয়া শুনিয়া গেলাম।"

শরৎচন্দ্র কিরূপ চিত্ররসজ্ঞ ছিলেন সে-সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় লিখেছেন:

"ছবি আঁকার ঝোঁকটার ভিতরে শরৎবাবুর কতখানি যে প্রাণের দরদ ছিল তাহা সত্য সত্যই নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ-কথা সত্য যে, তাঁহার যতটুকু চিত্রকলা বুঝিবার এবং বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল তাহাতে তাঁহাকে চিত্ররসজ্ঞ (connoisseur of art) বলিলে ভুল করবার কোনই কারণ ছিল না। এই চিত্রবিদ্যার প্রসঙ্গে আমাকে সব সময় অদ্ভুত রকমের সব প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন।

"উমেশ যোগ দর্শন"
(প্রথম খণ্ড)
চারিটি ভাষায়: ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠি
(গ্রন্থকার: শ্রীযোগীরাজ উমেশচন্দ্রজী)

যোগ সম্বন্ধে একটি চমৎকার নিবন্ধ, যাহা ব্যাখ্যা কোরেছে কিভাবে হজমীশক্তি, শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য শারীরিক অঙ্গসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১০৮টি বাস্তব আসনের চিত্রে সম্পূর্ণ। যোগের দ্বারা নেচারোপ্যাথি, ক্রোমোপ্যাথি, সাইকো-থেরাপি ইত্যাদি নিরাময় সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। প্রতিটি গৃহ, হাসপাতাল ও গ্রন্থাগারে যোগ্য স্থান পাবার অধিকারী। মূল্য ১৫৲; ডাকখরচ অতিরিক্ত; ভি. পি. করা হয় না।

যাগাসন চার্ট | আর্ট গ্লেজড্ কাগজে ছাপা, যোগাসনের চিত্র সম্বলিত একটি ছবির তালিকাও পাওয়া যায়। ডাকখরচসহ মূল্য ২·৫০ ন. প. মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিতব্য।

রামতীর্থ ব্রাহ্মী তৈল
লেবেল নং ১
রেজিষ্টার্ড

মাথার খুস্কি নিবারণ ও চুলওঠা বন্ধ করার জন্য একটি অমূল্য বলকারক। বহু মূল্যবান ৌগিক উপাদান সহযোগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মস্তিষ্কের চলাচল বেশ উন্নত করে এবং সুনিদ্রা আনয়ন করে। কেশবর্ধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। ল ঋতুতে ইহা প্রত্যেকের পক্ষে উপকারী। বড় বোতল ৪৲, ছোট ২৲, সর্বত্র পাওয়া যায়।

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম
দাদার, সেণ্ট্রাল রেলওয়ে: বোম্বাই-১৪
টেলিফোন—৬২-৮১১ টেলিগ্রাম "প্রাণায়াম" দাদার: বোম্বাই

" 'আচ্ছা, বল তো সরকার, world-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় painter কে ?' উত্তর দিলাম, 'র‍্যাফেল বড় painter।' 'উহঁ, হলো না। র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জিলো বড়। তবে বড় বড় art critic-দের মতে টিসিয়ান (Titian) সবচেয়ে বড় painter।' "

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত ছবিগুলির নাম করা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্রের প্রথম চিত্রটির নাম 'রাবণ-মন্দোদরী'; দ্বিতীয়টি 'মহাশ্বেতা'। এই 'মহাশ্বেতা'ই শরৎচন্দ্রের শিল্পী-জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল। রেঙ্গুনের বন্ধু-মহলে ছবিখানি সাড়া জাগালে, শরৎচন্দ্রকে অনেকেই সেদিন অনুরোধ করেছিলেন এটিকে বড় এক এক্‌জিবিশনে পাঠাতে। শরৎচন্দ্র রাজী হননি। তার কারণ ছিল, তিনি ছিলেন আত্মপ্রচারের বিরোধী।

এ সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় লিখেছেন :

"শরৎবাবু এবারে একখানা নূতন ছবি আঁকার আয়োজন করিতেছিলেন। নূতন করিয়া সরঞ্জামের যোগাড় করিয়া নূতন ক্যান্‌ভাসের উপর এক নূতন চিত্রের পরিকল্পনা নেহাত মন্দ হইতেছিল না। তাঁহার সর্বপ্রথম চিত্র 'রাবণ-মন্দোদরী'-খানা কেমন অস্পষ্ট হইয়াছিল। এখানা দেখা গেল সেইসব অস্পষ্টতা-দোষ-রহিত, অথচ অতিরিক্ত আলোকসম্পাতেও খুব যে উজ্জ্বল, তা নয়। আলো-ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, যে তাহা নিতান্ত কাঁচাহাতের বলিয়া মনে করিবার মতো নয়। বাস্তবিকই তাহার মধ্যে Anatomy-র জ্ঞান, Perspective এবং Background-এর আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণজ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল না, তাহাও বলিতে চাহি না। মোটের উপর, একসঙ্গে নিসর্গচিত্র ও মনুষ্যচিত্র মিলাইয়া যাহা হয়, ঠিক তাই, এই তপস্বিনী 'মহাশ্বেতা'র চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃতির খেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।"

শরৎচন্দ্রের শিল্পী-মনোচিত মন ছিল ব'লেই দিদি অনিলা দেবী ও তাঁর পরিজনদের আবদার রক্ষা ক'রে সামতাবেড়েতে রূপনারায়ণ নদের ধারে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। গ্রামের নদীর পরিবেশে তাঁর অন্তর কানায়-কানায় ভরে উঠত। তিনি সামতায় বাসভবনের নীচের একটা খোলা-বারান্দায় বসে লিখতেন। লেখার মধ্যে অরুচি জাগলে, লেখার কাগজের ওপর নানারকম স্কেচ অঙ্কন করতেন। রূপনারায়ণ নদের আকর্ষণও কম ছিল না।

এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর মেজো দেওরপো রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলেছেন :

"বড়মামার আর একটা গুণ ছিল তাঁর ছবি-আঁকা। সামতার বাসভবনটি ছিল ছবির মতো। অবসর-বিনোদনের জন্যে তিনি যেমন বই পড়তেন, আবার সাধারণ কাগজের ওপর লাল-নীল পেনসিল দিয়ে ছবিও আঁকতেন। স্বামী বেদানন্দের (শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা) সমাধির নক্সাটি তাঁরই পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া মায়ের মুখে শুনেছি (অনিলা দেবীর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, সেজন্য রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে তিনি ছেলের মতো দেখতেন) সামতাবেড়ের বাড়ির নক্সাটি বড়মামার তৈরি; এমনকি, যে-ঘরে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের দেওয়া 'যুগলমূর্তি' আছে, বড়মামা নিজেই মিস্ত্রী খাটিয়ে নিজের মনোমতো করেই ও-ঠাকুরঘরটি গড়ে তুলেছিলেন।"

এ ছাড়া শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, 'বাতায়ন'-সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের মুখে শুনেছি :

"কোলকাতার বাসভবনে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে ছবি আঁকতেন। কখনো লেখার কাগজে, কখনো দামী আর্টের কাগজ কিনে। তাঁর এই শিল্পী-মনোভাব খেয়ালী প্রকৃতির ছিল এ-কথা বলতে পারি না। তবে রেঙ্গুন-জীবনের মতো ছবি-আঁকার মধ্যে তাঁর কোনও আড়ম্বর ছিল না। শুধু রঙিন পেনসিল দিয়েই তিনি ছবি অঙ্কন করতেন।"

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শুনেছি :

"শরৎচন্দ্রের শেষজীবনের দিকে একবার তাঁর কোলকাতার বাসভবনে গিয়ে দেখতে পেলুম, একটা বড় কাগজের ওপর লাল-নীল পেনসিল দিয়ে কি যেন একটা ছবি আঁকছেন। কৌতূহল জাগলে, পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, 'এই-যে অসমঞ্জ। দেখো, আমি ভেবেছি কোলকাতায় যেমন একটা বাড়ি করলাম, তেমনি আমার জন্মস্থান দেবানন্দপুরে একটা বাড়ি তৈরি করবো। তুমি তো অনেকদিন ধরে কোলকাতায় আছ। চলো-না আমরা দুজনে মিলে দেবানন্দপুরে গিয়ে থাকি গে। এই দেখো তারই নক্সা করেছি।' ··· কিন্তু নক্সাটি পছন্দ না হওয়ায় তিনি ছিঁড়ে ফেলে দেন। তারপর আর একদিন তাঁর বাসায় গেলে তিনি আমাকে আর-একটি নক্সা দেখিয়ে বললেন, 'দেখো, এবারকার নক্সাটা ঠিক হয়েছে।' ···এবং ঐ নক্সাটি দেখে এটুকু বুঝেছিলুম—তাঁর চিত্রশিল্পের ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল।"

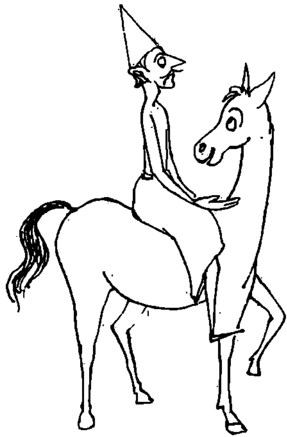

এই কলকাতাতেই ছিল

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনদুপুরে বাঁশের সঙ্গে একটা জলজ্যান্ত মানুষের হাত-পা বেঁধে মরা গরু-ছাগলের মতো ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে —এ দৃশ্য আজ কল্পনাও করা চলে না। কিন্তু আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে খাস কলকাতা শহরে এইরকম ঘটনাও ঘটতো। কাউন্সিলের গেটের উল্টো দিকের রাস্তা ধরে হাঁটছিল বিনয়রাম চ্যাটার্জী। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল একদল লোক—এসেই বিনয়রামের হাত-পা বেঁধে ফেলে বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়ে চললো বার্টন-সাহেবের বাড়ির উদ্দেশ্যে। বার্টনের বাড়িতে বেধড়ক চাবুক খেয়ে বিনয়রাম যখন প্রায় অচৈতন্য, তখন সাহেবের মনে হ'ল যে, আর মারলে তো ব্যাটা মরেই যাবে, তার চেয়ে মুখে খানিকটা গো-মাংস পুরে দিয়ে জাত নষ্ট করে ছেড়ে দেওয়া যাক। যথা ভাবা তথা কাজ।

বামুনের অপরাধ হ'ল যে, কোর্ট-উইলিয়ামের নতুন কারখানায় যে জোচ্চুরি চলেছিল তার খবর তিনি সরকারের কানে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। বার্টন-সাহেবের পিতৃদেব ঐ জোচ্চুরির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ব'লেই, বার্টনের রাগ গিয়ে পড়ে বিনয়রামের ওপর। সেদিন বিনয়রামকে বাগে পেয়ে সে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিলে। ঘটনাটা নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া হ'ল, কাউন্সিলের কানে গেল খবরটা, কিন্তু শাসনের ভার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার জন্যে বার্টনের কৈফিয়ত কেউ তলব করলে না।

অবশ্য এদেশীয়দের ওপর অন্যায় অত্যাচার করার জন্যে বিদেশীদের যে একেবারেই সাজা হ'ত না, তা বলা চলে না। নিজের ক্রীতদাসকে মারধোর করার অপরাধে ১৭৬৮ সালে মার্শাল জনসন সাহেবের নাকি ৪০০ পাউণ্ড জরিমানা এবং অনাহারে একমাস জেল হয়। কিন্তু শোনা যায় যে, মাস-তিনেক পরেই কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানিয়ে জনসন খালাস পেয়ে যান।

সাজা থেকে রেহাই ছিল না শুধু এদেশীয়দের। এমন কি, দোষ প্রমাণিত হ'লে স্ত্রীলোকদেরও পুরো সাজা না দিয়ে কোনক্রমেই ছাড়া হ'ত না। এক সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা হলপ করার অপরাধে আদালত থেকে এক স্ত্রীলোকের সাজার হুকুমে বলা হয়: "সামনের শুক্রবার পর্যন্ত জেলে আটক রাখবে, তারপর লালবাজারে নিয়ে গিয়ে একঘণ্টা 'হুড়ুমে' (হুড়ুম হল ইংরেজী 'টি'-এর মতো কাঠের একটা স্ট্যাণ্ড—তার গায়ে তিনটে গর্ত, সেই গর্তে মাথা আর হাত ঢুকিয়ে অপরাধীকে বেঁধে রাখা হ'ত) রাখবে। পরের দিন পুলিশ-অফিসে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে চাবুক মারতে-মারতে বড়বাজারে ঐ সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবে, আবার ঐভাবেই ফিরিয়ে আনবে।" সাজা কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। একমাস অন্তর তাকে আরও দু'বার ঐভাবে চাবুক মারার নির্দেশ আর দু'মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটি ১৭৭৯ সালের। তখন কলকাতার রাস্তায় প্রায় রোজই অপরাধীদের ঐভাবে চাবুক মারতে-মারতে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য লোকের চোখে পড়তো।

কোম্পানির আমলের কলকাতায়—চাবুক, হাতে-গলায় ছ্যাকা, হাত-পা কেটে দেওয়া ছিল লঘু অপরাধের শাস্তি, আর এই লঘু অপরাধ বলতে মানুষ-খুন-করাও বোঝাত। জন ম্যাকনাচি নামে এক সাহেবের মানুষ-খুন-করার জন্যে মাত্র একটাকা জরিমানা হয়েছিল ব'লে শোনা যায়। কিন্তু চুরি-ডাকাতি গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হ'ত, আর সেজন্যে চোর-ডাকাতদের সাজা ছিল ফাঁসি। ১৭৭৪ সালের কথা। তখনকার বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার চৈতন্য শীলের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়লো পাঁচজন সাহেব আর একজন বাঙালী। বিচারের পর চৈতন্য শীলের বাড়ির কাছাকাছি এক মাঠে তাদের সবাইকে ফাঁসি দেওয়ার হুকুম দেওয়া হল সেরিফকে। ফাঁসি দেওয়ার পাকাপোক্ত জায়গা ছিল হেস্টিংসের কাছে কুলীবাজারে। কিন্তু সুবিধামতো অন্য জায়গায়ও ফাঁসি দেওয়া হ'ত ব'লে ফাঁসিকাঠও লাগতো অনেক। জোসেফ সিম্পসন নামে এক সাহেব-কন্ট্রাক্টর ফাঁসিকাঠ, হুড়ুম ইত্যাদি সরবরাহ করে দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছিলেন।

১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস চট্টগ্রামের অপরাধীদের সম্বন্ধে নিজামত আদালতের রায় অনুযায়ী যে ওয়ারেন্ট জারী করেন, তাতে ডাকাতি করার জন্যে দুজনের ডান হাত আর বাঁ পা কেটে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। শুধু ডাকাতির জন্যেই নয়, সামান্য অপরাধেও চরম শাস্তি দেওয়ার নজীর উনিশ শতকেও পাওয়া যায়। পঁচিশ টাকা দামের একটা ঘড়ি চুরি করার জন্যে ১৮০০ সালে একজনের ফাঁসি হয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মুসলমানদের প্রথমে ফাঁসি না দিয়ে চাবুকে মারা হ'ত। ১৭৯০ সালে বোর্ডের হুকুমে চাবুকের বদলে তাদের তোপের মুখে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়ার রীতি উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও চালু ছিল। অনেকসময় অপরাধীর মাথা মুড়িয়ে, গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে, চটের কোপ্‌নি পরিয়ে দেওয়া হ'ত। তারপর মাথায় রঙবেরঙের ছবিওয়ালা কাগজের টুপি চড়িয়ে, গলায় জুতোর মালা আর গালে চুনকালি মাখিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে শহর ঘোরানো হ'ত। সঙ্গে থাকতো দুজন ঝাড়ুদার আর এক ঢেঁড়াওয়ালা। ঝাড়ুদাররা ঝাড়ুর বাতাস দিত আর ঢেঁড়াওয়ালা আসামীর কীর্তিকলাপ শোনাতো ঢেঁড়া পিটে। তখনকার ট্যাঙ্ক-স্কোয়ার (ডালহৌসি স্কোয়ার) থেকে লালবাজার হয়ে বহুবাজার পর্যন্ত ছিল চাবুক-খাবার রাস্তা। সেনাবিভাগের অপরাধীদেরও সাধারণ শাস্তি ছিল চাবুক। এ শাস্তি ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। কেরি-সাহেব তাঁর '*Good Old Days of Hon'ble John Company*'-তে লিখেছেন—"It was not until August, 1833 that a general order limited the punishment of the lash to the more serious crimes of mutiny, insubordination, offering violence to a superior, etc."

নদীর ওপর খুন-রাহাজানি করার জন্যে ফাঁসির আসামীদের বজরায় ক'রে গঙ্গার অপর পারে অর্থাৎ বর্তমান বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে নিয়ে গিয়ে বজরার ওপরেই লটকানো হ'ত। গঙ্গার পাড়েও একসার ফাঁসিকাঠ তৈরি থাকতো। ১৮২০ সাল পর্যন্ত বজরায় ফাঁসি দেওয়ার পর মৃতদেহ পাড়ে নিয়ে গিয়ে সেখানকার ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। কিছুদিন পরে এই ব্যবস্থা তুলে দিয়ে মৃতদেহ ফেলা হ'ত গঙ্গার জলে।

কলকাতার শেরিফ-ই ছিলেন সেকালে দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, জেলের সর্বময় কর্তা। আসামীদের শুধু জেলে পোরাই নয়, তাদের খাওয়া-পরার তদারক, শাস্তির হুকুম তামিল করানো, ফাঁসির আসামীদের ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি আরও নানা কাজ ছিল শেরিফের। তাঁর কর্মক্ষেত্রও এখনকার মতো শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। একদিকে মীরাট আর একদিকে মাদ্রাজ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের হুকুম কার্যকরী করার ভার ছিল শেরিফের-ই ওপর। কলকাতার বাইরে শেরিফের লোকজন, শান্ত্রীসেপাই ছুটতো কোর্টের নির্দেশ পালন করতে। এখনকার মতো এতরকমের যানবাহন তখন ছিল না; কাজেই কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো পাল্কীতে, কখনো নৌকোয় যেতে যেতে বেশ কয়েকমাস সময় চলে যেত। এর ওপর আবার রাহা-খরচ ফুরিয়ে গেলে পথে আরও দেরি হ'ত। তখন স্থানীয় ইংরেজ বাসিন্দাদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আবার যাত্রা সুরু করতে হ'ত। অনেকসময় রাহা-খরচই ডিক্রির খরচের চেয়ে বেশি পড়ে যেত।

কলকাতা থেকে এইভাবে শেরিফের দলবল আসায় খরচের বহর দেখে ব্যবসাদারদের চক্ষুস্থির হওয়ার উপক্রম হ'ল। অনেক ভেবেচিন্তে কানপুরের কয়েকজন ব্যবসাদার মিলে ১৮২৪ সালে শেরিফের কাছে এক দরখাস্ত পাঠালেন যে, কলকাতার বাইরে পশ্চিমের কোনো শহরে কিছু লোকজন রাখার হুকুম দেওয়া হোক। তার ফলে, বেনারসে কিছু কর্মচারী রাখার ব্যবস্থা করা হ'ল। ১৮৬২ সাল নাগাদ শেরিফের কার্যক্ষেত্র শুধু কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ হ'লে ঐ ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়।

শেরিফের কাজ হুকুম তামিল করা, আর হুকুম দেওয়ার মালিক জজ। ইংরেজ রাজত্বের প্রায় গোড়া থেকেই কিন্তু কলকাতায় ইংলণ্ডের মতো জুরীর সাহায্যে বিচার-ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা আসতেন বিলেত থেকে, কিন্তু জুরী নিয়োগ করতে হ'ত এদেশে। বারোজন ক'রে জুরী খুঁজে বার করবার জন্যে তখন সারা কলকাতা জুড়ে জাল ফেলতে হ'ত। কারণ প্রথমদিকে—বিলেতে জন্ম, কমপক্ষে একুশবছর বয়স আর প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মে বিশ্বাসী না হ'লে জুরী হিসাবে কাউকে নিয়োগ করা চলতো না। কাজেই সদর দেওয়ানী আদালতের জজ, গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি প্রমুখ বড় বড় রুই-কাতলা থেকে আরম্ভ ক'রে ইংরেজ ছুতোর-মিস্ত্রী, হোটেল-মালিক, দর্জি, দপ্তরী, দোকানদার প্রভৃতি চুনোপুঁটি সবাইকে টানা-জালে তোলা হ'ত।

জুরীদের দুর্ভোগও বড় কম ছিল না। কোর্টের হুকুম অনুযায়ী যথাসময়ে হাজির না হ'লে—হ'ত জরিমানা, আর জরিমানা না দিলে 'শ্রীঘর' বাস ছিল অবধারিত। তা ছাড়া আদালতেও তাঁদের চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল না। মামলা সুরু হওয়ার সময় থেকে রায় না বের হওয়া পর্যন্ত বারোজন জুরীকে রাখা হ'ত শেরিফের জিম্মায় ও পুলিশ-পাহারায়। অবশ্য যে-ক'দিন মামলা চলতো, সে-ক'দিনের জন্যে তাঁদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্তও শেরিফ-ই করতেন। এজন্যে গভর্নমেন্টের খরচও কম হ'ত না। বারোজন জুরীর জন্যে রোজ ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা খরচ হ'ত। ১৮১৪ সালে জুরীদের একদিনের খাইখরচের এক বিল থেকে জানা যায় যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রত্যেক জুরী গড়ে আধ বোতল মেডিরিয়া, আধ বোতল ক্ল্যারেট, সিকি বোতল পোর্ট, প্রায় এক বোতল বীয়ার আর আকণ্ঠ ব্র্যাণ্ডি ও জিন উড়িয়েছিলেন। খাওয়ার জন্যে সেদিন মোট খরচ পড়েছিল ১৮৭ টাকা। মদের খরচের বহর দেখে দৈনিক খরচ পরে ৮০ টাকায় বেঁধে দেওয়া হয়।

জুরীদের আদর-আপ্যায়নের ঘটা দেখে ফিরিঙ্গী সাহেবরাও জুরী হওয়ার জন্যে সুপ্রীম কোর্টের কাছে কাঁদুনি সুরু করেন। সুপ্রীম কোর্ট মঞ্জুরও করেন সে-আবেদন। দেশীয়দের মধ্যে যাঁরা জুরী হওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিলেন, তাঁদের আশা পূর্ণ হ'তে আরও ক'বছর সময় লেগেছিল। ১৮৩০ সালেই দেশীয়দের মধ্যে থেকে জুরী-নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হয়। বলা বাহুল্য, জুরী-প্রথা দেশে এখনও চালু আছে (অবশ্য বারোজনের বদলে জুরী এখন ন'জন), কিন্তু আদালতে আটক রাখা বা চর্ব্যচোষ্যে আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা বহুদিন আগেই উঠে গেছে।

গুজরাটি নবরাত্রি উৎসব ও গর্‌বা নৃত্য

অরু ঘটক

ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচার ভারতবর্ষের সব অঞ্চলেই আছে। প্রতিটি অঞ্চলের বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছাপ পাওয়া যায় তাদের সাধারণ লোকের এইসব নাচগানের উৎসবে। ভালো করে বিচার করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব এইসব উৎসবের প্রাণ। গুজরাটের ইতিহাস ঐতিহ্যময়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'তে উল্লেখ আছে যে সৌরাষ্ট্র একটি গণতন্ত্র ছিল। মৌর্য আমলে পুষ্যগুপ্ত রাজপ্রতিনিধি ছিলেন জুনাগড়ে। অশোকের ধর্মলিপির স্বাক্ষর আজও পাওয়া যায় জুনাগড়ের পাহাড়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গুজরাটের ইতিহাস।

গুজরাটের উল্লেখযোগ্য নাচগুলির নাম হচ্ছে গর্‌বা। গর্‌বী ও রাস ও গুজরাটী যাত্রার নাম হচ্ছে 'ভাওয়াই'। গর্‌বা-ই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাচ। দক্ষিণ বা উত্তর ভারতের উচ্চাঙ্গ-নৃত্যের কোনো ছাপই পাওয়া যায়না এই নাচগুলিতে, যদিও সমবেত নৃত্যপদ্ধতি ও সহজ তাল মনে করিয়ে দেয় যে-কোনো জায়গায় 'লোকনৃত্য'-র কথা। গুজরাটী নবরাত্রি শুরু হয় দুর্গাপূজার প্রতিপদের দিন থেকে। দুর্গা ও কালীকে গুজরাটে অম্বামাতা বলে পূজা করা হয়। একটি মাটির ঘটের ওপর একটি ঘিয়ের প্রদীপ হচ্ছে অম্বামাতার শক্তির প্রতীক। এবং নৃত্যরতা মহিলারা সেই ঘিয়ের প্রদীপকে ঘিরে গোল হয়ে নেচে তাঁদের ভক্তি অর্পণ করেন। এ পদ্ধতির অবশ্য তফাতও আছে। অন্য পদ্ধতিগুলিও একাধিক জায়গায় অনুসরণ করা হয়। প্রদীপের বদলে একাধিক প্রতীক আছে।

প্রতীকের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—

(ক) অম্বামাতার একটি ছবি ;

(খ) একটি ছোট ঝুড়ির ভেতর ভেজা মাটিতে চাপা থাকে ধান, গম ও শস্যবীজ :

(গ) একটি কাঠের ফ্রেমে রঙীন কাপড় জড়িয়ে রঙ দিয়ে শুভময় লেখা ;

(ঘ) নাচে যারা অংশগ্রহণ করছে—সব মেয়েরাই মাথায় একটি করে হাঁড়ির উপর ঘিয়ের প্রদীপ নিয়ে নাচে।

গর্‌বা হচ্ছে মেয়েদের নাচ, এবং যদিও বছরের মধ্যে অনেকবারই এটা নাচা হয়—যেমন রামনবমী, জন্মাষ্টমী, বসন্তপঞ্চমী, গৌরী ব্রত, ছাট, সাবিত্রী ব্রত—তবে এর শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে নবরাত্রি উৎসব। নবরাত্রির প্রতিটি রাতে

গুজরাটের শহরে গ্রামে মেয়েরা একসাথে নাচে এই নাচ। শরতের স্বচ্ছ আকাশের নীচে শক্তিমূর্তির প্রতীকের সামনে গুজরাটী মেয়েরা নেচে জানায় তাদের আবেদন। প্রতিটি পাড়ায় প্রতিটি গ্রামে আকাশ বাতাস উৎসবমুখর হয়ে ওঠে গানের সুরে, বাজনার আওয়াজ আর নাচের তালে। কালী—যিনি শক্তির প্রতীক, তাঁর অর্চনায় গুর্জরের এই অভিনব রূপ মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের বিচিত্র সংস্কৃতির মহিমা। গরবা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্প্রদায় হিসেবে নাচা হয়—জাতিবিচার না করে সারা গাঁয়ের মেয়েরা একসাথে নাচে যোগ দেয়। সাধারণতঃ একজন মহিলা ভার নিয়ে নিজেদের পাড়ায় বা মহল্লায় নাচের বন্দোবস্ত করেন। কয়েকটি বিশেষ পরিবার আছে, যে-পরিবারের মেয়েদের জন্মগত অধিকার থাকে গরবা-নাচের নেতৃত্ব করার।

নিয়ম হচ্ছে, যে-মহিলা নাচের বন্দোবস্ত করবেন তাঁকে নবরাত্রির প্রতিদিন উপবাস করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপবাস না ক'রে কোনো কোনো বিশেষ খাদ্য ও পানীয় বর্জন করতে হবে। যে মহিলা নাচের উদ্যোক্তা তাঁকে, প্রতিদিন যারা নাচে অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের, মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হবে ও 'লহানী' দিতে হবে। 'লহানী' হচ্ছে উপহার, সাধারণতঃ রান্নার বাসন বা শাড়ী। ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদানুসারী 'লহানী' রোজ বা শেষদিন দেওয়া যেতে পারে। দৈনন্দিন কাজকর্ম শেষ করে, স্নান করে মহিলারা আসেন নাচের অঙ্গনে। সন্ধ্যের পর প্রদীপ জ্বালিয়ে নাচ শুরু হয় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। প্রদীপের আলো আর রঙীন হাঁড়ির ভেতর রাখা প্রদীপশিখা, নাচের মিলিত ছন্দ ও গানের লয় মিশে এক অদ্ভুত রূপকথার দৃশ্যের মতো সুন্দর আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। ২০ থেকে ১০০ জন পর্যন্ত মহিলা নাচে অংশগ্রহণ করেন। নাচের তালে তাল রাখা হয় হাততালি দিয়ে। সাধারণতঃ গরবার ছন্দ খুব ধীরে হয়। এবং হাততালির মধ্যে অনেক সময় যায়। একধরনের নাচে হাততালি দিয়ে মেয়েরা কয়েক পা এগিয়ে যায় আর যখন দ্রুততর হয় তাল তখন একসঙ্গে তিনবার তালি দিয়ে একজায়গায় সম্পূর্ণ ঘুরে যেতে হয়। যখন মাথার ওপর মাটির হাঁড়ি থাকে তখন তালি দেওয়া হয় না। 'ছিক' বলে একধরনের গরবাতে হাততালি দিয়ে, আঙুল মট্‌কে আওয়াজ করে শরীর বেঁকিয়ে হাতের ভঙ্গী করা হয়। সাধারণতঃ একজন গান করে আর সব তাল রাখে—কখনো কখনো ঢোল বাজাবার লোকও থাকে। গরবা সাধারণতঃ এইসব তালে নাচা হয়—কাহারোয়া (৪ মাত্রা), দাদ্রা (৬ মাত্রা) ও দীপচান্দী (১৪ মাত্রা)। গরবার গান সাধারণতঃ গ্রাম সঙ্গীত, তবে কখনও তার ভেতর পিলু, সারঙ্গ ও কাফি রাগের ছাপ পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ গরবার গান অম্বামাতার শক্তি, রূপ ও ম বর্ণনা করে গাওয়া হয়। তা ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ, হনুমান ও অ পৌরাণিক চরিত্রের গুণ বর্ণনাও করা হয়। তা হলেও বল যায়, এই গানের প্রধান আরাধ্যাদেবী অম্বা, এবং অন্যা দেবতারা সেখানে নেপথ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চ যে, গুজরাটের অপরূপ গীতিনাট্য 'মেণাগুর্জরী'ও মহাকালী মহিমা কেন্দ্র করে রচিত।

গরবার গান-লেখকদের প্রভাব গুজরাটী সাহিত্যে বিশে ভাবে আছে। সবচেয়ে বিখ্যাত গায়ক ছিলেন বল্লভ ভা তারপর শ্যামল ভাট, প্রেমানন্দ, শিবানন্দ, নর্মদ ও দাস রামের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায়ই মীরাবাই ও নরসীভগতে ধর্মমূলক গান গরবার সাথে গাওয়া হয়। সবচেয়ে প্রা গরবা গান সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে রচিত বলে প্রসি আছে। গায়ক ছিলেন বল্লভ ধোওয়ালা, ইনি চুনোয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন ও অম্বামাতার ভক্ত ছিলেন ওঁর গানে অম্বামাতাকে 'বহুচোরাজী' রূপে কল্পনা ক হয়েছিল—মাথার সোনার হাঁড়িতে উজ্জ্বল হীরার আলো নৃত্যরতা। কথা হচ্ছে: "রঙ তেলী রঙ তেলী, যে রঙ রাত তেলী"। নাচের শুরু হয় প্রতিদিন আরতির প নীচের গান গেয়ে:

"হে আদ্যা শক্তি, শক্তিমা হে আদ্যা শক্তি
অসুর রক্ত শোণিতে পরনে পট্টকীরা, জয় জয় মা জগদম্বে"।

আর একটি গানের বাংলা অনুবাদ দিচ্ছি—এ অম্বামাতার বর্ণনা।

"আজ নবরাত্রি চারিদিকে রঙ ভরা : সকল হয়েছে গরবা নাচার—
এস মা এস যোগ দাও এই নাচে : পরনে মা'র ঘাঘরা পাঁচ রঙের
মার উড়নীর রঙ জমকাল কত ! ঝলকে উঠে সবুজ চোলী
মার গলায় সাতনড়ার মণিহার : হাতে কাংকণ মণি ভরে
এস মা, এস, এস, যোগ দাও এই নাচে।"

অম্বাদেবীকে বিভিন্নরূপে গান গেয়ে শোনানো হ একটি গানে ওঁকে বরোদার পাওয়াগড়ের রাণী বলা হয়—

"হে মাতা, রাণী তুমি পাওয়াগড়ের
তোমার ধাম পাহাড়ের চূড়ায়
তোমার কাছে আমরা যাব কেমন করে ?
আমাদের পথ দেখাও, হে মাতা… "

শারদ পূর্ণিমার সময় শ্রীকৃষ্ণের নামে গান গাওয়া হয়—

"ওই বাজে বাঁশী শ্রীকৃষ্ণের আর প্রাণ কলকল করে
আমার মনকে ভুলাতে আর কি চাই
তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও, কৃষ্ণমহারাজ
তবু আমার চোখে তোমায় দেখি
তুমি আমার প্রাণ-দেবতা, এস আমার সামনে !"

পৌরাণিক গান ছাড়াও এমনি সাধারণ গানও আছে যাতে মেয়েদের ডাকা হচ্ছে নাচে যোগ দেওয়ার জন্য—

"কুমারী কন্যা দূরে যেয়ে খেলনা আর, গরবার সময় এসেছে
যদি প্রদীপের তেল ফুরায়, ঘি দিয়ে দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখা হবে
কুমারী ……… এসেছে
মাটির হাঁড়ি উজ্জ্বল মণিমাণিক্যে, ভরা মনে হচ্ছে—
তবু আলো আর মাটির পাত্র ………
কুমারী কন্যা ………এসেছে।"

একটি লক্ষ্য করবার বিষয় হলো মহাকালীকে পাওয়াগড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে 'যেপাগুর্জরী'-তে কল্পনা কর হয়েছে। গীতিনাট্যের মুখবন্ধে সূত্রধার গাইছেন—

"কে তোঁথী কুমারী চালিয়া সে গরা পাওয়াগড় রে
কে পাওয়া তে গরবে অলোপ থই গই
মহাকালী রে কহেবায় রে।"

তত্ত শরৎকালে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাকালী ব
নবার অর্চনায় গুজরাটের এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার বিষয়।

আমেদাবাদে একটি কালীমন্দির আছে, সেখা
অধিষ্ঠাত্রী মহাকালী গুজরাটের জনসাধারণ দ্বা
নিত্যপূজিতা। দীপাবিতায় সেখানে আলোক-উৎসব হয়
সুপ্রাচীন সংস্কৃতির লীলাভূমি গুজরাট আজও তার নিজ
বিশিষ্ট ধারায় শক্তি-অর্চনা করে চলেছে। এমনি করে
ভারতের প্রদেশে প্রদেশে সংস্কৃতি এমন জীবন্ত ও অব্যাহ
প্রাণধারার মুখর হয়ে জাতিকে সঞ্জীবিত রেখেছে।

গ্রন্থ বৃত্তান্ত

কৃত্তিবাস

ফিলিপের বাবার ছিল কাগজের কারখানা। আধা-শহর, আধা-গ্রাম পাঁদ্মার ফিলিপদের বিরাট পৈতৃক বাড়ী, জমি আর কারখানা। নিখুঁত বনেদী পরিবার ও পরিচ্ছন্ন আভিজাত্যের মধ্যে ফিলিপ মানুষ হয়েছে। পাঁদ্মার নির্জন মাঠে, কখনো বা নদীর তীরে, আর নানারকম বই-এর মধ্যে ডুবে থেকে ফিলিপ একা-একাই বড় হয়ে উঠেছে। বই ছাড়া বিশেষ কোনো সঙ্গী জোটেনি। মাঝে মাঝে যখন তার কাকা আসতেন বেড়াতে, তখন সে খেলার সঙ্গী পেত কাকার মেয়ে রেনীকে। বড় হয়ে দূর শহরে স্কুলে সে পড়েছে। সেখানে মনে ছাপ রেখেছেন মঁসিয়ো বেইলি—সাহিত্যের অধ্যাপক। আর একজনকে মনে পড়ে, সে হল রেনিস। বয়সে কিশোর ফিলিপের থেকে বড়। নিটোল সৌন্দর্যের আকর্ষণে সে অনেককেই আকৃষ্ট করতো। গ্রীক-পুরাণের সুন্দরী হেলেনের কথা মনে পড়তো রেনিসকে দেখে। পনেরো বছরের ফিলিপ রেনিসকে কেন্দ্র করে এক রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল।

ধীরে ধীরে এ আকর্ষণ কেটে যায়। রেনিসের তরফ থেকে কোনো আগ্রহ ছিল না। ওদের পরিচয় হবার আগে থেকেই রেনিস বিবাহিত। মাদাম কোরা ছিলেন ফিলিপের এক মাসী। তিনি বিরাট ধনী—স্বামী মারা যাবার পর প্রচুর সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছেন। সপ্তাহে একটি দিন তিনি বাড়িতে পার্টি দেন। ফিলিপ কৈশোর কাটিয়ে উঠলে, মাদাম কোরার পার্টিতে তার নিমন্ত্রণ হতে শুরু হল। পার্টির ডিনার আর মেয়ে-বন্ধুতে প্রায় সকলেরই আকর্ষণ। সেখানে ফিলিপ মার্সেনাৎ-এর কুলগত বনেদী-আনা আহত হয়। ফিলিপের বাবা মাদাম কোরা-কে পছন্দ করতেন না—তাঁর পার্টিকেও সুনজরে দেখতেন না। ফিলিপের উঠ্তি বয়েস। চাকচিক্যের সহজ আকর্ষণে সাড়া দিতে তার বাধে না। সেখানে সহজলভ্য মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে প্রেমের খেলায় সে মেতে ওঠে। কিন্তু এ প্রেম কেবল খেলা মাত্রই। ফিলিপের উৎসাহ কেবল পার্টিতে এলেই।

ফিলিপ মিলিটারিতে চাকরি নেয়। কিছুদিন চাকরি করার পর অসুস্থতার ফলে সে বাপের কারখানায় এসে বসে। পাঁদ্মায় ফিরে কাজেকর্মে মন দেয়। মাঝে কিছুদিন রোগ-ভোগের পর আবহাওয়া বদলের জন্য বাইরে যেতে হল।

ফিলিপ এল ক্রোয়েসে। হোটেলে তার পাশের ঘরেই উঠেছিল এক পরিবার। বাবা, মা ও তাদের এক মেয়ে ওদিল। মেয়েটির প্রথম দর্শনেই ফিলিপ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ কেবল চোখের নেশা নয়। একদিন খুব সহজভাবেই তার কাছে পরিচিত হবার সুযোগ এল। এতদিন ফিলিপ নিজের মধ্যে নিজেই ডুবে ছিল। তার একাকী জীবন, বই আর কারখানার কাজ। সেখানে মুক্তপক্ষ হয়ে সচল জীবন-প্রবাহে মিশে যাওয়ার বাধা ছিল। ওদিলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর ফিলিপের জীবনে অনেক অনুভূতির অর্থ ই বদলে গেল। স্বল্পবাক্ গম্ভীর ফিলিপ অবাক হয়ে ভাবে, কেমন হাসিতে খুশীতে আলাপে প্রলাপে ওদিল নিজেকে প্রসারিত করে দিতে পারে। ফিলিপের কুলগত আভিজাত্য তাকে এতদিন সহজ হবার পথ খুলে দেয়নি। সারাদিন ধরে দুজনে ক্রোয়েসের পথে পথে ঘোরে।

ফিলিপের সঙ্গে ওদিলের বিয়ের প্রস্তাব মার্সেনাৎ-পরিবারের মনঃপূত নয়। তবু ফিলিপের ইচ্ছায় কেউ বাধা দেয়না। হনিমুন কাটিয়ে ফিলিপ ও ওদিল যখন ফিরে এল তখন এক ঘটনায় ওদিলের স্বতন্ত্র মনের পরিচয় ফিলিপকে শঙ্কিত করে তুলল। পর পর কয়েকটা ছোটখাটো ঘটনায় বোঝা গেল ওদিলের জটিল মনের খবর ফিলিপের কাছে দুর্জ্ঞেয়। ফিলিপ কিন্তু ওদিলের দেহমন সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্তে রাখতে চায়। কিন্তু পদে পদে ওদিলের স্বাতন্ত্র্যে বাধা পায়। কথা-কাটাকাটিও হয়। ফিলিপ যখন কাজে বেরোয়, ওদিল তখন কী করে ;—একটা অহেতুক কৌতুহল ফিলিপকে পীড়া দেয়।

বিয়ের পর ফিলিপ সোসাইটি, পার্টি, ডিনারে যোগ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ওদিল কিন্তু ধীরে ধীরে এইসব পার্টি-ডিনারে যোগ দেওয়া বাড়িয়ে দিল। ফিলিপের অনেক প্রশ্নের জবাব ওদিল ভালো করে দেয়না, পারলে এড়িয়ে যায়। ফিলিপের আশঙ্কা, ওদিলের বোধহয় নতুন কোনো পুরুষ-বন্ধু জুটেছে। এক ঈর্ষা তাকে অনবরত পীড়িত করে। মার্সেনাৎ পরিবারের সঙ্গে ওদিলের ঘনিষ্ঠতা হয় না। ফিলিপের বাবা মা ওদিলের এতখানি স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করেন না। ওদিল কিন্তু নিজের একান্ত ব্যক্তিগত দিক ফিলিপের অজ্ঞাত রাখে। ফিলিপের মনে হত, ওদিলকে ভালবাসতে গেলে দুঃখই পেতে হবে। সদা-শঙ্কিত হয়ে মানুষ জন্মায় না। পরিবেশের চাপে প'ড়ে তার আশঙ্কাগ্রস্ত মন

সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে। ফিলিপ এতটাও তলিয়ে ভাবে। অথচ ওদিল যতক্ষণ কাছে থাকে মনে হয় সে যেন এক দীর্ঘ স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করছে।

মাদাম কোতার পার্টিতে ওদিলের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী। সেখানে পরিচয় হয় ফ্রাঁসোয়া দ ক্রোজনাৎ নামে খুব স্মার্ট এক জাঁদরেল অফিসারের সঙ্গে। ফ্রাঁসোয়া নিজে যেমন মিশুকে—তেমনি কথায়-বার্তায়, ব্যবহারে নিজের চারিদিকে অপরূপ রহস্যময়তার সৃষ্টি করতে পারে। ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে ওদিলের ঘনিষ্ঠতায় ফিলিপের সন্দেহ যেমন বাড়ে, ঈর্ষাও বাড়ে। ফিলিপের মনে হতে লাগলো ওদিল বোধহয় লুকিয়ে-চুরিয়ে ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে মেলামেশা বাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ ওদিল ফিলিপের কাছে ফ্রাঁসোয়া সম্পর্কে একেবারেই নীরব থাকে। মনে হতে লাগলো ফ্রাঁসোয়া যে-সমস্ত বই পড়তে ভালবাসে, যেমনভাবে কথা বলে—ওদিল বুঝি সে-সব নকল করছে। কিন্তু এসব ব্যাপারের কোনো কৈফিয়ত দাবি করতে যাওয়া হাস্যকর। অথচ ফিলিপ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না—ফ্রাঁসোয়া-ওদিলের সম্পর্ক নিয়ে তার অনুমান কতখানি সত্য।

এর পর থেকেই ফিলিপের মনে ওদিলের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। মনে হয়, এ-দুর্ঘটনা বোধহয় এড়াতে পারা যাবে না। মনে একবার সন্দেহের রেখাপাত হলে, নানা ঘটনা-পরম্পরায় তা প্রায়ই জোরালো হয়ে ওঠে। ফিলিপের নিজের মন কেমন যেন বদলে যায়। মনে-মনে তীব্রভাবে যা সে কামনা করে, স্বাভাবিক আচরণে তা প্রকাশ করতে পারে না। ওদিলের ব্যবহারে আর ফিলিপের সন্দেহে ক্রমশঃ তিক্ততা বাড়তে থাকে। ওদিল নিজেই একদিন প্রস্তাব আনে বিবাহ-বিচ্ছেদের। ফিলিপ মনে-মনে উপলব্ধি করল সেই সত্য : **A great love is not sufficient to hold a woman unless the lover knows how to fill her life with renewed interests.**

সেইবছরের শেষেই ওদিলের সঙ্গে ফ্রাঁসোয়ার বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন বাদে মর্মান্তিক খবর এল, ওদিল আত্মহত্যা করেছে। ইতিমধ্যে য়ুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠেছে।

ফিলিপের ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী, কাকার মেয়ে রেনী ডাক্তারি পাস ক'রে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে এক হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হয়েছে। রেনীর সহযোগী ইসাবেলে নার্সিং ডিপ্লোমা নিয়ে তারই অধীনে কাজে যোগ দিয়েছে। ইসাবেলে যথেষ্ট কাজের মেয়ে। সুন্দরী ও কর্তব্যপরায়ণা। সেবার নিষ্ঠার কর্মে তার সুনাম আছে। রেনীর মাধ্যমেই ফিলিপের সঙ্গে ইসাবেলের পরিচয়। রেনীর কাছ থেকেই ফিলিপের বিবাহিত জীবনের গল্প ইসাবেলে শুনেছে। ইসাবেলে প্রথম থেকেই ফিলিপের প্রতি আকৃষ্ট। ফিলিপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ নিতে ইসাবেলে কোনো কার্পণ্য করেনি। ইসাবেলের জীবনে এর আগে অনেক পুরুষ-বন্ধু জুটেছিল, কিন্তু তাদের কেউই তার মনে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারেনি। ইসাবেলের সঙ্গ ফিলিপেরও ভালো লাগতো। ওদিলের মৃত্যুর পর ইসাবেলের পরিণত হৃদয়, রুচিশীল মন ধীরে ধীরে ফিলিপের কাছে তার সঙ্গ অপরিহার্য করে তুলল। তারপর একদিন ভাবে-ভঙ্গীতে ফিলিপ জানিয়ে দিল ইসাবেলেকেই সে বিয়ে করতে চায়।

বিয়ের পর ফিলিপের সামাজিক জীবনের সঙ্গে ইসাবেলে নিজেকে মিশিয়ে দিল। ফিলিপের মা গ্রামের স্কুল হাসপাতাল এসব নিয়ে মেতে থাকেন। ইসাবেলের সে-সব কাজেও আগ্রহ ছিল। ক্রমে ক্রমে ফিলিপের সঙ্গে সে অফিসেও যেতে শুরু করল। ফিলিপের পার্সোনা অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ সে করতো। সদাসর্বদাই ফিলিপে সঙ্গ তার কামনা। এমনকি, মৃত ওদিলকেও তার হিংসে আশঙ্কা—ওদিলের চিন্তায় ফিলিপ হয়তো ইসাবেলের সা পেয়েও তুষ্ট নয়। ইসাবেলে চায়, ফিলিপও তার অন্যা বন্ধুবান্ধবদের ভুলে গিয়ে কেবল তাকেই সঙ্গ দিক।

ফিলিপের পরিচিতের সংখ্যা অনেক। মেয়ে-পুরুষ ব দুই-ই আছে। পার্টি আছে, ডিনার আছে। তা সামাজিক জীবনে সকলের সঙ্গে মেলামেশায় দায়িত্ব আছে ফিলিপের বিবাহিত জীবনের ছোট-বড় করণীয় কাজ বাদে অফিসের কাজ বাদে আর-কিছুই ইসাবেলের পছন্দ নয় ইসাবেলে কয়েকবার তার অপছন্দের কথা অস্পষ্টভা জানিয়েছিল। ইসাবেলেকে হারাবার কোনো আশ ফিলিপের ছিল না, তাই ফিলিপ ইসাবেলের ইচ্ছে-অনিচ্ছে পছন্দ-অপছন্দ খুব সহজভাবে নিতে পারে। ইসাবেলে চিন্তায় স্পর্শ পেয়ে ফিলিপ নিজের মনকে বিশ্লেষণ করতে বসে। সে ভাবে একদা তার নিজের মানসিক আস্থাহীনত আশঙ্কা অবিশ্বাস আরেকজনের মনে স্থান নিয়েছে

তবু ফিলিপ নিজেকে মুক্ত করে আনতে পারে না—সামাজিক পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব সব-কিছুই সে সহজভাবে পেতে চায়।

মাদাম সোলের ভিলিয়ার অপরূপ সুন্দরী বলে মেয়ে-মহলে খ্যাত। ভিলিয়ারের সঙ্গে ফিলিপের পরিচয় হয় এক পার্টিতে। ভিলিয়ারের সঙ্গে ফিলিপের ঘনিষ্ঠতা স্বভাবতই ইসাবেলের পছন্দ নয়। এক দীর্ঘ ছুটির অবসরে ইসাবেলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিলিয়ার পরিবারের সঙ্গে ফিলিপ ও ইসাবেলে সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে যায়। সেখানে ইসাবেলের মন অস্থির হয়ে ওঠে—ফিলিপ ও সোলেরের ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। একটা ঈর্ষার আক্রোশে ইসাবেলের মন ভেঙে পড়তে চায়।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পর একদিন ইসাবেলে ফিলিপের অফিসে ফোন করতে গিয়ে ক্রস-কানেকশান পেয়ে যায়। একধারে ফিলিপ—অপরধারে মাদাম ভিলিয়ার। দুজনের হাসি ও কথাবার্তা ভেসে আসে। ইসাবেলে রিসিভার রেখে দেয়। ভিলিয়ারের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ইসাবেলে একদিন কথা-কাটাকাটি করে ফিলিপের সঙ্গে। কারখানায় বেড়াতে গিয়ে ইসাবেলে ম্যানেজারের কাছ থেকে আরো কিছু শুনলো। শুনলো, ফিলিপ আজকাল বেশ অমনোযোগী হয়ে পড়েছে—কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না—ক্লায়েন্ট-এর সঙ্গে দেখা করার সময় পায় না। ম্যানেজারের একার পক্ষে সব কাজ চালানো মুশকিল।

ইসাবেলের নানা আশঙ্কায় ঈর্ষায় বিয়ের দু'বছর কেটে যায়। ইসাবেলে অন্তঃসত্ত্বা। ইসাবেলের যখন শরীর খারাপ হয়, ওর মা এলেন দেখা করতে। মায়ের বুঝতে দেরি হয়নি, ফিলিপ তাঁর মেয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট নয়। কথায়-বার্তায় তাঁর মনে হল, এ ব্যাপারে ফিলিপের দায় খুব কম। তিনি মেয়ের মন বিশ্লেষণ করেছেন: No, it is because she analyses herself, she is always anxiously examining the barometer of love, as she puts it. .... Have you ever troubled much about the temperature of your marriage ?

ওদের ছেলের নাম হল এলেন। তারপর নানারকম ঘটনাচক্রে পড়ে মাদাম ভিলিয়ারের সঙ্গে ফিলিপের সাক্ষাৎকার কমে আসতে লাগলো। ইসাবেলের মনে খুশি উপচে পড়ে। ফিলিপ তখন পার্টি ডিনার আর বন্ধু-বান্ধবীর পরিবেশ থেকে অনেকটা সরে এসেছে। সারাদিনে বেশ কিছু সময় সে ইসাবেলের সঙ্গে কাটায়। ভিলিয়ার উপত্যকায় দুজনে বেড়াতে গেল। সেখানকার মনোরম পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইসাবেলের মনে বহুগুণ বর্ধিত হয়ে ধরা দিল। কিন্তু এত-সুখ বোধহয় কারুর সয়না। ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ ফিলিপের জ্বর হল। প্রথমদিকে অ্যাসপিরিন খেলেই শরীর ভালো হবে ব'লে ফিলিপের ধারণা হয়েছিল। কিন্তু সামান্য টেম্পারেচার ব্রঙ্কাইটিস ব'লে ধরা পড়লো। প্রথমদিকের উপেক্ষা অসুখ বাড়িয়ে দিয়েছে।

দিনরাত সেবা করেও, ইসাবেলে ফিলিপকে সারিয়ে তুলতে পারে না। অসুখ বেড়ে চলে। একদিন মাঝরাতে বিকারের ঘোরে ফিলিপ প্রলাপ বকতে থাকে। ফিলিপের মুখে মাদাম ভিলিয়ারের নাম। ইসাবেলেকে সে মাদাম ভিলিয়ার রূপেই দেখছে, ডাকছে, ঠোঁটের ওপর চুম্বন করতে আহ্বান জানাচ্ছে। সেদিন দুঃখমনেই ইসাবেলেকে মাদাম ভিলিয়ারের অভিনয় করে যেতে হল। মাদাম ভিলিয়ার রূপেই সে ফিলিপের ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিল।

পরের দিন মাঝরাতে সব শেষ। শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার আগে সে ইসাবেলের নাম মুখে এনেছিল: Isabelle, I am suffocating, I am going to die!

•

আঁদ্রে মোরোয়ার পুরনো এক উপন্যাসের নতুন ইংরিজী অনুবাদ* হয়েছে। ওপরের কাহিনীটি সেই অনুবাদের সংক্ষিপ্তসার। মোরোয়ার আসল নাম এমিলি হার্টসগ—জাতে তিনি ইহুদী। জীবনীকার হিসেবে বিখ্যাত হলেও, তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয় উপন্যাস লিখে। কয়েকটি গল্প-উপন্যাসের প্রকাশের পর তাঁর প্রথম জীবনী-গ্রন্থ বেরোয় শেলীর জীবন নিয়ে লেখা: *Ariel, the Life of Shelley*। এই বইটাই রাতারাতি মোরোয়াকে বিখ্যাত করে তোলে। সেই থেকে মোরোয়া জীবনী-লেখায় আত্মনিয়োগ করলেন। জীবনীকে চিত্তাকর্ষক উপন্যাস করে তোলায় মোরোয়ার জুড়ি নেই।

বর্তমানে মোরোয়ার বয়স চুয়াত্তর। এখনো তিনি সমান দক্ষতায় কলম চালিয়ে চলেছেন। উপন্যাস ও জীবনী দুই-ই লিখে চলেছেন। বর্তমান উপন্যাসটি আত্ম-জীবনীর ঢঙে লেখা। প্রেমের মধ্যে আশঙ্কা ও ঈর্ষা কত গভীর হতে পারে, এমনকি পাত্র-পাত্রীদের জীবনেও তার অশুভ প্রভাব স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অসহ্য করে তুলতে পারে—তার নিপুণ ছবি এই কাহিনীতে ফুটে উঠেছে।

---

* *The Climate of Love* : Andre Maurois : 1959

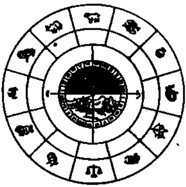

গ্রহ-বিচিত্রা

['বিশ্ব বিজ্ঞান' পত্রিকার
ফলিত-জ্যোতিষ বিভাগ হইতে গৃহীত]

জ্যোতীন্দ্রশর্মা

॥ অগ্রহায়ণ মাসের রাশিফল ॥

মেষ

মাসটি স্বাভাবিক চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক সচ্ছল থাকবে। স্ত্রীর সহিত সাধারণ কলহ সৃষ্টি সম্ভব। সন্তানের অবস্থা ভালো চলবে। কর্মফল স্বাভাবিক চলবে। ভ্রমণের যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—অশ্বিনী নক্ষত্রের—মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত দাম্পত্য অশান্তি, এবং স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা থাকবে। তারপর শুভ চলবে। ভরণীর—বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি, এবং শত্রু দ্বারা ক্ষতি সম্ভব। কৃত্তিকার—পারিবারিক অশান্তি থাকবে।

বৃষ

ভালো চলবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। আর্থিক অবস্থা ভালো চলবে। কর্মফল স্বাভাবিক চলবে। বিবাহযোগ্য-যোগ্যাদের বিবাহ-বিষয়ে শুভযোগ আছে। বিবাহে বাধা নাই। অর্থহানি হবে, কর্মের বাধা অপসরণ করবে।

নক্ষত্রফল—কৃত্তিকার—বন্ধু দ্বারা অশান্তি; স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি হবে। রোহিণীর—শুভ চলবে; বন্ধু দ্বারা উন্নতি, স্ত্রীর ভাগ্যোন্নতি, বিবাহযোগ্য-যোগ্যাদের বিবাহে বাধা থাকবে না। মৃগশিরার—শুভাশুভ মিশ্র চলবে।

মিথুন

ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার রোগভোগ থাকা সম্ভব। স্ত্রী স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। মানসিক শান্তি থাকবে না স্ত্রীলোক দ্বারা পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হবে। সন্তানে ভ্রমণযোগ আছে। কর্মস্থলে দুষ্টলোকের প্রভাব থাকবে কিন্তু ঐ প্রভাবে ক্ষতির যোগ নাই। আর্থিক অবস স্বাভাবিক চলবে। বিবাহযোগ্য-যোগ্যাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।

নক্ষত্রফল—মৃগশিরার—মাসের প্রথমভাগে সন্তা দ্বারা অশান্তি, বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে শেষভাগে সন্তানের শুভ, কর্মফল ভালো চলবে। আর্দ্রা —আর্থিক উন্নতি এবং ভ্রমণ। পুনর্বসুর—বন্ধু দ্বা ক্ষতি এবং কর্মফল শুভ চলবে।

কর্কট

মাসটি ভালো চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। অর্থহা হবে। কর্মোপলক্ষ্যে দেশভ্রমণ এবং কর্ম-পরিবর্তন সম্ভব গৃহাদি এবং ভূসম্পত্তি বিষয়ে শুভ সূচনা করে। অধ্যাপ সাহিত্যসেবী, বুদ্ধিজীবিগণের প্রতিভা-বিকাশে সম্মা লাভের যোগ আছে। সন্তানের উন্নতি হইবে। পিতা উন্নতির যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—পুনর্বসু-কর্কটের অর্থলাভ, কর্মসাফল্য। পুষ্যায়—শত্রুবৃদ্ধি হয়ে পরে হানি হবে। অশ্লেষায়—প্রতিবেশী দ্বারা ক্ষতি; কর্মস্থল শুভ চলবে।

সিংহ

পূর্বমাসের তুলনায় এই মাস ভালো চলবে। আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। অধীনস্থ ব্যক্তিগণ দমিত থাকবে। বন্ধু দ্বারা কর্মখ্যাতি বৃদ্ধি পাবে। মানসিক এবং পারিবারিক শান্তি থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে। কর্ম-পরিবর্তন হবার যোগ আছে (অর্থাৎ কর্মের বিভাগ পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে)।

নক্ষত্রফল—মঘায়—ভ্রাতা এবং প্রতিবেশীর সহিত কলহ, এবং মানসিক উদ্বেগ থাকবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক চলবে। পূর্বফল্গুনীর—অর্থহানি, এবং বন্ধুর সহিত বিরোধ। উত্তরফল্গুনীর—প্রতারক বা চোর দ্বারা অর্থহানি সম্ভব।

কন্যা

কন্যারাশির বিশেষ ভালো চলবে না। পারিবারিক অশান্তি, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থাকবে। দুষ্টা স্ত্রীলোকের প্রভাব এসে যশ কতকটা ম্লান করবার যোগ আছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক চলবে। কর্মস্থল স্বাভাবিক থাকবে। ভ্রাতার উন্নতির যোগ আছে। সন্তানদের অবস্থা মোটামুটি চলবে।

নক্ষত্রফল—উত্তরফল্গুনী-কন্যার আর্থিক অশান্তি। হস্তায়—নারীর দুষ্ট প্রভাব হতে অশান্তির সম্ভাবনা, এবং মানসিক উদ্বেগ থাকবে। চিত্রায়—ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে।

তুলা

ভালো চলবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। অর্থলাভের যোগ আছে। প্রতিবেশী এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণ দমিত থাকবে। সন্তান ও স্ত্রীর অবস্থা ভালো চলবে। নিজের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। বিবাহ-বিষয়ে কোনো গ্রহদোষ নাই। কর্মস্থল ভালো চলবে। সাধারণ ভ্রমণের যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—চিত্রা-তুলার ঝগড়া-বিবাদ থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক; অর্থব্যয় হবে; অন্যদিকে অর্থলাভও হবে। স্বাতীর—ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে। বিশাখায়—বিবাদের মধ্য হতে আর্থিক উন্নতি, ভ্রমণ এবং কর্মস্থলের সাধারণ পরিবর্তন দেখা যায়।

বৃশ্চিক

ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে। শত্রুবৃদ্ধি হবে। স্ত্রী এবং কন্যার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। অর্থহানির যোগ আছে। বুদ্ধির বিভ্রম সৃষ্টি হয়ে কাজের অসুবিধা সৃষ্টি করবে। মাসের ১৫ তারিখের পর কতকটা ভালো চলবে। কর্মস্থলে কতকটা উন্নতির যোগ ঐসময় আছে। পারিবারিক অবস্থা স্বাভাবিক চলবে। বিবাহ-বিষয়ে গ্রহদোষ নাই।

নক্ষত্রফল—বিশাখায়—একদিকে অর্থহানি, অন্যদিকে অর্থলাভ হবে। মাতার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। অনুরাধায়—ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে। জ্যেষ্ঠায়—অর্থকষ্ট, আত্মীয়-বিরোধ, বন্ধু দ্বারা কর্মোন্নতির যোগ আছে।

ধনু

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক উন্নতি সাধারণ হবে। কর্মস্থলে অশান্তি বৃদ্ধি পেয়ে পরে সাফল্যলাভ হবে। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির রোগভোগ ও অশান্তি সৃষ্টি হবে। বন্ধু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক জীবন বিশেষ ভালো চলবে না।

নক্ষত্রফল—মূলায়—কর্মস্থলে অশান্তি এবং মানসিক উদ্বেগ থাকবে। পূর্বাষাঢ়ায়—মানসিক দুঃখ, মাতার পীড়াভোগ থাকবে। উত্তরাষাঢ়ায়—অর্থলাভ ও কর্মে সাফল্যলাভ হবে।

মকর

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কর্মস্থলে বিভাগ-পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতির যোগ আছে। কর্মোপলক্ষ্যে ভ্রমণের যোগ দেখা যায়। পিতার উন্নতি সম্ভব। আর্থিক উন্নতি এবং অর্থলাভ হবে। পুত্রকন্যার বিবাহ-উৎসবের যোগ আছে। দুষ্টপ্রকৃতির স্ত্রীলোকের প্রভাব জীবনে আসবার যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—উত্তরাষাঢ়ায়—একদিকে কর্মস্থলে প্রতারণা, অন্যদিকে সাফল্যলাভ হবে। শ্রবণা এবং ধনিষ্ঠার শুভ ফল লাভ হবে।

কুম্ভ

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। প্রস্রাব সংক্রান্ত পীড়াভোগ হবার সম্ভাবনা আছে। আর্থিক উন্নতি হবে। ভ্রমণের

যোগ আছে। কর্মোন্নতির যোগ দেখা যায়। পিতার উন্নতি হবে। কর্মস্থলে খ্যাতি বৃদ্ধি হবে। নূতন কর্ম-সংগঠনের শুভ যোগ আছে।

ন ক্ষ ত্র ফ ল—ধনিষ্ঠায়—অর্থহানি যেমন হবে, তেমনি অর্থলাভও হবে। কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হবে। শতভিষায় এবং পূর্বভাদ্রপদের—প্রতারক কর্তৃক অর্থহানি, কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শুভ।

মীন

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। দাম্পত্য কলহ এবং স্ত্রীলোকের প্রভাব দ্বারা যশহানির যোগ দেখা যায়। বিবাহ-বিষয়ে বাধা সৃষ্টি হবে। কর্মস্থল স্বাভাবিক চলবে ভাগ্যবৃদ্ধির প্রভাব সৃষ্টি হবে, পরে শুভাশুভ কোনো ফল পা কমবে না। সন্তানের অবস্থা স্বাভাবিক চলবে।

ন-ক্ষ ত্র ফ ল—পূর্বভাদ্রপদের—অর্থহানি, স্ত্রীর সহি কলহ। উত্তরভাদ্রপদের—নিজের ভুল দ্বারা বিপথে চলা সম্ভাবনা; দুষ্টলোকের প্রভাব-বৃদ্ধি। রেবতীর—শু চলবে।

[মন্তব্য : রাশিফল সাধারণভাবে বর্ণিত হল, এবং ঠিক ফল প্রত্যে ব্যক্তির জন্মকালের গ্রহ-সংস্থানের এবং দশা-কালের উপর নির্ভর ক ভালো-মন্দ বিচার্য।]

কার্তিক মাস, ১৩৬৬ সন [অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫৯]

বাং তারিখ	ইং তারিখ	আরবী তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১	১৮	২৬	রবি	দ্বিতীয়া	ভরণী	নিষেধ	
২	১৯	২৭	সোম	তৃতীয়া	কৃত্তিকা	নিষেধ	
৩	২০	২৮	মঙ্গল	চতুর্থী	কৃত্তিকা	নিষেধ	দশরথব্রত
৪	২১	২৯	বুধ	চতুর্থী	রোহিণী	শুভ, দিবা ঘ. ৩।১৯ গতে নিষেধ	
৫	২২	৩০	বৃহস্পতি	পঞ্চমী	মৃগশিরা	শুভ, দিবা ঘ. ৮।৪৬ গতে নিষেধ	
৬	২৩	১	শুক্র	ষষ্ঠী	আর্দ্রা	নিষেধ	
৭	২৪	২	শনি	সপ্তমী	পুনর্বসু	নিষেধ	পুণ্যতয়া-স্নান
৮	২৫	৩	রবি	অষ্টমী	পুষ্যা	শুভ, রাত্রি ঘ. ৭।৪৮ গতে নিষেধ	
৯	২৬	৪	সোম	নবমী	অশ্লেষা	নিষেধ	
১০	২৭	৫	মঙ্গল	দশমী	মঘা	নিষেধ	
১১	২৮	৬	বুধ	একাদশী	পূর্বফল্গুনী	শুভ, রাত্রি ঘ. ৮।৫৫ গতে নিষেধ	একাদশীর উপবাস
১২	২৯	৭	বৃহস্পতি	দ্বাদশী	উত্তরফল্গুনী	নিষেধ	
১৩	৩০	৮	শুক্র	ত্রয়োদশী	হস্তা	নিষেধ	ভূতচতুর্দশী
১৪	৩১	৯	শনি	চতুর্দশী	চিত্রা	নিষেধ	শ্যামাপূজা, মহালক্ষ্মীপূ অমাবস্যার উপবাস নিশিপা
১৫	১	১০	রবি	প্রতিপদ	স্বাতী	শুভ, দিবা ঘ. ১।১ গতে নিষেধ	দ্যূত প্রতিপদ
১৬	২	১১	সোম	দ্বিতীয়া	বিশাখা	নিষেধ, রাত্রি ঘ. ৯।১ গতে মধ্যম	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অন্নপ্রাশ গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ

[পরপৃষ্ঠায় অবশিষ্টাংশ]

কার্তিক মাস, ১৩৬৬ সন [অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৫৯]

[পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ]

বাং তারিখ*	খ্রী: তারিখ	ভারতীয় তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১৭	৩	১২	মঙ্গল	তৃতীয়া	অনুরাধা	মধ্যম, সন্ধ্যা ঘ. ৫।৩০ গতে নিষেধ	অক্ষয়স্নান
১৮	৪	১৩	বুধ	চতুর্থী	মূলা	নিষেধ	
১৯	৫	১৪	বৃহস্পতি	পঞ্চমী	পূর্বাষাঢ়া	মধ্যম, দিবা ১১।২৫ গতে নিষেধ	বটুপঞ্চমী
২০	৬	১৫	শুক্র	ষষ্ঠী	উত্তরাষাঢ়া	নিষেধ, রাত্র ঘ. ১১।২৩ গতে শুভ	গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ
২১	৭	১৬	শনি	সপ্তমী	শ্রবণা	নিষেধ	গোষ্ঠাষ্টমী
২২	৮	১৭	রবি	অষ্টমী	ধনিষ্ঠা	নিষেধ	জগদ্ধাত্রীপূজা
২৩	৯	১৮	সোম	নবমী	শতভিষা	প্রাত ঘ. ৬।১৩ গতে মধ্যম	অন্নপ্রাশন
২৪	১০	১৯	মঙ্গল	দশমী	পূর্বভাদ্রপদ	নিষেধ, রাত্র ঘ. ১।১০ গতে শুভ	
৫	১১	২০	বুধ	একাদশী	উত্তরভাদ্রপদ	নিষেধ	উত্থান একাদশী
৬	১২	২১	বৃহস্পতি	দ্বাদশী	রেবতী	নিষেধ, দিবা ঘ. ৮।৫৭ গতে শুভ	হরির উত্থান, মহত্তরা-স্নান
৭	১৩	২২	শুক্র	ত্রয়োদশী	অশ্বিনী	শুভ	অন্নপ্রাশন, বৈকুণ্ঠচতুর্দশী
৮	১৪	২৩	শনি	চতুর্দশী	অশ্বিনী	নিষেধ	রাসযাত্রা, নিশিপালন
৯	১৫	২৪	রবি	পূর্ণিমা	ভরণী	নিষেধ, দিবা ৩।১২ গতে শুভ	পূর্ণিমার উপবাস, মহত্তরা-স্নান, পরেশনাথের মিছিল
	১৬	২৫	সোম	প্রতিপদ	কৃত্তিকা	নিষেধ	সংক্রান্তি। কার্তিকপূজা। ইতুপূজারম্ভ

---

* এই মাসে অত্র পঞ্জিকার তারিখের সহিত 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'র তারিখের তফাত আছে। আমাদের ১লা কার্তিক অন্যমতে ৩০শে আশ্বিন, আমাদের ২রা কার্তিক অন্যমতে ১লা কার্তিক—এইভাবে হইবে।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে এই বুঝায় যে, পঞ্জিকা আমাদের কেবলমাত্র ধর্মকর্মের নয়, সমগ্রজীবনের *Time Table* বা সময়-নির্দেশক পুস্তক। পঞ্জিকা-দের *Time Table*-এর আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান অঙ্ক ক'রে সাধারণের উপযোগী ক'রে তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করেন। ঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সাহায্য ছাড়া পঞ্জিকার গণনা সম্ভবপর হয় না। আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান [illegible] নির্ণয় ক'রে পঞ্জিকা গণনা, [illegible] বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি। সুতরাং আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে পঞ্জিকা-প্রণেতাদের সম্পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র আমাদের ধর্মকর্মের জন্যই যে পঞ্জিকার প্রয়োজন তা নয়, অকূলসমুদ্রে জাহাজ চালাবার জন্য নাবিকদিগের প্রধান অবলম্বন নৌ-পঞ্জিকা। ঝড়ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, জোয়ার-ভাটা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থার মোটামুটি পূর্বাভাস পঞ্জিকার তিথি-নক্ষত্র থেকে পাওয়া যায়। তাই আজ নাবিকগণ ও বৈমানিকগণ অধিকতর সতর্কভাবে কাজ করতে সক্ষম হন। ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যহ প্রভাতে মানুষের শুভাশুভের নির্ণয় পঞ্জিকাস্থিত গণনা হ'তেই পাওয়া যায়। কেবলমাত্র আমাদের ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে পঞ্জিকা আছে এবং সে-সব দেশের ধর্মকর্ম ও সামাজিক কার্য পঞ্জিকা অনুসারেই হয়। আর একটা প্রধান বিষয় এই যে, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত নাবিক-পঞ্জিকাসমূহ হ'তে গণিত তিথিমান একরূপ; আর এই ভারতবর্ষে প্রায় দশ-বিশ প্রকারের তিথি-সম্বলিত পঞ্জিকা আছে। ভারতে এই অবৈজ্ঞানিক হাস্যকর পরিস্থিতির [illegible]

নাট্যমহল

'হেডমাস্টার'-এর সাফল্যের পর 'অগ্রগামী' গোষ্ঠী নাকি তারাশঙ্করের জনপ্রিয় ছোটগল্প 'কান্না' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 'কান্না'র বিষয়বস্তুও এক অনবদ্য চিত্রগল্পের দাবি রাখে।

'অগ্রদূত' গোষ্ঠী সমরেশ বসুর 'কুহক' শেষ করেছেন। এ-ছবিতে উত্তমকুমার আবার প্রমাণ করবেন যে তিনি শক্তিমান নট। সেই সঙ্গে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গাপদ বসুর নামও উল্লেখযোগ্য।

'অগ্রদূত'-এর 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' কথাচিত্রে উত্তমকুমারের 'রাইচরণ' দেখবার জন্যে এখন থেকেই দর্শককুলের কৌতূহলের সীমা নেই। অসিতবরণ, দীপ্তি রায় ও নোতুন প্রভৃতি বহু শিল্পীই অভিনয় করেছেন এ-ছবিতে। প্রসিদ্ধ চিত্র-নাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছেন চিত্রনাট্য।

'রাজকুমারী চিত্রমন্দির'-এর 'মনের চোর' খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে। উত্তম ও তার এ-ছবির সম্পদ। পরিচালনা করছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

বিখ্যাত ভাটাবার-লেখক গৌরী শি রচিত 'এখনো দিন আসতে পারে'র স্যুটিং, শোনা যাচ্ছে, আগামী মাস থেকেই শুরু হবে। পরিচালনা করছেন 'সুন্দরম্' গোষ্ঠী।

'লা-আর্তে'-প্রযোজিত ইন্দো-ইতালীয়ান ছবি 'আকাশের রঙ' সুজিত দত্তগুপ্তের পরিচালনায় হবে শীঘ্রই ফ্লোরে যাচ্ছে। কাহিনী হচ্ছে: একজন ইতালীয়া মেয়ে ভারত-ভ্রমণে এসে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে ভারতবর্ষকে।

সুধীন দাশগুপ্ত এ-ছবির সুরকার নির্বাচিত হয়েছেন।

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত 'শুভবিবাহ' কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় এ-ছবির এক সম্পদ। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন— শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, সুপ্রিয়া চৌধুরী, শান্তি দা প্রভৃতি।

কোনো এক বিশিষ্ট প্রযোজক রমাপদ চৌধুরী 'লালবাঈ'কে চিত্রে রূপ দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে প্রচুর অর্থব্যয়ে জাঁকজমকের মাধ্যমে 'লালবা প্রস্তুত হবে। টেকনিকালারে নাকি তোলা হ ছবিটি।

সুধীর হাজরার কাহিনী অবলম্বনে—'কোনও একদিন' —পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে।

এক অভিনব কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে 'কোনও একদিন'—।

আর, একটি বেবী-ট্যাক্সি-ই নাকি এ-ছবির .এক উল্লেখযোগ্য শিল্পী!

রাজেন তরফদার পরিচালিত সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' এখন মুক্তির দিন গুনছে। জ্ঞানেশ মুখার্জীর 'গঙ্গা' ছবিতে অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের খুবই আনন্দ দেবে।

পরিচালক অপূর্ব মিত্র তুলছেন 'সাধক কমলাকান্ত'; গুরুদাস আছেন নাম-ভূমিকায়, দীপ্তি রায় তাঁর বিপরীত চরিত্রে অভিনয় করছেন।

'হাসপাতাল' চিত্রের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে স্বয়ং পরিচালক সুশীল মজুমদার

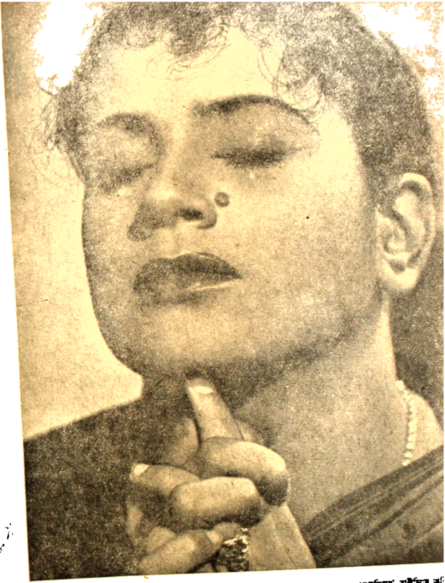

'শুভবিবাহ' বাণীচিত্রে সু

রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' কথাচিত্রে রাইচরণ চরিত্রে বিশিষ্ট রূপকার উত্তমকুমার

গৌতম পিকচার্সের 'অবাক পৃথিবী'র কাজ শেষ হয়ে গেছে। বিধায়ক-রচিত 'অবাক পৃথিবী' নাকি প্রতি মুহূর্তে দর্শকদের ভাবিয়ে তুলবার দাবি নিয়ে আসছে। পরিচালনা করেছেন—প্রসিদ্ধ ক্যামেরাম্যান বিভূতি চক্রবর্তী; অভিনয় করেছেন—উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার প্রমুখ শিল্পীরা।

●

কথায় কথায়

ঋতুচক্রের খেপা বাউল তার শরতের একতারাটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। বাঙালীর জাতীয় উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বাৎসরিক মহোৎসবের আর এক পালা চুকল শারদীয় সাহিত্যের পাতায় পাতায়। এরই সূত্র ধরে সাহিত্যের একটা নির্বিশেষ সালতামামি করা যাক।

কথায়-কথায় অনেক কথা আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তর-প্রত্যুত্তরের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলা সাহিত্য এগিয়ে চলেছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু কতখানি পথ আসলে এগিয়েছে, এইটেই হল গোড়ার প্রশ্ন। যে মোটরগাড়িটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কেবল এঞ্জিনের গর্জনকেই বাড়িয়ে চলে তার দাপট সম্বন্ধে আস্থা যতই থাকুক, ব্যর্থতা ওই গতিবিমুখতায়। তার চেয়ে অনেক বেশী কাজের লোক পাটীগণিতের সেই শামুকটা, যে পিছলপথে দু'হাত ওঠে, এক হাত নামে; আবার নামার বেগটা কমে গেলেই উঠতে শুরু করে। থেমে না-থাকার এই যে বাহাদুরি, এর মূল্য বড়ো কম নয়। বাংলা সাহিত্যের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যেও এই প্রাণশক্তিটুকু যে রয়েছে সেই হল আশার কথা।

এমন সময় একদিন ছিল যেদিন জীবনের গভীরতম বোধের রাজ্যে না গিয়ে এক গোষ্ঠীর লেখকরা ফ্রয়েডীয় তত্ত্বগুলিকে নিয়েই কথা-সাহিত্যের কারবার চালিয়েছিলেন। তাতে যৌনতত্ত্বের ব্যাখ্যায় যত দক্ষতাই থাকুক, সাহিত্যের রাজ্যে সৌন্দর্যের স্বচ্ছতা আসেনি। যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি অনেকখানি ধরা পড়েছে। সক্ষম, অক্ষম—অনেক লেখকই তাঁদের কলমকে অবিশ্রান্ত চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। হতাশার কারণ ঘটেছে অনেক সক্ষমের ক্ষেত্রে। শক্তিশালী কলম যদি সত্যকে অস্বীকার ক'রে অসত্যের দোকানপাট সাজিয়ে বসে, তবে তার চেয়ে বিড়ম্বনা আর নেই। সক্ষমদের অনেকেই জীবনের গভীরতম মর্মবেদনাকে উপলব্ধির জগতে ছাড়পত্র দেননি। তাই তাঁদের সাহিত্য অসম্পূর্ণ অসার্থক। আর অক্ষমদের তো সে-বালাইও নেই। জাতির জীবনে একের পর এক বিপর্যয়ের ইতিহাস থেকে এঁরা বেছে নিয়েছেন চোখা-চোখা বিকৃতমনের তীরগুলিকে। অনভিপ্রেত অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবার সময় নির্দেশকের চোখ যদি ঘৃণায় জ্বলে না ওঠে, বিক্ষোভে ফেটে না পড়ে তবে তা আরও বিপদ ডেকে আনে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মধ্যে যে শিল্পী গোপীলীলার বস্ত্রহরণ কাহিনীর রস আস্বাদন করেন তিনি অপরাধী। এর পেছনে আছে জাতীয় জীবনের এক শোচনীয় মনোবিকলনের অস্তিত্ব। তাই আজকের অনেক লেখকই পাঠক সৃষ্টি করতে পারেননি। অন্যদিকে বিকৃতরুচির পাঠকেরা পয়সা দিয়ে গড়ে নিয়েছে তাদের মনোমতো লেখক, যে লেখক পাঠকের রুচিবিকৃতির বিকট তালে তাল মিলিয়ে হাতের মিষ্টি যন্ত্রটাকে নিয়ে সঙ্গত করতে বসেছেন খেমটা-নাচের আসরে।

এঁরা আছেন এবং থাকবেন। তবুও হতাশ হবার দুর্যোগ এখনও আসেনি। বানের জল আর পচা পাতা মিলে যে মাটিকে একদিন বিষাক্ত ক'রে তোলে, জল সরে গেলে সেই মাটিতেই জন্ম নেয় নতুন অঙ্কুর। বাংলা সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন নষ্ট হয়নি। সক্ষমেরা যদি যথার্থ জীবনবোধকে পাশ কাটিয়েও যান, অক্ষমেরা যে যার সাধ্যমতো সে বোধের কথা বলে চলেছেন। জীবন-সমুদ্র-মন্থনে কেবল ঐরাবত আর অমৃতবাহিকা লক্ষ্মীই আবির্ভূতা হবেন এমন দাবি করা চলে না। গরল যা উঠবে তাও আমাদের সহ্য ক'রে নিতে হবে। তবে সেই গরলটুকুকে যেন অমৃত ব'লে পরিবেশন না করি।

—

অবশেষে সিংহলের প্রধানমন্ত্রীকেও আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হল। সারা এশিয়ার আবহাওয়া আজ যে ঘৃণা, অবিশ্বাস ও নির্লজ্জ ক্ষমতা-লোলুপতার বিষাক্ত ধোঁয়ায় অসহনীয় হয়ে উঠেছে, সিংহল তা থেকে মুক্ত বলেই এতদিন লোকে জানত। সলোমন বন্দরনায়কের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সে ভুল ভাঙল। বোঝা গেল, সারা এশিয়াই আজ একই বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সবচেয়ে বেশী দুঃখ লাগে এই কথা ভেবে যে, এক্ষেত্রে হত্যাকারী একজন বৌদ্ধভিক্ষু। যে-ধর্মের অনুপ্রেরণায় একদিন ওই ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করেছিল তার মূল কথা হল প্রেম ও অহিংসা, পশুহত্যারও অনুমতি যাতে নেই। অথচ একজন সুশিক্ষিত, সুমার্জিত ও

সিংহলের সকল মানুষের প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যক্তিকে হত্যা করতে তার হাত কাঁপল না। কতখানি অধোগতি হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব তা ভাবতেও ভয় হয়।

—

বৃটেনের সদ্য নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ ঘোষিত না হতেই শ্রমিকদলের নেতা অভিনন্দন পাঠালেন রক্ষণশীল দলের নেতার কাছে, দেশের অধিকাংশ লোকের সমর্থনে তাঁর দল আবার ক্ষমতালাভ করেছেন ব'লে। এমন সৌজন্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবোধ আজ এশিয়ার কোনো দেশের কোনো দলের কাছেই কি পাবার আশা করা যায়? এখানে পরাজিত পক্ষের মুখ থেকে প্রথম যে-কথাটি বার হয় তা হল, বিজয়ী পক্ষের বিরুদ্ধে অন্যায় কৌশলে জয়ী হওয়ার অভিযোগ। তারপর পাঁচ বছর ধ'রে পরাজিত পক্ষের একটা কাজ হল, বিজয়ী পক্ষকে অক্ষম, দুর্নীতিগ্রস্ত, এমনকি দেশের শত্রু ব'লে প্রচার করা।

—

মাস দুয়েক আগে পালাম বিমান-বন্দরে পাক-নায়ক জনাব আয়ুব খান ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর মধ্যে স্বল্প আলোচনার ফলে পাকিস্তান ও ভারতের যে মিত্রতার ধারা শুরু হয়েছিল, আজও তার গতি ব্যাহত হয়নি। শ্রীনেহেরু হয়ত শীঘ্রই করাচি বা পাকিস্তানের অন্য কোথাও যাবেন, পাক-নায়কের পরিদর্শনের পাল্টা দিতে। এইসব আলাপ-আলোচনার মধ্যে যদি কাশ্মীর, খালের জল, সীমান্ত ব্যাপার প্রভৃতি যাবতীয় সমস্যার সুসমাধান ঘটে যায় তবে সেটা এদেশ বা ওদেশের লোকেদের পক্ষে শুধু আনন্দের কারণ হবে না, একটা বিরাট সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও তাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তবুও এই শুভমুহূর্তে একটুখানি আশঙ্কা প্রকাশ করতেই হল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সখ্য-কামনায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে এমনই উদার হয়ে পড়েন যে, তার জন্যে শেষপর্যন্ত সারা ভারতকেই বিব্রত বোধ করতে হয়।

—

ভারতের প্রতি চীনের সাম্প্রতিক আচরণ যে সন্তোষজনক নয়, এ কথা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও স্বীকার করেছেন, যদিও তাঁরা চীনের এই নীতি-পরিবর্তনের জন্য ভারতকে দায়ী করেছেন। তাঁরা বলেছেন, দলাই লামাকে ভারত সরকার যদি আশ্রয় না দিতেন তাহলে এমন ঘটনা কিছুতেই ঘটত না। কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু এ কথা আজ কে না জানে যে রাজনৈতিক কারণে আশ্রয়হারা ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে পৃথিবীর সকল সভ্যরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বাধ্য। এই যুক্তিতেই চীনের বর্তমান সরকার আশ্রয় দিয়েছিলেন নেপালের বিদ্রোহী নেতা ডাঃ কে. আই. সিংকে, আর আজও আশ্রয় দিয়েছেন সংযুক্ত-আরব-প্রজাতন্ত্রে নির্বাসিত কমিউনিস্ট নেতা খালেদ বাক্‌দাশকে। এটা যদি চীনের পক্ষে অন্যায় না হয়ে থাকে তবে ভারতের পক্ষেই বা একজন মহামান্য নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া কেমন ক'রে অন্যায় কাজ হল?

ভারত তো তবু তাঁকে শুধু আশ্রয়ই দিয়েছে, তাঁর কোনো স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মর্যাদা স্বীকার করেনি। দলাই লামার উপস্থিতিকালেই প্রকাশ্যে ভারত সরকার জানিয়ে দিয়েছেন, তিব্বতের স্বাধীন সত্তা তাঁরা স্বীকার করেন না। অপরপক্ষে চীন সরকার কী করেছেন? তাঁরা দিনের পর দিন ডাঃ কে. আই. সিংকে পিকিং বেতারকেন্দ্র থেকে বক্তৃতা দিতে দিয়ে নেপালের জনসাধারণকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার সুযোগ দিয়েছেন। এই সেদিনও চীনের দশম প্রজাতন্ত্র-দিবসের উৎসবে খালেদ বাক্‌দাশ সমবেত জনসাধারণের সম্মুখে সংযুক্ত-আরব-প্রজাতন্ত্রকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করেছেন। চীনের সঙ্গে এমন মনোমালিন্যের দিনেও ভারত এ-কথা কল্পনাও করতে পারেনা যে, ভারতের প্রজাতন্ত্র-দিবসের উৎসবে লালকেল্লা থেকে ভাষণ দিয়ে দলাই লামা চীন সরকারকে আক্রমণ করছেন।

—

দুর্গতিনাশিনী মা তাঁর সন্তানদের দুর্গতির মধ্যে এলেন; চলে গেলেন।

ক্ষুধায় যাদের অন্ন নেই, পরিধানে যাদের বস্ত্র নেই, মাথা-গোঁজার আশ্রয়টুকু যাদের জলে ভেসে গেছে, তৃষ্ণার জলও সময় সময় যাদের দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে—তাদের দুর্ভাগ্যের প্রতি সমবেদনা জানাতেও সংকোচ বোধ হয়। বলতে পারেন, এতই যদি দুঃখ এদেশের তবে দুর্গোৎসবে এমন আলোর ঝলমলানি কেমন করে সম্ভব হয়?

একটা কথা আছে। আপনার আমার যা দুঃখ তা আমাদেরই থাক, তাকে আর সর্বজনীন ক'রে লাভ কি? সারা বছর ধরে এই ক'টা দিনের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকে তাঁতী, দরজী, কুমোর, দোকানদার, ঢাকী, মাইকওয়ালা ও আরও কতজন। তাদের আর বঞ্চিত ক'রে লাভ কি? দুঃখ তো তাতে বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং যা হচ্ছে হোক, তাতে যুক্ত হয়ে শুধু-শুধু আর নিজেদের দুঃখ বাড়াবেন না। তবে যদি শুনতে পান পাড়ার পূজা-কমিটি কিছু টাকা বাঁচিয়ে পাঠিয়েছে আর্ত-ত্রাণে, অবশ্য প্রাণভরে শুভকামনা করবেন সেই কমিটির।

●

সম্পাদক—চঞ্চল ভট্টাচার্য
জে. পি. দস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা • হইতে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত

বসুধারা

বাঙলার প্রাণ-প্রবাহ

সম্পাদক
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রন্থনায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
অজিত গুপ্ত

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ দ্বিতীয় সংখ্যা

'নাভানা'র বই

সন্তোষকুমার ঘোষের নতুন বই

চিররূপা

'চিররূপা'র গল্পগুলিতে রূপকে ছাড়িয়েও শিল্পীমানসের যে-জিজ্ঞাসা সরবে উচ্চারিত সে-জিজ্ঞাসা প্রেমের জিজ্ঞাসা। যে-মানুষটি আজীবন একটি না-পাওয়া মেয়ের স্মৃতিকে আঁকড়ে রইলো, জীবনের গোধূলিতে তার কাছে সে-মেয়েটির মূল্য কী। অতসী ঘরে নেই জেনেও নয়নমোহন আর মল্লিকার কাছে সে-ঘর কোনোদিনই নিরালা হয় না কেন? 'চিররূপা'র আটটি গল্পে আছে এমনি বহু বিচিত্র প্রেমের দিগ্দর্শন। আর আছে উপন্যাস-প্রায় বড়োগল্প 'জীবন-কাঠি'র মণিকা, প্রীতি ও রতীনকে ঘিরে নিষ্ঠুর প্রেমের এক জটিল আবর্ত, যে-আবর্তের প্রতিটি রেখাবলয় সন্তোষকুমারের শিল্পসত্তার স্পর্শ পেয়ে অনিন্দ্য হ'য়ে উঠেছে। দাম : তিন টাকা।

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

ফরিয়াদ

'ফরিয়াদ' উপন্যাসের ব্যারিস্টার নিমাই চ্যাটার্জী ধর্মাধিকরণের দরবারে এক মর্মান্তিক নালিশ নিয়ে উপস্থিত: তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী, তাঁর সন্তানের জননী এনাক্ষী শয়তান সিভাংশু মিত্রের শিকার হ'য়ে পালিয়ে গেছে। মাতৃমূর্তি দেশবিদেশের নাইটক্লাবে ভূমিকা নিয়েছে মোহিনী নৃত্যশিল্পীর। সুন্দরী এনাক্ষী আর দুঃখিনী প্রমীলাদের পণ্য বানিয়ে সিভাংশুর লেনদেন চলছে পৃথিবীর বন্দরে-বন্দরে। টাকা চাই। অঢেল টাকা ছাড়া ধমনীতে রক্ত আসে না, মানুষের নাড়ি শক্ত হয় না। টাকার জাদুতেই গারদের মজবুত গরাদে আলগা হ'য়ে যায়, আসামী সিভাংশুরা পালিয়ে গিয়ে আরও প্রবল প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠে। এই টাকাই আজকের পৃথিবীতে পয়লা আসামী। দাম : চার টাকা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র নতুন বই

এক অঙ্গে এত রূপ

অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে শুধু একটিমাত্র বিশেষণ, তিনি চিরন্তন নতুন। নতুন অচিন্ত্যকুমারের নতুনতর রচনায় পাওয়া যাবে তাই নতুনতর স্বাদ। সাতটি গল্পে সাতটি প্রেমের রঙে তৈরি একটি ইন্দ্রধনুর আকাশ। এক আকাশে এত রঙ। এক প্রেমে এত সুখ। এক সুখে এত কান্না। রূপ মরে যৌবন মরে কাম মরে প্রেম মরে কিন্তু কান্না মরে না। দাম : তিন টাকা।

প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস

সমুদ্র-হৃদয়

'সমুদ্র-হৃদয়' প্রতিভা বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস। দুটি বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের আগ্নেয়গিরি থেকে এই অপ্রত্যাশিত কাহিনীর জন্ম। নবাব সুলতান আমেদের ভালো লাগার আলো কি ক'রে ভালোবাসার আগুনে আহুতি হ'লো আর নবাবের সবুজ-মহলে বন্দিনী তেজস্বিনী সুলেখা তালুকদারের চিরসঞ্চিত অন্ধ আক্রোশ অবশেষে কোন্ অতলান্ত মমতায় ব্যাকুল উদ্বেল, 'সমুদ্র-হৃদয়'-এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিতে তা সজল বিধুর রেখায় আঁকা পড়েছে।…আধুনিক প্রেমের পরিভাষায় প্রতিভা বসুর 'মনের ময়ূর' 'তিন তরঙ্গ' 'মেঘের পরে মেঘ' ইত্যাদি গ্রন্থের সরস কাহিনীগুলিতে নারী-হৃদয়ের যে কোমল নির্ঝর রূপায়িত হয়েছে 'সমুদ্র-হৃদয়' উপন্যাসে তা গভীরতর ব্যঞ্জনায় সমুজ্জ্বল। দাম : চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যের গর্ব

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

নিজেকেই যা নীরবে প্রচ্ছন্ন রাখে সেই সুদুর্লভ নৈপুণ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার। বাংলা ছোটোগল্প তাঁর লেখনীর জাদুতে জীবনের রহস্য, বিস্ময়, বৈচিত্র্য ও গভীরতার অনাস্বাদিতপূর্ব রসলোকে উত্তীর্ণ। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উৎকৃষ্ট গল্পসমূহ এই সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। প্রবনগৌরবে অতুলনীয় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম : পাঁচ টাকা।

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

বসুধারা

তৃতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় খণ্ড • দ্বিতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

★ সূচীপত্র ★

ইন্দিরা দেবী । উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব । । ১৬৩
প্রভাতী মুখোপাধ্যায় । জনান্তিকে । । ১৬৬
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় । গাজিপুর : পদ্মাতীর : রবীন্দ্রনাথ । । ১৬৯
তুলসীদাস সিংহ । পল্লীর যাত্রযাত্রা : অগ্রহায়ণ । । ১৭৭
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । বিরেহী । । ১৮১
সালভাতোর কোয়াসিমোদো — অনুবাদ : অশোক মুখোপাধ্যায় ।
প্রাচীন শীত । কবিতা ।
সালভাতোর কোয়াসিমোদো — অনুবাদ : মৃত্যুঞ্জয় মাইতি ।
এখনি সন্ধ্যা আসবে । কবিতা ।
রণজিৎ দাশগুপ্ত । একান্তে । কবিতা ।

ঘোষণা ! ঘোষণা !! ঘোষণা !!!

……………………জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান কিং এণ্ড কোম্পানীর
আর একটি মূল্যবান অবদান……………………

“আর্নিকা হেয়ার অয়েল”

(উৎকৃষ্ট ভেষজ কেশ তৈল)

চুলওঠা, অকালপক্কতা এবং যে কোন শিরঃপীড়ায় আশু ফলপ্রদ। সুশ্রী ও সতেজ কেশশ্রীর জন্য নিয়মিত ব্যবহার করুন। সুগন্ধীযুক্ত ৪ আউন্স শিশিতে পাওয়া যাইতেছে। মূল্য ৩৲ টাকা।

কিং এণ্ড কোং
(স্থাপিত ১৮৯৪)

শাখা
১৫৪, রসা রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন : ৪৮-১৩৬৬ ,

: শাখা :
১০/১এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৪-২০০১

শাখা :
১২, ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন : ৪৪-৫৮৬৩

• যে কোন রোগে চিন্তাগ্রস্ত হইলে আমাদের ব্যবস্থাপক চিকিৎসকগণের সুপরামর্শ গ্রহণ করুন। ডাকযোগেও চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে।

বিশ্বেশ্বর নন্দী । আকাশগঙ্গা । উপন্যাস । । ১৯৯
সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । লটারির ঘুগ । । ২৩৮
ক. কৃ. ব. । পাতাল-প্রবেশ । পাগ্‌লা-গারদী কবিতা । । ২৪১
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য । চেনাশোনার বাইরে । । ২৪৬
রামপদ মুখোপাধ্যায় । সংশয় । । ২৫৫
পুরাতনী ['দিগ্দর্শন' হইতে উদ্ধৃতি] । । ২৬১
বেকান জোয়াইগ । অদৃশ্য শিল্প । অনুবাদ । । ২৬৩
শরৎকুমার মিত্র । পূর্বস্মৃতি । । ২৭২
অগ্নিমিত্র । জটিরামের কড়চা । । ২৭৯
সূত্রধার । অথ নট-ঘটিত । । ২৮৩
হিরণ্ময়ী বসু । দুর্লভ দেবতা । । ২৮৯
কৃত্তিবাস । গ্রন্থ-বৃত্তান্ত । । ২৯৩
জীবশর্মা । গ্রহ-বিচিত্রা । । ২৯৭
নাটমহল । মঞ্চলোক ও চিত্রলোক । । ৩০১
কথায় কথায় । । ৩০৫

প্রকাশিত হচ্ছে

'চিত্রগুপ্ত'র

জীবন বিচিত্রা

বাংলা-সাহিত্যের দরবারে এক অভিনব সংযোজন। কলকাতার মহান ধর্মাধিকরণের দ্বারা আদালতের একাধিক আসামীর প্রকাশ্য বিচারের রোমাঞ্চকর মর্মস্পর্শী কাহিনী। মানুষের কাছে সমাজের কাছে রাষ্ট্রের কাছে ওরা অপরাধী। প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়েছে ওদের শুভবুদ্ধি। ক্ষণিকের উন্মাদনায় মানবিকতার কাছে পাশবিকতা জয়ী হয়েছে। বিচারের কষ্টিপাথরে অপরাধ যাচাই হবার পর ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে ওদের। হয় কারাবাস। নয় দ্বীপান্তর। নতুবা ফাঁসি। ওদের কান্না আজও বুঝি প্রতিধ্বনিত হয় আদালত-গৃহের দেওয়ালে দেওয়ালে!

একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানব-দরদী লেখক সহানুভূতি-রঞ্জিত লেখনী দিয়ে রচনা করেছেন এইসব অপরাধীদের জীবনের আশা-নিরাশার কথা ও কাহিনী।

বসুধারা প্রকাশনী। ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

কথাসাহিত্য ও আলোচনা
[illegible]
দু'খানি [illegible] গ্রন্থ
West to day 7'00
আজকের পশ্চিম ৪'৫০
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
শরৎচন্দ্র—দেশ ও সমাজ ২'০০
নীলরতন সেনের
বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ ৩'৫০
[illegible]
মঞ্জরী (কবিতা) ২'০০

নূতন নূতন উপন্যাস
কনকপথ ২'৭৫
সুধীন সরকার
কালোপাখি (গল্প) ২'০০
জীবানন্দ ভট্টাচার্য
মণিমালা ২'৫০
গীতা মজুমদার
তুমি শুধু ছবি (গল্প) ৩'৫০
অন্নপূর্ণা গোস্বামী
কন্যাপীঠ ৩'৫০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে নূতন যোজন
কবি তরু দত্ত ২'৫
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলা ভাষায় কবি জীবনীর একমাত্র আক
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ১০'০
[illegible]
আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য
অনুবাদ

এ-১৩২, ১৩৩
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলিকাতা—বারো
ফোন : ৩৪-২৩৮৬

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬

CA
UNIVERSITY
CENTRAL
LIBRARY

বসুধারা

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

ইন্দিরা দেবী

বছর কয়েক আগের কথা। ফুটপাথে একরাশি বইএর ধ্যে একদিন আবিষ্কার করলাম লাল-মলাট-দেওয়া ইংরাজী কখানা বই—লিখেছেন অণিমানন্দ, ভূমিকার লেখক ন্ট জেভিয়ার্সএর জেসুইট অধ্যাপক Father Turmes; ইখানার নাম *The Blade Life and Work of Brahmabandhav Upadhyaya*।

এর আগে ব্রহ্মবান্ধবের নামোল্লেখ দেখেছি—তাঁর সম্পর্কে চার অধ্যায়'-এর ভূমিকায় এবং রবীন্দ্রনাথের আলোচনা পড়েছি, কিন্তু তাঁর গোটা জীবনী নিয়ে বইএর আকারে কানো আলোচনার উপর চোখ পড়েনি ইতিপূর্বে।

ভূমিকায় পাদরী Turmes লিখেছেন, ব্রহ্মবান্ধবের জীবনী নিয়ে ইতিপূর্বে যে দু'খানা বই লেখা হয়েছিল তা শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, অপ্রাপ্যও বটে। জার্মান ভাষায় তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ পাঠক-সমাজে স্বভাবতঃই তার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত। বাংলায় এমনি এক সুসন্তানের জীবনী বাংলাভাষায় আজ পর্যন্ত লেখা হলোনা—এটি বাংলাভাষা ও বাঙালী জাতির পক্ষে চরম দুর্ভাগ্য। শুধু জীবনী-লেখা নয়, স্মৃতিসভ আহ্বান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার মতো সাধার কর্তব্যপালন সম্পর্কেও আমরা উদাসীন। আমাদের আত্ম বিস্মৃতির বহুতর দৃষ্টান্তের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক।

বিপিনচন্দ্র পাল গভীর দুঃখে বলেছিলেন—

"আমাদের বর্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতকট পরিমাণে যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে

পাইয়াছি, দেশের লোক যেন ক্রমশঃ সে-কথা ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্ত কত আয়োজন হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতিসভার আয়োজন হয় না কেন ?"

বিপিনচন্দ্রের মুখ থেকে এই কথাগুলি উচ্চারিত হওয়ার পর বহুবৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে তবু আমরা এ অভিযোগের কলঙ্ক মোচনের কোনো চেষ্টাই করিনি। বৈদেশিকতার অত্যুগ্র মোহে আমরা অশোকলিপির পাঠোদ্ধারকারী প্রিন্সেপ সাহেবের নামকে পর্যন্ত রাজপথ চিহ্নিত করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছি, তবু উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই আমরা করিনি।

হুগলি জেলার খন্যান গ্রামের এক মধ্যবিত্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণপরিবারে আটানব্বই বছর আগে যে মহাজীবনের অভ্যুদয় হয়েছিল—তা একদিন রাজনীতির ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিল বিরাট বনস্পতি রূপে। ভবানীচরণ থেকে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবে পরিণতির পিছনে রয়েছে একটা বিদ্রোহোন্মুখ, সদা-সংগ্রামী, সত্যসন্ধানী, কর্মচঞ্চল মনের অভিব্যক্তির বিচিত্র ইতিহাস। বাংলার স্নিগ্ধ শান্ত নিস্তরঙ্গ পল্লীর বুকে অভাবনীয়রূপে সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল এক অসাধারণ অদমনীয় ক্ষাত্রবীর্য—ষোলোবছর বয়সেই তরুণ ভবানীচরণ দেখেছিলেন ক্ষাত্রশক্তির সাহায্যে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের স্বপ্ন। দুরন্ত প্রাণের আবেগ নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন জুলু (Zulu)-যুদ্ধে সৈনিক-তালিকাভুক্ত হবার আশা নিয়ে। তাঁর সে-আশা সফল না হলেও, তিনি হতোদ্যম হননি। পরের বছর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনজন সমবয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে ভবানীচরণ যাত্রা করলেন গোয়ালিয়র অভিমুখে। দেশীয় রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে সামরিক বিদ্যায় শিক্ষালাভ তাঁর উদ্দেশ্য। বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বাংলার এই চার তরুণ পৌঁছলেন গোয়ালিয়রে। কিন্তু সামরিক বাহিনীতে যোগদানের অনুমতি তাঁরা পেলেন না।

বাংলাদেশে ফিরে এসে ভবানীচরণ পরিচিত হলেন কেশবচন্দ্রের সঙ্গে। কেশবচন্দ্রের অগ্নিগর্ভ ব্যক্তিত্ব, বলিষ্ঠ চিন্তাধারা, সাহসদৃপ্ত নেতৃত্ব আকৃষ্ট করলো সত্যানুসন্ধিৎসু ভবানীচরণকে। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষান্তরিত হলেন। শুধু পরিগৃহীত ধর্মপ্রচার করেই সন্তুষ্ট থাকেননি ভবানীচরণ, সমাজসেবার ক্ষেত্রেও তিনি আত্মনিয়োগ করলেন অক্লান্ত আগ্রহে, অপরিসীম নিষ্ঠায়। তাঁর কর্মক্ষেত্র ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে চললো—বাংলা থেকে হায়দ্রাবাদে, করাচি থেকে বোম্বাই—কিন্তু বহুবাঞ্ছিত ধৈর্য এলোনা তাঁর অশান্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তে। নিত্য নতুন 'আবিষ্কৃতির অভিযান চললো তাঁর মনে-মনে। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সত্যসন্ধানী দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠলো ভগবান যীশুর ক্ষমাসুন্দর করুণাঘন মূর্তি। দীক্ষান্তর গ্রহণ করে তিনি হলেন প্রোটেস্টান্ট-পন্থী খ্রীষ্টান ; কিন্তু এতেও তাঁর অন্তরের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হলোনা। কয়েকমাস অতিক্রান্ত হতে-না-হতেই তিনি যোগদান করলেন ক্যাথলিক সঙ্ঘে। পরিচিত হলেন রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীরূপে, ভগবানের উপাসনা আর মানুষের সেবায় উৎসর্গ করলেন দেহমনের সকল শক্তিসামর্থ্য। .তবু 'ভরিল না চিত্ত'। ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ, পিতৃপুরুষের সংস্কার তাঁর মুমূর্ষু চিত্তে ঘটালো নূতন আলোকপাত। পরিচয় ঘটলো তাঁর স্বামীজির সঙ্গে। ইতিপূর্বে কুস্তির আখড়ায় নরেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ এসেছিল তাঁর জীবনে। এবার দেশহিতব্রতপ্রাণ, অমিতবীর্যের অধিকারী, মহাশক্তির আধার সন্ন্যাসীর সংস্পর্শ লাভ করে নূতন পথের ইঙ্গিত পেলেন ভবানীচরণ। বেদান্তের আলোকোজ্জ্বল পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প জাগলো তাঁর মনে। খ্রীষ্টের জীবনাদর্শ আর বেদান্তের শিক্ষা এ-দুয়ের সমন্বয় সাধন করে জীবনকে নতুন পথে চালাবার দুশ্চর সাধনায় আত্মনিমজ্জিত হলেন ভবানীচরণ। বেদান্ত-প্রচারিত সন্ন্যাসের আদর্শ গ্রহণ করে তিনি ধারণ করলেন গৈরিকবাস। ব্রহ্মবন্ধু উপাধ্যায় নামে পরিচিত হলেন ভবানীচরণ। পরে ব্রহ্মবন্ধু হলেন ব্রহ্মবান্ধব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন "রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।" শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনার মধ্যেই ব্রহ্মবান্ধবের কর্মোদ্যম্ নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তাঁর জীবনে যে সত্যোপলব্ধি ঘটেছিল, সেই সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন জীবন থেকে জীবনান্তরে। তাই বহু আয়াস আর অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি গড়ে তুললেন 'সারস্বত আয়তন' নামে বিদ্যামন্দির। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংস্পর্শ লাভ করে তাঁর শিক্ষাপ্রণালী এবং সংগঠনশক্তির অসাধারণত্ব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। পরে ১৯০১ সালে কবিগুরু যখন শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' স্থাপন করেন তখন তিনি আহ্বান জানালেন শিক্ষাব্রতী উপাধ্যায়কে। ব্রহ্মবান্ধব

প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"এই সময়েই আমি বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তখন আমার সহায় ছিলেন   তিনি তখন একদিকে বেদান্ত, অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন। কোনও কালেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা আমার না থাকাতে উপাধ্যায়ের সহায়তা আমার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। ··· কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করিতে করিতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যেরকম দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করিতেন আজও তা মনে করিয়া বিস্মিত হই।"

শান্তিনিকেতনে কর্মক্ষেত্র বেছে নেবার একবছরের মধ্যেই এলো ব্রহ্মবান্ধবের জীবনে পরিবর্তনের আরও একটি সম্ভাবনাময় অধ্যায়। বোলপুর থেকে কলিকাতা আসার পথে তিনি স্বামীজির মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেলেন। বেলুড়মঠে যখন তিনি পৌঁছলেন তখনও স্বামীজির চিতাগ্নি নেভেনি। সেই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীর চিতাগ্নি-শিখার প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ব্রহ্মবান্ধব। শোক আর সঙ্কল্পের মূর্ত প্রতীক গৈরিকধারী এই সন্ন্যাসীর মনে, শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হলো আপাতঃ বিলীয়মান অগ্নিগর্ভ থেকে একটি জ্যোতিষ্মান স্ফুলিঙ্গ—নূতন করে ব্রহ্মবান্ধব লাভ করলেন আত্মপরিচয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে জেগে উঠলো অননুভূতপূর্ব এক সত্তা, জ্ঞানমার্গের পথিক এবার অবতীর্ণ হলেন কর্মযোগীর ভূমিকায়।

তারপর থেকে বিচিত্র পথে উৎসারিত হতে লাগলো তাঁর কর্মধারা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী দেখা দিলেন ফিরিঙ্গী-দলের দুর্জয় শত্রু নিয়ে—রাজনৈতিক নেতারূপে। অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে হলো তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। [illegible] মেহমগ্ন হয়ে তিনি হলেন দেশসেবায় নিবেদিত-প্রাণ। ঋষিমন্ত্রের সাধক ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক রূপে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালীর কানে শোনালেন মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী। ভারতের রাজনীতি সেদিন আবেদন-নিবেদনের দুর্বল ব্যর্থ প্রয়াস পরিহার করে বেছে নিল আপোষহীন বলিষ্ঠ সংগ্রামের পথ। যে বিভীষিকা পন্থার আদর্শ সেদিন আভাসে ইঙ্গিতে বাংলার আকাশে দেখা দিয়েছিল—তার প্রধানতম বাহন ছিল উপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'। অগ্নিযুগের আবির্ভাব সেদিন যাদের ত্যাগ তিতিক্ষা আশ্রয় করে সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের অন্যতম পুরোধা ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। রোমান ক্যাথলিক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এই রূপান্তর আধুনিক ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

ইংরেজের সিডিশন আইনের সুদূরপ্রসারী
স্বাদেশিকতার এই অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গকে নির্বা
পন্থা অবলম্বন করেও সফলকাম হলো না।
কিংসফোর্ডের কক্ষে তিনি সদর্পে ঘোষণা
"I do not want to take any part i
because I do not believe that in carry
humble share of the God-appointed
Swaraj, I am in any way account
alien people who happen to rule o
whose interest is and must necessarily
way of our true national developmen
রাজনীতি তিনি অভিন্ন করেই দেখেছিলেন।
শৃঙ্খল-মোচনই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

রাজাদেশে বন্দী করে ভগ্নস্বাস্থ্য উপা
যাওয়া হলো ক্যাম্বেল হাসপাতালে—চ
প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু ইংরেজ পুলিশ
ভেদ করে উপাধ্যায়ের চিরবিদ্রোহী আত্মা
হলো ১৯০৭ সালের ২৭শে অক্টোবর। সংগ্র
বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি করলেন মহাযাত্রা।

ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন বজ্রগর্ভ, দ্বিধাকৃত বি
সাম্প্রতিক বাংলার ইতিহাসে আরো তি
কেন্দ্র করে এমনি বিদ্যুৎশিখা প্রজ্বলিত হয়ে
অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র। আবর্তের মূর্ত প্র
এঁদেরই স্বগোত্র।

জনান্তিকে

প্রভাতী মুখোপাধ্যায়

ছয়বৎসর কাল ইংলণ্ড ও জার্মানিতে বাস করার সময়ও ইওরোপের প্রায় সব দেশে ভ্রমণকালে নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। তার মধ্যে একদিকে রয়েছে গুরুগম্ভীর সব প্রশ্ন ও মন্তব্য: বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতনের কারণ, কালিদাসের অপূর্ব সৃষ্টি 'শকুন্তলা', সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, নেহরুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রশংসা, আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্যমূলক জাতি-বিভাগ, ব্রাহ্মণদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা, ইত্যাদি; অথবা ভারতীয় নারীদের দেহসজ্জা, বিশেষ ক'রে শাড়ীর সৌষ্ঠব ও সাজ-পোশাক হিসাবে উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য। এসব প্রশ্ন প্রায় সব ভারতীয়কেই করা হয় এবং এর বিবরণও আমরা নিয়তই পড়ি বিদেশের জন্য লেখা স্বদেশীয় কাগজে অথবা দেশের জন্য লেখা বিদেশী পত্র ও পত্রিকায়। এসবই হ'ল আমাদের স্টার্লিং এবং ডলার উপার্জনের জন্য 'important articles of export'। কিন্তু এ ছাড়াও আরও কিছু মন্তব্য শুনতে হয় এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়, যেগুলো লেখায় কষ্ট স্বীকারও কেউ করতে চান না; অথচ এ প্রশ্নগুলোর ভিতর দিয়েই সে-সব দেশের সাধারণ মানুষকে জানা যায় এবং এর অনেকগুলি অত্যন্ত কৌতূহলজনকও বটে। যেমন, ইওরোপের অনেক শিশুই ভারতীয় মেয়েদের দেখলে 'চাইনী' ব'লে ভাবে; তাদের গল্পের বইতে চাইনীদের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে ভারতীয় মেয়েদের খানিকটা সাদৃশ্য আছে, বিশেষ ক'রে চুল এবং চোখে। আমাকেও এ ধরনের অনেক মন্তব্য ও প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে, যার অনেকগুলিই আজ অবশ্য আর মনে নেই; কিন্তু কতগুলি প্রশ্ন, কেন জানি না, এখনও ভুলিনি। তারই কিছু কিছু পাঠকদের অবগতির জন্য লিখছি। এর দু'একটি ছাড়া বাকী সবগুলিই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

বার্লিনে একটি দোকান ছিল, যেখান থেকে আমরা ফার কিনতাম অথবা তৈরি করাতাম। দোকানী বিল-বইতে আমাদের নাম ধাম কী লিখতো জানি না, কিন্তু কোনদিনই আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। একদিন একজন ভারতীয় বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছি তার দোকানে, তাঁর ওভার-কোটের ফার-লাইনিং করাবেন ব'লে। সেদিনও দোকানদার আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা না করেই যথারীতি বইতে খস্ খস্ ক'রে কী লিখলো। আমি সেদিন আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা, আপনি তো কোনদিনই আমাদের নাম অথবা ঠিকানা কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না, অথচ আপনার বইতে প্রত্যেকবারই কী লেখেন বলুন তো?"

সে তার বইটি দেখালো—

নাম—*Tagore*
ঠিকানা—*India*

•

সব দেশেই বোধহয় কৌতূহল দমন করতে না পারা এবং তার অভিব্যক্তি হচ্ছে শিশু এবং বৃদ্ধ মনের পরিচায়ক। জার্মানির এক শহরে একবার এক বাড়িতে স্থানীয় বাসিন্দারা একজন ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। তার মধ্যে অবশ্য অধিকাংশই বৃদ্ধা, এবং তাঁরাই নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। একজন বৃদ্ধা সেই ভারতীয় অতিথির সঙ্গে খুব গল্প শুরু করলেন। তাঁর যৌবনে তিনি পর্যটকদের লেখা ভারতবর্ষের উপর অনেক বই পড়েছেন এবং সেইসব শতাব্দী-পুরানো কাহিনীই তিনি সগর্বে বিবৃত করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি মুরুব্বীর মতো ব'লে উঠলেন—"দ্যাখো, তোমরা আজকাল লেখাপড়া শিখেছ, স্বাধীন হয়েছ এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তোমাদের বর্তমান সরকারের অবদানও অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তোমাদের কি উচিত এখনও তোমাদের মেয়েদের মৃত-স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়ে মারা?"

ভারতীয় আগন্তুকটি উত্তর দিলেন—"কিন্তু আমাদের দেশে তো সতীদাহ প্রথা একশ' বছরেরও বেশী হ'ল সরকার থেকে আইন ক'রে তুলে দেওয়া হয়েছে।"

বৃদ্ধা একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে মন্তব্য করলেন—"আইন ক'রে কি আর কুসংস্কার দূর করা যায়? তোমরা শহরের

ছেলে, তার আধুনিক। নিশ্চয়ই গ্রামে এখনও এ-প্রথা চলে আসছে, তোমরা তার খবর রাখো না।"

তাঁর superior knowledge-এর কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে ভারতীয় ছাত্রটি চুপ ক'রে রইলো।

আর একজন অশীতিপরা অপ্রস্তুত অবস্থার অবসানের জন্য সহানুভূতিশীল হ'য়ে গল্প আরম্ভ করলেন ভারতীয়টির সঙ্গে। এঁদের অনেকেরই ধারণা যে, ভারতের ঘরে ঘরে মানুষের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে সাপ, ব্যাং প্রভৃতি জীব এবং শহরের রাস্তায় চলতে গেলেই বাঘ, হাতী, চাই কি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'লে, সিংহেরও সাক্ষাৎ মিলতে পারে। মহিলাটি ভারতীয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন্ শহরে থাকে এবং কলকাতার নাম শুনে বললেন যে, তিনি ভূগোলে পড়েছেন যে কলকাতা খুব বড় শহর। তারপরই কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, তোমরা রাস্তা দিয়ে কী ক'রে হাঁটো? 'টাইগার' তোমাদের আক্রমণ করে না?"

খানিকক্ষণ আগেকার তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ ক'রে ছাত্রটি চট্ ক'রে উত্তর দিল—"তা কেন, তোমাদের যেমন 'অটোবান' * আছে, আমাদের তেমনি 'টাইগার বান' আছে। তারা সেখান দিয়ে হাঁটে, আমরা আমাদের রাস্তা দিয়ে হাঁটি।"

একবার শীতের ছুটিতে মধ্য-ইওরোপের একটি প্রসিদ্ধ শৈলাবাসে বেড়াতে গিয়েছি। সেখানে যুদ্ধের আগে ভারতীয় রাজা-মহারাজারা অনেকেই শরীর সারাতে যেতেন। একবার এক মহারাজা তাঁর ৪০ জন পত্নী, পরিচারক, সেক্রেটারি, মোসাহেব ইত্যাদি সমভিব্যাহারে এই শৈলাবাসটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং একটা চারতলা হোটেলের সবটাই ভাড়া নিয়ে একমাস ছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই ঘটনাটি ভোলেনি।

একদিন আমি ও আমার স্বামী একজন বান্ধবীর সঙ্গে বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি। একজন বর্ষীয়সী মহিলা আমাদের বান্ধবীকে কী যেন জিজ্ঞাসা করলেন এবং বান্ধবীটি সবেগে মাথা নেড়ে তাঁকে কী বলে বিদায় ক'রে দিলেন। আমরা আমাদের বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, বৃদ্ধা কী প্রশ্ন করেছিলেন? মহিলাটি একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে উত্তর দিলেন যে, বৃদ্ধা প্রশ্ন করেছিলেন—"ভারতীয়দের তো অনেকগুলি স্ত্রী থাকে। এই ভদ্রলোকের ক'টি স্ত্রী? একটিকে তো দেখছি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, বাকীগুলি বুঝি দেশে আছে?"

•

ইওরোপে সাধারণতঃ ২৫শে ডিসেম্বর হচ্ছে পারিবারিক অনুষ্ঠানের দিন। পরিবারের লোকেরা এবং নিকটতম আত্মীয়স্বজন মিলে সেদিনটা বাড়িতেই উৎসব করে। আর ৩১শে ডিসেম্বর হচ্ছে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ-হল্লা করার দিন। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই পান, ভোজন, নৃত্য-গীতের পালা আরম্ভ হয়। কোথাও সারারাত উৎসব চলে, কোথাও রাত্রি ১২টায় নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে উৎসবে বিরতি নামে। ২৩।২৪শে ডিসেম্বর থেকেই ইওরোপের আবহাওয়ায় খুশির আমেজ মাখানো থাকে এবং তখনই নানারকম কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটে। আমরা একবার ৩১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। বেলা প্রায় ৪টার সময় মনে পড়লো যে, কিছু জিনিস এখনও কেনার বাকী আছে এবং পাড়ার একটা দোকানে কিনতে গেলাম। দোকানে মেয়েদের মধ্যে খুব হাসি-গল্প চলছিল এবং আমাদের দেখে দু'তিনজন মেয়ে এসে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো—আমাদের দেশ কোথায়, কী নাম, পেশা কী, ইত্যাদি। তারপরে প্রশ্ন আরম্ভ হ'ল—আমাদের সামাজিক অবস্থা, বিশেষ ক'রে মেয়েদের সম্বন্ধে। যথা—আমাদের মেয়েরাও রাস্তায় বার হয় কিনা, চাকরি করে কিনা, ইত্যাদি। দূরে দাঁড়িয়ে ছিল একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে। তার কাউন্টারের খরিদ্দারকে তাড়াতাড়ি বিদায় ক'রে দিয়ে আমাদের দিকে দ্রুতগতিতে এসে উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলো—"আচ্ছা, বলো তো, তোমাদের দেশেও শাশুড়ী আছে?"

•

একবার জার্মানির ছোট এক শহরে কয়েকটি বিদেশী ছাত্রী বেড়াতে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল ভারতীয়, ইরাকী, ইরানী, ইন্দোনেশীয় এবং আরও কয়েকজন। প্রত্যেকেই তাদের জাতীয় পোশাক পরেছিল। সন্ধ্যার দিকে তারা গিয়ে ঢুকলো একটি কাফেতে। সেই ছোট শহরে আর কোনদিন বোধহয় এতগুলি অদ্ভুত-পোশাক-পরা বিদেশিনীর আবির্ভাব হয়নি। তারা চা-খানায় ঢোকামাত্রই তাদের কে চা কফি দেবে তাই নিয়ে দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'য়ে গেল। খাওয়া যখন খানিকটা

---

* হিটলার নাকি জার্মানিতে খুব ভালো রাস্তা তৈরি করেছিলেন—যেখান দিয়ে পাশাপাশি চারখানা মোটরগাড়ি যেতে পারে। এই রাস্তাকে auto (motor-car) bahn (road) বলা হয়।

এগিয়েছে তখন একজন সাহস সঞ্চয় ক'রে ছাত্রীদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলো—"তোমরা কোথেকে আসছো?" বিদেশিনীদের একজন তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলো—"তোমার কী মনে হয়?" দু'তিনজন সমস্বরে ব'লে উঠলো—"নিশ্চয়ই কোনো সার্কাস-পার্টি থেকে।"

•

ভারতীয় মেয়েদের শাড়ী ও-দেশে প্রচুর বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অনেকেরই ধারণা যে, আমাদের পোশাক ওদের ফ্রকের মতোই সেলাই করা—শুধু প'রে নিলেই হ'ল। যখন শোনে যে শুধু লম্বা কয়েক গজ কাপড় জড়িয়ে প্রতিবারই এই পোশাকটি তৈরি করা হয় তখন আর ওদের আশ্চর্যের সীমা থাকে না। এই শাড়ী নিয়ে সাধারণ শ্রমিক ও শিশুদের কাছ থেকে যে-সব মন্তব্য শুনেছি তারই কয়েকটি তুলে ধরছি।

একদিন সকাল প্রায় সাড়ে সাতটার সময় বাড়ি থেকে একটা কাজে বেরিয়েছি। রাস্তায় যে-সব ফুলবাগান থাকে তারই একজন মালী আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলো—"হ্যাঁ গো, রাত্রিবাস প'রে রাস্তায় বেরিয়েছ কেন?"

আর একদিন বেলা প্রায় ১১টার সময় ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় লরী থেকে মাল নামাচ্ছিল কয়েকজন শ্রমিক, তারই মধ্যে একজন আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সরবে মন্তব্য করলো—"সেই কোন্ রাতে Mask Ball হবে, তার জন্য এখন থেকেই তৈরি হ'য়ে বেরিয়েছ?"

একবার একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এ গিয়েছিলাম কিছু জিনিস কিনতে, দোতলা থেকে নামছিলাম, সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ছিল একটি সাত-আট বছরের ছেলে। সে তার মাকে প্রশ্ন করছে শুনতে পেলাম—"মা, এই ভদ্রমহিলার গির্জাতে বিয়ে না হ'য়ে দোকানে বিয়ে হ'ল কেন?"

•

এক বান্ধবীর সঙ্গে গান্ধী সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তার দশ-বারো বছরের ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো—"মা, গান্ধী কে?"

মা উত্তর দিলেন—"Hunger Kunstler" (Hunger Magician)।

•

গ্রীষ্মের ছুটিতে বল্গেরিয়ায় বেড়াতে গিয়েছি। ঠিক সেই সময় ডঃ রাধাকৃষ্ণনও গিয়েছিলেন সেখানে, এবং তার কিছুদিন আগে বল্গেরিয়াতে রাজকাপুরের 'আওয়ারা' ছবিটি দেখানো হয়েছে। কাজেই ওখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা তখন ভারত সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল। পত্র-পত্রিকা মারফত গান্ধী, নেহরু, রবীন্দ্রনাথ, মায় কালিদাস পর্যন্ত তাদের পরিচিত। সকলের মুখে মুখেই এসব নাম এবং 'আওয়ারা'র গান। এ-হেন আবহাওয়া যখন চারিদিকে, সেই সময় আমরা একদিন সোফিয়াতে একটা ছোট রেস্তোরাঁতে বসে 'কিমাবচিতা' (কাবাব) খাচ্ছি। হঠাৎ একজন ইংরাজী-জানা মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল এবং নানারকম গল্প শুরু হ'ল। পাশের টেবিলে একজন বৃদ্ধা তাঁর তেরো-চোদ্দ বছরের নাতনীকে নিয়ে খাচ্ছিলেন। আমরা ইংরাজী-জানা মহিলার মারফত সেই বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। বৃদ্ধা একজন চাষী, নাতনীকে নিয়ে শহরে বেড়াতে এসেছেন। নাতনীটি স্কুলে পড়ে। আমি তাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলাম—সে কী পড়ে, বড় হ'য়ে কী করবে, ইত্যাদি; তারপরে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে ভারতবর্ষের নাম শুনেছে কিনা। মেয়েটি উত্তেজিতভাবে উত্তর দিল যে, সে পড়েছে ভারতবর্ষ খুব প্রাচীন ও বৃহৎ দেশ, পৃথিবীতে তার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবদান সম্পর্কেও সে কাগজে পড়েছে। আমিও তার জ্ঞানের পরিধিতে উৎসাহিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি যে-কোনো একজন ভারতীয়ের নাম করতে পার?"

আগ্রহ সহকারে উত্তর দিল—"হ্যাঁ, পারি। রাজকাপুর।"

•

ইওরোপের কোনো একটি শহরে একদিন দুপুরবেলা রেডিওতে অনুরোধের আসর হচ্ছিল। ঘোষণাকারিণী বললেন—"এবার আমরা আপনাদের ভারতের War dance-এর সঙ্গে যে-গান গাওয়া হয় তাই বাজিয়ে শোনাচ্ছি।"

রেকর্ডে বেজে উঠলো: "জন-গণ-মন-অধিনায়ক…"

গাজিপুর ঃ পদ্মাতীর ঃ রবীন্দ্রনাথ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১ "আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বার বার দেখেছি।" 'মানসী' কাব্যের রচনাবলী-সংস্করণের 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছেন। নতুন পরিবেশে রবীন্দ্র-কাব্য বার বার নতুন পথে যাত্রা করেছে। এই সূত্রের অনুসরণে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গোড়ার দিকের আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক ও রোমান্টিক, দূর ঐতিহাসিক ও নিকট বর্তমান পরিবেশের প্রভাব কত গভীরভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে মুদ্রিত হয়েছে, তা নতুন করে ভেবে দেখা দরকার। আর কিছু না হোক, রবি-প্রতিভাকে নবরূপে আবিষ্কার করা যাবে। 'তোমায় নতুন করে পাব বলে' পরিবেশ-প্রভাব-পটভূমিতে আমরা 'রবি-প্রতিভা-সন্ধানে নিযুক্ত হতে পারি।

২ ১৮৯০ থেকে ১৯১০ : এই বিশ বৎসরের পর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্য আপন ক্ষমতার জোরে নিঃসন্দেহরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পর্বে-রচিত ও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে—মানসী, চিত্রাঙ্গদা, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, কণিকা, কথা ও কাহিনী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, উৎসর্গ, স্মরণ, শিশু, খেয়া; গদ্যগ্রন্থ—য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র, পঞ্চভূত, শান্তিনিকেতন ; নাটক ও প্রহসন—মায়ার খেলা, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, মন্ত্রী-অভিষেক, মালিনী, বৈকুণ্ঠের খাতা, গোড়ায় গলদ, শারদোৎসব। এই পর্বে তিনি চারটি পত্রিকার সম্পাদনা করেন—হিতবাদী (সাহিত্য-বিভাগ), সাধনা, নব পর্যায় বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার। এই সময়ে তিনি উত্তরবঙ্গে ও উড়িষ্যায় ঠাকুর-পরিবারের জমিদারি দেখাশোনা করেন, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-রূপে কাজ করেন। এই পর্বেই তিনি সাহিত্য-নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

৩/ এই পর্বে তিনি অতিশয় কর্মব্যস্ত ছিলেন এবং উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা, বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশে নিরন্তর ছোটাছুটি করেন। নিভৃতে নির্জনে ধ্যানের প্রশান্তি ও অবকাশযাপনের সৌভাগ্য এই পর্বে খুব কমই এসেছে। মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাত তাঁকে এ-সময়েই পেতে হয়েছে। পিতারূপে, স্বামিরূপে সংসারের কঠিন কর্তব্যভার বহন করতে হয়েছে। পিতা, আত্মজা ও সহধর্মিণীর মৃত্যুশোক, মাতৃহারা সন্তানদের প্রতি বাৎসল্য এবং দেশমাতৃকার আহ্বান তাঁকে এই পর্বে তিন দিক থেকে আকর্ষণ করেছে। অথচ এ-সময়েই তাঁর কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, গল্প ও প্রবন্ধের ডালা ভরে উঠেছে; মহাকালের তরণীতে সাহিত্যের পাকা ফসল তিনি এ-সময়েই তুলে দিতে পেরেছেন।

৫) কলকাতার নগরজীবনের শ্রান্তিক্লিষ্ট কবি বার বার এ-সময় প্রকৃতির কাছে ছুটে যেতে চেয়েছেন এবং প্রকৃতিকে অলংকৃত রূপেই গ্রহণ করার জন্য তার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই প্রকৃতিপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিধৃত হয়েছে উপরিলিখিত কাব্যনিচয়ে ও গল্পগুচ্ছে। সংসারের সহস্র দাবি মিটিয়েই তিনি কিভাবে প্রকৃতিকে অন্তরের মধ্যে সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন, তার পরিচয় এখানেই পাই। পদ্মার বুকে বজরায় তিনি অকারণ পুলকে ভেসে বেড়াতে পারেননি। জমিদারির কাজ, কলকাতার সংসার ও সমাজ, সাহিত্যপত্রিকা ও স্বদেশী আন্দোলন, বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিদ্যালয়ের সহস্র চিন্তা তাঁর নির্জন

সাধনায় হানা দিয়েছে। নির্বিঘ্ন প্রকৃতিধ্যান ও সৌন্দর্য সম্ভোগের অবসর এ-সময় তিনি পাননি।

অথচ এই পর্বেই দেখি প্রকৃতির নব নব সৌন্দর্যধ্যানে কবিমন কিভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে. কবিতার সঙ্গে প্রবন্ধে ভাবনে ছায়াপাত করেছে, কাব্যপথে মোড় ফেরার ঘণ্টা বেজে উঠেছে। কবি যে কর্মের ক্রীতদাস ছিলেন না, তিনি যে ধ্যানের মুক্তপুরুষ ছিলেন, তার পরিচয় এখানে পাই। প্রতিভার আলোর কিরীট রবীন্দ্রনাথ মাথায় পরেছিলেন, বেদনার মূল্যে তা ক্রীত, শোকের অনলে তা পরিশুদ্ধ। সেই মুক্ত শুদ্ধ বাণীসাধক কিভাবে সংসারের সহস্র বন্ধন ও পিছুটানকে আড়াল করে প্রকৃতির আনন্দ দু'হাত ভরে গ্রহণ করে জীবনে সম্ভোগ করেছিলেন, তার পরিচয় এই পর্বে আমরা পাই।

। ২ ।

গাজিপুর কবিজীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 'মানসী' কাব্যের প্রধান ২৮টি কবিতা এখানে বাসকালে রচিত হয়। এই রোমান্টিক শহর কবিমনে শিশুকাল থেকেই স্বপ্নের ঘোর সৃষ্টি করেছিল। গাজিপুরে যখন তিনি যান, তখন পিতা বর্তমান, সংসারের জোয়াল কাঁধে নিতে হয়নি, পত্নী মৃণালিনী দেবী ও শিশুকন্যা বেলাকে নিয়েই তাঁর সংসার। গাজিপুর তাঁকে টেনেছিল —দুটি কারণে—গাজিপুরের গোলাপ-খেত, এর অনুষঙ্গে মনের মধ্যে পেয়েছিলেন রোমান্স-স্বর্গ শিরাজের আকর্ষণ; এবং প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী দুর্গমালা। বলা বাহুল্য, বাস্তবের গাজিপুর রোমান্সের গাজিপুরের সমকক্ষ হতে পারল না। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শেষে তিনি গাজিপুর যান, ১২৯৫-এর বর্ষাশেষে কলকাতায় ফেরেন। এই স্বল্পকালে গাজিপুরে রচিত কবিতাগুলি রবীন্দ্র-কাব্যের মূল্যবান ফসল। গাজিপুর শিরাজ-সমরখন্দ নয়, আগ্রা-দিল্লী নয়; তথাপি গাজিপুর কবিমানসের বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র বলে প্রমাণিত হয়েছিল। 'মানসী' কাব্যের রচনাবলী-সংস্করণের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূল হস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এল মনোরাজ্যে।"

এই মুক্তির আনন্দ 'মানসী' কাব্যের ২৮টি কবিতায় ধরা পড়েছে। যে নতুন পরিবেশে তিনি এগুলি রচনা করেন, তার বর্ণনাও এখানে পাই। কবি বলেছেন: "একখানা বড়ো বাংলা পাওয়া গেল, গঙ্গার ধারেও বটে, ঠিক গঙ্গার ধারেও নয়। প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার সর্বের খেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণটানা নৌকা চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পুর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলকচাঁপার ঘনপল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিমগাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার চালওয়ালা পল্লী।"

এই পরিবেশে রচিত কবিতাগুলিতে 'মানসী' কাব্যের মর্মকথাটি ব্যক্ত হয়েছে। তার সুর নিস্তব্ধ অলস মধ্যাহ্নের সুর, স্বপ্নচারণার ও রোমান্সের সৌন্দর্যলোক-পরিভ্রমণে তার জগৎ আবদ্ধ। সৌন্দর্যের স্রোতে গা ভাসাবার অনুকূল অবসরস্থল এই গাজিপুর। জোড়াসাঁকোর বৃহৎ বাড়ির নিত্য-কোলাহলের পর এই অপূর্ব অবসর কবিকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করল।

সংসারের বৃহত্তকে দূর থেকে দেখার, নিভৃতে প্রেম-সম্ভোগের, পত্নীর নিরন্তর সাহচর্যের অনুকূল অবকাশ মিলল অলস প্রতপ্ত মধ্যাহ্নের কোকিল-ডাকা মুহূর্তগুলিতে। 'মানসী' কাব্যে যে বৃহত্তের জন্য ব্যাকুলতা, তা এখানেই দেখা গেল। ভোগের জগৎ থেকে ভোগোত্তর জীবনের কবিহৃদয়ের ব্যাকুল গভীর তীব্র ক্রন্দন এখানেই ধ্বনিত হয়ে উঠল। সংসার-প্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে কবিমানস যে তৃপ্ত নয়, জীবন-মধ্যাহ্নে, প্রতপ্ত যৌবনের মধ্যদিনেই যে ব্যাকুলতা কবিহৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করে দিচ্ছে, তার পরিচয় এখানে পাই। গাজিপুরের রুক্ষ উদাস প্রকৃতির প্রভাব 'মানসী' কাব্যে প্রবল। এ কাব্যের যে প্রকৃতি-সৃষ্টি, তা প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরা রমণীরূপে দেখেছে; প্রকৃতিকে স্নেহশালিনী জননীরূপে দেখেনি। সমাজ-সংসার-প্রকৃতিতে আপন ধ্যানের সমর্থন না পেয়ে বেদনাকাতর কবিকণ্ঠে যে আর্ত ক্রন্দনধ্বনি বেজে উঠেছে, গাজিপুর তাকেই ভাষা দিয়েছে।

কবি যখন গাজিপুরে এসেছেন, তখন সঙ্গে এনেছেন বৌঠাকরুনের (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর) মৃত্যুজনিত শোক। সেই শোক তাঁর সমস্ত মনকে অধিকার করে আছে। সঙ্গিনী আছেন তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবী ও কন্যা বেলা। এই মৃত্যুশোক এবং পত্নীপ্রেম: এ দুয়ের

টানা-পোড়েনে কবিমনের ক্ষতবিক্ষত। এই পটভূমিতে গাজিপুরে রচিত কবিতাগুলি বিচার্য।

কবি বলেছেন,

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে
চলেছিনু আপনার বলে,
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।
['জীবন-মধ্যাহ্ন']

তারপর কুটিল হল পথ, জীবন হল জটিল, বার বার পতন ঘটল। সকল আশা ও বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে, তাই কবির অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা—'কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি, কোন্ পথে চলেছে জগৎ'। গাজিপুরের সেই 'কোমল সায়াহ্ন-লেখা বিষণ্ণ উদার প্রান্তরের প্রান্ত আম্রবনে', 'নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে', 'দূরদূরান্তরব্যাপী উদাস মধ্যাহ্নে' কবি জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করেছেন।

নিষ্ফল শোক আর বিষাদের অন্তরে মুক্তি পেল—

স্বজন-অতীত তারে করিয়া স্মরণ,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
নিরুদ্ধ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষঃস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণ সাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপধারা। ['জীবন-মধ্যাহ্ন']

কিন্তু অত সহজেই সমস্যার সমাধান হয় না। শুষ্কতার শ্রান্তি কবিকে আচ্ছন্ন করে; প্রশান্ত প্রকৃতি নিষ্ঠুর বলে মনে হয়, কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় আর্ত ক্রন্দন :

কত বার মনে করি   পূর্ণিমা-নিশীথে
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নিদ্রালস আঁখিসম   ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন। ['আকাঙ্ক্ষা']

জীবন-মানসীর স্মৃতি কবিকে তাড়না করে ফেরে। 'বিচ্ছেদ', 'মানসিক অভিসার', 'পত্রের প্রত্যাশা' কবিতায় কবিমনের গোপন কামনা ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে কবি জাগ্রত হয়েছেন, আশাবেশের শয্যাতল ছেড়ে বেদনার পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু কোনো সান্ত্বনাই কবিকে শান্ত করে না।

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাই এই কাব্যের উপজীব্য। এই তার শক্তি, এই তার দুর্বলতা। 'মানসী' কাব্যের জনপ্রিয়তার মূল এইখানে। কোনো বাস্তবাতীত প্রেরণা বা গভীর অনুভূতি এখানে নেই। প্রকৃতি এখানে কবির কাছে 'red in tooth and claw', তা নিষ্ঠুর, অন্ধ, মানবহৃদয়ের বেদনার প্রতি উদাসীন। কবির কাছে এখন মনে হচ্ছে—God's in his heaven, and all's *wrong* with the world। নিষ্ঠুর উদাস প্রকৃতির পরিবেশে মানসিক অশান্তির মধ্যে এটাই সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে। কবির—

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙে, এই গড়ে,
এই উঠে, এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।
['নিষ্ঠুর সৃষ্টি']

'মানসী' কাব্যের প্রকৃতি-চেতনা অনেকটা মানবমনের চেতনার সমগোত্রীয়। মানবজীবন ও সংসার সম্পর্কে এখানে 'মানসী' কাব্যের প্রকৃতির কোনো মায়ামমতা নাই। গাজিপুরে প্রাকৃতিক পরিবেশেও কবি সান্ত্বনা পাননি। 'প্রকৃতির প্রতি', 'মরণস্বপ্ন', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'কুহুধ্বনি' 'জীবন-মধ্যাহ্ন' কবিতাগুলি তার পরিচয়স্থল।

গাজিপুর সম্পর্কে কবি বলেছেন—"কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়"। এই কোকিলের ডাক 'কুহুধ্বনি' কবিতার উৎস। সংসারের সকল সংগ্রাম কোলাহলের উপরে চিরন্তনের বাণী নিয়ে ওই কুহুধ্বনি, এ এক নতুন *Ode to the Nightingale*।

'কুহুধ্বনি' কবিতায় মধ্যাহ্ন-দৃশ্যটি গাজিপুরের বাংলো থেকে দেখে লেখা, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। বর্ণনার প্রাণে কী নিপুণ আলেখ্য!—

বধূ আঙিনার কোণে   গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি;
বাঁধা কূপ, তরুতল,   বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লান মুখখানি।
দূর নদী, মাঝে চর,   বসিয়া মাচার 'পর
শস্যক্ষেত আগলিয়া চাষি;
রাখালশিশুরা জুটে   নাচে গায় খেলে ছুটে,
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।

এই মধ্যাহ্ন-চিত্রের আবহ-সংগীত কোকিলের পঞ্চ কুহুধ্বনি। তা শুনে কবির মনে হয়—

যেন কে বসিয়া আছে   বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ উদাসী সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী   সংগীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি।

সুকুমার কর্ণে তার   ব্যথা দেয় অবিরাম
শতকোলাহল বিকট নিনাদে ;
কঠিন সে অন্ধকারে   বাঁধিতে তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সংগীতে।
তাই ওই চিরদিন   অনিমেষ আঁখিহীন
মূকতান, করিয়া কাতর ;
সংগীতের কথা যত,   মিলিয়াছে তার মাঝে
কল্পনার অতুলন-স্বর।

'মানসী' কাব্যের এই মূল সুর—বিষাদ ও শান্তি—despair ও resignation।

'মানসী' কাব্যের উচ্চকোটির প্রেমকবিতাগুলি ('বধূ', 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম', 'অপেক্ষা', 'সুরদাসের প্রার্থনা') গাজিপুরেই রচিত। বাস্তবজীবনে প্রেমের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতি ঘটে অনিবার্য ব্যর্থতায়, আমাদের সংসারের কঠোর সত্যের সঙ্গে অন্তরতম ব্যাকুলতার কোনো সঙ্গতি নেই, এই গভীর উপলব্ধি এসকল কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। জীবন-মানসী কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু-আঘাতে উজ্জীবিত কবিমানসে এই সত্য গাজিপুরের অখণ্ড অবসরের গভীর চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্যাকুল হৃদয়ের আহ্বান শুনি 'বধূ' কবিতায়—

"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্!"—
পুরানো সেই সুরে   কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধাঘাট, অশথ-তল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জলকে চল্"।

সংসারের প্রেমের অপমান ঘটে, বিকৃতি দেখা দেয়, সে-কথা কবি বলেছেন—

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয়তলে   মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো। ['ব্যক্ত প্রেম']

প্রেমের ইতিহাসে এটাই ট্র্যাজেডি।

তবু প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চায়,
মোহন রূপ তাই ধরিয়া।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরান কেঁদে তাই মরিয়া। ['গুপ্ত প্রেম']

এই বেদনায় অপমান কবিকে সংসারের স্থূল প্রেম থেকে দূরে নিয়ে গেছে। 'মানসী' কাব্যের অন্যতম প্রধান কবিতা 'সুরদাসের প্রার্থনা' গাজিপুরে রচিত। পরবর্তী কাব্যে কবির উত্তরণের আভাস পাই এই কবিতায়। স্থূল কামনা ও ইন্দ্রিয়জ ভোগের রাজ্য ছেড়ে কবি মহত্তর প্রেমের পথে অগ্রসর হয়েছেন, নর্মসখী মানসসুন্দরীতে রূপান্তরিত হয়েছেন —এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত এখানে পাই। এ কবিতার দশম স্তবকে মানসসুন্দরীর প্রথম আভাস পাই :

বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার
চিরকাল রবে সে কি ?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে
ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি,
স্নিগ্ধ আনত আঁখি ?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে
দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে
চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যা-কিরণ
পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড় তিমির কেশে,
শান্তিরূপিণী এ মূরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া
চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, এই চাঁপাগাছ
দূর সরযূর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে
চিরদিন যাবে দেখা।
সে নবজগতে কাল-স্রোত নাই,
পরিবর্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে
চিরদিন রবে চাহি।

দেশকালাতীত বাস্তবোত্তর এই সৌন্দর্য-প্রতিমাই মানস-সুন্দরী। কবি এখন লালসা ও কামনার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমের মহত্তর স্তরে পৌঁছেছেন, শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের অশান্তি ও সংশয় এখন সমাপ্ত হতে চলেছে, 'তুচ্ছ হবে এক প্রেমে সর্বপ্রেমতৃষা' তার ইঙ্গিত পেয়েছেন। 'For ever shalt thou love and she be fair' এ-কথা কবি-জীবনে সত্য হতে চলেছে। গাজিপুরে রচিত এই কবিতা তাই রবীন্দ্র-প্রেমকবিতার একটি আলোকস্তম্ভরূপে বর্তমান রইল

'সোনার তরী' কাব্যের রচনাবলী-সংস্করণে 'মানসী' কাব্য সম্পর্কে কবি পুনর্বার বলেছেন : "মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলাঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুননির কাজ করেছিলুম, এর পূর্বে তা কখনো করিনি। নূতনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে ; তারই এসেছিল ডাক ; মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল।" গাজিপুরের রোমান্টিক পরিবেশ তাই মানসী-কাব্যের প্রধান প্রেরণাস্থল হয়ে রইল।

এর পর পট-পরিবর্তন ও পালা-বদল হল।

। ৩ ।

'সোনার তরী' ও 'মানসী' কাব্যের রচনার মধ্যে ব্যবধান দেড় বৎসর। এই সময়ে 'হিতবাদী' (সাহিত্য-বিভাগ) ও 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন ও উত্তরবঙ্গ-উড়িষ্যার ঠাকুরবাড়ির জমিদারি-পরিদর্শনে আত্মনিয়োগ করেন। এই জমিদারি-পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনিচ্ছা ছিল, পিতার আদেশে তিনি এই কর্মে প্রবৃত্ত হন। তার ফলে বাংলা সাহিত্যের ঘরে যে ফসল ওঠে, তা অমরতার দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। সোনার তরী-চিত্রা-গল্পগুচ্ছ-ছিন্নপত্র : এ ফসলের ক্ষেত্র পদ্মাতীরবর্তী গ্রাম ও পদ্মানদী। মধ্যযৌবনের কবি সেদিন মধ্য ও উত্তর বঙ্গের অভ্যন্তরভাগে জলপথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান ও সবিশেষ মর্ত্যমমতা : এ দুই যুগপৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যে এইকালে প্রকাশলাভ করেছে। পদ্মাতীরবর্তী গ্রামজীবনের ছোট সুখ ছোট দুঃখের প্রতি কবির মমতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য পদ্মার চরে অনির্বচনীয়ের আভাসবাহী সূর্যাস্ত-দৃশ্য। কবি-হৃদয়ের প্রকৃতিপ্রেম ও সংসারাসক্তি : এ দুই-ই সত্য। এ দুয়ের টানা-পোড়েনে যে ধূপছায়া-শাড়ির বুনট—তার আঁচলে পদ্মার তরঙ্গলীলা, নিস্তব্ধ সূর্যাস্ত আর উদার মধ্যাহ্ন-আকাশের ছায়াপাত হয়েছে।

এই পরিবর্তিত পটভূমি সম্পর্কে কবি নিজেই মন্তব্য করেছেন : "সোনার তরী লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ ; তার ভাষা চিনি সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে ; যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম, যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।" [রচনাবলী-সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৪৭]

রবীন্দ্র-গল্পের শ্রেষ্ঠ ফসল যে চুয়াল্লিশটি গল্প ('গল্পগুচ্ছ'র অন্তর্ভুক্ত), সেগুলি রচিত হয়েছে পদ্মার পটভূমিতে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের (১২৯৮–১৩০২ বঙ্গাব্দ) সময়-সীমার মধ্যে। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র কবিতাগুলিও এই সময়ে রচিত। তারপর ছোটগল্পের ধারা বন্ধ হয়েছে বাহ্যত 'সাধনা' পত্রিকার অন্তর্ধানে, সে-স্থানে পাই কাহিনী-কাব ও কাহিনীমূলক কবিতা (কথা, কাহিনী)। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কেবল শতাব্দীর সমাপ্তি নয়, কবিজীবনের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি। কবি এলেন শান্তিনিকেতনে, ছোটগল্পের ধা বন্ধ, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মব্যস্ত মুহূ গুলিতে পদ্মার শান্তি ও আনন্দ তিরোহিত, প্রবন্ধ উপন্যাসের দিন সমাগত। তাই পদ্মার পটভূমি ছো গল্পের ধাত্রী।

মানসী-তে গাজিপুরের রুক্ষ প্রকৃতি, সোনার তরী চিত্রা-গল্পগুচ্ছে পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গের শ্যামল প্রকৃ কণিকা ও চৈতালি-তে তার অনুস্মৃতি, খেয়া-গীতাঞ্জলি 'শান্তিনিকেতন'-উপদেশমালায় রাঢ়বঙ্গের কঠিন বৈরি প্রকৃতি।

পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গ আলোচ্য পর্বের সাহিত্যের প্রেরণ মূল। এই পর্বে কাব্যের রসের উৎস রহস্যময়ী পদ্মা অ ছোটগল্পের রসের উৎস পদ্মা ও তার শাখানদী-তীরব ছায়া-ঘনিবিড় গ্রামগুলি। "হে পদ্মা, তোমায় আম দেখা শত বার"—রহস্যময়ী সুন্দরী পদ্মার প্রতি কবি বার ব তাঁর হৃদয়ের অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। প রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিপুল গভীর প্রভাব মুদ্রিত করে দিয়ে সুদীর্ঘ জীবনের নানা পর্বে এই প্রভাবের নব নব পরি বিস্তৃত হয়েছে। এর প্রথম সার্থক পরিচয় পেলাম উ শতকের শেষ দশকে।

রবীন্দ্র-ভাষ্যকার শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই পদ্মালালি ভূখণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : "বর্ষাকালে এই অ জলময় হইয়া গিয়া পৃথিবীর ভূগোল-পরিচয় প্রকাশ করে

তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। নদী নালা বিল ইহার জলভাগ, আর বর্ষাজলের স্ফীতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত গ্রামগুলি এবং অনন্ত শস্যক্ষেত্র ইহার স্থলভাগ। পদ্মা প্রধান নদী, অবশ্য যমুনাও (ব্রহ্মপুত্র) কম নয় ; আর আছে আত্রেয়ী, নাগর, বড়ল, গোরাই (গৌরী নদী) ও ইছামতী প্রভৃতি নদনদী। আর রাজশাহী জেলা ও পাবনা জেলার একাংশ ব্যাপিয়া অনির্দিষ্ট-আকার চলন-বিল, তাহাও অগ্রাহ্য করিবার মতো নয়। রবীন্দ্রনাথের চোখে এই বিচিত্র ভূখণ্ড মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিণত জীবনচিত্র যেন উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—ইহার নিজস্ব মূল্য যাহাই হোক, এখানেই ইহার আসমানদারির সার্থকতা। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সূত্রে এই ভূখণ্ড রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাদটীকায় আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে।

"এই ভূখণ্ডের কথা যখন ভাবি, বিস্ময়ের অন্ত থাকে না ; মনে হয়, বঙ্গদেশে অবস্থিত এই ভূখণ্ডে বঙ্গের মর্মকথার কোন্ সত্য যেন প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয়, সিংহবাহিনী পদ্মা পরিপূর্ণ বিজয়গৌরবে আপন বামচরণ চলন-বিল-রূপী ঐ কালো অসুরটার স্কন্ধের উপর স্থাপন করিয়াছেন আর তাঁহাকে ঘিরিয়া আত্রেয়ী এবং গৌরী, বড়ল এবং নাগর নদনদীসমূহ বাঙালী-জীবনের ধ্যানের বিচিত্র পূর্ণতাকে যেন প্রকাশ করিয়াছে। এহেন ভূখণ্ড কবিপ্রতিভার যোগ্য ধাত্রী বটে। এই ভূপ্রকৃতি যেন ষড়্‌মাতৃকার মতো কবিকে স্তন্যদান করিয়াছে—আর তাই বুঝি কবিও প্রতিভার ষড়্‌মুখে জননীর ঋণ শোধ করিয়াছেন।

"এই ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অংশের প্রধান নায়ক পদ্মা, আর জনপদ অংশের প্রধান নায়ক অখ্যাত অজ্ঞাত মানব।"

['রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', পৃঃ ১০-১১]

পদ্মা এই পর্বে কবিমানসের ধাত্রী, প্রেরণাদায়িনী, জীবনরূপিণী। পদ্মাকে কবি স্বয়ং মানবীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 'ছিন্নপত্র'র পাতায় পাতায় তার পরিচয় রয়েছে। পদ্মা কবির কাছে 'আইডিয়া' মাত্র নয়, প্রিয়-সখী সত্তা, তার উপস্থিতি ও সাহচর্য কবি অনুভব করেছেন বাস্তবসত্যরূপে। পদ্মাকে কবির মনে হয়েছে "প্রাণভরা অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা", "হিলহিলে মেয়ের মতো"; বলেছেন "তার মানের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়", "পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি"। এ ধরনের অজস্র অনুরাগমিশ্রিত মন্তব্য 'ছিন্নপত্র'র ছড়ানো রয়েছে।

পদ্মাকে রবীন্দ্রনাথ যে কত গভীরভাবে ভালবাসেন তার একটিমাত্র সাক্ষ্য 'ছিন্নপত্র' থেকে উদ্ধার করছি। ভালবাসার অনুরূপ ভয়—বিচ্ছেদাশঙ্কা এখানে দেখা দিয়েছে : "হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর ফিরে পাবো না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন হবে, আর কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাবো। এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকবো! আশ্চর্য এই, আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।" [১৬ই মে, ১৮৯৩, শিলাইদা, 'ছিন্নপত্র']

এই একান্ত অনুরাগ ও প্রণয়ার্তির প্রতিধ্বনি শুনি 'পদ্মা' কবিতায় (চৈতালি) :

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে,
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে ···
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ? ···
আরবার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায় ?

এই অনুরাগের বেদনায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা নতুন করে পাই। ১৩০২ বঙ্গাব্দে এই বেদনা প্রকাশের পর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে রচনাবলী-সংস্করণে দেখি তার নতুন অভিব্যক্তি ('সোনার তরী'-র ভূমিকা, বৈশাখ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) : "আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জনসজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে।"

। ৪ ।

'গল্পগুচ্ছ'র মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব রূপলাভ করেছে, আর 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র বিশ্বপ্রকৃতি ও নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনার কাব্যরূপ সঞ্চিত হয়েছে। পদ্মার

ক্ষুরধার প্রবাহ, অনন্ত শস্যক্ষেত্র, উন্মুক্ত গগনললাট, ব্যাকুল মধ্যাহ্ন, উদাসিনী সন্ধ্যা 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র নির্বিশেষ সৌন্দর্যলোক গড়ে তুলেছে। প্রকৃতির দীর্ঘনিবিড় উষ্ণতায় কবি বার বার সঞ্জীবিত হয়েছেন। পদ্মার প্রেমে নতুন করে বাঁধা পড়েছেন; বলেছেন—"প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয়, আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু, যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল ছুল্‌ছুল্ করে ওঠে—চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদু কলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি নবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য-উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়।" [৯ই ডিসেম্বর ১৮৯২, শিলাইদহ, 'ছিন্নপত্র'.]

সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের যে বিষাদ ও বৈরাগ্য, তার পটভূমি এই পদ্মাপালিত ভূখণ্ড। ছিন্নপত্রের ১৪, ১৮, ২৭, ৩৪, ৬৬, ১৪২ সংখ্যক পত্রগুচ্ছ তার প্রমাণ। নিস্তব্ধতা, খোলা আকাশ ও কর্মবিরতির পটভূমিতে পৃথিবীর বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ও বিষাদ ফুটে ওঠে, এ-সত্য কবি হৃদয়ঙ্গম করেছেন পদ্মার নির্জন চরে সান্ধ্য-ভ্রমণকালে (দ্রঃ ১৪ সংখ্যক পত্র, 'ছিন্নপত্র')। "পৃথিবীর যে অংশটা নির্জন, বিরল, অসীম—সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে, আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে টান পড়ে। কাল সন্ধের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পূরবী বাজছিল, পাঁচ-ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম।"

যৌবনমধ্যাহ্নেই সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের যে বিষাদের সুর, তা কেবল sad song of humanity নয়, তা প্রকৃতির অন্তর থেকে কবির অন্তরে ঠাঁই নিয়েছে। তাই পূরবীতে বা টোড়িতে বিশাল জগতের অন্তরের হা-হা ধ্বনি ব্যক্ত হয়, এ-কথাই কবির মনে হয়েছে। পদ্মার চরে যে-সন্ধ্যাকে কবি দেখেছেন, তা পূরবীর বেদনা-মূর্ছনায় বহুরূপ নিয়েছে। নিঃসঙ্গ পদচারিণী সন্ধ্যা-রমণীকে দেখে কবি-হৃদয়ে যে রোমান্টিক বেদনার গীতধ্বনি উত্থিত হয়েছে, 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র তো তারই ঝংকার শুনি।

'বসুন্ধরা' কবিতায় যে-সন্ধ্যার চিত্রটি পাই, তা যে পদ্মাতীরের সন্ধ্যাচিত্র, এ সত্য মুহূর্তেই অনুভব করতে পারি—

দূর করো সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সন্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোঠে মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূমলেখা
সন্ধ্যাকাশে—যবে চাঁদ দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে—
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্বাসিত; বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী-'পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি। কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদব্যাকুল। ['সোনার তরী']

এই বিষাদব্যাকুলতাই 'সোনার তরী'-'চিত্রা'র প্রাণরস। এ বিষাদ কেবল সন্ধ্যায় নয়, মধ্যাহ্নেও। নিম্নোক্ত কবিতাংশে তারই পরিচয়বহ। হেমন্তের দ্বিপ্রহরে 'যেতে নাহি দিব'র কাতর বেদনা সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে—

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী। ['সোনার তরী']

পদ্মাপ্রকৃতি একবার কবিকে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করে, আরেকবার গ্রামপ্রকৃতির অভিমুখে আহ্বান করে। নির্জন-সজনের সংঘর্ষে 'সোনার তরী'র কাব্যকমল দেখা দিয়েছে। নির্বিশেষ সৌন্দর্যসাধনা আর সবিশেষ মর্ত্যমমতা, এ দুই প্রধান সুরকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে বিষাদ ও বৈরাগ্য। তা কেবল ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির নয়, কবিপ্রকৃতিরও। পদ্মাতীরবর্তী ভূখণ্ডে চরে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নে তারই দর্শন। 'অক্ষমা' ও 'দারিদ্র্য' সনেটে সবিশেষ মর্ত্যমমতা, এগুলি 'গল্পগুচ্ছ'র দোসর; আবার 'সোনার তরী'-'মানসসুন্দরী'-'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় নির্বিশেষ সৌন্দর্যসন্ধান, এগুলি 'চিত্রা'-'জীবনদেবতা'র দোসর। 'চিত্রা'র 'সিন্ধুপারে' কবিতায় নির্বিশেষ আদর্শ-সৌন্দর্যের সন্ধানে যে-কবি

আত্মনিয়োগ করেছেন, তিনিই 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কামনা করে মর্ত্যমমতার পরিচয় দিয়েছেন—"দূরে নদীপারে অবনতমুখী সন্ধ্যা"—এ তো সেই সন্ধ্যা, যাকে 'ছিন্নপত্র'র বার বার দেখেছি জনহীন চরের উপর দিয়ে বিষণ্ণবদনা রমণীরূপে চলে যাচ্ছেন। একবার মহিমাময়ী সৌন্দর্য-প্রতিমার পদপ্রান্তে কবির অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলির আত্মসমর্পণ, আরবার পদ্মাতীরবর্তী সুখদুঃখভরা মানবজীবনের জন্য ব্যাকুল বেদনাপ্রকাশ। 'সুখ' ও 'সন্ধ্যা' কবিতা-দুটিতে পদ্মাতীরবর্তী গ্রামজীবনের প্রসন্ন সরল আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। আর এই সন্ধ্যা-বন্দনা থেকেই কবি পুনর্বার নির্বিশেষ সৌন্দর্যের পথে চলে গিয়েছেন। 'সন্ধ্যা'র মুক্ততা থেকে 'সিন্ধুপারে'র 'পউষ প্রখর শীতে জর্জর ঝিল্লিমুখর' রাতে জীবনদেবতার প্রবল আকর্ষণে কবির নিরুদ্দেশযাত্রা। পদ্মাতীরের জনপদ কবিকে মর্ত্যমমতার পথে টানছে আর পদ্মাচরের সন্ধ্যার সূর্যাস্ত কবিকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অভিমুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাই বলেছি, পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গের এই ভূখণ্ড 'সোনার তরী'-'চিত্রা' কাব্যের, সেইসঙ্গে 'গল্পগুচ্ছ'-'ছিন্নপত্র'র প্রেরণাস্থল।

পরবর্তী কাব্য 'চৈতালি'তে মর্ত্যমমতার সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছে। 'গল্পগুচ্ছ'র সংসারাসক্তি নতুন করে 'চৈতালি'র কবিতাগুচ্ছে পাই। পদ্মার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে এই পর্বে রচিত 'পদ্মা' কবিতা-টিতে। 'দুর্লভ জন্ম' সনেট কবির মর্ত্যমমতার testament। আর 'মধ্যাহ্ন' কবিতা পদ্মাতীরবর্তী জনপদের একটি নিপুণ আলেখ্য। মর্ত্যমমতার সঙ্গেই রয়েছে সেই উদাস বৈরাগ্য ও বিষাদ। অলস মধ্যাহ্নের বিষাদ-সুরটি কবিমনকে আচ্ছন্ন করেছে, পরবাসী কবি শেষ পর্যন্ত নিজেকে সেই পদ্মাতীরবর্তী জনপদবাসীদের একজন বলে মনে করেছেন। পদ্মাতীরের জনপদের প্রতি কবির এই আন্তরিক ভালবাসা ও একাত্মতার ফলে আমরা পেয়েছি 'গল্পগুচ্ছ'র শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি। গিরিবালা, ফটিক, শুভা, মৃন্ময়ী, তারাপদ, রতন, উমা প্রভৃতি বালক-বালিকাই 'গল্পগুচ্ছ'র বৃহদংশের নায়ক-নায়িকা এবং তারা পদ্মাতীরবর্তী জনপদবাসী। 'গল্পগুচ্ছ'র আলোচনায় পদ্মা ও পদ্মার মেয়ে দুলালগুলির প্রাধান্য—এই বৈশিষ্ট্য পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাই পদ্মাতীর ও পদ্মানদী অনন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

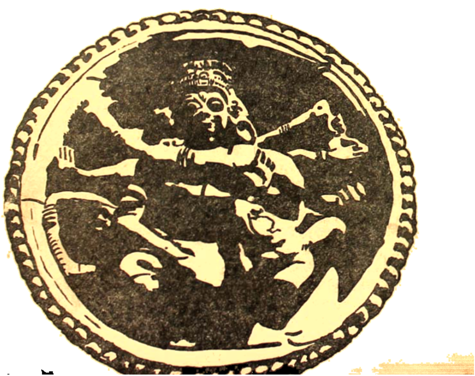

পল্লীর বারমাস্যা

তুলসীদাস সিংহ

। অঘ্রাণ ।

অগ্রহায়ণ তো আসলে অগ্রহায়ণ নয়—রসময়, বরং রসময়। নিজ মুখেই তো তিনি বলেন সে-কথা। ঐ যে—"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং···"—মাসগুলির মধ্যে আমি হলাম অগ্রহায়ণ মাস।

সুতরাং অগ্রহায়ণে আমি অগ্রহায়ণকে দেখি না—রসময়কে দেখি। দু'চোখ ভরে দেখি রসকষহীন পল্লীসমাজ-দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা-ধমনীর মধ্যে নবরসের সঞ্চার ঘটিয়ে সেই রসের মধ্যে কেমনভাবে তিনি আত্মগোপন করে রয়েছেন। পল্লীর প্রতিটি অণুপরমাণুতে মিশিয়ে দিয়েছেন আপন রসময় সত্তাটিকে। দু'কান ভরে শুনি তাঁর শ্রীচরণ-নিঃসৃত নূপুরধ্বনি। ঘরে শুনি, বাইরে শুনি, মাঠে-ঘাটে শুনি, পথে-প্রান্তরে শুনি। সকালের মিঠিমিঠি রোদের মধ্যে তাঁকে আমি হাসতে দেখি, দমকা হাওয়ার সঙ্গে ভাসতে ভাসতে আমার নাকে এসে ঢোকে তাঁর গায়ের গন্ধ, তন্দ্রালসা সন্ধ্যায় শিরশিরানির মধ্যে তাঁর স্পর্শসুখ অনুভব করি।···

মাঠ থেকে ধানের তাড়া মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরছিল পদ্মা বাউরী। আমি তার পিছনে পিছনে আসছিলাম। লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলেছে পদ্মা, আর তার মাথায় দু'পাশে ঝুলে-পড়া শীষগুলো থেকে শব্দ হচ্ছে ঝনর-ঝনর। আমি স্পষ্ট শুনতে শুনতে আসছিলাম ঝনর-ঝনর নয়—ঝমর-ঝমর। নূপুর—তাঁর পায়ের নূপুর। নূপুর বাজাতে বাজাতে তিনি আমাদের ঘরে আসছেন।

সেই যেদিন মাঠে গিয়ে লক্ষ্মীমাকে আমরা সাধ-ভাত খাইয়ে এসেছিলাম, সেইদিনই মাঠের এক কোণায় পুঁতে রেখে এসেছিলাম একটা শালের ডাল। ডালটার মাথায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম একটা শিকা। শিকা নয়—সিংহাসন। সেই সিংহাসনের উপর বসিয়ে রেখে এসেছিলাম পিটুলি দিয়ে গড়া নারায়ণ-মূর্তিকে। শিকা-সিংহাসনে বসে বসে তিনি এতদিন লক্ষ্মীদেবীকে আগ্‌লাচ্ছিলেন। মাঠ ছেড়ে লক্ষ্মীদেবী আমাদের ঘরে এসে ঢুকছেন—নারায়ণও সেই সঙ্গে সঙ্গে নূপুর বাজাতে বাজাতে ঘরে এসে উঠছেন।

ঘরে এসে যখন তিনি উঠলেন তখন দেখলাম সেকি তাঁর উদ্দাম নৃত্য!

খামারের মাঝখানে অর্ধচক্রাকারে পাটা পেতে দেওয়া হয়েছে। আর প্রত্যেক পাটার কোল ঘেঁষে এক এক জন মুনিষ দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে ধান পিটাচ্ছে। এলোপাথাড়ি নয়, সুষ্ঠু একটি তাল বজায় রেখে। ঐ তো তাঁর নৃত্য, ঐ তো তাঁর নৃত্যের তাল! পরিশ্রম করবার সময় কেউ আবার হাসে নাকি? কিন্তু ঐ তো দেখছি মুনিষদের মুখেও হাসি—পদ্মাদের মুখেও হাসি। ও-নাচ দেখে যশোদা হেসেছিলেন মাত্র এক যুগে—আমরা হেসে আসছি যুগ যুগ ধরে—পুরুষানুক্রমে।

এর পর দেখলাম তাঁকে রাসমণ্ডলের মধ্যে। সখীরা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল তাঁকে, মাঝে রেখে নাচতে লাগলো ঘুরে-ফিরে। তিনি বাঁশী বাজাতে লাগলেন 'রা—ধা' 'রা—ধা' বলে।

বাও মানে বাতাস। সেই বাও থেকে হয়েছে বাওলানো। বাওলানো অর্থাৎ বাতাস-লাগানো। ধান মাড়া বা ঝাড়া শেষ হওয়ার পর কুটোয়-ভর্তি ধানগুলো থেকে কুটোগুলো উড়িয়ে দেওয়া হয় প্রথমে বাতাস লাগিয়ে। একে বলে ধান-বাওলানো। বৃত্তাকারে দাঁড়ায় মুনিষরা, প্রত্যেকের হাতে থাকে এক একটা করে কুলো। গাদা থেকে এক চাপুনী করে ধান তুলে তুলে একজন ঐ বৃত্তের মাঝখানে চক্কর মেরে ছড়িয়ে দেয়। সঙ্গে স

ঘুরে-ফিরে কুলোর বাতাস দিতে থাকে বৃত্তরচনাকারীরা। শুরু হতে থাকে একটানা 'শাঁ—শাঁ'। আমার কানে ঢোকে 'শাঁ—শাঁ' নয়, 'ধা—ধা'।

এবার দেখলাম রসময় রসরূপে পল্লীসমাজদেহের ভিতরে প্রবেশ করলেন। নব-রস পেয়ে নীরস দেহ সরস হয়ে উঠলো। পেটের ক্ষুধা ভুলিয়ে গেল কোথায়—পেট ঘুমিয়ে পড়লো একেবারে। জেগে উঠলো এবার মন। শিরা-উপশিরা ছেড়ে স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লেন রসময়।

দেখি আশমতলায় আসর বসলো। রামায়ণ গান হবে। আভূমিলম্বমান কোঁচা, গায়ে 'হরে রাম' লেখা নামাবলী, দু'পায়ে ঘুঙুর, বাঁ হাতে মন্দিরা, ডান হাতে চামর—মূলগায়েন আবেগভরা কণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন গান। এক এক পদ গান আর নাচেন। নাচের সঙ্গে তাল রাখছে কোঁচা, ঘুঙুর, মন্দিরা, চামর। মূলগায়েনের মুখ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাচ্ছে দোহারদের মুখ। আসর সরগরম। ঘোমটার আড়ালে থেকে বৌ-ঝিরা দু'হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ছেলেমেয়েদিকে। আসরের একপাশে রাখা আছে একটা কাঁসার-থালা। ছেলেমেয়েরা থালার উপর ঠুং করে পয়সাটি ফেলে দিয়ে মূলগায়েনের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। মূলগায়েন চামরটি বুলিয়ে দিচ্ছেন তাদের মাথায় একবার করে। ব্যস, সব বালাই দূর হয়ে গেল!

তারপর দেখি 'বালক-সঙ্গীত' বা 'কৃষ্ণযাত্রার দল'ও এল। মুখ-চোখ-বসা জন ছয়েক নাবালককে ঘিরে একপাল ধড়চিটে অপোগণ্ড নাবালক—ব্যস, এই হল দল, কৃষ্ণযাত্রার দল। অবশ্য দিনের বেলায় এমনটি দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু রাত হলেই দেখবেন এদের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। ঐ যে গোটাকয়েক চটা-ওঠা বড় বড় টিনের বাক্স দেখছেন, ওগুলোর ভিতরে পোরা আছে ধড়া, চূড়া, বাঁশী, সাজ-পোশাক, আয়না, চিরুনি, সেন্ট-রূপী যাদুকাঠিরা। যেই না ঐ কাঠিদের পরশ লাগবে ওদের গায়ে গায়ে—সেই হয়ে উঠবে ওরা কৃষ্ণ বলরাম ললিতা বিশাখা বৃন্দা। ঠাসাঠাসি খোড়ো দোচালা-একচালায় যাত্রাগানের এই আশমতলায় শুকনো মাটিতেই নামিয়ে আনবে ওরা মথুরা-বৃন্দাবন। ওরা কাঁদলে তখন আপনিও কাঁদবেন—ওরা হাসলে আপনিও হাসবেন।

তারপর কাঁধে ঝোলা, গলায় হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে সত্যনারায়ণের পালা-গায়কদেরও দেখি গাঁয়ের রাস্তা বা গলি দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। মূলগায়েনের কাঁধের উপর লাল শালুতে মোড়া, চাঁদমালা-পরানো শালবালিশের মতো যে-জিনিসটি দেখা যাচ্ছে, ঐ উনিই হলেন সত্যনারায়ণ। যার বাড়ীতে বায়না আছে সেখানেই আজ সেবা-পূজা হবে ওঁর—তারপর রাত্রের দিকে হবে পালাগান।

তারপর দেখলাম হাপু-ওয়ালাদিকে। বাবুদের বার-দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী একটা মেয়ে মাথার চুলে হাত ঢুকিয়ে উকুন খুঁজছে, আর তারই কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তেলচিটে কেড়ানি পরা একটা মেয়ে আর একটা ছেলে হাঁকাহাঁকি করছে 'হাপু শুনবে গো মা—হাপু'। বারকয়েক হাঁকাহাঁকি করতেই ভিতর থেকে মেয়েছেলে গিন্নীবান্নি সব হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে চৌকাঠে পা দিয়ে দাঁড়াল। ছেলে-দুটো তখন হাত-পা নেড়ে, বুকে পিঠে ঠোঁটে গালে দিতে থাপড় মারতে মারতে গাইতে শুরু করলো হাপুগান—

"মা গো মা—ঝিঙে ফিঙি মা,
কলকাতাতে চলে যাবো
দেখতে পাবি না।
এ—হু, কম হু,
এঁ—হেঁ—হুঁ…"

অগ্রহায়ণকে আমি আগাগোড়া দেখি এবং দু'চোখ ভরে দেখি। আর এই অগ্রহায়ণই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়—এক অন্ন-রসই বাকী সব রসের রক্ষক। এক সূর্য যেমন লক্ষ লক্ষ তারকাকে আলোকমণ্ডিত করে রাখে, তেমনি এক ঐ অন্ন-রসই অগণিত রসধারাকে রসময় করে রাখে। ঐ মূল অন্ন-রসের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাওয়া মানেই অগণিত রসধারার সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাওয়া। দিদিমায়েরা হঠাৎ যদি বোবা হয়ে যায়—লেপ-কাঁথার তল থেকে যদি উড়ে পালিয়ে যায় কাহিনীগুলো—রামায়ণ গায়কেরা; কৃষ্ণযাত্রার দলরা, সত্যনারায়ণের পালাগান গায়করা, হাপুওয়ালারা যদি মরে—তাহলে বুঝতে হবে মূল রসের সান্নিধ্য থেকে আমরা দূরে সরে এসেছি। মূল রসের সন্নিহিত হওয়ার সাধনাই ওদিকে আবার ফিরিয়ে আনার সিদ্ধি এনে দিবে।

অন্ন অন্ন নয়, লক্ষ্মী—অগ্রহায়ণ অগ্রহায়ণ নয়, রসময়-লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যসেবা বলতে আমি এই লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যসেবা বুঝি। মার্গশীর্ষরূপী রসময়কে যখন আমি প্রণাম করি তখন আশীর্বাণীরূপে আমার কানে বেজে ওঠে—

"অন্নং বহু কুর্বীত"

■

কাটা আর মাড়া নিয়েই তো অগ্রহায়ণ মাস। প্রথমের দিকে কাটাই—শেষের দিক্ করে মাড়াই। ধান-কাটার শেষ যেদিন হবে সেদিন আসবে 'ডেনী'। বেশ মোটারকম এক আঁটি ধানই হল ডেনী বা ডেনীবুড়ী। অর্থাৎ মাঠের শেষ ধান। যথাবিধি পুজো করা হবে তাঁকে মাঠের মধ্যে; পুজাশেষে নিয়ে আসা হবে খামারে। খামারে গাদার সঙ্গে তোলা থাকবেন নবান্নর আগের দিন পর্যন্ত। নবান্নর দিন এই ডেনী-বিঁড়ের ধান দিয়েই হবে নবান্নর চাল তৈরি।

মাঠ থেকে ডেনী তুলে আনার দিন মাঠের অন্যান্য দেবতাদের পাওনাগণ্ডাও মিটিয়ে দেওয়া হবে। ক্ষেত্র-দেবতারা আছেন যে মাঠে মাঠে—কীটশত্রু, চোরশত্রু, দৈবশত্রু ইত্যাদি বিবিধ শত্রুর হাত থেকে তাঁরাই তো রক্ষা করেছেন শস্যকে। শেষ ধান তুলে নিয়ে যাচ্ছি মাঠ থেকে—পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে না তাঁদের? ক্ষেত্রদেবতারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। কোথাও তিনি পলাশীবুড়ী, কোথাও বাবাবুড়ী, কোথাও বা নাটশাল-বুড়ী। পূজাশেষে এঁদের নামে উৎসর্গ করা হয় একতাড়া ধান। ধান-তাড়ানী অবশ্য বামুনঠাকুরের পাওনা হয়।

চানাচুরওয়ালা, পানবিড়িওয়ালা, ইঁদুরকুলরা অবশ্যই পাওনাদার, সুতরাং তারা আপন আপন পাওনা মিটিয়ে নেয় ডেনী-ওঠার আগেভাগেই। ধান-কাটার সময় মালিকরা যখন থাকেনা কেউ মাঠে, সরে যায় মাঠ থেকে—সেই তালে জমির আলে এসে দাঁড়ায় চানাচুরওয়ালা, পানবিড়িওয়ালা। মুনিষদের মুখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে আর পয়সাকড়ি নয়—খড়-সমেত ধানের আঁটি-ই পাওনা হয় চানাচুরওয়ালা পানবিড়িওয়ালাদের। "পয়সা দেখ হয় তো লাঙল তুলে ধর্" হল আষাঢ়ের মন্ত্র, অগ্রহায়ণের মন্ত্র "পয়সা দেখ হয় তো আঁটি তুলে ধর্"। আর হঠাৎ যদি দূরের বাঁকে গদাদের টিকি বেরিয়েই পড়ে তাতেই বা হয়েছে কী। ধান-কাটার পারিশ্রমিক হিসাবে মুনিষরা তো আর টাকাপয়সা পায় না, পায় ধানের আঁটি—ওদের মুখে যার নাম বিঁড়ে। গদ-পিছু বাঁধা-হিসেব-মতো। গদাদের চোখে পড়ে গেলেও তেমন ক্ষতি নেই—নিজের পাওনা থেকে আগেভাগেই না-হয় এক বিঁড়ে নিয়ে সে চানাচুর খাচ্ছে, পানবিড়ি খাচ্ছে। আর যেদিন শুধু কাটা হবে—বাঁধা হবে না, সেদিন অবশ্য ধার দিতে হবে তাদিকে। কাল নগদ—আজ ধার। শেষ বাঁধার দিন লেন-দেন কাটাকাটি হয়ে যাবে একেবারে।

ইঁদুরকুলদিকে অবশ্য অতশত তোয়াক্কা করতে হয় না কারো। ধান পেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধানের শীষ কেটে আলের তলায় গর্তের মধ্যে নিয়ে যেতে শুরু করে সব। আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে সাতমহল—সাতমহলে আছে সাতরাণী। সেইজন্যেই তো কথা আছে: "অঘ্রানে ইঁদুর সাতটা বিয়ে করে"। সাতরাণী সহ রাজাকে কাল কাটাতে হবে সুখে-স্বচ্ছন্দে, তার মতো রসদ চাই তো?

কিন্তু বেচারা ইঁদুররা জানে না, বৃথাই তারা খেটে মরছে, বৃথাই তাদের এত সঞ্চয়। চতুর মানুষের হাতে ধনপ্রাণ নিয়ে টানাটানি লেগে যাবে একদিন। এবং সেদিন বেশী দূরে নয়। মাঠের সব ধান যখন উঠে যাবে খামারে, মাঠময় বেরিয়ে থাকবে শুধু খোঁচা-খোঁচা দাড়ির মতো গোড়াগুলো—তখন কোদাল, টাংনা আর ঝুড়ি নিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসবে সব বাউরী-বাগ্দীদের জোয়ানরা ইঁদুর-মহলের সন্ধানে। আলের নীচে ঘাসের ভিতরে ভিতরে ঐ-যে ছড়িয়ে রয়েছে ইঁদুর-মাটি—ঐ দেখেই বুঝে নেয় তারা এ-আলে ইঁদুরমহল আছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় খোঁড়ার কাজ। খুঁড়তে খুঁড়তে একসময় বেরিয়ে পড়ে মহল—মহলের পর মহল। ধানশীষে ঠাসা সে-সব মহলগুলো। সঞ্চিত ধনরত্ন সহ প্রাণ দিতে হয় ইঁদুরদিকে এইসব পরস্বাপহারীদের হাতে।

•

নূতন ধান উঠেছে আমাদের ঘরে ঘরে। নূতন চালের নূতন ভাত খাবো আমরা। কিন্তু খাওয়ার আগে সকলকে খাইয়ে পর খাবো। উৎসব করবো—কাককে পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবো সে-উৎসবে। "নূতন ধান্যে হবে নবা পল্লী-ভবনে-ভবনে"।

কী সুন্দর আর কত প্রাচীন এই নবান্ন-উৎসব! বৈদি যুগ থেকে পালিত হয়ে আসছে এ-উৎসব।

এ নিয়ে গল্পও তো আছে একটি:

মর্ত্যের মানুষদিকে মেরে ফেলবার জন্যে অসুরর একসময় চক্রান্ত করে খাদ্যশস্যের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে দিলে। বিষ-ছড়ানো খাদ্যশস্য যে খাবে সেই মরবে, দেখতে দেখতে সাফ হয়ে যাবে সব মানুষ। কিন্তু কেমন করে হো ফাঁস হয়ে পড়ল ভিতরের কথাটা—মানুষরা জেনে ফেললে খাদ্যশস্যের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জেনে-শু কে আর বিষ মুখে তুলতে যাবে! কেউ আর কিছু মু তুললো না। ফলে একই বিপদ অন্যরূপে দেখা দিল উপোস দিয়ে দিয়ে মরতে শুরু করলো সব।

মর্ত্যবাসীদের এই দশা দেখে স্বর্গের দেবতাদের মাথা ঘুরে গেল। চিন্তায় পড়লেন তাঁরা কী উপায়ে এখন মানুষদিকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারা যায়। চোখ বুজে বসে পড়লেন সব। তখন দৈববাণী হল—বিশেষ একটি যজ্ঞ করলে অসুরদের এ-চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে মর্ত্যবাসীরা।

কী যজ্ঞ করতে হবে, কেমন ভাবে করতে হবে সে-বৃত্তান্ত দৈববাণী মারফতই জানা গেল।

দেবতারা যজ্ঞ করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ইন্দ্র আর অগ্নি উভয়ে মিলে মন্ত্রোচ্চারণ করে আহুতি দিলেন যজ্ঞে। ফলে অসুরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হল, খাদ্যশস্যের মধ্যে যে-বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল তা উবে গেল।

মর্ত্যবাসীরা এবার খাদ্যশস্য মাঠ থেকে ঘরে তুলে আনতে লাগলেন। নতুন খাদ্যশস্য ঘরে তুলে এনে পর নতুন অন্ন তৈরি করে সর্বাগ্রে তাঁরা নিবেদন করলেন ইন্দ্র আর অগ্নিদেবতাকে। নতুন অন্ন নিয়ে উৎসব করা হল, প্রতিপালিত হল নবান্ন-উৎসব। তারপর সেই নবান্ন মুখে তুললেন মর্ত্যবাসীরা।

•

আচ্ছা, ঘুম থেকে উঠেই গন্ধ পান একটা? কেমন একরকমের ভেজা-ভেজা মিঠি-মিঠি গন্ধ?

রস জ্বাল দিচ্ছে ময়রারা। মহলে মহলে রস ফুটছে টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ করে—খেজুর-রস।

এখন যে-রসটির সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি—তা হল পিঠে-রস। কিন্তু আসকে-পিঠা কি আর একটা পিঠা! চোখ বুজেই খায় একে সব—কোঁচড় কেউ শুনে না। সুতরাং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আমিও শুনছি না।

ওরা কাজ করে [শিল্পী । অমল সেনগুপ্ত

বিদেশী

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কালের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলে ঘড়ির কাঁটা ঘোরে।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের রঙীন পাতাগুলি একে একে ঝরে যায়। তাকিয়ে দেখি, আবার যে মাস এসে গেছে।

—সহরের বাতাসে উদ্দীপ্ত উত্তাপ,—মনের অন্দরে হিমালয়ের হিমেল হাওয়া।

চরণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। দূর-দূরান্তের দুর্নিবার আকর্ষ পথে টানতে থাকে।

তবুও, আমার প্রবাস-যাত্রার প্রস্তুতির লক্ষণ নেই।

বন্ধু-বান্ধব আসেন। প্রশ্ন করেন, একি! এবার এখন এখানে? হিমালয়ে যাওনি?

আশ্চর্য হয়ে দেখি, এঁরা আশ্চর্য হন আমি গেলেও, না-গেলেও।

উত্তর দিই, যাবো বইকি। সময় হলেই যাবো। এবার যাত্রা করব ভাদ্র-আশ্বিনে—আগস্ট-সেপ্টেম্বরে।

এর বিশেষ কারণ আছে।

হিমালয়ে উত্তরাখণ্ডে যতবার ঘুরেছি, তখন মে-জুন মাস। সে-সময় কয়েকটি গন্তব্য-স্থলে ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হয়নি। কেননা, তখন যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে-সব দুর্গম স্থান বছরের সে-সময়ে তখনও তুষার-আবরণ মোচন করে না। গ্রীষ্মের খরতাপে বরফ ক্রমে গলে যায়, তারপর বর্ষা-শেষে কিছুদিনের জন্তে সেখানে পথ-চলাচল খানিকটা সম্ভব হয়ে ওঠে।

যেন, সে-সব অঞ্চলে প্রকৃতিদেবীর মানব-লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সেইমাত্র স্বল্পপরিসর অবসর।

তাই, পাহাড়ী বন্ধুরা পরামর্শ দেন, চলে আসুন এবার 'ভাদর-আশিনে', তখন যাবেন ও-সব দিকে। আস্মান্ বিল্কুল সাফ্ থাকবে, বরফও গলে যাবে, চারদিকে সব ফুল ফুটে থাকবে—নানান্ কিসিম্ ফুল;—কমলফুলের বাহার দেখবেন—সূর্যকমল, রুদ্রকমল, ব্রহ্মকমল,—দেবতার পূজার সেই-ই তো ফুল।

কথায় উৎসাহের উৎস-পথে ফুলের সুবাস যেন ভেসে আসে, মন আগ্রহে আকুল হয়ে ওঠে।

বদরীনারায়ণের সাধারণ যাত্রাপথ ছাড়িয়ে হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে সেইসব নির্জন পথে যাওয়াই এবার উদ্দেশ্য।

তাই, যেখানে যাত্রীর যাত্রার সারা, আমার হবে সেখানে যাত্রার সুরু।

২

হরিদ্বার থেকে ১৬ মাইল দূরে হৃষীকেশ। বাস্-ও চলে, ট্রেন-ও যায়। হৃষীকেশের পর হিমালয়ের পাহাড় সুরু। ১৩৫ মাইল দূরে পিপুলকোটি। বদরীনারায়ণের পথে এই পর্যন্তই এখন বাস্ চলাচল। তারপরে হাঁটা-পথ। বাস্ চলার সুবিধা হয়েছে যাত্রীদের নানান্ দিকে। এই সুদীর্ঘ পথ এখন বাস্-এ বসেই চলে যায়। দু'দিনেই পথ ফুরায়। পথ-চলার শারীরিক ক্লান্তি নেই। চটীতে অনভ্যস্ত জীবন-যাত্রার পাটও সংক্ষিপ্ত হয়। এখন ইচ্ছা করলে কলকাতা থেকে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই কেদার-বদরীর যাত্রা সাঙ্গ করে ফেরাও সম্ভব হয়। তা ছাড়া, এই বাস্-পথ-এর প্রায় সব স্থানই বিশেষ গরম। অর্থাৎ, মে-জুন মাসে। নদীর ধারে ধারে পথ। ছায়া-বিরল। দু'দিকে উঁচু পাহাড়। গ্রীষ্মের খরতাপে পাথর তাতে। বাতাসও তপ্তশ্বাস হানে। হিমালয় যেন ধুনি জ্বালিয়ে তপস্যায় বসেন। এখন বাস্-এ বসে নিমেষে সে-পথ নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু, পরিপূর্ণ সুখ কোথাও সম্ভব নয়। যাত্রী-সংখ্যার অনুপাতে বাস্ কম। তাই স্থানাভাবে বাস্-এর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে হয়। কোথাও বা অতিরিক্ত রাত্রিবাসও। বিশেষ ব্যবস্থা করে টিকিট-কাটা-প্রথার প্রচলনও হয়। সভ্যতার যান চলাচলের অনুকম্পায় পাহাড়ীরা চতুর হতে শেখে। বাস্-এর ভিতর ঠেলাঠেলি ভিড়। তার মধ্যে অনেকেই পাহাড়-পথে মোটর চড়ার অনভ্যস্ত। বিশেষতঃ, পাহাড়ীরা। তাদের মাথা ঘোরে, গা গুলায়। তারপর, যা হবার তাই হয়। সহযাত্রীর অভিযোগ করার উপায় নেই, করে লাভও নেই, শান্তিও নেই। অসুস্থ যাত্রীর তখন এমনি করুণ কাতর অসহায় ভাব!

ভাবি, পায়ে-হাঁটাই এ-পথের সত্যকার যাত্রা। ধরণীর ধূলি-ধূসরিত চরণে মনে অনন্ত আনন্দ আনে; পথের সঙ্গে পথিকের প্রকৃত পরিচয় ঘটায়। তবুও, বাস্-এর পথে হেঁটে চলার প্রেরণা পাই না। শুধু, অতি-দরিদ্র যাত্রী অথবা অতি-ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসী এখনও হৃষীকেশ থেকে হাঁটা-পথের পথিক হন।

পিপুলকোটি থেকে হাঁটা-পথে বদরীনাথ মাত্র ৩৫ মাইল। বাস্ আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলেছে। পাহাড়ের বুক চিরে পথ আরও কয়েক মাইল তৈরিও হয়েছে; বিরাট অজগর সাপের মতো পাহাড়কে আঁকড়ে ধরার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু, এখনও ব্যর্থ সে-উদ্যম। মানুষ পাহাড়ের পাথর কেটে, সেই পাথর দিয়েই পাহাড়ের পথ তৈরি করে, প্রকৃতি অট্টহাস্যে একমুহূর্তে সে-পথ ভেঙে-চুরে ধূলিসাৎ করে দেয়।

গতবছর মে-জুন মাসে যে-পথ দেখে গিয়েছিলাম প্রশস্ত রাজপথ, সভ্যতার যান চলাচলের ভার নিতে প্রায় প্রস্তুত, বর্ষার পর এখন গিয়ে দেখি—জীর্ণ-শীর্ণ ক্ষত-বিক্ষত তার দেহ, পাহাড়-ধসার ফলে বহু জায়গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পিপুলকোটি থেকে মাত্র আট মাইল দূরে পাতালগঙ্গা। কয়বছরের চেষ্টাতেও বাস্‌-এর পথ এখনও পাতালগঙ্গার পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম করতে পারেনি,—এমনি ভঙ্গুর ভাবের সে-পাহাড়!

তবুও, মানুষের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ডিনামাইটের প্রচণ্ড শব্দ ওঠে। প্রতিধ্বনিতে প্রকৃতির অট্টহাস্যও দ্বিগুণ হয়। পাহাড়ে মানুষে যেন যুদ্ধ চলে।

আগামী বছর যোশীমঠ পর্যন্ত নিশ্চয় বাস্ চলবে,—অনেকে আশা করেন।

কেহ বা আবার আশঙ্কা করেন, বলেন, যতদিন না চলে ভালোই। বাস্ চলাচলের সুবিধা আছে ঠিক। কিন্তু, শুধু বাস্-ই তো আসবে না, আনবে তবে অশান্তির ভার, সভ্যতার সহস্র সমস্যা—যেমন বন্যার স্রোতে ভেসে আসে অজস্র জাল-জঞ্জাল।

আশা-আশঙ্কায় পাহাড়ীদের উন্মুখ মন আলো-ছায়ার আলপনা আঁকে।

কয়বছর আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ে।

তখনও কলকাতাতে। কেদার-বদরী-যাত্রার উদ্যোগ করছি। এক পরিচিত ভদ্রলোক এলেন। তাঁরও যাবার বিশেষ ইচ্ছা। যথারীতি উৎসাহ দিই। তিনি প্রস্তুতও হন। প্রশ্ন করেন, কী কী জিনিস সঙ্গে নেবো বলুন তো?

ঠিক এমনি সময়ে পাণ্ডা শ্রীহর্ষপ্রসাদজি এসে হাজির। তাঁকে দেখেই বলি, এই যে আসল লোক এসে গেছেন, ইনিই সব পরামর্শ দেবেন।

পাণ্ডাজি-নতুনযাত্রী পেয়ে খুশী। নতুনযাত্রীও পাণ্ডার আশ্বাসবাণী শুনে নিশ্চিন্ত। দুজনে পরামর্শ চলতে থাকে। পাণ্ডাজি গাড়োয়ালী হলেও বাঙালী। বাংলাদেশের সঙ্গে বহুদিনের সম্বন্ধ। পরিষ্কার বাংলা বলেন।

নতুন যাত্রীটি স্টেনো-টাইপিস্ট। সঙ্গে-নিয়ে-যাবার জিনিসপত্রের নাম বলে যাচ্ছেন পাণ্ডাজি, আর তিনি শর্টহ্যাণ্ডে লিখে চলেছেন। অল্পেই তালিকা শেষ হল। ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, এই তাহলে! বিশেষ কিছুই তো নয় দেখছি। বোলে, আবার তাঁর ফর্দের উপর চোখ বুলিয়ে হঠাৎ বললেন, হাঁ, ধরেছি। একটা জিনিস আপনি বাদ দিয়ে গেছেন! সেটা লিখে নিই।

বিচক্ষণ পাণ্ডাজি আশ্চর্য হন। জিজ্ঞাসা করেন, কী বাদ দিলাম? সবই তো বলেছি মনে হচ্ছে।

তিনি উত্তর দেন, একটিন ঘি। শুনেছি ওখানে ভালো ঘি পাওয়া যায় না।

শুনেই পাণ্ডাজি হাঁফ ছাড়েন। গম্ভীর হয়ে বলেন, ওঃ!—নাঃ, ঘি নিয়ে যাবার দরকার হবে না, ওটা আপনি ওখানে পাবেন। তবে, আপনি ঠিকই বলেছেন, একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। সেটা হলো—বনস্পতি-তেল। আপনারা তো বনস্পতিই খান, সেটা ওখানে পাবেন না। পাবেন ঘি, তা হয়ত অনভ্যাসে পেটে সইবে না। সঙ্গে এক-টিন বনস্পতি নেবেন।

মাত্র বছর পাঁচেক আগেকার কথা। সেদিন পাণ্ডাজি বিদ্রূপচ্ছলে কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু, কয়বছরেই চোখের উপর দেখলাম, এ-যাত্রাপথে যতদূর বাস্ গেছে এখন সর্বত্রই বনস্পতির প্রচলন। কচিৎ কখনো দু-একটা দোকানে 'বিশুদ্ধ ঘি'-এর তৈরী খাবারের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়—যেমন কলকাতা সহরেও। সহরবাসীদের মতন যাত্রীরাও অনেক সময়েই সেগুলি সন্দেহের চোখে দেখেন।

দুর্গম হিমগিরি বাস্-পথের অগ্রগতি অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু, বনস্পতির গতিপথের এখন আর রোধ নেই। বাস্-পথ অতিক্রম করেও চলেছে!

বাস্-এর পথে পিপুলকোটির দশমাইল আগে চামোলী। চামোলীর অপর নাম লালসাঙা। এখানে অলকানন্দার উপর যে পুল আছে, এককালে তার রঙ ছিল লাল। তাই, চামোলী সেই লালরঙের ছোপ নিয়ে নিজের নতুন রঙীন নাম নিল—লালসাঙা! চামোলী ও পিপুলকোটির মাঝপথে অলকানন্দার সঙ্গে বিরহী-গঙ্গার সঙ্গম। পাহাড়ীরা বলে 'বিরেহী'। ম্যাপ-এও সেই নাম দেখি। সঙ্গমের কিছু দূরে বাস্-এর পথে বিরহী-নদীর উপর পুল। পুল পার হয়ে আবার অলকানন্দার কূল ধরে বাস্ চলে যায় পিপুলকোটি—পাঁচ-মাইল মাত্র দূর।

পুলের কাছে আমরা বাস্ ছেড়েছি। গন্তব্য-স্থল বিরহী তাল। সাহেবরা বলতেন, গোণা-লেক। এখান থেকে নয় মাইল পথ। বিরহী-নদীর উপত্যকা দিয়ে যেতে হবে। এ-পথে গ্রীষ্মকালেও যাবার কোনো বাধা নেই।

হিমালয়ের অন্তর, যেন, মানুষের অন্তর।

অন্তরে স্থান পেতে হলে প্রীতি-ভক্তি-প্রেমের ধারা ধরে

[illegible]তে হয়। হিমালয়ের অন্দরে পৌঁছুতে হলে তেমনি গিরি-নির্ঝরিণীর গতিপথ ধরে অগ্রসর হতে হয়। তুষার-শিখর থেকে পার্বত্য নদী আপন বেগে ধেয়ে নামে। নদীর প্রবল প্রবাহে পাথর কাটে, পাহাড় ধসে—নদী তার পথ খুঁজে নেয়। নদীর সেই প্রবাহ-পথ অনুসরণ করে পথিকেরও পথ-চলা শুরু হয়।

বিরহী-নদীর ধারা ধরে আমরাও চলেছি।

৩

ক'দিন আগে হেমকুণ্ডের পথে পরিচয় হয়েছে বন-বিভাগের একজন অফিসরের সঙ্গে। তিনিও চলেছেন একই সঙ্গে। ভালোই হয়েছে। এ-সব অঞ্চলে তাঁরাই রাজা। প্রবল প্রতিপত্তি। হবার কথাও। সঙ্গে দুজন চাপরাশী আছে। পুলের কাছে এ-অঞ্চলের রেঞ্জারবাবুও এসেছেন। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী। যে ক'দিন তাঁর এলাকায় অফিসর থাকবেন, তিনি-ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, চলবেনও।

অফিসরটির পদমর্যাদা আছে। তাই, সে-গৌরবের ভারে ভারাক্রান্ত হবার কথা। কিন্তু, আগেই পরিচয় পেয়েছি তা তিনি নন। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে এ-পথে চলতে প্রস্তুত হয়েছি। তাতে আমাদের সুবিধাও হয়েছে। এ-পথে লোক-চলাচল নেই, পথের নিশানাও নেই। এখানে একজায়গায় একটা গ্রাম আছে। তাও, শোনা কথা। কেননা, সে-গ্রাম পাহাড়ের উপরে, পথ থেকে দূরে। তাই, চোখে পড়ে না। গ্রামবাসীদেরও এ-পথে যাতায়াত করার প্রয়োজন হয় না।

বিজন পথে একাকী পথ চলায় আমার ভয় নেই। গহন বনের মধ্যেও নয়। কেন জানি না, নিবিড় নির্জন অরণ্যে আলোছায়ার আবছায়া পথে পথে একা ঘুরেছি, তবু মনে ছমছমে ভাব আসেনি। অপার আনন্দই পেয়েছি। বিরাট বনস্পতির শান্ত-ছায়ায় শ্রান্ত কায়া আশ্রয় পেয়েছে, তরু-লতার শ্যামল শোভা নয়নে স্নিগ্ধতা এনেছে। বনের পশুর হিংসার কথা মনে জাগেনি। কেননা, এত ঘুরেও তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হওয়ার ভাগ্য কচিৎ-ই হয়েছে।

কিন্তু, এখানে পথের নির্দেশ না থাকায় পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল। এঁরা থাকায় সে-অভাব মিটেছে।

অফিসরটি নতুন। নতুন এসেছেনও এ-পথে।

লম্বা, দোহারা চেহারা। সাহেবী পোশাকে আরও লম্বা মনে হয়। ফরসা রঙ। বয়স অল্প।

নাম অমরনাথ।

বলে, গতবছর চাকরিতে যোগ দিয়েছি। প্রথমেই গাড়োয়ালে পাঠিয়েছে। ভালোই হয়েছে। হিমালয় আমার ভালো লাগে।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাহলে গাড়োয়ালী নয়।

আমার কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে বোঝে। নিজেই বলে, পাহাড়ে আমার বাড়ি নয়, তবে পাহাড়-ই আমার এখন ঘর-বাড়ি। বনে-জঙ্গলে ঘোরাই হলো আমার কাজ। দেশ যশোর। পড়াশুনা করেছি আগ্রায়। এম্.এস্‌সি. পাস করে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিলুম, পাসও করলাম। গভর্নমেন্ট থেকে জানতে চাইলো, পুলিসে বা বন-বিভাগে কোথায় যোগ দিতে চাও? জানতাম, পুলিসের চাকরিতে পয়সা বেশী, প্রতিপত্তিও প্রচুর। তবুও, বন-বিভাগই বেছে নিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? এখানে তো বনে জঙ্গলে বাস? সমাজ-সভ্যতা-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন তো এ-জীবন?

শান্ত-স্বরে জবাব দেয়, তারি মধ্যে তো অপার আনন্দ। প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃত পরিচয়—এমন সুবর্ণ-সুযোগ আর কোন্ চাকরিতে আছে বলুন?

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। চারিদিকে স্নিগ্ধ-দৃষ্টির প্রলেপ বুলিয়ে নেয়। উচ্ছল নদীর চঞ্চল জলধারায়, উজ্জ্বল আকাশের নিবিড় নীলিমায়, গহন বনের বন-শ্যামলিমায় মগ্ন হয়। 'চক্ষুর্ভিরিব পিবন্তি'—সত্যই চোখ দিয়ে প্রকৃতির মনোলোভা শোভা যেন আকণ্ঠ পান করে নিতে চায়।

তারপর বলে, বদরীনারায়ণের পথে চাকরির প্রথমেই এসেছিলাম। কিন্তু, বিরহী-ডালের পথে আসা হয়নি। এখন ইন্‌স্পেক্‌শনে চলেছি। হ্রদের ধারের বোট-হাউসটি এবার বর্ষায় প্রায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল। জিনিসপত্রও কিছু নষ্ট হয়েছে। সেইসব দেখতে যাওয়াই উদ্দেশ্য। পথটাও দেখে রিপোর্ট দিতে হবে। যে-পথে চলেছি আমরা, সেটা এইবছরেই প্রথম তৈরি হয়েছে। নইলে, পথ বলতে বিশেষ কিছু ছিলই না। এ-বছর এক মিনিস্টারের আসার কথা ছিল, তাই খুব তাড়াতাড়ি রাস্তা তৈরি হলো। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তাঁর আসা হলো না—আপনারাই ভোগ করে গেলেন।

পথ-তৈরির পরিচয় পথ-চলায় মাঝে পাচ্ছি বটে।

আবার অনেক সময় দেখছি, পথ নেই-ও। সে-সব স্থানে পাহাড় ধসে গেছে, পথও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানে, যদি সম্ভব হয়, নদীর মধ্যে নেমে জলের পাশে ছড়ানো পাথরগুলির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছি। যেখানে আবার নদীর দুরন্ত স্রোতের মধ্যে পাহাড়ের ধস্ খাড়া নেমে গেছে, নীচে নামা সম্ভব নয়, সেখানে পাহাড়ের কিছু উপরে উঠে সে-সব স্থান কোনরকমে অতিক্রম করছি।

অমরনাথ বলে, পাহাড়ে প্রথম বছরের নতুন পথই সবচেয়ে বেশী ভাঙে। যেমন মানুষ প্রথম হাঁটতে শিখে বেশী পড়ে। এর বৈজ্ঞানিক কারণটিও সহজ। ভূতাত্ত্বিকের মতে হিমালয় এত বিরাট হলেও, সৃষ্টির জগতে ছেলেমানুষ। এখনও সম্পূর্ণ গড়ে ওঠেনি। এ-সব পাহাড়ের পাথর ও মাটি সব জায়গায় শক্ত হয়ে দানা পাকায়নি। নতুন পথ তৈরির ফলে পাহাড়ের ভারসাম্যের হেরফের হয়, হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করে গিরিরাজ ধস্ নামিয়ে দেন, পথরেখাও নিশ্চিহ্ন হয়। অথচ, এই পথ তৈরি করতে কম কাঠ-খড় আমাদের পোড়াতে হয়েছে? খরচ তো আছেই। তার কথা বলছি না। কিন্তু, গভর্নমেন্টের কোন্ বিভাগ থেকে সেই খরচা হবে তারই সমাধান হতে ক'বছর কেটে গেল।

তারপর, আশপাশের জঙ্গলগুলি দেখিয়ে বলে, সাধারণের ধারণা চারিদিকের সব জঙ্গলই বন-বিভাগের অধীনে। কিন্তু আশ্চর্য হবেন শুনে যে, এর মধ্যে অনেক বড় বড় জঙ্গলই বন-বিভাগের তত্ত্বাধীনে নয়।

প্রশ্ন করি, বন বন-বিভাগে নয়, সে কী ব্যাপার?

অমরনাথ দুঃখ করে বলে, কিন্তু তাই তো চলে আসছে। কবে কোন্ কারণে ইংরাজ-আমলে বড় বড় বনগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য-বিভাগের অধীনে রাখা হয়েছিল। এখন সেভাবে রাখার কোনও কারণই নেই, তবুও সেইভাবেই চলেছে। অনেক লেখালেখির পর এবার শুধু এই পথটুকু তৈরি করবার ভার বন-বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। মিনিস্টারের আসার সম্ভাবনায় তৈরির কাজও অনেকটা এগিয়েছিল। এখন সব বন্ধ।

হঠাৎ সোৎসাহে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ভালো কথা। মাছ খান তো?

এই আকস্মিক অবান্তর প্রশ্নে আশ্চর্য হই।

বলি, হঠাৎ এ-কৌতূহলের কারণ কি? কথা হচ্ছিল তো পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, পথ-তৈরির ব্যাপার নিয়ে। মাছ এলো কোথা থেকে?

হেসে উত্তর দেয়, বাঃ! চলেছেন সোণা-লেকে, আ ও-প্রশ্ন করব না? যারা ওখানে যায়, তারা সবাই তো মাছ ধরতে ও মাছ খেতেই যায়। ওখানকার ঐ তো মস্ত স্পোর্ট। তারই জন্যে ও-লেকের প্রসিদ্ধিও।

বললাম, তুমি খাও তো? মুখ বোজো, খেয়ো।

সে বলে, মাছ আমিও খাই না। শুনেছি, সাহেবরা ওখানে ট্রাউট্ মাছ ছেড়েছিল। এখনও মাঝে মাঝে ধরা হয়। বিলেতী মাছ, একটামাত্র কাঁটা, খেতে সুস্বাদু। টাটকা, তাজা বলে ওরা নাকি খাবে ভালো।

হেসে বললাম, ভালো মানে মৎস্যাশীর লোলুপ দৃষ্টিতে খাবে ভালো। যেমন, কচি ঘাস খাইয়ে অতি-যত্নে পোষা কচি-তাজা ছাগ-শিশু।

মনে পড়ল, কয়বছর আগে পাঞ্জাবে কুলু-ভ্যালিতে ট্রাউট্-মাছের চাষ দেখেছিলাম। বিয়াস্-নদীর অর্থাৎ বিপাশার উপত্যকা। ঘননীল জল। স্ফটিক-স্বচ্ছ। তরঙ্গোচ্ছল। পাথরে আঘাত পেয়ে জলস্রোত সাদা-সাদা ঢেউ-এর পাল তুলে চলেছে। কোথাও বা নদীর স্রোত বহু ধারায় বিভক্ত হয়েছে, ছোট ছোট দ্বীপের সৃষ্টি করেছে নদীর ধারেই পাইন ও চীর্ গাছের বন। জলের একটি ধারাকে সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই ধারার পথে মাঝে মাঝে বাঁধানো চৌবাচ্চা সেখানে জল জমে, আবার বয়েও যায়। সে-সব জলাধারের দুই মুখে ছোট ছোট দুয়ার। প্রয়োজনমতো সেগুলি খোল বা বন্ধ করা যায়, জলের গতিবেগ সংযত করা হয়। তা মধ্যে বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন আকারের মাছ। কোন্‌টিতে কত বছর বয়সের মাছ আছে, পাশেই সাইন-বোর্ডে লেখা।

শিখ-অফিসারটি আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

মাছ বিক্রিও হয়। আমার সঙ্গীরা কিনতে উৎসুক হলেন।

সবচেয়ে বড় মাছগুলি যেখানে আছে সেখানে দাঁড়ি অফিসারটি বললেন, হাত দিয়ে আপনারা নিজেরাই ধর পারেন, কোনো ভয় নেই।

যতীনবাবু মৎস্যাশী। তবুও, মাছ ধরার উৎসাহ ধৈর্য তাঁর কোনকালে নেই। মাছ-ধরার এমন সহ সুযোগ পেয়ে চৌবাচ্চার পাশে ধপ্ করে বসে পড়ে তি জলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। একটি বিশেষ মাছের উপর তাঁর লোলুপ দৃষ্টি। অনেক কষ্টে সেটি ধরলেনও। হাতে

মুখো মুঠো করে ধরেছেন। ধরেই আমাদের দিকে উৎফুল্ল নয়নে তাকালেন। মুখে বিজয়ী বীরের জয়োল্লাস। কিন্তু, নিমেষে মাছটা হাত থেকে সড়াৎ করে পিছ্‌লিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। 'এই পালালো'—বলে যতীনবাবু চীৎকার করে উঠলেন।

শিখ ভদ্রলোকটি কিন্তু দেখলাম খুব খুশী। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন।

বললেন, ভালোই হয়েছে। অপর আর একটি ধরুন। আপনার উৎসাহ দেখে বাধা দিতে পারছিলাম না—ওটি মৎস্য-নারী, ওগুলি ধরার এখানে নিয়ম নেই। অত মাছের মধ্যে ঠিক ঐটিই আপনি বেছে ধরেছিলেন!

সবাই আমরা হেসে উঠি। যতীনবাবুও। বললেন, আমার ভাগ্যই এইরকম!

সেই দেখেছিলাম ট্রাউট্‌-চাষ।

কিন্তু, গাড়োয়ালে—উত্তরাখণ্ডে—এ-চাষ হলো কি করে? এ যেন মন্দিরে মৎস্য-ভোগ!

মায়ের মন্দিরে, মায়ের অনুচরদের জন্যে, হয়ত নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু, এ তো শিব-স্থান!

এরও কারণ আছে।

বিরহী-তাল প্রাকৃতিক হ্রদ নয়। আবার মানুষের সৃষ্টিও নয়। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার মধ্যে এর জন্ম-কাহিনী।

বিরহী-গঙ্গার পৌরাণিক প্রাচীনত্ব আছে। সতীর দেহাবসানের পর বিয়োগ-বিধুর শঙ্কর এই তরঙ্গিণীর তটে বসে নিদারুণ তপশ্চর্যা করেন। সেই তপস্যার তপোফলে দেবী চণ্ডিকা পার্বতী-রূপে আবার অবতীর্ণা হন—এই পুরাণকাহিনী। বিশ্বের ঈশ্বর তিনিও বিরহ-কাতর। সেই বিরহী শিবের বিগলিত অশ্রু পূতধারায় পুষ্ট হয়েই নদীর নামকরণ হলো বিরহী-গঙ্গা। পরমপাবনী নদী। 'ব্রীহিকা নাম বিখ্যাতা'।

শুনেছি, এ-অঞ্চলে কোথায় বিরহীশ্বর শিবের মন্দিরও আছে।

কিন্তু, বিরহী-হ্রদের সে ঐতিহ্যময় গরিমা নেই, পুণ্যের মাহাত্ম্যও নেই। তবে, প্রসিদ্ধির ভৌগোলিক কারণ আছে।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। এক গভীর রাত্রে হঠাৎ গোণা-গ্রামের নিকটে এক বিরাট পাহাড়ের অর্ধাংশ ভেঙে পড়ে। সেই ধসে-পড়া পাহাড়ের বিপুল স্তূপে নদীর গতিপথ সম্পূর্ণ রোধ করে ফেলল। ফলে, নদীর জল ক্রমে জমতে থাকে এবং একটি বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। মাসের পর মাস নদীর জল সেখানে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে জমতে লাগল, অথচ সে-জল নিকাশের কোনো পথ নেই। কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, জল-নিকাশের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। অবশেষে, এগারো মাস পরে সেই ক্রম-প্রসারমান্‌ বিপুল বারিরাশি আত্মশক্তির প্রভাবে নিজেই এ-সমস্যার সমাধান করে নিল,—প্রচণ্ড বেগে সেই স্তূপের বাঁধ ভেঙে এক ক্ষুরধারা নদী নেমে এলো। সংহারিণী তার মূর্তি, সর্বগ্রাসিনী তার শক্তি। দেবী চণ্ডিকা বুঝি আবার কলিযুগে প্রচণ্ড নদী-রূপেই নেমে এলেন!

'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'।

প্রবল বন্যায় চারিদিক ভেসে গেল। অলকানন্দাও সে-জলভারে স্ফীত হলো। গাড়োয়াল-রাজধানী শ্রীনগরের শ্রী লুপ্ত হলো, নগর ধ্বংস পেলো। হরিদ্বারের ঘাট-দেশেও সে-বন্যার নির্মম, ক্রুদ্ধ আস্ফালন আঘাত হেনেছিল। এখনও সে-সব দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী লোকমুখে শোন যায়।

ধ্বংসলীলা সাঙ্গ ক'রে নদী শান্ত হলো। অবরুদ্ধ নদী মুক্তিপথের সন্ধান ফিরে পেলো।

তাই, আজ দেখি তার উচ্ছল জলধারায় সহজ সুন্দর গতিবেগ। নৃত্যছন্দে ছুটে চলেছে।

হ্রদের জল কিন্তু কমে গেলেও, থেকে গেল।

হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে পাহাড়-ঘেরা হ্রদ, সাহেব-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সুইজারল্যাণ্ডের স্বপ্ন-বিলাসী সৌন্দর্য-পিয়াসী মন নিয়ে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে চলে এলেন এখানে। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। আনন্দ-ভোগের লিপ্সা জাগল। জলে মাছ ভাসল, নৌকা চলল, তীরে বোট-হাউস তৈরি হলো।

স্বাধীনতার পর এখন সাহেবরা বিরল। তবুও যে-ক'জন আছেন তাঁদের মধ্যেই জনকয়েকের এখনও গোণা-লেকে আনাগোনা। আর যান সরকারী কর্তৃপক্ষের কয়েকজন যান।

কিন্তু, সে-মাছধরার মৎস্যলক্ষী গল্প ভালো লাগে না।

হিমালয়ের বিরাট সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে মন চায়।

অমরনাথের হালকা শরীর। যেন হাওয়ায় ভেসে-ভেসে সে চলে। অত দ্রুত চলা আমার স্বভাব নয়। তাকে বলি, তুমি এগিয়ে চলো। আমি ধীরে ধীরে যাবো। ভয় নেই, পথ ভুলবো না; পিছনে তো তোমার চাপরাসীরা আসছে।

সে এগিয়ে চলে তার বেয়ারার সঙ্গে কথা কইতে-কইতে। পথের দু'পাশের গাছের পাতা দেখে, ফুল দেখে, টেনে ছেঁড়ে, গন্ধ নেয়—গাছের নাম বলে দেয়। বেয়ারাকে কখনও বা প্রশ্ন করে, তোমাদের ভাষায় একে কি বলে?

আমায় ফিরে ফিরে বলে, এদেরও একবছর এসব বিষয়ে পড়তে হয়েছে, ট্রেনিং নিতে হয়েছে।

গাছ, ফুল, পাতা—বন জঙ্গল—সবাই যেন জানতে পারে এসেছে তাদের বন-কর্তা। তাদের জন্ম-পরিচয়, নাড়ী-নক্ষত্র তার নখ-দর্পণে।

আমার মন, কিন্তু, আনমনা।

আমি পেছিয়ে পড়ি। ইচ্ছা করেই,—আরোও। একা চলায় আনন্দ অনেক। একা তো নয়,—নিজেকেই নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া, চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, আবার নিজের মনোমুকুরে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি দেখা। এ যেন অজ্ঞাত অন্তরলোকের সঙ্গে এক অচিনের লুকোচুরি-খেলা।

বন-পথ। বিশাল সব বনস্পতি। তারি ফাঁকে ফাঁকে নীচের খাদে নদীর নীল-ধারা চোখে পড়ে। উপরে সবুজ পাতার জাফ্রি-ফাঁকেও দেখা যায় ফালি ফালি নীল আকাশ। গায়ে লাগে হেমন্তের প্রশান্ত বাতাস। সকালের রোদে চারিদিক ঝলমল্ করে। বর্ষার পর প্রকৃতির শুচি-স্নিগ্ধ স্নান-ধোয়া। যেন স্নান সেরে পুষ্পসাজ হাতে জননী বসুন্ধরা স্মিত-বদনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।

বাড়িতে দুর্গাপূজা। মা নিজের হাতে সব ভোগ রাঁধেন। আর কেউ রাঁধলে চলবে না। বলেন, সাহায্য করতে হয়, তরি-তরকারি এগিয়ে দাও। ঐ পর্যন্ত।

ভোরে স্নান সেরে গরদের লালপেড়ে শাড়ি পরে রান্নাঘরে ঢোকেন।

মাথায় চূড়া করে চুল বাঁধা, খুলে গেলে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পড়ে। মুখের রক্তিম আভা আগুনের তাপে আরও রাঙা হয়ে ওঠে। উনুন তো একটা নয়, সারি সারি কতটা জ্বলছে, সব-কটিতেই রান্না চড়েছে। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখি, আমার মা তো নন—জগজ্জননী দশভুজা। হাতে দশ-প্রহরিণী নয়, রন্ধনের দশ প্রকরণ। আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা যেন দশ-হাতে রন্ধন করছেন।

একটু দূরেই পূজামণ্ডপ। নিজেই ভোগ বয়ে নিয়ে যান। প্রকাণ্ড সব থালা। ভারে দেহ নত হয়েছে। মাথায় ঘোমটা। বাড়ির অন্দরমহল; তবুও লজ্জা। বলেন, পুরুতঠাকুর রয়েছেন যে!

নীচের ঠোঁট দিয়ে উপরের ঠোঁট চেপে ধরেন। হাওয়ায় ঘোমটার কাপড় অল্প ফাঁক হয়। তারি মধ্যে দিয়ে আড়চোখে দেখে পা ফেলে চলেন।

আমরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখি। শুচি-স্নিগ্ধ মায়ের রূপ। রূপের ছটা যেন ঠিক্‌রে পড়ে। ভাইবোনে বলাবলি করি, দেখেছ,—মায়ের মুখখানি ঠিক প্রতিমার মুখ-বসানো—একেবারে।

কথা শুনে মা রাঙা-মুখে চোখ রাঙান। ঠোঁটের কোণে মিষ্টমধুর হাসি,—বলেন, ছিঃ! বলতে আছে! আমার-সে কাজের সময়। ছুঁবি নাকি!

ছেলেবেলার সে-ছবি ভোলবার-নয়। আজ প্রকৃতির রূপের মাঝে সেই ছবিরই প্রতিচ্ছবি দেখি। চারিদিক শুচি-স্নিগ্ধ সুসজ্জিত সুন্দর।

অনাবিল আনন্দে মন ভরে ওঠে।

পথ চলেছি। ধীরে ধীরে। চলায় কষ্ট নেই। পথ-শ্রান্তিও নেই। কেননা, দুরারোহ চড়াই-এর অকস্মাৎ-আঘাত-ও নেই।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে-আসা ঝরণা-ধারা পথের স্বচ্ছন্দ গতি অবরোধ করে। পুল নেই। ছোট-বড় ঝরণা। ছোট ধারাগুলি পার হওয়ার অসুবিধা নেই। জলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত পাথর। সেইসব পাথর দিয়ে

জলের ধারা ছুটেছে। মাথা-উঁচু-করা পাথরগুলির উপর পা রেখে ডিঙিয়ে জল পার হই।

বড় ধারাগুলিরও জলের ভিতর নানান্ আকারের পাথর। কিন্তু, পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফিয়ে যাওয়া সব জায়গায় সম্ভব নয়। কোথাও বা সম্ভব হলেও সাহস ও শক্তির প্রয়োজন। সাবধানী মন কখনও বা সে-আত্মবিশ্বাসের অন্তরায় হয়। মনে ভাবি, অযথা সাহস প্রকাশের প্রয়োজন কি ?

পায়ের জুতা-মোজা খুলে ফেলি।

সঙ্গের পাহাড়ীরা বলে, কাঁধে উঠে পড়ুন, পার করে নিয়ে যাই।

হেসে বলি, কাঁধে চাপবার সময় যখন হবে, নিশ্চয় উঠব। কিন্তু, এ সময়ে নয়।

তারপর বলি, তোমরাও তো হেঁটেই পার হবে, তবে আমি-ই বা যাবো না কেন ?

সাবধান করে দেয়। বলে, তবে দাঁড়ান। চট্ করে জলে নামবেন না। জলের মধ্যে বড় পাথরগুলির কাছে কতখানি জল জানা নেই। কোমর-জলও কোথাও হতে পারে। ওপর থেকে দেখে বোঝবার জো নেই—এতো পরিষ্কার জল। আগে আমরা পার হয়ে দেখি কোন্খানে জল কম।

হাঁটুর উপর পায়জামার কাপড় তুলে একজন লাঠি-হাতে জলে নেমে পড়ে। ঘুরে-ফিরে দেখে বলে দেয় কোথা দিয়ে পার হব।

তারপর, আবার সতর্কবাণী। দাঁড়ান, জলের বড় টান। হাত ধরে চলুন।

সেইমতো যাই-ও। পায়ের তলায় জলের ভিতর কোথাও বা পিছল পাথর, কোথাও বা পায়ের জলশক্তি নদীর প্রবল প্রবাহ। হাত ধরে নিশ্চিন্ত মনে সহজেই পার হই। পাহাড়ী কর্মঠ কঠিন মুঠি। বন্ধুর পথে প্রকৃত বন্ধুর স্পর্শানুভূতির তৃপ্তি আনে।

দুই মাইল পথ চলে এসেছি। মাত্র তিন মাইল আর বাকি। বেলা এগারোটা বেজেছে।

অমরনাথ বলে, সামনে ঐ একটা-নদী দেখছি, বিরহী-নদীতে এসে মিশেছে। ওরই কাছে বসে কিছু খাওয়া-দাওয়া করা যাবে। তারপর একটু বিশ্রাম করে আবার চলা।

সঙ্গী শিশিরবাবু বল্লেন, বিশ্রামে প্রয়োজন কি ? মোটেই শ্রান্ত হইনি। দু'মাইল পথ দু'ঘন্টায় চলে এসেছি—বাকি তিন মাইলও এক ঘন্টায় যাবো। একেবারে যাত্রাপথ সাফ করে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

অমরনাথ হেসে বলে, অঙ্কের খাতায় পাতায় হাতের হিসাবে ওটা মেলে বটে, কিন্তু হিমালয়ের পাহাড়-পথে পায়ে ও-আঁক মেলে না। শুনেছি, সামনে কয়েক জায়গায় এখনও পথ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, কয়েক জায়গায় পাহাড়ও ভেঙেছে। এটুকু পার হতে সময় নেবে, একটু ক্লান্তিও হবে। তাই এখানে কিছু জল-খাবার খেয়ে নেওয়া ভালো। আমি অবশ্য একটানা চলতে প্রস্তুত—চলার অভ্যাসও আছে।

কারণ শুনে অকারণ ক্লেশভোগে সকলেই নারাজ হই। নদীর ধারে বিশ্রামের আশ্রয় খুঁজি।

বিস্তীর্ণ বালি-ভরা নদী। স্বর্ণকান্তি বালুকারাশির উপর জলধারার সুনীল জাল বোনা। বড় ধারাটির হাত দুই-তিন উপরে দু'খানা পাইনগাছের গুঁড়ি পুলের আকার ধরে শুয়ে আছে। তার উপর দিয়ে সাবধানে পার হলাম। পড়ার আশঙ্কা কম, ভয়ও করে না,—কেননা, পড়লে জামা-কাপড়ই ভিজবে, তার বেশী কিছু নয়।

জলের ধারে বালির উপর নানান্ আকারের পাথর। কালো বড়-বড় পাথরগুলি দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন অনেকগুলি প্রকাণ্ড কচ্ছপ নিশ্চল হয়ে রোদ পোহাচ্ছে।

দুটি সমতল পাথরের উপর পা ছড়িয়ে বসে আরামে বিশ্রাম করি। পাথরের পাশেই জলের ধারা।

কল্কল্ করে বয়ে চলেছে। স্ফটিক-স্বচ্ছ জল। জলের ভিতর সোনালী বালি চিক্চিক্ করে। ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। এদিক থেকে ওদিকে যায়, আবার চকিতে এদিকে ঘুরে আসে। নদীর দুই তীরেই পাহাড়ের ঢালু গা। ধীরে ধীরে বহু উপরে উঠে গেছে। দুইদিকেই গভীর বন। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের মাঝে [illegible] স্নিগ্ধ শোভা।

অমরনাথ অক্লান্ত। পরিশ্রমের শ্রান্তি জানে না। বিশ্রামের শান্তি মানে না।

এরি মধ্যে গাছের কয়েকটি বড় পাতা সংগ্রহ করেছে।

হেসে বলি, ওগুলি হবে কি ? বটানির স্পেসিমেন নাকি ?

সে-ও হেসে উত্তর দেয়, সায়েব-সৎকার নয়, অতিথি-সৎকারের আয়োজন হচ্ছে।

শিশিরবাবু নদীর জলে পাতাগুলি ধুয়ে নেন। পাথরের উপর বিছিয়ে দেন। অমরনাথের চাপরাসী খাবার-ভরা টিফিন-কেরিয়ার আনে।

অমরনাথ বলে, পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল আমার ঘর-বাড়ি। তাই এখানে আপনারা আমার অতিথি। আমার অকিঞ্চন আয়োজনে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা করছি।

আলুর সব্‌জি, রুটি ও মুগের ডালের লাড্ডু। অমৃত-ভোগের আস্বাদন পাওয়া যায়।

আহারান্তে ক্ষণিক বিশ্রাম। নদীর ধারেই গাছের নীচে সামান্য একটু ছায়া। সেই ছায়ায় স্নিগ্ধ প্রলেপ মেখে শ্রান্ত দেহখানি একটি পাথরের উপর এলিয়ে দিই। চোখে আলস্যের আবেশ আসে। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু জলধারার একটানা ছল্‌ছল্‌ শব্দ। সত্যিই যেন 'রৌদ্রময়ী রাত্রি'।

বৃহৎ মধুর স্বরধ্বনি তোলে জলতরঙ্গ।
প্রশান্ত প্রকৃতি মনে শান্তির পরিতৃপ্তি আনে।

কিন্তু, পথের আহ্বান পথিক-চিত্তকে সজাগ করে তোলে। আবার পথ-চলা সুরু হয়।

মাঝে মাঝে জঙ্গল। মানুষ-উঁচু ঘাস, ছোট ছোট গাছ। লাঠি দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে চলেছি। কখনও বা উন্মুক্ত বনপ্রান্তর। তারি বুকে আঁকাবাঁকা পথরেখা।

হঠাৎ একজায়গায় পথ-চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। পাহাড়ের মাথার উপর থেকে নেমে আসা প্রকাণ্ড একটা ধস্ পথের চিহ্ন কোথাও গ্রাস করেছে। খাড়া পাহাড়ের পা সোজা নদীর কূলে নেমে গেছে। অগ্রসর হবার উপায় নেই। পঁচিশ-ত্রিশ হাত নীচে নদীর ধারে নামতে পারলে, জলের ধারে ধারে বালি ও পাথরের উপর দিয়ে চলা যাবে বটে, কিন্তু নামা তো এখানে অসম্ভব বলেই মনে হয়।

মেজরবাবু বলেন, ভুলই হয়েছে। আর একটু আগে পথ ছেড়ে নদীর বুকে নামা উচিত ছিল, নামবার মতো পথও ছিল। সেইদিকে ফিরে যাওয়া যাক।

অমরনাথ চাপরাসী ও কুলীদের বলে, আবার ফেরা কেন? দেখনা, এইখানেই কোথাও নামা সম্ভব কিনা।

আমরা অপেক্ষা করি। তারা গাছের ডালপাতার অন্তরালে অদৃশ্য হয়। কিন্তু পরে ফিরে এসে জানায়, নাঃ, নামার পথ নেই। গোটা পাহাড় ধসে গেছে—একেবারে গাছপালা সমেত। অবশ্য আমরা পাহাড়ী আদ্‌মীরা—কোনরকমে নেমে যেতে পারি, কিন্তু আপনারা পারবেন না।

পাহাড়ীরা যখন পথ খুঁজতে ব্যস্ত, তখন অমরনাথের সঙ্গে প্রায় ব্যবস্থাই করেছিলাম যে ফিরে গিয়ে সোজা পথে নদীতে নামা যাবে।

এখন, অক্ষমতার কটাক্ষপাতে তার আত্মসম্মান আহত হয়।

বলে, চলো দেখি—আমিও পারব,—এখানেই নামব।

আমি সাবধান করি, দরকার কি অযথা দুঃসাহস-প্রকাশে? চলো, ঘুরেই যাওয়া যাক।

সে তখনি গম্ভীরভাবে আমাদের জানায়, আপনারা দাঁড়ান এখানে, আমি দেখছি। পাহাড়ীদের ধারণা আমরা বুঝি ভীরু।

তারপর, গাছপালার ভিতর প্রবেশ করে অন্তর্হিত হয়। আমরা অপেক্ষা করি।

কিছু পরেই দূর থেকে ডাক শুনি, চলে আসুন—সাবধানে, কুলীদের হাত ধরে।

এলামও তাই। তাদের হাত ধরে, ভেঙে-পড়া গাছের ডালের উপর পা রেখে, আর একটা গাছের ডালে ঝুলে। কোথাও বা বসে বসে!

কেন জানি না, তবুও ভয় করেনি—উত্তেজনার মধ্যে আনন্দই পেয়েছিলাম। গাছের ডালের স্পর্শ তো নয়, যেন মনে হয় ধরিত্রীমাতার হাত ধরে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে নেমে এলাম।

শিশিরবাবু হেসে বলেন, অমরনাথ স্বভাব ভোলবার নয়।

সম্মুখে নদীর ওপারে কিছুদূরে বিরাট পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে অমরনাথ বলে, ঐ পাহাড়টিরই অর্ধেক অংশ ভেঙে গিয়েছিল দেখা যাচ্ছে,—ওতেই বোধ করি গোণা-লেকের উৎপত্তি।

মেজরবাবু বললেন, ঠিক তাই। ঐটিই সেই পাহাড়। ওর পরেই গোণা-লেক।

প্রকাণ্ড উত্তাল এক পাহাড়। এক অর্ধাংশ তার মাথা থেকে ভেঙে ধসে গেছে। মনে হয় যেন কোন্ এক দৈত্য বিরাটাকার একটা কেকের মাঝখান দিয়ে ছুরি দিয়ে আধখানা কেটে ফেলে দিয়েছে। এত বড় পাহাড়-ধসা হিমালয়েও কচিৎ দেখা যায়।

প্রকৃতির চারিদিকের শ্যাম-স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে ধ্বংস-লীলার এ এক বিকট নিষ্ঠুর রূপ।

মনে পড়ে কয়েকবছর আগেকার একটি ঘটনা।

হাজারীবাগ-রাঁচির পথে রামগড়। তারি কিছুদূরে মোটরের বড়রাস্তা ছাড়িয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে। রাজরোপ্পা। দামোদরের তীরে ছিন্নমস্তার মন্দির। চারিদিকে ছোট-বড় পাথর। তারি মাঝ দিয়ে নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। বনের ধারে নদীর তীরে ছোট মন্দির। একে ছিন্নমস্তা, তায় জাগ্রতা দেবী। সবাই ভক্তি করে, ভয় করে। কিছুদূরে একটি গ্রাম। সেখান থেকে প্রতিদিন পূজারী এসে পূজা করে যায়। দিনের আলো হলে লোক আসে, সন্ধ্যার আগে ফিরে যায়। রাত্রিবাসের নিষেধ আছে। বলে, দেবীর মানা আছে।

মানা থাকার বিশেষ কারণও আছে। জীবন্ত প্রমাণের রূপ ধরে এক মানুষ-মূর্তি সমুখে দাঁড়ায়।

কী বিকট বিকলাঙ্গ! মাথা থেকে মুখ-বুক তক ক্ষতচিহ্নে ভরা। মূর্তিমতী বিভীষিকা!

বলে, ভালুকের অত্যাচার। নখ দিয়ে চিরে এমনি করেছে!

বিকৃত ক্ষত-ভরা অঙ্গ নিয়ে তবুও সে প্রাণে বেঁচে আছে।

এখানেও প্রকৃতির অঙ্গে আঁকা এক নিষ্ঠুর করুণ কাহিনী।

•

কিছুদূর গিয়েই নদী ছেড়ে আবার পাহাড়ের গায়ে পথ। বড় বড় গাছ। ছায়াশীতল। পথের মাঝে পার্বত্য নির্ঝরিণী। তুষার-শীতল ধারা। আবার জুতো-মোজা খুলে পার হতে হয়। আরও খানিক গিয়ে বিরহী-নদীর ওপারে পথ চলে গেছে। পারাপারের সাময়িক ছোট পুল। শালগাছের গোটা দুই গুঁড়ি ফেলা। সাবধানে পার হই। বেশী বৃষ্টি হলেই নদীর স্রোত বাড়ে, পুলের কাঠের উপর দিয়েই তখন জল ছুটে চলে কল্‌কল্ করে। ফেরার পথে তাই হয়েছিল। জুতো-মোজা-সমেত তারি উপর দিয়ে চলে এসেছিলাম। খুলিনি। কারণ, সেদিন ফেরার পথে বৃষ্টির মধ্যেই পথ চলতে হয়েছিল। জলে সমস্ত ভিজে জব্‌জবে হয়ে উঠেছিল। নতুন করে ভেজবার আর কিছু বাকি ছিল না। বর্ষার প্রচণ্ড প্রকোপে বর্ষাতির তলায় জামা-কাপড়ও সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছিল। যেন সদ্য স্নান সেরে উঠলাম। ভিজা জামা-কাপড়-জুতো-মোজায় পথ চলাতেও নবীন আনন্দের আস্বাদ। চারিদিকে যেমন বর্ষা-প্লাবিত প্রকৃতি, হৃদয়াকাশে তেমনি বর্ষণ-মুখর মন। মুখে চোখে বৃষ্টিধারার ছাট লাগে। চারিদিকে জলের স্রোত ছোটে। তারি মাঝে ছপ্ ছপ্ করে পথ চলি। সাবধানে পা ফেলি। সতর্কগতি ক্রমে সাহস সঞ্চার করে। দেখি, জলের মাঝেও পথ চলার ছন্দ আছে, আনন্দও আছে। মনে গুঞ্জন ওঠে: 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—ময়ূরের মতো নাচে রে।'—হিমালয়ে বর্ষামঙ্গল।

আশ্চর্য লাগে এ সিক্ত-সজ্জায় পথ-চলায়। গায়ের ভেজা কাপড় গায়ে শুকোয়। আবার পথে বৃষ্টি নামে,—আবার ভেজায়, আবার শুকায়। দিনশেষে পথ-চলা সাঙ্গ হলে, জামা-কাপড় ছাড়ি। আশঙ্কা হয়, পরদিন এই বৃষ্টি-ভেজার অত্যাচারের দুর্ভোগ আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু, কোনো কিছুই, অস্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। পাহাড়-পথে অভ্যস্ত জীবন-ধারা বৃষ্টির জল-ধারাকে সানন্দেই গ্রহণ করে।

শিশিরবাবু বলেন, দেবতার কী মহিমা! কলকাতা হোলে সামান্য একটু জলে ভিজলেই অনর্থ হ। আর এখানে? জলে এতো ভিজি তবুও জ্বর নেই। এতো চলি, এতো খাই—মনে হয় পাথর পর্যন্ত হজম করতে পারি।

অনাচারে অত্যাচারে শুধু স্বাস্থ্য ভাঙেই না, অবস্থা-বিশেষে স্বাস্থ্য গড়েও।

বিরহী-নদী পার হয়েই বাঁ দিকে একটু উপরে ছোট একখানি গ্রাম। গোণা গ্রাম,—তা থেকে হ্রদের নামকরণ গোণা-তাল। হ্রদটি এখান থেকে আধ মাইলের উপর দূর। হ্রদের উপরে অপর পারে আর একটি গ্রাম আছে, নাম তার ডোবুয়া। সে-গ্রামের অধিবাসীরা হ্রদের নাম দিয়েছে—ডোবুয়া-তাল। বলে, গোণা-তাল নাম হবার কোনো কারণ নেই। ও-গ্রাম তো জল থেকে অনেক দূরে, আমরা থাকি হ্রদের কতো কাছে—এর ঠিক নাম আমাদের গ্রামের নামে।

দুই গ্রামে এই নাম নিয়ে বিরোধ।

আত্মপ্রাধান্য মানুষ-স্বভাব। হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলেও ঈর্ষার সে-কীট সুযোগ বুঝে বাসা বাঁধে।

পাহাড়-ধসায় সমস্ত গোণা-গ্রাম ফেটে গিয়েছিল। এখনো কিছুদূর দিয়ে পাহাড়ের ধস্ নামে। নদী পার হয়ে

বাঁ দিকে গ্রামে যাবার পথ। আমাদের পথ গিয়েছে ডান দিকে হ্রদের অভিমুখে। পথের চারিপাশে পাহাড়-ধসার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। চতুর্দিকে ভাঙা পাথর, কাঁকর, বালি, মাটির বিরাট বিরাট স্তূপ। তারি মাঝে মাঝে পাথর-চাপা ঝরনার ক্ষীণ ধারাগুলি কোথাও বা আত্মপ্রকাশ করছে। সে-সব ধারার জলও ধ্বংসের মসী-মাখা। মলিন, ক্লান্ত। কোথাও বা জলে গন্ধকের গন্ধ আসে। বাঁ দিকে কিছুদূরে বিরাট পাহাড়। বিকৃত বিকট বিকলাঙ্গ। যেন অতিকায় এক দানবের বীভৎস কঙ্কাল।

কিন্তু, আশ্চর্য লাগে এই বিধ্বস্ত শ্মশানের মধ্যেও নবীন জীবনের স্পন্দন দেখে। চারিদিকে ভগ্নস্তূপ। তবুও, সেই উষর ভূমি ভেদ করে নবীন তরুলতার স্বভাব সজীবতা।

বিরাট পাহাড় ধসে পড়ে, নির্মূল হয় সব বৃহৎ বনস্পতি। তারপর, একদিন আবার সেই ধ্বংসের মাঝেও নবীন প্রাণের পুনঃ সঞ্চার হয়। হিমালয়ের পাথর ঠেলে নবজীবনের সবুজ পতাকা হাতে পাষাণ-শিশু মাথা তোলে, নবীন প্রাণের আনন্দ আনে।

কালের বিচিত্র ধর্ম।

নিদারুণ শোকাতুর মানুষও একদিন তার সে-শোকের অসহ জ্বালা ভোলে। কালের, কল্যাণময় কোমল প্রলেপ দুঃখ-হৃদয়েও শান্তিময়ী শান্তি আনে। তাইত, সংসারে মানুষ বাঁচে। এখানেও, ধ্বংসের মধ্যে প্রকৃতি আবার নবীন সাজে হাসে।

অল্প গেলেই হ্রদের বিপুল বারিরাশি চোখে পড়ে। চারিদিকে ঘন-সবুজ বনময় গিরিশ্রেণী। তারি মাঝে ঘননীল জলরাশির প্রশান্ত বিস্তৃতি।

পাহাড়ের কিছু উপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখি। পথ নেমে জলের ধারে লুপ্ত হয়েছে। তারই অল্প দূরে ডান দিকে সঙ্গমস্থলের বাঁধ ভেঙে জলধারা হ্রদ থেকে বেগে ছুটে চলেছে। নিম্নগামী ধারা পাষাণ-কারা ভেদ করে উন্মাদনায় উধাও। এই বিরহী-নদীর ধারা বয়েই আজ সারাদিন এসেছি।

নদীর মুক্তিদ্বারের অল্প উপরে নূতন ধর্মশালা। বাসোপযোগী হলেও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

অমরনাথ জানায়, ঐখানেই আমাদের রাত্রিবাস। দু'দিন এখানে আনন্দে কাটানো যাবে।

রেঞ্জারবাবু দূরে হ্রদের অপর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, ঐ ওপারে বোট-হাউস। গত বর্ষায় হ্রদের জল ঢুকে ক্ষতি করেছে। ওখানে থাকা এখন চলবে না।

সাদা-ধব্‌ধবে ছোট্ট একটি বাড়ি। দূরে নীল-জলের ধারে সবুজ-পাহাড়ের গায়ে শ্বেতবিন্দুর মতো মনে হয়।

পথটুকু শেষ হবার আগে ধর্মশালার কাছে চোখে পড়ে, বিস্তীর্ণ হরিৎক্ষেত্র। সবুজ ঘাসের উপর হলুদ-রঙের বিচিত্র শোভা।

আশ্চর্য বোধ হয়। হঠাৎ এত ফুল ফুটল কোথা থেকে?

অমরনাথ বলে, দূর থেকে দেখে সব 'বেরিলোড' মনে হয়।

নামতে নামতে দেখি, সত্যিই তাই। আমাদের চিরপরিচিত গাঁদাফুল। হঠাৎ দেখে মনে হয়, কারা যেন জলের ধারে গেরুয়া-কাপড় বিছিয়ে রেখেছে।

গাঁদাফুলে সরস্বতীপূজার কথা স্মরণ করায়। প্রতিমার সামনে পুষ্পপাত্র-ভরা গাঁদাফুল। অঞ্জলি ভরে অঞ্জলি দেওয়া—ছেলেবেলার ভয়-ভক্তি মেশানো সে এক অপূর্ব অনুভূতি!

রেঞ্জার জানান, হ্রদের চারিদিকে অনেক জায়গায় ফুটেছে দেখবেন। এ-সব স্বামীজির হাতে-করা বাগিচা।

স্বামীজি! এখানে সাধু কেউ থাকেন নাকি?

শুনি, আজ বছর কয়েক হলো একজন এসেছেন। তাঁরই একার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই ধর্মশালার প্রতিষ্ঠা। নিজে থাকেন কিছুদূরে হ্রদের ধারে একটি গুহায়। স্থলপথে সেখানে যাবার পথ নেই। জলপথে নৌকায় যেতে হয়। বন-বিভাগের সরকারী নৌকা তো আছেই, স্বামীজির নিজেরও একটি আছে।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের নৌকা এপারে এনে রেখেছে তো?

একটি পাহাড়ী সেলাম ঠুকে সমুখে এসে দাঁড়ায়। মলিন বেশভূষা। দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু, সবল স্বাস্থ্য, মুখে সরল হাসি। বলে, আমি চৌকিদারের ছেলে। বাবার বয়স হয়েছে, শরীরও ভালো নেই। তাই আমি এসেছি নৌকা নিয়ে। ধর্মশালায় থাকারও সব ব্যবস্থা করেছি।

ধর্মশালা দু'তলা বাড়ি। পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরি।

একতলায় হলী ও পিরনমা উঠেছে। আমরা থাকব দু'তলায়। উপরে ওঠবার সিঁড়ি নেই। ভবিষ্যতে হবার ব্যবস্থাও নেই। একটা মই লাগানো আছে। তাই দিয়ে উঠলাম। সিঁড়ি না করার হয়ত কারণও আছে। পাহাড়ে বাড়ি তৈরি হয় সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়। এখানেও তাই উঠেছে। সেইজন্যে পাহাড়ের গা থেকে সোজা বাড়ির উপরতলায় যাওয়া-আসা করা যায়। এখানেও বাড়ির পিছন দিকে একটা কাঠ ফেলে পাহাড়ের সঙ্গে সোজা যোগাযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ, দু'তলা হলেও সেখান থেকে সেটা একতলা।

দু'তলায় দুটি ঘর। তিনদিকে টানা বারান্দা। কাঠের রেলিঙ দেওয়া। সামনের বারান্দার নীচেই প্রাঙ্গণ। ফুলের রঙে রঙীন হয়ে আছে। মাঝখানে একটা শিমগাছ। শিম-এ ভরে আছে। আরও কিছু নীচে হ্রদ। ঘরের ভিতর বা বাহিরের বারান্দায় বসে মনে হয় যেন স্টীমারে চলেছি। সামনেই প্রসারিত হ্রদের বিপুল বারিরাশি। হ্রদের অপর দিকে দূরে দেখা যায় একটি পার্বত্য নদী, হ্রদে এসে পড়েছে। এতোদূর থেকে জলের ধারা নজরে আসে না; বালি-মাটি-পাথরকুচির সাদা রঙ উজ্জ্বল দেখায়।

বেজায় বলেন, ঐ বিরহী-নদী। অপর দিকে হ্রদে এসেছে, আর এইদিকে হ্রদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওপারে নদীর যে সাদা ধারা-পথ দেখা যায় তার অনেকখানি হ্রদের জলে আগে ঢাকা ছিল। হ্রদের জল ক্রমে ক্রমে নেমে আসছে।

শিশিরবাবু বলেন, তাহলে তো কিছুকাল পরে হ্রদের অস্তিত্ব যাবে, শুধু নদীর ধারাই থাকবে।

অমরনাথ জানায়, তাই হবারই হয়ত সম্ভাবনা, কিন্তু সে 'কিছু কাল' এখনও দীর্ঘ কাল। এখনও হ্রদের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই মাইল হবে, চওড়াও প্রায় সওয়া-মাইল। জলের গভীরতা এখনও অনেক। নৈনীতাল হ্রদের দ্বিগুণ আকার হবে।

বিরহী-নদীর উৎসমুখ চির-তুষার-প্রদেশে হিমপ্রবাহে। তুষার-মৌলী সেই গিরিশ্রেণী হ্রদের অপরপারে বহুদূরে দেখা যায়। নখাকৃতি শিখর। বরফ-ঢাকা পাহাড়-চূড়া যেন আকাশ স্পর্শ করে। রাশি রাশি সাদা মেঘের পুঞ্জ ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। যেন অলক্ষ্যে বসে কোন্ এক বুড়ী সাদা তুলা পিঁজছে।

হ্রদের ডানদিকে অরণ্যময় সবুজ পাহাড়। তারই বহু উর্ধ্বে একটি বড় গ্রাম আছে। নাম তার রাম্‌নি। এখান থেকে দেখা যায় না।

বাঁ-দিকের উঁচু পাহাড়গুলির পিছনে 'তুষারী পাস'। তুষারাবৃত গিরিসঙ্কট।

ঐসব পাহাড়গুলির উপর দিয়ে একটি পথ আছে। পর্বত-চূড়া-আরোহণকারীদের অভিযান-পথ। ছাপার হরফে সে-সব পথের সৌন্দর্যের বর্ণনা পড়েছি। ছবিও দেখেছি। আজ মানস-পটে সেই অদৃষ্ট-পূর্ব কল্পনার রঙীন তুলিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গোণা-তালের তীরে দু'দিন কাটল। নৌকা করে লেকে বেড়ালাম।

প্রথমদিনেই বোট-হাউস দেখে এসেছি। কাঠের ছোট বাড়ি। দু'খানি মাত্র ঘর। হ্রদের উপকূলে। গত বর্ষায় হ্রদের জল একটু বেশী বেড়েছিল। তাই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করে, সব ভাসিয়েও দিয়েছিল। কাঠের দেওয়ালের গায়ে, কাঠের মেঝেতে জলধারার নিবিড়-প্রবল-প্রবেশের অত্যাচার-কাহিনী এখনও আঁকা আছে।

অমরনাথ সব পরীক্ষা করে দেখে। তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। মন্তব্য করে, খুব বেশী ক্ষতি করেনি। কয়েক শ' টাকা খরচ করলেই সংস্কার হতে পারে। চায়ের সেট-এর পাত্রগুলি খুব বেঁচে গেছে।

তারপর চৌকিদারের ছেলেকে হুকুম দেয়, চায়ের কেট্‌লি, কাপ ডিশ নিয়ে চলো—আমাদের জন্যে। লিস্ট-এ ঠিকমতো নোট করে রাখো,—আবার মিলিয়ে তুলে রাখবে।

সরকারী অফিসারের সতর্ক দৃষ্টি সজাগ আছে।

বোট-হাউস-এর কিছু উপরে জোহ্না গ্রাম। ছোট গ্রাম। কয়েকখানি মাত্র ঘর। চৌকিদার ঐ গ্রামেরই লোক। নৌকায় বসে দাঁড় হাতে চৌকিদারের ছেলে গল্প করে, বাবা এখন আর বেশী কাজকর্ম করতে পারেন না। নৌকা বাইতেও সাহস পান না। আমার কিন্তু চালাতে খুব আনন্দ লাগে। কেমন দাঁড়ের সঙ্গে নৌকা চলে।

কথা বলতে বলতে দুই হাতের দুইটি দাঁড় জোরে জলে ফেলে। জল ছিটকে ওঠে। ধীরে ধীরে হাত চালায়। জল কেটে নৌকা চলতে থাকে। শান্ত জলের উপর নৌকার গতিপথের বিচিত্র রেখা ফুটে ওঠে।

তারপর জানায়, আমরা তো এই জলেই মানুষ। জন্মে অবধি এমন দেখেছি। গ্রামের বৃদ্ধরা কিন্তু এ-জলকে ভয় করেন। গল্প শুনেছি, চোখের উপর তাঁরা দেখেছেন এই জল জমতে। ক'দিন ধরে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি নেমেছিল। তারপর গভীর রাতে সে-নাকি এক অতি-বিরাট শব্দ করে পাহাড় ভেঙে পড়ে। সেই মুষলধার বৃষ্টির মধ্যেও ঘর ছেড়ে আতঙ্কে গ্রামের সব লোক বেরিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল, পৃথিবীর প্রলয় এসেছে। সারারাত পাহাড়-ধসার ধ্বংসলীলা চলে। তারপর দিনের আলো ফুটলে সব প্রকাশ পায়। তখনও সামনের ঐ পাহাড় ধসে-ধসে পড়ছে। তিনদিন ধরে এমনি করে পড়তে থাকে। প্রকাণ্ড বড় বড় পাথর সশব্দে গড়িয়ে এসে ছিটকে পড়ছে চারিদিকে—নদীর এ-পারেও—কামানের গোলার মতো। যেমন তার প্রচণ্ড বেগ, তেমনি ভয়ঙ্কর গর্জন। চারদিক আবছায়া—ধুলায় ধোঁয়া। নদীর এ-পারের গাছপালা, মাঠ—সব ধুলায় মলিন, বিবর্ণ হয়ে গেছে; যেন ধূসর-বসন-ঢাকা। পাহাড় থেকে চতুর্দিকে জলও নামছে। হ্রদের জল বাড়ছে। গ্রাম ছেড়ে সবাই পাহাড়ের আরও ওপরে বৃক্ষের ভিতর আশ্রয় নিল। এমনিভাবে বছরখানেক কাটার পর হ্রদের বাঁধ ভাঙল। এখন এসব সুন্দর জায়গা,—আপনারা দেখতে আসেন; কিন্তু সে-সব দিনের গল্প বলতে বৃদ্ধদের এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।

নৌকার উপর নিশ্চিন্ত আরামে বসে বিগত-কালের সেই ভয়াবহ কাহিনী শুনতে বেশ লাগে। যেন, বই-এর পাতায় পড়া রোমাঞ্চকর দুর্ঘটনা। অথচ, যা শুনছি তার মধ্যে এতোটুকু অতিক্রম নেই। Frank Smythe-এর *Kamet Conquered* বইখানিতে এর সমকালী অনুরূপ বিবরণ পড়েছিলাম।

পাহাড়টির নাম মৈথানা। ১১,১০৩ ফিট উঁচু পাহাড়ের অংশ ধসে পড়ে। দুইবারে। এক কোটি পঁচিশ লক্ষ কিউবিক ফিট পাথর ভেঙে পড়েছিল। নদীর গতিপথ রোধ করে ভেঙে-পড়া পাথর ও মাটিতে যে বাঁধের সৃষ্টি হলো, তারই উচ্চতা এক হাজার ফিট। হিমালয়ের কোলে অবশ্য নবজাত শিশু-পাহাড়। তবুও, যেন হঠাৎ-নবাবের মতো [illegible]। উদ্ধত। কল্যাণী নিরীহ বিরহীর সহজ গতিপথ অবরুদ্ধ করলো।

হ্রদের দীর্ঘতা হয়ে এলো তিন মাইল।

তারপর, জল জমে বাঁধ ছাপাবার উপক্রম দেখে কর্তৃপক্ষ সময়মতো গ্রামে গ্রামে বন্যার সতর্ক-নির্দেশ পাঠালেন। অলকানন্দা ও ভাগীরথী গঙ্গার দুই তীরের গ্রাম ও সহর-বাসীরা নদীর তীর ছেড়ে পাহাড়ের বহু উপরে আশ্রয় নিলো। বাঁধ থেকে ১৫০ মাইল দূরে হরিদ্বার। সেখানেও সাবধান-রব উঠল।

১৮৯৪ সালের ২৫শে আগস্ট। রাত্রি ১১টা ৩০। বাঁধ ছাপিয়ে—ভেঙে—জল ছুটল। ঘণ্টায় বিশ থেকে ত্রিশ মাইল গতিবেগ। বাঁধের মুখে গভীরতা হলো ২৮০ ফিট। প্রায় কুড়ি মাইল দূরে অলকানন্দার উপর চামৌলী সহর। তার মাইল দশেক আগে অলকানন্দার সঙ্গে বিরহী-গঙ্গার সঙ্গম। বন্যার জলভারে অলকানন্দাতেও স্ফীতি আনলো। চামৌলীতে নদীর গভীরতা হলো ১৬০ ফিট।

তারপর, দুইদিনেই হ্রদের জল ৩৯০ ফিট নেমে গেল, এবং পরে দেখা গেল বিরহী-নদীর তলভূমি বন্যার-বয়ে-আনা প্রকাণ্ড পাথর ও মাটির প্রলেপে ৫০ ফিট উঁচু হয়ে গেছে।

১৯৩১ সালে হ্রদের দৈর্ঘ্য ছিল ৩,৯০০ গজ, প্রস্থ ৪০০ গজ, গভীরতা প্রায় ৩০০ ফিট।

এই প্রবল বন্যায় মানুষের অসামান্য ক্ষতি হলেও প্রাণহানি হয়েছিল সামান্যই। সময়মতো সতর্ক-সংবাদে সকলেই সাবধান হয়েছিল। হয়নি শুধু একটি লোক। সে সপরিবারে বাঁধের নীচেই বাসা বেঁধেছিল। বহু সতর্কবাণী সত্ত্বেও। বাঁধ-ভাঙার উপক্রম হলে তাদের জোর করে দুইবার সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। তবুও, তারা সেখানেই ফিরে যায়। শেষ পর্যন্ত সেখানেই থাকে। কোনমতেই আর সরানো যায়নি। বন্যার সেই ভয়ঙ্কর ভৈরবী-মূর্তির কাছে শুধু এরাই আত্মাহুতি দেয়।

চৌকিদারের ছেলে গল্প করছিল—শুনেছি, লোকে তার নাম দিয়েছিল পোগা ফকির। স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতো। বলতো, ভগবান—বাপমায়, মায়বাপও তিনি। যদি জান্ নেবার মর্জি থাকে, তিনি নেবেনই, আমি পালিয়ে বাঁচবো কোথায়! যাবোই বা কেন?—কোন্ এক রাজার গল্প শুনিয়ে বলতো, অতোবড় রাজা, সব ব্যবস্থা করেও সাপের কামড়ে মরার ভাগ্য-লিখন কাটাতে পারেননি। আমি তো অতি-সাধারণ মানুষ, প্রাণ বাঁচাতে পালাবো কোথায়? শেষ পর্যন্ত নড়েওনি। বন্যা শুরু হোলে

তাদের আর চিহ্নও পাওয়া যায়নি। লোকে বলে, মস্ত ভক্ত ছিল। আমি বলি, আস্ত পাগল।

নির্বাক হয়ে তার গল্প শুনি।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আকাশে মেঘ জমে আসে। মেঘের জটাজালে সূর্যকিরণ বন্দী হয়। আলোছায়ার খেলা চলে। দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। মুহূর্তেই রামধনুর রঙীন রেখা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। আকাশের বুকে নয়, সবুজ পাহাড়ের গায়ে। অদূরে হ্রদের জলের ভিতর সে-রঙীন-রেখার একপ্রান্ত বিলীন হয়।

৮

নৌকা করে চলেছি সাধুর গুহায়।

আগেই শুনেছি, তিনি এখন এখানে নেই।

তাঁর পূর্বাশ্রম আলমোড়া-অঞ্চলে। পাহাড়ের অধিবাসী। শিক্ষিতও। আজ বছর পাঁচ-ছয় হলো এখানে এসেছেন। গুহার ভিতরে একা থাকেন। সাধন-ভজন করেন। গ্রামবাসীরা আন্তরিক শ্রদ্ধা করে। তাদের সামান্য আহার্যের নৈবেদ্যে তাঁর স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, এখন তিনি কোথায়? পাহাড়ের উপরে আরও একান্তে নিভৃতে কোথাও আছেন নাকি?

চৌকিদারের ছেলে উত্তর দেয়, না। ওদিকে নয়। নীচে গেছেন। আজ মাসকয়েক হলো। এবার ফেরবার সময় হয়েছে।

নীচে—অর্থাৎ পাহাড় ছেড়ে হরিদ্বার, দিল্লী প্রভৃতি দূরের অভিমুখে।

সহরে যাওয়ার কারণও শুনি। অর্থের অভাবে ধর্মশালার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। তাই পুঁজির সন্ধানে সহরে যাওয়া।

বিচিত্র জগৎ।

সহর থেকে মানুষ আসে হিমালয়ে শান্তির আশায়, সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধানে।

আবার, সত্য-সন্ধানী সাধু সাধনা ফেলে হিমালয় ছেড়ে সহরে ছোটেন ভিক্ষার ঝুলি হাতে। আত্মসুখের লোভে নয়, সহরবাসী যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজনের প্রয়োজনে।

অমরনাথ বলে, সাধুর আশ্চর্য ক্ষমতা। একার চেষ্টায় এখানে এমন ধর্মশালা তৈরি করা সহজ কথা নয়। ধর্মশালার বাকি অংশও হয়ত তিনি শেষ করাতে পারেন। কিন্তু, সমস্যা হয়েছে—দৈনিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে তিনি ফরেস্ট-ডিপার্টমেন্ট-এ জানিয়েছেন, তারা যদি এটা নিয়ে চালাতে চায়, তিনি দিতে রাজী আছেন। এই নিয়ে কথাবার্তাও চলছে। গভর্নমেন্ট থেকে নেবার প্রধান কারণ হলো, তারাও এখানে একটা নতুন বাংলো করতে চায়। ওপারে বোট-হাউস-এর কাছে জমিও ঠিক করা আছে।

শিশিরবাবু বলেন, কিন্তু সারা হ্রদের চারিদিকের মধ্যে এই ধর্মশালার জমিটি সবচেয়ে ভালো জায়গায়। উঁচু জমি। সামনেই হ্রদ। ওপারে আকাশ-ছোঁয়া বরফের পাহাড়। অপরূপ দৃশ্য ধর্মশালা থেকে। বোট-হাউস থেকে এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

অমরনাথ স্বীকার করে। বলে, তাইত এটা নিয়ে নেবার আমার এতো উৎসাহ।

আমি বলি, তোমাদের নেওয়া-না-নেওয়ায় আমার উৎসাহ নেই। আমি আশ্চর্য হই, সাধুটির সৌন্দর্য-দৃষ্টি দেখে। হ্রদের চতুর্দিকের মধ্যে সবচেয়ে রমণীয় স্থানটি ঠিক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রূপদ্রষ্টার একটু পরিচয়।

গুহার কাছে নৌকা থামে। পাহাড়ের গায়ে জলের ঠিক উপরেই ছোট গুহা। কাঠের ফ্রেমে ছোট দরজা। হ্রদের দিকে কাঠের একটি ছোট জানালাও আছে। জলে নৌকা বাঁধা। তাঁর আসা-যাওয়ার নৌযান।

অমরনাথ বলে, নেমে দেখবেন চলুন। সব খোলাই তো রয়েছে।

সাধুর অনুপস্থিতিতে নামতে অসম্মত হই। নৌকা থেকে বসেই দেখতে পাই তাঁর সামান্য মালপত্র। উঁচু করে সাজিয়ে রাখা। সবার উপরে একটি প্রাইমাস-স্টোভ। তার নীচেই একটি [illegible]।

অনুসন্ধানে জানলাম, সাধুজি সঙ্গীতজ্ঞ। সুমধুর ভজন করেন। গ্রামের লোকেরা প্রায়ই শুনতে আসে। তারা যথার্থ আনন্দ পায়। প্রাতে সন্ধেও নিস্তব্ধ নিশীথে তাঁর সুরের অস্ফুট-ধ্বনি শোনা যায়।

মৌন অচল হিমাচলে সশব্দ সঙ্গীত-স্পন্দন। যেন, হ্রদের ঐ শান্ত স্তব্ধ জলে মৃদু-সমীরণে ঈষৎ ঢেউ-এর খেলা।

স্বামীজির দর্শন পেলাম না। কিন্তু, মানুষটির প্রকৃত পরিচয় অন্তরে অনুভব করি। পান্থশালায় পরিমিত পারিপাট্য, হ্রদের ধারে ধারে গাঁদাফুলের মিষ্ট শোভা, নিভৃত গুহায় স্তব্ধ বাক্যের নির্বাক্ ধ্বনি—অদৃষ্ট মানুষটিকে যেন অতি নিকটে এনে দিল। সৌন্দর্যের সাধনাও শিব-সুন্দরেরই আরাধনা।

কলকাতা-সহরের একটি ঘটনা মনে পড়ে।

শীতকাল। সহরের এক অঞ্চলে সঙ্গীতের এক বড় জলসা চলেছে। বড় বড় ওস্তাদ এসেছেন। মার্গ-সঙ্গীতের পরিবেশে আসর জমেছে। এক বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ যন্ত্র-সঙ্গীত আলাপ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। এমনি সময়ে গেরুয়াধারী এক সাধু শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে থেকে উঠে এসে কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন, তিনিও কিছু যন্ত্র-সঙ্গীতের আলাপ করতে চান। উদ্যোক্তারা আশ্চর্য হলেন। গুণীজনের এই আসরে একজন অখ্যাত অজানা ব্যক্তির এ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য। বিনীতভাবে জানালেন, আমাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ চলছে; এর মধ্যে বাইরের কারো কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

সাধুটির তবুও বিশেষ আগ্রহ। অবশেষে শ্রোতাদের অনুমতি নিয়ে অল্প সময়ের জন্য তাঁকে বাজাতে দেওয়া হলো। তাঁকে জানানো হলো, এর বেশী সময় যেন তিনি কোনক্রমেই না নেন। তিনি বাজালেনও সেই স্বল্পসময়ের জন্য। শ্রোতাগণ স্তম্ভিত। কী গভীর জ্ঞান! কী মিষ্টি ধ্বনি! কী সুনিপুণ হাতের খেলা! তাঁরা আরও শুনতে চান। সাধুটি বললেন, আজ আর নয়। যদি অনুমতি পাই, কাল আমার নিজের যন্ত্র নিয়ে এসে কিছু শোনাবো।

পরের দিন সেইমতো ব্যবস্থাও হয়। সকলেই প্রকৃত গুণীর অসাধারণ গুণের পরিচয়ে মুগ্ধ হন। শ্রোতাদের উৎসাহ বাড়ে। অনুরোধ করে, তার পরের দিনের আসরেও যোগ দেবার জন্যে। কর্তৃপক্ষরাও পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু, সাধুটি কোনমতেই সম্মত নন। শেষ পর্যন্ত রইলেনও না। বললেন, যাচ্ছিলাম গঙ্গাসাগরে। স্টীমার ছাড়বার দু'দিন আগে এ-সহরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আপনাদের জলসার খবর পেলাম। তাই, শুনতে এসেছিলাম। শুনে আনন্দও পেলাম। কাল স্টীমার ছাড়বে। আমার যাবার সময় হয়ে গেছে। আর থাকবার প্রশ্ন ওঠে না।

তাঁর সঙ্গীতের উচ্চপ্রশংসা শুনে বিনীতভাবে বললেন, ও কিছুই নয়। অতি সামান্যই জানি। জানতেন বটে আমার গুরুদেব। অমন বাজনা কখনও শুনিনি, কণ্ঠ-সঙ্গীতও নয়।—বলে উদ্দেশে প্রণাম করেন।

কর্তৃপক্ষরা সঙ্কোচভরে বলেন, আমাদের আসরে যাঁরা যোগ দেন, তাঁদের কিছু প্রাপ্য হয়; আমাদের প্রণামীটা যদি—

তিনি বাধা দিয়ে বলেন, মন ভরে আমি আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি, তার চেয়ে বেশী আর কোনও প্রাপ্য নেই। প্রয়োজনও নেই।

উদ্যোক্তারা জানান, আবার যদি কখনো এ-পথে আসেন ও আমাদের ভাগ্যে থাকে—আবার শোনার আগ্রহ রইল।

সাধুটি হাসতে থাকেন। মিষ্ট হাসি। সঙ্গীতের মতোই মধুর।

তপস্যার ক্ষেত্র থেকে বয়ে-আনা আনন্দের ফসল। স্বর্ণপ্রভ। দিব্যসম্পদ।

বদরীনাথের এক সাধুর কথাও মনে হয়।

প্রতিবছর বৈশাখ মাসে মন্দির-খোলার সময় আসেন। আবার কার্তিক মাসে দীপাবলির সময় মন্দির বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমে যান। মন্দির-কমিটির উদ্যোগে তাঁর এখানে আসা ও থাকা। তাঁর তত্ত্বাবধানে এখানে মন্দিরে কয়মাস অখণ্ড কীর্তন চলতে থাকে। মন্দির-তোরণের উপরের একটি ঘরে দিবারাত্র এই নাম-ধ্বনি চলে।

মন্দিরের প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটি লম্বা বারান্দা। হল-ঘরের মতন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সাধুজি সেখানে নিজে কীর্তন করেন। সঙ্গে তাঁর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ থাকেন। যাত্রীরা বসে নাম-সুধা পান করেন, কীর্তনেও যোগ দেন। একপাশে একটি অল্প-উঁচু বেদীর উপর সাধুজি বসেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ। শ্মশ্রুগুম্ফজটাভারে গম্ভীর দর্শন। অথচ, আয়ত নয়নে স্নিগ্ধ দৃষ্টি। মুখে মিষ্টি হাসি। জরি-দেওয়া সিল্ক-এর অঙ্গাবরণ। বোধ করি, মন্দির থেকে বিশেষ ব্যবস্থা-করে-দেওয়া সাজসজ্জা। দেখেই বুঝি, ওটা ওঁর মনের ভূষণ নয়, প্রয়োজনও নয়। কেননা, আসন নিয়েই বেশভূষা খুলে ফেলেন। নগ্নদেহে বসেন। প্রকাণ্ড বীণ্‌টি হাতে তুলে নেন। কখনও বা কোলে রাখেন। সুদীর্ঘ অঙ্গুলিগুলি শিল্পীর লক্ষণ জানায়। ধরা দেখেই বোঝা যায় কত প্রিয়, কত সশ্রদ্ধ আলিঙ্গন। তারপর, ধীরে ধীরে স্বর ফোটে, সুর ওঠে। গম্ভীর।

মধুর। ভাবাপ্লুত। ভক্তিশীল। মনে হয়, দেবতার পার্থিব মন্দিরের মধ্যে হয়েছে অপার্থিব পরিবেশ। মন-প্রাণ স্নিগ্ধ-দিব্য-ভাবে রোমাঞ্চ বোধ করে।

সাধুজির সঙ্গে বাইরেও দেখা হয়। সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ করি। স্মিত-বদনে তাকান। তার বেশী আলাপ হয় না। মৌনী তিনি। মৌনী,—অথচ ভগবৎকীর্তনকারী। শুধু, দেবতার নাম-কীর্তনেই ধ্বনির উচ্চারণ। শুনি, এককালে ভারতবর্ষের একজন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এখন, সুর-সাধনায় কেবল দেব-আরাধনা।

ভাবি, সত্যই, শিবের নামও তো—বীণাধর, সামপ্রিয়, স্বরময়!

*

ধর্মশালায় বসেও সময় কেটে যায় অলস-মন্থর গতিতে।

বোট-হাউস-এর ঘরে রাখা মন্তব্য-পুস্তিকাটি পড়ি। বহু বছরের বহু লেখা। অধিকাংশই সাহেবদের। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। কিন্তু, বিস্তৃত বিবরণ মাছ-ধরার। কী আকারের কতোগুলি মাছ। কত তার ওজন। হ্রদের কোন্‌দিকে ধরা। কিসে ধরা। কী চারা। কবে কোন্ দিনের কোন্ সময়ে। আকাশের কী অবস্থা। বাতাসের কী গতি। জলের কী রঙ। সব-কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা। যেমন মৎস্যশিকারে আনন্দ, তেমনি অকপট ফলাফল-স্বীকারেও আগ্রহ। কোথাও সাফল্যের আনন্দোচ্ছ্বাস। কোথাও বা বিফলতার করুণ হুতাশ।

পড়তে বেশ লাগে। লেখার মধ্যে শুধু মাছ-ধরাই নয়, লেখকের চরিত্র-চিত্রও ধরা পড়ে।

চারিদিকে সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির অন্তহীন রূপ-লীলা দেখেও সময় কাটে। দু'তলায় বারান্দায় বসে উপভোগ করি।

ঘরের ভিতর থেকে অমরনাথ ডাক দেন। বলে, শুধু সৌন্দর্যই পান করছেন, আসুন, চা-ও একটু পান করবেন।

বলি, বাইরেই পাঠিয়ে দাও এখানে।

সে রাজী হয় না। তাই, ঘরের ভিতরেই যাই। দেখি, ঘরের মেঝেতে তার প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কটির উপর রঙীন টেবল্-ক্লথ পেতেছে। তার উপর চায়ের কাপ-ডিশ-এর সুন্দর রঙীন সেট সাজানো। মাঝখানে একটা গ্লাসের মধ্যে ফুল সাজিয়ে ফুলদানি হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বলে, দেখুন, কেমন চায়ের টেবিল সাজিয়েছি।—ক'চাম চিনি দেবো বলুন।

সাজ-সজ্জা আয়োজনের প্রশংসা করি। হেসে বলি, সবই সুন্দর হয়েছে। কিন্তু, তোমার গৃহলক্ষ্মীটি কই?

সে-ও হেসে উত্তর দেয়, সে-কথাই যখন তুললেন তখ শুনুন তার কাহিনী। সে-বছর তখনও ট্রেনিং-এ আছি। ট্রেনিং শেষ হলেই চাকরি সুরু হবে। তখনও কয়েকমাস বাকি। ক্যাম্পে আছি। হঠাৎ বাবার কাছ থেকে খবর পেলাম—আমার নাকি বিয়ে ঠিক করছেন। ছুটি নি যেন বাড়ি চলে আসি। তখনি তাঁকে লিখে জানালাম, ট্রেনিং-এর সময় বিবাহ করার এখানে নিয়ম নেই। তাই ছুটির অনুমতি পাওয়াও সম্ভব নয়। লিখে দিয়ে নিশ্চি হলাম। ক'দিন পরে হঠাৎ আমাদের অফিসার আমাকে ডেকে পাঠালেন। খুব কড়া লোক। আইন-কানুন স সময়ে মেনে চলেন। ভাবলাম, কোথাও কিছু দোষ করেছি নাকি! ভয়ে-ভয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। দেখেই বললেন, তোমার একসপ্তাহের ছুটি। কালই তুমি বা যাবে। ঠিক একসপ্তাহ পরে ফিরবেও। দেখ, কোন কারণে কামাই না হয়।

অবাক্ হয়ে বললাম, আমি তো ছুটি চাইনি!

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি চাওনি, কিন্তু, তোমা বাবা চেয়েছেন। ছুটি মঞ্জুরও করেছি।

আমি সঙ্কোচভরে বললাম, কিন্তু ছুটির কারণটা—

তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি কারণ জানতে চাই না। তোমাকে যা বলা হ তাই করো। বাবার কথা শুনবে। কালই রওনা হবে। গুড্‌লাক্, ইয়ংম্যান!—বলে তিনি নিজের কাজে ম দিলেন। আমার কিন্তু মনে হলো, তাঁর ঠোঁটের কো একটু হাসির রেখা। নির্বাক্ হয়ে চলে এলাম। বাড়ি গেলাম। বিবাহও করলাম। ফিরে এসে ট্রেনিং শেষ হবার পরেই চাকরি সুরু হলো। গত দেড়বছরের মধ্যে মাত্র তি দিনের ছুটি পেয়ে একবার বাড়িও গিয়েছিলাম। স্ত্রীর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল সেই বিয়ের পর একবার। সে আ মথুরায়। বি.এ. পরীক্ষা দেবে। ইচ্ছা আছে, এবা একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবো। তাকে নিয়ে একবা কলকাতাও বেড়াতে পারি। গেলে অবশ্য আপনাকে জানাতে ভুলবো না।—আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে কী দেখছেন? আমি তা বলে তার কথা বেশী ভাবি না ভাববোই-বা কখন? সব সময়েই তো কাজ করছি।

তারপর অতি ধীরে ধীরে বলে, তবে সত্যি বলতে কি, সন্ধ্যার পর অন্ধকারটা ভারী হয়ে ওঠে।

আমি বলি, চলো, বাইরে বারান্দায়। চা-টা ওখানে জমবে আরও ভালো। দেখছ না, জ্যোৎস্না উঠেছে কিরকম?

বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে বসি। কাঠের রেলিংএ হেলান দিয়েছি। পা-দু'খানি সোজা করে আরামে ছড়িয়েছি। নির্বাক্ হয়ে সামনে তাকিয়ে থাকি। চারিদিকে নিঃঝুম নিস্তব্ধ। একটু আগেই হ্রদের নীল জলে সন্ধ্যার ঘন-কালো ছায়া নেমেছিল। দূরে গগনস্পর্শী পাহাড়গুলি অন্ধকারের অন্তরালে বিরাট আকার দৈত্যের রূপ ধরেছিল। এখন জ্যোৎস্নার স্বর্ণময় স্পর্শে সেই ঘনীভূত আঁধার তরল হয়েছে। সুদূর আকাশ-পটে এখন তুষার-শিখর বিদ্যোজ্জ্বল। স্বর্ণকান্তি তার রূপ। হ্রদের জলেও জ্যোৎস্নার রূপচ্ছটা। তরঙ্গ-জালে যেন আকাশের এক চন্দ্র সহস্রখণ্ডে খণ্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে।

প্রকৃতির এই প্রশান্ত স্নিগ্ধ শোভা অন্তরে অপার আনন্দ আনে। হিমালয়ের ধ্যান-গম্ভীর রূপ। জ্যোৎস্নাস্নাত, জ্যোতির্ময়।

হঠাৎ দেখি, হ্রদের জলে সচল যান। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।

অমরনাথ জানায়, চৌকিদারের ছেলে নৌকা আনছে। তাকে বলেছিলাম, চাঁদ উঠলে আসতে। জ্যোৎস্নায় নৌ-বিহার হবে। চলুন, যাওয়া যাক্।

আমি যেতে অসম্মত হই।

সে একাই যায়।

হ্রদের জলে তরী তার ধীরে ধীরে বয়ে চলে। জ্যোৎস্নার আলোকেও তরণীর কালো-রূপ। দূরে সে কালো-ছায়া ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে মিলিয়ে যায়। বিরহী-হৃদয় বিরহী-হ্রদে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতায় সানন্দ সান্ত্বনা খোঁজে।

যুগ-যুগান্তের বিরহ-কাতর শঙ্করের তপস্যায় হোমানলে ক্ষুদ্র মানব স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়।

আমার দৃষ্টি, কিন্তু, হ্রদের সসীম সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। জলের উপর দিয়ে আমার মন ভেসে চলে। চারু চন্দ্রিমার স্বর্ণময় সোপান বেয়ে স্বপ্নলোকে উঠতে থাকে। দূর-দূরান্তের মসীমাখা আঁকাবাঁকা গিরিশিখরের পথে পথে ঘুরতে থাকে।

মনে পড়ে, ঐ পথ দিয়ে ঘুরে গিয়ে যাওয়া যায় ভুয়নদর উপত্যকায়। তারও উপরে লোকপালে। হেমকুণ্ডে। এইতো ক'দিন মাত্র আগে সেখানে ছিলাম।

হিমগিরির দুর্গম গোপন-পুরে। সুরলোকের সন্ধানে।

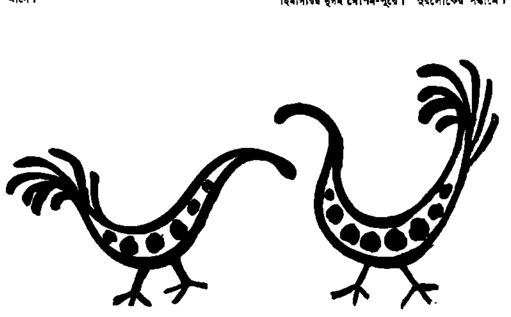

প্রাচীন শীত

সালভাতোর কোয়াসিমোদো

অনুবাদ : অশোক মুখোপাধ্যায়

দীপশিখার ঈষৎ আভায়
প্রসারিত হয়ে আছে
তোমার দুটি শুভ্র হাতের কামনা
হে প্রাচীন শীত,
ওককাঠ, গোলাপ আর মৃত্যুর বিচিত্র গন্ধে
তারা সুবাসিত।
পাখিরা শস্যের কণা খুঁজে খুঁজে
তুষার হয়ে গেল ;
কথারাও তাই।
দেবতার আশিসের মতো
একটুকরো উষ্ণ সূর্যালোক—
তারপর আবার সেই কুয়াশায় নিশ্চিহ্নতা।
সকালবেলা মনে হয়
গাছেরা এবং আমরা
যেন হাওয়ার অবয়ব হয়ে যাই।

মূলের ইংরেজী অনুবাদ :

Desire of your clear hands in the half light of the flame : they smelt of Oakwood and roses ; of death. Ancient winter.

The birds looked for their grain and were suddenly of snow ; similarly words ; a little sun, an angel's glory, and then the mist ; and the trees and us made of air in the morning.

এখনি সন্ধ্যা আসবে

[*AND IN NO TIME IT'S EVENING*]

সালভাতোর কোয়াসিমোদো

অনুবাদ : মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

তুমি, আমি, প্রতিটি মানুষ
একাকী দাঁড়িয়ে আছি
এই সূর্যরশ্মিবিদ্ধ পৃথিবীর বুকে ;
সন্ধ্যার আঁধার দ্রুত

একান্তে

রণজিৎ দাশগুপ্ত

আকাশের হাতছানিতে চলতি-পথের বাঁক
ভেঙে
টুকরো টুকরো স্বরলিপি
গীর্জার সান্দ্র ঘণ্টাধ্বনিতে
প্রতিধ্বনির মর্মর তোলে।

সান্ধ্যপ্রহরীর বিলম্বিত হাঁকে
আজানের সুর
দূর—দূরান্তরে
ছড়িয়ে পড়ে,

ক্লিন্ন, বিচ্ছিন্ন মন
বোবা কান্নার ঘেরাটোপ সরিয়ে
বন্ধ দরজার পাল্লা খুলে দেয়

খোলা হাওয়ায় গান রাখে।

আকাশগঙ্গা

• উপন্যাস •

বিশ্বেশ্বর নন্দী

হবেন তরফদার।

চিরদিনের দেশান্তরী তিনি। কাজে-কর্মে দেশ-বিদেশেই কাটাতে হয় তাঁর। বছরে-ছ'মাসে বাড়ী আসেন। দু'চারদিনের অতিথির মতো দু'চারদিন থেকেই আবার বের হন পথ-পরিক্রমণে। বৃদ্ধা জননীই বুঝি একমাত্র আকর্ষণ। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসার সুযোগ নেই তাঁর জীবনে, তাই যৌবনের অতিক্রান্তবেলায়ও সংসার পেতে বসার অবকাশ জোটেনি।

তরফদারের জ্যেষ্ঠ আজীবন সন্ন্যাসী হয়েই কাটিয়ে দিলেন তীর্থে তীর্থে। বৃদ্ধা জননীর সমস্ত সাধ অপূর্ণ ই রয়ে গেল। বৃদ্ধার মেয়েটিরও বিয়ে হয়ে গেছে কিছুদিন আগে। বাড়ীটা একটা উদাসীর মাঠ যেন। ঘরছাড়ার সুর অনুরণিত হচ্ছে বাড়ীটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

বিদেশ ও বাড়ীর সাথে যোগসূত্র রক্ষা করার কালে তরফদার একবার সাংঘাতিক অসুখে আক্রান্ত হয়ে কিছুদিন বাড়ীতেই থেকে যেতে বাধ্য হলেন। সেই সূত্রে অনুরাধার সাথে সান্নিধ্য।

অনুরাধা পাশের বাড়িরই ভাড়াটে। প্রতিবেশিনীর দাবি নিয়ে এ-বাড়ীর সাথে সম্বন্ধ দৃঢ় করেছিলেন আপন মধুর ব্যবহারে—অমায়িক আচরণে। তরফদার-জননী গ'লে গেলেন অনুরাধার আন্তরিকতায়। বিবাহিতা বোন মাঝে-মধ্যে পিতৃহীন পিত্রালয়ে বেড়াতে এলে অনুরাধার সান্নিধ্য ব্যতিরেকে অসহায় একাকী অনুভব করে। তরফদার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছেন অনুরাধা মায়ের কাছে। তাঁর উদাসীনতা—গৃহবিমুখীনতা—সংসার-অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি অনেক কিছুই। মায়ের খেদ ও বেদনার সব জায়গাই তাঁর চেনা।

সে-ও অনেক দিনের কথা। আরেকবার তরফদার দেখেছিলেন অনুরাধাকে এ-বাড়ীতেই। সে-ই প্রথম। প্রথম সন্দর্শনেই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল উভয়ের চোখের ওপর দিয়ে। সেই যে একবারের ক্ষণেকের চোখে-দেখা—একটা পরমারাধ্য দেবীমূর্তির মতো অঙ্কিত হয়ে রইল যেন হৃদয়ের পটে। চেহারার মাঝে এমন এক রূপের স্নিগ্ধ প্রলেপ ছিল, যা দৃষ্টি এড়াল না তরফদারের। সে-রূপে মোহ আছে,—আছে স্নেহ-বিগলিত কোমলতা। সে-রূপ পোড়ায় না—সান্ত্বনা বুলিয়ে দেয় সমস্ত দেহ-মনে। আর কণ্ঠস্বর। সে তো স্বর নয়, যেন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব রাগিণীর অদ্ভুত মূর্ছনা! কর্মব্যস্ততার কঠোরতার মাঝে হয়তো হারিয়ে যেতে পারে অনুরাধার বাস্তব সত্তা তাঁর মন থেকে; কিন্তু ঐ কণ্ঠের সুরবেশ কদাপি নয়। সেই সুরবেশ সংগীত সৃষ্টি করে রইল তাঁর অবচেতন হৃদয়-বীণায়। তরফদার উপলব্ধি করেছিলেন—ক্ষীর সমুদ্র-মন্থনে যে-সুধা উঠেছিল সে-সুধা পান করে অমর হলেন দেবতারা,—অনুরাধার কণ্ঠের সুরসুধা পান করে মর্ত্যের মানুষের অমরত্ব লাভ করা খুব কঠিন হবে না; অন্ততঃ তরফদার এই সুরসুধা পান করে-করে জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন।…কিন্তু সে-ও তো নিছক হৃদয়-বিলাস মাত্র, একটা মূল্যহীন আকাঙ্ক্ষা।

তরফদার দেখতে ভুল করেননি; অনুরাধার সীমন্তে যে অঙ্কিত হয়েছে লাল-টকটকে সিঁদুরের রেখা। তিনি তো জানেন,—এমন মেয়ের মুখের দিকে তাকানোর অর্থ দিগন্তের তারকার দিকে তাকিয়ে থাকা! কাছে যাওয়া যায় না, কাছে আহ্বান করা যায় না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই বিবাহিতা রমণীর মুখের দিকে তাকানো বড় ভুল, তার চেয়ে বেশী ভুল মুগ্ধ হওয়া।

তবু, বিদেশের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরই অবচেতন মনের মাঝে সংগীত সৃষ্টি করে একটি কণ্ঠের সুর। সে-সুর মিলায় না মন থেকে।

কে জানত, সেই অনুরাধাই রোগশয্যার শিয়রে বসে কণ্ঠের সুধা-লহরী ছড়াবেন!

তরফদারের অসুখের সমস্ত ঝক্কিটা পড়ল বৃদ্ধা বিধবা জননীর ওপরই।

ঝক্কিটা পড়ল অবশ্য জননীর ওপর, কিন্তু সে-ঝক্কি পোহালেন সমস্তটাই পরের বাড়ীর বধূ অনুরাধা দেবী। অনুরাধার চোখে নেই নিদ্রা—উদরে অন্ন দেবার ফুরসত-ও জুটছে না। নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দিলেন তিনি তরফদারের সেবায়। মা আপন সংসারের দিকে তাঁর দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যুক্তি তাঁর অকাট্য।—এমনি পরের সেবায় আত্মনিয়োগের সুযোগ জীবনে না-ও আসতে পারে, মা! সংসার আমার তো রইলই। দু'দিন পরে তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও চলবে। কিন্তু রোগীর সেবায় যে ব্যতিক্রম করার উপায় নেই।

মা এই মুগ্ধা মেয়েটির কাছে হার মানলেন। তরফদারও সম্ভ্রমে-সংকোচে মাথা পেতে নিলেন অনাদৃত-সেবা।

স্বীকার করতেই হবে—তরফদার সে-যাত্রা প্রাণ ফিরে পেলেন অনুরাধারই অকৃত্রিম সেবা এবং একনিষ্ঠ শুশ্রূষায়। তরফদার চিরকৃতজ্ঞ তাঁর কাছে।

রোগমুক্তির পর তরফদারের বিদেশ-যাত্রা শুরু হ'ল নতুন করে।

লজ্জায় ও সংকোচে তরফদার বিদায়কালে অনুরাধার কাছে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। অনুভব করেছিলেন,—এ অন্যায়,—তাঁর এই কসাই-সুলভ আচরণ মার্জনীয় নয়। অনুভব করেছিলেন বিদায়ের দিনে সিঁড়ির ধারে ঠিক মায়ের পাশটিতে অশ্রুমুখী আরেকটি কল্যাণী-মূর্তিকে।

বিদেশে কাজের খরস্রোতেও মনে পড়ল সেই কল্যাণীকে—যিনি নির্বাক শুশ্রূষা দিয়ে পুনর্জীবন দান করেছেন তরফদারকে। প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই—পুরস্কারের স্পৃহা নেই। অকৃপণ পরিচর্যা-দানেই পরম পরিতৃপ্তি। অনুরাধা তাঁদের কেউ নন। সামান্য প্রতিবেশিনী মাত্র। তবু এমন সেবা অনেক নিকট-আত্মীয়ের কাছেও দুর্লভ। তরফদার ভাবলেন, নির্লজ্জের মতো মুখ বুজে তাঁর সেবা গ্রহণ করলেন, অথচ সামান্য মৌখিক ভদ্রতা জ্ঞাপন করার মতো বুকের সম্পদও তাঁর নেই।

নীতিবুদ্ধি প্রেরণা যোগাল ভদ্রতা-জ্ঞাপনের। লিখলেন সবিনয়ে অনুরাধার কাছে: নবজীবন দান করেছেন আপনি। আপনার সস্নেহ-পরিচর্যার ঋণ স্মরণে রাখব চিরদিন।

অনুরাধার অবচেতন মনে যেন প্রত্যাশা ছিল এরই। সমুচিত উত্তর এল: ধন্যবাদ আপনার ঋণ-স্বীকারের জন্যে। সামান্য পরিচারিকার বেশী মূল্য দিতে পারলেন না আপনি আমাকে। ডাক্তার-নার্স রাখলে ততোধিক পরিচর্যা-দানের নৈতিক দায়িত্ব থাকত তারও। তার জন্যে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন বাহুল্য মাত্র।

তরফদার লিখলেন: হার মানলেম আপনার তীক্ষ্ণধীর কাছে। খোঁচা দেওয়ার কৌশল আয়ত্ত আপনার—স্বীকার করি। সংসার-অনভিজ্ঞ আনাড়ীর অসামাজিক ধৃষ্টতা কিছু ঘটে থাকবে হয়ত। মার্জনা ভিক্ষা চাই তার জন্যে। সত্যি, বিদেশী-বিভুঁয়ের দেবার মতো এর বেশী সম্বল নেই।

প্রত্যুত্তরে অনুরাধা বেদনা জ্ঞাপন করলেন: কৃপণ আপনি মনে-প্রাণে। সঙ্গ থেকে তাই খোয়াতে চান না কিছুই। কোনো দিক দিয়ে ঋণ-শোধের প্রতিশ্রুতি দিলে সুখী হতেম। সে-শক্তি না থাকলে, কতিপয় শব্দাবলির অর্থহীন মালা গেঁথে অসত্যকে অলংকৃত করে তুলবেন না। সম্ভ্রমবোধ রইল। সত্যি, কী আশ্চর্য মানুষ আপনি। মানুষ হিসেবে কোনো মূল্য দেবার কথাই মনে এল না আপনার! পারিবারিক স্পর্শ থেকে দূরে থেকে থেকে এমনি পাষাণ হয়ে উঠেছেন। তাই মানবিক নৈতিকতার কথা মনেই পড়ল না আপনার। অথচ অনেক প্রত্যাশাই ছিল আমার এরই জন্যে। … ভাবছেন, সীমা থাকা দরকার মেয়েদের প্রগল্‌ভতার। আপনার দৃষ্টিতে অতিক্রম করেছি আমি তা। ক্ষমা চাই তার জন্যে।

তরফদার লিখলেন: অপরাধী করেছেন ক্ষমা চেয়ে। নিত্য-নবজন্মের সাথে পরিচিত করে দিয়ে দৃষ্টির আগল দিলেন খুলে। ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার অনেক। মার্জনা ভিক্ষা তো আমারই চাইবার কথা। সমাজে বাস করে অসামাজিক আচরণ অমার্জনীয়। যদি কোনদিন এতটুকুন কাজেও লাগতে পারি আপনার, ধন্য মনে করব নিজেকে।

অনুরাধা শুধু দু'ছত্র লিখলেন প্রত্যুত্তরে: আশ্বস্ত হলেম তবু যা-হোক। সত্যি কাজের যদি ডাক পড়ে পিছ-পা হবেন না যেন।

এমনি পত্রালাপ চলতে থাকে।

মুখ ফুটে কথা বলবার সাহস ছিল না যাঁদের, পত্রে তাঁরা পাতাড়ি-পাতাড়ি ভরে মেলে ধরলেন পরস্পরকে। এক পক্ষের পত্রোত্তরের বিলম্ব অপর পক্ষের গভীর উৎকণ্ঠার কারণ হয়। তরফদার এ-বিরহ সইতে পারেন না।

অনুরাধা কান্নাকাটি করে চিঠি লেখেন: কী নিষ্ঠুর আপনি! কাজের তাগাদায় চিঠি লিখতে দু'দিন দেরি করেছিলাম বলে এমনি করে তার শাস্তি দিতে হয়?…না। সত্যি, আপনার হয়ত আবার অসুখ করেছে। দিন-রাত আমার আহার নেই, নিদ্রা নেই। আপনার কুশল-সংবাদ না পেলে জলগ্রহণ করব না।

তরফদার ভেবে সারা হয়ে যান। সত্যি, অদ্ভুত এ-নারী। সামাজিক বন্ধন নেই কোনখানে। সামান্য দু'চার দিনের চোখে-দেখা। তবু পরের জন্যে কেমন আকুল হয়ে পড়েছেন। এমন কল্যাণীদের কল্যাণে মানুষের সুকোমল বৃত্তিগুলো বেঁচে রয়েছে আজো। তাই মানুষ পায় সুন্দর-জীবন-ধারণের প্রেরণা। ক্লান্তি-অবসাদের সান্ত্বনা মেলে এঁদের স্নেহ-শীতল-পরশে।

লিখলেন তরফদার: অনাত্মীয়ের জন্যে দরদ আপনার অতুলনীয়। আপনার ঋণ শোধ করতে পারব না এ-জীবনে। কাজের চাপে পত্রোত্তরে বিলম্ব ঘটেছে কিঞ্চিৎ। এত উদ্বেগের তেমন-কোনই হেতু নেই।

অনুরাধা তীব্র উষ্মা জ্ঞাপন করলেন প্রত্যুত্তরে: কান ঝালাপালা করে ফেললেন ঋণ-ঋণ করে। চাইছে কে তার শোধ? কেন, ঋণের বাইরে কিছু ভাবনার মতো উদারতা

নেই আপনার? মানুষ হিসেবে কি কোনো মূল্যই নেই আমার আপনার কাছে? কেন এ অহেতুক মৌখিক-ভদ্রতার চাপে জীবন্ত মানুষকে চান মেরে ফেলতে? একজন দিনরাত এমনি আকণ্ঠ-প্রত্যাশা বয়ে বেড়াচ্ছে—ওদিকে মরছে উপবাসী অন্তরাত্মা আপন জীর্ণদেহ-পিঞ্জরে—তার দিকে দৃষ্টি ফেরাবার কথা কেন মনে পড়ছে না আপনার? কাজ! কাজ! কাজ! কী এত কাজ! কার জন্যে এ কাজ? মানুষ যদি মরে গেল তিল তিল করে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে—কী হবে ও-সব বাজে-কাজ দিয়ে?… খুব ভালো লাগে বুঝি একজনকে এমন নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাতে? জানিনে কোন্ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলাম আপনাকে—কোন্ অন্তর কেমন করে গ্রহণ করেছিল! বলতে পারেন মুহূর্তের জন্যেও কেন পারছিনে আপনার স্মৃতিকে মুছে ফেলতে মন থেকে? কেন প্রাণ এত আকুল—আবিঘূর্ণন অন্তরে ভরপুর?…আগে যদি জানতেম আপনার জন্যে কেঁদে সারা হতে হবে আমায়—ভালো ছিল আপনাদের সাথে অপরিচয়ের দূরত্বের প্রাচীর তুলে রাখা।…ভাবতে চাই—আপনি আমার কে? কেন এই ব্যাকুলতা? প্রাণের সব চুকে না তবু।…আমার এই উদ্বেগ—এমনি নির্লজ্জ উৎকণ্ঠা—আপনার দৃষ্টিতে কিরকম রূপ পরিগ্রহ করবে জানিনে। তবু এই অহেতুকতার কৈফিয়ত জানালাম আপনাকে—আপন অন্তর-ভার লাঘব করতে। বিচারে আমার শাস্তি সমাজ-নীতির চরম বিধান তা জানি। কিন্তু এমনি বিচ্ছিন্ন অবহেলায় কত প্রাণই তো পুড়ে হয়েছে ছাই—কত আত্মা নিশ্চিহ্ন হয়েছে ধরাধাম থেকে।

তরুকদার বিপন্ন বোধ করলেন নিজেকে। কী চান এই কুলবধূ তাঁর কাছে! সত্যি এমন-কিছু কি তাঁর আছে যা তিনি দিতে পারেন অনুরাধাকে! ক্ষণিকের চোখে-দেখা। এর বেশী কিছুই তো নয়। আর দিন-কয়েকের পরিচর্যা-দান, মুখ বুজে যা গ্রহণ করেছেন তরুকদার। নৈতিক উদ্বেগ খোঁচা দেবার কথা তো তাঁকেই। কিন্তু অনুরাধা কেমন করে এমন নিঃসংকোচে হৃদয়ের সকল দুয়ার খুলে দিতে পারলেন তাঁর কাছে! কেমন করে নিঃসংকোচে ব্যক্ত করতে পারলেন অন্তর-দুর্বলতা? তবে কি অনুরাধা—! ছি! ছি! তিনি যে পরস্ত্রী! অপরাধ আছে ঐ কলুষ-চিন্তায়।

তরুকদারের জীবনে এল তুমুল পরিবর্তন। সারা-জীবনটা দেশ-বিদেশেই কাটিয়েছেন একরকম। কাজ আর বই। অধ্যয়ন আর অর্থার্জন। তার সাথে সার্থ নতুন তথ্যের উদ্ঘাটন। নতুন সিরোমানের নবতম পদ্ধতি আবিষ্কার। এই পুঁথি-পাঁজি ও কলকারখানায় তলায় চাপা পড়েছিল মানুষ—তার সমূহ হৃদয়বৃত্তি। আজ তাঁর মনে হ'ল—কিসের ছোঁয়া লেগেছে তাঁর দেহে-মনে। জেগে উঠেছেন তরুকদার অনন্তশয়ন থেকে। মনে হ'ল তিনি আবিষ্কার করলেন নিজেকে বহু শতাব্দী পরে নতুন করে—আবিষ্কার করলেন হৃদয়ের বিরাট-শূন্যতা—অন্তরের উপবাসী মানুষকে। আবিষ্কার করলেন অন্তরের অনন্ত-বেদনা। কোন্ স্বপ্ন-গহনে ঘুমিয়ে ছিল অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা—প্রাণের এই কামনা! কে যেন এসেছে তাঁর হৃদয়ের দুয়ারে—কে দিল ডাক হাতছানি দিয়ে! সে তো অনুরাধা। চিরন্তনী-প্রকৃতি-সত্তা—যে যুগে যুগে পুরুষকে তুলেছে জাগ্রত করে—যার প্রেরণায় অক্ষয় রয়েছে অনন্ত সৃষ্টির ধারা। যারা পাষাণকে দিল প্রাণ—মূককে প্রদানিল তারা! আজ তরুকদারকে যিনি দৃষ্টির অঞ্জন এঁকে দিলেন তিনি অনুরাধা।

কর্মক্লান্ত অবসরক্ষণে তরুকদার বসেন ভাবতে। ক্লান্তিতে নেই আর অবসাদ। চিন্তায় নেই গ্লানি। ভালো লাগে অনুরাধার স্মৃতি। নিস্তব্ধ নিশীথিনীর সুপ্তিহীন প্রহরগুলি হয়ে ওঠে অনুরাধাময়। আকাশের অগণিত তারাপুঞ্জ-মাঝে নবজীবনের ইসারা খুঁজে পান তরুকদার। নিশি-শেষে প্রথম-প্রভাতে অনুরাধার মধুময় স্মরণ প্রথম অভিনন্দন জানায় তরুকদারকে। এক বিস্ময়-বিজড়িত অনুভূতির আস্বাদ পেলেন তরুকদার।

কিন্তু যতই উদ্ঘাটিত হয় আপন হৃদয় আপনার কাছে, শঙ্কিত হয়ে পড়েন তরুকদার ততই। কী অর্বাচীন হৃদয়-দৌর্বল্য! প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না একে। যদি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায় তাঁর এই অন্তর মনোভাব অনুরাধার কাছে—কী ভুল করবেন তিনি! ছিঃ ছিঃ!… লজ্জিত হয়ে পড়েন তরুকদার।

বাইরে টললেন না, মন—সে-মনের সন্ধান রাখতেন না তরুকদার,—যে-মন ঘুমিয়ে ছিল অচেতন জড়ায়—চাপা পড়েছিল কর্মময় বাস্তবসত্তার অন্তরালে। কোন্ অন্ধকার কন্দর থেকে বেরিয়ে এল সে নবীন পৃথিবী নিয়ে—নবতর দৃষ্টি নিয়ে—কল্পনাময় অনুভূতি নিয়ে। তরুকদার ভাবতে পারেন না নিজেও। তবু অনুভব করলেন—মরা-গাঙে বান ডেকেছে,—তার কুলুকুলু নাদ সংগীত-মুখর হয়ে ওঠে

তাঁর কর্ণকুহরে। কস্তুরী-মৃগ-সম আপন গন্ধে আপনি মাতোয়ারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তরফদার।

ফিরে এলেন দেশে—কলকাতায়। মায়ের চরণ স্পর্শ করে বললেন,—ফিরে এলাম মা, তোমারই চরণপ্রান্তে। আর যাব না।

—হ্যাঁ বাবা, যেয়ে আর কাজ নেই। বুড়ো হয়ে গেছি, কোনদিন মরে যাবো—দু'দণ্ড থাক্ আমার কাছে।

অশ্রুমুখী জননীর কী বিরাট সান্ত্বনা।

কিন্তু মায়ের সাধ মিটলনা এতেও। যুগ-যুগান্তর ধরে যে মায়েরা পুত্র-পুত্রবধূ-নাতি-নাতনীতে জম-জমাট সংসার পেতে এসেছেন, আজো সে-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে জননীর। প্রস্তাব করলেন,—আর যে পারিনে বাবা, এ-বিরাট সংসারের ভার বইতে। একটা বিয়ে-থা কর্—বৌমার হাতে সংসার তুলে দিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি আমি।

কণ্ঠে তাঁর বেদনা ও অনুনয়ের সুর।

অলক্ষিতে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তরফদারের। বুকের মাঝে খুঁজে দেখতে চাইলেন যেন কাউকে—একজন কার কথা মনে পড়ে গেল যেন তাঁর—যা ব্যক্ত করায় সামাজিক অপরাধ অনেক।

তরফদার লক্ষ্য করলেন দরজার পাশটিতে দাঁড়ানো সেই বধূটি—অর্ধাবগুণ্ঠনের অন্তরালে সলজ্জ হাসিটি লক্ষ্যে পড়ল তাঁর। চমকে উঠলেন তিনি। অন্তরের মাঝে যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—এঁর সাথে তাঁর কেন এত গভীর সাদৃশ্য! লজ্জায় আনতাননে কক্ষান্তরে চলে গেলেন তরফদার পাশের দরজা দিয়ে।

আপন কক্ষে অর্ধশায়িত তরফদার পুস্তক-অধ্যয়নে নিবিষ্ট। তরফদার নিজেই জানেন, গ্রন্থের পৃষ্ঠায় ছিল নিবদ্ধ-দৃষ্টি, মন ছিল যেন কোথায়! খুঁজে বেড়াচ্ছে সে কাউকে আশেপাশে এ'বাড়ী-ও'বাড়ীতে। প্রাণে আকণ্ঠ পিপাসা—হৃদয়ে ঊর্দ্ধ্বগ্রীব আকাঙ্ক্ষা—নয়নে অধীর প্রতীক্ষা তরফদারের।

—কেমন আছ?

চমকে উঠলেন না তরফদার। কারণ, এ তো জানা কথাই। অনুরাধা আসবেনই। ধন্য হল শ্রবণ-কুহর। এর জন্যেই তো প্রতীক্ষা ছিল এতদিন—এই সুমধুর কণ্ঠটির।—যে-কণ্ঠের সুর শুনে-শুনে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন তরফদার।

অনুরাধা প্রশ্ন করলেন। জড়তা নেই কোনোখানে। নেই আড়ষ্টতা। যেন এ-ভাবণই স্বাভাবিক অতি। কথায় এমন কোনো ভাব নেই যাতে প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটল তাঁদের প্রথম-কথনের সংকুচিত সুযোগ। যেন কতো কালের পরিচয়—অনন্তযুগের আত্মীয়তা। কোথায় গেল রমণীর সলজ্জতা! পরপুরুষের নির্জন প্রকোষ্ঠে অপরিচিতা পর-কুলবধূর নিভৃত-প্রবেশের সামাজিক ভীতি কোথায় হয়ে গেল ধূলিসাৎ। অনুরাধার নীতিতে বাধল না—রুচিতে ঠেকল না। সহজ সরল অতিপরিচিতার কণ্ঠস্বর থেকে নির্গত হয়ে এল 'কেমন আছো?'—কেমন করে 'আপনি'র দূরত্ব গেল খসে, 'তুমি' এল পরম আত্মীয়তা নিয়ে।

তরফদার মুখ তুলে তাকালেন। সলজ্জতা কাটেনি তাঁর। গল্পে-গুজবে হাসি-হল্লোড়ে সরগরম করে রাখতেন জনহীন বাড়ীটা পরের বাড়ীর বধূ এসে। তরফদার শুনতেন কখনো ভেসে আসছে কলহাসি পাশের ঘর থেকে—কখনো মাথাধরা। সে-হাস্যকল্লোলিনীর কল্পিত মূর্তিই দেখবেন প্রত্যাশা করেছিলেন। দেখলেনও তরফদার,—দীর্ঘ আয়ত নেত্রদ্বয়…। সীমন্তিনী অনুরাধাকে জীবনের এক উচ্ছ্বসিত বসন্ত-প্রভাতে দেখেছিলেন তরফদার। কিন্তু সে-রূপ আর এই রূপ তো এক নয়! হয়তো যৌবন বিদায় নেবার পূর্বমুহূর্তে যে মোহময় স্পর্শ রেখে যায়, তার সর্বশেষ আভাস বুঝি লেগেছিল যৌবন-বিগতপ্রায় তরফদারের চোখে; আজকের স্তিমিত-যৌবনে সে-রূপ বুঝি ধরা পড়ে না। আজকের অনুরাধার দৃষ্টির ভাষা অব্যক্ত নয় তরফদারের কাছে। মনে হ'ল—দৃষ্টিতেই রয়েছে তাঁর অন্তরের ভাষা। বেদনায় ভারাক্রান্ত অক্ষিপল্লবযুগল। ধরা পড়ে পুঞ্জীভূত দুঃখের গভীর অস্তিত্ব। হাস্যমুখরতা আবরণ মাত্র। আসলে ব্যথাই তাঁর হৃদয়ের স্পন্দনে। মনে হ'ল—দীর্ঘ ও-দুটি কাজল-নয়নের অন্তরালে রয়েছে তাঁর জীবনের অপরিসীম দুঃখ-জর্জর ইতিহাস। তরফদার অনুভব করলেন করুণা নয়, বেদনা। যেন, আত্মনিবেদনের গভীর তাৎপর্য রয়েছে এই সুন্দরী রমণীর। অনুরাধারই লিখিত পত্রের এক ছত্র মনে পড়ল তাঁর—এমনি বিচ্ছিন্ন অবহেলায় কতো প্রাণ পুড়ে হয়েছে ছাই, কতো আত্মা নিশ্চিহ্ন হয়েছে ধরাধাম থেকে।…

উত্তর দিলেন তরফদার: আছি ভালোই। তুমি?

তরফদারের সর্বশরীরে যেন প্রাণবন্যা বয়ে চলেছে।

নিরাশকণ্ঠে উত্তর দিলেন অদূরে দাঁড়ানো অনুরাধা,—আমাদের আবার থাকা! মেয়েরা তো আর মানুষ নয় যে, তাদের থাকা-না-থাকা নিয়ে মাথাব্যথা হবে কারো! কে রাখে তাদের সুখ-দুঃখের খবর।

বেদনা তাঁর উপছে পড়ল বাক্যে। কণ্ঠে অভিমানের সুর।

উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন তারকনাথ,—কেন? কিসের এত দুঃখ তোমার?

—দুঃখ?— বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল অনুরাধার মুখে। শোক তার বর্ণে বর্ণে। —কৈ, কোনোদিন জানতে তো চাওনি তুমি, এমনি মুখের হাসি দিয়ে ঢেকে রেখেছে কতো মানুষ, কতো তার বেদনার মর্মন্তুদ কাহিনী?

—এতদিন নিজের সন্ধানও কি নিজে করেছিলাম? দুনিয়ার মানুষ তো অনেক বড় কথা। যদি বিশ্বাস হয়— নিঃসংকোচে ব্যক্ত করতে পার, যদি তোমার দুঃখের কোনো প্রত্যক্ষ কারণ থাকে। তোমার কাছে ঋণী আমি। প্রাণ দিয়েও তোমার দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করব আমি।

—কিসের ঋণ? ও, তোমার সেই অসুখের সময়ের কথা বলছ?

—হ্যাঁ। একদিকে যম তাঁর চর-অনুচরবর্গ নিয়ে— অন্যদিকে তুমি। সে-টাগ-অব-ওয়ারে জয়ী হলে তুমি। ফিরিয়ে আনলে আমায় মৃত্যুর দুয়ার থেকে—দান করলে নতুন জীবন। সে-ঋণের কথা ভুলতে পারি এ-জীবনে?

—লজ্জা দিয়োনা আর ঋণ-ঋণ করে। মনে থাকবে তোমার প্রতিশ্রুতির কথা। আমার যা পোড়া-অদৃষ্ট! তুমি পারবে খণ্ডাতে সে-লিখন? রইল মনে। বলব'খন একদিন সময়মতো।

দুই

গভীর নিশীথেও নিদ্রা আসে না তারকনাথের চোখে। পুলক-অধ্যয়নের উপলক্ষ্যে জাল বুনেন অনুরাধার কল্পনায়। —ভালো লাগে তারকনাথের—ভালো লাগে নূপুরের রিনুঝুন। পুলকের বর্ণে বর্ণে ছন্দায়িত হয়ে ওঠে অনুরাধার প্রতিচ্ছবি। এত মধুর—এত আনন্দ-বিহ্বল এই কল্পনা— কে জানত তা!

রজনীর নিস্তব্ধ প্রহরে একরাশ আকুলতা নিয়ে তারকনাথের প্রকোষ্ঠদ্বারে মৃদু কর-সংকেত করলেন তারকনাথ-জননী—দ্বার-উন্মোচনের সাথে-সাথেই বলে উঠলেন,— বৌটাকে মেরে ফেললে যে রমেশ!

প্রাণের উৎসব-আনন্দ নিভন্ত হয়ে গেল একমুহূর্তে— অনুরাধা-তপস্যা ব্যাহত হয়ে গেল। —কে? কাকে?— কোথায়?— চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ উছলে পড়ল তারকনাথের। জামার আস্তিন গুটাতে গুটাতে বললেন,—কৈ? চলো দেখি?

রমেশদের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল বেচারী অনুরাধা স্বামীর নির্মম প্রহার হজম করে যাচ্ছেন নির্বিকারে। কথায় আবেদন নেই—কান্নায় আর্তনাদ নেই—আর এই দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদও নেই বিন্দুমাত্র। সহনশীলতার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখালেন—পাতিব্রত্যের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিলেন অনুরাধা।

নিমেষে রক্ত গরম হয়ে উঠল তারকনাথের। এই নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠল অন্তরাত্মা। শুধু মাত্র স্বামীত্বের অধিকারে একজন অবলা নারীর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার অপরিসীম স্বাধীনতার এই উচ্ছৃঙ্খল অভিব্যক্তিকে কিছুতেই তিনি ক্ষমার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারলেন না।

তারকনাথ একবার ভাবলেন, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে দিয়ে আসেন ঐ অসভ্য জানোয়ারটার। অসহ্য উত্তেজনায় শরীরের মাংসপেশীগুলো তাঁর কঠিন সবল হয়ে উঠল—ধমনীর রক্তস্রোতে অনলের বন্যা ছুটে চলেছে— নিজেকে কিছুতেই যেন সংবরণ করতে পারছেন না তিনি। এক এক বার ভেবেছেন, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েন নর-পশুটার ঘাড়ের ওপর। সর্বশরীর কাঁপছে উত্তেজনায়।

—ঘরে চল্, রমেশ!

মা স্বস্তি দান করলেন তাঁকে।

রজনীর সুদীর্ঘ প্রহর পর্যন্ত অনেক আলোচনা হ'ল মাতাপুত্রে—অনুরাধা-প্রসঙ্গে। অনুরাধার স্বামী ইঞ্জিনীয়ার —শিক্ষিত ভদ্রলোক হিসাবেই তাঁর সুপরিচয়। অর্থার্জনও করেন যথেষ্ট। কিন্তু অর্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হয় মদ এবং বারবনিতার পশ্চাতে। মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরেন অধিক রাত্রে। কোনোদিন বা দরজা খুলতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটলে কিংবা এক থেকে দুইবার দ্বারোদ্ঘাটনের আহ্বান জানাতে হলে—এককথায়, পান থেকে চুন খসলেই অনুরাধাকে পাশবিক দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হয় লম্পট-মাতাল স্বামীর। যে-নিরীহ বেচারী রাত্রির অনির্দিষ্ট প্রহর পর্যন্ত স্বামীর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেন, উপবাসক্লিষ্ট দেহে স্বামীর আহার্য পাহারা দিয়ে বসে থাকেন পরম উৎকণ্ঠায়, তাঁর প্রতি স্বামীর অমানুষিক স্বেচ্ছাচারের কাহিনী শুনলেন তারকনাথ। সে-কাহিনী মুখ ফুটে বলতে হ'ল না অনুরাধার।

পরদিনও গভীর রাতে অনুরূপ পদাচার পরিলক্ষণ করলেন তরফদার অনুরাধা-স্বামীর।

এই কি অনুরাধার জীবন! এমনি জটিল—এমনি বিড়ম্বনাময়। কিন্তু কেমন করে সম্ভব এর সমাধান—একজন পরস্ত্রীর গায়ে-পড়া ভালো-করা কেমন করে সম্ভব!

তিন

অকস্মাৎ ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হ'লে উদ্বেগের কারণ হয়। যে-অনুরাধার এ-বাড়ীতে না-আসার একটা দিনের দৃষ্টান্তও দেখতে পান না তরফদার—দিনে একবার অন্ততঃ যাঁর আসা চাই-ই এ-বাড়ীতে, তিনি যদি পর পর দু'দিন অনুপস্থিত থাকেন, তবে দুশ্চিন্তার কারণ হয় বৈকি। আর-কারো না হোক, তরফদারের নিশ্চয়ই হয় সমূহ দুশ্চিন্তার কারণ। তাইতো তিনি আর ঘরে টিঁকতে পারলেন না,—একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁকে টেনে নিয়ে এল অনুরাধাদের বাড়ীতে—সটান অনুরাধারই প্রকোষ্ঠদ্বারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দীর্ঘ দুই দিন উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর।

—আরে! কী সৌভাগ্য আমার! শবরীর গৃহে আজ রামচন্দ্রের পদার্পণ। এ কী অঘটন কথা!

তরফদার একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন অনুরাধার দিকে। তেমনি হাস্যময়ী তিনি। দু'দিনের স্বামী-নির্যাতনের গ্লানি যেন স্পর্শ ই করতে পারেনি তাঁকে।

—বাঃ, ঘরে এসো, বোসো!

তরফদার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন,—দু'দিন ধরে ওদিকে যাওয়া হয়নি যে বড়?

প্রহেলিকার হাসি খেলে গেল অনুরাধার মুখের ওপর। বললেন,—চিরদিনই কি মহম্মদকে যেতে হবে পর্বতের কাছে? পর্বত কি কোনোদিন আসতে পারেনা মহম্মদের কাছে?

—পর্বত যে স্থির নিশ্চল। তাই বারংবার মহম্মদেরই যেতে হয় পর্বতসকাশে।

—সেটুকুন পরখ করার জন্যেই যাইনি।

—তা তো সত্যি নয়। দিনে অন্ততঃ একবারও যাওনি আমাদের বাড়ীতে এমন দিনের কথা আমি তো স্মরণ করতে পারিনে। শ'খানেক ডিগ্রী জ্বর নিয়েও তো গেছ। আজ অকস্মাৎ তার ব্যতিক্রমে উদ্বেগের কারণ হয় বৈকি!

—তবু ভালো। আমার জন্যে পৃথিবীর একজনেরও অন্ততঃ মাথাব্যথা হয়।

—তা যেন হ'ল। কিন্তু সারাদিন না-যাওয়ার কারণটা?

—তার জন্যেই এত উদ্বেগ! আশ্চর্য তো! তা সে-কারণটা কি এখনো বুঝিয়ে বলতে হবে? বুঝছ না,—উনি যে বাড়ীতে ছিলেন—এই তো একটুখানি আগে বেরিয়েছেন। যাক, তবু এই কারণেই অন্ততঃ তোমার পদার্পণ ঘটল। তা-ও তো আমার কাছে কম আনন্দের কথা নয়।...দাঁড়াও দু'কাপ চা নিয়ে আসি। বেশ একটু শীত-শীত লাগছে না?— ব'লে তিনি চলে গেলেন।

তরফদার ভাবছেন দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে।...

—এত মশগুল কার চিন্তায়?— ব'লে দু'হাতে দুটো চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকলেন অনুরাধা। কাপ দুটো থেকে তখনও ধূম উদ্গীর্ণ হচ্ছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। টেবিলের ওপর কাপ দুটো রেখে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন,—নিশ্চয়ই অনুরাধার চিন্তায় নয়।

তরফদার বললেন,—সে-কথা বলাই বাহুল্য। নিজের সম্বন্ধে এতখানি সচেতন হওয়াটা 'নার্সিসিজম্'-এর আওতায় পড়ে। সেটা কিন্তু সর্বনাশের সোপান।

—এমন থমথমে অবস্থায় গুমরে-মরার চেয়ে একটা সর্বনাশ হয়ে যাওয়াই ভালো। স্বর্গে যখন স্থান হ'ল না, তখন নরকই গুলজার করা যাক। কী বলো?

—তোমার-আমার স্থান যে স্বর্গে কোনোদিন হবে না, সে তো জানা-ই কথা। তার জন্যে পূর্বাহ্ণে বাসনা দিতে হবে না। পাপ করলে তো আর পুণ্যের ফল পাওয়া যায় না!— ব'লে তরফদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন যেন তাঁরই সামনা-সামনি চেয়ারে উপবিষ্টা অনুরাধার সমগ্র মুখমণ্ডল—যেন কিছু আবিষ্কার করছেন ওখান থেকে।

—ওকি, অমন করে কি দেখছো?

—আচ্ছা, তোমার সমস্ত মুখে এতসব দাগ কিসের?

—ও কিছু না। ব্রণ-টনের দাগ-ছোপ হবে হয়তো।— ব'লে সর্বাঙ্গে শাড়ীটা টেনেটুনে ঢেকেঢুকে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন অনুরাধা।

এ-প্রচেষ্টাটা দৃষ্টি এড়াল না তরফদারের। বললেন,—ও দিয়ে তুমি নিজেকে ফাঁকি দিতে পার, অনুরাধা, আমাকে পারবে না। তোমাকে আজ নূতন কিংবা অনেকদিন পরে দেখছিনা তো। রাতারাতি অসংখ্য ব্রণ গজিয়ে ওঠাও স্বাভাবিক নয় মোটেই। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন,—যেটাকে শাড়ী দিয়ে ঢাকবার এইবার বিফল চেষ্টা করলে?

—এ তো আচ্ছা এক যন্ত্রণা দেখছি! মানুষের কি

সুখ-অসুখও থাকতে নেই? প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির জন্যে খোঁচাখুঁচি করলে তো পারা যায়না বাপু!

—দেখ, তুমি যেমন করেই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা কর না কেন, সুবিধে হবে না। তোমার ও-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবেই। আমি কি কিছুই জানিনে মনে করেছ নাকি?

—যদি জানই, তো জিজ্ঞেস করছ কেন?

—জিজ্ঞেস করছি এই কারণে যে আমার ধারণাটা তো ভুলও হতে পারে?

—ভ্রান্তিটা যতক্ষণ নিজের মাঝে থাকে, নিরসন না হওয়া পর্যন্ত তা তো সত্যি হয়েই থাকে।— ব'লে ঈষৎ হাসলেন অনুরাধা।

—তা হোক। সত্যি করে বলো ও-সব কিসের?— দৃঢ়কণ্ঠে বললেন তরফদার।

—ও-সব?— এক অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটে উঠল অনুরাধার মুখে। —ওসব আমার সুখময় দাম্পত্য-জীবনের চিহ্ন! খুশী হলে তো শুনে?— ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন অনুরাধা।

—মানে?

—মানে—তুমি একটা আস্ত বোকা।

—যেমন?

—যেমন, তুমি আমার সুখের দাম্পত্য-জীবনের চিহ্নগুলো চিনতে পারলে না। ওগুলো আমার স্বামীর প্রহার-চিহ্ন। তিনি গভীর-রাতে কোনো বারবনিতার গৃহ থেকে স্ফূর্তি লুটে আসেন চুর-মাতাল হয়ে। এসে যে-কোনো নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে নির্মমভাবে প্রহার করেন তাঁর অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে-করা স্ত্রীকে, অর্থাৎ আমাকে। আশা করি, শুনে তোমার খুব আনন্দ হ'ল!

—আমার আনন্দ হ'ল? মানে?

—মানে, আমার কুৎসিত আত্মগ্লানিটার কথা কিছুতেই চাপা রাখতে দিলে না, উচ্চারণ করালে আমার মুখ দিয়েই। এতে কারো-কারো পাশবিক উল্লাস হয় বৈকি!

—তোমার দুঃখময় জীবনের কথা জেনে আমার হয়ত উল্লাস হয়েছে। কিন্তু ব্যক্ত করার তোমার লোকসানটা হ'ল কোন্‌খানে?

—লাভও তো হয়নি। বরং লোকসান হ'ল এই যে আমার স্বামী-নিন্দা আমার নিজের মুখেই করতে হ'ল। সেটা কোনো স্ত্রীর পক্ষেই গৌরবের কথা নয়।

—তোমার মতো পতিব্রতা-স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দুটো মিলে না—এ স্বীকৃতিটা তুমি আদায় না করে ছাড়লে না আমার কাছ থেকে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এহেন প্রহসন মুখ বুজে চালাবে আর কদ্দিন?

—কিসের?

—এই বর্বর দাম্পত্য-জীবনের অভিনয়? মুখে তো স্ত্রী-স্বাধীনতা—নারী-প্রগতি প্রভৃতির বড় বড় বুলি শোনা যায়?

—মেয়েদের জীবন ওতেই ধন্য। স্বামীর অবাধ স্বৈরাচারের অধিকার আছে তোমাদের সমাজে। স্ত্রী এক-চুল নড়লেই কলঙ্ক রটে।

—ঐ ব্যবস্থা এককালে ছিল বটে, আজকাল নেই।

—আজকালও আছে। মুখে শাঁসালো-বুলি আওড়ালেও, ঠিক সংস্কারের জায়গায় স্ত্রী-মাত্রই দুর্বল। এর বিপরীত-দৃষ্টান্ত খুব বেশী মিলে না।

—একটা কুৎসিত—অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাকে জীবনভর চালিয়ে যাওয়ার কোনো বাহাদুরি নেই।

—সতী-সাধ্বী ব'লে খেতাব মিলবার সম্ভাবনা তো পুরোপুরিই আছে।

—কিন্তু তাতে মন ভরে কি?

—মেয়েদের তো মন নেই, তাই সে-মন ভরবারও প্রয়োজন নেই। পুরুষদের নিশ্চিন্ত-স্বাধীনতায় সুযোগ থাকলেই হ'ল। তারা তো জানে—শত উৎপীড়নেও স্ত্রী সতীত্ব-গৌরবের আশায় গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। কাজেই বাহির-বিশ্বে তারা বহুবল্লভতার দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে দিতে পারে। এত সুবিধে পাবে তারা কোথায়—এমন নিশ্চিন্ত-নির্ভরতা? জানেই তো ঘরে বিবাহিতা স্ত্রী রয়েছে—রাত্রির অনির্দিষ্ট প্রহর পর্যন্ত সে আহার্য পাহারা দিয়ে বসে আছে—তার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছে।...থাকগে সে-সব কথা।- ওসব নেহাতই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন,নেই।

—নিশ্চয়ই আছে প্রয়োজন আমার। অমন পচে-পচে মার যেতে আমি দেবো না তোমায় কিছুতেই!— উত্তেজিত হয়ে বললেন তরফদার।

অনুরাধার মুখে আবার সেই হাসি। সে-হাসির অর্ধেক কান্না, অর্ধেক শ্লেষ-মেশানো; দুঃখ ও বেদনায় সংমিশ্রিত সে-হাসি পীড়াদায়ক। বললেন,—অমন অযাচিতভাবে অপরের ভালো করতে এসো না। বিপদে পড়বে।

—যে-বিপদের আশঙ্কা করছ তুমি, সে বিপদ আমার

কাছে প্রত্যক্ষ নয় মোটেই। কাজেই চোখে দেখা এবং কানে শোনার পরও নিরস্ত থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

একটু থেমে কি যেন ভাবলেন তরফদার। তারপর বললেন,—শোনো, পর পর দুই রাত্রি তোমার উপর তোমার স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ঐ দুই রাত্রির বর্বর আচরণ দেখে অনুমান করা মোটেই কঠিন নয় তোমার সমগ্র দাম্পত্য-জীবনের ইতিহাস। তার জন্যেই অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ছুটে আসা আমার এখানে।

—তাতেই বা কি এল-গেল? যার প্রতিবিধানের উপায় নেই, তা ব্যক্ত করায় লজ্জা যে কতখানি সে-কথা আমার চেয়ে বেশী বুঝেছে কে? আর, কেউ বুঝে থাকলেও তাতে কোনো সুরাহাই হবে না। আসলে এ-অপরাধ আমার নারীজন্মের।

—ঐ অজুহাতে কোনো সান্ত্বনা মিলে না। ওটা আত্মনিপীড়ন—আত্মপ্রতারণা। ওটা সবচেয়ে বড় অপরাধ। সে-অপরাধের মার্জনা নেই।

—তা জানি। কিন্তু কোনো উপায়ান্তরও নেই এর।

—নিশ্চয়ই আছে। প্রীতি-ভালবাসার লেশ নেই যেখানে, সে-দাম্পত্য-জীবন প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে নিজেকে ঠকিয়ে লাভ কি?

—তুমি কি বলতে চাও স্বামীর ঘর ছেড়ে আর-কারো সাথে ঘর করি আমি?— দৃঢ়কণ্ঠে বললেন অনুরাধা।

সমান দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন তরফদার,—না, ততখানি বলতে চাইনে আমি। আমি বলতে চাই যে, এই জঘন্য জীবনের চেয়ে জলে ডুবে কিংবা গলায়-দড়ি দিয়ে মরা অনেক ভালো।

—দেখ, প্রত্যক্ষ হোক আর পরোক্ষ হোক, প্রত্যেকেরই কোনো-না-কোনো দুঃখ ও বেদনার কারণ রয়েছে। তোমার যুক্তি মেনে চললে জগৎ কবে শ্মশান হয়ে যেত।

—কিন্তু সমাধানের উপায় জানা সত্ত্বেও যারা সমাধান করতে চায় না, তারা কাপুরুষ—তারা মনুষ্যপদবাচ্য নয়।

—তুমি কি বলতে চাও অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতার বান বইয়ে দিলেই মনুষ্যত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো হবে?

—উচ্ছৃঙ্খলতায় মনুষ্যত্বের পরিচয় অবশ্যই হয় না, এতে অমানুষিকতাই বরং বাড়ে। বলছি যে, একজন উচ্ছৃঙ্খল হবে, আর অন্যজন হবে তার প্রত্যক্ষ বলি—এতেও কোনো মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না কোনো পক্ষ থেকেই। দুই পক্ষও সমান উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে হয়ত একটা সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে। নইলে প্রতিবাদহীন স্বেচ্ছাচারই শুধু যুগ-যুগান্তর ধরে চলতে থাকবে—প্রতিকার হবে না কোনোদিনই।

—তুমি অনেকখানিই এগিয়ে গেছ দেখছি প্রগতির রাস্তায়। তোমাদের তথাকথিত সমাজ কিন্তু ততখানি এগোয়নি—পড়ে আছে অনেক পশ্চাতে। তাই তার প্রতিবন্ধক আছে।

—মানুষের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না কোনোদিনই। প্রতিবন্ধক তার পদে পদে। তাই ব'লে তাকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টাটা তো অপরাধ নয়। জীবনটা তো আর গড্ডলিকা-স্রোত নয় যে, শুধুমাত্র গা ভাসিয়ে দিলেই চলে যাবে?

—জীবনটা তো তর্কশাস্ত্রও নয় যে, তা দিয়ে জীবনযাত্রা সহজ ও সরল হয়ে যাবে?

—মিছেমিছি তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি সোজাসুজি জানতে চাই—তোমার উদ্দেশ্য কী?

—কিসের উদ্দেশ্য?

—তুমি এই বদ্ধ দাম্পত্য-জীবন···

—থাক্। সোজা কথায় বলো না কেন, আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে কারো সাথে পালিয়ে যেতে রাজী আছি কিনা?

ইঙ্গিতটা তীব্রভাবে এসে বিঁধল তরফদারকে সুতীক্ষ্ণ শেলের মতো। তরফদার অনুরূপ শ্লেষের সুরেই জবাব দিলেন,—ঠিক তাই। যে-স্বামী দুশ্চরিত্র, মাতাল, বর্বর, বারাসক্ত, সে-স্বামী সর্বাংশেই পরিত্যাজ্য। আমি হলে গুলী করে মারতাম সে-স্বামীকে।

—চুপ করো। অনেকখানি সীমাই ছাড়িয়ে গেছ তুমি। আমার দাম্পত্য-জীবন আমারই একান্ত ব্যক্তিগত। সেই ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যথেষ্ট অনধিকার-চর্চা তোমার।— তীব্র কঠিন কণ্ঠে বললেন অনুরাধা।

—সেই অনধিকার-চর্চাই করব আমি। তোমায় দেবো না আমি এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করতে। দুশ্চরিত্র লম্পট স্বামীর···

—না, না, না। শুনতে চাইনে আমি আমার স্বামী-নিন্দা তোমার মুখ থেকে।— কান্নায় জড়িয়ে এল অনুরাধার কণ্ঠ।

—স্বামী, স্বামী, স্বামী! মাতাল পতিতাসক্ত স্বামীর···

—চুপ করো! চুপ করো। পায়ে পড়ি তোমার!

—না না, চুপ আমি করব না। তোমার জানোয়ার স্বামীর···

—না, না, না। অমন করে ভেঙে দিয়োনা আমার সুখের সংসার।— অনুরাধা উত্তেজনায় কেঁদে ফেললেন।

—ভেঙে দিয়োনা সু-খে-র সং-সা-র! আগুন জ্বালিয়ে দাও অমন সংসারে! পুড়ে ছাই হয়ে যাক্।— দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন তরুকুমার প্রবল উত্তেজনায়।

—কেন? কেন? কেন? কী করেছি আমি তোমার? কেন এমন সর্বনাশ করতে চাও আমার?— কান্না চাপতে-চাপতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন অনুরাধা।

—পালাচ্ছ কোথায়? স্পষ্ট জবাব দিয়ে যাও আমার কথার।— পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ালেন তরুকুমার।

—না না, যেতে দাও আমাকে।— সজোরে ঠেলেই চলে যাচ্ছিলেন অনুরাধা।

—না যেতে আমি দেবো না।— উত্তেজিত হয়ে সজোরে আকর্ষণ করলেন তরুকুমার অনুরাধার বস্ত্রাঞ্চল ধরে।

ছিটকে পড়ে গেলেন অনুরাধা। দরজার কোণায় লেগে কেটে গেল কপালের একাংশে। অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন তরুকুমার। ভয়ে এতটুকুন হয়ে গেলেন যেন তিনি।

ক্ষতস্থান থেকে প্রবল রক্তক্ষরণ হতে লাগল। যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন অনুরাধা,—উঃ, একি করলে তুমি, কী সর্বনাশ করলে তুমি আমার!— একহাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে বলে উঠলেন,—শীগ্‌গির বেঁধে দাও। ড্রয়ারে ব্যাণ্ডেজের কাপড় আছে—টেবলের ওপর আইওডিনের শিশি আছে।

বিদ্যুৎস্পিষ্টের মতো তরুকুমার ব্যাণ্ডেজ ও আইওডিন দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন অনুরাধার।

নীরবে অশ্রুপাত করে চললেন অনুরাধা। তরুকুমার অপরাধীর মতো বসে রইলেন হাঁটু গেড়ে ভূলুণ্ঠিতা অনুরাধার শিয়রে। দৃষ্টি তাঁর স্থিরনিবদ্ধ অনুরাধার দিকে।

মাত্র মিনিট কয়েক। অনুরাধা মুদিত-নয়ন উন্মীলিত করলেন। তখনো চোখের দু'কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। বললেন,—তুমি আমায় রক্ষা করতে পার? এই দেখ না—হাতে, বুকে, মাথায়, পিঠে—সর্বাঙ্গে অসংখ্য প্রহারচিহ্ন। সে আমায় দিনরাত এমনি করে হত্যা করে চলেছে। পারবে তুমি আমায় বাঁচাতে?

তরুকুমার বললেন,—পারব, অনুরাধা! তাইতো আমি এসেছি। জীবনের স্নিগ্ধ আলোকের মাঝে তোমায় তুলে নিয়ে যেতেই তো এসেছি আমি।

বিমূঢ়া অনুরাধা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বললেন ফিস্‌ফিস্ স্বরে,—তুমি দেবে আশ্রয় আমাকে?

তরুকুমার অভয়-আশ্বাসবাণী জানালেন,—হ্যাঁ, অনুরাধা! আশ্রয় দেব আমি আমার জীবনের প্রথম অনুরাগের নারীকে।

তবু সংশয় কাটে না অনুরাধার। বললেন,—কিন্তু কতদিন?

—কেন? চিরদিন।

—অভাগিনীর দুর্ভাগ্যের ভারে তোমার অনুরাগের তরণীও কি ডুবে যাবে না একদিন? পৃথিবীর সমস্ত আশ্রয় থেকেই তো বঞ্চিত হব আমি সেদিন।

—না, তা তুমি হবে না, অনুরাধা! জীবনে শুধু নয়, মরণেও আমি থাকব তোমার পাশে পাশে।

—আঃ, বাঁচলাম! তুমি আমায় নিয়ে চলো এই রুদ্ধ কারাগার থেকে।— ব'লে তরুকুমারের হাত-দুটি দুইহাতে চেপে ধরলেন অনুরাধা পরম-আবেগে নিশ্চিন্ত নির্ভরে।

—হ্যাঁ, তাই হবে, অনুরাধা। চলো, এ-দেশ ছেড়ে চলে যাই আমরা অন্য কোনোখানে।— তরুকুমার সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন অনুরাধার মাথায়, কপালে কপোলে।

বেচারী দীর্ঘ-নিপীড়ন-সহনের পর একটুখানি যেন স্নেহের আদর পেয়েছেন। এমন আদরে, এমন ভালবাসায়, এত গভীর অনুরাগে কাছে টেনে নেয়নি, কেউ তাঁকে জীবনে। অনুরাধার চক্ষু নিমীলিত হয়ে গেল নিশ্চিন্ত-নির্ভর আরামে। চোখের প্রান্ত বেয়ে দুটি অবিরল ধারা বয়ে চলেছে নির্ভর আনন্দে। তরুকুমারের দক্ষিণ-হস্ত তখনো বজ্রমুষ্টিতে ধরা অনুরাধার পাণিযুগলে।

—আই সী! ডাইন কাইন্ ইন্‌ডীড্! চমৎকার!

অনুরাধার স্বামী দণ্ডায়মান দ্বারপ্রান্তে। কখন নিঃশব্দে উঠে এসেছেন—তরুকুমার-অনুরাধা জানতেও পারেননি। কতক্ষণ ধরে তাঁদের অভিনয় লক্ষ্য করেছেন তাও জানবার কথা নয় কারো। আগন্তুকের আকস্মিক বাক্যস্ফুরণে চমকে উঠলেন উভয়েই। আক্রমণোন্মুখ শার্দূল-দর্শনেও হয়ত এতখানি বিচলিত হতেন না তাঁরা কখনও। তথাপি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থের মতোই উঠে বসলেন অনুরাধা ভূতলশয্যা থেকে। তরুকুমারও কোনো অপ্রকৃতিস্থতা ও অপ্রস্তুতের ভাব প্রকাশ করলেন না। তেমনিভাবে বসেই রইলেন অনুরাধার পাশে ধুলোমলিন মেঝের ওপর। যে দুর্জয়-অভিযানের প্রতিশ্রুতি তাঁরা গ্রহণ করলেন ক্ষণপূর্বে, তরুকুমার তারই জন্যে মনে-মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন। তার জন্যে যে-কোনো দুরূহ কার্য-সমাধান অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

অনুরাধা-স্বামীর কণ্ঠ পুনর্বার ধ্বনিত হ'ল। —'অ্যাম রিয়্যালি সরি। আই ইন্‌টারাপ্‌টেড্‌ ইন্‌ ইয়োর ড্রামাটিক-কমেডি। আই মীন্—এমন মিলনান্ত নাটকটা আমি মাটি করে দিলাম। এক্‌স্‌কিউজ মী।

চার্লস বয়ারের অভিনয়-নৈপুণ্য সম্বন্ধে যাঁদের সুপরিচয় নেই তাঁরা এই অদ্ভুত অভিনয়টা কল্পনা করতে পারবেন না অনুরাধা-স্বামীর। আকণ্ঠ মদ্যপান করে এলেও, অভিনয়ে খুঁত নেই কোনোখানে। বাক্যের প্রতিটি শব্দে, শব্দের প্রতিটি বর্ণে জ্বালা ধরে যায় সর্বাঙ্গে। একেকটা বাক্যে একেকটা ফোস্কা পড়ে যায় যেন গায়ে।

—অল্‌ রাইট্‌। লেট্‌ মী রিটায়ার।— ব'লে দরজার পর্দাটি সযত্নে টেনে দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন অনুরাধা-স্বামী।

অনুরাধা মাটির দিকে তাকিয়ে বসেই রইলেন। কোনো ভাবান্তর পরিলক্ষিত হ'ল না তাঁর।

তারকনাথ ভাবছেন—অতঃ কিম্‌ এবং কিং কর্তব্যম্‌।

কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বেই অনুরাধা-স্বামীর পুনরাবির্ভাব ঘটল। পর্দাটা সরিয়ে অভিনব নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকলেন তিনি—হাতে তাঁর প্রলম্বিত একটি চাবুক। জামার আস্তিন গুটানো। চোখ-দুটোতে হিংস্র শ্বাপদের দৃষ্টি। চাবুকটি দোলাতে দোলাতে বললেন, —আরন্‌ট ইউ দ্যাট নটোরিয়াস চিত্রকার?— এমনভাবে তাকালেন তারকনাথের দিকে যেন গ্রাস করে ফেলবেন এক্ষুনি। —ওল্ড কাউওয়ার্ড, ডোন্ট ইউ নো, সী ইজ্‌ মাই ওয়াইফ? এই চাবুক দেখেছ? পরস্ত্রীর সাথে প্রেম করা!... একটুখানি থেমে বললেন,—মাই ব্যাড-ওয়াইফ, অ্যান্ড ইউ মেক লভ্‌ উইথ হার।

তারপর দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে বললেন অনুরাধা-স্বামী, —হাউ ডেয়ার ইউ পুট ইয়োর নোজ,, ইউ ইন্‌ট্রুডার। আই মীন্‌, কী দুঃসাহস! নো, নো, আই'ল্‌ নেভার স্পেয়ার ইউ। আই মীন্‌, আই উইল স্যু ইউ বিফোর দি কোর্ট।—তারপর একটু থেমে আপন মনেই বললেন,—'অ্যাম সরি, ইট্‌স্‌ ইউজলেস্‌ টু অ্যাকুজ ইউ, যেখানে আমার বিবাহিতা স্ত্রীই ব্যভিচারিণী।

তারপর অনুরাধার সামনে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন স্বামী,—কি! স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরপুরুষের সাথে প্রেমালাপ আর প্রণয়-নিবেদন খুব আনন্দের, না?

অনুরাধাও হয়ত প্রস্তুত হয়ে নিয়েছেন ইত্যবসরে। দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়ই। নিজ-পুরুষের সাথে প্রেমালাপ করার সুযোগ যখন রাখোনি তখন পরপুরুষের সাথেই প্রেম করতে হবে বইকি!

—হুঁ, বটে। স্বামীর বর্তমানে অপরের সাথে প্রেম! দাঁড়াও, ঘুচিয়ে দিচ্ছি তোমার প্রেমলিপ্সা, ইউ শাইন্‌ট ওম্যান!— ব'লেই চাবুকটা সবেগে বাগিয়ে তুললেন অনুরাধার ওপর। কিন্তু তারকনাথ ধরে ফেললেন সে উদ্যত চাবুক পেছন দিক থেকে।

অনুরাধা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন আরো। দাঁড়িয়ে

রাগতস্বরে বললেন,—স্বামীত্ব ফলাতে আসতে লজ্জা করে না তোমার? কী দিয়েছ তোমার অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে-করা স্ত্রীকে এই কবছরে—অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুর্ব্যবহার ছাড়া? বাজারের মেয়েদের কাছে সর্বস্ব তো বিকিয়ে দিয়ে আস, ধন-সম্পত্তি মান-মর্যাদা নীতি ও মনুষ্যত্ব পর্যন্ত। আর আকণ্ঠ মদ খেয়ে এসে গৃহে স্ত্রীর ওপর দাপট কারণে-অকারণে। নির্লজ্জ-বেহায়া, স্বামীত্বের অধিকার ফলাতে আসেন আবার, লম্পট কাঁহাকার!— রাগে ও ক্ষোভে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললেন অনুরাধা।

আস্ফালন শুরু হ'ল স্বামীর। —হ্যাঁ, আমাকে লম্পট! আমার স্ত্রী হয়ে আমাকেই…!— ঝাঁপিয়ে পড়লেন অনুরাধার ওপর হিংস্র আক্রোশে। তরফদার যদি প্রতিনিবৃত্ত না করতেন তো টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতেন অনুরাধাকে।

ছটফট করতে লাগলেন অনুরাধার স্বামী পাগলের মতো। সত্যি তো, যত অযোগ্যই হোন স্বামী, স্ত্রীর পরপুরুষের প্রতি আসক্তি তাঁর স্বামীত্বে আঘাত হানে বৈকি। এতে যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় স্বামীর। আত্মবিশ্বাস চলে যায় তিল তিল করে। মনে হয়, পায়ের নীচের পৃথিবী সরে যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু করে।

রাগটা গিয়ে পড়ল এবার তরফদারের ওপর। রুখে দাঁড়ালেন অনুরাধা-স্বামী তরফদারের দিকে। —ইউ ভিলেন! ইউ হ্যাভ রুইন্‌ড মী, অ্যাণ্ড কম্‌প্লিট্‌লি মাই হোল ফ্যামিলি। আই'ল্‌ নেভার স্পেয়ার ইউ। ছাড়ব না আমি তোমাকে, চাব্‌কিয়ে…।— ব'লে গলার জামা ধরে সজোরে আকর্ষণ করলেন তরফদারকে উন্মত্ত শক্তিতে। —তোমায় খুন করে ফেলব আমি! আমার স্ত্রীকে ইলোপ করে নিয়ে যেতে এসেছ, স্কাউণ্ড্রেল!— হাতের চাবুক ফেলে দিয়ে এমন এক ঘুষি বাগিয়ে তুললেন যে, তা দিয়ে দেহের যে-কোনো স্থান জখম করে ফেলা যেত, যদি না তরফদার দীর্ঘ, পেশীবহুল বাম হাত দিয়ে অনুরাধা-স্বামীর উদ্যত দক্ষিণহস্তটি ধরে ফেলতেন।

একালের ব্যায়ামপুষ্ট সবলদেহী তরফদারের সাথে মাতাল ক্ষীণদেহ অনুরাধা-স্বামী শারীরিক শক্তিতে এঁটে উঠবেন কেন? তাই সামান্যতম প্রচেষ্টাতেই কাবু হয়ে পড়লেন অনুরাধা-স্বামী। বামনের আকাশ-স্পর্শের চেষ্টার মতো বাতুল-প্রচেষ্টা দেখে ঠোঁটের কোণে একটুখানি অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল শুধু তরফদারের। তারপর পাঁজাকোলা করে রেখে এলেন অনুরাধা-স্বামীকে পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার শেকলটিও তুলে দিয়ে এলেন। কোনো দৈহিক শক্তির অপপ্রয়োগ না করে যথেষ্ট সংযমেরই পরিচয় দিলেন তরফদার।

কক্ষান্তরে তখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ শুরু হয়েছে। গৃহের আসবাবাদি পতন ও ভাঙনের শব্দ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট—মুখে অকথ্য ভাষণ অনুরাধা-স্বামীর।

অনুরাধা সকাতরে বললেন,—আমার শেষ আশ্রয়ও আজ ঘুচে গেল—

তরফদার বললেন,—তাতে ভয় কি অনুরাধা? আমি তো রয়েছিই। আমার ওপর বিন্দুমাত্রও কি আস্থা নেই তোমার?

—আস্থা থাকবে না কেন? তবু সামাজিক জোরটা তো আমার সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল।

—এ তোমার অকারণ শঙ্কা, রাধা। সামাজিক মর্যাদা তুমি আমার কাছ থেকে পাবেনা বলেই কি ধারণা করে রেখেছ?

—ধারণা আমি অবশ্য কোনোটাই করে রাখিনি।

অনুরাধা-স্বামীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল পাশের ঘর থেকে। —পরস্ত্রীর সাথে প্রেম কোনোদিন কোনো সমাজ বরদাস্ত করেনি, তরফদার! অনুরাধাকে তুমি চেন না। সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমার। শী ইজ এ পয়জনাস্‌ কোব্রা। আই মীন্‌, সে-বিষের জ্বালা এ-জীবনে নিভবে না তোমার!

অনুরাধা-তরফদার পরস্পরের দিকে মুখ তুলে তাকালেন শুধু।

অনেকক্ষণ ধরে কোনো বাক্যস্ফূরণ হ'ল না কারো। উভয়েই যেন আপন আপন সমস্যায় চিন্তায় মগ্ন।

শেষ পর্যন্ত তরফদারই প্রস্তাব করলেন,—চলো, রাত তো অনেক হ'ল। অনর্থক দাঁড়িয়ে থেকে সময় ক্ষেপণ করে লাভ কি?

—কোথায়?

—কেন? আমার সঙ্গে। এই বিরাট বিশ্বের কোনোখানেই কি স্থান হবে না আমাদের?

—স্বর্গে না-হোক, নরকে নিশ্চয়ই স্থান করা যাবে। তুমি এখন যাও। কালকে ভেবে-চিন্তে একটা কিছু ঠিক করা যাবে'খন।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল শুধু তরফদারের। সে-সঙ্গে অনুরাধাও মুখ তুলে তাকালেন। কোনো দ্বিরুক্তি না-করেই তিনি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে এলেন।

পরদিন দেখা গেল, অনুরাধাদের বাড়ীর দরজায় বড় বড় তালা ঝুলছে।

চার

পরিণতিটা যে এমন আকস্মিক ও বিয়োগান্তরূপে ঘনিয়ে আসবে এমন কথা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন তরফদার? আশ্চর্য মেয়েদের মন। যেন বন্যার স্রোতে ভেসে গেল একমুহূর্তে সমস্ত হৃদয়াবেগ—দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ভাব ও ভাষা—প্রেম ও ভালবাসা।

মনীষীরা বলেছেন—বিরহেই মধুর প্রেম। কিন্তু আজকের জগতের মানুষ তো হৃদয় নিয়ে বাঁচে না, বাঁচে বস্তু নিয়ে। তাই বিনিময়ও চাই মানুষের। জীবনের প্রথম প্রেমের হতাশা অনেকখানি এসে গেল তরফদারের। কোথায় গেল তাঁর সেই আত্মবিশ্বাস, সেই মনের জোর। অনুরাধা যে অন্তরে-বাইরে রিক্ত করে দিয়ে গেছেন তাঁকে। যে সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান করে গেছেন—আমূল বিদ্ধ করেছে তা তরফদারের হৃদয়ে। আহত হৃদয় বুঝি আর নিরাময় হয় না।

মাস তিনেক কেটে গেল দুর্ভাবনাপন্ন হৃদয়ে অপরিসীম উদ্বেলতা নিয়েও।

এমন সময়ে একটা টেলিগ্রাম এল তরফদারের নিজেরই নামে। শঙ্কিত হৃদয়ে টেলিগ্রামটা খুলে একনিঃশ্বাসে পড়ে গেলেন টেলিগ্রামের লিখিতাংশ: অনুরাধা মরণাপন্ন। শেষ-সাক্ষাৎ করার অভিলাষ থাকলে অবিলম্বে রওনা হতে হবে। পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামের ঠিকানা।

তরফদারের বুকের জল যেন নিমেষে শুকিয়ে গেল—স্পন্দন দ্রুততর হ'ল হৃদয়ের।

সময়টা রাত ট্রেনেই কাটল। মাঝে মাঝে তন্দ্রার মতো আসছিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে আতঙ্কে চমকে ওঠেন তিনি। রোগ-জর্জর অনুরাধাকে যেন প্রত্যক্ষ করেন তিনি কল্পনা-নয়নে। ভীত-চকিতা অনুরাধা একরাশ আকুলতা নিয়ে তাকিয়ে আছেন তরফদারের দিকে। রোগে শীর্ণ হয়ে গেছে দেহ, মুখের লালিত্য গেছে মুছে। বিশীর্ণ হাত-দুটি তুলে শেষ-বিদায়ের অভিনন্দন জানালেন তাঁকে। বাক্‌শক্তি রহিত। তবু শুষ্ক ঠোঁট-দুটি টেনে কী যেন বলতে চান।

হঠাৎ স্বপ্ন যায় ভেঙে। ঘেমে নেয়ে ওঠেন তরফদার।

ট্রেন-স্টীমার-নৌকো ইত্যাদি করে একরাত্রি একদিনের অন্তে প্রার্থিত ঠিকানায় এসে পৌঁছানো গেল। ঘাট থেকে দূরে নয় বাড়ীটা। মোড় ঘুরতেই দেখা গেল পুরোনো ধরনের বনেদী বাড়ীটা।

কিন্তু অভিনন্দন জানাতে যিনি এগিয়ে এলেন, তাঁর সাথে এখানেই এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ ঘটে যাবে ভাবতেও পারেননি তিনি। তবু বিস্মিত হলেন না। অনুরাধার বাল্যসখী,—অনুরাধার অন্তিম অবস্থায় তাঁর উপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়।

ভদ্রতাসূচক নমস্কার-বিনিময়ের পর একটা সজ্জিত কক্ষে নিয়ে বসানো হ'ল তরফদারকে।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে। অনুরাধা-সখী একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে গেলেন টেবলের উপর। জানালার ফাঁক দিয়ে যে একফালি আকাশ দেখা যায়, তার ফাঁক দিকে তাকিয়ে অনেক কথাই ভাবছেন তরফদার।

খানিক পরেই অনুরাধা-সখীর প্রবেশ ঘটল। তাঁকে দেখেই বললেন,—অনুরাধা···

—আপনার অনুরাধা ঘুমুচ্ছে এখনও। মুখে তাঁর রহস্য-চটুল হাসি।— চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন অনুরাধা-সখী। —অনেক ক্লান্তি—অনেক অবসাদই জমে আছে তার। একটু শান্তিতে বিশ্রাম নিতে দিন তাকে। বেচারী আপনার জন্যেই মরতে বসল যেন!

—মানে?— তরফদারের কথায় ব্যাকুলতা উপচে পড়ল যেন। সোজা হয়ে উঠে বসলেন তিনি বিছানার ওপর বালিশটা কোলে নিয়ে।

—মানে তো জলের মতো পরিষ্কার।

—যেমন?

—যেমন?— ব'লে ক্ষণেক চুপ করে থেকে কিছু যেন ভেবে নিলেন তিনি। তারপর মাথা তুলে বললেন,—দেখুন, আমার কাছে আজ আর কিছু অবিদিত নেই। অবশ্য ইতিপূর্বেও যে জানতেম না কিছু তা নয়। তবে তখন মনে হয়েছিল এ একটা সাময়িক নেশা মাত্র। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ-জনিত ক্ষণিক মোহের বেশী মূল্য নেই এর। বিশেষ করে পরস্ত্রীর প্রেম এবং পরস্ত্রীর সাথে প্রেমের যেখানে সামাজিক অনুমোদন নেই, সেখানে অন্তরে দাহ থাকলেও হয়তো তার বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে সমাজ-শাসনের ভয় থাকবে। এ-ই ছিল ধারণা। তবে দুশ্চরিত্র অত্যাচারী স্বামীর কবল-মুক্তির একটা অবচেতন প্রচেষ্টাও যে এই আকর্ষণের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী নয় তাও বলা

যায় না। তা ছাড়া সহজ মানসিক আকর্ষণটাও যে গড়ে উঠতে পারে না, তা-ও জোর করে বলি না। কিন্তু এখন তার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিলক্ষ্য করলাম। তাই ভাবি, দুনিয়ায় অস্বাভাবিক নেই কিছুই। রোগশয্যায় পড়ে তার অবচেতন-মনের কোনো সত্যই আজ অনুদ্ঘাটিত নেই। তাইতো মনে হয়—এ-ভালবাসার একটা গভীরতর তলদেশ আছে। অন্তর ও মনের উপর গভীর রেখাপাত না ঘটলে এমন প্রাণ-খোলা স্বীকৃতি স্বাভাবিক নয়।

তরফদার উৎসুক-কৌতূহলে শুনে চললেন একনিষ্ঠ শ্রোতার মতো।

অনুরাধা-সখী বলে চল্লেন,—স্বামী নিয়ে এলেন কলকাতা থেকে এখানে। এটা আমাদেরই বাড়ী। অনুরাধাদের বাড়ী পাশেই। সে-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষও আজ আর অবশিষ্ট নেই। আত্মীয়-স্বজন তো কেউ নেই-ই। তাঁরা দীর্ঘদিন বিগত। অনুরাধার নিজের বলতে কেউ নেই ত্রিজগতে। মা-বাপ ভাই-বন্ধু কেউ না। আমাদের বাড়ীতেই মানুষ সে। ওর স্বামীর কুলেও কেউ নেই বলেই শুনেছি। তার স্বামী আমার বাবার এক বন্ধুরই ছেলে। শিক্ষিত, উপার্জনশীল, এবং উপযুক্ত বিবেচনায় বাবাই তাঁকে ধরে নিয়ে এসে অনুরাধার বিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর ভিন্নতর চরিত্রই উদ্ঘাটিত হ'ল। শুনলাম খুব মার-ধর করেছেন স্বামী। শয্যাগত অবস্থাতেই এখানে এনে ফেলেছেন।

—তাঁর স্বামী এখন কোথায়?

—স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করে তিনি পালিয়ে গেছেন, সে-মড়া চাপিয়ে দিয়ে আমাদের ঘাড়ে। উপায় নেই। দুটো যমজ-বোনের মতো মানুষ হয়েছি। বাবারও রয়েছে কিছু অপত্য-স্নেহ। তা ছাড়া সে-অবস্থায় ফেলবেই বা তাকে কোথায়? তার স্বামী ব'লে যাননি কাউকে কিছু। সেদিন রেঙ্গুন থেকে অনুরাধার কাছে—অনেক অনুনয়-বিনয়, অনেক ক্ষমা-প্রার্থনা করে পত্র দিয়েছেন একখানা অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে ভালবাসা জ্ঞাপন করে। শুধু তরফদারের প্রতি আকর্ষণটা বাদ দিলে অনুরাধার প্রতি অণু-পরমাণুকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। অনুরাধাই শুধু তরফদারের মতো লম্পটের প্রেমে পড়ে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে তাঁকে। এখানেই তাঁর চরম বেদনা। এটাই শুধু সইতে পারেন না তিনি।— থামলেন একটু অনুরাধা-সখী।

—তা অনুরাধা সে-পত্রের উত্তরে কী বললে?

—বলবে আবার কি? ছিঁড়ে ফেলে দিলে চিঠিটা। নামও শুনতে পারে না সে স্বামীর। সে তরফদারের নাম-মন্ত্র জপ করে। তাঁর জন্যেই তো এত টানা-হেঁচড়া। নইলে এ-কাহিনীর যবনিকা পড়ত কোথায়! কী কাণ্ডই যে বাধিয়েছেন মশায় আপনারা! এখন 'ইন্টারপ্রেটর'-এর কাজ করো বসে বসে। প্রেমে এমনি করে ডোবে মানুষ যে, উপলব্ধির মাত্রাটি পর্যন্ত নেই।

—কে জানতো, ডুবে তলিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত কোনো শান্তি নেই প্রেমে। তারপর কি হ'ল বলুন।

—দাঁড়ান বলছি।…সে-থেকে অনুরাধা আর শয্যা ছেড়ে উঠে বসতে পারেনি। এই সুদীর্ঘ তিনটি মাস সে শয্যাশায়িতা সমস্ত শক্তি রহিত হয়ে। কতোদিন আমায় বলেছে আপনাকে পত্র লিখে জানাতে। আমি তা পারিনি। কতকটা ইচ্ছা করেও করিনি। কারণ, ভাবলাম—যদি তাদের বিচ্ছিন্ন দাম্পত্য-সম্পর্ক আবার জোড়া লাগে—মেয়েদের এর বড় গতি তো নেই। কিন্তু দেখলাম হিতে-বিপরীত হতে চলেছে। দিন-কয়েক থেকে অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে। তার সাথে সাথে উদ্বিগ্নতাও গেছে বেড়ে। শুধুই বলে—'সে কি এসেছে?' তারপর হতাশ হয়েই বলে—'আমি তার কে! আসবেই বা কেন? আচ্ছা, তুই কি টেলিগ্রাম করেছিলি? বোধ হয় করিসনি? আমার জন্যে চরম অপমান তিনি সয়েছেন—অশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পৃথিবী থেকে শেষ-বিদায়ের সময় তাঁর কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নেবো, তার উপায়ও তুই রাখলিনে।' এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখে কালই জরুরী তার করে দিলাম আপনাকে। কাল অবস্থা খুবই খারাপ ছিল—কথা আর জিজ্ঞাসারও শেষ ছিল না।…দাঁড়ান আসি।— উঠে চলে গেলেন অনুরাধা-সখী।

একটু পরেই অনুরাধার বান্ধবী ঘরে ঢুকলেন। বললেন, —চলুন, সন্তর্পণে একটুখানি দেখে আসবেন তাকে। আপনারও উদ্বেগের কিছু প্রশমন হোক। এখনো ঘুমুচ্ছে বেঘোরে। জেগে গেলে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

অনুরাধার প্রকোষ্ঠটি বেশ উন্মুক্ত—পূব-দক্ষিণ খোলা। পূবের খোলা জানালা দিয়ে গঙ্গার হাওয়া ঘরে এসে ঢুকছে। চতুর্দশীর চাঁদের একফালি আলোও জানালার ফাঁক দিয়ে অনুরাধার শীর্ণ মুখের ওপর এসে পড়েছে। অদূরে টেবিলের ওপর খবরের কাগজ দিয়ে ঢাকা লণ্ঠনটি টিমটিম জ্বলছে। সেই ক্ষীণ আলোকে অনুরাধার মুমূর্ষু প্রতিমূর্তি পরিলক্ষ্য করলেন তরফদার। বিছানার সঙ্গে মেশে গেছে

দেহ। গণ্ড কোটর-প্রবিষ্ট। মুখমণ্ডলে পাণ্ডুরতা। চেনা যায়না অনুরাধাকে। এইকি সেই অনুরাধা! সেই লালিত্য, সে-সৌন্দর্য আজ কোথায় অন্তর্হিত! আজ এই অন্তিম-শয়নে তিনি কি তাঁর শেষ-সৎকার করতে এসেছেন? অনুরাধা সংজ্ঞাহীনভাবে পড়ে আছেন পালঙ্ক-শয্যায়।

—চলুন, এবার যাওয়া যাক।— বললেন নিম্নকণ্ঠে অনুরাধার সখী।

তরফদারের মুখ দিয়ে কোনো বাক্য নির্গত হ'ল না— নিঃশব্দে নেমে এলেন অনুরাধা-সখীকে অনুসরণ করে।

ঘরে এসে বসতেই বললেন অনুরাধার বান্ধবী,—শুধু চিন্তায় কোনো কাজ হবে না। এখন 'কংক্রীট' একটা কিছু করার ব্যবস্থা করুন। অনুরাধাকে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে। এখানে থাকলে সে বাঁচবে না। জানেন তো এটা অজ পাড়াগাঁ। কোনো ভালো ডাক্তার নেই এখানে—ওষুধপত্রও না—প্রয়োজনীয় জিনিস মিলে না হাতের কাছে। ছুটতে হয় সেই নারায়ণগঞ্জ। আসা-যাওয়ায় একটা দিন পুরো যায়। ঐ অনাদি কবিরাজই একমাত্র চিকিৎসক, যিনি কলেরা আর ম্যালেরিয়ায় একই চিকিৎসা করেন। আমার মনে হয়, কবিরাজমশায় আসল রোগই ধরতে পারেননি। যে সংখ্যাতীত চাবুকের প্রহার আর বুট-জুতোর পদাঘাত পেয়েছে তার স্বামীর কাছ থেকে, মনে হয়, এ-রোগের মূল সেখানে। কলকাতায় হাসপাতালে রেখে কিছুদিন চিকিৎসা করালে সেরে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

—তা বলুন, কবে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং এমতাবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।

—নিশ্চয়ই নিয়ে যাওয়া যায়। কবিরাজমশায়কে আমি জিজ্ঞেস করেছি। আপনি নৌকাদির ব্যবস্থা করুন। আর যদি সম্ভব হয় নারায়ণগঞ্জে গিয়ে 'বার্থ রিজার্ভ' করে আসুন। যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে রোগী নিয়ে যাওয়া খুব সুবিধেজনক হবে না।

রাত্রে সুনিদ্রা হ'ল না। শরীরে অপরিসীম ক্লান্তি। তবু ভোরেই বেরিয়ে গেলেন তরফদার নারায়ণগঞ্জের দিকে।

*

তরফদার নারায়ণগঞ্জ থেকে যখন ফিরলেন তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। অনুরাধা-সখীর সাথে সাক্ষাৎ হতেই বললেন,—সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে এলাম। কাল বেলা একটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরতে হবে। অর্থাৎ বারোটার ভেতর পৌঁছতে হবে আমাদের সেখানে। কাজেই ভোরেই চাপতে হবে নৌকোয়। সে অনুসারে ব্যবস্থাদি করবেন।

—ঠিক যেন অনুগত ভক্ত!— ব'লে একটু চটুল হাসি হাসলেন অনুরাধার সখী। —সে-ব্যবস্থা করা যাবে'খন। আপনি আগে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিন। বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছেন। বাবাও এসে পড়েছেন। ভয় ছিল, যদি কোনো কারণে বাবা এসে না পৌঁছতে পারেন, আর আপনি ওদিকে সব ব্যবস্থা করে আসেন, কী অসুবিধের ব্যাপার হবে!—আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন আগে, পরে আলাপ করিয়ে দেব'খন বাবার সঙ্গে।

আহারান্তে ঘরে এসে বসবার উপক্রম করতেই অনুরাধা-সখীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল পশ্চাদ্দিক থেকে,—এই যে, ইনিই আমার বাবা।

পশ্চাৎ ফিরে দেখলেন তরফদার—শ্বেতশ্মশ্রু-বিমণ্ডিত কম্বুদেহী এক ব্যক্তিকে। পিতাকে উদ্দেশ করে বললেন অনুরাধার বান্ধবী,—এঁর কথা তো তোমায় বলেছি। তুমি বসে আলাপ-সালাপ কর একটু, আমি ততক্ষণে কাজ-কর্মগুলো সেরে দিই। দেখো, বেশী বাজে বোকো না। উনি আজ খুবই ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি একটু বিশ্রাম করতে দিয়ো ওনাকে।— ব'লে তিনি গৃহাভিক্রান্ত হলেন।

তরফদার এগিয়ে এসে ভক্তিভরে পদধূলি নিলেন বৃদ্ধের।

—থাক্ থাক্, বাবা, বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো! তা বেশ বেশ, খুবই খুশী হলাম বাবা তোমাকে দেখে। সবই শুনেছি আমি রত্না-মার কাছে। তোমার মতো ছেলেই তো চাই দেশে। পরের দুঃখ বুঝবে—অপরের ব্যথায় ব্যথিত হবে। তা নয় তো সে কি আর মানুষ!

তরফদার বুঝতে পারলেন না বৃদ্ধের বাক্যমর্ম। রত্না তাঁর বাবাকে তাঁর সম্বন্ধে কী বলেছেন কে জানে! কিরকম সঙ্গতিহীন বলেই ঠেকছে কথাগুলো। যেন কোনো পূর্ব-সূত্র রয়েছে উক্তিগুলির। চুপ করে বসে শুনেই চললেন বৃদ্ধের উচ্ছ্বসিত বাক্য।

—ভগবান কল্যাণ করুন তোমার।

তরফদার ভাবলেন, হয়ত অনুরাধার চিকিৎসাদির ব্যবস্থার জন্যে অনাত্মীয় হয়েও তিনি যে এগিয়ে এসেছেন, তার জন্যেই বুঝি এই অভিনন্দন-বাণী। তাই পরম বিনয় সহকারেই বললেন,—তা আর বিশেষ কি?

—বিশেষ কি মানে? 'হিউম্যানিটেরিয়ান সার্ভিস'-এর 'অ্যাপ্রিসিয়েশন' চাই বইকি বাবা! নইলে ভগবান বিরূপ হবেন যে। বাবাজী, তোমার ওপরই···

—আজ্ঞে, তা আর বলতে হবে না। আমার যথাসাধ্য করব। এখন ভগবানের ইচ্ছে।

—তা তো বটেই, তা তো বটেই। তাঁর ইচ্ছে ব্যতিরেকে কিছুই তো হবার উপায় নেই জগতে। তুমি বাবা, আমায় একটা বিরাট উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি দিলে আজ। বুঝেই তো, বাপ হয়ে কেমন করে চোখে দেখি মেয়ের এই ছন্নছাড়া রূপ। তা বাবা, তুমি তো আমার ছেলের মতোই। আমার ছেলে বলতে নেই কেউ। তুমি আমার সে-অভাব পূরণ করলে। আশীর্বাদ করি, সুখী হও তোমরা। তা কাল ভোরে যাবারই তো ব্যবস্থা হয়েছে। বেশ, বেশ। আচ্ছা, বিশ্রাম করো তুমি। তুমিও তো কম ক্লান্ত নও।

কক্ষত্যাগ করলেন রত্নার পিতৃদেব।

সর্বনাশ, বৃদ্ধ বলেন কি! তরফদারের মনে কেমন একটা ধোঁকা লেগে গেল। বৃদ্ধের কথার মাঝে প্রচ্ছন্ন অথচ সুস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু সেটা কী? পাছে গোপন জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়ে এই ভয়ে তরফদার পাল্টা কোনো প্রশ্ন করেননি। আপাততঃ তিনি এই ভেবেই নিশ্চিন্ত হলেন যে, অনুরাধা অপত্যনির্বিশেষে পরিবর্ধিত হয়েছেন, বৃদ্ধ সেই পিতৃত্বের দাবি নিয়েই কথা বলছেন। মন তাঁর অনুরাধা-সর্বস্ব। তাই অনুরাধার বাইরে চিন্তা করতে মন তাঁর প্রস্তুত নয়।

মনে একটা ধন্দ নিয়েই শয্যাগ্রহণের উপক্রম করলেন। কিন্তু ব্যাহত হ'ল সে-প্রচেষ্টা রত্নার গৃহ-প্রবেশে। সহাস্যমুখেই তিনি ঘরে ঢুকলেন বিজয়িনীর ভাব নিয়ে। তাঁকে দেখেই তরফদার পরম লজ্জিতের মতো বললেন—ছি ছি, কী লজ্জার কথা। বৃদ্ধ লোক, কী ভাবলেন বলুন তো?

—কেন? কী হ'ল আবার?— মুখে তাঁর রহস্যময়ীর হাসি।

—হাসছেন আবার?

—হাসির ঘটনা ঘটে গেল, তবু হাসতে পারব না আমি, এ তো আচ্ছা বিপদ দেখি?

—কী বলেছেন আপনি আপনার বাবাকে?

কিয়ৎক্ষণ কিছু যেন চিন্তা করলেন রত্না। তারপর গম্ভীরভাবেই বললেন,—বলেছি যে আমার ভাবী-বর এসেছেন। অ্যাদ্দিন কলকাতায় কলেজে কাটালাম—এরকম একটা জুটে যেতে বাধা কি?— ব'লে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলেন তরফদারের দিকে।

মাথার ওপর বজ্রপাত হলেও এতখানি বিস্ময়াবিষ্ট হতেন না তরফদার। এবার যেন বৃদ্ধের কথাগুলোর সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো বাক্য-স্ফুরণ হ'ল না তাঁর মুখ দিয়ে। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন রত্নার মুখের দিকে। সে-বিস্ময় কাটিয়ে উঠবার আগেই রত্না বলে উঠলেন,—এ ছাড়া অন্য কিছু বলবার সহজ উপায় ছিল না আমার।

—তার মানে? কেন?

—কেন? আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তবু বুঝতে পারলেন না? আচ্ছা, বলুন তো কী বলতাম তাহলে? বলতাম কি যে অনুরাধার স্বামী 'নাম্বার টু' এসেছেন? তাতে কি বৃদ্ধের কাছ থেকে খুব অভিনন্দন পেতেন! না, অনুরাধা সম্বন্ধে বাবার ধারণা খুব আনন্দজনক হ'ত। আপনাকে টেলিগ্রাম করার পর থেকেই আপনাকে কেমন করে বাবার কাছে উপস্থিত করব ভেবে-ভেবে পাগল হয়ে উঠেছি; তাঁর বিভিন্নমুখী জিজ্ঞাসার কী উত্তর দোব! অনেক চিন্তার পর এই সহজ উপায়টায় উপনীত হয়েছি। এর চেয়ে সহজ সমাধান কিছুই মনে আসেনি আমার। বাবা আমার একটা গতি করার জন্যে খুবই উদ্ভ্রান্ত হয়েছেন। এই সময়ে আমার অস্ত্রে সর্বদিক রক্ষা করেছে ব'লে আমার বিশ্বাস। বলুন, অন্যায় করেছি?

তরফদার ভেবে দেখলেন, সত্যি এর চেয়ে সহজ উপায় ছিল না। বললেন,—হ্যাঁ, তা অবশ্য মন্দ হয়নি। তবে বৃদ্ধলোক, যিনি মেয়ের একটা গতি করার দুশ্চিন্তায় তটস্থ হয়ে উঠেছেন, তাঁকে এরকম মিথ্যেরকমভাবে আবদ্ধ করে তোলা কি খুব উচিত হ'ল, যার সত্যতার ভিত্তি নেই বিন্দুমাত্রও?

—কেন? কল্পনাটা সত্যেও পরিণত হয়ে যেতে পারে তো কোনোদিন। যাকগে, সে-মামলা পরে হবে'খন। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল আবার ভোরে-ভোরে উঠতে হবে তো।

রত্না চলে গেলেন।

পরদিন রওনা হতে হ'ল তাঁদের প্রত্যুষেই। তরফদার, রত্না, একটি চাকর আর অনুরাধা।

রত্নার বাবা এগিয়ে এসে বললেন,—রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, রত্নাও শুতে যাবার আগে বলল, তোমায় যেন একটু অনুরোধ করি।

—কি? বলুন।— তরফদারের কথায় বিনয় উপচে পড়ে।

—বাড়ীতে কঠিন রোগী। রত্না চলে গেলে আমি একলা বুড়োমানুষ কেমন করে সামলাব। এ-কথাটি একদম মনে আসেনি কাল। তাকেও তোমাদের সাথে নিয়ে যাও। সেও আমার মেয়ের মতোই। একটু কষ্ট করতে হবে আর কি, বাবা! আর এরাও তো রইল সঙ্গে। কলকাতার বাসায় রেখে যাবে শুধু। তার পরের ব্যবস্থা ওরাই করে নেবে। তা বাবা কিছু মনে করলে না তো?

বৃদ্ধ বিদায়কালে পুনর্বার তরফদারের মাথায় এবং পিঠে হাত বুলিয়ে তাঁর কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেন—কালবিলম্ব না করে যেন শুভকার্য সমাপন করে ফেলা হয়। বাড়ী ফেলে নড়বার উপায় নেই। নইলে তিনিও সঙ্গে যেতেন। ইত্যাদি।

কলকাতায় যেদিন পৌঁছলেন, সেদিনই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হ'ল অনুরাধাকে।

পাঁচ

হাসপাতালে অনুরাধার চিকিৎসা এগিয়ে চলেছে। তরফদার আর রত্নাও হাজিরা দিয়ে চলেছেন দিনের পর দিন। শুধু—তরফদার-অনুরাধার চাক্ষুষটা নিষিদ্ধ হয়ে থাকল। ডাক্তারদের মতে 'ইমোশন্যাল ওয়েভ'-এ নাকি রোগিণীর মৃত্যুর আশঙ্কা।

সেদিন হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে যেতে হ'ল তরফদারকে রত্নাদের বাড়ীতে, রত্নার সনির্বন্ধ অনুরোধে। নীচের কক্ষে আসন গ্রহণ করলেন তরফদার। রত্না স্বহস্তে খাবারের ট্রে বহন করে আনলেন—পরিবেশন করলেন ডিশ-ভর্তি বিবিধ খাদ্য।

ভোজনের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ তরফদারের চিরদিনই। তিনি আহার্য-সৎকারে মেতে গেলেন।

রত্না সামনের চেয়ারে বসে হয়ত তরফদারের ভোজন-নিষ্ঠাই লক্ষ্য করছিলেন। এর মাঝেই তিনি কথা বলে উঠলেন,—জানেন, বাবার চিঠি এসেছে একটা। লিখেছেন …ব'লে একখানা চিঠি বার করলেন রত্না তাঁর বস্ত্রান্তরাল থেকে। খুলে, চিঠিটা এগিয়ে দিলেন তরফদারের দিকে।

ততক্ষণে ভোজনপর্ব সমাধা হয়েছে তরফদারের। তরফদার বললেন গম্ভীরভাবে,—অপরের চিঠি পড়া অপরাধ।

—না না, অপরের পত্রপাঠের অপরাধে ফাঁসি হবার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নেই আপনার। আর ঐ পাপে নরকবাসও হবে না। আপনি বিনা দ্বিধায় পাঠ করতে পারেন। অনুমতি দিচ্ছি।

চিঠিটা তুলে দিলেন তরফদারের হাতে।

তরফদার আদ্যোপান্ত পত্রটি পাঠ করলেন। পড়তে-পড়তে সমগ্র মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর। পাঠান্তে সে-মুখভাবে বিস্ময় ও বিচলিতচিত্ততা প্রকট হয়ে উঠল। তীর্যকভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন রত্নার মুখের ওপর।

রত্নার মুখে চটুল হাসি।

তরফদার কিঞ্চিৎ রাগান্বিতভাবেই বললেন,—এর মানে?

প্রত্যুত্তরে রত্না খিলখিল করে হেসে উঠলেন শুধু। তরফদারের গায়ে তাতে জ্বালা ধরে গেল আরো। হেসে গড়িয়ে পড়লেন যেন রত্না। সে-হাসির ভেতর দিয়েই বললেন,—মানে? মানেটা বুঝলেন না এখনও?

—না!—গম্ভীরভাবে বললেন তরফদার।

রত্নার মুখও আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে উঠল। দৃঢ়কণ্ঠেই বললেন রত্না,—মানেটা হ'ল এই যে, বাবাকে যে বিয়ের কথাটা বলে এসেছি তার বিলম্ব আর কত, এবং এত বিলম্ব হবারই বা কারণ কী?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আমার ভাবী-বরের সাথে যে-উদ্দেশ্যে কাল-বিলম্ব না করে ছুটে চলে আসলাম, তার কদ্দূর? এবং বিলম্বেরও বা হেতু কি?

—এর অর্থ?

—অর্থও এর সুস্পষ্ট। জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান হয়েও আপনি তা বুঝে উঠতে পারলেন না?

—জ্ঞানী কিনা জানিনে আমি। তবে আজ বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারছি যে বুদ্ধিমান আমি মোটেই নই। নইলে অবশ্যই বুঝতে পারতাম আপনার চাতুরি।

—আপনি খুব রেগে গেছেন দেখছি। এবং জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান কোনোটাই যে আপনি নন তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে আপনার শালীনতা-বিরোধী বাক্যে। শুনুন, আপনাকে কেমনভাবে পরিচিত করতে হয়েছিল তা নিশ্চয় ভুলে যাননি আপনি। এ ছাড়া অন্য কোনো ভদ্র উপায় যে ছিল না তাও অজানা নয় আপনার। অতি স্বাভাবিকভাবেই বাবার প্রশ্ন আসবে—কী কারণে আপনি দেশের বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করলেন, যার সাথে সম্বন্ধটা পাকা হয়নি এখনও। সেক্ষেত্রে আমার সর্বদিক রক্ষা করতে হয়েছিল এই ব'লে যে, বিয়েটা তাড়াতাড়ি

ঘটাবার জন্যে বাবার সাথে ভাবী-বরের বোঝাপড়া হওয়া দরকার। এদিকে বিয়ের দিনও এসেছে ঘনিয়ে। আজ সেই কারণেই যদি বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, তা আশ্চর্যের নয় মোটেই। বলা বাহুল্য, আমি বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাই আদুরেও বটে। তাই প্রাচীনপন্থী বাবাও আমার এই দুঃসাহসিক স্বেচ্ছাচার ক্ষমা করেছেন, এই ভেবে যে, যাঁর একমাত্র মেয়ে কুমারী হয়ে থাকবারই সংকল্প গ্রহণ করেছে, তার অন্ততঃ সুমতি হয়েছে, যেমন করেই হোক একটা গতি হয়ে যাক তবু। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অবস্থা যা হয়ে থাকে!

—এই শেষবয়সে কেন এমন মিথ্যে এবং অলৌকিক-ভাবে আঘাত করলেন তাঁকে, যাঁর মেয়ের ওপর এতখানি দাবি—এত অধিকার আপনার?

—তা শুধু আমার বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে এবং আমাদের বাড়ীতে অভ্যাগত অতিথির মর্যাদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে। এবং তার জন্যে একটা বড় অপবাদের বোঝাও স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিতে হয়েছে আমার, আপনাদিগকে কুটিল সমালোচনার দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্যে।

তরফদারের মনটা নরম হয়ে গেল একটু। বললেন,—আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। আর এই ত্যাগ-স্বীকারের জন্যেও অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, সত্যের অপলাপ দিয়ে কোনো মহত্ব অর্জন করা যায় না। সত্যের জন্যে দুঃখভোগেও সন্তৃপ্তি আছে। এই সত্যকে বিকৃত করে আপনি বঞ্চনা করেছেন নিজেকে—আপনার বৃদ্ধ পিতাকে, যিনি শুধুমাত্র স্নেহের প্রশ্রয়ে আপনার যে-কোনো অন্যায়কে ক্ষমা করতে প্রস্তুত। আর তার সঙ্গে আমাকে জড়িত করে অভিশাপের ভাগী করেছেন—অপরাধী করেছেন আমাকে।

—আপনাদের জন্যে প্রাণ দিয়ে ফেললেও সুনাম বা প্রশংসা তো কোনোদিন পাওয়া যায়নি।

—ঐ সারবস্তুহীন প্রশংসা পাবার লোভে নিজ-হাতে নিজের সর্বনাশ করার কোনো যুক্তি তো আমি দেখিনে। যাক, কিছু মনে করবেন না, অনেক অপ্রীতিকর কথা বলে ফেলেছি। আচ্ছা, উঠি এখন।— ব'লে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তরফদার।

—এর মধ্যেই উঠবেন কিরকম?

—না, আজ যাই, একটু কাজ রয়েছে।

তরফদার ঘর ছেড়ে বাইরের বারান্দায় চলে এলেন।

রত্নাও চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন পেছন পেছন।

—তাহলে বাবাকে কী লিখব?

একটা বিপদের সুর বেজে উঠল রত্নার কণ্ঠে।

তরফদার তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন রত্নার সমগ্র মুখমণ্ডলে একটা করুণ-অসহায়তার ভাব ফুটে উঠেছে। পূর্বেকার সেই রহস্যময় চটুল হাসি কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। বড় করুণ দেখাল তাঁর দৃষ্টি। একটা পরম আশ্বাসপূর্ণ উত্তর শুনবার প্রত্যাশায় তাকিয়ে আছেন তরফদারের মুখের দিকে। এ-অবস্থা দেখে ভারী কষ্ট হ'ল তরফদারের। মনটা ভরে উঠল করুণায়। তবু সে-ভাব গোপন করে গম্ভীর স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন,—কী লিখবার কথা বলছেন?

—সেই যে, বাবা যা লিখেছেন পত্রে?

এ-কথায় তরফদারের মুখভাব আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন,—উত্তরটা কি আমারই দিতে হবে? নাকি আপনারই দেবার কথা? পত্রটা আশা করি আমার কাছে লেখা হয়নি!

—না, সে-উত্তর অবশ্য আমারই দেবার কথা। তবু আপনার মতামতের ওপর কি সে-উত্তর-দেওয়াটা সর্বাংশেই নির্ভর করছে না?

শুনেই তীক্ষ্ণ-শেলের মতো অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি রত্নার ওপর। সে-দৃষ্টি সহ্য করতে পারলেন না রত্না। অবনমিত করলেন মস্তক।

তরফদার বিদ্রূপ-জড়িত কণ্ঠে বললেন,—আপনি যে ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছেন, রত্নাদেবি! আপনার উদ্ভট কল্পনাটা সত্য হবে বলেই কি ধরে রেখেছিলেন?

রত্না নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন নীচের দিকে তাকিয়ে।

উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তরফদার রত্নার মুখের দিকে। কিন্তু প্রতিপক্ষের কোনো বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না দেখে বললেন,—তা হ'লে এই খণ্ড-নাটিকা আপনার পূর্বপরিকল্পিত দুর্লভ-আশারই অভিব্যক্তি!

—যা-ই বলুন আপনি। অন্য উপায় নেই আমার আজ।

—ছিঃ ছিঃ, আপনি এমন একটা ষড়যন্ত্র পাকাতে পারেন, তা কিন্তু আমার ধারণার বাইরেই ছিল। আপনাদের চরিত্র সত্যি দুর্বোধ্য। আপনি কি মনে করেছেন যে মেয়েদের পশ্চাৎ ধাওয়া করাই আমার পেশা? একটুখানি লোল-কটাক্ষ হেনেই কাৎ করে দিতে পারবেন ব'লে ভেবেছিলেন বুঝি? ঐ-ধাতু দিয়ে গড়ে উঠিনি আমি। তা ছাড়া অন্য যে-কোনো শুভ মুহূর্তে সম্ভব হলেও, আজ যে মোটেই

সম্ভব নয়, তা কি জানেন না আপনি? বিশেষ করে আপনারই বান্ধবী যেখানে সুমিত্রা, যিনি আপন ভগ্নীর মতো পরিবর্ধিত হয়েছেন আপনারই পাশে পাশে। তাঁর এতবড় সর্বনাশ করতে উদ্যত আপনি? এ কিন্তু ধারণাতীত আমার! মুখে তো কত সহানুভূতিশীলা! আর তলে তলে তাঁরই পদতলের মাটিটুকুনও সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন আপনি সংগোপনে! সত্যি, ধারণা বদলে দিলেন কিন্তু আপনাদের জাতি সম্বন্ধে। এমন অস্ত্র প্রয়োগ করার আগে একটিবারও কি ভেবেছেন আপনি আপনার প্রিয়বান্ধবীর কথা?

যে-কোনো রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষের দেহের মাংস খসে-পড়ত এহেন তীব্র ও ধারালো উক্তিতে। কিন্তু রত্নার তা হ'ল না। বরং একধরনের হাসিই বিকশিত হয়ে উঠল রত্নার সমগ্র মুখটা ভরে। পরম নির্লিপ্তের মতোই বললেন তিনি,—বান্ধবী যাকে ভালবাসে, তাঁকে অপর বান্ধবী ভালবাসতে পারে না, এমন যুক্তি নীতিশাস্ত্রে থাকতে পারে হয়ত, কিন্তু মনস্তত্ত্ব এবং মানবিক শাস্ত্রে বোধ করি তেমন কোনো বিধান নেই। চলুন, ঘরে গিয়েই এর মীমাংসা করা যাক্। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কী লাভ হবে?

কথাটা যৌক্তিক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তরফদার পুনর্বার ঘরে গিয়ে বসলেন।

বললেন,—তা হ'লে আপনি বলতে চান যে আপনিও আমাকে ভালবাসেন?

—আপত্তি কি?

—আপনার অবশ্য আপত্তি না-থাকারই কথা। আচ্ছা, দুনিয়ায় ভালবাসার পাত্র কি এই একটাই সৃষ্টি হয়েছিল যে, [illegible] তার একাধিক নারীর ভালবাসার দাবি মেটাতে হবে? যেন আমি মানুষ নয়, যেন একটা বিরাট কামনার পিণ্ড মাত্র, যেখানে যে-কোনো নারী তাঁর খেয়াল-খুশী-মতো এসে আপন,গোপন কামনার ধার দিয়ে যেতে পারেন। যেন আমার হৃদয় নেই, আর থাকলেও তার কিছুমাত্র মূল্য নেই। প্রকারান্তরে এইতো জানাতে চান? যদি তাই মনে করে থাকেন, খুব ভুল করেছেন। বরং এটুকুন খুব ভালো করেই জেনে রাখুন যে, হৃদয়ের জন্যেই আজ আমি এতখানি নেমে দাঁড়িয়েছি। সে-হৃদয়ে প্রথমা ছাড়া দ্বিতীয়ার স্থান নেই। জীবনে এবং মরণেও সে-হৃদয় অবিচলই থাকবে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, জৈবিক ক্ষুধার তাড়নার ওপর সে-ভালবাসার প্রতিষ্ঠা নয়।

তীব্র শ্লেষের সুরে বললেন রত্না,—হ্যা, তা অবশ্য ঠিকই। সেকালে এক যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে পড়েছি কাব্যে ও গ্রন্থে, আর এ-যুগে আরেক যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যক্ষ করলাম আপনার মধ্যে। তবে পুরাকালের যুধিষ্ঠির পরস্ত্রীর সাথে অবৈধ ভালবাসায় আবদ্ধ হয়েছিলেন ব'লে শোনা যায়নি। একালের যুধিষ্ঠিরের মাঝে সেই অতিরিক্ত যোগ্যতাও পরিলক্ষ্য করা যাচ্ছে।— ব'লে একটু হাসলেন রত্না।

—অথচ এই অবৈধ ভালবাসাকে প্রশ্রয় দেওয়াটা এ-যুগের যুধিষ্ঠিরের অতিরিক্ত যোগ্যতা বাড়াবার মহানুভবতায়, কি অন্যকোনো প্রচ্ছন্ন স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধিতে, তা এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি কিন্তু, যদিও তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। আপনার মনের কুৎসিত-দিকগুলো কিন্তু ক্রমেই প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করে উঠছে, রত্নাদেবি।

শুনে রত্না এমন বিকটভাবে হেসে উঠলেন যে, তরফদার অকস্মাৎ ভয় পেয়ে গেলেন। কিছুই তিনি হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারলেন না। বেকুবের মতো ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে রইলেন উন্মাদিনী-সদৃশা রত্নার দিকে।

হাসতে হাসতেই বললেন রত্না,—খুব জোর অভিযোগ করলেন যা-হোক আমাকে। কিন্তু, মিঃ তরফদার, আপনার উত্তেজিত মুহূর্তে আপনি বিন্দুমাত্রও টের পাননি যে, মনের কুৎসিত-দিকের পরিচয় আপনিই দিয়ে ফেলেছেন অনেকখানি। যাক, আজ কিন্তু খুবই সুখী হলাম, প্রকৃত আনন্দ পেলাম আপনার আত্মপরিচয় পেয়ে। এমন কঠোর নিষ্ঠা না থাকলে আয়ত্ত করা যায় না কিছু। সিদ্ধিলাভ ঘটে না মোটেই। আপনাকে অভিনন্দন জানাবার ভাষা নেই আমার। অনুরাধার কপাল ভালো। ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ঈর্ষা আমি করিনে। তার মঙ্গলের জন্যেই এত ক্ষুদ্র এত নীচ হয়েছি আপনার কাছেও। তার কি কোনো প্রয়োজন ছিল?...তাহলে জানিয়ে দিই আপনাকে কথাটা। আপনার অনুরাগের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আপনি পূর্ণ নম্বর পেয়ে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। দিন, হাত দিন—'হাণ্ডসেক্' করি!— ব'লে আপন দক্ষিণ-হস্ত প্রসারিত করে দিলেন তরফদারের দিকে।

তরফদার যন্ত্রচালিতের মতো হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলেন রত্নার দিকে। দেখলেন অশ্রু আর হাসির অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে রত্নার দৃষ্টির মাঝে। —কৃষ্ণকালো মেঘপুঞ্জের ওপর দিয়ে যেন একঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল।

তরুণদায়ের দক্ষিণ হস্তটা মৃদু আন্দোলিত করে দিয়ে ঝটিতি বেরিয়ে গেলেন রত্না ঘর থেকে।

অগ্র এবং পশ্চাৎ কিছুই উপলব্ধি করে উঠতে পারলেন না তরুণদার। বিরাট অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। রত্নাও ওজন করে নিলেন অনুরাধার প্রতি তাঁর অনুরাগের তীব্রতাটা। কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল তার পশ্চাতে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেল, রত্নার পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন বটে, কিন্তু আরেকজন যে তাঁরই দুর্বলচিত্ততার ওপর দিয়ে আপন জয় অর্জন করে চলে গেলেন। তাঁর মনে হ'ল অনেকখানিই যেন ছোট হয়ে গেলেন রত্নার কাছে।

ছ

পুরো তিনটি মাস চিকিৎসার পর অনুরাধা নিরাময় হয়ে উঠলেন। ডাক্তারদের মতে মাস-কয়েক স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকলে পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন অনুরাধা।

কোনো 'ইমোশন্যাল ওয়েভ'-এর সম্মুখীন হ'লে রোগিণীর 'হার্ট-ফেল' হবার সম্ভাবনা। তাই তরুণদার-অনুরাধার সাক্ষাৎকার ঘটেনি এ-পর্যন্ত।

তরুণদার ঔৎসুক্যবশতঃই একদিন লজ্জা-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন রত্নাকে,—আচ্ছা, অনুরাধা কি আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করে না?

রত্না সকৌতুকে বলেছিলেন,—তা আর করে না! জিজ্ঞাসা করে করে পাগল করে ফেললে আমাকে। আপনার জন্যে মশায় মিথ্যে কথা বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম আমি। ভাবছি, আমি মাঝখানে না-থাকলে কী অবস্থা হ'ত আপনাদের দুজনের। অনসূয়া-প্রিয়ম্বদার মতো কে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ভাব-বিনিময় করত?

—আপনার সৌহৃদ্যের জন্যে ধন্যবাদ, তার জন্যে আমি ঋণী আপনার কাছে। সে-ঋণ অপরিশোধ্য।

—যথেষ্ট হয়েছে! আর বেশী বললে ব্যঙ্গবোধ হবে।

—কিন্তু অনুরাধা কী বলেছে বললেন না তো?

—পাগল পথে-ঘাটে অনেকই দেখা যায়, কিন্তু আপনার মতো পাগল দেখা যায় না। বলেছি যে, আপনি কলকাতায় নেই। কোথায় যেন গেছেন কর্মপ্রয়োজনে। আমি রোজই খবর নিচ্ছি। আসলেই খবর পেয়ে যাবেন এবং খবর পাওয়া মাত্রই তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসবেন। অবশ্য পরে তার অতীব আগ্রহ এবং পীড়াপীড়িতে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা আপনিই করেছেন। দেশের বাড়ী থেকে এই পর্যন্ত ঘটনা তার কাছে আদ্যোপান্তই ব্যক্ত করতে হয়েছে। তার তো এর জানাই স্বাভাবিক। কারণ সে তো জানে যে, তার স্বামী নিশ্চয়ই এত অর্থব্যয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি। আর এ-ও জানে যে, আমাদেরও তেমন অর্থ-সাচ্ছল্য নেই যে, জলের মতো সে-অর্থ ব্যয় করতে পারি। কাজেই এমন একটা মহানুভব অনুগ্রহ যে দেবতার আশীর্বাদের মতো প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে, সে-প্রত্যয় তারও মনে জেগেছিল। কিন্তু যিনি এত করছেন তাঁর সাথে একবারও সাক্ষাৎ ঘটছে না ব'লে কতো আক্ষেপ করল সে। তবে এবার যে সে-প্রার্থিত সাক্ষাৎ ঘটবে সে-আশা তার দৃঢ় হ'ল এবং তাতে তার মনে জোরও এসেছে কতকাংশে। এই উচ্ছ্বসিত সংবাদ তার নিরাময়ের পক্ষে অনেকখানি সাহায্যও যে করেছে তা নিঃসন্দেহ।

অবশেষে সে-প্রার্থিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা হ'ল মাত্র হাসপাতাল থেকে অনুরাধার বিদায়ের দিনে।

যথারীতি হাজির হলেন তরুণদার আর রত্না। রত্না আগে আগে, তরুণদার পশ্চাতে।

তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে তরুণদার ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেলিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠছেন। উঃ, কতকাল পরে এই কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ ঘটবে উভয়ের। এই মুহূর্তটির জন্যে অনেক স্বপ্নগাথা—অনেক কল্পনাও তো রচনা ছিল মনে। আজ স্বপ্নের সেই রঙিন-ক্ষণ সমাগত। বুকটা দুলে দুলে উঠছে তাঁর বারংবার।

কেবিনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে পা-দুটো যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ফিরে-ফিরে আসতে চায়। রত্না ঢুকলেন কেবিনে। তরুণদার তৎক্ষণাৎ ঢুকতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার অন্তরালে। কিন্তু রত্না পশ্চাৎ ফিরে তাঁকে দরজার অন্তরালে লুক্কায়িত দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলেন,—একি! আসুন? বাঃ, কতো ঢং-ই করতে শিখেছেন বুড়ো-বয়েসে!

অনুরাধা কিন্তু ভাবতেই পারেননি যে তরুণদারই স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন তাঁর দ্বারপ্রান্তে—তাঁর সুদীর্ঘ-প্রতীক্ষার শ্রীরামচন্দ্র—যাঁর পুণ্য-পাদস্পর্শে শাপগ্রস্তা অনুরাধার মুক্তি আসবে। জিজ্ঞেস করলেন,—কে রে?

রত্না বলে উঠলেন স্নেহ ও মমতামিশ্রিত স্বরে,—কে আবার? তোর ইয়ে, মানে···

রত্নার অসম্পূর্ণ বাক্যের মাঝখানেই ঢুকে পড়লেন

তরফদার কেবিনে। চোখাচোখি হয়ে গেল দুজনের—অনুরাধা আর তরফদারের। কারো দৃষ্টিই নামল না কারো মুখের ওপর থেকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। কোনো বাক্যস্ফূর্তিও হ'ল না কারো মুখ দিয়ে। তাকিয়ে রইলেন নির্নিমেষে। যেন সারা-জীবনের চাওয়ার তৃষ্ণা মিটিয়ে নেবেন আজকেই। চেয়ে-চেয়ে চাওয়ার যেন শেষ হয় না কারো। এই চোখে-দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যৌবনেই যে মরে মরেছেন তাঁরা দুজনে। আজ সে-চাওয়াকে এত তাড়াতাড়ি শেষ হতে দিতে পারেন তাঁরা কেমন করে!

অনুরাধার চোখ ফেটে যেন জল গড়িয়ে পড়বে এবার। টলটল করছে একটা বিন্দু নয়ন-তারকার চারিদিকে। এবার তা গড়িয়ে পড়ল দুই গণ্ড বেয়ে। তাতেই বুঝি সম্বিৎ ফিরে এল অনুরাধার। বললেন,—তুমি! কিন্তু কী নিষ্ঠুর তুমি! এত কাছে এসেও এত দূরে সরে ছিলে তুমি!

তরফদারের কণ্ঠটিও বুঝি ধরে এসেছিল আবেগে। তাই কোনো কথাই বলে উঠতে পারলেন না তিনি। তাকিয়ে রইলেন শুধু অনুরাধার মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে।

অনুরাধা আবার কথা বলে উঠলেন,—ওকি, অমন করে তাকিয়ে রইলে যে! এসো, কাছে এসো আমার। নয়ন-ভরে দেখি তোমায়। উঃ, কতকাল পরে!

তরফদার নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন শুধু অনুরাধার মুখের কাছে, কোনো কথাই বলে উঠতে পারলেন না তবু।

অনুরাধা কম্পিত হস্তের স্পর্শ দিয়ে সর্বাঙ্গ তাঁর পরখ করতে লাগলেন। —কী খারাপ হয়ে গেছে শরীর তোমার!— একটু নিশ্চুপ থাকলেন অনুরাধা। চোখ-দুটো যেন তাঁর আবার ছলছল করে উঠল।

তরফদার এবার আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ডেকে উঠলেন,—অনু!

এবার একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পালা অনুরাধার। যেন এই আহ্বানের মাঝে কতখানি আবেগ—কতখানি উদ্বেলতা—কতখানি ভালবাসা আছে ওজন করে নিচ্ছেন তিনি। সেই আকাঙ্ক্ষিত নাম ধরে ডাকা! আহা! এই করুণ সুরের ডাক শোনার জন্যেই এত রোগ-ভোগের পরও বেঁচে উঠেছেন তিনি। বার বার যেন সেই আহ্বানের সুরের অনুরণন রোমন্থন করে নিচ্ছেন অনুরাধা। অনুরাধার চোখের সেই ছলছল অশ্রুবিন্দু-দুটি এবার গড়িয়ে পড়ল কপোল বেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের দুই মুঠো করে তরফদারের দক্ষিণ-হস্তটি টেনে নিয়ে যেন চেপে ধরলেন [illegible] আবেগে আপন বক্ষোপরে।

—চলুন, গাড়ী এসেছে। আর…র…র…এ…

ব্যাহত হয়ে গেল সে-আবেগ। স্খলিত হয়ে পড়ল তরফদারের হাত অনুরাধার হস্তমুষ্টি থেকে।

পশ্চাৎ ফিরে দেখলেন তরফদার—রত্না দাঁতে জিভ কেটে বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে, যেন অপরিসীম লজ্জায়।

তাঁদের এই আবেগার্দ্র অভিনয় দেখেই হয়ত রত্না ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্গত আবেগ প্রশমনের নিরঙ্কুশ সুবিধে দিয়ে। তাঁরা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি কখন রত্না ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন।

পরক্ষণেই আবার সকৌতুক হাস্যমুখে ঘরে ঢুকলেন রত্না। —ভো আর্যপুত্র, প্রস্থান-সময় সমাগত। রথ প্রস্তুত। আর্যপুত্রীকে নিয়ে এবার এগিয়ে আসতে হবে যে?

রত্নার রসিকতায় তাঁদের সলজ্জ ভাবটা কেটে গেল। তাতে স্বস্তিই পেলেন তাঁরা।

অনুরাধা বললেন,—তোর তো আনন্দ আর ধরে না দেখছি!

—আমার আনন্দ হবে না? বাঃ, আনন্দের আতিশয্যে এখনও যে 'বার্স্ট' করিনি এ-ই তোদের পরম সৌভাগ্য!—চলুন, রাত হয়ে গেল যে!—

সত্যি, রাত্রির কালোছায়া নেমে পড়েছে। শীতের রাত। একটু তাড়াতাড়ি হলো।

'লিফ্‌টে' নামলেন তাঁরা। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে দ্বারপ্রান্তে। রত্না এবং তরফদার হাত ধরে তুলে বসালেন অনুরাধাকে। তার পাশে গিয়ে বসলেন তরফদার। রত্না কিন্তু উঠলেন না, দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে। তরফদার উঠে বসার জন্যে অনুরোধ জানালেন। রত্না মুখটা গাড়ীর ভেতর এগিয়ে নিয়ে এসে নিম্নকণ্ঠে বললেন,—দাঁড়ান, একটা শাঁখ নিয়ে আসি।

—কি হবে?

—বাঃ, বাজাতে হবে না? বর-কনে চলেছে! কেউ না থাকত এক কথা ছিল। আমি যখন রয়েছিই তখন সে-কাজটা তো আমারই করবার কথা।

চোখে-মুখে চপল-চটুলতা উপচে পড়ছে রত্নার।

অনুরাধা সহাস্যে সরোষে ভৎ‌র্সনা করে উঠলেন,—থাম্ মুখপুড়ী! আর পাকামো করতে হবে না। যতই বয়েস বাড়ছে, ততই যেন দিন দিন ছেলেমানুষ হয়ে উঠছিস তুই। আর ফাজলামো করতে হবে না। আয়, উঠে বোস্।

গ্রীবা দোলাতে দোলাতে রত্না উঠে বসলেন বান্ধবীরই পাশে। —বাস্, একেবারে বধূ-বরণের সময়েই এসব মাঙ্গল্যানুষ্ঠান করা যাবেখন।— বললেন রত্না।

গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হতেই আবার বলে উঠলেন রত্না,—এই যে, ফুল কেনা হ'ল না যে কিছু—

অনুরাধা সস্নেহে চিবুকটি টেনে দিয়ে বলে উঠলেন,—থামবিনে তুই কিছুতেই? দাঁড়া, বাড়িতে দিচ্ছি তোকেও [illegible]। এত পুলক হয়েছে তোমার!

—না, পুলক তো শুধু তোমাদেরই হবার কথা। আমরা শুধু দেখেই আনন্দ পাই। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায় কি?

তরফদার এবার মুখ খুললেন। বললেন,—ও কি বলছেন, রত্নাদেবি! একেবারে খাঁটি দুধেরই ব্যবস্থা করছি। একটু ধৈর্য ধরুন শুধু।

—বাঁচলাম। একজন দরদী বন্ধু তবু পাওয়া গেল। ধন্যবাদটা 'অ্যাড্‌ভান্স'-ই দিয়ে রাখলাম। আপনার কথার ওপর নির্ভর করে উৎপ্রেক্ষার দিন গুনব আমি কিন্তু। এই দেখুন না তাকিয়ে। যৌবনটা একেবারে নিঃশেষ হয়নি এখনো। স্নো-পাউডার ঘষলে চেহারাটাও একেবারে মন্দ দাঁড়াবে না,—এ-যুগের ছোকরা দু'একটাকে নিশ্চয়ই কাৎ করা যাবে। কি বলেন?

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল রত্নাদের বাড়ীর দরজায়।

সাত

সমাজে বাস করে অসামাজিক অভিযান চালনোর প্রতিবন্ধক অনেক। তাই অনুরাধার একজন-কেউ হয়ে রত্নাদের বাড়ী ঢুকতে পারেননি তরফদার। রত্না-জননী যে অনুরাধারও মাতৃবৎ। সেখানে যে তাঁর কোনো পরিচয় নেই। প্রাণে আকণ্ঠ পিপাসা—সম্মুখে অপার জলধি,—পান করার অধিকার নেই। তাই উপবাস-যন্ত্রণায় গুমরে মরা ছাড়া উপায় কি?

স্বাস্থ্য ও হাওয়া-পরিবর্তনের বেলায়ও সেই একই প্রশ্ন। তিনি নিয়ে যাবেন কোথায়? কেমন করে? সে-অধিকার কি এসেছে এখনো? সমাজও এতখানি উন্নত হয়ে তো এখনো যায়নি যে তার অনুশাসন ও নীতির কটাক্ষ এড়িয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা বইয়ে দেওয়া যাবে সমাজে। যদি তাই করতে হয় তো ভিন্ন-পরিবেশে গিয়ে বাস করতে হয় ভিন্ন-দেশে, যেখানে তাঁদের অবৈধ পরিচয় ও সম্বন্ধ সমালোচনার বস্তু হবে না নিন্দুকের। তাই আজো তাঁর নেপথ্যেই বিহার করতে হবে ছায়ার মতো পশ্চাদনুসরণ ক'রে ক'রে।

সাত-পাঁচ বিবেচনায় সাব্যস্ত হ'ল রত্নাই হবেন আবার বাহিকা বান্ধবীর হাওয়া-পরিবর্তন-কালে। মধুপুরে আত্মীয়া রয়েছেন একজন রত্নাদের। তাঁদের বাড়ীতেই থাকা যাবে।

পরদিন রওনা হয়ে গেলেন তাঁরা মধুপুরের পথে। তরফদারও গেলেন। কিন্তু আসানসোল থেকেই ফিরে এলেন অসীম উদ্বেলতা নিয়ে। অনুরাধা ক্ষুণ্ণ হলেন খুবই। আর বড়-বাধা উত্তীর্ণ হয়ে এলেও অন্তরের হাহাকার মেটানো গেল না। এ যেন সীতাকে রাবণের কবল থেকে উদ্ধার করে আবার বনবাসের ব্যবস্থা। অনুরাধা আপত্তি জানালেন,—এই যদি মনে ছিল তোমার, কেন মরতে দিলে না আমাকে? এত অর্থব্যয় করে বাঁচালে কেন? প্রয়োজন নেই আমার হাওয়া-পরিবর্তনের।

অনেক যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়েই আসতে হ'ল তরফদারকে।

পর আসে অনুরাধা-পর্যায়। রত্না রসিকতা করেন যথেষ্টই। আর অনুরাধা জ্ঞাপন করেন উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ। সমস্ত বিশ্বই আজ শূন্য মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। প্রবাসে রোগ-ভোগে এবং রোগশয্যা-শয়নের মাঝে সেই অদর্শনজনিত বেদনাও আজ নগণ্য মনে হচ্ছে। তখন আশা ছিল না—ভরসা ছিল না—শক্তি ছিল না—উপায়ও ছিল না কিছু। তাই তপস্যা ছিল মৃত্যু-দেবতার। আজ মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন। হয়ত হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনায় সব ছিন্ন করে। কিন্তু মৃত্যুও যাঁর হাতে সঁপে দিয়ে গেল—তিনি আজ দূরে—বহু দূরে। কিন্তু কেন? কেন এই শাস্তির ব্যবস্থা! হৃদয়ের সমস্ত দ্বন্দ্ব-কামনাই যে আজ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। আজ ভেবেই পান না তিনি—কোথায় ছিল হৃদয়ের এত আবেগ! আজ যেন রোধ করার শক্তি নেই তাঁর। কোথায় ছিলেন তিনি! মনে হচ্ছে, বিরাট স্বপ্ন ভেঙে যেন উঠেছেন তিনি। উঠে দেখেন—তিনি নেই, যিনি শুধু জীবনে নয়, মরণেও থাকবেন তাঁর পাশে পাশে। এই অন্তর্দাহে পুড়ে মরতে হবে তাঁকে কদ্দিন? কবে ঘুচবে এই সীতার-বনবাস?

পত্রালাপেই শুধু সে-আবেগের নিরসন উভয় পক্ষের।

আট

দেড়টি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তরফদার মধুপুরে উপস্থিত হতে পারলেন না একবারও সশরীরে। কেমন করে পারবেন?—সেখানেও যে সেই একই প্রশ্ন। কী তাঁর পরিচয়—রত্নাদের আত্মীয়ার কাছে?

রত্না লিখেছেন: যে-প্রতিবন্ধকের জন্যে এদিন মধুপুরে যাওয়া ঘটাতে পারেননি তরফদার, সে-প্রতিবন্ধক অপসৃত হয়ে যাচ্ছে কালকেই। অর্থাৎ বাড়ীর মালিক ও লোকবর্গ যাচ্ছেন কলকাতায় তাঁদের আত্মীয়ের বিয়েতে কিছুদিনের জন্যে। এই ফাঁকে তিনি এসে উভয়ের মনের ফাঁকও কিছু ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তা ছাড়া কিছু জরুরী আলোচনাও আছে। এ-সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করা উচিত নয়। ইত্যাদি।

তরফদারও এ-সুযোগ নষ্ট করলেন না। বিরাট এক আকর্ষণের টানে রাত্রির গাড়ীতেই তিনি উঠে বসলেন। আবার সেই-স্বপ্ন রচনা—সেই কল্পনা-বিলাস। চক্রাকারে ঘুরতে লাগল মধুপুর নামটা তাঁর সমগ্র মনোমণ্ডলে। মধুর হয়ে উঠল মধুপুর। সেই রসিক-প্রবরের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠল তাঁর হিয়া-মন, যিনি নামকরণ করেছেন এই মধুপুরের।

ভোরে গিয়ে পৌঁছল ট্রেনটা মধুপুর স্টেশনে।

কলকাতায় এখন শীত যায়-যায়। এখানে শীত রয়েছে দিব্যি। কাঁপুনি ধরে রীতিমতো। বসন্তের ছুঁয়ে-যাবার পরশ পাওয়া যায় মৃদুমন্দ বাতাসে। শিহরণও জাগে একটু-একটু। কিন্তু সাঁওতাল পরগনার কনকনে শীত সে-আবেশ উপভোগ করতে দেয় না।

কাশ্মীরী শালটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে তরফদার পায়ে হেঁটেই এগিয়ে চলেছেন। লাল কাঁকরের কাঁচা-রাস্তা শালবনের মাঝ দিয়ে বেঁকে গেছে এঁকেবেঁকে। কুয়াশায় ঢাকা আকাশের কোণ ঘেঁষে আবছা-আবছা সূর্যোদয়ের আভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে শালবনের ফাঁক দিয়ে। মহুয়ার পাগল-করা গন্ধ নাকে এসে লাগল। মনটা তাঁর ভরে উঠল পুলকে। প্রাণের আনন্দ-হিল্লোলিত ভাবকে পরিপূর্ণ করল যেন প্রাকৃতিক পরিবেশও।

আঙিনায় গিয়ে দাঁড়ালেন তরফদার। যাঁদের অভ্যর্থনা করার কথা তাঁরা প্রস্তুত আছেন পূর্বাহ্নেই। অনুরাধা আর রত্না স্মিত হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে।

রত্না বললেন,—ট্রেনে সারারাত ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে। যাত্রীর ভিড় ছিল বুঝি খুব?

—কেন? কেমন করে বুঝলেন?

—অনুমান করলাম। প্রিয়জনের কাছে আসা তিন দিন আগে থেকে নিদ্রা বন্ধ হয়ে যায় কিনা? আমা বান্ধবীরও তাই অবস্থা হয়েছে। রাত্রে বোধ হয়, বার দশেক উঠে জাগিয়েছে: এই ওঠ্ না, রাত ভোর হ গেল যে—ট্রেন-আসার সময় হ'ল।

অনুরাধা চেপে ধরলেন রত্নার মুখ। তরফদার তাকাত লাগলেন এদিকে-ওদিকে—কেউ শুনে ফেলল নাকি?

অনুরাধার কবলমুক্ত হয়ে বললেন আবার রত্না,—শা মুখপুড়ী!— এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছেন তিনি।—রা আমাকেও ঘুমুতে দিলে না একফোঁটা।

অনুরাধা অনুযোগ করে বললেন রত্নাকে,—তুই আ একটা 'বদ্‌লোক'। সারারাত 'জার্নি' করে এসেছে শ্রা ক্লান্ত হয়ে, কোথায় তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে বসাবি, ন দাওয়ায় দাঁড়িয়েই ফাজলামি শুরু করেছেন। তার তরফদারকে বললেন,—চলো, ঘরে গিয়ে বসবে।—এ একটু চা করার ব্যবস্থা কর্ না, ভাই! কী শীত পড়েছ দেখেছিস? রোদও উঠবে না বুঝি আজ।

সত্যি, সকালবেলার সূর্যোদয়ের আভাস এখন সম্পূ ঢেকে গেছে কুয়াশায়।

রত্না অনুরাধার কথার সুর ধরে বললেন,—উনি 'জার্নি' করে এসেছেন—ক্লান্তি ওনার। আর আমি যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি সারারাত ধরে! আমার শরীরে কি ক্লান্তি থাকতে আছে? আমি তো আর তোমার 'উনি' নই!— ব'লে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অনুরাধা-তরফদার দুজনে একা এখন ঘরের ভেতর। বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে তরফদারের। অনুরাধা একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন করে ফেললেন, যার একটারও উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'ল না তাঁর। তিনিও জিজ্ঞেস করবেন ভাবলেন অনেক কথাই। কিন্তু কোন্‌টা জিজ্ঞেস করবেন আগে! শেষ পর্যন্ত কোনো কথাই বলা হ'ল না। বরং বললেন এমন একটা কথা যা এক্ষুনি বলে না-ফেললে এমন কোনো ব্রহ্মহত্যার মহাপাপ হ'ত না। তরফদার বললেন,—কালকে চলে যেতে হবে আমায় কলকাতায়। জরুরী কাজ ফেলে এসেছি।

অনুরাধার পুলকোচ্ছ্বাস অনেকাংশেই প্রশমিত হ'ল যেন। বললেন কিঞ্চিৎ হতাশভাবে,—সেকি! এত তাড়া কিসের? আমি তো আশা করে আছি, তুমি এলে দেওঘরটা একবারটি ঘুরে দেখে আসব, এতখানি কাছেই যখন এলাম। এরপরে আর সুযোগ আসবে কিনা কে জানে।

সময়ের সীমা এবং কার্যের তৎপরতাটা মেপে নিলেন যেন একবার তরফদার। একটুখানি ভেবেই বললেন,— বেশ, যাবে। কিন্তু যেতে যদি হয় তো আজই দুপুরের গাড়ীতে রওনা হতে হবে, যাতে দেখে-শুনে রাত্রের ভেতর ফিরে আসা যায়। কাল আমাকে ফিরতেই হবে কলকাতায়।

—নিন, নিন, চা নিন। আপনার নাকি খুব শীত লেগে গেছে বলে বললেন বান্ধবী। 'ছবি দিয়ে ছবি অনুভব' কিনা! বুঝেও থাকতে পারেন তিনি!— রত্না চা-জলখাবার নিয়ে ঢুকলেন ঘরে।

চা-খাবার পরিবেশিত হ'ল। এবং তাঁরা ব্যস্ত-ও হয়ে পড়লেন তা নিয়ে।

অনুরাধা রত্নার বাক্যের পূর্বসূত্র ধারণ করে ভর্ৎসনার সুরেই বললেন,—তোর মুখে কিছু আটকায় না দেখছি।

—না ভাই, আটকায় না কিছুই। ওই দোষটা আমার অতিবড় শত্রুও দিতে পারবে না। বড়বড়িয়ে বলে ফেলি সব একনিঃশ্বাসে। নইলে ভাত হজম হয়না ভাই! কেন? লজ্জা হচ্ছে বুঝি তোর? তা ভালো। লজ্জা নারীর ভূষণ। আমি তাতে আনাড়ী। ও-আওতায় পড়ি না আমি।

—ফাজলামিটা রাখ্‌ দিদিমণি এখন। নে, চা খেয়ে নে। তোর জালায় গলায়-দড়ি দিতে হবে দেখছি আমায়।

—দড়ি? আরে, মালা পরবি গলায়, সবুরটা থাকুক একটু। স্যুটকেসটা খুলে ভাখ্‌ না, সব রজনীগন্ধা আর জুঁইফুলের মালা। কি বলেন মশায়, সত্যি কিনা?— তরফদারকে আক্রমণ করলেন এবার রত্না।

তরফদারের কর্ণযুগল রক্তিম হয়ে উঠল লজ্জায়। অনুরাধা মাটির সাথে মিশে গেলেন। রত্নার রসিকতা বিঘ্নিত হ'ল না। শুধু হাসছেন তাঁরা। রত্নার বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি নেই তাঁদের। এই হাসি-হুল্লোড়ে মধুপুরের প্রথম সকালটা ভালোই কাটল তরফদারের। কথায় কথায় তরফদার বললেন,—আজকেই দুপুরের গাড়ীতে দেওঘর যাব ভাবছি। আপনার বান্ধবীর হঠাৎ দেওঘর দেখার শখ উথলে উঠল। সন্ধ্যের গাড়ীতেই ফিরে আসতে হবে। দেওঘর খুব বড় জায়গা নয়, আর দর্শনীয়ও তেমন বিশেষ-কিছু নেই। কাল আবার কলকাতা ফিরে যেতে হবে তো আমায়।

রত্না বললেন,—সেকি মশায়! এত তাড়া কিসের? একগাদা জরুরী কাজ ফেলে আজই আসার কী দরকার ছিল? না-হয়, দরকারী কাজ-কর্মগুলো সেরে দু'দিন পরেই আসতেন। কাজ-টাজ ফেলে রাখুন। বাড়ী এখন একদম খালি!— ব'লে তাৎপর্যপূর্ণ হাসি হাসলেন রত্না। —যাই, রান্নাদির একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করার চেষ্টা করিগে। আপনারা তো আবার 'হনিমুনে' যাবেন।

অনুরাধা এবার তাড়া করলেন রত্নাকে,—পোড়ারমুখী, একেবারে জাহান্নমে গেছিস! মুখটি সেলাই করে দেব তোর।

রত্না ততক্ষণে অন্তর্হিত হয়েছেন।

দশ

বেলা সাড়ে-এগারোটার গাড়ীতে রওনা হলেন তাঁরা দেওঘরের দিকে। অনুরাধা আর তরফদার। রত্নাকেও অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি আপত্তি করলেন। আপত্তির কারণ অবশ্য যা দেখালেন তা গ্রাহ্যের নয় মোটেই। সংসার পাহারা দেবার গুরুতর প্রয়োজনের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতাটা অস্বাভাবিক। আসলে তিনি যে তাঁদের উভয়কে একটা সুযোগ দিলেন, সে-কথা রত্না ঠাট্টার ছলে বললেও, তাতে

গভীরতর সত্য নিহিত আছে। এ-কথা তরফদার-অনুরাধা দুজনেই খুব ভালো করে বুঝেন। তবে রত্না ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছিলেন এগিয়ে দিতে।

ট্রেন আসবার বিলম্ব ছিল। ওয়েটিং-রুমে গিয়ে বসলেন তাঁরা। রত্না জিজ্ঞেস করলেন তরফদারকে,—আর পশ্চাৎমুখো ফিরবেন তো? নাকি এগুতে থাকবেন সামনের দিকে?

—মানে?

—মানে, নদী এবার সমুদ্রে এসে পড়েছে। যে-নদী একদায় দুর্গম পার্বত্যদেশ বেয়ে, জঙ্গল-জনপদ পেরিয়ে এসে মহাসমুদ্রের সাথে এক হয়ে মিশে যায়, সে কি পশ্চাদ্দিকে উজান বইতে চায় আর? আর সম্ভবও হয় না তা।

—আপনি তো দেখি উপমায় কালিদাসকেও ছাড়িয়ে যাবেন। প্রশংসা করি আপনার বুদ্ধি আর প্রতিভার। সত্যি, বলেছেন ভালো। তবে ফিরব নিশ্চয়ই। তারপরের প্রোগ্রাম ঠিক করিনি এখনও।

—এখন আর ঠিক না-করলে তো চলবে না। এতদিনের মধ্যে আপনি তো একবারও আসবার সময় পেলেন না। এবার যা-ও বা এলেন, তাও বলছেন আবার কালকেই চলে যাবেন। আজও তো ছুটছেন কোথায়। কাজেই আপনার সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলার ফুরসত-ও মিলছে না। জেলের পালা তো শেষ হ'ল। এবার পরবর্তী সূচী কী তা তো নির্ধারণ করতে হবে। এমন করে ঝুলে থাকবেন আর কদিন? নাকি জীবনভর একজন অপরের পশ্চাৎ-ধাওয়াই করবেন শুধু, ধরা দেবেন না কেউ কাউকে কোনোখানে?

—কেমন করে বলব তা? তবে জানি, ধরা দেবার ইচ্ছে যদি প্রবল থাকে উভয়েরই, কোনো প্রতিবন্ধকই পথরোধ করে দাঁড়াতে পারবে না তাদের। আর যদি তারা বুঝতে পারে যে ভুলপথে এসেছে তারা, ফিরে যাওয়ার রাস্তাও রয়েছে চির-উন্মুক্ত। স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারে তারা। তাঁর সংসার-সিংহাসন নিরঙ্কুশ রয়েছে আজও। তিনি তা বিনা-দ্বিধায় অধিকার করতে পারেন, এবং পরম মর্যাদায়।

আলোচনাটা গভীরভাবে জমতে পারল না আর। ট্রেন এসে পড়ল।

একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠে বসলেন তাঁরা—তরফদার আর অনুরাধা। ভিড়ও বেশী নয়। ট্রেন ছাড়ল। ফোঁস-ফোঁস করে এগিয়ে চলেছে ট্রেন বিরাটকায় অজগরের মতো।

রত্না হাত তুলে বললেন,— উইশ্ ইউ গুড্ লাক্!

তরফদার সহাস্যাননে অনুমোদন করলেন শুধু রত্নার শুভেচ্ছা।

অনুরাধা অবনমিত দৃষ্টিতে বসে রইলেন 'বার্থ'-এ। তিনি শাড়ীর আঁচলখানির একটি প্রান্ত জড়াচ্ছেন আর খুলছেন ডান-হাত দিয়ে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে। যেন একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন মনে-মনে।

তরফদার বসলেন না; অনুরাধার বিপরীত দিকের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি সংবাদপত্রের পাতার বিশেষ একটা সংবাদের ওপর যেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। যে-কোনো দর্শকের তা-ই মনে হবে। কিন্তু তিনি যে ওটা একটা অন্তরাল সৃষ্টি করেছেন সে-সংবাদ তিনি ছাড়া জানেনা আর কেউ। কিন্তু তার তো প্রয়োজন ছিল না। কক্ষে যাত্রী ছিলেন মাত্র আর একজন। একজন বৃদ্ধ সেতাব। তাঁর চোখে ধুলো দেবার প্রচেষ্টার কোনো সার্থকতা ছিল না। এই বিদেশে-বিভুঁইয়ে চিনছেই বা কাকে কে?

তরফদার তাকাচ্ছিলেন আড়-নয়নে অনুরাধাকেই। হাওয়া-পরিবর্তনে চমৎকার ফিরেছে চেহারাটা। নিটোল হয়েছে স্বাস্থ্য। লালচে-আভা ধরেছে গণ্ডস্থলে সিঁদুরে-আমের মতো। উপচে পড়ছে শ্রী। আকস্মিক দর্শনে মোহ জেগে যায়। পরনের আসমানী-শাড়ীটা বাড়িয়েছে সে-জৌলুস। এমনি রূপ আর যৌবনের পসরা নিয়ে যে-কোনো মুনির ধ্যান ভঙ্গ করে দেওয়া যায়। কপালের মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে লাল সিন্দুরের টিপ। লক্লক্ করছে যেন দেবী কালিকার লোল-রসনা অনুরাধার রক্তলাল সিঁদুর-পরা সীমন্তে, একটা বিরাট নিষেধের প্রাচীরের মতো। ভয়ে এগোনো যায় না কাছে।

পরবর্তী ষ্টেশনে সেতাব ভদ্রলোকটি নেমে গেলেন। আর কোনো যাত্রী উঠল না।

এতক্ষণ পরে অনুরাধা আনত-মস্তক তুললেন। গম্ভীরভাবেই বললেন আদেশের সুরে তরফদারকে,—এদিকে এসো।

তরফদার এগিয়ে এলেন,—কি?

যেন দূরত্ব বাঁচিয়েই বসলেন তরফদার অনুরাধার পাশে।

অনুরাধা সে-দূরত্ব কাটিয়ে দিলেন তরুকুমারের গায়ের কাছে সরে এসে। সেন্ট, প্রসাধন-দ্রব্য, চুলের সুগন্ধি তৈল, সর্বোপরি একটা পাগলকরা মেয়েলী-গন্ধ এসে লাগল তরুকুমারের শ্বাসযন্ত্রে। এমন বিজাতীয় গন্ধের মাঝে একটা মাদকতা আছে। সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে উপলব্ধি করলেন তরুকুমার সে-গন্ধ।

অনুরাধা অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,—ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন এতক্ষণ ?

—এমনি।

—এমনি ? তোমার পরিবর্তন হয়েছে দেখছি অনেক।

—কোথায় ? কেমন করে বুঝলে ?

—একটা ছাড়া-ছাড়া দূর-দূর ভাব পরিলক্ষ্য করছি আমি তোমার মাঝে। কেন, আমি কি কোনো অপরাধ করেছি ? আমার মাঝে কি তুমি এমন কিছু দেখেছ যার জন্যে দূরত্ব বাঁচিয়ে চলছ এত ? এইতো মাত্র অসুখ থেকে উঠেছি। কী করেছি আমি তোমার ! কেন এমন অবহেলা দিচ্ছ বলো তো ?— গলাটা ধরে এল অনুরাধার। একটা চাপা-কান্নার বেগ রোধ করতে চাইলেন যেন তিনি।

—আরে, কী পাগল ! কেমন করে, কখন অবহেলা করলাম তোমাকে !

—কেন, হাসপাতালের পর থেকেই তোমার এ-ভাবটা দেখা যাচ্ছে। মধুপুরে এলে না সঙ্গে। পরেও এলে না, এত লেখালেখি—এত অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও। আজ যদিও বা এলে, এসেই অমনি যাব-যাব শুরু করলে। [illegible] কী-সব বললে স্টেশনে ওয়েটিং-রুমে। ট্রেনে উঠেও দাঁড়িয়ে রইলে ওইখানে দরজার কাছে। এতসবের পরেও কি তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বলো যে তুমি তোমার সমস্ত আকর্ষণ তুলে নাওনি আমার ওপর থেকে ! কেন তুমি আমার এতখানি সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছ, বলো ত ? তোমার কাছে ফিরে আসার জন্যে কত তপস্যা করেছি দেবতার—কত মানত মেনেছি। কেন আজ তাকে এমন অকূলে ভাসিয়ে দিতে চাইছ ?— অনুরাধার আবেগ প্রশমিত হয় না কিছুতেই যেন।

তরুকুমার পরম মিনতির সুরেই বললেন,—এ তো আচ্ছা এক পাগল দেখছি। অমন করে ভুল বুঝো না, রাধা। বাইরের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্যেই আমার এই অভ্যাস সৃষ্টি করা। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তুমি। নইলে তোমার উদ্গ্রীবতা আছে, আমারও কি কম আছে কিছু। এতখানি করেছি—এতখানি মেনেছি যার জন্যে, তাকে অবহেলা আমি তো অন্ততঃ দিতে পারিনে।

—তুমি আর ছেড়ে যেয়ো না আমাকে।— অনুনয়ের স্বরে বললেন অনুরাধা। —তুমি যেদিন ছেড়ে যাবে, গলায়-দড়ি দিয়ে মরতে হবে আমায় সেদিন। তোমায় আর যেতে দেব না আমি আমার কাছ থেকে।

সত্যি, দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে রইলেন অনুরাধা তরুকুমারের দক্ষিণ-হস্তটি। এক্ষুনি বুঝি ছুটে পালিয়ে যাচ্ছেন তরুকুমার।

তরুকুমার ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন না সে-হাত। রমণী-হস্তের একটা উষ্ণ-স্পর্শ শিহরণ জাগাল তাঁর দেহে। বললেন,—না না, আর ছেড়ে যাব না তোমায়। জীবনের একটি দিনে যে-শপথ গ্রহণ করেছি, প্রাণান্তেও ভ্রষ্ট হব না আমি সে-ব্রত থেকে—এ আমার বিশ্বাস। তুমি কি সে-বিশ্বাস কর না ?

—কেন করব না ? নিশ্চয়ই করি। তবু, আমি যে দুর্বল, কোনো শক্তিই তো নেই আমার। তাই ভয় হয়।

—জেসিডি স্টেশন ছাড়াল। এর পরই তো বৈদ্যনাথধাম। অতঃপর ?

—বৈদ্যনাথদেবের মন্দির।

সুতরাং স্টেশনে নেমেই টাঙা ভাড়া করে বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলেন তারা।

ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের বিরাট নিদর্শন এই বৈদ্যনাথদেবের সুপ্রাচীন মন্দির। পর্বানুষ্ঠান না থাকলেও ভিড় আছে যাত্রীর—আগমন-নির্গমনের বিরাম নেই। পুণ্য-সঞ্চয়ের আশায় এসেছেন দূর-দূরান্তর দেশ থেকে। বোঝা যায়, মানুষের হৃদয়-দৌর্বল্যের অবসান ঘটেনি এখনো। আজো তাই দেবমন্দিরে ভিড় জমে যাত্রীদের ; দেবানুগ্রহে ভাগ্যান্তর-ঘটানোর মোহে।

অনুরাধা-তরুকুমারও স্থান করে নিলেন একপাশে দেবদর্শনের অভিলাষে। সভক্তি প্রণিপাত জানালেন উভয়ে। একটা পুরো দশটাকার নোট প্রণামী দিয়ে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে।

টাঙা ভাড়া করে বেরুলেন আবার দেওঘর শহরটি প্রদক্ষিণ করার জন্যে। নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা এবং নির্বিরোধ আনন্দে টহল দিয়ে বেড়ালেন ক্ষুদ্র শহরটি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দর্শনীয় বিশেষ কিছুই নেই। তবুও মন্দ লাগল না তাঁদের। একটুকরো সৌন্দর্য কোত্থেকে ছিটকে এসে পড়েছে যেন এই ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপরে।

অনুরাধা রুদ্ধনিঃশ্বাসে গিললেন যেন দেওঘর শহরটি। পাথরের পুতুল-খেলনা আর বিভিন্ন সামগ্রীতে ভরিয়ে ফেললেন অনুরাধা তাঁদের গাড়ী। মাঝখানে একফাঁকে একটা স্টুডিওতে ঢুকে যুগলে ফটো তুলে নিলেন একটা—দেওঘরের স্মৃতি। সঙ্গে সঙ্গেই 'ওয়াশ' করে দিয়ে দিল ফটো।

ঘুরে ঘুরে দেওঘরের সেই ঐতিহাসিক গির্জার কাছে এসে পৌঁছলেন তাঁরা। হিন্দুদের দেবমন্দির—তথা প্রখ্যাত তীর্থস্থানের পাশে খ্রীষ্টানদের পবিত্র উপাসনা-মন্দির। মন্দ নয়। তবে মুসলমানদের মসজিদও থাকা উচিত ছিল একটা। একেবারে 'কস্‌মোপলিটন' তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াত বৈদ্যনাথধাম। গির্জার চূড়া গগন স্পর্শ করে। 'টাওয়ারে' বিরাটকায় ঘড়ি। ঘাড় ব্যথা হয়ে যায় তাকাতে। কী সর্বনাশ! সাড়ে-চারটে! আসল জিনিসই যে দেখা হ'ল না এখনও। নন্দন-কানন—দেওঘরের অমরাবতী! একমাত্র আকর্ষণীয় ও লোভনীয় প্রদর্শনী দেওঘরের।

—কোচম্যান, নন্দন-কানন লে যানা জলদি!

—সাহাবকা মেহেরবানী। হুজুরের হুকুম তামিল করতেই তো আছি আমি।

নন্দন-কানন! ক্ষুদ্র টিলা হলেও উচ্চতায় কম নয় বড়। বেয়ে উঠতে শ্রমও বড় কম হয় না। মনোরম বৃক্ষ-সারি আছে—রয়েছে পুষ্পবিতান—সন্ন্যাসী আছেন—আশ্রমও আছে তাঁর। অতি মনোরম পরিবেশ। সত্যি নন্দন-কানন। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না আর। অনুরাধার দুঃখ হ'ল যে বাজে বাজে ঘুরে শুধু সময় নষ্ট করা হয়েছে। সেই থেকে এখানে এসে বসলেই অনেক আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যেত। অথচ এর জন্যে সময় বরাদ্দ সবচেয়ে কম। তাঁদের মতো অনেক যাত্রী—অনেক স্বাস্থ্যান্বেষীর ভীড় সেখানেও। সুন্দর জায়গা দেওঘর। নন্দন-কানন রূপ বর্ধন করেছে তার অনেকখানিই। হয়তো দেওঘরের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান—একমাত্র উপভোগ্য ও দর্শনীয় পীঠই এই নন্দন-কানন।

সূর্য অস্তমিতপ্রায়। পাহাড়ের ওপরে সূর্যাস্ত একটু বিলম্বেই হয় বুঝি। অস্তাচলোন্মুখ সূর্যের সোনালী রোদ এসে পড়েছে পত্রে-পত্রে বৃক্ষ-শাখায়। চমৎকার লাগল। বসলেন দুজনে পাশাপাশি বৃক্ষতলে; একটুখানি অন্ধকার কোণ খুঁজে। অনুরাধা আরো একটু গা-ঘেঁষে বসলেন তরফদারের। আবেশে নয়, ভয়ে। যদি পাহাড়-গড়িয়ে পড়ে যান। তরফদার একটু দূরত্ব বাঁচিয়েই বসবার চেষ্টা করলেন। অত নিবিড় হয়ে বসতে কেমন যেন লাগল।

অনুরাধা বলেই চললেন অনেক প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় কথা। সব তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনকে কেন্দ্র করে। যে-জিনিসটা সুন্দর লাগে চোখে সেটাই সংগ্রহ করে ঘর সাজাবার অভিলাষ জাগে তাঁর। —আচ্ছা, এমনি একটা টিলার ওপর ছোট্ট একটা বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ী, কেমন হয় বলো তো। ভারী চমৎকার—ভারী নিরিবিলি। বাইরের কোনো আবহাওয়াই কলুষিত করতে পারবে না আমাদের স্বচ্ছন্দ-জীবন।— বললেন অনুরাধা।

তরফদার প্রত্যুত্তরে বললেন,—তোমার কল্পনাটা অনেকাংশেই হয়ে এসেছে প্রায়। কিন্তু তা বাংলো-বাড়ী নয়। হওয়া উচিত ছিল কুটির—আশ্রম। তাকে ঘিরে থাকবে শ্যাম-দূর্বাদল আর পুষ্পবন, কদলীর ঝাড় আর দু'চারখানা আম-কাঁঠালের গাছ। হয়ত একটা বকুল কিংবা একটা চাঁপাগাছও। একটা সবৎসা গাভী। একটা দুগ্ধবতী ছাগী। অদূরের 'টাওয়ারে' ঘন্টায় ঘন্টায় সঙ্কেত দিয়ে যাবে সময়ের। আর কিছু চাব কি? কিন্তু, কন্ গড্‌স্ সেক্, কোনো প্রতিবেশী থাকবে না। তাহলে কিন্তু তিন দিনেই ঋষিকে আশ্রম ছেড়ে পালাতে হবে।

—ঠিক বলেছ। ভারী চমৎকার হবে। আমার ওসব আসে না। তোমার কবি-মন। তাই চট্ করে এই কাব্যময় পরিবেশটির কথাই মনে পড়ল। সে-রকম জায়গা একটা পাওয়া যায় না কোনোখানে?

—কেন যাবে না? এখানেই থাক না কেন। এও তো স্বর্গতুল্যই মনে হচ্ছে।

—জায়গাটা অবশ্য মনোরম অতীব। ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না মোটেই। কিন্তু তবু এখানে নয়। বড্ড ভীড় এখানে। আমি চাই এমন একটা পরিবেশ, যার আশেপাশে অনেকদূর পর্যন্ত লোকালয় থাকবে না। ঐ যে বললে প্রতিবেশী-বিবর্জিত?

—তা. হ'লে তো হিমালয়ের দিকেই যেতে হয়। সেখানেও অবশ্য আজকাল ভীড় বাড়ছে বলেই শোনা যাচ্ছে। তবু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে বার করা কঠিন হবে না।

—তবে তাই চলো, সেদিক-পানেই যাওয়া যাক।

—তাই চলো।...বাঃ, বসে আছ যে? ওঠো! যেতে হবে না?

—যেতে হবে বৈকি। তাই ব'লে এই মুহূর্তেই যে হিমালয়ের পথে পা বাড়াতে হবে তার কী মানে আছে?

—কী মুশকিল! মধুপুরের দিকে যেতে হবে তো।

এ-ট্রেন ফেল করলে কিন্তু এ-রাত্রে আর ফিরবার ট্রেন পাওয়া যাবে না।— ব'লে অন্ধকারের মাঝেও হাতঘড়িটা উল্টে-পাল্টে দেখার চেষ্টা করলেন তরফদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে।

কিন্তু তথাপি অনুরাধার উঠবার কোনো উৎসাহ পরিলক্ষিত হ'ল না। বললেন,—আমি আজ যাব না। সত্যি, এ-জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

—তবু তো যেতে হবে।

—চলে যাবার তেমন কোনো বাঁধা-ধরা আইন থাকে যদি, তবে চলো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলেন অনুরাধা। নন্দন-কানন থেকে বিদায়! সত্যি স্বর্গ থেকেই বিদায় নিলেন যেন তাঁরা। মন চায় না এমন মধুর পরিবেশ ছেড়ে যেতে।

রাস্তায় নেমে ঘড়ি দেখেই তো চক্ষুস্থির! সর্বনাশ! আর মাত্র পনেরো মিনিট সময়। তাড়াতাড়ি সামনে যে টাঙ্গাটা পাওয়া গেল তাতে চেপেই ছুটলেন স্টেশনের দিকে। কিন্তু স্টেশনে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই দেখলেন মধুপুরগামী ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। মাথায় বাজ পড়ল এবার! উপায়?

অতঃপর দুজনের সচকিত দৃষ্টি-বিনিময়।

অনুরাধা বললেন,—আমি কিছুই জানিনে বাপু।

—তা তো জানবেই না। নন্দন-কাননের হাওয়া গেলো-গে আর একটু, তারপর গাড়ী পাওয়া যাবে ভূরি ভূরি!

—সত্যি, কী করা যাবে? ওদিকে খোকাও হা-করে বসে থাকবে আমাদের জন্তে।

—চলো, ট্যাক্সি করে যেসিডি পর্যন্ত যাওয়া যাক। সেখান থেকে কোনো গাড়ী হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে দ্রুত চালিয়ে এসেও সফল হ'ল না। প্যাসেঞ্জার-গাড়ীটা কিছুক্ষণ হ'ল স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেছে। রাত বারোটায় যে-গাড়ী আসবে তা মধুপুরে থামবে না।

এবার আবার দুজনের বিচলিত হবার পালা। কী উপায় করা যায়। তরফদার বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন,—এইজন্তেই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—'পথি নারী বিবর্জিতা'।

অনুরাধা বললেন,—চলো, দেওঘরেই ফিরে যাওয়া যাক ট্যাক্সিতে। হোটেল-কোটেল তো মিলবে—নিদেনপক্ষে ধর্মশালা তো রয়েইছে। একরাত্রের মতো ব্যবস্থা কোনো-রকমে হয়ে যাবে।

—তাই করতে হবে। এমনিভাবে রাস্তায় রাস্তায় তো আর ঘুরে মরা যাবে না।

দেওঘরেই তাঁরা চললেন। হোটেল-মালিক একজনের সঙ্গে সুপরিচয় আছে তরফদারের। এদিকে আসলে, প্রায়ই উঠতেন সে-হোটেলে। পুরোনো পরিচয়ের একটা সুবিধে আছেই।

সেই পুরাতন পরিচিত হোটেলেই উঠলেন। মালিক দেখেই চিনতে পারলেন তরফদারকে। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। বাংলাও কিছু কিছু শিখেছেন। তরফদারকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন,—আরে, তোরোফদারবাবু যে? ক্যা বাত্, ক্যা বাত্? বহুত মেহেরবানী আপ্‌কো! গোরীব কো ভুলেননি দেখছি। আরে, আরে! বোসুন, বোসুন মাঈজি, বোসুন তোরোফদারবাবু। চা পিয়ে গা? বহুৎ হিম-ভি গিরা বহুত-জায়দা। তারপর কী খোবোর বোলুন। কী মোনে কোরে হঠাৎ! বহুত রোজ পর আয়া কিন্তু এবার। শাদী কিয়া কব্?…আরে, আপলোককো রহেনে কো বন্দোবস্তকে লিয়ে ঘাবড়ানে কা কোই বাত্ নেহি। হাপনার লিয়ে তো কোনো কোথা নাই। ও তো আমাকেই কোরতে হোবে।…

আপ্যায়নের ত্রুটি করলেন না হোটেল-ওয়ালা। আগের আগের বারে যখন এসেছিলেন বেশ মোটা পয়সাই কামিয়েছিলেন। এবারও টাকায় অঙ্কটা মন্দ হবে না—বিশেষ করে যখন সস্ত্রীক। অর্থের জন্তেই তো এ-ব্যবসা।

—খানা হোবে তো? চাউল, না রোটি?…হি হি বাঙ্গালী, উসব কুছ্ বোলতে হোবে না হামকো। কেবিনি বহেনেকে ভি সোব বন্দোবস্ত হায় কিয়া। আপাত্তি ছিলো না। হামনে বিলকুল-আপটুডেট কোরিয়া। বহুত কিছিম কা খদ্দের আতা থা তো। আপ্‌লোক কো কোই অসুবিধা হোবে না।…এতো রাত কোরলেন কেনো?… আভি আয়া? না, গিয়া রহা কাঁহাসে।…ই বাত্? বহুত হয়রানি কা বাত্ তো?…হি হি, সোব ঠিক হোয়ে যাবে, কুছ বোলতে হোবে না।…

সত্যি কোনো অসুবিধে হয়নি। সমস্ত ব্যবস্থাই পরিপাটি। হোটেল-মালিকের বিবেচনায় অবশ্য ত্রুটি নেই। জাজিম-পাতা পালঙ্কের ওপর লেপ-তোশক সজ্জিত, ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা, দুটো ধোয়া-ওয়াড়-লাগানো বালিশ। নেটের মশারিও খাটানো। যেন নব-পরিণীত

বরকনের ফুলশয্যার রাত্রির ব্যবস্থা। স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে এর চেয়ে অধিক কী আর প্রয়োজন।

বাইরে রূপটা যাই দাঁড়াক না কেন, আসলে কিন্তু সত্যকে দলিয়ে যাবার সাহস অনেকেরই থাকে না। তাই তরফদার আজিমের ওপর থেকে তোশকটি টেনে নিয়ে পাতলেন মেঝের ওপর। কাশ্মিরী শালটা গায়ে জড়িয়ে ফাঁকি দেওয়া যাবে'খন একরাতের মতো শীতটাকে।

কিন্তু অতঃপর অনুরাধার মুখমণ্ডল কালো মেঘের আকার ধারণ করল। চোখ-দুটোতে তীব্র বিদ্যুচ্ছটা। সে-অগ্নিদৃষ্টি দিয়ে এক্ষুনি দগ্ধ করে ফেলবেন যেন তরফদারকে। মুখে বললেন না কিছুই। সব কথাই কি মুখে ফুটে বলতে হয়? তরফদার কি বোঝেন না অগ্নির লেলিহান শিখার ভাষা কী! তিনি বুঝেও বুঝলেন না সে-ভাষা। অনুরাধাকে ওপরে শুয়ে পড়তে ব'লে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি ভূমিশয্যায়।

কিন্তু শুয়ে পড়লে কী হবে! নিদ্রা কোথায়! এহেন উদ্ভট অবস্থায় পড়েছেন কি তরফদার জীবনে কখনো? একজন যুবতী রমণীর সাথে একই সঙ্গে একই প্রকোষ্ঠে রাত্রিবাস! জীবনে এই প্রথম। তাইতো নিদ্রা নেই চোখে। মনে যে কতো বিচিত্র ভাবের উদয় হচ্ছে সীমা নেই তার।

অনুরাধার অবস্থাও তাই। এপাশ-ওপাশ করছেন বিছানায়। বুঝা যায় তাঁর মনেও অশেষ চাঞ্চল্যের ভিড়। এত কাছে এসেও এত দূরে সরে থাকার সার্থকতা কী? ভাবছেন নিশ্চয়ই যে, এমন দূরত্ব বাঁচিয়েই চলবেন যিনি, তাঁর সাথে ঘর-ছাড়ার মানে কী?

রাত তখন কত কে জানে। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে পৃথিবী। অদূরে কুঞ্জশিরে কোনো বিহগ যেন নীড় রচনা করেছে। অকস্মাৎ পাখা ঝাপটিয়ে উঠল।

অনুরাধা সন্তর্পণে নেমে এলেন তরফদারের শয্যায়। হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, তরফদারের চোখেও নিদ্রা নেই। অনুরাধা বসলেন শয্যা'পরে তরফদারের গা ঘেঁষে। একটি অস্পষ্ট চাপা রোদন-ধ্বনির রেশ শোনা যায়। যেন কারো বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে একটা মর্মান্তিক বেদনায়। যেন তাকে প্রকাশ করার উপায় নেই।.. দুর্দম প্রচেষ্টায়ও সে চাপা-বেদনার বেগ রোধ করা যাচ্ছে না। তরফদার অনুভব করছেন পার্শ্বোপবিষ্টার কান্নাধ্বনিত ক্ষীণ কম্পন। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অনুরাধা তরফদারের বুকের ওপর প্রবল আবেগে। বললেন কান্নাজড়িত কণ্ঠে,—এমন করে দূরে দূরে সরে সরে থাকার জন্যেই কি এই সুদীর্ঘ-দিন ধরে কঠোর সাধনা করলাম! বলো, বলো না। চুপ করে রইলে কেন?— সত্যি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন অনুরাধা এবং কাঁদতেই লাগলেন তিনি তরফদারের সুবিস্তৃত বক্ষের মাঝে মুখ লুকিয়ে।

সত্যি তো এমন দূরে দূরে সরে সরে থেকে উভয়ের মাঝে মহাসমুদ্রের ব্যবধান রচনার জন্যে তাঁরা এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসেননি। তরফদারের মুখ দিয়ে কোনো বাক্যই নিঃসরিত হ'ল না। কী বলতে পারতেন তিনি। তিনিও কি সান্নিধ্য-কামনায় পাগল হয়ে ওঠেননি! ভাষা ছিল না তাঁর। ছিল শুধু দাহ, শুধু বেদনা। তবু প্রকাশ ছিল না। তরফদার আঙুল বুলিয়ে চললেন ক্রন্দনাকুল অনুরাধার মস্তকের কুন্তলপুঞ্জে পরম স্নেহে ও ভালবাসায়।

তরফদার পরম স্নেহভরে ডাকলেন,—অনু!

—কি?

—চলো আমরা চলে যাই এখান থেকে কোনোদিকে, সমুদ্র পার হয়ে দূর-বিদেশে, যেখানে আমাদিগকে চিনতে পারবে না কেউ। যেখানে কোনো সমাজ আসবে না আমাদিগকে চোখ রাঙিয়ে, কোনো নীতিশাস্ত্র তর্জনী উঁচিয়ে এগিয়ে আসবে না আমাদের দিকে। সেখানে আমরা শুধু মানুষ, আমাদের রক্ত-মাংস নিয়ে, আমাদের সমস্ত হৃদয়াবেগ নিয়ে।

—তাই চলো!— অনুরাধার মস্তক তেমনিভাবে ন্যস্ত তরফদারের বক্ষোপরে নিশ্চিন্ত নির্ভরে। —এই নিষ্ঠুর ব্যবধান আমার আর সহ্য হয় না। চলো, নতুন কোনো দেশে, বনে কিংবা জঙ্গলে, কিংবা কোন পর্বত-গুহায়, যেখানে নবীন-উদ্যমে রচনা করব আমাদের পর্ণকুটীর। সেই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গ!...

ভোরের আলো এসে ঢুকল তাঁদের কক্ষে পূবের জানলার ফাঁক দিয়ে। পাখীরা সমস্বরে ঘোষণা করল রাত্রি-ভোরের বারতা। একটা পুরো রাত তাঁরা জেগেই কাটিয়ে দিলেন। ভোরের স্নিগ্ধ আলোকের মাঝে যেন একটা প্রচ্ছন্ন নবজীবনের ইশারা দেখতে পেলেন তাঁরা। সংযুক্ত করে প্রণাম করলেন তাঁরা দুজনে পূবদিকের উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে। দুজনেই গ্রহণ করলেন সমারব্ধ নবজীবনের সংকল্প।

প্রথম ট্রেনেই ফিরলেন তাঁরা মধুপুরে। ঠিক হ'ল, অনুরাধা দু'চারদিন আরো থাকবেন মধুপুরে। তরফদার দুপুরের গাড়ীতেই কলকাতা ফিরে যাবেন। এবং ন্যূনাধিক সপ্তাহকালের মধ্যেই তিনি সমস্ত ব্যবস্থাদি সমাধা করে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরবেন দুজনে—লণ্ডন, নিউইয়র্ক, অস্ট্রেলিয়া কিংবা আফ্রিকার পথে। অনুরাধার কিন্তু মধুপুরে ফিরবারও ইচ্ছে ছিল না। এদিক থেকে পাড়ি দিতে পারলেই যেন বেঁচে যান।

মধুপুর স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটেই তাঁরা বাড়ী পর্যন্ত এলেন। শালবাগানের বড় মোড়টা ঘুরতেই বাড়ীটা দেখা গেল। নজরে পড়ল রত্নাকে। অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন তাঁদের আগমন-পথের দিকে। অনুরাধা দেখেই বললেন,—রত্না কিন্তু প্রস্তুত হয়ে আছে। খুব একচোট নেবে আজকে আমাদের।

তরফদার সায় দিলেন। সত্যি, রত্নার একচোট নেবার অধিকার আছে, যুক্তিও আছে। বাড়ীর আঙিনায় পদার্পণের সাথে সাথেই রত্না এগিয়ে এসে বলে উঠলেন স্মিত হাসিমুখে,—খুব 'হনিমুন'ই করলেন মশাই আপনারা, আমি তো ভাবলাম—ওদিক দিয়েই হাওয়া হয়ে গেলেন বুঝি।

ঘরে এসে বসতে বসতে বললেন তরফদার,—তা কি করে হয়, আপনাকে যে জিম্মে বলে উৎকণ্ঠায় রেখে গেছি এখানে।

—আহা, মরি মরি! কী দরদী যে আমার! আমার উৎকণ্ঠায় চিন্তায় আপনাদের ঘুম হয়নি কিনা কাল রাত্রে! তার প্রমাণ, কাল ফিরবেন বলেও ফিরলেন না।

—বিশ্বাস করুন, একফোঁটা ঘুমও হয়নি কাল সমস্তটা রাত্রে। চেহারা দেখে অনুমান করতে পারছেন নিশ্চয়!—ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি টানবার চেষ্টা করলেন তরফদার।

রত্নাও হাস্যভরে বললেন,—তা আর পারছিনে! এসব দেখে-দেখে চোখ ব্যথা হয়ে গেল আমার। রসে টইটম্বুর আপনারা, দু-এক রাত অনিদ্রায় কেটে গেলে টেরটিও পাওয়া যাবে না। সে-পুলকের-রাত-জাগা আমার জন্যে দুশ্চিন্তার নিদর্শন বলে ধরে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হবার কোনো হেতু আছে কি আমার? এদিকে আমি গরীব বেচারী সারা রাত ঘুমুতে পারিনি একবিন্দুও আপনাদের জন্যে ভেবে-ভেবে।

—সত্যিই খুব দুঃখিত তার জন্যে। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কী করব, ট্রেনটা ফেল করে ফেললাম।

—প্রেমে ডুবলে পাশ করা যায় না, ফেল-ই করতে হয়। ট্রেন যে ফেল করবেন সে তো 'হনিমুন'-পরিকল্পনাতেই প্রচ্ছন্ন ছিল।

—কেমন করে?

—যেমন করে জলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি হলে ঘৃতে আর সন্ধান পাওয়া যায় না। দুটোতে মিলে তীব্রতা আগুনেরই হয় শুধু।

—পরিষ্কার হ'ল না।

—পরিষ্কার হবার কোনো লক্ষণও নেই। সত্যি, প্রে পড়লে মানুষগুলো কেমন বোকা হয়ে যায়।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আপনাদের অনুরাগের জলন্ত আগুনে উভয়ে মিলনের ঘৃতাহুতি ঘটেছে। আগুন তাই জলছে। তা মাটির পৃথিবী মিথ্যে হয়ে গেছে। আমরা তো কোন্ ছার তবু ভাগ্যি যে ফিরে এসেছেন, মাটির পৃথ্বীর কথা একেবা ভুলে যাননি।

রত্না ক্রমেই মুখরা হয়ে উঠছেন। আরো তীব্রত কটাক্ষপাতও আশঙ্কা করা যায়। অনুরাধা বোধ কা সে-আশঙ্কায়ই উঠে পালালেন। —যাই, চা-টা বানি নিয়ে আসি।

রত্না তাঁর পলায়নের হেতুটা অনুমান করেই বললেন,—ওঃ, তেনার আবার লজ্জা হচ্ছে! নাচতে নেমেছেন, তা আবার ঘোমটার টান।

অনুরাধা তখন অন্তর্হিতা।

রত্নাই আবার কথা বললেন,—এবারে যথাবিহি ব্যবস্থা করে ফেলুন। আমারও ছুটি হয়ে যায় আপনাদিগকে পাহারা দিয়ে দিয়েই কি কাটা জীবনটা?

অনুরাধা চায়ের ট্রে হাতে ঢুকলেন। এবং পর উল্লাসেই পরিবেশন করতে লাগলেন নীরবে।

অনুরাধাকে উদ্দেশ করেই বললেন রত্না,—কী মুখশ্রুতি, রা নেই যে মুখে! গতরাত্রের রসাবাদে রোমন্থন হচ্ছে বুঝি?

অনুরাধা শুধু একটু সলজ্জ মুচকি হাসি হাসলেন কোনো উত্তর দিলেন না।

রত্নাই পুনর্বার বললেন,—ক্ষণিকের মোহকে এবা চিরকালের সম্বন্ধে পরিণত করতে হবে যে। শুধু চে চেখে তো আর জীবন কাটবে না। কি বলেন মশায়?—তরফদারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন।

—তা তো বটেই। চাতকের পিপাসা নিয়ে কতকাল আর হা-হুতাশ করব?— বললেন তরফদার।

—তবে? গোপালঠাকুর এবার শালুক চিনেছেন দেখছি।

অনুরাধা রত্নার কথার সুরানুসরণ করেই বললেন,—তুই তো দেখছি আমাদের সংস্রব কাটাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিস। ব্যাপার কী বল্ তো?

—কেন আবার? তোমাদের অবৈধ সম্পর্ককে আজীবনই কি আমার সমাজের চোখে আড়াল করে বেঁচে থাকতে হবে?

এ-কথার উত্তর দিলেন তরফদার,—না, রত্নাদেবি, আর বেশীদিন পাহারা দিতে হবে না। এবার সত্যি ছুটি হবে আপনার। এই বড়জোর সপ্তাহেক, এর বেশী নয়। এর মধ্যেই পাড়ি দিচ্ছি দেশান্তরে—একেবারে আপনাদের সমাজদৃষ্টির বহুদূরে। অবশ্য একলা নয়, যুগলে। সত্যি, কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের ভাষা নেই আপনার নিঃস্বার্থ দানের। পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তুর সৃষ্টি হয়নি যা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ করা যায়। জীবনের কোনো স্তরেই ভুলতে পারব না যে আপনি আমাদের একান্ত আত্মীয়—দুর্দিনের বান্ধবী! আমরা চলে যাব পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে। সত্যি সুখী হতেম যদি আপনারও এই নিষ্ঠুর একাকীত্বের অবসান দেখে যেতে পারতেম।

—সন্ন্যাসিনীরা একাকিনীই থাকে, বরেনবাবু। তার জন্যে দুঃখ কি? ঘর বাঁধার প্রয়োজন যাদের—ঘর তারা বেঁধেছে, বাঁধবেও। কিন্তু ঘর যাদেরকে কাছে টানে না, বরং দূরেই ঠেলে দেয়, তাদের সে-বিলাসিতা কেন? অনুরাধা প্রতিষ্ঠিত হোক তার শান্তির সাম্রাজ্যে, সুখী হোন আপনারা, এর বেশী কাম্য নেই আমার।

দুপুরের গাড়ীতে রওনা হলেন তরফদার কলকাতায়। অনুরাধার উৎকণ্ঠা এবং রত্নার তৃতীয় জিজ্ঞাসা নিরসন করলেন এক সপ্তাহের মধ্যে, সমস্ত ব্যবস্থা সুপরিপাটি করে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

কলকাতায় এসে তরফদার মুহূর্তের ফুরসত-ও পেলেন না বিশ্রামের। ব্যাঙ্কের টাকা তোলা, অ্যাকাউন্টস্ ট্রান্সফার, ট্রাভেলার্স চেক্ ইত্যাদিতে তিন দিন কেটে গেল। একদিন গেল তাঁর নিজের ও অনুরাধার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সম্ভারে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাতে কেটে গেল আরেক দিন। আর মাত্র দুটো দিন হাতে। মাকে এ-সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়নি এখনও। তাতে কী ব্যাপার বাধবে কে জানে।

যথারীতি মাকেও তাঁর বিদেশ-যাত্রার কৃতসংকল্প জ্ঞাপন করলেন। ব্যাপার সত্যি বাধল। বৃদ্ধা তাঁর শেষ-অবলম্বনও হারালেন। অনুনয় করলেন—কান্নাকাটি করলেন অনেক। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নেই তরফদারের। চোখে রঙ লেগেছে তাঁর—আহ্বান এসেছে ঘর-ছাড়ার। অগত্যা কাশীই যাত্রা করতে হ'ল,—গর্ভধারিণী শেষ-নিঃশ্বাস কাশী-ধামেই ত্যাগ করার বাসনা জানিয়েছেন।

আদ্যোপান্ত ঘটনা জানিয়ে চিঠি লিখে দিলেন মধুপুরে—দিন চার-পাঁচ আরো বিলম্ব হবে তাঁর।

দশ

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন তরফদার কাশী থেকে এবং সে-রাত্রের গাড়ীতেই রওনা দিলেন মধুপুরের দিকে। তাঁর কাছে আজ সমস্ত পৃথিবীই সুন্দর। মনে হ'ল, শুধু তিনি আছেন, হয়ত অনুরাধাও আছেন ব'লে, বিশ্বপ্রকৃতিও আজ কলঙ্কহীন সৌন্দর্যে ভরা। অনুভব করলেন প্রকৃতির অন্তহীন রূপবিন্দুগুলো এক-একটা বিরাট ঐক্যের অঙ্গ,—একটা বিরাট ঐকতানের টুকরো-টুকরো সুর। সেই সুমধুর সুর দোলা দেয় মনকে, পুলকিত করে অন্তরকে একটা সুনিশ্চিত সম্ভাবনার আনন্দে। বিশ্বের সমস্ত দুয়ার আজ খুলে যাবে তাঁর পিপাসিত নয়ন-সম্মুখে। পশ্চাতের জগৎ সবই মিথ্যা। নিঃশেষে ভেসে যাবে সে-জগৎ আগামীর আনন্দ ও শান্তির বন্যার মাঝে। সেই নবজাগ্রত জগতে প্রথম পুরুষ ও নারীর আবির্ভাব হবে,—আদম আর ঈভের,—তরফদার আর অনুরাধার। এই সম্মিলিত জীবনের অপূর্ব জ্যোতিশ্ছটায় ঝরে পড়বে স্বর্গের দ্যুতি। নতুন-বিশ্বের জন্মলাভ হবে সেদিন নতুনতর আদর্শে, নবীনতর সূর্যরেখায়। সে-বিশ্বে জরা নেই, মৃত্যু নেই, বিচ্ছেদ-বিরহ নেই, দুঃখ নেই, বেদনা নেই। শুধু অফুরন্ত প্রাণের ভাণ্ডার।

মধুপুর-স্টেশনে সাঁওতাল কুলীগুলি সেদিন বেশ মোটা পয়সাই কামালো। গোটা বিশেক বিভিন্ন আকার-বর্ণের ট্রাঙ্ক-স্যুটকেস-বাক্স-বেডিং-এ ভরে গেল মধুপুরের বাড়ীটা। একটা গোটা সংসার টেনে নিয়ে চলেছেন তরফদার তাঁর লেজে বেঁধে।

কিন্তু বাড়ীর আঙিনায় পদক্ষেপের সাথে সাথে কেমন

যেন এক অজানা শঙ্কায় কেঁপে উঠল তাঁর বুকটা। অনুভব করলেন এক মহাশ্মশানের রিক্ততা। একজন কারো প্রাণবায়ু-নিঃশেষান্তে বাড়ীময় যে একটা হারানোর ব্যথার সুর বেজে ওঠে, সে-সুর যেন শুনতে পেলেন তরফদার পরম বেদনায়। ঐক্য-সংগীতের গভীর সুরের তলদেশে কোনোখানে একখানি তার যেন বেসুরো বাজছে। অতি করুণ ও বিসদৃশভাবে যা বাজল তা তাঁর শ্রবণপথে। তাঁরই আগমনক্ষণে যাঁদের পূর্বাহ্নেই অভিনন্দনের মাল্যহাতে উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকবার কথা, তাঁরা কোথায়? এই শুভাগমনে কোনো উচ্ছ্বাস, বিন্দুতম আনন্দও সৃষ্টি করল না একজনেরও। কিন্তু কেন? এ-ত্রুটি সামান্য হ'লেও, বিরাটাকারে আঘাত হানল তাঁর বক্ষে। অথচ সারা ট্রেনে আসতে আসতে স্বপ্নলীন কত কল্পনার জাল বুনেছেন তরফদার!

প্রত্যাশিত সময়ের অনেক পরেই এলেন রত্না চিন্তাকুল বিমর্ষ মূর্তিতে। তাঁর পশ্চাতে পাগলিনীর বেশে অনুরাধা, ততোধিক চিন্তাক্লিষ্টা, অধিকতর মলিন ও বিমর্ষ মুখমণ্ডল। উভয়েই যেন কোনো মরণোন্মুখ রোগীর পরিচর্যায় নৈশ-জাগরণ করেছেন বিগত কয়েক রাত্রি ধরে। চেহারায় কোনোখানে বিন্দুমাত্র শ্রীও আর অবশিষ্ট নেই।

ফ্যাকাশে মুখাবয়বের মাঝে কষ্টেও-হাসি-টানা-যায়-না এমনিভাবে এগিয়ে এসে রত্না অভিনন্দন জানালেন,—আসুন, আসুন। কিন্তু কত দেরি করে এলেন!— কথাটার রয়েছে এমন এক ভাবের ব্যঞ্জনা যাতে সুস্পষ্টভাবেই মনে হয়, বিলম্ব করে আসায় যেন একটা বিরাট সর্বনাশ ঘটে গেছে।

অনুরাধা কোনো কথাই বললেন না।

গৃহের অভ্যন্তর পর্যন্তও যেন এগুতে পারবেন না তরফদার। পা-দুটো কাঁপছে। এইমাত্র যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে। তার আলোড়ন স্তব্ধ হয়নি এখনও। একটা-কিছুর আশ্রয়ে বসতে পেরে যেন বেঁচে গেলেন তিনি। সারারাত ট্রেন জার্নিতে যে ক্লান্তি অনুভূত হয়নি অপরিসীম প্রাণচাঞ্চল্যে, সে-ক্লান্তি যেন দ্বিগুণতর হ'ল এই গুমোট পারিপার্শ্বিকতায়। ক্লান্তস্বরে বললেন,—আমার আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। মাকে যে কাশীধামে রেখে আসতে হ'ল। সে-কথা তো চিঠি লিখে জানিয়েছি আপনাদিগকে।

—সে-কথাই তো বলছি। অথচ পূর্ব-ব্যবস্থানুযায়ী সপ্তাহেকের মধ্যে এলে এমন অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হ'ত না!— বললেন রত্না হতাশভাবে।

এতক্ষণ যে সর্বনাশের আশঙ্কায় মনটা ভীত-চকিত হয়েছিল এখন যেন তার মূলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বক্ষের যে-উদ্বেলতাকে নানান্ মানসিক প্রবৃত্তি দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিলেন তরফদার, এখন বুঝি আর তা রক্ষা করা যায় না। বিচলিতের মতোই জিজ্ঞেস করলেন,—কী অবস্থার কথা বলছেন?

—বলছি। দাঁড়ান, চা-টা নিয়ে আসি। চায়ের উত্তাপে জার্নির ক্লান্তি কিছু কমবে বলেই আশা করা যায়।

—জার্নির ক্লান্তির চেয়ে, আপনাদের চেহারা দেখে এবং কথা শুনে অনেক বেশী ক্লান্তিই অনুভব করছি যেন। আসল রহস্যটা উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত মানসিক উদ্বেগের মাঝে কিছু কি রুচবে মুখে?

—রুচবে না কেন? দেরি হবে না। তৈরিই আছে সব। আপনি আসছেন আজ তা তো জানি।

রত্না অন্তর্হিতা হয়ে গেলেন।

অনুরাধা নিশ্চুপ বসেই ছিলেন আনতাননে। কোনো বাক্যব্যয় করেননি এপর্যন্ত। এখনও কোনো কথা বললেন না রত্নার অনুপস্থিতিতেও। তাতে তরফদারের বিস্ময় এবং আতঙ্ক বেড়ে গেল আরো। জিজ্ঞেস করলেন,—তোমাদের ভাব-ভঙ্গী-চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কোনো একটা বিরাট দুর্ঘটনাই ঘটে গেছে। কী হয়েছে বলো তো?

অনুরাধার বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। শুধু টপ্‌টপ্ করে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তাঁর সংযুক্ত হস্তদ্বয়ের ওপর। সে-ভাব গোপন করার জন্যেই হয়ত তিনি ড্রয়িংরূমের গৃহনিক্রান্ত হয়ে গেলেন। পরিস্থিতিটা আরো রহস্যজনক হয়ে উঠল তরফদারের কাছে। ঊর্ধ্বে আকাশ এবং নিম্নে পাতাল পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রত্না-বর্ণিত 'এমন অবস্থা'র কোনো কূলকিনারা খুঁজে পেলেন না। মনটা ক্রমেই সন্ত্রস্ত ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল তাঁর।

চা আর খাবারের ট্রে হাতে ঢুকলেন রত্না। অনুরাধা তাঁর পশ্চাতে। তিনজনের সামনেই পরিবেশিত হ'ল প্রাতরাশ।

ধীর শান্ত ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন তরফদার,—কী এমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে বলুন তো? আপনাদের চেহারা দেখে তো রীতিমতো ভীতির কারণ ঘটেছে বলেই মনে হয়। মনে হয়, কোনো প্রেতলোকের স্পর্শ লেগেছে আপনাদের গায়ে।

—ঠিক তাই। প্রেতলোকের স্পর্শ ই লেগেছে!— বললেন রত্না।

অনুরাধা সেই যে চুপ করে বসে ছিলেন, বসেই রইলেন অবনত মস্তকে, নির্বাক। যেন বাক্‌শক্তি নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়েছে তাঁর। খাবারাদিও স্পর্শ করলেন না। চায়ের কাপ থেকে শেষ ধূমও উদ্গীর্ণ হয়ে এখন শীতল জলে পরিণত হয়ে রইল। নিস্তাপ চায়ের পেয়ালার মতো উত্তাপহীনা বসে রইলেন অনুরাধা।

রত্না উদ্বেগপূর্ণ ঘটনাটা বিবৃত করলেন: অনুরাধার স্বামী এসেছেন রেঙ্গুন থেকে। তিনি এখন প্রকৃত অর্থের অধিকারী। রেঙ্গুন শহরে বাড়ী করেছেন, গাড়ী করেছেন, এবং জায়গা-জমিও বেশ কিছু করেছেন। এসেছিলেন দেশের বাড়ীতে। সেখান থেকে কলকাতায়। কলকাতা থেকে এই মধুপুরে—স্ত্রী-সকাশে। এক কথায়, বিল্বমঙ্গলের মতো প্রভূত কষ্ট ও অধ্যবসায় ব্যয় করেছেন প্রিয়া-মিলনের জন্যে। তাঁর প্রাক্তন জীবন ও আচরণের জন্যে তিনি আন্তরিক অনুতপ্ত। অতীত-জীবনে যে কলঙ্কময় ঘটনাটা ঘটেছে, সেখান থেকেই তাঁর জীবনের চূড়ান্ত শিক্ষা হয়েছে এবং সেখান থেকেই ভিন্নতর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর জীবনের গতি। তিনি মদ্য আর স্পর্শও করেন না এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বদ-খেয়ালগুলোও তিনি পুরোমাত্রায় বর্জন করেছেন। অর্থাৎ তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে এখন। পরিপূর্ণ মানুষ হবার প্রচেষ্টায় তিনি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেছেন, যাতে অনুরাধার বীতরাগ এবং বীতশ্রদ্ধার কারণগুলো সম্যক্‌রূপে অপসৃত হয়। অর্থাৎ অনুরাধার কাছে আদর্শ, লোভনীয় ও আকর্ষণীয় স্বামী হিসেবে পরিগণিত হবার সাধনাই তিনি এই দীর্ঘকাল ধরে করেছেন। অনুরাধাকে তিনি ভালবাসেন—যে-ভালবাসার কোনো ফাঁকি নেই। অনুরাধার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের নিমিত্তই তিনি বিগত অনেকমাস ধরে প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁর অর্থ এবং প্রতিপত্তি উভয়ই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এ-সমস্তই অনুরাধাকে কেন্দ্র করে। আত্মসুখবিধানের বৃত্তি প্রবলতর থাকলে তার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করতে পারতেন। একমাত্র অনুরাধার জন্যেই তাঁর কর্মনিঃস্থানে ছুটোছুটি করা। অনুরাধা-বিহনে তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে—এ তিনি উপলব্ধি করেছেন। আজ অনুরাধাকে তাঁর বিরাট ঐশ্বর্য-সাম্রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই তিনি ফিরে এসেছেন। ইত্যাদি।

প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে যেন একরাশ বারিপাত হ'ল। তরফদারের সমস্ত উত্তাপ মুহূর্তে নির্বাপিত হয়ে গেল। এক অদৃশ্য-হস্ত যেন অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁর এতকালের সাজানো বাগানটি মুড়িয়ে দিয়ে গেল। ধমনীর রক্তপ্রবাহ থমকে দাঁড়াল তরফদারের। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেল একনিমেষে। মনে হ'ল যেন তিনি ঢলে পড়ে যাবেন আসন থেকে। দেহে একবিন্দু শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট নেই। অনেক চেষ্টায়ও বাক্যোচ্চারণ করার শক্তি সংগৃহীত হ'ল না কিয়ৎক্ষণ পর্যন্ত।

এ-ভাব কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল তরফদারের। হবে না? তাঁর গগনচুম্বী স্বপ্নসৌধ যে সমূলে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই মর্মদাহী বেদনা রোধ করলেন এক অভিনব উপায়ে। প্রবলস্বরে 'হো হো' করে হেসে উঠলেন তরফদার পাগলের মতো এবং সে-হাসির শব্দের মধ্য দিয়েই বললেন —এই কথা? হো-হো-হো! সে তো সুখের কথা, রত্নাদেবি। অনুরাধা প্রতিষ্ঠিত হবে তার ভেঙে-যাওয়া সংসারে—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে!

তরফদারের এই উন্মাদ-আচরণে রত্না-অনুরাধা নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হয়েছিলেন। কথার শেষের দিকে কণ্ঠের করুণ সুরটাও ধরা পড়ে গিয়ে থাকবে তাঁদের কাছে। হয়ত এ-ও লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর চোখের কোণ-দুটিও অশ্রুজলে ভিজে উঠেছিল অন্তরের সুতীব্র দাহন-বেদনায় রুদ্ধ কান্নায়। তাই তাঁর কথায় প্রত্যুত্তর এলো একটু বিলম্বে।

তরফদারের বাক্যের সুর ধরেই বললেন রত্না,—সুখের কথা? তা বটে। কিন্তু সেই থেকে অনুরাধার নয়নে নেই নিদ্রা—উদরে নেই অন্ন। দেখুন না, কী রকম পাগলিনীর মতো হয়ে গেছে বেশভূষা-চেহারায়। আর সেই চিন্তায় আমিও পাগল হয়ে উঠেছি।

অনুরাধা প্রকৃতিস্থতা অর্জনের নিমিত্তই হয়ত উঠে বাইরে চলে গেলেন।

তরফদারও আয়ত্ত করে নিয়েছেন প্রকৃতিস্থতা পরিপূর্ণভাবে। অতি স্বাভাবিক-কণ্ঠেই বললেন—হ্যাঁ, তা দেখছি বটে। কিন্তু তাতে এমন পাগল হয়ে ওঠার কী হেতু আছে?

—হেতু নেই? বলেন কি!...তা হয় না। অনুরাধা চূড়ান্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ঐ বর্বর স্বামীর ঘর সে করবে না। আমার ইচ্ছেও তাই। তা তিনি মুখে যতই সাধুর বুলি আওড়ান না কেন। অবশ্য তিনি সজ্জন হয়ে ওঠেননি বলেও বলতে চাইনে আমি।

—তবে আর আপত্তি কিসের?

—আপত্তি? কেন, আপনি নিজেকে দিয়ে সে-কারণ উপলব্ধি করতে পারছেন না?

—পারছি বইকি।

—তবে? অনুরাধা মনের দিক থেকে সর্বাংশেই ত্যাগ করেছে তার তথাকথিত স্বামীকে। এবং আপনাকেই সে শেষ অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর মাঝে যে কোনো ফাঁকি নেই তা নিশ্চয়ই আপনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

—না, তার অবশ্যই কোনো প্রয়োজন নেই।

—সেইজন্যেই বলছিলাম যে, যথানির্দিষ্ট সময়ে আসলে এদিনে আপনাদের নিরুদ্দেশ-যাত্রার অর্ধেক পথ অতিক্রম করে যেতে পারতেন।

—তা হয়ত পারা যেত। কিন্তু সে-পারাটা বোধ করি ভগবানের ইচ্ছা-বহির্ভূত। তাই অনিচ্ছাকৃত অবস্থা-দুর্বিপাকে এই বিলম্বটা ঘটে গেল। হয়ত কোনো কল্পনাতীত শুভ-উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এর পশ্চাতে।

—শুভ-উদ্দেশ্য—না ছাই! শুনুন, এখনও একটা রাস্তা পরিষ্কার আছে। আপনারা দুজনেই বেঁচে যান তাহলে। আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় দিন গুণেছি শুধু, এই ক'দিন অধীর উদ্বেগে। আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আর কাল-বিলম্ব করবেন না।

—কিসের?

—অনুরাধার বর গেছেন কলকাতায়। কলকাতায় তালাবদ্ধ ভাড়াটে-বাসাটা তুলে দিয়ে আসবেন। কিছু কেনাকাটাও করবেন হয়ত। এদিক থেকেই সোজা স্টীমার-ঘাটে যাবেন কিনা? আবার পথে আমায় নামিয়ে দিয়ে যাবেন বাসায়, মার সঙ্গে বিদায়-সাক্ষাৎ সেরে আসবেন আজকেই। শুধু অনুরাধা দু'মিনিটের জন্যে ওপরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে আসবে। তিনি যেমন যাত্রা করছেন যে সস্ত্রীক আগামীকল্যের স্টীমারে। টিকিটাদি আজই কিনে নিয়ে আসবেন। শুধু লগেজ কষাটা বাকী থাকবে। কাজ এগিয়ে থাকল অনেকখানি। এই বিকেলের গাড়ীতেই ফিরবেন বলে গেছেন। নয়তো সেই রাত-দুপুরে। আমি বলি, আপনি এই দুপুরের গাড়ীতেই রওনা দিন অনুরাধাকে নিয়ে। পরের গাড়ীতে আমিও ছুটি কলকাতার দিকে। তারপর যার যার বুঝ, সে-সে পাবে।

—চক্রবর্তীর নির্দেশ আপনার, বড়দেবি! ধন্যবাদ তার জন্যে। কিন্তু এখন আর তা হয় না। সেই চৌর্যবৃত্তির আজ আর প্রয়োজন নেই।

এ-কথার প্রতিবাদ করলেন অনুরাধা বাইরে থেকে পাগলিনীর মতো ছুটে এসে,—কেন হয় না? এই কি ছিল তোমার মনের ইচ্ছে? আমাকে শেষপর্যন্ত পথে বসানো?

বুঝা গেল অনুরাধা এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথোপকথন শুনছিলেন। আসলে যে-বিচলিতচিত্ততা বোধ করার জন্যে তিনি কক্ষের বাইরে চলে গিয়েছিলেন তা তিনি পারেননি। সে-অসহায়ভাবটা ঠিকরে পড়ল বাক্যে। সে-বাক্য অশ্রু বাষ্পে ভিজে উঠেছে যেন।

রমা রান্নার অজুহাতে উঠে গেলেন, তাঁদেরকে নিভৃত আলাপের সুযোগ দিয়ে।

ভরদ্বাজ অনুরাধার কথার প্রত্যুত্তর করলেন,—পথে তুমি বসবে না—অনুরাধা, তুমি বসবে তোমার স্বামীরই স্বর্ণ-সিংহাসনে।

তাঁর উষ্মা প্রকাশ পেল অনুরাধার কণ্ঠে। বললেন অনুরাধা,—সেই স্বর্ণ-সিংহাসনে বসানোর জন্যেই বুঝি এদিন এই ছিনিমিনি খেলাটা করলে আমার সঙ্গে?

—কোথায় দেখলে ছিনিমিনি-খেলা? হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত দুর্ধর্ষ অভিযানটা লক্ষ্যে পড়ল না তোমার, লক্ষ্যে পড়ল শুধু ছিনিমিনি-খেলাটা! অমন করে ভুল বুঝোনা, অনুরাধা! তাহলে কিন্তু দুঃখের রাত্রে, দুর্যোগের অন্ধকারে কোনো সান্ত্বনাই খুঁজে পাব না কেউ।

—তবে কেন আজ বেসুরো গাইছ?

—বেসুরো নয়, সুরেই গাইছি।

—সুরে গাইলে ঐ দুশ্চরিত্র উৎপীড়ক স্বামীর ঘর-করার জন্যে ওকালতি করতে না তুমি। এবং তাই যদি তোমার আন্তরিক অভিলাষ হয়, তবে গলায়-দড়ি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না আমার। আমি আজ আশ্চর্য হয়ে যাই, যাকে নিয়ে দেশান্তরী হবার স্বপ্ন দেখেছিলে এবং সেজন্য প্রস্তুত হয়েও এসেছ আজ, মুহূর্তে সে-পরিকল্পনা তোমার কেমন করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আজ দেখতে পাচ্ছি আমার ভবিষ্যৎ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বুঝতে পারছি মৃত্যুই একমাত্র নিষ্কৃতির উপায় আমার।— বলতে বলতে চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল অনুরাধার।

ভরদ্বাজের বুক যেন ভেঙে যায়। কণ্ঠ বারবারই রুদ্ধ হয়ে আসে আত্ম-অস্বীকৃতির দাহন-যন্ত্রণায়। অতিকষ্টে সংবরণ করে নিয়ে বললেন,—অন্ধকার নয়, অনুরাধা—প্রখর দীপ্তিতে ভাস্বর তোমার ভবিষ্যৎ। মৃত্যু! হা—হা—হা—এই তো তোমার নব-জীবনের সূচনা। এবারই তোমার শাশ্বত নারী-জীবনের প্রতিষ্ঠা হবে।

—যথেষ্ট হয়েছে! তোমাদের পুরুষ-জাতিকে চেনা হয়ে গেল। আর তোমার দালালী করতে হবে না। আমার ভাগ্য আমি দেখতে পাচ্ছি স্বচক্ষে।

—তোমার স্বামী সত্যিকারের স্বামীর যোগ্যতা অর্জন করে এসে তোমায় ফিরে পাবার জন্যে যদি এমন আকাঙ্ক্ষিত হয়ে না উঠতেন তো, আমার দালালী করার প্রয়োজন হ'ত না, অবকাশও জুটত না।

—তবে নিজের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ছলনা করে আমায় আবার সেই ভাগাড়ে ঠেলে দেবার জন্যে এত উৎসাহী হয়ে উঠলে কেন?

—কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে, তোমার স্বামী সত্যি পরিবর্তিত এবং মার্জিত মানুষ হয়েছেন। তাঁর মন যদি আজো সত্যি উচ্ছৃঙ্খল থাকতো তো, তোমায় ফিরে পাবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করতেন না। দেশ-বিদেশেই তিনি তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা চরিতার্থ করতে পারতেন, এবং তার উপযুক্ত অর্থের অভাবও নেই তাঁর। তাঁর মনে তোমার জন্যে একটা স্থায়ী আসন পাতা না থাকলে, এমন উদ্বেল আকাঙ্ক্ষামণ্ডিত আচরণ সম্ভব ছিল না। দেহের ক্ষুধা চিরদিন থাকে না, মনের ক্ষুধাই স্থায়ী! সে-ক্ষুধার্ত-মনের সন্ধান তিনি পেয়েছেন।

—তাতে আমার কী এসে গেল! আমার মন যে আমি অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি! তাঁর মনের ক্ষুধা মিটাতে গিয়ে আমার মনকে বলিদান দিতে হবে—এই তো বলতে চাও তুমি?

—অনেকটা তাই হয়ত। তাই তো করে এসেছে নারীরা যুগে যুগে। বিষের প্রতিদানে সুধাই তুলে ধরেছে পুরুষের মুখে। তাই তো তাদের বক্ষেই অমৃতের অক্ষয়-ভাণ্ডার তুলে দিয়ে রেখেছেন বিধাতা। আর সেই সুধা পান করে পৃথিবীর আগামীদিনের শিশুরা বেঁচেছে। এ-বিধানের তো ব্যতিক্রম নেই, অনুরাধা!

—হ্যাঁ, তাই তো! তাদের সেই জীবন-সুধা শুষে-শুষে গলা তোমাদের এত বেড়ে গেছে যে, সে-ব্যবস্থাকে কায়েমী করার প্রচেষ্টায় তোমাদের ছলনার অন্ত নেই। থাকগে, অতসব বুঝবার দরকার নেই আমার। সত্যি যদি ভালবাস আমাকে, আর এদিনের সান্নিধ্য যদি ছলনা না হয়, তবে তুমি নিয়ে চলো আমাকে। আমাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়ো না আর!— অনুরাধার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল কান্নায়।

—তোমায় আমি ভালবাসি কিনা, বা সে-ভালবাসা ছলনা কিনা, তার উত্তর তো তোমার নিজেরই কাছে! তুমি যদি তা উপলব্ধি করতে না পার, তবে সহস্র ব্যাখ্যা-মূলক বক্তৃতা দিয়েও আমি তার প্রমাণ দিতে পারব না। ভালবাসি বলেই তোমাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করায় আমার আনন্দ। সে তোমার মৃত্যু নয় অনুরাধা, সেই তোমার সত্যিকারের জীবন।

—সে-জীবন যে আমার কাম্য নয়। আমি যে তোমায় ভালবাসি, তোমারই আত্মার মাঝে যে মিশিয়ে দিয়েছি আমার সত্তাকে। কেমন করে সেই অমৃতলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে একজন অবাঞ্ছিত পুরুষের কণ্ঠলগ্ন হব? মন যে আমি নিঃশেষে তুলে নিয়ে এসেছি তার কাছ থেকে। তোমাকেই বা মুছে ফেলব কী করে আমার মন থেকে?

—মেয়েরা তা পারে। তুমিও পারবে। মেয়েদের কাছে অতীতটা খুব বড় কথা নয়, বর্তমানটাই পরম সত্য। মনের চেয়ে যে প্রয়োজনের তাগিদ অনেক বেশী তাদের কাছে। তাই যাকে নিয়ে দীর্ঘদিন ঘর করেছে তাকে তারা ত্যাগ করতেও পারে, আবার যাকে হিয়া-মন উজাড় করে দিয়ে ভালবেসেছে, তাকেও তারা অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করে আসতে পারে হাসিমুখে—প্রয়োজনের তাগিদে। চেষ্টা করো, তোমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে না।

—এমনিভাবেই চিনলে বুঝি মেয়েদিগকে? এই বুঝি অমৃত-সুধার আদর? তাই আটকাচ্ছে না তোমার এমন নিষ্ঠুরভাবে ছেড়ে যেতেও!— ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল অনুরাধার। —আর যাকে এমনি করে ভালবেসেছ, তাকে যে বিনা-দ্বিধায় ত্যাগ করে যেতে চাইছ, তাতে পুরুষদের কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়ে না। আমি জানতাম, আমার কপালে অশেষ দুঃখ, কে খণ্ডাবে তা!— কান্নায় জড়িয়ে আসে অনুরাধার কণ্ঠস্বর।

—তা নয়। যারা সত্যিকারের ভালবেসেছে, তারাই তো করেছে দুরূহ ত্যাগ, করেছে অসাধ্য-সাধন। ভালবাসায় যে মিলন নেই, অনুরাধা! বিরহই যে মহৎ-প্রেমের প্রাণ। তাইতো বিরহ-বিধুর প্রেম এত মধুর। ও-যে হৃদয়ের এক মহার্ঘ-সম্পদ! যুগ যুগ ধরে শ্রীরাধা সে-বিরহের মালাই গেঁথেছিলেন।

—কিন্তু পৃথিবীর মানুষের যে শ্রীরাধার বিরহের মালা গেঁথে চলে না! তাহলে এইসব প্রেম-ভালবাসাগুলি কেন?

—ভালবাসা? প্রেম?— ক্ষণিক চুপ করে রইলেন তরফদার, যেন কোনো একটা ভাব গোপন করলেন।

তারপর বললেন,—যে প্রেমিক, যে ভালবাসতে জানে, সে যে কবি! তার হৃদয় গোপন বেদনায় ছিন্নভিন্ন। বেদনায় যখন সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, যখন সে কাঁদে, তখন তা অপূর্ব-মধুর সংগীতের ন্যায় নির্গত হয়ে আসে। তার হৃদয় বেদনাবিদ্ধ। সে হৃদয়ের আর্তনাদকে সংগীতে পরিণত করে। আর সেই সংগীতের অমৃত-সুধা পান করে ধন্য হয় পৃথিবীর মানুষ। তাই প্রেম আছে, ভালবাসাও আছে, নইলে প্রাণ খুলে যে কাঁদা যায় না, অনুরাধা।

তরুকান্তের কণ্ঠও কান্নায় রুদ্ধ হয়ে এল। সে-ভাব দৃষ্টি এড়াল না অনুরাধার। তীক্ষ্ণ সজল-দৃষ্টি তুলে তাকালেন তিনি তরুকান্তের দিকে। হয়ত চোখের কোণে দু'একটা অশ্রুবিন্দুও আবিষ্কার করে থাকবেন। অনুরাধা বললেন তীব্রস্বরে,—এই আত্মপ্রবঞ্চনার মানে কী? হৃদয়ের মাঝে এতবড় মিথ্যে—এতবড় ফাঁকি রেখে কেন আরেকটা মিথ্যের জন্যে এতবড় গোঁ ধরেছ, বলতে পার আমাকে? নিজের জিনিস পরের হাতে তুলে দিতে যেখানে নিজেরই বুক ভেঙে যাবে, সেখানে ঐ মহত্ত্বের প্রকাশ কেন?

—সত্যকে পেতে হ'লে কিছু কষ্টভোগ করতে হয়, বুকও ভাঙতে হয় কিছু কিছু। তাই তো সত্যের মূল্য এত বেশী।

—থাক্ সত্য, তোমার মাঝেই থাক্ তোমার সত্য। হৃদয়ের মাঝে এতবড় মিথ্যে রেখে আমি তার ঘর করতে যেতে পারব না। তাকে স্বামিরূপে গ্রহণ করিনি আমি।

—আমার সঙ্গে পালিয়েই যেতে পারবে শুধু?

—ঠিক তাই। তুমি যদি এতখানি এগিয়ে এসেও আজ পশ্চাৎপদ হও, তো আমার রাস্তাও আমি ঠিক করে রেখেছি।

—ভালো কথা। কিন্তু আমার কাছে কী পাবে তুমি?

—তুমি যা দিতে পার। যত সামান্যই হোক সে-দান তোমার, তাই হবে পরমার্থ আমার কাছে।

—আজকে হৃদয়চাঞ্চল্যে মনে হচ্ছে—পরমার্থ হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হবে না। তার কারণ, মহাসমুদ্রকে কোনোদিন কলসীতে আটকানো যায় না। প্রেম যে মহাসমুদ্রের মতো বিস্তৃত। প্রেমের তখন মৃত্যু ঘটবে। আর সে-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেবে বিষাদ। সেটা সুখের হবে না। তোমার মনেও থাকবে একটা বিরাট ক্ষত, যে একজনের বিবাহিতা স্ত্রী হয়ে তুমি আরেকজনের সাথে ঘর ছেড়েছ। এতে তোমার মনের বল দৈনন্দিন ক্ষীণ হয়ে যাবে। তুমি যে সতীত্ব হারিয়েছ, এই ব্যথা তোমায় কাঁটার মতো বিঁধবে। এই মনোবেদনা তোমার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণার কারণ হবে। কী দিয়ে মুছবে তুমি সে-গ্লানি?

—কেন? তুমি মুছে দেবে সে-গ্লানি তোমার প্রীতি ও ভালবাসা দিয়ে, তোমার হৃদয়ের ঐশ্বর্য দিয়ে—যে-ঐশ্বর্য নিয়ে একদিন দেখা দিয়েছিলে মেঘদূতের মতো আমার নিপীড়ন-ক্লিষ্ট জীবনে!

—আমার ওপর অনেক আস্থা দেখছি তোমার। কিন্তু এ-মোহও একদিন কেটে যেতে পারে আমার। মোহটা তো আর স্থায়ী হয় না। সেদিন আমিও তো বিরূপ হয়ে উঠতে পারি তোমার ওপর এই ভেবে যে, যে-নারী আপন বিবাহিত স্বামীকে ত্যাগ করে আসতে পারে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের সাথে।

—মেয়েদের মূল্য-বিচার এই মাপেই যারা করে থাকে, সে-পুরুষদের সম্বন্ধে মেয়েদেরও অনেক কিছু বক্তব্য থাকে। তোমারও সে-ভাব যেদিন জাগবে—নদীর জল নিশ্চয় সব শুকিয়ে যাবে না সেদিন। শান্তি ও সুখের জন্যে একদিন ঘর ছেড়েছিলাম, সেদিন আরেকবার না-হয় ঘর ছাড়ব মৃত্যুর জন্যে। বুঝব, পৃথিবীর মানুষের কাছে হৃদয়ের মূল্য বেশী নয়।

—হ্যাঁ, প্রেমে পড়লে ঘরই ছাড়তে হয়। ঘর-বাঁধা আর যায় না। তোমাদের সৃষ্টি কিন্তু ঘর-বাঁধার। ঘর-ছাড়ার নয়। তাই তোমাকেও স্বামীর ঘরেই যেতে হবে, অনুরাধা! মেয়েদের যে এর চেয়ে বড় গতি, বড় গৌরব আর নেই।

প্রত্যুত্তরে অনুরাধা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রমা ঢুকলেন দু-পেয়ালা গরম চা হাতে। বললেন,—ব'কে ব'কে নিশ্চয় গলা শুকিয়ে গেছে—নিন, একটু ভিজিয়ে নিন। নবোদ্যমে বকতে থাকুন আবার। বলি, কমেডি না ট্রাজেডির দিকে যাচ্ছেন?

—এসব কাহিনীর পরিণতি ট্রাজেডিই হয়ে থাকে। গায়ের জোরে তো আর কমেডি করা যায় না, রমাদেবি!

—অন্তরের সাথে বাইরের মিল থাকলে, ট্রাজেডিকেও কমেডি করা যায়। যা হোক, আপনারা একটা সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে থাকুন। আমার রায় তো আছেই শেষ পর্যন্ত।— ব'লেই তিনি অন্তর্হিত হলেন।

অনুরাধার বক্তব্য অব্যক্তই রইল। এই কথায় মুখভাব গম্ভীর হ'ল আরো।

তরুকান্ত বললেন,—দেখ, তোমাদের সমাজে অবৈধ

ভালবাসার অনুমোদন নেই। শাস্ত্রেও তার বিধান দেয়নি। প্রগতির ধ্বজা উড়িয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। সে-সত্য সাদা-চোখেও আজকাল দেখা যায়। কিন্তু ঐ প্রগতির আলো তাদের মনের কালিমা দূর করতে পারেনি। তাই যে-কোনো অসামাজিক আচরণে মনের দিক থেকে বাধা আসে। গায়ের জোরে সে-বাধা অতিক্রম করে গেলেও, পরবর্তী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ক্লিষ্ট ও বিষন্ন হয়ে ওঠে ঐ সংস্কার-বিরোধী ক্ষণিক উত্তেজনার জন্যে। সংস্কারের জায়গায় মানুষমাত্রই দুর্বল। এর ব্যতিক্রম তোমার আমার কারো জীবনেই দেখা দেবে না। অনুরাধা, তুমি তোমার স্বামীর কাছেই যাও! অন্ততঃ এই দুর্বিষহ-বোঝা বাকী জীবনে আর বয়ে বেড়াতে হবে না।

অনুরাধা তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। হয়ত হৃদয়ের রুদ্ধ-বেদনার চাপ সামলিয়ে নিলেন। তারপর ধরাগলায় বললেন,—কেমন করে তুমি এমনি চোখের পলকে নিজেকে এমন নিষ্ঠুরভাবে অস্বীকার করে যেতে পারছ, ভেবে আশ্চর্য লাগে। কিন্তু যে-স্বামীকে ভালবাসিনি বিন্দুমাত্রও, নেই একবিন্দু শ্রদ্ধাও, তার ঘর করব আমি কেমন করে? কেমন করে লুকোচুরি খেলব নিজের মনের সঙ্গে?

—ভালবাসার জন্যে তো বিয়ে হয়নি তোমাদের। বিয়ে হয়েছিল সামাজিক সুবিধে-ভোগের নিমিত্ত। তার মাঝে ভালবাসা খুঁজতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। ভালবাসা যদি কোনোদিন গজিয়ে ওঠে, সেটা উপরি-পাওনা। আমাদের বিবাহ-বিধানে 'ভালবাসা' কথাটির উল্লেখ নেই। দুটো অপরিচিত নরনারীর বিয়ে হয় ভালবাসা-সৃষ্টির 'লটারি' হিসেবে নয়। সে উদ্দেশ্য ভিন্ন। এই প্রচলিত বিধানের যদি কোনোদিন পরিবর্তন ঘটে সময়ের চাপে, সেদিন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে।

অনুরাধা নতমুখে চুপ করে রইলেন। কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

তরফদার পুনর্বার শুরু করলেন,—বলতে পার, এতসব বুদ্ধি-বিবেচনা তখন কোথায় ছিল, যখন প্রথম আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল, যে, আজ একজন অসহায়া নারীর হৃদয়ের সম্ভ্রমকে চুরমার করে দিয়ে চলে যাচ্ছি আমি। তার উত্তরে বলব—বস্তুতান্ত্রিক জগতে আজ হৃদয়ের মূল্য বেশী নয়, হৃদয় গুমরে মরে চিরদিনই। কে তার মূল্য বুঝেছে? আর, অসহায়া তুমি নও। বরং তোমার প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা এবং মর্যাদা আজ পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হ'ল। এবং তা হয়েছে [illegible] আমি নিশ্চিন্ত। নইলে ভবিষ্যতের একটা পরম অবাঞ্ছিত পরিণতির দিকে আমায় ছুটে চলতে হ'ত। ভগবানকে ধন্যবাদ! তিনি নিষ্কৃতি দিলেন সে-ব্যর্থ-পরিস্থিতি থেকে।

অনুরাধার বাক্যব্যয় হ'ল না। অধোবদনে বসে রইলেন। শুধু নীরবে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল তাঁর পরিধেয়ের ওপর।

তরফদারের চোখ-দুটোও ছলছল করে উঠল। দু'বিন্দু অশ্রুও গড়িয়ে পড়ল গণ্ড বেয়ে অলক্ষ্যে। পকেটের রুমাল দিয়ে সিক্ত নেত্রদ্বয় মুছে নিয়ে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে নিয়ে বললেন,—আমার জন্যে ক্ষোভ কোরো না, অনুরাধা। অনেক অসতর্ক-মুহূর্তে মনে পড়বে হয়ত আমার কথা, হয়ত অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হবে নেত্রপল্লব। তার সান্ত্বনা কোথায়? তার সান্ত্বনাও খুঁজে পাবে তুমি তোমার সৃজনধর্মী মনে; তোমারই নবকল্পান্বিত সংসারের নব-নব রূপায়নে। আজ হয়ত সাক্ষাৎ ঘটবে না আমাদের এ-জীবনে। না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবু জানবে, তুমিই জাগ্রত থাকবে আমৃত্যু আমার মাঝে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে। সেই আমার বাকী জীবনের মহার্ঘ-সঞ্চয়। তাতেই আমার পরম পরিতৃপ্তি। অতীত-জীবনের স্মৃতি-সুধার সমুদ্র-মন্থনেও তো আনন্দ আছে। চিরদিনের ছন্নছাড়া আমি। স্থিতি নেই আমার জীবনে। পূর্বে যা ছিলেম, আজও তাই হ'লেম। জীবনের মধ্যপথে শুধুমাত্র ক্ষণিকের বসন্ত এসেছিল। নিদাঘ-শুষ্ক-জীবনে তার মূল্য যে অনেক, অনুরাধা! ঐ ছোঁয়াই আমার সমগ্র ভবিষ্যৎ-জীবন মধুময় করে তুলবে। সেই অকাল-বসন্তের পূজা করব আমি আজীবন। তুমি সুখী হও, শান্তি পাও জীবনে। এর বেশী কামনা নেই আমার।— বলতে বলতে তরফদারের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

অনুরাধার রুদ্ধ কান্না এবার অবারিত হ'ল। কান্নার বেগ কিছুতেই রোধ করতে পারছেন না।

রত্না এসে ঢুকলেন। —এবার স্নানাদি করুন। আমার রান্নার পাট শেষ।

—না, এখন আমি যাব। এই গাড়ীটা ধরতে হবে।— হাত-ঘড়িটা দেখে বললেন তরফদার,—এখন বারোটা বাজে, সাড়ে-বারোটার গাড়ীটা অনায়াসে ধরা যাবে।

—সেকি মশায়! এতকাল পরমাত্মীয় ছিলেম, আর মুহূর্তে এত পর হয়ে গেলাম যে, রাঁধা-ভাতটাও খেয়ে যাবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না!

—না না, ওকি বলছেন, রত্নাদেবি—পর হবেন কেন,

যে আপন হয়ে রইলেন হৃদয়ের মূলে গেঁথে, চেষ্টায়ও উপড়াতে পারব না তাকে। বলছিলাম যে, যেতেই যখন হবে, বিলম্ব করে লাভ কী, চলতেই থাকি—

—যাবেনই তো। সিদ্ধান্ত যখন করে ফেলেছেন, বাধা দেবার মতো শক্তি তো আমাদের নেই। যেয়েই যাবেন এখন বিকেলের গাড়ীতে।

অগত্যা তাই করতে হ'ল।

অনেক সাধ্যসাধনা করেও অনুরাধাকে খানাহারে প্রবৃত্ত করানো গেল না। সেই-যে দরজায় অর্গল বন্ধ করে শয্যাগ্রহণ করেছেন পাশের ঘরে, বিদায়কাল পর্যন্ত আর উঠলেন না।

মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে রত্না-তরফদারের পুনরালাপ হ'ল। রত্না অনেক চেষ্টায়ও তরফদারের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত খণ্ডাতে পারলেন না।

রত্না জিজ্ঞেস করলেন,—কলকাতার দিকেই যাবেন তো?

—না, কলকাতায় গিয়ে আর কী করব? বর্মের দিকে যাব। সেখান থেকে জাপানের দিকে যাব বলেই মনস্থ করেছি। জাপানের পাসপোর্ট করেছি। ঘুরতে থাকি। দেখি-না জীবনের গতি কোথায় গিয়ে থামে। তারপর আপনি?

—আমি? হ্যাঁ, আমার চাকরিও তো শেষ হ'ল। যেখানকার জল সেখানে গিয়েই থামল। মাঝখান থেকে তার উত্তাল তরঙ্গে হাবুডুবু খেলাম আমরাই। কলকাতায়ই তো যেতে হবে আমার। তারপর দেখি কোনো মিশন-টিশনে যোগ দেওয়া যায় কিনা। বেকার বসে থাকতে তো পারব না।

—বিয়ে-থা করবেন না বলেই ঠিক করেছেন বুঝি?

—বিয়ে? হা-হা-হা! কাকে করব? সেরকম মনের মতো মানুষ যে খুঁজে পাইনে।

—খুঁজলেই পেয়ে যাবেন। মনের-মানুষ খোঁজাখুঁজির যে রেওয়াজ এসে গেছে আজকাল।

—তা ঠিক। কিন্তু তাতে সুফল আমি দেখিনি। তাই প্রবৃত্তি হয় না। তা ছাড়া বিয়ে সকলকে করতেই হবে তার কি মানে আছে?

—তা নেই অবশ্য। বলছিলাম যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় পাপ বোধ করি আত্মপ্রবঞ্চনা।

—হবে হয়তো। সে-সত্য আপনার চেয়ে বেশী কে বুঝেছে।

বিকেলের গাড়ীতে যথারীতি ফিরলেন অনুরাধার স্বামী কলকাতা থেকে। তরফদারকে দেখেই বললেন,—আই সী, ইউ আর হীয়ার! আই মীন্, কতক্ষণ এলেন? আমি তো ওদিকে কলকাতায় বাড়ীতে খুঁজে এলাম আপনাকে। ভাবলাম, সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি যখন, একবার দেখা করেই যাই। এতদিনের প্রতিবেশী! দেখলাম বিরাট-বিরাট তালা ঝুলছে আপনাদের বাড়ীর দরজায়। তা আমরা তো কালই রওনা দিচ্ছি রেঙ্গুনের দিকে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হ'ল। নইলে একটা বড় খুঁত থেকে যেত মনে। তা অনুরাধার সঙ্গে দেখা হয়েছে তো? অনুরাধা কৈ গো? কোথায় গেলে? ইনি এসেছেন। আক্কেল-বুদ্ধি এদের আর হবে না কোনদিন।— ব'লে নিজেই তিনি উঠে গেলেন তদ্বির করতে। ফিরে এসে বললেন,—এখনো ঘুমচ্ছেন বেঘোরে। এসব মেয়েছেলেদের নিয়ে আর পারা যায় না, মশায়! তিনি বলেন—তিনি আমার সঙ্গে ঘর আর করবেন না। আই মীন্, সী হ্যাজ ডাইভোর্সড্ ইন মাইণ্ড।...এক্সকিউজ মী,— পকেট থেকে সিগারেট-কেস বের করে এগিয়ে দিলেন তরফদারের দিকে। নিজেও একটা লাগালেন মুখে। —স্বীকার করি, চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম একদিন। বাট্ এ ম্যান্ ইজ নেভার ব্যাড্ ফর দি হোল্ লাইফ। একদিনের ভ্রান্তি কি সারা-জীবনের সুকৃতি নষ্ট করতে পারে? আপনিই বলুন না। আই হ্যাড্ এ রি-বার্থ ইন্ মাই লাইফ্, অ্যাণ্ড অ্যাম্ এ চেঞ্জড্-ম্যান টু-ডে। আই মীন্, সেই যে পরিবর্তন এল তার কি ব্যতিক্রম ঘটেছে কোনখানে বলে বলতে পারবে কেউ আমাকে? অথচ তার জন্যেই এত সংস্কার করেছি আমার নিজের। আরে বাপু, পাস্ট্ মিস্-ডীডের কি ক্ষমাও নেই, মশায়? এই যদি তোমার মন হবে তো কেন এলাম এতখানি ছুটে? সত্যি, এদের মন পাওয়া বড় কঠিন। আই মীন্, ইট্‌স্ প্র্যাকটিক্যালি এ টেরিব্‌ল্ টাস্ক।...

সন্ধ্যে সাতটার মেল-ট্রেনেই রওনা দিলেন তরফদার। অনুরাধার স্বামী আপত্তি তুললেন,—ক্ষেপেছেন মশায়, এই শীতের রাতে ট্রেন-জার্নি করবেন! তার চেয়ে বসুন গাঁট হয়ে, প্রাণ খুলে গল্প করা যাক। কাল চলে যাচ্ছি, হয়তো ইহজীবনে আর সাক্ষাৎই হবে না।...কৈ হে রাধিকা, কী বেরসিক বলো দিকিনি তোমরা, এমন শীতের সন্ধ্যায় কোথায় গরমাগরম চা-পান করাবে, তা না, তোমরা...

তরফদার বাধা দিয়ে বললেন,—মাফ করবেন, মিঃ রায়।

আমাকে এ-গাড়ীতেই যেতে হবে। আপনার সৌজন্যের কথা স্মরণে রাখব।

—কলকাতায় যাবেন তো? কাল আমাদের সঙ্গে একসঙ্গেই যাবেন'খন।

—না, আমি বম্বের দিকে যাব। সেখান থেকে জাপানের দিকে পাড়ি দেবার ইচ্ছে আছে।

—আই সী, আই সীন্, নিরুদ্দেশ-যাত্রা। বেশ আছেন মশায়! সারাজীবন দেশ-বিদেশে ঘুরে-ঘুরেই কাটিয়ে দিলেন। তা মনে রাখবেন আমাদের কথা।

—ও, নিশ্চয়ই।

অনুরাধার স্বামী কেন এত পরমাত্মীয় জ্ঞান করলেন তরফদারকে তা জানা যায়নি। তরফদার আশ্চর্য হলেন কিঞ্চিৎ। তিনি কি আদ্যোপান্ত ঘটনা বিস্মৃত হয়ে গেলেন? নাকি তাঁর 'রি-বার্থ' সর্বদিক দিয়েই ঘটেছে। প্রীত হলেন তরফদার তাঁর আচরণে।

যথারীতি সন্ধ্যাবেলাতে বিদায় নিলেন তরফদার। অনুরাধার সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি বিদায়কালে। সেই-যে শয্যা নিয়েছেন—এ-পর্যন্ত ওঠেননি আর। কিন্তু আবছা অন্ধকারে জানালার গরাদ ধরে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি যে অনুরাধাই তাতে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্রও। তরফদার চলে যাচ্ছেন চিরজীবনের তরে, সে-মুহূর্তে অনুরাধা তাঁকে শেষ-দেখা না-দেখে থাকতে পারেন না। অশ্রুর অভিষেকে আচ্ছন্ন হবে তাঁর যাত্রাপথ সে তো তিনি জানেন।

টাঙ্গা চলেছে স্টেশনের দিকে লাল-কাঁকরের রাস্তা বেয়ে। একঝলক শীতের হাওয়া বয়ে গেল। ছুঁচের মতো এসে বিঁধল শরীরে।

তরফদারের বুকের ভিতরটা হু-হু করে জ্বলে উঠল তীব্র যন্ত্রণায়। হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে পড়ে গেল দেহ থেকে। মধুপুরের সমস্ত মধুই যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মধুপুরের শেষ-পাদস্পর্শ উঠল তরফদারের।

রত্না এসেছিলেন স্টেশন পর্যন্ত। একফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন রত্না,—একটা কথার উত্তর দেবেন, রমেশবাবু?

—বলুন।

—এমন নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চনা করলেন কেন নিজেকে? সমস্ত-কিছু হাতের মধ্যে পেয়েও, সে-পাওয়ার জন্যে এত কঠোর সাধনা করলেন, এত ক্লেশ স্বীকার করলেন?

—সে-পাওয়া তো পাওয়া হ'ত না, রত্নাদেবি! সে হ'ত জীবনের সবচেয়ে গ্লানির ইতিহাস, বিরাট অনুশোচনা ও অভিশাপে ভরা।

—কেন?

—আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এতখানি এগিয়ে যায়নি যে আজো! আমি এগিয়ে যেতে পারতাম হয়ত আমার সুঠাম দেহ নিয়ে, প্রবল শারীরিক শক্তি-প্রয়োগে, কিন্তু মনটা আমার পড়ে থাকত পশ্চাতে সংস্কারের অন্ধকারে। এটুকুন গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। তবু অনুরাধার স্বামী আজ স্ত্রীর কাছে এমন ক্ষুধার্ত প্রাণ নিয়ে ফিরে না আসলে হয়ত আমাকে একটা বিরাট দুর্নীতির দৃষ্টান্ত রেখে যেতে হ'ত। সেটা ভবিষ্য-জগতের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক হ'ত না।

—কিন্তু অনুরাধা?

—আমার পক্ষে যা সত্য, অনুরাধার পক্ষেও তাই। সে-ও সংস্কারমুক্ত নয়। তার মর্মদাহ আরো তীব্রতর হ'ত। চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। এ-ই বরং তার উপযুক্ত স্থান হ'ল। সে তাল রাখতে পারত না আমার সাথে। তাদের সংসার ও সমাজ দুই-ই চাই, রত্নাদেবি!

—বুঝলাম। আর কি ফিরবেন না কোনোদিন?

—সম্ভাবনা নেই। কেন? কেউ তো আর অনির্বাণ দৃষ্টিদীপ জ্বেলে বসে থাকবে না আমার জন্যে অধীর প্রতীক্ষায়?

—থাকতেও তো…

ট্রেনটা এসে দাঁড়াল।

তরফদার ট্রেনে উঠে দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন রত্নার দিকে তাকিয়ে। রত্না অপ্রত্যাশিতভাবে তরফদারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে পদধূলি নিলেন মাথায়। তরফদার অপ্রস্তুত হলেন—বিস্মিত হলেন,—একি!…

ট্রেন ছেড়ে দিল।

রত্না তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে তরফদারের দিকে। তরফদারও বিস্মিত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলেন রত্নার দিকে। স্টেশনের স্বল্পালোকেও দেখা গেল, অজস্র অশ্রুর ধারায় সিক্ত হয়েছে রত্নার নিষ্পলক দৃষ্টি। তারপর রত্নাও হারিয়ে গেলেন দৃষ্টির বাইরে—শালবনের অন্তরালে।

এত কামনা, এত আকাঙ্ক্ষার তীর্থভূমি মধুপুর পড়ে রইল পশ্চাতে। সে-মধুপুরের কাঁকর-পথে পুনর্বার পদচারণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও রইল না। দুর্দান্ত-গতি মেল-ট্রেনের সাথে মনের গতিবেগ দ্রুততর হ'ল না। ক্ষত-বিক্ষত সে-মন পড়ে রইল মধুপুরের ছায়াঢাকা অঙ্গনের পথে কোনো একটি রুদ্ধদ্বার-কক্ষের গবাক্ষপথের দিকে সাশ্রুনয়নে তাকিয়ে।

লটারির যুগ

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিক কতদিন আগে যে কলকাতায় পা দিয়েছিলেন, সে-কথা টিরেট্টো সাহেবের এখন যেন আর মনে পড়েনা। বোধহয় একযুগ আগে! এতকাল কলকাতায় রয়েছেন ব'লে নিজের জন্মভূমির কথা যে মনে পড়েনি তা নয়—কিন্তু ফিরে যাবার ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেননি তিনি। শুধু টাকা আর টাকা—প্রচুর টাকার মালিক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন এদেশে। প্রচুর পরিশ্রমও করেছেন। তারপর অল্প অল্প করে টাকা আসতে সুরু করেছে। বাড়িঘর, জমিজমা, বাজার, দোকান সবই হয়েছে। লোকেও বলতে সুরু করেছে টিরেট্টো প্রচুর টাকার মালিক। এতদিন পরে মনের সেই ইচ্ছাও আবার মাথা তুলেছে। টিরেট্টো ভাবছেন অনেক তো হ'ল, আর নয়। জীবনের বাকী দিনগুলো এবার স্বদেশেই কাটাবেন। সমুদ্রে ঘেরা সেই ছোট্ট দ্বীপটির ছবি চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে। মন উতলা হয়ে উঠেছে। কিন্তু যাবার আগে বিষয়-সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা দরকার, না হ'লে পাঁচভূতে লুটে খাবে তাঁর এতদিনের পরিশ্রমের ফল। তা ছাড়া আর ফিরে তো আসবেন-না এই বাংলা দেশে, কাজেই কাঁচা টাকাই তিনি নিয়ে যেতে চান সঙ্গে।

আপনারা ভাবছেন তা এ'নিয়ে এত চিন্তা কেন? সম্পত্তি নীলামে বেচে দিলেই তো হাঙ্গামা চুকে যায়। কিন্তু টিরেট্টো তা না ক'রে খবরের কাগজে নিজের নামে এক লটারির বিজ্ঞাপন দিলেন। জানা গেল, মিঃ টিরেট্টোর লটারিতে একশ' সিক্কা টাকার ৩,২০০টি টিকিট থাকবে। টিকিটের টাকা টিরেট্টো সাহেবের নামে বেঙ্গল-ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। টিকিট বেচা শেষ হ'লে টিকিট-ক্রেতাদের নিয়ে এক সভা হবে। সেই সভায় এক লটারি-কমিটি নিয়োগ করা হবে মিঃ টিরেট্টোর লটারির কাজ পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে। বিজ্ঞাপনে আরও জানানো হ'ল যে, যদি কোনো দুর্ঘটনার জন্যে লটারি না হয়, তাহলে টিকিটের টাকার জন্যে দায়ী থাকবে ব্যাঙ্ক।

আজকের দিনে নিজের সম্পত্তি বেচবার জন্যে কেউ খবরের কাগজে লটারির বিজ্ঞাপন দিতে যাবেন না, এ কথা সত্যি। কিন্তু টিরেট্টো সাহেবের লটারি বড় কম দিন আগেকার কথা নয়। ১৭৮৮ সালের 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ ছাপা হয়েছিল ঐ বিজ্ঞাপন। সে-যুগটাই ছিল লটারির। তখন সম্পত্তি বেচতে হ'লে এইভাবে লটারি বা নীলাম-লটারি করা হ'ত। নীলাম-লটারির বৈশিষ্ট্য হ'ল, নগদ টাকা দিলে, খেলার আগেও প্রাইজের যে-কোনও জিনিস পাওয়া যেত।

এইভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এর সূচনা হয় বটে, কিন্তু ক্রমশই লটারি কলকাতায় শুধু যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা নয়,

শেষ পর্যন্ত এই লটারির টাকায় জলা-জঙ্গল-খাল-ডোবায় ক্ষত-বিক্ষত গ্রাম সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কালীঘাটকে মহানগরী কলকাতা রূপে গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সে পরের কথা। তার আগে টিরেট্টা সাহেবের লটারির প্রাইজের বিবরণ শোনা যাক।

টিরেট্টা-লটারির প্রাইজ ছিল ছ'টি। ১নং প্রাইজ: কলকাতার কেন্দ্রস্থলে ন'বিঘা আট কাঠা জমির উপর টিরেট্টা সাহেবের একটি প্রশস্ত পাকা বাজার। দুটি স্কোয়ারে ভাগ করা—ভেতরে দোকানপাট, পাকা স্টল, চারপাশে দালান, চওড়া রাস্তা। ২নং প্রাইজ: উত্তরে ঐ বাজারের লাগোয়া এবং চিৎপুর রাস্তার সামনে চার বিঘা তেরো কাঠা জমি—যাকে বলা হয় 'ব্যারিং বেরী সাহেবের ভিটে'। ৩নং প্রাইজ: টিরেট্টা সাহেবের বাজারের দক্ষিণে এক বিঘা জমির ওপর একখানি দোতলা বাড়ি। তার সঙ্গে পুব দিকে বাড়ির লাগোয়া চার বিঘা ছ'কাঠা জমি আর উত্তরে বাজারের লাগোয়া ২০০ ফুট লম্বা, ৩২ ফুট চওড়া একটা পাকা সেড। মূল্য ৩৬,০০০ টাকা। ৪নং প্রাইজ: এক বিঘা জমির উপর লা গ্র্যান্ড সাহেবের বড় বাড়ি—নিচের তলায় ছ'খানা ঘর, চারটি কুঠরি, একটা হল্, সামনের দিকে থামওয়ালা বারান্দা আর ঘোরানো সিঁড়ি। মূল্য ২৫,০০০ টাকা। ৫নং প্রাইজ: মিট বাজারের দক্ষিণে ৩নং প্রাইজে উল্লিখিত পাকা সেডের কাছে চার বিঘা জমি। মূল্য ১৬,০০০ টাকা। ৬নং প্রাইজ: ৩নং প্রাইজে উল্লিখিত দোতলা বাড়ির দক্ষিণে চার কাঠা জমির ওপর একতলা বাড়ি—চারখানা ঘর, একটা হল্ আর ঢাকা বারান্দা। মূল্য ৮,০০০ টাকা।

প্রাইজের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্যে বিজ্ঞাপনের শেষদিকে লেখা হয় যে, বাজারের দোকানগুলো থেকে মিঃ টিরেট্টা আপাতত কম ভাড়া নেন বটে, কিন্তু ১নং প্রাইজের সম্পত্তি থেকে মাসে পাকা ৩,৫০০ সিক্কা টাকা অনায়াসে পাওয়া যাবে। প্রাইজের বিবরণ থেকে টিরেট্টার সম্পত্তির পরিমাণ আর ধনৈশ্বর্যের সমৃদ্ধি সহজেই অনুমান করা যায়।

শুধু জমিজমা, ঘরবাড়িই নয়—প্রাইজ থাকতো হরেক-রকমের। ১৭৮৪ সালের এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায়,

"উমেশ যোগ দর্শন"
(প্রথম খণ্ড)
চারিটি ভাষায়: ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী
(গ্রন্থকার: শ্রীযোগীরাজ উমেশচন্দ্রজী)

যোগ সম্বন্ধে একটি চমৎকার নিবন্ধ, যাহা ব্যাখ্যা কোরেছে কিভাবে হজমশক্তি, শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য শারীরিক অঙ্গসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১০৮টি বাস্তব আসনের চিত্রে সম্পূর্ণ। যোগের দ্বারা নেচারোপাথি, ক্রোমোপাথি, সাইকো-থেরাপি ইত্যাদি নিরাময় সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। প্রতিটি গৃহ, হাসপাতাল ও গ্রন্থাগারে যোগ্য স্থান পাবার অধিকারী। মূল্য ১০৲; ডাকখরচ অতিরিক্ত; ভি. পি. করা হয় না।

যোগাসন চার্ট | আর্ট গ্লেজড্ কাগজে ছাপা, যোগাসনের চিত্র সম্বলিত একটি ছবির তালিকাও পাওয়া যায়। ডাকখরচ সহ মূল্য ২'৫০ ন. প. মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিতব্য।

রামতীর্থ ব্রাহ্মী তৈল

পেটেন্ট নং ১ রেজিষ্টার্ড

মাথাধরা, খুস্কি নিবারণ ও চুলওঠা বন্ধ করার জন্য একটি অমূল্য বলকারক। বহু মূল্যবান যৌগিক উপাদান সহযোগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মস্তিষ্কের চলাচল ব্যবস্থা উন্নত করে এবং সুনিদ্রা আনয়ন করে। কেশবর্ধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। সকল ঋতুতে ইহা প্রত্যেকের পক্ষে উপকারী। বড় বোতল ৩৲, ছোট ২৲, সর্বত্র পাওয়া যায়।

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম
দাদার, সেন্ট্রাল রেলওয়ে: বোম্বাই-১৪
টেলিফোন—৬২-৬১১ টেলিগ্রাম "প্রাণায়াম" দাদার: বোম্বাই

প্রাইজের মধ্যে রয়েছে হীরা-চুনি-পান্না-মুক্তা ইত্যাদি দামী পাথর বসানো আংটি, কানের দুল, সোনার বাঁটের ছুরি, নস্যির কৌটা, মূল্যবান আসবাবপত্র, আয়না, টাইমপিস, ওয়াল-ক্লক, রূপোর টি-সেট ইত্যাদি।

ইংলণ্ডের স্টেট-লটারির অনুকরণেই কোম্পানির আমলের কলকাতায় লটারি খেলা সুরু হয়। সারা বছর ধরে চলতে থাকলেও, শীতকালেই যেন খেলা জমে উঠতো। লটারি নিয়ে গোটা শহরটা সে-সময় যে কিরকম মেতে উঠতো তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় খবরের কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যে: *The demands for tickets in the Calcutta Lottery is astonishingly great. A society of gentlemen have subscribed for 500 tickets. The wheels are making by Nichols and Howatts upon the same construction as those used for the State Lotteries in England.*

জনহিতকর কাজে সাহায্যের উদ্দেশ্যে লটারির চেষ্টা প্রথম দেখা যায় ১৭৯৩ সালে। সে-বছর বেঙ্গল-লটারির কমিশনারেরা লটারিতে অনেক টাকা তুলে নেটিভ হাসপাতালের কমিটিকে সে-টাকা দিতে যান। কমিটির বোধহয় ঐভাবে টাকা নিতে প্রেস্টিজে বেধেছিল। তাঁরা নিতে রাজী না হওয়ায়, সে-টাকা দেউলিয়াদের সাহায্যের জন্যে দান করা হয়। সেই থেকেই কলকাতার অঙ্গসজ্জার জন্যে লটারি করে টাকা তোলা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়।

১৮০৫ সালে এক লটারিতে একহাজার সিক্কা টাকার পাঁচহাজার টিকিট বিক্রি হয়। মোট টাকার শতকরা দশভাগ কলকাতা টাউন-হল্ তৈরির জন্যে আর দু'ভাগ লটারির খরচ হিসাবে রেখে, বাকী টাকার প্রাইজ দেওয়া হয়।

কলকাতার লটারির প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। শহরের উন্নতির মূলে তাঁর দান বড় কম নয়। ১৮০৫ সাল থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত তাঁর 'টাউন ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি'র হাত দিয়েই লটারির টাকার বড় বড় ট্যাঙ্ক, প্রশস্ত রাস্তা, টাউন-হল্, বেলেঘাটার খাল-কাটা ইত্যাদি নানা কাজ হয়েছে।

লটারির গুণ দেখে কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ১৮১৭ সালে 'লটারি-কমিটি' নিয়োগ করেন। কলকাতা শহরের উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করার উদ্দেশ্যে এই কমিটিকে দেওয়া হয় আগেকার সতেরোটি লটারির উদ্বৃত্ত সাড়ে চার লক্ষ টাকা। শুধু টাকাই নয়, সেইসঙ্গে যথেষ্ট প্রশাসনিক ক্ষমতাও দেওয়া হয় লটারি-কমিটিকে। বলতে গেলে, প্রায় ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ছিল শুধু নদী, বন্দর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ। বাকী সব কাজের ভার দেওয়া হয় লটারি-কমিটির উপর। এইভাবে লটারি-কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কোম্পানির সেটেলমেন্ট কলকাতা শহরকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার কাজ চলতে থাকে।

এই কমিটির উদ্যোগেই কলকাতার ধুলোভরা রাস্তায় প্রথম জল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তার আগে 'জেন্ট্'রা সকাল-সন্ধ্যায় রেস-গ্রাউণ্ডে হাওয়া খেতে বেরিয়ে দশগুণ ধুলো খেয়ে হাঁফিয়ে উঠতেন। শহরের বড় বড় রাস্তায় এইভাবে জল দেওয়ার ব্যবস্থা হ'লে, ১৮১৮ সালের 'ক্যালকাটা গেজেট' খুশি হয়ে লেখেন: *We observe with much satisfaction the great improvement to the convenience and comfort of the residents in the Chowringhee by the road being watered from the corner of Dhurrumtallah upto the Chowringhee Theatre.*

রাস্তায় জল দেওয়ার উদ্দেশ্যে কমিটি চাঁদপাল ঘাটে একটা ইঞ্জিন বসিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু শুধু রাস্তায় জল দেওয়াই নয়—নোংরা, জঙ্গলাকীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর কলকাতাকে আধুনিক মহানগরীর রূপসজ্জায় সাজিয়ে তোলার কাজও এই লটারি-কমিটি প্রথম সুরু করেন। উত্তর থেকে দক্ষিণে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, উড স্ট্রীট প্রভৃতি বড় বড় রাস্তা, ট্যাঙ্ক, কলেজ স্কোয়ার, কর্নওয়ালিস স্কোয়ার, ওয়েলেসলি স্কোয়ার প্রভৃতি সুন্দর স্কোয়ারও এই কমিটির উদ্যোগে ক্রমে তৈরি হয়। এ ছাড়া চারধার দিয়ে রাস্তা বার ক'রে, পুকুর কেটে ময়দানের সৌন্দর্য বাড়ানো, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলুটোলা স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, মীর্জাপুর স্ট্রীট ইত্যাদি রাস্তা-তৈরির কাজও হয় এই কমিটির পরিচালনায়।

লটারি-কমিটির আমল কবে শেষ হয়েছে। কলকাতার রাস্তাঘাটের আরও উন্নতি হয়েছে—কত নতুন রাস্তা, স্কোয়ার, পার্ক, লেন তৈরি হয়েছে। লম্বে-চৌড়ে কলকাতার পরিসরও অনেক বেড়ে গেছে। কলকাতা এখন মহানগরী। এই মহানগরীর অঙ্গসজ্জা কিন্তু আজও শেষ হয়নি। আবর্জনা-বস্তি-খাটালের পরিবেশ থেকে মুক্ত করে মহানগরীকে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে তোলার যে-চেষ্টা আজও চলেছে 'কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট'-এর কল্যাণে, তার শুভ উদ্বোধন করে যান এই লটারি-কমিটি আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে।

পাতাল-প্রবেশ

[বিপরীত রামায়ণ হইতে]

অ. কৃ. ব.

"বৃদ্ধা হইয়াছি আমি অযোধ্যার রাণী
কৌশল্যা, এবারে তাই লইব বিদায়
সিংহাসন হতে। মোর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ
জনক-নন্দিনী সীতা সর্বজনপ্রিয়া ;
রাণী-পদে অভিষিক্তা করিব তাহারে।
তোমরা কি কহ ?"
শুনি' সভাসদগণ
"সাধ্বী ! সাধ্বী !" এই কথা কহে সমস্বরে।

রাজ্যময় এ বারতা হইল রটিত,
রাজ্যময় শুরু হ'ল আনন্দ-হুল্লোড়
বালা বৃদ্ধা নির্বিচারে।
শুধু একজন
যোগ নাহি দিল এই হৈ-হল্লা স্রোতে।
মন্থর তাহার নাম, কুব্জ-পৃষ্ঠ দাস—
এসেছিল দশরথ-রাজগৃহ হতে
দশরথ সাথে, যবে দশরথ আহা
এসেছিল অযোধ্যায় নব পতি হয়ে
কৌশল্যার।
বক্রমনা মন্থর দুর্মতি
দশরথে ধিক্কারিয়া কহিল নিভৃতে :
"মূর্খ, শুধু মূর্খ নহ, মহামূর্খ তুমি
হে মত্ত, ভাব না তাই কি হইবে দশা
তব, সিংহাসনে আহা বসে যদি সীতা।
এমনিতে তোমারে সে গ্রাহ্য নাহি করে,
তার 'পর রাণী হলে উঠিতে বসিতে
নাকাল করিবে তোমা।

"… দুটি বর প্রাপ্য তব"

হও সাবধান,
রাণী হতে নাহি দিয়ো জনক-কন্যারে,
নতুবা কপালে তব অশেষ দুর্গতি।"

শুনি' থরথর কণ্ঠে কহে দশরথ
"কি হবে উপায় মোর, হে মন্থর দাদা?
কেমনে করিব রোধ সীতা-অভিষেক?
রাণী কৌশল্যার সে যে জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ,
সিংহাসনে তাহারি তো অগ্র-অধিকার।
তা ছাড়া কৌশল্যা রাণী সর্বশক্তিমতী
অযোধ্যায়, মোর কিছু নাহি তো ক্ষমতা।"

"তথাপি উপায় আছে। শোনো তবে কহি।"
কহিল মন্থর, "রাণী কৌশল্যার আহা
একবার ক্ষত হতে বিষরক্ত চুষি',
অন্তবার নিজ রক্ত দিয়া তার দেহে
রক্ষা করেছিলে প্রাণ, তারি বিনিময়ে
দুটি বর প্রাপ্য তব।
তারি এক বরে
পাঠাও কানন-বাসে চৌদ্দ বর্ষ তরে
সীতারে, আরেক বরে ভরত-ঈশ্বরী
মাণ্ডবীরে করো আহা অযোধ্যার রাণী।
দুই ঢিলে এক পাখী হইবে নিহত,
স্বস্তিতে রহিবে তুমি মাণ্ডবী শাসনে
সীতাহীন অযোধ্যায়।"
শুনি দশরথ
চলিলেন রাণী পাশে মাগিবারে বর।

"কহ মোরে রবিমুখ, কি তব প্রার্থনা।
তোমারে অদেয় কিছু নাহি তো জগতে।"
কহেন কৌশল্যা।
"তবে করহ সীতারে
চৌদ্দবর্ষ-নির্বাসিতা, মাণ্ডবীরে রাণী।"
কহিলেন দশরথ।
"অন্য বর চাহ।"
কাতরে কৌশল্যা রাণী কহিলেন কাঁদি।
"অন্য বর নাহি চাহি।" কহেন উত্তর
ভ্রূকুটিত দশরথ। "না দাও না দিবে।
বরান্তরে রাজী নহি, অয়ি বরাননে।"
বচনে বন্দিনী আহা কোশল-নন্দিনী

তিনের বিদায়

কাঁদেন লুটায়ে ভুঁয়ে হায় হায় করি
উন্মাদিনী সম।
কিন্তু নাহিক উপায়,
দিতে হল দুই বর সত্যরক্ষা তরে।
পত্নী সীতা সহ আহা যেতে বনবাসে
শ্রীরাম নাছোড়বান্দা।
কহিলেন সীতা:
"দীর্ঘ বনবাস কষ্ট কেমনে সহিবে?
তুমি যে অবল নর। অসংখ্য বিপদ
আছে যে জঙ্গলে।"
"জানি।" কহিলেন রাম।
"তবু জানি যেথা তুমি সেথা স্বর্গ মোর।
জীবনে মরণে তুমি…" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তা শুনি লক্ষ্মণ-পত্নী ঊর্মিলাও আহা
সাজিল সীতার সাথে যেতে বনবাসে,
ফেলি অযোধ্যায় হায় বেচারা লক্ষ্মণে।
কাঁদিল অযোধ্যা পুরী তিনের বিদায়ে।
কৌশল্যা গেলেন মারা মহামনোদুখে।

মাতৃগৃহ হতে ফিরি মাণ্ডবী সুন্দরী
করেন তাণ্ডব শুরু দশরথ 'পরে।
কহিলেন "সীতাদেবী রহিতে জীবিতা
আমি নাহি হবো রাণী। দিদির স্যাণ্ডাল
রাখি' সিংহাসন 'পরে তাঁরি নামে আহা
রাজত্ব চালাবো।" যথা বাক্য, তথা কাজ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে শেষে কিছুদিন বাদে
উপনীত তিনজন পঞ্চবটী বনে।
সেথায় নির্মাণ করি' পর্ণের কুটীর
আনন্দে করেন বাস।
একদিন রাতে
সীতা রাম রয়েছেন কুটীর-অন্দরে
বিশ্রম্ভ-আলাপে মগ্ন, বাহিরে ঊর্মিলা
নীরবে প্রহরা-রত হাতে ধনুর্বাণ।
আকাশে হাসিছে চাঁদ, লক্ষ লক্ষ তারা
করিতেছে ঝিক্‌মিক্ জোনাকির মতো।

হেনকালে এলো সেথা বিধির বিধানে
লঙ্কাবাসী মন্দোদরী-ভ্রাতা নিশাচর,
নাম সূর্পণখ।
হেরি ঊর্মিলারে তার
মুহূর্তে মজিল মন। পুরুষসুলভ
লজ্জায় খাইয়া মাথা হৃদি-নিবেদন
করিল সে ঊর্মিলার পাদপদ্মযুগে।

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই।" শুনিল জবাব।
"দুটি পাদপদ্মে মোর একটি হৃদয়
আগেই নিয়েছে ঠাঁই। সে হৃদয় হায়
ভুগিছে বিরহ-ব্যথা অযোধ্যাপুরীতে
নীরবে আঁখির জলে।"
কহে সূর্পণখ
"প্রেম-শরে জর্জরিত হৃদয় আমার
পারিব না, পারিব না লইতে ফিরায়ে।
হয় প্রেম, নয় মৃত্যু দেহ তুমি মোরে
চন্দ্রাননে।"
পরক্ষণে উৎকট চীৎকার।
সূর্পণখ, ছিন্ন-নাক ঊর্মিলার তীরে,
ছুটিল লঙ্কার পানে।

দিদি মন্দোদরী
শুনিয়া ব্যাপার ক্রোধে কহেন কাঁপিয়া
"ঊর্মিলার এত স্পর্ধা, কাটিয়াছে নাক
আমার ভ্রাতার। জানি, সীতার প্রশ্রয়ে
বেড়েছে সে এত। শিক্ষা দেবো তারে আমি।"

সেই রাগে রামচন্দ্রে করিয়া হরণ
রাখেন অশোকবনে রাণী মন্দোদরী
চেড়ী-প্রহরায়। সেথা সীতামুখ ধ্যানে
ভাসেন জানকীনাথ নয়নের নীরে
অবিরাম।
মন্দোদরী আসি' বহুবার
কহিলেন "স্বর্ণলঙ্কা-অধিশ্বরী আমি,
আমারে ভজনা কর সীতারে ভুলিয়া
হে শ্রীরাম! দশাননে করিয়া বাতিল
একাসনে তোমারে করিব পাটরাজা।"
তবু না টলিল চিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের।

সূর্পণখ, ছিন্ন-নাক ঊর্মিলার তীরে, ছুটিল লঙ্কার পানে

অবশেষে একদিন আসি' হনুমতী
বহু সন্ধানের পরে, কহিলেন রামে
"মোছ অশ্রু হে শ্রীরাম, আর নাহি ভয়,
সীতাদেবী করিবেন তোমারে উদ্ধার
অচিরে। ধৈরয ধর সৎ সাধু তুমি।"

লঙ্কা অবরুদ্ধ হলো। বাধিল লড়াই।
মরিল বানরী কত, কত যে রাক্ষসী
কে জানে হিসাব তার?
কহিল রাবণ
কাঁদি সকাতরে "শোনো শোনো মন্দোদরী,
এখনো ফিরায়ে দাও শ্রীরামচন্দ্রেরে
সীতার সকাশে। লঙ্কা রক্ষা পাবে তবে,
নহিলে সোনার লঙ্কা যাবে ছারে খারে।
এখনো দুর্মতি ত্যজ, এ মোর মিনতি।"

হুঙ্কারিয়া কহিলেন রাণী মন্দোদরী
"ডুবুক সোনার লঙ্কা চির রসাতলে,
তবু না ছাড়িব রামে, এ মোর শপথ।"

ধ্বংস হলো স্বর্ণলঙ্কা, রাণী মন্দোদরী
ত্যজিলেন ইহলোক সীতার শায়কে।

শ্রীরামে লইয়া সাথে বনবাস-শেষে
ফিরিলেন অযোধ্যায় সীতা ও ঊর্মিলা।
পুরিল অযোধ্যাপুরী "জয় জয়" রবে।
সিংহাসনে মহানন্দে বসিলেন সীতা
শ্রীরামে দক্ষিণে লয়ে।
একদিন হায়
ভদ্রদূতী আসি' কানে কহিল বারতা
"অযোধ্যাবাসিনী সবে করিছে জল্পনা
এতদিন বন্দী থেকে রাক্ষসী মহলে
আছে কি অপাপবিদ্ধ রামের চরিত্র?
নানা মনে নানা রূপ জাগিছে সন্দেহ।"

শুনিয়া কহেন সীতা "প্রকাশ্য দরবারে
অগ্নিতে পরীক্ষা হবে শ্রীরাম চরিত্র।
তাহাতে করিলে পাস রাখিব রামেরে,
অন্যথায় চিরতরে করিব বর্জন

"মোছ অশ্রু হে শ্রীরাম, আর নাহি ভয়,…"

যদ্যপি এ চিত্ত হয় কাটিয়া চৌচির।
প্রজারঞ্জন জানি কর্তব্য আমার।"

জ্বলিল অগ্নির কুণ্ড, লেলিহান শিখা
দাউ দাউ করি' উঠে আকাশের পানে।
শর্ত হলো কুণ্ডমাঝে কিছুক্ষণ থাকি'
অক্ষত ফিরিতে যদি পারেন শ্রীরাম,
হইবে প্রমাণ তবে রাক্ষসী মহলে
কোনো পাপ পশে নাই চরিত্রে তাঁহার।

পরীক্ষা হলেন পাস সীতাব্রত রাম।
বাহির হলেন যবে অগ্নিকুণ্ড হতে

মনে হলো স্নান করি' সরযূর জলে
তোয়ালেতে অঙ্গ মুছি' এসেছেন তিনি
স্নিগ্ধ শান্ত দেহে।
দেখি' কহিলেন সীতা
সভাসদগণে "অগ্নিপরীক্ষায় রাম
করিয়াছে পাস। সবে কর অনুমতি
নিষ্পাপ বলিয়া তারে করিব গ্রহণ।"

নীরব রহিল সভা। সভাসদগণ
সবে অধোমুখে বসি'; বুঝিলেন সীতা
এখনো সন্দেহে ভরা সবার অন্তর।
বুঝিলেন রামচন্দ্র আরও কঠিন
পরীক্ষা করিলে পাস তথাপি ইহারা
নিষ্পাপ বলিয়া নাহি করিবে বিশ্বাস।

সীতার মুখের পানে তাকায়ে শ্রীরাম
দেখিলেন নাহি সেথা কোনরূপ হায়
আশার আভাস। তিনি কহিছেন যেন
"প্রজানুরঞ্জিকা আমি অসহায়া রাণী।
এদের সন্দেহ যদি নাহি হয় দূর
কিছু না হইবে মোর একার বিশ্বাসে।"

কাঁদিয়া কহেন রাম "আর নাহি সহে,
দ্বিধা হও, দ্বিধা হও, হে মাতা ধরণী!"

মাতা হইলেন দ্বিধা, সন্তান শ্রীরাম
অদৃশ্য হলেন আহা প্রবেশি' পাতালে,
সঙ্গে সঙ্গে বুজে গেল প্রকাণ্ড ফাটল।

"রাম! রাম! রাম!" বলি' আর্তকণ্ঠে হায়
ডাকিলেন সীতাদেবী। কে দিবে উত্তর?
সতত দিবানিশি সীতা কাঁদেন বিষাদে।

চেনাশোনার বাইরে

অজয়মোহন ভট্টাচার্য

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

আট তারিখ রাত। কাজের অবস্থা ভালো। মনটা খুশী।

বিক্রমকে বললাম—"চলো ওপরে, গান শোনাবো। রবীন্দ্রনাথের গান।"

যাবার পথে মহারাষ্ট্র-দলের খবর নিয়ে গেলাম।

ওপরে উঠেছি। সুন্দর কণ্ঠে উর্দু গান ভেসে এলো। দিল্লীর সেন্ট স্টীফেন্স কলেজের একটি ছাত্র গান গাইছে "দিল্ তুমে দিয়া থা রাখ্নেকো"—Christina Rossetti-ও গেয়েছিলেন—

You took my heart in your hand
With a friendly smile
With a critical eye you scanned
Then set it down.

—সেই রসের গান। সকলেই ছেলেটিকে 'পল্' বলে ডাকে দেখলাম। তাঁবুর ধারে বসে পল্ গান গাইতে লাগলো, আর বৃষ্।

আমি আমার তাঁবুতে বসে গান শুনছি।

বিক্রম জিজ্ঞাসা করলো—"আপনার মনে হয় কাজ আমরা শেষ করতে পারবো?"

আমি সোৎসাহে বললাম—"নিশ্চয়।"

আগের রাতে ঘুম ভালো হয়নি। সারাদিন পরিশ্রম গেছে। কখন চোখ বুজে এসেছে। কে যেন তাঁবুতে ঢুকলো। জেগে গেলাম। মুখের ওপর টর্চের আলো।

"ঘুমিয়ে পড়েছেন? আমি তো শুনলাম অনেক রাত অবধি জেগে থাকেন।"

দুর্গাপ্রসাদ এসেছে। উৎকলের দুর্গাপ্রসাদ, কটক শহরে বাড়ী। সুগঠিত, সুশিক্ষিত শ্রীমন্ত-যৌবনময় ছেলে। পাশের তাঁবুটায় ওরা তিনটি উৎকলবাসী ও একজন বাঙালী থাকে।

আমি বললাম—"এসো, বোসো; খবর ভালো তো?"

"হ্যাঁ, আমাদের গ্যাংটার ধারে-কাছেও আজ গেলেন না। কাজ আমি আপনাকে করতে দিতাম না। সে-কথা আমরা আগেই ঠিক করে ফেলেছিলাম। কিন্তু আপনাকে ছাড়বো না।"

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—"না না, সেকি কথা! আমি ডাক্তারের সঙ্গে একটা গাঁয়ে চলে গিয়েছিলাম। নৈলে—কাজ আমি করবোই। সেইজন্যেই তো আসা। এত রাতে কি এই বলতেই এলে?"

"না স্যার, এ কথা বলার জন্য নয়। মনটা ভালো লাগছে না। ওরা তাস খেলছে। হল্লা হচ্ছে, ঘুমুতে পাচ্ছিনা। জঙ্গলটা থেকে আজ শাঁ-শাঁ শব্দ বেরুচ্ছে। কান পাতা যাচ্ছেনা।"

হেসে বললাম—"মনটাও হুহু করছে বুঝি?"

"তা করছে। মন আমার আছে জানতাম না। এখন এখানে এসে বুঝছি। শরীর আর মস্তিষ্ক চর্চাই করেছি। কিন্তু হুহু করছে অন্য কারণে। আহানাকে নিয়ে এই কাজে নেমেছি আমরা। আমরা যুবকদলের হয়ে দেশের কাজে এসেছি। কেবল কি মাটি কেটে, পাথর সরিয়ে, জঙ্গল পুড়িয়ে যাব?"

"আর কি চাও?"

"কোনও সংগঠন, কোনো প্ল্যান, কোনো প্রণালী।"

"আর একটু বুঝিয়ে বলো, দুর্গাপ্রসাদ।"

"দেখুন, উৎকল কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছি। আমার খরচ আমার জিলা কংগ্রেস কমিটি বহন করছে। কংগ্রেস-ভক্ত আমি। কিন্তু এ-দলে তো কংগ্রেসের কোনও নাম-গন্ধ থাকা উচিত নয়। এখানে আমরা মাত্র যুবক। তাই তো কথা ছিল।"

"বেশ তো। তাই হোক। এতে ঘাবড়াচ্ছো কেন?"

"ঘাবড়াবোনা? আহানা কথায় কথায় কংগ্রেস আর নেহেরু আর ইন্দিরার কথা ব'লে ব'লে ক্যাম্প্‌টার মধ্যে বিক্ষেপ এনেছে বুঝছেন?"

আশঙ্কিত হয়ে বললাম—"এরই মধ্যে বিচ্ছেদ? বলো কি দুর্গাপ্রসাদ?"

"না, সে-বিচ্ছেদ বলছিনা। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র হলেও, তারা নানা দলের। কেউ সংঘের, কেউ জনতা-পার্টি, কেউ কম্যুনিস্ট পার্টি, কেউ সোস্যালিস্ট, কেউ প্রজা—লক্ষ্য করে থাকবেন। আমার এটা ভালোই লেগেছিল। এখানে যদি এমন কোনও ব্যবস্থা থাকতো আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তা বলতে পেতাম, হয়তো রাজনীতির চালবাজির মধ্যে দেশের প্রতি কর্তব্যকে আমরা একতারার মতো দেখতে পেতাম।"

"তোমার মতলব কী? যদি পারি তোমায় সাহায্য করবো।"

"আমি চাই সপ্তাহে অন্ততঃ একবার একটা ডিবেট-মতো হোক। তাতে সবাই বলবে। এতে অনেকটা মতামত জানাশোনার ব্যবস্থা হবে।"

"এ তো ভালো প্রস্তাব।"

"কিন্তু আম্বানা মানছে না।"

"কী বলে?"

"বলছে, এতে নাকি ঝগড়াঝাঁটি হয়ে দল ভেঙে যাবে, বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তা ছাড়া কংগ্রেস যখন ক্যাম্প অর্গানাইজ করেছে তখন কংগ্রেস-বিরোধী মতবাদ প্রকাশের সুযোগ এ-ক্যাম্পে করবেনা।"

আমি ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলাম। হেসে বললাম—"এ ক্যাম্পে কংগ্রেসের চরখাওয়ালা ঝণ্ডা উড়ছেনা, দুর্গাপ্রসাদ—জনগণমনের প্রতীক চক্রচিহ্নিত পতাকা উড়ছে। আজ যাও, কাল কথা বলবো।"

•

পরের দিন ভোরবেলা যখন ক্যাম্পে ঢুকছি তখনও গোপী আর বিক্রম শুয়ে। বিক্রম বললো—"হোলো কথা?"

আমি বললাম—"কী কথা?"

বিক্রম বললো—"আম্বানাকে বোঝানো হোলো?"

আমি বললাম—"আড়ি-পাতা বদভ্যাস, বিক্রম!"

বিক্রম ঝাড়াঝুড়ি দিয়ে উঠে বললো—"বাঃ, কানের কাছে বসে কাল দুপুর-রাতে কাজিয়া চালালেন, আর আড়ি পাতলাম আমি! এত ভোরে উঠে আপনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম আম্বানার কাছে চলেছেন। কী বললো ও?"

"কী আবার বলবে? রাজী হোলো, যদি আমি ভার নিই যে ঝগড়াঝাঁটি হবেনা।"

বিক্রম বললো—"আম্বানা একটা নীরস পাঁঠা!"

গোপী হেসে ফেলে বললো—"আর তুই সরস!"

তুলসীরাম চা নিয়ে এসে গেছে।

আজ তুলসীরাম খুব খুশী, তিনজনকেই জাগা পেয়েছে।

"কাল রাত্তে একটা গোলমাল টের পেয়েছিলেন, স্যার?" জিজ্ঞাসা করলে গোপী।

"গোলমাল? কোথা থেকে?"

"এই তাঁবুতে। প্রথম ভাবলাম কেউ ঢুকেছে! তারপর কেবল খড়্‌বড়্‌ খড়্‌বড়্‌। নিশ্চিত কোনও জানোয়ার ভেবে টর্চ জ্বালতেই কি-একটা ছুটে চলে গেল। ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর বিক্রমকে তুললাম। বিক্রম তো ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলে। আবার শুলাম। নখায়, তাকিয়ার মাথার কাছে স্পষ্ট শব্দ! আবার টর্চ জাললাম। আবার পালালো।"

তুলসীরাম বললে—"পাহাড়ী সাপ, হুজুর। এ-তাঁ ছাড়ুন।"

সর্বনাশ! বললাম—"সাপ হ'লে চার-পায়ে তড়্‌বড়্‌ করে ছুটবে? ভালুকের বাচ্চা বোধহয়।"

তুলসীরাম টুপীটা খুলে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—"ভূত হবে!"

একটা রুমালে বাঁধা ছোলা ছিল। ছোলাগু ছড়ানো। রুমালটায় বিরাট ফুটো। আমি বললাম—"তুলসীরাম, তোমার ভূত ছোলা খুব ভালবাসে দেখ পাচ্ছি।"

আজ সকালটা চকচকে পরিষ্কার। রোদ এসে পড় পিঠে। শাবল চালাচ্ছি। একধারটা কেটে যাচ্ছে, কি কোণটায় বিরাট জগদ্দল চাইটা যেন যম। নড় চায়না। অভ্র-মেশানো জমাট পাথর। শাবলের ঘা স নেয়। গর্ত করতে দেয়না। আজ থেকে একটা ক সরকারী কুলী এক-একটা গ্যাঙে আছে। তারা দেখা কী করতে হবে। আমাদের সঙ্গের লোকটার নাম ছিরু সে উপদেশ দিলে চারপাশ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে তারপর ত দিয়ে জমি কেটে চাপ দিলে এ-চাঙড় সরবে। সারাদি গেল সেই পরিখা কাটতে। তিনি যেখানে ছিলে সেখানেই রইলেন।

কাজ সেরে ক্যাম্পে ফিরছি। এ দল, ও দল সব সঙ্গ নিচ্ছে। ম্যাথাম্যাটিক্সের সেই রামমূর্তি দু'খানা হাত দেখালে। বেচারীর হাতে কুড়ুল। তিনটে গাছ সে পেড়ে ফেলেছে। কিন্তু কি-একটা গাছের রস হাতে লেগে দুটো হাতের চেটো, পিঠ, কব্জি পর্যন্ত ছোটো-বড় ফোস্কায় ভরে গেছে। দেখতেও বীভৎস লাগে।

রামমূর্তিকে নিয়ে সোজা ডিস্পেন্সারিতে গেলাম। ডাক্তার রামমূর্তিকে দেখেই বললো—"ঠিক হায়, এবার হাত-দু'খানা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবো। কুড়ুল ঠিক চালাতে পারবে। চালিয়ে যাও। ফোস্কা সব উড়ে যাবে। থামালেই বিপদ হবে। ওসব হয়। চালাও।"

রামমূর্তি বড় খুশী। "তাই চাই, ডাক্তার। এখানে এসে বসে থাকতে চাইনা।"

বারান্দায় দুটি ছেলে বসে।

"ওকি, কাজে যাওনি তোমরা?"

"শরীর অসুস্থ।"

"তোমার রুগীর সংখ্যা কতো হোলো, ডাক্তার?"

"মরাঠা-ক্যাম্পের আটজন, এরা দুজন, আরও দুজন আছে।"

"ডাক্তার, ছোটোখাটো রোগে তুমি যদি এখানেও সার্টিফিকেট দাও, আমাদের কাজ এগুবেনা বুঝতে পারছো?"

হাসতে হাসতে ডাক্তার বললো—"এইসব দুধের বাচ্চারা ভুলে যায় যে, আমি ফৌজের ডাক্তার। আমি বলেছি আজ খানা বন্ধ। সাবুদানা বা বার্লি বা ভাতের মাড় ব্যবস্থা।"

তাতেই ওদের মুখ কাচুমাচু।

ডাক্তার বলে চললো—"সকালের চা-পরোটা বন্ধ ছিল কিনা!"

"বেচারী!" আমি বললাম—"আর এরকম কোরোনা, ভাই। কতবড় মুখ করে এসেছি। কত আশা কত গর্ব। এখন কাজ করতে নেমে পিছ-পা হবো? ছোঃ।"

ওরা তারপর থেকে আর কামাই করেনি অবশ্য, কিন্তু ডাক্তার না থাকলে রোজই কামাইয়ের সংখ্যা বেড়ে যেতো।

ওরা চলে গেল। রামমূর্তিও চলে গেল। ডাক্তারের ঘর থেকে মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে। ডাক্তার বললে—"আজ ভাত আছে, বাঙালীবাবু!"

আমার মন ভালো নেই। আমি বললাম—"আজ থাক। কিছুই ভালো লাগেনা।"

"কেন মাস্টার?—

> '*Why so pale and wan fond lover?*
> *Prithee why so pale?*
> *Will, when looking well can't move her*
> *Looking ill prevail?*'

—কে যেন, Shelly না Wordsworth?"

ডাক্তার ঠাট্টা ক'রে সব সময়ে কবিতা ব'লেই বলতো—Shelly না Wordsworth,—জানতো সব ঠিক। সারা জীবনে ডাক্তার কেবল পড়াশুনাই করেছে। আমি কয়েকদিনেই এ বিষয়ে ওকে ধরে ফেলেছিলাম।

আমি পাল্টা ছাড়লাম—

> "*Come oh thou traveller unknown*
> *Whom still I hold but cannot see.*"

ডাক্তার বললে—"ব্যাপার কি? কে এই পথিক—যে তোমায় ধরে রেখেছে, দেখতে দিচ্ছেনা। বলো হে বলো।" চোখে অপরূপ কৌতুকের হাসি।

বলি-কি-বলিনা ইতস্ততঃ করছি। বললাম—"ডাক্তার, কাছাকাছি স্ত্রীলোক কোথায় আছে?"

দাঁড়িয়ে উঠে বললো—"বলো, তাই বলো। যা শীত! বটেই তো! তা বেশ, খাও দাও—আজ নয় সন্ধ্যার পর ব্যবস্থা করা যাবে।"

আমি তো লজ্জায় লাল।

ডাক্তারের চোখে অজস্র হাসি। মাঝে ডাক্তারের বয়-চাকরটা দু'কাপ কফি রেখে গেল। মাথায় গোল টুপির ওপর কম্ফর্টার বাঁধা, গলায় কী জড়ানো। ঢলঢলে পোশাক নোংরামিতে ভরা। চোখ-দুটো চপল, ঠোঁট লাল। পা পর্যন্ত ঢাকা পা-জামা।

আমি বললাম—"ভাখো, বাঁদরামি কোরোনা। তুমি বেশ জানো আমি মেয়েমানুষ চাইনি।"

"কিন্তু তুমি বললে স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোককেই তো মেয়েমানুষ ব'লে বলে জানি। স্ত্রীলোক আবার কিরকম চায় সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক?"

"ডাক্তার, যদি তুমি সামলে কথা না বলো, আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো।" ডাক্তার ততক্ষণে আমার হাত ধরেছে। "এই ক্যাম্পের আশেপাশে কখনও কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক তো দেখিনি। অথচ…"

"অথচ কী?" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো।

"অথচ আমি দেখেছি।"

"দেখেছো। তা কী? প্রেমে পড়েছো?"

"না, তাও নয়।"

"ওঃ, বলবেনা তুমি। বেশ। ওদিকে খাবারের তাড়া পড়েছে। বারোটা বেজেছে। আমার আন্তরিক সমবেদনা জেনো। আপাততঃ খাবার ঘরে চললাম।"

ডাক্তার বেরিয়ে গেল। আমার কথাটা পাড়া হোলোনা। কেমন যেন ও আমায় চটিয়ে দিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ডাক্তারের গোসলখানায় ঢুকলাম। বয়টা গরম জল দিল এক-বালতি। জানতোনা গরম জলে নাইনা। কিন্তু সেদিন নাইলাম। স্নান সেরে খাবার ঘরে গেলাম। ডাক্তার আগেই বলে দিল—"মাস্টার-সাবের ভাত আমার ঘরে দিয়ে এসো।"

মুরগী নয়; শিকার-করা পাখী, একটা পাহাড়ী ডাক্তারকে দিয়ে গেছে। সেই ঝোল আর ভাত খাচ্ছি। ডাক্তার বললে—"বেশ লাগছে নয়? অনেকদিন পরে ভাত।"

আমার আগেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু অন্যমনস্ক তাই বলিনি। বললাম—"হ্যাঁ, বেশ লাগছে।"

"অন্ধকার রাতে অজানা মেয়ের হাতের ছোঁয়ার মতো, নয়?"

চমকে ওর মুখের পানে চাইলাম।

ওর চোখে ঝকঝকে হাসি।

"তাহলে তুমি জানো!"

ডাক্তার বললে—"কি?"

আমি স্থির চেয়ে রইলাম।

"নাঃ, বিলকুল প্রেমে পড়েছো। নৈলে এমন পাগল হয়ে গেলে খোকা। কী জানি?"

"এই যা বললে?"

"আমি তো একটা কাব্যিক উপমা দিলাম মাত্র।"

"মিথ্যেকথা। কিন্তু কে সে?"

"কে? হাসালে।" এবার ডাক্তার বিপুল স্বরে হেসে ফেললো।

"কিন্তু আমি তো কোনোদিন দেখিনি।"

ভেতরে কে হাসলো।

ডাক্তার হাঁক দিয়ে তার বয়-চাকরকে বললে—"এই—মাস্টার-সাবকে ভাত আর ঝোল দিয়ে যা।"

আমি আপত্তি করতেই বললে—"আরে, না—না—প্রেমে পড়েছেন বলে খাওয়া কম করে দেবেন, সেকি হয়!"

সেই বয়টা এবার এসে আবার পরিবেশন করতে আসলো। বেশ বুঝলাম, যাবার সময় সেই মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমি বললাম ইংরাজীতে—"চাকরটি তো তোমার দিব্যি ফাজিল! আমাদের কথার রস উপভোগ করছে।"

ডাক্তার চেঁচিয়ে বললো—"বদতমীজ্ বেয়াদব!—ঘাবড়োনা মাস্টার, কাল আর ওকে দেখতে পাবেনা।"

সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম—"আরে, না—না—ছি ছি। লঘুপাপে গুরুদণ্ড। আমরাও তো বেশ ঢেকে ঢেকে কথা বলছিনা।"

ডাক্তার বললে—"হ'লেই বা। তা ব'লে—"

"থাকগে। আচ্ছা, বলো ডাক্তার, তুমি জানলে কি করে যে আমি অন্ধকারে হারিয়ে গেছিলাম।"

"আর মিনিটে মিনিটে পড়াটা বুঝি কাউ?"

"তবে তুমি এলেনা কেন?"

"আরও ভালো হাত আমি বাগীর বাজার থেকে আনিয়েছিলাম। পাহাড়ী-ভাত—এসব বড়লুকি ওয়েষ্ট কিছু নয়। কুপথ থেকে সুপথে আনতেও ওরা কম দক্ষ নয়, মাস্টার; এবার যে-কেতাব লিখবে তাতে লিখো।"

"আর তোমার পথ?"

ডাক্তার বললে—

> *"He that is down need fear no fall,*
> *He that is low, no pride ;"*

মুগ্ধ হয়ে বললাম—"আরো বলো, ডাক্তার!"

বললে—"সব মনে রাখতে নেই। বাকীটুকু যা মনে রাখার মতো শোনো—

> *"Fullness to such a burden is*
> *That go on pilgrimage*
> *Here little, and hereafter bliss,*
> *Is best from age to age."*

তারপরই বললে—"সব লিখে রাখো রোজ?"

বললাম—"হ্যাঁ, নোট রাখি। কিন্তু কতো পড়েছো তুমি ডাক্তার!"

বললে—"কিসে? প্রেমে? একবারও নয়। পড়লে নাকি ওঠা যায়না। তাই বরাবর পিঠে বেল্ট বেঁধে সাঁতার কাটলাম।"

বিকেলে ডাক্তার চায়ে ডাকলো। কিন্তু সেই ছোকরা বয়টা নেই দেখে শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"সেই বয়টা কোথায় গেল, ডাক্তার।"

গম্ভীর হয়ে ডাক্তার বললে—"বরখাস্ত, বেয়াদবীর জন্য বাগীর মাল বাগী ফিরে গেছে।"

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"মানে?"

ডাক্তার চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললো—"তিনদি

ছিল ছেলের পোশাকে। তোমাকে যখন অতো কাছাকাছি ধোঁকা দিতে পেরেছে, দুপুরের আলোয়, নিশ্চয় আর কেউ সন্দেহ করেনি! কি বলো?"

আমি প্রায় ভেঙে পড়ে বললাম—"বলো কি ডাক্তার! ঐ ছেলেটাই আমার রাতের সেই—?"

ডাক্তার বললে—"আজ নাকি পথে গিয়ে আবার হারিয়েছিলে। কোথায়?"

বুঝলাম এখন ডাক্তার ও-কথা আর বলবেনা।

আমি দম নিয়ে বললাম—"আজ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছি। আর যে বাঁচিয়েছে তার ঋণ জীবনে শোধ হবার নয়।"

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"আর বোলোনা! আজ তোমার কাছ থেকে যখন চলে গেলাম, মনটা বেশ হালকা। আমি আর বিক্রম পরামর্শ করলাম ওপরের জঙ্গলটায় যাবো।"

"একদিন তো গিয়েছিলে।"

"তাই তো। এতো সুন্দর জঙ্গল যে মায়া পড়ে যায়। দুপুরে ছিল চড়া রোদ। পাইনের মাথাগুলো জ্বলছিল। ভাবলাম যাই। বিক্রম রাজি হলো। একটা ক্যামেরা, একটা লাঠি আর একটা ছোরা নিয়ে চললাম। একদিন ওঠা ছিল। উঠতে বেগ পেলাম না। বেশ উঠে গেলাম। জঙ্গলটার ভেতরে চলতে লাগলাম। দুর্ভেদ্য অরণ্য। রোদ এসে তলাটায় যেন কাব্য করে রেখেছে। ঘুম-ঘুম-শঙ্কিত ঝরাপাতার দল ওখানেই শেষশয্যা পেতেছে। চলি আর পায়ের তলা থেকে মাথা অবধি কেঁপে যায়। আলোছায়ার অমন সুন্দর শাড়ী জীবনে দেখিনি। দু'চোখ ভরে দেখছি। দেখতে দেখতে নেশায় পেয়ে গেল যেন। চলতেই লাগলাম। এক এক জায়গায় ঘন অরণ্য—হঠাৎ জমাট অন্ধকার; আবার রূপের তরঙ্গের মতো সোনা streamline বন্যা এসে খানিকটা জায়গা আলোর রোদে ভরে দিয়েছে। আর পতঙ্গই বা কতো রকমের! কতো ফড়িং, কতো প্রজাপতি, কতো ফুল। বড় বড় গিরগিটি হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পাখীগুলো এ-ডাল ও-ডাল উড়ে পালায়, কিন্তু বেশীদূর যায়না। পুরোনো সব আদ্যিকালের গাছ—তাদের গায়ে সব শ্যাওলাও বা কতো, অজস্র লতাপাতাও তত। এক একটা গাছের বাকল চিরে বেরিয়েছে পাতলা ফার্নের মতো পাতা, তার গায়ে ফোটা নীলবর্ণের ছোট্ট ফুল, মাঝটায় খয়েরী; আর একটা দেখলাম ব্রাহ্মীশাকের পাতার চেয়ে বড়ো, মোটা মোটা রসে ভরা পাতা—তার গায়ে গাঢ় গোলাপী কাঞ্চনফুলের মতো বড় তিন-চার থাক সাজানো পাতাধরা ফুল। সবচেয়ে ভালো এই ফুলটি তোমার জন্য এনেছি, ডাক্তার। উঃ, কী উঁচু ডালে হয়েছিল এটা! সূর্যের আলোয় সারা গা ধুয়ে দিয়ে নির্জনে স্নান করছিল—যেন চাঁদের আলোয় আফ্রোদিতের স্নান আয়ল-হ্রদের তীরে। জুতো খুলে গাছে চড়লাম। ভাখো কেমন সাদা, এমন সাদা দেখেছো কখনও? একটা পাতার দিকে চাও, প্রতিটি রেখায় যেন জমাট ক্ষীণ লাল লেগে আছে; অথচ সারা ফুলটায় সেই ক্ষীণ হারিয়ে গেছে তপনপানের পরের কলুষহীন শুভ্রতায়—যেন সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের মতো নীরব-বন্দনায় স্তব্ধ, ঝটিঘাত শুভ্রতায় আপ্লুত। আর মাঝটায় দেখছো, ডাক্তার—কেমন একটি ছোটো ডাঁটা, আর তার গায়ের পরাগ দেখছো? প্রথম গর্ভিণীর প্রাচুর্যে স্ফীত, অহংকারে শিহরিত, সম্ভাবিত প্রাণের সাড়ায় উন্মীলিত। কেমন গোল বড় সবুজ পাতা দুটি ঢেকে আছে একে দু'পাশ থেকে। এই ফুলটি নিয়ে আসতে আমার প্রায় আধঘণ্টা পরিশ্রম করতে হয়েছে।"

"কিন্তু হার দিতে হোলো ডাক্তারকে! মানাতো একটা আলতো খোঁপায়, না?"

হেসে বললাম—"কৈ খোঁপা? সে তো ফুরিয়ে গেছে দশবছর আগে। এখন আছে খোঁপার সজ্জা। তবে ফুলটা এখন যাকে দিলাম, তাকে দিয়েছি জানলে খোঁপার মালিক খুশীই হবেন।"

ডাক্তার ঘ্রাণে চুমুক দিয়ে মাথায় হাত ঠেকালো। "বোলো তাঁকে আমার কথা।...আর বলবেই বা কী, লিখছোই তো।"

"ফুলটা অনেকটা সময় নিলো। আর একটা অমন ফুল দেখিনি। আচ্ছা ডাক্তার, গাছের গায়ে যে গাছ হয়, তার ফুলগুলো এতো সুন্দর এতো বর্ণাঢ্য হয় কেন?"

"অর্কিড ওরা,—শ্যামল সমাজের বারবনিতা। বৌ রাখার খরচের চেয়ে রক্ষিতার খরচ বেশী; বনিতার গায়ের রং না থাকলেও চলে, বারবনিতার চলেনা। ধূলায় নেমে ওরা থাকতে পারেনা। সৈরিন্ধ্রী ওদের দরকার। দুটোই যে পরভৃতিকা—পরের গায়ের রস চুষে বাঁচে।...কাজেই।"

"তোমার কাব্য পেলে আর রক্ষা নেই। আমার কাহিনী আর হবেনা।"

"আরও আছে নাকি?"

"নেই ? ফুল নিয়ে নেশা ধরেছে। ক্রমাগত ওপরদিকে চেয়ে চলছি, কোথায় আবার কী ফুল দেখি। হঠাৎ সামনে দেখি প্রায় হাজার ফুট জায়গা জুড়ে একটা বাঙ্কুলে আট-কোণা ক্যাক্টাসের ঝাড়। তার মাঝ থেকে বিরাট মোটা মোটা ডাঁটি বেরিয়েছে। ডাঁটির চারধারে বড় বড় লাল ফুল। টকটকে লাল, জবার চেয়েও গাঢ়। কিন্তু ক্যাক্টাসের ঝাড়ে হাত দিতে সাহস হোলোনা। আমি বিক্রমকে বললাম, দেখা যাক্। খুব জোর একটা শব্দ হচ্ছে, খুব নিঃশব্দে মরণ এগিয়ে এলে বুকটা যেমন করে বলে গোখরো। কেন যে ভয় হোলো জানিনা। কিন্তু ভয় হোলো। হঠাৎ বিক্রম আমায় জোরে একটা টান দিয়েই ছুটতে লাগলো। পাহাড়টার যে গা বেয়ে উঠেছি, তারপর তার মাথায় চড়ে অন্য গা দিয়ে নেমে গেছি অনেকটা। এখন দৌড়াবার সময় তাই ওপরদিকে চড়তে হোলো। খানিকটা উঠে পিছনপানে চাইলাম। নৈনিতালে থাকতে হলদ্ওয়ানীর জঙ্গলে বিরাট বিরাট পাইথন দেখেওছি, শিকারও করেছি। অত বিরাট না হলেও, একটা বড় পাইথন ক্যাক্টাসের ঝাড়ের মধ্যে ঢুকছিল। তার লেজটা দেখতে পেলাম। বিক্রম বললো একমিনিট সময়। তারপরেই বিক্রম প্রায় ভেঙে পড়ে বসে পড়লো, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। আমি হাঁপাচ্ছি।

"কিন্তু তখন হোলো বিপদ। প্রথমটায় ফুলের খোঁজে, তারপর সাপের ভয়ে ছুটে কোনও দিক্‌জ্ঞান ছিলনা। দুর্ভেদ্য জঙ্গলে রাস্তা দিশা পাইনা। আমি তৎক্ষণাৎ বিপদ বুঝলেও, বিক্রম বোঝেনি। আমি বিক্রমকে বললাম—'বসলে তো চলবেনা; ফিরতে হবে।' তা ছাড়া এখন বসা নিরাপদ নয়। তারপর ঘুরি আর ঘুরি। আধঘণ্টার মধ্যে বুঝতে পারলো বিক্রম—ঘুরে ঘুরে একই জায়গায় আসছি আমরা। গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে সূর্যের গতি দেখে এগুতে লাগলাম। আরও একঘণ্টা গেল। পথ নেই। এমনি করে বিকেল হবে, সন্ধ্যা হবে, রাত্রি হবে। বিক্রম মরিয়া হয়ে বললো—'একটা পাহাড়ই তো—এর শেষ মিলবে না?' চললাম। তিন মিনিটের মধ্যে একটা বিরাট দেয়ালের সামনে এসে পড়লাম। পাইন জঙ্গল। মাটি থেকে একফুটের মাথাতেই শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গাছে গাছে এমন নিবিড় ঠাসাঠাসি যে, একটা শেয়ালও বোধহয় গলতে পারেনা। তখন একটা শুকনো কাঠ নিয়ে চালালাম। ইচ্ছা—ফোঁকর সৃষ্টি করি। যদি কেউ ভাবে। কিন্তু মন ভাঙেনি। ভয় করছিল খুবই—তবু এ জঙ্গলের গোড়া দেখছিলাম দু'চোখ ভরে। হঠাৎ মনে হোলো এ জঙ্গলে প্রথম মানুষ আমরা দুজন। এ বনদেবীর দেহের অবলোকনের প্রথম চরিতার্থতা আমার। কবে কোন্ ভূ-বিপ্লবে সমুদ্রগর্ভ থেকে ঠেলে উঠেছিল এই সুবিশাল হিমালয়। সেই হোলো বনশ্রীর পীনপয়োধর। তাতে লেগে ছিল সমুদ্র-সংস্পর্শের ক্ষতচিহ্ন, লেগে ছিল সাগরগর্ভের পঙ্কিল চিত্রলেখা। সেই পঙ্কলেখার গায়ে গায়ে শৈবালের পাপড়ি ছিল, প্রবালের চূর্ণ ছিল, ছিল সমুদ্রবুকের ফাইলস্যাক্সোর লয়েশি, ফ্যাভোসিকাই, লোফোফিলি আর হাইড্রোফাইটিদের রাশি রাশি বীজ। সেই বীজ তো সূর্যের ছোঁয়া পেয়েছে—লক্ষ লক্ষ বৎসর তপস্যা করেছে দেব-সবিতার, সূর্যরক্তে সমৃদ্ধ করেছে বালুর ফুল; লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে পাতা আর শিশিরের প্রলেপ দিয়ে রাশি রাশি বালুর ফুলে দান করেছে ক্ষমতা, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা। আর যা পাহাড় তা তো বালি ছিল; আর যা কেলু, পাইন তা তো ছিল পামাটী আর কাদাসের বীজাণু। প্রাণবীজের তপস্যা জলের তলায় চলে কোটি বৎসর, হিমাচলের তপস্যা মাটির ওপরে চলেছে বহুকোটি বৎসর। মানস-সরোবরের নীল জলে তাই সমুদ্রের নীল দেখি; গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্র বহু পথ অতিক্রম করে আবার ফিরে যায় সেই সাগরকে। আমার মনে ভয় নেই; আমার ফিরে যাবার পথ, ব্যাকুলতা কিছু নেই; শুধু ভাবছি এই বিরাট তামসিক রাজ্য, এই নিস্তব্ধ-চঞ্চল, সৃষ্টি-সংহার-মুখর বৃক্ষজগৎ—একদিন প্রভাতে এর সূচনা হয়েছিল সমুদ্রগর্ভ হ'তে। সমুদ্রমন্থনে বের হলেন লক্ষ্মী, বের হলেন বরুণী; বের হোলো অমৃত, হলাহল। - সবই তো এই ওষধি-জগতের নামান্তর রূপ। সমুদ্রমন্থন, উর্বশী—সে কি সত্য? সে কি কবিতা? সে কি সত্য-কবিতা?"

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললে—"সামান্যকে অসাধারণ করে বলার ধরনটাই কাব্য—নয় মাস্টার? বলতেও পারো। অথচ মদ খাওনা আশ্চর্য। মদের মাতাল তো তবু হুঁস থাকে; তোমরা যে নেশায় মত্ত তার হুঁস নেই।"

একটু বেশী বিচলিত হয়েই পড়েছিলাম। লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

লক্ষ্য করে ডাক্তার বললো—"লজ্জা পেয়োনা মাস্টার, ব'লে যাও। জঙ্গলে-পাহাড়ে তো কাটালাম অনেকদিন। এমনটা যে আছে দেখিনি কখনও। যা চোখে পড়ে সবই কি দেখা যায়? জাগে মন; চোখ একটা দরজা মাত্র। আচ্ছা, তুমি এইসব বট্যানিকাল নাম জানলে কোত্থেকে?—"

আমি বললাম—"আকাশ থেকে। সে কথা নয়। বিক্রম হঠাৎ হাত ধরে টেনে টানলো। দূরে, অনেক দূরে একটা সাদা ঝকঝকে তুষার-স্রোত। শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায়। চোখ-ঝলসানো দ্যুতি। অন্ধকার মহারণ্যের ওপারে রজতজ্বালা আলো। যেন অজ্ঞান-তিমিরান্ধ-পারে প্রজ্ঞাদীপ্তি, সংসার-অরণ্য-পারে আত্মার চমক। মন ভরে গেল শুধু আনন্দে। মনন নয়, চিন্তন নয়; শুধু স্ফটিকস্বচ্ছ আনন্দ। বললাম একটু। বিক্রম টানা সত্ত্বেও বসলাম। হয়তো এমনটি চোখে পড়বেনা কখনও। খুব জোর চেঁচামেচি লাগালো মাথার ওপর পাখীরা। একটা বনবিড়াল গুঁড়ি মেরে চলেছে একটা পাখীর বাসার পানে; পাখীগুলি আর্তনাদ করছে। একটা ঢিল ছুড়িয়ে মারবো এমন ঢিল নেই। একটা কাঠের টুকরো তুলে ছুঁড়লাম। বেরালটা পালালো;—পরক্ষণেই ভাবলাম 'কতক্ষণ'? এগুচ্ছি। হাতে জ্বলন্ত কাঠ। হঠাৎ কানে ভেসে এলো শব্দ 'খুট্' 'খুট্'—খানিকটা থেমে থেমে, কিন্তু যখন হচ্ছে, একসঙ্গে চার-পাঁচটা। একদিন এই শব্দ এই অরণ্যে তুলসীরামের আবির্ভাব এনেছিল। আজও হয়তো তুলসীরাম! কান খাড়া করে রইলাম, কিন্তু বড় দূরে, এবং দিকটা একেবারেই ঠাওর হচ্ছিলনা। আমি তাড়াতাড়ি আমার হাতের কুড়ুলটা নিলাম। যেই ওদিকের শব্দটা থামে তৎক্ষণাৎ একটা গাছের গায়ে জোরে কুড়ুল চালিয়ে আমিও শব্দ করি। অনেকক্ষণ চললো এইভাবে। কোনও ফল হোলোনা। কেবল আগে শব্দটা যতক্ষণ থামছিল, এখন তার চেয়ে বেশীক্ষণ থামছে। তখন আমি কুড়ুলের শব্দ করার পরে পরে জোর চেঁচাচ্ছি "তুলসীরাম"—কেন যে তুলসীরাম ব'লে চেঁচালাম জানিনা—উদ্দেশ্য কোনও একটা শব্দ করবো। মনে তুলসীরামের নামটা ছিল তাই চেঁচালাম। তখন আর শব্দটা শুনছিনা। আমিও শব্দ থামালাম। এটা ভুল করলাম। খানিকট পর আবার শব্দ। আমিও শব্দ করতে লাগলাম। বিক্র বললো—'আমরা শব্দ থামালে ও দিক্ পাবে কেন খুঁজে'—কেমন যেন ধারণা হোলো কেউ। সঙ্গে সঙ্গে পাতা জড়ে করে আগুন ধরালাম, আর শব্দ করতে লাগলাম।

"এবং অরণ্যের ঘনপত্র ভেদ করে দেখা গেলো শ্রীমা তুলসীরামের হর্ষবিকশিত মুখ, সাথে ছোট্ট তিরস্কার—'আবার এই জঙ্গলে আপনারা? ভালুকের পেটে যাবা ইচ্ছে বুঝি?'

"আনন্দের আতিশয্যে তুলসীরামকে তো জড়িে ধরলাম। ওর টুপী আমার মাথায়, আমার টুপী ওর মাথা দিয়ে একটা শট্ নিলাম। আর ওর সঙ্গে বসে বসে কত গল্প করলাম।

"এতক্ষণে নেমে আসছি। তর-তর যায় দিয়ে যে আনন্দ আজ পেয়েছি তার বোধহয় তুলনা নেই ডাক্তার, এক এই কবির কাপ ছাড়া।"

কবি আসতে দেখে নাটকীয়ভাবে কথা থামালাম।

ডাক্তারও কবির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললো—"এ সম্বন্ধে কবির কোনো লাইন নেই? তোমাদের কবি তো অনন্ত ভাণ্ডার!"

একটু থেমে বললাম—

'হঠাৎ শিরে লাগলো আঘাত বনের শাখাজালে,
হঠাৎ হাতে নিবলো আমার বাতি।
চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্ কালে
চেয়ে দেখি তিমিরঘন রাতি।
কেঁদে বলি মাথা করে নীচু
"শক্তি আমার রইলো না তো কিছু"
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন পিছু পিছু
এসেছে মোর চিরদিনের সাথী।'

আচ্ছা ডাক্তার, বাংলা তুমি বোঝো?"

PELICAN
● SHOCK PROOF ● WATER PROOF
● ANTIMAGNETIC ● DAMP-DUST PROOF
● UNBREAKABLE MAIN SPRING
A SWISS QUALITY WATCH

ডাক্তার বললে—"সবটা নয়; তবে কাব্যের বাংলা বুঝি। বাংলা আমার ভালো লাগতো বরাবর; সেই মালায়া থেকে। বন্ধুও পেয়েছি। কিন্তু তুমি কি সারা রবীন্দ্র-কাব্য কণ্ঠস্থ করেছ?"

"আকাশের গ্রহগুলো সব চিনলেও, ডাক্তার, সারা আকাশকে চেনা যায়না। জ্যোতির্বিদের অনুসন্ধান-বৃত্তির শেষ কই? রবীন্দ্রজগৎ—সৌরজগৎ, ডাক্তার!"

"বাপ্, রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলো তো বাঙালীর পরনের কাপড় খুলে নাও, সে কিছু টের পাবেনা। ভয় লাগে তাই ও-কথা তুলতে।"

হাসলাম।

ও বললো—"রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় বাঙালী কে আছে, মাস্টার?"

গম্ভীর হয়ে বললাম—"আমি।"

ডাক্তার বললে—"না—না—সত্যি তোমার মত কী?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—"তোমার মত কী?"

ডাক্তার বললো—"চেনেনা বাঙালী তাকে। রবীন্দ্র-প্রভা একটু ম্লান হোক, তখন চিনবে।"

"কে সে?"

"রাজা রামমোহন রায়।"

ঘরে ঢুকলো বিক্রম আর গোপী।

গোপী বললো—"ঠিক জানি আপনি এইখানে। আপনার কি কঠিন কোনও গোপন ব্যাধি আছে জনাব? ডাক্তারের কাছে তো রোগীই আসে জানি।"

ডাক্তার বললো—"ডাক্তারির পসারই হোলো রোগীদের চিকিৎসায়।"

গোপী বললো—"চলুন চলুন—"

"কোথায়? পেশোয়ার?"

বিক্রম হেসে ফেললো।

গোপী বললো—"আর পেশোয়ারের নামও যদি মুখে আনি! আমি কি জানি খোদাতালা এখানেও এক সার্জেন জুটিয়ে দেবেন?"

বাইরে জ্যোৎস্না। আজ পূর্ণিমা। প্লাবন-করা আলো। আগেভাগে খাওয়া সেরে দলে দলে ছেলে আজ ছুটি পেয়েছে। এমন দিন আর তারা পাবেনা। আমাদের খাবার বাংলোর তলায় পথের ধারে কে একটা লোক ছোটো একটা তাঁবু ফেলেছে। উনুন জ্বেলেছে—কড়া চাপিয়ে পকোড়া ভাজছে। জিলিপি করে রেখেছে। লোকটা এ কদিনে খুব কামিয়ে নেবে। তার তাঁবুর তলায় একগাদা ছেলে জড়ো হয়েছে। আমাদের দলের একটা ছেলে মাউথ-অর্গান বাজায় চমৎকার। তার বাঁশীর স্বর ভেসে আসছে। বোঝা যাচ্ছে বাঘেলালের পথ ধরে সে অনেক নীচে নেমে গেছে। বুদ্ধ্ বাঙালী ছেলেদের নিয়ে বহু উঁচুতে একজায়গায় বসে গান লাগিয়েছে। পথটা এঁকেবেঁকে বহুদূর গেছে। যতদূর চাই—দলে দলে ছেলেদের জামা-কাপড় দেখা যায়। এমন দিন গোপী আর বিক্রম আমায় ছাড়বেনা। সকালে ভাত ছিল; বিকেলে রুটি ভাত দুই-ই ছিল। আমি দুই-ই খেলাম। ডাক্তার একটা অমলেট পাঠিয়ে দিলো। তিনজনে ভাগ করে নিলাম।

গোপী বললে—"খেতে লাগিয়েছেন তো আপনি!"

বিক্রম বুঝলো আমি একলা থাকতে চাই। গোপীকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। আমি আফিসে ঢুকে পড়লাম। 'খাদ্যমালা নিউজ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যার জন্ত লেখা দেখলাম। টুকিটাকি অন্ত কাজ সারলাম, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখা দিল। কাঁধে বন্দুক।

তখুনি বেরুলাম।

চাঁদের আলো আর আলো! ডাক্তার আমায় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এমন পথ দিয়ে নিয়ে চললো কোনো লোক নেই।

নিজেই কথা পাড়লো—"প্রথম-ছোঁয়া পেয়ে কী ভাবলে মাস্টার?"

"অবাক্ হলাম। ভয় পাইনি কিন্তু মুগ্ধ হলাম।"

"মুগ্ধ করায়ই মেয়ে ও। কী যে লক্ষ্মী আর কী যে ভালো কি বলবো। অথচ আজ ও চলে গেছে একেবারে খাদের মুখে। এ-খাদে ধ্বংস নেমেছে। তলিয়ে ও যাবেই।"

"ভালবাসো বুঝি?"

"নাঃ, ঐ কারবারটা করিনি। তবে বহু নারী জীবনে দেখেছি, ঘেঁটেছি। সমবেদনাটাই হয়ে পড়ে কারোর ওপর বেশী, কারোর কম। ব্যাপার হয়েছে যে, ওই মেয়েটা আমায় হয়তো ভালবাসে।"

"ও ছিল আমার একটা রোগিণীর মেয়ে—"

অবাক হয়ে বললাম—"তবে তোমার চেনা বলো?"

"কাশীতে ও অনেকের চেনা।"

"এ পথে এলো কি করে?"

"যা ক'রে সবাই আসে। দ্বিতীয় স্বামীর মেয়ে ও। তৃতীয় ও চতুর্থ স্বামী ওকে দেখতে পারলোনা। মা বিয়ে দিয়ে দিলো অল্পবয়সে। যার সঙ্গে বিয়ে দিলো সে সম

সইতে পারেনা। তাকে ফৌজে ভর্তি হতে হোলো, সেই সুযোগে ফৌজে যাবার আগে ও ভালো করে কামস্নান সেরে নিলে পণ্যনারীর ঘাটে ঘাটে। এবং মেয়েটাকে সাংঘাতিক সংক্রামিত করে গেল। মা মারা গেছে ততদিন। চতুর্থ বাপ ওকে আশ্রয় দিলো বটে, কিন্তু ফলে যে কাণ্ড হোলো সমাজ ওকে স্থান দিলনা। শ্রীমান বাপ ওকে ঘর বাড়ী রেখে গ্রাম ছেড়ে পালালো সেই বাড়ীতে ও আজও। এখন ও জানে যে, ওর জীবন রক্ষা করেছি আমি, ওর স্বাস্থ্য আমারই দেওয়া। তাই ওকে আবার বিক্রি করার হাত থেকে পরিত্রাণও আমারই হাতে। এখনও ও আশা করে ওর স্বামী ফিরে এসে ওকে সংসারী করবে।"

"ওর স্বামী ফেরেনি? যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে।"

"ফিরবেওনা। বর্মায় সে হারিয়ে গেছে। অর্থাৎ অনেক মিঞার যা দশা ওরও তাই। এক নয় এতদিন কারেন ডাকাত-দলে ঢুকে পুরোপুরি ডাকাত হয়েছে; নয়তো উত্তর-বর্মায় কোন্ বনে বর্মী সুন্দরীর ছেলেমেয়েকে নাওয়াচ্ছে খাওয়াচ্ছে। পুরুষকে-কাজ করতে হয়না। কি-বা হয়তো মরেই গেছে।"

"ওকে তা বললেই পারো।"

"বয়স কি ওর? এতো পারবে কেন? বাপ মরেছে, মা মরেছে, সংসার মরেছে, সমাজ মরেছে, স্বামী মরেছে, বেঁচে আছে কেবল ভালবাসার মতো একটু জিনিস। তাই নিয়ে স্বপনের জাল বোনে। থাক্না। মানে কিছু পাঠাই। বলা আছে ওকে নিয়ে বণিকবৃত্তি যেন আর না চালায়। লোকটা ভয় খায় আমাকে। তাই যতদিন পারে একটু স্বপ্ন দেখুক। পথ তো ওর বাঁধাই এবং সেই পথের বাঁকেই ওর কবর পাতা। ওরই মধ্যে তবু আমায় দেখতে পেলে খুশী হয়।"

"তাহলে এতো লুকিয়ে রাখার দরকার ছিল কি তোমার ডাক্তার? তোমার পরিচারিকাও তো থাকতে পারতো।"

"না, তা পারতোনা। প্রথম বাধা ও ডাকসাইটে মাল। এখন ও যতই বাক্-বন্ধ থাক, সামাজিক গ্লানি মাথায় নিয়ে যে মেয়ে বাজারে এসেছে তার ডাক-নাম চাপাচাপি থাকেনা। তারপর এ ক্যাম্প্‌টার একটা শুচিতা আছে; বিশেষ ক'রে খবরের কাগজের স্বপ্ন-ওড়া ক্যাম্প এটা; সরকারী চাকরিটা খোয়াতে চাইনা। তবে তোমরা ক্যাম্পের যারা, জানতে না পারলেও, সরকারী করেক্ট-রেজার প্রভৃতি দু'চার জন জানতোই। ওদেরই জী ক'রে তো ও বাড়ী ফিরে গেল।"

কোথায় আমরা বসে ছিলাম জানিনা। [illegible] পাশে বসে। সামনে বাক্সোপাল গ্রামটা বহু নীচে খ মধ্যে। টালি-ছাওয়া ঘরগুলোর ওপর হালকা কুয়াশা চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে। হালকা ঝিরঝিরে বাত দিচ্ছে।

*

ক্যাম্পে ফিরে দেখি বুদ্ধু আর চৌধুরী বসে আছে।

—"দাদা, আমরা আপনাকে পাচ্ছিনা। রোজ কত সব লেখেন। আমাদের একদিন শোনান।"

"সব লেখা কি শোনাবার জন্যে?"

"না—আমি জানি আপনি লেখেন। আমরা ক' বাঙালী আছি। ক'দিনই বা এমনি জায়গায় থাকবে একটু একসঙ্গে বসবোনা কেন আমরা?"

"নিশ্চয়, বসবে। কিন্তু কিছু কাজ করোনা ত চেয়ে।"

"করছি তো কাজ। কাজ আপনার শেষ করে দেবো

"সে-কাজ বলছিনা। তোমাদের সব statisti সংগ্রহ করার কাজ ছিল। নিচ্ছ তা?"

"নিশ্চয়। কালই আপনাকে তা দেখাবো।"

"কত নিরক্ষর দেখলে?"

"প্রায় সব।"

"তবেই ভাখো! বড়দের নয় ছেড়ে দাও। কি ছোটোদের নিয়ে রোজ দুপুরে একটা ক্লাস তো করা যায় হাতের লেখা আর অক্ষর-পরিচয় করিয়ে দিতে পাচ তোমরা।"

পরের দিন থেকে যেদিন ফিরে আসি সেদিন পর্য প্রায় আশীটি ছেলেমেয়েকে ওরা পড়িয়েছিল। আম মন ভরে যেতো যখন দেখতাম, বারোটার পর কাঠের তা হাতে নিয়ে ছেলেমেয়ের দল ভেড়ার ছানার মতো পাহা বেয়ে ক্যাম্পে উঠছে। ওরা এই শিক্ষা চালিয়ে যে পারবে কিনা জানিনা। কিন্তু আমাদের চেষ্টায় দিন দু কাজ করার ফলে ওরা অক্ষর-পরিচয় শেষ করে যুক্তাক্ষ শিখে ফেললো। গুণতে শিখলো আরও ভালো।

নয় তারিখ বিকেলেই আম্বানা চলে গিয়েছিল শিমলা

[ক্রমশ]

সংশয়

রামপদ মুখোপাধ্যায়

পাঁচ পাহাড়ের দেশ রাজগীরে এসে সব জিনিস ভালো লাগছে। বেশ খোলামেলা চারিদিক। পূব-দক্ষিণে সারি সারি পাহাড়; পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট মন্দির, আঁকা-বাঁকা পথ, গুহা—হাজার হাজার বছর আগেকার পুরাণ-ইতিহাস-কিংবদন্তী প্রভৃতি মিলিয়ে খড়িচি
রানি; আবার আধুনিক যুগের সম্পদগুলিও তার পা
সাজানো। বেশ লাগছে জায়গাটি।

উষ্ণজলের ধারায় স্নান করতে এসে একটি জিনিস

ভালো লাগল না। ওই ব্রহ্মকুণ্ডটি। যতই পৌরাণিক মহিমায় মণ্ডিত হোক—চারিদিকে উঁচু দেওয়াল-ঘেরা চৌবাচ্চার উষ্ণজলে আকণ্ঠনিমগ্ন নরনারীর মেলা, এতগুলি দেহের ক্লেদ জলে কেমন যেন ফেনার মতো হয়েছে, তেল-তেলে জল—তলায় পাঁক না থাকলেও, ঘোলাটে ভাব—ওখানে গা ডোবাবার কথা মনে হতেই গা পাক দিয়ে উঠল। একদিন শুধু অনুরোধে পড়ে···

তার আগে বিপুল পাহাড়ের কথাটা বলে নিই। সমতলের মানুষ আমরা—পাহাড় দেখলেই মন নেচে ওঠে। পাহাড়ে ওঠার আরাম নাই, আনন্দ আছে। দেহ পিছিয়ে পড়লেও, মন সর্বক্ষণই অগ্রগামী—ক্লান্তির চরম ক্ষণেও দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ।

প্রথমটা কোনদিকে না চেয়ে পাথরের ধাপগুলি লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছিলাম। তারপর কিছুটা সন্তর্পণে, সবশেষে একটু দাঁড়িয়ে—পাশে পিছনে উপরে তাকিয়ে হিসাব করছি কতখানি উঠেছি—আরও কতখানি বা উঠতে হবে। পাহাড়টা মায়াবী। নীচে থেকে যেটুকু দেখা যায়—তাতে চূড়ায় ওঠার কল্পনাটা সহজ, কিন্তু ওর দেহের খাঁজে খাঁজে জড়ানো পথটায় সেই ধরা কঠিনই। ও যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে—আর কত পাকে জড়িয়েছে বিপুলের দেহটাকে—কে বলবে। তবু উঠছিলাম শেষ দেখব বলে।

মাথার ঠিক উপরেই ছোট একটি জৈন-মন্দির দেখা গেল। সুগম পথে ওখানে পৌঁছতে অন্তত আধঘণ্টা লাগবে। অথচ মাথার উপরে উঠবার একটি সোজা পথও দেখছি—একটু বিপজ্জনক পথ—যা ধরে দশ মিনিটেই মন্দির-প্রাঙ্গণে যেতে পারব। সেই সোজা পথটিই ধরলাম।

মিনিট তিন চলার পর একটি গুহা—তার ঠিক উপরেই একটা পাকুড়গাছ—তার কতকগুলি মোটা শিকড় গুহার দু'পাশে ছড়িয়ে পড়েছে। পাথর-বিছানো সরু পথটি গুহার পাশ দিয়ে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, কিন্তু বিনা অবলম্বনে সে-পথ অতিক্রম করা দুরূহ।

গুহামুখে পৌঁছে দেখি আরও একদল যাত্রী। সে-দলে সমর্থ পুরুষ কেউ নেই। দুটি প্রৌঢ়া, একটি তরুণী, একটি ছোট মেয়ে আর কিশোর ছেলে গুটিতিনেক। ছেলেরা শিকড় ধরে অবলীলাক্রমে উপরে উঠে গেছে। সেখান থেকে হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে—মেয়েদের ঊর্ধ্বমুখী হবার জন্য উৎসাহিত করছে। মেয়েরা কিন্তু বিচলিত—দ্বিধাগ্রস্ত।

আমাকে দেখে ওঁরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সম্মুখের বাধা আমাদের অপরিচয়ের কুয়াশাকে একমুহূর্তে দূর করে দিল। একজন প্রৌঢ়া বললেন, দেখ তো বাবা—ছেলেগুলোর কাণ্ড! আমরা কি ওদের মতো উঠতে পারি।

বললাম, কেন পারবেন না, গাছের শেকড় শক্ত করে ধরুন।

তরুণী হেসে বলল, পা ফসকে যায় যদি?

প্রৌঢ়া বললেন, পারব না, বাবা।

ওঁদের অভয় দিলাম,—আমি রইলাম নীচে—সাহায্য পাবেন।

ওঁরা চেষ্টা করলেন, বিনা সাহায্যে কেউই উঠতে পারলেন না। সবশেষে উঠলাম আমি।

উপরে উঠে দু'পক্ষেরই সঙ্কোচ কেটে গেল। এমনভাবে চলাফেরা আলাপ-আলোচনা হাসিখুশি শুরু হলো যা এক-পরিবারভুক্ত লোকের পক্ষেই সম্ভব।

দেবদর্শন-শেষে প্রশ্ন উঠল, কোন্ পথে ফিরব? দশ মিনিট—না আধঘণ্টার পথ ধরব?

তর্কের অবকাশ ছিল না। ওপারে বৈভর পাহাড়ে মাথায় সূর্য তখন অস্তাচলচূড়াবলম্বী হয়েছেন। অচেন পাহাড়ের কোলে অন্ধকার নামলে, পথ-চলা মানেই তে প্রাণ-সংশয়। বিশ মিনিটের মূল্য এখন ঢের বেশী। অতএব যে-পথে আরোহণ—সেই পথেই অবরোহণ প সারতে হবে।

সে-পর্বটা নিতান্ত সহজ হ'ল না। গাছের ডাল ব শিকড় ধরে নিম্নগামী হওয়ার বিপদ বেশী। দেহের বোঝাট তখন মাধ্যাকর্ষণের অনুকূল। ঊর্ধ্বগতি ভারসাম্যের সহায়ক কিন্তু ভারাকর্ষণে নিম্নগতি বিপজ্জনক। মেয়েরা পিছিয়ে উঠলেন।

—না বাবা, ফিরে সোজা পথ দিয়ে চলো।

তরুণী হেসে বলল, তা কেন—উনি তো রয়েছে সাহায্যকারী, আমাদের এক এক করে নামিয়ে নিন না?

সময়ের হিসাবে এখানেও যথেষ্ট ভুল ধরা পড়ল, এ ছাড় বদিচ পথও ছিল না।

আমাকেই সেই ভার নিতে হ'ল। প্রৌঢ়া, বালিকা তরুণী—সকলকেই একরকম সাপটে ধরেই নামাতে হ'ল। প্রৌ একহাতে একটা করে শিকড় ধরলেন বটে—অচল হ'লে তা উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারলেন না, আমার কাঁধে দ্বিতী বাহুটি জড়িয়ে ধরে প্রায় সব ভারটিই ন্যস্ত করলেন আমা দেহের উপর। আপদ্ধর্ম অনুসারে বয়স বা অপরিচয়ে ব্যবধান রাখলেন না।

অনেক কষ্টে দলটিকে নিয়ে সমতলভূমিতে উত্তীর্ণ হলাম।

চলে আসছিলাম—প্রৌঢ়া বললেন, সেকি বাবা, তা হবে না। আমাদের বাসায় পৌঁছে চা খেয়ে যেতে হবে।

ছেলেরা দু'দিক থেকে দু'হাত চেপে ধরল, যান তো দেখি—কেমন করে যান।

গন্তব্য পথ আমাদের একই। কুণ্ড থেকে একটিমাত্র পথই গেছে গ্রামের দিকে। একটা ঝাঁকড়া বটগাছের পাশে এসে পথটা দু'ভাগ হয়েছে। বাঁ দিকের পথটা রাজগীরকে পাশ কাটিয়ে সোজা ছুটেছে নালন্দা—পাওয়াপুরী—বিহার-শরীফ—পাটনা। আমরা সোজা পথে এসে উঠলাম রাজগীর-কুণ্ড স্টেশনের কাছ বরাবর। স্টেশনের পিছনেই যে যাত্রী-নিবাসগুলি রয়েছে, তারই একটি দোতলা বাড়িতে এসে উঠলাম আমরা। আমার বাসাটা স্টেশন পেরিয়ে পোস্ট-আপিসের গায়ে।

গৃহকর্তা প্রৌঢ়। স্থূল দেহ, বাত-বেদনায় ক্লান্ত হলেও মুখে প্রসন্ন হাসি। আমাকে স্বাগত জানালেন। বললেন, তাই বলুন, ভালো গাইড পেয়েছে। আমি ভাবছিলুম—সন্ধ্যে উৎরে গেল—কোথায় রইল সব? পথ হারালো নাকি?

বললাম, পথ একটিই এখানে—হারায় নাকি কেউ?

অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক, যা বলেছেন। পথও হারায় না যেমন—অনাত্মীয়ও তেমনি থাকেনা কেউ। স্থানের মাহাত্ম্য আছে বইকি।

সুবোধবাবু ভারত-সরকারের পদস্থ অফিসার ছিলেন। বছর তিন হ'ল অবসর নিয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন, জান প্রণব, অবসর নিয়ে প্রথম প্রথম এমন অবস্থা হয়েছিল,—দিন আর কাটে না! যে দরের চাকরে হোক না কেন—ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়ার মতো তাদের অবস্থা। গাড়িতে জোতা থাকে যতদিন—বেশ থাকে, দাঁড়িয়ে গেল তো ব্যস্। চাকরি গিয়ে—কি করি—কোথা যাই—এমনি অস্বস্তিবোধ। অবশেষে ভগবান দয়া করলেন। বললেন, অনেক বাত্‌চিত করেছ সরকারী দপ্তরখানায় বসে—তারই সবগুলিকে মিলিয়ে মহাবাত সৃষ্টি করে তোমার কটিদেশে জুড়ে দিচ্ছি—ওকে নিয়ে অনায়াসে সময় কাটাতে পারবে তুমি।

ব'লে আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন।

—এখন আমার প্রচুর অবসরকে সেঁক তাপ মালিশ ইন্‌জেক্‌সান প্রভৃতি কর্ম-তালিকার ভয়ে ইনি অটলভাবে জুড়ে বসেছেন। তারই তাগিদে রাজগীরে আগমন। ওই-যে সাতধারার উষ্ণজল—ওই লাগিয়ে লাগিয়ে যদি কোমর সোজা করতে পারি—

বললাম, যা ভিড়—ধারার নীচের বসেন কেমন করে?

—ধারার নীচের ঠাঁই হয়নি প্রথম প্রথম—ওই কুণ্ডে গিয়ে গলা ডুবিয়ে বসে থাকতাম।

—এই বক্কালে?

—উপায় ছিল না—ঔষধার্থে সুরাপান করার বিধান আছে তো। এখন অবশ্য উপায় বা'র করেছি। রাত ন'টার সময় ডুলি চেপে কুণ্ডে যাই—জায়গাটা ফাঁকা থাকে। একটা ধারা—ওই সবশেষের দিকে কোণেরটা—যেটা সব-চেয়ে নীচু,—মাথা পেতে বসার অসুবিধা ব'লে ওটার নীচে লোক জমে না—ওইটার তলায় কোমর পেতে পড়ে থাকি ঘণ্টাখানেক। এগারোটার ফিরে আসি বাসায়। অতঃপর আহার—শয়ন এবং সুনিদ্রা। ভাবছি, শীতটা এইখানেই কাটিয়ে যাব। তুমি কতদিন থাকবে?

—বড়জোর একসপ্তাহ।

—মোটে!— বিস্মিত হলেন।

—কি করি বলুন—সামান্য দিনের ছুটি—

—একটা অনুরোধ করব!— ব'লেই হাসলেন।

—হাসলেন যে?

—নিজের অভ্যাস ছাড়া কত কঠিন বলো তো? তুমি আমার ছোটছেলের বয়সী—তোমাকেও অনুরোধ! ওদ কলকাতায় গিয়ে হবে, কেমন!— একটু থেমে বললেন যে ক'টা দিন আছ—মেয়েদের একটু এদিক ওদিক নি যেয়ো। এই যেমন সোন-ভাণ্ডার, মনিয়ার মঠ, সপ্তপর্ণ গুহা, গৃধ্রকূট পাহাড়—নালন্দা—এই সব। তোমা গাইড পেলে ওরাও নিশ্চিন্ত—আমিও নিশ্চিন্ত।

•

এমনি করেই কাটল ক'টা দিন। প্রত্যহ আহারা সেরে পুরাণ-ইতিহাস-খ্যাত জায়গাগুলি দেখে বেড়াই সারা দুপুর এবং সন্ধ্যায় পরও খানিকটা দিব্য হৈ-হল্লো আমোদে কেটে যায়। পাহাড়ের চূড়ায়, গুহার মধ্যে, ভ বিহারের ধ্বংস-চত্বরে, অলিন্দে, কিংবা অরণ্যে উপত্যকা অবাধ বিচরণে আর স্বচ্ছন্দ আলাপে—অপরিচয়ের ব্যবধা লুপ্ত হ'ল। কিশোর ছেলে-মেয়েদের কথা ছেড়ে দি প্রৌঢ়াদের কথাও ধরছি না, কিন্তু ভদ্রলোকের একমা তরুণী কন্যা রমলা পর্যন্ত অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠল। সকলে কাছে সহজ হয়ে উঠলাম বলেই—রমলার দুর্ভাগ্যের কাহি শুনলাম।

বললেন ওর মা—বর্ষীয়সী গৃহিণী, বাবা, আমাদের রাজগীর আসার আসল উদ্দেশ্য হ'ল মেয়েটাকে খুশি রাখা। ওর মতো দুর্ভাগিনী মেয়ে আর নেই!

কী আশ্চর্য—এই সচ্ছল সংসারের প্রাকার ডিঙিয়ে দুর্ভাগ্যের ঢেউ আসে কেমন করে!

আসে বইকি—দুর্ভাগ্যের বা মনস্তাপের একটাই তো কূল নয়। হয়তো ধন থাকে প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য জোগায়, মন, তাকে একেবারে নিঃস্ব করে পথে বসায়। মেয়েটি মনের দিক থেকে নিরাশ্রয়। বিয়ে হয়েছে—অথচ স্বামী কী বস্তু জানে না—শ্বশুর-ঘর চেনে না।

মাতাল চরিত্রহীন লম্পট যাই হোক স্বামী—একদিন-না-একদিন তার পরিবর্তন আসে। রক্তের তেজ কমলে সংসারে মন বসে, নিজের অধিকার ফিরে পায় মেয়েরা। কিন্তু যে নিয়ত মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে—তার কাছে কোন্ সাহসে মেয়েকে পাঠানো যায়?

—বিয়ের আগে কিছুই বুঝতে পারিনি, বাবা। বিয়ের পর মেয়ে কেঁদে বলল, তোমরা আমার গলা টিপে মেরে ফেললে না কেন? আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে তোমরা দায়মুক্ত হ'লে, কিন্তু আমার বুকে জ্বাললে চিতার আগুন। সে-আগুনে শুধু মেয়েই পুড়ছে না—আমরাও পুড়ছি। যতদিন বাঁচব—জ্বলতে হবে।

কিন্তু রমলাকে দেখে কিছু বুঝবার জো নাই। সেই প্রথম দিনটিতে বিপুল পাহাড়ের গুহামুখে শিকড়ের শিকল ধরে উঠবার কল্পনায় ও পরে ভয়ে পিছিয়ে উঠেও হেসে ফেলেছিল—সেই কণ্ঠটিকে আমি ভুলিনি। সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকের হাতে হাত দিয়ে যখন নামছিল—তখনও ওর উচ্ছলিত হাসির বিরাম ছিল না। আমার মনে হয়েছিল—ও যেন সহজ সরল পাহাড়ী ঝরনা—যা নাকি পাথরে পাথরে নূপুর বাজিয়ে নীচের খাদে গড়িয়ে যায়—যতদূর নামে ততদূরই সুর-ঝঙ্কারে প্রতিধ্বনি তোলে। তারপরও চায়ের আসরে, গৃধ্রকূটের শিরোদেশে, মণিয়ার মঠে, জলকুণ্ডের বিজন অরণ্যে বা বৈভার-শিখরে আদিনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে—সর্বত্রই ওর চিরবালিকা প্রাণের কলোচ্ছ্বাসে মুগ্ধ হয়েছি। ওইসব পরিবেশে মনের কোণেও বিকার জাগেনি। সেখানে অপরিচয়ের তিলমাত্র কুয়াশা লেগে ছিল না, সৌজন্য প্রকাশের অনুরূপ দাবিও ছিল না। দুটি সংসার যেমন এক হয়ে গিয়েছিল—দুটি সমবয়সী তরুণ-তরুণীও তেমনি মনোবিকার লালনের অবকাশ পায়নি। যদিও রমলা স্বামিসঙ্গবঞ্চিতা এবং আমি অকৃতদার। বেশ আশ্চর্য লাগছে? কিন্তু আশ্চর্য লাগার সময়টুকুও তো পাইনি। রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে যে বসব—তেমন অবসর ছিল না। এখানে দিগন্তে ছড়ানো মাঠ বন পাহাড়—চারিদিকে অবারিত সৌন্দর্যের প্রকাশ। কলহাস্যমুখরিত মুহূর্তগুলি পুরাণ ইতিহাস ধর্ম প্রসঙ্গে বাঁধা—প্রান্তরে পর্বতে অরণ্যে গুহায় মন্দিরে মঠে ছড়ানো অজস্র কাহিনী। এসব শুনে আর শুনিয়ে দীর্ঘ সময়কে মনে হত কতটুকু বা! এই পরিবেশে মন কেমন করে হবে অন্তর্গামী। সারাদিন ভ্রমণঘটিতে শ্রমপুষ্ট হয়ে সন্ধ্যায় ফিরেছি বাসায়—আহারান্তে শয্যা আশ্রয় করতে-না-করতে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছি। এ জগৎ আলাদা—এর চিন্তাধারাও ভিন্নতর।

এইভাবেই দিন কাটছিল। শেষদিনটাও যদি কাটত তেমনিভাবে তাহলে, জটিল একটি প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরে, এ কাহিনী লিখতে বসতাম না।'

শেষদিনটি নির্বিঘ্নে কাটেনি। আর তার জন্যে দায়ী ওই সাতধারা। প্রথম থেকেই ওর পাঁচিল-তোলা জায়গাটুকু ভালো লাগেনি। বিশেষ করে কুণ্ডটা চোখে পড়লেই সারা মন ক্লেদাক্ত হয়ে উঠতো। ভবিষ্যদর্শনের ছবিটা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই এঁকে দিয়েছিল—ওই পাঁচিল-ঘেরা সঙ্কীর্ণ কুণ্ড, সবুজ সলিল, সরীসৃপের মতো ঘেঁষাঘেঁষি একরাশ মুখ…

শেষদিনের ঘটনার আগে সপ্তপর্ণী গুহার কথাটা বলে নিই।

সেটি তৃতীয় দিন। সেদিন খুব ভোরে এসেছিলাম স্নান করতে। প্রোগ্রাম ছিল—যথাসত্বর সময় স্নান আহার সেরে নালন্দা যাব দলবলে। প্রচণ্ড শীত বলে ছেলেদের ঘুম ভাঙেনি। গৃহিণীরা ব্যস্ত ছিলেন ভোজনপর্বের আয়োজনে। স্নানে এসেছিলাম আমি আর রমলা।

রাজগীরের প্রধান আকর্ষণ উষ্ণজলে স্নান। সবচেয়ে বিস্ময়ের জিনিসও। সকালে বিকালে সন্ধ্যায় রাত্রিতে যে-কোনো সময়ে যতবার খুশি স্নান করলে শরীর ও মন খুশ থাকে।

আমার এই অভিমতে সবাই হাসত। বলত, দুনিয়ার আর কাজ নেই বুঝি?

রমলা আমাকে সমর্থন করে বলত, দুনিয়ার বাইরে এসেছি না আমরা? চলুন চলুন, স্নান করে আসি।

সকাল-সন্ধ্যায় দু'বেলা স্নান করতাম আমরা, ওঁরা হ্রদের বাইরে সিঁড়িতে বসে গল্প করতেন।

এইদিন ভোরবেলায় স্নান সারা হ'লে রমলা বলল, একবারবার চলুন না?

—কোথায়?

—সপ্তপর্ণী-গুহায়। যেখানে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর একটি সভা বসেছিল, মহাকাশ্যপকে সভাপতি করে। শুনেছি—পাঁচশো লোক জমা হয়েছিল সেই সভায়। ভাবুন তো কী বিরাট গুহা! যাবেন?

—দেরি হবে না?

—এই তো দূরেও উপরে একটুখানি উঠে পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ। বড়জোর আধ মাইল। চলুন—চলুন—

জোর করে টেনে নিয়ে গেল সেই পথে। সে-পথে লোক-চলাচল কম। বাঁ ধারে খাড়া উঠে গেছে বৈভব-পাহাড়—ডান ধারে সমতলভূমি। বেণুবন বিহারের জায়গাটিকে চিহ্নিত করে রমণীয় একটি পুষ্পোদ্যান—মাঝখানে রেখে বাঁধানো আয়নার মতো একটি পুষ্করিণী। গৃধ্রকূট গুহা থেকে নেমে এসে মাঝে মাঝে সে-বেণুবনে বিশ্রাম করতেন তথাগত—এবং তাঁর উপদেশ শুনতে হাজার হাজার নরনারী জমত যেখানে—এইটিই সেই বেণুবন কিনা এ-বিষয়ে ঐতিহাসিকরা নিঃসন্দেহ নন।

যাই হোক, অসমতল পথে গুহায় পৌঁছতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল। রমলা গুহার সামনে এসে রীতিমতো হতাশ হল। ভেবেছিল—সরকারী ফলকে ঘটা করে যখন নির্দেশনামা দেওয়া হয়েছে—তখন সুসংস্কৃত একটি রম্যস্থানই দেখতে পাবে। গুহার ভিতরের খানিকটা প্রবেশ করা সহজ হবে—অন্তত সেই ঐতিহাসিক স্থানটুকু পর্যন্ত, যেখানে মহাকাশ্যপের পরিচালনায় বুদ্ধ-বচন-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু হায় রে, গুহার মুখে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড—এধারে ওধারে বনঝোপ কাঁটাগাছ। গুহার পাথরে ধোঁয়ার দাগ। হয়তো সাধুসন্তরা মাঝে মাঝে এখানে এসে ধুনি জ্বালিয়ে আসন করেন। গুহার ভিতরে চাপ-বাঁধা জমাট অন্ধকার। বেড়তলা সমান উঁচু গুহামুখ।

রমলা বলল, চলুন, ভিতরে খানিকটা যাওয়া যাক।

ইতস্ততঃ করছি—ও আমার হাত ধরে বলল, আসুন না? এত ভীতু আপনি!

সবেমাত্র দশ-বারো হাত এগিয়েছি—ফড়ফড় করে মাথার উপর দিয়ে কি যেন উড়ে গেল।

রমলা ঘন হয়ে দাঁড়াল আমার কাছে। বলল, চারদিকে কি বাদুড় হবে।

আরও হাত কয়েক এগিয়েছি—খসখস সড়সড় শব্দ হল। কি-সব যেন চলা-ফেরা করছে।

—কিসের শব্দ?— আমার হাতে চাপ দিয়ে প্রশ্ন করল রমলা।

বললাম, বুঝতে পারছিনে। কত-কি জন্তু-জানোয়ার আছে এখানে—কে জানে!

—জন্তু-জানোয়ার!— শুকনো গলায় বলল রমলা,—শিয়াল, ভালুক, বাঘ?

—সাপ-টাপও শুনেছি আছে।

এমন সময় সড়সড় করে শব্দটা এগিয়ে আসতে লাগল—কি যেন লাফিয়ে পড়ার শব্দ হ'ল।

ভয়ার্ত চীৎকার করে দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল রমলা। ভয়ে অভিভূত হয়েছিলাম আমিও। বাইরেই ফিরতে চাইছিলাম—শুধু ওর 'ভীরু' অপবাদে সামনে যেতে হচ্ছিল। ওর স্পর্শে সেই ভয়টাই প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করল আমায়। কাঁপতে কাঁপতে ওকে কোনমতে টেনে নিয়ে গুহার বাইরে এলাম।

মূর্ছা যায়নি—কাঁপছিল রমলা। বাইরের আলোতে এসে ওর ভয় দূর হ'ল। একটু হাসি ফুটল মুখে। বলল, জন্তুটা যদি আক্রমণ করত?

আমাকে নিরুত্তর দেখে রমলা বলল, আমি জানি—পালাতেন। 'আপনারা সব পারেন।'— উপল-বিচ্যুত ঝরণা-ধারার মতো ও কলস্বনা হয়ে উঠল।

'আপনারা' মানে পুরুষ-জাতি। হঠাৎ এ-অনুযোগ করল কেন রমলা? আমি তো ওকে ফেলে পালাইনি।

পরে এই কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছি। সে অনেক পরে। শহরের ধোঁয়াটে আকাশের নীচের চারিদিকে উত্তুঙ্গ অট্টালিকা-প্রাচীর-নিষ্পিষ্ট কক্ষবাস একখানি ছোট বাড়ির একটি আলো-বঞ্চিত ঘরে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ স্পষ্ট হয়েছে অর্থ।

এখানে এখন দিগন্তবিস্তৃত সমতলভূমি প্রথম-সূর্য-কিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—গুহার অন্ধকার পিছনে রেখে আমরা দাঁড়িয়েছি তারই সামনে। প্রকৃতি এখানে কল্যাণময়ী, প্রকৃতি গুহাহিত।

ধুপ্ করে লাফানোর শব্দে পিছনে চেয়ে দেখি একটি বানর গুহামুখের শিলাসনে উপবিষ্ট—আরও গুটিকয়েক গুহার আধ-অন্ধকার ঠেলে বাইরের দিকে আসছে।

রমলা বলল, শীগ্‌গির চলুন—না হ'লে অনধিকার-প্রবেশের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

•

প্রফুল্ল মনেই আমরা সপ্তপর্ণীর কাছে বিদায় নিলাম।

•

শেষদিনে—সাতঘাটায় স্নান করতে এসে কিন্তু এমনটি ঘটল না।

সেদিনও ভোরবেলায় এসেছি—আমি আর রমলা। অত ভোরেও স্নানার্থীর ভিড় জমেছে—জলের মুখ খালি পাওয়া দায়। রমলা বলল, চলুন, কুণ্ডের জলে স্নান করে আসি।

—কুণ্ড। না—না—

—আরে, ভয় কি। কত লোকই নাইছে তো—কেউ কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আসুন— আমার হাত ধরে টানতে-টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে রমলা বলল, আগে আপনি নামুন। দেখুন তো কতখানি জল? আরও ধাপ আছে, না, লাফিয়ে নামতে হবে? একেবারে গলা-জল? পারব?

—তবে থাক্-ই না।— শেষবার আপত্তি জানালাম।

—বাঃ রে, চান করব না। এঁরা চান করছেন না? আসুন—নামুন— আমাকে একরকম ঠেলেই নামিয়ে দিলে।

ছ্যাক করে গরম জল লাগল গায়ে। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। প্রথমটা কেমন চিন-চিন করছিল, ক্রমে সে-ভাব কেটে আরাম বোধ হল। ঈষদুষ্ণ জলের স্পর্শ শীতকাতর শরীরে মোহ সঞ্চার করল। কেমন আচ্ছন্ন ভাব—নেশার মতো। জলের মধ্যে এধার ওধার ঘুরে নিলাম একটু। বেশ খেলার মতো লাগছে—কৌতুক বোধ হচ্ছে—আনন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে চেনা-জানা লোককে নিয়ে কিছুক্ষণ ভেসে বেড়াই—হুটোপুটি করি খানিক। বয়সের ভার পৈঠার উপরে নামিয়ে সকলেই তো এমন করছে।

—বাঃ রে, নিজেই তো দিব্যি সাঁতার কাটছেন—আমায় ধরুন!— রমলা ধাপের উপর দাঁড়িয়ে বলল।

ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আসুন, নেমে পড়ুন—

মাথা নেড়ে বলল রমলা, সাহস হচ্ছে না, ও-হাতটাও দিন।

দিলাম বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে। রমলা হেঁট হয়ে শক্ত করে চেপে ধরল আমার দু'খানা হাত। একবার ঝাঁপানোর উপক্রম করে মাথা নাড়ল, না—হচ্ছে না, একটি হাত ছাড়ুন তো—বে-কায়দায় পড়লে নিজেকে বাঁচাবার পথটা অন্তত খোলা থাক্।

—বে-কায়দায় পড়বেন কেন?

—বলা যায় কি!— ব'লে হাসতে হাসতে আমার একখানা হাত ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। কিন্তু খোলা হাতখানিও নিশ্চেষ্ট রইল না। বুঝি নিজের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার প্রত্যয়ে আমাকে অভিভূত—পুলকিত—মুহুর্মুহু শিহরিত করে সেই হাতখানি আমারই কণ্ঠ বেষ্টন করে আমার সমস্ত নিরাপত্তাকে ভাসিয়ে দিল। সেই মুহূর্তে উষ্ণজলের সঞ্চিত তাপটুকু ধমনীতে প্রবেশ করে শোণিত-প্রবাহকে অত্যন্ত উষ্ণ ও চঞ্চল করে তুলল—আর, আমি মূর্ছাতুর আবেশে ভেসে বেড়াতে লাগলাম—কুণ্ডের এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে।

কতক্ষণ পরে না জানি চেতনা হ'ল।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম কুণ্ড থেকে। রমলাকেও টেনে তুললাম। কিন্তু ওর মুখের পানে চাইতে পারলাম না—কুণ্ডের খোলা মুখ দিয়ে আকাশ দেখলাম। ম্লান ধূসর একখানা মেঘ ভাসছে মাথার উপরে—কুণ্ডটাও সেই ঘোলাটে ছায়ায় কুশ্রী হয়ে উঠেছে। ওর ক্লেদার্দ্র জলে একরাশ সরীসৃপ যেন কিলবিল করছে।

সেইদিনই রাজগীর ত্যাগ করলাম।

এর পর নিভৃত অবকাশে কতবার নিজেকে প্রশ্ন করেছি, ওই ঘটনার জন্য আমিই কি দায়ী ছিলাম? সেই সঙ্গীন মুহূর্তে শুধু আমার মুখখানিই কি ফিরানো ছিল শৈলগুহার দিকে—যেখানে যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত তমসার স্তূপে দেহ ঢেকে হিংস্র জীবজন্তু-সরীসৃপেরা চলাফেরা করছে, আর ওর দৃষ্টি ছিল কি তার বিপরীতে—সূর্যালোকিত জাহ্নবীভূষণা ধরিত্রীর দিগন্ত-প্রান্তে—যেখানে অফুরন্ত-আলোধারার স্রোতে শত-বিকশিত পঙ্ক-নির্মুক্ত জীবন-পদ্ম সর্বক্ষণই লীলাচঞ্চল?

সুজাতনা

দিগদর্শন

॥ জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্ত্তৃক সম্পাদিত ॥

। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত ।   । প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল ১৮১৮ খৃঃ ।

প্রথম ভাগ]   [এপ্রিল ১৮১৮ খৃঃ

● **হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ।**— যে২ দেশে হিন্দু লোক বসতি করে কেবল সেই দেশ হিন্দুস্থান। তাহার দক্ষিণসীমা সমুদ্র, এবং হিন্দুস্থানকে দুই ভাগ করা যায়, দক্ষিণ হিন্দুস্থান ও উত্তর হিন্দুস্থান। দক্ষিণ হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা যদি নর্ম্মদা নদী কল্পনা করা যায়, তবে দক্ষিণ হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র, এবং দক্ষিণের অন্তসীমা কুমারী অন্তরীপ, তাহার নিকট লঙ্কাদ্বীপ তাহার যথার্থ নাম সিংহলদ্বীপ, কিন্তু তাহার রাজধানীস্থানের নাম লঙ্কা ছিল, তাহাতেই সকল রাজ্যের নাম লঙ্কা। সেখানকার লোকেরা অদ্যাপি সিংহলদ্বীপ নামে খ্যাত।

হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম ভাগে সিন্ধু নদী। শাস্ত্রে কহে যে লোক এ নদীর পার যায়, তাহার জাতি থাকে না, এই হেতুক সে ভাগে হিন্দুস্থানের সেই সীমা। সিন্ধু নদীর পশ্চিমে বলোচস্থান, ও তাহার পশ্চিমে পারসী দেশ, সেখানকার সকল লোক মুসলমান। হিন্দুস্থানের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব ভাগে হিমালয়শ্রেণী, ঐ শ্রেণী অল্প বক্রভাবে কাশ্মীর হইতে যেকান পর্য্যন্ত, দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে চলিয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব ভাগে ব্রহ্মা দেশ, বাঙ্গালা ও ব্রহ্মাদেশের মধ্যে মণিপুর ও হিড়ম্ব এবং আরও নানা নামে কতক পর্ব্বতীয় লোক আছে, তাহারদের হিন্দুব্যবহার।

এই২ সীমার মধ্যে এই২ দেশ; দক্ষিণে উড়িষ্যা ও তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় ও মহীসূর ও ত্রবণোর ও হয়দরাবাদ ও পুণ্যগ্রামীয় ও নাগপুরীয় মহারাষ্ট্র দেশ। এবং উত্তরে বঙ্গ ও মগধ ও কাশী ও বুন্দেলখণ্ড ও বঘেলখণ্ড ও মিথিলা ও কোশলা ও মথুরা ও হরিয়াণা ও দোয়াব ও রোহিলখণ্ড ও জয়পুর ও বিকানিয়ার ও যোধপুর ও দৌলৎরাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্তরাও হোলকারের দেশ ও পঞ্জাব ও মুলতান ও সিন্ধু ও গুজরাট। এবং পূর্ব্বদিকে ইঙ্গ্রণ্ডীয়েরদের অধিকার ভিন্ন নেপাল ও আসাম ও হিড়ম্ব ও মণিপুর ও জয়ন্তীপুর ও কুকী ও নাগা ও গারো এবং অন্য২ পর্ব্বতীয় কতক জাতি। এই সকল দেশ হিন্দুস্থানের অন্তর্গত, যেহেতুক ইহারদিগের হিন্দুব্যবহার, এই২ দেশ ভিন্ন কোন দেশে হিন্দুব্যবহার নাই। ব্রহ্মা ও শ্যামদেশীয় ও চিনীয় ও সিংহলীয়েরা বৌদ্ধমতে চলে।

● **হিন্দুস্থানের বাণিজ্য।**— হিন্দুস্থানের উৎপন্ন নানা দ্রব্য, অন্য দেশীয় লোকেরদের অতিশয় উপকারক, এদেশের ধনের এক প্রধান কারণ এই। এখানকার লোকেরা অন্য দেশের উৎপন্ন বস্তুর বড় আবশ্যক রাখে না, অন্যত্র প্রায় সব হিন্দুস্থানে বহুসংখ্যক উৎপন্ন হয়, এইহেতুক অন্য২

লোকেরা এখানকার বস্ত্রের কারণ বৎসর২ অনেক ধন এদেশে আনে। আরও পূর্ব্বকালের হিন্দুস্থানীয় রাজারদিগের অধিকারে দস্যুপ্রভৃতি ভয়প্রযুক্ত লোকেরদের সম্পত্তির স্থৈর্য্য ছিল না। যে স্থানে এমত স্থৈর্য্য না থাকে, এবং যথার্থ না হয়, সে স্থানে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা বহু কর্জ্জ-কারণ টাকা কখন নিয়োগ করে না। এই ক্ষণে ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকারে যথার্থ বিচার হওয়াতে, হিন্দুস্থানের বাণিজ্য ও ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, ও এখনও হইতেছে।

হিন্দুস্থানোৎপন্ন বস্তুদ্বারা অন্য২ দেশীয়েরদের বাণিজ্য হয়, সে এই২ বস্তু। ···

[মিষ্ট চীজ, তুলা, আফিম, মদ, রেশম ও সোরা—এই ছয়টি প্রধান প্রধান উৎপন্ন বস্তুর বিশদ বিবরণ উল্লিখিত আছে।]

• **বলূনদ্বারা সাদ্‌লর সাহেবের আকাশগমন।**— ছয় মাস হইল সাদ্‌লর সাহেব এক যুবা ও বিদ্বান ও অতি সাহসি ব্যক্তি ঐর্লণ্ড উপদ্বীপ হইতে আকাশপথে ইংলণ্ডে যাইতে স্থির করিয়া এক বলূন প্রস্তুত করিলেন। সে বস্তু রেশমে নির্ম্মিত গোলাকৃতি তাহাকে সামান্য বায়ু হইতে লঘু বায়ুতে পূর্ণ করিয়া তাহার নীচে একটা নৌকা বাঁধে ও ঐ নৌকাসমেত ভূমিতে দৃঢ়রূপে তিন চারি বন্ধন দেওয়া যায় সেই বন্ধন এককালে কাটিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অতিবেগে সে বলূন ঊর্দ্ধে গমন করে যাবৎ পর্য্যন্ত তাহার তুল্য বায়ু পায়।

এই মত এক বলূন সাদ্‌লর সাহেব প্রস্তুত করিলেন। সা[illegible] সাহেবের ঊর্দ্ধগমন দেখিবার কারণ অনেক লোক একত্র হইয়াছিল পরে এক ভাগ্যবতী যুবতি স্ত্রীর হাত হইতে সম্ভ্রমের চিহ্নরূপ এক পতাকা লইয়া নির্ভয় হইয়া বলূনের নৌকারোহণ করিলেন পরে বন্ধন কাটিবামাত্র অতিবেগে ঊর্দ্ধে উঠিলে পরে সাদ্‌লর সাহেব নীচস্থ লোকেরদের প্রতি আপনার টুপী ও নিশান ফিরাইতে লাগিলেন। এক দণ্ডের মধ্যে সে বলূন মেঘস্থানের ঊর্দ্ধে উঠিল মেঘব্যবধানপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎকাল অদৃশ্য হইল পরে মেঘ ছাড়া হইলে পুনর্ব্বার লোককর্ত্তৃক একটি বিন্দু জ্ঞানে দৃষ্ট হইল ক্রমে এক কালে অদৃশ্য হইল। সে সময়ে সাহেবের উপরে শিলাবৃষ্টি হইল এবং সাহেব দেখিলেন যে শিলা পৃথিবীর নিকটে আসিতে২ জল হইয়া বৃষ্টি হইল। উঠিবার সময় ঐর্লণ্ড হইতে ইংলণ্ডে জাহাজ যাইতেছে তাহা দেখিতে পাইলেন কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের উপরে পঁহুছিয়া ক্রমে বায়ু নির্গত করিয়া পৃথিবীর উপরে নামিলেন। এমত এক ব্যক্তি বিদ্যাদ্বারা আকাশে দেড় ক্রোশ উঠিয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ সমুদ্র পার হইয়া কোন ব্যাঘাত না পাইয়া এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে পঁহুছিলেন। অনুকূল বায়ু হইলে বলূন এক ঘণ্টার মধ্যে পঁচিশ ক্রোশ চলে। এ অতি আশ্চর্য্য বস্তু পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে এখন পর্য্যন্ত মনের মত হয় নাই। এখন তাহার বিষয়ে প্রধান চেষ্টা এই যে এমত কোন২ উপায় করা যায় যে তাহাতে যখন যে দিকে যাইতে ইচ্ছা হয় সেই দিকেই বলূনদ্বারা যাওয়া যায়। এই মত কোন অনুকূল উপায় করা গেলে যেখানে যখন যাহার ইচ্ছা তখন সেখানে যাওয়া যাইবেক।

• **বিসুবিয়স পর্ব্বতবিষয়ে।**— মুঙ্গেরের নিকটে সীতাকুণ্ডে ও হিন্দুস্থানের অন্য২ স্থানে উষ্ণ জল নির্গত হয় তাহার কারণ এই যে সেখানকার মৃত্তিকা আগ্নেয় বস্তুতে সম্পূর্ণ। এই২ স্থান হিন্দুরা অতিতীর্থ করিয়া মানে কিন্তু ইউরোপের মধ্যে এই মত অনেক পর্ব্বত আছে যে সেখান হইতে দিবারাত্র অগ্নি ও ধূম নির্গত হয়, এবং কোন২ সময়ে স্রোতের ন্যায় আগ্নেয় বস্তু দ্রবীভূত হইয়া বহে, তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামপ্রভৃতি নষ্ট হয়। যে২ দেশে হিন্দুস্থানীয় এই২ রূপ চমৎকার স্থান হইতেও অধিক চমৎকার স্থান আছে সেই২ দেশীয়েরা সে স্থানকে তীর্থ করিয়া মানে না, এবং যে দেশীয় লোকেরা হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের হইতে অল্পজ্ঞান তাহারা সীতাকুণ্ড হইতে ক্ষুদ্র স্থানকেও বড় করিয়া মানে।

বিসুবিয়স পর্ব্বত ইতালি দেশে, নাপলস নামে নগর হইতে চারি ক্রোশ অন্তর, এবং পৃথিবীস্থ আগ্নেয় পর্ব্বতের মধ্যে এই পর্ব্বত বড়; ঐ পর্ব্বতের মূলঅবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত যে উপত্যকা ভূমি সে নানাবিধ সফল বৃক্ষযুক্তা, সেখানকার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু নির্ম্মল ও শীতল; ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গেতে আট শত হাত ব্যাস এক মহাগর্ত্ত আছে তাহা হইতে দিবারাত্র ধূম নির্গত হয়। কোন২ সময়ে সমুদয়পর্ব্বত কম্পমান হয়, তাহার শব্দ কামানের শব্দ হইতেও বড়, এবং সে পর্ব্বতের মুখহইতে অগ্নি ও জ্বলনীয় পাথর সাত শত হাত ঊর্দ্ধে উঠে, এবং দ্রবীভূতাগ্নি ঐ পর্ব্বতের মুখ হইতে জলের ন্যায় নির্গত হয়; ঐ অগ্নি চলিতে২ গৃহ ও বৃক্ষ ও ভূমির শস্যাদি সকল নষ্ট করে। এক শত বৎসর হইল, একবার ঐ অগ্নির মহাপ্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সেই সময়ে তাহার ভস্ম ও প্রস্তর পঁচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত হইল। এক শত বৎসরের মধ্যে অনুমান দুই তিন বার তাহার ঐরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

• অনুবাদ •

অদৃশ্য শিল্প

স্তেফান জোয়াইগ

ড্রেসডেন শহরের ঠিক পরের স্টেশনে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমাদের কামরায় এসে প্রবেশ করলেন। আমাদের দিকে চেয়ে বেশ মিষ্টিভাবে হাসলেন একটু। আমাকে লক্ষ্য ক'রে এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন আমাকে তিনি চেনেন। আমি হকচকিয়ে গেলুম ব'লে তিনি তাঁর নিজের নামোল্লেখ করলেন। হ্যাঁ, সত্যিই তো তাঁকে আমি চিনি

একসময়ে বার্লিনে শিল্পকলা-সম্বন্ধীয় জিনিসপত্র বিক্রি করতেন তিনি। আর্ট-ডিলার ছিলেন। চারুকলার একজন রসজ্ঞ বিচারক ব'লেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল খুব। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আমি প্রায়ই তাঁর দোকান থেকে অটোগ্রাফ এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি কিনে নিয়ে যেতুম। আমার উল্টোদিকে বসতেন তিনি। খানিকক্ষণ পর্যন্ত আজেবাজে কথা নিয়ে আলোচনা চলত। তারপর আলোচনার বিষয়-বস্তু যেত বদলে। এই সবে তিনি দেশ পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে এলেন। কী উদ্দেশ্যে তিনি পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা তুলতেন ভদ্রলোকটি। সাঁইত্রিশ বছর ধরে শিল্পবস্তু বিক্রি ক'রে ঘুরছেন, অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু এবারকার অভিজ্ঞতা সত্যিই অদ্ভুত।

গৌরচন্দ্রিকা যথেষ্টই হ'ল। আমি এবার গল্পটা তাঁর নিজের ভাষাতেই ব্যক্ত করছি। নইলে কথোপকথনের প্যাঁচের মধ্যে প'ড়ে খেই হারিয়ে ফেলতে পারি।

—তুমি নিশ্চয়ই জানো [তিনি বলতে আরম্ভ করলেন] মুদ্রাস্ফীতির সময় থেকে আমার ব্যবসার কী অবস্থা হয়েছিল। টাকার মূল্য বাষ্পের মতো চতুর্দিকে উবে যেতে লাগল। যুদ্ধের সময় কারবার ক'রে যারা প্রচুর পয়সা কামিয়েছিল তারা সব ঝুঁকে পড়ল পুরনো শিল্পীদের ছবির ওপর (যেমন—ম্যাডোনা ইত্যাদি)। প্রাচীনযুগের কারুকার্যময় বস্ত্রাদি এবং প্রথম-প্রকাশিত পুস্তকাদি সংগ্রহের জন্যও উদগ্রীব হয়ে উঠল তারা। ওদের চাহিদা মেটানো সহজ কাজ নয়। আমার শখ এবং রুচি অনুযায়ী সবচেয়ে ভালো ভালো জিনিসগুলি নিজের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলুম। সেগুলোও বুঝি টেনে-হিঁচড়ে ঘর খালি ক'রে বার ক'রে নিয়ে যেতে চায় তারা। ঘরে রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে। তাদের যদি সুযোগ-সুবিধে দিতুম তাহ'লে আমার শার্টের কাফ-লিংক্স আর টেবিল-ল্যাম্পটাও কিনে নিয়ে যেত বোধহয়। বেচবার মতো 'মাল' যোগাড় করা ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। শিল্পদ্রব্যের বদলে 'মাল' কথাটা ব্যবহার করলুম ব'লে তুমি হয়তো রাগ করতে পারো। কি করব, বাপ [illegible] তাহ'লে। এইসব নতুন ধরনের খদ্দেরদের কাছ থেকে খারাপ বুলি শিখেছি। শব্দদোষ।

একান্ত বিষয়ীব্যক্তি একটি দামী কোট কিংবা শিল্পী ভ্যারসিলোর আঁকা একটা সামান্য নক্সা সংগ্রহ করতে পারলে ভক্তিরসপ্লুত চিত্তে এতো বেশি গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠে যেন মাত্র কয়েকশো টাকার বিনিময়ে একটা মহামূল্যবা ব্যাঙ্ক-নোটের মোহাঙ্কিত আত্মাটি সে কিনে ফেলেছে বহুদিনের অভ্যাসের ফলে আমার অবস্থাও ঠিক সেইরকম হতো। প্রাচীন যুগের ভেনিসের ছাপাখানা থেকে মুদ্রি একটা বই আমার হাতে এলে, আমিও ঠিক বিষয়ী লোকদের মতো পাওয়ার গর্বে স্ফীত হয়ে উঠতুম।

নষ্ট করবার মতো ঐসব খদ্দেরদের হাতে এতো বে টাকা ছিল যে, তাদের লোভ সংবরণ করাবার কোনে উপায় খুঁজে বার করা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। আমা দোকানের চারদিকটা ভালো ক'রে দেখলুম সেদিন। ম হ'ল, সত্যিকারের মূল্যবান জিনিস আর বিশেষ কিছুই নেই জানলা-দরজা সব বন্ধ ক'রে দিলেও ক্ষতি নেই। শিল্পসম্ভারে এই মুখ্য ব্যবসাটি আমি পেয়েছিলাম পূর্বপুরুষদের কা থেকে। কিন্তু এখন দেখলুম, আজেবাজে জঞ্জাল ছা দোকানে আর কিছুই নেই। উনিশশো চোদ্দ সালে আগে ফেরিওয়ালাও ঠেলাগাড়িতে ক'রে এমন জিনিস বি করতে লজ্জা বোধ করত।

এইরকম একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে একদি পুরনো আমলের খাতাপত্রগুলো দেখতে লাগলুম, আগেকা সব খদ্দেরদের ঠিকানাগুলো খুঁজে বার করব ব'লে সুদিনের কেনা জিনিস হয়তো এখন তাঁরা বেচে ফেলতে পারেন। দুঃসময়ের কথা কেউ বলতে পারে না। পুরনে খদ্দেরদের তালিকাটির সঙ্গে শবদেহ-সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, যাঁরা সৌভাগ্যের দিনে এ দোকান থেকে শিল্পদ্রব্য ক্রয় করেছিলেন তাঁদের মধে অনেকেই মৃত। এবং যাঁরা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁ হয়তো মূল্যবান সংগ্রহগুলো বেচে ফেলতে চাইবেন। যা হোক, খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন একগোছা চি আমার হাতে এল। জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যে ছিলেন পত্রলেখকটি। অবিশ্যি তখনও যদি বেঁচে থাকে তবেই। তাঁর বয়েস এতো বেশি হয়েছিল যে, তাঁকে আ ভুলেই গিয়েছিলুম। মনেই বা রাখব কি ক'রে—উনিশশ চোদ্দ সালের মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে তিনি আমা দোকানে জিনিস কিনতে আসেননি। সত্যিই যু প্রাচীন যুগের মানুষ ছিলেন ভদ্রলোকটি। প্রথম চিঠিগুলে অর্ধশতাব্দীরও আগে লেখা। আমার ঠাকুরদা তখ ব্যবসার প্রধান পরিচালক ছিলেন। এই কারবারের স আমার যোগাযোগ প্রায় সাঁইত্রিশ বছর হ'ল। অথচ এ

দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল ব'লে মনেও পড়ে না।

সব দেখেশুনে যা বুঝতে পারলুম তাতে মনে হয় তিনি একজন সেকেলে ধরনের খামখেয়ালী মানুষ ছিলেন। জার্মানির ছোট ছোট শহরে আজকালও সেইরকমের দু'একজন মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর হাতের লেখা এতো ঝরঝরে যেন তামার পাতের ওপর খোদাই করা। প্রত্যেকটা অর্ডারের তলায় লাল কালি দিয়ে লাইন টানা। প্রতিটি জিনিসের দাম লিখে দিতেন, তাও দু'রকম ভাবে। সংখ্যা দিয়ে তো লিখতেনই, তার পাশে আবার কথায় লিখে প্রকাশ করতেন। ভুল হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। চিঠি লিখতেন ছেঁড়া কাগজের টুকরোয়। খামগুলি ছিল যেন-তেন প্রকারে তৈরি করা বিভিন্ন আকারের। এইসব থেকে সন্দেহ হতো তিনি অভাবগ্রস্ত মানুষ। খামের তলায় সব সময়েই উপাধি আর খেতাবগুলো লিখতেন: 'ফরেস্ট-রেঞ্জার এবং অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা, অবসরপ্রাপ্ত; লেফটেনেন্ট, অবসরপ্রাপ্ত; প্রথম শ্রেণীর আয়রন-ক্রস দ্বারা সম্মানিত'। আঠারোশো সত্তর খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে যখন তিনি যোগদান করেছিলেন তখন তাঁর বয়েস প্রায় আশিবছরের কাছাকাছিই হবে।

খামখেয়ালী ধরনের লোক ছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধি তাঁর তীক্ষ্ণ ছিল। জ্ঞানের পুঁজিও কম নয়। খোদাই-করা কাজ আর ছবির সংগ্রহ দেখে মনে হতো লোকটির রুচিবোধ আছে। প্রথম দিকে তিনি খুব কম টাকারই অর্ডার দিয়েছিলেন। কিন্তু সতর্কভাবে অর্ডারগুলি পছন্দ করতে গিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেলুম। যখন দু'একটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে একগাদা অভিজাততম জার্মান উড্‌কাট কেনা যেত, তখন এই সেকো-মানুষটি খোদাই-করা কাজের একটি সংগ্রহ কিনে ফেলেছিলেন। যুদ্ধকালীন ধনী কারবারীদের বহুবিজ্ঞাপিত সংগ্রহের চেয়ে তাঁরটা ছিল অনেক বেশি মূল্যবান। দীর্ঘদিন ধ'রে শুধু যে-সব জিনিস তিনি অল্প মূল্যে আমাদের দোকান থেকে খরিদ করেছিলেন তার দাম আজ বহুগুণ বেশি। তা ছাড়া অন্যান্য দোকান থেকেও যে তিনি অতো সস্তায় আরও ভালো ভালো জিনিস কিনে রাখেননি, তাই বা বলি কি ক'রে। কালক্রমে এই সুন্দর সংগ্রহটি কি হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে? তাই বা কি ক'রে হয়। শিল্পবস্তুর কেনাবেচার বাজারের সঙ্গে আমার গভীর সংযোগ। অন্তত তাঁর শেষ খরিদের দিনটি পর্যন্ত আমার কিছুই অজানা ছিল না। তাই ভাবলুম, আমি টের পেলুম না, অথচ সবই বেহাত হয়ে গেল, তেমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব। তিনি যদি মারা গিয়ে থাকেন, তাহ'লে সম্ভবত তাঁর ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারটি উত্তরাধিকারীদের হস্তগত হয়েছে।

ব্যাপারটা এতো কৌতূহলোদ্দীপক মনে হ'ল যে, পরের দিনই, অর্থাৎ গতকাল বিকেলবেলা আমি তাঁর সন্ধানে রওনা হয়ে গেলুম। স্যাক্সনি প্রদেশের লোকালয়-বহির্ভূত এক নিভৃত অংশে এই শহরটি।

ছোট রেল-স্টেশনের বাইরের রাস্তা ধরে আমি হাঁটতে লাগলাম। এটাই ঐ শহরের বড় রাস্তা। দু'পাশের ভাঙাচোরা বাড়িগুলো দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলুম না যে, এমন জায়গায় যারা বাস করে তাদের মধ্যে কেউ রেমব্রান্টের পুরো এচিং, ড্যুরেরের অসংখ্য উড্‌কাট আর মান্তেনিয়ার জীবনব্যাপী শিল্পকর্মের সমগ্র সংগ্রহের মালিক হ'তে পারে। যাই হোক, পোস্ট-অফিসে গেলাম খোঁজ করতে। তাঁর নামোল্লেখ ক'রে বললুম যে, এক-সময়ে তিনি ফরেস্ট-রেঞ্জার আর অর্থ নৈতিক কাউনসিলারও ছিলেন। শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম যে, তিনি এখনো বেঁচে আছেন। কি ক'রে বাড়িটা খুঁজে বার করতে হবে তাও এঁরা ব'লে দিলেন। স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, পথ চলছি আর সেই সঙ্গে বুক আমার ধুকপুক করছে।

দুপুরের অনেক আগে গিয়েই পৌঁছলাম।

শিল্পবিচারে যিনি এতোবড় একজন সমঝদার, তিনি সেই ভাঙাচোরা একটা বাড়ির দোতলায় থাকেন। একতলাটা একজন দর্জীর দখলে। দোতলায় উঠে বাঁ দিকে দেখলুম ওখানকার পোস্ট-অফিসের মাস্টারমশায়ের নাম লেখা রয়েছে। ডান দিকের সাদা ফলকের ওপর সেই ভদ্রলোকটির নাম। উঃ, শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমি খুঁজে পেলুম! ঘণ্টা টিপবার সঙ্গে সঙ্গে একজন বৃদ্ধা এসে দরজা খুললেন। বৃদ্ধার মাথাভর্তি পাকা চুলের রাশি। তার ওপরে কালো রঙের লেসের টুপি। আমার নাম-লেখা কার্ডখানা তাঁর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, কর্তামশাই বাড়ি আছেন কিনা। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মহিলাটি একবার আমাকে দেখলেন, দেখলেন কার্ডখানাও, তারপর আবার তিনি দৃষ্টি ফেললে আমার ওপর। রাজধানীর কেউ যে এমন একটা ভগবা-পরিত্যক্ত ছোট শহরে দেখা করতে আসতে পারে সে-ক ভেবে তিনি বোধহয় উদ্বেগ অনুভব করলেন। যাই হোক গলার সুর যথাসাধ্য মোলায়েম ক'রে তিনি আমা

মিনিট-খানেক অপেক্ষা করতে ব'লে দরজার ফাঁক দিয়ে অন্তর্হিতা হ'য়ে গেলেন। প্রথমে শুনলুম ফিসফিস ক'রে কথা বলছেন। তারপর উঁচু এবং আন্তরিকতাপূর্ণ একটি পুরুষকণ্ঠের কথা কানে এল আমার: "কি বললে? মিস্টার রাকনের? বার্লিনের সেই সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-ব্যবসায়ী? নিশ্চয়ই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" তক্ষুনি সেই বুড়ী ফিরে এলেন আবার, এবং ভেতরে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন।

এলোমেলোভাবে ছড়ানো কতকগুলো [illegible] আসবাবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মানুষটি বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু হাসিখুশী। নাকের তলায় বুনো গোঁফ—সামরিক ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ। দু'হাত বাড়িয়ে আমায় তিনি অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর হাবভাবে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা ছিল না, অথচ আচরণের মধ্যে অবর্ণনীয় কাঠিন্য লক্ষ্য করলুম আমি। এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন না ব'লে আমি বাধ্য হ'য়েই তাঁর কাছে হেঁটে গিয়ে করমর্দন করলাম। আমি স্বীকার করছি, একটু বিরক্তই হলাম। তারপর আমার নজরে পড়ল যে, করমর্দনের জন্যে তিনি হাত পর্যন্ত তুললেন না। যেন আমার হাতটা আগে আসবে ব'লে অপেক্ষা করছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণটা চোখে পড়ল আমার। ভদ্রলোকটি অন্ধ।

ছেলেবেলা থেকেই অন্ধলোকদের সামনে আমি অস্বস্তি বোধ করি। কেমন একটা লজ্জা আর হতাশায় মন আমার ছেয়ে যায়—যখনই দেখি একটি পরিপূর্ণ প্রাণচঞ্চল মানুষ কোনো একটা ইন্দ্রিয়হানির অক্ষমতায় কষ্ট পাচ্ছে। আমার তখন মনে হয়, আমি বুঝি অন্যায়ভাবে সুবিধা ভোগ ক'রে যাচ্ছি। এই ভদ্রলোকটির সাদা ভুরুর তলায় দৃষ্টিহীন অচেতন চোখ-দুটির দিকে তাকিয়ে অনুরূপ অনুভূতি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। এই অস্বস্তিকর মানসিক বাধা থেকে অচিরেই উদ্ধার করলেন তিনি। আনন্দের আতিশয্যে হাসতে হাসতে ব'লে উঠলেন, "সত্যিই কী স্মরণ-চিহ্নিত দিন আজ! বার্লিনের একজন সুবিখ্যাত মানুষ আমার এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন! দৈবঘটনা ঘটলেও হয়। তোমার মতো একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী যখন মরিয়া হয়ে ছুটে আসে, তখন এই গেঁয়ো-লোকদের একটু সতর্ক থাকতে হয়। কি বলো? আমাদের এই অঞ্চলে একটি প্রবাদ আছে: 'আমেনীশে যদি জিপ্সীদের ঘুরে বেড়াতে দ্যাখো, তাহ'লে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিজেদের পকেট সামলাও!' তোমার এই অযাচিত আগমনের কারণটা আমি আন্দাজ করতে পারি। আমি খবর পেয়েছি যে, কারবার আজকাল ভালো চলছে না। খদ্দের নেই, থাকলেও সংখ্যায় খুব কম। তাই ব্যবসায়ীরা তাদের পুরনো খদ্দেরদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমারও বোধহয় শূন্যহাতে ফিরে যেতে হবে। আমাদের মতো পেনশন-প্রাপ্ত লোকেরা ভেবে খুবই আনন্দ পায় যে, খিদে মেটাবার জন্যে ভাঁড়ারে অন্তত শুকনো রুটি পাওয়া যাবে। সমস্ত জীবন ধ'রে আমি শিল্পবস্তু কিনে বেড়িয়েছি। এখন আমার পুরো সন্ন্যাস। কেনবার দিন অতীত।"

ভুলটা তাঁর শুধরে দিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম আমি যে, কোনো কিছু বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসিনি। কাছেই অন্য একটা জায়গায় কাজ ছিল। তাই ভাবলুম, এতো বড় একজন স্বনামধন্য শিল্প-সংগ্রাহকের সঙ্গে দেখা না ক'রে গেলে অন্যায় হবে। তা ছাড়া তিনি একজন পুরনো খদ্দেরও বটে। কথাটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ঘরের মাঝখানে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন—প্রথমে মুখটা তাঁর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর গোটা অস্তিত্বটাই আত্মগর্বে ভরপুর হয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বোধহয় ভাবলেন, ঐ দিকেই কোথাও তাঁর স্ত্রী ঘোরাফেরা করছেন। তাঁর দিকে চেয়ে এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন তিনি বলতে চান—"ওগো, ভদ্রলোকটির কথা শুনলে?" এবার তিনি সামরিক কর্মচারীদের চরিত্রোচিত কাঠখোট্টা ভাবভঙ্গী বর্জন ক'রে অত্যন্ত মিষ্টি এবং স্নেহসিক্ত সুরে বলতে লাগলেন, "সত্যিই, তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না···কিন্তু আমার মতো একজন বুড়োহাবা লোকের সঙ্গে শুধু সাক্ষাৎ পরিচয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে যদি এসে থাকো তাহ'লে আমি দুঃখিত বোধ করব। সে যাই হোক, তোমার দেখবার মতো জিনিস আছে এখানে। বার্লিন কিংবা ভিয়েনার অ্যালবার্টিনায়, এমনকি লুভ্র্‌-এও এমন জিনিস দেখতে পাবে না। (ওঃ, প্যারিসের বাজার যেন ভগবানের অভিশাপ নামে!) একটি রুচিসম্পন্ন লোক পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় যে-সব অমূল্য শিল্পসম্পদ সংগ্রহ ক'রে রেখেছে তা তো আর রাস্তায় ঘাটে পাওয়া যায় না। লিজ্‌বেথ, দয়া ক'রে কাবার্ডের চাবিটা একবার দাও তো?"

এরপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। এতোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী শান্তচিত্তে আলোচনাটা শুনছিলেন। চাবির কথাটা

শুনে তিনি সহসা চমকে উঠলেন। আমার দিকে হাত তুলে মাথা নাড়তে লাগলেন। কি যে তিনি বলতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না। হেঁয়ালির মতো মনে হ'ল। আমার দিকে এগিয়ে এসে কাঁধে তাঁর হাত রাখলেন, তারপর বললেন, "ফ্রান্জ, তুমি নিশ্চয়ই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছ, অন্য কোথাও তাঁর কাজ আছে কিনা। আর এখন তো প্রায় খাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।" আমার দিকে চেয়ে মহিলাটি পুনরায় বলতে লাগলেন, "সত্যিই আমি দুঃখিত, অতিথিকে আপ্যায়ন করবার মতো যথেষ্ট খাবার নেই ঘরে। তুমি তো নিশ্চয়ই হোটেলে খেতে যাবে। তারপর এসো, আমাদের সঙ্গে ব'সে এক পেয়ালা কফি খাবে। তখন আমার মেয়ে আনা মারিয়াও ফিরে আসবে। পোর্টফোলিওর অভ্যন্তরে কী কী আছে সে সম্বন্ধে আমার চেয়ে আমার মেয়েই ভালো জানে।"

আরও একবার বৃদ্ধাটি আমার দিকে করুণভাবে দৃষ্টি দিলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল, তিনি চাইছেন না যে, তক্ষুনি আমি পোর্টফোলিও থেকে সংগ্রহের তালিকাটি পরীক্ষা ক'রে দেখি। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমি বললুম যে, সত্যি কথা বলতে কি, গোল্ডেন স্ট্যাগ্ হোটেলে আমারও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তারপর তিনটে নাগাদ ফিরে আসব। তাতে আমি খুশিই হবো। তখন হাতেও অনেক সময় থাকবে, মিস্টার ক্রনফেল্ড যা যা দেখাতে চান সবই আমি দেখব। ছ'টার আগে বাড়ি ফেরবার আমার দরকার নেই।

বাচ্চা ছেলেদের হাত থেকে খেলনা নিয়ে গেলে যেমন-ভাবে তারা রেগে ওঠে, আমাদের এই বৃদ্ধ-ভদ্রলোকটিও ঠিক তেমনিভাবে রেগে উঠলেন। অসহিষ্ণু স্বরে বলতে লাগলেন, "জানি, বার্লিনের বিশিষ্ট লোক তোমরা; তোমাদের হাতে সময় খুব কম। তবুও আমার মনে হয়, কয়েক ঘণ্টা সময় এখানে কাটিয়ে যেতে পারলে তোমার ভালোই হবে। তোমায় শুধু দু'-তিনটে প্রিন্ট্ আমি দেখাতে চাইনে, তোমায় দেখাব সাতান্নটা পোর্টফোলিওর পুরো তালিকা-সূচী। এক এক জন শিল্পীর জন্যে এক-একটি পোর্টফোলিও—তালিকার সংখ্যাধিক্যে যেন পোর্টফোলিও ফেটে পড়ছে! যাই হোক, তুমি যদি ঠিক ঠিক তিনটের সময় আসতে পারো তাহ'লে বোধহয় ছ'টার মধ্যে আমরা সবক'টা তালিকা প'ড়ে ফেলতে পারব।"

বাইরের দরজা পর্যন্ত বৃদ্ধা আমায় এগিয়ে দিতে এলেন। দরজাটা পার হয়ে এসে অত্যন্ত নিচু গলায় বললেন, "তোমার ফেরবার আগে আনা মারিয়া যদি তোমার সঙ্গে হোটেলে গিয়ে দেখা করে তাতে তোমার আপত্তি আছে কি? এইটেই ভালো ব্যবস্থা হবে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। কিন্তু এক্ষুনি তো কারণগুলো তোমায় বলা চলবে না।"

"আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি তাতে খুশিই হবো। সত্যিই আমি একা-একাই খাচ্ছি। আপনাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে সে যেন সোজা আমার ওখানেই চ'লে আসে।"

এক ঘণ্টা পরে ডাইনিং-রুম থেকে বেরিয়ে আমি যখন হোটেলের বসবার ঘরে এসে ঢুকলাম, আনা মারিয়া তখন এসে উপস্থিত হ'ল। দেখলুম, অবিবাহিতা প্রবীণা স্ত্রীলোক, রোগা আর সন্ন্যাসী ধরনের—কাপড়চোপড়ে সাদাসিধে। আমাকে দেখে যেন হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল। সহজ এবং স্বাভাবিক ক'রে তোলবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টাও করলুম। এমনও তাকে বললুম যে, তার পিতার যদি ধৈর্যচ্যুতি ঘটে থাকে তাহ'লে এক্ষুনি আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে রাজী আছি, যদিও তিনটে তখনও বাজেনি। মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। আরও বেশি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর কোনোরকমে ভাঙা-ভাঙা কথায় অনুরোধ করলে যে, রওনা হওয়ার আগে কয়েকটা কথা সে বলতে চায়। স্বীকৃতি জানিয়ে বললুম, "আপনি তাহ'লে বলুন। কোনো সাহায্যের দরকার হ'লে বলবেন, আমি করব।"

কি ক'রে যে আলোচনা শুরু করবে বুঝতে পারছিল না। হাত এবং ঠোঁট ওর কাঁপছিল। শেষ পর্যন্ত একটু স্থির হয়ে বলতে আরম্ভ করল, "আমার মা এখানে পাঠিয়েছেন আমাকে। আপনার কাছ থেকে একটু অনুগ্রহ চাই আমরা। আপনি এখান থেকেই সোজা ফিরে চলে যান। বাবা আপনাকে তাঁর সংগ্রহটি দেখাতে চাইবেন। কি বলব···দেখুন, সংগ্রহ যা করেছিলেন বিশেষ কিছু আর নেই তার।"

হাঁপাতে লাগল মেয়েটি। প্রায় ফুঁপিয়ে কাঁদার মতো অবস্থা। তারপর একনিশ্বাসে ব'লে চলল, "দেখুন, কোনো কথাই গোপন করতে চাইনে আমি···আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কী সাংঘাতিক কষ্টেই না দিন কাটছে আমাদের। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই বাবার দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। আগে থেকেই চোখে কম

লেখছিলেন। হয়তো অত্যধিক উত্তেজনার জন্যেই এমনটা ঘটল। যদিও তাঁর তখন সত্তর বছর বয়েস, তবুও তিনি যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। আঠারো শো সত্তর খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের কথা হয়তো বা তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি। বুঝতেই পারছেন, এবারকার যুদ্ধে যোগ দেওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তারপর আমাদের সেনাবাহিনীর অগ্রগতি যখন বন্ধ হয়ে গেল, বাবা তখন আঘাত পেলেন খুব। ডাক্তারের ধারণা, এই আঘাতই তাঁর দৃষ্টিহানির কারণ। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁর অক্লান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব বলিষ্ঠ এবং কর্মচঞ্চল। উনিশশো চোদ্দ সালেও দীর্ঘপথ হাঁটতে পারতেন তিনি—শিকার করতেও পারতেন। দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার পরে তাঁর আনন্দের একমাত্র উৎস হ'য়ে দাঁড়াল এই সংগ্রহগুলি। প্রত্যেকদিন এগুলোর দিকে চেয়ে থাকেন তিনি। শুধু চেয়ে থাকেন, দেখতে পান না। প্রতিদিন বিকেলবেলা পোর্টফোলিও সব টেবিলের ওপর রেখে প্রিন্ট্ গুলো এক এক ক'রে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করেন। বহু বছরের পরিচিত প্রিন্ট্, একটাও এলোমেলো হয় না। অন্য কিছুতেই তাঁর আর আসক্তি নেই আনন্দও নেই। অতীতের সেই নিলামের বিবরণী সব পড়তে বলেন আমায়। পড়িও। যখনই বেশি দামের জিনিসগুলির কথা উল্লেখ করি তখনই স্ফূর্তি বাড়ে তাঁর।

"এই অবস্থা যে কতো ভয়াবহ সে-কথা এবার শুনুন। মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপার বাবা এখনো টের পাননি। আমরা যে নিঃস্ব হয়ে গেছি, তাঁর পেনসনের টাকা দিয়ে যে একদিনেরও খাবার কেনা যায় না তাও তিনি জানেন না। তা ছাড়া আরও লোকের ভরণপোষণের ভার নিতে হয়েছে আমাদের। আমার এক ভগ্নীপতি ভার্দুনের যুদ্ধে মারা গিয়েছেন। তাঁর চারটি সন্তানের দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। এই আর্থিক কষ্টের কথা বাবার কাছে গোপন রাখতে হয়েছে। যতদূর সম্ভব খরচ আমরা কমিয়ে ফেলেছি, তবুও দু'বেলার অন্ন যোটানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। কিছু কিছু জিনিস আমরা বিক্রি করতে আরম্ভ করলাম। বাবার যে-সব প্রিয় সংগ্রহ ছিল তাতে হাত দিলাম না, শুধু খুঁটিনাটি জিনিসগুলো উধাও হতে লাগল। অবিশ্যি বেচবার মতো তেমন কিছু ছিলও না অবশ্য। কারণ, কষ্টেসৃষ্টে পয়সা যোগাড় ক'রে বাবা তো উড্ কাট, তামার পাতের ওপর খোদাই-করা কাজ আর ঐ ধরনেরই ছোটখাটো জিনিস কিনে রেখেছিলেন। বাড়তির আর কি। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন দাঁড়াল, সংগ্রহগুলো তাঁর বিক্রি ক'রে দেব, না তিনি উপোস ক'রে মরবেন? তাঁর অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করলাম না আমরা। কি-ই বা লাভ হতো তাতে? তাঁর তো ধারণাই ছিল না যে, অতিরিক্ত মূল্য দিয়েও খাবার যোগাড় করতে কষ্ট হচ্ছে। তিনি শোনেননি যে, যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটেছে। এবং অ্যাল্সেস-লোরেনের ওপর যে জার্মানির আর অধিকার নেই এই খবরটাও তাঁর জানা ছিল না। এই ধরনের খবর কখনও আমরা তাঁকে প'ড়ে শোনাই না।

"প্রথমে বেচলুম রেমব্রাণ্টের একটা অতি মূল্যবান এচিং—নক্সা। খুব ভালো দামই পাওয়া গিয়েছিল, কয়েক হাজার টাকা। আমরা ভেবেছিলাম এই টাকায় আমাদের অনেকদিন চলবে। তুমি তো জানো উনিশশো বাইশ-তেইশ সালে টাকার দাম কিরকম কমে গিয়েছিল। আমাদের যা সমূহ দরকার ছিল সব কেনাকাটার পরে বাকী টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিলাম। দু'মাসের মধ্যেই সব ফুরিয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে আরও কয়েকটা এনগ্রেভিং বেচে দিতে হ'ল। মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে খারাপ সময় তখন। দোকানদার পুরো দাম দিতে দেরি করতে লাগল। যখন দিল তখন টাকার মূল্য এতো কমে গেল যে, আসলে নির্ধারিত দামের শতাংশের এক অংশ মাত্র পেলুম। ভাবছেন, নিলামওয়ালাদের কাছে যাইনি কেন? তাদের কাছেও গিয়েছিলাম। সেখানেও ঠকলুম আমরা, যদিও লক্ষ লক্ষ টাকা দাম উঠল। হাতে টাকা আসবার পর দেখলাম, হাজার টাকার নোটও সব রাস্তার ছেঁড়া কাগজের সামিল। সামান্য একটু খাদ্যের সংস্থান করতে গিয়ে বাবার সংগ্রহগুলোকে চতুর্দিকে বেচে দিতে হ'ল।

"এই কারণেই মা আজ আপনাকে দেখে এতো বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পোর্টফোলিওগুলি আপনার সামনে খুলতে গেলেই আমাদের চালাকি সব ধরা পড়ত। প্রিন্ট্গুলি বেচার সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা জায়গাগুলিতে একই সাইজের মোটা কার্ট্রিজ কাগজ জুড়ে দিলাম। বাবা ধরতে পারলেন না। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে প্রত্যেকটা প্রিন্ট্ তিনি দেখেন, সেই সঙ্গে গুণেও ফেলেন। চোখে দেখার মতো আনন্দ পান বাবা। রসিক লোকদের ছাড়া অন্য কারো সামনে পোর্টফোলিওগুলো বার করেন না তিনি। ছবিগুলিকে এতো বেশি ভালবাসেন যে, তিনি যদি জানতে পারেন এগুলি সব বিক্রি হয়ে গেছে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ মারা যাবেন তিনি। শেষ যাঁকে ছবিগুলি দেখাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন ড্রেসডেন শহরের কিউরেটার। বহু বছর আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন।"

মহিলাটির গলা কাঁপতে লাগল এবার। পুনরায় বলতে লাগল, "আপনাকে অনুরোধ করছি, এই মিথ্যে-স্বপ্নটা ভেঙে দেবেন না তাঁর। বিশ্বাস যদি হারিয়ে ফেলেন তিনি—তাহ'লে বাবা আর বাঁচবেন না। হয়তো আমরা অন্যায় করেছি, কিন্তু আমাদের আর উপায় ছিল না। পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাগুলি কি বাবার ঐ পুরনো-ছবির চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়? প্রত্যেকটা ছবির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন তিনি, যেন ছবিগুলি তাঁর বন্ধু। এরাই তো তাঁর সুখ এবং শান্তির উৎস ছিল। দৃষ্টি হারাবার পর আজ বোধ হয় এই প্রথম তাঁর চরম আনন্দের সুবর্ণ-সুযোগ এলো। একজন বিশেষজ্ঞের সামনে তাঁর এই সংগৃহীত সম্পদগুলি তুলে ধরবার জন্যে কতো দীর্ঘদিন ধরেই না তিনি অপেক্ষা করছিলেন! অতএব আমাদের এই ছলনাটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আপনি যদি একটু সাহায্য করেন…"

আমার এই গল্পের পুনরাবৃত্তি দিয়ে তোমায় আমি ঠিক বোঝাতে পারব না যে, তার এই অনুরোধের ভাষা কী করুণ আর বেদনাময় হয়ে উঠেছিল। আমার এই ব্যবসায়ী-জীবনে অনেক কিছু দেখলাম—নোংরা কারবার দেখেছি, মুদ্রাস্ফীতির জন্যে বহু লোককে পথে দাঁড়াতেও দেখেছি। একটুকরো রুটির জন্যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অমূল্য সম্পত্তি বেচে ফেলতেও দেখলুম—আর দেখলুম একেবারে নির্জিবের মতো। কিন্তু তাতেও হৃদয় আমার প্রবলে স্পন্দিত হয়নি। সেইজন্যেই এই কাহিনীটা গভীরভাবে স্পর্শ করল আমায়। তোমাকে বলা আবশ্যক যে, ওঁদের ঐ ছলনার অংশ নিতে প্রতিশ্রুত হলুম।

একসঙ্গেই আমরা বাড়ি পর্যন্ত এলুম। আসবার পথে শুনে দুঃখ বোধ করলাম যে, কতো অল্প দামেই না এই সরল এবং অজ্ঞ মহিলা দুজন প্রিন্ট্‌গুলি সব বেচে ফেলেছেন। এর মধ্যে অনেকগুলি ছিল খুবই দামী, কয়েকটার তো জুড়ি মেলাই অসম্ভব। স্থির করলুম, যেমনভাবে পারি এঁদের সাহায্য করব আমি।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার সময় শুনতে পেলাম, স্ফূর্তির সুরে বৃদ্ধটি বলেছেন—"এসো! এসো!" অন্ধ মানুষের শ্রবণশক্তি বোধহয় তীক্ষ্ণ হয়। তাই আমার পায়ের আওয়াজ চিনতে পারলেন তিনি। আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষাও করছিলেন।

দরজা খুলে দিয়ে মৃদুভাবে হাসতে হাসতে বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন, "দুপুরের খাওয়ার পর জানেন, একটু দিবানিদ্রা দেয়। কিন্তু আজকে ঘুময়নি, বোধহয় উত্তেজনা খুব বেশি।" মেয়ের দিকে চেয়ে তিনি বুঝে নিলেন, কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। পোর্টফোলিওর গাদা টেবিলের ওপরেই ছিল। অন্ধ মানুষটি তৎক্ষণাৎ আমার হাতে ধ'রে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। দিয়ে বলতে লাগলেন, "এসো, সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আরম্ভ করা যাক। অনেক কিছু দেখার আছে, সময় পেয়ে উঠবে না। প্রথম পোর্টফোলিওতে সব ডুরারের ছবি। তাঁর শিল্পকর্মের প্রায় পুরোটা। এক-একটা দেখবে আর মনে হবে, একটার চেয়ে অন্যটা ভালো। শিল্পকর্মের মহৎ নিদর্শন। তুমি নিজেই বিচার ক'রে দ্যাখো।" পোর্টফোলিওটা খুলে তিনিই বললেন, "বাইবেলের শেষ-পুস্তকের অবলম্বী যে-সব ছবি আছে তা থেকে শুরু করা যাক।"

যেমন ক'রে মানুষ পলকা কিংবা দামী জিনিস নাড়াচাড়া করে তেমনিভাবে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সেই কার্ট্রিজ কাগজের চিহ্নহীন সাদা পাতাটা আমার চোখ আর তাঁর নিজের চোখের মাঝখানে তুলে ধরলেন তিনি। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে এমন একটা গভীর আগ্রহ ফুটে উঠল যে, বিশ্বাস করতে পারলুম না, তিনি অন্ধ। যদিও জানি অসম্ভব, তবুও তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূর ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল তিনি বুঝি দেখতে পেলেন।

"এর চেয়ে ভালো প্রিন্ট্ কি তুমি কখনো দেখেছ? কী স্বচ্ছ এর মুদ্রণ। খুঁটিনাটি রেখাগুলিও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। ড্রেসডেনের যাদুঘরে রক্ষিত একটা কপির সঙ্গে আমারটা মিলিয়ে দেখেছিলাম। সেটাও ভালো, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার গায়ে দেখলুম দাঁশের মতো দাগ পড়েছে অনেক। তা ছাড়া আমার কাছে তো পুরো সংগ্রহটাই আছে।"

পাতাটার পেছন দিকটা এবার ঘুরিয়ে ধরলেন তিনি। এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আঙুল তুললেন যে, ইচ্ছে ছিল না, তবুও ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অলিখিত শিলালিপি পড়তে লাগলুম যেন।

বৃদ্ধটি আবার বলতে লাগলেন, "চেয়ে দ্যাখো, এতে নাগ্‌লের, রেমি আর এস্‌দাই-এর সংগ্রহের শীলমোহর রয়েছে। এইসব অতিপ্রসিদ্ধ পূর্বসূরীরা কখনো কল্পনাও করতে পারেননি যে, তাঁদের সারাজীবনের সঞ্চিত সম্পদ সব এমন একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে প'ড়ে থাকবে।"

ঐ চিহ্নহীন সাদা পাতাটি সম্বন্ধে তাঁর এতো উচ্চ প্রশংসা শুনে সত্যিই কম্পিত হয়ে উঠলাম। যখন তিনি আঙুল

দিয়ে অদ্ভুত শীলমোহরের স্থানটি নির্দেশ করছিলেন তখন আমার হাতে পর্যন্ত সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল। যে-সব মৃত পূর্বগামীদের নাম করলেন তিনি, তাঁরা যেন সহসা কবর থেকে বেরিয়ে এলেন। জিব আমার আড়ষ্ট হয়ে গেল। মহিলা-দুটির বেদনাময় মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই নিজেকে সামলে নিলুম আমি। তারপর আবার অভিনয় শুরু ক'রে দিলাম। খুব একটা দৃঢ়তার ভাব দেখিয়ে ব'লে উঠলাম, "হ্যা হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার এই সংগ্রহটির জুড়ি পাওয়া অসম্ভব।"

জয়ের আনন্দে ফুলে-ফেঁপে উঠে বৃদ্ধটি বলতে লাগলেন, "এটা তো কিছুই না। এই দুটো প্রিন্ট্ তুমি ছাখো—'মেলন্কোলিয়া' আর 'প্যাশন'। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শেষেরটি অদ্বিতীয়। মনে হয় যেন সেদিনের মুদ্রণ। তোমার বার্লিনের শিল্প-ব্যবসায়ীরা আর পাবলিক-গ্যালারির বড়-কর্তারা যদি দেখেন তাহ'লে ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরবেন।"

—বর্ণনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, একঘেয়েমির ক্লান্তি আসছে তোমার। যাই হোক, তন্ন তন্ন ক'রে পোর্টফোলিওগুলি দেখাতে লাগলেন তিনি—প্রায় ঘণ্টা দুই-এর ব্যাপার! বসে-বসে শ'তিনেক সাদা পাতা দেখা আর সময়মতো প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠা, সে এক ভীতিকর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। অবিশ্যি, অন্ধ মানুষটি তাতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। এবং তাঁর সরল বিশ্বাসের প্রাবল্যে আমিও যেন শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে লাগলুম।

বিপদে যে পড়িনি তা নয়। তিনি আমায় রেমব্রাণ্টের 'অ্যান্টিওপ' ছবির প্রিন্ট্ দেখাচ্ছিলেন। খুবই দামী ছবি, এবং সেটা যে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয়ে গেছে তাতেও সন্দেহ নেই। প্রিন্টের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ তাঁর মনে সন্দেহ জাগল। কয়েকটা পরিচিত খাঁজ তাঁর হাতে ঠেকল না। মুখের ওপর বিষাদের ছায়া পড়ল, ঠোঁট-দুটো কেঁপেও উঠল একটু। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "নিশ্চয়ই এটা 'অ্যান্টিওপ'? আমি ছাড়া অন্য কেউ তো উড্কাট আর এচিংগুলিতে হাত দেয় না। তবে কি ক'রে প্রিন্ট্গুলো অদলবদল হয়ে গেল?"

সাদা কাগজগুলো তাঁর হাত থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে নিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শুরু ক'রে দিলুম। সন্দেহটা ক্রমে ক্রমে মন থেকে তাঁর মুছে যেতে লাগল। যতো বেশি প্রশংসা করছি ততো বেশি তাঁর সন্তুষ্টি বাড়ছে। মেয়ে আর স্ত্রীর দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন তিনি, "এই ছাখো, সত্যিকারের জহুরী! তোমরা তো বলতে, বাজে জিনিস কিনে-কিনে টাকা নষ্ট করছি আমি। সমস্ত জীবন ধ'রে সবরকম সাংসারিক সুখ-সুবিধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি। বই কিনিনি, ভ্রমণ করতে বেরোইনি, থিয়েটার দেখা বন্ধ করেছি, কোনোরকম নেশা পর্যন্ত স্পর্শ করিনি। যে-ক'টা টাকা বাঁচাতে পেরেছি তাই দিয়ে এই শিল্প-সংগ্রহটা কিনেছি। তোমরা ভাবতে, কী তুচ্ছই না এসব কাজ! এখন ছাখো, মিস্টার হাক্নের প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, আমি ভুল করিনি। আমার মৃত্যুর পরে ড্রেসডেন শহরের যে-কোনো ধনীলোকের মতো তোমরাও ধনী হবে। তখন তোমরা আমার এই 'বাতিক'-এর কথা স্মরণ ক'রে আত্মতুষ্টি লাভ করবে। কিন্তু আমি যতোদিন জীবিত থাকব ততোদিন এই সংগ্রহগুলির একটাও খোয়া যাবে না। আমার মৃত্যুর পরে ইনি কিংবা অন্য কোনো শিল্প-ব্যবসায়ী আসবেন। এগুলি বেচবার সময় সাহায্যও করবেন। বেচতে তোমাদের হবেই। কেননা আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পেন্সনটাও বন্ধ হয়ে যাবে।"

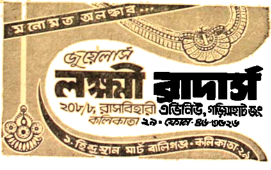
মনোমত অলঙ্কার ...
জুয়েলার্স
লক্ষ্মী ব্রাদার্স
২০৮/৮, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট জং
কলিকাতা ২৯ • ফোন ৪৬-৩৩২৬
১, হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ • কলিকাতা-২৯

কথা বলছেন আর সযত্নে স্নেহভরে ফাঁকা পোর্টফোলিওটির গায়ে হাত বুলচ্ছেন। বৃদ্ধটা সত্যিই কী ভয়ঙ্কর আর মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল। বহু বছরের মধ্যে, এমন কি, উনিশশো চোদ্দ সাল থেকেই একজন জার্মানের মুখের ওপর এমন একটা চরম সুখের ছবি ফুটে উঠতে দেখিনি। তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে সজলচোখে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দুঃখ পাচ্ছেন, আবার সেইসঙ্গে চাপা আনন্দের আভাস। এ যেন সেই দু'হাজার বছর আগেকার মেয়ে-দুটির মতো—ভীতা, অথচ আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে দেখছে কবরের, পাথর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যীশুখ্রীষ্টের পুণ্যময় শবদেহটি তাতে নেই।

আমার মুখ থেকে এতো প্রশংসার কথা শুনেও বৃদ্ধটির যেন তৃষ্ণা মিটল না। আমার কথা শুনছেন আর পোর্টফোলিও থেকে আরও প্রিন্ট্ বার ক'রে আমায় দেখাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি। কার্ট্রিজ কাগজের ফাঁকা এবং সাদা পাতাগুলি গুছিয়ে রেখে দিলেন পোর্টফোলিওতে। আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলাম।

এবার কফি খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। বৃদ্ধটি ভেঙে পড়লেন না, বরং পুনর্যৌবন লাভ করলেন যেন। কি ক'রে হঠাৎ-হঠাৎ এইসব মূল্যবান সংগ্রহগুলি পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি, সেই সম্বন্ধে কতোরকমের গল্প বলতে লাগলেন। বলতে-বলতে আবার তিনি পোর্টফোলিও খুলতে যাচ্ছিলেন। আমরা সবাই তখন জোর দিয়েই বললুম যে, আর দেরি করলে ট্রেন পাব না। তিনি বিরক্ত বোধ করলেন।

যাই হোক, তিনি আর আমায় বাধা দিলেন না। এবং আমরা উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তাঁর কণ্ঠস্বর নরম হয়ে এলো। আমার হাত ধরে তিনি আদর করতে লাগলেন। অন্ধমানুষের স্পর্শানুভূতির গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করলুম আমি।

উৎকম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধটি বললেন, "তুমি এসেছ ব'লে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তোমার মতো বিশেষজ্ঞকে এগুলি দেখিয়ে আমি কী তৃপ্তিই না পেলুম! তুমি রসিক, তাই তুমি এর রস আস্বাদন করতে পারলে। একজন অন্ধলোকের কাছে আসা তোমার নিরর্থক হবে না। আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি শোধ করতে চাই। আমার উইলের ক্রোড়পত্রে লেখা থাকবে যে, তোমরাই আমার সংগ্রহগুলি নিলাম করবে। তোমাদের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ নেই।"

একখানা অন্তঃসারশূন্য কাগজের পোর্টফোলিওর ওপর স্নেহাতুর হাতখানা ফেলে রাখলেন তিনি। বললেন, "কথা দিয়ে যাও, সংগ্রহগুলির জন্যে একটা সুন্দর ক্যাটালগ তৈরি করবে তুমি? এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্মৃতিস্তম্ভ আমি কল্পনাই করতে পারিনে।"

তাঁর স্ত্রী আর মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলাম আমি। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করছিলেন তাঁরা। ভয়ে মরছেন, মৃদু কম্পনধ্বনিও যদি তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছয়! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কথা দিয়ে আসতে হ'ল তাঁকে, যদিও জানি এমন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অসম্ভব। কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি আমায় আলিঙ্গন করলেন।

মা আর মেয়ে দুজনেই আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজা পর্যন্ত এলেন। কথা বলছিলেন না; চোখ দিয়ে অ জল গড়িয়ে পড়ছিল। আমার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ আমি শিল্প-ব্যবসায়ী, দাঁও মারবার উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়ে ছিলাম সেখানে। তা তো হ'লই না। বরং আমি যে তাঁদের সৌভাগ্যের বরণডালা হাতে নিয়ে উপস্থিত হলুম একটি বুড়োলোককে সুখী করবার জন্যে চালাকির আ নিতে দিব্যি দিয়ে বসলাম। এই মিথ্যাচারের জন্যে লজ্জা বোধ করলুম বটে, কিন্তু তা সত্বেও খুশী হলুম আমি। অন্ত একটা দীর্ঘদিনের একটানা দুঃখজনক অন্ধকারময় পরিবেশে মধ্যে স্ফূর্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারলুম তো।

পথে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আবার জানালা খোলার আওয়াজ এলো কানে। আমার নাম ধ'রে কে যেন ডাকলেনও। অন্ধমানুষটি চোখে দেখতে না পে কি হবে, অনুমানে বুঝতে পারলেন আমি কোন্ দিক দি গেলুম। দৃষ্টিহীন চোখ তাঁর এদিক-ওদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমায়। জানালার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁ স্ত্রী আর মেয়ে তাঁকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ফেললেন ভয় পেলেন, কি জানি প'ড়ে যান যদি! একটা রুমা উড়িয়ে তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, "তোমার যাত্রা শু হোক, ফিক্টার রাক্সের!"

একটা বাচ্চা-ছেলের মতো গলার স্বর তাঁর ছড়িয়ে পড় আকাশের শূন্যতায়। এমন একটি উৎফুল্ল মুখের ছা সারাজীবনেও ভোলবার নয়। ড্রেসডেনের রাস্তায় যে-স নিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ আমি দেখেছি, তাদের সঙ্গে এ কোনো তুলনাই হয় না। একটা মিথ্যে কল্পনার জাল আ বুনে এলুম—তা হোক, দুর্বিবহ জীবনের বোঝা খানিকু হালকা হবে তাতে। বোধহয় গ্যেটেই যেন বলেছিলেন "শিল্প-সংগ্রাহকদের মতো সুখী আর কেউ নয়"।

পূর্বস্মৃতি

শরৎকুমার মিত্র

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

১৮৮৭

প্রথম থিয়েটার দেখিলাম। ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা। আমরা সেই সময় ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিষয় সংক্ষেপে পড়িয়াছিলাম। ঠিক বলিতে গেলে লিখিয়াছিলাম। ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তক ছিল না। শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে (আজকালের Standard VIII এবং VII) পড়ান হইত। আমাদের শিক্ষক হেডমাষ্টার ভোলানাথবাবু গল্প করিতেন আধ ঘণ্টা, পরে বাকী আধ ঘণ্টা dictate করিতেন, সেটি প্রথমে গল্প করা হইয়াছে। তখন period পুরা ১ ঘণ্টা করিয়া ছিল। দিনে ৫টা period। সেই dictationটা খাতায় লিখিয়া পরদিন আনিয়া শিক্ষককে দিতে হইত। তিনি ভুল এবং লেখার দোষ সংশোধন করিয়া দিলে আবার একখানা খাতায় লিখিতে হইত।

বাবার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহিত খুব বন্ধুতা ছিল। শুনিয়াছি 'ন্যাশনাল', 'বেঙ্গল' ও 'ষ্টার' থিয়েটার হইবার আগে যখন এমেচার থিয়েটার মাত্র ছিল, তখন বাবা Play করিতেন। পরে বাবা গিরিশবাবুকে 'ম্যাকবেথ'ও 'বলিদান' লিখিতে সহায়তা করেন। পরে ন্যাশনাল থিয়েটার যখন হয় তখন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' হয়। তাহাতে যখন সাহেব—হলি-স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতেছে, দেখান হইবার উপক্রম হইতেছে, তখন দর্শকদের মধ্যে বাবা ও তাঁহার বন্ধু টাপুকুর নিবাসী দীনদয়াল বসু (বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ইভান্‌স্ সাহেবের 'বাবু') ছিলেন। দীনদয়ালবাবু এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সীটগুলির পিছনের (ঠেসান দিবার) ডাণ্ডার উপর দিয়া ষ্টেজের উপর গিয়া সাহেবকে ঘুষি মারেন। বাবা তাঁহাকে আটকাইতে পারেন নাই। সেই অবধি বাবা আর থিয়েটার করেন নাই।

যাহা হউক 'চৈতন্যলীলা' যখন ষ্টার থিয়েটারে হইতেছিল (এখন যেস্থলে Chittaranjan Avenue), বাবা আমাদের গিরিশবাবুর বাড়ীতে লইয়া যান। গিরিশবাবু আমাদের সহিত আলাপ করিয়া বলেন, "তোমরা থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিয়া আসিও"। তিনি পরে পাস (pass) দিয়াছিলেন। আমরা দুই ভাই ও আর এক মাসতুতো ভাই দেখিয়া আসিলাম। থিয়েটার বড় ভাল লাগিল, বিশেষতঃ চৈতন্যের part। বিনোদিনী নাম্নী অভিনেত্রী চৈতন্য সাজিয়াছিল। বিনোদিনী তাহার মায়ের সহিত মধ্যে মধ্যে দুপুরবেলা (ছুটির দিন বাদে) আসিত এবং আমরা একসঙ্গে খেলা করিতাম, আমাদের চেয়ে বয়সে বড় ছিল কিছু। আর ভাল লাগিয়াছিল জগাই পাগলের part। বোধহয় অমৃত মিত্র সাজিত। থিয়েটার এতই ভাল লাগিল যে, অত খেলা কমাইয়া আমরা থিয়েটার করিতে লাগিলাম। আমি, দাদা, আমার মাসতুতো ভাই (আমার চেয়ে এক বছরের ছোট; আমাদের বাড়ীতেই থাকিত), আমাদের কাকিমা (কাকার দ্বিতীয় স্ত্রী; আমার চেয়ে ২।৩ বছরের বড়) গিরিশবাবুর একখানা ছোট নাটক লইয়া আরম্ভ করি। দর্শক ছিলেন আমার মা, মাসী কয়েকজন (হয়

বাসীর ২।৩ জন প্রায় বেড়াইতে আসিতেন) ও মধ্যে মধ্যে পিসিমা আসিতেন চুঁচুড়া হইতে, আর আমার বন্ধুরা। লর্ড রিপনকে, ১৮৮৪ সালে যখন তিনি চলিয়া যান, বেলগাছিয়ায় পার্টি দেওয়া হয়, কারণ তিনিই বোধ হয় প্রথম Liberal Viceroy এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি গবর্নমেন্ট হাউস হইতে বেলগাছিয়া যাইবার পথে আলোকমালা দেওয়া হয় এবং চৌমাথায় সব রঙিন কাগজ ও জরীর-তোরণ-দ্বার করা হয়। এই উৎসবের পর আমাদের চৌমাথার সব তোরণ-দ্বারের সাজসজ্জা আমাদের বাটীতেই থাকিত ও তাহা লইয়া থিয়েটার করিতাম। 'সীতার বনবাস' প্লে করিতাম।

২

এই বৎসর বাংলা ভাষার একজন প্রধান স্রষ্টা অক্ষয়কুমার দত্ত মারা যান। তিনি মৃত্যুর পূর্বে উইল করেন, এবং বাবাকে Executor করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র লেখাপড়া করেন নাই। তাঁহার পৌত্র বিখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন জন্মান নাই। তাঁহার সাংসারিক জীবন বড় অ-সুখের ছিল। স্ত্রী বড় কলহপ্রিয়া। তাই তিনি বালিতে গঙ্গার খুব নিকটে একটি বাগান কিনিয়া সেইখানে নির্জনে থাকিতেন। মৃত্যু আসন্নপ্রায় হইতে বাবাকে খবর দেন। বাবা বালিতে যান, আমি সঙ্গে যাই। গিয়া দেখিলাম, একটি ছোট্ট দ্বিতল বাটী। বাগানে একটি Orchid house আছে। বাড়ীতে একটি Library ও বৈজ্ঞানিক শাঁখ, শামুক, অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি আছে। আর একটি Pyramid shape-এর glass case-এ সুন্দর ভাবে শাঁখ প্রভৃতি সাজান আছে ও বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—

Nature and Nature's laws—
Lay hid in night,
Nature said, let Newton be
And all was light.

অক্ষয়বাবু agnostic ছিলেন।

অক্ষয়বাবুর কঙ্কালরূপ চেহারা দেখিয়া ভয় পাই নাই। তাঁহার দৃষ্টি ও মুখ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম। আমরা পৌঁছিবার অতি অল্পকাল পরেই অক্ষয়বাবুর প্রাণত্যাগ হয়।

১৮৮৮

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে একদিন বাবা বলিলেন, "আমি আজ বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতেছি। তোমরা তাঁহার বই সব পড়িয়া থাক—দেখিতে চাও তো চল।" আমরা সোৎসাহে চলিলাম।

তিনি গোলদীঘির কাছে এক গলিতে কোন এক বাড়ীতে থাকিতেন। কোন্ রাস্তা তাহা মনে নাই। তখন তিনি আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বাবা, আমি ও দাদা সন্ধ্যার সময় বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিলাম। তখন তিনি কাছারী হইতে ফেরেন নাই। আমরা বাড়ীর দরজার সামনেই একটা ঘরে খালি তক্তপোষের উপর অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর বঙ্কিমবাবু ফিরিলেন—চাপকান চোগা পরা। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়াছে। তখন কলিকাতায় আজকালকার অপেক্ষা ধোঁয়া সন্ধ্যার সময় অনেক বেশী হইত এবং ধোঁয়ায় অনেক ধুলা থাকিত। রাস্তায় আলোও আজকাল অপেক্ষা কম ছিল। আমার মনে নাই তখনও কলিকাতায় সর্বত্র গ্যাসের আলো হইয়াছিল কিনা। গ্যাস থাকিলেও এখনকার মত incandescent mantle ছিল না। কাজে কাজেই যে ঘরে বসিয়াছিলাম, তাহা প্রায় অন্ধকার। ঘরে কোন আলো ছিল না। বঙ্কিমবাবু বাবাকে দেখিয়া বলিলেন—"আমার আজ কার্যগতিকে দেরী হইয়াছে, কিছু মনে করিবেন না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হইব, আপনার অসুবিধা হইবে না ত? দুটি ছেলে কে?" বাবা বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি বসছি। আপনি ধড়াচূড়া ছেড়ে জলযোগ করে আসুন। এরা আমার ছেলে।" বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "ওঃ, তাহ'লে পালাই"—বলিয়া চলিয়া গেলেন। মিনিট ১৫।২০ পরে লণ্ঠন লইয়া চাকর আসিয়া বলিল, "আপনারা একটু পা তুলুন, বাবু আপনাদের উপরে আসতে বলেন।" আমরা তাহার সঙ্গে উপরে গেলাম এবং একটি ঘরে ঢুকিলাম। দেখিলাম ঘরের একপাশে একটি সরু কাল পাথরের টেবিল, তাহার দুই পাশে দুইটি double wick-এর টেবিল ল্যাম্প। বঙ্কিমবাবু একেবারে দেয়ালের কাছে দেয়ালের দিকে পিঠ করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা যাইতেই আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এসো, এসো, তোমরা আমার সামনে দু'জন বোসো।" বাবাকে বলিলেন, "তুমি টেবিলের এই দিকটায় বোসো।" বলিয়া বাবাকে নিজের বাঁ দিকের চেয়ারটা দেখাইয়া দিলেন। তাহার পর আমাদের বলিলেন—"তোমরা আমাকে দেখতে এসেছো। তাই আমি সেজে গুজে এলুম। তাই দুটো জোর আলো দিয়েছি। যেমন লোকে মেয়ে দেখতে এলে হয়।" আমরা হাসিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন—"ভাল

ধরে দেখে নাও, পছন্দ হোলো?" আমি বলিলাম—"খুব নয়, আপনি ত সুন্দর নয়।" তিনি বলিলেন—"আঃ, তাইত তোমরা হতাশ হলে, আমার বই ত নিশ্চয় পড়েছ, পড়ে মনে করেছিলে, বইও যেমন ভাল লাগছে, আমাকে দেখেও তেমনি ভাল লাগবে—না?" আমরা ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকিলাম।

তারপর বাবা ও বঙ্কিম Calcutta University-র *Bengali Selections*-এর কথা কহিতে লাগিলেন। আমাদের সময় পর্য্যন্ত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (পরে যাহাকে Matriculation পরীক্ষা বলিত, এখন School Final বলে) বাংলায় পাঠ্য ছিল না। কেবলমাত্র একটা বাংলার পরীক্ষা হইত, তাহার full marks : ৪০ মাত্র; ২০ নম্বর থাকিত একটা ইংরেজী হইতে বাংলা অনুবাদে এবং ২০ নম্বর একটা essay-তে। অনুবাদে alternative passage থাকিত বলিয়া মনে হয় না। সময় কিন্তু অন্য Paper-এর মতন তিন ঘণ্টাই থাকিত। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের Entrance পরীক্ষা হইবার পর ১৮৯১ বা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলার পাঠ্যপুস্তক হয় এবং বাংলায় ১০০ নম্বর full marks হয়। সেই পাঠ্যপুস্তকের Selection-এর জন্য বঙ্কিমবাবু ও বাবার উপর ভার দেওয়া হয়। উভয়েই University Senate-এর মেম্বার ছিলেন। এই দুইজনের উপর ভার দেওয়া মানে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের পর বঙ্কিমবাবুই বঙ্গ-সাহিত্যের সম্রাট—তাঁহারই একাধিপত্য। বাবার Academic career তখন unique এবং গবর্নমেন্ট বা ইউনিভার্সিটির বাংলা ভাষাশিক্ষার সম্যক উপলব্ধি হইবার আগেই বাবা তাঁহার স্কুলে বাংলা ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ (প্রায় ১ ঘণ্টা) কথা হইবার পর বাবা বলিলেন—"আপনার 'কপালকুণ্ডলা' হইতে 'সাগর-সঙ্গম'-এর যে অংশ আমরা লইতেছি তাহার ভাষা যদি দুই এক জায়গায় একটু পরিবর্তন করা হয় আপনার কি আপত্তি আছে?" বঙ্কিমবাবু শুধু বলিলেন, "কেন?" আমরা তাঁহার কণ্ঠস্বর হইতে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি বিরক্ত হইয়াছেন। বাবা বলিলেন, "ভাষায় একটু সামঞ্জস্যের অভাব ত আছে। কোথাও চলতি ভাষা কোথাও লিখিত ভাষা এবং মধ্যে মধ্যে অসংস্কৃত ভাষা আছে মনে হয়—ছেলেদের ত একরকম ভাষা পড়াই ভাল।" বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"আমি ত নির্বাচনের ভার নিয়েছি, বাকী সব তুমিই ত করবে, কিন্তু বলে দিচ্ছি—যদি আমার লেখার উপর হাত চালাতে চাও, তুমি সেটা নিওনা। এবং একলাই সব কর।" বাবা বলিলেন—"আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন? আমি ত শুধু suggest করছি আচ্ছা, আপনার যেমন ভাষা আছে তাই থাকবে।' তখন বঙ্কিমবাবু শান্ত হইলেন। পরে বঙ্কিমবাবু আমাদে বলিলেন, "ভাখো তোমার বাবা বড় সহজ লোক নন উনি মাসিক পত্রিকায় দুইটা প্রবন্ধ দিয়েছিলেন যে, আমা 'রজনী'র main theme আমি লর্ড লিটন-এর *Las Days of Pompeii* থেকে নিয়েছি এবং আমা 'দুর্গেশনন্দিনী'র ideaটা আমি সার্ ওয়াল্টার স্কটে *Ivanhoe* থেকে নিয়েছি। পরে আমার সঙ্গে দেখা হতে আি বলেছিলাম সে ভুল ধারণা। তাতেও তিনি দমলেন না বললেন—আপনি হয়ত ঐ দু'খানা বইএর কথা ভুে গিয়েছিলেন কিন্তু আপনার মনে ঐ ideaগুলোর impression ছিল—ভাখো, কথা শোনো!" তারপর বলিলেন "যাক, তোমরা ইংরেজী বই দুখানা পড়েছ?" আমি বলিলাম "*Ivanhoe* পড়তে চেষ্টা করেছিলুম, শেষ গ্রীষ্মের ছুটিতে বুঝতে পারলুম না।" তারপর আমরা চলিয়া আসিলাম।

১৮৮৯

১

কলিকাতা হাইকোর্টে বহুকাল বড়দিনের ছুটি ২৩শে ডিসেম্বর আরম্ভ হইত। তাহার ঠিক আগের দিন ব তাহার আগের দিন আমি বাবার সহিত হাইকো বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেদিন আমাদের স্কুে Entrance class-এ ছুটি, ২রা জানুয়ারী Test Examination হইবে। বাবার মুহুরীর সঙ্গে হাইকোর্ট সব ঘুরি দেখিলাম, তাহার পর বেলা ১২টা আন্দাজ উকীলদে লাইব্রেরীতে ফিরিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাকে ব্যারিষ্টারদের লাইব্রেরীতে লইয়া গেলেন এবং একটি ছো গোল টেবিলে, যেখানে এড্‌ভোকেট-জেনারাল সার্ চার্ল পল্ বসিয়াছিলেন সেইখানে গিয়া বসিলেন। সেখানে Barrister সৈয়দ আমীর আলিও বসিয়াছিলেন। আি দাঁড়াইয়াছিলাম। একখানা চেয়ার ফাঁকা ছিল। সা চার্লস পল্ বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কে" বাবা বলিলেন। তাহার পর সার্ চার্লস পল্ আমাকে নিজের কাছে ডাকিয়া আমার পিঠ চাপড়াইলেন এব খালি চেয়ারে আমাকে বসিতে বলিলেন। বাবা ও সার্ চার্লস পল্ একটা মোকদ্দমার বিষয় পরাম (consultation) করিতে লাগিলেন। আমীর আলি চু

করিয়া বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্যর্ চার্ল্‌স পল্ বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন নজির ঐ বিষয়ে বাবা পাইয়াছেন কিনা। বাবা বলিলেন—"না।" সেই সময় আমীর আলি আস্তে আস্তে মাথা নাড়িলেন। স্যর্ চার্ল্‌স পল্ আমীর আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তিনি মাথা নাড়িতেছেন। তিনি বলিলেন, "এর আবার নজির কি? Commonsense-ই তো তোমাদের contention support করছে।" স্যর্ চার্ল্‌স পল্ আমীর আলিকে বলিলেন, "You talk of commonsense. Only yesterday you had been a cart-driver."

তখন আমীর আলি নিজের সব brief ফেরত দিয়া লাইব্রেরীতে, চুপচাপ বসিয়া ছিলেন। কারণ তখন টেলিগ্রামে খবর আসিয়া গিয়াছে যে আমীর আলি ১লা জানুয়ারী হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইলেন।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বাবার কাছে শুনিলাম যে তখন ইংরেজ ছাড়া কাহাকেও এটর্নী করা হইত না। তাই স্যর্ চার্ল্‌স পলের বাপ বিলাতে গিয়া সলিসিটর্ হইয়া আসেন। উঁহারা আমেরিকান খ্রীষ্টান। তিনি হাইকোর্টে enrolled হইয়া বলিয়াছিলেন, "Well, one day my son will rule over you all." বাবা গল্পটা বলিয়া বলিলেন, "দেখলে ত কেমন ব্যাপার, কাহাকেও গ্রাহ্য করেনা।" সত্য সত্যই পরে নিজেই দেখিলাম। স্যর্ চার্ল্‌স পলের কি প্রতাপ। ইংরেজ জজদের কাহাকেও খাতির করিয়া কথা কহিতেন না।

পরে দেখিয়াছিলাম ব্যারিষ্টারদের মধ্যে স্যর্ গ্রিফিথ্ ইভান্‌স্, মিঃ ডবলিউ. জ্যাকসন্, মিঃ হিল্, মিঃ ডবলিউ. সি. বনার্জি, মিঃ গার্থ, মিঃ নাইট এবং উকীলদের মধ্যে ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ এবং নরেন্দ্রকুমার বসু জজদের বড় খাতির করিতেন না। স্যর্ চার্ল্‌স পল্, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ বা নরেন্দ্রকুমার বসুর মতন কেহ মুখ খারাপ করিতেন না।

আমার মনে আছে হিল্ সাহেব জজ র‍্যামপিনি ও তাঁহার সহযোগী জজের কাছে একটি সমন আপিলের বক্তৃতা করিতেছিলেন। বাবা আমার পক্ষে ছিলেন। আমি তখন উকীল হইয়াছি, ওই মোকদ্দমাটির সহায়ক ছিলাম। হিল্ সাহেব appellant-এর পক্ষে। তিনি facts না বলিয়া points of law ওখানেই বলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। বাবা বাধা দিয়া বলিলেন, facts কি আগে বলা উচিৎ? র‍্যামপিনির তাহাই ঠিক মনে হইল। তিনি হিল্ সাহেবকে বলিলেন, "Let us hear the facts first." হিল্ সাহেবের কিন্তু তাহা অভিপ্রায় ছিল না। তিনি অনাবশ্যক facts ২।১টা বলিলেন। আবার যেনতেন করিয়া points of law তুলিতে চেষ্টা করেন এবং প্রত্যেক বারে বাবাও উঠিয়া বলেন, "That is again avoiding facts". জজ র‍্যামপিনিও হিল্ সাহেবকে তাহা বলেন। এইরূপ তিন চার বার হইবার পর হিল্ সাহেব বলিলেন—"Like *we are seven* আমি কেবলই এক ভাবে চালাইতে চাহিতেছি আর তুমি (মানে জজ) অকারণ আপত্তি করিতেছ। It is useless dashing my head against a wall or stones." এই বলিয়া হিল্ সাহেব কাগজাদি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া আদালত হইতে চলিয়া যান।

ইহার বহুকাল পরে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ—ষ্টিফেন ও বসন্তকুমার মল্লিক—জজদ্বয়ের কাছে চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের মন্দির সংক্রান্ত একটা দরখাস্ত করিতেছিলেন। আমি তাঁহার সহযোগী ছিলাম। অপর পক্ষ ঐ মন্দিরের মোহন্ত। জজ ষ্টিফেন বলিলেন, "এ দরখাস্ত ত নামঞ্জুর করিবই, আর তোমারই দরখাস্তের উপর আমরা নিজ পক্ষ হইতে তোমারই উপর রুল জারি করিব—কেন এই কার্যটা করা হইতেছে।" রাসবিহারীবাবু বলিলেন, "তাহা তোমরা আইনতঃ পার না।" জজ ষ্টিফেন বলিলেন, "হাঁ ১৯০৮ সালের Civil Procedure Code অনুযায়ী পারি।" রাসবিহারীবাবু বলিলেন, "সে এরূপ ব্যাপারে হয় না। তুমি নূতন Civil Procedure Codeটা ভাল করিয়া পড় নাই।" জজ ষ্টিফেন বলিলেন, "ভাল করিয়াই পড়িয়াছি। জজদের পক্ষ হইতে যে opinion গিয়াছিল, সে draft করিবার জন্য যে কমিটি হয়, তাহাতে আমি ছিলাম।" রাসবিহারীবাবু বলিলেন, "আমি যে সম্পূর্ণ বিলের draft করিয়াছি।" জজ ষ্টিফেন বলিলেন, "তাহা যাহা বল, আমরা rule দিতে পারি।" রাসবিহারীবাবু বলিলেন, "তাহা হইলে দেখিতেছি যে তুমি Civil Procedure Code বুঝিতেই পার নাই।" মোকদ্দমাটি অবশ্য আমরা হারিলাম, কিন্তু আমাদের উপর রুল হয় নাই।

তাহার কিছুদিন পরে উক্ত জজদ্বয়ের নিকট একা একটা মোকদ্দমা করিয়াছিলাম। আমার contention ছিল যে নাবালক আদালতের অনুমতি না লইয়া পার্টিশনের মোকদ্দমা রুজু করিতে পারে না। রাসবিহারীবাবু আমার পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মোকদ্দম

ঠিক পড়ে। জজেরা আমাকে নজীর দেখাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "এই elementary principle-এর জন্য নজীর দেখাইতে হইবে বুঝি নাই, নজীর দেখাইতে হইলে লাইব্রেরী হইতে text book আনাইতে হইবে। একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।" রাসবিহারী বেশ জোরে বলিলেন, "আর নজীর দেখাইতে হইবে না। বসিয়া পড়, যতসব বাঁদর আমদানি হয়েছে।"

আর একবার রাসবিহারীবাবু চীফ জস্টিস্ (বোধ হয়, স্যাণ্ডার্সন ও চোজ্‌নার্)-এর কাছে একটি মোকদ্দমা করিতেছিলেন। মোকদ্দমাটি Public Demands Recovery Act-এর। চীফ জস্টিস্ এ বিষয়ে বুঝিতেন না কিছু। চোজ্‌নার আই. সি. এস. জজ—বুঝিতেন এবং তিনিই কথাবার্তা চালাইতেছিলেন। হঠাৎ জজ চোজ্‌নার-এর তন্দ্রা আসিয়া পড়িল। রাসবিহারীবাবুও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। এমন সময় রাসবিহারীবাবুর কথা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় জজ চোজ্‌নার্-এর তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল এবং তিনি রাসবিহারীবাবুকে বলিলেন, "কোথায় যাও?" রাসবিহারীবাবু বলিলেন, "তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, আমি বাহিরে গিয়া একটু চুরোট খাইতে যাইতেছিলাম।" জজ চোজ্‌নার বলিলেন—"তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ সব শুনিয়াছি"। বলিয়া সব যথাযথ বলিয়া গেলেন। এ মোকদ্দমায় আমি তাঁহার সহযোগী ছিলাম।

রাসবিহারীবাবুর আর একটি ঘটনা বলি। একটি খুব বড় মোকদ্দমা হইতেছিল। হাজারীবাগ রামগড়ের মহারাজার পক্ষে রাসবিহারী, আমি ও আরও ৩।৪ জন ছিলাম। অপর পক্ষে স্যর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, বিজয়মোহন মজুমদার ও অপর ৪।৫ জন ছিলেন। সবজজ মহারাজাকে মোকদ্দমা হারাইয়া দেন। মহারাজা হাইকোর্টে আপীল করেন। উডরফ্ ও কক্স জজদ্বয়ের কাছে শুনানি হয়। এসময়ে স্যর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বা বিজয়মোহন মজুমদার ছিলেন না। এই দুই জজে মতভেদ হয়। আইনতঃ জজ কক্স-এর মতই প্রবল হইল। কারণ, তিনি আপীল ডিস্‌মিস্ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। আমরা জজ কক্স-এর রায়ের বিরুদ্ধে Letters Patent Appeal করিয়াছিলাম। তিন জন জজে এই আপীল শুনেন—জেনকিন্স সি. জে., আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও রিচার্ডসন।

একদিন পুরা শুনানির পর আশুবাবু বলিলেন,—মোকররী জমার চেয়ে ঠিকা জমায় জমিদারের লাভ ত বেশী। ইহা আমাদের case-এর against-এ। রাসবিহারী হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "It is not a questio of Mathematical quibble. Any one who ha a rood of land—and I happen to have a few—know, that a *mokarari* right is more valuable.' আশুবাবুর জমিদারী কিছুই ছিল না। তিনি বুঝিলে এ remark-টা তাঁহারই বিরুদ্ধে। তিনি রাগিয়া উঠি বলিলেন, "What do you mean to say?" রাসবিহারী-বাবু বলিলেন, "I mean what I say." চীফ জস্টি দেখিলেন ব্যাপার সুবিধার নয়। তখন বেলা ১টা ১০ মি. অর্থাৎ midday recess-এর ২০ মিঃ আগে; তি বলিলেন, "Sir Rashbehari : we shall adjourn no and reassemble as usual at 2-30." রাসবিহারীবা বলিলেন, "There is no question of merger. would like much rather to be addressed a Dr. Rashbehari."

পূর্বদিনে মোকদ্দমা শুনানির গোড়া হইতে রাসবিহারী বাবুর বক্তৃতা চলিতেছিল। ২॥০টার সময় যখন জজের বেঞ্চে বসিলেন, তখনও রাসবিহারীবাবু গোড়াতেই আর করিলেন, "Judges should, like Cæsar's wife be above suspicion, you must not be swayed b personal considerations." এই বলিয়া বাকী সমস্ত দি বক্তৃতা করিলেন। তিন জন জজই চুপচাপ থাকিলেন কেহ কোন কথা কহেন নাই। পরে মোকদ্দমা আর আড়াই দিন হয়। তন্মধ্যে দুইদিন স্যর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকা বক্তৃতা করেন। প্রায় দুই মাস পরে রায় প্রকাশ হয়। চীফ জস্টিস্ ও আশুবাবু পৃথক রায় দেন। কিন্তু উভয়ে আপীল ডিক্রি করিলেন। রাসবিহারীরই জয় হইল। অপর পক্ষ বিলাতে আপীল করেন। কিন্তু মিটমাট হই যায়। ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের জজদের সহিত কে একটা মজার কথা কাটাকাটি হইয়াছিল। কিন্তু আমি নি সে সময় উপস্থিত ছিলাম না।

২

তখন আমি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি অর্থাৎ আজ কালকার Class IX। একদিন সন্ধ্যার পর বাবা আমাে সুনামধন্য রাজেন্দ্র দত্তের কাছে লইয়া যান। রাজেন্দ্রবা কলিকাতার প্রথম হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তি মেডিক্যাল কলেজে কয়েক বৎসর পড়িবার পর বিখ্যা বেরিনি সাহেবের influence-এ পড়েন। তিনি আ

মাতাঠাকুরাণীর দূর সম্পর্কে মামা ছিলেন। কিন্তু বেরিস্ নি সাহেবের সহিত সর্বদা রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে যাতায়াত করায় বাবার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমরা তাঁহাকে বলিতাম "জোয়ান দাদা"; তিনি বেশ লম্বা এবং দোহারা ছিলেন ও খুব খাইতে পারিতেন।

একদিন আমাদের সামনেই তিনি খাইতে বসিলেন। এবং আমাকে বলিলেন—"তুই নাকি খুব খেতে পারিস? তোকেও খেতে দিক, দেখি তুই বেশী খেতে পারিস কি আমি পারি।" আমি বলিলাম, "কিছুদিন আগে শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষের (মহাকবি) বাটীতে নিমন্ত্রণ-বাটীর বড় বড় লুচি ২২ খানা খাইয়াছি। তাহা ছাড়া দই, মিঠাইও বেশ খাইয়াছি। সন্ধ্যার সময়ও জানিতাম না যে নিমন্ত্রণ খাইতে হইবে। বাড়ী ফিরিয়াও অভ্যাস মত আমাদের খুব খাইয়াছিলাম। আপনি কি খান দেখি।" বাবা আমাকে খাইতে দিলেন না। দেখিলাম তিনি প্রায় আমি যাহা গিরিশবাবুর বাড়ী খাইবার কথা বলিয়াছিলাম সেইরূপ খাইলেন। আমি বলিলাম, "এ আর কি হইল?" তিনি বলিলেন, "আরে, তোর বয়স আর আমার বয়স। আর তুই কি কি দিন এই রকম খেতে পারিস?"

তারপর একটি বড় পিকদানী তাঁহার কাছে আসিল। তিনি গলায় আঙুল দিয়া সব বমি করিয়া ফেলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হল?" তিনি বলিলেন "এই ত বমি প্রতিদিন রাত্রে। রসাস্বাদ ভোগ করে নিই তারপর তুলে ফেলি। সকালে নাম মাত্র ভাত, শুক্ত, ডালনা ও মাছের ঝোল খাই।" [ক্রমশঃ]

—

'পূর্বস্মৃতি'তে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২): প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা। কলিকাতায় সাধারণ থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা অগ্রবর্তী উদ্যোগী হন, তাঁহাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র অন্যতম। তিনি অনুবাদে ও মূলে প্রায় ৮০খানি নাটক রচনা করেন। অনেক পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী বহু সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে (যেমন—স্টার, মিনার্ভা, এমারেল্ড ও ক্লাসিক) তিনি যুক্ত হইয়া পড়েন।

ইভান্স্, স্যার গ্রিফিথ হাম্‌ফ্রে পুঘ (১৮৪০-১৯০৭): অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। পরবর্তীকালে কলিকাতায় আসিয়া অ্যাটর্নিগিরি আরম্ভ করেন। তিনি ১৮৭৭ সন হইতে ১৮৯০ পর্যন্ত বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৯০ সনে অস্থায়ী অ্যাডভোকেট-জেনারেল ও পুনরায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। ১৮৮৩ সনে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় জনস্বার্থের অনুকূলে কার্য করেন।

রিপন, লর্ড ফ্রেডরিক রবিনসন (১৮২৭-১৯০৯): বিলাতে বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রী পদে কার্য করেন। তিনি উদারনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন। উদারনৈতিক গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রিসভা কর্তৃক বড়লাট নিযুক্ত হইয়া রিপন ভারতবর্ষে আগমন করেন। বড়লাট-রূপে তাঁহার কার্যকাল ১৮৮০-১৮৮৪। তিনি 'দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন' তুলিয়া দেন এবং তাঁহার আমলে আফগানিস্তানের যুদ্ধ সমাপ্তি হয়। অন্যান্য আইন বিধিবদ্ধ করিয়াও তিনি যশস্বী হইয়া যান। শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন এবং স্থানীয় শিক্ষা-প্রসারের পরিকল্পনা তাঁহার আর একটি কীর্তি। তাঁহার আইন-সচিব স্যর কোর্টনি ইলবার্ট, দেশীয় বিচারকগণও যাহাতে ইউরোপীয় বিচারকদের মতো ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচারের অধিকার লাভ করেন, তজ্জন্য একটি আইনের খসড়া বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন। ইহা 'ইলবার্ট বিল' নামে খ্যাত হইয়াছে। এই বিল লইয়া তখন ইউরোপীয়দের বিক্ষোভে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বড়লাট রিপন ১৮৮৪ সনে অবশেষে একটি আপোসমূলক ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২): সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। সাহিত্য-সাধনাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি অনুবাদে ও মূলে বিভিন্ন ছন্দে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'ছন্দের রাজা' বলিয়া তিনি বিশেষভাবে আখ্যাত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪): 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-জাতীয় চিত্তে এক অপূর্ব স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রস-সাহিত্য এবং মনন-সাহিত্য উভয় বিভাগেই তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগ আনয়ন করেন। তাঁহার জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে বহু পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইয়াছে।

পল, স্যর গ্রেগরী চার্লস (১৮৩১-১৯০০): লণ্ডন ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হন। ব্যবহারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হেতু তিনি ক্রমশঃ আইন-ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করেন। এক সময় কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট-জেনারেলের কার্য করেন। তিনি বড়লাটের এবং বাংলার আইন-সভারও সদস্য ছিলেন।

সৈয়দ আমীর আলি (১৮৪৯-১৯২৮): আমীর আলির পূর্ব-পুরুষ পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আসেন এবং অযোধ্যা-এ বসবাস আরম্ভ করেন। সেখান হইতে তাঁহার পিতা সাআদত আলি কলিকাতায় আসিয়া হুগলিতে বাস করিতে থাকেন। আমীর আলি হুগলী কলেজে বিদ্যালাভ করিয়া বিলাতে যান এবং সেখান হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। ১৮৭৩ সনে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবহারশাস্ত্রে এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান আইনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে ও ইহার বিভিন্ন কর্মে তিনি আন্তরিক সহযোগিতা করেন। তিনি বড়লাটের এবং বাংলার আইন-সভার সদস্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন (১৮৯০-১৯০৪)। ১৯০৯ সনে তিনি বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হইয়া যান। আমীর আলি শিয়া-শ্রেণীভুক্ত মুসলমান ছিলেন। তিনি খাঁটি যুক্তিপূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মুসলমান শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, এবং মুসলমান শাস্ত্র ও আইনের উপর বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার রচিত *A Critical Examination of the Life and Teachings of Muhammad, The Spirit of Islam, The Ethics of Islam* প্রভৃতি পুস্তকগুলি বিশ্বজগতে বিশেষ খ্যাত।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee : ১৮৪৪-১৯০৬): বিখ্যাত ব্যারিস্টার। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। ১৮৮৫ সনে তিনি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ১৮৯২ সনে দ্বিতীয়বার ঐ পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি শেষজীবনে বিলাতে বসবাস করিতেন, সেখানেও স্বদেশের সপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন।

গার্থ, স্যার রিচার্ড (১৮২০-১৯০৩): কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৮৭৫-১৮৮৬)। পরে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বহুবার বেথুন স্কুল ও কলেজের অনেক সভায় সভাপতি ছিলেন। অবসর-গ্রহণের পর বিলাতে অবস্থানকালে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতিমূলক কোনো কোনো কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। *A Few Plain Truths about India* গ্রন্থখানির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র (১৮৪৪-১৮৯৩): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্র। গণিত, দর্শন ও আইনশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য সুবিদিত। হুগলী ও প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে, ব্যবহারশাস্ত্রে দক্ষতা হেতু, অধিকাংশ বিচারপতির এবং সহকর্মিগণের শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' (১৮৭৭) পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপেও তিনি বৃত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ল-এর সভাপতিও হইয়াছিলেন।

রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আইনশাস্ত্রে উচ্চতম ডি.এল. উপাধি লাভ করেন। তিনি যৌবনেই 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্যবহারশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য হেতু হাইকোর্টের বিচারপতি, সহকারী আইন-ব্যবসায়ী এবং মোকদ্দমায় পক্ষ-প্রতিপক্ষ সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। আইন-সভার ভিতরে ও বাহিরে বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে তিনি যেমন সরকারের সহযোগিতা করেন, তেমনি যাহা কিছু জনস্বার্থ-বিরোধী বলিয়া তিনি মনে করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনকালে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নতিকল্পে যে দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, তাহার উভয়েরই তিনি সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। স্যার তারকনাথ পালিতের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট' ১৯১০ সনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে (National Council of Education, Bengal) লীন হইয়া যাইবার পরেও আজীবন (মৃত্যুকাল পর্যন্ত) তিনি এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষাকল্পে অনেক টাকা দান করেন। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের জন্যও তিনি শেষ-ইচ্ছা-পত্রে (Will) প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া যান। এই অর্থসাহায্য বলেই 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট' যাদবপুরে স্থানান্তরিত হইয়া একটি বিরাট বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তির উপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব। রাসবিহারী ১৯০৭ সনে সুরাটে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক মতভেদহেতু কংগ্রেস ভাঙিয়া গেলে তিনি পরবৎসর ইহার সভাপতির কার্য করেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার (১৮৬৪-১৯২৪): বিখ্যাত ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার 'কনিক্স' পুস্তক সর্বত্র সমাদৃত হয়। এক সময় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে ইহা নির্ধারিত ছিল। ১৮৮৮ সনে তিনি আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯০৪ হইতে ১৯২০ সন পর্যন্ত তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। শেষবৎসরে তিনি কিছুকালের জন্য অস্থায়ী প্রধান-বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি পুনরায় আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। আশুতোষের প্রধান কীর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কার ও স্নাতকোত্তর (Post Graduate) শিক্ষা-বিভাগ প্রবর্তন। পঁচিশ বৎসর বয়সেই সেনেটের সদস্য রূপে তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হয় এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার এই সংযোগ অব্যাহত ছিল। তিনি ১৯০৬ সন হইতে ১৯১৪ সন পর্যন্ত একাদিক্রমে ৮ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে সমাসীন ছিলেন। পূর্ব হইতেই অগ্রণী হইলেও, এই আট বৎসরের মধ্যেই তাঁহার সকল প্রয়াস একটি মূর্ত রূপ ও পরিণত আকারে প্রকাশ পায়। কলা এবং বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার সমান সমান দৃষ্টি ছিল এবং উভয়েরই বিভিন্ন বিভাগের উচ্চতম শিক্ষা এবং মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্র করিয়া তুলিতে তিনি তৎপর হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলায় উচ্চতম শিক্ষা ও মৌলিক গবেষণার আয়োজন করিয়া যান স্যার আশুতোষ। তিনি ১৯২৩ সনে শেষবারের মতো কিছুকাল উপাচার্যের পদে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু শিক্ষানীতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর—গভর্নর লর্ড লিটনের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ করেন। স্বদেশী আন্দোলনকালে উচ্চপদাধিকারী কোনো কোনো কর্তাব্যক্তি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অযথা অত্যাচার শুরু করিলে, তৎকালীন চ্যান্সেলর বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলোচনার দ্বারা আশুতোষ ইহার প্রতিরোধে সক্ষম হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁহার হস্তক্ষেপ হেতু বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ কর্তাব্যক্তিদের বিদ্বেষমূলক আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

রাজেন্দ্র দত্ত (১৮১৮-১৮৮৯): হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র। তিনি ক্রমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দিকে আকৃষ্ট হন। ১৮৫১ সনে ডাঃ বেরিনি সঙ্গে হোমিওপ্যাথির প্রচার-কার্য নিঃস্বার্থভাবে শুরু করেন। ইহার পূর্বেই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট করাইবার মূলে ছিলেন তিনি (১৮৬৭)। রাজেন্দ্র দত্ত পূর্ব হইতে ব্যবসায়-কার্য দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং ইহার একটি মোটা অংশ জনহিতে ব্যয় করেন। কলিকাতা 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ' মূলতঃ তাঁহারই উদ্যোগে ১৮৫৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ে ক্ষতি হইবার পরে, অর্থ সাহায্য করিতে না পারায় কলেজটি পরে উঠিয়া যায়। রাজেন্দ্র দত্ত দানশীলতা-গুণে সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিলেন। বিনা দর্শনীতে তিনি সর্বদা রোগী দেখিতে যাইতেন। তাঁহার চিকিৎসা পদ্ধতি এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে রোগীগণের বিশেষ আস্থা হইত। দরিদ্রগণকে ঔষধপথ্য দিয়াও তিনি বহুবার সেবা করিয়া গিয়াছেন।

জটিরামের কড়চা

অগ্নিমিত্র

॥ এক নিবন্ধ ॥

কেহ দায়ী নহে

[৺জটিরামবাবুর বর্তমান রচনাটি পড়ে মনে হয় বিশেষ একটি আবেগময় মুহূর্তে রচিত। তাই আমরাও এটিকে তাঁর 'আত্মকথা-মূলক রচনা'র পর্যায়ভুক্ত না করে পৃথকভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করছি। এসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, রচনাটির কিছু কিছু অংশ সম্বলিত দুটি একটি চোতা (রচনাগুলির জন্য তিনি চোতার কাগজই ব্যবহার করতেন) অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি। আমরা সে-অংশগুলি ভবিষ্যতে কখনো উদ্ধার করতে পারলে পাঠক-পাঠিকাকে অবশ্যই উপহার দিতে পারবো। বলা বাহুল্য, আবেগময়তাপ্রসূত রচনা হলেও এটির মধ্যে ৺জটিরাম চাকলাদারের স্বভাবসিদ্ধ পাণ্ডিত্য এবং মৌলিকতার চিহ্ন একেবারে উহ্য নয়। —লিপিকা]

কাল গভীর রাত্রিতে আমার পাশের বাড়ীর সৃষ্টিধরবাবুর মেজো মেয়ে লীলারাণী গলায় দড়ি দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে। আত্মহত্যা করিবার পূর্বে মেয়েটি যথারীতি চিঠি লিখিয়াছিল। 'আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে'—এই কথাটি শুধু লিখিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই। তাহার উপর বেশ কয়েকবার কালি বুলাইয়া অক্ষর কয়টিকে মোটা করিয়া রাখিয়াছে। তবুও পরিত্রাণ পাইল না। সকালে পুলিসের গাড়ী আসিয়া তাহার মৃতদেহটি লইয়া গেল। আমার ঘরে বসিয়া আমি সম্মিলিত কণ্ঠের কান্না শুনিতে লাগিলাম।

সত্যকথা বলিতে কি, মেয়েটির জন্য বড়ো দুঃখ হইতে লাগিল। সুন্দরী যুবতীর অকালমৃত্যুতে কাহার না দুঃখ হয়? আমার অনাথা-আশ্রমের যে তিনটি মেয়ে গত দুই বছরের মধ্যে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহাদের জন্যও আমার যথেষ্ট দুঃখ হইয়াছিল। আর লীলারাণী তো একেবারে আপনজনের মতো। শুধু কি তাই? অনাথা-আশ্রমের মেয়ে তিনটি এমন নিমকহারাম যে, আত্মহত্যার পূর্বে এক কলমও লিখিয়া যায় নাই। পরোপকার করিতে যাইয়া আমাকে বার বার তিনবার কী ঝামেলাতেই না পড়িতে হইয়াছিল। সৃষ্টিধরবাবুর মেয়েটি কত ভালো। তাহার মৃত্যুর জন্য কেহ যে দায়ী নহে এ-কথাটি জানাইয়া যাইবার জন্য কেমন আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছে। এমন কি, সৃষ্টিধরবাবুর যাহাতে ব্যয়বাহুল্য না ঘটে, তাহার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছে। চিঠির মধ্যে শ্মশানখরচ বাবদ চৌদ্দটাকা ছাপান্ন নয়া পয়সাও রাখিয়া গিয়াছে।

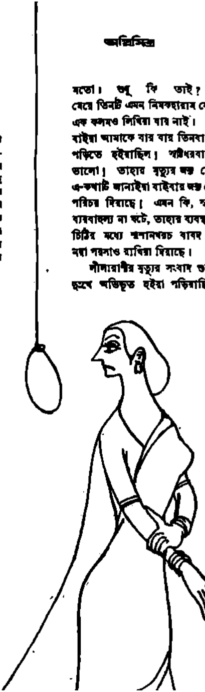

লীলারাণীর মৃত্যুর সংবাদ শুনিবার পর হইতেই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। একে একে যতোই শুনিতে লাগিলাম, বিস্ময় ততই বাড়িতে লাগিল। এত বিষয়-বুদ্ধি থাকিতে মেয়েটি আত্মহত্যা করিতে গেল কেন? কুরূপা নহে। একটু কষ্ট করিয়া দুই-চারিটি বছর বাঁচিয়া থাকিলে চিত্রতারকা হইতে পারিত, জাহাজ-মেরিন ইন্সুরেন্সের এজেন্সি লইয়া লাখ-লাখ টাকার ব্যবসা জমাইয়া দিতে পারিত। এমন কি, কপালে

থাকিলে, কৃষ্টি-প্রতিনিধি হইয়া হয়তো কোনোদিন বিদেশ ভ্রমণ করিয়াও আসিতে পারিত। নিতান্তই কিছু না হইলে সেল্‌স-গার্ল হইবার মতো যোগ্যতাটুকু তো মেয়েটার চেহারায় ছিল। এতসব পথ থাকিতে খামোখা আত্মহত্যা করিয়া আখের নষ্ট করিল কেন? যদি আত্মহত্যাই করিল তবে কাহাকেও দায়ী করিল না কেন? একটা মানুষকেও যদি দায়ী করিয়া যাইত তাহা হইলেও জগতের অনেকখানি উপকার হইত। আদালত-প্রাঙ্গণে ঢুকিলেই যাহারা ভদ্রলোকের জামা টানিয়া ধরিয়া মোকর্দমা করাইয়া ছাড়েন, তাঁহাদের একজনেরও দৃষ্টিটা অন্তত একটা দিন সাদা-মুখ-বাবুটার পরিবর্তে চাঁদনী-বাজারে-কেনা পুরাতন শামলাটিকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া [illegible] ঠুকিয়া, মানত করিয়া একবার সেই অতিপুরাতন 'যাও, তুমি ভারী অসভ্য' বাক্যটি উচ্চারণ করিবার সুযোগ পাইতেন। মেয়েটা সে-কথা চিন্তা করিল না। স্বার্থপরের মতো নিজে মরিয়া নিজের বুঝ টুকু বুঝিয়া লইল।

লীলারাণী লিখিয়াছে, তাহার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। কথাটা অবশ্যই ঠিক। জন্ম হউক, মৃত্যু হউক—কে কাহার জন্য কবে দায়ী হইয়াছে? দায়ী করিলেই কি দায়ী হয়? লীলারাণী তো নিজেকে মারিয়া ঝগড়া মিটাইয়াছে। লীলারাণীর পিতাঠাকুর হরিধনবাবুর বয়স হয়তো পঞ্চাশ হইবে। তাঁহার বয়সকে একশোগুণ করিয়া সন তারিখ ধরিয়া পিছন ফিরিলেও তো সমস্যার নিষ্পত্তি নাই। মিশর, ব্যাবিলন আর মাইকেনী কাল্‌চারের দিনেও কি কেহ কাহাকেও দায়ী করিতে পারিয়াছে? মন্দিরের পুরুতঠাকুরদিগের পিছনে হিসাব করিলে যতগুলি মেয়ে মরিয়াছে, তাহাদের জন্য কে কাহাকে দায়ী করিয়াছিল? অতদূরে যাইব না। এই সেদিনের কথা। গোটা কলিঙ্গ রাজশক্তির ব্লিচিং-পাউডার ঘষিয়া সাফ করিবার পর চণ্ডাশোকের যখন মৌতাত কাটিল, তখন কী হইয়াছিল? চণ্ডাশোক যেই ধর্মাশোক হইলেন, অমনি নাকি সব দোষ কাটিয়া গেল। পিছনে সিংহাসনের খুঁটিটা না থাকিলে, অনুরাধাপুরে বোধিবৃক্ষের ডাল লইয়া মহেন্দ্রকে আর পৌঁছাইতে হইত না। দায়ী হইয়াও তো অশোক দায়ী হইলেন না। সুতরাং কাহারও মৃত্যুর জন্য কেহই দায়ী নহে।

এইতো সেদিনের কথা। মিত্রপক্ষ আর শত্রুপক্ষের

ফোন : ২২-৪৬৮৭

এস, মুখার্জী এণ্ড কোং

[কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

পি. ২২-৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১

পরিবেশক :

টিটাগড় পেপার মিল্‌স কোম্পানী লিমিটেড

এবং

হুগলি ইঙ্ক কোম্পানী (প্রাঃ) লিমিটেড

ষাঁড়ের-লড়াইতে গোটা দুনিয়া তছনছ হইয়া গেল, তাহার জন্যই বা কে দায়ী হইয়াছে? বোমা যখন পড়িয়াছে তখন সৈনিক, ভদ্র কিংবা বংশজের ঘাড় বাছিয়া পড়ে নাই। কিন্তু হত্যার অপরাধটা এ-যাত্রা হিটলার, মুসোলিনি আর তোজোর ভাগেই পড়িল। যুদ্ধে জিতিলে হত্যার অপরাধ হয় না। হারিলে অবশ্যই হয়। তাহা না হইলে নিজপক্ষের গুপ্তচরের অধস্তন সাতপুরুষ দেশপ্রেমিকের পেনসন পায়, আর বিরুদ্ধপক্ষের গুপ্তচর ধরা পড়িলে তাহার মাথাটি এ-পক্ষের পুরুতের ভাগে পড়ে কেন?

কাহারও মৃত্যুর জন্য অপর কেহ দায়ী নহে। ইহা আমি অন্ততঃ পুরাপুরি বিশ্বাস করি। কেন করি? করি এইজন্যই যে, সত্যাই অপর কেহ দায়ী হইতে পারে না। অনাথা-আশ্রমের নিমকহারাম মেয়ে তিনটির জন্য স্ত্রীলোকে আমাকেই তো দায়ী মনে করিয়াছিল। তাই বলিয়া আমি কি সত্যই দায়ী? বলা যায় না, সমাজের পাঁচজনের একজন না হইয়া শশধরবাবুর মতো কেরানী হইলে হয়তো দায়িত্ব আমার উপরই পড়িত। 'হোমরামি'র [হোমরা-চোমরা শব্দের বিশেষ্য করা হ'য়েছে মনে হয়। —লিপিকার] তকমা থাকার একটা মস্তবড়ো সুবিধা আছে। স্ত্রীলোকে যাহাই বলুক, শেষ পর্যন্ত তাহা মিথ্যা প্রমাণ হয়। আমার ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই তো জটিয়ার চাকলাদার নহে। এত টাকা কি এমনিই ··· [ঠোঙা` নিখোঁজ। —লিপিকার]

ছেলেমেয়েগুলি টপাটপ আত্মহত্যা করে আর জাঁক করিয়া লিখিয়া যায়, আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে। ওহে বাপু, তোমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী হইবার এমন মাথাব্যথা কাহার পড়িল যে, তুমি দায়ী বলিলেই দায়ী হইবে? আমার কন্যা আজ আত্মহত্যা করিয়া যদি লিখিয়া রাখে 'আমার মৃত্যুর জন্য আমার পিতা দায়ী'—অমনি আমি দায়িত্ব স্বীকার করিব? অবশ্য আমার মেয়ে হইতে সে আশঙ্কা নাই। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য মোটা দানে-রাখিয়াছি। সে-টাকাগুলির বন্দোবস্ত না করিয়া অমনি গলায় দড়ি দিবে, আমার মেয়েরা অত বোকা নহে। শশধরবাবুর মেয়েটি সেদিক দিয়া কিছু বোকা বইকি! সে ভাবিয়াছে, তাহার আত্মহত্যার উপরই যেন দুনিয়ার ভালোমন্দ নির্ভর করিতেছে। গরীব বাপ না-হয় বিবাহ দিতে একটু বেগ পাইতেছিল। ওদেশের সব হীরার-টুকরা ছেলের তুলনায় না-হয় লীলারাণী অযোগ্যাই হইয়াছে। তাই বলিয়া এমন কাণ্ড করিতে হয়? মেয়েটা এত কথা চিন্তা করিল, অথচ এ-কথাটি চিন্তা করিল না যে, পিতার যথেষ্ট অর্থ না থাকায়, যে যুবকটি তাহাকে ভালবাসিয়াও শেষ পর্যন্ত বিবাহ করিল না, সে আর যাহাই হউক, নির্বোধ নহে। বিবাহ না-হয় নাই হইল, নিজের নির্বাচনের তারিফ করিতে করিতে মেয়েটা অনায়াসে জীবনটা কাটাইতে পারিত। তাহাও করিল না। আমি ভাবিতেছি, আমার ঘরের তালা খোলা থাকিলে ছুটিয়া যাইয়া ছেলেটিকে লইয়া আসিতাম। যাচিয়া তাহাকে আমার ব্যবসায়ের অংশীদার করিয়া লইতাম।

শশধরবাবুর বাড়ী হইতে এখনও কান্নার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। আমার মতো শক্ত মানুষেরও কান্না পাইতেছে। রূপসী মেয়েটা এত পথ থাকিতে আত্মহত্যা করিতে গেল কেন? কুলবধূর ঢেকেশিতে জায়গা না পাইলেই কি সমাজের উপর এমন করিয়া অভিমান করিতে হয়? এই যে কয়েকহাজার বছর কাটিয়া গেল, মানুষ কি বসিয়া আছে? দেশের যুবতী-শক্তির যাহাতে অপচয় না হয় তাহার জন্য সমাজের বড়ো বড়ো মাথাগুলি এতদিন ধরিয়া ঘামিতেছে। এই যে শশধরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হারাধনবাবু গাড়ী হাঁকাইয়া কতদিন গরীব বন্ধুর বাড়ীতে আসিয়াছেন, তাহার মধ্যে আন্তরিকতা নাই? তাঁহার কত কাজ! জনসভা আছে, পাড়ার কোন্দল আছে, হোটেলের ব্যবসা আছে, রাজনীতি আছে। এত কাজের মধ্যেও সময় করিয়া তিনি গরীব বন্ধুর তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়াছেন। অন্তর্দৃষ্টির বলে প্রথম-দর্শনেই বুঝিয়াছেন লীলারাণীর মতো চৌখস মেয়ে হয় না। এমন কি, সংসারে যাহাতে মেয়েটা দু'পয়সা সাহায্য করিতে পারে তাহার জন্য একটা ব্যবস্থা করিবার কথা নিজেই যাচিয়া বলিয়াছেন। কয়জন এমন করে? লীলারাণীকে নাকি কী একটি চাকরিও তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। অথচ হঠাৎ কাল রাত্রে আত্মহত্যা করিয়া মেয়েটা সকলেরই সঙ্গে বেইমানী করিয়া গেল।

তাহার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে বলিয়া সে যে লিখিয়া গিয়াছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মেয়েটার উপর প্রথম সহানুভূতি জাগিয়াছিল, এখন রাগ হইতেছে। আমি তো মরিয়া যাই নাই। আমার নিকট একটা পরামর্শ লইতেও আসিতে পারিত। তাহা আসিবে কেন? এদিকে চালাইব গোরুর গাড়ী, কিন্তু হেড-লাইট থাকা চাই। শশধরবাবুকেও তো পরামর্শ দিয়াছিলাম। কিন্তু কী ফল হইল? আমার কথা শুনিয়া সেদিন মিষ্ট-দুধের ব্যবসা

ধরিলে নিজের ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে অন্তত গোটা দু'তিন মুলতানী কিম্বা সাহিওয়াল গাই কিনিবার পয়সা বাঁচেই হইত। এখন নিশ্চয়ই মনে-মনে আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু আর উপায় নাই। আমার কাছে আসিয়াও ফল হইবে না। আমি ব্যবসা ছাড়িয়া এখন সাহিত্য-সৃষ্টির ব্রত লইয়াছি। আমার সময় নাই।

দারিদ্র্য আছে বলিয়াই কি অমানুষ হইয়া যাইতে হইবে? আর এ-কথা কে না জানে যে—যে যাহার প্রাক্তন অনুসারে দারিদ্র্য ভোগ করে। ইহার জন্যেও তো কেহ দায়ী নহে। লীলারাণীর মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে, শশীধরবাবুর দারিদ্র্যের জন্য কেহ দায়ী নহে, হারাধনবাবুর উপচিকীর্ষা নামক সদ্গুণের আধিক্যের জন্য কেহ দায়ী নহে। তাহা হইলে এত কাণ্ডের জন্য দায়ী কে?

আগেই তো বলিলাম, কাহারও জন্যে কেহ দায়ী নহে। হাতে তেমন ক্ষমতা থাকিলে দায়িত্বের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এমন সহজ কথাটা যে কেন ইহাদের মাথায় ঢুকিল না, তাহাই আশ্চর্য। আর আইন-কর্তাদেরও বলিহারি যাই। এমন আইন করিয়া রাখিয়াছেন যে, নিশ্চিন্তে মরিবারও উপায় নাই। কাহারও যদি গলায় দড়ি পরিবার বাসনা জাগে তো তুমি বাধ সাধো কেন বাপু? কোনোমতে গলার দড়িটা যদি পিছলাইয়া যায়, অমনি তাহাকে সেই দড়ি হাতে পরাইয়া জেলে চড়াইবে। কারণ কী—না আত্মহত্যার চেষ্টার অপরাধ। তা বাপু নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যদি অপরাধ না হয়, তবে মারিবার জন্য অপরাধ হইবে কেন? ··· [এখানে কিছু অংশ পাওয়া যায়নি। —লিপিকার] ··· মরিলে যদি পৃথিবীর বোঝা কিছু হালকা হয় তো আমরা যাহারা বাঁচিয়া থাকিবার দলভারী তাহাদের একটু সুবিধা হয়। যে বাঁচিয়া রহিল তাহার সুখ-সুবিধা দেখাই তো সমাজধর্ম। যে লোকটা থাকিতে চাহে না তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখাটা কোন্ মহৎ কর্ম বাপু? এইযে মেয়েটা মরিল, তাহাকে লইয়া আবার টানা-হেঁচড়া কেন? সে গেল, দুনিয়ার খবরের একখানা রেশন-কার্ড তো বাতিল হইল। মনিভাবে যাহারা মরিতে ইচ্ছুক তাহাদের যদি অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহা হইলে শ্মশানযাত্রীদের বড় খরচটা একটু চাপ পড়িবে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের ফল।

লীলারাণী মরিয়াছে, আপদ চুকিয়াছে। শশীধরবাবুর অন্ততঃ পাঁচহাজারের একটা ধাক্কা বাঁচিল। আরও দুইটি মেয়ে আছে। তাহারাও বুদ্ধিমতী হইলে, হয় বাপকে বাঁচাইবে, নয়তো নিজে বাঁচিবে। কিন্তু আমার কপালে কী হইল? তিনটিকে পার করিয়াছি। বাড়ে এখনও পাঁচটি ঝুলিতেছে। তাহাদের প্রত্যেকের জন্মেই যে হীরার-টুকরার বাপ-মায়েরা আসিয়া ফুলবধূর ভেকেন্সিতে নিয়োগ-পত্র রাখিয়া গিয়াছেন। কোনোটিকে বিউনিকে পাঠাইতে হইবে, কোনোটি আবার বাদবপুর-শিবপুরেই তুষ্ট। শশীধর-বাবুকে একবার ডাকিয়া দেখাইতে সাধ যায়। মেয় না চাহিতেই জলের ধারায় এই যে আমি ভিজিতেছি—ইহা দেখাইতে পারিলেও আনন্দ। লেখাপড়া শিখাইয়া পয়সা নষ্ট করি নাই। নগদ টাকার কারবার। আমার বর যাচিয়া ঘর আসিতেছে। ভাবী জামাতা-বাবাজীবনেরা আসেন যান। জানলার খড়খড়ি তুলিয়া আলাপ জমান—ভিতরে আসিতে চাহেন না। আলিপুর আবহাওয়া-অফিসের সঙ্গে খবরের কাগজের যে সম্বন্ধ, আমার শারীরিক অবস্থার সঙ্গে আমার ভাবী বৈবাহিকবর্গের তাহার চেয়েও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যে-তিনটিকে পার করিয়াছি, তাহাদের শ্বশুরেরা খবরাখবর করেন—দুইবছরে একবার।

আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। লীলারাণীর মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে, এই কথাটি ভাবিতে ভাবিতেই কত প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। মেয়েটা মরিয়া তাহার বাপের অনেক উপকার করিল। আমারই কি কম উপকার হইয়াছে? বিষয়-সম্পত্তি শ্রীমতী চপলাসুন্দরীর নামে হস্তান্তর করিয়া দিয়াছি। ছেলেদের যে যাহার ভাগ বাঁচ করিয়া লইয়াছে। এখন ভাবাবহ অবস্থায় আমি যদি এই ঘরে মরিয়া পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর জন্যও কেহ দায়ী হইবে না। কেহ যদি দায়ী না হইল, তবে আমি কষ্ট করিয়া মরিব কেন? শশীধরবাবুর মেয়ে ভালোমানুষী করিয়া সবাইকে বাঁচাইয়া দিয়া গিয়াছে। আমি তাহা করিব না। আমাকে যদি মরিতেই হয়, তো এই কথাই লিখিয়া রাখিব যে, আমার মৃত্যুর জন্য উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত দুই গোলার্ধের সব-কয়টি মানুষ দায়ী। মজাটা দেখিব। আদালতটাই বা কোথায় বসে আর হাকিম হুজুরই বা কোথা হইতে আসে। যদি ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা হয় তবে ও-জগতে যাইয়া নালিশ দায়ের করিব। লীলারাণী ছাড়িয়াছে তাই বলিয়া জটিরাম চাকলাদার অত সহজে ছাড়িবে না।

অথ নট-ঘটিত

সূত্রধার

৮

ক্লাসিকে যখন 'হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড', স্টার তখন মিটমিটে করছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিরহ', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'সপ্তম প্রতিমা' 'সাবিত্রী' 'বেদৌরা' প্রভৃতি অভিনীত হতে থাকল; কোনোটাই জমল না। হঠাৎ ১৯০৩ সালে একদিন চাকা ঘুরল; স্টার রঙ্গমঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' দেখা দিল। স্টারে এত লোকসমাগম বহুকাল হয়নি। তা ছাড়া এই নাটকখানি ইতিহাস রচনা করল।

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

"দোষত্রুটির কথা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত ক'রে এ কথা বলা যায় যে, এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংবাদপত্র এবং বক্তৃতামঞ্চ জাতির যতখানি হিতসাধন করেছে, এ দেশের নাট্যমঞ্চ তার চেয়ে কম হিত করেনি।"

তখন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'সিরাজদ্দৌলা' ও নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' বেরিয়েছে। বাঙালি দেখল তারই পূর্বপুরুষ একদিন প্রবলপরাক্রান্ত মুঘোল বাদশাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরাট সৈন্যদলকে নাস্তানাবুদ করেছিল। রাণা প্রতাপ, শিবাজী অবশ্যই নমস্য; কিন্তু তাঁরা কেউ বাংলার নন; কোন্ সে বাঙালি-বীর যিনি অন্নগত-প্রাণ অস্ত্রশস্ত্রবিহীন বাঙালিকে তার ভীরুতার গ্লানি থেকে মুক্ত ক'রে তাকে বীরত্বের গৌরবে মহিমান্বিত করেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বারো-ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া প্রতাপাদিত্যকে রঙ্গমঞ্চে বাঙালির চোখের সামনে ধরলেন। সমালোচক বললেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' ইতিহাসও নয় নাটকও নয়, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কতকগুলি কিংবদন্তী দিয়ে বইটি রচিত, আর তা বহু অনৈসর্গিক ঘটনার ভারাক্রান্ত—এক পাখির গায়ে তিনজনের তিনটে শর ঠিক একই সময়ে এসে বিঁধল, আর রক্তাক্ত পাখি পড়ল ঠিক গোবিন্দদাস বাবাজীর মাথার উপর; বিজয়ার গান যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল, এইরকম অনেক কিছু। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটককে সমালোচক যে-দৃষ্টিতে দেখেন, দর্শক সে-চোখে দেখেন না। স্টারে 'প্রতাপাদিত্য'র অভিনয় দর্শককে মাতিয়ে দিল। তখন ইংরেজরাজ নিজমূর্তি ধরেছে; দর্শক যখন প্রতাপের মুখে শুনল—'হয় যশোর, নয় মৃত্যু', তখন তার দেহের রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হতে থাকল।

এর পর 'সিরাজদ্দৌলা' 'মীরকাশিম' 'ছত্রপতি' প্রভৃতি অনেক দেশাত্মবোধক নাটক অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু 'প্রতাপাদিত্য' এদের সকলের অগ্রগামী ; শুধু বহুদিন আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' ও 'পুরুবিক্রম'-এ জাতীয়তাবোধের সুর দেখা দিয়েছিল। নাটকের অভিনয়ে দর্শক যে ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধান করতে চায় না, তা বিশেষভাবে দেখা গেল পরবর্তীকালে অভিনীত 'বঙ্গেবর্গী' নাটকে। বর্গীরা এসে বাংলাদেশকে তচ্‌নচ্‌ করত ; তাদের ভয়ে বাঙালি ত্রস্ত ; আলিবর্দি এই বর্গীর উৎপাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে অনেক কিছু করেছিলেন। কিন্তু নাট্যকার ব্যাপারটিকে একেবারে উল্টে দিলেন ; আলিবর্দিকে করলেন বাংলার স্বাধীনতার হন্তারক আর ভাস্কর-পণ্ডিত মুক্তিদাতা। দর্শক ধন্যি-ধন্যি করল।

যাক, 'প্রতাপাদিত্য' সু-অভিনীত হল। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন : প্রতাপ—অমৃতলাল মিত্র, বিক্রমাদিত্য ও রডা—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, গোবিন্দদাস বাবাজী—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া—নরীসুন্দরী।

বহু রাত্রি নাটকখানি চলল, স্টারের বেশ অর্থাগম হল।

'প্রতাপাদিত্য'র পর স্টার আবার পেছিয়ে পড়তে লাগল। মঞ্চস্থ হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রত্নাবতী' 'নারায়ণী'। চলল না। এর পর দেখা দিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণা প্রতাপ'। প্রতাপাদিত্যের গরম সুরের পর এর সুর নরম, তবে একেবারে বেসুরো নয়। 'তারাবাই' নাটক লেখা হয়েছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দে ; 'তারাবাই' চলল না দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লেখার ওই রীতি ত্যাগ করলেন। 'রাণা প্রতাপ' সু-অভিনীত হল, দর্শক খুশি হল।

সবই ভালো হল, কিন্তু প্রথম অভিনয়-রাত্রে স্টারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মনোমালিন্য ঘটল, দ্বিজেন্দ্রলাল স্টার পরিত্যাগ করলেন। ব্যাপারটা ছিল এই। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'হলদীঘাটের যুদ্ধ' নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন, কবিতাটা সে সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। অমৃতলাল বসু ওই কবিতাটিকে চারটি ভাগ ক'রে চারটি ভূতের মুখে বসান, তারা যুদ্ধবর্ণনা ক'রে যাচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এটা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি স্টারের সংস্রব ত্যাগ ক'রে পরের শনিবারই ওই বই মিনার্ভার অভিনয় করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। মিনার্ভা তখন মনোমোহন পাঁড়ের কর্তৃত্বাধীনে।

এর কিছু আগের কথায় আসা যাক। মিনার্ভায় অভিনয় চলছিল মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার'। মনোমোহন গোস্বামী একজন গ্র্যাজুয়েট। এখনকার মতো তখন অলিতে-গলিতে শতাধিক গ্র্যাজুয়েট থাকত না। গ্র্যাজুয়েট বললে লোকের মনে সম্ভ্রমের উদয় হত। গ্র্যাজুয়েট শুধু বই লেখেননি, আবার স্টেজে নামছেন। বাইরে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। পোস্টারে হ্যাণ্ডবিলে প্রোগ্রামে যেখানেই মনোমোহন গোস্বামীর নাম থাকে, পাশে দেওয়া হয় বি.এ.। পরবর্তী যুগে অবশ্য মেয়ে-গ্র্যাজুয়েটও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছে। যাক সে-কথা, মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' নাটকখানি বিভিন্ন নাটকের ভালো ভালো সিন নিয়ে একটা জগাখিচুড়ি। তার অভিনয়ও মাঝারি রকমের। তা হোক, লোকে নিল। এই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটার মনোমোহন পাঁড়ের হাতে এল। থিয়েটারের মালিক কিন্তু চুনীলাল দেব, মনোমোহন পাঁড়ে লেসি।

মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা নিয়ে চুনী দেবকে ওই থিয়েটারের অধ্যক্ষ করলেন; অভিনয়-সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপার তিনি দেখবেন। হাইকোর্টের উকিল মহেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন মনোমোহন পাঁড়ের বন্ধু, তিনি থিয়েটারে প্রায় আসতেন। তখনকার দিনে একটা থিয়েটার খুললে নানারকমের মকদ্দমা-মামলা প্রায় লেগে থাকত। এইসব দেখবার ভার তিনি মহেন্দ্রবাবুর হাতে দিলেন ; বাকি সব কাজ নিজের হাতে রাখলেন। চুনীবাবু প্রথমেই দলটাকে ভালো ক'রে গড়তে সচেষ্ট হলেন। মনোমোহনবাবু তাঁর বন্ধু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এলেন ; অরোরা থেকে তারক পালিত ও তারাসুন্দরীকে আনলেন ; তারপর একে একে এলেন ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মন্মথনাথ পাল, মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুগায়িকা ও সু-অভিনেত্রী সুশীলাবালা। মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া' অরোরায় খুব জমেছিল, এখন চুনীবাবু মনোমোহন রায়কে ধরলেন মিনার্ভার জন্যে একখানা নাটক লিখে দিতে। তিনি দিলেন 'ঐন্দ্রিলা'। বহু অর্থব্যয়ে তা মঞ্চস্থ করা হল ; অভিনয় খুব ভালোই হল, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে তা হল একেবারে নিষ্ফল। এখন উপহারের পুনর্বৃত্তিতে মিনার্ভা দাঁড়িয়ে গেল।

স্টারে তখন 'প্রতাপাদিত্য'র অভিনয় শেষ হয়েছে, চুনীবাবু অর্ধেন্দুশেখরকে নিয়ে এলেন। অর্ধেন্দুশেখর এসেই বললেন, 'প্রতাপাদিত্য' খোলো। তাই হল ; তিনি হলেন—আগেকার বিক্রমাদিত্য ও রডা, চুনী দেব—প্রতাপ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শংকর, তারাসুন্দরী—কল্যাণী। এ তো হল, কিন্তু বিক্রির অঙ্ক মোটেই ভালো হল না।

ওদিকে ক্লাসিক টলমল করছে, গিরিশচন্দ্রের কয়েকমাসের মাইনে বাকি। চুনীবাবু গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় নিয়ে এলেন; দানীবাবুও এসে গেছেন। এতগুলি প্রতিভাশালী অভিনেতা-অভিনেত্রী এর আগে আর কোনও থিয়েটারে মিলিত হননি।

ঠিক এই সময়ে কিন্তু চুনীবাবুর সঙ্গে মনোমোহনবাবুর মনোমালিন্য হল। চুনীবাবু মিনার্ভার সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করে চলে গেলেন। এখন মিনার্ভার একমাত্র মালিক হলেন মনোমোহন পাঁড়ে। তিনি মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে একজন অংশীদার করে নিলেন। গিরিশচন্দ্রের সম্মতিক্রমে মনোমোহনবাবু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করলেন।

এখন চাই উপযুক্ত বই। বিয়োগান্ত নাটক 'সরলা'র সাফল্য দেখে স্টারের স্বত্বাধিকারীরা একসময় গিরিশচন্দ্রকে দিয়ে 'প্রফুল্ল' লেখান। তার অভূতপূর্ব সাফল্য হল। গিরিশচন্দ্রের সেটা মনে ছিল; তিনি জানতেন করুণরসাত্মক বিয়োগান্ত নাটক বাঙালির হৃদয়কে অতিমাত্রায় স্পর্শ করে। বিবাহ-পণের কুফল দেখিয়ে তিনি নাটক লিখলেন 'বলিদান'। গিরিশচন্দ্র নাটকটিকে অতি করুণ করতে গেলেন, ফলে জায়গায় জায়গায় তা অতিরঞ্জন-দোষে দুষ্ট হল; কিশোরের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ীর বিবাহে তিনি নাটক শেষ করতে পারতেন, কিন্তু তাতে দর্শকের মনে দাগ কাটত না; তিনি করুণাময়ের উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ ঘটালেন। যা হোক, খুব জমজমাটির সঙ্গে অভিনয় হল। প্রথম রাত্রে ছিলেন—

করুণাময়—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
রূপচাঁদ—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী
দুলালচাঁদ—দানীবাবু
কিশোর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মোহিত—ক্ষেত্রমোহন মিত্র
রমানাথ—মন্মথনাথ পাল
সরস্বতী—আমোদসুন্দরী
[illegible]—সুশীলাসুন্দরী

এতগুলি উৎকর্ষশীল শিল্পীকে নিয়ে একখানা নাটকের অভিনয় বঙ্গ-রঙ্গালয়ে খুব বেশি হয়নি।

Indian Nation-এ অধ্যাপক এন. এন. ঘোষ লিখলেন—

The play is an intensely realistic tragedy. Babu Girishchandra Ghosh, the talented author of the play, plays the part of Karunamoy to perfection. Most of the actors and actresses are up to the mark. *Aug. 14, 1905*

একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় গিরিশচন্দ্র

বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র এই নাটকখানি রচনা করেন। অভিনয়ের পঞ্চম রাত্রে বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু 'বলিদান'-এর অভিনয় দেখে মুক্তভাবে মন্তব্য করেন—"the unique piece for social reformers to stop dowry system."

'বলিদান'-এর অভিনয় চলেছে, গিরিশচন্দ্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সকলেই চিন্তিত, কী উপায়! কয়েকজন গিরিশচন্দ্রের বাড়ি গেলেন। তিনি বই বন্ধ রাখতে রাজী নন; বললেন—দু'রাত্রি কোনোরকমে চালিয়ে নাও। কিন্তু ওই দু'রাত্রিই বা চালায় কে? গিরিশচন্দ্র বললেন—পারে এক অর্ধেন্দু; তাকে কিন্তু আটকে রেখো, আর পার্টটা মুখস্থ করতে বোলো।

শুনে অর্ধেন্দুশেখর বললেন—ও পার্ট যে গিরিশ 'জ্বালিয়ে' দিয়ে গেছে, ও পার্ট আর কাউকে ছুঁতে হবে না।

শেষ অবধি অর্ধেন্দুশেখর রাজী হলেন। অপরেশচন্দ্র লিখছেন—

"সোমবার হইতে শনিবার পর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখর আর বাড়ি যান নাই। চোখে ভালো দেখিতে পাইতেন না, বই পড়িয়া

পার্ট মুখস্থ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ক্ষেত্রবাবু তাঁহাকে পার্ট বলাইতে আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্রি করুণাময়ের ভূমিকা সাহেবের জপমালা হইল। [সম্প্রদায়ের সকলে অর্ধেন্দুশেখরকে 'সাহেব' বলত]। যখনি থিয়েটারে যাই, দেখি সাহেব পার্ট বলিতেছেন; আহার-নিদ্রা নাই, অন্য কোন কথা নাই। গিরিশবাবু যে তাঁহাকে নজরবন্দী রাখিতে বলিয়াছিলেন, সে কথাও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। আর গিরিশবাবুর সে কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সে ইঙ্গিতের মর্যাদা তিনি রাখিয়াছিলেন; এ কয়দিন তিনি মদ স্পর্শ করেন নাই—অথচ এই মদই ছিল তাঁহার অহোরাত্রের সঙ্গী। সে শনিবার অর্ধেন্দুশেখর করুণাময় সাজিলেন। তাঁহার অপবাদ ছিল তিনি পার্ট মুখস্থ করিতেন না, কিন্তু সে কলঙ্ক এবার আর রহিল না। তিনি করুণাময়ের ভূমিকা যে শুধু মুখস্থ করিয়া চালাইয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে, অভিনয় তাঁহার এতই সুন্দর ও মর্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, গিরিশচন্দ্রের পর এ পর্যন্ত যত করুণাময় দেখিয়াছি, অর্ধেন্দু-করুণাময়ের মতো করুণাময় আর দেখি নাই। অর্ধেন্দুশেখর সে রাত্রি খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিলেও, গিরিশচন্দ্রের সহিত এই চরিত্রের conception লইয়া পার্থক্য ছিল।"

অপরেশচন্দ্র লিখছেন—"যে দৃশ্যে হিরণ্ময়ী পুকুরে ডুবিয়া মরে, সেই দৃশ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া অর্ধেন্দুশেখর মমতা-বিগলিত চক্ষের ধারে বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন—'এই যে, খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাই ত বলি, আমার শান্ত মেয়ে, হারাবার যাবে না।' এ অংশে দর্শকও কাঁদিতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেন, তখন তাঁহার চক্ষে জল কোথায়? দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিতপ্রবাহ স্তব্ধ, নিষ্পলক নেত্রে জমাট-বাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, স্তব্ধ, গম্ভীর! এ চিত্র দেখিয়া দর্শকের অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন হাহাকার করিয়া উঠিত, কোন্ অপরিজ্ঞাত লোক—কোথায় ছিল, কখন আসিল—ঝঞ্ঝা ঝড়ের মতো অলক্ষ্যে; নিমেষে সব ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেল। গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দর্শককে অনুসরণ করিত। অভিনয়ান্তে—পথে, গৃহদ্বারে, অন্দরে শয়নকক্ষে, আহারে, নিদ্রায়, স্বপ্নে, অভিনয় দেখার দু'তিন দিন পরেও এ করুণাময়ের প্রভাব দর্শককে আচ্ছন্ন করিয়া

নিখুঁত প্রতিলিপি গ্রহণের উপযোগী ব্লক ও মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যে...

যে ব্লক ছাপা হ'লে, মূল ছবির সঙ্গে কোনও তফাৎ থাকে না,
প্রত্যেকটি রেখা যা'তে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সেই সুন্দর
ঝকঝকে ব্লক প্রত্যেকেই চায়। এর পেছনে রয়েছে
ব্লক নির্মাণ নৈপুণ্য আর সযত্নপ্রয়াসলব্ধ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।

● ● ●

লাইন, হাফটোন, কালার প্রিন্টিং, টাইপসেট
এবং ডিজাইন তৈরীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

• কালার স্টুডিও •

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৬ • ফোন: ৫৫-৪৬০৭

ধারিত। সাহেবের অভিনয়ে সমস্ত নাটকের প্রভাব দর্শককে আকুল করিয়া তুলিত ; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে নাটকের সকল ঘটনা চাপা দিয়া মানসচক্ষে কেবল দেখা দিত কালাপাহাড়—বজ্রাহত তরুর ন্যায় পত্রপুষ্পহীন বিশুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের মতো! 'গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এই দুই কালাপাহাড়-আলোচনায় তিনি বলেছিলেন—'কালাপাহাড় ও-দৃশ্যে যদি কাঁদবে, তা হলে সে আর গলায় দড়ি দিতে পারে না।' "

লেখক মহোদয়ই গিরিশচন্দ্রকে নানা ভূমিকায় দেখেছে ; কালাপাহাড়-গিরিশ আর-সকল গিরিশকে বোধ হয় ছাপিয়ে গেছে, যোগেশ-গিরিশকেও।

'বলিদান'-এর অভিনয় বন্ধ হয়েছে। সেই সময়েই একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে 'রাণা প্রতাপ' অভিনয় করার কথা বললেন। মহেন্দ্রবাবু রাজী ; ঠিক হল পরের শনিবারই মিনার্ভায় 'রাণা প্রতাপ' খোলা হবে। স্টারের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা। কর্তৃপক্ষ ভালোরকমই জানেন যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় স্টার থিয়েটারকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে ; ওই থিয়েটারের প্রতি তাদের একটু মমতা আছে। দুর্দিনেও স্টার তার আভিজাত্য হারায়নি ; বিডন স্ট্রীটের থিয়েটারগুলির মতো সে সারারাত্রি অভিনয় করেনি, উপহার বিতরণ করেনি। সেই স্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, আর পাঁচদিনে বই নামাতে হবে। অধিকাংশ অভিনেতা-অভিনেত্রী এই পাঁচদিন বাড়ি গেলেন না ; দিনরাত রিহার্শাল চলতে লাগল। শেষে নাটক মঞ্চস্থ হল :

রাণা প্রতাপ—দানীবাবু
শক্তসিংহ—নগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
পৃথ্বীরাজ—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী
সেলিম—ক্ষেত্রমোহন মিত্র
পুরোহিত—মন্মথনাথ পাল
যোশীবাই ও দৌলত—তারাসুন্দরী
মেহের—হীরাবালা

দৌলতের ভূমিকা যাকে দেওয়া হয়েছিল, যবনিকা ওঠবার পর জানা গেল সে অসুস্থ, আসেনি। তারাসুন্দরী সেদিন যোশীবাই ও দৌলত এই দুই ভূমিকাতেই নামলেন। সম্পূর্ণ এক নতুন ভূমিকায় একদিনও রিহার্শাল না দিয়ে যে তারাসুন্দরী নেমেছেন দর্শকরা তা বুঝতেই পারল না, তারা মনে করল প্রতিযোগিতায় জেতবার জন্যে কর্তৃপক্ষ তারাসুন্দরীকে দুটি ভূমিকায় নামিয়েছেন।

প্রতিযোগিতায় মিনার্ভার হার হল। 'প্রফুল্ল'য় জিতেছিল, এবার হারল।

মনোমোহন পাঁড়ে

গিরিশচন্দ্র এবার 'সিরাজদ্দৌলা' লিখতে আরম্ভ করলেন। এই নাটক-রচনায় গিরিশচন্দ্র যথাসম্ভব ইতিহাসকে অনুসরণ করলেন। উত্তরকালে 'সিরাজদ্দৌলা' পড়ে নবীনচন্দ্র সেন গিরিশচন্দ্রকে লেখেন—"তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, সিরাজের মসী-চিত্রিত আলেখ্যই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল।"

ওই নাটকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লেখেন—

"বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ-চরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের কাছে ঋণী।"

ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সেইসময়কার ইতিহাস অনুসরণ করেই চলল; কিন্তু নিছক ইতিহাসে নাটক জমে না। গিরিশচন্দ্র তাঁর কল্পনা হতে দুটি চরিত্র সৃষ্টি করলেন—একটি করিমচাচা ও অপরটি জহরা; প্রথমটির ভূমিকা নিজে নিলেন, দ্বিতীয়টি দিলেন তারাসুন্দরীকে। গিরিশচন্দ্রের প্রায় সব নাটকে একজন প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ থাকেন, আর তিনি হন আধপাগলা। এখানে করিমচাচাও তাই। করিমচাচার গতি অবারিত—কি নবাবের দরবার, কি মীরজাফরের গুপ্তসভা, সর্বত্র তিনি আছেন, আর সবসময় হাসি-হাসি কথা বলেন। জহরাও নিজেদের মধ্যে ঘসেটি মীরজাফর ক্লাইভ ওয়াট্‌স সিরাজ সকলের কাছে উপস্থিত হচ্ছে ও সকলের কথা জেনে নিচ্ছে।

সিরাজ সম্বন্ধেও কিছু বলবার সময় এসেছে। বিদেশী ঐতিহাসিক বিদ্বেষবশত প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করেছিল এ কথা সত্য; কিন্তু তেমনি সত্য কি নয় যে আমাদের স্বদেশীযুগের ঐতিহাসিকরা জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হয়ে সিরাজকে তার প্রাপ্যের অধিক মর্যাদা দিয়ে গেছেন। নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন এই কথা ধরে নিয়ে যে, দেশের জন্যে যে যুদ্ধ করে সে সবসময়ই আদর্শ চরিত্রের লোক। 'প্রতাপাদিত্য'র তাই দেখা গেছে, 'সিরাজদ্দৌলা'র তাই দেখা গেল। তবে এজন্য গিরিশচন্দ্রকে দায়ী করা যায় না, তিনি তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের অনুসরণ করেছিলেন। স্বাধীনতা-লাভের পর শিশিরকুমার ভাদুড়ী বহু অর্থব্যয়ে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'র পুনরভিনয় করলেন; কিন্তু তা জমল না। তার কারণ বোধ হয় এই, বাংলার শিক্ষিত সমাজ গিরিশচন্দ্রের সিরাজের মধ্যে আসল সিরাজকে খুঁজে পাননি।

'সিরাজদ্দৌলা' যখন খোলা হল, কলকাতা শহর তখন জাতীয়তা-আন্দোলনে উদ্বেলিত। একদিন 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় চলেছে, বালগঙ্গাধর টিলক মিনার্ভা থিয়েটারে এলেন। সমস্ত নাট্যশালা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে মুখরিত হল। গিরিশচন্দ্র তখন মঞ্চে করিমচাচা বেশে। তিনি সেই দরবারেতেই নতজানু হয়ে টিলককে অভিবাদন জানালেন।

'বলিদান' অভিনয় খুবই ভালো হয়েছিল, কিন্তু বেশি পয়সা আনেনি। সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনীত হয়; শুধু অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা ছেড়ে গেছেন। 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয়ও খুব ভালো হল, আর তা বেশ লাভজনকও হল। অপরেশচন্দ্র চলে যাওয়াতে গিরিশচন্দ্রকে হাল ধরতে হল; তিনি এখন হলেন ম্যানেজার।

'সিরাজদ্দৌলা'র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গিরিশচন্দ্র 'মীরকাশীম' রচনায় হাত দিলেন। মীরকাশীম প্রজাবৎসল ছিলেন; তিনি ইংরেজের খেলার পুতুল হয়ে নবাবী করতে চাননি; তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে লড়েছিলেন, শেষ অবধি হৃতসর্বস্ব হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। ইতিহাসের এইটুকু ভিত্তির উপর তিনি নাটক রচনা করলেন।

সেটা ১৯০৬ সাল; দেশ স্বদেশী আন্দোলনে মেতে গেছে। প্রতিরাত্রে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। অনেকদিন এর অভিনয় চলল। মিনার্ভা থিয়েটার ফেঁপে গেল।

'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশীম'-এর অভিনয়ের ব্যবধানে গিরিশচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র নতুন নাট্যরূপ দিয়ে তা মঞ্চস্থ করলেন। এতে রইলেন—

ধীরেন্দ্র সিংহ—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
বিদ্যাদিগ্‌গজ—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী
জগৎসিংহ—তারকনাথ পালিত
ওসমান—দানীবাবু
তিলোত্তমা—প্রকাশমণি
বিমলা—তিনকড়ি দাসী
আয়েষা—তারাসুন্দরী

অতুলনীয় হল এ অভিনয়। দর্শকের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করল দানী—ওসমান, ও তারা—আয়েষা। বহু বছর পরে আর্ট থিয়েটারের আসরে দর্শক স্টার রঙ্গমঞ্চে ওই ওসমান-আয়েষার সমর দেখেছিল। তাঁদের বয়স তখন প্রায় পঁচিশ বছর করে বেড়ে গেছে, দেখতে কিছুটা বেমানান হয়েছে; কিন্তু দীপ্তি তখনও অম্লান রয়েছে। [ক্রমশ]

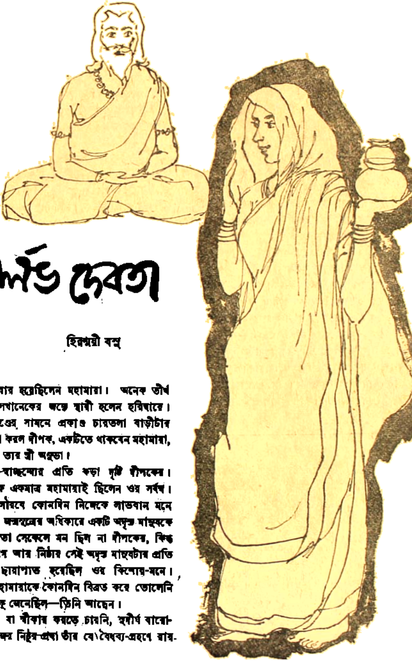

দুর্লভ দেবতা

হিরণ্ময়ী বসু

সাধু-দর্শনে বার হয়েছিলেন মহামায়া। অনেক তীর্থ পর্যটন করে মাসখানেকের জন্যে স্থায়ী হলেন হরিদ্বারে। একেবারে ব্রহ্মকুণ্ডের সামনে প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ীটার দুখানি ঘর ভাড়া করল দীপক, একটিতে থাকবেন মহামায়া, অন্যটিতে সে ও তার স্ত্রী অনুভা।

মায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কড়া দৃষ্টি দীপকের। ছোটবেলা থেকে একমাত্র মহামায়াই ছিলেন ওর সর্বস্ব। পিতৃপরিচয়ের গৌরবে কোনদিন নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেনি দীপক। জন্মসূত্রের অধিকারে একটি অদৃশ্য মানুষকে শ্রদ্ধা করবার মতো সেকেলে মন ছিল না দীপকের, কিন্তু মহামায়ার ত্যাগে আর নিষ্ঠায় সেই অদৃশ্য মানুষটার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ছায়াপাত হয়েছিল ওর কিশোর-মনে। অহেতুক প্রশ্নে মহামায়াকে কোনদিন বিব্রত করে তোলেনি দীপক, শুধু এইটুকু জেনেছিল—তিনি আছেন।

আত্মীয়স্বজন যা স্বীকার করতে চায়নি, সুদীর্ঘ বারো-বছর পর সমাজের নিষ্ঠুর-প্রথা তাঁর বৈধব্য-গ্রহণে বাধ-

পাপ করেছিল—সে-নির্দেশ মহামায়া মানেননি। তাঁর অবচেতন মনের দৃঢ় প্রত্যয়কে শুধু রূপদান করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কত যত্নে যে মহামায়া দীপককে মানুষ করে তোলেন সে-সব কথা একটি দিনের জন্যেও ভোলেনা দীপক। মাকে তার বড় নিঃস্ব মনে হয়। চিরটা কাল তিনি একাই কাটালেন—না নিলেন পিতৃকুলের সাহায্য, না হলেন শ্বশুরকুলের কৃপাপ্রার্থী।

ছুটি পেলেই দীপক তাই বার হয়ে পড়ে, মহামায়াকে নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। সেই সময়টুকু আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে মায়ের ভেতর। সেই উন্মনা সদা-বিষন্ন মানুষটি যেন বাইরের হাওয়ায় সজীব হয়ে ওঠেন, নিষ্প্রভ চুন-পালানো মনটি তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠে।

বার তের বছর আগে এমনি একবার বিশ্বনাথ-দর্শনে গিয়ে হরিদ্বারকে পছন্দ করে ফেলেন মহামায়া। সেইখানেই দীপকের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায়।

হরিদ্বারে আসবার পর মহামায়ার নিয়মিত কাজ হয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, আরতি-দর্শন আর সাধু-সেবা। সন্ধান করে করে, যেখানে যত সাধু আছেন পাহাড়ের কোলে কুটির বেঁধে, তাঁদের দর্শন করতে যান মহামায়া। সঙ্গে থাকে পাঁচবছরের নাতি উজ্জ্বল—আর হাতের পুঁটলিটায় ছাতু আটা ঘি চিনি, যৎসামান্য ফলমূল।

পাহাড়ে চলতে কষ্ট হয় মহামায়ার। ক্ষয়ে-যাওয়া দেহটাকে টেনে নিয়ে তবু ওঠেন। পায়ের তলা ক্ষত-বিক্ষত হয়, তবু ভ্রূক্ষেপ করেন না। দীপক আপত্তি জানালে বলেন, —এতে আর কষ্ট কি? মনের তৃপ্তির চেয়ে শরীরের কষ্ট কখনও কি বড় হয়, খোকা?

অনুভাও কোনো কোনো দিন সঙ্গে যেতে চায়, কিন্তু মহামায়া আপত্তি জানান; বলেন,—তোমার কাজ তুমি করো, বউমা—আমার এগিয়ে যাওয়ার রসদে আর ভাগ বসাতে চেয়ো না।

স্মিত হাস্যে ভরে ওঠে মুখটা, গায়ের রক্তাভ ছটা যেন আলো ছড়ায়।

হরিদ্বারের আশেপাশে লছমন-ঝোলার গঙ্গার অপর পারে সু-উচ্চ পর্বতগুলির অনেক অনেক উপরে সাধুরা সব ছাউনি বেঁধে আছেন, কেউ বা ছোট্ট একটু গুহায়। হপ্তায় একদিন নেমে আসেন কেউ, কেউ বা পনেরো দিন অন্তর, আবার কেউ মাসে একবার। কালী-কমলীর সেবায়েতরা তাঁদের আটা গুড় চিনি লবণ দান করেন, কেউ ফলমূল তরিতরকারি যৎসামান্য গ্রহণ করেন। বৎসরে একবার দুটো করে কম্বলও তাঁদের দেওয়া হয়—কেউ গ্রহণ করেন, কেউ করেন না। শীত-তাপ সুখ-দুঃখ সবই তাঁদের এক অনুভূতিতে বাঁধা পড়ে গেছে।

মহামায়া পাহাড়ে ওঠেন আর ভাবেন—এমনি করে যদি একেবারে উঠে যেতে পারতেন? একেবারে নীল আকাশের কোল ঘেঁষে যে-চূড়াটি মিশিয়ে গেছে দিক্‌চক্রবালে, ওইখানে এতটুকু ঠাঁই যদি পেতেন!

সাধুরা সব মৌনী। ধ্যানে মগ্ন। কথা বড় একটা কেউ বলেন না, চোখ চেয়ে দেখবারও ফুরসত নেই তাঁদের।

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়
এন,সি
একস্ট্রা স্ট্রং
গোল্ডেন 'র' নস্য
প্রস্তুতকারক-
এন,সি,আর্য্য স্নাফ এণ্ড সিগার কোং
মাদ্রাজ-১
কলিকাতা ব্রেঞ্চ-৭১ এ,চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলি:১২
ফোন
৩৪-৫০০৩

মহামায়া তবু যান, সাধ্যমতো আহার্য আর পানীয় কুটিরের সামনে রেখে চলে আসেন। সব দিন দর্শনও হয় না।

অনুভা হেসে বলে,—মায়ের আমার যেমন পাগলামি!

দীপক হাসে না, কোমল তিরস্কারের সুরে বলে,—সারাজীবন হিসেবী হয়ে চলার পর যদি কিছু বেহিসেবী হয়ে পড়েন তাতে আমাদের সহানুভূতি থাকাটাই উচিত, অনু—মা যে আমার বড় নিঃসঙ্গ, মনের সুখ তো কোনদিন পাননি?

হপ্তা দুই হরিদ্বারে থাকবার পর মহামায়া হৃষীকেশে চলে গেলেন। একা গেলেন, ছেলে বউ নাতি সবাই হরিদ্বারে রইল। সেখানেও যেন তিনি থাকতে পারলেন না; চলে গেলেন নদী পার হয়ে, দোলা-সেতু পার হয়ে গঙ্গার ওপারে। গীতাশ্রমের কাছেই পাহাড়ের ওপর এক ধর্মশালায় আস্তানা পাতলেন।

প্রতিদিন ভোর না হতেই বার হয়ে পড়েন সাধু-দর্শনে। একা যান না, সঙ্গে থাকে আরো নানা জাতের রকমারি বয়সের যাত্রীর দল।

পাহাড়টার ওপর প্রায় পঞ্চাশটা কুটির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় আছেন 'মৌনী বাবা'। দর্শন করা বড় কঠিন। নীচে তিনি একেবারেই নামেন না। কালী-কমলীর ছত্র থেকে খাদ্যসম্ভার তাঁর কুটিরে পৌঁছে দিয়ে আসে শিষ্যের দল। অন্য সাধুরাও তাঁর সেবা করেন, পান-ভোজনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আহার্য বা পানীয় জল প্রায় পড়েই থাকে, দৈবাৎ তিনি আহার গ্রহণ করে।

মহামায়া শুনলেন মৌনী-বাবার অলৌকিক গুণাবলী। যাকে তিনি স্পর্শ করেছেন—তারই দেহ রোগমুক্ত হয়েছে, ব্যাধি শোক নিরাময় হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সর্বসময়েই তিনি ধ্যানস্থ। ধ্যানভঙ্গের পর কাউকে সামনে দেখলে নাকি কথা বলেন, আহার্য গ্রহণ করেন—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষের মতোই ব্যবহার করেন। আশপাশ থেকে শুনলেন মহামায়া—সাধু শুধু ধর্মেই সুপণ্ডিত নন, তিনি মহাজ্ঞানী পুরুষ। গীতাশ্রমের গীতাপাঠ ও তত্ত্বব্যাখ্যায় সবার প্রধান ও প্রথম স্থান অধিকার করেন সাধু শূলপাণি। তাঁর কুটিরের সামনে এক বৃহৎ ত্রিশূল, তাঁর ধ্যানমঞ্চের দু'পাশে আর পশ্চাতেও তিনটি ত্রিশূল। বৎসরান্তে যখন একবার নামেন তখনও হাতে থাকে ত্রিশূল। এই ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসীকে দেখার জন্য মানুষের আগ্রহের সীমা নেই।

মহামায়াও এগিয়ে চলেন সাধু শূলপাণির কুটিরের দিকে। ভোর থেকে যাত্রা শুরু হয়, প্রায় বিকেল তিনটে নাগাদ দলটি গিয়ে পৌঁছায় এক পান্থশালায়। খাদ্যের কোনো আয়োজন নেই সেখানে, শুধু বিশ্রামের জন্য অপরিসর ছাউনি আছে কয়েকটি। সেদিনের মতো যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়, পথে বন্যজন্তুর ভয় আছে।

পরদিন আবার ভোর থেকে যাত্রা শুরু হয়। উঁচু-নীচু খাড়াই পথ। অনেক কষ্টে দলটি গিয়ে পৌঁছাল সাধুর কুটিরে।

সকলেই একে একে দর্শন সেরে বার হয়ে এল।

সবশেষে গেলেন মহামায়া।

পাথরের নুড়ির এক প্রশস্ত বেদির ওপর বাঘছালে বসে আছেন সাধু শূলপাণি। শান্ত সৌম্য চেহারা; ধুলো-মাটি, ছাই-ভস্মের চিহ্নমাত্র নেই। গেরুয়া-রঙের একফালি চাদর জড়িয়ে বসে আছেন। শুভ্র দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখ, মাথার শুভ্র জটাগুলি কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে।

মহামায়া দুই চোখ ভরে দেখলেন সাধুকে—দর্শন শুধু চোখের নয়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির আলোকগুচ্ছ দিয়ে আত্মার দর্শন ঘটল।

কতক্ষণ তিনি সেখানে ছিলেন—কতক্ষণ ধরে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে ছিলেন—অজ্ঞাত ভাবে চোখের পাতা অবনত হয়ে পড়েছিল কিনা কিছুই জানেন না। সাধু-দর্শনের পরক্ষণেই মহামায়ার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়।

যাত্রীদলের কেউ ভাবল তিনি নেমে গেছেন, কেউ ভাবল মহামায়া অন্য পথে গেছেন; কেউ তাঁর সন্ধা করল না, নেমে গেল পথে।

মহামায়া যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন রাতে অন্ধকারে ছেয়ে গেছে বন-অরণ্যে-ঢাকা পর্বতের চূড়াগুলি। নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন পৃথিবী যেন বাক্‌রুদ্ধ অবস্থা শূলপাণির ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষারত। উন্মুক্ত আকাশ ভ অসংখ্য তারার মৃদু আলোয় আর বন অরণ্যের কম্পমা বাতাসের অস্পষ্ট মর্মরধ্বনিতে যেন এক মায়ালোক স করছে।

সাধু শূলপাণি তখনও ধ্যানস্থ। মহামায়া নতজানু হ তাঁকে প্রণাম জানালেন। গাঢ় অন্ধকারে ছাওয়া দীর্ঘপ অতিক্রম করে নীচে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন। স্বর্গদ্বা পৌঁছেও অভীষ্ট-সিদ্ধির মোহ বুঝি ত্যাগ করতে পারলেন মহামায়া—পারলেন না নিত্যের অস্তিত্ব ভুলে, সংসার অ স্নেহ ত্যাগ করে স্বর্গের বাসিন্দা হওয়ার ব্রতসাধন করতে

মনের অন্তরালে তখন একটিমাত্র গোপন ইচ্ছা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—প্রতিষ্ঠা চাই, সম্মান চাই, নিজের তেজোদীপ্ত চরিত্রের এই মহামূল্য আলোকরশ্মি—দীপকের সামনে, তার স্ত্রীর সামনে অন্ততঃ জ্বলে উঠুক।

কুণ্ঠিত পায়ে পঁয়তাল্লিশ বছরের দেহভার বহন করে এগিয়ে গেলেন মহামায়া। সারাজীবনের সঞ্চয় আজ নিঃশেষে ঝরে পড়তে চায়, জানিয়ে যেতে চায় তাঁর ব্যর্থ-বেদনা। অপমান গ্লানি আর অমর্যাদার আসনে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যে-মানুষ নির্বিকার সন্ন্যাসধর্মে আজ পঁচিশটি বছর কাটিয়ে দিল, কোন্ লজ্জায় মহামায়া তাঁর ধ্যানভঙ্গ করবেন? কী পুঁজি আছে তাঁর? কোন্ সম্বলের দোহাই দিয়ে এতবছরের অস্বীকৃতিকে সমাজের সামনে সগৌরবে মেলে ধরতে চাইছেন? আত্মসম্মানের মোহে বাধা পড়লেন মহামায়া।

চিন্তারও শেষ নেই, পথেরও শেষ নেই। ভয় করে, বুঝি দিক্‌ভ্রম হ'ল। আশ্চর্য, কত সহজে কত সংক্ষিপ্ত পথে মহামায়া এবার নেমে এলেন! স্থবির পা-দুটিতে যেন অসুরের বল।

যেখান থেকে পাহাড় শেষ হয়ে উঁচু-নীচু রাস্তার ঢল নেমেছে, সেই প্রান্তে এসে মহামায়া আর-একবার ফিরে তাকালেন প্রণাম নিবেদন করবার জন্য। সমগ্র শরীরে তাঁর বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল—পশ্চাতে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামী শূলপাণি! এত কাছে এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য যে, মহামায়া স্বচ্ছন্দে অনুভব করলেন সেই মহাপুরুষের উত্তাপ। মুখে তাঁর মৃদু কোমল হাসি, প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তিনি চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। উভয়েই যেন উভয়কে প্রাণ ভরে দেখলেন, উপলব্ধি করলেন পরস্পরের নিবিড় যোগাযোগ।

ভোরের আলো দিক্‌চক্রবালে প্রসারিত হওয়ার পূর্বে, ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি ধীর পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জীবনের এতবড় সম্পদের সংবাদ ছেলে-বউকে না দিয়ে স্থির থাকতে পারলেন না মহামায়া। সেইদিনই ফিরে গেলেন হরিদ্বারে।

দীপককে ডেকে বললেন,—শীগ্‌গির তৈরি হয়ে নাও, আমার সঙ্গে যেতে হবে সাধু-দর্শনে।

বিস্মিত দীপক প্রতিবাদ করলে না।

সকলে প্রস্তুত হয়ে বাসে উঠলেন। পথ অনেকখানি। মহামায়ার যেন বিন্দুমাত্র দেরি আর সহ্য হচ্ছে না।

বেলা একটা নাগাদ লছমন-ঝোলায় পৌঁছে তাঁরা গিরিশৃঙ্গে উঠতে সুরু করলেন। সবার আগে মহামায়া আর উজ্জ্বল। সবার মুখে উদ্বেগ আর আগ্রহের গভীর ছাপ। কে এই সাধু? এত সাধু-দর্শনে মহামায়া গেছেন, কৈ এমনিভরো বিহ্বল তো তাঁকে কোনদিন দেখায়নি? দীপকের মনে সংশয়ের দোলা লাগে। নিঃশব্দে পথ চলে সকলে।

রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নের শেষে গভীর অরণ্যের নিবিড় অভ্যর্থনা ওঁদের মনকে বিমনা করে তুলল, তবু ওঁরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন ত্রিশূলেশ্বর শূলপাণির কুটিরে।

কুটির-দ্বার আজ উন্মুক্ত। মহামায়া অনাবিল আনন্দে উজ্জ্বলের হাত ধরে ভেতরে প্রবেশ করলেন। এমন মোহের ফাঁস আজ তৈরি করে এনেছেন মহামায়া—দেখতে চান কত শক্তি আছে মৌনী-সাধুর তাঁকে অস্বীকার করবার? মহামায়াকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু পারবেন কি তিনি পৌত্রের দাবিকে অস্বীকার করতে?

মহামায়ার স্বচ্ছন্দগতি বাধা পেল, অচিন্তিত চিন্তায় আধ মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল—চারিদিকে ছড়ানো ভগ্ন পাথরের মূর্তিগুলোয় পা পড়তেই যেন অট্টহাসে দর্পধ্বনি তুলল। পরিত্যক্ত আসন পড়ে আছে, পুজোর আয়োজন প্রস্তুত—কিন্তু দেবতা নেই!

প্রসঙ্গ পিকাসো

কৃত্তিবাস

মাইকেল এঞ্জেলোর ছবি Last Judgment-এর কয়েকটি জায়গায় আপত্তি জানিয়ে পোপ বলেছিলেন, অশ্লীল ও অশোভন। মাইকেল এঞ্জেলো নাকি উত্তর দিয়েছিলেন : Let him change the world and after we will change the painters। পৃথিবীটাই যখন শ্লীলতা ও শোভনতায় পূর্ণ নয়—তখন মানুষের সৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ শোভনতা কেমন করে থাকবে ? অশোভন মানেই তো আর অসত্য নয়। শোভন ও অশোভন দুই-ই পাশাপাশি বাস করে। শিল্পীর নজর একচক্ষু হরিণের মতো নয়। একদিক এড়িয়ে অপরদিকে দৃষ্টি দেওয়া ধর্মযাজকের সাধনা —শিল্পীর সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে তা হতে পারে না।

পিকাসোর এক নতুন জীবনীতে* গ্রন্থকার পিকাসোর সৃষ্টি ও সৃষ্টির ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : Picasso's love of nature is not limited. It extends to qualities that are conventionally despised. It is there he often makes discoveries and brings to light things of unexpected value. He is the scavenger who unearths from the mud abandoned riches, and the magician who can produce a dove from an empty hat.

পিকাসোর সৃষ্টি নিয়ে যত বিতর্কের ঝড় বয়েছে, আর কোনো শিল্পীর কাজ নিয়ে তত হয়নি। পিকাসোর জীবিতকালেই তাঁর সম্পর্কে যত বই প্রকাশিত হয়েছে—এমনটিও কোনো শিল্পীর ভাগ্যে হয়নি। সমালোচকরা বলেন, পিকাসোর হাত গল্পের সেই কৃপণ মাইদাসের মতো—যে হাতের স্পর্শ লেগে সব-কিছুই সোনা হয়ে যায়। পিকাসোর আঙুলের পেনসিল যদি কাগজের ওপর আঁচড়ও কাটে—তারও বাজার-দর আছে।

শিল্পকর্মের গতানুগতিক পথ অনুসরণ না করার ফলেই পিকাসো দুরন্ত বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। সমালোচক ও শিল্পরসিকদের চোখ যা দেখে অভ্যস্ত, পিকাসো সেই ধারা থেকে সোজাসুজি সরে এসেছেন। এমন এক ভিন্ন পথে ভিন্ন মেজাজ নিয়ে সরে এসেছেন যা হৃদয়ঙ্গম করতে শিল্পসমালোচকদের বেশ কিছু বছর কেটে যায়। এতকাল শিল্পের লক্ষ্য ছিল ন্যাচারালিজম। ন্যাচারালিজমের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ সংহত হলো ফরাসী তৈলচিত্রে। উনিশ শতকের অষ্টম দশকে সেজাঁ, ভ্যান গগ, গগ্যাঁ ছিলেন এই নতুন আন্দোলনের পুরোধা। পিকাসোর জন্ম সেই যুগে। শিল্পের এই যুগকে বলা হয় 'পোস্ট-ইম্প্রেসনিজ্‌ম্'।

জীবনের তিন-চতুর্থাংশ ফ্রান্সে বাস করলেও, পিকাসোর স্প্যানিয়ার্ড চরিত্র সহজেই ধরা পড়ে। ধরা পড়ে তাঁর শিল্পকর্মে। জীবনের এক-চতুর্থাংশ কেটেছে মাতৃভূমি স্পেনে। মাদ্রিদ, বার্সিলোনা, মালাগায়। পিকাসোর শিল্পকর্মে যে দ্বন্দ্ব—যে বিভিন্ন মেজাজের প্রকাশ —যে বহুমুখীনতার স্পর্শ—তাতে জাতীয় চরিত্রেরই প্রতিফলন ঘটেছে। এমন বৈচিত্র্য আর বিভিন্ন মনন পৃথিবীর অন্য কোনো শিল্পীর সাধনায় মেলেনি। পিকাসোর মাতৃভূমি স্পেনের একদিকে যেমন উজ্জ্বল সূর্য সপ্রকাশ—অন্যদিকে তেমনি পাহাড়ের ছায়া-ঘেরা অন্ধকার। একদিকে চিরবসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ,—অপরদিকে শীত—কনকনে হাওয়া। একদিকে উর্বরতা—ফসলের প্রাচুর্য,—অন্যদিকে অনুর্বর রুক্ষভূমি। স্পেনীয় চরিত্রেও এই বৈচিত্র্যের স্পর্শ ধরা যায়। সূক্ষ্ম অনুভূতির আবেগ ও রুক্ষ হৃদয়ের কাঠিন্য দুই-ই পাওয়া যাবে। ফ্রান্সে বাস করলেও, বৈচিত্র্যধর্মে পিকাসোর শিল্পরচনায় স্পেনীয় প্রভাব লুপ্ত নয়। স্পেনীয় প্রভাব অর্থে জাতীয় চরিত্রের বৈচিত্র্য।

পিকাসোর বাবা Don Jose Ruiz Blasco ছিলেন চিত্রকর। মায়ের নাম Maria Picasso Lopez। ডন যোশে কিছুদিন স্থানীয় এক মিউজিয়মে কিউরেটর ছিলেন। পরে বার্সিলোনায় এক কলেজে শিল্প-অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত হন।

পিকাসোর ছেলেবেলায় এক আশ্চর্য প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল। কথা বলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি পিকাসো কাগজ-পেনসিল নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। পাতার পাতায় আঁচড় কাটা—ছেলেবেলায় পিকাসোর নাকি এই ছিল খেলা। খুব কম বয়স থেকেই পিকাসোর এই আশ্চ প্রবণতার ফল ফলেছে। চোদ্দবছর বয়সে পিকাসো যে-কোনো ছবি পেনসিলের আঁচড়ে সঠিকভাবে 'কপি করতে পারতেন। চোখের দেখা পেনসিলের ডগা নিখুঁত উঠে আসতো।

ছেলেবেলার স্মৃতিমন্থনে পিকাসো এমন কতকগু ঘটনার উল্লেখ করেছেন—যা তাঁর উত্তরজীবনে শিল্পকর্ ছাপ রেখেছে। সবে হাঁটতে শেখার বয়সে পিকাসোকে নিয়ে যাওয়া হত পার্কে। পার্ক-ভর্তি একপাল ছেলে ছুটোছুটি করে বিকেলের হাওয়া মধুর করে রাখতো। সে পার্কে যত না ছেলে—তার থেকে বেশী উড়তো পায়রা পিকাসোর লক্ষ্য ছিল উড়ন্ত পায়রা। বাবার কোলে চে জানলা দিয়ে বাবার আঙুল অনুসরণ করে পিকাসো দেখতে গাছে গাছে পায়রার দল। উত্তরজীবনে পিকাসো

---

* Picasso : His Life and Art—Roland Penrose : Victor Golancz : 1958

আশ্চর্য সৃষ্টি 'শান্তির পারাবত'। জীবনীকার বলছেন—Throughout his life these birds have been constant companion of Picasso. Gentle and elusive—they have become the symbol of his most tender feelings and utopian desires। পিকাসোর 'শান্তির পারাবত' দেশে দেশে নগরের দেয়ালে দেয়ালে অঙ্কিত হয়ে হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। পিকাসোর 'পায়রা' শান্তির প্রতীক হিসেবে বিশ্বজনের কাছে স্বীকৃত।

ছেলেবেলায় ছবি আঁকায় কাজে বাবার কাছ থেকেই পিকাসোর হাতেখড়ি হয়েছিল। ডন যোসে অনেক সময়ে নিজের ছবির কিছু অংশ পিকাসোকে দিয়ে আঁকিয়ে নিতেন। ছবি অসমাপ্ত রেখে চলে যেতেন—পিকাসোকে বলতেন সম্পূর্ণ করে রাখতে। এমনি একবার এক ছবিতে পায়রা আঁকবার দরকার পড়েছিল—চোদ্দবছরের পিকাসোকে তা আঁকতে দিয়ে ডন যোসে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন জীবন্ত পায়রার দল ছবিতে জড়িয়ে আছে। ডন যোসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নিজের ব্রাশ, প্যালেট আর রঙ পিকাসোকে উপহার দিলেন। বললেন, এত জীবন্ত নিখুঁত ছবি তিনি নিজেও আঁকতে পারতেন না।

এত কম বয়সেই পিকাসো রীতিমতো শিল্পী হয়ে উঠেছে। এখন তার আলাদা স্টুডিও চাই। ছেলে খুব বড় শিল্পী হয়ে উঠুক, ডন যোসের এই কামনা। ছবি আঁকার আলাদা ঘর হল। এমন কি, ডন যোসে নিজেই মাঝে মাঝে পিকাসোর মডেল হয়ে বসে যেতেন। চোদ্দবছরের পিকাসোর ছবি *Science and Charity* জাতীয় প্রদর্শনীতে যথেষ্ট সুনাম কিনলো। ষোলোবছর যখন বয়স তখন তিনি ছবি আঁকার সবরকম অ্যাকাডেমিক টেস্ট উৎরে গেছেন। কিন্তু তখনো তাঁর ছবিতে পিতা আর পিতৃবন্ধুদের ছাপ রয়েছে। এ প্রভাব এড়ানোই পিকাসোর কাম্য। নিজের কাজ নিয়ে অসম্ভব পরিশ্রম করে চলেছেন। কেবল স্টুডিওয় বসে না থেকে, পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। পথ, কাফে, সরু গলি, বোহেমিয়ানদের ভীড়ে পিকাসোকে দেখা যেতে লাগলো। পিকাসো তাঁর আশ্চর্য চোখজোড়া দিয়ে সব-কিছু মনের পটে মুদ্রিত করে নিতেন। সেগুলো রঙে আর পেনসিলে নতুন করে জন্ম নিত।

স্পেনের বুল-ফাইট দেখার খুব শখ ছিল পিকাসোর। বুল-ফাইটে মানুষ আর পশুর নাটকীয় চলাফেরা,—দৃঢ়ভঙ্গী,—দর্শকদের উন্মাদনা,—মাঠে আলোছায়ার খেলা সব-কিছু মিলিয়ে ছোট ছোট অজস্র ছবি পিকাসোর মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে যেত। রেখায় আর তুলিতে তাকে মূর্তমান করে পিকাসো সেগুলো বিক্রি করে পয়সা তুলতেন—আর সেই পয়সাতেই কেনা হত বুল-ফাইট দেখার টিকেট।

তাঁর এ-সময়কার স্কেচ-বুকে অজস্র ছবি পাওয়া যায়। রাস্তা, ঘোড়ার গাড়ী, ভিখিরী, কোচম্যান, নাচঘর, বুল-ফাইট, ডক-শ্রমিক, নৌকোর মাঝি, নিজের আত্মীয়স্বজনের অনেকগুলি ছবি—বাবা, মা, বোন। বোন লোলা পিকাসোর খুব আদরের—তার অনেক ভঙ্গিমায় ছবি পিকাসো এঁকে রেখেছেন—কখনো দাঁড়িয়ে, চুল আঁচড়ানোর ভঙ্গীতে—চেয়ারে বসে।

উনিশবছর বয়সে পিকাসো প্রথম প্যারিসে গেলেন। প্রথম অভিজ্ঞতার প্যারিস তাঁর জীবনে অনেক মূল্যবান সম্পদ এনে দিয়েছিল। প্যারিসে স্টুডিওর পর স্টুডিও দেখে বেড়াতে লাগলেন, মিউজিয়মে গেলেন, মৃত শিল্পীদের সৃষ্টির নতুন করে পরিচয় পেলেন। অভিজ্ঞতার দিক থেকে পিকাসো এক নতুন জগতের পরিচয় নিলেন। এই ক'বছরে তিনি ১০০টি তৈলচিত্র শেষ করেছেন। শিল্পকর্মে তাঁর বিষয়ের অভাব ছিল না। চোখে যা দেখতেন সব-কিছুতেই তাঁর আগ্রহ।

কুড়িবছর বয়স যখন পিকাসোর তখনই তাঁর অনেক ছবি খ্যাতিলাভ করেছে। সে-সময়কার ছবিতে ধীরে ধীরে পিকাসোর নিজস্ব ভঙ্গিমা জন্মলাভ করছে—ছবি দেখলে বলে দিতে পারা যেত এ-ছবি পিকাসোর আঁকা। এ সময়ে পিকাসোর প্রিয় রঙ ছিল নীল। ক'বছর ধরেই তাঁর ছবিতে নীল রঙের প্রাধান্য ছিল। এই ব্লু-পীরিয়ডে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য আছে। মানুষের ছবিতে হাতের ওপর জোর পড়েছে—লম্বা লম্বা আঙুল—দৃঢ় শক্ত হাত। হাতের এই ছাপ উত্তরযুগেও পিকাসোর ছবিতে রয়েছে। এই ব্লু-পীরিয়ডেই পোর্ট্রেট-পেন্টিং-এ পিকাসো অপূর্ব দক্ষতা লাভ করেছেন।

পেন্টিং আর দৈনিক জীবন এ-দুয়ের মধ্যে তফাত রইলো না পিকাসোর কাছে। দুটো চোখ নিয়েই যেন পিকাসো বেঁচে রয়েছেন। নিজের মধ্যে একটা প্রতিভার আবেগ—নতুন-দিগন্ত-লাভের আকাঙ্ক্ষা—নতুন-জীবন-লাভের উন্মাদনায় পিকাসো তখন মুহ্যমান। বন্ধুদের সংবর্ধনা, দর্শকদের চিত্তজয় করেও তাঁর একাকীত্ব কাটলো না। সমালোচক বলছেন: He felt the troubling solitude of nascent genius and the call to new horizons.

এ সময়ে পিকাসোর চোখ পড়লো একটি মেয়ের ওপর। অলিভিয়া ফারনান্দে। তার সবুজ চোখ—মাথা-ভর্তি ঘন চুলের অরণ্য—নিটোল স্বাস্থ্য। অলিভিয়া হলো পিকাসোর মেয়ে-বন্ধু। ছ'বছর তাঁরা একসঙ্গে দিন

কাটিয়েছেন। পিকাসোর জীবনে তখন বোহেমীয় প্রভাব। অলিভিয়ার বাহ্য সৌন্দর্য পিকাসোকে উদ্বুদ্ধ করেছে—পিকাসোর নতুন শিল্পকৃতির সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। পিকাসোর অনেক-ছবিতে অলিভিয়া অমর হয়ে রয়েছে।

ক্রমে ক্রমে পিকাসোর নাম প্যারিসের চৌহদ্দি পেরিয়ে ফ্রান্সের বাইরেও ছড়িয়ে পড়লো। পিকাসোর স্টুডিওতে বিদেশীদের ভীড় হতে সুরু হল। বিশেষ করে, দেশের নবীন সাহিত্যিক-কবি-বুদ্ধিজীবীর দল পিকাসোর ভক্ত হয়ে উঠলো। তখনো কিন্তু পিকাসোর আর্থিক দুর্গতির অবসান হয়নি। রাত্রে কাজ করতে করতে তেলের প্রদীপ নিবে আসে। সস্তায় মোমবাতি কিনে এনে বাঁ-হাতে ধরে সেই ক্ষীণ আলোয় অন্ত হাত দিয়ে পিকাসো এঁকে যেতেন। এমনিতেই, গভীর রাত্রে বসে কাজ করাই ছিল পিকাসোর শখ। এমনও দিন গেছে—ভোর ছ'টা বেজেছে—তিনি তুলি ছেড়ে উঠেছেন।

'ব্লু-পীরিয়ড' কেটে যেতে পিকাসোর ছবিতে ক্লাসিকাল রীতির ঝোঁক এল। বিশেষ করে মিশরীয় ও ফিনিশীয় চিত্রকলার প্রভাব। কিন্তু ক্লাসিকাল রীতির দিকে পিকাসোর ঝোঁক বেশীদিন রইলো না। তাঁর ক্লাসিকাল অঙ্কনরীতির মধ্যেও মানুষের চেহারার স্বাভাবিক অনুকরণ থাকতো না। শরীরের আনুপাতিক অঙ্গ-সংস্থান অ্যাকাডেমিক অঙ্কন-পদ্ধতির বাইরে যেতে লাগলো। পরিষ্কার বোঝা যায়, এই সময় থেকেই পিকাসো নতুন এক অঙ্কনরীতির জনক হতে চলেছেন।

পিকাসো কিউবিজমের জনক। প্রথম কিউবিস্ট শিল্পসৃষ্টির মজার ইতিহাস আছে। ১৯০৭ সালের বসন্তকালে পিকাসো এক ছবি আঁকলেন। নাম দিলেন—'Les Demoiselles d' Avignon'। বিরাট এক পেন্টিং—৮ ফুট লম্বা, ৮ ফুট চওড়া। এ ছবি আঁকার সুরু থেকেই পিকাসোর বন্ধুরা এসে ভীড় করতেন। অদ্ভুত এক ছবি তৈরি হচ্ছে। এ ছবিতে রয়েছে আকাশ-নীল পটভূমিকার ওপর কয়েকটা ন্যা মেয়ের স্থূল চিত্র—মেয়েদের আকৃতিতে মিশরীয় অঙ্কনরীতি ও ক্যাটালনিয়া ফ্রেস্কোর প্রভাব রয়েছে। তাদের অস্বাভাবিক মুখাকৃতিতে কেমন বিষণ্ণ তিমিরাচ্ছন্ন নৈরাশ্য। তখনকার চিত্ররীতির মাঝখানে এ-ছবি একটা অবিশ্বাস্য শিল্প-বাক্য নিয়ে এসে হাজির হল।

পিকাসোর হাত দিয়ে এমন একটা ছবির রচনায় পিকাসোর বন্ধুরা প্রথম হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পী-বন্ধুরা এ-চিত্রের কোনো অর্থই খুঁজে পেলেন না—কেউ কেউ বললেন, পিকাসো ছবিতে 'ফোর্থ ডাইমেনসান'-এর আভাস দিয়েছেন। সবচেয়ে চটে গেলেন মাতিস। কিছুদিন আগেই পিকাসোর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পিকাসোর থেকে তিনি ছ'বছরের বড়। নতুন যুগের 'এক্সপ্রেশনিস্ট' অঙ্কনরীতির তিনি নেতা। মাতিস বললেন, পিকাসোর এই ছবি নতুন শিল্পধারাকে ব্যঙ্গ করার জন্যই রচনা। বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক ফেলিক্স ফিনিয়োঁ ছবি দেখে বললেন, পিকাসোর ক্যারিকেচারের দিকেই মন দেয়া উচিত।

তিক্ত সমালোচনায় পিকাসো যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। পরিচিতের ভীড় থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেন। এমন একাকী হয়ে গেলেন যে, কেউ কেউ ভাবতে সুরু করলো—পিকাসো বোধহয় এবার আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু পিকাসো এই সমালোচনাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলেন। নির্বিঘ্নমনে তিনি একই রীতিতে এঁকে চললেন। ধীরে ধীরে সমালোচক বন্ধুদের মত পাল্টাতে সুরু হল। শিল্পরীতিতে একটা নতুন যুগের উন্মোচন হচ্ছে এমন ধারণা এল। কিউবিজম্-এর স্রষ্টা হিসেবে পিকাসোর সঙ্গে ব্রাক-এর নামও উল্লিখিত হয়। ব্রাক ও পিকাসো বেশ কয়েকবছর ঘনিষ্ঠভাবে কাটিয়েছেন। শিল্পের রীতি নিয়ে দুজনের মধ্যে যে আলোচনা হত তাতে দুজনেই একমত হতেন। শিল্পী হিসেবে ব্রাক সবার আগে পিকাসোকে স্বীকৃতি দিলেন। কেউ কেউ বলেন, ব্রাক স্বতন্ত্রভাবেই, পিকাসোর ছাপ না নিয়ে, কিউবিস্ট রীতিতে ছবি এঁকে গেছেন। ধীরে ধীরে এই রীতি অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যেও ছড়িয়ে গেল।

ইজম্ হিসেবে কিউবিজম্ সেদিনকার ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ালো। এমনকি কবি-সাহিত্যিকরাও একটা কিউবিস্ট দর্শন খাড়া করে তার ভিত্তিতে কলম-চালনা সুরু করলেন। বুদ্ধিজীবী মহলে একটা চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তু হিসেবে কিউবিজম্ পুরোদস্তুর আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। দূর দূর দেশ থেকে পিকাসোর ছবির জন্যে তাগাদা আসতে সুরু হল। আটলান্টিক পেরিয়ে কিউবিজম্ আমেরিকায় হাজির হল।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষমুখে প্যারিসে এল রুশীয় নাচের দল। তাদেরি এক প্রধান নৃত্যপটীয়সী ওল্গা কোখলভার সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে, যুদ্ধশেষে পিকাসো তাঁকে বিয়ে করলেন।

যুদ্ধ শেষ হবার পর পিকাসো কিছুদিন রিয়ালিস্টিক শিল্পরীতিতে ছবি তৈরি করলেন; আসলে কোনো একটা বিশেষ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে চলা পিকাসোর ধর্মই নয়। কিউবিজম্-এর জনক তিনি—কিন্তু একমাত্র কিউবিস্ট রীতিকেই ধ্যানসর্বস্ব করেননি। কিউবিজম্-এর সঙ্গে অন্যান্য

পদ্ধতিতেও প্রায় সমস্তরকম বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি তৈরি করে গেছেন। পিকাসোর বৈশিষ্ট্য হল তাঁর স্টাইলের বৈচিত্র্য। পৃথিবীর কোনো একজন মাত্র শিল্পীকে পাওয়া যাবেনা যিনি তাঁরই মতো শিল্পচর্চার মারফত এত বিচিত্র সম্পদের নিশানা দিয়েছেন। কিউবিজম্ যখন সাধারণের কাছে স্বীকৃত শিল্পধারা হিসেবে গৃহীত হয়েছে তখন তিনি নিও-ক্লাসিকাল স্টাইলের অন্তর্গত পদ্ধতিতেও বেশ কয়েকটি ভালো ছবি তৈরি করলেন। কিছুদিন আবার 'সুররিয়ালিস্ট' কবিদের সঙ্গেও মিশলেন। তাঁর বন্ধু হলেন আঁদ্রে ব্রেটন, পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ। এই কবিদের সঙ্গে তাঁর মনের মিলও যথেষ্ট ছিল। কবিদের পাল্লায় পড়ে পিকাসো কিছুদিন কবিতাও লিখেছিলেন। পিকাসোর মা ছেলের প্রকৃতি জানতেন। তিনি এসে একদিন বললেন—"পিকাসো, তুমি সব-কিছুই করতে পার—কোনদিন যদি দেখি রাস্তাঘাটে জননেতা সেজে বক্তৃতা দিচ্ছ, তাতেও আমি আশ্চর্য হবনা।"

১৯৩৬ সালে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর অত্যাচার সুরু হল। দেশ-বিদেশে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে জনমত খাড়া হল। স্পেনের জনসাধারণকে সাহায্য করার আশায় দেশ-বিদেশের ভলান্টিয়ার-বাহিনী স্পেনে এসে জমায়েত হল। পিকাসো স্বাধীনতা ও শান্তির পূজারী। তাঁর শিল্পী-সাহিত্যিকের গোষ্ঠিতেও ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো। মাতৃভূমির বিপদে পিকাসো তাঁর সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। এক বীভৎসদর্শন ছবি তৈরি করলেন; নাম দিলেন: Dream and Lie of Franco।

এদিকে স্পেনে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছে। ফ্রাঙ্কো হিটলারের সাহায্য চাইলেন। হিটলারের বোমারু বিমান গুয়েরনিকা নামে স্পেনের ছোট্ট এক শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিল। সেই খবর প্যারিসে যখন এল—জনতা তখন রাস্তায় নেমে পড়েছে। ক্রোধে উত্তেজনায় উত্তপ্ত জনতার সেই অগ্নিরূপ পিকাসো প্রত্যক্ষ করলেন। সেই ক্রোধের আগুন থেকে পিকাসোর মনে বিরাট এক সৃষ্টির চেতনা ছড়িয়ে পড়লো। বিরাট সৃষ্টির জন্যে বিরাট ক্যানভাস প্রয়োজন। ১২ ফুট চওড়া ও ২৬ ফুট লম্বা এক ক্যানভাস শিল্পী মেলে ধরলেন তাঁর স্টুডিও-ঘরে। এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল [illegible]ধি ছড়িয়ে গেল তার বিস্তৃতি। পিকাসো সুরু করলেন [illegible]কা। যখন শেষ হল—নাম দিলেন 'গুয়েরনিকা'। বিরাট পটভূমিকায় এ-ছবিতে তিনটে ভাব পরিষ্কার ফুটে উঠেছে: যুদ্ধের দারিদ্র্য, আহতের যন্ত্রণা ও জনতার নিশ্চিত জয়ের আশা। অজস্র সমালোচক পিকাসোর এই ছবির মর্মোদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন। এ-ছবি প্রথম দৃষ্টিতেই বীভৎস মনে হবে। কিন্তু এর অর্থের বিস্তৃতি ও সারল্য সাধারণের মনে সহজেই চমক লাগায়। এ ছবি দেশ-বিদেশে ঘুরলো। প্যারিস একজিবিশান শেষ হবার পর নরওয়েতে প্রদর্শিত হল। সেখান থেকে এল ইংলণ্ডে। লণ্ডনের কয়েক জায়গায় বেশ কিছুদিন প্রদর্শিত হল। লণ্ডনে সাধারণ দর্শকের মনে এ-ছবি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ক্রোধ-ঘৃণা-বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। লণ্ডন ছেড়ে 'গুয়েরনিকা' এল নিউইয়র্কে। ততদিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। ছবি আমেরিকাতেই রয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হবার দশবছর পরে আবার এল য়ুরোপে। য়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশ ঘুরিয়ে আনার পর এ-ছবি যুক্তরাষ্ট্রকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পিকাসো আবার নতুন উদ্যমে শিল্পচর্চা সুরু করেছেন। যুদ্ধে জার্মান অধিকারের মধ্যে থেকেও ফরাসী 'রেজিস্ট্যান্ট-মুভ্‌মেন্ট'কে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন তিনি। জনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে কোনদিনই তাঁর আপোষ ছিলনা। জনতারই একজন হয়ে মহান শিল্পীর দায়িত্ব তিনি চিরকাল পালন করে এসেছেন।

যুদ্ধের পর পিকাসো অনেক ছবিই তৈরি করেছেন—বহু বিষয়বস্তুতে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর সৃষ্টি। বিভিন্ন পদ্ধতিতে তিনি এঁকেছেন। ছোট একটা প্রবন্ধে তার ইতিকাহিনী টানা যায় না।

পেনরোজ সাহেবের বই এদিক দিয়ে মূল্যবান সংকলন। মহৎ শিল্পীর জীবনের এক বিস্তৃত ইতিহাস য়ুরোপীয় শিল্প-ইতিহাসের পটভূমিকায় ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সাধারণের বোধগম্য করেই তিনি লিখেছেন। আমাদের অনেকের কাছেই আধুনিক শিল্পজগতের ধ্যান-ধারণা এখনো অজ্ঞাত। পেনরোজ সাহেবের বইটি চারুকলা সংক্রান্ত সাধারণের অনেক অজ্ঞতার নিরসন করবে।

এ-বইটির অন্য আকর্ষণও আছে। লেখার শেষে পিকাসোর বহু বিখ্যাত ছবির মিনিয়েচার ফটোগ্রাফ দেওয়া রয়েছে।

পেনরোজ সাহেব নিজে একজন খ্যাতনামা তৈলচিত্র-শিল্পী। প্যারিসে লণ্ডনে নিউইয়র্কে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।

তাঁর অন্যান্য বই: ১. *The Road is Wider than Long*; ২. *Portrait of Picasso*।

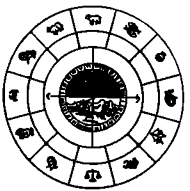

গ্রহ-বিচিত্রা

['[illegible] [illegible] পত্রিকার
[illegible] জ্যোতিষ বিভাগ হইতে [illegible]]

জ্যোতিষশর্মা

॥ পৌষ মাসের রাশিফল ॥

মেষ

মাসের মধ্যকাল পর্যন্ত ভালোমন্দ মিশ্র চলবে। বাধার মাধ্যমে কর্মে সাফল্যলাভ। আর্থিক সচ্ছলতা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি, এবং শত্রুহানি হবে। মাসের ১৫ তারিখ থেকে পৌষ মাসের শেষ পর্যন্ত নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হতে হবে। ভাগ্যলাভে বাধা সৃষ্টি হবে। সন্তানের উপর আঘাত আসতে পারে। গুরুজন দ্বারা অশান্তি থাকবে। কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করবে।

নক্ষত্রফল—অশ্বিনীর—অর্থলাভ, পরে অর্থহানি সম্ভব। ভরণী এবং কৃত্তিকার—শত্রু এবং বন্ধু দ্বারা অশান্তি, গুরুজন দ্বারা শোকলাভের সম্ভাবনা।

বৃষ

স্বাস্থ্য ভালো চলবে না। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক চলবে। কর্মস্থলে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। অশান্তির মধ্যে বিশেষ ক্ষতির যোগ নাই। পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির রোগভোগ সম্ভব। সন্তানের অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে।

নক্ষত্রফল—কৃত্তিকা-যুক্তের বন্ধুবিয়োগ এবং নিজের অশান্তি থাকবে। রোহিণীর এবং মৃগশিরার—আকস্মিক পীড়াভোগ; আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক চলবে।

মিথুন

মাসের মধ্যসময় পর্যন্ত মোটামুটি চলবে। এইসময়ের মধ্যে সন্তানের উন্নতি সম্ভব। তারপর বাকী মাস কাজে বাধা, স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ, ব্যবসায়ে অংশীদারের সহিত বিবাদ এবং মোকদ্দমা-ভয় সূচনা করে। মোট কথা, মাসটি বিশেষ ভালো চলবে না। সতর্ক থাকা আবশ্যক।

নক্ষত্রফল—মৃগশিরা-মিথুনের স্ত্রীর জীবনসংশয় পীড়াভোগ ও পারিবারিক অশান্তি সম্ভব। আর্দ্রার—ব্যবসায়ে প্রতারণা লাভ, বন্ধুর সহিত কলহ। পুনর্বসুর—দুষ্ট লোক দ্বারা ক্ষতি এবং আঘাতপ্রাপ্তির যোগ আছে।

কর্কট

মাসটি ভালো চলবে। পারিবারিক শান্তি থাকবে। গৃহে পুণ্য-উৎসবের যোগ আছে। সন্তানের উন্নতি হবে। সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং বিদ্যার্থিগণের প্রতিভা-বিকাশের পক্ষে মাসটি শুভ। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। শত্রুহানি হ'য়ে মানসিক শান্তি দান করবে। কর্মোন্নতির যোগ আছে। কাজে আশানুরূপ সাফল্য লাভ হবে।

নক্ষত্রফল—পুনর্বসুর—সন্তানের এবং নিজের উন্নতির যোগ আছে। পুষ্যার—আর্থিক উন্নতি, যশ ও খ্যাতি লাভ। অশ্লেষার—শত্রুর কবলে অর্থ বা সম্পদ পতিত হবে, এবং স্ত্রীর আকস্মিক অশুভ হবার যোগ আছে।

সিংহ

মাসটি ভালো চলবে না। আর্থিক অশান্তি, সন্তানের রোগভোগ বা সন্তান দ্বারা অপযশ লাভের যোগ আছে। বন্ধু দ্বারা অর্থখ্যাতি বৃদ্ধি এবং কর্মোন্নতির সম্ভাবনা আছে।

সন্তান বা নিজের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভবের যোগ আছে। ভুল ধারণা এবং সন্তানের কৃত অন্যায় দ্বারা অশান্তিলাভের যোগ রয়েছে। মানসিক ক্ষেত্রে সবল থাকায়, অশান্তি থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। পিতামাতার দিক থেকে ভালো চলবে। ভূসম্পত্তিলাভের যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—মঘার—আর্থিক বিপদ, বন্ধু এবং মাতৃস্থানীয়ার দ্বারা উপকার। বুদ্ধির ভুলে অন্যায় দ্বারা মানসিক অশান্তিলাভ সম্ভব। পূর্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনীর—অশুভ; মানসিক অশান্তি ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে।

কন্যা

পারিবারিক এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। মাসের প্রথমার্ধে আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। তারপর বিশেষ ভালো থাকবে না। স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে। মাতা ও মাতৃস্থানীয়ার মৃত্যুতুল্য রোগসৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। গৃহবিবাদে মোকদ্দমা-ভয়সৃষ্টির যোগ দেখা যায়। ভ্রাতার উন্নতির যোগ আছে। কর্মস্থল ভালো চলবে।

নক্ষত্রফল—উত্তরফল্গুনীর—মানসিক উদ্বেগ, বন্ধুর দ্বারা ক্ষতির যোগ আছে। হস্তার ও চিত্রার—মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার রোগভোগ; বন্ধু দ্বারা ক্ষতি।

তুলা

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। একদিকে অর্থলাভ, অন্যদিকে ব্যয়বাহুল্য সৃষ্টি হবে। ছোট ভ্রাতা-ভগ্নী এবং প্রতিবেশী দ্বারা অশান্তির যোগ আছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। দাম্পত্য প্রীতি ও অনুরাগ বৃদ্ধি হবে। স্নেহপ্রবণতার আসক্তির প্রভাব সৃষ্টি করবে। শুক্র স্বাতিতে থাকায়, উপরিলিখিত ফল সূচনা করে। কর্মস্থল স্বাভাবিক উন্নতির মধ্যে চলবে। মাসের শেষভাগ ভালো চলবে না।

নক্ষত্রফল—চিত্রার—মানসিক শান্তি, আর্থিক উন্নতি হবে। কিন্তু ভ্রাতা-ভগ্নীর দ্বারা বিপদ-সৃষ্টির যোগ আছে। স্বাতীর—শুভ চলবে। মানসিক শান্তি থাকবে। কর্মে উন্নতির সাধারণ প্রভাব করবে। বিশাখার—প্রতিবেশী দ্বারা প্রতারণালাভ এবং আর্থিক অশান্তির যোগ আছে।

বৃশ্চিক

মাসটি ভালোমন্দ মিশ্র চলবে। অর্থহানির যোগ আছে; কিন্তু অভাবনীয়ভাবে অর্থলাভের যোগাযোগও হবে। মাসের প্রথমার্ধে কলহ দ্বারা অশান্তি, অর্থহানি; মধ্যভাগ থেকে অর্থলাভ এবং মানসিক শান্তি থাকবে। কর্মস্থল ভালো চলবে। আত্মীয় দ্বারা অশান্তি বৃদ্ধি হবে। অগ্রজের রোগভোগ থাকবে। মোটামুটি ভালোমন্দভাবে মাসটি চলবে।

নক্ষত্রফল—বিশাখার—বন্ধু দ্বারা অর্থক্ষতি এবং ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা আছে। অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠার—একদিকে অর্থলাভ, অন্যদিকে অর্থহানির যোগ আছে। আত্মীয়-বিরোধেরও যোগ আছে।

ধনু

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। নানাপ্রকার অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। কর্মস্থলে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির রোগভোগ হইতে অশান্তিলাভ হবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে না। আয় হবে; ব্যয়-আধিক্যের জন্যে অভাব থাকবে। পারিবারিক অশান্তির যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—মূলা এবং পূর্বাষাঢ়ার—রোগভোগ ও মানসিক অশান্তি থাকবে। উত্তরাষাঢ়ার—বন্ধুর বিপদে অশান্তি ভোগ, এবং কাজে বাধা থাকবে।

মকর

মাসের অধিকাংশ ভালো চলবে। কর্মোন্নতির যোগ আছে। কর্মস্থলে বিভাগ-পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। আর্থিক উন্নতি হবে। অগ্রজের উন্নতি সম্ভব। সন্তানের রোগভোগে অর্থব্যয় হবে। মোকদ্দমা প্রভৃতি সৃষ্টির যোগ

আছে। পিতার সম্মান-বৃদ্ধি এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধি হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

নক্ষত্রফল—উত্তরাষাঢ়ার—কর্মোপলক্ষ্যে ভ্রমণ এবং আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার—ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত মতবিরোধ সৃষ্টি হ'য়ে, পরে কর্মে সাফল্য-লাভ হবে। পূর্বের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হইবে।

কুম্ভ

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। কর্মোন্নতির যোগ আছে। পিতার উন্নতি, গৃহে পুণ্যানুষ্ঠানের যোগ আছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থিক উন্নতি হবে। অগ্রজের রোগ-ভোগ দ্বারা অশুভ ফল দান করবে। সাধারণ ভ্রমণের যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—ধনিষ্ঠার—ভাগ্যোন্নতি ও কর্মপ্রাপ্তি লাভ হবে। শতভিষার—স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অর্থহানির প্রভাব সৃষ্টি করবে। পূর্বভাদ্রপদের—বন্ধু দ্বারা ভাগ্যোন্নতি এবং দেশভ্রমণের যোগ আছে।

মীন

ভালোমন্দ মিশ্র চলবে। স্ত্রীর রোগভোগ থাকবে। কর্মস্থানে গোলযোগ বৃদ্ধি হ'বে, পরে শান্তি আসবে। গুরুজন দ্বারা লোকসানের যোগ আছে। ভ্রমণে পথিমধ্যে বিপদের যোগ আছে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে।

নক্ষত্রফল—পূর্বভাদ্রপদের পিতার বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির রোগভোগ দ্বারা অশুভ, এবং অর্থহানি হবে। উত্তরভাদ্রপদের—মানসিক দুশ্চিন্তা ও বাধার মাধ্যমে ভাগ্যোন্নতি সম্ভব। রেবতীর—বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি সম্ভব।

[বক্তব্য: রাশিফল সাধারণভাবে বর্ণিত হলো। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকালে গ্রহসংস্থান ও দশান্তর্দশার শুভাশুভ ফলের উপর নির্ভর ক'রে ইহা বিচার্য।]

অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৬৬ সাল [নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৫৯]

বাং তারিখ	ইং তারিখ	চান্দ্র তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিধি
১	১৭	২৬	মঙ্গল	দ্বিতীয়া	রোহিণী	মধ্যম	বিবাহ
২	১৮	২৭	বুধ	তৃতীয়া	মৃগশিরা	শুভ, রাত্র ঘ. ১০।৪২ গতে নিষেধ	
৩	১৯	২৮	বৃহস্পতি	চতুর্থী	আর্দ্রা	নিষেধ, রাত্র ঘ. ১০।১৪ গতে শুভ	
৪	২০	২৯	শুক্র	পঞ্চমী	পুনর্বসু	শুভ, রাত্র ঘ. ৬।১৫ গতে নিষেধ	
৫	২১	৩০	শনি	ষষ্ঠী	পুষ্যা	নিষেধ	
৬	২২	১	রবি	সপ্তমী	অশ্লেষা	নিষেধ	
৭	২৩	২	সোম	সপ্তমী	মঘা	নিষেধ	
৮	২৪	৩	মঙ্গল	অষ্টমী	মঘা	নিষেধ	পুণ্যতোয়া-স্নান
৯	২৫	৪	বুধ	নবমী	উত্তরফল্গুনী	নিষেধ	ত্র্যহস্পর্শ
১০	২৬	৫	বৃহস্পতি	একাদশী	হস্তা	মধ্যম	একাদশীর উপবাস। গোস্বামি-মতে পরাহে
১১	২৭	৬	শুক্র	দ্বাদশী	চিত্রা	নিষেধ	
১২	২৮	৭	শনি	ত্রয়োদশী	স্বাতী	শুভ, রাত্র ঘ. ৯।৪৩ গতে নিষেধ	বিবাহ। পুণ্যতোয়া-স্নান
১৩	২৯	৮	রবি	চতুর্দশী	বিশাখা	নিষেধ	অমাবস্যার নিশিপালন

[পরপৃষ্ঠায় অবশিষ্টাংশ]

সন্তান বা নিজের বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভবের যোগ আছে। ভুল ধারণা এবং সন্তানের কুত অভ্যাস দ্বারা অশান্তিলাভের যোগ রয়েছে। মানসিক ক্ষেত্র সবল থাকায়, অশান্তি থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। পিতামাতার দিক থেকে ভালো চলবে। ভূসম্পত্তিলাভের যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—মঘায়—আর্থিক বিপদ, বন্ধু এবং মাতৃস্থানীয়ার দ্বারা উপকার। বুদ্ধির ভুলে অন্যায় দ্বারা মানসিক অশান্তিলাভ সম্ভব। পূর্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনীর—অশুভ; মানসিক অশান্তি ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে।

কন্যা

পারিবারিক এবং মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। মাসের প্রথমার্ধে আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। তারপর বিশেষ ভালো থাকবে না। স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে। মাতা ও মাতৃস্থানীয়ার মৃত্যুতুল্য রোগসৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। গৃহবিবাদে মোকদ্দমা-ভয়সৃষ্টির যোগ দেখা যায়। ভ্রাতার উন্নতির যোগ আছে। কর্মস্থল ভালো চলবে।

নক্ষত্রফল—উত্তরফল্গুনীর—মানসিক উদ্বেগ, বন্ধুর দ্বারা ক্ষতির যোগ আছে। হস্তায় ও চিত্রায়—মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার রোগভোগ; বন্ধু দ্বারা ক্ষতি।

তুলা

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। একদিকে অর্থলাভ, অন্যদিকে ব্যয়বাহুল্য সৃষ্টি হবে। ছোট ভ্রাতা-ভগ্নী এবং প্রতিবেশী দ্বারা অশান্তির যোগ আছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। দাম্পত্য প্রীতি ও অনুরাগ বৃদ্ধি হবে। স্নেহপ্রবণতায় আসক্তির প্রভাব সৃষ্টি করবে। শুক্র রাশিতে থাকায়, উপরিলিখিত ফল সূচনা করে। কর্মস্থল স্বাভাবিক উন্নতির মধ্যে চলবে। মাসের শেষভাগ ভালো চলবে না।

গাঙ্গুরামের
ফোন: ৪৭-২৩৭৭
দই
চমচম
সন্দেশ
৪
রাবড়ি
গাঙ্গুরাম অ্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর • কালীঘাট • কলিকাতা

নক্ষত্রফল—চিত্রায়—মানসিক শান্তি, আর্থিক উন্নতি হবে। কিন্তু ভ্রাতা-ভগ্নীর দ্বারা বিপদ-সৃষ্টির যোগ আছে। স্বাতীর—শুভ চলবে। মানসিক শান্তি থাকবে। কর্মে উন্নতির সাধারণ প্রভাব করবে। বিশাখার—প্রতিবেশী দ্বারা প্রতারণালাভ এবং আর্থিক অশান্তির যোগ আছে।

বৃশ্চিক

মাসটি ভালোমন্দ মিশ্র চলবে। অর্থহানির যোগ আছে; কিন্তু অভাবনীয়ভাবে অর্থলাভের যোগাযোগও হবে। মাসের প্রথমার্ধে কলহ দ্বারা অশান্তি, অর্থহানি; মধ্যভাগ থেকে অর্থলাভ এবং মানসিক শান্তি থাকবে। কর্মস্থল ভালো চলবে। আত্মীয় দ্বারা অশান্তি বৃদ্ধি হবে। অগ্রজের রোগভোগ থাকবে। মোটামুটি ভালোমন্দভাবে মাসটি চলবে।

নক্ষত্রফল—বিশাখার—বন্ধু দ্বারা অর্থক্ষতি এবং ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা আছে। অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠার—একদিকে অর্থলাভ, অন্যদিকে অর্থহানির যোগ আছে। আত্মীয়-বিরোধেরও যোগ আছে।

ধনু

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। নানাপ্রকার অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। কর্মস্থলে গোলযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির রোগভোগ হইতে অশান্তিলাভ হবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে না। আয় হবে; ব্যয়-আধিক্যের জন্যে অভাব থাকবে। পারিবারিক অশান্তির যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—মূলা এবং পূর্বাষাঢ়ার—রোগভোগ মানসিক অশান্তি থাকবে। উত্তরাষাঢ়ার—বন্ধুর বিপদে অশান্তি ভোগ, এবং কাজে বাধা থাকবে।

মকর

মাসের অধিকাংশ ভালো চলবে। কর্মোন্নতির যোগ আছে। কর্মস্থলে বিভাগ-পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। আর্থিক উন্নতি হবে। অগ্রজের উন্নতি সম্ভব। সন্তানের রোগভোগে অর্থব্যয় হবে। মোকদ্দমা প্রভৃতি সৃষ্টির যোগ

আছে। পিতার সম্মান-বৃদ্ধি এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধি হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

নক্ষত্রফল—উত্তরাষাঢ়ার—কর্মোপলক্ষ্যে ভ্রমণ এবং আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার—ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত মতবিরোধ সৃষ্টি হ'বে, পরে কর্মে সাফল্য-লাভ হবে। পূর্বের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হইবে।

কুম্ভ

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। কর্মোন্নতির যোগ আছে। পিতার উন্নতি, গৃহে পুণ্যানুষ্ঠানের যোগ আছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থিক উন্নতি হবে। অগ্রজের রোগ-ভোগ দ্বারা অশুভ ফল দান করবে। সাধারণ ভ্রমণের যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—ধনিষ্ঠার—ভাগ্যোন্নতি ও কর্মখ্যাতি লাভ হবে। শতভিষার—স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অর্থহানির প্রভাব সৃষ্টি করবে। পূর্বভাদ্রপদের—বন্ধু দ্বারা ভাগ্যোন্নতি এবং দেশভ্রমণের যোগ আছে।

মীন

ভাগ্যোদয় মিশ্র চলবে। স্ত্রীর রোগভোগ থাকবে। কর্মস্থানে গোলযোগ সৃষ্টি হ'বে, পরে শান্তি আসবে। গুরুজন দ্বারা লোকসানের যোগ আছে। ভ্রমণে পথিমধ্যে বিপদের যোগ আছে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে।

নক্ষত্রফল—পূর্বভাদ্রপদের পিতার বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির রোগভোগ দ্বারা অশুভ, এবং অর্থহানি হবে। উত্তরভাদ্রপদের—মানসিক দুশ্চিন্তা ও বাধার মাধ্যমে ভাগ্যোন্নতি সম্ভব। রেবতীর—বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি সম্ভব।

[দ্রষ্টব্য: রাশিফল সাধারণভাবে বর্ণিত হলো। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকালের গ্রহসংস্থান ও দশান্তর্দশার শুভাশুভ ফলের উপর নির্ভর ক'রে ইহা ফিরবে।]

অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৬৬ সন [নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৫৯]

বাং তারিখ	ইং তারিখ	জাতীয় তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১	১৭	২৬	মঙ্গল	দ্বিতীয়া	রোহিণী	মধ্যম	বিবাহ
২	১৮	২৭	বুধ	তৃতীয়া	মৃগশিরা	শুভ, রাত্র ঘ. ১০।৪২ গতে নিষেধ	
৩	১৯	২৮	বৃহস্পতি	চতুর্থী	আর্দ্রা	নিষেধ, রাত্র ঘ. ১০।১৪ গতে শুভ	
৪	২০	২৯	শুক্র	পঞ্চমী	পুনর্বসু	শুভ, রাত্র ঘ. ৬।১৫ গতে নিষেধ	
	২১	৩০	শনি	ষষ্ঠী	পুষ্যা	নিষেধ	
	২২	১	রবি	সপ্তমী	অশ্লেষা	নিষেধ	
			সোম	সপ্তমী	মঘা	নিষেধ	
৮	২৪		মঙ্গল	অষ্টমী	মঘা	নিষেধ	পুণ্যতোয়া-স্নান
৯	২৫	৪	বুধ	নবমী	উত্তরফল্গুনী	নিষেধ	ত্র্যহস্পর্শ
১০	২৬	৫	বৃহস্পতি	একাদশী	হস্তা	মধ্যম	একাদশীর উপবাস। গোস্বামি-মতে পরাহে
১১	২৭	৬	শুক্র	দ্বাদশী	চিত্রা	নিষেধ	
১২	২৮	৭	শনি	ত্রয়োদশী	স্বাতী	শুভ, রাত্র ঘ. ৯।৪৩ গতে নিষেধ	বিবাহ। পুণ্যতোয়া-স্নান
১৩	২৯	৮	রবি	চতুর্দশী	বিশাখা	নিষেধ	অমাবস্যার নিশিপালন

[পরপৃষ্ঠায় অবশিষ্টাংশ]

অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৬৬ সন [নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৫৯]

[পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ]

ইং তারিখ*	পৌঃ তারিখ	সায়নিক তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১৪	৩০	৯	সোম	অমাবস্যা	অনুরাধা	নিষেধ	অমাবস্যায় উপবাস, মৌনী-অক্ষয়া-স্নান
১৫	১	১০	মঙ্গল	প্রতিপদ	জ্যেষ্ঠা	নিষেধ, ১০।২১ গতে শুভ	মনোরথ-দ্বিতীয়া। হবিষ্যী
১৬	২	১১	বুধ	তৃতীয়া	মূলা	নিষেধ	ত্র্যহস্পর্শ
১৭	৩	১২	বৃহস্পতি	চতুর্থী	পূর্বাষাঢ়া	শুভ, রাত্র ঘ. ১২।১১ গতে নিষেধ	বিবাহ
১৮	৪	১৩	শুক্র	পঞ্চমী	উত্তরাষাঢ়া	দিবা ঘ. ৭।৩৪ গতে রাত্র ঘ. ৩।৫৪ মধ্যে শুভ	বিবাহ। অন্নপ্রাশন
১৯	৫	১৪	শনি	ষষ্ঠী	ধনিষ্ঠা	শুভ, রাত্র ৮।২৪ গতে নিষেধ	গুহষষ্ঠী
২০	৬	১৫	রবি	সপ্তমী	শতভিষা	মধ্যম, রাত্র ঘ. ৭।৫৩ গতে নিষেধ	মিত্রসপ্তমী। অক্ষয়া-বিজয়া-স্নান
২১	৭	১৬	সোম	অষ্টমী	পূর্বভাদ্রপদ	শুভ, রাত্র ঘ. ৭।৫২ গতে নিষেধ	
২২	৮	১৭	মঙ্গল	নবমী	পূর্বভাদ্রপদ	নিষেধ	
২৩	৯	১৮	বুধ	দশমী	উত্তরভাদ্রপদ	নিষেধ	মৃগনেত্রাপ্রবৃত্তি
২৪	১০	১৯	বৃহস্পতি	একাদশী	রেবতী	শুভ, দিবা ঘ. ১১।২১ গতে নিষেধ	সাধভক্ষণ। একাদশী
২৫	১১	২০	শুক্র	দ্বাদশী	অশ্বিনী	শুভ, দিবা ঘ. ১।৫৩ গতে নিষেধ	অখণ্ডদান-দ্বাদশী
২৬	১২	২১	শনি	ত্রয়োদশী	ভরণী	নিষেধ	
২৭	১৩	২২	রবি	চতুর্দশী	কৃত্তিকা	নিষেধ	পাষাণ-চতুর্দশী
২৮	১৪	২৩	সোম	চতুর্দশী	রোহিণী	নিষেধ	বিবাহ। পূর্ণিমার নিশিপালন
২৯	১৫	২৪	মঙ্গল	পূর্ণিমা	মৃগশিরা	নিষেধ, রাত্র ঘ. ১।২৬ গতে শুভ	পূর্ণিমায় উপবাস, মৃগনেত্রা-নিবৃত্তি
	১৬	২৫	বুধ	প্রতিপদ	আর্দ্রা	নিষেধ	সংক্রান্তি

---

* এই মাসে অন্য পঞ্জিকার তারিখের সহিত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার তারিখের তফাত আছে। আমাদের ১লা অগ্রহায়ণ অন্যদের ৩০শে কার্তিক, আমাদের ২রা অগ্রহায়ণ অন্যদের ১লা অগ্রহায়ণ—এইভাবে আমাদের ৩০শে অগ্রহায়ণ অন্যদের ২৯শে অগ্রহায়ণ হইবে।

[সূর্য ও চন্দ্রের পরম সান্নিকর্ষকালকে অমাবস্যা বলা হয়। সূর্য ও চন্দ্র ঊর্ধ্বাধোভাবে সমসূত্রপাতের ন্যায় এক রাশির এক অংশে মিলিতভাবে অবস্থান করিলেই অমাবস্যা কৈকেন্দ্রী-সমত্ব হইয়া থাকে। ঐ মিলিতভাবে অবস্থানের পর সূর্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডলের প্রতিদিন ধারাবাহিক বহির্গমনের নাম 'এক তিথি'। সূর্যসিদ্ধান্ত বিস্তারিতভাবে প্রকৃতি এই তিথির কথাই সর্বত্র বলিয়াছেন। এই তিথি শাস্ত্রসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত। ভারত-সরকারের পঞ্জিকাতেও এই জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানসম্মত তিথিই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই তিথি প্রত্যক্ষে পরীক্ষা করা যায়। যে কেহ প্রেসিডেন্সি কলেজে বা আলিপুর মানমন্দিরে যেয়ে, নিজ চক্ষে দেখিয়া প্রকৃত তিথির পরিমাণ জানিতে পারেন। তিথির এই আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সমতা সত্ত্বেও, আমার বাড়ীতে আজ একাদশী—প্রতিবেশীর বাড়ীতে পরের দিন একাদশী; আমার বাড়ীতে আজ জন্মাষ্টমী, অন্যের কাল জন্মাষ্টমী; আমার বাড়ীতে আজ কার্তিক পূজা, অন্যের বাড়ীতে কাল কার্তিক পূজা আমরা কিরূপে বরদাস্ত করি? অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রকৃত তত্ত্ব সংগ্রহ করুন এবং যথাসময়ে ধর্ম-কর্ম করিবার চেষ্টা করুন।]

নাট্যমহল

রঙ্গলোক

'সেতু'

নতুন আঙ্গিকে রচিত এবং উচ্চাঙ্গের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ, কিরণ মৈত্রের কাহিনী অবলম্বনে বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাট্যরূপায়িত 'বিশ্বরূপা'র তৃতীয় নাট্য-নিবেদন 'সেতু' তাঁদের পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

একটি বন্ধ্যা নারীর মাতৃত্ব-কামনার দুরন্ত বাসনার আবেগমধুর পটভূমিকায় 'সেতু'র কাহিনী রচিত।

বিত্তশালী তাপস রায় একটি বেবি-ফুড কারখানার মালিক। তার নিঃসন্তানা স্ত্রী অসীমার রূপ অর্থ সব-কিছু থাকা সত্ত্বেও, ন'বছরের বিবাহিত জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছে শুধু একটি না-পাওয়ার ক্ষোভে। বাৎসল্য থেকে বঞ্চিতা অসীমা। সন্তান না পাওয়ার বেদনা তার সব আনন্দকে ম্লান করে দেয়। উন্মনা অসীমা দিনের বেলায় মেঘের লুকোচুরি দেখে আর রাত্রে আকাশের তারা গুণে কাটিয়ে দেয় তার নিঃসঙ্গ জীবন। কর্মব্যস্ত তাপস রায় আর তার সহোদর পুলক অসীমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়।

অসীমার বোন অণিমার স্বামী অমরেশ তাপস রায়ের বেবি-ফুডের একমাত্র পরিবেশক। অণিমা চায় প্রচুর অর্থ। দিদির মতোই প্রাচুর্য চায় সে। আর তার চাওয়ার তাগিদে অমরেশ এক কূটচরিত্র অবাঙালীর পরামর্শে শিশুখাদ্যে ভেজাল দিয়ে প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়। বিলাসিতার অর্থব্যয়ে অণিমা তখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

ইতিমধ্যে অণিমার প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশনে অসীমা নিমন্ত্রিত হয়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেখানে যায়। কিন্তু বোনের ছেলেকে আশীর্বাদ করবার জন্যে স্পর্শ করতে গেলে, এক কুসংস্কারাচ্ছন্না বিধবা তাকে চূড়ান্তভাবে অপমানিত করে। বন্ধ্যা নারীর নিশ্বাসে নাকি বিষ আছে। তার ছোঁয়ায় শিশুর অকল্যাণ হয়। অণিমাও সে-কথা বিশ্বাস করে। দিদিকে অপমান করতে তার একটুও বাধে না। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আহত হয়ে ক্রন্দনপরা অসীমা ছুটে বেরিয়ে যায়। তারপর এক চলন্ত ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অভিশপ্ত জীবন বিসর্জন দেবার সংকল্প করে। ঘটনাস্থলে তার স্বামীর উপস্থিতিতে জীবন রক্ষা হয়।

তারপর দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে অসীমার মনে আসে গভীর প্রশান্তি। মাতৃত্বের আবাহন জানিয়ে আসছে তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত সন্তান। অসীমার স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে তাপস রায়ের গৃহ ভরে ওঠে। পুলকের জীবনেও আসে আনন্দের একটা নতুন স্বাদ। রীতা নামে তার প্রেয়সীর সঙ্গে দাম্পত্য-বন্ধনে মিলিত হতে চলেছে সে।

এমনি এক আনন্দমুখর মুহূর্তে সংবাদ এল অণিমার স্বামী অমরেশ এবং সেই কুচক্রী অবাঙালী অংশীদার পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে—শিশুখাদ্যে ভেজাল দেওয়ার অপরাধে। তাদের মুনাফার প্রাসাদ গড়তে অনেক শিশু প্রাণ হারিয়েছে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে। বিচারে শেষপর্যন্ত তাদের দুজনের জেল হয়, এবং গভর্নমেন্ট তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে।

নবদম্পতি পুলক ও রীতার আগমন তখন আসন্ন।

কী দৃশ্যে সুব্রতা সেন, জয়শ্রী সেন,
দ্র মিত্র ও অসিতবরণ

ই মুহূর্তে ডাক্তার এসে তাপস রায়কে জানান, পরীক্ষা রা গেছে, পেটে টিউমার-জনিত এক ব্যাধিতে মেয়ে কপট মাতৃত্বের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সন্তান- র পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না। সেই সময়ে । অণিমা সব গর্ব বিসর্জন দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে জলে। বেদনার কশাঘাতে জর্জরিতা অসীমা ক নিদারুণ ব্যর্থতার মাঝেও অণিমাকে নিজের ঠাঁই দেয়। উজ্জ্বল হাসি দিয়ে উদ্গত অশ্রু ক'রে পুলক আর গীতাকেও বরণ ক'রে ঘরে তোলে রা কেউ জানল না অসীমার ভেতরে আছে অতল সমুদ্র। কতখানি ব্যথার পাষাণ-ভার বুকে নিয়ে সে । দাঁড়িয়ে আছে। অসীমার আত্মপ্রবঞ্চনার নীরব র দাঁড়িয়ে রইল শুধু তার স্বামী তাপস রায়। বেই নাটকের পরিসমাপ্তি।

ু' নাটকে অসীমার চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র অবিস্মরণীয় করেছেন। বিবাহিতা নারীর মাতৃত্ব-কামনার

ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। তাপস রায়ের ভূমিকা অসিতবরণ এককথায় অনবদ্য। জয়শ্রী সেন অণিমা কঠিন চরিত্রটিতে যথাযথ রূপ দিয়েছেন। গীতা ও পুলকে ভূমিকায় যথাক্রমে সুব্রতা সেন ও তরুণকুমার সাবলী অভিনয়ে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। অপরেশ চরিত্রে মমতাজ আহমেদ সু-অভিনয় করেছেন। পরিচালক নরেশ মিত্র মৃতপুত্রের চিন্তায় আত্মহারা অর্ধোন্মাদ এক বৃদ্ধে ভূমিকায় দর্শক-মনে রেখাপাত করেন। অন্যান্য ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মাস্টার দীপক তারক ঘোষ ও আরতি দাসের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

'সেতু'র নাট্যরূপের গতি স্থানে স্থানে ব্যাহত হয়েছে কতকগুলি চরিত্রের অহেতুক আবির্ভাবে। কতকগুলি স্থানে সংলাপ কষ্টকল্পিত। পুত্রের অন্নপ্রাশনের দৃশ্যে অসীমা প্রতি অণিমার আচরণ অতিনাটকীয়তা দোষে দুষ্ট পার্কের দৃশ্যটি বৈচিত্র্য আনলেও, বাস্তবানুগ হয়নি। এই রকমের কিছু অসঙ্গতি থাকলেও, নাটকটি মৌলিকতায় দি দিয়ে এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সর্বজন-উপভোগ্য হয়েছে দৃশ্য-পরিকল্পনা এবং আলোকসম্পাত নাট্যশালার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

চিত্রলোক

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' চিত্রে রূপায়ি করেছেন পরিচালক তপন সিংহ। কয়েকটি বহিদৃ গ্রহণের জন্যে তিনি সদলবলে ভূপাল ও রাজস্থানে রওন হয়েছেন। এই ছবিটির শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করছেন—ছ বিশ্বাস, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রাধামোহন ভট্টাচার্য। সঙ্গীত-পরিচালনায় আছেন আলি আকবর খান।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী' কাহিনী অবলম্বনে বি. এন. সরকারের সুযোগ্য পুত্র দিলীপ সরকার তাঁ

নবগঠিত প্রতিষ্ঠান 'সরকার প্রোডাকশন'-এর হয়ে যে-ছবিটি প্রযোজনা করছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'নতুন ফসল'। বহুদিন পরে রাইচাঁদ বড়ালের সুর-সংযোজনা এই ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ। প্রবীণ পরিচালক হেমচন্দ্রের পরিচালনায় 'নতুন ফসল'-এর দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছেন কালী ব্যানার্জী ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

বিশ্ববন্দিত পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর আগামী ছবি 'দেবী'র কাজ নিয়ে বর্তমানে ব্যস্ত। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। অন্য দুটি প্রধান ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ও করুণা ব্যানার্জীকে দেখা যাবে। পরিবেশনায় 'অনতা পিকচার্স'।

নবগঠিত 'রামধনু পিকচার্স'-এর প্রথম প্রচেষ্টা 'তেরো নদীর পারে'। বৈচিত্র্যপূর্ণ মনোরম বহিঃদৃশ্য ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। মেদিনীপুর জেলার হলদি নদীর ধারে বেশিরভাগ চিত্রগ্রহণ করা হবে। একটি সার্কাস-দলের কাহিনীকে কেন্দ্র করে এ-ছবির আখ্যানভাগ রচিত। ভূমিকা-লিপিতে আছেন জ্ঞানেশ মুখার্জী, প্রিয়ম হাজারিকা এবং একটি সার্কাস-দল। এই চিত্রের পরিচালক বারীন সাহা বিদেশ থেকে চিত্রশিল্পের যাবতীয় কলাকৌশল সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে একখানি শিশুচিত্র উপহার দিয়ে ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছেন। 'তেরো নদীর পারে'র সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ।

এন.সি.এ. প্রোডাকশনের 'হাসপাতাল' দ্রুত সমাপ্তির পথে। তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট অশোককুমার বর্তমানে কলকাতায় আছেন এবং সুচিত্রা সেনের বিপরীতে তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'হাসপাতাল' প্রযোজনা করছেন প্রেমচাঁদ আঢ্য, পরিচালনা করছেন সুশীল মজুমদার, এবং এই চিত্রে সুরারোপ করছেন অমল মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা দেবেন আরতি মজুমদার, বিশ্বজিৎ, জয়শ্রী সেন এবং পরিচালক স্বয়ং।

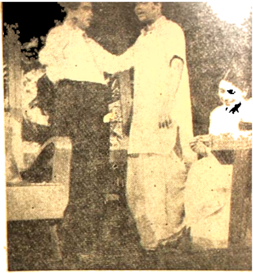

'সেতু' নাটকের একটি পরিহাস-মুখর দৃশ্য
অসিতবরণ, তরুণকুমার ও তৃপ্তি মিত্র

প্রযোজক রাখালচন্দ্র সাহা নিবেদিত 'বাদল পিকচার্স'-এর পরবর্তী ছবির নাম 'সাথীহারা'। শ্রী মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে প্রবীণ পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত এই ছবিটি পরিচালনা করছেন। সঙ্গীত-পরিচালনায় আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার ও মালা সিন্‌হা।

এ.ভি. ফিল্ম্‌স-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'ইন্দ্রধনু'র কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। 'ইন্দ্রধনু'র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। দীপক বসুর পরিচালনায় এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন— অসিতবরণ, অরুন্ধতী, পাহাড়ী সান্যাল, জীবেন বসু, কাজরী গুহ এবং ডাঃ হরেন মুখার্জী। এডেন এবং সিঙ্গাপুর বন্দরে গৃহীত কতকগুলি বহিঃদৃশ্য এই চিত্রের অন্যতম সম্পদ।

উত্তমকুমার

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত বিরচিত মঞ্চ-সফল নাটক 'মায়ামৃগ'র চিত্ররূপ দিয়েছেন এস.বি.পি. প্রোডাকসন্স। চিত্ত বসুর সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হৃদয়গ্রাহী সুর-সংযোজনায় ছবিটি যথেষ্ট মৌলিকতার দাবি রাখে। বহুদিন পরে প্রতিভাময়ী সন্ধ্যারাণীর চিত্রাবতরণ 'মায়ামৃগ'কে এক পৃথক মর্যাদা দিয়েছে। এ ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে তিনি রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন—উত্তমকুমার, সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, সুনন্দা দেবী, ছবি বিশ্বাস ও তরুণকুমার। ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

এবার 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'-এর পঞ্চত্রিংশ অধিবেশন হচ্ছে বাঙ্গালোর শহরে। সাহিত্য-সরস্বতীর মণ্ডপে বৎসরান্তে এই যে মিলনোৎসব; এর মনস্তাত্ত্বিক উপযোগিতা সম্পর্কে কোনো বিরূপ প্রশ্নের অবকাশ নেই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব বাঙালী নানা কারণে ছড়িয়ে আছেন, তাঁদের কাছে এই সম্মেলনের গুরুত্ব যে কতখানি

কথায় কথায়

তার প্রমাণ প্রতিটি অধিবেশনেই পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে, যে বছর যেখানে সম্মেলন হয়, সেখানকার বাঙালীরা নিজেদের অনেকখানি অসুবিধা স্বীকার করেও, শ্রম অর্থ এবং চিন্তা দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকেন। মনের আদানপ্রদানের এ-দিকটা যদি অটুট থাকে তবে যে-কোনো সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে ওঠে। ১৯৫১ সালে পাটনা অধিবেশনে 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' নামান্তরিত হয়ে হল 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'। বিভিন্ন যুক্তিসংগত কারণে এ নাম-পরিবর্তনের সার্থকতা সকলেই নিঃসংশয়ে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এর পূর্ববর্তী পর্যায়ে 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'-এর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে যে বিশেষ একটি দিক ছিল তাও আমরা অস্বীকার করতে পারিনে।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্যপূর্ণ শুভেচ্ছা-পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

> কল্যাণীয়েষু,
>
> প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনকে এতকাল সযত্নে রক্ষণ, পালন করে এসেছ বলেই তোমরা প্রবাসী বাঙালীর বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। বর্তমান প্রতিকূল আঞ্চলিক মনোবৃত্তিতে অন্যান্য প্রদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যেরকম বাধা পাচ্ছে তাতে এরকম প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা পূর্বাপেক্ষা অনেক বড় হয়ে উঠেছে। আমি তোমাদের অধ্যবসায়ের সফলতা কামনা করি। ইতি—১৩।৫।৪০
>
> তোমাদের
> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টীকা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য সেই সঙ্গে এ-কথাও বলা যায় যে, অতীতদিনের এই বিশেষ কারণটি, সম্পূর্ণ না হলেও, আংশিকভাবে দূরীভূত হয়েছে। ভারতের যে-কোনো আঞ্চলিক ভাষার নাম ক'রে বলা যেতে পারে যে সে-ভাষার সাহিত্য বাংলা-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে কম-বেশী কিছু-না-কিছু অনুবাদের দ্বারা নিজের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে। অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক কারণে বাংলার প্রতিষ্ঠা আগের তুলনায় কম।। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা আগের চেয়ে বেড়েছে। ১৯৫৫ সালে মাদ্রাজ-সম্মেলনে তেলেগ
ও তামিল সাহিত্য-শাখা দুটিতে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও ১৯৫
সালে আমেদাবাদ সম্মেলনে আমেদাবাদ পৌরসভা কর্তৃ
সম্মেলনকে নাগরিক সংবর্ধনা-দান এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টা
সুতরাং 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'-এর দায়ি
আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে প্রতিনিধিদের দায়িত্ব নিয়ে যাঁর
যান তাঁদের উদ্দেশেও আমাদের বিনীত বক্তব্য আছে
দেখা গেছে, প্রতিবছরই এই সম্মেলনের প্রতিনিধিত্ব নি
অন্তত কিছু ব্যক্তি অধিবেশনে যোগদান করেন যাঁদে
কাছে দেশভ্রমণের কর্মসূচীটা মূলকে অনেকসময় ছাপি
যায়। ভ্রমণ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সম্মেলনের মূল লক্ষ্যটা য
তাতে এতটুকুও ব্যাহত হয় তবে স্থানীয় উদ্যোক্তা
কর্মিবৃন্দের মনে প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে অবাঞ্ছিত ধারণা হও
মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই প্রতিনিধিত্ব করতে যাঁ
যাবেন তাঁরা সম্মেলনের অধিবেশন কার্যক্রমে যথোপযু
গুরুত্ব দেবার পর যদি তাঁদের ভ্রমণসূচী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে
তবে সেটা সব দিক দিয়ে সুন্দর হয়।

আমরা আশা করি, গতবছর সম্মেলনের জব্বলপু
অধিবেশনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে, এবার সেগুলি দূ
হয়ে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের এই পঞ্চত্রিংশ অধিবেশ
সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে।

—

হিন্দী যে ভারতের জাতীয় ভাষা নয়, একটা আঞ্চলি
ও অনুন্নত ভাষা মাত্র, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ বোধ হ
ভারতের জাতীয় সংগীত। সে-গান হিন্দীভাষায় রচি

নয়, যা তাতে উল্লিখিত ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির একটিরও ভাষা হিন্দী নয়। পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় (অর্থাৎ কেরল, মহীশূর, মাদ্রাজ, অন্ধ্র), উৎকল, বঙ্গ ও আসাম—সকলেই অহিন্দী-ভাষী। ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ লোক যদি হিন্দীকে জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করতে না চায় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু ভারত-সরকারের মনোভাব এ ব্যাপারে যেন কিছুতেই স্পষ্ট হতে চাইছে না। অ-হিন্দীভাষী রাজ্যগুলির অধিবাসীরা যখনই দলমত-নির্বিশেষে সম্মিলিত হয়ে হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের প্রসার-প্রতিরোধে উদ্যোগী হয় তখনই ভারত-সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়—প্রকৃত যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা হবে না। কিন্তু সেই আশ্বাসে অহিন্দী ভারত শান্ত হলেই আবার শুরু হয়ে যায় হিন্দী-সমর্থকদের তৎপরতা।

সম্প্রতি ভারত-সরকার আবার একবার এই লুকোচুরি খেলা খেললেন। সংসদের গত অধিবেশনে সম্মিলিত অহিন্দী-ভাষী সদস্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন—১৯৬৫ সালে হিন্দীকে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করার প্রস্তাব ভারত-সরকার এখন স্থগিত রেখেছেন। ওই একই বক্তৃতায় হিন্দীর দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও তিনি কয়েকটি সরল মন্তব্য করলেন। ফলে ভারতের অহিন্দী-ভাষী চল্লিশ কোটি মানুষ আবার নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু ক'দিন যেতে-না-যেতেই ভারত-সরকার পুনরায় ঘোষণা করলেন—১৯৬৫ সালেই হিন্দী পুরোপুরি ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের ও [illegible] প্রতিকার অনুমান ভারতের অহিন্দী-ভাষী নয়টি রাজ্যের (বোম্বাই বিভক্ত হলে দশটি) স্থায়ী ও সংঘবদ্ধ সংগঠনের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।

—

ভারতে চীনের আক্রমণাত্মক মনোভাব যখন নির্লজ্জভাবে ব্যক্ত—সেইসময় মালয় ও আয়ারল্যান্ড যুক্তভাবে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে তিব্বতে মানবতা-বিরোধী নিষ্ঠুর নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিল। সেই অভিযোগ-সংবলিত প্রস্তাবটি রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত হলেও, কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সমর্থনের অভাবে তার গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেছে।

ব্রিটেন, ফ্রান্স বা রাশিয়া যে ওই প্রস্তাব সমর্থন করেনি তার কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। কেনিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষের রক্তে যে ব্রিটেনের হাত আজ কলঙ্কিত, আলজিরিয়ার ও হাঙ্গেরির মুক্তি-সংগ্রামকে যে ফ্রান্স ও রাশিয়া হাজার হাজার মানুষের জীবন নিয়ে দমন করেছে, তাদের পক্ষে চীনের অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই মানবাধিকারের সনদ তুচ্ছ ক'রে তাদের বলতে হয়েছে—ওটা চীনের ঘরোয়া ব্যাপার, ও নিয়ে আর কারও মাথা ঘামানর দরকার নেই। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে কোনো নৃশংস মানুষ যদি তার স্ত্রীপুত্রকে হত্যা করতে যায় তো করুক, বাইরে পাঁচজনের সঙ্গে সে যদি ভদ্র ব্যবহার ক'রে চলে তাহলেই হল।

এদের যুক্তি না-হয় বোঝা গেল, কিন্তু ভারত ওই প্রতিবাদ-প্রস্তাবে সমর্থন জানাল না কোন্ যুক্তিতে? তার যুক্তিও যদি 'সার্বভৌম অধিকারের' যুক্তি হয়ে থাকে, তবে এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত মানুষের কথা সে আর কোন্ মুখে বলবে? সাম্রাজ্যবাদীদের এই 'সার্বভৌমত্ব' ও 'ঘরোয়া ব্যাপারের' যুক্তি তো পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি জমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাহলে আর মানবাধিকার নিয়ে এত বড়ো বড়ো কথা বলার প্রয়োজন কি? আর একটা কথা আছে। জাতিপুঞ্জে প্রস্তাবটির বিরুদ্ধতা-প্রসঙ্গে কোনো কোনো রাষ্ট্রপ্রতিনিধি বলেছেন, সারা এশিয়া জুড়ে আজ চলেছে অগ্রগতির বিপ্লব, সে-পথে যারা বাধা দেবে তাদের ছিটকে পড়তেই হবে। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু সারা এশিয়া বলতে কি শুধু চীনকেই বোঝায়? আর অগ্রগতির দুর্বার অভিযান কি শুধু সেই দেশেই শুরু হয়েছে? 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি'কে শুধু ওই দেশ থেকেই ছিটকে পড়তে হচ্ছে কেন? এশিয়ার আর কোন্ দেশে কোন্ 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি'র পক্ষে নিশ্চিন্তে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে? আর 'প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি' বলতে যদি দলাই লামাকেই বোঝানো হয়ে থাকে, তবে তাঁর পক্ষে চীনের অন্যতম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া সম্ভব হল কি করে?

সম্পাদক—[illegible] ভট্টাচার্য
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬ হইতে [illegible] বসু কর্তৃক মুদ্রিত

বসুধারা

বাঙলার প্রাণ-প্রবাহ

সম্পাদক
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রন্থনায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
অজিত গুপ্ত

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড পৌষ, ১৩৬৮ তৃতীয় সং

হাতের কাছে

ক্যাপস্টান মজুত রাখুন!

যেখানেই থাকুন, আর যাই করুন — সবসময়ে হাতের কাছে ক্যাপস্টান মজুত রাখবেন। ধূমপানে এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাবেন না।

উইল্‌স-এর ক্যাপস্টান-এর
তুলনা নেই

CAP/392

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত।

বসুধারা

তৃতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় খণ্ড • তৃতীয় সংখ্যা

পৌষ, ১৩৬৬

★ সূচীপত্র ★

রমেশচন্দ্র দত্ত । বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য । । ৩০৭
রাজশেখর বসু । রাশিরাশি । । ৩১০
সনৎকুমার গুপ্ত । রমেশচন্দ্র দত্ত । । ৩১৩
তুলসীদাস সিংহ । পল্লীর বারমাস্যা : পৌষ । । ৩১৫
অনিমেষ চক্রবর্তী । একটি বিচার-কাহিনী । । ৩২২
করবী দত্ত । মুরারি-মামা । । ৩২৭
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য । চেনাশোনার বাইরে । । ৩৩৪
দীপক চৌধুরী । মনের মধ্যে মন । উপন্যাস । । ৩৪২
সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । সে এক দুনিয়া । । ৪০৮
যোহান ফন্ গয়টে — অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় । প্রেমিক কাছে । কবিতা । । ৪১২
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় । ক্ষমা করো, প্রভু ! । কবিতা । । ৪১২
শান্তিলতা দাশগুপ্ত । রাশিয়ার স্মৃতি । । ৪১৩
শরৎকুমার মিত্র । পূর্বস্মৃতি । । ৪২০
কালীচরণ ঘোষ । সমবায়ী চাষ বা 'সমবায়ী ক্ষেতি' । । ৪২৬
গেজা গার্দোন্ডী — অনুবাদ : মলিনা রায় । তুষার-বন্যা । । ৪২৯
সূত্রধার । অথ নট-ঘটিত । । ৪৩৩
অগ্নিমিত্র । ঘটিরামের কড়চা : কপিথ-নাটক । । ৪৩৮
পুরাতনী ['সমাচার দর্পণ' হইতে উদ্ধৃতি] । । ৪৪৩
জীবশর্মা । গ্রহ-বিচিত্রা । । ৪৪৫
নাটমহল [মঞ্চলোক ও চিত্রলোক] । । ৪৪৯
কথায় কথায় । । ৪৫৩

প্রবন্ধসাহিত্য ও আলোচনা
[illegible]
West to-day 7·00
আজকের পশ্চিম ৪·৫০
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
শরৎচন্দ্র—দেশ ও সমাজ ৫·০০
অধ্যাপক নীলরতন সেনের
বাংলা সাহিত্যে প্রসঙ্গ ৩·৫০
[illegible]
মঞ্জরী (কবিতা) ৫·০০

নূতন নূতন উপন্যাস
[illegible] ২·৭৫
সুনীল সরকার
কালাপাখি (গল্প) ৫·০০
জীবানন্দ ভট্টাচার্য
মণিমালা ৫·৫০
লীলা মজুমদার
তুমি শুধু ছবি (গল্প) ৩·৫০
অন্নপূর্ণা গোস্বামী
কন্যাপীঠ ৩·৫০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে নূতন যোজন
কবি তরু দত্ত ২·৫০
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
বাংলা ভাষায় কবি জীবনীর একমাত্র আলেখ্য
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ১০·০০
দু'জন বৃটিশ [illegible] লেখা
আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য
অনুবাদ

এ-১৩২, ১৩৩

Some valuable comments on

Economic Resources of India & Pakistan

—by K. C. Ghosh

"........ A dictionary of a country's economic resources is always a useful book of reference. So is Mr. K. C. Ghosh's book on India and Pakistan. —*Statesman*

"........ a most authoritative work, which takes into account the chief economic factors which go to create wealth." —*Chamber of Commerce Journal, London*

"The author has .... nicely presented all the key-factors of economic development .... No section of Indian economic .... has been left out of account and the array of statistical notes has left nothing to be desired. —*Amrita Bazar Patrika*

Answers to Questions set for Electrical Supervisors' Examination

(ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজারশিপ পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য পুস্তক)

বর্তমানে নিম্নলিখিত খণ্ডসমূহ পাওয়া যায় :

(*a*)	Part I for 1945-48	2·50
(*b*)	Part II & XI for 1945-48	2·50
(*c*)	Part III for 1945-48	-- 2·50
(*d*)	Part IV for 1946-52	-- 2·50
(*e*)	Part V for 1946-52 --	-- 2·50
(*f*)	Part I (Supplement) for 1950-53	2·00
(*g*)	Part II (Supplement) for 1950-53	2·00
(*h*)	Part XI (Supplement) for 1950-53	2·00

ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই পুস্তক পাইবেন।

ইলেকট্রিক্যাল পকেট বুক (বাংলা ভাষায়)—শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

ইলেকট্রিশিয়ানদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং পকেটে রাখবার মতো সাইজ। মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক

কে. পি. বসু পাবলিশিং কোং

৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

॥ 'বসুধারা'র নিয়মাবলী ॥

॥ গ্রাহকদের সম্পর্কে ॥

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ টাকা। গ্রাহক হইলে চাঁদার হার—বার্ষিক (সডাক) ১২৲ টাকা এবং ষাণ্মাসিক (সডাক) ৬৲ টাকা। ভিঃ-পিঃ-যোগে পত্রিকার গ্রাহক হইলে, গ্রাহকদেরই ভিঃ-পিঃ খরচ বহন করিতে হয়। মনি-অর্ডার-যোগে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে এই অতিরিক্ত খরচ আর দিতে না। বৎসরের যে-কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। শারদ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। ভারতের বাহিরে পত্রিকার চাঁদার হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

কার্যালয়—বসুধারা : ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ : ফোন : ৩৪-১১০০

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা

পৌষ, ১৩৫৯

CALC
DEPT
LIBR
UNIVE

বসুধারা

বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য।

রমেশচন্দ্র দত্ত

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য ও বঙ্গীয় চিন্তার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধ,—এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লেখা যায়। আমি দুই চারিটী কথাতে এই বিষয়ে কি লিখিব? সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তা ও কল্পনা, উদ্যম ও উন্নত আশার পূর্ণ বিকাশস্থল। বঙ্গদেশের আধুনিক কল্পনা তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে,—তিনি সেই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক চিন্তা তাঁহাকে সংগঠিত করিয়াছে,—তিনি সেই চিন্তাকে পুনরায় উদ্দীপিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের আধুনিক আশা ভরসা, উদ্যম ও উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছে,—আবার বঙ্কিমচন্দ্র সেই আশা ও উদ্যমকে অলন্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—আবালবৃদ্ধবনিতা সকল সম্প্রদায় বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিস্তৃত করিয়াছেন।

• • •

… শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য জ্ঞান, পাশ্চাত্য সভ্যত ও পাশ্চাত্য উন্নতির আলোকে সহসা বঙ্গদেশে দেখা দিল; আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বলতম কিরণ বঙ্গদেশে প্রতিফলিত হইল,—আধুনিক উদ্যম, উৎসাহ ও উন্নতি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইল। ভিন্নরুচি লোকে ভিন্ন প্রকারে সে সভ্যতা গ্রহ করিলেন। গল্পগ্রাহিগণ ইউরোপীয় সুরাপান প্রভৃতি দো গ্রহণ করিলেন, ফলগ্রাহিগণ ইউরোপীয় উৎসাহ, উদ্যম স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বধর্ম্ম-প্রিয়তা গ্রহণ করিলেন। দেশে

মহা আন্দোলন হইল, চিন্তার লহরী বহিল, উৎসাহ ও উদ্যম উৎকর্ষ লাভ করিল, দেশপ্রিয়তা ও ধর্মপ্রিয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। সেই চিন্তা, সেই উৎসাহ, সেই ধর্মপ্রিয়তা ও দেশপ্রিয়তা প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন রায়ে পূর্ণ-বিকাশ পাইল।

শতাব্দীর মধ্যকালেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল তরঙ্গ দেশে বহিতে লাগিল, তাহাতে সুফলও ফলিল, কুফলও ফলিল। সমাজে কতকটা বিশৃঙ্খলতা হইল, কতকটা নূতন বলেরও আবির্ভাব হইল। বিদেশীয় আচারের অনুকরণেচ্ছা প্রবল হইল, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশহিতৈষিতা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বিদেশীয় শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় কথা জানিবার ইচ্ছাও বলবতী হইল। দুই দিক হইতে তরঙ্গ আসিয়া যেন সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু এই পরস্পর-প্রতিঘাতী ঊর্মিরাশির মধ্যে জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় বল, জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় উদ্যম গঠিত ও স্থিরীকৃত হইল। এই প্রতিঘাতী চিন্তা-তরঙ্গ, এই জাতীয় বল ও জাতীয় উদ্যম মধুসূদন দত্তে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন বিদেশীয় ভাবে ও আচারে বিব্রত, এবং তাঁহার যশোলিপ্সাও প্রথমে বিদেশীয় পথে প্রধাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা শেষে জাতীয় ভাবে পূর্ণ-বিকাশ প্রাপ্ত হইল।

> "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
> তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
> পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
> পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।…
> স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
> 'ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
> এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
> যা ফিরি, অজ্ঞান তুই—যা রে ফিরি ঘরে।'
> পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
> মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।"

এই সুমধুর কথাগুলি কেবল মধুসূদনের জীবনের ইতিহাস নহে,—সেই সময়ের বঙ্গদেশের জাতীয় ইতিহাস। সেই সময়ে শিক্ষিত ধীশক্তি-সম্পন্ন সকলেই পরধন-লোভে মত্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করিয়া অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে ঘরে আসিয়া পৈতৃক ধন পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভ্রমণ, সেই ভিক্ষাবৃত্তি ব্যর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগের পক্ষে ফলশূন্য হয় নাই। পাশ্চাত্য উদ্যম ও উৎসাহ আমাদিগের পক্ষে মূল্যবান্। সেই শিক্ষাবলেই আমরা নিজের ধন চিনিতে পারিয়াছি, সেই উৎসাহ বলেই আমরা পৈতৃক রত্ন আহরণ করিতেছি। এই সুফলটী শতাব্দীর চরম ফল,—এই সুফলটী বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে সম্পূর্ণ রূপে পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া দেশীয় ভাষা ও দেশীয় বিদ্যার অনুশীলন, পাশ্চাত্য উৎসাহের সহিত স্বদেশের উন্নতি ও ঐক্যসাধন, পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিয়া কায়মনঃপ্রাণ দেশের জন্য সমর্পণ করা,—এইটী আমাদের শতাব্দীর শেষ ফল,—এইটী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। সাধারণ অনুকরণশীল ব্যক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় লোকের মধ্যে প্রভেদ এই;—পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার মন পুষ্টিলাভ করিয়াছে, অজীর্ণতা-দুষ্ট হয় নাই। জ্ঞানরত্ন সকল স্থান হইতেই আহরণীয়,—বঙ্কিমচন্দ্র সকল দেশ, সকল স্থান হইতে সেই রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভা আরও সমুজ্জ্বল করিলেন। সে প্রতিভার ফল কি, তাহা আমরা গত ত্রিংশৎ বৎসর ক্রমান্বয়ে দেখিয়াছি।

যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটী নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটী নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটী নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

* * *

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতাম,—অদ্যও তাহা করিতেছি, এবং ভরসা করি বহুদিন পর্য্যন্ত এই শিক্ষা লাভ করিতে থাকিব। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের নিজের ধন প্রায় কিছু ছিল না, আমরা কাঙ্গালীর ন্যায় ফিরিতাম, অদ্য আমাদের নিজের একটু ধনসঞ্চয় হইয়াছে। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রধান আহরণকারী। এখন আমরা গর্ব করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা বলি, স্নেহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে যত্ন করি, বাৎসল্যের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যকে পালন করি। মনের সহিত একটু শক্তি হইয়াছে,—রাজনীতিতে বল, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বল, সাহিত্য সম্বন্ধে বল, প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে বল, আমাদের নিজের ধনের একটু স্পর্দ্ধা করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা কেবল বিদেশীয়দিগের স্তুতিবাদক নহি, দেশীয় আচার-ব্যবহারে বীতরাগ নহি, দেশীয়

ইতিহাসে মূর্খ নহি, এবং দেশীয় ধর্ম্মে অবহেলা করি না। আমাদের শরীরে যেন একটু বল হইয়াছে, মনে একটু স্পর্দ্ধা হইয়াছে, জাতীয় ধন চিনিয়াছি, জাতীয় ধর্ম্মের মর্ম শিখিয়াছি। এটী উন্নতির লক্ষণ। আমরা যেন ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হইতে থাকি।

এ উন্নতি যে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা সাধিত, তাহা নহে। এটী কতকটা ইংরাজি শিক্ষার ফল, কতকটা দেশের ও সময়ের উন্নতি, কিন্তু এ উন্নতিও বঙ্কিমচন্দ্রে পূর্ণবিকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ আমি পড়ি নাই, এবং সকল বিষয়ে তাঁহার কি মত, তাহাও জানি না। কিন্তু মতামতের আলোচনা এখানে করিতেছি না। তিনি হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সময়ের একটী লক্ষণ,—একটী চিহ্নস্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য সংঘটন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নির্জ্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্ম্মের সঞ্জীবনী শক্তি প্রচারকরণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানবিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন,—এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা, আজি বঙ্গসমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মাত্র। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ ক্রমশঃ ঐক্যলাভ করিতে শিখিতেছেন,—প্রাচীন ধর্ম্ম-জ্ঞান এবং উদার আচার ও অনুষ্ঠান সেই ঐক্যসাধনের একমাত্র মন্ত্র।*

—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। শ্রাবণ, সন ১৩০১

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'ও ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে প্রকাশিত হয়। পরিষদের প্রথম সভাপতি রূপে ইহা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের ভাষণ।

রাশিরাশি

রাজশেখর বসু

প্রমথ বিশির কোনও বইএ পড়েছি, অক্ষয়কুমার দত্ত অনবরত ভাবতেন, ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড! শেষ বয়সে তাঁর মাথার অসুখ হয়েছিল, নিরামিষ ছেড়ে তিনি আমিষ খেতে শুরু করেছিলেন। প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তাই বোধ হয় তাঁর অসুখের কারণ।

বিপুল, বিশাল, বিরাট, ভূমা, অসীম ইত্যাদি শব্দের কটা মোহিনী শক্তি আছে। অত্যন্ত বৃহতের চিন্তা মাদের একটু অভিভূত করে, তার উপলব্ধিতে আমরা ময়াবিষ্ট হই, আনন্দিত হই, কিঞ্চিৎ ভয়ও পাই। ষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন 'হৃষিত' অর্থাৎ রোমাঞ্চিত য়েছিলেন, তাঁর মন 'ভয়ে প্রব্যথিত' হয়েছিল। আবার উ কেউ বিপুলতা থেকে আশ্বাসও পান। ভবভূতি র জীবদ্দশায় অবজ্ঞাত ছিলেন। মালতীমাধব নাটকের তাবনায় এই বলে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন— ল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা; কোনও কালে কোনও নে এমন লোক থাকতে পারেন যিনি আমার সমানধর্মা বং এই রচনার গুণগ্রহণে সমর্থ।

আকাশ সমুদ্র হিমালয় ইত্যাদির বিশালতা কবিকে বাবিষ্ট করে। দেশ আর কাল নিয়ে দার্শনিকরা চিরকাল থা ঘামিয়েছেন, এই দুই বিরাট পদার্থের কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছে, না শুধুই আমাদের অধ্যাস বা illusion? এখনও রা এ রহস্যের সমাধান খুঁজে পান নি। বিজ্ঞানীরা বই মাপতে চান, তাঁদের মানদণ্ড একদিকে বেড়ে লছে, আর একদিকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হচ্ছে, আগে যে সংখ্যা র মনে হত এখন তাতে কুলয় না। সেকালেও কের ধারণা ছিল যে আকাশে অসংখ্য তারা আছে, কিন্তু শুধু চোখে যা দেখা যায় তার সংখ্যা তিন হাজারের বেশী নয়, লোকে তাই অসংখ্য মনে করত। এখন যন্ত্রের যত উৎকর্ষ হচ্ছে ততই বেশী তারা দেখা যাচ্ছে, লক্ষ থেকে কোটি, তার পর বহু কোটি।

এক শ বৎসর আগে পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বাইবেলের উক্তি অনুসারে বিশ্বাস করতেন যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভূবিজ্ঞানী লায়েল বললেন, পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার নয়, কয়েক কোটি বৎসর। তার পর ডারউইন আর ওআলেস প্রচার করলেন, লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপী ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে পুরাতন জীব থেকে নব নব জীবের উদ্ভব হয়েছে। তখনকার গোঁড়া খ্রীষ্টানরা (যার প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন) এই মতের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন, কিন্তু তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হলেন। আধুনিক গবেষণায় স্থির হয়েছে, পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি নয়, বহু কোটি বৎসর।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের কালপরিমাণ আরও বিপুল। চতুর্যুগ = ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। এক মন্বন্তর = ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার বৎসর। ব্রহ্মার এক অহোরাত্র = ২৮,৮০০ কোটি বৎসর। ব্রহ্মার আয়ু = ১০,৩৬৮এর পর ১২ শূন্য দিলে যত হয় তত বৎসর।

প্রচলিত ধারাপাতে সংখ্যার এই তালিকা দেখা যায়।— এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, নিযুত (million), কোটি, অর্বুদ, বৃন্দ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্খ (billion), পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য, পরার্ধ। বৃন্দ-এর অন্য নাম অব্জ।

Prof. N. W. Pirie, F.R.S. ১৯৫৪ সালে লিখিত *Origin of Life* প্রবন্ধে এই শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

পরার্ধ মানে ১এর পিঠে ১৭ শূন্য। ছেলেবেলায় আমরা যে ধারাপাত পড়তুম তাতে পরার্ধের পরেও অনেক সংখ্যা ছিল। তাদের নাম ভুলে গেছি, শুধু শেষের দুটি মনে আছে—পার, অপার। আমাদের যিনি অঙ্ক শেখাতেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, অপারের পরে কোন্ সংখ্যা? তাঁর বিদ্যা বেশী ছিল না, উত্তর দিলেন, অপার সব চাইতে বড়, তার পরে আর সংখ্যা নেই। আমি বললুম, কেন, অপারের পিঠে তো আরও শূন্য জুড়ে দেওয়া যায়। তিনি বললেন, তাতে তোর লাভটা কি? অপারের বেশী টাকাও তোর হবে না, কাইবিচিও হবে না। মাষ্টারমশাই মিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত পিঁপড়ের মতন। চিনির এক কণায় যদি পেট ভরে তবে বস্তার সন্ধান করা বোকামি।

বিজ্ঞানীরা টাকা গোনবার জন্যে সংখ্যা চান না, যেসব বৃহৎ বা সূক্ষ্ম বা রাশি রাশি বস্তু নিয়ে তাঁদের কারবার, তার পরিমাণের জন্যেই সংখ্যা দরকার। লক্ষ, কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন ইত্যাদিতে এখন কাজ চলে না। তারায় তারায় দূরত্ব মাপা হয় আলোকবর্ষ দিয়ে (প্রায় ৬এর পর ১২ শূন্য মাইল), অথবা parsec দিয়ে (প্রায় ১৯এর পর ১২ শূন্য মাইল), অতি সূক্ষ্ম বস্তু মাপা হয় Angstrom unit দিয়ে (১ সেন্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ১ ভাগ)।

খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ দার্শনিক A. N. Whitehead লিখেছেন—*Let us grant that the pursuit of mathematics is a divine madness of the human spirit, a refuge from the goading emergency of contingent happenings*। অর্থাৎ ধরা যেতে পারে, গণিতের চর্চা একরকম দিব্যোন্মাদ, ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায়। হোআইটহেডের যদি ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র পড়া থাকত তা হলে হয়তো লিখতেন—গণিতচর্চায় যে আনন্দ লাভ হয় তা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।

যাঁরা খাঁটী গাণিতিক তাঁরা সংখ্যা নির্ধারণ করেই খুশী, তা দিয়ে কি মাপা হবে সে চিন্তা তাঁদের নেই। Edward Kasner একজন বিখ্যাত মার্কিন গণিতজ্ঞ। খেয়ালের বশে একদিন তিনি একটা সংখ্যা স্থির করলেন—১এর পিঠে ১০০ শূন্য। তাঁর ন বছরের ভাইপোকে বললেন, ওরে, এর একটা নাম বলতে পারিস? ভাইপো বলল, *googol*। নামটি গ্রীক ল্যাটিন বা ইংরেজী নয়, ছোট ছেলের মনগড়া বালভাষিত, যেমন হিংটিংরাটিম। কিন্তু এই গুগল নাম এখন সর্বস্বীকৃত হয়েছে। কাসনার তাঁর ভাইপোকে আবার বললেন, গুগলের চাইতে ঢের বড় একটা সংখ্যা বলতে পারিস? ভাইপো বলল, পারি, একের পিঠে দেদার শূন্য বসিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না হাতে ব্যথা হয়। কাসনার বললেন, তা হলে তো একটা মূর্খ পালোয়ানের কাছে আইনস্টাইনকে হেরে যেতে হবে, সংখ্যার নির্ধারণ গায়ের জোরে হতে পারে না। তখন ভাইপো চিন্তা করে বলল, একের পিঠে এক গুগল শূন্য, এর নাম হ'ক *googolplex*। কাসনার বললেন, তথাস্তু, গাণিতিক সমাজও তাই মেনে নিলেন।

আপনি অভ্যাস করে অনায়াসে এক গুগল অর্থাৎ ১এর পর ১০০ শূন্য লিখতে পারেন, লাইনটি লম্বায় চার-পাঁচ ইঞ্চের বেশী হবে না। কিন্তু গুগলপ্লেক্স লেখবার চেষ্টা করবেন না, পাগল হয়ে যাবেন। কাগজে কুলোবে না, ঘরেতেও নয়, পৃথিবীতেও নয়, আকাশের অতিদূরস্থ নক্ষত্র পর্যন্ত শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে যেতে হবে।

গন্ধর্ব পুষ্পদন্ত যে মহিম্নস্তব রচনা করেছেন তার একটি শ্লোকে আছে—সমুদ্র যদি মসীপাত্র হয়, তাতে যদি অসিত-গিরিসম চূর্ণীকৃত কজ্জল গোলা হয়, সুরতরুর শাখা যদি লেখনী হয়, ধরণী যদি পত্র হয়, এবং সারদা যদি সর্বকাল লিখতে থাকেন, তথাপি হে মহেশ, তোমার গুণাবলীর পারে পৌঁছুতে পারবেন না। পুষ্পদন্ত যদি আধুনিক গণিতের সংখ্যা জানতেন তা হলে সংক্ষেপে বলতে পারতেন, হে মহেশ, তোমার গুণরাশি গুগলপ্লেক্সের চাইতেও বেশী।

সংখ্যাবিশারদরা অনেক রকম অদ্ভুত হিসাব করেছেন। মানবজাতি যখন প্রথম কথা বলতে শিখল তখন থেকে এখন পর্যন্ত মোট কত কথা বলেছে? শিশুর আধ-আধ কথা, প্রেমালাপ, গালাগালি, রাজনৈতিক বক্তৃতা ইত্যাদি সব নিয়ে ১এর পিঠে মোটে ১৬টা শূন্য, গুগলের চাইতে ঢের কম।

নোবেল-পুরস্কৃত এডিংটন হিসাব করেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত প্রোটন আছে তার সংখ্যা ১৩৬·২ × ১এর পর ২৫৬ শূন্য। ইলেকট্রনের সংখ্যাও তাই। অর্থাৎ গুগলের চাইতে বেশী কিন্তু গুগলপ্লেক্সের চাইতে কম।

আমাদের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথে কত তারা আছে? জ্যোতির্বিদরা অনুমান করেন, ৩,০০০ কোটি থেকে ১০,০০০ কোটির মধ্যে, অর্থাৎ ৩এর পর ১০ শূন্য এবং ১এর পর ১১ শূন্যর মধ্যে। গুগলের চাইতে ঢের কম।

দাবা খেলায় যত চাল হতে পারে তার সংখ্যা কত? আগে ১এর পর ৫০ শূন্য বসান। যে সংখ্যা পাবেন তত শূন্য ১এর পর বসান। গুগলের চাইতে বেশী কিন্তু গুগলপ্লেক্সের চাইতে কম।

এইবার অতি ক্ষুদ্র রাশি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। আমাদের শাস্ত্রোক্ত অণু-পরমাণু কি বস্তু তা বোঝা যায় না। সংস্কৃত অভিধানে ত্রসরেণুর অর্থ—ছয় পরমাণুর সমষ্টি, অথবা গবাক্ষচ্ছিদ্রাগত রৌদ্রে দৃশ্যমান চঞ্চল সূক্ষ্ম পদার্থ। জীববিজ্ঞানে কীটের চাইতে কীটাণু ছোট, তার চাইতে জীবাণু বা মাইক্রোব ছোট, তার চাইতে ভাইরস ছোট (অণুবীক্ষণে অদৃশ্য)। রসায়নের অণু আরও ছোট, পরমাণু তার চাইতে ছোট, প্রোটন আরও ছোট, ইলেকট্রন সব চাইতে ছোট।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের উত্তম উদাহরণ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। মাদার টিংচারে যে মূল বস্তু থাকে তার ১০ ভাগের ১ ভাগ থাকে প্রথম ডাইলিউশনে। তৃতীয় ডাইলিউশনে ১,০০০ ভাগের ১ ভাগ। দ্বাদশ ডাইলিউশনে লক্ষ কোটি ভাগের ১ ভাগ। শততম ডাইলিউশনে থাকে ১ গুগলের ১ ভাগ। হোমিওপ্যাথরা বলেন, ডাইলিউশন বৃদ্ধিতে ঔষধের পোটেন্সি বৃদ্ধি হয়। অবিশ্বাসীরা বলেন, ১০০ ডাইলিউশনে পৌঁছবার আগেই এমন অবস্থা হয় যে এক শিশিতে অণু-প্রমাণ ঔষধও থাকে না। বিশ্বাসী বলেন, তোমার অঙ্কশাস্ত্র যাই বলুক, অণুপ্রমাণ ঔষধ থাকুক বা না থাকুক, লো দেখছি উপকার হয়, অতএব তর্ক না করে খেয়ে যাও বিশ্বাসেই ফললাভ হয়।

অতি সূক্ষ্মের আর একটি উদাহরণ—ব্যাঙের আধুলি গল্প। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতীতে তার ভা বর্ণনা আছে। ব্যাঙ তার বন্ধুকে একটি আধুলি ধা দিয়েছিল। শর্ত এই ছিল যে প্রতি কিস্তিতে অর্ধেক শো করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে চার আনা, দ্বিতীয়ে দু আনা, তার পর যথাক্রমে এক আনা, দু পয়সা, এক পয়সা আধ পয়সা ইত্যাদি। ব্যাঙ হিসাব করে দেখল, তা পাওনা কোনও দিন শোধ হবে না, একটু বাকী থাকবেই সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল। ব্যাঙ যদি বুদ্ধিমান হ তবে বুঝত যে কয়েক কিস্তি পরেই বাকীর পরিমা নগণ্য হয়ে যাবে, অনন্তকাল তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

অন্তরকলন বা *differential calculus*এর আবিষ্ক লিবনিৎস সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন তিনি প্রশিয়া রানীকে বললেন, যদি অনুমতি দেন তবে আজ আপনাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম infinitesimal রাশির রহস্য বুঝিয়ে দেব রানী বললেন, আপনাকে বোঝাতে হবে না, সূক্ষ্মাতিসূ কাকে বলে তা এখানকার এই সভাসদদের আচরণ থেকে আমি টের পাই।

রমেশচন্দ্র দত্ত

[১৮৪৮–১৯০৯]

সনৎকুমার গুপ্ত

মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বরে মনীষী রমেশচন্দ্র এ ধরাধাম ত্যাগ করেন। বিবিধ কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও এই স্বল্পকালীন জীবনে তিনি যে-সব কীর্তিকলাপ রেখে গেছেন, তা আজকের দিনের বাঙালীর পক্ষে পরিমাপ করা অসম্ভব। ইংরেজীনবিশ রমেশচন্দ্র কিভাবে বাংলা-সাহিত্য-সেবায় তৎপর হয়েছিলেন—নিজের কথাতেই তিনি তা প্রকাশ করেছেন:

"… বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির প্রশংসা করিলাম … বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—যদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লিখ না কেন? আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম,—আমি যে বাঙ্গালা লিখা কিছুই জানি না। … ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখি নাই, কখনও বাঙ্গালা রচনা পদ্ধতি জানি না। গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন,—রচনা পদ্ধতি আবার কি?—তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনা পদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে। এই মহৎ কথা আমার মনে বরাবর জাগরিত রহিল, …।"[১]

এই কথোপকথনের অনেক আগে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের প্রতিভার বিষয়ে তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা *Three Years in Europe* গ্রন্থটির সমালোচনাকালে যে মন্তব্য করেছিলেন তা একান্ত উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটিতে রমেশচন্দ্রের নাম ছিল না; "By a Hindu" [Cal. 1872, pp. 116] রূপে প্রকাশিত হয়।

"… এইরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল … এই লেখক বাঙ্গালী জাতির সেই বাসনা পুরাইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। … মধ্যে মধ্যে কবিতা … বাঙ্গালী হইয়া যিনি ইংরাজিতে কবিতা রচনা করেন। আমরা কখন তাঁহার প্রশংসা করিব না, … পরিশেষে লেখকের নিকট আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই যে, এই পুস্তকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করুন।"[২]

রমেশচন্দ্র শুধু বাংলা কথা-সাহিত্য রচনা করেই লেখনীকে ক্ষান্ত দেননি। সাহিত্যের নানা বিভাগে বিভিন্ন রচনায় স্থায়ী চিহ্ন তিনি রেখে গেছেন। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য-রচনায় শিল্পী রমেশচন্দ্রের পরিচয় সেকালের নানা সাময়িক পত্রের

---

[১] 'নব্যভারত' বৈশাখ ১৩০১

[২] 'বঙ্গদর্শন' ফাল্গুন ১২৭৯

মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। পুরাতত্ব, প্রত্নতত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি বিষয়ে নানা মৌলিক রচনার প্রবর্তক রমেশচন্দ্র। তাঁর 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র অনুবাদ ১৮৮৫-৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'হিন্দুশাস্ত্র' এবং 'নামজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত' হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৯৩-৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই কাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিভাবে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন :

"... যখন রাজকীয় কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন সর্ব্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ লইতে যাইতাম ... বাঙ্গালী মাত্র ঋগ্বেদের অনুবাদ পড়িবে, একথা শুনিয়া যাহারা হিন্দুধর্ম্মে দোহাই দিয়া পয়সা আদায় করে, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল —ধর্ম্ম ব্যাপারিগণ ঋগ্বেদের অচিন্তিত অবমাননা ও সর্ব্বনাশ বলিয়া গলাবাজী করিতে লাগিল, ... অনুবাদককে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, ... এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। তিনি বলিলেন, 'ভাই, উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটী সম্পন্ন কর। যদি আমার শরীর একটু ভাল থাকে, যদি আমি কোনরূপে পারি, তোমাকে সাহায্য করিব।'"[*]

বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের 'ঋগ্বেদ সংহিতা' সম্বন্ধে যা বলেছেন :

"ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশবাবু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, বিশুদ্ধি, এবং সর্ব্বাঙ্গীণতার সহিত এই কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, ইউরোপে হইলে এত দিন বড় জয় জয়কার পড়িয়া যাইত।" ...[*]

সাতষট্টি বছর আগে কয়েকটি বাঙালী তরুণ বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধনের জন্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সূচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁদের প্রস্তাবিত পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব তরুণদের উপদেশ দিয়ে প্রস্তাবিত সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি-পদে রমেশচন্দ্রকে নির্বাচন করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্রও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা মেনে নিয়ে ক্রমান্বয়ে ১৩০১, ১৩০২ ও ১৩০৯ বঙ্গাব্দ—এই তিন বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। রমেশচন্দ্রের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সূচনা তথা বাঙালীর নিজস্ব বাণীমন্দির-প্রতিষ্ঠা এক যুগান্তকর ঘটনা।

রমেশচন্দ্রের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চৈতন্য লাইব্রেরি'র তদানীন্তন সম্পাদক গৌরহরি সেনকে যা লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গের শেষ করছি :

"তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্য্যে, কি দেশহিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি—এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল—তাঁহার কর্ম্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অমল নির্ম্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই। —১৬ই পৌষ ১৩১৬।"[*]

---

[*] 'নবভারত' ভাদ্র ১২৯৮

[*] 'প্রচার' ২য় বর্ষ ১২৮৭

[*] 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-৬৪'। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পল্লীর বারমাস্যা

তুলসীদাস সিংহ

। পৌষ ।

গরা-বাংলায় একটা কথা আছে—"আষাঢ়াস্তি বেলা আর পৌষভাস্তি রাত"। অর্থাৎ কিনা আষাঢ়ে বেলাটা বা দিনটা হয় মস্তবড়—আর পৌষে রাতটা হয় মস্তবড়। পৌষের রাত যেন শেষ হতে চায় না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘুম মিটে যাওয়ার পরও রাত থাকে। সুতরাং বাধ্য হয়েই তখন মানুষকে স্বপ্ন দেখে বাকী রাতটুকু কাটাতে হয়। যতরকমের আজগুবি স্বপ্ন সম্ভব তা মানুষ ভাবে এই পৌষের রাতেই।

আমিও দেখেছিলাম।

দেখছিলাম আমার বয়সটা কমে গিয়ে এইটুকু হয়ে গেছে। নন্টা আর আমি পাশাপাশি শুয়ে আছি। লেপের তলা থেকেই দিব্যি বুঝতে পারছি শেষরাতের সেই হাড়-কাঁপুনে হাওয়াটা হুর হুর করে বইতে শুরু করে দিয়েছে—পাড়ার যত ঢেঁকী আছে সবগুলোই হয়ে উঠেছে মুখর। কানে আসছে ঢেঁকীদের একটানা আওয়াজ—"ঢেঁকেড় ধুম্, ঢেঁকেড় ধুম্—পেঁ হুচ্, কে গো—পেঁ হুচ্, কে গো—চাঁই চপক্ কাটাল্যা পা, চাঁই চপক্ কাটাল্যা পা—পেঁ হুচ্, কে গো"।

অগ্রহায়ণ যেমন অগ্রহায়ণ নয় নবান্ন, তেমনি পৌষ পৌষ নয় লক্ষ্মী—বরং মা-লক্ষ্মী। ঘরে ঘরে যে এখন মা-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। আর ঘরে যখন মা-লক্ষ্মী পাওয়া গেছে তখন এইসময় তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে না রাখলে পালিয়ে যাবেন যে কোন্ ফাঁকে। তিনি যে চঞ্চলা—থাকতে চাননা যে তিনি একজায়গায় চিরকাল। গোলা বা মরাইয়ের মধ্যে যা বাঁধবার বাঁধা হয়ে গেছে যা হচ্ছে—চাল করে নিয়ে পুজোর মধ্যেও বাঁধতে হবে তো বেশ কিছু। তাই একপ্রহর রাত থাকতে উঠে চাল করে নেওয়ার এত ধুম। অত-অত চাল নইলে করা যাবে কি করে। ধীরে-সুস্থে করতে গেলে পৌষ নয়, মাঘও গড়িয়ে যাবে। আর মাঘে চালের পুজো-বাঁধা মাত চালেরই পুজো-বাঁধা—লক্ষ্মীকে বাঁধা নয়। মাঘ মাস যে আর লক্ষ্মী-মাস নয়।

হাড়-কাঁপুনে হাওয়ার ভর করে ভেসে আসা ঢেঁকী আওয়াজের সঙ্গে একসময় পাখীদের আওয়াজও ভেসে এল

নন্টা আর আমি উঠে পড়লাম লেপের তলা থেকে পাশেই দিদিমার খাট—দেশালাইটা সন্তর্পণে বালিশের ত থেকে হাত করে নিয়ে ছুটিতে এসে দাঁড়ালাম আমতলায় তলা বেঁটিয়ে জমা করলাম একগাদা শুকনো আমপাত শুকনো বলছি কেন আবার—হিমে পাতাপাত সব ব হয়ে আছে। অনন্ত দেশালাইয়ের কাঠি হার মা এ-পাতাদের কাছে। সুতরাং গাদাটার তলায় প্রথ শুকনো খড় দিতে হয় এক-মুঠি। শুকনো খড়ের ধ প্রথমে জ্বলবে—আর আঁচ লেগে গরম হয়ে উঠলে পর ধ উঠবে ঐ আমপাতারা। তাও আবার মন্ত্র পড়তে হ ফুঁফুঁটি—

"পাল, ধোঁয়া লেগে যা,
ইঁদুর-মাটি খেয়ে যা।"

ব্যস্, ধোঁয়া লেগে যেতেই, ধোঁয়াকে ঘিরে জমে গে আমাদের মতো পাঁচ-দশটা নন্টা-মন্টা। কিন্তু মজা ক কতক্ষণ লেগে থাকবেন ঐ ক'টি পাতার উপরে? পা পুড়ে গেল সব। আবার পাতা কুড়িয়ে আনতে হে কিন্তু কে আনবে? কার দায়? গরম আবহাওয়া ছে কে হিম হতে যাবে ঠাণ্ডায়! সুতরাং বেশ মজা প হল। গোল হয়ে বসে থাকা ছেলেদের বুকে আঙুল টোকা মারতে মারতে ঠিক করা হল কে পাতা কুড়ি আনবে—

"আগী দুগী নারাণতলে বসি
নারাণঠাকুর মারলে বাণ
কাঠ খড় কুটো পাতা
কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আন্।"

যার বুকে এই 'আন্'-এর টোকাটি পড়লো তাকেই আনতে হবে পাতা কুড়িয়ে। জারিজুরি বৃথা। সটার বুকেই আন্-এর টোকা পড়ল—উঠে গেল সে পাতা কুড়িয়ে আনতে। কিন্তু পাতা নিয়ে আসতে আসতে আগুন এদিকে জল। হিম হয়ে উঠলো গা-টা। কাঁপতে লাগলাম ঠক্‌ঠক্ করে। ···

হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুমটা। দেখি, লেপটা সরে গেছে গা থেকে। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি আজকের 'আমি'টি হয়ে গেলাম। কান পেতে শুনলাম তবলার শব্দ—পাড়ার কেউ তবলা সাধছে—'তাক্ ডেরে কিটি তাক্—ডেরে ডেরে কিটি তাক্'। কিন্তু ঢেঁকীর শব্দ নেই কোথাও। কান-দু'টোকে খুব বেশী খাড়া করতেই কানে এল মৃদু, অতি মৃদু একটা ধিকি-ধিকি শব্দ—কল, ধানের কল চলছে পাশের গাঁয়ে। ধানকল খুব ভালো জিনিস—ও এনে দিয়েছে দুধের মতো সাদা ভাত, হাড়-কাঁপুনে এই ভোরের হাওয়ায় হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছে পল্লীর মেয়ে-বৌ'দিকে। সেইসঙ্গে কেড়ে নিয়েছে শিবের গীত, কেড়ে নিয়েছে মেয়ে-বৌদের শরীর-চর্চার সুযোগ, কেড়ে নিয়েছে সন্তান-সম্বল-হীনা অনাথা বিধবাদের বারোমাসের একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

•

পৌষ মাস ভারী মিষ্টি মাস। এ মাসের রোদ মিষ্টি, হাওয়া মিষ্টি, আগুন মিষ্টি, লেপ-কাঁথার তলা মিষ্টি, সকাল-সন্ধ্যা-দুপুর মিষ্টি, খেজুর-রস মিষ্টি, ঝোলাগুড় মিষ্টি—বেগুন, বিলিতী বেগুন, কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ-মূলো-কপি, আধকোটা সজনেফুল, কাঁটাফুল, পেঁয়াফুল, বড় ফুল মিষ্টি, ঘরের পাড়ায় ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী মিলে বনে গিয়ে একসাথে বসে বনভোজনের ভাত-খাওয়া মিষ্টি। কিন্তু এসব মিষ্টিকে ছাড়িয়ে যায় মকরসংক্রান্তি আর টুসুগানের মিষ্টি। পৌষের পৌষত্ব আসলে এ-দুটিকে নিয়েই।

•

আমাদের কাছে মকর—মকর, কিন্তু গিন্নীদের কাছে মকর একাই মকর নয়। চাওড়ী (আউনি), বাঁওড়ী (বাউনি), মকর এই তিন মিলে গিন্নীদের মকর। আর বাঁদের চাইতে যেহেতু বাকি দৃঢ়, সেহেতু ছেলেরা জানে মকর মানেই চাওড়ী, বাঁওড়ী, মকর, এখ্যান, বেখ্যান, গাঁই, সুঁই। ছেলেদের মকর সাতে মিলে মকর। এই সাতটি দিন তাদের কাছে দিন নয়—তাই, নীল-আকাশের সাতভাইয়া। মেয়েরা আবার ছেলেদের চাইতে এক-কাঠি উপরে। মেয়েছেলেদের মকর আবার তিরিশ দিনে মিলে মকর। তাদের মকর আসলে আরম্ভ হয়ে যায় সেই পৌষের প্রথম দিনটি থেকে—যে-দিনটিতে তারা টুসু' পেতেছে। টুসুকে নিয়েই যে তাদের মকর। আর বুড়ো-বুড়ীদের মকর আরম্ভ হয় সেই দিন, যেদিন তারা ছেলেমেয়েদিকে রাজী ক'রে ধোচকা-বুঁচকি-সমেত গঙ্গাসাগরের দিকে পা বাড়ায়।

সুতরাং বারোমাসের তেরো পরবের মধ্যে মকর পরবটি হচ্ছে এমন এক পরব—যা ছেলে, মেয়ে, বুড়ো-বুড়ী, কর্তা-গিন্নী সকলের কাছেই সমান।

গিন্নীদের মকর আরম্ভ চাওড়ী বা আউনির দিন থেকে—ছেলেদেরও মকর আরম্ভ ঐ চাওড়ীর দিন থেকেই। ছেলেরা সব দল বেঁধে হাতে দা-কাটারি নিয়ে চাওড়ীর সকালে বেরিয়ে পড়ে তালপাতার সন্ধানে। মকরের ভোরে ডুব দেওয়া মাত্র অঙ্গ অবশ হয়ে যাবে যে—ডুব দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের সামনে এসে দাঁড়ালে পর তো ধড়ে প্রাণ আসবে। ঘাটের উপরেই তালপাতার কুঁড়ে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করে তাই পাড়ার সব ছেলেরা। মকরস্নান-সেরে-ওঠা ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ী সব এই কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁচে। তালপাতা শুকোতে লাগে মাত্র একদিন কি দু'দিন। চাওড়ীর সকালে কাটলে, বাঁওড়ীর সন্ধ্যায় শুকিয়ে যায়। ছেলেরা তাই চাওড়ীর দিন কাঁচা তালপাতা কেটে এনে পুকুরের পাড়ে ছড়িয়ে-রাখে। তারপর বাঁওড়ীর দিন যেই সূর্য পাটে বসে অমনি প্যান্টের পকেটে এক-পকেট করে বাঁওড়ী-পিঠা পুরে নিয়ে ছুটে আসে সব পুকুরঘাটে। শুকনো তালপাতাগুলো দিয়ে তৈরি হবে এবার কুঁড়ে। কুঁড়ে ক'টা হবে তা আগে থাকতে বলবার উপায় নেই। যদি দেখা যায়, ও-পাড়ার ছেলেরা ও-ঘাটে বাঁধছে ন'টা, তাহলে এদিকে বাঁধতে হবে দশটা। ওরা যদি বাঁধে দশটা, তবে এরা বাঁধবে এগারোটা। একটা বেশী চাই-ই। তাতে যদি দু'খানা পাতা দিয়েই কুঁড়ে করতে হয়—তাও সই।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তারা আর একটাও উঠতে বাকী নেই আকাশে—কিন্তু তবু কুঁড়ে বাঁধা শেষ হয়না ছেলেদের। যে-পুকুরপাড়টার তালগাছে সন্ধ্যা হলেই ভূত দোলে, মুখ-আঁধারি হলেই যে-পুকুরের ঘাটে পেত্নী-শাকচুন্নীরা আসে কাপড় কাচতে, যার পাড়ে রোজ সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়ায় দু-তিনটা করে টিকচুন—সেই পুকুরটারই ঘাটে মুখ-আঁধারী অন্ধকারের মধ্যে ব'সে ছেলেরা আজ কুলকুলি দিচ্ছে—"ও-পাড়ায় সাতটা কুঁড়ে—আমাদের আটটা ও-ও-ও-ও—"

বাংলার পৌষ-

ও-পাড়ার ছেলেরা এখন কিছুটি বলছে না, পেরে হয়তো দেখাবে কাকে বলে কুলহুলির ধুম।

বুঁড়ে বাঁধা শেষ ক'রে দু'পাড়ার ছেলেই আপন আপন বাড়ি ফিরে এল। তারপর বেশ খানিকটা রাত যখন হল তখন ও-পাড়ার ছেলেরা করলে কি—দল-পুষ্ট হয়ে চুপিচুপি চলে এল পুকুরঘাটে। এসে, এ-পাড়ার বুঁড়েগুলোর কয়েকটায় ধরিয়ে দিলে দেশালাইয়ের কাঠি। তিনটা ছাড়া বাকী সব-ক'টা বুঁড়ে জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে। এবার ভোরবেলায় পুকুরঘাটে এসে দেখাও-না কুলহুলির ধুম—'ও-পাড়ার তিনটে বুঁড়ে, আমাদের সাতটা—ও-ও-ও-ও।'

বলাবলিটা যেক্ষেত্রে এতদূর গড়ায় সেক্ষেত্রে ছেলেরা সব সারারাত ধরে পুকুরঘাটে বসে বুঁড়ে আগলায়।

মকর-বুঁড়ে তৈরি হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ছেলেদের মুখে মুখে এক লাইন ছড়া ফিরতে থাকে—'চক্র দেখে মক্র স্নান'। চক্র মক্র যার উচ্চারণ হয় না, সে বলে—'চকর দেখে মকর স্নান'। চক্র অর্থাৎ সূর্যদেব যেই লাল হয়ে দেখা দিলেন অমনি সেই লাল চক্রটিকে দেখে দাও ডুব। ব্যস্, এই হল খাঁটি মকরস্নান।

মকরস্নান সেরে আমাদের মুখে হাসি ফোটে দুটি কারণে। প্রথমতঃ, বাড়িতে গিয়ে সকলের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবো, কেউ বলতে পারবে না শীতের ভয়ে আমি মকরস্নান করিনি। দ্বিতীয়তঃ, পিঠার থালাটি নিয়ে এবার বসে পড়বো যে। মিঠি রোদটিতে বসে খেজুর-গুড় দিয়ে পিঠা খাওয়ার আরাম কত। ডুব দিয়ে উঠে বুঁড়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাত-পিঠ সেঁকবার সময় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—জিভ দিয়ে জল পড়ে গেছে অনেকের ফোঁটা দুই।

কিন্তু দুনিয়ার নিয়মই কেমন উল্টো! আমাদের সব জিভ দিয়ে জল পড়ছে, আর ঐ মেয়েরা—ওদের জল পড়ছে চোখ দিয়ে। আমরা যখন ডুব দিয়ে বুঁড়ের সামনে এসে ডানা মেলে দাঁড়িয়েছি, ওরা তখন চোখের পাতাটি না ফেলে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। টুসুর ভেলাটা ঢেউ খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে মাঝ-জলের দিকে। গাঁদাফুলের কয়েকটা দলা ছেড়ে ভেসে গেছে জলে, ভেলার প্রদীপগুলো জ্বলছে এখনও, দু একটা পলতে নিভে গেছে কেমন। দু'একটা নয়—একে একে সবগুলো পলতেই যখন নিভে যাবে, ভেসে যাবে ভেলার সব-ক'টা ফুল-ই—তখন চোখ-বোজার ধুম পড়ে যাবে ওদের। চোখের জল একেবারে শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা কেউ আমাদের দিকে মুখ ফেরাবে না।

ঐ তো ও-ঘাট থেকে এখনও ভেসে আসছে—

"এতদিন রাখিলাম মাকে কুঁড়ুচির কপাটে গো,
আর রাখিতে লারব [পারিলাম না] মাকে
মকর এল বাসী গো—"

টুসু-মা আমাদের আদুরে মেয়ে—রাজারাজড়ার ঘরের মেয়ে নয়, ফেন-ভাতই যে-ঘরের হালুয়া-পোলাও, কুঁড়চি-ডালের বেড়াই যে-ঘরের কপাট—টুসু সেই ঘরেরই মেয়ে। মিঠাই-মণ্ডা দিয়ে টুসুর ভোগ হয় না—নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরী আসকে-পিঠে, আর ভূতমুড়ি-চালের মুড়িই হ'ল টুসুর ভোগ। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি অর্থাৎ আসকে-পিঠে খাওয়ার শুরু দিনটি যেই গত হল অমনি টুসু কুঁড়ুচির আড়ালে এসে উঠলেন। কুঁড়ুচির আড়ালে থেকে আসকে-পিঠে, মুড়ি খেয়ে সারা পৌষমাসটা কেটে গেল, তারপর একদিন বাদ সাধতে এল মকর। মকরের দিন বিদায় দিতে হ'ল টুসুকে আমাদের বাড়ি থেকে।

এই হল টুসুর বাইরের রূপ। এবার ভিতরে ঢোকা যাক।

মাটির একখানা সরা বা থালার মধ্যে প্রথমে দেওয়া হল গোবর, তার উপর তুঁষ, সর্বোপরি সরষে-ফুল, শিমফুল, গাঁদাফুল ইত্যাদি পৌষমাসের ফুল। ব্যস্, এই হয়ে গেল 'টুসু'। সুতরাং এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, টুসু হলেন দেবী ধরিত্রী বা মাটি-মা—যাঁর দেওয়া দৌলতে আমাদের আঙিনা, অন্নয় ভরে উঠেছে—যাঁর দৌলতে আমরা আজ এই গাদা-গাদা পিঠা খাচ্ছি। ঐ যে—

"টুসাদ্ গো মাই
তোমার দৌলতে আমরা চুকি-পিঠা খাই।"

ইতুও তো দেবী ধরিত্রী বা মাটি-মা। ইতু-উৎসবও তো সূর্য আর ধরিত্রীকে নিয়ে উৎসব। কিন্তু ইতু আর টুসুতে তফাত আছে ঢের। ইতুর ধরিত্রী বৃদ্ধা ধরিত্রী—আর টুসুও ধরিত্রী, কিন্তু কুমারী ধরিত্রী। ইতুর সাথী বাড়ির গিন্নীরা—টুসুর সাথী বাড়ির কুমারী মেয়েরা। ইতুপূজা গিন্নীদের পূজা—টুসুপূজা কুমারীদের পূজা।

উর্বর মাটিই শস্য-সম্পদ-দানে সমর্থ। গোবর সার পেয়ে মাটি উর্বর হয়ে ওঠে। কিন্তু মাটি তো আবার শুধু উর্বর হয়ে উঠলেই হল না—উর্বর মাটির গর্ভে তেজের প্রবেশ ঘটা চাই। মিলন ঘটা চাই প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের। সর্ববীজাধার, সর্বতেজের আকর সূর্যদেবই হলেন সেই পুরুষ। তিনি তেজ দান করেন—ধরিত্রীদেবী সেই তেজ গর্ভে ধারণ করে শস্যশালিনী হন। কিন্তু আশ্বিন থেকে সূর্যদেব ক্রমশঃ তেজ হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। অর্থাৎ ক্রমশঃ বুড়ো হয়ে পড়ছিলেন। আর তেজ কমতে কমতে একেবারে তেজহীন হয়ে পড়ার নামই তো মৃত্যু। সূর্যদেবের মৃত্যু ঘটেছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেবী ধরিত্রীও হয়ে পড়েছিলেন মৃতা। কিন্তু আবার পৌষের কটি দিন কেটে যেতেই সূর্যদেব নবজন্ম লাভ করলেন। তেজ তাঁর বাড়তে শুরু করলো। পৌষের শেষে এসে এখন তিনি হয়ে উঠেছেন নবযুবকের মতোই তেজবান্। সূর্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রীদেবীও নবজন্ম লাভ করলেন। মেয়ে হয়ে লালিত-পালিত হতে লাগলেন আমাদের বাড়িতে। পুরো একটি মাস হল তাঁর বাল্য আর কৈশোরের প্রতীক। এখন তিনি নবযুবতী। বিবাহযোগ্যা কুমারী। সরষে-ফুল, শিমফুল, গাঁদাফুলের সাধ তো কুমারী-কন্যারই সাধ। কুমারী-কন্যা এখন উর্বরা—বিবাহযোগ্যা। টুসুর সরায় ঐ গোবর হল উর্বরতার প্রতীক। উর্বরা কিন্তু অন্তঃসারশূন্যা। এই অন্তঃসারশূন্যতার প্রতীক হল টুসুর সরা বা খলায় দেওয়া ঐ তুঁষ। তেজ লাভ করলেই তিনি এবার শস্যশালিনী হয়ে উঠবেন। সুতরাং একটি শুভদিন দেখে মেয়েকে জামাইয়ের হাতে সমর্পণ করে দেওয়াই এবার একান্ত কর্তব্য।

পৌষ-সংক্রান্তির শুভলগ্নটিই হল ঐ সমর্পণের দিন। ঐ দিন ভোরবেলায় উঠে মেয়েরা সব টুসুকে সাজিয়ে-গুজিয়ে, নিয়ে আসে পুকুরঘাটে। পুকুরঘাটে এসে অপেক্ষা করে সূর্যোদয়ের। তারপর সূর্যদেব যেই লাল হয়ে দেখা দেন, অমনি সেই নবোদিত তরুণ সূর্যদেবকে বরণ করা হয়। তা দেখে—সকলের মুখ দিয়ে একই সঙ্গে বার হয়ে আসে সেই একটি ছড়া—

> "রাই উঠছেন রাই উঠছেন কড়ঙ্গার ঘাটে।
> কার আছে গো হলুদ-তেল দাও গো রাইয়ের হাতে।
> রাই উঠছেন রাই উঠছেন ভোরনদার ঘাটে।
> কার আছে গো আলতা-চিরুন দাও গো রাইয়ের হাতে।
> রাই উঠছেন রাই উঠছেন গোলসার ঘাটে।
> কার আছে গো আমলা-তেল দাও গো রাইয়ের হাতে।
> রাই উঠছেন রাই উঠছেন ছোটনদার ঘাটে।
> কার আছে গো ফুলচন্দন দাও গো রাইয়ের হাতে।"

[রাই বা রায় মানে হল সূর্য। বঙ্গ-ললনাদের কাছে সূর্যদেব রাই নামেই আখ্যাত হয়েছেন।]

বরণ-শেষে মেয়েরা টুসুকে সূর্যের হাতে সমর্পণ করে। টুসুর সরাটিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়াই হল ঐ সমর্পণ করা।

ধরিত্রী আর সূর্যের এই যে বিবাহোৎসব বা মিলনোৎসব এ অতি প্রাচীন উৎসব। মানুষ যখন সর্বপ্রথম সূর্যদেবকে সর্ববীজাধার, সর্বতেজের আকর-রূপী দেবতা ব'লে চিনতে পেরেছে, উর্বর মাটির গর্ভে সূর্যতেজ নিষিক্ত হওয়ার ফলে ধরিত্রী শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে ব'লে বুঝতে পেরেছে—সেইদিন থেকেই হয়তো এই টুসু-উৎসব আমাদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। তারপর যুগ যত অতিক্রান্ত হয়েছে—টুসুর আদিম রূপটিও তত বদলে গেছে। ক্রমে একদিন গরীবের কুঁড়েঘরের গণ্ডী ছাড়িয়ে টুসুর আধিপত্য উচ্চশ্রেণীর অন্দরমহলে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অম্বুবাচী, শীতলষষ্ঠী, ডাকসংক্রান্তি, ইতুপূজা, নবান্ন আদি বহু উৎসবই তো আসলে কৃষি-উৎসব—কৃষকদের উৎসব। কিন্তু এসব উৎসবই উচ্চনীচ আদি করে বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে সমাদরের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। আদিতে যাঁরা ছিলেন লৌকিক দেবতা, কালে তাঁরা সবাই আর্য দেবদেবীর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছেন। অশাস্ত্রীয় থেকে হয়ে উঠেছেন শাস্ত্রীয়। অশাস্ত্রীয় দেবতা টুসু যখন শ্বশুরবাড়ি যান—শাস্ত্রীয় দেবতা গণেশ তাই তখন তাঁর সঙ্গে যান—

> "টুসু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে।
> ঘরে আছে গণেশঠাকুর সঙ্গে পাঠিয়ে দে।"

আবার শুধু গণেশই বা বলি কেন—গণেশের সঙ্গে সঙ্গে রাম, সীতা, শিব, নীলমণি সবাই তো একে একে যোগ দিয়ে দিয়েছেন টুসুর সঙ্গে। ফলে, আদিম টুসু নবকলেবর ধারণ ক'রে সম্পূর্ণ আধুনিকা হয়ে উঠেছেন।

টুসুর এই আধুনিক রূপটি দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারা গেল না—ঢুকে পড়তে হল আমাদের এক অত্যাধুনিক টুসুর কাব্যে।

একেবারে ভিতরে এসেই ঢুকেছিলাম। মেয়ের দল টুসুর সামনে বসে দুলতে দুলতে গান গাইছে। দলের পাণ্ডা প্রথমটায় একটু কিন্তু-কিন্তু করলেও, শেষে দেখলাম আমাকে আর গ্রাহ্যের মধ্যে না ধ'রে, গড়গড় করে গেয়ে চললো রামায়ণ-গান নয়, টুসু-গান—

"রাম গেছেলেন বনকে ঘোড়া তপোবনের বাজারে।
লবকুশ ধরলো ঘোড়া সীতা ধন দাও ছেড়ে।
ছাড়বো না ছাড়বো না ঘোড়া ছাড়বো না বিনা রণ।
কেমন রাম তুই বুঝাব আজ বুঝ এ মোদের মন।"

তারপর—

"বাপ-বেটাতে যুদ্ধ করে দেবলোকের বিচারে।
স্বর্গীয়েরা কইকাঁইয়ে আতঙ্ক হয় পক্ক।
ও রামচন্দ্র ও রামের মা তোর রামের কি দুর্দশা।
বন দিলে গাছের ব্যথা তোর দিলে মাথার জটা।"

একা শুধু রামই নয়, রামের সঙ্গে সঙ্গে শিব আছেন, নীলমণি আছেন—

"শিব বেরিয়েছেন ভিক্ষা করতে কাঁধে ঝুলি ঝটিস।
কি করে দিন্ দিব বাবা আর কাঁদে গণেশ।"

"আমার আঙিনার মাঝে নাচে রে ও নীলমণি।
দুধ দিব নাচরে বাবা চূড়া বাঁধা বেণী।"

কিন্তু শুধু ঠাকুর-দেবতা নয়—মানুষও আছে। আবার শুধু মানুষ নয়, গ্রামের মানুষও আছে। টুসুগানের মধ্যে যেমন উঁকি মারেন অযোধ্যার রাম, তেমনিই উঁকি মেরে যায় ঘরের গ্রাম—

"হাসান-মোড়ার গাঁ দাঁড়িয়ে গাঁ আমার কাদের পোর্ট।
যে দিকে যাই কাদ-কাঁদানি গাঁ হল মুরাবাবা।
গাঁ যে আমার পর্বকুটি, গাঁ যে আমার গলার হার।
হয় যদি আমার বেণী ফুল দেবতার বাহবার।"

ঘরের সঙ্গে আছে ঘরোয়া ব্যাপার। টুসু যে ঘরের মেয়ে—সে যে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সুতরাং—

"আমার বাবা ধরে ঘাঁড়ে সে যে চিনির দম করে।
টুসু যাবে শ্বশুরবাড়ি সাজাবো তারে ভারে।"

তারপর—

"ইংরেজীর কাপড়খানি ফুলেফুলে সাজাবো।
টুসুকে বিদায় দিতে পারলে বুক বাঁধবো।"

মেয়েকে বিদায় দেওয়ার পর মনে জাগে বিষাদ। বুককে তখন মরুভূমির মতো মনে হয়। ইচ্ছা হয়, ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও পালিয়ে যাই।

"বাড়ির মামা [মীত] খুঁজা খুঁজে খাটি বলে জল খাবো।
কোলের ছেলা নাকে দিয়ে বৃন্দাবন চলে যাবো।"

এ ছাড়া আবার আছে মজার মজার গান। তার একটি—

"বাঁকুড়াতে দেখে এলাম দালানকোঠা বাড়ি হবে।
তার উপরে আমার টুসু ইংরেজী নভেল পড়ে।"

এই হল টুসুর সর্বশেষ আধুনিকা রূপ। টুসু ইংরেজী নভেল পড়ছে। এতদিনে আরও অন্য কোনো রূপে হয়তো দেখতে পাওয়া যেত টুসুকে—কিন্তু উপায় নেই যে আর। যে কারণে আর নতুন করে তৈরি হয়নি ঝাপান, নাচনী-নাচের গান, বাঘোমেলে ছড়া, ধাঁধালি, পাঁচালি, কবিগান —সেই কারণেই তৈরি হতে পারনি আর নতুন করে টুসুগান।

তা সে যাই হোক, টুসুগান যা তৈরি হয়ে আছে, তা সব একত্র জমায়েত করলে মহাভারত হয়ে যাবে। আর এসব গানের মধ্যে 'আখানী' ব'লে যে একটি বিভাগ আছে তা ভারী মজার—শুনলেই পেটে খিল ধরে যায়। টুসু কারো একার নয়—সব বাড়িতেই টুসুর আসর বসেছে, সব আসরেই গান চলেছে। আজ আবার যে টুসুর জাগরণ—সারারাতই তো গান গেয়ে কাটাতে হবে। আর এই গান গেয়ে সারারাত কাটানোর প্রধান উপকরণ হচ্ছে 'আখানী' গান। আমি তোমার টুসুর নিন্দা করে একটা গান গাইলাম—তুমিও আবার গানের মাধ্যমে তার জবাব দিবে। এখানে তুমি আর আমি সমান হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি বললাম, তুমি তার জবাব দিতে পারলে না—এই হল 'আখানী'। অর্থাৎ তুমি এসে গেলে—হেরে গেলে। কিছুক্ষণ ধরে আসল গান হবার পরই শুরু হয়ে যায় আখানী গান। এ-বাড়ির মেয়েরা যখন আখানী ধরে—ও-বাড়ির

মেয়েরা তখন চুপচাপ কান খাড়া করে শোনে, এরা যখন চুপ থেমে—ওরা তখন ধরে। এজাতীয় আলাদা গান এক-আধটি নয়, যথেষ্ট আছে। উদাহরণ-স্বরূপ গোটাকয়েক মাত্র তুলে দিচ্ছি—

> "আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝন্‌ঝন্ করে গো।
> উয়ার [উহার] টুসু হতভাগী খাজনা দেতে মরে গো।"
>
> "এক-গাছালি কলাই-ভাজা ইঁদুর-ভাগে হলো।
> উয়ার টুসুর ডেকে এসে খুঁটে [খুঁড়িয়ে] খাওয়া কাড়লো।"
>
> "উয়ার টুসু নাম করেছে শিবা-বাটীর ঘাঁটিতে।
> ঘ'রেতে ঘ' বেটী খাজনা যাবে বলে দেয় ফুল।"

জাগরণের দিন সারারাত ধরে চলে টুসুগান। তারপর কলমর নিশি পোহায়। ভোর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লে টুসুর বিদায়-সজ্জা। টুসুর সরাটার চারদিকে বসানো াছে প্রদীপ। প্রদীপে তেল-সল্‌তে দিয়ে সেই সরা মাথায় য়ে বেরিয়ে পড়ে মেয়েরা পুকুরের দিকে। আগে আগে লে কাঁসর ঘণ্টা শাঁখ। আর সেই শাঁখ আর কাঁসর-টাকেও ছাপিয়ে ওঠে মেয়েদের গলা—

> "এতদিন রাখিলাম মাকে খুঁচি কপাটে গো।
> আর রাখিতে নারব মাকে মকর এল বাসী গো।"

সরার প্রদীপগুলো কিন্তু এখন জ্বলছে না—জ্বলবে সেই কুরঘাটে গিয়ে। প্রদীপগুলো জ্বেলে দিয়ে টুসুর াটাকে ভাসিয়ে দেওয়া হবে জলে। তারপর দিতে হবে সব জলের ঢেউ। ঢেউ পেয়ে টুসু দুলতে দুলতে দিয়ে যাবে মাঝ-জলের দিকে।

ঐ-যে জলে দাঁড়িয়ে ঢেউ দিচ্ছে মেয়েরা। সামনে য়ে দেখুন ওদের চোখেও ঢেউ খেলছে।

তাইতো বলছিলাম, আমাদের সব কিছু দিয়ে জল চ্ছে—আর ঐ মেয়েরা, ওদের জল পড়ছে চোখ দিয়ে।

আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই যদি বিষাদ ঘটে তবে তার নাম 'হরিষে বিষাদ', কিন্তু বিষাদের সঙ্গে সঙ্গেই যদি আনন্দ ট তাহলে তাকে কি বলবো? বিষাদে হরিষ? তা সে ই হোক, কোনো কোনো মেয়ের পক্ষে এই বিষাদ-মুহূর্তটির র সঙ্গে আনন্দ-মুহূর্তও এসে উপস্থিত হয়। তারা যে নেকে মকর পাতাবে আজ। ঝিঙাফুল, ফুল, ফুল-পাতা, ই, মকর, গঙ্গাজল এসব পাতানোর যুগ চলে গেছে ক্ষাবে—না, কোথাও আর রেওয়াজ নেই বোধ হয় দের। কিন্তু একদিন ছিল—এবং বেশ ভালোভাবেই ন। এই মকর-পাতানোর কথাই ধরুন না। ধরুন, ঐ দুটি মেয়েতে গলায় গলায় ভাব। ও একে ছেড়ে থাকেনা একমুহূর্ত—এ ওকে ছেড়ে থাকেনা একমুহূর্ত। এরা এখন একটা যা হোক কিছু সম্পর্ক পাতানোর অধিকারী। মকরের অপেক্ষায় ছিল এতদিন ওরা। আজ সেই মকর। হাত-ধরাধরি করে নেমে পড়লো ওরা পুকুরে। নেমে, হাত-ধরাধরি করেই একসঙ্গে ডুব দিলে। তারপর ডুব দিয়ে উঠেই, এ ওর দিকে তাকিয়ে বললে 'মকর'—ও এর দিকে তাকিয়ে বললে 'মকর'। ব্যস্‌, মকর পাতানো হয়ে গেল ওদের। আজ থেকে ওরা পরস্পর পরস্পরকে ডাকবে 'মকর' ব'লে। এবং ও'দিকে কেন্দ্র ক'রে দুটি বাড়ির মধ্যে সৃষ্টি হবে এক আত্মীয়তার বন্ধন। দুটি বাড়ির মধ্যে প্রীতির আদানপ্রদান চলবে আমরণ।

তা সে থাকুগে ওসব। মকরস্নান হ'ল, খুঁড়ের আগুনে হাত-পা সেঁকাও হল, এবার আসুন বাড়িতে গিয়ে মিষ্টি-রোদটিতে বসে পিঠে খাই। এ পিঠাকে কোনো কোনো জায়গায় লোক সাদা-বাংলায় বলে 'গেঁড়গেঁড্যা'; যারা তার চাইতে একটু মিহি ক'রে বলে, তারা বলে 'পুরপিঠা'; যতদূর মিহি করে বলা সম্ভব ততদূর মিহি করে যারা বলে, তারা বলে 'পুলিপিঠে'। আমার মনে হয়, এ-পিঠেকে 'পুরপিঠা' বলাই সঙ্গত। পুর দিয়ে তৈরী যে-পিঠা তাই পুরপিঠা। যা পূরণ করে তাই 'পুর'। পুর অর্থাৎ নারকেলের পুর, চাছির পুর, তিলের পুর, কলাইয়ের পুর। কেউ কেউ আবার আলুসিদ্ধ, বেগুন-পোড়া দিয়েও পুর তৈরি করে। পণ্ডিতদের মতে এ পিঠা যা-তা পিঠা নয়—ভারী মূল্যবান পিঠা। খাদ্যগুণ বলতে যা বোঝায় তা সবই মিলে যাবে এই পুলিপিঠার মধ্যে। এর মধ্যে আছে—শ্বেতসার, শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ, লবণ। আতপচাল দিয়ে তৈরি ব'লে আতপচালের ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্সও এই পিঠার মধ্যে ঢুকে যাবে। আর যে-গুড়টি দিয়ে পিঠাগুলি খাওয়া হয়, তার মধ্যে থাকছে পটাস বা পটাশিয়াম লবণ। পুলিপিঠা বা পুরপিঠার মধ্যে বিভিন্ন খাদ্যগুণের এমনিধারা সমন্বয় ঘটে ব'লেই এ-পিঠা হয়ে ওঠে গুরুপাক। হজমশক্তি জোরালো-রকম না থাকলে, এ-পিঠে পেটে গিয়ে হিতে বিপরীত ঘটায়। শীত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হজমশক্তিটিও বাড়তে থাকে—শীত যখন বেশ জোর-রকম পড়ে যায়, আমাদের হজমশক্তিও তখন বেশ জোর-রকম বেড়ে যায়। এই হজমশক্তি বেড়ে ওঠার তালটির সঙ্গে তাল রেখে তাই পিঠা খাওয়ার নিয়মটি বাঁধা আছে। প্রথম শীত যেই পড়লো অমনি আস্কে-পিঠা

খাওয়া শুরু হল—তারপর শীত যখন গুরুতর হল তখন আমাদের পিঠাটিও গুরুতর রকম হ'ল। পৌষ-সংক্রান্তির কিছু আগে থেকেই শীত গুরুতর আকার ধারণ করে—তারপর তো 'মাঘের শীত বাঘ', সুতরাং সংক্রান্তি থেকে সরস্বতীপুজো পর্যন্ত চলুক ও-পিঠা। কিন্তু সরস্বতীপুজার পর আর নিয়ম নেই এ-পিঠা খাওয়ার। শীত যে তখন কমতে থাকে—তাই। সরস্বতীপুজার পর কারো যদি পিঠা খাওয়ার ইচ্ছা হয় তবে সে সরুচাকলি খেতে পারে, চুষিপিঠা খেতে পারে—কিন্তু পুলিপিঠা কোনোমতেই নয়। একেবারে বাঁধা নিয়ম।

বিস্মিত হতে হয় আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা ভেবে—যাঁরা শীতের সময় পিঠা, বিশেষ করে এই পুলিপিঠা খাওয়ার নিয়মটি বেঁধে দিয়ে গেছেন। শীতকালে যে ভালো ভালো খাবার খেতে হয়—শীতকালটা যে খাওয়ারই কাল। বাংলায় তো একটা চলতি কথাই আছে—"পেটে খেলে পিঠে সয়"। শীতটা লাগে পিঠে, বুকে, কানে আর বগলে বেশী—তবে সবচাইতে বেশী লাগে পিঠে। পেটের ভিতরে একটু অধিকমাত্রায় স্নেহ-শর্করা গেলে, পিঠ এই দুর্জয় শীতকে অনেকটা সহ্য করে নিতে পারে। কিন্তু গরীব মানুষ আমরা—কোথায় পাবো বাবা স্নেহ-শর্করায় ভর্তি অত দামী দামী খাবার। আমাদের পূর্বপুরুষরা তাই মাথা খাটিয়ে আবিষ্কার করে গেছেন এমন একটি খাবার, যা মাঝে মাঝে খেলেও, দামী খাবার খাওয়ার ফল ফলে অথচ খরচও হয় নিতান্ত কম। গরীব-বড়লোক সবাই জোটাতে পারে, খেতে পারে তা। এবং খাবারটি শুধু স্নেহ-শর্করায় নয়—স্নেহ শর্করা শ্বেতসার প্রোটিন লবণ ভিটামিন-বি-কমপ্লেক্সে ভরা।

পিঠা খাওয়াও হল। এরপর যা হবে তা দেখতে চাইলে চোখ খুলে রাখলে চলবে না—দুটো চোখই বন্ধ করে ফেলতে হবে। চোখ-দুটো বন্ধ করে দেখতে পেলাম—পিঠা-খাওয়া সেরে, ছেলে ছোকরা বুড়ো সব একে একে এসে হাজির হল গাঁয়ের মাথায় ফাঁকা ডাঙা বা মাঠের উপরে। তারপর এক এক দলে ভাগ হয়ে গিয়ে মত্ত হয়ে পড়লো সব খেলায়। সারাদিনটা কাটাতে হবে যে আজ খেলা আর খাওয়ার মধ্যে দিয়েই। দেখলাম, কোনো দল খেলছে হা-ডু-ডু, কোনো দল হুড়িচিঁ (হুড়িখলম), কোনো দল ডালিম ডালা, কোনো দল হুনকোট, কোনো দল ডাং-গুলি। কানে এল খেলোয়াড়দের মুখ থেকে বেরিয়ে-আসা—

"কে খেলে ভাই কানামাছি, কে খেলে ফুল।
কে খেলে খোলামকুচি, কে খেলে পাথর।
কে খেলে খাল, কে খেলে মাঠ।"

"চু যে যাব ডাং—সোনার বাঁধবো ঠ্যাং।
মারবো চাঁদের বাড়ি—পাঠাবো যমের বাড়ি।
' বাড়ি—ই—ই—ই—"

"হা-ক-ডু-ডু খেলতে গেলাম
ঘুড়িয়ে পেলাম খেল।
খেলে যা মরার খেল।"

"আকডুডু খেলিয়ে
বাঘ মারে ঢেঁকিয়ে
বাঘের তেজে
পিঠিম ধরে
কদুক পিঠিম
ঝুরুক খোঁপা
ডাক দে রে দু'চাচুরা
খা-ডু-উ-উ—"

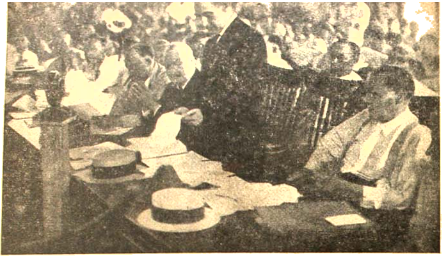

বিজ্ঞানের একদিন

একটি বিচার-কাহিনী

অনিমেষ চক্রবর্তী

সেটা ষোলো শ' সালের ইউরোপ। কবি-দার্শনিক গিওর্ডানো ব্রুনো বলে বসলেন: জীবন জিনিসটা এই পৃথিবীর একচেটে বৈশিষ্ট্য, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিরাট এ বিশ্বে আমাদের অতিপরিচিত পৃথিবীর বাইরে আরও কত গ্রহ উপগ্রহ রয়েছে। সেখানে কোথাও প্রাণের চিহ্ন থাকতেও তো পারে।

সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা পাদরীরা এ-কথা শুনে শিউরে উঠলেন: যে-পৃথিবীতে যীশুর জন্ম এবং বিকাশ—জীবন তার সীমানা ডিঙিয়ে যেতে পারে, এ তামসিক কল্পনা শুধু ভ্রান্ত নরাধমের পক্ষেই সম্ভব। এমন কল্পনাবিলাসের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

অতএব ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হল, পোপ অষ্টম ক্লিমেণ্টের উপস্থিতিতে।

পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণের কথা বলতে গিয়ে গ্যালিলিও গর্দান দিতে বসেছিলেন। শেষপর্যন্ত প্রাণের মায়ায় তিনি স্বীকার করলেন: না, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।

ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে বিজ্ঞানীর (এবং সাহিত্যসেবী কিংবা শিল্পীর) মুক্ত-কল্পনার এ ধরনের বিরোধটা চিরন্তন বললে বেশী বলা হয় না। আফিংখোর কমলাকান্তের ভাষায়: "নূতন কথা যে বলে সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়।"

কিন্তু শেষপর্যন্ত তথ্যনির্ভর বিজ্ঞানেরই জয় হয়েছে বার বার, মানুষের শুভবুদ্ধি সত্যকে বরণ করে নিয়েছে।

তাই ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রাক্কালে যে-কথা বলার অপরাধে ব্রুনোর প্রাণ গেল, যে-সত্য মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেও গ্যালিলিও প্রচার করতে সাহস পেলেন না…এমনি আরও কত কথা…আজকের মানুষ শুনলে আর আঁৎকে ওঠে না।…"কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীর ভদ্র-সমাজ, ধার্মিক-সমাজ, বিদ্বান্‌-সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গ্যালিলিওকে আর মস্তিষ্কভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।" আসলে এ শুধু বিজ্ঞানের জয় নয়, এ ধর্মেরও জয়। কারণ গোঁড়ামির মেঘ না কাটলে মানবতা-নির্ভর উদার ধর্মের দেখা পাওয়া শক্ত। দার্শনিক হোয়াইটহেডের মতে এই সম্পর্কেই বলেছেন—"Religion is tending to degenerate into a decent formula wherewith to embellish a comfortable life."

বিজ্ঞান যত এগিয়েছে ধাপে ধাপে, হেরে-যাওয়া গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের পথ আগলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ততই এসেছে কমে। তা নইলে ডারউইন 'অরিজিন অব স্পিসিস' ছাপার অক্ষরে বের করে আর-একদিনও বেঁচে থাকতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

সেটা ১৮৫৯ সাল। ব্রুনোর মৃত্যুর প্রায় আড়াই শ' বছর পর। এর মধ্যে মানুষের চোখ অনেকটা খুলে গেছে।

জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার প্রথাও আর নেই। ধর্মযাজকদের সপ্তদশ শতাব্দীর তেজ ম্লান হয়ে এসেছে অনেকটা। তবু টিঁকে উঠল। সময়ের এক বিস্তীর্ণ পটভূমিতে মানুষ বন্য-জানোয়ারের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা, এ কথা ভেবে ধর্মযাজকদের উষ্মাটা বেশ তীব্রই হয়েছিল। তাই ডারউইনের জৈব-বিবর্তন-তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে প্রথম প্রথম ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছিল অনেককেই।

এমনি এক তরুণ আমেরিকান শিক্ষকের অপরাধ এবং বিচারের চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের জনৈক অধ্যাপক। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করুন, এ বছরেই ডারউইনের যুগান্তকারী প্রকাশনের শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী। উনিশ শ' পঁচিশ সাল। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কাটা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। ধর্মযাজক আর ব্যবসায়ীদের বেশীর ভাগ নিজ নিজ স্বার্থ-চিন্তায় মগ্ন। কিন্তু সেটাই আবার তরুণদের নবজাগরণের যুগ। মেঘের কিনারে রুপোলী আলোর রেখা। তরুণদের মধ্যে কেমন একটা অসহিষ্ণু ভাব, পুরোনোকে আর নির্বিচারে মেনে নিতে চায় না। একটা সন্দেহ, একটা অবিশ্বাস—কী একটা ঘুম থেকে তারা যেন জেগে উঠছে। প্রবীণদের কেউ কেউ নবীনদের বলছেন—"এরা সব উচ্ছন্নে গেছে।"

এমনি এক প্রবীণ উইলিয়ম জেনিংস ব্রিয়ান টেনেসীর প্রতাপশালী ধর্মযাজক। বক্তা হিসাবেও তাঁর প্রসিদ্ধি। তিন তিন বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, যদিও প্রতিবারই ভাগ্যদোষে হেরে গেলেন। বিজ্ঞানের শিক্ষা এবং তার বহুল প্রচার দেশের সর্বনাশ করবে, এতে ধর্ম উচ্ছন্নে যাবে—ব্রিয়ানের এটা ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। দলবল নিয়ে অনেকগুলো স্টেটের বাসিন্দাদের এ-কথাটা তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন, অজস্র সভা-সমিতি ডেকে। অবশেষে স্কুল-কলেজগুলিতে চাপ দেওয়া হ'ল যাতে বিজ্ঞানের পঠন সংক্ষিপ্ত করা হয়, একেবারে বাদ দিলেও ক্ষতি নেই। বিশেষতঃ ঐ নাস্তিক ডারউইনের বিদ্যাভাষণের কাছাকাছিও যেয়ো না: বাইবেলের অতবড় শত্রু আর বড় একটা জন্মায়নি। এমনি ধরনের গোষ্ঠীর পত্তন অনেক। কিন্তু তবু ঝড় থামানো গেল না।

চব্বিশ-বছরের সাদাসিধে তরুণ জন থমাস্ স্কোপস্। টেনেসীর ছোট্ট শহর ডেটনের পাব্‌লিক-স্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষক এবং ফুটবল-কোচ্। তারুণ্য দুঃসাহসের পথে টেনে নিয়ে গেল তাঁকে। স্কোপস্-এর ছাত্ররা জানল—চার্লস ডারউইনের নাম, শুনল—প্রজাতি-উৎপত্তির রোমাঞ্চকর কাহিনী। স্কোপস্-এর তরুণ বন্ধুরা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন : একবার পড়িয়েই দ্যাখো-না, কী হয়। যদি বেশী গণ্ডগোল বাধে তবে হয়ত তোমাকে জেলে যেতে হবে, কিন্তু ব্যাপারটার একটা এস্পার-ওস্পার হবেই।

স্কোপস্-এর মনের গোপন বাসনাটাও ছিল তাই। বন্ধুদের কথায় মনের জোরটা দ্বিগুণ হ'ল।

স্কোপস্‌কে ঠিক সময়েই গ্রেপ্তার করা হ'ল। তাঁর অপরাধের খবর সংবাদপত্রের মারফত বড় বড় শিরোনামায় সমস্ত দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল অল্প সময়ের মধ্যে। ব্রিয়ান আর তাঁর দলবলের এটা একটা চমৎকার সুযোগ। এই 'নিরীহ' স্কুলমাস্টারকে আদালতে হাজির করতে পারলে, শাসনের রাস্তা একদম সাফ। আর কেউ ডারউইনের নাম সহজে মুখে আনবে না! কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা কি তাই?

এমনি সময়ে তিনজন দাঁদরেল আইনজীবী কি-একটা বৈষয়িক ব্যাপারে নিউইয়র্কে মিলিত হয়েছেন। ক্লারেন্স ড্যারো, বেইনব্রিজ কোলবী, ডাড্‌লে ফিল্ড ম্যালোন। কথায় কথায় টেনেসীর ঘটনাটা এসে গেল। তাঁরা একমত হলেন : একজন গরীব শিক্ষককে কিছুতেই ব্রিয়ানের দলের হাতে এমনভাবে নাজেহাল হতে দেওয়া চলবে না। একটা কিছু করতেই হবে।

তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে স্কোপস্-এর পক্ষ সমর্থনের অনুমতি চাইলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল। শুধু শিক্ষিত তরুণরাই নয়, ব্রিয়ান-গোষ্ঠির 'ধর্ম' 'ধর্ম' ক'রে বাড়াবাড়িটা, বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই পছন্দ করেননি।

নাটক বেশ জমে উঠল। পত্র-পত্রিকায় শিরোনাম দিনে দিনে কালকেতুর মতো মাত্রাগতিতে বড় হয়ে উঠল। শুধু সংবাদ-শিকারীদের নয়, ডেটনে গুণী-জ্ঞানীর মেলা বসে গেল। ড্যারোর আহ্বানে সাড়া দিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্বের অধ্যাপকগণ, ইভলিউশনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রমাণ দিতে; এলেন অনেক থিওলজীয়ান—এ তত্ত্বের ভিত্তিতে বাইবেলের নতুন মূল্যায়নের প্রচেষ্টায়। এলেন আরও অনেক। এঁরা সবাই এসেছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে। ড্যারোর ডাকটা শুধু যোগাযোগের সেতু মাত্র।

লাজুক-স্বভাব স্কোপস্-এর মানসিক অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। দু'দিন আগে ক'জন ওঁর নাম জানত! আর আজ প্রখ্যাত আইনজীবী, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ওঁরই পক্ষ সমর্থন করতে ছুটে আসছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। রাতারাতি এক বিরাট আলোড়নের নায়করূপে নিজেকে চিহ্নিত দেখে স্কোপস্ অভিভূত হয়ে পড়লেন।

স্থানীয় অধিবাসীদের বেশীর ভাগই কিন্তু ঝুঁকেছিল ব্রিয়ানের দলের দিকে। তবু তাদের মনে একটু সন্দেহ জাগল: ড্যারোর মতো খ্যাতিমান লোক গায়ে পড়ে ঐ সামান্য স্কুল-মাস্টারের পক্ষ নিল কেন? এইসব স্থানীয় বাসিন্দাদের বেশীর ভাগই সাধারণ মানুষের পর্যায়ে পড়ে। এদের মনে বিজ্ঞানের ছোঁয়া প্রায় লাগেনি, স্বাধীন চিন্তার রাজ্যে পাখা মেলে দিতে এরা জানে না, কিংবা হয়ত ভয় পায়। ধর্মযাজকরা এদের মানসিক কাঠামো শক্ত পেরেক মেরে-মেরে তৈরি করেছেন, যাতে নড়বার-চড়বার সুযোগ থাকে অল্প। কাজেই স্কোপস্-এর বিচার সম্পর্কে এদের মনোভাবটা সহজভাবেই নেওয়া চলে।

মানুষের ইতিহাসের চলার ছন্দটা তো এই। মানব-সভ্যতা ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে। এর বাহক ঐ সাধারণ মানুষ—জনসাধারণ। কিন্তু যখন কোনো ক্ষণজন্মা পুরুষ তাদের সামনে বহন করে এনেছেন নতুন আলোক—সাধারণ প্রথমে তাঁকে করেছে অবিশ্বাস। পুরাতনকেই তারা ভালোভাবে চেনে—এর সঙ্গে তাদের সুদূর অতীত থেকে বন্ধুত্ব। অপরিচিত নতুনের সামনে তারা প্রাচীর তুলে দিতে চায়, আঘাত ক'রে দূরে ঠেলে দিতে চায় তাকে। কিন্তু কিছু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমও রয়েছে। এরা ভাবে, নতুন কি একেবারেই প্রবঞ্চক?—কিন্তু তাঁর বয়ে-আনা আলোটা যে স্থির দীপ্তিতে জ্বলছে, ওটা আলেয়া কি করে হবে? একবার দেখাই যাক-না একটু এগিয়ে। বুদ্ধিজীবীদের এই 'বিশ্বাসঘাতকতা'র পথেই নতুন সাধারণের কাছে পৌঁছয় প্রাচীরের ছোট্ট ফাটল বেয়ে আসা ঊষার প্রথম আলোকের মতো। সাধারণ প্রথমে শঙ্কিত হয়, কিন্তু আস্তে আস্তে এ-প্রশ্নটা তাদের মনে জাগে: এ আলোক-রেখার উৎস কোথায়?—দেয়াল ভেঙে ফেলে। সামনে তরুণ সূর্য। সাধারণ তখন বলে: জয় হোক তোমার, তোমার মশাল আমরাই বহন করে এগিয়ে যাবো। মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সৃষ্টি এবং গোড়াপত্তন কল্পনাপ্রবণ অসাধারণ পুরুষ (বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিল্পী) এবং বুদ্ধিজীবীদের যোগাযোগে। কিন্তু তার রক্ষার দায়িত্ব জনসাধারণের। তবে অনেক গণ্যমান্য ক্ষমতাশালী লোক সাধারণের এ দায়িত্ব পালনের কাজটা সহজতর করে দেন, অহর্নিশ চলতি প্রথার গুণগান ক'রে। তাই অন্য এক নতুন শক্তির প্রত্যূষে স্রষ্টার সঙ্গে রক্ষকের সংঘাত অনিবার্য। কিন্তু এদের একজনকে বাদ দিলে আর-একজন কোন্ শূন্য-দিগন্তে কোথায় মিলিয়ে যাবে। এ দুয়ের সংঘাতের ইতিহাসটা অনেকসময় বেদনাদায়ক হলেও, এ স্বাভাবিক ঘটনা। এক ঋতু থেকে অন্য ঋতু: মাঝখানে কয়েকটা অস্বাস্থ্যকর দিন।

কাজেই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, স্কোপস্-এর সমর্থকদের আশ্রয় নিতে হ'ল ডেটন থেকে কিছুদূরে টিলার উপর এক ভুতুড়ে বাড়িতে। স্থানীয় লোকেরা কেউই দুধ-কলা দিয়ে এমন সাপ পুষতে রাজী নন।

বিচারের প্রথম দিন শুক্রবার ১০ই জুলাই। সেদিন শুধু জুরি-নির্বাচনের পালা। মজাটা দেখবার মতো। জুরিদের মধ্যে এগারোজনই ব্রিয়ান-গোষ্ঠীর ধর্মযাজক। বিজ্ঞানের সঙ্গে এঁদের সম্পর্কের নমুনাটা বোঝা যাবে দুটো দৃষ্টান্ত থেকে। এঁদের একজন এক ডারউইনের নাম শুনেছেন, কিন্তু সে কাছাকাছি কোথায় এক মুদীর দোকানের মালিক! এঁদের অন্য একজন লিখতে জানেন না, পড়তেও জানেন না। তবু স্কোপস্-এর অপরাধ-নির্ণয়ে এঁদের কথার দাম অনেক।

রবিবার আদালত বন্ধ। ব্রিয়ান এই ছুটির দিনে এক বিরাট জনসভায় ওজস্বিনী ভাষায় ডারউইনকে আক্রমণ করলেন: "পৈশাচিক অন্ধকারের কুটিল আবর্ত থেকে জন্ম নিয়েছে নাস্তিক ডারউইনের এই নোংরা, রোগাক্ত তত্ত্ব ··· মানসিক বিকারগ্রস্ত নির্বোধের তামসিক অলসকল্পনার এই ক্ষুদ্র সৃষ্টি এবার পবিত্র ধর্মের সঙ্গে সামনাসামনি সংগ্রামে দাঁড়াবার দুঃসাহস সঞ্চয় করেছে ··· অবশেষে এর বিনাশের সময় ঘনিয়ে এল। দুষ্কৃতকারীর শাস্তি যুগে যুগে এমনি করেই হয়েছে ···।" বক্তা হিসাবে ব্রিয়ানের খ্যাতিটা ফাঁকা নয়।

সোমবার। ড্যারো ঘোষণা করলেন: "আমরা বিজ্ঞানী এবং থিওলজীয়ানদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে চাই। এতে স্পষ্ট বোঝা যাবে খ্রীষ্টধর্মের মূল সুরের সঙ্গে ডারউইনের তত্ত্বের কোনো বিরোধ নেই। তা ছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের একটি স্বীকৃতি: 'The Law knows no heresy and is committed to no support of dogma nor to the establishment of any sect.' ... ওঁরা বলতে চান বাইবেলের বিরোধী কোনো কিছুই শেখানো চলবে না। গোটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচশ' চার্চ রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রেই এক চার্চের বাইবেলের ভাষ্য অন্য চার্চের থেকে কতকাংশে আলাদা। কোন্ ভাষ্য সত্য, কোন্ ভাষ্য মেনে চললে অপরাধ করার সম্ভাবনা কম তা বুঝতে হ'লে, গোটা বাইবেল এবং তার পাঁচশ' রকমের ভাষ্যের সঙ্গে স্কোপস্-এর পরিচিত থাকা দরকার। কিন্তু এ কি করে সম্ভব? ..." আরও অনেক যুক্তিতর্কের শেষে ড্যারো বললেন: "... ব্রিয়ানের মতো লোকেরা যদি তাঁদের মতামত নির্বিচারে চাপিয়ে দিতে পারেন—তবে ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, সংবাদ-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—বিজ্ঞান—কৃষ্টি এবং সভ্যতার বাহক সব-কিছুর মৃত্যু আসন্ন—আমরা খুব শিগ্ গিরই আবার ষোড়শ শতাব্দীর গৌরবময় অধ্যায়ে ফিরে যেতে পারবো, যখন ধর্মান্ধের দল কথায় কথায় অগ্নিকুণ্ড জ্বালাত নতুন কোনো চিন্তাধারার নায়কদের জীবন্ত দগ্ধ করতে!"

ড্যারোর এ-বক্তৃতা উপস্থিত জনসাধারণের মনে বেশ দাগ কেটেছিল।

বিজ্ঞানী এবং থিওলজীয়ানদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে শুনে ব্রিয়ানের দল একটু হকচকিয়ে গেলেন।

বুধবার যখন এমনি দু-একজন বাইবেল এবং ইভলিউশন-এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনায় উঠলেন, ব্রিয়ান-গোষ্ঠী ক্ষেপে প্রায় আগুন! তাঁদের দাবি: এসব সাক্ষ্য একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। আসল জ্ঞাতব্য হচ্ছে, স্কোপস্ অপরাধী কিনা।

বৃহস্পতিবার গলা আরও চড়িয়ে ব্রিয়ান বললেন: "জনসাধারণের ইচ্ছাই হচ্ছে আইন।"

এই ব'লে তিনি সবার সামনে ইভলিউশন্ সম্পর্কে যে বই থেকে স্কোপস্ পড়িয়েছিলেন তার একটা পাতা খুলে ধরলেন। এতে ছিল—একই বৃত্তের মধ্যে মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের একটা ছবি।

ব্রিয়ানের চিৎকার শোনা গেল: "ড্যানিয়েলকে এরা সিংহের বিবরে নামিয়ে এনেছে এইসব বিকৃতমস্তিষ্ক বিজ্ঞানীর কী দুঃসাহস — ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে এরা অন্ধকার অরণ্যের অপবিত্র গন্ধ-মাখানো সিংহ-ব্যাঘ্রের সঙ্গে একই বৃত্তের সীমায় চিহ্নিত করেছে ... বাইবেলের বক্তব্য বোঝানোর জন্য এইসব নাস্তিক বিশেষজ্ঞদের ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই ... এদের কথা মাতালের প্রলাপের চেয়ে বেশী মূল্যবান নয়।"

জন স্কোপস্

উইলিয়ম জেনিংস ব্রিয়ান

এ প্রসঙ্গে ব্রিয়ানের অন্য একদিনের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য : "আমি বাইবেলকে স্বয়ং ভগবানের উক্তি বলেই বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করি। যেটুকু আমি বুঝি না, সেটুকু সরল প্রাণে মেনে নিই। আমি বিশ্বাস করি : ঈভ-ই বিশ্বের আদি স্ত্রীলোক, আদমের একখণ্ড অস্থি থেকে ভগবান যাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি, নারীর প্রসববেদনা ঈভের পাপেরই ফল। আমি বিশ্বাস করি, ঈভকে দুর্বুদ্ধি দিয়েছিল বলেই, সাপকে অমন বুকে ভর দিয়ে চিরদিন চলতে হবে। ··· আমি বিশ্বাস করি, ব্যাবেল-টাওয়ারের সৃষ্টিলগ্নের পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ এক-ভাষাতেই কথা বলত ; আধুনিক ভাষাগুলোর জন্ম সেখান থেকেই।"

তবু একবার তিনি থমকে দাঁড়ালেন : বিশ্বসৃষ্টির সাতদিন আসলে হয়ত বা সাত যুগ। পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা যে পাঁচহাজার বছরের পুরোনো সভ্যতার চিহ্ন মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছেন, এ-কথা অবশ্য তিনি জানতেন না। তবে বিজ্ঞানের এসব কচ্‌কচির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই, বিশেষতঃ যেখানে বাইবেলের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ।

এ শুধু টেনেসীর ব্রিয়ান নয়, বিভিন্ন যুগে বহু 'ব্রিয়ান' ধর্মান্ধতা কিংবা কুসংস্কারের পায়ে স্বাধীন চিন্তার শক্তি—বিজ্ঞান কিংবা শিল্পকলাকে এমনি করেই বলি দিতে চেয়েছে। এদের হৈচৈ-এর মধ্যে কান পাতলে শোনা যাবে মানবসভ্যতার পদধ্বনি। এদের 'গেল' 'গেল' চিৎকার শুনলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়—মানুষ এগিয়ে চলেছে।

আবার বৃহস্পতিবারে ফিরে যাওয়া যাক্‌। সেদিন ব্রিয়ান শুধুমাত্র যুক্তিহীন মেজাজ দিয়ে বাজি মাৎ করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত কথার খেই হারিয়ে ফেললেন। ডেটনের জনসাধারণও যেন একটু বিরক্ত হলেন।

এইবার স্কোপস্‌-পক্ষের বলার পালা। উঠে দাঁড়ালেন ম্যালোন। তাঁর প্রথম জিজ্ঞাসা : বিজ্ঞানের চর্চা কোন্ যুক্তিতে আমরা করতে পারবো না ? তারপর তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি বজ্র-উৎসারিত হ'ল : "ডেটনের এ ঘটনার পর বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকার যে কতটা প্রয়োজন তা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য ব্রিয়ান-গোষ্ঠী নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। কিন্তু কেন ? কিসের জোরে ? যুক্তির সামনে দাঁড়াতে তাঁদের কেন এত ভয় ? তাঁরা তথ্যনির্ভর যুক্তি দেখান, আমরা মাথা পেতে মেনে নেব। আমরা প্রগতির সহচর, আমরা বিজ্ঞানের সঙ্গী, আমরা যুক্তিবুদ্ধির হাত ধরেছি। এ পথ মনুষ্যত্বের পথ, এ পথ সভ্যতার পথ। আমেরিকার মৌলিক স্বাধীনতা এর সঙ্গে জড়ানো। কিসের ভয় আমাদের, কোথায় ভয় ? জ্ঞানকে তুচ্ছ-হেয় ভেবে আমরা এগিয়ে যাবো।" এবা হঠাৎ ব্রিয়ানের দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললেন : " 'ভয়' বসে আছে।"

জনসাধারণকে সামাল দেওয়া শক্ত হয়ে উঠল চিৎকারে, চেয়ার-বেঞ্চি বাজানোর সঙ্গে তারা স্কোপ পক্ষকে উৎসাহিত করল। তাদের পুরোনো বিশ্বা দু'দিনের আঘাতে টলমল করে উঠল।

কিন্তু তবু শেষপর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য গ্রহণ কা হ'ল না। জজসাহেব ব্রিয়ান-গোষ্ঠীর দিকে একটুও ঝুঁ ছিলেন না, এ কথা হলপ করে বলা চলে না।

শেষদিন ড্যারো কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে জজসাহেবে বললেন : 'মাননীয় মহাশয়, মিছিমিছি সময় নষ্ট করছি আমরা। জুরিদের ডাকুন, তাঁরা এসে বলুন, স্কোপ অপরাধী।"

আদালত তাই করলেন। 'অপরাধী' স্কোপস্‌-এর শাস্তি হিসাবে জরিমানা হ'ল একশ' ডলার।

স্কোপসের পক্ষ যে প্রায় প্রসন্নচিত্তে এ-বিচার মেনে নিলেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এ পরাজ একটা সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক জয়েরই পূর্বাভাস। ব্রিয়া ভেবেছিলেন, স্কোপসকে ঘায়েল করতে পারলে, ডারউইনে নাম আর কেউ মুখে আনবে না। ফল হ'ল ঠিক উল্টো বিজ্ঞানকে পিষে দেওয়ার ষড়যন্ত্র 'বুমেরাং' হয়ে এসে বিঁধ ব্রিয়ান-গোষ্ঠীর মস্তকে।

আগে যেখানে একজন 'ইভলিউশন' নিয়ে মাথ ঘামাচ্ছিলেন, এখন সেখানে যোগ দিলেন আরও তিনি জন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের ছাত্রসংখ্যা আশ্চর্যরকম বেড়ে গেল বছরখানেকের মধ্যেই। সবাই জানতে চায় প্রজাতি-উৎপত্তির তত্ত্ব, সবাই জানতে চায় ডারউইনকে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের জনৈক অধ্যাপক (ইনি স্কোপস্‌-মামলায় একজন সাক্ষী, এবং ইনিই মামলার কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন) নতুন সেশনে ক্লাসে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, নিশ্চয় তাঁর ভুল হয়েছে ঘরটা দেখতে। নৃতত্ত্বের লেকচারে এত ছাত্র কোনোদিন দেখেননি তিনি। অনেকে চুপি-চুপি বলছিল : "ইনি স্কোপস্‌-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।"

এই ভদ্রলোক স্কোপস্‌-এর বিচার-প্রসঙ্গে বলেছেন—*Evolution lost in Court but ultimately won in the eyes of nation.*

শুধু ইভলিউশন নয়, মানুষের মননশীলতা বিকাশের ইতিহাসে এ-উক্তি বার বার সত্য হয়েছে।

বাইরে এনে রাখতেই একটা
র গন্ধ এসে লাগল নাকে।
থেকে মাছিগুলো উড়তে-
ড়তে চলে এলো বাইরে।
ই আর রজনীগন্ধা-ফুল ছড়িয়ে
য়ে, সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে
ওয়া হ'ল। মুখটা শুধু রইল
লো। খাটের চারপাশে
ছি উড়তে লাগল ভন্‌ভন্
রে। ফুলের গন্ধের সঙ্গে
টের আর পচা-ঘায়ের দুর্গন্ধ
মিশে বাতাসটা ভরে উঠল
রি।

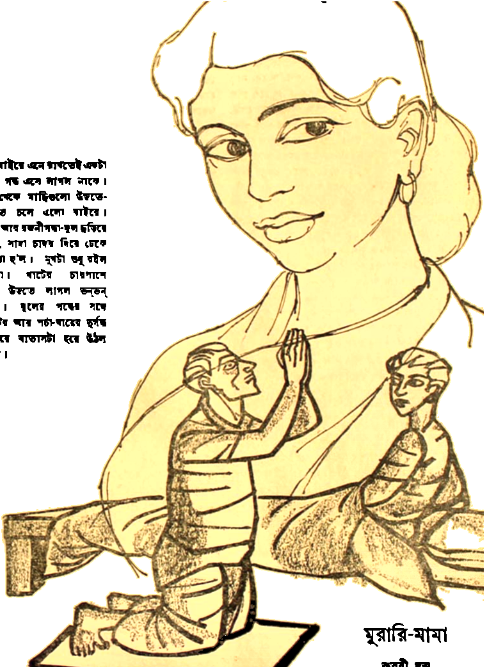

মুরারি-মামা

[illegible]

মুরারি-মামা মারা গেছেন।

মুরারি-মামা মারা গেছেন। অথচ কাঁদছে না তো কেউ। বৃদ্ধবয়সের মৃত্যু বুঝি চোখে জল আনে না? সংসারে থাকাটাই তো একটা পরম সান্ত্বনা। যে চলে গেল তার জন্যে এতটুকু চোখের জল পর্যন্ত ফেলবে না কেউ, এ কিরকম নিষ্ঠুরতা? হলেই বা সে বিশ্রী-রোগে-পড়ে-থাকা একজন বিরাশি-বছরের বৃদ্ধ। ভাবতে ভাবতে কখন দু-এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে চোখের কোণ বেয়ে, টের পাইনি। রাঙাবৌদির কথায় সম্বিৎ ফিরে চেয়ে দেখি মাধবদা অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমার দিকে। রাঙা-বৌদি বললে, ভাখোনা ভাই সুব্রত, দীপুটা বাইরে কোথায় গেল। ওকেও তো যেতে হবে শ্মশানে—ফিরতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। এইবেলা ওকে একটু চা খাইয়ে দিই। ছেলেমানুষ, থাকতে পারবে না নইলে।

উঠে বাইরে গেলাম। দেখি, রাস্তার ধারের রোয়াকে মুখ লাল করে বসে আছে দীপু। —কি হয়েছে রে? এখানে বসে কেন?— জিজ্ঞেস করি। প্রাণপণে কি-একটা কষ্ট চাপবার চেষ্টা করতে করতে বলল ও, দুর্গন্ধে ভীষণ গা ঘুলিয়ে উঠেছে, সুব্রত-কাকা। বমি পাচ্ছে খালি…। বলতে-বলতেই হড়্‌হড়্‌ করে বমি করে ফেলল দীপু। ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এনে ওর মুখ-চোখে দিয়ে দিলাম। একটু জল খেয়ে সুস্থ হলো ও।

বললাম, মুরারি-মামার ঘরে বুঝি তুই যেতিস না বিশেষ? বমি করলি যে হঠাৎ?

দীপু একটু বাঁকা হেসে বললে, বাবাঃ, ঐ কুঁদুলে বুড়োর ঘরে ঢুকতে দায় পড়েছিল আমার! তার ওপর ইদানীং মাসখানেক তো গন্ধগোকুল হয়ে বসেছিলেন।

অবাক হলাম না। কারণ মুরারি-মামার চরিত্র সম্বন্ধে আমার বেশ একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাই বললাম, কুঁদুলেই হোক আর যাই হোক, তবুও তোর ঠাকুরদা তো। হাজার হ'লেও গুরুজন। দিনের মধ্যে একবারও কি দেখতে যেতিস্‌নে?

হতাশভাবে হাত ওল্টালো দীপু। বলল, তা তো যেতাম। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তো রোজই একবার করে হাঁক পাড়তাম, কি দাদু কেমন আছ—ব'লে। তা বুড়োর আবদার ছিল কত! বলত কি, কাছে এসে বোস্‌না দীপু একবার! বাবাঃ, একে কানে শোনে না, তার আবার ঐ বিকট গন্ধ! কোনোমতে একটা অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়া ছাড়া উপায় কি?— ব'লে মুচকে হাসল একটু ও।

কিছু বলতে ইচ্ছে করল না আর। বলবই বা কী। মাধবদারই ছেলে তো। ও তো বলবেই। মাধবদার বাপ উদ্ধার হয়েছে। শুধু মাধবদারই বা বলি কেন। সকলেরই। মুরারি-মামাকে নিয়ে যে অশান্তি একশেষ হয়েছিল ইদানীং। মাথার গোলমাল তো ছিল একটু বরাবরই—সেটাই বেড়েছিল একটু। আর রোগ। বিরাশি-বছরের বৃদ্ধ। রোজ ভোরে যাওয়া চাই গঙ্গাস্নানে আর বিকেলে লোকের বাড়ি বেড়াতে। ডাক্তার বলেছিলেন বয়েস হয়েছে—'ডায়েট্‌ কণ্ট্রোল' করতে হবে। যেখানে-সেখানে বা যখন-তখন খাওয়া চলবে না। রেগে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন: 'আমি তবে আর কারুর বাড়ি বেড়াতে যাব না কখনও। খেতে দিলে খেতেই যখন পারব না তখন গিয়ে লাভ কী।' সব জায়গায় যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। এমনকি মেয়ের বাড়িতে পর্যন্তও যেতেন না।

গঙ্গাস্নান করে ফেরার পথে ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। একটা পা কেটে বাদ দিতেই হ'ল শেষপর্যন্ত। তারপর আবার ব্লাড-প্রেসারের স্ট্রোক্‌। ডানদিকটা পড়ে গেল একদম। মাস-ছ'য়েক আগের কথা। সেই থেকেই শয্যাগত। মাসখানেক আগে আবার বেড্‌সোর হয়েছিল। সেইগুলো কেমন করে যেন বিষাক্ত ঘা হয়ে গেল। শুচিবায়ুগ্রস্ত যে-মানুষ দিনের মধ্যে দশবার স্নান করতেন আর কাপড় ছাড়তেন, গঙ্গাজল ছিটোতেন সারা বাড়িময়, তাঁকেই শেষটায় মেথরের সেবা নিতে হয়েছিল। মর্মান্তিক। অসহ্য কষ্ট পেয়েছিলেন শেষের ক'টা দিন। সে-কষ্ট চোখে দেখা যেত না—মনে-মনে কেবলই প্রার্থনা করতাম—হে ঠাকুর, ওকে এই কষ্ট থেকে মুক্তি দাও।

রাঙাবৌদি খুব সেবা করেছিলন মুরারি-মামার। ঐ প্রচণ্ড দুর্গন্ধের মধ্যে কোনোদিন তো রাঙাবৌদির মুখে এতটুকু বিকৃতি দেখিনি। রুগীর সেবা, সংসারের সমস্ত কাজকর্ম নির্বিবাদে করে গেছে। তার ওপর বুড়োর নিত্য ঠাকুর-পুজো। সেটাও নিষ্ঠা সহকারে করেছে রাঙাবৌদি। কিন্তু আশ্চর্য, কোনোদিন রাঙাবৌদির মিষ্টিমুখের অম্লান হাসিটাকে শুকিয়ে যেতে দেখিনি। বৌমা না হ'লে একদণ্ড চলত না মুরারি মামার। একবার মাত্র কিছুদিনের জন্যে মুরারি-মামার সেবা করেছিল একটা জমাদার। রাঙাবৌদির

অসুখ করাতেই ঐ বিপত্তি। রাধীবৌদির তখন কী আকুলি-বিকুলি—শ্বশুরকে দেখাশোনা করতে পারতেন না ব'লে। কিন্তু মাধবদা? নাকে কাপড় দিয়ে দু-মিনিট বলেই উঠে যেত ঘর থেকে। আমার নিজের চোখে দেখা।

আমাকে ভালবাসতেন মুরারি-মামা। তাই আমারও ছিল আকর্ষণ।

উনি আমার নিজের মামা ছিলেন না। দূর-সম্পর্কে কি যেন একটা আত্মীয়তা ছিল মাত্র।

বোম্বাই প্রদেশে ছিল আমার কর্মক্ষেত্র। মাঝে মাঝে কোলকাতায় আসতাম। উঠতাম মুরারি-মামার বাড়িতে। তখন থেকেই আমার কাছে উনি ছিলেন এক বিরাট বিস্ময়। বুঝতে চেষ্টা করতাম ওঁকে।

বহু বিচিত্রে ভরা এই পৃথিবী। তার মাঝে মানুষের জীবন এক বিচিত্রতর অধ্যায়। আর বিচিত্রতম? সে তো ঐ বহু বিচিত্রের এক অংশ—মানুষের মন! পণ্ডিতরা নাকি বলেছেন, মন হচ্ছে অণুপরিমাণ। এর চাইতে বড় সংজ্ঞা আর কোথায় আছে? দেহের প্রতিটি কোষে কোষে ঐ পারমাণবিক মনটা রেণু রেণু হয়ে মিশে রয়েছে। তাই বুঝি অবয়বের অতিরিক্ত ঐ মনটার বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা আর প্রবণতার এক আশ্চর্য সমাবেশ। মনকে দেখতে পেয়েছে কেউ? না তো। তবু তো ঐ অদৃশ্য বস্তুটিই মানুষের সংসারকে আর জীবনযাত্রাকে এগিয়ে দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। মুরারি-মামা ছিলেন এক বিচিত্রতম মনের মানুষ। প্রতিদিন তাঁকে দেখেছি নব নব মানসিকতায় প্রকাশনায়। মৃত্যু এসে আজ দাঁড়ি টানল সেই বৈচিত্র্যভরা মানসিকতার প্রবাহে।

•

প্রথম যেদিন মুরারি-মামার কাছে এসেছিলাম সে-কথা আজও মনে পড়ে। আমার পরিচয় পেয়ে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন। সারাদিন অজস্র গল্প করেছিলেন আমার সঙ্গে। মার সঙ্গে ছোটবেলায় কিরকম খুনসুটি করতেন তার গল্প। সব গল্প আজ আর মনে নেই, তবে সেদিন যে তাঁর গল্প-বলায় সরল কাব্যের আনন্দ পেয়েছিলাম সে-কথা ভোলবার নয়।

রাত্রে বললেন মেয়েকে, ওরে রাধা, সুব্রতর বিছানাটা আমার ঘরেই দিস্।

রাধাদি মুচকে হেসে চুপি-চুপি বললে আমাকে, খুব যে সাধ হয়েছে বাবার কাছে শোবার। সারারাত কী কাণ্ড হয়, দেখো তখন।

আমার ভয়-পাওয়া মুখটা দেখে বোধহয় করুণা হ'ল। বললে, না রে, ভয়ের কিছু নেই। তবে কিনা ঘুমের দফাটি মাটি সারারাত।

আমি তো অবাক্। —ঘুমের দফা মাটি! কেন বলো তো?

উত্তর এল, বাবার অনেকরকম বাতিক আছে জান না তো। নতুন মানুষ, জানবেই বা কেমন করে। সারারাত ঠাকুর-পুজো আর··· মুখ টিপে একটু হেসে থেমে গেল রাধাদি।

সত্যি, সে-রাতটায় এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। ঘুম আসবার আগে পর্যন্ত নানারকম গল্প করলাম মুরারি-মামার সঙ্গে। গল্পের মাঝে হঠাৎ যেমন প্রশ্ন করে বসলেন, তুই কোনো মেয়েকে ভালবাসিস, সুব্রত?

আমি বিস্ময়ে চমকে উঠি প্রশ্ন শুনে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, কেন বলুন তো?

বললেন, লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে? বলেই ফেল্ না। আমিও তো তোদের আজকালকার ভাষায় লাভ-ম্যারেজ করেছিলাম। তবে একটা কথা মনে রাখিস্, বিয়েই করিস্ আর প্রেমই করিস্ না কেন, কখনো দুঃখ দিস্নে, বুঝলি? দুঃখ দিলে চিরজীবন ধরে তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দেখিস্, খুব সাবধান!

শেষের কথাগুলো কেমন যেন করুণ শোনাল। আমি কিছু উত্তর দিলাম না। উনিও আর কিছু বললেন না, চুপচাপ হয়ে গেলেন একদম।

তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। অনেক রাতে চোখে আলো লাগতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে। আর মুরারি-মামা খাটের ওপর হাঁটু মুড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে। দু-হাত জড়ো-করা বুকের কাছে, নিমীলিত আঁখি, আর ঠোঁট-দুটো নড়ছে একটু একটু। আমি অবাক হয়ে দেখলাম মুরারি-মামার শীর্ণ দু-গাল বেয়ে অঝোরধারে অশ্রু ঝরছে। হঠাৎ জোরে আর্তনাদ করে উঠলেন—মালতী, মালতী, ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি! আর তো পারিনে এ-কষ্ট সইতে। আমাকে ডেকে নাও গো তোমার পাশে। ফাঁকি দিয়ে একা-একা কেন চলে গেলে মালতী? প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগটুকুও দিলে না আমায়!

দু-হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন ঐ বিরাট দেহের বয়স্ক মানুষটি।

আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি। কি যে করব ভেবে

পাচ্ছিনা। দেখি, আস্তে আস্তে সামলে নিলেন, তারপর উঠে বাইরে গেলেন। মাথায় মুখে জল দিয়ে এসে বসলেন মেঝেতে আসন পেতে। তারপর আরম্ভ হ'ল পুজো। ঘরের এক কোণে রয়েছেন শালগ্রামশিলা। তা ছাড়া আরও অনেক দেব-দেবীর পট। সজোরে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন মুরারি-মামা। আমার কথা বোধহয় উনি তখন ভুলে গিয়েছিলেন।

বহুক্ষণ জেগে থাকবার পর এক-সুরে মন্ত্রপাঠ শুনতে শুনতে একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল বুঝি। হঠাৎ আবার কান্নার আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি—মুরারি-মামা দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির নীচে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদছেন। দেওয়ালে মাথা ঠুকছেন বার বার, আর বিলাপোক্তি করছেন—আমাকে ফেলে কেন চলে গেলে মালতী? অভিমান করে ভুল বুঝে গেলে? একবারটির জন্তে তুমি এসে দাঁড়াও গো আমার সামনে! আমার অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নিতে দাও, মালতী!

ছবিটা দেখলাম লক্ষ্য করে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না ভালো করে। মনে হ'ল যেন দুটো অস্পষ্ট ছাপ। বোধহয় কারুর পায়ের ছাপ।

ভোর পাঁচটায় শান্ত হয়ে এসে শুলেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দেখি গভীর ঘুমে মগ্ন!

আমার বিস্ময়ের ঘোর যেন আর কাটতে চাইছিল না সেদিন।

সকালে চায়ের টেবিলে গিয়ে বসলাম। রাধাদি জিজ্ঞেস করল, কেমন ঘুমোলি কাল রাত্তিরে?

হেসে বললাম, মন্দ নয়।

আরও দু-একদিন মুরারি-মামাকে লক্ষ্য করবার ইচ্ছেয় মিথ্যেকথাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে বেমালুম।

একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রাধাদি আমার দিকে। কিন্তু আর কিছু বলল না।

সেদিন রাত্রে যখন শুতে গেলাম, দেখি, ঘরের আলো নেবানো, সিংহাসনের ওপর প্রদীপ জ্বলছে এক কোণে। ধূপের মৃদু-মৃদু সৌরভ। আর সেই ম্লান আলোয় মুরারি-মামা দুলে দুলে সুর করে চৈতন্যচরিতামৃত পড়ছেন। কপালে ও নাকে চন্দনের তিলক আঁকা। চোখে নিকেল-ফ্রেমের চশমা। তার কাঁচে দেখলাম জল চিক্‌চিক্‌ করছে। নিরাবরণ বক্ষস্থল চন্দনচর্চিত। শুভ্র উপবীত আর ক্ষৌম পট্টবাস পরিহিত মুরারি-মামাকে ভারি অচেনা ঠেকল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, মুরারি-মামার মধ্যে বহুবিচিত্রের আর কতখানি দেখতে বাকী আছে এখনও?

আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আওয়াজ পেয়ে বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন মুরারি-মামা। বললেন, সুব্রত, তুই শুয়ে পড়্, বাবা! আমি একটু পাঠ করে তারপর শোব। আলো জ্বালা থাকলে তোর অসুবিধে হবে, পিদীম জ্বালিয়েছি রে, বুঝলি। তুই ঘুমো, বাবা। অসুবিধে কিছু হয় যদি বলিস্, কেমন?

আমি হাসি চেপে উত্তর দিলাম, না না, অসুবিধে কী। আমি তো এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। আপনি ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে নিন না, যদি অসুবিধে হয়।

চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ শুনতে শুনতে একটু তন্দ্রা এসে গেছে, হঠাৎ মুরারি-মামা জিজ্ঞেস করলেন, কি রে সুব্রত, ঘুমিয়েছিস্ নাকি?

বললাম, না মামা, এখনো ঘুমোইনি। কি বলছেন?

—বলছিলাম কি, তুই দীক্ষা নিয়েছিস্, সুব্রত?—সন্দেহ স্বরে প্রশ্ন করলেন মুরারি-মামা।

বিস্মিত হয়ে বললাম, না তো। কেন বলুন তো এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন?

বললেন, তোরা সব আজকালকার ডব্‌কা ছোঁড়া। তোদের সব দীক্ষা নেওয়া, গুরুসঙ্গ করা দরকার। না হ'লে, মন্দপথে চলে যাবার সম্ভাবনা। তখন মুক্তি পাবি কেমন ক'রে বল্ দিকিন্। সৎগুরু ঠিক করে দেব এখন। দীক্ষা নিয়ে নিস্, বুঝলি?

কী আর উত্তর দেব। তখনকার মতো এড়াবার জন্তে বললাম, আচ্ছা।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, ঘরে আলো জ্বলছে আর সেই আগের রাত্রের ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

সারাটা রাত মুরারি-মামার কান্না আর বিলাপোক্তি শুনে আমার আধো-জাগরণ আধো-ঘুমের মধ্যে কেটে গেল। ভোর পাঁচটায় উঠে বাইরে বাগানে এসে শুলাম।

রাধাদির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখি, রাধাদি ব্যাকুল হয়ে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকাডাকি করছে।

চোখ রগ্‌ড়ে উঠে বসলাম।

রাধাদি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কয়েক মিনিট, তারপর বলল, ঘরে চলো। চা হয়ে গেছে।

চা খেতে খেতে হঠাৎ রাধাদির প্রশ্নে চমকে উঠলাম। —বাবার জ্বালায় অস্থির হয়ে বাগানে গিয়ে শুয়েছিলে, না?

মাধবদা চমকে খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকাল। —বাগানে?

বললাম, হ্যাঁ, বাগানে গিয়ে শুয়েছিলাম ভোরবেলা। সারারাত যা কাণ্ড করেন উনি, মনে হয়না কোনো সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক ওরকম করতে পারে। ওঁর মাথার জন্যে একটু চিকিৎসা-টিকিৎসা করা দরকার কিন্তু।

মাধবদার মুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটা বিচিত্র হাসি। বলল, কী কাণ্ড করেন বল্ তো রাত্তিরে?

বললাম সব।

ওরা দুজনে মনে হ'ল সব জানে। শুধু আমাকে দীক্ষা নেবার উপদেশ দিয়েছেন শুনে একটু অবাক হ'ল।

—মালতী কার নাম বলো তো?— জিজ্ঞেস করলাম শেষপর্যন্ত কৌতূহল চাপতে না পেরে।

রাধাদি হাসল। বলল, ওটা বাবার দেওয়া মার কানে-কানে-ডাকা নাম। মার পোশাকী নামটা তো ভালো ছিল না। গিরীন্দ্রমোহিনী।

বললাম, আচ্ছা, তা লাভ-ম্যারেজের কথা কি বললেন বলো তো, বুঝতে পারলাম না ঠিক। গিন্নি-মামীকে উনি নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন নাকি?

মাধবদা আর রাধাদি হেসে উঠল চোখাচোখি করে।

রাধাদি বলল, ওমা, তা বুঝি জানো না। বাবারা থাকতেন ওপরতলায় আর মা থাকতেন নিচের তলায় ভাড়া। চাঁদের আলোয় ছাতে শরৎবাবুর সেই 'পরিণীতা'র মতো ব্যাপার আর কি।

মাধবদা বললে, হ্যাঁ, সে এক মহা কাণ্ড। বাবা তো তখন সবে এম.এ পাস করেছেন। দেখতে ভালো ছিলেন, তার আবার ঠাকুর্দার মতো নামকরা আই.সি.এস.-এর ছেলে; প্রচুর সম্বন্ধ আসছে, সবাই সুন্দরী রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজ্যলাভের স্বপ্ন দেখছে। এধারে বাবা তো ঐ কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছেন। ঠাকুর্দাকে বলবার সাহস নেই। শেষে একটা সম্বন্ধ যখন প্রায় সব ঠিকঠাক, ঝুলিয়ে দিলেই হয়—তখন মরিয়া হয়ে বলে ফেললেন ঠাকুমাকে—'ঐ নিচের তলার গিন্নিকেই আমি বিয়ে করব।' ঠাকুমা তো চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হবার যোগাড়! শেষপর্যন্ত অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে হ'ল সব মিটমাট।

মুরারি-মামার যে পরিচয় এই ক'দিনে পেয়েছি তাতে তাঁর বিয়ের ইতি-পর্বটা শুনে বিস্মিত হ'তে পারলাম না। মনে হ'ল এইরকমটা না ঘটলেই বোধহয় অবাক হবার কারণ হ'ত। বললাম, গিন্নিমামী মারা যেতেই তাই মুরারি-মামা অতো ভেঙে পড়েছেন, না? সত্যি, স্বামী মারা গেলে স্ত্রীলোকের অনেক বেদনা ঠিকই, কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে পুরুষ যেরকম অসহায় আর কাতর হয়ে পড়ে এমন কিন্তু মেয়েরা হয় না।

রাধাদি মুখ বেঁকাল। বললে, আর পুরুষ যখন দুঃখ দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে তখন? তোমরা আর বোলো না বড়-মুখ করে বুঝলে? তোমাদের জন্যেই স্ত্রীলোকের মৃত্যু, তোমাদের জন্যেই তাদের জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বাবাই তো মাকে দুঃখ দিয়ে আর নিষ্ঠুর ব্যবহার করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। না-হ'লে অত অল্পবয়সে মার কি যাবার কথা?

আমি অবাক হয়ে তাকাতে, মাধবদা মাথা নাড়ল। বলল, হ্যাঁ রে, সত্যিই তাই। বিয়ের পর থেকেই প্রায় গুরুসঙ্গ করে এসেছেন বাবা। ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখেছি এই নিয়ে কী অশান্তি ছিল সমস্ত বাড়িতে। মা মারা যাবার কয়েকবছর আগে বাবার হঠাৎ এক গুরু জুটল। প্রত্যেক বছরই প্রায় গুরু বদলাতেন কিনা। গুরুজী বললেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করো। বেদবাক্য! ব্যস্, আর কি! বাবা অমনি মার সঙ্গে কথা-বলা বন্ধ করলেন। মুখও দেখতেন না দিনান্তে একটিবারের জন্যে। টাকাপয়সা ছুঁতেন না। হিসেব-টিসেব সব আমাদের দিয়ে করাতেন। চরম হ'ল শেষটায়। গুরুকে বাড়িতে এনে তুললেন। চোব্য-চোষ্য করে গুরুর কী সেবার ঘটা! শেষে একদিন করলেন কি—বোধহয় গুরুর নির্দেশেই—রাধাকে পাঠালেন গুরুজীর পদসেবা করবার জন্যে। রাধার তখন সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে, ভারি সুন্দর হয়েছে চেহারা। গুরুর তো দেখে প্রাণ যায়-যায়। রাধা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করতে গেছে। রাধা ধাক্কা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। আমাকে আর কাকামণিকে ব'লে দিতে, আমরা মারতে-মারতে ঘাড় ধরে বার করে দিয়ে এলুম রাস্তায়। গুরুগিরির দফা রফা করে দেওয়া হ'ল একদম!

রাধাদি দেখি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। সামলে নিয়ে বলল, ওমা, বাবার তখন কী রাগ, যদি দেখতে! বলেন কি—আমরা নাকি গুরুজীকে ভুল বুঝেছিলাম।

মাধবদা বললে, গুরু তো ভাগলো, গুরুবাক্য কিন্তু ভূত

হয়ে বাবার ঘাড়ে চেপেই রইল। ফলে, মার হ'ল যন্ত্রণার একশেষ। ভীষণ চাপা ছিলেন মা, কোনো দুঃখ-কষ্ট বা মনোবেদনার কথা কোনোদিন মুখে ফুটে বলতেন না। মন গুমরে থেকে থেকে মৃত্যুকেই বরণ করে নিলেন শেষপর্যন্ত। বাবা তো বাক্যালাপ বর্জন করেছিলেন মার সঙ্গে, অসুখেও কোনোরকম সেবা-যত্ন করেননি। এমনকি মা যেদিন গেলেন সেদিন, সেদিনও বাবা মার সঙ্গে শেষবারের মতো একটি কথাও বলেননি। মার সেদিন কী আকুলি-বিকুলি একটা কথা শোনবার জন্যে! আমার আজও চোখের সামনে ভাসে বাবার সেই হৃদয়হীন পাষাণ চেহারাটা।

মাধবদা আর রাধাদি দুজনকারই চোখ ছলছল করে এল।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, সে-পাপের সে-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত উনি তাই আজও করে চলেছেন, মাধবদা। প্রতিটা রাত কী অসহ যন্ত্রণায় কাটে ওঁর তা বুঝতে পারছি এখন।

•

মুরারি-মামার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওঁর নাকি ইচ্ছে ছিল ইলেকট্রিক-চুল্লীতে ওঁকে যেন দাহ করা হয়। মাধবদা সেই কথাই চিন্তা করতে করতে গিয়ে মুরারি-মামার ঘরে ঢুকেছিলেন, যদি কিছু কাগজ-পত্র পাওয়া যায় ওঁর শেষ-ইচ্ছের সাক্ষ্য-স্বরূপ। আমি অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলেম পুরনো কথা। যে মুরারি-মামার কত বাতিক ছিল—এর হাতে খাব না, ওকে ছুঁলে চান করতে হবে, তাকে জিনিসপত্রে হাত দিতে দেব না—সেই মুরারি-মামার শেষ-ইচ্ছে ইলেকট্রিক-চুল্লীতে নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা! আশ্চর্য লাগে বেশ একটু।

মুরারি-মামার চরিত্রে বৈচিত্র্যের যে অজস্র বহুমুখীন সমাবেশ লক্ষ্য করেছিলাম, তাতে প্রতিমুহূর্তেই বিস্ময়ের সৃষ্টি হ'ত। আমার ধারণা ছিল ওঁর চরিত্রের সব বৈশিষ্ট্যই বুঝি জেনে ফেলেছি আমি।

কিন্তু না। তখনো ছিল একটুখানি বাকী। কামিনী-কাঞ্চনের নীতি যে উনি অনেকদিন আগেই ত্যাগ করেছিলেন সে-কথা মাধবদা, রাধাদি বা আর কেউ জানত না। আমিও জানতে পারতাম না, যদি না মুরারি-মামা

নিখুঁত প্রতিলিপি গ্রহণের উপযোগী ব্লক ও মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যে...

যে ব্লক ছাপা হ'লে, মূল ছবির সঙ্গে কোনও তফাৎ থাকে না,
প্রত্যেকটি রেখা যা'তে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সেই সুন্দর
বস্তুকে ব্লক প্রত্যেকেই চায়। এর পেছনে রয়েছে
ব্লক নির্মাণ নৈপুণ্য আর সযত্নপ্রয়াসলব্ধ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।

• • •

লাইন, হাফ্‌টোন, কালার প্রিন্টিং, টাইপসেট
এবং ডিজাইন তৈরীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

• কালার স্টুডিও •

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৬ • ফোন: ৫৫-৪৬০৭

মারা যাবার ক'দিন আগে আমাকে একটা কাজের ভার দিলেন।

মুরারি-মামা চুপিচুপি আমায় বললেন, আমার সুটকেসে একটা ঠিকানা-লেখা খাম আছে, ওটা একটু পৌঁছে দিতে পারবি, সুব্রত? ওর মধ্যে কিছু টাকা আছে। অন্যবার লোক এসে নিয়ে যায়, এবার কেন এল না, বুঝতে পারছি না। অথচ দেরিও তো হয়ে যাচ্ছে, না পাঠালে এখন সে অসুবিধেয় পড়বে।— ব'লে, করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে অনুনয়ের ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলেন।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম ঠিকমতো পৌঁছে দেবার ভার নিয়ে।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে গেলাম। যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম তাতে অবাক হ'তে হ'ল। চিঠির মালিককে দেখে আরও।

বাঈজী কিরণবালা। এককালে খুব নাম-ডাক ছিল। এখন সব ছেড়ে দিয়েছে। হরিনাম কীর্তন ক'রে দিন কাটে। মুরারি-মামার অনুতাপ-দিগ্ধ জীবনের অনেকগুলো দিনের স্মৃতিতে জড়ানো বাড়িটা। দিদিমায়ের মৃত্যুর পর কিরণবালার মধুর কণ্ঠের পদাবলী-কীর্তনের মাধ্যমে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের দুরাশাটাকে জীবন থেকে অপসারিত করেছিলেন নিশ্চিন্তভাবে। কিন্তু তাতেও আসেনি শান্তি। তাই সে-অশান্তির ভাগ নিতে হয়েছিল কিরণবালাকেও।

বললে, তোমার নাম সুব্রত? তোমার কথা শুনেছি, বাবা। এসো, বোসো ঘরে। উনি এখন কেমন আছেন?

বললাম, আর আশা নেই।

চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। পরে আস্তে আস্তে বললে, সবই আমার কপাল, বাবা শ্রীগোবিন্দ যা করবেন। আমার সঙ্গে তো আজ প্রায় তিন-চার বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন, টাকা পাঠিয়ে দিতেন। টাকার জন্যে কি আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল? একটা শোকা-তাপা মানুষ, তাকে একটু শান্তি-স্বস্তি দেওয়াটাই তো বড় কথা।… বলতে বলতে চোখে জল ভরে এল। আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বললে, একবার দেখতে ইচ্ছে করে বড়—আর দুটো কথা শুনতে। কিন্তু তা তো হবার নয় কিছুতেই।

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি, কেন হবার নয় বলুন তো? আপনার সঙ্গে কি কথা বলতেন না উনি?

উত্তর দিলে, আগে তো আসতেন যেতেন প্রতিদিন। হঠাৎ কী হ'ল জানিনে। চিঠি লিখে পাঠালেন আমায় এখানে—আর আসবেন না। আমার মুখ দেখবেন না, আর কথাও বলবেন না। গুরুর আদেশ। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দিতেন ঠিকই। কিন্তু হাজার অনুরোধ অনুনয় করেও একবারের জন্যেও আসেননি এখানে।

—কতদিন আগের ব্যাপার বলুন তো?— জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

—তা বছর চারেক হবে।

হিসেব করে দেখলাম মনে-মনে, ঐ সময়েই আমি মুরারি-মামার বাড়ি প্রথম আসি।

বললাম, দেখতে যাবেন?

একটু থমকে গেল। পরে সামলে নিয়ে বলল, যেতাম একবার। কিন্তু না। একটা কথাও তো বলবেন না; মুখ ফিরিয়ে নেবেন, রাগ করবেন হয়তো। কি করব বাবা গিয়ে আমি?

•

নতুন খাটে অজস্র ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে মুরারি-মামার মৃতদেহ। কিন্তু সব সুগন্ধ—ফুলের আর সেন্টের গন্ধ—সব ছাপিয়ে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে পচা-ঘায়ের দুর্গন্ধ। সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠছে। হয়তো আমিও এবার বমি করে ফেলব। মনকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে সাজাতে লাগলাম খাটটা। মুখের দু-পাশে দুটো তোড়া রাখতে গিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি, দু-চোখের কোণে জল জমে রয়েছে। গালেও জলের শুকনো দাগ। মুখটা ঈষৎ হাঁ হয়ে রয়েছে। বোধহয় কিছু বলতে চেয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে। কি সেই কথাটা?—"আজও কি কথা বলবে না, মালতী?"…

সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল সহসা, মুরারি-মামার প্রায়শ্চিত্ত কি আজও শেষ হয়নি। মৃত্যুর পরে যদি কোনো জগৎ থাকে সত্যিই, সেখানে মালতী কি আর দাঁড়িয়ে নেই ওঁকে কথা দিয়ে বরণ করে নেবার জন্যে?

চেনাশোনার বাইরে

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

দশ তারিখ সকালে সকলেই যথারীতি কাজে গেল। ক্যাম্পের নীচেই সড়কটায় 'ভর্মা-বাইসারিয়া' দলের কাজ চলছিল। বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ দেখলাম দলে ৭।৮টি ছেলের জায়গায় তিন চার জন মাত্র; এবং তারাও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত—হাঁপাচ্ছে। রোল-হাজিরা নেবার প্রবৃত্তি হয়নি এখানে। নিতামও না। কিন্তু ঘুরে ঘুরে বেড়াবার সময় সবাইকে দেখে নিতাম। কম দেখে জিজ্ঞাসা করার ফলে চোখে-মুখে কৌতুক ফুটে গেল। বললো—"এই গেছে যেন কোথায়; এসে যাবে।" আমি ব্যাপারটা সুবিধার মনে না করে নোটিশ দিলাম যে, খাবার জন্য প্রত্যেককে রাশন-কার্ড দেওয়া হবে। তাতে রোজ দু'বেলাই নয়, চারবার চাররকম খাবার বেলাতেই (প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন-ভোজ, অপরাহ্ণ-চা, রাতের খাবার) ঢেড়া কাটাতে হবে অফিসে। ফলে দেখলাম সিন্‌হা, বাইসারিয়া এবং ভর্মা দুপুরে ফেরেনি। বেলা যখন দুটো তখন বিচলিত হয়ে পড়লাম।

কশবচন্দ্রজী তখন একখানা সার্ক্‌লার আমায় দেখালেন। সার্ক্‌লারখানা সরকারী। আগেই এসেছিল। আম্বানার ইঙ্গিতে আমার কাছ থেকে গোপনে রাখা হয়েছিল। এখন যেহেতু আমি ডাইরেক্টর এবং তিনটি পাখী বেখবর তাই দেখাচ্ছে।

সার্ক্‌লারখানির মর্ম এই যে, খাবরাদার আশেপাশে দু'মাইলের ব্যবধানে পনেরোটি গ্রাম আছে ছোটোয়-বড়োয়। ছেলেরা সব Social survey-র জন্য যাবে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সব সময় সব জায়গায় এদের ঘোরা নিরাপদ নয়; বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা গ্রামীণদের অসাক্ষাতে করাও ঠিক নয়। তা ছাড়া বন্যজন্তুর উৎপাতের জন্য যেখানে সেখানে ঘোরা ঠিক নয়। তাই পনেরোটি গ্রামেরই মুখ্য গ্রামীণদের নোটিশ-জারি করা হয়েছে ছেলেদের যাতে সার্ভের কাজে সাহায্য করে। ছেলেরা যেন গিয়ে প্রথমেই মুখ্য গ্রামীণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে। একত্র গ্রামের নাম, গ্রামীণের নাম, মুখ্য ইত্যাদি জানিয়ে একটা ফর্দও দিয়েছে।

দশ তারিখ সকালে এই ফর্দটার কপি সবাইকে দেওয়া হোলো, আর নির্দেশ দেওয়া হোলো যে, ছেলেরা যেন যথেচ্ছভাবে ঘুরতে ঘুরতে গ্রামের মধ্যে যখন তখন না যায়। গেলে, সময়মতো যাবে ও গ্রামীণদের মুখপাত্রের সঙ্গেই কথা বলবে।

ইস্তাহারটা আম্বানা যাবার আগেই দস্তখত করে গিয়েছিল। দশ তারিখে সেটা বিলি করে দেওয়া হোলো। যেন সিন্‌হা-ভর্মা-বাইসারিয়া দলের অন্তর্ধানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এটা বেরুলো, এই সবাই ভাবলো। ওদের অন্তর্ধান একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো।

বেলা দুটো হবে। আমি রোদে বসে বসে ম'ম-এর লেখা 'রেড্' (*Red*) পড়ছি। ডাক্তার আজ আর হুঁস নেই। মেয়েটার গল্প করার পর খুব টেনেছে। সকালটায় অতিকষ্টে দুটো কেস দেখেছে। তারপর সারা দুপুর ঘুমোচ্ছেই। মনটা অসোয়াস্তিতে ভরতি।

সিন্‌হা বলে—সে আমার চেয়ে বয়সে ছোটো। কিন্তু সেটা বলা ওর রোগ। ওর ছেলে আই.এ. পড়ে। বরাবাঁকীতে বাড়ি। নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর মাড়ায়নি। কেবল আলুর গুদামে আগুন লাগলে, আলু ছড়িয়ে বেড়িয়েছে। গত নির্বাচনে খুব হৈ-চৈ করেছে। তাই কান্নাকাটি করে এসেছিল এই দলে প্রায় জোর করে। আম্বানা আগে থেকেই আমাকে সাবধান করেছিল লোকটা সম্বন্ধে। আমি লোকটাকে পছন্দ করতাম না ওর ঠোঁট-দুটোর জন্যে—যেমন পুরু, তেমনি ওল্টানো; বাইসারিয়ারও তাই, তবে পাতলা এবং লাল; আভিজাত্য আছে বাইসারিয়ার মধ্যে। কিন্তু বর্মা আর সিন্‌হাকে কিছুতেই ভালো লাগেনি। সুস্থ সতেজ তরুণদের দলে এইজাতীয় লোকের থাকাটা আমার খারাপই লাগতো।

সিন্‌হা আমায় এড়িয়ে চলতো, এবং বেশ দূরেতায় অবসর বিনোদনের জন্য দু'চারটে মাটির গালও দিতে ছাড়তোনা। সেটা খুব গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু ওরা গেলো কোথায়! নিশ্চয় দুরর্বে নয়।

ভাবছি। হঠাৎ ভবানন্দ আর-একটি ছেলেকে এনে বসালে পাশে। বছর কুড়ি বয়স ছেলেটির। এও সিন্‌হা। চকচকে রং। গলাবন্ধ যোধপুরী মোটা কোট। বড়ো বড়ো সাদা ঝকঝকে দাঁতে গালভরা হাসে। শক্ত চেহারা, উৎসাহী। ছেলেটার নাম ভুলে গেছি। আমরা 'কেশব' বলে ডাকবো।

“আপনি সিন্‌হা-দলের খোঁজ চান?”

সন্দিগ্ধ রহস্যসঙ্কুল প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করেছে ভবানন্দ। আমি চাইলাম দুজনার মুখের পানে। ভবানন্দ ঘাবড়ে গিয়ে বললে—“এই ছেলেটি জানে।”

ছেলেটির হাতে একটা ছড়ি। পায়ে মোটা ভারী জুতো। বললে—“ওরা সম্ভবতঃ রাতে ফিরবে না। কালই একটা গাঁয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসেছে। কোথায় একটা মেলা আছে। সেই মেলা দেখতে যাবে বলে গেছে। রাত কাটিয়ে আসবে। একটা গাঁয়ে গিয়ে একটা বাগাল পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছিল। আজ কিছু উপঢৌকন-সামগ্রী নিয়ে গেছে।”

বোধহয় তিন চার মিনিট সময় লেগেছিল। ভবানন্দকে বললাম—“আফিস তো কেউ দেখবে। আমি চললাম। তোমার থাকা দরকার। আর বিক্রম এবং গোপীকে ডাক দাও। আমরা ফিরবো, ভয় কোরোনা। তবে সিন্‌হার দলের তাঁবু গোটাতে পারো।”

আমি জানি এইবয়সের ছেলেরা যেমন হাস্য পরিহাস রসালাপ ভালবাসে, ঠিক ততটাই ভালবাসে শক্ত লোককে। শক্ত লোক বিদ্যা ও সহানুভূতির আধার হলেই তরুণের শ্রদ্ধাভক্তি পায়।

আমার কথায় ওরা যেন একটু ভয় পেয়ে গেলো। কেশব তবু উৎসাহিত। কেন বুঝতে পারলাম না। গোপী, বিক্রম, কেশব এবং আমি চারজন বেরিয়ে পড়লাম পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে। কেশবের হাতে একটা পুঁটলি।

“ওতে কি?” পথে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

“চিনি”—বললে কেশব। “গাঁ-টা অনেক দূর। শুধু দূর নয়, তীব্র খাড়াইয়ের পথ। যাবার পথে নেমে যাবো, কিন্তু আসার সময় সত্যিই বড় কষ্ট। এখান থেকে প্রায় সাড়ে চার মাইল খালি নামা আর নামা। চা, দুধ পাওয়া যাবে। চিনির জন্য ওদের ভারি কষ্ট। তাই চিনি নিয়ে যাচ্ছি। দুধ-চা পেলেই খাবো।”

“গ্রামের মুখিয়ার নাম?”

“রতনদাস।”

“রতনদাসকে তুমি দেখেছো?”

“কাল? না। কাল ঐ গ্রামের একটা নীচ লোকের সঙ্গে আলাপ হয় পথে। তার সঙ্গে ওরা নীচ কথাবার্তা চালায়। তার বাড়ি যায়। সেখানে মেলায় যাবার কথা ওঠে। তারপর ফিরে আসে। এর মধ্যে মুখিয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা ওঠেই না।”

“নীচ-ই যদি, তবে মেলায় যাবে কেন?”

কেশব বললে—“কাল বুঝতে পারিনি। আজ নোটিশ দেখে বুঝেছি। যে গ্রামটায় মেলা, সেটা এই পনেরোটি গ্রামের বাইরে এবং বিইবাহুলি গ্রাম থেকে আরও দু'মাইল। খবর পাবেন না আপনারা।”

মন যেন কুঁকড়ে গেল। এতক্ষণে বিক্রম আর গোপী ব্যাপারটা যেন ধরতে পারলো। গোপী তো চঞ্চল! সে-ই আগে কথা বললো—“তারা গেছে যাক্‌না মশায়, আপনার কেন এই গরু তাড়ানো? আপনার নয়…”

গোপীকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বললাম—“সে-দলে সিন্‌হাও আছে, গোপী। সিন্‌হা আটটি সন্তানের পিতা।”

বিক্রম বললো—“গোসাইন্!”

“তা ছাড়া fruit of knowledge-কে ভয় করি না, ভয় করি Satan-কে। ফল খায় খাক; কিন্তু তার কথায় খাবে কেন যে খাওয়াচ্ছে সেটাকে অন্তরের সুখের অন্তরায় জেনে; যার খাওয়াবার প্রবৃত্তিটা দুষ্প্রবৃত্তি থেকে জাত। ওরা যদি ফূর্তি করতে বেরিয়ে যেতো আমি ওদের মানিয়ে নিতাম, আজ নয় কাল। কিন্তু একটা দুষ্ট-সংসর্গে পড়ে যাবে এইটাই পরিতাপের বিষয়। আমি নারী আর স্বৈরাচার থেকে বাঁচাবার জন্য ছুটছিনা, আমি ছুটছি সিন্‌হার হাত থেকে ওদের বাঁচাবার জন্য।”

গোপী বললে—“বাঁচাতে আপনি পারেন? পারবেন?”

কথা এসে গেল। কিন্তু বক্তৃতা দেবার প্রবৃত্তি নেই। শিক্ষকতা করার একটা গভীর অনুযোগ যে যখন তখন যেখানে সেখানে বক্তৃতা দিতে যাওয়া শিক্ষকদের একটি বদভ্যাস। মনে করুন একজন ডাক্তার যেখানে যখন যাচ্ছেন,—সমাজে, ক্লাবে, বেড়াতে,—কেবল নাড়ী টিপছেন,

জিভ দেখছেন, বা বিশেষ সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে বক্তৃতা ঝাড়ছেন ; মনে করুন দরজী যন্ত্র তত্ত্ব আলাপ-আলোচনা জামার কাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, বা নাপিত চুল-কাটার মধ্যে, বা পুরোহিত সর্ব্বত্রই শ্রাদ্ধ-বিবাহ-যজ্ঞের কুণ্ডলীর মধ্যে বদ্ধ—অবস্থাটা কেমন ! সুখের বিষয় এরা কেউ নিজেদের পেশা বা বৃত্তিকে (কমলাকান্ত যেন ক্ষমা করেন !) এমন করে সহজাত কবচ করে রাখেন না, শিক্ষক যেমন। যার সঙ্গেই কথা বলা যাক, অল্পক্ষণেই তাকে ছাত্রের পর্যায়-ভুক্ত জ্ঞান করা একটি সুনিয়মিত অসভ্যতা না হোক, অশালীনতা ; এবং যদি কোনও কারণে ঐ পর্যায়ভুক্ত করায় বাধা থাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শম্বুকবৎ বেবাক অবয়বকে সঙ্কুচিত করে গোঁড়ামির খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে আত্মগোপন থাকা,—এগুলি শিক্ষকদের স্বভাবধর্ম। এক কথায়, শিক্ষকরা অসামাজিক তার কারণ তাদের দারিদ্র্য ততটা নয়, যতটা তাদের এই বক্তৃতার নেশা। দুনিয়ার যাবৎ লোক তাঁর ছাত্র হোলো তো হোলো—বেশ সময় কাটবে তাঁর, নৈলে তিনি বড়ই মনমরা ; জগৎ অবিবেচক ! এইভাবে কার্য-কারণ সম্বন্ধের প্রতি ও ভারসাম্যের প্রতি উদাসীন শিক্ষকের আনা-যান। অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু খবরের কাগজের সম্পাদক, রাজনৈতিক ভাড়াটে প্রচারক, উকিলের দালাল বা কোর্টের পেশকারের মতো কি উপন্যাসে কি জীবনে শিক্ষক একটি 'টাইপ' হয়ে রইলেন। তিনি পড়েন ও পড়ান —সেইটাই be all and end all of life।

আমি শিক্ষক। এসব গুণগুলো পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। যাবৎ দুনিয়াকে 'ভালো' করার ভার, 'বোঝাবার' ভার আমার। বক্তৃতা পেলে হোলো, ভালো করার সুযোগ পেলে হোলো। ডাক্তার ঠিকই ঠাট্টা করে। গোপীও ঠিক আঘাত করেছে।

বলতাম। কিন্তু মন নেহাত ভারি হয়ে আছে ; কিছু বলিনি।

ভালো করার ভার আমার নেই। কিন্তু এই ক্যাম্প থেকে উদ্ধার হয়ে ওরা বেরিয়ে যাবে এবং আমাদের 'বেচুন' জীব' ভেবে কানুন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করবে সেটাই বা সহজ নির্বোধের সঙ্গে হজম করি কি করে? ডিসিপ্লিন নয় কড়া-কড়ি না হোলো, মানুষকে নয় বেশি না কামালাম। কিন্তু তোপুরে এতো ঘটা করে একটা কাজের ভার নিয়ে তার মুখে এতোবড়ো একটা বিষবৃক্ষ জন্মাতে দেখে চুপ করে থাকি কি করে?

ভাবতে ভাবতে থাবরালার জঙ্গলের পুবধার ঘুরে উত্তর বেড় দিয়ে পশ্চিমে এসে পড়েছি যাতে পশ্চিম-উত্তর দিকটা চোখে পড়ে। এ-দিকটায় আগে আসিনি। পাহাড়টার পিছনে গা বেয়ে যে একটা ঘন অন্ধকার পিচ্ছিল পথ আছে লক্ষ্যই করিনি।

যেখানে পথটা খুব চওড়া সেখানটায় দেড়ফুট। তারপর থাবরালা পাহাড়ের সুগভীর অরণ্যসঙ্কুল খড্‌। পশ্চিম-উত্তর দিক তাই অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে, আর জঙ্গলে ভর্তি। উদয়সূর্যের তাপ পায় না ;—অস্তসূর্যের অন্ধকার পায়। সারা পাহাড়ের চোয়ানো জল পাইনের শিকড় বেয়ে টপ্ টপ্ করে পড়ছে। পচা-পাতা-ঢাকা দেড়-ফুটী পথ কোথাও ৪৫ কোথাও ৫০ ডিগ্রীর খাড়াই নিয়ে নেমে গেছে। মাথার ওপর গাছও বড়ো, গাছের শেকড়ও ততো। গভীর বন। পদে পদে পা হড়কায়। এতো বন, এতো-এতো রকমের বিচিত্র বিচিত্র গাছ জীবনে কখনও দেখিনি। বড়ো থেকে ছোটো, ঘাস থেকে পাইন, শ্যাওলা থেকে দেবদারু, সুন্দর থেকে বীভৎস কতো গাছ, কতো পাতা, কতো ফুল! মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে বিরাট বিরাট ফাটল ; দুটো-একটা গুহার মতো, কিন্তু ভেতরে জমাট অন্ধকার। নেমে চলেছি। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। বক্তৃতা, নম্রতা, হিংস্রতা, ভয় সব জড়িয়ে আমরা যেন একটা বিরাট দৈত্যের গায়ে গা ঘেঁষে চলেছি। সবুজ ঘাস, পাতা, দূর্বা, কিসলয়—যা নিয়ে আমরা কাব্য করি তাও যে আমাদের কাছে কী ভয়াবহ হিংস্র রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে, ওই গুরুগম্ভীর অরণ্যানীর জঠরে প্রবেশ করে উপলব্ধি করলাম। নামছি তো নামছিই। বাঁকের পর বাঁক, পিছ্‌লে-পিছ্‌লে ভয়াতুর পদক্ষেপ, হাতে লাঠি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। নিজের দেহভার পায়ের গোড়ালির ওপর বার বার এসে পড়ছে ; টাল সামলানো দায়। ইঞ্চির পর ইঞ্চি একটু একটু করে চলার দায়িত্ব। তাই মুখে কথা নেই। এই প্রকাণ্ড গগনচুম্বী দৈত্যের গায়ে হাত রেখে প্রাণ নিয়ে চলা। কথা বলার অবসর কৈ।

মাঝে মাঝে দেখতে পাই পাহাড়ের গায়ে সহস্র সহস্র ফলহীন গাছের পাশে পাশে মাটিতে শুয়ে শত শত অমনি গাছ। কবে যেন মাটি ধুয়ে-ধুয়ে ওরা ভেঙে পড়েছে শিকড়-সমেত। বর্ষার তুমুল বেগ যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকে তখন এই বিরাট গাছগুলিকে নামিয়ে আনতে থাকে। যুগ যুগ ধরে একটু একটু করে এরা নামবে, গলবে, পচবে, ঘুরে ঘুরে শেষ অবধি নদীর অববাহিকায় গিয়ে মিশবে, পলিমাটির উর্বরতা বাড়াবে। এ-দেশটার নীরস

সূর্যহীনতার রাজত্ব। তাই সব জীবনই এখানে পচনশীল। এতো শীত যে, উত্তাপের অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও বহু প্রাণ জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু পচছে সঙ্গে সঙ্গে। অদ্ভুত এই পচা। শীতের দেশের মৃত্যু। প্রাণ চলে গেলেও অবয়ব থাকে অনেকদিন অপরিবর্তিত।

চলতে চলতে হাতের লাঠিটা ভেঙে গিয়েছিল। লাঠি না নিয়ে এ পথ চলা সাংঘাতিক কাজ—মরণের সঙ্গে খেলা করা। বড়ো বড়ো গাছ পড়ে আছে। সুবিধামতো একটা মোটা ডাল ধরে টান মারতেই সেটা অনায়াসে খ'সে এলো তার জনিতা-বৃক্ষশরীর থেকে, এবং হাতে যেটুকু এলো তা মুঠোর মধ্যেই কালো কাদা হয়ে গেল। অথচ বাইরে থেকে দেখতে পরিপুষ্ট সম্পূর্ণকলেবর বৃক্ষটি। ব্যাপারটা মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। মনে হয়েছিল মিশরের মমির মতো গাছের মমির পিরামিড এই পাহাড়ের পিঠ। লক্ষ লক্ষ গাছ এইভাবে পড়ে আছে, একদিন জীবিত ছিল। এইখানেই পড়ছে, পচছে, গলছে, মাটি হচ্ছে, মিশে যাচ্ছে জলে, জল মিশছে ঝর্ণায়, ঝর্ণা শাখা-নদীতে, শাখা-নদী মহানদীতে—যে মহানদী সৃষ্টি করছে ব-দ্বীপ আর উপত্যকার উর্বরতা। গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা-ভূমির উর্বরতা, শ্যামলতা এই বন ধোয়া জলেরই অবদান—সোঁদরবনের ব-দ্বীপের মাটি হিমালয়ের পাইন-পুষ্ট; সোঁদরবনের জঙ্গল আর হিমালয়ের জঙ্গল সগোত্রের; আমরা যেমন আর্যসন্তান!

নামছি আর নামছি। গোড়ালির আর ভয় নেই। এখন পায়ের পাতার ওপর চাপ পড়ছে। সমস্ত দেহটা নিজের ভারে নিজে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ কেশব চেঁচিয়ে উঠলো—"দেখুন দেখুন,—সাপ!"

ডানপাশটায় বরাবর একটা খাদ চলেছে। দুটো পাহাড়ের মাঝে খাদ। খাদ বলে কি হয়, গভীর বনানী ও শস্পে ভরতি; ভরাট সবুজের সদর-কাছারি। ওদিক যাতে না মাড়াই সেই নিষেধ এই সেতু-সূচী পথের গায়ে সদর্পে লাঞ্ছিত। কিন্তু সেই ভরাটের মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে ফণা দুলিয়ে-দুলিয়ে জেগে উঠেছে—একটা নয়, দুটো নয়, শত শত নাগকন্যা। তাদের মাথায় চক্র, গলায় কালোয়-সাদায়, খয়েরে-পাটায় রেখাবহুল চিত্র-বিচিত্র। লক্‌লক্ করছে দ্বিধাভক্ত জিভ।

এতো সাপ কেন? কিন্তু সেই শঙ্কা-স্তিমিত ভয়মুহূর্ত বেশীক্ষণ স্থায়ী হোলো না। ... আশ্চর্য প্রকৃতি! আশ্চর্য তার লীলাবিভ্রম। সাপ নয়; একজাতীয় গাছ। ওলকচুর পাতার মতো গোল ধরনের পাতার মাঝ দিয়ে লিক্‌লিকে ডাঁটার মাথায় ফুল। কিন্তু ঠিক যেন সাপ। ফণার বিস্তারে, রেখার চাতুর্যে, ঠোঁটের তলায় সেই দ্বিখণ্ডিত জিহ্বার বিভ্রমে, বাতাসের দোলায় এ যেন প্রকৃতির শিল্প-রচনার চরম নিদর্শন। মনে পড়ে যায়, শিমলার পাহাড়ের গায়ে গায়ে এই ধরনের ফণা-তোলা ছোটো ছোটো গাছের দল ছোটো ছোটো পতাকার ধ্বজা দুলিয়ে কাঁপতে থাকে। লোকে পাহাড়ী ভাষায় বলে 'সাপ গাছ'। কিন্তু এই দারুণ জঙ্গলে এরা আর সেই ছোটো ছোটো পতাকার রূপে নেই। অন্ধকার আর গভীরতার প্রসাদে এদের ভয়ঙ্কর রূপ পূর্ণ-বিক্রমে প্রকাশিত। খুব ঠাওর করে না দেখলে সত্যিই চমক লাগে।

গাছটার শঠতা ও রহস্য ভেতরের 'অহং'কে ধাক্কা দিল যেন। কোমরের বড়ো ছোরাখানা বার করে খুঁড়ে বার করলাম শেকড়। মাটি তো মাটি নয়, পচা পাতার স্তূপ। সহজেই শেকড়-সুদ্ধ গাছটা বেরিয়ে এলো। শেকড়টা গোল ওলের মতো, অতো বড়ো নয়। গাছটা মাঝখান থেকে সবুজ ডাঁটি, গায়ে খয়ের-রঙের ডোরা কাটা, ছোটো ছোটো আঁশের মতো। যেমন পেঁয়াজকলির ডাঁটি হয়। মাথায় ঐ ভীষণ ফণা। গাছটা মনে আছে, আর মনে আছে সেই ভয়মুহূর্তের আতঙ্ক।

এর একটু পর থেকেই ঝর্ণার জলের শব্দ কানে আসতে লাগলো। বোঝা গেল এই খাদটার মাঝ দিয়ে একটা জলধারা বয়ে চলেছিল। বহু নীচে থাকায় জল ক্ষীণ হওয়ার জন্য শব্দ পাচ্ছিলাম না। এখন স্রোত খানিকটা কলেবর লাভ করেছে এবং খাদটাও প্রশস্ত অগভীর হয়ে এসেছে তাই শব্দটা কানে আসে। ক্রমশ বনের বলিরেখা বিলীন হোলো, খাদের তলায় জল দেখ গেল। এ-ধারের পথটাও শেষ হয়ে গেল। ওপারে দেখা যাচ্ছে। খাদটা পার হতে হবে। কিন্তু মাঝে কল্ করে পার্বত্য ঝর্ণা কোথায় মঞ্জীর পায়ে নেচে ছুটেছে। হই কি করে, সেই চিন্তা।

কেশব বললে—"কাল ঐ পাথর বেয়ে-বেয়ে মাঝের বড়ো বড়ো নুড়ির ওপর পা রেখে পার হয়েছিলাম। চলুন না?"

"কিন্তু পা যদি হড়কায়?"

গোপী পরম শ্লেষভরা কণ্ঠে বললে—"আপনার হড়কাবে কি তার? পাছে কারুর পা হড়কায় সেইজন্য তো আপনার এই অভিযান!"

আমি পাথরের ওপর সাবধানে পা রেখে রেখে

এগিয়ে গেছি। গোপী চেয়ে-চেয়ে দেখছে। বিক্রম যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির নেশায় ওর চোখ ঢলঢল। কেশব তার স্বভাবসুলভ চপলতা নিয়ে চট্‌পট্‌ আমায় পিছু নিলে।

পাহাড় বদলে অন্য পাহাড়ে এলাম। একটা বাঁক ঘুরে একেবারে অন্য পারে এসে গেলাম। প্রকাণ্ড একটা পাইন ভেঙে পড়ে আছে পথের আড়াআড়ি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথর-মাটির জঞ্জাল। পাইনটাকে ডিঙোনো দুঃসাধ্য। ছুরি দিয়ে কয়েকটা ডাল কাটা হোলো। একটু জায়গা ফাঁক করা গেল। গুঁড়ি বেয়ে হামা দিয়ে সেই জায়গাটা পার হয়ে যখন পাহাড়টার ওপারে এসেছি তখন বেলা-শেষের আলোর উদ্ভাস। হঠাৎ সমস্ত উত্তর দিকটা খোলা গেলো, মাঝে একটা সুবৃহৎ অবকাশ। পাহাড় ঘেরা বড়ো একটা উপত্যকা। ওপারের পাহাড়ের গায়ে গায়ে কেয়ারি-করা ক্ষেত আর বহু গ্রাম এক-একখানা ছবির মতো। হঠাৎ চমক লাগে এদেশ দেখে। বাঁ-দিকে সেই জঙ্গল-ভরা পাহাড়টার কোণা দেখা যায়। ডান ধারে পথ নেমে গেছে। সামনে একটা রজতদ্যুতি তুষার—নীল আকাশের বুক ফুঁড়ে উঠেছে। তার গায়ে গায়ে রোদের ঝলক। কোথাও গাঢ় বেগনী রং, কোথাও কমলা, কোথাও একেবারে গলানো সোনা। চোখ জুড়োনো বাসনা এমন শোভা, এমন মহিমা, এমন বিস্তার। ও যেন দেবতাদের দেশ, ও যেন চিন্তা আর মনন-জগতের আদর্শের দ্যুতিচ্ছটায় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, অথচ দেশের হাতছানি! কিন্তু এ-ধারের এই বিস্তীর্ণ উপত্যকার গায়ে ওই-যে ছোটো ছোটো গ্রামগুলি দেখা যায় ওরা তো সেই দুরারোহ আদর্শ-জগতের ভুবন-ভোলানো ইঙ্গিত নয়; ওরা এই জীবনের, এই জগতের। ছোটো ছোটো সাধ আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছে ওরা; রোজকার সুখ-দুঃখের কাহিনী, ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, মানুষের ক্ষুদ্র মনটির ভীতি, সংশয়, বেদনা, তিরস্কার, ঘৃণা, লজ্জা, হিংসা, দয়ার রূপ। একখানা নয়, দু'খানা নয়, এমন তিরিশটা গ্রাম গোনায় পার আমরা হেরে গেলাম। বায়নোকুলার বা টেলিস্কোপ থাকলে কত মজা হোতো, দূর থেকে গ্রামগুলো দেখা যেতো। এমন ছবি; ছবি তোলার লোভ সংবরণ করা কঠিন। বিক্রম তার ক্যামেরা নিয়ে যখন খুটখাট করলে তখন মাঝে মাঝে মেঘের পানসী ভাসছে। জানি কিছুই ধরা পড়বে না এই অবিনশ্বর সৌন্দর্যের, তবুও মানুষের যে অসীম আগ্রহ অক্ষয়ে ধরে রাখার চিরকালের তাড়ায়।

এই পথে চলেছি একটা বিশ্রী কাজে। মন যে কোথায় আঘাত পাচ্ছে। অবাক হয়ে নিজের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করছি, করছি বোঝাপড়া। কেন আমার এ নাক ঢোকানোর প্রবৃত্তি! অমরাবতীর স্বপ্ন সার্থক ক এই পরম রমণীর শোভার-সমুদ্রে কেন আমি আমাকে হারি ফেলতে পারিনা? কেন জন্মগত অধিকার এই রসবিলাসে নিরুপদ্রবে গ্রহণ করতে পারিনা, কেন বর্ণাঢ্যতার নির্জ মাটির কলস আমার ভাঙতে গিয়ে এমন পিছল পট্টি করা সহজ কেন নই? কেন নই? কে সিন্‌হা আর বাইসাহিবা কোথায় তারা রসসন্ধানে গেছে, আমার এতো খবরদা কেন?

দুনিয়াকে ভালবাসতে যাওয়ার পথ যাদের, তার নিজেদের ভালবাসে কিনা জানিনা। কিন্তু ভালবাসা যাদে প্রকৃতিগত, তারা নিজেদেরও ভালবাসে। Epicurianism-এর বিষই sensitive-কে মহৎ হতে দেয়না। এ কথ সত্য, শিল্পীমাত্রেই egotist—নৈলে শিল্প হয়ে যায় দর্শন রস হয়ে যায় বিজ্ঞান।

কেশব বললে—'স্যার, থামবেন না। এমন একটা দে সামনে আসছে—যার মতো দেশ এই পৃথিবীতে থাকতে পারে এমন ধারণা ছিল না। আপনি তো অনেক দে দেখেছেন, অনেক কেতাব পড়েছেন, আপনাকেও বলতে হবে এমনটি দেখেননি।"

চমক ভাঙলো। "কেশব, এই দৃশ্যই কি কখন দেখেছি? দার্জিলিঙের কাঞ্চনজঙ্ঘা, ওদের দেশে ম্যাটারহর্ন—কতোই তো শুনি। কিন্তু এই যে সব অখ্যা অজ্ঞাত মহাপুণ্যস্থান আছে—একি জানতাম তাই কেদার-বদরী আর মানস-সরোবর—কত পড়েছি, কা সকলের লেখা। সে তো মানুষ যুগ যুগ ধরে দেখেছে দেবতা দেখার আগ্রহে অতিক্রম করে গেছে দুর্গমকে কিন্তু এই যে সব দৃশ্য—যার আশেপাশে মানুষের বসতি বিরল, যার ধারে-কাছে সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিবেশন নী এদের মাঝে লুকিয়ে আছে লোকোত্তর সম্পদ। এর কথা কি জানি, না, কাউকে জানাতে পারবো? এর সাথে পরিচয় দেবার চেষ্টা করতে গেলেও তা ভাবোচ্ছ্বাসময় গ হয়ে দাঁড়াবে; দাঁড়াবে ভাবালুতা।"

গোপী বললে—"সাব্, আপনি তো দেখছি বৈরা লোক। আপনি আর দেশে নাই-বা ফিরলেন। থে যান্-না এখানেই?"

গোপী করলো ঠাট্টা। কিন্তু বললে মনের কথা।

এমনি কথা আমার স্বজন বলেছিলেন। স্বজনাই নারী। বলা যাক সেই অবান্তর কথা।—

তখন সবে ফিরেছি একবৎসর অজ্ঞাতবাসের পর। মাথায় লম্বা চুল, গায়ে মলিন খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পা-জামা—চোখে মমতাকে প্রতিহত করার শুকনো ক্ষুধার ঝলক—আমার দিদি দেখেই বললেন—"কেন এলি ফিরে? সন্ন্যাসীর বেশ নিয়েছিস, ভালো লাগেনা সংসার-ধর্ম। উজুন-চুলে; উজুন-চুলে থাকলেই পারতিস। তুই আর তোর গাছ, নদী, আকাশ। এলি কেন বাড়িটাকে আবার পুলিসের পরিক্রমা তৈরি করতে?"

দিদি জানতেন মনের খবর। মরে গেছেন তিনি।

আর যিনি এই মনের যথাধিকারিণী তিনি বলেন—"মাঝে মাঝে ভরসা হারাই। এ ভয় আমার যাবেনা। যে-কোনোদিন চলে যেতে পারো তুমি। সব ভালবাসা আর মায়ার ওপরেও তোমার জগৎটাকেই তুমি ভালবাসো, সেখানে আর কেউ নেই। ভয় করে আমার।"

আর আমার মনে বেজে যায়—

> "*I was not left, like others, cold and dead;*
> *The spirit whom I lov'd in solitude*
> *Sustained his child.*"

এ যে কেবল রোমান্স-বিলাসী পাগলামি নয়, এ যে বাঙালী তরুণের উচ্ছ্বাস নয় মর্মবেদনা দিয়ে, তা বুঝি—যাকে ইংরেজরা বলে *sweet anguish*—এইসব প্রাকৃতিক পরিবেশ এসে সহসা প্রশ্ন জাগে সমগ্র অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে—

কথমাত্মত্যাগিক্ শরীর আয়াসঃ বা এবিকলা কথং
প্রাপিতঃ ? কেনোপকরণেন, কথং বাসনকিতঃ
কথকতাম্ ?

[কেন বলো এই দেহ এলো ?
শরে শিরে করে ভাসাভাসি
আমার সে কেন ছিলে গেল ?
বহু দিবা দিনে যে দুখ ?
সত্য বলো দিনে যায় আবার
আলো বায় আর পরিপূর্ণ ?]

প্রশ্ন জাগে—

কস্মিন্ জনস্য বিরহেণ নবীভবেৎ বিয়োগঃ জগতি ?
[কাহারে হারিয়ে পরে মন হয় কানা ?]

তাই হয়তো গোপী আমায় তামাশা করলো।

ম্লান হাসি হেসে বললাম—"হ্যাঁ গোপী, থেকে যাবোই ঠিক করছি। শিবুহা আর বাইসাহিবাদের সন্ধানটা নিই, তারপর।"

কোথায় আমার কৈশবের বন্য সেই দেশ। চলতে লাগলাম। শরীর যেন হালকা হয়ে গেছে, এমনই আনন্দ। গোপী আর কেশব এগিয়ে যেতে লাগলো। বিক্রম আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। পাখীটা-আসটা দেখছে, পোকামাকড় লক্ষ্য করছে, আর মাঝে মাঝে বলছে, "দেখুন স্যার, দেখুন!" এতো যখন দেখার জিনিস, দুটো চোখ তখন কম মনে হয়। তাই বার বার ডেকে বলতে ইচ্ছে হয়—"চোখ ধার দাও, চোখ ধার দাও।"

পাহাড়টার মোড়। দূরের পাহাড়ের পেছনটা অন্ধকার। লম্বা লম্বা গাছ গভীর খাদের মধ্য দিয়ে বরাবর ওপরে উঠে গেছে। এতো ঢালু পাহাড় এটা যে, এর গায়ে কোনও গাঁ নেই। এ পাহাড়টাও একসময়ে ঘুরে গেল অন্য মোড়ে। আর মুহূর্তেই দেখলাম অদ্ভুত দৃশ্য।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা হালকা নরম মিষ্টি গোলাপী গন্ধ নাকে আসছিল। ওরা তামাশা করবে তাই জাহির করিনি কথাটা। কিন্তু তার রহস্য এতক্ষণে সমাধান হোলো। আমি কি করে বোঝাবো সেই অনির্বচনীয় প্রকৃতি-শোভা?

সামনে বিরাট একটা উপত্যকা ঢাকা পড়েছে ঘন পাইন-বনের সারিতে। আরও গভীর দৃষ্টি হানলে দূরের গ্রাম দেখা যায় পাইনের ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু সমস্ত উপত্যকাটা সাদায় সাদা। পাইনগাছগুলো পর্যন্ত সাদা। পাহাড় সাদা, পথ সাদা, বন সাদা, বনান্ত সাদা,—আর সব সাদার ওপর মহিমময় সাদা হিমালয়ের শিখরে শিখরে পুঞ্জীকৃত তুষারের আস্তরণ।

এতো সাদা এলো কোথা থেকে! অনবরত একটা গুন্‌গুন্ গুঞ্জধ্বনি, কানে সেই সঙ্গীত, চোখে ঐ সাদার উৎসব, নাকে একটা অপরূপ সুবাস, বাতাসে চঞ্চল মধুতা—অপূর্ব মায়াময় স্বপ্নপুরীর দেশ এ। সাজানো চারিধার, অথচ জনবসতি নেই। থমকে দাঁড়াতে হোলো গোপীকেও এবার। বললে—"তাজ্জব দেশ! গোলাপ? কেবল সাদা গোলাপ? এতো ফুল, এতো!" বিশ্বাস হয়না অনুভূতিকে।

পাহাড়ের লতানে গোলাপ। মোটা মোটা লতায় বেড়ে পাইনকে জড়িয়ে জড়িয়ে ওপরে চলে গেছে, চলে গেছে ডাল থেকে ডালে, শাখা থেকে শাখায়, মাইলের পর মাইল। পথ জানেনি, বন জানেনি, মাটি জানেনি, আকাশ জানেনি,—সেই গোলাপের বন্ধন নিবিড় হতে নিবিড়তরে, দূর হতে দূরান্তরে চলে গিয়ে সমগ্র

উপত্যকাটাকে ভরিয়ে দিয়েছে শুধু সাদা একপাটি গোলাপের সমুদ্রে। তারই গন্ধে বাতাস সুরভিত; আর সেই গন্ধ-প্রমত্ত মৌমাছিদের ঝাঁক অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ক্ষীণ পাখার গুন্‌গুনানিতে এই বনস্থলী গুঞ্জিত। সাদার গুঁড়ো নয়, সাদার তুলির কাজ—সবুজকে যেখানে সেখানে ঢেকে-ঢেকে সাদার কাজ। ছশো ফুটের মাথায় পাইন-গাছ জড়িয়ে রেখেছে ঐ সাদার মুকুট, আর সবার মাথায় তুষারমণ্ডিত হিমগিরি। অপ্সরা বা কিন্নরের বাসভূমি চোখে দেখিনি। কল্পনায় যা এঁকেছি তাও এতো সুন্দর নয়। সকল কল্পনাকে পরাজিত ক'রে এই শোভা নিজের মহিমায়-আমাদের অভিভূত করে ফেললো।

আমরা যেন কেমন হয়ে গেলাম। কাউন্ট-অব্-মন্টেক্রেস্টো ধনভাণ্ডার পেয়ে হঠাৎ তা ছড়াতে শুরু করেছিল। হঠাৎ পেলে পাগল হয় অনেকে, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ পায়। আমরা ছুটোছুটি করে এ-ডাল কাটি ও-ডাল কাটি কেবল গোলাপ কুড়োবো, গোলাপ। সেই ইচ্ছে, সেই নেশা, সেই সব।

খানিকটা সময় এই প্রলয়ঙ্কর মত্ততায় কেটে যাবার পর হুঁস হোলো। তখন সবাই সবাইকে দেখে খালি হাসি। কিন্তু বসতি আর বেশীদূরে নেই, কারণ ক্ষেতখামার দেখা যাচ্ছে এইবার। রাস্তার ধারে একটা ফলক দেখলাম ডাক-বাংলো লেখা। ছোট্ট পাহাড়ী কুঁড়ে, পাশটায় একটা ছোটো বাগান। দুটো নাশপাতি গাছ, দুটো আখরোট আর পাঁচ-ছ'টা আপেলের গাছ। আখরোট-ফুল ফুটে আছে ঝুমকো-ঝুমকো সাদার গুচ্ছ, যেন বড়ো বড়ো টগরের থোলো, পাপড়িগুলো রেশমের মতো নরম আর পাতলা।

ঘুমভরা চোখের মতো রাস্তাটা চলে গেছে গ্রামের পানে। সেই গ্রাম যেখানে সেই ডাক্তার বাড়ি, যে বাড়িতে ওরা কথা বলেছে মেলায় যাবার জন্য।

গ্রাম এসে গেল।

গ্রাম তো এসে গেল। কিন্তু একি গ্রাম! জন-মনিষ্যি নেই। গরুগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিচিলি চিবোচ্ছে। ছাগল-ভেড়াগুলো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। ছাদে ছাদে মকাই সব বেছানো। খোলা-বারান্দায় খাট কাৎ করা, আর তার পাশে পরিত্যক্ত পাহাড়ী হুঁকো। কিন্তু লোকজন নেই। সেই ডাক্তার দোকানেও কেউ নেই। যেন নিদ্রিত-পুরী।

কেশব অপ্রস্তুত। বললে—"কিন্তু এই সে-গ্রাম। ঐ সেই বাড়ি। ওখানে বসে ওরা কাল কথা বলেছিল। আমি ঠিক জানি।"

একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বিদেশীদের অনধিকার-প্রবেশের বিপক্ষে প্রতিবাদ জানাতেই, চার-পাঁচটা কুকুর দৌড়ে এলো। তাদের ঐকতান থামতে-না-থামতেই একটি বুড়ো পাহাড়ী এগিয়ে এলো দু'খানা কুঁড়ের মাঝ দিয়ে।

আমরা তখন জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, কেশবের কথা ঠিক। কিন্তু গ্রামের সবাই গেছে মেলায়। রাতে আর কেউ ফিরবেনা। ফিরবে পরদিন সকালে।

শুনে আমরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম। ক্ষুধায় তখন পীড়িত; আর চা! চা না পেলে আমায় স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে হবে।

বুড়োকে মোটেই প্রীত দেখলাম না। নেহাত পীরিত জমাতেই হবে তাই ওর হুঁকায় টান দিয়ে আত্মভাই দেখালাম। কিন্তু শক্ত ঘাঘু হাড়! কিছুতেই গলেনা। সাফ বলে—"চা-কা ব্যবস্থা করা যেতে পারেনা।"

বেনেনী কায়দায় কেশব বললে—"চিনি এনেছি, বুড়ো, চিনি এনেছি।"

কুৎকুতে চোখ চেয়ে বুড়ো বললে—"তোমাদের চিনিতে কাচের গুঁড়ো আছে। কাল তোমরাই এসেছিলে তো? আজ আমার গাঁয়ের লোক নিয়ে কয়েক ছোঁড়া গেছে মজা ওড়াতে। মেলায় জোয়ানরা গাঁ খালি করে গেছে জানতে পেরে তোমরা ধাওয়া করেছো। তোমরা আসছো খবর পেয়ে গেছি অনেক আগে। তাই দল বেঁধে সবাইকে মেলায় পাঠিয়ে দিয়েছি। ঐ ছাখো, ওরা যাচ্ছে।"

দূরে পাহাড়ের গায়ে চাদর আর রঙীন জামা দেখা গেল। সারি সারি মেয়েরা চলেছে।

লজ্জায় যেন মরে গেলাম।

আমি বুড়োকে বোঝালাম যে, অপরের অসভ্যতার জন্য আমাদের সন্দেহ করা ওর খুব স্বাভাবিক হয়েছে—কিন্তু আমরা ওদের ধরতে এসেছিলাম।

বুড়ো আমার দিকে খানিকটা চাইলে, তারপর বললে,—"হয়তো ঠিক। কিন্তু চা আমি দেবো কোত্থেকে? চায়ের পাতা আমি খানিকটা দিতে পারি।"

বিক্রম বললে, "বেশ বেশ, আমি আগুন করে জল ফোটাচ্ছি। একটা লোটা দাওনা।" ব'লেই ফস্ করে একটা সিগারেট বার করে বুড়োর হাতে গুঁজে দিলে।

বুড়ো সিগারেটটা ধরালো। লোটাও দিলে। কিন্তু বললে—"দুধ নেই।"

নাঃ, নেহাত পাজী বুড়োটা। এত গরু চরছে, ঘরে গরু বাঁধা, আর বলছে: 'দুধ নেই।'

আমি কথাটা মনে পড়িয়ে দিতেই বুড়ো যা বললো শুনে চক্ষুস্থির।

কি-এক সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করেছে গ্রামের বাদি পশুকে—সাংঘাতিক ব্যাধি। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া সবার চোখের কোণে ঘা, দাঁতের মাড়ীগুলো ঘায়ে ধক্ থিক্ করছে—খুরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, চামড়া আর রের সংযোগ-স্থানে ঘা। এমনকি, শিঙের সন্ধিস্থলেও া। মাছি ভন্‌ভন্ করছে।

"ও-দুধ আমরা খাইনা। বাটে ঘা হয়েছে, বাট টিতে শুরু হয়েছে। সব মরে যাবে-বাবু, সব—"

যখন হয় এ রোগ, সবই মরে যায়। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ওরা সরিয়ে ফেলেছে অন্য গাঁয়ে, বাকী পশুদের কটু ঠাওর হতে-না-হতে। একেবারে অন্য গ্রামে নিয়ে মনি। কিছুদিন মাঝামাঝি এক জায়গায় রেখে রেছিল। যখন নিরাপদ দেখেছে তখন গাঁয়ে নিয়ে ছে। একরকম 'কোয়ারান্টাইন' বলতে হবে।

ঐ লোটাতেই জল-গরম চড়ানো হোলো, চায়ের পাতা চ করলাম, নৈলে: কোনো পদার্থ ছিলনা চায়ে, চিনি গাম, এবং সেই 'র' চা একটু একটু করে পান করলাম া নাসপাতি সহযোগে। অমন সুন্দর চা জীবনে কখনও ই খেয়েছি মনে পড়েনা।

বিক্রম হাসলো।

গোপী যেই চায়ে চুমুক দিতে যাবে অমনি বিক্রম বলে লা—"মত্‌ পীজিয়ে, নবাব-সাব্‌।"

"কেন?" জিজ্ঞাসা করলো গোপী আর্তস্বরে।

"সত্যই তো, কেন?" আমিও জিজ্ঞাসা করলাম।

বিক্রম হাসতে লাগলো।

গোপী বললে—"কেমন বদ্‌তমীজ 'সাহজাদা' দেখুন। র সঙ্গে মস্করা করছে, জনাবকে মধ্যস্থ রেখে। তমাম টা কোথায় চলেছে আল্লা!"

াপীর ভাবভঙ্গি দেখে আমরা হাসছি। গোপী র বাটি আবার তুলতেই বিক্রম আবার হাঁকলো— ীর কসম্, গোপী, ও চা খেয়োনা তুমি। ইমানদারির !"

গাপী রেগে বললে—"আমার অজাতপুত্রের মাতুল, তোমার গোষ্ঠীর সরতাজ্ আমার পয়জার হোক, খাবোনা কেন শুনি? এই প্রচণ্ড পতনের পর তমাম পায়জের পয়জারখানা ছেটে মারলেও আর পতন হবেনা জানি। তবে চা, সামান্য চা খেতে আপত্তি কেন শুনি?"

বিক্রম বললো—"বেশ! নবাবসাহেব খিদমৎগার খিদমৎ করতেই পারে। নবাবী মেজাজে যা উচিত মনে হবে তাই সে করবে। তবে এও ঠিক, অনুচিতকেই যদি উচিত না মনে করবে, তবে আর নবাবী মেজাজ বলেছে কেন?"

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—"আহা, খাওনা ওকে খেতে, বিক্রম—কেন বাগড়া দিচ্ছ?"

বিক্রম বললে—"আর পান? চা খাওয়ার পর নবাবসাব পান না পেলে পথ চলবেন কি করে?"

হাতের বাটির চা অম্লান-বদনে মাটিতে তৎক্ষণাৎ ঢেলে ফেলে দিয়ে গোপী বললে—"বিক্রম আজ গোষ্ঠীর বুকে ঢোকানো ছুরি টেনে বার করে নিয়ে গোষ্ঠীকে বাঁচালো জনাব। নৈলে গেছিলাম। নরক—এটা নরক! পান নেই, চা নেই, হুরী নেই, গরু-ভেড়ায় পোকা, মানুষে জরা—এ গ্রাম নয়, জাব—এটা সেই *Ancient Mariner*-এর enchanted ship—"

বিক্রম বললে—"আর তোমায় ঐ চা মাটিতে ফেলে দেওয়া albatross-বধের পাপ। খাও চা, শিপ্‌সিপ্ খাও, নৈলে গেলে।"

গোপী বললে—"না, ভাই। আর নয়। পান না পেলে মরে যাবো। কে জানতো এই বিপদে পড়বো? পান আনতে ভুলেছি। চা না খেলে আমার কিছু হবেনা।"

বিক্রম বললে—"না, চায়ের অপমান আমরা সহ্য করবনা।"—ব'লেই ওর বাটি আবার ভরে দিল।

গোপী ইতস্ততঃ করেছে দেখে বিক্রম পকেট থেকে একটা পান বার করে গোপীকে দেখাতেই, কুঁদো বাঘের মতো গোপী ঝাঁপিয়ে পড়লো বিক্রমের ওপর, এবং সেখানেই তাকে মাটিতে ফেলে দুটো গালে একেবারে সাড়ে-বিয়ানব্বইটা চুমো খেলে এলোপাতাড়ি বিরাট বিরাট শব্দ করে!

ততক্ষণে বুড়ো গ'লে মাই-ডিয়ার হয়ে গেছে। ঘুরে ঘুরে বাড়ি-ঘর-দোর দেখালে, খলিহান দেখালে, গোশালা দেখালে, বাগান-ক্ষেত-খামার দেখালে।

[ক্রমশঃ]

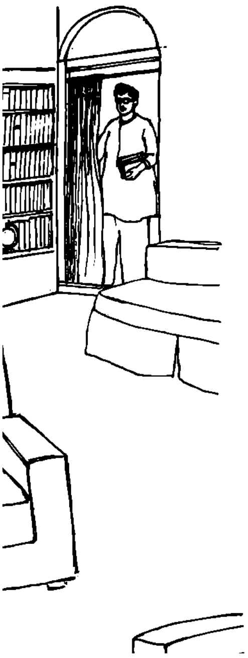

মনের মন্দিরে

দীপক চৌধুরী

বছরটা বোধহয় উনিশ শো পঁচিশ সালই হবে, আলো-আঁধার মেশানো প্রত্যূষের এক অদ্ভুত মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেল। আমার বয়েস সেদিন বারো-বছর। আমি বিছানা ছেড়ে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। পূব আকাশে রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে ঈষৎ আলো ফুটে উঠেছে। আমাদের বাড়ির ডান দিকে চেয়ে দেখি, বহুপুরাতন মন্দিরের শীর্ষদেশ অন্ধকারের আবরু ছিন্ন ক'রে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

অন্ধকারকে পরাজয়ের গ্লানিতে ম্লান ক'রে দেওয়া মন্দিরের ধর্ম। ভগবানের সত্য মন্দির-শীর্ষে সেদিন আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলুম।

সেদিন আমার বারো-বছর বয়েস। বারো-বছরের চোখ দিয়ে সর্বকালের চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই নবনীতা, জীবনের এই প্রান্তিক প্রদেশে দাঁড়িয়ে আজ কেবলই মনে হচ্ছে, সর্বকালের সেই চিরন্তন সত্যের মধ্যে নিজেকে যদি তখন একেবারে বিলীন ক'রে দিতে পারতুম তাহ'লে আজ আর আমি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন সঙ্গতিহীন হ'য়ে পড়তুম না। তাইতো পেছনের ব্যর্থতাগুলো জীবনের এই ভাঙা রঙ্গমঞ্চে সমস্ত আবহাওয়াটাকে এমন বিয়োগান্ত ক'রে তুলেছে।

তুই হয়তো ভাবছিস এই পরিণতির জন্যে আমার আর দুঃখের অবধি নেই, চোখের জলে বুঝি বা সারা দুনিয়া প্লাবিত হ'য়ে গেল! না ভাই, আমি আর কাঁদতে পারি না। অন্তহীন মহাসমুদ্রে যারা সাঁতার কাটে, তারা আবার চোখের জল ফেলবে কেন? জীবনে আমার এমন মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আছে ব'লেই এ-কথা আজ এত জোর দিয়ে বলতে পারছি। তুই আজ অনেক দূরে—তোর কাছ থেকে আমার দূরত্ব এত বেশি যে, ছুটে গিয়ে যে তোকে সমস্ত কাহিনীটা ব'লে আসব তার কোনো উপায় নেই। সেইজন্যেই আজ আমি এই চিঠিখানা তোকে লিখছি।

অনেকবার মনে হয়েছিল, কী দরকার আছে আমার এই কাহিনী লিখে তোকে বিব্রত করবার? শুনেছি, দুটি খোকাখুকু নিয়ে তুই মহা-গিন্নী ব'নে সংসার করছিস।

তোর সেই কাল্পনিক রূপ মনে পড়তেই মনের ভেতরটা ভীরভাবে ভ'রে ওঠে। পরিতোষবাবুকে খাইয়ে, পরিচর্যা ক'রে, খোকাখুকুদের তদারক ক'রে তোর হয়তো ন্যের সময় কিছু থাকে না। তবুও ভাবি, একটানা সুখ ও আনন্দ ব্যস্ততার মধ্যে তুই হয়তো দু-একটি মুহূর্ত বিহ্বল হ'য়ে বসবি আমার চিঠি নিয়ে—হয়তো রক্তিমে হ'য়ে উঠবে তার কোমল মুখের স্বপ্ন রেখা ক'টি, এইটুকু ভেবেই যে ন্ধ্যাচলের মনোরম দৃশ্যটা আমার কাছে মমতাসজল হ'য়ে উঠছে! যে জীবন আমাকে এতভাবে এমন ক'রে ফাঁকি দিয়েছে, তার প্রতি আকর্ষণ আমার একটুও কমেনি। কমেনি ব'লেই বোধহয় চিঠি লেখবার তাগিদ আজ আমার এত বেশি ব্যাকুল ক'রে তুলেছে।

সেদিন আমাদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে নতুন ক'রে দেখেছিলুম। আকাশের স্বচ্ছ স্বাভাবিক ভাব আর বহুপুরাতন মন্দিরের শীর্ষদেশ আমার কাছে এক নতুন জগতের সন্ধান এনেছিল। কলকাতার জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে যে-আকাশ আমরা দেখতে পাই, সে-আকাশের স্বাভাবিক চেহারা ভোরের সঙ্গে একেবারে মেলে না। স্নাতা বঙ্গরমণীর লজ্জা-জড়িত দেহলাবণ্যের সঙ্গে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বাংলার রূপ ও স্বচ্ছ প্রকৃতিকে সেদিন শহরের ধূলিম্লান আকাশ আর ফাঁকি দিতে পারেনি।

কতক্ষণ যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম আজ আর তা মনে নেই। একটু পরেই বুঝতে পারলুম রাস্তার লোক-চলাচল আরম্ভ হয়েছে। ভেতর থেকে মা আমায় ডাকলেন, "কুমু, দিনী—"

"যাই, মা—"

ভেতরে যাওয়ার পরে মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "অত ভোরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী দেখছিলি?"

"এমনিই দাঁড়িয়ে ছিলাম—বোধহয় রাস্তার লোক দেখছিলুম।"

"না, এ অন্যায়।"

"কেন মা?"

"তুই যে বড় হয়েছিস কুমু, বারো পেরিয়ে গেছিস।"

"বারো! তাই তো—" এই ব'লে অতিবড় এক ভাব-গম্ভীর দার্শনিকের মতো আমি সেখান থেকে চ'লে এলুম। কি আশ্চর্য, গতকালও তো আমার বারো-বছর বয়েস ছিল, কিন্তু কই, কেউ তো আমায় বারো-বছর বয়েসের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়নি! রাস্তার লোকের সঙ্গে বারো-বছর বয়েসের ঠিক কোন্ জায়গায় যে বিরোধ ঘটেছে, সেই কথাটা বোঝবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলুম। আর বিশেষ ক'রে কালকের বারো-বছরের সঙ্গে আজকের বয়েসটা যে এত বেশি শত্রুতা ক'রে বসবে তেমন কথা উপলব্ধি করা সেদিন আমার কাছে সহজ ছিল না।

যেমন প্রতিদিন ইস্কুলে যেতুম, সেদিনও জামাকাপড় প'রে ইস্কুলে যাওয়ার জন্যে খাবার ঘরে এসে ব'সে পড়লুম। পাশের ঘর থেকে মা আমায় দেখছিলেন। তিনি এ-ঘরে এসে বললেন, "তোর আর ইস্কুলে যাওয়ার দরকার নেই।"

"কেন মা?"

"তুই যে এখন বড় হয়েছিস, কুমুদিনী।"

"সেকি, আজ যে আমাদের প্রাইজ দেওয়া হবে! আমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি। আমাদের হেড-মিস্ট্রেস রানীদি কত খুশী হবেন—তিনি আমায় ভীষণ ভালবাসেন।"

"ভালবাসা তো বাড়িতে তুই যথেষ্ট পাচ্ছিস—"

"মা—"

"না, বাড়িতে যদি ভালবাসা তোর ভাগে কিছু কম পড়ে, আমায় তাহ'লে তুই খবর দিস।"

"আমি যে আজ প্রাইজ পাব, মা।"

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মা বললেন, "না, তা হয় না। তোর বাবা আজ দোকান থেকে তোর জন্যে অনেক বই কিনে নিয়ে আসবেন।"

তবুও শেষবারের মতো চেষ্টা ক'রে বললুম, "প্রাইজের বইতে যে আমার নাম লেখা থাকবে।"

"তাহ'লে খোকাকে পাঠাব। সে গিয়ে বইগুলো সব নিয়ে আসবে।"

"কিন্তু রানীদি খুবই দুঃখ পাবেন—"

"দশজনের দুঃখটাও আমাকে দেখতে হয়, কুমু। হাতে আর বেশি সময় নেই আমাদের। দু'এক বছরের মধ্যে তোর বিয়ে হয়ে যাবে। এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।"

মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলুম খাবার ঘরে। আমার চোখের সামনে চেয়ে দেখি মস্তবড় একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাই নবনীতা, বলতে পারিস, সেই জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মধ্যে সেদিন কোন্ প্রশ্নটা আমাকে সবচেয়ে বেশি লজ্জা দিয়েছিল?

আমাদের ঘড়িতে যখন এগারোটা বাজল, তখন আমি ড্রইংরুমে ব'সে ছিলুম। ইস্কুলের একটা ছবি আমি যেন ঘরে ব'সেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলুম। রানীদি বার বার ফোন ক'রে খোঁজ নিচ্ছেন, কুমুদিনী এল কিনা। ভ্রমর, ইরা, নলিনী হয়তো আমার আগমন-প্রতীক্ষায় পথের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবলই নিরাশ হ'য়ে পড়ছে। আমাদের স্কুলের ঝি-দাই আমার কাছে মোটা বকশিশ পাবে ব'লে কত আশা ক'রে ব'সে আছে। কিন্তু সুনন্দা নিশ্চয়ই খুশী হবে। সে আমার সঙ্গে পরীক্ষায় প্রথম হ'তে পারত না ব'লে কত দুঃখ করত। সে যদি আমার এই বারো-বছরের দুর্ঘটনার খবরটা জানতে পারে, তাহ'লে আমি জানি, সুনন্দা আজ সবাইকে পেট ভ'রে খাইয়ে দেবে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে বারো-বছরের আবর্তে খেই হারিয়ে ফেলবে সে-কথা কল্পনা করা সুনন্দার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি তিনটে বেজে গেছে। স্কুলের ছুটি হ'য়ে গেল। আজ তো আমার অনেক গেল। জীবনের ঘড়িতে কতবারই তো তিনটে বেজেছে, কিন্তু বারো-বছর বয়সে সেই যে একবার তিনটে বেজেছিল সে-কথা ভেবে আজও আমার চোখে জল আসে।

আমাদের পরিবারের কথা তোর মনে আছে কি? বাবার সঙ্গে তোর তো একবার আলাপ হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর সঙ্গে আমারও শুধু আলাপই ছিল, গভীরভাবে পরিচয় কোনোদিনই হয়নি। মায়ের কাছে শুনতাম, বাবা জমিদার। বড় জমিদারি তাঁর ছিল না, অথচ প্রজা-শাসনের নাম ক'রে বাবা বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। ভেতরের [illegible] মা জানতে পেরেছিলেন অনেকদিন আগেই। মুখ বুজে সহ্য করতেন সব। রে বুঝতে পেরেছিলাম, মুখ বুজে সহ্য করার অভ্যাসটা সামাজিক শিক্ষার অংশ। পুরুষমানুষের সাত খুনও মাপ।

এখন আমি আবার ফিরে যাচ্ছি উনিশ শো পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দে। ইস্কুল থেকে নাম কাটা গেছে আমার। প্রাইজের বই সব সেখানেই প'ড়ে রইল। আমার ছোটভাই অমলেশকে মা পাঠাতে চেয়েছিলেন রানীদির কাছে। আমি যেতে দিইনি।

সন্ধেবেলা একদিন রাজুদা এল। রাজুদার ভালো নাম সুব্রত সরকার। রাজুদার বাবা ছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু। সেইজন্যে ছেলেবেলা থেকেই রাজুদা আমাদের এখানে যাওয়া-আসা করত। মজুমদার-বাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে তার কোনোদিনই অনুমতির প্রয়োজন হ'তো না। কলেজে যাওয়া, বই পড়া, ক্রস-ওয়ার্ড পাজল্ মেলানো আর নিউ-মার্কেটে মাঝে মাঝে সওদা করা, এই ছিল তার জীবনের অত্যাবশ্যক করণীয় কাজ। অন্যদিনকার মতো এসেই সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "কি রে, চুপ ক'রে ব'সে আছিস যে?"

"শরীরটা ভালো নেই, রাজুদা।"

"তোদের গাড়িটা দেখলুম বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চল্, মার্কেট থেকে একবার ঘুরে আসি। শরীর ভালো হ'য়ে যাবে।"

"তুমি তাহ'লে একটু বোসো, মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।"

রাজুদা একটু বিস্মিত বোধ করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কই, আগে তো কখনো জিজ্ঞাসা করিসনি?"

"আজ আমার শরীর ভালো নেই, ডাক্তারের বারণ আছে। তুমি একটু অপেক্ষা করো, মায়ের অনুমতি নিয়ে আসি। হাজার হ'লেও ডাক্তারের কথা তো!"

"তোর এই ডাক্তারটি কে রে, কুমু?"

"মা নিজেই, রাজুদা।"

মুহূর্তের জন্যে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে। হয়তো তার ক্রস-ওয়ার্ড আর বই-এর রাজ্যে ডাক্তারের এই অপ্রত্যাশিত বিধিনিষেধ একেবারেই মনঃপূত হয়নি।

মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "রাজুদা এসেছে, মার্কেটে যাব?"

"না, মা—রাজুর সঙ্গে তোমার আর একা-একা বাইরে বেরুনো চলবে না।"

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব'লে ফেললুম, "কেন, প্রায়ই তো যেতুম তার-সঙ্গে।"

"এখন থেকে আর চলবে না।"

"কেন, মা? আমায় বুঝিয়ে দাও।"

"কুমুদিনী, এখন তুই বড় হচ্ছিস। আমাদের সমান ঘরে তোর বিয়ে হবে। এখন থেকে তাই তোকে একটু সামলে-সুমলে চলতে হবে, মা!"

তাই তো, সে-কথা যে একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম! আমি বড় হয়েছি। বারো-বছরের পর্বত-প্রমাণ বোঝা নিয়ে ভুইংরুমে ফিরে এসে বললুম, "না, রাজুদা, খাওয়া চলবে না। অনুমতি পাওয়া যায়নি।"

ভেতরের ব্যাপারটা সে হয়তো বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "হুম্, আজ একটা ক্রস-ওয়ার্ড পাজল্ কিছুতেই মেলাতে পারিনি। জীবনে এই আমার প্রথম পরাজয়।"

গম্ভীরভাবে রাজুদা আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আমি সেই অন্ধকার ঘরে ব'সে বারো-বছরের অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমের মধ্যে বোধহয় রাজুদার কথা ভেবে অনেকবার হেসে উঠেছিলুম! কী ছেলেমানুষ! একটা ক্রস-ওয়ার্ড্ পাজল্ মেলাতে পারেনি ব'লে জীবনের পরাজয়টাকে আমাদের ভুইংরুমে ব'সে আজ সে অতি অনায়াসেই স্বীকার ক'রে গেল। পুরুষমানুষের মুখে পরাজয় কথাটা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগত না। তাই ঘুমের মধ্যেও হেসে উঠেছিলুম আমি। বেচারা রাজুদা!

দুই

তুই এখন কলকাতায়। আমি অনেক দূরে। সেদিন মাঝরাতে কেন যেন তোর কাছে ছুটে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম। সেই কলকাতা—কত দীর্ঘদিন হ'য়ে ও-শহরের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়নি। একদিন কলকাতার আলো-বাতাসের সঙ্গে আমার এত বেশি নিবিড় পরিচয় হয়েছিল যে, কখনো ভাবতে পারিনি, এর সঙ্গে আমার আবার বিচ্ছেদ ঘটবে। তবুও তো বিচ্ছেদ ঘটেছে—তবুও তো এতগুলো বছর কলকাতাকে না দেখে থাকতে পেরেছি। অসংখ্য সুখ-দুঃখের স্মৃতি-বিজড়িত কলকাতার কথা ভাবতে আমার কান্না পায়। ও-শহরের বিরাট বিরাট রাজপথের পিচ-ঢালাই আবরণের নীচে দুর্বল ও অক্ষমের দীর্ঘশ্বাসগুলো চিরদিনের মতো বন্ধ হ'য়ে গেছে। নবনীতা, তুই লিখেছিলি, তোর বড়-মেয়ে রমলা সিনিয়ার কেমব্রিজ পাস ক'রে বিলেত যাচ্ছে। কত আনন্দের খবর বল্ তো? কী ভীষণ পরিবর্তন! পনেরো-বছরের মেয়েকে একা-একা বিলেত পাঠাচ্ছিস লেখাপড়া শেখাতে। কী সর্বনাশ! মাত্র পনেরো-বছর!

ঐ বয়েসে আমার জীবনে এক মস্তবড় সমস্যা এসে উপস্থিত হ'ল। আমার বাবা বড়লোক ছিলেন। সুতরাং পয়সার অভাব কাকে বলে আমি জানতুম না। আমাদের বাড়ির অনাবশ্যক চাকর-দারওয়ানের সংখ্যা থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, আমরা বড়লোক।

বারো-বছর বয়েস থেকে আমার হাতে বিশেষ কিছু কাজ ছিল না। ইস্কুলে যেতে হয় না। গানবাজনার ব্যবস্থা নেই। রাজুদা মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু বাইরে আর বেরুতে পারি না। এ যেন বারো-মাস ছুটির বৈচিত্র্যহীন একটানা অবকাশ। একতলা থেকে দোতলা, এবং পুনরায় দোতলা থেকে একতলা পর্যন্ত আমার যাওয়া-আসা সীমাবদ্ধ ছিল। কি ক'রে যেন এই সীমাহীন পৃথিবীটা অকস্মাৎ একদিন মজুমদার-বাড়ির দোতলা আর একতলার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল।

পুরো কাজল-মাসটা বাবা বাড়ি থেকে আর বেরুলেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাইরে থেকে লোকজন আসছিলেন। কে তাঁরা, কেন আসছিলেন, সে সম্বন্ধে আমি কোনো কিছুই জানতাম না। একদিন সন্ধেবেলা সুনন্দা এল। ওদের সঙ্গে আমাদের খানিকটা আত্মীয়তা ছিল। ওর বাবা প্রিয়নাথবাবু সরকারী চাকরি করতেন। চাকরিটা বেশ বড় ব'লেই শুনেছিলাম। একটু সাহেবী মেজাজের লোক তিনি। মা বলতেন—"প্রিয়নাথবাবু ব্রাহ্ম নন—তিনি শুধু ব্রাহ্মসমাজের আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করেন। বড্ড অনুকরণ-প্রিয়।"

দোতলার বারান্দায় ব'সে আমরা গল্প করছিলুম। এক ইস্কুল এবং একই ক্লাসে পড়তুম আমরা। ওকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কি এখনো ইস্কুলে পড়ছ?"

"হ্যাঁ, ভাই।"

"তোমার মা তোমায় বারণ করেননি?"

"শুধু মা নয়, ছোটপিসীও বলেছিলেন, আমার আর পড়বার দরকার নেই। কিন্তু বাবা ওঁদের কথায় কান দেননি। তিনি বলেছেন, আমায় বি-এ পাস করাবেন। বাবা বলেন যে, ছেলেদের মতো মেয়েদেরও লেখাপড়া শিখতে হবে। বাবা অনেকদিন বিলেতে ছিলেন কিনা।"

আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম "বলো কি! বি-এ পাস? সবাই তখন অবাক হ'য়ে যাবে।

"তুমি পড়া ছেড়ে দিলে কেন? তোমার কথা রানীদি প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন। ইরা বলছিল, তোমার নাকি বিয়ে হবে?"

"ধ্যেৎ! ইরা তো ভারি দুষ্টু! কই, আমি তো জানি না আমার বিয়ের খবর? রানীদি কী ভাবলেন বলো তো?"

তিন বছর হ'ল আমি আর ইস্কুলে যাই না। সুনন্দা বলল, "ইস্কুলের বুড়ী-দাইটা নাকি মারা গেছে। গত তিন-বছরে মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক—" সুনন্দা বলছিল আর আমি তন্ময় হ'য়ে ইস্কুলের গল্প শুনছিলুম। তিন বছরের মধ্যে ইস্কুলটায় এত বেশি পরিবর্তন হ'ল, অথচ আমার কিছু হ'ল না। জিজ্ঞাসা করলুম, "আমাদের ক্লাসে আজকাল তুমিই তো প্রথম হচ্ছ, সুনন্দা?"

"না। মধুর সঙ্গে পেরে উঠলুম না। ওর মতো চব্বিশ-ঘণ্টা আমি বই নিয়ে ব'সে থাকতে পারি না। রানীদি বলেন, মধু হচ্ছে বুক-ওয়ার্ম। এ বছর সে মোটা মোটা প্রাইজের বই পেয়েছে। ভালো কথা, রানীদির কাছে তোমার সেই প্রাইজের বই সব জমা রয়েছে। খোকাকে পাঠিয়ে বইগুলো আনতে পারো তো?"

বললুম, "কী হবে প্রাইজ দিয়ে? আমি তো আর লেখাপড়া করি না।"

"চলি, ভাই—" সুনন্দা উঠে পড়ল, "বাবা এসেছেন।"

"কোথায় তিনি?"

"তোমার বাবার সঙ্গে গল্প করছেন। গল্প মানে—" হঠাৎ থেমে গেল সুনন্দা। ইচ্ছে ক'রেই বেশ একটু রহস্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করল সে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী গল্প, ভাই?"

মুচ্‌কি হেসে সুনন্দা বলল, "ফরিদপুরের এক জমিদার বাবাকে অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখেছেন—মানে, তাঁর ছেলের সঙ্গেই—। চলি, ভাই। বড্ড দেরি হ'য়ে গেল।"

কী যে ভাবছিলুম ভগবান জানেন। পেছন দিকে চেয়ে দেখি রাজুদা এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুনন্দা সেখানে নেই।

বললুম, "বোসো। আজকাল যে আমাদের এখানে আসা একেবারে ছেড়েই দিয়েছ? বড্ড শুকিয়ে গেছ। ভালো আছ তো তুমি?"

"হ্যাঁ—ভালোই আছি।"

"তবে আসো না কেন?"

"লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। পরীক্ষায় ফল ভালো হওয়া চাই। আমাদের তো জমিদারি নেই [illegible] হয়।"

"সে-কথা ঠিক। তোমার রোজগার করতে হবে। বি-এ পড়ছ, কম কথা নয়। কিন্তু একটা কথা আমার বার বার মনে হয়—মনে হয়, আবার সেই পুরনো ইস্কুলে ছুটে চ'লে যাই, গিয়ে ব'সে পড়ি বই নিয়ে। রাজুদা, চেষ্টা করলে আমিও একদিন বি-এ পাস করতে পারতুম।"

রাজুদা হাসতে হাসতে বলল, "সে আর এমন শক্ত কাজ কী! তুমি তো লেখাপড়ায় খুবই ভালো ছিলে।"

হঠাৎ কি যেন মনে হ'তেই রাজুদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, আজকাল তো তুমি ক্রস-ওয়ার্ড পাজল্ সম্বন্ধে আমায় কিছু জিজ্ঞেস করো না? নিজেই সব করো বুঝি?"

"ও-সব ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন?"

"ভা-রি শক্ত মনে হয় আজকাল। অনর্থক সময় নষ্ট ক'রে আর লাভ কি? আজকাল তো নিউ-মার্কেটেও যাই না।"

"সেইজন্যেই বুঝি আমাদের এদিকে আর পথ মাড়াও না?"

"ঠিক তা নয়—তবে কি জানো, তোমাদের বিরক্ত করতে চাই না। অনেক কাজ-টাজ থাকে তোমাদের।"

"রাজুদা, আমার তো সময়ের কোনো মূল্যই নেই। যদি সময় পাও, তবে মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে যেয়ো।"

চ'লে গেল রাজুদা। আমি বারান্দায় ব'সে রইলাম। একটু বাদেই দেখলাম, সুনন্দা আর তার বাবার সঙ্গে রাজুদাও গাড়িতে উঠে বসল।

আরও ক'টা দিন পার হ'য়ে গেল। মা কিংবা বাবার মুখ থেকে আমার বিয়ের খবর কিছু শুনতে পেলুম না। মাঝে মাঝে মা আর বাবা বিকেলের দিকে বাইরে বেরিয়ে যেতেন। অমলেশের কাছে শুনতুম, তাঁরা নাকি আমার বিয়ের জন্যে জিনিস-পত্র কেনাকাটা করছেন। মনে-মনে হাসতুম আমি, বিশ্বাস করতুম না। জিনিসগুলো যখন আমার ব্যবহারের জন্যেই কেনা হচ্ছে তখন আমার পছন্দ-অপছন্দের কথা নিশ্চয়ই তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন একবার।

ঠিক এইরকম সময়ে একদিন খবর পেলুম, রাজুদা মোটর-চাপা প'ড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তিন বছর পরে কেন যেন সে নিউ-মার্কেট যাচ্ছিল। এবং সেই মার্কেটে

যাওয়ার পথেই এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। মা বলছিলেন, কাল আমার জন্মদিন। পনেরো পেরিয়ে ষোলোয় পা দেব আমি।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা আর বাবা তাকে দেখতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। মায়ের আশপাশ দিয়েই আমি ঘোরাঘুরি করছিলাম। ভেবেছিলাম, মা আমাকেও সঙ্গে নেবেন। সেইদিনই আমি প্রথম অনুভব করলুম, রাজুদার জন্যে আমারও ভাবনার অন্ত নেই। খুব ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি, সেই মুহূর্তে, ছুটে রাজুদার কাছে চ'লে যাই। শেষপর্যন্ত মাকে ব'লে ফেললুম, "মা, আমাকেও তোমরা নিয়ে চলো।"

"না। তোর যাওয়ার কোনো দরকার নেই। খোকা রইল বাড়িতে।"

প্রায়ই খবর পেতুম রাজুদা আমায় দেখতে চাইছে। খবর এনে দিয়ে যেত সুনন্দা। রাজুদাকে একবারটি দেখবার জন্যে ছটফট করতে লাগলাম। একবার আমার কী ভীষণ অসুখ হয়েছিল। সকাল-সন্ধ্যায় রাজুদা এসে প্রত্যেক দিন আমাকে দেখে যেত। আজকে যখন তার এতবড় বিপদ, তখন আমারও কি একবার যাওয়া উচিত নয়? তুই হ'লে কী করতিস, নীতা?

একসপ্তাহ পরে রাজুদা খানিকটা সুস্থ হ'য়ে উঠল। সুনন্দাই খবর দিল আমায়। বিকেলের দিকে সে এসেছে আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে। সুনন্দার আজ জন্মদিন। রাত্রিতে ওদের বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল আমার। গাড়িতে উঠে বসলুম আমরা।

অনেকদিন পর বাইরে বেরিয়ে মনে একটা অসীম তৃপ্তি এল। আমরা দুজন ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই। সুনন্দাদের গাড়িটা বেশ বড়। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা স্বাধীন ও মুক্ত। কিছুক্ষণের জন্যে আকাশের আলো-বাতাসের-সঙ্গে আমাদের তুলনা করা চলবে, জীবনের এই পরম সৌভাগ্যের মুহূর্ত-ক'টিকে আজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে হবে। একবার মনে হ'ল, সুনন্দাকে বলি রাজুদার বাড়ি যাওয়ার জন্যে। অনুরোধ করলে সুনন্দা হয়তো তা রাখবে। মাত্র দু'মিনিটের জন্যে রাজুদাকে একবার দেখে আসতে চাই। কিন্তু সুনন্দাকে কোনো-কিছুই বলতে পারলুম না। দু-তিনটে রাস্তা পার হ'য়ে গেলুম আমরা। ফোর্ড-গাড়িটা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে। নতুন নতুন রাস্তা চোখে পড়তে লাগল। সুনন্দাদের বাড়ি আমি চিনি—রাস্তাও চেনা। তবে কি সুনন্দা আমায় ভুল-পথে নিয়ে এল? তবে কি সে আমায় রাজুদার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে?

হঠাৎ পার্ক সার্কাসের মোড়টা চোখে পড়ল আমার। সুনন্দাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "এ কোন্ রাস্তা?"

"পার্ক সার্কাস।" জবাব দিল সুনন্দা।

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

পার্ক-সার্কাসের ঐ জনাকীর্ণ রাস্তার দিকে মুখ ক'রে সুনন্দা বলল, "ঝাউতলা—রাজুদার বাড়ি।"

নবনীতা, বুঝতে পারছিস, ফোর্ড-গাড়িটার কাছেও ধরা প'ড়ে গেলুম? সত্যিই তো, আমার মনটা যে ঝাউতলা-রোডে অনেকক্ষণ আগেই পৌঁছে গেছে, সে-কথা কি ক'রে অস্বীকার করি ভাই? ভাবলুম, গাড়িটাকে আমিই যেন রাজুদার বাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি। ড্রাইভার কিংবা স্টীয়ারিং-এর সাধ্যই নেই এর মুখ এখন ভবানীপুরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার।

অচেনা-পথের আকর্ষণ বেশি ব'লেই না অচেনা-পথে ভয় বেশি।

ভয় আমি পেলুম। রাজুদাকে দেখতে খুবই ইচ্ছে করছিল সত্যি, কিন্তু এমনি ক'রে লুকিয়ে আসবার জন্যে মন কি আমার প্রস্তুত ছিল? এই অভিসারের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার মতো মন আমার তখনও তৈরি ছিল না।

ঝাউতলা রোডে গাড়ি এসে থামতেই সুনন্দাকে বললুম, "না ভাই, ফিরে চলো।"

বিস্মিতভাবে সুনন্দা বলল, "সেকি, রাজুদা যে তোমায় দেখতে চাইছে!"

"না, না, তা হয় না। এ যে অসম্ভব, সুনন্দা!"

"অসম্ভব কেন? এসেই তো পড়েছি। রাজুদাকে না দেখে ফিরে যাওয়া চলে না।" সুনন্দার গলার সুর যেন খানিকটা কর্কশ। চোখে-মুখেও ওর নতুন ভঙ্গী।

তবুও আমি বললুম, "বেশ, তাহ'লে তুমি নিজে গিয়ে একবার দেখে এসো।"

এবার সে মিনতির সুরে বললে, "এসেই যখন পড়েছি তখন চলো তাকে একবার দেখে যাই। বেচারা রাজুদা!"

মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। শেষপর্যন্ত যেতেই হ'ল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, গাড়ি থেকে নামবার সময় পা আমার কেঁপে উঠেছিল।

বিছানায় শুয়ে ছিল রাজুদা। আমাকে দেখে তার কী আনন্দ! কিন্তু সুনন্দার চোখে এত উল্লাসের রং লেগেছে কেন? ওর দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভয়ে আমার নিজের মুখ

শুকিয়ে গেল। ভেতরের রহস্য আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না।

বিছানার পাশেই ব'সে পড়লুম আমি। রাজুদা বলতে লাগল, "সেদিন বড্ড বেশি অন্যমনস্ক হ'য়ে পথ হাঁটছিলুম। তোমার জন্মদিনের জন্যে কি-একটা জিনিস কিনতে মার্কেটে যাচ্ছিলুম। কেনা হ'ল না। উপরন্তু এই বিপদ ঘাড়ে নিয়ে বাড়ি ফিরতে হ'ল। কারা যে রাস্তা থেকে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে তাও জানি না।"

বললুম, "তাতে কি হয়েছে, আসছে বছর আমার তো আবার জন্মদিন হবে।"

"হবে আমি জানি। কিন্তু সে যে অনেক দেরি, কুমু। তিন শো পঁয়ষট্টি দিনের ব্যবধান—" এই ব'লে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

বললুম, "ভয়ের কিছু নেই আর। তাড়াতাড়ি ভালো হ'য়ে ওঠো এবার। ভালো হ'য়ে উঠে আমাদের বাড়ি একবার এসো কিন্তু। অনেক কথা হয়েছে, রাজুদা। এখন চলি—"

আমি লক্ষ্য করছিলুম, বাইরের দরজার দিকে নন্দা বারে বারে দৃষ্টি ফেলছিল। হঠাৎ যেন সে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। আমি উঠে পড়লুম এবার। দরজার কাছে গিয়ে নন্দাকে বললুম, "তুই ব'সে রইলি কেন, চল্—" এই ব'লে যেই আমি ঘর থেকে বেরুতে যাব, ঠিক সেই সময়ে আমার মা আর বাবা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের পেছনে দেখলুম নন্দার বাবাও এসে দাঁড়িয়েছেন।

নবনীতা, দৃশ্যটা একবার কল্পনা করতে পারিস? আজ আমার এই বয়েসেও সেদিনের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলে শরীরে কাঁপুনি ওঠে।

নন্দার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে নন্দা, কুমুকে এখানে নিয়ে এসেছিস কেন? তোর অন্য বন্ধুরা সব তোকে খোঁজাখুঁজি করছে। ব্যাপারটা কী?"

নন্দা এবার অত্যন্ত স্পর্ধার জবাব দিল, "কুমু এখানে আসতে চাইল কিনা, তাই।"

মা আমায় ডাকলেন, "কুমুদিনী—"

"হ্যাঁ মা, নন্দার কোনো দোষ নেই। আমিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি। চললুম, রাজুদা। ভালো হ'য়ে গেলে, একদিন এসো কিন্তু।"

সেদিন আর নন্দাদের ওখানে বেড়াতে যাইনি। বাড়ি ফিরে এসে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে খুব কেঁদেছিলুম। কিন্তু কার জন্য যে এত ক'রে কাঁদলুম বলতে পারিস, নীতা? রাজুদা, নন্দা, না আমার নিজের জন্যে? সেদিনকার কিশোর-মাটিতে যে-প্রশ্নের বীজ হাওয়ায় উড়ে পড়েছিল, সে-বীজ আজ বত্রিশ-বছর বয়েসে পর্বতপ্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মতো অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। কিন্তু একটা প্রশ্নেরও সমাধান আজও আমি খুঁজে পাইনি। এই দীর্ঘদিন ধ'রে যার অন্বেষণে এমন ক'রে ঘুরে বেড়ালুম, তার পেছনে সেই একই প্রশ্ন। এই প্রশ্নটাই জীবনে কতবার কত রকম ভাবে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে সে-কথা বলতে গেলে পুরো কাহিনীটাই তোকে লিখতে হয়। লিখবও। আজ নয়, অন্য একদিন।

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। আমার বাংলোর বারান্দা থেকে দূরের পাহাড়গুলো বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। প্রকৃতির মধ্যে কোথাও একটু চঞ্চলতা নেই। পাখি গান গাইছে, তাতে বিন্দুমাত্র কর্কশতা নেই। এই সবে রোদ উঠল, তাতে তিলমাত্র ঝাঁঝ নেই—বাতাস বইছে, তাতেও বিন্দুমাত্র তীব্রতা নেই। ঐ-যে দূরে পাহাড়ের মাথাগুলো উঁচু হ'য়ে আছে, তাতেও রুক্ষতা কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বচ্ছ আকাশের ভাবগম্ভীর মূর্তি আজ আমার মনে কী গভীর সান্ত্বনা এনেছে! কিন্তু এই সমস্যাহীন প্রকৃতির বুকে এত উন্মাদনা কেন? এমন একটা পৃথিবীর বাতাসের মধ্যে মনটাকে পুরোপুরিভাবে মিশিয়ে দিতে পারছি না কেন? বার বার ক'রে সেই পুরনো সমস্যার দিকে ছুটে যেতে চাই। সত্যিই, জীবনের এই বিস্ময়কর কার্য-কারণের অর্থ খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। তাই আবার আমি পনেরো-বছর বয়েসে ফিরে যাচ্ছি।

আগের চিঠিতে তোকে লিখেছিলুম, পনেরো পার হ'য়ে গেছি। মজুমদার-বাড়ির দোতলার ঘরে ব'সে শুধু দেহটারই উন্নতি হয়নি, মনের জটিলতাও বেড়েছে অনেক। ভাববার, বুঝবার এবং অনুভব করবার জন্যে মনটা ছটফট করে। সেদিন রাজুদার বিছানার পাশে গিয়ে ব'সেছিলুম আমি। কপালে হাত রেখেছিলাম তার। কি-যে ঘটল বুঝতে পারলুম না। দেহ এবং মনে একটা নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম হ'ল। ধরা দিতে চাইলুম রাজুদার কাছে। রাজুদা আমায় গ্রহণ করুক, নিয়ে যাক, ব্যবহার করুক—তারপর যদি ফেলে দেয় তো দিক, ভুলে যায় তো যাক, অনুতাপ আমি করব না। অনুযোগ তো দেবই না। তবে ছিল রাজুদা। সব-মতো একটা মৌলিক, ছিপছিপে

রোগা-মতো একটা লোক, সব মিলিয়ে ক্ষুদ্র একটা পরিবেশ—তবুও, তবুও বার বার ক'রে আমার মনে হ'তে লাগল, এইটুকু পরিবেশের মধ্যেই আমার সার্থকতার বীজ লুকানো রয়েছে, এর বাইরে আমার মুক্তির কোনো পথ নেই। কৈশোর পালিয়ে গেল, হারিয়ে গেলুম আমি। প্রতি পদে পদে গড়ে ওঠা পনেরোটা বছরের রক্ত-মাংস পর্যন্ত রূপান্তরিত হ'ল। নতুন রক্তের নতুন মাংসের অনুভূতি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না। এতকাল নারীগর্ভে তবু পলিমাটি পড়ছিল, পনেরোটা-বছরের পলি—তারপর হঠাৎ আমার মন-মতো ঐ চৌকির ওপর বীজের মাথাটা জেগে উঠল যেন! আমি সেই বীজ, পলিমাটি ব'য়ে ব'য়ে ওপর-দিকে জেগে উঠেছি। পরিচয় আমার নতুন, আমি নারী। ক্ষুদ্র এই পরিবেশের বাইরে আমার পরিণতির আর পথ নেই। ছাউতলা আমার নারী-জীবনের শুরু।

মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জমতে লাগল। জবাব খোঁজবার চেষ্টা যে করিনি তা নয়। কিন্তু সংস্কার ও সামাজিক অনুশাসনগুলো পাহারাওয়ালার মতো সব সময় আমায় সতর্ক ক'রে দিত। সত্যিই তো, এতটুকু মেয়ে কতটুকুই বা জানে আর কতটুকুই বা বুঝতে পারে? হয়তো সামাজিক অনুশাসনগুলোই উচ্ছৃঙ্খল হ'তে দেয়নি। মায়ের মুখে 'সমাজ' কথাটা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু ও-জিনিসটা যে কী, তা আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতুম না। বারো-বছর বয়েস থেকে 'সমাজ' কথাটা আমার মনে ভৌতিক জগতের ভীতি এনে দিয়েছিল। কথাটা কানে এলেই আমার হাত-পা সব যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত। অন্ধকার রাত্রিতে যেন ভূত দেখে চমকে উঠতুম আমি। ভেবে হয়তো আশ্চর্য হ'বে রাত্রির [illegible] যে, যারা বিশ-ইঞ্চি দেওয়াল-ঘেরা, মহলোয়ার-বাড়ির দোতলার ঘরে নিরাপদে বাস করছে তাদের আবার ভূতের ভয় কেন। ভূত তো বাইরে, শ্মশান আর বাঁশবনের আশেপাশে বসতি করে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তোকে আমি বলতে পারি যে, যারা ভূতকে সত্যিই ভয় করে, তারা বাইরে এবং ভেতরে কোনো স্থানেই ভৌতিক ভীতি থেকে নিষ্কৃতি পায় না। সমাজ সম্বন্ধে এই আমার নিরপেক্ষ অভিমত। ভেতরে যদি মরো তবে খুব আঁটকে অন্ধকারে মরবে, আর বাইরে যদি মরো তাহলে খোলা আকাশের নীচে পরম ব্যাপ্তির অনুভূতি নিয়ে মরতে পারবে। ফল হিসেবে দুটোই এক। অর্থাৎ সেই মরণ তোমার হ'লই।

এর পরে আরও ক'টা মাস পার হ'য়ে গেল। শুনেছি, সুনন্দা ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সেই বাবুদার বাড়ির ঘটনার পরে সে আর আমাদের এখানে আসেনি। দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। মাঝে মাঝে সুনন্দার কথা মনে হয়। জানতে ইচ্ছে করে। কলেজে পড়তে কেমন লাগছে ওর। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল ওর ভালো হয়নি। মায়ের কাছে শুনেছি, দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে সে। তা হোক, তবুও আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মুখে ওর সুখ্যাতি খুব শুনতে পাই।

একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা সুনন্দা এসে উপস্থিত হ'ল। আমি যেন হাত দিয়ে স্বর্গ ছুঁয়ে ফেললুম। কলেজের খবর জানবার আগ্রহের চেয়ে বাবুদার খবর জানবার আগ্রহ ছিল বেশি। ওকে নিয়ে এসে বসলুম ড্রইংরুমে।

সোফার ওপর এলিয়ে ব'সে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছিস, রুনু? আসব আসব ক'রেও এতদিন আসতে পারিনি। বল্, কেমন আছিস ভাই?"

গলার স্বরেও ওর অস্বাভাবিকতা। মনে হ'ল, আমি কেমন আছি তা সে জানতে চাইছে না। ও যে নিজে ভালো নেই সেই খবরটাই সুনন্দা আমাকে জানাতে চাইছে। সন্দেহ দূর করবার জন্যেই আমি বললুম, "আমি তো ভালোই থাকব। কারণ কিছু নেই—খারাপ থাকবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তুই কেমন আছিস? কলেজ কেমন লাগছে?"

জবাবটা এড়িয়ে গেল সুনন্দা। সে বলল, "এই দ্যাখ্, আসল খবরটা তোকে দেওয়া হয়নি। তোর বিয়ে পাকা হ'য়ে গেছে। ছেলেটি খুব ভালো। ফরিদপুরের এক জমিদারের ছেলে। নামটা যেন কী? এই যাঃ—" এই পর্যন্ত ব'লে সুনন্দা স'রে ব'সে শিস দিতে লাগল। যেন শিস দিয়ে নামটাকে ডেকে ফিরিয়ে আনছে সে। তারপর যেন আকর্ষণশক্তির শেকল দিয়ে নামটাকে বেঁধে রেখে সুনন্দা বলল, "প্রিয়তোষ।"

"প্রিয়তোষ? সে কে?"

"আমার জামাইবাবু। তোমার স্বামী। বি-এ পড়ছে। কোন্ একটা কলেজে যেন পড়ে। আচ্ছা, এক মিনিট—" আবার শিস দিতে লাগল সুনন্দা। তারপর শাড়ির আঁচলটা বুকের ওপর লেপটে দিতে দিতে হঠাৎ ব'লে উঠল, "বিদ্যাসাগর। অনেক পয়সা। রূপের খ্যাতি ওর ছেলেবেলা থেকেই ছিল। বংশটা ঐতিহাসিক। ইংরেজ আমলে প্রিয়তোষই প্রথম বি-এ পাস করবে

—চৌধুরী-বংশের একমাত্র গ্রাজুয়েট। তোর পছন্দ হবে খুব।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "আমার রূপ আর পারিবারিক সম্পদের কথা ওঁরা জানেন?"

"হ্যাঁ।"

"কি ক'রে? ওঁরা তো আমায় দেখেননি?"

"আমার বাবার ওপর নির্ভর করেছেন ওঁরা।"

"প্রিয়তোষ আমায় দেখবে না?"

"ছিঃ, বলিস কি! আমাদের সমাজে ওসব চল্ নেই।"

বললুম, "ব্যস্, বুঝে গেছি, আর বলতে হবে না।"

সুনন্দা আমার অজ্ঞতার জন্যে সহসা যেমন লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল, তেমনি পুনরায় কথাটা আবার এত সহজে বুঝতে পারলুম ব'লে একমুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। সে বলল, "সত্যি ভাই রুমু, শিগ্‌গীরই একটা নেকলেস পাচ্ছি তাহ'লে?"

"তোমার বিয়ে হবে না, নন্দা?"

"এখনো দেরি আছে। আগে বি-এ. পাস করি, তবে তো। ও হাঁ, ভালো কথা মনে পড়ল—" এই ব'লে উঠে পড়ল সুনন্দা, "কালকে হঠাৎ রাজুদার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। তোর বিয়ের খবর শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল সে।"

"বলিস কি! পা-এর ঘা সব শুকিয়ে গেছে?"

"বোধহয় শুকিয়ে গেছে। একটা কথা মনে রাখিস, রুমু, প্রিয়তোষবাবু পাত্র হিসেবে পয়লা-নম্বর। যে-কোনো মেয়ে লুফে নেবে। যতই কেননা বলিস, বংশের দিক দিয়ে দেখতে গেলে রাজুদা আমাদের সমান তো নয়। বরং ছোটই হবে।"

সুনন্দা চ'লে গেল। এগিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি আর একতলাতেও নামলুম না। চুপ ক'রে ব'সে রইলুম কিছুক্ষণ। ব'সে ব'সে সুনন্দার কথাই ভাবতে লাগলুম। সে নাকি রাজুদাকে ভালবাসে! অথচ তার সম্বন্ধে এমন একটা বিশ্রী কথা বলতে ওর মুখে একটুও আটকালো না।

সত্যিকথা বলতে কি, সুনন্দার ভালবাসা নিয়ে আমার একটুও দায় ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হ'তো, ওকে আমি চিনিও না। একখণ্ড মেঘের মতো হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়, আবার চ'লেও যায় হঠাৎ। স্থায়ী পরিচয়ের কোনো চিহ্ন রেখে যায় না।

এখন আমার মনে হচ্ছে সেদিন সে আর যা-ই ব'লে গিয়ে থাকুক, একটা সত্যিকথা সে ব'লে গিয়েছিল। আমার বিয়ের কথা। সত্যিই বিয়ে আমার পাকা হ'য়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য হওয়ার কথা। আমার বিয়ের খবর আমার আগে সুনন্দা জানে। জেনেছে রাজুদাও।

এবার সব কেনাকাটা পুরোদমে শুরু হয়েছে। গহনা সব আগেই কেনা হ'য়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে মা অবিশ্যি বলতেন আমায় তাঁর সঙ্গে বাজারে যাওয়ার জন্যে। আমার পছন্দসই দু'চারটে জিনিস যে তিনি কিনতে চাননি তা-ও নয়। কিন্তু জিনিসের প্রতি আমার আর লোভ ছিল না। দু-একশো-ভরি-সোনার চেয়ে রাজুদার মূল্য ছিল অনেক বেশি।

বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, আমিও ব্যাকুল হ'য়ে উঠতে লাগলুম তত বেশি। এ ব্যাকুলতা আমার রাজুদার জন্যে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম, রাজুদাকে আমি ভালবাসি। তার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে, আমি অপরের সঙ্গে ঘর করতে চ'লে যাচ্ছি। আর আমায় সে দেখতে পাবে না। অপরের সঙ্গে বিয়ে হওয়া মানেই আমি মরলুম। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আমি আবার নতুন ক'রে জন্মাব। সে এক অচেনা কুমুদিনী—তার সঙ্গে রাজুদার পরিচয় থাকবে না।

সুনন্দাকে একদিন খবর পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে এলুম। বললুম তাকে, "তোর কাছে আজ আর কিছু গোপন করব না, নন্দা। তুই নিশ্চয় জানিস রাজুদাকে আমি ভালবাসি।"

সুনন্দা বলল, "এসব সাংঘাতিক কথা বলিসনি, রুমু! বিয়ের ব্যাপারটা নিতান্তই সামাজিক। ভালবাসতে হয়, দূর থেকে শ্বশুরবাড়ি ব'সে ভালবাসবি।"

"বিয়ের পরে রাজুদাকে দূর থেকে ভালবাসার অধিকার সমাজ আমায় দেবে কি? এ-কথা কি তুই জোর ক'রে বলতে পারিস?"

সুনন্দার জোর যে কতটা এবং কেন, সে-কথা আমি জানতুম। একটু থেমেই সুনন্দা বলল, "দেবে, নিশ্চয়ই দেবে। তা ছাড়া দূর থেকে ভালবাসাই হচ্ছে আসল ভালবাসা। আজকাল আমি ইংরেজী সাহিত্য পড়ছি যে, রুমু।"

"কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্য থেকে নজির বার করতে পারিস?"

"ভেরি, সরি—সত্যিই আমি বোকা ব'নে গেলুম। দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আমার কোনো আইডিয়া নেই।"

"কেন?"

"বোধহয় ইংরেজী ভাষায় এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা হয়নি ব'লে।"

সুনন্দা যে কলেজে পড়ছে সেই কথাটাই বার বার ক'রে স্মরণ করলুম আমি। স্মরণ করাবার চেষ্টা করতে লাগল সুনন্দা নিজেই।

শেষপর্যন্ত ওকে আমি অনুরোধই করলুম, "রাজুদা তো আজকাল আমাদের বাড়ির পথ মাড়ায় না। তাকে একবার আমার হ'য়ে বলিস যে, সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। খুব জরুরি। সম্ভব হ'লে আজকেই যেন আসে।"

"কেন, ইলোপ করবি বুঝি?"

"যদি করি তাহ'লে তোকে আগে থেকে বলব কেন?"

"তা ঠিক। ব'লে-ক'য়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ইলোপ করা যায়ও না—" উঠে পড়ল সুনন্দা, "কাল তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল। শুনলুম, তার পরীক্ষা এসে গিয়েছে খুব সামনে। লেখাপড়া নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। বৃত্তি-পাওয়া ছেলে তো! তোর কথা তাকে বললুম বার-কয়েক। কান-ই দিলে না। ব্যাপারটা কি জানিস, ঝুনু? সে অবিশ্যি তোকে [illegible] ভালো—"

"থাক্ ভাই, অতটা কষ্ট করবার দরকার নেই। তুই শুধু রাজুদাকে গিয়ে খবরটা দিয়ে আয় যে, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। নষ্ট করবার মতো হাতে আর সময় নেই।"

"বেশ, এ আর এমন শক্ত কাজ কী। চললুম—কিন্তু—থাক্—" এই ব'লে সুনন্দা দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে।

ওর চোখের দৃষ্টি আমার ভালো লাগল না। সত্যিই কি সে আমার সাহায্য করবে? আর ও যদি না করে, করবেই বা কে? সে-দুঃখ ধীরে ধীরে মনের মধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছে, তাকে মুক্তি দিয়ে বুকটাকে হালকা করতে চেয়েছিলুম সুনন্দার কাছে। ভেবেছিলুম সে-ই আমার একমাত্র বন্ধু। বনলীতা, তুই হয়তো প্রশ্ন করবি এতটুকু মেয়ের আবার দুঃখ আসে কি ক'রে? যার অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত ছোট, তার মনের মধ্যে এত বেশি দুঃখ জ'মে উঠল কি ক'রে? তবুও উঠল। দুঃখ এসেছে অতি নিঃশব্দে—আমার মর্ম-কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে। আমি যখন তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতে চাইলুম, তখন বুঝলুম, হৃদয়ের মাঝখানে আমার দেহ-মন সব একাকার হ'য়ে গেছে। রোধ করবার ইচ্ছে ছিল, শক্তি ছিল না।

বিয়েরও আর মাত্র ক'টা দিনই বাকী। রাজুদা আসেনি। সুনন্দা অসন্তুষ্ট হ'তে পারে ভেবে তাকেও আর ডাকতে পাঠাইনি। বোধহয় বিয়ের আগে রাজুদার সঙ্গে আমার আর দেখা হ'ল না! হতাশ হ'য়ে পড়লুম।

এদিকে আমাদের বাড়িতে হৈ-হল্লা প্রত্যেকদিনই বাড়ছে। দেশ থেকে এবং কলকাতার বাইরে থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা সব এসে পৌঁছে গেছেন। গোটা বাড়িটা জমজম করছে। কাচ্চাবাচ্চা মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন বাস করছেন এখানে। চুপ ক'রে নিরিবিলিতে ব'সে থাকবার মতো জায়গা নেই আর। আমার মাসতুতো বোন নলিনীদি এসেছেন কানপুর থেকে। তাঁর কাছে শুনলুম, বিয়ের পরেই আমায় চ'লে যেতে হবে ফরিদপুর। তিনি আমায় হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, "এ-বিয়েতে তোর কোনো আপত্তি নেই তো?"

হাসি পেল, দুঃখ হ'ল, কাঁদতে ইচ্ছে করল, কিন্তু তবুও চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তিনি পুনরায় বললেন, "তোকে কিন্তু ফরিদপুরে গিয়ে থাকতে হবে, ঝুনু।"

বললুম, "শ্বশুরবাড়ি যখন যেতেই হবে, তখন স্থান-নির্বাচনের দুর্ভাবনা আমার নেই। আন্দামানে হ'লেও যেতে রাজী আছি।"

"সাবাস, সাবাস ঝুনু! ওরকম মনের জোর থাকলেই সুখে-শান্তিতে স্বামীর ঘর করতে পারবি।"

এ বোধহয় নলিনীদির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আর একেত্রে স্বামীর ঘর করতে মনের জোর যে কেন দরকার তা আমি বুঝতে পারলুম না।

বললুম, "বলো, যদি স্থান-নির্বাচনে আমার কোনো আলাদা মতামত থাকতই, তাহ'লে কি তোমরা আমার মতের কোনো মূল্য দিতে?"

"এ কিরকমের কথা রে, ঝুনু? তোর মনে যেন গণ্ডগোল রয়েছে? ছেলেটি যে খুবই ভালো।"

"ছেলেটির ভালোত্ব সম্বন্ধে আমি কোনো সন্দেহ করিনি। আমার প্রশ্নটা ঠিক তুমি ধরতে পারনি, নলিনীদি। যাক্গে ছাই। কপালে যা আছে তাই হবে। এখন তোমাদের শুধু আশীর্বাদ পেলেই হ'ল।"

ভাবি অবাক হচ্ছি ভেবে, এ তো মজা মন্দ নয়। চোখ বেঁধে কানামাছি খেলার মতো অন্ধকারে পথ হাতড়াতে-হাতড়াতে চলতে থাকব আর প্রথম যার গায়ে হাত ঠেকবে তিনিই হবেন আমার স্বামী!

একদিন মা আমায় বললেন, "চারিদিকে রক্ত বিপ্লবী

মফস্বলের সব কথা রটেছে, রুনু। এসব কথার সত্যি-মিথ্যে নিয়ে যাচাই করবার সময় নেই। এ ক'টা দিন তোকে একটু সামলে-সুমলে চলতে হবে।"

অবাক হ'য়ে গেছি। জিজ্ঞাসা করলুম, "কী কথা রটেছে, মা?"

"তোর সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করা যায় না। কর্তা এলে, তার কাছেই জিজ্ঞাসা করিস। ঐ তো দেখছি সুনন্দাকে। কলেজে পড়ছে অথচ কী তার বিচারবুদ্ধি। কত তার ভালো-মন্দ জ্ঞান। সবাই সুখ্যাতি করে।"

"আমায় তোমরা কলেজে পড়তে দিলেনা ব'লে হয়তো আমার বিচারবুদ্ধি কিছু হ'ল না। আর ভালো-মন্দ জ্ঞান কলেজে না পড়লেও যে হয় তার দৃষ্টান্ত তো তুমি নিজেই, মা।"

"বলে কি! তোর দেখছি আদালতের উকিল-ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল। ঘরে ব'সেও তোর তো শিক্ষা কম হয়নি।"

"অস্বীকার করব না। সুনন্দা কলেজে পড়ছে ব'লে তাকে কত প্রশংসাই না করলে! কারণ সে তোমার নিজের মেয়ে নয়। পরের মেয়ে কলেজে পড়লে আপত্তি করো না, অথচ আমার বেলায় যতসব সামাজিক নিয়ম।"

মা খুব রেগে গিয়েছিলেন। ফস ক'রে তিনি ব'লে বসলেন, "এসব শিক্ষা কি তুই রাজুর কাছে পেয়েছিস?"

"তোমার পায়ে ধরছি, মা, তুমি অন্তত অমন কথা বোলো না। পৃথিবীর আর সবাই বলুক, কিন্তু তুমি? না না, রাজুদাকে তুমি শুধু-শুধু অপমান কোরো না।"

"রাজুর বুঝি এত অল্পতেই অপমান হয়?"

"যা সত্য নয় তা যত অল্পই হোক, তাতেই অপমান।"

"ওরে বাবা! রাজুর অপমানের জন্যে তোর রাত্রে বোধহয় ঘুম আসে না? কুমুদিনী—"

"তুমি ঠিকই বলেছ, মা। অনেকদিন থেকে রাত্তিরে ঘুমুতে পারছি না। কিন্তু রাজুদার অপমান তার কারণ নয়।"

তিনি এবার গলার সুর চড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, "তবে ঘুম আসছেনা কেন?"

"কবিরপুর যেতে হবে ব'লে।"

"বুঝেছি। তোকে ইস্কুলেও পড়তে দেওয়া উচিত হয়নি। তিন বছর আগে যদি বিয়ে দিয়ে দিতুম তাহ'লে আর আমায় অপমান করবার সুযোগ পেতিস না।" মায়ের গলা প্রায় ভিজে এসেছে।

"মা, এতে মান-অপমানের কোনো কথাই নেই। আমি তোমায় শুধু একটা অনুরোধ করতে চাই—"

"কী অনুরোধ?"

"কবিরপুর আমায় পাঠিয়ো না। এ বিয়ে তুমি ভেঙে দাও, মা!"

"রাজু বলেছে বুঝি?"

"না—আমি বলছি—"

"ছি! নীচু-বংশের ছেলে…"

আমি সজ্ঞানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না।

যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন আমি বিছানায় শুয়ে আছি। শক্ত সিমেন্টের ওপর প'ড়ে গিয়ে কপালটা কেটে গেছে। কপালের ওপর দাগও পড়েছে একটা। কিন্তু কপালের ভেতরে সেদিন যে-দাগ পড়েছিল তার চিহ্ন দেখছি আজ এতদিন পরেও এতটুকু ম্লান হয়নি।

বিয়ের আর দিন সাতেক বাকী। রাজুদা এল না। সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা কেমন গুমোট ক'রে ছিল। মাঝে মাঝে রোদ উঠছে, মেঘলা হ'য়ে আসছে। একটু-একটু শীত পড়েছে। অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহ। একটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে চুপ ক'রে ব'সেছিলুম ড্রইংরুমে।

আমার আর কিছুই করবার ছিল না। ব'সে ব'সে একটা পুরনো অ্যালবামের পাতা ওলটাতে লাগলুম। আমার নিজের ছবির সংখ্যা এতে অনেক। ছেলে-বয়েস থেকে শুরু ক'রে বিভিন্ন বয়েসের ছবি আমার তুলে রেখেছিলেন বাবা। হঠাৎ শেষের দিকে একটা পাতার ওপর চোখ পড়ল আমার। ছোট-সাইজের অনেকগুলো ছবির মাঝখানে রাজুদার একটা ফোটোও রয়েছে। মনে পড়ল, ফোটোখানা আমিই তার কাছ থেকে চেয়ে রেখেছিলাম। নিউ-মার্কেটের একটা সস্তা স্টুডিয়ো থেকে ফোটোখানা তুলিয়েছিল সে। বোধহয় বছর চার আগের ছবি এটা।

সিঁড়ির দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল রাজুদা। একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অবাক হ'য়ে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইলুম আমি। কালো, বেশ ছিপছিপে গড়ন, নতুন কলেজে-পড়া ছেলের মতো চশমা পরেছে, হাতে মোটা-মোটা গোটা চার ইংরেজী বই, উসকোখুসকো চুলের ওপর অন্যমনস্কতার ঢেউ। ঢিলে পা-জামার তলায় এক-জোড়ার কাদামাটি মাখিয়ে রাজুদা এসে মজুমদার-বাড়ির ড্রইংরুমে ঢুকে পড়ল। এ যেন নিতান্তই বাংলার পলিমাটি আর নীল আকাশের

বিস্ময়কর সৃষ্টি! কাব্য আর কর্মহীনতার চমকপ্রদ সংমিশ্রণ। আমার দৃষ্টিতেও সেই দৃশ্যটা সেদিন খুব ভালো লেগেছিল। বার বার আমার মনে হয়েছিল, রাজুদাকে ছাড়া আমি আর কাউকে ভালবাসতে পারব না। সেই মুহূর্তেই রাজুদার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার লোভ হ'ল আমার। নিজের পুরো অস্তিত্বটা তার হাতে তুলে দিতে চাইলুম আমি। বইগুলো ফেলে দিয়ে এখন যদি হাত বাড়িয়ে দেয় সে, একটা প্রশ্নও আমি করব না, শুধু মজুমদার-বাড়ি থেকে মাথা উঁচু ক'রে বেরিয়ে যাব তার হাত ধ'রে।

একটু বাদেই অভিমানের সুরে জিজ্ঞাসা করলুম, "পথ ভুল ক'রে এলে নাকি?"

"কেন?"

"তোমার পা-জামার তলায় দেখছ কত কাদা? মনে হচ্ছে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হ'য়ে এলে। কোথা থেকে আসছ?"

"লাইব্রেরি থেকে। কী হয়েছে তাতে?"

"নাঃ—তেমন কিছু না। জানো, আর সাতদিন পরে আমার বিয়ে হবে? চলে যাব ফরিদপুর না কোথায়।"

রাজুদা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "খবরটা শুনেছিলাম বটে, কিন্তু বিশ্বাস করিনি, কুমু।"

"তোমার অবিশ্বাসের কারণ?"

"এতদিন আমার গর্ব ছিল কুমু, তুমিই আমায় সবার চেয়ে বেশি ক'রে জানো। সে-গর্ব আমার আজ রইল না।"

"আমার গর্বই কি তুমি রাখতে দিয়েছ?"

"রক্ষা করবার সুযোগ দিলে কই? যাক, সুনন্দাকে ধন্যবাদ দিতে হবে। খবরটা সে ঠিকই বলেছিল। সুনন্দা মিথ্যে-কথা বলে না।"

আমি এবার একটু ঝাঁঝের সুরেই বললুম, "সুনন্দাকে, ধন্যবাদ দেবে সে-কথা আমাকে না জানালেও পারতে। কিন্তু—"

"কি? এবার বোধ করি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলবে? কুমুদিনী, তোমরা যত সহজে মানুষকে দরজা খুলে দাও, আবার তত সহজে তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করো কি ক'রে? ছিঃ—"

"রাজুদা, এ তুমি কী বলছ? তোমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছি আমি? আমি যে শুধু তোমার জন্যেই দরজা খুলে রেখেছি। সারা জীবনেও দরজা আমি বন্ধ করতে পারব না। আমার জীবনের সবটুকু আয়োজন শুধু তোমার জন্যেই, রাজুদা!"

"মিথ্যে কথা। ফরিদপুর যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা ক'রে আমায় তুমি এসব কথা শোনাচ্ছ। সুনন্দার কথা প্রথমে বিশ্বাস করিনি।"

পোড়া-কপাল আমার! সত্যিই সুনন্দা মিথ্যে-কথা বলে না। সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রাজুদা। আমি ডাকলুম, "রাজুদা, রাজুদা, দাঁড়াও—"

পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন মা। পেছনে পেছনে সুনন্দাও এল। মা রাজুদাকে ডেকে বললেন, "আর সাতদিন পরে কুমুদিনীর বিয়ে। এ-বাড়িতে যদি তুমি আসবার দরকার বোধ করো, তাহ'লে আসবে ঠিক সাতদিন পরে। বুঝলে রাজু?"

রাজুদার হাত থেকে বইগুলো সব প'ড়ে গেল মেঝের ওপর।

আমি পাথরের মতো কঠিন হ'য়ে গেলুম, সুনন্দা যেন হিল্লোলিত কৃষ্ণশাখার মতো একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠল। রাজুদা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মা কালবৈশাখীর মতো দরজার কাছে উড়ে গিয়ে বললেন, "রাজু, একি তোমার অভদ্রতা! মেয়েটার জীবন নিয়ে এ কি-রকমের ছিনিমিনি খেলা? তা ছাড়া কুমুদিনীকে বিয়ে করবার সাহস তোমার আছে?"

রাজুদা মায়ের দিকে চেয়ে শুধু বলল, "এবার তাহ'লে আসি।"

সুনন্দা তার বইগুলো কুড়িয়ে রাজুদার হাতে তুলে দিতে ভুল করল না।

চ'লে গেল সে।

আমি দেখলুম চ'লে যেতে।

মায়ের শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলনা ঝাউতলা-রোডের দুরন্ত সরকার।

তিন

কবরীতা, তুই তো জানিস, আমাদের এদিকটা পাহাড়-অঞ্চল। কাল রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম। হঠাৎ কিরকম একটা ঝাঁকুনি লাগল। ঘুম ভেঙে গেল। একটু পরেই বুঝতে পারলুম ভূমিকম্প হচ্ছে। সবাই ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক। ঘরে ব'সে থাকলে জীবন বিপন্ন হ'তে পারে। আমি কিন্তু ঘর থেকে এক-পা-ও নড়লুম না। নরেনের মা ঘরের বাইরে থেকে অনেক ডাকাডাকি করল, কিন্তু সাড়া দিলুম না। নিশ্চিন্ত-মনে শুয়ে রইলুম। এই থেকে বুঝতে পারছি আমার মনে আর বিন্দুমাত্র মৃত্যুভয় নেই। সবরকম ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছি

আমি। তুই হয়তো বলবি, জীবনটা ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই নিজের মনকে ফাঁকি দিচ্ছি। অসত্য জগতে বাস করছি ব'লে সন্দেহও করবি। কিন্তু ভাই, আমার এই নতুন-তৈরী জগতের খবর যদি রাখতিস তাহ'লে সন্দেহ করবার কারণ কিছু ঘটত না। উপলব্ধির স্তর আমার গভীর হয়েছে ব'লেই জোর ক'রে ঘোষণা করতে পারছি আজ—জগৎ আমার অসত্য নয়। মৃত্যুর স্বাভাবিকতায় আর আমি ভয় পাইনে।

কিন্তু সেই-যে রাজুদা আমাদের বাড়ি থেকে অপমানিত হ'য়ে বেরিয়ে গেল, তারপর কেবলই মনে হ'ত এর জন্যে দায়ী আমি। আমার ম'রে যাওয়াই উচিত। মরণের কথা আমি দিনরাত ভেবেছি। ভেবেছি আর লুকিয়ে-লুকিয়ে কেঁদেছি।

বিয়ের দিন সুনন্দাকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমাদের বর এসে পৌঁচেছে।"

"হ্যাঁ, ভাই।"

"দেখতে কেমন?"

"সুপার্ব্। এ-ছেলেকে একবার যে দেখবে সে-ই তার প্রেমে পড়বে।"

"তুমি ক'বার দেখেছ, সুনন্দা?"

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে সুনন্দা বলল, "আজ থেকে রাজুদার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "রাজুদা আসবে না?"

"কি ক'রে বলি—তবে কি জানো কুমুদিনী, সেদিনকার অপমানের কথা রাজুদা ভুলতে পারেনি। বড্ড লেগেছে তার।"

বললুম, "সেটাই তো স্বাভাবিক। ঐ অবস্থায় সবারই লাগত। কিন্তু রাজুদা আমার দিকটা একটুও দেখতে পারনি। অনেক কথাই তাকে আমার বলার ছিল। বলবার জন্যে কতদিন ধ'রে অপেক্ষা করছিলুম। তুই সবই জানিস, নন্দা। তোর কাছে আমার কোনো কথাই গোপন নেই।"

"এমন কী গুরুতর কথা যা তাকে বলতে পারিসনি?" সুনন্দার মুখে কৌতুকের হাসি, "যদি দরকার মনে করিস আমি তাকে জানাতে পারি।"

"সত্যি বলছিস পারবি?"

"পারব। বাড়ি ফেরবার মুখে তার ওখানে একবার হ'য়ে যাব। তোর এই বিয়ের উৎসব নিয়ে রাজুদা পরীক্ষা দিচ্ছে। ফল কেমন হবে কে জানে।"

"ফল ভালোই হবে। প্রথম-হওয়া ছেলে।" এই ব'লে সুনন্দাকে কাছে ডাকলুম। খুব আগ্রহের সঙ্গে আমার দিকে ঝুঁকে বসল সে। আমি তখন বললুম ওকে, "রাজুদাকে বলিস আমি তাকে ভালবাসি।"

হো-হো ক'রে হেসে উঠল সুনন্দা। আমার হাতটা চেপে ধ'রে একজন অভিজ্ঞ লোকের মতো সে বলতে লাগল, "ঠিক বলেছিস, কুমু। ওয়াণ্ডারফুল! ইংরেজী উপন্যাসে এমন-সব কথা অনেক লেখা আছে। অবিশ্যি সে-সব উপন্যাস রেলগাড়িতে ব'সে পড়তে হয়। আজকে তোর বিয়ে, অথচ রাজুদার কথা ভেবে হালকা-বাতাসে ভালবাসার ফানুস ওড়াচ্ছিল। হুঃ—" একটু হেসে যেন নিজের মনেই বলতে লাগল সুনন্দা, "বিয়ের রাত্রে নিজেকে একজন 'হিরোইন' মনে করা মন্দ নয়। বড়লোকের বিলাসিতা শুধু টাকার ওপর নির্ভর করেনা দেখছি। হাউ ফানি।"

সন্ধের একটু পরেই গোটা দত্তপুকুরটাই আমোদ-আহ্লাদের নেশায় মাতাল হ'য়ে উঠল। চিৎপুরের সবচেয়ে বড় বাজনদার ওসমান খাঁ নিজে এসেছে তার দলবল নিয়ে। বাগবাজারের ভাড়াটে বাড়িতে বরপক্ষ এসে উঠেছেন। সেখান থেকে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে—বর আসছে। চারদিক থেকে হল্লা উঠল, বর আসছে। বাজনা বাজছে। বাজী পুড়ছে। মাসী-পিসীর দল চেঁচিয়ে উঠলেন, উলু দাও। ঘরে ব'সে হাসছি আর শুনতে পাচ্ছি পুরনারীদের শঙ্খধ্বনি।

তোকে বলতে লজ্জা নেই নবনীতা, যে, বিয়ের দিন থেকেই আমার স্বামী সম্বন্ধে কেমন যেন একটা কৌতূহল হ'তে লাগল। মনে হচ্ছিল কতক্ষণে তাকে দেখব। এ তো শুধু চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা নয়, এ হচ্ছে বিয়ে-বিয়ে খেলা। আমি হেরে গেলুম। হারিয়ে দিল রাজুদা। শুভকর্মের সূচনায় আমার অস্থিরতা বাড়ল। এ অস্থিরতা আমার স্বামীকে দেখবার। হাজার হ'লেও আমি মেয়ে, বাঙালী মেয়ে। দূরের রাজুদার কথা ভেবে আর লাভ কি? ঘরের দরজায় প্রিয়তোষ উপস্থিত। রাজুদা কল্পনা; প্রিয়তোষ বাস্তব। টোপর-পরা বাস্তবটিকে এখন দেখবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলুম।

চার

শ্বশুরবাড়ি চ'লে এসেছি। বহুদিন পর আমার কলকাতা ছাড়তে হ'ল। এই জায়গাটা একটা পাড়াগাঁ। গাঁয়ের

নাম বংশীপুর। আমার শ্বশুর শ্রীগগনবিহারী চৌধুরী এ-অঞ্চলের বড় জমিদার। সমস্ত পল্লীগ্রামটা জুড়ে এঁদের বিরাট প্রাসাদ মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। একটা একটা ক'রে অসংখ্য মহল পার হ'য়ে এসে তবে এঁদের অন্দরমহলে পৌঁছানো যায়।

মনে আছে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা। গঙ্গার ধারে নন্দীর-ঘাট ব'লে ছোট একটা স্টেশন। স্টীমার থেকে এই নন্দীর-ঘাটেই নামলুম আমরা। স্টেশনের ঘাটবাবু থেকে কুলীরা পর্যন্ত সবাই এক এক ক'রে আমার শ্বশুরের পায়ের ধুলো নিল। তিনি আশীর্বাদ করলেন। তাদের সামনে দিয়েই আমি হেঁটে গিয়ে পাল্কিতে উঠে বসলুম। মুখ আমার কেউ দেখতে পেল না, ঘোমটা টানা ছিল। স্টীমার থেকে নামবার আগে শ্বশুর আমার বললেন, "পায়ের জুতোটা এবার খুলে ফেলতে হবে, বৌমা। দু-একদিন কষ্ট হবে। তা হোক। নিয়ম তবু মানতে হবে। নন্দীর-ঘাটই আমাদের রাজত্বের পশ্চিম সীমানা—ইংরেজ স্টীমার-কোম্পানি আমাদেরই জমির ওপর স্টেশন তৈরি করেছে। ওরা আমার ভাড়াটে।"

খালি-পায়ে পাল্কি পর্যন্ত হেঁটে আসতে হ'ল। পাল্কিতে উঠে প্রিয়তোষ বলল, "প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে।"

"না, অসুবিধে কিছু হচ্ছে না।"

"মানুষের ঘাড়ের ওপর হাত-পা গুটিয়ে বসবার অভ্যেস অনেকেরই থাকে না।"

"আপনি কিছু ভাববেন না, আমার বেশ ভালোই লাগছে।"

কাঁচা-রাস্তার ওপর দিয়ে দুলতে-দুলতে আমরা বংশীপুরের দিকে এগিয়ে চললুম। পাল্কির দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে দিয়েছিল প্রিয়তোষ। হাওয়া আসছিল। বাঁ দিকে দেখলুম মস্তবড় নদী। কলকাতার গঙ্গা আমি দেখেছি। তার তুলনায় একে সমুদ্রের মতো মনে হচ্ছিল। ওপারটা যে কতদূরে তাও আমি আন্দাজ করতে পারলুম না। বর্ষার জলে নদীর বুক চওড়া হয়েছে আরও বেশি। মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে পদ্মার বিস্তৃতি দেখতে লাগলুম। তন্ময় হ'য়ে গেলুম। তাই নবনীতা, পদ্মার দিকে চেয়ে মনের তরুণতা আমার জেগে উঠতে লাগল। মনে হ'ল আমি পারব। আবার নতুন ক'রে প্রেমের সাধনে প্রিয়তোষ-নৌকোটিকে ভাসিয়ে নিতে পারব। স্বামীর দিকে চেয়ে বললুম, "পাড়াগাঁ আমার ভালো লাগছে।"

কথাটা প্রিয়তোষের পছন্দ হ'ল না। সে বলল, "পূর্ববঙ্গের মাটি আর নদী দেখে-দেখে আমার তো বিরক্তি ধ'রে গেছে।"

"আপনি শিক্ষিত, তাই বিরক্তি ধরা স্বাভাবিক। আমার বিদ্যের দৌড় যে কতদূর তা তো আপনি জানেন। সেইজন্যেই হয়তো আমার চোখে রং লেগেছে। এরই মধ্যে চারিদিকের দৃশ্যটা যেন প্রজাপতির মতো আমার সামনে ঘুর ঘুর ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভালবাসতে আরম্ভ করলুম আমি। ইচ্ছে করছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও উড়তে থাকি। পদ্মার বুকের চেয়ে মানুষের বুক কি চওড়া হয় না?"

আমার কথা শুনে প্রিয়তোষ একটু হকচকিয়ে গেল। পাল্কির দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে বলল, "বংশীপুরে প্রবেশ করলুম আমরা।"

সত্যিই প্রবেশ করলুম। পাল্কির দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ হয় না। একটু ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলুম, রাস্তার দু'দিকে লোকের ভিড় জমেছে। প্রিয়তোষ বলল, "এটা বাড়িতে ঢুকবার প্রথম দরজা। এ-রকম আরো তিনটে আছে।"

দরজা নয়, সিংহ-দরজা। চারদিকে একতলার সমান উঁচু প্রাচীর। প্রথমেই চোখে পড়ল চৌধুরীদের সেরেস্তা। একতলা ব্যারাকের মতো পর পর অনেকগুলো ঘর। কর্মচারীরা সব দু'দিক থেকে হাত জোড় ক'রে পাল্কির উদ্দেশে নমস্কার করলেন। সিমেন্টে বাঁধানো পথ দিয়ে আমরা দু'নম্বর দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলুম। ভেতরে দেখলুম বাংলো-প্যাটার্নের একটা বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। প্রিয়তোষ বলল, "জেলা থেকে সাহেব-সুবোরা এলে ওই বাংলোতেই থাকেন। আর ওর পেছনদিকে দোতলা একটা বাড়ি আছে। সেটা অন্যান্য অতিথিদের জন্যে।"

"অনেক অতিথি আসেন বুঝি?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

"পুজো কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় ভিড় হয়। তা ছাড়া ওখানে গরিব ছাত্র আছে গুটি-পাঁচেক। গ্রামের ইস্কুলে তারা পড়ে। তাদের থাকা, খাওয়া এবং কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা সব বাবাই ক'রে দিয়েছেন। শুনেছি ঠাকুরদার আমলে ছাত্রসংখ্যা ছিল অনেক। পয়সার অভাবে কেউ লেখাপড়া করতে পারছেনা শুনলে তিনি তক্ষুনি তাদের ডেকে পাঠাতেন। বাবার আমলে সংখ্যা

খুবই কমে গেছে।" পাল্‌কির দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে প্রিয়তোষই বলল, "এইখানে আমাদের নামতে হবে। এই অংশটায় চৌধুরীদের বিষ্ণু-মন্দির। মন্দিরের সংলগ্ন মস্তবড় একটা মণ্ডপ দেখা যাচ্ছে—ওটাকে নাটমন্দির বলে।"

পাল্‌কি থেকে নেমে পড়লুম আমি। এগিয়ে এসে বজর-মশাই বললেন, "মন্দিরে যাও, মা। প্রণাম ক'রে এসো।"

মূর্তির সামনে পুরোহিতমশাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনে হ'ল আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। আমার হাতে কয়েকটি ফুল তুলে দিয়ে তিনি বললেন, "ভগবান বিষ্ণু আপনার মঙ্গল করবেন! শুধু চৌধুরী-পরিবারের নয়, সারা পৃথিবীর পালনভার তাঁরই উপর নির্ভর করছে। তিনি পরমাত্মা পুরুষ, অব্যয়, ঈশ্বর ও প্রভু। জগতের কল্যাণের জন্যে, দেবতাদের সাহায্য করবার জন্যে ও দানব-নিধনের জন্যে ভগবান বিষ্ণু যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অভীষ্টদাতা, বন্ধু। এবার বলুন—" এই ব'লে পুরোহিতমশাই গভীর ও উদাত্তকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নাড়তে লাগলুম বটে, কিন্তু সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করতে পারলুম না। দেবতার পায়ে ফুলগুলি রেখে দিয়ে মনে-মনে সেদিন আমি বলেছিলুম—"আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, প্রভু! পিতামাতা আমায় কয়েক পাতা ইংরেজী শিখিয়েছিলেন, কিন্তু দেবতার ভাষা আমায় শেখাননি। এবার আমি শিখব।"

পুরোহিতমশাই আশীর্বাদ করলেন আমায়। আমি তাঁর পায়ের-ধুলো নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার পরে প্রিয়তোষকে দেখতে পেলুম না। সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে খুঁজছেন? দাদাকে? সে পালিয়েছে। এবার চলুন, অন্দরমহলে যেতে হবে।" এই ব'লে মুখ টিপে হাসতে লাগল সে।

এবার আমরা হাঁটতে লাগলুম চার-নম্বর দরজার দিকে। প্রত্যেকটা অংশই আলাদা আলাদা। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। উঁচু উঁচু দেওয়াল। এপাশ থেকে ওপাশের কিছুই দেখা যায় না। একটু বাদেই মেয়েটি আমায় বলল, "আমি এঁদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। এখানে থাকি না। ভৈরবপুরে এক মামা আছেন। তাঁর গলগ্রহ হ'য়ে থেকে আছি। সত্যিকথা বলতে কি দিদি, আমি এঁদের কিছুই হই না। আমার নাম বকুলবালা দাসী।"

বললুম, "আমি আপনাকে দিদি ব'লে ডাকব।"

"তা কি হয়! ওঁরা রাগ করবেন। আসলে আমি তো চাকরানীর কাজ করি—দাসী।"

"দাসী?"

"হ্যাঁ গো, তাই হ'ল। প্রিয়তোষের মা মারা যাওয়ার পরে মাঝে মাঝে এঁরা আমাকে ডেকে নিয়ে আসেন। কেন জানো?"

"না তো—"

"আমার রান্নার হাত নাকি খুব ভালো। খেলে, চৌধুরীমশায়ের খুব তৃপ্তি হয়।"

"তৃপ্তি হয়?"

"হ্যাঁ গো, তাই হ'ল। তাড়াতাড়ি হজম হ'য়ে যায়।" একটু ভেবে নিয়ে বকুলবালাই বলল, "তোমার শাড়িটা কী সুন্দর! বেনারসী, না? সোনার পাড়, না গো দিদি?"

আমি জবাব দিলাম না। কেমন একটু অদ্ভুত ঠেকতে লাগল। মাঝখানের বড়-উঠোনটা পার হ'তে হ'তে বকুলবালা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। হাসিখুশী ভাব আর নেই। হঠাৎ সে গম্ভীর হ'য়ে গেছে। আমি তাকে বললুম, "আপনার শাড়িটা বেনারসী নয় বটে, কিন্তু খুবই ভালো শাড়ি। দামীও।"

"কত দাম হবে?"

"তা চল্লিশ-টাকা তো হবেই।"

হেসে ফেলল বকুলবালা। তারপর আমার কানে কাছে মুখ এনে ফিসফিস ক'রে বলল, "কাউকে বলবেন না চৌধুরীমশাই জানতে পারলে রাগ করবেন। কলকাত থেকে আসবার সময় প্রিয়তোষ এটা আমার জন্যে কিনে এনেছে। লুকিয়ে-লুকিয়ে ভৈরবপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি সে। শাড়ি কি আর পরতে মনে লাগে, দিনরাত ত পুজো করি।"

সামনেই মস্তবড় দোতলা বাড়ি। দু-তিন জ মধ্যবয়সের এয়ো সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা এগিয় এলেন। প্রিয়তোষও ছিল। সে পরিচয় করিয়ে দি বলল, "ইনি আমার পিসীমা। আর উনি হচ্ছেন গ্রাম সম্পর্কে জ্যাঠাইমা। প্রণাম করো।"

প্রণাম করা শেষ হওয়ার পরে চারদিকে চেয়ে দেখলা বকুলবালা সেখানে নেই। চৌধুরীদের অন্দরমহলে আ কোলাহলও নেই।

সব-ক'টা মহলই জনশূন্য।

পাঁচ

শ্বশুরবাড়িতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। আত্মীয়স্বজন যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই চ'লে গেছেন। গেছে বকুলবালাও। গুটিকয়েক দাসী ছাড়া আর কাউকে আশেপাশে দেখতে পাই না। নগেনের মা আমার খাস-চাকরানী। তার অন্য কোনো কাজ নেই। সে শুধু আমার হুকুম পালন করে। তার কাছেই শুনলাম, যাওয়ার দিন নাকি বকুলবালা কেঁদেকেটে অস্থির হ'য়ে উঠেছিল। প্রিয়তোষের পায়ের ওপর তারই দেওয়া শাড়িখানা তাল ক'রে রেখে দিয়ে বলেছিল, "আমি এসব চাই না। তোমার বৌকে দিয়ে দিয়ো। দুধের স্বাদ আমার ঘোল খেয়ে মিটবে না। ভৈরবপুরে আমি থাকব না, থাকব না—"

"কি করতে চাও?" জিজ্ঞাসা করেছিল প্রিয়তোষ।

"এখানে যদি থাকতে না দাও তাহ'লে আমি পালিয়ে যাব—গিয়ে উঠব একেবারে কলকাতায়।"

"পাগল! এখানে থাকবে তো, বাবাকে গিয়ে বলো। আমি তো আর এ-বাড়ির কর্তা নই। এই রইল দশটা টাকা।"

বকুলবালা চ'লে গিয়েছে। প্রিয়তোষও এখানে নেই। বি-এ পরীক্ষা তার দেওয়া হয়নি। বিয়ে করতে হ'ল ব'লেই পরীক্ষা সে দিতে পারেনি। সে কলকাতা চ'লে গেছে। আমার শ্বশুরই নাকি তাকে কলকাতা যেতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঘন-ঘন বংশীপুরে আসবার দরকার নেই। এখন লেখাপড়া করবার সময়, অনাবশ্যক উত্তেজনা ওর পক্ষে ভালো হবে না। যাওয়ার সময় প্রিয়তোষ অবিশ্যি আমায় ব'লে গিয়েছিল "চিঠি দিয়ো। লম্বা লম্বা চিঠি। তাতে সব-কথা যেন থাকে। স-ব, মানে তোমার সব প্রাইভেট খবর। বুঝলে?"

"আমার তো কোনো প্রাইভেট খবর নেই। তা ছাড়া এত তাড়াতাড়ি স-ব জানতে চাইবেন না।"

"হ্যাঁ, সেই ভালো। সপ্তাহে অন্তত তিনখানা ক'রে চিঠি পাই যেন।"

প্রিয়তোষ চ'লে গেছে তা-ও সাতদিন হ'য়ে গেল। কলকাতার মতো এখানেও আমার বিশেষ কিছু করবার নেই। শ্বশুরমশাইকে একরকম দেখতেই পাইনে। তিনি যে-অংশটায় থাকেন সেটা একটা আলাদা রাজ্য। আমার দিক থেকে দূর তো বটেই। তা ছাড়া তিনি অল্পভাষী মানুষ। চেহারা দেখলে বয়েস ঠিক বোঝা যায় না। মাথার চুল পাকেনি একটিও। প্রিয়তোষের কাছে শুনেছি, বয়েস তাঁর পঞ্চাশ। চৌধুরী-বাড়ির নির্জনতা মানুষকে পাগল ক'রে দেয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, এ যেন অকরুণ-হত্যার এক ভয়াবহ কারাগার। জীবনের জাগ্রত চেতনার মধ্যে এ এক নিশ্চিত মরণের পক্ষাঘাত অনুভূতি। এ-বাড়ির সেই অসংখ্য মহলের মধ্যে মৃত্যুর অদৃশ্য তালিকায় কত যে কাহিনী আজ লুপ্ত হ'য়ে গেছে তার খবর কেউ রাখে না। এখানে জীবনের উচ্ছ্বাস নিশ্ছিদ্র প্রাচীরের গায়ে বিলীন হ'য়ে গেছে। জীবনের রাজপথে মৃত্যুর শীর্ণযোদ্ধার অহর্নিশি ডিউটি দিয়ে চলেছে। এর পাশে আমার কলকাতাকে একবার দাঁড় করাতে ইচ্ছা করে। কত-না পার্থক্য!

প্রায় একবছর পরে স্বামী আমার দেশে ফিরল। চিঠির যোগাযোগ ছাড়া তার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমিও একবছরের মধ্যে কলকাতা যাইনি। বাড়ি ফিরে এসে প্রিয়তোষ প্রথম ক'দিন আমার কলকাতার সিনেমা-থিয়েটারের গল্প বলতে লাগল। বাইরে থেকে গিয়ে যে-সব ছেলেরা কলকাতার হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে, আমার স্বামীও তাদের মধ্যে একজন।

কলকাতার এক বিখ্যাত থিয়েটারে নতুন একজন অভিনেত্রী যোগদান করেছে। প্রিয়তোষ ঘোষণা করল—"তার নাম সুরবালা।" তার ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল সে সম্বন্ধে প্রিয়তোষের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার তো বি-এ পরীক্ষা শেষ হ'ল। এর পরে আপনি কী করবেন?"

বিরক্ত বোধ করল আমার স্বামী। সে বলল, "সুরবালার ভবিষ্যতের সঙ্গে আমার ভবিষ্যতের কী সম্বন্ধ? ভাখো, তুমি এত গ্রাম্য কেন বলতে পারো?"

কলকাতার হোস্টেলে থেকে যে-সব ছেলেরা লেখাপড়া করে তাদের মুখে এমন প্রশ্ন অশোভন কিংবা অস্বাভাবিক নয়।

বললুম, "বেশ তো, চলুন না কলকাতায় যাই। আপনার সঙ্গে সেখানে কিছুকাল বাস করলে হয়তো আমার এই গ্রাম্য-ভাবটা আর থাকবে না।"

এবার প্রিয়তোষ জবাব কিছু দিতে পারল না। গম্ভীর হ'য়ে গেল। আমি জানতুম, কলকাতা যাওয়া এবং না-যাওয়া সম্বন্ধে প্রিয়তোষের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। আমার শ্বশুর এখানে সর্বময় কর্তা।

কয়েকটা দিন এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিল প্রিয়তোষ। বংশীপুরে মন বসছে না। আমাকেও যেন

পুরনো ব'লে মনে হচ্ছে ওর। আমার প্রাইভেট খবরও জানতে চায় না সে। সারাটা দিন কী করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয় না। আমি যত ওকে কাছে টানতে চাই ততই সে দূরে সরে যায়। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলুম না। একদিন ওকে রাত্রিবেলা জিজ্ঞাসা করলুম, "আমাকে বোধহয় আপনার পছন্দ হয়নি, না?"

"পছন্দ না-হওয়ার কী—ভালোই তো।" উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়ল প্রিয়তোষ। বাইরে থেকে এসে জামাকাপড় ছাড়েনি। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেছিল, আজ রাত্রিরে সে খাবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "শরীরটা কি ভালো নেই আপনার?"

"ভালো আছে। দুপুরের ভাত এখনো হজম হয়নি। বংশীপুরের জলবায়ু আমার সহ্য হয় না। তা ছাড়া কী ভীষণ গরম পড়েছে!"

"জামাটা খুলে ফেলুন। শোবার সময় শরীরটা হালকা থাকাই ভালো।" আমি একটু এগিয়ে বসলুম প্রিয়তোষের দিকে। অপেক্ষা করলুম, কিন্তু সাড়া দিল না সে। একটু বাদেই মনে হ'ল, ঘুমিয়ে পড়েছে প্রিয়তোষ। সতেরোয় পা দিয়েছি আমি।

বিছানা থেকে নেমে পড়লুম। ভাবতে লাগলুম বকুলবালার কথা। মাঝে মাঝে মনে হয়, অত্যন্ত সরল। ওর ব্যবহার দেখে কিংবা মুখের কথা শুনে বিচার করতে গেলে ভুল হবে। আমার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কটা অস্বাভাবিক ঠেকে। হয়তো এ আমার বোঝার ভুল। আমার শহরে দৃষ্টিতে কৃত্রিমতার কুয়াশা। গ্রাম্য-জীবনের সরলতায় আমি পাপ দেখতে পাই।

কয়েকটা দিন স্বামীর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল না। শুনলুম, আশেপাশের বন-বাদাড়ে পাখি শিকার ক'রে বেড়াচ্ছে। অনেক রাত্রে ফিরে আসে। অন্দরমহলে আর ঢোকে না। বাইরের গেস্ট-হাউসে এসে ঘুমোয়। নগেনের মা উৎসাহ দিয়ে বলে, "বড্ড ছেলেমানুষ!"

"এ-কথা কেন বলছ?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

"পাখি-শিকারের নেশা এখনো তাঁর কাটল না। যতই বলো, এ-নেশা তো দিনের বেলায়।"

একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "রাত্রিবেলা দাদাবাবুকে দেখাশোনা করে কে? বকুলবালা কি চ'লে গিয়েছে?"

"না। বুড়োকর্তার অন্দরমহলে কাল দেখেছি।"

আজ আমি মনে-মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, রাত্রিতে যদি প্রিয়তোষ না ফেরে তাহ'লে লুকিয়ে গেস্ট-হাউসে আমি নিজে গিয়ে উপস্থিত হবো। বকুলবালার সঙ্গে স্বামীর সম্পর্কটা নিজের চোখে দেখে নিতে চাই।

তাই নবনীতা, পরে বুঝেছিলাম, সম্পর্কটা দেখবার আগেই আমি মনে-মনে ওদের মধ্যে সম্পর্ক একটা তৈরি ক'রে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, প্রিয়তোষ বকুলবালাকে ভালবাসে। ভালো না বাসলে যেন নিজের মনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। স্বামীকে অপরাধী করতে পারলেই বুঝি নিজের অপরাধ কাটবে। বংশীপুরের অন্দরমহলে আমি তো একা ঢুকিনি, রামুদাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। যেদিকেই চোখ ফেরাই সেদিকেই রামুদাকে দেখতে পাই আমি। আমার এই লুকনো-রাজ্যের সংবাদ প্রিয়তোষ জানে না।

রাত দশটার পরে নগেনের মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নেমে এলুম একতলায়। এদিক-ওদিকে দু'একটা আলো তখনো জ্বলছিল। ঠাকুর-চাকরদের খাওয়া শেষ হয়নি। নগেনের মা বলল, "বড়কর্তা টের পেলে আমি খুব মুশকিলে প'ড়ে যাব।"

"টের পাবেন না।"

"তাহ'লে অন্য পথ দিয়ে যাই, দিদি। বাড়িটার সামনে লোকজন থাকতে পারে। আজ ক'দিন থেকে দাদাবাবু শিকার ক'রে বেড়াচ্ছেন। রঘুনন্দন সিং তাঁর সঙ্গে যায়।"

"বেশ তো, পেছনদিক দিয়েই চলো। আমি শুধু দেখতে চাই, বকুলবালা সেখানে আছে কিনা।"

কোন্ পথ দিয়ে যে নগেনের মা আমায় গেস্ট-হাউসের পেছনদিকে নিয়ে এল বুঝতে পারলুম না। সব রাস্তাই অচেনা ব'লে মনে হ'ল আমার। দক্ষিণ দিকে অন্য একটা একতলা বাড়ি চোখে পড়ল আমার। ঘরে আলো জ্বলছে দেখলুম। নগেনের মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ওখানে কে থাকেন? কাছারি-বাড়ি নাকি?"

"না, দিদি। ওখানে গরিব ছেলেরা থাকে। বিনে-পয়সায় খায়-দায়, লেখাপড়া শেখে। এখন বোধহয় গুটি-পাঁচেক ছেলে আছে। সোমক চৌধুরীর আমলে বাড়িটা জমজম করত। বহু ছেলে থাকত তখন। গাঁয়ের ইস্কুল থেকে পাস ক'রে বেরিয়ে তারা চ'লে যেত ঢাকা, কলকাতা।—ঐ ভাখো, বকুলবালা আসছে। এদিকে স'রে এসো।"

বড় একটা আমগাছের আড়ালে আমরা স'রে দাঁড়ালুম

আমি দেখলুম, ছেলেদের বাড়ি থেকে বকুলবালা বেরিয়ে এল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গেস্ট-হাউসের সামনের দিকে চ'লে গেল সে। জিজ্ঞাসা করলুম, "ওখানে গিয়েছিল কেন?"

"বোধহয় শিবাজীর কাছে। শিবাজী হচ্ছে বকুলবালার ছোট ভাই। গাঁয়ের ইস্কুলে পড়ে।"

লুকিয়ে লুকিয়ে বকুলবালাকে দেখবার আর দরকার ছিল না। নগেনের মাকে বললুম, "থাক্, গেস্ট-হাউসে আর যাওয়ার দরকার নেই। সামনের রাস্তা দিয়েই অন্দর-মহলে ফিরে যাচ্ছি।"

নগেনের মা কী ভাবল জানি না, গেস্ট-হাউসের পাশ দিয়ে একাই হেঁটে চললুম। বড়সড়টা দেখতে পেলুম আমি। হঠাৎ ডান দিকে দৃষ্টি পড়ল আমার। গেস্ট-হাউসের ড্রইংরুমে প্রিয়তোষ ব'সে আছে। মনে হ'ল একটু আগেই সে ফিরে এসেছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে পা-দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে অনেকদূর পর্যন্ত। গায়ে হাফ-হাতার শার্ট। পরনে ব্রীচেস। পায়ে মোটা-চামড়ার জুতো। পালিশ-করা জুতো আপাতত কাদায় ভর্তি। সেন্টার-টেবিলের কোণায় দু'নলা বন্দুকটা কাৎ হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। মেঝের ওপর একঝাঁক পাখি গোছা ক'রে বাঁধা। সবগুলো পাখি এক-রঙের নয়। রং-বেরং-এর মরা পাখি। তারই পাশে ব'সে পড়েছে বকুলবালা। কাদা-মাখা জুতোর ওপর হাত রেখেছে সে। ইচ্ছে ছিল না, তবুও দাঁড়িয়ে পড়লুম। ভয় পেয়ে নগেনের মা তখন অনেকদূরে স'রে গিয়েছে। আমি দেখলুম, বকুলবালা প্রিয়তোষের জুতোর ফিতে খুলে দিচ্ছে। খুলতে খুলতে সে জিজ্ঞাসা করল, "আমার তবে কি হবে?"

"কাল আমি চ'লে যাব। সকালে গিয়ে বাবাকে বলব, তিনি যেন তোমায় এখানে থাকতে দেন।"

"শুধু-শুধু এখানেই বা থাকব কেন?" প্রিয়তোষের হাঁটুর ওপর হাত রাখল বকুলবালা।

প্রিয়তোষ তার হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কী চাও তুমি?"

"আদর আর সোহাগ। খেতে-পরতে না দাও আপত্তি করব না।"

"কিন্তু—" অসহায়ের মতো প্রিয়তোষ এদিকে ওদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগল, "কিন্তু ছেলেবেলাকার কথা কি তুমি ভুলে যেতে পারছ না?"

"ছেলেবেলা নয় গো। প্রিয়তোষ, তোমার সেই সবেদা-গাছটা বড় হয়েছে—তুমি নিজে হাতে পুঁতেছিলে, মনে নেই? তোমার ভালবাসার গাছ।" এই ব'লে বকুলবালা উঠে পড়ল মেঝে থেকে। প্রিয়তোষের গলা জড়িয়ে ধ'রে কানের কাছে মুখ নিয়ে গুন্‌গুন্ স্বরে গান ধরল—"পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব, পিরীতি শিথান মাথে—"

জানালার আরও কাছে আমি এগিয়ে গেলুম। বকুলবালা গলা জড়িয়ে ধ'রে গান করছে আর প্রিয়তোষ মরা পাখির গোছাটাকে পা দিয়ে খোঁচা মারছে। আমি দেখলুম, মেঝেতে রক্তের দাগ—বিন্দু-বিন্দু চোখের জলের মতো রক্তের ফোঁটা।

গান-গাওয়া শেষ ক'রে বকুলবালা জিজ্ঞেস করল, "কি গো, মনে পড়ছে? এই গান শোনবার জন্যে বিয়ের দু'মাস আগে ছুটে গিয়েছিলে ভৈরবপুর। মনে পড়ছে? তুমি কি তখন ছেলেমানুষ ছিলে, প্রিয়তোষ?"

"আমায় তুমি ক্ষমা করো, বকুল", বন্দুকটা ডান হাতে টেনে নিয়ে নলের মুখে নাক লাগিয়ে প্রিয়তোষ বলল, "এবার তুমি যাও। রঘুনন্দনকে ডাকব। এখনো অনেক কাজ বাকি। কাল আমি চ'লে যাচ্ছি।" উঠে পড়লো প্রিয়তোষ। মরা পাখির গোছাটাকে পা দিয়ে একদিকে একটু সরিয়ে দিয়ে বার দুই হাই তুলল। নাক দিয়ে নিশ্বাস টানতে টানতে বলতে লাগল, "বারুদের গন্ধ এখনো টাটকা। পাখি এত ভালবাসি যে, দেখলেই গুলী মারতে ইচ্ছে করে। ওরা নিজে থেকে যদি ধরা দিত তাহ'লে সারাদিন ওদের পেছনে ঘুরে বেড়াতুম না। অনেক রাত হয়েছে, বকুল। এবার তুমি যাও।"

"যদি না যাই, গুলী মারবে নাকি?" ঠেলা মেরে বন্দুকের নলটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল বকুলবালা। দিয়ে বলল, "মারো, মারো না এইখানে। তোমার দেওয়া ব্লাউজ আমি পরিনি। গুলী মারতে চাও, মারো। আমার আর বাঁচবার সাধ নেই, প্রিয়তোষ।"

"লোভ দেখিয়ো না, বকুল। হয়তো সত্যি-সত্যি গুলী মারতে পারি।"

আঁচলটা একটু সরিয়ে দিয়ে বকুলবালা বলল, "চেয়ে ভাখো, তারপর মারো।"

প্রিয়তোষ দেখল কিনা বুঝতে পারলুম না। ওপাশের দরজায় দাঁড়িয়ে শ্বশুরমশাই দেখলেন। আমি আগেই তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে তিনি গাড়ি-বারান্দাটা পার হ'য়ে গেলেন। দুজের শেষটুকু দেখবার

সঙ্গে সঙ্গে মুখ এবং মেজাজের পরিবর্তন ঘটলো তাঁর। একটু আড়ালে স'রে গিয়ে প্রসন্ন সুরে ডাকলেন তিনি, "প্রিয়তোষ—প্রিয়তোষ আছ নাকি ?"

"এই ফিরলুম, বাবা।"

গগন চৌধুরী ঘরে ঢুকলেন। মনে হ'ল, প্রিয়তোষ আজও টের পায়নি, তার বাবার বয়েস পঞ্চাশ নয়, পঁচিশ।

আমি দেখলুম, বকুলবালা শাড়ির আঁচলটা গুছতে লাগল। দূরে দাঁড়িয়েও সেদিন বুঝতে পেরেছিলুম, আমার চেয়ে বকুলবালার স্বাস্থ্য হাজারগুণে ভালো। এ-সৌন্দর্যের তুলনা নেই।

তারপর কি যে হ'ল আমি আর খবর রাখিনি। কাঁপতে কাঁপতে নগেনের মা আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাতে সে মৃদু টান দিয়ে বলল, "দিদি, চ'লে এসো।"

পেছনের রাস্তা দিয়েই ফিরে এলুম অন্দরমহলে। নিজের ঘরে এসে নগেনের মাকে বললুম, "অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমার কাছেই তো গল্প শুনেছি গোলক চৌধুরীর অন্তঃপুরে ওরকম দশ-বিশটা বকুলবালা সব সময়েই বাঁধা থাকত। এবার তুমি যাও।"

বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চ'লে গেল নগেনের মা। ভেতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলুম আমি।

পরের দিন সকালবেলার দিকে স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'ল আমার। দেখা করবার জন্যেই সে এসেছিল আমার কাছে। রওনা হচ্ছে সে। প্রিয়তোষ বলল, "কলকাতা চললুম। চিঠি দিয়ো।"

বললুম, "আপনি তো বছরে দশ মাস কলকাতা থাকেন। হয়তো কলকাতার প্রতি টান আপনার বেশি। তাই ব'লে দেশের মায়া একেবারে ছেড়ে দিলে চলবে কেন ?"

"ল-কলেজে ভর্তি হ'তে হবে। হাতে আর বেশি সময় নেই। আমাকে যেতেই হবে। এম-এ আর ল একসঙ্গেই পড়বো। তোমায় সব খবর জানিয়ো।" এই ব'লে প্রিয়তোষ এগিয়ে এল আমার দিকে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "কী চান ?"

কিছু বলল না, মুখটা নিচু করল প্রিয়তোষ। একটু দূরে স'রে গিয়ে আমি বললুম, "পৌঁছেই কিন্তু কুশল-সংবাদ দেবেন।"

স্বামীকে ধ'রে রাখা সত্যিই সম্ভব হ'ল না। সে চ'লে গেল। কতদিনের জন্যে সে গেল বুঝতে পারলুম না। প্রথম দিনটার কথা মনে আছে। সমস্তটা দিন ছটফট করতে লাগলুম। সময় যেন কাটতে চায় না। শুয়ে পড়লে ঘুম আসে না। ব'সে থাকলে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। মনে হ'ল, হাতের মুঠো আলগা। কাউকেই ধ'রে রাখতে পারলুম না। রাজুদাকে হারিয়ে এলুম। প্রিয়তোষ তো আগে থেকেই হারিয়ে গেছে।

সন্ধেবেলা নগেনের মা বলল, "বকুলবালাকে ভৈরবপুরে পাঠিয়ে দিলেন বড়কর্তা।"

"কেন ? বকুলবালার কী অপরাধ ? আহা, বেচারী কত কষ্ট পাচ্ছে।"

"তা তো জানি না, দিদি। যাওয়ার সময় বড়কর্তা বললেন, 'আমি না ডাকলে তুই আর বংশীপুরে আসিস না, বকুল।' বড়কর্তার কথা শুনে লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে রাখল সে। পালকিতে উঠে বকুলবালা আমার কাছে ডেকে বলল, 'তোরা দেখিস কি ক'রে এর প্রতিশোধ নিই ! পালঙ্কের ওপর পা তুলে ব'সে প্রিয়তোষের বৌ খুব মজা দেখছে, না রে নগেনের মা ?' সে কী তার চোখ দিদি, যেন আগুনের গোলা।"

"আমি তো তার কোনো ক্ষতি করিনি, তবে কেন আমার ওপর রাগ করল সে ?"

"কি জানি—এ ভালোই হ'ল, দিদি, আর এখানে সে আসবে না।"

সত্যিই বকুলবালা আর এখানে এল না। প্রা একবছর হ'তে চলল, না এল বকুলবালা, না এল প্রিয়তোষ। শ্বশুরমশাই আমায় একদিন ডেকে বললেন, "সরস্বের মধে প্রিয়তোষকে এখানে আসতে বারণ ক'রে দিলুম। একেবারে এম-এ পাস ক'রে আসবে। আর তো মাত্র একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুমি কি একবার কলকাত থেকে ঘুরে আসবে, বৌমা ?"

"আমার নিজের তেমন ইচ্ছে নেই।"

"ইচ্ছে না থাকলে গিয়েও দরকার নেই। আমি দিন সাতেকের জন্যে একবার কলকাতা যাব। একলা থাকতে ভয় করবে না তো ?"

"না, ভয় করবে কেন ? নগেনের মা তো কাছে থাকে।"

এই সময় বছর দশ-বারো বয়েসের একটি ছেলে [illegible] ঘরে এসে ঢুকল। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে শ্বশুরকে প্রণা

করল সে। আমাকেও প্রণাম করতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে বললুম, "থাক্, থাক্। ছেলেটি কে বাবা?"

"রঘুদের ভাই।"

"তাই নাকি? শিবাজী তো মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতে পারে।"

শ্বশুরমশাই বললেন, "হ্যাঁ, সেইজন্যেই ওকে ডেকে পাঠালুম। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। অন্তত আমি যে-ক'টা দিন থাকব না, তুই এখানে আসিস, শিবাজী। দারওয়ানকে আমি হুকুম দিয়ে যাব। আচ্ছা, তাহ'লে তুই এখন যা।"

"আমার মহলটা ওকে চিনিয়ে দিই, বাবা। এসো ভাই—" এই ব'লে শিবাজীকে নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

তাই নবনীতা, দুটো বছর ধরে ব'সে ব'সে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কোনো কিছুই করবার ছিল না। শিবাজীর সঙ্গ পেয়ে আজকাল একঘেয়েমি অনেকটা কেটে গেছে। এই দুর্ভেদ্য মহল-রাজ্য পার হ'য়ে শিবাজী প্রায়ই আসে আমার ঘর পর্যন্ত। প্রথমে সে ভয় পেত। তারপর দেখলুম, আসা-যাওয়া করতে ও আর ভয় পায় না। মাঝে মাঝে শ্বশুর নিজেই ওকে ডেকে পাঠান। জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁরে শিবু, শুনলুম তোর নাকি একজোড়াও জুতো নেই?"

"আজ্ঞে না।" জবাব দেয় শিবাজী।

"তাহ'লে পায়ের মাপটা এক্ষুনি গিয়ে কাছারি-বাড়িতে দিয়ে আয়। কী রঙের জুতো পছন্দ হয় তোর?"

"আমি তো কোনোদিনও জুতো পরিনি—" লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে রাখে শিবাজী।

বিস্ময়ের মাত্রা বাড়তে লাগল আমার। শুধু জুতো নয়, জামাকাপড়ও কিনে দিলেন শ্বশুরমশাই। শিবাজীর এই হঠাৎ-পরিবর্তন সবারই চোখে পড়তে লাগল। গরিব ছেলেদের সঙ্গে আজকাল আর ওকে খেলতেও হয় না। বড়কর্তা হুকুম দিয়েছেন, শিবাজী অন্দর-মহলে এসে দু'বেলাই খেয়ে যাবে। একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁরে শিবু, তোদের গাঁয়ে কোনো লাইব্রেরি আছে?"

"খুব বড় লাইব্রেরি আছে বোসবাবুদের বাড়িতে। তুমি যদি বলো, আমি অনেক বই এনে দিতে পারি। যাবে একদিন আমার সঙ্গে? লাইব্রেরিটা দেখে আসবে?"

ওর কথা শুনে হেসে ফেললুম আমি। বললুম, "আমি যে জমিদার-বাড়ির বৌ—তোদের মতো যখন তখন যেখানে-সেখানে যেতে পারি না। আমাদের সমাজ তোদের মতো খোলামেলা নয়।"

গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবল শিবাজী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কী বই আনব? ইংরেজী, বাংলা সব রকমের বই আছে।"

"বোসবাবুদের জিজ্ঞেস করিস, তাঁরা যা-যা বই দেন সব নিয়ে আসিস।"

"আচ্ছা। অমলদাকে গিয়ে বলি।" সেইদিনই বিকেলবেলা লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এল শিবাজী। এক নতুন জগতের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল সে। এখানে সমাজ কিংবা ধর্মের কোনো অনুশাসন নেই। জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে দিন-রাত্রি আমি পড়তে লাগলুম। এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে আরও একটা জগৎ রয়েছে তার খবর যে রাখে না, সে সত্যিই দুর্ভাগা। কেমন ক'রে যে আমার জীবনের ওপর দিয়ে আরও একটা বছর পার হ'য়ে গেল সে-কথা জানতে পারলুম না। গতবছরেও স্বামী আমার দেশে আসেনি। পরীক্ষার পরে এবার দেশভ্রমণে বেরিয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে তার চিঠি পাচ্ছিলুম। ভ্রমণের উন্মাদনা তার চলার পথে পেছনের বাস্তবকে একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে। আমি তার স্ত্রী—উনিশ-বছরের সত্তা নিয়ে তার জন্যে ব'সে রয়েছি। এ-সত্তাকে যে চোখে দেখতে পায় না, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে না, মন দিয়ে যে বিচার করতে জানে না, তার সম্বন্ধে তোর নিজের কী ধারণা হ'তো, নবনীতা? আমার প্রাপ্যতা কি তার দৃষ্টিকে লজ্জা দিয়েছিল? কিন্তু আমার স্বামীর জীবনের তুলাদণ্ডে দেশভ্রমণের ওজন, আমার উনিশ-বছরের চেয়ে বেশি হ'ল কি ক'রে? তাই জ্ঞান-সমুদ্রের মধ্যে ডুবে থেকেও তাকে আমি ভুলতে পারলুম না। স্বামীর প্রয়োজন আজ আমার কাছে সবচেয়ে বেশি।

চৌধুরী-বাড়িতে যতগুলো মহল আছে তার আভ্যন্তরিক ইতিহাস আমার কাছে না ব'লে শিবাজী ঘুমোতে পারত না। প্রত্যেকদিন রাত্রিতে একটা-দুটো গল্প সে বলতই। শিবাজী যেন ভারত আর লঙ্কার মাঝখানে রামেশ্বর-সেতুবন্ধ।

একদিন সে জিজ্ঞাসা করল, "আমার দিদিকে তুমি চেনো?"

"চিনি। কি রে, চুপ ক'রে রইলি যে? বললুম তো, দিদিকে তোর চিনি। কি, হয়েছে কী, বল্—"

মুখ নিচু ক'রে ধীরে ধীরে শিবাজী বলতে লাগল, "দিদিকে আমি আর ভালবাসি না।"

"কেন? হঠাৎ তুই তার ওপরে রাগ করলি কেন?"

"তোমার নামে দিদি সব খারাপ কথা বলে।"

"বকুলবালা কেন আমার নামে খারাপ কথা বলতে যাবে? সে তো অনেকদিন বংশীপুরে আসেনি।"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল শিবাজী। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত ঠেকতে লাগল। কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে। নইলে শিবাজী এত গম্ভীর হ'য়ে ব'সে থাকত না। জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁ রে শিবু, কী হয়েছে বল্ না। আমার কাছে ভয় কি? তোর দিদির সঙ্গে দেখা হ'ল কোথায়?"

"কাল সে এসেছিল দু'ঘণ্টার জন্যে। বড়কর্তার কাছে তোমার নামে সব মিথ্যেকথা বলছিল।"

শিবাজীর মুখ দেখলুম রাগে লাল হ'য়ে উঠেছে। সে বলতে লাগল, "বড়কর্তার কাছে কাল দিদি নালিশ করছিল—সব মিছে-কথা। বোসবাবুদের কাছে নাকি চিঠি লিখে তুমি বই আনাও—একটা কথাও দিদির সত্যি নয়। বড়কর্তা বিশ্বাস করলেন। আমাকে ধমকাতে লাগলেন তিনি।" এই ব'লে সে চোখের ওপর হাত রাখল।

বললুম, "কাঁদিস্‌নে ভাই। আমরা তো জানি, বকুলবালা মিছে-কথা বলেছে।"

"কেন মিছে-কথা বলেছে জানো?"

"তুই বল্, আমি শুনি।"

আমার চোখের দিকে চেয়ে শিবাজী খোলসা করল, "দিদিকে বিয়ে করবে বড়কর্তা।"

তাই নবনীতা, সারাটা রাত আমার ঘুম এল না।

দশ

বংশীপুরের আকাশে সত্যি-সত্যি মেঘ ক'রে উঠল। যেমন কালো তেমনি ভয়ংকর। হঠাৎ এ-মেঘ কোথা থেকে এল, কেমন ক'রে এল কিছুই বুঝতে পারলুম না। ফাল্গুন শেষ হয়নি, বসন্তের বুকে আর্দ্রতার প্রমাণ নেই—তবু ঝরঝরে শীতল হাওয়া আসছে দক্ষিণ-গঙ্গার মাথার ওপর দিয়ে। আমি জানি বঙ্গোপসাগরের বুক এখনো পাটির মতো সমতল। মৌসুমী-বায়ুর [illegible] শুরু হ'তে এখনো অনেক দেরি। তবুও দেখছি চৌধুরী-বাড়ির মাথার ওপরে মেঘ জমেছে। বকুলবালা আসছে। ভৈরবপুর থেকে রওনা হওয়ার খবর পেয়েছি আমি।

কয়েকদিনের মধ্যেই এই উপকূলে গর্জন উঠল।

বিয়ের তোড়জোড় চলছে। আত্মীয়-স্বজন কাউকে ডাকেননি বড়মশাই। নায়েব, তসিলদার, খাজাঞ্চী এবং অন্যান্য কর্মচারীরা কেনাকাটা করছেন। নায়েবমশাই গেলেন কলকাতায়—তসিলদার ছুটলেন ঢাকা শহরে। খবর পেয়ে সেখানকার সবচেয়ে বড় স্বর্ণকার নরহরি পোদ্দার নিজেই এসে উপস্থিত হলেন বংশীপুরে। মস্তবড় ঘর তৈরি হ'ল। নানা রকমের গয়না তৈরি ক'রে দিতে হবে। চুল থেকে পায়ের আঙুল অবধি সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। সিঁথিফুল থেকে আঙুলবড়। কব্জির মাপ চাই। কোমরের পরিধি কত? শুধু গোট গড়ালে চলবে না।

"আর কী অলংকার গড়াবেন?" প্রশ্ন করলেন নরহরি পোদ্দার।

"নিতম্ব-নাগিনী।"

কোমরের নিচে সোনার বেড়। পেছন থেকে ঘুরিয়ে এনে নাভির তলায় ক্লিপ-লাগানো। অবস্থান ঐখানে, পরবে শাড়ির ওপর। কাপড়ের মতো চারদিকে ঝুলে থাকবে সোনার সাপ। সাপের মুখ ভোঁতা হ'লে চলবে না। বিষধর শান্ত স্নিগ্ধ মুখ যদি হয়, বাতিল করবেন তিনি। বড়কর্তা হুকুম করলেন, "দীর্ঘ সূচিমুখ ফণাটি সবাই যেন দেখতে পায়, পোদ্দার। নিরামিষাশী বোষ্টমদের বেশ এটা নয়—এদের সোনার দাঁতেও শাক্ত ঐতিহ্য।"

"আপনার কথা মিথ্যে নয়, কর্তামশাই। এখন মাপ-জোখের কী ব্যবস্থা হবে?"

মাপ-জোখ সব জানাই ছিল বকুলের।

ফাল্গুন মাসের সাতাশ তারিখে বিয়ের দিন ঠি হয়েছে। আর মাত্র দিন পাঁচেক বাকি। নগেনের খ খবর দিয়ে আসে, বড়কর্তার মহল থেকে খবর ওকে সংগ্র করতে হয়। সে-সব খবর নগেনের মা'র কানে আসে না, সে-সব খবর দিয়ে যায় শিবাজী। বকুলবালার প্রতি ছেলেটা রুষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বিয়ের দিন যত ঘনিয়ে আস শিবাজীর রোষ এবং অসন্তুষ্টির মাত্রা বাড়ছে তত বেশি। ওর ধারণা জন্মেছে, বকুলবালা এখানে এলে আমার খু অসুবিধে হবে। ওকে বললুম, "না ভাই, দিদির ওপর রাগ করিস্‌নে। তার তো বরাত খুলে গেল।"

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বললুম, "দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস-না ওখানে।" আমি নিজেই ওকে হাত ধ'রে টেনে আনলুম। বসিয়ে দিলুম খাটের ওপরে। বসতে দ্বিধা করে শিবাজী। জমিদার-বাড়ির অন্দরমহলে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছে বটে, কিন্তু এখনো মনের ব্যবধান ঘোচেনি। হাঁটতে গেলে হোঁচট খায়, বসতে বললে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে আসে। ডাল-ভাত-তরকারির পরে মাছ-মাংস পাতে পড়লে ঠাকুরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে। দূরের মহলের ছেলে অন্দরমহলে এসেও এখনো এঁদের অংশ হ'তে পারেনি। বকুলবালা জমিদারের বৌ হবে, শিবাজী বোধহয় তাঁর শ্যালক হ'তে পারবে না। বাইরের মহলে বাস ক'রে ছেলেটা এরই মধ্যে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "কি রে শিবু, চুপ মেরে গেলি যে? আজ কিন্তু ভাই আমাকে আরও নতুন বই এনে দিতে হবে।"

"আগেরগুলো সব প'ড়ে ফেলেছ?" অবাক হ'ল শিবাজী, "তাহ'লে বোধহয় ওখানে আর নতুন বই নেই। অমলদা বলছিলেন, আরও নতুন বই কিনতে হবে। অমলদার কাছে আর পয়সা নেই।"

"তাহ'লে কি হবে?" মাথায় ওর হাত বুলতে লাগলুম।

"আচ্ছা, তুমিও তো বড়লোক। তোমার হাতে টাকা নেই?"

"না, ভাই। আমি তো কোনোদিন কারো কাছে কিছু চাইনি। সারাদিন ঘরের মধ্যে ব'সে থাকি। টাকা দিয়ে কী করব?"

আমার কথা শুনে ও শুধু অবাক হ'ল না, দুঃখও পেল। সে বুঝতে পেরেছে, আমি এখানে বাস করছি বটে, কিন্তু সুখী নই। চৌধুরী-বাড়ির অসংখ্য মহলের মধ্যে একটা মহল আমার। হাতের কাছে ঐশ্বর্যের স্বর্গ প'ড়ে রয়েছে, ইচ্ছা করলেই সেখানে প্রবেশ করতে পারি। অভাবের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। চতুর্দিকেই উদ্বৃত্তের ঢেউ। তবুও—তবুও আমি সুখী নই, সে-কথা বুঝতে পেরেছে শিবু। এই এক জায়গায় ওর সঙ্গে আমার মিল আছে। একই মিলনক্ষেত্রে আমার পাশে শিবাজী। পরের দয়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ও। শুধু ও নিজে নয়, দিদিও। গরিব না হ'লে, অসহায় না হ'লে, চৌধুরীবাবু কিছুতেই দিদিকে বিয়ে করতে পারতেন না।

বিয়ের আর মাত্র তিনদিন বাকি। মন অশান্ত, দেহ ক্লান্ত। দিনরাত ব'সে ব'সে শুধু ভাবছি। প্রিয়তোষে সঙ্গে বকুলবালার সম্পর্কটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না সে যে প্রিয়তোষকে ভালবাসে তাতে আর সন্দেহ নেই কিন্তু আমার স্বামীর মনোভাবের পরিচয় আমি পাইনি সেন্ট-হাউসের দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় বকুলবালার গানের কলিটাও ভুলতে পারি না। 'পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব, পিরীতি শিথান মাথে'। কী অদ্ভু গান! কী গভীর ওর কামনা! প্রিয়তোষের দেহটাে দখলে আনবার জন্যে মূঢ় নারী অন্তর্দাহে পুড়ে মরছে।

স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় আমি আকুল হ'য়ে উঠলুম প্রত্যেকদিনই ভাবি সে আসবে। কল্পনা করি, ভারত ভ্রমণের উন্মাদনা তার হ্রাস পেয়েছে। এবার সে আমা কথা ভাবছে। মাঝ-পথ থেকে ফিরে আসবে। স্বামীে আমার দরকার।

বিয়ের দিন সকালবেলা বকুলবালা চ'লে এল ভৈরবপু থেকে। বিয়ে চৌধুরী-বাড়িতেই হবে। তাও আমা হবে শ্বশুরের ঘরের সামনে, দোতলায়। বিয়ে করবার জ তিনি একতলায় উঠোনেও নামতে পারবেন না। এক বেশি নড়াচড়া করলে চৌধুরীদের মর্যাদায় মূলে আঘা লাগবে। বকুলবালাদের ঘর সমান নয়, অনেক নিচে দয়া ক'রে তিনি শুধু শয়ন-কামরা থেকে ফুট-দশেক পথ হেঁ বারান্দা পর্যন্ত আসবেন। সেখানেই ছাদনাতলা, সেখানে বকুলবালার কুমারী-জীবনের অবসান। দশ ফুট পথে মাঝখানে প'ড়ে থাকবে সমাজ, ধর্ম, খাদ্য, যৌবন—সব চৌধুরীমশাই তাদেরই ওপর পা ফেলে-ফেলে ছাদনাতল পর্যন্ত পৌঁছবেন! বকুলবালার জন্যে মন আমার কাঁদে লাগল। এমন খাদ্য ভোগে লাগবে না, নষ্ট হবে। 'তা নবনীতা, বিশ্বাস করো, আমি যদি পুরুষ হতুম তাহ'ল বকুলবালাকে পাওয়ার জন্যে নদী সাঁতরাতুম, পাহাড় ডিঙি পা ভাঙতুম। তবুও দৌড়াতে দৌড়াতে, কিংবা হামাগু দিয়ে হাজার মাইলের পথও অতিক্রম ক'রে বকুলবালা ঘরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হতুম। বিয়ের দিন সকা থেকে এসব কথাই মনে হচ্ছিল। ওকে বিয়ে করবার জন্যে বংশীপুরের জমিদার নাকি একতলাতেও নামতে পারবে না। উপায় থাকলে প্রিয়তোষকে ধ'রে নিয়ে আসতু আজ। বলতুম, এতবড় অধর্ম ঘটতে দিয়ো না প্রিয়তোষ, ওকে বিয়ে করো তুমি। আমি সতীন হ'য়ে তোমার সেবা করব। 'পতি পরম গুরু' মন্ত্র আওড়াবো তবুও বকুলবালাকে রক্ষা করো, নষ্ট হ'তে দিয়ো না।

বহুদিনকার একটা অব্যবহৃত মহলের দরজা-জানালা খোলা হয়েছিল গতকাল। আজ সকালে বকুলবালা সেখানে এসেই আশ্রয় নিয়েছে। কয়েকজন দাসী সকাল থেকেই সেই মহলটা আগলে ব'সে ছিল। বকুলবালার খাস-চাকরানী এরা। তা ছাড়া, নায়েবমশাই তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা দুটিকেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরা ছাড়া অনুষ্ঠান হবে না। দুপুরের দিকে তশিলদার নবকেষ্ট মুখুজ্জের স্ত্রীও আসবেন। সম্প্রদানের জন্যে বকুলবালার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় গতকাল থেকে এসে ব'সে আছেন চৌধুরী-বাড়ির অতিথিশালায়। ভৈরবপুরের নিকট-আত্মীয়েরা কেউ সম্প্রদান করতে রাজী হননি।

শ্বশুর আমার খবর পেয়েছেন, সকাল থেকে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে আছি আমি। এমনকি নগেনের মা পর্যন্ত আমার ঘরে ঢুকতে পারেনি। শ্বশুর নাকি বলেছেন, যতদিন বেঁচে থাকবেন, তিনি আর আমার মুখ দেখবেন না। সত্যিই তো, বকুলবালার মুখের কাছে আমার মুখ আজ কলঙ্কিত হ'য়ে গেল!

সন্ধেবেলা দরজায় আবার আওয়াজ শুনতে পেলুম। মৃদু করাঘাত। মনে হ'ল শিবাজী এসেছে। দরজা খুলে দিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "কি রে এখানে? লগ্ন ক'টায় রে?"

"জানি না—।"

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, চোখ-দুটো লাল। বুঝলুম, কেঁদেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "দুপুরবেলা এলি না কেন একবার?"

"অমলদা মিটিং করছিলেন। তিনি বক্তৃতা দিলেন।"

"কী বললেন অমলদা?"

"বললেন যে, টাকার জোরে কর্তাবাবু অন্যায় করছেন। আরো অনেক কথা—"

দরজাটা খোলা ছিল। এবার সেটা বন্ধ করতে গিয়ে বললুম, "দরজা বন্ধ করলে আমি আর খুলব না। যদি বিয়ে দেখতে যেতে চাস তো এইবেলা যা।"

"বিয়ে আমি দেখব না। তোমার কাছে ব'সে থাকব। অমলদা বললেন, দোষ শুধু কর্তাবাবুর নয়, দিদিরও। শোনো—" এই ব'লে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এল শিবাজী, তারপর বলল, "অমলদা বললেন, 'দিদিকে জিজ্ঞেস ক'রে আয়, চৌধুরীবাবুকে সত্যিই সে বিয়ে করতে রাজী আছে কিনা। রাজী না থাকলে পালিয়ে আসতে বল্।' দিদিকে অমলদাই বিয়ে করতে পারেন, দুমুদি। দিদিকে গিয়ে বলব?"

"তাহ'লে বরং দিদিকে খবরটা তুই দিয়ে আয়, ভাই। পালিয়ে যেতে চাইলে আমিও সাহায্য করব। অমলদা বিয়ে করবেন তো?"

"কথা যখন দিয়েছেন নিশ্চয়ই করবেন।"

"তাহ'লে তুই এক্ষুনি যা। আর শোন্, শিবু—দিদির কানে-কানে বলিস। কেউ যেন শুনতে না পায়।"

"আচ্ছা।" শিবাজী বেরিয়ে গেল।

ভেতর থেকে দরজায় খিল লাগালুম না আমি। শুধু ভেজিয়ে দিলাম। আমার কিন্তু বিশ্বাস, বকুলবালা রাজী হবে না। এই বিয়ের পিছনে ওর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়ে বোধহয় ভালো করলুম না। বকুলবালা আবার একটা নতুন গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে পারে। মাঝখান থেকে অমলবাবুরা বিব্রত বোধ করবেন। কথাটা শ্বশুরমশায়ের কানে গেলে ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর হ'য়ে উঠতে পারে। বংশীপুর চৌধুরীদের খাস সম্পত্তি। জমিদারদের প্রতিপত্তি ক'মে গিয়েছে বটে, কিন্তু দশ-বিশটা বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিলেও, আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়না তাঁদের। আমি জানি, অমলবাবুদের লাইব্রেরিটার ওপর এঁদের খুব রাগ। পুলিসরাও চোখ রেখেছে। হয়তো লাইব্রেরিটা জ্ব'লে-পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে পারে। আজকের রাত্রিটা তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ব'সে ছিলুম। ছটফট করেছি। বকুলবালাকে সঙ্গে নিয়ে কখন সে ফিরে আসবে। কোন্ পথ দিয়ে যে ওকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করব তাও আমি মনে-মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। সেজেগুজে বকুলবালা আমার মহলে আসবে প্রথমে। দাসদাসীরা কেউ সন্দেহ করবে না। ঘরে ব'সে গল্প করব দু'দশ মিনিট। শিবাজী যাবে অমলবাবুকে খবর দিতে। সেখানকার ছাদনাতলা আগে থেকে তৈরি থাকা চাই। যেন পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে বকুলবালাকে অমলবাবু বিয়ে ক'রে ফেলতে পারেন। কর্তাবাবু যখন খোঁজ করতে বেরুবেন, তখন তো বকুলবালা পরস্ত্রী। বাড়ির বাইরে গিয়ে বকুলবালার নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার পর্যন্ত তাঁর লোপ পেয়ে গিয়েছে। সারা সময়টা এই ক'টা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার ক'রে ভাবলুম। মুগ্ধ হ'য়ে গেল। আমার আবদ্ধ ঘরেও রোমাঞ্চের হাওয়া বইছে। প্রতি রোমকূপে স্ফূর্তির স্পন্দন। বকুলবালার বদলে বিয়ের চেলী প'রে ব'সে রয়েছি যেন আমি।

আমি গেলুম দরজার খিল লাগাতে। এমন সময় কে যেন ঘরের দরজায় করাঘাত করতে লাগল।

শিবাজী এসে ঘরে ঢুকলো। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কি রে, কী হ'ল? বলেছিলি?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর?"

"আমার কথা শুনে দিদি বললে, 'দাঁড়া, কর্তাবাবুকে ব'লে দিচ্ছি। কে তোকে বুদ্ধি দিয়েছে রে? প্রিয়তোষের বৌ বুঝি? কর্তাবাবুর সঙ্গে আগে বিয়েটা হ'য়ে যাক, তারপর দেখিস।' আমি বললুম, 'না দিদি, তিনি আমায় কিছু বলেননি। এ তো অমলদার নিজের কথা।' দিদি বলল, 'তোর অমলদার আস্পর্ধা তো কম নয়। বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে চায়! তোকেও এবার জব্দ করব, দাঁড়া। বিয়েটা হ'য়ে যাক। তোদের সবাইকে মজা দেখাব!' কুমুদি, এখন কী হবে? কর্তাবাবুকে যদি ব'লে দেয়?"

"তেমন যদি বিপদে পড়িস, আমি তোকে রক্ষা করব। হ্যাঁ রে, দিদি কী করছিল? ওখানে আর কে কে আছে?"

"নায়েবমশায়ের বৌ, আর সব ঝি-চাকরানী। নগেনের মা দিদিকে আলতা পরাচ্ছিল।"

"খুব সেজেছে বুঝি বকুলবালা?"

"হ্যাঁ, রানীর মতো লাগছিল।"

"রানী?" সকৌতুক হাসি আর চাপতে পারলুম না, জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ক'রে বুঝলি রানীর মতো? তুই কি রানী আরও দেখেছিস, শিবু?"

"দেখেছি, কুমুদি। কর্তাবাবুর কাছারি-ঘরে রাজারানীর ছবি টাঙানো আছে। মাথায় মুকুট। কপালের ওপরে সোনার খাবর।"

দরজার দিকে ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও এগিয়ে গেলুম। ভেতর থেকে বন্ধ করার আগে বললুম, "আজ থেকে তোরাও চৌধুরী-বাড়ির অংশ হ'য়ে গেলি।"

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ছেলেটা আমার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মাথা নিচু ক'রে চ'লে গেল পূবদিকের বারান্দা দিয়ে।

ওইদিকেই কর্তাবাবুর মহল।

সাত

সত্যিই বকুলবালার বিয়ে হ'য়ে গেল।

আবার সেই প্রতিদিনকার জীবন তার নিয়মিত পথ ধ'রেই চলতে লাগল। বোসবাবুদের লাইব্রেরি থেকে বই আসছে, বকুলবালার মহল থেকে খাবার আসছে—আর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে আসছে প্রিয়তোষের চিঠি। সময়টা মন্দ কাটছিল না।

হঠাৎ একদিন শিবাজী এসে খবর দিয়ে গেল, "আজ থেকে এ-বাড়ির নিয়মকানুন সব বদলে গেল। এবার দিদির কথামতো সবাইকে চলতে হবে।"

নিয়মকানুনের কোনো পরিবর্তন হয়েছে ব'লে আমার জানা ছিল না। অন্ততঃ আমি টের পাইনি। তবুও ওর কথা শুনে একটু বিচলিত বোধ করলুম। হয়তো নতুন নিয়ম দু-একটা চালু হবে এবার।

একদিন হঠাৎ সকালবেলা বকুলবালা আমায় ডেকে পাঠাল।

একটু বাদেই আমি এলুম কর্তাবাবুর ঘরে। আগেও বারকয়েক এখানে এসেছি আমি। বিয়ের দিন থেকে বোধহয় এই ঘরের সব-কিছু বদলে গিয়েছে। হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না। আগের খাটখানা নেই। বিরাট বড় দু'খানা নতুন খাট একসঙ্গে জোড়া দেওয়া। দেখতে অনেকটা প্যালেসের মতো। অন্যান্য আসবাব যা ছিল তা আর নেই। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতবড় ঘরের মধ্যে শুধু খাট দু'খানাই আছে। খাটের পাশে একটা মাত্র চেয়ার। আমি সেই চেয়ারের দিকে হেঁটে গেলুম।

ঘরে ছিল বকুলবালা। গত সাতদিনের মধ্যে সেও দেখলুম ভীষণভাবে বদলে গিয়েছে। একটু-আধটু বদলানো হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হ'ল, বকুলবালা বদলায়নি, ভেঙে গিয়েছে। ক'দিন আগের সাজানো বাগানটা এলোমেলো। দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকম্পের মতন বাগানের মাটিতে ধসের চিহ্ন। চিহ্নগুলো চিড় নয়, ফাটল।

একটা ঝি তার পা টিপছিল। দেখলুম, পায়ের আলতা মলিন হ'য়ে এসেছে বটে, কিন্তু এখনো মুছে যায়নি। বকুলবালা ঝি-কে বলল, "তুই এখন যা, প্রমদা। পরে আসিস। ডান পায়ের হাঁটুতে ব্যথা, কোমরটা কনকন্ করছে। আজ তোর আর অন্য কোনো কাজ নেই, শুধু টিপে দিবি। বুঝলি?"

"বুঝেছি, ছোট-মা।"

"তোর যদি হাত ব্যথা করে, সরলাকে পাঠিয়ে দিস।

এখন যা—বেরো তাড়াতাড়ি।" বকুলবালা পাশ ফিরে শুয়ে বলতে লাগল, "শরীরের আর দোষ কি, বৌমা—"

আমি একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলাম। প্রমদা তখন চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দায় পা দিয়েছে। কি বলতে কি যে ব'লে ফেলবে বকুলবালা তার ঠিক নেই। আমি তাই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলাম।

প্রমদা চ'লে যাওয়ার মিনিট দুই পরে বকুলবালা বলল, "বুঝলে বৌমা, শরীরের দোষ কিছু নেই। শক্ত চৌকির ওপর শুয়ে-শুয়ে শরীর তৈরি হয়েছে। হঠাৎ এই সাতদিন থেকে নরম গদির—বৌমা—" আমার দিকে চোখ তুলে সে বলল, "বৌমা, আমায় তুমি প্রণাম করলে না?"

হাঁটু পর্যন্ত শাড়িটা তোলা ছিল। তার পা-টা আমার দিকে আলগা ভাবে তুলে ধ'রে বকুলবালাই বলল, "প্রণাম করো, বৌমা।"

চেয়ার থেকে উঠে পড়লুম আমি। খাটের কাছে গিয়ে বললুম, "পা-টা বিছানার ওপর রেখে রাখুন। দু'পায়েরই ধুলো নিতে হয়।"

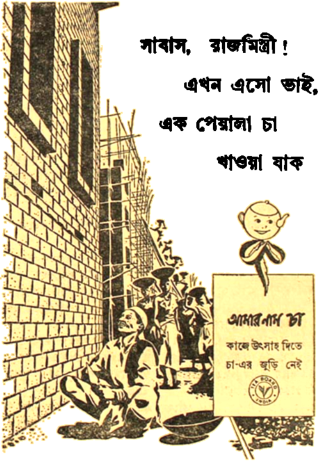

শাশুড়ীর পায়ের-ধুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "শরীরটা কি ভালো নেই আপনার ?"

"কি ক'রে ভালো থাকবে, বৌমা ?" ফিক্ ক'রে হেসে ফেলল সে। আমি তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে ব'লে ফেললুম, "ও হ্যাঁ—তাই তো! ভালো থাকবার কথা নয়। খাটুনি তো কম যায়নি। তার ওপরে উদ্বেগ—বুঝতে পেরেছি।"

"কিছুই বুঝতে পারনি। আসল কথা, ঘুম আসছে না। তোমার বড়র বললেন, একহাত পুরু গদির নিচে নাকি আবার আধহাত পুরু—কি যেন বলে তাকে ?"

"স্প্রিং—"

"হ্যাঁ, তাই হবে। নিচে ব'সে যায়, আবার উঠে পড়ে। লাফায়। প্রথম দিন তো ভয় পেয়েছিলুম খুব। ভেবেছিলুম, তলিয়ে যাচ্ছি বুঝি—ভাবছি, আজ থেকে মেঝেতে শোব।—প্রমদা, প্রমদা কই রে, কোথায় গেলি ? কোমরটা আবার কন্‌কন্ করছে। হ্যাঁ বৌমা, তোমার বুঝি ব্যথা-বেদনা নেই ? কন্‌কন্ করে না ?"

"না। আমি এখন চলি।"

"খালি ঘরে ব'সে সময় কাটাও কি ক'রে ? প্রিয়তোষ কবে আসবে ?" প্রশ্ন করল বকুলবালা। তারপর নিঃসংকোচে এলোমেলো শাড়ির আঁচলটা আরও বেশি অবিন্যস্ত ক'রে বলতে লাগল, "প্রিয়তোষ এসে দেখবে, ওর সেই শখের সবেদা-গাছের ডালটি ভেঙে গিয়েছে। ইচ্ছে ক'রেই নিজেকে ভাঙলুম আমি। প্রিয়তোষ বিশ্বাসঘাতক। ওর ওপরে নির্ভর কোরো না। ওরা যদি নুলো, কুব্জ, অথর্ব হ'য়ে যায়—তবুও না। টাকা, গহনা, শাড়ি দিয়ে হয়তো সুখ কেনা যায়, মন কেনা যায় না। তুমি তো বৌমা কলকাতার মেয়ে, তুমি কী বলো ?"

"পরে আবার আসব। আমি চলি এখন।" আমি উঠে পড়লুম। বকুলবালা বিছানায় শুয়েই ডাকল আবার, "শোনো বৌমা—"

আবার আমি তার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। এবারও সে ডান পা-টাই উঁচু ক'রে তুলে ধরল, আর ধরল প্রায় আমার বুক অবধি। লজ্জা-শরমের বালাই নেই। বকুলবালা বলল, "যাওয়ার আগে প্রণাম ক'রে গেলে না? শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে না গেলে পাপ হবে।"

বললুম, "পা-টা পালঙ্কের ওপর রেখে রাখুন। তাতে প্রণাম নিতেও সুবিধে, করতেও সুবিধে।"

আমার বক্তব্য সে শুনলো কিনা বুঝতে পারলুম না। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখলুম, দুটো পা-ই গুটিয়ে ফেলল সে। জড়োসড়ো ভাবে শুয়ে হাত দি চোখ-দুটো ঢেকে রাখল। তারপর গুনগুন্ সুরে গা ধরল—"পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব, পিরীতি শিথা মাথে—"

প্রণাম না ক'রেই বেরিয়ে এলাম আমি। মনে হ' বকুলবালার গলার স্বর ভেজা।

তারপর আরও একটা সপ্তাহ কেটে গেল। কোনো দিক থেকেই ডাক এল না আমার। বকুলবালা নীরব। বড়কর্তার মহলের নতুন খবর কিছু কানে আসেনি। শিবাজী আজকাল মাঝে মাঝে আসে, কথা কম কম। গতকালও সে এসেছিল। দু'খানা নতুন বই দিয়ে গিয়েছে। যাওয়ার সময় ব'লে গিয়েছিল, "এই-ই শেষ। আর নেই কুমুদি, টাকার যোগাড় না হ'লে অমলদা আর বই কিনতে পারবেন না। এ-মাসে কেউ একটা পয়সাও চাঁদা দেয়নি—আচ্ছা, আমি চললুম।" শিবাজী সত্যি-সত্যি চ'লে গেল। বেচারী শিবু।

সন্ধের সময় বকুলবালা এসে উপস্থিত হ'ল আমার ঘরে। খুবই অপ্রত্যাশিত আগমন সন্দেহ নেই।

আপাতত সে টেবিলের দিকে পেছন ফিরে আমা খাটের ওপর বসল। পা ঝুলিয়ে দিল এবং দুটো পা- মৃদু মৃদু দোলাতে লাগল। পায়ের-ধুলো নেওয়ার অনুষ্ঠা পালন করবার জন্যে বকুলবালা হুকুম করল না, অনুরোধ করল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কর্তাবাবু কি কাছারি-বাড়ি থেকে ফেরেননি ?"

"আজ তিনি ঘর থেকে এক-পা-ও বেরোননি। সারাদি ওষুধ খাচ্ছেন", অর্থপূর্ণভাবে হাসতে হাসতে বকুলবাল বলল, "কোবরেজ-ব্যাটা সবদিনই নিজের হাতে ঘ ওষুধ বাটছে আর কর্তাবাবুকে খাওয়াচ্ছে। কুমুদিনী—"

"আজ্ঞে—" ভাবলুম পা-টা এবার তুলে দেবে বুঝি বলবে, প্রণাম করো। আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম হঠাৎ কেন সে বৌমার বদলে 'কুমুদিনী' ব'লে সম্বো করল বুঝতে পারলুম না। বুকের ভেতরটা ভয়ে কেঁপে উঠেছে আমার।

দরজার ওপাশে প্রমদা এসে দাঁড়িয়েছিল। বকুলবা জিজ্ঞাসা করল, "কী চাই তোর ? পিছু-পিছু এখানে এ কেন ?"

"কর্তাবাবু পাঠিয়ে দিলেন, ছোট-মা।"

"কেন?"

"আপনাকেও এই ওষুধটুকু খেয়ে নিতে বললেন।" প্রমদা ঘরের মধ্যে ঢুকলো। আমি দেখলুম হাতে ওর কালো-রঙের একটা খল। সেটা বকুলবালার দিকে এগিয়ে ধ'রে প্রমদা বলল, "চেটে-চেটে খেয়ে নিন, ছোট-মা।"

খিলখিল স্বরে হেসে উঠল বকুলবালা। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল আমার বিছানার ওপর। বলল, "বেরো এখান থেকে! কোবরেজ-ব্যাটাকে খেয়ে নিতে বল্ গে যা। যা বলছি—"

চ'লে গেল প্রমদা। একটা হেঁচকা টান মেরে দেহটাকে তুলে ফেলল বকুলবালা। সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বলল, "বড় শখের সবেদা-গাছ ছিল, বৌমা!" নাক দিয়ে ঘন-ঘন নিশ্বাস টানলো সে, তার পরে আবার বলল, "প্রিয়তোষের গন্ধ পেলাম যেন। ফিরেছে নাকি?"

"না। সে এলে প্রথমেই তাকে আপনার কাছে পাঠাব।"

"কেন? আমার কাছে পাঠাবে কেন, কুমুদিনী?"

"আপনার পায়ের-ধুলো নিয়ে আসতে।"

আশ্চর্যরকমের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করলুম বকুলবালার মধ্যে। চাঞ্চল্য আর রইল না। উঠে পড়ল সে।

ঠিক সেইসময়ে ঘরে ঢুকলো শিবাজী।

গম্ভীর স্বরে বকুলবালা বলল, "এ-বাড়ির কোনো বৌ আজ পর্যন্ত গোপনে অন্য কারো সঙ্গে সম্বন্ধ পাতায়নি। অস্বীকার তুমি করতে পারবে না, বৌমা। অমল বোসদের সঙ্গে তোমার খুবই পরিচয়। শিবাজী তার সাক্ষী।"

বললুম, "সাক্ষী-সাবুদের দরকার নেই। শিবাজী যখন বই নিয়ে আসছে তখন এটা যে কোনো গোপন ব্যাপার নয় তা তো আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন।"

"অমন কায়দা ক'রে তর্ক আমি করতে পারিনে। তুমি হচ্ছ গিয়ে কলকাতার মেয়ে, আমরা গেঁয়ো", আমার চোখের দিকে চেয়ে গলার স্বরে হুকুমের দৃঢ়তা এনে সে-ই বলল, "বৌমা, এবার থেকে নতুন নিয়ম চালু করলুম। সোজা কথা, বোসবাবুদের বাড়ির সঙ্গে তোমার আর সম্বন্ধ থাকবে না। এ তোমার শ্বশুরের আদেশ।"

"আদেশ আপনার হ'লেও মাথা পেতে গ্রহণ করব। কিন্তু বোসবাবুদের লাইব্রেরি থেকে যদি বই আনি তাতে অপরাধ কী?"

"বলো কি! এদেশের ছোঁড়ারা যে তোমার নিয়ে দিনরাত্তির রগড় ক'রে বেড়াচ্ছে। বোসবাবুদের বাড়িতেই সে-সব ফক্কড়দের আড্ডা।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "এটি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা? মনে হচ্ছে, সেই ফক্কড়দের আড্ডায় আপনি নিজে গিয়ে কান পেতে শুনে এসেছেন। ছিঃ!"

"বৌমা—" বকুলবালা এবার দজ্জাল শাশুড়ীর মতো অশোভন ভঙ্গী ক'রে বলল, "এটা কইলকেতা নয়, বগীপুরের চৌধুরী-বাড়ি—বোধহয় এই কথাটা ভুলে গিয়েছ, না?"

"আমি ভুলিনি। আপনি নিজে হয়তো ভুলে গিয়েছেন। আজকের এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের দিনে চৌধুরী-বাড়ির মর্যাদার কথা মনে রাখা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। শিবাজী, আজ থেকে তাই তোমার ডিউটি শেষ হ'ল। বই যা আছে এখানে, সব ফিরিয়ে দিয়ে এসো।"

শিবাজী তবুও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। এবার আমার সত্যি-সত্যি রাগ বাড়তে লাগল। আমার অনুরোধ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করছে! ধমকানির স্বরে বললুম, "তুই না নিস, জানালা দিয়ে বই সব ফেলে দেব।"

"তাই দাও, কুমুদি। লাইব্রেরিটা আর নেই।"

"নেই! কোথায় গেল?"

"কাল ভোররাত্রে পুড়ে গেছে। কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।"

আট

দশ-বারো বছর আগের ঘটনা, তবুও যেন মনে হয় একটা ঘটনাও পুরনো নয়।

আগের চিঠিতে তোকে লিখেছিলুম, বকুলবালা হঠাৎ এসে আমার ঘরে সেদিন উপস্থিত হয়েছিল। বোসবাবুদের বাড়ির সঙ্গে আমার যাতে যোগাযোগ না থাকে তার জন্যে হুকুম ক'রে গিয়েছিল সে। হুকুমের গর্জন আজকাল মাঝে-মাঝেই শুনতে পাই। লাইব্রেরিটা পুড়ে যাওয়ার পরে নতুন ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের দুই মহলের মধ্যে ব্যবধান অনেক, তা সত্ত্বেও বকুলবালা যোগাযোগ রক্ষা করছে। সে নিজেই চ'লে আসে, নয়তো ডেকে পাঠায় আমাকে। দেরি ক'রে গেলে প্রথমে ভর্ৎসনা করে তার পর উপদেশের স্বরে বলে—"গুরুজনেরা ডেকে পাঠালে তক্ষুনি ছুটে আসতে হয়।"

আমার বিশ্বাস, বকুলবালা এতদিনে বুঝতে পেরেছে যে প্রাপ্য অপমান আর লাঞ্ছনা দিয়ে সহজে মেয়েকে হা

মানাতে পারবে না। শাশুড়ীর ভূমিকায় আজকাল তাই অভিনয় করতে মাঝে মাঝে ভুলে যায়।

সেদিন আবার আমার ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল। মৃদু হেসে বলল, "কুমুদিনী, আমার বোধহয়—" কথাটা শেষ করল না। জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার বোধ হয় কী? বললেন না তো?"

কথাটা বলল হাসতে হাসতে, শেষ করল গম্ভীরভাবে। আমি দেখলুম, মুখের রেখাগুলো সব ভাঙা। যন্ত্রণা লুকিয়ে রাখতে পারল না। আগের মতো মুখের রং ফরসা নেই। একটু যেন তামাটে হ'য়ে এসেছে। সম্পর্কে আমার শাশুড়ী। বারকয়েক তো পায়ের-ধুলোও নিলুম। তবুও যেন মনে হয়, প্রিয়তোষের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বকুলবালা। ওর পাশে ছাড়া বকুলবালাকে অন্য কোথাও মানায় না। শাশুড়ীর ভূমিকায় অভিনয় করে সে। শুধু অভিনয়। সত্যিকারের শাশুড়ী হওয়া কি ওর পক্ষে কোনোদিন সম্ভব হবে? আজকাল আমার কষ্ট হয় বকুলবালার জন্যে। প্রিয়তোষ ভুল করেছে। বকুলবালাকে নিয়ে পালিয়ে গেলেই পারত।

কয়েকদিন পরে বকুলবালা আবার এল আমার কাছে। এসে বলল, "না, হ'ল না! ভুল, সব ভুল।" শুয়ে পড়ল আমার বিছানার ওপর। অস্বস্তি আর অশান্তির কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠেছে। প্রিয়তোষের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বকুলবালা কি শেষপর্যন্ত নিজের ওপর প্রতিশোধ নিল?

গড়াতে লাগল বকুলবালা। বিছানার এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত। ঢাকাই জামদানি এলোমেলো হচ্ছে। গড়াচ্ছে আর বলছে, "শুকিয়ে মরলুম, কুমুদিনী! এই জন্যে—" গলার নিচে হাত বুলতে লাগল, "এই ভাখো, কাঁচা মাসে প'চে উঠেছে। উনোনে তাপ নেই। দেখবে? তিন মাস হ'য়ে গেল, বুকোটা শুধু—" বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী চান আপনি?"

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বকুলবালা বলল, "প্রিয়তোষ বিশ্বাসঘাতক! বেইমান। একবিন্দু তাপ পর্যন্ত রেখে যায়নি। তোমার বিছানাটা পর্যন্ত ঠাণ্ডা। কুমুদিনী, জানো, ওর সঙ্গে আমি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম?"

"গেলেন না কেন?"

"এক-নম্বরের ভীরু—" উঠে বসল সে, "চারদিক বন্ধ ক'রে নির্বিঘ্নে ভোগ করতে ভালবাসে ওরা। পদ্মা-পারের মানুষ জল দেখলে ভয় পায়। ঢেউ দেখলে ঘরের জানালা-দরজায় খিল লাগায়। জানো, ওরা কেউ পদ্মায় নেমে চান করেনি? বাথরুম, না কি-সব নামমুণ্ডু বাড়ির মধ্যে তৈরি ক'রে রেখেছে। গোলক চৌধুরীর আমলে এসব ছিল না। শুনেছি, আমার দিদিমাকে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে পদ্মায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন গোলক চৌধুরী। দুর্ধর্ষ পুরুষ ছিলেন তিনি। দিদিমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাসতেন। সে এক সাংঘাতিক কাহিনী!" এইটুকু ব'লে থেমে গেল সে। যেন অতীতের গোলক চৌধুরীকে খুঁজতে লাগল বকুলবালা।

আমি অনুরোধ করলুম, "গল্পটা বলুন না, শুনি।"

"গল্প কি গো, বৌমা? সত্যি-ঘটনা।"

"তাই বলুন।"

দুটো বালিশ টেনে নিল সে। বুকের তলায় রেখে তার ওপরে দু'হাতের কনুই ঠেকিয়ে বকুলবালা বলতে লাগল, "আমার দাদামশাই টের পেয়েছিলেন যে, সেই রাত্রে গোলক চৌধুরী আসবেন। তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ ছিলেন। তবুও ভৈরবপুরে তাঁর নামডাক ছিল খুব। আগে থেকেই গাঁয়ের লোকদের জড়ো ক'রে রেখেছিলেন। তার মধ্যে ভালো ভালো লেঠেলরাও ছিল। বাড়ির তিন দিকে তারা ঘেরাও ক'রে পাহারা দিচ্ছিল। অন্য দিকটা খালি ছিল। পাহারা দেওয়ার দরকার হয়নি। ওইদিকেই পদ্মা। কালবৈশাখীর মুখে পদ্মার চেহারা বদলে গিয়েছে। ভীষণ তার চেহারা। ওপারের উঁচু-উঁচু নারকোল কিংবা তালগাছগুলোও আর দেখা যায় না। পদ্মার বুক শুধু চওড়া হয়নি, সেখানে দিগন্তজোড়া বড় বড় ঢেউ উঠেছে—বাতাসের ধাক্কা লেগে ভেঙে পড়ছে তারা। পাগলা-হাওয়ার গর্জন শুনে আতঙ্কে অস্থির হ'য়ে উঠত মানুষ। তোমাদের মতো পাকা-বাড়ি ছিল না দাদামশায়ের। উত্তর দক্ষিণ খুঁটিতে দু'খানা মাত্র ঘর। একদম নদীর সামনে। মনে হ'তো, দুটো ব্যাঙের ছাতা বুঝি!" হঠাৎ মুখ তুলে বকুলবালা জিজ্ঞাসা করল, "ওমা! কে ও! প্রমদা?"

"হ্যাঁ। আপনার চানের সময় হয়েছে। বারোটার ঘণ্টা বাজলো কাছারি-বাড়িতে।"

"তুই চান ক'রে নিগে যা—আমি এখন যাব না। বেরো, বেরো এখান থেকে—" প্রমদাকে তাড়িয়ে দিয়ে বকুলবালা বলতে আরম্ভ করল, "রাত বারোটার সময় গোলক চৌধুরী এলেন। সন্ধ্যে থেকে দুর্যোগ শুরু হয়েছিল।

ঘোড়ায় চেপে একা-একা তিনি দশমাইল রাস্তা ছুটে এসেছেন। সাহসের বাহাদুরি আছে বটে। এইতো সত্যিকারের পুরুষ! নির্ভর করা যায়, হাত ধ'রে বেরিয়ে যাওয়া চলে। এমন মানুষের সামনে তোমার এসব গদিওয়ালা খাট-পালঙ্ক কী? কতটুকু আরাম পাওয়া যায়, বৌমা? বাদশাদের হারেমে ঢোকবার লোভ কার হয়?"

"আপনার দিদিমা কি গোলক চৌধুরীকে ভালবাসতেন?"

"তাঁর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, বৌমা। নইলে কি তিনি রাত বারোটার সময় এমন দুর্যোগের মধ্যে পদ্মার পাড়ে এসে অপেক্ষা করতেন? গল্প শুনেছি, ঘোড়াটা দূরে রেখে এসে গোলক চৌধুরী পায়ে হেঁটে পদ্মার পাড় পর্যন্ত এলেন। তিনি বললেন, 'সরলা, সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ। গাঁয়ের লোকেরা টের পেয়েছে। কী করবে?' দিদিমা বললেন, 'আমি তো সাঁতার জানি। সামনের পথ তো আটকাতে পারেনি ওরা।' গোলক চৌধুরী অবাক হলেন। পদ্মা এখন নদী নেই, সমুদ্র। জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভয় করবে না তো?' ঠিক সেইসময় লেঠেলরা সব এদিক-ওদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল। চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এল গোলক চৌধুরীর দিকে। আক্রমণকারীদের সামনে দাদামশাই। তাঁর হাতে সাত-মুখো বর্শা। খানিকটা দূর থেকেই বর্শা ছুঁড়লেন তিনি। লাগল না। নিশ্চিন্ত-মনে এগিয়ে আসছিলেন ওঁরা। ভেবেছিলেন, গোলক চৌধুরী ধরা পড়বেই। পদ্মার দিকে পথ নেই। বৌমা, ওঁরা ওই দিকেই পথ পেয়েছিলেন। দিদিমাকে নিয়ে গোলক চৌধুরী ঝাঁপ দিলেন পদ্মায়।—চান করতে চললুম, বৌমা। বাকী গল্পটা বিকেলবেলা বলব।"

"না—এখুনি বলুন। এমন গল্পের শেষ না শুনে কি স্বস্তি পাওয়া যায়! ব'লে যান।" অনুরোধ করলুম আমি।

এবার বকুলবালা নিজের কাপড়-চোপড়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলতে লাগল, "ঘণ্টা-দুয়েক ঝড়ের সঙ্গে লড়তে হ'ল। দিদিমা হাঁপিয়ে পড়লেন। কোথায় তীর, কোথায় ডাঙা! দেহটাকে ভাসিয়ে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ভর করলেন গোলক চৌধুরীর ওপর। ওজন কমানো দরকার। শাড়ি কাপড় এক এক ক'রে ফেলে দিতে হ'ল। আরও ঘণ্টা দুই ভেসে রইলেন ওঁরা। হাতের কাছে কুটোটি পর্যন্ত নেই। স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ দিকে যে যাচ্ছেন তাও তাঁরা জানেন না। এই সময় আরও জোরে ঝড় উঠল। দিদিমা বুঝতে পারলেন, তীরে আর পৌঁছনো যাবে না। বললেন তিনি, 'ছেড়ে দেওয়ার আগে আমায় তুমি একটু আদর করো, গোলক। এর পরে তো শুধু কুমীরের ভোগে লাগব।' দিদিমাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলেন গোলক চৌধুরী। যতক্ষণ পারলেন ছাড়লেন না। তারপর কখন যে দিদিমা তাঁর হাত থেকে ফসকে গেলেন টের পেলেন না গোলক চৌধুরী। ভোরের দিকে, কুটোর চেয়েও বড় জিনিস একটা নজরে পড়ল তাঁর। একটা কাঠের দরজা। গতরাত্রের ঝড়ে কারো বাড়ির নিশ্চয়ই উড়ে গিয়েছিল। দরজাটা আপাতত চেপে ধরলেন তিনি। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। দূর থেকে জেলেরা তখুনি দেখতে পেয়েছিল। নৌকো নিয়ে ছুটে এল তারা। জেলেরা পরে জানতে পারল, এই উলঙ্গ মানুষটি বংশীপুরের জমিদার গোলক চৌধুরী। কুমুদিনী, প্রিয়তোষরা তাঁর রক্ত পেয়েছে, সাহস পায়নি, সামর্থ্যও পায়নি। কলকাতার জলবায়ুতে সব নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।"

"তাই তো মনে হচ্ছে।—আপনার মধ্যে কিন্তু দিদিমা এখনো বেঁচে রয়েছেন।" মন্তব্য করলুম আমি।

"তোমার ভয় করে না?"

"না।"

ব্লাউজের বোতাম লাগালো। তারপর শাড়ির আঁচলটাকে গুছিয়ে নিয়ে বকুলবালা বলল, "তাহ'লে প্রিয়তোষকে তুমি ভালবাস না। তোমার মনের মধ্যেও অন্য একটা মন আছে।"

বললুম, "হয়তো আপনার ধারণা মিথ্যে নয়। ইচ্ছে করলে প্রিয়তোষকে ফিরিয়ে নিতে পারেন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বকুলবালা বলল, "আর পারি নে।"

"কেন?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বকুলবালা বলল, "প্রিয়তোষের বাবা আমার স্বামী। বৌমা, ও এলে আগে যেন আমার পায়ের-ধুলো নিয়ে আসে। ওকে আমি—" কথাটা শেষ না ক'রে সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি ছুটে গেলুম পেছনে পেছনে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কই, কথাটা শেষ করলেন না তো?"

ঘুরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বকুলবালা বলল, "ওকে আমি পায়ের তলায় রাখতে চাই, বৌমা। রাখব-ও।"

পিয়াসী আর আসে না আমার কাছে। আসবার

হুকুম নেই। নগেনের মা বলে—"বড়কর্তার হুকুম অমান্য করবে কি ক'রে?"

বেচারী নিরু! আমি জানি, আমার কাছে আসতে পারছে না ব'লে মনে-মনে কষ্ট পাচ্ছে সে। আমিও একলা প'ড়ে গেলুম। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রইল না।

বিকেলের দিকে আজ নগেনের মা বলল, "দাদাবাবুর বোধহয় চিঠি এসেছে। বড়কর্তার কাছে লিখেছেন, দু-একদিনের মধ্যে তিনি দেশে ফিরে আসবেন। প্রমদারা সব বলাবলি করছিল। বড়কর্তার কাছে একবার যাও না?"

বললুম, "তাড়াতাড়ির কিছু নেই। সন্ধেবেলা শাশুড়ী-ঠাকরুন নিজেই আসবেন এখানে। তখন তাঁর কাছ থেকেই জেনে নেবো।"

আমি জানি, প্রিয়তোষের কাণ্ড দেখে এরা সব অবাক হ'য়ে গিয়েছে। যুবতী বৌ-কে ফেলে রেখে সে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে। প্রায় একবছর হ'ল প্রিয়তোষ বংশীপুরে আসেনি। নগেনের মায়ের ধারণা, প্রিয়তোষ অত্যন্ত ছেলেমানুষ। দেহ এবং মন দুটোই ওর কাঁচা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ খুব কম। হয়তো নগেনের মায়ের ধারণা মিথ্যে নয়। প্রিয়তোষ সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান আমার চেয়ে অনেক বেশি।

গত ক'দিন থেকে বকুলবালা সন্ধের সময় রোজই আসছিল আমার ঘরে। উল্টোপাল্টা অনেক রকমের কথাই সে বলে। মাঝে মাঝে মনে হয়, বকুলবালা অভিনয় করছে। আবার কখনো সন্দেহ হয়, উত্তেজনার মাত্রা বাড়লে সে বোধহয় উন্মাদ হ'য়ে যেতে পারে।

একদিন আমি বকুলবালাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনার দাদামশাই কি গোলক চৌধুরীকে ক্ষমা ক'রে গিয়েছিলেন?"

"না।" একটু অসতর্ক হ'য়ে পড়েছিল বকুলবালা। সে বলল, "ক্ষমা করেননি। ভেতরের আগুন চেপে রেখেছিলেন। প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজেছেন সারাজীবন। মরবার আগে মামাকে ব'লে গিয়েছিলেন, 'চৌধুরীদের মনে রাখিস, নিবারণ। টাকার জোরে ওরা যা খুশি তাই ক'রে যাচ্ছে। আমার মতো আরও অনেক সংসার ওরা ভেঙেছে। ওদের শাস্তি দিস। চৌধুরীদের সিন্দুকটা যেদিন বার ক'রে এনে রাস্তায় ফেলে দিতে পারবি, সেদিন ওদের বিষদাঁতটা ভাঙবে।' বুঝলে বৌমা, আমার নিবারণ-মামা সাদাসিধে লোক। দাদামশাই মারা যাওয়ার সাত দিনের মধ্যেই একটা কথাও মনে রাখলেন না মামা।"

"কিন্তু আপনি বোধহয় মনে রেখেছেন?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

আমার প্রশ্ন শুনে সজাগ হ'য়ে গেল বকুলবালা। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হ'য়ে গেল। হাসিখুশির ভাব দেখিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্বটা হালকা করবার উদ্দেশ্যে সে বলল, "কী যে বলো, বৌমা! সিন্দুক দিয়ে আমি কী করব? কপাল না পুড়লে চৌধুরী-বাড়িতে ঢুকতে পারতুম না। বৌমা, আমার আর কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই। যতদিন পারি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাব। হ্যাঁ বৌমা, তোমার কেন ছেলেপিলে হ'ল না? কোনো দোষ-টোষ আছে নাকি? কুমুদিনী, আমরা দুজনেই যদি হাত-পা গুটিয়ে আলসা হ'য়ে ব'সে থাকি, তাহ'লে এই বিরাট জমিদারিটার কী হবে?"

"তা তো বলতে পারব না। এখানকার সিন্দুকের প্রতি আমারও কোনো লোভ নেই। বরং আপনার চেষ্টাই ফলবতী হোক, ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই করি। আপনার দিদিমার রক্ত পেয়েছেন আপনি, আপনার হবে।"

নবনীতা, সেইদিনই প্রথম আমি অনুভব করলুম, চৌধুরীদের শাস্তি দেওয়ার জন্যেই বকুলবালা তৈরি হচ্ছে। সাবধান না হ'লে প্রিয়তোষ বঞ্চিত হবে। আমার বিশ্বাস, দিদিমা আর গোলক চৌধুরীর কাহিনীটা ওর জানা নেই। 'পিরীতি পালকটা' যেন হঠাৎ 'চক্রান্তের পালক' ব'লে মনে হ'ল আমার। 'নিভৃত-নাগিনী'র মুখে শান্ত—ঐতিহ্যের বিষ যে কতটা, তা বোধহয় শ্বশুরমশাইও বুঝতে পারছেন না।

আজ সন্ধের পরেও বকুলবালা এল না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর নগেনের মাকে বললুম, "যাই একবার বড়কর্তার মহল থেকে ঘুরে আসি।"

আমার মহল থেকে বড়কর্তার শোবার ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে মিনিট তিন-চার লাগে।

আমি এসে বড়কর্তার শোবার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলুম। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারলুম না। বকুলবালার দু-একটা কথা আমার কানে এল।

বকুলবালা বলছিল, "কোবরেজ কিছু জানে না। সে কিছু বোঝে না, কর্তাবাবু—চলো, কলকাতা যাই। সেখানে বড় ডাক্তার আছে। পঞ্চাশ-বছর বয়েস এমন কি বেশি? হয়তো দু-এক দাগ ওষুধ তোমায় খেতে হবে। শুনেছি ষাটবছর বয়েসেও গোলক চৌধুরী সমর্থ ছিলেন। লোকে

বলত, এই তল্লাটে তিনিই নাকি সত্যিকারের ফকির ছিলেন। নাগরাজপুরের পতিত-জাতিরা তো তোমাদেরই প্রজা, কর্তাবাবু। শুনেছি, গোলক চৌধুরী সেই অঞ্চলে খুবই যাওয়া-আসা করতেন। তাঁকে নাকি ডেকে নিয়ে যেত। ফল খুব ভালো হয়েছে। ওদের মধ্যে এখন বি-এ পাস, এম-এ পাসের সংখ্যা নাকি অনেক? কি কর্তাবাবু, চুপ ক'রে রইলে যে? গোলক চৌধুরীর কীর্তি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? পতিত-জাতি উদ্ধার পেল, ছেলেরা সবাই উন্নতি করল। আর তোমার মাত্র সন্তান—আমায় তুমি একটা সন্তান দেবে তো কর্তাবাবু?"

"আমি তো দিতে চাই, বকুল। শুধু সন্তান নয়, আরও অনেক কিছু। তোমার নামে একটা বড় সম্পত্তি দলিল ক'রে দিলুম।"

"দলিল আমি ছিঁড়ে ফেলব। ও আমি চাই না। আগে আমি মা হ'তে চাই। সম্পত্তিটার আয় কত, কর্তাবাবু?"

"তা বছরে হাজার পঁচিশ তো হবে—পরে আরও দেব, বকুল। তোমায় ক্ষতিপূরণ ক'রে দিতে হবে। লোভ না করলেও পারতুম—"

"সেকি কথা! স্বর্গে ব'সে গোলক চৌধুরী রাগ করবেন না? তিনি ছিলেন সত্যিকারের পুরুষ। ভৈরবপুরের অনেকে আজও তাঁর নাম করে। নমস্কার করে। মনে-মনে পায়ের-ধুলো নেয়। গোলক চৌধুরীর দেহে পুণ্যি ছিল। কর্তাবাবু, চলো একবার কলকাতা যাই। ওষুধ নিয়ে আসি।"

"প্রিয়তোষ কাল এসে পৌঁছবে, তারপর চলো।"

"দরজাটা তাহ'লে বন্ধ ক'রে দিই?"

আমি দেখলুম, বকুলবালা আলোটা নিবিয়ে দিল। তারপর সত্যি-সত্যি দরজাটা বন্ধ করল কিনা বুঝতে পারলুম না। তার আগেই সেখান থেকে স'রে এলুম আমি।

দশ

সন্ধের মধ্যে প্রিয়তোষের আজ পৌঁছবার কথা। প্রায় তেরো মাস পরে দেশে ফিরছে সে। গতকাল সারাটা রাত ঘুমোতে পারিনি। প্রথমে বকুলবালার অত্যাশ্চর্য কথাগুলোই মনে পড়তে লাগল। কর্তাবাবুকে যে সে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে সে-সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছি বকুলবালার অসাধারণ চাতুর্যের প্রমাণ পেয়ে। ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একটা নয়, একাধিক। কখনো স্ফুলিঙ্গের মতো ছিটকে পড়ছে বাইরে, কখনো দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে বকুলবালা, আবার নিঃশব্দে ভেতরে ভেতরে দগ্ধে দগ্ধে মরছে। এ বড় অদ্ভুত চরিত্র, এ বড় অদ্ভুত মেয়ে। একবার ভাবি, জমিদারিটা নিজের দখলে এনে হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চিন্ত-মনে ভোগ করবে সে—আবার মনে হয়, সব-কিছু ফেলে দিয়ে একবস্ত্রে বেরিয়েও যেতে পারে। গোলক চৌধুরীর সঙ্গে দিদিমা ওর গলায় ফাঁস দিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, বকুলবালা প্রিয়তোষের সঙ্গে সমুদ্র সাঁতরাতেও ভয় পাবে না।

সকাল থেকেই আমি সেজেগুজে ব'সে রইলুম। সত্যিই সাজলুম আজ। যেন বকুলবালাকে হারিয়ে দিতে চাই। তাকে আমি প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।

শুধু নিজেই সাজলুম না, ঘরটাকেও সাজালুম। নগেনের মা ফুল নিয়ে এল। রং-বেরং-এর নানা রকমের ফুল। গোটাকয়েক ফুলদানি ভ'রে উঠল। নগেনের মা বলল, "তোমার পালঙ্কটা আমি সাজিয়ে দিই, দিদি।"

খানিক বাদে মনে হ'ল, ফুলদানিগুলো খালি থাকলেও কোনো ক্ষতি হ'তো না। চোখে পড়ত না প্রিয়তোষের। শয্যায় আজ অনেক ফুল। ফলের প্রত্যাশা আমার সারা দেহে। বকুলবালাকে হারিয়ে দিতে হবে। আমার চেয়ে আগে বকুলবালা মা হ'তে পারবে না।

সন্ধের একটু পরেই প্রিয়তোষ পৌঁছলো। আমি দেখলুম, ঘরে ঢুকে খুশি হ'ল না সে। একটু যেন বিরক্তি বোধ করল। বসবার জায়গা পাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করল, "বসব কোথায়? বিছানায় এত ফুল কেন?"

"আজ আমাদের ফুলশয্যার রাত। তুমি খাটের ওপরেই বোসো।"

হাত দিয়ে ফুলগুলো একদিকে সরিয়ে দিয়ে প্রিয়তোষ বসল খাটের কিনারে। আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম। অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার লাল বেনারসীর দিকে চেয়ে রইল। বিস্মিত বোধ করছে, কিন্তু মুগ্ধ হচ্ছে না। হাত তুলছে না, মুখের আকৃতি পাথরের মতো কঠিন। ঠোঁটের ভাঁজে আকাঙ্ক্ষার তাপ নেই। উবু হ'য়ে প্রিয়তোষের পায়ের-ধুলো নিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন আছ?"

"ভালো আছি। তোমরা কেমন আছ?"

"সব কুশল।" আমি একটু দূরে স'রে এলাম।

প্রিয়তোষ এবার খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। জিজ্ঞাসা করল সে, "চা কিংবা জল-টল কিছু আছে? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

হাসি এল। হেসে ফেললুমও। দরজার কাছে গিয়ে ডাকলুম, "নগেনের মা—এক গ্লাস জল গড়িয়ে দাও তো। দাদাবাবুর তেষ্টা পেয়েছে।"

জল খেয়ে প্রিয়তোষ ঘোষণা করল, "ভীষণ ক্লান্ত আমি। ঘুমতে চাই।"

"নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছ, ঘুমের ব্যাঘাত কিছু হবে না।" অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথাটা বললুম আমি।

প্রিয়তোষ শুয়ে প'ড়ে বলল, "এত তাড়াতাড়ি ফেরবার ইচ্ছে ছিল না।"

"তবে ফিরলে কেন?"

"এতবড় জমিদারির মায়া ত্যাগ করি কি ক'রে?" প্রিয়তোষ পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে দেশলাই খুঁজতে লাগল। একটু বিরক্তির সুরেই জিজ্ঞাসা করল, "এ-ঘরে কি কিছুই নেই নাকি?"

"আমিই তো আছি।" ওর কাছে এগিয়ে যাওয়ার এই আমার শেষ চেষ্টা।

ধীরে ধীরে প্রিয়তোষ বলতে লাগল, "তুমি যে আছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে দিয়ে তো আর সিগারেট ধরানো যাবে না!"

"না, আর বোধহয় যাবে না। ঠাণ্ডা জল হ'য়ে গেছি!"

"একটা দেশলাই আনো দিকিন—" কথা জড়িয়ে আসছিল ওর।

স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলুম আমি। তেরো মাস পরে আমার স্বামী আমার ঘরে ঢুকে দেশলাই খুঁজছেন!

দেশ-ভ্রমণের কষ্ট কম নয়। দু'দিন পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সময় কাটালো। মাঝে মাঝে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলত—"কুমুদিনী, দেশলাইটা দাও তো।"

তিন দিন পর থেকে সে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বর্ণনা দিতে লাগলো। ভাবলুম, তবু ভালো। বকুলবালার ভবিষ্যতের সঙ্গে যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বর্ণনা জট পাকিয়ে যায় নি, সে-কথা ভেবে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলুম।

ভৌগোলিক বর্ণনার পর প্রিয়তোষ এবার ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে লাগল। দু-এক পাতা ওল্টাবার পরেই সে এসে উপস্থিত হ'ল সম্রাট শাজাহানের যুগে। ওখানেই সে আসবে এবং ওখানেই সে সারাটা জীবন ব'সে থাকতে চাইবে, তাও আমি জানতুম। শাজাহানের প্রেমের গভীরতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে প্রিয়তোষ।

বললুম, "শাজাহানের হ'য়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসটাই তো এতকাল প্রচারের কাজ চালিয়ে এসেছে। তেরো মাস পরে ফিরে এসে তুমিও যদি তাঁর কথাই শুধু বলো তাহ'লে তোমার গভীরতা আমি বুঝব কি ক'রে? আমার দৃষ্টিতে শাজাহানের চেয়ে আমার স্বামীর স্থান অনেক উঁচুতে। আমার ওপর তাজমহল তোলবার দরকার নেই, শুধু এই মহলটার স্মৃতি তুমি বাঁচিয়ে রেখো। এবার চলো, বকুলবালার সঙ্গে দেখা করবে—"

বাধা দিয়ে প্রিয়তোষ জিজ্ঞাসা করল, "বকুলবালা এখানে কবে এল?"

"প্রায় পাঁচমাস তো হবেই। কর্তাবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। বকুলবালাই জোর ক'রে বিয়ে করিয়েছে তাঁকে। চলো, তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে।"

প্রিয়তোষের মুখের রং যেন ধূলিধূসর হ'য়ে গেল।

ঘরের বাইরে থেকে প্রমদা ঘোষণা করল, "ছোট-মা আসছেন।" বলতে বলতে প্রমদা স'রে গেল একপাশে।

ঘরে ঢুকল বকুলবালা। দেখলুম, গয়নার বাহুল্য নেই। হাতে দু'গাছা চুড়ি। গলায় একটা সরু হার। পরনে জামদানি কিংবা ঢাকাই বুটিদার নেই। সাধারণ একটা লালপেড়ে শাড়ি প'রে এসেছে বকুলবালা। সিঁথির ওপর পুরু ক'রে সিঁদুর লাগানো। দগদগ করছে। সত্যিকারের আগুন হ'লে দাউদাউ ক'রে জ্বলত। আমি দেখলুম, বকুলবালার চোখের নিচে কালি পড়েছে। তিন দিন আগেও এখানে কালি ছিল না—কলঙ্কের চিহ্ন তখন খুঁজে পাইনি আমি।

বললুম, "প্রিয়তোষ, প্রণাম করো—"

দিন দুই পরে বুঝতে পারলুম, প্রিয়তোষ এখানে অস্বস্তি বোধ করছে। একদিন সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা কুমুদিনী, তুমি কি এই নতুন ব্যবস্থায় অপমান বোধ করছ না?"

বললুম, "আমার তো কোনো আলাদা মান-অপমান নেই। কিন্তু এ-প্রশ্ন তুমি কেন করলে? বকুলবালার কর্তৃত্বাধীনে বাস করতে তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে?"

"আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না, কুমুদিনী। জমিদারি চাই না। আমি এবার নিজেই রোজগার করতে

থেকো।" প্রিয়তোষ পায়চারি করছে আর মাঝে মাঝে বলছে—"বংশীপুরে আমি থাকব না। কুমুদিনী, তৈরি হও। আর দু-একদিনের বেশি হাতে সময় নেই কিন্তু।"

ওর কথা শুনে আমি বললুম, "কলকাতা আমার ভালো লাগে না। এক কাজ করো, সেখানে গিয়ে আগে তুমি চাকরি-বাকরি একটা নাও, তারপর ছুটি পেলে আমায় এসে নিয়ে যেয়ো।"

"চাকরি আমি পাবই, কুমু। আইন-পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট্‌ক্লাস পেয়েছি।"

"বলো কি গো!"

"হ্যাঁ, কুমু!" প্রিয়তোষ এগিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। ওর বুকের ওপর মাথা রেখে জিজ্ঞাসা করলুম, "বাবাকে বলোনি?"

"কাউকে বলিনি। বলবও না। আজ যাব আমি ওঁর কাছে টাকা চাইতে। টাকার সম্পর্ক ছাড়া বাবার সঙ্গে আমি আর কোনো সম্পর্ক রাখব না।"

"ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই। তিনি গুরুজন।"

"তাহ'লে বকুলবালাকে বিয়ে করলেন কেন?"

"খুব লেগেছে তোমায়, না?—এই ছাড়ো!—ছাড়ো বলছি···ছোট-মা আসছেন—"

"ছাড়ব না—বকুলবালা দেখুক।"

বাইরে থেকে প্রমদা ঘোষণা করল, "ছোট-মা এসেছেন।"

বকুলবালা ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তোষের হাত সরিয়ে দিয়ে আমি একপাশে স'রে দাঁড়ালুম। বকুলবালা মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, "কি বাবা প্রিয়তোষ, বৌমাকে আদর করছিলে বুঝি? ভালো। আহা, বেচারী এতকাল মরুভূমিতে বাস করছিল। বৌমা, প্রিয়তোষ তো একবারও আমায় প্রণাম করল না? এর মানে কি? ও কি আমার সঙ্গে প্রথম থেকেই শত্রুতা আরম্ভ করল?"

সামনে এগিয়ে এলুম আমি। বিনীতভাবে বললুম, "না না, তা কি কখনো হয়? আপনার সঙ্গে শত্রুতা করবার সাহস ওর হবে না।" প্রিয়তোষের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমিই বললুম, "ছোট-মাকে প্রণাম করো—"

প্রিয়তোষ তবু খাটের ওপর ব'সে রইল। বুঝলুম,

"উমেশ যোগ দর্শন"
(প্রথম খণ্ড)
চারিটি ভাষায়: ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী
(গ্রন্থকার: শ্রীযোগীরাজ উমেশচন্দ্রজী)

যোগ সম্বন্ধে একটি চমৎকার নিবন্ধ, যাহা ব্যাখ্যা কোরেছে কিভাবে হজমীশক্তি, শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য শারীরিক তন্ত্রসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১০৮টি বাস্তব আসনের চিত্রে সম্পূর্ণ। যোগের দ্বারা নেচারোপ্যাথি, ক্রোমোপ্যাথি, সাইকো-থেরাপি ইত্যাদি নিরাময় সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। প্রতিটি গৃহ, হাসপাতাল ও গ্রন্থাগারে যোগ্য স্থান পাবার অধিকারী। মূল্য ১৫৲; ডাকখরচ অতিরিক্ত; ভি. পি. করা হয় না।

যোগাসন চার্ট | আর্ট গ্লেজড্‌ কাগজে ছাপা, যোগাসনের চিত্র সম্বলিত একটি ছবির তালিকাও পাওয়া যায়। ডাকখরচ সহ মূল্য ২·৫০ ন. প. মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিতব্য।

রামতীর্থ ব্রাহ্মী তৈল

পেটেন্ট নং ১
রেজিষ্টার্ড

মরামাস খুস্কি নিবারণ ও চুলওঠা বন্ধ করার জন্য একটি অমূল্য বলকারক। বহু মূল্যবান মৌলিক উপাদান সহযোগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মস্তিষ্কের চলাচল ব্যবস্থা উন্নত করে এবং সুনিদ্রা আনয়ন করে। কেশবর্দ্ধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। সকল ঋতুতে ইহা প্রত্যেকের পক্ষে উপকারী। বড় বোতল ৩৲, ছোট ২৲, সর্বত্র পাওয়া যায়।

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম
দাদার, সেন্ট্রাল রেলওয়ে: বোম্বাই-১৪
টেলিফোন—৬২-৮১১　টেলিগ্রাম "প্রাণায়াম" দাদার: বোম্বাই

প্রণাম করবার ইচ্ছা ওর নেই। মুশকিলেই প'ড়ে গেলুম আমি। বকুলবালা বুঝতে পেরেই আমাকে বলল, "থাক্, থাক্—এখনো ছেলেমানুষ প্রিয়তোষ। গুরুজনদের ভক্তি করতে শেখেনি। থাক্ বৌমা, ওকে পেড়াপীড়ি কোরো না। জোর-জবরদস্তি করলে কেঁদে ফেলবে। ওকে তো আমি চিনি!" বকুলবালা এগিয়ে গেল প্রিয়তোষের দিকে। মনে হ'ল, প্রিয়তোষের পাশে বসতে চেয়েছিল বকুলবালা। উঠে পড়ল প্রিয়তোষ। আলনার ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে জামাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বকুলবালা জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ বাবা প্রিয়তোষ, তুমি নাকি কালই কলকাতা যেতে চাইছ? উনি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, কালই তোমার যাওয়া উচিত হবে কিনা। বুঝলে বৌমা, আমার মত না পেলে উনিও কিছু বলতে পারছেন না। টাকা-পয়সার ব্যাপার—সিন্দুক খুলতে কষ্ট হয় কর্তাবাবুর। চাবি আজকাল তাই আমার কাছেই থাকে। বৌমা, প্রিয়তোষ একসঙ্গে পাঁচহাজার টাকা চেয়েছে। কী করবে অত টাকা দিয়ে ও?"

জামাটা গায়ে দিয়ে প্রিয়তোষ বলল, "তুমি সব জিনিস-পত্তর গুছতে আরম্ভ করো, কুমুদিনী। আমি একটু ঘুরে আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছ এখন?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

"এ ক'দিন তো বাইরে বেরুতে পারিনি। যাই একবার লাইব্রেরিটা দেখে আসি।"

"লাইব্রেরিটা পুড়ে গেছে।"

বকুলবালা দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "লাইব্রেরিটা আড্ডার জায়গা হ'য়ে উঠেছিল। সেখানে মিটিং বসত। অমলবাবু আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল—" বিছানার ওপর লুটিয়ে প'ড়ে হো-হো ক'রে হাসতে লাগল বকুলবালা।

নবনীতা, মাত্র চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে আমার মনটা ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল। দু-তিনজন ঝি কাপড়-চোপড় গুছতে লাগল। সত্যিই কাল সকালে আমরা বংশীপুর ত্যাগ করব। মাঝে মাঝে প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকছে। নতুন এক-একটা লিস্ট্ এনে ফেলে দিয়ে ব'লে যাচ্ছে—"কুমু, মামাবাড়ির বাসনপত্রও কিছু কিছু সঙ্গে নিতে হবে। তোমার ছোট-মা নিজেই গুদাম-ঘরে ঢুকেছেন। কলকাতার সংসার এখানে ব'সেই তিনি সাজিয়ে দেবেন বললেন। গয়নাগুলো কী করলে?"

"কী করতে বলো?"

"ঐ বড় ট্রাঙ্কটার তলায় রেখে দাও। তোমার যা ব
গায়ে আছে সেগুলো তোমার গায়েই থাক্।" উপদেশ
দিয়ে এবং সতর্ক ক'রে প্রিয়তোষ বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক বাদে আবার সে ফিরে এল। এসে বলল,
"প্রথমে তো ফড়েপুকুরে গিয়ে উঠতে হবে। এতসব
মালপত্র—কি জানি তোমার মা-বাবা কী ভাববেন। হ্যাঁ
শোনো—তোমার ছোট-মা বললেন, সঙ্গে নায়েবমশাই
যাবেন। এত মালপত্র নিয়ে আমি হয়তো মুশকিলেই
পড়ব। জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতায় শুধু নগেনের ম
থাকলেই চলবে কিনা। ইচ্ছে করলে আমরা প্রমদাকে
নিতে পারি। তুমি কি বলো?"

"না, এত লোকের দরকার নেই।"

"দু-চারজন লোক সঙ্গে গেলে কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়
যেত, কুমু। অতবড় একটা শহর—চেনা-জানা লোকের
সংখ্যা কম। একটা নতুন সংসার সাজিয়ে গুছিয়ে বসতে
হবে।"

প্রিয়তোষ চ'লে যাচ্ছিল। ডেকে বললুম, "এত
লোকজন নিয়েই যদি কলকাতা যেতে হয় তাহ'লে বংশীপু
ত্যাগ করবার দরকার কিছু ছিল না।"

"দরকার আছে, কুমু", সিগারেট ধরালো প্রিয়তোষ
"ছোট-মা নিজেই সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন। কত খুশি
হ'য়েছেন তিনি!"

খুশি হয়েছেন? হওয়ারই কথা। আমি জানি, চৌধুরীদের
বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদের মাঝখানে আমার স্বামী আজ
তার প্রতিদ্বন্দ্বী। মা হওয়ার জন্যে বকুলবালার চোখের ঘ
নেই। তা ছাড়া বকুলবালার অঙ্গুলি-নির্দেশে যখন আমার
শ্বশুরের বুদ্ধি পরিচালিত হচ্ছে তখন ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা ঘটবার
প্রচুর সম্ভাবনা রইল। জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ আমার
ফুরিয়েছে সত্যি, কিন্তু তাই ব'লে আমার স্বামী যদি তাঁর
ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হন, তাহ'লে দুঃখের আর অবধি
থাকবে না। স্বামীকে বললুম, "দ্যাখো, তুমি তো আমার
চেয়ে জমিদারিটাকে বেশি ভালবাসো। সুতরাং এতবড়
সম্পত্তিটা ছোট-মা'র ওপর ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।"

"তা হোক, আমি নিজে রোজগার করব। তোমাকে
নিয়ে আমি কলকাতায় একটা নতুন সংসার গ'ড়ে তুলবই।"

"এ তো খুব সাহসের কথা। আমার কিন্তু ভ
করছে।"

বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো মৃদু হেসে প্রিয়তোষ বল

"বাবার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হ'য়ে গেছে। মাসে মাসে তিনি আমায় পাঁচশো টাকা ক'রে খরচ দেবেন। সঙ্গে এখন দু'হাজার দিয়ে দিচ্ছেন। বাড়িঘর সাজাবার জন্তে টাকা লাগবে। ছোট-মা বললেন, লাগে, আরও টাকার বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন তিনি। এখনো তোমার ভয় করছে নাকি, কুমু?"

"নাঃ—" হেসে ফেললুম আমি, "তুমি চাকরি করবে শুনে ভয় পেয়েছিলুম। হ্যাঁ, এবার তুমি নতুন সংসার গড়তে পারবে। ভাবো, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করতে চাই। যদি রাগ না করো তো বলি।"

"রাগ করবো কেন? বলো—"

জিজ্ঞাসা করলুম, "আমায় তুমি ভালবাস?"

হো-হো শব্দে হেসে উঠল প্রিয়তোষ। সিগারেটটা মুখ থেকে প'ড়ে গেল মেঝেতে। পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল সেটা। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কুমুদিনী, তুমি কি আজকাল উপন্যাস পড়ছ?"

"কেন?"

"উপন্যাস না পড়লে স্বামীকে এসব প্রশ্ন করা যায় না।" একটু থেমে প্রিয়তোষই বলল, "যার সঙ্গে বিয়ে হয়নি তার কাছে এমন প্রশ্ন অস্বাভাবিক মনে হ'তো না। স্বামী তো স্ত্রীকে ভালবাসবেই। এ ধর্মশাস্ত্রের কথা, কুমুদিনী।"

"কিন্তু জীবনের কথা তো অন্তরকম হ'তে পারে? ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে কি আমরা সবাই জীবন মিলিয়ে চলতে পারি?"

স্বামীর মুখের দিকে আমি একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলুম। দেখলুম, কী যেন ভাবছে। মনে আমার খটকা লাগলো। প্রিয়তোষ আমায় ভালবাসে কিনা তার জবাবটা সে সোজাসুজি দিতে পারছে না।

শেষপর্যন্ত প্রিয়তোষ বলল, "কুমুদিনী, তোমার প্রশ্নের জবাবটা আজ আমি দিতে পারলুম না। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে কিনা, এ-প্রশ্ন স্ত্রীর মুখ থেকে শোনাও যা, আর কবিতায় ব'লে কল্পনায় অভাব বোধ করাও তাই। তবুও বলছি, এ-প্রশ্নের উত্তর তুমি পাবে।"

আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম আমি। আবার সেই কলকাতা। আবার হয়তো রাজুদার সঙ্গে দেখা হবে একদিন। নবনীতা, কলকাতার সঙ্গে কি বন্ধন আমার কোনোদিনই ছিন্ন হবে না? সত্যিকথা বলতে কি, রাজুদা সেখানে না থাকলে হয়তো আমার মানসপট থেকে কলকাতা চিরদিনের জন্ত নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতো। কিন্তু ঐ যে পেছনে ফেলে রেখে এসেছি আমার সমস্ত-জীবনের স্বপ্ন—সেই স্বপ্নটাকে ঘিরেই তো আমার পনেরো-বছরের প্রত্যেকটা দিন অপূর্ব সংগীতে মত্ত হ'য়ে ছিল। আজো তার রেশটুকু পূর্বস্মৃতিকে সজাগ ক'রে তোলে। স্মরণযোগ্য অতীতটা আমাকে শুধু কাঁদায়। বিন্ধ্যাচলের বুকে মাথা রেখে বলি—"আমায় তোরা ক্ষমা করিস, নীতা!"

পরের দিন রওনা হওয়ার ঘণ্টা দুই আগে বকুলবালা এসে জিজ্ঞাসা করল, "ঘরে আর কোনো জিনিসপত্র প'ড়ে রইল না তো?"

"হ্যাঁ, রইল। শাড়ি-জামা সব তো নিতে পারলুম না। বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছি, এত জামা-কাপড় নিয়ে কী হবে?"

"না, না—এখানে আমার ফেলে রেখে গেলে কেন?" ফস্ ক'রে সুর বদলে বলতে লাগল, "বৌমা, তোমার মনে আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তুমি তোমার নিজের দেশেই যাচ্ছ। কিন্তু প্রিয়তোষের জন্তেই ভাবনা রইল। মাঝে মাঝে ওর খবর দিয়ো।"

বলতে বাধ্য হলুম, "আমরা তো আর চিরকালের জন্তে যাচ্ছি না। বিশেষ ক'রে আমার তো যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না।"

"না, না—তা কী ক'রে হয়, বৌমা। তোমার শ্বশুর নিজে সব বন্দোবস্ত করেছেন। বোসবাবুদের জন্তে তোমার একটু মন পুড়বে জানি। কিন্তু কলকাতা তো বড় জায়গা ব'লে শুনেছি, সেখানে নতুন সম্বন্ধ পাতালেও লোকের চোখে পড়বে না। প্রিয়তোষ শুধু ভীরু নয়, বোকা-ও।" শাড়ির আঁচলটা নাড়াচাড়া করতে করতে বকুলবালাই বললে, "কিছুই দেখতে পায় না—"

বাধা দিয়ে বললুম, "কলকাতার লোকের চোখ সম্বন্ধে আপনার এত অভিজ্ঞতা আছে জেনে দুঃখিত হলুম। বংশীপুরের জমিদার-বাড়িতে আপনার এই অভিজ্ঞতা সম্মানের নয়। এতদিনে আপনার প্রবৃত্তির সংশোধন হওয় উচিত ছিল। আজকে যাওয়ার দিনে এমন সব কুৎসিত কথা শুনব ব'লে আশা করিনি।"

ঠিক এইসময় আমার স্বামী এসে উপস্থিত হ'ল। বল সে, "ঝগড়া ক'রে আর লাভ নেই। যাক, আজকেই তে আমরা যাচ্ছি। এ-মহলের আলো আজ থেকে নিবে গেল।'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, "কক্ষনো না—একমাস পরেই আমি আবার ফিরে আসব। বংশীপু আমার শ্বশুরবাড়ি।"

কথাগুলো বকুলবালা শুনলো কিনা বুঝতে পারলুম না

আশ্চর্য সরল এবং নির্লজ্জ ভঙ্গীতে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল বকুলবালা।

বিপ্রলব্ধার বন্যা আমাকেও স্পর্শ করল আজ।

দশ

নবনীতা, এই সবে ভোর হ'ল। কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসব, এমন সময় পাশের বাংলো থেকে মিস্ত্রিদের সেই বাচ্চা ছেলেটা কেঁদে উঠল। লাল-টুকটুকে দেখতে। বেশ মোটাসোটা, একটা লাল উলের ওভার-অল্ গায়ে চড়িয়ে সেদিন ওদের আয়া ওকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। 'ললি-পপ্' খেতে বড্ড ভালবাসে। মিস্ত্রিদের বৌ ছেলেমানুষ, এই তার প্রথম সন্তান। তাই ছেলে-ভোলানো ছড়াগুলো এখনো আয়ত্তে আনতে পারেনি। আমি কলকাতা থেকে ছেলেটার জন্যে অনেক খেলনা আনিয়েছি। মিস্ত্রিদের বৌ বাংলা মাসিক কাগজে কবিতা লেখে। ছেলেপুলের ঝামেলা তাই সইতে পারে না। ওর নাম রেণু। রেণুর বয়েসে আমি তখন স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় নতুন সংসার গড়তে এলুম।

ফড়েপুকুরেই এসে উঠলুম আমরা। নায়েবমশাই সঙ্গে এসেছেন। আমাদের পৌঁছে দিয়ে তাঁর ফিরে যাওয়ার কথা। নগেনের মা থেকে যাবে। একজন বামুনঠাকুরও বংশীপুর থেকে এসেছে। বাঙালী ব্রাহ্মণ। শুনলুম, তাকে সবাই পরেশঠাকুর ব'লে ডাকে। প্রিয়তোষের সবচেয়ে প্রিয় বামুন। তার হাতের রান্না খেতে ভালবাসে প্রিয়তোষ।

এখানে এসে পৌঁছবার পর থেকেই নায়েবমশাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়তোষ বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাঙালী-পাড়া ওর পছন্দ নয়। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছি, আমাদের পছন্দের সঙ্গে ওর একটা পছন্দও মেলে না।

গত তিনবছরের মধ্যে ফড়েপুকুরের বাড়িতেও দেখলুম অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাবাকে দেখে চেনা যায় না। মনে হয় আশি-বছরের বুড়ো। মাথায় তাঁর ঘন কালো চুল ছিল। এখন পুরো মাথাটা জুড়েই টাক পড়েছে। মায়ের কাছে শুনলুম, সবগুলো দাঁতই তাঁর নকল।

আমার ছোট-ভাই অমলেশ কলেজে পড়ছে। অমলেশ যাতে মানুষ হয় তার জন্যে মায়ের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ফড়েপুকুরের বাড়িতে সে থাকে না। মা বললেন, "বুঝলি কুমু, তোর বাবার সঙ্গে ওর দেখা-সাক্ষাৎ যত কম হয়, ততই ভালো। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের হোস্টেলে রেখে দিয়েছি। আমি চাই, লেখাপড়া শিখে অমলেশ চাকরি করুক। ব'সে ব'সে খাওয়ার অভ্যেস বড় খারাপ।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "তাহ'লে জমিদারি দেখবে কে?"

"উনি যতদিন বাঁচবেন ওটাও বাঁচবে। তারপর বেচে দেব। ও ছাই মানুষ-মারার কল। জীবনে তো কম দেখিনি।"

"অমলেশ চাকরি করলে সমাজের লোকেরা হাসবে না?"

"হাসুক। ওর জমিদার হ'য়ে কাজ নেই।"

"জানো মা, আমি যদি লেখাপড়া ছেড়ে না দিতুম, এই বছরই আমি বি-এ পাস করতুম।—সুনন্দার খবর কী?"

"বি-এ পাস করেছে সুনন্দা। আমাদের এখানে আসে না আর। শুনছি রাজুর সঙ্গে বিয়ে হবে। রাজু এখন প্রোফেসারি করে, কলেজে পড়ায়।"

নবনীতা, বুঝতে পারছিস নিশ্চয়ই, গত তিনবছরের মধ্যে কলকাতার সমাজে বিপ্লব ঘ'টে গেছে। মায়ের মনে যখন ঘটেছে তখন সমাজেও যে ঘটবে তা তো জানা কথা।

ক'দিন থেকে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা আমাকে দেখতে আসছিলেন। মাসিমা থাকতেন বালিগঞ্জে। তিনি এলেন তাঁর ছোট-মেয়ে গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে। ঘরে ঢুকেই মাসিমা বললেন, "কই রে কুমু—জমিদার-গিন্নী কোথায়? আয়, তোকে একবার দেখি।"

পায়ের-ধুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন আছ তোমরা, মাসিমা? হ্যাঁ রে গৌরী, তুই দেখছি এখনো শ্বশুরবাড়ি যাসনি? মাসিমা, ওকে তোমরা বিয়ে দাওনি কেন?"

"ওমা, শোনো কথা! এই সবে কলেজে ঢুকলো, এর মধ্যেই বিয়ে দি রে?"

"সমাজের লোকেরা হাসাহাসি করছে না?"

"তা করুক, বাছা—বালিগঞ্জে আবার সমাজ কই? তুই সত্যিই গিন্নী হ'য়ে গেছিস, কুমু। সমাজ-টমাজ এখানে নেই, ওসব তোর পাড়াগাঁয়ে আছে।"

মায়ের দিকে ঘুরে মাসিমাই বললেন, "দিদি, কুমু বোধহয় সুখী হয়নি।"

এক অভিজাত পাড়ায় বাড়ি নেওয়া হ'ল। সংসার গড়তে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় লাগেনি। পার্ক ষ্ট্রীটের দোকান থেকে লোক এসে ঘর সাজিয়ে দিয়ে গেল।

কী কী আসবাব লাগবে এবং কোথায় কোথায় কেমন ক'রে বসানো হবে তা সবই ঠিক ক'রে দিয়ে গেল পার্ক-স্ট্রীটের বিশেষজ্ঞরা। দরজী এসে জানালা-দরজার মাপ নিয়ে গিয়েছিল। গৃহপ্রবেশের দিন দেখলুম, পর্দা সব লাগানো হ'য়ে গিয়েছে। প্রিয়তোষ বলল, "তোমার আর শুধু-শুধু কষ্ট করতে হ'ল না।"

নগেনের মা বাইরে থেকে বলল, "নায়েবমশাই আসছেন।"

প্রিয়তোষ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল বারান্দায়। পর্দার এপাশে দাঁড়িয়ে ওঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগলুম আমি।

নায়েবমশাই বললেন, "আমি তাহ'লে আজ রাত্রের ট্রেন ধরব, ছোটবাবু।"

প্রিয়তোষ বলল, "আর ক'টা দিন থেকে যান।"

"সাত দিনের জন্যে এসেছিলাম। পনেরো দিন হ'য়ে গেল। অসুবিধে কিছু তো হচ্ছে না?"

"অসুবিধে? না, তেমন কিছু নেই। তবে এতবড় শহর—বুঝতে পারছেন তো নায়েবমশাই, এখানে একটা নতুন সংসার গ'ড়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। এ ক'টা দিন আপনি ছিলেন, ভয়-টয় তেমন করেনি।"

"তাহ'লে আমি ফিরে গিয়ে ব্রজেনকে পাঠিয়ে দিই। সে বরং এখানে এসে দু-এক মাস থেকে যাক। আমার ফেরা দরকার। আদায়-উশুলের টাইম—কাল চিঠি এসেছে। ফেরবার তাগিদ দিয়েছেন বড়কর্তা।"

ভীষণ চিন্তিত হ'য়ে পড়ল প্রিয়তোষ। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, মাথার চুলে হাত বুলোচ্ছে সে।

নায়েবমশাই বললেন, "এখন দেখছি সাহেব-পাড়ায় বাড়ি না নেয়াই উচিত ছিল, ছোটবাবু। কড়েপুকুরের দিকে বাড়ির তো কোনো অভাব ছিল না। ওঁদের কাছাকাছি বাড়ি একটা পাওয়া যেতই।"

"বেশ, তাহ'লে আপনি যান। গিয়েই কিন্তু ব্রজেনকে পাঠিয়ে দেবেন। নতুন দারওয়ানটার নাম যেন কী?"

এবার আমি পর্দার আড়াল থেকে বললুম, "ব্রজেনবাবুকে পাঠাবার দরকার নেই। দারওয়ানও যেন না আসে। ছোটকর্তার দেখাশোনার ভার আমরাই নিলুম, নায়েবমশাই। আজকের ট্রেনেই আপনি রওনা হ'য়ে যান।"

। একমাসের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠলুম যেন। কোনো-কিছু করবার নেই, কোনো-কিছু ভাববারও নেই। প্রিয়তোষ তার বন্ধুদের বাড়ি যায়। মাঝে মাঝে তাদের নেমন্তন্ন ক'রে এখানে নিয়ে আসে। দু-একজনের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে আমার। হৈচৈ ক'রে প্রিয়তোষের সময়টা মন্দ কাটছিল না।

কিন্তু আমি কী করি? বই নেই, বকুলবালাও নেই। প্রিয়তোষকে একদিন বললাম, "ক'খানা বই কিনে দাও না?"

"লাইব্রেরির মেম্বার হবে?" জিজ্ঞাসা করল প্রিয়তোষ।

"আপত্তি নেই। কিন্তু খবর র'টে গেলে হয়তো তোমাদের দিক থেকে আপত্তি উঠতে পারে।"

"এটা বংশীপুর নয়, বুঝলে? দ্যাখো ঝুমু, তোমার জন্যে বন্ধুদের কাছে আমার কথা শুনতে হয়।"

"কেন বলো তো?"

"ওদের সঙ্গে ব'সে তুমি গল্প করো না। শুধু নমস্কার ক'রে পালিয়ে আস। গল্পই যদি না করবে তাহ'লে এতবড় একটা ড্রইংরুম সাজিয়ে রাখলুম কী করতে? ও, হ্যাঁ, এই দ্যাখো—আজ সন্ধ্যের সময় আমার এক বন্ধুকে চা খেতে ডেকেছি। ঠাকুরকে বোলো, কিছু খাবার যেন তৈরি ক'রে রাখে।" প্রতিদিনকার মতো সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল প্রিয়তোষ।

বেলা বারোটা-একটার সময় ফিরে আসবে। বিশ্রাম করবে খানিকক্ষণ। তারপর স্নান করতে ঢুকবে। স্নানঘ থেকে বেরুবে একঘণ্টা পরে। খেতে বসতে বসতে প্রা তিনটে বাজবে। ছাত্রজীবনের অভ্যাসগুলো সব এক এ ক'রে বদলে যাচ্ছে। আগে দেখেছি, ভোরবেলায়ই ঘু থেকে উঠত। এখন ওঠে বেলা আটটা-ন'টায় সময় দশটার সময় ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ করে। রাত্রের রুটিন এইরকম। জমিদারদের মতো অলস জীবনের প্রতি আক হচ্ছে প্রিয়তোষ। এর পর ঘরে আর মন বসবে না। ও কয়েক ঘণ্টা ঘুমবার জন্যে মাঝরাত্রে বাড়ি ফিরবে সে মায়ের কাছে শুনেছি, গোড়ার দিকে আমার বাবার রুটিন ঠিক এইরকমই ছিল।

মাঝে-মাঝেই আজকাল চাকরির আলোচনাটা তুলি আমি বুঝতে পেরেছি, চাকরির দিকে ঝোঁক নে প্রিয়তোষের। সে শুধু বলে, "হ্যাঁ, দেখি। কাল একবা যাব—"

আজও ওর যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি। রুটিনের উচ্ছৃঙ্খল দিন দিন শুধু বেড়েই যাচ্ছে। সেদিন বাড়ি ফিরে হঠা ঘোষণা করল—"বকুলবালার নাকি খুব অসুখ। ভাব একবার বংশীপুর যাব।"

কথাটা বলেছিল মাঝরাতে, পরের দিন যখন ঘুম থেকে উঠল তখন আর বংশীপুর যাওয়ার কথা নিয়ে আলোচনা করল না। ব্রেকফাস্ট খেতে বসবার সময় বলল, "টিকিট কেটে এনেছি—"

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব কিন্তু।"

"তা তো যাবেই। তিনখানা কেটেছি। কাল রবিবার, অমলেশও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। উমাশশী নাকি পার্ট করেছে সুপার্ব!"

"উমাশশী? সে কে?"

"বা রে—! চণ্ডীদাস ফিল্মে পার্ট করেছে সে। সারা বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছে। বুঝলে কুমু, এরকমটা বড় দেখা যায় না। ঘুম থেকে উঠেই বিখ্যাত! উমাশশীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা পেলে আমি ফিল্ম তোলার ব্যবসা করতুম। ডবল টাকা দিলে উমাশশীকে পাওয়া যায়। কাল দেখবে, সিনেমায় কী ভিড়। হাউস ফুল।"

"হাউস ফুল?"

"হ্যাঁ। বুঝলে কুমু, খবরের কাগজের লোকেরা বলেছে, উমাশশী হচ্ছে সত্যিকারের শিল্পী।" রুটি চিবতে চিবতে প্রিয়তোষই আবার বলল, "একলাখ টাকায় একখানা ফিল্ম তোলা যায়। বন্ধুরা বলছে পঁচিশহাজার টাকা হাতে থাকলেই হ'ল, তারপর ধীরে ধীরে, বুঝলে—মানে, উমাশশীকে আগে হাজার দশেক আগাম দিতে হবে।" এক গেলাস দুধ এক টানে খেয়ে ফেলল প্রিয়তোষ।

জিজ্ঞাসা করলুম, "বংশীপুর যাবে না?"

"যাব। কিন্তু বাবা কি হাজার-পঁচিশেক টাকা আমায় দেবেন? তোমার কী মনে হয়? বাবা না দেন, বকুলবালা দেবে", উঠে পড়ল প্রিয়তোষ, "ইচ্ছে করলে বকুলবালা আমায় লাখ-টাকাও দিতে পারে।"

"হ্যাঁ, তার কথা আলাদা।" একটু হেসে ওকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "চণ্ডীদাস তো তোলা হ'য়ে গেছে। তোমরা কী বই তুলছ?"

"টাকা আগে হাতে আসুক, তারপর ঠিক হবে।"

"আমার মনে হয়, বকুলবালার জীবনটা তুলতে পারলে লাখ-লাখ লোক তোমাদের ছবি দেখতে আসবে। বংশীপুর কবে যাচ্ছ?"

"দেখি, আগে এদিকের ব্যবস্থা সব পাকা ক'রে নিই।" চ'লে যাচ্ছিল প্রিয়তোষ।

জিজ্ঞাসা করলুম, "বকুলবালার না অসুখ?"

"সেইজন্যেই এখন যাব না। সুস্থ হ'য়ে না উঠলে টাক দেবে কি ক'রে?"

তারপর আরও একসপ্তাহ কেটে গেছে। প্রিয়তো বকুলবালার অসুখের কথা আর উল্লেখ করল না। বুঝলুম ওদের ফিল্ম-শিল্পের প্রাথমিক পরিকল্পনা এখনো পেকে ওঠেনি।

আজ সন্ধের সময় প্রিয়তোষের বন্ধু চা খেতে এল একতলায় ড্রইংরুমে বসেছে ওরা। নগেনের মা বলল "ওরা দুজন ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই।" এরই মধ্যে বার দুই প্রিয়তোষ আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। যাইনি যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। ওর বন্ধুদের সম্বন্ধে আমার ধারণ বদলে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, স্বামীর শুভাকাঙ্ক্ষী তারা নয়।

একটু বাদেই প্রিয়তোষ উঠে এল ওপরে। অনুরোধ করল আমায়, "কুমুদিনী, চলো, আমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচ করিয়ে দেব। এ একেবারে আলাদা ধরনের ছেলে।"

"তিনি কি আমায় দেখতে চান?"

"নিশ্চয়ই। এমন ছেলের সঙ্গে তোমায় আজ পরিচ করাব যে, তুমি জীবনে কখনো দেখনি।"

"কেন, আমার স্বামী? তাঁর চেয়ে ভালো ছেলে পৃথিবীতে আর কেউ আছে সে-কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

"কি যে বলো, কুমুদিনী! আমি ওর সামনে দাঁড়াতে পারি নাকি? লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "বন্ধুটির নাম কী?"

"সুব্রত সরকার। আমরা সবাই ওকে রাজু ব'লে ডাকি।"

"ও,—সত্যি? কিন্তু আমি তো যেতে পারব না!!" বুকের মধ্যে চিপচিপ আওয়াজ হ'তে লাগল। মুখ দিয়ে আমার কথা সরতে চাইছে না। এত বেশি বিচলিত হ'য়ে উঠলুম যে, প্রিয়তোষ পর্যন্ত হতভম্বের মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বোধহয় ধরা প'ড়ে গেলুম ওর কাছে কি যে বলব, কেমন ক'রে বলব কিছুই বুঝে উঠতে পারলু না। গত তিনবছরের গাম্ভীর্য বুঝি প্রিয়তোষের সামনে ভেঙে পড়তে চায়।

প্রিয়তোষ বলতে লাগল, "ব্যাপারটা খুবই অদ্ভু ঠেকছে আমার চোখে। মনে হচ্ছে, রাজুকে তুমি চেনো কুমুদিনী, একটা প্রশ্ন করব। অবিশ্যি অপ্রাসঙ্গিক নয় অসম্মানিত বোধ করবে না তো?"

ইতিমধ্যে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করবার সময় পেয়েছিলুম। বললুম, "বুঝতে পেরেছি। এই প্রশ্নটাই সব স্বামীর কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয়। কিন্তু তার কি কোনো দরকার আছে?"

"আলবৎ আছে। সম্পর্কটা যখন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মতো, তখন আমার অধিকার স্ত্রীর ওপর কতটা সেটা আমি জানতে চাই।"

নির্বিকারভাবে জবাব দিলুম আমি, "তোমার অধিকার আমার ওপর সম্পূর্ণ।"

"বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, রাজুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিল। কুমুদিনী, আমার জীবনের এই সবে সূর্যোদয় হয়েছে, এক্ষুনি কি ক'রে আমি সূর্যাস্তের বিদায়-সংগীত গাইব? হ্যাঁ, বন্ধুকে আমি সোজাসুজি কথাটা জিজ্ঞাসাই করব।"

প্রিয়তোষ চ'লে যাচ্ছিল। ওকে আমি ডেকে বললুম, "দাঁড়াও। শোনো। উৎসব-বাড়িতে খিড়কির পাশে দাঁড়িয়ে যারা এঁটো-পাতা কুড়োয়, তারা কাঙাল। তুমি তাদের দলের লোক নও। তুমি মহৎ ব'লেই যে ওরা তোমার করুণা ভিক্ষা করে। ভিক্ষা না দিতে পারো, দুঃখ করব না; কিন্তু আঘাত কোরো না। আমি কিছুই পাইনি, প্রিয়তোষ—এমনকি একটুকরো ছেঁড়া এঁটো-পাতা পর্যন্ত না।"

"কুমুদিনী, আমি জানতে চাই, রাজুকে কি তুমি ভালবাস?"

"এ তোমার অহেতুক প্রশ্ন। আমি তোমার স্ত্রী, সেইটেই সত্য।"

আমি দেখলুম, দ্রুতপায়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে চ'লে গেল প্রিয়তোষ। সিঁড়িতে পৌঁছতে দু'মিনিট সময় লাগল আমার। ছটফট করতে লাগলুম। যাওয়া উচিত কি উচিত নয়, বুঝতে পারছি না। রাজুদাকে প্রিয়তোষ হয়তো সত্যি-সত্যি অপমান ক'রে বসবে। হাজার অপমান করলেও যে রাজুদা মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে যাবে তাও আমার জানা আছে। নিজেদের মধ্যে অসহায় বোধ করতে লাগলুম। চোখ ফেটে জল আসছিল আমার। শক্ত হওয়ার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি। রাজুদাকে যদি অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে হয় তাহ'লে এ-কাজ আমারই করা উচিত। প্রিয়তোষ যেন রাজুদার কাছে ছোট হ'য়ে না যায়। আমার স্বামীর মাথা যেন উঁচু থাকে, এই ভেবে আমিও ঢুকে পড়লুম একতলার ড্রইংরুমে।

ঘরে ঢুকতেই প্রিয়তোষ বিব্রতভাবে বলল, "রাজু, ইনি আমার স্ত্রী,—আর এ হচ্ছে আমার বন্ধু অধ্যাপক সুব্রত সরকার।"

নমস্কার বিনিময় করবার আগেই স্বামীকে আমি বললুম, "তুমি যাকে পরিচয় করিয়ে দিলে তার সঙ্গে আমার ছেলেবেলা থেকেই চেনা।" এবার রাজুদার দিকে চেয়ে বলতে লাগলাম, "এ তোমার তীব্র অভদ্রতা, রাজুদা। বিয়ের দিন থেকে যে-সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে, তার প্রতি কি লোভ তোমার কমেনি? এ-লোভ শুধু নির্লজ্জ নয়, নির্মমও।"

রাজুদা উঠে পড়ল। তারপর মাথা নিচু ক'রে বলল, "আজ চলি ভাই, প্রিয়তোষ। অনেক রাত হ'য়ে গেল।"

আমি তবু বললুম, "রাজুদা, তুমি নিঃশব্দে অপমান সহ্য করো কি ক'রে? তোমার কি একটুও লজ্জা-বোধ নেই? তুমি যাও, রাজুদা—চিরকালের মতো যাও। আমায় বাঁচতে দাও। দয়া করো—"

"চললুম। অন্য একদিন এসে চা খেয়ে যাব, প্রিয়তোষ। না না, নেমন্তন্ন করতে হবে না। নিজেই এসে চেয়ে খেয়ে যাব।"

স্বামী বলল, "তুমি দাঁড়াও, রাজু। কথা আছে।"

আমি তখন চিৎকার ক'রে বললুম, "এখনো কি তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওনি?"

"না, কুমুদিনী। আমার শিক্ষা আর আভিজাত্যের ওপর নির্মম পদাঘাত করলে তুমি। এ আঘাত সহ্য করবার মতো সংশিক্ষা ভগবান আমায় দেননি। সুব্রত আমার অতিথি। তাই তোমার হ'য়ে রাজুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

রাজুদা বিনীতভাবে বলল, "দোষ আমার। কুমুদিনীর কোনো দোষ নেই।"

মুহূর্তের মধ্যে দ'মে গেলুম আমি। লোকটার কি এতটুকু অপমান-জ্ঞানও নেই। মিনতির স্বরে বললাম এবার, "আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না, রাজুদা। তুমি যাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় একটু শান্তি দাও।" কেঁদে ফেললুম।

কী অসহায়, কী দুর্বল আমরা!

ঠিক এই সময়ে সুনন্দা এসে উপস্থিত হ'ল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে বলতে আরম্ভ করল, "ভাই কুমু, নেমন্তন্ন পাইনি, তবু ছুটে এলুম। আই সী, এই-যে রাজু! বা রে, তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ভাঙা

রঙ্গমঞ্চে তোমরা তিনজনে মিলে শেক্সপিয়রের রিহার্সেল দিচ্ছিলে। আবহাওয়া বিয়োগান্ত। কিন্তু তোমাদের নাটকের বিষয়বস্তু আমার জানা নেই। মাপ করবেন মিস্টার চৌধুরী, আপনার বাড়িতে মোস্ট আন্‌এক্সপেক্টেড গেস্ট—হয়তো ইন্‌ট্রুডও করলুম।"

"না না, সেকি কথা—এ যে আমার সৌভাগ্য। বসুন আপনি।"

সুনন্দা বলল, "সৌভাগ্য আপনার না আমার, এখনো ঠিক আন্দাজ ক'রে উঠতে পারছি না। তা রাজুর বুঝি প্রায়ই এখানে নেমন্তন্ন হয়?" আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সুনন্দাই বলতে লাগল, "তবে আমার সঙ্গে রাজুর দেখা হয়—ওয়ান্স ইন্‌ এ ব্লু-মুন। এখানে এসে দেখা হ'ল, সৌভাগ্য তো বটেই। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ল, রাজু। সেদিন যে তুমি আমার জন্মদিনে একটা উপহার দিলে, সেটা দেখে লেডি মিত্তির নাকি খুবই হেসেছিলেন। কিন্তু বুঝলি ভাই হুমু, আমি তো জানি, রাজুদার এই সামান্য উপহারের দাম কত—ওকি রাজু, তুমি চললে নাকি?"

সহসা দৃপ্তিত আঁচলটা গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুনন্দা। আমাদের দিকে চেয়েও দেখল না একবার। রাজুদাকে বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

প্রিয়তোষ বাধা দিয়ে বলল, "আপনি বসুন। আপনার এখন যাওয়া চলবে না। কলকাতায় এসে এইতো সবে আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা।"

"এইটেই যেন শেষ-দেখা না হয়, ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনাই করুন। রাজু, কি করব?"

"তুমি কি করবে তা তুমিই ঠিক করো। আমার অন্য জায়গায় একটু কাজ আছে। তুমি বরং দু-এক ঘন্টা ব'সেই যাও।"

রাজুদা চ'লে গেল।

সুনন্দার অপ্রত্যাশিত আগমনে ঘরের আবহাওয়া একেবারে বদলে গেল। মনে হ'ল, পুরো রঙ্গমঞ্চটা দখল ক'রে বসল সুনন্দা। আমার স্বামী তন্ময় হ'য়ে অভিনয় দেখতে লাগল ওর।

প্রায় সাড়ে-তিনবছর পরে ওকে আমি দেখলুম। ঘাড়ের তলা থেকে চুল ছেঁটে ফেলেছে। বেশভূষার মধ্যে শালীনতার অভাব। বাইরের বেশভূষা থেকে আন্দাজ করলুম আমি, ভেতরের মনটা ওর গভীর। ভেঙে গিয়েছে। হাজার চেষ্টা করলেও আর বোধহয় জোড়া লাগবে না। নিঃসন্দেহ হলুম, রাজুদাকে ও পায়নি। বিয়ের কথাটা সামাজিক গুজব ছাড়া আর কিছু নয়।

খাবার ঘরে এসে বসলুম আমরা। টেবিলে খাবার সব সাজানোই ছিল। আমার স্বামী যত্ন ক'রে সুনন্দার সামনে বিভিন্ন প্লেটে খাবার সব তুলে তুলে দিতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তুই কি এম-এ ক্লাসে ভর্তি হোস্‌নি, নন্দা?"

"না। কেউ বলছে সরাসরি বিলেত যেতে, কেউ বলছে বিয়ে করো।"

আতঙ্কের সুরে প্রিয়তোষ বলল, "বিলেত যেতে হয়, এম-এ পাস ক'রে যান। কলকাতার ডিগ্রীটা হাতের কাছে রয়েছে।"

"রাজু যা বলে, শেষপর্যন্ত তাই করতে হবে।" কথাটা বলল আমার দিকে চেয়ে।

আমি কোনো মতামত প্রকাশ করলুম না।

ওর এম-এ পড়া নিয়ে প্রিয়তোষ খুব উৎসাহী হ'য়ে উঠল। সে বলল, "আমার মতে আপনার এম-এ পাস করা উচিত। দেশকে বড় করতে হ'লে চাই আপনাদের মতো মেয়ের দল।"

তন্দ্রালু ভাবে সুনন্দা বলল, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে, জামাই-বাবু!—তাই হুমু, তুই তো খবর রাখিস না, গত তিনটে বছর—" এই পর্যন্ত ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সুনন্দা।

একটু ঝুঁকে ব'সে প্রিয়তোষ জিজ্ঞাসা করল, "কেন, কি হয়েছিল আপনার?"

"নাঃ, তেমন কিছু নয়, মিস্টার চৌধুরী", হাই তুলল সুনন্দা, "স্যরি। মনটা যখন সংস্কার-মুক্ত হয় তখন তার জটিলতা যে কত বাড়ে তা বোধহয় আপনারা কেউ ভেবে দেখেননি। সংস্কারহীন মনটা যদি বল্গা-বিহীন তুরঙ্গের মতো কেবলই এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে তাহ'লে পথের অনির্দিষ্টতা ঠেকিয়ে রাখা যায় না। পথটাকে না চিনে বল্গাটাকে আলগা করা উচিত নয়। এই দ্যাখ্‌, হুমু, শুধু নিজের কথাই ব'লে যাচ্ছি। তুই কেমন আছিস? মিস্টার চৌধুরী, আপনি বোধহয় একটু অবাক হয়েছেন?"

"কেন বলুন তো?" প্রিয়তোষ ওর দিকে আরও খানিকটা ঘন হ'য়ে বসল। চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেল সুনন্দার দিকে।

আঁচলটা নিয়ে খেলা করতে করতে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সঙ্গে রাজুর চেনা হ'ল কবে?"

"ইউনিভারসিটিতে।"

"ওঃ—তাহ'লে তো মাত্র সেইদিন। আমাদের সঙ্গে চেনা অনেক দিনের। আর—" সুনন্দা অর্থপূর্ণভাবে আমার দিকে চেয়ে হেসে উঠল, তারপর বলল, "বড্ড শীত করছে ভাই হুমু।"

প্রিয়তোষকে বললুম, "আমার আলমারি থেকে একটা শাল নিয়ে এসো। কালো-রঙের একটা কাশ্মিরী শাল আছে দেখবে।"

প্রিয়তোষ শাল আনতে গেল। আমার সন্দেহ হয়েছিল, সুনন্দা আমায় একলা পেতে চায়। তাই আমি প্রিয়তোষকে সরিয়ে দিলুম ঘর থেকে।

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ রে, রাজু আজ হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'ল কি ক'রে? তুই বুঝি ডেকে পাঠিয়েছিলি?"

"না।" বুঝলুম সতর্ক থাকতে হবে।

"রাজু বুঝি নিজেই এল?"

"তোর জামাইবাবু নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। আমি জানতুমই না যে, প্রিয়তোষের সঙ্গে তার পরিচয় আছে।"

প্রিয়তোষ শাল নিয়ে এল। সুনন্দার হাতে দিয়ে সে বলল, "তোমার শালটা খুঁজে পেলুম না, সুনু। আপাতত এইটেতেই চ'লে যাবে।"

এটা প্রিয়তোষের নিজের ব্যবহারের শাল। মনটা খচ্ ক'রে উঠল। আমি দেখলুম, সুনন্দা শালটাকে মাথা অবধি টেনে দিয়ে এমন একটা ভঙ্গী ক'রে বসল, যেন এর চেয়ে বেশি আরামের জিনিস পৃথিবীর আর কোথাও তৈরি হয় না।

বংশীপুর সম্বন্ধে আরও মিনিট দশ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চলল। তারপর সুনন্দা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আজ চলি—"

প্রিয়তোষ মিনতির সুরে বলল, "কাল সন্ধেবেলা আপনার নেমন্তন্ন রইল এখানে। আসতেই হবে কিন্তু।"

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

[মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইবে]

পঞ্জিকা সংস্কারের অগ্রদূত 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'—রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক ধর্মসংস্থা এবং সংস্কৃতিবান হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল সমাজই শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করছেন। গণিত-জ্যোতির্বিদ্, এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গ্রহবিম্ব দর্শনের সাথে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত'; 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের' নির্ভুল তিথি এবং গ্রহাবস্থান,—ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণের বারোমাসের তেরো পার্বণ যথাকালে নির্বাহ হয়, কখনও কালভ্রষ্ট হয় না। প্রচলিত অশুদ্ধ পঞ্জিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম ক'রে, হিন্দুর ধর্মরক্ষা যথাকালে সম্পাদনের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৺মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ। তাঁদের সংস্কারমুখী আন্দোলনের ফলেই 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'র জন্ম হয়। স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান-সংস্থার অধীন ৺মেঘনাদ সাহা পরিচালিত 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি' বাংলাদেশে একমাত্র 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'কেই সংস্কারের অগ্রদূত ব'লে স্বীকার করেছেন। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড, জ্যোতিষীগণের গ্রহফল বিচারের জন্য 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'ই নির্ভরশীল।

চীন এবং ভারতের বর্তমান বিবাদের ভবিষ্যবাণীর সত্যতা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১৩৬৬):

(১) বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, মাঘ এই চারিমাস [illegible] চঞ্চল হইবে।

(২) ...... ঐ সময় ভারত সীমান্ত তিব্বত পর্যন্ত চীনের [illegible] প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, — শত্রুতা, সামরিক [illegible] হইবে।

(৩) ...... ইহাতে ভারতীয় এবং [illegible] পক্ষীয় [illegible] ধীর [illegible] থাকিবে।

(৪) ...... ভারতরাষ্ট্রে বৌদ্ধনীতির মধ্যে পতিত হইবার যোগ আছে।

(৫) ...... একদিকে চীনের [illegible] প্রভাব, অন্যদিকে আমেরিকার আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবল থাকিয়া উভয় নীতিই পরিণাম হইবে।

এইসকল ভবিষ্যবাণী ১৩৬৫ সালের মাঘ মাসে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১৩৬৬)' বলে প্রকাশ করা হয়েছিল, 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, ১৩৬৬'-র 'রাষ্ট্রগত বর্ষফল'-এ শ্রী[illegible]নাথ [illegible] জ্যোতিষী কর্তৃক ভবিষ্যবাণী—পৃষ্ঠা ৮০|৮৬ দ্রষ্টব্য।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা কার্যালয়

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ফোন—৩৪-১১০০

বার দুই হাই তোলার পরে সুনন্দা বলল, "ঠিক। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বিশ্রাম করবার মতো জায়গা এটা। নিরিবিলি। হৈচৈ নেই। শালটা আপনার রেখে গেলাম, জামাইবাবু।"

"না না, আপনি নিয়ে যান। কাল ফিরিয়ে আনলেই চলবে।"

"একেবারে ফিরিয়ে না আনলেও যে চলে তা আমি জানি।" একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে সে-ই বলল, "তোরা যে মস্তবড় জমিদার তা কি আমি জানি না? জামাইবাবুর অনেক টাকা।"

শালটা খুলে রেখে ধীরে ধীরে হেঁটে বেরিয়ে গেল সুনন্দা। দেহটা ভাঙাচোরা, পদক্ষেপে ক্লান্তি—আর দৃষ্টিতে ওর বেদনার চিহ্ন।

সেদিন বাবা আর মা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। বাবার শরীর একটু ভালো। এখানে তিনি এই প্রথম এলেন। খবর দিয়েই এসেছিলেন ওঁরা। প্রিয়তোষ বাড়ি ছিল।

একতলাতে গিয়েই আমি ওঁদের অভ্যর্থনা করলুম। বাবা হঠাৎ আমার মুখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে, শরীরটা কি তোর ভালো নেই?"

আমার হ'য়ে মা জবাব দিলেন, "কুমুদিনী আজকাল ব্রত-উপবাসে মন দিয়েছে। আজ ওর শিবরাত্রির উপোস চলছে কিনা, তাই মুখটা অমন শুকনো লাগছে। স্বাস্থ্য ওর ভালো।"

তবুও বাবা বললেন, "না, সন্দেহ হ'চ্ছে, কুমুদিনী সুখী হয়নি।"

আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম এই ভেবে যে, এটা তো সামাজিক সমস্যা নয়। চোখ বেঁধে আমাকে যেখানে দিয়ে দেওয়া হ'ল, সেখানে গিয়ে আমি সুখে থাকব না, এমন প্রশ্ন কি কেউ করতে পারে? কিন্তু বাবার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার অবকাশ কোথায়!

মা বলতে লাগলেন, "নতুন দেশে নতুন মানুষের সঙ্গে বাস করতে প্রথম প্রথম খানিকটা অসুবিধে সবারই হয়।"

আমরা গিয়ে বাবার ঘরে বসলুম। একটু পরে প্রিয়তোষ এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

বাবা বললেন, "প্রিয়তোষ, কুমুদিনী বোধহয় শরীরের ওপর একটুও যত্ন নেয় না। সাবধান না হ'লে একেবারেই যে ভেঙে পড়বে।"

বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল প্রিয়তোষের মুখে। বলল, "ধর্মের কুসংস্কার ওকে পেয়ে বসেছে। শরী খারাপ। তাই বারণ করেছিলুম শিবরাত্রির উপো করতে।"

"প্রিয়তোষ—" বাবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহসের তে এল, "প্রিয়তোষ, ধর্মের ওপর কি তোমার আস্থা নেই?"

"আমার আস্থার ওপরে তো ওর স্বাস্থ্য নির্ভ করছে না।" স্বামীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

মা বললেন, "প্রিয়তোষ তো ঠিক কথাই বলেছে। টাইফয়েডের রোগীকে পোশাক পরিয়ে লড়াই করে পাঠালে লাভ হবে কি? যে দাঁড়াতে পারছে না তা কাঁধে একটা বন্দুক চাপিয়ে দিলেই কি সে গুলী ছুঁড়ে পারবে?" আমার দিকে গভীর দৃষ্টি ফেলে তিনিই আবা বললেন, "এতদিনের মধ্যে একটা সন্তান অন্তত হও উচিত ছিল। প্রথম দরকার স্বাস্থ্যরক্ষা, তার পর—" প্রিয়তোষের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "জমিদারি রক্ষা জন্যে উত্তরাধিকারী চাই।"

বাবা একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে ছিলেন। সারাজীবন ধ'রে এত অপরাধ করেছেন যে, মায়ের সামনে কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। তবুও তিনি বললেন, "সন্তান হওয়া ভালো। কিন্তু তাই ব'লে স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই।"

এই সময়ে সুনন্দা বাইরে থেকে ডাকল, "কুমু—কুমুদিনী—"

"কে রে? নন্দা? আয়, ভেতরে আয়—" মা নিজেই উঠে গিয়ে সুনন্দাকে ডেকে নিয়ে এলেন।

সময়টা এখন উনিশ শো বত্রিশ সাল। আমাদের সমাজটা তখনো খুব খোলামেলা নয়। জমিদারের ছেলেরা লেখাপড়া শিখছে, বিলেত যাচ্ছে, উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তারও হয়েছে অনেকে, তবুও অন্তঃপুরের আবরু সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হয়নি। পেছনে পেছনে অনেকেই ওকে নিয়ে তামাশা করে। অবাধ স্বাধীনতার ফল যে কী বিষময় হ'য়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ হিসেবে সুনন্দার নামটাই তারা উল্লেখ করে বার বার। হোটেলে আবহাওয়ায় ওর সঙ্গ পেতে চায় সবাই, কিন্তু পারিবারিক পঙ্ক্তিভোজনে সুনন্দা আমন্ত্রিত হয় না। আমার মা-ই শু ওকে আদর করেন, ভালবাসেন। এবং রাজুদার সঙ্গে ওর যাতে বিয়ে হয় তার জন্যে চেষ্টাও করেন খুব।

মায়ের এই চেষ্টা অর্থপূর্ণ ব'লে মনে হয় আমার।

মা তাঁর নিজের পাশের চেয়ারটা পেছনদিকে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, "এইখানে বোস্, নন্দা।" ওর মাথায় হাত বুলতে বুলতে তিনিই বললেন, "বড্ড শুকিয়ে গেছিস রে! কাল গাড়ি পাঠিয়েছিলুম রাজুর মাকে নিয়ে আসবার জন্যে। তিনি আসতে পারলেন না। হ্যাঁ রে কুমু, রাজু কি তোদের সঙ্গে এসে একবারও দেখা করেনি?"

"করেছে।" বললুম আমি।

"নিজে থেকেই এল বুঝি?"

এবার সুনন্দা জবাব দিল, "তা কখনো সে আসে? জামাইবাবু ডেকে এনেছিলেন। বড়লোকদের প্রতি রাজুদার সাংঘাতিক বিদ্বেষ। মাসিমা, তুমি কেন শুধু-শুধু তেল খরচ করে গাড়ি পাঠাও?"

হাসতে হাসতে মা উঠে পড়লেন। আমি দেখলুম, তাঁর পুরো দৃষ্টিটা আমার ওপরই রয়েছে। বাবার মতো তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন আমি সুখী হইনি। রাজুদার যদি সুনন্দার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়, তাহ'লে দুশ্চিন্তা তাঁর কাটবে। এইজন্যেই বোধহয় সুনন্দার বিয়ের ঘটকালি করছেন তিনি। মনে-মনে মা আমাকে ভয় পান।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাবাও উঠে পড়লেন। ভেতরের ব্যাপার তিনি কিছু বুঝতে পারেননি। তাই বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজুর সঙ্গে কি নন্দার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে?"

"চেষ্টা করছি—দেখি। চল্ নন্দা, বাড়ি যাবি না?" মা ওকে এখানে বসতে দিতে চান না।

"এখন যাব না, মাসিমা। সঙ্গে আমার গাড়ি আছে।"

"তাই তো—" মা একটু চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "শুনলুম, তোকে একটা গাড়ি কিনে দিয়েছেন তোর বাবা। নিজেই চালাচ্ছিস বুঝি?"

"হ্যাঁ, মাসিমা। বাহ্? শোনো—" সুনন্দা উঠল, "আমার বিয়ের জন্য তোমার আর চেষ্টা করতে হবে না। দু-চার মাসের মধ্যে আমি বোধ হয় বিলেত চলে যাব। মাসিমা, শোনো—রাজুকে আমি বিয়ে করব না। বংশের দিক দিয়ে ওরা আমাদের চেয়ে ছোট।"

চকিতের মধ্যে প্রিয়তোষ ঘুরে ব'সে বলল, "আপনি এম-এ ক্লাসে ভর্তি হ'য়ে যান। বিয়ের সমস্যা পরে মিটলেই বা ক্ষতি কি?"

"আপাতত সমস্যা কিছু নেই, জামাইবাবু। মাসিমা, তুমি অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলে। বাবার কাছে শুনলুম, রাজুর মায়ের সঙ্গে দেনাপাওনার কথা পর্যন্ত ব'লে ফেলেছ! তোমায় ধন্যবাদ।—চললুম রে, কুমু।"

মা বললেন, "একটু দাঁড়া, নন্দা। তোর বাবাই আমাকে বলেছিলেন কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেলতে। প্রায় শেষ এসেছিল। রাজুকে বিলেত পাঠাবার খরচা সব তিনিই দিতেন। ও কি রে, কী করছিস?"

"পায়ের-ধুলো নিচ্ছি। নইলে তোমার ঋণ শুধব কী দিয়ে?" সুনন্দা সত্যি-সত্যি উবু হ'য়ে ব'সে মায়ের পায়ের-ধুলো নিল।

নবনীতা, কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারলুম, পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হচ্ছে। রাজুদার সঙ্গে সুনন্দাকে বিয়ে দেওয়ার জন্যে মায়ের চেষ্টা এবং উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন সুনন্দার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করছেন তিনি। মা তাঁকে বুঝিয়েছেন, দুজন দুজনকে এত বেশি ভালবাসে যে, তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়া দরকার। মায়ের এই উদার মনোভাবের জন্যে আমি নিজেও খুব বিস্মিত বোধ করছি।

মাকে সেদিন আমি জিজ্ঞাসাও করেছিলুম, "সুনন্দার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তুমি বড় বেশি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছ, না মা?"

"হ্যাঁ। মেয়েটাকে দেখে কষ্ট হয়। চেহারার কী ছিরি হয়েছে!···হ্যাঁরে কুমু, রাজু আবার এসেছিল নাকি এখানে?"

"নাঃ—সেদিন যে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম ওকে।"

"তাড়িয়ে দিয়েছিলি? আহা, ভদ্রলোকের ছেলে, তাকে তাড়িয়ে দিলি কেন? মিষ্টিকথায় বলতে পারতিস তো; আর বোধহয় আসবে না।"

"আসতে পারে। রাজুদার অপমান-জ্ঞান নেই। তোমরা তো তাকে কম অপমান করোনি—"

বাধা দিয়ে মা বলেছিলেন, "তোর ভালোর জন্যেই করতে হয়েছিল, কুমু। এখন দেখছিস তো, সুনন্দাকে বিয়ে করবার জন্যে রাজু পাগল হ'য়ে উঠেছে?"

আজকাল প্রায়ই মা আসেন এখানে। বেশিক্ষণ বসেন না। কথা-প্রসঙ্গে রাজুদার কথা জিজ্ঞেস করেন। ব্যাপারটা আমার কাছে গোড়ার দিকে রহস্যাবৃত ঠেকেছিল। পরে অবিশ্যি সবই বুঝতে পারলুম। একদিন তিনি আমায় বললেন, "প্রিয়তোষের দিকে একেবারেই তুই দৃষ্টি দিচ্ছিস না, কুমুদিনী। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় তারও খবর রাখিস না।—একা-একা প'ড়ে থাকিস, কি-ক'রে সময় কাটে তোর?"

"বই পড়ি।"

"বই পড়িস?" কথাটা যেন মায়ের বিশ্বাস হ'ল না, "বই পড়ে সময় নষ্ট করছিস কেন? চার বছর শেষ হ'তে চলল,—না কুমু, এসব আমি বুঝতে পারি না। এতদিনে মা হওয়ার কথা, বই নিয়ে মত্ত থাকলে চলবে কেন? হ্যাঁ রে, তুই কি এখনো রাজুকে ভুলতে পারিসনি?"

"মনে রেখে লাভ কি, মা?"

"বলা যায় না", ছটফট করতে করতে মা বললেন, "তোরা সব জমিদারদের রক্ত পেয়েছিস—তোদের আমি বিশ্বাস করি না। তোরা সব করতে পারিস!"

মনে-মনে মা আমাকে ভয় করতেন। তিনি ভেবেছিলেন, সুনন্দার সঙ্গে রাজুদার বিয়ে হ'য়ে গেলে ভয় তাঁর কাটবে। হয়তো আজকাল তিনি বুঝতে পারছেন, গরিব ব'লে রাজুদাকে সরাসরি বাতিল ক'রে দেওয়া উচিত হয়নি। তাঁর নিজের ভুলটাকে সংশোধন করবার পথ খুঁজছেন তিনি। মা তাই ভাবছেন, আমার জীবন থেকে রাজুদাকে সমূলে উচ্ছেদ করা দরকার। সুনন্দার সঙ্গে তার বিয়ে হ'য়ে গেলে ভয় থেকে মুক্তি পাবেন মা।

এগারো

কলকাতার এক সাহেবপাড়ায় নতুন সংসার গ'ড়ে উঠেছে। পুরনো যেটা ছিল তার প্রতি স্বামীর আর আকর্ষণ নেই। বংশীপুর আমার শ্বশুরবাড়ি, ওখানকার মহলদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী আমার স্বামী। যে-বংশীপুরের পেছনে রয়েছে কয়েক পুরুষের সঞ্চিত কীর্তি, যেখানে আজ খড়ের চালা থেকে ইট-সুরকির পাঁচ-মহলের প্রাসাদ তৈরি হ'ল—সেখানে আমার স্বামী সংসার গড়তে পারল না। কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, সে আর কোনোদিনই বংশীপুরে ফিরে যাবে না। বিদেশী শিক্ষার আভিজাত্য হাজার হাজার প্রিয়তোষকে আজ ঘর-ছাড়া ক'রে দিয়েছে। চৌধুরী-পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা আর প্রিয়তোষের নেই। ভাঙবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বকুলবালাই তো ঢুকে পড়েছে সেখানে। চৌধুরীদের সিন্দুকটা একদিন রাস্তায় এসে পড়বেই।

চাকরি করার কথাও আর বলেনা প্রিয়তোষ। মাস ফুরলেই টাকা আসে। চিঠিপত্র লেখবারও তাগিদ নেই ওর। বকুলবালার কথা উল্লেখ করলে রাগ করে। বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলে, "ভালো আছেন তিনি, নায়েবমশাই লিখেছেন।" আজ পর্যন্ত একটা চিঠিও আমি দেখিনি। একতলায় অফিস-ঘর খুলেছে সে। টেবিল-চেয়ার কিনে সাজিয়ে রেখেছে ঘরটা। চিঠিপত্র সব সেখানেই থাকে। নগেনের মা বলে, "দাদাবাবু খুব সাবধানী মানুষ। চিঠিপত্র সব দেরাজে বন্ধ ক'রে রাখেন।"

বাঁধা-নিয়মের পথ ধ'রেই আরও কয়েকটা মাস কেটে গেল। মা আজকাল আর ঘন-ঘন আসেন না। এলেও, সুনন্দার বিয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করেন না। শুধু খোঁজ নেন, আমি কেমন আছি। মুখে বলি, ভালো আছি। তিনি চেয়ে থাকেন আমার চোখের দিকে। আমার ভালো থাকার খবরটা যে সত্য নয়, তা বোধহয় মা বুঝতে পারেন। দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন করেন না তিনি। অমরেশের খবর দু-একটা পরিবেশন ক'রে আবার তিনি চ'লে যান।

প্রিয়তোষের দৈনন্দিন কার্যসূচীতে বিপ্লব ঘ'টে গেছে। প্রায় সমস্তটা দিনই বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ি ফেরে অনেক রাত্রে। প্রথম প্রথম আমি অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকতুম। প্রিয়তোষ না খেলে আমিও খেতুম না। দু-একদিন দেখবার পরে খুবই বিরক্ত বোধ করতে লাগল সে। সেদিন তো রাগ ক'রে ব'লে বসল, "তোমার গ্রাম্যতা দেখছি এখনো কাটলো না।"

"কেন? কী করলুম আমি?"

"এই-যে রাত বারোটা অবধি ব'সে আছ, খাওয়াদাওয়া করোনি। শুনেছি পাড়াগাঁয়ের সতীলক্ষ্মীরা এমনি ক'রে স্বামিভক্তির প্রমাণ দেয়। কুমু, আমি তোমার কাছে কোনো প্রমাণ চাইনে।"

"মাঝে মাঝে প্রমাণের দরকার হয়, নইলে স্বামিদেবতার মন অশান্ত হ'য়ে ওঠে। তা ছাড়া একা-একা বাড়িতে ব'সে থাকতে হয়, কোনো-কিছু একটা না করলে আমারই বা সময় কাটে কি ক'রে?"

"কেন, রাজুকে ডেকে আনলেই তো পারো। সত্যি বলছি কুমু, আমার আপত্তি নেই।"

"আমার আছে।"

"কী আপত্তি আমায় খুলে বলো।"

"আমার স্বামীর পাশে অন্য কাউকে আমি দাঁড় করাতে চাইনে। ধর্ম এবং নীতি দুটোই আমি মানি।"

প্রিয়তোষ হাসতে লাগল। নিজের দুর্বলতা গোপন করবার আর কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না। রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল। তর্ক করবার সময় এটা নয়। আমি বললুম, "জামা-কাপড় ছেড়ে এসো। খেতে বসবে না? রাত তো কম হয়নি।"

"আমি হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি।" ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে প্রিয়তোষ বলল, "মনে হচ্ছে তুমি আজকাল উপন্যাস পড়া ছেড়ে দিয়েছ। কুমু, তুমি কি ধর্মগ্রন্থ পড়ছ?"

এই প্রশ্নটা প্রিয়তোষ মাঝে-মাঝেই করে। কেন করে, বুঝতে পারি না। সত্যি-সত্যি, আমি তো ধর্মগ্রন্থ পড়ি না। হয়তো বা আমার গাম্ভীর্যের প্রতি কটাক্ষ করে সে। আমাকে কেন্দ্র ক'রে একটা উপহাসের জগৎ যদি সে মনে-মনে গ'ড়ে তুলেও থাকে তাতেও আমি আশ্চর্য হবো না। আমাকে জানবার কিংবা চেনবার চেষ্টা নেই প্রিয়তোষের মধ্যে। প্রথমে মনে হ'তো সংসারের সব-কিছু থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছি। আজকাল ভাবি, জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধহয় আমার সম্পূর্ণ হ'ল। উপড়ে-ফেলা ঘাসের চাপড়ার মতো প'ড়ে রইলুম এক অজানা পৃথিবীর অন্ধকার কোণে। মনের শূন্যতায় নতুন সত্যের খোঁজ করতে লাগলুম আমি।

হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা প্রিয়তোষ ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল। তাড়াহুড়ো ক'রে ঢুকে পড়ল আমার ঘরে। আবদার-মেশানো ছেলেমানুষী সুরে বলল, "শিগ্‌গীর তৈরি হ'য়ে নাও। দশ মিনিট সময় দিলুম তোমায়।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"থিয়েটারে। টিকিট কেটেছি। আজ দেখবে সুরবালাকে—শিশিরবাবুর উল্টো-দিকে নামছে সে। কুমু, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, আমি একদিন বলেছিলুম সুরবালার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। ভাখো, ভবিষ্যদ্বাণী আমার সত্য হ'ল কিনা। চটপট তৈরি হ'য়ে নাও।"

আপত্তি করবার সময় দিল না প্রিয়তোষ। নিজে ঢুকে পড়ল স্নানঘরে। ওর কথা এবং চলাফেরার মধ্যে এমন একটা গতির সৃষ্টি হ'ল যে, আমিও আর ব'সে থাকতে পারলুম না। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদলে ফেললুম।

ট্যাক্সিতে উঠতে যাওয়ার আগের মুহূর্তে মা এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়তোষ মা-কে বলল, "আমরা থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি।"

খবরটা শুনে মা খুশি হলেন। বললেন তিনি, "বেশ, খুব ভালো কথা। আমোদ-আহ্লাদ করবার এই তো বয়েস। তোমরা দুজনেই যাচ্ছ, না, সঙ্গে আর কেউ আছে? রাত হবে ফিরতে—সঙ্গে দারোয়ানটাও যাক না? বাইরে কোথাও ব'সে থাকবে।"

"কিছু দরকার নেই—" অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল প্রিয়তোষ।

"তাহ'লে বরং আমি গাড়ি পাঠাব। ক'টায় ভাঙবে?"

"রাত এগারোটা—" বলতে বলতে প্রিয়তোষই আগে উঠে বসল গাড়িতে, "হ্যাঁ, সে-ই ভালো হবে। গাড়িটা পাঠিয়ে দিলেই ভালো হবে। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, এসো কুমু—"

মা বললেন, "উঠে বোস্। আমি এমনিই এসেছিলাম। কোনো কাজ ছিল না। তোরা কেমন আছিস জানতে এসেছিলাম। হ্যাঁ রে কুমুদিনী, শুনলাম, গগনবাবুর নাকি অসুখ?"

গাড়িতে ব'সে জবাব দিল প্রিয়তোষ, "ওরকম একটু-আধটু অসুখ বাবার লেগেই থাকে। ও কিছু না—"

"তা আমি যে শুনলাম, তোমার ছোট-মা কলকাতায় লোক পাঠিয়েছেন বড় একজন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে? প্রিয়তোষ, তুমি বোধহয় দেশের খবর-টবর কিছু রাখো না।"

"স-ব খবর রাখি। বাবার সর্দিকাশির ধাত, বর্ষাকালে শরীর তাঁর কোনোদিনই সুস্থ থাকে না।—কুমু, টিকিট তিনখানা এনেছ?"

"টিকিট? আমি তো টিকিটের চেহারা পর্যন্ত দেখিনি।"

"এই যে—টেবিলের ওপর প'ড়ে রয়েছে তাহ'লে।"

প্রিয়তোষ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল বাড়ির ভেতর।

মা এবার আমার দিকে এগিয়ে এসে নিচু স্বরে বললেন; "আমি কিন্তু একটু ভয়ই পাচ্ছি তোদের জন্যে, কুমুদিনী।"

"কেন, মা?"

"মনে হচ্ছে, বংশীপুরে কোনোরকম একটা গণ্ডগোল বেধেছে। তোদের উচিত, এখন সেখানে গিয়ে থাকা। কুমুদিনী, সৎমায়ের সংসারে প্রিয়তোষ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না তো?"

"সেইজন্যে আমি বংশীপুর ছাড়তে চাইনি। কিন্তু ও সে-কথা বুঝবে না। পাড়াগাঁয়ের জলবায়ু ওর সহ্য হয় না। লেখাপড়া শিখেছে, আমার চেয়ে এসব ব্যাপার ও-ই ভালো বোঝে। তুমি তো জানো, টাকাপয়সার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।"

"ওই আসছে প্রিয়তোষ। শোন্—" আরও কাছে এগিয়ে এসে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রিয়তোষ তিনখানা টিকিট কিনেছে কেন? সুনন্দাও যাচ্ছে নাকি সঙ্গে?"

"আমি কিছু জানি না। তুমি বরং ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারো।"

"থাক্, থাক্—এখন দরকার নেই। আমি তো গাড়ি পাঠাব, ড্রাইভারের কাছ থেকেই খবর পাবো।"

প্রিয়তোষ ট্যাক্সিতে উঠবার আগে মা গিয়ে তাঁর নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন।

থিয়েটারে যাওয়ার পথে আমি আর কথা বললুম না প্রিয়তোষের সঙ্গে। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল তিনখানা টিকিট কেনার রহস্য আমি জানতে চাইব। মায়ের ধারণা হয়তো মিথ্যা নয়। ঝুনুকেও সঙ্গে নেবে প্রিয়তোষ। আমার মধ্যে যা অভাব ছিল সেটা পূরণ করবার জন্যে ঝুনু আজ প্রস্তুত। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল —আবার খাবো তাই লেমনেডের গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে ভাবছে, সমুদ্রমন্থনের 'হিরো' হওয়া বুঝি তেমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

সবচেয়ে বেশিদামের টিকিট কিনেছে প্রিয়তোষ। সামনের সারিতে পর পর তিনখানা বড় চেয়ার। বেশ পুরু গদি লাগানো চেয়ার। প্রেক্ষাগারে ভিড় দেখলুম খুব। নিচে এবং ওপরে একটা সীট-ও খালি প'ড়ে নেই। শিশিরবাবু সুরবালাকে দিয়ে সীতার ভূমিকায় অভিনয় করাচ্ছেন। দর্শকদের মধ্যে তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা চলেছে। কেউ বলছে, সুরবালা ডোবাবে। কেউ বলছে, পাস-করা মেয়ে সুরবালা, নতুন স্টাইলের অভিনয় ক'রে সবাইকে অভিভূত ক'রে ফেলবে। আমার পেছনের সারিতে ব'সে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী নব্যশিক্ষিতা সুরবালাকে কেন্দ্র ক'রে ঝগড়া আরম্ভ করলেন। স্বামীটির ধারণা, শিক্ষিতা ব'লেই অভিনয় সে ভালো করবে। স্ত্রীর বিশ্বাস, অভিনয় করতে প্রতিভার দরকার, বি-এ পাস না করলেও চলে। মাথা নেড়ে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে লাগলেন স্বামীটি। বিরাট বড় একটা পানের ডিবে থেকে গোটা চার পান বার ক'রে একসঙ্গে মুখের মধ্যে পুরে দিলেন তিনি। প্রতিবাদের ভাষা তাঁর আটকে যেতে লাগল। সেই সুযোগে স্ত্রীটি প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, রামায়ণের সীতা কোনোদিনই কলেজে পড়েননি। আমাদের বাঁ পাশে বসেছিলেন অলিপুরের বড়-রাজকুমার বরদাপ্রসাদ। বছর তিরিশ বয়েস হবে। দেখলে মনে হয়, পঞ্চাশ পার হ'য়ে গেছেন। একটা দেহে যেন দুজন মানুষের মেদ-মজ্জা বহন করছেন তিনি। তাঁর জন্যে দেখলুম ইজিচেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। [illegible] পিঠে ঠেস ঘণ্টা চার ব'সে থাকতে পারেন না। পায়ের তলায় দেখলুম নরম তুলোর বালিশ একটা। সঙ্গে একজন চাকর নিয়ে এসেছেন অলিপুরের রাজকুমার। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে। মাঝে মাঝে ভেতরে এসে পায়ের তলার বালিশটা নেড়েচেড়ে ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়। ধুতির কোঁচাটা লুটিয়ে পড়েছিল মেঝেতে। চাকরটা দেখলুম কোঁচার প্রান্তটা মাটি থেকে তুলে গুঁজে রাখল রাজকুমারের হাঁটুর তলায়। হাত-পা নাড়তে কষ্ট হয় বরদাপ্রসাদের। এমন কি, ঘাড় ফিরিয়ে আমাকেও একবার দেখতে পারলেন না তিনি। ঘাড়ের দু'দিকে উদ্বৃত্ত মাংস চীনদেশের প্রাচীরের মতো খাড়া হ'য়ে আছে। [illegible] তাঁর মাথা পাচ্ছিল।

এর মধ্যে প্রিয়তোষ বার দুই প্রবেশ করেছিল প্রেক্ষাগারে। আমাকে এসে ব'লে গিয়েছিল, "আমি এক্ষুনি আসছি। চা খাবে?"

"না। এইতো একটু আগে বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি। তুমি বাইরে-বাইরে ঘুরছ কেন?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

"একজন বন্ধু আসবে ব'লে কথা দিয়েছিল। তারও টিকিট কিনেছি আমি। কিন্তু—" হাতঘড়িতে সময় দেখে প্রিয়তোষ বলল, "আর বোধহয় এল না। থিয়েটার আরম্ভ হ'য়ে যাবে। তুমি বোসো, আমি আসছি। গেট-কীপারকে ব'লে আসি, পরে যদি আসে ও, আমায় যেন খবর দেয়।"

"বন্ধুটি কে?"

"এলেই দেখতে পাবে।" প্রিয়তোষ বেরিয়ে গেল বাইরে। বুঝলুম, বড্ড বেশি নিরাশ হয়েছে সে।

প্রথম দৃশ্যের মাঝামাঝি সময়ে প্রিয়তোষ এসে বসল তার জায়গায়। মুখ ভার ক'রে ব'সে রইল সে। স্টেজের দিকে একবারও চেয়ে দেখল না। আমার কিন্তু ওর বন্ধুর নাম জানবার জন্যে কৌতূহল বাড়তে লাগল। আমি জানি, নিজে থেকেই বলবে প্রিয়তোষ। ধৈর্য ধরতে পারলেই কাজ হবে। বলবার জন্যে সুযোগ খুঁজছে সে।

প্রথম অঙ্ক শেষ হওয়ার পরে প্রিয়তোষ বলল, "চায়ের অর্ডার দিয়েছি। এখানেই নিয়ে আসবে। আমি একটু বাইরে থেকে দেখে আসি।"

"কী দেখবে?"

"খুবই অবাক হ'য়ে গেছি। কথা দিয়ে কথা ভাঙবার মানুষ সে নয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখছি, এল না। তবুও একবার দেখে আসি। হয়তো হঠাৎ কোনো কাজে আটকে পড়েছিল। এখন এসে বাইরে অপেক্ষা করছে। তুমি বোসো, ঝুনু—"

প্রেক্ষাগারের আলো জ্বলে উঠেছে। চারদিকে

সুরবালার নাম নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ বলছে, সুপার্ব। কেউ বলছে, একেবারে খাঁটি সোনা। তৃতীয় অভিমতও কানে এল। শিশিরবাবু গাধা ঠেঙিয়ে ঘোড়া তৈরি করতে পারেন। মাস্টারিতে জুড়ি নেই তাঁর। ভদ্রঘরের মেয়েরা কেন পেশাদার থিয়েটারে নামছেন না? ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হ'ল। প্রিয়তোষ এবার মনোযোগ দিয়ে সুরবালাকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। মাঝে মাঝে আমার দিকে ঝুঁকে ব'সে বলছিল, "বি-এ পাস-করা অভিনেত্রী—বুঝলে হমু, এ একেবারে আলাদা ধরনের অভিনয়। বাংলা স্টেজে বিপ্লব আনবে সুরবালা। শিশিরবাবু সেদিন আমার এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।"

"তাই নাকি? কই, আমায় তো তুমি বলোনি?"

"শিশিরবাবুর একটা নতুন প্রোডাক্সনে আমি টাকা দেব। ফিল্মের চেয়ে থিয়েটারে টাকা লাগে কম। লাভের পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমার—বাকিটা তাঁর।"

থিয়েটার শেষ হ'য়ে গেল। আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, গাড়িতে ব'সে মা-ও অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, "তোদের ওখান থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গায় গিয়েছিলুম। সেখানে খুবই দেরি হ'য়ে গেল। ভাবলুম, তোদের তুলে নিয়ে যাই। কেমন লাগল থিয়েটার?"

প্রিয়তোষ বলল, "সুপার্ব। সুরবালা এখন যে-বইতে নামবে সেই বইয়েতেই টাকা আসবে। প্রথম শো-তেই 'হিট্' হবে, আপনাকে ব'লে রাখলুম আমি।"

"কুমুদিনী, তোর কেমন লাগল?"

"শিশিরবাবুর অভিনয় আমার ভালো লাগে।"

"কেন, সুরবালার—?" মা দৃষ্টি দিলেন প্রিয়তোষের দিকে।

আমাকে কথা বলতে না দিয়ে প্রিয়তোষ বলল, "শিশিরবাবু তো ভালো করবেনই। প্রশ্ন হচ্ছে সুরবালাকে নিয়ে। সীতা 'হিট্' হয়েছে দেখতে পেলেন। পরের বই-ও 'হিট্' হবে। ভালো ব্যবসা এটা, আপনাকে গোড়াতেই ব'লে রাখলুম।"

"আমাকে ব'লে লাভ কি প্রিয়তোষ? আমি তো আর ব্যবসা করতে যাব না।"

কলেজ স্ট্রীটের ওপর দিয়ে আমরা ওয়েলেসলির দিকে আসছিলুম। পার্ক স্ট্রীটও পার হ'য়ে আসতে হবে। থিয়েটারি আলোচনা বন্ধ হওয়ার পরে আমরা তিনজনেই চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। মা কেন এসেছেন তার কারণ আমি জানি। তৃতীয় কাউকে আমাদের সঙ্গে দেখতে না পেয়ে তিনি যে অবাক হননি তাও নয়। তবুও আমি নতুন আলোচনা শুরু করলুম না।

নিঃশব্দে বাকী পথটা চ'লে এলুম আমরা। সবাই আমরা মনে-মনে জানি, 'মনস্বা' এবং 'রাজু' এই নাম-দুটোকে কেন্দ্র ক'রে চাপা অশান্তির ঝড় বইছে। সাহস ক'রে কেউ তাই সত্যকথা বলতে চায় না। ভেতরে প্রবেশ করতে গেলেই ঝড়ের মুখে বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন মা। তৃতীয় টিকিটখানা কার জন্যে কেনা হয়েছিল, তার নামটা মায়ের কাছে রহস্যাবৃত হ'য়ে রইল। আমি বুঝলুম, অনিশ্চয়তার অস্বস্তি নিয়ে মা কড়েপুকুরে ফিরে গেলেন।

পরের দিন একটু বেলা ক'রেই ঘুম থেকে উঠল প্রিয়তোষ। খাবার টেবিলে যখন এসে বসল তখন ন'টা বেজে গিয়েছে। প্রথমেই সে এক পেয়ালা গরম দুধ খায়। তারপর পুরো ব্রেকফাস্ট। দুধের পেয়ালাটা ওর সামনে রেখে দিয়ে বললুম, "আজ আর বাইরে বেরিয়ে কাজ নেই।"

"কেন?" দুধের পেয়ালায় চুমুক দিল প্রিয়তোষ।

"আমরা সবাই কাল রাত জেগেছি—"

"সবাই!" ভুরু কোঁচকালো সে।

কথাটা আমিও আর গোপন ক'রে রাখতে পারলুম না। বললুম, "হ্যাঁ, মার কাছে কাল তো শুনলে, রাত দশটা পর্যন্তও মনস্বা বাড়ি ফেরেনি। মাঝে মাঝে ভাবি, মনস্বার পারিবারিক শাসন-ব্যবস্থায় মুক্ত বাতাসের এত প্রাচুর্য কোথা থেকে এল, আর কেমন ক'রেই বা এল। ভাবি, [illegible] সব জেনেনা রে?"

"তোমার বক্তব্য আগে শুনে নিই।"

"বক্তব্য আর কি—ভাবছি, মনস্বার বাবা অনেকদিন বিলেতে ছিলেন ব'লেই কি মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন রঙিন ফানুসের মতো উড়ে বেড়াতে? কলকাতার হাওয়ার ওপর তাঁর এত নির্ভরতা কী ক'রে এল? যে-দেশের জনতা স্বাস্থ্যহীনতায় এত বেশি কষ্ট পাচ্ছে, সে-দেশের বাতাসে কি ব্যাধির বীজাণু নেই?"

"আবদ্ধ ঘরের স্তূপীকৃত আসবাবের আশেপাশে যে-অন্ধকার পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে সেখানেই তো বীজাণুদের বাসা এবং তাদের আক্রমণের উৎকৃষ্ট গতি।"

আমি এবার হাসতে হাসতে বললুম, "বাইরের মুক্ত হাওয়ায় 'ব্যাসিলি' বুঝি একেবারেই নেই? অন্তত সুনন্দাদের বাড়িতে দু-একটা থাকাও তো সম্ভব। লক্ষ লক্ষ 'ব্যাসিলি'র মধ্যে যেটা সবচেয়ে মারাত্মক সেটাই হয়তো ওদের বাড়িতে ওৎ পেতে ব'সে আছে, রোগ বুঝে কোপ মারবে।"

"সুনন্দাকে তুমি ঈর্ষা করো।" উঠে পড়ল প্রিয়তোষ।

"একটু দাঁড়াও। সুনন্দাই বোধহয় ঈর্ষা করে আমায়।"

"কী ক'রে বুঝলে?"

"কাল তোমার নেমন্তন্ন সে রক্ষা করেনি। থিয়েটারের টিকিট একটা তোমার নষ্ট হয়েছে।"

"টিকিট কিনেছিলাম রাজুর জন্যে।"

মুহূর্তের মধ্যে দ'মে গেলুম আমি। প্রিয়তোষ-চরিত্রের লুকনো একটা দিক চোখে পড়ল আমার। দুঃখে এবং লজ্জায় আমি আর ওর মুখের দিকে চোখ তুলতে পারলুম না। রাজুদাকে খাতির ক'রে ডেকে আনবার জন্যে প্রিয়তোষের মানসিক অধঃপতন দেখতে পেলুম আমি। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, সুনন্দার সঙ্গে প্রিয়তোষের নতুন একটা সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে। কল্পনার স্বর্গে ব'সে দিন কাটাচ্ছি আমি।

বারো

পায়ের তলা থেকে মাটি আলগা হ'য়ে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি, ক্রমাগত বড় শূন্যতার গহ্বরে ডুবে যাচ্ছি আমি। সাংসারিক ভালো-মন্দ আর আমার স্পর্শ করতে পারছে না। [illegible] মতো জীবনটা আমার। তবু [illegible] পড়ল না, আত্মরক্ষা-বোধ পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। অঞ্জলির রাজুদার কথা ভেবে বিলুপ্ত বোধশক্তি ধ'রে রাখবার চেষ্টা করছিলুম। এখন মনে হচ্ছে, লুকনো চিন্তার শক্তি আমি পাইনি, বরং সেই চিন্তাটাই আমায় দুর্বল ক'রে দিয়েছে। তাই নবনীতা, জীবনের প্রথম প্রেম কি ম'রেও মরে না? যদি না-ই মরে তাহ'লে একে সার্থক ক'রে তোলার কি কোনো পথ নেই? পথটা খুঁজতে লাগলুম আমি। নির্জন অবসর মুহূর্তে কখনো কখনো মনে হয়, ঘুমতে-ঘুমতে হঠাৎ বুঝি জেগে উঠলুম।

[illegible] প্রিয়তোষও দিনরাত ভেবে বেড়াতে লাগল। আমাদের মধ্যে শুধু সকালের দিকে অল্প সময়ের জন্যে দেখা হয়। তাও দু-চারটের বেশি কথা বলে না। ওর সওয়ালে জবাব দিতে দেরি করে। দিলেও, ভুল জবাব দেয়। প্রিয়তোষ আজকাল মিথ্যেকথা বলছে। নৈতিক সাহসও হারিয়ে ফেলেছে সে। বাইরে-বাইরে ও যা ক'রে বেড়াচ্ছে তাতে শান্তি নিশ্চয়ই পায়নি। পেলে, প্রিয়তোষ অবশ্যই সত্যকথা বলত। বাঙালী জমিদারের স্ত্রী আমি, আমাকে ভয় করত না সে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে যতটুকু স্থায়িত্ব আছে, তার সিকিভাগ স্থায়িত্বও আমাদের মধ্যে নেই। মর্যাদার সিংহাসন প্রথম থেকেই ধূল্যবলুণ্ঠিত। বকুলবালা তার দাদামশায়ের কথা উল্লেখ ক'রে বলত: "গোলক চৌধুরী অনেকের সংসার ভেঙে দিয়েছে। পারিস তো, চৌধুরীদের সিন্দুকটা বাজারে এনে ফেলে দিস।" মাঝে-মাঝেই এই কথাটা আমার মনে হয়। বকুলবালার নিবারণ-মামা কোনো-কিছুই করতে পারেননি। বকুলবালা নিজে কী করবে জানি না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়ু যে শেষ হ'য়ে এসেছে আমি তা বুঝতে পারছি। সিন্দুকটার জন্যে ভাবনা আমার ছিল না। সামাজিক পরিবর্তনের চাপে ওটা একদিন নিজে থেকেই নষ্ট হ'য়ে যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি প্রিয়তোষের কথা। প্রিয়তোষের টাকার অভাব ঘটেছে। মাসিক পাঁচশো-টাকায় কুলিয়ে উঠছে না আর। মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে টাকা ওর ফুরিয়ে যায়। নরেনের মা এবং পরেশঠাকুর দুজনেই গতমাস থেকে মাইনে পায়নি। দৈনিক কাঁচা-বাজারের টাকাতেও ঘাটতি পড়তে লাগল। আমরা শুধু ডাল-ভাত খেয়ে জমিদারি-অহংকার হজম করতে লাগলুম। প্রিয়তোষ নিজে আর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে—"বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।"

এতকাল পর্যন্ত টাকাকড়ির সঙ্গে সম্পর্ক আমার ছিল না। এমনকি, দু-এক-শো টাকার বড় অঙ্ক হাত দিয়েও ছুঁয়ে দেখিনি। বাজারে যাবার আগে পরেশঠাকুর আসে আমার কাছে। জিজ্ঞাসা করে—"বাজারে যেতে হবে না?"

"আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।"

ওকে দাঁড়াতে ব'লে আমি নিজেই [illegible] পড়ি। আওয়াজ ক'রে আলমারিটা খুলতে থাকি [illegible] বুঝতে দিই যে, আমি টাকা বার করছি। [illegible] অক্ষমতা আমার ধরা পড়তে যায় দু-একদিনই [illegible]। এখন আর পরেশঠাকুর আমার কাছে আসে না। যত বাকিই হোক, সে ব'সে থাকে প্রিয়তোষের জন্যে। পরের দিনের বাজারের টাকা সে চেয়ে নেয় ওর কাছ থেকে।

নরেনের মা আমায় এসে খবর দেয়—"আজ দাদা দুটো টাকা দিলেন দাদাবাবু।"

বাইরে-বাইরে টাকা ওড়াচ্ছে প্রিয়তোষ। একদিন সে বলল আমায়, "আমি একবার বর্ণীপুর যাব।"

"হঠাৎ?"

"হ্যাঁ, হঠাৎ। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। নায়েবমশাইকে তিনখানা চিঠি লেখবার পরে কাল জবাব পেলুম।" ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একখানা পোস্টকার্ড বার করল, "কুমু, প'ড়ে দ্যাখো।"

"তুমি পড়ো, আমি শুনি।"

উত্তেজিত ভাবে বার দুই পায়চারি করল সে। তারপর পোস্টকার্ডখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে বলল, "এ-মাসে আমি শ'-পাঁচেক টাকা বেশি চেয়েছিলুম। মাত্র পাঁচশো টাকা। দু'খানা চিঠির জবাব দেয়নি—তৃতীয় চিঠি পেয়ে ব্যাটা লিখেছে, আদায়পত্র নেই। সরকারী খাজনা দেওয়ার সময়, ইত্যাদি। কতরকমের আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম—জমিদারি হাতে এলে নায়েবটাকে প্রথমদিনেই তাড়িয়ে দেব। গভর্নমেন্টের খাজনা দু'দিন পরে-দিলে কী হ'তো?"

"পরে দিলে গভর্নমেন্ট শুনবে না। তোমরা তো প্রজার কাছ থেকে আগেই আদায় ক'রে নিয়েছ—"

বাধা দিয়ে প্রিয়তোষ জিজ্ঞাসা করল, "কুমু, তুমিও কি প্রজার দলে?" ছেলেমানুষের মতো হাঁ ক'রে সে চেয়ে ছিল আমার মুখের দিকে। গম্ভীরভাবে বললুম, "আমি শুধু তোমার দলে। আমরা দুজনেই একটা দল।"

"তাহ'লে একমাত্র তুমিই আমার আজ সাহায্য করতে পারো—" এগিয়ে এসে প্রিয়তোষ আমার কাঁধের উপর হাত রাখল, "আমার আজ শ'খানেক টাকার দরকার। পকেটে কিছু নেই। তুমিই বলো কুমু, এতবড় সহরে শুধু-পাঁচশো-টাকায় কি-ক'রে আমি সংসার চালাব? স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কেউ চালাতে পারবে না।"

মুখ টিপে টিপে হাসছিলাম আমি। বালকসুলভ অক্ষমতা প্রকাশ করতে করতে প্রিয়তোষ আবার ব'লে উঠল, "কুমু, এক্ষুনি একবার বকুলপুকুরে যাও। মায়ের কাছ থেকে শ'-দুই টাকা ধার চেয়ে নিয়ে এসো। পরের মাসে ফিরিয়ে দেব।"

"এই যে বললে শ'খানেক?"

"প্রথমে ভেবেছিলুম শ'খানেক। পরে ভাবলুম, ধারই যখন নিতে হবে তখন শ'-দুই নেওয়াই ভালো। শ্বশুর-[illegible] ট্যাবি ভাবছে নাকি?"

"না। মায়ের কাছে আমি টাকা চাইতে পারব না।"

আমার কাছ থেকে উঠে গিয়ে প্রিয়তোষ আবার পায়চারি করতে লাগল। আমি বুঝতে পারলুম, টাকার ওর সত্যিই খুব দরকার। জিজ্ঞাসা করলুম, "হঠাৎ তোমার খরচ এত বেড়ে গেল কি ক'রে? চালের দাম তো সেই সাড়ে-তিনটাকাই আছে।"

"তুমি বুঝবে না। তুমি তো ঘরে ব'সে থাকো—সংসার চালাবার দায়িত্ব সব আমাকেই নিতে হয়েছে।"

"নতুন সংসার গড়বার দায়িত্ব যখন নিয়েছ—"

বাধা দিয়ে প্রিয়তোষ জিজ্ঞাসা করল, "অন্তত পঞ্চাশটা টাকার বন্দোবস্ত তুমি ক'রে দিতে পারো না?"

"পারি—নিশ্চয়ই পারি।" বলতে বলতে গলা থেকে পাঁচ-ভরির সোনার হারটা ওর হাতে দিয়ে বললুম, "বিক্রি কোরো না, বাঁধা দিয়ে টাকা আনো। পরের মাসে খালাস ক'রে আনবে।"

আমার হাত থেকে খপ্‌ ক'রে হারটা টেনে নিয়ে প্রিয়তোষ বেরিয়ে গেল। একটা কথাও সে আর বলল না। দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে গেল।

কয়েকদিন পরে বিকেলের দিকে মা এলেন। তাঁর কানেও খবর পৌঁছেছে। প্রিয়তোষের টাকার খুব টানাটানি। এদিক-ওদিকে ধার ক'রে বেড়াচ্ছে সে। স্ত্রীর গয়নাও বাঁধা দিতে আরম্ভ করেছে। মা বললেন, "এখন তো দেখছি, আমাদেরও ইজ্জত আর বাঁচে না, কুমুদিনী। গগন চৌধুরীর একমাত্র ছেলে স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিচ্ছে খবরটা কানে আসাও পাপ। হ্যাঁ রে, সত্যি নাকি?"

"সত্যি। গলার সেই সোনার হারটা খুলে দিয়েছি।"

"ভুল করেছিস। খাল কেটে কুমীরের পথ খুলে দিলি। ক্রমে ক্রমে একটা গয়নাও আর থাকবে না।"

"মা, আমি গয়না দিয়ে কী করব?"

"প্রিয়তোষ গয়না দিয়ে কী করছে তার খবরও রাখবি না? এত টাকা ওর কেন দরকার হয়? কুমুদিনী, তুই আর খুকীটি নোস—" মুখের ভঙ্গী আর গলার সুর বদলে হেসে মা-ই বলতে লাগলেন, "প্রিয়তোষকে দোষ দিয়েই বা কী করব, এইজন্যে দায়ী তুই, দায়ী বাবুও।"

"মা!—"

"হ্যাঁ, প্রিয়তোষ তোর মনের খবর রাখে।" উঠে পড়লেন মা। বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "আমিই বা কী করব! চেষ্টা তো কম করলুম না। অমলার সঙ্গে বাবুর বিয়েটা দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হ'তে

পারতুম। এখন ঐ নন্দার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রিয়তোষ। বাংলাদেশের জমিদারি যে কবে উচ্ছেদ হবে একমাত্র ভগবানই জানেন! নিজে তো জ'লে মরলুম সারাজীবন—এখন আবার তুই জ্বালাচ্ছিস আমায়। কুমুদিনী, কুমু—" মা প্রায় ভেঙে পড়লেন, গলার স্বরও তাঁর ভিজে উঠল। আমি মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি আমার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলেন, "গোড়ায় যদি আমি একটা ভুল ক'রেই থাকি, তার জন্যে এতবড় শাস্তি দিবি তুই?"

"আমি তোমায় শাস্তি দিলুম কি ক'রে, মা?"

"ওরে, নিজেকে আর ফাঁকি দিসনে। তোর মনের মধ্যে মন—বাচ্চুকে তুই আজও ভালবাসিস। কুমু, আমাদের যে ভগবান সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়—ছেলেখেলা ক'রে সাক্ষীর অবমাননা আমরা করতে পারিনে। যারা প্রতিশ্রুতি ভাঙে তাদের চরিত্র দুর্বল। প্রিয়তোষকেও সেই কথা বোঝাতে হবে। আমি জানি, সুনন্দা ওকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে।"

"আমায় কী করতে বলো?"

"তোরা এখানকার পাট তুলে দিয়ে বংশীপুরে ফিরে যা।"

"বেশ—বলব প্রিয়তোষকে।" মা'র পিছু পিছু আমিও ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। মনে হ'ল, মা'র শেষকথাটা এখনো বলা হয়নি। সত্যিই তাই। তিনি অনুরোধের সুরে বললেন, "বাচ্চুকে ভুলে যাওয়াই তোর সবচেয়ে বড় কর্তব্য। নইলে, কাউকে তুই রক্ষা করতে পারবিনে। নিজেও নষ্ট হ'য়ে যাবি। এই যাঃ—আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম। শ'-পাঁচেক টাকা এনেছি। এটা তোর কাছে রেখে দে। আপত্তি করিসনে, কুমু। বংশীপুর থেকে টাকা এলে না-হয় ফিরিয়ে দিস। যাব—থাক—"

টাকাটা হাতে নিলুম না আমি। বললুম, "ওকে আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। টাকা পাবে শুনলে সে তখনি ছুটবে কড়েপুকুরে।"

"তাহ'লে ওকে পাঠিয়ে দিস।"

বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে লাগলুম আমি। ঘরের নিরিবিলিতে ব'সে বাইরের বাধা-বিক্ষুব্ধ জীবনগুলোর কাহিনী শুনতে গিয়ে আবিষ্কার করলুম, সংগ্রামের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি আমি। একটা বৃত্তের মতো ওরা সবাই ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, মাথা ঠোকাঠুকি করছে, কিন্তু কেন্দ্রটি ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমি স'রে দাঁড়ালে বৃত্তটি যে ভেঙে পড়বে সে-সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না।

নবনীতা, কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের আর্থিক অবস্থা আরও গুরুতর হ'য়ে উঠল। দু-একদিন পর পর গয়নাগুলো উধাও হ'য়ে যেতে লাগল। এখন আর প্রিয়তোষ আমার অনুমতি নেয় না। অপেক্ষা করে—আমি কখন স্নানঘরে গিয়ে ঢুকব। আমার চোখের সামনে আলমারি খুলতে লজ্জা পায়। দু-একদিন আমি ইচ্ছে ক'রেই স্নান করতে ঢুকলুম অসময়ে। বুঝতে পেরেছিলাম, আলমারি খোলবার জন্যে সে অস্থির হ'য়ে উঠেছে। শেষপর্যন্ত প্রায় সব গয়নাই নিয়ে গেল প্রিয়তোষ।

পরেশঠাকুর বংশীপুর ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। মাঝে-মাঝেই নোটিশ দেয়। নগেনের মা-ও অবস্থা দেখে হকচকিয়ে গেছে। ঠিক বুঝতে পারছে না, গলদের স্রোতটা কোথা থেকে বইতে শুরু করেছে। মূলের রহস্য ধরতে পারেনি সে। সুনন্দা এখানে মাত্র বার দুই এসেছে। তা ছাড়া নগেনের মা তো জানে না, স্কুল থেকেই সুনন্দা আমায় হারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রতিযোগিতায় কোনোদিনই আমার সঙ্গে পেরে ওঠেনি সে।

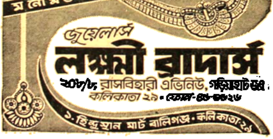
মনোমত অলঙ্কার...
জুয়েলার্স
লক্ষ্মী ব্রাদার্স
২০৮/৮, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট মোড়
কলিকাতা ২৯ • ফোন-৪৬-৩৩২৬
১, হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ • কলিকাতা-২৯

সুযোগ খুঁজছিল সুনন্দা। এবার আর প্রতিযোগিতা নয়, প্রতিশোধ নিচ্ছে। প্রিয়তোষকে ভেঙেচুরে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। সুনন্দার ব্যবহারে দুঃখের চেয়ে লজ্জা পাচ্ছি বেশি।

হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা প্রিয়তোষ বাড়ি ফিরে এল। দুমদাম আওয়াজ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল দোতলায়। এসে জিজ্ঞাসা করল, "কুমু, টাকা এসেছে?"

"টাকা?"

"হ্যাঁ, এ-মাসের টাকা। আজ তো মাসের পাঁচ তারিখ। পয়লা তারিখের মধ্যেই তো টাকা এসে পৌঁছয়।"

"না, টাকা তাহ'লে আসেনি।"

"ও—আচ্ছা, একবার পোস্ট-অফিসে খোঁজ নিই। হয়তো সেখানে এসে প'ড়ে আছে। পিওন-ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই—ও, ভালো কথা, তোমার একটা চিঠি এসেছে। লেটার-বক্স থেকে নিয়ে এলুম।"

"আমায় কে চিঠি লিখবে?"

"ভাখো তো—" পকেট থেকে চিঠিখানা বার করল প্রিয়তোষ।

খামখানা দেখলুম বেশ পুরু। লম্বা চিঠি। চার-পাঁচ পাতা। তলার দিকে নাম দেখলুম বকুলবালার। প্রিয়তোষকে বললুম, "বকুলবালা লিখেছে। নাও, তুমিই পড়ো।"

"অতবড় চিঠি পড়বার সময় নেই আমার। ভাখো তো, টাকার কথা কিছু লিখেছে কিনা?"

পাঁচপাতা থেকে খুঁজে বার করতে গিয়ে পুরো চিঠিখানাই পড়তে লাগলুম। প্রিয়তোষ মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

বকুলবালা লিখেছে:

> খোকা, তোমার বন্ধুর খুব অসুখ যাচ্ছে। আমার তো বাঁধা দুটো হাত। তা দিয়ে বাবার সেবা এবং শুশ্রূষা দুই-ই করতে হয়। পৌঁছতে পিয়ারীকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছি। অভিভাবিকা অবস্থা খুবই খারাপ। ডাক্তারমশাই বলছেন, এখন আরাম-উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই। চাউলের দামের ওপর দিয়ে এবার খুব বড়-ঝাপটা গেল। তার ওপর পক্ষাঘাতী না কাঠ-কারখানা আরম্ভ করেছে তাতে বংশীপুর থাকবে কিনা সন্দেহ। জীবনভাবে ভাবছে। এবার বন্যার দু'পারেই চৌধুরীদের বড় বড় লোটাভিরেক বাজার ছিল। তা থেকে প্রতিমাসে যা আয় হ'তো তার পরিমাণ কম না। ক'দিন আগে বড় ওঠার দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে সবগুলো বাজারই পদ্মার গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। সব মিলিয়ে মোটা পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে গেল। এখনো তো বর্ষার শেষ হয়নি। খরস্রোতা পদ্মার যৌবন আসছে। আর বিষ্ণুপুর গঞ্জনার দুই তীরে বাজা ভেঙে চলেছে। বাবা শুয়ে আছেন। তাঁর পদসেবা করতে করতে আমি শুনতে পাই সেই দুই তীরের গর্জন। এবার বংশীপুর টিকবে কিনা বলা মুশকিল।
>
> খোকা, গতকাল থেকে কাছারির দফতরটি কাগজপত্র সব সরানো হচ্ছে। কোথায় সরানো হচ্ছে জানো? ভৈরবপুর— আমার মামাবাড়ির দেশ। সেখানে আমি বড় হয়েছি। তুমি তো আমার দিদিমা-মামার নাম জানো। কর্তাবাবু লোকটা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। টাকাপয়সার প্রতি আর তাঁর আসক্তি নেই। নগদ টাকা নাড়াচাড়ার দায়িত্ব সব আমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছেন কর্তাবাবু। শুধু খাচ্ছেন আর ঘুমোচ্ছেন।
>
> খোকা, শুনলাম প্রিয়তোষ অফিসে গিয়ে দুটো উঁচু-পদ হ'য়ে উঠেছে। তোমাদের সব খবরই আমি রাখি। কেন একটা মেয়ের পেছনে সে হাজার-হাজার টাকা ওড়াচ্ছে। মেয়েটি কে, খোকা? তা সে যেই হোক, তার জেনে আমার কাজ নেই। কারণ প্রিয়তোষকে আমি চিনি। সোমেন চৌধুরীর রক্ত পেয়েছে সে, কিন্তু সাহস আর সামর্থ্য পায়নি তাঁর।
>
> খোকা, শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের বাজার-খরচ পর্যন্ত চলছে না। বড় দুঃখের কথা! তুমি যে কী ক'রে প্রিয়তোষের অত্যাচার সহ্য করছ ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি।

এই পর্যন্ত পড়বার পরে প্রিয়তোষ আর ধৈর্য ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারল না। রেগে উঠল। জিজ্ঞাসা করল সে, "এখানকার খবর বকুলবালা জানল কী ক'রে?"

"কি জানি, আমি তো আজ পর্যন্ত কাউকে একটা চিঠিও লিখিনি। আমার মতো এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আর কারো আছে কিনা সন্দেহ। ভাখো, আমি বলি কি, তুমি একবার বংশীপুর যাও। এখন আদায়-উসুল নেই বটে, কিন্তু তোমাদের কি জমানো টাকা কিছু ছিল না? দু-এক লাখ তো থাকা সম্ভব।"

"দু-এক লাখ? বাবার ব্যাঙ্কে অন্তত দশ লাখ তো আছেই। ভাখো তো, এ-মাসের টাকার কথা কিছু লিখেছে কিনা?"

পাতাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলুম। পঞ্চম পাতার শেষের দিক থেকে পড়তে আরম্ভ করলুম:

> খোকা, প্রিয়তোষ প্রত্যেক মাসে নায়েবমশাইকে চিঠি লিখে লিখে বড্ড বেশি বিরক্ত করে। তিনি তো কাজের লোক। অত লম্বা-লম্বা চিঠি পড়বার সময় থাকে না তাঁর। তিনি তাই প্রত্যেকটা চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। আমারই বা সময় কোথায়, খোকা? বাবার প্রতি কর্তব্য ক'রে আমার হাতেও উদ্বৃত্ত সময় বেশি থাকে না। তুমি কি জানো, প্রতি চিঠিতে প্রিয়তোষ শু

> টাকা চেয়ে পাঠায়? ওকে তোমাদের কোনো কথা বলার থাকে না, আর আমাদের কথা জানবার প্রশ্নও করেনা সে। যাক, ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তোমরা সুখী হও। প্রিয়তোষকে বোলো, এ-মাসে এবার থেকে টাকা পাঠানো সম্ভব হবে না।

তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠল প্রিয়তোষ। স্প্রিং-এর মতো ঝপ্ ক'রে লাফিয়ে উঠল সে। বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, "এর মানে কী?"

"লেখা প'ড়ে যা বুঝলুম, তাতে মনে হচ্ছে এ-মাসে আর টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।"

সহসা প্রিয়তোষ কান খাড়া ক'রে মোটরের হর্ন শুনতে লাগল। আমাদের বাড়ির সামনে থেকে আওয়াজটা আসছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "হর্ন বাজাচ্ছে কে?"

"বোধহয় সুনন্দা—" দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রিয়তোষ বলল, "দুটোর সময় ওর আসবার কথা ছিল। ঠিক কারেক্ট-টাইমে পৌঁছে গেছে। হুনু, একটু রাত বেশি হবে আজ। ডায়মণ্ড-হারবার যাচ্ছি—" আর কোনো প্রশ্ন করবার সময় দিল না আমায়। দুম্‌দাম আওয়াজ করতে-করতে লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে।

মনে হ'ল সত্যিই আমি হেরে যাচ্ছি সুনন্দার কাছে। অসহায়তা আমার চরমে উঠেছে। এ শুধু মানসিক নয়, দৈহিকও। রাত যত বাড়ছে হাত-পা-গুলো তত বেশি দুর্বল হ'য়ে পড়ছে। জানালার গরাদে হাত রাখতে গিয়ে বুঝতে পারলুম, আঙুলগুলো অবশ। রাত বারোটা বেজে গেল। ঘুম আসছে না। ছটফট করছি। একবার একতলায় গিয়ে দেখে এলুম, পরেশঠাকুর কী করছে। দেখলুম, দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমচ্ছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম খানিকক্ষণ। এই লোকটিই লুকিয়ে-লুকিয়ে বকুলবালাকে খবর পাঠায়। যে-বিষাক্ত বৃত্তটা আমাকে কেন্দ্র ক'রে চব্বিশ-ঘণ্টা ঘুরপাক খাচ্ছে, তার মধ্যে পরেশঠাকুরও ধরা পড়েছে।

কিন্তু আমিই বা কী করি। একদিকে বকুলবালা, অন্যদিকে সুনন্দা—ওরা দুজনেই প্রিয়তোষকে পায়ের তলায় ফেলে রাখতে চায়। কী ক'রে আমি প্রিয়তোষকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসব তার পথ তো কিছু চোখে পড়ে না।

দোতলায় উঠে এসে পায়চারি করতে লাগলুম ক্রমাগত। এতদিন পরে আমিও যেন অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছি। কী করব, কী করা উচিত সে-সম্বন্ধে একবার রাঘুদাকে প্রশ্ন করলে কেমন হয়?

বারান্দায় আলো জ্বলছিল। দেখলুম, প্রিয়তোষ ঝিমতে-ঝিমতে আমার ঘরের দিকে আসছে। মাতালের মতো একটু যেন হেলে-দুলে পা ফেলছে। চলার ভঙ্গীতে ক্লান্তির স্পষ্টতা।

আমার খাটের কিনারে ব'সে পড়ল সে। আলো জ্বেলে দিয়েছিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি? রাত প্রায় একটা!"

নিষ্পলকে প্রিয়তোষ চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বলল, "অ্যাক্সিডেন্ট।"

"অ্যাক্সিডেন্ট?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার লাগেনি তো? সুনন্দার?"

"ওরই লেগেছে।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "ভেঙে-চুরে গেছে নাকি কিছু?"

"না—ডাক্তাররা বললেন, বেঁচে গেছে মেয়েটা। শুধু বুকের একদিকে একটু গর্ত হয়েছে। স্টীয়ারিং-এর খোঁচা লেগেছে। এক মাস অন্তত বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।"

"এখন সে কোথায়?"

"এইতো রাত দশটার সময় ওকে বাড়ি নিয়ে এলুম। স্ট্রেচারে শুইয়ে আনতে হ'ল। রাত বারোটায় ভাড়াটে নার্স এসে পৌঁছলো। সুনন্দার মা বললেন, 'রাত বারোটা বেজে গেছে, তুমি এবার বাড়ি যাও, প্রিয়তোষ।' বুঝলে হুনু, এ হচ্ছে বর্বর-দেশের আইন।" সিগারেট ধরালো প্রিয়তোষ।

চলতে চলতে হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে পড়লুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "আইন? এর মধ্যে তুমি আইন দেখলে কোথায়?"

অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল প্রিয়তোষের মুখে। বলল সে, "যুবতী মেয়ের ঘরে আমায় তিনি থাকতে দিলেন না। সামাজিক আইন এত কঠিন হ'লে চলবে কেন? এতবড় একটা অ্যাক্সিডেন্টের পরে মেয়েটাকে ভাড়াটে নার্সের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভালো হ'ল না। কী বলো তুমি?"

ভয়ের ভাবটা আমার কেটে গেল। বুঝলুম, বড় আঘাত লাগেনি সুনন্দার। তাই একটু হালকা সুরেই বললুম, "সামাজিক আইনটা ভাঙলেই তো পারতে। তোমরা জমিদার, তোমরা যা করো সেইটেই আইন। তা ছাড়া, রাত বারোটা পর্যন্ত যেটা আইন ব'লে গণ্য হ'ল, সেটা সাড়ে-বারোটার সময় বে-আইন ব'লে গণ্য হবে কেন? ভগবান তো ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে আইন সৃষ্টি করেননি।"

"এ ভগবানের আইন নয়, সমাজের। সহস্র বছর ধ'রে এ-আইন চ'লে আসছে। সবাই মানে।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, এ আইন তুমি ভাঙতে পারো। তুমি আইন পাস করেছ বটে, কিন্তু এ আইন ভাঙবার জন্যে তোমার পাস করবার দরকার ছিল না।"

আমার কথা শুনে আমার স্বামী যেন মনে-মনে একটু সাহস পেল। এগিয়ে এল আমার দিকে। তারপর বলল, "তাহ'লে কাল থেকে আমিই নন্দার শুশ্রূষার ভার নেব…"

রাত্রিতে স্বামী আমার ঘুমোতে পারল না। শুধু পায়চারি করলে আর সিগারেট খেল। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, প্রিয়তোষ তার ঘরে নেই। বিছানাটা যেমন পাতা ছিল ঠিক তেমনি প'ড়ে আছে। জামা-কাপড় পর্যন্ত বদলায়নি। খোঁজ নিলুম, একতলার অফিস-ঘরে সে আছে কিনা। নগেনের মা খবর দিল, না, সেখানেও ছোটবাবু নেই।

ভালোই করেছে প্রিয়তোষ। একটু বেলা বাড়তেই দুজন পাওনাদার এল তার খোঁজ করতে। এই প্রথম আমি দেখলুম, পাওনাদাররা বাড়ি পর্যন্ত ছুটে এসেছে।

পরে কী হবে একমাত্র ভগবানই জানেন!

তেরো

ভাই নবনীতা, কাল যে তোকে চিঠিখানা লিখেছি সেটা অসম্পূর্ণ ছিল। লেখা বন্ধ ক'রে হঠাৎ আমি বাইরে বেরিয়েছিলুম। মিত্তিরদের বউ কাল কলকাতায় ফিরে গেল। সঙ্গে গেল বাচ্চাটা। শীতের মুখে ওরা আর পাহাড়ে থাকতে সাহস করল না। বাচ্চাটা ক'দিন থেকে সর্দিকাশিতে ভুগছিল। ছেলেটা শেষমুহূর্তে বায়না ধরল তার সঙ্গে আমাকেও কলকাতা যেতে হবে। রেণুও ওর সঙ্গে সঙ্গে সুর তুলল—"দিদি, তুমিও চলো।" রেণুকে আমি কেমন ক'রে বোঝাই যে, কলকাতার সঙ্গে আমার চির-বিচ্ছেদ ঘটেছে। কালকে রওনা হওয়ার আগে মা আর ছেলে দুজনেই কেঁদেকেটে অস্থির হ'য়ে উঠল।

কিন্তু আমার স্বামী কি জানত যে আমিও বেবির মতো কাঁদতে কাঁদতে নিদ্রাহীন রজনীগুলো চোখের জলে ভিজিয়ে তুলছি?

ভাড়াটে নার্সকে ছাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তোষও রাত জাগছে। ওকে আর আজকাল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাথগেটের দোকানে ঘণ্টা তিন অপেক্ষা ক'রে ওষুধ নিয়ে আসে। ললিত বাঁড়ুজ্জের কাছে আজ এক্স-রে রিপোর্ট নিয়ে যেতে হবে। যাবে আমার স্বামী। নিউ-মার্কেটে আজ পেশোয়ার থেকে টাটকা আঙুর আসবার কথা আছে। যেখানে যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে জলের অংশ কম ব'লে স্বামীর আর দুঃখের শেষ নেই। কাজ তাঁর অনেক বেড়ে গেছে। নন্দার বাবার সঙ্গে নাকি পরামর্শ চলছে, বিলেত থেকে বড় সার্জন আনানো যায় কিনা। দিশী ডাক্তাররা যদি ভুল ক'রে বসেন তাহ'লে ক্ষতি হ'তে পারে। হয়তো নন্দার একটা পা শেষপর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে। আহা, বেচারী নন্দা! যে-নন্দা ছুটতে এত ভালবাসে—যাকে শাবুলোর সন্ধানে ঝাউতলা পর্যন্ত প্রত্যহ ছোটাছুটি করতে হয়—তার পা কেটে ফেললে চলবে কেন? দয়াময়ের বিচার এত কঠিন নয়!

স্বামী চিন্তিত। প্রিয়তোষ বলল, "নন্দার এই সর্বনাশের জন্যে আমিই দায়ী। সত্যিই আমি। এখন যদি ওর পা একটা কেটে ফেলতে হয় তাহ'লে তার ক্ষতিপূরণ করবে কে?"

বললাম, "পা যখন ইনসিওর করা ছিল না, তখন ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠছে কি ক'রে? আর তোমার নিজের একটা পা কেটে নিয়ে নন্দার সঙ্গে জুড়ে দিলেও যে সে আর ঝাউতলা পর্যন্ত ছুটতে পারবে না সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং নন্দার এই লোকসান পূরণ করতে পারো তুমি তোমার একমাত্র—" কথাটা বলব কিনা ভাবছিলাম।

প্রিয়তোষ অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করল, "একমাত্র কী?"

"একমাত্র তোমার নিঃস্বার্থ সেবা ছাড়া তো ক্ষতিপূরণের দ্বিতীয় কোনো পথ দেখছি না।"

খুশি হ'ল প্রিয়তোষ। ঝুঁকে ব'সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি মনে হয়, নন্দাকে আমি আশানুরূপভাবে সেবা করতে পারছি?"

"চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে। আজকাল তো ওদের ওখানে দিনের মধ্যে তেইশ ঘণ্টা ক'রে কাটাচ্ছ। তোমার সেবা করবার উদ্যোগ আর উদ্দীপনা দেখে মাঝে মাঝে লোভ হয়, আমিও যেন একদিন মোটরের তলায় প'ড়ে দুটো পা-ই ভেঙে আসি।"

সহসা ঘরের আবহাওয়া থমথমে হ'য়ে উঠল। আমার সোজা চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখল প্রিয়তোষ। কী বুঝল জানি না। চুপ ক'রে ব'সে

রইল সে। আলোচনার উপসংহার টানবার উদ্দেশ্যেই বললুম, "আমার কথা ভেবে কষ্ট পেয়ো না। তুমি যেমন ক'রে পারো সুনন্দার পা-খানাকে রক্ষা করো আগে।"

"আচ্ছা কুমু, বলতে পারো নন্দার সেবা সম্বন্ধে তোমার এত উৎসাহ কেন?"

পোড়া কপাল আমার। আমার উৎসাহ দেখে স্বামী অবাক হচ্ছে, কিন্তু তার উৎসাহ দেখে আমি কেন অবাক হচ্ছিনে সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেল প্রিয়তোষ।

খপ্ ক'রে হাত বাড়িয়ে প্রিয়তোষ বলল, "কুমু, ঘরে দেশলাই আছে?"

"দেশলাই?"

"হ্যাঁ। কোথায় যে দেশলাইটা ফেলে এলুম মনে নেই। আচ্ছা আচ্ছা, এখন থাক্। আলোচনাটা শেষ ক'রেই ফেলি। আসল সত্যটা কি তুমি আজও বুঝতে পারনি, কুমুদিনী?"

"না। তুমি আমায় সত্য চিনিয়ে দাও।"

উঠে পড়ল প্রিয়তোষ। দরজার দিকে এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে সে ব'লে ফেলল, "তোমায় আমি আজও চিনি না! পরিচয় হয়নি।"

মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়লুম আমি। অনুরোধ করলুম, "অমন ক'রে কাউকে আঘাত দিতে নেই। পরিচয় যার পেলে না, তাকে ভুলে যাওয়া বরং ভালো, কিন্তু আঘাত দেবার মধ্যে বিন্দুমাত্র পৌরুষ নেই। দাবি যদি প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, তবে দাবি হারিয়েছ ব'লে অপরকে আঘাত করবে কেন?"

তর্কশাস্ত্রের সব নীতি বর্জন ক'রে ব'লে উঠল প্রিয়তোষ, "নন্দাকে তুমি ঈর্ষা করো।"

"মানুষের মধ্যে ঈর্ষা আছে ব'লেই না পৃথিবীতে এত নাটক-নভেল লেখা হয়। তুমি আজ যে-নাটকের স্ব-নির্বাচিত 'হিরো' সে-নাটক কেউ কোনোদিন লিখবে না। কারণ, কুমুদিনী সুনন্দাকে ঈর্ষা করেনি, করবেও না।"

"যাদুর পায়ের কাছে যার মন প'ড়ে রয়েছে তার ঈর্ষা থাকবে কি ক'রে?"

"আলোটা এবার নিবিয়ে দেয়া যাক। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।" আমি উঠে গিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলুম।

ডানদিকের জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। জ্যোৎস্না আমায় শান্তি দিল না, সুতরাং জানালাটাও বন্ধ ক'রে দিলুম। স্বামী বুঝল, এবার আমি শুয়ে পড়ব। সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওকে যেতেই হ'তো। নাইট-ডিউটি আছে। স্বার্থহী
সেবা। সেবা যদি নিঃস্বার্থ হয় তবে তাতে মত্ততা আস
কেন? যে-সেবায় মত্ততা নেই, সে-কাজে পুরুষ আন
হয় না।

দিন-সাতেক পরে শুনতে পেলুম সুনন্দার পা অনেকট
ভালো হয়েছে। পা না কাটলেও চলবে। হয়তো হাঁটবা
সময় একটু অসুবিধা হ'তে পারে। ডাক্তাররা বলেছেন
কয়েকদিন পরে হাওয়া-পরিবর্তনের দরকার হবে
পরেশঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে একদিন গেলুম ওকে দেখতে
আগে থেকে খবর দিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না।

ওর শোবার ঘরের দরজা খোলা ছিল। বেলা তখ
দোপহর তিনটের বেশি নয়। বারান্দা থেকেই দেখতে
পেলুম, বিছানায় শুয়ে রয়েছে সুনন্দা। বালিশের দু'দি
দুটো বিনুনি ফেলে রেখেছে। সবুজ-রঙের ফিতে বুনে-বু
বিনুনি-দুটোকে শুধু ফাঁপিয়ে তোলেনি, লম্বাও করেছে
দূর থেকে মনে হচ্ছিল দুটো লাউডগা-সাপ যেন প'ড়ে আ
বালিশের গায়ে। একটা নিয়ে খেলা করছিল আমার স্বামী

আমাকে দেখতে পেয়ে প্রিয়তোষ উঠে পড়ল
বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সুনন্দা তার হাতা
বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। ম্লান হাসির ইশারা দি
বললে, "এই দ্যাখ্, কুমু, কত শুকিয়ে গেছি।"

"তাইতো দেখছি।"

"শুকিয়ে-শুকিয়ে কী ভীষণ ছোট হ'য়ে গেছি, না?"

"তা হোক, ভালো জিনিসের অল্পই ভালো।" ও
বিছানার পাশেই ব'সে পড়লুম। জিজ্ঞাসা করলুম, "এখ
কেমন আছিস?"

"অনেকটা ভালো। কী সেবাই না করলেন জামাইবাবু।
সুনন্দা এবার স্পষ্টভাবে হেসে উঠল। দেখলুম, গাল-দুটে
একটু লাল হ'ল। পেশোয়ারের টাটকা আঙুর খেয়ে ও
গালের স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে। প্রিয়তোষের পরিশ্রম কা
লেগেছে।

এই সময়ে কি-একটা কাজের অজুহাতে ঘর থেকে বেরি
গেল প্রিয়তোষ। জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যাঁ রে, যাদু
তোকে দেখতে আসেনি?"

"একদিন এসেছিল। কলেজ নিয়ে খু-ব ব্যস্ত। শুনলু
অল্প সময়ের মধ্যে নাকি ছেলেদের কাছে খুব পপুলা
হয়েছে। তোর সঙ্গে যাদু আজকাল দেখা করে না, কুমু!

"ও-কথা বলিস্‌নে, ভাই। আমার কাছে কেন
আসবে?"

"চুপ ক'রে রইল সুনন্দা। মুখের ভাবভঙ্গী বদলে গেল! অস্বাভাবিক ভাবে অতি অল্পসময়ের মধ্যে গম্ভীর হ'য়ে গেল সে। একটু বাদেই সে বলতে লাগল, "আমরা দুজনেই ওকে পেলুম না। আচ্ছা ঝুমু, একটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দিবি?"

"কি?"

"তুই কি এখনো রাজুকে ভুলতে পারিসনি?"

বললুম, "এ-প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ নয়। কিন্তু আমার ভুলে-যাওয়ার ওপর তোর পাওয়া তো নির্ভর করছে না, নন্দা।"

একটু কাৎ হ'য়ে শোবার চেষ্টা ক'রে সুনন্দা বলল, "তোকে স'রে দাঁড়াতে হবে। সর্বনাশ যখন আমার হয়েছে তখন রাজুকেও এর অংশ নিতে হবে।"

"সেইজন্যেই আমি স'রে দাঁড়াতে পারি না। তোর চোখে রাজুদার সর্বনাশের ছায়া দেখতে পেয়েছি ব'লেই তাকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। নন্দা—"

বাধা দিয়ে সুনন্দা বলল, "তবু—তবুও একে সম্ভব ক'রে তুলতে হবে। প্রিয়তোষকে দেখে তোর নিজের সর্বনাশের ভয়াবহতা দেখতে পাচ্ছিস কি, ঝুমু?"

"পাচ্ছি। নন্দা, প্রিয়তোষ আঘাত পাবে একবারই। বিক্ষত হবে, তাও জানি। তবু আমি ওর ক্ষতের চিহ্ন মুছে দিতে পারব। কিন্তু রাজুদা কি দু-দুটো আঘাত সহ্য করতে পারবে? আহা, বেচারী রাজুদা! কোনোদিন কাউকে একটা রূঢ় কথা পর্যন্ত বলেনি!—আমি চলি এবার। প্রিয়তোষের বোধহয় অসুবিধে হচ্ছে খুব।"

আলোচনার সুতোটা কেটে দিয়ে সুনন্দা বালিশের তলা থেকে একটা ফোটো বার করল। দেখলুম রাজুদার ছবি।

সুনন্দা ফোটোখানা হাতে নিয়ে বলতে লাগল, "সেবার অনেক কান্নাকাটি ক'রে এই ছবিটা আদায় ক'রে নিয়েছিলাম।"

এই সময়ে আমার স্বামী একটা শেভিং-কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। রাজুদার ফোটোখানা তাড়াতাড়ি আমার হাতব্যাগের তলায় চাপা দিয়ে রেখে দিল সুনন্দা। টিকিট না কিনেও ব'সে ব'সে চলচ্চিত্র দেখতে লাগলুম আমি।

সুনন্দা বলল, "ঝুমু, জামাইবাবু না থাকলে এবার আর বেঁচে উঠতুম না। অপারেশন যে করতে হ'ল না, তা তোমাদের প্রিয়তোষবাবুর সেবার গুণে। এতবড় ঋণ শোধ করব কি ক'রে?"

"শোধ যে করতেই হবে তেমন দাবি তো উনি করেননি। যাঁরা মহৎ তাঁরা প্রতিদান চান না। তা ছাড়া এক্ষেত্রে ওঁর দায়িত্বই ছিল সবচেয়ে বেশি। সেদিন সন্ধেবেলা উনি যদি ডায়মণ্ড-হারবার যেতে তোকে বাধা করতেন তাহ'লে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটতো না। অভিভাবকের কর্তব্য তিনি করেননি।"

শেভিং-কাপে ক'রে বেদানার রস নিয়ে এসেছে প্রিয়তোষ। কাপটা রাখবার জন্যে জায়গা খুঁজছিল সে। বিছানার পাশে একটা টি-পয় ছিল। তার ওপরে আমি আমার হাতব্যাগটা রেখেছিলুম। তার তলায় ছিল রাজুদার ফোটোখানা।

প্রিয়তোষ আমাকে বলল, "তোমার ব্যাগটা সরিয়ে নাও একটু। বিছানার ওপর রাখো। এখানে ওর ফলের রসটুকু রেখে যাই।"

স্বামীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে সুনন্দা বলল, "দোহাই আপনার জামাইবাবু, ফলের রস আমি এখন খাব না। আপনি শেভিং-কাপটা নিয়ে যান।"

শেষের কথাটা যেন একটা রূঢ় আদেশের মতো শোনালো। সঙ্গে সঙ্গে বিনুনি-দুটোও বুঝি স্থানচ্যুত হ'য়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। শেভিং-কাপটা হাতে ক'রে পুনরায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল প্রিয়তোষ।

সুনন্দা এবার বলল, "দে তো ভাই ফোটোখানা এবার। ভুল ক'রে তোর ব্যাগের সঙ্গে আবার চ'লে না যায়।"

বাড়ি ফেরবার জন্যে উঠে পড়লুম। সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, "আবার কবে আসবি? আমি বোধহয় শিগ্‌গিরই মধুপুর চ'লে যাব। ওখানকার আবহাওয়া আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হবে।"

"তার আগে আরেকবার আসব নিশ্চয়ই।"

"ঝুমু—" গম্ভীর সুরে সুনন্দা আমায় ডাকল। ঘুরে দাঁড়ালুম আমি। জিজ্ঞাসা করলুম, "আর কিছু বলবি?"

"প্রিয়তোষকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"বেশ তো—"

"মন থেকে বলছিস?"

জবাব দিলুম না। সুনন্দা তবু আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, "প্রিয়তোষ আমায় ভালবাসে।"

"আর তুই ওকে ভালবাসিস না?"

"দরকার নেই। ওতেই আমার মনের জ্বালা মিটবে। ঝুমু, রাজুকে তুই ফিরিয়ে দে। তোর জন্যেই ওকে পাইনি। কথা দিবি না, ঝুমু—ঝুমু—একটু দাঁড়া। শোন্,

প্রিয়তোষকে আমি ভালবাসি না। ওকে আমি মুক্তি দিয়ে দেব—”

শেষের দিকে কি-যে বলল, শুনিনি। লম্বা এবং চওড়া বারান্দাটা পার হ'য়ে পুব কোণায় এসে দাঁড়ালুম। এখানেই একতলায় নেমে যাওয়ার সিঁড়ি। কাউকে কোথাও দেখতে পেলুম না। সুনন্দার মা ঘুমচ্ছেন। বাবা এখনো অফিস থেকে ফেরেননি। প্রিয়তোষ বোধহয় অন্তরকে নিয়ে পা-ঢাকা দিয়েছে। কারো জন্যেই অপেক্ষা করলুম না। দরকারও নেই। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলুম নিচে।

ওপরে উঠে আসছিল রাজুদা। সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় দেখা হ'য়ে গেল। সে একটু স'রে দাঁড়াল দেয়ালের দিকে। নিচে নেমে যাওয়ার জন্যে পথ ক'রে দিল আমায়। কথা বলল না। রাজুদাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, হঠাৎ বুঝি কিছু একটা পেয়ে গিয়েছি। ধ'রে রাখবার জন্যে প্রাণপণে সংগ্রাম করতে লাগলুম। মাথা নিচু ক'রে রাজুদা দাঁড়িয়ে আছে, কথা বলছে না। আমিও থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম, অথচ মনে হচ্ছে থামিনি। নেমে যাচ্ছি যেন। মুহূর্তটা স্থির, অথচ চঞ্চল। ধ'রে আছি, তবু ভাবছি ফসকে গেল বুঝি।

পাশ কাটিয়ে রাজুদাই প্রথম দু'ধাপ ওপরে উঠে গেল। মুহূর্তটা সত্যিই আর থেমে নেই। আমিও নিচে নামতে লাগলুম। মনে হ'ল, রাজুদা পেছন থেকে আমায় দেখছে। বোধহয় কথা বলতে চায়। মনে-মনে আমি তো অনেক কথাই এর মধ্যে ব'লে ফেলেছিলুম তার সঙ্গে।

দু'ধাপ ওপরে উঠে রাজুদা ডাকলো, “কুমু—”

“রাজুদা—”

“ভালো আছ তো, কুমু? জানতে ইচ্ছে করে খুব।”

জবাব দিতে পারলুম না। পরেশঠাকুর এসে ঢুকে পড়ল সিঁড়ির মুখে।

দিন-পনেরো পরে সকালবেলা প্রিয়তোষ বলল, “কুমুদিনী, আজ আমি মধুপুর যাচ্ছি। পরেশঠাকুর রইল। অমলেশ যেন এখানে এসে কয়েকটা দিন থেকে যায়। আর দিন-পাঁচেক পরে বংশীপুর থেকে টাকা এসে যাবে। সুতরাং তোমার আর কোনো অসুবিধে রইল না।”

ব্যস, প্রিয়তোষ পরম নিশ্চিন্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, “সমাজের কাছে আমি কী জবাবদিহি করব? মধুপুরে গেলে যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে সে-বিষয়ে কারো কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। কিন্তু সুনন্দার অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গে তোমারও কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে কী বলব?”

“সমাজ? সে তো আমাদের পাড়াগাঁয়ে আছে। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। সেদিন রাজুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল নন্দার ওখানে। ওকে বলেছি, মাঝে মাঝে তোমার যেন খোঁজ-খবর নেয়।”

স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলুম ঘরে।

যাবতীয় জিনিসপত্র সব বাঁধা হচ্ছে। বড্ড অসহায় বোধ করতে লাগলুম। লোকচক্ষুর অন্তরালে যার এতগুলো বছরের প্রতিটি মুহূর্ত কেটে গেল তার কাছে আজ থেকে আর কোনো শাসনের বিড়ম্বনা থাকবে না। কিন্তু তবু মেয়েরা নির্ভর করতে চায়। একটা কিছু নির্ভরযোগ্য শক্ত জিনিস আঁকড়ে না ধরলে সে যেন পথ চলতে পারে না। নির্ভরতায় মেয়েদের মহিমা বাড়ে।

সারাটা সকাল বাড়ি ব'সে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল প্রিয়তোষ। আমার ঘরে সে এর মধ্যে একবারও আর ঢুকলো না। আমি জানি ওর হাতে আর বেশি টাকা নেই। গতমাসটা কোনোরকমে চ'লে গিয়েছে। বাড়ি-ভাড়ার কী ব্যবস্থা ক'রে গেল জানি না। গত তিনমাসের ভাড়া বাকি ছিল। বংশীপুরের জমিদার ব'লেই বাড়িওয়ালা প্রিয়তোষকে তাগাদা দেন না। পরেশঠাকুরের কাছে শুনেছি, প্রিয়তোষ নাকি হ্যাণ্ডনোট দিয়ে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে হাজার-দুই টাকা ধারও নিয়েছে। সুনন্দার পেছনে এত টাকা যে কি ক'রে সে খরচ করল ভেবে পাই না।

দুপুরে আমার ঘরে এসে প্রিয়তোষ বলল, “ওদের ওখানে আমি যাচ্ছি। আর বাড়ি ফিরব না। সেখান থেকেই সোজা স্টেশনে চ'লে যাব। মধুপুর পৌঁছেই চিঠি লিখব। একটা পোস্টকার্ড এখান থেকেই কিনে নিয়ে গেলুম।”

“একেবারে এখান থেকে লিখে নিয়ে গেলেও তো পারতে।”

ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও বারান্দায় বেরিয়ে এলুম। পরেশঠাকুর ওপরে উঠে আসছিল। ওকে দেখতে পেয়ে প্রিয়তোষ যেন থমকে উঠল, “কি রে, এখনো ট্যাক্সি ডাকতে যাসনি?”

“যাচ্ছি, ছোটবাবু। এই টেলিগ্রামটা এল কিনা—”

“টেলিগ্রাম?” হাত বাড়ালো প্রিয়তোষ। পরেশঠাকুরের হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে প'ড়ে ফেলল সে।

খোকা করতে দেরি করল না—"কাল দুপুরবেলা বাবা মারা গেছেন।"

বিছানা-বাঁধা হোল্ড্-অলের ওপর ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল আমার স্বামী। আন্দাজ করলুম, ওর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। একটু পরেই আমি বললাম, "মালপত্র সব তো বাঁধাই আছে। চলো, সন্ধের গাড়িতে আমরা বংশীপুর রওনা হই। পরেশঠাকুর এক্ষুনি একবার কড়েপুকুর যাক। মাকে ডেকে নিয়ে আসুক।"

"দাঁড়াও, একটু ভেবে নিই।" বলল প্রিয়তোষ। শোকের প্রথম ধাক্কাটা এত তাড়াতাড়ি সামলে নিতে পারবে ব'লে ভাবতে পারিনি। মধুপুর যেতে পারল না ব'লে ওর দুঃখ আর অনুশোচনার সীমা নেই। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো মধুপুর রওনা হওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে পিতার মৃত্যু-সংবাদটায় স্বামী যেন ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে বলল, "ছি ছি, কী কাণ্ড হ'ল বলো দেখি! এমন সময় একটা টেলিগ্রাম এলো—নাঃ, এ-সবের মানে বুঝতে পারি না।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "কিসের মানে বুঝতে পারলে না? টেলিগ্রামের ভাষায় কি কোনো সন্দেহ আছে?"

"না, সে-কথা বলছি না। টেলিগ্রামটা ঘণ্টা চার পরে এলেই তো হ'তো—তাতে ওদের কোনো অসুবিধে কিংবা ক্ষতি হ'তো না।"

"ক্ষতি যা হবার তা তো হ'য়েই গেছে। এবার ছেলেমানুষি করলে আর চলবে না। বংশীপুরের জমিদার তুমি।"

"বহুলবালার মতো তুমিও দেখছি টাকা বড্ড ভালবাস। টাকাপয়সার কথা চুলোয় যাক। [illegible] মুশকিলের কথাটা ভেবে দ্যাখো একবার। টিকিট কিনে বার্থ রিজার্ভ ক'রে সব বন্দোবস্ত ক'রে এলুম আমি—নাঃ, কেউ শয়তানি করেনি তো? বাবা তো শুধু সর্দিকাশিতে ভুগছিলেন। মধুপুর যেতে দেবেনা ব'লে হয়তো কেউ আমার সঙ্গে চালাকি করেছে", পরেশঠাকুরের দিকে একবার অর্থপূর্ণ-ভাবে তাকিয়ে প্রিয়তোষ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি বলো, কুমুদিনী?"

"ভগবান ছাড়া এমন চালাকি আর কেউ করতে সাহস করবে না! পরেশ, তুমি এক্ষুনি একবার মা-কে খবর দাও। নগেনের মা কই? তাকে বলো, আমরা আজ বংশীপুর রওনা হবো।"

পরেশঠাকুর দ্রুতপায়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। হোল্ড্-অলের ওপরই ব'সে রইল প্রিয়তোষ। আমি বললুম, "ওখানকার কাজ সব মিটিয়ে আবার এখানে ফিরে এলেই চলবে। মধুপুর তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। নন্দাকে আমি চিঠি লিখে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। মা আগে আসুন, ব্যবস্থা করছি সব।"

"জানো কুমুদিনী, আমি কিন্তু জমিদারি চালাতে পারব না। সব বেচে-টেচে দিয়ে আসব।"

সাহস পেয়ে প্রিয়তোষের কাঁধে হাত রেখে বললুম, "আমি ঘরে ব'সে যতটুকু লেখাপড়া শিখেছি তাই দিয়ে সব-কিছু চালিয়ে নিতে পারব। তোমাকে কিছু করতে হবে না। তোমার রাজ্য-পরিচালনায় আমি হবো মন্ত্রিণী। তুমি শুধু ঘরে ব'সে পড়তে থাকবে রবিঠাকুরের 'চয়নিকা'। সেই অবসরে অন্তঃপুরে ব'সে আমি নায়েবের কাছ থেকে চয়ন ক'রে নিয়ে আসব স্বর্ণ রৌপ্য, যতো আছে তার কাছে। ওগো, সোনা-রুপোর পাহাড়ে ব'সে বংশীপুরকেই আমরা ক'রে তুলব আমাদের মধুপুর। সেখানে ব'সে আমরা উপভোগ করব আমাদের মিলনের মধুযামিনী। আমি ভুলে যাব, কবে কোন্ এক বিবাহ সভায় এসেছিল [illegible], আবার কখন কেমন ক'রে সে মিলিয়ে গেছে অচেনা আঁধারে। চলো, তুমি আর আপত্তি কোরো না!"

"কবিত্ব করলে বটে, কিন্তু রাত জেগে ট্রেনে চেপে বংশীপুর যেতে একেবারেই মন সায় দিচ্ছে না।"

"তোমার পায়ে পড়ি, আমায় একবারটি সুযোগ দাও! কলকাতার এই কঠিন ও কঠোর পরিবেশের বাইরে তোমার হবে নতুন ক'রে প্রেমের অভিষেক। আমাদের ঐ বংশীপুরের প্রাচীনতার মাঝখানে আমায় সৃষ্টি করতে দাও আমার নবীন সম্রাট—প্রেম ও অনুরাগে, শাসন ও পালনে তাঁর সাম্রাজ্য হবে আমাদের সুখ-সম্পদ!"

আমার দিকে চেয়ে প্রিয়তোষ বলল, "তোমার কথাবার্তাগুলো মন্দ নয়। নবীন সম্রাট, প্রেমের সাম্রাজ্য মধুযামিনী কথাগুলো এমনভাবে বললে যে, আমার মতো একজন আনাড়ীর কানেও শুনতে ভালো লাগল। প্রেমের রাজ্যে তুমি তো নবাগতা নও, কুমুদিনী—সেইজন্যে এত সুন্দর ক'রে বলতে পারলে। কিন্তু আপাতত বংশীপুরে গিয়ে মধুযামিনীর বদলে নায়েবকে ডেকে টাকাপয়সার হিসেবটা নিয়ে আসি। বাবার সঞ্চিত টাকার পুরোটা না পাই, অর্ধাংশ অন্তত পাওয়া যাবে। এখানে অনেক টাকা ধার করেছি। চলো, আজই আমরা রওনা হবো।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলেন মা।

চোদ্দ

আবার আমরা বংশীপুর ফিরে চললুম। পুরো রাতটা ট্রেনেই কেটে গেল। আমি লক্ষ্য করলুম, প্রিয়তোষ ঘুমতে পারছে না। মাঝে মাঝে উঠে বসছে—কামরার মধ্যে পায়চারিও করছে।

হঠাৎ একসময়ে প্রিয়তোষ জিজ্ঞাসা করল, "ঘুমিয়েছ নাকি?"

"না। কিছু বলবে?"

"সুনন্দা বড্ড রোগা হ'য়ে গেছে। ওর বোধহয় আর মধুপুর যাওয়া হবে না।"

"তুমিও কিন্তু রোগা কম হওনি।" অন্ধকারে ব'সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলুম আমি।

খুশি হ'ল সাথী। আমার পাশে ব'সে পড়ে প্রিয়তোষ বলতে লাগল, "জানো হৃদ্বিনী, আমি কিন্তু বংশীপুরে বেশিদিন থাকতে পারব না।"

"জমিদারি দেখবে কে?"

"নায়েবমশাই। তা ছাড়া ছোট-মা তো থাকছেনই।"

মনে-মনে ভয় পেলুম আমি। এ-ভয় আমার অনেকদিনের। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়েই যে বকুলবালা চৌধুরী-বাড়িতে প্রবেশ করেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রিয়তোষ টাকাপয়সার সুবিধা-ভোগে বঞ্চিত হবে কথাটা ভেবে অস্বস্তি বোধ করি খুব। আমি জানি, অসাবধানের সুযোগ বকুলবালা ছাড়বে না। সাংসারিক কলাকৌশল যার করায়ত্ত, তার কাছে প্রিয়তোষের মতো অনভিজ্ঞ যুবকের তো অস্তিত্বই নেই। দু'আঙুলে টিপে দিলে যে-বস্তু অনায়াসেই গ'লে যায়, তার কঠিনত্ব বকুলবালার কাছে নিতান্তই হাস্যকর। এহেন মানুষকে গুছিয়ে-গাছিয়ে সহজে পুনরায় লোটা-কম্বল সহ কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে সাতদিনও লাগবে না তার। কিন্তু বকুলবালার সন্দেহ সব আমার ওপর। স্ত্রীলোকের কুটিলতার যত কৌশলই থাক, সে-কৌশল ব্যর্থ করা স্ত্রীলোকের পক্ষেই সম্ভব।

বর্ষার মুখে পদ্মা এবারও ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করেছে ব'লে খবর পেয়েছিলাম আমরা। বংশীপুরের আশপাশের কয়েকটা গ্রাম নদীগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার সংবাদ দিয়েছিলেন নায়েবমশাই।

গোয়ালন্দ থেকে আমরা স্টীমারে উঠলুম। বেলা দশটার মধ্যে নন্দীর-ঘাটে এসে পৌঁছবার কথা। প্রিয়তোষ বলল, "নন্দীর-ঘাট স্টেশনটা আর নেই, ভেসে গিয়েছে। ওখান থেকে তিন মাইল দক্ষিণে নতুন স্টেশন তৈরি হয়েছে। আমাদের বোধহয় নৌকো ক'রে বংশীপুরে পৌঁছতে হবে।"

"বাড়ি পৌঁছব কখন?"

"মনে হয় রাত হ'য়ে যাবে।"

সত্যিই তাই হ'ল। স্টীমার থেকে নেমে আমরা নৌকোয় চেপে বসলুম। রওনা হবার আগে প্রিয়তোষ নায়েবমশাইকে টেলিগ্রাম করেছিল বটে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, টেলিগ্রাম তিনি পাননি। বংশীপুরের কাউকে দেখতে পেলুম না আমরা। ঘাটে নেমে প্রিয়তোষ খবর পেল, চৌধুরী-বাড়ির প্রথম মহলটা জলমগ্ন হয়েছে। দ্বিতীয় মহলের সিংহদরজা পর্যন্ত জল এসেছে। কালবৈশাখীর মুখে কী হবে বলা যায় না। কাছারির সব কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। নতুন কাছারি খোলা হয়েছে ওখান থেকে আরও দশ মাইল পুবে ভৈরবপুর গ্রামে।

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়.
এন,সি
একস্ট্রা স্ট্রং
গোল্ডেন 'র' নস্য
প্রস্তুতকারক:-
এন.সি.আর্য্য স্নাফ এণ্ড সিগার কোং
মাদ্রাজ-১
কলিকাতা কেন্দ্র • ৯২/এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ • কলি: ১২
ফোন
৩৪-৫০০৩

মদন মাঝি বললে, "কি বলব ছোটকর্তা, সেদিন দেখলাম মন্দিরের সামনে তিনটে সিঁড়িও ডুবে গিয়েছে।"

"ডুবে আর যাবে কোথায়, মদন? ঐ তো বিক্রমপুরের কিনারায় ঘেঁষে তলা থেকে আবার নতুন মাটি মাথা তুলছে।"

"হ্যাঁ, ছোটকর্তা—ঐ চরটা দু'দিন আগে নায়েবমশাই দখল নিতে গিয়েছিলেন। পারলেন না।"

"পারলেন না কেন?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

হাল ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল মদন মাঝি। আকাশের মেঘ দেখছিল। নৌকো চলছে পালের হাওয়ায়। এখনো মাইল পাঁচেকের পথ। বেলা শেষ হয়নি বটে, তবু মনে হচ্ছে রাত এসে গিয়েছে। আকাশের বুকে শুধু কালো-মেঘ।

আমার প্রশ্ন শুনে মদন মাঝি বলতে লাগল, "বিক্রমপুরের কুণ্ডুবাবুদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। ওঁরা গুলী চালিয়েছিলেন। নায়েবমশাই তো তাঁর লেঠেলদের নিয়ে পালিয়ে এলেন।"

হাওয়ার গতি বাড়ছে। নৌকোয় ব'সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলুম, কিনারের মাটি ভেঙে-ভেঙে পদ্মার জলে মিশে যাচ্ছে। হতাশার সুরে মাঝি বলল, "এ তো মাটি নয়, তাল-তাল সোনা! কামধেনুর মতো সব কামনাই পূরণ করত। বছর ভ'রে ফসল! পাট উঠল তো ধান লাগাও। ধান কাটা সারা ক'রে দাও ছড়িয়ে মুগ-মুশুরি। ছোটকর্তা তো কলকাতায় থাকেন, এই অঞ্চলে আজকাল আখের চাষও হচ্ছে। ঢাকায় রমানাথবাবু চিনির কল বসিয়েছেন—" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে-ই বলল, ছোটকর্তা তো তাঁর ঠাকুরদাকে দেখেননি। একটা মানুষের মতো মানুষ ছিলেন তিনি। লাঠি চালিয়ে বন্দুকের গুলী রুখে দিতে পারতেন। সারা মুলুক জুড়ে গোলক চৌধুরীর গর্জন শোনা যেত। তাঁকে সবাই পুরুষ-সিংহ বলত। একবার তো কালবোশেখীর সময় ভৈরবপুরের বজরা থেকে লাফিয়ে পড়লেন জলে। এক-রত্তি ভাবনা ছিল না। রাত-ভর সাঁতরাতে লাগলেন—তাও কি বলে দিবে, খালি-হাত-পা না—ছোটকর্তা তো কলকাতায় রইলেন, গল্প-গুজব শুনলেন না কিছুই। যেমন তাকত ছিল তাঁর—নারায়ণপুরের পতিত-মাঝিরা তাঁর রক্ত পেয়ে মানুষ হ'য়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন তো আজকাল শহরের বড় হাকিম হ'য়ে বসেছে। কি বলে দিবে—সারারাত সাঁতরালেন, পিঠের ওপর মস্ত বোঝা। শেষপর্যন্ত উনি আর বাঁচলেন না।" এই ব'লে থেমে গেল মদন মাঝি।

"উনি? কে বাঁচলেন না, মদন?" জিজ্ঞাসা করল প্রিয়তোষ।

"আজ্ঞে, ছোটমুখে বড় কথা বলতে নেই। কুণ্ডুবাবুরা আবার মানুষ নাকি? এক-পুরুষের রাজা তাই ভাঙকে বলে আর! ওদের গুলীর শব্দ শুনে বংশীপুরের নায়েব হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে এলেন। আরে, দুর দুর! নেংটি-ইঁদুর কি আর বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে? বুক ছিল একটা গোলক চৌধুরীর! মাস্টারবাবুর বৌকে বুকের তলায় চেপে ধ'রে এই পাগলী পদ্মায় কলজেতে লাথি মারতে লাগলেন—"

প্রিয়তোষের মুখে বিস্ময়ের আর সীমা নেই। ও ভাবছিল, মদন বোধহয় সব আবোল-তাবোল বকছে। বকুলবালার দিদিমা যে মাস্টারবাবুর বৌ ছিলেন তেমন খবরটা প্রিয়তোষের জানা নেই। সুযোগ পেয়ে প্রিয়তোষকে বললুম আমি, "তোমার ঠাকুরদা গোলক চৌধুরী লুকিয়ে-লুকিয়ে মাস্টারবাবুর বৌকে ভালবাসতেন।"

"মাস্টারবাবুটি কে?" কৌতূহল বাড়ল প্রিয়তোষের।

"বকুলবালার দাদামশাই।" তারপর পুরো গল্পটাই বললুম ওকে।

বংশীপুর পৌঁছতে রাত হ'য়ে গেল। এবার আর এক-একটা ক'রে মহল পার হ'য়ে আসবার দরকার হ'ল না। মন্দিরের কাছাকাছি নৌকো এসে ভিড়ল। কাছারি-বাড়িটা তো নেই-ই, গেস্ট-হাউসটাও নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। দৃশ্যটা এমন ভয়াবহ যে, নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারলুম না। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ধারে কাছে একটি জনপ্রাণীও নেই। মন্দিরের বারান্দায় শুধু একটা হারিকেন লণ্ঠন টিমটিম্ ক'রে জ্বলছে। মন্দিরের দরজা খোলা, পুরোহিত-মশাইকে দেখতে পেলুম না আমি। নৌকো থেকে নেমে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলাম। প্রিয়তোষ একটু বিরক্তির সুরে জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে যাচ্ছ কেন? মন্দির তো অন্ধকার।"

"ভয় কোরো না, ঠাকুর আছেন।"

রাত্রিটা যে কী ক'রে কাটল তার সঠিক বর্ণনা তোকে আর দিতে পারব না, নীতা। দোতলায় উঠবার সিঁড়িটা আমাদের খুঁজে খুঁজে বার ক'রে নিতে হ'ল। কোথাও আলো নেই। দাস-দাসীদেরও দেখতে পেলুম না। ভুতুড়ে বাড়ির মতো মনে হ'তে লাগল। অন্ধকারে পথ হাতড়ে-হাতড়ে প্রিয়তোষের ঘর পর্যন্ত এলুম আমরা। দরজায় তালা লাগানো ছিল। নগেনের মা গেল বকুলবালার

কাছ থেকে চাবি আনবার জন্যে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "বাড়িটার চারদিকেই জল নাকি?"

"কি ক'রে বুঝব? কেন, ভয় করছে বুঝি?"

"সাঁতার জানি না।"

"আমি জানি।"

"তুমি তো গোলক চৌধুরী নও—পিঠে নিয়ে সাঁতরাতে পারবে না।"

সত্যিকথা বলতে কি, নীতা, আমার মনে তখন মৃত্যু-ভয় এসে গিয়েছিল। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ সিগারেট টানছিল। ঐ ক্ষীণ আলোতে মাঝে মাঝে চোখ-দুটো ওর দেখতে পাচ্ছিলুম আমি। মনে হ'ল, দৃষ্টিতে ওর দয়ামায়া নেই। আমি সাঁতার জানি না, খবরটা শোনবার পরের মুহূর্ত থেকেই ঘন-ঘন সিগারেট ধরাতে লাগল প্রিয়তোষ। দু-চারটে টান মেরে গোটা দুই সিগারেট ফেলে দিয়ে আবার একটা নতুন সিগারেট ধরাল সে। কেমন যেন ভীষণভাবে অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছে।

অনুমান আমার মিথ্যে হয়নি। একটু বাদেই সে বলল, "তুমিই আমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এলে এখানে। শ্রাদ্ধশান্তির কাজ মধুপুরেও করা যেত। কুমুদিনী, তুমি কি সত্যিই সাঁতার জানো না?"

জবাব দেওয়া অনাবশ্যক।

চাবি নিয়ে নগেনের মা তক্ষুনি ফিরে এল। সঙ্গে প্রমদাও এসেছে। তার কাছে শুনতে পেলুম, বকুলবালা আজকাল আর কারো সঙ্গে দেখা করে না। সকালবেলা নায়েবমশাই বার বার চেষ্টা ক'রেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। বড়কর্তার ব্যাঙ্কে আর একটা আধলাও নেই। টাকার অভাবে জমিদারির সামান্য কাজও অচল হ'য়ে উঠেছে। আগামীকাল সদর থেকে উকিলবাবু এসে পৌঁছবেন। আরও শুনলুম, শিবাজীকে কলকাতায় হোস্টেলে রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছে বকুলবালা। একদিনের জন্যে শিবাজীকে ডেকে আনিয়েছিল সে। আজ সকালেই সে কলকাতা রওনা হ'য়ে গিয়েছে। নায়েবমশায়ের ধারণা, দু-এক লাখ টাকা শিবাজীর নামে ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছে বকুলবালা।

পরের দিন প্রিয়তোষ নায়েবমশাইকে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু বাবার তো পাঁচ-দশ লাখ টাকা থাকবার কথা?"

"আজ্ঞে আমিও তাই জানতুম। মৃত্যুর দিন-সাতেক আগে কর্তাবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রেও সন্তোষজনক জবাব পাইনি। সদরে গিয়ে খবর নিয়েছিলুম, ব্যাঙ্কের বাবুরা বললেন, টাকা সব তিনি তুলে নিয়েছেন। নগদ বলতে ঝুড়িয়ে-কাচিয়ে মাত্র হাজার দুই হবে। সত্যেন উকিল বললেন, একটা উইল নাকি তিনি ক'রে গেছেন। আজ তো উকিলবাবু আসছেন, শুনবেন সব। এখন দৈনিক খরচের পর্যন্ত টাকা নেই—"

"ছোট-মা কী বলেন?"

"কারো সঙ্গে তিনি দেখা করেন না। বাইরের দরজায় দুটো দারওয়ান বসিয়েছেন তিনি।— তাঁর ঘরে, দেওয়ালের গায়ে দুটো বড় বড় সিন্দুক বসানো আছে। ছোটবাবু—"

এই সময় সত্যেন উকিল এসে পৌঁছলেন। সোজা দোতলাতেই উঠে এসেছেন তিনি। চোখে চশমা তাঁর লাগানোই ছিল। মাথাটা বাঁ দিকে একটু হেলিয়ে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বুঝি আমাদের প্রিয়তোষের বৌ?"

উকিল কিনা, তাই প্রথমেই আইডেন্টিফাই ক'রে নিচ্ছেন। নায়েবমশাই বললেন, "হাাঁ।"

"বাঃ বেশ, সুখে থাকো, মা। আমি আর ক'দিন আছি বলো? বুড়ো হ'য়ে গেছি, যমে ধ'রে যাই।—সন্তান হয়নি বুঝি?" চশমার তলা দিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন আমার দিকে। নায়েবমশাই মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন যে, হয়নি।

"হবে, হবে, ভাবনা কী, মা। এখনো সময় আছে। তুমি নিশ্চয়ই জানোনা যে, আমার বড়ছেলে পরিমল সদরে বেশ বড় উকিল-ই হয়েছে। উকিল তো আজকাল অনেকেই হয়, কিন্তু পরিমলের মতো ক'জন হয়? আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। এক-পুরুষের কাজ চালিয়ে দিলুম আমি। তোমাদের সময় কাজ চালাবে পরিমল।"

বুঝতে আর অসুবিধে হ'ল না যে, আগামী পুরুষের জন্যে সত্যেন উকিল তাঁর বড়ছেলের পক্ষ নিয়ে আমাদের খোসামোদ করছেন।

তিনি এবার আমার স্বামীর দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, "এসো বাবা, এসো! উইলের খসড়াটা শুনে নাও।" কাগজের বাণ্ডিলটা খুলে বললেন তিনি, "মৃত্যুর মাস দুই পূর্বে বড়কর্তা এই উইল প্রস্তুত ক'রে গিয়েছেন। তিনি সজ্ঞানে এবং সুস্থ অবস্থায় এই উইল—বাবা প্রিয়তোষ, মন দিয়ে শুনছ তো?"

"শুনছি।"

"বেশ, বেশ—সাক্ষী-সাবুদ যাঁরা আছেন তাঁরা কোনো কার্যসূত্রেও তোমাদের সম্পত্তির সঙ্গে, এমনকি প্রত্যক্ষ

কিংবা পরোক্ষভাবেও জড়িত নন। অর্থাৎ এই উইল সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ নেই। এই উইল পাকা এবং পোক্ত। বাবা প্রিয়তোষ—"

বাধা দিয়ে এবার আমিই ব'লে ফেললুম, "উইলটা পড়ুন আপনি—"

"পড়ছি মা, পড়ছি। কিন্তু উইলটা তো ইংরেজীতে লেখা—"

"কঠিন ইংরেজী না হ'লে আমি বুঝতে পারব।"

"বাঃ, কী সুন্দর কথা। আমি জানতুম, প্রিয়তোষের বৌ ইংরেজী লেখাপড়া নিশ্চয় করেছে। বড়কর্তার বিধি-ব্যবস্থা সব নিখুঁত ছিল। প্রিয়তোষের ভাগ্য ভালো, এমন বৌ পেয়েছে।"

একটু ব্যস্ত হয়ে আমি বললুম, "আমার স্বামী কতটা-কী পেয়েছেন এবার সেই কথাটাই বলুন।"

"সে তো তেমন কিছু পায়নি—মানে, উল্লেখযোগ্য নয়।"

প্রিয়তোষ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। আমি ব'লে উঠলুম, "দাঁড়াও, সবটা শুনে যাও।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা, পাওনি ব'লে যে পাবে না, তেমন কথা কল্পনাও কোরো না। আপাতত তুমি মাসিক পাঁচশো-টাকা ক'রে মাসোহারা পাবে। জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সব তোমার ছোটমা'র। এই ভালো হ'ল, প্রিয়তোষ। দায়িত্বহীন পাঁচশো-টাকার ব্যবস্থা মন্দ নয়—যথেষ্টই হবে।"

আমি বললুম, "আমরা তো শুধু সুখ চাইনি, দায়িত্ব নিতেও চেয়েছিলাম।"

"পাঁচশো টাকা তো কম নয়।"

"সে তো ভিক্ষে।"

"ছি, ছি মা, এমন কথা বলতে নেই। শ্বশুরের টাকা ভিক্ষে হবে কেন? তিনি সন্তানে এবং সুখ-স্বস্তিকে এই ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "এই পাঁচশো-টাকার মুষ্টিভিক্ষা কি চিরকালের ব্যবস্থা?"

"বলো কি! আসলে তো তোমরাই সব পাবে। এই বিরাট সম্পত্তির মালিক যে তোমারই সন্তান। তোমার সন্তান হওয়ার পরে সে যতদিন না সাবালক হচ্ছে, শুধু সেই ক'টা দিন ছোটমা জমিদারির পরিচালনা করবেন। ইতিমধ্যে ভগবান না করুন, ছোটমা যদি বড়কর্তার পদানুসরণ করেন তাহ'লে জমিদারিটা সোজাসুজি তোমার হাতেই আসবে। এখন কথা হচ্ছে, তোমার একটি সন্তানের প্রয়োজন, এবং সেটি যত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছয় ততই মঙ্গল।"

ঘরের বাতাসে অপরিমিত গাম্ভীর্য। প্রত্যেকেই যেন এই ব্যবস্থায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। অনাগত শিশুর সাবালকত্ব-কল্পনায় উইল-তৈরির বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু এই দীর্ঘসময়ের অনির্দিষ্টতায় স্বামীর আর ভবিষ্যৎ রইল না। বংশীপুরের সঙ্গে যেটুকু তার যোগাযোগ রইল তার দাম মাত্র মাসিক পাঁচশো-টাকা।

এই সময়ে প্রমদা ছুটে এল খবর দিতে যে, ছোটমা সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমরা সদলবলে তক্ষুনি রওনা হয়ে গেলুম আবরু-মহলটির দিকে। নায়েবমশাই চঞ্চল হয়ে উঠলেন সবার চেয়ে বেশি। আগে আগে হাঁটতে লাগলেন তিনি। উইলের খসড়াটা গুছিয়ে রাখবার সময় পেলেন না উকিলবাবু। ওখানে ফেলে রেখেই উঠে এলেন।

বকুলবালার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারলুম না আমরা। বারান্দাটার মাঝখানে যে-দরজাটা ছিল সেটা দেখলুম ভেজানো রয়েছে। বকুলবালা শোকাভিভূতা মনে ক'রে প্রিয়তোষ সান্ত্বনার সুরে বলল, "কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা আসিনি, শুধু দেখা করতে এসেছি।"

দরজার ও-পাশ থেকে সে বলতে লাগল, "তিনি যে আমায় এমনভাবে এত তাড়াতাড়ি ফেলে চলে যাবেন তা তো আগে বুঝতে পারিনি। এমন কোনো কঠিন ব্যারাম নয়—হঠাৎ আমার এই সর্বনাশ হ'ল। আমায় কেন তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন না! আমি এখন একা-একা থাকব কি ক'রে?" শোকের বেগ অনেকটা কমে এসেছে।

আমি বললুম, "আপনি কেন একা-একা থাকবেন? আমরাই তো এসে পড়েছি। আর কাঁদবেন না।"

আমাদের থাকবার খবর শুনে বকুলবালা পুনরায় কান্নার সুর চড়িয়ে দিল। দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রিয়তোষ ঘোষণা করল, "শ্রাদ্ধশান্তির কাজ হয়ে গেলে আমরা চলে যাব। আমাকে যেতেই হবে।"

যেমন বলা সঙ্গে সঙ্গে কাজ। কান্না গেল থেমে। আড়ালে দাঁড়িয়েই সে জিজ্ঞাসা করল, "প্রিয়তোষ, তুমি কি চাকরি-বাকরি কিছু করছ?"

"না। টাকাপয়সার অভাব খুব বেশি। শুধু বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়েনি, অনেক টাকা দেনা হয়ে গিয়েছে।"

"ছি, ছি, খবর দাওনি কেন?" মাতৃত্বের কণ্ঠস্বরে

চরিত্রের ছাপ থাকা বিচিত্র নয়। এখন কিন্তু কণ্ঠস্বরের মধুরতায় বকুলবালার চরিত্রের কুটিলতাই ধরা পড়ল। আমার মনে হ'ল, আমাদের আর্থিক কষ্টের খবর শুনে আরাম পেল সে।

দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করবার সাহস পেল না প্রিয়তোষ। দরজার সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে বলল, "আমার এখন লাখ-খানেক টাকা চাই।"

সাহস পেয়ে নায়েবমশাই বললেন, "ছোটমা, এদিকেও যে টাকার বড্ড টানাটানি। সেরেস্তার কর্মচারীদের মাইনে-পত্র বাকি পড়েছে। তা ছাড়া নতুন কাছারি-বাড়ির জন্যেও টাকার প্রয়োজন। এর ওপর সরকারী খাজনা তো আছেই। আপনিই বা এখানে আর ক'টা দিন থাকতে পারবেন—ভাঙনের যা অবস্থা দেখছি, তাতে মনে হয় এই বাড়িটা আর নিরাপদ নয়। যদি বলেন, তাহ'লে ভৈরবপুরেই নতুন ঘরবাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করি।"

"না, আমি বাবার ভিটে ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না।" বকুলবালার গলার স্বরে দৃঢ়তা।

ছটফট করতে করতে প্রিয়তোষ বলল, "বাবার অন্তত লাখ-দশেক টাকা থাকা উচিত। সেসব তিনি কোথায় রেখে গেলেন?"

গলার স্বর অস্বাভাবিক ভাবে নরম ক'রে বকুলবালা বলতে লাগল, "প্রিয়তোষ, আমি জানি বড়কর্তার জন্যে তোমার আর দুঃখের সীমা নেই। কিন্তু তবুও তাঁর টাকাপয়সার হিসেব-পত্র তোমার জানা দরকার। তুমি আমার হিসেব-পত্র নিয়ে কথা বলতে বারণ করবে জানি। বলবে হয়তো, বাবাই যখন চ'লে গেলেন তখন তাঁর হিসেব দিয়ে কী হবে? তুমি বললেও আমি শুনব না। টাকা থাকলেই তার একটা হিসেব থাকে। হিসেব তিনি রেখে গেছেন বটে, কিন্তু নগদ টাকা বিশেষ কিছু রেখে যাননি। তাঁর ব্যারাম-পীড়ায় সবই খরচ হয়ে গেল। আমি তো গুনতে জানি না—মনে হয়, হাজার দশ টাকা তিনি এই থলিটার মধ্যে ফেলে গেছেন।"

দরজার ফাঁক দিয়ে থলিটা এগিয়ে ধরল বকুলবালা। আমি দেখলুম, প্রিয়তোষ দ্বিধা করছে। হাত-দুটো কাঁপছেও যেন। পরিস্থিতিটা মুহূর্তের মধ্যে পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে প্রিয়তোষ। উকিলবাবু মাথা নিচু ক'রে রেখেছেন। দশহাজার টাকার থলিটার প্রতি তাঁরও বোধহয় মায়া জন্মেছে। নায়েবমশায়ের চোখ-দুটোও বোজা। বকুলবালার হাত থেকে থলিটা টেনে নিলুম আমিই। নায়েবমশায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললুম, "অন্তত, মাইনের টাকাটা এই থেকে নিয়ে নেবেন আপনারা।"

ভেতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল বকুলবালা।

নিজের ঘরে ফিরে এসে স্বামীকে বললুম, "উইলের ব্যবস্থায় আমি হতাশ হয়ে পড়িনি। আমরা যদি বংশীপুরে থাকি তাহ'লে তোমার ছোটমার ওপর নজর রাখা সহজ হবে। কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই আমাদের। আমি তোমায় যেতে দিতে চাইনে।"

"আমার কী লাভ তাতে?"

"কেন? আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তান? ওগো, আমাদের জীবনে আজও মধুযামিনী আসেনি। তুমি যেয়োনা কলকাতায়—তোমায় আমি ধ'রে রাখব। ভবিষ্যৎ-সন্তানের কল্যাণের কথা ভেবে অন্তত সুনন্দার কথা ভুলে যাও!"

"কুমুদিনী, তোমার স্বার্থের জন্যে তোমার সন্তানের দরকার। তোমার ভবিষ্যৎ আছে ব'লেই তুমি মধুযামিনী কামনা করছ—কিন্তু আমার তাতে স্বার্থ কী?"

"ওগো, আমাদের দুজনার প্রেমের সার্থকতায় যে সৃষ্টির সার্থকতা। জমিদারির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্যে সন্তান আমি চাই না। আমার দেহের সৃষ্টিতে শুধু টাকাপয়সার ঝংকার থাকবে তেমন কামনা আমার নেই। এসো, আমরা আবার নতুন ক'রে জীবনের জয়গান গাই!"

তাই নবনীতা, এমন সুযোগও নষ্ট হয়ে গেল। যে-স্বপ্ন সার্থক হ'তে পারত, যে-জীবনের শূন্যতায় রূপ ও রসের পুরোপুরি সামঞ্জস্য আনা যেত, সে-সবই শিল্পীর মর্মচেতনে দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। সুযোগটা নষ্ট হয়ে গেল ব'লে হাহাকার ক'রে উঠলুম, সারারাত ধরে কাঁদতে-কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়লুম—কিন্তু প্রিয়তোষের মন ভোলাতে পারলুম না।' মনে হ'ল, শুধু-হাতেই সে সুনন্দার কাছে ফিরে যাবে আবার।

পনেরো

বংশীপুরের আকাশে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। একটা সর্বগ্রাসী কালো ছাউনি যেন চতুর্দিকের আকাশটাকে ঘিরে রেখেছে সর্বক্ষণ। পদ্মার বুকে গর্জন। উদ্ধত ফণার মতন ঢেউগুলো মাথা উঁচু ক'রে বংশীপুরের দেহে ছোবল মারছে দিনরাত। মাটি ধসে পড়ছে জলে। দোতলার বারান্দায়

দাঁড়িয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণের আম-কাঁঠালের গাছগুলো আমি দেখতে পাই। ডুবে গিয়েছে। শুধু ওপর-ডালের পাতাগুলোই দেখা যায়। আশপাশ থেকে লণ্ঠনের আলো এসে পড়লে পাতাগুলো চিকমিক ক'রে ওঠে। মনে হয়, পাতার ফাঁকে বুঝি লক্ষ জোনাকি আজ জলোচ্ছ্বাসে অস্থির। মসীকৃষ্ণ ছাউনির গায়ে জোনাকির আলো। মৃত্যুর মূকতায় জীবনের আলো নবকলেবরে সমুদ্ভাসিত হচ্ছে। জোনাকিগুলো যেন জন্ম-মৃত্যুর সংযোগ-সেতু।

দু'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, এখানকার দাস-দাসীরাও বড়লবাবার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। ডুবে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেছে দূর-দূর গাঁয়ে। সেরেস্তার কর্মচারীদেরও অসন্তুষ্টি কম নয়।

বড়লবাবার খাস চাকরানী প্রমদা বলে—"লাখ-লাখ টাকা গো, দিদি—বাণ্ডিল বেঁধে সিন্দুকে ফেলে রেখেছেন ছোটমা।"

"কেন ফেলে রেখেছেন? অতো টাকা দিয়ে কী করবেন তিনি?"

"দাদাবাবুর সর্বনাশ করবেন—তা ছাড়া আর কী।"

"দাদাবাবুর ওপর রাগ বুঝি খুব?"

প্রমদা চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ। তার পর বলল, "নগেনের মাকে জিজ্ঞেস করবেন—সে তো সব জানে।"

"তোমার মুখেই শুনি। ভয় নেই, বলো।"

উসখুস করতে করতে প্রমদা বলল, "দাদাবাবুর সঙ্গে পিরীত ছিল কিনা—তাঁকে যে করতে চেয়েছিলেন। পারলেন না ব'লে সর্বক্ষণই রাগের ঠেলায় গরগর করছেন। নায়েবমশাইকে ব'লে তিনিই তো দাদাবাবুর টাকা দিলেন বন্ধ ক'রে। বড়কর্তা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, দাদাবাবু কইলকেতায় মস্তবড় চাকরি পেয়েছেন। আহা, মরবার আগে বড়কর্তা কী কষ্টই না পেলেন! দাদাবাবুর নাম ধ'রে ধ'রে শুধু ডাকতেন—কাছে থাকতেন না ছোটমা। পাশের ঘরে ব'সে—" থেমে গেল প্রমদা।

"থামলে যে?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

"ভয় করছে গো দিদি।"

হাসি পেল আমার। সমস্ত সংসারটার আজ গলা পর্যন্ত জল—ভেসে-যাওয়ার মুহূর্তটাও প্রায় এসে গিয়েছে দরজার সামনে, তাতেও যদি কারো ভয় পাওয়ার কারণ না থাকে, তবে কেন প্রমদা প্রেম-প্রসঙ্গের কাহিনী-বর্ণনায় ভয় পাচ্ছে? ওকে অভয় দিয়ে বললুম, "চৌধুরীবাড়ির তিন ভাগ তো জলের তলায় আশ্রয় পেয়েছে, বাকী শুধু এক-সিকি। এখন আর ভয় নেই, বলো—"

ডাইনে-বাঁয়ে দৃষ্টি ফেলে প্রমদা একবার দেখে নিল যে, কেউ কোথা থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে শুনছে কিনা। তারপর সে ফিসফিস স্বরে বলল, "পাশের ঘরে ছোটমা দিনরাত্তির পুজো করতেন।"

"পুজো?" হঠাৎ যেন অবিশ্বাসের ধাক্কা লাগল একটা।

"হ্যাঁ দিদি, দাদাবাবুর ছবি পুজো করতেন। মাঝে মাঝে আমায় বলতেন, 'পুজো করি কেন জানিস? মন্তরের দড়ি বেঁধে চৌধুরীর ব্যাটাকে কইলকেতা থেকে হিড়হিড় ক'রে টেনে আনব। সোনার চৌধুরীকে শাস্তি দিতে হবে না?' সেকি রাগ গো দিদি! সাপের মতো ফোঁসফোঁস করতেন। সব কথা বলেছি নগেনের মাকে।"

এইটুকু বলতে প্রমদা ঘেমে উঠল। সে কী ঘাম! টসটস ক'রে কপাল থেকে গড়িয়ে পড়ছে শাড়ির ওপর। মনে হ'ল, কথা ওর এখনো ফুরয়নি। জিজ্ঞাসা করলুম, "আরও কথা আছে নাকি?"

"আছে, দিদি…"

"বলো না, শুনি।"

পুনরায় আশপাশটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে প্রমদা বলতে লাগল, "আপনারা তো পরশু এলেন। ছোটমাকে ছুটে গিয়ে খবর দিলুম। বিছানা থেকে নেমে এলেন তিনি। রাত তো তখন কম নয়। সিন্দুকের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, 'এই দ্যাখ্, সাপের মাথায় মণি—দশলাখ টাকা। চৌধুরীর ব্যাটা বাবা মারতে আসবে। প্রমদা, সিন্দুকটা খোল্ তো?' চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সিন্দুক খুললুম। বাণ্ডিল-বাণ্ডিল টাকা। গয়নাও অনেক। সিন্দুক থেকে একটা ছোট বন্দুক বার ক'রে নিলেন। ভয়ে আমার শরীলটা কাঁপছে গো দিদি—"

"ভয় নেই, ছোট বন্দুক আমাদেরও আছে।"

"তারপর ছোটমা দাদাবাবুর ছবিখানা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। চেপে ধ'রে সে কী কান্না! কাঁদেন আর বলেন, 'এই দ্যাখ্, সবেদা-পাত্র কী ভাঙা!' আমি বললুম, 'এমন কাজ কোরো না, ছোটমা—রেখে দাও ছবি। পাপ হবে যে।' 'পাপ?' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তিনি আবার বললেন, 'পাপ? পাপ করেছে তো সেই বুড়োটা—পাপ করেছে তোদের দাদাবাবু। এই দ্যাখ্—' দাদাবাবুর ছবিখানা এবার তিনি বালিশের গায়ে সোজাভাবে বসিয়ে রাখলেন। ছি ছি—কি বলব দিদি, তারপর উঠে এসে

ছোট-বন্দুকটা হাতে তুলে নিলেন। ছবির দিকে তাক ক'রে তিনি গান ধরলেন: 'পিরীতি-পাবকে দহন করিব—' —এই একটা গানই রোজ তিনি গাইতেন। তারপর হঠাৎ, এক পলকের মধ্যেই গুড়ুম-গুড়ুম দু'বার আওয়াজ! দাদাবাবুর ছবিখানা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। ··· এ-সংসারে ধর্ম নেই।"

"হ্যাঁ, আমরা সবাই পাপ করেছি, প্রমদা! শাস্তি পেতেই হবে।"

বকুলবালাকে আজও আমি চিনতে পারলুম না। সেকি সত্যি-সত্যি প্রিয়তোষকে ভালবাসে? নাকি মৃত দাদাবাবুর হয়ে চৌধুরীদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছে সে?

মনে আমার সত্যিই ভয় এসেছে। বংশীপুর থেকে এখন পালাতে পারলেই যেন বাঁচি। পদ্মার গর্জনের চেয়ে বকুলবালার গর্জন বেশি ভয়ঙ্কর। পদ্মার গর্জন কানে শোনা যায়, বকুলবালার গর্জন চাপা।

গতকাল থেকে প্রিয়তোষ বংশীপুরে নেই। সে গিয়েছে ভৈরবপুরের কাছারি-বাড়িতে। টাকা সংগ্রহ করবার জন্যে চেষ্টার আর ত্রুটি রাখছেনা সে। একেবারে শূন্যহাতে গিয়ে সুনন্দার কাছে দাঁড়াবে কি ক'রে? সুনন্দাকে ভালবাসতে হ'লে টাকার প্রয়োজন।

আজ সকাল থেকেই হাওয়ার গতি বাড়তে আরম্ভ করেছে। বিকেলের মধ্যেই যে কালবৈশাখীর প্রলয়-নাচন শুরু হবে তাতে আর সন্দেহ নেই। একমাত্র প্রমদা ছাড়া অন্য দাস-দাসীরা সবাই বকুলবালার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চ'লে গিয়েছে দুপুরের আগেই। নরেনের মা এসে বলল, "দাদাবাবু কি খবর পাননি? ভৈরবপুরে লোক পাঠিয়ে ডেকে আনা দরকার। কাল রাত্রে মন্দিরটা ভেঙে পড়েছে। পশ্চিমদিকের আমবাগানটার আর কিছুই নেই। ঝড় উঠেছে—বাবো!—"

একটু বাদেই ছুটে এলেন নায়েবমশাই। তিনি করজোড়ে বললেন, "দুপুরের আগেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে—"

"ছোটমা কী করবেন?"

"তিনি বললেন, স্বামীর ভিটে ছাড়তে পারবেন না। দারওয়ান দুটো পালিয়েছে।"

"ছোটবাবু কোথায়?"

"তিনি মহলে-মহলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এখন তো টাকা আদায়ের সময় নয়। লোক পাঠিয়েছি তাঁকে খবর দেওয়ার জন্যে। আপনার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ফেলুন—গহনার বাক্সটা সঙ্গে রাখবেন।"

"গহনার বাক্স?" হেসে ফেললুম আমি, "কয়েকগাছা চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই আমার, নায়েবমশাই। কলকাতায় দেনা শোধ করবার জন্যে সব বেচে ফেলতে হয়েছে।"

নিঃশব্দে মাথা নিচু ক'রে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। চৌকাঠের দিকে এক পা এগিয়ে এসে বললেন, "আপনাদের এতো অভাব ছিল, বড়কর্তা কিন্তু জানতেন না তা। যদি অনুমতি দেন, তাহ'লে আমি একবার ছোটমার ঘরে গিয়ে ঢুকতে চাই। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কর্তাবাবুর সিন্দুকে অন্তত লাখ-পাঁচেক টাকা আছে।"

"টাকার অভাবটাই আমার একমাত্র অভাব নয়, নায়েবমশাই। তা ছাড়া ছোটমা আপনাকে ঢুকতে দেবেন না।"

"দরকার বোধ করলে জোর ক'রে ঢুকব।" কণ্ঠস্বরে তাঁর দৃঢ় কম্পন।

"আপনি বুড়োমানুষ—দরকার নেই।" আমিও

● SHOCK PROOF ● WATER PROOF
● ANTIMAGNETIC ● DAMP-DUST PROOF
● UNBREAKABLE MAIN SPRING

এগিয়ে এলাম চৌকাঠের দিকে। এসে বললাম, "ছোটমাও জীবনে কোনো-কিছুই পাননি। তাঁরও অভাবের পরিমাণ কম নয়। ভেঙেচুরে খান-খান হয়ে গেছেন। পাঁচ দশ লাখ টাকার সিন্দুকটা বুকে নিয়ে যদি তিনি পদ্মার গর্ভে ডুবে যেতে চান তবে তাই-ই তাঁকে করতে দিন, নায়েবমশাই—একবিন্দু শান্তির জন্য দশ লাখ টাকার লোকসানটা তো কিছুই না। ছোটমা যা চান তাই তাঁকে করতে দিন। আমাদের জমিদারি তো বিরাট। টাকার লোকসান আমাদের পুষিয়ে যাবে একদিন।"

বিকেলবেলাতেই কালবৈশাখীর প্রচণ্ড দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। মুহূর্তে-মুহূর্তে জলের লেভেল উঁচু হয়ে উঠছে। এমন ভয়াবহ দৃশ্য জীবনে বোধহয় একবারই দেখা যায়। আমার জিনিসপত্র সব সরিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমি একবার বকুলবালার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলাম। দেখলুম, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। প্রমদা আর নগেনের মা বারকয়েক ডাকাডাকি করল। সাড়া দিলনা সে। নায়েবমশাই বললেন, "আর একমুহূর্তও বিলম্ব করা চলবে না। সামনের দিকের পুরো অংশটাই ধসে পড়েছে। আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে খিড়কির পথে।"

চৌধুরীবাড়ির পূব-সীমানা পেরিয়ে একটা উঁচু জায়গায় এসে উঠলাম আমরা। বাইরে বেরিয়ে ধ্বংসের চেহারাটা পুরোপুরি দেখতে পেলাম আমি। নায়েবমশাই আঙুল তুলে বললেন, "ঐ-যে বড় বড় দুটো থাম দেখা যাচ্ছে তারই ঠিক পশ্চিমদিকে বড়কর্তার মহলটা। দেখছেন, এতোবড় বিরাট একটা বাড়ির শুধু ঐ অংশটুকুই এখন নড়বড়ে দাঁতের মতো ঠক্ ঠক্ ক'রে নড়ছে?"

সন্ধে হয়ে এসেছে। এবার আমরা রওনা হবো। দুটো পাল্কি তৈরি করাই ছিল। গোটা দশ লণ্ঠনও জ্বালানো হয়েছে। নায়েবমশাই বললেন, "আপনারা এবার রওনা হয়ে যান। আমি রইলুম। দেখি, দারওয়ান দুটোকে সঙ্গে নিয়ে আর একবার চেষ্টা করি—যদি ছোটমাকে বার ক'রে আনতে পারি।"

এইসময়ে প্রিয়তোষ এসে উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার, নায়েবমশাই?" সামনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে যেন হাহাকার ক'রে উঠল, "সবই যে গেল! রাক্ষুসী পদ্মার একি কাণ্ড! চৌধুরীদের আর রইল কী?" কেঁদে ফেলল প্রিয়তোষ। বসীপুরের মাটির প্রতি এই ওর প্রথম আকর্ষণ—এই ওর প্রথম কান্না। তন্ময় হয়ে বাড়িটাকে দেখতে লাগল ও। ইঁট-সুরকি ভেঙে পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। দেখতে দেখতে দোতলার থাম-দুটোও ভেঙে পড়ল জলে। প্রিয়তোষ কাতরস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ থাম-দুটোর পেছনের ঘরটাতেই বাবা থাকতেন! বাবা—" পদ্মার পাড়ের ভেজা মাটিতে ব'সে পড়ল সে। চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আশপাশটাও দেখছে। হঠাৎ পাল্কির দিকে নজর পড়তেই প্রিয়তোষ যেন আঁৎকে উঠল, "কুমু, বকুল কোথায়?"

"বকুল নয়, ছোটমা।" বললুম আমি।

"কোথায় তোমার ছোটমা?"

"তিনি এলেন না। বললেন, স্বামীর ভিটে ত্যা করবেন না।"

"ছি ছি—তুমি তাকে ঈর্ষা করো, কুমুদিনী!" প্রিয়তোষ সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

পথ রুখে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথা চললে?"

"তোমার ছোটমাকে নিয়ে আসতে।"

"সামনে জল দেখতে পাচ্ছ না?"

"আমি সাঁতার জানি। নায়েবমশাই, টাকাপয়সা স বার ক'রে এনেছেন?"

"ছোটবাবু, আমি ঠিক জানি না—সিন্দুকে টাকাপয় আছে কিনা।"

প্রমদা এগিয়ে এল সামনে। বলল, "দুটো সিন্দুকে অনেক টাকা। দিদি, আপনাকে তো বলেছিলাম, বাচ দেখেছি আমি।"

আমার দিকে একবার দৃষ্টি দিল প্রিয়তোষ, তার ঝাঁপ দিল জলে। আমি দেখলুম, সাঁতার কেটে সে ওপা উঠে গেল। দূরত্ব খুব বেশি নয়, তবুও আমার মনে হ'ল যেন গোলক চৌধুরী পদ্মা সাঁতরাতে লাগলেন। সমস্ত রা ধরে সাঁতরাতে লাগলেন, শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, বুকের পাঁজ ভেঙে যাচ্ছে, তবুও তিনি তীরে গিয়ে উঠতে পারলেন না ভোরবেলা জেলেরা খুঁজে পেয়েছিল তাঁকে। ··· আর কিছুই পেলুম না। সমস্ত রাত অপেক্ষা ক'রে রইলু প্রিয়তোষ কিংবা বকুলবালা পাড়ে এসে পৌঁছলো না।

ভোরের আলোয় দেখলুম, চৌধুরীবাড়ির চিহ্ন পর নেই।

জীবন-পদ্মার বুক পাটির মতো সমতল।

সে এক দুনিয়া

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার জনগণকে ভাগ্যবান হওয়ার একটা সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে: "প্রত্যেক ভদ্রলোক, নাবিক, দুঃসাহসী এবং যথার্থ তেজস্বী যুবক—যাঁরা দেশের শত্রুপক্ষের জাহাজ লুঠ করে সম্মানজনক সম্পত্তি লাভ করতে চান—তাঁদের জন্যে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। 'মৃত্যু অথবা গৌরব রণতরী' নামে একটা সেরা পালের জাহাজ জেম ক্রেগীর পরিচালনায় ছ'টি বাইশ পাউণ্ড গোলার কামান, বারোটি কোহর্ন এবং পঞ্চাশটি সুইভ্‌ল্‌ কামান এবং একশ' কুড়ি জন নাবিক নিয়ে পাঁচ মাস ধরে ওলন্দাজ, ফরাসী এবং স্পেনীয়দের জাহাজ লুঠপাট করার উদ্দেশ্যে কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ত্যাগ করবে। নাবিকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হবে ও তাদের কাজে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হবে।"

কোনও সংবাদপত্রে যে এ-ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হতে পারে, এ কথা আজ কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু কল্পনা নয়, এক দিন সত্যিই ঐ বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল কলকাতার বাসিন্দাদের ভাগ্যবান হওয়ার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ছাপা হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম-ছাপা সংবাদপত্রে। সে-সংবাদপত্রের নাম 'বেঙ্গল গেজেট অব দি ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাড্‌ভার্টাইজার্‌স্‌'। সম্পাদক—জেম্‌স্‌ অগাস্টাস হিকি। প্রকাশকাল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

কোম্পানির আমলের কলকাতায় খবরের কাগজের জন্মও এই বিজ্ঞাপনেরই প্রয়োজনে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, সে প্রয়োজনও প্রথম এক বিজ্ঞাপন মারফতই ব্যক্ত করা হয়—তবে ছাপা নয়, হাতে-লেখা বিজ্ঞাপন।

১৭৬৮ সালে বোল্ট্‌স্‌ নামে এক ব্যবসাদার কাউন্সিল-হাউসের দেওয়ালে হাতে-লেখা এই বিজ্ঞাপনটি ঝুলিয়ে দেন:

Mr. Bolts takes this method of informing the public that the want of printing press in the city being of great disadvantage in business, and making it extremely difficult to communicate such intelligence to the community as is of the utmost importance to every British subject he is ready to give the best encouragement to any person or persons who are versed in the business of printing or manage a press, the types and utensils of which he can produce.

প্রথম-জীবনে কোম্পানির অধীনে চাকরি করলেও, পরে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে আরও পাঁচজনের মতো বোল্ট্‌স্‌-ও প্রচুর টাকার মালিক হয়েছিলেন। বোল্ট্‌স্‌ যে কত পাকা, উঁচুদরের ব্যবসাদার তার প্রমাণ এই বিজ্ঞাপন। আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই, ছাপাখানার কাজ জানে এবং টাইপ এবং যন্ত্রপাতিও তৈরি করতে পারে এমন লোককে সাধ্যমতো সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন ছাপাখানা খোলবার জন্যে। শুধু তাই নয়, বোল্ট্‌স্‌ ছিলেন সত্যিই দূরদর্শী। সে-যুগে এ-কাজ যে সহজে হবে না তা জেনেই ইতিমধ্যে সকলের জ্ঞাতব্য বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্যে তিনি এক অভিনব পরিকল্পনার কথাও ঐ বিজ্ঞাপনেই জানিয়ে দেন:

In the meantime he begs leave to inform the public that having in manuscript many things to communicate which most intimately concern every individual, any person who may be induced by curiosity or other more laudable motives, will be permitted at Mr. Bolt's house to read or take copies of the same. A person will give due attention at the hours from ten to twelve in the morning.

অর্থাৎ সরকারী বিজ্ঞাপন তিনি হাতে লিখে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। বিজ্ঞাপন দেখা বা নকল নেওয়ার জন্যে ঐ কাগজ তাঁর বাড়িতে পাওয়া যাবে। আগন্তুকদের পরিচর্যার জন্যে রোজ সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত একজন লোকও সেখানে মোতায়েন থাকবে।

এইভাবে হাতে-লেখা কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্ম হলেও, বোল্ট্স্-এর নাম কিন্তু আজ রাশি রাশি ছাপা বিজ্ঞাপনের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ছাপা বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা তিনি করে উঠতে পারেননি। তবে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। হিকি-র দু'পৃষ্ঠার কাগজের বেশির ভাগেই থাকতো বিজ্ঞাপন। সে-কাগজ অবশ্য বেশিদিন টিঁকে থাকেনি, কিন্তু তার কারণ বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য নয়, অশ্লীল আর কুরুচিপূর্ণ সম্পাদকীয় তার জন্যে দায়ী। হিকি-র কাগজ বন্ধ হয়ে গেলেও—বিজ্ঞাপনের চাহিদা, গুরুত্ব কিন্তু কমেনি। ১৮১৮ সালের ১লা অক্টোবর জেম্স্ সিল্ক বাকিংহামের সম্পাদনায় 'ক্যালকাটা জার্নাল' ছাপার সময়েও সেই কাগজের নাম দেওয়া হয় 'দি ক্যালকাটা জার্নাল অব্ ওরিয়েন্টাল অ্যাড্ভার্টাইজার্স্'। কলকাতার দেখাদেখি মাদ্রাজে, কানপুরেও পরে 'মাদ্রাজ অ্যাড্ভাইটাইজার্স্' এবং 'কানপুর অ্যাডভার্টাইজার্স্' নামে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

অবশ্য সব কাগজের নামের সঙ্গেই যে 'অ্যাড্ভার্টাইজার্স্' শব্দটি যুক্ত থাকতো তা নয়, তবু সে-যুগের অধিকাংশ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রই ছিল মূলত 'অ্যাড্ভার্টাইজার্স্'। কাগজের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলেও একথাই প্রমাণিত হয়। বিষয়বস্তুর প্রথম ভাগ হ'ল: সরকারী ঘোষণা ও সংবাদ। যেমন—কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন ও পেন্সনের শর্ত, অফিসের নিয়মাবলী, স্থানীয় করের হার, কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ, ডাক-সংক্রান্ত ইস্তাহার ইত্যাদি। এসব ঘোষণা, সংবাদকেও স্বচ্ছন্দে সরকারী বিজ্ঞপ্তি বলা চলে।

দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ সম্পাদকীয় স্তম্ভে থাকতো—হয় কোনও সংস্কৃত শ্লোক বা ফারসী কবিতার অনুবাদ বা মোগল দরবারের বিবরণ কিংবা ইংলণ্ডের নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট, চিঠিপত্র, টুকিটাকি খবর বা সেকালের ফ্যাশান, নৈতিক আদর্শ, কল্পনা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর লেখা নিবন্ধ। এ ছাড়া সম্পাদকীয় স্তম্ভের এক অংশ জুড়ে থাকতো 'পোয়েট্স্ কর্নার' অর্থাৎ কবিতার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান। এই 'পোয়েট্স্ কর্নার'-এ প্রেমের কবিতা ছাপার রেওয়াজ ছিল। একেও ব্যক্তি-বিশেষের বিজ্ঞাপন ব'লে ধরা চলে।

কাগজের তৃতীয় এবং মুখ্য ভাগ হ'ল: বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন প্রকাশের কোনও বাঁধা নিয়ম ছিল না। বিজ্ঞাপনদাতার টাকা আর মর্জির ওপরেই এটা নির্ভর করতো। তাই দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন মারফত দ্বৈত-যুদ্ধে আহতের কাছে বিজয়ীর ক্ষমা-প্রার্থনা থেকে শুরু ক'রে, বল নাচ, সঙের নাচ, কলকাতা-বারাসতের ঘোড়দৌড়, 'ইউরোপ গুড্স্' নিয়ে কলকাতা-বন্দরে জাহাজ পৌঁছানোর খবর, নিলাম, নতুন শুঁড়িখানার উদ্বোধন, লাইব্রেরি, বেশসজ্জা, পাখী সন্ধান, দ্বৈরথের ঘোষণা, কাপড় ধোলাই, বাজী পোড়ানো ইত্যাদি সবই থাকতো। প্রকৃতপক্ষে, সেকালের কাগজে যদি কিছু আকর্ষণ থাকে তো, সে হ'ল বিজ্ঞাপন। শু সেকালেই নয়, এ আকর্ষণ একালের পাঠকও অনুভ করবেন, যদি ফিরে যান সেই বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায়।

১৭৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর। মেসার্স জে. ডেভিডসন এক বিজ্ঞাপনে জানান, তাঁরা ডিহি এন্টালিতে জায়গা নি বাড়ি করেছেন এবং খুব বেশি করে কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করার উদ্দেশ্যে প্রচুর সাজসরঞ্জাম এনেছেন, লোকজ লাগিয়েছেন। (ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কাপড় ধোলা করা হয়) ধোলাইয়ের রেট:

	প্রতি মাসে সিক্কা টাকা
পুরুষ ও মহিলাদের [illegible]	৩
৭ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের	[illegible]
৬ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের	২
চাকর	১

১৭৮৮ সালের ৩০-এ অক্টোবর। পুরুষ ও মহিলাদে বেশসজ্জা করার জন্যে প্যারিস থেকে এসেছেন হেয়া ড্রেসার মিঃ লাক্রোয়। তিনি একেবারে হাল-ফ্যাশানে বেশসজ্জা করেন। মহিলাদের জন্যে ৪ টাকা এ পুরুষদের ২ টাকা। চুল-কাটার জন্যে ১ টাকা।

১৭৯১ সালের ২৮-এ এপ্রিল। বহু অকেজো ঘো প্রতিদিন কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখে জনৈ ভদ্রলোক ইঙ্গিত হিসাবে প্রস্তাব করছেন যে, আমাদে দেশে ঘোড়া-প্রজননের কাজে এদের বেশ ভালোভা লাগানো যেতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতা এ বিষয়ে নিঃসন্দে যে, ঘোড়াগুলির দেশপ্রেমী মালিকরা এই পরিকল্প বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। ঘোড়াগুলি বয়স

সহকারে গ্রহণ ক'রে প্রস্তাবিত কাজে ধর্মতঃ ব্যবহার করা হবে।

১৭৯৩ সালে প্রকাশিত নিচের এই বিজ্ঞাপনটি পড়লে হাসি পায় বটে, কিন্তু সে-যুগে কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে টাকার যে কতটুকু মূল্য ছিল তা বুঝতে দেরি হয় না :

"অনেক ভদ্রলোক পায়ের নিচে কড়া হওয়ায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন। যিনি এই কড়া তুলে দিতে পারবেন, ভদ্রলোক যন্ত্রণামুক্ত হওয়ার পর তাঁকে ১,০০০ সিক্কা টাকা দেবেন।
—জিন জ্যাগ সেন"

গেঁটে বাতের রোগীর বাতের ব্যথা উপশমের জন্যে বিশেষভাবে তৈরী আরাম-কেদারার এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ১৭৯৫ সালে। আসবাবপত্র-নির্মাতা মিঃ ডবলিউ মারার্শ এক বিজ্ঞাপনে জানান যে, অন্যান্য আসবাবপত্রের সঙ্গে দুটি মেহগিনি-কাঠের মারলিন 'গাউট চেয়ার' পাওয়া যাবে। চেয়ার-দুটি চামড়া, লোম দিয়ে মুড়ে একেবারে ঠিক করে রাখা হয়েছে।

"বৈঠকখানা রোডের ওপরে মিঃ ডেবিকিওর বাড়ির ঠিক সামনে একখানি একতলা বাড়ি ভাড়া দেওয়া বা গোপনে বিক্রি করা যেতে পারে। বাড়িটিতে দু'খানি ঘর, একটা বড় হল্, রান্নাঘর, বৈঠকখানা এবং অফিস-ঘর আছে। বাড়িতে যে দোকান-ঘরগুলি আছে সেগুলিও এইসঙ্গে বিক্রি করা হবে। ভালো ও স্থায়ী ভাড়াটে পেলে এই ঘরগুলি ভাড়া দেওয়া হয়। শুধু এই ঘরগুলি থেকেই ভালো আয় হবে। কোনও মহিলাকে উপঢৌকন দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং স্থায়িভাবে বাস করার পক্ষে বাড়িটি বাঞ্ছনীয় মনে হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে ঐ বাড়িতে কিংবা বহুবাজারে মিঃ জন অ্যাখানালের কাছে খোঁজ করুন।"

এতরকমের জিনিস থাকতে কোনও মহিলাকে কেন যে একখানি বাড়ি উপঢৌকন দেওয়ার কথা উঠতে পারে, এ বিজ্ঞাপন থেকে তা বোঝা শক্ত।

কেরী-সাহেবও তাঁর *The Good Old Days of John Company* বই-এ এই উপঢৌকনের প্রস্তাবকে 'অদ্ভুত উপঢৌকন' ব'লে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এইসঙ্গে ১৮০৩ সালে প্রকাশিত কেরিয়া উইলিয়াম্‌স্ অ্যাণ্ড হোল্যান্ড সাহেবের নিলাম-ঘরের বাড়ি-বিক্রির এই বিজ্ঞাপনটি মিলিয়ে পড়লে এরকম বিচিত্র উপঢৌকনের পেছনে একটা ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে :

"তালতলা বাজারে একটি বাগানবাড়ি এবং বাড়ির লাগোয়া জমি বিক্রি আছে। ভারত থেকে চলে যাচ্ছেন এমন কোনও ভদ্রলোক যদি তাঁর এদেশী মহিলা-বন্ধুর ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করতে চান, তাঁর পক্ষে এই বাড়ি কেনা খুবই বাঞ্ছনীয় মনে হবে।"

১৮০৯ সাল। পাণিপ্রার্থীর বিজ্ঞাপন : "ভদ্রবংশের সুন্দর যুবক সহৃদয়া অংশীদার এবং উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী-লাভে অভিলাষী হয়ে কোনও সুন্দরী যুবতীর পাণি-প্রার্থনায় এই সুযোগ গ্রহণ করছেন। পাত্রীর নিজের গুণাবলী থাকা একান্ত দরকার, অবশ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হলেও আপত্তি নেই, কারণ পাত্র দেশের দূর প্রত্যন্ত-অঞ্চলে দীর্ঘদিন একা ভ্রমণ করতে মনস্থ করেছেন।"

১৮১০ সাল। পেটেন্ট হেড-ড্রেস : উইলিয়াম সিম (রস এম্পোরিয়াম অফ ফ্যাশান থেকে) মহিলাদের কেশ-সজ্জাকারী এবং সকলপ্রকার শোভাবর্ধক কেশসজ্জা-প্রস্তুতকারক। লণ্ডনের দুটি সেরা ফ্যাশান-ঘর রস এবং বিউফর্ট

: উপন্যাস :
: ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় :
প্রাণ ও পাষাণ
দাম ৫৲
নর-বিগ্রহ ৩৷০
জ্যোতির্গময় ৫৲
জীবন রুদ্র ৩॥০
কালরুদ্র ৪৲
মহারুদ্র ৪৲
স্বাক্ষর ৩॥০
সন্ধ্যারাগ ৪॥০
মেঘ মেদুর ৩॥০
চিতাবহ্নিমান ৪৲

: উপন্যাস :
: পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য :
ওরা কাজ করে
দাম ৫৲
মরা নদী ৫৲
সাহিত্যিক ২৷০
: রমেন রায় :
মর্ত্যের-মৃত্তিকা ৩৷০
আরক্তিম ৪৲
জাগ্রত জীবন ৭৲
মুখর-মুকুর ৪৲
: সরলা বসু রায় :
পথ ও পাথেয় ২৲

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
৫৭-সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

থেকে বাছাই-করা সবরকমের সুন্দর পরচুলা। মহিলাদের জন্য হেড-ড্রেসের সঙ্গে ব্যাণ্ডো বা রিবন জুড়ে দেওয়ার দরুন ঠিক দীর্ঘ বেণীর মতো দেখতে হওয়ায়, পল্লী অঞ্চলের মেয়েদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক এবং স্বচ্ছন্দে নিখুঁত ফুল-ড্রেস করা চলবে। ফুল-ড্রেস, হাফ-ড্রেস, হেড-ড্রেস, ব্যাণ্ডো; বর্ডার, হেয়ার-ক্যাপ-রিংলেট, রিদ্‌ ইত্যাদি ভদ্রলোকদের পরচুলা, একেবারে আসল চুলের মতো—সুবিধা, চেহারার জলুস ও মানানোর জন্যে।"

সেকালে হেয়ার-ড্রেসাররা শুধু মেয়েদেরই ফিতে-ফুল দিয়ে বেণীসজ্জা করতো না বা চুলে পাউডার-পমেটম মাখাতো না, পুরুষদেরও কেশসজ্জা করতো। দু'বেলা ড্রেসারের কাছে চুল না বাগিয়ে কোনো সাহেবই সমাজে বেরোতেন না। ইংলণ্ড, প্যারিস থেকে নামকরা হেয়ার-ড্রেসার আসার দরুন দেশী ড্রেসারদের সারা মাস কাজ করে দু'টাকার বেশি মিলতো না। বিদেশীদের মধ্যে আবার স্পেশাল হেয়ার-ড্রেসার ছিল ফরাসীরা। ইউরোপের দুজন বিখ্যাত ড্রেসার মিঃ মালভেইন্ট ও মিঃ সিডেট ১৭৮৫ সালে কলকাতায় আসেন সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষদের কেশ-পরিচর্যার উদ্দেশ্যে। মালভেইন্ট মহিলাদের কেশচর্চার জন্যে নিতেন মাসে দুই মোহর, আর সিডেট নিতেন চার টাকা। শুধু পুরুষ নয়, মহিলা হেয়ার-ড্রেসারের কথাও বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়।

১৭৮৪ সালে এক দম্পতি এদেশে আসেন কাজের খোঁজে। তাঁদের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, স্ত্রী কেশচর্চায় নিপুণা এবং স্বামী কোচোয়ানীতে ওস্তাদ।

এই বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্যের মধ্যে আর-এক-ধরনের বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করা দরকার। তা হ'ল বইয়ের বিজ্ঞাপন। ১৭৮১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত কলকাতার নামকরা বিলিতী দোকানের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে—দোকানে চকোলেট, জ্যাম; বাদাম থেকে আরম্ভ করে Gibbon-এর ইতিহাস পর্যন্ত রাখা হ'ত। এই ধরনের আর একটি বিজ্ঞাপন: বেলার্স ওয়ড্ অ্যাণ্ড বন্ড-এর দোকানে সদ্য রক্ষিত উত্তমাবস্থায় মনাক্কা ও বাদাম, আর হান্‌স্‌ স্লোনির মিল্ক-চকোলেট, এক্সেলোর সুগন্ধি রোজবেরী জ্যাম আর নতুন নতুন বই-এর বিরাট সমাবেশ—তার মধ্যে কয়েকটি হ'ল: গিবনের 'রোম্যান এম্পায়ার', জনসন এবং স্টিভেনসনের 'শেক্‌স্‌পীয়ার', বন্ড-এর 'বৃটিশ এম্পায়ার' ব্ল্যাকস্টোনের কমেন্টারিজ, নিউটনের 'মিল্টন', চেস্টারফিল্ডের পত্রাবলী, গোল্ডস্মিথের প্রবন্ধাবলী, জীবনীমূলক অভিধান—ইত্যাদি।

বই-এর এত বিজ্ঞাপন দেখে প্রশ্ন জাগে, কারা এসব বই কিনতেন? যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের অবসর-বিনোদনের জন্যে ছিল সুসজ্জিত শুঁড়িখানা, বিলিয়ার্ড রুম, লটারি, নাচখেলা, বারাসতের রেস, সান্ধ্যভোজ আর মনিহারী দোকানের মনোরম আড্ডা—তাদের মধ্যেও কি এমন কিছু লোক ছিলেন—যাদের জন্যে ইউরোপ থেকে নতুন নতুন বই আসতো জাহাজে করে?

সে-যুগের এইসব বিচিত্র বিজ্ঞাপন পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলে চলচ্চিত্রের রীলের মতো এক এক করে সেকালের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ-জীবনের কত আপাত-গোপন ছবিই চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! অজানা দেশ, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও ইংরেজ ব্যবসাদাররা কেমন ক'রে নিরলস পরিশ্রম, সততা আর ধৈর্যগুণে এদেশে নতুন নতুন ব্যবসা খুলে-প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন তার কত চমকপ্রদ কাহিনীই না লুকানো আছে এইধরনের অবজ্ঞাত বিজ্ঞাপনের অন্তরালে। এইসব ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের মধ্যে গোটা সমাজেরই বিচিত্র ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। সেকালের সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় বিস্ময় জমা হয়ে আছে বিজ্ঞাপনে।

ঐতিহাসিক সিটন-কার সে-যুগের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে যথার্থ ই লিখেছেন: *the most interesting of the whole. It throws light on the minutest detail of the inner and domestic life of the English community of Calcutta and the Bengal Presidency.*

প্রেমিক কাছে

যোহান ফন্ গ্যেটে

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আমি তো তোমাকে ভাবি যখন সহসা সূর্য ঐশ্বর্যে ভাস্বর
সমুদ্রের থেকে দীপ্তি পায়,
তোমার কথাই ভাবি যখন চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্নার প্রস্রব
বিম্বিত বিশ্রাম করে ঝর্ণার কায়ায়।

তোমাকে পথেও দেখি যেখানে উড়ছে ধূলিকণার সংহতি
দূর প্রান্তে আমার দৃষ্টির,
গাঢ় তমিস্রার রাতে যখন শ্রমক্লান্ত পা-দু'খানি প্রতি
অপ্রসর পদচিহ্নে কম্পনে অস্থির।

তোমারই তো গান শুনি গভীর গর্জনে তরঙ্গের
উৎক্ষেপেই-চূর্ণ-হওয়া যাদের উৎসব,
শান্ত উপত্যকা খুঁজি যেখানে দাঁড়িয়ে পরিতৃপ্তি শ্রবণের
হ'লে পৃথ্বী একান্ত নীরব।

আমি তো তোমারই সঙ্গে, তোমার প্রতিমা রাখেনি তো ব্যবধান
আমার সন্নিধি থেকে আর।
অস্ত গেছে সূর্য, আছি তারাদের আলোর উত্থান
প্রতীক্ষায়, তারাদের এবং তোমার।

ক্ষমা কোরো, প্রভু!

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

আশ্চর্য!
যখনই তোমাকে স্মরণ করি
তখনই ভেসে ওঠে
তোমার অনবদ্য ক্রুশ-বিদ্ধ রূপ
আমার চক্ষের সম্মুখে।
প্রসারিত হস্তে
তুমি আহ্বান কোরছো বিশ্বকে
তোমার বিস্তৃত বক্ষে।
রক্তাক্ত পদপ্রান্তে
জাগতিক মূঢ়তা,
প্রশান্ত মুখপদ্মে
অখণ্ড তিতিক্ষা,
স্থিরদৃষ্টিতে
ক্ষমার ঐশ্বর্য,
আলুলায়িত কুন্তলে
নির্বিকল্প অনাসক্তি,
কণ্টক-মুকুটে
পার্থিব তুচ্ছতা;
আর সমস্ত শরীরে
হিরণ্যদীপ্তি,
যেন সদ্যই স্নান সেরে উঠেছ
স্বর্গের সমুদ্র থেকে।

অন্য রূপে কল্পনা করিতে পারিনা তোমায়;
ক্ষমা কোরো, প্রভু!

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়

রাশিয়ার স্মৃতি

শান্তিলতা দাশগুপ্ত

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ডাক্তার ও ডাক্তার-জায়া মিলে এগারজনের একটি দল নিয়ে দুর্দান্ত বেগবান্ সোভিয়েট জেট্ দিল্লী থেকে মস্কো অভিমুখে উড়ে চলেছে। মাত্র সাড়ে-সাতঘণ্টায় তিন-হাজার মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করবে।

ছত্রিশহাজার ফিট উঁচু থেকে হিমালয়-পর্বতশ্রেণীর শোভা দেখছি। তুষারাচ্ছন্ন গিরি, নদী, ভূমের নানা বর্ণ মিলে এক অভিনব সৌন্দর্য চোখের সম্মুখ দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে একসময় আমরা সোভিয়েট রাজ্যের অন্যতম রিপাব্লিক তাশকেন্টে পৌঁছলুম। এখান থেকে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে মস্কো রওনা হব।

ভোজনে বসে আবিষ্কার করলুম, ভাষার বাধা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পরিবেশনকারিণীরা আমাদের ত্রিসীমানা ঘেঁষছেন না। দোভাষিণী আনার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু একটির পর একটি ভোজ্য পরিবেশনে কী দীর্ঘসময়ই না নিচ্ছে! ভোজন যেন উদরপূর্তি নয়,—বিলাস।

পূর্ব-নির্দিষ্ট 'এয়ার-ইণ্ডিয়া-ইণ্টারন্যাশনাল—সুপার-কন্সটেলেশন'-এর পরিবর্তে জেটে সফর করায় আমরা প্রায় সাড়ে-চারঘণ্টা আগে মস্কো নেমেছি। তাই ইণ্ট্যুরিস্টের বাস্ অপেক্ষায় নেই। স্টেশনে যাত্রীর আনাগোনা ক্রমশঃ বাড়ছে। মেয়েরা কেউ কেউ ঠোঁট রাঙিয়েছে বটে, তবে সেটা যেন নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। একদল কিশোর-কিশোরীও জমায়েত হয়েছে,—কোথায় যাবে ওরা? আনন্দ-ভ্রমণে?

—ওঠো, ওঠো—বাস্ এসেছে—

বিরাট বিরাট রাস্তা, মস্ত মস্ত বাড়ি ডিঙিয়ে বাস্খানা এসে থামল 'পিকিং' হোটেলে। দেখি। হোটেলের নাম 'পিকিং' কেন? উত্তর পেলাম, চীনেদের এখানে আনাগোনা বেশী এবং এ-হোটেলে চীনদেশীয় খাবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাই।

হোটেলের বন্দোবস্ত চমৎকার। বেড-রুম, ড্রইংরুম—তাতে পুরো জমকালো আসবাব, টেলিফোন, রেডিও, কোনো কোনো ঘরে টেলিভিশন-সেট। সংলগ্ন স্নানাগারে ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা।

খাবার ইউরোপীয় ধরনের। তবে চালের ব্যবহার ওদেশে আছে। 'পরিজ' নামীয় যে-বস্তুটি প্রাতঃরাশে মাঝে মাঝে পেয়েছি সেটি সোজাসুজি 'ফেন-ভাত'। এ ছাড়া ঘি-ভাত ও পোলাও-ও খেয়েছি। পোলাও-কে ওরা বলে 'প্লভ্', লঙ্কাকে 'পপ্‌পর'। এরকমের ভাষার সাদৃশ্য পেলে আমাদের দোভাষিণী ও গাইড দীনার চোখে-মুখে খুশী উপচে পড়ত।

মস্কোর বর্তমান প্রধান সড়ক গর্কি স্ট্রীট। ৩০ মিটার

চওড়া। কিন্তু একসময় এটি ছিল মাত্র ১১ মিটার। শুনলুম, সমুদয় ফিটিং-সহ বিরাট বিরাট বাড়ি কতক সরিয়ে রাস্তাটি চওড়া করা হয়েছে। এই বিষয়টিকে আধার করে একটি কাহিনী শোনালো লীনা: একটি কিশোর স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু বাড়ি কোথায়? ঠিক এই-খানটিতেই তো ছিল তার বাড়িটি। হঠাৎ দূরে দৃষ্টি মেলে ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল—"আরে, ঐ তো আমাদের বাড়িটা! কিন্তু অমন হেঁটে-হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে কেন?"

ক্রেম্‌লিন প্রাসাদের পার্শ্ববর্তী রেড-স্কোয়ারের ঐতিহ্য একদিনের নয়। অতীতে এটি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, সারা রাশিয়ার মস্কো-অভিমুখী পথের মিলনক্ষেত্র। সেদিনের আনন্দের সঙ্গে বহু দুঃখের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে এর বুকে। এখানেই ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বসমক্ষে বিদ্রোহী নেতা স্তেপ্যান রেজিনের শিরোচ্ছেদ ঘটে। তারপর ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পিটার-দি-গ্রেট প্রগতিশীল কর্মপন্থার বিরোধী জার-সৈন্যগণকে হত্যা করেন, সেও এখানেই। আবার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের শেষ যুদ্ধও সংঘটিত হয় এই রেড-স্কোয়ারে। এই যুদ্ধে নিহত সোভিয়েট বীরদের সমাধিস্থ করা হয়েছে ক্রেম্‌লিন-প্রাচীরের পাদদেশে। নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা সমাধিগুলিকে ঘিরে আছে—ঘন সবুজ গাছের সারি। প্রস্তরফলকে মৃতের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে তাতে জানা গেল ঐ সৈন্যদলে কিছু বিদেশীও ছিলেন।

আজ যেখানে ক্রেম্‌লিন প্রাসাদটি সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় আট শ' বছর আগে সেখানে ছিল ঘন বন। অধিবাসীরা ছিল কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী এবং শিকারী। দুর্গ-নির্মাণের জন্য এ-স্থানটি নির্বাচনের কৃতিত্ব প্রধানতঃ প্রিন্স ইউরি ডল্‌গোরুকির (Yury Dolgoruky)।

সেকালে জার-সম্রাট ও ধর্মযাজকগণ কী প্রাচুর্যের মধ্যেই না জীবন কাটাতেন। ক্রেম্‌লিনের 'আর্‌মারি'তে দেখলাম—তাঁদের ব্যবহৃত সিংহাসন, মুকুট, দণ্ড, পোশাক-পরিচ্ছদে অকৃপণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে স্বর্ণ-মণি-মাণিক্য-জহরৎ। একটি ঘোটকের হীরকখচিত স্বর্ণাভরণ দেখিয়ে লীনা বলেছিল—"ঐশ্বর্যের এমন অপব্যয়, কিন্তু তখন দেশের অগণিত প্রজার দু'বেলার আহার ছিল না।"

ক্রেম্‌লিন-স্থিত 'গ্রেট ক্রেম্‌লিন প্রাসাদ'টি আমাদের পার্লামেন্ট-এর মতো। ওখানেই এখন সোভিয়েট সরকার এবং কম্যুনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসে।

আচ্ছা, আমাদের মতো আগন্তুকদের দেখে উস্‌পেন্‌স্কি (Uspensky) ক্যাথিড্রালটি কী ভাবে? একবার মনে কি পড়ে না—সেদিনের রাজপরিবারের বিবাহ-রাজ্যাভিষেকাদি অনুষ্ঠানের বৈভবপূর্ণ জাঁকজমকের কথা? কিন্তু জগতে চিরস্থায়ী তো নয় কিছু। ঐ তো দু'শ' টন ওজনের বিখ্যাত জার-ঘণ্টাটি আর তারই পাশে জার-কামান। কিন্তু যাঁদের উৎসাহে এদের সৃষ্টি তাঁরা আজ কোথায়!

তাঁরা নেই, কিন্তু আছে নূতন রাশিয়ায় সুস্থ সবল নূতন মানুষ। পরিচ্ছন্ন পথে চলতে-চলতে মনের আনন্দে তারা 'মারোজনা' অর্থাৎ আইসক্রীম চুষতে চুষতে যায়। শীতের দিনেও স্বয়ংক্রিয় পাত্র থেকে সোডা-লিমনেড খাওয়া যেন একটা নেশার মতো।

স্বয়ংক্রিয়-যন্ত্র বলতে হোটেলের জুতো-পালিশের যন্ত্রটির কথা মনে পড়ল। সে এক ছেলেমানুষী কাণ্ড। দশ-পনেরো-কুড়ি এই পর্যায়ে প্রতিবারে ৪৫টি কোপেক (৫৫ নয়া-পয়সার একটু বেশী) ফেলতে হয়, এবং ধীরে-সুস্থে একজোড়া জুতো চমৎকার চক্‌চকে হতে পারে—ততটা সময় চালু থাকে। কিন্তু ভারত-সরকারের মঞ্জুরী অর্থ আমাদের জন্য এত সামান্য যে, রোজ জুতো-পালিশের বাবুগিরি চলে না, তাই একজন কোপেক ফেললে, অন্ততঃ তিনজন ভাগাভাগি করে কাজ সারতেন।

রুশীদের অর্থব্যয়ে কৃপণতা নেই। কারণ জীবন-পরিক্রমায় ওরা একরকম নিশ্চিন্ত। ওদেশে শিক্ষা অবৈতনিক। তা ছাড়া কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বহু বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে। আর চিকিৎসা? সে-দায়িত্বও সম্পূর্ণ সরকারের; এবং জনসাধারণের জন্য সে-ব্যবস্থাকে রাজসিক ব্যাপার বলা চলে। প্রতি পাড়ায় একটি করে পলিক্লিনিক রয়েছে। তাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আছেন। এক্স-রে এবং প্যাথলজি সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা তাঁরাই করেন। আবার প্রয়োজনবোধে রোগীকে হাসপাতালে এঁরাই ভর্তি করে দেন।

গর্ভবতীকে ওখানে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য,—কর্মী হ'লে, হাল্কা কাজ এবং প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের বন্দোবস্ত হয়। এর পর শিশু জন্ম হ'ল। এখন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তাকে পরীক্ষা করবেন পলিক্লিনিকের ডাক্তারেরা। ছাত্র, কর্মী, বৃদ্ধ—অর্থাৎ রাশিয়ার প্রতিটি জনসাধারণের নির্দিষ্ট দিনে, সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজিরা দেওয়া অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে। এককথায়, জনস্বাস্থ্যের প্রতিও দেশ অত্যন্ত যত্নবান্। তাই হয়ত পথে-ঘাটে যাদের দেখেছি, অমন স্বাস্থ্যশ্রীমণ্ডিত দেখেছি।

ক্রেমলিন-এর 'গ্রাণ্ড প্যালেস'

আর হবেই বা না কেন? সাধারণতঃ খাওয়া-পরা এবং ভবিষ্যতের ভাবনাই তো মানুষের মনকে কুরে কুরে, তাকে অকালে হতস্বাস্থ্য করে দেয়। সে দুর্ভাগ্য থেকে ওরা মুক্ত। বেকার-সমস্যা ওদেশে নেই। যে-কোনো মানুষ ইচ্ছানুসারে পূর্ণ বা আংশিক কাজ পেতে পারে। আর বৃদ্ধবয়সে? তখন পেন্‌সন আছে। সে-পেন্‌সন ৩০০ রুবলের (১ রুবল—প্রায় ১৵০) কম তো নয়ই, তার ঊর্ধ্বতম বেতনের সমানও হ'তে পারে। তবে সেটা নির্ভর করবে তার কর্মজীবনের দক্ষতার উপরে। বৃদ্ধবয়সে থাকবার জন্য 'হাউস অব রেস্ট' আছে, প্রয়োজনে অনায়াসে সেখানে জীবন কাটানো চলবে।

একদিন এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, খাদ্য-বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হ'লেই কি সব পাওয়া হ'ল? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লে জীবনকে এত দিক থেকে দেখার প্রয়োজন যে, এককথায় জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে দেশ-বিভাগের অভিজ্ঞতা থেকে সখেদেই বলব, এ প্রাথমিক প্রয়োজনের তাগিদ বহু উদার অন্তঃকরণকে অনুদার করেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'লে তবেই-না ভাববার অবকাশ আসে: কী আমি পেলাম না—কী আমার পাওয়া উচিত ছিল।

একদিন কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলুম। ওটি স্থায়ী প্রদর্শনী। অত্যন্ত শীতের ক'টি মাস বাদে সারা বছর খোলা থাকে। প্রদর্শনী একদিনে দেখা অসম্ভব। প্রায় ২২ মাইল পথ চলতে পারলে তবে সম্পূর্ণ দেখা হয়। শিল্প-প্রদর্শনীতে তিনটি স্পুটনিকেরই প্রমাণ-সাইজ মডেল দেখলাম। ২নং স্পুটনিকের 'লায়েকা'র চেহারাটি খোলাভাবে প্রদর্শিত রয়েছে। যেখানে সেখানে লায়েকার তস্বীর। একেই বলে অমরত্ব। জন্ম কুকুর-যোনিতে, এক অবিস্মরণীয় গবেষণায় তার জীবনদানও নিতান্তই দৈব ঘটনা, তবু সে-নাম ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য হয়েছে।

কৃষি-প্রদর্শনীতে রাশিয়ার পনেরোটি রিপাব্‌লিকের কৃষিজাত দ্রব্য, পশুপক্ষী, বাগান-বাগিচা, কৃত্রিম হ্রদ—সবটা পেরেছি, দেখেছি। কিন্তু কী ওতে নেই? কাফে, রেস্তোরাঁ, দোকানপাট, সিনেমা, মুক্ত-পরিবেশে থিয়েটার করবার স্টেজ, এমনকি দূরের যাত্রীর জন্য গেস্ট-হাউসেরও বন্দোবস্ত আছে।

সিনেমা ও থিয়েটার স্টেজ 'গর্কি পার্কে'ও রয়েছে। ওটি মস্কোর আধুনিকতম পার্ক। সে যেন এক চিরস্থায়ী আনন্দ-মেলা। ওখানে চিত্তবিনোদনের এতরকমের সরঞ্জাম রয়েছে যে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতে পারে। 'জায়েন্ট হুইল'-এ চড়ে আমরা খুবই কৌতুক বোধ করেছিলাম। ওটি অনেকটা আমাদের 'নাগরদোলা'র মতো। প্রতিটি বাক্সে চারটি আসন। —এমন চল্লিশটি বাক্সে একসঙ্গে ১৬০ জন ঘুরতে পারে। কিন্তু এত ভীড় যে, 'কিউ'তে অপেক্ষা করতে হ'লে হয়ত আমাদের চড়াই হ'ত না। কিন্তু লীনার অনুরোধে ওরা সাদরে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

আরো একবার, মুসোলিয়াম অর্থাৎ লেনিন ও স্ট্যালিনের সমাধি-মন্দির দেখতে যেয়েও, জনসাধারণের কাছে অনুরূপ সহযোগিতা পেয়েছিলাম। দু'-দু'-জনের প্রায় আধমাইল-ব্যাপী লাইন দু'ফাঁক হয়ে আমাদের আগে দেখবার সুযোগ করে দিয়েছিল, নইলে ওদিনই 'লেনিন মৌসোলিয়াম' দেখা কোনোরকমেই সম্ভব হ'ত না।

শুনেছিলাম, সোভিয়েট নেতাদের দেহ অবিকৃতভাবে রক্ষিত আছে। ভেবেছিলাম মিশরের 'মমি'র মতোই কিছু দেখব। কিন্তু কী দেখলাম! কে বলবে এ দুটি মৃতদেহ! মনে হচ্ছে, এক্ষুনিই যেন দুজন ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেহের লোমকূপও স্পষ্ট দেখছি। না কোনো বিকার, না বিকৃতি। অথচ লেনিন দেহরক্ষা করেছেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে, এবং স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেও পাঁচটি বছর কেটে গেছে।

ডাক্তারেরা প্রধানতঃ হাসপাতাল দেখতেই এসেছেন। আমরা আনাড়ী হ'লেও ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। ওখানে দেখেছি, মৃতের দেহ থেকে চামড়া নিয়ে 'স্কিন-ব্যাঙ্কে' জমা রাখছে। পরে গ্রাফ্‌টিং-এর কাজে লাগাবে। মৃতের দেহের রক্তও ওদেশে পরীক্ষান্তে 'ব্লাড-ব্যাঙ্কে' জমা হয়। তবে সাধারণতঃ এসব দেহ দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির। মৃতের রক্ত জীবিতের দেহে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, এ গবেষণা সম্ভবপর হচ্ছিল না। শেষে একদিন সুযোগ ঘটল। এক ইঞ্জিনীয়ার-সাহেব দেহ থেকে রক্তক্ষরণ ক'রে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এত রক্ত নিঃসৃত হয়েছিল যে, বাইরে থেকে রক্ত না দিলে তাঁকে বাঁচানো মুশকিল। ঠিক সেইসময়ে দৈবক্রমে দুর্ঘটনায় মৃত একটি দেহও পাওয়া যায়, এবং দু'দেহের রক্তেও সাদৃশ্য মেলে। যেহেতু ইঞ্জিনীয়ার-সাহেব জীবনকে নষ্ট করতেই উদ্যোগী হয়েছিলেন—তাই তাঁর দেহেই গবেষণা চালানো হয়, এবং সুফলও পাওয়া যায়। তারপর থেকে বিনা দ্বিধায় মৃতের রক্ত ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ ছাড়া আমরা রাশিয়ার বৃহৎ হাসপাতালের অন্যতম বট্‌কিন (Botkin) হাসপাতাল দেখেছি। দেখেছি অপারেশন-থিয়েটার, মেটারনিটি-হোমের ব্যবস্থা আর বিকৃত-মস্তিষ্কদের জন্য 'ক্যানাস্কো হাসপাতাল'। রোগীদের হাতের কাজ, আঁকা ছবি দেখলে কে বিশ্বাস করবে—ওদের মনের ঠিকানা নেই। আবার একটি রোগী অভিযোগ জানাবার বোর্ডে লিখেছে, মীনা তর্জমা করে শোনান—"এখানকার ফুলের বাগান সযত্ন-রক্ষিত নয়"।

মস্কোভা নদীর পা ঘেঁষে ৮০ মিটার উঁচু লেনিন পাহাড়। তারই উপরে ২৪০ মিটার উঁচু সম্পূর্ণ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়টি। কেন্দ্রীয় সৌধটি ৩২-তলা। তাকে ঘিরে আছে আরো ৩৬টি সৌধ—দুই থেকে আঠারো-তলা উঁচু। চারিদিকের পরিবেশ অতি মনোরম। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো বাড়ি থেকে বিজ্ঞানের ছটি বিভাগ এখানে সরিয়ে আনা হয়েছে। এখানে ছয়হাজার ছাত্র এবং ১৪৮টি অধ্যাপক-পরিবারের বাসের সুবন্দোবস্ত আছে আর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যেই তাঁরা এক গোটা শহরের সমুদয় সুযোগ-সুবিধা পান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাসেম্‌ব্লি হল্‌'-টি খুব জমকালো। আমরা ঢুকতেই ২০০-বাল্‌বের ঝাড়লণ্ঠনটি জ্বালানো হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে যেন চারদিকে বর্ণচ্ছটা ছিটকে পড়ল। এ ছাড়া ফিল্মের-সাহায্যে-শিক্ষাদানের অডিটোরিয়াম, ক্লাব অডিটোরিয়াম, ব্যায়ামাগার, পুস্তকাগারের ব্যবস্থাও চমৎকার।

হ্যাঁ, 'লেনিন লাইব্রেরি'ও দেখেছি বৈকি। পুস্তকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। এ ছাড়া প্রতিদিন নানা দেশ থেকে সদ্যপ্রকাশিত নানাজাতীয় পত্রিকা আসে। শুনেছি, পুস্তকাগারটির 'কার্ডিং সিস্টেম' এত সুন্দর যে, মাত্র দশমিনিটের মধ্যে যে-কোনো বই হাতে এসে পৌঁছাতে পারে। সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত লাইব্রেরির কাজ চলতে থাকে। এখানকার কর্মীর সংখ্যা দু'হাজার পাঁচশ' এবং তাদের মধ্যে চল্লিশজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন শুধু বইগুলিকে কীট-পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষার কাজে।

এত দূরদেশে এসে বাঙালী পরিবারে ঘন হয়ে বসব, ভাবিনি। কিন্তু সেটিও ঘটে গেল। শ্রীযুক্ত শুভময় ঘোষ ওদেশে অনুবাদ-বিভাগে কাজ করছেন। 'পিকিং' হোটেলে দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তিনিই আমাদের নিয়ে এসেছেন শ্রীযুক্ত সমর সেন ও শ্রীযুক্ত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করাতে। মিসেস সেন ও মিসেস চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক ব্যবহারে অপরিচয়ের বাধা আপনা থেকে কখন যে খসে গেছে টের পাইনি। বহুপরিচিতের মতো জিজ্ঞেস করেছি—"বেড-কাভার-খানার দাম কত?"

—"'সেভ্‌ন' রুবল।" সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা বাৎলান, "প্রথমদিকে দাম-শুনে আমাদেরও চক্ষুস্থির হ'ত। কিন্তু এদেশে আয়টাও অনেক বেশী কিনা, তাই এখন কিছু মনে হয় না। একজোড়া জুতো কিনতে যান, দাম হাঁকবে ৭০।৮০ রুবল, মেয়েদের একটা ওভার-কোট—৭০০।৮০০ রুবল।"

"সেটি টের পেয়েছি, সেদিন 'গুমে' (Gum—ডিপার্টমেন্ট-স্টোর) গেলে। কী বিরাট স্টোর, আর তেমনি ভীড়! অথচ আমাদের দেশের তুলনায় কত বেশী দাম এক-একটি জিনিসের। আচ্ছা, এখানে ঘরের কাজের জন্য লোক পাওয়া যায়?"

মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, "আমি কিছুদিনের জন্ত এক বুড়ী ঝি রেখেছিলাম। মাইনে দিতে হ'ত ৩০০ রুবল, খেতে রুটি ডিম মাখন দুধ ফল। অবিশ্যি কাজ করত সব। ঝাড়পোঁছ করা, বাসন-মাজা, বাজার, রান্না, এমনকি ছোটখাটো কাপড় কেচে ইস্ত্রিও করত। এখন আমরা নিজেরাই করে নিই।—এবার, কী কী দেখলেন বলুন।"

"সিনেমা আর পাপেট-শো দেখেছি। ব্যালে দেখব লেনিনগ্রাদে। সেদিন ট্রেটিয়াকভ আর্ট-গ্যালারি দেখতে গিয়েছিলাম। একাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে রাশিয়ার চিত্রকলার বিবর্তন ধরে ধরে সাজানো। ওখানেও তাজমহল আর আমাদের গরুর-গাড়ীর ছবি দেখলাম। ক্রামস্কয়ের আঁকা 'পুত্রবিয়োগান্তে গর্কি-পত্নী'র ও রেপিনের আঁকা 'আইভেন-দি-টেরিবল—পুত্রকে ছুরিকাঘাত করার পর' এই চিত্র দু'খানা এখনও যেন চোখের সামনে জলজল করছে। তা ছাড়া 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' বিষয়টি কেন্দ্র ক'রে আঁকা কয়েকখানা ছবি কৌতুকের সৃষ্টি করেছে।

"মেট্রো অর্থাৎ ভূগর্ভ-রেলপথও দেখেছি। এস্কালেটর দিয়ে নেমে-নেমে কোন্ পাতালপুরীতে চলে গেলাম। স্টেশনগুলো কী পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর সুন্দর ঝাড়-লণ্ঠনে সাজানো। জাতীয় জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীও চিত্রিত রয়েছে দেখলাম।"

ওদিকে ডাঃ দাশগুপ্ত 'লিখাসভ মোটর ওয়ার্কস'-এর গল্প ফেঁদেছেন। —"ওটি মস্কো থেকে ১৫ মাইল দূরে। বিরাট কারখানা। ৫,০০০ ইঞ্জিনীয়ার কাজ দেখছেন। ফ্যাক্টরির নিজস্ব পলিক্লিনিক রয়েছে। ওঁদের ডাক্তারদের ইউনিট—ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনারও তদারক করেন। মালিকের অসতর্কতা-ই দুর্ঘটনার কারণ প্রমাণিত হ'লে, ঐ ইউনিটই মালিকের জরিমানা ধার্য করেন। এজন্ত আদালতে আর্জি পেশ করতে হয় না।—আর জানেন, রাশিয়াতে ডাক্তারেরা নাকি দিনে মাত্র ৬'৫ ঘণ্টা কাজ করেন।"

ইত্যবসরে চা এল। ওদেশে লেবু দিয়ে পাতলা লিকারের চা খায়। তাই চা-পানে তৃপ্তি হ'ত না। মাত্র এই দু'টো দিন চা ভালো লাগল। আজ, আর একদিন ভারতীয় দূতাবাসে চায়ের নেমন্তন্নে।

সেদিন রাষ্ট্রদূত-পত্নী আমাদের জন্ত 'দহি-বড়া'র বন্দোবস্ত করেছিলেন, বিলিতী খানার মুখে ভালো লাগবে ব'লে। রাষ্ট্রদূত মিঃ মেননকে প্রশ্ন করেছিলাম—"সত্যিই কি এখানে 'আয়রন কার্টেন' ব'লে কিছু আছে? এক মুসোলিয়াম ছাড়া আর কোথাও তো ক্যামেরা নিতে বাধা পাইনি।"

উত্তর পেলাম: "আর্মেনিয়া সবার জন্ত খোলা নয়। আমি অনেক চেষ্টার পর হালে যাবার অনুমতি পেয়েছি।" আমরা লেনিনগ্রাদ যাব শুনে বললেন, "ও শহরটি মস্কো থেকেও সুন্দর।"

সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বিতীয় মহানগরী লেনিনগ্রাদ সত্যিই সুন্দর। নেভা নদী যেখানে ফিন্ল্যাণ্ড উপসাগরে মিলিত হ'তে যাচ্ছে—এমন একটি মনোরম পরিবেশে জার-সম্রাট পিটার-দি-গ্রেট এ শহরটির পত্তন করেন। তখন এর নাম ছিল সেন্ট পিটার্সবার্গ। নেভা নদী এখানে বিচিত্র-ধারায় প্রবাহিত হওয়ায় শহরটি ছোট ছোট দ্বীপে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে এবং চারশত সুন্দর সুন্দর সেতু দ্বারা ঐ অংশগুলি সংযুক্ত হয়েছে। আমাদের বাসের বন্দোবস্ত হয়েছে 'এস্টোরিয়া' হোটেলে—যেখানে একসময় রাজ্যের প্রধান প্রধান অতিথিদের পানে ভোজনে ও নৃত্যগীতে সংবর্ধিত করা হ'ত।

প্রথমদিন আমরা 'উইন্টার প্যালেস' দেখতে গিয়েছিলাম। এর ভেতরের দু'শ' চল্লিশটি কক্ষ 'হারমিটেজ মিউজিয়াম'—জার-সম্রাটগণের কারুকার্যময় নানাদ্রব্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। নানা দেশের ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পের বহু মূল্যবান সংগ্রহ ওখানে সাজানো আছে। এ ছাড়াও দু-একটি বিশেষ আকর্ষণীয় জিনিস দেখেছি। যেমন পিটার-দি-গ্রেট-এর 'রাইটিং টেবল'। টেবিলটির উচ্চতা ও প্রস্থ দেখেই ওটির ব্যবহারকারীর অসাধারণ দীর্ঘদেহের অনুমান হয়। আরেকটি—'ফাউন্টেন-অব-টিয়ার্স'। জারিনা দেহত্যাগ করেছেন—জার নিজের শোকাশ্রুর প্রতীক হিসেবে একটি 'ফাউন্টেন' রচনা করালেন। অশ্রুবিন্দুর মতো একটির পর একটি বিন্দু পড়ছে ফোয়ারাটি থেকে। জনপ্রিয় কবি পুশকিন ওখানে একবার পুষ্পের অর্ঘ্য দিয়েছিলেন। সেই থেকে রোজ টাট্কা ফুল দেওয়া হয়—ঠিক যেখানে বিন্দুগুলি ব'য়ে-ব'য়ে পড়ছে।

'উইন্টার প্যালেস'-এর সমুখে প্রশস্ত চত্বর। মাঝখানে এক বিশাল জয়স্তম্ভ। এখানেই একদিন সম্রাটের বিশাল কসাক-সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ হ'ত। এখানেই সমবেত প্রজাবৃন্দকে জার-সম্রাট তাঁর প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করতেন। এখানেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জেনুয়ারি সম্রাট নিকোলাস আলেকজান্দারের আদেশে

বুভুক্ষু, বিপন্ন, নিরস্ত্র জনতার উপর নির্মমভাবে গুলী বর্ষণ করা হয়। অসহায় বালক-বৃদ্ধ-বনিতার রক্তে সেদিন নেভা নদী রাঙা হয়ে উঠেছিল। 'রক্তাক্ত রবিবার' রূপে ঐ দিনটি ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

রাস্তায় বেরিয়ে কত প্রাসাদ, উপবন, দুর্গ, গির্জা, পুস্তকাগার, হাসপাতাল দেখেছি; দেখেছি ক্যাথারিন-দি-গ্রেট-এর তোশামোদকারী-পরিবৃত মূর্তিটি। নেভা নদীর তীরে পিটার-দি-গ্রেট-এর অশ্বারোহী বিরাট মূর্তিটি দেখিয়ে নীনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এখনও তোমরা জার-সম্রাটের মূর্তি রক্ষা করেছ কেন?" উত্তরে নীনা বলেছিল, "আমরা তাঁদের শোষণনীতির বিরোধী, কিন্তু তাঁদের বহুমুখী গুণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্।"

মস্কোতে 'পাপেট-শো' দেখতে যেয়ে যেমন আমেরিকার দুটি ভ্রমণকারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, লেনিনগ্রাদের 'কিরভ স্টেডিয়াম' দেখতে এসে চেকোস্লোভাকিয়ার কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ ভালো ইংরেজী বলেন। সৈন্য-বিভাগে পারদর্শিতার ইনাম হিসেবে কয়েকটি মেডেল পেয়েছেন দেখলাম। খুব গর্বের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন—"আমি একজন দেশপ্রেমী।"

একদিন সকালবেলা 'প্যাভলভ ইন্‌স্টিটিউট'-এ প্যাভলভের গবেষণাগারে ঢুঁ মারলাম। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত চুল্লী বেশ যত্নে রক্ষিত আছে। ঐ ইন্‌স্টিটিউটে এখন প্যাভলভের 'কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্' সম্বন্ধীয় নানা গবেষণা চলছে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমরা পেট্রোড্‌ভোরেটস্-এর (Petrodvorets) বিখ্যাত ফাউন্টেন্‌স্ দেখতে যাব।

যাবার সময় গ্রামের পথ অতিক্রম করতে হ'ল। স্থানে স্থানে বিগত দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের ৯০০-দিন-ব্যাপী অবরোধের এক-আধটুকু চিহ্ন এখনও বর্তমান। দেখছি—কাঠের ছোটো-ছোটো সুন্দর বাড়ি, তাতে টেলিভিশনের এরিয়াল। জানি না, ওগুলো কারো নিজস্ব সম্পদ কিনা। শুনেছি, ওদেশে বড় শহরে নিজস্ব বাড়ি করবার অনুমতি মেলে না। নিজের বাড়ি করতে হ'লে গ্রামে আসতে হয়। পথে পিটার-দি-গ্রেট-এর একটি প্রাসাদ দেখলাম। ওটি এখন কর্মীদের দীর্ঘ অবকাশে বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জার-সম্রাটদের গ্রীষ্মনিবাস পেট্রোড্‌ভোরেটস্ ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের কূলে অবস্থিত। এখানে আটাশটি রাজপ্রাসাদ আর একটি অতি মনোরম উত্তান আছে।

এই উত্তানেই ফোয়ারার রাজ্য, আর তাদের কত বিচিত্র নাম। একটি ফোয়ারার নাম 'কেভারিট'। ঘূর্ণায়মান কয়েকটি হাঁস ও কুকুরের মুখ থেকে জল প'ড়ে প'ড়ে কুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। পাশে ইংরেজীতে লেখা আছে—হাঁসেরা কুকুরকে বলছে: "তুমি বলবান্ স্বীকার করি, এবং আমাদের হয়রান করতেও পার, কিন্তু এত বেশী বলবান নও যে আমাদের ধরতে পারবে।"

আবার একটি বর্তুলাকার চত্বরের বসবার আসনকে আচ্ছাদন ক'রে আছে একটি বিরাট ছাতা—নাম 'চাইনিজ আম্ব্রেলা'। অনেক হেঁটে ক্লান্ত হয়ে ওখানে বিশ্রাম নিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ধারায় ছাতা বেয়ে জল পড়তে লাগল। না ভিজে বেরোবার জো নেই। আর এক কাণ্ড, একটি কৃত্রিম ওক-গাছ থেকে অনবরত জল ঝরছে। জলের ছিটে বাঁচিয়ে পথ চলতে হ'লে কতগুলো পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে চলতেই হবে। কিন্তু যে-মুহূর্তে ঐ নুড়িতে পা পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে বহুধারায় জল ছিটকে আসছে। ব্যাপার কী। হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল—দুটি লোক নিকটবর্তী ঝোপের আড়ালে বসে ঐ যন্ত্রের কলকাঠি নাড়ছে। অতীতে জার এবং জারিনাগণ অতিথি-পরিবেষ্টিত হয়ে এখানে কত সায়াহ্ন কত কৌতুকেই না অতিবাহিত করেছেন!

আর একটি কথা। এখানকার কয়েকটি বিশেষ ধরনের ফোয়ারার সঙ্গে মহীশূরের 'বৃন্দাবন গার্ডেন্‌স্'-এর কয়েকটি ফোয়ারার সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। এ ফোয়ারাগুলির প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য ব'লে, মনে হয়, 'বৃন্দাবন গার্ডেন্‌স্' পরিকল্পনার প্রধান কর্ণধার এই উত্তানটি পরিভ্রমণ করে চমৎকৃত হয়েছিলেন—এবং মহীশূরের ঐ উত্তান-রচনায় এ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বীয় কল্পনার সংমিশ্রণে অমন দুর্লভ সৌন্দর্য-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

লেনিনগ্রাদের বৃহত্তম মেটারনিটি-হোম 'স্নেগেরভ (Snegerov) হস্পিটাল' দেখেছি। নানা ব্যাপারের সাহায্যে মায়েদের সহজভাবে সন্তান-প্রসবের উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে এবং উৎসাহ-বাক্যের দ্বারা প্রসবকালীন ভীতি দূর করবার চেষ্টা চলছে। 'পেইনলেস্ ডেলিভারি'র জন্ত কোনো ঔষধ প্রয়োগ করা হয় না। দৈহিক ও মানসিক এই প্রক্রিয়াগুলি দ্বারাই ডেলিভারি 'পেইনলেস্' করা হয়। ১৫।২০ মিনিটের ফিল্মে ঐ-সংক্রান্ত ছবি দেখলাম। প্রসূতিকে বলা হচ্ছে: "তোমার দিদিমা-মা'র মতো তুমিও আজ মা হ'তে চলেছ। মেয়েদের জীবনে এ অতি স্বাভাবিক অবস্থা, এবং এজন্ত তোমাকে বাইরে থেকে কেউ সাহায্য

থেকে বাছাই-করা সবরকমের সুন্দর পরচুলা। মহিলাদের ক্রপ হেড-ড্রেসের সঙ্গে ব্যাণ্ডো বা রিবন জুড়ে দেওয়ার দরুন ঠিক দীর্ঘ বেণীর মতো দেখতে হওয়ায়, গরম অঞ্চলের মেয়েদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক এবং অল্পক্ষণে নিখুঁত ফুল-ড্রেস করা চলবে। ফুল-ড্রেস, হাফ-ড্রেস, হেড-ড্রেস, ব্যাণ্ডো, বর্ডার, হেয়ার-ক্যাপ-রিংলেট, রিবন্‌ ইত্যাদি ভদ্রলোকদের পরচুলা, একেবারে আসল চুলের মতো—সুবিধা, চেহারার জলুস ও মানানোর জন্যে।"

সেকালে হেয়ার-ড্রেসারেরা শুধু মেয়েদেরই ফিতে-ফুল দিয়ে কেশসজ্জা করতো না বা চুলে পাউডার-পমেটম মাখাতো না, পুরুষদেরও কেশসজ্জা করতো। দু'বেলা ড্রেসারের কাছে চুল না বাগিয়ে কোনো সাহেবই সমাজে বেরোতেন না। ইংলণ্ড, প্যারিস থেকে নামকরা হেয়ার-ড্রেসার আনার দরুন দেশী ড্রেসারদের সারা মাস কাজ করে দু'টাকার বেশি মিলতো না। বিদেশীদের মধ্যে আবার স্পেশাল হেয়ার-ড্রেসার ছিল ফরাসীরা। ইউরোপের দুজন বিখ্যাত ড্রেসার মিঃ মালভেইন্ট ও মিঃ সিডেট ১৭৮৫ সালে কলকাতায় আসেন সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষদের কেশ-পরিচর্যার উদ্দেশ্যে। মালভেইন্ট মহিলাদের কেশচর্চার জন্যে নিতেন মাসে দুই মোহর, আর সিডেট নিতেন চার টাকা। শুধু পুরুষ নয়, মহিলা হেয়ার-ড্রেসারের কথাও বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়।

১৭৮৫ সালে এক দম্পতি এদেশে আসেন কাজের খোঁজে। তাঁদের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, স্ত্রী কেশচর্চায় নিপুণা এবং স্বামী কোচোয়ানীতে ওস্তাদ।

এই বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্যের মধ্যে আর-এক-ধরনের বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করা দরকার। তা হ'ল বইয়ের বিজ্ঞাপন। ১৭৮৭ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত কলকাতার নামকরা বিলিতী দোকানের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে—দোকানে চকোলেট, জ্যাম, বাদাম থেকে আরম্ভ করে Gibbon-এর ইতিহাস পর্যন্ত রাখা হ'ত। এই ধরনের আর একটি বিজ্ঞাপন: মেসার্স ওয়ত্‌ অ্যাণ্ড লঙ্গ-এর দোকানে সযত্নে রক্ষিত উত্তমাশার মনাক্কা ও বাদাম, তার হান্‌স্‌ স্লোনির মিল্ক-চকোলেট, এক্সেলোর দুর্লভ রোজবেরী জ্যাম আর নতুন নতুন বই-এর বিরাট সমাবেশ—তার মধ্যে কয়েকটি হ'ল: গিবনের 'রোম্যান এম্পায়ার', জনসন এবং স্টিভেনসনের 'শেক্‌স্‌পীয়ার', নক্স-এর 'বৃটিশ এম্পায়ার' ব্ল্যাকস্টোনের কমেন্টারিজ, নিউটনের 'মিল্টন', চেস্টারফিল্ডের পত্রাবলী, গোল্ডস্মিথের গ্রন্থাবলী, জীবনীমূলক অভিধান—ইত্যাদি।

বই-এর এত বিজ্ঞাপন দেখে প্রশ্ন জাগে, কারা এসব বই কিনতেন? যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের অবসর-বিনোদনের জন্যে ছিল সুসজ্জিত শুঁড়িখানা, বিলিয়ার্ড রুম, লটারি, নাচখেলা, ময়দানের রেস, সান্ধ্যভোজ আর মনিহারী দোকানের মনোরম আড্ডা—তাদের মধ্যেও কি এমন কিছু লোক ছিলেন—যাদের জন্যে ইউরোপ থেকে নতুন নতুন বই আসতো জাহাজে করে?

সে-যুগের এইসব বিচিত্র বিজ্ঞাপন পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলে চলচ্চিত্রের রীলের মতো এক এক করে সেকালের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ-জীবনের কত আপাত-গোপন ছবিই চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! অজানা দেশ, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও ইংরেজ ব্যবসাদারেরা কেমন ক'রে নিরলস পরিশ্রম, সততা আর ধৈর্যগুণে এদেশে নতুন নতুন ব্যবসা খুলে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন তার কত চমকপ্রদ কাহিনীই না লুকানো আছে এইধরনের অবজ্ঞাত বিজ্ঞাপনের অন্তরালে। এইসব ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের মধ্যে গোটা সমাজেরই বিচিত্র ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। সেকালের সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় বিস্ময় জমা হয়ে আছে বিজ্ঞাপনে।

ঐতিহাসিক সিটন-কার সে-যুগের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে যথার্থই লিখেছেন: *the most interesting of the whole. It throws light on the minutest detail of the inner and domestic life of the English community of Calcutta and the Bengal Presidency.*

প্রেমিক কাছে

যোহান বল্‌ফ্ গ্যয়টে

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আমি তো তোমাকে ভাবি যখন সহসা সূর্য ঐশ্বর্যে ভাস্বর
সমুদ্রের থেকে দীপ্তি পায়,
তোমার কথাই ভাবি যখন চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্নার প্রহর
বিম্বিত বিশ্রাম করে ঝর্ণার কায়ায়।

তোমাকে পথেও দেখি যেখানে উড়ছে ধূলিকণার সংহতি
দূর প্রান্তে আমার দৃষ্টির,
গাঢ় তমিস্রায় রাতে যখন ভ্রমণরত পা-দু'খানি প্রতি
অগ্রসর পদচিহ্নে কম্পনে অস্থির।

তোমারই তো গান শুনি গভীর গর্জনে তরঙ্গের
উৎক্ষেপেই-চূর্ণ-হওয়া যাদের উৎসব,
শান্ত উপত্যকা খুঁজি যেখানে দাঁড়িয়ে পরিতৃপ্তি শ্রবণের
হ'লে পৃথ্বী একান্ত নীরব।

আমি তো তোমারই সঙ্গে, তোমার প্রতিমা রাখেনি তো ব্যবধান
আমার সন্নিধি থেকে আর।
অস্ত গেছে সূর্য, আছি তারাদের আলোর উত্থান
প্রতীক্ষায়, তারাদের এবং তোমার।

ক্ষমা কোরো, প্রভু!

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

আশ্চর্য!
যখনই তোমাকে স্মরণ করি
তখনই ভেসে ওঠে
তোমার অনবদ্য ক্রুশ-বিদ্ধ রূপ
আমার চক্ষের সম্মুখে।
প্রসারিত হস্তে
তুমি আহ্বান কোরছো বিশ্বকে
তোমার বিস্তৃত বক্ষে।
রক্তাক্ত পদপ্রান্তে
আসক্তির মুক্ততা,
প্রশান্ত মুখপদ্মে
অখণ্ড তিতিক্ষা,
স্থিরদৃষ্টিতে
ক্ষমার ঐশ্বর্য,
আলুলায়িত কুন্তলে
নির্বিকল্প অনাসক্তি,
কণ্টক-মুকুটে
পার্থিব তুচ্ছতা;
আর সমস্ত শরীরে
স্নিগ্ধদীপ্তি,
যেন সদ্যই স্নান সেরে উঠেছ
স্বর্গের সমুদ্র থেকে।

অন্য রূপে কল্পনা করিতে পারিনা তোমায়;
ক্ষমা কোরো, প্রভু!

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়

রাশিয়ার স্মৃতি

শান্তিলতা দাশগুপ্ত

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ডাক্তার ও ডাক্তার-জায়া মিলে এগারজনের একটি দল নিয়ে দুর্দান্ত বেগবান্ সোভিয়েট জেট্ দিল্লী থেকে মস্কো অভিমুখে উড়ে চলেছে। যার সাড়ে-সাতঘণ্টায় তিন-হাজার মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করবে।

ছত্রিশহাজার ফিট উঁচু থেকে হিমালয়-পর্বতশ্রেণীর শোভা দেখছি। তুষারাচ্ছন্ন গিরি, নদী, হ্রদের নানা বর্ণ মিলে এক অভিনব সৌন্দর্য চোখের সম্মুখ দিয়ে সরে-সরে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে একসময় আমরা সোভিয়েট রাজ্যের অন্যতম রিপাব্লিক তাসকেণ্টে পৌঁছলুম। এখান থেকে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে মস্কো রওনা হব।

ভোজনে বসে আবিষ্কার করলুম, ভাষায় বাধা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পরিবেশনকারিণীরা আমাদের ত্রিসীমানা ঘেঁষছেন না। দোভাষিণী আনার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু একটির পর একটি ভোজ্য পরিবেশনে কী দীর্ঘসময়ই না নিচ্ছে! ভোজন যেন উদরপূর্তি নয়,—বিলাস।

পূর্ব-নির্দিষ্ট 'এয়ার-ইণ্ডিয়া-ইণ্টারন্যাশনাল—সুপার-কন্‌ষ্টেলেশন'-এর পরিবর্তে জেটে সফর করায় আমরা প্রায় সাড়ে-চারঘণ্টা আগে মস্কো নেমেছি। তাই ইণ্ট্যুরিস্টের বাস্ অপেক্ষায় নেই। ষ্টেশনে যাত্রীর আনাগোনা ক্রমশঃ বাড়ছে। মেয়েরা কেউ কেউ ঠোঁট রাঙিয়েছে বটে, তবে সেটা যেন নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। একদল কিশোর-কিশোরীও জমায়েত হয়েছে,—কোথায় যাবে ওরা? আনন্দ-ভ্রমণে?

—ওঠো, ওঠো—বাস্ এসেছে—

বিরাট বিরাট রাস্তা, মস্ত মস্ত বাড়ি ডিঙিয়ে বাস্‌খানা এসে থামল 'পিকিং' হোটেলে। সেকি! হোটেলের নাম 'পিকিং' কেন? উত্তর পেলাম, চীনেদের এখানে আনাগোনা বেশী এবং এ-হোটেলে চীনদেশীয় খানার বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাই।

হোটেলের বন্দোবস্ত চমৎকার। বেড-রুম, ড্রইংরুম—তাতে পুরো ঝকঝকে আসবাব, টেলিফোন, রেডিও, কোনো কোনো ঘরে টেলিভিশন-সেট। সংলগ্ন স্নানাগারে ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা।

খাবার ইউরোপীয় ধরনের। তবে চালের ব্যবহার ওদেশে আছে। 'পরিজ' নামীয় যে-বস্তুটি প্রাতঃরাশে মাঝে মাঝে পেয়েছি সেটি সোজাসুজি 'ফেন-ভাত'। এ ছাড়া ঘি-ভাত ও পোলাও-ও খেয়েছি। পোলাও-কে ওরা বলে 'পল্ভ্', শরবতকে 'শর্‌বর'। এরকমের ভাষার সাদৃশ্য পেলে আমাদের দোভাষিণী ও গাইড মীনার চোখে-মুখে খুশী উপচে পড়ত।

মস্কোর বর্তমান প্রধান সড়ক গর্কি স্ট্রীট।। ৩০ মিটার

চওড়া। কিন্তু একসময় এটি ছিল মাত্র ১৭ মিটার। শুনলুম, সমুদয় ফিটিং-সহ বিরাট বিরাট বাড়ি অন্যত্র সরিয়ে রাস্তাটি চওড়া করা হয়েছে। এই বিষয়টিকে আধার করে একটি কাহিনী শোনালো লীনা: একটি কিশোর স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু বাড়ি কোথায়? ঠিক এইখানটিতেই তো ছিল তার বাড়িটি। হঠাৎ দূরে দৃষ্টি যেতে ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল—"আরে, ঐ তো আমাদের বাড়িটা! কিন্তু অমন হেঁটে-হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে কেন?"

ক্রেমলিন প্রাসাদের পার্শ্ববর্তী রেড-স্কোয়ারের ঐতিহ্য একদিনের নয়। অতীতে এটি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, সারা রাশিয়ার মস্কো-অভিমুখী পথের মিলনক্ষেত্র। সেদিনের আনন্দের সঙ্গে বহু দুঃখের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে এর বুকে। এখানেই ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে সর্বসমক্ষে বিদ্রোহী নেতা স্তেপ্যান রেজিনের শিরোচ্ছেদ ঘটে। তারপর ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পিটার-দি-গ্রেট প্রগতিশীল কর্মধারার বিরোধী জার-সৈন্যগণকে হত্যা করেন, সেও এখানেই। আবার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের শেষ যুদ্ধও সংঘটিত হয় এই রেড-স্কোয়ারে। এই যুদ্ধে নিহত সোভিয়েট বীরদের সমাধিস্থ করা হয়েছে ক্রেমলিন-প্রাচীরের পাদদেশে। নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা সমাধিগুলিকে ঘিরে আছে—ঘন সবুজ-গাছের সারি। প্রস্তরফলকে মৃতের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে তাতে জানা গেল ঐ সৈন্যদলে কিছু বিদেশীও ছিলেন।

আজ যেখানে ক্রেমলিন প্রাসাদটি সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় আট শ' বছর আগে সেখানে ছিল ঘন বন। অধিবাসীরা ছিল কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী এবং শিকারী। দুর্গ-নির্মাণের জন্য এ-স্থানটি নির্বাচনের কৃতিত্ব প্রধানতঃ প্রিন্স ইউরি ডল্‌গোরুকির (Yury Dolgoruky)।

সেকালে জার-সম্রাট ও ধর্মযাজকগণ কী প্রাচুর্যের মধ্যেই না জীবন কাটাতেন! ক্রেমলিনের 'আর্মারি'তে দেখলাম—তাঁদের ব্যবহৃত সিংহাসন, মুকুট, দণ্ড, পোশাক-পরিচ্ছদে অকৃপণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে স্বর্ণ-মণি-মাণিক্য-জহরৎ। একটি ঘোটকের হীরকখচিত বর্মাভরণ দেখিয়ে লীনা বলেছিল—"ঐশ্বর্যের এমন অপব্যয়, কিন্তু তখন দেশের অগণিত প্রজার দু'বেলার আহার ছিল না।"

ক্রেমলিন-স্থিত 'গ্রেট ক্রেমলিন প্রাসাদ'টি আমাদের পার্লামেন্ট-এর মতো। ওখানেই এখন সোভিয়েট সরকার এবং কম্যুনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসে।

আচ্ছা, আমাদের মতো আগন্তুকদের দেখে উস্পেনস্কি (Uspensky) ক্যাথিড্রালটি কী ভাবে? একবার মনে কি পড়ে না—সেদিনের রাজপরিবারের বিবাহ-রাজ্যাভিষেকাদি অনুষ্ঠানের বৈভবপূর্ণ জাঁকজমকের কথা? কিন্তু জগতে চিরস্থায়ী তো নয় কিছু! ঐ তো দু'শ' টন ওজনের বিখ্যাত জার-ঘণ্টাটি আর তারই পাশে জার-কামান। কিন্তু যাদের উৎসাহে এদের সৃষ্টি তাঁরা আজ কোথায়!

তাঁরা নেই, কিন্তু আছে নূতন রাশিয়ার স্বপ্ন সফল নূতন মানুষ। পরিচ্ছন্ন পথে চলতে-চলতে মনের আনন্দে তারা 'মারোজনা' অর্থাৎ আইস্‌ক্রীম চুষতে চুষতে যায়। শীতের দিনেও স্বয়ংক্রিয় পাত্র থেকে সোডা-লিমনেড খাওয়া যেন একটা নেশার মতো।

স্বয়ংক্রিয়-যন্ত্র বলতে হোটেলের জুতো-পালিশের যন্ত্রটির কথা মনে পড়ল। সে এক ছেলেমানুষী কাণ্ড। দশ-পনেরো-কুড়ি এই পর্যায়ে প্রতিবারে ৪০টি কোপেক (৫৫ নয়া-পয়সার একটু বেশী) ফেলতে হয়, এবং ধীরে-সুস্থে একজোড়া জুতো চমৎকার চকচকে হতে পারে—এতটা সময় চালু থাকে। কিন্তু ভারত-সরকারের মঞ্জুরী অর্থ আমাদের জন্য এত সামান্য যে, রোজ জুতো-পালিশের বাবুগিরি চলে না, তাই একজন কোপেক ফেললে, অন্ততঃ তিনজন তাড়াহুড়ো করে কাজ সারতেন।

কর্মীদের অর্থব্যয়ে কৃপণতা নেই। কারণ জীবন-পরিক্রমায় ওরা একরকম নিশ্চিন্ত। ওদেশে শিক্ষা অবৈতনিক। তা ছাড়া কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বহু বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে। আর চিকিৎসা? সে-দায়িত্বও সম্পূর্ণ সরকারের; এবং জনসাধারণের জন্য সে-ব্যবস্থাকে রাজসিক ব্যাপার বলা চলে। প্রতি পাড়ায় একটি করে পলিক্লিনিক রয়েছে। তাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আছেন। এক্স-রে এবং প্যাথলজি সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা তাঁরাই করেন। আবার প্রয়োজনবোধে রোগীকে হাসপাতালে এঁরাই ভর্তি করে দেন।

গর্ভবতীকে ওখানে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য,—কর্মী হ'লে, হালকা কাজ এবং প্রয়োজনীয় ব্যায়ামের বন্দোবস্ত হয়। এর পর শিশুর জন্ম হ'ল। এখন নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তাকে পরীক্ষা করবেন পলিক্লিনিকের ডাক্তারেরা। ছাত্র, কর্মী, বৃদ্ধ—অর্থাৎ রাশিয়ার প্রতিটি জনসাধারণের নির্দিষ্ট দিনে, সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজিরা দেওয়া অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে। এককথায়, জনস্বাস্থ্যের প্রতিও দেশ অত্যন্ত যত্নবান্। তাই হয়ত পথে-ঘাটে যাদের দেখেছি, অমন স্বাস্থ্যশ্রীমণ্ডিত দেখেছি।

ক্রেমলিন-এর 'গ্র্যাণ্ড প্যালেস'

আর হবেই বা না কেন? সাধারণতঃ খাওয়া-পরা এবং ভবিষ্যতের ভাবনাই তো মানুষের মনকে কুরে কুরে, তাকে অকালে হতস্বাস্থ্য করে দেয়। সে দুর্ভাগ্য থেকে ওরা মুক্ত। বেকার-সমস্যা ওদেশে নেই। যে-কোনো মানুষ ইচ্ছানুসারে পূর্ণ বা আংশিক কাজ পেতে পারে। আর বৃদ্ধবয়সে? তখন পেন্সন আছে। সে-পেন্সন ৩০০ রুবলের (১রুবল—প্রায় ১৶০) কম তো নয়ই, তার উর্ধ্বতম বেতনের সমানও হ'তে পারে। তবে সেটা নির্ভর করবে তার কর্মজীবনের দক্ষতার উপরে। বৃদ্ধবয়সে থাকবার জন্য 'হাউস অফ রেস্ট' আছে, প্রয়োজনে অনায়াসে সেখানে জীবন কাটানো চলবে।

একদিন এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন, খাদ্য-বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হ'লেই কি সব পাওয়া হ'ল? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লে জীবনকে এত দিক থেকে দেখার প্রয়োজন যে, এককথায় জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তবে দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা থেকে সবেগেই বলব, এ প্রাথমিক প্রয়োজনের তাগিদ বহু উদার অন্তঃকরণকে অনুদার করেছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'লে তবেই-না ভাববার অবকাশ আসে: কী আমি পেলাম না—কী আমার পাওয়া উচিত ছিল।

একদিন কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলুম। ওটি স্থায়ী প্রদর্শনী। অত্যন্ত শীতের ক'টি মাস বাদে সারা বছর খোলা থাকে। প্রদর্শনী একদিনে দেখা অসম্ভব। প্রায় ২২ মাইল পথ চলতে পারলে তবে সম্পূর্ণ দেখা হয়। শিল্প-প্রদর্শনীতে তিনটি স্পুটনিকেরই প্রমাণ-সাইজ মডেল দেখলাম। ২নং স্পুটনিকের 'লাইকা'র চেহারাটি খোলাভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে লাইকার জয়গীত। একেই বলে কপাল। জন্ম কুকুর-যোনিতে, এক অবিস্মরণীয় গবেষণায় তার জীবনদানও নিতান্তই দৈব-ঘটনা, তবু সে-নাম ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য হয়েছে।

কৃষি-প্রদর্শনীতে রাশিয়ার পনরোটি রিপাবলিকের কৃষিজাত দ্রব্য, পশুপক্ষী, বাগান-বাগিচা, কৃত্রিম হ্রদ—যতটা পেরেছি, দেখেছি। কিন্তু কী ওতে নেই? কাফে, রেস্তোরাঁ, দোকানপাট, সিনেমা, মুক্ত-পরিবেশে থিয়েটার করবার স্টেজ, এমনকি দূরের যাত্রীর জন্য গেস্ট-হাউসেরও বন্দোবস্ত আছে।

সিনেমা ও থিয়েটার স্টেজ 'গর্কি পার্কে'ও রয়েছে। ওটি মস্কোর আধুনিকতম পার্ক। সে যেন এক চিরস্থায়ী আনন্দ-মেলা। ওখানে চিত্তবিনোদনের এতরকমের সরঞ্জাম রয়েছে যে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতে পারে। 'জায়েন্ট হুইল'-এ চড়ে আমরা খুবই কৌতুক বোধ করেছিলাম। ওটি অনেকটা আমাদের 'নাগরদোলা'র মতো। প্রতিটি বাক্সে চারটি আসন। —অমন চল্লিশটি বাক্সে একসঙ্গে ১৬০ জন ঘুরতে পারে। কিন্তু এত ভীড় যে, 'কিউ'তে অপেক্ষা করতে হ'লে হয়ত আমাদের চড়াই হ'ত না। কিন্তু মীনার অনুরোধে ওরা সানন্দে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

আরো একবার, মুসোলিয়াম অর্থাৎ লেনিন ও স্ট্যালিনের সমাধি-মন্দির দেখতে যেয়েও, জনসাধারণের কাছে অনুরূপ সহযোগিতা পেয়েছিলাম। দু'-দু'-জনের প্রায় আধমাইল-ব্যাপী লাইন দু'ফাঁক হয়ে আমাদের আগে দেখবার সুযোগ করে দিয়েছিল, নইলে ওদিনই 'লেনিন মিউজিয়াম' দেখা কোনোরকমেই সম্ভব হ'ত না।

শুনেছিলাম, সোভিয়েট নেতাদ্বয়ের দেহ অবিকৃতভাবে রক্ষিত আছে। ভেবেছিলাম মিশরের 'মমি'র মতোই কিছু দেখব। কিন্তু কী দেখলাম! কে বলবে এ দুটি মৃতদেহ। মনে হচ্ছে, এক্ষুনিই যেন দুজন ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেহের লোমকূপও স্পষ্ট দেখছি। না কোনো বিকার, না বিকৃতি। অথচ লেনিন দেহরক্ষা করেছেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে, এবং স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেও পাঁচটি বছর কেটে গেছে।

ডাক্তারেরা প্রধানতঃ হাসপাতাল দেখতেই এসেছেন। আমরা আনাড়ী ক'টিও ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। ওখানে দেখেছি, মৃতের দেহ থেকে চামড়া নিয়ে 'স্কিন-ব্যাঙ্কে' জমা রাখছে। পরে গ্রাফ্‌টিং-এর কাজে লাগাবে। মৃতের দেহের রক্তও ওদেশে পরীক্ষান্তে 'ব্লাড-ব্যাঙ্কে' জমা হয়। তবে সাধারণতঃ এসব দেহ দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তির। মৃতের রক্ত জীবিতের দেহে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, এ গবেষণা সম্ভবপর হচ্ছিল না। শেষে একদিন সুযোগ ঘটল। এক ইঞ্জিনীয়ার-সাহেব দেহ থেকে রক্তক্ষরণ ক'রে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এত রক্ত নিঃসৃত হয়েছিল যে, বাইরে থেকে রক্ত না দিলে তাঁকে বাঁচানো মুশকিল। ঠিক সেইসময়ে দৈবক্রমে দুর্ঘটনায় মৃত একটি দেহও পাওয়া যায়, এবং দু'দেহের রক্তেও সাদৃশ্য মেলে। যেহেতু ইঞ্জিনীয়ার-সাহেব জীবনকে নষ্ট করতেই উদ্যোগী হয়েছিলেন—তাই তাঁর দেহেই গবেষণা চালানো হয়, এবং সুফলও পাওয়া যায়। তারপর থেকে বিনা দ্বিধায় মৃতের রক্ত ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ ছাড়া আমরা রাশিয়ার বৃহৎ হাসপাতালের অন্যতম বট্‌কিন (Botkin) হাসপাতাল দেখেছি। দেখেছি অপারেশন-থিয়েটার, মেটারনিটি-হোমের ব্যবস্থা, আর বিকৃত-মস্তিষ্কদের জন্য 'ক্যাসান্‌কো হাসপাতাল'। রোগীদের হাতের কাজ, আঁকা ছবি দেখলে কে বিশ্বাস করবে—ওদের মনের ঠিকানা নেই। আবার একটি রোগী অভিযোগ জানাবার বোর্ডে লিখেছে, সীমা তর্জমা করে শোনাল—"এখানকার ফুলের বাগান সযত্ন-রক্ষিত নয়"।

মস্কোভা নদীর গা ঘেঁষে ৮০ মিটার উঁচু লেনিন পাহাড়। তারই উপরে ২৪০ মিটার উঁচু অদ্ভুত নূতন বিশ্ববিদ্যালয়টি। কেন্দ্রীয় সৌধটি ৩২-তলা। তাকে ঘিরে আছে আরো ৩৫টি সৌধ—দুই থেকে আঠারো-তলা উঁচু। চারিদিকের পরিবেশ অতি মনোরম। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো বাড়ি থেকে বিজ্ঞানের ছয়টি বিভাগ এখানে সরিয়ে আনা হয়েছে। এখানে ছয়হাজার ছাত্র এবং ১৩৮টি অধ্যাপক-পরিবারের বাসের বন্দোবস্ত আছে আর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যেই তাঁরা এক গোটা শহরের সমুদয় সুযোগ-সুবিধা পান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাসেম্ব্লি হল্‌'-টি খুব জমকালো। আমরা ঢুকতেই ২০০০-বাল্বের ঝাড়লণ্ঠনটি জ্বালানো হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে যেন চারদিকে স্বর্ণচ্যুতি ছিটকে পড়ল। এ ছাড়া ফিল্মের-সাহায্যে-শিক্ষাদানের অডিটোরিয়াম, ক্লাব অডিটোরিয়াম, খাবারঘর, পুস্তকাগারের ব্যবস্থাও চমৎকার।

হ্যাঁ, 'লেনিন লাইব্রেরি'ও দেখেছি বৈকি। পুস্তক-সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। এ ছাড়া প্রতিদিন নানা দেশ থেকে সদ্যপ্রকাশিত নানাজাতীয় পত্রিকা আসে। শুনেছি, পুস্তকাগারটির 'কার্ডিং সিস্টেম' এত সুন্দর যে, মাত্র দশ-মিনিটের মধ্যে যে-কোনো বই হাতে এসে পৌঁছাতে পারে। সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত লাইব্রেরির কাজ চলতে থাকে। এখানকার কর্মীর সংখ্যা দু'হাজার পাঁচশ', এবং তাদের মধ্যে চল্লিশজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন শুধু বইগুলিকে কীট-পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষার কাজে।

এত দূরদেশে এসে বাঙালী পরিবারে জন হয়ে বসব, ভাবিনি। কিন্তু সেটিও ঘটে গেল। শ্রীযুক্ত শুভময় ঘোষ ওদেশে অনুবাদ-বিভাগে কাজ করছেন। 'পিকিং' হোটেলে দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে পরিচয়। তিনিই আমাদের নিয়ে এসেছেন শ্রীযুক্ত সমর সেন ও শ্রীযুক্ত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করাতে। মিসেস সেন ও মিসেস চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক ব্যবহারে অপরিচয়ের বাধা আপনা থেকে কখন যে খসে গেছে টের পাইনি। বহুপরিচিতের মতো জিজ্ঞেস করেছি—"বেড-কাভার-খানার দাম কত?"

—"'ষোল' রুবল।" সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা বাৎলান, "প্রথমদিকে দাম শুনে আমাদেরও চক্ষুস্থির হ'ত। কিন্তু এদেশে আয়টাও অনেক বেশী কিনা, তাই এখন কিছু মনে হয় না। একজোড়া জুতো কিনতে যান, দাম হাঁকবে ৭০।৮০ রুবল, মেয়েদের একটা ওভার-কোট—৭০০।৮০০ রুবল।"

"সেটি টের পেয়েছি, সেদিন 'গুমে' (Gum—ডিপার্টমেন্ট-স্টোর) গিয়ে। কী বিরাট স্টোর, আর তেমনি ভীড়। অথচ আমাদের দেশের তুলনায় কত বেশী দাম এক-একটি জিনিসের। আচ্ছা, এখানে ঘরের কাজের জন্য লোক পাওয়া যায়?"

মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, "আমি কিছুদিনের জন্য এক বুড়ী ঝি রেখেছিলাম। মাইনে দিতে হ'ত ৩০০ রুবল, খেতে রুটি ডিম মাখন দুধ ফল। অবিশ্যি কাজ করত সব। ঝাড়পোঁছ করা, বাসন-মাজা, বাজার, রান্না, এমনকি ছোটখাটো কাপড় কেচে ইস্ত্রিও করত। এখন আমরা নিজেরাই করে নিই।—এবার, কী কী দেখলেন বলুন।"

"সিনেরামা আর পাপেট-শো দেখেছি। ব্যালে দেখব লেনিনগ্রাদে। সেদিন ট্রেটিয়াকভ আর্ট-গ্যালারি দেখতে গিয়েছিলাম। একাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে রাশিয়ার চিত্রকলার বিবর্তন ধরে ধরে সাজানো। ওখানেও তাজমহল আর আমাদের গরুর-গাড়ীর ছবি দেখলাম। ক্রামস্কয়ের আঁকা 'পুত্রবিয়োগান্তে গর্কি-পত্নী'র ও রেপিনের আঁকা 'আইভেন-দি-টেরিবল—পুত্রকে ছুরিকাঘাত করার পর' এই চিত্র দু'খানা এখনও যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। তা ছাড়া 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' বিষয়টি কেন্দ্র ক'রে আঁকা কয়েকখানা ছবি কৌতুকের সৃষ্টি করেছে।

"মেট্রো অর্থাৎ ভূগর্ভ-রেলপথও দেখেছি। এস্ক্যালেটর দিয়ে নেমে-নেমে কোন্ পাতালপুরীতে চলে গেলাম! স্টেশনগুলো কী পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর সুন্দর ঝাড়-লণ্ঠনে সাজানো! জাতীয় জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীও চিত্রিত রয়েছে দেখলাম।"

ওদিকে ডাঃ দাশগুপ্ত 'লিখাসভ মোটর ওয়ার্কস'-এর গল্প ফেঁদেছেন। —"ওটি মস্কো থেকে ১৫ মাইল দূরে। বিরাট কারখানা। ৫,০০০ ইঞ্জিনীয়ার কাজ দেখছেন। ফ্যাক্টরির নিজস্ব পলিক্লিনিক রয়েছে। ওঁদের ডাক্তারদের ইউনিট—ফ্যাক্টরির দুর্ঘটনারও তদারক করেন। মালিকের অসতর্কতা-ই দুর্ঘটনার কারণ প্রমাণিত হ'লে, ঐ ইউনিটই মালিকের জরিমানা ধার্য করেন। এজন্য আদালতে নালিশ পেশ করতে হয় না।—আর জানেন, রাশিয়াতে ডাক্তারেরা নাকি দিনে মাত্র ৬'৫ ঘণ্টা কাজ করেন।"

ইত্যবসরে চা এল। ওদেশে লেবু দিয়ে পাতলা লিকরের চা খায়। তাই চা-পানে তৃপ্তি হ'ত না। মাত্র এই দু'টো দিন চা ভালো লাগল। আজ, আর একদিন ভারতীয় দূতাবাসে চায়ের নেমন্তন্নে।

সেদিন রাষ্ট্রদূত-পত্নী আমাদের জন্য 'দহি-বড়া'র বন্দোবস্ত করেছিলেন, বিলিতী খানার মুখে ভালো লাগবে ব'লে। রাষ্ট্রদূত মিঃ মেননকে প্রশ্ন করেছিলাম—"সত্যিই কি এখানে 'আয়রন কার্টেন' ব'লে কিছু আছে? এক মঙ্গোলিয়ায় ছাড়া আর কোথাও তো ক্যামেরা নিতে বাধা পাইনি।"

উত্তর পেলাম: "আর্মেনিয়া সবার জন্য খোলা নয়। আমি অনেক চেষ্টার পর হালে যাবার অনুমতি পেয়েছি।" আমরা লেনিনগ্রাদ যাব শুনে বললেন, "ও শহরটি মস্কো থেকেও সুন্দর।"

সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বিতীয় মহানগরী লেনিনগ্রাদ সত্যই সুন্দর। নেভা নদী যেখানে ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরে মিলিত হ'তে যাচ্ছে—এমন একটি মনোরম পরিবেশে জার-সম্রাট পিটার-দি-গ্রেট এ শহরটির পত্তন করেন। তখন এর নাম ছিল সেন্ট পিটার্সবার্গ। নেভা নদী এখানে বিচিত্র-ধারায় প্রবাহিত হওয়ায় শহরটি ছোট ছোট দ্বীপে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে এবং চারশত সুন্দর সুন্দর সেতু দ্বারা ঐ অংশগুলি সংযুক্ত হয়েছে। আমাদের বাসের বন্দোবস্ত হয়েছে 'এস্টোরিয়া' হোটেলে—যেখানে একসময় রাজ্যের প্রধান প্রধান অতিথিদের পানে ভোজনে ও নৃত্যগীতে সংবর্ধিত করা হ'ত।

প্রথমদিন আমরা 'উইন্টার প্যালেস' দেখতে গিয়েছিলাম। ওর ভেতরের দু'শ' চল্লিশটি কক্ষে 'হারমিটেজ মিউজিয়াম'—জার-সম্রাটগণের কারুকার্যময় নানা দ্রব্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। নানা দেশের ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পের বহু মূল্যবান সংগ্রহ ওখানে সাজানো আছে। এ ছাড়াও দু-একটি বিশেষ আকর্ষণীয় জিনিস দেখেছি। যেমন পিটার-দি-গ্রেট-এর 'রাইটিং টেবল'। টেবিলটির উচ্চতা ও প্রস্থ থেকেই ওটির স্বত্বাধিকারীর অসাধারণ দীর্ঘদেহের অনুমান হয় আরেকটি—'ফাউন্টেন-অব-টিয়ার্স'। জারিনা দেহত্যা করেছেন—আর নিজের শোকাশ্রুর প্রতীক হিসেবে একটি 'ফাউন্টেন' রচনা করালেন। অশ্রুবিন্দুর মতো একটির প একটি বিন্দু পড়ছে ফোয়ারাটি থেকে। জনপ্রিয় কবি পুশকিন ওখানে একবার পুষ্পের অর্ঘ্য দিয়েছিলেন। সে থেকে রোজ টাটকা ফুল দেওয়া হয়—ঠিক যেখানে বিন্দুগু ঝ'রে-ঝ'রে পড়ছে।

'উইন্টার প্যালেস'-এর সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর। মাঝখানে এক বিশাল জয়স্তম্ভ। এখানেই একদিন সম্রাটের বিরা কসাক-সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ হ'ত। এখানেই সমবেত প্রজাবৃন্দকে জার-সম্রাট তাঁর প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে দর্শ দিয়ে কৃতার্থ করতেন। এখানেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারি সম্রাট নিকোলাস আলেকজান্ডারের আদেশে

বুভুক্ষু, বিপন্ন, নিরস্ত্র জনতার উপর নির্মমভাবে গুলী বর্ষণ করা হয়। অসহায় বালক-বৃদ্ধ-বনিতার রক্তে সেদিন নেভা নদী রাঙা হয়ে উঠেছিল। 'রক্তাক্ত রবিবার' রূপে ঐ দিনটি ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

রাস্তায় বেরিয়ে কত প্রাসাদ, উপবন, দুর্গ, গির্জা, পুস্তকাগার, হাসপাতাল দেখেছি; দেখেছি ক্যাথারিন-দি-গ্রেট-এর তোশামোদকারী-পরিবৃত মূর্তিটি। নেভা নদীর তীরে পিটার-দি-গ্রেট-এর অশ্বারোহী বিরাট মূর্তিটি দেখিয়ে লীনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এখনও তোমরা জার-সম্রাটের মূর্তি রক্ষা করেছ কেন?" উত্তরে লীনা বলেছিল, "আমরা তাঁদের শোষণনীতির বিরোধী, কিন্তু তাঁদের বহুমুখী গুণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্।"

মস্কোতে 'পাপেট-শো' দেখতে যেয়ে যেমন আমেরিকার দুটি ভ্রমণকারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, লেনিনগ্রাদের 'কিরভ স্টেডিয়াম' দেখতে এসে চেকোস্লোভাকিয়ার কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ ভালো ইংরেজী বলেন। সৈন্য-বিভাগে পারদর্শিতার ইনাম হিসেবে কয়েকটি মেডেল পেয়েছেন দেখলাম। খুব গর্বের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন—"আমি একজন দেশপ্রেমী।"

একদিন সকালবেলা 'প্যাভলভ ইন্‌স্টিটিউট'-এ প্যাভলভের গবেষণাগারে ঢুঁ মারলাম। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত ছুরী বেশ যত্নে রক্ষিত আছে। ঐ ইন্‌স্টিটিউটে এখন প্যাভলভের 'কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্স্' সম্বন্ধীয় নানা গবেষণা চলছে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমরা পেট্রোড্‌ভোরেট্‌স্-এর (Petrodvorets) বিখ্যাত ফাউন্টেন্‌স্ দেখতে যাব।

যাবার সময় গ্রামের পথ অতিক্রম করতে হ'ল। স্থানে স্থানে বিগত দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের ৯০০-দিন-ব্যাপী অবরোধের এক-আধটুকু চিহ্ন এখনও বর্তমান। দেখছি—কাঠের ছোটো-ছোটো সুন্দর বাড়ি, তাতে কৌলিডিসনের এক্তিয়ার। জানি না, ওগুলো কারো নিজস্ব সম্পদ কিনা। শুনেছি, ওদেশে বড় শহরে নিজস্ব বাড়িঘর করবার অনুমতি মেলে না। নিজের বাড়ি করতে হ'লে গ্রামে আসতে হয়। পথে পিটার-দি-গ্রেট-এর একটি প্রাসাদ দেখলাম। ওটি এখন কর্মীদের দীর্ঘ অবকাশে বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জার-সম্রাটদের গ্রীষ্মনিবাস পেট্রোড্‌ভোরেট্‌স্ ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরের কূলে অবস্থিত। এখানে আটাশটি রাজপ্রাসাদ আর একটি অতি মনোরম উদ্যান আছে।

এই উদ্যানেই ফোয়ারার রাজ্য, আর তাদের কত বিচিত্র নাম! একটি ফোয়ারার নাম 'কেভালিট'। ঘূর্ণায়মান কয়েকটি হাঁস ও কুকুরের মুখ থেকে জল প'ড়ে প'ড়ে হ্রদের সৃষ্টি করেছে। পাশে ইংরেজীতে লেখা আছে—হাঁসেরা কুকুরকে বলছে: "তুমি বলবান্ স্বীকার করি, এবং আমাদের হয়রান করতেও পার, কিন্তু এত বেশী বলবান নও যে আমাদের ধরতে পারবে।"

আবার একটি বর্তুলাকার চত্বরের বসবার আসনকে আচ্ছাদন ক'রে আছে একটি বিরাট ছাতা—নাম 'চাইনিজ আম্‌ব্রেলা'। অনেকে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে ওখানে বিশ্রাম নিতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ধারায় ছাতা বেয়ে জল পড়তে লাগল। না ভিজে বেরোবার জো নেই। আর এক কাণ্ড, একটি কৃত্রিম ওক-গাছ থেকে অনবরত জল ঝরছে। জলের ছিটে বাঁচিয়ে পথ চলতে হ'লে কতগুলো পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে চলতেই হবে। কিন্তু যে-মুহূর্তে ঐ নুড়িতে পা পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাধারার জল ছিট্‌কে আসছে। ব্যাপার কী! হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল—দুটি লোক নিকটবর্তী ঝোপের আড়ালে বসে ঐ বর্ষণের কলকাঠি নাড়ছে। অতীতে জার এবং জারিনাগণ অতিথি-পরিবেষ্টিত হয়ে এখানে কত সায়াহ্ন কত কৌতুকেই না অতিবাহিত করেছেন!

আর একটি কথা। এখানকার কয়েকটি বিশেষ ধরনের ফোয়ারার সঙ্গে মহীশূরের 'বৃন্দাবন গার্ডেন্‌স্'-এর কয়েকটি ফোয়ারার সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। এ ফোয়ারাগুলির প্রাচীনত্ব অনস্বীকার্য ব'লে, মনে হয়, 'বৃন্দাবন গার্ডেন্‌স্' পরিকল্পনায় প্রধান কর্ণধার এই উদ্যানটি পরিদর্শন করে চমৎকৃত হয়েছিলেন—এবং মহীশূরের ঐ উদ্যান-রচনায় এ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর কল্পনার সংমিশ্রণে অমন দুর্লভ সৌন্দর্য-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

লেনিনগ্রাদের সুবৃহৎ মেটার্নিটি-হোম 'স্নেগেরভ (Snegirov) হস্পিটাল' দেখেছি। নানা ব্যায়ামের সাহায্যে মায়েদের সহজভাবে সন্তান-প্রসবের উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে এবং উৎসাহ-বাক্যের দ্বারা প্রসবকালীন ভীতি দূর করবার চেষ্টা চলছে। 'পেইনলেস্ ডেলিভারি'র জন্য কোনো ঔষধ প্রয়োগ করা হয় না। দৈহিক ও মানসিক এই প্রক্রিয়াগুলি দ্বারাই ডেলিভারি 'পেইনলেস্' করা হয়। ১৫।২০ মিনিটের ফিল্মে ঐ-সংক্রান্ত ছবি দেখলাম। প্রসূতিকে বলা হচ্ছে: "তোমার দিদিমা-মা'র মতো তুমিও আজ মা হ'তে চলেছ। মেয়েদের জীবনে এ অতি স্বাভাবিক অবস্থা, এবং এজন্য তোমাকে বাইরে থেকে কেউ সাহায্য

করবার নেই। নিজেকে নিজে সাহায্য ক'রে তোমাকে 'মা' ডাক শুনতে হবে।"

মস্কোতে 'ইণ্ডো-রাশিয়ান ফ্রেণ্ড সোসাইটি'র আহ্বান রক্ষা করতে যেয়ে ওদের সাদর ব্যবহারে আপ্যায়িত হয়েছিলাম। কিন্তু লেনিনগ্রাদের 'কিশোর-প্রাসাদ'-এর কিশোর-কিশোরীদের প্রাণোচ্ছল সহজ সরল আনন্দোচ্ছ্বাস যেন ভুলবার নয়।

রুশদেশের শহরে শহরে কিশোর-কিশোরীদের জন্যে 'পাওনিয়ার্স প্যালেস' রয়েছে। লেনিনগ্রাদের এ বিরাট প্রাসাদটি জার-আমলের। তিনশ' কক্ষ। 'কিশোর-প্রাসাদ' বিদ্যালয় নয়, ক্লাব। সাত থেকে আঠারো-বছরের কিশোর-কিশোরী সভ্য হতে পারে। এখানে অভিনয়, নৃত্যগীত, চিত্রবিদ্যার ব্যবস্থা তো আছেই, তা ছাড়া পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং রসায়নের বিভিন্ন বিভাগ দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। নিজেদের প্রবণতা অনুসারে কিশোরেরা আপন আপন বিদ্যা নিজেরাই নির্বাচন করে এবং সপ্তাহে দু'দিন ঐ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভ করে। কোন্ কিশোর-কিশোরীকে কোন্ বিষয়ে শিক্ষিত করলে দেশ ও জাতি অধিকতর লাভবান্ হবে, 'পাওনিয়ার্স প্যালেস' থেকে অনায়াসে সে-নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে।

ওখানকার জ্যোতির্বিজ্ঞান-কক্ষটি চমৎকার। আলো নিবিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে অগণিত তারকাবলীর মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী আবর্তিত হ'তে লাগল। গল্প শেখাবার জন্যে পুশ্‌কিন ও গর্কির দুটি কাহিনী ফ্রেস্কো করা আছে দেখলাম। মোট কথা, আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভের পরিপূর্ণ সুযোগ এখানে আছে। তাই ব'লে ওরা স্কুলের পড়ায় গাফিলতি করতে পারে না। ওখানকার ডাইরেক্‌ট্রেস্ জানালেন, যদি কোনো কিশোর স্কুলের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়, তবে প্রাসাদের 'কিশোর সঙ্ঘ' তাকে পুনরায় কৃতকার্য না হওয়া পর্যন্ত প্রাসাদ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত করে।

আমরা ডাইরেক্‌ট্রেসের ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে এক-দল কিশোর-কিশোরী সোল্লাসে আমাদের হাত ধরে নৃত্যগীত শুরু করে দিল—যেন কতদিনের জানা-চেনা। আমরাও ক্ষণিকের জন্য বয়সের ব্যবধান ভুলে পরম কৌতুকে যেন ওদেরই একজন হয়ে উঠলাম। এদেরই একটি কিশোরী আমাদের এক সঙ্গীর ডাইরিতে লিখেছিল—"তোমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইল।"

মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদ যেতে আসতে রেলে চড়েছি। করিডোর-ট্রেন—তাতে দুই শ্রেণী—নরম ও শক্ত। শক্ত শ্রেণীতেও রাতের জন্যে ধব্‌ধবে বিছানা ও কম্বল মেলে। এক-একটি কামরায় চারটি করে বার্থ। প্রতি বার্থের সঙ্গে বেড-লাইট। আয়না, টেবিলও আছে। সীটের তলাটির নীচে একটি বাক্স। জিনিসপত্র ওর ভিতরে রাখা চলে, অথবা করিডোরের উপরের তাকে। সব-কিছু এত পরিচ্ছন্ন যে, মনে হয় ট্রেনখানা যেন এক্ষুনি কারখানা থেকে বের করে আনা হয়েছে। ভাবছিলাম, আমাদের দেশেও যদি এমন হ'ত! কিন্তু হবার আগে, এ-জিনিস রক্ষা করবার শিক্ষারও যে প্রয়োজন।

শুধু ট্রেনে নয়—যেখানে গেছি সর্বত্র পরিচ্ছন্নতা। রোগ-বীজাণু-নাশক দ্রব্যাদির ব্যবহার অকৃপণ ব'লেই হয়তো মশা বা মাছির উপদ্রব কোথাও দেখিনি।

এমন একটি সুষ্ঠু পরিবেশে কয়েকটা দিন অতি আনন্দে কাটানো গেল।

ওদেশের নারী-সমাজ সাধারণতঃ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করেন। তাই ব'লে বৃত্তি বাধ্যতামূলক নয়। ইচ্ছানুসারে স্বামীর আয়ে স্ত্রীর জীবিকা-নির্বাহ হ'তে পারে; তবে বিপত্তির দিনে তাকে পরিশ্রম করেই খেতে হবে। সরকার কোনো ভাতার বন্দোবস্ত করবেন না। নীনা বলছিল—"আমাদের সরকারের নীতি: অলস ব্যক্তি উপোসী থাকুক।"

না না, গির্জা বা মস্‌জিদে যেতে বাধা নেই। একজন ইংরেজির অধ্যাপিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল; বললেন, "আমার একটি মাত্র ছেলে; শিক্ষাসমাপনান্তে সে ধর্মযাজক হবে।"

বলি—"তুমি কি তাতে সুখী হবে?"

উত্তর পেলাম—"নিশ্চয়। আমি ধর্মে বিশ্বাস করি।"

•

বিমানঘাঁটিতে বসে আছি। বিদায়ের মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। জানি, দেশের বন্ধুদের কেউ কেউ হয়ত বলবেন—"বেছে ভালো তাই দেখে এসেছ—এতো বাহ্—"। কিন্তু আমি তো এত দূরদেশে ক্লেদের সন্ধানে আসিনি। যা সুন্দর—যা গ্রহণযোগ্য—আমার দেশের জন্য আমি সেই স্মৃতিই বহন করে নিয়ে যাব। আমাদের দেশকে অন্যদেশের ছাঁচে ফেলে গড়তে তো চাই না। আমাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে অন্যদেশের বৈশিষ্ট্য মিশে আমার ভারত আরও সুন্দর হোক—এই তো আমার কামনা।

পূর্বস্মৃতি

শরৎকুমার মিত্র

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

১৮৯০

১

এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পরেই, একদিন প্রাতে জানকীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বাটীতে আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন বাবার কাছে। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিবেন। তাঁহার নিজের পুস্তক কিনিয়া পড়িবার সামর্থ্য নাই। এবং তিনি নিকটেই থাকেন। এই অভিপ্রায়ে বাবার সহিত আলাপ করা। যখন তিনি প্রথম আসিলেন, আমি বাবার কাছেই ছিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঠ্যপুস্তক ছাড়া কি কি বই পড়েছ?" জানকীবাবু বলিলেন, "কিছু নয়।" বাবা বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার এ পরীক্ষা না দেওয়াই ভাল। যদি দিবেই স্থির করিয়া থাক, অন্তত বছর দুই পড়িতে থাক বাইরের বই।" জানকীবাবু বলিলেন, "কিন্তু একখানা খুব বড় বই যাহা পাঠ্য নয় তাহা একেবারে মুখস্থ করেছি।" বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে বইটা কি?" উত্তরে জানকীবাবু বলিলেন, "*Webster's Dictionary.*" বাবা হাসিয়া বলিলেন, "সর্বনাশ! যে এ কাজ করতে পারে, তার কোন আশাই নাই, তবে তার অসাধ্য কিছু নয়। কিন্তু এ পরীক্ষা মুখস্থ নয়।"

যাহা হউক তিনি আমাদের লাইব্রেরী হইতে ইংরেজী ও সংস্কৃত খুব পড়িতে লাগিলেন। সকাল ও সন্ধ্যায় প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের জন্য আমার সহিত দাবা খেলিতেন। দুই তিন দিন ৫।৬ দান খেলিলাম, সবই হারিলাম। জানকীবাবু বিখ্যাত দাবা-খেলোয়াড়। চতুর্থ দিনে এক দান চটিয়া গেল। জানকীবাবু আমাকে অনুরোধ করিলেন সন্ধ্যার সময় তাঁহার দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের বাড়ীতে গিয়া দাবা খেলিতে। আমিও প্রায় প্রতিদিনই যাইতাম এবং কখন কখন জিতিতাম। তাঁহার সহিত খুব আলাপ হইল। একটা জিনিষ তাঁহার ভাল লাগিত—তাঁহার বাচালতা ও বাক্পটুতা। আমি সর্বদা বাবাকে এই কথা বলিতাম। জানকীবাবু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইলেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত ভাগাভাগি করিয়া। সেইবারেই ই. এম. বটলারও ঐ বৃত্তি পান। জানকীবাবু পরে বি. এল্. পাস হইলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ত কথা ও তর্কের ওস্তাদ, তুমি হাইকোর্টে ওকালতি কর।" তাহাই তিনি করিলেন, কিন্তু তাহা অতি অল্প দিনের জন্য। অত বাক্পটু, অত বিদ্বান ও কলেজের নামজাদা অধ্যাপক, সামান্য একটা একত্র কথা আদালতে বলিতে কাঁপিয়া অস্থির। তিনি ওকালতি ছাড়িয়া দিলেন এবং রিপন কলেজের সাধারণ বিভাগের অধ্যাপক এবং আইন বিভাগের প্রিন্সিপাল হইলেন।

২

সর্পের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে কিনা তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের এবং জনসাধারণের বিশেষ মতদ্বৈধ আছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক নাকি বলেন সর্পের শ্রবণশক্তিই নাই, থাকিলেও বাজনায় তাহারা বিচলিত হয় না। আমি কিন্তু একটা

ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং বুঝিতে পারি নাই। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পর আমার পিসেমহাশয়ের বাড়ী ক্যাকশিয়ালি চুঁচুড়ায় ছিলাম। তাঁহার এক আত্মীয় হুটুক প্যারিলাল মজুমদার তাঁহার বাড়ীর নিকটে থাকিতেন। সেখানে আমার খুব যাতায়াত ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামলাল আমাদের স্কুলের ছাত্রাবাসে বিনাবেতনে থাকিতেন এবং পরে ঐ স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। তাহার পর ঐ স্কুলেই শিক্ষক ছিলেন। তিনি মাত্র এন্ট্রান্স পাস ছিলেন। কিন্তু ইংরেজী খুব ভাল জানিতেন।

একদিন বৈকালে প্যারিবাবুর বাটী গিয়া দেখি তিনি একটি বড় ঝোপের আড়ালে সেতার বাজাইতেছেন। তিনি খুব ভাল সেতার বাজাইতে পারিতেন। আমি সেখানে গেলাম ও তন্ময় হইয়া শুনিতেছি, এমন সময় দেখিলাম ঝোপ হইতে একটি বৃহৎ গোখ্‌রো সাপ বাহির হইয়া প্যারিবাবুর পশ্চাতে ফণা বিস্তার করিয়াছে। ফণাটি উচ্চ করিয়া দুলিতে লাগিল। আমি ছাড়া আরও ৫।৭ জন লোক ছিলেন। তাঁহাদের একজন প্যারিবাবুকে কানে কানে সর্পের কথা বলিলেন। প্যারিবাবু তাঁহার মধ্যম পুত্র হরিবোলাকে ডাকিতে বলিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন যে খুব বড় একটা সাপ আছে তিনি জানেন এবং একটা বড় বাঁশ আনিয়া সাপটা চাপা দিতে। তাহা না হইলে বাজনা থামিলেই সাপ কামড়াইয়া দিবে। প্যারিবাবু বরাবর বাজাইয়া চলিয়াছেন। তিনি বাজাইতে আরম্ভ করিবার প্রায় একঘণ্টা পরে সাপটার পেটের উপর বাঁশটা চাপাইয়া তাহাকে জখম করিয়া মারা হইল। এদিকে প্যারিবাবুও অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

১৮৯১

১

বৎসরের প্রায় শেষ। আমাদের ইংরেজীর প্রফেসর এফ. জে. রো ইতিহাস 'পড়াইতেছিলেন' অর্থাৎ গল্প করিতেছিলেন ও কিছুক্ষণ ইংরেজী পড়াইতেছিলেন। আমাদের ইতিহাসের প্রফেসর ছিলেন ট্যাক্, সি. এ কিন্তু তাঁহার ইতিহাস পড়ান ঘৃণিত ছিল। কারণ তিনি আমাদেরই এফ-এ পরীক্ষায় "পেপার-সেটার" হইয়াছিলেন। ট্যাক্ সাহেবকে আমরা বেশ ভালবাসিতাম কারণ তিনি Historyও ভাল পড়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে বেশ মজার গল্প বলিতেন। একটা গল্প এই :—তাঁহার এক বড় কুকুর ছিল। বড় ভালবাসিতেন। সে কুকুর হারাইয়া গেল। কিছুদিন পরে একটা ফিরিঙ্গি তাহাকে একটা কুকুর বেচিতে আসিয়াছিল। কুকুরটা আসিয়াই ট্যাক্ সাহেবের কাছে গিয়া তাঁহার হাত চাটিতে লাগিল। কুকুরটা হারান কুকুরের মাপের, কিন্তু হারান কুকুরটি সাদা ছিল, এটা ব্রাউন। ট্যাক্ সাহেবের বড় আনন্দ হইল। দরদস্তুর করিয়া কুকুরটি ৩০০্ তিনশত টাকা দিয়া কিনিয়া ফেলিলেন। পরদিন কুকুরটিকে সাবান মাখাইয়া স্নান করান হইল। আবার পরদিন স্নান করান হইল, তখন ২।১ স্থানে সাদা রং বাহির হইল। তৎপর দিন স্নান করাইতে সবটাই সাদা বাহির হইয়া পড়িল। তখন ট্যাক্ সাহেব দেখিলেন তাঁহারই কুকুর তাঁহাকে বেচিয়া গিয়াছে। ট্যাক্ সাহেব একলাই একটা ঘরে থাকিতেন এবং বড় "untidy" ছিলেন। এক এক সময় আসিতেন প্যান্টালুনে তালি দেওয়া, কোন কোন সময় জুতার দুই পাটি দুই রকম থাকিত।

এদিকে যখন রো সাহেবের উপর ইতিহাস পড়ানর ভার পড়িল, তিনি প্রথম দিনই বলিলেন, "History of Greece and Rome-এর আমার কিছুই মনে নাই, কেবল Second Punic War-এর বিষয় কিছু মনে আছে, কারণ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইংরেজীর পেপার-সেটার হওয়ায় ঐটে আমাকে পড়িতে হইয়াছিল।" তাই তিনি ঠিক করিয়াছিলেন যে দুই ক্লাসই ইংরেজী পড়াইবেন। কিন্তু তখন আমাদের সহিত উঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই, এবং আমরা তখন প্রফেসর এইচ. এম. পার্সিভ্যাল-এর ভয়ানক admirer। তিনিই ফার্স্ট ইয়ার-এ ইংরেজী পোয়েট্রি পড়াইতেন। সেকেণ্ড ইয়ার-এ তাঁহার চেয়ে সিনিয়র প্রফেসর এফ. জে. রো পড়াইতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই টেনিসন-এর একটা প্যাসেজ-এর ব্যাখ্যা লইয়া গোলযোগ বাধিল—পার্সিভ্যাল সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সহিত রো সাহেবের অমিল হইল। আমরা পার্সিভ্যাল সাহেবের ব্যাখ্যাই ঠিক বলিলাম। রো সাহেব বলিলেন—"পার্সিভ্যাল সাহেব মিল্টন বা সেক্সপীয়রের অথরিটি হতে পারেন, টেনিসনে নন—টেনিসনের আমি অথরিটি এবং সন্দেহস্থলে আমি পোয়েট-কে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি।" তবু আমরা দমিলাম না। আমি বলিলাম—"কবির নিজেদের মত নিয়ে কথা নয়, পাঠকরা কি মনে করে তাই নিয়ে কথা। শুনেছি জার্মান কবি হাইন (Heine)-এর বিষয়ও এই কথাই হয়েছিল।"

এ ঘটনাটা রো সাহেবের সহিত হইয়াছিল ইতিহাস পড়াইবার বহু পূর্বে।

যাহা হউক রো সাহেব যখন দুই ঘণ্টা উপর্য্যুপরি ইংরেজী পড়াইতে লাগিলেন আমরা বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। দুই চারি দিন পরেই একটা মজার কাণ্ড হইল। দুই ঘণ্টা পড়ান শেষ হইতেই অধিকাংশ ছাত্র হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল এবং ২৫।৩০ জন একসঙ্গে আওয়াজ করিয়া বই বন্ধ করিল। তাহাতে একটা বন্দুক ছোঁড়ার মত আওয়াজ হইল। রো সাহেব ইহাতে বিরক্ত হইয়া কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে প্রথম বই বন্ধ করিয়াছে। যাহাদের তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কেহই করে নাই ও জবাব দিল না। (স্যার) ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাবা মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল বলিতে যে সে প্রথমে করিয়াছে। কিন্তু সে একটু তোতলা ছিল, তাহার একটু সময় লাগিয়াছিল। তাহার কথা উচ্চারণ হইবার আগেই রো সাহেব বলিয়া উঠিলেন—"Monumental liars"। আমি তাঁহার চেয়ারের পার্শ্বের প্রথম বেঞ্চ-এ ছিলাম। আমি বলিয়া উঠিলাম—"Pyramidal liar"। ঘণ্টা শেষ হইল এবং রো সাহেব চলিয়া গেলেন। আমরা কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম না। পরেই পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন পড়াইতে আসিলেন। তাঁহার সহিত সকলের সদ্ভাব। তাঁহার সহিত পরামর্শ করা হইল। কি করা যায়। আমরা অনেক বলিলাম, প্রিন্সিপাল টনি সাহেবের কাছে রো সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করা যাক। পণ্ডিত মহাশয় পরামর্শ দিলেন যে তাহাতে কিছু হইবে না; টনি সাহেব যতই খাঁটিলোক হউন না কেন, সাহেবে সাহেবে মুখ শোঁকাশুঁকি, তিনি বলিবেন তোমরাও ত অন্যায় করিয়াছ। আমি বলিলাম, কিন্তু রো সাহেব সমস্ত জাতটাকে গাল দিয়াছেন। আমি একজনকে দিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তাহা হউক, তোমরা রো সাহেবকে নিজেকে বয়কট কর"। তাহাই সাব্যস্ত হইল।

ব্যাপারটার কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই যে, এই ঘটনার কিছু পূর্বে ঐ "*expression*"—*monumental liars* একজন আমেরিকান এপিস্কোপাল বিশপের মুখে বাহির হয়। তিনি ভারতবর্ষ বেড়াইয়া আমেরিকায় ফিরিয়া ভারতবাসীদের characteristic ঐ কথায় প্রকাশ করেন। এবং কলিকাতার ইংরেজী খবরের কাগজে তাহা প্রকাশ করেন। কথাটি বেশ শুনিতে ভাল, এবং কথাটি রো সাহেবের নিশ্চয় মনে ছিল। সেদিনের ঐ ঘটনায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আমরা বয়কট করিয়াছিলাম যে তিনি আমাদের প্রফেসর হইয়া আমাদের জাতিকে গাল দিলেন বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। বয়কটখানা কে গিয়া দিবে তাহা লইয়া একটু গোলমাল হইল। আমি বলিয়াছিলাম (স্যার) চারুচন্দ্র ঘোষকে দিতে, কারণ তিনি খুব চাল করিতেন যে ইংরেজী খুব জানেন, ও কাহাকেও ভয় করেন না। অবশেষে আমি ও অপর ৬।৭ জন গিয়া দিলাম, রো সাহেব পড়াইবেন বলিয়া সেই আসিতেছিলেন। বারাণ্ডাতেই দেওয়া হইল তিনি ক্লাস-এ ঢুকিবার আগেই। তিনি বয়কট পড়িলেন এবং বলিলেন, "আমার মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া গিয়াছিল, আমি বড় দুঃখিত, তোমরা কিছু মনে করিও না।" আমরা সব ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম, নড়িলাম না। রো সাহেব আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ইহাতে সন্তুষ্ট নও? কি চাও বল?" আমাদের মধ্যে একজন বলিল, "ক্লাসে গিয়া বলিলে ভাল হয়।" রো সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা চল।" ক্লাস-এ আসিয়া তিনি প্লাটফরম্-এর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াই বলিলেন, "My friends, I have been a Professor a quarter of a century almost and have never been at arms with my pupils, I am extremely sorry, I have said that and ask you to excuse me"—বলিয়া তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ব্যাপার এইখানেই শেষ হইল। কিন্তু আমাদের সকলের মনের অবস্থা কি হইল তাহা সহজেই অনুমেয়, এবং এই অবস্থা অনেকদিন ছিল। তাহার পর যে কয়দিন রো সাহেব পড়াইয়াছিলেন, আমাদের তাঁহার সহিত খুব সদ্ভাব।

৫

আমার এক দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাইয়ের (পরে তিনি আরও দূর সম্পর্কে হইয়া যান, কারণ নড়াইলের রায়েদের কোন বাড়ীতে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র লয়—কিন্তু বাবা আমার ভাইয়ের নাবালক Guardian থাকায়, আমরা খুব নিকটাত্মীয় যেন ছিলাম) বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার সময় গান-বাজনার এক বৈঠক হয়। আমি গিয়াছিলাম, গিয়া দেখি একা মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়া আছেন। তিনি নোট জাল করার জন্য জেলে যান। এবং আদালতের রায় ছিল ৭ বৎসর সশ্রম জেল। ইনি সকল প্রকার বাজনায় খুব পারদর্শী ছিলেন।

শুনা যায়—তিনি ইংরেজ Jailor-এর পত্নীকে বাজনার পারদর্শিতায় চমৎকৃত করায় তাঁহাকে তিন বৎসর জেল খাটিবার পর ছাড়িয়া দেয়। তিনি আমার পরিচয় পাইয়া তাঁহার পার্শ্বে আমাকে বসাইয়া বলিলেন—"গান-বাজনা কিছু জান?" আমি বলিলাম—"না। সুযোগ ছিল শিখিবার, বাবার মক্কেল ছিলেন মন্টুবাবু, তিনি শিখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু বাবা দেন নাই।" মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—"কে মন্টুবাবু—হুগলির প্রাণকৃষ্ণ হালদারের ভাইপো?" প্রাণকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতেই পরে হুগলি কলেজ হয়। তিনিও নোট জাল করিতেন। আমি বলিলাম, "হাঁ।" মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "বেশ ভাল লোক পাইয়াছিলে, আর তোমার শেখা হইল না। বড় দুঃখের কথা।" আমি বলিলাম, "বাবা আমার মামার মামাতো ভাইয়ের এক খুব ভাল টেবিল হারমনিয়াম বাঁধা রাখিয়াছিলেন। সেই হারমনিয়ামটা একদিন টুংটাং করিয়া দুপুর বেলা বাজাইতেছিলাম, এমন সময় মন্টুবাবু আসিয়া উপস্থিত। তখন বাবা হাইকোর্টে। মন্টুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাজাইতে জানি নাকি?' আমার বড় লজ্জা হইল। আমি বলিলাম, 'না'। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় জানো, শুনে মনে হচ্ছিল একটা গৎ বাজাইতেছ।' আমি বলিলাম, 'না-না, কিছুই জানি না।' তিনি বলিলেন, 'লজ্জা কি, আমি শিখাইব। তুমি গাইতে জান?' আমি বলিলাম, 'না'। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় জানো। গাইতে না জান, গান তো জান দুই একটা।' আমি বলিলাম, 'না, তাও জানি না।' তিনি বলিলেন, 'একথা মিথ্যা। অন্ততঃ পায়খানায় গিয়েও ত গুন্ গুন্ কর। তাহা হইলেই হইবে।' এমন সময় বাবা হঠাৎ সকাল সকাল বাড়ী ফিরিলেন। সেই গান বাজনায় শেখানো আরম্ভ ও শেষ।"

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আচ্ছা একটা জিনিষ ছাখো" এবং দেশীয় বহু প্রকার যন্ত্র—তানপুরা, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, জলতরঙ্গ প্রভৃতি বাঁধিলেন, এবং তবলায় চাঁটি দিলেন।

সেকালে অধিকাংশ লোক ভাবিতেন, গান-বাজনা শিখিলেই অসৎসঙ্গ হইবে ও ছেলে খারাপ হইয়া যাইবে। যখন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমার বড় ছেলে ও দুই মেয়েকে, বয়স ১৪, ১২, ৮, (স্যার) আশুতোষ চৌধুরী ও তাঁহার স্ত্রী প্রতিভা দেবীর 'সঙ্গীত সঙ্ঘে' দিয়াছিলাম, বাবা বড় রাগ করিয়াছিলেন। বলিতেন, "আমি আগে মনে করিয়াছিলাম, শরতের বড় ছেলেই আমার নাম রাখিবে, কিন্তু তাহার বাপের জন্ত আর তাহা হইবে না দেখিতেছি।"

এর অনেক বছর পরে হাওড়া টাউন হল-এ 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা'র বার্ষিক অধিবেশন হয়। এবং স্থির ছিল "ওপেনিং সং" (উদ্বোধন সঙ্গীত) করিবেন শিবপুর নিবাসী মন্মথনাথ দত্ত (যাঁহার রেকর্ড সব আছে)। তিনি সময়ে উপস্থিত হইলেন না। কারণ তাঁহাকে আনিতে গাড়ী পাঠান হয় নাই, যদিও তিনি বলিয়াছিলেন, পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই। তখন বাবা ও Statutory Civilian বরদা মিত্র—আমার বড় ছেলে, বড় মেয়েকে (যাহার পরে এলাহাবাদে বিবাহ হয়) বলিলেন, "তোরা একটা গান গাইতে পারবি?" তাহারা বলিল, "পারবো।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গান গাইবি?" তাহারা বলিল, "বেদগান।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, কিন্তু ভয় পাবি না তো?" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি ত বেশ করিলে, ওদের মনে একটা stage fright করিয়ে দিলে।" তিনি স্বীকার করিলেন, "এটা ঠিক বলেছিস।" পরে যখন তাহারা বেদগান—

'সংগচ্ছ ...

গাহিয়া হল ভর্তি শ্রোতাদের চমৎকৃত করিল, তখন বাবা খুব আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি মনে করিতাম, আমাদের রক্তে গান-বাজনার উৎস নেই, কিন্তু দেখছি আছে।"

তাহার পর যখন ১৯১৭ সালে যে মাসে খুব পীড়িত হইয়া পড়িলেন, এবং প্রায় শয্যাগত ছিলেন, ৪ মাস প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমার বড় ছেলে ও দুই মেয়েকে ডাকিয়া বলিতেন,—"শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, তোরা একটু বাজনা দিলে, আর গান কর।" তাহারা সেতার ও এস্রাজ বাজাইত, ও মধ্যে মধ্যে গান করিত।

বাবা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পরলোকগত হন।

৩

আমাদের সেকেণ্ড ইয়ার আরম্ভ হইবার পর শীতের প্রারম্ভে স্নাকেটের আমদানী হইল এবং ঐ যন্ত্রের অদ্ভূত ব্যাপার লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছিল। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ছিলাম। একদিন আমাদের ইংরেজীর অধ্যাপক আসিলেন না, তিনি হাইকোর্টে জুরী ছিলেন। আমরা ২।১ জন খুব সাহস করিয়া প্রিন্সিপাল টনির কাছে গেলাম এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, আমাদের পড়াইতে। অভিপ্রায়—অতবড় নামওয়ালা ইংরেজী অধ্যাপকের পড়ান কিপ্রকারে শুনিব। টনি সাহেব বড় রাশভারি লোক ছিলেন, তাঁহার কাছে সহজে কেহ যাইত না। তিনি আমাদের পড়াইতে রাজী হইলেন না। বলিলেন প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই। বই যাহা পড়াইবার কথা, Hughes-এর 'লিভিংষ্টোন'—অতীব সোজা বই।

কিন্তু তিনি তবুও রাজী হইলেন না। বলিলেন, আগে হইতে পড়িয়া না আসিলে কত কি জিনিষ "ওভারলুকড্" হইয়া যাইতে পারে। তিনি আমাদের সে ঘণ্টা ছুটী দিলেন।

আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু হোস্টেলে ১০।১২ জন চলিলাম। সেখানে আমাদের এক সহপাঠী সুরেশ প্লাঞ্চেট আনাইয়াছিল। 'Hindu Hostel' প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদেরই জন্য হয়। প্লাঞ্চেট দুইজন ধরিল, সকলে নির্বাক দেখিতেছি। প্লাঞ্চেট নড়িতে আরম্ভ করিল। সুরেশ প্লাঞ্চেটের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?" প্লাঞ্চেট লিখিল, সুরেশের বাবার নাম, অর্থাৎ তাহার পিতার আত্মা আসিয়াছেন। তাহার পর প্রশ্ন চলিতে লাগিল পর্যায়ক্রমে। কিন্তু সুরেশ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহার বাবার ত কোন অসুখ ছিল না। তিনি না মরিলে তাঁহার আত্মা কি করিয়া আসিতে পারে? আমার হঠাৎ মনে হইল, মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন কি আত্মাটা শরীরে থাকে? স্বপ্ন দেখা হইতে সন্দেহ হয় শরীরে থাকে কিনা? আমি তাহা বলিলাম, এবং সুরেশকে বলিলাম, "তুমি অত বিচলিত হইতেছ কেন? হয়ত তিনি ঘুমাইতেছেন, তাহাও ত হইতে পারে।" সুরেশের পিতা ভাগলপুরে থাকিতেন।

ঘণ্টা প্রায় ফুরাইল। আমরা কলেজে চলিলাম, সুরেশ থাকিয়া গেল। সে ভাগলপুরে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করিল। আমাদের ৪টার সময় কলেজ ভাঙিবার সময় টেলিগ্রামের উত্তর আসিয়া গেল যে, পিতা মৃত, যে সময় প্লাঞ্চেট চলিতেছিল, তাহার কিছু পূর্বে মারা গিয়াছেন।

তাহা হইলে আত্মা কি পুত্রকে দেখিতে আসিয়াছিল? সন্দেহ হইল, প্লাঞ্চেটে কতকটা বিশ্বাস হইল। আর বলিতাম না 'Plan-to-cheat'. পরে মাদাম ব্লাভাট্স্কি, স্যার অলিভার লজ, প্রফেসর টিণ্ডালের পুস্তক পড়িয়াছি।

[ক্রমশঃ]

—

'পূর্বস্মৃতি'তে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪-১৯৩২): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে সরকারী অফিসে এবং পরে শিক্ষাব্রতী রূপে কার্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশনের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধানশিক্ষক পদে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হন; রিপন কলেজ, সিটি কলেজ ও মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান 'বিদ্যাসাগর কলেজ') মনোবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতির অধ্যাপনা করেন। তিনি [illegible] মর্টন স্কুলেরও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। পাঁচখণ্ডে লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' মহেন্দ্রনাথের অপূর্ব কীর্তি।

উড্রোফ, স্যার জন (১৮৬৫-১৯৩৬): [illegible] কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯০৪-২২) ছিলেন; অবসরগ্রহণের পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বরাবর ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। উইলিয়ম আর্চার একখানি পুস্তকে ভারতীয় সভ্যতার নিন্দা করিলে, উড্রোফ উহার প্রতিবাদে *Is India Civilised* লিখিয়া [illegible]। তিনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করেন। তাঁহার এই কার্যে প্রধান সহযোগী ছিলেন হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অটলবিহারী ঘোষ।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। প্রথমে রিপন কলেজে (বর্তমান 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ') ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদে ব্রতী হন। কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মৃত্যুর পর তিনি কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ (১৯১৯-২০) হন। পরে তিনি এই পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়া প্রায় দুই বৎসর কাল কাজ করেন। তাঁর অধ্যাপনার খুব প্রসিদ্ধি ছিল।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২): বিখ্যাত মুৎসুদ্দী দ্বারিকানাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় অতি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অ্যাটর্নী রূপে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া মিসেস অ্যানি বেসান্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। প্রতিষ্ঠাবধি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনকালে আবির্ভূত 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর তিনি অন্যতম কর্ণধার। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এবং 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তিনি কখনও সম্পাদক কখনও সহকারী সভাপতি এবং কখনও সভাপতি রূপে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' 'বেদান্ত পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য দিবে। তিনি সুবক্তা, লেখক এবং সাহিত্য-সাধক রূপে পরিচিত ছিলেন।

রো, এফ্. জে.: প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক (১৮৭০-৯৬)। তিনবার অস্থায়ী অধ্যক্ষপদে তিনি কার্য করেন—যথাক্রমে ১৮৭৯, ১৮৮৭ ও ১৮৮৮ সনে। ঐ পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন ৩রা জানুয়ারি ১৮৯৬ তারিখে। পরবর্তী ২রা জুলাই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপক টনি-এর সঙ্গে তিনি একযোগে এদেশীয় ছাত্রদের জন্য *Hints on English Grammar* নামে একখানি বিশেষ উপযোগী পুস্তক লেখেন।

[illegible], জি. এ.: প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস-অধ্যাপক (১৮৮৩-১৮৯২)।

পার্সিভাল, এইচ্. এম্.: প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক (১৮৮০-১৯১১)। কিছুকাল (১৯০৪-১৯০৭) তিনি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগে অর্থনীতি সম্বন্ধেও অধ্যাপনা করেন। ১৯০২ সনে তিনি একবার অস্থায়িভাবে কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি ১৯১১, ১লা এপ্রিল অবসরগ্রহণ করেন। তিনি সেক্সপীয়র সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। সেক্সপীয়রের *As you Like It*, *Merchant of Venice*, এবং *Macbeth* নাটকত্রয়ের উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ [illegible]।

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, সার্ (১৮৭৫-১৯৫০): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ভূতত্ত্ব-বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি.এ. ও এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি সংস্কৃত-ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। আইন-পরীক্ষায় পাস হইবার পর তিনি প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে বিলাত হইতে ব্যারিস্টারী সনদ লইয়া আসেন এবং ১৯০৪ সনে হাইকোর্টে ব্যারিস্টার-রূপে আইন-ব্যবসা শুরু করেন। কৃতিত্বের সহিত আইন-ব্যবসা পরিচালনা করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৯২৪-২৮)। বাংলার ও ভারতবর্ষের শাসন-পরিষদের আইন-সদস্যরূপেও তিনি কার্য করেন। তিনি ভারতবর্ষের অ্যাডভোকেট-জেনারেল ছিলেন আটবৎসর (১৯৩৭-৪৫)। ইহার পরই তিনি বরোদার দেওয়ান হইলেন (১৯৪৫-৪৭)। ভারত-ডোমিনিয়নে করদ বা মিত্ররাজ্যগুলির যোগদানের বিষয়ে ব্যবস্থাপনের সার্থক প্রয়াস সুবিদিত। তাঁহারই শাসনে বরোদা সর্বপ্রথম ভারত-ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর তিনি কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী গবর্নর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন (১৮৩০-১৯০৭): পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক (১৮৭৭-১৯০২)। তাঁহার 'সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজ' (প্রবাসী, কার্তিক ১৩০৯) এবং 'সেকালের সংস্কৃত কলেজ' (প্রবাসী, ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩০৯) স্মৃতিচিত্রগুলি তথ্যপূর্ণ এবং উপভোগ্য।

টনি চার্লস, হেনরি (১৮৩৭-১৯২২): প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৬৪ সনে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া আসেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা শুরু করেন ১৮৭২ সন হইতে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ১৮৭৬ সন হইতে ১৮৯২ পর্যন্ত। তিনি কয়েকবার অস্থায়িভাবে শিক্ষা-অধিকর্তার পদেও কার্য করেন। সেবার শিক্ষা-অধিকর্তার কার্য করিবার কালে ১৮৯২ সনে অবসরগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘকাল (১৮৬৮-১৮৯২) সদস্য ছিলেন। বিলাতে ফিরিয়া ইণ্ডিয়া অফিসের 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি'র অধ্যক্ষ হন। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কথাসরিৎসাগর, উত্তররামচরিত, কথাকোষ, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রবন্ধচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের ইংরেজীতে অনুবাদ তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির একটি নিদর্শন।

চারুচন্দ্র ঘোষ, সার্ (১৮৭৪-১৯৩৯): প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র (১৮৯০-১৮৯৪)। তিনি বি.এল. পাস করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন (১৮৯৮)। এইসময়ে তিনি সক্রিয়ভাবে 'জাতীয় কংগ্রেসে' যোগ দেন। বিলাত হইতে ব্যারিস্টারী সনদ প্রাপ্ত হইয়া ১৯০৭ সনে নূতনভাবে আইন-ব্যবসা শুরু করেন। ১৯১৯ সনে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। তিনি চারবার অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে বৃত হন। ১৯৩৪, ১-লা জানুয়ারি বিচারপতি পদ হইতে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি দুইবার (১৯৩২ ও ১৯৩৩) 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি'র সভাপতি হন।

আশুতোষ চৌধুরী, সার্ (১৮৬০-১৯২৪): প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া আশুতোষ বিলাত যাত্রা করেন। কেম্ব্রিজের সেন্ট জন্‌স কলেজ হইতে অনায়াসে 'ট্রাইপস' উপাধি লাভ করেন এবং ব্যারিস্টার হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি ১৮৮৬ সনে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। আশুতোষ ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবিদের কাব্যালোচনা সম্পর্কে তাঁহার বহু প্রবন্ধ 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। স্বদেশে বিবিধ কল্যাণমূলক কার্যে তিনি ক্রমে লিপ্ত হইয়া পড়েন। ১৯০৪ সনে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে' আশুতোষ সভাপতি পদে বৃত হন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্থাপিত 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ইহার সঙ্গে জড়িত থাকিয়া উৎসাহভরে খাটিয়া যান। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

প্রতিভা চৌধুরী (১৮৬৫-১৯২২): মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। তিনি গৃহে শিক্ষালাভ করিয়া বহু ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। সঙ্গীত-চর্চায় তিনি বিশেষভাবে রত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অন্যতম গায়ক। 'বালক', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বিস্তর স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। তিনি সঙ্গীত-বিদ্যার প্রসারকল্পে 'সঙ্গীত সংঘ' স্থাপন করেন। ইহাতে তাঁহার স্বামী আশুতোষ চৌধুরীর সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'আনন্দ সঙ্গীত' নামে সঙ্গীত-বিষয়ক একখানি পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। এ কার্যে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী তাঁহার সহযোগী হন।

মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি (১৮৩১-১৮৯১): পুরা-নাম হেলেনা পেট্রোভনা ব্লাভাট্‌স্কি। আমেরিকায় তিনি কর্নেল অল্‌কটের সহযোগে 'থিয়সফিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শক্তিশালিনীর লেখায় অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া জনসাধারণকে বিস্মিত করিতে থাকেন। অন্যান্যদের আলোচনায় তিনি পথপ্রদর্শক বলা হন। 'থিয়সফিক্যাল সোসাইটি' কোনো বিশেষ ধর্মমত প্রচার না করিয়া সাধারণকে নিজ নিজ ধর্ম আচরণ এবং পরস্পর প্রাচীন শাস্ত্রের চর্চার উপদেশ দিতেন। তিব্বত পর্যটনকালে তিনি এক তিব্বতী সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে তাঁহারই উপদেশে তিনি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম 'থিয়সফিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অলিভার লজ, সার্ (১৮৫১-১৯৪০): ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী। লিভারপুল ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রথমে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন (১৮৮১-১৯০০)। ইহার পর বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ হন (১৯০০-১৯১৯)। বেতারে সংবাদ-আদান-প্রদান সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রেততত্ত্ববিদ্যা চর্চায় শেষজীবনে রত হন। প্রেততত্ত্ববিদ্যা-সম্পর্কে তাঁহার বহু প্রবন্ধ আমরা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র জন্য পাঠাইতাম। 'রেমণ্ড অথবা মারণ' নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থ প্রচুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

টিণ্ডাল [অধ্যাপক] (১৮২০-১৮৯৩): সে-যুগের একজন নামজাদা পদার্থ-বিজ্ঞানী। তাপ, শব্দ ও আলোক সম্পর্কে তাঁহার অনেকগুলি পুস্তক আছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধূলা' নামক প্রবন্ধে বিজ্ঞানী টিণ্ডালকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

সমবায়ী চাষ বা 'সঞ্ঝী ক্ষেতি'

কালীচরণ ঘোষ

সমবায়-প্রথায় নানারূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা আজ আর নূতন নহে। সমবায়ের ইতিহাস অর্ধশতাব্দী বা তাহারও অপেক্ষা পুরাতন। মানুষের বুদ্ধিতেই কেবল প্রতিষ্ঠান চলে না; ইহা যে একটা প্রকাণ্ড অংশ সে-কথা অস্বীকারও কেহ করে না। কিন্তু সেইসঙ্গে মানুষের মনের নানারূপ চিন্তাধারা, কর্মপ্রণালী, আকর্ষণ, আবেগ, রুচি প্রভৃতি লক্ষ্য করারও প্রয়োজন আছে।

সকল বিষয়েরই ভালো-মন্দ দুইটা দিক আছে। অবশ্য এমন বহু ব্যাপার আছে, যাহার মন্দ দিকটা ভালো দিকের তুলনায় উপেক্ষণীয়। আবার এমন বহু চিত্তবৃত্তি, সদ্‌গুণাবলী এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠান বা ঘটনা আছে যাহার মন্দ দিকটা লোকে মনেই করে না। তাহাতেও যে নিস্তার আছে, তাহা নহে, কারণ অতি দান করার অপরাধে বলীর বন্ধনদশা ঘটিয়াছিল।

একটা ভালো বিষয়ের চিন্তায় সুখ আনন্দ নিশ্চয়ই আছে। সৎকথা ও সৎকার্যের নির্দেশ দিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু যখন এসকল ব্যাপারের বিধি-ব্যবস্থা দিতে হয়, তখন ভাবিয়া দেখা দরকার, মানুষ তাহার কতখানি পালন করিতে পারে, বা তাহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে। যাহা দুঃসাধ্য, এমনকি যাহা অ-সাধ্য তাহার কথা কেহ মনে আনিবে না। সুতরাং সে-কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু বিচার করিয়া তাহার কর্মফল গ্রহণ করিতে হয়। যাহাতে আশাতীত, এমনকি আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না, বা বিচার করিয়া লোকে তাহা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবে, এরূপ অবস্থায় উদ্ভব হয়, তাহাতে ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হইবার কথা নহে।

সমবায়-প্রথার সাহায্যে মানুষের কল্যাণকর আর্থিক ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত এবং নানা-মুখী করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত যত সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সমবায়-সমিতি সম্পর্কে যেসকল মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অর্থ লেনদেন ব্যাপার ব্যতিরেকে আরসকল—যথা: কৃষি, শিল্প, গো-পালন, দুগ্ধ-বিতরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সমবায়-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বা বিবরণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এমনকি উপেক্ষণীয় বলা চলে। অন্ততঃ তাহা হইতে উৎসাহ লাভ করিবার মতো মালমসলা কিছুই পাওয়া যায় নাই।

এক এক অঞ্চলের লোকের কর্মশক্তি, রুচি, প্রেরণা প্রভৃতি ভিন্ন হইয়া থাকে। অনেকে ইহা 'জলহাওয়া'র প্রভাব বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে, এক পাঞ্জাবকে বাদ দিলে, আরসকল রাজ্যে আর্থিক লেনদেন প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনও সমবায় উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। বাংলাদেশের লোকে হয়তো অধিকতর, একক প্রভুত্বলাভের আকাঙ্ক্ষী, সেই কারণে সারা ভারতবর্ষে এক বাংলাদেশেই সম্পত্তি বণ্টনের জন্য দায়ভাগ-বিধি আবহমানকাল প্রচলিত রহিয়াছে। সেইরূপ অন্যান্য রাজ্যেও ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। এই গুরুতর চরিত্রগত পরিচয় উপেক্ষা করা বিজ্ঞের লক্ষণ নয়।

কিছুকাল যাবৎ, সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ পাকা করিবার অভিপ্রায়ে, যাহা কিছু নূতন করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই যাহাতে সমভাবে লাভের অধিকারী হইতে পারে, কোনও ধূর্ত, স্বার্থপুষ্ট লোক কোনও ফাঁকে বেশী মুনাফা না পায় তাহার জন্য সকল ক্ষেত্রেই সমবায় (কো-অপারেটিভ) সংস্থার জন্য উচ্চতম মহল হইতে সুপরামর্শ দান করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, যেসকল ক্ষেত্রে সরকারী চেষ্টা বিফল হইয়াছে; যেমন—কুটীর-শিল্প, মৎস্য উৎপাদন, খাদ্য উৎপাদন প্রভৃতি, সেখানে সমবায়ের উপর অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। ইহার পশ্চাতে যে লজ্জা ঢাকিবার একটা বিরাট বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া গিয়াছে, তাহা একটু মনোযোগ দিলেই লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

অগ্রপশ্চাৎ বিচার এবং পুরাতন অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ যদি সেই বিষয়ের উপর দেশের

ফসলের অকল্যাণ অত্যধিক মাত্রায় নির্ভর করে। সমবায়-কৃষি-পদ্ধতির অভিজ্ঞতা দেশের মধ্যে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; যাহা আছে তাহা নিরাশাব্যঞ্জক। সমষ্টি-কৃষি না হইয়া যদি সমবায়-কৃষি হয় তবে নূতন ব্যবস্থার এক-একটি সমবায়-কৃষি-প্রতিষ্ঠানকে—যে জমিতে ফসল উৎপাদন করা হইবে তাহার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকিবে। সেই জমির মালিক বিভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক, এবং এই মালিকানা স্বত্বের কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইবে কিনা বলা বড় কঠিন। জমির মালিক হিসাবে ঐ ব্যক্তি হয়তো খাজনার বদল টাকা বা ফসল লইতে পারিবে। সমস্ত ইচ্ছুক মালিককে চাষের কাজ করিতে হইবে এবং মজুরি হিসাবে ফসল বা ফসল-বিক্রয়লব্ধ অর্থ, নিজ অংশ অনুযায়ী, গ্রহণ করিতে পারিবে। অপরাপর খুঁটিনাটি সরকারী সমবায়-বিভাগের বিধির আওতায় পড়িবে।

এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যাহারা একবার এই সমবায়-ভুক্ত হইবে, খুব সম্ভব তাহারা আর নিজ সম্পত্তি লইয়া বাহির হইতে পারিবে না। মনে হয়, প্রস্তাবক বা উদ্যোক্তারা জানেন, এই স্বেচ্ছায় সমবায়-প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নহে এবং শীঘ্রই মনান্তর ঘটিয়া বহু প্রতিষ্ঠান পুরাতন ব্যক্তিগত চাষের পথে ফিরিয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট হইবে। সুতরাং প্রত্যেকের জমির ভিন্ন সত্তা লোপ করিয়া প্রতিষ্ঠানের মাত্র একখণ্ড জমিতে পরিণত হইয়া যাইবে। তাহা হইলে, নামে 'সমবায়' থাকিলেও, প্রকৃত ক্ষেত্রে ইহা 'যুক্ত বা সংযুক্ত কৃষি' অর্থাৎ 'জয়েন্ট ফার্মিং' (joint farming)-এতে পরিণত হইবে। অন্য কারণ ছাড়াও এই এক কারণে বহু কৃষক জমির মালিক এই ফাঁদের মধ্যে পড়িতে দ্বিধাগ্রস্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আদর্শ হিসাবে ব্যবস্থা মন্দ নয়। প্রথম কথা—নিজস্ব জমি থাকিলে নিজের শক্তি, জ্ঞান ও সম্পত্তি হিসাবে চাষ করা সম্ভব। স্বাধীনতা সম্বন্ধে এত বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তির স্বার্থপ্রসারের যে প্রকাণ্ড ফিরিস্তি সর্বদাই প্রকাশিত বা প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে বাধ্যতাভাবে অপরের (এখানে প্রতিষ্ঠান) তাঁবেদারিতে কাজ করিতে অনেকেরই মন বেশ সাড়া দিবে না। তাহার পর জমির গুণাগুণ হিসাবে 'খাজনা' নির্ধারিত করার সময় প্রত্যেকেই নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অপরকে লাভবান মনে করিবে; ইহা বিরোধের দ্বিতীয় বীজ। তাহার পর কে কতটা শ্রম করিয়াছে, তাহার বিচার লইয়া খুবই অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে এবং ফসলের বাঁটোয়ারা (মজুরি হিসাবে) লইয়া যাহা হওয়া সম্ভব তাহা যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ মতান্তর ও মনান্তরের কারণ হইবে, সন্দেহ নাই।

যাহাই হউক, সব বিরোধেরই মীমাংসা করিবে পাঁচজনে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সাময়িক বোর্ড বা পরিচালকবৃন্দ—এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরের ক্ষুদ্রতা খুব ভালো করিয়া জানা আছে, সেখানে এত সহজে মীমাংসা মানিয়া লইবার লোকাভাব ঘটিবে। 'জয়েন্ট ফার্মিং' হইলে, এ বালাই নাই, সকল কৃষক জমির মালিক 'ক্ষেত-মজুর' হইয়া যাইবে।

যাহা হউক, মানিয়া লওয়া গেল যে, সব ব্যবস্থাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। উন্নত বীজ ও সার কেনা, নূতনতর যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ব্যবহার প্রভৃতি খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি উপলক্ষ্যে এযাবৎ নানা সমবায়কে সুপরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। তাহার জন্য কত লক্ষ টাকা সরকারী অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ হিসাব দিলে এবং সে অনুপাতে কত চাষ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার খতিয়ান করিয়া দেখিলে, আসল রূপ ধরা পড়িবে। এখন জমি জল (প্রয়োজনবোধে) ছাড়া চাষের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন তাহা সরকার হইতে ঋণ লইতে হইবে। বৃহৎ ব্যাপারে ঋণের পরিমাণ লঘু হইবার কথা নয়। সরকারী ব্যাপারে কত টাকার কাজ হয় আর কত টাকা অ-কাজে যায় তাহা লইয়া মাথাব্যথার অন্ত নাই। এই ব্যাপারে 'সৌরী সেন'-এর অর্থ হয়তো চাষ আরম্ভ হইবার পূর্বেই ব্যয় হইয়া যাইবে এবং ফসলের বদলে ক্ষেত তৃণাচ্ছাদনে হরিৎবর্ণ হইয়া থাকিবে।

এই সমবায়-কৃষি প্রবর্তনের জন্য যে উৎকট উৎসাহ হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাতে লোকে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। মনে প্রশ্ন জাগে, যখন স্থানে স্থানে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা হইল, তখন প্রজাকে জমির মালিক না করিয়া এইরূপ সমবায়কে মালিক করিয়া জমি দান করা হয় নাই কেন? সরকারী জমির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে এবং খাস সরকারী জমিতে গত কয়বৎসরে ফসলের হার কিভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার হিসাব প্রকাশ করা ভালো। এই উৎসাহভরে সকলকে এক জোয়ালে না জুড়িয়া, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলকভাবে চালাইতে দোষ নাই।

উৎসাহ বর্তমানে উন্মায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া আতঙ্ক আরও বেশী করিয়া দেখা দিয়াছে। যাঁহারা এই আদর্শের সহিত একমত হইতে পারিবেন না, বা বিরোধিতা

করিবেন, তাঁহারা যেন কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া যান। ইহা একটি অর্থনৈতিক পরীক্ষা বা গবেষণা। ইহার সহিত কংগ্রেস হইতে বিতাড়নের হুমকি লোককে বুঝাইয়া দিতেছে যে, ইহাকে যত নিরীহ মনে করা হয়, ইহা তত নিরীহ নয়; প্রকৃতপক্ষে ইহার পিছনে প্রচণ্ড রাজশক্তি উদ্যতফণা হইয়া আছে। (প্রতিবাদের রূপ দেখিয়া উৎসাহীরা সম্প্রতি সুর একটু নরম করিয়াছেন।)

ইহা নিষ্ফলে যখন প্রকাশিত হইবে, তখন দেখা যাইবে—সরকারের সমস্ত মনোযোগ, অর্থসাহায্য, গবেষণার কল, বিজ্ঞ অভিজ্ঞ মত ও উপায় প্রভৃতি সবই সমবায়-প্রতিষ্ঠানের দিকে নিয়োজিত হইতেছে। বহু আবেদন-নিবেদন চীৎকারেও সরকারী যে-কোনো-রূপ সাহায্য পাইতে চাষী ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়ে। তাহার প্রার্থনা আর মঞ্জুর হয় না। যেখানে এইরূপ একটি সরকারী অর্থ ও সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠান থাকিবে, তাহার সন্নিকটে কোনও সাহায্য-সমবায়-সমিতি গঠন না করিলে যে পাওয়া যাইবে না, তাহা এরূপ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সকলকে শাসনযন্ত্রের মধ্যে ফেলিবার যে অদম্য স্পৃহা নানা রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহা তাহারও একটি অংশ। যাহা মুখের মধ্যে লওয়া হইয়াছে, তাহা চর্বণ ও পরিপাক দ্বারা নিজ শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া ও নিজ শক্তিতে আস্থাবান হইয়া অপর নূতন বিষয়ে হাত দিলে কাহারও বিশেষ কিছু বলিবার থাকে না। তাহা না হইয়া যখন দেখা যায়, প্রত্যেক ছোট-বড় সরকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমেই অচল হইয়া উঠিতেছে, সে-সময় এইরূপ একটি গুরুতর ব্যাপার সহজে গ্রহণ করার যুক্তি এক বিস্ময়কর বস্তু। ইহার সমর্থন যাঁহারা করিতেছেন তাঁহারা নমস্য ব্যক্তি, কিন্তু দেশের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ঘনাইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা নূতন ধরনের কৃষি-সমবায় প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তাঁহাদের ইচ্ছা ও শক্তির উপর ছাড়িয়া দিলে ভালো হয়। সরকারী টাকা কৃষিতে ব্যয় করিতে না পারিলে, কৃষির যে কত উন্নতি হইতেছে, প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং যোগ্য লোক, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ও অপরাপর সাহায্য করিয়া ফলাফল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই সমীচীন। সরকারী জমিতে আমন্ত্রিত চাষী দিয়া এরূপ সমবায় পরিচালিত করিতে পারিলে, জমির দোষগুণ অনুপাতে খাজনা বণ্টন লইয়া বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। তাহা ছাড়া প্রায়-নিরক্ষর চাষীরা একসঙ্গে প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ খর্ব করিবার শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায়।

সরকারী সহায়তা এবং কতক পরিমাণ 'খবরদারি' করিবার জন্য সরকারী হিসাব-পরীক্ষক প্রভৃতির আবির্ভাব প্রায়ই ঘটিবে। বাঁধা নিয়মের খাতে হিসাব প্রভৃতি রাখিতে হইবে। দু'দশখানা চিঠিপত্র লেখার কাজ আছে। সরকারী বড়কর্তাদের সঙ্গে টাকা আদায়, দোষ ঢাকা বা 'শাস্তি'র হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বড়-সদরে তদ্বির-তাগিদ করিবার জন্য কাহাকেও কাহাকেও 'শহরে' যাইতে হইবে। ইহার জন্য শিক্ষিত, চতুর, উদ্যমশীল লোক প্রয়োজন। ইংরেজী-ভাষায় দখল থাকিলে আরও ভালো হয়। সুতরাং যাহারা মাঠের কাজে ক্লান্ত এবং সংসারের শত কাজের জন্য বিব্রত, সেইসকল চাষী 'সভ্য' (member) অপরের বুদ্ধি ও পরামর্শে চলিতে বাধ্য থাকিবে। তখন সমবায় এবং এইশ্রেণীর লোকের যোগসাজসে যাহাদের কল্যাণের জন্য এত তোড়জোড়, প্রচার, হুঙ্কার, ভীতি-প্রদর্শন ও অকাতরে অর্থব্যয় চলিতেছে, তাহাদের যে খুব বেশী লাভ হইবে, তাহা বড়ই কষ্টকল্পনা। অন্ততঃ বর্তমান ক্ষেত্রে, বিনা প্রস্তুতিতে, এতবড় পরীক্ষার ক্ষেত্রে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশী হইবে—তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

আমার এ ধারণা কার্যক্ষেত্রে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

তুষার-ঝরা

গেজা-গার্দোন্যী

অনুবাদ ঃ মলিনা রায়

রাতের বেলায় পৃথিবী শীতে জমে যেন হিম হয়ে গেছে। সকালবেলা সূর্যও ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। মেঘের আড়াল থেকে, যে একবার একটুখানি উঁকি দেবে, সে-সাহসটুকুও তার নেই। কেবল আবছা আলোর একটি ক্ষীণরেখা দেখে টের পাচ্ছি সূর্যটা কোথায় আছে।

সকাল আটটার দিকে আমার জানালার ধারে একবার ঝুর-ঝুর করে সাদা তুষার ঝরে পড়ল। তার পরে আর-একবার পড়ল, তৃতীয়বার আবার। ধূসর-রঙের মেঘগুলো তুষারের ধারায় ঝ'রে-ঝ'রে যেন এক ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে। এ-বছর শীতের আরম্ভে এই প্রথম বরফ-পড়া।

আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছি। ছোট গেট-টা খোলার শব্দ হল। বারান্দায় শিশুদের জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বাইরে ছেলেরা চেঁচিয়ে বলতে লাগল—দেখ দেখ, বরফ পড়েছে কত। ছোট বীজের পালকের লেপখানা খুলে দিয়ে যেন চারিদিকে পালক ছড়িয়ে পড়েছে।

বেহলা নামে ছোট্ট ছেলেটি একমুঠি বরফ নিয়ে ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়েই ছেলেমেয়েরা সব চুপ। যে যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

গোলাপী-গোলাপী গাল, লাল-লাল কান আর হাসি-মাখা চোখ—আশ্চর্য, কিসে না এরা আনন্দ পায়! বরফের ঝড়েও কত আমোদ!

ছেলেমেয়েদের এই খুশির ঢেউ আমার মনেও দোলা লাগাল। শিশুর মন যে কত সরল, কত সহজ। আশেপাশে এতটুকু পরিবর্তনেও তার ছোট্ট প্রাণটি সাড়া দিয়ে ওঠে।

এ যেন একটি সূক্ষ্মকোমল তারের যন্ত্র। কোনো ভারী কাজে লাগে না, কিন্তু একটুখানি ছোঁয়া পেলেই বেজে ওঠে।

আমাদের জগৎ থেকে শিশুর জগৎ একেবারে আলাদা। যেসব জিনিস আমাদের চোখে খুব বড়, সেসব দিকে এদের নজর নেই। অথচ আমাদের কাছে যা তুচ্ছ, তা এদের কাছে ভারি মূল্যবান। যা দেখে আমাদের একটুও হাসি পাবেনা, তাতেই এরা হেসে হয়ত কুটিপাটি হবে। আর যেসব দিকে আমরা চোখ তুলেও তাকাব না, তারই জন্য এরা কেঁদে আকুল।

ছোট একটুখানি কালির দাগ, কি অদ্ভুত একটি পোশাক, নয়তো বা একটা সামান্য গুবরে-পোকা দেখলেই অনেকসময় শিশুরা হো-হো করে প্রাণ-খুলে হাসতে থাকে। আবার কলমের নিবটা একটু বেঁকে গেছে, কি কেউ ওকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেছে, তো অমনি ও কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। এমন কি, একটু বেশি শীত করলে, কি কোনো কারণে মন উদ্বিগ্ন হলেও সে না কেঁদে পারেনা। কান্নার সময়ে যদি আবার মনটা খুশি হবার মতো কিছু পায়—চোখের জলের মধ্যেই দেখা দেয় হাসির ইন্দ্রধনু।

ক্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখি, দ্বিতীয় সারির প্রথম আসনটি এখনও খালি।

ছোট্ট রোজ কোভাচেভ বাবা মাতাল। গ্রামের দূর প্রান্ত থেকে সে আসে। তারই বসার জায়গা ওটি। হাসি-মাখা মিষ্টি চোখ নিয়ে বসে থাকে যেন ছোট্ট সাদা-পুষিটি। সে সারির প্রথম আসনে ও বসে। ওর কাজ হল সকলের হাত পরিষ্কার আছে কিনা দেখবে। কারোর চুলে পালক আটকে থাকলে ঝেড়ে দেবে। বাড়ির কাজ ক'রে সবাই ক্লাসে এসেছে কিনা—সেদিকে নজর রাখবে।

ছোট্ট রোজ কোভাচেভের এটি একটি খুব বড় সম্মান।

একদিন বিকেলে একটি নতুন ছাত্রী এসে ওর পাশে বসল। দুজনে মিলে খুব হাসাহাসি, কানে কানে কথা বলা চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রাণ-ভ'রে আমোদ করতে লাগল তারা। এ দুটি ছোট ছোট মেয়ে কানে কানে কী এত কথা বলে? আর অত হাসিরই বা ওরা কী পায়? হয়তো খুব সামান্য কিছু হবে, অথচ ওদের কাছে তা খুব মজার ব্যাপার।

রোজাকে সাবধান করে দিতেই হল।

এভাবে সতর্ক করে দেওয়াটা ক্লাসে নতুন কিছু নয়। কিন্তু তাদের যেন দ্বিতীয়বার আর কখনো স্মরণ করাতে না হয়—এ নিয়মও সবাই জানে।

কিন্তু আমার ছোট্ট রোজ-সোনাটি বন্ধুকে নিয়ে এমনই মেতে উঠল যে, আবার আমাকে সাবধান করে দিতে হল। ছুটির পরে ওকে থেকে যেতে বললাম।

হাসিভরা নীল চোখ-দুটিতে গভীর ছায়া ঘনিয়ে এল। ও গম্ভীর হয়ে গেল।

স্কুল ছুটি হতেই শিশুদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত গেলাম। তারপর উঠোনটা ঘুরেই আমার ছোট্ট কয়েদীটির কাছে ফিরে এলাম।

ও বসে আছে ওর নিজের জায়গায়—সেই দ্বিতীয় সারির প্রথম আসনে, কনুইয়ে ভর দিয়ে। উদ্বেগ-ভরা

তিস্তার চরে : বেদুইন

রাজনীতির দ্যূতক্রীড়ায় কোটি কোটি নিরপরাধ পরিবার আশ্রয় ও আশার নিরাপদ এলাকায় এসেছিল। এমনি-ধারা একটি পরিবারের বাস্তব কাহিনী গড়ে উঠেছিল তিস্তার চরকে ভিত্তি করে। তারই জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন 'পথে প্রান্তরে' লেখক বেদুইন। তিন টাকা

মরুপথের নদী : সুধাকর

টি.বি.-র আক্রমণে বাংলার যুবশক্তি ক্ষীয়মাণ। টি.বি. হাসপাতালের রোমাঞ্চ-ধর্মী কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। 'মরুপথের নদী' বাংলা সাহিত্যে নবতম সৃষ্টি।

আড়াই টাকা

যুগান্তর প্রাপ্তী ভবন
১০২, বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

চোখ-দুটি মেলে খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

টেবিলের সামনে বসে ওকে ডেকে বললাম,—এদিকে এসো।

চোখ-দুটি নীচু করে সামনে এসে দাঁড়ায়।

তক্ষুনি কোনো কথা আমি বলিনি। কারণ, জানি ওর ছোট্ট-বুকের ধুকপুকনিতে যে-কথা ওর কানে বাজছে তার চাইতে বেশি আমি কি বলতে পারি।

তালি-দেওয়া জামা পরা এই-যে একটি ছোট্ট মেয়ে—আর রেশমে মখমলে সাজানো বড়লোকের একটি আদুরে কন্যা—এদের মধ্যে তো কোনো তফাত নেই।

শিশুর সুন্দর মুখ আর তার ছোট্ট প্রাণখানি বিধাতা একই ভাবে সৃষ্টি করেন। ধনী-দরিদ্র সেখানে সমান।

এই দরিদ্র চাষীর মেয়ের মুখে কী বুদ্ধির দীপ্তি আর কী নিষ্পাপ দুটি নীল-চোখের চাউনি! নাকটি টিকলো, ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁট-দু'খানি। প্রতিটি গতিভঙ্গীতে কী স্বাভাবিক সৌন্দর্য। প্যারিসের কোনো ধনীগৃহে জন্মালে সেই সমাজেই হয়তো ওর সৌন্দর্যের সমাদর হত কত।

কিন্তু হায়, ভগবান মানবশিশুগুলিকে এই তুষারেরই কণার মতো নির্বিচারে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দিয়েছেন। নয়তো অকরুণ বিধাতা তাকে মাতাল কোভাচের মেয়ে করে পাঠালেন কেন? তার গায়ের জামা-কাপড় গ্রীষ্মেও যেমন, শীতেও তেমনি—সেই লাল-বুটি-দেওয়া ছিটের কাপড়ের ব্লাউজ আর রঙ-ওঠা নীল স্কার্ট। তাতেও আবার শতেক তালি। তার পায়ে কোনোদিনই জুতো ওঠেনি, কখনো উঠবেও না। আর-পাঁচটি ক্লাসের বন্ধুর মতো বরফের ওপর সে খালিপায়ে ছুটবে। আর এভাবেই সে বড় হতে থাকবে।

বাধ্য হয়েই আমাকে কড়া হতে হল। কারণ, চুপ করে বসাটাই ক্লাসের প্রধান রীতি।

—কয়েকদিন আগে, এইখানে দাঁড়িয়ে তুমি কী প্রতিজ্ঞা করেছিলে, বলো তো?

রোজা ম্লানমুখে চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মিনিট পরে বললাম,—তোমার আজকের দিনের ব্যবহার কি ভালো-মেয়ের মতো হয়েছে?

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল,—না।

—তবে যে-জায়গায় তুমি বসছ, তার কি তুমি যোগ্য?

এবারে ওর স্বর আরো মৃদু। যেন শোনাই যায় না। বলল,—না।

—বেশ, কাল থেকে অন্য একজন কেউ সে-জায়গায় বসবে। কারণ আমি তো তোমাকে আর ভালবাসতে পারিনে।

কথাগুলো ওর মনে কঠিনভাবেই ঘা দিল। তবু ওর মুখের একটি রেখাও বদলাল না।

ও টলতে-টলতে বেরিয়ে গেল।

গেট পার হবার সময় দেখলাম, ছোট তালি-দেওয়া অ্যাপ্রনটি তুলে চোখ-দুটি মুছছে।

পরের দিন আর রোজা স্কুলে এল না।

একটি ছোট ছেলেকে ওর মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম ওর খবর নিতে। ছেলেটি এসে বললে, স্কুলে আসার সময় কুকুরের তাড়া খেয়ে রোজা একটি ছোট নালীতে পড়ে যায়। তার পরে বাড়ি ফিরে যখন পৌঁছল, তখন ওর সমস্ত জামা-কাপড়ে বরফ জমে গেছে।

বরফ-পড়া দেখতে দেখতে রোজা কোভাচের কথাই ভাবছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে চারদিক সাদা হয়ে গেল। খেতের শুকনো ফসলের খুঁটিগুলো যেন সাদা ফার-কোটে সেজেছে, আর চারদিকের সব বাড়ির মাথা যেন সাদা পাথরের লেপে ঢাকা। আম-গাছগুলো গ্রীষ্মে যেমন ফুলে ভরে থাকে, এখনও বরফে ঢেকে তাদের সেরকমই দেখাচ্ছে।

রোজা জ্বরে পড়ার পর থেকে প্রতিদিন এক একটি করে ছেলে ওদের বাড়িতে পাঠাতাম। ছেলেটি আমার নাম করে জেনে আসত, ও কেমন আছে।

একদিন দুপুরে গিয়েছিল পাল। সে এসে খবর দিল রোজা আর কথা বলতে পারছে না।

লাঠি আর টুপি হাতে তখনই বেরিয়ে পড়লাম। ছোট নদীটি পার হবার সময় বাপ কোভাচকে দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে একটা কূলে ভর দিয়ে ও দাঁড়িয়ে ছিল। টুপিটা বরফের ওপর প'ড়ে, ওয়েস্ট-কোট খোলা, শার্টের ফাঁকে বুক দেখা যাচ্ছে।

বললাম,—এমন সময়েও তুমি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছ।

লোকটা চোখ-দুটি তুলে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, যেন কিছুই বুঝতে পারেনি।

—আমি—মাতাল? মোটেই না। মদ খেয়েছি বটে কিন্তু মাতাল হইনি।

—তবে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতেই বা পারছ না কেন?

সে আঙুল নেড়ে বলল,—মিথ্যেকথা। আমি তো দাঁড়িয়েই রয়েছি।

—তোমার মেয়ের এত অসুখ, তুমি জানো না?

হাবার মতো মাথা নেড়ে সে বললে,—হ্যাঁ জানি, ভগবান ওকে শাস্তি দেবেন।

এমন লোকের সঙ্গে কে কথা বলবে!

ওদের বাড়ির দরজায় ঢুকে একবার পেছন ফিরে তাকালাম। দেখি, টুপিটি তোলার জন্য তখনও কোভাচ বরফের ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে।

জানালার ধারে মেয়েটি শুয়ে। অজস্র তালি-দেওয়া একখানি নীল লেপে ওর সর্বাঙ্গ ঢাকা।

চোখ বুজে স্থির হয়ে ও পড়ে আছে।

ওর খাটে মাথা রেখে মা নিঃশব্দে কাঁদছে।

আমি আস্তে আস্তে বললাম,—তুমি কি জেগে আছ?

মা মাথা নেড়ে বলল,—হ্যাঁ, জেগেই আছে।

আমার গলা শুনে ছোট্ট মেয়েটি চোখ মেলে তাকাল। তারপর হাত-দু'খানি তুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমি দু'হাতে তা জড়িয়ে ধরে তাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

—রোজালি, আমায় চিনতে পেরেছ তো, ধন?

ধীরে ধীরে চোখের পাতা-দুটি নামিয়ে সে বোঝাল যে, আমায় চিনেছে।

—আমি জানি, তুমি এখন কথা বলতে পারছ না। কিন্তু একটু ভালো হয়ে উঠলে আবার কথা বলতে পারবে।

হে ভগবান, এ সংসারে যতরকম দুঃখ আছে—রুগ্ন শিশুর চোখে-মুখে যে কাতরতা ফুটে ওঠে, তা চেয়ে বেদনার তো কষ্টকর বোধহয় কোনওটাই নয়।

—বালো. আমি তোমায় দেখতে এসেছি, একটু চেয়ে দেখো। আমি তোমার মাস্টারমশাই। তোমার মাস্টারমশায়ের অসুখ করলে তুমিও তাকে দেখতে যাবে। আমায় তুমি দেখতে যাবে তো সোনা?

আর একবার চোখ-দুটো বুজে ও আমায় বুঝিয়ে দিল: হ্যাঁ, ও যাবে।

—তোমার জায়গায় কেউ বসেনি। যতদিন তুমি অসুখে পড়ে থাকবে, ততদিন কাউকে সেখানে বসতে দেব না। তুমি ভালো হয়ে গেলে পরে সেখানে গিয়ে বসবে। হ্যাঁ, আমার রোজালি এবার কত ভালো, কত শান্ত মেয়ে হবে। জানো তো মণি, তোমার মাস্টারমশায় তোমায় কত ভালবাসেন।

এবার সে যখন আমার দিকে তাকাল, তার জলভরা করুণ চোখ-দুটিতে আনন্দের আভা চিকচিক করছে।

ওর মা আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল। আমি বললাম,—তুমি সাহস হারিয়ো না, ভগবান ওকে এখনই তুলে নেবেন না।

অ্যাপ্রন দিয়ে চোখ-দুটো মুছে মা বলল,—আমার স্বামী তো এখনও তাড়িখানা থেকে ফেরেনি। ওই আমার একমাত্র মেয়ে।

—ও ফিরে আসছে, আমি দেখেছি। কিন্তু ওর মদ-খাওয়া বন্ধ করার জন্য কিছুই কি করা যায় না?

—আমি তো সবরকম চেষ্টা করেছি। ওকে মন্ত্র-পড়া জলও খাইয়ে দেখেছি। কিছুতেই কিছু হয়নি। জানেন, আমার বাচ্চাটি মারা গেলে যে একটি মোমবাতি জ্বালাব, তারও উপায় নেই। সব বেচে ও মদ খেয়েছে।

•

একদিন বিকেলে আমি যখন বাচ্চাদের প্রতিলিখনের জন্য একটা বই পড়ে যাচ্ছি, তখন দেখি, পাহারাওয়ালা ভারী বুট পরে আমার জানালার পাশ দিয়ে গেল। কালো ভেড়ার চামড়ার টুপি প'রে, পাইপ টানতে-টানতে সে গির্জের দিকে যাচ্ছে।

আমার গলা দিয়ে আর স্বর বেরোল না। ইশারায় জনকে ডেকে সেই অংশটি পড়ে যেতে বললাম। ছেলেটি একহাতে বই ধরল, আর অন্যহাতে নিজের থলের দড়ি ধরল। এ অভ্যাস ওর আজ পর্যন্ত ছাড়াতে পারিনি। তার পরে ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করল।

হঠাৎ মৃত্যু-সংকেতের ঘণ্টা বেজে উঠল।

জন পড়া থামিয়ে দিল।

সমস্ত ক্লাসের মধ্য দিয়ে যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বয়ে গেল।

সবাই চুপ।

ক্লাসের প্রত্যেকটি ছেলে বড় বড় চোখ মেলে তখনও আমার দিকে তাকিয়ে।

গেজা গার্দোনী (১৮৬৩-১৯২২) হাঙ্গেরির প্রসিদ্ধ লেখকদের অন্যতম। এই গল্পটি শ্রীমতী এডা বোস *Snowflakes* নামে প্রথমে ইংরিজিতে অনুবাদ করেন।

অথ নট-ঘটিত

সূত্রধার

১

'মীরকাসিম' অভিনয়ের বছর মিনার্ভা থিয়েটার প্রায় এক লাখ টাকা অর্জন করল। থিয়েটারের মালিকরা দেখলেন, দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক নামাতে পারলে স্বদেশী আন্দোলনকে সহায়তা করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে দু পয়সা ঘরে আসবে। সে-নাটককে যথাযথভাবে ইতিহাস অনুসরণ করলে চলবে না; তার মধ্যে যে দেশপ্রেমিক থাকবে তাকে 'ম্যাটসিনির শীকার' হতে হবে, উচ্ছ্বাসে নাটকখানি ভরা থাকবে; তবেই সে-নাটক জমবে। 'মীরকাসিম' যখন জোর চলছিল তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন—মীরকাসিম বার বার রণক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছে, আর বার বার তার মুখ দিয়ে আমাকে বলাতে হচ্ছে, আমি না পালালে বাংলাকে বাঁচাবে কে? আর, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের করতালি!

স্টারের জন্য সে সময় ক্ষীরোদপ্রসাদ রচনা করলেন 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' ও 'নন্দকুমার'। উচ্ছ্বাসের অভাব থাকায় অভিনয় জমল না। 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত'র মীরকাসিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন অমৃতলাল মিত্র। নতুন নাটকে এই তাঁর শেষ অভিনয়। যে কণ্ঠস্বর ছি তাঁর প্রধান সম্পদ, ক্যানসার রোগে তা চিরদিনের মতে স্তব্ধ হয়ে গেল। 'নন্দকুমার'এ নাম-ভূমিকায় নামলে নবাগত এক ব্যক্তি, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সাধার রঙ্গমঞ্চে তিনি আগেও নামেননি, পরেও না; অপূর্ব অভিন করে গেলেন ওই চরিত্রে।

'মীরকাসিম'এর সঙ্গে সঙ্গে মিনার্ভা অতুলকৃষ্ণ মিত্রে 'শিরী ফরহাদ' খুললেন; তাও বেশ পয়সা আনতে লাগল। এখন মিনার্ভার সঙ্গে সংযুক্ত রইলেন তিনজন নাট্যকার—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র। 'শিরী ফরহাদ'-এর পর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দুর্গাদা অভিনীত হল। ঘটনার বাহুল্যে নাটকখানি ভারাক্রা তেমন জমল না। কিন্তু ওই বছর বড়দিনের সময় অভিনী গিরিশচন্দ্র-প্রণীত পঞ্চরং 'যায়সা কি ত্যায়সা' বেশ জনপ্রি হল। এর পর আবার একটা ওলট-পালট ঘটল।

১৯০৭ সালে ক্লাসিক থিয়েটার প্রকাশ্য নীলামে উঠল কিনে নিলেন শরৎকুমার রায়। থিয়েটারের নাম দিলে কোহিনূর। এবার লোক ভাঙাবার পালা আরম্ভ হ

স্টার থেকে এলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিনার্ভা ছেড়ে দেবার পর তিনি সেখানে অবৈতনিক হিসেবে কাজ করছিলেন। নাট্যকার হিসেবে আনা হল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে, তখন তিনি 'চাঁদবিবি' লিখে চলেছেন, সেই বই নতুন কোহিনূরে মঞ্চস্থ করা হবে। মিনার্ভা থেকে দানীবাবু, হাঁদুবাবু, তিনকড়ি দাসী; ক্লাসিক থেকে তারাসুন্দরী। ক্ষেত্রমোহন মিত্র গোড়া থেকে ছিলেন, আর তিনিই প্রধানভাবে এইসব যোগাযোগ করতে থাকলেন। এবার গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে টানাটানি চলল; স্টার তাঁকে নিয়ে যেতে চায়, মিনার্ভা তাঁকে রাখতে চায়, কোহিনূর তাঁকে আনতে ব্যগ্র। শেষে গিরিশচন্দ্র কোহিনূরেই যোগদান করলেন—দশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক বেতন পাঁচ শ টাকা।

বাড়ি মেরামত-কাজ তখনও শেষ হয়নি, নাটকের শেষ অঙ্ক লেখা বাকি; কিন্তু এতগুলি লোককে তো বসিয়ে মাইনে গোনা যায় না। মেরামত-কাজ দিনরাত চলতে লাগল, নাটকের শেষ অঙ্ক গিরিশচন্দ্র তাড়াতাড়ি লিখে দিলেন; ১৯০৭ সালের ২৬শে শ্রাবণ কোহিনূর থিয়েটার মহাসমারোহে খোলা হল।

প্রথম অভিনয় রজনীতে নামলেন—

আদিল শা—দানীবাবু
ইব্রাহিম—ক্ষেত্রমোহন মিত্র
রসুলী—মন্মথ পাল
মল্লাজী—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চাঁদবিবি—তারাসুন্দরী
খোদিবাই—তিনকড়ি দাসী

প্রথম রাত্রে বিক্রি হল ছাব্বিশ শ টাকা। বহু লোক ফিরে গেল; জায়গা থাকলে আরও ছাব্বিশ শ বিক্রি হত। বাংলা নাট্যশালায় এর আগে কোনোদিন প্রথম রজনীতে এত বিক্রি হয়নি।

গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ছেড়ে আসায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সেখানকার ম্যানেজার হলেন। মিনার্ভায় থাকতে গিরিশচন্দ্র ওখানকার জন্য 'ছত্রপতি' নামে একখানি দেশাত্মবোধক নাটক লিখে দিয়েছিলেন, তিন অঙ্ক অবধি তার মহড়া দিয়ে এসেছিলেন, তিনি চলে আসায় অমরেন্দ্রনাথ বাকি দু অঙ্কের মহড়া দিয়ে, কোহিনূর যবে 'চাঁদবিবি' খুলল তার এক সপ্তাহ পরে 'ছত্রপতি' মঞ্চস্থ করলেন। গিরিশচন্দ্রও চুপ করে রইলেন না; মিনার্ভা যবে 'ছত্রপতি' খুলল, তার তিন সপ্তাহ পরে কোহিনূরেও 'ছত্রপতি' মঞ্চস্থ হল। গিরিশচন্দ্র, দানীবাবু, হাঁদুবাবু, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী সকলেই অংশগ্রহণ করলেন।

*Bengalee*তে লিখল—

Chhatrapati is one of the best and most powerful dramas ever produced on the Indian stage.

এর পর এখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের একখানি অর্থব্যঞ্জক রাজনৈতিক চুটকি 'দাদা ও দিদি' অভিনীত হল।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মিনার্ভায় বেশিদিন রইলেন না। তিনি চলে যাবার পর মিনার্ভা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নূরজাহান' অভিনয় করল। জমল না। পরে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'তুফানী' জুড়ে দেওয়ায় কিছুটা অর্থাগম হতে থাকল।

কোহিনূর থিয়েটার খোলবার ছ মাস পরেই স্বত্বাধিকারী শরৎচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হল; আর তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পরে শরৎবাবুর পিতাও পরলোকগমন করলেন। শরৎবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর শিশিরবাবু এখন থিয়েটার-পরিচালনার ভার নিলেন। এর কিছু আগে থেকে গিরিশবাবু পীড়িত হয়েছেন, নতুন নাটক লিখতে পারছেন না। শিশিরবাবু গিরিশচন্দ্রের মাহিনা বন্ধ করে দিলেন। গিরিশবাবু তাঁর প্রাপ্য বেতন ও বোনাসের বাকি চার হাজার টাকার জন্যে হাইকোর্টে নালিশ করলেন। বিচারে তিনি জয়লাভ করলেন।

এবারও স্টার ও মিনার্ভা দুই থিয়েটার তাঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। শেষে মহেন্দ্রকুমার মিত্রের আগ্রহাতিশয্যে তিনি মিনার্ভায় যোগদান করলেন। মাসিক বেতন ৪০০৲ টাকা ও লাভের এক-পঞ্চমাংশ।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অন্যান্য কয়েকজন লেখকের বই নিয়ে কোহিনূর থিয়েটার টিম্‌টিম্‌ ক'রে কয়েক বছর চলল। শেষে ১৯১২ সালে ঋণের দায়ে প্রকাশ্য নীলামে কোহিনূর থিয়েটার বিক্রি হল। মনোমোহন পাঁড়ে এক লক্ষ এগারো হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। তিনি তাঁর মিনার্ভা থিয়েটারের অংশ মহেন্দ্রকুমার মিত্রকে বিক্রি করে দিলেন। এখন দুজন পৃথক ব্যক্তি দুই থিয়েটারের মালিক হলেন।

গিরিশচন্দ্র যখন মিনার্ভায় ফিরে এলেন তখন ওখানকার কর্তৃপক্ষ বিধবাবিবাহ নিয়ে তাঁকে একখানি সামাজিক নাটক লিখতে অনুরোধ করলেন। গিরিশচন্দ্র লিখলেন—'শাস্তি কি শান্তি'। গিরিশচন্দ্রের অন্য সামাজিক নাটকের মতো এ নাটকেও আর্টের চেয়ে নীতির কলাপাতই বেশি।

এই নাটকের শেষটায় ভূমিকাদ্বয়ের প্রতিযোগিতা চলেছে। সে যাই হোক, এই নাটকে প্রসন্নকুমারের ভূমিকায় রাণীবাবুর অভিনয়ের তুলনা হয় না। নাটকে পাগল ব'লে একটি চরিত্র ছিল; N. Banerjee নামে একজন নাট্যামোদী সুদর্শন যুবক ওই ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন; ইনি খাকবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। এঁর সজ্জনতা, এঁর উচ্চপ্রাণতা অবিস্মরণীয়। অর্ধেন্দুশেখর যখন পীড়িত হয়ে পড়লেন, খাকবাবু তখন তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচর্যা করতে থাকলেন। তাঁরই বাড়িতে অর্ধেন্দুশেখর দেহত্যাগ করেন।

অর্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছেন —"যাহারা ইউরোপে নানাদেশীয় রঙ্গমঞ্চে বড়ো বড়ো অভিনেতার অভিনয় দেখিয়াছেন আর বাংলার অর্ধেন্দুশেখরকেও অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন, ইউরোপে জন্মালে তিনি ইউরোপের নট-তালিকায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন।"

অর্ধেন্দুশেখর সুরেলা অভিনয় আদৌ পছন্দ করতেন না; সু-আবৃত্তির সঙ্গে সু-অঙ্গ-চালনার দিকে তাঁর সমান দৃষ্টি থাকত, অথচ তা মাত্রা না ছাড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। অভিনয়-শিক্ষাদানে তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। তাঁর বিশেষ দৃষ্টি থাকত ছোটো পার্টগুলিকে নিখুঁত করে তোলার দিকে।

অর্ধেন্দুশেখর ধনী ছিলেন না। যৌবনে স্বেচ্ছায় ধনী আত্মীয়ের আশ্রয় ত্যাগ করে আসেন। নাট্যশালার চাকরিতে তিনি বেতনের অঙ্কের পরিমাণ কোনোদিন চিন্তা করতেন না। তিনি যখন ৭০৲ টাকা করে পাচ্ছেন, দেখা গেছে, তিনি যাদের শেখাচ্ছেন তাঁদের কারুর কারুর বেতন তাঁর চেয়ে বেশি। এ নিয়ে তিনি ক্ষোভ করেননি, মালিকের কাছে আবেদন করেননি; আর মালিক যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেবেন না, সে তো জানা কথা। নতুন নাটক অভিনীত হবে; অভিনেতারা বড়ো বড়ো পার্ট যে যা চাচ্ছেন, তিনি দিয়ে চলেছেন, বড়ো পার্ট আর রইল না; চার-পাঁচটি ছোটো পার্ট নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হলেন। পোশাক বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর, দাঁড়ানো, চলাফেরা নিজেদের মধ্যে এমন পরিবর্তন করেছেন যে, সেই নাটকে ওইসব ছোটো পার্ট বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠল।

টাকাপয়সার কথা যিনি কোনোদিন চিন্তা করেননি, ব্যবসাবুদ্ধি যাঁর একটুও নেই, একদিন এক খেয়ালে তিনি নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী হলেন। ফল ফলতে বিলম্ব হল না; বসতবাড়িখানি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল। আর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আশ্রয়দাতার বাড়িতে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এর জন্যে সমাজকে দোষ দেওয়া যায় না, শিল্পীকেও নয়। শিল্পীকে তাঁর খেয়াল কোন্ দিকে টেনে নিয়ে যাবে শিল্পী নিজেই জানেন না; আর সমাজও তা জানতে পারে না। আগের যুগে আমরা মাইকেলকে দেখেছি; এ-যুগেও তার দৃষ্টান্ত আছে।

যাক এ কথা।

এই সময়ে কলকাতা কর্পোরেশন এক নিয়ম করল— রাত একটার পর কোনো থিয়েটার চলবে না। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বাঁচল, দর্শকরাও; নাট্যকারেরা তাঁদের কলমের রশি টেনে ধরলেন।

১৯০৮ সালের শেষের দিকে মঞ্চস্থ হল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবারপতন'।

এই নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন—

"এই নাটকে আমি এক মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরীয়সী।"

এই নাটকে 'প্ল্যাটফরম স্পীচ' নেই, অনৈসর্গিক ঘটনার আমদানি নেই, আছে বিচার-বিশ্লেষণ। আর মনুষ্যত্ব যে জাতীয়তার উর্ধ্বে তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় চারণীদের গান—

কিসের শোক করিস ভাই—
আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই— আবার তোরা মানুষ হ'।

বলা বাহুল্য, এরকম উচ্চস্বরের কথা সাধারণ লোকের মনকে স্পর্শ করে না। হলও তাই, এ নাটক জমল না।

'মেবারপতন'এর পর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের দুটি গীতিনাট্য অভিনীত হল। তারপর দেখা দিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান'। সে-যুগে অভিনীত দু শ-আড়াই শ নাটকের মধ্যে মাত্র তিনখানি নাটক আজও টিকে আছে; তারা হল—'প্রফুল্ল' 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত'। কাল নিরবধি চলেছে; ভাবীকালে 'প্রফুল্ল' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' অবলুপ্তির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে কিনা জানিনে, তবে 'সাজাহান' সম্বন্ধে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে তার আসন সুদৃঢ়। এতে নীরস তথ্যপ্রচার নেই, ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে নাটক এগিয়ে চলেছে, আর এই ট্র্যাজেডির নায়ক সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব একে ঐতিহাসিক নাটক হতে চিরন্তন নাটকের পর্যায়ে উন্নীত করে দিয়েছে। বৃদ্ধ সাজাহান কারাপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ, তিনি চলমান ঘটনাপ্রবাহের দ্রষ্টা মাত্র; ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করছে প্রতিনায়ক আওরঙ্গজেব। জাহানারা পিয়ারা ইতিহাস-বিরোধী নয়; তারা নাটকীয় রস পরিবেশন ক'রে চলেছে। সেক্সপীয়রের 'কিং লিয়ার'-এর পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান'এর গৌরবময় আসন। অভিনয়ে আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় দানীবাবু, জাহানারার তারাসুন্দরী ও পিয়ারার সুশীলাবালা নাটকখানির মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

'শাস্তি কি শান্তি' রচনার সময় থেকে গিরিশচন্দ্র হাঁপানি রোগে বিশেষ কষ্ট পান; সেই কারণে প্রায় দু বছর তিনি কলকাতা ছেড়ে কাশীধামে বাস করেন। কিন্তু মিনার্ভার জন্যে নাটক লিখতে হবে। এখন কোন্ বিষয় ধরবেন? 'প্রফুল্ল' 'বলিদান' ও 'শাস্তি কি শান্তি'তে সামাজিক সমস্যাগুলি শেষ করেছেন। জাতীয়তামূলক নাটক পুলিসের কাছ থেকে পাস করিয়ে নেওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। গিরিশচন্দ্র ভাবলেন, ধর্মপ্রধান বাংলাদেশে ধর্মমূলক নাটক কোনোদিনই অনাদৃত হবে না। লিখলেন—'শঙ্করাচার্য'। ১৯১০ সালে নাটকখানি মঞ্চস্থ হল।

শঙ্করাচার্যের জীবনী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মালমসলা বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। গিরিশচন্দ্রকে নির্ভর করতে হল প্রচলিত জনশ্রুতির উপর, যার বেশির ভাগ অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। নাটকখানি ভক্তিমূলক নয়, জ্ঞানবাদের শুষ্ক আলোচনায় পূর্ণ। ধর্মপিপাসু শ্রোতা নাটকখানি দেখে মুগ্ধ হল, সাধারণ দর্শক নিল না।

এর পর অভিনীত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাংলার মসনদ'। 'সিরাজদ্দৌলা'র পূর্বকার ঘটনা নিয়ে নাটকখানি রচিত। বাংলার মসনদের উপর ভগবানের অভিশাপ, এই কথাই নাটকে বলা হয়েছে। নাটকখানি জমল না।

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের কয়েকটি গীতিনাট্যের পর দেখা দিল গিরিশচন্দ্রের 'রাজা অশোক'। অশোক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মালমসলা প্রচুর ছিল, গিরিশচন্দ্র তার অনেকগুলি ব্যবহার করলেন, কিন্তু পাশাপাশি দাঁড় করালেন কতকগুলি অলৌকিক চরিত্র—মার, তার কন্যা তৃষা প্রভৃতি। সমস্ত নাটকখানি না হল ঐতিহাসিক, না হল পৌরাণিক।

এর পর ১৯১১ সালে দেখা দিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত'।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনী-লেখক নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন—

"মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় একদিন কথায় কথায় দ্বিজেন্দ্রলালকে বললেন, রায় সাহেব, এতদিন পিঁয়াজ-রসুন খাইয়ে গায়ে গন্ধ করে দিয়েছেন, এইবার একটু ঘি-আলোচাল খাইয়ে দিন্ না। দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তর দেন, এইবার তাই হবে।"

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক সেই প্রতিশ্রুতির ফল। এই নাটকে মুখ্যচরিত্র হল চাণক্য; চাণক্যের পাশে চন্দ্রগুপ্ত একেবারে অপরিস্ফুট, অথচ নাটকখানির নাম 'চন্দ্রগুপ্ত'। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ঐতিহাসিক মূল্য কম, নাটকীয় মূল্যও খুব বেশি নয়। চন্দ্রগুপ্ত-মুরা-চাণক্যের পাশাপাশি দুটি উপকাহিনী চলেছে—একটি অ্যান্টিগোনাসের, অপরটি ছায়ার। নন্দের হত্যা রঙ্গমঞ্চে ওইরকম ভাবে দেখানো দর্শকের রুচিকে আঘাত করে, আর তা প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের বিরোধী। কাত্যায়ন অসঙ্গত, তিনি মন্ত্রীপদের অনুপযুক্ত; বাচালের স্থূল রসিকতা পীড়া দেয়। সব জড়িয়ে নাটকটি দানা বাঁধেনি। কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবে এই নাটকের কতকগুলি দৃশ্য বাঙালি-হৃদয়কে জয় করেছে। দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দার সাহের মুখে ভারতের প্রকৃতি-স্তব, চন্দ্রগুপ্তের মাতৃভক্তি, নন্দকে হত্যার পরে মুরার বিলাপ, চাণক্যের নিজ কন্যাকে ফিরিয়ে পাওয়ার দৃশ্য এই নাটকটিকে কালজয়ী করেছে। আর এই নাটকটিকে সমুজ্জ্বল করলেন দানীবাবু তাঁর চাণক্যের অভিনয়ে।

দানীবাবুর অভিনয় সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা যাক। বাংলা রঙ্গমঞ্চের উচ্চশ্রেণীর নট গিরিশচন্দ্র ঘোষ,

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, অমৃতলাল বসু, শিশিরকুমার ভাদুড়ী উচ্চশিক্ষায় সংস্কৃতিতে কাব্যবোধে অভিনয়ের উৎকর্ষতা-জ্ঞানে অসাধারণ ছিলেন। অভিনয়-কলা সম্বন্ধে প্রতিভা দানীবাবুর এঁদের কারুর চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি ছেলেবেলায় লেখাপড়া কিছুই শেখেননি, পরে কোনোদিন শেখবার চেষ্টাও করেননি। শোনা যায়, তাঁকে যেসব পার্ট দেওয়া হত তাতে যুক্ত অক্ষর ভেঙে লিখে দিতে হত। আর্ট বা সাহিত্যের কোনো ধারই তিনি ধারতেন না;' অথচ এই লোক মঞ্চে যখন অভিনয় করে যেতেন—কি-এক যাদু বিস্তার ক'রে শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলতেন। তাঁর উচ্চারণে জড়তা ছিল, তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল একটু বিকৃত। কিন্তু অভিনয়ে যখন তিনি ডুবে যেতেন তখন দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে অভিনয় দেখত, তাঁর এসব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা তাদের মনেই আসত না।

১৯১১ সালে ব্রিটিশ-রাজের দমননীতি প্রচণ্ডরূপ ধারণ করল। ব্রিটিশ-সিংহ নাট্যশালার উপর তার থাবা বসাল। 'সিরাজদ্দৌলা' 'মীরকাশিম' 'ছত্রপতি শিবাজী' 'দাদা ও দিদি' 'সন্ন্যাসীর প্রায়শ্চিত্ত' 'নন্দকুমার' 'বাংলার মসনদ'-এর অভিনয় বন্ধ হল, ওইসব পুস্তকগুলিও বাজেয়াপ্ত হল।

কাশীধামে থাকতে গিরিশচন্দ্র 'তপোবল' নামে একখানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। ১৯১১ সালের শেষে মিনার্ভায় তা অভিনীত হল। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে নিয়ে এই নাটক রচিত; চরিত্রবলই যে প্রকৃত বল এই ছিল নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। এরপর 'গৃহলক্ষ্মী' নামে একখানি সামাজিক নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তা শেষ করতে পারলেন না। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ গিরিশচন্দ্র দেহত্যাগ করলেন। বাংলার এক গৌরব-রবি চিরতরে অস্তমিত হল।

বেঙ্গল থিয়েটারের কথায় আসা যাক। ম্যানেজার বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ওই থিয়েটার-বাড়ি ভাড়া নিয়ে পর পর দেখা দিল—অরোরা, ইউনিক, ন্যাশানাল, গ্রেট ন্যাশানাল, গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল, থেস্‌পিয়ান টেম্পল, প্রেসিডেন্সি প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়। অরোরার সময় 'রিজিয়া' খুব জাঁকজমকের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। ইউনিকের পরিচালনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'তারাবাই' অভিনীত হল। গ্র্যাণ্ড থিয়েটার নাম দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এলেন, নিজের একখানি বই ও মনোমোহন গোস্বামীর 'পৃথ্বীরাজ' অভিনয় করলেন। অল্পকাল পরেই তিনি চলে গেলেন। এখন ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়ে চুনীলাল দেব ওই থিয়েটার পরিচালনা করতে থাকলেন। তারাসুন্দরী এখন এখানে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গবিক্রম', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দুর্গাদাস', মনোমোহন গোস্বামীর 'সমাজ' পর পর অভিনীত হল। চুনীবাবু চলে গেলেন। ১৯১২ সালে আবার এলেন অমরেন্দ্রনাথ। এখন থিয়েটারের নাম হল গ্রেট ন্যাশানাল; নিজ রচিত 'জীবনে-মরণে' অভিনয় করলেন। তিনি চলে গেলেন। তারপর নাম হল গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়দেব' খুব জনপ্রিয় হল; পরে বহু যাত্রাদল ওই নাটকের পুনরভিনয় করল। এর পর ক্ষেত্রমোহন মিত্র তিনকড়ি দাসীকে নিয়ে 'নৃপমদন' অভিনয় করলেন; নাটকটি সু-অভিনীত হল; এখন থিয়েটারের নাম হল থেস্‌পিয়ান টেম্পল। বছরখানেকের মধ্যেই থেস্‌পিয়ান টেম্পল উঠল। এল প্রেসিডেন্সি থিয়েটার। এরা বেশিদিন রইল না। তারপর ওই নাট্যশালা বহুদিন খালি পড়ে থাকল। এখন এল একটি প্রতিষ্ঠান—রাত্রে যেখানে একটিও আলো জ্বলল না, একটি লোকও আনাগোনা করল না; শুধু দিনমানে ১০টা-৫টায় পিয়ন বেরতে লাগল চিঠির বোঝা নিয়ে—এখানে স্থাপিত হল বিডন-স্ট্রীট পোস্ট-আপিস।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

[ক্রমশঃ]

জটিরামের কড়চা

অগ্নিমিত্র

[৺জটিরাম চাকলাদার যে নাট্যরচনাতেও হাত দিয়েছিলেন তার পরিচয় তাঁর বর্তমান রচনাটিতে পেয়ে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম। পাঠক-পাঠিকাও হবেন, এ-কথা বলা বাহুল্য। একথাও বলে রাখা দরকার, নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও জটিরামের রীতি মৌলিক। স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রীর সঙ্গতি রক্ষায় যে সাধারণ নিয়মটি আছে তাও তিনি অনুসরণ করেননি। কিন্তু তাঁর রচনায় কমা-ফুলস্টপের ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ায় এ-রচনাটির বানান অবিকৃত রেখে সম্পাদক-আসরের হাতে দিলাম। —লিপিকার]

কপিষ-নাটক

স্থান: দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রম-সংলগ্ন উদ্যান। কাল: অপরাহ্ণ। ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী গার্গী একটি নাতি-উচ্চ এলাচগাছের পাশে বসিয়া কুট্ কুট্ করিয়া কাজুবাদাম খাইতেছেন এবং একটি লোক-সঙ্গীত গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছেন। একটু পরেই দেখা গেল, বুকে পিঠে মাথায় ফ্লানেলের কাপড় জড়ানো ঋষি উদ্দালক উদ্যানের পাশের পথ দিয়া যাইতেছেন। গার্গী তাঁহাকে ডাকিলেন।

গার্গী। মহর্ষি! মহর্ষি উদ্দালক!

উদ্দালক। আমাকে ডাকছ?

গার্গী। (ফিক্ করিয়া হাসিয়া) অমন সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছেন?

উদ্দালক। আর বলো কেন? যাচ্ছি মহর্ষি চরক বি.পি.'র কাছে।

গার্গী। মহর্ষি চরক বি.পি.! সে আবার কী?

উদ্দালক। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া। আয়ুর্বেদ বেহাত হবার পর থেকে উনি তো ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া মতেই চিকিৎসা করছেন কিনা। কবরেজ ভেবে কেউ পাছে কল্ না দেয়, তাই নামের সঙ্গে বি.পি. জুড়ে নিয়েছেন।

গার্গী। আপনার বুকের দোষ তাহ'লে সারেনি এখনো?

উদ্দালক। কই আর পারল! মহর্ষি চরক এখন পেনিসিলিন চিকিৎসা চালাচ্ছেন। দেখি কী হয়!

গার্গী। গুরুর জমির জল ঠেকাতে আ'লের ওপর শুয়ে প'ড়ে কাজটা হয়তো আপনি খারাপ করেননি। কিন্তু ভুল ক'রেছেন সারাদিন শুয়ে থেকে। কাছে-পিঠে একটা লোকও পেলেন না? সে গিয়ে বলতো। আপনার সুখ্যাতিটা বজায় থাকতো, ব্রঙ্কাইটিসেও ভুগতে হ'ত না।

উদ্দালক। কী আর ক'রবো! এখন চিকিৎসায় কতদিনে সারে!

গার্গী। খরচটা কার? গুরুর না আপনার?

উদ্দালক। ছিঃ গার্গী, ও-কথা বলতে নেই। গুরুর কাজে দেহ একটু অসুস্থ হ'য়েছে ব'লে তাঁর কাছে হাত পেতে খরচ নেব?

গার্গী। আপনার আর এক সতীর্থ ঋষি উপমন্যুও তো নাকি গুরুর সেবা ক'রে ক'রে শেষে খেতে না পেয়ে অর্কপত্র খেয়ে অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাই না?

উদ্দালক। হ্যাঁ, তা হ'য়েছিল বটে। পরে তো চোখ ভালো হ'য়ে গেছে। সে এখন দিব্যি দু'পয়সা ক'রে খাচ্ছে।

গার্গী। আর আপনি?

উদ্দালক। আমার কথা আর বলো কেন? বুকের দোষটা না গেলে আর কিছু করা হ'চ্ছে না।

গার্গী। কাজুবাদাম খাবেন? কাশি থেকে আনিয়েছি।

উদ্দালক। দাও একমুঠো।

[গার্গী একমুঠি কাজুবাদাম উদ্দালকের হাতে দিলেন]

গার্গী। আপনার এ ফ্লানেল কোথায় কিনেছেন?

উদ্দালক। কি জানি বাপু। ঘরে ছিল তাই গায়ে জড়িয়েছি।

[দুইজনের গলার সাড়া পাইয়া গার্গী ফিরিয়া তাকাইল। দেখা গেল দেবগুরু বৃহস্পতি এবং মহর্ষি অগস্ত্য কথা বলিতে বলিতে আসিতেছেন। তাঁহারা কাছে আসিতেই গার্গী ও উদ্দালক অভিবাদন জানাইলেন।]

গার্গী। মহর্ষি অগস্ত্য এখনো ঘামছি দেখছি?

অগস্ত্য। থামার উপায় কি আছে? এই নিয়ে না-হ'ক পাঁচশো বাহাত্তর বার হাঁটাহাঁটি ক'রে আজ গিয়ে শুনলাম মেডিকেল বিলে অডিট-অবজেকশন হ'য়েছে!

[অবসন্নভাবে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন]

উদ্দালক। মেডিকেল বিল?

অগস্ত্য। ওই-যে সেই কবে সমুদ্র শোষণ ক'রেছিলাম, সেই সময় কতগুলো মাছের কাঁটা, গলায় ফুটেছিল। দেবরাজ ইন্দ্রকে গিয়ে বললাম তোমাদের রাজ্য তো দানবদের হাত থেকে নিষ্কণ্টক হ'ল, এবার আমার গলাকে নিষ্কণ্টক করবার বন্দোবস্ত করো বাপু। ইন্দ্র বললে, আপনি যা খরচ ক'রে একটা বিল দেবেন, আমি দেবো। আমার টাকাকড়ি কোথায় বলো? ধার ক'রে যা'হক চিকিৎসা তো করালাম। বিল-ও দিলাম। কিন্তু এতদিন পরে আজ শুনি অডিট-অবজেকশন হ'য়েছে।

গার্গী। কেন?

অগস্ত্য। তবে আর ব'লছি কি। দেবতারা যে আমাকে সমুদ্র শোষার কন্ট্রাক্ট দিয়েছিলেন তার টেণ্ডারের কপি চাই, অর্ডারের কপি চাই। আচ্ছা বলো দিকি বাপু, ওই সাত-তাড়াতাড়ির ভেতর লেখাপড়ার কথা মনে আসে? নাকি আমার গলায় অতগুলো কাঁটা ফুটে থাকবে তা জানা ছিল? দুত্তোর ছাই, না দেক না দেবে টাকা। নাও, বিড়ি খাও—

[ট্যাঁক হইতে দুইটি বিড়ি বাহির করিলেন]

গার্গী। (জিভ কাটিয়া) মহর্ষি! আমি তো বিড়ি খাইনে।

অগস্ত্য। এ-হে-হে, ভাখো তো কী ভুল! নাও হে উদ্দালক—

উদ্দালক। আজ্ঞে, আপনাদের সমুখে—

অগস্ত্য। ওরে বাবা, তাতে দোষ হবে না। খাও—

[দুজনেই বিড়ি ধরাইলেন]

জানলে গার্গী, আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি। তবু বৃহস্পতিকে একবার ব'লে রাখছি। ও যদি তদ্বির ক'রে বিলটার কোনো গতি ক'রতে পারে।

বৃহস্পতি। আমার কথা তো তোমাকে বললাম হে। আমার আখড়া থেকে চার্বাক বেরোবার পর থেকে ও-মহলে খাতির একটু ক'মে গেছে। পেন্‌শনটা অবিশ্যি দিয়ে যাচ্ছে। দেখি, কতদূর কী ক'রতে পারি।

অগস্ত্য। বুঝলে বৃহস্পতি, বেচে কারও উপকার ক'রতে নেই।

গার্গী। আপনার সামনে ব'সে ঋষি উদ্দালক। উনি তো গুরুর জমির জল ঠেকিয়ে এখনো সর্দি-কাশিতে ভুগছেন।

অগস্ত্য। ভুগুক। সেরে গেলে আর একবার জমির কাদায় গিয়ে শুয়ে থেকো হে। জগতে আর তো শোবার জায়গা নেই!

উদ্দালক। কী যে বলেন! আচ্ছা, আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আমার ইনজেকশনের সময় হ'ল, আমি যাই। [উদ্দালকের প্রস্থান]

অগস্ত্য। তা তুমি এখানে কী মনে ক'রে গার্গী? যাবার সময় শুনলাম গুনগুন্ ক'রে গান গাইছিলে?

হস্পতি। ও-যে রেডিও প্রোগ্রাম পেয়েছে।

অগস্ত্য। বাঃ, উত্তম।

গার্গী। আপনি শুনবেন না আমার গান?

অগস্ত্য। আমার রেডিও নেই। আর্যা লোপামুদ্রার মামা আদুরে ভাগ্নীকে একটা কিনে দিয়েছিলেন। সেটাও রেডিও সিলোন বাজাতে-বাজাতে জখম হ'য়ে পড়ে আছে।

[অগস্ত্য গলায় কম্ফর্টার জড়াইতে লাগিলেন]

গান তো গাইছ, নাড়া বেঁধেছ কার কাছে?

বৃহস্পতি। তা শোনোনি বুঝি? গার্গী আজকাল চার্বাকের ছাত্রী হ'য়েছে।

অগস্ত্য। চার্বাক? মানে, তোমার সেই নাস্তিক শিষ্য?

গার্গী। ফোক-সঙ্‌টা উনি খুব ভালো তালিম দেন কিনা।

অগস্ত্য। রাখো তোমার ফোক-সঙ্! আর কোনো সঙ্ ছিল না? ধ্রুপদ-সঙ্ নেই? একটা সেফটিপিন দাও তো, কম্ফর্টারটা এঁটে নিই।

[গার্গী একটা সেফটিপিন লইয়া অগস্ত্যের কম্ফর্টার আঁটিয়া দিলেন। অগস্ত্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

আমার কেসটা তাহ'লে একটু দেখো, বৃহস্পতি।

[অগস্ত্যের প্রস্থান]

বৃহস্পতি। ভাখো দিকি বেচারার হাল! একটা মেডিকেল বিলের জন্যে এত হয়রানি।

গার্গী। সব দেখেশুনেই আমি মিউজিক লাইনে চ'লে এসেছি।

বৃহস্পতি। তোমার পঠন-পাঠন?

গার্গী। তুলে রেখেছি। ওতে পয়সা নেই। খেটেখুটে এ লাইনে একবার একটা রেকর্ড বাজারে ধরাতে পারলে আর ভাবনা নেই।

বৃহস্পতি। তোমার কাছে ঝাল-নুন আছে গার্গী?

গার্গী। না তো। নিয়ে আসবো?

বৃহস্পতি। আনো। আমি ততক্ষণে গাছে উঠে কিছু পক্ব কপিত্থ পাড়ছি।

[গার্গী কোমরে আঁচল জড়াইয়া আশ্রমের দিকে ছুটিল। বৃহস্পতি কয়েৎবেল-গাছে উঠিতে লাগিলেন।

একটু পরেই দেখা গেল চার্বাক উদ্যানের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার পিছনে তার ফিলিপ সিডনি ও ধাত্রী পান্না।

বৃহস্পতি লজ্জা পাইয়া ডালের আড়ালে লুকাইলেন।]

চার্বাক। গার্গী এখানে ছিল, গেল কোথায় ?

ধাত্রী পান্না। আশ্রমের দিকে ছুটে গেলেন একজন।

চার্বাক। তাহ'লে গার্গীই হবে। যাকগে, তোমার কান্না থেমেছে ?

পান্না। এ কান্না কি থামে ? নিজের সন্তানকে জেনে-শুনে ছুরির মুখে ঠেলে দিয়েছি, ও-হো-হো—

[আবার কাঁদিয়া উঠিল]

চার্বাক। তা বাপু, তোমার ছেলেটির জীবনের মিলেটিড ভ্যালু তো কম ছিল। তার জন্যে আবার কান্না কেন ?

পান্না। কম ? ধাত্রীর ছেলে হ'লেও সে তো মানুষ ছিল, বাবা।

চার্বাক। মা-জননী, তা যদি বুঝে থাকো তো রাজবংশ বাঁচাতে সেই নির্দোষ ছেলেটাকে কেন মারলে ?

পান্না। নইলে যে রাণা-বংশ ধ্বংস হ'য়ে যেত, বাবা। ডি. এল. রায় নাটক লিখতেন কাকে নিয়ে বলো ?

চার্বাক। তাহ'লে কেঁদো না বাপু। তোমাদের ও আত্মত্যাগের থিয়োরি আমি বুঝিনে। একটা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আর একটা বলি দিতেই হয়—তাহ'লে যেটা আগে যাচ্ছিল, সেইটে গেলেই হয়। এই যে আর একজন। চেনো এঁকে ?

পান্না। বিলাইতী মানুষ ?

চার্বাক। হ্যাঁ। নিজের মুখের জল দিয়ে আর-একজনকে বাঁচিয়ে, নিজে তারপর হেঁচকি তুলে এন্তেকাল ক'রলেন। এঁর তবু কৈফিয়ত আছে। সে-লোকটা জলের বোতলের দিকে তাকিয়ে ছিল। তোমার কী কৈফিয়ত আছে ?

সিডনি। মিস্টার চার্বাক, আমি তাহ'লে যাচ্ছি। গুড-নাইট !

[ফিলিপ সিডনির প্রস্থান]

চার্বাক। পান্নাবাই ! পরের জন্যে করো ভালো কথা। কিন্তু নিজের ক্ষতি ক'রেই যদি করলে তাহ'লে তোমার ক্ষতিটা পূরণ করবে কে ?

পান্না। ভগবান ক'রবেন।

চার্বাক। তিনি ক'রবেন কী ? তিনি তো প্যারালিসিস হ'য়ে প'ড়ে আছেন !

[গার্গীর প্রবেশ। হাতে বাদ-ফুল, খাঁচাল্কা। গলায় লোক-সঙ্গীতের সুর।]

গার্গী। তুমি এসে গেছ চার্বাক ?

চার্বাক। তোমার হাতে কী ?

[কয়েৎবেল-গাছ হইতে বৃহস্পতি গলা চড়াইয়া ডাক দিলেন]

বৃহস্পতি। চার্বাক !

চার্বাক। গুরুদেবের গলা না ? কোথায় তিনি ?

বৃহস্পতি। এই যে বাবা, আমি কপিথ-বৃক্ষে। কাঁটায় আমার উত্তরীয় আটকে গেছে। আমাকে একটু সাহায্য করো, চার্বাক।

[চার্বাক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

গার্গী। ওমা, তুমি গেলে না ?

চার্বাক। উহুঁ। যখনই হোক উনি নিজে নামবেন।

গার্গী। তুমি কিরকম লোক, চার্বাক ? কপিথ-শাখায় গুরুদেবের উত্তরীয় আটকে গেছে আর তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে ?

চার্বাক। তুমি যাও না।

গার্গী। আমি গাছে চড়ব ?

চার্বাক। ক্ষতি কি ? ব্রহ্মবিদ্যা ছেড়ে কোক-শাস্ত্র ধরতে পেরেছ, আর গাছে উঠতে পারবে না ?

গার্গী। বেশ, যাচ্ছি।

[গার্গী গাছের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। চার্বাক দাঁড়াইয়া মিটমিট করিয়া হাসিতে লাগিলেন।]

বৃহস্পতি। গার্গী, তুমি এসেছ ? আমি যে নামতে পারছিনে।

গার্গী। উত্তরীয় রেখেই নেমে আসুন।

বৃহস্পতি। এমন দামী উত্তরীয় রেখে যাবো ?

[বৃহস্পতি কাঁদিবার উপক্রম করিলেন]

চার্বাক। গুরুদেব ! প্রাণটা আরও দামী।

বৃহস্পতি। তোমার কল্যাণ হোক, চার্বাক। আমি উত্তরীয় রেখেই নামছি।

[একটু পরে বৃহস্পতি নামিয়া আসিলেন। গার্গী অগ্রসর হইয়া গেলেন।]

গার্গী। কপিথ এনেছেন কি ?

বৃহস্পতি। তা এনেছি। এই নাও। বেশ ক'রে রসিয়ে রাখো তো, মা।

[চার্বাক অগ্রসর হইয়া আসিলেন]

চার্বাক। প্রভু! আমিও যেন কপিত্থের অংশ পাই।

গার্গী। আহা, লজ্জাও করে না!

বৃহস্পতি। উঁহুঁ। চার্বাক ন্যায্য কথাই ব'লেছে, গার্গী। ওর বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে আমার চেষ্টায় আমি নেমে এলাম। ওর বুদ্ধির দাম দিতে হবে বইকি।

গার্গী। লোকে মিথ্যে বলে না। এত শিষ্য থাকতে চার্বাকের উপর আপনার পক্ষপাতিত্ব বেশী।

বৃহস্পতি। তা হ্যাঁ, তা একটু বটে।

ধাত্রী পান্না। আমি তাহ'লে যাই।

চার্বাক। আরে, যাবে কি, কয়েৎবেল-মাখা খেয়ে যাও।

ধাত্রী পান্না। হায় ভগবান! কয়েৎবেল যে আমি ভগবানকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছি। আর খাওয়ার উপায় নেই।

চার্বাক। তুমি একেবারে মরেছ। সবই গেছে, এখন কেলাস ফাইভ-সিক্সের পাঠ্যপুস্তকে তোমার গল্প আর ছবিখানা যা ভরসা। সেগুলোও আবার কাউকে সমর্পণ করে বসোনি তো?

ধাত্রী পান্না। আবার সেই ছবির কথা মনে করিয়ে দিলেন? ও-হো-হো—

[কাঁদিয়া ফেলিল। এবং ছবির ভঙ্গীতেই বাঁ-হাতখানিতে চোখ ঢাকিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।]

বৃহস্পতি। আহা, বেচারা একটু খেতে পেলে না।

[গার্গী কিছুটা মাখা কয়েৎবেল বৃহস্পতির হাতে দিলেন। বৃহস্পতি চাটিতে চাটিতে এক অদ্ভুত পরিতৃপ্তির ভঙ্গী করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।]

গার্গী। এবার তো তোমার পালা?

চার্বাক। তোমাকে বঞ্চিত ক'রে নয়।

গার্গী। এত দয়া?

চার্বাক। স্রেফ প্রতিদান। দয়া-ক্ষমা কিছু নয়। তুমি ব্রহ্মবিদ্যের কচ্‌কচি ছেড়ে এসে আমার সুরে লোক-সঙ্গীতের রেকর্ড ক'রছ—তার প্রতিদান।

গার্গী। আর কিছু নয়?

চার্বাক। আর কী?

গার্গী। আমাকে গান শেখাচ্ছ কেন?

চার্বাক। তোমার গলা ভালো। শেখালে, গানগুলোর একটা গতি হবে তাই শেখাচ্ছি।

গার্গী। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তুমি বড়ো নিষ্ঠুর!

চার্বাক। কেন, আমি তো তোমার মেডিকেল বিল চেপে রাখিনি। মাইনে দিচ্ছ, প্রাণ দিয়ে শেখাচ্ছি। ফাঁকিটি পাবে না।

গার্গী। মাইনে! তোমাকে আমি মাইনে দিই?

[চোখ ছলছল করিয়া উঠিল]

চার্বাক। তবে কী দাও, সম্মান-দক্ষিণা? বেশ, তাই সই। ওকি, তোমার চোখ ছলছল ক'রছে কেন? ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়েছে?

গার্গী। (স্বগতঃ) হায়রে লোকায়তিক, চোখ কেন ছলছল করে, কুমারী-হৃদয় কেন কেঁপে-কেঁপে ওঠে, তা তুমি কি বুঝবে? (প্রকাশ্যে) কই না তো!

চার্বাক। আর একটু কপিত্থ-মাখা দাও দিকি।

গার্গী। তোমার লোক-সঙ্গীতের টানে আমি পুঁথিপত্তর ফেলে এসেছি। তোমার জন্যে—

চার্বাক। মোটেই ভালো কাজ করোনি। পরের জন্যে নিজের ক্ষতি ক'রেছ কি মরেছ। তাহ'লে ওই ধাত্রী পান্নার মতো কেলাস-ফাইভের বইয়ে ছবি ছাপা হবে আর নিজে কেঁদে কেঁদে মরবে, তা ব'লে রাখছি।

গার্গী। আগে কেন বলোনি? কেন আগে সাবধান ক'রে দাওনি?

[ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন]

চার্বাক। গার্গী! তুমি কাঁদছ? তুমি কি প্রেমে পতিত হ'য়েছ?

গার্গী। না। কপিত্থ-মাখা বড়ো ঝাল হ'য়েছে। উঃ—

[চার্বাক ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইলেন]

সমাচার দর্পণ

॥ জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্ত্তৃক সম্পাদিত ॥

॥ শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত ॥ ॥ প্রথম প্রকাশ :—২৩শে মে ১৮১৮ খৃঃ ॥

৫৩ সংখ্যা শনিবার। ২২ মে সন ১৮১৯। ১০ জ্যৈষ্ঠ সন ১২২৬।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তমিহ জানন্ত সমাচারস্য দর্পণে॥

কোম্পানির কাগজ।

কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা বার আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা এক টাকা ডিসকৌণ্ট।

ইশ্তাহার।

হিন্দস্থান বাঙ্ক।

১১ মে ১৮১৯।

পঁচিশ২ টাকা করিয়া পঁচহত্তর টাকার মিথ্যা তিন নোট হিন্দস্থানবাঙ্কের নোট বলিয়া ঐ বাঙ্কে টাকা লইবার কারণ কোন ব্যক্তি আনিয়াছে। এই কারণ ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আপন বাঙ্কের যে২ স্বতন্ত্র চিহ্ন আছে যাহার দ্বারা সকল লোক সত্য কিম্বা মিথ্যা নোট জানিতে পারে সেই২ চিহ্ন পুনর্ব্বার লোকেরদিগকে জানাইতেছেন।

হিন্দস্থানবাঙ্কের প্রত্যেক প্রকৃত নোটে এই২ জলের দাগ আছে যদি আলো ও চক্ষু এই উভয়ের মধ্যে ঐ নোট রাখিয়া কেহ দেখে তবে ঐ জলের দাগ সে অনায়াসে দেখিতে পায়। নোটের কিনারে চারি দিকে জলের ঢেউর মত লতার দাগ আছে ও ইংরেজী বড় অক্ষরে হিন্দস্থান বাঙ্ক এই কথা ঐ কাগজের মধ্যে লেখা যায় এবং ঐ রূপ ইংরেজী অক্ষরের উপরে হিন্দস্থানবাঙ্ক এই কথা বাঙ্গালা অক্ষরে ও নাগর অক্ষরে লেখা যায়। এবং তাহার নীচে পারসী অক্ষরে সেই কথা আছে। যে তিন মিথ্যা নোট প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জলের কোন দাগ ছিল না এবং ঐ নোট শ্রীযুত এ জে মেকান সাহেবের নামে মিথ্যা যে সহী করিয়াছিল সে সহী প্রকৃত রাখিতে পারে নাই তাহা হইতে অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল।

ঐ বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা আরো ইশ্তাহার দিতেছেন যে বাঙ্গালবাঙ্কের যেমত ধারা আছে সেই ধারানুসারে হিন্দস্থানবাঙ্কের যে জল চিহ্ন তাহা যদি কোন মিথ্যা নোটের উপরে থাকে তবে যে ব্যক্তি সেই নোট বাঙ্ক আপন লোকসান করিয়াও তাহাকে সেই নোটের টাকা অবশ্য দিবেক যদি সেই ব্যক্তি আপন হিসাবের কেতাবের মধ্যে সেই মিথ্যা নোটের নম্বর ও টাকা ও যাহার নিকটে পাইয়া থাকে তাহার নাম এমত দেখাইতে পারে যে পূর্ব্বে ঐ নোট যাহার স্থানে ছিল তাহা প্রকাশ হয়। কিন্তু যদি তজবীজে প্রকাশ হয় যে ঐ ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোট করিয়াছে কিম্বা তাহা জ্ঞাত ছিল তবে ঐ মিথ্যা নোটের টাকা সে কদাচ পাইবেক না। আরো যে কোন মিথ্যা নোটে জলের দাগ থাকে কি না থাকে সেই রূপ নোট যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা

না জানিয়া টাকা লইবার কারণ বাঙ্কে আনে তবে মিথ্যার প্রকাশ হইলে সেই ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারী ব্যক্তিকে দেখাইয়া সে বিষয় আদালতে সাবুদ করিতে পারিলে সে ব্যক্তি তাহার টাকা পাইবেক। ঐ তিন মিথ্যা নোটকর্ত্তারদিগকে ধরিবার নিমিত্ত বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা সকল লোকের নিকটে জ্ঞাত করাইতেছেন। যে ব্যক্তি ঐ মিথ্যা নোটকারিরদের এমত সন্ধান করিয়া দিতে পারে যে তাহারা ধরা পড়ে ও আদালতে সাবুদ হয় কিম্বা এই তিন নোটের কোন এক নোটের সন্ধান দিতে পারে কিম্বা বাজারে যে আর কোন মিথ্যা নোট চলিতেছে তাহার বিষয়ে সাবুদের উপযুক্ত সন্ধান দিতে পারে তবে সে জন হাজার টাকা বকশীস পাইবেক কিন্তু যদি মিথ্যা নোটকারীরদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি এই২ রূপ সন্ধান দেয় সে কদাচ পাইবেক না। সাবুদ হইবামাত্র হাজার টাকা বকশীস দেওয়া হইবেক।

নূতন সমাচার পত্র।

দক্ষিণ দেশে কুমারী অন্তরীপের নিকটে মোং তঞ্জাবুর শহরে তথাকার রাজা সরফৌজী মহারাজ আপন ঘরে এক ছাপাখানা করিয়াছেন ও তামল নামে আপন ভাষাতে এক সমাচারের কাগজ ছাপাইবেন তাহাতে এক দিগে ইংরাজী ও এক দিগে তামল থাকিবেক।

ধনলাভ।

দুই মাস হইল মোং জঙ্গীপুর হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে গংকোর নামে এক গ্রামে এক দরিদ্র গৃহস্থ আপন ঘরের নিকটে এক গর্ত্ত করিবার সময়ে অকস্মাৎ ছয় সাত হাজার টাকা পাইয়াছে এই টাকা অতিশয় প্রাচীন ও তাহার মোহর দেখিয়া বুঝা যায় যে সে পাঁচ ছয় শত বৎসরের প্রাচীন টাকা হইবে। এইরূপ গৌড় শহরে মৃত্তিকা খুঁড়িবার সময়ে অনেকে অনেক টাকা পায়।

আমেরিকা দেশে শীঘ্রগামী।

আমেরিকা দেশের মধ্যে অত্যুত্তম রাস্তা আছে ও গাড়ির দ্বারা সকল লোক ও ডাকওয়ালা গমনাগমন করে। পাঁচ মাস হইল আমেরিকার রাজধানী নগরহইতে অন্য এক নগরে যাইতে গাড়ীর দ্বারা ডাক বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক শত বিশ ক্রোশ গিয়াছে মোং কলিকাতাহইতে যতদূর মালদহ এত দূর বিশ ঘণ্টায় পঁহুছিল এমত বেগগামিতা কখনও শুনি নাই।

হীরা হারাণ।

ইংগ্লণ্ড দেশের রাজার কতক হীরা আছে সেহীরা কেবল এক রাজার নয় কিন্তু যখন যিনি রাজসিংহাসনে বসেন তাহারি সে হীরা সেই সকল হীরা ইংগ্লণ্ডের রাণীর জিম্মাতে ছিল। রাণীর মরণান্তর সে হীরার অন্বেষণ হইয়াছে কিন্তু পাওয়া যায় নাই যে অপহরণ করিয়াছে সে ধরা পড়ে নাই যে সিন্দুকে থাকিত কিন্তু সে সিন্দুক শূন্য পাওয়া গিয়াছে।

অপমৃত্যু।

১৮ মে মঙ্গলবার মোং কলিকাতার সিমুলিয়াতে এক বণিকের স্ত্রী একটা পাথরের বাটীর কারণ বিরোধ করিয়া গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বেদান্ত মত।

৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচন্দ্র মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণান্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কাল ক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদহইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।

ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহী।

গত বৎসর যখন ইংগ্লণ্ডীয় সেনাপতি ও সিপাহী ফ্রান্স দেশে ছিল তখন এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহী আপন ইচ্ছায় এক জন ফরাসীসকে খুন করিল। পরে ঐ ব্যক্তির মকদ্দমা হইয়া সে দোষী হইলে তাহার ফাঁসি দিতে হুকুম হইল তখন ঐ ব্যক্তি আপন সেনাপতির নিকটে দৌড়িয়া গিয়া কহিল যে তোমার আজ্ঞায় আমি যে অনেক ফরাসীসকে মারিয়াছি তাহার কারণ কিছু হইল না কিন্তু আপন ইচ্ছায় যে এক জনকে মারিয়াছি ইহার কারণ আমাকে ফাঁসি দিতে হুকুম করিয়াছেন এ কি।

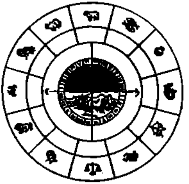

গ্রহ-বিচিত্রা

['বিশ্ব দিগন্ত' পত্রিকার
গণিত-জ্যোতিষ বিভাগ হইতে গৃহীত]

জ্যোতিষশর্মা

॥ মাঘ মাসের রাশিফল ॥

মেষ

মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নানাপ্রকার অশান্তি—ভাগ্যলাভে বাধা সৃষ্টি হবে। প্রথম সপ্তাহের পরে ভালো চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। শত্রুহানি হ'য়ে কাজের বাধা অপসারিত হবে। কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হবে। গৃহে পূজা-উৎসবের যোগ আছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থিক অবস্থা কতকটা ভালো চলবে। পূর্বের অসমাপ্ত-কর্ম-সমাধানের সম্ভাবনা আছে।

নক্ষত্রফল—অশ্বিনী-মেষের প্রথমাংশে কাজের মধ্য থেকে আর্থিক উন্নতি হবে। ভরণী এবং কৃত্তিকায়—বন্ধু দ্বারা ভাগ্যোন্নতির যোগ আছে।

বৃষ

মাসের প্রথম সপ্তাহ ভালো চলবে। নিজের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কর্মে সাফল্য-লাভ হবে। বিবাহ-বিষয়ে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শুভ-যোগ। এইসময়ের মধ্যে বিবাহ হবার সম্ভাবনা আছে। তারপর গ্রহদোষে বাধা সৃষ্টি করবে। প্রথম সপ্তাহের পরে মাসটি বিশেষ ভালো চলবে না। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। গুরুজন দ্বারা অশান্তি লাভ হবে। কর্মস্থলে বাধার ভিতরে কাজ করতে হবে। সর্বোন্নতিতে বাধা আসবে। সন্তানের স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো থাকবে না।

নক্ষত্রফল—কৃত্তিকায়—বন্ধু দ্বারা ক্ষতি। রোহিণীর—আকস্মিক রোগভোগ। মৃগশিরায়—অর্থহানি, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, মোকদ্দমা-সৃষ্টির সম্ভাবনা।

মিথুন

মাসটি নানাপ্রকার সংঘাতের মাধ্যমে উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে। দাম্পত্য-কলহ-সৃষ্টির যোগ আছে। বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়ে গোলযোগ-সৃষ্টি হ'য়ে, পরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাহ সম্পাদিত হবে। কর্মস্থলে অশান্তির প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। অগ্রজের কতকটা উন্নতি হবে।

নক্ষত্রফল—মৃগশিরা-মিথুনের স্ত্রীলোক দ্বারা প্রতারণা লাভ এবং অর্থহানি হবে। আর্দ্রায়—স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ, এবং বিবাহ-বিষয়ে গোলযোগ সৃষ্টির যোগ আছে। পুনর্বসুর—বন্ধু দ্বারা প্রতারণা সম্ভব।

কর্কট

মাসের প্রথম সপ্তাহ ভালো চলবে, তারপর সম্পূর্ণ মাসটিই অশুভ চলবে। প্রতিবেশীর সহিত শত্রুতা, অনুজ দ্বারা ক্ষতি, কর্মস্থলে শত্রুবৃদ্ধি হবার যোগ আছে। সাধারণ স্বাস্থ্য একপ্রকার চলবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। সন্তানদের অবস্থা মোটামুটি ভালো। আর্থিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হবে না। বিবাহ-বিষয়ে কোনো গ্রহদোষে বাধা নেই।

নক্ষত্রফল—পুনর্বসু-কর্কটের কলহ দ্বারা অর্থক্ষতি। পুষ্যার—কর্মস্থলে অশান্তি। অশ্লেষার—শত্রুর কবলে অর্থ, এবং স্ত্রীর রোগভোগ থাকবে।

সিংহ

মাসটি পূর্বমাসের তুলনায় ভালো চলবে। আর্থিক উন্নতি হবে। শত্রুহানি হবে। সন্তানের উন্নতি হবে। সন্তান-লাভের সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধির প্রভাবে সকল কাজে জয় হবার যোগ আছে। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা আছে। পিতার সম্মান বৃদ্ধি হবে। পারিবারিক শান্তি থাকবে। বিবাহ-বিষয়ে এ-মাসে কোনো গ্রহদোষ দ্বারা বাধা সৃষ্টির প্রভাব নেই।

নক্ষত্রফল—মঘা-সিংহের আর্থিক উন্নতি এবং সন্তানের উন্নতি হবে। পূর্বফল্গুনীর—মানসিক অশান্তি, বুদ্ধির ভুলে অর্থহানি সম্ভব। উত্তরফল্গুনীর—মানসিক চাঞ্চল্যভাব থাকবে ; বন্ধুর সাহায্যে উন্নতি সম্ভব।

কন্যা

বিশেষ ভালো চলবে না। মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। শরীরে বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকবে। দাম্পত্য-কলহ দ্বারা পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করবে। কর্মস্থল অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। পিতৃবন্ধু দ্বারা কর্মসাফল্য লাভ হবে। বিবাহ-সংক্রান্ত-বিষয়ে বাধা সৃষ্টি হবে। মাতার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

নক্ষত্রফল—উত্তরফল্গুনী-কন্যার স্বভাবের চঞ্চলতা দ্বারা দুষ্টা নারীর প্রভাবের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বুদ্ধির প্রভাবে আত্মদমন ক'রে চলবার সামর্থ্য থাকবে। কর্মস্থল ভালো চলবে। হস্তার—বায়ুভয়, কর্মস্থলে আকস্মিক অশান্তি থাকবে। চিত্রার—বন্ধু দ্বারা ক্ষতি এবং মাতার রোগভোগ থাকবে ; আর্থিক উন্নতির যোগ আছে।

তুলা

মাসের প্রথম সপ্তাহে আর্থিক সচ্ছলতা থাকবে। এইসময়ে অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে। তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় মাসটি চলবে। কর্মস্থল ভালো চলবে। ভ্রাতার উন্নতি সম্ভব। সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো চলবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সাধারণভাবে চলবে। ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্বসূত্রে কতকটা উন্নতি হবে। ভ্রমণের প্রভাব সৃষ্টি করবে। বিবাহ-সংক্রান্ত-বিষয়ে গ্রহদোষে কোনো বাধা নেই। [illegible] অবস্থা মোটামুটি ভালো চলবে।

নক্ষত্রফল—চিত্রানক্ষত্রের তুলারাশির পক্ষে ভ্রাতার সহিত বিরোধ সম্ভব। স্বাতীর—স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। বিশাখার—ভ্রাতার উন্নতি এবং বন্ধুর দ্বারা নিজের সাধারণ উন্নতি হবে।

বৃশ্চিক

মাসটি ভালো চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পারিবারিক শান্তি থাকবে। আর্থিক উন্নতি হবে। কর্মোন্নতির যোগ আছে। কর্মোপলক্ষ্যে ভ্রমণ সম্ভব। পিতার উন্নতি হবার সম্ভাবনা। বিবাহ-বিষয়ে গ্রহদোষে বাধা নেই। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না।

নক্ষত্রফল—বিশাখার—বন্ধুর সাহায্যে আর্থিক উন্নতি। অনুরাধার—সন্তানের জন্য উদ্বেগ, এবং অর্থলাভ ও অর্থহানি উভয়ই হবে। জ্যেষ্ঠার—অর্থলাভের যোগ এবং কর্মোন্নতির সম্ভাবনা আছে।

ধনু

বিশেষ ভালো চলবে না। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। কলহ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে। শরীরে আঘাত-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। মানসিক অবস্থা ভালো থাকবে না। পারিবারিক অশান্তি থাকবে। কর্মস্থলে শত্রুর দ্বারা ক্ষতির যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—মূলার—পারিবারিক কলহ সম্ভব। পূর্বাষাঢ়ার—মানসিক অশান্তি, কর্মস্থলে আর্থিক বিষয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা আছে। উত্তরাষাঢ়ার—ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে।

মকর

মাসের প্রথম সপ্তাহে আর্থিক সচ্ছলতা থাকবে, তারপর ব্যয়বাহুল্যে অর্থাভাব সৃষ্টি করবে। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিবে, পরে তা হবে না ; স্থগিত থাকবে। সাধারণ স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো চলবে না। সন্তানের অবস্থা ভালো চলবে। পুণ্যকর্মে বাধা সৃষ্টি করবে। মাঝে মাঝে বুদ্ধির ভুলে যেমন অর্থব্যয় হবে, তেমনি কাজে অশান্তি আসবে।

নক্ষত্রফল—উত্তরাষাঢ়া-মকরের বন্ধুর বিপদে অর্থব্যয় এবং কর্মস্থলে সাধারণ উন্নতি হবে। শ্রবণার—সন্তানের পীড়াভোগে অথবা অর্থব্যয় সম্ভব। ধনিষ্ঠার—লোকসাজের সম্ভাবনা আছে।

কুম্ভ

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। আর্থিক উন্নতি হবে। আকস্মিক ধনলাভের যোগ আছে। মাসের প্রথম সপ্তাহের পর থেকে সকল কাজে সাফল্যলাভ হবার যোগ আছে। পিতার উন্নতি হবে। অশান্তির ভিতর থেকে অগ্রজের উন্নতি হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। কর্মস্থল ভালো চলবে।

নক্ষত্রফল—ধনিষ্ঠায়—স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। আর্থিক উন্নতি হবে। অগ্রজের রোগভোগ থাকবে। শতভিষায়—একদিকে দুষ্টলোক দ্বারা প্রতারণা লাভ, অন্যদিকে আর্থিক উন্নতি উভয় সম্ভব। পূর্বভাদ্রপদের—ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে।

মীন

কর্মস্থলে শ্রমবহুল কর্মের মাধ্যমে কর্মোন্নতির সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। দুষ্ট স্ত্রীলোকের প্রভাব সৃষ্টি হবে। সন্তানের অবস্থা ভালো চলবে। পিতামাতার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। পিতার পক্ষে কতকটা অশুভ প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। বিবাহ-বিষয়ে নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি হ'য়ে, পণ্ড হবার উপক্রম হবে।

নক্ষত্রফল—পূর্বভাদ্রপদ-যাঁদের কর্মস্থলে প্রতারণা লাভ। উত্তরভাদ্রপদের—কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। রেবতীর—ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে।

দ্রষ্টব্য: রাশিফল সাধারণভাবে বর্ণিত হ'ল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকালের গ্রহসংস্থান এবং দশান্তর্দশার ফলের সহিত পার্থক্য ঘটিতে পারে।

পৌষ মাস, ১৩৬৬ সন [ডিসেম্বর, ১৯৫৯—জানুয়ারি, ১৯৬০]

বাং তারিখ	ইং তারিখ	চান্দ্রিক তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১	১৭	২৬	বৃহস্পতি	দ্বিতীয়া	পুনর্বসু	শুভ, রাত্র ঘ. ৪।০ গতে নিষেধ	
২	১৮	২৭	শুক্র	তৃতীয়া	পুনর্বসু	নিষেধ, সন্ধ্যা ঘ. ৫।১ গতে শুভ	
৩	১৯	২৮	শনি	চতুর্থী	পুষ্যা	নিষেধ	
৪	২০	২৯	রবি	পঞ্চমী	অশ্লেষা	নিষেধ	
৫	২১	৩০	সোম	ষষ্ঠী	মঘা	নিষেধ	
৬	২২	১	মঙ্গল	সপ্তমী	পূর্বফল্গুনী	নিষেধ	পূর্বেদ্যুশ্রাদ্ধ
৭	২৩	২	বুধ	অষ্টমী	উত্তরফল্গুনী	নিষেধ	পূণাষ্টকাশ্রাদ্ধ
৮	২৪	৩	বৃহস্পতি	নবমী	হস্তা	নিষেধ	
৯	২৫	৪	শুক্র	দশমী	চিত্রা	নিষেধ	
১০	২৬	৫	শনি	একাদশী	স্বাতী	শুভ, দিবা ঘ. ১০।৪১ গতে নিষেধ	একাদশীর উপবাস
১১	২৭	৬	রবি	দ্বাদশী	বিশাখা	নিষেধ	
১২	২৮	৭	সোম	ত্রয়োদশী	জ্যেষ্ঠা	নিষেধ	ত্র্যহস্পর্শ, [illegible]
১৩	২৯	৮	মঙ্গল	অমাবস্যা	মূলা	নিষেধ	অমাবস্যার উপবাস নিষিদ্ধ
১৪	৩০	৯	বুধ	প্রতিপদ	পূর্বাষাঢ়া	মধ্যম, সন্ধ্যা ঘ. ৫।২৫ গতে নিষেধ	
১৫	৩১	১০	বৃহস্পতি	দ্বিতীয়া	উত্তরাষাঢ়া	নিষেধ	লক্ষ্মীপূজা
১৬	১	১১	শুক্র	তৃতীয়া	শ্রবণা	শুভ, দিবা ঘ. ২।৫৯ গতে নিষেধ	অন্নপ্রাশন

[পরপৃষ্ঠায় অবশিষ্টাংশ]

পৌষ মাস, ১৩৬৬ সন [ডিসেম্বর, ১৯৫৯—জানুয়ারি, ১৯৬০]

[পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ]

ইং তারিখ	বাং তারিখ	[illegible] তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১৭	২	১২	শনি	চতুর্থী	ধনিষ্ঠা	নিষেধ	
১৮	৩	১৩	রবি	পঞ্চমী	শতভিষা	নিষেধ, দিবা ঘ. ১১।৪১ গতে ২।১৪ মধ্যে শুভ	বটপঞ্চমীব্রত
১৯	৪	১৪	সোম	ষষ্ঠী	পূর্বভাদ্রপদ	শুভ, রাত্র ঘ. ২।৩১ গতে নিষেধ	
২০	৫	১৫	মঙ্গল	সপ্তমী	উত্তরভাদ্রপদ	শুভ, দিবা ঘ. ১১।৫০ গতে নিষেধ	
২১	৬	১৬	বুধ	অষ্টমী	রেবতী	নিষেধ	
২২	৭	১৭	বৃহস্পতি	নবমী	অশ্বিনী	নিষেধ	
২৩	৮	১৮	শুক্র	দশমী	ভরণী	নিষেধ	
২৪	৯	১৯	শনি	একাদশী	কৃত্তিকা	নিষেধ, রাত্র ঘ. ১।৫৭ গতে শুভ	একাদশীর উপবাস, মন্বন্তরাস্নান
২৫	১০	২০	রবি	দ্বাদশী	রোহিণী	শুভ	জয়ন্তী মহাদ্বাদশী
২৬	১১	২১	সোম	ত্রয়োদশী	মৃগশিরা	শুভ, রাত্র ঘ. ১।৩ গতে নিষেধ	অন্নপ্রাশন
২৭	১২	২২	মঙ্গল	চতুর্দশী	মৃগশিরা	নিষেধ	
২৮	১৩	২৩	বুধ	পূর্ণিমা	আর্দ্রা	নিষেধ	পূর্ণিমার উপবাস, পুষ্যাভিষেক
২৯	১৪	২৪	বৃহস্পতি	প্রতিপদ	পুনর্বসু	নিষেধ	সংক্রান্তি

মত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত ভাবে পঞ্জিকা গণনা হয় না। আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করিয়া পঞ্জিকা গণনা করাই বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি। সুতরাং আকাশে অবস্থিত ঐ সকল নিখুঁত গণনা সহযোগে পঞ্জিকা-প্রণয়নের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের উদয়াস্ত, গ্রহযুতি, জোয়ার-ভাটা প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনাগুলির সময় যদি পঞ্জিকার প্রকাশিত সময়ের সঙ্গে একেবারে না মেলে, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে হইবে যে, পঞ্জিকার গণনায় কোথাও ভুল আছে। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ এবং বৈজ্ঞানিকগণ আধুনিক কালের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনার সহিত মিল আছে। সুতরাং এই পঞ্জী আর্য-জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক সমর্থিত।

মঞ্চলোক

গত ১৮শে ডিসেম্বর থেকে 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চের নতুন আকর্ষণ 'এক পেয়ালা কফি' অভিনীত হচ্ছে। বহুদিন পরে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ক্রাইম-ড্রামা-পরিবেশন এক অভিনব ঘটনা। ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'এক পেয়ালা কফি' পরিচালনা করছেন তরুণ রায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন—তরুণ রায়, বিশ্বজিৎ, অজয় রায়, অজিত চ্যাটার্জী, দীপান্বিতা রায়, কেতকী দত্ত ও 'রঙমহল'-এর অন্যান্য শিল্পীরা।

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে নতুন নাটক 'অঙ্গার'-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। কয়লাখনির পটভূমিকায় বৈচিত্র্যধর্মী আঙ্গিকে রচিত 'অঙ্গার' এক মৌলিকতার দাবি নিয়ে আসছে। প্রখ্যাত সুরশিল্পী রবিশঙ্করের সুর-সংযোজনা 'অঙ্গার'কে এক নতুন মর্যাদা দেবে। এ ছাড়া অনন্য লোকসঙ্গীত-শিল্পী নির্মল চৌধুরীর মঞ্চাবতরণ এই নাটকের অন্যতম সম্পদ। 'লি থিয়েটার'-এর পক্ষে উৎপল দত্ত 'অঙ্গার' রচনা এবং পরিচা করছেন। এই বৈচিত্র্যধর্মী নাটকটিতে অভিনয়ে গ্রহণ করছেন যেসব নতুন ও পুরাতন শিল্পী, তাঁদের উল্লেখযোগ্য হলেন—উৎপল দত্ত, তাপস সেন, রবি তরুণ মিত্র, সত্য ব্যানার্জী, কমল মুখার্জী, ভোলা নিমাই ঘোষ, প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত, জীন গ্যাসপার, উমা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত, সুনীল রায়, বীরেশ্বর সান্ শোভা সেন, নীলিমা দাস, মায়া চক্রবর্তী, নন্দী মৈ সুমিতা দাশগুপ্ত।

চৌরঙ্গীতে অনুষ্ঠিত 'শিশু রঙমহল'-এর বিভিন্ন অ এ-মাসের আমোদ-প্রমোদের উল্লেখযোগ্য সূচী। মনে পরিবেশে সুসজ্জিত ও আকর্ষণপূর্ণ মণ্ডপে শিশুদে কৃত আবৃত্তি, নাটক ও নানা রঙ্গ-অনুষ্ঠান দর্শনীয়।

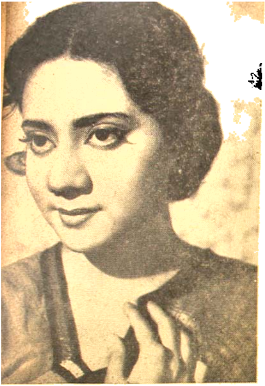

কোয়া' বাণীচিত্রে বাসবী নন্দী

চিত্রলোক

ছায়াচিত্র পরিষদ প্রাইভেট লিমিটেড প্রযোজিত 'রাজা সাজা' দ্রুত সমাপ্তির পথে। অভিনেতা-পরিচালক বিকাশ রায় স্বয়ং 'রাজা সাজা'র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুরসৃষ্টিতে আছেন কালিপদ সেন। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করছেন—উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, চন্দ্রাবতী, তরুণকুমার ও গঙ্গাপদ বসু।

কল্লোল ফিল্মস্-এর প্রথম চিত্র-নিবেদন 'বাইশে শ্রাবণ'। কানাই বসু রচিত নতুন ধরনের এক কাহিনী 'বাইশে শ্রাবণ' পরিচালনা করছেন মৃণাল সেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যা সুর-সংযোজনা ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। নবাগতা মাধ মুখার্জী নায়িকার চরিত্রে রূপ দেবেন। অন্যান্য ভূমিকাগু রূপায়িত করবেন শক্তিমান ও শক্তিময়ী নূতন অভিনেতা অভিনেত্রীগণ।

এম. পি. প্রোডাকসনের 'কুহক' দ্রুতগতিতে নির্মীয়মা শক্তিমান সাহিত্যিক সমরেশ বসু রচিত, ভাবাবেগে পুষ্ট এ কাহিনীর পরিচালনায় আছেন 'অগ্রদূত'-গোষ্ঠী। সঙ্গী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'কুহ ছবিতে উত্তমকুমারকে একটি বৈচিত্র্যধর্মী কঠিন চরি দেখা যাবে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন- সাবিত্রী চ্যাটার্জী, তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু ও শ্রী মজুমদার।

প্রখ্যাত অভিনেতা প্রদীপকুমার বাংলা ছবি প্রযোজনা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর নবগঠিত প্রতিষ্ঠা পি. কে. প্রোডাকসনের হয়ে যে-ছবিটি তিনি উপহা দিচ্ছেন—তার নাম 'রায়বাহাদুর'। ডাক্তার আনন্দ কিশোর মুন্সীর গল্প অবলম্বনে এই চিত্রটির পরিচাল করছেন প্রবীণ পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত-পরিচালনায় আছেন সলিল চৌধুরী। নায় নায়িকার চরিত্রে রূপ দেবেন যথাক্রমে প্রদীপকুমা ও মালা সিন্হা। অন্যান্য ভূমিকায় জহর গাঙ্গুল ভানু ব্যানার্জী, রেণুকা রায়, জীবেন বসু ও জহর রায়ে দেখা যাবে।

সুধীর হাজরার কাহিনী 'কোনো একদিন' অসী ব্যানার্জীর পরিচালনায় দ্রুত প্রস্তুতির পথে। প্রধা ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করছেন—সুপ্রিয়া চৌধু নির্মলকুমার, নমিতা, কমল মিত্র, তরুদাস, মলিনা, অনি

াটার্জী ও সবিতাব্রত দত্ত। 'মুক্তি মেকার্স'-প্রযোজিত এই ত্রে সুর দিচ্ছেন সুবোধ দে।

'চিত্রবন্ধ'র প্রথম নিবেদন শক্তিপদ রাজগুরু রচিত চেনামুখ'। প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন ঋত্বিক ঘটক। লং-এর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে 'চেনামুখ'-এর তকগুলি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই চিত্রের বিভিন্ন ংশে অভিনয়ে আছেন—সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল চ্যাটার্জী, র্তা ঘটক, নিরঞ্জন রায়, বিজন ভট্টাচার্য, গীতা দাস ও ছু ভাওয়াল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু-পঠিত উপন্যাস সপ্তপদী'র চিত্রগ্রহণ দীর্ঘদিনের বিরতির পর আবার শুরু য়েছে। উত্তমকুমার-প্রযোজিত 'সপ্তপদী'র পরিচালনা বং চিত্রগ্রহণে আছেন অজয় কর। ইউরোপীয় গায়িকা ুবি মিলার্ড-এর কণ্ঠে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বিরচিত কখানি ইংরাজী গান এই ছবিতে শুনতে পাওয়া যাবে। ায়কের চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন উত্তমকুমার, এবং নায়িকা ীনা ব্রাউন রূপে দেখা দেবেন সুচিত্রা সেন।

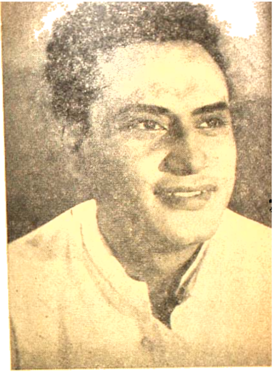

'দুই বেচারা' বাণীচিত্রে কালী ব্যা

প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজের 'নদের নিমাই' শ্রীগৌরাঙ্গ-হাপ্রভুর ভক্তিমধুর জীবন-নাট্য। চৈতন্যদেবের বাল্য ও কশোরের লীলাময় জীবন থেকে শুরু ক'রে, তাঁর সাধনার সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত চিত্রায়িত করা হচ্ছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন শ্রীবিমল রায়। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন অসীমকুমার। বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে সবিতা চ্যাটার্জীকে দেখা যাবে।

'মালা প্রোডাকশন্স'-এর 'দুই বেচারা'র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। দুজন শিক্ষিত সমাজের সৎভাবে বাঁচার প্রয়াসকে কেন্দ্র ক'রে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন—কালী ব্যানার্জী, অনুপকুমার, বাসবী নন্দী, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, জহর রায়, অনিল চ্যাটার্জী, তুলসী চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী, নৃপতি প্রভৃতি। পরিচালনায় —দিলীপ বসু। সঙ্গীত-পরিচালনায়—ডাঃ ভূপেন হাজারিকা। নেপথ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন গীতা দত্ত, মান্না দে ও ডাঃ হাজারিকা স্বয়ং।

বিবিধ সংবাদ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৫৯ সালে নির্মিত চিত্রের রাষ্ট্রপতি-পুরস্কার-দানের জন্য নির্বাচন ১৯৬০ সালের

গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত হবে। যোগদানেচ্ছু প্রযোজকের কাছ থেকে অবিলম্বে ছবি পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আহ্বান জানিয়েছেন। কলকাতা থেকে কয়েকটি বাংলা-ছবি যাচ্ছে—যেগুলি শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের দরবারেও শ্রেষ্ঠত্বের আসন পাবার দাবি রাখে।

অপরাজেয় হাস্যরসিক জহর রায় এবার চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। সোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে তিনি ছবিটি প্রযোজনা করবেন, এবং পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন সম্ভবত চিত্রশিল্পী সন্তোষ গুহ রায়। এক হাস্যরসিকের বিচিত্র জীবনের পটভূমিকায় রচিত এই ছবিটির নাম 'হাসি শুধু হাসি নয়'।

'জনতা পিকচার্স ও থিয়েটার্স'-এর পক্ষে অসিত সেন একখানি ছবির পরিচালনায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ব'লে জানা গেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত হবে। নায়িকা-চরিত্রে রূপ দেবেন সুচিত্রা সেন।

'অগ্রগামী'-গোষ্ঠীর পরবর্তী চিত্র-নিবেদন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আগুন'। শিল্পী-নির্বাচন এখনও হয়নি।

'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব' শুরু হয়েছে ২৭শে ডিসেম্বর থেকে। এই উৎসব ১৯৬০ সালের ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। শিশু ও কিশোরদের উপযোগী আরও অধিকসংখ্যক শিক্ষামূলক চিত্র নির্মাণ করা এই উৎসবের উদ্দেশ্য। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের শিক্ষামূলক কিশোর-চিত্র প্রদর্শিত হবে।

●

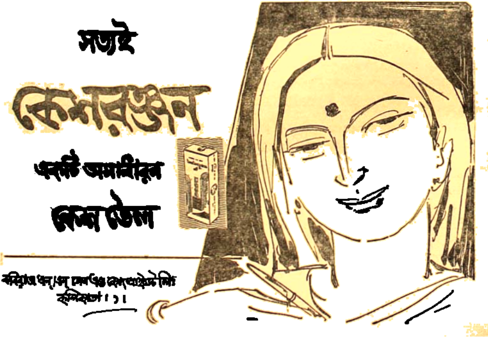

কথায় কথায়

একালের বাংলা সাহিত্যের যে শাখা সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে তা হল ছোটগল্প। শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে, বিশেষ ক'রে গত কয়েকবছরে বাংলা ছোটগল্প কী বিষয়বস্তু, কী আঙ্গিক পরিবেশনা—সব দিক থেকে এক বিস্ময়কর অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে। উপন্যাস সাহিত্য সে হিসেবে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। অথচ পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকায় ছোটগল্প-সংকলনের স্থান উপন্যাসের অনেক নিচে। সাহিত্যের অর্থনৈতিক বাজারে ছোটগল্প ও উপন্যাসের তুলনামূলক চাহিদা ক্রমশই এক কৌতূহলজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি ক'রে চলেছে। শোনা যায়, ক্রেতার কাছে টানা গল্প অর্থাৎ উপন্যাস-জাতীয় রচনার চাহিদা অনেক বেশী। এ তথ্যের সত্য-মিথ্যা যাচাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু এইটুকুই বলা দরকার যে, এই শোনা কথা সত্যি হলে রসিক পাঠকের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ যে-কোনো সাহিত্যেরই অনাদৃত কোনো শাখা বেশীদিন সমৃদ্ধি সৃষ্টি ক'রে চলতে পারে না।

ক্রেতা ও বিক্রেতার দিক থেকে উপরোক্ত তথ্য হয়ত সত্যি হতে পারে। কিন্তু 'ক্রেতা' ও 'পাঠক'—এ শব্দ দুটির সংজ্ঞা ভিন্ন। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, পাঠকের সমাদর না পেলে ছোটগল্প অল্প কয়েকবছরে এতখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারত না। পাঠক ছোটগল্প ভালবাসেন ও পড়তে চান। কিন্তু রসিক পাঠকমাত্রেই নিয়মিত গ্রন্থক্রেতা ন'ন। অথচ প্রকাশক বা গ্রন্থ-বিক্রেতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ক্রেতার সঙ্গে। সমস্যাটিও তাই কৌতূহলজনক। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনা শাখাটিও গত কয়েকবছরে অনেকখানি পুষ্ট হয়েছে। রম্যরচনায় গল্পের আমেজ যদিও বা থাকে, উপন্যাসের গুণ নিশ্চয়ই নেই। সেক্ষেত্রে রম্যরচনার বই নিতান্ত যে বিক্রি হয় না, এমন তো নয়। এমনকি, ক্ষেত্রবিশেষে রম্যরচনার বই অপ্রত্যাশিতভাবে খুব তাড়াতাড়ি দু-তিন সংস্করণকে অতিক্রম ক'রে গেছে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে। সুতরাং চাহিদার দিক থেকে উপন্যাসই যে একমাত্র বস্তু, এ কথা একবাক্যে মেনে নেওয়া যায় না। উপন্যাসের চাহিদা হয়ত সবচেয়ে বেশী, কিন্তু সর্বগ্রাসী নয়।

আমাদের আসল প্রশ্ন ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ পুষ্টি নিয়ে। শিল্পকলা-মাত্রই পৃষ্ঠপোষণার অপেক্ষা রাখে। বিশেষ ক'রে সমাদরের অভাবে সাহিত্যের একটা উজ্জ্বল অংশ ক্রমশ নিষ্প্রভ হতে থাকে, তবে তা আজ না হোক, বিশ-পঁচিশ বছর পরে একটা বড়োরকমের বিড়ম্বনা ডেকে আনবে। গ্রন্থ-ব্যবসায়ীর দিক থেকে একটা কৈফিয় আছে। পৃষ্ঠপোষণা করতে গিয়ে ক্রমাগত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া তাঁরা কেউ কাম্য মনে করবেন না। অথ ছোটগল্প-গ্রন্থের প্রচার নির্ভর করছে তাঁদেরই উপরে যে-পাঠক ছোটগল্প ভালবাসেন, তিনি ক্রেতা হিসেবে যখ বই কিনতে আসেন, তখন উপন্যাসকেই তিনি অগ্রাধিকা দেন—এই কথাই কি তাহলে আমাদের মেনে নিতে হবে তাহলে প্রথিতযশা লেখকদের নির্বাচিত গল্পগ্রন্থগু হয়ত প্রকাশিত হ'ত না। সব দিক থেকে ভাবলে সমস আরও জটিল হয়ে পড়ে।

আসল সমস্যার মূল আরও গভীরে। এদেশে অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যে প্রথমতঃ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগ গ'ড়ে তোলার মতো ক্রেতার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য সর্বজনীন পাঠাগার ও বিবাহের উপহার—এই দুইটি দিকে উপরই সুকুমার-সাহিত্যের ক্রয়-বিক্রয় অনেকখানি নির্ভ করে। সর্বজনীন গ্রন্থাগারের সদস্যদের রুচি ও চাহিদা উপর নির্ভর করে কর্মকর্তাদের গ্রন্থ-নির্বাচন ও ক্রয় সুতরাং পরস্পরনির্ভরশীল এই চাহিদা-চক্রের মধ্যে প'ড়ে যে-কোনো ভাবেই হোক, ছোটগল্পের প্রচার ও নিত্য নূত পরীক্ষার সুযোগ ও পরীক্ষা, দুই-ই যেন ক'মে আস একটা আশংকা দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গী পুষ্টির জন্যে যাঁদের প্রকৃত আগ্রহ আছে তাঁদের সবাইকে এ প্রসঙ্গে নতুন ক'রে ভেবে দেখতে হবে।

—

মানুষের সমাজ-জীবনের কোনো বৈষয়িক বা সাংস্কৃতি পরিবর্তন না ক'রে, শুধুমাত্র আইনের জোরে তা

কুসংস্কার ও দুর্নীতিমুক্ত করা যায়, এ ধারণা শুধু অনৈতিহাসিক নয়, অযৌক্তিকও। যদি তা সম্ভব হ'ত তবে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের অক্লান্ত প্রয়াসে একশ' বছর আগে বিধিবদ্ধ 'বিধবা-বিবাহ আইন' আজও আইন-গ্রন্থেই আবদ্ধ হয়ে থাকত না। মহাদেবের জটায় বন্দী গঙ্গা যেমন ভগীরথের সাধনায় মুক্তধারা হয়ে সংখ্যাতীত তৃষিত হৃদয়কে শান্ত করেছে, ঠিক তেমনি ক'রেই ওই মহাপুরুষের জীবনসাধনা এতদিনে অসংখ্য হতভাগিনীর অভিশপ্ত জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিত। তা যে হয়নি তার একমাত্র কারণ, ওই দুঃসাহসী সমাজ-বিপ্লবীর দুর্নিবার প্রগতির সঙ্গে এদেশের সমাজ সমতালে এগিয়ে যেতে পারেনি। সমাজ-বিপ্লবীর বলিষ্ঠ চিন্তা, সাহিত্যিকের অকুণ্ঠ লেখনী, আর রাষ্ট্রশাসকের সর্বকল্যাণকর মহৎ পরিকল্পনা—এই তিনের সার্থক সম্মেলন ছাড়া সমাজ-জীবনের প্রকৃত পরিবর্তন কল্পনাতীত অসম্ভব ঘটনা।

সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে পণপ্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে একটি বিধেয়ক গৃহীত হয়েছে। বিবাহে পণদান-ব্যবস্থার অবসান ঘটানোই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু সে-উদ্দেশ্য যে ভাবে সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয় তার প্রমাণ আইনটির রচয়িতারাই দিয়েছেন। পণ আদায়ের সবরকম সম্ভাব্য দ্বারের মুখ বন্ধ ক'রে প্রথমে যে আকারে প্রস্তাবটি সংসদে স্থাপিত হয়েছিল তা সংসদ-সদস্যদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করতে পারেনি। আর তাঁদের সমালোচনা ও বিরুদ্ধতার ফলেই শেষপর্যন্ত আইনটির অনেকগুলি খিড়কি-দরজা খুলে দিতে হয়েছে। এই বিরুদ্ধতা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দেশের সাধারণ মানুষ তো অনেক পরের কথা, আইন-সভায় দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরাও এখনো অন্তর থেকে পণপ্রথার বিরোধী হতে পারেননি। তাই তাঁরা এমন একটি ধারায় আইন পাস করলেন, যাতে আর যাই হোক, পণপ্রথা বন্ধ হবে না। শুধু আগে যা দেওয়া হ'ত পণ হিসেবে, এখন থেকে তা দেওয়া হবে উপহার নামে।

আইন না থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষিত সমাজে বহুবিবাহ বহুদিন আগেই লোপ পেয়েছে। পণপ্রথা-নিবারক আইনের অপেক্ষা না রেখেও ঠিক তেমনি ইতিমধ্যে বহু শিক্ষিত নরনারী বিনা-পণে পাণিগ্রহণ করেছেন। কেন তাঁরা তা করেছেন এটুকু বুঝলেই রাষ্ট্রের আইনকারেরা পণপ্রথা-জাতীয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন।

—

চীন ভারতের যে-পরিমাণ ভূমির উপর অধিকার দাবি করেছে তা আয়তনে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের সমান, আর সারা ভারতের আয়তনের ত্রিশভাগের একভাগ। আর সে চুপ ক'রে থাকেনি—আসাম, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের অনেকগুলি স্থান সে ইতিমধ্যেই দখল ক'রে নিয়েছে। সীমান্তরক্ষাকালে নয়জন ভারতীয় চীনা-সৈনিকদের নিষ্ঠুর আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন, আরও কয়েকজন চীনা-বন্দী-শিবিরে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছেন। ভারতের সমগ্র উত্তর-সীমান্ত জুড়ে চলেছে চীনা সৈন্যবাহিনীর সামরিক মহড়া। এ অবস্থায় সারা ভারতের মানুষ যে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে সেটা অতি স্বাভাবিক কথা।

চীন একটি প্রবল শক্তিশালী দেশ, অতএব তার সঙ্গে বিরোধিতা করা ভারতের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা হবে, এমন একটি প্রচ্ছন্ন প্রচার আজকাল চীনের-অনুকূলে বেশ প্রকাশ্যেই চলেছে। কিন্তু এই উক্তির সমর্থনে কোনো ঐতিহাসিক বা সাম্প্রতিক তথ্য পাওয়া খুবই দুষ্কর। জনসংখ্যা বা আকৃতির বিচারে চীন অবশ্য খুবই বিরাট, কিন্তু এই বিরাটত্ব তার রাষ্ট্র-জীবনের কোনো সংঘর্ষেই সহায়ক হয়নি। একক শক্তিতে চীন কোনোদিনই কাউকে পরাস্ত করতে পারেনি। আর কমিউনিস্ট রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর রাতারাতি তারা এক প্রবল শক্তিতে পরিণত হয়েছে—এমন প্রমাণও কিছু পাওয়া যায়নি। তা যদি হ'ত তাহলে চীনের মূল ভূখণ্ডে ক্ষুদ্র পর্তুগালের পক্ষে আজও মাকাও অধিকার ক'রে ব'সে থাকা সম্ভব হ'ত না, বা হংকং আজও থাকতনা ব্রিটিশ অধিকারে। হতবীর্য চিয়াং-কে বিতাড়িত ক'রে ফরমোসা দখল করাও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি তার পক্ষে, মার্কিন শক্তির ভয়ে। এসব থেকে স্পষ্টই এ-কথাটা বোঝা যায় যে, পূর্ব-অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও, অমিতবীর্যের অধিকারী হয়নি আজও চীন।

তাহলে ভারতের উপর হামলা করার সাহস চীন কোথা থেকে পেল, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে। তার উত্তরে শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল দুর্বলটুকু সে বুঝতে পেরেছে। সে জেনেছে যে, নিজ স্বার্থ যতই বিপন্ন হোক না কেন, একক উদ্যোগে ভারত কোনোদিনই যুদ্ধ করবে না। আর গোটাকতক তার জায়গা যদি এভাবে দখল ক'রে নেওয়া যায় তাহলে আলাপ-আলোচনার পর সে-দখলের অর্ধেক অন্ততঃ নিজ অধিকারে রাখা যাবে।

●

সম্পাদক—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জে. সি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬ হইতে [illegible] দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত

বসুধারা

বাংলার প্রাণ-প্রবাহ

সম্পাদক
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রন্থনায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
অজিত গুপ্ত

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড   মাঘ, ১৩৬৬   চতুর্থ সংখ্যা

পশ্চিম বঙ্গে

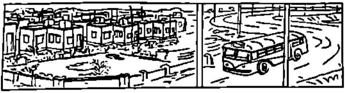

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

অক্লান্ত অভিযান

২৬শে
জানুয়ারী

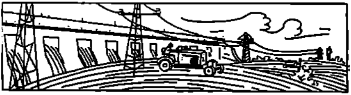

প্রজাতন্ত্র দিবস, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

WBG-34

বসুধারা

তৃতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় খণ্ড • চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৬৬

❦ সূচীপত্র ❦

গীতা ঘোষ । সৌন্দর্য-রসিক বলেন্দ্রনাথ ।
তুলসীদাস সিংহ । পল্লীর বারমাস্যা : মাঘ ।
রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় । এঞ্জাইম ও পরিপাক ক্রিয়া ।
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য । চেনাশোনার বাইরে ।
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় । বোলপুর : রবীন্দ্রনাথ ।
সুবোধকুমার চক্রবর্তী । আর চাঁদ । উপন্যাস ।
অসিতকুমার । দিনগুলি, রাত্রিগুলি । কবিতা ।
জীবিতেশ চক্রবর্তী । জন্মদিন । কবিতা ।
যামিনীমোহন ঘোষ । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ।
শরৎকুমার মিত্র । পূর্বস্মৃতি ।
হরেন্দ্রনাথ ঘোষ । চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি সত্য-কাহিনী ।
অমিমিত্র । অটিরামের কড়চা : চ্যারিটি-প্রদর্শনীতে সভাপতির ভাষণ ।
কালীচরণ ঘোষ । সভ্যদেশে বালিকা-বিবাহ ।
সুখময় ঘোষ । মেনকার একটাই ইতিহাস ।
সূত্রধার । অথ নট-ঘটিত ।
পুরাতনী ['ব্রাহ্মণ সেবধি' হইতে উদ্ধৃতি] ।
জীবনর্ষি । গ্রহ-বিচিত্রা ।
নাটমহল [মঞ্চলোক ও চিত্রলোক] ।
কথায় কথায় ।

Some valuable comments on

Economic Resources of India & Pakistan

—by **K. C. Ghosh**

"........ A dictionary of a country's economic resources is always a useful book of reference. So is Mr. K. C. Ghosh's book on India and Pakistan. —*Statesman*

"........ a most authoritative work, which takes into account the chief economic factors which go to create wealth." —*Chamber of Commerce Journal, London*

"The author has .... nicely presented all the key-factors of economic development .... No section of Indian economic .... has been left out of account and the array of statistical notes has left nothing to be desired. —*Amrita Basar Patrika*

Answers to Questions set for Electrical Supervisors' Examination

(ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজারদিগের পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য পুস্তক)

বর্তমানে নিম্নলিখিত খণ্ডসমূহ পাওয়া যায় :

(*a*)	Part I for 1945-48	2·50
(*b*)	Part II & XI for 1945-48	2·50
(*c*)	Part III for 1945-48	2·50
(*d*)	Part IV for 1946-52	2·50
(*e*)	Part V for 1946-52	2·50
(*f*)	Part I (Supplement) for 1950-53	2·00
(*g*)	Part II (Supplement) for 1950-53	2·00
(*h*)	Part XI (Supplement) for 1950-53	2·00

ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই পুস্তক পাইবেন।

ইলেকট্রিক্যাল পকেট বুক (বাংলা ভাষায়)—শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

ইলেকট্রিশিয়ানদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং পকেটে রাখবার মতো সাইজ। মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক

কে. পি. বসু পাবলিশিং কোং

৫২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

॥ 'বসুধারা'র নিয়মাবলী ॥

॥ গ্রাহকদের সম্পর্কে ॥

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১্ টাকা। গ্রাহক হইলে, চাঁদার হার—বার্ষিক (সডাক) ১২্ টাকা এবং ষাণ্মাসিক (সডাক) ৬্ টাকা। ভিঃ-পিঃ-যোগে পত্রিকার গ্রাহক হইলে, গ্রাহকদেরই ভিঃ-পিঃ খরচ বহন করিতে হয়। মনি-অর্ডার-যোগে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক হইলে এই অতিরিক্ত খরচ আর দিতে না। বৎসরের যে-কোনো মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। শারদ-সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। ভারতের বাহিরে পত্রিকার চাঁদার হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

কার্যালয়—বসুধারা : ৫২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ : ফোন : ৩৪-১১০০

OE
LIB
UNIV

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ, ১৩৮০

বসুধারা

সৌন্দর্য-রসিক বলেন্দ্রনাথ

গীতা ঘোষ

১২৭৭ সালের ২১শে কার্তিক, রবিবার, পূর্ণিমা-তিথির শতচক্রে ভূমিষ্ঠ হন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ। জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুসারে শতচক্রে জাত সন্তান কবি হয়। বলেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্র নির্ভুল। রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে তৈরী সাহিত্য-শিষ্য বলেন্দ্রনাথ যৌবনের কবি, প্রেমের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার রীতিমতো সামর্থ্য রাখেন।

বলেন্দ্রনাথের ছাপা লেখার প্রথম সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের 'বালক' পত্রিকায়। রচনাটির শিরোনামা 'একরাত্রি'। এর পর ঊনত্রিশ-বছরের জীবনকালে 'সাধনা', 'বালক', 'ভারতী', 'ভারতী ও বালক' 'সাহিত্য', 'প্রদীপ' পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা প্রকাশি হয়েছে। মৃত্যুর পরেও তাঁর লেখা ছাপানো হয়েছে 'পূ এবং 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য়।[1] কিন্তু পুস্তিকা-আকা প্রকাশিত হয়েছে বলেন্দ্রনাথের মাত্র তিনখানি বই। এগু তাঁর জীবিতকালেই প্রকাশিত। তিনখানির মধ্যে দু কবিতার বই। কবিতাগুলি অ-পূর্বপ্রকাশিত।

এদের একটি 'মাধবিকা'[2], অন্যটি 'শ্রাবণী'[3]। একটি বসন্তের কবিতা, অন্যটিতে বর্ষার। ভারতীর সাহিত বসন্ত নারীসৌন্দর্যের এবং বর্ষা নারীপ্রেমের দ্যোতক

এ সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের নিজের মত—"বসন্তের কবিতা—যৌবনের প্রথম বিকাশ। বর্ষার কবিতা—যৌবন বটে, কিন্তু প্রথম যৌবন নহে।" *

'শ্রাবণী'র প্রথম কবিতাতে তাই তিনি বলেছেন—

"মধুমাস ছিল যবে তুমি ছিলে বধূ
গোপন মর্মের মাঝে, অয়ি নববধূ।
এখন ছেয়েছ তুমি প্রাবৃটের মেঘে
জলভরানত।" ['চিরনব']

। ২ ।

'মাধবিকা' শব্দের এক অর্থ 'বাসন্তীলতা', অন্য অর্থ 'মদিরা'। গ্রন্থনামের তাৎপর্য-বিশ্লেষণে দুটি অর্থই প্রায় সমার্থক হয়ে যাচ্ছে। বাসন্তীলতা অর্থে বসন্তের বা যৌবনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে; আবার, মদিরা অর্থেও পাওয়া যাচ্ছে যৌবনের ইশারা। প্রসঙ্গত, 'মাধবিকা'র প্রথম কবিতাটির প্রথমাংশ দেখা যাক :

"পঞ্চ ঋতু যাক নিয়ে যাহে খুশী যার,
মধুমাস থাক্, প্রিয়ে, তোমার আমার।
শুধু এই যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস,
অনুরাগমদে ভরা নিত্য নব আশ,
এই তন্দ্রা, এই স্বপ্ন, এই নিশিদিশ,
এই মনোমোহকর মদির আবেশ।"
['মাধবিকা']

যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাসের মনোমোহকর মদির-আবেশ-মুগ্ধ কবির মনোবীণা মৃদু সুরে গুঞ্জন তুলেছে 'মাধবিকা'র কবিতাগুলিতে।

"সর্ব অঙ্গে ধ্বনি তব বাজিছে, সুন্দরী
কঙ্কণ মেখলা হার নূপুর গুর্জরী
নানা সুরে নিশিদিন ; ···
··· নূপুরশিঞ্জন শুনি'
ধ্যান ভাঙি' উঠে' আসে মনোজয়ী মুনি
ধ্বনির পশ্চাতে ; ছন্দে ছন্দে প্রতি পাতে
বিরহীর মন নাচে মেখলার সাথে ;
তরুণ অরুণরাগে কঙ্কণকিঙ্কিণী
বক্ষমাঝে তালে তালে বাজে রিণিঝিনি।"
['শিঞ্জন']

"বলেন্দ্রনাথের কবিতাগুলিতে সৌন্দর্যের দিকে একটা ভাবপ্রবণ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। সৌন্দর্য-উপভোগের 'আকাঙ্ক্ষা' মাত্র বলিব, 'তৃষ্ণা' বা 'লালসা' বলিব না। কিন্তু তাহার যেন তৃপ্তিতে পর্যবসান ঘটিতেছে না। তৃপ্ত অভিমুখে সবেগে ধাবিত হইতে চাহিতেছে না।" *

এই ভাবপ্রবণতা-হেতু সুন্দরীর কঙ্কণকিঙ্কিণী তাঁ 'বক্ষমাঝে তালে তালে বাজে রিণিঝিনি'। দিশাহারা ক স্বীকার করতে বাধ্য হন যে তাঁর দৃষ্টিতে নারীর

"একে একে ফুরাইল সকল উপমা—
বয়ান হেরিয়া লাজে মলিন চন্দ্রমা,
আঁখি লজ্জা দেয় হরিণীরে স্নেহভরে,
পুষ্পশর ছাড়ে ধনু ভ্রূবিলাসভরে,
নাসিকায় শুকশিশু, অধরে প্রবাল,
গ্রীবাদেশে হারে কম্বু, বাহুতে মৃণাল,
অভ্রভেদী মহিমার পয়োধরভূমি
হিমগিরি ছাড়ি' উঠে সপ্তলোক চুমি',
কেশরী মরিছে হেরি কটির তনিমা,
পুলিন নিতম্বে মজে সকল প্রতিমা,
উরুদেশে হার মানে কদলীগঠন,
দেহখানি সুললিত লতার মতন ;—
ত্রিভুবন আছে শুধু, অয়ি মনোরমা,
তোমার অঙ্গের তরে যোগাতে উপমা।"
['উপমা']

অপ্রাসঙ্গিক হলেও, ২৮ চৈত্র ১৩০২ তারি রবীন্দ্রনাথের লেখা 'মানসী' কবিতা স্মরণ করা অন্যা হবে না :

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত-না—
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে, খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।"
['মানসী'] *

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপ-বিভোর কবি তন্ময় দৃষ্টি মেলে ধরেন মানসী-প্রতিমার দিকে। প্রেয়সী নারীর যৌবন-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবির চিন্তা-পরম্পরা লক্ষণীয় :

"মিটাইতে জগতের সর্ববিধ ক্ষুধা
দুটি কুম্ভ পূর্ণ করি' দিয়াছেন বিধি
নারীর হৃদয় জুড়ি' দুটি পয়োনিধি।"
['বিধাতৃত্ব']

"ঘাটে রাখি' দুগ্ধ কুম্ভ নামে কুতূহলে
ভাসাইতে পূর্ণ কুম্ভ যমুনার জলে
গোপবধূজন যত ; দেহবন্ধ হ'তে
কুচকুম্ভ দুটি বুঝি ভেসে যায় স্রোতে
কোন্ দূরদেশে কোন্ ভাবের উদ্দেশে
যৌবনপীযূষভরা মৃদু প্রেমাবেশে। …
এই সেই কুম্ভমেলা, এই সে প্রয়াগ,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে উথলয় নব অনুরাগ।"
['কুম্ভমেলা']

যৌবন-বেদিতে নম্র প্রণাম জানিয়ে কবি মিনতির কণ্ঠে বলেন, আশা প্রকাশ করেন—

"স্ফুরিত অধরে
আয়ত্ত করিয়া মোর চুম্বন-পিপাসা
বঞ্চিত করিয়ো শেষে না পূরায়ে আশা
মোর মুগ্ধ অধরের স্পর্ধা চূর্ণ করি' ;
অঞ্চলের প্রান্তখানি রাখিয়ো সম্বরি'
বক্ষতলে মুষ্টি-করে। তবু যৌবনছলে
চাও যদি মোর মুখে অবজ্ঞা ত' হ'লে
নিশি না হইতে শেষ শাসনের পাশ
আসিবে শিথিল হয়ে' মনে আছে আশ।"
['মান']

যৌবন চির-আদৃতা। কুহুকুহুনাদিনী নারীরও আশা—

"বড় আশা আছে মনে
আমারে লইবে তুমি', অয়ি সুগঠনে,
বক্ষতলে তব। তাপে স্থির হবে যবে
পীন স্তন দুটি রাখিব আচ্ছাদি' তবে
সলিল-অন্তরে, স্তনাগ্রশিখর-'পরে
শুধু দুটি বারিবিন্দু বদ্ধ মেরুস্তরে
রহিবে উজলি …"
['জলবেদনা']

ঠিক এই ভাবটি বলেন্দ্রনাথ গদ্যের মাধ্যমে কিভাবে ব্যক্ত করেছেন তারও একটু নমুনা দেওয়া যাক :

"সাধ যায়, একবার ঐ কূলে কূলে উচ্ছলিত কান্তিবক্ষ যৌবনসরসীর মধ্যে তোমাদের মত এমনি মনের সাধে গাহন করিয়া আসি—যেমন করিয়া আমার বুকের মাঝে তোমাদের তরুণ তনুখানি আগ্রীব আপনাকে দিয়া ঢাকিয়া রাখি, তেমনি করিয়া একবার তোমাদের তরুণ যৌবনে সর্বাঙ্গসমাচ্ছন্ন হইয়া ঐখানে সম্যক্ সমাহিত হইয়া থাকি।" [১]

ওপরের উদ্ধৃতিগুলি হতে কবির সৌন্দর্যবোধের একটা বিশেষ দিক চোখে পড়ছে। যার আলোচনা এখানে করে রাখা দরকার। বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ অতি উচ্চাঙ্গের। তিনি নগ্ন-সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ ভক্ত। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মত হিসেবে তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"নগ্নতা আর কাহাকে বলে? অলঙ্কারশূন্যতা বৈ ত নয়। … নগ্নতার গম্ভীরতা আছে, আনন্দ আছে, সেখানে শ্রী কলায় কলায়। অলঙ্কার-আবরণ চক্ষু আকর্ষণ করে ; নগ্নতা হৃদয় টানিয়া আনে। … অবগুণ্ঠনে যে সৌন্দর্য নাই, আমরা এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সৌন্দর্যের সম্যক্ অভিব্যক্তি নগ্নতায়। … অভিব্যক্তি নহিলে সৌন্দর্য ব্যর্থ। একটা কথা উঠিতে পারে, অভিব্যক্তিতে রহস্য থাকে কিরূপে? নগ্নতা যদি রহস্যময়ী হয়, তবে তাহাতে

অভিব্যক্তি হইবার সুবিধা কোথায় ? কিন্তু প্রকৃতিতে কি দেখা যায় ? ··· মহত্ত্ব অভিব্যক্তির হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র কলিকার মধ্যে পূর্ণযৌবনের সৌন্দর্য সন্নিবিষ্ট ছিল, ইহাতেই তাহার মহত্ত্ব। কলিকা যদি না ফুটিত, কুসুমরূপে ব্যক্ত না হইত, তাহা হইলেই সে সৌন্দর্য ব্যর্থ। বিকাশের মধ্যে অতীতের সহিত ভবিষ্যতের মায়াবন্ধন। এই বন্ধনসূত্রে ভাবের প্রলয় আবদ্ধ। ··· নগ্নতার প্রত্যেক সৌন্দর্য অপর সৌন্দর্য-ব্যক্ত। রঙবিশেষের পর অন্য রঙ, ছায়ার পর যথাস্থানে আলোক, ছায়ালোকের তারতম্য, সমস্ত মিলিয়া একটা প্রভাব বিস্তার করে। অথচ, সকল ভাব সম্পূর্ণ খেলিবার জমি পায়, সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয় না। এই জন্যই নগ্নতার এমন সৌম্য গাম্ভীর্য।" ৮

বলেন্দ্রনাথ যে কতোবড়ো সৌন্দর্যরসিক ছিলেন তারই পরিচয় মিলছে ওপরের সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিটিতে। কিন্তু একটা কথা—সাহিত্যে 'নীতি'র স্থান নিয়ে যাঁরা অহোরাত্র ভাবনা-চিন্তা করেন, তাঁদের কাছে এ উদ্ধৃতিটি মারাত্মক বোধ হতে পারে। তাই স্মরণ করছি আর-এক রসিক-পণ্ডিতের কথা :

"রসাস্বাদে সুনীতি-দুর্নীতির সংস্কারই বিদ্যমান থাকে না। ··· যে নীতি সকল নীতির নিয়ামক, সকল খণ্ড নীতিকে ধারণ করিয়া আছে—সাহিত্য সেই নীতির লীলাস্থল। ··· যে প্রবৃত্তির মূলে আছে আত্মপরায়ণতা বা আত্মসংকোচ—তামসিক আত্মরতি—তাহাই দুর্নীতি।" ৯

নগ্নতা আর অশ্লীলতার মধ্যেকার পার্থক্যটুকু নীতি-বাগীশদের দৃষ্টি যাতে এড়াতে না পারে তার জন্যে বলেন্দ্রনাথের আর-একটি রচনার অংশবিশেষ তুলে দেওয়া দরকার।—

"গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ নিষ্প্রয়োজন।

"কিন্তু এই গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্তির পাশে ফরাসী চিত্রশালার একখানি নারদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সত্য নাই, সে দীপ্ত গৌরব নাই। ফরাসী চিত্রকর ঐ নারীমূর্তির সর্বাঙ্গ হইতে বসন অপনীত করিয়া দিয়া পায়ে হয় ত জুতা রাখিয়াছেন, কিম্বা এমন করিয়া এমন কিছু রাখিয়াছেন, যাহাতে এই বর্তমান সভ্যতার বসনভূষণের একটি ভাব মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটা সচেতন উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।" ১০

এ আলোচনার এইখানেই সমাপ্তি। এর পরে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

এবার পূর্ব আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক্। যৌবনের স্তবনই 'মাধবিকা'র একমাত্র সুর। যৌবনের অপরিমিত সৌন্দর্যে কবি বিহ্বল। কিন্তু তবু একদিন এ বিহ্বলতার অবসান সূচিত হলো :

"চুম্বন গুঞ্জন আর সরস বসন্ত
অদ্যাবধি হয়েছে বিস্তর, হোক্ অন্ত
এবে এ সবের।" ['বিড়ম্বনা']

স্বাভাবিক কারণেই, 'বসন্তের সৌন্দর্যোচ্ছ্বাস ক্ষণিকতার আশংকা-বিজড়িত'। এক বসন্তেই তার অবসান।

"হে মোর সঙ্গীত তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হ'ল অবসান।
একবেলা নৃত্য শুধু একবেলা গান,
ছড়ায়ে রঙীন্ পাখা হৃদয়ে শয়ান। ···
যে স্বল্পায়ু, তাহে তোর কোনো খেদ নাই,
যে পারে অমর হ'তে হোক্ না সে, ভাই,
বৃদ্ধ যম, উচ্চাসনে বসি' তার পাশে
চিরকাল বেঁচে থাকা মহা লাঞ্ছনা সে।
তার চেয়ে ঢের ভাল, ছড়াইয়া পাখা
খেলাশেষে হৃদয়ের বক্ষে মরে' থাকা।"

['অবসান']

। ৩ ।

"বর্ষার সহিত বসন্তের মজ্জাগত প্রভেদ এই যে, বর্ষা আমাদিগকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে—বসন্ত আমাদিগকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করে।" ১১

চিরকাল বাইরে ভালো লাগেনা, ঘরেও মন টানে :

"মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়ে,
তুমি এস নেমে এস হৃদয়গুহায়
অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি।"

['অন্তরবাসিনী']

"এ আমার অন্তরের নিভৃত নিলয়।
হেথা তুমি রাণী শুধু নিজ মহিমায়,
নহ কেহ বাহিরের বসনভূষায়। ···
এস তবে, অয়ি প্রিয়ে, অয়ি অবগুণ্ঠনে,
লাজভয় ত্যজ আসি' মর্মনিকেতনে।"

['আবাহন']

একঘেয়েমি জিনিসটা শিল্পীমনের পক্ষে পীড়াদায়ক। একই ছাঁদে কবরী রচনা ক'রে, কাজলের রেখা টেনে, কুঙ্কুমের ফোঁটা দিয়ে শিল্পী-মন তৃপ্ত করা যায়না। চাই নিত্য নব প্রসাধন। তাই তো প্রকৃতিসুন্দরী সৌন্দর্য-পিপাসুদের কাছে এত আকর্ষণীয়। 'শ্রাবণী'র আরম্ভেই তার উল্লেখ :

"ঋতু পরে যায় ঋতু, মাস পরে মাস,
নিত্য নব নব ভাবে তোমার প্রকাশ।"
['চিরনব']

শ্রাবণের সৌন্দর্য কোথায়, তার উল্লেখ রয়েছে 'শ্রাবণী' গ্রন্থের নাম-কবিতায় :

"নিত্য নব ছন্দোভরে চিত্ত ভরি উঠে,
হে বরষা, তব এই দীর্ণ বক্ষ টুটে'।
এত ধ্বনি, এত বর্ণ, এত খেলাধেলা,
এত পুষ্প, এত গন্ধ, লাবণ্যের মেলা,
এত নৃত্য এত গান, এতেক ঝঙ্কার,
কোথা তব ছিল ঢাকা এত মনোভার!
কি নির্ঝরে বাহিরিল মুক্ত নব প্রাণ,
কি প্রবাহে মুখরিল পূর্ণ কলতান;
কি আলোকে, হে মায়াবি, তুলিলে ফুটায়ে
বিচিত্র এ চিত্রলেখা, কি ঘন ছায়ায়
নিবিড় করিয়া আন নিখিল সংসারে
অন্ধকুলায়মাঝে ; কি কুহকহারে
হৃদয়ে হৃদয়ে কর চকিত-বন্ধন ;
কূল নাহি পেয়ে কোথা' আকুল যৌবন।"
['শ্রাবণী']

বর্ষণেই শ্রাবণের সৌন্দর্য :

"বর্ষ—শ্রাবণ বর্ষ। তোমার বারিধারায় যে গম্ভীর কাব্য রচিত হইতেছে, তাহা উপভোগ করিবার জন্ত সব স্থির, সব মানব তৃপ্তির নেত্রে চাহিয়া আছে। এক ফোঁটা বারিপতনশব্দ হইতে বঞ্চিত হইলে তোমার এ মহাকাব্যের ভাব বুঝি হারাইয়া যাইবে। তাই সকলে নীরব। তুমি শুধু বরিয়া যাও—তোমার বর্ষরবে বর্ষে বর্ষে এমনি নূতন নূতন কাব্য রচিত হৌক। আমরা সেই কাব্যের সৌন্দর্যে ডুবিয়া একটু আনন্দ উপভোগ করি।" [১২]

বর্ষার শ্রাবণের গাম্ভীর্যে বসন্তের চাপল্য কর্পূরের মতোই উবে যায়। অন্তরের গভীর প্রদেশে পঞ্চমের উদাত্ত গম্ভীর কল্যাণের সুর বাজে :

"তখন আছিলে শুধু রূপে সমুজ্জ্বল,
আজিকে তোমারে হেরি' সর্ব অমঙ্গল
ধীরে সরে' যায় দূরে ; মৌন প্রেমভরে
সকরুণ আঁখি অমিয় সেচন করে
অন্তরনিভৃতে শতধারে ; হে প্রেয়সি,
গৃহলক্ষ্মীরূপে আজি তুমি মহীয়সী
আপন মহিমালোকে।" ['গৃহলক্ষ্মী']

সৌন্দর্য-পাগল কবি প্রেয়সীর প্রতি অবাক্-দৃষ্টি মেলে ধরেন। কিন্তু কী অতলান্ত রহস্য ঐ 'একরত্তি দেহযষ্টি'-তে!

"দু'টি ক্ষুদ্র কূলে কূলে পূর্ণ সুধাভরে ···
··· সারাদিন ধরি'
চেয়ে আছি অনিমিষে অসীম বিস্ময়ে
ওইখানে—ওই তব রহস্য-নিলয়ে।
মনে হয়, আছি যেন আঁখির পলকে,
দেবতাও নাহি জানে, স্বর্গে কি নরকে।"
['দ্বিধা']

"অবাক বিস্ময়ভরে আঁখি চেয়ে থাকে ;
ভাবিয়া না পায় চিত্ত এ কি মায়াবিনী
অথবা পুরাণ' সেই স্বপ্নের কাহিনী !"
['চুলবাঁধা']

কবির মনে হয় তাঁর প্রিয়া যেন আপন মহিমায় চলতে থাকেন 'বাসনায় সাধনায় অতীত প্রদেশে'। শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে কানায় কানায় ভরে ওঠে কবির সমস্ত সত্তা। যে-কথা বলতে আসেন তা আর বলা হয় না, যে-ব্যথা বুকে জমে ওঠে তা প্রকাশ করবার ভাষা যোগায় না :

"মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায় ?
বলিবার যাহা ছিল সব রহে যায়। ···
নিবিড় তিমিরতলে ঘনায় যে ব্যথা
মন-অন্তরালে, ভাষা তার নাহি কোথা
পাই খুঁজে' খুঁজে'। ···
মিছে আসে দিনে দিনে ঘুরিছে হৃদয়,
বলিতে আসিয়া আর বলা নাহি হয়।"
['অসমাপ্ত']

এই যে গাঢ় প্রেম, যার রসে বিভোর কবির সব কথা অসমাপ্ত থেকে যায়, বলতে এসে যা বলতে পারেন না—সেই প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির 'বাসনার কথাটুকু না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কবির নিজের উক্তিই এ ব্যাপারে সবচেয়ে মূল্যবান :

"যখন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়, তখন শরীর দূরে পড়িয়া রহে না; তখন স্বতই বাহু বাহুর নিকটে আকৃষ্ট হয়, কপোল কপোলে আসিয়া সংলগ্ন হইতে চাহে। দেহ মন আত্মা একত্র হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। ভাঙিয়া ভাঙিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতে গেলে প্রেমকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায়না। প্রেমের মধ্যে এই সকলই অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে একীকৃত হইয়াছে। …

"শরীরমাত্রগত সম্ভোগ ও দর্শনস্পর্শনাকাঙ্ক্ষাহীন অতিসূক্ষ্ম ধ্যানমাত্রগত সম্ভোগ—মৃতদেহ ও প্রেতাত্মা—উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম। জীবন্ত মানবই—আত্মাধিষ্ঠিত দেহই—মানবের শরীর মন আত্মাকে সমগ্রভাবে আকর্ষণ করিয়া মনুষ্যকে সফল করিতে পারে। …[১০]

"বিরহ কেমনে কহি আছ মনে মনে—
যদিও মিলিতে চাহে দেহ দেহ সনে। …
তনু চাহে তনু মাঝে পাইতে বিলয়,
যৌবন করিতে চাহে আপনারে ক্ষয়
ওই রূপবেলাতটে, লাবণ্য-সৈকতে,
উচ্ছল পুলকে যেথা কামনা মন্মথে;
হৃদয় নীরব শুধু হৃদয়ের মাঝে
তোমারে হেরিয়া সেথা অভিনব সাজে।"

['বিরহের মিলন']

এইখানেই নিহিত রয়েছে বলেন্দ্র-কাব্যের চরম সার্থকতার চাবিকাঠি। এইখানেই বলেন্দ্র-কাব্যের মহত্ত্ব।

---

১. ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ হতে ১৩০৬ আষাঢ় পর্যন্ত বলেন্দ্রনাথের যেসব লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা সংকলিত হয়েছে, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক ছাপানো 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে।
২. ১৮৯৬ এপ্রিলে প্রথম প্রকাশিত
৩. ১৮৯৭ জুনে প্রথম প্রকাশিত
৪. হৃদয়ের কবিতা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর [ভারতী ও বালক, ১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ]
৫. ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের রচনাবলীর প্রথম সংকলন 'গ্রন্থাবলী' (১৩১৪)-র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য
৬. চৈতালি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭. সন্ধ্যাবেলা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর [ভারতী, ১৩০৩ বৈশাখ]
৮. মানবের সৌন্দর্য— " [ভারতী ও বালক, ১২৯৬ পৌষ]
৯. সাহিত্যে দুর্নীতি—মোহিতলাল মজুমদার [সাহিত্য-কথা]
১০. জন্মান্তর—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর [সাধনা, ১৩০০ ফাল্গুন]
১১. হৃদয়ের কবিতা " [ভারতী ও বালক, ১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ]
১২. [illegible] " [ভারতী ও বালক, ১২৯৬ শ্রাবণ]
১৩. জন্মান্তর " [সাধনা, ১৩০০ ফাল্গুন]

নিখুঁত প্রতিলিপি গ্রহণের উপযোগী ব্লক ও মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যে…

যে ব্লক ছাপা হ'লে, মূল ছবির সঙ্গে কোনও তফাৎ থাকে না,
প্রত্যেকটি রেখা যা'তে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সেই সুন্দর
ঝক্‌ঝকে ব্লক প্রত্যেকেই চায়। এর পেছনে রয়েছে
ব্লক নির্মাণ নৈপুণ্য আর সযত্নপ্রয়াসলব্ধ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।

● ● ●

লাইন, হাফ্‌টোন, কালার প্রিন্টিং, টাইপসেট
এবং ডিজাইন তৈরীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

• কালার স্টুডিও •

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৬ • ফোন : ৫৫-৫৬০৭

পল্লীর বারমাস্যা

তুলসীদাস সিংহ

। মাঘ ।

মাঘের প্রথম দিনটি আমাদের কাছে মহা অশুভ দিন। পহেলা মানেই মূর্তিমান অশুভ। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে বছরের শুধুমাত্র একটি পহেলার ক্ষেত্রেই। সে পহেলাটি হল এই মাঘ মাসের পহেলা। মাঘ মাসের পহেলা 'পহেলা' নয়—এখ্যান, এক মহা শুভদিন। এ-দিনের যাত্রা অগস্ত্যযাত্রা নয়—এখ্যান যাত্রা। এ দিনের সিদ্ধি শুধু এ-দিনেরই সিদ্ধি নয়—সারা বছরের সিদ্ধি। এ দিনের জয়লাভ সারা বছরেরই জয়লাভের সূচক। এ-দিন তাই ঘরে ঘরে যে-লক্ষ্মীর পূজা হয়, সে-লক্ষ্মী হলেন 'এখ্যান লক্ষ্মী' বা বিজয়লক্ষ্মী। আগেকার দিনের রাজা-রাজড়ারা বিজয়-লক্ষ্মীকে লাভ করবার জন্যে তাই দেখি এই বিশেষ দিনটিকে 'আহেরিয়া' উৎসবের দিন বলে চিহ্নিত করে বিশেষভাবে মৃগয়াযাত্রা করতেন। এ-দিনে মৃগয়ালাভ হলে, তাঁরা ধরে নিতেন সামনের সারা বছরটি ধরেই তাঁদের যুদ্ধে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজয়লাভ ঘটবে। বিজয়লক্ষ্মী তাঁদের ভাগ্যাকাশে অচলা হয়েই অবস্থান করবেন। তাঁদের এই বিশেষ দিনের মৃগয়াযাত্রা আহেরিয়া উৎসব বা শিকার-পরব বা এখ্যান-পরব নামে বাংলার বারো মাসের তেরো পরবের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়ে আজও বহু অঞ্চলে পালিত হচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়।

রাজা ভেঙে রাজড়া, রাজড়া ভেঙে জমিদার বা রাজা-বাবু। এই জমিদার বা রাজাবাবুরা আপন আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠী আর প্রজা-আচ্ছাদিকে নিয়ে মকরসংক্রান্তির সন্ধ্যায় এক বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকে ঠিক হয়, কে কে জালদড়ি নিবে বা জেলে হবে, কারা শুধু জঙ্গল পিটাবে, কোন্ কোন্ বনে ঢুকতে হবে। কুলপুরোহিত পাঁজি ঘেঁটে ডাকিনী-যোগিনীদের সংস্থান অনুযায়ী ব্যবস্থা দিবেন—কোন্ মুখে প্রথম জাল পাততে হবে, প্রথম জঙ্গল পিটানো হবেই বা কোন্ দিকে মুখ ক'রে, ইত্যাদি। পরের দিন ভোর-রাত থাকতে উঠে বেরিয়ে পড়বে সব জঙ্গলের দিকে। শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ডোম-ডাম্বারা—কাঁধে থাকবে তাদের টামা, নাগাড়া, কাঁসি।

শিকারী সেজে যারা আজ জঙ্গলে আসে, তাদের পেশা যেমন ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ানো নয়—তেমনি যে-শিকার তারা করছে সে-শিকার বাঘ ভালুক বা গণ্ডার নয়। পেশাও বদলেছে—শিকারও বদলেছে। শিকার বলতে শিকারীরা প্রধানতঃ বোঝে খরগোস। খরগোসের জায়গায় যদি একটা শেয়াল, কটাস, কি গাঁমসোলা এসে জালে পড়ে যায় এবং জেলের হাতে ঘা খেয়ে মরে তবে তাদের কেউই শিকারপদবাচ্য হবে না। অবশ্য জঙ্গল পিটানোর সময় চিতাবাঘ, নেকড়ে-বাঘ, মেঁছো-বাঘ যে না বেরোয় তা নয়, তবে তারা শিকারীদিকে অতটা খাতির করে না—জালটাকে তো নয়ই। পাটের সুতো দিয়ে তৈরী এসব জাল, সময় পেলে, খরগোসরাই কেটে দিতে পারে—কতবার অমন দিয়েছে। আর কী নিরীহ জীব এই খরগোস। হরিণের চাইতেও ভীতু। সর্বদা ভয়ে অস্থির। তাড়া খেলে তো কথাই আলাদা। তাড়া খেয়ে খরগোস যখন ছুটে তখন তার কান-দুটো হয়ে যায় তীরের ফলার মতো খাড়া—আর ছুটে যেন খরগোস নয়, তীর। কিন্তু ছুটে আর পালাবে কোথায়! জঙ্গল ঘেরাও করা হয় তিন দিক থেকে—একদিকে থাকে সার সার জাল পাতা। তিন দিক থেকে শিকারীদের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আটকে পড়ে ঐ পেতে-রাখা জালগুলোর মধ্যে। জেলে-শিকারী জালের কাছাকাছি কোনো ঝোপের আড়ালে তৈরি হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে—আটকে-পড়া-মাত্র হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে খরগোসকে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কচি-ছেলের মতো কেঁদে

ওঠে খরগোশ—ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ। খরগোশের কান্না ঠিক একেবারে কচি-ছেলের কান্নার মতো। কান্না অগ্রাহ্য ক'রে শিকারী প্রথমেই খরগোশের কান-দুটো একটু ক'রে চিরে দেয়, তারপর পিছনের দুটো পা একসঙ্গে বেশটি ক'রে বেঁধে মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়। এ হল নিয়ম। ঢোল-ডাগরের কানেও চলে যায় ততক্ষণে জালে শিকার ধরা পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে তারা ক'রে ওঠে—ঢুড্ডু-ঢড্ডু-ঢুম ঢড্ডুম ঢড্ডুম।

জঙ্গল ঘেরাও করে অত হৈ-হল্লা না করেও বা জাল না পেতেও খরগোশটিকে ধরা যায়। সেরকম শিকারীও আজকের দিনটিতে ফিরবে জঙ্গলে। এরা করে কী—তিন-চার জনে মিলে হাতে এই-টুকু-টুকু লাঠি নিয়ে ঝোপে ঝোপে ঘুরে বেড়ায়, মুখে কেমন থেমে থেমে শব্দ করতে থাকে—খঁ-খঁ-খঁ-খঁ। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে একটা ঝোপের মধ্যে হয়তো চোখ পড়ে গেল তাদের—যে-ঝোপটার শুকনো পাতার আড়ালে খরগোশ-ভায়া চার পা গুটিয়ে বসে আছে। শিকারীর চোখ-দুটোর সঙ্গে খরগোশের চোখ-দুটো এক হয়ে গেলেই শিকারী 'খঁ-খঁ' ছেড়ে বলতে আরম্ভ করে—'বাঘ রে, বাঘ রে, বাঘ রে'। 'বাঘ রে' 'বাঘ রে' শুনেই খরগোশ হয়ে পড়বে চলৎ-শক্তি-রহিত, একটুকুও আর নড়বে না সে। শিকারীরা হয় তখন তাকে ঠেঙিয়ে মারে, না-হয় একেবারে তার গলায় ক্যাঁক করে হাত বসায়। 'বাঘ রে' 'বাঘ রে' বললে খরগোশরা ছুটে পালিয়ে যেতে পারে না। কেন, এ-প্রশ্নের উত্তরে শিকারীরা বলে, বাঘকে খরগোশরা যমের মতো ভয় করে—'বাঘ'-শব্দ শোনামাত্র ওদের চার-পা অবশ হয়ে যায়। খরগোশরা তো লেখাপড়া শেখেনি, বাঘ-শব্দের অর্থ ওরা বোঝে কেমন করে—এ-প্রশ্নের উত্তরে সব শিকারীই জবাব দেয়, ভগবান মালুম।

শিকারের সন্ধানে এ-জঙ্গলে ও-জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে বেলা বাড়ে। তলার সূর্যি উঠে পড়ে কাঁধের উপরে, কাঁধের সূর্যি মাথায়। তখন জালদড়ি গুটিয়ে জঙ্গলের পাশেই কোনো এক পুকুরে বা জোড়ের ধারে বসে জল-খাবার খায় শিকারীরা। যাঁর শিকার তিনিই শিকারীদের জলখাবারের ব্যবস্থা করেন। জলখাওয়া শেষ হলে, ফের আবার ঢুকে পড়ে শিকারীরা জঙ্গলে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলতে থাকে শিকার-সন্ধান।

তারপর সূর্যাস্ত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ-দিনের মতো জাল গুটিয়ে নেয় শিকারীরা—জঙ্গল ছেড়ে ফিরে আসে গাঁয়ে। ফেরার সময় শোভাযাত্রা সহকারে পাঁচটা
গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে নাচতে নাচতে তারা যখন আ
তখন তাদের আনন্দ-কোলাহলে আর নাগাড়ার বা
মুখরিত হয়ে ওঠে পল্লীর আকাশ-বাতাস। সামনে থা
নাগাড়া, টাসা, কাঁসি, সানাই নিয়ে বাজনদাররা—তাদে
পিছনে থাকে নৃত্যরত শিকারীরা, তাদের পিছনে থা
শিকার। একটা লম্বা লাঠিতে সারিবদ্ধভাবে ঝুলিয়ে দেও
হয় শিকারগুলো,দুজন দু'কাঁধে লাঠিটা ধরে থাকে। নাগা
বাজতে থাকে 'ঢুড্ডু-ঢড্ডু-ঢুম ঢড্ডুম-ঢড্ডুম', টাসা বাজে
থাকে 'টেনে টেনে টেনে টেনে—টেন্ন্ন্ টেনে টেনে টেনে
কাঁসি বাজতে থাকে 'কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই', আর এ-সবে
উপরে গলা কাড়তে কাড়তে চলে সানাই 'ও তেরে রেরে'

চলতে চলতে পথের মধ্যে যে গাঁ পড়ে সেই গাঁয়ে
মাঝখানে কোথাও ফাঁকা জায়গা দেখে থেমে পড়ে শোভ
যাত্রা। মাঝখানটা ফাঁকা ক'রে দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়া
সব। গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ীরাও এসে জোটে
নাগাড়া, টাসা, কাঁসি, সানাই খুব বহরে ধরে রক্ত-গর
করা সুর। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া শিকারীদের মধ
থেকে তখন দু'চারজন ক'রে লাফিয়ে পড়ে ঐ ফাঁ
জায়গাটায়। চলে লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, আড়া
ধরা লম্বা লাঠির উপর পেটটা চেপে ধ'রে বাঁই-বাঁই ঘোর
শূন্যাসনে থেকে দু'হাত মাটিতে রেখে ছুটে বেড়ানে
হাওয়ার মধ্যে ভেমাল্ট খাওয়া, সোজাভাবে উল্টোভা
ডিগ্‌বাজি মারা, ইত্যাদি। কিছুক্ষণ ধরে এইভাবে খে
দেখানোর পর গোল হয়ে দাঁড়ানো শিকারীরা ফের ল
লাইন ক'রে দাঁড়ায়। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে আব
সামনের দিকে। এইভাবে চলতে চলতে আপনার গাঁ
এসে পৌঁছায়।

কিন্তু শিকার যদি না হয় এ-দিনটিতে? সারাদি
জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে হয়রান হলেও একটা শিকারের দে
মিললো না এমন তো হওয়া স্বাভাবিক—হয়ও কতবার
এক্ষেত্রে আগে আগে শিকারীরা করতো কী—খাওয়া-দাও
ভুলে, মুখ চুন ক'রে বসে পড়তো জঙ্গলের মধ্যে। এখানে
রাতটা বনের মধ্যে থেকেই কেটে যেতো। তার পরে
দিন হয়তো মিলতো শিকার—তখন উপবাস ভঙ্গ হতে
লোকালয়ে এসে মুখ দেখাতো শিকারীরা। আজকা
অবশ্য আর সে-সব নেই। শিকার না হলে, শিকারী
সকলে মিলে আজকাল আর উপোস দেয় না—যাঁর শিক
তিনিই কেবলমাত্র উপোস দিয়ে থাকেন। শিকা
না মিললে, জঙ্গলের মধ্যে না থেকে, বাড়িতেই ফিরে আ

শিকারীরা। অবশ্য মাথা উঁচু ক'রে নয়—নীচু ক'রে, লোকালয়ের মাঝ দিয়ে নয়—লোকালয়ের আড়ালে আড়ালে। পরদিন অর্থাৎ মেথ্যান-দিন রাত থাকতে-থাকতে ফের চলে আসে সব জঙ্গলে, নূতন উদ্যম নিয়ে আবার চলে শিকার-সন্ধান। ভাগ্য নেহাত খারাপ না হলে সন্ধ্যা নাগাদ একটা-না-একটা মিলে যায়ই শিকার। তবে আহেরিয়ার শিকার অর্থাৎ এথ্যান-যাত্রার শিকারের চাইতে আহেরিয়ার পরের দিনের শিকার অর্থাৎ মেথ্যান-যাত্রার শিকারের গুরুত্ব কিছুটা কম এই যা।

এইদিনই সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে হয় এথ্যান-লক্ষ্মীর পূজা। লক্ষ্মীপূজা বছরে অনেকদিনই হয়, কিন্তু সে অন্যান্য দিনগুলির লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে এ-দিনের লক্ষ্মীপূজার পার্থক্য আছে একটু। এথ্যান-লক্ষ্মীর পূজা হবে অন্দরে নয়—উঠোনে। মরাই বা গোলার কোলের উপর হবে এথ্যান-লক্ষ্মীর আসন পাতা। বেতের তৈরী একরকমের ঝুড়ি আছে, যাকে বলে আড়ি—সেই আড়ি নতুন ধান দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হবে, ধানের উপর সাজিয়ে দেওয়া হবে লক্ষ্মীর সাজ। লক্ষ্মীর সাজ অর্থাৎ হাতি, ঘোড়া, পায়রা, মাথা-কাটা গণেশ, পেঁচা, হাওদা-বসানো হাতির উপর দাঁড়িয়ে-থাকা পুতুলের সারি—সব পিতলের তৈরী। কাঁসা-পিতলের কাজ করে যারা, তারা আগে আগে মাথায় ঝুড়ি-বোঝাই লক্ষ্মীর সাজ নিয়ে এ-সময়টায় পাড়াগাঁয়ের অলিতে-গলিতে হেঁকে বেড়াতো দেবতার : সাজ চাই, মা—লক্ষ্মীর সা—জ। এখন কৈ আর চোখে পড়েনা এদিকে। "কোন্ দিয়ে তার দু'পায় আলতা"। তা সে যাই হোক, মরাই-তলায় আল্পনা কেটে, আল্পনার উপরে পিঁড়ি বা চৌকি পেতে তার উপর বসিয়ে দেওয়া হবে এই সাজ-দিয়ে-সাজানো লক্ষ্মীর আড়িটা। এই আড়িটার উপরেই এথ্যান-লক্ষ্মীর পুজো হবে।

সূর্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এথ্যান-লক্ষ্মীর পূজা শুরু হয়। পুরুতঠাকুর যথানিয়মে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্তরূপে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুজো সেরে বেড়ান।

পুজো হয়ে যাওয়ার পর বাড়ির গিন্নী লক্ষ্মীর আড়িটাকে উঠোন থেকে অন্দরে তুলে নিয়ে যাবেন। নিয়ে যাবেন মাথায় ক'রে—জলধারার উপর পা ফেলতে ফেলতে। কিন্তু এই তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়ম আছে একটি। নিয়ম হল, পুজো হয়ে যাওয়ার পর যতক্ষণ না শিয়াল ডাকছে 'হুয়া' 'হুয়া' ক'রে, ততক্ষণ লক্ষ্মীর আড়িকে তোলা চলবেনা মরাই-তলা থেকে। সুতরাং পুজো হয়ে যাওয়ার পরই কান পেতে বসে থাকতে হয় বাড়ির সকলকে। অন্যদিন সূর্য্যি ডুবতে-না-ডুবতেই কান ঝালাপালা হয়ে যায়—চারদিক জুড়ে গোল পাকিয়ে বসে শিয়ালেরা—

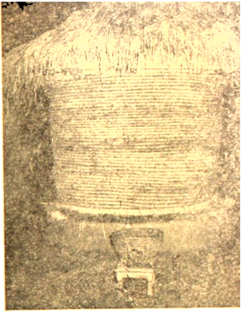

এথ্যান লক্ষ্মী

"হুক্কা হুক্কা হুক্কা হুয়া—
ছেলেপিলেদিকে বাঘিয়ে ভজিয়ে দোয়া"।

অথচ আজ একপ্রহর গড়িয়ে গেলেও 'হুয়া' শুনতে পাওয়া যায়না শিয়ালদের। কিন্তু দোষটা শিয়ালদের নয়—মানুষদেরই। আজ যে এথ্যান-শিকারের দিন। দূরের জঙ্গল, কাছে-পিঠের জঙ্গল—সব জঙ্গলই আজ তোলপাড় ক'রে দিয়েছে শিকারীরা। কাছে-পিঠের জঙ্গল ছেড়ে প্রাণ নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে শিয়ালরা। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর হৈ-হল্লা থামিয়ে, জাল-কাঁধে শিকারীরা ঘরে ফিরে এলে, ঝোপে জঙ্গলে যখন পুনরায় নেমে আসবে শান্ত নীরবতা তখন হয়তো শিয়ালরা বেরিয়ে আসবে বন ছেড়ে গাঁয়ের ধারের মাঠে ঝোপে। অন্তরে ভয় থাকতেও, নিত্যকার অভ্যাসমতো হঠাৎ তাদের মুখ দিয়ে হয়তো বেরিয়ে পড়বে 'হুয়াক্কা হুয়াক্কা—'। অথবা হঠাৎ একেবারে সমস্বরে

না ডেকে, এক-আধজন অনুচ্চস্বরে ক'রে উঠলো হয়তো 'ঊ-উ-উ-উ'। এদের এই ডাক নিয়ে রহস্যেরও যে সৃষ্টি না হয়, তা নয়। কতবার হয়েছে। একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন শীতের সময় কুকুরগুলো 'ভেউ-ভেউ' 'ঘেউ-ঘেউ' ছাড়াও মাঝে মাঝে শেয়াল-মাফিক ঠিক শিয়ালদের মতোই মুখটা উপরের দিকে তুলে এক টানে পাড়ে—'হু-উ-উ-উ-উ'। হু-এর হু আর হ-এর হ দূর থেকে প্রায় একরকমই শুনতে লাগে। আসলে হয়তো কুকুরমশাই ক'রে উঠলেন 'হু-উ-উ' আর টুনি কি পিণ্টুর কানে এসে ঢুকলো সে হু-টা 'হ' হয়ে। শোনামাত্র লাফিয়ে উঠলো তারা: মা গো-মা—ডেকেছে ডেকেছে, আমরা দুজনেই শুনেছি। একরকম সারাটা দিনই গেছে পিঠে-গড়ার কাজে, গতকাল গেছে খিচুড়ি-রান্নার ধুম—সুতরাং আলিস আসে বৈকি মেয়েদের। সব-ক'টিকে বাইরে একবার চোখ বুজতে পারলেই বাঁচে তারা। সুতরাং টুনি-পিণ্টুদের শোনা কুকুরের ডাকই তাদের কাছে শিয়ালের ডাক হয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে যে হোক একজন শুনলেই তো হল। এতটুকুও সন্দেহ না ক'রে লক্ষ্মীর আড়ি মাথায় নিয়ে ঘরে উঠে পড়েন তাঁরা। ব্যস, লক্ষ্মী-ঠাকরুন এবার সারা বছর ধরে অচলা হয়েই বসে থাকবেন ঘরের মধ্যে।

•

এর পরেই আসে দেবী সরস্বতীর কথা। পৌষ মাস যদি হয় লক্ষ্মীমাস, তবে মাঘ মাস হল সরস্বতী-মাস। এ মাসে ফুল ফোটে, হাওয়া বয় সরস্বতীর জন্যে—আমগাছ, শরগাছের মাথাগুলো হি-হি ক'রে হাসে সরস্বতীর জন্যে—আমগাছে আমগাছে কচি কচি পল্লবরা উঁকি মারে সরস্বতীর জন্যই। আকাশটা বদলে নতুন হয়, বাতাসটা বদলে নতুন হয়, রোদটা কেমন নতুন নতুন লাগে, মাটির গন্ধটা নতুন নতুন লাগে, গাছের মাথাগুলো নতুন নতুন ঠেকে। সরস্বতী যে নতুন ভারী ভালবাসেন। নতুনের মতো নয়—ঝরঝরে তকতকে পরিষ্কার নতুনই হল দেবী সরস্বতীর আসন।

আজ সকালটি হলেই চাই নতুন শরের নতুন কলম, নতুন কালি, নতুন দোয়াত। আখের মাথায় যে ফুলন্ত সরু শীষটা ওঠে, সে-শীষটাকেও শর বলে, তা ছাড়া নদীর ধারে বা জোড়ের ধারেও শরগাছ পাওয়া যায়। আখের শরই হোক বা শরগাছের শরই হোক, যে-কোনো শর যোগাড় ক'রে শরের ডাঁটাটাকে আধ হাত লম্বা কয়েটা টুকরোতে ভাগ ক'রে নিলাম। তারপর সে-টুকরোগুলোর একটা দিক ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেললেই কলম হয়ে গেল। নতুন শরের নতুন কলম। এবার চাই কালি। আমাদের বাড়িতে মুড়ি ভাজা হয় যে-খলাটায়, সে-খলাটার তলায় পুরু ভুষোর স্তর জমে থাকে। বাঁশের পাতি বা তালপাতা দিয়ে সেই ভুষোটা চেঁছে একটা-ঝিনুকে নিয়ে নিলাম। তারপর করলাম কী—মুঠোখানিক আতপচাল ঐ মুড়ি-ভাজা খলাটার ভেজে পুড়িয়ে নিলাম। এমন পুড়ালাম, যাকে বলে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া। পুড়ে-খাক-হয়ে-যাওয়া আতপচালগুলো এবার একটা বাটিতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলাম। গোটাকয়েক হর্তুকিও থেঁতো ক'রে ওর সঙ্গে ফেলে দিলাম। আগের সারা দিনরাত ধরে ওগুলো ভিজলো। পুজোর দিন সকালে উঠে দেখলাম জলটা কালো হয়ে গেছে। সেই-যে সেই মুড়ি-ভাজা খলার ভুষো চেঁছে রেখেছি, সেই ভুষোটা এই কালো জলটার সঙ্গে ফেলে দিয়ে আচ্ছা ক'রে ঘেঁটে নিলাম। ঘেঁটে নেওয়ার পর জলটা একটা ন্যাকড়া দিয়ে অন্য পাত্রে ছেঁকে নিলাম। ছিবড়াগুলো ন্যাকড়ার উপর রয়ে গেল—পরিষ্কার কালি পড়ে রইলো তলার বাটিটায়। ব্যস, এই হয়ে গেল নতুন কালি। এই কালির নামই 'বিরানি কালি'। এর রং-ও যেমন—গন্ধটাও তেমনি। যদি বলি, এ কালিটা দিয়ে লিখলে পর লেখাটাকে ঝকঝক্ করে উঠতে হবে, তাহলে এইসঙ্গে একটু বাবলা-আঠা ফেলে দিতে হবে। কালিটাকে এবার নতুন দোয়াতে ভরিয়ে নিলাম। নতুন দোয়াত মানে, বাজার থেকে কিনে-আনা কাঁচের বা চীনামাটির দোয়াত নয়—মাটির দোয়াত। কুমোর-জ্যেঠা যে আমাদের জন্যে মাটির দোয়াত গড়ে রেখেছে। সেই দোয়াত এনেই কালি ভরলাম। নতুন কলম হল, নতুন কালি হল, নতুন দোয়াত হল। এবার ঘরের মধ্যে একটা চৌকি পেতে চৌকির উপর বই খাতা রামায়ণ মহাভারত গীতা চণ্ডী সব সাজিয়ে দিলাম। পুরুতঠাকুর এলে, এর উপর এবার পুষ্পাঞ্জলি দেবো।

অন্য দিন ঘুম থেকে উঠতে যত বেলাই হোক, আজ কিন্তু কোকিল ডাকবার আগেই ছেলেদের ঘুম ভেঙে যায়। হাত-পা ধুয়ে হাতে এক-একটা সাজি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে তারা। যাদের বয়স আট-ন' বছর—তারা বাড়ির আশপাশে, ডোবার ধারে বা বাগানের পাশের বাসক গাছ থেকে বাসক ফুল তুলে, পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে গাঁদা-ফুল তুলে। যাদের বয়স বারো থেকে উনিশের মধ্যে,

তারা গাঁ ছেড়ে চলে যায় জঙ্গলে। ঢিলা বা ডিলা ফুল, আমডগি, জামডগি, আমমুকুল ছাড়াও নতুন নতুন বুনো-ফুল যা পাবে তুলে আনবে তারা বন থেকে। আর যাদের বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে, তারা পাড়াতেও যাবে না, জঙ্গলেও যাবে না—বাড়িতে বসে বসে কেবল হুকুম পাস করবে: এই টুছু, আল্‌পনা দেওয়া হলো না এখনো, পিঁড়িটা ধুয়ে আন্‌ শীগ্‌গির, ধুনোর দলা প্রদীপের সল্‌তে ঠিক করে ফেল্‌ তাড়াতাড়ি।

একটু বেলা হলেই পুরুত-ঠাকুর আসেন। গোটা পাড়ার আজ পূজো সারতে হবে তাঁকে। পুরুতমশাই আসামাত্র অন্তরটা নেচে উঠলো আমাদের। নতুন কাপড়টি প'রে, কাপড়ের আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে, কপালে চন্দনের টিপ নিয়ে, বিড়বিড় ক'রে অনেকগুলো মন্ত্র প'ড়ে আঁজলা-তিনেক ফুল ছড়িয়ে দিয়ে শেষে আসল কথাটি পেড়ে ফেললাম: 'তুমি নাও মা পুষ্পের ভার—আমাকে দাও মা বিদ্যার ভার'।

কিন্তু ঘরে ঘরে পুঁথিপত্র, বই-কেতাব, দোয়াত-কলম ইত্যাদি সাজিয়ে এভাবে সরস্বতীপূজা করার রীতিটি হল প্রাচীন রীতি। এ পুরনো রীতিটা পাড়াগাঁয়ে এখনও যদি-বা চলছে, দু'পাঁচবছর পরে বোধহয় আর চলবে না। উঠে যাবে একেবারে। পুরনো রীতিকে তাড়াবার জন্যে এসেছে নতুন রীতি। আগে পাড়াগাঁয়ের কোনো জমিদার বা অবস্থাপন্ন লোকই প্রতিমা বা পুতুল তৈরি করিয়ে সরস্বতীপূজা করতেন। আর আজকাল এমন গাঁ নেই যে-গাঁয়ে মাত্র একটা পুতুল আসে। গাঁয়ে যদি চারটি পাড়া থাকে, তবে চারটি পাড়ায় পাঁচটি পুতুল আসে। ও-পাড়ার সরস্বতীর হাঁসটা যদি সরস্বতীর হাঁটু পর্যন্ত গলা তুলে থাকে, তবে এ-পাড়ার সরস্বতীর হাঁসের গলা সরস্বতীর কোমর ছাড়িয়ে উঠে যায়। এ-পাড়ার ছেলেরা যদি আনে দুটো ঢাক—ও-পাড়ার ছেলেরা আনে চারটে ঢাক। হায় মা সরস্বতী!

•

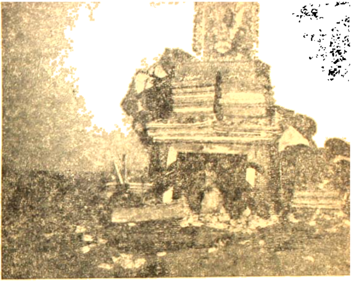

বই সেলেট পুঁথিপত্র সাজিয়ে সরস্বতী

শ্রীপঞ্চমী অর্থাৎ সরস্বতীপূজার পরের দিনটাই হল শীতলা-ষষ্ঠীপূজার দিন। মেয়েরা এ-দিন অতি ভক্তিসহকারে ষষ্ঠীদেবীর পূজো দেন, ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করেন, আর বাড়ির সকলকে ঠাণ্ডা বা বাসী খাবার খেয়ে থাকতে বাধ্য করেন। শীতলা-ষষ্ঠীর দিন গরম খাবার মুখে তুলবার নিয়ম নেই—এ দিনের সব খাবারই হবে বাসী খাবার।

সরস্বতীপূজার পরের দিনটিতে শীতলা-ষষ্ঠীর পূজা হলেও, পর্বটা আসলে লেগে যায় ঐ সরস্বতীপূজার দিনেই। এ-দিন রান্না করে রাখলে তবে তো তা পরের দিন বাসী হবে। সরস্বতীপূজার দিনটিই হল রাঁধাবাড়ার দিন। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত শুনে যান এ-দিন 'ছেংছাং কল্‌ কল্‌ কল্‌ কল্‌'—মেয়েদের আজ আর নিস্তার নেই। তবে এতসব যে রান্না হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান হল মাছ-রান্না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতবার দেখুন, মাছ-ই আপনার আগে চোখে পড়বে। মাছের ঝোল, মাছের ঝাল, মাছের টক, মাছ-ভাজা, মাছের কালিয়া, মাছের যুগল-মিলন—মানে, মাছ একাইএকশোটি হয়ে আজ বলেন, আমায় চাখো। তবু মনে রাখবেন, পশ্চিমবাংলার লোকের কাছে হালে মাছ-পাওয়া আর চাকরি-পাওয়া এক হয়ে গেছে। অবশ্য যাঁরা ছেলের বাবা তাঁদের আজ পোয়া-বারো। মেয়ের

বাবা যত গরীবই হোন, রাঁধাবাড়ার দিন সন্ধ্যা নাগাদ মাছের তত্ত্ব পাঠাবেনই মেয়ের বাড়িতে। এ হল নিয়ম। তবে নিয়ম মানে কড়াকড়ি নিয়ম নয়—অনিয়মও ঘটে। এবং আজকাল একটু বেশী ক'রেই ঘটে।

রাঁধাবাড়ার দিন সূর্যিঠাকুর কিছুদূর উঠতেই, বাড়ির কর্তা সদর দরজার উপর চোখ রেখে বসে পড়েন—আর বেলা বেড়ে উঠতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির গিন্নী মিনিটে মিনিটে উনুনশাল ছেড়ে বেরিয়ে এসে বাণী কাড়েন : ওগো, ওদের আশায় আর থেকো না—তোমার বৌটিই সাধের বেটী আহ্লাদী নয়, আরও পাঁচটা আছে তার। নতুন নতুন দিয়েছিল বছর-কয়েক—সেই ঢের।

কর্তা শিকড় গেড়ে বসেছিলেন। শিকড় তুলে কেয়ট-বাড়ির দিকে পা বাড়াতে যাবেন—এমন সময় দরজার মাথে মাথাটা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ঢুকে পড়ল বেহাইবাড়ির পরাণ। মাথার ঝুড়িটা নামিয়ে দিয়ে পরাণ দাঁত বার করে বললে, "ভালো আছেন তো, বাবু। মাছ আর মিলেনা কোথাও, এ-পুকুর ও-পুকুর ক'রে যোগাড় করতেই কর্তার দেরি হয়ে গেল।"

অন্যদিন হলে এক কথাতেই কাজ সারেন কর্তা—আজ কিন্তু একেবারে বেহাইবাড়ির পুঁটেকে, কচুকে, রসময়, কুকুর, বেড়াল, চিরেপাখী নাম ধরে ধরে সকলের খবর নেন তিনি। শেষে বলেন, "তা বেশ তা বেশ, তুমি পা ধুয়ে এসে খাও দেখি আগে চাট্টি।"

পরাণ খিড়কির পুকুরে পা ধুয়ে আসবার জন্যে পা বাড়াতেই গিন্নীঠাকরুন একলাফে উঠোনে এসে দাঁড়ান। শুধু মাছ নয়, মাছের সঙ্গে ফুলকপি আছে, বাঁধাকপি আছে, পেঁয়াজ, বিলাতী-বেগুন, গুড়-আলু, মটরশুঁটি আছে—কিন্তু সেদিকে নজর না প'ড়ে, নজর পড়বে গিন্নীর খালি ঐ মাছের ঝুড়োটার উপরেই : "তুলেই দ্যাখো-না গো, ওটা পচা না টাট্কা।"

কোঁচা গুটিয়ে কর্তামশাই যেই একটু হাত লাগালেন ঝুড়োটায় অমনি জোর গলায় বলে উঠলেন গিন্নী : "সে আমি আগে থাকতেই জানি। কড়ে-আঙুলের মতো এই-টুকু-টুকু মাছ না পাঠালেই তো পারতেন তিনি। কই, দেখবে এস গো বৌমা, তোমার বাপের বাড়ির মাছের কেমন চেহারা। টাকাটা আমার গচ্চা যাবে।" (যে লোকটি তত্ত্ব নিয়ে আসে তাকে ষোলো-আনা দিয়ে বিদায় করাই হল রীতি।)

তা সে যাই হোক, মাছের চিন্তা ঘুচলো কর্তার। গিন্নীও মেজাজ ঠিক ক'রে উনুনশালে শিকড় গেড়ে বসলেন। উনুনশালে থেকেই বারোটা—মানে, রাত বারোটা হল। তারপর চোখ বুজতে-না-বুজতেই সকাল। এর পর ষষ্ঠীপূজা যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ বসে থাকতে হবে সবাইকে চুপচাপ। ষষ্ঠীপূজা শেষ হলে পর গিন্নীরা মুখ তুলবেন—মুখ তুলে খাবার ধরে দিবেন সকলের সামনে। টাট্কা খাবার নয়—বাসী খাবার।

শীতলা-ষষ্ঠীর দিন কেন টাট্কা খাবার খাওয়া চলবে না তা প্রতিবছর এই দিনটিতেই মেয়েরা একজায়গায় জমায়েত হয়ে হুকুম করে জেনে নেয়। এ-দিন কোনো একটি প্রশস্ত উঠোনে পাড়ার মেয়ে-বৌরা সব এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে। তাদের মাঝখানে থাকে জলভরা একটি ঘটি, একগোছা বাঁশপাতা ঘটিটার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়। ঘটিটার পাশে নামানো থাকে এক বাটি দই আর হলুদ।

মেয়েদের মধ্যে থেকে কোনো এক প্রবীণা বলতে আরম্ভ করেন—

এক যে ছিল সওদাগর। সওদাগরের বয়স সত্তোর—সওদাগরের স্ত্রীর বয়েস ষাটের কাছাকাছি। চার ছেলে আর চার বৌ নিয়ে দুজনেই পরম সুখে কাল কাটায়। সওদাগর-গিন্নীর তো চব্বিশঘণ্টাই মনে হয়, আমার মতো এমন ভাগ্যবতী আর কে আছে দুনিয়ায়। জোয়ান চার ছেলে—লক্ষ্মীর মতো চার বৌ। হাতে শাঁখা কপালে সিঁদুর। ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা।

এমন একদিন হল কী—এক ফকির এসে দরজায় দাঁড়ালো, "চাট্টি ভিক্ষা দাও, মা" ব'লে। ভিক্ষা দিতে বেরিয়ে এল বুড়ী নিজেই। কিন্তু ভিক্ষার ঝুলির দিকে বুড়ী হাতটা এগিয়ে দিতেই মাথা নাড়লো ফকির, তোমার হাতে তো ভিক্ষা নেওয়া চলবে না, মা। তোমার বৌদের কাউকে পাঠিয়ে দাও, তারা কেউ এসে ভিক্ষা দিয়ে যাক আমাকে।

বুড়ী একেবারে হাঁ হয়ে গেল ফকিরের কথা শুনে। ভিখারী নারায়ণ। নারায়ণের সঙ্গে আর কথা-কাটাকাটি না ক'রে বুড়ী বড়বৌকে এসে বললে, ভিক্ষাটা তুমিই দিয়ে এসো তো, মা। ঘরের লক্ষ্মী বড়বৌ শাশুড়ীর কথায় ভিক্ষা দিতে এল ফকিরকে। ভিক্ষা দিয়ে পর বড়বৌ বললে ফকিরকে, শাশুড়ীর হাতে ভিক্ষা নিলেন না কেন বলতেই হবে আপনাকে। ফকির বললে, বুঝলে না, মা—তোমার শাশুড়ীর ছেলেই আছে চারটি, মেয়ে তো আর একটিও নেই। বরং বেটা-আঁটকুড়ো ভালো, তবু বেটী-আঁটকুড়ো যে

ভালো নয়, মা। বেটী-খাটকুড়োর হাতে ভিক্ষা নেওয়া চলে না—তাই নিলাম না আর কি।

বড়বৌ লক্ষ্মীবৌ—ফকিরকে জড়িয়ে ধরলে সে, শাশুড়ীর বেটী-খাটকুড়ো নাম যাতে ঘোচে তার ব্যবস্থা করতেই হবে আপনাকে।

কিন্তু সে ভারী অসম্ভব কথা! ছেলে-পিলে হওয়ার বয়স কোন্ দিন পার হয়ে গেছে বুড়ীর, বুড়োও বুড়ো হয়ে গেছে। তবে ফকিরের অসাধ্য কাজ কিছুই তো নেই দুনিয়ায়। বড়বৌয়ের ধরপাকড়ে দুটি ওষুধ বার করলে ফকির। একটি ওষুধ খেলে বুড়ীর বয়স কমে যাবে, আর একটি ওষুধ খেলে বুড়ীর গর্ভ হবে। ওষুধ-দুটি বড়বৌয়ের হাতে দিয়ে বার বার করে সাবধান করে দিলে ফকির, যে-মেয়েটি হবে বুড়ীর সেটি হবে ষষ্ঠীর দেওয়া মেয়ে। নাম রাখবে তার 'ষাট্টু'। আর দেখো, এ মেয়ে কোনোদিন যেন টাট্‌কা খাবার না খায়। যা-কিছু খাব, সবই যেন বাসী হয়।

এই ক'রে বড়বৌ আর ফকিরের চেষ্টায় বুড়ীর একদিন সত্যি-সত্যিই গর্ভলক্ষণ দেখা দিল, এবং যথাসময়ে বুড়ীর একটি কন্যাও জন্মালো।

মা-ষষ্ঠীর দেওয়া মেয়ে, সুতরাং মেয়ে নিরাপদে বড় হয়ে উঠলো। রূপও হল তার একেবারে পদ্মফুলটির মতো। তারপর একদিন দেখতে দেখতে মেয়ের বিয়ের ফুলটিও ফুটে উঠলো। সওদাগরের মেয়ে, ভাবনা-চিন্তার তো আর কিছু নেই। বেশ বড়রকম এক সওদাগরের ছেলের সঙ্গে ষাট্টুর বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর পাল্‌কিতে চড়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে ষাট্টু—যেতে যেতে একটা পুকুরের কাছে এসে পাল্‌কিটা থামতেই ষাট্টুর বর হঠাৎ বলে বসল ষাট্টুকে, তুমি তো গো ষষ্ঠীর দেওয়া মেয়ে—যা ইচ্ছে তাই তো করতে পার তুমি। তা কই তোমার গায়ের সব গয়নাগুলো খুলে ফেলে দিতে পার এই পুকুরটায়? আছে সেরকম মনের জোর? মা-ষষ্ঠীর দেওয়া যখন তুমি তখন মা-ষষ্ঠী তো জলের গয়নাগুলো তুলে নিয়ে আবার তোমার গায়ে পরিয়ে দিবেন। কই দেখিনা একবার—দাওনা ওগুলো জলে ফেলে।

বলতে-না-বলতেই ষাট্টু গায়ের গয়নাগুলো খুলে খুলে ছুঁড়ে দিতে লাগলো পুকুরের জলে। দেখতে দেখতে গা-টা খালি হয়ে গেল ষাট্টুর—একফোঁটা সোনারও চিহ্ন রইলো না আর ষাট্টুর গায়ে।

পাল্‌কি চলতে লাগলো। চলতে চলতে পাল্‌কি যখন এসে এবার থেমে গেল বরের বাড়িতে—তখন কনে দেখবার জন্যে ছুটে এল সব মেয়ে-বৌরা। যে আসে, সেই গালে হাত দেয়, এ আবার কেমনধারা সওদাগরের মেয়ে গো—গা যে একেবারে খালি!

বৌভাতের দিন কিন্তু সকলকে থ বানিয়ে দিলে ষাট্টু। বৌভাতের দিন মেছুনীরা মাছ কুটতে কুটতে একটা মাছকে নিয়ে ভারী নাচারে পড়ে গেল। মাছটা আর কাটা যায়না কোনোমতেই। সব মেছুনীই হার মেনে গেল। বরের মায়ের কানে এ-কথাটা যেতেই বরের মা বললে ষাট্টুকে, তুমি তো গো বাছা, ষষ্ঠীর দেওয়া মেয়ে, অসাধ্য কাজ কিছুই নেই তো তোমার, তা কই এই মাছটা কেটে দাও দেখি তুমি। শাশুড়ীর কথায় ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এল ষাট্টু—বেরিয়ে এসে মাছ কুটতে বসলো। এবার কিন্তু মাছের ঘাড়টা বঁটিতে ঠেকাতে-না-ঠেকাতেই দেহ্‌দ্ব্‌ খণ্‌ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাছের পেট থেকে বেরিয়ে পড়লো সেই জলে-ফেলে-দেওয়া যত গয়না। এক ঢিলে দু'পাখী মরলো। বর বুঝলে, হ্যাঁ, ষষ্ঠীর দেওয়া মেয়ে বটে—শাশুড়ীও বুঝলে এ মেয়ের অসাধ্য কিছুই নেই। এর পর অন্দরমহল থেকে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালো ষাট্টু তখন বলতে হল সব মেয়ে-বৌদিকে, হ্যাঁ, সওদাগরের মেয়ে বটে—গা দেখতে পাওয়া যায়না গয়নায়।

তারপর সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো ষাট্টু।

ঘরকন্না করতে করতে শেষে একদিন ষাট্টুর গর্ভলক্ষ দেখা দিল। বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি—দু'বাড়ির লোকের আনন্দ আর ধরে না। ষাট্টুর শাশুড়ী ষাট্টুকে সব সম চোখে চোখে রাখে, ষাট্টু যেদিকে যায় শাশুড়ীও সেদিকে যায়। একদিন হল কী—ষাট্টু বাঁশ-ঝোপওয়ালা এ পুকুরে স্নান করতে এল—শাশুড়ী সঙ্গেই আছে। ঘাটে উপর এসে পা দিয়েছে ষাট্টু—এমন সময় তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়লো বড়-রকমের একটা থলে। শঙ্খচিল একট চক্কর দিচ্ছিল উপরে—থলেটার উপর এসে সেটা ঠ মারতেই থলেটা ফেটে গেল। আর ভিতর থেকে বেরি পড়ল ষাট ছেলে, এক মেয়ে। পুকুরের ঘাট, বাঁশঝো আলো হয়ে উঠলো তাদের রূপে। শাশুড়ীর আন জানে কে!

ঘরে এসে ষাট্টু এবার বললে শাশুড়ীকে, আমার এ একষট্টিটি ছেলের জন্যে চাই একষট্টিটি আঁতুড়-ঘর, একষট্টি ধাই, একষট্টিটি খাটিয়া। বলতে বলতে অত ঘর কোথা মিলবে—শাশুড়ী মহা চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু ষষ্ঠীর দেও

মেয়ে ষাটু সে-চিন্তা দূর করলে। কাজললতা বার ক'রে ষাটু এক-একটি দাগ কাটে আর এক-একটি ঘর তৈরি হয়ে যায়। ঘর হল, ধাই হল, খাটিয়া হল। শাশুড়ী যে-ঘরটায় ঢোকে সেই ঘরটাতেই দ্যাখে ষাটু ছেলেকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে।

সোনার সংসার হল ষাটুর। ষাট ছেলে, এক মেয়ে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো। ষাটু এবার ঘর-আলো-করা বৌ আনবার দিকে মন দিলে। ষাট ঘর থেকে ষাট বৌ আনলে চলবে না—যে-ঘরে আছে ষাটটি মেয়ে একটি ছেলে, সেই ঘরেই বিয়ে দিতে হবে ছেলেমেয়েদের। খোঁজ করতে করতে মিলে গেল সেরকম ঘর। ষাটটি ছাদনাতলা হল। ষাটু নিজেও ষাটটি হয়ে ষাট বৌকে ঘরে তুললে।

যার ষাট-ষাটটি বৌ, তার আবার কাজ কি! ষাটু পা ছড়িয়ে বসে থাকে চুপচাপ—ষাট বৌ দিনরাত সেবা যোগায়। কোনো দুঃখই নেই ষাটুর, সব সাধই মিটে গেছে তার—কিন্তু কেবল ঐ একটিমাত্র সাধ থেকে যাচ্ছে। চাট্‌কা খাবারের সাধ যে কেমন তা আর জানতে পারলো না ষাটু এ-জীবনে। থাকতে না পেরে, ষাটু একদিন বৌদি'কে [illegible] সেই সাধের কথাটা জানালে। ষাট বৌ সঙ্গে সঙ্গে হরেকরকম চাট্‌কা খাবার তৈরি করতে লেগে গেল। মাঘ মাসের ষষ্ঠীর দিনে ষাটু আরাম ক'রে সেইসব চাট্‌কা খাবার খেলে।

ব্যস, ভোরে উঠে ষাটু দ্যাখে ষাট বৌ, ষাট ছেলে সব মরে পড়ে আছে। "হায় মা-ষষ্ঠী, আমার কি হল, বাবা" ব'লে ষাটু কান্না জুড়ে দিলে।

ঘরে বসে কান্না নয়—ঘর-দুয়ার ছেড়ে বনে বনে পাগলিনীর মতো কেঁদে বেড়ায় ষাটু। বনে ঘুরতে ঘুরতে একসময় তার মাথায় কি-একটা ঠেকলো, উপরের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে ষাটু একজোড়া পা। ষাটু বলে উঠলো তা দেখে, আমার মাথায় পা ঠেকিয়ে কে বাবা তুমি অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল করলে। গাছের উপর থেকে মানুষের গলা ভেসে এল: কেন—গরম গরম লুচি খাওগে যাও, তোমার না হলে আর কার এমন দুর্গতি হবে গো?

তা শুনে ঝুলন্ত পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে ষাটু—

"আমি কোথায় কেঁদে,
তুমি কি করে জানলে বল?"

তাহলে তুমিই আমার মা-ষষ্ঠী।

ষাটুর কান্নায় গলে গেলেন মা-ষষ্ঠী। ষাটুকে বললেন তিনি, "তবে যা—আরও এগিয়ে যা। দেখবি একজায়গায় একজন গলিত-কুষ্ঠ বসে আছে, দই আর হলুদ একটা ভাঁড়ে মিশিয়ে সেই ভাঁড়টা তার মাথায় ঢেলে দিস, ঢেলে দেওয়ার পর ফের আবার তার গা থেকে দই-হলুদ জিভে চেটে ভাঁড় ভর্তি করতে হবে। এ যদি পারিস তাহলে ঐ দই-হলুদটিতেই তোর ছেলে-বৌরা ফের আবার বেঁচে উঠবে। একটুও ঘৃণা করলে চলবে না, একটুও কম দই হলে চলবে না—ভাঁড়টি ঠিক ভর্তি হওয়া চাই।"

কিছুদূর গিয়ে দেখলে ষাটু, সত্যি-সত্যিই একজন গলিত-কুষ্ঠ বসে আছে—হাত-পা সব গলে গেছে তার, পুঁজ পড়ছে তেমনি মোটা গা দিয়ে। মনের মধ্যে একটুও ঘৃণা না রেখে ভক্তিভরে নির্দেশ-মাফিক কাজটি সমাধা করলে ষাটু। তারপর দই-হলুদে-ভরা ভাঁড়টি নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। ষাটুর হাতের দই-হলুদের ছোঁয়া পেয়ে ষাট ছেলে ষাট বৌ সব বেঁচে উঠলো আবার। ষাটুর সংসার আবার সেই সোনার সংসার হল।

সামনে তো রাখাই আছে দই-হলুদে-ভরা একটি বাটি। কাহিনী বলা শেষ হলেই, সেই বাটিটা মাটির উপর উপুড় ক'রে দেওয়া হয়। মাটি থেকে দই হলুদ ফের আবার তোলা হয় বাটিতে। তারপর তা থেকে একটু একটু ক'রে আঙুলের ডগায় নিয়ে সকলের কপালে ছুঁইয়ে দেওয়া হয়। সবশেষে জলের ঘটি থেকে বাঁশপাতায় ক'রে জল নিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয় মেয়েদের মাথায় মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে যে জল ছিটায়, সে আউড়ে যায়: ষাটুর বাও পাও—ষাটুর বাও পাও—

এঞ্জাইম ও পরিপাক ক্রিয়া

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

কোনো মহাপুরুষ বলেছিলেন, 'আমরা যেমন, জগৎকে দেখি তেমন।' নাট্যকার বললেন, 'সংসারটা রঙ্গমঞ্চ মাত্র।' দার্শনিক বললেন, 'সংসার মায়া; এর অস্তিত্ব নেই; কে তুমি, কে তোমার কান্তা, পুত্র?' কবি বললেন, 'সংসার রহস্যাচ্ছন্ন, সে-রহস্য কেবল আমার চোখে ধরা পড়েছে; আকাশে যখন চাঁদ উঠেছে, সরোবরে তখন কুমুদিনী ফুটে উঠেছে; ভ্রমর মাধবীকুঞ্জে ঘুরে মরছে কেন, এ আমি জানি।' বিজ্ঞানী বললেন, 'জগৎ সংসার সব বিরাট অট্টালিকার মতো, এর ইট এক একটি পরমাণু।' রসায়নবিদ বললেন, 'আমাদের দেহটা একটা বিরাট যৌন কারখানা; এর ভেতর নিত্য কত অণুর ভাঙাগড়া বিরামবিহীন চলেছে, দিনরাত এর চুল্লী চলেছে সমানভাবে জ্বলে, তার উত্তাপ আমাদের শরীরের উত্তাপ, ৩৭° সেন্টিগ্রেড। এ কারখানার নিভৃত কক্ষের কর্মী কারা?' রসায়নবিদ বললেন, এরা এঞ্জাইম। বিচিত্র এদের কর্মকুশলতা। জটিল এদের দেহবন্ধন। বিস্ময়কর এদের সামর্থ্য। মানুষের গড়া রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে এদের আশ্চর্য কাজের তুলনা হয় না। এক গ্র্যাম পেপ্‌সিন দুঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৫০,০০০ গ্র্যাম (প্রায় একমণ দশ সের) সিদ্ধ ডিম পরিপাক করাতে পারে। একঘণ্টার মধ্যে ল্যাকটেজ এঞ্জাইম যে পরিমাণ দুগ্ধজাত চিনি গ্লুকোজে পরিণত করতে পারে, মানুষের গড়া কোনো প্রণালীতে তা করতে হ'লে অন্ততঃ একমাস সময় লাগে।

রসায়নবিদ বললেন, রক্ত, মাংস, স্নেহ, শর্করা আর প্রোটিন দিয়ে গড়া। রক্তে রয়েছে গ্লুকোজ, পেশীতে ও লিভারে সঞ্চিত আছে গ্লাইকোজেন, যা গ্লুকোজের নামান্তর। ত্বকের নীচে মেদ বা স্নেহের আবরণ। রক্তে মিশে আছে প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ, মাংস দেহতন্তুও গড়ে উঠেছে প্রোটিন দিয়ে। রক্তমাংসের পাঁচভাগের একভাগ প্রোটিন, মস্তিষ্কের বারোভাগের একভাগ প্রোটিন, এমনকি অস্থি ও দাঁতের শতকরা একভাগ প্রোটিন। প্রোটিন ছাড়া জীব-জন্তু নেই। মানুষের ব'লে নয়, অণুতম অণুজীবদেহও প্রোটিন ছাড়া গঠিত হয় না।

প্রায় একশ' কুড়ি বছর আগে জীবদেহতন্তু থেকে রাসায়নিক পদার্থরূপে প্রোটিন নিষ্কাশন করেন ওলন্দাজ রসায়নবিদ মালডর (Mulder)। তিনি গ্রীকভাষা থেকে পদার্থটির নামকরণ করেন 'প্রোটিন' বা 'যার প্রথমস্থান'। অবশ্য রসায়নের ভাষায় বলতে গেলে জীব-জীবনে প্রোটিনের স্থান পুরোভাগে।

বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে মোটমাট অসংখ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন (কোনো-কোনোটার এর উপর সলফর, ফসফোরস) পরমাণু-সন্নিবেশে প্রোটিনের অণু গড়া। তাই প্রোটিন অত্যন্ত জটিল যৌগিক প্রোটিনের অণু বিরাট; হাইড্রোজেনের পরমাণুর তুলনা অনেক অনেক বড়। কোনোটা চল্লিশ লক্ষ গুণ ভারী কোনোটা আবার এর চেয়েও ঢের বেশী ভারী। তবু এর আকারে অনেক ছোট, শক্তিশালী অনুবীক্ষণে ধরা পড়ে না।

শর্করা আর স্নেহের অণু অনেকগুলি কার্বন, হাইড্রোজে ও অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গড়া। গ্লুকোজ অণু গ উঠেছে ছয়টি কার্বন, বারোটি হাইড্রোজেন ও ছয়টি অক্সিজে পরমাণুর সংযোগে। মলটোজ চিনির একটি অণু গড়ে উঠে দুইটি গ্লুকোজ অণুর রাসায়নিক সংযোগের ফলে। স্টার্চে অণু গড়ে উঠেছে অনেকগুলি গ্লুকোজ অণুর সমাহারে শর্করা-শ্রেণীভুক্ত আরও জটিল সেলুলোজের অণু অসং গ্লুকোজ অণুর সমাহারে গঠিত। প্রোটিনের অণুগুলি প্রা কুড়িটি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযোগে গঠিত। বিভি হওয়াতে অ্যামিনো অ্যাসিড অণুর সমাহার বিভিন্ন হওয়া সম্ভাবনা বেশী। প্রোটিন অণুর জটিলতাও তাই বেশী যেমন একপ্রকার প্রোটিনের অণুতে কল্পনা করা যাক—এ দুই, তিন, চার—এইভাবে পরপর কুড়িটি বিভিন্ন অ্যামি অ্যাসিডের অণু যুক্ত হয়ে আছে। আর এক প্রকার প্রোটি অণু হতে পারে যাতে একনম্বর অ্যামিনো অ্যাসিডের স

দুইনম্বর অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত না হয়ে তিননম্বর আছে; তিননম্বরের সঙ্গে চারনম্বর যুক্ত আছে, ইত্যাদি। এইভাবে অসংখ্য সম্ভাব্য প্রোটিন অণু গড়ে উঠে। তাই প্রোটিন অণু, শর্করার অণুর চাইতে জটিল। বলতে গেলে, জীবদেহের উপাদান রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে জটিল। ইংরাজি ২৬টি বর্ণের সমাবেশে অসংখ্য শব্দ গঠিত হয়েছে। এর থেকে ধারণা করা যাবে, ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুর সমাবেশে কতগুলি প্রোটিন অণু গঠিত হতে পারে।

জীবদেহের নখ, চুল, পালক, খুর প্রোটিন অণু দিয়ে গড়া—এই প্রোটিনের নাম কেরাটিন। সিল্ক-তন্তু প্রোটিন দিয়ে গড়া—এর নাম ফাইব্রয়েন। এইগুলিতে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি শিকলের মতো যুক্ত। কোনো কোনো প্রোটিন অণুতে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি লম্বাভাবে শিকলের মতো যুক্ত না হয়ে জট-পাকানো সুতার মতো জোটবদ্ধ গ্রন্থিযুক্ত হয়ে যায়। এইপ্রকারের প্রোটিনকে 'গ্লবিউলার প্রোটিন' বলে। এই প্রোটিনগুলি জীবদেহে বিভিন্ন এঞ্জাইম রূপে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ারত থাকে।

হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ আমাদের পরিচিত। ক্ষতস্থানে দুই-এক ফোঁটা দিলে পর দ্রবণটি বজবজ করে ওঠে। তখন হাইড্রোজেন পারক্সাইড যৌগিক থেকে কতক অক্সিজেন অংশ গ্যাসের বুদ্বুদরূপে বাহির হয়ে আসে। তাই উচ্ছলন দেখা যায়।

হাইড্রোজেন পারক্সাইড = হাইড্রোজেন মন-অক্সাইড বা জল + অক্সিজেন গ্যাস। এই রাসায়নিক ক্রিয়া বোতলে রাখা হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। রৌদ্র লাগালে বা দ্রবণটি লোহাচুরের সংস্পর্শে এলে হাইড্রোজেন পারক্সাইড থেকে অক্সিজেন বিয়োজন ক্রিয়া বেশী দ্রুত হতে থাকে। অথচ তাতে লোহাচুরের কোনো পরিবর্তন হয় না। লোহাচুরের মতো অনেক পদার্থ আছে যারা এইভাবে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। এদের অণুঘটক বলে। তপ্ত চিনাবাদাম তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক ক্রিয়ায় কৃত্রিম ঘি উৎপন্ন হয়। নিকেল-চূর্ণ এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় অণুঘটক। বলা হয়, হাইড্রোজেন গ্যাস দাহ্য। বায়ুর মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাসে অগ্নি সংযোগ করলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। অথচ বায়ু শুষ্ক ও হাইড্রোজেন গ্যাস শুষ্ক থাকলে হাইড্রোজেনে আগুন ধরতে চায় না। কিন্তু একবিন্দু জলের সংস্পর্শে এলে সহজে জ্বলে। জল বা জলীয় বাষ্প এখানে অণুঘটক। দেহের ভিতরে বিচিত্র রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য বিবিধ এঞ্জাইম উৎপন্ন হয়—বিচিত্র বিস্ময়কর এদের কাজ। ক্ষতের উপরকার ক্ষতে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ ঢাললে সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গত হতে থাকে। দেহতন্তুতে থাকা এঞ্জাইম, ক্যাটালেজ, হাইড্রোজেন পারক্সাইড হতে অক্সিজেন বিয়োজন ক্রিয়া দ্রুত হতে সাহায্য করে।

খুব স্বল্পপরিমাণ অণুঘটক খুব বেশী পরিমাণ যৌগিকের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অণুঘটকের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। কতকগুলি অণুঘটক খানিকটা জায়গায় বিছিয়ে দিলে রাসায়নিক ক্রিয়া সহজে দ্রুত হ'তে পারে। লোহাচুর খুব মিহি করে চূর্ণ করে এক বর্গইঞ্চি স্থানে খুব পাতলা করে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তাতে নির্দিষ্ট সময়ে

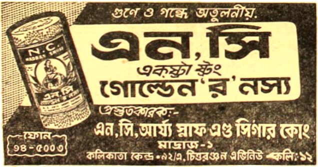

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়.
এন,সি
একস্ট্রা স্ট্রং
গোল্ডেন 'র' নস্য
প্রস্তুতকারক:-
এন,সি,আর্য্য স্নাফ এণ্ড সিগার কোং
মাড্রাজ-১
ফোন
৭৪-৫০০৩
কলিকাতা কেন্দ্র •৯২/এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ • কলি: ১২

খানিক পরিমাণ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড থেকে অক্সিজেন বিয়োজন হল। এমন দুই বর্গইঞ্চি স্থানে ঐ একই পরিমাণ লোহাচূর ছড়ানো হ'ল। তাতে ঐ একই সময়ে অনেক বেশী পরিমাণ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বিয়োজিত হ'ল।

অণুঘটকের অণুগুলি পাশাপাশি সাজানো থাকলে, বেশ খানিকটা বর্গক্ষেত্র জুড়ে থাকে। এইরকম অবস্থায় অণুঘটন ক্রিয়া সবচেয়ে ভালোভাবে চলে। দেহের ভিতরে স্থানে স্থানে দেহতন্তুতে বিভিন্ন এনজাইম অণুগুলি এইভাবে স্থান জুড়ে থাকে। এতে এনজাইমের তেমন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এ যেন চেয়ারে ব'সে মোজা পরার মতো; যতলোক খুশি একে একে ব'সে মোজা প'রে নিল, তাতে মোজা-পরার কাজটা সহজ হ'ল, অথচ চেয়ারের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ল না। অল্পপরিমাণ এনজাইম বিপুল পরিমাণ পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে পারে। দেহে তাই বিভিন্ন এনজাইম খুব অল্প পরিমাণেই থাকে। তাতে তাদের কাজে কোনো অসুবিধা হয়নি।

গ্রীষ্মকালে 'আমানি' রাখা হয়। রসায়নবিদের মতে ভাত বা ফেন থেকে টক আমানি তৈরি হয় রাসায়নিক প্রণালীতে, এনজাইমের সাহায্যে। ফেনের উপাদান স্টার্চ থেকে বাতাসে ভেসে চলা ছত্রাকের এনজাইমের সাহায্যে কিছু কোহল আর কিছু অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। সেই 'স্টার্চ-কোহল-অ্যাসিড-জল-মিশ্রিত পদার্থ' আমানি ব'লে পরিচিত।

খেজুর-রস গেঁজে তাড়ি হয়। রসায়নবিদ আবিষ্কার করলেন ঈস্ট নামক একজাতীয় ছত্রাক বাতাসে ভেসে বেড়ায়। অনুকূল আশ্রয় পেলে এরা বাঁচে, বাড়ে, বংশবৃদ্ধি করে। ঈস্ট খেজুর-রস আশ্রয় করলে, খেজুর-রসের রাসায়নিক পরিবর্তনে কোহল উৎপন্ন হয়। ঈস্টের মধ্যে আছে এনজাইম; এই এনজাইমই খেজুর রসের মিষ্টি চিনি-অণুকে কোহলে পরিণত হ'তে সাহায্য করে।

ঈস্ট থেকেই প্রথম এনজাইম আবিষ্কার হয়। গ্রীক-ভাষায় এনজাইমের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'ঈস্ট থেকে যা পাওয়া যায়'। এ হ'ল ১৮৭৮ সালের কথা। ১৮৯৭ সালে বুখনার (Buchner) দেখালেন—ঈস্ট-কোষ নিঙড়ে রস বের করে নিলে, সেই রসও ঈস্টের মতো স্টার্চ থেকে কোহল তৈরি করতে পারে। আবার ১৯২৬ সালে অন্য এক এনজাইমের সঠিক স্বরূপ জানা গেল। মাখন-সীমের বীচি থেকে সুমনার (Sumner) বিশুদ্ধ এনজাইম আবিষ্কার করলেন। সেই এনজাইম শোধন করে পেলেন কেলাসিত কঠিন রাসায়নিক পদার্থ। পরীক্ষা করে দেখলেন এটি একজাতীয় প্রোটিন, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন দিয়ে গড়া জৈব জটিল রাসায়নিক পদার্থ। এর পর ধীরে ধীরে অনেক এনজাইমের স্বরূপ জানা গেল—এখন বলা চলে, সব এনজাইম প্রোটিন-জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। জীবদেহ নিজ প্রয়োজনমতো বিবিধ এনজাইম গড়ে নেয়। এক-একটি এনজাইম এক-এক-জাতীয় রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। যে-কোনো এনজাইম যে-কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া করে না।

দেহ খাদ্য পরিপাক করে; তার থেকে পুষ্টিবৃদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করে। খাদ্য থেকে শক্তি, পেশী, মেদ ইত্যাদি গড়ে নেয়। পরিপাক ক্রিয়া রাসায়নিক ক্রিয়া। দেহের এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিবিধ এনজাইম বিশেষভাবে সাহায্য করে। খাদ্যের রাসায়নিক উপাদান মোটমাট হ'ল জল, খনিজ পদার্থ, খাদ্য লবণ, লৌহঘটিত যৌগিক, ক্যালসিয়ম, ফসফোরস, গন্ধক প্রভৃতি যৌগিক, ভিটামিন, প্রোটিন শর্করা স্নেহ প্রভৃতি পদার্থ। খাদ্যস্থ প্রোটিন থেকে দেহ তৈরি করে নেয় অ্যামিনো অ্যাসিড, আবার তার থেকে নিজ তন্তুর উপযুক্ত উপাদান প্রোটিন গড়ে নেয়। স্নেহ ও শর্করা দেহকে শক্তি যোগায়। দেহ যেন মোটরের মতো একটা যন্ত্র। স্নেহ আর প্রোটিনে গড়া দেহতন্তু যেন এর এঞ্জিন; স্নেহ আর শর্করা এর পেট্রোল, আর এনজাইমগুলি যেন মোটর-চালক।

যে-কোনো একরকমের খাদ্য থেকে দেহের পুষ্টিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সব উপাদান পাওয়া যায় না। ইক্ষুচিনি শর্করা যোগায়, স্টার্চও তাই। তেল, মাখন, ঘি স্নেহ যোগায়। ছানা প্রোটিন। ইক্ষুচিনি থেকে দেহ গড়ে নেয় গ্লুকোজ আর ফ্রাকটোজ, স্টার্চ থেকেও গ্লুকোজ, দুধের চিনি থেকে গ্লুকোজ আর গ্যালেকটোজ। দেহের শক্তিক্ষয়ের জন্য এগুলির বড় দরকার। রক্তে মিশে থাকে গ্লুকোজ, পেশী ও লিভারে সঞ্চিত থাকে গ্লুকোজেন বা রূপান্তরিত গ্লুকোজ। দেহের শক্তিক্ষয় হ'লে, তা পূরণ করার জন্য গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয়। স্নেহপদার্থ শক্তির উৎস। তেল ঘি থেকে স্নেহ নিয়ে দেহ নিজের উপযুক্ত স্নেহ তৈরি করে নেয়; প্রয়োজনমতো মেদরূপে স্নেহ সঞ্চয় করে রাখে।

খাদ্য থেকে পাওয়া প্রোটিন থেকে দেহ নিজের উপযুক্ত প্রোটিন গড়ে নেয়; তাই দিয়ে নিজের দেহতন্তু পেশী ইত্যাদি গড়ে তোলে। দেহে প্রবেশ করা থেকে রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু হয়, খাদ্যের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। দেহ

শর্করা, প্রোটিন আপনা-আপনি ভেঙে ছোট ছোট অ্যাসিড, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয় না। স্নেহ শর্করা ইত্যাদির সঙ্গে জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়—

ইক্ষুচিনি + জল = গ্লুকোজ + ফ্রাকটোজ
স্টার্চ + জল = কেবল গ্লুকোজ
তেল বা ঘি + জল = অ্যাসিড + গ্লিসারিন
প্রোটিন + জল = বিবিধ অ্যামিনো অ্যাসিড

[বিভিন্ন প্রোটিন থেকে সবসুদ্ধ কুড়িটি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া গেছে।]

এই রাসায়নিক ক্রিয়াগুলিতে বিভিন্ন এন্জাইম সাহায্য করে। অর্থাৎ বিভিন্ন খাদ্য পরিপাক করতে বিভিন্ন এন্জাইম দরকার হয়। যেমন—স্টার্চ থেকে গ্লুকোজ তৈরি হ'তে সাহায্য করে এমাইলেজ এন্জাইম। তেল পরিপাক করার লাইপেজ, প্রোটিন প্রোটিয়েজ জাতীয় এন্জাইম, পেপসিন ও ট্রিপসিন।

খাবার গেল মুখের ভিতর, লালাগ্রন্থি সক্রিয় হ'ল, লালা ঝরল। দাঁত খাবার চিবাল। জিব খাদ্যে লালা মাখাল। লালায় রয়েছে এমাইলেজ এন্জাইম, যা সাহায্য করল খাদ্যের স্টার্চের অংশ ভাঙতে। চর্বিত খাদ্যের মণ্ড পাকস্থলীতে এল। সেখানে জারক রসের সঙ্গে মিশল। জারক রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশে থাকে পেপসিন এন্জাইম, খাদ্যের প্রোটিন অণু ভাঙল। তারপর আংশিক জারিত খাদ্য এসে পৌঁছল বিশ ফুট লম্বা ক্ষুদ্র-অন্ত্রে। যকৃৎ (লিভার) আর অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) থেকে রস নিঃসৃত হয়ে খাদ্যে মিশল। রসে অনেকগুলি এন্জাইম থাকে। প্রোটিন অণু ভেঙে দেবার জন্য ট্রিপসিন, স্নেহ ভাঙবার জন্য লাইপেজ, স্টার্চ ভাঙবার এমাইলেজ—এমনি আরও কত এন্জাইম।

পরিপাক ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া; সম্পূর্ণ হ'তে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগে। মুখবিবর থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে যেমন খাদ্যও অগ্রসর হ'তে থাকে তেমনি তেমনি বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটতে থাকে। যেমন, মুখবিবরে এমাইলেজ এন্জাইম খাদ্যের স্টার্চ অণুকে ভেঙে ডেক্সট্রিন অণু তৈরি করল; পেটে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ডেক্সট্রিন অণু ভেঙে আরও ছোট কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন সংযুক্ত অণু তৈরি করল, ক্ষুদ্র-অন্ত্রে সেই অণুগুলিকে অগ্ন্যাশয়ের এমাইলেজ, মলটোজ চিনিতে পরিণত করল। তারপর মলটোজ এন্জাইম মলটোজ অণুকে বিখণ্ডিত করে দুইটি গ্লুকোজ অণুতে রূপান্তরিত করল। খাদ্যের স্টার্চ পরিপাক হয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন হ'ল। তখন সেই গ্লুকোজ দেহ কাজে লাগাতে পারল। রক্তস্রোতে গ্লুকোজ মিশল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শক্তি এল। বিশেষ চাহিদার জন্য লিভারে গ্লাইকোজেন রূপে গ্লুকোজ থাকল। তেমনি অন্ত্রনিঃসৃত রসে সুক্রেজ এন্জাইম আছে। তা ইক্ষুচিনি থেকে গ্লুকোজ তৈরি করতে সাহায্য করে; আর ল্যাকটেজ এন্জাইম থাকে,—তাতে দুধের চিনি থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয়।

প্রোটিন অণুকে ভাঙতে সাহায্যে করল পেপসিন ও ট্রিপসিন এন্জাইম। প্রোটিন অণুর স্থানে স্থানে খণ্ডন ক'রে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত করল, এ অংশগুলিকে পেপটাইড বলে। পেপটাইডগুলিতে দুইটি, তিনটি বা বড়জোর চারটি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড অণু সংযুক্ত থাকে। পেপটাইড খণ্ডগুলি ধীরে ধীরে অন্ত্রে উপনীত হ'ল। পেপটাইডেজ এন্জাইম এদের বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিযুক্ত করল, অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি থেকে আবার দেহের উপযুক্ত প্রোটিন গড়ে উঠল, দেহতন্তু বা পেশী নির্মিত হ'ল।

অগ্ন্যাশয় এন্জাইম, লাইপেজ, স্নেহ পরিপাক করে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় একটা মস্তবড় অন্তরায় আছে। স্নেহ জলে দ্রবিত হয় না। কথায় বলে, তেলে জলে মিশে না। তাই লাইপেজ এন্জাইমের এই রাসায়নিক কার্যে অসুবিধা হয়। স্নেহ পরিপাক কাজের জন্য লিভার থেকে নিঃসৃত হল পিত্তরস। এতে কয়েকটি যৌগিক পদার্থ থাকে, যেগুলি সাবানের মতো ঘি বা তেলের সঙ্গে সহজে মিশে। তাতে তেল জলের সঙ্গে মিশে গেল। তখন লাইপেজ এন্জাইম তেল পরিপাক করল।

তাই রসায়নবিদ জীবের বাঁচা-বাড়াকে বললেন, বিরাট বিস্ময়কর রাসায়নিক ক্রিয়া। দেহ-অভ্যন্তর হ'ল রসায়নাগার, এন্জাইম হ'ল কর্মী, আর খাদ্য তার রাসায়নিক সম্ভার; দেহের ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়াচক্র ঘুরে চলে; পেশীর পুষ্টি হয়, দেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

* * *

চেনাশোনার বাইরে

অজয়মোহন ভট্টাচার্য

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

চমৎকার একটা দৃশ্য দেখলাম। ছবি আঁকতে জানলে ছবি আঁকতাম। পাহাড়ের ওপর খানিকটা সমতল। দু'ধারে সারি সারি দোতলা কাঠের ঘর। একটা পাশ খড়্। সে-ধারটায় দেয়াল-গাঁথা। সেই দেয়ালের পাশেই আর একটা দেয়াল ভেতরের দিকে। তাতে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। মাথার ওপর ধামা-ভর্তি গম তুলে ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে ফেলছে। ধ-ধ করছে বাতাস। গমগুলো ছুটো দেয়ালের মাঝে পড়ছে। সারা অঙ্গনটায় তুষ ছড়িয়ে পড়ছে, আর সেইসঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাজা গমের মাদক গন্ধ। মেঝের একটু কৌশলী একটি মেয়ে ঝাঁটা দিয়ে ছড়িয়ে-পড়া গমগুলো একজোট করে ডালায় ভরছে। মাথায় করে এনে চাপড়ার জালায় ভরে রাখছে। ওরা কাজ করছে, তিনটি শিশু খেলা করছে। গাল ফেটে পড়ছে রক্তে। মাথায় গোল গোল, তালু-চাপা ফেল্টের টুপি; এককালে সবুজ রং ছিল। গায়ে চকচকে পট্টুর কোট। খেলা করছিল, আমাদের দেখে চমকে দাঁড়ালো। একটি সম্পূর্ণ সুখী তৃপ্ত পরিবারের ছবি। বুড়ো বললে—"আমার বাড়ি। আমার মেয়ে, আমার নাতনী।"

"ওরা মেলায় যায়নি?"

"নাঃ, আমি ওদের পাঠাইনি। দরকার ছিলনা। আমি তো রইলাম।"

আমি সুযোগ পেয়ে বললাম—"ওদেরই না পাঠালে কেন?"

"ওরা নির্ভরযোগ্য ছিলনা। তা ছাড়া তখন রাগ হয়েছিল।"

"কখন?"

"যখন খবর পেলাম তোমরা আসছো।"

"আর এখন?"

"এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। তোমরা সব তো ছেলের মতো আমার। কাল যারা এসেছিল তারা ভারি বদ্লোক, বাবু। একজনকে মেরেছিলাম। উঃ, ভীষণ পাজী লোকটা।"

মনে পড়ে গেল কাজের কথা: "আমি ওদের খোঁজেই এসেছিলাম। আমায় আজ মেলায় পৌঁছে দিতে পারো?"

বুড়ো বললে—"কেন বলো তো? তোমার মেলায় যাবার শখ কেন?"

বিক্রম বুড়োকে বোঝালো। বুড়ো বললো—"মেলার পথ বড় কঠিন। এখুনি রওনা হলেও, রাত ন'টার আগে পৌঁছানো যাবেনা।"

"তবে কি করি?"

বুড়ো বললে—"তোমরা ফিরে যাও। কাল আমি সব খবর তোমায় দেবো।"

"কাল হলে আমার চলবেনা। আজই চাই।"

বুড়ো খানিক ভেবে তার নাতনী সেই মেয়েকে ডাকলো—"পামা!"

নাতনী এসে দাঁড়ালো।

"তোর মাকে গিয়ে বল্, বাবুদের একটু ঘী আর দু'খানা করে রুটি দিক। ওদের কাছে চিনি আছে। কেন লাগবে। অনেক পথ উঠতে হবে ওদের। আর তুই দৌড়ে চলে যা। ওদের গিয়ে ধরে ফেল্। মেলায় গিয়ে দেবীমাঈকে বাবুর চিঠি দিবি লুকিয়ে, কেউ না টের পায়।"

পামা বললে—"তা আমি পারবোনা। ঐ বাবুটা মেলায় আছে—আমি যাবোনা। তা হলে তো আমি আগেই যেতাম। মাকে বলছি রুটি করে দিতে।"

আমি বললাম—"কেন যাবেনা, পামা-বহিন্? ওরা খারাপ। অথচ ওরা আমার ছাত্র। আমিই খারাপ। আমি যদি ওদের না ঠিক করি কি হবে ওদের। ওদের জন্য আমি এতদূর এসেছি। আমি ওদের না নিয়ে ফিরবোনা। তোমার দাদু বলছেন সেখানে যাওয়া কঠিন। যত কঠিনই হোক, আমি যেতামই। কিন্তু তোমার দাদু

আমার বড়দাদার মতো, আমারও দাদুর মতো। তাঁর কথা আমি মানতে বাধ্য। তাই তোমার চিঠি দেবো, তুমি দেবীমাঈকে দিয়ো।"

পান্না খানিকটা তাকিয়ে, কিছু না বলে চলে গেল। কী যেন দেখলাম ওর চোখে।

বুড়ো বললে,—"পান্না বড় খাঁটী মেয়ে। চমৎকার শিকারী। ছুটতে পারে হরিণের চেয়েও জোর। সেই রূপ আর গুণের দৌলতে ওর বিয়ে হয়েছে এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে। ওর ননদ বিধবা হবার পর আর বিয়ে করতে চাইছেনা। অথচ ওর ননদের দেবর তাকে বিয়ে করবেই। ওর স্বামী সেই দেবরের পক্ষে। তাই বোনকে বাধ্য করছে বিয়ে করতে। বোন কান্নাকাটি করছে। ভাই-বোনে খিটিমিটি। জোর করে পান্নার স্বামী তার বোনকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছে। পান্নার অমতে হয়েছে। পান্না তাই স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে। ব'লে এসেছে, যদি ননদ টিকুলিকে ওর স্বামী লেখরাজ ফিরিয়ে না আনে, ও লেখরাজের কাছে ফিরবেনা।"

"বলো কি! লেখরাজ কী বলে?"

বুড়ো তামাকের গুড়গুড়িতে টান মেরে বললে—"লেখরাজ আর পান্নায় বড় ভাব। ওদের একসঙ্গে তো দেখনি। তেমন ভাব আকাশের সঙ্গে চাঁদেরও হয়না, ফেনুর সঙ্গে বাতাসেরও নয়। আমি আমার এই গুড়গুড়িটাকে বোধহয় তেমন ভালবাসিনা। লেখরাজ বোধহয় কিছু ধারে টিকুলির দেওরের কাছে। মরে-বেঁচে সে টাকা শোধ দিয়ে ও টিকুলিকে ফিরিয়ে আনবেই। তখন পান্না যাবে।"

"তবে যে বললে লেখরাজ জমিদারের ছেলে?"

হেসে বুড়ো বললে—"জমিদারের ছেলেই সে। জমিদার তো আর নয়।"

পান্না এসে হাজির। গরম গরম বেঁটে-বেঁটে গোলগাল পোড়া আটার তালের ভেতর ঠেসা করে ঘী ভরা। কোথায় লাগে বিলিতী কেক! সকলকে দু'খানা করে দিয়ে গেল। বললো—"বসুন, আরও আনছি। লেখরাজের কথা বুঝি বলছিলো বুড়ো?"

আমি হাসলাম; বললাম—"হ্যাঁ, লয়লা-মজনুর গল্প জানো?"

বুড়ো বিষম খেলো। "আরে আরে! ও জানবে কোত্থেকে? সে জানতো ওর দাদী।"

ততক্ষণে পান্না চলে গেছে।

"বড় ভালো মেয়েটা, বাবুসাব্। ও চলে যাবে আসছে শীতের পরেই। মনটা কেমন যেন করে। তার আগেই মরে যেতে সাধ যায়। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় ওকে আর লেখরাজকে দেখবার জন্যেই বেঁচে থাকি।"

আরও দুটো করে সেই শকরী কেক্।

"কি রে পান্না? যাবি চিঠি নিয়ে?"

পান্না এবার পূর্ণকণ্ঠে বললো—"না, চিঠি নিয়ে যাবোনা। যাবো ভাইসাব্‌কে নিয়ে। যাবেন ভাইসাব্? চলুন। ছোটো পথে আমি সন্ধ্যার পরেই পৌঁছে দেবো আপনাকে।"

আমি পড়লাম বিপদে। একদিকে আস্তানা-বিহীন ক্যাম্প। আমি একা দুর্গমের যাত্রী। ছেলে-ক'টা পলাতক। এদের ছেড়ে দিয়ে আমার এগিয়ে যাওয়া। অন্যদিকে খাবার লোভ, সঙ্গের লোভ, মেলার লোভ, অভিজ্ঞতার লোভ।

বিক্রম বিপদ বুঝতে পেরে বললো—"প্রিন্সিপল-সাব্, আপনি চলে যান। ক্যাম্প আমরা ঠিক রাখবো। কাল আপনি ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন। ওদের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। আপনার যাওয়া উচিত। আমরা ক্যাম্পে খবর দেবো।"

কেশব বললে—"আর আপনার জীবন যদি বিপন্ন হয়, প্রিন্সিপল-সাব্?"

পান্না শুনছিল। হঠাৎ বললো—"আমি তার জামীন।"

মেয়ে এই কথা বলে! কেশব থেমে গেল। আমার ইচ্ছা ছিল কেশবকে সঙ্গে নিই। কিন্তু ঐ পথে ফিরে-যেতে হবে ওদের। ওরা কেশবকে কিছুতেই ছাড়লোনা।

অগত্যা আমি ওদের খানিকটা এগিয়ে দিলাম।

চা আর রুটি খেয়ে তখন আমরা অন্য মানুষ। ওরা হাত নাড়তে নাড়তে ওপরে চলে গেল। আমি আর পান্না নীচের পথ ধরলাম। আমার গায়ে বুড়োর দেওয়া একটা মোটা পাহাড়ী লুই। পান্না আবার সেটা পাহাড়ী কায়দায় বেঁধে দিলো। কোমরটায় একটা লম্বা কম্ফর্টার দিয়ে বাঁধন দিলো। মাথায় একটা পাহাড়ী টুপি দিলো আর হাতে একটা গাদা-বন্দুক আর লাঠি। একেবারে পাহাড়ীর সাজ হয়ে গেল। আয়না থাকলে দেখে নিতাম। ওরা সঙ্গে থাকলে শট্ রাখতাম একটা।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই পাহাড়টার খাদের তলায় গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম। এর পর একটা ঝরনা থেকে জল

খেলাম। তারপর চড়াই আরম্ভ হোলো। বেলা তখন সাড়ে-চারটে।

যতই চেষ্টা করি, পান্নাকে ধরতে পারিনা। ও এগিয়ে যাচ্ছেই। ওর অল্প বয়স। প্রাণশক্তি প্রচুর। তা ছাড়া এই পাহাড়ের বুকেই মানুষ। আমি পারবো কেন ওর সঙ্গে? কিন্তু সে-কথা নয়। ইচ্ছে করলে তো আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতেও পারতো। আমায় ও এড়িয়ে চলেছে। এর মধ্যেও তার্যা-লিন্‌হার অতর্কিত আক্রমণ ও পশুবৃত্তির প্রতিক্রিয়া রয়েছে। মনটা যেন ভারি হয়ে উঠলো। আমি যেন তার্যা-লিন্‌হা জাতের পশু। ও আমায় তাই পরিহার করে চলেছে সযত্নে।

পারবো কেন এই আত্মগ্লানিকে তুচ্ছ করে পথ চলতে। যেন গভীর বনের তলায় একটা ঝরনা ঝরঝর করে বয়ে যাচ্ছে। বিরাট দেহ নিয়ে একটা পাথরের উৎপাত উদ্‌ হয়ে আছে জায়গাটার ওপর। মাথার ওপর ঝুলে আছে। ওপরপানে তাকালে মনে হয় এখুনি পড়বে ঘাড়ে। খণ্ডগিরিতে হাতীগুম্ফার কাছে এমনি একটা জায়গায় প্রস্তর-বিভাগ লোহার থাম দিয়ে মজবুত করে রেখেছে। গা বেয়ে-বেয়ে জল চুইয়ে পড়ছে, ছাতটা তাই শ্যাওলা-ভরা। যেখানটা দিয়ে হাঁটবো সেটাও শ্যাওলায় ভরতি। একটু অসাবধান হলেই আছাড় খেতে হবে এবং গড়াতে হবে অনেকটা। ভয়ের জায়গা, তবু যেন রোমাঞ্চকর।

আমার দেরি দেখে পান্না পেছল-জায়গাটার ওপারে গিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালো। চক্ষে হাসি নেই, সংকেত নেই, ভর্ৎসনা নেই, এমনকি তক অপেক্ষাও নেই—যা পথযাত্রী সহচরের চক্ষে থাকে। এই অপরিসীম ঘৃণার দাক্ষিণ্যে চলতে মর্মে মর্মে অপমানিত বোধ করছি। বাধ্য হয়েই বোধহয় পান্না বললো—"আপনার কষ্ট হয় আপনি গাঁয়ে ফিরে যান। আপনার বন্ধুদের খবর আমি আজ রাতেই এনে দেবো।"

আমার কষ্ট হওয়া-না-হওয়ার কথাটা সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম 'বন্ধুদের' কথাটার ওপর। আমি বললাম, "বন্ধু? বন্ধু আমার কে? ওরা?" আমার কণ্ঠে কী সুর বেজেছিল জানিনা; কিন্তু ও যখন মুখ ফিরিয়েই আবার চলতে আরম্ভ করে দিল তখন ওর চোখে যেন ঝলক দেখলাম।

আমি যতক্ষণে সেই পিছল পার হয়েছি ততক্ষণে পান্না আমায় প্রায় এক মাইল পেছিয়ে ফেলে গেছে। ওকে ধরার আশা করা বৃথা। চড়া খাড়াই আর যেন ভাঙতে পারিনা। কিন্তু একটা কিশোরী অবলীলাক্রমে যা পারছে তার সামনে মাথা নীচু করে নিতেও যে পৌরুষের বাধে সে পৌরুষাভিমান তখনও জরাগ্রস্ত হয়নি। চলছি ঠোঁটের তলায় প্রাণবায়ুকে চেপে ধরে, বুক হাপর টানছে কল্‌জের আগুনের তাপ ঠিক রাখার জন্যে। আর পারছিনা যেন। তবু চলেছি।

হঠাৎ একটা ঢাল পেলাম, অনেকটা ঢাল; একেবারে ছবিতে দেখা তিমি-মাছের পিঠের মতো। মাঝখানটা ছোট ছোটো চকচকে গাঢ় সবুজ ঘাস। চারপাশটায় লম্বা লম্বা পাইন। হঠাৎ দেখলে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ফুটবল-মাঠের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তখন কিছুই উপভোগ করতে পারছিনা। পাইনের বর্ডারের কাছে পৌঁছেই টাল খেয়ে পড়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ কেন জানিনা জ্ঞান হারালাম। এটুকু মনে আছে, লোভ হওয়া সত্ত্বেও পান্নাকে ডাকিনি।

জ্ঞান হতে দেখি পান্না পাতায় করে জল এনে মুখে চোখে দিচ্ছে। আমায় ডাকছে, জাগাবার চেষ্টা করছে। হালকা একটা শব্দ কানে আসছে। আর আসছে ডাক: "বাবুসাব, ওঠো, জোরে না চললে বেলায় আজ পৌঁছানো যাবেনা। এই বনে রাত কাটাতে হবে। ওঠো তুমি, ওঠো—"

উঠতে তখন আমি পারতাম। কিন্তু লজ্জায় উঠতে পারছিনা। ছি-ছি জ্ঞান হারালাম। এমন কি পরিশ্রম করেছি?

পান্না হাসছে। "দাদু তোমায় যেভাবে বেঁধে দিয়েছে, আমরাই ভির্মি যেতাম; উঃ, পাহাড়ী লুই, লোহামা তাও জড়িয়ে বাঁধা তোমায় এই চামড়ার পোশাকের ওপর। ভেতরটা যেন আগুন হয়ে ছিল। কী ঘাম! সব এই ওড়না দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তোমায় চামড়ার পোশাকের বোতাম দিতে পারিনি।"

আমি ম্লান হাসি হেসে বলেছিলাম—"বড়ো কষ্ট দিলাম তোমায় বোন্! আমি এখন সুস্থ। চলো—"

আমার মাথা ওর কোলে। ও মাথাটা চেপে বললো—"একটু আরও বিশ্রাম করো। তারপর চলবো। আমি নীচে নেমে জল নিয়ে এসে একটু পরিশ্রান্ত হয়েছি।"

ওর কোমল মনটির মাঝে কতখানি ভদ্রতা যে বাসা বেঁধে আছে এই স্বীকৃতিতে বুঝতে পারলাম।

"এতো নরম মন তোমার পান্না, অথচ লোকজনকে কী নিষ্ঠুর তো?"

"জানি, দাদু তোমার সব বলেছে, ভাইসাব্। আমি জানি, দাদু যাকে ভালবাসে তাকেই আমার কথা বলে। তোমার আসার অনেক আগে মাজারামের কাছে দাদু তোমার কথা শুনেছে। আশেপাশের অনেক গাঁয়ে তোমার কথা গেছে। দাদু তোমায় দেখেই আমায় পাঠালো। কিন্তু যত পণ্ডিতই হওনা কেন বাবুজী, লেখরাজকে চেনোনা। সে চাবুক নৈলে ঠিক থাকেনা।"

"চাবুক বুঝি দূরে বসে চুপ করে থাকায়?"

"তোমার ঘোড়া-চড়ার ওস্তাদির খবর শুনে আমরা কতো হেসেছি। মাজারাম ঘোড়া নিয়ে প্রায়ই আসে কিনা! ঐ ওস্তাদি নিয়ে চাবুকের রহস্য তুমি জানবে কি করে? যত দুরন্ত ঘোড়া ততো লম্বা চাবুক, যত লম্বা চাবুক ততো দূর থেকে মারতে হয়।"

"যদি ছিট্‌কে বেরিয়ে যায় ঘোড়া?"

পান্না উঠে দাঁড়ালো। এবার দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগলাম। এখন যেন বেশ হয়।

কথা চালিয়ে যাবার জন্য বললাম—"বললেনা, বোন—ঘোড়া ছিট্‌কে গেলে কী করবে?"

জ্বলজ্বল করে উঠলো সেই স্তিমিত চোখ। যেন যে ছুরির ধারটা দেখছিলাম এতক্ষণ, সেই ছুরিরই ফলা দেখলাম। যে মেঘের ঘনঘটা দেখছিলাম, তাতেই দেখলাম বিদ্যুৎচমক। "লেখরাজ আমার শিকার-করে-পাওয়া বুনো হরিণ। অনেক গভীর জঙ্গলের মধ্যে অনেক হায়রানির পর তীর মেরে জিতে নিয়েছি ওর মুহব্বৎ (প্রেম)—পাহাড়ী রীতিতে একের শিকার অন্যে ছোঁয়না, যদি সে নিজে ভাগ না দেয়। লেখরাজ। জানো ভাইসাব, লেখরাজের ওপর যদি আমার জোর না থাকতো তো নসব আমার কে? ভালবাসা দিয়েই ভালবাসা চেনা যায়, জান্ দিয়ে জান্, মুহব্বৎ দিয়ে মুহব্বৎ।"

হালকা নয়, বেশ জোরে শব্দ আসছে ঢোলকের। আমি বুঝতে পারছি মেলার কাছাকাছি এসেছি। বললাম—"শব্দটা কি মেলা থেকে আসছে, না?"

"—হ্যাঁ।"

"এতো তাড়াতাড়ি এসে গেলাম?"

"ছোটো পথে এনেছি। তা ছাড়া কম ছুটেছো তুমি? অন্য কেউ দেখলে ভাবতো আমায় ধরার জন্য ছুটেছো। আমি পাহাড়ী মেয়ে, একটা বাঙালীবাবু আমায় পাহাড়ের পথে এগিয়ে যাবে, সেই লজ্জায় আমি যতই ছুটি, তুমিও ততই ছোটো। আমি নিজেই প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। ভাগ্যি তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়লে, তাইতো একটু জিরিয়ে বাঁচলাম।"

"বলো কি! অথচ আমার তুমি জিতিয়ে যাচ্ছে সেই লজ্জায় আমি মরিয়া হয়ে তোমার পিছু নিয়েছি। নৈলে কখন তোমার ডেকে থামাতাম।"

দুজনেই হাসছি।

"তা ব'লে খুব কাছে নয় মেলা। পাহাড়ের গা এমন কাছাকাছি শব্দ হলেও, ঘণ্টাখানেকের পথ আরও।"

যখন মেলায় পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। শেষের পথটুকু অন্ধকারেই এসেছিলাম। গ্রামের না 'বালী'। গ্রামের উপান্তে একটা তেমাথায় একটা ঝরনা। সেই ঝরনার ধারে পাথরের মন্দির। গায়ে রাখা বহু-পুরাতন সিঁদুর-লিপ্ত একখানা চৌকো পাথর। তার গা লেখা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'—সেটাই ওরা দেবীর পট ব'লে পূজ করে। ভিতরে একটা পাথরের সিংহ এবং একটা দেয়াল ঢাকা লাল কাপড়। সেই কাপড়ের পিছনে একটি ছোট তাক-গোছের। তার ওপর কেবল কর্পূর জ্বালানো হচ্ছে। তাকটার আশেপাশে সর্বত্র সিঁদুরের ছড়াছড়ি।

এইখানে আমি আমার জীবনের একটা স্মরণীয় রাত্রি যাপন করি। আজও আমি সেই রাত্রির বহু রহস্য ভে করতে পারিনি। কখনও পারবো বলে বোধ হয়না। সেই রহস্যলোকের কথা বলার আগে ছোটো একটা কথা সে নেবো।

পান্নাকে এতক্ষণ আমরা অনেকটা চিনেছি। ভ্রমণ কাহিনীতে হঠাৎ-পাওয়া মেয়ের মতো এই পান্নাও হঠাৎ আমার এই কাহিনীর মধ্যে মিশে গিয়েছিল অকারণে অকারণেই, সম্পূর্ণ অবান্তর ঘটনা-বিন্যাসে লেখরাজ টিকুলির কথা এই কাহিনীর মধ্যে জড়িয়ে পড়লো। তাই পান্নার নাম করে ক'টা কথা এইখানে লিখে পান্নাকে আর লেখরাজকে ভুলে যাবার চেষ্টা করবো আমরা এই কাহিনীর বাকী অংশে। পথে পাওয়া পরিচয়, পথেই ছড়িয়ে দেবো।

মেলায় লেখরাজ এসেছিল। আমায় এসে সহজ প্রণা করে দাঁড়ালো সুদর্শন ছেলেটি। চমৎকার আভিজাত্যপূ সুগঠিত অবয়ব। সে-ই জিজ্ঞাসা করলো—"আপনার স পান্নাকে দেখেছিলাম, সে কৈ?"

আমার কী হোলো। আমি চমকে জিজ্ঞাসা করলা —"তুমি কি লেখরাজ?"

তখন রাত্রি। মন্দিরের মধ্যে স্তিমিত দীপশিখা। ত

বুঝলাম চঞ্চল হয়েছে যুবক। "তা হলে আপনিও জানেন আমার কথা।...কৈ সে?"

"জানিনা তো। এইতো ছিল।"

ওরই গাঁয়ের একটি মেয়ে বললে—"ও চলে গেল গাঁয়ে।"

"এই রাতে?"

"হ্যাঁ। লেখুকে দেখেই ও চলে গেছে। আমায় বলে গেছে ভাইসাব্‌কে নিয়ে যেতে।"

চমকে আমি উঠে দাঁড়ালাম। পরাজিত, বিক্ষত সেই যুবক-মনের সমস্ত গ্লানি ও শোক যেন আমায় গ্রাস করলো। আমি বললাম—"না, তা হতে পারেনা। এখুনিই তো সে গেছে। কতদূরই সে গেছে? আমি যাচ্ছি তাকে ডেকে আনবো।"

লেখরাজ আমার হাত ধরলো। বললো—"আপনি জানেন না পান্নাকে। যদি সে সত্যি ফিরে যাবার মন করে থাকে, তাকে মৃত্যু ছাড়া কেউ ধরতে পারবেনা। আমি একবার দেখতাম তাকে। খাটছি, ভাইসাব্‌! আর ছ'মাস খাটলেই চিকুলিকে আমি বাঁচাতে পারবো। তখন পান্নাও আসবে। ততদিন পান্না আসবেনা। তার প্রতিজ্ঞার বড়ো দাম।"

বুঝলাম, প্রশংসা করলেও, অভিমানে সেই পাহাড়ী যুবকের বুক ভেঙে যাচ্ছিল। আমি সান্ত্বনা দেবো সে-ভাষা আমার ছিলনা। পান্নার কথা এইখানেই শেষ। পান্না যদি জোর না করতো, চিকুলির প্রেমকে কে সম্মান দিত? তাইতো বার বার বলি polygamy বা polyandry সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গ। ব্যক্তিগত জীবনের বন্ধনের সীমা নির্দেশ কে কবে করে দিতে পেরেছে? দশরথেরই তো চার রানী ছিলো। অথচ রাম তো কৈ সীতাকে ছেড়ে অন্য পত্নী ধার্মিক প্রয়োজনে বা গুরুর নির্বন্ধেও গ্রহণ করেননি। মন্দোদরীর বা তারার দ্বিতীয় বিবাহানুষ্ঠানে যিনি যোগদান করেছেন তাঁর চোখে তো সীতা-বিরহ-অশ্রু এতটুকু বেমানান হয়নি! পান্না-চিকুলির কথাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য পাহাড়ী polyandry। মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করবে ততদিন, যতদিন সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে থাকবে মানবের ব্যক্তিগত পরম জীবন, যেখানে সে একা একা থাকে সমাজের বাইরে।

আমার প্রথম সন্ধান সিদ্ধার জন্য। এর খবর যাঁর কাছে পেলাম তিনি ঐ মন্দিরে পূজারিণী 'দেবীমাঈ'। এঁর সঙ্গে ছিলাম কয়েকঘণ্টা। রাত্রির মধ্যযাম পর্যন্ত। তার পরেই আমি বালী থেকে ফিরে আসি বাদরালায়। যখন বাদরালায় পৌঁছাই তখন ভোরের আলো দেখা গেছে পূর্বের শিখরগুলির ওপর। সিদ্ধাদের কথা পরে বলবো। এখন বলবো সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা, যার প্রতি বর্ণ আজ মনে করলেও ভয়ে বিস্ময়ে গা শিউরে ওঠে। সেই তন্ত্রজ্ঞা দেবীমাঈ আমায় বার বার নিষেধ করেছিলেন সে-কথা কাউকে বলতে, বা জানাতে। তাতে নাকি আমার ভয়াবহ ক্ষতি হবে। তখন মনে হয়েছিল কাউকে বলবোনা। কিন্তু আজ বলবই। বামাক্ষেপার তারা-পীঠ আর বালীর সেই সিদ্ধপীঠ এক কিনা আমি জানিনা, কিন্তু ভীষণ সে অভিজ্ঞতা, অতি ভীষণ।

•

প্রথমেই জানলাম ওরা প্রমত্ত অবস্থায় কোথাও বন্দী। এবং ওদের মুক্তির ভার দেবীমাঈর। কে এই দেবীমাঈ? তাঁর সঙ্গে আমায় দেখা করতে যেতে হবে।

মন্দিরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এরই মধ্যে লেখরাজের আগমন, পান্নার অন্তর্ধান ইত্যাদি। বাইরে জোর মেলা চলেছে। হিমাচল-প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ নাচের হুল্লা চলছে—সঙ্গে শিঙা, বাঁশী ও ঢাক বাজছে। বড়ো বড়ো মশাল জেলে দোকানীরা খাবার বেচছে; বেচছে পশম, নুন, তেল, আর কাপড়। বেচছে আয়না, ছুঁচ, পুঁতি আর সেলুলয়েডের চুড়ি-বালা এইসব। বেচছে কানের গহনা, চুলবাঁধার ঝুমকো ফিতে, ক্যাম্বিসের জুতো আর চা। দেশী বিদেশী কত জিনিস, মুর্গী থেকে মোষ—কত পশু, শিকার-করা পশুর ছাল আর গাছ-গাছড়ার ওষুধ। সবই আছে। সাধু-সন্ন্যাসী আছে, যাদুকর আর দাঁতের ডাক্তার, চশমাওলা আর ফটোগ্রাফার—এরাও আছে। এরা একটা বড়ো দল। সব মেলাতেই ঘুরে বেড়ায়। মশালে মশালে জায়গাটা লাল হয়ে আছে। মানুষেরা সব চলাচল করছে—যেন শ্মশানে প্রেতদল চলছে—নাক, কপাল, চিবুক—একটা পাশ লাল, চকচক করছে, অন্যদিকটা অন্ধকার কালো। আর সবটা জড়িয়ে ধোঁয়ায়, কোলাহলে, নানা গন্ধে ও বীভৎসতায় মেলার জমক বেড়েছে একেবারে ষোলোকলায়।

এরই মধ্যে বলে সেই দেবীমাঈর জন্য। কে একজন বললে তিনি এখানে আসবেন ঠিক রাত একটায়। তার আগে দেখা করতে গেলে তাঁর গুহায় যেতে হবে।

বুজরুকির সবটুকুই আছে টের পেয়ে কৌতুক বোধ করলাম। পাথরের চাইতে 'মণিপদ্মে হুঁ' আছে, তার সামনে কর্পূর জ্বালানো আছে, সিঁদুর, কাজল, ত্রিশূল—সব।

মধ্যস্থান আছে, আবার গুহাও আছে। দেবীমাঈ অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মন্দিরের বাহিরে প্রকাণ্ড এক যূপকাষ্ঠ। সকাল হতে বহু বলি হয়ে গেছে। রাতেও হবে। সেজন্য মোষ, ছাগল সবই বাঁধা আছে।

রাত একটা অবধি শুধু অপেক্ষা করবো, সে চলেনা। লেখরাজ, আর পাহাড় বেয়ে-যাওয়া সেই মেয়েটা, নাম ভুলে গেছি, ডিম্পি বলবো, তখনও মন্দিরে বসে। তাদের দিকে চাইলাম। মন্দিরে অনবরত লোক আসছে, কর্পূর আরতি করছে; ভোগ চড়াচ্ছে, চলে যাচ্ছে। পাণ্ডার বদলি যে-লোকটা ব'সে, তাকে যদি মদের ভাটিতে বা আদালতের সামনের রোয়াকে—বটতলায় দেখতাম বিস্মিত হতাম না। ঘর ধোঁয়ায় ভরতি। লেখরাজ বললো—"যেতে চান, নিয়ে যেতে পারি।"

"যেতে আমায় হবেই। আমি মেলা দেখতে আসিনি। আমাদের দলের নিয়ম মেনে চলতে হয়। ক'টি ছেলে নিয়ম ভেঙে চলে এসেছে, তাদের কড়া শাসন করবার জন্য এসেছি। তাদের নিয়ে আমায় আজই ফিরতে হবে, কাল কাজে লাগতে হবে তাদের।"

লেখরাজ আমায় নিয়ে মেলার মধ্য দিয়ে চলতে সুরু করলো। রাতে মেলায় ভীড় কমলেও, মদের ভাটির সামনে ভীড়। মাংস-পোড়া, ঝলসানো আণ্ডেল আর মটর-আলুর চাট বিক্রি চলছে। আর চলছে নাচ, বড়ো বড়ো ঢোলকের সঙ্গে। অনেক ধরনের নাচ। ছেলেমেয়ে মিলে নাচ দেখলাম না। মেয়েরা বেশী উল্লাস করে নাচছে। তাদের নাচের মধ্যে প্রাণের চেয়ে মাংস বেশী, রসের চেয়ে দেহ বেশী, গানের চেয়ে চিৎকার বেশী। এগিয়ে চলেছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শিরশিরে বাতাস দিচ্ছে। লাঠি হাতে, বন্দুক কাঁধে এগিয়ে যাচ্ছি। জনতা আমায় বুঝতে পারছেলো বিদেশী ব'লে।

প্রায় আধঘন্টা পরে একটা নির্জন অন্ধকার গিরিপথ দিয়ে চলতে চলতে একজায়গায় লেখরাজ দাঁড়ালো। ডিম্পি এগিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। দাঁড়িয়ে রইলাম এক দুই তিন ক'রে ক'রে প্রায় পনেরো মিনিট। এবার ডিম্পির হাতে একটা মশাল, সঙ্গে একটা পাহাড়ী পুরুষ। আসতেই বললো—"চলুন, দেবীজী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন; কিন্তু জলদি।"

Rider Haggard-এর লেখা *She* পড়ার পর এমন একচ্ছত্র অপ্রতিহত ক্ষমতা কোথাও দেখিনি, এমন রোমাঞ্চকর পরিবেশে। সেই নারী, সেই আদিম-মানবসুলভ উদ্দামতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বীভৎসতা।

খাড়াই উঠে একটা গুহার ছোটো মুখ। প্রায় গুঁড়ি মেরে খানিকটা গিয়ে বিরাট গহ্বর। গুহাটার গায়ে তিন-চারটে মশাল গাঁথা। গুহাটার ভেতরে অন্ততঃ ১,০০০ বর্গফুট জায়গা।

ভিতরে বাঘের ছালের ওপর যিনি ব'সে তাঁর বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ তো বটেই। মাথায় জটার ভার। গায়ে গলায় রুদ্রাক্ষ। পরণে রক্তকৌপীন। বুকের ওপর রুদ্রাক্ষের আর শঙ্খমালের স্তূপ ছাড়া কিছু নেই। সারা কপাল সিঁদুর আর কজ্জল লিপ্ত। চোখ-দুটো দপ্ দপ্ করছে। বেশ বোঝা যায়, গাঁজার নেশায় টলমল। গাঁজার কড়া গন্ধ আমার নাকে ঢুকেছে অনেকক্ষণ।

আমি প্রণাম করিনি দেখে লেখরাজ বললে—"ইনি দেবীমাঈ, কালীর মন্দিরের সত্যিকারের দেবী।"

দেবীমাঈ বললেন—"উনি বাঙালী, তন্ত্রের দেশের লোক। কালীঘাটে, কামাখ্যায় ওঁর মাথা নেমেছে। এখানে নামবে কেন। তুমি ওদের সঙ্গে সকালে আসোনি কেন?"

কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ আমার সহ্য হচ্ছিলনা।

আমি যতটা সম্ভব খাদে জিজ্ঞাসা করলাম—"ওরা কোনও বেয়াদবি করেনি বোধহয়?"

একটা চিমটে নিয়ে সামনের ধুনিটা নেড়ে দিয়ে বললেন—"কোরতো। আমি করতে দিইনি। করবেই বা কী, ওরা তো ছেলেমানুষ,‘প্রকৃতির কতটুকু জানে। প্রকৃতি দেখলেই উন্মাদ হয়। শঙ্করও হয়েছিলেন। পরমপুরুষ নির্বিকার। প্রকৃতি তার বিকার ঘটায়। তাই প্রকৃতির পূজা। তাই প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। এদের নিয়ে যদি খেলায় না মত্ত থাকবে তো পরমাপ্রকৃতির শ্মশানে ভূতপ্রেত ডাকিনী শাকিনীর নৃত্য চলবে কাদের দিয়ে।’ আমরা সবাই যে কঙ্কাল এ বোধ আমাদের ক'জনের আছে। তোমারই কি আছে?"

আমি নির্বাক হয়ে ওই অসংলগ্ন বাক্যস্রোতকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করছি।

একটু থেমে বললেন—"তোমার তো মাথা অত্যধিক [illegible] নিজেকে-নিয়ে নিজে প্রমত্ত। ছিন্নমস্তার ভৈরব। তোমায় সময়ে পেলে অনেক কাজে লাগাতাম। তুমি এদের বাঁচাতে এসেছো। জানো কি কী থেকে বাঁচাতে এসেছো?"

আমি বেশ বুঝতে-পারছিলাম আমার শরীর কেমন যেন হালকা হয়ে আসছিল। আত্মপ্রত্যয় কেমন যেন খসে পড়ছিল মন থেকে। অজ্ঞান অচৈতন্য নয়; তবু যেন আস্থাহীন, ইচ্ছাহীন, গতিহীন একটা অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থা।

"বাঁচাতে আমি ওদের আসিনি, বাঁচাতে এসেছি নিজেকে, নিজের মানকে, আর সেই মানকে জড়িয়ে একটা মহৎ উদ্দেশ্যের মানকে।"

"মান! অভিমান, অপমান, সম্মান, প্রমাণ, অনুমান, নির্মাণ, পরিমাণ—একটা একটা উপসর্গের খোঁচাতেই মানের মান কোথায় পালায়। তোমার তিনটে উপসর্গ। কী ঠুনকো মান তোমার। সত্যি করে বলোনা, সুন্দরীদের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যেই তোমার ভয় বেশী, তাই নয়?"

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম—"সেটা কি এতই তুচ্ছ?"

"তুচ্ছ? তুচ্ছ কে বলে? ভয়ের শক্তি কি কম? কালভৈরব সৃষ্টি হোলো ভয়কে শক্তিমান করার জন্য। সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সবাই ভয়ে চলে। উপনিষদ পড়োনি? খুব তো 'পড়িয়ে' ব'লে অহঙ্কার তোমার। আমার পঞ্চাশবছর বয়স এই গুহায় ঢুকেই বুঝে ফেলেছো! ভয়কে তুচ্ছ করবো? ভয়কে ভয় করিনা, ভীতুকে ভয় করি। বিষকে ভয় করিনা, সাপকে ভয় করি। বিষ তো পান-ই করি অহরহ।" ব'লেই একটা হাড়ের বাটি থেকে খানিকটা মধু খেলেন। "কিন্তু এইগুলোর ভয়ে আমি মরি।" লক্ষ্য করে দেখলাম রুদ্রাক্ষের ভিতরে এবং জটায় গোটা-তিনেক সাপ।

"তবে ওদের রেখেছেন কেন?"

"তোমায় গুহায় ঢুকতে দিলাম কেন? সাপকেও বশে আনা চাই। তোমার অখণ্ড অহংকে নিয়ে খেলা করতে আমার বিলাস। এই-যে পীঠ দেখছো, এটা এক-যোজন-ব্যাপী। এখানে মহাদেব গড়াগড়ি খান সতীর শোকে। জ্বালামুখী থেকে তারাদেবী পর্যন্ত এই মহাপীঠ একটা মহাশ্মশান। তার নাভিকেন্দ্র ঐ তাকটা, রাঙা কাপড়ে ঢাকা ঐ তাকটা, যাতে কর্পূর জ্বলছে দেখে তোমার মনে হাসি-বিদ্রূপ আর ধরেনা। যার সেবায়েতকে দেখে তুমি সাহিত্যিক রসে ভরপুর। ভাটিখানার মালিক, আর শুঁড়িদের দালাল! ঐ তাকটা আর ওরই মতো ভৈরব এই শ্মশানকে জীবন্ত করে রেখেছে।"

আমি মনের শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে বললাম—"আপনার চেয়েও ভালো 'thought reading'-এর গুণী আমার দেখা আছে কাশীতে।"

"হ্যাঁ, তুমি সিদ্ধপুরুষ বিজেন-সাধুর কথা বলছো। তিনি তোমায় ভালবেসেছিলেন—ছেলেমানুষ ছিলে, ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করতে, সরল মনে নারায়ণ-সভাকে ভালবাসতে। ভালবাসায় সার্থী ছিলে। এখনও তো তোমায় দেখে আমার কত আনন্দ। সংসার তোমায় বাঁধেনি। তোমার নিজের বন্ধনেই তুমি জড়িয়ে পড়েছ বেশী। নৈলে ভালবাসার জিনিস তুমি।"

আমি বিহ্বল হয়ে চিৎকার করে বললাম—"আপনি মায়া জানেন!"

খল্‌খল্ করে হেসে ভৈরবী বললেন—"মায়া! মায়া জানি। মায়াই যদি জানতাম, তোমায় আমি বেঁধে রাখতাম। জানিনা মায়াই। আর সব জানি। জানি তুমি ওদের খুঁজতে আসনি, এসেছো তোমার ক্ষুধার্ত চিত্তকে নিবৃত্ত করতে। ওরা কোথায় জান?"

"শুনেছি আপনি বেঁধে রেখেছেন।"

"হ্যাঁ। দেখবে?"

"শুধু দেখবোনা, ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।"

"বেশ, তাই যেয়ো। দেখি তোমার হাত।"

ডিম্পি আর সেবরাজ গুহার মুখে বসে আছে। দু-চারজন আরও লোক এদিক ওদিক। ধুনির ওপারে ভৈরবী, এপারে আমি। হাতটা আগুনের একপাশ দিয়ে বাড়িয়ে দিলাম আমি।

তৎক্ষণাৎ হাতটা সোজা ধুনির ওপর দিয়েই টেনে ধরলেন এবং অনেকটা সিঁদুর মাখিয়ে দিলেন হাতের তেলোয়।

আশ্চর্য! আগুনের শিখার মধ্য দিয়ে হাত প্রসারিত, একটু আঁচ লাগছেনা হাতে। সিঁদুর লেপা হয়ে গেলে বললেন—"চেয়ে ছাখো তো হাতে।"

মাথা আমার ঘুরে গেল। যেন টাল খেতে গিয়ে সামলে নিলাম। পাইন-বনের ধারে আমি অজ্ঞান হয়েছিলাম আজই বিকেলে।

হাতের মধ্যে দেখি ওরা তিনজন একটা ঘরে বসে তারস্বরে গান গাইছে। আর কেউ নেই। সামনে রুটি আর মাংস। এবার ওরা খাবে। ওদের মুখে অসীম তৃপ্তি আর আনন্দ। কিন্তু ওরা প্রকৃতিস্থ নয়। হয় আনন্দে পাগল, নয়তো মদে পাগল।

আমি কাতর হয়ে ভৈরবীর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন—"ওরা আজ যাবে এ ভরসা নেই। তবে চাও তো যেতে পারবে। কিন্তু কেন? ঐ-যে কিশোরটিকে দেখছো, ও এককালে প্রখ্যাত কবি হবে। ওর মধ্যে প্রকৃতির লীলা অপরূপ হয়ে উঠবে। আর বাকী দুটো তাল-বেতাল। শ্মশানের মড়া প্রাণ পেয়েছে।"

"কিন্তু আপনি যখন সব জানেন…"

আমার কথা শেষ হোলোনা, তিনি বললেন—"হ্যাঁ, সেই ডাক্তারের কথাও জানি। ডাক্তারটাই তো অবিদ্যা। তাকে দেখবে ?"

হাতের দিকে তাকাই। ডাক্তারটাকে আগে দেখিনি। দেখলাম সাদা গায়ে ক্ষত নিয়ে একটা লোক বসে বসে একটা যুবতীর বক্ষ থেকে রক্তপান করছে। যুবতী পরম তৃপ্তিভরে শুয়ে আছে।

আমি এবার চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালাম—"একি বীভৎসতা ! আপনি আমায় কি বিভ্রান্ত করে দেবেন ?"

আবার সেই অট্ট-অট্ট হাসি। "ঐ ক্লেদাক্ত লোভ ও কামকেও প্রকৃতি তার বক্ষ দেয়। ঘৃণ্য কেউ নয় এই মহাপীঠে। মহামায়ার সন্তান সবাই। আমি ডাক্তারকে তাই আলাদা রেখেছি। ওর শরীরে ব্যাধি। তবু ওরও মা আছে। জানবে, প্রতিহনন করা মায়ের ধর্ম নয়। মা যে সকলকে বুকে টানবেন। রোগ, জরা, মৃত্যু—সবসুদ্ধ বুকে টানবেন !"

একি কথা শুনছি ? এই কি হিমালয় ? কোনও অহঙ্কার, কোনও পাপ, কোনও অশুভতা কি এই মহামহিমময় দেবতাত্মার কন্দরে ঠাঁই করবেনা ?

ভৈরবী বললেন—"তোমার তো অবাক হবার কথা নয়, বাবা। তুমি বাঙালী ; তোমাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন ব্রহ্মানন্দ গিরি, রামকৃষ্ণ, ভোলাগিরি, বামাক্ষেপা। বাংলাদেশটাই মহাপীঠ ; বীরাচারের দেশ, বীরভূমি। দেখনি আচণ্ডালকে কোল দিতে শক্তি-উপাসক চৈতন্যকে ? দেখনি কুকুর-শেয়ালের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে বামাকে ? এই তো তন্ত্রের বীজ। শ্মশানকালীর নিত্যকালের নাচন প্রমথদের নিয়ে—কারো হাত নেই, কারো মাথা নেই, কারো পেট নেই—কত কদর্য, বীভৎস, অসভ্যতাকে নিয়ে। তুমি কে ? কেন তোমার এত ভয় ? নিজের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও। কতদিন ধরে রাখবে ?"

আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলাম ভৈরবীকে। তিনি তাঁর ত্রিশূলটা দিয়ে আমার পিঠে একটা দাগ কেটে দিলেন।

হঠাৎ জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান হতে দেখি আমি সেই কর্পূর-প্রজ্বালিত মন্দিরে। দেবরাজ ও ডিম্পি নেই। আছেন ভৈরবী আর একজন লোক—যাকে চিনিনা।

আমি জাগলাম যেন। তখন অসীম স্ফূর্তি, অসীম বল। মন আনন্দে ভরপুর। নিস্তব্ধ নিথর রাত্রি। হাতঘড়িতে রাত ঠিক একটা। বেলার শব্দ ক্ষীণতর।

ভৈরবী বললেন—"কাউকে বোলোনা এসব কথা। বিশ্বাস করবেনা কেউ। আর অবিশ্বাসের পাপ তোমায় স্পর্শ করবে। ক্ষতি হবে তোমার। বই লিখবে তুমি, জানি। কিন্তু পারো তো বাদ দিয়ো।"

"পারবো না"—দৃঢ় কণ্ঠে বললাম।

ভৈরবী বললেন—"সাহস থাকে, লিখো। আমার নিষেধ রইলো।"

আমি সুযোগমতো বললাম—"আমি রামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপার দেশের লোক। ভয়ে মিথ্যাও বলবনা, গোপনও করবোনা। বলবনা একটি কথা।"

"কী কথা ?" ভৈরবীর চক্ষে শিশুর কৌতুক।

"জানছেনই তো আপনি। বলবনা আপনি আমায় যা দেখালেন, যা দিলেন, আর যা ভালবাসলেন।"

"বঁপিয়ার ছেলে ! ওরে, সে যে বলা যায়না। ভালবাসার কথা বলা যায় ? কেউ পেরেছে বলতে ? তুই পেরেছিস ?"

আমি বললাম—"আমি এখুনি বেরুবো।"

"এত রাতে ? পথ তো জানোনা ; যেতে পারবে ?"

আমি পরম নির্ভয়ে বললাম—"তুমি আমার মা। আমায় তুমি পৌঁছে দাও।"

"এই লোক তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এর সঙ্গে কোনো কথা বোলোনা। একবারও নয়।"

আমার চাদর, টুপি, লাঠি, আর বন্দুক ভৈরবীকে দিয়ে বললাম—"এগুলো ডিম্পিকে দিয়ে দেবেন।"

"আর, বন্ধুদের নিয়ে যাবেনা ?"

আমি কাতরকণ্ঠে বললাম—"আমায় আর আঘাত দিয়োনা, মা। আমি একাই ফিরবো।"

প্রণাম করে যখন পথে বেরুলাম তখন আমার ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, অবসাদ নেই। মন ভরে উঠছে গানে। মাথার ওপর মেঘের খেলা, পাইনের দোল, আকাশের স্বচ্ছতা। পাশে পাশে বনের গাম্ভীর্য, পাতার সপ্তা, অরণ্যের পদক্ষেপ। পায়ের নীচে বসুন্ধরার দৃঢ় স্পর্শ, মনের মধ্যে স্বরবর্ণ। গান আর গান। পূর্ণকণ্ঠে ধরলাম—

"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়
জানিনাই তো তুমি এলে আমার ঘর—"

এ আমার কী হোলো! যে দুরন্ত খাড়াই নেমে আসার সময় আমি বার বার পতিত, বিভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত—সেই খাড়াই চড়বার সময়ে এ কী গানের পরে গানে পেলো আমায়। একটা কথা, সেই গোলাপ-ঢাকা উপত্যকা ধারে-কাছেও নেই। নতুন পথ, একেবারে নতুন পথ—অথচ নাকে সেই গন্ধ, সাথে আবার মন্দিরের ভেতরকার গন্ধ। আগে আগে চলেছে জমাট-আঁধার-বহন-করা অজ্ঞাত প্রদর্শক। তার পিছু, তার পিছু। কথা কইবনা, তার সঙ্গে চলবো পথ। বার বার প্রশ্ন আসে কণ্ঠনালীকে বিব্রত ক'রে: "বলো, এ পথ কোথায় গেলে? এ কোন্ পথ? 'কঃ পন্থা?' 'Quo vadis?'" কিন্তু নিষেধ-সতর্ক মন কিছুতেই কণ্ঠকে স্বর দেয়না, প্রশ্নকে ভাষা দেয়না। তাই আমার গান এলো—

> "যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইব কত আর
> আর পারিনা যে রাত জাগতে, হে নাথ, ভাবতে অনিবার"…

বাতাস জোর দোল দিচ্ছে রাতের পারাবারকে। অন্ধকারের গভীরে উঠেছে তরঙ্গায়িত বিস্ময়। আকাশে তারাগুলো দীপান্তরের প্রদীপশিখার মতো মিটিমিটি চাইছে; এই গভীর রাত্রির তরঙ্গে এখুনি বুঝি ভেসে যাবে, নিবে যাবে, ডুবে যাবে। পাইন-বন, পাইন-বন! তোমার দীর্ঘশ্বাসের dirge, তোমার অন্তস্তল হতে উৎসারিত Pindaric Odes, মন্দাক্রান্তায় বিলম্বিত রোদনধ্বনি—আমায় আজ পাগল করে দেবে। আমার স্নায়ু যেন তারযন্ত্রের স্পর্শ-কাতরতা নিয়ে ব্যাকুল;—'মৌনীবীণা মোর তোমার অঙ্গুলি-পরশ'—হঠাৎ তাই মনে পড়ে গেল—

> "হে অভিসারিকা তব অদূর পদধ্বনি লাগি আপনার মনে
> বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে থাকি নির্জন প্রাঙ্গণে
> দীপ চাহে তব শিখা, মৌনীবীণা মোর তোমার অঙ্গুলি-পরশ
> তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার সঙ্গ সুধারস।"

'তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার'। এর রূপটি যে কেমন, বোঝা যায়না এই গভীরে ডুব না মারলে। কৃষ্ণা দ্বিতীয়া আজ। রাত এখন ছটো পেরিয়ে গেছে। আকাশের হিম-কাঁপা-তারার সভাতল উজ্জ্বল করে রেখেছে অদেখা চাঁদের যৌবন। কিন্তু বনশ্রী সে-আলো থেকে বঞ্চিত। উঞ্ছবৃত্তির মুষ্টিভিক্ষার মতো অরণ্যের এখানে ওখানে মুঠো-মুঠো চাঁদের ধুলো ছড়িয়ে আছে হয়তো, কিন্তু দুইয়ে-দেওয়া জ্যোৎস্নার তরঙ্গ—সে কোথায়? অরণ্য যে কত গভীর তা আমরা জানি কেবল দু'পাশে ভেদ করে যাবার ব্যবধান দিয়ে; কিন্তু মাথার ওপরেও যে একটা দুর্ভেদ্য আবরণ অরণ্য রচনা করে তোলে, সে আবরণ যে ধাপে ধাপে শত শত সহস্র সহস্র ফুট উঁচু, উঁচু, আরও উঁচুতে চলে যেতে পারে: সে-অরণ্যের ছাতে ছাতে যে সহস্র সহস্র প্রাণী সংসার পেতে জীবন যাপন করতে পারে—এর অনুভূতি, এর অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় কি করে, যদি না এই কুমারী-অরণ্যের বুকের গভীরের স্পন্দন ধরা যায় নিজের বুকে, যদি না এই অমৃত-বর্ষীরা পার্বতী-কন্যার বৃক্ষ-নিকেতনের সৌধচূড়-সংলগ্ন গবাক্ষগুলি প্রত্যক্ষ করতাম। এ 'আমি' যে কোন্ 'আমি' তা আমার আর মনে ছিলনা। লোকোত্তর একটা অরণ্যসত্তায় একাকার আমি; মহারণ্য, বিশাল স্তব্ধ অরণ্যের একটা অণুর মতো এই আমার 'আমি'টুকু লেগে আছে যেন তাণ্ডব-মথিত এই সৃষ্টি-সংহার-চঞ্চল অরণ্যজঠরের প্রান্তে। উঠছি, উঠছি; চলছি, চলছি; সম্মুখে পুঞ্জীভূত, ঘনীভূত বিষবাষ্পের মতো শরীরী একটা সত্তা ক্রমশঃ এগিয়ে যায়; আমি পিছু-পিছু। মনে কোটি প্রশ্ন: স্নায়ুতে অদ্ভুত অনুভূতি; অথচ উত্তরের ব্যবধান নীরব নৈঃশব্দ্যে স্তব্ধ। অসহ্য হোলো। এই জ্যোতি-পারাবারের তীরে বসে এই তিমির-বাটিকার মধ্যে আত্মসমাধি। আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হোলো। মনে হোলো, চিৎকার করে বলি: হে শরীরধারী নিস্তব্ধতা, আমার এই গভীরের স্বাধীনতায় ছেড়ে দিয়ে চলে যাও তুমি। পেতে দাও ফিরে আমার নিত্যকার সত্তাকে। অনিত্য এই তীব্র অনুভূতির দহন-দাহন থেকে আমায় শান্তি পেতে দাও।—

> "কে যায় অমৃতধাম যাত্রী
> আজি এ গহন তিমির রাত্রি,
> কাঁপে নভ জয়গানে।"

তাই গান ধরলাম ব্যাকুল অসহায়তায়—

> "তোমায় আমায় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে
> অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে"…

মাথার ওপর পাখীরা ডেকে উঠলো; অন্ধকার যেন আলোর তরঙ্গে কেঁপে উঠলো, বাতাসে গন্ধ ভাসতে লাগলো না-জানা পরিমলের। … গান গেয়ে চলেছি নিজের কণ্ঠকে নিজের সঙ্গী করে রাখার বাসনায়—

> "আজি নিদ্রিত নিখিল ভুবনে জাগে কে জাগে
> ঘন সৌরভ মত্ত পবনে জাগে কে জাগে
> কত নীরব বিহগ-কুলায়ে
> মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে—জাগে কে জাগে
> কত অস্ফুট পুষ্প গোপনে—জাগে কে জাগে
> এই অপার অম্বর পাথারে
> স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে …"

গান থেমে গেল। কই তাকে তো আর দেখছিনা! কোথায় গেল সে?

[ক্রমশঃ]

বোলপুর ঃ রবীন্দ্রনাথ

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৯৬ থেকে ১৯০৫ : এই দশবৎসর রবীন্দ্রনাথের জীবনে নানা কর্মব্যস্ততা ও অশান্তির পর্ব। কখনো শিলাইদহ, কখনো কলকাতা, কখনো বা বোলপুর—কোথাও তাঁর স্থিতি নেই। ব্যক্তিগত জীবনে নানা আঘাত ও দুর্বিপাক তাঁকে এ সময় সহ্য করতে হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির জমিদারি পরিদর্শন, কুষ্টিয়ায় পাটের ব্যবসা, ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থক্ষতি ও সে-ক্ষতি সামলাবার জন্য প্রচুরতর আর্থিক ঋণ, শেষপর্যন্ত বিশহাজার টাকার দেনার জালে জড়িয়ে পড়া; স্ত্রী-পুত্রকে শিলাইদহে নিয়ে বসবাস, স্ত্রীর আপত্তি, শেষপর্যন্ত শিলাইদহে বসবাসের সংকল্প ত্যাগ; পিতার, কন্যার, স্ত্রীর ও অন্য আত্মীয়ের মৃত্যু; সাধনা ও বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকা সম্পাদনা, কলকাতায় ব্রাহ্মধর্ম ও হিন্দুধর্মের বাদ বিতণ্ডা; স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, মতভেদ ও সংস্রব ত্যাগ; বোলপুর বোর্ডিং-স্কুলকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম রূপে স্থাপনা (১৯০১), তার পরিচালন-সমস্যা—আর্থিক ও অন্যান্য সংকট; বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে প্রেরণের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্যোগ; কন্যার বিবাহদান, পুত্র ও জামাতার শিক্ষাদান প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র কর্মের দায় ঘাড়ে নিয়ে কবি এ সময়ে চলেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, কিছুতেই কোনো বাইরের আঘাতেই তাঁর অন্তরের ধ্যানভঙ্গ হয়নি।

শতাব্দীর শেষবৎসরে—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে—চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'; এরপরই 'নৈবেদ্য' (১৯০১)। শিলাইদহে অশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যেই তিনি 'নৈবেদ্য'র গভীর ধ্যানের ও কঠিন প্রতিজ্ঞার কাব্যরূপ দান করেন। এগুলিতে প্রকৃতি-পরিবেশ বা প্রকৃতি-বর্ণনা নেই। প্রাচীন ভারতের মহান জীবনের প্রতি, তার উচ্চ সংকল্প ও কর্মসাধনার প্রতি, যোদ্ধাদের প্রতি কবিমনের আকর্ষণ ও অনুরাগ এগুলিতে প্রকাশিত। তাই পরিবেশ-প্রভাব এখানে নেই। তারপর ১৯০৫-এ 'স্বদেশ' কাব্য—স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় লিখিত দেশপ্রেমের কবিতার সংকলন। এরপরই 'খেয়া' (১৯০৬), 'শিশু', 'স্মরণ' ও 'উৎসর্গ'। এই সময়ে 'গল্পগুচ্ছ'র আরো কিছু গল্প ও প্রচুর প্রবন্ধ—রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; 'নৌকাডুবি' উপন্যাস ও 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রকাশিত হয়। মূলতঃ এটি গদ্যের যুগ। নানা কর্মের, সামাজিকতার, চিন্তার ও সাধনা-বঙ্গদর্শন-সম্পাদনার সমস্যা কবিকে এখানে বাহ্যত বহির্জীবনের প্রতি আকর্ষণ করেছে। এরি মাঝে 'খেয়া' কাব্য প্রকাশিত হয়েছে; তা ভগবৎচিন্তায় উদ্দীপ্ত, 'মিস্টিক'-বোধে অনুপ্রাণিত, পরিবেশ-প্রভাব-মুক্ত, বাহির কোলাহল থেকে দূরে অন্তরদেশে প্রতিষ্ঠিত। গল্পগুচ্ছের ধারা যেমন শুকিয়ে এসেছে, প্রকৃতিধ্যানের ও প্রকৃতিতে সহজ আনন্দলাভের পথও তেমনি সংকীর্ণ হয়েছে। 'খেয়া' কাব্যের অধ্যাত্মচিন্তাবাহী কবিতাগুলির মাঝে স্বদেশী গান ও কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, অথচ এ দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই; আসলে অন্তরের গভীর ধ্যান বাইরের কোলাহলে ভঙ্গ হয়নি।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাথমিক সংকটের ও স্বদেশীর উত্তেজনা থিতিয়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ

বীরভূমেই তাঁর ধ্যানের আসন ও কর্মের পীঠ স্থাপনা করলেন। তারপর নোতুন করে প্রকৃতিকে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাই। 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা, শারদোৎসব ও গীতিমাল্য-গীতালি-গীতাঞ্জলিতে রাঢ়-বঙ্গের প্রকৃতির নোতুন রূপটি দেখা গেল। এই পাঁচটি গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯০৮ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। এগুলিতে রাঢ়-বঙ্গের প্রকৃতি-বর্ণনার প্রথম ফসল সঞ্চিত হয়েছে।

'খেয়া' কাব্যের যে প্রকৃতি-বর্ণনা, তা কোনো ভৌগোলিক পরিবেশে ধরা দেয় না। 'মিস্টিক' কাব্যভাবনায় যে প্রকৃতি-আলেখ্য দেখা দিয়েছে, তা দেশকালের সীমার বাইরে। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি কাব্যের যে শারদ-প্রকৃতি, তা খুব স্পষ্ট নয়। 'শারদোৎসব' নাটক সম্পর্কে একই বক্তব্য প্রযোজ্য। বস্তুত, এগুলির উপর নির্ভর করে রাঢ়-বঙ্গের প্রকৃতি দর্শন করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

বীরভূমের রুক্ষ বৈরাগী উদাস প্রকৃতির প্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাই 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালায় (১৯০৯-১৬)। কবির ব্যক্তিগত জীবনে এই পর্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০২ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ : এই সাতবৎসরে মৃত্যু বার বার কবিকে আঘাত করেছে। কবিজায়া, কন্যা রেণুকা, পুত্র শমীন্দ্রনাথ, জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ, বন্ধু শ্রীশচন্দ্র এইসময়ের মধ্যে লোকান্তরিত হন। 'স্মরণ' কাব্য (১৯০৩) ছাড়া আর কোথাও ব্যক্তিগত শোক প্রকাশ পায়নি। স্বদেশ-সাধনা ও অধ্যাত্ম-সাধনায় এই পর্বে কবি খুবই ব্যস্ত। শান্তিনিকেতনে এই ব্যস্ততা ও উত্তেজনা-অন্তে যখন স্থিতি-লাভ করে কবি বসলেন, তখনই 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার রচনা, যদিও নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি বা শান্তি কবির ভাগ্যে ঘটেনি। 'ধর্ম' (১৯০৯) সাত বৎসরের (১৯০০-০৭) ভাষণমালার সংগ্রহ, তা কতকটা নৈর্ব্যক্তিক, ধর্মতত্ত্বের প্রকাশ্য আলোচনা-সংগ্রহ। কিন্তু 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা বীরভূমের উদাস বৈরাগী পটভূমিতে ব্যক্তিগত ধ্যানের প্রকাশস্থল। কবিজীবনের মনন ও সাধনার ফল এই উপদেশমালায় সংগৃহীত হয়েছে। জীবনশিল্পী কবির ধ্যানলব্ধ বাণীমালায় উপযুক্ত পটভূমিরূপে শান্তিনিকেতনের রুক্ষ প্রান্তর, উদার গগন, শান্ত বিভাবরী, প্রসন্ন প্রভাত বর্তমান। মৃত্যুর বর্ণবিরল পটভূমিতে এগুলি গভীর ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। শোকের পবিত্র অগ্নিতে দুঃখ ও মৃত্যুকে কবি নোতুন করে উপলব্ধি করেছেন, বৃহতের জন্য গভীর আন্তরিক আকুলতা প্রভাতী ও সান্ধ্য উপাসনান্তে প্রবন্ধ ভাষণে প্রকাশিত হয়েছে। খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি কাব্যধারায় এবং শারদোৎসব-অচলায়তন-রাজা-ডাকঘর নাট্যধারায় যে অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতা, তারই স্পষ্ট প্রকাশ 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা।

রাঢ়-বঙ্গের উদাস বৈরাগী প্রকৃতি এই অধ্যাত্ম-সাধনার যোগ্য পটভূমি। বীরভূমের রুক্ষ উদার প্রান্তরে দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না, নিশীথের আকাশে কোথাও মলিনতা নেই, স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের সন্ন্যাসব্রত কোথাও মনকে বাঁধা পড়তে দেয় না : এ সবই কবিমনের ব্যাকুলতাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রার্থনান্তিক ভাষণগুলি অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার পরিচয়মূলক কয়েকটি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি :

[১] "কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে—'বাজে বাজে, রম্যবীণা বাজে'। ... কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে 'বাজে বাজে, রম্যবীণা বাজে'। এ কবিকথা নয়, এ বাক্যালংকার নয়—আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে। ... কাল কৃষ্ণ একাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীণকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম ; সে ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হ অপূর্ব নিঃশব্দ সংগীতে গাঁথা পড়ছিল।"

['সোনা', শান্তিনিকেতন ১]

[২] "বিশ্বের একটা মহল তো নয়। তার নানা মহলে নানারকম উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সজনে নির্জনে না ক্ষেত্রে উৎসবের নানা ভিন্ন ভাব, আনন্দের নানা ভিন্ন মূর্তি নীলাকাশতলে প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে এই ছায়াস্নি নিভৃত আশ্রমের যে প্রাত্যহিক উৎসব, আমরা আশ্রমে আশ্রিতগণ কি সেই উৎসবে সূর্যতারা ও তরুশ্রেণীর স কোনোদিন যোগ দিয়েছি ?"

['শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব', তদেব]

[৩] "কালকের উৎসবমেলায় দোকানি-পসারীর এখনও চলে যায়নি। সমস্ত রাত তারা এই মাঠের মধ আগুন জ্বেলে, গল্প করে, গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে কাটি দিয়েছে।

কৃষ্ণ চতুর্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত উপাসনার স্থানে এসে বসলুম তখনও রাত্রি প্রভাত হ বিলম্ব আছে। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, এখানকা

ধূলিবাষ্পশূন্য স্বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেবচক্ষুর অনিমেষ জাগরণের মতো অক্লান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে। ভাঙা মেলার লোকেরা শুকনো পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে।

অন্যদিন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা! বাগানের সমস্ত পাখি জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না, শালবনের মর্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তরে-হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে না।"

['মানুষ', তদেব]

[৪] "জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশব্যাপী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল সেই আনন্দ সেই আনন্দসম্মিলন তো মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে, এখানকার গাছপালার শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির স্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্ছে। অনেক দিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত এখানকার সূর্যোদয়কে সূর্যাস্তকে এবং নিশীথরাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলছে। … এই-যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া আনন্দের নিত্য-লীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের মধ্যদিনের স্তব্ধতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতেই আর ক্লান্তি মানতে চায় না, তখন সেই পর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও-একটি অপরূপ শুভতার অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তরবায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধপ্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর-একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটি পরমপ্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা, এইখানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্যনিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে।"

['আশ্রম', তদেব]

[৫] "এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চার দিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণ গন্ধ ফুল ফল—নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চার দিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং-শিবমদ্বৈতমের দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর—সেই নিভৃতে, সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।"

['ভক্ত', শান্তিনিকেতন ২]

[৬] "দেখতে দেখতে উত্তর-পশ্চিমে ঘনঘোর মেঘ করে এসে সূর্যাস্তের রক্ত আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল বৃষ্টিক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মতো ধুলার ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্তভাবে ছুটে আসছে। আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপরে একটা কোলাহল জেগে উঠল; তারপরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল—পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্মরে আকাশ ভরে গেল—ঘনধারায় বৃষ্টি নেমে এল। তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জন, বাতাসের বেগ, এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে-সব কথা বলার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে-সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারি দিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের লোকজন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। স্নান ও পানের জলের কি রকম ব্যবস্থা করা হবে সেজন্যে আমরা

নানা ভাবনা ভাবছিলুম; মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর রুক্ষতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল—দেখতে দেখতে জলে একেবারে চার দিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে ক্ষণে নয়—চিন্তা করে নয়, চেষ্টা করে নয়—পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে। …

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন, সে যে কী বাধাহীন, কী প্রচুর, কী মধুর, কী গভীর, সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে; আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করেছে।”

[‘বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা’, তদেব]

‘শান্তিনিকেতন’ উপদেশমালায় সর্বত্র বীরভূমের উদাস রুক্ষ গৈরিক প্রকৃতির এই ধরনের বর্ণনা ছড়িয়ে আছে। জীবনের মধ্যবিন্দুতে উপনীত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গভীর অধ্যাত্ম-সাধনলোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি তারই যোগ্য পটভূমি। কবিকল্পনার উপর নোতুন পরিবেষ্টনীর প্রভাব যে কত গভীর, তারই পরিচয় এখানে পাই। পরবর্তী পনেরো বৎসরে রচিত কাব্যধারায় (পূরবী-মহুয়া থেকে আরোগ্য-জন্মদিনে : ১৯২৫-৪১) এবং নাটকে, গানে, প্রবন্ধে, ভ্রমণবিবরণে শান্তিনিকেতন বার বার দেখা দিয়েছে।

গাজিপুর, পদ্মাতীর, বোলপুর : এই তিন প্রকৃতি-চিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই তিন চিত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নেই, কিন্তু প্রেরণার উৎসরূপে এই তিন দৃশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

যৌবনের সূচনায় গাজিপুরকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে গ্রহণ করেছিলেন। ঊনত্রিশ-ত্রিশ বছর বয়সে-দেখা সেই গাজিপুর জীবনের শেষপ্রান্তে ‘পুনশ্চ’ ও ‘আরোগ্য’ কাব্যে ফিরে এসেছে। আর পদ্মাতীর, চর ও মধ্যবঙ্গের জনপদ তো বার বার রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছে। রাঢ়-বঙ্গের সন্ন্যাসী রুক্ষপ্রকৃতির প্রভাব পরবর্তীকালে আরো গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। পুনশ্চ-পরিশেষ-বীথিকা-বিচিত্রিতা-শেষ সপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী-প্রান্তিক-সেঁজুতি কাব্যধারা এই প্রভাবের পরিচায়ক।

কবি এই প্রকৃতি-দৃশ্যগুলিকে সমস্ত জীবন ধরে মনের মধ্যে সযত্নে লালন করেছেন। কিছুই তিনি হারাতে চাননি। মুগ্ধদৃষ্টির প্রদীপে কবি বার বার এদের আরতি করেছেন; বলেছেন :

“মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চলতি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে-গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে;
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি—
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব-কিছু।”

[‘দেখা’, পুনশ্চ]

এর বেশি প্রত্যাশা কবির নেই। ‘পুনশ্চ’-কাব্যের ‘স্মৃতি কবিতাটিতে চল্লিশ বৎসর পরে এবং ‘আরোগ্য’-কাব্যে ‘ঘণ্টা বাজে দূরে’ কবিতাটিতে পঞ্চাশ বৎসর পে গাজিপুরের মধ্যাহ্ন-দৃশ্যটি ফিরে এসেছে। প্রথম-যৌবনে সঙ্গী গাজিপুরের গঙ্গার চর আর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন নোতুন কে কবিকে মুগ্ধ করেছে। আর পদ্মার নির্জন চর, চলমান স্রোতে পটে আলোছায়ার খেলা আর পূর্ণিমা-বিভাবরীতে স্বপ্নল তীরভূমি কবিকে পদ্মাপ্রেমী করে রেখেছে তাঁর সমস্ত জীবন কবি পদ্মাকে দেখেছেন চল্লিশ বৎসর পরে; বলেছেন :

“পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে,
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত— …
একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহু দূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপরে
আমার একলা দিন রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা— …
… তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ
দেখা যায় অদূরে
এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী

[‘কোপাই’, পুনশ্চ]

প্রকৃতি-প্রেমী কবি এই সুন্দরী ধরণীর কাছ থেকে চিরবিদায় নেবার আগে মর্ত্যমমতার শেষ স্বাক্ষর রেখে গেছেন 'আরোগ্য'-কাব্যের 'ঘণ্টা বাজে দূরে' কবিতাটিতে (৩১শে জানুয়ারি ১৯৪১, শান্তিনিকেতন)। কবিজীবনে যে তিনটি প্রকৃতি-দৃশ্য গানের ধুয়ার মতো ফিরে ফিরে এসেছে—সেই গাজিপুর, গঙ্গাতীর ও বোলপুরের প্রকৃতি-আলেখ্য শেষবারের মতো দেখে নিয়েছেন। এ-কারণে এই কবিতাটি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এটির মধ্য দিয়ে সারাজীবনের প্রকৃতি-প্রেম ও তার প্রভাবের সানুরাগ অঙ্গীকার শেষবারের মতো কবি রেখে গেছেন। মৃত্যুর সিংহদ্বারে উপনীত হয়ে সুগভীর মর্ত্যমমতা ও নির্মম নিরাসক্তি, দুয়েরই স্বীকৃতি কবি এখানে জানিয়েছেন; বলেছেন:

"পথে চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।"

কবির মনে পড়ে—

"পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা;
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।"

মনে পড়ে—

"সেই বহুদিন আগে,
দু-প্রহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য তীরে-তীরে,
কচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের;
ছুটিছে ভাটির স্রোতে নৌকা খরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল—"

'সংসারের প্রান্ত-জানালায়' বসে এইসব ছবি কবির চোখে পড়েছে—মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত-জীবন-পরিক্রমান্তে ফিরে এসেছেন শান্তিনিকেতনের উদার প্রান্তে, যেখানে—

"দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।"

['সংসারের প্রান্ত-জানালায়', আরোগ্য]

মর্ত্যমমতার Last Testament রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছেন এই কাব্যের 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' কবিতায়। জীবনের সমস্ত শোক দুঃখ, আঘাত বেদনা, জয় ক্ষতি, কীর্তি সাফল্য,—সব-কিছুর উপরে জয়লাভ করেছে কবির সুগভীর ধরণী-প্রীতি, এতেই কবি জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছেন। এ প্রেমের, এ উপলব্ধির, এ আনন্দের ক্ষয় নেই—এই মন্ত্রবাণী তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। আনন্দ-কম্পিত কণ্ঠে কবির এই ঘোষণাই আমাদের পরম-প্রাপ্তি:

"শেষস্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, 'তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি,
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বোলপুরের প্রকৃতি তাই অমর হয়ে রইল।

আয় চাঁদ

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

িনের পৃথিবীতে অন্ধকার হয়তো অনেকক্ষণ নামেনি। কিন্তু পাহাড়ের এই সংকীর্ণ উপত্যকায় কালির মতো ঘন হয়েছে সায়াহ্নের অন্ধকার। আকাশে আজ চাঁদ ওঠেনি। ঝাউগাছের ফাঁক দিয়ে এখনও একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের ছায়ায় পৃথিবীটা যেন আরও ছোট হয়ে গেছে। রাম সিং বাইরে পেট্রোম্যাক্স আনবে, তার আগে আমাদের লণ্ঠন দিয়ে গেল। তাঁবুর ভিতর ফোল্ডিং-টেবিলে বসে আমরা নক্সা সম্পূর্ণ করব।

নিকটের নদী থেকে জলস্রোতের শব্দ আসছে অল্প অল্প। ঝিঁঝিঁ ডাকছে অবিশ্রাম। বাতাসে ঝাউগাছের চামর দুলছে। খসখস করে শব্দ হচ্ছে চীর গাছের ঝরা পাতায়। অন্ধকারে এই বনময় পৃথিবী যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, সবাই তার জন্য সতর্ক হয়ে আছে।

হঠাৎ আমার আলসেশিয়ান কুকুরটা ডেকে উঠল। একবার দুবার নয়, বার বার ডাকতে লাগল। কোন শত্রুর সন্ধান পেয়েছে, এমনি দুরন্ত আক্রোশে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাকতে লাগল। টর্চটা হাতে করে আমি বাইরে বেরুব ভাবছি, এমন সময় সহসা থেমে গেল। মনে হল, চারিদিক একসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেছে। একেবারে নিঃসাড় প্রাণহীন পৃথিবী। ছুটে আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম।

ছুতো নেতিয়ে পড়েছে। বিস্ফারিত চোখে যেদিকে চেয়ে আছে, আমি সেদিকে কিছু দেখতে পেলুম না। একটা দমকা বাতাস বুঝি ঘূর্ণীর মতো পাক খেয়ে গেছে সামনে দিয়ে। অন্ধকারে তার ছায়া পড়েনি, শুধু শুকনো পাতার উপর মর্মরধ্বনি উঠল বক্ষের নিঃশ্বাসের মতো।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। সারা শরীরে আমার কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আমি কিছুই দেখতে পাইনি। কিন্তু মনে হল, অনেক দেখার চেয়ে বেশি আমি দেখেছি। কল্পনার অতীত কোন অবিশ্বাস্য বস্তু।

পিছন থেকে হঠাৎ আমার কাঁধে কে হাত রাখল। চমকে ফিরে দেখলুম আমার সহকর্মী গোবিন্দকে। অত্যন্ত সহজভাবে প্রশ্ন করল: কিসের গোলমাল?

গোলমালের কথা বলতে আমি সাহস পেলুম না। গোবিন্দর দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের মতো। অলৌকিক কথায় সে বিশ্বাস করবেনা। হেসে খুন হবে। আমাকে পাগল ভাববে। বললুম: কিছু নয়।

গোবিন্দ বোধহয় বিশ্বাস করল না। বলল: ছুতো অমন পাগলা হয়েছিল কেন?

নাম শুনেই ছুতো এগিয়ে এল। লম্বা জিব বার করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। এবারে লেজ নাড়তে লাগল খুব জোরে জোরে। বললুম: দেখছ তো, কিছু হয়নি বলছে।

হঠাৎ আমার রাম সিং-এর দিকে নজর পড়ল। পেট্রোম্যাক্স বাতিটা হাতে নিয়ে অন্ধকারে সে বসে আছে। চেঁচিয়ে বললুম: কী ব্যাপার রাম সিং?

লোকটা চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি একটা দেশলাই-এর কাঠি জেলে বলল: কিছু নয়।

গোবিন্দ একবার কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইল, আর একবার রাম সিং-এর দিকে। তারপর বিরক্তভাবে ভিতরে গিয়ে কাজে বসল।

দুই

আমরা নতুন পৃথিবী গড়ছি।

লাঙল দিয়ে জমি চাষ করে যে ফসল ওঠে, তাতে আমাদের পেট ভরেনা। আমরা কলের লাঙল চালাচ্ছি। জলের জন্য আর আকাশের দিকে চেয়ে থাকিনা। খাল কেটে জল আনছি প্রয়োজনমতো। বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ করছি। নকল বৃষ্টিরও ব্যবস্থা করছি। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, পৃথিবীতে বেড়াবার জায়গা ভালো নেই, চাঁদে কিংবা মঙ্গলগ্রহে অবকাশ যাপন করা দরকার। অনেকে সেখানে জমি কিনছেন পাকাপাকি বসবাসের জন্য। জগৎটাই নতুন হবে।

পৃথিবীর সব দেশ আমরা উঠে-পড়ে লেগে গেছি। কেউ এগিয়ে গেছি, কেউ পিছনে পড়ে আছি। সবার চোখে শুধু একই স্বপ্ন—আমরা নতুন পৃথিবী গড়ব।

কালী নদীর স্রোত ধরে আমরা ধীরে ধীরে উপরে উঠছি। তাঁবু ফেলেছি নদীর তীরেই। এই উপত্যকায় অনেক জায়গাতেই এখন জরীপের কাজ হচ্ছে। কালীকেই প্রথমে বাঁধতে হবে। নেপাল আর পাঞ্জাবের সীমানা দিয়ে নামবার সময় মাঝে মাঝেই ক্ষেপে যায়। নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ঘর্ঘরাকে শাসন করতে হলে আগে কালীকে সামলাতে হবে। তারপর রেলের লাইন বসবে, খোলা হবে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-পথ। ভারতবর্ষ থেকে মানুষ মানস-সরোবরে স্নান করতে যাবে বিদ্যুতের ট্রেন চেপে, ফিরবে কৈলাস দর্শন করে।

জনকয়েক চেনম্যান খালাসী নিয়ে আমরা দুজন সারভেয়ার আছি একসঙ্গে এই পার্বত্য অরণ্যের ভিতর। দিনেদের তাড়াতেই তাড়াতাড়ি কাজ করি। সকাল-সকাল প্রাতরাশ সেরে গোবিন্দ গেছে উত্তর দিকে। আমি এলুম দক্ষিণে।

বন এখানে গভীর নয়। বেশ হালকা হয়ে প্রান্তের সঙ্গে মিশে গেছে। সূর্য এখনও বনের আড়ালে ঢাকা আছে। আর একটু পরে রোদ আসবে। রোদের বন্যায় এই বন আর প্রান্তর ভেসে যাবে। শীতের জড়তা শুধু আমাদের। আঙুল আড়ষ্ট থাকবে আর কিছুক্ষণ। তারপর কাজ করতে করতেই সব ভুলে যাব। সূর্য যখন মাথার উপরে আসবে,

তখন আর মনে হবেনা যে পাহাড়ের উপর বনের ভিতর আমরা কাজ করছি। গায়ের গরম জামা তখন খুলে রাখতে ইচ্ছে হবে। গাছের ডালে টাঙানো টুপিটা আবার মাথায় তুলে নেব।

আরও একটা জিনিস সর্বদা লক্ষ্য করেছি। নতুন কিছু দেখতে গ্রামের লোকের ভারি কৌতূহল। শুধু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নয়, বড় বড় মেয়ে-পুরুষরাও আসবে। এই বনের ধারে এতগুলো লোক কী করছে। ক্ষেত নেই, ফসল নেই, তবু কেন লোকগুলো এমন পরিশ্রম করছে। বনের ভিতর শিকল টানাটানি, আর দূরবীনের ভিতর দিয়ে ঘন ঘন গজ দেখা।

একটা ছোট মেয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল ভয়ে ভয়ে: ওর ভেতরে কী আছে?

তার উপযুক্ত প্রশ্নই বটে। সারাক্ষণই ওতে আমি চোখ দিয়ে আছি। বলছি 'ডাইনে' 'বাঁয়ে'। হিজিবিজি দাগ কাটছি কাগজের গায়ে। দেখবার জিনিস নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে। বললুম: দেখবে?

সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। বয়স তার আট-দশ বছরের বেশি হবেনা। আমার প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে উঠল। খুব জোরে বলল: হাঁ।

মাথাটাও দোলাল সেই সঙ্গে।

বললুম: এসো—

আমার আদেশের অপেক্ষা সে করেনি। সোজা আমার পাশে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তাকে তুলে ধরতে হবে। তুলে না ধরলে দূরবীনে তার চোখ পৌঁছবেনা। খালাসী সোহন এগিয়ে আসছিল। তার আগেই মেয়েটিকে আমি তুলে ধরলুম।

ভারি পুলক তার। নানা ভাবে দেখল, দুচোখ দিয়ে দেখল। কী দেখে ভাল লাগল সেই জানে। খুশিতে উপচে উঠল।

ততক্ষণে সব ছেলেমেয়ে এগিয়ে এসেছে। বড়রাও। সোহন সবাইকে তাড়াতে যাচ্ছিল। বললুম: দেখুক সবাই।

আর যায় কোথা। এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে সবাইকে ঘিরে দাঁড়াল। দূরবীন উল্টে পড়বার যোগাড়। খালাসীরা একে একে সবাইকে তুলে দেখাল। বড়রাও দেখল।

সুন্দর মেয়েটা আবার নতুন প্রশ্ন ছুঁড়েছে। বলল: দেখে কী হয়?

বললুম: যারা দেখতে পায়না, তাদের দেখাই।

মেয়েটি ভাল বুঝতে পারেনি। তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

বললুম: এসব জায়গা তোমরা রোজ দেখছ। দেশে এমন অনেক লোক আছে, যারা একদিনও দেখতে পাবেনা। অথচ তোমাদের ভালর জন্যে অনেক কিছু করতে চায়। তারা কী করে দেখবে বল।

আমাদের ভাল করবে?

মেয়েটি আশ্চর্য হল।

নিশ্চয়ই করবে।

দিদির করবেনা?

হেসে বললুম: তারও করবে।

কিন্তু কী করে করবে?

তারপরেই জিজ্ঞাসা করল: তোমরা বুঝি সব জায়গা দেখবে?

বললুম: হাঁ।

ছোট হাতখানা তুলে দূরে নির্দেশ করল: ঐ দিকটাও?

বললুম: ঐ দিকটাও।

যেখানে যেতে মানা আছে?

বুঝলুম শ্মশানের কথা বলছে। বললুম: সেখানটাও।

মেয়েটির চোখ বড় বড় হল। বলল: ভয় করবেনা?

হেসে বললুম: তুমি তো আমাদের সঙ্গে থাকবে, তাহলে ভয় করবেনা।

মেয়েটির মুখ মলিন হল। ভয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা।

গম্ভীরভাবে বললুম: তুমি যদি যেতে না চাও, তাহলে অন্য কথা। জোর করে তোমাকে নিয়ে যাব না।

এই আশ্বাসটুকু পেয়ে আবার প্রশ্ন করল: কারণবাবার ওখানেও দেখবে?

বললুম: দেখব।

মাথা দুলিয়ে মেয়েটি বলল: তাহলে আর ফিরতে দেবেনা।

ছেলেমেয়েরা সবাই আমাকে ঘিরে ধরেছিল। সোহন সবাইকে তাড়া দিচ্ছে। ঠেলেও দিচ্ছে দুএকজনকে। বড়দের কৌতূহল নিবৃত্তি হয়েছে। বলল: চল্ চল্, বাড়ি চল্।

বলে সবাইকে একরকম ঠেলেই নিয়ে গেল।

আমি জানতুম এই ছেলেমেয়েরা কালও আসবে। এলও তাই। আমরা পৌঁছবার আগেই কয়েকজন সেখানে জড়ো

হয়ে আছে। সেই সুন্দর মেয়েটিও আছে। আমি কাছে আসতেই দল ছেড়ে এগিয়ে এল।

কাছে টেনে নিয়ে বললুম: কাল তোমার নাম বলনি তো?

আমার নাম: মেয়েটি ভারি খুশী হল। বলল: পেমা।

ভারি সুন্দর নাম তো!

গদগদ ভাবে পেমা বলল: জান, কাল সন্ধ্যেবেলায় দিদি এসেছিল। তোমার কথা তাকে বলেছি।

কী বলেছ?

তুমি বলনি, দিদিরও ভাল করবে।

বলেছি তো।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমি এই মেয়েটির আনন্দের আড়ালে কোন বেদনার ইঙ্গিত পেলুম। তার কচি মনের কোথায় যেন অনেকখানি বেদনা জমে আছে। আমার আশ্বাসে প্রচুর আরাম পেয়েছে। তাই একটা গর্বের ভঙ্গিতে তাকাল তার সঙ্গীদের দিকে।

•

ছেলেমেয়েরা একসময় বাড়ি গেল।

আবার ঘুরে এল দুপুরের দিকে। তখন আমি একটা গাছের নিচে বসে ফ্লাস্কের চা ঢেলে খাচ্ছি।

পেমাকে কাছে ডাকলুম।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে কাছে এল। এমন একটা ভঙ্গি করে তার সঙ্গীদের দিকে চাইল যে না হেসে থাকতে পারলুম না। তার গর্বের কারণ আমি বুঝি। এতগুলো ছেলেমেয়ের ভিতর তাকে আমি কাছে ডাকলুম, এতেই গর্ব। জিজ্ঞাসা করলুম: তোমার দিদি এলনা?

পেমার প্রসন্ন মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তার পিছনে আর একটি মেয়ে এগিয়ে এসেছিল। তারই বয়সী। সে বলল: ওর দিদি তো কারণবাবার গুহায় থাকে।

কেন জানিনা, আমি চমকে উঠলুম।

পেমা বলল: কারণবাবা ধরে নিয়ে গেছে। কিছুতেই দিদিকে ছেড়ে দেবনা।

দিদি কি পালিয়ে আসতে পারেনা?

কী করে আসবে বল? কারণবাবা টের পেলে দিদিকে মেরে ফেলবে।

যে মেয়েটা এগিয়ে এসেছিল সে বলল: ওর দিদিই তো আসতে চায়না।

আপত্তি জানিয়ে বললুম: না না. তা কেন হবে? ওর দিদি যে পেমাকে খুব ভালবাসে।

সেই মেয়েটি আমার কথা মেনে নিলনা। বলল: তুমি জাননা। আমার মা বলে যে কারণবাবা কি কাউকে জোর করে ধরে রাখতে পারে?

পারেনা আবার: পেমা প্রতিবাদ করল: যেয়েই দেখনা একবার! দিদি বলছিল, সে না গেলে তাকে কেটে ফেলবে। আর বাড়ির লোক যদি তাকে ধরে রাখে তো সবাইকে কেটে ফেলবে।

ঠোঁট উল্টে অন্য মেয়েটা বলল: কাটলেই হল আর কি!

আমি হেসে বললুম: তোমার তো সাহস খুব চলনা, আজ তোমার সঙ্গে কারণবাবার আশ্রমে যাই।

ভয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে মেয়েটা পিছিয়ে গেল।

মজা দেখবার জন্য আমি একখানা হাত বাড়িয়ে দিলুম। মেয়েটা পিছন ফিরেই লম্বা ছুট দিল।

তার পালিয়ে-যাওয়া দেখে অন্য কোন মেয়ে হাসলনা। হাসতে পারেনা। কারণবাবার নামে সবাই যে পালিয়ে যাবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। মেয়েটা যা বলেছে, এটা তার নিজের কথা নয়, ওর শোনা কথা। তার নিজের কথা ধরা পড়েছে তার পালিয়ে-যাওয়ায়।

পেমা বলল: ওর কথা তুমি বিশ্বাস ক'রোনা। ও কিছু জানেনা।

হেসে বললুম: সে আমি বুঝতে পেরেছি।

পেমা খুব নিশ্চিন্ত হল।

আমার চা খাওয়া শেষ হয়েছিল। ফ্লাস্কটা বন্ধ করে আমি উঠে পড়লুম।

•

কাজ সেরে বাড়ি ফিরবার সময় মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। পেমার কথাই ভাবছিলুম। ভাবছিলুম তার দিদির কথা। বয়স নিশ্চয়ই বেশি হবেনা। কিন্তু পেমার মতো ছোট নয়। কারণবাবার আশ্রমে থাকে। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি আসে, আবার ফিরে যায়। গ্রামে এই নিয়ে যে আলোচনা হয় তা মুখরোচক। তারই খানিকটা আভাস পেয়েছি আর একটি ছোট মেয়ের কথায়। সবটুকু সে বোঝেনা বলেই সব কথা সে বলতে পারেনি। যা বলেছে, তাতেই ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া চলে।

সোহনরা আমার অনেক পিছনে ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে কথা কইছিল। এত সাবধানে বলছিল যে

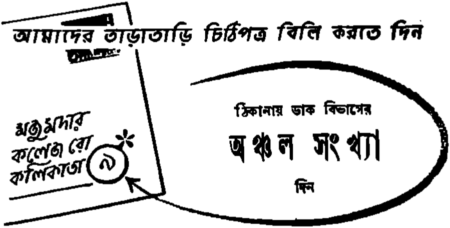

আমাদের তাড়াতাড়ি চিঠিপত্র বিলি করতে দিন

ঠিকানায় ডাক বিভাগের

অঞ্চল সংখ্যা

দিন

ডাকবিলির সুবিধের জন্য বেশীর ভাগ বড়ো বড়ো সহরকেই বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

এই রকম ভাবে অঞ্চল ভাগ করার উদ্দেশ্য হোল পর্য্যন্ত প্রমাণ চিঠিপত্র এক জায়গায় না বেছে, ঠিকানা অনুযায়ী বিভিন্ন বিলি কেন্দ্রে বেছে এবং ডাক পিওনের বিলিপথের দূরত্ব কমিয়ে, তাড়াতাড়ি ডাক বিলি করা।

ঠিকানায় অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে ডাকে যে সব জিনিষপত্র পাঠানো হয়, সেগুলি সরাসরি সেই অঞ্চলের বিলিকারী ডাকঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অঞ্চল সংখ্যা থাকলে চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বেছে ফেলা যায়, এই সংখ্যা না দিলে সেগুলি দেরীতে পৌঁছুবার সম্ভাবনা বাড়ে। ডাক বিভাগীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এমন কোন সহরে যদি আপনি থাকেন, তাহলে আপনার কাছে যাঁরা চিঠি লেখেন তাঁদের অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে চিঠির ঠিকানা লিখতে বলুন।

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 59/348

আমার কানে কিছুই আসছিল না। হঠাৎ একজন হেসে উঠল। কেন হাসল, তারাই জানে। কিন্তু আমি চমকে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলুম।

তিন

ক্যাম্পে ফিরে দেখলুম, গোবিন্দ তখনও ফেরেনি, অথচ তার লোকজনরা সবাই ফিরে এসেছে। জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে সে আজ দেরিতে ফিরবে, আমরা যেন অনর্থক হয়রান হতে না বেরই। বললুম: কোথায় গেছে বলতে পার?

একজন বলল: বোধহয় কারণবাবার আশ্রমের দিকে।

কী করে বুঝলে?

গাঁয়ের ছেলেমেয়ে রোজই তো অনেক আসে। তাদের কাছে কারণবাবার গল্প জিজ্ঞাসা করছিলেন। তাঁর াশ্রম কোথায়, কখন তাঁর দেখা পাওয়া যায়, এইসব কথা।

উত্তরে আমি শুধু 'হুঁ' বললুম। একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল। দিন ধরে যে ভয় পাচ্ছিলুম, সেই ভয়ই তাহলে সত্য ল। গোবিন্দকে তো আমি চিনি। কারণবাবার কাছে কটুখানি প্রশ্রয় পেলেই তার পাগলামি আবার জেগে ঠবে। তারপর আর রক্ষে নেই। আজ একাদশী, কাল মাবস্যা। কারণ পাত্র আধা দুন। নিত্যকর্ম মন্ত্রের াপ, শ্মশান-সাধনা শুরু হলেই প্রাণান্ত ব্যাপার। ারারাত নৃত্য করে দিনের বেলায় দূরবীন তাকবে। ওর লাসীরা বলে, দূরবীনে চোখ রেখে নাকি একদিন ঘুমিয়ে ড়েছিল। ওরা ধরে না ফেললে সেখানে দূরবীনটাই রত।

মুখ হাত ধুয়ে যখন খেতে বসলুম, গোবিন্দ তখনও রেনি। সোহন এসে কাছে দাঁড়াল। এটা তার ভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। খাবার সময় আমাকে সে একা কতে দেয়না। কেউ না থাকলে নিজে এসে দাঁড়ায়। কারণে নানা গল্প করে। বোধহয় একদিন আমি লেছিলুম যে গল্প করে খেলে আমি বেশি খাই। এটা ত্য কথা। মা আমাকে বলতেন। খাবার সময় একদিন তিনি বাড়ি ছিলেন না। ফিরে এসে এঁটো থালা দেখে াটা বলেছিলেন, একা খেলে নাকি আমার পেট রেনা। কথাটা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। বিদেশে এসে র কথা কার না মনে পড়ে।

কিন্তু সোহনকে কাছে দাঁড়াতে দেখলে আমার হাসি পায়। লম্বা-চওড়া বিরাট চেহারা, লোহার মতো মজবুত চকচকে। গোঁফ বড় বড়, কিন্তু মাথায় চুল নেই। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কামিয়ে রাখে। বলে, পাগড়ি বাঁধতে সুবিধে হয়। এই লোকটাও আমার কথা ভাবে, স্নেহ করে, সঙ্গ দিতে আসে। হেসে বললুম: কী খবর, সোহন?

এইটুকু সময়ের মধ্যে সোহন যে অনেক খবর সংগ্রহ করেছে, তা আমি জানি। ও দলের খালাসীদের সঙ্গে জোরে জোরে গল্প করছিল। কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে। কিন্তু সোহন প্রশ্নটার উত্তর দিলনা।

বললুম: কারণবাবা নাকি মস্ত তান্ত্রিক।

আস্তে আস্তে সোহন বলল: কাপালিক।

তান্ত্রিক আর কাপালিকের প্রভেদ আমি বুঝিনা। গোবিন্দ একবার আমাকে ভাল করে বুঝিয়েছিল। কিন্তু আমি ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করিনি। শুধু অভিধানের মানেটা আমার মনে আছে—নরকপালধারী তান্ত্রিক বিশেষ। এসব কথা একবার শুনলেই সাধারণত মনে থাকে। আমারও থাকত। কিন্তু গোবিন্দ সেই সময় এত বাড়াবাড়ি করছিল যে আমি তার কোন কথাই ভাল করে শুনতুম না। আজকে তবু গভীর বিস্ময়ের ভান করে বললুম: আচ্ছা!

কাপালিক সম্বন্ধে সোহনের কী ধারণা জানিনে। কিন্তু উৎসাহ পেয়ে বলল: হাঁ হুজুর।

বেশি কথা বলার অবকাশ আমার নেই। সোহন তা বোঝে। বলল: হুজুর, কাপালিকের চোখ চুম্বক-লোহার মতো। একবার চোখে চোখ পড়ল কি সর্বনাশ। যত বড় মরদ হক না কেন, তাকে টানবেই।

বললুম: বটে!

পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে সে উত্তর দিল: হাঁ হুজুর। আমাদের গ্রামে একবার কাপালিক এসেছিলেন। আমরা তখন ছোট ছোট। শুনেছি, সেদিন ছিল অমাবস্যার সন্ধ্যা। বেছে বেছে একটা জোয়ানকে বাবা পছন্দ করলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, চল্। আর কোন কথা নয় হুজুর, সে লোকটা ভেড়ার মতো পিছন পিছন চলল। গ্রামের লোক তার হাত ধরে কত টানাটানি। কিছুতেই কিছু হলনা।

খেতে খেতে আমি বললুম: তারপর?

তারপর হুজুর কী বলব! একেবারে গ্রামের সীমার বাইরে জঙ্গলের ভেতর ঢুকল কাপালিক-বাবার পিছনে।

বাবা হাত পা ধুয়ে পুজোয় বসলেন, ঐ লোকটা কাছেই বসে রইল। শেষরাতে যখন পুজো শেষ হল, বাবা বললেন, যা ঐ ডোবায় একটা ডুব দিয়ে আয়। তখুনি সে স্নান করে এল। বাবা বললেন, এইখানে বোস্। সে-ও তাঁর কাছে গিয়ে বসল। বাবা ফুলচন্দন দিয়ে তাকে উৎসর্গ করলেন। তারপর এক ঘটি কারণ-জল আর খাঁড়া হাতে নিয়ে বললেন, ঐ হাড়কাঠে গলা দে।

অবিশ্বাসের সুরে আমি বললুম : বল কি সোহন!

ঠিক বলছি হুজুর। একটুও বানিয়ে বলছিনা। লোকটা কোন আপত্তি করলনা। সটান গিয়ে শুয়ে পড়ল।

শিহরে উঠে আমি বললুম : থাক্ থাক্, আর বলতে হবেনা।

বাকিটুকু সোহন আর বললনা। তবে বুঝতে পারলুম যে এই গল্প সে মনে-প্রাণে সত্য বলে স্বীকার করে। আমি বিশ্বাস করিনা বললে সে মানবেনা। বরং আরও যুক্তি দিয়ে তর্ক করে সে আমাকে মানাতে চেষ্টা করবে। তাই আমি গল্প সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করলুম না।

সোহন নিজেই বলল : যা শুনলুম হুজুর, এই কারণ-বাবাও অমনি ক্ষমতা ধরেন। সেখানে ছোট মেয়েটা যা বলল, তা মিথ্যে নয়। পুজোর জন্যে ওর দিদিটাকে ধরে নিয়ে গেছেন। একদিন গ্রামে এসে খুঁজে খুঁজে ঐ মেয়েটাকে পছন্দ করেন। তারপর তার চোখের দিকে এমন করে তাকালেন যে, মেয়েটা আর ঘরে থাকতে পারলনা। বলতে গেলে এখন কারণবাবার সঙ্গেই ঘর করছে।

বললুম : চল্ একদিন যাওয়া যাক তাঁর আশ্রমে।

সোহন নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

বললুম : ভয় করবে নাকি?

সোহন বলল : ভয়ের কথা নয় হুজুর, ভাবনার কথা। ওসব জায়গায় না গেলেই ভালো।

সন্ধেবেলায় ড্রয়িং-টেবলে বসে আমি কাজ করছিলুম। হিসেব-নিকেশ, প্লটিং ও ড্রয়িং। কালকের কাজও বাকি ছিল। শেষ করতে তাই দেরি হচ্ছিল। খালাসীরা তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছে। বাইরে প্লেটফর্মের নিচে তারা সোহনের রামায়ণ-পাঠ শুনতে বসেছে। সবাই বসেনা। বসে তারাই যারা ধর্মভীরু মানুষ। দু-একজন নাকি পাশের গ্রামেও যায় সান্ধ্য-ভ্রমণে। রাতে দেরি করে ফেরে। আমার মন মাঝে মাঝে ওদের দিকেও চলে যায়।

সোহন তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে। রামচরিতমানস। বড় সহজ মিষ্টি ভাষা। হিন্দীকে সব সময় হিন্দী মনে হয়না। যেমন বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী। সোহনের গলাটিও মিষ্টি। পড়ে দরদ দিয়ে। আজ অরণ্যকাণ্ড পড়ছে।—

কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারি।
তিন্‌হ মহঁ অতি দারুণ দুখদ মায়ারূপী নারি।

সোহন এসবের মানে বুঝিয়ে দিচ্ছে।—কাম ক্রোধ লোভ অহঙ্কার এসমস্তই মোহের প্রবল সৈন্য। আর এদের মধ্যে মায়ারূপী নারী দারুণ দুঃখদায়ক।

সুনু মুনি কহ পুরান শ্রুতি সন্তা।
মোহ বিপিন কহুঁ নারি বসন্তা।
জপতপ নেম জলাশ্রয় ঝারী।
হোই গ্রীষম সোখই সব নারী।

শোন মুনি, পুরাণ শ্রুতি ও সাধুরা বলেন যে, মোহ-বে নারী হল বসন্ত। জপতপ নিয়ম যদি জলাশয় হয়, ত নারী হল শোষণকারী গ্রীষ্ম।

তুলসীদাস এইখানেই ক্ষান্ত হলনি। শ্লোকের প শ্লোক রচনা করেছেন নারীর উপর। সমস্ত ঋতুর স নারীর তুলনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বললেন—

দীপ শিখা সম যুবতি জন মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদা সতসঙ্গ।

যুবতী নারী প্রদীপের শিখার মতো, ওরে মন, তা পতঙ্গের মতো উড়ে পড়তে চেয়োনা। সদা সৎসঙ্গ ক ও কাম মদ ত্যাগ করে রামের ভজনা কর।

সোহন পড়ল : ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সক কলি কলুষ বিধ্বংসনে বিমল বৈরাগ্য সম্পাদনো নাম তৃতী সোপানঃ অরণ্যকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

আমাদের অরণ্যকাণ্ডের তো সবে শুরু। কিন্তু ভা ভাল যে, এ অরণ্য মোহের নয়, আর বসন্ত আসেনি নারী পদক্ষেপে। তারপরেই মনে এল সেই ছোট মেয়েটির ক আর তার দিদির কথা। তার দিদিকে আমি দেখিনি কিন্তু মনে হচ্ছে, ছোট বোনের মতো সে আর নাবালি নয়। বসন্ত যদি জেগে থাকে তো সে ঐ কারণবাব আশ্রমে।

একসময় সোহন এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছি তাকে দেখতে পেয়ে বললুম : কী খবর?

সোহন চিন্তিত ভাবে বলল : ব্যাপারটা হুজুর ভ বলে হচ্ছেনা।

কেন ?

রাত তো অনেক হল।

এই রাতের কথায় আমার গোবিন্দর কথা মনে পড়ল। সে এখনও ফেরেনি। এবারে তার খোঁজ করা দরকার। রাত বাড়লে আমাদেরও দুর্ভোগ বাড়বে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম : চল।

সোহন বলল : আপনি কেন কষ্ট করবেন হুজুর ! রাম সিংকে নিয়ে আমরা বেরুই।

আমার মন মানলনা। বললুম : রাম সিং ক্যাম্পের পাহারায় থাক্‌। আমি যাব।

আমাদের একজনকে দরকার বন্দুকের জন্য। বন্দুকটা সঙ্গে থাকলে ওদের সাহস থাকে। আমার কাগজপত্র আমি গুটিয়ে রাখলুম, বন্দুকটা নিলুম বিছানার তলা থেকে। আর এক হাতে টর্চ নিলুম। লাঠি আর লণ্ঠন হাতে সোহনরা দুজন তৈরি ছিল। 'রাম রাম' বলে বেরিয়ে পড়া গেল।

গোবিন্দকে নিয়ে পারা যায়না !

চার

গোবিন্দকে খুঁজতে আমাদের বেশি দূর যেতে হলনা। নদীর ধারেই তার দেখা পাওয়া গেল। টর্চের আলো ফেলে আমি এগোচ্ছিলুম। হঠাৎ মনে হল যেন কিছু দেখতে পেয়েছি। ভাল করে আলো ফেলতেই সন্দেহ দূর হল। নদীর দিকে মুখ করে গোবিন্দ বসে আছে। আলো দেখতে পেয়েছে কিনা জানিনা, পিছনে ভ্রূক্ষেপ করলনা।

আর আমি বাতি জ্বাললুম না। লণ্ঠনের ম্লান আলোতেই বাকি পথটুকু এগিয়ে গেলুম।

আমার পায়ের শব্দে গোবিন্দর ধ্যান ভঙ্গ হলনা। আমি দেখলুম, সে তার দুচোখের পূর্ণ দৃষ্টি দূরে প্রসারিত করে অন্ধকারের রূপ দেখছে। নিশ্চয়ই শুধু ভাবছেনা। তাহলে তার দৃষ্টি এক জায়গাতেই স্তব্ধ হয়ে থাকত। সে চারিদিকে তাকাচ্ছে, উপরে নিচে দক্ষিণে ও বামে। তাকাচ্ছে, নদীর জলে গাছের পাতায় ও আকাশের তারায়। মনে হল, সে তাদের সঙ্গে কথা কইছে। তাদের ভাব বিনিময় হচ্ছে দৃষ্টির ভাষায়। নিঃশব্দ ভাষা।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম গোবিন্দকে। যেন গোবিন্দ সব ভুলে গেছে, দেশ কাল সমাজের কথা, এমনকি নিজের কথাও। ক্যাম্পে ফেরার কথা তার মনে পড়ছেনা। ক্যাম্পের কথাই হয়তো ভুলে গেছে। তাকে জাগিয়ে না দিলে কিছুই তার মনে পড়বেনা। আস্তে আস্তে ডাকলুম : গোবিন্দ।

গোবিন্দ চমকে উঠল। চিন্তার জগতে ফিরে এসেও যেন এলনা। নিজের হাতটা মাটির উপর ঠুকে ইঙ্গিতে আমায় বসতে বলল।

বললুম : আর কত রাত এখানে বসে থাকবে ?

উত্তরে গোবিন্দ বলল : আর একটু বসব।

আমি জানি, এই মুহূর্তে তাকে তোলা যাবেনা। তাই পিছন ফিরে সোহনদের বললুম ফিরে যেতে। ওরা প্রতিবাদ করতে জানেনা। তাই ফিরে গেল। আমি এসে গোবিন্দর পাশে বসলুম।

গোবিন্দ কোন কথা বলল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম : বল কী বলবে !

গোবিন্দ বলল : পৃথিবীটাকে আজ নতুন মনে হচ্ছে।

আমি জানতুম, আজ তার কাছে এইরকমের কথাই শুনতে পাব। বললুম : পৃথিবী তো রোজই নতুন। কোন দিন কি পুরনো হয় !

গোবিন্দ তখুনি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম : পুরনো যা হয়, সে আমাদের ক্যাম্প, আর কাজ। কয়েকদিন যেতে-না-যেতেই বড় একঘেয়ে লাগে।

সেই সঙ্গেই যোগ করলুম : চল, এইবার ঘরে ফিরি।

আমি উঠতে যাচ্ছিলুম। গোবিন্দ আমার হাত চেপে ধরল। বলল : আর একটু ব'সো।

আমি বসতেই জিজ্ঞাসা করল : আমার কেন নতুন মনে হচ্ছে, তা জানতে চাইলেনা ?

বললুম : কবির চোখই অমনি। পুরনো জিনিসকে প্রতিদিন নতুন দেখে, আর পুরনো কথাকে বার বার নতুন করে বলে।

মাথা নেড়ে গোবিন্দ বলল : হলনা। আজ আমি নতুন জিনিসই দেখতে পেয়েছি। একেবারে নতুন। এমন ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার ছিলনা।

ব্যঙ্গভরে প্রশ্ন করলুম : তুমি কি কাফ্রাবাদার বাজারে গিয়েছিলে ?

গোবিন্দ সসঙ্কোচে উত্তর দিল : হুঁ।

তুমি তাহলে সেই মেয়েটার কথা ভাবছ ?

সেই মেয়েটা।

গোবিন্দ চমকে উঠল।

বললুম : পেয়ার দিদি তো।

গোবিন্দ আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললুম: মেয়েকে তুমি চিনবেনা। এই গ্রামেরই মেয়ে। কারণবাবা তার দিদিটাকে ধরে নিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ আপত্তি জানাল, বলল: ধরে কেন নিয়ে যাবেন। সে নিজেই গেছে। তাড়িয়ে দিলেও কি সে কখনও ফিরে যাবে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: বল কি!

গোবিন্দ কোন উত্তর দিলনা।

বললুম: মেয়েটা ওখানে কী করে?

গোবিন্দ ধীরে ধীরে আবৃত্তি করল:

> নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
> ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।
> মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
> বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতা সর্বা এব কুলাঙ্গনা।
> রূপযৌবনসম্পন্না শীল-সৌভাগ্য-শালিনী।
> পূজনীয়া প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।

এই শ্লোকটি গোবিন্দর মুখে আমি আগে অনেকবার শুনেছি। তখন সে তন্ত্রের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করত। সময়াচার তন্ত্র, আচার-ভেদ তন্ত্র, গুপ্তসাধন তন্ত্র, নিরুত্তর তন্ত্র, তারা-রহস্য কুলার্ণব প্রভৃতি নানা প্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। তখন সে এইসব শ্লোক আমাকে বহুস্থলে শুনিয়েছে। মানেও বুঝিয়ে দিয়েছে। তারপর যখন নিজে ক্রিয়াকর্ম শুরু করেছে জাহির হয়ে, তখন আর তার মুখে তামাশা শুনিনি। এসবের তখন সে অন্য ব্যাখ্যা করেছে। দার্শনিক ব্যাখ্যা। সেসব আমার মনে নেই।

গোবিন্দ বলল: নবকন্যার কথা তোমাকে আমি বলেছিলুম। যত্নে নবকন্যার পূজা করলে নিশ্চিত সিদ্ধি হবে।

বাধা দিয়ে আমি বললুম: এ তো কারণবাবার কথা। রূপযৌবনসম্পন্না শীলসৌভাগ্যশালিনী কন্যার পূজো করে তিনি নিজে সিদ্ধিলাভ করবেন। কিন্তু মেয়েটার কী লাভ হবে? ধরুন সংসার ছেড়ে গভীর বনের ভেতর এই যে তার নির্বাসন, সে তার কী মূল্য পাচ্ছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোবিন্দ বলল: সে কথা তুমি গুপ্তসাধন তন্ত্রকারকে জিজ্ঞাসা করো, যিনি ঐ শ্লোক রচনা করেছেন।

মেয়েটিকে কেন জিজ্ঞাসা করলেনা?

আমি জানতে চাইলুম।

গোবিন্দ বলল: তার বয়স এখনও হয়নি।

কোনদিন হবে কি?

জানিনে।

অনেকক্ষণ থেমে থাকবার পর জিজ্ঞাসা করলুম: কারণবাবাকে তোমার কেমন লাগল?

গোবিন্দ বলল: কঠিন প্রশ্ন।

বললুম: তাঁর শক্তির বিচারে নয়, মানুষ হিসেবে?

গোবিন্দ বলল: কঠিন মনে হল। স্নেহের সংবাদ কোনখানে পেলুম না।

সাধনার কথা?

বললেন না। তবে আমার মনে হল তিনি কৌলাচারী। স্থানকাল কর্মাকর্মের কোন বিচার নেই। তাঁর আচরণে আমার এই কথাই মনে হচ্ছিল।

বললুম: তাই, আচার-আচরণের কথা আমি ভুলে গেছি। কয়েকটা নাম শুধু মনে আছে।

গোবিন্দ বলল: আবার আমাকে বলতে হবে?

সে তোমার ইচ্ছা।

গোবিন্দ ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর বলল: বেদাচার বৈষ্ণবাচার শৈবাচার শাক্তাচার ও দক্ষিণাচার। এই পর্যন্তই ভাল। রাতে সাধন ভজন নিষেধ। শুধু মালা জপ চলতে পারে। বৈষ্ণবাচারে তো রাতে মালা বা যন্ত্র পর্যন্ত স্পর্শ করা নিষেধ। স্বাধীনতা শুরু হল বামাচার থেকে। পঞ্চতত্ত্ব ও খ-পুষ্পের ব্যবহার, কুলস্ত্রীর পূজা—সবই বিধেয়। পরমা শক্তির পূজা করতে হবে বামাঙ্গনা হয়ে। তারপর পশ্বাচার, বীরাচার ও সিদ্ধান্তাচার। শোধন করলেই সব দ্রব্য শুদ্ধ হয়। কাজেই কোন আচার মানবার প্রয়োজন নেই। কৌলাচার আছে সকলের শেষে।—

> অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
> নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে।

এটা তারা-রহস্যের কথা। যাঁরা অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভায় বৈষ্ণব, নানাবেশধারী এই যোগীই কৌল। কৌলের কোন আচার নেই। কর্দম ও চন্দনে, কাঞ্চনে ও তৃণে, পুত্র ও শত্রুতে, এমনকি গৃহে ও শ্মশানে কোন প্রভেদ দেখেন না। এঁরা কোথাও শিষ্ট, কোথাও ভ্রষ্ট। ভূত-পিশাচের মতো এঁদের বিহার ও বিচরণ।

জিজ্ঞাসা করলুম: কারণবাবাকে কৌল বলে কেন সন্দেহ করছ?

গোবিন্দ বলল: কারণে তিনি ডুবে আছেন, আর রাতে তাঁর কুলক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থা দেখলুম।

কুলক্রিয়ার গল্পও তার কাছে শুনেছিলুম। আজ মনে নেই। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করলে আর রক্ষা থাকবেনা।

এই নদীর ধারে বোঝাতে শুরু করলে রাত এখানেই ভোর হবে। তাই বললুম: এবারে বাড়ি চল।

বাড়ি আবার কোথায়?— গোবিন্দ প্রশ্ন করল।

বললুম: ঐ হল। আমাদের তাঁবুর কি কোন টান নেই?

গোবিন্দর উঠবার ইচ্ছা ছিলনা। এক রকম জোর করেই তাকে টেনে তুললুম। বলল: একটা কথা বলবে ভাই?

কেন বলবনা।

ওই মেয়েটার সম্বন্ধে কী শুনেছ বল।

হেসে বললুম: সবই তো বলেছি।

ব্যস?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম: ঐটুকুই।

গোবিন্দর এই কৌতূহল আমার ভাল লাগলনা। তার চিন্তার পরিধি বড় বিস্তৃত। কল্পনার কোন সীমা নেই। এই মেয়েটার সম্বন্ধে সে কী ভাবছে, সেই জানে। তবু আমার মনে হল যে সে অনেক কিছু ভাবছে। এই ভাবনা তাকে পীড়িত করবে। হয়তো বা অকল্যাণের পথে টানবে। গোবিন্দর নীতিবোধ আছে, ধর্মবোধও। ধর্ম তাকে কারণবাবার আশ্রয়ে টানবে। কারণবাবা তান্ত্রিক। তাঁর শ্রীচক্র শবসাধন প্রভৃতি কতরকম সাধনা আছে জানিনে। গোবিন্দ একবার তার মধ্যে পড়লে ভবিষ্যৎ বড় আশঙ্কার। তন্ত্রসাধনায় নীতির অভাব আছে বলে আমার বিশ্বাস। বাহির থেকে সকলেরই তাই মনে হবে। এ সবের দার্শনিক তত্ত্ব কেউ বলে দিলে হয়তো আমার বিশ্বাস বদলাবে। কিন্তু এখন তো উদ্বেগ বাড়ল।

গোবিন্দ বলল: কথা বলছনা যে?

সত্য কথাটাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: বড় ভয় হচ্ছে।

গোবিন্দ হেসে উঠল হা-হা করে। চারিদিকের অরণ্যে তার প্রতিধ্বনি উঠল।

ভূতো আমার পিছনে ছিল। ডেকে উঠল: ঘেউ ঘেউ।

পাঁচ

তান্ত্রিকদের গোপন ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল আমার কারও চেয়ে কম নয়। শ্রীচক্রে নাকি একজন করে পুরুষ ও নারী পাশাপাশি চক্রাকারে বসে। মাঝখানে আর একজন নারী। পুরুষের সঙ্গিনী হবেন শক্তি-বা ভৈরবী। আর মাঝখানের নারীকে ভগবতী জ্ঞানে পূজা করতে হবে। গোবিন্দর কাছেই এই সমস্ত শুনেছিলুম। কিন্তু ভাল করে কৌতূহল মিটিয়ে শুনতে পাইনি। আমার মনের ভিতর অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু পাছে গোবিন্দ আরও জড়িয়ে পড়ে, এই ভয়ে আমি আমার সমস্ত কৌতূহল দমন করেছি। আজও করি।

একসময় কিছু বাংলা বই সংগ্রহ করে পড়েছি। সাধু-সন্ন্যাসীর লেখা বই, এবং সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে লেখা বই। তাতে অনেক অলৌকিক ও আজগুবি ক্রিয়াকলাপের গল্প জেনেছি। কিংবা অনেক কীর্তির গল্প। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে সে সব কথা মেনে নিতে মন চায়নি। সাধন-প্রণালীর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা উচিত। তবেই তাতে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। কোন বিশ্বাসের পিছনে যুক্তির অভাব দেখলেই তাকে আমরা কুসংস্কার বলে অবহেলা করি।

গোবিন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। এবারে বলল: কী ভাবছ?

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম: কিছু না।

গোবিন্দ হাসল; বলল: ভয়ের কী আছে?

কে বলল আমি ভয় পেয়েছি?

ভয় না পেলে কি কেউ ভাবনার কথা চেপে যায়?

আমি এ কথার উত্তর দিলুম না। কিন্তু গোবিন্দ বলল: তোমার ভাবনার কথা আমি জানি।

আমি আমার দৃষ্টি দিয়ে প্রশ্ন জানালুম।

গোবিন্দ বলল: তোমার ভাবনা আমার জন্যে। ভাবছ, একবার ঐ চক্রে ভিড়ে গেলে তোমার দুর্ভোগের অন্ত থাকবেনা। সেবারের কথা তো একেবারে ভুলিনি।

একটু থেমে বলল: এ পথে খানিকটা এগিয়েছিলুম। ক্রিয়া-কর্ম শিখতে আমার বাকি ছিলনা। যা বাকি ছিল তা হল এ সবের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। ঐটুকুরই আমার লোভ ছিল, ঐটুকু মিটলে আমি শান্তি পেতুম।

তাকে নিরুৎসাহ করবার জন্য বললুম: সে রকম কিছু থাকলে নিশ্চয়ই জানতে পেতে। নেই বলেই পাওনি।

বাধা দিয়ে গোবিন্দ বলল: ভুল হল। কোন জিনিস ভাল করে না জেনে সমালোচনা করতে নেই। এতদিন চেষ্টা করেও আমি যা জানতে পারিনি, তুমি কিছু না জেনে সে সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রোনা।

তবু আমি নিরস্ত হলুম না। বললুম: ঐ তো মজা। কিছু আছে ভেবেই লোকে হয়রান হচ্ছে।

কিছু জানতে গেলেই হয়রান হতে হয়। সেটা ভাল লক্ষণ।

আমার মনে হল, গোবিন্দর বাসনা এখনও অপূর্ণ আছে। সুযোগ পেলে আবার সে ঐ চক্রে গিয়ে যোগ দেবে। সে কি সেই সুযোগেরই অপেক্ষা করছে। বললুম: জানবার অনেক জিনিস আছে গোবিন্দ, তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে জীবনটা নষ্ট না করলেও চলবে।

একে তুমি জীবন-নষ্ট বল?

নষ্ট নয়! অনাচার বলে যা আমরা ঘৃণা করি, ধর্মের নামে তাই তোমরা প্রশ্রয় দিচ্ছ। এই যে কিছুক্ষণ আগে তুমি নবকন্যার নাম করলে, কী দরকার ঐ নবকন্যা নিয়ে মাতামাতি করবার। এ সবের মানে কি আমরা বুঝিনা? ধর্মের নামে ব্যভিচারের ছাড়পত্র দিচ্ছ।

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম। তাই থামতে পারলুম না: তোমার ঐ শ্লোকটা বল তো, যাতে চক্রে বসে পরের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী ভাববার স্বাধীনতা আছে।

গোবিন্দ চুপ করে ছিল। বললুম: ভয় পাচ্ছ কেন, বল না!

এ সমস্ত কথা গোবিন্দর কাছেই আমি শুনেছিলুম। তখন সে আমাকে তামাশা করে সব কিছু শুনিয়েছিল। কিন্তু আজ চুপ করে রইল। আমি মনে করবার চেষ্টা করলুম:

ন গতিঃ কুলবামান্ত ন গতিস্ত বিবাহিতঃ।

গোবিন্দ বলল: প্রথম লাইনটা বাদ গেল।

বললুম: বল। তোমাকেই তো বলতে বলছি।

নিতান্ত অনিচ্ছায় গোবিন্দ বলল:

অন্যলোকে গতিঃ শূদ্রানলোকে গতির্নহি।
ন গতিঃ কুলবামান্ত ন গতিস্ত বিবাহিতঃ।
বিবাহিত পতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চনে।
বিবাহিতঃ পতিঃ নৈব [illegible] কর্মণি।

নাকটা কুঁচকে বললুম: কী ব্যাপার দেখ! চক্র করে বসলে বিবাহিত স্বামী আর স্বামী থাকবেনা। তখন চক্রগত সমস্ত পুরুষেরই মনোরঞ্জন করা চলবে। মরি মরি!

গোবিন্দ বলল: কিন্তু সেইটাই তো শেষ কথা নয়! বেদোক্ত কর্মে যে বিবাহিত পতিত্যাগ বিহিত নয়, তাও বলা হয়েছে।

বললুম: সমাজে যা ব্যভিচার বলে নিন্দিত, তন্ত্রমতে কেন তা প্রশ্রয় পাবে?

গোবিন্দ এ কথার উত্তর দিতে পারলনা। বললুম: এ কথার সদুত্তর যেদিন তুমি দেবে, সেদিন তোমার কাজ আমি সমর্থন করব।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে গোবিন্দ বলল: চল, তোমাকে কারণবাবার কাছে একদিন নিয়ে যাই। তাঁকেই তুমি এই প্রশ্ন ক'রো।

বললুম: প্রশ্ন আমি তোমাকে করব। এর পেছনে অনেক সময় তুমি নষ্ট করেছ।

গোবিন্দ বলল: বেদবিহিত আচারকেই তন্ত্রমতে পশ্বাচার বলে। কারণ, চার বেদেই নাকি পশুভাব প্রতিষ্ঠিত।

আমি উত্তর দিলুম: এ তোমার তন্ত্রমত। আমার মতে তন্ত্রের আচারই পশ্বাচার। মানুষের আচার হলে খানিকটা ঢাকাঢাকি চক্ষুলজ্জা থাকত। এমন নির্বিকার ভাবে বলতে পারতনা যে, চক্রগত সমস্ত পুরুষ সমস্ত কুলস্ত্রীর পতি, আর বিবাহিত পতি কেউ নয়। তোমাদের লজ্জা করেনা?

গোবিন্দ বলল: তুমি যা বলছ, তা উত্তর আর নিরুত্তর তন্ত্রের কথা। তন্ত্রে তন্ত্রে মতভেদ আছে।

স্মরণ করে বলল: ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলে যে বামাচারীর নরক অনিবার্য।

সে তো পুরাণের কথা, তন্ত্রের নয়।

আমি উত্তর দিলুম।

গোবিন্দ বলল: তন্ত্রসারেও কতকটা সেই কথাই আছে।

একটু চিন্তা করে বলল:

[illegible] ব্রাহ্মণো মদ্যং [illegible]।
বামকামো ব্রাহ্মণোহি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।

জিজ্ঞাসা করলুম: এ কথা কি কোন ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক মানেন?

গোবিন্দ সংক্ষেপে উত্তর দিল: জানিনে।

তর্কে আমার প্রবৃত্তি ছিলনা। বরং মনে হয়েছিল যে এখান থেকে সরে গেলে তন্ত্র নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করব। একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। সেই প্রথম রাত্রির ঘটনা। তাকে বিভ্রম বলে উড়িয়ে দিতে না পেরে মনে-মনে বড় অশান্তি বোধ করছিলুম। সত্য বলে মেনে নিতে পারলেও খানিকটা আরাম পেতুম। আমি জানি, নিজের অজ্ঞাতসারে প্রতি রাত্রে আমি কান পেতেছি। রাতে ঘুম ভেঙে গেলেও নিঃশ্বাস বন্ধ করে কারও পদশব্দের অপেক্ষা

করেছি। কিন্তু তার পরে ভূতো আর ডাকেনি। আমরাও ঘুমিয়েছি নিশ্চিন্তে। মনে হচ্ছে যে দুশ্চিন্তা করবার মতো কোন ঘটনা বোধহয় এখানে ঘটেনি।

আমাকে শোবার উদ্যোগ করতে দেখে গোবিন্দ হাসল।

বললুম : হাসলে যে।

এমনি।

এমনিতে তো পাগলে হাসে।

গোবিন্দ হেসে বলল : আমরাও তো পাগল।

হুঁ।— বলে আমি শুয়ে পড়লুম।

গোবিন্দ ঘুমলো।

বাইরে রাত আজ বড় অন্ধকার। আমার জীবনও অন্ধকারের পথ ধরেছে।

৩

সোনার দিদির নাম হল সোমা। বয়স উনিশ-কুড়ি। যে বয়সে শ্বশুর-ঘর করতে যেত সগৌরবে, সেই বয়সেই কারণবাবার আশ্রমে এসে ঢুকেছে। এ মুলুকে কারণবাবা তখন নতুন এসেছেন। একেবারে একা। সোমা এসে তাঁর সংসার দেখার ভার নিল। সোমার বাবা-মা কান্নাকাটি করেছিল। থানা-পুলিশও বোধহয় বাকি রাখেনি। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। কারণবাবা সিদ্ধপুরুষ, মারণ উচাটন জানেন। শুধুমাত্র ইচ্ছার অপেক্ষা। তাঁর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, চোখে চোখ তুলে চাইবে, এমন মানুষ এ তল্লাটে নেই।

সোমাকে আমি দূর থেকে দেখলুম। সে এসেছিল নদীতে জল নিতে। ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে। কাজকর্ম শেষ করে আমি একা গিয়েছিলুম কারণবাবার আশ্রমের দিকে। আশ্রমে যাইনি, নদীর তীরে বসে গোবিন্দর অপেক্ষায় ছিলুম। সে আজকাল রোজ আশ্রমে যায়। জিজ্ঞাসা করলে বলে অন্তর্যাগ শেখে। আমি শুধাই, কার কাছে। সোমার কাছে নিশ্চয়ই। প্রশ্ন শুনে সে হাসে, উত্তর দেয়না। উত্তরটা আমি কল্পনা করে নিই।

কাল জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কেমন দেখতে? দেখবি? —গোবিন্দ জানতে চেয়েছিল। বলেছিলুম, আশ্রমে যাবার সাহস নেই। তবে পথের ধারেই বসে থাকিস।—গোবিন্দ পরামর্শ দিয়েছিল। আজ আশ্রমে যাবার পথে গোবিন্দ আমাকে এইখানে বসিয়ে রেখে গেছে। এইখানে বসেই সোমাকে দেখতে পেলুম।

কলসীতে জল ভরেই মেয়েটা গেলনা। উঠে দাঁড়িয়ে এদিকে সেদিকে চাইতে লাগল। আমার মনে হল, সে আমাকেই খুঁজছে। বিচিত্র নয়। গোবিন্দ হয়তো বলেই পাঠিয়েছে। আমি এগিয়ে গেলুম।

সোমা তার শাড়ির আঁচল আরও একটু সামলে নিল।

কাছে গিয়ে আমি গোবিন্দর কথা জিজ্ঞাসা করলুম। সোমা লজ্জা পেল, বলল: আশ্রমে আছে।

আমি তার লজ্জা দেখে হাসলুম।

মেয়েটা পালিয়ে গেল।

আমি তাকে আটকাতে পারতুম। কথা বলে, কিংবা পথ আগলে। হাত বাড়ালেও তার নাগাল পেতুম। এই নির্জন নদীর তীরে, সভ্যজগতের রীতিনীতির বাইরে, মানুষের চোখের আড়ালে আমি আদিম মানুষের মতো লুব্ধ চোখে সোমাকে দেখতে পারতুম। আমি জানি, সোমা তাতে আপত্তি করতনা। তার দৃষ্টিতে আমি যৌবনের তৃষ্ণা দেখেছি। গোবিন্দর নামে এইজন্যই সে লজ্জা পেয়েছে। এত সহজে ধরা দিতে তার একটুও দ্বিধা হয়নি। তবু আমি শুধু হাসলুম। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাসলুম। যেতে তাকে বারণ করলুম না, হাত বাড়িয়ে পথ রোধ করলুম না।

সোমা চলে গেল। তরতর করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল। পিছনে একবার তাকিয়েও গেল। কটাক্ষ হেনে গেল কিনা, দেখতে পেলুমনা।

রাতে তাঁবুতে ফিরে গোবিন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করল: কেমন দেখলে?

বললুম: সঙ্গে নিয়ে পালাতে ইচ্ছে করে।

গোবিন্দ বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হল। বলল: ঠিক বলছ?

হেসে বললুম: ভয় নেই, আমি তাকে নিয়ে পালাবনা। বলছি, কেউ যদি পালায়, তাহলে তার ছন্দের প্রশংসা করব।

গোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলল: হুঁ।

জিজ্ঞাসা করলুম: ঠিক বলিনি?

এ কথার উত্তর না দিয়ে গোবিন্দ বলল: কারণবাবা বলছিলেন জান?

জানিনা।

আমার জানবার কথাও নয়। ও দিকেই আমি মাড়াইনি। গোবিন্দও সে কথা জানে। প্রশ্নটা উত্তরের আশায় না হলেও আমি উত্তর দিলুম।

গোবিন্দ বলল: বাবা বলছিলেন সোমার মতো আর-একটি মেয়ের কথা। তখন তিনি হিমালয়ের অন্তর থাকতেন। সেইখানে তাঁর আশ্রম রক্ষা করত। কেউ দেখা করতে এলে মুগ্ধ হত সেই মেয়ের রূপ দেখে। ধর্মকর্মের কথা ভুলে যেত। মানুষ ভুল করে। কৌলের লতাসাধনে যে নারীর ব্যবহার, সে আর সাধারণ নারী নয়। তার মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব হয়েছে, ভগবতীর আধার সে। তাকে কামনা করলে পুরুষের মঙ্গল নেই। ভগবতী তাকে শাস্তি দেবেন।

লতাসাধন আমি জানিনা। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলুম না। গোবিন্দ বলল: বাবা বললেন, অনেকগুলো মানুষ নাকি বেঘোরে মারা পড়েছে। মৃত্যুর সে সব বীভৎস গল্প। শুনলে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বললুম: মেয়েটার কিছু হলনা?

গোবিন্দ বলল: শেষবারে মেয়েটাও নাকি পাপ করেছিল। তার ফল পেয়েছে হাতে হাতে।

কী ফল শোনবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করলুম। কিন্তু গোবিন্দ সে গল্প জানেনা। বলল: সোমা সে গল্প জানে।

বললুম: বুঝেছি।

কী বুঝেছ?— গোবিন্দ জানতে চাইল।

বললুম: তুমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে তোমার মঙ্গল হবেনা। আর মেয়েটা যদি তোমাকে প্রশ্রয় দেবার চেষ্টা করে, তাহলে তাকেও শাস্তি পেতে হবে। এই তো?

গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে রইল।

বললুম: বাঘের খাঁচায় হাত বাড়িয়েছ, সামলাতে পারবে তো?

তুমি কি তামাশা করছ আমার সঙ্গে?

গোবিন্দ জানতে চাইল।

আমি জানতুম, প্রশ্নটা তামাশার মতো শোনাবে। সোমা এই গ্রামেরই একটি পাহাড়ী মেয়ে। চঞ্চল কোমল সুন্দর মেয়ে। তাকে নিয়ে রসিকতা করা যায়, ঘর করার কথা ভাবা যায়না। তরল পরিহাস আর গম্ভীর জীবনযাত্রা কখনও এক নয়। কারণবাবার আশ্রমে সোমা বাঁধা পড়েছে। বুড়োর লতাসাধনে সে ভগবতী সেজে বসেছে। বসুক। গোবিন্দ তাকে নিয়ে কী করবে? মোহ?

আমার মনে হয়না, গোবিন্দ এত ঠুনকো। তবে কি সে মেয়েটাকে রক্ষা করতে চায়? এই অসুস্থ জীবন থেকে বার করে তাকে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবে? কেন, কী জন্য সে এই অসাধ্য সাধনে জীবনকে বিপন্ন করতে যাবে। আবার সেই শ্লোকের কথা এসে পড়ে। তোমাকে দেখে গোবিন্দর ভাল লেগেছে। তোমার ভাল করতে সে চায়। একটা অসহায় মেয়ের মঙ্গল করতে গিয়ে জীবন যদি বিপন্ন হয় হোক। এ তো মানুষেরই কাজ!

আপত্তি জানিয়ে বললুম: তামাসা কেন করব।

তাই তো মনে হচ্ছে।

বললুম: দুঃসাহসের কাজ করছ, তাই সাবধান করে দেবার দরকার মনে করছি।

বাইরে মোহনের গলা শোনা যাচ্ছিল। সে রামায়ণ পাঠ করছে। মনে মনে আমি তার পরিবেশটি কল্পনা করতে পারি। জনকয়েক তারই মতো প্রৌঢ় মানুষ তাকে ঘিরে বসেছে। মাঝখানে মোহন। উপরে পেট্রোম্যাক্স বাতি দিনের মতো আলো করে রেখেছে চারিদিক। আর মোহন তার জনকয়েক অশিক্ষিত সঙ্গীকে কিছু আলো বিতরণের চেষ্টা করছে।

সেদিনের সন্ধ্যার কথা আমার মনে পড়ল। মোহন অরণ্য কাণ্ড পড়ছিল। তুলসীদাস নারীর সম্বন্ধে কতগুলি মূল্যবান শ্লোক রচনা করেছেন। মোহনরা একাধিকবার এই শ্লোক পড়ে। বাড়ির জন্য মন কেমন করলেই বোধহয় পড়ে। কিছু শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা। আমি জানি, যে কদিন তারা বাড়িতে থাকবে, এসব শ্লোকের একটাও তাদের মনে থাকবেনা।

শুনে শুনে আমারও কয়েকটা শ্লোক মুখস্থ হয়ে গেছে। তারই একটা হঠাৎ মনে পড়ল:

> দীপ শিখা সম যুবতি তন মন জনি হোসি পতঙ্গ।
> ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদা সতসঙ্গ।

যুবতী নারী প্রদীপের শিখার মতো। ওরে মন, তাতে পতঙ্গের মতো উড়ে পড়তে চেয়োনা। তারই সঙ্গে উপদেশ আছে বাঁধা। সদা সৎসঙ্গ কর, আর কাম মদ ত্যাগ করে রামের ভজনা কর।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল: কোন্‌টা দুঃসাহসের কাজ?

কোন্‌টা। হাসতে হাসতে আমি বললুম:

দীপ শিখা সম যুবতি তন মন জনি হোসি পতঙ্গ।

এ শ্লোক গোবিন্দও অনেকবার শুনেছে। তাকে মানে বলে দেবার দরকার নেই। গম্ভীরভাবে সে বলল: হুঁ।

কথাটা মানলে তো?

না।

না কেন?

যুবতী জন এখানে নিজেই যে জ্বলছে। পতঙ্গের মতো পুড়ে মরবে।

তুমি কি তাকে রক্ষা করতে পারবে?

মাথা নেড়ে গোবিন্দ বলল: না।

না কেন?

বাঁচা-মরা তার নিজের হাতে। নেশায় মেয়েটা বুঁ হয়ে আছে, তাকে জীবনের পথটা বাৎলে দেব।

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম: কারবাবা?

গোবিন্দও উত্তর দিতে দেরি করলনা। বলল: তাঁ সঙ্গে আমার জন্ম দেখা—ভজহি রাম তজি কাম মদ কর সদা সতসঙ্গ।

তুমি তাকে সৎসঙ্গ বল!— আমি জানতে চাইলুম।

গোবিন্দ বলল: কোন্‌টা সৎ আর কোন্‌টা অস দূর থেকে তা জানা যায়না। অন্তরঙ্গ ভাবে মি তা জানতে হয়।

গোবিন্দ থামলনা, বলল: আর একদিন তুমি এ কথা জানতে চেয়েছিলে। তন্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য কথা। এখনও কি জানবার ইচ্ছে আছে?

কেন থাকবেনা?

গোবিন্দ বলল: বেশ, একদিন তোমাকে বাব কাছে নিয়ে যাব। তাঁর মুখেই সব শুনতে পাবে।

তাঁর মুখে কেন। আমি [illegible] উত্তর দিলু তুমিই আমাকে ব'লো।

তা!— গোবিন্দ হাসল।

এ কথায় আমার পৌরুষে আঘাত লাগে। বললু তাই হবে।

নয়

ইতিমধ্যে গোবিন্দ তার জপ-তপ পূজাপার্বণের সাম বার করে ফেলেছে। খেতে বসবার আগে পূজায় বস কিন্তু পূজার কোন উপকরণ নেই। কোশাকুশি ফুলচ ভোগ নৈবেদ্য কিছুই নেই। ঠাকুর পর্যন্ত না। গো একদিন বলেছিল যে এসবের কোনই দরকার নেই। দ দুরকম পূজারই বিহিত আছে—বহির্যাগ ও অন্তর্যা পূজার উপকরণ থাকলে বহির্যাগে ব'সো, না থাক মানসোপচার।—

পৃথিব্যাত্মক গন্ধঃ আকাশাত্মক পুষ্পকং ।
ধূপোবায়্বাত্মকঃ প্রোক্তো দীপো বহ্ন্যাত্মকঃ পরঃ ।
রসাত্মকং নৈবেদ্যং পূজাপঞ্চোপচারিকা ।

গুরুগীতার নির্দেশ এই যে পৃথিবীকে গন্ধ, আকাশকে পুষ্প, বায়ুকে ধূপ, তেজকে দীপ ও জলকে রসাত্মক নৈবেদ্য কল্পনা করে এই পঞ্চোপচারে অন্তর্যাগ করা চলে। ষট্‌চক্রভেদ এই অন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর ছয় গ্রন্থিতে পদ্মাকারে ছয়টি চক্র সংলগ্ন আছে। শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে এইসব গ্রন্থি ও পদ্মের কয়টি করে দল, তার হিসেব আমার মনে নেই। কুলার্ণব তন্ত্রে নাকি পূজা-পদ্ধতি লেখা আছে। দেহের বায়ুযোগে অগ্নির শক্তি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বোধিত করতে হবে। তারপর বীজমন্ত্রের উচ্চারণে তাঁকে জাগ্রত করে ছয় পদ্মকে এবং পদ্মস্থিত তিন শিবকে ভেদ করবে। তারপর সেই কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল কমলে স্থাপন করে পরম শিবের সঙ্গে সংযোগ করাবে। এর থেকে উৎপন্ন হবে পরমামৃত। সাধক তাই আকণ্ঠ পান করে কুণ্ডলিনীকে মূলাধার পদ্মে আনবে কুলপথ দিয়ে।

গোবিন্দ বোধহয় এই কাজে বসেছে। কতক্ষণ ধ্যানস্থ থাকবে জানিনে। উপায়ান্তর না দেখে আমি দাবা পেতে বসলুম। দাবাখেলা যোগাভ্যাসের মতো। এ যোগ দেহের নয়, ইন্দ্রিয়েরও নয়। এ যোগ বুদ্ধির। দেহ মন ইন্দ্রিয় বুদ্ধি সব কিছুকে ঐ সাদা-কালো ছকখানির উপর সংহত করে পরম ধৈর্যের চরম যোগাভ্যাস করতে হবে। মাছ ধরাকে তপস্যা বলা চলে। ঊর্ধ্ববাহু শিবনেত্র নয়, দুহাতে ছিপ ধরে ফাৎনার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে নির্বিকার প্রহর গণনা। কলিযুগের এই তো তপস্যা।

বাইরে অন্ধকার রাত্রি স্তব্ধ হয়ে আছে। লোকজনের আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা। কেমন থমথম করছে চারিদিক। ঘরের ভিতরে তাকিয়েও কোন জীবনের সাড়া পেলুমনা।

মুদিত নেত্রে গোবিন্দ ধ্যানস্থ হয়ে আছে।

হঠাৎ আমার বিদ্রোহ করতে ইচ্ছা হল। এই কি জীবন! আত্মীয়-পরিজন-হীন নির্বান্ধব দেশে এ আমরা কেমন করে দিন কাটাচ্ছি। জীবনের আস্বাদ কি আমরা ভুলে গেলুম, না তার অর্থ আমরা হারিয়ে ফেলেছি! মানুষ কি শুধু কাজ নিয়ে বাঁচতে পারে। শুধু কর্তব্যবোধ আর চাপানো দায়িত্ব নিয়ে! মনে কি তার স্বাধীনতার স্বপ্ন নেই!

ভাবতে ভাবতেই পাগলামি এল। ডাকলুম: গোবিন্দ! গোবিন্দ সাড়া দিলনা।

দৃঢ়স্বরে আবার ডাকলুম: গোবিন্দ!

গোবিন্দ বোধহয় এমন কঠিন কণ্ঠস্বর আমার অনেকদিন শোনেনি। তার ধ্যানভঙ্গ হল। কথা না বলে আমার দিকে তাকাল প্রশ্নের দৃষ্টিতে। বললুম: অনেক হয়েছে, এবারে উঠে পড়।

গোবিন্দ এই আদেশের অর্থ বুঝতে পারলনা। কোনও প্রশ্নও করলনা। শুধু মাথাটা একটু উপরের দিকে তুলে বুঝিয়ে দিল, কেন।

বললুম: ঢের হয়েছে। এমন করে আর তোমাকে ঠকতে দেবনা।

মনে মনে গোবিন্দ বোধহয় হাসল। তাই চোখ বন্ধ করে আবার মন দিল নিজের কাজে।

দাবার ছক আমি গুটিয়ে রাখলুম। নিজেদের জীবনের ছকে একটা ঘোড়েও আমার এগোয়নি। যুদ্ধে যেদিন নেমেছিলুম, সেদিন আমার পুরো সেনাদল সঙ্গে ছিল। আজও আছে, কিন্তু ঠিক একই জায়গায়। হুকুমের অভাবে এক পাও তারা এগোয়নি। গোবিন্দর কিছু এগিয়েছে। কিন্তু সে নিতান্ত বেয়াড়া ভাবে। পরিকল্পনার অভাবে দুর্গকে সে অরক্ষিত করে ফেলেছে। এখন শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষা। তাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। বললুম: উঠবেনা?

এবারে আর গোবিন্দর ভাবান্তর দেখলুম না।

দাঁতে দাঁত চেপে বললুম: তোমার কুলকুণ্ডলিনীর নিকুচি করেছি!

জানিনা কেন নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। উঠে গিয়ে গোবিন্দর হাত টেনে ধরলুম, বললুম: ওঠ শিগ্‌গির।

গোবিন্দর উপায় ছিলনা। দাঁড়াতেই হল। বলল: হঠাৎ এমন পাগল হলে কেন?

আমি পাগলামি করছি, না তুমি পাগল হয়ে গেছ।

গোবিন্দ হেসে বলল: আমি তো চিরকালের পাগল।

দেখি। মনে হল, আমি একটা ধাক্কা খেয়ে গেলুম। যে সত্যি পাগল, সে তো নিজেকে পাগল ভাবেনা। গোবিন্দ যখন পাগল বলে স্বীকার করছে, তখন তাকে আর পাগল ভাবা উচিত হবেনা। বরং আমিই নিজেকে যদি ভাবি। তবে কি—

আর আমি ভাবতে পারলুম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: তবে কি আমি পাগল?

গোবিন্দ এবারেও হাসল।

আমি রেগে গেলুম, বললুম: হাসলে চলবেনা, গোবিন্দ। জীবন নিয়ে তুমি ছেলেখেলা করছ। সে কথা মনে করিয়ে দেবার সময় এসেছে।

খেলা বল, ছেলেখেলা ব'লোনা।

গোবিন্দ উত্তর দিল তরল স্বরে।

খেলা করবারই বা তোমার কী অধিকার আছে?

নেই অধিকার?

কিছুতেই নেই।

গোবিন্দ হেসে বলল: জীবন আমার, আর অধিকার থাকবে কি তোমার সোমার দিদির?

তর্কের খাতিরে বললুম: নিশ্চয়ই আছে। তোমার জীবনের ওপর তো তোমার একার অধিকার থাকবেনা যে ইচ্ছে করলেই তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। শুধু তোমার পিতামাতা আত্মীয়-পরিজনের নয়—আমার আছে, সোমারও আছে।

সোমারও আছে?— গোবিন্দ হাসল হা-হা করে।

বললুম: আমাদের এ অধিকার অস্বীকার করলে তোমাকে অমানুষ বলব।

গোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলল: সোমার ওপরেও তাহলে আমাদের অধিকার আছে বল।

আমি বলে ফেলছিলুম, আছে বৈকি। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিলুম। এমন প্রগল্‌ভ হবার বয়স আমি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। আমি চুপ করে গেলুম।

গোবিন্দ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপরে কাছে এসে চেয়ার টেনে বসল। আমি জানতুম সে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছে, কিন্তু আমি কিছু শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলুম না।

গোবিন্দই কথা কইল, বলল: সোমাকে ভাল লেগেছে বুঝি?

আমি চমকে উঠলুম। বললুম: মানে?

এমনিই জিজ্ঞেস করছি।

হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন মনে এল?

মন তো বিচিত্র জিনিস।

বিচিত্র বলে কি এমনি বেয়াড়া? এমন অসঙ্গত কথা কেন মনে আসবে?

অসঙ্গত কেন বলছ? এই তো সবচেয়ে সঙ্গত কথা। এই পাহাড়ের কোলে নদীটি কেমন মানিয়েছে বল! সোমাও কি আমাদের মনে তেমনি মানায়নি?

এ কথার উত্তর আমি দিতে পারলুম না। ঘর ছেড়ে তাঁবুর বাহিরে বেরিয়ে এলুম।

গোবিন্দও আমার পিছনে এল।

ঝিঁঝিঁ ডাকছে। তার একটানা আওয়াজ। নিস্তব্ধ পৃথিবীর সে একটা অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি। ঐ ধ্বনি পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ করেনা। মনে হল, আমাদের মনেও অমনি একটি ধ্বনি বাজছে। জীবনের ধ্বনি। ওটা থামলেই মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কেন থামল, কেন তাল কাটল! কোন অমঙ্গল কি আছে ভবিষ্যতের ভিতর লুকিয়ে! আশঙ্কায় বুক কাঁপে।

আট

প্রথম সন্ধ্যার কথা আমরা ভুলে গেছি। অলৌকিক ভেবে সেদিন রাতে বিচলিত হয়েছিলুম, মতিভ্রম বলে এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। এমন অনেক ঘটনা জগতে হামেশা ঘটে, বিজ্ঞানে যার নাগাল মেলেনা। বিজ্ঞান তো সৃষ্টির আদি নয়, সৃষ্টিকে বিজ্ঞান অনুসরণ করে। ভাষার যেমন ব্যাকরণ।

গোবিন্দ রেডিও খুলে গান শুনছিল, আর গান গাইছিল গুনগুন করে। মন-মেজাজ যে প্রসন্ন আছে, তাতে সন্দেহ জাগেনা। আমি জানি, সে আমার অপেক্ষাতেই আছে। নক্সাপত্র গোটালেই সে দাবা বিছিয়ে বসবে। খানিকক্ষণ আগে তাড়াও দিয়েছে। আমি তাকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছি।

হঠাৎ সে উঠে এল। নক্সার একটা কোণা ধরে টেনে সরিয়ে দিল। বলল: আর অপেক্ষা করতে পারবনা।

হেসে বললুম: চাকরিটা যাবে।

কেন?

দাবার ছক বেছাবার সময় গোবিন্দ প্রশ্ন করল।

নক্সাখানা মুড়ে আমি টিনের খোলের ভিতর পুরে ফেললুম। বললুম: উত্তরে কারণবারা আর দক্ষিণে শ্মশান। চোখ বন্ধ করলেই সোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

গোবিন্দ অট্টহাস্য করে উঠল।

দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে গোবিন্দ বলল: তুমিই প্রথম চাল দাও।

শেষ চালটা কি তুমি দেবে?

আমি জানতে চাইলুম।

হাসতে হাসতেই গোবিন্দ উত্তর দিল: ইচ্ছে তো সেইরকম।

আমিও হেসে বললুম : আমাকে মাৎ করে কি তোমার আশ মিটবে ?

গোবিন্দ এ কথার উত্তর দিলনা। বলল : সেদিন তুমি একটা কথা লুকিয়েছিলে।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : তোমার কাছে গোপন করেছি !

গোবিন্দ বলল : হ্যাঁ। যেদিন আমরা প্রথম এসেছিলুম, সেদিন সন্ধ্যেবেলায়, তোমরা কিছু দেখতে পেয়েছিলে। আমাকে বলেছিলে, কিছু না।

আমি তখন গভীর ভাবে ভাবছিলুম, কোন্ বোড়েটা চালব। বললুম : একটা ছায়া।

ছায়া ! : গোবিন্দ আশ্চর্য হল, বলল : দাঁড়িয়ে শুধু দেখলে ! ছুটলেনা তার পেছনে ?

বললুম : তুমি কবি মানুষ। ছায়ার পেছনে ছুটতে হয়, তুমি ছুটো।

তার কবিত্বের পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি। প্রয়োজনমতো সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে পারে যথেষ্ট ভাবে। নিজেও মানে বোঝে, আমাকেও বোঝায়। কিন্তু গোবিন্দ আজ প্রতিবাদ করলনা, বলল : তুমি শুধু ছায়াই দেখলে। তার আগে বা পেছনে আর কিছু দেখলেনা ?

তা দেখলে আর ভাবনা কী ছিল !

আমি উত্তর দিলুম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোবিন্দ বলল : তা বটে।

বাইরে হাওয়া বইছে জোরে জোরে। সেই হাওয়া তাঁবুর গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। পত্ পত্ করে শব্দ হচ্ছে, আর কেঁপে উঠছে ভিতরের আলো। মনে হল, গোবিন্দ তার কান পেতে আছে। কান পেতে বাইরের শব্দ শুনছে। আমিও সেই শব্দ শোনবার চেষ্টা করলুম।

একসময় গোবিন্দ বলল : কিছু শুনতে পাচ্ছ কি ?

বললুম : বাতাসের শব্দ।

আর কিছু ?

মাথা নেড়ে বললুম : না।

না !— গোবিন্দ বড় আশ্চর্য হল।

আমিও হলুম। তারপর আরও ভাল করে কান পেতে বললুম : পাতার শব্দ।

বড় মৃদু মর্মরধ্বনি। কিংবা শাড়ির আঁচল টানার মতো খসখস শব্দ। গোবিন্দ খুশী হল অপরিমিত। বলল : ঠিক সেইরকম শব্দ, না ?

সেইরকম মানে ?

সেদিন যেমন শুনেছিলে ?

বললুম : না। সে আরও স্পষ্ট, আরও বেগবান। মনে হয়েছিল, কে যেন শুকনো পাতা নিষ্ঠুর পায়ে মাড়িয়ে গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণে। সবই শুনেছি। দেখেছিও অনেক। শুধু মানুষটিকে দেখতে পাইনি।

গোবিন্দ আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল : তা বটে।

রাত আরও গভীর হল। কিন্তু চাঁদ উঠল না। আজ বোধহয় শেষরাতে চাঁদ উঠবে। খেয়ে দেয়ে গোবিন্দ গিয়ে বাইরে বসেছিল। শুতে আসছিল না। বললুম : কী হল, শোবে না আজ ?

গোবিন্দ চমকে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে বলল : তুমি শুয়ে পড়।

বললুম : এমন তন্ময় হয়ে কী ভাবছ ? বাড়ির কথা, না আর কিছু ?

গোবিন্দ উত্তর দিলনা।

বললুম : তবে কি সেদিনের কথা ভাবছ ?

ভুতো আমার পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মুখটা আমার গায়ে ঘষতে ঘষতে লেজ নাড়তে লাগল। মানে, এইবার ঠিক ধরেছ ওর মনের কথা।

নিঃশব্দে গোবিন্দ আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : ঠিক ধরেছি তো ?

গোবিন্দ এ কথারও উত্তর দিলনা।

এবারে আমি তার হাত ধরে ভিতরে টেনে আনলুম। বললুম : তোমার কিসের ভাবনা বল তো ? এই পাহাড়ে বনে এমন অনেক ঘটনাই তো ঘটে, যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না। তার জন্যে রাত জাগতে হবে !

রাত জাগতে হলনা। কিন্তু শেষরাতে আমার ঘুম ভাঙল। ভুতো হঠাৎ ডাকতে শুরু করেছে। নদীর কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিঁর ডাক। সেদিনের মতো কুকুরটা আবার উন্মাদ হয়ে উঠেছে। লাফাচ্ছে দুরন্ত আক্রোশে। তার গলার শিকলের শব্দে মুখর হয়েছে চারিদিক।

হঠাৎ আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, গোবিন্দ ছুটে বেরিয়ে গেল। টর্চ ছিল টেবিলের উপরে। সেটাও নিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করলনা। আমিও তার অনুসরণ করলুম, কিন্তু বাইরে এসে তাকে দেখতে পেলুমনা।

আকাশে বোধহয় এখনও চাঁদ ছিল। ঘন বনের

দেখতে অপূর্ব আর
মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়
SRM
প্রিন্টেড
ভয়েলস্
শ্রীরাম মিলস লিমিটেড
ফারগুসন রোড, বোম্বাই-১৩

আড়ালে সে চাঁদ হারিয়ে গেছে। শুধু একটু নেশার মতো আবছায়া আলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। সেই আলোতে পৃথিবীটা আমি দেখবার চেষ্টা করলুম।

ভুতো তখনও ডাকছে, তাকাচ্ছে দক্ষিণের দিকে মুখ করে। আমিও আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই ছায়ামূর্তির আবির্ভাবের অপেক্ষায় রইলুম।

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। তারপরে কী যে হয়ে গেল টের পেলুমনা। ভুতো নেতিয়ে পড়েছিল, একেবারে নিঃসাড় নিস্তব্ধ। একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে। ধুলো উড়লনা, পাতা নড়লনা। তবু কিছু দেখতে পেলুমনা। শুধু একটা ছায়া দেখলুম। আর শুনলুম যক্ষের নিঃশ্বাসের মতো শুকনো পাতার শব্দ।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কতক্ষণ কেটেছিল জানিনে। চেতনা ফিরে পেলুম ভুতোর আদরে। একেবারে আমার পায়ের কাছে এসে হাঁটুর উপর মুখ ঘষছে। সাহস দিচ্ছে আমাকে। কিন্তু গোবিন্দকে কোথাও দেখতে পেলুম না।

পূবের আকাশ স্বচ্ছ হতে এখনও কি খুব দেরি আছে!

নয়

গোবিন্দ কোথায় গেল!

লোকটা যে একটু স্বতন্ত্র জাতের তাতে সন্দেহ নেই। খুব দরকারী কাজে তার অবহেলা দেখেছি। আবার প্রচুর উৎসাহ দেখেছি একেবারে অকাজে। সময়ের হিসেব রাখেনা। সময় মেনেও চলেনা। বলে, আমি কেন ঘড়ির হুকুম মানব। সময়ের কথা মনে করিয়ে দিলে বিরক্ত হয়। বলে, তোমার ঘড়ি আমি বন্ধ করে দেব। ভয় থাকলে সরকারী কাজ করে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে। তখন হেসে বলে, দেখেছ ঘড়িটাকে, কেমন পেছু লেগেছে।

রুচির ব্যাপারেও তাই। আজ যা পছন্দ হল, কাল তা হলনা। সে কথা মনে করিয়ে দিলে বলে, ও হল মর্জির ব্যাপার। মেজাজের উপর নির্ভর। কাজেই তার যুক্তি অকাট্য।

তাঁবুর ভিতর ফিরে এসে শুতে পারলুম না। অন্ধকারে লোকটা গেল কোথায়। ছায়ামূর্তি তো অনেকক্ষণ আগেই অন্তর্হিত হয়েছে। গোবিন্দ কেন ফিরছেনা। কোন বিপদে পড়েনি তো! এই বন অরণ্যের ভিতর কে তাকে উদ্ধার করবে। চীর গাছের শুকনো পাতা খসখস করছে, আর শোঁ শোঁ করছে ঝাউ-এর পাতা। দূর থেকে কালী নদীর কলধ্বনি ভেসে আসছে। ঝিঁঝিঁরা ডাকছেনা।

টেবিলের উপর থেকে টর্চটা সংগ্রহ করে নিলুম। বন্দুকটা নিলুম বিছানার তলা থেকে। পরিধেয় পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ হলনা। চটি পায়েই বেরিয়ে পড়লুম।

একবার মনে হল রাম সিং-কে ডেকে তুলি। গাড়োয়ালের লোক রাম সিং। তার দুর্বার সাহস। বনকে সহজ ভাবে, আর পাহাড়কে সমতল। পথ চলে চোখ বুঁজে। রাত জাগে কুকুরের মতো। কিন্তু সে লোকটাও মনে হল ঘুমে আজ অচৈতন্য। তার তাঁবুর ভেতর থেকে কোন সাড়া এলনা।

ভুতো ছটফট করছিল। সে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। গলার শিকল খুলে দিয়ে বললুম: আয়।

প্রবল উল্লাসে ভুতো লেজ নাড়ছিল। এবারে লাফিয়ে এগিয়ে গেল।

বললুম: ব্যাপারটা কি রে?

মুখ তুলে ভুতো ঘেউ ঘেউ করল। মানে, আমি সঙ্গে আছি। ব্যাপার যাই হোক, ভয় পাবার কিছু নেই।

বললুম: তবে নেতিয়ে পড়েছিলি কেন?

ভুতো বলল, গরর-গরর। মানে, কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

তবে এখন কিসের ভরসা দিচ্ছিস?

মুখ তুলে ভুতো ঘেউ ঘেউ করল। মানে, ঘুমের ঘোর তো আর নেই। এখন তৈরি হয়ে বেরিয়েছি।

বললুম: সাবাস।

ভুতো অমনি পিছিয়ে এসে আমার পায়ে মুখটা ঘষে দিল। আমার কাঁধে বন্দুক, ডান হাতে টর্চ। বাঁ হাতে তার গালে দুটো চড় মারলুম আস্তে আস্তে। হাতের ভিতর তার মুখটা ঘষে দিয়ে ভুতো আবার এগিয়ে গেল। দাঁতের ফাঁক দিয়ে আওয়াজ বার করল, হিস্‌-হিস্‌।

পথ আমি নিজে চলছিলুম না। ভুতো আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সামনের দিকে নেমে যাচ্ছিলুম। একটু এগিয়েই নদীর তীর পাওয়া গেল। রাতের অন্ধকারেও রূপালী জলের রেখা দেখতে পেলুম ছলছল করে বয়ে চলেছে।

ভুতো মাটি শুঁকল। বললুম: কী দেখছিস রে?

ভুতো একবার ডানদিকে, আর একবার বাঁ দিকে ফিরল। মানে, কোন্‌ পথে গেছে।

সে কথা তোর মাটি শুঁকে বার করতে হব?

ভুতো কী বুঝল সেই জানে। এবারে একই ভঙ্গি করল দুবার। বললুম: দুজন লোক?

মস্ত বড় জিব বার করে ছুতো হাসল।

আমি আশ্চর্য হলুম: দুজন কে রে?

কাছে একখণ্ড বড় পাথর ছিল। ছুতো লাফিয়ে গিয়ে সেই পাথরে বসল সামনের পা-দুটো পিছনের পায়ের হাঁটুতে রেখে। এই ভঙ্গি দেখেই আমার রাম সিং-এর কথা মনে পড়ল। হাতে কাজ না থাকলে সে বাইরে বসে এমনি করে, হাত দিয়ে নিজের হাঁটুটা জড়িয়ে।

খুশী হয়ে বললুম: সাবাস বেটা, রাম সিং-এর কথা বলছিস তো।

ছুতো লাফিয়ে এসে আমার গায়ে তার মুখটা ঘষে দিল। বাঁ হাতে আবার তার গালে দুটো চড় মারলুম আস্তে আস্তে। হাতের ভিতর তার মুখটা ঘষে দিয়ে ছুতো হিস্ হিস আওয়াজ করল দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

মানে, সেও খুশী হয়েছে।

ছুতো তার কর্তব্যের কথা ভোলেনি। দক্ষিণ দিকে খানিকটা পথ গিয়েই ফিরে এল। এবারে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল উত্তর দিকে। তাকে অনুসরণ করতে করতে বললুম: কি রে, দুজনেই একদিকে গেছে বুঝি?

ছুতো উত্তর দিলনা। আরও জোরে এগিয়ে চলল।

বললুম: অত দৌড়সনা। এই পাথুরে রাস্তায় আমি ছুটতে পারবনা। অন্ধকারে পড়ে গেলে হাড়-গোড় গুঁড়িয়ে যাবে।

ছুতো একবার পিছন ফিরে তাকাল। তারপর ফিরে এসে আবার আমার সঙ্গে চলতে লাগল।

মাঝে মাঝে আমার আশ্চর্য লাগে। এক দেশের মানুষ আর এক দেশের কথা বোঝেনা। ভারতবর্ষের এক রাজ্যের লোক বোঝেনা আর এক রাজ্যের কথা। কিন্তু এই জানোয়ারটা বুঝি মানুষের কথা বোঝে। না বুঝলে, এমন করে উত্তর দেয় কেমন করে? হয়তো এ তার অনুমান, কিংবা অভ্যাস। হয়তো বা কিছুই নয়। তার খামখেয়ালি আচরণের আমি মনগড়া উত্তর করে নিচ্ছি।

ডান হাতে কালী নদী কলকল ছলছল শব্দে বয়ে চলেছে। জলের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে অন্ধকার আসছে ফিকে হয়ে। রাত্রি শেষ হতে আর দেরি নেই। কিন্তু পথের দিকে তাকিয়ে কোন ভরসা পাচ্ছিনা। টর্চের আলো ফেলে যতদূর দেখা যায়, সেই সীমার মধ্যে কারও সন্ধান নেই। গোবিন্দ তবে কোথায় গেল!

আর রাম সিং! রাম সিং-এর কথায় আমার অন্ত কথা মনে এল। তাঁবুর বাহিরে বেরিয়ে তার কথা আমার মনে পড়েছিল। ভেবেছিলুম, সে বোধহয় তার নিজের তাঁবুর ভিতর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। সারাদিন তারা নানা কাজকর্ম করে। রাতে ভাল ঘুম হওয়াই স্বাভাবিক। আমি শুধু ছুতোর আচরণেই ভাবছি, রাম সিং বেরিয়ে এসেছে। গোবিন্দকেই খুঁজতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ মনে হল, বনের ভিতর কার পদশব্দ শুনতে পেলুম। পথের উপর টর্চের আলো ফেলে কিছু দেখতে পেলুম না। মাটি শুঁকে ছুতো ডানহাতে মোড় ফিরেছিল। এইবারে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। সেইদিকে আলো ফেলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দূরের একটা গাছের আড়ালে মনে হল, মানুষ দেখতে পাচ্ছি। আচমিতে আমার হাত গেল বন্দুকের উপর। আর ছুতো ডাকতে লাগল প্রাণপণে।

ভেবেছিলুম, বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজ করব। কিন্তু তার দরকার হলনা। তার আগেই আমি রাম সিং-এর গলা শুনতে পেলুম। হাঁক দিল: ছুতো।

ছুতো আর একবারও ডাকল না, একেবারে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিও তার পিছনে ছুটে গেলুম।

বেশি দূর নয়। সেখানে পৌঁছতে আমাদের একটুও সময় লাগলনা। রাম সিং-ও এগিয়ে আসছিল। তার কাঁধের উপর গোবিন্দকে অচৈতন্য দেখলুম। আশ্চর্য হয়ে বললুম: একি!

রাম সিং হিন্দীতে কথা বলে। বলল: বাবুজীর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

জিজ্ঞাসা করলুম: কেন বল তো?

তা না হলে কেউ অন্ধকারে ছোটে: রাম সিং হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দিল: আমি তাঁকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলুম।

আর কিছু দেখনি?— আমি জানতে চাইলুম।

রাম সিং বলল: আর কী দেখব! অন্ধকার রাত, ছুতো ডাকছিল ঘেউ ঘেউ করে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাবুজী ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তারপর?

রাম সিং বলল: আমিও ছুটলুম। কিন্তু নদীর ধারে এসে পথ হারিয়ে গেল। বাবুজী কোন্ ধারে গেলেন, দেখতে পেলুম না। খুঁজে খুঁজে এই বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেলুম।

গোবিন্দর নাকের কাছে হাত এনে দেখলুম, তার প্রা০

আছে, চেতনা নেই। নদীর ধারে পৌঁছে তাকে মাটির উপর শোয়ানো হল। রাম সিং এবারে অঞ্জলি ভরে জল এনে গোবিন্দর মুখে চোখে ছেটাতে লাগল।

আমি আমার হাত নেড়ে একটু হাওয়া দেবার চেষ্টা করে বললুম: কেন বেরিয়ে গিয়েছিল বলতে পারনা?

কুকুরটা খুব ডাকছিল: রাম সিং উত্তর দিল।

আরও কিছু জানতে পারা যাবে এই আশায় বললুম: আর কিছু?

রাম সিং বলল: আর তো কিছু দেখিনি। বড় বাতিটা জলছিল। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি।

তুমি একা বেরিয়েছিলে, না আরও কেউ বেরিয়েছিল?

রাম সিং বলল: দু-একজন আমাকেই জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যাপার কী? আমি তাড়া দিয়ে তাদের ঘুমতে বলেছিলুম।

তারপর?

হঠাৎ মনে হল, আপনাদের তাঁবু থেকে কে যেন ছুটে বেরিয়ে গেল। আলোর নিচে দিয়ে যাবার সময় বাবুজীকে আমি চিনলুম।

গোবিন্দর দিকে তাকিয়ে আমি বললুম: চুপ!

রাম সিং জল ছেটানো বন্ধ করে আগেই চুপ করেছিল। মনে হল, তার জ্ঞান ফিরে আসছে। কয়েকটি মুহূর্তের অপেক্ষা। তারপরেই গোবিন্দ চোখ মেলে চাইল।

আমরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে চেয়ে ছিলুম। কিন্তু গোবিন্দ কথা কইল, আস্তে আস্তে বলল: আমরা কোথায়?

রাম সিং আমার মুখের দিকে চাইল। আমি উত্তর দিলুম: নদীর ধারে।

গোবিন্দ তার চারিদিকটা একবার চেয়ে দেখল। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। পথের সঙ্গে বনের এবং গাছের সঙ্গে আকাশের প্রভেদটা বোঝা যাচ্ছে। বলল: এখানে কেন এলুম?

বাধা দিয়ে বললুম: সে কথা পরে হবে।

গোবিন্দ তার নিজের শরীরটা দেখবার চেষ্টা করল। হাত দুখানাও তোলবার চেষ্টা করল। তারপর বলল: সে কোথায় গেল?

আমি আশ্চর্য হলুম অপরিমিত। কিন্তু সে ভাব যথাসম্ভব গোপন করে বললুম: কার কথা জিজ্ঞাসা করছ?

গোবিন্দ উত্তর দিলনা।

বললুম: বল।

গোবিন্দ নিরুত্তর।

অনেকক্ষণ পরে বলল: চল এবারে ফিরে যাই।

বললুম: চল।

গোবিন্দ আমাদের কাঁধে ভর দিয়ে ক্যাম্পে ফিরল। পুবের আকাশে তখন অন্ধকার নেই।

দশ

গোবিন্দকে আজ কাজে যেতে আমি বারণ করেছিলুম। মনে করেছিলুম, তার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে তা স্বীকার করলনা। ভাল করে স্নান করে কাপড়-জামা পরল, মহতোকে ডেকে বলল: ডবল নাস্তা।

ডবল নাস্তা মানে ভারি রকমের প্রাতরাশ। হেভি ব্রেকফাস্ট। আজকাল শহর এলাকায় 'হাই টি'-র প্রচলন দেখে এসেছি। শুধু টি নয়, হাই টি। মানে, সন্ধ্যেবেলায় এত রকমের ভোজ্য বস্তু থাকবে যে, বিকেলের চা-টা বাঁচবেনা, বাঁচবে রাতের খাবার। আমাদের ডবল নাস্তাও কতকটা তেমনি। সকাল আটটায় যখন কাজে বেরোই, তখন খাবার সময় ঠিক থাকেনা। চেষ্টা করি দুটোর মধ্যে ফিরতে, কিন্তু সব সময় হয়ে ওঠেনা। তাইতেই ডবল নাস্তার প্রয়োজন। সারাদিন কাজ করে ফিরে আসবার মতো কিছু শক্তি সঞ্চিত থাকবে। গোবিন্দর কথার উত্তরে বললুম: আজ কি না গেলেই হতনা?

রুক্ষস্বরে সে উত্তর দিল: ওপরওয়ালা নেই বলেই ফাঁকি দিতে হবে, এ কথায় আমি বিশ্বাস করিনা।

বললুম: আমি তোমার কাজ করে দেব।

গোবিন্দ বলল: তাহলে তো আমি ফিরে গেলেই পারি।

বললুম: এ রাগের কথা নয় ভাই, আমার অনুরোধ না হয় একটা দিন রাখলে?

এ তোমার বেয়াড়া অনুরোধ: গোবিন্দ উত্তর দিল: সুস্থ শরীরে কেন আমায় ঘরে বসিয়ে রাখবে?

তোমার সুস্থ শরীর, এ কথা যে মানতে পারছিনে। পারলে আপত্তি করতুম না।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে গোবিন্দ খালাসীদের হাঁক দিল। বলল: আজ বড় দুরবীন সঙ্গে নেবে।

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

ছেলেবেলায় নিশিতে ডাকার কথা শুনেছিলুম। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিনি। তারপর ইংরেজীতে একটা গল্প পড়ে সেই ধারণা খানিকটা স্পষ্ট হয়েছিল। এ রোগের ডাক্তারী নাম সম্‌নাম্বুলিজ্‌ম্। মানুষ ঘুমের ঘোরে বিছানা

ছেড়ে ওঠে। জাগ্রত মানুষের মতো দরজা খোলে, পথ চলে। অপ্রশস্ত আলসের উপরেও নাকি হাঁটতে পারে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করার গল্পও শুনেছি। বাধা পেয়ে পড়ে গেলে আর উঠতে পারেনা, গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে যায়। আমি ডাক্তারি জানিনা। এর বৈজ্ঞানিক সত্যের খবরও রাখিনা। শোনা গল্প, সহজ ভাবে বিশ্বাস করেছি। আজ আবার এই গল্প আমার মনে পড়ল।

গোবিন্দর জন্য মহতো তখন নাস্তা এনেছিল। টেবিলের উপর সেটা রেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আপনারটাও আনব হুজুর?

বললুম: আমার নাস্তা হলেই চলবে, তখন নাস্তার দরকার নেই।

মহতো খাবার আনতে গেল।

আমি জানি, গোবিন্দর কোন রোগ নেই। কর্মজীবনে অনেকদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনা হয়েছে অনেকবার। চেষ্টা-চরিত্র সুপারিশ করে একত্র থেকেছি। যাযাবর জীবন বড় দুঃসহ লাগে, বড় অসহায় মনে হয়। তাই একটা মনের মতো সঙ্গী চাই। গোবিন্দ আমার প্রিয় সঙ্গী।

এই পরিকল্পনাতেও ছোট ছোট দল বেরোবার কথা ছিল। চার পাঁচটি খালাসী নিয়ে এক একজন ওভারসীয়ার। আমরা সবাই আপত্তি জানিয়েছিলুম। এ তো সমতলের কাজ নয় যে একটা বড় ক্যাম্প পড়বে। আর আমরা এক একজন এক একদিকে গিয়ে কাজ সেরে আবার ফিরে আসব। পাহাড়ে নদীর জরিপ এমন সহজ কাজ নয়। সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। মাইলের পর মাইল কাজ করতে হবে। দিনের পর দিন সময় লাগবে। এক একটা ক্যাম্পেই হয়তো দশ পনরো দিন করে থাকতে হবে। তাই আমরা দুজন করে ওভারসীয়ার এসেছি আর দশজন খালাসী। ক্যাম্পের ভার রাম সিং আর মহতোর উপরে। রাম সিং তার পাহারা দেয়, আর মহতোর রান্নার হাতের প্রশংসা আছে। বাকি আটজন খালাসীর কাজ করে। দুভাগে দুজনের সঙ্গে যায়। জরিপের সাজ-সরঞ্জাম তো কম নয়। থিওডোলাইট, লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট, তার সঙ্গে স্ট্যাণ্ড চেন ফিতা। চারটে লোক সঙ্গে না থাকলে চলেনা।

আমার খালাসীরাও তৈরি হয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করল, যন্ত্র কী নেবে। গোবিন্দ আজ থিওডোলাইট নিয়ে যাচ্ছে। আমার দরকার ছিল লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্টের। বললুম: ছোট দূরবীন নাও।

গোবিন্দ আজ খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছে। অন্যদিন কথা বলে বলে খায়। আজ একটাও কথা কইলনা।

গোবিন্দর যে কোন রোগ নেই, এ কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। এ যদি নিশিতে ডাকা হত, তাহলে হয়তো এমন করে ডাকত না, আমাদেরও ঘুম ভাঙত না। বাকিটুকু যা দেখেছি, সে আমার চোখের ভুল হতে পারে। স্বপ্নও হতে পারে। তবে গোবিন্দ যে আমাদের চেয়েও কিছু বেশি দেখেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আরও বেশি না দেখলে সে অমন করে ছুটে যেতনা। কিন্তু কী দেখল সে!

আমি জানি, গোবিন্দ এ কথার উত্তর এখন দেবেনা। সহজেও দেবেনা। যদি কখনও দেয়, নিজের মর্জি মতো দেবে। প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যাবেনা, অনুরোধ করে শুধু আঘাত পেতে হবে। কিন্তু যখন বলতে চাইবে, তখন শুনতে না চাইলেও বলবে। এমন ঘনিয়ে এমন ফাঁদিয়ে বলবে যে ধৈর্য হারাতে হবে। অথচ বিরক্ত হলে চলবেনা। তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধবে। গোবিন্দর এই প্রকৃতি।

আমার খাবার যখন এল, গোবিন্দর খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে। ড্রয়িং টেবিল থেকে এটা সেটা টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে বলল: চললুম।

বললুম: কোন্ দিকে যাচ্ছ?

বেরিয়ে যেতে যেতে গোবিন্দ বলল: উত্তরে।

উত্তরে কেন? কাল তো দক্ষিণে গিয়েছিলে।

বাহির থেকে গোবিন্দর উত্তর এল: মর্জি।

তার মর্জির উপর আমার কোন হাত নেই। তাই চু করে গেলুম।

যেতে যেতে রাম সিং-কে আমি ডাকলুম। লোকট কথা কম বলে। প্রয়োজনের চেয়েও কম। তার ক রীতিমতো অসুবিধাই হয়। কিন্তু আজ সকালে তাকে প্রগল্‌ভ হতে দেখেছি। সেও তখন ঘুম ছিলনা। তা অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলেছে। এবারে অত্যা লজ্জিতভাবে কাছে এসে দাঁড়াল।

বললুম: আর কোন খবর পেলে?

রাম সিং উত্তর দিলনা।

বললুম: আমি গোবিন্দর কথা জিজ্ঞাসা করছি।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে রাম সিং বলল: কাছে একট খারাপ জায়গা আছে।

খারাপ জায়গা?

রাম সিং আর কথা কইলনা।

একটা ধমক দিয়ে বললুম : বল না, কী খারাপ জায়গা।

রাম সিং সংক্ষেপে বলল : শ্মশান।

আমি হেসে ফেললুম। বললুম : শ্মশান আবার খারাপ জায়গা হল কবে থেকে? রাজা উজীর থেকে গরীব ভিখিরীকে পর্যন্ত যে জায়গায় যেতেই হবে, সে আবার খারাপ কিসের।

রাম সিং উত্তর দিলনা।

সোহন এসেছিল আমার জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে। সে বলল : খুব খারাপ শ্মশান, হুজুর। এ তল্লাটের লোক ভয় পায়।

হেসে বললুম : মেলা ভূত আছে বুঝি?

কিন্তু আমার রসিকতায় কারও মুখে হাসি ফুটলনা। বুঝতে পারলুম যে ইতিমধ্যেই তারা নানা সংবাদ সংগ্রহ করে ফেলেছে। হয়তো কালকেই করেছিল। আজ সেইসব কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ফেলেছে। তাই আর হাসতে কারও সাহস হলনা।

এদের ভয় দেখে আমি বিস্মিত হই। বিংশ শতাব্দী শেষের দিকে এগিয়েছে। মানুষ আর পৃথিবীতে বেড়িয়ে সুখ পাচ্ছেনা। গ্রহে গ্রহান্তরে বেড়াতে চাইছে। স্পুটনিক যাচ্ছে। এর পরে মানুষ যাবে। বিজ্ঞানের এই জয়-যাত্রার দিনে আমরা সংস্কার মানব! ভূতের ভয়ে অস্বীকার করব সত্যকে! বললুম : চল, আজ তোমাদের শ্মশানটা একবার দেখে আসব।

আমার প্রস্তাব কারও ভাল লাগলনা।

এগারো

দুপুরে ক্যাম্পে ফিরতে আমার একটু দেরি হল। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করেছিলুম। ইচ্ছা ছিল যে ফেরার আগে শ্মশানটা একবার দেখে আসব। শ্মশানের বদনাম সর্বত্রই শুনতে পাই কোনখানে কোন মানুষকে শ্মশানের প্রশংসা করতে শুনিনি। আজও পর্যন্ত কেউ আমাকে বলেনি যে তাদের শ্মশানটা ভাল, বা সেখানে যেতে কোন ভয়-ডর হয়না। এমনি বিচিত্র এই স্থান।

বললুম : চল, শ্মশানটা একবার দেখে যাই।

না বলার সাহস কারও নেই, কিন্তু হাঁ-ও কারও মুখে শুনলুম না। তাদের চোখের দিকে চেয়ে দেখলুম যে বড় অসহায় দেখাচ্ছে তাদের চোখের দৃষ্টি। মায়া হল। জিজ্ঞাসা করলুম : ভয় করছে?

সোহন কিছু সাহস সঞ্চয় করে বলল : অবেলায় আবার স্নান করতে হবে।

হেসে বললুম : কাছেই তো নদী।

নদীর কথায় ভরসা কেউই পেলনা। তাই দেখে বললুম : তাহলে তোমরা ফিরে যাও। আমি একটু ঘুরে যাব।

এই খালাসীরা আমাদের অনেক সুখ-দুঃখের বন্ধু। এদের সবার সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের মিল আছে, আছে একাত্মবোধ। এরাও ঘরছাড়া। দেশের জন্য এদেরও মন টানে, মন খারাপ হয়। কিন্তু কঠিন কর্তব্য এদের বেঁধে রাখে। এই পাহাড়ে বনে, এই লোকালয়ের বাইরে দিনের পর দিন পড়ে থাকতে হয়। থাকবনা বললে চলেনা।

সোহন বলল : তা হয়না হুজুর।

কেন হয়না?

সোহন নিরুত্তর।

জিজ্ঞাসা করলুম : ভূতে মেরে ফেলবে?

না।

তবে?

একা যাওয়াটা ঠিক নয়।

এ-ও বুঝি সংস্কারের কথা। কিন্তু এ তো কুসংস্কার। বললুম : আলবৎ ঠিক। আমি একাই যাব।

সোহন আর উত্তর দিলনা। এরা তর্ক করেনা, কিন্তু যা ভাল বোঝে তা জোর করেই করে। সরকারী কাজে এই জেদ দেখিনা। সেখানে তাদের নিজেদের কোন মত নেই। যা বলব, তাই করবে। চেন টানতে বলব, অমনি টানবে। গজ ধরতে বলব, সঙ্গে সঙ্গে সোজা করে ধরবে। ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে বলব, সেই দিকে হেলাবে। কেন, সে প্রশ্ন করবে না। কত বার, সে কথা জানতে চাইবেনা। কখন শেষ হবে, সে সম্বন্ধেও কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু একা আমাকে শ্মশানে যেতে দেবেনা। বারণ করলেও শুনবেনা। মার খেলেও প্রতিবাদ করবেনা। তারা যাবেই। একজন অন্তত যাবে। শেষ পর্যন্ত সেই রফা হল। তিনজন ফিরে যাবে, আর সোহন থাকবে আমার সঙ্গে।

সকালবেলায় এই লোকটিই আমায় খবর দিয়েছিল যে শ্মশানটা খারাপ। এ তল্লাটের লোক খুব ভয় পায়। এতক্ষণ কাজ করেছি, কিন্তু লোক দেখিনি। লোকালয়ও না। সোহনকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। বললুম : শ্মশানের খবর কার কাছে তোমরা পেলে?

সোহন বলল : আমিই পেয়েছি হুজুর। কাল বিকেলবেলায় বাজ্যাত্রের খোঁজে বেরিয়ে এই খবর পেয়েছি। গাঁয়ের লোক বলল, খবরদার, নদীর ধার দিয়ে যাবিনে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যা। কেন, জিজ্ঞাসা করতেই খবরটা বেরিয়ে পড়ল।

গ্রাম কতদূর ?

সোহন বলল : এই জঙ্গলটার ওধারে। ভাল চাষআবাদ আছে হুজুর, কোন জিনিসের অভাব নেই।

সোহন গল্প করতে ভালবাসে। যতটুকু সুযোগ দেওয়া যায়, তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে। গ্রামের চাষআবাদের কথায় আমার আগ্রহ ছিলনা। বললুম : শ্মশানের গল্প কী শুনলে, তাই বল।

ভয়ে ভয়ে সোহন বলল : সে বড় সাংঘাতিক গল্প হুজুর, শুনলে দিনের বেলাতেও ভয় করে। গ্রামের লোকেরা বলল, ওরে, তোরা পরদেশী মানুষ, এসব শুনে তোদের কাজ নেই। যা বলছি, তাই মেনে চল্। ওধার দিয়ে যাতায়াত করবিনা। কিন্তু হুজুর, আমার মন মানল না। বললাম, আমরা আরা জেলার লোক, বেয়াল্লিশ সালে রেলের তারা নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলেছি। ভয় কাকে বলে আমরা জানিনে।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্য আমি বললুম : ঠিক কথা।

হাঁ হুজুর।— বলে সোহন তার লম্বা গোঁফের উপর একবার হাত বুলিয়ে নিল।

বললুম : তারপর ?

সোহন বলল : আমি মানলাম না হুজুর, জোর করে তাদের গল্প শুনলাম।

সোহন তার চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল। একধারে কালী নদী, তার ওপারে গভীর অরণ্য স্তরে স্তরে উপরে উঠে গেছে। এ ধারের বন ক্রমে ক্রমে অগভীর হয়ে লোকালয়ে পৌঁছেছে। শ্মশানের পথ এসেছে ফুরিয়ে। আর একটু এগোলেই বোধহয় সেখানে পৌঁছে যাব। পরিবেশের ভিতর কেমন একটা থমথমে ভাব। সোহন বলল : এখানেই শুনবেন হুজুর ?

কেন, আপত্তি আছে নাকি ?

আমি জানতে চাইলুম।

সোহন একটু নম্র স্বরে বলল : জায়গাটা ভাল নয় কিনা হুজুর, তাই বলছিলাম—

ভয় করছে, এই তো ?

সোহনের আত্মাভিমানে বুঝি আঘাত লাগল। বলল : ভয় নয় হুজুর। ভাবছিলাম, পথে ঘাটে শ্মশানের গল্পটা ভাল নয়।

আমি হেসে ফেলেছিলুম। কিন্তু সোহন কিছু বলবার সুযোগ পেলনা। ঘট্ ঘট্ করে দুবার শব্দ হল। কোন জন্তুর ডাক, না পাখির পাখার শব্দ, বুঝতে পারলুম না। সোহন কিন্তু তটস্থ হয়ে উঠল। বললুম : কি রে, কী হল ?

দেখলেন তো হুজুর : সোহন উত্তর দিল : ঐ স্থানের নামেই কেমন বাধা পড়ল।

একটু থেমে বলল : মানুষের বুদ্ধিও কমে যায়। ভাবলাম, এই দুরবীনটার বদলে ঠ্যাঙাটা হাতে নেব। তাও ভুল হয়ে গেল।

হেসে বললুম : কেন রে, ঠ্যাঙাটা থাকলে বুঝি ভূতকে পেটানো যেত ?

উত্তরে সোহন 'রাম রাম' বলল।

আমি হাসছিলুম। কিন্তু এই হাসি সোহনের ভাল লাগছিল না। বলল : এসব জায়গায় আসতে হলে ওটাকেও, মানে, কুকুরটাকেও সঙ্গে আনতে হয়। 'রাম রাম'।

ভূতোর কথায় বুঝি ভূতের কথা মনে পড়েছে। তাই 'রাম রাম'।

একেবারে নদীর ধার দিয়ে চলেছি। মনে হল, এখানে যেন বন আরও ঘন, আরও অন্ধকার। কোন দিকে আর সূর্যের আলো এসে পৌঁছচ্ছে না। মনে হবেনা আকাশে এখন সূর্য আছে। অদ্ভুত শীতল স্থান। মাটি বুঝি ভিজে আছে, স্যাঁতস্যাঁত করছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাউ-এর গাছ থেকে গড়িয়ে নামল। নদীর দিক থেকেও এল আর-এক ঝলক বাতাস। শরীরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল।

সোহন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমিও দাঁড়ালুম। কাছে দূরে অনেকগুলো জায়গায় কালো কালো দাগ দেখতে পেলুম। নদীর জল ঘেঁষে পাথরের উপর কালো দাগ। একদিন আগুন জ্বলেছিল, আজ তার দাগ আছে। কিছু পোড়া আধ-পোড়া কাঠকুটোও চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হাড়-গোড় নেই, নেই অন্য কোন বীভৎস দৃশ্য। সোহন তবু তার দুহাত জুড়ে প্রণাম করল আর বিড়-বিড় করে আওড়াল : রাম রাম।

এই সেই খারাপ জায়গা। কিন্তু আমার কিছু খারাপ লাগলনা। বললুম : এ তো দিব্যি ভাল জায়গা দেখছি। বসবি কিছুক্ষণ ? না, ভয় করবে ?

সোহন উত্তর দিলনা। আমি জানি, এইখানে দাঁড়িয়ে

ভয় করবেনা বলবার সাহস তার নেই। ধৃষ্টতাও নেই। ভয় করবে বলতেও অহংকারে বাধে। তাই তার নিরুত্তর থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সামনে থেকে কালী নদী হঠাৎ বেঁকে গেছে। বেঁকেছে পশ্চিমের দিকে। হঠাৎ মনে হবে, এইখানেই বুঝি নদীর শেষ। চলতে চলতে এই বনের ভিতর নদী তার গতি ফেলেছে হারিয়ে। সোহন আড়ষ্ট ভাবে সেই দিকে চেয়ে বলল: এইবারে চলুন হুজুর, বেলা অনেক হয়েছে।

বেহ্বার ভাবনা কোনদিন তারা ভাবেনি। আজও যে ভাবছেনা, সে আমি নিশ্চয়ই জানি। এ তার ছল মাত্র। তাকে আরও ভয় দেখাবার জন্য আমি সামনের দিকে পা বাড়ালুম। সোহন বোধহয় আঁৎকে উঠল। বলল: ওদিকে নয় হুজুর, ওদিকে যাবেন না।

গলার স্বর তার কেঁপে উঠল।

ফিরে বললুম: আচ্ছা।

সোহন আমার মুখের হাসি দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সেখানে তার উত্তর দিলনা। ফেরার পথেও ফিরে ফিরে দেখল পিছন দিকে। যে রকমের জায়গা। বলা যায় কি!

হাঁটতে হাঁটতে খোলা জায়গায় পৌঁছে আকাশের সূর্যের দিকে চাইল। বলল: বেলা দেখছেন তো হুজুর। ভবল নাস্তা করে বেরলে আমি তাগাদা দিতাম না।

হেসে বললুম: তা বটে। তুমি আরা জেলার লোক, ভয়-ডর তোমার থাকবে কেন! রেলগাড়ির বড় বড় ডাব্বা কাঁধে বয়ে তোমরা গঙ্গার জলে ফেলেছ:

সোহন বুঝতে পারল, আমি তাকে ঠাট্টা করছি। তাই বলল: বড় সাংঘাতিক গল্প শুনেছি হুজুর।

তোমার গল্পের কথা তো অনেকবার শোনালে!

আমি উত্তর দিলুম রুক্ষভাবে।

সোহন খানিকক্ষণ ইতস্তত করল, তারপর বলল: এই শ্মশানে নাকি নরবলি হয়েছে।

নরবলি!

হাঁ হুজুর।

কে দিল?

সোহন ভয়ে ভয়ে বলল: কারণবাবা।

সত্যি!

সোহন বলল: সত্যি হুজুর। মানুষ দেখলে ভেড়া বানিয়ে দেন। তারপর অমাবস্যার রাত্তে—

বাকিটুকু শেষ করবার সাহস তার ছিলনা। কারণবাবা রেলগাড়ির ডাব্বা হলে তার ভয় করবার কারণ ছিলনা। তিনি সাধু, মহাসিদ্ধ পুরুষ, মানুষকে ভেড়া বানিয়ে পূজার সময় বলি দেন। হয়তো ঐ শ্মশানই তাঁর সাধনার স্থান। আজ তিনি সেখানে থাকলে দুজনকেই হয়তো ভেড়া বানিয়ে দিতেন। তাঁর দুটো অমাবস্যার বলির ব্যবস্থা হয়ে যেত!

বললুম: এ জায়গাটাও তো আমাদের জরিপ করতে হবে।. কী করে করবে?

সোহন এ কথার উত্তর দিলনা।

বললুম: উত্তর দিচ্ছনা যে?

সোহন বলল: হুজুর, ডিউটি অন্ত জিনিস। তার জন্যে প্রাণের ভয়-ডর ঘরে রেখে বেরতে হয়।

মনে হল, সোহন একটা সত্য কথা বলেছে। তার মতো আরও অনেকে এই কথা বলবে। কিন্তু সবাই বলবেনা। যদি সবাই বলত, তাহলে দেশের আজ অন্য রূপ হত। দেশের অন্য রূপ যাঁরা দেখতে চান, এই অশিক্ষিতদের কাছে তাঁদের কর্তব্যবোধ শিখতে হবে। এদের আমি শ্রদ্ধা করি।

বারো

আমি বেশ দেরিতে ফিরলুম। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হলুম যে গোবিন্দ তখনও ফেরেনি। অথচ তার খালাসীরা ফিরে এসেছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে সে আজও কারণবাবার আশ্রমের দিকে গেছে।

অন্ধকার গভীর হতে লাগল। কিন্তু গোবিন্দ ফিরলনা। একসময় মনে হল, বড় বেয়াড়া তার লোকগুলো। একজনকে ডেকে বললুম: তোমরা তাকে একা ছেড়ে দিলে?

কী করব হুজুর: মাথা চুলকে সামনে এল একজন: আমরা সঙ্গে যাব বলতে গুরু তুলে মারতে এসেছিলেন।

আর তোমরা অমনি পালিয়ে এলে!

আমি ধমক দিলুম।

লোকটা ভয়ে ভয়ে বলল: আমরা যে হুজুরের চাকর।

কথাটা আমি বিশ্বাস করি। সব ব্যাপারেই তারা সব কথা মানে। কাজেই এ কথাও মেনেছে। আমার সোহন হলে কী করত বলতে পারিনে। কারণবাবার গল্প তার শোনা আছে, কাজেই সে বোধহয় একা কিছুতেই যেতে দিতনা। মার খেয়েও সঙ্গে যেত।

জামা কাপড় পরে আমি বাহিরে এলুম। কিন্তু আশ্চর্য হলুম সোহনকে দেখে। আমার হুকুম শোনবার আগেই সে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে তৈরি হয়েছে।

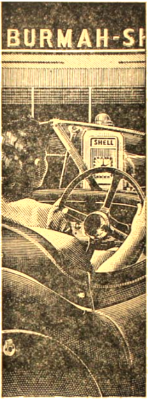

শিষ্টাচার
ক্ষিপ্রতা
নৈপুণ্য

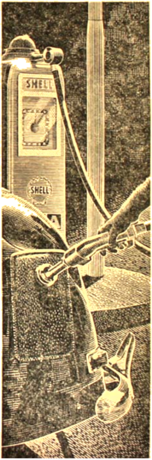

বার্মা-শেলের পাম্পে এলেই আপনি অনুভব করবেন সমাদৃত ক্রেতার মর্যাদা। এখানকার সহৃদয় ব্যবহার ও ব্যক্তিগত মনোযোগই এর মূলে। অনেক সময়ে যা মনে হয় তুচ্ছ—গাড়ীর বেলায় সে তো সত্যিই বড় হতে পারে এখানকার সহায়ক তা জানে। সে বলবে—"তেলটা দেখে দি, ব্যাটারি-ও দেখে দি, রেডিয়েটার দেখেছি, জল ঠিক আছে। চাকার হাওয়া দেখলাম, সব কটাতেই হাওয়া মাপ অনুযায়ী দিয়েছি—আর কিছু ?"

সহায়কের দৃষ্টিতে বাদ পড়বে না কিছু। দেখবেন আপনার গাড়ীর সকল প্রয়োজন শান্ত অথচ ক্ষিপ্র ও বিবেচনাভাবে মেটান হয়েছে।

মোটরগাড়ীর মালিকের ব্যস্ততার অন্ত থাকেনা। একবার পেট্রোল নিতে এলে স্বভাবতই তাঁর তাড়া থাকে। এই তাড়াতাড়ির দাবী মেটাবার জন্য আমাদের ডিলারের সহায়কেরা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাদের কাজ শান্ত অথচ ক্ষিপ্র ও নিপুণ।

বার্মা-শেলের
সেবাই
এই।

বললুম : ও কী ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সোহন বলল : বন্দুকটা হুজুর সঙ্গে নেবেন, আর টর্চলাইট।

আমাদের কি সারা রাত খুঁজে বেড়াতে হবে ?

এ কথার উত্তর সে দিলনা।

আমি দেখলুম, গোবিন্দর দলেরও একটা লোক তৈরি হয়ে এসেছে। কিন্তু বড় অপ্রসন্ন মন। বললুম : তুমি আবার কেন যাবে ?

মনে হল, লোকটা ক্ষুব্ধ হল। বলল : আপনিও হুজুর এই কথা বলছেন !

কেন ?

কিন্তু এই কেনর উত্তর সে আর দিলনা।

শুধু বন্দুক আর টর্চ নয়, ছুতোও আমার সঙ্গে চলল।

পথ চলতে চলতে সোহন বলল : আজকালকার ছেলে-ছোকরারা খুব পাজি হয়েছে। তা না হলে অমন করে কথা বলে !

মন্দটা আমার সঙ্গে নয়। সে তার সঙ্গীর সঙ্গেই কথা বলছে। আমি আগে, আর তারা আমার হাত দু-তিন পিছনে চলেছে। নদীর ধারে পৌঁছে আমরা উত্তরের পথ ধরেছি। সেই পথ! আজ শেষরাতে অন্ধকারে আমি এই পথে এসেছিলুম। ছুতো আমাকে এনেছিল। এবারেও ছুতো নিয়ে যাচ্ছে। সে আগে আগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

সোহনের সঙ্গী বলল : এই কাজ আমার বাপ-দাদাও করেছে, কিন্তু এত কথা আমরা আজও জানিনা।

জানবি কোথা থেকে : সোহন উত্তর দিল : কংগ্রেস-রাজই তো এইসব শেখাচ্ছে।

পিছন ফিরে বললুম : কী শেখাচ্ছে রে ?

সোহনরা আস্তে আস্তেই কথা বলছিল। তাই আমার প্রশ্ন শুনে কিছু লজ্জা পেল। বলল : সে সব শুনে আপনার কাজ নেই হুজুর।

বললুম : বল্ না।

সোহনের এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে লাঠি। তবু সেই হাত দুটো কপালমাথায় ভক্তি করে বলল : আমাদের বাপ-দাদা বলত, তোদের মনিব হল ওভারসীয়র বাবু। তার বড় আর কেউ নেই।

গম্ভীরভাবে বললুম : কংগ্রেস-রাজ কী বলে ?

বলে : সোহন ইতস্তত করল খানিকক্ষণ, তারপর বলল : বলে, মনিব হল কংগ্রেস-রাজ, আর সবাই গোলাম।

আমি বললুম : ঠিকই তো বলে রে !

সোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল : আচ্ছা হুজুর।

আবার খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। তারপর বললুম : সেই ছোকরাটা কী বলছিল ?

এই প্রশ্ন শুনে সোহন খুশি হল। বলল : শুনেছেন হুজুর ?

বললুম : বল্ না।

বলছিল, যা যা, মেজেগুজে সঙ্গে যা। খুব তাড়াতাড়ি তরক্কি হবে, ওভারসীয়র হবি।

সোহনের সঙ্গীটা যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল : আপনিই বলুন হুজুর, আমরা কি চাকরি করতে আসি, না প্রাণের টানে আসি ! আজকালকার ছোকরাদের কি কোন বোধ নেই ?

আমারও একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বললুম : সত্যি কথা।

এর পরে আর গল্প জমলনা।

কারণবাবার আশ্রম কোথায়, আমি তা জানিনা। এরা জানে কিনা, তাও আমার জানা নেই। বোধহয় জানেনা। সারাক্ষণ তো আমাদের সঙ্গেই আছে। কী করে জানবে !

কারণবাবা নরবলি দেন শুনেছি। নিশ্চয়ই কাপালিক। কপালকুণ্ডলায় কাপালিকের গল্প পড়েছি। নানা কথাও শুনেছি কাপালিকের সম্বন্ধে। তাঁরা মানুষকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেন। চেহারায় ভেড়া নয়, কাজে ভেড়া। চোখের দিকে চেয়ে এমন জাদু করেন যে সুড়সুড় করে সে পিছন পিছন চলে। তার আর স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকেনা। এসব কথা আমি গোবিন্দর কাছেই প্রথম শুনেছিলুম। সে তখন তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করত, আর যাতায়াত করত একজন তান্ত্রিকের কাছে। সে সব দিনের কথা আমি ভুলবনা।

তান্ত্রিকদের সম্বন্ধেও সে সময়ে আমি অনেক কথা শুনেছি। কত রকম আচার আছে, তার ক্রিয়া-পদ্ধতি, পঞ্চ ম-কারের দার্শনিক ব্যাখ্যা, অঙ্গপূজার তাৎপর্য, ইত্যাদি কোন আলোচনাই বাকি রাখেনি। পাগল হতে আমার আর সময় লাগতনা। এমনি সময় হঠাৎ একদিন গোবিন্দর মোহভঙ্গ হল। সে আর এক গল্প। ভৈরবী নিয়ে গণ্ডগোল। গুরুশিষ্যে প্রায় লাঠালাঠির যোগাড়। গোবিন্দকে আমিই গিয়ে উদ্ধার করে আনলুম।

গোবিন্দ তারপর তান্ত্রিক ক্রিয়া ছাড়ল বটে, কিন্তু

মাঝে মাঝেই তার শখ জেগে ওঠে। সাজসরঞ্জাম এখনও আছে। নারকেলের পাত্র, নরকপাল, হাড়ের মালা—এইসব। মায়া করে সেদিন এসব ফেলে দেয়নি। যোগাড় করতে কষ্ট হয়। যদি কখনও কাজে লাগে।

গোবিন্দর পুরনো নেশা আবার জেগে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। আর তা ভাল করে জাগলে কিছুতেই রক্ষে নেই। তাঁবুর ভিতরে তো নিত্য-কর্ম শুরু হয়ে গেছে। বাহিরে হল যাগযজ্ঞ, পুরশ্চরণ, শবসাধনা। সে সব ভয়ানক ব্যাপার। ভাবতে ভাবতেই আমি শিহরে উঠলুম।

ঝাউ-এর বন ক্রমে ক্রমে ঘন হচ্ছে। এদিকে দুরকমের ঝাউ। একরকম, তার ডগায় শুধু পাতা। চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একগোছা পাতা। পাতা বললে ভুল হবে। সবুজ রঙের নরম কাঠি। দোলালে চামরের মতো দোলে। যেখানে একটু ডাল বেরিয়েছে, তারই মাথায় একটি সবুজ চামর। বাতাস সোঁ সোঁ করে তাকে দোলায়, গাছটাকেও হেলায়। আর একরকম, ছোট ছোট পাতায় থোকা। পাতা এ-ও নয়, আলপিনের মতো কাঁটা, রুক্ষ সবুজ। ডালের যেখানে সেখানে থোকা। এ গাছগুলোও হাওয়ায় দোলে, কিন্তু পাতা দোলেনা।

চীর গাছ দুরকমের দেখিনি।

সোহন তার সঙ্গীর সঙ্গে কথা কইছিল। হঠাৎ আমার কান সেদিকে গেল। সোহন বলছিল: কারণবাবা পাহাড়ে একটা গুহার মধ্যে থাকেন।

পাহাড় তো নদীর ওধারে!— শুধাল তার সঙ্গী।

আমারও এই প্রশ্ন ছিল। তাই আমি উত্তর শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সোহন বলল: আরে, আমি কি জানতাম যে বাবার আশ্রমে কোনদিন যেতে হবে? তাহলে না হয় জেনেই নিতাম।

ঠিক কথা। কিন্তু তার সঙ্গী বলল: বাবুদের সঙ্গে থাকলে জেনে রাখতে হয়। তাঁদের তো সব ঝক্কির ব্যাপার। চল্ বললেই চল্।

এও ঠিক কথা। কিন্তু সোহন বলল: বাবার গল্প শুনে মনে করেছিলাম যে ওখানে গেলে আর ফিরে আসতে হবে না। ও কাজ শ্মশান যাবারই সামিল। একাদশী অমাবস্যায় বাবা শ্মশানে মড়ার ওপর চাপেন। সন্ধ্যেবেলায় কেউ মরলে আর রক্ষে নেই। বাবা ঠিক ঘাড়ে চাপবেন। সে নাকি কঠিন পূজা, কেউ পারেনা।

গোবিন্দকে কোনদিকে দেখতে পাচ্ছিনা। এমন অনির্দিষ্টভাবে পথ চলারও কোন অর্থ নেই। তাই পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলুম: বাবুকে কোথায় ছেড়ে এসেছ?

কথা বন্ধ করে দুজনেই একসঙ্গে এগিয়ে এল।

বললুম: আমি গোবিন্দবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করছি।

সোহনের সঙ্গী বলল: সে জায়গা তো অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছি হুজুর।

বললুম: তবে?

সোহন বলল: কারণবাবার আশ্রমে যদি গিয়ে থাকেন, তবে মুশকিল আছে।

মুশকিল কিসের?— আমি জানতে চাইলুম।

সোহন বলল: জায়গাটা তেমন সুবিধের নয়।

বললুম: যে রকম জায়গা দেখে এলুম, তার চেয়েও খারাপ?

সোহন বলল: রাম রাম!

সমতল ভূমি হলে অন্ধকার এত ঘন হতনা। পাহাড় বলে ছায়া বড় তাড়াতাড়ি নামে। বনও এমন গভীর যে দিনের বেলাতেও অন্ধকার জমে থাকে। এখন স দোয়াতের কালির মতো একাকার হয়ে গেছে।

বললুম: গোবিন্দর দেখা কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পার?

মাথা চুলকে সোহন বলল: সেইটেই তো ভাবনার কথা

বাবার আশ্রমটাও তো তোমাদের জানা নেই?

আমি জানতে চাইলুম।

সোহন বলল: সেইটে বড় ভুল হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার মনে হলনা যে লোকটা তার জন্য একটু দুঃখিত হয়েছে। আশ্রমের পথ জানা থাকলে আজ সেখা যেতেই হত। না বলার অভ্যাস তাদের নেই। অথ যাওয়াটাও যে কত ভয়ের ব্যাপার, সে কথা তার জা হয়ে গেছে। ভাবনা শুধু গোবিন্দকে নিয়ে। তারও একা খোঁজ পাওয়া দরকার। আমি কথা কইলুমনা দেখে সোহ বলল: গ্রামে গিয়ে কি জিজ্ঞাসা করে আসব?

বললুম: গ্রাম কতদূর?

সোহন উত্তর দিল: এদিকে কোন গ্রাম আছে কি জানিনে, তবে ওদিকের গ্রাম খুব বেশি দূরে নয়।

বললুম: যেতে আসতে কত সময় লাগবে?

সোহন বলল: তা একটু সময় লাগবে। যতটা এগো ততটা ফিরতে হবে। তারপর সোজা পশ্চিম মুখো।

এ পথ কম নয়। তাই ফেরার কথা না ভে এগোতেই লাগলুম।

কিন্তু লক্ষ্যহীনভাবে কত এগোনো যায়!

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ বোধহয় ডুবে গেছে। জোনাকি এদিকে দেখিনি। শুধু তারার আলোয় কি এই উপত্যকাটা আলোকিত হবে?

পাতায় খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কখনও কখনও সোঁ সোঁ করে বাতাস আসছে। ঝাউ-এর পাতায় শব্দ। আর ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

গোবিন্দকে আমরা কতক্ষণ খুঁজব!

পিছন ফিরে দেখলুম সোহন নেই। তার সঙ্গীও নেই। অন্ধকারে তারা হারিয়ে গেছে। তাদের লণ্ঠনের আলোও দেখতে পেলুমনা। আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। কোথায় গেল এরা। এই একটু আগে তো আমার পিছনে ছিল, কথা বলছিল।

হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়ল। বড় খিদে পেয়েছে। বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে পা দুটো। মাথাটাও বুঝি ঘুরছে। এমন দুর্বল শরীরে কী করে হাঁটছিলুম, ভেবে আশ্চর্য বোধ হল। আমাকে কি টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোন অদৃশ্য শক্তি। ভয়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে ডাকলুম: সোহন।

খচ্ করে একটা শব্দ হল আমার কাছেই, দেশলাই জ্বলল। দেশলাই-এর আলোয় দুজনকেই দেখতে পেলুম। তারা লণ্ঠন ধরাচ্ছে। লণ্ঠন বুঝি নিবে গিয়েছিল।

এতক্ষণে আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি। টর্চটার কথা আমার মনে ছিলনা। এইবার পথের উপর তার আলো ফেলে বললুম: ফিরে চল।

জোরে জোরেই কথাটা বললুম। পাছে তারা মনে করে যে ভয় পেয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম।

সোহনরা কোন উত্তর দিলনা। তারা কী ভাবল, সে কথা বুঝতে পারা আমার ক্ষমতার অতীত।

ক্লান্ত দেহে অবসন্ন মনে যখন ক্যাম্পে ফিরলুম, তখন মনে হল আমি মানুষ খুন করতে পারি। আমাদের পেট্রোম্যাক্সটা খুব উঁচু করে খাটানো। অনেক দূর থেকে তার আলো দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খুব কাছে এসে যেন গানের সুর শুনতে পেলুম। আমাদের একটা ছোট রেডিও সেট আছে। ব্যাটারিতে চলে। সন্ধ্যাবেলায় গোবিন্দ তাতে বাংলা গান শোনে। দুজনেরই যখন হাতে কাজ থাকেনা, তখন আমরা দাবা পেতে বসি। গোবিন্দ কি ফিরে এসেছে!

তাঁবুর ভিতর ঢুকে দেখলুম, শুধু ফিরে আসা নয়, রেডিও খুলে একাই দাবা খেলছে। সরু চুরুট ধরিয়ে দুজনের চাল একা চালছে। এই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, আমি মানুষ খুন করতে পারি।

সোহন আমার কাঁধ থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল, হাতের টর্চটাও। বলল: মুখ হাত ধুয়ে নিন হুজুর, খাবার তৈরি আছে।

আমি যে ক্ষুধার্ত সে কথা এরা জানে। ক্ষুধার্ত মানুষ অমানুষ, তার প্রবৃত্তি হল আদিম বর্বর। পেটে খাদ্য পড়লে সে তার মনুষ্যত্ব ফিরে পায়। আমার মনে হল এই অশিক্ষিত লোকটা বুঝি সেই কথাই আমাকে মনে করিয়ে দিল।

তেরো

রাত তখন কত হবে জানিনে। ভুতোর বেপরোয়া ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ঠিক প্রথম রাত্রির মতো থমথমে আবহাওয়া। কোনদিকে কোন শব্দ নেই। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে। ভুতোর গলায় শিকল বাজছিল ঝনঝন করে। তার ডাকের সঙ্গে শিকলের শব্দও থেমে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ হল ভূমিকম্পের আগের অবস্থার মতো।

আমি লাফিয়ে উঠে টর্চটা সংগ্রহ করে নিলুম। অন্ধকারে তাঁবুর ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছেনা। ঘর থেকে বারান্দা পেরিয়ে বাহিরে এলুম। আমাদের বড় পেট্রোম্যাক্স চারিধারটা আলো করে রেখেছে। কিন্তু দেখতে কিছুই পেলুমনা।

রাম সিং নিঃশব্দে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমিও নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকালুম।

ভুতো আবার সোজা হয়ে উঠল। আমার পায়ের কাছে এসে পা ঘষতে লাগল।

আমি রাম সিং-কে জিজ্ঞাসা করলুম: ব্যাপার কী?

সংক্ষেপে সে উত্তর দিল: কারণবাবা।

আশ্চর্য হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম: দেখতে পেলে?

রাম সিং মাথা নাড়ল। মানে, দেখতে পেয়েছে।

আমি আরও বিস্মিত হলুম। বললুম: বল কি!

কিন্তু রাম সিং এ কথার উত্তর দিলনা। সে শুধু প্রশ্নের উত্তর দেয়, তা না হলে চুপ করে থাকে। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলুম: কারণবাবাকে তুমি নিজের চোখে দেখলে?

রাম সিং ঘাড় নেড়ে বলল : হাঁ হুজুর।

সঙ্গে আর কে ছিল ?

রাম সিং তাঁবুর দিকে তাকাল।

জিজ্ঞাসা করলুম : গোবিন্দ ?

জী।

আমি চমকে উঠলুম : গোবিন্দকে তুমি কারণবাবার সঙ্গে দেখলে !

রাম সিং-এর উত্তর তেমনি সংক্ষিপ্ত : হাঁ হুজুর।

এতক্ষণ টের পাইনি যে আরও কয়েকজন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মনে হল কেউ ছুটে গিয়ে আমাদের তাঁবুর ভিতরেও ঢুকল। পরক্ষণেই বেরিয়ে এলে দেখলুম, সে সোহন। বলল : নেই তিনি।

টর্চ জেলে আমিও দেখলুম তাঁবুর ভিতর ও বাহির। কোথাও সে নেই। ঘড়িতে দেখলুম, রাত বারোটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। আমাদের এই কৃত্রিম আলোর পরিধির বাহিরে অমাবস্যার অন্ধকার থিতিয়ে আছে। সেদিকে যাবার কথা ভাবতে ভয় হয়।

রাম সিং তবু একটা লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে এল। তাই দেখে সাহস হল। বললুম : চল।

এই চলার উদ্দেশ্য কী জানিনে। রাম সিং-এর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে কারণবাবা উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছেন, মানে, শ্মশানের দিকে। অমাবস্যার রাতে হয়তো কোন ক্রিয়া করবেন। কিংবা শবসাধনা। আমাদের তাতে দরকার নেই। শুধু গোবিন্দর জন্যই আমাদের মাথাব্যথা। কিন্তু সে কেন ছুটল ? আগে থেকেই কি সে তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছিল ? আমাদের তাহলে জানানো উচিত ছিল। তাতে আর কিছু না হোক, আমাদের এই হয়রানিটা বাঁচত।

আমার পিঠে বন্দুক আছে, হাতে টর্চ। সামনে সোহনরা দুজন। লণ্ঠন হাতে এগিয়ে চলেছে। দিনের বেলায় যে-সব স্থানে যেতে এদের ভয়ের অন্ত নেই, এই অন্ধকার রাতে সেখানেই এরা নির্ভয়ে চলেছে। আমি তাদের যেতে বলিনি। একা যেতে ভয় করলেও এদের যেতে বলতুম না। এরা স্বেচ্ছায় এসেছে। এদের নাড়িতে যে কর্তব্যবোধ, সে এ যুগের নয়। এ কালের ছেলে আইন জানে, আন্তরিকতা জানেনা। তর্ক শিখেছে, ত্যাগ শেখেনি। কিন্তু এই পুরনো অশিক্ষিত মানুষগুলোর কর্তব্যবোধের পরিধি অনেক বড়। সরকার-নির্দিষ্ট কাজ থেকে প্রভুর সেবা পর্যন্ত সবই তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই চেতনা থেকে তারা প্রেরণা পায়। ভয়-ডর অগ্রাহ্য করে দুঃসাহসের কাজ করে।

চলতে চলতে আমি তাদের কথাই ভাবছিলুম। আর কান পেতে শুনছিলুম তাদের গল্প। সোহন বলছিল : গোবিন্দবাবু একটু ঐ ধরনের।

ঐ ধরনের মানে ?— তার সঙ্গী জানতে চাইল।

সোহন বলল : একটু কেমন-কেমন।

তার সঙ্গী বিরক্ত হল, বলল : তোমার কথার কোন মাথামুণ্ডু নেই। ভাল করে বুঝিয়ে বল।

সোহন ভাবল খানিকক্ষণ। তারপর বলল : যখন কাজ করে তো খাওয়া-দাওয়ার কথা সব ভুলে যায়। আবার যখন করেনা, তখন সারাদিন শুয়েই কাটায়।

গম্ভীরভাবে তার সঙ্গী সমর্থন করল, বলল : তা ঠিক।

সোহন বলল : ঠিক মানে ? আলবৎ ঠিক। আজ দেখলিনা, না-খেয়ে না-দেয়ে সারাদিনটাই কাটিয়ে দিল। আর আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান।

তার সঙ্গী বলল : এখন কী হবে ?

সোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মানে, ভগবান জানেন।

সকলের সামনে চলছিল ভুতো। লাফিয়ে লাফিয়ে পথ দেখিয়ে চলেছে।

সোহনের সঙ্গী বলল : দিনটা আজ ভাল নয়।

সোহন বলল : অমাবস্যা নয়তো।

অমাবস্যার নামে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অদ্ভুত অন্ধকার। একদিকে অরণ্যময় পাহাড়, দুরন্ত নদী কালী বইছে তারই কোল ঘেঁষে। অন্যদিকে গভীর বন। গ্রামের দিক থেকে স্তরে স্তরে দুর্গম হয়ে বন এই নদীর তীরে এসে মিশেছে। মাথার উপরে আকাশ দেখা যায়না। গাছে গাছে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দুএকটা তারা দেখে সন্দেহ হয় যে সে বুঝি জোনাকি। গাছের পাতায় আটকে আছে। যেদিকে আমরা চলেছি, সে স্থান আরও অন্ধকার। দিনের বেলাতেও যে সেখানে আলো পৌঁছয়না, তা আমরা দেখে এসেছি। আজ কী দেখব, তা ভাবতে ভয় করছে।

সেদিন আমরা গোবিন্দকে খুঁজে পেয়েছিলুম অচেতন অবস্থায়। কেন জানিনা, আজও ইচ্ছা হল তাকে অচেতন দেখবার। চলতে চলতে যদি তাকে পথের ধারে কুড়িয়ে পাই, তাহলেই যেন ভাল হয়। তাহলেই আনন্দ পাই বেশি। কিন্তু কেন এমন ইচ্ছে হল, সে কথা ভাবতে গিয়ে শ্মশানের কথা মনে হল। তাকে খুঁজে পেলে শ্মশানে

আমাদের যেতে হবেনা। যেতে হবেনা কারণবাবার কাছে। এমন শ্মশানচারী মানুষের কাছে না যাওয়াই মঙ্গল।

সোহন বলছিল : কিরে, অমাবস্যার নামে ভয় পেলি নাকি ?

তার সঙ্গী বলল : ভয় পেলেই বা উপায় কী !

সোহন তাকে সাহস দিল। বলল : বাবুর হাতে বন্দুক আছে।

বন্দুক : লোকটা হাসল : ভূত-প্রেতের ওপর কি বন্দুক চলবে !

রাম রাম, রাম রাম !

সোহন বুঝি নিজেকেই সাহস দেবার চেষ্টা করল।

তার সঙ্গী হঠাৎ বলে উঠল : গরিবের চাকরি যেন বংশে কেউ না নেয়।

আমি জানি, এ তার মনের কথা। তার কেন, অনেকেরই মনের কথা। পেটের জন্য কত লোককেই তো দেশ ছাড়তে হয়। কিন্তু সারা জীবন মাঠে-ঘাটে ঝাড়ে-জঙ্গলে কাটাতে হয়না। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা যায় মাথার উপর দিয়ে। রাতে ঘুম হয়না বাঘ-ভালুকের ভয়ে। কোথাও মশা, কোথাও জোঁক, কোথাও বা রোগ আর দুর্ভোগ। লোকটা ঠিকই বলেছে, গরিবের চাকরি যেন বংশে কেউ না নেয়।

সোহন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সঙ্গীও দাঁড়াল। টর্চ জেলে দেখলুম, ভূতো আর এগোচ্ছেনা। শুধু লেজ নাড়ছে। গায়ে আলো পড়তেই লাফিয়ে পেছিয়ে এল। আমার পায়ে গাল ঘষতে লাগল ব্যস্ত ভাবে।

আমি লক্ষ্য করলুম, ভূতো আজ ঘেউ ঘেউ করলনা। কিছু যে দেখতে পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখতে পেয়েও চুপ করে রইল। নিশ্চয়ই চেনা মানুষ দেখেছে।

আমি আলো নিবিয়ে অন্ধকারের ভিতরেই দেখবার চেষ্টা করলুম। সোহনদের বললুম, পিছিয়ে আসতে। খুব আস্তে আস্তে। কিন্তু উপর থেকে হুট-হুট করে কে সাড়া দিল। অদ্ভুত আওয়াজ, কি পাখীর ডাক, তা বুঝতে পারলুম না। গায়ে তবু কাঁটা দিয়ে উঠল।

খানিকটা তফাতে মনে হল, গোবিন্দর মতো কে একজন পদ্মাসনে ধ্যানস্থ হয়ে আছে। মানুষ চিনতে ভূতোর কখনও ভুল হয়না। কিন্তু সে-ও আজ আমার পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে লেজ নাড়ছে। আমি স্তব্ধ হয়ে পরিবেশটা অনুভব করলুম। গোবিন্দ নিশ্চয়ই আমার বেশি আগে বেরয়নি। হয়তো ছুটে এসেছে বলে কিছু আগে পৌঁছেছে। কারণবাবার সঙ্গে ব্যবস্থা করা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি এমন নিশ্চিন্তমনে ধ্যানে বসতে পারতনা। তিনিও হয়তো কাছে কোথাও যোগে বসেছেন।

আমার কৌতূহল হল উদ্দীপিত। পিছিয়ে এসে সোহনকে বললুম ফিরে যেতে। গোবিন্দর শ্রবণ বাঁচিয়েই কথাটা বললুম। সোহন চমকে উঠল। বলল : এই শ্মশানের ভেতর আপনাকে ফেলে যাব !

বললুম : তা ছাড়া যে উপায় নেই। এতগুলো মানুষ থাকলে এদের কাণ্ড-কারখানা আর দেখা যাবেনা।

দেখে আশ্চর্য হলুম, সোহন কোন তর্কে প্রবৃত্ত হলনা। তার সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার প্রহরী রইল ভূতো। খানিকটা তফাতে থাবা পেতে বসে আমাকে সাহস যোগাতে লাগল অযাচিতভাবে।

দূরে নদীর জলের কাছে অল্প-অল্প আগুন জ্বলছে। মনে হল, সেই আলোর কাছে আমি কারণবাবাকে দেখতে পাচ্ছি। কারণবাবাকে আমি চিনিনা, কখনও চোখে দেখিনি। কিন্তু তিনি ছাড়া যে আর কেউ এই অমাবস্যার রাতে শ্মশানে সাধনা করতে আসবেন না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। কারণবাবা কি এসেই এখানে ধুনি জেলেছেন ? কিন্তু এ তো নতুন আগুন নয়, এ আগুন তো নিবে আসছে। তবে কি এ কোন চিতার আগুন !

চিতার কথাতেই শব-সাধনার কথা মনে এল। শুনেছি শ্মশানচারী তান্ত্রিকরা নাকি চিতার শবকেও টেনে বার করে তার উপর সাধনায় বসেন। এমনই বীভৎস এঁদের ক্রিয়া-কলাপ যে এঁদের দেখলেই শ্মশানযাত্রীরা শব ফেলে পালিয়ে যায়। ছেলেবেলায় এই সমস্ত ঘটনার অনেক মুখরোচক গল্প শুনেছি। তারপর শুনেছি গোবিন্দর কাছে। চণ্ডালের মৃত দেহ নাকি প্রশস্ত। সেই মৃত্যু যদি লাঠি খড়্গ বা বজ্রের আঘাতে, শূলের উপরে, বা সর্প-দংশনে হয়ে থাকে, তাহলে আরও ভাল। যুদ্ধে নিহত বা জলমগ্ন হলেও ভাল। তরুণ কান্তিমান দেহ হলে তো রীতিমতো উপাদেয়।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল, কারণবাবা বসে নেই। তিনি কিছু করছেন। সেই অস্পষ্ট আলোর মনে হল, তাঁর সামনে একটা শব দেখতে পাচ্ছি। তিনি বোধহয় শবেরই পূজা করছেন।

গোবিন্দ বলেছিল, অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে অথবা

কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারে শব-সাধনা করতে হয়। স্থান-নির্বাচনের একটা নির্দেশ আছে। নির্জনে শূন্যগৃহে বিল্বমূলে কিংবা বন পর্বত নদীতীর বা শ্মশানে এই সমস্ত ক্রিয়া করা উচিত। কারণ ও উপচার নিয়ে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বেরতে হবে। প্রথমে পূজা করতে হবে গুরু গণেশ ও যোগিনীর। তারপর বলিদান। কারণবাবার বলিদান আজ হয়েছে কিনা আমি দেখতে পাইনি।

খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি কারণবাবাকে লক্ষ্য করছিলুম। এবারে মনে হল, তিনি শবের পিঠে কিছু মাখাচ্ছেন। গোবিন্দর কাছে শুনেছিলুম, চন্দন লেপন করতে হয়। তার পর কিছু পাতলেন। বোধহয় কম্বল ও মৃগচর্ম। গোবিন্দর কাছে আমি তাই শুনেছিলুম। গোবিন্দ বলেছিল যে কোন্ একটা তন্ত্রে আছে, মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধ্যায় ভেড়া ছাগল ও মহিষের শব গ্রামের বাইরে কোন জায়গায় ফেলতে হয়। আর তার সঙ্গে বীজযুক্ত কবচ। সাধক মাঝখানের একটা কবন্ধের উপর গন্ধর্ব রূপে আরোহণ করে সাধনা করবে। গন্ধর্বের রূপটা আমার মনে আছে। মুখে পান আর চোখে কাজল। তাহলেই হল।

কারণবাবা যখন উঠে দাঁড়ালেন, তবে আমি কণ্টকিত হয়ে উঠলুম। অস্পষ্ট আলোতেও আমি স্পষ্ট দেখলুম, তাঁর গলা থেকে কয়েকটা নরমুণ্ড ঝুলছে। কয়েকটা ধব্‌ধবে সাদা বস্তুর উপরে কালো কালো গর্ত। আমার দিকে চেয়ে যেন দাঁত বার করে বিদ্রূপ করছে। তারপর—

তারপর যা দেখলুম, তা বলতে পারবনা। এমন বীভৎস দৃশ্য বুঝি কল্পনা করাও যায়না। গোবিন্দ আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু কারণবাবা ক্ষেপে গেলেন। যাচ্ছে তাই গালাগালি শুরু করলেন।

আমি কী করব, ভেবে পাচ্ছিলুম না। হঠাৎ দেখলুম, দুধার থেকে দুটো লোক ছুটে এসে গোবিন্দকে আমার কাছে টেনে আনল। হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু ভূতোর লেজ-নাড়া দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম যে, চিন্তার কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্ত হলুম সোহনের গলা শুনে। বলল: পালিয়ে চলুন হুজুর। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

গোবিন্দর হাত ধরে ওরা ছুটছিল। আমিও ছুটলুম। ভূতো আমার পাশে পাশে ছুটতে লাগল।

তের

অনেকটা পথ দৌড়ে এসে আমরা দাঁড়ালুম। সোহনরাও গোবিন্দর হাত ছেড়ে দিয়েছে। ভূতো দেখলুম চারিদিকে নজর রেখেছে, পিছনেও দেখছে ফিরে ফিরে। অন্ধকার বন ছাড়া আর কিছু আমাদের নজরে পড়লনা।

অনেকক্ষণ চলবার পরে সোহন বলল: কারণবাবার খাঁড়াখানা দেখেছিলেন হুজুর?

বললুম: না তো।

সোহন বলল: আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম।

তারপরেই শিউরে উঠল। অন্ধকারেও আমি তার আতঙ্ক দেখলুম স্পষ্টভাবে।

বললুম: তাতে ভয় কিসের?

আস্তে আস্তে সোহন বলল: এ পর্যন্ত উনি এক-হাজার নরবলি দিয়েছেন, আর আটটা দিলেই ওঁর একটা সংকল্প পূর্ণ হবে। গাঁয়ের লোক বলছে, অন্ধকারে মানুষ দেখলে বাবা আর ছেড়ে দিচ্ছেন না। মন্ত্র পড়ে ভেড়া বানিয়ে দিচ্ছেন। তারপর এই শ্মশানে এনে—

বাকিটুকু সে আর বলতে পারলনা। তার সঙ্গী বলল: আমাদের বাপ-মায়ের অনেক পুণ্য, তাই আজ রক্ষা পেয়ে গেলাম।

বাপ-মায়েরই পুণ্য বটে: আমি উত্তর দিলুম: তা না হলে আজ বাবার এক রাতেই চারটে বলি মিলত।

সোহন বুঝি আর্তনাদ করে উঠল: রাম রাম!

কারণবাবাকে আমি দূর থেকে দেখেছি। আবছায়া আলোয়। কাপালিক বলতে আমার চোখের সামনে যে-মূর্তি ভেসে ওঠে, ঠিক তার উল্টো। কেন জানিনা, আমার ধারণা হয়েছে যে কাপালিকরা বিরাট পুরুষ। দীর্ঘাঙ্গ, সুগঠিত কঠিন দেহ, লাল টকটকে ফরসা রঙ। মুখে গোঁফ দাড়ি আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু কারণবাবাকে বেঁটেখাটো রোগা মানুষ বলেই মনে হল। রঙও বোধহয় ময়লা। অন্তত অন্ধকারে তাই মনে হল। মুখ ভর্তি গোঁফ দাড়ি। যখন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁকে ধনুকের মতো বাঁকা দেখাচ্ছিল। বললুম: মানুষ হয়ে মানুষকে ভয় পাচ্ছিল?

গম্ভীরভাবে সোহন বলল: মানুষই তো মানুষের শত্রু হুজুর। মানুষকে তো বাঘে খায়না, ভগবানও মারেনা। মিছিমিছি আমরা ভগবানের দোষ দিই।

হয়তো কথাটা সত্য। কিন্তু এদের মুখে তেমন মানায়না। আমি গল্প করছিলুম গোবিন্দর সঙ্গে। তার কথা বলা দরকার। কিন্তু কিছুতেই এখন বলবেনা। প্রশ্ন করলেও উত্তর দেবেনা। আমাদের কথার ভিতর অতর্কিতে যদি বলে ফেলে, সেইজন্যই সোহনের সঙ্গে কথা বলে

যাচ্ছি। বললুম : আমার কুষ্ঠিতে কিন্তু এই কথাই লেখা আছে।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে সোহন আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : মানুষের হাতে আমার মৃত্যু হবে।

আপনার!

সোহনের বিস্ময় দেখে মনে হল যে এই কথাটা আমার ক্ষেত্রে তত বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছেনা। যদি গোবিন্দর হত, তাহলে খুব সহজেই মেনে নেওয়া যেত। এখানে এসে অবধি গোবিন্দর আচরণ বদলে গেছে। হয় কিছু ভাবছে, নয় বেয়াড়া ব্যাপার কিছু করে বসছে। এ সমস্ত যে কারণবাবার কারসাজি, তাতে আর কারও সন্দেহ নেই। তিনি না টানলে গোবিন্দ এমন ছুটে ছুটে বেরবে কেন।

এইখানেই যদি সব কিছুর শেষ হত, তাহলে ভাবনা ছিলনা। মনে হচ্ছে, এই তো সবে শুরু। এর পরিণামটা আমরা ভাবতে পারছিনা। আমাদের কল্পনার যে পরিণাম, সে বড় নির্মম, বড় ভয়ানক। সে কথা ভাবতেও বুকের রক্ত একেবারে জমে যায়! কিছুতেই আমরা তা ভাবতে পারিনে।

একসময় আমরা সমস্ত পথ অতিক্রম করে ক্যাম্পে এসে পৌঁছলুম। পথে গোবিন্দ একটা কথাও বলেনি। বলল নিজের তাঁবুতে ঢুকে : কাজটা তোমরা ভাল করনি।

আমি কোন উত্তর দিলুমনা।

গোবিন্দ বলল : আমি বাবার উত্তরসাধক হয়ে বসে ছিলুম। তোমরা জোর করে আমায় ধরে আনলে।

কথা শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। তবু আমি চুপ করে থাকলুম।

গোবিন্দ বলল : শ্মশান-সাধনার একটা সুযোগ পেয়েছিলুম। তোমরা আমায় সে সুযোগটা থেকে বঞ্চিত করলে।

তোমার লজ্জা করেনা : আমি আর উত্তর না দিয়ে থাকতে পারলুম না : আমরা তোমায় চেঁচিয়ে উঠতে বলেছিলুম, তাই না?

গোবিন্দ সত্যিই লজ্জা পেলনা। বলল : প্রথম প্রথম শ্মশানে গিয়ে সবাই চেঁচায়। বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, তিনি নিজেও বোধহয় চেঁচিয়েছিলেন।

বললুম : আমরা তো চেঁচাইনি। যে সোহন দিনের বেলায় শ্মশানের নাম করতে ভয় পায়, উঠতে বসতে রাম রাম করে, সে কিনা তোমাকে উদ্ধার করে আনল।

গোবিন্দ বলল : তোমরা কেন বিভীষিকা দেখবে! ও তো আমাদের দেখবার জিনিস! তবে সাধনার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তাই এত বিঘ্ন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কালীর দর্শন মেলে।

আমি বিশ্বাসের প্রশ্ন তুললুম না। বললুম : সিদ্ধিলাভের চেষ্টার আগে নিজের মাথাটা ঠিক রেখো। ওখানে গোলমাল হলে সবই ব্যর্থ। একেবারে লঙ্কা সিদ্ধি।

সেইসঙ্গেই যোগ করলুম : প্রাণের কথাটাও মনে রেখো। ওটাও গেলে আর ফিরে পাবেনা।

গোবিন্দ এসব কথার উত্তর দিলনা। খাটে উঠে সটান শুয়ে পড়ল।

আমিও শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুম যে আর আসবেনা, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম।

গোবিন্দও উসখুস করছিল। তাই দেখে বললুম : ঘুম আসছেনা বুঝি?

গোবিন্দ উত্তর দিলনা।

বললুম : কার কথা ভাবছ? কারণবাবার, না পেমার দিদির?

কী যা-তা বলছ।— গোবিন্দ ধমক দিল।

হেসে বললুম : চটছ কেন। পুরাকালে ঋষিদের তপোভঙ্গ হয়েছে, আর আমাদের হলেই দোষ!

গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে রইল।

বললুম : সত্যি বলছি ভাই, মেয়েটাকে দেখে অবধি আমার মনটাও বড় উতলা হয়েছে। এমন রূপ অনেকদিন চোখে পড়েনি!

আমার মনে হচ্ছিল, শব-সাধনার চেয়ে প্রেমে পড়া ভাল। দুটো রোগেই মাথা খারাপ হয়। কিন্তু একটা আর একটার চেয়ে এক হিসেবে ভাল। শব-সাধনায় মাথা খারাপ হলে সারাবার পথ থাকেনা, কিন্তু প্রেমে পড়ে মাথা বেগড়ালে বেয়ে ভূত নামানো যায়। এই ধারণা থেকেই আমি তোমায় গল্প শুরু করেছি।

কিন্তু তার পর?

তারপর আর ভাবতে পারছিনে। তারপরের ভাবনা পরেই ভাবব। আপাতত তো তাকে শ্মশান থেকে আশ্রমে ফেরাই। বললুম : তোমাকে বেশ ভাল করে দেখেছে তো?

গোবিন্দ উত্তর দিলনা।

কিন্তু অনেক কথা আমার জানবার ছিল। বললুম : ঐ পরিবেশে তাকে খুশী দেখলে?

পুরনো অন্ধ-সংস্কার নিয়ে

আপনার উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ নষ্ট করছেন কি ?

এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা কোন সুযোগই হাতছাড়া করেন না মনে ক'রে নিজেদের আধুনিক ব'লে গর্ব বোধ করেন। কিন্তু আসলে তাঁরাই অন্ধ-সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে নিজেদের সুযোগই নষ্ট করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, রান্নার জন্যে স্নেহজাতীয় জিনিসের কথাই ধরুন। অনেকেই বলেন "বনস্পতি দিয়ে রাঁধা খাবার আমি কখনো খাই না। এটা একটা কৃত্রিম স্নেহ। কাজেই প্রাকৃতিক স্নেহপদার্থের মত ভাল হতেই পারে না।" অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র তৈরী করতে মানুষের অসাধারণ যত্ন ছাড়া এর ভেতর কৃত্রিম ব'লে কিছুই নেই।

আগাগোড়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ

বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী একটি বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়। এই বিশুদ্ধ স্নেহপদার্থ সহজেই হজম হয় ও সবরকম রান্নার পক্ষেই উৎকৃষ্ট—কারণ বনস্পতি দিয়ে রাঁধা খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয় না। বনস্পতি কেনায় ও ব্যবহারে খরচ কম…কারণ এর প্রতিটি আউন্সই খাঁটি ও পুষ্টিকর।

ভাল খাদ্য ও ভালভাবে বাঁচার জন্যে

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স স্নেহজাতীয় পদার্থ খাওয়া দরকার। বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু বনস্পতি অল্প খরচে আপনাকে এই সুযোগ দিচ্ছে। ভাল খাদ্য ও ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্যে বনস্পতির ব্যবহার সুরু করা আপনার উচিত নয় কি ?

বনস্পতি — বাড়ীর গিন্নীর বন্ধু

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

VHA 9203

গোবিন্দ উত্তর দিল : না।

তবে কি সে দুঃখে আছে ?

তাও না।

তবে ?

গোবিন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল : জানিনা।

কেন ?

কেন আবার ! এসব কথা সে আমাকে কেন বলবে।

সে বলবে কেন। নিজের তো একটা ধারণা আছে। তাকে দেখে তোমার নিশ্চয়ই কিছু মনে হয়েছে। আমি সেই কথাই শুধু জানতে চেয়েছি।

গোবিন্দ সংক্ষেপে বলল : তুমি নিজে জানতে যেয়ো।

দেরি না করে আমি বললুম : আমিও তাই ভাবছি।

দম-দেওয়া পুতুলের মতো গোবিন্দ সোজা হয়ে উঠে বসল। বলল : কী ভাবছ ?

মনে মনে আমি হাসছিলুম। বললুম : ঐ তান্ত্রিকটার হাত থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করা দরকার। কোথায় একটা সুস্থ পুরুষের সঙ্গে ঘর করবে, তা নয় ঐ বীভৎস বুড়োটা ! মেয়েটা এতদিন কেন আত্মহত্যা করে মরেনি, তাই ভাবি।

গোবিন্দ আমাকে ধমক দিল। বলল : তুমি গিয়ে কী করবে ?

কী করব : আমি উত্তর দিলুম : সোজা গিয়ে ভাব করতে শুরু করব। বোঝাব যে, ইচ্ছে করলে সে একটা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে, এবং তাই তার করা উচিত। ভাল করে বুঝিয়ে দেব যে, সে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ভেতর আটকা পড়েছে। অবিলম্বে তার বেরিয়ে আসা উচিত।

যদি না আসে ?

টেনে আনব। টেনে আনতেই তো যাচ্ছি।

কারণবাবা তোমাকে ছেড়ে দেবেন ভাবছ ?

সহজে ছাড়বেন না। কিন্তু আমিও ছাড়াতে জানি। দরকার হলে পুলিশ ডাকব।

গোবিন্দ গম্ভীর গলায় বলল : বাবার যৌগিক ক্ষমতার কথা ভেবেছ ?

তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম : কী করবেন তিনি ?

কী করবেন : গোবিন্দ একটু থেমে বলল : মারণ-উচাটন কোন কিছুই বাবার অজ্ঞাত নয়। শব-সাধনায় সিদ্ধপুরুষ কখন পুলিসের ভয় করেনা।

বললুম : সে দেখা যাবে। আগে তো মেয়েটার সঙ্গে ভাব করি।

খবরদার : গোবিন্দ আমাকে সতর্ক করল : তুমি ওধারে যাবেনা।

বললুম : তুমি বুঝি ভাব জমিয়েছ ?

উত্তর না দিয়ে গোবিন্দ শুয়ে পড়ল।

আমি হাসলুম মনে-মনে।

পনেরো

পরদিন দুপুরবেলায় ক্যাম্পে ফিরে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। গোবিন্দ তার আগেই ফিরে এসে সবাইকে তাড়া দিচ্ছে। তার তখনই বেরুতে হবে। কিন্তু তাড়া দিচ্ছে আমার জন্যই। আমি এত দেরিতে কেন ফিরি। যাত্রা নষ্ট হচ্ছে অনিয়মে। তাকে এই খবরটা এতদিন দেওয়া উচিত ছিল। তাহলেই সে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারত। আমি যে ফিরেছি, তা সে টের পায়নি। রাম সিং-কে বললুম : জিজ্ঞেস কর তো, তার নিজের স্বাস্থ্যের সে কী যত্ন-নিচ্ছে।

তুমি ফিরেছ : গোবিন্দ আমার দিকে ফিরে তাকাল : আর তর্ক নয়। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে নাও। আমাদের এখুনি বেরুতে হবে।

বললুম : কোথায় যাবে বল তো ?

কেন, কাল তো তুমিই যেতে চাইলে : গোবিন্দ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল : কারণবাবার সঙ্গেও তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। তন্ত্রমন্ত্রের যা কিছু ব্যাখ্যা তোমার দরকার, সবই তাঁর কাছে জেনে নিয়ো।

আর তুমি কী করবে : আস্তে আস্তে আমি যোগ করলুম : আড়ালে গিয়ে সোনার সঙ্গে বুঝি ভাব করবে ?

গোবিন্দর মেজাজ আজ প্রসন্ন ছিল। বলল : তোমার কোন আপত্তি নেই তো ?

হেসে বললুম : ছিটেফোঁটা আমাকেও দিয়ো।

খেয়েদেয়ে দুই বন্ধুতে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। বড় বড় ঝাউগাছগুলো সূর্যকে আড়াল করতে পারেনি। গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকছে। ছড়িয়ে পড়েছে এখানে সেখানে। আলো-ছায়ার এই খেলা আরও অনেকক্ষণ চলবে। গোবিন্দ বলল : কাপালিক দেখেছ আগে ?

বললুম : দেখেছি।

দেখেছ ?— গোবিন্দ ভারি আশ্চর্য হল।

বললুম : কলকাতায় কাপালিককে দেখেছি।

গোবিন্দ প্রাণভরে হাসল। বনের ভিতর এই হাসির

শব্দ ভারি অদ্ভুত শোনায়। মনে হয়, চারিদিকের গাছগুলো এই হাসি শুনে তটস্থ হয়ে উঠেছে। কারণ জানতে চাইছে। ভাবছে, পাগল নয়তো লোকটা! অনেকক্ষণ তারা কান পেতে থাকে। শোনবার চেষ্টা করে পরের কথাগুলো। আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, গাছগুলো সব অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে।

গোবিন্দ বলল: কী দেখছ চারিদিকে?

আমি আমার পাগলামির কথা তাকে বলতে পারলুম না। বললুম: ভুতোটাকে সঙ্গে আনলে ভাল হত।

ভুতের ভয় করছে বুঝি? কিন্তু তোমার ভুতো কারণবাবার ভূত তাড়াতে পারবেনা। না এনে ভালই করেছ।

ফেরার সময় সাহস যোগাত। অন্তত সময়মতো যে সতর্ক করতে পারত তাতে সন্দেহ নেই।

গোবিন্দ এ কথা মানলনা। বলল: কারণবাবার সঙ্গে পরিচয় হলে বুঝতে পারতে যে সে সবের কোনো প্রয়োজন নেই। বিপদ আসে অতর্কিতে, সতর্ক হবার সুযোগ দিয়ে আসেনা। তা এলে, সবারই সুবিধে হত।

বললুম: এইজন্যেই তো ভুতোকে আমি ভালবাসি। বিপদের কথা সে আমার আগেই টের পায়।

হঠাৎ গোবিন্দ বলল: দূরে কিছু দেখতে পাচ্ছ?

আমি চমকে উঠেছিলুম। দেখতে পেয়ে গোবিন্দ বলল: চমকাবার মতো কিছু নয়। মানুষ মনে হচ্ছে, তাই না?

মানুষ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কজন? গ্রামের দিক থেকে আসছে পাহাড়ের দিকে। মাঝে মাঝেই তারা হারিয়ে যাচ্ছে বড় বড় গাছের আড়ালে। এবারে তাদের ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলুম। একজন লাঠি হাতে চলেছে সন্তর্পণে। আর একজন তার পাশে পাশে। পাশের মানুষটি কি একটি মেয়ে? তার পরনে তো আঁটসাঁট পা-জামা দেখছিনে, দেখছি ঘাগরার মতো মলিন কাপড়। দুটো পা টেনে টেনে চলছেনা, একটি দেহ সাবলীল গতিতে চলেছে।

গোবিন্দর দৃষ্টি বোধহয় আমার চেয়ে ভাল। বলল: লোকটা বোধহয় অন্ধ। মেয়েটার হাত ধরে চলেছে।

আমি মিলিয়ে দেখলুম। মনে হল, গোবিন্দ ঠিকই বলেছে। বললুম: বোধহয় তাই।

গোবিন্দ বলল: বোধহয় কেন, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে।

আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিনে। বললুম: আমার দূরদৃষ্টি নেই।

গোবিন্দ বলল: সংসার-যাত্রায় দূরদৃষ্টির প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি।

বললুম: দূরদৃষ্ট বেশি কিনা, তাইতেই জ্বলে যাচ্ছে।

গোবিন্দ আবার হেসে উঠল।

গোবিন্দর আজ আমি অন্য রূপ দেখতে পাচ্ছি। বড় প্রসন্ন মন, দরাজ মেজাজ। বললুম: ব্যাপারটা কী বল তো!

গোবিন্দ বলল: তার তাড়া কিসের! নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।

বলতে কি বাধা আছে?

তোমার কাছে কিছুরই বাধা নেই।

তবে আর কি।

বলে তার মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু গোবিন্দ অন্য কথা বলল: ওরা কোথায় যাচ্ছে বলতে পার?

বুঝতে পারলুম, গোবিন্দ আমার প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেল। তাই আমিও কোন উত্তর দিলুম না।

গোবিন্দ বলল: ওরাও যাচ্ছে কারণবাবার আশ্রমের দিকে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: সেকি, সেখানেও কি মানুষ সাধ করে যায়?

গোবিন্দ হেসে বলল: বাবার সম্বন্ধে তোমার কিছুই জানা নেই, অথচ একটা ধারণা পুষছ মনে মনে।

ধারণা আমার নিজের নয়, দশজনের ধারণাকেই আমি নিজের বলে মেনে নিয়েছি।

বুদ্ধিমান লোকেরা কী বলে জান?

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল।

বললুম: অনেক কথাই বলে।

গোবিন্দ বলল: তার একটি হচ্ছে, নিজে দেখে বিচার করে ধারণা করবে। পরের ধারণা সম্বল করে নিজে কোন কাজ করতে নেই।

বললুম: বুঝেছি। তুমি বলতে চাও, ঐ কাপালিক-ঠাকুর একজন মহাপুরুষ।

গোবিন্দ বলল: একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও। কারণবাবার সম্বন্ধে ওদের কী ধারণা তা জানা যাবে।

তোমার নিজের ধারণা বুঝি বলতে চাওনা?

তাতে তোমার নিরপেক্ষ বিচারের অসুবিধা হবে।

কাজেই আমরা পা চালিয়ে চললুম। প্রতি পদক্ষেপে

মনে হল তারা আমাদের কাছে সরে আসছে। আরও একটু এগিয়ে দেখলুম, তারা সরে আসছেনা, এত ধীরে ধীরে হাটছে যে সে দাঁড়িয়ে থাকার মতন।

গোবিন্দ বলল : লোকটা যে অন্ধ তাতে সন্দেহ নেই।

কেন বল তো ?— আমি জানতে চাইলুম।

গোবিন্দ বলল : দেখছনা, জোয়ান মানুষটা কেমন এলোমেলো লাঠি ফেলছে। মেয়েটা ওকে নিয়ে যাচ্ছে, তবু বেশি সাহস পাচ্ছেনা।

ওরা বসে পড়লনা ?

তাইতো দেখছি।

আশ্রম আর কতদূর ?

- গোবিন্দ হেসে বলল : নদীর ওপারেই আশ্রম।

ওপারে !

আমি বিস্মিত হলুম অপরিমিত।

গোবিন্দ বলল : ভয় নেই, নদীর ওপরে ভাল পুল আছে।

তবে যে সেদিন আমি এপারে দেখলুম মেয়েটাকে ?

তাতে কী হয়েছে : গোবিন্দ উত্তর দিল : আমাদের ক্যাম্পেও তো যে কোনদিন আসতে পারে !

আমার একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

অন্ধ মানুষটা বসে ছিল নদীর ধারেই। বোধহয় জিরিয়ে নিচ্ছিল। আমার কাছাকাছি পৌঁছতেই মেয়েটা এগিয়ে এল। সোমার বয়সী সুশ্রী মেয়ে, কিন্তু বড় বিষণ্ণ মুখ। অনেক গ্রীষ্মের বেদনার দাহে ভিতরটা বুঝি জ্বলছে। গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করল পাহাড়ী হিন্দীতে : কারণবাবার আশ্রমটা আর কতদূর ?

গোবিন্দর যেন কতকালের চেনা, এমনি সহজভাবে বলল : তা চল না, আমি তোমায় পৌঁছে দেব।

পৌঁছে দেবে ?

মেয়েটার বিহ্বলতা হল অবর্ণিত। ছুটে গিয়ে সঙ্গী পুরুষটাকে বলল উঠতে, নিজে তার ছোট পুঁটুলিটা হাতে তুলে নিল। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, তার পিঠেও একটি পুঁটুলি বাঁধা। একটা কচি ছেলে সেই তো ওর ভিতর !

চলতে চলতেই গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল : তোমরা বুঝি অনেক দূর থেকে আসছ ?

মেয়েটা বলল : তা দূর বৈকি। দুদিন আমরা হাটছি।

দুদিন !— ভাবতে আমার কষ্ট হল।

মেয়েটা বলল : দেখনা এই লোকটাকে। বনের জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে চোখটা নষ্ট করেছে। আর সারা গায়ে ঘা।

পরম স্নেহের সুরে গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল : বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছে বুঝি ?

মেয়েটা বলল : বাঘ হলে তো ভাল ছিল, পেছন থেকে চোখে থাবা মারতনা। ওটা ছিল বেইমান নেকড়ে। সামনা সামনি আসবার সাহস নেই বলে পেছন থেকে থাবে।

গোবিন্দ বলল : তারপর ?

তারপরের কথা বলল ছেলেটা। নেকড়ে তো তাকে মারতে পারেনি, মারত যারে। এই মেয়েটা তার সর্বনাশ করেছে। বউ যে এমন শত্রু হয়, তা তার জানা ছিলনা।

গোবিন্দ হেসে বলল : শত্রুতা আবার কী করল ?

শত্রুতা নয় : ছেলেটা জবাব দিল : অন্ধ হয়ে সারা-জীবন বাঁচতে হবে। মরে গেলে আমিও বাঁচতাম, এও রক্ষা পেত।

মেয়েটা বলল : কথা শোন বাবু। এই নেমকহারামটার সঙ্গে আমার ঘর করতে হয়।

এদের কথোপকথন শুনে আমি আশ্চর্য হচ্ছিলুম। চেনা নেই পরিচয় নেই, অথচ কত সহজে আলাপ হচ্ছে। কোন্ দূর বাংলাদেশ থেকে আমরা এসেছি শিক্ষা ও সভ্যতার গর্ব নিয়ে। এরা অশিক্ষিত পাহাড়ী মানুষ। সমাজের রীতিনীতি আচার ভাষার কত বাধা। তবু কত সহজ। কত সহজে আমরা আত্মীয়ের মতো হয়ে গেলুম। মনে হল, সভ্যতাই একটা বাধা। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ সৃষ্টি করেছে সভ্যতা। এই পাহাড়ে বনে, নদীতীরে নির্জনে সভ্যতার আলো এসে এখনও পৌঁছয়নি। তাইতেই এরা এত সহজে আত্মীয় হতে পারে। বাঘকে ভয় পায়না, ঘৃণা করে নেকড়েকে। আমাদের সভ্যতাকেও কি এরা নেকড়ের মতো বেইমান মনে করে ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে গোবিন্দ বলল : তা কারণবাবার কাছে কেন চলেছ ?

এ প্রশ্নের উত্তর মেয়েটার তৈরিই ছিল। বলল : ওর চোখের জন্যে।

কারণবাবা কি চোখের ডাক্তার ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

ওসব বৈদ্যের এ কাজ নয় বাবু, যদি পারে তো সাধু-সন্তেই পারবে।

সেইসঙ্গেই যোগ করল : এই বাবার অসাধ্য কাজ

নেই। তেমন করে ধরতে পারলে গতি একটা হবেই। হয়েছেও তো দুপাঁচজনের।

সঙ্গটা তার পরে বলল: আমাদের গাঁয়েরই তো একটা লোকের চোখ সারালেন। রোগে ভুগে চোখ গেল অন্ধ হয়ে। সেই চোখ বাবা সারালেন।

তাও ভাল যে জন্মান্ধকে দৃষ্টি দেবার গল্প বলেনি। এই বৈজ্ঞানিক যুগে সে গল্প বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। রোগে অন্ধ হবার হয়তো অনেক কারণ আছে। সে বোধহয় সত্যিকারের অন্ধত্ব নয়। কাজেই ওষুধ দিয়ে বা অস্ত্র চালিয়ে ভাল করা সম্ভব। আমাদের সঙ্গে যে লোকটা চলেছে, তার চোখ দুটো নেকড়ে-বাঘে উপড়ে নিয়েছে। কিংবা নষ্ট হয়েছে থাবার ঘায়ে। এ চোখ কি সে ফিরে পাবে! তবু এরা বুক-ভরা বিশ্বাস নিয়ে চলেছে। বিশ্বাসে কী না মেলে!

এবারে আমরা নদীর ধারেই পৌঁছে গেলুম। এই জায়গাতেই নদী বোধহয় সবচেয়ে সংকীর্ণ। তাইতেই এখানে পুল তৈরি হয়েছে। দুটো গাছ পাশাপাশি ফেলা। এ পারকে যোগ করেছে ও পারের সঙ্গে। একটা গাছেরও পুল আছে শুনেছি, শুনেছি দড়ির পুলের কথা। তাইতেই এই পুলটা বড় নিরাপদ মনে হল। কিন্তু মেয়েটি ভয় পেল তার স্বামীর জন্য। গোবিন্দর দৃষ্টি বড় সজাগ। বলল: ভয় কী, আমি তো আছি।

বলেই সেই লোকটার একখানা হাত ধরল। মেয়েটা ধরল আর একখানা হাত। অপরিসর নদী। নিরাপদেই আমরা পেরিয়ে গেলুম।

যোগ

কারণবাবার আশ্রম দেখে ভারি আশ্চর্য লাগল। আশ্রম বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই সেখানে নেই। কোন কুটির নেই, মানুষ নেই, নেই কোন পোষা পশুপাখী। যা আছে, তা দেখে মন ভরেনা। কালো পাহাড়ের গায়ে পাশাপাশি দুটো গুহা আছে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন দুটি অপ্রশস্ত স্থান। একটির মুখের সামনে বড় একখানা পাথর ঠিক প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর একটির মুখ খোলা। কিন্তু ঐ খোলা মুখের দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠতে হয়। মাথার উপর থেকে গোটাকয়েক নরকপাল ঝুলছে। বীভৎস দৃশ্য। সোজা হয়ে ঢোকবার উপায় নেই। ঐ মুণ্ডগুলোকে এড়াতে হলে গুড়ি মেরে ঢুকতে হবে। ভিতরে একটা ধুনী জ্বলছে মনে হল। গোবিন্দ বলল: বাবার বৈঠকখানা ওটা।

আর এধারেরটা?— আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

গোবিন্দ বলল: শোবার ঘর।

ব্যবস্থা যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। খোলা বৈঠকখানা, কিন্তু পর্দা আছে শোবার ঘরের। পর্দা অতিক্রম করে উঁকি না দিলে ভিতরের জিনিস সহসা চোখে পড়েনা।

গোবিন্দ বলল: ওদিকে যেয়োনা।

শোবার ঘরের দিকে আমি যাচ্ছিলুম না। তবু সে আমাকে সতর্ক করে দিল। আমরা সবাই এলুম বৈঠকখানার সামনে।

ধুনীর আগুনে ভিতরটা অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। জনকয়েক লোক মনে হল জটলা করছে। গোবিন্দ এগোতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কয়েক হাত পিছিয়ে এল। বাজ পড়ার মতো একটা প্রচণ্ড শব্দ হল। তারই সঙ্গে কী একটা পদার্থ ছিটকে বেরিয়ে এল। আমরা দুধারে সরে গিয়েছিলুম। গোবিন্দ চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল: বাবা ক্ষেপে গেছেন!

যে পদার্থটি ছিটকে এসেছিল, সে সচল। একটা রুগ্ন মানুষ। গায়ে মুখে কুৎসিত রোগের দাগ। বুঝতে কষ্ট হলনা যে, ওকে দেখেই কারণবাবা ক্ষেপে গেছেন। গুহার ভিতর থেকে এক রকমের শব্দ আসছিল। অদ্ভুত গম্ভীর আওয়াজ। কারণবাবা বোধহয় বলছিলেন: ওষুধ নয়, বিষ দেব তোমাকে। কটা মেয়েকে খুন করেছ এ পর্যন্ত?

ভিতরে উত্তর দিচ্ছে অন্য লোক। বলছে: তুমি তো অন্তর্যামী বাবা। দিব্য চোখে তুমি সবই দেখতে পাচ্ছ। তুমি ক্ষমা না করলে—

কথা শেষ করার সুযোগ সে পেলনা। অকথ্য ভাষায় কারণবাবা গালাগালি শুরু করলেন।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলুম। যে রুগ্ন লোকটা বেরিয়ে এসেছিল, সেও মাথা গুঁজে বসে রইল। দ্বিতীয়বার ভিতরে যাবার সাহস তার হলনা।

কিন্তু ভিতরের মানুষটার সাহস দেখলুম অপরিমিত। নির্ভীকভাবে বলতে লাগল: ত্রিশূলখানা তো বাবা তোমার হাতের নাগালেই আছে। অমন গালাগালি না করে দাওনা আমার পেটটা ফুটো করে। আমিও রক্ষা পাই, তোমাকেও আর জ্বালাতন হতে হয়না।

এ কথার উত্তর কারণবাবা দিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে বললেন: শালা এইবার।

গোবিন্দ উঁকি দিচ্ছিল। বলল: ব্যাটা বেঁচে গেল।

কারণবাবা তাহলে ঐ লোকটার পেটে ত্রিশূল ফোটাননি। আমরাও নিশ্চিন্ত হলুম।

গোবিন্দ বলল: পেয়েছে কিছু।

আমি আস্তে আস্তে বললুম: কী পেয়েছে?

গোবিন্দ সে কথার উত্তর দিলনা। বলল: প্রসাদের ঘটা দেখ। সাষ্টাঙ্গে পড়েছে। এইবারে লাথি খাবে।

লাথি খেল কিনা আমরা দেখতে পেলুমনা। কিন্তু বেরিয়ে এল গড়িয়ে গড়িয়ে। বাহিরের আলোতে এসে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ল। তারপরেই সঙ্গীকে ধমক দিল: চল্ হতভাগা!

আমাদেরও সে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু কথা কইল সেই পাহাড়ী মেয়েপুরুষ দুটির সঙ্গে। বলল: এই বেলা ঢুকে পড়্, বাবা আজ খুশ মেজাজে আছে।

ভয়ে ভয়ে গোবিন্দকে আমি বললুম: এই তাঁর খুশ মেজাজ?

গোবিন্দ সহজভাবে উত্তর দিল: হাসতে হাসতে যে মানুষ বলি করতে পারে, তার এটা খুশ মেজাজ নয়?

কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু ভিতরে যাবার প্রবৃত্তি আমার হলনা। বললুম: আমি তাই ফিরে যাই।

গোবিন্দ আমার কথায় উত্তর দিলনা। বাহির থেকে হাঁক দিল: বাবা, ভেতরে আসব?

কারণবাবা এই বাবা সম্বোধনের যা উত্তর দিলেন, তাতে কানে আঙুল দেওয়া উচিত। গোবিন্দ কিন্তু খুশী হয়ে বলল: সত্যিই, বাবার মেজাজটা আজ ভাল আছে।

সেই মেয়েপুরুষ দুটি ইতস্তত করছিল। গোবিন্দ তাদেরকেও সঙ্গে ডাকল, বলল: চলে এস।

আমাকে ডাকল না। কাঁধে ভার দিয়ে মাথা নিচু করিয়ে ভিতরে ঠেলে দিল। নিজেরাও এল।

বাবার সম্বোধনগুলো অশ্রাব্য। সেইগুলো বাদ দিয়েই শোনা উচিত। বললেন: ব্যাটা এক দঙ্গল পঙ্গপাল নিয়ে এসেছে!

তাড়াতাড়ি গোবিন্দ বলল: আমার এক বন্ধুর কথা বলেছিলুম বাবা।

সেই নাস্তিকটা তো: বাবা উত্তর দিলেন: ওর মতলবটা ভাল নয়।

গোবিন্দ তখন সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করছিল। ভাবলুম, আমার বদনাম ঘোচাবার জন্য আমিও প্রণিপাত করব কিনা। কেন জানিনা, তা পারলুম না। কারণবাবা বললেন: হবেনা, হবেনা। তোমার দ্বারা এ সব হবেনা।

কথাটা আমার মনে লাগল। আমাকে লক্ষ্য করেই কি বললেন! কিন্তু কিছু প্রশ্ন করবার সাহস হলনা।

গোবিন্দর পর সেই মেয়েটি প্রণাম করল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তার স্বামীকে বলল প্রণাম করতে।

কারণবাবা বললেন: এ হতভাগাটা আবার কে?

গোবিন্দ বলল: দেশে কি দুঃখীর অভাব আছে বাবা।

কারণবাবা খানিকক্ষণ ধরে গালাগালি করলেন। তারপর বললেন: হতভাগা দেশের দোষে কি এরা আমার কাছে আসবে! এরা আসে নিজের কর্মফলের দোষে। দেখছিসনা ব্যাটা জানোয়ারকে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিল।

মেয়েটা আর্তনাদ করে বাবার পা জড়িয়ে ধরল, বলল: ঠিক বলেছ বাবা। হালচাল এর মানুষের মতো নয়।

এই আর্তনাদের সঙ্গে আমি শিশুর কান্না শুনতে পেলুম। এতক্ষণ যে পদার্থটি জড় মনে হয়েছিল, সে প্রাণবন্ত জেনে আশ্চর্য লাগল। শিশু কি এতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে! কারণবাবা ভেংচি কাটলেন। বললেন: কাচ্চা-বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে এসেছে! হতভাগা!

তারপরেই হাঁক দিলেন: গোবিন্দ!

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

একটা বোতল এগিয়ে দে তো।

লক্ষ্য করে দেখলুম যে অনেক কটা বোতল রাখা আছে। আরও কয়েকটা বোতল বেরুল সেই মেয়েটার ঝুলি থেকে। বোতলের নামে বুঝি তার নিজের ঝুলিটার কথা মনে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল: আমি এনেছি বাবা!

বাবা আর একদফা গালাগালি করলেন। বললেন: বোতল আনলেই ব্যবস্থা হবে, না? চোখ কখনও ফিরে পাওয়া যায়!

শিশুর কান্না থামেনি। তাকে সামলাতে সামলাতে কাতর স্বরে মেয়েটি বলল: তোমার দয়া হলে সব হয় বাবা।

কারণবাবা এ কথার উত্তর দিলেন না। বললেন: আজ রাতে চক্রের ব্যবস্থা কর্।

মেয়েটির চোখে মুখে দেখলুম আনন্দের লালিমা ফুটে উঠল। বোধহয় ভাবল, তারই জন্য এই ব্যবস্থা হচ্ছে। বলে উঠল: কর বাবা, আজ রাতেই ব্যবস্থা কর!

কারণবাবা একেবারে ফেটে উঠলেন। বললেন: হ্যাঁ, তোমার জন্যেই সব করছি!

তারপরেই করলেন অজস্র অশ্রাব্য গালাগালি।

ছোট ছেলেটার কান্না থেমে এসেছিল। আবার সে ফেটে পড়ল। মেয়েটা ততক্ষণে তার ছেলেকে পিঠ থেকে কোলে নামিয়ে নিয়েছে। পিছন ফিরে বসে ছেলের কান্না বন্ধ করল অতর্কিতে। ছেলেটা উঁ-উঁ করেই চুপ হয়ে গেল।

গোবিন্দ মধ্যস্থ হয়ে বলল: দুঃখী লোক বাবা!

বাবার গালাগালি থামল। বললেন: দুঃখী বলেই পাগল হতে হবে! কানা চোখ কেউ সারাতে পারে?

মেয়েটি একটুও ভয় পায়নি, বিচলিত হয়নি একটুও। বলল: তুমি সব পার বাবা! অন্ধ মানুষকে চোখ দিয়েছ, প্রাণও দিয়েছ। আর আমার বেলায় খারাপ চোখটা ভাল করতে পারবেনা!

আমি তো হতভম্ব: কারণবাবা একটা বিকট ভেংচি কাটলেন: চিমটেটা আন্, চোখটা ভাল করে উপড়ে দিই।

চিমটেটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া ছিল। মেয়েটা নিজেই এগিয়ে বাবার ভঙ্গি করে বলল: ওর কানা চোখ তুলে কী করবে, আমার চোখ জোড়া উপড়ে দাও।

এই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমার আশ্চর্য লাগছিল। এমন সপ্রতিভ মেয়ে আমি অনেকদিন দেখিনি। কোন দ্বিধা নেই, জড়তা নেই। সহজভাবে নিজের দাবি জানাতে এসেছে। জানিয়েছেও। মনে হল, কারণবাবাও ঠিক এমন মেয়ের সাক্ষাৎ আগে কখনও পাননি। তাইতেই হাঁক দিলেন: গোবিন্দ!

গোবিন্দ এগিয়ে গেল।

বাবা বললেন: কাল তোমার চক্রে বসতে বলেছিলাম, তাই না?

গোবিন্দ মাথা নাড়ল।

বাবা বললেন: আজ এই মেয়েটাকে নিয়ে বসো।

গোবিন্দ ভাল ছেলের মতো বলল: যে আজ্ঞে।

কেন জানিনা আমার মনে হল, এই মেয়েটা শুধু নিজের প্রয়োজনেই আসেনি, এসেছে চক্রেরও প্রয়োজনে। তান্ত্রিক চক্র কি চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে! গতকাল কারণবাবা চক্রের জন্য একটি মেয়ের প্রয়োজন আছে মনে করেছিলেন। সেই মেয়ে এসেছে নিজে থেকে। আর একটা মেয়ে—

সোমার কথা আমার মনে পড়ল। কই, তাকে তো দেখতে পাচ্ছিনে! এই পরিবেশে তার কী আকর্ষণ! তাকেও কি এদের চক্র চুম্বকের মতো টানছে! চেষ্টা করেও কি সে এই আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেনা?

কারণবাবা গোবিন্দকে বললেন: এই নাস্তিকটাকে বিদেয় কর্।

নাস্তিক যে আমাকে বললেন তাতে সন্দেহ নেই। আর একবার তিনি আমাকে এই কথা বলেছেন। আমি কথা ভাবছিলুম। কিন্তু এই অভিযোগ শুনে আর বললুম না। গোবিন্দকে বললুম: আমি তাহলে চলি।

গোবিন্দ আমাকে অনুমতি দিলনা, কারণবাবাকে বলল: ও এসেছিল তন্ত্রের আলোচনা শুনতে।

কারণবাবা অকথ্য ভাষায় তার উত্তর দিলেন। গোবিন্দকে বড় অসহায় দেখাল। তার মুখ চেয়েই আমি চুপ করে বেরিয়ে এলুম। কোন কথার উত্তর দিলুম না। গোবিন্দ একবার আমার আর একবার কারণবাবার মুখের দিকে চেয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সতেরো

গুহার ভিতর থেকে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসবার সময় ভাবিনি যে বাইরে এসে সৌভাগ্যের সন্ধান পাব। সোমা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই হেসে উঠল উজ্জ্বল আবেগে। শব্দহীন হাসি। আমি লক্ষ্য করে আশ্চর্য হলুম যে সে হাসিতে শব্দ ছিলনা। সোমা বলল: ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছ তো?

সংক্ষেপে উত্তর দিলুম: না।

না মানে?

বললুম: তাড়িয়ে দিলেন।

হাসতে হাসতেই সোমা বলল: সবাইকেই তো তাড়িয়ে দেন। কিন্তু কেউ যায়না।

সোমার কাঁকালে ছিল কলসী। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বেলা পড়ে এসেছে। জলকে চলার সময়। জিজ্ঞাসা করলুম: কোথায় যাচ্ছ?

উত্তর না দিয়ে সোমা তার কাঁকালের কলসীটা দেখাল। সমস্ত শরীরটা উঠল দুলে। বেহায়ার মতো আমি তাকে খুব ভাল করে দেখলুম। নির্লজ্জের মতো। কিন্তু সোম লজ্জা পেল। কলসীর নিচে থেকে শাড়ির আঁচলটা আর বেশি করে টেনে নিল। আরও ঘন করে দেহটাকে ঢাকবার চেষ্টা।

আমি তোমার সঙ্গে যাব?— আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

সোমার আপত্তি করা উচিত ছিল। কিন্তু তা করলনা সঙ্গে যাবার অনুমতিও দিলনা। ঘাড়টা একটু কাৎ ক তরতর করে এগিয়ে গেল।

আমার মনে হল, সোমা আমাকে ডেকেই গেল। আমি আর অপেক্ষা করলুম না। তারই পিছনে এগিয়ে গেলুম।

সোমা সেই নদীর পুলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধরে ফেললুম। বললুম: নদীর এপারে কি জলের ঘাট নেই?

কেন থাকবেনা!— সোমা উত্তর দিল।

তবে যে ওপারে যাচ্ছ?

সংক্ষেপে সোমা বলল: ইচ্ছে।

ভারি বেয়াড়া ইচ্ছে তো। এতখানি পথ জল বইতে তোমার কষ্ট হয়না?

যদি বলি, আনন্দ পাই?

তাও বিচিত্র নয়। সারাদিন হয়তো খাঁচায় পাখির মতো বন্দী হয়ে থাকে। এই জলকে চলার নামে খানিকক্ষণের মুক্তি। বললুম: আমি নিশ্চয়ই আনন্দ পাব।

সোমা একটা কটাক্ষ হানল।

আমার ভাল লাগল।

ওই মেয়েটা কে?

পিছন ফিরে সোমা জানতে চাইল।

বললুম: দুঃখী মেয়ে।

পিঠে ওর ছেলে বুঝি? ওর নিজের ছেলে?

উত্তর না দিয়ে আমি হাসলুম।

সোমা বোধহয় আমার হাসি দেখতে পায়নি। বলল: ভারি রুগ্ন ছেলেটা, তাই না?

তুমি দেখলে কী করে?

লুকিয়ে দেখেছি। কালো তুলো তুলো গাল, ড্যাবা ড্যাবা চোখ, পিটপিট করে চাইছিল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে আমি সোমার দিকে তাকালুম। মনে হল, সে এখনও ঐ ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছে। তার সমস্ত মন এখন একটি শিশুর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কথা বলে আমি তার আবেশ নষ্ট করলুমনা।

একখানা পাথরের উপর বেকায়দা পা পড়তেই তার ধ্যানভঙ্গ হল।

আমি তার পাশে পাশে চলছিলুম। একসময় প্রশ্ন করল: তোমার ভয় করেনা?

কিসের ভয়?

এই যে আমার পাশে পাশে চলেছ, বুড়ো দেখতে পেলে তোমার মুণ্ডপাত করবে।

গালাগালির ভয় আমি পাইনে। গালাগালি ছোটলোকে করে।

বড়লোকে বেশি করে।

বললুম: যারা করে তারা ধনী হতে পারে, কিন্তু বড়লোক নয়। মেজাজে মানুষ বড়লোক হয়, টাকায় নয়।

সোমা আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হল, এ কথা তার বিশ্বাস হল না। বললুম: কেন, ঠিক বলিনি?

সোমা আমার উত্তর দিলনা। বলল: তাহলে গরীব কারা?

হেসে বললুম: যারা কিছু নেই ভাবে, তারাই গরীব।

যাদের সত্যি কিছু নেই?

মন মেজাজ সকলেরই আছে। নিজেকে রাজা ভাবতে বাধা কিসের।

তাতে তো পেট ভরবেনা।

সোমা উত্তর দিল দুঃখিত চিত্তে।

সহসা এ কথার উত্তর আমি খুঁজে পেলুমনা। পেট এমন জিনিস যেখানে কোন ফাঁকি চলেনা। কথার বক্তৃতায় পেট ভরেনা, শাস্ত্রালোচনায় ভরে না, যোগাভ্যাসেও বোধহয় ভরেনা। শুধু মাত্র খাদ্য দিয়ে পেট ভরে। আজকের বিজ্ঞান গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু বিনা খাদ্যে পেট ভরাবার ব্যবস্থার কথা ভাবছেনা। উপায় থাকলে হয়তো ভাবত। তবু আমি সোমাকে একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করলুম। বললুম: খিদের কথা ভুলতে পারবে।

সোমা উত্তর দিতে দেরি করলনা, বলল: খিদে পেলে আমার সব ভুল হয়ে যায়।

কাঠের পুলটা আমি সাবধানে পার হলুম। কিন্তু সোমার পায়ের দিকে তাকিয়ে মনে হলনা যে, সাবধান হবার প্রয়োজনীয়তা সে স্বীকার করে। কাঠ আর মাটি বুঝি তার কাছে একই জিনিস। পায়ের নিচে কিছু থাকলেই হল। না থাকলেও বোধহয় কিছু ক্ষতি নেই। পুলের শেষটুকু সে লাফিয়ে লাফিয়েই পেরিয়ে গেল।

পিছন থেকে ডেকে বললুম: তোমার সঙ্গে আমি ছুটতে পারিনে।

সোমা হেসে উঠল। তার হাসির শব্দে নদীর তীর হল ধ্বনিতে মুখর। আমার মনে পড়ল, কারণবাবার গুহার সামনেও সোমা হেসে উঠেছিল। কিন্তু সে হাসিতে শব্দ ছিলনা। সোমা পিছন ফিরে তার বাঁ হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে বলল: চলে এস।

তার কমলা হাতখানা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলুম। খিলখিল করে হেসে সোমা হাতখানা টেনে নিল।

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। তারপরেই মনে হল, লজ্জা পাওয়া তো উচিত নয়। যুগে যুগে নারী এমনি করেই তো পুরুষকে ডাকে, আকর্ষণ করে। হেসে হাত বাড়িয়ে। তারপর হাত টেনে নেয়। না নিলে আরও বিপদ। তাতে হাত পুড়বে, কপালও পুড়বে। আর জ্বলবে মন। নারী বুঝি দূর থেকে দেখবার জিনিস। সম্মান করবার, উপভোগ করবার। ভোগ করবার নয়। আমিও নিজের হাতখানা গুটিয়ে নিলুম। সোমার হাসি তখনও থামেনি।

একটু উদার ভাব মিশিয়ে বললুম: বুড়োকে বুঝি এমনি করে ভোলাও?

উত্তর দিতে সোমা একটুও দেরি করল না, বলল: বুড়ো এমনিতেই ভুলে আছে।

আর গোবিন্দ?

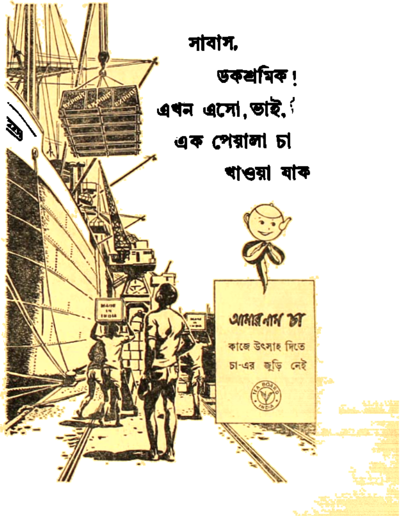

আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখখানি দেখছিলুম। বেলাশেষের রশ্মি পড়েছে তার গৌর গালে। টুকটুকে রঙ আরও লাল দেখাচ্ছে। মনে হল, আরও একঝলক রঙ লাগল। রক্তের রঙ। একটা কটাক্ষে ভর্ৎসনা জানিয়ে মেয়েটা মুখ ফেরাল। আমি জানি, সোমা রাগ করেনি।

কলসী নিয়ে সোমা নদীর জলে নামলনা। একখানা পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়াল। বললুম: বসবে এইখানটায়?

সোমা বলল: তুমি লোক সুবিধের নও।

সুবিধের হলে আর তোমার সঙ্গে আসব কেন!

মানে?

মানে, ভাল লোক হলে ঐ বুড়োর পায়ের তলাতেই পড়ে থাকতুম। তোমার পেছনে এতদূর আসতুম না।

তুমি তো উল্টো রাস্তায় আসনি। নিজের আস্তানার দিকেই যাচ্ছ।

গম্ভীর ভাবে বললুম: তুমি উল্টো দিকে গেলে আমিও সেদিকেই যেতুম।

আমার কথা শুনে সোমা বোধহয় বিস্মিত হল, কিন্তু ভয় পেলনা। বলল: বেশ লোক তো!

বেশ লোক কেন?

সোমা বলল: নিজেকে কি কেউ খারাপ বলে।

লোক সুবিধের নই বলেই সব কথা স্বীকার করি। ভাল হলে চেষ্টা করতুম, লোকে যাতে আরও ভাল বলে। মানে, ভণ্ড সাজতুম।

তোমার মতে তাহলে ভাল লোকেরা সব ভণ্ড?

সব না হলেও বেশির ভাগ তো বটে। এই তোমার কথাই দেখনা। ঐ বুড়োটার সঙ্গে তুমি ভণ্ডামি করছনা!

কী রকম?

বললুম: তোমার যা বয়স, তাতে তোমার ঘর করা উচিত আমাদের মতো একটা জোয়ানের সঙ্গে। তা নয়, একটা মাতাল বুড়োর সঙ্গে জীবনটা নষ্ট করছ।

যৌবনটাও বলতে পারতুম, কিন্তু মুখে আটকে গেল। এতটা হয়তো নিজের দেশে নিজেদের জানাশুনো কোন মেয়েকে বলতে পারতুম না। পাহাড়ী দেশে বনের ভিতর মূর্খ মেয়ে বলেই পারলুম। অসভ্য সমাজে ভণ্ড সাজবার কোন প্রয়োজন মনে হয় না।

সোমাকে আমি বিভ্রান্ত হতে দেখলুম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল: তুমিও এই কথা বলছ?

আর কে বলেছে?— আমি জানতে চাইলুম।

সোমা সে কথার উত্তর দিলনা। বলল: নিজের চোখে না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবেনা।

কী দেখতে হবে বল?

সোমার দৃষ্টিতে আমি আচ্ছন্নতা দেখলুম। সে বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: বল।

ধীরে ধীরে সোমা বলল: তুমি বুঝবেনা।

কেন বুঝবনা: আমি উত্তর দিলুম: তুমি বললেই আমি বুঝতে পারব।

সোমা খানিকক্ষণ কী ভাবল, তারপর বলল: আমাকে তো মানুষের মতো দেখেনা, সে আমাকে পূজো করে। আমার মধ্যে সে ভগবতীকে দেখে।

এ সব কথা আমার শোনা আছে। তার পরের কথাটুকুও শোনা। ভগবতী ভক্তির জিনিস, ভোগের নয়। তাঁর সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ, দেহের নয়। শক্তি-সাধনের দার্শনিক তত্ত্ব আমার জানা নেই। তবু আমি দেখতে পেলুম, এই মেয়েটা কিছু বুঝেছে, কিছু পেয়েছে। একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। আগের মুহূর্তে যে নিজেকে ভগবতী ভাবল, পরের মুহূর্তে সে কী করে ধরা দেয় মানুষের কাছে। মানুষের কামনা কি দেবতাকেও ছুঁতে পারে?

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু সোমা তার সুযোগ দিলনা। সে রেগে গেছে। পাশ থেকে কলসীটা কুড়িয়ে নিয়েই লাফিয়ে উঠল। বলল: চললাম।

বাধা দেবার চেষ্টা করে বললুম: আর একটু বসবেনা?

সোমা তখন জলের কাছে নেমে গেছে। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জল ভরতে ভরতে বলল: না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। সেই চটুল মেয়েটি। তার জল ভরা কলসী কাঁকালে নিয়ে পাশ দিয়ে যাবার সময় বলল: তোমার বন্ধুও আজ চক্রে বসবে। দেখতে এস।

আমি কোন উত্তর দিতে ভুলে গেলুম।

আঠারো

ক্যাম্পে ফিরতে আমার মন আজ সরল না। সোমা চলে যাবার পরেও আমি সেই পাথরখানার উপর বসে রইলুম।

দৃষ্টি এখানে সীমিত। পিছনে ঘন অরণ্য দক্ষিণে ও বামে দূর প্রসারিত, সম্মুখে তামস পর্বত তরঙ্গায়িত হয়ে দিগন্তকে অবরুদ্ধ করেছে। মাঝখানে কলোচ্ছলা কালীর

দুরন্ত নৃত্য। পাহাড়ের অন্ধকারে এখনও সব কিছু আবৃত হয়নি। চীর গাছগুলো স্থির হয়ে আছে, নড়ছে ঝাউএর পাতা। ছোট ছোট সবুজ চাদরগুলো একই সঙ্গে একদিকে হেলে পড়ছে। কান পেতে তার শব্দ শোনা যায় দীর্ঘশ্বাসের মতো।

মনে হল, কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি চমকে উঠে চারিদিকে চাইলুম। কে হাসল! কাছে-পিঠে কেউ তো কোথাও নেই! এই নির্জন স্থানে কে আমাকে উপহাস করবে! হঠাৎ দেখতে পেলুম, জলস্রোতের সঙ্গে কয়েকটা নুড়ি একটা বড় পাথরের উপর আছড়ে পড়ল। এক রকমের অদ্ভুত শব্দ উঠল। কোন মায়াবী মেয়ের হাসির মতো।

আজ সোমা কয়েকবার এমনি করে হেসেছিল। ঠিক এমনি উপহাসের মতো বেহায়া ভঙ্গিতে। নদীটা কি আমাকে উপহাস করছে! কিন্তু কেন তা করবে? আমি তো তেমন কিছু বোকামির কাজ করিনি!

করেছ।

সেকি! চমকে আমি ঘাড় ফেরালুম। পিছন থেকে কে কথা বলল শুকনো গলায়! না না, ও নিশ্চয়ই মানুষের গলা নয়। গোটাকয়েক শুকনো পাতা পড়েছে চীর গাছের। শক্ত মাটির উপর খসখস করে শব্দ হয়েছে। এই নির্জন স্থানে মানুষ কোথা থেকে আসবে!

ঝাউএর চাদরগুলো আবার একদিকে হেলে পড়ল। শব্দ উঠল সোঁ সোঁ করে। ওরাও কি কিছু বলছে!

হঠাৎ কয়েকটা বাদামের খোলার মতন জিনিস আমার কোলের উপর এসে পড়ল। ওরা যেন ভাব করতে এসেছে। হাতে করে কুড়িয়ে দেখলুম, ও ঝাউএর পাকা ফল। বাতাসে ফেটে গিয়ে নিচে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার কোলে না পড়ে নরম মাটিতে পড়লে ঐ ফলের বীজ থেকে নতুন চারা হত। নতুন গাছ। বনের ভিতর গাছ কেউ লাগায়না। গাছেরা নিজেরাই গাছ লাগায়। নিজেরাই ছায়া বিস্তার করে শিশু গাছকে রোদ ঝড় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মাটি থেকে রস টেনে বেঁচে থাকতে শেখায়, বাতাস থেকেও খেতে শেখায়। গাছ এখানে একা থাকেনা, বনে এরা সমাজ গড়ে আছে। নানা রকমের গাছ। কারও নাম আমরা জানি, গুণ জানি। কারও কিছুই জানিনা। ওদের তাতে কিছুই যায় আসেনা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরে ভাব করে থাকে। মানুষের মতো নির্জনে থাকতে ওরা ভালবাসেনা। আমাকে একা দেখে আমার সঙ্গেও ভাব করতে চাইছে। নদীটাও ওদের কথা বোঝে। বোধহয় ওদের একই ভাষা। সারাক্ষণ কথা কয়। কথা শোনায়।

আর ঐ বুড়ো পাহাড়টা! ও বড় বেশি গম্ভীর। সহসা কথা কয় না। শুধু এদের কথা শোনে। আজ বুঝি আমার কথা শুনছে।

সোমাকে ওরা সবাই দেখেছে। ও মেয়েটা আমাকে ফেলে নাচতে-নাচতে চলে গেছে। এই বুড়ো পাহাড়, এই নদী, এই লম্বা গাছগুলো কি সোমার এই কাজ সমর্থন করতে পেরেছে! নিশ্চয়ই পারেনি। তবে নদীটা কেন হেসে উঠল! আর তাকে সমর্থন করল চীর গাছের পাতাগুলো! ঐ মেয়েটার কথা ভাবছিলুম বলে কি তারা আমায় বোকা ভাবছে! বিচিত্র নয়। বোকারাই তো মেয়েদের কথা ভাবে!

কোথা থেকে খানিকটা বাতাস এল। শুকনো পাতার উপর উঠল মর্মর ধ্বনি। মনে হল, এই বুনো সমাজটা একযোগে সমর্থন করছে নদীর হাসিকে আর চীর পাতার মন্তব্যকে। এদের ভিতর মতান্তর নেই। নিজেরা তো একাত্মাই, তেমন মানুষ পেলে তারও সঙ্গে একাত্ম হতে পারে।

মন বলল, পালিয়ে যাই। এই পাহাড় এই নদী এই বন, এরা সবাই আমার মূর্খতা দেখেছে। সবাই আমাকে চিনে ফেলেছে। এদের কাছে মুখ দেখাবার আর আমার উপায় নেই। আমাকে পালিয়ে গিয়েই মান বাঁচাতে হবে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে পা চালিয়ে দিলুম।

পায়ের তলায় ঝাউএর একটা বীজ মর্মরিয়ে গুঁড়িয়ে গেল। আমি চমকে উঠেছিলুম। মনে হল, ঝিঁঝি শব্দ করে কারা সব হেসে উঠল। ভয়ে ভয়ে আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

কিন্তু কেন ওরা হাসল? আমি পালিয়ে যাচ্ছি দেখে! না ভাবল, আমি আবার ঐ মেয়েটার কাছেই যাব! সোমা আমায় সত্যিই যেতে বলেছে। গোবিন্দ আজ চক্রে বসবে। সেও বসবে। আর সেই মেয়েটা! অন্ধ স্বামীর জন্ত তাকেও আজ বসতে হবে। কিন্তু ছেলেটাকে কার কাছে রাখবে? সোমা যে চক্রে বসবে, কিন্তু সঙ্গী হবে কার? কারণবাবার, না গোবিন্দর! কারণবাবার সঙ্গী তো সে রোজই হয়। বুড়ো কি আজ নতুন মেয়েটাকে নিয়ে নিতে চাইবেনা? গোবিন্দর কপাল তাহলে ফিরে যাবে। সোমাকে পাশে নিয়ে বসবে, কালী রূপে

তার পূজো করবে। কপালে সিঁদুর মেখে হাতে তুলে নেবে নারকেলের পানপাত্র। মন্ত্র পড়ে কারণ শোধন করবে। তারপর সেই শোধন-করা সুরাপান। দুএক পাত্র নয়, পর পর পাঁচ পাত্র। যতক্ষণ দৃষ্টি ও মন চঞ্চল না হয়, ততক্ষণ পান। তারপর চক্রীদের কল্যাণ ও তাদের বিপক্ষের বিনাশের জন্য শান্তিস্তোত্র পাঠ। আনন্দোল্লাস করবে আনন্দস্তোত্র পাঠের পর। হাঁটতে হাঁটতেই আমি বুঝতে পারছিলুম যে কপালে আমার ঘাম দেখা দিয়েছে। আমি ঘেমে উঠেছি।

কিন্তু এ আমি কোন্ পথে চলেছি! এ তো আমার ক্যাম্পে ফিরবার পথ নয়! এ পথে গেলে যে আমি কারণবাবার গুহাতেই পৌঁছে যাব! আমার পা কেন আজ এদিকে যাচ্ছে! আমি নিজের পায়ের দিকে তাকালুম। এ তো আমারই পা! কিন্তু আমার আদেশের অপেক্ষা যেন আজ করছেনা! ওদের কি কেউ টানছে!

দেওয়ালের উপর থেকে টিকটিকি উত্তর দিলনা টিক-টিক। এখানে ইটের দেওয়াল নেই। টিকটিকিও নেই দেওয়ালের উপর। এখানে শুধু সারি সারি গাছ। গাছে টিকটিকি আছে কিনা জানিনা, ঝিঁঝি পোকার অভাব নেই। ওদের ডাক একবার শুরু হলে সারারাত ধরে চলবে। গোবিন্দদের চক্রও কি আজ সারারাত চলবে!

সেই কালা লোকটা আজ কী করবে! তাকে তো চক্রে বসতে দেবেনা! সে এসবের জানেই বা কী! জানলে কি তার বউকে বসতে দিত!

বনের গাছগুলো আজ বড় গম্ভীর হয়ে আছে। হেলছেনা দুলছেনা, কোন সাড়া শব্দই দিচ্ছেনা। তারা কি সব মরে আছে, না আতঙ্কে জড় হয়ে গেছে! কিসের আতঙ্ক! আমার জন্য! আমি কি কোন বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছি! বোধহয় যাচ্ছি। তা না হলে এরা এমন মুখ গুমরে চুপ করে থাকবে কেন!

তবে কি আমার ফেরা উচিত! একি, পথের উপর এত বাধা কেন! একটা দুটো তিনটে—আরও একটা —ঐ তো আর একটা। পথের উপর আড়াআড়ি ওরা পড়ে আছে। ওরা চায়না আমি ঐ বাধা ডিঙিয়ে যাই। ওগুলো কী! উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বড় বড় গাছের পিছনে এখনও কিছু আলো আছে। ছায়া ঘনিয়েছে নিচে। আবছায়া পথের উপর কালো কালো ছায়া পড়ে বাধার সৃষ্টি করেছে। তবু আমি থামতে পারলুম না। ছায়াগুলো ডিঙিয়ে পেরিয়ে গেলুম।

একবার মনে হয়েছিল, গাছেরা বোধহয় পথের উপর সরে আসবে। হাত বাড়িয়ে বলবে, ওদিকে যেয়োনা, ও তোমার পথ নয়। হাত জোড় করে আমি বলব, পথ ছাড়ো, যেতে আমাকে হবেই। আমাকে যে টানছে। আমি থামতে পারছিনা, ফিরতে পারছিনা। ওরা বলবে, কেন পারবেনা, আমরা তোমাকে ধরে রাখব। তুমিও তো আমাদেরই একজন।

সত্যিই তো। আমিও তো ওদেরই একজন। আমাদের মস্তবড় সমাজ। উপরে আকাশ আর নিচে মাটি, চারিদিকের দিগন্ত দিয়ে ঘেরা এই বিরাট বিশ্বটাই তো আমাদের সমাজ। আমরা চাইনা বলেই অন্যের কথা আমরা বুঝিনা, শুনিনা। অন্যের আগ্রহও আমরা দেখতে পাইনা। আজ নিঃসঙ্গ হয়ে সবই দেখতে পাচ্ছি।

এমন অন্যমনস্কভাবে আমি কাঠের পুলটা পার হতে পারলুম না। সেই সংকীর্ণ পুলের সামনে এসে মনে হল, এও বুঝি একটা ছায়া। কিন্তু আড়াআড়ি নয়। এরা যেন পথ ছেড়ে দিল। যেন হাতছানি দিল এগিয়ে যেতে। আমি দাঁড়িয়েছিলুম। পুলের উপর পা দেবার আগে ভাল করে অনুভব করলুম এই পরিবেশটা। তারপর সবই সরল হয়ে গেল। আমি একটা পাগল, পাগলের মতো সব আবোল তাবোল ভাবছি।

বেশ সন্তর্পণে পুলটা পার হলুম। সরু সরু দুটো গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে একটা দুরন্ত নদী পার হতে সতর্ক হওয়া উচিত বৈকি। পা হড়কে পড়ে গেলে বোধহয় আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। নদী অনেক নিচে। বড় বড় পাথর ছড়িয়ে আছে বেহিসেবী ভাবে। নদীর স্রোতও প্রখর। পাথর বা নদী দুইই মারাত্মক। দৃষ্টিকে তাই পথের উপর সংহত করে পুলটা পেরিয়ে এলুম।

অন্ধকার বেশ ঘনিয়েছে। কিন্তু আমি একজন মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম। সে নদীর ধারে একটা পাথরের উপর বসে আছে। একেবারে একা। ভাল করে লক্ষ্য করেই তাকে চিনতে পারলুম। সেই অন্ধ যুবকটি। আমার কী মনে হল জানিনে, আমি এসে তার পাশে বসলুম।

লোকটা চমকে উঠেছিল। দেখতে পেয়ে আমি নিজের পরিচয় দিলুম। বললুম: একা একা কী করছ?

লোকটা হাত দিয়ে আমার দেহটা একবার দেখে নিল। তারপর বলল: আমার কাছে আর কে থাকবে বাবু?

তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তাড়াতাড়ি আমি বললুম: কেন, আমি তো তোমার কাছে থাকব বলে এলুম।

তুমি ওদের সঙ্গে পুজোয় বসবেনা ?

না।

লোকটার এ কথা বিশ্বাস হল না। বলল: আমি যে শুনলুম—

বললুম: ঠিকই শুনেছ। যে বসবে তার নাম গোবিন্দ। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

অনেকক্ষণ লোকটা কথা কইলনা। তারপর বলল: আমার বউটা তো বাবু মূর্খ মেয়ে, ও কী পুজো করবে!

তন্ত্রমন্ত্রের সম্বন্ধে কিছু ধারণা না থাকলে আমারও নিশ্চয়ই এ কথা মনে হত। কিন্তু এই অজ্ঞ মানুষটিকে কিছু সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন আছে। বললুম: ওকেই তো বাবা পুজো করবে। চোখ বন্ধ করে তোমার বউকে ভাববে মা কালী।

অন্ধকারেও আমি পাশের মানুষটাকে চমকে উঠতে দেখলুম। আর্তনাদের মতো অসহায় সুরে বলে উঠল: ছি ছি, ও যে আমার বউ। আমি তো ওর কোন সম্মান রাখিনে।

মানুষ কি কখন অপবিত্র হয়: আমি তাকে সান্ত্বনা দিলুম: অনুতাপের আগুনে পুড়লে পাপও সোনা হয়ে যায়। তোমরা তো পাপ করনি।

এ কথা বোধহয় লোকটার বিশ্বাস হলনা। চুপ করে শুনে গেল, কোন উত্তর দিলনা।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

১৩৬৭ বঙ্গাব্দ   মূল্য ২৸৹

[মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইল]

পঞ্জিকা-সংস্কারের অগ্রদূত 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'—রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সংস্কৃতিমূলক ধর্মসংস্থা এবং সংস্কৃতিবান হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল সমাজেই শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করছেন। গণিত-জ্যোতির্বিদ্, এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গ্রহদিগ্‌দর্শনের সাথে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত'; 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের' নির্ভুল তিথি এবং গ্রহাবস্থান,—ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের বারোমাসের তেরো পার্বণ যথাকালে নির্বাহ হয়, কখনও কালভ্রষ্ট হয় না। প্রচলিত অশুদ্ধ পঞ্জিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম ক'রে, হিন্দুর ধর্মরক্ষা যথাকালে সম্পাদনের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৺মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ। তাঁদের সংস্কারমুখী আন্দোলনের ফলেই 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'র জন্ম হয়। স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান-সংস্থার অধীন ৺মেঘনাদ সাহা পরিচালিত 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি' বাংলাদেশে একমাত্র 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'কেই সংস্কারের অগ্রদূত ব'লে স্বীকার করেছেন। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড, জ্যোতিষীগণের গ্রহফল বিচারের জন্য 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'ই নির্ভরশীল।

চীন এবং ভারতের বর্তমান বিবাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১৩৬৬):

(১) বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, মাঘ এই চারিমাস বিপদাবিপত্তি চঞ্চল হইবে।

(২) ...... ঐ সময় ভারত সীমায় তিব্বত পর্যন্ত চীনের মোঙ্গোলীয়ন প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে, ... শত্রুভূত, সামরিক রক্তক্ষয় হইবে।

(৩) ...... ইহাতে ভারতীয় এবং মোঙ্গোলীয়ন পক্ষের বিভিন্ন বীজ দূর থাকিবে।

(৪) ...... ভারতরাষ্ট্র গোষ্ঠীনীতির মধ্যে পতিত হইবার যোগ আছে।

(৫) ...... একদিকে চীনের মোঙ্গোলীয়ন প্রভাব, অন্যদিকে আমেরিকা আটলান্টিক সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের প্রভাব প্রবল থাকিয়া উভয় নীতিই পরিম্লান হইবে।

এইসকল ভবিষ্যদ্বাণী ১৩৬৫ সালের মাঘ মাসে 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১৩৬৬)' যখন প্রকাশ করা হয়েছিল, 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, ১৩৬৬'-র 'রাষ্ট্রগত ফলাফল'-এ শ্রীনরেন্দ্রনাথ যাদব জ্যোতিঃশাস্ত্রী কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী—পৃষ্ঠা ৮৭।৮৮ দ্রষ্টব্য।

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা কার্যালয়

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬   ফোন—৩৪-১১০৫

একসময় বলল : আমাকে ওরা এইখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে বলল : ওরা কী করছে, তুমি দেখে আসবে বাবু?

বললুম : আসব।

উঠে দাঁড়াবার পরে দেখলুম, লোকটা হাত দিয়ে আমার বসবার জায়গাটা দেখছে। আমাকে না দেখে কিছু তৃপ্তি পেল বলে মনে হল। বলল : আমি তোমার অপেক্ষা করব।

উনিশ

কারণবাবার গুহায় ঢোকবার সাহস আমার ছিলনা। ভয় কারণবাবাকে নয়। ভয় সভ্যতার। সন্ধ্যাবেলাতেই হয়তো তাঁরা চক্র করে বসেছেন। কিংবা লতা-সাধন। কুমারীপূজার পদ্ধতির কথাও আমি গোবিন্দর কাছে শুনেছি। নারীর অঙ্গপূজা দেখবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। কৌতূহল গোবিন্দর জন্য। শুধু কৌতূহল নয়, দুশ্চিন্তাও। সে কেন আরও বেশি এ সবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে।

একদা সে তার অবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ধর্মগ্রন্থ পড়তে শুরু করে। মনুসংহিতা ও বৈদিক পূজাবিধির পর তন্ত্রশাস্ত্র। অনেক পড়াশুনো করবার পর বলেছিল, দুর্বলতার জন্যই মানুষ এসব মানে। জীবনে তো দুর্দশার অন্ত নেই! তখন খানিকটা শান্তি পাওয়া যায়।

এ কথাটা মিথ্যা নয়। বিপদে পড়ে আমি সনৎকাকের কাছে দৌড়তে দেখেছি। তার চোখের সামনে নিজের হাত দুখানা মেলে ধরেছে। শনির স্থান কেন নিচু, [illegible]া রক্তমুখী নীলা ধারণ কর। কিংবা নিয়ে গেছে [illegible]ের ছকখানা। অষ্টোত্তরী বা বিংশোত্তরী গণনা [illegible]রে জ্যোতিষী মহাশয়ের পরামর্শ দিয়েছেন। অবস্থা [illegible]ও খারাপ হলে তন্ত্র আছেন। এ তো এদেশের চরিত্রের দুর্বলতা। এদেশে যে মন্ত্রতন্ত্রের প্রতি ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

এ তো হল একতরফা বিচার। নাস্তিকের বিচার। ভগবানে যাঁরা বিশ্বাস করেন, এ তো তাঁদের যুক্তি নয়! এ যুগের বৈজ্ঞানিকরা ভগবানকে অস্বীকার করতে পারে বুদ্ধির অহংকারে। একসময় তারা অনেক জিনিসই অস্বীকার করত। বিজ্ঞান যত অগ্রসর হচ্ছে, বিশ্বাসের পরিধি তত বাড়ছে নাকি! এমন দিন কি আসবেনা, যেদিন ভগবানকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারব বৈজ্ঞানিক সত্য বলে। কোন বৈজ্ঞানিক কি এ কথা ভাবছেন না! কোন মানুষ কি সেদিনের অপেক্ষা করে বসে নেই!

অমি-মাপা সায়েন্টিস্ট হলেও গোবিন্দর প্রকৃতি কিছু কবির মতো, আর বৈজ্ঞানিকের মতো কঠিন দৃষ্টিভঙ্গী। আপাতদৃষ্টিতে দুটোকে পরস্পর-বিরোধী মনে হয়। কিন্তু তার চরিত্রে কোন বিরোধ দেখিনি। ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোন বিরাট শক্তি নেই, কিন্তু পৃথিবী আছে রূপ-রস-গন্ধে ভরা। প্রত্যক্ষ বস্তুকেই তো আমরা কল্পনা করি। বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিত্বের কেন বিরোধ থাকবে!

আজ কদিন আমি গোবিন্দর আচরণে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিনা। তার ব্যবহার কেমন এলোমেলো। যে শাস্ত্রে তার বিশ্বাস নেই, তাই নিয়ে কেন এমন মেতে উঠেছে! তন্ত্রকে সে কি আরও ভাল করে যাচাই করে নিতে চায়, না এর পিছনে কোন মোহ আছে! তন্ত্র-সাধনায় অনেক প্রলোভন। ব্রহ্মজ্ঞান তো পরের কথা, তার আগে আছে পঞ্চ ম-কার। আছে সোমা। মেয়েটা সত্যিই সুন্দর।

কারণবাবার পাশের গুহায় আমি ঢুকিনি। বাহির থেকেই শুধু দেখেছি।' সেটা কি সোমার অন্তঃপুর! সে একা থাকে সেখানে! কেন জানিনা আমার ইচ্ছা হল সোমার অন্তঃপুর দেখবার। সভ্য মানুষের এমন বাসনা হওয়া উচিত নয়। সভ্যতার রাশ টেনে অন্যায় বাসনাকে সংযত করতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে তত্ত্বকথা আমি ভুলে গেলুম। মনে হল, এই পরিবেশের ভিতর সভ্য সমাজের রীতিনীতি ভুলে গেলে কোন পাপ হবেনা। এই তো পৃথিবীর আদিম পরিবেশ। মানুষে মানুষে এখানে আদিম রীতিতে দেখা হতে পারে।

সতর্ক পায়ে আমি কারণবাবার গুহাটা পেরিয়ে অন্য গুহার সামনে এলুম। সামনের পাথরটা পেরিয়ে ভিতরে আর কিছু দেখতে পেলুমনা। ঘন অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে আমার নিশ্বাস রোধ হয়ে এল। মনে হল, আমি মানুষের নিশ্বাসের শব্দ পেয়েছি। এই গুহায় একাধিক জীবনের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আমি বাহিরে বেরিয়ে এলুম।

বড় পাথরটার কথা মনে ছিলনা। ধাক্কা খেয়ে আমি ছিটকে পড়লুম। ভিতর থেকে হুঙ্কার উঠল। কারণবাবার গলা আমি অনুমান করতে পারলুম। কিন্তু উত্তর দেবার সাহস হলনা। কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়েই অন্ধকারে আত্মগোপন করলুম।

কারণবাবার গুহার ভিতর আলো জ্বলছিল। বোধহয়

তাঁর ধুনীর আলো। সেই আলোতে আমি একটি মূর্তি দেখতে পেলুম, গুহার ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। মরা মানুষের মুণ্ডগুলির মাঝখানে লোকটাকে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে। কারণবাবা এত বীভৎস!

গুহার বাহিরে এসে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ডাক দিলেন: গোবিন্দ।

অস্পষ্টভাবে আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলুম। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছিলেন না। সরু সরু পা দুখানা তাঁর রীতিমতো টলছিল।

গোবিন্দর সাড়া আর আমি পেলুমনা। কিন্তু কারণবাবার গলা শুনতে পেলুম: বুঝেছি।

বলে পাশের গুহার দিকে এগিয়ে গেলেন খপখপ করে। দূর থেকে আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে একটা দুর্যোগের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

এবারে আমি গোবিন্দকে দেখতে পেলুম ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে আসতে। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা সে খেলনা। বেরিয়ে এসেই নদীর পুলের দিকে পালিয়ে গেল।

গুহার ভিতর থেকে বুড়ো বেরলেন অনেকক্ষণ পরে। উচ্চস্বরে গালাগালি করতে করতে। একসময় বললেন: ব্যাটাকে দেখে নেব।

তারপর গলার স্বর আরও নামিয়ে বললেন: অমাবস্যার রাতে শ্মশানে ওর গর্দান নেব।

অন্ধকারে কারণবাবার চোখ আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না। বোধহয় সে দুটো বাঘের মতো জ্বলছিল। সকালের সেই মেয়েটা কারণবাবার গুহা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। তার ছেলেটা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। সোমাকে আমি দেখতে পেলুমনা।

কুড়ি

কর্তব্যে আমাদের ত্রুটি হচ্ছে। গত কয়েকদিনে কাজ যা এগিয়েছে, তাকে সন্তোষজনক বলা চলেনা। কাজ এইরকম শম্বুক গতিতে এগোলে একমাসেও এখানকার তাঁবু উঠবেনা। সরকারকে তার জন্য কৈফিয়ত তো দিতেই হবে, অন্য কোন মারাত্মক খেসারত দিতে হবে বলে আশঙ্কা করছি। কারণবাবার আশ্রমে সেদিনের ঘটনার পর আমার বিশ্বাস হয়েছে যে গোবিন্দ তাঁর মৌচাকে ঢিল দিয়েছে। এই ধৃষ্টতা তাঁকে সাময়িকভাবে মেনে নিতে হয়েছে। না মেনে নিয়ে উপায় ছিলনা। কিন্তু মানবার প্রয়োজন নেই। তিনি সইবেনওনা।

এমন একটা ঘটনার পরেও তিনি যদি গোবিন্দকে শ্মশানে নিয়ে যান শব-সাধনার জন্য, সেও ভাবনার কথা। এর পিছনেও কোন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে। তান্ত্রিক মানুষের কাছে মারণ উচাটন তো ছেলেখেলার সামিল। নির্জন শ্মশানে হয়তো দুদিন বসবে উত্তরসাধক হবে। তৃতীয় দিনে নেচে উঠবে। সে নাচ আর বন্ধ হবেনা।

নরবলির কথা সুবি সোহনলা বলাবলি করছিল। অসাধ্য এঁদের কিছুই নেই। নিজের দেশে নরবলির এত গল্প শুনেছি যে অবিশ্বাসের কথা মনে আসেনা। বরং ভয়ে সারা শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

মনে হল, এখান থেকে অবিলম্বে আমাদের তাঁবু সরানো দরকার। কাজ অসমাপ্ত থাকে থাক। পরে তা সামলানো যাবে। আমি একা এসে তা সারলে যাব। একটু না হয় বেশি হাঁটতে হবে। গোবিন্দকে রক্ষার জন্য সে কষ্ট স্বীকার করতে আমার কষ্টবোধ হবেনা।

পরক্ষণেই অন্য কথা মনে হল। গোবিন্দ যদি এমনি কষ্ট স্বীকার করে কারণবাবার সঙ্গে তার যোগাযোগ রক্ষা করে! সেও বিচিত্র নয়। গোবিন্দ একরোখা। একসময়ে এই তন্ত্র নিয়ে কত কী তামাসা করত। যতসব অশ্লীল শ্লোক তার মুখস্থ ছিল। আমাকে তার মানে জিজ্ঞাসা করত। মানে বুঝবার জন্য সংস্কৃত জানবার প্রয়োজন হতনা। শুনেই কানে আঙুল দিতে হত। গোবিন্দ খুব গম্ভীর ভাবে বলত, তুমি নিজে অসভ্য কিনা, তাই কানে আঙুল দিচ্ছ। তারপর সেইসব শ্লোকের মানে আমাকে বলত। সে সব খুব উঁচু দরের আধ্যাত্মিক কথা। আমি ভেবে পেতুমনা, এইসব আধ্যাত্মিক কথা এমন [illegible] অশ্লীল শ্লোকে লেখবার কী প্রয়োজন ছিল।

গোবিন্দকে আমি এ প্রশ্ন করেছি। তখন [illegible] বুঝলেনা, এসব হল শিশু ভুলবার চেষ্টা। প্রলো[illegible] বড়লোকদের না হলে ধর্মকর্মে লোক ভিড়বে কেন? আমার মনে হত, এর চেয়েও কোন বড় উদ্দেশ্য হয়তো ছিল হিন্দু ধর্মে ধার নেই, আকর্ষণ নেই, রাজনৈতিক সুবিধা-সুযোগও নেই। হিন্দুরা তাই মুসলমান হচ্ছে, খ্রীষ্টান হচ্ছে। বুদ্ধ ও মহাবীর আবার এই দেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মে খানিকটা ব্যভিচারের লোভ না থাকলে গোটা দেশটাই হয়তো বৌদ্ধ বা জৈন হয়ে যেত শঙ্করাচার্য একা আর কত বাঁচাতেন। এসব আমার নিজের মনের কথা। ইতিহাসে পড়িনি, কোন পণ্ডিতের

মুখেও শুনিনি। সত্য হলে কোন পণ্ডিত কি আর তন্ত্রশাস্ত্রের ভূমিকায় এ কথা লিখতেন না?

সকালবেলায় আমি গোবিন্দকে আদেশ করলুম: আজ থেকে তুমি দক্ষিণে যাবে আমার জায়গায় কাজ করতে।

কেন?— গোবিন্দ ফোঁস করে উঠল।

বললুম: আমার হুকুম।

আর তুমি কোন্‌দিকে যাবে?

তোমার কাজে।

কিন্তু জরিপের কাজ ছাড়াও আমার অনেক কাজ ছিল।

যদি চাও তো সে সবও করবার চেষ্টা করব।

সব তুমি জান?

বললুম: অন্ধকারে লুকিয়ে সোমার সঙ্গে যোগসাধনা করতে পারব।

গোবিন্দ লাফিয়ে উঠল। বলল: কী বললে?

আমি উত্তর দিলুমনা।

গোবিন্দ আমাকে ছেড়ে দিলনা। বলল: কে তোমাকে এসব কথা বলল?

অত উত্তেজিত কেন হচ্ছ: আমি উত্তর দিলুম: চোখ থাকলে সবই যে দেখতে পাওয়া যায়।

কী দেখেছ তুমি?

বললুম: সে সব কথা খুব শ্রুতিমধুর নয়। কাজটাও ভাল নয় কিনা, তাই একটু সাবধান হতে বলছি। তুমি মৌচাকে ঢিল দিয়েছ।

একটু বিদ্রূপের সুরে গোবিন্দ বলল: তুমি কি আজকাল জ্যোতিষ-চর্চা করছ?

জ্যোতিষ নয়, জরিপ: আমি উত্তর দিলুম: চোখে [illegible]দিয়ে চারিধারটা ভাল করে দেখি। তাতে [illegible]যা তো ভাল করে দেখতেই পাই, দূরেরও [illegible] দেখতে পাই।

গোবিন্দ আর প্রশ্ন করলনা। আমি বললুম: তোমারও ভবিষ্যৎটা দেখতে পাচ্ছি। এইবেলা সাবধান না হলে ঘরে ফেরা আর সম্ভব হবেনা। তোমার ঐ কারণবাবা কিছু দেখেছেন। বাকিটুকু কল্পনা করে নিতে তাঁর একটুও কষ্ট হয়নি। তুমি কি ভাবছ, তিনি তোমাকে ছেড়ে দেবেন?

তুমি কি—

গোবিন্দ থামতেই আমি বললুম: কাল সন্ধ্যাবেলার কথা বলছি।

গোবিন্দ বিহ্বল চোখে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম: চক্রে বসবার আগে সোমাকে নিয়ে কেন পাশের গুহায় ঢুকেছিলে? ধৈর্য ধরে আর একটু অপেক্ষা করতে পারলেনা?

অভিভূত ভাবে গোবিন্দ বলল: এসব কথা তুমি কী করে জানলে?

ভয় দেখাবার জন্য বললুম: আরও একটু জানি।

বড় বড় চোখে গোবিন্দ আমার দিকে চেয়ে রইল।

বললুম: কারণবাবা তোমার সর্বনাশের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছেন।

গোবিন্দর দৃষ্টিতে অবিশ্বাসের ইঙ্গিত দেখে বললুম: গুহা থেকে বেরিয়ে তুমি যখন নদীর দিকে পালালে, তখনি তিনি প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন। ছাগল হলে কাল রাতেই শেষ করে দিতেন, মানুষ বলেই দুদিন সময় পেয়েছ।

ভয়ে গোবিন্দ আঁতকে উঠল কিনা জানিনা, বাহিরে আমি কোন লক্ষণ দেখতে পেলুমনা। আর কোন কথাও কইলনা। তার চেন্‌ম্যানদের ডেকে আমি যখন দক্ষিণে যাবার নির্দেশ দিলুম, তখনও সে চুপ করে রইল। ভাবলুম, ওষুধে কাজ হয়েছে। কিন্তু এই ভাবনা যে কত ভুল, পরে তা বুঝতে পেরেছিলুম।

উত্তরের এলাকায় কাজ করে আমি গিয়েছিলুম কারণবাবার কাছে। একটু তাড়াতাড়িই সেখানে গিয়েছিলুম। দুটো কাজ ছিল। প্রথমটা হল সেই অন্ধের খোঁজ। বাবার প্রসাদে লোকটা চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে কিনা জানতে হবে। দ্বিতীয়টা হল, গোবিন্দকে রক্ষার ব্যবস্থা। মনে-মনে তার উপায় একটা ঠিক করে ফেলেছি। বাবার মনের কথাটি জেনে নিতে হবে। সে কথা যদি মারাত্মক হয় তো রাগটা যাতে গোবিন্দর উপর থেকে আমার উপরে এসে পড়ে, তার চেষ্টা করতে হবে।

কারণবাবার আশ্রমের দিকে যেতে যেতে মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে উপকারটা কার করছি! গোবিন্দর, না আমার নিজের! আমি নিজেও কি সোমার দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হইনি! ঐ মেয়েটার চোখে কি চুম্বকের শক্তি নেই! গোবিন্দ তো তন্ত্রসাধনার লোভেই এসেছিল। যখন এসেছিল, তখন সে সোমাকে জানতনা। এখন বাঁধা পড়েছে। হঠাৎ এই বাঁধন ছেঁড়া কি তার পক্ষে সহজ হবে!

তারপরেই মনে হয়েছিল, আমিও কি বাঁধিনা এই বাঁধনে

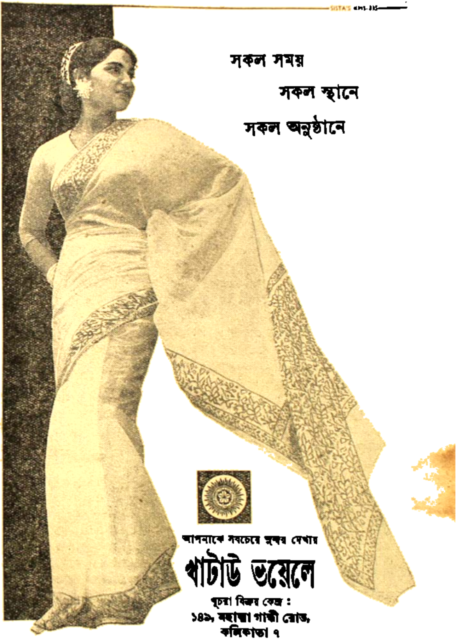

SISTA'S [illegible]

সকল সময়

সকল স্থানে

সকল অনুষ্ঠানে

আপনাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়

খাটাউ ভয়েলে

খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র :
১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৭

দি খাটাউ ম্যাকানজী স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ • মিল—বাইকুল্লা, বোম্বাই। • অফিস—লক্ষ্মী বিল্ডিং, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই।

জড়িয়ে পড়তে! মাকড়শার মতো আমি নিজের লালা দিয়ে জাল বুনেছি। তাতে কে আটকা পড়বে জানিনা, নিজে জড়িয়ে থাকবার জন্য তা যথেষ্ট।

চলতে চলতেই এ সব কথা আমার মনে হয়েছিল। পা কিন্তু থামেনি। থেমেছে নদীর পুল পেরিয়ে সেই গুহার মুখের সামনে। কোন্‌টায় ঢুকব, তারই জন্য ইতস্তত করেছিলুম। সামনের বড় গুহাটায় কারণবাবা হয়তো কারণে বুঁদ হয়ে আছেন। সোমা নিশ্চয়ই পাশের গুহায় আছে। কী করছে সে। কী করে সময় কাটায়! দুপুরটা কি সে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটায়? কোন কোন দিন যে বাপের বাড়িতে বেড়াতে যায়, সে কথা আমি তার ছোটবোন সোমার কাছে শুনেছি। এখন সে নিশ্চয়ই কারণবাবার গুহায় শুয়ে নেই।

সেদিকে আমি ইতস্তত করিনি। সাহসে ভর করে সোমার গুহার ভিতরেই ঢুকে পড়লুম। অন্ধকার এখানে গাঢ় নয়, আলোও নেই পর্যাপ্ত। সামনের বড় পাথরখানা সূর্যরশ্মির পথ রোধ করেছে, কিন্তু আলোকে আটকাতে পারেনি। আলোর পথ অবারিত—যেমন জ্ঞানের, যেমন মনের।

সোমাকে আমি গুহার ভিতর দেখতে পেলুমনা। যাকে দেখতে পেলুম, তাকে চিনতে আমার একটুও কষ্ট হলনা। সেই অন্ধ লোকটার বউ। একটা কোণায় মুখ ঢেকে বসে ছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল। আমি তার চোখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। কাল বিকেলের মতো তার দৃষ্টি আজ উজ্জ্বল নয়। আজ তা ভারাক্রান্ত। আচরণে উজ্জ্বলতা নেই এতটুকু, ক্লান্তিতে যেন [illegible]মিয়ে পড়েছে। বললুম: কী হয়েছে তোমার?

[illegible] উত্তর দিলনা।

[illegible]বারা বললুম: তোমার স্বামী কোথায়? সে তার [illegible] পেয়েছে তো?

[illegible]র বদলে সে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেলুম। ঠিক এমনটি কি আমি আশঙ্কা করেছিলুম! এ তো শুধু আশাভঙ্গের কান্না নয়, এর আড়ালে যেন গভীর কোনো বেদনা আছে।

অনেকক্ষণ আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলুম। হঠাৎ তার ছেলের কথা মনে পড়ল। তাকে তো দেখতে পাচ্ছিনা। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলুম: তোমার ছেলে কোথায়?

কিন্তু সে কথা কে বলবে! কান্নায় সে ভেঙে পড়েছে। আমি আর দাঁড়াতে সাহস পেলুমনা। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম গুহার ভিতর থেকে। কান্নাকে আমার ভয় করে। মানুষের কান্নায় উত্তাপ আছে, মন গলে বরফের মতো। মনটা শক্ত রাখতে হলে পালাতে হবে বৈকি। আমি পালিয়ে গেলুম।

একুশ

বাইরে এসে আমি আরও আশ্চর্য হলুম। হামাগুড়ি দিয়ে পাশের গুহার ভিতর কে ঢুকে গেল। চোরের মতো সন্তর্পণে ঢুকল। লোকটাকে দেখবার জন্য আমি এগিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু সেই নরমুণ্ডগুলি আমাকে বাধা দিল। মনে হল, তারা একসঙ্গে আমার দিকে চেয়ে ভেংচি কাটছে। কাটবেই তো। কাপুরুষের মতো আমি একটা অসহায় মেয়ের কাছ থেকে পালিয়ে এলুম। আমি তো উপহাসেরই সামগ্রী।

আমি জানতুম, গোবিন্দ আজ ঐ গুহার ভিতরে নেই। সোমাও নেই। হয়তো সেই অন্ধ মানুষটাও নেই। কারণবাবা একা বসে বসে পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষ করছেন বিকৃতমুখে। আমি কোনদিন মদ খাইনি। কিন্তু নিশ্চয়ই জানি, মানুষ আরামের জন্য মদ খায়না। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারি যে এক চুমুক মদ গিলতে কত কষ্ট পেতে হয়। তবু মানুষে মদ খায়। খাবার পর নাকি ভাল লাগে, চোখে রঙ লাগে। দুঃখ ভুলে যায়, দুনিয়ার চেহারাটাই যায় বদলে। কারণবাবা কেন এত মদ খান? পাত্রে ঢেলে খেলে মদের নামটাই শুধু কারণ হয়, জিনিসটা তো পাল্টায়না। কারণে বেশি আসক্তির জন্যই বোধহয় তাঁর নাম হয়েছে কারণবাবা।

হঠাৎ আমার কর্তব্যের কথা মনে পড়ে গেল। এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো আমার চলবেনা। আর দ্বিধা না করে আমিও হাঁটু মুড়ে বসলুম, আর গুহার ভিতরে ঢুকলুম হামাগুড়ি দিয়ে।

কারণবাবা চীৎকার করে উঠলেন। অশ্রাব্য গালাগালি। কিন্তু আজ আমি বিচলিত হলুমনা। আজ আমার সাহস বেড়ে গেছে। পাশের গুহায় আমি একটা মেয়েকে কাঁদতে দেখেছি। আর দেখেছি আর একটা লোককে চোরের মতো এই গুহায় ঢুকতে। ঐ গালাগালিকে আমি আর ভয় পাইনে। সরাসরি আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলুম।

কারণবাবাকে শান্ত হতেই হবে। 'হলেনও। তখন আমি কথা কইলুম। জিজ্ঞাসা করলুম: গোবিন্দ কোথায়?

দরকার ?

কারণবাবা তাঁর রাঙা চোখ তুলে কটমট করে চাইলেন।

বললুম : জানেন না নিশ্চয়ই ?

কী !

বলে আবার তিনি খানিকক্ষণ গালাগালি করলেন।

মনে মনে আমি হাসলুম। আমার কাছে আজ তিনি হেরে গেছেন। বললুম : আপনি যে জানেন না, আমি তা জানতুম।

কারণবাবা এ কথা মেনে নিলেন না। বললেন : শ্মশানে বেঁধে রেখেছি। আজ রাতে বলি দেব।

প্রথমটায় আমি শিউরে উঠেছিলুম। তারপরেই মনে হল, এ তাঁর বানানো কথা। গোবিন্দর খোঁজ তিনি জানেন না। বললুম : গোবিন্দ গোয়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কারণবাবা আর একবার চাইলেন কটমট করে।

বললুম : বিশ্বাস হচ্ছেনা, না ? ঐ মেয়ে এবারে আমার সঙ্গে চক্রে বসবে। ব্যবস্থা আমি পাকা করে ফেলেছি।

তন্ত্রসাধনার কী বুঝিস ব্যাটা !

কারণবাবা গর্জন করে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম : আসল কাজটুকু ঠিক বুঝি। পঞ্চ ম-কারের সাধনা তো এমনিতেই করি, এবারে বেশ ভাল করে নিয়মিতভাবে করব।

কারণবাবা একটা ভেংচি কেটে বললেন : হুঁ।

হুঁ মানে ?

মানে বুঝলে ফুর্তি ছুটে যেত।

বললুম : পঞ্চতত্ত্ব না হলেও চলে এমন লোক আর ক'টা আছে! মদ মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন। মুদ্রা হল [illegible]; টাকাও বটে। ও না হলে আমাদের কারও চলেনা। বাকিগুলোর মধ্যে বঞ্চিত হলে আবার আমাদের জন্ম নিতে হবে।

বিড়বিড় করে কারণবাবা খানিকক্ষণ গালাগালি করলেন। বললেন : পঞ্চ ম-কারের রাজসিক অর্থটাই তো লোভনীয় লাগে কিনা! হতভাগা নাস্তিক কোথাকার!

আজ গালাগালি শুনেও আমার ভাল লাগছে। বললুম : সমস্ত যোগাড় করে এসেছি। সন্ধ্যাবেলায় গোয়াকে নিয়ে বসব।

কারণবাবা চেঁচিয়ে উঠলেন : খবরদার! না জেনে শুনে এসব কখনও করবিনা!

মদ খেয়ে মাতলামিটাও কি শিখে করতে হবে নাকি ?

আমি নির্ভয়ে তাঁকে উত্তর দিলুম।

তাল চাল তো সাত্ত্বিক বা তামসিক অর্থে পঞ্চ ম-কারের সেবা নয়।

এ সব অর্থভেদের কথা আমার কিছু জানা নেই। বললুম : যা জানি, তাইতো করব।

কারণবাবা খানিকটা শান্ত হলেন। বললেন : এগিয়ে বোস্।

এগিয়ে বসতে আমি সাহস পেলুমনা। বক্সাকে খাঁড়াটা আছে দূরে। কিন্তু শিব-বাবা ত্রিশূলটা মাটিতে পোঁতা আছে, তাঁর ডান হাতের কাছেই। ওটা তুলে নিয়ে পেটে খোঁচা দিতে বেশিক্ষণ সময় লাগবেনা। নাগালের বাইরে থাকাই নিরাপদ। আমাকে নড়তে না দেখে বললেন : কি রে, ভয় করছে বুঝি ?

তা একটু করছে বৈকি।

কারণবাবা খুশী হলেন, বললেন : ব্যাটা সত্যি বলতে শিখেছে তো!

বললুম : বলুননা আপনি, এইখান থেকেই আমি শুনতে পাব।

কারণবাবা বললেন : সমাজটা চিরদিন এক রকম ছিলনা। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেও এসবের অবাধ প্রচলন ছিল। আটকালো কলিতে এসে। ভিতরে যত পাপ করতে লাগল, আমরা বাইরে তত সাধু সাজতে লাগলাম।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : সেকালেও পঞ্চ ম-কারের প্রচলন ছিল!

ছিলনা! : কারণবাবা উত্তর দিলেন : আপত্তি তো শুধু মদ আর মৈথুন নিয়ে, বেদ পুরাণে তার অজস্র দৃষ্টান্ত

তারপর গড়গড় করে বললেন : বেদের সোম যজ্ঞে ও সৌত্রামণি যজ্ঞে মদের অবাধ ব্যবহার ছিল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য শিষ্য কচকে মদের সঙ্গে ভক্ষণ করেছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজের সস্ত্রীক সুরাপান ও গীতবাদ্য ও বনিতা ভোগ করতেন। রামচন্দ্র সীতাকে সাত্ত্বিক সুরা পান করিয়েছিলেন, আর মৈরেয়ক মদ্যপান করে যাদবকুল ধ্বংস হয়েছিল। মদ খেয়ে স্বয়ং ব্রহ্মারও পদস্খলন হয়েছিল। নিজ কন্যা সন্ধ্যার দিকে চেয়েছিলেন কামার্ত দৃষ্টিতে। রুদ্রদেব তাঁর ত্রিশূল দিয়ে ব্রহ্মার পঞ্চম শির কেটে সন্ধ্যাকে রক্ষা করেছিলেন।

বাধা দিয়ে বললুম : থাক এ সব গল্প।

কারণবাবা বিশ্রীভাবে দাঁত বার করে হাসলেন।

বললেন : স্ত্রী-পুরুষের যৌন স্বাধীনতার কথা শুনবিনা? দেবগুরু বৃহস্পতি কী করেছিলেন! সে নোংরা কথা মুখে বলতে বাধে। সে যুগটাই ঐরকম ছিল। মহর্ষি উদ্দালক সপরিবারে বসে আছেন। এক ঋষি এসে তাঁর স্ত্রীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। মহর্ষির আপত্তি করার উপায় নেই, কিন্তু ছেলে ক্ষেপে গেল।

দোহাই বাবা : আমি হাত জুড়ে অনুরোধ করলুম : এসব গল্প তুমি অন্য লোককে শুনিয়ো।

কারণবাবার হাসিটাও বড় বীভৎস। বললেন : তবে তুই চেকে বসছিস!

বললুম : আপনার সাত্ত্বিক পঞ্চ ম-কারের গল্প বলুন।

সে কি ভাল লাগবে? সহস্রার থেকে অমৃতের ক্ষরণ হবে, সেই মদ, সেই ব্রহ্মজ্ঞান। মা মানে রসনা। বাক-সংযমের নামই মাংস সাধনা। যে মানুষ জ্ঞানের অসি দিয়ে পাপ পুণ্যকে ধ্বংস করে মনোবৃত্তি লয় করেন, তাঁকে মৎস্যভোজী বলা যায়। সহজ কথায়, কুম্ভকযোগ। অসৎসঙ্গ ত্যাগের নামই মুদ্রাসাধনা। আর মৈথুন হল শেষ অবস্থা—

কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্।

মূলাধারের কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগবলের সাহায্যে শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলাসীন পরম শিবের সঙ্গে সংযোগ ঘটানো—তারই নাম মৈথুন। সহস্রার থেকে তখন অমৃতের ক্ষরণ হবে।

একটু থেমে কারণবাবা বললেন : এরই নাম দিব্য ভাবের সাত্ত্বিক পঞ্চ ম-কার। আর যার জন্যে তোরা পাগল হস, সে হল বীরভাবের রাজসিক পঞ্চ ম-কার। পশু ভাবের তামসিক পঞ্চ ম-কার একেবারে নিরামিষ। পঞ্চতত্ত্বের বদলে তার অনুকল্প দিয়ে ক্রিয়া সারতে হবে। মদের বদলে দুধ ঘি মধু, মাংসের বদলে আদা-রসুন, মাছের বদলে মুলো বেগুন, মুদ্রার বদলে চাল গম, আর মৈথুনের বদলে ইষ্টমূর্তির তিনবার পুষ্পাঞ্জলি। আরও অনেক অনুকল্প আছে, সে সবই নিরামিষ। তোদের মতো মাতালদের তা পছন্দ হবেনা।

আমি লক্ষ্য করছিলুম, কারণবাবা খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি থামতেই জিজ্ঞাসা করলুম : কিসের ভাবনা হচ্ছে বলুন তো?

কারণবাবা খেঁকিয়ে উঠলেন। আমি জানি, তিনি তাঁর দুর্ভাবনা লুকোবার চেষ্টা করলেন।

ভৈরবী কোথায়?— আমি জানতে চাইলুম।

বিরক্তভাবে কারণবাবা বললেন : চুলোয় গেছে।

আমি বোধহয় এইরকম উত্তরের আশা করেছিলুম। তাই খুশী হয়ে বললুম : উঠি আজ।

আরও কয়েক পাত্র কারণ গলাধঃকরণ করে তিনি উত্তর দিলেন : সব ব্যাটা ভৈরবীর খোঁজে আসে!

হামাগুড়ি দিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলুম। জড়িয়ে জড়িয়ে তিনি বলতে লাগলেন : একটা একটা করে ব্যাটাদের বলি দেব!

পাশের গুহাটায় আমি আর গেলুমনা। মেয়েটা এখনও নিশ্চয়ই মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। তার ছেলে নেই। ছেলেটা কি চুরি হয়ে গেল! ভাবতে আর ভরসা হলনা। তাড়াতাড়ি আমি নদীর দিকে পা চালিয়ে দিলুম।

পুলের উপর উঠে আমি সেই অন্ধ লোকটাকে দেখতে পেলুম। গত সন্ধ্যার মতো আজও সে একা একখানি পাথরের উপর বসে আছে। পাশে তার লাঠিগাছটি। মনে হল তাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বড় নিঃসঙ্গ, বড় অসহায়। কারণবাবাকে আজ তার চেয়েও বেশি অসহায় দেখেছি।

সন্ধ্যা নামছে।

বাইশ

ফেরার পথে গোবিন্দর একটা কথা আমার মনে পড়ল। গোবিন্দ একদিন বলছিল যে, তন্ত্রসাধনাকে দেশে জনপ্রিয় করবার প্রয়োজন হয়েছে। তার যুক্তি বড় অদ্ভুত। বলেছিল, দেশ থেকে ধর্মচর্চা একেবারে উঠে গেছে। যেটুকু আছে, তা নিতান্তই লোক-দেখানো। মানত না থাকলে কোন হিন্দু মন্দিরে যায়না। বিদেশের মন্দিরে যায় তার কারুকার্য দেখতে। যোল দুর্গোৎসবে পুজোটা উপলক্ষ্য, আসল লক্ষ্য হল মাতামাতি। বামুনের ছেলে পৈতে নিয়ে তিনদিনও ত্রিসন্ধ্যা করেনা, চতুর্থ দিনে সেই ন'গাছি সুতো দেয়ালের পেরেকে টাঙিয়ে রাখে। এই তো হিন্দুর ধর্মবোধ।

জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তন্ত্রসাধনার প্রসার হলে কি কিছু সুবিধে হবে? গোবিন্দ উত্তর দিয়েছিল, হবে বৈকি। কোনরকমে বামাচারী হতে পারলে কত লোভনীয় ক্রিয়ার অধিকারী হওয়া যায় বল। ধর্ম সেবার জন্য না হোক, [illegible] স্বাধীনতার জন্য লোক তান্ত্রিক হবে।

তাতে লাভ? আমি জানতে চেয়েছিলুম। গোবিন্দ বলেছিল, লাভ পরে। দস্যু রত্নাকর রাম নাম উচ্চারণ করতে পারেননি; মরা মরা বলতে-বলতেই তাঁর সিদ্ধি হয়েছিল।

কথাটা মিথ্যা নয়। দেশের চারিত্রিক কাঠামো আজ ভেঙে গেছে। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে দেশকে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়নি, স্বাধীনতা যেখানে কুড়িয়ে পাওয়া গেল, স্বাধীনতার মূল্য সে দেশ কী করে বুঝবে। গুটিকয়েক মানুষ নিয়ে তো দেশ নয়। তা যদি হত, তাহলে আজ এত দুর্দশা থাকতনা। দেশে আজ নীতির অভাব; তারই সঙ্গে রুচির বিকার ঘটছে। এই অধঃপতন থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে কোন কড়া নেশার দরকার। কারণবাবা নাকি গোবিন্দকে একদিন এই নেশার কথা বলছিলেন: রক্তের চেয়ে বড় নেশা নেই। দেশ যখন রক্তে ভেসে যায়, সেই পাশবিক লীলার মধ্যে মানুষ তার মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়। যে দেশে স্বাধীনতা আসে রক্তস্রোত বেয়ে, সে-দেশের মানুষ স্বাধীনতার মর্ম বোঝে। সম্মান করে নীতিবোধকে, চারিত্রিক দৃঢ়তা রক্ষায় সারাক্ষণ সচেষ্ট থাকে।

তারপর ধর্মের নেশা। ধর্মের প্রেরণাতেও কোন দেশ গড়ে উঠতে পারে। আমরা রক্ত চাইনে। তাই ধর্মকে নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। এই বাঁচার দাম আরও বেশি। জীবন দীর্ঘস্থায়ী। একদা এই ভারতবর্ষ ছিল ধর্মাশ্রয়ী। জীবনের বিকাশ হয়েছিল আধ্যাত্মিক চেতনায়। এ দেশ তাই আজও মরে যায়নি। চট করে মরবেনা। মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র একদিন জানা ছিল। তাই মরতে মরতেও বেঁচে উঠবে। কারণবাবা নাকি বিশ্বাস করেন, তন্ত্র হল সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র। দেশ যখন পাপে পঙ্কিল হয়ে যাবে, তখন যৌন স্বাধীনতার সমর্থন চাইবে ধর্মের নামে। তন্ত্রে সেই সমর্থন আছে। গোবিন্দ বলে, চক্র আর লতা-সাধন তো ব্যভিচারের নামান্তর। তবু কারণবাবা এই তন্ত্রকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র বলেন। ও যে রাম নাম। জপতে জপতেই সিদ্ধি আসে।

এ সমস্ত একদিন ভণ্ডামি বলে আমার মনে হয়েছিল। ধর্মাচরণের পিছনে কোন্ রাজনৈতিক যুক্তি থাকতে পারে! না, এত সব ভেবে কেউ ধর্মাচরণ করে। তবু কেন কারণবাবা এইসব ভাবলেন, এই কথা ভেবে আমার আশ্চর্য বোধ হল। সত্যিই কি তাঁর কোন উদ্দেশ্য আছে! খণ্ডিত ভারতকে কি তিনি ধর্মের বাঁধনে বাঁধতে চান? তাই যদি সত্য হয়, তবে লোকালয়ের বাইরে এই পাহাড়ে কেন আশ্রয় নিয়েছেন!···সোঁ সোঁ করে ঝাউ এর পাতা কাঁপছে। তার বীচির ভাঙা খোলাগুলো মটমট করে গুঁড়িয়ে গেল পায়ের নিচে। নিজের নিশ্বাসও এমনি করে কানে আসছে। কথাটা তো মিথ্যে নয়! শাস্ত্রমতে এখন ঘোর কলি। তন্ত্র প্রাধান্য পাবে এই কলিযুগে। সত্যিই তো, মানুষের রুচি আজ যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, ব্যভিচারের স্বাধীনতাই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে। তন্ত্রে সেই আকর্ষণ আছে। গোবিন্দ ছুটে এসেছে। গোবিন্দর মতো মানুষ ভারতে অনেক আছে। আমিও কি আসিনি।

ভাবতে ভাল লাগছিল না। অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কষ্ট হচ্ছিল। কান পেতে শুনছিলুম, কারও পদধ্বনি শোনা যায় কিনা। চোখ মেলে চাইছিলুম, কারও দেখা মেলে কিনা। তাহলে আমার ভাবনার পালা শেষ হবে। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারব। সুখ বোধ করব।

গ্রামের দিক থেকে যে রাস্তাটা এসে নদীর ধারে মিশেছে, সেই তিন মাথায় এসে আমি থমকে দাঁড়ালুম। কেউ আসছে। অন্ধকার এমন কিছু গভীর হয়নি যে তাকে চিনতে কষ্ট হবে। সোমা আসছে। ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত পদে নয়। তার চটুল চরণে আমি নির্ঝরের নৃত্য দেখতে পেলুম। পায়ে নূপুর বাঁধা থাকলে জলতরঙ্গের সুর শুনতে পেতুম স্পষ্টভাবে। সোমাই আসছে। কিন্তু একি, তার হাত দুটো কেন বুকের উপরে জোড়া। সেই ছেলেটা বুঝি।

আমারও বুকের উপর থেকে একখানা পাথর নেমে গেল। খুশিতে সমস্ত মন গেল ভরে।

আমার কাছাকাছি এসে সেও থমকে দাঁড়াল। আর আমাকে আর কথা কইতে হলনা। সোমা নিজেই প্রশ্ন করল: তুমি এখানে?

হেসে বললুম: তোমার অপেক্ষাতেই যে দাঁড়িয়ে আছি।

আমার অপেক্ষায়!— সোমা বিস্মিত হল অপরিমিত।

আমি কি অন্যায় করেছি?

অন্যায়: সোমা এবারে সহজ হয়ে গেল, বলল: তোমরা ভারি দুষ্টু।

আমরা কারা?

তুমি আর তোমার বন্ধু।

সোমা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলুম। নাগালের বাইরে না হলে তাকে কাছে টেনে নিতে পারতুম।

এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলতে লজ্জা হল। বললুম : এস না, এই নদীর ধারে একটু বসি।

সোমা ফিরে দাঁড়াল। হাসল মায়াবিনীর মতো। বলল : তোমাদের দুষ্টুমির শেষ নেই।

নদীর দিকে নেমে যেতে যেতে বললুম : গোবিন্দ কোথায় ?

সোমা ছোট্ট উত্তর দিল : জানিনে।

তবে আমাকেই আজ গোবিন্দ ভাব না।

সোমার দেহে মনে আজ অদ্ভুত প্রসন্নতা দেখলুম। হাসতে হাসতেই সে আমার কাছে নেমে এল। আমার পাশে বসল একই পাথরের উপর। ছেলেটাকে বুকের উপর চেপে ধরেছে।

পাথরটা আমি ভাল করে দেখলুম। এত বড় না হলে গায়ে গায়ে ঘেঁষে বসতে হত। তার দেহের উত্তাপ পেতুম। স্পর্শও। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নেব!

এই মেয়েটাকে গোবিন্দর ভাল লেগেছে। সবারই লাগবে। ভাল মেয়েকে কার না ভাল লাগে! আমার নিজেরও কি লাগেনি! এ কথা জানতে পারলে গোবিন্দ কি রাগ করবে? কেন করবে! আমি তো রাগ করিনি।

সোমা সহসা হেসে উঠল।

হাসলে যে?

তোমার ভাব দেখে।

তাড়াতাড়ি আমি নিজের দিকে চাইলুম, চাইলুম সোমার দিকে। নদী বন পাহাড় আর আকাশের দিকেও তাকালুম। মনে হল সব একাকার হয়ে গেছে। কাউকে আর পৃথক করে দেখা যাচ্ছেনা। সবাই আমরা সবার সঙ্গে মিলে গেছি। ছোট ছেলেটাও কাঁদতে জানেনা।

সোমা অনেকক্ষণ পরে কথা কইল। বলল : তোমরা দুজনেই দুষ্টু।

কে বেশি বল তো?— আমি জানতে চাইলুম।

ভেবেছিলুম, এ কথার উত্তর সোমা দিতে পারবেনা। কিন্তু তখুনি সে উত্তর দিল : দুজনেই সমান।

কারণবাবা বুঝি লোক খুব ভাল?

সোমা চমকে আমার দিকে চাইল।

চমকালে কেন! তাঁর তপস্বীর আখরা সমান রাখছিলে, জানতে পারলে আর রক্ষা রাখবেন না, এই তো!

সোমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ছেলেটাকে মুখের কাছে তুলে আদরে আদরে অস্থির করে দিল। কিন্তু কোন উত্তর দিলনা।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম : আর তোমরা চক্রে বসবেনা?

না।

কাল?

কালও না। আর কোনদিন বসবনা।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু তার বিরাগের কারণ সোমা আমাকে জানালনা।

জিজ্ঞাসা করলুম : রাগটা কার ওপর?

রাগ নয় তো : ছেলেটার সঙ্গে খেলা করতে করতে সোমা উত্তর দিল : চক্র আমার ভাল লাগেনা।

আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন সে তার গর্বের কথা আমাকে শুনিয়েছিল। কারণবাবা তাকে পুজো করে। সে তখন আর সোমা নয়, সে ভগবতী। সবাই তাকে পুজো করবে। কিন্তু আজ তার সে অহংকার দেখতে পেলুমনা। মনে হল, ঠিক কথাটি সে বলতে পারলনা। আজ তার অন্য কিছু ভাল লেগেছে। বোধহয় একটা সহজ সুস্থ জীবনের আস্বাদ পেয়ে কৃত্রিম জীবনটাকে আর ভাল লাগছেনা। বললুম : কারণবাবা তাহলে কী নিয়ে বাঁচবেন?

তাঁর তো শ্মশান আছে। সেখানেই তিনি সাধনা করতে যাবেন।

গোবিন্দও যাবে?

আজ যাবে।

আবার!

আমি বোধহয় ভয় পেয়েছিলুম। তাই লক্ষ্য করে সোমা বলল : তুমি ভারি ভীরু।

বললুম : ভয় পাবারই যে কথা। কারণবাবা বলেছিলেন, গোবিন্দকে তিনি কেটে ফেলবেন।

কাটলেই হল!

সোমা ঠোঁট ওল্টাল। তার নির্ভীক দৃষ্টিতে আমার বিস্ময় বাড়ল। কিন্তু আর কিছু প্রশ্ন করবার অবকাশ পেলুমনা। সোমা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বললুম : আর বসবেনা বুঝি?

না।

সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে সোমা রাস্তার উপর উঠে এল। বলল : আসি।

বিক্রী এখন অনেক উঁচুতে উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার জন্যেই নয়, চুলের প্রসাধনেও অতুলনীয়। সেই জন্যেই দিনকে দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও, তরুণ-ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সবাই চুল কালো করবার জন্যে অন্য সব কিছু ছেড়ে লোমা-র দিকেই ঝুঁকেছেন।

লোমা

চুল কালো করবার জন্যে
সর্বত্র প্রশংসিত।

সোল এজেন্টস্ :
এম, এম, খাম্বাটাওয়ালা
আমেদাবাদ—১
এজেন্টস্ :
সি নরোত্তম এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

কলিকাতার এজেন্ট : শাহ বডিসি এণ্ড কোং ১২৯, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

৮ আমি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তার চলা দেখতে লাগলুম। ছেলেটাকে বুকের উপর চেপে সে নেচে নেচে পথ চলেছে।···

দিনের আলো কি মিলিয়ে গেল। রাতের আলো বুঝি আরও মিঠি!

তেইশ

ক্যাম্পে ফিরে আমি বিস্মিত হয়ে গেলুম। খালাসীরা পেট্রোম্যাক্স জালিয়ে গোল হয়ে বসেছে। কিন্তু অন্যদিনের মতো উচ্চকণ্ঠে কেউ রামায়ণ পড়ছেনা। কিছু যে পড়ছে, তা মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। ভূতো অভিনন্দন জানাল তার নির্ধারিত প্রথায়। কিন্তু তার মধ্যেও খানিকটা সংযম দেখলুম।

সোহন উঠে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম: গোবিন্দ ফিরেছে?

সোহন সংক্ষেপে উত্তর দিল: ঘুমচ্ছেন।

সন্ধ্যাবেলায় তাঁবুর ভিতর শুয়ে ঘুমচ্ছে। কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো!

তাড়াতাড়ি আমি ভিতরে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে দেখলুম। পরম নিশ্চিন্তে সে ঘুমচ্ছে। সারারাত্রি জাগরণের পর মানুষ এমন অকাতরে ঘুমতে পারে। সে কি আর একটা রাত জাগার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে! সোমার কাছে তো সেই রকম কথাই শুনেছি। বুকটা আমার কেঁপে উঠল।

বাইরে এসে সোহনকে জিজ্ঞাসা করলুম: গোবিন্দ খেয়েছে?

খেয়েছেন।

সোহন এর বেশি কিছু বলল না। ভূতো আমার পাশে এসে পায়ের উপর মুখ ঘষতে লাগল।

শুক্লপক্ষের রাত। আকাশের ফালি চাঁদ এখনও দেখতে পাইনি। তারার ম্লান আলো। গাছপালার একটা পাতাও নড়ছেনা। পৃথিবীটা স্তব্ধ হয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলার প্রকৃতির রূপ অনেকদিন দেখিনি। রোজই কি তার এমন নিষ্প্রাণ অবস্থান।

রাতে ঝড় উঠেছিল কিনা জানিনা। সকালবেলায় সব কিছু এলমেলো বলে মনে হল। তাঁবুর ভিতর মালপত্র আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাইরেও তাই। কিন্তু গোবিন্দ সন্ধ্যাবেলার মতো নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। তবে কি রাতে সে কোথাও যায়নি!

আসল খবরটা রাম সিং-এর কাছেই পেলুম। ঝড়ের রাতটায় তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। প্রবলভাবে ডাকতে ডাকতে ভূতো নেতিয়ে পড়ল। তার বেশি সে কিছু দেখতে পায়নি। দেখতে পেল ঝড় থামবার পর। চোরের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপে গোবিন্দ ফিরে এল। রাত তখনও ভোর হয়নি। কিন্তু ভূতোর ডাকে রাম সিং-এর দৃষ্টি সজাগ হয়েছিল।

কেন জানিনা আমার মনে হল, আমার দুর্ভাবনার শেষ আজ এইখানেই হয়ে গেল। সোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে আজকের রাতটা দুর্যোগের হবে। বলেছিল, গোবিন্দ আজ রাতে যাবে শ্মশান-সাধনায়। তারপর যাবে কিনা, সে কথা সে বলেনি। বিছানায় শুয়ে ভেবেছিলুম, আজকের রাতটা আমি জেগেই কাটাব। গোবিন্দকে বিশ্বাস নেই। কখন যে কী বিপদ নিমন্ত্রণ করে আনে, তার ঠিক নেই। তাকে চোখে চোখে রাখাই কর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্যের কথা যে কতক্ষণ মনে ছিল, এখন তা মনে করতে পারছিনা। এমন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গিয়েছিলুম যে রাতে ঝড়ের শব্দও শুনতে পাইনি।

যখন আমি সরে যাচ্ছিলুম, সোহন আমাকে আর একটা খবর দিল: সেই ছোকরাটি কাল রাতে ফেরেনি।

কোন্ ছোকরা?

প্রশ্ন করেই মনে পড়ল সেই খালাসী ছোকরার কথা। প্রতি সন্ধ্যায় সে গ্রামে যায়, ফেরে রাত করে। তার এই দুর্বলতার কথা ক্যাম্পে কারও অজ্ঞাত নেই। সমর্থন না থাকলেও, বাধা তাকে কেউ দেয়নি। কিন্তু এতটা যে প্রশ্রয় পাবে, সে আশঙ্কা কারও ছিলনা। সোহন আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার দরকার বোধ করলনা। বলল: ভোরবেলায় তাকে খুঁজে আনা হয়েছে।

আর কিছু জানতে চাইবার প্রবৃত্তি হলনা। বললুম: বেরবার জন্যে তৈরি হও।

বেরবার সময় সোহন বলল: কোন্ দিকের নক্সা নেব হুজুর, উত্তরের না দক্ষিণের?

কাজ আমরা দক্ষিণেই করছিলুম। কাল উত্তরে গিয়েছি গোবিন্দর জায়গায়। এ প্রশ্ন তার সঙ্গত বটে। বললুম: রোজই আমরা উত্তরে যাব।

আমার নির্দেশের কথা গোবিন্দ শুনতে পেয়েছিল। ছুটে বেরিয়ে এল। বলল: না না, দক্ষিণে আমি যেতে পারবনা। দক্ষিণে তোমরা যাও।

গজ স্ট্যাণ্ড দূরবীন নিয়ে খালাসীরা দাঁড়িয়ে আছে। সোহন যাচ্ছিল নক্সার চোঙা আনতে। বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

গোবিন্দকে বড় উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কতকটা সামনে নিয়ে বলল: শ্মশানের দিকে আমার বড় ভয় হয়। আমাকে উত্তরেই যেতে দাও।

মনে হল, গোবিন্দ সত্য বলছেনা। গভীর রাতে একাকী শ্মশানে যেতে যার কিছুমাত্র শঙ্কা জাগেনা, সে কি দিনের বেলায় লোকজন নিয়ে যাকে ভয় পাবে। বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হল। তবু বললুম: যাবে যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ ক'রো।

গোবিন্দ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

আমরা দক্ষিণেই গেলুম।

চলতে চলতে পঞ্চ ম-কারের কথা আমার মনে এল। কাল আমি তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনেছি। সেই ব্যাখ্যা মনের আগুনে পরিপাক হয়ে বড় সুন্দর লাগছিল। মদ্য মানে ব্রহ্মানন্দ, মাংস মানে মৌনাবলম্বন, মৎস্য মানে জ্ঞানার্জন, মুদ্রা মানে সংযম ও মৈথুন মানে ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের মিলন। এই তো পরম যোগ। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সাধনা আর কী আছে! থাকবেই বা কী করে। হরপার্বতী স্বয়ং হলেন প্রবক্তা। মহাদেবের আগম শাস্ত্র ও ভগবতীর নিগম শাস্ত্র। দেবতা কি কখনও কুৎসিত শাস্ত্রের প্রচার করেন!

তন্ত্রের নানা আচার হলেও, ভাব মাত্র তিনটি। মানসিক ধর্মের নাম ভাব। জীবনের প্রথম ষোল বৎসর পশুভাব, বীরভাব পঞ্চাশ পর্যন্ত, তারপর বাণপ্রস্থে দিব্যভাব। ভাবের আবার অভিষেক আছে। আট রকমের অভিষেক। পূর্ণাভিষেকের পর মানুষের শিবসাযুজ্য।

তন্ত্রের কোন কোন স্থানে দ্বৈতাদ্বৈত উভয় ভাবই লক্ষ্য করা যায়। শিবশক্তির সংস্কার সঙ্গে এর বিরোধ নেই। তন্ত্র বলে:

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদা পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।

তিনি এক, তিনি সৎ রূপ, তিনি সত্য, তিনি অদ্বৈত, তিনি পরাৎপর। তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি সদা পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ। এ কথা আমাদের কাছে নতুন নয়। এ কথা বেদে আছে, উপনিষদে আছে, আমাদের পুরাণে ও দর্শনে আছে। সেই সৃষ্টিতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, পরমাণুতত্ত্ব, পঞ্চমহাভূতের কথা ও স্বর্গ-নরক-বাসের প্রসঙ্গ। জন্মান্তর ও পাপপুণ্যের একই ব্যাখ্যা।

একদিন গোবিন্দ আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল যে তন্ত্রে ব্যভিচারের প্রশ্রয় নেই। বিবাহিত স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর প্রতি সকাম দৃষ্টি তন্ত্রে নিন্দিত হয়েছে। শুধু প্রায়শ্চিত্ত নয়, গুরুদণ্ডেরও বিধান আছে। ব্যভিচারীকে বিকলাঙ্গ করে নির্বাসনের বিধান। সেদিন গোবিন্দর এই ব্যাখ্যা আমি মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু কেন জানিনা, আজ আমার এইসব কথা মনে পড়তে লাগল। মনে হল, তন্ত্রের সম্বন্ধে আমাদের একটা ভুল ধারণা জন্মেছে। মিথ্যা প্রচারের দ্বারা তন্ত্রমতকে হয়তো অকারণে বিকৃত করা হয়েছে। এর পিছনেও কি কোন উদ্দেশ্য আছে।

সোহন হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল।

তারা আমার পিছনে আসছিল। চমকে ফিরে দেখলুম যে তারা পথে দাঁড়িয়ে কথা কইছে কোন গ্রামবাসীর সঙ্গে। দূরত্ব খুব বেশি নয়। তাই চেঁচিয়ে বললুম: কী হল?

সোহন ছুটে এগিয়ে এল। বলল: সর্বনাশ হয়েছে।

কিসের সর্বনাশ?

হাঁপাতে হাঁপাতে সোহন উত্তর দিল: খুন।

খুন! কে খুন হল! গোবিন্দ?

না হুজুর।

সোহন ভয়ে কাঁপতে লাগল। পাংশু দেখাচ্ছে তার সমস্ত মুখখানা। যেন মস্ত বড় একটা অকল্যাণ হয়েছে।

তার সঙ্গীরাও এগিয়ে এসেছে। তাদেরই একজন বলল: কারণবাবা খুন হয়েছেন হুজুর, শ্মশানে তাঁর লাশ পড়ে আছে।

আমি অভিভূত হয়ে গেছি।

সোহন বলল: মড়া ফেলে এরা পালিয়ে এল।

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বললুম: চল তো!

শ্মশানে যাবেন!

সবাই আশ্চর্য হল আমার অভিপ্রায় জেনে। কিন্তু আমার অনুসরণ করতেও দ্বিধা করলনা।

অল্পক্ষণ পরেই সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতে পেলুম। যেখানটায় মৃতদেহ নামিয়ে লোকগুলো পালিয়ে গেছে, তার কাছেই উত্তরসাধকের মুণ্ড আসন। গোবিন্দ সেদিন এইখানেই বসেছিল। ওধারে কারণবাবার নিঃসাড় দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ঘাড়ের উপর ছোরার আঘাত রক্তের ধারা নেমেছিল দুধার দিয়ে। এখন শুকিয়ে জমে আছে। পাশের ছোরাটিও আমি দেখতে পেলুম। চমকে উঠলুম এই ঝকঝকে ছোরাখানা দেখে।

বিহ্বলভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর সোহ বলল: আমাদের নিয়ে পুলিসে না টানাটানি করে।

কেন? : আমি জানতে চাইলুম।

সোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: সারারাত ছোকরা বাইরে ছিল!

আমি জানি, এ ছোরা সেই ছোকরার নয়। আমাদে ক্যাম্পেরই নয়। এ ছোরা আমি অন্যত্র দেখেছি। কি সে কথা কি বলা চলে।

●

দিনগুলি, রাত্রিগুলি

অসিতকুমার

দিনগুলি রাত্রিগুলি একে একে হয়ে যাবে ম্লান
অনেক হলুদ পাতা ভরে দেবে পৃথিবীর মাটি
দেখা দেবে ডালে ডালে একটানা উত্তরের টান
—এ কথা জেনেই এই মাটির গভীরে পথ হাঁটি।

এবং জীবন যেন চারিপাশে সমুদ্রসমান
ছড়ায় হিংস্র ফেনা উত্তাল তরঙ্গবাহু তুলে
অনেক মুহূর্তস্রোত, হঠাৎ হাওয়ায় দুলে দুলে
তটের পাথরে তবু দুরন্ত দারুণ অবসান।

জন্মদিন

জীবিতেশ চক্রবর্তী

জন্মেছি কবে এই মর্ত্যের ধুলাতে
ভুলে গেছি, তবু বারে বারে মন ভুলাতে
তারিখটা আসে ঘুরে ফিরে প্রতি বছরে।
উর্বশী দিন নানাবিধ ছলা কলাতে
যৌন মনের গোপন কথাটি বলাতে
বেহায়ার মতো বছরের পর বছরে
তারিখটা আসে। আসে যাতনার রাত্রি
ভোর নেই যার, নেই কোনো সহযাত্রী,
নীল আশা তার কেরানী রোগীর পথ্য।
পদোন্নতির মোহঘেরা অপ্সরা,
ভিখারী দিনের সম্ভার আনে বস্তা,
তাদের মুখে বেঁচে-থাকাটুকু সত্য।
মিথ্যে হয়েছে জয়, জয়লগ্ন,
হাল পাল নেই, এ জীবন-তরী ভগ্ন।

জন্মেছি কেন এই মর্ত্যের ধুলাতে
সে কথা ভাবি না। মন চায় মন ভুলাতে।

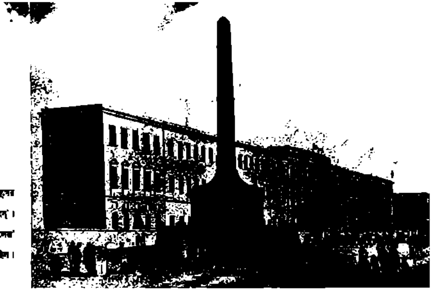

সে-যুগের 'রাইটার্স বিল্ডিং'। 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' এখানেই ছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

যামিনীমোহন ঘোষ

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা যে, কলেজের নাম যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, সেহেতু উহা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গমধ্যে অবস্থিত। কিন্তু সেকালে ফোর্ট উইলিয়ম অর্থে কলিকাতা নগরী বুঝাইত; যথা—'হাইকোর্ট অব জুডিকেচর অ্যাট ফোর্ট উইলিয়ম', 'গবর্নর অব ফোর্ট উইলিয়ম ইন বেঙ্গল'। বাংলায় প্রেসিডেন্সি স্থাপনের পর কলিকাতাকে 'প্রেসিডেন্সি'ও বলা হইত; সেহেতু 'প্রেসিডেন্সি কলেজ', 'প্রেসিডেন্সি জেল', 'প্রেসিডেন্সি জেনারেল হস্পিটাল' ইত্যাদি।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সদর ছিল কলিকাতা। কলিকাতা একটা সুবিস্তৃত পরগনার নাম; বর্তমান ব্যারাকপুরের দক্ষিণ হইতে প্রতাপনগর পর্যন্ত বিস্তৃত, পশ্চিমে গঙ্গা। ডিহি কলিকাতাতে ছিল তিনটি গ্রাম—কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর, যাহা ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে চার্নক বয়নামা পাইয়া ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উহার মালিক সাবর্ণ-চৌধুরী-বংশের কর্তা বিদ্যাধর রায়চৌধুরী হইতে কিনিয়া লন।

লালদীঘির ধারে সাবর্ণ চৌধুরীদের পাকা কাছারি-বাড়ি ছিল। ডিহি বিক্রয়ের পরও এই কাছারি-বাড়িতে পূর্বের ন্যায় রীতিমতো উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ চলিত। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, এই কাছারি-বাড়িতে হোলি-খেলার সময় গোরা নাবিকেরা প্রবেশ করিতে চায়—সেই সময় সাবর্ণ চৌধুরীদের গোমস্তা ফিরিঙ্গী এন্টনী বাধা দেয়। ইহাতে এক ইংরেজ এন্টনীকে বেত্রাঘাত করে। (এন্টনীর বাড়ি ছিল বর্তমান এন্টনী বাগান অঞ্চলে।) সে এই অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া ইংরেজের এলাকা ছাড়িয়া চৌধুরীদের কাছারি-বাড়ি কাঁচরাপাড়ায় চলিয়া যায়। সেখানে এন্টনী-সাহেবের ভগ্নাবশেষ বাড়ি এবং এন্টনীর নামে একটা হাট

আছে। কলিকাতার ইতিহাস-লেখক এ. কে. রায় বলেন যে, এন্টনীর পৌত্র কবিওয়ালা এন্টনী।

হেস্টিংসের আমলেই 'রাইটার'দের আবাসের ব্যবস্থা হইল। কলিকাতার চাকুরিরত সিনিয়ররা শেষের দিকে তাঁদের বাড়িতে নবাগতদের 'গেস্ট' ভাবে আশ্রয় দিতে রাজী হইলেন না। নবাগতদের বাসের একটা ব্যবস্থা দরকার। রাইটারদের আবাসগৃহ তৈয়ার করিলে মোটা ভাড়া পাওয়া যাইবে। টমাস লায়ন নামক এক ব্যক্তি ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির জুনিয়ার কর্মচারীদের আবাসগৃহ নির্মাণ করিবার জন্য দুইটি পতিত খামার-জমির পাট্টা পাওয়ার প্রার্থনা করিলেন। এই জমিই হইল বর্তমান রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর স্থান। লায়ন প্রার্থনাতে জানাইলেন যে, তিনি এক ইমারত-শ্রেণী ('a range of buildings') তৈয়ার করিবেন। এইজন্যই রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর উত্তরদিকের রাস্তাকে *Lyon's Range* বলে।

এদিকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিরেক্টররা হুকুম দিলেন যে, পুরানো কোর্টের বাড়ি সিভিল-সার্ভেন্টদের বাসের জন্য ব্যবহার করা হউক। কটন লিখিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোর্টের মধ্যে নীচের তলার অস্বাস্থ্যকর বাড়িতে রাইটাররা থাকিত, তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কোর্টের অ্যাপার্টমেন্টে পুরানো বাড়িতে বিলাস-আসক্ত রাইটাররা থাকিবে কেন? লায়নের বাড়ি তৈয়ার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা Writers' Buildings দখল করিয়া বসিল। লায়ন বোধহয় এইসব ভাড়া আদায় করার অসুবিধার জন্যই বারওয়েল-এর (গবর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বারের নিকট) বিক্রয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বনামী বা বেনামীতে হউক, বাড়ীর মালিক ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বারওয়েল। কেহ কেহ বলেন, লায়ন বারওয়েলের বেনামদার। বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোডের এক বাড়ি (স্টেট-ব্যাঙ্কের বাড়ি) লায়ন স্যার রবার্ট চেম্বার্সকে বিক্রি করেন; রাণী মুদী গলির (বর্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের) এক বাড়িও বিক্রি করেন। জমি কিনিয়া লইয়া তাহাতে বাড়ি তৈয়ার করিয়া জমি-বাড়ি বিক্রি করা বর্তমানেও অনেকের ব্যবসা। যাহা হউক, বারওয়েল হইতেই কোম্পানি পাঁচ বৎসরের জন্য রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ লীজ নিলেন। বারওয়েলের এই লীজের বিরোধিতা করেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সিস এবং তৎসহ হুইলার। তাঁরা এই লীজে সহি করেন না। রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এ বাস করাতে রাইটারদের একসঙ্গে বাসের ব্যবস্থা হইল। পিছন-দিকেই 'ল্যা গেলিস ট্যাভার্ন'—গুরুভোজন ও খানাপিনার হোটেল, নাচগানের আড্ডা, হৈ-হল্লোড়ের জায়গা। Play House বা থিয়েটার-বাড়ি তো পাশেই ছিল। তৎকালীন 'কলিকাতা গেজেট'-এ সে-সবের কতকটা নমুনা পাওয়া যায়। সারারাত্রি যে তাহারা এখানে আমোদ-প্রমোদ করিয়া কাটাইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহারা দিনের বেলায় কাটাইত সুপ্রীম-কোর্টে চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমার বিচার দেখিয়া। সুপ্রীম-কোর্ট বর্তমান সেন্ট এণ্ড্রুজ গির্জের জায়গায়, রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর পূর্বদিকে। খিদিরপুরের ডক ওয়াটসনের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হইতেছিল। ওয়াটসনের নামেই 'ওয়াটগঞ্জ'। ওয়াটসনের একজন ইংরেজ কর্মচারী দুইজন ছুতার মিস্ত্রীকে মজুরির দাবে বেত্রাঘাত করে ও আটক রাখে। মিস্ত্রীরা সুপ্রীম-কোর্টে নালিশ করে। তখন মহরমের সময়, মিছিলের জনতা আদালতে ভীড় করে। উত্তেজনা সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠে। জনতা ইংরেজদের মারধোর করিয়া হাঙ্গামা বাধায়। ইংরেজরা সুপ্রীম-কোর্টের ছাদে আশ্রয় লয়। এ-সময় ইংরেজ আসামী—নাম কেলী—এক পিয়নের বন্দুক লইয়া জনতাকে তাড়া করে। জনতা রুখিয়া আসিয়া রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ আক্রমণ করে, কারণ ইংরেজদের ওপর তাদের আক্রোশ। জনতা রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর দরজা-জানালা ভাঙিয়া ফেলে। সুপ্রীম-কোর্ট আসামীর জরিমানা করিলেন। চাঁদা করিয়া সেই জরিমানার টাকা তৎক্ষণাৎ আদায় হইল। আসামীকে ইংরেজ-স্বাধীনতার ত্রাণকর্তা উইলক্সের সমতুল্য বলা হইল। ইংরেজদের বিচার যাহাতে ইংরেজ জুরী দ্বারা হয় তাহার ব্যবস্থার জন্য চাঁদা তুলিয়া পরবর্তীকালের 'ক্যালকাটা গেজেট'-এর সম্পাদক অগস্টাস হিকীকে ইংলণ্ডে পাঠানো হইল।

রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর প্রথম লীজ শেষ হইল।

ওয়েলেসলি গবর্নর-জেনারেল হইয়া রাইটারদের শিক্ষা-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আদেশ করিলেন যে, ১৮০১ সনের ১লা জানুয়ারির পর হইতে কোনো অফিসার পরীক্ষা পাস করিতে না পারিলে কোনো পদে নিযুক্ত করা হইবে না। পরীক্ষার বিধিব্যবস্থা পরে নির্ধারিত করা হইবে। আইন, রেগুলেশন ও ভাষা বিষয়ে পাস করা আবশ্যকীয় হইবে। দেওয়ানী আদালতের জজ ও রেজিস্ট্রারদিগকে ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষায় পাস করিতে হইবে। রাজস্ব-কালেক্টর, শুল্ক-কালেক্টর, বাংলা ও উড়িষ্যায় নিযুক্ত লবণের এজেন্টদের বাংলাভাষায় পরীক্ষা অবশ্য পাস করিতে হইবে। বিহারে ও বারাণসীতে

অনুরূপ কাজে নিযুক্ত অফিসারদের অথবা আফিস-এর এজেন্টদিগকে হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষা পাস বাধ্যতামূলক হইবে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে জুনিয়ার সিভিলিয়ানদের Gilchrist Academy-তে ভর্তি হইবার আদেশ দেওয়া হয়। ফারসী ভাষায় পরীক্ষা ইচ্ছাধীন ছিল, কিন্তু হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন ওয়ারিং; তিনি পুরস্কার পাইলেন হিন্দুস্থানীতে ও ফারসীতে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য।

ইহার পর ওয়েলেসলি রাইটারদের শিক্ষার এক বিরাট পরিকল্পনা তৈয়ার করিলেন। তিনি কোম্পানির সিভিল-সারভেন্টদের বিচার, রাজস্ব এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা কর্তব্য-কার্য বলিয়া ধার্য করিলেন। সওয়াল জবাব দেশীয় ভাষায় হইবে। আইন হইবে সাধারণতঃ নবাবী আমলের প্রচলিত আইন—যাহাতে তাহারা অভ্যস্ত। গবর্নর-জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত বহুবিধ রেগুলেশন দ্বারা সেইসব প্রচলিত আইন যেরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে সেই অনুসারে আইনের বিচার করিতে হইবে। সর্বোপরি মূলমন্ত্র থাকিবে 'ব্রিটিশ কন্‌স্টিটিউশন'।

ওয়েলেসলি একটা রেগুলেশন দ্বারা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করিলেন এবং সেখানে রাইটারদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

এই রেগুলেশন দ্বারা ব্যবস্থা হইল গবর্নর-জেনারেল কলেজের পৃষ্ঠপোষক হইবেন। কলেজের গবর্নর হইবেন সুপ্রীম-কোর্টের মেম্বারগণ, সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের জজগণ। অ্যাডভোকেট-জেনারেল ও স্ট্যাণ্ডিং-কাউন্সেল আইন-উপদেষ্টা হইবেন। প্রোভোস্ট ও ভাইস-প্রোভোস্ট বেতনভুক্‌ হইবেন, তাঁহাদিগকে এই রেগুলেশন জারীর সঙ্গে সঙ্গেই নিয়োগ করা হইবে। প্রোভোস্ট হইবেন ধর্মযাজক।

বাংলা-র প্রেসিডেন্সিতে নিযুক্ত নবাগত সিভিলিয়ানদের প্রথম তিনবৎসর প্রবাসিত শিক্ষায় কলেজে কাটাইতে হইবে।

কলেজে শিক্ষা-বৎসর ৪টি 'টার্ম'-এ বিভক্ত করা হইবে। প্রত্যেক টার্ম-এর মাঝে একমাসের ছুটি থাকিবে। কলেজটি আবাসিক হইবে। সকল সিভিলিয়ানদের একসঙ্গে খাইবার (common table) ব্যবস্থা হইবে।

Champion
REGD.

A pen which leaks, clogs and smudges makes writing tedious and tiresome. The CHAMPION pen is an exception.

Manufactured according to the latest precision techniques, it makes writing effortless and pleasurable. Available in a wide range of styles and colours, at prices to suit everyone.

GUJRAT
INDUSTRIES
PRIVATE
LIMITED

Lalji Mansing Bldg., Lohar Chawl,
Bombay-2

এই কলেজ রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ হইতে সরাইয়া, কলিকাতা হইতে কিছুদূরে গার্ডেনরিচে লওয়ার প্রস্তাব করা হইল। গার্ডেনরিচ কলিকাতার কাছে, সেখানে বিস্তৃত জায়গা পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেখানে বাড়ি করিতে দেরি হইবে। সেজন্ত রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এ এই কলেজ আপাততঃ রাখা সাব্যস্ত হইল। এবং আবশ্যকমতো পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া করিয়া লাইব্রেরি, খাইবার হল্, লেকচার-হল্ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। সৈন্তবিভাগ টিপু সুলতানের লাইব্রেরির যে অংশ গবর্নর-জেনারেলকে উপহার দিয়াছে, তাহা এখানে রাখা যাইতে পারে।

অন্ত ভাড়া-বাড়ির ব্যবহার সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, পরবর্তীকালে 'এক্সচেঞ্জ' ভাড়া করা হইয়াছিল। এই বাড়ি লালদিঘীর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত ছিল। এখানে পাদরী ব্রাউন, বুকানন ও কেরী রাইটারদিগের নিকট বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু প্রধান লক্ষ্য ছিল—পাদরী প্রোভোস্ট তাহাদিগকে রোজ prayer করাইবেন এবং ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা অচল।

পরবর্তীকালে টিপু সুলতানের লাইব্রেরির একটিমাত্র হাতে-লেখা বই (manuscript) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভাগ্যে পড়িল। পরিকল্পনায় আরও ব্যবস্থা হইল যে, কলেজের ছাত্রদের প্রত্যেককে আবাসস্থল দেওয়া হইবে। কলেজের ব্যয়েই তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রত্যেক টার্ম-এ সপ্তাহে দুইদিনের বেশী কোনো ছাত্রই খাওয়ার টেবিল হইতে অনুপস্থিত থাকতে পারিবে না। তাহাদিগকে ৩০০৲ টাকা অ্যালাউয়েন্স দেওয়া হইবে ও নিখরচায় খাওয়া ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

প্রোভোস্ট নিযুক্ত হইলেন পাদরী ব্রাউন, তাঁহার অফিস বসিল কোর্ট হাউস স্ট্রীটে; সেখান হইতে তিনি নোটিস জারী করিলেন ১০ই নভেম্বর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। নোটিসে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, ২৪শে নভেম্বর সোমবার হইতে লেকচার আরম্ভ হইবে—আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষায়। ঐ তারিখই 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' স্থাপনের তারিখ ধরা যাইতে পারে। ১৮ই আগস্ট তারিখের ডিরেক্টরদের অনুমতি পাওয়ার পূর্বেই ওয়েলেসলি তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কলেজের কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু ডিরেক্টরগণ পরিকল্পনা মঞ্জুর করিলেন না। তাঁহারা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের চিঠিতে লিখিলেন—"আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এই কলেজ-স্থাপন-ব্যাপারে আমরা সম্মতি দিতে পারিতেছি না। কারণ আমাদের অপরিমিত ঋণ, ভারতবর্ষে অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা, সেহেতু আমাদের ধারকরী (credit) কমিয়া যাওয়া, আমাদের ব্যবসায়ে টাকা খাটানো কমিয়া গিয়াছে, কি বলিতে গেলে, একেবারে বন্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায় আমরা কলেজের জন্ত খরচ করিতে পারিব না।" তাঁহারা হুকুম দিলেন—কলেজ অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। গার্ডেনরিচে জমি খরিদ করা বন্ধ হউক এবং রাইটারদিগকে গিল্‌ক্রাইস্টের সেমিনারিতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হউক।

অন্ত কোনো ব্যক্তি হইলে, এইরূপ ব্যর্থমনোরথ হইয়া মুষড়াইয়া পড়িতেন। কিন্তু ওয়েলেসলি সে-ধাতের লোক ছিলেন না। তিনি লিখিলেন—"ডিরেক্টরদের আদেশ মানিতেই হইবে। গার্ডেনরিচের কেনা জমি ক্ষতিতে বিক্রি করিয়াছি। কিন্তু ডিরেক্টরদের হুকুম সাপেক্ষে কলেজের পঠন (course) আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় তিন-বৎসরের কোর্স শেষ হওয়ার পূর্বে কলেজ বন্ধ করা চলে না। সেইজন্ত যদি কলেজ তুলিয়াই দিতে হয়, তবে ডিরেক্টরদের আদেশ তিনবৎসরের জন্ত মকুব রাখা হউক।"

ডিরেক্টররা কূটনীতির ফাঁদে পড়িলেন। অগত্যা তাঁহারা ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের এক চিঠিতে তাঁহাদের আদেশ রদ-বদল করিলেন। কলেজ রহিয়া গেল। কিন্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাইটারদের নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল।

এদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংলণ্ডেও কলেজে হিন্দুস্থানী ভাষা পড়ার ব্যবস্থা করা হইল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিকাতা গেজেট'-এ দেখা যায় মুন্সী মির্জা খলিল হার্টফোর্ড কলেজে হিন্দুস্থানী শিক্ষার জন্ত ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। ইহার পূর্বে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাঙালী মুন্সী মহম্মদ ইংলণ্ড যান; তাঁহার বাড়ি ছিল নদীয়া জেলায়; শেখ তাজুদ্দিনের পুত্র। বাদশাহ শাহ আলম ইংলণ্ডের রাজার নিকট এক প্রার্থনা-পত্র পাঠান, যাহাতে তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসানো হয়। এই প্রার্থনা-পত্রের দূত হন মেজর সুইনটন—বার্ন কোম্পানির অন্ততম স্থাপয়িতা। মুন্সী মহম্মদকে সুইনটনের সঙ্গে পাঠানো হয়, যদি কোনো ফারসী চিঠি ইংলণ্ডের রাজা শাহ আলমকে লিখেন, তাহা ফারসী ভাষায় লিখিবার জন্ত। মুন্সী তিন বৎসর ইংলণ্ডে ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন 'শিগর্ফ নামা'।

ডিরেক্টরদের আদেশ অনুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ অনেকটা দেশীয় ভাষার শিক্ষাকেন্দ্র হইল। কেরী, বুকানন ও পাদরী ব্রাউন কলেজে বক্তৃতা দিতেন। কেরী-রচিত বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা-ইংরেজী অভিধান এই কলেজের ছাত্রদের বাংলা-শিক্ষার প্রধান সহায়ক হয়। কেরীর সহকর্মীরা পুস্তক লিখিতেন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। যদিও তাঁহার উড়িষ্যায় জন্ম। তাঁহার রচিত 'রাজাবলী' ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি বিদ্যাপতি-রচিত 'পুরুষপরীক্ষা'র বঙ্গানুবাদ, এবং 'বত্রিশ-সিংহাসন'-এর বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁহার এইসকল বই কলেজে পড়ানো হইত। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' ১৮০১ সালে লিখিত হয়। ইহাও কলেজের পাঠ্য ছিল। সংস্কৃতাভিজ্ঞ উইলসনের সহকর্মী রামকমল সেনের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনিও এই কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে। পরে বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের দেওয়ান নিযুক্ত হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথম বাংলা গদ্যরচনা 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য উহা রচনা করেন। তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজের প্রধান কেরানী (Head writer) নিযুক্ত হন। বলিতে গেলে, এই কলেজের নিকট বর্তমান গদ্য-বাংলা-ভাষা অনেকাংশে ঋণী।

রাইটারদের বাসস্থান ও খাওয়া-খরচ বাবদে ৩০০৲ ভাতা ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল।

পরীক্ষা হইত—কতক লিখিত ও কতক মৌখিক। মৌখিক পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত ছিল: ফারসী—আনওয়ারী সোহেলী, গুলিস্তান; হিন্দুস্থানী—প্রেমসাগর; বাংলা—হিতোপদেশ। অনার্স-সহ পাস করিলে ১,০০০৲ পুরস্কার দেওয়া হইত।

এদিকে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ হেইলবারিতে স্থাপিত হইল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন দ্বারা ১৮ হইতে ২২ বৎসর বয়সের যুবকদের হেইলবারি কলেজে ভর্তি না হইয়াও, একটি পরীক্ষা লইয়া 'রাইটার' নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা পাঁচ বৎসর চলিল—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আবশ্যিক সময়ে (probationary period) রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এ রাইটারদের আবশ্যকীয় (compulsory) বাস তুলিয়া দেওয়া হইল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ বাংলা-গবর্নমেন্টকে হস্তান্তরিত করা হইল।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্ট এক আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ করিলেন যে, যোগ্যতামূলক পরীক্ষা দ্বারা সিভিলিয়ানদের নিযুক্ত করা হইবে। ইহার পর আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোনো সার্থকতা রহিল না। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এ রাইটারদের বাধ্যতামূলক বাস-ভবন উঠাইয়া দেওয়া হইলে পর রাইটা[illegible]ংস্ অনেকদিন মার্চেন্ট-অফিস-রূপে ব্যবহৃত হইত। [illegible]ঃপর রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ বাংলা-সরকারের দপ্তর হইয়াছে।

রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর আলোচনাকালে একটি কথার উল্লেখের প্রয়োজন। যুদ্ধে নিহত সিভিলিয়ানদের একটি স্মৃতিস্তম্ভ এখানে আছে, কিন্তু বাঙালীর গৌরব যাঁহারা এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে এই বিল্ডিংস্-এর সম্পর্ক-নির্দেশক কিছু নাই। মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে বসিয়াই 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন'-এর খসড়া করেন, বেঙ্গলী-ট্র্যানস্লেটার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসু তাঁহাদের অনেক গ্রন্থই এখানে বসিয়া রচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অনেক ঐতিহাসিক এই বিল্ডিংস্-এর Historical Record Room-এ বসিয়া ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়াছেন; যথা—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, ইত্যাদি; ইহা ছাড়া একজন ডাচ্ প্রফেসারও গবেষণা করিয়াছেন। ইহাদের নামে কি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয় নয়? বঙ্কিম 'দেবী চৌধুরাণী'র ঐতিহাসিক তথ্য এইখানেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি।

পূর্বস্মৃতি

শরৎকুমার মিত্র

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

১৮৯২

১

এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ পড়িব বলিয়া ভর্তি হইতে গেলাম, তখন দেখিলাম, নোটিশ-বোর্ডে জিওলজি বা বাইওলজি-তে যদি ৭ জন করিয়া ছাত্র পাওয়া যায় তো ক্লাস খোলা হইবে। সার্ চার্লস এলিয়ট এই নোটিশ দিয়াছিলেন, বড় আনন্দ হইল। কারণ, ১৮৯৩ সালে মুঙ্গেরে একমাস থাকিয়া, এবং উষ্ণ প্রস্রবণ, সীতাকুণ্ড দেখিয়া এবং ১৮৯১ সালে বরাকরে থাকিয়া কয়লাখনি ও অনেক quartz crystals ও কুলটি Iron and Steel Works দেখিয়া Geology পড়িবার বড় সাধ হইয়াছিল।

আমি দশ-এগার জন ঠিক করিলাম,—(সার্) বি. এল. মিত্র, (জষ্টিস) দ্বারকানাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ মিত্র (ব্যারিষ্টার, সার্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের সহোদর), মনোজমোহন বসু (হাইকোর্টের উকিল, পুলিস কোর্টে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত), আর্. ডব্লু. টিপেনডেল (অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট; বিশপস্ কলেজ হইতে এফ. এ উত্তীর্ণ ও সিংহলবাসী), চারুচন্দ্র দত্ত (আই. সি. এস.) এবং অপর পাঁচ-ছয় জন। কিন্তু প্রিন্সিপাল সার্ আলেকজাণ্ডার পেডলার কিছুতেই এই খবর Lieutenant Governor সার্ চার্লস এলিয়ট-কে দিলেন না। তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না যে Geology বা Biology ক্লাস খোলা হয়। বোধহয় তাহা হইলেই প্রিন্সিপাল-এর কাজ বাড়িবে। আর তাঁহার ইচ্ছা ছিল সকলে Physics আর Chemistry লয়। ফলে তিন-চার জন Physics আর Chemistry Class-এ যোগ দিল (তন্মধ্যে চারুচন্দ্র দত্ত) percentage ও attendance পাছে কম হইয়া যায়।

তখন আমি সার্ চার্লস এলিয়ট-এর কাছে বেলভেডিয়ারে একদিন গেলাম। তিনি ছেলেদের বড় ভালবাসিতেন। এবং মধ্যে মধ্যে ছেলেদের গার্ডেন পার্টি দিতেন। ছেলেরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে, পাহারাওয়ালা, চাপরাশি বা বাবুরা খবর দিত। আমি গিয়া দেখা করিলাম ও বলিলাম—"আমরা এখনও ছয় জন আছি, আর একজন এক্সটার্নাল ষ্টুডেণ্ট হইতে চায়, সে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশান-এ পড়ে, সে শুধু Geology পড়িতে চায়। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আরও ছাত্র জুটিবে।" সার্ চার্লস এলিয়ট বলিলেন—"এক্সটার্নাল ষ্টুডেণ্ট কে হইতে চায় এবং কেন? অপর যে ছাত্র জুটিবে কেন তোমার মনে হইতেছে?" আমি বলিলাম—"আর যে কারণই থাক, নূতন বিষয়ে সহজে পাস হইয়া যাইবে এই ভরসায়।" তিনি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"আচ্ছা, ক্লাস খোলা হইবে।" খোলাও হইল। সার্ টমাস হলাণ্ড, Superintendent, Geological Survey, প্রফেসর নিযুক্ত হইলেন। শুক্রবার ছাড়া এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইতেন। শুক্রবার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম-এ যাইতে হইত। ৩টা হইতে ৫টা পর্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল হইত। Botany, Anatomy ও Zoology-র elementary knowledge আবশ্যক বলিয়া মেডিক্যাল কলেজ-এ

লেকচার শুনিবার ব্যবস্থা পরে হয়। প্রথমে প্রিন্সিপাল সে রাজী হন নাই। বলিয়াছিলেন যে শুধু মেডিক্যাল কলেজ-এর মিউজিয়ম দেখিবার সুযোগ দিতে পারেন। পরে হলাণ্ড সাহেব চেষ্টা করিয়া লেকচার শুনিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যাহারা সহজে পাস করিবেন বলিয়া এই ক্লাসে ভর্তি হইয়াছিলেন, তাঁহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন। কারণ, Geology-র পেপার-সেটার ও একজামিনার ছিলেন, মিঃ ডব্লু. কিং, Director, Geological Survey of India। তিনি বাঙ্গালীদের Geological Survey Department-এ ঢুকিতে দিতে বড়ই নারাজ ছিলেন। তখন পরীক্ষায় প্রশ্ন শক্ত হইলে বা বেশী ফেল হইলে, ছেলেরা ষ্ট্রাইকও করিত না, হাঙ্গামাও করিত না। প্রথম যেবার এই Geology Class-এর বি. এ. পরীক্ষা হয়, অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Mathematics-এর B. Course-এ ভয়ানক ফেল হইয়াছিল; কারণ তখন নিয়ম ছিল প্রশ্নে শতকরা ষাট ভাগ পাঠ্য বই হইতে থাকিবে। পাস-মার্ক ছিল শতকরা তিরিশ, কিন্তু সেবার পাঠ্য বই-এর প্রশ্ন সবে ছিল শতকরা তেত্রিশ ভাগ, তাহার মধ্যে আবার অনার্স কোর্স হইতে বারো নম্বর ছিল। যখন কলেজে ক্রস-লিষ্ট আসিল, তখন অধ্যাপক গিলিল্যাণ্ড (Senior Professor in Mathematics এবং paper-setter) দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ছেলেরা ইউনিভার্সিটি-তে দরখাস্ত বা গোলযোগ করে নাই।

যতদূর মনে আছে, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শীতকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি "Edisons Phonograph" (স্যর্) জগদীশচন্দ্র বসু আনাইয়াছিলেন। ফনোগ্রাফ সেই নূতন আবিষ্কার হইয়াছে। তখন গ্রামোফোন ওঠে নাই। আমি তখন প্রায়ই অধ্যাপক বসুর কাছে গিয়া ফনোগ্রাম শুনিতাম। তিনি মতি রায়ের যাত্রার রেকর্ড করিয়াছিলেন। একদিন যাত্রার একটি রেকর্ড চালাইয়া তিনি পার্শ্বের ঘরে গিয়াছিলেন, ফনোগ্রাম যে ঘরে চলিতেছিল সে ঘরে কেহই ছিল না। এমন সময় কলেজের হেড ক্লার্ক অখিলবাবু অধ্যাপক বসু-কে প্রিন্সিপাল টনি-র কাছে ফনোগ্রাম-এর বিল সম্বন্ধে কথা বলিবার জন্য যাইতে বলিতে আসিয়াছিলেন। টনি সাহেব অত টাকা (১,০০০৲) দিয়া একটা ইন্‌স্ট্রুমেন্ট কেনায় বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। অখিলবাবু, ঘরে কেহ নাই অথচ গান হইতেছে দেখিয়া, ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া প্রিন্সিপাল টনির কাছে চলিয়া যান।

অখিলবাবু একে ভয়ানক ভীত হইয়াছিলেন, তাহার উপর ভুঁড়ি ছিল যথেষ্ট—ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে গিয়া বড়ই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বহু কষ্টে টনি সাহেবের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে। টনি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"বোস সাহেব কই?" তখন অখিলবাবু বহু কষ্টে বলিলেন—"ঘোস্ট (ghost) Sir, ঘোস্ট Sir!" টনি সাহেব আগে ত' *ghost* কথার উচ্চারণটা যে 'ঘোস্ট' নয় 'গোস্ট' তাহা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপার কি। যখন বহু কষ্টে অখিলবাবু সব বলিলেন, টনি সাহেব নিজে একতলায় ফিজিক্স ল্যাবরেটরী-তে গেলেন। গিয়া ফনোগ্রাফ শুনিলেন। শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ফিজিক্স-এর সিনিয়র প্রফেসর ডব্লু. বুথ সাহেবের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ১,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ বরাবর বাবার নিমন্ত্রণ রাখিবার জন্য আমি দিঘাপতিয়া যাইতেছিলাম। নিমন্ত্রণের উপলক্ষ ছিল দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার (তখনও রাজা হন নাই) প্রমদানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশন ও তাঁহার ছোট দুই ভ্রাতা কুমার শরৎকুমার ও হেমন্তকুমারের বিবাহ। আমাদের দুই পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাজা প্রমথনাথ ও বাবা ছিলেন কলেজের সহপাঠী। রাজার পুত্র প্রমদানাথ ও বসন্তকুমার আমার সহপাঠী। শৈশবে আমি, প্রমদানাথ ও বসন্তকুমার একত্রে দিনরাত্র অনেকদিন কাটাইয়াছি ও একত্রে মায়ের সহ ঘুমাইয়াছি।

দিঘাপতিয়া যাইতে নাটোর ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া ৫ মাইল ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে হইত। তখন ত' মোটর কার সৃষ্টি হয় নাই।

আমার সহিত বাবু মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ছিলেন। তিনি তখনও মহারাজা হয়েন নাই। এবং বাবার নিকট অনেক রূপে সাহায্য পাইতেন। তিনি ও দিঘাপতিয়া রাজারা এক জা'ত।

দার্জিলিং মেলে যাইব বলিয়া আমি ও মণীন্দ্রবাবু টিকিট কিনিয়া ট্রেনের কাছে গিয়া দেখিলাম, ট্রেনের মাঝখানে যে ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আছে

তাহাতে স্থান নাই। ট্রেনের ঘণ্টা ১০ মিঃ থাকিতে হয় এবং রাত্রি ৬টায় নাটোর পৌঁছায়। প্লাটফরম্‌-এ একজন গার্ড বলিয়া দিলেন, শেষে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আছে (তখন eight wheeler হয় নাই) তাহাতে জায়গা আছে। পিছনে গিয়া দেখি, কথা ঠিক, সেখানে আরও তিনজন আমাদের ন্যায় বিপৎপতিত যাত্রী প্লাটফরম্‌-এ অপেক্ষা করিতেছেন। তন্মধ্যে, চক্ষুর ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচী এবং গবর্ণমেণ্টের হিন্দি-ট্রানস্লেটর কানাইলাল শাস্ত্রী ছিলেন। গাড়ীতে উঠিতে পারিতেছেন না। গাড়ীতে উঠিবার দরজা আটকাইয়া একটি ক্ষীণদেহ সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। কাহাকেও উঠিতে দিতেছেন না। প্লাটফরম্‌-এ যে গার্ডরা ছিল, তাহারাও সাহেবকে কিছু বলিতেছে না। এমন সময় একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক—নাতিদীর্ঘ, উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, আমাদের ন্যায় ধুতী, সার্ট ও উড়ানী পরিধান, আসিলেন। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা দাঁড়াইয়া আছি কেন? ট্রেন ছাড়িতে ত' পাঁচমিনিটও বাকী নাই। আমরা ব্যাপারটা বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করিতেছি।" বলিয়া তিনি সাহেবটির কাছে গিয়া, ইংরেজীতে দরজা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি ছাড়িতে পারেন না, কারণ তাঁহার মেম আছেন। তিনি নেটিভদের উঠিতে দিতে পারেন না। আমাদের নূতন বন্ধুটি বলিলেন—"তোমাকে ছাড়িতেই হইবে।" সাহেবটি বলিলেন—"কিছুতেই নয়।" আমাদের বন্ধু বলিলেন—"আচ্ছা", বলিয়া সাহেবটির রিষ্ট ধরিলেন ও চাপিয়া ধরিলেন। তখন সাহেব বলিলেন—"আমি ছাড়িয়া দিতেছি।" বলিয়া তিনি ও মেম সাহেব নামিলেন। এবং তাঁহার সঙ্গে যা ট্রাঙ্ক ও বেডিং ছিল, গুটাইয়া লইয়া প্লাটফরম্‌-এ রাখিলেন। এমন সময় গার্ডরা খবর দেওয়ায় সাহেব ষ্টেশন মাষ্টার স্বয়ং সেখানে হাজির। সাহেব, যাত্রী সাহেবকে বলিলেন—"আমি একখানা গাড়ী জুড়িয়া দিতেছি, কোন ভাবনা নাই।" তাহাই হইল। ট্রেন দশমিনিট দেরীতে ছাড়িল।

ট্রেন ছাড়িবার পর জানিলাম আমাদের বন্ধুটি প্রফেসর রামদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি নৈহাটী যাইতেছিলেন, তাঁহার সার্কাস সেখানে হইবে।

এই ঘটনায় আমার বহু পুরাতন একটি কথা যাহা শুনিয়াছিলাম এবং যাহা নিজের হইয়াছিল এক বৎসর আগে, মনে পড়িল এবং আমার সহযাত্রীদের বলিলাম।

বহু পুরাতন কথাটি এই। শেওড়াফুলির রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় (আওরঙ্গজীবের সময়ে এই পরিবারের কর্তা রাজা উপাধি পান); তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার গিরীন্দ্রনাথ ট্রেনে করিয়া শেওড়াফুলি হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস-এই আসিতেছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহাদের বাটীর প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলেন এক সাহেব পা ছড়াইয়া একটি বেঞ্চ ভরিয়া বসিয়া আছেন। অন্য বেঞ্চে একটা বড় ট্রাঙ্ক আছে। কুমার গিরীন্দ্রনাথ মাষ্টার মহাশয়কে ট্রাঙ্কের পাশে বসাইলেন। নিজে সাহেবের কাছে আসিয়া বলিলেন পা গুটাইয়া লইতে, যাহাতে স্বচ্ছন্দে বসিতে পারেন। সাহেব কোন কথারই জবাব দিলেন না। কুমার সাহেবী পোষাকেই ছিলেন, কিন্তু তিনি যে নেটিভ তাহা অবশ্য বুঝিতে পারা যাইতেছিল, যদিও তিনি বেশ ফর্সা ছিলেন। সাহেব কথার কোন উত্তর না দেওয়ায়, কুমার জুতা শুদ্ধ পা বেঞ্চে তুলিয়া দিলেন এবং সাহেবের ও তাঁহার জুতা ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল। সাহেবকে তিনি বলিলেন—"Will you please sit up?" সাহেব বলিলেন "না", এবং বলিলেন বসিবার জায়গা যথেষ্ট আছে। কুমার বলিলেন—"I refuse to sit there, you have to sit up." সাহেব বলিলেন—"I refuse to do so." কুমার বলিলেন—"You have to. If you do not do as I say, you will feel the consequence." সাহেব বলিয়াছিলেন—"Take care." এই বলিতেই কুমার সাহেবকে এক বিরাশী সিক্কার চড় মারেন। সাহেব বলেন—"You will feel the consequence now, when we reach Howrah you will be handed over to police." কুমার বলিলেন—"Very well." ট্রেন হাওড়া পৌঁছিল এবং কুমার, শিক্ষক ও সাহেব নামিলেন। পুলিসকে না ডাকিয়া সাহেব চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া কুমার তাঁহাকে বলিলেন—"কই পুলিসের কাছে আমাকে দিলে না?" সাহেবটি বলিলেন—"No. Let us forget and forgive."

সাহেবটি স্যর্ আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী, পরে বাঙ্গালার ছোটলাট হন।

আমার নিজের যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা এই। এক সোমবারে ঠিক ১১ মাস আগে অর্থাৎ ১৯২২ সালে মার্চ মাসের শেষ। আমি দেশ হইতে বড় এক বস্তা আলু আনিয়াছিলাম। সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী আমি। দেখিলাম, বোগী-তে একখানি বড় সেকেণ্ড ক্লাস ও একখানি কুপ্‌।

আমি কুপ্‌-এ বস্তাটি লইয়া উঠিয়া বসিলাম। এদিকে শেওড়াফুলিতে বড় কম্পার্টমেন্ট ভর্তি, অনেকে দাঁড়াইয়া। সব অফিস বা আদালত যাত্রী। আমার একটি পরিচিত ভদ্রলোক, আমার চেয়ে বয়সে ১০।১২ বৎসরের বড় (প্রায় ৩০) বলিলেন—"ওহে, তুমি করিয়াছ কি, ঐ কম্পার্টমেন্ট-এ উঠিয়াছ, আবার আলুর মত একটা বস্তা লইয়া! তুমি ফার্ট ক্লাস-এ আসিলে না কেন?" আমি বলিলাম—"কেন? আপনারা সব কষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া পর্যন্ত, কেন ও গাড়ীতে ভিড় করিতেছেন, এই কম্পার্টমেন্টটা খালি, কেউ কেউ আসুন না।" তিনি বলিলেন—"না।' দেখিবে এখন।" ট্রেন ছাড়িয়া দিল। শ্রীরামপুরে চার জন সাহেব আসিয়া কুপ্‌-এ উঠিলেন, এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া একজন আমার কাছে আসিয়া বলিলেন—"What's in this bag? Why did you not put it in the luggage van?" বেশ একটু রুক্ষ ভাবেই বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—"That is my look-out." পরে তিনি বলিলেন—"You go and sit in that corner and remove your bag to that corner." সে কর্নারটাতে রৌদ্র আসিতেছিল। আমি বলিলাম—"No. I am not going to that, but I can do so, if you help me to remove the bag, I can then put up the shutter and sit there." সাহেব বলিলেন—"Why shall we help you? You have to go to that corner and remove the bag." আমি বলিলাম—"I refuse to do that", এবং মুচকাইয়া হাসিলাম। সাহেবরা মুখ চাওয়া-চায়ি করিল এবং তিনজন একই বেঞ্চে বসিল।

পরবর্তী সোমবার আমি পুনরায় আসিতেছিলাম। ঐভাবে আবার তিনটি সাহেব আসিলেন। সেবার আলুর বস্তা শেওড়াফুলিতে নাবাইয়া দিয়াছিলাম, চুঁচুড়ায় আমার পিসেমহাশয়ের জন্য। আমি পা ছড়াইয়া বসিয়াছিলাম, অন্য বেঞ্চের কোণের উপর। সাহেবগুলি পাশের বড় কম্পার্টমেন্ট-এ গিয়া বসিলেন, যাত্রীদের মুখে পরে শুনিলাম—"Allow us please get in, we shall not disturb you and shall keep standing if required. Some

"উমেশ যোগ দর্শন"
(প্রথম খণ্ড)
চারিটি ভাষায়: ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী
(গ্রন্থকার: শ্রীযোগীরাজ উমেশচন্দ্রজী)

UMESH YOGA DARSHAN

যোগ সম্বন্ধে একটি চমৎকার নিবন্ধ, যাহা ব্যাখ্যা কোরেছে কিভাবে হৃদযন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য শারীরিক তন্ত্রসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১০৮টি বাস্তব আসনের চিত্রে সম্পূর্ণ। যোগের দ্বারা নেচারোপাথি, ক্রোমোপাথি, সাইকো-থেরাপি ইত্যাদি নিরাময় সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। প্রতিটি গৃহ, হাসপাতাল ও গ্রন্থাগারে যোগ্য স্থান পাবার অধিকারী। মূল্য ১৫৲; ডাকখরচ অতিরিক্ত; ভি. পি. করা হয় না।

যোগাসন চার্ট
আর্ট পেপার কাগজে ছাপা, যোগাসনের চিত্র সম্বলিত একটি ছবির তালিকাও পাওয়া যায়। ডাকখরচ সহ মূল্য ২'৫০ ন. প. মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিতব্য।

রামতীর্থ ব্রাহ্মী তৈল

পেটেন্ট নং ১
রেজিষ্টার্ড

মরামাস খুস্কি নিবারণ ও চুলওঠা বন্ধ করার জন্য একটি অমূল্য বলকারক। বহু মূল্যবান মৌলিক উপাদান সহযোগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মস্তিষ্কের চলাচল ব্যবস্থা উন্নত করে এবং সুনিদ্রা আনয়ন করে। অঙ্গমর্দনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। সকল ঋতুতে ইহা প্রত্যেকের পক্ষে উপকারী। বড় বোতল ৪৲, ছোট ২৲, সর্বত্র পাওয়া যায়।

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম
দাদার, সেন্ট্রাল রেলওয়ে: বোম্বাই-১৪
টেলিফোন—৬২-৮১১ টেলিগ্রাম "প্রাণায়াম" দাদার: বোম্বাই

sight of you can go to next practically empty coupe." অবাক হইয়া গেলেন অনেকে। কিন্তু ছয়-সাত জন আমার গাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাদের মুখে ঘটনাটি শুনিলাম।

আজকাল সাহেবদের রকম সকম কিরূপ, তাহার আরও দুই-তিনটি ঘটনা এইখানে লিপিবদ্ধ করি। এই দুই-তিনটি ঘটনা আমার বিষাণভিরা যাত্রার ঘটনার পর। শুনিয়াছি পূর্বে নাকি এরূপ ইতর বা কাপুরুষ ছিল না।

অনন্ত বাগচী আমার কলেজের সহপাঠী। তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাত ৺বরদাপ্রসাদ বাগচী বাবার সহপাঠী ছিলেন। তিনি প্রথমে ওকালতি করিতেন। পরে কীর্তনই করিতেন। আমার সহিত ১৯১৪ সালে বৃন্দাবনে দেখা হয়। তখন তাঁহার বয়স ৬৮।৬৯। অনন্তর পিতা ছিলেন ৺অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। তিনি শেষ পর্যন্ত সবজজ হন। অনন্ত-পিতৃব্য ছিলেন, আগরার বিখ্যাত ডাক্তার ৺রমাপ্রসাদ বাগচী, এবং যাঁহার আতিথেয়তা চিরস্মরণীয়। ইঁহারা মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত বহরমপুরের বিখ্যাত বাগচী বংশের। আমার শ্বশুর মহাশয়ও বহরমপুরের বিখ্যাত গুহরায় বংশের। এই দুই পরিবারে খুব সৌহার্দ্য ছিল—যেন এক পরিবার।

অনন্ত এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় তাঁহার বাবা বকিয়াছিলেন। সে তাহার একমাত্র কন্যা দুর্গাকে অন্নদাবাবুর কাছে রাখিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। আমার যখন (১৯০০ সালে বোধ হয়) আলিপুরে অন্নদাবাবুর সহিত দেখা হয়—তখন তিনি বলিলেন—"অনন্ত পশ্চিমে আছে শুনিয়াছি, সে এখানে আসে না।" তাহার পর ১৯১১ সালে, রাঁচী যাইবার উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া হইতে আমি সপরিবারে যাইতেছিলাম। প্রায় ২০ বৎসর পরে অনন্তর সহিত দেখা। নূতন করিয়া চেনাশুনা হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি করছিস্ আজকাল?" সে বলিল—"কিছু নয় ভাই, কাষ হচ্ছে সাহেবদের চাবুক মারা।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কিরকম।" সে বলিল—"ভাই, কানপুরে আমার হেড কোয়ার্টার, আমি কয়লার ব্যবসা করি। সাহেব স্টেশনমাষ্টার একবার সাহেবদের আনুকূল্যে আমার ব্যবসার ক্ষতি করে, এবং তাহারাও আমার সহিত খুব অপমানজনক ব্যবহার করে। সেই অবধি আমি সাহেব দেখিলেই চাবুক মারি। আমি সর্বদা cabriolet হাঁকাইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। একবার উহারা দুই-তিন জন মিলিয়া আমাকে রাস্তায় মারে। কিন্তু আমি একাই উহাদের খুব মারি। তারপর আর সাহেবরা আমাকে দেখিলে, সেদিকে আর আসিত না। আমার ব্যবসাও বেশ চলিতে লাগিল।" অনন্ত পরে রামমূর্তির সহিত wrestling করিতে করিতে একটা শিরা ছিঁড়িয়া গিয়া মারা যায়।

অন্য একটি ঘটনা এই। এটি ফিরিঙ্গিদের সাহসিকতার দৃষ্টান্ত! ১৯১০ সালে, আমি হাইকোর্টের পূজার ছুটিতে ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতাম। কারণ, আমাদের বাটীর ও শ্বশুরবাটীর সকলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। কেবল আমি ও আমার স্ত্রী ছিলাম কলিকাতায়। আমি প্রতিদিন বৈকালে নিজেদের বাটীতে আসিতাম এবং ব্যাডমিণ্টন খেলিয়া ও ডাকের চিঠিগুলি লইয়া শ্বশুরবাড়ীতে ফিরিতাম। একদিন সন্ধ্যার সময় ট্রাম-এ গিয়া এসপ্লানেড জাংশন-এ পৌঁছিলাম। কালীঘাটের ট্রাম-এর অপেক্ষায় আছি। এমন সময় দেখিলাম কিছু দূরে—আন্দাজ হাত পনের-কুড়ি দূরে খুব জনতা হইয়াছে, এবং গোলযোগ হইতেছে। আমি সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি, একটি মুচী এক ফিরিঙ্গির জুতা সেলাই করিয়া প্রাপ্য পয়সা সম্পূর্ণ পাইতেছে না। 'সাহেব' এক আনা দিতেছে, মুচী বলিতেছে "চারি আনা পাওনা"। সাহেব মুচীকে বলিল "শালা", বলিয়া জুতা মারিতে গিয়াছিল। তাহার দলে দশ-বার জন ফিরিঙ্গি ছিল। তখন নূতন স্বদেশীর খুব আন্দোলন। ভীড়ের মধ্যে হইতে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"বন্দে মাতরম্"। যেই এই চীৎকার করা, সেই সাহেবটি পকেটে হাত দিয়া, মুঠা করিয়া পকেটে যাহা কিছু ছিল মুচীর কাছে ফেলিয়া দিয়া, নিজ দলবল সহ দৌড় দিল। দেখা গেল, সাহেব ১।০ পাঁচ সিকা আন্দাজ ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে।

খাঁটী সাহেবের ১৮৯৬ সালের ও পরবর্তী দুই এক বৎসরের বীরত্বের কথা যথাস্থানে পরে বলিব। [ক্রমশঃ]

'পূর্বস্মৃতি'তে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এলিয়ট স্যার্ চার্লস অ্যালফ্রেড (১৮৩৫-১৯১১)। বিখ্যাত ইংরেজ সিভিলিয়ান। তিনি বঙ্গদেশের ছোটলাট পদে ১৮৯০ হইতে ১৮৯৫ সন পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বা যাদুঘরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অশোকের অনুশাসনগুলির নকল ও প্রতিলিপি আনাইয়া সংরক্ষিত করা হয়।

দ্বারকানাথ মিত্র: প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন যথাক্রমে ১৮৯২ ও ১৮৯৩ সনে। তিনি ১৮৯৪ সনে ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষা পাস করেন। সম্মান-সূচক

তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এল. (১৮৯৬), এম. এল. (১৯০৮) ও ডি. এল. (১৯১২) উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি আইন-ব্যবসায়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (১৯১৬-১৯২১) ছিলেন। ১৯২০ সন হইতে তিনি অল্পকাল কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্যাকাল্‌টি অব ল'-এর 'ডীন' বা সভাপতি ছিলেন ১৯৩০ সন হইতে ১৯৩৭ সন পর্যন্ত।

পেড্‌লার স্যর্ আলেকজাণ্ডার : ১৮৭৩ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া আসেন। তিনি কলেজে রসায়নের গবেষণার নিমিত্ত উপযুক্ত যন্ত্রপাতিসহ রসায়নাগার-প্রতিষ্ঠায় সবিশেষ সহায়তা করেন। এ বিষয়ে সরকারী আনুকূল্য ও সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য। অস্থায়ী অধ্যক্ষপদে তিনি নিযুক্ত হন তিনবার—যথাক্রমে ১৮৮০, ১৮৮৭ ও ১৮৯২ সনে। ১৮৯৬, ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি অধ্যক্ষপদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি শিক্ষা-অধিকর্তার পদ লাভ করেন ৩রা জানুয়ারি ১৮৯৯ তারিখে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯০৪ হইতে ১৯০৬ সন পর্যন্ত।

হলাণ্ড স্যর্ টমাস্ এইচ : ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের উচ্চতম পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ত্ব শ্রেণী খোলা হইলে তিনি ইহার প্রথম অধ্যাপক হন। ভূতত্ত্ব-বিভাগের স্থায়ী পদে থাকিয়া নিজ নিজ কার্য ব্যতীত এই অধ্যাপক-পদেও কর্ম করিতেন। হলাণ্ড অধ্যাপক ছিলেন প্রথমে ১৮৯২ হইতে ১৮৯৬ এবং পরে ১৮৯৯ সন হইতে ১৯০১ সন পর্যন্ত। ইহার পর তিনি ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর হন। প্রথম মহাসমরকালে তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদের 'শিল্প ও যুদ্ধ' বিভাগের সদস্য হইয়াছিলেন।

গিলিল্যাণ্ড, জে. এইচ. : প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক (১৮৮৮)। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরে তিনি ১৮৯৭-৯৮ সনে কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের পদেও কর্ম করেন। এইসময়ের মধ্যে (১৮৯৬-৯৮) তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কার্যকালেই, ১৮৯৯ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

জগদীশচন্দ্র বসু, স্যর্ (১৮৫৮-১৯৩৭) : বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক। প্রথমে কলিকাতায় এবং পরে বিলাতে বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নান্তে ১৮৮৫ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ত্রিশবৎসর অধ্যাপনা-কার্যে লিপ্ত থাকিয়া ১৯১৫ সনে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে এবং উদ্ভিদবিদ্যায় মৌলিক গবেষণা করিয়া জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজকে চমৎকৃত করিয়া দেন। বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হন।

অবসরগ্রহণের পর আচার্য বসু ১৯১৭ সনে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' ভারতীয় স্থাপত্য-রীতিতে নির্মাণ করান এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণাগার করিয়া গেলেন এই মন্দিরকে। তাঁহার গবেষণার ফল বহু ইংরেজী পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে। বাংলা রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'অব্যক্ত' পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যে 'ক্লাসিক্‌'-এর মর্যাদা পাইবার যোগ্য।

বুথ উইলিয়াম : প্রেসিডেন্সি কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক (১৮৭৬-১৮৮৩)। তিনি মাঝে মাঝে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনাও করিতেন। হুগলি ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষপদেও কিছুকাল কার্য করিয়াছিলেন। বুথ প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক পদে ১৮৮৭ সনে নিযুক্ত হন এবং এই পদে ১৮৯২ সন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কিছুকাল (১৮৯৮-৯৯) কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষপদেও ব্রতী হন। তিনি পরে আসামের শিক্ষা-অধিকর্তা হইয়া যান।

রাজা প্রমথনাথ রায়, দিঘাপতিয়া (১৮৪৯-১৮৮৩) : ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি দক্ষতার সহিত জমিদারি পরিচালনা করেন। দানশীলতার জন্য তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। স্কুল, কলেজ, বালিকা-বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনকল্পে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। স্বদেশের শিল্পপ্রসারেও তিনি যত্নবান ছিলেন। কিন্তু মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার কার্য অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। তাঁহার চারি পুত্র—প্রমদানাথ, বসন্তকুমার, শরৎকুমার এবং হেমেন্দ্রকুমার। শরৎকুমার রাজশাহীর সুবিখ্যাত 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কাশিমবাজার (১৮৬০-১৯৩০) : বিখ্যাত দানবীর। কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের ভাগিনেয়। কলিকাতা শ্যামবাজারে জন্ম, পিতার নাম নবীনচন্দ্র নন্দী। কৃষ্ণনাথের সহধর্মিণী মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর (১৮৯৭) পরবৎসর মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজার স্টেটের অধিকারী হন।

মণীন্দ্রচন্দ্র বিবিধ জনহিতকর কার্যে ক্রমশঃ লিপ্ত হইলেন। বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদকল্পে ১৯০৫, ৭ই আগস্ট কলিকাতার টাউন-হলে যে বিখ্যাত জনসভা হয়, তাহাতে সভাপতিত্ব করেন মণীন্দ্রচন্দ্র। জাতীয়-শিক্ষা-প্রসারে, বিশেষতঃ জাতীয় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠায় মণীন্দ্রচন্দ্র সবিশেষ তৎপর ছিলেন। শিল্প-শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি গভর্নমেণ্টের হস্তে একলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি অর্পণ করেন। তিনি জীবনে শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প-বিষয়ক বিবিধ জনহিতকর কার্যে বহু লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯০৭ সনে তাঁহারই আহ্বানে কাশিমবাজারে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন উদ্‌যাপিত হয়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' মন্দির তাঁহার প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর নির্মিত হয়।

রামমূর্তি নাইডু (১৮৭৯-১৯৩৮) : বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। মাদ্রাজ প্রদেশে জন্ম। দেশীয় প্রথায় ব্যায়ামানুশীলন করিয়া বিশেষ ক্ষমতা লাভ করেন। স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় রীতিতে আশ্চর্য ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়া তিনি বিখ্যাত হন।

ম্যাকেঞ্জী স্যর্ আলেকজাণ্ডার (১৮৪২-১৯০২) : কৃতী সিভিলিয়ান। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য করিয়া বাংলার ছোটলাট হইয়া আসেন ১৮৯৫ সনের ডিসেম্বর মাসে। তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন—এপ্রিল, ১৮৯৮ পর্যন্ত। তাঁহার সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের সংস্কার-বিষয়ের অছিলায়, ইহার গণতান্ত্রিক গঠন-প্রণালী সঙ্কুচিত করার আয়োজন হয়। যে বিল্‌-এ এইরূপ আয়োজনের কথা হয় তাহা ঐ সময় 'ম্যাকেঞ্জী বিল্' নামে আখ্যাত হইয়াছিল। এই বিল্ আইনে পরিণত হইবার পর, ইহার প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আটাশ জন নির্বাচিত সদস্য কর্পোরেশন হইতে পদত্যাগ করেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু, 'সাবাস—আটাশ' কবিতায় এই ব্যাপারটিকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি সত্য-কাহিনী

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ। রোমক সভ্যতার গৌরব-রবি অস্তমিত। বিশাল রোমক সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন—পরাক্রান্ত রোমক-বাহিনী আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আলস্য ও বিলাস-পরায়ণতায় রোমক শৌর্য-বীর্য সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন।

ফ্রান্স তখন মহাপরাক্রান্ত অষ্টম চার্লস-এর অধিনায়কত্বে গৌরব-দীপ্তিতে ভাস্বর। তাঁর বিজয়ী বাহিনী একের পর এক যুদ্ধ ক'রে ফ্রান্সের পতাকা ফ্রান্সের সীমা ছাড়িয়ে সুদূর দেশে উড়িয়ে চলেছে।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম চার্লস-এর দৃষ্টি পড়ল হৃতবীর্য রোমান সাম্রাজ্যের দিকে। বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। নেপল্‌স্ পর্যন্ত এসে—তিনি প্রথম বাধা পেলেন। সুরক্ষিত নগর-প্রাকারের অভ্যন্তর থেকে রোমানরা বাধা দিতে লাগল ফরাসী-বাহিনীকে। কিন্তু ভোগবিলাসী রোমানদের পক্ষে নগর-রক্ষা বেশীদিন সম্ভব হল না। ফরাসী-বাহিনীর অবরোধের কাছে আত্মসমর্পণ করল রোমানরা।

বিজয়-উল্লাসে নগর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করল ফরাসী-বাহিনী। নেপল্‌স্-এর নগর-প্রধানরা যোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন বিজয়ী ফরাসীদের। মহা আদর-আপ্যায়নে ফরাসী-বাহিনীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন নেপল্‌স্-এর জনসাধারণ। রাজকীয় অভ্যর্থনা ও যত্নে ফরাসী-বাহিনী আনন্দে মেতে উঠল। সুরা ও নারীর উন্মোচনে আনন্দমত্ত ফরাসী-বাহিনী বিলাস-স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। অগ্রগতি বন্ধ ক'রে—তারা নেপল্‌স্-এ কিছুদিন বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করতে লাগল।

দিনকয়েক পরে দেখা দিল এক ভয়াবহ ব্যাধি। সারা গায়ে ফোস্কার মতো লালাভ গুটি। ক্রমে গা থেকে মাংস গ'লে খ'সে পড়তে লাগল। সারা গা দুর্গন্ধ-ঘায়ে ভর্তি হয়ে গেল। এই রোগ কেবল ফরাসী-বাহিনীর মধ্যেই দেখা দিল। রাজকীয় চিকিৎসকরা এর কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারেননি—কোনো চিকিৎসারও সুরাহা করতে পারলেন না। বহু লোক প্রাণ হারাল। যারা প্রাণে বাঁচল, তারাও তারপর বহুদিন পর্যন্ত জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে রইল। ব্যাপার দেখে অষ্টম চার্লস তাঁর সৈন্যদলকে দেশে ফিরতে আদেশ দিলেন।

বিনাযুদ্ধে বিজয়ী ফরাসী সৈন্যদল তাদের অধিকৃত দেশ পরিত্যাগ করে দেশে ফিরে গেল।

কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হল, তা জানতেন কেবল নেপল্‌স্-এর কয়েকজন নগর-প্রধান। ক্রিস্টোফার কলোম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করে ফিরে আসেন, তখন তাঁর জাহাজের নাবিকরা সঙ্গে করে নিয়ে আসে এক অদ্ভুত রোগ। পরে যখন স্প্যানীয়ার্ডরা নেপল্‌স্ অধিকার করে, তখন নেপল্‌স্-এর বারনারীদের মধ্যে সংক্রমিত হয় এই ব্যাধি। তাই যখন ফরাসী-বাহিনী নেপল্‌স্ অধিকার করে, তখন তাদের সেবা ও মনোরঞ্জনের জন্য পাঠানো হয় সুবেশা বারনারী। আর তা থেকেই আক্রান্ত হয় ফরাসী-বাহিনী। তখন ফরাসীরা এই রোগকে বলতো নিওপলিট্যান রোগ। আরও পরে ফ্র্যাকাসটোরিয়াস (Fracastorius) এই রোগের নাম দেন 'সিফিলিস'। সেটা হচ্ছে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

◆

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। বস্‌ওয়ার্থের যুদ্ধে জয়লাভ করে আর্ল-অব-রিচমণ্ড ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে বসবার আয়োজন করছেন। আর্ল-অব-রিচমণ্ড টিউডর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'সপ্তম হেনরি' নাম ধারণ ক'রে রাজ্য-অভিষেকের দিন ঘোষণা করলেন। উৎসব-আয়োজন সম্পূর্ণ—এমন সময় দেখা দিল এক বিচিত্র অসুখ—রাজকীয় বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ঝড়ের বেগে। অল্পজ্বর ও কাঁপুনি নিয়ে এর সুরু, তারপর জ্বর ও কাঁপুনি বাড়তে থাকে, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা দেখা যায়; সারা মুখ-চোখ লাল হয়ে যায়, আর হয় প্রচুর ঘাম (sweat)। কয়েক মিনিটের মধ্যে শয্যাশ্রয় করতে হয় আক্রান্তকে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নিভে যায় জীবনদীপ। শত শত লোক প্রাণ হারাল এর কবলে। কেউ রেহাই পেলনা। রাজার ভৃত্য, মজুর, ব্যবসাদার, নগর-পিতা, সেনানী সকলেই আক্রান্ত হল। কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল। সারা দেশ আর্তনাদে ও করুণ বিলাপে মুখরিত হয়ে গেল। রাজবাড়ির পরিচারক, রাজার দেহরক্ষী কেউ বাদ গেলনা। বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিলেন রাজ্য-অভিষেক। এই প্রথম—কোনো রোগের আক্রমণে ইংলণ্ডের রাজ্য-অভিষেক স্থগিত রইল। বিদ্যুদ্বেগে যেমন এই রোগের ব্যাপ্তি, তেমনিভাবেই নিঃশেষ হয়ে গেল এর ক্ষতিকর অভিযান। ইংলণ্ডের বাইরে আর কেউ এর কবলিত হয়নি। আজ পর্যন্ত এই বিচিত্র অসুখটির কোনো কারণ নির্ণীত হয়নি। শুধু তাই নয়, এরকম অসুখের বর্ণনাও আর শোনা যায়নি পরবর্তীকালে। দেবতার রুদ্ররোষের মতো আবির্ভূত হয়ে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে মিলিয়ে গেল এই বিচিত্র রোগটি—যার স্থান রয়ে গেল ইতিহাসের পাতায়—গবেষকদের গবেষণাগারে।

জটিরামের কড়চা

অগ্নিমিত্র

। চ্যারিটি-প্রদর্শনীতে সভাপতির ভাষণ ।

[কোনো একটি চ্যারিটি-অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে ৺জটিরাম চাকলাদার একশো এক টাকা এবং নিম্নের ভাষণটি দিয়েছিলেন। যতদূর জানা যায়, সমস্ত খবরের কাগজকেই এই ভাষণের প্রতিলিপি দেওয়া হ'য়েছিল। দুঃখের বিষয়, কোনো কাগজেই সেটি মুদ্রিত হয়নি। এতদিনে রচনাটির মূল পাণ্ডুলিপি হস্তগত হওয়ায়, বর্তমান লিপিকার কালবিলম্ব না ক'রে সেটি পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করবার গৌরবে গৌরবান্বিত। —লিপিকার]

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, মা, ভগিনী ও খুকিগণ! আজ যে কত বড়ো এক উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সকলে এখানে সমবেত হ'য়েছি, তা কেবল আমরাই জানি না। এই মহানগরীর আরও বহু সহস্র নরনারী জানেন। কিন্তু হায়, এই ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহের সংকীর্ণ স্থানে তাঁদের সকলের স্থান হয়নি। সভা আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত খবর পাওয়া গেল, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে চ্যারিটি-দানেচ্ছু মহতী জনমণ্ডলীর সঙ্গে পুলিস-বাহিনীর একটি খণ্ডযুদ্ধ হ'য়ে গেছে। আহা, কী পরিতাপের বিষয়! দক্ষিণ-বঙ্গের ঝটিকা ও বন্যা বিধ্বস্ত নরনারীর সাহায্যকল্পে এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা দেশহিতৈষী যুবকবৃন্দ রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে, এমনকি, শতাধিকবার কষ্টসাধ্য বিমান-ভ্রমণ ক'রে বোম্বাই পর্যন্ত

ছুটে গিয়ে চিত্র-তারকা, চিত্র-উল্কা, চিত্র-ধূমকেতু বর্গের যে অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তাকে এককথায় বলা চলে অপূর্ব! মহানগরীর এই ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে আজ চিত্র-নেবুলা আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ক'রব। আপনাদের মতো আর যেসব মহাপ্রাণ দেশহিতৈষী ব্যক্তি এই বিরাট সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বাইরে প্রেক্ষাগৃহের ইটে মাথা কুটছেন, তাঁদের দরদী-অন্তরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আপনাদের কাছে আমি একটি প্রস্তাব ক'রবো। যেহেতু এটি শোকসভা নয়, সেইহেতু আপনারা অর্ধদণ্ডায়মান হ'য়ে অর্ধমিনিট কাল নীরব থেকে সেইসব দরদীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করুন। [দর্শকবৃন্দের তথাকরণ]

বন্ধুগণ! দক্ষিণ-বঙ্গের বন্যা ও ঝটিকা বিধ্বস্ত নরনারীর উদ্দেশে আয়োজিত এই চ্যারিটি-অনুষ্ঠানে আজ নৃত্যগীতের যে ব্যবস্থা করা হ'য়েছে, তা অভূতপূর্ব। বিপন্ন দেশবাসীর দুর্গতিতে কাঁদো-কাঁদো হৃদয়ে আপনারা যে-পরিমাণে টিকিট কেটেছেন, তাও পূর্বের সমস্ত রেকর্ডকে ভঙ্গ ক'রেছে। দেশের ধনশক্তি, দেশের জন-হৃদয় যে কী পরিমাণে পরদুঃখকাতর, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখে আমি অভিভূত হ'য়ে পড়ছি। যে দেশে, যে জাতিতে এই গুণ নেই, সে-জাতির বেঁচে থাকা মিথ্যে। ভগবানের অশেষ দয়ায় আমাদের অন্ততঃ সে-কলঙ্ক বহন ক'রতে হবে না। ভারতীয় মনের এই-যে কলা-প্রীতি, এই-ই হয়তো বাঁচিয়ে রাখবে এ-জাতিকে। দক্ষিণ-বঙ্গে বন্যা এবং ঝড় হ'য়ে যাবার পাঁচমাস পরে আজকের এই অনুষ্ঠান দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এ-দেশ তার ঐতিহ্যকে ভোলেনি। সমবেত প্রত্যেকটি নরনারীর চোখে মুখে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের যে-চিহ্ন আমি স্পষ্ট দেখতে পারছি, তাতে এই নগণ্য বৃদ্ধের বুকও গর্বে ফুলে উঠছে। আমার মনে হ'চ্ছে,—মনে হ'চ্ছে কেন বলি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ষোলো-সালের ঝড়ে বিপন্ন মানুষদের উদ্দেশে, এমনকি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মৃত অগণিত বাঙালীর মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে জাতীয়-তর্পণ করবার উদ্দেশ্যে যদি আজ থেকে দশ বছর পরেও আজকের মতো চিত্র-তারকা-সমন্বিত এইজাতীয় নৃত্যগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তবুও ভারতবাসী হিসাবে বাঙালী ঠিক এমনি ক'রেই তাতে সাড়া দেবে। [সমবেত করতালি]

বন্ধুগণ! আজকের এই চ্যারিটি-অনুষ্ঠান অনেক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঝড় কেমন ক'রে এসেছিল, বন্যার জল কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত নির্ভর মানুষের বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তারই এক আলেখ্য আজ নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত হবে। এর জন্যে বহু অর্থব্যয়ে দৃশ্যপট নির্মিত হ'য়েছে। বহু অর্থব্যয়ে শিল্পিগোষ্ঠীকে বিমানযোগে বোম্বাই থেকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হ'য়েছে। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে সুদূর লণ্ডন থেকে রূপসজ্জা-বিজ্ঞান-পাঠরত ভারতীয় ছাত্র শ্রীমধুরমিলন সিংহ রায়চৌধুরীকে পর্যন্ত বিমানযোগে আনানো হ'য়েছে। নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়াও আছে আধুনিকতম সঙ্গীত। শিল্পিবর্গের প্রত্যেকেই চিত্র-জগতের স্বপ্নলোক থেকে এই প্রেক্ষাগৃহের পাদপ্রদীপের সামনে এসে ধন্য ক'রবেন দেশদরদী ভদ্রমণ্ডলীর চক্ষুকে।

বন্ধুগণ। চ্যারিটির মহৎ প্রেরণা নিয়ে আজ আপনারা যে সদলে এখানে সমবেত হ'য়েছেন, তার জন্যে উদ্যোক্তা-পক্ষের হ'য়ে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রতে গিয়ে উদ্যোক্তাগণকে যে কতখানি ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হ'য়েছে তা জানবার সৌভাগ্য আমি লাভ ক'রেছি। নিজ নিজ কাজের ক্ষতি ক'রে এঁদের অনেকেই আজ প্রায় দু'মাস যাবৎ স্টুডিও এবং তারকাবর্গের বাড়িতে তারকেশ্বরের হত্যে দিয়ে ব'সে ছিলেন। তাঁদের সে-পরিশ্রম সার্থক। তাঁদের সে-আত্মত্যাগের কাহিনী জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে। দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি, জাতির প্রতি গভীর মমতা না থাকলে, ক'জন এই পরার্থপরতার ব্রত গ্রহণ ক'রতে পারেন? এই বিশাল আয়োজন ক'রতে

তাঁদের ব্যয় হ'য়েছে প্রায় সাতাশ হাজার টাকা। বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ অবশ্য বাইশ হাজারের বেশী হয়নি। আমি জানি, এ টাকা পঁচাত্তর হাজারেও উঠতে পারতো যদি এই প্রেক্ষাগৃহে স্থান সঙ্কুলান করা সম্ভব হ'ত। দেশবাসী যে এতখানি সাড়া দেবে তা হয়তো উদ্যোক্তামণ্ডলী ভাবতে পারেননি। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আমন্ত্রিত শিল্পীদের কাছে প্রতিশ্রুত সম্মান-দক্ষিণায় অর্থে টান পড়েছে। কী পরিতাপের বিষয়, ব্যয়-নির্বাহের জন্যে উদ্যোক্তাগণকে আরও প্রায় পাঁচহাজার টাকার ঘাটতি পূরণ ক'রতে হবে। যদিও সে-অর্থ শিল্পিবর্গের জন্যেই ব্যয় ক'রতে হবে, তবুও এ-কথা সত্য যে, দেশের এই দুর্দিনে, দক্ষিণ-বঙ্গের এই বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য করবার আগ্রহ নিয়ে যে-সব ব্যক্তি অকাতরে টিকিট কেটেছেন, তাঁরা অন্তত নৃত্যের মাধ্যমে দুর্গত নরনারীর শোচনীয় অবস্থার শিল্প-ব্যঞ্জনা দেখে দেশের দুর্গতিকে আরও গভীর ক'রে অনুভব করবার সুযোগটুকু পেয়ে যাবেন। জাতীয় দুর্দিনে এ-ও কি কম? আবার যখন বন্যা কিম্বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী বিপন্ন হবে, তখন যে আরও সাড়া পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

দুঃখের বিষয়, এই অনুষ্ঠানে উদ্বৃত্ত অর্থ পাওয়া গেল না। সংকটত্রাণের জন্যে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ এবারে কিছুই দিতে পারলেন না। কিন্তু তাঁরা হতাশ হননি। যে সাতাশহাজার টাকার কথা বলা হ'ল, তার মধ্যে কয়েক হাজার টাকা তাঁরা অগ্রিম হিসেবে শিল্পীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, আগামী বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় চ্যারিটি-অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে শিল্পীরা যাতে এখন থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'য়ে থাকেন। [সমবেত করতালি]

সুধিবর্গ, আমি আর বেশী সময় নিয়ে আপনাদের ধৈর্যের উপর অত্যাচার ক'রব না। যে-সব নৃত্যশিল্পী মেক-আপ নিয়ে ব'সে আছেন, তাঁদের পেইন্ট ঘামে নষ্ট হ'বার আগেই আমি আমার বক্তব্য শেষ ক'রব।

আজকের এই অনুষ্ঠানে মহানগরীর নরনারীর কাছ থেকে যে অভূতপূর্ব সহযোগিতা পাওয়া গেল, তাকে আমি অভূতপূর্ব ব'লব না,—ব'লব—জাতীয় জীবনের যথাযোগ্য সহযোগিতার ভাব। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি, আগামী বছরে এই উদ্যোক্তাগণ যখন আবার চ্যারিটি-প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রবেন, তখন যেন ঠিক এমনি সহযোগিতাই পাওয়া যায়। যে-সব দেশদরদী নরনারী প্রেক্ষাগৃহের বাইরে লাঠি-লাঞ্ছিত হ'য়েছেন, তাঁরাও যেন তাঁদের এই জাতীয়তাবোধের যথাযোগ্য মর্যাদা পান।

সময় হ'য়ে গেছে। এবারে নৃত্য ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করি।

জুয়েলার্স
লক্ষ্মী ব্রাদার্স
২০৮/৮, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট মোড়
কলিকাতা ২৯ • ফোন ৪৬-৬৫২৬
১, হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ • কলিকাতা ২৯

সভ্যদেশে বালিকা-বিবাহ

কালীচরণ ঘোষ

নিত্যগতিশীল কাল চলার-পথে সর্বদাই সকল বিষয়ে পরিবর্তন সাধন ক'রে চলেছে। এইটাই তার ধর্ম, কারণ কাল নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না; থাকলে, জগতের ধ্বংস অবধারিত।

চোখের ওপর সবই ওলটপালট হচ্ছে; কোনোটা খুবই গুরুতর, কোনোটা বা সামান্য। আজ যাকে লোকে ভালো ব'লে আঁকড়ে থাকতে চায়, সময়ের গুণে বা কালের ধর্মে তাই আবার সাপের খোলসের মতো পরিত্যাগ করতে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। চিরাচরিত সামাজিক রীতি-প্রথার অতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে ভারতবর্ষে। চোখের ওপরেই ঘটছে; প্রত্যেকেই তাতে প্রভাবান্বিত হচ্ছে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। এর একটা বড় উদাহরণ হ'ল হিন্দুর বিবাহ ও উত্তরাধিকার বিধি। আইন জবরদস্তি ক'রে যাকে ভালো ব'লে মেনে নিতে বাধ্য করছে, তাই সমাজ-ব্যবস্থায় দৃঢ় আসন লাভ ক'রে চলেছে। এটাও অবশ্য বদ্‌লে যাবে— কালের প্রতাপ যখন অভিভূত ক'রে নূতন ধারণা মানুষের মাথায় গজিয়ে তুলবে।

হিন্দু-বিবাহের ব্যাপারে আমরা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। পুরুষের পক্ষে, এক স্ত্রী বর্তমানে, অত্যন্ত গুরুতর কারণ ব্যতীত এবং গুরু-পুরোহিত, বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, সমাজ-নেতার হাজার আস্ফালন, মুরুব্বিয়ানা সত্ত্বেও, আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করা চলছে না। স্ত্রীলোকের এ বিষয়ে বাধা, সারা ভারতে, অতি সামান্য ব্যতিক্রম এখানে ওখানে থাকলেও, চিরকালই বর্তমান।

বিবাহের বয়স সম্বন্ধেও একই কথা। বালিকা-বিবাহ আইনের চক্ষে অপরাধ। সর্দা-আইন বা বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন থেকে আরম্ভ ক'রে হিন্দু-বিবাহ আইন বা 'হিন্দু কোড' পর্যন্ত কেবলই ছেলেমেয়ের বিবাহের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে চলেছে। এ কাজটা যে অন্যায় হঠাৎ তা বলা যায় না, তবে বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে ব'লে কেউ কেউ মত পোষণ করেন। কালের ধর্মে, অর্থনৈতিক চাপে প'ড়ে এ জিনিস আপনিই ঘটে যাচ্ছে। যৌবনাবস্থা প্রায় শেষ হ'য়ে এল, এমন পাত্র-পাত্রীর চারিদিকে ছড়াছড়ি।

এমন যে ভারতের হিতকামী মণ্ডলী প্রবর্তিত আইন, এর পরিবর্তন আবার কি পাঁচ-সাত-দশ বৎসরের মধ্যে দেখে যেতে হবে? কে জানে, কাল আমাদের অলক্ষ্যে মৃদু-মৃদু হাসছে কিনা। জগতের সর্বাপেক্ষা সভ্যদেশ, জগতের অলঙ্কার যে জাতি, যার জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমৃদ্ধি-কৃষ্টি-সভ্যতার ভাতি জগতে ছড়িয়ে অপর জাতিকে নিষ্প্রভ ক'রে তুলেছে, তার দিকে দৃষ্টি ফেরালে মনের কোণে যেন একটু সন্দেহের ছায়া উঁকিঝুঁকি মারতে চায়। আজ আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র) যা করে, আগামী কাল নয়, পাঁচ সপ্তাহ নয়, পাঁচ মাস পরে অপর দেশ তাই অনুসরণ করবার সাহস বা শক্তি অর্জন ক'রে ধন্য হয়।

বালিকা প্রশ্ন।—আমরা শুনে আসছি অপ্রাপ্তবয়স্কের বিবাহ, তার ওপর তার মাতৃত্ব বর্বর অসভ্য সমাজের একটা বড় লক্ষণ। বোধ হয়, 'লক্ষণ' সকল দেশেই অপ্রাপ্ত-বয়স্কের মধ্যেই পরিগণিত হ'য়ে আসছে। এই সুসভ্য আমেরিকার পদক্ষেপের পূর্বেই বালিকা-বিবাহের একটা লক্ষণ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ১৯৪৮ সালে মাত্র ৪৮৭টি এই 'বালিকা' বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। (আমেরিকার আইনে বালিকার বিবাহের সর্বনিম্ন কত বয়স নির্ধারিত আছে, তা লেখকের অজ্ঞাত)। তারপর প্রতিবৎসরই কিছু কিছু বাড়ছে। ১৯৫৬ পর্যন্ত তিনবৎসরের হিসাব:

১৯৫৪ — ১,৬৫৪ সংখ্যা
১৯৫৫ — ১,৭১৫ "
১৯৫৬ — ২,১৩৭ "

আমেরিকার সহিত সকল ব্যাপারে যার ও তার অর্থকলে সম্পৃক্ত, অর্থাৎ কিনা 'হরিহর-আত্মা' কানাডার বিষয় উল্লেখ করা চলে। সেখানে অনূর্ধ্ব ১৬-বয়স্কা মেয়ের বিয়ের ধুম আরও প্রবল:

১৯৪৮ — ৬১ সংখ্যা
১৯৫৩ — ৭৬৯
১৯৫৪ — ৭৭৮
১৯৫৬ — ৮৩১
১৯৫৭ — ৯০৬

ইংলণ্ডে ১৫ বা ১৬-র নিম্নবয়স্ক বালিকাদের বিবাহের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না; তবে ১৬ হ'তে অনূর্ধ্ব

১৯-এর হিসাব থেকে এর মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায় :

১৯৪৮ — ৫৩,৯০০ সংখ্যা
১৯৫৪ — ৫৯,৫৫০ „
১৯৫৫ — ৬৭,১৫২ „
১৯৫৬ — ৭১,৩৮৫ „

এ হিসাব হ'ল বিবাহ-ব্যাপারের। মাতৃত্বের কোটায় এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের আর একটু সংবাদ পরিবেশন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে ব'লে মনে হয় না।

বালিকা-মাতৃত্ব-প্রধান 'সভ্য' দেশের মধ্যে আমেরিকা অগ্রণী। অনূর্ধ্ব ১৫-বৎসর মাতার সংখ্যা একবৎসরে (১৯৫৬ সাল) আমেরিকায় ৬,৩৫৬। এ ছাড়া ভ্রূণহত্যায় কিছু জীবননাশ হয়তো হ'য়েও থাকবে। অন্যান্য সভ্যদেশেও বালিকা-মাতা আছে, তবে এতটা নয়। যেমন—মেক্সিকো : ১,০২০, পোলাণ্ড : ৪১৯, চিলি :- ৪৯১, কলম্বিয়া : ৩৭১, ফ্রান্স : ৫৭, ইত্যাদি।

কেবল বালিকা-বিবাহ নয়, পুরুষ (যুবক)-রাও এই নেশা থেকে বাদ পড়েনি। কত বয়সের নারী তারা বিবাহ করে, সে-সম্বন্ধে কোনও কথা না তুললেও বলা যায়, 'সকাল সকাল' বিবাহ ক'রে ঘর-সংসার পাততে তারাও বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছে।

আবার আমেরিকার কথাই ধরা যাক্। গত কয়েক-বৎসরে ১৫ থেকে ১৯ বয়সের (অর্থাৎ teenagers-এর মেজরিটা) ছেলের বিবাহের সংখ্যা অতি দ্রুত বাড়ছে। হিসাব হ'তে দেখা যাচ্ছে :

১৯৪৮ — ১৯,৩৮০ সংখ্যা
১৯৫৪ — ৭১,০০৩ „
১৯৫৫ — ৭৩,৫৫৯০ „
১৯৫৬ — ৮৫,৯৯০ „

২০-বছরের কম, হয়তো ১৫ থেকে ১৯-ই হবে, কানাডায় ছেলেরা বিবাহ করলে :

১৯৪৮ — ৫,৪৮০ সংখ্যা
১৯৫৪ — ৬,৭২৩ „
১৯৫৫ — ৭,৫৮৮ „
১৯৫৬ — ৮,০১৯ „

আবার ইংলণ্ড সম্বন্ধে সেই এক কাহিনীই বলা যায়; অর্থাৎ ১৫-১৯ বয়সের ছেলেদের বিবাহের সংখ্যা একই ভাবে বাড়ছে :

১৯৪৮ — ৭,৯৫০ সংখ্যা
১৯৫৪ — ৯,৩৯৯ „
১৯৫৫ — ১১,৭৫০
১৯৫৬ — ১৩,৩১২ „

ইটালিতে ১৫-র অনূর্ধ্ব এবং ১৫ থেকে ১৯ বছরের ছেলে-মেয়ের বিবাহ-সংখ্যায় ১৯৪৮ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু 'অসভ্য' এসিয়ার জাপান এই ধারার একটা প্রধান ব্যতিক্রম। নীচের হিসাব সে-কথা প্রমাণ ক'রে দেবে :

	১৩-র অনূর্ধ্ব	১৫—১৯ বয়সের	
	বালিকা	বালক	বালিকা
১৯৪৮	১০	৬৭,০২৭	১১,৯৮৮
১৯৫৪	১	৩৪,৭১০	৩,২০৫
১৯৫৫	—	৩০,৬৫৩	২,৮২৫
১৯৫৬	৩	২৮,১২৮	২,২১৬

(জাপান কবে 'সভ্য' বা 'অসভ্য' হচ্ছে এর বিচার করা প্রয়োজন)।

কমবয়সে বিবাহ করার যোঁকটা কয়েকটি দেশে বাড়বার কারণ সম্বন্ধে সমাজনীতি-বেত্তাদের কী জবাব আছে তা জানা নেই। হয়তো হ'তে পারে যে, বয়স্কদের বিবাহের মধ্যে দাম্পত্য সম্প্রীতির অভাব 'অপ্রাপ্ত'বয়স্কদের চেয়ে অনেক বেশী। এর যতত্র হিসাব না পেলে, নিশ্চিত ভাবে বলা বড় কঠিন। আরও হয়তো, ঐসকল উন্নত দেশের মধ্যে বালিকারা পূর্বের চেয়ে কমবয়সেই পূর্ণতা (শারীরিক ও মানসিক) লাভ করছে এবং মনোমতো স্বামী নির্বাচন ক'রে বিয়ে করে ফেলছে। অভিভাবক যাঁরা, তাঁরাও আবার 'বোধহয়' দেখছেন, কমবয়সে স্বামী লাভ করলে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা কম হয়, মেয়েটা সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করে। মনে হয়, এইসকল বালিকা-বধূরা স্বামীর ওপর উপার্জন ও সংসার-রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে অধিকমাত্রায় গৃহকর্মে মনোনিবেশ ক'রে আনন্দ পায় বেশী।

যাই হোক, তত্ত্ব কি অতত্ত্ব বলা শক্ত, কিন্তু 'অপ্রাপ্ত' বয়সে বিবাহ করার একটা 'রুচিবিকার' কোথাও কোথাও আত্মপ্রকাশ করছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

UNO' *Demographic Year Book, 1958* হ'তে সমস্ত হিসা সংগৃহীত হয়েছে।

মেনকার একটাই ইতিহাস

সুখময় ঘোষ

আমরা তখন আশুতোষ কলেজে পড়ি। সেটা আমাদের ফাইন্যাল ইয়ার। চারবছরে সঙ্গ যা করেছি, তাতে পরীক্ষা পাসের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। তবু থাকে বলে কচ্ছপের কামড়। ধড়টা খসে গেলেও দুই পাটি দাঁত বসে থাকে ঠিক। টেস্ট-পরীক্ষার জন্যে তোড়জোড় হচ্ছে। মাঝে মাঝে জেনারেল ক্লাস পালিয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে থাকি। অনার্স-ছাত্রের এই রীতি। বাঁধা লাভের চেয়ে উপরির লোভটা বেশী প্রবল। তাতে সত্যিকারের কিছু হোক আর নাই হোক—আমি, রমেন, শম্ভু—আমরা সকলেই ওরকম মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসতাম। আর নোট করার নামে গল্প করতাম। ছেলেবয়সের প্রায় সব গল্পই এক সুরে বাঁধা। শব্দের ব্যবহারটা শুধু ভিন্ন।

শম্ভু তার দুঃখের কাহিনী শোনাচ্ছিল। তার ভালবাসার গল্প। সবজান্তার মতো তাচ্ছিল্য-মিশ্রিত কৌতূহলে আমরা সে-গল্প শুনছিলাম।

শম্ভুটার জীবনে অনেক দুঃখ। বেচারা ভালবাসলো অনেককেই। ভালবাসা পেলোনা কারো। নরনারী নির্বিশেষে সবাই তাকে ঠকিয়েছে। তবু ভালবাসার প্রতি অনাস্থাশীল সে নয়। তার মতে, ভালবাসা কথাটা আধুনিক অতিব্যবহারে যতো অকেজো আর বিপর্যস্তই হয়ে পড়ুক—মানুষের জীবনে সেই হ'ল পারফেকশন, যথার্থ মূল্যায়ন। নানা রূপে, নানা ভাবে মানুষ তার সাধনাই করে আসছে যুগযুগান্তর ধরে। মানুষের যত মহৎ কীর্তি, ঐশ্বর্য বা ঔদাসীন্যের, ভালবাসাই রচনা করেছে তার এক-একটি মহৎ সম্ভাবনা। ইতিহাসের পৃষ্ঠা যদি খুলি—তাতেও দেখা যায়—

বক্তৃতায় একটা ঘোর আছে, সেখানে যতির সমাদর নেই। শম্ভু বোধহয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, রমেনটা, বেঁকে বসলো। বললো—'থাম্, মেলাই বাজে বকিসনে। ওতে আমরা বিশ্বাস করিনে।'

শম্ভু ছাড়বার পাত্র নয়। যদিও রমেনকে সে ভালো করেই চেনে। বললো—'কিসে তোদের অবিশ্বাস?'

'তোমার ঐ মহৎ ভালবাসায়। ওসব ধাপ্পাবাজি। কাজ হাসিল করবার ফন্দি-ফিকির।'

রমেন বলে চললো—'আসলে প্রয়োজনটাই সব। কীর্তি করেছে যারা, তাদের ছিল কীর্তির মোহ। যাঁরা করেছে

ইতিহাস রচনা. তাদের ছিল নিজের গুছিয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষা। পরবর্তী কালের যতসব ভণ্ড বিজ্ঞের দল, তার গায়ে একটা লেবেল এঁটে তার নাম দিলো ভালবাসা, প্রেম। সব বোগাস!'

যুক্তিতর্কের গোলামিটা রণেন কোনোকালেই পছন্দ করে না। উগ্রপন্থী রণেন এইরকম করেই তার মতামত ব্যক্ত করে থাকে। আমরা তাতে বিচলিত হইনে। যেমন হইনে শম্ভুর বখাল্ চোখ-দুটো দেখে।

কিন্তু শম্ভু আজ হার মানতে গররাজী। বললো—'তাহলে তুমি বলতে চাও, প্রয়োজনটাই সব? মানুষের মন বলে কিছু নেই?'

আমি ভয় পেলাম। এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকেই পড়াশুনো করছে। গলা নামিয়ে বললাম—'শম্ভু, আস্তে বল্। গোলমাল হচ্ছে বড্ড।'

রণেন বললো—'ছেলেমানুষি করিসনে, শম্ভু। ঢের বড় হয়েছিস, এখন আর ওসব তোকে মানায় না। ওরকম বড় বড় কথা এককালে আমিও বলতাম। এখন সার বুঝেছি। দরকার হয়, যাকে খুশী তুড়ি মেরে হাতের মধ্যে নিয়ে এসো। প্রয়োজন যদ্দিন না ফুরোয়, ততোদিন সে চিত্রাঙ্গদা। প্রয়োজন ফুরোলেই তিলোত্তমা। বুঝলে ভায়া, ওসব প্রেম-ট্রেম কিছু নয়।'

শম্ভু কথাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলো—'ভালবাসা নেই, অথচ সে হবে তোমার?'

'হাজার বার হবে, যদি থাকে প্রয়োজন।'

'প্রয়োজনটা কিসের?'

'মনের নয়, অন্ততঃ এটুকু বলতে পারি।'

শম্ভু এবার রুখে দাঁড়ালো তার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমরা সবাই উপভোগ করতে লাগলাম দৃশ্যটা।

'অসম্ভব। আমি তোকে চ্যালেঞ্জ করছি।'

রণেন হটবার পাত্র নয়। বললো—'আমি তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলুম। কী করতে হবে?'

সমস্যা হ'ল। কী চ্যালেঞ্জ দেওয়া যায়। আমার মুখে এসে গেল তার হঠাৎ সমাধান। বললাম—'মেনকা। আমাদের অমিতা রায়।'

'চমৎকার আইডিয়া!' উৎসাহিত হয়ে উঠলো সকলেই।

'এই মেনকাকে ভালবাসার ফাঁদে, তোমার ভাষায় যেটা প্রয়োজনের তাগিদ, তার ফাঁদে ফেলতে হবে। পারবে? একদিনের জন্যে?'

মুহূর্ত ভাবলো না রণেন। বললো—'নিশ্চয়ই পারবো। কতো টাকা বাজি?'

'না, টাকা নয়। সবাই মিলে খাওয়া আর সিনেমা। যে হারবে, সমস্ত খরচ তার।'

শঙ্কু বললো—'অ্যাটেণ্ড।'

রণেন বললো—'অ্যাটেণ্ড।'

ঘণ্টা পড়ো-পড়ো। আমরা অতঃপর ক্লাসে গিয়ে বসলাম।

মাত্র এগারো-ঘণ্টার উৎকণ্ঠা। তারপরই এলো সেই বাঞ্ছিত দিবস। সকাল থেকেই আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছি। ভাবছি, রণেন কি তাহলে অসম্ভবকেই সম্ভব করবে?

রূপের গরবে গরবিনী মেনকা আশুতোষেরই থার্ড-ইয়ারের ছাত্রী। যদিও মেনকা প্রাতঃ-বিভাগের, তবু দিবা-বিভাগের আমরা তাকে ভালো করেই জানতাম। পরে নামও জেনেছিলাম। ব্যাঙ্কার অতনু রায়ের কন্যা অমিতা রায়। কিন্তু প্রথমদিন দেখে যে-কথাটা মনে হয়েছিল তাকে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। অমিতা রায় অমর্ত্য-রূপের অধিকারিণী নয়। কিন্তু চলনে বলনে নিজের চারপাশে সে এমন একটা জগতের অধিষ্ঠাত্রী হয়ে পড়তো, ক্লাসে তাকে ছাড়া আর কাউকেই বড় একটা চোখে পড়তো না। এবং সকলের চোখে পড়বার জন্যই যেন তার জন্ম। অথচ এই মেয়ে কারো দিকে চোখ তুলে তাকাবার অভিলাষিণী নয়। যেন তাকালে সেই হতভাগার মর্মমূল অবধি ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত হয়ে যাবে। সেইজন্যেই তাকাতো না। যেন কারো সঙ্গে কথা বললে বেচারার সব সাধনা যাবে রসাতলে, সেইজন্যেই সে কারো সঙ্গে মুখ খুলতো না।

মেয়েরা বলতো—'দেমাকী'।

আমরা বলতুম—'মেনকা'।

ছাত্রী হিসেবেও মেনকার যথেষ্ট সুনাম ছিল। মেনকা সেই তিনজন মাত্রের একজন, যাদের অনার্স ছিল ইকনমিক্সে। খবরে জেনেছি, আমরা যারা বাংলা-অনার্সের ছাত্র তাদের সে হাতেই তোলে না। তাতে আঘাত পেয়েছিলুম কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু তার প্রতিকার আমাদের হাতে ছিল না। এমন যে তুখোড় ছেলে রণেন, সেও কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—'অবলা'।

ঐ পর্যন্তই। তারপর ওকে নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামাইনি।

সেই মেনকাকে ঘায়েল করবে রণেন। অন্ততঃ সিদ্ধ-সঙ্কল্পের জন্যে। ভাবছিলুম, এর চেয়ে হাবহেডলের চ্যালেঞ্জও ভালো ছিল। বলা যায় না, কোথা দিয়ে কী হয়ে যায়। শেষকালে বুঝি একটা গোলমাল বাধিয়ে বসলাম। অথচ এইসমস্তেরই মূলে আমি। আমিই শঙ্কুকে ভালবাসার গল্প শোনাতে বলেছিলাম, আর আমিই চ্যালেঞ্জের জন্য মেনকার নাম উল্লেখ করেছিলাম।

ভাবতে ভাবতে ব্রজেশের বাড়ি গেলাম।

ব্রজেশ ভবানীপুরেই থাকে। বললাম—'কি রে, কিরকম বুঝছিস?'

ব্রজেশ বললে—'দাঁড়া না, ভারী মজা হবে।'

'আমার কিন্তু ভাবনা হচ্ছে রীতিমতো।'

'আরে রেখে দে তোর ভাবনা।' ব্রজেশ উড়িয়ে দিলো—'রণেন অত কাঁচা ছেলে নয়।'

যথাসময়ে কলেজের জন্যে তৈরি হয়ে সবাই এসে পার্কের সামনে মিলিত হলুম।

'কি রে—রেডি?'

রণেন হাসিমুখে বললো—'কাল দুপুর থেকেই।'

মেয়েদের কলেজ ছুটি হয়েছে। দলে দলে বেরিয়ে আসছে রাস্তার ওপর। ভিড়ের মাঝে হঠাৎ মেনকাকে দেখতে পেয়েই রণেন এগিয়ে গেল। হাতের খাতা ক'টি সঙ্গেই নিয়ে গেল।

মুচকি হেসে শঙ্কু বললো—'যায় না যায়।'

আমি বা ব্রজেশ, আমরা কেউই হাসতে পারলাম না। যথেষ্ট উদ্বেগ নিয়ে রণেনের কীর্তিকলাপ দেখছিলাম।

ভিড়ের মাঝে সবটা লক্ষ্য করতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, রণেন কী বলতেই মেনকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর মিনিট দশেক কী কথা হলো দুজনে। মেনকার গম্ভীর মুখের সংযত অভিপ্রকাশগুলো দেখছিলাম। রণেনের দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা কিন্তু যথেষ্ট সহজ আর স্বচ্ছ। একসময় হাসলো মেনকা। কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে হেসে কী বললো রণেনকে। তারপর দুজনেই গুট্‌গুট্‌ করে এগিয়ে চললো মোড়ের দিকে। পাশ দিয়ে যাবার সময় রণেন একবার আড়চোখে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল।

বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে আমরা ওদের অনুসরণ করলাম। ওরা একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই আমরা বসে পড়লাম ফুটপাথের ওপর।

শঙ্কু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো—'অসম্ভব, ওদের আগেই জানাশোনা ছিল।'

আমরা দুজনেই প্রতিবাদ করলাম—'বাজে-কথা বোলো না, শঙ্কু। তুমি বাজি হেরেছো। এবার সিনেমার টিকিট কাটো।'

শঙ্কু এবার গজরাতে লাগলো—'বেশ, কাটবো। কিন্তু

আমার চ্যালেঞ্জ এখনো ফুরিয়ে যায়নি। তাকে অন্তত অবস্থার দেখরক্ষা করতে হবে। আই মীন্—'

ব্রজেন বললো—'আস্ত মানুষটাকে গিলে ফেলা সম্ভব নয়। দুজনে একসাথে রেস্তোর্যাঁয় ঢোকার পর একজন আরেকজনকে খামচে দেবে, তাও বেমানান। সুতরাং—'

সুতরাং যে কী, সেটা তখনো বুঝতে পারিনি। বুঝেছিলাম কিছুক্ষণ বাদে, যখন রণেন বেরিয়ে এসে বললো—'তোরাও চল্। ডাকছে তোদের। আর গপ্প—'

তবু গপ্প নয়। সন্দেহ আমারও হয়েছিল। ঘটনার পরও ঘটনা হয় অবিশ্বাস্য যদি তার প্রকৃতি হয় দুর্বোধ্য।

একদিন রণেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'সত্যি তোদের ভাব ছিলনা রণেন?'

রণেন হেসে জবাব দিয়েছিল—'পাগল না মাথা-খারাপ! ওরে, আমার মতো ছেলের সঙ্গে কেউ কখনো ভাব করে না। সে-সম্ভাবনায় ছাই দিয়েছে শত্রুর মতো আশাবাদী ছেলেরা। আসলে সেই প্রথম—আর সেই শেষ—'

সত্যিই তাই। এর পর আর কোনোদিন দুজনকে একসাথে দেখিনি। বরং একজন আরেকজনকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেই দেখেছি পরম ঔদাসীন্যে। সাময়িক একটা প্রয়োজনে দুজনে দুটো কথা বলা মানেই কিছু একটা অন্তরের সম্পর্ক গড়ে ওঠা নয়। আর আশ্চর্য, এই বিষয়ে বেশী সংযম দেখিয়েছে রণেন নিজে।

কিছুদিন পরের ঘটনা। আমরা তখন ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি। সময় কাটছে বাঁধা গতে। তাতে না আছে উত্তাপ, না জীবনের লক্ষণ। এমনি সময় হঠাৎ সেদিন রণেন কথায় কথায় বললো—'জীবনে বহু আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। এগুলো মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

অবাক হয়েছিলাম। রণেনের মুখে হেঁয়ালি? বললাম—'রহস্যটা কী?'

রণেন হেসে বলেছিল—'সেই তো রহস্য।'

প্রশ্নটা মনে জেগেই ছিল। রণেন তার জবাব দেয়নি।

তবু জবাব পেয়েছিলাম। তার বহুদিন পর। যখন আমাদের জীবনে কল্পনার শিকড়টুকু অবধি উৎপাটিত। স্বপ্নের রসটুকু মরুবিলীন। আমার কথা বলবো না। শোনাতে বসেছি রণেনের গল্প। তখন কি জানতাম, এ-গল্প মেনকারও।

পরীক্ষায় পাস করেছিলাম, কিন্তু সম্মানহীন হয়ে। তারপর আর সে-চেষ্টা করিনি। সংসারের প্রয়োজনে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলাম কোলকাতার বাইরে। কোলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে প্রথম প্রথম চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। তারপর সেটা কেটে গেল। রণেন ছিল কোলকাতাতেই। কিন্তু শেষের দিকে ওর সঙ্গেও আর বড় একটা যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। রণেনের সর্বশেষ চিঠিতে যথেষ্ট অনুযোগ ছিল। আমি যার জবাব দিতে পারিনি। রণেনও আর লেখেনি তারপর। মাঝখানে একবার কোলকাতা এসেছিলাম। খোঁজ করেছিলাম রণেনের। জানলাম ও ঠিকানা বদল করেছে। কোথায় গেছে জানা গেল না। রণেন যে-অফিসে কাজ করতো লিখেছিল, তার নামও গেছি ভুলে। সুতরাং রণেনের সঙ্গে সে-যাত্রা দেখা হ'ল না। জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেলাম আমরা।

কেটে গেল অনেক দিন।

ফুল-কমিটির কাজে কোলকাতা এসেছিলাম। আমার এক সহকর্মীর বিশেষ একটা ফরমাস নিয়ে যাদবপুর যাবার উদ্দেশ্যে পাঁচনম্বর বাসে চেপে বসেছি। গড়িয়াহাটা আসতেই এক-রাশ মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কোনো-রকমে সামনে বসতে গিয়ে দেখি ঠিক আমার সামনেই—আরে!—'রণেন?'

'তুই এদিকে?'

'তুই এখানে?'

কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। রণেন আমাকে শান্ত করলো। বললো—'বোস্। দাঁড়িয়ে যাওয়া আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। তারপর? কোলকাতা এসেছিস কবে? এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?'

বললাম—'যাদবপুর। কোলকাতা এসেছি দিন চারেক হ'ল।'

রণেন বললো—'ভালোই হ'ল। আমিও যাদবপুরেই থাকি। টিকিট কেটেছিস্?'

আমি মাথা নাড়লাম। কণ্ডাক্টার এসে হাত বাড়াতেই রণেন পয়সাটা ফেলে দিয়ে বললো—'এক-আনার একটা।'

রণেনের দিকে তাকিয়ে দেখলুম তাকে চিনতে পেরে আমি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছি। স্বাস্থ্যটা অনেক ভেঙেছে

রণেনের। পোশাকের দিকে নজর নেই। চোখে চশমা উঠেছে। হাতঘড়ির ডায়ালটায় বদ-রঙ ধরেছে। চেন্‌টার সেই জেল্লা আর নেই। তার বদলে চামড়ার বেল্ট লাগিয়েছে। চোখে-মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। দাড়ি কামায়নি ব'লে আরো ক্লান্ত মনে হচ্ছে। উগ্রপন্থী রণেন তার উগ্রতা হারিয়ে কেমন যেন সবার অলক্ষ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই রণেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ছেলে ছিল। কলেজের স্ট্রাইক থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক, অনুষ্ঠান—সর্বত্রই ছিল তার অবাধ গতি। পড়াশুনোতেও খুব খারাপ ছিল না। অন্ততঃ আমার চেয়ে ভালো। রণেন অনার্স পেয়েছিল। ফূর্তিবাজ অমিতব্যয়ী রণেন আজ মূর্তিমান দুর্গতি।

টিকিটটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই বললাম—'তোর একি চেহারা হয়েছে?'

রণেন হেসে বললো—'তুই কিন্তু একটু মোটা হয়েছিস।'

বললাম—'ওটা সুখের লক্ষণ নয়, জল-হাওয়ার গুণ। তারপর? তুই এদিকে?'

'সে অনেক কথা। ভেবেছিলাম সব লিখে জানাবো। সে-সুযোগ দিলি কোথায়? বিয়ে করেছিস?'

'সময় পেলাম কই? নিজের ঠাঁই নিয়েই ব্যস্ত। লক্ষ্মীকে কখন ডাকি।'

'খাসা আছিস তাহলে। যদ্দিন উইংসের পেছনে ততোদিনই সুখ।'

'আর তুই?'

'এখানে নয়। বাসায় গিয়ে কথা হবে।'

বাসটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। সামনে পিছনে আরো দু'একটা। ব্যাপার কী? অ্যাক্সিডেন্ট?

রণেন হেসে বললো—'যাতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, তারই ব্যবস্থা। লেভেল-ক্রসিং। তুই বুঝি এদিকে আর কখনো আসিসনি?'

'বছর দশেক আগে গড়িয়াহাটা এসেছিলাম একবার, তাও এবার এসে চিনতে পারিনি।'

রণেন বললো—'হ্যাঁ, সেই উদ্বাস্তুর দল। ও-কূল ভেঙে এসে এ-কূল গড়ছে।'

'আর তুই?'

'বাস্তু হারিয়ে আমিও দলে ভিড়েছি।'

ঝক্ ঝক্ করে একটা ট্রেন চলে যেতে বাসটা ছাড়পত্র পেলে।

বললাম—'বাস্তু-হারানোটা কিরকম? তোর সেই খিদিরপুরের বাসা?'

'ভাড়া ছিল ষাট টাকা। হঠাৎ ক'রে বাবার মৃত্যুর পর সেটা চালানো সম্ভব হ'ল না। দোকানের কর্মচারী-গুলো প্রথম প্রথম সততা রক্ষা করেছিল। শেষে উল্টো হাল ধরলো। বুঝলুম সামনে ঝড়। ভরাডুবি আসন্ন। মাকে আর ছোট ভাইবোনগুলোকে বাঁচাতে হবে, সেই আমার একমাত্র ভাবনা। অনেক তদ্বির তদারক করে পরীক্ষায় বসবার একটা সুযোগ পেলাম। ফলাফল নিতান্ত মন্দ হয়নি। কর্তৃপক্ষ বললেন—চাকরি হ'ল। তবে ছ'মাস শিক্ষানবিশী করতে হবে। তারপর মেওয়া মিলবে। তাতেই রাজী। এই দুর্দিনের বাজারে তৈরী চাকরি কে দেয়? কিন্তু সংসারের চাকা ঐ সামান্য তেলে সচল রাখা সম্ভব হ'ল না। খিদিরপুরের বাসা ছেড়ে দিয়ে যাদবপুরের মশার রাজত্বে একটা সস্তা গুহায় এসে ঢুকলুম। প্রথম প্রথম অসুবিধে হ'ত। এখন বেশ ভালো আছি।'

বললাম—'তোদের দোকান?'

'দোকান আর কে চালায়! ওসব তুলে দিয়েছি। এখন মোটামুটি চলে যাচ্ছে। ভগবানের দয়ায় হচ্ছে সবই। ছোট ভাইবোনগুলোকেও মানুষ করছি। শেষবয়সে মাকেও দুটো খেতে দিতে পারছি—' রণেনের চোখে-মুখে একটা আত্মপ্রসাদের বিমল আনন্দ ফুটে উঠলো। এই রণেন নাস্তিক নয়, মনুষ্যত্বে অবিশ্বাসী নয়। দয়া আর দায়িত্ব, স্নেহ আর ভালবাসা—সব-কিছুকেই আজ সে হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছে। সবুজ দলে নাম লিখিয়েছে রণেন।

যাদবপুর পৌঁছে রণেন বললো—'আগে আমার বাসায় চল্। তারপর কোথায় যেতে চাস্ যাবি। ভয় নেই, আমি তোকে পৌঁছে দেবো।'

সাঁঝের তখনো ঢের বাকি। আমি আপত্তি করলাম না।

৮-বি টার্মিনাসটা পেরিয়েই রণেন বললো—'দাঁড়া, একটা ওষুধ নিতে হবে।' ব'লেই পাশের ওষুধের দোকানটায় ঢুকলো।

আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রণেন ফিরে এলো বিষণ্ণ বদনেই।

বললাম—'কার ওষুধ?'

'আর বলিস্‌নে! হঠাৎ ক'রে ছেলেটার জ্বর এসেছে কাল থেকে। আমারও দাঁতের ব্যথা, বাপ-বেটা দুজনের ওষুধই নিয়ে নিলাম।'

'তোর ছেলে— ?'

'তবে আর বলছি কি? যে-সে লোক নই! রঞ্জনের খোদ মেইন্‌-ম্যাট্রন। হাততালি কুড়োবার সময়ও হয়ে এসেছে। তার পর? তোর খবর কী? এ পর্যন্ত আমিই তো বলে যাচ্ছি একটানা।'

নিরুৎসাহ হয়ে বললাম—'আমার খবর কিছুই নেই। আজ তোর কথাই শুনবো। বিয়েটা হ'ল কবে?'

'তা প্রায় বছর হয়েছে।'

'দু'বছর! আমাদের একটা খবরও দিলিনা?'

'অনেক ভেবেছি। কিন্তু বিশ্বাস কর্‌, সাহস পেলাম না কিছুতে। কাউকে জানাইনি। এমনকি আত্মীয়-স্বজনকেও না। যারা জেনেছে তারাই সেধে এই কথা বলেছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কী? কেন এই গোপনতা? বিয়েটা কি অপরাধ?'

'না, বিয়েটা নির্বুদ্ধিতা। যার কিছুই নেই করবার, সেই বিয়ে করে। যাক্‌, আজ আর ঝগড়া নয়। তবে আমার গল্প তোকে শোনাবো। আজ নয়, আরেকদিন। আজ শুধু আলাপ-পরিচয়টা করে যা—'

'কার সঙ্গে?'

'আবার কার সঙ্গে? আমার বউ-এর সঙ্গে।'

আলাপ-পরিচয় হ'ল। নতুন নয়, নতুন ক'রে। যা ছিল জিজ্ঞাসা, যা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর, আর যা হয়ে রইল রহস্য। মেনকাকে বিয়ে করেছে স্বপন।

মেনকা নয়, অমিতা রায়কে দেখলুম নতুন ক'রে। রঙ নেই জৌলুস নেই, স্বাস্থ্য নেই—আছে শুধু মুখের আদলটুকু। শ্রী আর কমনীয়। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। রাঙানো সিঁথি, মুখে মিষ্টিহাসি। আমায় দেখে ঘোমটা তুলে দিলে।

জিজ্ঞেস করলুম—'এটা কী হ'ল?'

অমিতা হেসে বলেছিল—'লজ্জা নয়। এই রীতি। দেখতে পাচ্ছোনা, ওদিকে শাশুড়ী-ঠাকরুন আছেন।'

বললাম—'তোমাকে বৌদি ব'লেই ডাকি। আচ্ছা বৌদি—তোমরা দুজনে মিলে কি আমাকে শুধু বোকাই বানাবে স্থির করেছো? এই চেহারা কেন তোমার?'

'স্বাস্থ্যের কথা বলছো? বড্ড রোগা হয়ে গেছি, না? কি করবো, খোকনটা যে-বছর হ'ল, সে-বছর খুব কঠিন অসুখে পড়েছিলাম। তারপরই এই অবস্থা। চাকরি একটা করতাম, তাও রাখা সম্ভব হ'ল না। তা ঠাকুরপো—বাক্টারি আছে তোমার সন্ধানে? দাওনা একটা জুটিয়ে?'

'থাকি কোলকাতার বাইরে। এখানে কোথায় সন্ধান রাখবো?'

'ও, নেই বুঝি। কি জানো, আজকালকার দিনে একজনের রোজগারে সংসার চলে না। দায়িত্ব তো শুধু ওঁর একার নয়। দুজনে মিলে ঝুঁকি নিয়েছিলাম, তারপর সব দায়িত্ব ওঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নির্লজ্জের মতো নিশ্চিন্ত বসে আছি।'—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসকে কিছুতেই চাপতে পারলো না অমিতা। কিংবা চাপতে চাইলো না। হয়তো এরই ফাঁকে নিজের বুকের ভার একটু লাঘব করলো।

বললাম—'তোমার মা-বাবা—'

'ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। মা-বাবার মতামত তো নিইনি। ওঁরাই বা আমাদের খোঁজ করবেন কেন? বাবা তবু আসতে চেয়েছিলেন। আমি মানা করে দিয়েছি। বাবাকে দেখাবার মতো উঁচু মাথা যে আর নেই ঠাকুরপো। যাক্‌ সে-সব কথা।—তুমি বোসো, আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসছি।'—ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল অমিতা।

স্বপন কোথায় বসে গরম জল আর লোশান দিয়ে দাঁতের চিকিৎসা করছিল। আমি একা-একাই বসে রইলাম অনেকক্ষণ। ভাবছিলাম, সেদিনের মেনকাই হ'ল আজকের অমিতা। অদ্ভুতের কথা।

স্বপনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'পাষণ্ড! এমন করে মেয়েটাকে শাস্তি দিলি?'

স্বপন হেসে জবাব দিয়েছিল—'অন্যথায় আমাকেই শাস্তি পেতে হ'ত। বিশ্বাস কর্‌—আজ যা দেখছিস, এর সবটার জন্যেই আমি দায়ী নই। শোন্‌ যদি। একট অল্পবয়সের ছেলে আর যাই করুক, আজকালকার দিনে দুম্‌ করে বিয়ে করে বসে না। তবু আমাকে তাই করতে হয়েছিল। জানিস সে-গল্প? কাউকে না ব'লে আমি যেন শান্তি পাচ্ছি না।'

তাল ঠুকবার দরকার হয়নি। আগাগোড়া সাজানো গল্পটাই বললো স্বপন:

"—সেদিনের ঘটনাটা মনে কর্‌। বাজি জিতেছিলুম শঙ্কুর সঙ্গে। বোধহয় জীবনের বাজি হারবার জন্যেই

কিন্তু ঘটনাটাকে আমি মোটেই গুরুত্ব দিইনি। তাকে কথাও দিয়েছিলাম সেরকম। ফলেই আমার মনে তার স্থায়িত্ব হয়েছিল সীমিত। কিন্তু একদিন বুঝলুম, অপরপক্ষে এই খেলোয়াড়ী মনোভাবের যথেষ্ট অভাব ছিল।

টেস্ট-পরীক্ষার পর কলেজে গিয়েছিলুম একটা কাজে। হঠাৎ কোথা দিয়ে অমিতা এসে সামনে দাঁড়ালো। বললো—'আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

জীবনে সেই দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে কথা হ'ল।

বললাম—'বলুন, কী দরকার?'

প্রথম থেকেই ও যেন কিরকম অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলো। বললো—'জানেন, আজ আমি বন্ধুদের কাছে অপমানিত হয়েছি। এখনো তার জবাব দিতে পারিনি।'

এসব কথা আমাকে বলার অর্থ কিছুই বুঝলাম না। বললাম—'আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

বললে—'হ্যাঁ। মেয়েদের তো আপনি জানেন না। ওরা ভীষণ হিংসুটে। বলছিল—'কোনো ছেলে নাকি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছুক নয়। কোনোদিন সে-চেষ্টা আমি করিনি বটে, কিন্তু আজ কিরকম যেন রোখ চেপে গেল। ব'লে বললাম—বেশ, আমার আজকের জন্মদিনেই আমি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করবো। তখন দেখিস—। ব'লে তো বসেছি। এখন তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। অথচ আমার কোনো বন্ধুও নেই। জানাশোনা দু'একজন আছে বটে, কিন্তু তাদের বন্ধু বলে ঘোষণা করতেও লজ্জা হচ্ছে। তাই বলছিলাম—যদি সেদিনকার কথা ভেবে—আপনি—আমাকে, মানে—একটু সাহায্য করেন!—'

আমি তো শুনে অবাক। এ মেয়ে কি মেয়ে, না আর কিছু।

বললাম—'বাঃ, ওরা বুঝি আমায় কেউ চেনে না। যখন দেখবে আমাকেই আপনি বন্ধু বলে চালিয়ে দিচ্ছেন—'

'না না। ওরা কেউ আপনাকে চেনে না। ওরা আমার পাড়ার বন্ধু। কলেজের নয়। কলেজে তো আমার কোনো বন্ধু নেই।'

কথাটার মধ্যে দিয়ে একমুহূর্ত-বিষাদ যেন আমায় আঘাত করলো। আমার আর কি। না ভেবেই বললাম—'বেশ তো, ঠিকানাটা দিন, যাবো আপনার নিমন্ত্রণ রাখতে। জন্মদিনের খাওয়ার কথা বলছেন যখন। তা, আমার আর-সব বন্ধুদের কি সঙ্গে নিয়ে যাবো?'

'সে তো আরো ভালো হয়।' বললে ও।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। তোদের কাউকেই পেলাম না। অগত্যা একাই যেতে হ'ল। হাতে করে নিয়ে গেলাম একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। যেতেই অনুযোগ—'এতো দেরি করলেন? আমি ভাবলুম আপনি বুঝি আর এলেন না। আসুন, মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

হাতের ফুলের তোড়াটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম—'আমার এই বন্ধুগিরি যেহেতু একদিনের, সুতরাং আপনার জন্মদিনে এই একদিন-স্থায়ী উপহার—'

'আপনি বুঝি আগে থেকেই সব দেখতে পান? আসুন—'

গান শুনেছি অনেক—সেই প্রথম অতনু রায়কে চোখে দেখলাম।

কিছুক্ষণ বিচ্ছিন্ন গল্পগুজবে কাটলো। ওর বন্ধুরাও জুটেছিল আশেপাশে। একসময় ও বললো—'চলুন, ওদিকে যাই।'

আমরা একটা সাজানো ঘরে এসে দাঁড়ালুম। অদ্ভুত রুচির ছাপ তার সর্বত্র।

বললাম—'আপনার ঘর বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

বললাম—'চমৎকার! বাইরে-ভিতরে এমন সঙ্গতি! যেন একখণ্ড কবিতা।'

ও আমার মুখের দিকে তাকালো। বললো—'আপনি কি কবি?'

'কেন বলুন তো?'

'চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

বললাম—'তাহলে আমার চেহারার নিন্দে করছেন বলুন? চেহারা যেহেতু কাব্যলক্ষ্মীর বিজ্ঞাপন। কবি নই, তবে লিখি মাঝে মাঝে পূর্বসূরীদের ল্যাজ ধরে।'

হাসলো অমিতা। 'তাহলে আমার অনুমান মিথ্যে নয়। আপনি তো গানও জানেন।'

'কে বললে?'

'শুনেছি।'

'ভুল শুনেছেন। তবে আপনার বাবার গান আমি ভালবাসি। আপনার গানও কিন্তু আমার ভালো লাগবে।'

'কেমন করে জানলেন।'

হেসে বললাম—'বাঃ, যাঁর বাবা এমন গান গান, তিনি নিজেও কিছু কম গাইয়ে হবেন?'

শুনে ও খিলখিল্ করে হেসে উঠলো। 'চমৎকার যুক্তি। আপনার বাবা বুঝি কবি?'

একটু কি অপ্রস্তুত করেছিল আমায়? বলতে পারিনে। জবাব দিলুম—'নাঃ—তিনি কবি নন, দরজী।'

পেশাটার সভ্যনাম আমার অজানা নয়। কিন্তু সেটা মুখে এলো না।

অমিতা কিন্তু বেকায়দায় পড়লো। আমতা-আমতা ক'রে বললো—'ও, ক্ষমা করবেন। আমি না জেনে—'

এতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে? বললাম—'তাতে কি, আমার বাবাও তো আমার পরিচয়। কাব্যের কথা হ'ল, গানের কথা হ'ল, আর আমার বাবার কথা জানতে চাইবেন না?'

ওকে সহজ হবারই সুযোগ দিলাম। তার চোখে-মুখে দেখলাম প্রসন্ন ধন্যবাদের ভাষা। ব্যস্ত হয়ে বললো—'গান শুনবেন আমার?'

'নিশ্চয়ই শুনবো। শোনাবেন একটা?'

অমিতা অর্গানের কাছে গিয়ে বসলো। গান শোনালো। ভালো-ও লেগেছিল। শুধু আমাকেই শোনালো—এমন গান আমার অনাস্বাদিতপূর্ব। তাই বেশী ভালো লেগেছিল। …

আরেকদিন দেখা হ'ল সিনেমা-হলে।

কাছে এসে বললো—'মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন যে?'

বললাম হেসে—'আজ কি কথা বলার চুক্তি ছিল?'

'চুক্তি না থাকলে বুঝি কথা বলতে নেই? ছবি দেখতে এলেন?'

বললাম—'টিকিট পাইনি। অ্যাডভান্স কেটে নিয়ে যাচ্ছি।'

বললো—'যাই। মা ওঁরা হয়তো ভাবছেন, হারিয়ে গিয়ে অন্য সীটে বসে পড়েছি।'

বললাম—'আচ্ছা, আসুন।'

'শুনুন? কাল একবার আসবেন।'

'কেন বলুন তো?'

'কেন আবার কি। এমনি। আসবেন, কেমন?'—আমার সম্মতির জন্যে আর দাঁড়ালো না। যেন তার কোনো দরকারই নেই, এমনি একটা ভাব ক'রে কথাটা ব'লে চলে গেল। …

এই সময়েই আমার জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা। বহু মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু এমন বিজয়িনীর সাক্ষাৎ পাইনি কোনোদিন। বেশ একটা ভালো-লাগা কৌতূহল নিয়ে ওদের বাসায় যেতে শুরু করলাম। আর তারই সূত্র ধরে কখন যে সেই ফাঁদ-পাতা ভুবনে এসে ধরা দিলাম, বুঝতেই পারলাম না। তোদের কাছে বলিনি। কিন্তু প্রায়ই দুজনে ঘুরে বেড়িয়েছি এখানে ওখানে। আমাদের একেকটা দিন মনে হ'ত একেকটা মুহূর্ত। অবাক হতুম ভেবে।

একদিন বললো—'আমায় মেনকা ডাকেন কেন?'

হেসে জবাব দিলুম—'দেবী মেনকার একটাই ইতিহাস।'

জবাব শুনে হেসেছিল ও।

আরেকদিন বললো—'কতো জায়গায় গেলুম, কই আপনার বাসায় তো নিয়ে গেলেন না একদিন? জানেন, আমার ভীষণ মাসিমা পেতে ইচ্ছে করে। মাসি-পিসি আমাদের কেউ নেই কিনা? আমরা বড্ড একলা!'

বললাম—'বেশ তো, চলুন না একদিন। আপনাকে দেখে মা-ও খুব খুশি হবেন। অনেক শুনেছেন আপনার গল্প।'

'আপনি বলেছেন বুঝি? কেন নিন্দে-মন্দ করতে গেলেন?'

'প্রশংসাও তো করতে পারি।'

হেসে বললো—'চলুন—' …

এমনি সব বিচিত্র উপল। জ'মে জ'মে তারাই একদিন পাহাড়-প্রমাণ হয়ে উঠলো। তাকে সরাবার সাধ্য আর আমাদের রইলো না।

পরীক্ষায় পাস করলুম। বললে—'এর পর?'

বললাম—'একমেবাদ্বিতীয়ম্, মানে—একটা চাকরি।'

'অসম্ভব। তোমাকে এম.এ. পড়তেই হবে। তুমি অ্যাড্‌মিশান নাও।'

নিতে হ'ল। কয়েকদিন ক্লাসও করলাম। তারপর পুজোর ছুটি। রঙীন কল্পনার স্রোতে দুজনে ভেসে গেলুম। নেই শাসন। নেই কোনো বন্ধন। কোনো বাসনাকেই সংযত করার প্রয়োজন আমাদের ছিল না। কোনো কৌতূহলকেই অনিবৃত্তি রাখার। অমিতার মা বাবা বাধ সাধলেন। তাতেই সে হয়ে উঠলো আরো ক্ষিপ্ত। উন্মাদ। আমিও তখন মতিচ্ছন্ন। ভালো-মন্দ কোনো ভাবনাই আমার তখন ছিল না। ভুলটা করে বসলুম তখনই। বিশ্বাস কর্—সবটাই ছিল আমাদের অনায়ত্ত।

একবার শুধু বলেছিলুম সভয়ে—'কি বলছো?'

ও ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—'ঠিকই বলছি। সবই তো দিয়েছি তোমায়। তবে কেন এত দ্বিধা। সব নিলে। কিছুই দেবে না আমায়?'

আর কিছু ভাবিনি। তাকে বুকের ওপর টেনে নিয়েছিলুম। কেঁদেছিল অমিতা। বলেছিল—'এত সুখ জীবনে কখনো পাইনি। তুমি আমার চিরজীবনের প্রণাম নাও।'

তার পর—। যাক সে-কথা। শুধু এই ভেবে অবাক হলুম, জীবনে কোনোদিন কোনো কাজের জন্যে গোপনতার আশ্রয় নিইনি। কিন্তু সেই প্রথম মনে হ'ল—গোপনতাই জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু।

বলেছিলুম—'একি হ'ল।'

হেসে জবাব দিয়েছিল—'মেনকা নামের একটাই ইতিহাস।'

কিন্তু যা একান্ত গোপনীয়, তা আর গোপন রইলো না।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম—'এখন?'

নির্ভয় অমিতা। বললো—'ভাবছো কেন? মানুষের জীবনে দুটো মাত্রই পথ। একটা বাঁচার, আরেকটা মৃত্যুর। এ তো চিরকালের।'

উন্মাদ হয়ে গেলুম। 'আমি তোমায় মরতে দেবো না।'

'তবে কি করবে শুনি?'—স্পষ্ট দেখলুম, একটা কান্নাকে লুকিয়ে ফেললো অমিতা।

'বিয়ে করবো। তোমাকে দেবো নারীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। জানুক বিশ্বলোক, তুমি আমারই সন্তানের মা।'

'তোমার মা-বাবার মত করাতে পারবে?'

'চুলোয় যাক মতামত। আমি সাবালক, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

তবু একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমার মা বাবা দুজনেই মত দিলেন। কিন্তু অমিতার মা বাবা দিলেন না। সুতরাং বিয়েটা হ'ল আইনের সাহায্য নিয়ে।

এম.এ. পড়া আর আমার হ'ল না। এইসময়ে বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। একটা গোটা সংসারের দায়িত্ব। ব্যবসাতেও কাটল ধরলো। কি করবো, কি করবো।

অমিতা বললো বার বার—'ভেঙে পোড়ো না। দুজনে মিলে হাল ধরবো সংসারের। আমিও তো আই.এ. পাস। একটা চাকরি কি আমিও জোটাতে পারবো না?'

কিন্তু ভেঙে পড়লো অমিতাই। যখন বিয়ের সাত মাস পরে মেয়েটা হ'ল, এবং দু'দিন পরেই মরে গেল। তার সে কী কান্না! আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম। সাতদিন পালিয়ে বেড়িয়েছিলুম ওর কাছ থেকে। মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস হয়নি। সংসারও হয়ে পড়ছে অচল। চারটে ছোট ভাইবোন—ওদের পড়াশুনো, স্কুলের মাইনে, বাড়িভাড়া। তারপর মা আর আমরা দুজন। পাগলের মতো চাকরির সন্ধানে ছুটলাম। একের জায়গা থেকে ঘুরে এসে কেঁদেছি। কেউ দয়া করেনি। কেউ না। একটা বছর এইভাবে কেটেছে। আশা-ভরসা সব গেল ফুরিয়ে। নির্বোধের মতো দু'একবার জীবননাশের কথাও ভেবেছি।

তারপর ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হলেন সহসা। চাকরিটা পেয়ে গেলুম। ওর-ও একটা মাস্টারি জুটলো।

উঠে এলুম যাদবপুরের বাসায়।

কিন্তু তারপর ওর মুখে আর কোনোদিন হাসি দেখিনি।

আর আমি? আমার কথা শুধু তোকেই বলা যায়। হ্যাঁ, তিন বছর। এই তিনবছর আমি উপোসী। শুকিয়ে গেলুম! আমার শরীরটা তো রক্তমাংসের। কিন্তু—তবু দয়া হ'ল না তার।

রাগ করেছি। অভিমান করেছি। নির্লজ্জের মতো অনুনয় করেছি। তার শুধু এক কথা—'এখনো শিক্ষা হয়নি তোমার? কী তুমি? আমাদের সাতরাজার ধন এক মানিক এই খোকন বেঁচে থাক্। তাকেই মানুষ করবো সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে। আমার কথা রাখো, লক্ষ্মীটি! আর আমি পারবো না।'

শান্তির কথা বলছিলি? শাস্তি পেলাম দুজনেই। কিন্তু বলতে পারিস, কার শাস্তির ভার হলো বেশী! ওর, না আমার?—"

রমেন আমার মুখের দিকে চেয়েছিল জবাবের প্রত্যাশায়। সে-জবাব আমার কাছে ছিল না।

বিদায়ের আগে রমেন বললো—'হাঁ,—ও বলছিল, আরেকদিন তোর আসবার কথা। তোর কি সময় হবে? তোকে কিছু খাওয়াতে পারেনি ব'লে দুঃখ করছিল। আমাকেও গালাগাল কম করেনি।'

বললাম—'বৌদিকে বলিস, না হলেও, সময় আমি করে নেবো। তার হাতের রান্না খাওয়ার সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবো না। কাল আসবো।'

সহকর্মীর ফরমাস সেদিন রাখা সম্ভব হয়নি। তাতে আমার দুঃখ নেই। শুধু ভাবছিলাম, শাস্তিটা যা-ই হোক—তার জন্যে কি আমারও কিছু দায় নেই?

●

সূত্রধার

১৯০৮ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টার থিয়েটারে যোগদান করলেন। এখন কয়েক বছর স্টার তাঁর কর্তৃত্বাধীনে চলল। হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'কামিনী-কাঞ্চন', 'রাণী ভবানী', রমেশচন্দ্র দত্তের 'জীবনসন্ধ্যা'র নাট্যরূপ অভিনয় করে চললেন। তাঁর নিজের রচিত কয়েকটি নাটিকার, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কয়েকটি নাটকের, সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বংশীবিল', 'দশচক্র'র অভিনয় চলতে লাগল। বেশি কিছু সুবিধা হল না। শেষ জমিয়ে দিল অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল'। সেটা ১৯১২ সাল। 'খাসদখল'-এ নামলেন—

অমৃতলাল বসু—নিতাই
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—মোহিত
কুঞ্জলাল চক্রবর্তী—ঠাকুর্দা
ক্ষেত্রমোহন মিত্র—হরেন
গোপাললাল ভট্টাচার্য—লোকেন
বসন্তকুমারী—মোক্ষদা
সুশীলাবালা—গিরিবালা

নিতাই-এর '*is the*' কিছুদিন ছাত্রমহলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

এর পর দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নাটক 'পরপারে' অভিনীত হল। দ্বিজেন্দ্রলাল বহু নাটক লিখেছেন, নীতিবোধের অভাব কোনোটায় ছিল না, কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে তিনি চুপচাপ থাকতেন। এই 'পরপারে' নাটকে তিনি পরকাল আমদানি করলেন; আর নাটকের পাত্র-পাত্রীরা হয় পরম সৎ আর না-হয় পরম অসৎ, রক্তমাংস দিয়ে গড়া নয়। 'পরপারে'র পর একদিন স্টারে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আনন্দ-বিদায়'-এর অভিনয় হল; অভিনয় আরম্ভ হল—কিন্তু শেষ অবধি পৌঁছল না। এ-সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা না করাই ভালো।

আরও বছর তিনেক থেকে অমরেন্দ্রনাথ স্টার থিয়েটার ত্যাগ করলেন। এর কয়েকবছর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

স্টার আবার টিম্‌টিম্ করতে রইল; ফের মাথে উঠল ১৯১৮ সালে যখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিরাজবৌ'-এর নাট্যরূপ অভিনীত হল। নাটকে অমৃতলাল বসু অংশগ্রহণ

করলেন। এর পর থেকে স্টার থিয়েটার পরিচালনা করতে থাকলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক অনূদিত সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' মঞ্চস্থ করলেন; এতে তারাসুন্দরী ডেসডিমোনা রূপে অপূর্ব অভিনয় করলেন। এখন থেকে অপরেশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটক—'রাখীবন্ধন', 'অযোধ্যার বেগম', 'সুদামা' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হল। 'রাখীবন্ধন'-এ তারাসুন্দরীর ধারা ও তারক পালিতের চন্দ্রাবত অবিস্মরণীয়। তারক পালিতকে এর পর আর রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল না। তিনি সরকারী চাকরি করতেন, নাট্যশালার বিজ্ঞাপনে তাঁর নামের পাশে সব সময় 'এমেচার' লেখা থাকত। তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। পূর্ণশক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন যে তিনি হঠাৎ নাট্যশালা ত্যাগ করলেন, জানা যায় না।

১৯২৩ সালে স্টারে এল আর্ট থিয়েটার লিমিটেড।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে দানীবাবু পিতা ও গুরু একসঙ্গে দুই হারালেন। এখন থেকে দানীবাবুর প্রতিভার আর নব নব বিকাশ দেখা গেল না। মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের 'গৃহলক্ষ্মী', প্রমথ ভট্টাচার্যের 'ক্লিওপেট্রা', ক্ষীরোদপ্রসাদের ও অপরেশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটকের অভিনয় হল। ১৯১৩ সালে অমৃতলাল বসু মিনার্ভায় যোগদান করলেন; তাঁর রচিত 'নবযৌবন' অভিনীত হল; তিনি তাতে অংশগ্রহণ করলেন। ১৯১৫ সালে মিনার্ভা থিয়েটার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সিংহল বিজয়' মঞ্চস্থ করল। অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় তারক পালিত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী, নরীসুন্দরী দেখা দিলেন। খুব বেশি জমল না। পরের বছর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গনারী' অভিনীত হল; অভিনয় ভালোই হল; কিন্তু এ অভিনয় গ্রন্থকার দেখলেন না, তখন তিনি পরলোকে। ১৯১৮ সালে এখানে 'কিন্নরী'র অভিনয় খুব জনপ্রিয় হল। 'কিন্নরী' বইটা বাজে, কিন্তু এতে 'আলিবাবা'র আবদালা-মর্জিনার প্যাটার্নে দুটি চরিত্র ছিল—উৎপল ও মকরী। উৎপলের ভূমিকায় দেখা দিলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। মিনার্ভায় লোক ভেঙে পড়তে লাগল। কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর নৃপেন বসু মিনার্ভা ছেড়ে চলে যাওয়ায়, তারাসুন্দরী পুরুষবেশে অবতীর্ণা হলেন উৎপলের ভূমিকায়। দ্বিগুণ ক'রে জমে উঠল 'কিন্নরী'র অভিনয়। এই দেখে স্টার মিনার্ভা থেকে তারাসুন্দরীকে ছাড়িয়ে এনে তাঁকে দিয়ে ওই 'কিন্নরী'র অভিনয় আরম্ভ করল। দর্শক এখন মিনার্ভা ছেড়ে স্টারে ভিড় করল। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত আদালত অবধি গড়াল। মিনার্ভায় ১৯১৯ সালে বরদা দাশগুপ্ত প্রণীত 'মিশরকুমারী'র অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হল। নাটকীয় গুণাবলী এতে বিশেষ কিছু ছিল না, তবে এই নাটকে কাফ্রী ও মিশরীয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সাদা ও কালোর মধ্যে সংঘাত, অধিকার-পাওয়া ও অধিকার-হারাদের মধ্যে সংগ্রাম দর্শকদের মনকে আলোড়িত করল। চিত্তরঞ্জন দাশ এই অভিনয় দেখতে আসেন। তারপর এখানে জে. এল. গুপ্তের 'মনীষা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বশীকরণ', বরদা গুপ্তের 'নাদির শাহ', ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেল্লার কীর্তি' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক অভিনীত হল।

ওদিকে নতুন যুগের ভেরী বাজিয়েছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা ভাবলেন, ওই তালে না চলতে পারলে, থিয়েটারকে আর বাঁচানো যাবে না। তাঁরা নিয়ে এলেন নবযুগের দুই অভিনেতা—নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

১৯২২ সালে ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা'য় তাঁরা দেখা দিলেন।

এই ১৯২২ সালে অক্টোবর মাসে মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে পুড়ে গেল।

মনোমোহন পাঁড়ে কোহিনূর কিনেছেন, এখন তার নাম হল মনোমোহন থিয়েটার। অভিনয় চলতে লাগল, দানীবাবু এসেছেন, চুনীবাবু এসেছেন, তিনকড়ি এসেছেন। বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হল নিশিকান্ত বসু রচিত 'দেবলাদেবী' ও 'বঙ্গে বর্গী'। নাটক দুটির মূল্য বিশেষ কিছু ছিল না, তবে তাদের স্থূল ঘটনাবলী দর্শকদের মনোরঞ্জন করত।

শেষে ১৯২৪ সালে মনোমোহনে এল শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দির।

এর আগে স্টারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড।

অমৃতলাল বসু এক ভাষণে বলেছেন—

"কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশে নাট্যকলা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছিল। সারাজীবন ধরে আমি এই কলায় সাধনা করে এসেছি। শেষে আমার এই বৃদ্ধবয়সে নাট্যকলার এই অবনতি দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল। কিন্তু আজ যাঁরা নাট্যশিল্পে নবযুগ এনেছেন—আর্ট থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করছেন এবং বিশেষ ক'রে শিশিরবাবুই এই নবযুগের প্রবর্তক। যে ব্যথা নিয়ে আমার ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল, সে বেদনা থেকে এঁরা আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।"

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নবযুগের অভ্যুদয় এই সময়েই হল, এটা ঠিক। কিন্তু সাধারণ নাট্যশালার বাইরের কথাও আমাদের স্মরণ করতে হয়।

শচীন সেনগুপ্তের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করি—

"ঠাকুরবাড়ির সেই সাধকরা—গুণেন্দ্রনাথ, গগেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে যে মর্যাদা দিয়ে গেছেন, রচনা করে, অভিনয় করে এবং প্রযোজনার মানোন্নয়ন করে, তাই-ই বাংলা নাটককে বিশ্বের দরবারে স্থান করে দিয়েছে, এ-কথা সকলেই জানেন। ওঁরা সকলেই নাটক না লিখলেও, সকলেই কিন্তু বাল্যকাল থেকে অভিনয় করে এসেছেন। ··· তখনতেই ওঁরা শুধু নাটককেই ন্যাশনাল করবার কথা ভাবেননি, নাট্যশালাকেও ন্যাশনাল করবার কথা ভেবেছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি পশ্চিমের দিকে ছিল না, পূবের দিকেই ছিল; পশ্চিমের জানলাটা অবশ্য সম্পূর্ণ খোলাই রেখেছিলেন। ওঁদের সাহিত্যে, ওঁদের সংগীতে, ওঁদের চিত্রে যে পরিচয় পাওয়া যায়, ওঁদের নাটকেও তাই-ই পাওয়া যায়। ওঁরা

'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ে নাম-ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

যেমন খাঁটি বাঙালি, তেমন খাঁটি ভারতীয়, তেমনই খাঁটি বিশ্বপ্রেম বিশ্বাসী, মহামানবতার আহ্বায়ক।"

১৮৮১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'র এক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় হল। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী সরস্বতী। বহু সম্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তখন তাঁর বয়স তেতাল্লিশ বছর, ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বয়স সাঁইত্রিশ, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হননি। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সামনে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম অভিনয়; তাঁর বয়স তখন কুড়ি।

শচীন সেনগুপ্ত লিখছেন—

"এই বাল্মীকি-প্রতিভা তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সহরে—শিক্ষিতদেরকে, যারা বাল্মীকিকে জানতে চায়নি, রামায়ণ ভুলে ছিল, মনে-প্রাণে চেয়েছিল ইংরেজ হতে, সাহিত্য-শিল্প সবই গড়ে তুলতে চেয়েছিল ইংরেজের ধাঁচে। বাল্মীকির এই প্রতিভাকে, ভারতের এই প্রতিভাকে, প্রকাশ ক'রে তিনি তাদেরই ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলেন, যারা মনে করতে অভ্যস্ত হয়েছিল যে প্রতিভা শুধু পাশ্চাত্ত্য দেশেরই সম্পদ, পোড়া প্রাচ্যে নয়। সেদিন তেমন শিক্ষিতের সংখ্যা কম ছিল না। শুধু গানে যে নাটক হয়, এ-কথা তখনকার শিক্ষিত বাঙালি প্রায় ভুলে বসেছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' মুষ্টিমেয় লোককে খুশি করেছিল। আর তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রীত হয়েই বাড়ি ফিরলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গান রচনা করলেন, বহু বছর পরে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎবর্ষের জয়ন্তী উৎসবের সময় তিনি ওই গানটি প্রকাশ করেন। গানের প্রথম চার লাইন ছিল এই—

"উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নবজগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।"

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় ঠাকুরবাড়িতে পরে অনেক বার হয়েছে। একবারের অভিনয় সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ যে মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করি—

"এইবারে বড়ো 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গল্প শোনো। বড়ো বলছি এইজন্য, ও-রকম মহাধুমধামে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' আর হয়নি। রবিকাকা তখন আমাদের দলের হেড, সাজ-পোশাক স্টেজ বাঁধবার ভার আমাদের উপরে। ঐ সে-বার থেকেই ও-সব কাজ আমাদের হাতে পেলুম। তার কিছুকাল আগে একবার 'বাল্মীকি-প্রতিভা' নাটক করে আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য এক গাদা টাকা তোলা হয়ে গেছে। বেশ কয়েক হাজার টাকা উঠেছিল এই নাটক করে।

"তা এবারে কর্তাদাদামহাশয়ের কী খেয়াল হোলো, লাটসাহেবের মেম লেডি ল্যান্সডাউনকে পার্টি দেবেন, হুকুম হোলো 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয় হবে।

"রবিকাকা সেজেছেন বাল্মীকি, আমরা সব ডাকাত, অক্ষয়বাবু দস্যুসর্দার, বিবি লক্ষ্মী, প্রতিভাদিদি সরস্বতী, অতি হাত-বাঁধা বালিকা। জোর রিহার্সেল চলেছে।

"মহাসমারোহে স্টেজ সাজানো হোলো। নিতুদা নিলেন স্টেজ সাজাবার ভার। অনেক কারিকুরি করলেন তিনি স্টেজে। মাটি দিয়ে উঠানের খানিকটা অর্ধচন্দ্রাকারে ভরাট করলেন। বটগাছ তো আগেই সাবাড় হয়েছিল, যা ছিল কিছু বাকী এনে পুঁতলেন, বনজঙ্গল বানালেন সেই মাটিতে। স্টেজে সত্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, দোতলার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা চলে গেছে স্টেজের ভিতরে। নানারকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সিন বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। পদ্মবন, সোনার পদ্মফুল পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের মতো পাতলা গজের পর্দা পর পর চার-পাঁচটা স্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথমটা বেশ ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাবে, পরে এক একটা পর্দা উঠে যাবে, ও-পাশ থেকে আস্তে আস্তে আলো ফুটবে আর একটু একটু ক'রে পদ্মবনে সরস্বতী প্রকাশ পাবে।

"অভিনয়ের দিন এল। ··· সিন উঠল। এখন অক্ষয়বাবুর পালা, তিনি কেন জানি না, পাশ থেকে স্টেজে না ঢুকে ও-পাশ দিয়ে ঘুরে মাঝখান দিয়ে ভিতর থেকে 'রী-রে-রে' বলে হাঁক দিয়ে যেই ঠেলে বেরিয়েছেন, নিতুদা অনেক সব দড়িদড়ার কীর্তি করেছিলেন বলেছি, এখন তারই একটা দড়িতে অক্ষয়বাবুর গলা গেল বেঁধে। কিছুতেই আর খোলে না, কেমন যেন আটকে গেছে। যতই মাথা ঝাঁকানি দেন, উঁহু, দড়ি খোলে না। মহা বিপদ, আমি পিছন থেকে আস্তে আস্তে দড়িটা তুলে দিতেই অক্ষয়বাবু এক লাফে স্টেজের সামনে গিয়ে গান ধরলেন—

আঃ বেঁচেছি এখন
শর্মা ও দিকে আর নন,
গোলেমালে ফাঁকতালে সটকেছি কেমন
সা-র সটকেছি কেমন।

'রঘুপতি'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

এই গান গাইতেই, আর তার উপর অক্ষয়বাবুর গলা, চারদিক থেকে হাততালি পড়তে লাগল। প্রথম গানেই একেবারে মাৎ। তারপর বৃষ্টি হোলো স্টেজে, আর সঙ্গে সঙ্গে গান

রিম ঝিম রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরষে --

"পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড়কড় ক'রে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি; দুটো রোলার ছিল, তিনতলা তেতালার ছাদ থেকে সেই রোলার দুটো গড়গড় ক'রে এধার থেকে ওধার গড়াতে লাগলেন। যতদূর রিয়ালিস্টিক করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল।

"এখন দস্যুরা ঢুকবে। আগেই তো বলেছি স্টেজে মাটি ভরাট ক'রে গাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। এখন বৃষ্টিতে সব কাদা হয়ে গেছে। দাদা স্টেজে ঢুকেই তো ধপাস্ ক'রে পা পিছলে পড়ে গেলেন। পড়ে গিয়ে আর উঠলেন না, ওখানেই হাত-পা একটু তুলে বেঁকিয়ে ঐভাবেই পোজ দিয়ে রইলেন। আমরাও আশেপাশে সব যে যার পোজ দিয়ে বসলুম, লুটের জিনিস ভাগ হবে। বিনুকেও সেবার নামিয়েছিলুম। বিনু তখন ছোটো, ওর একটা পোষা ঘোড়া ছিল, রোজ ঘোড়ায় চড়ত। সেই ঘোড়ার পিঠে আমাদের লুটের মাল বোঝাই করে বিনু স্টেজে এল। আমরা সব লুটের ভাগ করলুম, একজন আবার গিয়ে ঘোড়াকে একটু ঘাস-টাসও খাওয়ালে। সে কি অ্যাকটিং যদি দেখতে।

"তার উপর রবিকাকার গান, আর তাঁর তখনকার গলা, যখন গাইতেন,

এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হোলো সব দিক উজলা।

সব লোক একেবারে স্তব্ধ হয়ে যেত।

"লক্ষ্মী সেজে বিবি যখন লাল আলোতে স্টেজে ঢুকত, আহা সে কি যে সুন্দর দেখাত! সরস্বতীর বেলায় থাকত সব সাদা—সাদা সোলার পদ্মফুলের মধ্যে শুভ্র সাজে প্রতিভাদিদি যখন বীণা হাতে বসে থাকতেন প্রথমে সবাই ভেবেছিল মাটির প্রতিমা। সেও যে কী শোভা! অস্ট্রিচের ডিমের খোলা দিয়ে শখ ক'রে একটা ছোট্টো সেতার বানিয়েছিলুম, সেটা রুপোলী রাংতা দিয়ে মুড়ে বীণা তৈরী হয়েছিল। আমার সেই সেতারটি ঐ ক'রেই গেল। তা সেই বীণাটি হাতে নিয়ে প্রতিভাদিদি বসে থাকতেন, শেষটায় উঠে রবিকাকার হাতে বীণা দিয়ে বলতেন,

এই যে আমার বীণা, দিনু তোমারে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

সে-কথা সত্যি সত্যিই ফলল ওঁর জীবনে।"

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র পর 'কালমৃগয়া', তারপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এমন কর্ম আর করব না' অভিনীত হয়েছিল। পরে এই প্রহসনখানির নাম হয়েছিল 'অলীকবাবু'। এর প্রধান পাত্র-পাত্রী ছিল এই—

সত্যসিন্ধু—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অলীকবাবু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিসনি—মহর্ষির কনিষ্ঠা কন্যা বর্ণকুমারী দেবী

১৮৯০ সালে, নাটক বলতে সাধারণ লোকে যা বোঝে, রবীন্দ্রনাথ সেইরকমের এক নাটক লিখলেন—'রাজা ও রানী'। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু দোষত্রুটি দেখেছিলেন; তাই তিনি ওই নাটকের রূপ একেবারে বদলে ফেলে 'তপতী' নাম দিয়ে নতুন নাটক রচনা করেন। কবি যাই বলুন, 'রাজা ও রানী' একখানি প্রথম শ্রেণীর ট্র্যাজেডি। শুধু ওর দুটি দৃশ্য বর্তমান যুগের দর্শকের ভালো লাগে না—মঞ্চে ছিন্ন মুণ্ড আনা আর স্টেজের উপর ইলার মূর্ছা যাওয়া।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের জমিতে বির্‌জিতালাও একটা পুরানো বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ইন্দিরা দেবী লিখছেন—

"বাড়িটা জীর্ণ হলেও তার সঙ্গে আমাদের অনেকের সুখস্মৃতি জড়িত। তারই একতলার চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে প্রথম 'রাজা ও রানী'র অভিনয় হয়। তার পাত্রপাত্রী ছিল এইরকম—

বিক্রম—রবিকাকা
সুমিত্রা—মা
দেবদত্ত—বাবা
নারায়ণী—মৃণালিনী দেবী (রবিকাকার স্ত্রী)

"মা খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন শুনতে পাই। পরদিন বঙ্গবাসী কাগজে 'ঠাকুরবাড়ির নতুন ঠাট' বলে একটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ বেরল। তাতে উক্ত পাত্রপাত্রীর তালিকা এবং পরস্পরের সম্পর্ক পরিষ্কার ক'রে দিয়ে দেওয়া ছিল। বলা বাহুল্য বাবা এসব সমালোচনা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মনে হয় এই অভিনয়ে 'উনি' কুমার এবং প্রতিভাদিদি ইলা সেজেছিলেন।"

বাড়ির ছেলেমেয়েদের তাগাদায় রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের গল্পাংশ নিয়ে তাঁর অমর নাটক 'বিসর্জন' রচনা করলেন। ধর্মের যুক্তিহীন অর্থহীন প্রথার সঙ্গে নিত্যসত্য মানবধর্মের বিরোধ হল 'বিসর্জন' নাটকের মূল কথা। ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওই বাড়িতে 'বিসর্জন'-এর প্রথম অভিনয় হল। এর পর ঠাকুরবাড়িতে কয়েকবার 'বিসর্জন' অভিনীত হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ কখনও হতেন রঘুপতি, কখনও জয়সিংহ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একদিনকার অভিনয়ের কথা স্মরণ করা যাচ্ছে। তখন তাঁর বয়স বাষট্টি বছর, যুবক জয়সিংহ রূপে অবতীর্ণ; আর সেদিন অপর্ণা ছিলেন রাণু অধিকারী, এখনকার লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়। অভিনয় হচ্ছিল অধুনালুপ্ত এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে। জয়সিংহ ও অপর্ণার মধ্যে কথাবার্তা চলেছে, এমন সময় দর্শকের দৃষ্টির অন্তরালে স্টেজের একস্থানে আগুন লাগলো। অপর্ণা পালাতে ব্যস্ত, জয়সিংহ বজ্রমুষ্টিতে তার হাতের কব্‌জি ধরল, আর এমনভাবে তাকে দাঁড় করাল যাতে ওই আগুন তার চোখের সামনে না পড়ে। জয়সিংহ খুবই জানে যে, সে যা বলবে তার প্রত্যুত্তর দেবার শক্তি অপর্ণা হারিয়েছে। ওদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, আর সেই পরিবেশের মধ্যে মঞ্চের উপরে জয়সিংহ অবিরাম গতিতে অবিচলিত কণ্ঠে নাটকের গতি অগ্রসর ক'রে দিচ্ছে। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জয়সিংহের কথা শুনে যাচ্ছে, কথাগুলি মূল নাটকে আছে কিনা সে জ্ঞান তাদের লুপ্ত। পর্দার পাশে প্রম্‌টার বই ফেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ছয়-সাত মিনিট এইরকম চলল। শেষে দমকল এসে যখন আগুনকে আয়ত্তের মধ্যে আনল তখন অপর্ণার হাত ধরে জয়সিংহ মঞ্চ হতে নিষ্ক্রান্ত হল। [ক্রমশঃ]

ব্রাহ্মণ সেবধি

(ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ)

॥ শিবপ্রসাদ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত [?] ॥

সংখ্যা ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ খৃঃ

জগদীশ্বরায় নমঃ।

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয় দ্বিতীয় এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রিষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের অধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্ব্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্ম্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্ব্ব প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের স্বভাবসিদ্ধ প্রায় এই যে যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম্ম যদ্যপিও হাস্যাস্পদস্বরূপ হয় তথাপি ঐ দুর্ব্বল দেশীয়ের ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস ও তুচ্ছতা করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে যখন মোছলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এইরূপ নানাবিধ ধর্ম্মগ্লানি করিলেক চেঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর প্রায় ছিল তথাপি এদেশীয়দের ঈশ্বর নিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার করা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও উপহাস করিত। মগেরা যাহাদের প্রায় কোনো ধর্ম্ম ছিল না তাহারাও যখন বাঙ্গালার পূর্ব্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্ব্বদা হিন্দুর ধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব্বকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা অতি-নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানাবিধ অসৎ কর্ম্মে বিরত ছিল তাহারাও আপন প্রজা ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদির ধর্ম্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব এদেশে অধিকারপ্রাপ্ত ইংরেজ মিসনরিরা এরূপ

ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস যাহা করেন তাহা অসম্ভাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না ইহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্য দেশ আক্রমণকর্ত্তাদের ন্যায় ধর্মঘটিত উপদ্রব করিলে তাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমার ত্রুটি আছে যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা অথবা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না তবে বিচারবলে হিন্দুর ধর্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্মের উৎকৃষ্টত্ব ইহা স্থাপন করেন সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম গ্রহণ করিবেক অথবা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্র গৃহে নিবাস ও শাকাদি ভোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিকা দেখিয়া তুচ্ছ করিয়া বিচার হইতে যেন নিবৃত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে। সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তিসিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল পরে পরে উত্তরের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান যাইবেক ইতি।

আঠার শও একুশের ১৪ জুলাইয়ের লিখিত পত্র যাহা পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে।

সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমার নিবেদন এই বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা নগরে নানাজাতীয় ভাষা ও শাস্ত্র ও গ্রন্থ একত্র আছেন শাস্ত্রার্থের সন্দেহচ্ছেদস্থলে এরূপ অবসর প্রায় নাই তন্নিমিত্ত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাবলোকনপূর্ব্বক সমুদায়ের সদুত্তর যদি সমাচার দর্পণদ্বারা দেন তবে আমার আনন্দ এবং জনপদের অধিক উপকার সম্ভাবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাব ইতি।

প্রথম। হিন্দুরদের বেদান্ত শাস্ত্রদৃষ্টে বোধ হয় যে আত্মা এক নিত্য কালত্রয়রহিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্যস্বরূপ বিভু নিরাময় অন্তর্ব্বহিঃপূর্ণ তদ্ভিন্ন দৃশ্য জীব পদার্থ পৃথক নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশ্য হয় শুদ্ধ মায়াঘটিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমত রজ্জুতে সর্পভ্রম ও মরীচিতে গন্ধর্ব্বনগরী দর্শন তদ্রূপ জগৎ ও জীবাভিমান মিথ্যা কেবল অজ্ঞানবশতো অহং ও জগৎ সত্যতায় জীবাভিমানে বোধ হইতেছে যদি এই মতের গৌরব মানি তবে আত্মাতে দোষ স্পর্শে অথবা আত্মা ও মায়ায় এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেকে উভয়ের নিত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়ত এক আত্মা হইলে জীবের কর্ম্ম জন্য হিতাহিত ভোগ নানা আশ্চর্য্য হয়। তৃতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখণ্ডত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন যেমত জলের বিন্দু উঠিয়া পুনর্ব্বার ঐ জলে লীন হয় তেমতি আত্মাতে এই জগৎ উৎপত্তি স্থিতি লয় বারবার হইতেছে মায়ার বল এ গতিকে আত্মার পর মানিলে আত্মা নির্দ্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন। শ্রুতি কহেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ। এ প্রমাণে জীবের সদসদ্ভোগ কেন মানি ইতি।

দ্বিতীয়তো ন্যায় শাস্ত্র কহেন যে পরমাত্মা এক ও জীব নানা উভয়েই অবিনাশী এবং দিগ্‌দেশ কালাকাশ অণু এ সকল নিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জগদীশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকারে তাঁহাকে কর্ত্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদাতৃত্ব-জন্যেচ্ছারহিত কহেন এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যাঘাত হয় কেন না তেঁহ কুলালাদির ন্যায় দ্রব্যসংযোগে কারকত্বে প্রতিপাদ্য হন উপরের বিধানে বোধ হয় ঐ দ্রব্যাদি ও জীবের বাচকত্ব তাহাতে অভাবের বিশেষতো জন্যেচ্ছারাহিত্যে নানা দেহাদির উৎপত্তি স্থিতি নাশ ও জীবের কর্ম্মফলদাতৃত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন বিশেষতঃ কর্ত্তা ও জীব উভয়রূপেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি যেমন অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ ও অল্পৈশ্বর্য্যবান্ মধ্যে ন্যূনাতিরেক তদ্বৎ কর্ত্তা ও জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতিব্যাঘাত।

তৃতীয়তো মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন সংস্কৃত শব্দে রচিত যে মন্ত্র সেই মন্ত্রাত্মক যাগাদি নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্য্যরূপী ফল বর্ত্তে সে ঈশ্বর মনুষ্য জীব মধ্যে নানাবিধ ভাষা এই জগতে ও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ আছে দ্রব্য ও ভাষা উভয়েই জড় মনুষ্যের অধীন এ গতিকে যে কর্ম্মের কর্ত্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি সেই কর্ম্মের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার করি বিশেষত ঈশ্বর কর্ম্মরূপী এক ঐ শাস্ত্র এই কহেন নানা কর্ম্মরূপী ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রতীত হয় অধিকন্তু এ প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই সে দেশকে অনীশ্বরীয় কেন না কহা যায়। পাতঞ্জল শাস্ত্রের মতে যজ্ঞ যোগসাধনরূপী কর্ম্ম করিয়াছেন তৎপ্রযুক্ত উপরের বিধান দৃষ্টে এক প্রশ্ন দৃষ্ট করিলাম।

চতুর্থ। সাংখ্য মতে প্রকৃতি উভয় মিলিত চনকদলের ন্যায় পুরুষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী ব্রহ্ম কহেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পাদন কেমনে সম্ভব হয় এ মতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি।

ইহার শেষ লিপিকে দুইয়ের সংখ্যায় দেখা যাইবেক।

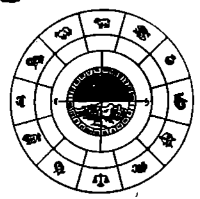

গ্রহ-বিচিত্রা

['বিশ্ব বিদ্যার পত্রিকা'র
গণিত-জ্যোতিষ বিভাগ হইতে গৃহীত]

জ্যোতিষশর্মা

॥ ফাল্গুন মাসের রাশিফল ॥

মেষ

মাসটি ভালো চলবে। কর্মোন্নতিতে বিভাগ-পরিবর্তনের যোগ আছে। কর্মোপলক্ষে ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। পিতার উন্নতি সম্ভব। পিতার এবং নিজের আর্থিক উন্নতি হবে। সন্তানের স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো থাকবে না। গৃহে পুণ্য-উৎসবের যোগ আছে। অগ্রজের আকস্মিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। গৃহাদি লাভের সুযোগ হবে। বিবাহ-বিষয়ে মাসটিতে কোনো গ্রহদোষ নাই। ছাত্র-ছাত্রীগণের পরীক্ষা-বিষয়ে শুভ সূচনা করে।

নক্ষত্রফল—অশ্বিনী, ভরণী-যুক্ত মেষের মানসিক শান্তি ও আর্থিক উন্নতি হবে। কৃত্তিকায়—বন্ধু দ্বারা ভাগ্যোন্নতি এবং কর্মোন্নতির যোগ আছে।

বৃষ

মাসটি ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে। কর্মস্থলে অশান্তির মধ্য থেকে সাফল্য লাভ হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভ্রমণের যোগ আছে। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির রোগ-ভোগ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে। আর্থিক অবস্থা একপ্রকার ভালো চলবে। পারিবারিক শান্তি মোটামুটি থাকবে। সন্তানের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে। ছাত্র-ছাত্রীগণের পরীক্ষা-বিষয়ে কতকটা অশান্তি দিবে। অশান্তির মধ্য থেকে বিত্তীয় উন্নতির যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—কৃত্তিকা-বৃষের বন্ধু দ্বারা অশান্তি লাভ, মাতার রোগভোগ সম্ভব। রোহিণীর—রোগভোগ হবে; ভ্রমণের যোগ আছে। মৃগশিরায়—স্বাস্থ্যভঙ্গ, এবং পিতার অশান্তি থাকবে।

মিথুন

মাসটি গতমাসের তুলনায় ভালো চলবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কাজকর্ম বাধার মধ্য থেকে চলবে। কর্মোন্নতির প্রভাব সৃষ্টি ক'রে, তারপর বাধা সৃষ্টি হবে। মাতা এবং বন্ধু দ্বারা অশান্তি বৃদ্ধি হবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক চলবে। বিবাহ-বিষয়ে এ-মাসে কোনো গ্রহবাধা নাই। ছাত্র-ছাত্রীগণের পরীক্ষা-বিষয়ে শুভ হবে।

নক্ষত্রফল—মৃগশিরায়—স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না; কাজে বাধা সৃষ্টি হবে। আর্দ্রার—নিজের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না; কর্মস্থল ভালো চলবে। পুনর্বসুর—ভালো চলবে; কর্মস্থলে উন্নতির যোগ আছে।

কর্কট

মাসটি ভালো-মন্দ মিশ্রভাবে চলবে। স্ত্রীর এবং নিজের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। শত্রুবৃদ্ধি হ'বে, পরে শত্রুগণ পরাজিত হবে। এইসময় যেমন শত্রুবৃদ্ধি হবে, তেমনি শত্রু নির্মূলও হবে। এই মাসে বিবাহ-

যোগ্য-যোগ্যাগণের আকস্মিক বিবাহের যোগ আছে। কর্মস্থল ভালো চলবে। কর্মোপলক্ষে ভ্রমণ অথবা কর্মের বিভাগ-পরিবর্তন সম্ভব। আর্থিক উন্নতি হবে। ভ্রাতা দ্বারা অশান্তিলাভের যোগ আছে। পিতার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।

নক্ষত্রফল—পুনর্বসু—শত্রুহানি হবে; সস্ত্রীক ভ্রমণের যোগ আছে; কর্মস্থল ভালো চলবে। পুষ্যায়—স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এগিয়ে গিয়ে, প্রতারিত হবার যোগ আছে।

সিংহ

গতমাসের তুলনায় এ-মাসটি ভালো চলবে। সন্তানের উন্নতি হবে। নিজের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। আর্থিক অবস্থার সাধারণ উন্নতি হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। বিরুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হ'য়ে, কাজের বাধা সৃষ্টি করবে। নিজের বুদ্ধির বলিষ্ঠ প্রভাব দ্বারা, বাধার মধ্য থেকেও, কর্মসাফল্য লাভ হবে। বিবাহ-বিষয়ে নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি হবে। কর্মোপলক্ষে ভ্রমণের যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—মঘা-সিংহের আর্থিক কষ্ট থাকবে; কিন্তু পুত্রের কর্মোন্নতি হবে। পূর্বফল্গুনীর—বন্ধু দ্বারা কর্মপ্রাপ্তি, ভূসম্পত্তি লাভের যোগ আছে। উত্তরফল্গুনীর—স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না; আর্থিক অভাবে দুশ্চিন্তা থাকবে।

কন্যা

মাসটি ভালো চলবে। পারিবারিক শান্তি থাকবে। দেশভ্রমণের যোগ আছে। সন্তানের উন্নতি হবে। বিবাহ-বিষয়ে এ-মাসে বাধা থাকবে। পিতার উন্নতি হবে। পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভ হবে। কর্মোন্নতির যোগ আছে। শত্রুহানি হ'য়ে, কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হবে। গৃহাদি নির্মাণের পক্ষে মাসটি শুভ। বন্ধুর প্রভাবে উন্নতির যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—উত্তরফল্গুনীর পক্ষে মাসটিতে মানসিক উদ্বেগ থাকবে; স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। হস্তা ও চিত্রার—মাতার রোগভোগ, বন্ধু দ্বারা ক্ষতি হবে; কর্মস্থলে উন্নতির যোগ আছে।

তুলা

মাসটি স্বাভাবিক চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পারিবারিক শান্তি থাকবে। ভূসম্পত্তি থেকে অর্থাগমের যোগ আছে। ভ্রাতার উন্নতি হবে। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। স্ত্রীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। কর্মস্থ ভালো চলবে। বিবাহ-যোগ্য-যোগ্যাগণের এ-মাসে বিবাহ বিষয়ে কোনো গ্রহদোষে বাধা নাই। গৃহনির্মাণ প্রভৃতি কাজে বাধা থাকবে না, বরং দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে চলবে। বিদ্যার্থীর বিদ্যায় উন্নতির যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—চিত্রা-তুলার ভ্রাতার অশান্তি, বন্ধুবা থেকে শান্তি লাভ হবে; শত্রু দ্বারা উদ্বেগ সৃষ্টি হবে স্বাতীর—মাতা এবং মাতৃস্থানীয়া হ'তে অশান্তি থাকবে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হবে; কর্মস্থল স্বাভাবিক চলবে বিশাখায়—শুভ চলবে; স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কর্মস্থ ভালো চলবে।

বৃশ্চিক

মাসটি ভালো চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে কর্মোৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক উন্নতি হবে। ভ্রাতা উন্নতি হবে। মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে। বন্ধুর সাথে কল হবে। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো চলবে না। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালে থাকবে। বিবাহ-বিষয়ে কোনো গ্রহদোষে বাধা নাই বিদ্যার্থীর বিদ্যায় উন্নতি হবে। কর্মস্থল ভালো চলবে পিতার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। গৃহাদি নির্মাণ-কা কতকটা বাধা থাকবে।

নক্ষত্রফল—বিশাখায়—আর্থিক উন্নতি হবে অনুরাধায়—বন্ধু দ্বারা আর্থিক অশান্তি সৃষ্টি হবে। পিতা আকস্মিক রোগ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে। জ্যেষ্ঠার—আর্থিক উন্নতি, ভ্রাতার উন্নতি, দেশভ্রমণ হবে; মাতা স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং পারিবারিক অশান্তি থাকবে।

ধনু

মাসটি ভালো চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থি উন্নতি হবে। ভ্রাতা দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে। কর্মোন্নতি যোগ আছে। পিতার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। স্ত্রী স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে। সন্তানের উন্নতি হবে বিদ্যার্থীর বিদ্যায় উন্নতি হবে। গৃহাদি নির্মাণ-কার্যে বাধ থাকবে না; কাজ সহজে সমাধান হবার যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—মূলায়—আর্থিক ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি হ'য়ে, প ভালো হবে। মাতার মৃত্যুতুল্য পীড়াভোগ হবে পূর্বাষাঢ়ার—আর্থিক ও মানসিক অবস্থা ভালো চলবে আকস্মিক কর্মলাভের যোগ আছে। উত্তরাষাঢ়ার—দেশভ্রমণ হবে; ভ্রাতার দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে; স্বা ভালো থাকবে।

মকর

মাসটি বিশেষ ভালো চলবে না। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে। প্রবল দ্বারা অর্থব্যয়, এবং অযথা অর্থহানি সম্ভব। কর্মস্থলে বাধা সৃষ্টি হবে। স্ত্রীলোকের প্রভাব দ্বারা অবনতির যোগ আছে। নানাপ্রকার লোভনীয় প্রভাব জীবনের উপরে এসে অশান্তি-সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মস্থল স্বাভাবিক চলবে। সন্তানদের অবস্থা ভালো থাকবে। পিতামাতার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে। বিদ্যার্থীর নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি হবে।

ন ক্ষ ত্র ফ ল—উত্তরাষাঢ়ায়—স্ত্রীলোকের প্রভাব দ্বারা অর্থব্যয়ের প্রভাব-সৃষ্টি সম্ভব; কর্মস্থল ভালো চলবে। শ্রবণায়—বন্ধু দ্বারা অর্থক্ষতি, কর্মস্থলে অশান্তির মধ্য থেকে সাধারণ উন্নতি সম্ভব। ধনিষ্ঠায়—আত্মীয়ের সহিত কলহ; কাজকর্মে অশান্তি থাকবে।

কুম্ভ

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। রোগভোগে অর্থব্যয় হবে। অর্থ-উপার্জন গতমাসের তুলনায় অধিক হবে। কর্মোন্নতির যোগ আছে। অগ্রজের উন্নতি হবে। সকল কাজে সাফল্য লাভ হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সন্তানের উন্নতি হবে। গৃহে পুত্রকন্যার বিবাহ-উৎসবের যোগ আছে। পারিবারিক শান্তি থাকবে।

ন ক্ষ ত্র ফ ল—ধনিষ্ঠা-জাতকের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না; অযথা অর্থব্যয় হবে। শতভিষায়—স্ত্রীর দ্বারা মানসি অশান্তি লাভ, অন্যদিকে কর্মসাফল্য দ্বারা আনন্দ লা হবে। পূর্বভাদ্রপদের—যেমন অর্থ উপায় হবে, তেমনি অযথা অর্থব্যয় হবে।

মীন

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাক না। সন্তানের উন্নতি হবে। নিজের কর্মস্থানে ক্ষমত বৃদ্ধি হবে; কর্মোন্নতির যোগ আছে। আর্থিক উন্নি হবে। আকস্মিক অর্থলাভের যোগ আছে। পিতা উন্নতি হবে। বিদ্যার্থীর বিদ্যার উন্নতি হবে। পারিবারি জীবন স্বাভাবিক চলবে।

ন ক্ষ ত্র ফ ল—পূর্বভাদ্রপদের—নিজের ভুল-ভ্রান্তির জ কলহ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে। উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী—শুভ চলবে; আর্থিক উন্নতি ও কর্মে সাফল্য লাভ হবে

দ্রষ্টব্য: রাশিফল সাধারণভাবে বর্ণিত হ'ল। ব্যক্তির জন্মকালের এ গ্রহাদির এবং দশার উপর নির্ভর ক'রে এই ফল বিচার্য।

মাঘ মাস, ১৩৬৬ সাল [জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০]

বাং তারিখ	ইং তারিখ	চান্দ্রিক তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিধি
১	১৫	২৫	শুক্র	প্রতিপদ	পুষ্যা	নিষেধ	
২	১৬	২৬	শনি	দ্বিতীয়া	অশ্লেষা	নিষেধ	
৩	১৭	২৭	রবি	তৃতীয়া	মঘা	নিষেধ	
৪	১৮	২৮	সোম	চতুর্থী	পূর্বফল্গুনী	শুভ	
৫	১৯	২৯	মঙ্গল	পঞ্চমী	উত্তরফল্গুনী	নিষেধ	
৬	২০	৩০	বুধ	ষষ্ঠী	হস্তা	শুভ, দ. ১।৫৮ গতে নিষেধ	বিবাহ
৭	২১	১	বৃহস্পতি	সপ্তমী	চিত্রা	মধ্যম	বিবাহ
৮	২২	২	শুক্র	অষ্টমী	স্বাতী	নিষেধ	ত্র্যহস্পর্শ
৯	২৩	৩	শনি	নবমী	বিশাখা	নিষেধ, রাত্র দ. ৩।২৭ গতে শুভ	বিবাহ
১০	২৪	৪	রবি	একাদশী	অনুরাধা	নিষেধ	একাদশীর উপবাস

[পরপৃষ্ঠায় অবশিষ্টাংশ]

মাঘ মাস, ১৩৬৬ সন [জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০]

[পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ]

বাং তারিখ	ইং তারিখ	জাতীয় তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১১	২৫	৫	সোম	দ্বাদশী	জ্যেষ্ঠা	নিষেধ	
১২	২৬	৬	মঙ্গল	ত্রয়োদশী	মূলা	শুভ, সন্ধ্যা ঘ. ৬।৩ গতে নিষেধ	রটন্তী কালিকাপূজা
১৩	২৭	৭	বুধ	চতুর্দশী	পূর্বাষাঢ়া	নিষেধ	রটন্তী চতুর্দশীস্নান, নিশিপালন
১৪	২৮	৮	বৃহস্পতি	অমাবস্যা	শ্রবণা	নিষেধ	অমাবস্যার উপবাস
১৫	২৯	৯	শুক্র	প্রতিপদ	ধনিষ্ঠা	নিষেধ	বিবাহ
১৬	৩০		শনি	দ্বিতীয়া	শতভিষা	নিষেধ	ত্র্যহস্পর্শ
১৭	৩১	১১	রবি	চতুর্থী	পূর্বভাদ্রপদ	নিষেধ	গণেশপূজা
১৮	১	১২	সোম	পঞ্চমী	উত্তরভাদ্রপদ	শুভ	সরস্বতীপূজা, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন
১৯	২	১৩	মঙ্গল	ষষ্ঠী	রেবতী	শুভ, রাত্র ঘ. ১।৪৮ গতে নিষেধ	শীতলাষষ্ঠী
২০	৩	১৪	বুধ	সপ্তমী	অশ্বিনী	নিষেধ	বিবাহ, বিধানসপ্তমী, মাকরী-সপ্তমী
২১	৪	১৫	বৃহস্পতি	সপ্তমী	ভরণী	নিষেধ	ভীষ্মাষ্টমী
২২	৫	১৬	শুক্র	অষ্টমী	কৃত্তিকা	নিষেধ	মহানন্দাস্নান
২৩	৬	১৭	শনি	নবমী	কৃত্তিকা	নিষেধ	বিবাহ
২৪	৭	১৮	রবি	দশমী	রোহিণী	শুভ	
২৫	৮	১৯	সোম	একাদশী	মৃগশিরা	শুভ, ঘ. ৩।৩ গতে নিষেধ	একাদশীর উপবাস
২৬	৯	২০	মঙ্গল	দ্বাদশী	আর্দ্রা	নিষেধ	বরাহদ্বাদশী
২৭	১০	২১	বুধ	ত্রয়োদশী	পুনর্বসু	রাত্র ঘ. ৮।৩ গতে ৮।৩৪ মধ্যে শুভ	অন্নপ্রাশন
২৮	১১	২২	বৃহস্পতি	চতুর্দশী	পুষ্যা	নিষেধ	পূর্ণিমার নিশিপালন
২৯	১২	২৩	শুক্র	পূর্ণিমা	অশ্লেষা	নিষেধ	পূর্ণিমার উপবাস, কলিযুগাদ্যাস্নান
৩০	১৩	২৪	শনি	প্রতিপদ	মঘা	নিষেধ	সংক্রান্তি

[illegible] এই সূত্রে যে, পঞ্জিকা কেবলমাত্র আমাদের বর্ষবর্তের মাস ও দিন নির্দেশক পুস্তক নয়, পরন্তু উহা আমাদের সমগ্র জীবনের কর্মনির্দেশক পুস্তক বটে। পঞ্জিকা নামক পুস্তকখানিতে সৌর, জ্যোতিষিক ও বৈদিক সকলপ্রকার বিষয় দেওয়া থাকে। অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য ছাড়া পঞ্জিকা-গণনা হয় না। আকাশের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান যথাযথ নিরূপণপূর্বক পঞ্জিকা গণনা করাই বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি। সুতরাং আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সহিত পঞ্জিকা-গণনার সম্পূর্ণ সমতা সাধন করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র আমাদের বর্ষবর্তের জন্যই যে পঞ্জিকার প্রয়োজন তাহা নহে; অকূল সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার জন্য নাবিকদিগের একান্ত আবশ্যক নৌ-পঞ্জিকা। বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, জোয়ার-ভাঁটা, [illegible] উত্থান-পতন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনার পূর্বাভাস পঞ্জিকাগণিত [illegible] ও তিথি নক্ষত্র হইতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র আমাদের ভারতে নয়, পৃথিবীর সকল সভ্যদেশসমূহের পঞ্জিকা আছে এবং তাহাদের জ্যোতিষিক গণনা একই মূল উপাদান হইতে, এবং তাহাদের গণনা-পদ্ধতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে দশ-বিশ প্রকারের তিথি-সম্বলিত পঞ্জিকা প্রচলিত আছে। ভারতে এই অবৈজ্ঞানিক হাস্যকর পরিস্থিতি দূরীভূত করিবার [illegible] বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার উদ্ভব হইয়াছিল। সম্প্রতি ভারত-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্জিকার তিথি-নক্ষত্র এই পঞ্জীর অনুরূপ। সুতরাং বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের সারণী সরকারী স্বীকৃতি লাভ করিল। বসুধারার সকল পাঠকবর্গ নববর্ষ হইতে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে সর্বকর্ম নির্বাহ করিবেন, এ আশা আমাদের আছে।

নাট্যমহল

মঞ্চলোক

গত ২২শে জানুয়ারি শুক্রবার, স্টার থিয়েটারে মনোজ বসু রচিত এবং দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাট্যরূপায়িত 'ডাকবাংলো' নাটকের দ্বিশততম অভিনয়ের স্মারক-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

•

রহস্যঘন নাটক 'এক পেয়ালা কফি' রঙমহলে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে।

•

মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত কয়লাখনির পটভূমিকায় রচিত 'অঙ্গার' প্রভৃতি বৈচিত্র্য এনেছে নাট্যামোদী দর্শকদের চোখে।

•

সাধনা রায়চৌধুরী

ডাকবাংলো নাটকে

গীতা দে

জ্ঞান লাহা

বিশ্বরূপার পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'সেতু শততম অভিনয়-রজনী সমা আঙ্গিক সৌকর্যে এবং অভিন কুশলতায় 'সেতু' দর্শক-মন করেছে।

—

চিত্রলোক

'মায়ামৃগ'

এমকেজি প্রোডাকশনের নিবেদন। পরিচালনা : চিত্ত বসু। কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। চিত্রগ্রহণ : সুহৃদ ঘোষ। সম্পাদনা : রবীন দাস। প্রধান চরিত্রে : সুনন্দা দেবী, সন্ধ্যারাণী, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ।

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত বিরচিত সফলকাম নাটক 'মায়ামৃগ' রূপালী পর্দায় সমবেত শিল্পীদের অপূর্ব অভিনয়-দক্ষতায় এবং সংবেদনশীল চরিত্র-চিত্রণে একটি রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি।

ব্যারিস্টার অমিয়নাথ মুখার্জী এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীর সুখের সংসারে একমাত্র সন্তান শুভ্র। ছোট্ট সংসারটির আশেপাশে আছে পরহিতব্রতী সাবিত্রীর আশ্রিত একদল নিরুপায় মানুষ। তাদের মধ্যে প্রধান হলো—ভবঘুরে জুয়াড়ী মহেন্দ্র এবং কলেজে-পড়া মেয়ে নিরুপমা।

একদিন সাবিত্রীর সংসারে একখানি চিঠি বহন ক'রে নিয়ে এলো নিদারুণ উৎকণ্ঠা। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে একাকিনী সাবিত্রী পড়তে থাকে সেই পত্র। শুভ্রর কথা ভেবে চমকে ওঠে সে।

বাইশ বছর আগের একটি দিনে ফিরে যায় তার মন। সেদিন নিঃসন্তান সাবিত্রীর মনে বেদনা ছিল নিষ্ফল মাতৃত্বের। সাবিত্রী একদিন স্বামীর সঙ্গে ছোটবোন গীতার কাছে যায়। তাদের সংসার ছেড়ে আদর্শবাদী যুবক বিভূতির হাত ধরে গীতা চলে এসেছিল। সাবিত্রী আর অমিয়নাথ দেখেন আদর্শবাদী বিভূতি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত। সংসারে অভাবের ছায়া। গীতার কোলে তখন দু'বছরের শুভ্র, এবং আরও একটি সন্তানের আগমন আসন্ন। দুর্বলতার বশে গীতার কাছে সাবিত্রী শুভ্রকে ভিক্ষা চায়। তাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করবারও প্রতিশ্রুতি দেয়। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় গীতার মনে দিদির ওপর ঘৃণা জমে ওঠে। শুভ্রকে সে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়। সাবিত্রী আর অমিয়নাথ ফিরে আসেন।

তারপর ঘটনাচক্রে গীতা একদিন শুভ্রকে কোলে নিয়ে দিদির কাছে এসে হাজির হয়। মিথ্যা-মামলায় জড়িত বিভূতিকে বাঁচাতে গেলে টাকার প্রয়োজন। কিন্তু সাবিত্রী টাকা দিতে সম্মত হলেও, শুধু-হাতে টাকা ভিক্ষা নিতে গীতার আত্মসম্মানে বাধে। শুভ্রকে দান ক'রে, তার বিনিময়ে সে টাকা নিয়ে যায়। ভবিষ্যতে কোনোদিন তাকে নিজের সন্তান বলে দাবি করবে না, ভগবানের নামে এই শপথ ক'রে গীতা চলে যায়। সেদিন থেকে সম্পর্কের সূত্র ধরে আর কোনো সংবাদ আদান-প্রদান হয়নি দু'বোনের মাঝে।

বাইশ বছর পরে একখানি ছোট্ট চিঠিতে সংবাদ জানিয়ে গীতা কলকাতায় এলো। উপযুক্ত একটি ছেলেকে সে হারিয়েছে এবং একটা দুর্ঘটনায় বিভূতি তখন পঙ্গু। সাবিত্রীর নির্দেশে অমিয়নাথ তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন, পাছে শুভ্র তার পিতৃপরিচয় জানতে পারে। ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গীতার মনটাও শুভ্রকে দেখবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। দৈবদুর্বিপাকে একদিন শুভ্রর মোটরের ধাক্কায় বিভূতি আহত হয়। কথাবার্তায় গীতা ও বিভূতি জানতে পারে শুভ্রকে তাদেরই ছেলে ব'লে। কিন্তু শুভ্রর কাছে সে-কথা অজ্ঞাতই রয়ে যায়। শুভ্রর মুখ থেকে এই দুর্ঘটনার কথা জানতে পেরে সাবিত্রীর মনে জাগে দারুণ উৎকণ্ঠা। শুভ্রকে হারাবার ভয়ে তার মন হয় চঞ্চল; গীতা ও বিভূতিকে সকাতর মিনতি জানায় তার সংসারে যাতে আগুন না জ্বলে।

সে-কথা শুনে অসুস্থ বিভূতি গীতার হাত ধরে পথে নামে। এতখানি অবশ্য আশা করেনি সাবিত্রী। কপর্দকশূন্য অসুস্থ বিভূতির কথা চিন্তা করে সে। অতঃপর তার পরামর্শে মহেন্দ্র যায় বিভূতির সন্ধানে এবং পথে তাদের দেখা পেয়ে সোজা সাবিত্রীর বাড়িতে নিয়ে আসে। সেখানেই বাইরের মহলে ওদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বিভূতির অসুখে শুভ্রর সেবা ও যত্নটা সাবিত্রীর চোখকে পীড়া দেয়। কিছুতেই সে শুভ্রকে নিরস্ত করতে পারেনা। আর পারেনা শুভ্রর সঙ্গে নিরুপমার কোনো মধুর সম্পর্ক সহ্য করতে, যে-সম্পর্কটা এ-কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। উপায়ান্তর না দেখে সাবিত্রী শুভ্রকে নিজের বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু যাবার দিন আনমনা শুভ্র হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে শয্যাশায়ী হয়। শুভ্রর ঘরে গীতাকে প্রবেশের অধিকার দেয়না সাবিত্রী।

একদিন গভীর রাতে গীতা লুকিয়ে ওপরে ওঠে এবং তাই দেখে সাবিত্রী তাকে যারপরনাই অপমান করে। গীতা প্রতিশ্রুত হয়, শুভ্রকে সুস্থ দেখে, সে বিভূতিকে নিয়ে চিরদিনের জন্য এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

অতঃপর শুভ্র ও নিরুপমার ওপর সাবিত্রীর অত্যাচারের প্রতিবাদে অসুস্থ বিভূতি একদিন এগিয়ে যায়, এবং সেই উত্তেজনার মুহূর্তে তার মৃত্যু হয়।

সীতা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সঙ্গে যায় নিরুপমা। এতদিনে শুভ্র খানিকটা আন্দাজ করতে পারে, কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে, একটা যেন অসঙ্গতি আছে কোথাও। মহেন্দ্রর নির্দেশে এক বিরাট জিজ্ঞাসা নিয়ে সে ওপরে ছুটে যায়। অমিয়নাথের কাছে শোনে তার পিতৃমাতৃ-পরিচয়। ঝড়ের বেগে তখন সে ছুটতে থাকে সীতার কাছে—তার মায়ের কাছে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে শুভ্রকে আলিঙ্গন করে সীতা। সাথে সঙ্গে এসে পড়েন অমিয়নাথ ও সাবিত্রী। সব গর্ব বিসর্জন দিয়ে সাবিত্রী এসে দাঁড়িয়েছে সীতার পাশে! মাঝখানে শুভ্র।

কাহিনীর সমাপ্তি এইখানে।

শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির নিখুঁত চিত্রণ 'মায়ামৃগ' ছবির বৈশিষ্ট্য। সাবিত্রীর ভূমিকায় সুনন্দা দেবীর অভিনয় ইদানিংকালের এক স্মরণীয় সৃষ্টি। একদিকে বাৎসল্যে সাবিত্রী যেমন কোমলপ্রাণা, অন্যদিকে শুভ্রকে হারাবার আশঙ্কায় তেমনি কঠোরহৃদয়া। সীতা চরিত্রে সংবেদনশীল অভিনয়ে, আবেগমথিত অনুভূতিতে সন্ধ্যারাণী অপূর্ব। শক্তিমান বিকাশ রায় এক ভিন্নতর চরিত্রে দর্শকমনে রেখাপাত করেছেন। তেজস্বী, আত্মাভিমানী, আদর্শবাদী দরিদ্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি বিভূতি-রূপী বিকাশ রায়। ব্যারিস্টার অমিয়নাথ-রূপে ছবি বিশ্বাসকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারা যায় না। মহেন্দ্রর টাইপ-চরিত্রে উত্তমকুমার অপূর্ব অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক প্রণয়-ভীরুর মন্দ নয়, এবং নতুন নায়ক বিশ্বজিৎ আশা করি বাংলা ছবির নায়কের অভাব পূরণ করবেন। সংযত অনুশীলনে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায় অভিনীত রসাত্মক চরিত্রগুলি সু-অভিনীত হ'লেও, চিত্রনাট্যের দোষে জায়গায় জায়গায় পীড়াদায়ক।

'দুই বেচারা'য় কালী ব্যানার্জী ও অনুপ

দুই বেচারা'য় সন্ধ্যা রায়.

'মায়ামৃগ' ছবির চিত্রনাট্য সব জায়গায় গতি ঠিক রাখতে পারেনি। সাবিত্রীর বাইশবছর আগে ফিরে যাওয়ার ফ্ল্যাশ-ব্যাকের দৃশ্যটি ভিন্নতর আঙ্গিকে উন্নততর কলাকৌশলে গৃহীত হলে হৃদয়গ্রাহী হতো। তা ছাড়া সময়ের ব্যবধান অনুপাতে মেক-আপেও কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। ছবির সঙ্গীতাংশ ভালো, কিন্তু আবহসঙ্গীত শেষের দিকে ছবির গতির সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি। সেইজন্যে স্থানে স্থানে ছবির গতি মন্থর হয়ে গেছে। আলোকচিত্র-গ্রহণ ও সম্পাদনা মোটামুটি ভালো।

—

'দুই বেচারা'য় অনিল চা

মালা প্রোডাকশনের 'দুই বেচারা' বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষায়। দুইটি শিক্ষিত ও সৎ তরুণের বেঁচে থাকার প্রয়াসকে কেন্দ্র ক'রে 'দুই বেচারা'র হাস্যরসাত্মক কাহিনী রচিত। এই চিত্রের প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন—কালী ব্যানার্জী, অনুপকুমার, বাসবী নন্দী, সন্ধ্যা রায়, কমল মিত্র, জহর রায়, অনিল চ্যাটার্জী, তুলসী চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী এবং নৃপতি চ্যাটার্জী। দিলীপ বসু পরিচালিত 'দুই বেচারা'র চিত্রগ্রহণ করেছেন বিভূতি চক্রবর্তী। সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্বে আছেন ডাঃ ভূপেন হাজারিকা। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন জনপ্রিয় শিল্পী মান্না দে, গীতা দত্ত এবং ডাঃ হাজারিকা স্বয়ং। নৃত্য-পরিচালনা করেছেন গোপীকৃষ্ণ। সম্পাদনায় আছেন অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী।

ইউ. বি. ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের 'মনে মনে' দ্রুত প্রস্তুতির পথে। 'মনে মনে'র কাহিনীকার ও পরিচালক

উমাপ্রসাদ মৈত্র। তপন বাগচী এই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী, এবং সুর সংযোজনা করেছেন অনল চট্টোপাধ্যায়। কাশ্মীরের মনোরম পরিবেশে একটি অভিযাত্রী-দলের কাহিনী 'মনে মনে'র বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন—আলোক চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, তরুণ চক্রবর্তী, সন্ধ্যা রায়, রত্না ব্যানার্জী, সুজাতা মুখার্জী, মণি শ্রীমানি, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

কয়েকজন কলাকুশলীদের নিয়ে নবগঠিত প্রতিষ্ঠান 'চিত্রায়ণী'র প্রথম প্রচেষ্টা একটি শিশুচিত্রের মাধ্যমে। ছবিটির নাম 'মায়ের গলার হার'। কাহিনী এই ছবিরই অন্যতম পরিচালক বিশ্বনাথ দে-র রচনা। দীনেন গুপ্ত-র চিত্রগ্রহণে এই ছবির প্রধান ভূমিকা-লিপিতে যাঁদের নাম ঘোষিত হয়েছে, তাঁরা হলেন—সন্ধ্যারাণী, ছবি বিশ্বাস, জীবেন বসু, মণি শ্রীমানি, মণীন্দ্রকুমার, মাস্টার টুকাই ও মাস্টার চন্দন। সুরযোজনে থাকবেন তরুণ সুরকার অশোক মজুমদার।

সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার পরিচালিত একটি অভিনব চিত্র 'যাত্রী'। এই ছবিটির অধিকাংশই একটি স্পেশাল-ট্রেনে ভারত-দর্শনের পথ-পরিক্রমার দৃশ্য। আসমুদ্র হিমাচল কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মানুষ ও সংস্কৃতির বাণী নিয়ে আসছে 'যাত্রী'। ছবিটি মুক্তির প্রতীক্ষায়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'দেবী' ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শহরের বিশিষ্ট কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—ছবি বিশ্বাস, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, শর্মিলা ঠাকুর, করুণা ব্যানার্জী, পূর্ণেন্দু মুখার্জী, অর্পণ চৌধুরী, অনিল চ্যাটার্জী, কালী সরকার প্রভৃতি। সুর দিয়েছেন ওস্তাদ আলি আকবর খান।

বিবিধ সংবাদ

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অপুর সংসার' ছবিটি 'অস্কার' পুরস্কারের জন্য 'ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া' অনুমোদন করেছেন।

'চাওয়া পাওয়া'-খ্যাত 'যাত্রিক'-গোষ্ঠীর পরবর্তী চিত্র-নিবেদন 'স্মৃতিটুকু থাক'। নায়িকা-চরিত্রে সুচিত্রা সেন রূপ দেবেন বলে জানা গেছে।

১৯৫৯ সালে ভারতে নির্মিত চিত্রের সংখ্যা মোট তিনশো দশ। এই সংখ্যা পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ভারতীয় চিত্র ভারতের বাইরে থেকে আশাতিরিক্ত মুদ্রা অর্জন করেছে।

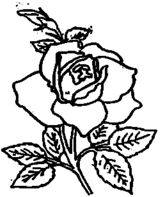

নাভানার বই

উপন্যাস। অমিয়ভূষণ মজুমদারের

গড় শ্রীখণ্ড

দাম : ৮·০০

নীল ভুঁইয়া

দাম : ৫·০০

প্রতিভা বসুর

তিন তরঙ্গ

দাম : ৪·০০

বিবাহিতা স্ত্রী

দাম : ৩·৫০

মনের ময়ূর

দাম : ৩·০০

মেঘের পরে মেঘ

দাম : ৩·৭৫

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

মীরার দুপুর

দাম : ৩·০০

গল্প। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর

এক অঙ্গে এত রূপ

দাম : ৩·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

বসন্তপঞ্চম

দাম : ২·৫০

প্রতিভা বসুর

মাধবীর জন্য

দাম : ২·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

বন্ধুপত্নী

দাম : ২·৫০

সন্তোষকুমার ঘোষের নতুন বই

চিররূপা

'চিররূপা'র গল্পগুলিতে রূপকে ছাড়িয়েও শিল্পীমানসের যে-জিজ্ঞাসা সহজে উচ্চারিত সে-জিজ্ঞাসা প্রেমের জিজ্ঞাসা। যে-মানুষটি আজীবন একটি না-পাওয়া মেয়ের স্মৃতিকে আঁকড়ে রইলো, জীবনের গোধূলিতে তার কাছে সে-মেয়েটির মূল্য কী। অতসী ঘরে নেই জেনেও মদনমোহন আর মল্লিকার কাছে সে-ঘর কোনোদিনই নিরালা হয় না কেন? 'চিররূপা'র আটটি গল্পে আছে এমনি বহু বিচিত্র প্রেমের দিকদর্শন। আর আছে উপন্যাস-প্রায় বড়োগল্প 'জীবন-কাটির বণিকা', প্রীতি ও যতীনকে ঘিরে নিষ্ঠুর প্রেমের এক জটিল আবর্ত, যে-আবর্তের প্রতিটি রেখাবলয় সন্তোষকুমারের শিল্পদক্ষতার স্পর্শে অনিন্দ্য। তিন টাকা।

প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস

সমুদ্র-হৃদয়

'সমুদ্র-হৃদয়' প্রতিভা বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস। দুটি বিরুদ্ধ হৃদয়ের আবেগসিদ্ধি থেকে এই অপ্রত্যাশিত কাহিনীর জন্ম। নবাব সুলতান আমেদের ভালো লাগার আলো কি ক'রে ভালোবাসার আগুনে আহুতি হ'লো আর নবাবের সবুজমহলে বন্দিনী সুলেখা ভাদুড়ীর চিরসঞ্চিত অন্ধ আক্রোশ অবশেষে কোন্ অতলান্ত মমতায় আকুল উথলো, 'সমুদ্র-হৃদয়'এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিতে তা সকল বিধুর রেখায় আঁকা পড়েছে। চার টাকা।

দীপক চৌধুরীর নতুন উপন্যাস

ফরিয়াদ

'ফরিয়াদ' উপন্যাসের ব্যারিস্টার নিমাই চ্যাটার্জি ধর্মাধিকরণের দরবারে এক মর্মান্তিক নালিশ নিয়ে উপস্থিত। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী, তাঁর সন্তানের জননী এনাক্ষী শয়তান সিতাংশু মিত্রের শিকার হ'য়ে পালিয়ে গেছে। মাতৃমূর্তি দেশ-বিদেশের নাইটক্লাবে ভূমিকা নিয়েছে মোহিনী নৃত্যশিল্পীর। সুন্দরী এনাক্ষী আর দুঃখিনী প্রবীলাদের পণ্য বানিয়ে সিতাংশুর লেনদেন চলছে পৃথিবীর বন্দরে-বন্দরে। টাকা চাই, ডলার পাউণ্ড পিসেটা চাই। অঢেল টাকা ছাড়া ধমনীতে রক্ত আসে না, মানুষের নাড়ি শক্ত হয় না। টাকার জাদুতেই গারদের মজবুত লোহার গরাদে আল্গা হ'য়ে যায়, আসামী সিতাংশু পালিয়ে গিয়ে আরও প্রবল প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠে। এই টাকাই আজকের পৃথিবীতে পয়লা আসামী। চার টাকা।

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

কথায় কথায়

নিখিল-ভারত-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ৩৫তম অধিবেশন এ বছরে সমাপ্ত হল দক্ষিণ-ভারতের বাঙ্গালোর শহরে। স্থানীয় পুট্টান্না চেট্টী টাউন-হলে এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল শ্রী আর. আর. দিবাকর। এ বছরে সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে বাংলা-সাহিত্যের বর্তমান গতিপ্রকৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ ক'রে শ্রীচক্রবর্তী যে ভাষণটি দিয়েছেন, তার গুরুত্ব অনেকখানি। তাঁর ভাষণ থেকে আমরা কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"সাহিত্যের বিষয়বস্তু যে বদলেছে তাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে কাজ করতে পারেনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সে-কাজ সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন করে দিয়েছে—সে শুধু কিছুদিনের জন্ত একটা পৃথিবীব্যাপী হানাহানির প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা ঘটিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; রাষ্ট্রে, সমাজে, মানুষের মনোজগতে পুরাতন সব কিছু লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়ে রেখে গেছে কেবল ধ্বংসস্তূপ। মহাযুদ্ধ যত না সংহার ক'রে গিয়েছে মানুষ, তার চাইতে শতগুণ অধিক সংহার ক'রে গিয়েছে মানুষের পুরাতন সংস্কার ও তার ওপরে গড়া সমাজবিধান ···।"

যুদ্ধোত্তরকালে সাহিত্যের সমস্যা কেবলমাত্র পুঁথির জগতেই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। রাষ্ট্র, সমাজ আর ব্যক্তি-মানসের উপর যুদ্ধের প্রভাবে যে ওলটপালট ঘটে গেছে তার প্রকট ছাপ আজকের যুগের সাহিত্যকে নতুন জীবন-বোধের পথে পরিচালিত করেছে। বর্তমান দুনিয়ার চিন্তাশীল আর বুদ্ধিজীবীর জীবন-জিজ্ঞাসা সুরু হয়েছে এক নতুন অধ্যায় থেকে। শ্রীচক্রবর্তী তাঁর ভাষণে এ জিজ্ঞাসার প্রতি বলিষ্ঠভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাংলা-সাহিত্য আজকের পৃথিবীতে অন্যতম স্বীকৃত মহান্ সাহিত্য। বিশ্ব সে স্বীকৃতি দিয়েছে এ সাহিত্যের স্বকীয়তার, এর স্বমর্যাদার। তাই দিন যতো এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলা-সাহিত্যের গাম্ভীর্য এবং গুরুত্ব ততই বেড়ে চলেছে।

যুদ্ধোত্তর বাংলা-সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীচক্রবর্তী এর সমৃদ্ধি এবং অভাব—দুটো দিক সম্পর্কেই সংক্ষিপ্ত অথচ সুচিন্তিত যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার গুরুত্ব অনেকখানি। সাহিত্যের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"পরিবর্তনের ছাপ বাংলা-সাহিত্যের উপরও পড়েছে, তবে যতটা পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপর, ততটা নয়। কিছুদিন পূর্বেও বাংলা-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল জমিদারদের বিলাসব্যসন; প্রজা-জমিদারে বিবাদ এবং সম্পন্ন অবস্থার মানুষদের দু'একটা অতি সাধারণ গার্হস্থ্য সমস্যা। পরে কিছুটা-বাস্তবিকতা প্রবেশ করেছিল। আজ সাহিত্য ভাঙন-ধরা মধ্যবিত্ত সমাজের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে এবং আরও নেমে গিয়ে কারখানার, কয়লাখনির ও চা-বাগানের শ্রমিক ইত্যাদি শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে বিষয়বস্তু ক'রে নিয়েছে। বাংলার নূতন সাহিত্য বন্ধন-ছেদনের সংকল্প প্রেমাবেগের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ ক'রে প্রেমের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং চরিতার্থতা সন্ধানের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃততর করেছে।"

উদ্ধৃত অংশের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে সাহিত্যের প্রকৃতি-পরিবর্তনের অনেক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণসূত্র পাওয়া যাবে। শ্রীচক্রবর্তীর ভাষণে যে আশা এবং সংস্কার-মুক্তির বলিষ্ঠতা ফুটে উঠেছে তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। কিন্তু প্রসঙ্গত একটা বিষয়ের উল্লেখ করব। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় যে-কথাটির ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, আমাদের বক্তব্য সেই প্রসঙ্গে। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে জীবন-বোধের একটা অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে। অস্থির সংশয় থেকে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস থেকে ঘৃণা, এবং সবশেষে সেই ঘৃণা থেকে জন্ম নিয়েছে এক অতল হতাশা। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইয়োরোপের সাম্প্রতিক সাহিত্যে আধুনিক জীবন-ব্যাখ্যার এ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু তার পাশাপাশি অখণ্ড-জীবন-বোধের স্বপ্ন চেতনা সেখান থেকে এখনও বিলীন হয়ে যায়নি। বৈচিত্র্যময় বহুবিস্তৃত অভিজ্ঞতার পরিধি

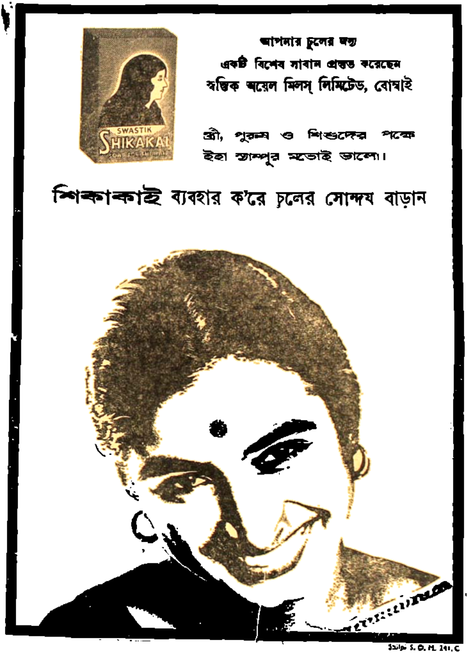

আপনার চুলের জন্য
একটি বিশেষ সাবান প্রস্তুত করেছেন
স্বস্তিক অয়েল মিলস্ লিমিটেড, বোম্বাই

স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের পক্ষে
ইহা শ্যাম্পুর মতোই ভালো।

শিকাকাই ব্যবহার ক'রে চুলের সৌন্দয বাড়ান

Shilpi S. O. M. 241. C

ইয়োরোপের সাহিত্যকারসমাজকে যে অবাধ সুযোগ দিয়েছে, তার অভাব এদেশে আছে। কিন্তু সেইটেই কি প্রধানতম কারণ, যার জন্যে বাংলা-সাহিত্যে পরিবর্তিত পটভূমিতেও সামগ্রিক জীবন-বোধের কোনো সার্থকতম রচনা এখনো পাওয়া গেল না? বাঙালী মধ্যবিত্তের দিকে আজকের লেখকের দৃষ্টি ফিরেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নিয়ে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে কিছু-না-কিছু রসোত্তীর্ণ সার্থক সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাকে নিয়ে এদেশে এখনো তো খণ্ড খণ্ড স্কেচ প্রচেষ্টাই চলেছে বেশি। সুতরাং এ-কথা অনিচ্ছার সত্বেও হয়ত আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের সাহিত্যকারসমাজের দৃষ্টিচারণায় এমন কোনো একটা ত্রুটি রয়ে গেছে যার ফলে সর্বাঙ্গীণ জীবন-বোধ এখনো তেমন সার্থক হয়ে ফুটে ওঠেনি। শুধু তৈলচিত্রেই শিল্পীর প্রকাশ নয়, পেনসিল-স্কেচেও সার্থক ছবি হয়। কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের বিপুল সম্ভাবনা থাকতে আমরা কি কেবল পেনসিল-স্কেচেই সম্পূর্ণ খুশি থাকব?

বাঙ্গালোরের সম্মেলনে মূল সভাপতি সংক্ষিপ্ত-বক্তব্যে বাংলা-সাহিত্যের সম্বন্ধে যে আশার বাণী শুনিয়েছেন তা আমরা সানন্দে গ্রহণ করব। তাঁর বক্তব্য যেখানে এসে থেমেছে সেখান থেকে আমাদের সাহিত্য আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যাক, এই কামনাই করব। আরও আশা করব, বাংলা-সাহিত্য-সম্মেলনের ৩৬তম অধিবেশনের সভাপতি যেন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন, এই একবছরে আমাদের সাহিত্যে মননশীলতা, দৃষ্টিগভীরতা আর অখণ্ড-জীবন-চেতনার বাণী আরও ব্যাপক হয়ে আসছে।

—

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল আইন-সভায় গৃহীত হয়েছে, এই বছরেই তার কাজ শুরু হবার কথা। আগামী সামনের বাজেট-অধিবেশনেই কল্যাণী ও দার্জিলিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা অনুমোদিত হবে ব'লে শোনা যাচ্ছে। শিক্ষার অনুরাগী যারা, তাঁদের সকলের কাছেই ভারত ও বাংলা সরকারের এই উদ্যোগগুলি অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে। নতুন কোনো পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলেই বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু ওই অসুবিধাগুলির জন্যেই কোনো পরিকল্পনা বর্জিত হতে পারে না। ইংরেজ আমলেই উত্তর-প্রদেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সুতরাং স্বাধীন ভারতে বাংলার মতো একটি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর রাজ্যে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই বেশি নয়।

বাংলার উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পাঁচ শ, কয়েক বছরের মধ্যে এ সংখ্যা বেড়ে প্রায় দু'[illegible] দাঁড়াবে। এই বিপুলসংখ্যক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শি[illegible] ব্যবস্থা ঠিকমতো চালানোর জন্য বহু এম.এস্‌-সি. শিক্ষক প্রয়োজন। এ ছাড়া জাতির বিভিন্ন গঠনমূলক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য আরও কয়েক হাজার বিজ্ঞানীর প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং অনতিবিলম্বেই বাংলায় ব্যাপক ভাবে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে যা অবস্থা তাতে তার পক্ষে এ গুরুদায়িত্ব কোনোমতেই বহন করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই একমাত্র এ-সমস্যার সমাধান ঘটাতে পারে। যাদবপুর, বর্ধমান, কল্যাণী, দার্জিলিং প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক-ভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে এম.এস্‌-সি. পড়ানোর ব্যবস্থা হোক, দেশের শিক্ষানুরাগী মাত্রেরই এটা একান্ত কামনা।

—

দ্বিভাষী বোম্বাই রাজ্য শেষপর্যন্ত ভাষার ভিত্তিতেই দ্বিধা বিভক্ত হল। নতুন অঙ্গরাজ্য দুটির নাম হবে বোম্বাই ও গুজরাট। বোম্বাই মারাঠাদের আর গুজরাট গুজরাটীদের। তিন বছর আগে মোটামুটি এই সুপারিশই করেছিলেন রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশন। কিন্তু বোম্বাই শহরের মুষ্টিমেয় গুজরাটী বণিকদের আবদার রাখতে গিয়ে ভারত-সরকার সেদিন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। মারাঠী ও গুজরাটীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে তাঁরা তাঁদের এক অবাঞ্ছিত বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে দেন। কিন্তু সেটি যে তাঁরা একেবারেই ভালো কাজ করেননি তা বুঝতে পারলেন এতদিন পরে, আর এত ক্ষয়ক্ষতির শেষে।

মারাঠী ও গুজরাটীরা যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন, এতে বাঙালী, ওড়িয়া প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশবাসীরা খুশি হবেন। কিন্তু এই ঘটনা থেকে যে শিক্ষা তাঁরা লাভ করলেন তা ভয়াবহ। আজ যেন এইটাই প্রমাণ হল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অতি ন্যায্য দাবিও জোর ক'রে আদায় ক'রে নিতে হয়—বিক্ষোভ, হাঙ্গামা ও গুলী-বর্ষণে অবস্থা চরমে না ওঠা পর্যন্ত তাঁদের টনক নড়ে না।

—

গত তিনবছরে প্রকাশিত বাংলা-গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হওয়ায়, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র রচিত 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাস ১৯৫৯-এর 'সাহিত্য আকাদামি পুরস্কার' অর্জন করেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীমিত্রকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সম্পাদক—সত্যেন্দ্র আচার্য
জে. সি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মদন গোস্বামী লেন, কলিকাতা হইতে [illegible] বসু কর্তৃক মুদ্রিত
[illegible]

বসুধারা

বাংলার প্রাণ-প্রবাহ

সম্পাদক
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রযোজক
প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
অজিত গুপ্ত

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড ফাল্গুন, ১৩৬৬ পঞ্চম সংখ্যা

বসুধারা

"……বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা……"

আগামী বৈশাখ-সংখ্যা বসুধারা 'বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশের আয়োজন হ'য়েছে। এই সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ :

একটি দীর্ঘ ও সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখছেন ঃ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

বড় গল্প লিখছেন ঃ **শংকর**

ছোট গল্প ঃ

সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অজিতকৃষ্ণ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র,
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রভৃতি

এ ছাড়াও একটি সম্পূর্ণ নাটক লিখছেন ঃ

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

ইহা ভিন্ন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখছেন। অতুল গুপ্তর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ রচনা। এ ছাড়াও—, কথায় কথায়, অর্থনৈতিক প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক আলোচনা, রঙ্গব্যঙ্গ প্রভৃতি অভিনব রচনায় এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ থাকবে। আরও আকর্ষণীয় সূচী আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

এই সংখ্যার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র

গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য লাগে না।

'বসুধারা' কার্যালয়
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বসুধারা

তৃতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় খণ্ড • প্রথম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৬৬

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ । স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙালী সংস্কৃতি । ৫৯৩

তুলসীদাস সিংহ । পল্লীর বারমাস্যা : ফাল্গুন । ৫৯৮

দক্ষিণারঞ্জন বসু । সংস্কৃতির ধর্ম [২] : সভ্যতার গতিপথে । ৬০৫

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য । চেনাশোনার বাইরে । ৬০৭

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । একালের দ্বৈরথ । ৬১৭

ঘোষণা ! ঘোষণা !! ঘোষণা !!!

……জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান কিং এণ্ড কোম্পানীর

আর একটি মূল্যবান অবদান……

"আর্নিকা হেয়ার অয়েল"

(উৎকৃষ্ট ভেষজ কেশ তৈল)

চুলওঠা, অকালপক্কতা এবং যে কোন শিরঃপীড়ায় আশু ফলপ্রদ। সুশ্রী ও সতেজ কেশশ্রীর জন্য নিয়মিত ব্যবহার করুন। সুগন্ধিযুক্ত ৪ আউন্স শিশিতে পাওয়া যাইতেছে। মূল্য ৩৲ টাকা।

কিং এণ্ড কোং

(স্থাপিত ১৮১৪)

শাখা
১৪৪, রসা রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন : ৪৮-১৩৬৬

: শাখা :
৯০/৭এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭
ফোন : ৩৪-২০০১

শাখা :
১২, রয়েড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
ফোন : ৪৪-৫৮৬৩

• যে কোন রোগে চিন্তাগ্রস্ত হইলে আমাদের ব্যবস্থাপক চিকিৎসকগণের সুপরামর্শ গ্রহণ করুন। ডাকযোগেও চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে।

সূচীপত্র

অনিল সেনগুপ্ত । চিত্রপট । উপন্যাস । ৬২০
[illegible] দত্ত । জীবমৃতের ফুল । কবিতা । ৬৩০
[illegible] চক্রবর্তী । আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জন্য । কবিতা । ৬৩০
[illegible] ঘোষ । এলাম বামাকানে । ৬৩১
অমিমিত্র । জটিবাবের কড়চা : তৈলোপনিষদের ভূমিকা । ৬৩৬
অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় । বেতো ঘোড়া । ৬৩৮
সূত্রধার । অথ নট-ঘটিত । ৭১১
কালীচরণ ঘোষ । চল্‌তি হাওয়া । ৭১৭
শরৎকুমার মিত্র । পূর্বস্মৃতি । ৭২১
অমিত গুপ্ত । ছলোবাসিতা । ৭২৮
পুরাতনী ['বঙ্গদূত' হইতে উদ্ধৃতি] । ৭৩৩
অজিত গাঙ্গুলী । ধুতি-তত্ত্ব । ৭৩৫
জীবনর্ষি । গ্রহ-বিচিত্রা । ৭৩৯
নারায়ণ সেন । নন্দনকাননে পাঁচদিন । ৭৪৩
নাট্যমহল [মঞ্চলোক ও চিত্রলোক] । ৭৪৫
কথায় কথায় । ৭৪৯

THE FOLLOWING INFORMATION IS PUBLISHED IN COMPLIANCE WITH RULE 8 OF THE REGISTRATION OF NEWSPAPERS (CENTRAL) RULES 1956

FORM IV

Name of the Newspaper—BASUDHARA

1. Place of Publication—42, Cornwallis Street, Calcutta-6.
2. Periodicity of its Publication—Monthly.
3. Printer's Name—Sri Jayanta Basu.
   Nationality—Indian.
   Address—11, Mohendra Gossain Lane, Calcutta-6.
4. Publisher's Name—Jayanta Basu.
   Nationality—Indian.
   Address—42, Cornwallis Street, Calcutta-6.
5. Editor's Name—Prof. Charu Chandra Bhattacharyya.
   Nationality—Indian.
   Address—3, Bipradas Street, Calcutta-9.
6. Names and addresses of Individuals who own the newspapers and partners or shareholders, holding more than one per cent of the total capital.
   Jayanta Basu—11, Mohendra Gossain Lane, Calcutta-6.

I, Jayanta Basu, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

20.2.60 (Sd.) Jayanta Basu

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৬৬

বসুধারা

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙালী সংস্কৃতি

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

আধুনিক বাঙালী তথা ভারত সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণীয়।

কী সে বিশিষ্ট জীবন-সাধনা, যার প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী সংস্কৃতি দেশকালের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বজীবন ও বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হল—আধুনিক সমাজতত্ত্বজিজ্ঞাসায় সে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার ও কেশবচন্দ্রের প্রগতিবাদী সংস্কারপ্রচেষ্টা এবং দেশাত্মবোধের প্রেরণায় রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সংস্কৃতির পুনরনুশীলন ও পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের প্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দের অবতারবাদে বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতাপ্রী
বাঙালীর সম্প্রসারিত ধর্মচেতনা ও জাতীয়তার কে
পশ্চাদ্মুখী গতির একটি অভ্রান্ত পরিচয় মাত্র। কি
বিচার-বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, প্রাচ
পাশ্চাত্য বিভিন্ন ভাবাদর্শের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ, বকি
বিবেকানন্দ-পূর্ব 'সংস্কার-যুগ'-এর বিভ্রান্ত বাঙালী-চি
স্থিতিস্থাপকতা এনে দিয়েছিল সনাতন হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্
চিরপূজ্য দেবদেবীর প্রতি এ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর অবিচলি
শ্রদ্ধা এবং আত্মিক উপলব্ধিজাত দ্বিধাহীন বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ববিচার প্রস
সমকালীন পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতা-প্রভাবিত শিক্ষিত বাঙালী

ধর্মচেতনা বিবর্তনের দিকেই সংস্কৃতি-সমালোচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সবথেকে বেশী। কিন্তু স্বামীজির জীবন-সাধনার একমাত্র পরিচয় হিন্দুর সনাতন ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই নিহিত মনে করবার মতো ভ্রান্তি বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। বস্তুতঃপক্ষে এ বীরাচারী সন্ন্যাসীর জীবন-সাধনার অন্যতম পরিচয় দেখা যায় স্ব-দেশ, স্ব-জাতি ও স্ব-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, পরানুকারী এবং আত্মবিস্মৃত একটা জাতিকে স্ব-ধর্ম ও স্বাজাত্যবোধের স্থির প্রতিষ্ঠা-ভূমির ওপর পুনঃস্থাপিত করবার ক্লান্তিহীন সংগ্রামের মধ্যে। যে বিজাতীয় জীবনাদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত শিক্ষিত বাঙালী-চিত্তে সৃষ্টি করেছিল একটা তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ, মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সে সঙ্কীর্ণ মুক্তিচেতনার ওপর উড়িয়ে দিলেন সমষ্টিচেতনার গৌরব-পতাকা। প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী সংস্কারপ্রচেষ্টায় যে অবিমিশ্র পাশ্চাত্ত্য মানবতাবোধের আদর্শ বাঙালীর চিত্তে সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি, সে মানবতার আদর্শকে অধ্যাত্মচেতনার ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করে সে মহান প্রেরণাকে সার্থকভাবে সঞ্চারিত করে দিলেন স্বামীজি দেশবাসীর অন্তরে। সর্বোপরি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একশ্রেণীর বাঙালী, তথা ভারতবাসী যখন বিজাতীয় জীবনচিন্তার অনুসরণে জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠন করবার আত্মশ্লাঘায় স্ফীত, সে সংস্কৃতি-সংকটের যুগে সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য ভাব ও চিন্তার উন্মত্ত গতিকে প্রতিহত করলেন ভারতবর্ষের সনাতন অগ্নিগর্ভ বাণীর সাহায্যে। বিশ্বসংস্কৃতির সুবিপুল ভাণ্ডারে ভারতীয় সুপ্রাচীন সংস্কৃতিরও যে দান করবার অনেক সম্পদ আছে, সে আত্মভ্রষ্টতার যুগে এ অচিন্ত্যপ্রায় সত্যের প্রকাশই হল স্বামীজির সংস্কৃতিসাধনার বিশিষ্টতম পরিচয়।

॥ ২ ॥

আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি-বিকাশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত ভূমিকা কী, এবার তার বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক্। কিন্তু এ পরিচয় সম্পূর্ণ হবেনা, যদি আমরা 'সংস্কৃতি'র স্বরূপ-লক্ষণের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিতি লাভ না করি।

আচার্য সুনীতিকুমারের মতে 'সংস্কৃতি' অর্থে বিশেষ করে বোঝায় 'মার্জিত মানসিকতা'। মানুষের এ পরিশীলিত মানসপ্রবৃত্তি অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অধ্যাত্মবোধ বলতে কোনো অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতির কথা অবশ্য [illegible] এ অধ্যাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায় মানুষের আ[illegible]ক্তির জাগরণে। এ জাগরণ রূপ লাভ করে, [illegible]ানুভূতিতে, কখনও সাহিত্য-সৃষ্টিতে, কখনও [illegible]। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে, এ জাগরণের [illegible]ল তিনটি: প্রথমতঃ, মনের স্বাধীনতা (freedom [illegible] mind); দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বমানবতা (universalism); আর তৃতীয়তঃ, শালীনতা (urbanity)।

আধুনিক কোনো কোনো সংস্কৃতি-সমালোচক মনের স্বাধীনতাকে বলেন বুদ্ধির মুক্তি, বিশ্বমানবতাকে অভিহিত করেন 'হিউম্যানিজম', আর urbanityকে বিশেষিত করেন 'decencies of life' বলে।[১]

বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় আমরা দেখতে পাব, স্বামীজি বিশেষ করে জোর দিয়েছিলেন বাঙালী তথা ভারতবাসীর আত্মিক শক্তির জাগরণের উপর। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন, যতদিন না মানুষ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হবে, ততদিন তার দ্বারা কোনো মহৎ বা বৃহৎ কাজ করা সম্ভব হবেনা। আত্মনির্ভরহীন মানুষকে স্বামীজি অভিহিত করেছেন 'নাস্তিক' বলে: "He who does not believe in himself is an atheist." আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না এলে 'মনের স্বাধীনতা' আসবে না, আর মনের স্বাধীনতা না এলে কোনোপ্রকার সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশও সম্ভব নয়। জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণায়ত বিকাশসাধনপ্রয়াসে বিদেশী আদর্শ-অনুসরণ-নির্ভরতাই যথেষ্ট নয়, তার জন্যে চাই "growth from within"। স্বামীজির সমগ্র জীবনবোধ ও জীবনচর্যা আবর্তিত হয়েছে এ আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের উপর। এ আত্মশক্তির উৎস হল জাগ্রত হৃদয়। স্বামীজি তাই নিছক বুদ্ধিচর্চা হতে হৃদয়চর্চার ওপর জোর দিয়েছিলেন বেশী। বুদ্ধি ও হৃদয়ের নির্দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে, স্বামীজি স্পষ্টভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন হৃদয়ের নির্দেশ অনুসরণ করবার জন্যে: "If your brain and your heart come into conflict, follow your heart." গভীর আত্মবিশ্বাস ও প্রবল ধর্মবোধ স্বামীজির জীবনোপলব্ধির মূলে। এ বিশ্বাসের পথেই আসবে মনের স্বাধীনতা, আর এ স্বাধীনতাই এনে দেবে জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী সংস্কৃতিরক্রান্তিযুগে এই হল বিবেকানন্দের বিশিষ্ট বাণী। সাম্প্রতিক বাঙালী জীবনের আদর্শচ্যুতি ও বিভ্রান্তির মধ্যে স্বামীজির সে বলিষ্ঠ জীবনবাণী স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়:

---

[১] গোপাল হালদার। বাঙালী সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ

> "The history of the world is the history of a few men who had faith in themselves. That faith calls out the Divinity within. As soon as a man or a nation loses faith in himself, death comes. Believe first in yourself, and then in God."

স্বামীজি-কথিত এ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বা মনের স্বাধীনতাই গত শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানানুশীলনে, জাতীয়তাবোধে এবং ধর্মপ্রীতিতে এনে দিয়েছিল একটা উদার মুক্তির ইঙ্গিত। এ মানসমুক্তির ফলে আধুনিক সংস্কৃতির একটি নতুন রূপ উঠল প্রত্যক্ষ হয়ে—এ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বাঙালী-সংস্কৃতি-অনুরাগী মাত্রেরই সুবিদিত।

জাতীয়তাবোধকে অতিক্রম না করেও বিশ্বমানবতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি আধুনিক সংস্কৃতির একটা বড় লক্ষণ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনায় এ লক্ষণটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। শুধুমাত্র একটা প্রবল ভাবাবেগ নয়, গভীর মননশীলতা ও আত্মিক সহমর্মিতা মানবতার মূল্য-উপলব্ধির মূল প্রেরণা। সংস্কারযুগের মনীষীদের মতো নির্বিশেষের সাধনা তিনি করেননি, রূপাতীতের স্বপ্ন তাঁর মুক্তিপ্রয়াসী চিত্তকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি—তাঁর সুবিস্তৃত বিশ্বচেতনা রূপ পেয়েছিল বস্তুর মধ্যে, 'বিশেষ'-এর মধ্যে—নিপীড়িত মানবতার সার্বিক কল্যাণ-কামনায়। লাঞ্ছিত বঞ্চিত জীবনের প্রতি, সহজ ও সরল পথভ্রষ্ট মানুষের প্রতি সীমাহীন প্রীতিই এ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল,—যে সর্বাত্মক সহানুভূতির প্রেরণায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন :

> "The only God in whom I believe, is the sum-total of all souls, and above all I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races."

পরিশীলিত হৃদয়বৃত্তির এ ব্যাপকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী-সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করেছে, এবং উন্মোচিত করেছে বাঙালী শিল্পী ও জীবনসাধকদের সামনে এক অনাবিষ্কৃত ও বিচিত্র মানবমাহাত্ম্যের জগৎ। স্বামী বিবেকানন্দের এ গভীরতম মানবমাহাত্ম্য-উপলব্ধি বাঙালী শিল্পীর শিল্প-সাধনাকে এখনও হয়ত চরম মূল্যে মূল্যবান করে তোলেনি ; কিন্তু উদার, সমুন্নত ও বিশ্বমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি বাঙালী শিল্পীর সামনে যে বিরাট সম্ভাবনাময় ভাবপ্রেরণার আদর্শ স্থাপন করেছেন, বর্তমান বিভ্রান্তির চঞ্চল যুগের অবসানে, সে মহান প্রেরণা বাঙালীর সংস্কৃতি-সাধনাকে যে একটা পরম গৌরবে তাৎপর্যময় করে তুলবে, এ অনুমান অহেতুক নয়।

স্বামী বিবেকান

বিচিত্রধর্মী মানবপ্রকৃতির দিকে অপরিসীম বিস্ময়-বিস্মিত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর অন্তরের অপরিমেয় ঐশ্বর্যবোধও মানুষের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল তাঁর অনুভবক্ষম আত্মাকে। এ উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অন্তহীন বিশ্বতরঙ্গের মধ্যে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের মতো তিনিও একজন। মানবজীবনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে স্বামীজির বলিষ্ঠ বাণী এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> "Never forget the glory of human nature! We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but the waves on the boundless ocean which I am."

এ গভীর আত্মোপলব্ধি তাঁকে প্রভাবিত করে তুলেছিল অন্তহীন দেশ ও কালের বিশ্বমানবের প্রতি। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতিকেও বেগবান করেছে বিশ্বজীবনের প্রতি এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। বৈদান্তিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েও তিনি যে শুধুমাত্র প্রভাবিত চিত্তে বিশ্বজীবনের জয়ধ্বনি সাগ্রহে শুনেছিলেন তা নয়, জীবনের আদর্শ সম্পর্কে বেদশাস্ত্রের চিরন্তন সত্যবাণীকেও পরম আত্মীয়ের মতো বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন জড়বাদী আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনের মর্মদ্বারে। শুধু অন্ধের মতো নির্বিচারে পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করা নয়, নিজের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাও বিশ্ববাসীকে পরম আত্মীয়জ্ঞানে দান করা—এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কৃতি-সাধনার মূলমন্ত্র। বিশ্বজনসেবার ও বিশ্বমৈত্রীর পীঠস্থান স্থাপন করেছিলেন তিনি এ বাংলাদেশেরই গঙ্গাতীরে; তাঁর মহান সেবাদর্শের অনুগামী ভক্তরা তাঁর সুউচ্চ জীবনাদর্শের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন আশ্রমিক সংঘের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে। বিবেকানন্দের জীবনসাধনায় দেশকালের সীমায় কেন্দ্রায়িত বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতি সার্থকভাবে সর্বপ্রথমে বিশ্বসংস্কৃতিসভায় নিজ সুনির্দিষ্ট আসন লাভ করল।

প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশী কাল পরানুকরণস্পৃহ বাঙালী-জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে গ্লানি সঞ্চিত হয়েছিল, সে গ্লানিময় জীবনকে সংযমশুদ্ধতার নিয়মনিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ঐকান্তিক চেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনার অন্যতম দিক। সংস্কৃতির স্বরূপলক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার যাকে বলেছেন 'urbanity', আর কোনো কোনো সংস্কৃতি-সমালোচক যাকে অভিহিত করেছেন 'decencies of life' বলে, বাঙালীর সমষ্টিগত জীবনে সে 'urbanity' বা 'decencies of life'-এর প্রবর্তনার জন্য একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনসাধনায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকারীদের প্রতি এ সংযমব্রতী সন্ন্যাসীর সাবধানবাক্য—"বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।", "মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপন হয়না।"—সে ভাববিভ্রান্তির যুগে বিপরীত জীবনাদর্শের প্রভাবে দোদুল্যমান বাঙালীর চিত্তে যে শ্রেয়বোধের আদর্শ জাগ্রত করে তুলেছিল, তার সাক্ষী বাঙালীর সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাস। স্বামীজির সংযমব্রতী জীবনের এ প্রচণ্ড আদর্শনিষ্ঠা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালীর জীবনচর্যায় শালীনতাবোধ এনে দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতিকে উত্তীর্ণ করেছে আধুনিকতার স্তরে—বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতি আলোচনায় এ-কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

। ৩ ।

সংস্কৃতির প্রধানতম বাহন সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কেও স্বামী বিবেকানন্দের মতামত তাঁর জীবনবাণীর মতোই দৃঢ় এবং স্পষ্ট। উচ্চতর সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য স্বামীজি যেমন চরিত্রের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতাকে সবার উপর স্থান দিতেন, তেমনি উচ্চতর কলাসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি সরলতা ও স্পষ্টতার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সঙ্গীতকে মর্মস্পর্শী করে তোলবার জন্যে তিনি সমর্থন করতেন সহজ ও সরল সুরের, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বভাবের অনুকরণকেই তিনি দিতেন সর্বাগ্রগণ্য স্থান; আর সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে স্বামীজি যে আদর্শের কথা বলেছেন, আধুনিক গতিপ্রধান সাহিত্য-সৃষ্টির যুগে তা সাহিত্যশিল্পীমাত্রেরই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে তার উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়—

> "ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি আমার গুরুর ভাষাকে অনুকরণ করি। উহা যেমন চলিত ভাষা তেমনি ভাবের প্রকাশক। ভাষা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে।"

> "বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের আদর্শে না গড়িয়া বরং পালির আদর্শে গড়িলে ভাল হয়। কেননা পালির সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। … নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করাও আবশ্যক। যদি সংস্কৃত অভিধান হইতে এমন শব্দ সংগ্রহ করা যায় তবে তদ্দ্বারা বাংলা ভাষার বিশেষ পুষ্টিলাভ হইতে পারে।"

সাহিত্যের ভাষা হিসাবে লোকপ্রচলিত চলতি ভাষার উপযোগিতা সম্পর্কে স্বামীজি নিঃসন্দিহ। চলতি ভাষার সম্বন্ধে স্বামীজি বলেন:

> "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। … চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয়না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈরী করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য-গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার

> বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর, সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ওসকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? ..."

ভাষা সহজ সরল হলেও ভাবব্যঞ্জনা যে বলিষ্ঠ হতে পারে তার প্রমাণ স্বামীজির নিজের রচনা। বিবেকানন্দের রচনা ওজগুণসম্পন্ন বলিষ্ঠ গদ্যের নিদর্শন। গোমুখীনিঃসৃত গঙ্গার তরঙ্গবেগ সে-রচনার প্রতি ছত্রে। সে ভাষা গভীর আবেগময়, অথচ সে আবেগধর্ম যুক্তি, তর্ক ও মননের সীমাকে অতিক্রম করে বৃথা বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হয়নি কোথাও। আবেগ ও মননের অপূর্ব সমন্বয় বিবেকানন্দের গদ্য—বাংলা সাহিত্যে অনন্য, তুলনারহিত।

প্রচলিত অর্থে বিবেকানন্দকে হয়ত ঠিক সাহিত্যশিল্পী বলা চলেনা, কিন্তু যে অর্থে বিবেকানন্দ সমন্বয়ের ভিত্তিতে বাংলার নবযুগের উদার ও শক্তিমান সংস্কৃতির স্রষ্টা, তেমনি বাংলা গদ্যের বেগ ও বলিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোধা। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানপূত জীবনাদর্শ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালীকে নবতর সংস্কৃতি-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করলেও, তাঁর ঋজু ও বলিষ্ঠ গদ্যরীতির আদর্শ পরবর্তী যুগে তেমন অনুসৃত হয়নি—বিপুল সম্ভাবনার পরিচয়বাহী হলেও সে-গদ্য বাংলা-সাহিত্যে নিঃসঙ্গ।

Champion
REGD.

A pen which leaks, clogs and smudges makes writing tedious and tiresome. The CHAMPION pen is an exception.

Manufactured according to the latest precision techniques, it makes writing effortless and pleasurable. Available in a wide range of styles and colours, at prices to suit everyone.

GUJRAT
INDUSTRIES
PRIVATE
LIMITED

Lalji Mansing Bldg., Lohar Chawl,
Bombay-2

পল্লীর বারমাস্যা

তুলসীদাস সিংহ

। ফাল্গুন ।

শীত যাবো-যাবো করছে আর বসন্ত আসবো-আসবো করছে—ঠিক তার আগের সময়টায় কেমন একটা হাওয়া বয়! ওটা কি হাওয়া? আর পাঁচটা হাওয়ার মতো ওটাও যদি হাওয়া তবে ওটা গায়ে লাগলেই মনটা কেমন একরকমের করে ওঠে কেন? বুকের কাছটায় নয়, গলার কাছটায় নয়, নাভিমূলের কাছটাতেও নয়, ওদেরই মধ্যে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে যেন ঢেউ তোলে ঐ হাওয়াটা। ঐ ঢেউটার সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছু যেন উঠে পালিয়ে-পালিয়ে যায় ভিতর থেকে। মনে হতে থাকে কেবল, আমার যা ছিল তা যেন পালিয়ে যাচ্ছে—আমার যা আছে তা যেন হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

হাওয়া তো নয় ওটা—ওটা ছটফটানি। ওটা হল সেই তাঁর ছটফটানি।

আর কি চাই? এসেছে রস, এসেছে রূপ, এসেছে বর্ণ, এসেছে গন্ধ—এসেছে আনন্দ আরোগ্য শান্তি শ্রী। তারা সবে মিলে রচনা করে তুলেছে যে লীলাবাসর—সব চাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘ'টে যাওয়ার কথা যেখানে সব পাওয়ার মধ্যে—সেখানেও, সেই লীলাবাসরের বুকেও দাঁড়িয়ে আছে এখনো পৃথ্বীর কামনা সহস্রবাহু তুলে। শত শত সহস্র সহস্র হাত তবুও আছে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে।

কিন্তু দেওয়ার তো আর কিছুই নেই! এবার যে বিনিময়ের পালা। শুধু দেওয়া আর নেওয়ার পালা। শুধু নেওয়া নয়—নেওয়া আর দেওয়া, দেওয়া আর নেওয়া। এই দেওয়া-নেওয়ারি দোদুল-দোলনায় তিনি যে চান দুলতে। সেই তিনি—যিনি রসময় নন—রসলোলুপ, চৈতন্যময় নন—লীলাময়, প্রাণবন্ত নন—প্রাণসখা। সেই তিনি—যিনি লীলারস-সম্ভোগব্যাকুল নিখিল-প্রাণসখা। সেই তিনি, যিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে হারিয়ে ফেলতে চান নিজেকে আবীর-কুঙ্কুম-কাশরেণুর মেঘমণ্ডলের মধ্যে। হতে চান লীলারসপানে আত্মহারা। চান হৃদি-দোলনায় বসে দোল খেতে।

কিন্তু বসবার আসন কৈ তাঁর। কোথায় এসে বসবেন তিনি। নিখিল-হৃদি যে এখনো কামনাব্যাকুল। লীলাবাসর যে এখনো কামধূমে অন্ধকার। কে সরাবে ঐ অন্ধকার—শত শত সহস্র সহস্র ঊর্ধ্ববাহুকে কে করবে নতমুখী।

ছটফট ছটফট করতে থাকেন তিনি। নিখিল-হৃদি-দোলনায় এসে বসবার জন্যে ছটফট ছটফট করতে থাকেন। তাঁর সেই ছটফটানিটা নেমে আসে হাওয়া হয়ে। সব-কেড়ে-নেওয়ার হাওয়া হয়ে—কামময় বিকল করার বয় হয়ে।

গাছেদের কাছে ওটা হাওয়া নয়—হাত। নিষ্ঠুর দুটো হাত। ঐ নৃশংস দুটো হাত শত শত সহস্র সহস্র ঊর্ধ্বমুখী হাতের দিকে এগিয়ে আসে। তাই দেখে নিথর হয়ে যায় গাছের মাথাগুলো। পাতাগুলো সব ছবি হয়ে গিয়ে মুখ নামায় মাটির দিকে। রোদটা মাটি দেখে। হাওয়াটা কাঁপে থরথর করে। পাখী ডাকে, কিন্তু তাদের সে ডাকগুলো নাচে না—কাঁদে। প্রাণে লাগে না—কানের ভিতর দিয়ে মরমে আঘাত হানে। বুকগুলো কাঁপতে থাকে গাছগুলোর। আর যত কাঁপতে থাকে তত ঐ নিষ্ঠুর হাত-দুটো এগিয়ে এগিয়ে আসে পাতাদের গলার দিকে। শেষে হাত-দুটো গিয়ে গলায় বসে যায়। ঘটে শীতের পরিসমাপ্তি। কামময় ঝরে ঝরে পড়ে।

মানুষ-গাছেদের বুকের কাছে ঐ হাত-দুটো হাত না হয়ে, আসে পিন হয়ে। মানুষের বুকগুলো তো বুক নয়—গালার থালা। গালার থালায় ডুবিয়ে থাকা আসল মণিরত্নগুলোর কাছে গিয়ে হাত লাগায় ঐ পিনটা। কুলকুণ্ডলিনীর মতো

পাকে পাকে ঘুমিয়ে থাকা মণিমাণিক্যগুলো মাথা তোলে। তারপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাইরে। ছড়িয়ে পড়ে প্রেম-রেণু, অনুরাগ-আবীর, প্রণয়-কুসুম, প্রীতি-ফাগ। ছড়িয়ে পড়ে বাঙ্ময়, ভাবময়, রসময়, প্রাণময় হয়ে। কাম ঝরে—প্রেম জাগে। কাম-পাতারা ঝরে—প্রেম-ফুলের কুঁড়ি জাগে। গাছদের কাছে পাতাই তো আসল মণিমাণিক। পাতারা যদি ঝরে যায় তবে গাছদের বুকগুলো কেমন-কেমন করে উঠবে না। মানুষের চোখে যা আসল মণিরত্ন তা যদি হারিয়ে-হারিয়ে যায় তবে ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে না মানুষদের ভিতরগুলো!

কাম-পাতারা যত ঝরে তাঁর ছটফটানিটা তত কমে। তারপর একসময় ছটফটানিটা থেমে যায়—হাসির রেখা ফুটে ওঠে তাঁর মুখের কোণে।

পাতাঝরা বৃক্ষে ফুঁড়ে জাগে কিশলয়রেখা। জাগে কুঁড়ি।
নেমে আসেন তিনি একটু একটু করে!
কুঁড়িরা চোখ খোলে একটু একটু করে।
পা-দুটো এসে লাগে তাঁর ধরার ধুলায়।
ধরার ধুলা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে ওঠে ব্রজধুলা।
পীতপট্টাম্বর একটু তুলে ধরেন তিনি।

তাঁর সেই পীতপট্টাম্বরের হাওয়া লেগে হাওয়াটা 'হাওয়া' না থেকে, হয়ে যায় 'মধুবাতাস'।

এবার আর হাসির রেখা নয়—স্পষ্ট হাসি ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।

মুচ্‌কি হাসি।
কুঁড়িরা ফোটে।
হি-হি করে ওঠেন তিনি।
গন্ধ ছোটে।
হো-হো করে ফেটে পড়েন।
মধু ঝরে যায়।

তিনি বসেন। নিখিল-হৃদি-দোলনায় তিনি স্থির হয়ে বসেন।

কালবৈশাখী হয়ে ঘূর্ণিচূর্ণী ছেড়ে যখন তিনি চলতে থাকেন তখন তিনি হন চলন্ত, দক্ষিণায়ন-শয্যায় শুয়ে শুয়ে যখন ঘুমান তখন তিনি হন ঘুমন্ত, হেমাঙ্গ হয়ে যখন তিনি হেম-হাসি হাসেন তখন তিনি হন হেমন্ত, রসমঞ্চে রাস-রূপ মাধুরিমামণ্ডলে যখন ঘুরপাক খেতে থাকেন তখন তিনি হন ঘুরন্ত, আর রসলোলুপ লীলাময় হয়ে যখন তিনি এসে বসেন নিখিলের হৃদয়দোলায় তখন তিনি হন বসন্ত।

ফোটো সেন্টু—জমু

তিনি হৃদয়-দোলায় স্থির হয়ে বসে থাকেন। হৃদ দোলারা দোলে। দুলে দুলে তাঁকে দোল খাওয়ায়।

•

ফুল আর পাখী—পাখী আর ফুল। কার নাম বলবো কত নাম বলবো? মধু আর গন্ধ—গন্ধ আর মধু। ক গন্ধের নাম বলবো? কত মধুর কথা বলবো?

যেদিকে তাকাই শুধু ফুল ফুল আর ফুল! চারদি থেকে সব উঠেছে খালি ফুটি ফুটি আর ফুটি!

আর আমড়া শিমুল পলাশ টগর বকুল চিরলতা কন ধাঁকড় আকন্দ এরা সব বড়—এরা ফুটেছে। যারা ছো কোণে-খাড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মরে মরে বেঁ আছে যারা—এই যেমন ঘেঁটু কাউন এরাও দেখি ফুটেছে ফুটেছে কাঁটান, করবী, নয়নতারা, শাল, কামরাঙা, ডালি কলকেগুলো। ফুটেছে ডাঙায়। ফুটেছে জলে। ফুটে মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে বাগানে বাগিচায় কোণে কা আচিরে পাঁচিরে। সেটে কার কতটুকু কী গুণ আছে, ছোট আর কে বড়, কে বাউরী আর কে বামুন—সে স কিছুর যাচাই-বাছাইয়ের যেন দরকারই নেই। ফুটলে ফুল। যে ফুটবে সেই ফুল হবে।

কে ও?

অনুরাগ-রক্ত-রঞ্জিত শিমুল।

যার দেহে এত কণ্টক তার বুকে এত অনুরাগ! এত মধু! অনুরাগ আছে, মধু আছে—গন্ধ নেই? এক ফোঁটাও গন্ধ নেই নাকি ওদের বুকে!

গন্ধ আছে—নাক নেই।

ও কে?

চন্দনতরু আঁকড়।

এ সেই আঁকড় যার পাতা তিক্তরসে ভরা, ডাল তিক্তরসে ভরা, ফল—ফল নয়, মূর্তিমতী মৎসরতা; হাতে-পায়ে যার রাক্ষসের মতো নখ—ও সেই আঁকড়! এই চন্দনের মতো ফুল ঐ তেঁতো গাছটার! এই যে ফুরফুরে গন্ধটা এটা ঐ ফুলগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে! মা আমি কোথায় যাবো গো!

আর ও—ঐ যে, ঐ যার মুখটি আধ আঁচলে ঢাকা?

লালটুকটুক-শাড়ী-পরা হলুদবরণ পলাশ।

আহা কী লজ্জা! "ফোটে ফোটে—তবু ফোটে না"।

ওর বুকে ও কি? মধু? তবে তো ও পলাশ নয়। তবে তো ও হল গিয়ে সেই "বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ"।

তেলচুকচুক পাতা কিন্তু ফলটির শিরে শিরে থাকে কাঁটা। পাছে কেউ ফলে মুখ নামায় তাই ফলময় কণ্টক। সেই কাঁঠাল এখন ফুটিয়ে রেখেছে ফুল। ফলের গায়ে থাকে কাঁটা, বুকের কোষে কোষে থাকে আঠা। কিন্তু ফুলে? ফুলে কাঁটাও নেই—আঠাও নেই। হৃদয়-পুষ্পে কাঁটা থাকে না। উঃ বাবা, নাকে শাতপুরু কাপড় চাপা দিলেও যার গন্ধটা পেটে এসে ঢুকছে—ও গন্ধটা ঐ কাঁঠাল-ফুলের।

পাছে কেউ আলিঙ্গন করে ফেলে সেই ভয়ে অঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে কাঁটার চাদর। অঙ্গে কাঁটার-চাদর-জড়ানো সেই কাউর ফুল ফুটিয়েছে এখন হলুদবরণ। ফুল নয় যেন মূর্তিমান আনন্দ। আনন্দই ফুলটি হয়ে বসে আছে বোঁটা-কাঁটার ঊর্ধ্বে। ও কে? ভ্রমর? ও কী বলছে আমি জানতে পারছি। ও বলছে, তুমি যদি দরজায় দরজায় কাঁটা বিছিয়ে রাখ তবে জানবে আমি ধরবো পাখা। তুমি যদি রচনা করে রাখ কণ্টকশয্যা তবে আমি হবো ভ্রমর। উড়ে এসে জুড়ে বসবো একেবারে তোমার বুকের মাঝখানটিতে। আর ওরা? ওরা মৌমাছি, ওরা ঘুনে মৌ। দোষ ওরা দেখতে পায় না কারো। দেখতে পায় খালি গুণ। চব্বিশঘণ্টা খালি গুণ গুণ গুণ গুণ আর গুণ গুণ গুণ গুণ।

দেখবো কত! তাকাবো কত! এই দুটি ছোট ছোট চোখে কতই আর ধরবে!

কান পাতি।

যেদিকে কান পাতি—কানে ঢোকে শুধু স্বর, শুধু গান। এক রকমের নয়—হরেক রকমের। কত স্বরই না আছে গাছে গাছে—কত গানই না আছে গলায় গলায়! সবাই বলছে "কিছু বলি"—সবাই বলছে "কিছু গাই"।

আচ্ছা, এই যারা এত এত গান গাইছে, যারা মুখ গুঁজে আছে বুকে বুকে—তারা সব পাখী?

কই দেখি? হ্যাঁ, পাখীই বটে। কিন্তু সবাই যে এরা খালি পাখীই—আর কিছু নয়। চিনতে পারছি না যে এদের মধ্যে কে ছেলেমানুষ, কে নবযুবক, কে বাহাত্তুরে! সবাই যে এক। সবারই স্বর এক, রঙের জৌলুস এক, কণ্ঠের মাধুরী এক! কেন? বৈশাখ থেকে এই যে এতটা পথ আমি হেঁটে হেঁটে এলাম—কত কত পাখী তো চোখে পড়লো, কিন্তু কই দেখলাম না তো একটা পাখীকেও যে এ-ডাল থেকে ও-ডালে উঠে বসবার সময় মাঝখানে একটু থেমে নিয়ে দু'হাঁটুতে দুটো হাতের ভর রেখে একটুখানি হাঁপিয়ে নিলে, একটা মাথাও তো দেখলাম না টাকে ভরা, একটা মাথাও তো দেখলাম না পাকা চুলে ভর্তি। দেখলাম না কেন একটাকেও জীর্ণ-শীর্ণ হাড়-বের-হওয়া জবুথবু—ঘাড় গুঁজে হাতে-পায়ে হাঁটছে। ওরা কি বুড়ো হয় না। কেন হয় না? আমরা যে হই!

আচ্ছা, কী খাচ্ছে ওরা ওরকম ঘাড় গুঁজে গুঁজে?

মধু।

মধু! অমৃত নয় তাহলে!

অত অত তো পাখী—নাম নেই কি ওদের এক-একটা করে?

নাম আছে বৈকি। ঐ তো নাচছে হলদিবনা, কোকিল, কুরুকল, ছুতোরকাটা, বেনা, বুলবুলি, ট্যাকগোনা, বোলপতকি, সিপাইবুলি, টিপটিপালি, কুর্বকেটা, ঘুই, গুবাবাধি, বলা, শালিক ...। তার পর? আর জানি না। নাম আছে আরো অনেক অনেক, কিন্তু ওদের সেই নামগুলো বোধ হয় জানতে নেই মানুষদিকে। ওরা বোধ হয় মানুষদের জানাচেনার বাইরেরই বস্তু।

কী বলছে ওরা অতশত?

কেউ বলছে ব্যাং-চু-চু-চু, কেউ বলছে অহহলুহুইলিন, কেউ বলছে—কটের পোকা হোক, কেউ বলছে—হলুদ তোল হলুদ তোল, কেউ বলছে—লুটে নে লুটে নে, কেউ বলছে—

টেসেক্ টেসেক্ টেসেক্ টেসেক্, কেউ বলছে—ঘুঁজাক্ ঘুঁজাক্ ঘুঁজাক্ ঘুঁজাক্, কেউ বলছে—কাহ্ কাহ্ কাহ্ কাহ্, কেউ বলছে—চিপ চিপ চিপ চিপ, কেউ বলছে—ঘুই ঘুই ঘুই ঘুই, কেউ বলছে—চেট্ চেট্ চেট্ চেট্, কেউ বলছে—চুইং চুইং চুইং চুইং, কেউ বলছে হুক্ হুক্ হুক্ হুক্, কেউ বলছে—হোয়িং ধান্-টি-টি-টি, কেউ বলছে 'উ—হ', কেউ বলছে 'আ—হা'। আর বলতে পারবো না।

কত আর শুনবো! এই-টুই-টুই ছুটো ছুটো দিয়ে কত আর ঢুকবে। তবে এরা এত শত সব যে যা বলছে তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়াবে কিন্তু সেই একই কথা। সেই—

কি?

তা কি করে বলবো! সে যে ভারী অশ্লীল কথা।

গীতগোবিন্দ যে অশ্লীল!

ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীটিই হল শিবচতুর্দশী। শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের দিন। এবং এই শিবচতুর্দশীর আগের কৃষ্ণাচতুর্থী তিথিটি হল সঙ্কটতারিণী ব্রতানুষ্ঠানের দিন।

কৃষ্ণাচতুর্থীতে সঙ্কটতারিণী, কৃষ্ণাচতুর্দশীতে শিবরাত্রি।

সঙ্কটতারিণীর দিন মেয়েরা সব বাড়ীতে বাড়ীতে পাহাড় গড়তে বসেন। পাহাড় যে শুধু পাথরেরই হতে হবে তার কী মানে আছে। পাহাড় পাথরেরও হতে পারে, মাটিরও হতে পারে, কল-কুলারও হতে পারে, মণ্ডামিঠাইয়েরও হতে পারে। ছোটবেলায় দেখতাম পণ্ডিতমশাইরা গুরু-ট্রেনিং দিতে যাওয়ার সময় চায়ের ট্রে-র মতো কাঠের একটা ট্রে-র মধ্যে ভারতবর্ষ গড়তেন। ধুলোটুলো কি-সব পাঁচরকম মিশিয়ে মশলা তৈরি হত। আর ঐ একই মশলায় নীল সবুজ হলদে লাল ইত্যাদি রং মিশিয়ে নানা জায়গায় লেপে দিলেই কোনোখানটা হতো সাগর, কোনোখানটা হতো নদী, কোনোখানটা জঙ্গল, কোনোখানটা বা পাহাড়-পর্বত। মুঠো-আঙুলের গড়নও যে-জায়গাটা উঁচু নয় সেটা হল গিয়ে হিমালয়।

ঠিক তো ঐ পণ্ডিতমশাইদেরই মতো বাড়ীর মেয়েবৌরাও এই দাঁকের দিনটিতে মশলা তৈরি করেন এবং ঐ মশলা দিয়ে পাহাড় গড়তে বসেন। অবশ্য পণ্ডিতমশাইদের মতো এ পাহাড়গুলো অমন অখাদ্য পাহাড় নয়—বেশ মুখরোচক, মিষ্টি-মিষ্টি পাহাড়। রকমারি পাহাড়। কোনোটা তিল-বেশানো মশলা দিয়ে তৈরি, কোনোটা চালের গুঁড়ো

সঙ্কটতারিণী

মেশানো মশলা দিয়ে তৈরি, কোনোটা বা চীনার মশলা দিয়ে তৈরি। পাহাড়ের মাথায় যেসব গাছপালারা থাকে, ওরাও তৈরি হয় ঐ একই মশলা দিয়ে। পাহাড় ছাড়াও তৈরি হয় নাড়ু—তিলের নাড়ু, গুঁড়ির নাড়ু, চীনার নাড়ু।

কৃষ্ণতিল-কে ঘন্টাকয়েক জলে ভিজিয়ে রাখা হল প্রথম—ভিজলেই, উপরের কালো খোসাটা নরম হয়ে গেল। এরপর এই ভেজা তিলগুলোকে মাটির উপর রেখে আচ্ছা-রকম রগ্ড়ে দিলেই কৃষ্ণ রাই হয়ে যাবেন। অবশ্য তিলের মধ্যে বহু বেহায়া তিলও থাকে, হাজার ঘষাঘষি করলেও যাদের 'মলিনত্বং ন মুঞ্চতি'। যাই হোক, খোসা ছাড়ানোর পর তিলগুলোকে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর গরম খলায় ভেজে গুড় মিশিয়ে নিলেই মশলা তৈরি হয়ে যায়। এরপর এই মশলা থালার উপর উঁচু করে সাজিয়ে দিলে হল পাহাড়, গোল গোল ডেলা পাকিয়ে নিলে হল নাড়ু। বেহায়া তিল আর সাদা তিলে মিশে এইসব পাহাড় আর নাড়ুগুলোকে সাদা-কালো সাদা-কালো দেখতে লাগে বেশ। গুঁড়ির নাড়ু বা গুঁড়ির পাহাড় হবে আতপ-চালের গুঁড়োর সঙ্গে গুড় মিশিয়ে। আর এই নাড়ু বা পাহাড় ছাড়াও তিল দিয়ে তৈরী মশলা দিয়ে তিন্জাতের একটি জিনিস তৈরি হবে—তার নাম হল বখরা। হিন্দুস্থানীরা স্ত্রী-ছাগলকে বলেন বখরী—বখরী-ই পুংলিঙ্গে হল বখরা। অর্থাৎ কিনা পাঁঠা। পাহাড় বা নাড়ু তিলের হতে পারে, চীনার হতে পারে, গুঁড়ির হতে পারে—কিন্তু বখরাকে হতে হবে তিলেরই। নিয়ম।

ব্যস্, এইসব নাড়ু, পাহাড়, বখরা যা হল সবই ঐ দেবী সঙ্কটতারিণীর নৈবেদ্য। পাড়ার মধ্যে কোনো একটি ঘরে সঙ্কটতারিণীর পূজোর জায়গা ঠিক করা থাকে। পাড়ার মেয়েরা আপন আপন নৈবেদ্য এই একটি জায়গাতেই এনে

হাজির করেন। এবং পুজোর সময় ঐ একটি জায়গাতেই সব মেয়েরা এসে জমায়েত হয়ে বসেন। অন্যান্য সব গাঁয়ে যেমন এক এক পাড়ার মেয়েরা এক এক জায়গায় জমায়েত হয়ে সঙ্কটতারিণীর পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তেমনি আবার কোনো কোনো গাঁ আছে যে, গাঁয়ের কোনো একটি জায়গায় ছ-পাঁচ গাঁয়ের মেয়েরা এসে জমায়েত হয়ে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এক পাড়ার মেয়ে একজায়গায় জমায়েত হলেই সামলানো দায়—পাঁচগাঁয়ের মেয়ে একজায়গায় জমায়েত হলে কী অবস্থা দাঁড়ায় আঁচ করে নিন।

মূর্তি বা বিগ্রহ তৈরি করে সঙ্কটতারিণীর পুজো করা হয় না। 'সঙ্কট পেটারী' ব'লে একজাতীয় বাক্স বা কৌটো কাঠের পিঁড়ি বা চৌকীর উপর রেখে পুজো করা হয়। বাঁশ, খেজুরপাতা, টিন বা কাঠের তৈরী ছোট একটা বাক্সের মধ্যে দুনিয়ার যতরকম মঙ্গলকর বস্তু আছে, যথা—হলুদ সুপারী কড়ি দূর্বা ইত্যাদি বোঝাই করে দিলেই হয়ে গেল 'সঙ্কট পেটারী'। প্রতি বাড়ী থেকেই আসবে এইরকমের এক একটি করে 'পেটারী'—আর সব ঐ একটা চৌকীর উপর পাশাপাশি করে সাজিয়ে দেওয়া হবে। মানে, তৈরি হবে পেটারীর পাহাড়। আর আসবে প্রতি বাড়ী থেকে এক একটি করে প্রদীপ। পুজো আরম্ভ হওয়ার আগে প্রদীপ যে একবার জ্বললো তা যতক্ষণ না পুজো শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জ্বলন্ত থাকা চাই। প্রদীপের সঙ্গে মেয়েরা তাই তেলের ভাঁড়টাও নিয়ে আসেন। পুজো চলতে থাকে আর মেয়েরা প্রদীপের কাছটিতে বসে প্রদীপ দেখতে থাকেন। মাঝে মাঝে সাবধান-বাণী ওঠে: ও কমলা! তোর সল্তেটা একটু উসকিয়ে দে; ও মেজবৌ! প্রদীপটায় তেল-টেলে দে এক-পলা।

তিল দিয়ে তৈরী বলা ব'লে সেই যে এক বস্তু বানানো আছে সেটার গতি হবে কখন জিজ্ঞাসা করছিলাম পুরুতঠাকুরকে। পুরুতঠাকুর বললেন, ব্যস্ত হয়ো না গোপাল—হবে। ও কাজটা সব শেষেই সেরে হয়।

সামনের পা-দুটো পিঁড়ের উপর রেখে, পিছনের দুটো পিছন দিকে টেনে ধরে রাখবার বালাই নেই, কানে ফুল গুঁজে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে 'জয় মা' ব'লে চীৎকার করবারও প্রয়োজন নেই, পুজো শেষ হলে পুরুতমশাই একা-একা এক-একটা বলা টানতে লাগলেন আর চাকু-ছুরিটা গলায় গলায় দিব্যি বসিয়ে যেতে লাগলেন। ট্যাঁ নেই, ভ্যাঁ নেই, রক্তপাত নেই। এ সেই 'গলাটা কেটে দে মা—রক্ত যেন না বেরোয়'। যিনি দুর্গা তিনিই বিপদতারিণী, আর যিনি বিপদতারিণী তিনিই সঙ্কটতারিণী নন এইটুকুই। দুর্গা আমাদের দুর্গতি নাশ করেন, কিন্তু বেচারা ছাগলদিকে মহা দুর্গতির মধ্যে ফেলে দেন। বিপদতারিণী পুজো নেন কিন্তু পুজোর বলি গ্রহণ করেন না—সুতরাং বিপদতারিণীর পূজা বলিহীন অন্নহীন পূজা। সঙ্কটতারিণীর ক্ষেত্রে কিন্তু গলাও কাটা যায়—রক্তও বার হয় না। সঙ্কটতারিণী যথার্থ ই 'সঙ্কটতারিণী'।

বিনা রক্তপাতে পুরুতঠাকুর বলিদান শেষ করলেন। এবার চাঁদ চাই। চাঁদকে অর্ঘ্যদান করলেই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে। কিন্তু কৃষ্ণচতুর্থীর চাঁদ—উঠতে সেই ন'টা-পৌনে-ন'টা। ততক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে সকলকে চুপচাপ। এই প্রতীক্ষার সময়টুকু কাটানোর জন্যে মেয়েরা সব করে কি—পাড়ার কোনো ছেলেকে বা স্বয়ং পুরুতঠাকুরকেই পাকড়াও করে, রামায়ণ পড়তে হবে।

সুতরাং এ সময়টায় উচ্চকণ্ঠে রামায়ণ পাঠ হয়। পাঠের আগে ছেলে বা পুরুত যেই হোক—রামায়ণটা খুলে প্রথমেই প্রশ্ন করবে, কোন্খানটা?

বর্ষীয়সী যাঁরা আছেন তাঁরা একবাক্যে বলে উঠবেন, অদ্ভুতের আবার এখান ওখান কি—যেখান থেকে হোক পড়ো। বারো-তেরো বছরের পাকা মেয়ে যারা, তারা তৎক্ষণাৎ বলে উঠবে, সূর্পণখার-নাক-কাটার পাতাটাই পড়্ না রে, পটু। পনেরো-ষোলো বছরের আইবুড়ো মেয়েরা বারো-তেরোদিকে দাবিয়ে বলে উঠবে, সীতার-স্বয়ংবরটা পড়্, পটু। যাঁরা বত্রিশ পেরিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে তখন ফরমাশ উঠবে, স্বয়ংবরের সময় এটা নয়—লবকুশের রামায়ণগানটা পড়্, পটু। যাঁরা প্রথমটায় বলেছিলেন অদ্ভুতের আবার এখান ওখান কী—তাঁরা শেষটায় এবার সবকে দাবিয়ে দিয়ে বলবেন, না-না—শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজাটা পড়্; আজকের দিনে ঐখানটা পড়তে হয়।

এইসব সাতসতেরো কাটিয়ে একটা পাতা উল্টাতে-না-উল্টাতে ছুলি চেঁচিয়ে উঠবে: উঠেছে উঠেছে—ঐ যে পালুইটার ফাঁকে—কত্তো বড়।

নিয়ম—চাঁদ উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদকে অর্ঘ্যদান করতে হবে। চাঁদ উঠলো এবং সে-চাঁদ আধহাতের উপর উঠে পড়লো তবে সে চাঁদকে অর্ঘ্য দেওয়া মানেই 'বুড়ো চাঁদে অর্ঘ্যি'। শ্রীরামচন্দ্র হয়তো চোখ তাক্ করে ধনুকের গুন টেনে ধরেছেন আর ঠিক সেই সময়টিতেই ছুলি চেঁচিয়ে উঠেছে—"কত্তো বড়"—ব্যস্, শ্রীরামচন্দ্র গুন টেনেই

ধরে থাকেন, মেয়েরা সব ভিড় ভিড় করে উঠোনে নেমে দাঁড়ায়।

উঠোনের মাঝখানে গোল গোল মাণ্ডুলী দিয়ে রাখা হয়েছে আগে থাকতে—তাদের সামনে এসে এবার বসে পড়ে মেয়েরা। পুরুতঠাকুর এক এক দলকে একবারটা ঐ বসে বসেই খানিকগুলো মন্ত্র উচ্চারণ করিয়ে নেন—মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হলে উঠে দাঁড়ায় সব। জোড়হাতের ভিতরে ফুল-ফল-পয়সাপাতি পোরা থাকে—মন্ত্র ব'লে চাঁদের দিকে মুখ করে জোড়হাত ছেড়ে দিলেই, যা কিছু ছিল সব পড়ে যায় মাণ্ডুলী-দেওয়া জায়গাটার উপরে। অর্ঘ্যদান শেষ হয়।

আর অর্ঘ্যদান শেষ হওয়া মানেই অনুষ্ঠান শেষ হওয়া।

এবার শুরু হবে ঠেলাঠেলি: "ও গপু! এ থালা তো আমার নয়, এতটুকু পাহাড় আমরা সাতজন্মে পুজো দিইনি। আমার থালাটায় ঘরের তৈরী খাঁটী গাওয়া-ঘিয়ের লুচি আছে—নাকের গোড়ায় তুললেই বুঝতে পারবি। এমন প্রদীপ আমাদের সাতপুরুষে ছোঁয়নি কেউ।" ইত্যাদি।

ওদিকে ঘরের-ছেলে পরের-ছেলে সব উঠোনে দাঁড়িয়ে নাচছে: আমি লোব ডিলের পাহাড়, আমি লোব টানার পাহাড়, চূড়োর গাছগুলো কি-ও আমি একা খাবো, তোর আমার আধটা-আধটা করে খাবো, না তুমি!

•

ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীটিই হল শিবচতুর্দশী। এদিন সকাল থেকে আরম্ভ করে ফের আবার সকাল না হওয়া পর্যন্ত জলের মুখ দেখবার উপায় নেই উপোসীদের। নির্জলা উপবাসী থেকে কাটাতে হবে দিন—কাটাতে হবে রাত। ঘুমিয়ে নয়—জেগে থেকে রাত কাটানো চাই। চার প্রহরে চারবার পুজো হবে শিবঠাকুরের, দই দুধ ঘি আর মধু দিয়ে চারবার স্নান করবেন তিনি রাত্রে—বসে-বসে দেখতে হবে তা। জেগে থেকে সহজভাবেই যাতে রাত কাটাতে পারা যায় সেইজন্যে বহু জায়গায় শিবমন্দিরের সামনে মেলা বসানো হয়, যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়। উপবাস আর রাত্রিজাগরণই যে এ ব্রতের মুখ্য অঙ্গ।

ভক্তি চাই না, ভালবাসা চাই না, প্রার্থনা চাই না, মন্ত্র চাই না, ধূপদীপ নৈবেদ্য চাই না—শুধু মাত্র উপবাসী থেকে রাত জেগে থাকতে হবে এবং এ অবস্থায় ব্রতীর অগোচরেও যদি এসে পড়ে একটি শুকনো বিল্বপত্র আশুতোষের মাথায়, তবে তাতেই কাজ হবে। তাতেই সন্তুষ্ট হবেন তিনি। তাতেই মুক্তি পাবে ব্রতী। পাপী হোক, তাপী হোক, চণ্ডাল হোক, ব্যাধ হোক—তাতেই আশীর্বাদ পাবে আশুতোষের। তাইতো ঘটেছিল একজনের ক্ষেত্রে। সেই থেকেই তো এ-ব্রতের উদ্ভব। নৃশংস এক ব্যাধ—হিংসাই যার জীবিকা—সেই তো এ-ব্রতের প্রথম ব্রতী।

সেই ব্যাধ, সেই প্রথম ব্রতী সেদিন দিনশেষে বহুদূরের এক গভীর জঙ্গল থেকে শিকারের ভার কাঁধে বাড়ী ফিরছিল। সকাল থেকে পেটে পড়েনি তার কিছুই, এক-ফোঁটা জল পর্যন্ত না, ক্ষুধাতৃষ্ণা নিয়েই ঘুরে বেড়িয়েছে বনময় টো-টো করে। একে এই সারাদিনের ঘোরাঘুরি, তার উপর ক্ষুধাতৃষ্ণার অসহ্য জ্বালা—ক্লান্ত হয়ে, কাতর হয়ে বসে পড়লো সে একটা গাছের তলায় একটু বিশ্রাম করে নেওয়ার জন্যে। আর, বিশ্রাম করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে এক-সময়। ঘুম যখন ভাঙলো তখন দ্যাখে সে দিন আর নেই—রাত হয়ে গেছে। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় সে গাছতলা থেকে, চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে—দ্যাখে খালি অন্ধকার। এখন উপায়। এভাবে তলায় দাঁড়িয়ে থাকলে হয় বাঘের পেটে যেতে হবে, না হয় সাপের পেটে যেতে হবে। ভাবনা ছেড়ে উঠে পড়লো সে তাড়াতাড়ি গাছটার উপরে। উপরে উঠে একটা ডালের সঙ্গে নিজের দেহটাকে লতা দিয়ে বেশটি করে বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগলো সে প্রভাতের। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভয়ে ঘুম আর নাবেনা তার চোখে। তাকিয়ে থেকেই কেটে যায় প্রহরের পর প্রহর।

রাতটা হচ্ছে ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত,—যে গাছটায় উঠে জেগে আছে সে, সেটা হচ্ছে বেলগাছ, আর এই বেল-গাছটার তলায় রয়েছেন শিবদেহী আশুতোষ। ব্যাধের নড়াচড়ায় শুকনো বেলপাতা একটি একটি করে খসে খসে পড়ে—পড়ে তলায় শিবলিঙ্গের মাথায়।

তাতেই কাজ হল। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন খুব আশুতোষ ব্যাধের উপরে। সর্বপাপ হরণ করে নিলেন তিনি ব্যাধের। ব্যাধ হয়ে গেল সর্বপাপমুক্ত। অন্তিমে স্থান হল ব্যাধের শিবলোকে।

এ-ব্রতে মুখ্য হল তাই রাত্রিজাগরণ আর উপবাস। সারা দিন রাত উপবাস দিয়ে থাকেন ব্রতীরা। তারপর রাত্রিশেষে উপবাস ভঙ্গ করে পারণ করেন। পারণের খাবার ভাত-তরকারি। কিন্তু তরকারির মধ্যে বিশেষ একটি তরকারি খেতেই হবে আজ উপোসীদিকে—নিয়ম। সে বিশেষ তরকারিটি হল—বেথো (বেথুয়া) শাক দিয়ে

তৈরী ফুলের টব। অনেকেই তাই এ পার্বণটিকে 'পার্বণ' না ব'লে বলেন 'ফুলবেথো'।

কোনো কোনো জায়গায় আবার পারণ করার পরও পারণের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত জেগে বসে থাকতে হয় ব্রতীদিকে। সাঁঝের তারা দু'একটি করে যখন ফুটে উঠবে আকাশে—তখন সেই তারা দেখে পর ঘুমুতে পাবে তারা। তার আগেই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি কুকুর হয়ে জন্মাতে হয় পরের জন্মে। গতরাত কেটেছে জেগে জেগে, আবার এই সারা দিন! নিজের অজ্ঞাতেই কোনোসময় ঘুমে ঢলে পড়া স্বাভাবিক ব্রতীদের পক্ষে। কিন্তু সেজন্যেও নাকি ব্যবস্থা থাকে পাকাপোক্ত। বাড়ীর কেউ বসে থাকে সব সময় ব্রতীর পাশটিতে। হাই উঠলে বা চোখের পাতা জোড়া লাগলে ঠেলে-ঠেলে নেড়ে-নেড়ে দেওয়ার জন্যে।

•

"আদুরে বাদুরে চাদুর—
চাল ভাজা খাও গো—
না হয় খোল ভাজা খাও গো।"

'চারটি ভিক্ষে পাই, মা', 'হরি বল', 'রাধেকৃষ্ণ'—এগুলি হল যেমন ভিক্ষের বুলি—এই বুলিটিও হল তেমনি একটি ভিক্ষে-করার বুলি। ফাল্গুনের শেষ দিনটিতে শুনতে পাওয়া যাবে এ-বুলিটি ছেলে-ভিখারীদের মুখে মুখে।

ফাল্গুন-সংক্রান্তিটি যে ঘেঁটু—ঘণ্টাকর্ণ-দেবতার পূজার দিন। কড়ি-বসানো, সিঁদুর-মাখানো এক চাপ গোবরকে একটা মাটির সরা বা খলা দিয়ে চাপা দিয়ে দিলেই হয়ে গেল ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ। এঁর পূজার ফুল হল ঘেঁটুফুল। পূজাশেষে এই খলাটিকে ঠেঙিয়ে ভেঙে ফেলার নিয়ম। এ এক যাচ্ছেতাই কাণ্ড। যার মাথায় চাপলো ফুল—তার মাথাতেই চাপবে আবার লাঠি। পূজাশেষে ছেলেরা সব লাঠি বসাতে আসবে ঘেঁটুশুদ্ধ খলাটির মাথায়। দেখতে-দেখতে খলাটি হয়ে পড়বে খণ্ডাকুটি। ছেলেরা এ-কাজটি শেষ করে এবার বেরিয়ে পড়বে ভিক্ষায়। প্রতিটি দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে আর একসঙ্গে চীৎকার করে বলবে ঐ অদ্ভুত বুলিটি: হয় চাল দাও—না হয় খোল দাও। সবাই চাল দেয়। যার দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় ছেলেরা সেই দেয়। ভিক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই চালগুলি ভেজে তৈরি করা হবে কড়কড়ে। এই কড়কড়ে এবার খেতে হবে একমুঠো করে সবাইকে। যে খাবে তারই আর খোসপাঁচড়া হবে না। সুতরাং এ কড়কড়ে কর্তাও খায়, গিন্নীও খায়, বুড়োও খায়, বুড়ীও খায়, ছেলেও খায়, মেয়েও খায়। খোস-পাঁচড়ার দেবতা বিদায় হন গাঁ-ঘর থেকে।

আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

সংস্কৃতির বর্ণ [২]

সভ্যতার গতিপথে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সংস্কৃতির উচ্চ-নীচ আছে। তবে আমরা তাকে উচ্চ-নীচ না বলে, বলবো—বিচিত্র। সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য আছে। যেমন থাকে ফুলে। সব ফুলই গাছের সংস্কৃতি, কিন্তু সব ফুল একরকম নয়। ফুলে ফুলে নানা বর্ণ, নানা গন্ধ। নানা রকমের বাস। ঐক্যও আছে। কিন্তু সে-কথা পরে। তার আগে উচ্চ-নীচের একটু বিচার আবশ্যক।

সংস্কৃতির সঙ্গে উচ্চ-নীচের ধারণা আমাদের মনে আসে তখনই, যখন আমরা সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতাকে গুলিয়ে ফেলি। এরা সম্পর্কবিহীন এমন নয়, কিন্তু স্পষ্টতঃই এরা ভিন্ন জিনিস। 'রিফাইন্‌মেন্ট' বা ভদ্রতা কিংবা শিষ্টাচার যেমন সংস্কৃতি নয়, তেমনি সভ্যতাও সংস্কৃতি নয়। কেন নয়, তাই এবার বলছি।

আমরা জানি সাহিত্য বা কবিতা সংস্কৃতির একটি উপাদান। কারণ তাতে আমাদের অন্তরের বাসনা তার পূর্ণতা পায়। মুক্তিলাভ করে। কেউ টাইপ-রাইটার নিয়ে বসে বসে কবিতা লিখলেন। টাইপ-রাইটার বা কলম না হলে তাঁর কবিতা হয়তো হতো, কিন্তু মুক্তি পেত না—পেত না প্রকাশের পথ। তাই বলে কলম কিংবা টাইপ-রাইটার কি সংস্কৃতি? কিংবা তার উপাদান? মোটেই না। টাইপ-রাইটার বা কলম আসলে সভ্যতা-বিকাশের পথে একটি সিঁড়ি। সভ্যতার একটা দান। একটা লক্ষণ। যারা টাইপ-রাইটার তৈরি করেন, তাঁরা কবি নন। কর্মী। সভ্যতার লক্ষণ—এবম্বিধ বাস্তব-প্রকাশ কর্মলক্ষণ। সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি—মানুষ তার প্রয়োজনে যে-সব কৌশল এবং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তার সমগ্র যোগফল। রাষ্ট্র, শাসনতন্ত্র থেকে শুরু করে, কাপড়ের কল, ব্যালট-বাক্স, টেলিফোন, রেলপথ, স্কুল, ব্যাঙ্ক এসবই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সংস্কৃতিতে এদের প্রভাব হয় অতি অল্প। যদি কিছু থাকে, তবে তা পরোক্ষ। সংস্কৃতির কারবার সভ্যতা এই দানের যোগ্য মূল্যায়নের ওপর। টাইপ-রাইটারে ব্যাবহারিক গুণের চেয়ে তার রং বা গঠন সেখানে বেশী বিচার্য। সংস্কৃতি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, তার চি আত্মচেতনার। সভ্যতা নিছক আত্মচেতনার নয়, হিসা পরখের।

এ ছাড়াও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম পার্থক্য সভ্যতার পরিমাপ হয়, কিন্তু সংস্কৃতির কোনো মাপকা নেই। সভ্যতার ব্যবহার প্রত্যক্ষ। সুতরাং তার ক্ষে অবশ্যই যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন আসে। কোন্ রাষ্ট্রব্য অধিকতর উৎকৃষ্ট তা যেমন তার আচরণ দিয়ে আম বিচার করতে পারি, তেমনি পারি বৈজ্ঞানিক এ পৌরাণিক প্রথায় ধানচাষের পদ্ধতিরও। সেকেলেটা আমরা নিশ্চই বলে বাতিল করে দিতে পারি। কারণ এ ফসল কম ফলে। গাদা-বন্দুকের চেয়ে মেশিন-গান যে য হিসেবে নিঃসন্দেহে ভালো এটাও আমরা বলতে পারি কিন্তু তখনই থামবো যখন আমাদের বক্তব্য সভ্যতা নিয়ে এটা আরো ভালো কি-না, আরো আমাদের মেশিন-গানে প্রয়োজন আছে কি-না, সে প্রশ্ন আলাদা। সেখানে valuation-এর কথা আসবে। আমাদের সংস্কৃতি অনুযা আমরা তখন রায় দেব। সুতরাং অনেক নতুন জিনি সের কদরটা সভ্যতার পরিচায়ক হলেও, সংস্কৃতির নয় সংস্কৃতির নতুন-পুরানো নেই, সংস্কৃতি চিরকাল কষ্টিপাথর তার হাতে সভ্যতার বিচার হয়।

সংস্কৃতি আর সভ্যতার এখানেই দ্বিতীয় পার্থক্য সভ্যতা পরিবর্তনশীল। কিন্তু সংস্কৃতি তা নয়। সংস্কৃতি যাত্রাপথে কোনো মাইল-পোস্ট নেই। কিন্তু সভ্যতার আছে। বলতে গেলে সভ্যতা সব সময়েই চলছে

ই আজকের আবিষ্কার আগামীকাল বদল হয়। তার শক্তিকে ভর করে নতুন কৌশল জন্ম নেয়। এককালে যাতায়াতের পথে মানুষের সম্বল ছিল দু'খানা মাত্র পা। আজ মহাশূন্যেও সে বিচরণে সক্ষম। সভ্যতা তাকে উপাদান দিয়েছে হাতে তুলে। এ-উপাদানটা অবশ্যই কালকেরটির চেয়ে উন্নততর। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি সে-কথা? কিংবা চিত্রকলার ক্ষেত্রে? সেক্সপীয়র পুরানো পৃথিবীর মানুষ আর আমরা একালের—এ-যুক্তিতে কি আমরা বাতিল করে দিতে পারি তাঁর নাটক? মহাভারত পুরানো কাব্য—তাই বলে কি পুরানো লাঙলের মতো, কিংবা তালপাতার-কাগজ ব্যবহারের মতো বাতিল করতে পারি আমরা তাকে? পারি না। কারণ, সংস্কৃতি কালজয়ী।

আরও পার্থক্য আছে। সভ্যতা নিজের বেগে নিজে চলে। কিন্তু সংস্কৃতি সে-ভাবে চলে না। তাকে টেনে নিতে হয়। তার কারণ, দুটি দুই চরিত্রের জিনিস। একটি ব্যবহারিক, অন্যটি আন্তরিক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের রুচি অনেক ভোঁতা, ভেতরের ঘরে তেমনি সূক্ষ্ম। তা ছাড়া, সভ্যতার দান সবাই নিতে পারে। সংস্কৃতিকে সকলে পারে না। রেলে অশিক্ষিত মানুষও চড়তে পারে। কিন্তু বিশেষ আকর্ষণ না থাকলে কেউ চিত্র-প্রদর্শনীতে পা বাড়ায় না।

সভ্যতা সর্বত্রগামী। কিন্তু সংস্কৃতি নয়। রাশিয়ার তৈরী এরোপ্লেন ভারতেও গৃহীত হতে পারে। কিন্তু নবদ্বীপের খোল-করতাল টেক্সাসে চালাতে গেলে বিপত্তি ঘটতে পারে। একমাত্র যোগ্য ভিত্তিভূমিতে ভিন্ন জল-বায়ুর সংস্কৃতি শিকড় গাড়তে পারে। এবং তাও অনেক যত্ন-বর্ধনের মধ্যে। কিন্তু সভ্যতার বেলায় তা নয়। যদি যোগাযোগের পথ থাকে তবে সভ্যতা হু-হু করে চলে আসে। তাকে ভাবতে হয় কম। তাকে নেওয়া যায় অতি সহজে। তবে অবশ্য কখনও কখনও বাধাও আসে। সে-বাধা অবশ্য ঐ দেশের সভ্যতা উপস্থিত করে না। তা আসে সংস্কৃতির তরফ থেকে। দেশে দেশে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে প্রতিবেশী পরিচয় থাকে, বিদেশে অনেক সময় তা থাকে না। যখন তেমন অনুকূল সংস্কৃতি থাকে না, তখনই বাইরের সভ্যতাকে সে প্রতিরোধ করে। যেমন ভারতের সংস্কৃতি এককালে রেলগাড়ীকে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিংবা যেমন বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করতে চাইছে। **Parliamentary Democracy**-কে নিতে হলেও তার যোগ্য সাংস্কৃতিক ভিত্তি চাই।

সংস্কৃতি সভ্যতাকে কখনও কখনও এড়িয়ে চলে। বিশেষ করে সেই সভ্যতা যখন থাকে তার চিন্তার বাইরে, কিংবা তার সাংস্কৃতিক মূল্যমানের ওজন-দণ্ডের নীচের দিকে। এমন ব্যাপার প্রতিদিন ঘটে না। কদাচিৎ ঘটে। সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরোধ বা সভ্যতার চলার পথে বিপত্তি দৈবাৎ ঘটনা। কিন্তু সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে সংঘর্ষ প্রায় নিত্য ব্যাপার। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই চলে সংস্কৃতির গ্রহণ-বর্জন, রূপান্তর। বাইরে থেকে যা আসে তাকে যেমন আমরা সব সময় নেই না, তেমনই বহুও নেই না।

তা ছাড়া সংস্কৃতি নিত্য-বস্তু বলেই সভ্যতার সঙ্গে এর আর-এক জায়গায় পার্থক্য দেখা যায়। তা হচ্ছে এই—সংস্কৃতি আমরা প্রাচীন গ্রীস থেকেও নিতে পারি, কিন্তু সভ্যতার বেলায় শেষতমটিই চলে, পুরানো জিনিস অচল। দশম শতকের চৈনিক চিত্রকলা আমাদের ভালো লাগতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের রোমান-চিকিৎসাশাস্ত্রকে আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে অধীতব্য বিষয় হিসেবে মেডিক্যাল কলেজে গ্রহণ করতে পারি না।

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা চরিত্রে দু'জিনিস। সভ্যতা সর্বব্যাপী, যন্ত্রগতি, দ্রুত এবং তার রাজপথ সহজতর। কিন্তু সংস্কৃতি পদে পদে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ায়, তার পথ বাঁকা পথ। পরস্পরকে না জেনেও, এক দেশ আর এক দেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারে। কিন্তু গান্ধার-শিল্পের জন্ম সাক্ষাতের ফল নয়, মিলনের ফসল।

চেনাশোনার বাইরে

ব্রজমোহন ভট্টাচার্য

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

চাইছিলাম সে চলে যাক্, আমি একলা থাকি। কিন্তু সে যে কতো ব্যর্থ চাওয়া, হঠাৎ তার অদৃশ্য হওয়া দেখে বুঝতে পারলাম। কত ডাকলাম—"কই গো, কোথায় গেলে তুমি!"—কেউ এলোনা। একটা অশরীরী ভয় আমায় পেয়ে বসলো। পথ হারানোর ভয়, হারিয়ে যাওয়ার ভয়। খামোকা ছুটতে লাগলাম।

কতক্ষণ ছুটেছিলাম জানিনা। আর পারিনা যেন। চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। আমার ধারণা আমি ডাকছিলাম। কানে আমার যে-শব্দটা পৌঁছাচ্ছিল, আমারই কণ্ঠস্বর, তা যেন আর্তস্বরে ক্রন্দন—"কে কোথায় আছো এসো!" কিন্তু কেঁদেছিলাম কি আমি? কি জানি।

হঠাৎ খানিকটা উঁচুতে একটা আলো দেখা গেল। বেশ বুঝলাম জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে কে দাঁড়িয়েছে।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হোলো। আলোটা দেখে কী করব ভাবছি বটে। কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি সেই আগুনটুকুর দিকে। ঐ শিখার মধ্যে আমার জগৎ। শিখায় আগুন, আগুনে শিখা; আগুনে মানুষ, মানবসভ্যতা, মানবসমাজ। এবার আর অশরীরী বচনহীনতা নয়; এবার অগ্নি-উপাসক Prometheus-এর সন্তান মাটির মানুষ।

আমি জানিনা আমি কী বলেছি। কিছুই মনে নেই। কানে যেন বলছে—"জোর বৃষ্টি এসে গেলে এ-পথে উঠতে পারবেনা। সাবধানে গাছের ডাল ধরে ধরে উঠে এসো।"

নারীকণ্ঠ। হোক নারী। মানুষ! মানুষ পেয়েছি! সাবধানে পা ফেলে ফেলে উঠে এলাম। একটা প্রকাণ্ড গুহা। তিনটি মেয়ে বসে বসে আগুন সেঁকছে। বাইরে জোরে বৃষ্টি এলো।

খানিকটা পরে বুঝলাম এরা পথচারিণী। খুব রাত হয়ে গিয়েছিল তাই ওরা এখানেই কাঠ জেলে রাত কাটাচ্ছে। একটা হল্ট্ (halt) মতো। বিপদে আপদে আশ্রয়। মেয়েটা আগুন জ্বেলে-জ্বেলে ছাইয়ে ছাইয়ে ভরতি। প্রত্যে
কিছু কিছু কাঠ এনে রেখে যায় গুহায়। প্রায় সারাবছ
আগুন জ্বলে, যতদিন পথ-চলাচলের জন্য খোলা থাকে
পাহাড়ে মাঝে মাঝেই নাকি এমনিতরো গুহা আছে।

"কোথায় থাকো তোমরা?"

বড়টি বললে—"অনেক দূরে। এখান থেকে চারদিনে
পথ। মেলায় যাচ্ছিলাম। সময়মতো পৌঁছতে পারলাম না
পথে বড় ঝড়বৃষ্টি গেছে।"

"এখন কি করবে?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"কী আবার করব? কাল যাব মেলায়। সেখানে এ
মেয়েটার মাকে বার করবো।"

"ব্যাপার কি?"

ওরা ইতস্ততঃ করছে।

যে মেয়েটিকে নিয়ে কথা তার কাছে শুনলাম যে ত
মা তার বাপকে ছেড়ে দিয়ে অন্যকে বিয়ে করে চলে গে
অন্য গাঁয়ে। সে বাপকে ছাড়তে পারেনি কারণ ত
বাপের দুটো পা-ই কাটা। বাপ পথের গ্যাঙে ক
করতো। ডিনামাইটের কাজ। একদিন পাথর কেটে এক
এতবড়ো ধস্ নেমেছে যে, বাপ পালাবার আগেই নী
পড়ে গেলো। পা-দুটো হাসপাতাল থেকে কেটে দিয়ে
হঠাৎ গাঁয়ে আপেলের দালাল এক ব্যবসায়ী এলো। ে
পাহাড়ী। তার মা সেই লোকটার সঙ্গে চলে গেলে
ওদের দেশে তো যায় এমন, বড়ো কথা নয়। কিন্তু
বাপের মনে সেটা খুব লাগে। যৌবনে সে যখন মিল
রোড তৈরি করতে যায়—তখন এক জমিদারের সু
মেয়ে তার সঙ্গে সাথী করতে চায়। কিন্তু তখন
স্বান্তরে তা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ সে বিবাহি
জীবনে মদ খায়নি সে আর স্ত্রী ছাড়া কোনো মেয়েমানুষ
জানেনি। তাই সেই স্ত্রী চলে যাবার পর থেকে লো
পাগলের মতো হয়ে গেছে। মেয়েটির সঙ্গে যে-ছেলে
বিয়ের কথা, সে এখন আর দেরি করতে চাইছেনা। এ

সে এখন তার মাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কারণ সে তার বাপকে ছেড়েও যেতে পারে না, বাপও তার বাড়ী-ঘর-দোর ছেড়ে নড়বেনা; এদিকে তার পীতমও ঘরজামাই হতে নারাজ।

বললাম—"তুমি অন্ত পীতম ঠিক করো, গাঁয়ের পীতম।"

মেয়েটা কাজল চোখে তীব্র চাহনি হেনে বললে—"আমি মদন পণ্ডিতের মেয়ে, বাবু! পীতম বদলাইনা! আমি জানি মেলায় মা গেছে। সেখানে গিয়ে মাকে ডেকে আনবো।"

"তোমার মা আসবে কেন?"

"এখন আসবে।"

"কেন?"

মেয়েটা চুপ করে গেল।

তার সহচারিণী বললো—"ওর মার খারাপ রোগে গা ভরে গেছে। বাবুজীটি পালিয়ে গেছে। মেলায় প্রবীমাজীর কাছে রোগের ওষুধের জন্ম গেছে সে।"

"সেই রোগসুদ্ধ তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনবে কেন? ও ছোঁয়াচে রোগ। তার পাপের সাজা তাকে ভুগতে দাও।" আমি বললাম।

"সেকি বাবু!" চমকে উঠলো মেয়েটা।

"যা হলেও, মা তো মা-ই। ছোঁয়াচে? মায়ের সবই তো ছোঁয়াচে। ছোঁয়াচ ছাড়া মাকে পেতাম কোথা থেকে। মা এখন লজ্জায় ঘেন্নায় আসতে পারছেনা। আমি গেলেই আসবে। আর বাবা খুব খুশি হবে। তারপর বাবা আর মা থাকবে। আমি পীতমের গাঁয়ে চলে যাবো।"

কিছু বুঝিনা এদের রহস্য। আমি খানিকটা থেমে বললাম—"খাদরালা কোথায় কতদূর জানো?"

ওরা হাসলো; বললো—"খাদরালাতে বসেই তো কথা বলছো। এই গুহার পথ ধরে নেমে বাঁকটা পার হলেই তো খাদরালা।"

ততক্ষণে ফরসা হয়েছে বাহিরটা। চেয়ে দেখি সত্যিই তো খাদরালার পাহাড়ের পেছন দিকেই রোডের মাথায় পাইন-বন যেখানে আরম্ভ সেখান থেকে শ'খানেক ফুট তে গাছে ঢাকা এই গুহাটা।

পরে কতবার দেখেছি।

উঠে দাঁড়ালাম খাদরালার পথে। উত্তর দিকের বরফঢাকা পাহাড়গুলোর সোনার রং চিক্‌চিক্ করছে। আমি ক্যাম্পে ফিরে আর ওপরে গেলামনা। নীচে বরফ-র আগুনের পাশে শুয়ে পড়লাম।

•

জাগলাম; এসে ডাকলো গোপী।

"কমাল্ সাব্ কমাল্। কখন এলেন? ওপরে গেলেন না?"

কমলচন্দ্ বললে—"কেন বেকার কষ্ট দিচ্ছ। এই ঘন্টা-দুই হবে এসে শুয়ে পড়েছে। জুতো অবধি ছাড়েনি। ঐ ভবানন্দ জুতো ছাড়িয়ে দিয়েছে। আমি কম্বল চাপা দিয়েছি, আগুন জোর করে দিয়েছি। আরাম করতে দাও।"

আর আরাম।

"কলকল গীতে সিন্ধু বিভাসে পশিল নদীতে,
নাবিক জোয়ার!…"

এখানে "নাবিক ছেলের দল"।

চা খাচ্ছে আর চলেছে কাজে। আমার প্রবর্তিত সেই কার্ড নিয়ে নিয়ে হাজির। চা-রুটি খাচ্ছে, আর কার্ড জমা রাখছে।

আমি উঠে পড়েছি তখন।

বুদ্ধু গান জুড়েছে। আমি চ'টে উঠে বললাম—"লজ্জাও নেই ঘেন্নাও নেই। রাবিশ ফিল্মী গানগুলো এই সুরভরা আকাশে ছাড়ছো? তোমার কণ্ঠে মাকড়সা জাল পাতবে।"

বুদ্ধুর রাগ নেই। বুদ্ধু ছেলেমানুষ। ইঁদুরের চাউনির মতো ভীরুসতর্কতার মধ্যেও সদাজাগ্রত দুষ্টবুদ্ধি জ্বলজ্বল করে। অবিকল ছোটভায়ের ছাঁচে গড়া মন, প্রাণ, মেজাজ।

সঙ্গে সঙ্গে ধরলো—

"কাল রাতের বেলায় গান এলো মোর মনে—
তখন তুমি ছিলেনা গো, ছিলেনা মোর সনে।"…

আমি মোটামুটি জুতা পেয়ে স্নানের জন্ম এদিক ওদিক চাইছি—ডাক্তার এসে হাজির।

"গোসলখানায় যাও। তোমার রাতে অভ্যাগমের খবর আমি পেয়েছি এবং সকালে যেভাবে পড়ে ছিলে সে-ছবিও দেখে গিয়েছি। তৎক্ষণাৎ এক টিন জল গরম করে রাখতে হুকুম দিয়েছি। গোসলখানায় যাও। আজ দেখবে মন-মেজাজ কেমন খুশি করে দিই!"

গোসলখানায় ঢুকেই বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বললাম—"জীতা রহো ডাক্তার, জীতা রহো। মাত্র এই একদিনের সেবার বিনিময়ে তোমায় আমায় কোথায় বেঁধে দেবো। কোথায় পেলে ডাক্তার এমন খোয়া টার্কিশ টাওয়েল—সাবানের নতুন কেক—গন্ধতেল? ডাক্তার, ইচ্ছে করছে তোমায় জড়িয়ে নাচি।"

"ভেতো বাঙালী আর কি করবে? হ'তে পাহাড়ী, তো বলতে, ঘোড়ায় জীন জুতে ছুট লাগাই।"

"কিন্তু ডাক্তার, ঐ গরম জলে আমার নাওয়া চলবেনা; আমার আরামই নষ্ট হবে।"

"বন্ধু, আরামের জন্য হলে—তোয়ালে, সাবান আর গন্ধতেলের বন্যায় এই গোসলখানাকে মোগলহামাম করতে পারতাম না। যা করেছি সবই অতিপরিশ্রান্ত স্নায়ুপ্রবণ রোগীর জন্য ডাক্তারী ব্যবস্থা। গরম জলও সেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের অঙ্গ। সুতরাং একেবারে ফুটন্ত গরম জলে গা হাত ধুয়ে ফেলো।"

স্নান সেরে নতুন গেঞ্জি আর সার্ট প'রে ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই সামনে পটে ভরা কফি আর প্লেটে সাজানো ক্রীম-ক্র্যাকার, একটুকরো মাখন এবং দুটো ডিম।

ডাক্তার রুগী দেখায় ব্যস্ত। আমি গোগ্রাসে খেতে লাগলাম। সুস্থ মানুষ যেন। সব খেয়ে একটা আপেল হাতে বেরিয়ে মনে হতে লাগলো কালকের রাত্রি যেন একটা ঘোর দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি।

ডাক্তার বললে—"পেলে ওদের?" বলেই হো-হো করে হেসে ফেললে। আমিও কি জানি কেন হাসতে-হাসতে বেরিয়ে পড়লাম কাজ দেখতে।

ফিরে অফিসের কাজ। তারপর খাদরালা-নিউজের লেখা। দুপুরের খাওয়াও সারা। খুব কাজ চলেছে। মহারাষ্ট্র দল দু'বেলাই প্রাণপণে খাটছে। একটা বিশ্রী পাহাড় ওদের ভাগে পড়েছে। সবটা শক্ত চাপ একটা। কাটতে ভীষণ হয়রানি। বাঁকের মাথায় ব'সে চওড়া করতে হবে বেশী।

বেলা আড়াইটা আন্দাজ বসে আছি ম'ম্-ক্লাবে। আমার ম'ম্ পড়া দেখে চার-পাঁচটি ছেলে জড়ো হয়ে বসে দুপুরবেলাটার খাবার-হলের সামনের জায়গার আকাশের তলায় একটা বড়ো সতরঞ্চি বিছিয়ে। আমি জোরে জোরে পড়ি, ওরা শোনে। বেশ কাটে ঘণ্টাখানেক। সেই সময় ভর্মা, বাইসারিয়া, সিন্‌হা ফিরলো। তাদের চেহারা যা দেখলাম তখন আর কিছু বলতে পারলাম না।

কিন্তু সারা ক্যাম্প উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো তাদের প্রতি কী আদেশ হয় দেখার জন্য।

আমি আগে থেকেই বলে রেখেছিলাম যে আমার না আসা পর্যন্ত ওরা একটা বিশেষ তাঁবুতে অন্য সব ছেলে থেকে আলাদা থাকবে। তেমনই হোলো। ওরা শুধু প্রথমটায় তা বুঝতে পারেনি। আর যখন বুঝতে পারলো তখন ঘাঁটাতে সাহস করেনি।

কর্মচন্দ্‌জী আমাদের মধ্যে সবার বড়ো। তাঁর আসল পরিচয় তিনি অফিসের টাইপিস্ট। কিন্তু সেটাই তাঁর নকল পরিচয়। লোকটি স্বল্পভাষী, রসালাপী, মধুরস্বভাব এবং রাশভারী। আমায় একটু বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। বললেন—"ওরা লোক ভালো নয়। কি করবেন ওদের নিয়ে। আপনার পেয়ারের লোক। আমানা এলে ওদের আবার আস্কারা দেবে। তখন আপনার অবস্থা কী হবে ভাবছেন?"

সিগারেট খাচ্ছিলাম আর চোখ বোলাচ্ছিলাম 'Perennial Philosophy'র ওপর। একটা জায়গায় লেখা—

Seccho-র বলা কথা:

What life can compare with this?
Sitting quietly by the window,
I watch the leaves fall and the flowers bloom,
as the seasons come and go.

তার পরে-পরেই চোখে ধরেছে—Ryo Nen-এর কথা—

Sixty times have these eyes behold
the changing scenes of Autumn.
I have said enough about moonlight,
Ask me no more.
Only listen to the voice of pines and cedars,
when no wind stirs.

কর্মচন্দ্‌জীর কথাটাও কানে গেল।

প্রবৃত্তি নেই যে কিছু বলি। না-বলাও ভালো দেখায়না। ভদ্রলোক কি মনে করবেন।

বললাম—"আমি আমার কাজটুকুই সারতে পারি, কর্মচন্দ্‌জী। তার বেশী কিছু করবোও না, চাইও না।"

"তবে হটোপাটি করে গেলেন কেন ধাওয়া করে?"

"একহিসেবে ওরা আমার সমব্যথী; বন্ধু। ওদের জন্যই জীবনে দুর্গমনীয়তে গমন করেছি, অভাবিতকে ভাবনা করেছি। ওদের অপমান আমি করবনা; তবে ক্যাম্পের ভার নিয়েছি; এ দায়িত্বকেও তুচ্ছ করবোনা।"

•

আজ আমার মন যেন কেমন উদাস। ক্ষণে ক্ষণে চিন্তার তরঙ্গে ভেসে আসছে শিশুদের চাঞ্চল্যে প্রাণবন্ত সেই খামার—খলিহান্; পাখির চকিত দৃষ্টি; মেষশাবকের বিহ্বলতা; গভীর রাত্রে ভৈরবীর সদর্প প্রচার; নির্জন পথের ধারার মধ্যে হঠাৎ আত্মবিস্মৃতি—সেই গুহা, আগুন, পাহাড়ী-কন্যার কাহিনী।

খাদরালা ক্যাম্পের জলটা যেখান থেকে আসে

সেখানটায় যাইনি। আজ একা-একা পথ ধরে ধরে সেদিকেই যাচ্ছি।

খাদয়ালা-হোটেলে উঠলাম।

সেই পাথরের টালি ছাওয়া বিশ্রী ঘর। একটা ঘরেই রান্না-খাওয়া। রান্নার জন্য বড়ো বড়ো গোটা চার উনুন। অন্যপাশে পাইনের গুঁড়ি মাঝখান থেকে দু'ভাগ চিরে উল্টে বসানো চারটা পায়ার ওপর—সেটাই টেবিল। সঙ্গে বেঞ্চ-ও ঐরকমই চেরা-গুঁড়ি। একদিকটা সেন, অন্যদিকটা গোল। লম্বায় অনেকটা। পাশে খদ্দের আর গরুর থাকবার জায়গা। অন্যপাশে একটা মুদীখানা।

"না বাবু, সিগারেট আর নেই, ফুরিয়ে গেছে।"

"বলো কি! আমার যে দরকার।"

"আজ তো নাচার। কাল খচ্চর আসবে মাল নিয়ে। তার আগে নয়।"

"দুধের ব্যবস্থা হোলো কিছু?"

"হ্যাঁ, আপনি পাবেন দুধ রোজ আধাসের। তার বেশী হবেনা।"

"সে তো পাচ্ছিই।"

"তবে?

"তোমাদের আমদানি না হওয়া পর্যন্ত তো যা-খুশি দাম নিচ্ছো।"

বনেদী হাসি হাসলো।

বিশ্বসংসারে দুটো পাকাজাত আছে। কোনো কিছুই তাদের মধ্যে ফাটল আনতে পারেনি। একটা হোলো হলী বা মজদুর, আর অন্যটা বেনে। জগতের সব মজদুর একধরনের। এক ঘাটে মাথা মুড়িয়েছে; এক ভাঁড়ে জল খেয়েছে; এক নৌকায় সফর করছে; এক বাজারে সওদা করছে। ওদের সমস্যা এক; ধর্ম এক, নিক্কন এক, বুলি এক। তেমনি বেনে;—সেই তেলালো কথা, শাসালো নেয়াপাতি ভুঁড়ি, কায়েমী হাসি, শকুনে দৃষ্টি, ঘোলাটে বুদ্ধি এবং দুনীতে সহবেদনা। জোঁকের মতো স্বার্থের গর্তে সুবিধার লেজ ঢুকিয়ে দাঙ্গের কাঁকড়া খেয়েই চলেছে, খেয়েই চলেছে—তোয়াক্কা নেই। মাডাগাস্কারের শেয়াল-কাঁকড়ার বা সমাজ, উত্তরমেরুতেও তাই, ন্যাসাল্যাণ্ডও বা ইস্‌বেয়ার্স্‌ অব বোর্নিও বা তাসমানিয়ার কোনও প্রভেদ নেই। শেয়াল—ব্যাঙ—কাঁকড়া—ত্রিকোণ সর্বত্র একই কাহিনী রচনা করে চলেছে সেই নোমাডিক্‌ যুগ থেকে আজ পর্যন্ত, রাজা জর্জের থেকে প্রজা চার্চিল পর্যন্ত। একই ব্যাপার। গুছিয়ে বোঝা দরকার।

আমি সিগারেট পেলামনা। নেমে চললাম আবার পথে। ঘুরে ঘুরে দল বেঁধে বেঁধে ছেলেরা ঘোরাফেরা করছে। আমার ম'স্-ক্লাবের দু'একজন দেখা পেয়ে সঙ্গ নিলে। সাহিত্য-আলোচনা একটু-আধটু হোলো। কিন্তু কিছুক্ষণেই বুঝতে পারলাম ভালো লাগছেনা কিছু। একলা থাকতে ইচ্ছা করছে। একটু থেমে যেতে চাই "to cease upon the midnight hour"। একটু নিশ্বাস নেবার সময়।

ওরা বুঝতে পেরে এগিয়ে গেল।

আমি ঝর্ণার কাছাকাছি গিয়ে একটা পথ ধরে নেমে যেতে লাগলাম। বেশ বেলা আছে তখনও। এধারে বনও তত গভীর নয়। পাহাড়টা তৃণগোছের। ওপারের ক্ষেত-টেত-গুলোও স্পষ্ট। রোদে ক্ষেতগুলোর মধ্যে বেশ 'চেনা-গাঁ চেনা-গাঁ' ধরনের ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে। বেশ নিরিবিলি জায়গা দেখে বসলাম।

নেমে গেছে পাহাড় ধরে ধরে ধাপ রেখে রেখে—আর প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে মাঝে মাঝে পাইন গাছ। ওপারের পাহাড়ের চূড়ায় ঘন পাইনের জঙ্গলের গভীর সবুজ প্রায় কালো করে রেখেছে আকাশের ললাট। সেই ঘন সবুজের বেল্ট্ শেষ হবার পর খানিকটা হালকা সবুজের কার্পেট, ঘাসে ঢাকা, তারপরই গ্রাম আর ক্ষেত।

আমি খাদয়ালা-নিউজের জন্য কাগজ বার করে লিখতে বসলাম। শেষ সিগারেট ধরালাম। আলো যতক্ষণ আছে লিখবো। নোট নিয়ে নিলাম গতকালের ঘটনার। শ্রীমতীকে চিঠি লিখে আনন্দ জানালাম। বেলা গড়িয়ে এলো। সন্ধ্যা হোলো। এধার থেকে পশ্চিম দিকটা দেখা যায়। সূর্যাস্ত দেখা যায়না তা ব'লে। সেটা পাহাড়-চাপা পড়ে। তবু পড়ন্ত রোদের আভায় যে বেদনা-মাধুরী মেলানো, সেই মাধুরীর দীপ্তি পরিবেশন করছিল এই পশ্চিম গগনের টুকরোটুকুনি।

সন্ধ্যার বাতাস। কেমন যেন আমেজ আছে। কাল যেন কেটেছে ম্যাকবেথের দৃশ্য দেখে, আজ যেন দেখছি উইন্টারস্-টেল্। কাল গিয়েছে প্যারাডাইস-লস্ট প'ড়ে, আজ পড়ছি *Skylark* কি *Ode to Autumn*।

হঠাৎ শুনি মৃদু পদক্ষেপ।

ফিরে চেয়ে দেখি একটি স্ত্রী, হটায়-মেয়ে। মুখখানি ধ্যাবড়া গোলগাল। গাল-দুটো লালচে টস্‌টস্‌ করছে। মুখে ফিকফিক হাসি। কাছ ঘেঁষে এসে বললে।

"নমস্তে, মাষ্টার-সাব!"

আশ্চর্য। "নমস্তে। তুমি কে?"

হাত বাড়িয়ে বললে—"এই নাও।"

আশ্চর্য। চার প্যাকেট সিগারেট।

"সিগারেট? কে দিলে? তুমি কে, মা? আমায় চিনলে কি করে?"

"তোমায় অনেকেই চিনে গেছে—তুলসীরাম, মাঙ্গুরাম, পেশাধারের সকলে—রোদু, কোটী, বাহলির লোকেরা সকলেই তোমায় জানে। তুমি মাস্টার-সাব্। আমিও তোমায় জানি।"

"হঠাৎ এতো নামী হয়ে উঠেছি জানতাম না তো?"

"হবেনা? এখানে ক'টাই বা লোক। এর মধ্যে কেউ এলেই জানাজানি হয়ে যায়।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, আমি তোমার কথা কোটীর তুলসীর কাছে খুব শুনেছি। তুমি যী খাওলা—কোন্ দেবীকে দান করেছো তাও শুনেছি। আমার নাম তুস্তা। আমি থাকি কাকোরী গাঁয়ে। এখান থেকে পাঁচমাইল দূরে। দেওকীনন্দন গাঁয়ের মুখিয়া।"

"দেওকীনন্দন তো পেশাধারের মুখিয়া?"

"হ্যাঁ। পেশাধারের দেওকীনন্দন অন্য। আমাদের গাঁয়েও দেওকীনন্দন।"

ইংরেজ রাজাদের মতো এদেরও নামের ভাণ্ডার বড় স্বল্পবিত্ত।

ও বলতে লাগলো—"আমি ঐ হোটেলে বসে বসে চুপি সেলাই করছিলাম। তোমার কথা সবই শুনলাম। দুধ আর সিগারেট চাই তোমার, পেলেনা। তাই ভাবলাম আমি তোমার কিছু সেবা করি।"

এতোদিন এখানে এসেছি, কোনও পাহাড়ী মেয়েকে দেখে মনে হয়নি ঘরোয়া, ভালো-লাগার টানটা ধরেনি। এ মেয়েটি পাহাড়ের মতো চমৎকার নয়, কিন্তু ভালো লাগলো একেবারে ওপারের গাঁয়ের মতো, ঝর্ণার জলের স্নিগ্ধতার মতো। জিতে নিলে এই রোগা অথচ তাজা মেয়েটা। ওর মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল বহুর বসের আগে আমার ছোট যে বোনটা মারা গেছে। তেমনি [illegible] তোবড়ানো নাক-মুখ, বয়স ঘটির গড়নে চেহারা।

"তা তুমি কেনই বা কষ্ট করলে, কী করেই বা পথ জানলে। তা ছাড়া জাননা কি এই ক্যাম্পে মেয়ে আসা বারণ, মেয়েদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা বারণ। আমি বড়ো; আমিই বারণ শুনবোনা?"

হাসছে তুস্তা। একেবারে দু'খান-করা হাসি। লজ্জা-সরম বাধা-নিষেধ না-মানা হাসি। দাঁতের বাহারের পানে চোখ আটকে থাকে।

"কষ্ট কি? ঝর্ণার ওধারে আমার গাঁয়ের একজনার একটা দোকান আছে। তার কাছে সিগারেট থাকে। আমি জানতাম। আমি ছুটে নিয়ে ফিরছি। দেখি তুমি আসছো। আমি অনেক আগে পৌঁছেছি পাকদণ্ডি ধরে। ফিরে চললাম দোকানে। লক্ষ্য করলাম তুমি কি কর। অনেকক্ষণ লিখলে, মাস্টার-সাব্। আমি বলি কি সিগারেট ধরাও, আমায় একটা দাও। আর ঐ দোকানে চলো চা খাবে। কী ভাবছো? ক্যাম্পে কেউ জানে নাকি যে আমি ঐ বাদরালা-হোটেলে রাত কাটাই? ওঃ বাবা, তবেই তাড়াবে! আমি হোটেলওলার বৌয়ের ঘরে থাকি। ওর ছেলের তদারক করি। গরুকে সানি পানি দিই। খদ্দেরের সেবা করি। বদলে থাকতে দেয়, ঘোমটা দিয়ে থাকি। তোমায় দেখে বড়ো ভালো লাগে তাই সিগারেট খুঁজতে এসেছিলাম।"

"তুমি তো দিলে, মা, আমি এখন কী দিই?"

"ওঃ বাবা, তুমি তো বেনিয়া কম নও, মাস্টার-সাব্। তোমার জন্য আমি আমার প্রীতমকে দেখতে পাব। তোমাদের সঙ্গে কাজ করে আমার প্রীতম। আজ ছ'মাস পরে এদিকে এলো। খুব ভালো কাজ জানে তাই সিমলা থেকে আসতে সময় পায়না। একসঙ্গে একমাস থাকবে তাই বড়ো খুশী। আমিও খুশী। ওকে নিয়ে রোজ রাতে এই দোকানটায় চলে আসি। গাঁয়ের ভাই একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছে।"

দোকানে এসে গিয়েছিলাম। চা চড়লো। আমি গল্প করতে লাগলাম।

জীবনের রসে অবগাহন। এই লোলুপতা আমার যাবার নয়। যখন যেখানে গেছি—নগর, কলরবমুখর, প্রগল্ভ নরনারী আমায় টেনেছে। মানুষ। মানুষের কথা, মানুষের গান, মানুষের প্রাণ—আমার সব নেশার বড়ো নেশা। শ্রেণী নয়, শিক্ষা নয়, লিঙ্গ নয়, সজ্জা নয়, জাতি নয়, ভাষা নয়—কোনও প্রভেদই প্রভেদ নয়—মানুষ যতক্ষণ মানুষ; তার প্রাণের কথা যতক্ষণ তার প্রাণের প্রবাহ।

আমি এদের পেলাম। গল্প পেলাম। চা পেলাম, সিগারেট পেলাম—and the wilderness is paradise now—আমায় গোপী না তুললে ডাক্তার না ডাকলে এখন আমি সমাহিত।

তুত্তার স্বামী কুলী-গ্যাঙে কাজ করে। তার বাড়ী কেকই গাঁয়ে। বয়স ছাব্বিশ। তার বিবাহ হয় প্রথম এক কিশোরীর সঙ্গে। সাপের কামড়ে সে মারা যাবার পর কিছুদিন ও পাগলের মতো থাকে। তখন এক বর্ষীয়সী ধনাঢ্যা রমণী ওকে সেবাযত্ন করে ভালো করে। কিন্তু তারপরে ওকেই সে বিবাহও করে। গাঁয়ে খুব বড়ো ভোজ হয়। কিন্তু সেই রমণীর পরিবারে এক পাহাড়ী চাষীও ছিল, ক্ষেতখামার তদারক করতো। একদিন একটা বিশেষ অবস্থায় সেই লোকটার সঙ্গে বর্ষীয়সী পত্নীকে দেখার পর ওর স্বামী হঠাৎ বুড়ীকে মারধোর ক'রে বসে, যেটা পাহাড়ী সমাজে গর্হিত ব্যাপার। ওদের বিয়ে ভেঙে যায়। তারপরেই তুত্তার সঙ্গে ওর ভাব-সাব আরম্ভ হয়। এখন তুত্তা জানে দুনিয়াটা যতবড়োই হোক, তার স্বামীর দিল্ আর কলেজার কাছে ছোটো, খুব ছোটো। আর তার গান। "মাস্টার-সাব্ শোনাবো তোমাকে তার গান। বনের সাপ, হরিণ, পাখীও বশ মানে।"

"বশ-মানা সাপই তোর সতীনকে কামড়েছিল বুঝি তুত্তা ?"

তুত্তা হেসে সবিনয়ে বললো—"সত্যি, চমৎকার গায়।"

ছোট্টো ঘর। ওরই মধ্যে চা তৈরি করে আমার হাতে যখন দিল তখন আমার মন ভরে আছে তুত্তার সরল মনের মতো ও-পাহাড়ের গায়ে আঁকা গ্রামখানার ছবি।

কিন্তু ফেরার তাগিদ আছে। আজ আমার কথা দেওয়া আছে দুর্গাপ্রসাদকে। তার সেই ক্রিকেট-ক্লাবের ব্যবস্থা করতেই হবে।

হোলোও। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে খবরালা-নিউজ সংক্রান্ত কাজকর্ম সেরে ফেললাম পার্থিবের সঙ্গে। খবরালা-নিউজের সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ বুড়্। প্রধান সম্পাদক যে পার্থিব নিজে, আগেই তা বলেছি। বুড়্ দেখি হাসছে। পার্থিব ততক্ষণ চলে গেছে।

ভারী দুষ্টু ছেলেটা। সেয়ানার অগ্রগণ্য। "হাসছো কেন শুনি ?"

"মেড়ো বেটা ভাবছে উনি কতো ইম্পর্ট্যান্ট্। ওর ধারণা ও-ই সব খবরালা-নিউজটি লিখছে।"

আমি কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললাম (সত্যি রাগ করা যায়না বুড়্র ওপর)—"আবার অসাক্ষাতে কথা বলছো ? যাই কিছু বলোনা কেন, অসহিষ্ণুতা ও অশালীনতা প্রকাশ পাবে কেন ?"

করমচন্দ্ জীও হাসছে। বুড়্ জব্দ ! ভবানন্দও মজা পাচ্ছে। বুড়্ জব্দ।

বুড়্ বললো—"আমি ওসব শালীনতা কালিনতা বুঝিনা বাবা। আমার রাগ হয় ওর কড়কড়ানি দেখে। আহানা ওকে নাচিয়ে তুলেছে।"

"তা নয় বুঝলো, তোমার জ্বালা কেন ?"

"আমি দাদা চাল্ দেখতে পারিনা। একটা গল্প লিখেছে। ইংরেজী লিখেছে—He burst out his basket of love pathetically."

এবার হাসি চেপে রাখা কঠিন হোলো। করমচন্দ্ ও ভবানন্দ একেবারে হো-হো হাসতে লাগলো।

বুড়্ খোঁচা খেয়ে বললে,—"Purgatory লিখতে purgative লিখে বলে slip of tongue হয়েছে।"

হাসতে হাসতে বুড়্কে বললাম—"থামো বুড়্, থামো। দশহাজার ফুটের মাথায় এডিটরি করতে গেলে purgative ছাড়া purgatory-র তল্লাস মেলেনা। কত উঁচু কিনা। ঐ পার্থিবের রসজ্ঞান আছে।"

করমচন্দ্ আর ভবানন্দ খুব হাসতে লাগলো। এর মধ্যেই দেখি দুর্গাপ্রসাদকে নিয়ে গোপী আর বিক্রম। গোপী বললে—"জনাব, মুসলমান শাদী ক'রে তিনবার 'তালাক' বললেই খালাস। কিন্তু জনাব, জোরুর গাঁঠ থেকে মুক্ত হবার মন্ত্র কোরান-হদিসেও নেই। আপনি জালিম।"

একগাল পান। দামী জর্দার গন্ধ। খুব সেজেছে। হাতে ছড়ি।

বিক্রম বললো—"কাজ কেমন এগুচ্ছে স্যার ? সত্যের কাজ দেখলেন ?"

"আজ আর যাইনি কোথাও, বিক্রম। দুর্গাপ্রসাদ রিপোর্ট দেবে।"

দুর্গাপ্রসাদ বললে—"দিলীপ মোহন খাতার দলে খুব কাজ চলেছে। বিক্রম ঐ দলে, আর তিনটি বাঙালী ছেলে আছে ঐ দলে। একেবারে শেষ দলটা। যেতেই হয় প্রায় আড়াই মাইল। কিন্তু খুব speed-এ কাজ করছে। আর মহারাষ্ট্র দল। ওঃ, অমানুষিক পরিশ্রম। ওরা পাথর সরাবার মতো ধৈর্য নিয়ে এসেছে। কী কঠোর পরিশ্রমী। দু'বেলা সমান খেটেছে। খাবার অর্গানাইজেশন ভালো। মীর্জাপুর বেশীর ভাগই আড্ডা দিচ্ছে। কিন্তু পাহাড় থেকে ছিঁড়ে সিদ্ধিপাতা কাঁচা খাচ্ছে আর গুণ্ডার মতো কাজ করে যাচ্ছে। অনেকটা সাফ করে ফেলেছে। ঐ ছাড়া

ক্যাম্পের ওধারে পাহাড়ীদের দলটাও খুব খাটছে। ওদের কাজ আর খালাসের কাজ দেখলে ভরসা হয় আমরা কাজ শেষ করবো।"

আমি একটু মজা দেখবার জন্য বললাম—"গোপী কোন্ দলে আছ?"

বিক্রম হেসে ফেললো।

গোপী কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বললো—"জী জনাব। উড়েদের ভাষাটাই আজও undeveloped, তাই ওদের ভাষায় সত্যকথা বলার বয়স এখনও আসেনি। এই উড়েটার কথায় রিপোর্ট নিচ্ছেন স্যার?"

"কিন্তু আমি তো ইংরেজীতে বললাম।"

গোপী বললে—"ঐ তো দেখুননা বুদ্ধির বহর। ওকি ইংরেজীতে ভাবছে? ভাবছে তো ওর সেই উৎকলী ভাষায়। যে ভাষায় এখনও সাফ্ লফ্জ্ ব'লে জিনিসই নেই। হকিকত্ (সত্য)-এর প্রতিশব্দ নেই। ওদের জীবনে এর ব্যবহার নেই।"

দুর্গাপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললে—"তোমার উৎকল-ভাষার ওপর তো যথেষ্ট অনুরাগ দেখতে পাচ্ছি। পড়েছো ও-ভাষা?"

"তোবা, তোবা; পড়ে সমালোচনা? সে উৎকলী primitiveরা করে। দুনিয়া এখন এগিয়ে গেছে হে দোস্ত্। এখনকার latest report—না দেখে, না গিয়ে তো হবেই, সেটাই বিধি। In fact যা হয়নি তাই নিয়েই modern journalism। পড়ার পর বইয়ের সমালোচনা ঐ কটকে এখনও চলে। আমাদের এলাহাবাদ-বা-লণ্ডনের মতো জায়গায় সমালোচকরা না-লেখা বইয়ের সমালোচনা in advance block করিয়ে রাখেন। যখন যেমন বই পান একটা করে ছেড়ে দেন। Latest mechanised form of criticism;—উড়ে, তোমরা বুঝবে কি?"

"উড়ে উড়ে করছো? উড়ে কি মানুষ নয়?"

"হকিকত্ এই যে, আমি জানিনা। জামউদ্দীন কন্সাল্ট করতে হবে। তবে আমার এক উকিল বন্ধু—জজিয়তি পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছেন হাসানবাবু—তিনি বলেছেন ইংরেজী আইনে মানুষ খুন করার সাজা ফাঁসি হলেও, উড়ে মারলে ফাঁসি হয়না।"

দুর্গাপ্রসাদও যত হাসে আমরাও তত হাসি। আর গোপী ততই বলে—"হকিকত্—বকিকত্—বিল্‌কুল জনাব, বিল্‌কুল। তবে আমি জানিনা আপনারা মানবেন কিনা। ভালো কথা, সার কথা, ক'জনাই বা মানেন।"

"কিন্তু কোন্ দলে কাজ করছো তুমি? সেখানে কিরকম কাজ চলছে?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

গোপী বললে—"সবচেয়ে কঠিন জায়গা এবং সবচেয়ে দূরে।"

দুর্গাপ্রসাদ বলবার আগেই বিক্রম বললে—"শালা, চোর।"

জয়চন্দ্ বললে—"নং ৫ গ্যাঙ্ হবে। খুব নরম মাটি, পাথর নেই বললেই হয়। বড়ো বড়ো গাছ। কেটে চাড দিলেই মাটিশুদ্ধ পড়ছে।"

"হ্যাঁ, আর কদাল দিয়ে খেড়ে পরিষ্কার করে ফেলা হচ্ছে! আপনি বেধড়ক হয়ে এইসব সাদা-মিথ্যা (সফেদ ঝুট—white lie) বলে চলেছেন। আর মশাই, কাছে মানেই তো আমরা দূরে। কারণ নিকট ও দূর তো relative কথা। যারা দূরে তাদের জোরাই আপনাদের এতো বেশী তারা দিলের কাছে কাছে আছে। আর আমরা আপনাদের দিল থেকে বহু-বহু-দূরে, জনাব। দূরত্ব যে কী তা বিরহী ততো বোঝেনা। এক রাস্তার এপা ওপার জানলায় বসে যারা প্রেম করে তারাই বোঝে— am here and you are there and a hundred miles between."

বিক্রম বললে—"সাবাস্। আর নরম মাটিটা শক্ত করাবে কি করে?"

"নরমই হোক আর শক্তই হোক, প্রশংসা পাওয়াটা শক্ত। আরে বাবা, এসেছি বেকালে, সাফ করে দিয়ে নামবো। কিন্তু 'প্রশংসা পাবোনা' এই দুর্ভাবনার মধ দিয়ে কাজ করা, এবং 'প্রশংসা পাবো' এই আশার মধ দিয়ে কাজ করার মধ্যে শক্ত কোন্টা জনাব, আপনি তে হিম্মত্‌দার, আপনিই বলুন।"

"শুনছো দুর্গাপ্রসাদ?" আমি ইঙ্গিত করলা দুর্গাপ্রসাদকে।

দুর্গাপ্রসাদ বললে—"শিখছি দাদা, শিখছি! সত্য রিপোর্ট কি করে দাখিল করতে হয় তারই তালিম নিচ্ছি।"

মাথা নীচু করে একহাতে [illegible] আদাব জানিয়ে গোপী দুর্গাপ্রসাদের স্নেহটুকু গ্রহণ করলো। দুর্গাপ্রসা প্রত্যভিবাদন করলো গোপীকে ব্যঙ্গ করে।

যেভাবে গোপী 'উড়ে' 'উড়ে' ব'লে দুর্গাপ্রসাদকে ধরেছিল তাতে আর কেউ হলে রেগে যেতো। কি সত্যিকার প্রীতির বন্ধনের এতো জোর-বাতাস যে—ধুলো বালি, খড়কুটোকে দাঁড়াতেই দেয়না। সব উড়িয়ে নি

চলে যায়, রেখে যায় নির্মল জীবনের ইঙ্গিত। আমি লক্ষ্য করেছি যে, যে-কোনো ভালো আড্ডায় একজন করে বিদূষক থাকে। ইংরেজীতে বলে butt। এরা ঠিক ভাঁড় নয়। কিন্তু এদের ঠ্যাং সহজেই ধরে কাৎ করা যায়, এবং সকলের উৎসারিত শ্রী-হস্তে এরা এদের ঠ্যাংটি এগিয়ে দিতে দ্বিধা করেনা। এদের উদার মনটিই একটামাত্র জানলা, সেদিক থেকে খালি বয় রহস্যের মনমাতানো বাতাস। হাজার ঠাট্টা-বিদ্রূপের একমাত্র পরিচয়—'তোমায় আনন্দ দিল কি?' —তা যদি দেয়, তা হোলেই হোলো। মূল্য তাকে দিতে হয় হোক। সে আনন্দিত। মেসে, হোস্টেলে, হোটেলে বড়ো বড়ো দলে এই লোকটিকে আশ্রয় করে জাত ভুলে, সমাজ ভুলে, বা জিলা ভুলে কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হতে দেখেছি। সুরসিক তার রসে স্নান করে। 'গাড়োল' যারা তারাই ক্ষেপে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে;—সে আবার তখন অন্য-ধরনের মজা! হোস্টেলে, ক্লাবে, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই ধারাটি আন্তর্জাতিক। আমাদের দেশে 'বাঙাল', 'ঘটী', '[illegible]', 'বাবিন্দির', 'বখ্‌নে' ইত্যাদি কথার চল্—সরল [illegible]হাসকে যে কতো নব নব রসে সঞ্জীবিত করে রেখেছে, কতো সুন্দর মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে, কতো পরম বন্ধুকে নিকটতর পরিবেশে টেনে এনেছে তার ইয়ত্তা নেই।

যারা ব্যক্তিগতভাবে এইসব আলোচনা চালায় বা এসব কথার মূল্য মান-অপমান দিয়ে যাচাই করে তাদের বলতে ইচ্ছা যায়: "আপনি কী হারাইতেছেন আপনি জানেন না!"

দুর্গাপ্রসাদ এসেছিল সেই debate নিয়ে আলোচনা করতে। ঠিক হয়ে গেল কাল প্রথম পলিটিক্যাল সভা হবে। রমেশচন্দ্র নোটিশ টাইপ করলো, আমি স্বাক্ষর করলাম এবং নোটিশ-বোর্ডে টাঙিয়ে দিলাম।

ওপরে ওঠার আগে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে পারলাম না।

"ভাই শীত করে ভীষণ। ঘুমুতে পারিনা।"

"শীত তাড়ে দুই আর রুই।"

"দুই আর পাই কোথায়? রুই পাইয়ে দিতে পারো?"

"কি চাই? কম্বল? ক'টা চাই? আমার কাছে এই হাসপাতাল বলে খান কুড়ি আছে। লুকিয়ে তোমায় চারখানা দিতে পারি।"

যতক্ষণ পাইনি, বেশ দরকারী বোধ হচ্ছিল। এখন পেয়েই মনে হোলো ডাক্তারের সঙ্গে আলাপের সুবিধা বাগিয়ে আমি চারখানা কম্বল-হাসিল করলাম। ঠিক। কিন্তু ঠিক কি? এই শীত তো অনেকেরই হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে; আমি কেন বিশেষ সুবিধা নেবো।

ডাক্তার মিটিমিটি হাসছে।

"হাসো কেন?"

"নেবেনা কম্বল, নয়?"

"ঠিক বলেছ। না নেওয়াই উচিত।"

ডাক্তার বললে—"যখন চাইলে তখনই কাগজের টুকরোয় একটা কথা লিখে ঐ বইটার তলায় রেখে দিয়েছি। কাগজ তোলো, পড়ে দেখে নাও।"

একটু থেমে বললাম—"না, আমি দেখবোনা। আমার আর একজন বসে বসে study করছে ভাবতে আমার বিশ্রী লাগে। আমি দেখবোনা।"

"আর পয়সার বদলি আর্টিস্টরা যখন ন্যাংটা ক'রে মেয়েদের বসিয়ে রাখে, study করে, তখন? তখন সেটা ভালো লাগে তো?"

"সে-কথার কাজ কি? আজ আমি তোমার সঙ্গে কথায় ফাঁসবো না। ওপরে গিয়েই লম্বা ঘুম দেবো। আজ বড় ক্লান্ত। Study করতে যাদের ভালো লাগেনা তাদের কিছুতেই ভালো লাগেনা। আমি একজন বাঙালী মহিলা-আর্টিস্টকে জানি। জীবনের বেশীর ভাগই তিনি প্যারিসে থেকে থাকেন। মাঝে মাঝে ভারতে আসেন। আমার একজন বিশেষ পরিচিতা বান্ধবীর কথা বলছি শোনো। এম.এ. পাস করে চাকরি খুঁজছে, কাজ চাই। এটা-ওটা-সেটা করতে করতে ঐ আর্টিস্টটির কাছে লোভনীয় কাজ পেলো। দু'চারটে চিঠি লেখা, টাইপ করা; একটু আধটু সময় সঙ্গ দেওয়া, গালগল্প করা; ব্যস্। পয়সা মন্দ নয়। ইতোমধ্যে আমার বান্ধবীর সাংসারিক অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে এলো। কাজ করে আরও পয়সা চায়। কাজ পায়না। এ-কাজটা ছাড়তে পারেনা। অভাব, অভাব। কাগজের জন্য লিখতে লাগলো, ভালো ভালো লেখা। প্রত্যেকটা ফিরে আসে। (পরে এই কথা নিয়ে আমার বান্ধবী অনেক হাসাহাসি করেছে—কারণ প্রত্যেকটি article অবিকল পরে কাগজে ছেপেছে, এমনকি দাম দিয়েছে ভালো;—কিন্তু তখন তিনি বিশেষ সমস্যা—বলেন আর হাসেন।) এই অবস্থায় হঠাৎ সে একদিন ও-কাজটাও ছেড়ে দিল। আমি তো শুনে স্তম্ভিত। আর্টিস্ট মহিলাটিকে যতদূর জানতাম খুব ভালো, খুব ভদ্র ব'লে জানতাম। তাঁর সঙ্গ এমনি পাওয়াই একটা বিশেষ ভাগ্যের কথা; অথচ তার

ওপরে টাকা। এ কাজ ছাড়লো কেন? আর্টিস্ট তার কাছে একদিন বলে যে টাকা সে অনায়াসে রোজগার করতে পারে চেহারা যখন তার এতো ভালো। সে যদি নিরাবরণ হয়ে রোজ দু'ঘণ্টা ক'রে বসে আর ছবি আঁকতে দেয়, বহু টাকা এখুনি সে পাবে ঐ আর্টিস্টের কাছে। শুনেই আমার বান্ধবী পালিয়ে এসেছে। আর্টিস্ট বলেছেন নাকি যে প্যারিস হোলে এই ধরনের প্রস্তাব বিখ্যাত শিল্পীর কাছ থেকে পাওয়া যে কেউ মাথায় মনে করতো। কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও ভারতবর্ষ। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন সে পালালো। বুঝলাম যে তার অভাব তাকে অনেকটা ঠেলে এনেছে তার পূর্বপুরুষের আভিজাত্য থেকে বটে। কিন্তু উৎকোচ এবং অভাব, মৃৎ কলসী আর নদীর জল পাশাপাশি বেশীদিন রাখা যায়না। কলসীর শূন্য জলকে চাইবেই এবং একদিন কলসী জলে ডুবে যাবে। এখন লোকে কলসী দেখিয়ে বলবে—"একটু জল ঢালো তো!"—কলসীর কথা কেউ বলবেনা। সে ধারক, বাহন, আধার মাত্র। কথাটা ভারী সুন্দর করে বলেছিল সে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান সব সময় অহংকার নয়। এবং নিজেকে আর কেউ study করছে এই বোধটা সব সময় বেশ রুচিপ্রদ হয়না, খুব রুচিকর পরিবেশেও। আসল কথাটি, মানুষ বড়ো আজব জীব। আর তার মনটি রামধনু-বাটা রঙে রঙীন। বাতাসে বাতাসে, আলোয় আলোয় বদলাচ্ছেই, বদলাচ্ছেই। বোঝা ভার। আচ্ছা, শুভরাত্রি। চলি—"

•

শীত করেনি সে-রাতে।

বিক্রম আর গোপী জানতো আমার শীত করে।

ওরা দুজনে একটা বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করেছে, আমায় দিয়েছে ওদের বাকী একটা তোশক এবং একটা লেপ।

বললে—"দুজনে আমরা এক লেপে, বেশ গরম হবো। আমরা দুই, আপনি নিন্ দুই। সংকোচ করবেন না। বরং গরম হয়ে একটু 'ট্যাগোর' পড়ে পড়ে মানে বোঝান্। বলুন ট্যাগোর থেকে দু-একটা প্রেমের কবিতা—ব্রাউনিং হার মানে এমনি।"

হেসে বলি—"ঐ ব্রাউনিং? ব্যস্? কেন তোমাদের গালীব, জৌক্—এঁরা?"

শুয়ে পড়েছি। আলো নিবে গেছে। বাইরে ল্যাম্পটা জ্বলছে। এধারে চুল্লীতে গরম জল ফুটছে। তুলসীরাম মজলিসকায় ব্যস্ত আছে নিশ্চয়। ওধারে তাঁবুতে দুর্গাপ্রসাদ ঘুমুতে পারেনা; পটনায়ক আর সর্দাররা মিলে তাস চালাচ্ছে। "আমার ঐ হার্টস্ দেখেও ঐ স্পেড্‌স্ ডাকলে; নো-ট্রাম্প্‌স্ ডাকলেনা?" ··· ওধারে মীর্জাপুরের চ্যাংড়াগুলো ফিল্মী গান গাইছে, আর মাঝে মাঝে এমন হল্লা করছে, বোঝা যাচ্ছে অশ্লীল এয়ারকি করছে পুরোদমে।

বিক্রমের গলা সাড়া দিলো; ও বললে—"প্রেম নয়, কাব্য। শুনুন—

'কোই উম্মীদ্ বর নহীঁ আতী। কোই সূরত নজর নহীঁ আতী।
আগে আতী থী হালে দিল্‌পে হঁসী। অব কিসী বাত পর নহীঁ আতী।
হম্ ওয়াঁ হৈঁ জহাঁসে হমকো ভী। কুছ হমারী খবর নহীঁ আতী।
মোত্ কা একদিন মোয়াইয়ন্ হৈ। নীঁদ ক্যোঁ রাত ভর নহীঁ আতী।
মরতে হৈঁ আরজূ মে মরনে কী। মোত্ আতী হৈ পর নহীঁ আতী।
কাবে কিস্ মুঁহ সে জাওগে গালীব। শরম তুমকো মগর নহীঁ আতী।'"*

"আমাদের কবি বলেছেন শোনো"—বললাম আমি—

'আশাহীন দিন দুরাশার দীনে রঙিন উষার বর্ণ
কখনো হতো বা হাস্যের মতো হাতে ওড়ে কমলা বর্ণ
আমার্জনার খঞ্জপুঞ্জে বাজার পথ বন্ধ
দীর্ঘ দুহন শুষ্ক সূর্য বৈশাখ মাস রুদ্ধ
হঠাৎ তখন কার লেখা মন দিলো বদলে দিলো
প্রাণে যদি মন গান অজস্র সুর যদি না দিলো।'"

গানিটাই এদের অভিভূত করেছিলো। তবুও অর্থ বলার পর ওরা সমস্ত কবিতাটাই শুনলো।

তখন গোপী বললো—"আচ্ছা, এইধরনটার কী আছে রবীন্দ্রনাথে বলুন—

'What if we still ride on we two
With life for ever old yet new,
Changed not in kind but in degree
The instant made eternity,—
And heaven just prove that I and she
Ride ride together, for ever ride?'"

---

* আশাহীন দিন, উপায় বিহীন, এ—কেমন?
কর্মই ক্লেশের কঠিন আবরে বেঁধেছি মন;
আর সেই হাসি নাই সে নাই।
গভীর আঁধার রাত—ব্যথার বেদনে ভরাহীন।
প্রতিদিন বিচ্ছিন্ন হলে একটি দিন—
চোখে ঘুম কেন নাহিরে নাই?
মরণ চাহিয়া মরিয়া মরিয়া মরিব কি?
পরাণ পরান মরি তবুও মরিনা তাতে কি।
মরণ তবুও আসিয়ে নাই।
তোমার আমার তীর্থ গালীব। হায়রে হায়!!
কোন্ মুখে যাবে তীর্থ করিতে? লাজ কোথায়?
তোমার লজ্জা নাহিরে নাই।

…"বিলিতী পীচ আর চেরির বাদে আর আর পেয়ারায় খুঁজলে পাবে কেন গোপী ? [illegible] [illegible] আলাদা হলেও, দৃষ্টিবোধে তারা একই। কোনো রবীন্দ্রনাথের দুটো কবিতা—

[illegible] রবে মোর [illegible] কাছে
একদা বসিয়ে চাও বোলো—
এই কথাটুকু রেখো মোর চিরকাল
ভালবাসার ছবি তুমি দেখো
মনে ভাবনায় আমি পথের [illegible]
যাহা দাঁড়ালো দু দিকেই [illegible] যবে যাবে,
ভোরের সময় হলো দেখা সবাই
আবার আসিতে হবে এসো—
জানি দেখা হবে তবে জানি নেই
তবু ভালো বাসা যদি বোলো…

আর একটা এই সঙ্গে দেখো—

[illegible] [illegible] বিজলিমায় [illegible]
[illegible] নিবে [illegible] কাছে—
এক দিনের [illegible] [illegible] যাবে
[illegible] [illegible] নাহি চলে।
যদি দিতে নদী [illegible] [illegible] যদি
বিনা পাতের কাঁচি
চতুর মুখে [illegible] কাঁদিব
তুমি আছো আমি আছি।"

ওরা কাব্য বলে জৌকের, ফিরাকের, হাফিজের, ইকবালের—আমি বলি রবীন্দ্রনাথ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি থেকে ;—তারপর রাত্রি হয় গভীর গভীরতর। পাইন-বন ডাকতে থাকে। গোপী খানিকক্ষণ আগেই ঘুমিয়েছিল, বিক্রমও ঘুমায়।

খাদরালার জঙ্গল আর ঘুমাবো। চোখ বুঁজি, ঘুম আসেনা। নিশির-ডাকের মতো খাদরালা-অরণ্যের উদ্বেলিত ধ্বনি-তরঙ্গ আমায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রাণপণ চেষ্টা করি লেপের মধ্যে থাকবো ; বেরুবো না। বোঝাই নিজেকে যে আমি বড়ো ক্লান্ত। আজ আমার ঘুমানো উচিত ;—আজ আমি ঘুমাবো। কিন্তু নাঃ—আমায় ডাকছে কে—"শোবে কি গো ! শেষে গিয়ে কতো শোবে। এসো এসো, ছাখো কতো সেজেছি !"

না বেরুলে দেখতে পেতামনা গিরিচূড়ায় প্রতিফলিত রক্তাভ চন্দ্রালোকের জ্যোতি-তরঙ্গ। ম্লান জ্যোতি ; কিন্তু পাহাড়ের রক্তস্রাব তাতেই যেন বিহ্বল।

আর ডাকছে পাখী। নিরন্তর ডাকছে। কেউ ওর ডাকে সাড়া দেয়না, তবু ডাকছে।…যেমন ডাকছে আমার মন। কেউ ওর ডাকে সাড়া দেয়না, তবু ডাকছে।

তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। জাগলাম একেবারে তুলসীরামের সাড়া পেয়ে—"বাবুসাব্—চা !"

[ক্রমশ]

A HIGH CLASS FOUNTAIN PEN INK
Sulekha
SULEKHA WORKS LTD.

সুলেখা
ফাউন্টেনপেন কালি

সর্ব্বাধিক বিক্রয়ের গৌরব
অর্জ্জন কোরেছে

(স্পেশাল)
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বে • মাদ্রাজ

একালের দ্বৈরথ

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাগজে তো কত মজার খবর থাকে, কিন্তু সকালে উঠে কাগজ খুলতেই যদি চোখে পড়ে: গত সোমবার জুয়ার ধার নিয়ে একজন অ্যাটর্নি আর এক লাইব্রেরির মালিকের মধ্যে বচসার ফলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়,—অ্যাটর্নি ঘটনাস্থলেই মারা যান—তাহলে কী মনে হবে? এরকম একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দুজন শিক্ষিত লোক পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করতে পারে? শেষপর্যন্ত হয়ত একটা অদ্ভুত কাণ্ড, অপূর্ব ঘটনা ব'লে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অন্য খবরে চোখ ফেরাবেন? কিন্তু ব্যাপারটা অদ্ভুত হলেও, যখন ঘটেছিল, তখন আদৌ অপূর্ব বা অপ্রত্যাশিত মনে হত না।

খুব বেশিদিনের ব্যাপার নয়, বড়জোর দুশো-পৌনেদুশো বছর আগেকার কলকাতায় খবরের কাগজ দেখলেই এরকম দ্বন্দ্বযুদ্ধের খবর সপ্তাহে এক-আধটা পাওয়া যায়।

ওপরের খবরটা বের হয়েছিল ১৭৮০ সালে ৩১এ মে তারিখের 'ক্যালক্যাটা গেজেট'এ। ক'দিন বাদে আবার ৫ই জুলাই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে নিহত করার জন্যে একজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলার খবর দিয়ে বলা হয় যে, জুরীরা আসামীকে নির্দোষ ব'লে রায় দিয়েছেন। আইনের চোখে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অপরাধ, কিন্তু হত্যাকারী অভিযুক্ত হলেও বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। অবশ্য সবাই তা পেত না, দোষী প্রমাণ হলে কিছু জরিমানাও হত।

শোনা যায়, মধ্যযুগে নাইটরা নাকি প্রেমের খাতিরে, মর্যাদা রক্ষার জন্যে প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতেন। মোটামুটি বলা যায় যে, নাইটরা একটা আদর্শ, বিশ্বাস বা প্রেরণাবশে দেশের জন্যে, রাজার জন্যে কিংবা প্রণয়িনীর জন্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া মোটেই অগৌরবের ব'লে মনে করতেন না। আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকেই 'দ্বৈরথ'এর রেওয়াজ ছিল। রামায়ণ-মহাভারতে তার অনেক নজীর আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষাকে জগৎসিংহের প্রতি অনুরক্ত দেখে প্রতিদ্বন্দ্বী ওসমানকে দিয়ে জগৎসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছেন; কিন্তু আঠারো শতকের ইংলণ্ডে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কারণ হয়ে ওঠে তুচ্ছাতিতুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনা। বন্ধুর বাড়িতে হয়ত বসে গল্প করতে করতে কোনো বিষয়ে তার মতে আপনি সায় দিতে পারলেন না, ব্যস্, সে আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাবে, আর আপনি সে-আহ্বান গ্রহণ না করলে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবেন না। ভাবতে পারেন এ অবস্থা? কিন্তু সত্যিই তাই হত। ১৭৬৫ সালের 'ওয়েস্টমিনস্টার জার্নাল'এ দ্বন্দ্বযুদ্ধের এক বিবরণ ছাপা হয়। ব্যাপারটা কী? না, এক শুঁড়িখানায় দুটি শ্রমিকের মধ্যে 'স্প্র্যাট' মাছ কি করে রাঁধে তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হ'ল। একজন বললে, মাছ ভাজে; আর একজন বললে, না, সেদ্ধ করে। সত্যি কী করে, তা জানবার জন্যে কারুরই কোনো মাথা-ব্যথা নেই, মাঝখান থেকে ঠিক হল দুজনে লড়বে। বন্ধুবান্ধবরাও খুশি। তারা চাঁদা তুলে তিন শিলিং দিয়ে দুটো পিস্তল ভাড়া করে আনলে। ঐ অবস্থায় মৃত্যু-সংবাদ অপ্রত্যাশিত নয়। তবে বরাত-জোরে দুজনেই সে-যাত্রায় বেঁচে যায়।

সে সময় ইংলণ্ডের রাস্তাঘাটের অবস্থাও কলকাতার রাস্তাঘাটের তুলনায় খুব ভালো ছিল না। পথেঘাটে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। তার ওপর দেশসুদ্ধ লোক

বোধহয় জুয়াখেলায় মেতে উঠেছিল। জুয়ার হারজিত নিয়ে ঝগড়ার নিষ্পত্তি হত দ্বন্দ্বযুদ্ধে। তখনকার কেতা অনুযায়ী পুরুষ-পুঙ্গবদের কোমরে সব সময়েই তরোয়াল ঝুলত, আর কথায় কথায় ঝিলিক দিত তরোয়ালের সুতীক্ষ্ণ ফলা। এমনকি বলনাচ, মাস্কোয়েড, কফি-হাউস, থিয়েটারের পিট পর্যন্ত সামান্য কারণেই রক্তারক্তির ব্যাপার হয়ে উঠত, আর শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে এরকম ঝগড়ার মীমাংসা হত দ্বন্দ্বযুদ্ধে। এমন সপ্তাহ যেত না, যার মধ্যে একটা-না-একটা লোক এভাবে প্রাণ হারায়নি।

অপরাধ যত সামান্যই হোক না কেন, ক্ষমা-প্রার্থনা কাপুরুষতার লক্ষণ। তাই সব ব্যক্তিগত অপরাধের মীমাংসা হত—হয় তরোয়ালের খোঁচায়, না হয় পিস্তলের গুলীতে। দ্বন্দ্বযুদ্ধের এই মাতামাতি সম্পর্কে এক ইংরেজ লেখক লিখেছেন—*The prevalent idea even among the most orthodox people at this time seems to have been that some knowledge of the art of 'crossing swords' was absolutely essential to all who wished to be included in the category of fine gentlemen. This passion for duelling, like that for gambling, was not however confined to any one class or rank. It pervaded all without exception.* অর্থাৎ তখন গোঁড়া ইংরেজরাও মনে করতেন যে, ভদ্রমতো ভদ্রলোক হতে হলে তরোয়াল চালানো শিখতেই হবে। তখন জুয়া আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। গোটা জাতটাই জুয়া আর দ্বৈরথে মেতে উঠেছিল।

ঠুনকো মান রক্ষার অজুহাতে বা নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে সে-যুগের বহু সম্ভ্রান্ত ও প্রখ্যাত ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছেন, এবং কেউ কেউ আবার একাধিকবার। হ্যামিল্টনের ডিউক আর লর্ড মোহনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ইংলণ্ডে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল ব'লে শোনা যায়। এই সাংঘাতিক দ্বৈরথে দুজনেই মারা যান। সে-যুগের বিখ্যাত গায়িকা মিস লিন্‌লের জন্যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত নাট্যকার রিচার্ড ব্রিন্‌স্লে শেরিডন ক্যাপ্টেন ম্যাথুজের সঙ্গে দু'বার যুদ্ধ করেছিলেন। প্রথমবার শেরিডন খুব আহত হন। কিন্তু যুদ্ধ করতে করতে দুজনেই এতদূর ক্ষেপে উঠেছিলেন যে, তাহলে অবাক হতে হয়। "Both their swords breaking upon the first lunge they threw each other down, and with the broken-pieces hacked at each other rolling upon the ground, the seconds standing by, as quiet spectators." এই রক্তপাগল হানাহানির কথা শুনলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন মনে পড়ে:

"দোসর-বিহীন রণে
রক্ত-মাতালসনে
কত পাগড়ি খসিল পাগড়ি লুটিয়া লুটিয়া—
রক্তমাখা কোমরের ফুল ফুলন-সনে।"

বিধান-সভার বিতর্কের সময় মতানৈক্য এবং কথা-কাটাকাটির ফলে গণ্ডগোল, গালিগালাজ, এমনকি জুতো ছোড়াছুড়ির কথাও আমরা জানি, কিন্তু বিলেতের কমন্স-সভার কোনো ব্যাপারে মতের মিল না হওয়ায়, চার্লস জেম্স ফক্স মিঃ অ্যাডামকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন ১৭৭৯ সালের ২৯শে নবেম্বর। ফক্স সামান্য আঘাত পান বটে, কিন্তু প্রাণে বেঁচে যান। শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে ১৭৯৮ সালের মে মাসে পার্লামেন্টের দুই সদস্য উইলিয়াম পিট আর জর্জ টায়ার্নের মধ্যেও সামান্য কারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধে। বিতর্কের সময় পিটের কোনো মন্তব্য টায়ার্নের কাছে আপত্তিজনক ঠেকে আর তার ফলেই মনান্তর। টায়ার্নে পরের দিন পিটকে দ্বৈরথে আহ্বান জানান। দুজনেই যথাক্ষেত্রে যথাসময়ে হাজির হন এবং নিয়মমাফিক মতে একবার করে পিস্তল ছোড়বার পর দুজনেই সম্মানরক্ষা হয়েছে মনে করে সে-যাত্রায় ক্ষান্ত হন। ইংলণ্ডের মাটিতে সেই হল শেষ দ্বৈরথ। সেই থেকেই এই জঘন্য প্রথা উঠে যায়।

কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দারা সব ব্যাপারের মতো দ্বৈরথের ব্যাপারেও সে-যুগের ইংলণ্ডের বাসিন্দাদের চেয়ে পেছিয়ে ছিলেন না। কথায় কথায় তাঁরাও দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে উঠতেন। কলকাতায় যত লড়াই হয়েছে, তার মধ্যে গভর্নর-জেনারেল হেস্টিংস আর তাঁর কাউন্সিলের প্রধান সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কাউন্সিলে রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোনো নীতি নিয়ে দুজনের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। সেইসূত্রে হেস্টিংস ফ্রান্সিসকে যোগাযোগ করে একটি চিঠি লিখেন। ফ্রান্সিস উত্তরে জানান—*You have left me no alternative but to demand personal satisfaction of you for the affront you have made to me.* অর্থাৎ হেস্টিংস তাঁকে যে অপমান করেছেন, তাতে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর নেই। হেস্টিংসও সে-আহ্বান গ্রহণ করেন। ১৭৮০ সালের ১৭ই অগাস্ট

বেলভেডিয়ারের কাছে আলিপুরের এক নির্জন প্রান্তরে দ্বন্দ্ব হবে ব'লে স্থির হয়। এই রাস্তাটির পরে 'ডুয়েল অ্যাভেন্যু' নামকরণ হয়েছে।

ফ্রান্সিসের ডায়েরি থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর সহকারী কর্নেল ওয়াটসনের সঙ্গে যথাসময়ের আগেই ঘটনাস্থলে হাজির হন। হেস্টিংস আসেন তাঁর সহকারী কর্নেল পিয়ার্সের সঙ্গে প্রায় দু'টোর সময়। দুজনের কেউই দ্বন্দ্বযুদ্ধের রীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই ওয়াটসন, বিলেতে কয় বছর আগেকার দ্বৈরথের নজীর অনুসারে, দুজনকে চোদ্দ-পা দূরে দাঁড় করান। দুজনের পিস্তলে গুলী ভরে নেওয়ার পর একসঙ্গে ছুঁড়তে বলা হয়। ফ্রান্সিসের পিস্তলের বারুদ ভিজে যাওয়ায়, আওয়াজ হল না। তখন তাঁকে আর একটি পিস্তল দেওয়া হয়। তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই গুলী ছোঁড়েন। হেস্টিংস অক্ষত থাকেন, কিন্তু ফ্রান্সিসের গায়ে গুলী লাগে। তাঁর চিৎকারে হেস্টিংস দৌড়ে গিয়ে পিয়ার্সের সাহায্যে ক্ষতস্থান বেঁধে দেন। আঘাত গুরুতর না হওয়ায়, ফ্রান্সিস সে-যাত্রায় রক্ষা পান।

এর কিছুদিন পরে স্ত্রীকে লেখা হেস্টিংসের এক চিঠিতে এই দ্বৈরথের কথা, এবং ফ্রান্সিস আরোগ্যলাভ করছেন জেনে হেস্টিংসের স্বস্তিলাভের কথা জানা যায়। এইসব চিঠি থেকে বোঝা যায় যে, নেহাত আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যেই হেস্টিংস এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছিলেন এবং ফ্রান্সিস আহত হওয়ায় তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

ফ্রান্সিস নিজে কিন্তু এর পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহূত হয়েও তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মী গ্র্যাণ্ড সাহেবের স্ত্রী মাদাম গ্র্যাণ্ড তখন কলকাতার সেরা সুন্দরী ব'লে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ফ্রান্সিস এক রাত্রিতে মিঃ গ্র্যাণ্ডের অনুপস্থিতির সুযোগে দড়ির সিঁড়ির সাহায্যে মাদামের বিশ্রাম-কক্ষে হাজির হন। মাদাম তাঁকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন। ধরা পড়ার ভয়ে ফ্রান্সিস তখুনি পালিয়ে যান। পরের দিন মিঃ গ্র্যাণ্ড তাঁকে দ্বৈরথে আহ্বান করেন। কিন্তু ফ্রান্সিস কয়েকটি কারণ দেখিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। গ্র্যাণ্ড সুপ্রীম কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে স্ত্রীর মানহানির অভিযোগ আনেন, এবং আদালতের বিচারে ফ্রান্সিসের পঞ্চাশহাজার টাকা জরিমানা হয়। আচ্ছা আক্কেল-সেলামি দিতে হয়েছিল তাঁকে।

বলা বাহুল্য যে, দীর্ঘকাল ধরে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলতে থাকায়, লড়াইয়ের কয়েকটি নিয়মকানুনও তৈরি করা হয়েছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা সকলেই সেসব নিয়ম মেনে চলতেন। কোনো ব্যাপারে মতভেদ হলে, অতীতের কোনো বিখ্যাত দ্বন্দ্বযুদ্ধের নজীর অনুযায়ী কাজ করা হত।

মোটামুটিভাবে, কোনও লোক কোনো সময় কারুর কথায়, কাজে কোনও ভাবে অপমানিত বোধ করলে ব্যক্তিগত মর্যাদার জন্যে তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাতে পারতেন। সাধারণত চিঠিতেই এ-কাজ সারা হত। যাকে যুদ্ধে আহ্বান করা হত, তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে তরোয়াল বা পিস্তল অথবা দু'রকম অস্ত্রই ব্যবহার করা হত। যুদ্ধ হত কোনো প্রান্তরে এবং দুজনেরই একজন করে 'সহকারী' থাকতেন। ভোরবেলায় যথাস্থলে পৌঁছনোর পর তরোয়ালের দৈর্ঘ্য মাপা হত, কারণ লড়ায় দুটো তরোয়াল সমান হওয়া দরকার। পিস্তল হ'লে, সহকারীরাই গুলী পুরে দিতেন। তারপর দূরত্ব ভালো করে মাপা হত। একটা রুমাল ফেলবার পর বা তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে দুজনের পিস্তল ছোঁড়বার কথা। প্রায়ই এই দলের সঙ্গে একজন সার্জেন থাকতেন এবং একপক্ষ আহত হলেই দুজনের সম্মান রক্ষা হয়েছে ব'লে মনে করা হত। আর দ্বৈরথেরও পরিসমাপ্তি ঘটত সেখানে। কিন্তু কেউ কেউ এত সহজে নিরস্ত হতেন না। সেক্ষেত্রে '[illegible]'র দুজনের মধ্যে বোঝাবুঝির নিষ্পত্তির দায়ী থাকতেন দুই সহকারী।

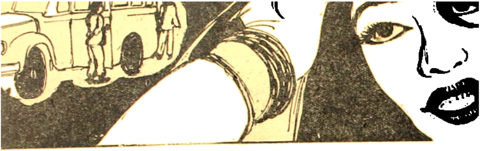

[illegible]

অনিল সেনগুপ্ত

হেমন্তের গোধূলি।

ান আলোর শেষ রশ্মিটুকু একটু একটু ক'রে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

ভ্রমরা নদীর এপারে-ওপারে আবার একটা রাত ছে। কালো কালো ডানার ঝাপটা দিয়ে দিগন্ত জুড়ে আসছে অন্ধকারের বিরাট পাখি।

শীর্ণস্রোতা ভ্রমরা।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সেই কবে ছুটে বেরিয়ে ছিল দামোদরের অসতর্ক বুক থেকে। মাঠ ডিঙিয়ে, র পেরিয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ভাব জমিয়ে ছুটেছে পুবের । ছুটতে ছুটতে শেষে হাঁপিয়ে পড়েছে। হাঁপাতে তে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে গঙ্গায়।

পুরো পঞ্চাশ মাইল পথও নয়। ভ্রমরা ভাতে দিশেহারা। শীত-গ্রীষ্মে ভালোমানুষ লক্ষ্মী মেয়েটি বর্ষায় একেবারে দস্যি দামাল পাগলী মেয়ে।

খেয়ালী মেয়ে ভ্রমরার গতিপথটুকু কেবলই আঁকাবাঁকা সেই পথেরই একপাশে কাগনি রেলস্টেশন। অন্যপা দেউলীর পায়ঘাটা। কাগনি স্টেশনের মার্শেলিং ইয়ার্ড বাঁয়ে রেখে পূর্ববাহিনী ভ্রমরা কিছুটা এগিয়ে এসেই বাঁ নিয়েছে উত্তরমুখে। এরই এপারে দেউলী। ওপা কাগনি ইয়ার্ডের বিরাট বিসর্পিল বিস্তার।

দেউলীর ঘাটে দাঁড়িয়ে নজর চলে অনেক দূর।

ওপারে মাটির বুকে লাইন আর লাইন। কালো কা পাঁজরের মতো। ওয়াগনের পর ওয়াগন। শ্রেণী বণিকে

প্রাণ-ডোমরার লৌহপিঞ্জর। এখানে-ওখানে দু'চারটে গুমটি-ঘর। কেলে-মাখা অকেজো মালগাড়ীর মরচে-ধরা চাকাগুলো লম্বা ঘাসে ঢেকে গেছে।

কাসনি ইয়ার্ডের বাতাস দিনরাত মুখর। কখনো পাইলট-ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ কর্কশ বাঁশী। কখনো বা ওয়াগনে ওয়াগনে ঠোকাঠুকির তীব্র ধাতব-ঝঙ্কনা। কি দিনে, কি রাতে—কাসনির জীবন নিস্পন্দ হয়না কখনো।

সেই কাসনি ইয়ার্ডে হেমন্তের আর একটি সন্ধ্যা নামছে। হাঁপ-ধরানো গুমোট বাতাস। রাশি রাশি কয়লার ধোঁয়া কুণ্ডলী ক'রে চাপ বেঁধেছে খণ্ড খণ্ড কুয়াশার মতো। উড়ে পালাবার আকাশ পায়নি।

এপারে সেউলী ঘাট আর বসতি ওপারের তুলনায় ঘুমপুরী। পারঘাটার কাছে দুটো মাত্র চায়ের দোকান। সেখান থেকে একটু দক্ষিণে ঝাঁকড়া নিমগাছটার তলায় এসে আপাতত থমকে থেমে গেছে সেউলী-কাটোয়া রোডের শেষপ্রান্তটা। সড়কের পূব-দক্ষিণে বাউড়ীপাড়ার বসতি। তারপর অজ গ্রাম।

রাতের অন্ধকার নামতে-না-নামতেই থমথমে হ'য়ে গেছে সেউলীর ঘাট। কাটোয়া থেকে শেষ বাস্ আসবে [illegible]টায়। কিছুক্ষণের মতো একটু প্রাণচঞ্চল হ'য়ে উঠবে [illegible]টা। তারপর আবার নীরবতা। একেবারে নিস্তব্ধ। [illegible]বে রাতের কালো ডানার তলায় ডুবে যাবে সেউলী। অন্ধকারের নিকষ-কালো আঁচল মুখে টেনে সারারাতের মতো মুখ ঢাকবে ভ্রমরা।

রাত জাগবে শুধু কাসনি ইয়ার্ড। রাত জাগবে ইয়ার্ডের বিজলী বাতিগুলো। আলোয় আলো ইয়ার্ডের গুমোট আকাশ। নীচের অন্ধকারে সে-আলোর সবটুকু পৌঁছয় না। সেখানে [illegible] আরও বেশী অন্ধকার।

বিচিত্র জীবন কাসনি ইয়ার্ডের। রহস্যের শেষ নেই। সে রহস্যের অনেকখানি জানে [illegible]-নদী ভ্রমরা। কিন্তু ভ্রমরা তো মুখ খোলে না। শুধু জানে আর জানে। অসংখ্য কালো রাতের নিবিড় আলিঙ্গনে বারাঙ্গনা কাসনি ইয়ার্ডের জীবন-উল্লাস শতধারায় উপচে পড়ছে।

সেই কাসনি ইয়ার্ডের আসব-সুরভিত বুকে আবার একটা রাত এসে ধরা দিল।

। ২ ।

ওপারে সেউলীর ঘাটে ধর্মদাস হাজরার দোকানে ব'সে পাচু মল্লিক সেই কখন এক গেলাস চা নিয়েছিল। চা-টুকু ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে প্রায় জল। পাচু মল্লিকের হুঁশ নেই। ওপারের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে তো ব'সেই আছে।

হাতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ধর্মদাস সুখ-দুঃখের কথা বলছিল। হঠাৎ পাচু মল্লিকের দিকে নজর পড়তেই একটু হেসে বললে, নির্বাক্ হ'য়ে কী অত দেখা করছেন মল্লিক-মশায়? চা যে আপনার জুড়িয়ে গেল।

সম্বিৎ পেয়ে পাচু মল্লিক চায়ের গেলাসটা তুলে নিলে। এক চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত ক'রে বললে, এঃ, একেবারে বরফ হ'য়ে গিয়েছে গো!

ধর্মদাস হেসে বললে, চায়ের কি দোষ বলেন? ও আপনি ফেলে দেন। আর এক কাপ বানিয়ে দিচ্ছি।

পাচু মল্লিক নীরবে গেলাসের চা-টুকু ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে সুরু করলে।

চা ছাঁকতে ছাঁকতে একবার আড়চোখে তাকালে ধর্মদাস। কারবাইড গ্যাসের আলো এসে পড়েছে পাচু মল্লিকের মুখের দিকে। কেমন যেন বিশ্রী দেখাচ্ছে মুখখানা। চোয়াল-দুটো ফুটে বেরিয়েছে। চোখের কোটর-দুটো যেন বয়সের তুলনায় অনেক বেশী প্রকট হ'য়ে উঠেছে। বয়স হয়তো সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। কিন্তু পাক ধরেছে দু'চার-গাছা চুলে।

চায়ের গেলাসটা পাচু মল্লিকের সামনে রেখে ধর্মদাস বললে, দেখে দেখে আপনার সাধ আর মেটে না! দেখবেন দেখেন, তবে চা-টুকু এবার গরম থাকতে যেন মনে ক'রে খেয়েন।

পাচু মল্লিক একটু হাসলে। বিবর্ণ বিষণ্ণ একটুকরো হাসি। একগাল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কতো মারা পড়েছিল কিনা তাই চেয়ে চেয়ে দেখছি, হাজরা-মশায়।

তা দেখেন। তবে কিনা আপনার চাকরি যাওয়ার পরেও সবাই চলছে। বেড়েছে বই কমা হয়নি। মিছেমিছি আপনি অমন পারমেন্ট চাকরিটা খোয়ালেন।

একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে পাচু মল্লিক বললে, চলুক দেখি কতদিন চলে।

ধর্মদাসও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, বড় দুঃখ্যু হয় গো মল্লিকমশায়। মানুষের পাপ-নিশ্বাসে ভগবানের বাতাসটুকুও কিনা বিষিয়ে গেল।

পাচু মল্লিক মুখ ফেরালে। কোটরে বসা নিষ্প্রভ চোখ-দুটো যেন জ্বলে উঠলো। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, এখনও 'হয়েছে কী? আরও যাবে গো আরও যাবে।

পোকায়-কাটা ঝাঁঝরা ফুসফুসে ক'দিন আর দম নেওয়া যায় বলো না? ফুসফুস থেকে বিষ ছড়াচ্ছে সর্ব অঙ্গে। ও যে হ'তেই হবে গো হাজরামশায়!

অজয়ের ওপর দিয়ে ব'য়ে এলো একঝলক শিরশিরে বাতাস। গ্যাসের আলোর শিখাটা কাঁপতে লাগলো।

ধর্মদাস বললে, আর ভালো লাগে না, মল্লিকমশায়। মেয়ে-জনে যাহোক কপিলার বিয়েটা চুকিয়ে দিতে পারলে এখানকার দোকানপাট তুলে দিয়ে একদিকে বেরিয়ে পড়বো।

পাঁচু মল্লিক হাসতে লাগলো। অবজ্ঞার টানা হাসি। বললে, পালাবে কোথায়? বেচাকেনা যা করছ ক'রে যাও। অজয়ের পুলটা তো হবে-হবে শুনছি। ওটা একবার হ'য়ে গেলে তোমার এই টিমটিমে বেউলী-ঘাটের বাহার কত খুলে যাবে দেখো হে? দিন ফিরে যাবে তোমার।

ধর্মদাস উদাস স্বরে বললে, কি জানি! তবে মন আর কিছুতেই এখানে বসতে চায় না, মল্লিকমশায়।

ওপারে একখানা পাইলট-ইঞ্জিন তীব্র কর্কশ বাঁশী বাজাতে বাজাতে চ'লে গেল ইয়ার্ডের দক্ষিণ দিকে। এপারের জমাট নীরবতা অনেক মুহূর্তের জন্যে ভেঙে খান্‌খান্ হ'য়ে গেল।

ধর্মদাস বললে, পান খাবেন নাকি একটা? কলকাতা থেকে নতুন পাত্তি-জর্দা আনা করেছি কাল।

পাঁচু মল্লিক নির্বিকার নির্লিপ্তভাবে বললে, দাও একটা।

ধর্মদাস পান সাজতে সাজতে বললে, আপনার তো কত জানাশোনা। জান না আমার কপিলার যুগ্যি একটা ভালো পাত্তর।

পাঁচু মল্লিক চোখ না ফিরিয়েই বললে; পাত্তর তো তোমার হাতের নাগালেই আছে গো।

ধর্মদাস সাগ্রহে বললে, কার কথা বলছেন?

কেন গো? বীরুলাল। তোমাদের আগুরী সমাজে ওর চেয়ে ভালো পাত্তর খুঁজতে গেলে নগদের হিসেবটা ভেবে দেখেছ?

ধর্মদাস কোনো জবাব দিলে না। বেউলী-কাটোয়া লাইনের বাস-ড্রাইভার বীরুলাল বল। উগ্রক্ষত্রিয়ের ছেলে। সংসারে দায়দায়িত্ব নেই। রোজগারও ভালো। তবু কপিলার বিয়ের প্রসঙ্গে বীরুলালের কথা ধর্মদাস বরাবরই এড়িয়ে চলে।

ধর্মদাসের উত্তর না পেয়ে পাঁচু মল্লিক বললে, কি গো, বীরুলালকে মনে ধরে না?

একটা ঢোঁক গিলে ধর্মদাস বললে, আজ্ঞে না, সে-কথা বলি না। জানেন তো ওই একটাই যার মেয়ে। মনের সাধ, মেয়েটাকে গ্রামদেশে কোনো চাষীগেরস্ত ঘরে দিই। আপনাদের গাঁয়ের কাছে-পিঠে তেমন কোনো ঘর জানা নাই আপনার?

পাঁচু মল্লিক পান চিবোতে লাগলো। জবাব দিলে না। ধর্মদাস সাগ্রহে বললে, আপনাদের আশীর্বাদে সামনের মাঘ-ফাগুনের মাঝেই যদি কিনা মেয়েটাকে তার আপন ঘর চিনিয়ে দিতে পারি তো তার চেয়ে বড়ো সাধ আর নেই।

পাঁচু মল্লিক বললে, পাত্তর তুমি পাবে না বাপু। এমন সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা যার স্বভাব তার গেরো অত সহজে কাটে না।

ধর্মদাস চুপ ক'রে ব'সে রইল। বীরুলাল জোয়ান ছেলে। তাজা প্রাণ, জমাট যৌবন। আয়ব্যয়ও ভালো। তবু ধর্মদাস তাকে মনেপ্রাণে মানিয়ে নিতে পারে না। এ আপত্তি তার নিজের। এর গোপন কারণ সে ছাড়া আর কেউ জানে না। কপিলাও না। বীরুলালকে ভয় পায় ধর্মদাস। জীবিকার জন্যে যারা যন্ত্রদাস হয়েছে, তাদের সবাইকেই কেমন ভয়ের চোখে দেখে ধর্মদাস। তাদের চালচলন, তাদের কথাবার্তা—সব-কিছুর মধ্যে কী এক উগ্রতা যেন অষ্টপ্রহর মিশে আছে। বীরুলালও যে সেই দলের।

বীরুলাল প্রায় রোজই আসে। শেষ বাস্ বেউলী-ঘাটে পৌঁছে দিয়ে তার ছুটি। ধর্মদাসের দোকানে এসে বসে। হৈ-হৈ ক'রে মাতিয়ে রাখে। গেলাস-গেলাস চা খায়। হাসির কথা পেলে হো-হো ক'রে হাসে। লোকটার ভেতর তাজা প্রাণ আছে। তবু ধর্মদাস তাকে কপিলার বর ব'লে কিছুতেই মন মানাতে পারে না।

কতদিন গভীর রাতে দোকানের ঝাঁপ খুলে ধর্মদাস ওপারের দিকে তাকিয়ে থাকে। আলো, ধোঁয়া, কয়লার লালচে আগুন, ইঞ্জিনের বাঁশী—সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক যন্ত্র-জগৎ। আলো-আঁধারী ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে এগিয়ে যায় গন্‌গনে আগুনের ঝলক। সারারাত ধ'রে শান্টিং করে পাইলট-ইঞ্জিনগুলো। চুল্লীর মুখ দিয়ে আগুনের তীব্র হল্‌কা ছড়িয়ে পড়ে ইয়ার্ডের ওপর। তারই আভায় শিউরে ওঠে নৈশ-ইয়ার্ড। উড়ন্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে দেখায় নৈশ আকাশের গায়ে অসংখ্য শরীরী প্রেতের মতো। ওখানে মানুষ ঘুমোয় না। মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে

কাগনি ইয়ার্ডের রাত্রি। ধর্মদাসের চোখে পরিয়ে দিয়েছে লোভের ঠুলি। ঘুমটুকু চুরি করেছে যন্ত্রদানব। ধর্মদাস সে কথা ভাবলেই ভয় পায়। গা ছম্‌ছম্‌ করে।

কী হ'ল গো হাজরামশায়? অত কি ভাবছো গো?

পাহু মল্লিকের ডাকে চমক ভাঙলো ধর্মদাসের। অপ্রতিভ হাসি হেসে সামলে নিলে নিজেকে। তারপর আমতা আমতা ক'রে বললে, আজ্ঞে, ভেবে আর কতটুকুন করবো বলেন? বিধির নির্বন্ধ যেখানে আছে, কপাল ঠিক সেখানেই টানা ক'রে নেবে, না কি বলেন?

পাহু মল্লিক কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কথাটা বলা হ'ল না। দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালে বাউরীপাড়ার মাখন বাউরীর বউ পদ্মিনী। বাইশ-তেইশের ভরা যুবতী। কালো শাড়ীর ঘেরে টলমল করছে কালো দেহের যৌবন-ভার। কপালে জলজল করছে সিঁদুরের টিপ।

পদ্মিনীর কাঁধে একটা ঝুড়ি। তার ভেতর একটা ছুটোফাটা বস্তা। কয়লার কালিতে কালো হ'য়ে গেছে সে ছুটো।

ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে পদ্মিনী বললে, আমার পানটা দাও গো দাদা।

ধমক দিয়ে ধর্মদাস বললে, ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এয়েছিস নাকি? দাঁড়া, দিচ্ছি।

পদ্মিনী মুখ ভার ক'রে বললে, তাড়াতাড়ি না গেলে হিন্দুস্থানী মাগীগুলো কি আর একটা টুকরো কয়লাও রাখবে ভেবেছ?

পাহু মল্লিক একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে, বাপ্‌রে! তোর কয়লায় হাত দেয়, এমন বুকের পাটা কার বটে রে, অ্যাঁ?

পদ্মিনী মুচকি হাসলে। কাগনি ইয়ার্ডের নৈশ-জীবনে তার দাম কতখানি তা পাহু মল্লিক অন্তত জানে। পদ্মিনী তাতে লজ্জা পায় না। পাল্টা হাসির লহর তুলে বললে, মালবাবু বলেছে ভালো। বাবুভেয়েরা আমার কয়লা কুড়িয়ে রাখে, তাই না গো?

পাহু মল্লিক কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু অপ্রতিভ হ'য়ে গেল। পরক্ষণেই সামলে নিলে নিজেকে। বললে, কেন রে, নতুন মেয়েরা এখন তোকে টেক্কা দিয়েছে বুঝি?

ফিক্‌ ক'রে একটু হেসে পদ্মিনী বললে, একদিন রেতের বেলা গিয়ে দেখেই এসোনা ক্যানে। যাবে তো চলো আমার সঙ্গে।

পাহু মল্লিক জোর ক'রে একটু হেসে বললে, ষোলো-বছর রেলের চাকরি ক'রে এখন ইয়ার্ডে যেতে হবে কিনা পদ্মিনী-শিখণ্ডী নিয়ে, অ্যাঁ?

পদ্মিনী বললে, চাকরি যখন করেছ তখন করেছ। এখন তো আর চাকরে নও। যাই বলো গো মালবাবু, তুমি চাকরি খোয়ালে নিজের দোষে। এইতো রোজ আসছি যেছি, কই আর কারও চাকরি যাবার কথা তো শুনিনি!

পাহু মল্লিক কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, রোজই তাহ'লে কয়লা কুড়োতে যাস্, কেমন?

পদ্মিনী ঘাড় দুলিয়ে বললে, না গেলে ঘরে ব'সে খেতে দেবে এমন রসিক কোথা পাই বলো?

পাহু মল্লিক অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললে, তা বটে।

রোজ সন্ধ্যার পর জমরা পেরিয়ে পদ্মিনী যায় কয়লা কুড়োতে। পদ্মিনী একা নয়। আরও অনেক মেয়ে। বাইরের লোকের ইয়ার্ডে যাওয়ার আইন নেই। এদের আইন অন্য। ধোঁয়াটে আলোর ওড়না-ঢাকা কাগনি ইয়ার্ডের নৈশ অন্ধকারে গানার থেকে নাম্বার-টেকার-বাবু, কায়ারম্যান থেকে মালবাবু—কত অগুনতি মানুষের লালসার ঘোলাটে চোখ চেয়ে থাকে এদের প্রতীক্ষায়। আমন্ত্রণ ক'রে আনে কয়লার লোভ দেখিয়ে। তারা আসে। মুচকি হেসে কটাক্ষ হানে। ইঞ্জিনের পরিত্যক্ত পোড়া কয়লার সঙ্গে না-পোড়া কয়লার টুকরো মিশে যায় তাদের ঝুড়িতে। বিচিত্র জগৎ। বিচিত্র তার উপহারের রীতি।

পদ্মিনী আগেও যেত। এখনো যায়। ধর্মদাসের হাতের সাজা পান দু'চারটে নিয়ে যায় সঙ্গে ক'রে। জমরা পেরিয়ে হারিয়ে যায় ওপারের আলো-আঁধারীর বাঁকে। তারপর গভীর রাতে ভর্তি ঝুড়ি আর বস্তা নিয়ে ওপারে সবচেয়ে কাছের গুমটি-ঘরটার পাশে এসে দাঁড়ায়। মাখন গিয়ে কয়লা আর বউ নিয়ে ঘরে ফেরে।

পান সাজতে সাজতে ধর্মদাস বললে, নতুন জর্দা আনা করেছি রে পদ্মিনী। খাবি নাকি একটু?

দিবে, দাও। দেখো বাপু যেন মাথা না ঘোরায়।

ধর্মদাস একটু হেসে জর্দার কৌটো টেনে নিলে।

ভুরু কুঁচকে পদ্মিনী বললে, হাসতে লেগেছ ক্যানে গো?

হাসছি তোর কথা শুনে। তোর মাথা ঘোরাবে এমন জর্দা তো দূরের কথা, মানুষই কি পাওয়া যাবে একটা?

পদ্মিনী ফিক্‌ ক'রে হেসে বললে, তার খোঁজেই তো মরে যেছি গো।

পাঁচু মল্লিক এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, ওর মাথায় অনেক দাম গো হাজরামশায়। তোমার কর্তা খাইয়ে অমন দামী মাথাটাকে আবার বেসামাল ক'রে দিয়ো না যেন।

বেসামাল হবেনা গো রাজবাবু। হ'লে অনেক আগেই হ'ত। বাবুভেয়েরা কত সামলে-সুমলে রাখে জানোনি?

পাঁচু মল্লিক এমন ভাবে সিগারেট টানতে লাগলো যেন পদ্মিনীর কথাটা তার কানেই ঢোকেনি।

ধর্মদাস কাগজে মুড়ে কয়েকটা পান এগিয়ে দিলে। একটা পান মুখে দিয়ে পদ্মিনী অপাঙ্গে একবার তাকালে পাঁচু মল্লিকের দিকে। তারপর ধর্মদাসকে উদ্দেশ ক'রে মুচকি হেসে বললে, মজার ব্যাপার বটে হ'ল, হাজরামশায়। রাজবাবুর চাকরি গেল তবু কাগনির মায়া গেল না গো!

পাঁচু মল্লিক আড়চোখে তাকিয়ে বললে, মায়াটা কি কাগনির? তোদের মায়ায় আসি যে। তোমরা পেরিয়ে ওপার যেতে তোদের পা ভিজে যায়, তাই দেখে দুঃখ হয়। তোমরার পুলটা তৈরি হোক। শুকনো পায়ে তোদের আসতে যেতে দেখে তবে নেউলী ছাড়বো জানলি?

আহা, এত বয়স তোমার গো!

তোরা না মায়া কাটিয়ে দিলে বয়স কী ক'রে ছাড়ি বল্?

ও বাবা গো। এত টানাটানিতে রাজবাবুর পরাণটা আবার কিনা টিঁকলে হয়!

কথাটা ব'লেই পদ্মিনী আর দাঁড়ালে না। ঝুড়িটা তুলে নিয়ে বনহরিণীর গতিতে তোমরার দিকে এগিয়ে গেল। দেখতে দেখতে মিশে গেল অন্ধকারে।

পাঁচু মল্লিক সেদিকে তাকিয়ে আপনমনেই হাসতে লাগলো।

ধর্মদাস আস্তে আস্তে বললে, হাসছেন ক্যানে মল্লিক-মশায়?

পাঁচু মল্লিক সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বাইরে। তারপর উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, নলরাজার উপাখ্যান মনে আছে হাজরামশায়?

আজ্ঞে হাঁ, আবছা আছে। সে হবেক অনেককাল আগে নলদময়ন্তীর পালাগান শুনেছিলাম, খুঁটিনাটি সব কি আর বলতে পারবো?

পাঁচু মল্লিক তেমন ক'রেই তাকিয়ে রইলো কাগনির দিকে। ধর্মদাসের সব কথা হয়তো শোনেওনি ভালো ক'রে। আপনমনেই বলতে লাগলো, পুণ্যবান রাজা নলের দেহে কলির প্রবেশ কেমন ক'রে হ'ল তা একবার ভেবে ভাখো দিকি। অনাচার না ঘটলে, পাপও ভয়ে দূরে থাকে। অমন যে সর্বনাশা কলি, সেও কিন্তু অনাচারের ছিদ্র না পেয়ে নলের দেহে ঢুকতে পারেনি গো। নিষ্ঠাবান রাজা একদিন পা ধুতে গিয়ে অবহেলা করলেন। গোড়ালির সবটুকু ভিজলো না। সেই অশুচির কারণ ধ'রেই তাঁর দেহে হ'ল কলির প্রবেশ। মনে পড়ে?

সোৎসাহে ধর্মদাস বললে, আজ্ঞে হাঁ, মনে পড়েছে।

পাঁচু মল্লিক বলতে লাগলো, নলরাজার উপাখ্যান মনে রেখো, আর তাকিয়ে ভাখো তোমাদের ওই ওপারের দিকে। লোভের চেয়ে বড়ো অশুচিরোগ আর নেই গো হাজরা-মশায়। তোমাদের ওই কাগনিতে কলি ঢুকেছে সেই অনাচারে। দেখে নিয়ো, কিছু থাকবে না। সব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

ধর্মদাস চুপ ক'রে শুনছিল।

পাঁচু মল্লিক একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, একটানা কুড়ি বছর ওই ইয়ার্ডে চাকরি করেছি। টেবিল-চেয়ার তো পরের কথা, ওখানকার ঘাসগুলোকে পর্যন্ত একটা একটা ক'রে চিনি। লোভের কীট ওখানে কিলবিল করছে যে, বুঝলে?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন পাঁচু মল্লিক। তারপর একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, নাঃ, তোমার দোকানে এসে বসলেই যতো সব পুরনো কথা মনে পড়ে। থাক্ ওসব কথা। বেশ কড়া ক'রে আর-একটা চা লাগাও দিকি।

ধর্মদাস কোনো কথা না ব'লে আবার চা তৈরি করতে গেল।

নতুন পাতি-জর্দার ঝাঁঝে বেশ মৌতাত লেগেছে। আরামে আধবোজা চোখে পান চিবুচ্ছে পাঁচু মল্লিক। ধর্মদাসের দিকে তার চোখ পড়েনি। নজর পড়লে দেখতে পেত একটা বিশেষ হাসির রেখা ফুটে উঠেছে প্রৌঢ় মানুষটার ওষ্ঠে। ঘুষের দায়ে হাতে-নাতে ধরা পড়েছিল পাঁচু মল্লিক। ধরা না পড়লে কি নলরাজার উপাখ্যান শোনাবার জন্যে সন্ধ্যায় এপারে এই দোকানে এসে বসবার অবসর হ'ত তার?

পাঁচু মল্লিক আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে চাদরটা গায়ে ভালো ক'রে জড়িয়ে বসলে। তার মন তখন উধাও হ'য়ে গেছে হয়তো কাগনির বিচিত্র অতীত স্মৃতিতে।

। ৩ ।

প্রায় বারোবছর আগেকার কথা।

মঙ্গলকোটের ওদিকে নিজের গ্রাম থেকে একদিন বেরিয়ে পড়েছিল ধর্মদাস হাজরা। উগ্রক্ষত্রিয়ের দাপটে সারা বর্ধমান একদিন কাঁপত। সে অনেক পুরনো কথা। দাপট পুরো না থাকলেও, দু'একশো বিঘে জমি অন্তত অনেকেরই আছে। ধর্মদাসের তাও ছিল না। সামান্য পুঁজি সম্বল ক'রে দেউলীর সায়রঘাটায় এই দোকান খুলল।

দেখতে দেখতে এই দশ-বারো বছরে কত পরিবর্তন হ'ল। বাউরীপাড়ার মেয়ে-পুরুষ বাঁশ-বেতের কাজ ছেড়ে নাম লেখালে কুলী-কামিনের খাতায়।

কত রং বদল!

এক অভাবকে ঠেকাতে গিয়ে আর এক অভাবের দাসত্ব।

কাসনি ইয়ার্ডের ঠিকাদারের বস্তা চিনি আর লোহালক্কড় ব'য়ে ব'য়ে কুঁজো হ'য়ে গেল মানুষগুলো। সোজা শিরদাঁড়া আগে বাঁকানো যেত না। এখন কুঁজো পিঠ এমনিই বেঁকে থাকে।

আরও কত কী!

কাঞ্চনমূল্যে কী না হয়! পেটের জ্বালার কাছে আর কোন্ জ্বালা? রূপ বিকোলে রূপোর চাকতি। নেবার লোকের অভাব ক'রে এলো দেখতে দেখতে। ভীড় বেড়ে চললো নৈশ কাসনির আবছায়ায়। পেটের জ্বালায় বেচাকেনার সুরু। শেষে নেশার মাতনে তার ক্রমলেলিহান বিস্তার।

শবর-শবরীর দেশ। ধর্মঠাকুরের আপন রাজ্য।

আর কোনো চিহ্ন নেই তার।

শবরের গলা থেকে গুঞ্জা-মালা ছিনিয়ে নিয়েছে কাসনি ইয়ার্ড। তীব্র ধারালো বাঘ-নখে থাবা বসিয়েছে শবর-শবরীর হৃৎপিণ্ডে।

একই পটে কত রঙের বদল-পালা!

বোবা ব্রমরা হয়তো প্রতিটি দণ্ড, প্রতিটি পল-অনুপলের ইতিহাস জানে। ধর্মদাস জানে কতটুকু? কাল-পুরুষের আদি-অন্তহীন হিসেবের খাতায় বারোবছরের কথা কতটুকু আর? তবু ধর্মদাস বিহ্বল হ'য়ে যায়। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করবার আগে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওপারের দিকে।

বিজলী বাতিগুলো জ্বলছে। সারা ইয়ার্ড জুড়ে আলোর আলো। কতখানি আঁধার ঢাকতে অত আলো জ্বালতে হয়?

দোকান সুরু করবার প্রায় তিনবছর পরে সুদিনের মুখ দেখেছিল ধর্মদাস। কাটোয়া থেকে দেউলী পর্যন্ত সড়কটা তখনই শেষ হ'ল। লোকজনের আনাগোনায় বিক্রি বাড়লো বেশ কিছুটা। ধর্মদাস আরও কিছুটা জমি কিনে ফেললে। দেশের বাড়ীর পাট চুকিয়ে, নিয়ে এলো বউ আর মেয়েটাকে। কপিলার বয়স তখন সাত বছর।

মা-বাপের চোখের মণি কপিলা। একে একে তিনটি ছেলে-মেয়ে মারা গেছে। কপিলাকে চোখের আড়াল করতেও বুক কাঁপে ধর্মদাসের। ব্রমরার পাড় দিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতো কপিলা। বালির ওপর ছুটতো, নাচতো। কখনো বা ব'সে ব'সে আপনমনেই ঘর বানাতো বালি দিয়ে। ধর্মদাস বিভোর হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো। আটহাতী ডুরে শাড়ীখানা প'রে আপন খেয়ালে খেলে বেড়াচ্ছে কপিলা। একটা খেয়ালী প্রজাপতি যেন পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে ঘাসে ঘাসে, বালির বুকে বুকে।

দুদিন এসেছিল চকিতে। চকিতেই আবার মিলিয়ে গেল। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে মারা গেল কপিলার মা। ধর্মদাস একহাতে চোখের জল মুছলে। অন্য হাতে বুকে তুলে নিলে মেয়েকে। কপিলার মুখ তাকিয়ে দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেনি।

সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটা দেখতে দেখতে বড়ো হ'য়ে উঠেছে। ব্রমরার পাড়ে ছুটোছুটির কথা হয়তো ভালো ক'রে মনেও নেই তার। এখন নেহাত দরকার না পড়লে দোকান-ঘরেও আসে না। সকালে বিকেলে কলসী নিয়ে ব্রমরায় যায় জল আনতে। কে তখন বলবে, এই মেয়েই সেই মেয়ে! বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে ধর্মদাস হাজরার। বিয়ে হ'লেই এই মেয়ে চিরকালের মতো পর।

অথচ মেয়ের বিয়ে তো দিতেই হবে। নিজের বুক খালি হবে ব'লে কি এমন স্বার্থপরের মতো ভাবতে হয়।

নিজের কাছেই লজ্জা পায় ধর্মদাস। তাড়াতাড়ি কাজের ভেতর মন ডুবিয়ে দেয়।

। ৪ ।

শাহু মল্লিক বলেছিল, ব্রমরার পুল তৈরির কথা চলছে।

ধর্মদাস ততটা গুরুত্ব দেয়নি। কত কিছুরই তো কথা হয়। সব-কিছু কি সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে যায় নাকি?

কিন্তু শাহু মল্লিকের কথাই ঠিক। তার চ'লে যাওয়ার পর উনিশ-কুড়িটা দিন সবে পার হ'য়েছে। ব্রমরার ওপারে মাল-বোঝাই লরীর আনাগোনা সুরু হ'য়ে গেল।

কাপনি ইয়ার্ডের একেবারে উত্তরপ্রান্তে পাঁচিলের গা ঘিরে যে-রাস্তাটা চ'লে গেছে শহরের দিকে—ঠিক তার সামনেই উঠবে নতুন পুল। কাটোয়া-বেউলী সড়কের ধস্‌কে-থাকা প্রান্তটা গিয়ে মিশবে পুলের এপাশে। কাপনির সঙ্গে বেউলীর রাস্তা জুড়ে যাবে একদিন পরে।

সারাদিন ধ'রে শরীর গোঙানি আর মানুষের সাড়ায় জমজমাট হ'য়ে উঠেছে ব্রহ্মার পাড়।

অঘ্রাণের দুপুর।

একটু শীতের আমেজ লেগেছে হাওয়ায়। দুপুরের রোদে আর তেমন ঝাঁজ নেই।

দোকানের ভেতর ব'সে চুপ ক'রে তাকিয়ে ছিল ধর্মদাস।

ব্রহ্মার স্রোত অনেক সরু হ'য়ে গেছে। দু'পাশের বালুরাশির তৃষ্ণার্ত জিভের ভয়ে সে যেন দিশেহারা। যতটা পারে আড়ষ্ট হ'য়ে কোনোমতে ব'য়ে চলেছে। তারই ভেতর ঘুরে ঘুরে কয়েকটা কাদাখোঁচা পাখি পোকা খুঁটে বেড়াচ্ছে। ওপারে কাপনি ইয়ার্ডও যেন ক্লান্ত কুকুরের মতো জিভ বার ক'রে হাঁপাচ্ছে।

কপিলা কোন্ ফাঁকে এসে একটু দূরে ব'সে পড়েছিল।

পুল তৈরির তোড়জোড় যেদিন থেকে শুরু হ'য়েছে সেদিন থেকেই তার চোখে মুখে এসে বাসা বেঁধেছে একরাশ বিস্ময়। চোখের সামনে একটা দৈত্য যেন জাদুক ব্রহ্মার এপার-ওপারে দু'পা দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

ধর্মদাস অন্যমনস্ক ছিল।

কপিলা আস্তে আস্তে বললে, পুলটা সত্যি সত্যি উঠবে তো বাবা?

কপিলার ছেলেমানুষী প্রশ্নে হেসে ফেললে ধর্মদাস। বললে, সত্যি সত্যি যদি না-ই উঠবে তো অতগুলো বিদ্বান লোকে অত হিসেবপত্তর করছে ক্যানে রে?

কপিলা লজ্জা পেয়ে বললে, অনেক বড়ো ব্যাপার কিনা, তাই বলছি।

কথাটা সে নিজেও ভেবে দেখলে। সারাদিন ধ'রে অতগুলো লোক কত সব মাপজোক করছে। বড়ো বড়ো কাগজ বার ক'রে কী সব যেন মিলিয়ে দেখছে। তাও যদি বা অকাজের হয় হোক। নদী-ভর্তি ইঁট, কাঠ, লোহালক্কড় আর সিমেন্ট বালিগুলো তো শুধু শুধু আসছে না। আর অতগুলো মানুষই বা কেন সারাদিন ধ'রে ব্রহ্মার গরম বালিতে পা পুড়িয়ে অত কষ্ট করছে?

লোকগুলোর সম্বন্ধে কপিলার বিস্ময়ের অন্ত নেই। তার চেয়েও বড়ো বিস্ময় সেই অতিকায় দৈত্যটার সম্বন্ধে। চোখের সামনে একটু একটু ক'রে গড়ে উঠবে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি। শক্ত বাঁধনে বেঁধে ফেলবে ব্রহ্মার দুই পাড়। তারপর একদিন হয়তো লোকজন আর গাড়ীঘোড়ায় গমগম্ করবে এই নির্জন জায়গাটা। তখন কি কেউ জানবে, এর আগাগোড়া ইতিহাস জানতো কপিলা নামে একটা মেয়ে? কেউ কি ভাববে, সেই মেয়েটা কেমন বিস্ময়ভরা বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতো এই ফাঁকা প্রান্তরটার দিকে

ছেলেমানুষের মতো মাথা দুলিয়ে কপিলা বললে, আমি কিন্তু আগাগোড়া সব দেখবো, বাবা।

ধর্মদাসের চোখে তখন একটু তন্দ্রা নেমেছে। চোখ বুজেই বললে, দেখবি, নিশ্চয় দেখবি।

সামনের মাঘে ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পা দেবে কপিলা। অথচ মাঝে মাঝে ছেলেমিতে ছোট মেয়েদেরও সে হার মানায়। কিছুক্ষণের জন্যে বিহ্বল হ'য়ে পড়ে ধর্মদাস। মন চ'লে যায় কয়েকবছর অতীতে। ধর্মদাস ভুলে যায় তার কপিলা বড়ো হ'য়েছে।

আস্তে আস্তে বিকেলের আলো কখন প'ড়ে এলো।

চমক ভেঙে কপিলা উঠে পড়লে। ধর্মদাস তখনো খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

ধর্মদাসকে জাগিয়ে দিয়ে কপিলা বললে, আমাকে বলো ঘুম-কাতুর। তুমি নিজে এই দিনমানে কেমন ঘুম দেছ দ্যাখো তো?

ধর্মদাস সস্নেহে হেসে বললে, তোতে আমাতে এক কথা হ'ল রে? বুড়ো হ'য়ে গেছি না আমি?

কপিলা বললে, ও তোমার বাতিক। তোমার পারা খুনখুনে বুড়োমানুষ বলি দেশে আর একজনাও পাওয়া যাবে না?

ধর্মদাস হেসে ফেললে। কপিলা চলে গেল বাড়ীর ভেতর। বাপের মুখে ও-কথা শুনলে কপিলা সত্যিই বেশ রেগে যায়।

সন্ধ্যে হ'য়ে এলো।

উনুনে কয়লা ছড়িয়ে দিয়ে ধর্মদাস গরম গরম এক গেলাস চা খেয়ে নিলে।

পদ্মিনী এলো তার সময়মতো। রাতের অন্ধকার তখন নেমে পড়েছে।

ঝুড়িটা মেঝের রেখে তার ওপর ব'সে পড়লে পদ্মিনী। ব্যস্ততার কোনো চিহ্ন নেই।

ধর্মদাস বললে, কি রে, আজ ঘোড়ায় চেপে আসিসনি?

না, দাদা। হেসে বললে পদ্মিনী।—তাতে ক'রে একটুক্ চা দাও দিকি। গা-গতর একটু গরম ক'রে নিয়ে যাবো।

ধর্মদাস চা তৈরি করতে লাগলো। পদ্মিনী একটু হেসে বললে, তোমার মালবাবুর কী হ'ল গো দাদা?

কি জানি, হয়তো অসুখ-বিসুখ হ'য়েছে। ক্যানে?

শুনলে না সেদিন? আমাদের শুকনো গাঙে বেড়ে-আসতে দেখার ভারী শখ ছিল তেনার। তোমরার পুল হ'তে চললো—তা শখ মেটাতে আসবে না একবার?

ধর্মদাস বললে, মল্লিকমশায় কথার পিঠে অমন কত কথা বলে। তা কি তেনার মনেও আছে ভাবিস?

পদ্মিনী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, মনে নেই আবার? রেতের বেলায় ওনাকেও আমি ওপারে দেখেছি, উনিও আমাকে দেখেছে। ওনার শখের কথা জানতে বাকী নেই আমার।

ফিক্ ক'রে একটু হাসলে পদ্মিনী। ধর্মদাস চুপ ক'রে রইলো। কেঁচো খুঁড়তে হয়তো সাপ বেরুবে। দরকার কি?

পদ্মিনী আবার বললে, একটা কথা বলবো দাদা? তোমার কপিলাকে বিয়ে-শাদী দেওয়া ক'রে সরাও এখান থেকে। বোষ্টমী বলো, কাগনি বলো—হাওয়া বড়ো খারাপ।

ধর্মদাসের যেখানে ভয়, ঘা পড়েছে সেখানেই। বললে, মেয়েটার বিয়ের কথায় তো আমার রেতের ঘুম দূর হ'য়েছে রে। কী যে করি—

পদ্মিনী বললে, তোমাকে দাদা ব'লে ডাকা করেছি তাই কথাটা বলি। ঘরে তোমার বাড়বাড়ন্ত মেয়ে। মালবাবুকে অত পাত্তা দিয়োনি দাদা। ওনার নজর ভালো নয়।

হুঁ। তা কপিলার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?

সম্বন্ধের কথা কে বলেছে? বলছি অত খাতির নাই বা করলে।

খাতির আবার কোথায় দেখলি। দোকানদার মানুষ আমি, খদ্দের এলে কি তাড়িয়ে দেব? তোকেও তো দোকানে বসতে দিই। তোরই বা কোন্ মতলবটা আছে বল্?

পদ্মিনী যেন এতটুকু হ'য়ে গেল। যে-মুখে পাড় মল্লিকের কথায় জবাব দিতে তার মুখে খই ফোটে, সেই মুখই নীরব হ'য়ে গেল ধর্মদাসের সামনে।

ধর্মদাস চায়ের ভাঁড়টা এগিয়ে দিলে।

পদ্মিনী বললে, তবে আর তোমার দোকানে আসবোনি, হাজরামশায়।

কথাটা ব'লেই মনে মনে মুষড়ে গিয়েছিল ধর্মদাস। সস্নেহে বললে, রাগ বাসিস্‌নি, পদ্মিনী। আমার বড়ো-মেয়েটা বেঁচে থাকলে বুঝি বা তোর পারা বয়েস হ'ত তার। বড়ো দুখ্যু হয় রে পদ্মিনী!

ক্যানে গো, তোমার আবার দুখ্যু কী?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধর্মদাস বললে, অমন সন্‌ঝেনে লোভের টানে তোরা ওপারে ছুটিস, তাই দেখে দুখ্যু হয়। এ ভালো নয় রে পদ্মিনী, এ ভালো নয়।

পদ্মিনী লজ্জা পেলে না। মুখ বুজে চায়ে চুমুক দিতে লাগলো। ধর্মদাস তার নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, পুল তৈরির কাজে তো কতো লোক নিচ্ছে। মাগনকে বল্‌না ক্যানে ওখানে লেগে পড়তে।

পদ্মিনী ব'ললে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কয়লাগুলো তবে বেচা করবে কে?

ধর্মদাস আর কথা বাড়ালে না। পদ্মিনী আপনমনে একটু হেসে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলে দোকানের বাইরে। তারপর মুচকি হেসে বললে, পান দাও গো তাড়াতাড়ি। আজ কত দেরি হ'য়ে গেল।

পান নিয়ে পদ্মিনী উঠে দাঁড়ালে। হাসতে হাসতে বললে, মালবাবু এলে একটা কথা শুধোবার ভারী সাধ রয়েছে। এলে একবার খবর দিয়ো, হাজরামশায়।

ধর্মদাস বললে, যা বাপু তুই। প্যানর প্যানর আর ভালো লাগেনি।

পদ্মিনী হাসতে হাসতেই বললে, যাবো ব'লেই তো উঠে পড়লাম, দাদা। ওপারের টানে না গেলে যে পারিনে।

সন্ধ্যে ঘুরে গেছে অনেকক্ষণ আগে।

রহস্যময়ী-কাগনি ইয়ার্ড সেই কখন তার অঙ্গ আবৃত ক'রে নিয়েছে রাত্রির কালো বেশবাসে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে পাইলট-ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ কর্কশ বাঁশী। কাঁচা-কয়লার ধোঁয়া উড়ে আসছে ময়রার ওপর দিয়ে।

পদ্মিনী চ'লে গেল।

ধর্মদাস ব'সে রইলো চুপ ক'রে।

আরও কতক্ষণ ব'সে থাকতো কে জানে। দূর থেকে বাতাসে ভেসে এলো বাস্-এর শব্দ।

ধর্মদাস সচকিত হ'য়ে উঠলে। বাস্ এসে পড়লে তখন

আর সময় পাওয়া যাবে না। একেই শীতের রাত। তার ওপর খদ্দেরগুলো যেন সাতসকাল ওকাত থেকেই মেজাজে শান দিয়ে আসে।

ক্লান্ত হাত চালিয়ে কাজ শুরু করলে ধর্মদাস। হঠাৎ কানে ভেসে এলো মিহিগলার গুন্‌গুন্ গানের শব্দ।

ধর্মদাসের ব্যস্ত হাত থেমে গেল। কপিলার গলার গান।

রান্না করতে করতে আপন খেয়ালে গান গাইছে কপিলা। বেশ সুরেলা গলা। ভারী মিষ্টি।

আজকাল আপন খেয়ালে কপিলা অনেকসময় চাপা গলায় গান গায়। কানে এলেই তন্ময় হ'য়ে শোনে।

এককালে ধর্মদাসেরও গানের গলা ছিল। গাঁয়ের যাত্রাদলে বেশ কয়েকবার গান গেয়েছে সে। তখন তার বয়স বোধহয় কপিলার চেয়েও কম।

অনেক পুরনো কথা। অনেক মিষ্টি স্মৃতি।

আর একবার উদাস হ'য়ে গেল ধর্মদাসের মন। কিন্তু সময় কোথায়?

বাস্-এর শব্দ অনেক এগিয়ে এসেছে। হাতে এখনো অনেক কাজ বাকী।

সাতটা তখনো বাজেনি। কয়েক মিনিট বাকী।

বাস্ এসে গেল বেউলীতে।

থেমে যাবার আগে ইঞ্জিনের শেষ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো ঝাঁকড়া নিমগাছটার পাতায় পাতায়।

স্টীয়ারিং ছেড়ে একলাফে নেমে পড়লে বীরুলাল ড্রাইভার। আপন গাড়ীটার উদ্দেশে বললে, নে বেটি, মেয়ের মতো এবার নিশ্চিন্তে ঘুম যা—

যাত্রীর সংখ্যা বেশী ছিল না। যে যার পথে চ'লে গেল। জায়গাটা ফাঁকা হ'য়ে গেল দু'মিনিটে।

কণ্ডাক্টার কার্তিক বললে, আজও হাজরার দোকানে যাওয়া করতেই হবে বীরুদা?

বীরুলাল বললে, ক্যানে, না যাওয়ার মতো কী হ'ল? হাজরার পায়কটগুলো যে শুকিয়ে-খড়ি হ'য়ে যাবে রে।

আমি ফিরে আসছি। মাথায় যে চোট আজ লেগেছে, তাই বলি আজ নয় একটু জিরোলে। কপিলা তোমায় পালিয়ে যাচ্ছে না গো।

তুই কটির থলেটা দে দিকি।—কপিলার কথা তোকে [illegible] হবে না।

মুচকি হেসে কার্তিক থলিটা তুলে দিলে বীরুলালের হাতে। তারপর বললে, রোজ রোজ এত হয়রানির চেয়ে একেবারে ঘর বেঁধেই ফ্যালো না গো। বল হাজরাকে বলি?

বীরুলাল হেসে কার্তিকের পিঠে একটা চাপড় মেরে বললে, গাড়ীর ইস্টার্ট দেওয়া কাজই ব'লে এটাতেও তোকে হ্যাণ্ডেল মারতে ডেকেছি নাকি রে শালা? ঘর যা—দিদিকে বলিস তাড়াতাড়ি ফিরবো।

বীরুলাল পা চালিয়ে দিলে ধর্মদাসের দোকানের দিকে।

কার্তিক জায়গায় দাঁড়িয়েই আপনমনে খানিকটা হাসলে। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে হাঁক দিলে, বাত্তিটা ধর্ রে—

যার উদ্দেশে বলা সে অনেক আগেই সাড়া পেয়েছিল। বাস্-স্ট্যাণ্ডের গায়েই কার্তিকের বাড়ী।

কার্তিকের দিদি রাণী আলো হাতে ঘর থেকে নেমে এলো। টেমির লালচে আলোয় তার শ্রীহীন মুখখানা যেন আরও বেশী পাণ্ডুর মনে হচ্ছিল।

কার্তিক বললে, বীরুদা হাজরার দোকানে গেল। তাড়াতাড়ি ফিরবে ব'লে গেইছে।

শুনেছি। মৃদুস্বরে রাণী বললে।

এত ক'রে বললাম যে আজ দিনটা একটু জিরোও। কে শোনে কার কথা। গাড়ী থামলো কি ছুটলো!

রাণীর ওষ্ঠের কোণে ফুটে উঠলো একটু কৌতুকের হাসি। বললে, হাজরার দোকানের চা পেটে না পড়লে তোর গুরুর যে রেতে ঘুম হয় না।

কার্তিক বললে, হাজরার চা না পিত্তি। যার তো বাপু ওই নেশায়। আজ মাথায় অতবড়ো চোট লাগলো তাও কি কামাই দিবে?

রাণী অবাক্ হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলে, কিসের চোট? কী হ'য়েছে?

কাটোয়া ইস্টিশন-বাজারে কার সঙ্গে হাতাহাতি ক'রে আজ মাথা ফাটা ক'রেছে।

হাতাহাতি? ওই মানুষে!

তা ছাড়া আর কী? আমি গেইছিলাম টাউনের দিকে। ফিরে এসে দেখি মাথায় ফেট্টি বেঁধে ইস্টাণ্ডের চায়ের দোকানে ব'সে বিড়ি ফুঁকছে। শোনলাম সে লোকটাকে নাকি আধমরা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

রাণী যেন অবাক্ হ'ল। বীরুলাল ফুর্তিবাজ মানুষ। সে যে মারামারি করতে পারে তা ভাবতেই পারা যায় না।

ব্যাপারটা কল্পনা করতে গিয়ে ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে রাণী।

কার্তিক হাত-মুখ ধুতে চ'লে গেল।

টেমিটা নামিয়ে রেখে রাণী কয়েকমুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো পাশের বিছানার দিকে।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে মেনকা। একমাথা চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে তেলচিটে বালিশটার ওপর দিয়ে। ঢলঢলে মুখখানায় কোথাও কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই। নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত বারোবছরের ঘুমন্ত মেয়ে। মিটমিটে আলোয় চিক্‌চিক্ করছে কাঁসার নাকছাবিটা। কাঁথাখানা ভাগ্যিস গায়ে আছে, নইলে পরনের শাড়ীও ঘুমের মধ্যে ঠিক থাকে না মেয়েটার। ঘুমের ভেতর কতবার যে রাণী তার শাড়ী গুছিয়ে দেয় তার কোনো খোঁজই রাখে না মেনকা।

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ছোট বোনটার দিকে তাকিয়ে রইলো রাণী। এ-বয়স একদিন তারও ছিল। মেনকার মতো এমন নিশ্চিন্ত ঘুম সে-ও হয়তো ঘুমিয়েছে কোনোদিন। সেরকম আর একটা রাতের কথাও এখন মনে পড়ে না। একটা জীবনে যে এত বেদনা জমতে পারে তা কি সে জানতো তখন?

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস রাণীর বুক থেকে বেরিয়ে এলো।

ঘুমন্ত মেনকার কপালের ওপর সস্নেহে একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়ালে। কার্তিককে জলখাবার দিয়ে কিছুক্ষণের মতো বিশ্রাম্। বীরুলাল ফিরে এলে দুজনকে ভাত দিয়ে নিজে খাওয়ার পর রাতের মতো ছুটি।

বছরখানেক আগে বীরুলাল ড্রাইভারের চেষ্টায় কার্তিক এই চাকরিটা পায়। সেই থেকে কার্তিক বীরুলালের কাছে একেবারে বাঁধা হ'য়ে আছে। বীরুলাল আগে যখন শেষ বাস্ নিয়ে দেউলী আসতো তখন তার সীটের তলায় থাকতো কাটোয়ার হোটেলের ভাত। মাসকতক আগে কার্তিক সে-ব্যবস্থা তুলে দিয়েছে। বীরুলালের বিছানাটাও থাকে কার্তিকের ঘরে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলে বিছানাটা নিয়ে আসে বাস্-এর ভেতর। ভোরবেলা গাড়ী ছেড়ে যাওয়ার আগে বিছানাটা রেখে যায় নিজের ঘরে। বীরুলাল অনেকবার আপত্তি করেছে, কার্তিক শোনেনি। স্বামী-পরিত্যক্তা দিদি আর ছোট বোনটাকে নিয়ে যে অন্ধকারে সে প'ড়ে ছিল, সেখান থেকে বীরুলাল তাকে টেনে তুলেছে। কৃতজ্ঞতার শেষ নেই কার্তিকের।

রাণী মাঝে মাঝে বীরুলালকে নিয়ে কৌতুক করে। সময় সময় কার্তিক রীতিমতো বিরক্ত হয় তাতে। রাণী আরও মজা পেয়ে বলে, তোর মতো এমনধারা চেলা পেলে আমিও একবার গুরুগিরির চেষ্টা ক'রে দেখতাম।

কার্তিক কখনো রেগে চ'টে একটা জবাব দেয়। কখনো বা হাসতে থাকে। রাণীকে সে বেশ কিছুটা ভয় ক'রেই চলে। বিয়ের পর তিনটে বছর যেতে-না-যেতেই স্বামীর সোহাগ ঘুচিয়েছে রাণীর কপালে। গাঁয়ের পাঠশালায় মাস্টারি করে রাণীর স্বামী শ্রীকণ্ঠ। কোথা দিয়ে কী বিষ তার মনে ঢুকেছিল তা সে-ই জানে। রাণীকে সন্দেহ করতে সুরু করলে। সেই বিষের ধোঁয়া আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে শ্রীকণ্ঠের মন। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন রাণীকে এখানে রেখে সেই যে চ'লে গেল, তারপর আর ঘরে নেওয়ার নাম করেনি।

কার্তিকের বাবা তখনো বেঁচে ছিল। মেয়ের মুখ চেয়ে তিন চার বার গিয়ে জামাইয়ের মন ফেরাতে চেষ্টা করেছে লোকটা। শ্রীকণ্ঠ নরম হয়নি। মুখের ওপর বলেছে, অমন অসতী মেয়ের জন্ম দেওয়া করেছিলেন ক্যানে? আপনার মেয়ে আপনাকেই ফিরিয়ে দেলাম—নিজের পথ নিজে ক'রে নেবে।

চোখের জল চেপে বুড়ো-মানুষটা দেউলীতে ফিরে এসেছে। নিজের অদৃষ্টকে গালি দিয়েছে বার বার।

তারপর একদিন সে-ও চোখ বুজলে। কার্তিক তখন একেবারে দিশেহারা। সেই অবস্থার ভেতরই মালিককে ব'লে ক'রে বীরুলাল কার্তিকের চাকরি ক'রে দিয়েছিল।

কার্তিক ভয় করে রাণীর একটা বিশেষ অবস্থাকে। হঠাৎ এক এক দিন কী যে হয়—রাণীর শ্রীহীন মুখখানা যেন ছাইয়ের মতো হ'য়ে যায়। কাজকর্ম সবই করে। কিন্তু প্রাণ নেই তাতে। তখন রাণীর চোখের দিকে তাকালে কার্তিকের একটা কথাই মনে পড়ে। স্বামীকে উপলক্ষ্য ক'রে তার দিদি যেন পৃথিবীর সব-ক'টি হাসিমুখকে অভিশাপ দিচ্ছে।

রাণী মুখে যাই বলুক, ভাইয়ের কৃতজ্ঞতার খাতিরে তার যতটুকু করবার আছে, তা সে করে। কার্তিক সেটুকু বোঝে।

হাত-মুখ ধুয়ে কার্তিক ঘরে এলো।

তার সামনে একবাটি মুড়ি রেখে রাণী বসলে মেনকার পায়ের কাছে। ঘুমন্ত বোনের পায়ের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, ম্যানকার জন্যে এখন থেকেই একটা ছেলের খোঁজ করতে থাকিস কার্তিক।

নাভানার বই

উপন্যাস।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের
গড় শ্রীখণ্ড
দাম : ৮·০০

নীল ভুঁইয়া
দাম : ৫·০০

দীপক চৌধুরীর
ফরিয়াদ
দাম : ৬·০০

প্রতিভা বসুর
সমুদ্র-হৃদয়
দাম : ৪·০০

তিন তরঙ্গ
দাম : ৫·০০

মেঘের পরে মেঘ
দাম : ৩·৭৫

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
মীরার দুপুর
দাম : ৩·০০

গল্প।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর
এক অঙ্গে এত রূপ
দাম : ৩·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের
চিররূপা
দাম : ৩·০০

প্রতিভা বসুর
মাধবীর জন্য
দাম : ২·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
বন্ধুপত্নী
দাম : ২·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

বাংলা ছোটোগল্প প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীর জাদুতে জীবনের রহস্য, বিস্ময়, বৈচিত্র্য ও গভীরতায় অনাস্বাদিতপূর্ব রসলোকে উত্তীর্ণ। সংহত সুষমা ও শিল্প-সৌকর্যের সুদুর্লভ নৈপুণ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র দেশ-বিদেশের দিক্‌পাল কথাসাহিত্যিকদের সমকক্ষ। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত উৎকৃষ্ট গল্পসমূহের মনোজ্ঞ সংকলন। দাম : পাঁচ টাকা।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের

পলাশির যুদ্ধ

মাত্র ন' ঘণ্টার ঘটনা হ'লেও পলাশির যুদ্ধ একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণেই বাংলাদেশের মধ্যযুগের অবসান এবং বর্তমান যুগের অভ্যুদয়। কলকাতা শহরের গোড়াপত্তনের কথা, বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজের 'আঁতুড়ঘরের' ইতিহাস লেখকের কথকতায় বৈশিষ্ট্যে সার্থক উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক। দাম : চার টাকা।

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম

প্রকৃতিপ্রেম, দেশপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমের ন্যায় লৌকিক প্রেমও রবীন্দ্র-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অনুপম ঐশ্বর্য। 'রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম' গ্রন্থে মহাকবির কাব্য, নাট্যকাব্য ও কথাসাহিত্যে লৌকিক প্রেমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত হয়েছে। দাম : তিন টাকা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পসংগ্রহ

বসন্তপঞ্চম

প্রেমের বিচিত্র লীলায় অধ্যাপিকা সুমিতা, পুরীর মনোমোহন হোটেলের কমলা দেবী, হেডমিস্ট্রেস অনীতা সেন আর বস্তির মেয়ে বকুল—সকলেই যেন বিভিন্ন মিশ্র রাগের বিমূর্ত মূর্ছনা। বাংলা ছোটোগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যে একজন প্রধান শিল্পী 'বসন্তপঞ্চম'-এর গল্পগুচ্ছ তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দাম : আড়াই টাকা।

সত্যপ্রিয় ঘোষের উপন্যাস

চার দেয়াল

বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন উমেশ—আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্রী বিনতা মধ্যবিত্ত জীবনের মামুলি নায়ক নায়িকা হ'য়েই চরিতার্থ হবে? যৌবনচেতনার আকস্মিকতায় সংস্কারজীর্ণ দেয়ালের উপর তাই অবরোধ-মুক্তির আর্তনাদ বেজে উঠছে: না, না, না। নতুন মূল্যবোধের দৃঢ় প্রত্যয়ে কাহিনীপ্রধান উজ্জ্বল আধুনিক উপন্যাস। দাম : তিন টাকা।

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

কার্তিক অবাক্ হ'য়ে বললে, সে কি রে ?

রাণী মৃদুস্বরে বললে, বোনের বিয়ে তো যখন হোক দিতেই হবে।

কার্তিক নির্বিকারভাবে বললে, সে যখন হবে তখন দেখবো। বিয়ে তো তোরও দেওয়া হ'য়েছিল, ফলটা কী হ'ল ?

রাণী বললে, আমার কথা থাক্। সব মেয়ের অদেষ্ট সমান হয় নাকি রে ?

তা ওর অদেষ্টে যা আছে, তাই হবে। আমি খামোখা চেষ্টা ক'রে কী করবো ?

ওমা, তুই না করলে কে করবে ?

আচ্ছা ক'রবো। এখন দুটো খেতে দে দিদি।

রাণী অপ্রতিভ হ'য়ে বললে, আচ্ছা, থাক এখন। তবে কথাটা একেবারে ভুলে যাস না যেন আবার।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে ঘাড় নাড়লে কার্তিক। তারপর বাটিটা তুলে নিয়ে চ'লে গেল নিজের ঘরে।

রাণী চুপ ক'রে ব'সে রইলো সেখানে। তার ভাবান্তরটুকু কার্তিকের নজরে পড়েনি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে রাণী।

বাস্-এর শব্দ শুধু ধর্মদাসই শোনেনি।

কপিলাও শুনেছে সে-শব্দ। তার গানের সুর হঠাৎ থমকে থেমে গেছে। ঢিপ্‌ঢিপ্ ক'রে উঠেছে নব-অনুরাগিণীর ভীরু সলজ্জ বুক।

একটু পরেই সেই লোকটা দোকানঘরে আসবে। তার আসার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকিত হ'য়ে উঠবে দোকানঘর। খুশিতে ভ'রে উঠবে চতুর্দিকের বাতাস।

তরকারিতে জল দিতে গিয়ে আরও খানিকটা তেল ঢেলে ফেললে কপিলা। শেষে নিজের মনেই লজ্জায় মরে। ছি ছি, কেউ যদি দেখে ফেলতো।

বীরুলালের সাড়া পাওয়া গেল।

কপিলারও চোখ-মুখ লাল। গরম হ'য়ে গেল কান-দুটো। তরকারিতে জল ঢেলে দিয়ে পা টিপে টিপে নেমে এলো উঠোনে। সারাদিন ধ'রে যে মুহূর্ত ক'টির প্রত্যাশা, তা যখন আসে তখন কেমন বিহ্বল হ'য়ে পড়ে কপিলা। এক পলক দেখার সাধ। কিন্তু সামনে যাওয়ার আড় ভাঙে না। একটা দুটো কথা বলার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সামনে গেলে হয়তো গলায় স্বর ফুটবে না।

বীরুলালকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলে ধর্মদাস —এই যে এসো গো ঘরের পো।

বীরুলাল ছাতির থলিটা রেখে বললে, এক কাপ কড়া চ লাগাও, হাজরামশাই।

বীরুলালের পটি-বাঁধা মাথায় নজর পড়লো ধর্মদাসের বললে, মাথায় আবার কী হ'ল ?

খানিকটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বীরুলাল বললে, ও কিছু নয়। কাটোয়ার বাজারের একটা বাজে লোকে সঙ্গে একটু হাতাহাতি হ'য়েছিল। তখন তোমার আঙুল তিনেক মতো কেটে গেইছে।

ধর্মদাস আঁৎকে উঠলে। —হ্যাঁ, তা এসে একটু গরম জলে ধুয়ে ফ্যালোনি ?

ডাক্তারখানা থেকে ওষুধপত্তর দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। আর কিছু দরকার নেই।

ধর্মদাস আশ্বস্ত হ'ল। খানিকটা শাসনের সুরেই বললে, যেমন চোয়াড়ের মতো চাকরি, তেমন চোয়াড়ে মেজাজ তোমাদের। ক্যানে বাপু, মারামারি ধরাধরিটার দরকার কি ?

বীরুলাল নিঃশব্দে হাসতে লাগলো।

একখানা মোটা চাদর হাতে কপিলা এসে দাঁড়ালে মাচার পাশে।

ধর্মদাস অবাক্।

কপিলা বললে, এই চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নাও, বাবা। নইলে অসুখ হবে তোমার।

ধর্মদাস সুবোধ বালকের মতো চাদরখানা হাতে নিলে। তার মুখে ফুটে উঠলো প্রসন্ন হাসি। বললে, দ্যাখো বীরু, চেয়ে দ্যাখো একবার। ওর তদারকির জ্বালায় আমি একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে গেছি।

বীরুলাল দেখলে। তার দেখা আলাদা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে সে। অপলক বিস্ময়ের চাউনি। চোখের পাতা পড়ে না।

কপিলার চোখেও এসে লেগেছিল সে-চাউনির তীর। বুকের ভেতর সব রক্তটুকু যেন ছলাৎ ক'রে ঢেউয়ে ঢেউয়ে আছড়ে পড়তে লাগলো।

ধর্মদাস বললে, বীরুলালের কাণ্ড শোন্ কপিলা। আজ কার সঙ্গে মারামারি ক'রে মাথা ফাটিয়ে এসেছে দ্যাখ্।

কপিলা তাকাতে পারলে না। অথচ দেখবে ব'লেই এসেছিল। একটু আগের সব কথা তার কানে গেছে।

বীরুলাল হাসতে লাগলো।

কপিলা যেমন দ্রুত এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই চ'লে গেল।

ধর্মদাস পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললে, মেয়েটা আমার বড্ডো লাজুক।

সে-কথা বীরুলালের কানেও হয়তো গেল না। তার চোখের ঘোর তখনো কাটেনি। সাত আট মাস আগে কপিলাকে সামনা-সামনি একদিন দেখেছিল। তারপরে এত কাছে দেখলে আজই। রূপ যৌবন যেন কপিলার দেহে আর বাঁধা থাকতে চাইছে না। উপচে পড়ছে বর্ষাকালের ঝরনার মতো।

দু'গেলাস চা ক'রে ধর্মদাস নিজে এক গেলাস রেখে দিলে। বীরুলাল একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। চায়ের গেলাস হাতে পেয়ে হঠাৎ খানিকটা অনাবশ্যক উঁচুস্বরে বললে, বড্ডো দোকানেই চা খাই না ক্যানে, তোমার হাতের চা একটা আলাদা জিনিস মাইরি।

ধর্মদাস কৃতার্থের হাসি হেসে বললে, সে বাপু তোমরা পাঁচজনাই বিচার করবে।

বীরুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে ধর্মদাস কী যেন দেখছিল। একটু পরে বললে, আজেবন এই দৌড়োদৌড়ির চাকরিটাই করবে ঠিক করলে নাকি?

আমাদের চাকরি কোথায় পাবো বলো? অন্য সাধ একটা ছিল বটে—

বাধা দিয়ে উদ্গ্রীব হ'য়ে ধর্মদাস বললে, কী সাধ?

একটা মেরামতী কারখানা। ঘরে বসে রোজগার। পড়তাও ভালো। কিন্তু পুঁজি কই?

ধর্মদাস মনে মনে একটু দ'মে গেল। তারপর বললে, আগুরীর ছেলে হ'য়ে জমিজমার সাধটা নেই তোমার?

দূর্ত্তোর জমিজমা। আকাশের পানে তাকিয়ে বছর কাটানো! ওসব বাপু পোষাবে না আমার। বাদলা হ'ল তো হ'ল, আর না হ'লে কপাল পুড়ে ছাই। তার চেয়ে অনেক নিশ্চিন্তে চাকরিটা ক'রে যেছি বাপু। আজ এ-কম্পানি ছাড়িয়ে দিলে তো কাল ও-কম্পানি ডেকে স্টিয়ারিঙে বসাবে। বীরু-ড্রাইভার ভাঙা-এঞ্জিনকে কথা বলায় তা জানে সব মালিক মহাজনেরা।

ধর্মদাস নির্জীব স্বরে বললে, তোমার নামডাকের কথা আমরাও শুনেছি। তবে এ বড্ডো চোরাড়ে কাজ কিনা!

তা একটু বটে। গা-গতর বড্ডো ক'ষে যায়।— বললে বীরুলাল।

উৎসাহিত হ'য়ে ধর্মদাস বললে, সেই কথাটাই বলছি। আগুরী-ঘরে জমিজমার সাধ নেই, এ কথা তো কেউ পেত্যয় যাবে না। যদি কিনা জমিজমার সাধ থাকে তো বলো, তোমার জন্যে নয় চেষ্টা ক'রে দেখি।

বীরুলাল বললে, টাকা কোথায়?

ধর্মদাস আমতা আমতা ক'রে বললে, গরজ থাকলে টাকায় কি আটকে থাকে? ধার কর্জ ক'রে একবার—

তাহ'লে কিছু টাকা দাও না যোগাড় ক'রে। ছোটো-খাটো একটা মেরামতী কারখানা লাগিয়ে দিই কাটোয়ায়। মাইরি বলছি, দু'বছরের মধ্যেই সুদসুদ্ধ আসল টাকায় উশুল দিয়ে দিব।

ধর্মদাস চায়ে চুমুক দিলে। কোনো কথা বললে না।

বীরুলাল সাগ্রহে বললে, কী ভাবছো গো? পারবে যোগাড় করতে?

ধর্মদাস একটু নিষ্প্রাণ হাসি হেসে বললে, ক্ষেপা বটে! টাকার কথা ভাবলেই কি অমনি যোগাড় হ'য়ে যায় গো?

বীরুলাল ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলে। আড়চোখে ধর্মদাসের দিকে তাকালে কয়েকবার। সেদিক থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অন্যদিনের মতো গালগল্পও আজ আর জমলো না তেমন। চা খাওয়া শেষ ক'রে উঠে পড়লে বীরুলাল। বললে, আজ তাহ'লে চলি।

ধর্মদাস অন্যমনস্ক হয়ে কী ভাবছিল। সংক্ষেপে বললে, আচ্ছা।

বীরুলাল একবার আড়চোখে তাকালে পেছনদিকে। মিথ্যে আশা। তার ত্রিসীমানায়ও কপিলার চিহ্ন নেই।

একটা বিড়ি ধরিয়ে দোকান থেকে পথে নেমে পড়লে বীরুলাল। ধর্মদাস তখনো অন্যমনস্ক হ'য়ে কী ভাবছে আপনমনে।

শাহু মল্লিক এবারে এলো প্রায় দেড়মাস পরে।

ধর্মদাস অভ্যেসমতো আপ্যায়ন করলে। শাহু মল্লিক উরুতে চাপড় মেরে বললে, কেমন হে হাজরা, সেদিন বললাম না তোমরার পুলটা তোমার তৈরি হ'ল ব'লে?

ধর্মদাস বললে, আজ্ঞে, শুধিয়ে দেখেন সবাইকে। আপনার কথা আমরা কতবার বলাবলি করেছি। তা এবারে এত দেরি করলেন যে?

শাহু মল্লিক চাদরটা ভালো ক'রে জড়িয়ে বসলে।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, দেখি কি আর সাধে করেছি? সেবার গিয়েই অসুখ হ'ল। উঠতে নাহোক পনেরো দিন। তারপরই আবার সাত ধাক্কায় খোয়া। তা তোমরা সব কেমন আছো? কপিলা ভালো আছে তো?

আজ্ঞে, আপনাদের আশীর্বাদে কেটে যেছে।

কপিলার জন্যে একটা ভালো ছেলের সন্ধান এনেছি হে।

ধর্মদাস সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকালে। —কোথায় ঘর? বয়েস কত? কী করে?

আহা-হা, অত ব্যস্ত হ'চ্ছ ক্যানে? সব কথা শোনো আগে।

বলুন।— ধর্মদাস এগিয়ে বসলে।

পাচু মল্লিক গলা খাটো ক'রে বললে, ছেলে ভালো। বাপটা একনম্বরের ঘ'ড়েল। একটু সবুর করতে হবে।

ভালো পাত্তর হ'লে তা সব ক'রবো। ধর্মদাস বললে, আপনি একবার আমার কপিলাকে দেখাবার ব্যবস্থা ক'রে দেন। তারপর দেখি কোন্ ছেলের বাপ নাক সিঁটকে ফিরে যায়!

পাচু মল্লিক হেসে বললে, আমি কি আর তা জানিনে? তবে আমি যখন হাত লাগিয়েছি তখন তোমার কপিলার কপাল খুললো ব'লে। তবে হ্যাঁ, আমার একটা কথাও রাখতে হবে তোমাকে।

বলুন। একটা ছেড়ে দুটো আদেশ করুন। সাধ্যমতে কুলোলে নিশ্চয় রাখবো।

একটা চা খাওয়াও তার আগে।

ধর্মদাস আর দ্বিতীয় কথাটি না ব'লে চা করতে লেগে গেল। পাচু মল্লিকের মুখে ফুটে উঠলো রহস্যমাখা একটুকরো চাপা হাসি।

ধর্মদাস সযত্নে চায়ের-গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে ধরা গলায় বললে, আশীর্বাদ করেন মল্লিকমশায়, মা-মরা মেয়েটাকে যেন তার আপন ঘরবাড়ী বুঝিয়ে দিয়ে এবারে দায়মুক্তি হ'তে পারি।

পাচু মল্লিক মাথা নেড়ে বললে, তাই বটে। দায়মুক্তি ছাড়া আর কী? মেয়ে-সন্তানকে আপন ভেবে মায়ামমতা বাড়িয়েছ কি মরেছ!

ধর্মদাস ম্লান হেসে বললে, মায়াটা তাই ব'লে তো আর কমা করা যায় না, মল্লিকমশায়। ওই তো হ'ল জ্বালা।

পাচু মল্লিকের মুখখানা মুহূর্তের জন্যে কেমন নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। ধর্মদাসের পরিতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন উদাসভাবে বললে, আমার ও-জ্বালা নেই হাজরা।

ধর্মদাস চমকে উঠলে। পাচু মল্লিক নিঃসন্তান নয় তবে কি কোনো অঘটন ঘটেছে?

আমতা আমতা করে ধর্মদাস বললে, ঘরে কি কোনে আপদ-বিপদ হয়েছে নাকি?

পাচু মল্লিক হাসলে। চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, আপদ বিপদ তো আমার সঙ্গী গো। হাজরামশায়, তোমা একটা মেয়ে আছে, তোমার মায়া আছে মমতা আছে আমার ঘরে কী আছে জানো? কতগুলো শুয়োরে বাচ্চা। সেগুলোর জন্মদাতা হয়েছি বটে—বাপ হ'তে পারলাম না গো!

ধর্মদাস তাড়াতাড়ি বললে, কী যে বলেন আপনি!

ঠিক বলেছি। পচা পাঁকের গাঁথুনি দিয়ে ইমারত গড়তে গিয়েছিলাম গো, হ'ল না!

ধর্মদাস বিহ্বলের মতো বসে রইলো। কোনো কথ বলতে পারলে না। হাঁ ক'রে শুধু তাকিয়ে রইলে পাচু মল্লিকের মুখের দিকে।

পাচু মল্লিকও নীরব।

ধর্মদাসের পিতৃত্বের পরিতৃপ্তি দেখে তার হিংসা হয় বিহ্বল হ'য়ে পড়ে সবটুকু চেতনা।

তিনটি সন্তান পাচু মল্লিকের। জন্মদাতা পিতাকে শ্রদ্ধা করবার অবকাশ তাদের জীবনে আসেনি। ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে তারা কাটিয়েছে, সেখানে সে অবকাশ ছিল না। উপার্জিত অর্থের ছক-বাঁধা অঙ্কটাকে কেউ আমল দেয় না সেখানে। জীবনযাপনের উপকরণ সেখানে বরাবরই এসেছে প্রাচুর্যের লেবেল নিয়ে। নিজেদের ঘরে আশেপাশে—সর্বত্র। মাসমাইনে পেয়ে ফেরার চেয়ে ডিউটি সেরে ফেরার মূল্য সেখানে অনেকখানি। পকেট-ভর্তি কাঁচা টাকা। কেউ প্রশ্ন করেনি কোথা থেকে এলো। অনটন পড়লে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়েছে।

এতেই সে-ইতিহাস শেষ হয়নি। অসতর্ক পিতার পকেট থেকে চুরি করতেও তারা শিখেছিল ছোটবয়স থেকেই। ধমক দেবার মতো মনের জোরও পায়নি তাদের বাব কিম্বা মা। শেষে বাড়ীতে ফিরেই রোজগারের টাক দেরাজে বন্ধ ক'রে রাখতো পাচু মল্লিক। নিষ্ফলার পিতৃত্ব। নিষ্ফলার ব্যক্তিত্ব। নিষ্ফল শাসন তর্জন। তাদের কাছে প্রাপ্য সম্মানটুকু আদায় ক'রে নেবার সাহসও আর ছিল না বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে শ্রদ্ধাটুকুও পায়নি পাচু মল্লিক।

কাপনি ইয়ার্ডের বাবু-কোয়ার্টারে কিলবিল করছে অগণ্য [illegible] সরীসৃপ। জীবনধারণের প্রয়োজন জীবনকে

ক'রে তুলেছে দুর্বহ। সেই আবহাওয়ায় চাকরির শেষ দু'বছর কাটিয়েছে পাহু মল্লিক। দু'হাতে উপার্জন করেছে। কিন্তু সামলাতে পারেনি। শেষের দিকে ইচ্ছে-খুশি-মতো টাকা-পয়সা না পেয়ে ছোট ছেলে দুটো অন্য বাড়ীতে চুরি সুরু করেছিল। বড়োটি মেয়ে। চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই বিধাতার চাতুরি ধরে ফেলেছিল সে। একটা লালসার্ত পুরুষের কাছে সদ্য-যৌবনের ছোঁয়া-লাগা একটা মেয়ের দামও অনেকখানি। বাবু-কোয়ার্টারের এলাকা জুড়ে পাহু মল্লিকের মেয়ের অবাধ গতি। সমাদর তার চতুর্দিকে। পাহু মল্লিক এক রাত্রে মদ খেয়ে ফিরে গলা টিপে ধরেছিল মেয়ের। ওই মেয়েকে নিয়ে তার কাগনি-বাস দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে।

মেয়ের মা এক ধাক্কায় ফেলে দিলে স্বামীকে। ভাঙা গলায় চীৎকার করে উঠলে, লজ্জা করে না তোমার? কার রক্তের ধারা পেয়ে মেয়ে অমন হ'ল? বলো, কার রক্ত— তোমার না আমার? বলো—

আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলে পাহু মল্লিকের স্ত্রী। মেয়েটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

লজ্জা, ঘৃণা, রাগ, বিতৃষ্ণা সব মিশিয়ে পাহু মল্লিকের স্ত্রীর তখন এক অদ্ভুত মূর্তি। থরথর্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে স্বামীর পায়ের ওপর মাথা কুটতে কুটতে সে কেঁদে উঠলে। —আমি তো এখনো মরে যাইনি, তবু তুমি নিজে কী ক'রে বেড়াও? নাইট ডিউটি, নাইট ডিউটি, নাইট ডিউটি! শুধু টাকা? আর কিছু নয়? বলো, আমাকে ছুঁয়ে বলো! কোন্ রক্ত দিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে এনেছ বলো? কার পাপে আমার কচি মেয়ে অমন—

বিপুল কান্নার উচ্ছ্বাসে শেষের কথাগুলো হারিয়ে গেল। বিহ্বল হতবাক্ পাহু মল্লিক ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলে স্ত্রীর দিকে। জবাব দেবার মতো একটা কথাও নেই!···

এসব কাহিনী ধর্মদাস জানে না।

জানলে হয়তো পাহু মল্লিকের কথা ভেবে সে শিউরে উঠতো।

ভাবতে ভাবতে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল পাহু মল্লিক। গেলাসের চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। ধর্মদাস মাঝে মাঝে অবাক্ হ'য়ে তাকাচ্ছে তার মুখের দিকে। কিছু হুঁশ নেই।

হঠাৎ ওপারে একটা ইঞ্জিনের বাঁশী আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

চমক ভাঙলো পাহু মল্লিকের। কেমন একটু অদ্ভুত হাসির সঙ্গে বললে, পুরনো কথা ভাবছিলাম গো।

এতক্ষণ পরে আবহাওয়ার গুমোট কেটে গেল। ধর্মদাস বললে, আজ্ঞে, তা কিছুটা বুঝতে পেছি। আপনার কাজের কথাটা তো বললেন না?

পাহু মল্লিক এতক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। নতুন ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, সড়কের পাশে তোমার যে কাঠা-পাঁচেকের জমিটা আছে, ওইটে যদি বেচা করো তো আমি নিই।

আপনি এই সেটেলমেণ্ট-জমি নিয়ে কী করবেন আবার?

দেখি, একটা দোকান-পসার যদি খোলা যায়।

এই মাঠ-পাথারে কিসের দোকান করবেন গো?— রীতিমতো অবাক্ হ'য়ে প্রশ্ন করলে ধর্মদাস।

একগাল হেসে পাহু মল্লিক বললে, তা কি আগে বলা যায়? পুল তৈরি হচ্ছে, লোকজনের বসতি কিছু হবে। তারপর বাজার কেমন দাঁড়ায় দেখে তো কারবারের সামগ্রীটা ঠিক করবো? তবে ভয় নেই, চায়ের দোকান ক'রে তোমার পসারে হাত দেবো না গো।

ধর্মদাস বিব্রতভাবে বললে, আজ্ঞে, তা ভেবে শুধুইনি। আপনি দোকান করবেন শুনে অবাক্ লাগলো তাই কথাটা বলা।

জমিটা দেবে কিনা তাই বলো বাপু।

আজ্ঞে, আপনি চাওয়া করেছেন তখন দিতে হবে বইকি। সময় হ'লে বলবেন।

দিন পনেরোর ভেতরেই ফিরে আসবো এবার। ধরো, মাসখানেক পরে?

তাই হবে। তবে আমার কমিশার কথাটা যেন ভুলে যাবেন না, মল্লিকমশায়।

জিভ কেটে পাহু মল্লিক বললে, ছি ছি, তা কি ভুলতে পারি? এক বাণ্ডিল বিড়ি দাও দিকি, একটু ঘুরে আসি।

ঝেড়ে-পুঁছে এক বাণ্ডিল বিড়ি এগিয়ে দিলে ধর্মদাস। পাহু মল্লিক বেরিয়ে গেল।

। ৮ ।

দোকান থেকে বেরিয়ে বাউরীপাড়ার পথ ধরলে পাহু মল্লিক।

শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর চাঁদ ফুটফুট করছে। পায়ে চলা পথের রেখাটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কুয়াশা জমে উঠছে একটু একটু ক'রে। হাড়-কাঁপানো শীতের কন্‌কনে বাতাস গায়ে এসে বিঁধছে।

চাদর মাথায় মুড়ি দিয়ে আরও জোরে পা চালিয়ে দিলে

পাচু মল্লিক। বাউরীপাড়ায় ঢুকে সোজা মাগন বাউরীর ঘরের সামনে এসে চাপাস্বরে ডাক দিলে, মাগন আছিস্ নাকি?

আছি গো।

সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মাগন। পাচু মল্লিককে দেখে অবাক্ হ'য়ে বললে, মালবাবু, আপনি?

এলাম তোদের সব খোঁজ-খবর নিতে। তোর পরিবার কোথায় রে?

ঘরকে নেই। কয়লা কুড়াতে গেইছে ওপারকে।

পাচু মল্লিক তা জানে। নিশ্চিন্ত হ'য়ে এগিয়ে এলো কাছে। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে, তোদের ঘরের মদ একটু খাওয়াতে পারিস মাগন? আমি দাম দিয়েই কিনবো।

মাগন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো। চাকরি যাবার পর কাগনির মালবাবু মাঝে মাঝে এসে হাঁস-মুরগী কেনে। একসঙ্গে কয়েকশো হ'য়ে গেলে নিয়ে গিয়ে চালান দেয় কলকাতায়। সেই মানুষটা এসে মদ কিনতে চাইবে, তা বোধহয় মাগন ভাবতে পারছিল না।

পাচু মল্লিক দেরি দেখে ছটফট ক'রছে। বললে, কি রে, এক আধ বোতলও নেই ঘরে?

মাগন একগাল হেসে বললে, তা আছেন। কিন্তু ওই ধেনোর বাস কি আপনার নাকে সইবে বাবু?

সইবে, খুব সইবে। তুই আন্ দিকি।

বলতে বলতে দাওয়ার ওপর ব'সে পড়লে পাচু মল্লিক।

মাগন নিজে সুযোগ পেলেই মদ খায়। দোকানও অনেক দূরে। তাই দু'এক বোতল সবসময়ই কাছে কাছে রাখে। ঘরে গিয়ে সে একটা নতুন বোতল নিয়ে এলো। পাচু মল্লিক ছোঁ মেরে তার হাত থেকে বোতলটা নিয়েই আধবোতল মদ গলায় ঢেলে দিলে।

মাগন হা হা ক'রে উঠলে।—করেন কী মালবাবু, দু'মুঠো চালভাজা তো মুখে দিয়ে নিতে হয়।

পাচু মল্লিক আরও খানিকটা মদ ঢক্‌ঢক্ ক'রে খেয়ে বোতলটা ফেরত দিলে মাগনকে। বললে, পাচু মল্লিক মদ খেলে, বিনি চাটেই খায় বুঝলি?

মাগন একগাল হেসে বললে, আপনাকে গুরু মানি বাবু!

পাচু মল্লিক হাসলে। মাগনের কাঁধে হাত রেখে বললে, ব'স্ এখানে। অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

মাগন প্রথম থেকেই হকচকিয়ে গেছে। কিন্তু পাচু মল্লিকের ভাব-সাব দেখে প্রতিবাদের সাহস পেলে না। পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে মাগনের হাতে একটা গুঁজে দিলে পাচু মল্লিক।

খা শালা, সিগ্রেট খা—মৌতাত জমবে।

মাগন ইতস্তত ক'রে সিগারেটটা কানে গুঁজে রাখলে।

সিগারেট ধরিয়ে পাচু মল্লিক বললে, পদ্মিনী তোকে মানে?

মাগন একগাল হেসে বললে, তা মানবে না ক্যানে? আমার পরিবার বটে তো!

পরিবার! বিড়বিড় ক'রে আপন মনেই কথাটা উচ্চারণ ক'রলে পাচু মল্লিক। তারপর হঠাৎ ভেংচি কেটে বললে, ঘরের মাগকে দু'মুঠো ভাত দেবার ক্ষমতা নেই তো বিয়ে করেছিলি ক্যানে রে? লজ্জা করে না তোর?

মাগন থতমত খেয়ে বললে, আজ্ঞে দুজনায় মিলে উপায় করছি। তা এতে লাজলজ্জায় কী আছে বলেন?

পাচু মল্লিক মুখ বিকৃত ক'রে বললে, করো বাবা, দুজনায় মিলে উপায় করো! তোর পদ্মিরাণী একদিন শিকলি কাটবে রে—তা ব'লে রাখছি।

আজ্ঞে, তা কাটলে আর কী করবো বলেন?

ঘরের মাগকে শাসন করবিনে?

দুটি ভাত-কাপড়ই যদি কিনা দিতে না পারলাম তো আমার শাসন সে নিবে ক্যানে?

পাচু মল্লিক হো হো ক'রে হেসে উঠলে। চোখ-দুটো লাল হ'য়ে উঠেছে। চাদরখানা গা থেকে পড়ে গেছে। হুঁশ নেই তার।

মাগন নরমস্বরে বললে, অতখানি নির্জলা খেয়ে ভালো করলেন না, বাবু।

আবার হেসে উঠলে পাচু মল্লিক। ঢুলুঢুলু চোখের পাতা তুলে তাকালে মাগনের দিকে। —ভালো করিনি? খুব ভালো করেছি। তোর ঘরের বউ তোকে তবু মানে। আমার অবস্থা জানিস? মানা তো দূরের কথা, ভালো ক'রে একটা কথা বলে না রে, মাগন! রক্ত জল ক'রে টাকা কামিয়েছি। তার দাম কি পেলাম বল্? বউটা ঘেন্না করে। মেয়েটা তো ডানা গজাতে-না-গজাতেই চরিত্তির নষ্ট ক'রে ব'সে আছে। ছেলে-দুটো চোর। দেশের বাড়ীতে ব'সে শুয়োরের বাচ্চাগুলো এখন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে।

হঠাৎ আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলে পাচু মল্লিক। হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে আবার বলতে লাগলো, যেমন বাপ, তেমনি তো তার সন্তান রে।

একটাও মানুষ হবে না রে মাগন, একটাও না। তুই কাগজ কলম নিয়ে আয় আমি লিখে দিচ্ছি।

মাগন চুপ ক'রে ব'সে রইলো। নেশার ঝোঁকে মালবাবু এখন আরও কত কি বলবে কে জানে।

মাগনকে নীরব দেখে পান্নু মল্লিক আবার বললে, কই, আনলিনে?

আজ্ঞে, কাগজ কলম কোথায় পাবো?

হঁ, আচ্ছা থাক্। তবে কিনা আমিও হচ্ছি বিপিন মল্লিকের ছেলে। মুখের এই যে একটা কথা বলিয়ে গেলাম, এ তুই যাচাই ক'রে দেখিস্ মাগন। একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি, বুঝলি?

মাগন কোনোমতে একটু সায় দিয়ে বললে, রেতের বেলা পথ চলতে বা বেভুল হয়। চলেন আপনাকে ধর্ম হালদার দোকানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হাত ধ'রে জোর ক'রে তাকে বসিয়ে দিলে পান্নু মল্লিক। বললে, নিজেই খুব যেতে পারবো। ব'স্, অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

মাগন অগত্যা চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

পান্নু মল্লিক বললে, তোমরাপ পুল হ'চ্ছে দেখেছিস?

আজ্ঞে, তা দেখছি।

এপারে কুলীধাওড়া হবে। গঞ্জ-বাজারও হ'তে পারে একদিন। একটা কান্ট্রি-লিকার-শপ হ'লে কেমন হয় রে?

মাগন ঘাবড়ে গিয়ে বললে, আজ্ঞে, কী হবে বললেন?

কান্ট্রি লিকার শপ। দিশী মদের দোকান রে শালা। খেয়ে খেয়ে পেটের ভেতর ভাটিখানা হ'য়ে গেল আর নাম জানিসনে? কেমন হয় একটা দোকান খুললে?

খুব ভালো হয় বাবু। মাগন উৎফুল্ল হ'য়ে বললে, করেন ক্যানে দোকান একটা।

ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবো দেখিস। লাইসেন্স পেতে যা দেরি।

আপনি দোকান খুলে দেন বাবু।

খদ্দের হবে তো?

খদ্দের হবে না? কী যে বলেন, মালবাবু! খদ্দের না হয় তো আমার কান-দুটো কেটে ঝুলিয়ে রেখে আসবো আপনার দোকানে।

পান্নু মল্লিক চোখ তুলে তাকালে। তার দেওয়া সিগারেটটা মাগনের কানে গোঁজা দেখে ক্ষেপে গেল।

ওকি করেছিস্? নামা সিগারেট। ধরা আমার সামনে।

মাগন ইতস্তত ক'রে বললে, আজ্ঞে ধরাবো বইকি। আপনি ভালবেসে জিনিসটে দিলেন বটে।

দাঁতখিঁচুনি দিয়ে পান্নু মল্লিক বললে, তা আবার কানে গুঁজে রেখেছিস ক্যানে? আমার আবার সম্মান কি রে শালা? তুইও অপদার্থ পুরুষমানুষ, আমিও তাই। তুই আমি ইয়ার।

কাঁপা হাতে দেশলাই জ্বেলে মাগনের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিলে পান্নু মল্লিক। মাগনের আড়ষ্ট ভাব দেখে তার পিঠে শিথিল হাতের একটা থাবা মেরে হা-হা ক'রে আবার হেসে উঠলে।

টান্ শালা, জোরসে টান্। সব ইয়ার, সব সমান রে হারামজাদা।

বীরুলাল যে-কথাটা কার্তিক আর রাধীর কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিল, তা গোপন থাকেনি।

কাটোয়ার রাস্তায় বীরুলাল যার সঙ্গে মারামারি করেছিল, সে এসে পরে ব'লে গেছে কার্তিককে। রাধীর স্বামী শ্রীকণ্ঠ। কার্তিককে শাসিয়ে গেছে। বীরুলালকে সে যেন বেশী খাতির না করে। কার্তিক কোনো জবাবই দেয়নি। একমাত্র জবাব সে দিতে পারতো লোকটার টুঁটি টিপে ধ'রে। রাধীর মুখ চেয়ে তা করেনি।

বীরুলালকে কার্তিক কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। ঘটনাটা শুনেছিল কাছের এক দোকানদারের মুখে।

শ্রীকণ্ঠ যেচে এসে বচসার সূত্রপাত ঘটায়। কী কতগুলো গরম কথা কাটাকাটির পর শ্রীকণ্ঠই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বীরুলালের গায়ে। পরমুহূর্তেই বীরুলাল বাঘের মতো রুখে দাঁড়ালে। শেষে রক্তারক্তি। ভালোমতো জখম হ'য়ে তবে শ্রীকণ্ঠের সাধ মিটেছিল।

অথচ বীরুলাল সব কিছু গোপন ক'রে একটা গালগল্প তৈরি ক'রে বলেছিল কার্তিককে।

শ্রীকণ্ঠ এসে যেদিন নিজের মুখে সেদিনকার কথা বলছিল, তখন বীরুলাল সেথাও ছিল না। অনেক কথা বললে লোকটা। তার শেষকথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁ ক'রে কার্তিকের মাথায় রক্ত উঠে গেল। তবু অনেক কষ্টে সামলে নিলে নিজেকে।

একটা কুৎসিত মুখভঙ্গী ক'রে শ্রীকণ্ঠ বললে, আমার বিয়ে-করা পরিবারের সঙ্গে তোর ভাইটার ঢলাঢলি করবে আর আমি শালা গোঁসাইবাড়ীতে ব'সে খোল বাজাবো,

কেমন? তোর দিদিকে বলিস্, আমার পরিবার হ'য়ে ওসব চলবে না।

কার্তিক ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিলে। শ্রীকণ্ঠ পানের পিক ফেলে পিটপিট ক'রে একবার তাকালে। তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল স্টেশনের দিকে। ···

তারপর কিছুদিন কেটে গেল।

কার্তিক এ-প্রসঙ্গ নিয়ে কারও সঙ্গেই কোনো কথা বলেনি।

হঠাৎ সেদিন শ্রীকণ্ঠ এসে ব'লে গেল, সামনের শনিবার বেউলীতে যাবে।

কার্তিক কঠোর স্বরে শুধু বললে, না। যাওয়ার দরকার নেই আপনার।

শ্রীকণ্ঠ একগাল হেসে বললে, তোর দিদিকে নিয়েই আসবো ভাবছি। হাজার হোক ঘরের বউ তো। মন-কষাকষি জিইয়ে রেখে লাভ কী বল্? তাহ'লে ওই কথাই রইলো, ভাই।

শ্রীকণ্ঠ চ'লে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ব'সে কত কিছু ভাবলে কার্তিক। কাটোয়া থেকে বাস্ ছাড়বার পর অবশ্য কাজের চাপে সে-সব চিন্তা চাপা প'ড়ে গেল।

বাস্ এসে দাঁড়ালো বেউলীর স্ট্যাণ্ডে। ক্লান্ত ইঞ্জিনটা শেষ গর্জনের শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেল ক্লান্তের মতো।

একটু একটু কথাবার্তা। পোটলা-পুঁটলি নামানোর শব্দ। শেষ যাত্রীদের কথাবার্তায় মৃদু কোলাহল। সচকিত হ'য়ে উঠলো নিমগাছের তলা।

তাও সব থেমে গেল একটু পরেই। নিভে গেল বাস্-এর আলো। ধীরুলাল চ'লে গেল ধর্মদাসের দোকানের দিকে।

কার্তিক একা।

একটা বিড়ি ধরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলে কিছুক্ষণ ধরে। তারপর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে এগিয়ে চললো ঘরের দিকে।

মেনকার শাড়ীখানা নিয়ে সন্ধ্যের পর রিপু করতে বসেছিল রাণী। দুপুরে পুকুরের ধারে গিয়ে শাড়ীটা অনেকখানি ছিঁড়ে এনেছে মেনকা। তার জন্যে মনটা তারও খারাপ ছিল। কাঁচুমাচু মুখে রাণীর হাতে শাড়ীটা দিয়ে বার বার ক'রে বলেছে, দাদা ফিরে আসার আগেই যেন সব ঠিকঠাক ক'রে রাখা হয়।

[illegible] এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাণী একমনে রিপু ক'রে চলেছিল। বাস্-এর শব্দ কানে যেতেই মেনকার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। বেচারা অনেক বকুনির ভয় নিয়ে ঘুমিয়েছে অথচ রিপু এখনো শেষ হয়নি।

শাড়ীখানা সরিয়ে রেখে আলো হাতে বাইরে এলো রাণী। কার্তিক ততক্ষণে উঠোনে এসে গেছে।

কার্তিক বললে, একটু চা ক'রে দিবি দিদি?

তুই হাত-মুখ ধুয়ে ব'স্, দিচ্ছি। আজ খুব শীত পড়েছে, তাই না রে?

হুঁ।

কার্তিক ঘরে চলে গেল। রাণীও চ'লে গেল চা তৈরি করতে।

হাত-মুখ ধুয়ে এসেও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলো কার্তিক। কথাটা ঠিক কী ভাবে তুলবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকলে রাণী। কার্তিক তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চায়ের গেলাসটা টেনে নিলে।

রাণী বেরিয়ে যাচ্ছিল। কার্তিক বললে, শোন্—

কিছু বলবি?

হুঁ। একটা ঢোঁক গিলে নিলে কার্তিক। —দাদাবাবু আজ দেখা ক'রে গেল।

নিমেষে বিবর্ণ হ'য়ে গেল রাণীর মুখ। ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো কার্তিকের মুখের দিকে।

কার্তিক একচুমুক চা খেয়ে বললে, ধীরুদা সেই যে একদিন মারামারি ক'রে মাথা ফাটিয়ে এসেছিল—কার সঙ্গে জানিস?

কাঁপা গলায় রাণী বললে, তোর দাদাবাবুর সঙ্গে?

হুঁ।

ক্যানে আমাকে বলিসনি?

বললে কী করতিস তুই?

রাণী কোনো জবাব দিতে পারলে না। তার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হ'য়ে এলো। বিবর্ণ বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, কী করেছিল সে-লোকটা?

তা জানিনে। সে যা হবার তা হ'য়ে গেইছে। দাদাবাবু ব'লে গেল সামনের শনিবার তোকে নিতে আসবে।

আমাকে নিয়ে যেতে!— আর্তস্বরে রাণী বললে, তুই কী বললি?

কিছু বলিনি।

বিক্রী এখন
অনেক উঁচুতে
উঠেছে

লোমা শুধু চুল কালো করবার জন্যেই নয়, চুলের প্রসাধনেও অতুলনীয়। সেই জন্যেই দিনকে দিন ভারতের সর্বত্র এবং বাইরেও, তরুণ ও বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সবাই চুল কালো করবার জন্যে অন্য সব কিছু ছেড়ে লোমা-র দিকেই ঝুঁকেছেন।

লোমা

চুল কালো করবার জন্যে সর্বত্র প্রশংসিত।

সোল এজেন্টস:
এম, এম, খাম্বাটওয়ালা
আমেদাবাদ—১
এজেন্টস:
সি নরোত্তম এণ্ড কোং
বোম্বাই—২

কলিকাতার এজেন্ট: শাহ বডিসি এণ্ড কোং ১২৯, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-

আমি যাবো না। তুই ছোটভাই, তোর পায়ে ধ'রে বলছি কার্তিক আমাকে যেতে দিসনি যে।

কথাটা ব'লেই রাণী ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কার্তিক গম্ভীর গলায় ডাকলে, শুনে যা।

রাণী থেমে গেল।

কার্তিক বললে, যাবিনে ক্যানে?

রাণী ধরা গলায় বললে, ক্যানে তা তুই বুঝবিনে কার্তিক। আমি পারবো না।

কার্তিক গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলো। রাণীর দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হ'ল না তার।

চোখ ফেটে জল আসছে রাণীর। উদগত কান্নার বেগ চেপে সে বললে, কাল সে-লোকটাকে মানা ক'রে দিয়ে আসিস্, কার্তিক।

কার্তিক হঠাৎ বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠলে।—তারপর কী করতে হবে বল্? আমার দিকটা ভাববিনে একবার? এ্যানকার কথা ভাববিনে? এত গোঁ ধ'রে ব'সে থেকে কার কপালের শাস্তিটা তুই বাড়াবি বল্? বল্ না ক্যানে স্পষ্ট ক'রে।

রাণী কোনো কথা না ব'লে একবার শুধু তাকালে কার্তিকের দিকে। জলের ধারা নেমেছে তার দু'গাল বেয়ে। আঁচলে চোখ ঢেকে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

চায়ের গেলাসটা পাশেই ছিল। দু'এক চুমুক খাওয়া হ'য়েছে। বাদবাকী সবটুকুই রয়েছে। ধোঁয়া উঠছে গরম চা থেকে।

হঠাৎ গেলাসে একটা লাথি মারলে কার্তিক। ছিটকে গিয়ে বাঁশের খুঁটিতে লেগে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল গেলাসটা। ভাঙা কাচ আর গরম চা ছড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

কার্তিক ফিরেও তাকালে না। চাদরটা গায়ে টেনে নীরবে শুয়ে পড়লো।

সারারাত ঘুমোয়নি রাণী।

শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত নিজের জীবনের কথা ভেবেছে আর বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছে।

মাঝে আর চারদিন। তারপর আসবে সেই শনিবার। ব্যাধের মতো এসে দাঁড়াবে শ্রীকণ্ঠ।

একবার খুশিতে রাণীকে সে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার খুশিতেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আবার একদিন খুশি হ'লে লাথি মেরে ফেলে যাবে।

একদিন গেল। দু'দিন গেল।

কারও মুখে কোনো কথা নেই। কার্তিক ভালো ক'রে কথাও বলে না রাণীর সঙ্গে।

আর একটা দিন গেল।

আজ আর রাণী ধৈর্য রাখতে পারলে না। কার্তিকের সামনে চা আর মুড়ির বাটি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কার্তিক গম্ভীর মুখে বললে, কিছু বলবি?

রাণী মৃদুস্বরে বললে, তোর দাদাবাবু কাল তাহ'লে সত্যিই আসা করবে?

হুঁ।

তুই মানা করিসনি?

না।

রাণী চুপ ক'রে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর কঠিন শান্ত স্বরে বললে, বেশ, আসে আসবে। তবে আমার জন্যে তাকেও ভাবতে হবে না, তোকেও ভাবতে হবে না। আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই ক'রে নিতে পারবো।

কার্তিক প্রথমটা বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। সে-ভাবটা কাটতেই একেবারে ফেটে পড়লে।—কী ব্যবস্থা করবি তুই? যে তোর মুখ চেয়ে ব'সে আছে এই সেউলীর ঘাটে? নাকি কাগনির কয়লা কুড়াতে গিয়ে কামাই করবি রেতের বেলা?

কার্তিক!

তীক্ষ্ণ চীৎকার ক'রে উঠেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে রাণী।—আমাকে—সোদর বোনকে এমন কথা বললি তুই? বলতে পারলি এ-কথা?

হতভম্ব হ'য়ে গেছে কার্তিক।

চিন্তা ক'রে কথা বলেনি। বলেছে অন্ধ রাগে। নিরুপায় দারিদ্র্যের তাড়নায়।

সামনে দাঁড়িয়ে ঝরঝর ক'রে কাঁদছে তার দিদি। ছেলেবেলার অনেক মারামারির সাক্ষী। কত বিপদ অবস্থায় নিশ্চিন্ত আশ্রয়। কার্তিকের সেই দিদি। স্বামীর আদর-সোহাগ পায়নি। পেয়েছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। মনের আগুনে জ্ব'লে পুড়ে ছটফট ক'রতে ক'রতে এসে আশ্রয় নিয়েছে তার কাছে। একটু শান্তিতে বেঁচে থাকার আশায় আঁকড়ে ধরতে চায় সহোদর ভাইকে।

কান্না ঠেলে এলো কার্তিকের গলায়। শুকনো মুড়িগুলো যেন জীবন্ত পোকার মতো কামড়ে ধরছে কণ্ঠনালী।

রাণীর দিকে তাকাতে পারলে না কার্তিক। পড়ে রইলো চা আর মুড়ি। চাদরটা তুলে নিয়ে ঝড়ের-বেগে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

থম্‌থমে রাত।

একটা ঝরাপাতা মাটিতে পড়লে তার শব্দ শোনা যায়।

রাণী মন খুলে কাঁদলে। অনেকক্ষণ কেঁদে চুপ করলে। তারপর শুধু পাথরের মূর্তি। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। দুঃখের চেতনাও যেন স্তব্ধ গম্ভীর হ'য়ে গেছে।

বীরুলাল যখন ফিরে এলো তখনো কার্তিক আসেনি। গাড়ীর ভেতর বিছানাটা দেখতে না পেয়ে একটু অবাক হ'য়ে কার্তিকের নাম ধ'রে সে ডাকলে দু'বার।

কোনো সাড়া নেই।

আলো নিভিয়ে রেখে বাস্ থেকে নেমে কয়েক পা এগুতেই ভাখে বিছানা নিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে রাণী।

অবাক্ হ'য়ে বীরুলাল বললে, তুমি?

ক্যানে, আমি পারিনে? রোজই তো কার্তিক দিয়ে যায়, একদিন নয় দিদিই বিছানাটা ক'রে দিক।

কার্তিক কোথায়?

কি জানি কি কাজে গেইছে।

রাণী গাড়ীর ভেতর উঠে গেল।

বীরুলাল হতবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, দাঁড়াও, বাতি জেলে দিই।

না। এমনিই পারবো।

বীরুলাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিছানা পাতা শেষ ক'রে গাড়ী থেকে নেমে এলো রাণী। দাঁড়ালে বীরুলালের কাছাকাছি। শুধু নির্জন অন্ধকারে তার মূর্তিটাকে একেবারে অচেনা মনে হ'ল বীরুলালের।

রাণী বললে, আমি তো নেউলী ছেড়ে চললাম গো ডাইভার-সাহেব।

বীরুলাল বললে, শুনেছি।

শুনেছ বুঝি? আহা হা, সে-লোকটার সঙ্গে হাতাহাতি মারামারি ক'রেও আমাকে ধ'রে রাখতে পারলে না গো?

চম্‌কে উঠলে বীরুলাল। তার হাতের ওপর বিদ্যুৎ-স্পর্শ। হিমশীতল নরম নরম আঙুলের চাপে কেঁপে উঠলো বীরুলালের স্টীয়ারিং-ধরা কর্কশ হাতের কব্‌জি।

চাপা স্বরে খিলখিল ক'রে হেসে রাণী বললে, কেমন পুরুষমানুষ গো তুমি? যাকে মারলে-ধরলে সেই লোকটাই [illegible] নিয়ে যাবে রাণীকে?

বীরুলাল বিহ্বল ভাবে বললে, তোমার আজ কী হ'য়েছে দিদি?

কী আবার হবে? ফুর্তি হ'য়েছে। ফুর্তিতে বুকে নাচন লেগেছে ভাখো।

মুহূর্তের মধ্যে বীরুলালের হাতখানা বুকের ওপর টেনে নিলে রাণী। বীরুলাল কাঠের পুতুল। ফিস্‌ফিস্ ক'রে রাণী বললে, কি গো, বুকের নাচন মালুম হয়?

হাত টেনে নিলে বীরুলাল। আচ্ছন্নের মতো বললে, ঘরে চলো দিদি।

ঘর! ঘরে গে' কী করবো গো? তোমাকে নাকাল করতে আজ-বড়ো ভালো লাগছে, ডাইভার। চেয়ে ভাখো, কপিলার মতো রূপসী না হই, একেবারে কালো-কুচ্ছিতও নই গো।

বীরুলাল সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল। তার সমস্ত চেতনায় যেন একটা প্রলয় ঘ'টে গেছে। এক আকস্মিক আবর্তের তীব্র পাকে পাকে ঘুরে তার আচ্ছন্ন মনটা যেন কোথায় কোন্ গভীরে তলিয়ে গেল।

রাণী ফিস্‌ফিস্ করে বললে, কথা বলছো না যে?

বীরুলাল শুধু বললে, ঘরে যাও, দিদি।

দিদি নয় গো—রাণী। আমার নাম জানো না তুমি? কপিলার বাঁধন থেকে তোমাকে কেড়ে নিব গো, কেড়ে নিব। তাতে আমার পাপ হবে না একটুও।

কাপনি ইয়ার্ডের একটা ইঞ্জিন আর্তনাদ ক'রে উঠলো রাত্রিকে কাঁপিয়ে। তীক্ষ্ণ সে কান্নার রেশ বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ক্রমে মিলিয়ে গেল প্রান্তরের ওপর দিয়ে।

বীরুলাল ফিরে তাকালে।

রাণী আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে যাচ্ছে উঠোনের দিকে।

বীরুলালের পা দু'খানা অসাড় হ'য়ে গেছে। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো নিষ্প্রাণ নির্বাক পুতুলের মতো।

মাঘ মাস শেষ হ'তে চললো।

দ্বরবার স্রোত বালির বুকে পথ হারিয়ে উধাও।

শুধু বালি আর বালি। এখানে ওখানে মাথা খুঁড়ে উঁকি দিয়েছে কয়েকটা বাউয়ের চারা। বৈশাখ পর্যন্ত বিশুষ্ক স্রোতের এই রেখাটি শুধু সাক্ষী দিয়ে বলবে, এই তার পথ। দামোদরের দস্তি মেয়ে দ্বরবা এই পথটা ধ'রেই ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গঙ্গায়।

বালির বুকে অনেক গভীর থেকে পুলের গাঁথুনি উঠছে।

বিরাট ক্রেন আর যান্ত্রিক হাতুড়ির প্রচণ্ড শব্দে সারাদিন ধ'রে কাঁপতে থাকে দেউলী। পাথরকুচি আর সিমেন্ট-বালির মসলা সারাদিন ধ'রে ঢালছে তো ঢালছেই। অজয়ের বালির তলায় এত জায়গাও ছিল।

কপিলা রোজই একরাশ কৌতূহল নিয়ে দ্যাখে। নেমে যায় বালির ওপর। অন্যমনস্ক ভাবে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যায় এক এক দিন। খেয়াল হ'লেই লজ্জা পেয়ে থেমে পড়ে। বালির ওপর ব'সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে গড়ন্ত পুলের দিকে।

আজ সকালে বিরাট ক্রেনটা শূন্যে তুলে ফেলেছিল একটা লোহার কড়িকে। ঠিক যেন একটা খেলনা-পুতুলকে হাতে তুলে দোলাচ্ছে। সেই কড়িটা বসানো হ'য়ে গেছে কংক্রীটের গাঁথুনির ওপর। তারপর আরও একটা। ঠিক একই ভাবে।

কপিলা অবাক্ হয় আর ভাবে। ভাবতে ভাবতে আরও অবাক্ হয়। এত শক্তি মানুষের! এত বুদ্ধি ওই মানুষগুলির! অত দূরের কথায় কাজ কী। বীরুলাল যে দুটো মাত্র হাত দিয়ে দৈত্যের মতো অতবড়ো বাস্-গাড়ীখানাকে রোজ পোষা ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে নিয়ে যায় আবার ফিরিয়ে আনে, তা কি কিছু কম?

বেলা প্রায় প'ড়ে এসেছে।

কপিলা তবু নিশ্চিন্তে বালির ওপর ব'সে রইলো। ধর্মদাস কাটোয়ায় গেছে শম্ভু মল্লিকের সঙ্গে। জমি-বিক্রির দলিল রেজিস্টারি হবে। ফিরবে সেই শেষ বাস্-এ। তার আগে একসময় রান্নার পাট চুকিয়ে রাখলেই চলবে।

কপিলা বিভোর হ'য়ে ব'সে ছিল।

হঠাৎ মিহিগলায় একটা ডাক শুনে সে চমকে তাকালো। কাছেই অজয়ের উঁচু পাড়ের একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে মেনকা ডাকছে।

কপিলাদিদি, ও কপিলাদিদি!

পিছন ফিরে তাকিয়ে কপিলা চীৎকার ক'রে উঠলে, স'রে যা, ম্যানকা। প'ড়ে যাবি যে!

মেনকা হি হি ক'রে হেসে দৌড় দিলে। ঢালু পাড় দিয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এলো কপিলার কাছে। বললে, পুল দেখছো, কপিলাদিদি? কাছে গে' দেখলেই পারো। আমি তো রোজ যাই।

কপিলা তার গাল টিপে দিয়ে বললে, আমি এখান থেকেই ভালো দেখি।

মেনকার মুখের দিকে তাকিয়ে পুরনো কথা মনে পড়লো কপিলার। ক'বছর আগে সে নিজেও তো কোমরে আঁচল জড়িয়ে এমন ক'রে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতো!

মেনকা তার হাত ধ'রে বললে, আমাদের বাড়ী চলো না গো।

ক্যানে রে?

তুমি তো আর যাও না, ভাই।

কপিলা চুপ ক'রে রইলো। মেনকা পাছে তার বিরক্তি ধ'রে ফেলে তাই তাড়াতাড়ি বললে, আজ বাবা ঘরকে নেই রে। পরে একদিন যাবো।

ও-বাড়ীটার অস্তিত্ব কপিলার কাছে ক্রমেই দুঃসহ হ'য়ে উঠছে। বিতৃষ্ণায় তার বুক জ্বলে। যে মানুষটাকে কাছে বসিয়ে সাধ মিটিয়ে খাওয়াবে সে—তাকে ভাত বেড়ে দেয় মাগী। কপিলা কিছুতেই মাগীকে সহ্য করতে পারে না। স্বামীর সোহাগে আগুন দিয়ে মেয়েটা সেই কবে এসে বাপের বাড়ীতে ব'সে আছে। যাওয়ার নামও নেই!

মেনকা একটা ঝাউয়ের চারা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বেছে বেছে দুটো ময়ূরপুচ্ছ-পাতা সন্তর্পণে ছিঁড়ে নিয়ে একটা পরিয়ে দিলে কপিলার খোঁপায়। নিজের বিনুনিতে গুঁজে দিলে একটা।

কপিলা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁরে, তোর দিদি আর শ্বশুরঘরকে যাবে না?

ঠোঁট উল্টে মেনকা বললে, দাদাবাবু নিলে তো যাবে!

কপিলা একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে বললে, আমি হ'লে কিন্তু চ'লে যেতাম রে, ম্যানকা। নিজের ঘর থাকতে বাপের বাড়ী প'ড়ে থাকতে কারও ভালো লাগে বল্?

মেনকা কী বলবে বুঝতে পারলে না। কপিলা তার হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই হেসে ফেললে। মেনকার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, দুত্তোর যত সব কথা! চল্ ম্যানকা, তোকে একটা জিনিস খাইয়ে দিই।

কী জিনিস গো?

চল্ না বাপু।

মেনকাকে নিয়ে বাড়ীতে চ'লে এলো কপিলা। তার হাতে কিসের একটু আচার দিয়ে তার পাশে ব'সে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সব কথা জেনে নিলে। সব কথাই বীরুলালকে নিয়ে।

মেনকা শেষে বিরক্ত হ'য়ে বললে, আর তোমার কথার জবাব দিতে পারবোনি বাপু। মুখ ব্যথা হ'য়ে গেল একেবারে।

কপিলা হেসে বললে, তুই দুপুরবেলা আমার কাছে

চ'লে আসিস। দুজনে মিলে রোজ পুন্ন দেখতে যাবো, কেমন?

মেনকা চ'লে গেল।

কেমন একটা দুঃখ অবসাদে কপিলা যেন ঝিমিয়ে পড়লে। তার সব রাগ গিয়ে পড়লো ধর্মদাসের ওপর। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছে কোনোদিন? মেয়ের মনের কথা বুঝবে কেমন ক'রে? পুরুষমানুষে কিছু বোঝে না। মা বেঁচে থাকলে হয়তো এতদিন বুঝে নিত। এমন ক'রে গুমরে কাটাতে হ'ত না কপিলার।

ধর্মদাস ফিরে এলো শেষ গাড়ীতে।

মুখখানা গম্ভীর। কেমন থমথমে ভাব। কপিলা একটু ভয় পেয়ে গেল।

দোকান খোলার ঝামেলা নেই। খাওয়া সেরে নিয়ে ধর্মদাস চুপ ক'রে ব'সে রইলো বিছানায়।

কপিলা বললে, শুয়ে পড়ো বাবা।

ধর্মদাস আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললে, মল্লিকমশায় বড়ো তঞ্চকতা করলে রে কপিলা। আগে জানতে পেলে জমিটা দেতাম না ওনাকে।

কপিলা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে।

ধর্মদাস বললে, আমাকে বলেছিল একটা দোকান করবে। এখন জানা গেল মদের দোকান হবে।

কপিলা অবাক্ হ'য়ে বললে, মদের দোকান?

হুঁ। আমাকে আগে বলেনি। বল্ দিকি, এটা তঞ্চকতা হ'ল না? দেউলী এবার পুরোপুরি উচ্ছন্নে যাবে রে। আর তারই জন্যে জায়গা দেলাম কিনা আমি!

কপিলা বললে, জমি তুমি না দিলে আর কেউ দিত, বাবা। ও নিয়ে ভেবে আর লাভ কী?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধর্মদাস বললে, না, লাভ আর কী। যা হবার তা তো হ'য়েই গেইছে। দুঃখটা হ'চ্ছে কী জানিস? মল্লিকমশায় মানুষটাকে আমি চিনতে ভুল করলাম!

কপিলা মৃদু হেসে বললে, ও দুঃখু তোমার ঘুচবে না, বাবা। মানুষ চেনার চোখ তোমার নেই বাপু।

ধর্মদাস ক্ষুব্ধস্বরে বললে, তোর খালি ওই কথা।

কপিলা বললে, এখন শুয়ে পড়ো দিকি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধর্মদাস বললে, দশ-বারো বছর আগে যখন এই দেউলীর ঘাটে এসে দোকান খোল্লাম, তখন কী অবস্থা ছিল জানিস্? অনেক ভালো। দিনকে দিন দেখছি আর সব-কিছু কেমন উলটপালট হ'য়ে যেছে যে, মা। ওপার এপার এবার একাকার হ'য়ে যাবে।

দূরের কাসনি ইয়ার্ডের নানা শব্দ ভেসে আসছে নৈশ বাতাসে। ঘরের পিছনে কোথায় যেন অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছে কতগুলো ঝিঁঝি পোকা।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধর্মদাস বললে, তোর বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলে দেউলীর বাস আমি তুলে দেবো, কপিলা।

কপিলা একটাও কথা বললে না। এঁটো বাসন নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ধর্মদাস অন্য একটা কথা আর ভাবলে না। ক'দিন পরে আর একবার যেতে হবে কাটোয়ায়। যেতে হবে কপিলাকে সঙ্গে নিয়ে। ভালো সম্বন্ধটা পাছে হাতছাড়া হয় সেই ভয়ে মেয়েকে কাটোয়াতে নিয়ে দেখাবার কথা কবুল ক'রে এসেছে। কপিলার দূরসম্পর্কের এক মামা দিন ঠিক্ ক'রে খবর পাঠাবে।

কপিলা তখন দাওয়ার খুঁটি ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে অন্য কথা ভাবছিল। মেয়ের চিন্তায় ধর্মদাস তো অস্থির হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু ঠিক যেটি হ'লে কপিলার হাতের মুঠোয় চিরকালের সুখ এসে ধরা দেবে, সেইটিই কেবল তার বাবার নজরে পড়বে না? বীরুলালকে দেখেও কিছু ভাববে না তার বাবা?

॥ ১২ ॥

শেষ পর্যন্ত শ্রীকণ্ঠ নিতে আসেনি রাণীকে।

তার না-আসাটা রহস্য হ'য়েই র'য়ে গেল রাণীর কাছে। কার্তিকের মুখ দেখে কিছু একটা সে অনুমান করেছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে হয়নি আর।

কার্তিকও কিছু বলেনি। রাণীর চোখের জল সহ্য করতে পারেনি কার্তিক। শ্রীকণ্ঠকে সে আসতে দেয়নি। শাসিয়ে দিয়েছিল চূড়ান্তভাবে। ভয় পেয়ে শ্রীকণ্ঠ আর আসতে চেষ্টা করেনি।

বীরুলাল সে-কথা জানতো। জানতো না শুধু রাণী। মনের প্রশ্ন সে মনেই চেপে রেখেছে।

তারপর মাসখানেক কেটে গেল।

রাণী আবার অনেকটা সহজ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু বীরুলাল যেন ক্রমেই কেমন গুম্ হ'য়ে যাচ্ছে। আজকাল দেউলীতে এলে বেশীর ভাগ দিনই কার্তিকের ঘরে এসে বসে। ধর্মদাসের দোকানে যাওয়া একেবারেই ক'মে

গেছে। কার্তিক মাঝে মাঝে আশ্চর্য হ'য়ে বলে, তোমার কী হ'ল গো বীরুদা? যা হয় বাপু একটা হেস্তনেস্ত ক'রে দাও। হাজরাকে বলোনা ক্যানে।

বীরুলাল কখনো ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। কখনো উত্তরে শুধু হাসে। সে-হাসির অর্থ বুঝতে পারে না কার্তিক।

রাণী চা ক'রে দেয়। একবারের জায়গায় দু'বার। দরকার হ'লে তারও বেশী। ঠাট্টা-তামাসা করে সুযোগ-মতো। কিন্তু সেই বিশেষ রাত্তির কথা মুখে আনেনি আর একদিনও।

সেই মারামারির কথা তুলে ক'দিন আগে আমায় ঠাট্টা করেছে রাণী। মুচকি হেসে বলেছিল, কী সর্বোনাশ করতে গেইছিলে বলো দিকি ড্রাইভার-সায়েব? তোমার ওই থাবড়া হাতের চড়চাপড়ে কিনা আমার কপালের সিঁদুর মুছতে সাধ করেছিলে, অ্যাঁ?

বীরুলাল বোকার মতো হেসেছিল। কিছু বলতে পারেনি। রাণী মুচকি হেসে আবার বললে, আচ্ছা ড্রাইভার-সায়েব, তুমিই বলোনা ক্যানে, যে সিঁদুর কপালে দিয়ে সাধ আহ্লাদ মেটে না, তেমন সিঁদুর গেলেই বা কী, থাকলেই বা কী?

বীরুলাল বললে, তুমিও তো কিছু কম নও গো। নিজের ঘরকে চ'লে গেলেই হ'ত। দিতে তো চেয়েছিল।

রাণী এবারে আর হাসলে না। বললে, চ'লে গেলে তোমাদের হাড় জুড়াতো, তাই না গো?

বীরুলাল বললে, তোমার সুখ-শান্তি দেখে মন খুশী হ'ত।

আমার সুখ-শান্তি! বিষণ্ণ একটুকরো হাসির সঙ্গে রাণী বললে, আমার কপালটা আমারই, ড্রাইভার-সায়েব। তার বিত্তান্ত আমি জানি!

বীরুলাল কিছু বলতে পারলে না। রাণী দিনের পর দিন যেন আরও রহস্যময়ী হ'য়ে উঠছে। ইচ্ছে-খুশি-মতো নেশার রং লাগায় বীরুলালের চোখে। আবার আপন খেয়ালেই হাসতে হাসতে দূরে স'রে যায়।

নীরবে চা খেতে লাগলো বীরুলাল। রাণী ততক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে। ফিক্ ক'রে একটু হেসে বললে, নিজের সুখ-শান্তিটা কবে দেখা হবে গো? কপিলা যে মন মুষড়ে শুকিয়ে যেছে।

বীরুলাল অন্যমনস্কভাবে বললে, কপিলার সাধ থাকলে নিজে আসবে।

ইস্! কপিলা মেয়ে নয়? সে ক্যানে মুখ ফুটে বলবে? আদর-সোহাগের পরশ দিয়ে মেয়েছেলের মনের আগল খুলতে হয় গো, ড্রাইভার-সায়েব—নইলে খোলে না।

বীরুলাল তাকালে রাণীর দিকে। কপিলার হ'য়ে এত ওকালতি কেন? কার কথা বলতে চায় রাণী? কপিলার, না নিজের?

রাণী মিটমিট ক'রে হাসছিল। বীরুলালের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই আবার বললে, আহা, কপিলার মন এখনো জানতে পেলে না গো!

বীরুলাল আড়চোখে তাকিয়ে বললে, তার মনে আর দরকারটা কী? তার কবল থেকে আর একজন নাকি কেড়ে নিবে শুনি।

রাণী চমকে উঠলো। নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হ'য়ে গেল তার মুখখানা। আস্তে আস্তে বললে, ছিঃ, অমনধারা লোভের ফাঁদ আর পেতো না, ড্রাইভার-সায়েব।

লোভের ফাঁদ পাতা করেছি আমি।

কী জানি! নিষ্প্রাণ স্বরে রাণী বললে।

নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলো বীরুলাল। এ কী রহস্য! সেই রাত্তির কথা এমন ক'রে ভুলিয়ে দিতে চায় মেয়েটা?

সামনে থেকে স'রে গেল রাণী। বীরুলাল তখনকার মতো আর কিছু বলবার অবকাশ পেলে না।

তারপর কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

সেদিন সকালের মিষ্টি রোদ সবে ছড়িয়ে পড়েছে ধানে ধানে পাতায় পাতায়।

বাস্ ছাড়তে তখনো কিছু সময় বাকী।

গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে কার্তিকের সঙ্গে কথা বলছিল বীরুলাল। হঠাৎ তার মুখের কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। তার বিস্ময়বাধা দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে কার্তিক পেছন ফিরলে।

ধর্মদাস এগিয়ে আসছে। তার পেছনে কপিলা। মুখ নীচু ক'রে বাপের সঙ্গে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে।

কার্তিক ফিস্ফিস্ ক'রে বললে, বাপ-বেটী একসঙ্গে কোথায় যেছে গো?

বীরুলালের মুখখানা কালো হ'য়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, জানিনে।

কার্তিক বুঝতে পারলে না বীরুলালের মনের ভেতর কী প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হ'য়ে গেছে। ক'দিন আগে ধর্মদাস যেদিন কাটোয়া থেকে ফেরে, সেদিন ভাসা-ভাসা

তাবে একটা কথা তার কানে এসেছিল। ধর্মদাসের সঙ্গে কপিলাকে দেখে তার মনে পড়েছে সেই কথা। মেয়ে দেখাতে যাচ্ছে ধর্মদাস। বাস্‌ চেপেই যাবে। গাড়ী চালিয়ে কপিলাকে পৌঁছে দেবে বীরুলাল।

কার্তিকের আর সবুর সইছিল না। গলা চড়িয়ে প্রশ্ন ক'রলে, কোন্‌ দিক পানে চললে গো হাজরামশায় ?

একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে ধর্মদাস বললে, কাটোয়া যাচ্ছি গো। অনেকদিন তো দেউলী থেকে পা সরেনি মেয়েটার। তাই ভাবলাম, টাউনে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি একটা দিন। গাড়ী ছাড়তে দেরি কতো ?

কার্তিক উৎসাহের সঙ্গে বললে, এই ছাড়লো ব'লে। উঠে ব'সোনা ক্যানে। কপিলা, ওঠ্‌না ক্যানে গাড়ীকে।

কপিলা জড়োসড়ো হ'য়ে গাড়ীতে উঠে বসলে। বীরুলালের হঠাৎ কী দরকার পড়লো সে-ই জানে। বনেট তুলে ইঞ্জিনটাকে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লে।

কার্তিক মিটমিট ক'রে হাসছিল। এগিয়ে গিয়ে বনেটের আড়ালে বীরুলালের কানে কানে বললে, দাদা, হাতের কসরতটা আজ একবার মালুম করিয়ে দাও গো। গাড়ীর সঙ্গে মেয়েটার মনও যেন উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া চাই।

বীরুলাল ধমক দিয়ে বললে, বাজে বকতে হবে না। হাঁক পাড়গে যা। গাড়ী ছাড়বো এখন।

কার্তিক থতমত খেয়ে বললে, আট-দশ মিনিট সময় আছে তো বাপু।

না, নেই। গাড়ী ছাড়বো এখন।

বনেট ফেলে দিয়ে নিজের জায়গায় চ'লে এলো বীরুলাল। কার্তিক অগত্যা দু'চারবার হাঁক ছেড়ে ঘণ্টি টেনে দিলে।

বীরুলালের হাতে গাড়ীর ইঞ্জিন সচল হ'য়ে উঠলো। ধুলো উড়িয়ে বাস্‌ ছুটলো দেউলী ছেড়ে।

মাইল তিনেক পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। তারপরই পীচের পাকা সড়ক। ফাঁকা রাস্তা। গাড়ী যেন উড়ে চললো।

স্টীয়ারিং হাতে নিয়ে বীরুলাল কোনোদিন অন্যমনস্ক হয়নি। আজ তার ব্যতিক্রম হ'ল। একটা সীট্‌ পিছনেই ব'সে আছে কপিলা। অবাক্‌ হ'য়ে বীরুলালের কেরামতি দেখছে কিনা কে জানে।

আগের বার শাহু মল্লিক এসেছিল বীরুলালের পাশে ব'সে। সাতপাঁচ কথার মধ্যে ধর্মদাসের কথাও উঠেছিল সেদিন। ধর্মদাস মেয়ের বিয়ে দিতে চায় চাষীগেরস্ত ঘরে। বীরুলাল বাস্‌-ড্রাইভার না হ'য়ে কিছু জমিজমার মালিক হ'লে হয়তো তার হাতেই মেয়েকে তুলে দিত মানুষটা। মিথ্যে বলেনি শাহু মল্লিক। মনে পড়ল, কথায় কথায় ধর্মদাস বীরুলালকেও একদিন জমিজমার কথা বলেছিল।

গাড়ী ছুটেছে।

বীরুলালের মুখে ফুটে উঠেছে একটু চাপা হাসি। এখন যদি গাড়ীসুদ্ধ লোক নিয়ে একটা অঘটন ঘটিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে কোথায় থাকবে চাষীগেরস্ত পাত্র ? কোথায় থাকবে অত সাধের কপিলা ?

একদিকে কপিলা। অন্যদিকে রাণী। কপিলা ফুটন্ত ফুল। রাণী আগুনের ফুলকি। কপিলার ডাগর ডাগর চোখে শুধু লজ্জা আর লজ্জা। সাহস নেই বুকে। রাণীর চোখে ব্যর্থতার জ্বালা। বুকে অনেক সাহস। ভালবাসার মরণে মরবার সাহস। ...

আচম্‌কা ক্ষিপ্রতায় প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরলে বীরুলাল।

সামনে পড়েছে একটা গোরু।

তীব্র আর্তনাদ ক'রে গাড়ীখানা থেমে যেতেই গোরুটা ছুটে নেমে গেল মাঠের ভেতর।

ব্রেক ছেড়ে দিয়ে একটা বুকভরা নিঃশ্বাস ছেড়ে দিলে বীরুলাল। আর একটু হ'লেই অঘটন সত্যি সত্যি ঘটতো।

গাড়ী আবার চলতে সুরু করলো।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সবাই ঘাবড়ে গিয়েছিল। ধর্মদাস শুকনো গলায় প্রশ্ন করলে, কী হ'ল গো বাপের পো ?

বীরুলাল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, কিছু নয় গো। কোন্‌ আবাগীর বেটা এই সাতসকালে গোরু ছেড়ে দিয়েছে ভাখোনা ক্যানে ! শালা গেঁয়ো লোক, উজবুক কোথাকার—

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলে বীরুলাল।

গুরুর নিষেধ আছে। গাড়ী একবার হাতে নিলে মন বেচাল করা চলবে না। জল হোক, ঝড় হোক, ছেলেবেলা থেকে কাটুক—মানলে চলবে না। অনেকগুলো জীবনের দায়িত্ব দু'খানা হাতের ওপর। সে-দায়িত্ব পালন না করতে পারলে এ-কাজ করতে নেই।

গাড়ী ছুটলো আবার আগের মতো। ন'টা কুড়িতে পৌঁছতে হবে কাটোয়ায়।

। ১৩ ।

রোজ যে-সময়ে বাস্‌ ফিরে আসে দেউলীতে, আজ সেইসময়ে এলো। এক মিনিট এদিক ওদিক নেই।

গাড়ী থামিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো বীরুলাল। আজ আর সঙ্গে সঙ্গে নামলো না তার জায়গা থেকে।

কপিলাকে নিয়ে বাড়ী চলে গেল ধর্মদাস। একবার যাওয়ার কথাও বললে না বীরুলালকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ফাঁকা হ'য়ে গেল জায়গাটা।

কার্তিক এতক্ষণ মোট-ঘাট নামাতে ব্যস্ত ছিল ছাদের ওপর। নীচে নেমে এসে বীরুলালকে চুপচাপ দেখে বললে, কী হ'ল গো, আজ যে মুখে কথাটি নেই?

বীরুলাল একটু শুকনো হাসি হেসে বললে, চোখের সমুখ দিয়ে নাগরী এলো গেল, একটা কথা হ'ল না তাই ভাবছি মনে।

যা ভাববে ভাবো। একটু জলদি ক'রে এসো বাপু। আমি আবার ডাকাডাকি করতে পারবোনি।

কার্তিক চলে গেল।

বীরুলাল কয়েক মিনিট বসে রইলো একই ভাবে। [illegible]পর সীটের তলা থেকে একটা বোতল বার ক'রে [illegible]খানি মদ ঢেলে দিলে গলায়।

সারাদিনের ক্লান্তি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আপন-মনে খানিকটা হেসে গাড়ী থেকে নেমে এলো বীরুলাল। কার্তিকের ঘরে গিয়ে গা এলিয়ে দিলে মাদুরের ওপর। বললে, এখন আর বিরক্ত করিসনে কার্তিক। একটু পরে নিজেই চা চেয়ে খাবো।

কার্তিক বললে, আমি কিন্তু চা খেয়ে একপাক ঘুরতে যাবো।

বীরুলাল সাগ্রহে প্রশ্ন করলে, কোথায়?

যাই দেখি কোন্ চুলোকে যাওয়া হয়। তবে কিনা হাবলার দোকানকে নয়।

অন্যদিন হ'লে হয়তো বীরুলাল নিজে বেরিয়ে পড়তো। কিংবা কার্তিককে যেতে দিত না। আজ কিন্তু কোনো আপত্তিই করলে না।

চা খেয়ে কার্তিক বললে,—মল্লিকমশায় একবার দেখা করতে বলেছিল। তাই যাচ্ছি।

কার্তিক চলে গেল। বীরুলাল চুপ ক'রে শুয়ে রইলো। রাণী একবার অন্তত আসবে তা সে জানতো।

একটু পরেই রাণী এলো। মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে, অসুখ-[illegible]করেছে নাকি?

[illegible]অমনি শুয়ে আছি।

[illegible]পারা মানুষ কিনা অমনি শুয়ে প'ড়ে থাকে!

[illegible] এগিয়ে এলো। বীরুলালের কপালে হাত ঠেকিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে, না বাপু, জ্বরজ্বালা তো নয়। কী হ'য়েছে ড্রাইভার-সায়েব?

বীরুলাল উঠে বসলে। মদের গন্ধ রাণীর নাকে এসে লাগতেই সে বললে, আজ তুমি মদ খেয়েছ?

হুঁ। মদের বাস চেনো তবে?

চিনিনে? হেসে উঠলে রাণী। —যে মানুষের হাতে তোমরা দিয়েছিলে, সে তো জলের বদল মদ খায় গো। নইলে ঘরের বউকে কোনো ভালোমানুষে এমন হেনস্থা করতে পারে?

বীরুলাল কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে রাণীর দিকে তাকালে। রাণী অপ্রতিভ হয়ে বললে, অমনধারা তাকাইছ ক্যানে?

দেখছি তোমাকে।

আমাকে? কাঁপা গলায় রাণী বললে, আমাকে কী দেখছো অমন ক'রে? দ্যাখোনি এতদিন?

দেখেছি বইকি। এমনধারা দেখিনি।

রাণীর মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। অস্ফুটস্বরে সে বললে, ও-কথা বলতে নেই, ড্রাইভার। ও-ভাবনা ভাবতে নেই, ছি—

বীরুলাল গম্ভীরস্বরে বললে, ভাবনাটা আমার মনে আনা করেছে কে?

আমি তামাশা করেছিলাম, ড্রাইভার।

সেই তামাশাই সত্যি হোক্না ক্যানে। কপিলাকে চাই না আমি।

রাণীর একখানা হাত ধ'রে এক ঝটকায় তাকে টেনে নিয়ে বীরুলাল বললে, তোমাকে হ'লেই আমার চলবে।

মুহূর্তের মধ্যে কী যে হ'য়ে গেল তা বীরুলালও বুঝতে পারলে না। উন্মাদিনীর মতো বীরুলালের কবল থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে রাণী। ক্ষিপ্র হাতে বীরুলালের জামা খাবড়ে ধ'রে ভাঙা গলায় আর্তনাদ ক'রে উঠলে। —কী বললে তুমি? আমাকে হ'লেই চলবে তোমার? সব মেটাবে রাণীকে দিয়ে? কপাল ভেঙেছে ব'লে রাণী এত সস্তা! এত সস্তা ভেবে আমি?

কেঁদে ফেললে রাণী। চোখের জলের বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার গাল বেয়ে। জলভরা চোখের ভিতর থেকে যে-দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তা দেখা যায়। জল আর আগুনের হল্কা যেন একই সঙ্গে বেরিয়ে আসছে তার চোখ থেকে।

বীরুলাল হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে রইলো কয়েকমুহূর্ত।

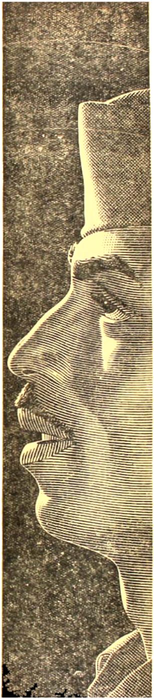

শিষ্টাচার

ক্ষিপ্রতা

নৈপুণ্য

বাদ পড়বে না কিছু—তেল, জল, হাওয়া, পেট্রোল সবই দেখা হয়। হবেই বা না কেন—আমাদের প্রত্যেক পাম্পে যে-সব সহায়কদের হাতে এই কাজ তারা বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তারা শান্ত অথচ ক্ষিপ্র ও বিবিধরকম নৈপুণ্যের সঙ্গে গাড়ীর প্রয়োজনীয় সব কিছুই যোগাতে প্রস্তুত। তাদের কাছে এলেই আপনি অনুভব করবেন সম্মানিত ক্রেতার সমাদর।

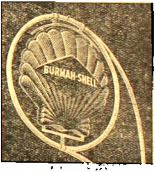

বার্মা-শেলের পাম্পে গাড়ী নিয়ে আসুন। এলেই দেখতে পাবেন সহাস্য মুখে অভিবাদন এবং আপনাকে সব রকমে সাহায্য করার আগ্রহ।

বার্মা-শেলের
সেবাই
এই।

রাণী আবার কেঁদে উঠলে, ডাইভার, আমাকে পেয়ে তুমি এই ভাবলে! দু'দিনের শখ মিটিয়ে তারপর কপিলাকে বিয়ে ক'রে সুখের সংসার পাতবে তাই ভেবেছ?

বীরুলালের আলিঙ্গনে একটা অসহায় নরম পাখির মতো কাঁপতে লাগলো রাণী। কাজলা চোখে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। —ডাইভার! এ কপালে সিঁদুরের দাগ যে একবার প'ড়ে পেইছে গো! কপাল থেকে যদি বা মোছলাম, মন থেকে মুছতে পারবো না—

বীরুলালের বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো রাণী। অনেকদিনের নিরুদ্ধ কান্নার উৎসমুখ আজ খুলে গেছে।

নির্বাক নিস্পন্দ কয়েকটি মুহূর্ত।

বীরুলালও সম্বিৎ প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। রাণীকে আস্তে আস্তে বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই ওর পায়ের তলা থেকে মাটি যেন স'রে গেল।

দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে আছে কাত্তিক।

বীরুলাল বিমূঢ়ের মতো আর একবার তাকালে। জায়গাটা ফাঁকা। নিমেষের মধ্যে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেছে কাত্তিক।

রাণী কিছুই জানলে না। আঁচলে চোখ মুছে অবশ পায়ে আস্তে আস্তে গিয়ে দরজার কপাট ধ'রে দাঁড়ালে।

টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বীরুলাল। বাইরে কালো কালো অন্ধকার। নিমগাছের তলায় একটা মরা জানোয়ারের মতো প'ড়ে আছে তার গাড়ীখানা। আর কোনো চিন্তার অবকাশ ছিল না। আচ্ছন্নের মতো শুয়ে পড়লে হিমশীতল সীটের ওপর। চকিতে একবার চোখে ভেসে উঠলো কপিলার মুখ। আপনমনে হাসলে বীরুলাল।

রাত কত হ'য়েছে কে জানে। কে যেন আস্তে আস্তে গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকছে।

ঘুম ভেঙে গেল বীরুলালের। প্রচণ্ড শীতে দেহটা যেন জ'মে বরফ হ'য়ে গেছে।

কৃষ্ণপক্ষের থমথমে রাত। আকাশে সবে পাণ্ডুর চাঁদ উঁকি দিয়েছে। সেই আলোর যতোটুকু দেখা যায়। কোনোমতে বীরুলাল দেখলে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কাত্তিক। কাঁধে ব্যাগটা।

বীরুলাল বললে, কী রে, সকাল হ'য়ে গেল?

না। তোমার বিছানাটা ওই-যে পেতে দিয়েছি, বীরুদা। ভাতের থালাও ওর পাশে আছে, খেয়ে নিয়ো।

কাত্তিকের কথাগুলো যেন কান্নায় ভেজা। বীরুলাল চুপ ক'রে রইলো। একটু পরে কাত্তিক আবার বললে, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, বীরুদা। চাকরিটা না পেলে হয়তো বা না-খেয়ে দিন কাটাতে হ'ত।

বীরুলাল মৃদুস্বরে বললে, "আবার এসব কথা ক্যানে রে?

কার্তিক বললে, সত্যি ছাড়া মিথ্যে তো নয়। ব্যাগটা তুমি রেখে দাও। ক্যাশ মিলিয়ে টিকিটপত্তর সব থু'য়ে দিয়েছি। আজকের সকালটা নিজেই একটু কষ্ট ক'রে চালিয়ে নিয়ো। মুখুজ্যেবাবুকে ব'লো, এ-চাকরি আমি আর করতে পারলাম না।

বীরুলাল একটা কথাও বলতে পারলে না। সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখে বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইলো কাত্তিকের দিকে।

ফিকে জ্যোৎস্নায় বহুদূর পর্যন্ত সেউলীর প্রান্তরটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। অল্প অল্প কুয়াশা জমে উঠেছে মাঠের কোথাও কোথাও। বাউরীপাড়ার প্রান্তে মাঠের উপর আধার খুঁটে বেড়াচ্ছে গোটাকতক রাতচরা হুতিক-পাখি। শিকার পাওয়ার আনন্দে ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। নিস্তব্ধ মাঠের ওপর দিয়ে বাতাসে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁদের ডাকের শব্দ।

কাত্তিক ব্যাগটা রেখে দিলে বীরুলালের পাশে। বললে, সবই ঠিক-ঠিক আছে। তবু তুমি একবার দেখেশুনে নাও।

বীরুলাল নিষ্প্রভ স্বরে বললে, সত্যিই তুই চাকরি ছেড়ে দিবি কাত্তিক?

ম্লান হাসির একটা রেখা ফুটে উঠলো কাত্তিকের মুখে। বললে, তবে কি মিছে তামাশা করতে এলাম এই নিশুত রেতে?

বীরুলাল তার হাত ধ'রে বললে, মাথা ঠাণ্ডা কর্ কাত্তিক। সব কথা শুনে তারপর—

বাধা দিয়ে কার্তিক বললে, আমি তো কোনো কথা শুধোইনি। থাক্ ওসব কথা।

বীরুলাল তার হাত ছেড়ে দিলে।

একটু থেমে কাত্তিক বললে, আর একটা কথা। কাল থেকে খাওয়ার অন্ত কোনো বেবস্থা দেখে নিয়ো। এ মাসে যে ক'টা দিন বাকী রয়েছে তার হিসেবে এই তোমার সাতটাকা ফেরত।

[illegible] সাতটা টাকা বার ক'রে বীরুলালের হাতে গুঁজে দিয়ে কার্তিক নেমে পড়লে গাড়ীর পা-দানি থেকে।

বীরুলাল অস্ফুটস্বরে ডাকলে, কার্তিক!

কার্তিক তখন কয়েক পা এগিয়ে গেছে। পিছন ফিরলে না। তার ভেজা গলার একটুকরো কথা কান্নার মতো ভেসে এলো। —নুনের দাম রেখেছি, বীরুদা। আর নয়—

রাত্তির-পাখির মিঠি ডাক ছাপিয়ে ওপার থেকে ভেসে এলো প্রচণ্ড ঝন্‌ঝন্ শব্দ। ওয়াগনে ওয়াগনে ধাক্কা লেগেছে হয়তো।

ঘুমন্ত সেউলী ঘুমের ঘোরে একবার চমকে উঠেই আবার ঢ'লে পড়লে গভীর ঘুমে।

বীরুলাল ব'সে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে। নিঃসঙ্গ অসহায় বীর ড্রাইভার। যার হাতে তাজা ইঞ্জিন কথা বলে।

। ১৩ ।

কাটোয়া থেকে ফেরার পর তিন-চারদিন কেটে গেল।

কপিলার মুখে কথা নেই। গম্ভীর থমথমে মুখে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নিয়মমতো সংসারের কাজ ক'রে চলেছে। কাজ না থাকলে তৈরি ক'রে নেয়। পুল [illegible]থতেও যায় না।

ধর্মদাস প্রথমে কিছু চিন্তা করেনি। কিন্তু দু'দিন যেতেই মেয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে মনে মনে সে বিচলিত হ'য়ে পড়েছে। একটা মাত্র মেয়ে। তার মুখও যদি সারাদিন ভার হ'য়ে থাকে তাহ'লে শান্তি কিসে?

সেদিন রাত্রিতে খেতে ব'সে ধর্মদাস বললে, তোর কী হ'য়েছে তা মন খুলে বল্ দিকি কপিলা?

কপিলা মৃদুস্বরে বললে, কই, কিছু হয়নি তো।

ধর্মদাস বললে, কিছু যদি না হবে তো এমনধারা মুখ বেজার ক'রে কাটাইছিস ক্যানে?

কপিলা কোনো জবাব দিলে না।

ধর্মদাস আমতা আমতা ক'রে বললে, বড়োসড়ো হ'য়েছিস, এখন বিয়ের কথায় মুখ ভার করলে চলবে ক্যানে মা? আমি হঠাৎ চোখ বুজলে তোর কী বেপারটা হবে ভাব্, না ক্যানে।

ভেবেছি।

কী ভেবেছিস?

তুমি মরবে না।

ধর্মদাস হেসে উঠলে। চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল চিকচিক ক'রে উঠলো তার। একটা প্রগাঢ় আবেগে গলার স্বর যেন ধ'রে এলো। সস্নেহে বললে, ওটা তো কোনো কাজের কথা নয় রে, কপিলা। যমরাজের পাইক-পেয়াদা একদিন আসবেই বটে। তার আগে তোর বেবস্থা ক'রে ফেলতে পারলে আমার শান্তি। তোর মুখে হাসি না ফুটলে আমার সুখটা কোথায় বল্?

কপিলার বুক ঠেলে একটা কথা বেরিয়ে আসতে চায়। সব কথার শেষ কথা। যে-কথা আর কেউ জানে না। এক অসহ পুলক। এক সুতীব্র শিহরণ। প্রচণ্ড এক আবেগে যে-কথা তার বুকের ভেতর কেবলই রোমাঞ্চ জাগায়। একজন বলিষ্ঠ পুরুষ। যার আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে থরথর ক'রে কেঁপে উঠবে কপিলার দেহ। যে মানুষটার বুকে নিজেকে সঁপে দিয়ে যৌবন সার্থক করবে কপিলা। তার জীবন-যৌবনের সবটুকুকে আবেগে অব[illegible] ক'রে কানায় কানায় ভ'রে তুলতে পারবে যে পুরুষ-মানুষটা। সেই বীরুলালের কথা তো একবারও বলে না তার বাবা।

কী হবে ক্ষেতখামার আর জমিজমা দিয়ে। কী এমন সুখ চাষীমেয়েদের ঘরে। পুরুষমানুষ কি সবাই হয়? ক'জন পারে অমন একটা দৈত্যের মতো গাড়ীকে আপন দাপটে উড়িয়ে নিয়ে যেতে? ক'জন পারে অমন হা হা করে হাসতে? ক'টা পুরুষমানুষের হাত অমন কর্কশ আর কঠিন?

অনেক কথা গলার কাছে এসে জমা হ'য়ে আছে। কিন্তু মুখে আসে না। একটা উদগত দীর্ঘশ্বাস চেপে বাপের সামনে থেকে স'রে গেল কপিলা। শুয়ে পড়লে নিজের বিছানায়।

সেদিন সকালের ছবিটা এখনো যেন তার চোখের সামনে ভেসে রয়েছে। ছোট্ট একটা চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অতবড়ো গাড়ীখানাকে যেন একটা খেলনা-গাড়ীর মতো ছুটিয়ে নিয়ে গেল বীরুলাল। কী বোকা লোক। তারই গাড়ীতে চেপে কপিলাকে দেখাতে নিয়ে গেল ধর্মদাস। অথচ কোনো হুঁশ নেই মানুষটার। গাড়ীখানা রোজই তো ছুটোছুটি করে। সেই দিনটার জন্যে গাড়ীর কল বিগ্‌ড়ে গেলে কী এমন ক্ষতিটা হ'ত? কল খারাপ হওয়া তো দূরের কথা, গাড়ী সেই যে ছুটলো, তার আর থামা-থামি নেই। কপিলাকে কেরামতি দেখানোর শখ হয়েছিল। বোকা মানুষ আর কাকে বলে?

হাসি পেলো কপিলার। হাসতে গিয়ে শেষে চোখ

ভিজে এলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো বালিশে মুখ গুঁজে। বীরুলাল যদি একবার এসে হাত বাড়িয়ে দেয়, কপিলা ঝাঁপিয়ে পড়বে তার বুকে। দু'হাতে আঁকড়ে রাখবে মানুষটাকে। সারাজীবন, চিরকাল। কপিলার চোখের চাউনি দেখেও বীরুলাল তা বুঝতে পারে না?

ধর্মদাসের চোখে ঘুম আসেনি।

খাওয়ার পর বাইরে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলো মাচার উপর। অনেক চিন্তার জট বেঁধেছে মনে। বেচে দেখানো হ'য়েছে। কিন্তু দেনা-পাওনার হিসেবে আপোস হবে কিনা কে জানে। একদিকে এই চিন্তা। অন্যদিকে কপিলার শুকনো মুখ।

রাত কত হ'য়েছে কে জানে।

ফাল্গুনের হাওয়ায় একটু শিরশিরে ভাব। শীত ক'মে গেছে পাঁচ-সাতদিন আগে থেকে।

ওপারে কাগনির আগুন জ্বলছে। উত্তাপে ওপারের বন তো পুড়েই গেছে আগে। এপারেও বদলাচ্ছে। পান্নু মল্লিক মদের দোকানের লাইসেন্স পেয়ে গেছে। টিনের ঘর উঠেছে ধর্মদাসের দেওয়া জমিতে। পুল হ'য়ে গেলে সেটলী হ'য়ে চোলাই চালানের পথ খুলে যাবে।… পান্নু মল্লিক বলেছিল, লোভের পাপে মনের অশুচি। সেই অশুচির আসনে একালের কলির অধিষ্ঠান।

আপনমনে বিভোর হ'য়ে কত কথা ভাবছিল ধর্মদাস। হঠাৎ নজর আটকে গেল শ্রমধার উঁচু পাড়ে। মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে পদ্মিনী। তার হাঁটার ভঙ্গী চিনতে কষ্ট হয় না ধর্মদাস হাজরার।

একটু অবাক্ হ'ল ধর্মদাস। আজ সন্ধ্যেবেলায় পদ্মিনী তো পান নিতে আসেনি। কাগনিতে গেল কখন?

পদ্মিনী এগিয়ে এলো। অন্ধকারে ধর্মদাসকে ব'সে থাকতে দেখে অবাক্ হ'য়ে বললে, কি গো দাদা, ঘুম যাওনি এখনো এত রেতে?

ক'টা বাজে?

তা প্রায় বারোটা।

তুই এত রেতে ফিরছিস, মাগন কই?

তার খুব জ্বর। ঘরকে শুয়ে আছে।

কমলা কোথায় তোর?

পদ্মিনী মৃদুস্বরে বললে, আজ এমনিই যাওয়া লাগলো। তোমাদের জামাই তো প'ড়ে আছে, ব'য়ে আনবে কে?

ধর্মদাস মৃদুস্বরে বললে, রোগা মানুষটাকে একা ফেলে আজ তাহ'লে নাই বা যেতিস পদ্মিনী।

পদ্মিনী মৃদু হেসে বললে, হাতে পয়সা নেই। তো না যেয়ে কী করবো?

আমার ঠেঞে ধার নিয়ে যেতিস।

পদ্মিনী বললে, চাইলে তুমি দিতে তা জানি। কিন্তু শুধতে হবে না? তখন পেতাম কোথায় বলোনা ক্যানে?

ধর্মদাস চুপ ক'রে রইলো।

পদ্মিনী আবার একটু হেসে বললে, তোমাকে একটা কথা শুধুই দাদা। ওপারে কত বাবুদের সঙ্গে আমার চেনা-শোনা। তারা তো কই কোনোদিন বললে না, পদ্মিনী তোর দরকার, এ ক'গণ্ডা পয়সা তুই নে। আমার দরকারে পাইনে, দাদা। তেনাদের দরকারে বেচে পয়সা আনে। তা তুমিও তো বেটাছেলে, পরিবার মরেছে সেই কবে। তুমি কিছু না নিয়ে এমন ধার দিতে চাও শুনলে বাবুরা বলবে কী?

ধর্মদাস মৃদু ধমক দিয়ে বললে, ছি ছি, এমন কথা তুই বললি আমাকে?

পদ্মিনী হাসলে। অদ্ভুত হাসি। বললে, বলতে আর দিলে কই, হাজরামশায়। এমন বিষের দেশে বিষ-বাতাসে দম নিয়েও অমনধারা তুমি রইলে কী ক'রে তাই ভাবি আর অবাক্ হই।

ধর্মদাস তাকিয়ে রইলো পদ্মিনীর মুখের দিকে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখেছে পদ্মিনীকে। শিথিল বেশবাস, শিথিল সম্ভ্রম-চেতনা। রাত বারোটা বেজে গেছে। কাগনির মাংসলোলুপ মানুষগুলোর কাছে সম্পদ বিকিয়ে আঁচলে হয়তো কয়েকটা সিকি আধুলি বেঁধে ঘরে ফিরছে এত রাতে। পয়সা ফুরোলেই আবার যাবে। আর সব পথ বন্ধ ক'রে উপার্জনের সবচেয়ে সহজ এই রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছে কাগনির কালো রাত। রূপ নয়, যৌবন নয়— শুধু নারীদেহ। পদ্মিনী যদি বেঁচে থাকে তবে আজ থেকে দশবছর পরেও কাগনির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে।

ধর্মদাসের বুকের ভেতরটা যেন দুমড়ে মুচড়ে পিষে যেতে লাগলো। বড়ো মেয়েটা বেঁচে থাকলে পদ্মিনীর সমানই হ'ত। ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে ধর্মদাস।

পদ্মিনীর দেহ ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আসছে। বললে, তোমার সঙ্গে এমন সময় দেখা হ'য়ে একটু লাজ বাসতে লাগ লেছে, দাদা। ঘরকে যেয়ে ঘুম যাওগা। এসব নিয়ে ভেবে মন খারাপ করো ক্যানে? আমিও ঘরকে যাই—

ধর্মদাস বললে, ঘুম না যেয়ে আর কী করবো? একটা

কথা তোকে বলি পথিনী। কাগনি তোকে নেশায় টানে টানছে। নেশায় পেয়েছে তোকে।

পথিনী অন্তঃকোপে হাসি হেসে বললে, তা হবে। তবে কিনা এ নেশা আর কাটাতে পেছি না, দাদা।

পথিনী হাসতে হাসতে চ'লে গেল।

ধর্মদাস তাকিয়ে রইলো অপস্রিয়মাণ মূর্তিটির দিকে। তারপরে আপনমনে হাসলে একটু। পথিনী বিশ্বাস করতে পারে না ধর্মদাসের সহানুভূতিকে। মনে মনে কী ভেবেছে, তা সে-ই জানে। রাস্তার কাগনি তাকে যতগুলি পুরুষমানুষ চিনিয়েছে, তাদের চেহারা একটাই। আর কোনো চেহারা দেখেনি পথিনী। কেমন ক'রে চিনবে? জীবনের কোন্ অবসর মেয়েটাকে দেবে সে সুযোগ।

সারা গা কেমন যেন শিরশির্ করতে লাগলো ধর্মদাসের। এতদিন যেমন তেমন ক'রে কেটেছে। আর একটা দিনও দেরি নয়। পুল চালু হ'লে কাগনি আর সেউনীর শেষ ব্যবধানটুকুও মুছে যাবে। তার আগেই আদরের কপিলাকে ছুঁড়ে দিতে হবে দূর থেকে। দরকার হ'লে শেষ সম্বলও বেচে ফেলতে হবে। এই বিষের হাওয়ার রাজ্যি থেকে কপিলাকে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার আর কোনো কাজ নেই। আর কোনো চিন্তা নেই। মেয়েটা [illegible] বাঁচুক।

৫

কপিলার মামার চিঠি পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলো ধর্মদাস। সমস্ত বাতিল হ'য়ে গেল। পাত্রপক্ষের মোটা দাবির সবটুকুকে মেনে নিয়েছে আর এক পাত্রীপক্ষ। সেখানেই ঠিক হ'য়েছে বিয়ে।

চোখের সামনে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলো ধর্মদাস। চিঠিখানা হাতে ক'রে ব'সে রইলো বোবার মতো। এর পর উপায় কী?

সন্ধ্যে ঘুরে গেল।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে কপিলাকে ডাক দিলে ধর্মদাস। বললে, আমি একটু মল্লিকখানায় ঠেঞে ঘুরে আসছি। এই যাবো আর আসবো।

কপিলা ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো। পাচু মল্লিক মদের দোকান করবে জানার পর থেকে তার সঙ্গে আগের মতো ব্যবহার প্রায় ছেড়ে দিয়েছে ধর্মদাস। দিন তিনেক হ'ল মদের দোকানও খোলা হ'য়ে গেছে। এখন এই অসময়োবেলায় সেখানে ধর্মদাসের কী দরকার। বুক কেঁপে উঠলো কপিলার। মদের নেশা কি শেষপর্যন্ত টানলো তার বাবাকে?

কপিলার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে ধর্মদাস বললে, কি রে, একা থাকতে ভয় করবে?

না। কিন্তু তুমি হঠাৎ মদের দোকানকে ক্যানে যেছ বাবা?

ধর্মদাস মেয়ের শুকনো মুখের রহস্য বুঝতে পেরে হেসে বললে, ক্ষেপা মেয়ে বটে! আমি কি মদ খেতে যেছি নাকি? অন্য কথা আছে তেনার সঙ্গে।

কপিলা আশ্বস্ত হ'য়ে বললে, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো কিন্তু।

হন্‌হন্ ক'রে হেঁটে চললো ধর্মদাস। কিন্তু তার মনের জোরে কোথায় যেন একটা শিথিলতা এসেছে। নিরুপায় ভাবে পাচু মল্লিকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, আগের দিনও সে তা ভাবতে পারেনি।

বড়োরাস্তার পাশে নতুন টিনের ঘরে পাচু মল্লিকের দোকান চালু হ'য়ে গেছে। ছোট একখানা টিনের পাতের উপর সবুজ রঙে লেখা হ'য়েছে দোকানের পরিচয়। দরজার ঠিক ওপরেই দেওয়ালের গায়ে চক্চক্ করছে ছোটবড়ো অক্ষরগুলো:

শ্রীশ্রীকালীমাতা সহায়
দেশী মদের দোকান
প্রোঃ :—শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক।

সামনে দাওয়ায় ঝুলিয়ে দেওয়া হ'য়েছে একটা টিমটিমে আলো। সেই আলোয় চক্চক্ করছে টিনের পাতখানা। আর সেই সঙ্গে টাটকা রঙের অসমান অক্ষরগুলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো ধর্মদাস। ঘরের ভেতরে এরই মধ্যে ভীড় জমতে শুরু করেছে। একটু একটু কলরব। হাসি, চীৎকার, গান—সব মেশানো শব্দ।

অস্বস্তির সঙ্গে দাওয়ায় উঠে এগিয়ে গেল ধর্মদাস। দরজা থেকে গলা বাড়িয়ে বিনীত গলায় ডাকলে, মল্লিক-মশায়!

ধর্মদাসকে দেখতে পেয়ে পাচু মল্লিক একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললে, আরে, দাদা যে। এসো হে, এসো।

ধর্মদাস কুণ্ঠিতভাবে বললে, আজ্ঞে ভেতরে আর যাবো না। যদি এক দণ্ডের জন্যে একবার বাইরে আসেন—

পাচু মল্লিক তার কথা শেষ করতে না দিয়েই বললে, বাইরে কেন, ভিতরেই এসো না গো। শুঁড়িখানায় গেলেই কি মাতাল হ'তে হবে নাকি। এসো হে, এসো। তোমার জমি, তোমার প্রজার দোকান, তুমি থাকবে বাইরে? কই, এসো না বাপু।

ধর্মদাস ভিতরে ঢুকলে।

চারিদিকে মদের উগ্র গন্ধ। মেঝের মাটির ভাঁড়ের ছড়াছড়ি। একপাশে বেঞ্চিতে ব'সে মশগুল হ'য়ে আছে ক'জন। তারা সবাই মেউনীর লোক নয়। পুলের কুলীও আছে দু'চারজন।

ধর্মদাস এগিয়ে গেল পাচু মল্লিকের গরাদ-ঘেরা গদীর সামনে। বললে, একটা গোপন কথা ছিল, মল্লিকমশায়।

বলোনা এখানে।

ধর্মদাস একটু ইতস্তত ক'রে বললে, আজ্ঞে আপনি এখন বেচাকেনায় ব্যস্ত কিনা তাই—

পাচু মল্লিক বললে, যা বলবার বলোই না বাপু।

ধর্মদাস একটু ইতস্তত ক'রে বললে, আপনি বীরুলালকে ঠিক করে দেন। ওর হাতেই কপিলাকে দেবো আমি।

পাচু মল্লিক হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো ধর্মদাসের মুখের দিকে। তারপর বললে, হঠাৎ মত পাল্টালে যে?

মেয়েটা আমার সুখী হোক। কপালে যদি সুখ থাকে তো—

আহা-হা, অত ব্যস্ত হ'য়ো না। এ-কথা ঠিক করলে কবে?

আজই। চতুর্দিকের অবস্থা দেখে বুক শুকিয়ে যেছে আমার।

পাচু মল্লিক ভুরু কুঁচকে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চাপা গলায় বললে, বীরুলাল কাত্তিকের বাড়ীতে খেতো শুতো তা জানো?

হুঁ, তা জানি বইকি।

কাত্তিক তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে নিজেও বাগের চাকরি ছেড়েছে, তা শুনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা শুনেছি। তবে বীরুলালকে তাড়িয়ে দিয়েছে ব'লে তো শুনিনি।

শোনোনি তো এখন শোনো। স্বভাব-চরিত্তির খুব ভালো নয় বীরুলালের। কাত্তিকের দিদি-মাসীর সঙ্গে—

বাকীটুকু আর বললে না পাচু মল্লিক। চোখের বিশেষ এক ইঙ্গিতে ভরাট ক'রে দিলে বক্তব্যটুকু। তারপর মুচকি হেসে বললে, আরে বাপু, আগুনের কাছে ঘি রাখলে তা গলবেই। কিছু একটা না ঘটলে কাত্তিক মিছেমিছি বীরুকে তাড়িয়েছে নাকি?

হাসতে লাগলো পাচু মল্লিক।

ধর্মদাসের মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো বললে, এসব কি সত্যি?

সত্যি হে, নির্জলা সত্যি। তবে কিনা মেয়ের বিয়ে দিতে চাও দাও। বয়েসের দোষ একটু আধটু অত বিচার করলে ঠগ বাছতে যে গাঁ উজোড় হ'য়ে যাবে গো হাজরা।

ধর্মদাস আস্তে আস্তে উঠে পড়লে। শেষ আশা ছিল বীরুলাল। সে আশাও বুঝি নষ্ট হ'তে চলেছে।

পাচু মল্লিক বললে, দোকান সেরে নিভৃত রাতে আমি যাবো, হাজরা। খুলে বলবো সব কথা।

ধর্মদাস ক্ষীণস্বরে বললে, আজ্ঞে, তা শুনে আর কী আসাবে? ও-ছেলের সঙ্গে কপিলার বিয়ে আর হ'ল না।

পাচু মল্লিক বললে, কপিলার সব্বোনাশ কেউ যদি করে তো তুমিই করবে, হাজরা। মেয়ের জন্যে ধম্মপুত্তুর পাত্র তুমি কোথায় পাবে? একটাও নেই।

ধর্মদাস চুপ ক'রে রইলো।

পাচু মল্লিক বলতে লাগলো, মেয়ের কপালে মেয়ে সুখ-দুখ জুটবে। তা নিয়ে তুমি অত মাথা ঘামাও কেন বাপু? হাজরা, সময় থাকতে মেয়েটাকে যাহোক একটা মানুষ জুটিয়ে দাও। নইলে দু'এক বছর পরে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাবে।

ধর্মদাসের মুখখানা রাগে কালো হ'য়ে গেল। তারই ভেতর সম্ভ্রমটুকু কোনোমতে বজায় রেখে বললে, আমার কপিলা তেমন মেয়ে নয়। ম'রে যাবে তবু নষ্ট হবে না জানবেন আজ্ঞে।

আর একমুহূর্তও দাঁড়ালে না ধর্মদাস। পাচু মল্লিকের কথাগুলো যেন তীরের মতো এসে বিঁধেছে তার বুকে। 'সময় থাকতে মেয়েটাকে যাহোক একটা মানুষ জুটিয়ে দাও'। কথাটা ভাবতেই ঘৃণায় রী রী ক'রে উঠলো তার দেহ। তার মেয়ে এত ছোট?

দ্রুত পায়ে হেঁটে চললে ধর্মদাস। রাগে, ঘৃণায় সমস্ত শরীর থেকে যেন আগুন ছুটছে। কতটুকু জানে পাচু মল্লিক? কপিলার মা যখন মারা যায় তখনো তো বয়স যায়নি ধর্মদাসের। কামনা বাসনা ছিল না? বিয়ে করতে পারতো না আর একটা? ধর্মদাস বিয়ে করেনি। কামনা বাসনা তুলে দিয়ে এসেছিল কপিলার মায়ের চিতায়। নিজে মা হ'য়ে মেয়েকে বুকে নিয়ে মানুষ ক'রে তুলেছে

সব কষ্ট স'য়ে। সেই মানুষটার রক্তেই কপিলার জন্ম। অত ছোট নয় তার কপিলা।

। ১০ ।

ধর্মদাস বেরিয়ে যাবার পর পান্নু মল্লিক আপনমনে হাসতে লাগলো অনেকক্ষণ ধ'রে। ধর্মদাস একটা আজব মানুষ। পাঁকের মধ্যে জীবন কাটিয়ে কপালে চন্দন-তিলক পরার শখ লোকটার। জলে বাস ক'রে ডাঙার বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার সাধ। লাভ কী তাতে? দাম কে দেবে?

খদ্দেরের ভীড় বাড়তে সুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরেই তখনকার মতো ধর্মদাসের কথা ভুলে গেল পান্নু মল্লিক।

সেউলীতে নতুন মদের দোকানের খবর পৌঁছে গেছে সব ঠিক-ঠিক জায়গা মতো। খদ্দেরের সংখ্যা বাড়ছে।

রাত গভীর হ'তে থাকে। একে একে মানুষগুলো টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। দরজা বন্ধ ক'রে টাকা গুনে গুনে তোলে পান্নু মল্লিক। চকচক্ ক'রে ওঠে তার কোটরে বসা চোখ-দুটি। আরও টাকা চাই। আরও অনেক টাকা। অভিজাতী কন্যা বিয়ের বউ শ্রদ্ধা দিতে পারেনি, ভালবাসতে পারেনি। তার ওপর আর লোভ নেই পান্নু মল্লিকের। কাগনি ইয়ার্ডে পয়সার বিনিময়ে নাম-না-জানা মেয়েগুলো যেটুকু খাতির করতো সেটুকুও পাওয়া যাবে না বউয়ের কাছে? কাগনির মেয়েরা সামান্যে খুশী। বিপিন মল্লিকের পুত্রবধূর হাতে মুঠো মুঠো টাকা তুলে দেবে পান্নু মল্লিক। ভালবাসার প্রয়োজন নেই—সমীহ করুক। ভয় করুক স্বামীকে। সমাদর করুক পয়সাওয়ালা পুরুষমানুষকে।

টাকা তুলে রেখে এক এক দিন নিজের গলায় কিছুটা মদ ঢেলে দিয়ে ঝিম ধ'রে ব'সে থাকে। গভীর রাতে আসে পদ্মিনী। ঠুক ঠুক ক'রে টোকা মারে দরজায়। কাগনি থেকে ঘরে ফেরার পথে ঝুড়িতে ক'রে কয়েকটা বোতল নিয়ে যায় রোজ। পরের দিন ইয়ার্ডে নিয়ে যেতে হবে লুকিয়ে। কাগনি ইয়ার্ডে পান্নু মল্লিকের ব্যবসা ছড়িয়ে দিচ্ছে পদ্মিনী। বিক্রির দাম মিটিয়ে নতুন বোতল নিয়ে নিশুত রাতে ঘরে ফেরে।

পদ্মিনী বলে, অনেক তো নাক সিঁটকান করেছ, মালবাবু, এখন যে সেই পদ্মিনী না হ'লে চলে না গো!

পান্নু মল্লিক এক গাল হেসে বলে, তোরা হ'লি আদ্যাশক্তির অংশ। তোদের ছাড়া জগৎব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কাজটা হয় রে?

পদ্মিনী মানে না বুঝেও হাসে। পান্নু মল্লিককে সমীহ করার প্রয়োজন সে বোধ করেনি কোনোদিন। বলে, চরিত্তির নিয়ে আর যেন কথা তুলো না, মালবাবু। সেই তো হার মানলে পদ্মিনীর ঠেঞে।

পান্নু মল্লিক বিগলিত হাসি হেসে বলে, তোর সঙ্গে কি আমার আজকের সম্বন্ধ রে পদ্মিনী? লোকের সমুখে তো আর সে-কথা তোলা চলে না। তাই একটু কাটা কথা হয়তো বা বলি। তুই আবার সত্যি ব'লে ভাবিসনে যেন!

পদ্মিনী এ-ছলা-কলায় ভোলেনি। নিজের পাওনা না বুঝে নিয়ে একদিনও সে পা বাড়ায় না। স্পষ্ট বলে তোমার চরিত্তির ভালো নয় মালবাবু, কথায় দাম নেই। রোজ তোমায় মাল বেচে দিব, রোজ আমার পাওনা মিটাবে তবে অন্য কথা।

পান্নু মল্লিক হয়তো একটু অপ্রতিভ হয়। কিন্তু গায় মাখে না ওসব কথা। মুচকি হেসে বলে, আমার চরিত্তি ভালো নয়, কিন্তু তুই হ'লি ধোয়া তুলসী গঙ্গাজল, খাঁ ছেড়ে দে ওসব কথা—

ছাড়বো ক্যানে? চরিত্তির খালি গড়বেই নাকি মালবাবু? চরিত্তির হ'ল মনে।

বিজ্ঞভাবে পান্নু মল্লিক বলে, নিশ্চয়ই। মনের পাপ হ'ল আসল পাপ। দেহে কি পাপ থাকে নাকি রে বো মেয়ে?

পান্নু মল্লিক ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে হাসে। ফি ফিস্ ক'রে বলে, পাপ কাকে বলে, আর পুণ্যিই বা কা বলে, অ্যাঁ? বেঁচে থাকাটা হ'ল পুণ্যি, আর বেঘোরে ম' যাওয়া হ'ল তাহা পাপ। বেঁচে থাকার জন্যে এই সাতপাঁচ করছিস তুই, এই তোর পুণ্যি রে পদ্মিনী। হ'ল সাধনা। মনে কালি না মেখে ক'টা মেয়ে তোর পা এমন সাধনা করতে পারে বল্?

পদ্মিনী ঠোঁটকাটা। অনেক কথাই বলে পা মল্লিককে। তবু কোথায় যেন একটু দুর্বল হ'য়ে পড়ে এ কথা শুনে। এক এক দিন অবাক্ চোখে তাকিয়ে থা পান্নু মল্লিকের ঘোলাটে চোখের দিকে।

প্রায় রোজই একই ধরনের বচসা।

তবু পদ্মিনী আসে। না এসে থাকতে পারে না পান্নু মল্লিকও তার কথাগুলো গায়ে না মাখিয়ে বোতল গু তুলে দেয় ঝুড়ির ভেতর। আপনমনে হাসে। ক কথায় মেয়েটাকে ভোলানো কত সোজা! …

রাত প্রায় এগারোটা বাজে।

খদ্দেরদের বিদায় ক'রে এতক্ষণ পর মেজাজে একটা সিগারেট ধরালে পান্থ মল্লিক। ধর্মদাস হাজরার চেহারা আবার ভেসে উঠলো চোখের সামনে। মেয়ের বিয়ের নামে প্রায় পাগল হ'য়ে গেছে লোকটা। বিয়ে! কী দাম আছে বিয়ের! বিপিন মল্লিক তো কত সাধ ক'রে ভালো ঘরের মেয়ে এনেছিল ছেলের জন্যে। কী ফল হ'ল? নাইট ডিউটিতে রাতের পর রাত ইয়ার্ডে কাটিয়েছে পান্থ মল্লিক। বাবু-কোয়ার্টারের খুপরিতে ব'সে ভালোমানুষের মেয়ে কিছুই কি করেনি? কোনো পাপ, কোনো অন্যায়? ইয়ার্ডের অন্ধকারে পরের বউকে যদি সে নিজে লালসার থাবায় বেষ্টন করতে পারে তবে ঘরের বউ যে আর কোথাও ধরা দেয়নি তার প্রমাণ কি? নিশ্চয়ই ধরা দিয়েছে। স্বামীর কাছে ধরা পড়েনি সেই জোরেই তার জোর।

এসব কথা একবার মনে এলেই বুকের ভেতরটা কেমন জ্বালা ক'রে ওঠে পান্থ মল্লিকের। তখন মদ চাই। মদ না হ'লে কী এক অসহ্য জ্বালায় ছটফট করতে থাকে তার মন।

ঢক্‌ঢক্‌ ক'রে বেশ খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিয়ে আবার আপনমনে সে হাসতে আরম্ভ করলে। ধর্মদাস হাজরা কি ভেবেছে, মানুষের রক্ত থেকে এ বিষ নির্মূল হ'য়ে যাবে? আগের মতো বিশ্বাস নিয়ে, প্রেম নিয়ে আবার ঘর সাজাবে মানুষ? হয় না, আর তা হয় না। এ বিষ কালবিষ। যতদিন বেঁচে আছো, বিষের জ্বালায় জ্বলো। একমাত্র ওষুধ হ'ল টাকা। টাকার ওষুধে কালবিষের জ্বালা যতক্ষণ পারো ভুলে থাকো। কেমন ক'রে তা এলো, সৎ না অসৎ—ও বিচার কি আর করতে আছে?

হঠাৎ একা ঘরে হা হা ক'রে হেসে উঠলে পান্থ মল্লিক। ধর্মদাস হাজরার মতো বোকা লোক আর একটাও নেই বোধহয় মেদিনীতে। ওই একটা মেয়ের জোরেই এতদিনে কাড়ি কাড়ি টাকা জমাতে পারতো লোকটা। তা না ক'রে ধরেছে উল্টো পথ। না খেয়ে মারা পড়বে একদিন। সেদিন কেউ খোঁজ করবে না, লোকটা ভালো ছিল কি মন্দ ছিল।

ঠুক্‌ ঠুক্‌ ক'রে দরজায় শব্দ হ'ল।

চমকে উঠলো পান্থ মল্লিক। যদিও জানা আছে পদ্মিনী আসবে, তবু ভয় করে। চোরের ভয় বাড়ছে ধীরে ধীরে আজকাল।

আবার শব্দ হ'ল।

পান্থ মল্লিক সাড়া দেবার আগেই বাইরে থেকে পদ্মিনী বললে, ঘুম দেছ নাকি মালবাবু? দোর খোলো বাপু—

দরজা খুলে দিলে পান্থ মল্লিক।

পদ্মিনী ঘরে ঢুকে ঝুড়িটা সন্তর্পণে নামিয়ে রাখলে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বললে, আজ আর ওপারকে যাওয়া হ'ল না, মালবাবু। ওগুলো তুলে রাখো।

পান্থ মল্লিকের মাথায় তখন নেশার মৌতাত একটু চেপেছে। পুরোপুরি বেসামাল হ'য়ে পড়েনি। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, ওপারে না গেলে যে বাবুদের চোখের জলে পুকুর হ'য়ে যাবে পদ্মরাণী!

পদ্মিনীর চোখে আজ আর কটাক্ষ নেই। টিপে টিপে হাসলে না সে কথায়। বললে, ঘরের মানুষটার বাড়াবাড়ি অসুখ। যে ক'দিন না কমে সে-ক'দিন ওপারে যাওয়া আর হবে না।

পান্থ মল্লিক হুঁশ ফিরে পেয়েছে ততক্ষণে। বললে, তার মানে আমার বেচাকেনাও বন্ধ?

তার আমি কী করবো?

বাজার খারাপ হ'য়ে যাবে যে।

পদ্মিনী মুখঝামটা দিয়ে বললে, হয় হোক। পদ্মিনী ছাড়া কি সেখানে আর মেয়ে নেই? আর কাউকে দিয়ে পাঠাও।

থতমত খেয়ে পান্থ মল্লিক বললে, আহা, রাগিস কেন বাপু। রাখালের কী অসুখ হ'য়েছে?

মা'র দয়া। গুটি উঠতে লেগেছে গা-গতরে।— জবাব দিলে পদ্মিনী।

পান্থ মল্লিক আঁৎকে উঠলে। —বলিস কি! না না বাপু, তোর তাহ'লে আর এসে দরকার নেই। তুই ঘরেই থাক্‌গা।

পদ্মিনীর ঠোঁটে ফুটে উঠলো একটুকরো ধারালো হাসি। পান্থ মল্লিকের একখানা হাত ধ'রে বললে, আমারও যদি হয় তো, তখন একবার দেখতে যাবেনা মালবাবু?

পান্থ মল্লিক হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, যাবো বইকি। তোকে দেখতে যাবো না?

পদ্মিনী বললে, ভয় নেই গো মালবাবু, আমার অত সহজে মরণ নেই। তোমাকেও কষ্ট ক'রে যেতে হবে না।

পান্থ মল্লিক বললে, তোর কথাই সত্যি হোক পদ্মিনী। ও রোগে বড়ো কষ্ট। একটু সাবধানে থাকিস বাপু।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী ক'রে পদ্মিনী বললে, সাবধান-অসাবধানের কী বা রয়েছে বলো। মা'র দয়া যাকে হবে, তার এমনিই হবে।

পান্থ মল্লিক বললে, আচ্ছা, তুই যা।

এত তাড়াতাড়ি যেতে দিচ্ছ। কোনোদিন তো ছাড়ো না এত সহজে!

ছাড়িনে ব'লে আজও ছাড়বো না?— শাম্ভু মল্লিক কেমন এক উদাস স্বরে বললে, তোর জন্যে মাগন হয়তো পথ চেয়ে ছটফট করছে।

পদ্মিনী হতবাক্ হ'য়ে গেল। শাম্ভু মল্লিকের মুখে এমন কথা! মাগন পথ চেয়ে আছে ব'লে শাম্ভু মল্লিকের দুশ্চিন্তা!

শাম্ভু মল্লিক বললে, হাঁ ক'রে কী দেখছিস?

তোমাকে। তোমার মুখে এমনধারা কথা গো!

কেন, বলতে নেই?— একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শাম্ভু মল্লিক বললে, আমারও সব আছে রে পদ্মিনী, সবাই আছে আমার। ডেকে সাড়া পাইনি কোনোদিন। কেউ আসেনি ডাক শুনে। মাগনের ভাগ্যি তো অনেক ভালো। হারামজাদা আমার চেয়ে অনেক ক্ষমতা রাখে!

পদ্মিনী বিশেষ কিছুই বুঝলে না। শুধু বুঝলে মদের ঝোঁকে মালবাবুর কথা জড়িয়ে আসছে। একটু হেসে বললে, মদের কারবার খুলে নিজেই তো মাতাল হ'য়ে বেহু গো। এখন শুয়ে পড়ো দিকি। কুলুপগুলো টেনে-টুনে দেখে দিয়ো। মনে থাকবে?

চোখ বুজে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে শাম্ভু মল্লিক। পদ্মিনী মৃদু পায়ে বেরিয়ে গেল।

চোখ খুললে শাম্ভু মল্লিক। বুকের ভিতর জ্বালার সেই আগুনটা আবার দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে। যেটুকু মৌতাত জমে এসেছিল, তাও কেটে গেছে এতক্ষণে।

মদের বোতলটা আবার টেনে নিলে শাম্ভু মল্লিক। ঢক্‌ঢক্ ক'রে বাকী মদটুকু গলায় ঢেলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বোতলটাকে। সেটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঠেকে গেল বেঞ্চির পায়ায়। হেসে উঠলে শাম্ভু মল্লিক। জড়ানো চোখে খালি বোতলটার দিকে তাকিয়ে বললে, ধাঃ শালা, মাগনটাও আমার চেয়ে বেশী ক্ষমতা রাখে। আর আমি? বিপিনে মল্লিকের কুলাঙ্গার। তোর মতোই ফাঁকা রে, একেবারে ফাঁকা—

"উমেশ যোগ দর্শন"
(প্রথম খণ্ড)
চারিটি ভাষায়: ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটি, মারাঠী
(গ্রন্থকার: শ্রীযোগীরাজ উমেশচন্দ্রজী)

যোগ সম্বন্ধে একটি চমৎকার নিবন্ধ, যাহা ব্যাখ্যা করেছে কিভাবে হজমীশক্তি, শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য শারীরিক অঙ্গসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১০৮টি বাস্তব আসনের চিত্রে সম্পূর্ণ। যোগের দ্বারা নেচারোপ্যাথি, ক্রোমোপ্যাথি, সাইকো-থেরাপি ইত্যাদি নিরাময় সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। প্রতিটি গৃহ, হাসপাতাল ও গ্রন্থাগারে যোগ্য স্থান পাবার অধিকারী। মূল্য ১৫৲; ডাকখরচ অতিরিক্ত; ভি. পি. করা হয় না।

যোগাসন চার্ট | আর্ট গ্লেজড্ কাগজে ছাপা, যোগাসনের চিত্র সম্বলিত একটি ছবির তালিকাও পাওয়া যায়। ডাকখরচ সহ মূল্য ২·৫০ ন. প. মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিতব্য।

রামতীর্থ ব্রাহ্মী তৈল

পেটেন্ট নং ১
রেজিষ্টার্ড

মাথার খুস্কি নিবারণ ও চুলওঠা বন্ধ করার জন্য একটি অমূল্য বলকারক। বহু মূল্যবান যৌগিক উপাদান সহযোগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মস্তিষ্কের চলাচল ব্যবস্থা উন্নত করে এবং সুনিদ্রা আনয়ন করে। কেশবর্দ্ধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। সকল ঋতুতে ইহা প্রত্যেকের পক্ষে উপকারী। বড় বোতল ৪৲, ছোট ২৲, সর্বত্র পাওয়া যায়।

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম
দাদার, সেন্ট্রাল রেলওয়ে: বোম্বাই-১৪
টেলিফোন—৬২৮১১ টেলিগ্রাম "প্রাণায়াম" দাদার: বোম্বাই

। ১২ ।

পান্থ মল্লিকের দোকান থেকে ফিরে সে-রাতে দু'চোখের পাতা আর এক করতে পারেনি ধর্মদাস। ঘুম এসেও আসে না। কারখানার কোলাহল রাতের বাতাসে ব'য়ে আসছে। আর্তনাদ করতে করতে ছুটে বেড়াচ্ছে উন্মাদ ইঞ্জিনগুলো। ঘুমন্ত ওয়াগনগুলো হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দ তুলে বার বার ভেঙে দিচ্ছে রাতের স্তব্ধতাকে।

কপিলার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে এসে লাগছে।

অকাতরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। ভরা বয়সের গাঢ় ঘুম। ডাকাত পড়লেও বোধহয় জাগবে না।

পুরনো কথা মনে পড়লো।

অল্পকালে কপিলার মায়েরও ঠিক এমনি ঘুম ছিল। রান্না করতে করতে ঘুঁটের ঝুড়ির ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল একদিন। তখনো কপিলা হয়নি। ধর্মদাস পাঁজাকোলা ক'রে তার ঘুমন্ত দেহটা তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। তাও টের পায়নি মানুষটা। তারপর সেই কথা নিয়ে কত হাসাহাসি।

সেই মায়ের মেয়ে। মায়ের মতোই ঘুমটুকু পেয়েছে মেয়ে তার। ঘুমোক। প্রাণ ভ'রে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকুক কপিলা। ভুলে থাকুক সব-কিছু।

মনে পড়ছে পান্থ মল্লিকের কথাগুলো।

একে ঘুম নেই চোখে। তার উপর মাথা গরম হ'য়েই উঠেছে। ঠাস্ ক'রে লোকটার গালে একটা চড় ক'ষে দিলে বোধহয় ভালো হ'ত। তাহ'লে চোখের পাতায় হয়তো ঘুমটুকু নামতো আজ।

বীরুলালের সম্বন্ধে পান্থ মল্লিক যা বলেছে তা কি সত্যি? বীরুলালের পেশাকে হয়তো ভালো লাগে না ধর্মদাসের। কিন্তু মানুষটাকে ভালো লাগতো। তার লম্বা-চওড়া গড়ন, তার প্রাণখোলা হাসি, তার আসা-যাওয়া—সব-কিছুর ভেতর একটা তাজা মানুষের প্রাণ আছে। মনে মনে কোথায় যেন বীরুলালের উপর একটু আকর্ষণও ছিল তার। সেই বীরুলালও অন্যায় লোভের কালি মাখালে অমন টক্‌টকে তাজা প্রাণটায়!

পান্থ মল্লিকের সব কথা বিশ্বাস হয় না। হয়তো কোনো পাপই করেনি বীরুলাল। সবই পান্থ মল্লিকের কল্পনা। কিন্তু তবুও তৃপ্তি নেই। কল-কব্জার নেশা বীরুলালের রক্তে একেবারে মিশে রয়েছে। বড়ো বেপরোয়া! বড়ো বিশৃঙ্খল। ও-নেশা তার কোনোদিনই কাটবে না। সব জেনেশুনেও কপিলাকে কেমন ক'রে তার হাতে তুলে দেবে ধর্মদাস? কপিলা যদি রুখতে না পারে ছেলেটার বেপরোয়া ধারা?

কপিলার মা ছিল বড়ো শান্ত। ধর্মদাসকে ভালবেসেই সে সুখী। কোনোদিন দাপট দেখানোর চেষ্টা করেনি। বড়ো-মুখে কথা বলেনি একটা দিনও বোধহয়। দুঃখ পেলে মুখ ভার ক'রে ঘুরে বেড়াতো। টস্‌টস্ করে চোখের জল ফেলতো। তারপর যে-মুহূর্তে ধর্মদাস তাকে বুকে টেনে নিত, সেই মুহূর্তেই সব অভিমান গ'লে জল। বুকে মুখ গুঁজে ঝরঝর করে কাঁদতো। চোখের জলে মনের বোঝা হালকা হ'য়ে গেলে একটুকরো হাসি ফুটে উঠতো তার মুখে। ধর্মদাসকে জড়িয়ে ধরে বলতো, তুমি আমায় অমনধারা আর ব'কোনি গো!—আমার বড়ো দুঃখ্যু হয়। ধর্মদাস আকুল আবেগে বউকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদরে আদরে প্রায় বেহুঁশ ক'রে দিত তাকে। আবেশে, আবেগে কাঁপতো তার বউ। ধর্মদাসকে আঁকড়ে ধরতো আরও নিবিড় ক'রে।

সেই মায়ের রক্ত কপিলার গায়ে। সেই মায়ের সব হাব-ভাব ওর চোখে মুখে। বড়ো কোমল, বড়ো অভিমানী!

চোখে ঘুম নেই। শেষরাতের ক্লান্ত চোখ-দুটি জ্বালা করছিল। তারই ভিতরে কখন যেন জল এসে গেছে দু'চোখে।

কাঁথার প্রান্তে চোখ মুছে নিয়ে আপনমনেই ধর্মদাস একটু হাসলে। কপিলার মা আর ফিরে আসবে না। সতীলক্ষ্মী মেয়ে। কপালের সিঁদুর, হাতের নোয়া আর পায়ের আলতা নিয়ে চলে গেছে। সেখানে ব'সে কি আর মেয়ের কথা ভাবছে না সে? সব হারিয়ে শেষের ওই একটিই সম্বল। তাকে যোগ্যমতো ঘরে বরে না দিলে ওপারে গিয়ে কপিলার মায়ের কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? …

কাক ডেকে উঠলো।

চমকে উঠে জানালার দিকে তাকালে ধর্মদাস। পেঁপে-গাছটার ফাঁক দিয়ে ভোরের আকাশ দেখা যাচ্ছে। আলো ফুটে উঠছে। সারারাত কেটে গেছে?

ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমের ভান করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লে ধর্মদাস। কপিলা এক্ষুনি উঠবে। ধর্মদাস সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে জানতে পারলে বকাবকি করবে। বড়ো ঠাণ্ডা মেয়েই হোক, ধর্মদাসকে সে বেশ শাসন করে। ধর্মদাস মাঝে মাঝে কপিলাকে রাগিয়ে

দিয়ে মজা দেখে। কপিলার শাসন বেশ লাগে তার। কিন্তু অন্যদের ব্যাপার আলাদা। মেয়েটা আপন খুশিতে আছে থাকুক। বাপের দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার কথা নাই বা জানলে সে আজ।

। ১৮ ।

সকাল-দুপুরের পাট চুকিয়ে দোকান বন্ধ করতে প্রায় একটা বেজে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়ে ধর্মদাস উঠে পড়লো। উনুনে কয়লা চাপিয়ে রেখে কপিলাকে বললে, আমি একবার ঘুরে আসি। ফিরতে দেরি হ'লে দু'মুঠো গুঁড়ো-কয়লা ছড়িয়ে দিস আখায়। তুই আবার যেন খদ্দের সামলাতে আসিসনে। বলিস, বাবা না এলে হবে না।

কপিলা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। দোকানে আসতে তারও আপত্তি। পুরুষমানুষগুলোই যেন কেমন। বয়সের বাছবিচার নেই, লজ্জা-ঘেন্না নেই—সুবিধে পেলেই পিটপিট ক'রে তাকায়। কপিলা অস্বস্তি বোধ করে। গায়ের কাপড় ঠিক থাকলেও আবার টেনে ঠিক করে। স'রে যেতে পারলে বাঁচে।

ধর্মদাস সোজা হেঁটে চললে কার্তিকের বাড়ীর দিকে। পড়ন্ত বিকেলের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। অজয়ের পুলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নজর আটকে গেল তার। পুলটা ধীরে ধীরে অনেকখানি গড়ে উঠেছে। উপরে কংক্রীটের গাঁথুনি চলছে। সর্বাঙ্গ কাঠের তক্তা আর চটে জড়ানো। তারই নীচে সিঁদুরে-রঙের লোহার থাম আর কড়িগুলো সিঁদুরে-আলোয় আরও বেশী চকচক করছে। পুলটা শেষ হ'তে নাকি আরও মাস-দুয়েক লাগবে। কাগনি আর সেউলীর মাটি তারপর একাকার হ'য়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো ধর্মদাস। কার্তিকের সঙ্গে কথা শেষ ক'রে ফিরতে হবে। ফিরে এসে তারপর তো বোধহয় আর ফুরসত পাওয়া যাবে না। আজকাল বিকেলের দিকে ভীড় একটু বাড়ছে। পুলের দু'একজন বাবুও এত পথ হেঁটে চা খেতে আসে তার দোকানে। [illegible] চা নাকি একটা অপূর্ব জিনিস। ধর্মদাস মনে মনে খুশী হয়। বেশী যত্ন নিয়ে বাবুদের চা তৈরি করে। একগাল হেসে বলে, খেয়ে জানাবেন, আজকের চা কেমন হ'ল।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখন এসে গেছে কার্তিকের বাড়ী। কার্তিকের নাম ধরে দু'বার ডাক দিলে ধর্মদাস। কোনো সাড়া নেই। আর একবার [illegible] যাচ্ছিল। তার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রা[illegible]।

ধর্মদাসকে দেখেই মুহূর্তের জন্যে রাণীর মুখ কেমন যেন হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে-ভাব সামলে নিয়ে হাসিমুখে বললে, কপিলার বাপ যে। কী ব্যাপার?

ধর্মদাস একটু ইতস্তত করে বললে, কার্তিক কোথায় গো?

দু'দিন হ'ল কাটোয়া গেইছে।

ফিরবে কবে?

ঠিক নেই।

বাসের চাকরি নাকি ছেড়ে দিয়েছে শোনলাম।

হ্যাঁ। তা ওখেনে দাঁড়িয়ে ক্যানে, এসো।

ধর্মদাস কী যেন ভাবলে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। মাদুর পেতে তাকে বসতে দিয়ে রাণী বললে, হঠাৎ কার্তিককে কী দরকার পড়লো তোমার?

দরকার? তা একটা ছিল।

আসল দরকার কাকে? কার্তিক না বীরু-ভাইডার?

ধর্মদাস থতমত খেয়ে বললে, তা শুধুচ্ছিস ক্যানে? দরকার আমার কার্তিককে।

সেউলীতে এসে প্রথম যখন দোকান করে ধর্মদাস তখন এই মেয়েটা কতটুকু ছিল। হয়তো বছর নয়েক বয়স তখন। সেই মেয়ে বড়ো হ'ল। বিয়ে হ'ল তার। স্বামীর ঘর থেকে ফিরেও এলো একদিন। একখানা ভারী পাথরের মতো এসে চেপে বসলে বাপের বুকে। মেয়ের কপালের কথা ব'লে কতদিন যে বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে রাণীর বাবা!

সব যেন সেদিনের কথা। রাণীর সেই ছোটবেলা থেকে বাপের বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত ঘটনাগুলো সবেমাত্র সেদিন যেন ঘটেছে। অথচ কত পরিবর্তন। চেহারায় জৌলুস নেই মেয়েটার। কথার ভাবে সে মিঠে সুরটা যেন হারিয়ে গেছে।

ধর্মদাস অন্য কোনো কথা না পেয়ে শেষে বললে, কেমন আছিস তোরা সব?

রাণীর চোখে-মুখে যেন একটা ছুরির ধার চকচক ক'রে উঠলো। কপিলার বাবা কি সুযোগ পেয়ে তাদের অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা করতে এসেছে? মুখের ভাব চেপে সে বললে, খুব ভালো আছি গো। ক্যানে, শোনোনি?

বিস্মিত হ'য়ে ধর্মদাস বললে, কই, না তো? কার্তিক নতুন চাকরি পেয়েছে নাকি?

চাকরি পেলে আর ভালো থাকবো ক্যানে? প্রত্যুত

[illegible] হাসি মিলিয়ে রাণী বললে, সুখের কপাল আমাদের [illegible] ধকধক করছে তা একবার ভাবো!

ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো ধর্মদাস।

রাণী হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তোমার কপিলার বিয়ে দেওয়া কবে হবে গো? তাড়াতাড়ি দাও—আমরা দেখে চোখ জুড়াই।

ধর্মদাস এসেছিল বীরুলালের সম্বন্ধে শাহু মল্লিকের কথাগুলো আভাসে একবার যাচাই ক'রে নিতে। সে তো দূরের কথা। রাণীর কথার ধরনে সে নিজেই বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে বললে, বিয়ের কিছু ঠিক হয়নি এখনো।

ক্যানে, বীরু ড্রাইভারকে নাকি জামাই করবে শোনলাম।

কোথায় শুনলি?

শোনো কথা! কোথায় শুনেছি তা মনে ক'রে ব'সে আছি নাকি?

ধর্মদাস স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললে, বীরুলাল এখন নাকি আর তোদের ঘরে খায় না?

না। কাত্তিক তাকে মানা ক'রে দিয়েছে।

তাই বল্।

আর কিছু শুনতে চাও না? ক্যানে মানা করেছে, কবে মানা করেছে? মানা করেছে তার স্বভাবের দোষে। আমি বলেছি কাত্তিককে। দিদি ব'লে ডেকে কুনজর দিয়েছিল তাই তাড়িয়ে দিতে বলেছি তাকে। আর কিছু জানতে চাও?

ধর্মদাস কাতরস্বরে বললে, না। আচ্ছা, আমি যেছি রে—

কাত্তিক এলে কিছু বলতে হবে?

না।

ধর্মদাস উঠে রওনা দিলে। পিছন ফিরে তাকায়নি আর। তাকালে দেখতে পেতো রাণীর মুখে ফুটে উঠেছে এক বিচিত্র হাসির রেখা। সেদিনকার সেই ছোট মেয়েটির মুখে আজকের এই নির্মম হাসির আভাসটুকু দেখলে হয়তো শিউরে উঠতো ধর্মদাস।

ধর্মদাস চলে যাওয়ার পরেও রাণী ব'সে রইলো মাদুরের উপর। ক্রুর, নির্মম হাসিটুকু ছড়িয়ে পড়লো তার সারা মুখে। এতবড়ো একটা সুযোগের কথা একটু আগেও সে ভাবতে পারেনি। সবাই সুখের হাসি হাসবে, শুধু সে পারবে না! কপিলা তার সাধের মানুষটার বুকে মুখ লুকিয়ে সোহাগ কাড়বে জীবনভর। আর রাণী? মিথ্যে-বদনামের কলঙ্ক মেখে সারাজীবন শুধু আঁচলে মুখ লুকিয়েই কাটাবে? কেন? কী পাপ সে করেছিল? কপিলাই বা কোন্ পুণ্য করেছে? মিথ্যে কলঙ্কই সত্যি হোক। বত্রিশ দাঁতে বিষ ছড়িয়ে সব হাসিমুখগুলোকে কালো ক'রে দিতে পারলে এক অদ্ভুত নির্মম তৃপ্তি।

মাদুরখানা গুটিয়ে রেখে অবেলায় হঠাৎ গিয়ে শুয়ে পড়লে রাণী। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিমঝিম করছে। তবুও বুকে একটা প্রচণ্ড উল্লাস। কপিলাও বীরুলালকে পাবে না। কপিলার স্বপ্ন ভাঙুক। রাণীর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসে যদি পৃথিবীর এতটুকু ক্ষতি না হয় তা'হলে কপিলার স্বপ্ন ভাঙলেই বা কী ক্ষতি? মরুক কপিলা।

। ১০ ।

সে-রাতেও ঘুম এলো না ধর্মদাসের চোখে।

পথগুলো একে একে বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। এত আদরের কপিলা যেন অজান্তে কখন ঘাড়ের বোঝা হ'য়ে উঠতে শুরু করেছে। উপায় নেই। পিছনের দিন চলে গেছে অনেক পিছনে। আর ফিরবে না। বীরুলালের হাতে কপিলাকে আর তুলে দেবার সাহস নেই। কয়েক মাস আগে সময় ছিল। তখন বিয়ে দিলে হয়তো এতদিনে ভ'রে উঠতো কপিলার আপন সংসার। হয়তো বীরুলালের তাজা প্রাণটা আরও তাজা ক'রে তুলতো কপিলা তার ভালবাসা দিয়ে। আর তা হয় না।

পর পর প্রায় তিনটে রাতই না-ঘুমিয়ে কেটে গেল। পরের দিন দুপুরের খাওয়ার পর থেকেই শরীরটা কেমন খারাপ লাগছিল। বিকেলের আলো মিলিয়ে যাবার আগেই কাঁপিয়ে জ্বর এলো। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে লাগলো।

কোনোমতে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে ভেতর-বাড়ীতে চ'লে এলো ধর্মদাস। চোখ-দুটো লাল। হাঁপাতে হাঁপাতে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

কপিলা সবে উঠনে আঁচ দিয়ে চুল বাঁধতে বসেছিল। ধর্মদাসের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে শুকনো গলায় বললে, কী হ'য়েছে বাবা?

তেমন কিছু নয় রে মা। বোধ করি জ্বর এসেছে একটু।

কপিলা সে-কথা বিশ্বাস করলে না। কাছে এসে ধর্মদাসের কপালে হাত রেখেই আঁৎকে উঠলে। —এই তোমার একটু জ্বর?

ধর্মদাসের হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে কপিলা। সংসারে আপন জন বলতে এই একটিই মাত্র লোক। সামান্য কিছুতেও কপিলা মনে মনে বড়ো ভয় পেয়ে যায়।

ধর্মদাসও ভয় পেয়ে গেছে। জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে ব্যাকুল স্বরে বললে, আমার যদি ভালোমন্দ একটা কিছু হ'য়ে যায় তাহ'লে তোকে কে দেখবে মা?

কপিলা মৃদু ধমক দিয়ে বললে, কী যে তুমি বলো বাবা! একটু যদি গা গরম হ'ল অমনি ছাইপাঁশ ভাবনা তোমার।

ধমকের সুরে তেমন জোর নেই। বুক কাঁপে কপিলার। সত্যিই যদি কিছু হয়, তারপর নিজের অবস্থা ভাবতে গিয়ে সে শিউরে ওঠে। পাখার হাওয়া করতে করতে মুখ ঘুরিয়ে নিলে কপিলা। পাছে চোখের জল দেখে ফেলে তার বাবা।

দু'দিন জ্বর ছিল। তৃতীয় দিনে জ্বর ছেড়ে গেলেও নির্জীবের মতো শুয়ে রইলো ধর্মদাস। দু'দিন যাবৎ দোকান খোলা হয়নি। মন উস্‌খুস করতে লাগলো। বিকেলের দিকে একবার ওঠার চেষ্টা করেছিল। কপিলা কড়া শাসনে শুইয়ে রেখেছে তাকে। নিরুপায় ধর্মদাস বাধ্য হ'য়ে মেনে নিয়েছে সে-শাসনটুকু। মেয়েটা পরের ঘরে চ'লে গেলে আর তো এ জিনিস ফিরে পাওয়া যাবে না।

রাত প্রায় আটটা বাজে।

ধর্মদাসের শিয়রে ব'সে আস্তে আস্তে পাখায় বাতাস দিচ্ছিল কপিলা। হঠাৎ চম্‌কে উঠলে। ছলাৎ ক'রে উঠলো বুকের ভেতরটা। পাখা থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলে কপিলা।

ধর্মদাস বললে, কে ডাকছে রে? বীরুলালের গলা না?

কপিলা বললে, উঁ, কী বললে? কার গলা তা আমি জানবো কেমন ক'রে?

ধর্মদাস বললে, হুঁ, বীরুলালই বটে। ব'লে দে আজ দোকান খুলবে না।

কপিলা কোনো কথা না ব'লে উঠে পড়লে। সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে ক'রে ধর্মদাস বললে, আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি রে, কপিলা। তুই থাক্‌।

কপিলা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সারাদিন ধ'রে জ্বর বাপকে শাসন করেছে। উঠতে দেয়নি একবারও। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটাও কথা বেরুলো না তার মুখ থেকে। অসহায় নীরব দৃষ্টিতে ধর্মদাসের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নীচু ক'রে মৃদুস্বরে বললে, আচ্ছা।

ধর্মদাস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই দেখলে, দাওয়ার উপর এসে দাঁড়িয়েছে বীরুলাল।

কী ব্যাপার গো হাজরামশায়? শোনলাম তোমার খুব জ্বর হ'য়েছে?

একটু শুকনো হাসি হেসে ধর্মদাস বললে, না গো, তেমন কিছু নয়। ভালো হ'য়ে গেইছি।

কপিলা তখনো স'রে যাবার সময় পায়নি। মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার পাশে। বীরুলাল তার দিকে তাকালে। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন হাতুড়ি পেটাতে লাগলো কপিলার বুকে।

ধর্মদাস বিব্রত বোধ করছিল। বললে, তুমি হঠাৎ?

ক্যানে, আসতে নেই নাকি?

ছি-ছি, কী যে বলো। ও কপিলা, বসতে দে বীরুলালকে।

কপিলা কোনোমতে একখানা মাদুর পেতে দিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ধর্মদাস মনে মনে খুশী হ'ল।

বীরুলাল একটু হেসে বললে, কতদিন তোমার এধারে আর আসা হয়নি!

তাতে কী হ'য়েছে। তুমিও তো বাবা কাজের মানুষ।

তা বটে। অপ্রতিভ ভাবে বীরুলাল একটু হাসলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলে ধর্মদাস হাজরার সেই প্রাণখোলা আপ্যায়নের চিহ্নটুকু নেই ও-কথাগুলির কোথাও।

বীরুলাল বললে, তোমাদের মায়া কাটাতে চললাম এবার।

ক্যানে, কী হ'ল?

অন্য লাইনে চ'লে যেছি।

ড্রাইভারগিরি ছেড়ে দিচ্ছ? উৎসুক আগ্রহে প্রশ্ন করলে ধর্মদাস।

না গো। ছাড়লে এখন খেতে দিবে কে? এই মাসটা শেষ হ'লে পর আমি চ'লে যাব নূতনহাট লাইনে। এখানে আসবে অন্য লোক।

ধর্মদাস কয়েক মুহূর্ত কেমন যেন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো বীরুলালের দিকে। তারপর বললে, তাহ'লে সত্যিই তুমি সেউড়ী ছাড়লে?

বীরুলাল অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিল। সংক্ষেপে বললে হুঁ।

ধর্মদাস বললে, ভালোই করলে, বাবা।

ক্যানে? মন্দটা কী ছিল?

ধর্মদাস অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে, মন্দ বলছিনে। তবে কিনা একটা নতুন জায়গায় আবার কাজ করবে তো। সেইটেই মনের ভালো।

বীরুলাল একটু হাসলে। এই ধর্মদাস হাজরা একদিন আগ্রহ নিয়ে তাকে বোঝাতে চেয়েছিল কপিলার দিকে।

ধর্মদাস তখন কী ভাবছে তা সে-ই জানে।

বীরুলাল আচমকা প্রশ্ন করলে, তোমার কপিলার বিয়ে কবে ঠিক হ'ল গো?

ধর্মদাস চমকে উঠলে। বীরুলাল কি তার সঙ্গে তামাশা করতে চায় এই খোঁচা দিয়ে? একটা কড়া জবাব মুখে এসে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বললে, বিয়ে জিনিসটে কি আর এককথায় হয় গো বলের গো? লাখো কথা খরচা হবে তবে একটা বিয়ে।

ক্যানে, কাটোয়ায় সে পাত্তরের পছন্দ হ'ল না?

ধর্মদাস কোনো জবাব দিলে না। তার ইচ্ছে হ'ল, সেই মুহূর্তেই গলা ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেয় বীরুলালকে।

বীরুলাল একটু হেসে বললে, তোমাদের সেউলী ছেড়ে চ'লে যেছি, আর তো জ্বালাতে আসবো না। তাই কথাটা শুধোলাম। তুমি চ'টে গেলে নাকি গো?

ধর্মদাস দাঁতে দাঁত চেপে বললে, আমার ভাবনা আমি ভাববো। তোমার ভেবে লাভ নেই।

তুমি একেবারে আগুন হ'য়ে রয়েছ দেখছি।

ক্যানে আগুন হয়েছি, তা ভাবনা করার মাথা তোমার নেই। তবে কিনা একটা কথা ব'লে রাখি। আমার দোকানকে আসতে হয় এসো। বাড়ীর অন্দরে আর এসো না, বলের গো। বদনামের বড়ো ভয় আমার।

বীরুলাল প্রথমটা বিস্ময়ের মতো তাকিয়ে রইলো। পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না বুঝে এসেছি, হাজরা-মশায়। চ'লে যেছি আমি।

কথাটা ব'লেই সে বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে। ধর্মদাস হাজরার কাছে এতখানি অপমান সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। দ্রুতপায়ে উঠোন ডিঙিয়ে বাড়ীর বাইরে পা দিলে বীরুলাল। দোকানঘরের কোণ ঘেঁষে পাশ ঘুরতে গিয়েই বাধা পড়লো। আর এক প্রচণ্ড বিস্ময়। পায়ে-চলা সরু পথটা আটকে দাঁড়িয়ে আছে কপিলা।

বীরুলাল তবু বিশ্বাস করতে পারেনি। ধর্মদাসের শেষ কথাটা তখনো কানে বাজছে। গরম হল্‌কা ছুটছে চোখ-মুখ দিয়ে। তার সমস্ত আক্রোশ এসে পড়লো কপিলার উপর। বললে, কি গো, এত দামী মেয়ের বর জুটলো না যে এখনো?

কপিলার বুকের ভেতর সে-কথাটা যেন তীরের মতো গিয়ে বিঁধলো। বীরুলাল সেউলী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। কথাটা কানে যাবার পর থেকে সে আর স্থির থাকতে পারেনি। সব সংকোচ দূরে রেখে সে আজ এসে দাঁড়িয়েছে বীরুলালের পথ রোধ ক'রে। কিন্তু বীরুলালের প্রথম কথাটাই শানানো তীরের মতো বিঁধে গেল তার গায়ে।

কপিলা বললে, আমার বর জোটেনি ব'লে দুখ্‌ পেছো তুমি? ভয় নেই, বর জুটবে।

চাষীলোকের বর তো?

যে ঘরই হোক। তোমার তাতে কাজ কি বলো?

বীরুলালের বাক্যস্রোত সহসা বন্ধ হ'য়ে গেল। কপিলার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলবার এমন একটি নিবিড় মুহূর্ত তার জীবনে আজই প্রথম। প্রত্যাশার অতীত একটা দান। অথচ ধর্মদাসের কাছ থেকে অপমানের পরই কিনা এলো সেই মুহূর্তটি।

কপিলা বললে, সেউলী ছেড়ে চ'লে যেচ্ছো?

হাঁ।

ক্যানে?

ক্যানে আবার? মিস্তিরী মানুষ, গাড়ী চালিয়ে খাই। এক জায়গা থাকলেই হ'ল।

কপিলা নীরব। বীরুলালও।

নির্বাক কটি মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর কপিলা কেমন যেন এক অদ্ভুত স্বরে বললে, তাই তো বটে। মিস্তিরী মানুষের ঘরও লাগে না, সংসারও লাগে না, কিন্তু লাগে না বটে।

লাগলেও, জোটে কই? বীরুলাল বললে, মিস্তিরী-মজুরের ঘর করবার মেয়ে থাকলে তো হয়।

কপিলার টানা-টানা চোখ-দুটি জলে চিক্‌চিক্‌ ক'রে উঠলো। অন্ধকারে তা দেখতে পেলে না বীরুলাল। অন্ধকারে মুখই দেখা যায় না—মন তো দূরের কথা। মনের কথা থাকে আরও গভীরে।

সেউলীতে আর আসবে না?

বীরুলাল চমকে উঠলে। এতদিন যে-মেয়েটা তাকে দেখলেই কেমন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছে, আজ তার এ কী রূপ? এ যেন সে-মেয়েই নয়।

কই, জবাব দিলে না?

সেউলীতে আমার সাধ আর নেই!

আচ্ছা, যাও। ব'লেই ছুটে চ'লে যাচ্ছিল কপিলা।

বীরুলাল অতর্কিতে তার হাত ধ'রে বললে, আর কিছু জানতে চাও না?

না। হাত ছাড়ো—

বীরুলাল হাত ছাড়লে না। বললে, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার সাধ ছিল, কপিলা। তোমার বাপ চায় না। মজুর-মিস্ত্রীকে অপছন্দ করে তোমার বাপ।

আমি তো করিনি। আমাকে তুমি এত দুখ্ দাও ক্যানে?

ব'লেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে কপিলা।

বিহ্বল হ'য়ে গেল বীরুলাল। এ কোন্ নতুন কথা? এ কোন্ নতুন কথা? কপিলা কাঁদছে। ধর্মদাস হাজরার জেদালী রূপসী মেয়ের চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

বীরুলাল পাগলের মতো কপিলার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, আগে ক্যানে বলোনি তুমি?

কপিলা কোনো জবাব দিলে না। বীরুলাল পুরুষ-মানুষ। সে কেমন ক'রে বুঝবে, আগে অনেকবার কপিলা এ-কথা বলেছে। এ-কথা সে বলেছে চোখের ভাষায়। বলেছে লজ্জাবতীর এড়িয়ে যাওয়ার সংকেতে। আজ দু'বছর ধরে কত নীরব ভাষাতেই কপিলা বলেছে, ভালোবাসি। বলেনি শুধু মুখের ভাষায়। গোপন লজ্জার রঙে রাঙানো অনুরাগটুকুকে আলোর সামনে এনে দিলে যে তার রঙ বদলে যাবে।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কপিলা হাতখানা টেনে নিলে। ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসিকে কিছুতেই সে আর লুকোতে পারলে না। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জা-রাঙানো হাসি। ধরা দিয়ে ধরতে পাওয়ার আবেগ-মথিত উচ্ছ্বাসের মধুর হাসি। চোখের জল তখনো শুকোয়নি।

বীরুলাল কিছুই দেখতে পেলে না। অবসন্ন স্বরে বললে, বড়ো দেরি ক'রে ফেলেছ, কপিলা।

কপিলা আমেকটা সামলে নিয়ে বললে, আমার বাপকে বুঝিয়ে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না তোমার কপিলাকে?

বীরুলাল আর কিছু ভাবতে পারলে না। যে কঠিন-হাতের পেষণে মাটিকে একদিন বুকে টেনে নিয়েছিল, সেই হাতেই টেনে নিলে কপিলাকে। কপিলার মুখখানি বুকের ভেতর চেপে ধ'রে আচ্ছন্নের মতো বললে, পারবো। আমার কপিলাকে নিয়ে যাবো আমি!

আবেগে, আবেগে কাঁদতে লাগলো কপিলা। বীরুলালের বুকে মাথা রেখে কতদিন ধরে সে কত কথা বলেছে। ঘর ছেড়ে যাওয়ার-পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালিশে মুখ গুঁজেছে। আজকের স্বপ্ন ভাঙা না-ভাঙা নিজের হাতে। তবু সাহস হয় না। ধর্মদাসের কথা মনে হ'তেই বুক কেঁপে উঠলো। বীরুলালের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে আস্তে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বিবশ কণ্ঠে বললে, আজ যাও। যেদিন এসে সিঁদুর পরিয়ে তোমার বধুকে নিয়ে যাবে, সেইদিনকার জন্যে বসে থাকবো আমি।

বীরুলাল কী যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই একটু দূর থেকে তীক্ষ্ণ দুর্বল গলায় ধর্মদাস চীৎকার ক'রে উঠলে, কপিলা!

কপিলার কানের ভিতর দিয়ে যেন একটা আগুনের হল্‌কা ঢুকে গিয়ে পুড়িয়ে দিলে সমস্ত মাথাগুলো।

ধর্মদাস পাগলের মতো চীৎকার করে বললে, যমের পেঁা, এত ছোট মন তোমার? একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছ, আমার কচি মেয়েটাকেও রেহাই দিবে না তুমি? তোমার দুই পায়ে পড়ি, আমার কপিলার উপর তোমার নজর দিওনা, বাবা!

বীরুলাল তাকিয়ে দেখলে কপিলা সামনে নেই। ধর্মদাস রোগা দেহ নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

বীরুলাল দাঁড়িয়ে রইলো। তার সামনে এসেই দু'হাতে তার একখানা হাত চেপে ধ'রে শিশুর মতো কেঁদে উঠলে ধর্মদাস।—বাবা, আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। আমার মেয়েটাকে তুমি রেহাই দাও, বীরুলাল!

বীরুলাল শান্ত গলায় বললে, কপিলাকে আমি বিয়ে করতে চাই, হাজরামশায়। তুমি একবার ভেবে দেখো।

কথাটা ব'লেই রওনা হ'ল বীরুলাল। ধর্মদাস উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে দেখলে বীরুলালের বলিষ্ঠ দেহটা মিলিয়ে যাচ্ছে জমাট অন্ধকারে। কাঁপতে কাঁপতে বসে গিয়ে শুয়ে পড়লে সে। চোখের জল আর বাধা মানে না। শেষ আশা ছিল কপিলার ওপর। সেটুকুও বোধহয় আজ ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল।

-

গভীর রাত্রি।

ওপারে কারখানি ইয়ার্ড যেমন জাগে তেমনি জেগে আছে। মেটেলীর গাছ থেকেও এসেছে দুঃস্বপ্নের চমক রাতের মেটেলীতে প্রাণের সাড়া জাগায় শাহ্ মজিদের মদের দোকান। অতন্দ্র রাত কাটায় কত পুরুষ, কত নারী। কত চোখের পাতায় ঘুম আসে না কে জানে।

ধর্মদাস জেগে আছে।

বুকের ভেতর গুমরে-ওঠা এক যন্ত্রণা পাক খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে। এতদিনকার নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে এক বিপুল আলোড়ন। দুঃসহ বেদনা। শুকনো গালের পাশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল।

কপিলাও ঘুমোয়নি।

মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে। এতদিন তো মনের গোপন কথাটুকু সে সন্তর্পণেই বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল। গৌরদাস দেউলী ছেড়ে চলে যাওয়ায় মুখে না বললে সে-কথা আজও হয়তো গোপন থাকতো।

হঠাৎ বাইরে থেকে পদ্মিনীর গলা শোনা গেল। [illegible]দাসকে ডাকছে পদ্মিনী।

ধর্মদাস দু'বার শুনলে। তারপর সাড়া দিয়ে উঠে [illegible]ল বিছানা থেকে। মৃদুস্বরে বললে, কপিলা, ঘুম গেছিস?

কপিলা সাড়া দিলে না।

ধর্মদাস দরজা খুলে বাইরে এলো। হাতের মিটমিটে আলো তুলে ধরলে পদ্মিনীর সামনে।

পদ্মিনীর চোখে জল। বললে, কী দেখছো দাদা?

কী হয়েছে তোর? বাগন কেমন আছে?

মারা গেল।

বাগন মারা গেইছে!

হ্যাঁ। বেঁচে গেল গো। ধরা গলায় পদ্মিনী বললে। —এখন শেষ কাজটুকু আমারই দায়। পাঁচটা টাকা দেবে দাদা?

ক্যানে? পাঁচটাকা লাগবে কিসে?

যারা নিয়ে যাবে তারা মদ খাবে।

পাঁচটাকার মদ?

তার কমে যাবে না তারা। ও-রুগীকে ছুঁতে ভয় বাসছে। পাঁচটা টাকা দিতে পারবেনা দাদা?

ধর্মদাসের হঠাৎ কী হ'ল সেই জানে। তিক্ত কর্কশ স্বরে বললে, না, পারবো না আমি। আমার কী? পাঁচটা লোককে মদ খাওয়াবি তুই, আর টাকা দেবো আমি? ক্যানে?

পদ্মিনী ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, আমি তোমার টাকা শুধে দেব, দাদা! আজকের মতো দয়া করো গো—

দয়া! দয়া আমি আর করবো না পদ্মিনী। যে টাকায় তুই দেনা শুধবি তা ছুঁতে আমার ঘেন্না হয়। তোর গতর-বেচা টাকায় এতদিন খাইয়েছিস তাই লোকটা অমন বেঘোরে মারা গেল। গা দিয়ে পাপ ফুটে বেরিয়েছে ওই গুটি হ'য়ে। যা পারিস কর্‌গা, আমি এর মধ্যে নেই।

পদ্মিনী দাওয়ার নীচে ব'সে পড়লে। আর্তস্বরে বললে, আমার পাপে আমাকে যতখুশি গালমন্দ ক'রো দাদা। সে-মানুষটাকে শেষ যাত্রাটা যেতে দাও গো!

ধর্মদাস চুপ ক'রে রইলো।

পদ্মিনী কাঁদতে কাঁদতে বললে, দাদা, মল্লিকমশার কাছে তো যাইনি। ছুটে এলাম তোমার কাছে। দেবে না তুমি?

ক্যানে, যা না তেনার কাছে।

না। তার চেয়ে মরা মানুষটাকে পায়ে দড়ি বেঁধে ভোমরার চরে দিয়ে আসবো আমি।

পদ্মিনী উঠে দাঁড়ালে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে তার। বললে, চললাম। তুমি ঘুম যাওগা, দাদা।

পদ্মিনী সত্যি সত্যিই পিছন ফিরে রওনা দিলে। ধর্মদাসের পিছন থেকে কপিলা ডাকলে, দাঁড়া পদ্মিনী।

ধর্মদাস অবাক্ হ'য়ে দেখলে কপিলা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই কপিলা মৃদুস্বরে বললে, বাবা, ওকে টাকা দেবে না?

ধর্মদাস নিষ্প্রাণস্বরে বললে, দিয়ে দে, মা। ছ'টা টাকাই দে। নইলে ওর হাতে তো একটা পয়সাও থাকবে না!

পদ্মিনী নীরব কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কপিলার দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ঢেকে ফেললে। তার চোখে জল নেমেছে হুহু ক'রে।

ধর্মদাস দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ নির্বাক মূর্তির মতো।

কপিলা ঘরে চ'লে গেল। টাকা এনে ধর্মদাসের হাতে দিয়ে একপাশে স'রে দাঁড়ালে। ধর্মদাস যন্ত্রচালিতের মতো পদ্মিনীর সামনে টাকা ক'টা ছুঁড়ে দিয়ে বললে, নিয়ে যা।

টাকা কুড়িয়ে নিয়ে ধরা গলায় পদ্মিনী বললে, তোমাকে দাদা ডেকেছি, তাই গালমন্দ খেয়েও বিপদে এ টাকা নেলাম, দাদা। এ টাকা যদি কখনো শোধ করি তো জানবে, সৎ উপায়ের টাকায় করলাম, পাপের টাকায় নয়। যাই—

পদ্মিনী চ'লে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধর্মদাস আপনমনেই বললে, টাকা! টাকা দিয়ে কী করবো আমি!

কপিলা নতমুখে ঘরে চ'লে গেল। ধর্মদাস সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের মতো।

ওপারে কাশনির জোছনাই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নিস্তব্ধ। গভীর রাতের ঘুম-চোখে যেন ঢ'লে ঢ'লে পড়ছে কাশনি।

কত বছর সে ঘুমোয়নি। কত অসংখ্য মুহূর্তের গ্লানি জ'মে জ'মে কালো হ'য়ে গেছে সমস্ত হৃদয়। মানুষকে লোভের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। পান্নু মল্লিককে ছেড়ে দিয়েছে। হয়তো পদ্মিনীকেও ছাড়বে একদিন। কিন্তু সে অন্ধ মানুষ। মানুষের দুঃখে মাটি কাঁদে না? কাগনির মাটি লজ্জায় শিউরে ওঠে না একবারও?

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ধর্মদাস।

কতক্ষণ সেভাবে কেটেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ পিছন থেকে কপিলার ডাক শুনে সে সম্বিৎ ফিরে পেল। ধরা' গলায় ডাকছে কপিলা। —বাবা! ঘুম যাবে না?

অ্যাঁ? হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি, মা। তুইও জেগে রয়েছিস?

না। আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছি।

ভালো করেছিস। আমার শরীর কাহিল কিনা, তাই ঘুম আসছে না। তুই ঘুমো গা, মা।

তুমি ঘরে চলো।

চল্।

আর প্রতিবাদ না ক'রে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লো ধর্মদাস।

কপিলা বললে, মাথায় বাতাস ক'রে দেবো বাবা?

ধর্মদাস নিজেকে যেন আর সামলে রাখতে পারছে না। তার কপিলা। তার আদরের মেয়ে, তার স্নেহময়ী মা। কই, কপিলার কথায় অবাধ্যতা নেই। তবে বীরুলাল কার জোরে অমন দাপটে কথা ব'লে গেল?

ধর্মদাস ক্লান্তস্বরে বললে, থাক্ না। তুই ঘুমো গা—

কপিলা বললো, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তবে যাবো।

তবে ব'স্ আমার মাথার কাছে। তোর ঠাণ্ডা হাতখানা আমার কপালে একটু বুলিয়ে দে।

কপিলা তাই করতে লাগলো।

ধর্মদাস কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেল সব-কিছু। শুধু সে নিজে আর তার বুকজোড়া মানিক কপিলা। এর ভেতর বীরুলাল নেই, রাণী নেই, কাগনির ছবি নেই, পান্নু মল্লিক নেই। কেউ নেই, কিছু নেই এই দুর্লভ মুহূর্ত-কয়টির অবসরে।

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য
কেএমপি
মার্কা
সরিষার
তৈল
গ্যারান্টি ১০০% খাঁটি
১ সের, ২½ সের ও ৫ সের
টিনে পাওয়া যায়।
—: পরিবেশক :—
এস. এম. সিণ্ডিকেট
৩, কমার্শিয়াল বিল্ডিং
কলিকাতা—১

কপিলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে তাকালে। কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছে ধর্মদাস। আস্তে গায়ের চাদরখানা ভালো ক'রে টেনে দিয়ে পা টিপে টিপে সে উঠে গেল।

নিজের বিছানায় শুয়ে চোখের জল আর বাধা মানলো না তার। দ্বিগুণ বেগে ছাপিয়ে এলো দু'চোখে। ফুঁপিয়ে কাঁদলে যদি সে-শব্দে জেগে যায় ধর্মদাস। বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো কপিলা। নিঃশব্দ নীরব কান্না।

ঝড় তুলেছে সে দুটি মানুষের মনে। একদিকে ধর্মদাস। আর একদিকে বীরুলাল।

সেদিন ধর্মদাস চ'লে যাবার পর রাণী প্রথমে মনে মনে হসেছিল। তারপর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠতেই শুয়ে ড়েছিল। অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা যেন ছিঁড়ে প'ড়ে যাচ্ছে। াতাস হঠাৎ যেন ভারী হ'য়ে উঠেছে। নিঃশ্বাস নিতেও ষ্ট হ'চ্ছে।

এরকম তার আগেও হ'য়েছে। কিন্তু সেদিন যেন তন্ত্র। এত কষ্ট, এত অস্থিরতা দেখা দেয়নি আগে। াগুন বেরুচ্ছে যেন চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে। ছটফট করতে াগলো রাণী। এত যন্ত্রণা একটা জীবনে? এত কঠিন খ?

অন্ধকার হ'য়ে আসছে। হঠাৎ কী মনে ক'রে পাগলের তো সিঁথির সিঁদুরটুকু হাত দিয়ে ঘষতে লাগলো সে। ছে ফেললে কপালের টিপটা। নির্দয় হাতের ঘষায় মুছে ল সিঁদুর।

কাজটা ক'রেই মনে মনে শিউরে উঠলো রাণী। ছি ছি, কী কাজ নিজের হাতে সে করলে! সঙ্গে সঙ্গে উঠে লোটা জ্বেলে পুরনো আরশিখানা টেনে নিয়ে বার বার 'রে নিজের মুখ দেখতে লাগলো রাণী। সারা কপাল কে লাল হ'য়ে গেছে সিঁদুরে। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। াখ-দুটোয় এসে যেন সব রক্ত জমাট বেঁধেছে।

আরশিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে তুলসীতলায় য়ে বালতির পর বালতি জল মাথায় ঢালতে লাগলো ণী। সেই সময় মেনকা ফিরে এলো। ভয় পেয়ে মেনকা ললে, কী হ'ল দিদি?

কিছু নয় রে, কিছু নয়। মাথা ধরেছে একটু।

মেনকা তাতেই সন্তুষ্ট হ'ল না। এরকম আরও দু'একদিন দেখেছে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে এগিয়ে গেল। বালতিটা হাতে নিয়ে জল ঢালতে ঢালতে বললে, কাল সকালে তুই কাপনির হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আসবি দিদি। রান্নাবান্না আমি করবো।

এত কষ্টের মধ্যেও রাণীর হাসি পেলো। বললে, নে বাপু, তোকে আর পাকামি করতে হবে না। যা করছিস তাই কর্।

কয়েক বালতি জল ঢালার পর একটু আরাম বোধ হচ্ছিল। সারা দেহে তবু যেন কী এক গভীর ক্লান্তি নেমেছে। ঘরে গিয়ে অবশ দেহটাকে কোনোমতে বিছানায় এলিয়ে দিলে রাণী। মেনকা ভয়ে আধখানা হ'য়ে গেছে। চুপ ক'রে ব'সে রইলো তার দিদির পাশে।

মেনকার কচি মুখখানার দিকে কতবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে রাণী। নিষ্পাপ, অবুঝ, টাটকা একটা প্রাণের প্রতিচ্ছবি। এমন দিন রাণীরও ছিল। আর ফিরে আসবে না।

ম্লানস্বরে রাণী ব'ললে, হ্যাঁরে, কবে ফিরবে তা কিছু তোকে ব'লে গেইছে কাত্তিক?

কই, না তো। ক্যানে, তোকে বলেনি?

না। কি জানি, বললেও আমার মনে নেই।

মিথ্যে কথাটা ব'লে পাশ ফিরে শুয়ে রইলো রাণী। কার্তিক আজকাল ভালো ক'রে কথা বলে না রাণীর সঙ্গে। নতুন চাকরির চেষ্টায় সেউলী থেকে রওনা হওয়ার আগে পরোক্ষে একবার বলেছিল, ফিরতে হয়তো তিন-চার দিনও দেরি হ'তে পারে। রাণীও কোনো কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেনি।

রাত বাড়তে লাগলো। কাটোয়ার বাস্ এসে গেল সেউলীতে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে বসলে রাণী। বাস্ আর এগিয়ে আসবে না। বীরুলাল বাস্-টাও সরিয়ে নিয়ে গেছে একটু দূরে।

ব'সে থাকতে থাকতে কখন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে মেনকা। সেইভাবেই নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ঘুম। নিজে কতটুকু চায় তার হিসেব নেই। কতটুকু দিতে পারে তাও জানে না। কোনো দেনা-পাওনার হিসেব নেই, কোনো চাওয়া-পাওয়ার খতিয়ান নেই মেনকার। কত সুখ, কত শান্তি ঐ কচি বুকটায়।

ম্লান একটু হাসি মুখে নিয়ে আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল রাণী। অন্তত মেনকার জন্যেও তো দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে হবে।

সে-রাতটাও কেটে গেল।

পরের দিন রাণীর দুশ্চিন্তা একটু বাড়লো। কার্তিক রাগের অভিমানে এককথায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। একটা চাকরি পাওয়া কত কঠিন। যদি আর চাকরি না পায়? যদি আর না ফিরে আসে?

সারাদিন ধ'রে অনেক কিছু ভাবনা পাক খেতে লাগলো তার মাথায়। দিনের আলো নিভে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো ধীরে ধীরে। বাস্-এর শব্দের জন্যে উৎকর্ণ হ'য়ে ব'সে রইলো রাণী।

বড্ডো-দুঃসহ মনে হোক, সময় একসময় কেটেই যায়। বাস্-এর শব্দ ভেসে এলো দূর থেকে। রাণী কান খাড়া ক'রে বেরিয়ে এলো দাওয়ায়। মেনকা বললে, দাদা আজ আসবে দিদি?

বুঝতে পারছি না। দেখি, গাড়ী আসুক।— রাণী বললে।

রাস্তা দিয়ে দু'চারজন লোক চ'লে গেল পাড়াটার দিকে। কার্তিকের কোনো চিহ্ন নেই। আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো রাণীর বুক। আরও কয়েকজন লোক আসছে। আর এক পা এগিয়ে দাঁড়ালো রাণী। চোখ-দু'টি সজাগ হ'য়ে উঠলো তার। একজন বড়োসাজা ছেলে এদিকেই আসছে। মেনকা উৎফুল্ল হ'য়ে বললে, ওই যে এসেছে দাদা।

লোকটা এগিয়ে এলো। উঠোন পেরিয়ে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ালো। মেনকা চেঁচিয়ে উঠলে, ওমা, দাদাবাবু এসেছে!

রাণীও চিনতে পেরেছিল একটু দূর থেকে। তার পায়ের তলার মাটি যেন দুলে উঠেছে তখন। থরথর ক'রে কাঁপছে সর্বাঙ্গ।

শ্রীকণ্ঠ একটু হেসে বললে, কিগো, কেমন আছ তোমরা? আরে, এটা কে বটে? ম্যানকা নয়? বাঃ, দিব্যি ডাগর হ'য়ে উঠেছে তো!

কাঁপতে কাঁপতে হাতের সামনে খুঁটিটা আঁকড়ে ধ'রলে রাণী। বললে, তুমি ভালো আছ?

শ্রীকণ্ঠ হাসলে। পানের ছোপ-পড়া কালো কালো দাঁতগুলো যেন কতগুলো পোকার মতো কিলবিল ক'রে উঠলো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রেখেই উঠে এলো দাওয়ায়। বললে, চিনতে পেরেছ তাহ'লে, অ্যাঁ?

রাণী কিছুই বললে না। মেনকা আলোটা আনতে ছুটে চ'লে গেল ঘরে। শ্রীকণ্ঠ একটু খোসামোদের হাসি হেসে বললে, রা কাড়ছো না যে মাইরি? আর কারও আসার কথা ছিল নাকি?

রাণী আরও জোরে আঁকড়ে ধরলে বাঁশের খুঁটিটা। মাথা ঘুরছে। পা কাঁপছে থরথর ক'রে। এতদিন পর এই তার স্বামীর প্রথম সম্ভাষণ।

মেনকা আলো নিয়ে এলো। বিবর্ণ দৃষ্টি মেলে রাণী তাকালে শ্রীকণ্ঠের দিকে। বললে, আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ?

উঁ? না গো, নিয়ে যাবো আর কোথায়? কতদিন দেখিনি, তাই ভাবলাম দেখে আসি একবার।

রাণী কঠিন স্বরে বললে, কে তোমাকে আসতে বলেছে?

অ্যাঁ? আসতে আবার বলবে কে? নিজেই এলাম। কাটোয়ার ইস্ট্যাণ্ডে শোনলাম বেতো-দাদা চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ক্যানে ছেড়েছে তা কি আর বুঝতে বাকী থাকে আমার? ড্রাইভারটাকে একদিন কাটোয়ার রাস্তায় খুব পিটেছিলাম। সে-ই আবার তোমার কাছে এনে পৌঁছে দিলে! গাড়ী চালিয়ে সেই শালাই নিয়ে এলো আমাকে।

হা হা ক'রে হেসে উঠলে শ্রীকণ্ঠ।

রাণী দাঁতে দাঁত চেপে বললে, ভুল করেছে।

কী বললে?

রাণী কোনো জবাব দিলে না।

ওটাকে তাহ'লে ছেড়ে দিয়েছ মাইরি?

হ্যাঁ।

বেশ করেছ। আমি তো বেঁচে মরেছি, তোমার ভাবনাটা কী? কই রে ম্যানকা, বসতেও দিবিনে নাকি?

এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে শ্রীকণ্ঠের দিকে তাকিয়ে ছিল মেনকা। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, ক্যানে দেব না? ঘরে আসা করেন আগে।

কথাটা ব'লেই সে ঘরে চ'লে গেল। শ্রীকণ্ঠ একটু এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললে, কাটোয়ায় দেখা হ'ল কার্তিকের সঙ্গে। সোনলায় ঘর ফিরতে আরও দু'একদিন নাকি দেরি হবে।

রাণী সহসা ঘুরে দাঁড়ালে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শ্রীকণ্ঠের দিকে তাকিয়ে তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, তাই কি দু'দিনের স্ফূর্তি লুটতে এসেছ?

থতমত খেয়ে শ্রীকণ্ঠ বললে, তার মানে?

মানে? দাঁতে দাঁত পিষে রাণী বললে, বাজারের মেয়ের কাছে পয়সা লাগে। এখেনে তাও লাগবে না, তাই না?

আহা-হা, বাজারের কথা আবার ক্যানে আসছে গো? তোমার কাছে আসতে নেই আমার?

সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠলে রাণী। —না, না, না। এখেনে থাকতে হবে না তোমাকে।

সেকি! হতভম্ব হ'য়ে শ্রীকণ্ঠ বললে, এখেনে থাকবো না তো কোথায় যাবো এত রেতে?

যেখেনে তোমার খুশি। নদী পেরুলেই কাগনি আছে।

শ্রীকণ্ঠ কয়েক মুহূর্ত ক্যালক্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো। তারপর বিড়বিড় ক'রে বললে, আহা-হা, অমন পাগলামি করতে হয়?

টাকা আছে পকেটে?

টাকা!

ফুর্তি লুটতে এয়েছ, টাকা লাগবে না? কত টাকা দিতে পারবে বলো।

তোমার কাছে টাকা নিয়ে আসতে হবে?

ক্যানে নয়? কিসের এত খাতির তোমার সঙ্গে?

শ্রীকণ্ঠ ক্যালক্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। রাণীর কথাগুলো সে যেন তখনো বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছে না।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শ্রীকণ্ঠ বললে, তাহ'লে সত্যি সত্যিই তুমি—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না রাণী। তার তখন কোনো হুঁশ নেই। কাঁপতে কাঁপতে বললে, সত্যি যদি না হবে তো কুকুরের পারা ঘর থেকে তাড়া করেছিলে ক্যানে?

সে তো কবে সেই পুরানো কথা গো।

আমার কাছে পুরানো নয়। যাও তুমি। টাকা দিয়ে ফুর্তি করবার অনেক লোক আছে আমার।

শ্রীকণ্ঠ এতক্ষণ পরে হাসলে একটু। বিশ্রী এক চাপা-হাসি। তারপর পকেট থেকে একটা পান নিয়ে মুখে দিয়ে বললে, বেশ, বেশ। তা বটে ভালোই করেছ। তবে কিনা সবচেয়ে আপন লোকটাকে কিনা শেষকালে তুমিও কুকুর-খেদা করলে সেইটেই দুখ্যু।

যাও। কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো রাণী।

যেছি। থতমত খেয়ে শ্রীকণ্ঠ বললে, দেখি, একটা রাত না হয় কাগনিতে কাটাই।

আড়চোখে একবার তাকিয়ে শ্রীকণ্ঠ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

মেনকা এতক্ষণ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখছিল। যেতেই সে প্রায় কেঁদে ফেললে।

দিদি, দিদি গো—

রাণী কোনো জবাব দিলে না। তার পায়ের নীচে মাটি যেন দুলতে সুরু করেছে। থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে ব'সে পড়লে।

মেনকা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলে রাণীকে। অবশ, অশক্ত দেহ। অজ্ঞান হ'য়ে গেছে রাণী। মেনকা চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলো, দিদি, দিদি গো—তারপর ভয়ে কেঁদে ফেললে।

শ্রীকণ্ঠ তখনো বড়োরাস্তায় পড়েনি। মেনকার ভয়ার্ত চীৎকার তার কানে এলো। কিন্তু সে আর ফিরলে না। একটা বিড়ি ধরিয়ে হন্‌হন্‌ ক'রে হাঁটতে সুরু করলে বড়োরাস্তা ধ'রে।

মাগনের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর থেকেই কী একটা অজানা আতঙ্কে যেন পেয়ে বসলে পাছু মল্লিককে। গভীর রাত। থমথম করছে চারিদিক। মদ কিনতে এলো বাউরীপাড়ার দু'তিনজন লোক। তাদের মুখে সংবাদটা শুনেই কেন যেন পাছু মল্লিকের গা ছমছম ক'রে উঠলো। টাকা বুঝে নিয়ে মদের বোতল তাদের হাতে দিয়ে সে বললে, পদ্মিনী খুব কাঁদাকাটা করছে নাকি রে?

তারা অত খেয়াল ক'রে দেখেনি। মোটামুটি অবস্থাটা যা দেখেছে তাই বললে। পাছু মল্লিক দরজা বন্ধ ক'রে দেবার আগে বললে, পদ্মিনীকে বলিস এখন পাঁচ-সাতদিন যেন কোথাও না বেরোয়। সব ছোঁয়াছুঁয়ি ওই তো করেছে, তার আবার অমন কালরোগ।

তারা চ'লে গেল। পাছু মল্লিক ব'সে রইলো একটা আড়ষ্ট পুতুলের মতো। গা ছমছম করছে। মনে পড়[illegible] মাগনের চেহারাটা। দেউলীতে মদের দোকান হবে শুনে কী খুশী হয়েছিল লোকটা। ক'দিন ভোগ করতে পেল? এই বিদেশে যদি আজ পাছু মল্লিকের এমন কোনো একটা অসুখ হয়, তবে মুখে জল দেবার একটা লোকও তো থাকবে না। পদ্মিনী যেমন মেয়েই হোক, শেষ ক'টা দিন শান্তি দিয়েছে মাগনকে। কিন্তু পাছু মল্লিককে শান্তি দেবার জন্যে তার বউ কি ছুটে আসবে দেউলীতে? যদিও বা

আসে, তাও লোক-দেখানো। কিংবা বৈধব্যের আশঙ্কায়। প্রাণের টানে সে কোনোদিনই ছুটে আসবে না। ছেলেমেয়েরাও না। পান্নু মল্লিকের বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে কতটুকু দরকার? টাকার জন্যে যতটুকু। আর তাদের জন্মদাতার কাছে তাদের অস্তিত্বের দাম? তাও বোধহয় কিছু নয়। সত্যিকারের সন্তান-কামনা কি ছিল পান্নু মল্লিকের? সমস্ত সাধন আহ্লাদে নিয়ে আসা বংশধরের রক্তে, প্রাণে, চেতনায় নিজের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখে যাবার সেই বিপুল তৃষ্ণা? সে তৃষ্ণার কথা মনে পড়ে না। মনে পড়ে অন্ধ এক উন্মাদনার কথা। আকণ্ঠ দেহ-পিপাসার যোগসূত্রে সন্তানেরা একে একে এসেছে তাদের মায়ের কোলে। অবাঞ্ছিত অস্তিত্ব। কিন্তু পরিত্যাগের উপায় নেই। নতুন মানুষ ব'লে পান্নু মল্লিক এতটুকু সমাদর করতে পারেনি তাদের। বিরক্তিকর এক একটা রক্তমাংসের পুতুল। তাদের মেনে না নিলে উপায় ছিল-না তাই মানতে হ'য়েছে। পান্নু মল্লিক তাদের জন্মদাতা পিতা। কিন্তু তারা তো পান্নু মল্লিকের আকাঙ্ক্ষার সন্তান নয়। তাদের দোষ কী? ···

সে-রাত্রি ছটফট ক'রে কেটে গেল পান্নু মল্লিকের। ভোরবেলা একটু ঘুম এসেছিল। সে ঘুম যখন ভাঙলো, তখন বেলা প্রায় ন'টা। পান্নু মল্লিক যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো। রাতের অন্ধকার নামলেই তার মনটা বার বার উড়ে চ'লে যায় অতীতে। দিনের বেলা চিহ্নও থাকে না কিছু।

সমস্ত দুশ্চিন্তা নিঃশেষে মুছে ফেলে তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লে। কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ছিল না। কিন্তু কিছুটা পথ হাঁটার পর পান্নু মল্লিক নিজেই অবাক্ হ'য়ে গেল। ধর্মদাস হাজরার দোকানের কাছে এসে পড়েছে সে। দেউলীতে এখনো এই একটা লোক আছে। সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়ের সমস্ত পুরনো ধারণা নিয়ে এখনো লোকটা নিজের গড়া জগতে বাস করছে। তবু তার কাছে এসে বসলে দুটো মুহূর্তও নিজেকে ভুলে থাকা যায়। আশ্চর্য হ'য়ে গেল পান্নু মল্লিক। ধর্মদাস হাজরা তার মতো মানুষকে দুর্বোধ্য আকর্ষণে কাছে টানে।

কয়েকদিন অসুস্থতার পরে সেইদিন সকালে ধর্মদাস সবে দোকান খুলেছে। পান্নু মল্লিককে দেখে আপ্যায়ন সে করলে বটে। কিন্তু বড়ো শুষ্ক আপ্যায়ন।

পান্নু মল্লিক বললে, কিগো, মুখ ভার যে?

আজ্ঞে, শরীরটা এখনো কাহিল কিনা। টেনে টেনে ধর্মদাস বললে। তারপর একটু চুপ ক'রে থাকার পর প্রশ্ন করলে, চা খাবেন তো?

তা খাবো বইকি। মাধনের খবর শুনেছ হাজরা-মশাই?

হুঁ। কাল রেতে মারা গেইছে।

ভালোই হ'য়েছে, কী বলো? বেঁচে থেকে কোন্ শান্তিটা পেত? না ঘরের, না বাইরের। এখন একেবারে হিসেবের বাইরে। বুঝলে হাজরা, এই হ'ল তোমার সেরা ভালো।

ধর্মদাস চা ছাঁকছিল। কোনো কথা বললে না।

পান্নু মল্লিক আপনমনেই বলতে লাগলো, মৃত্যুর উপরে আর সত্য নেই, হাজরা। বাসনা, কামনা, সুখ দুঃখ—সব শেষ। বাসনার শেষই যদি হ'ল তাহ'লে দুঃখও তো শেষ। তবু কিনা, মরতে এত ভয় পাই। তুমি ভয় পাও না হাজরা?

ধর্মদাস বললে, আজ্ঞে, ওসব কথা কি আমি বুঝি?

কেন বুঝবে না? এসব কি নতুন কথা নাকি? এই হ'ল সব কথার শেষ কথা হে হাজরা! না বুঝলে তোমাকে ছাড়ছে কে?

ধর্মদাস চায়ের গেলাস এগিয়ে দিলে। পান্নু মল্লিক আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিয়ে কেমন অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলো ওপারের দিকে।

প্রথম বৈশাখের সকাল।

প্রখর রোদের আলো এরই মধ্যে চোখ ঝল্সাতে সুরু করেছে। সামনে প'ড়ে আছে দ্বারকার বিস্তৃত খাত। ধু-ধু করছে বালি। তার উপর প'ড়ে রোদের আলো ঠিক্‌রে এসে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে দৃষ্টি।

হঠাৎ ধর্মদাস বললে, আর কিছু জমি-টমি কেনা করার ইচ্ছে আছে নাকি বাবু?

পান্নু মল্লিক একটু আশ্চর্য হ'য়ে প্রশ্ন করলে, কেন বলো দিকি?

ক্যানে আর? আপনি তো দেউলীকে পাকাপাকি বসলেন। যদি আরও জায়গা-জমি লাগে।

তুমি বেচবে?

হ্যাঁ। ভাবছি এ-দোকানটার খদ্দের পেলে এটাও বেচা ক'রে দেব।

এখানে থাকবে না?

সাধ নেই আর।

পান্নু মল্লিক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধর্মদাসের দিকে

তাকালে। তারপর টিবিয়ে টিবিয়ে প্রশ্ন করলে, তোমার কী হ'য়েছে বলো দিকি ?

ধর্মদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, আমার মন বিষিয়ে উঠেছে, মল্লিকমশাই। মেউলীতে আমি আর থাকতে পাচ্ছি না। আপনি জেনেন তো বলেন—

পান্থ মল্লিক মৃদু হেসে বললে, হাজরা, মেউলী না হয় ছাড়লে। কিন্তু কোথায় গিয়ে পার পাবে বলো দিকি ?

গাঁয়ে চ'লে যাব।

এখানে আর ক'টা দিন কষ্ট ক'রে টিঁকে থাকো, দু'হাতে পয়সা লুটবে হে। মেউলী তো টাউন হ'য়ে গেল ব'লে।

ধর্মদাসের গলা কেমন ধরা-ধরা। আস্তে আস্তে বললে, মল্লিকমশাই, টাউন হোক, শহর হোক, আমি তো আর ঠেকাতে পাচ্ছি না। আমার সাধও নেই। কী করবো অত টাকা দিয়ে ?

টাকা দিয়ে কী করবে ? হো হো ক'রে হেসে উঠলে পান্থ মল্লিক। হাসতে হাসতে বললে, হাজরা, তুমি মাইরি একটা অবতার মানুষ !

ধর্মদাস হাসলে না। উদাস দৃষ্টিতে সমরার দিকে তাকিয়ে বললে, ঠাট্টা করেন ক্যানে, মল্লিকমশাই। মুখ্যুসুখ্যু লোক আমি। বড়ো কথা জানিনে। বলতেও সাহস নেই। চোখ দিয়ে যা দেখি, তারই কথা বলি। সব দেখে শুনে আর বাঁচতেই সাধ যাচ্ছে না আমার।

পান্থ মল্লিক শেষ চুমুক চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালে। মৃদু হেসে বললে, তোমার কাছে এসে বসলেই মন খারাপ ক'রে দাও তুমি। বাঁচবে কি মরবে তা তুমি ঠিক করো বাপু। আমি চলি।

ধর্মদাস অপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, আজ্ঞে মনটা কিছু খারাপ আছে তাই—

সে তোমাকে ব'লে বোঝাতে হবে না, এমনিই বুঝেছি।

কিন্তু জমি-জায়গা কিনবেন কিনা, বললেন না তো ?

তুমি কি সত্যি সত্যিই বলছ নাকি ?

আজ্ঞে, আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করবো ক্যানে ?

পান্থ মল্লিক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললে, সব বেচে-কিনে চলে যাবে ?

খদ্দের পেলে তাই করবো।

তোমার মেয়ের বিয়ে ?

কপালে থাকলে যেখেনে হয় হবে।

পান্থ মল্লিক ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলে। তারপর বললে, তুমি বলেছ ঠিক। মেউলীতে জায়গা-জমি আমার আরও চাই। তবে দু'একদিন ভাবতে দাও হাজরা। তুমিও দর-দাম ভাবতে থাকো।

ধর্মদাসের চোখ-দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাতজোড় ক'রে সে বললে, দর-দামে অসুবিধে হবে না মল্লিকমশাই। ন্যায্য দামের একপয়সা বেশী চাওয়া করবো না।

পান্থ মল্লিক তখন ভবিষ্যতের অন্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। ধর্মদাসের কথাগুলো ভালো ক'রে না শুনেই বললে, আমার কথা না পাওয়া পর্যন্ত অন্য কাউকে আবার কথা দিয়ে ব'সোনা যেন হাজরা।

ধর্মদাস জিভ কেটে বললে, ছি ছি। তা করবো ক্যানে ?

পান্থ মল্লিক হেসে বললে, আরে, ওটা একটা কথার মাত্রা। তা বেশ, ওই কথাই রইলো।

বেরিয়ে এলো পান্থ মল্লিক। বেলা দশটার কড়া রোদে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। সামনেই প'ড়ে ধুঁকছে মেউলীর পোড়ো জমিগুলো। বিবর্ণ পোড়া ঘাসের চাদর গায়ে প'ড়ে আছে নদীর পাড় থেকে ওপাশে বড়োরাস্তা পর্যন্ত। এই জমির দামই হ'য়ে যাবে তিনগুণ চারগুণ। হয়তো তার চেয়েও বেশী। দেখা যাচ্ছে সমরার পুলটা। আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো পুল খুলে যাবে। তখন হাত কামড়ালেও সস্তা দামে জমি বেচবে না কেউ। ধর্মদাস চোখ খুলে দিয়েছে। যেমন ক'রেই হোক জমি নিতে হবে।

রোদের ঝাঁঝে চোখ ঝলসে যায়। তবু অপলক চোখে পান্থ মল্লিক দেখতে লাগলো চারদিকে তাকিয়ে। অদূর ভবিষ্যতের নতুন স্বপ্নে তার কোটরে বসা চোখ-দুটি হঠাৎ যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। মেউলীর বাতাস ধর্মদাসের বুকে হাঁপ ধরিয়ে দিয়েছে। পান্থ মল্লিক এই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। মেউলীর মাটির উপর নতুন ক'রে গড়ে তুলবে তার ভাগ্যকে।

। ২৩ ।

কয়েকদিন পরে কার্তিক ফিরে এলো।

কোনো চাকরি হয়নি তার। অতর্কিতে আগের চাকরি ছেড়ে দেবার কথা সকলেই শুনেছিল। অন্য কোনো মালিক তাকে নতুন ক'রে কাজ দিতে রাজী হয়নি। অত খামখেয়ালী লোক দিয়ে এ কাজ চলে না।

এ ক'দিনে কার্তিকের চেহারা যেন অর্ধেক হ'য়ে গেছে।

চুলগুলো উসকো-খুসকো। জামা-কাপড়ে ময়লা জমেছে অনেকখানি। ভবিষ্যতের চিন্তায় চোখের চাউনি তার কেমন যেন দিশেহারার মতো।

রাণীর চোখ ছাপিয়ে জল আসছিল। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বললে, অত ভাবনা ক'রে কী করবি? অদেষ্টে যা আছে তাই ভোগ করবো তিনজনায়।

কার্তিক রাণীর দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। রাণীর গলার স্বরে সমবেদনার দরদটুকু তার কানে ঠিকই বেজেছে। তবু কেন যেন একটা নিষ্ফল আক্রোশ কেঁপে উঠতে থাকে বুকের ভিতর। শ্রীকণ্ঠের ব্যাপারে যদি অতবড়ো কাড়াকাড়ির ঘটনাটা না ঘটতো, তাহ'লে হয়তো চাকরি ছাড়ার প্রশ্নই আসতো না কোনোদিন। রাণী এখানে না থাকলে বীরুলালের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার অত মর্মান্তিক আঘাতও হয়তো পেতে হ'ত না!

রাণী মৃদুস্বরে বললে, একটা কথা বলবো কার্তিক?

কী কথা?

আজ হোক কাল হোক, একটা উপায় কিছু হবেই বটে। ম্যানকা আর তোর নিজের দুটি ভাত যেমন তেমন ক'রে জুটিয়ে নিতে পারবিনে?

তুই? তোর দরকার নেই?

রাণী চুপ ক'রে রইলো।

কার্তিক একটু বিরক্ত স্বরে বললে, আবার কোন্ পাগলামি এলো তোর?

রাণী মুখ নীচু ক'রে বললে, তোর দাদাবাবু এসেছিল। ভাবছি, চলেই যাই।

দাদাবাবু এসেছিল! কোথায়?

এখন কোথায় আছে জানিনে। ম্যানকা বলছিল, দুপুরবেলায় পুলের ওধারে বাবুদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে তেনাকে।

কার্তিক গুম্ হয়ে বসে রইলো।

রাণী ভয়ে ভয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কী বলিস তুই?

আমি তোকে দু'বেলা দু'টো ভাতও দিতে পারবো না ব'লে যেতে চেছিস?

না।

তবে কী? মন ফিরেছে তোর?

রাণী নিরুত্তর।

কার্তিক ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, যা বলবি স্পষ্ট ক'রে বল্ না, দিদি। একটা কথাও তুই মন খুলে বলতে জানিসনে?

রাণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, বললাম তো।

দাদাবাবু কবে এসেছিল?

পরশু সন্ধ্যেবেলায়।

এখেনে রইলো না ক্যানে?

তা আমি কী জানি?

তবে কে জানবে? এবারেও তোকে নিয়ে যেয়ে যদি আবার একদিন তাড়িয়ে দেয়?

দেবে না।

বেশ, যা ভালো বুঝিস কর্‌গা। দাদাবাবু আবার কবে আসবে কিছু ব'লে গেইছে?

না।

কার্তিক কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাণীর দিকে তাকিয়ে তারপর বললে, দিদি, যদি ভালোভাবে ঘর-সংসার করতে সাধ যায় তো তোকে যেতে মানা করবো না। কিন্তু আমার বোঝা কমা করতে যদি যাবি ভাবিস তবে তোকে আমি যেতে দেবো না তা জেনে রাখ্‌গা।

রাণী কোনো কথা বললে না। কার্তিকের সামনে থেকে জলের গেলাস আর মুড়ির বাটিটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

সেদিন আর কোনো কথা হ'ল না। পরের দি সকালে উঠেই কার্তিক যেন কোথায় বেরিয়ে গেল। ফি এলো দুপুরবেলায়। রাণী লক্ষ্য ক'রে দেখলে তার চোখমুখে দুশ্চিন্তার দিশেহারা ভাব অনেকখানি কেটে গেছে। অবাক্ হ'য়ে সে অনেক কিছু ভাবলে। কিন কিছুই ঠিক করতে পারলে না।

খেতে ব'সে কার্তিক নিজেই কথা তুললে।—একট কারবার খুলবো ঠিক করলাম রে, দিদি।

রাণী আরও অবাক্ হ'য়ে বললে, কারবার! পয়স কোথায়?

দাদন দিতে রাজী হ'য়েছে একজন।

কে? কাঁপাগলায় প্রশ্ন করলে রাণী।

পাড়ু মল্লিক মশায়। ভেবে ঠিক করলাম এই ভালো। ঘরের খেয়ে যা হয় দুটো পয়সা ঘরে আনা যাবে।

রাণী ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ তারপর বিস্ময়ের ধাক্কা কেটে যাবার পর প্রশ্ন করলে, কিসের কারবার এখন করবি? আর মল্লিকমশায় ব তোকে হঠাৎ দাদন দিতে রাজী হ'ল ক্যানে?

ক্যানে আবার? তেনার বাধ আছে তাই। জেলে-ডাঙায় দোকান করবো ঠিক করলাম। মল্লিকমশায়ের খদ্দেরদের কাছে পড়তে পারে না, এমন অবস্থা। মদ খেয়ে সব, চাট নিয়ে আসছে ওপার থেকে। এপারে দোকান থাকলে, দু'একবছরে চাইকি ডিম, মাংস, চপ কাটলেট পর্যন্ত আরম্ভ করবো দেখিস। দোকান খুলছি ফুলুরি বেগুনি এইসব দিয়ে। কেমন হবে রে?

আপনমনে কথা ব'লে যাচ্ছিল কার্তিক। রাণীর মুখের দিকে তাকায়নি। শেষ কথাটা ব'লে চোখ তুলতেই সে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে গেল। রাণী যেন একটা কাঠের পুতুলের মতো ভাবলেশহীন দৃষ্টি মেলে শুনছে তার কথা।

কার্তিক বললে, কী হ'ল রে?

কিছু না।

তা অমন ক'রে তাকাইছিল ক্যানে?

কেমন ক'রে আবার? তোর কথা সব শোনলাম।

কেমন মনে হয় তোর?

ভালো।

কার্তিক আশ্বস্ত হ'ল। উৎসাহের সঙ্গে বললে, পরের মর্জির উপর চাকরির চেয়ে স্বাধীনমতে উপায় করা অনেক ভালো, কী বলিস?

রাণী প্রশ্ন করলে, তা এতে পাল্লুবাবুর বাধটা কী?

বুঝলিনে? এখানে ব'সেই চাট পাওয়া গেলে খদ্দেররা আরও বেশী ক'রে আসবে।

ও! কিন্তু দোকানটা হবে কোথায়?

মল্লিকবাবুর দোকানের পাশে।

শেষকালে শুঁড়ির দোকানের সঙ্গে কারবার খুললি কার্তিক? বলতে বলতে গলা ধ'রে এলো রাণীর। বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টি মেলে সে তাকালে ভাইয়ের দিকে।

কার্তিক এ প্রশ্নে হঠাৎ বিব্রত হ'য়ে পড়লে। তারপর বললে, তবে কি না-খেয়ে মরতে বলিস? দেখলি তো, এতদিন ধ'রে কত চেষ্টা করলাম একটা কাজের জন্যে। কেউ তো দিল না।

রাণী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, তবে কর্। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি হয় মল্লিকবাবুর ধার শুধে দিবি।

কার্তিক মাথা নেড়ে ব'ললে, সে তোকে ভাবতে হবে না। চায় তো, সুদও দিয়ে দেবো কিছু।

আচ্ছা, তুই যা এখন।— বললে রাণী।

কার্তিক কী যেন ভেবে একটু হেসে বললে, কতদিন পরে আজ তোর সঙ্গে বেশ ফুর্তি-মেজাজে কথা বলছি দিদি?

রাণীর চোখ-দুটো ছলছল ক'রে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাতের পাতায় চোখ মুছে সে-ও হেসে ফেললে। তারপর বললে, মেজাজ খারাপ হ'লে হক্কি-দীগ্‌দি জ্ঞান তো আর থাকে না তোর। একেবারে বাবার পারা মেজাজ করেছিস।

কার্তিক হাসতে লাগলো। রাণী আর দুটি ভাত আনবে ব'লে উঠতেই কার্তিক বললে, দোকানটা একটু গুছিয়ে তুলি। তারপর যদি কিনা তুই দাদাবাবুর কাছে যেতে মন করিস তো আমি নিজে তোকে রেখে আসবো।

রাণী প্রসঙ্গটা এড়াতে পারলেই রেহাই পায়। তাড়াতাড়ি সে বললে, ওসব কথা থাক্‌গা এখন।

কার্তিক কী যেন ভেবে বললে, আচ্ছা।

রাণী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেঁসেলের দিকে এগিয়ে গেল।

পাল্লু মল্লিক খবর নিয়ে জেনেছিল, ময়ূরার পুল শেষ হবার আগেই সেউড়ী-কাটোয়া রোডের বাকী অংশটুকু তৈরি হ'য়ে যাবে। খুব বেশী টাকার কাজ নয়। সাহসে বুক বেঁধে সে বেশ কয়েকদিন যাতায়াত করলে কাগনিতে। ঠিকাদারিটা পাওয়া গেলে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হ'ল না। কাগনির রায়-কোম্পানির কাছে হেরে গেল পাল্লু মল্লিক। রায়-কোম্পানি পেল ঠিকাদারি। তারই দু'চারদিন পরে ধর্মদাস তার চোখ ফিরিয়ে দিলে সেউড়ীর পোড়ো জমিগুলোর দিকে।

দিন-ছয়েক হ'ল রায়-কোম্পানির ওভারসিয়ার রূপরাম দত্তের তাঁবু পড়েছে সেউড়ীর মাঠে। পাল্লু মল্লিকের দোকান থেকে তিনশো হাত দূরেও নয়। দোকানের পেছনদিকে তক্তপোশের উপর ব'সে খোলা জানালা দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে ছিল পাল্লু মল্লিক। রায়-কোম্পানির টাকার জোর অনেক বেশী। তাদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে গেলে আরও শক্ত বনেদ চাই।

উদ্গত আক্রোশটুকু মনে চেপে রেখে পাল্লু মল্লিক শুয়ে পড়লে। বিকেল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ থাকে না। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে না নিলে গভীর রাতে বড্ড বেশী ক্লান্তি লাগে।

চোখে সবে একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় কে যেন দরজায় ধাক্কা দিলে। বিরক্ত হ'য়ে পাল্লু মল্লিক দরজা খুলে দিলে। কিন্তু আগন্তুককে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বিরক্তির জায়গায় এলো বিস্ময়। সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীকণ্ঠ হাসছে।

শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
গুরুদত্তের "চৌদভিন কা চাঁদ" ছবিতে

রূপ যেন তার রূপ কথারই রাজকন্যার মতো...

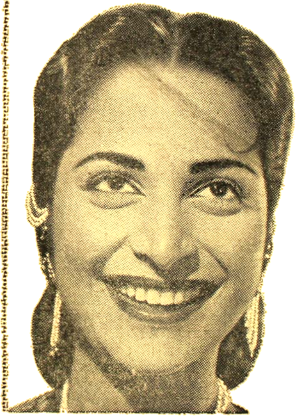

রূপে গুণে অপরূপ! যেন উপকথার, রূপবতী রাজকন্যা! ···· এত রূপ, এত লাবণ্য সে-তো ওর নিজেরই চেষ্টায়। রূপসী চিত্রতারকা ওয়াহেদা রেহমান জানেন, সৌন্দর্যের গোপন কথা হলো ত্বকের কুসুমসম কোমলতা। 'তাইতো আমি রোজই লাক্স ব্যবহার করি। এর সরের মতো ফেনায় সত্যিই ত্বক মোলায়েম আরো লাবণ্যময়ী হয়' ওয়াহেদা বলেন। আপনার কমনীয়তাও বাড়িয়ে তুলুন — বিশুদ্ধ লাক্স ব্যবহার করে।

LUX
TOILET SOAP

চিত্রতারকার সৌন্দর্য্য-সাবান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাক্স

LTS.43-X52 BG

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী।

পাচু মল্লিক বললে, আপনি ?

ক্যানে, আসতে নেই ? এটা আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ তো বটে।— বললে শ্রীকণ্ঠ।

কাটোয়ার বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে চায়ের দোকানে ব'সে শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হ'য়েছে পাচু মল্লিকের। পরিচয় তখন থেকেই।

পাচু মল্লিক বললে, আজই এলেন নাকি ?

আজ কী বলেন—পাঁচদিন হ'য়ে গেল এসেছি।

কই, কার্ত্তিক তো কিছু বললে না ?

জানলে তো বলবে।

কোথায় রয়েছেন তাহ'লে ?

কাগনিতে। শ্বশুরবাড়ী রয়েছে, ধর্ম্মসাক্ষী-করা বিয়ের পরিবার রয়েছে এখেনে। তা মশায়, যার কপাল মন্দ তার সব মন্দ। এখেনে জায়গা হয়নি আমার। কী আর করি, কাগনি গিয়ে একটা বন্দোবস্ত করতে হ'ল। এমন মেয়েই বিয়ে করেছিলাম মশায়!

কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকে পড়লে শ্রীকণ্ঠ। পা দুটো বেশ ঝাঁকিয়ে বসলে পাচু মল্লিকের তক্তপোষের ওপর। একটা পান মুখে দিয়ে প্রশ্ন করলে, জায়গাটা কেমন লাগছে আপনার ?

পাচু মল্লিক বিরক্তির সঙ্গে বললে, এই জায়গার কথা আবার শুধোচ্ছেন ? নেহাত লাইসেন্সটা পাওয়া গেল, তাই চোখ কান বুজে দোকানটা চালিয়ে যাচ্ছি।

হা-হা ক'রে হেসে উঠলে শ্রীকণ্ঠ। বললে, যতো সব অপোগণ্ডের দেশ মশায়! পিছে-পীকে বলুন, কাদ্চায় বলুন—একেবারে ভাঁড়ে-মা-ভবানী! এমন অবস্থায় যা হয় আর কি!

পাচু মল্লিক অন্যমনস্ক হ'য়ে কী যেন ভাবছিল। শ্রীকণ্ঠ তা লক্ষ্য করেনি। আপনমনে পান চিবোতে চিবোতে নিজের কথা ব'লে যেতে লাগলো।

মাঝপথে পাচু মল্লিক বললে, এবারে তাহ'লে বউকে নিয়েই দেশে ফিরছেন ?

বউ ? শ্রীকণ্ঠ যেন অবাক্ হ'য়ে গেল। পানের পিক্ ফেলে খানিকটা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললে, বউ কি-বলছেন মশায় ? অমন নষ্ট-মেয়েকে আবার ঘরে নিয়ে ঘর জ্বালাবো নাকি ? ঘরের কথা বলতে নেই, তাই চুপ ক'রে থাকি। পরপুরুষ হ'লে, এই শর্ম্মাই ওই মেয়ের কাছে কত খাতির পেতো দেখতেন।

পাচু মল্লিকের মুখে একটা হাসির ঝিলিক দেখা দিয়েই অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বললে, কী আর করবেন! অদৃষ্ট 'মানি না' 'মানি না' ক'রেও তো মানতে হয় মশাই।

শ্রীকণ্ঠ বললে, আশা ছেড়েই দিয়েছি। কিছুকাল এখেনে কাটাবো বন্দোবস্ত করেছি। নিজের চোখেই সব দেখে শুনে যাই। তবু মনের শান্তিটা থাকবে—খামোখা একটা মেয়েছেলের উপর খারাপ ব্যবহার করিনি।

পাচু মল্লিক সে-কথার ধার না ঘেঁষে প্রশ্ন করলে, এখানে কোথায় থাকা ঠিক করলেন ?

ওই তো তাই দেখা যাচ্ছে মশায়। রায়বাবুরা বনেদী ঘর। আলাপী মানুষের খাতির করতে জানেন। ওনারাই চেপে ধরলেন তো আর অমত করার পথ পেলাম না। ওনাদের চাকরিটা নেলাম।

'পাচু মল্লিক সংক্ষেপে বললে, ভালো করেছেন।

তাই ভেবেই তো নেলাম চাকরিটা।

মাস্টারি ছেড়ে দেবেন ?

ছেড়ে দেবো কি, ছাড়া হ'য়ে গেইছে আজ দু'মাস হ'ল। ও চাকরি ভদ্দরলোকের পোষায় ? ছ্যা—

পাচু মল্লিক কিছু না ব'লে একটু হাসলে। লোকটা উঠলেই সে বাঁচে। কিন্তু চটাতেও সাহস হয় না। যে ক'দিন লোকটা এখানে থাকবে, সে ক'দিনই কিছু-না-কিছু পয়সা দেবে দোকানে।

বেলা প'ড়ে আসছে। কার্ত্তিকের আসার সময় হ'য়ে গেছে। মনে মনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লে পাচু মল্লিক। বললে, মনে ক'রে এসে যে দেখা ক'রে গেলেন, সে মশাই, এমন ক'জন করে ? ভারী খুশী হ'য়েছি। মাঝে মাঝে দোকানে পায়ের-ধুলো দেবেন দয়া ক'রে।

শ্রীকণ্ঠ হা-হা ক'রে আবার খানিকটা হেসে বললে, মাঝে মাঝে কী বলেন মশায় ? এই শুকনো মাঠে রসের যে কল পেতেছেন, তার টানে না এসে যাবো কোথায় ? একনম্বর মাল মজুত থাকে তো ?

পাচু মল্লিক বিগলিত হাসি হেসে বললে, নিজের মুখে কী আর বলবো বলুন, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। পরখ ক'রেই দেখবেন একবার পাচু মল্লিক কী দেকারের জিনিস খাওয়ায় ?

শ্রীকণ্ঠ আর একটা পান মুখে দিয়ে বললে, বেশ, সেই কথাই রইলো। রায়বাবুদের ইচ্ছে এই সেউলীতে একটা বাজার বসানো। সেটা হ'লে আমিও ধরুন রয়ে গেলাম এখানে। আমাকে আবার খুবই বিশ্বাস করেন কিনা।

পাচু মল্লিকের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো।

তার এত যত্নে লালিত গোপন আকাঙ্ক্ষার ওপর রাঘবাবুরা থাবা বসাতে উন্মুখ! ভাগ্যিস শ্রীকণ্ঠ এসেছিল আজ!

একটু কাষ্ঠহাসির সঙ্গে পান্থ মল্লিক বললে, আমার একবার বেরোতে হবে, দে-মশাই। রাতের দিকে আসবেন, বেশ জমিয়ে গল্পগুজব করা যাবে।

শ্রীকণ্ঠ বললে, তা আসবো বইকি। ইয়ে, মানে যদি কিছু মনে না করেন তো একটা রিকোয়েস্ট করি। এ মাসের এই তিন-চারটে দিন একটু খাতির করতে হবে, মল্লিকবাবু। মাইনেটা পেলেই একেবারে হাতে হাতে মিটিয়ে দেবো, মাইরি বলছি।

পান্থ মল্লিক কয়েক মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলে। তারপর বললে, কিছু ভাবনা নেই আপনার। যখন হাতে আসে দেবেন।

তাহলে রাত্তিরবেলায় আসবো?

আসবেন। একটু গভীর রাতে, অন্য খদ্দেরগুলো বিদেয় হওয়ার পরে।

শ্রীকণ্ঠ এতখানি আশা করেনি। ক্যালক্যাল ক'রে পান্থ মল্লিকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর বললে, কেনা গোলাম ক'রে নিলেন দাদা। পায়ের-ধুলো দেন একবার—

সঙ্গে সঙ্গে নীচু হ'য়ে সে পায়ের-ধুলো নেয় আর কি! তাকে কোনোমতে ঠেকিয়ে পান্থ মল্লিক বললে, কী যে করেন! এটা আর এমন কী উপকার করা হ'ল? চেনা-শোনা লোকের সুবিধে অসুবিধে একটু না দেখলে চলবে কেন, অ্যাঁ?

শ্রীকণ্ঠ খুশীতে ভরপুর হ'য়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে তালা দিয়ে পান্থ মল্লিকও রওনা হ'ল ধর্মদাসের দোকানে। আর গড়িমসি করবার সময় নেই। অজস্র টাকার মালিক কাপনির রায়েরা। খেয়াল হ'লে একবেলার মধ্যে কিনে নিতে পারে পাঁচটা তালুক। তাদের সঙ্গে টাকার জোরে পেরে ওঠা কঠিন। তারা থাবা বসানোর আগেই নিজের আখের গুছিয়ে নিতে হবে। পাকা কথা নিতে হবে ধর্মদাসের মুখ থেকে। তারপর টাকার ব্যবস্থা। জীবনের সব ক'টি খেলায় হার হ'য়েছে। সব খুইয়ে বেউলীর মাটি কামড়ে প'ড়ে এই তার শেষ সাধনা। এতেও যদি হার মানতে হয় তাহ'লে সম্বল আর রইলো কতটুকু?

।.২৫ ।

এই কয়েকদিনে ধর্মদাস যেন অনেকখানি বুড়ো হ'য়ে গেছে। পান্থ মল্লিককে সে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল। মুখে হাসিও ফুটলো না। নিষ্প্রাণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে, আসেন। ভালো আছেন তো?

পান্থ মল্লিক বেঞ্চির উপর ব'সে বললে, এই বাজারে কোন্ লোকটা ভালো আছে গো? তুমি ভালো আছ, বলো?

আমার কথা ছেড়ে দেন। যেমন হোক কেটে যেছে।

মামুলী আলাপের অবসর নেই পান্থ মল্লিকের। এখান থেকে ফিরে গিয়ে আবার দোকান খুলতে হবে। একটু ঝুঁকে প'ড়ে চাপাস্বরে সে বললে, তোমার কথাটা ভেবে দেখলাম, হাজরা। যা বেচতে চাও আমাকেই দিয়ো। ন্যায্য দামের একপয়সা কম পাবে না, জানলে?

ধর্মদাস একটু বিব্রতভাবে বললে, আজ্ঞে, সে কথা তো বটেই। তবে কিনা এখনো মন ঠিক ক'রে উঠতে পারিনি।

ভুরু কুঁচকে পান্থ মল্লিক বললে, সেকি কথা! এই যে সেদিন বললে—

আজ্ঞে বলেছিলাম তা ঠিক। তবে—

উঁচু তি বাজার-দরের কথা ভাবতে সুরু করেছ নাকি আবার?

ছি ছি। জিভ কেটে ধর্মদাস বললে, বেচা করলে চলতি দরেই দেবো, মল্লিকমশায়। আমি ভাবছি অন্য কথা।

কী কথা বলো না।

ধর্মদাস চুপ ক'রে রইলো।

পান্থ মল্লিক মনে মনে ছটফট করছিল। ধর্মদাসের উদাসীন ভাবটুকু সে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলে না। প্রশ্ন করলে, আবার মত পালটালে কেন বাপু?

ধর্মদাস বললে, অনেক পুরানো কথা মনে পড়ে, মল্লিকবাবু। অনেক মেহনতের পয়সায় জমিগুলো কেনা করেছিলাম।

তা-ভেবে আর কী হবে বলো? পঞ্চাশ টাকার খরিদ জমির দাম পাচ্ছ না-হক তিনশো টাকা। তোমার আট-দশ বিঘের হিসেবটা সেই হারে একবার ক'রে ভাখো দিকি। মাটিতে ফেলে রাখা টাকাটা কেমন মুনাফা তুলে দিচ্ছে হাতে!

ধর্মদাস একটু মাথা নেড়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কোনো কথা বললে না।

পান্থ মল্লিক বেঞ্চিখানা এগিয়ে নিয়ে বসলে। ধর্মদাসের হাতে একটা বিড়ি দিয়ে বললে, কষ্ট হয় তা কি আর বুঝিনে, হাজরা। তবে কিনা তুমি যখন বেউলীর বাস তুলে

দেওয়াই ঠিক করেছ তখন তোমার এত শখের জমিজমাগুলো অচেনা লোকের হাতে দিয়ে লাভ কী? বেশ তো, বিঘে পিছু না হয় পাঁচ-দশ টাকা বেশীই নিয়ো। জানলাম, সে-টাকাটা গেল একজন খাঁটি মানুষের ত'বিলে। আমার কথা মনে ক'রে সেই টাকার বদলে কপিলার বিয়েতে একটা কোনো গয়না গড়িয়ে দিয়ো। টাকাটা আমার সার্থক ব্যয় হবে।

ধর্মদাসের চোখ ছলছল ক'রে উঠেছে। পান্নু মল্লিকের শেষ কথাটুকু তার মনের ক্ষতস্থানে যেন নতুন ক'রে একটা আঘাত দিলে। নির্জীব কণ্ঠে সে বললে, একপয়সাও বেশী চাওয়া করবো না, মল্লিকবাবু। বেচাকেনা যদি করি তো আপনাকেই দেবো।

পান্নু মল্লিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। ধর্মদাসের কথায় দাম আছে। তবু নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না সে। ধর্মদাস হাজরাও তো মানুষ। রায়বাবুরা যদি দেড়া দাম কবুল করে? ধর্মদাস হাজরা কি পারবে সে-লোভ সামলাতে?

ধর্মদাস হঠাৎ প্রশ্ন করলে, এত জমি নিয়ে আপনি এখন কী করবেন?

পান্নু মল্লিক চমকে উঠেই সামলে নিলে নিজেকে। বললে, তা কিছু ঠিক করিনি। তবে কিনা এটাও সত্যিকথা হাজরা, দিনে দিনে সেউলীর চেহারা যা হ'য়ে উঠছে, আর কিছুদিন পরে তোমার মতো সাধুসন্ত মানুষ এখানে টিঁকতে পারবে না।

ধর্মদাস অপ্রতিভভাবে বললে, ছি ছি, ওসব কথা ব'লে অপরাধী করবেন না।

পান্নু মল্লিক বললে, যা সত্যি তাই বলেছি। কেমন ক'রে টিঁকবে বলো? ওপারে কাগনি তো পাশে পাশে ঝাঁঝরা হ'য়ে গিয়েছে, এপারেও শুরু হ'ল ব'লে। এপারে বাজার বসবে, পাইকার মহাজন আসবে যাবে, কুলীধাওড়া হবে, হয়তো বা ধরো বেশ্যাপাড়াও বসলো ব'লে। তার ভেতর ওই সোমত্ত মেয়েটাকে নিয়ে ভদ্রভাবে বাস করতে পারবে তুমি, বলো?

ধর্মদাস বিহ্বলভাবে বললে, সেসব কথা আমি ভেবেছি। তাই তো সেউলী ছাড়তে মন ছটফট করছে।

পান্নু মল্লিকের ওষ্ঠে ফুটে উঠলো একটুকরো ধারালো হাসি। টোপ গিলেছে ধর্মদাস হাজরা। লোকটার চোখে মুখে আতঙ্কের রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

ধর্মদাস বললে, নলদময়ন্তীর পালাটা একদিন না বলেছিলেন মল্লিকবাবু? সবই মিলে যাচ্ছে।

যাবেই। এ কি কেউ রুখতে পারে হাজরা? দশবছর পরে এই সেউলীতে এসে চিনতেই পারবে না দেখো।

তাই বটে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধর্মদাস বললে। —আমি চ'লেই যাবো, মল্লিকবাবু। এ নরকে থাকতে পারবো না।

পান্নু মল্লিকও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, তাই করো হাজরা। এ নরকে থাকতে বলবো কোন্ মুখে? আমার তো উপায় নেই। দু'মুঠো ভাতের জন্যে ওই দোকানটা সম্বল। ইচ্ছে করে না, তবু থাকতে হবে। এ যে কী জ্বালা, হাজরা! যতোই পুরুষকার বলো আর কর্মযোগ বলো—নিয়তির কাছে কিছু নয় হে কিছু নয়।

পান্নু মল্লিক উঠে দাঁড়ালে। ধর্মদাস বললে, চা খেয়ে যান। রাত দশটা তক্ তো আর খদ্দেরও পাবেন না।

আবার ব'সে পড়লে পান্নু মল্লিক। উদাস স্বরে বললে, কপালের লেখা! ক্ষত্রিয় সন্তান হ'য়ে অন্ন সংস্থান করতে হবে মদ বেচে।

ধর্মদাস কিছু না ব'লে চা হাঁকতে লাগলো। পান্নু মল্লিক আস্তে আস্তে বললে, আমি মদ বেচি ব'লে আমাকে তুমি ঘেন্না করোনা হাজরা?

ধর্মদাস লজ্জা পেয়ে বললে, ছি ছি, ঘেন্না করতে যাবো ক্যানে?

আমি নিজে কিন্তু করি। পান্নু মল্লিক বললে, ঘেন্না করি নিজেকে। তবে আসল অন্যায়টা কে করেছিলেন জানো? আমার পিতাঠাকুর। আমার জন্মটাই হ'ল অন্যায় জন্ম।

ধর্মদাস বিব্রতভাবে বললে, আজ্ঞে, ও-কথা বলতে নেই। কতবড়ো নামী বংশের সন্তান আপনি।

নামী বংশ! হ্যাঁ, এককালে ছিল বটে। আমার পূর্বপুরুষ জ্ঞান-শিক্ষের মাতাল করেছিল গঙ্গার পশ্চিম কূল। আর আমি শালা মদ বেচে মাতাল করছি তোমাদের পূর্বকূল। কী বলো?

ধর্মদাস এত বেশী বিব্রত বোধ করছিল যে কিছুই বলতে পারলে না। পান্নু মল্লিক চায়ের গেলাসটা হাতে নিয়ে একটু হেসে বললে, বিধাতাপুরুষের বিচারটা একবার ভাখো হাজরা। আমার দোষ কী বলো?

দায়সারা ভাবে ধর্মদাস বললে, তা বটে।

পান্নু মল্লিক চা-খেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে চাপাস্বরে বললে, টাকাকড়ির দরকার থাকে তো বলো কিছু অগ্রিম দিয়ে যাই।

আজ্ঞে, যা নেবার সে মনস্থির করবার পরেই চাওয়া করবো।

দেখো, আবার অন্য কাউকে যেন দিয়ে ব'সো না।

ধর্মদাস একটু রুক্ষগলায় বললে, কথায় খেলাপি আমি করি না মল্লিকবাবু।

পাহু মল্লিক তাড়াতাড়ি আবহাওয়া হালকা করবার জন্যে একগাল হেসে বললে, নাও, অমনি চ'টে গেলে। তোমার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করাও দায়।

ধর্মদাস ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। বিনীতভাবে বললে, আজ্ঞে, মনমেজাজ ভালো নেই কিনা। অপরাধ নিবেননি দয়া ক'রে।

পাহু মল্লিক হাসতে হাসতে বললে, তোমার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক নাকি, অ্যাঁ? কই, মোহিনী জর্দা দিয়ে একটা পান ছাড়ো দিকি।

ধর্মদাস পান দিলে। পাহু মল্লিক পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

বিকেলের পড়ন্ত আলো অনেকটা নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছে। তবু আগুনের হল্‌কা যেন গা পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হু-হু ক'রে গরম বাতাস উড়ে আসছে ভ্রমরার উপর দিয়ে। তাপ সইতে না পেরে মাটি যেন ঝল্‌সে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। নিজের জন্যে একটু চা তৈরি ক'রে এপাশে বেঞ্চের উপর এসে বসলে ধর্মদাস।

ভ্রমরার পুল শেষ হবার পথে। মাটি ঢেলে ঢেলে সড়কটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুলের দিকে। পাহু মল্লিক ঠিকই বলেছে। দশ বছর তো দূরের কথা। দু'বছর পরেই হয়তো এ-দেউলী আর এমন থাকবে না। ওপারের মাটিতে জমেছে কয়লার কালো আর মনের কালো। এপারের মাটি বিষিয়ে উঠছে শুধু মদের বিষে আর মনের কালিতে। গভীর রাতে গোঁ গোঁ ক'রে ছুটে চ'লে যাবে কালো-কারবারের লরী। টাকার ছিনিমিনি খেলা চলবে দেউলীতে। পাহু মল্লিক মদের দোকান বসিয়েছে। নষ্ট-মেয়েরা এসে বাকীটুকু পূরণ করবে। জমির জন্যে পাহু মল্লিকের এত গরজ। তার মনে কী আছে কে জানে। হয়তো নরকের বাকীটুকু সে-ই এনে প্রতিষ্ঠা করবে দেউলীর মাটিতে।…

হাঁপিয়ে উঠলো ধর্মদাস। আর ভাবতে গেলে ঝিম্ ধ'রে যায় মাথায়। গেলাসটা এতক্ষণ বেঞ্চের উপরেই ছিল। সেটাকে ধুয়ে রাখবার জন্যে উঠতেই তার চমক ভাঙলো। সন্ধ্যে কখন হ'য়ে এসেছে টেরও পায়নি।

তাড়াতাড়ি উনুনে কিছু কয়লা ছড়িয়ে দিয়ে সাজ-সরঞ্জামগুলো নিয়ে বসলে সে। আবার চিন্তাগুলো এসে চেপে বসলো মাথায়। কালের হাওয়া তো কেউ ঠেকাতে পারবে না। পালিয়ে গিয়ে কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে? ক্ষতি কি এখানে থাকতে?

রাত্রির অন্ধকার আবার ডানা মেলে নেমে এলো দেউলীতে। সেই ক্লান্তিকর একটানা রাত। কাগনি ইয়ার্ডের আলো যেমন জ্বলে তেমনিই জ্বলে উঠলো।

দোকানে ব'সে কেমন এক অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে ওপারের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল ধর্মদাস। হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল তার। একটা ছায়ামূর্তি আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে ভ্রমরার খাতের দিকে। ধর্মদাস হাঁক দিলে, কে যায়?

ছায়ামূর্তি থেমে গেল। জবাব এলো, আমি পদ্মিনী।

ধর্মদাস ঠিকই অনুমান করেছিল। পদ্মিনী আজকাল লুকিয়ে লুকিয়ে ওপারে যায়। দোকানের কাছে আসে না।

ধর্মদাসের ডাকে সাড়া দিয়েই পদ্মিনী সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। কী করবে তা ভেবে নেবার আগেই দোকান থেকে নেমে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসতে লাগলো ধর্মদাস। পদ্মিনী মুখ নীচু করলে। ধর্মদাস এসে দাঁড়ালো একেবারে তার মুখোমুখি। বললে, কোথায় যেছিস রে?

পদ্মিনী চুপ করে রইলো।

ধর্মদাস আবার বলে, নেশাটা ছাড়তে পেলিনে তুই?

পদ্মিনী চাপা কঠিন স্বরে বললে, খেতে দিবে কে? তুমি দিবে বলো?

যারা ফুর্তি করে তোকে নিয়ে, তারা কেউ তোকে মরণকাল তক্ খেতে দেবে?

এখন তো দিচ্ছে।

একটা খারাপ রোগ ভোগ হ'লে খোঁজ করবে একবার?

ক্যানে করবে? দায় কি তাদের?

তবু ক্যানে তুই যেছিস?

ক্যানে যাই জানো না? বার বার ক্যানে কানের কাছে ক্যাচ-ক্যাচ করো তুমি? খেতে দিতে পারো?

পারি। ক্যানে পারবো না? অদ্ভুত এক স্বরে বললে ধর্মদাস। সে স্বর পদ্মিনী কোনোদিন শোনেনি।

পদ্মিনী অবাক্ হ'য়ে বললে, তুমি জেদ রাখতে পেরে বসিয়ে খাওয়াতে চেয়েছো?

বসিয়ে খাওয়াবো ক্যানে? আমি একটা মানুষ নয়? সাধ-আহ্লাদ কোনোকালে ছিল না আমার?

পদ্মিনী অস্ফুট কণ্ঠে বললে, কী বলছো তুমি দাদা ?

উঁ ? বলছি মনের কথা। এতোকাল অনেক সাধ-আহ্লাদ ছেড়ে দিয়েছি। কার লেগে এত করলাম বল্ ?

পদ্মিনী সব ভুলে গেল। ধর্মদাসের একখানা হাত ধ'রে বললে, দাদা, দোকানকে যাও। তোমার মন-মেজাজ ভালো নেই। পায়ে পড়ি, তোমার ঘরকে যেয়ে একটু শুয়ে থাকো গা।

কাঠের পুতুলের মতো নির্বাক ধর্মদাস। পায়ের নীচে মাটি কাঁপছে। অসংখ্য ভীমরুল যেন এসে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে তার সমস্ত দেহে। অসহ্য যন্ত্রণা। নিজের কথাগুলো যেন গলন্ত সীসের মতো প'ড়ে অবশ ক'রে দিয়েছে শ্রবণেন্দ্রিয়। মাথার ভেতর চলছে একটা প্রলয়।

পদ্মিনী বললে, ঘরকে যাও দাদা!

যেছি। অবশ গলায় ধর্মদাস বললে। —লোভের পাপ বড়ো সাংঘাতিক পাপ রে পদ্মিনী! বড়ো কুটিল তার স্বভাব।

পদ্মিনী বেদনার্ত স্বরে বললে, কী বলবো দাদা, সারা দেউলীকে একটা মানুষ এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। এ নেশায় তুমি ভুলোনি দাদা!

ধর্মদাস বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইলো পদ্মিনীর মুখের দিকে। নির্জীব স্বরে বললে, কী জানি রে পদ্মিনী, ক্যানে এমন মতি হ'ল! তবু ভাখ্, এত লোকে কতভাবে পয়সা কুড়াইছে, ফূর্তি কুড়াইছে, আমি তো কিছু করিনি। এত দুঃখু স'য়ে কষ্ট স'য়ে ভালো হ'য়ে থাকলাম ক্যানে? দামটা কী পেলাম!

পদ্মিনীর হাতের ওপর টপ্‌টপ্ ক'রে দু'ফোঁটা জল পড়লো। অবাক হ'য়ে পদ্মিনী বললে, দাদা, কাঁদছো?

না।— তাড়াতাড়ি হাতের পাতায় চোখ মুছে নিয়ে ধর্মদাস বললে, আমি দেউলী ছেড়ে চলে যাবো রে পদ্মিনী! এখানে থাকলে মরে যাবো—

পদ্মিনী বললে, তাই যাও দাদা। সেই ভালো।

ধর্মদাস আস্তে আস্তে ফিরে এলো দোকানে। পদ্মিনী এলো তার পিছু পিছু। সেখান থেকেই কপিলাকে ডাক দিলে।

কপিলা এসে দাঁড়াতেই পদ্মিনী বললে, তোর বাপকে ঘরকে নিয়ে শুইয়ে দে, কপিলা। মাথা ঘুরে প'ড়ে গেইছিলো।

কপিলা কাঁদো-কাঁদো মুখে এসে ঝুঁকে পড়লো ধর্মদাসের সামনে। ম্লান একটু হেসে ধর্মদাস বললে, কিছুই হয়নি রে, তুই যা।

কপিলা বললে, তা হোক, তুমি ঘরকে চলো বাবা!

বলছি তো কিছু হয়নি। তুই যাবি কিনা বল্—

কপিলার চোখ টলমল ক'রে উঠলো। বললে, তবু তুমি ঘরকে যাবে না, বাবা!

না।

পদ্মিনী গতিক দেখে বললে, দাও, এখন বাপ-বেটীতে বোঝাপড়া করো। আমি চললাম—

পদ্মিনী সত্যিই চ'লে গেল। ধর্মদাস ব'সে রইলো পাথরের মূর্তির মতো।

কপিলা উদ্গত কান্নার ঢেউয়ে ভেঙে-পড়া গলায় বললে, ক্যানে তুমি আমার সঙ্গে এমন করো বাবা? কী করেছি আমি?

ধর্মদাস শুকনো চোখ-দুটি তুলে তাকালে কপিলার দিকে। আস্তে আস্তে বললে, তুই আর কী করবি! করেছে আমার অদেষ্ট। দেউলীর জমিজমা দোকানপাট সব বেচা ক'রে দেবো, কপিলা। এখেনে আর থাকতে পারবো না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কথা শেষ করলে ধর্মদাস। কপিলা উদ্গত কান্নার বেগ কোনোমতে চেপে বাড়ীর ভেতর ছুটে চলে গেল।

ধর্মদাস তখন থেকে ব'সে আছে। কপিলা সেই কখন বাড়ীর ভিতর চ'লে গেছে, আর আসেনি। হয়তো মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছে কাঁদতে কাঁদতে।

রাত বেড়ে চলেছে।

ওপারে কাশনির কুলির ব্যারাক। তার হৃৎস্পন্দনের শব্দ শোনা যায় বাতাসে কান পাতলে। দাক্ষায়ণীর যৌবন-উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছে শতধারায়।

দোকান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো ধর্মদাস। কপালের শিরাগুলো দপ্‌দপ্ করছে। মাথার ভিতর দুঃসহ যন্ত্রণা। সারা দেহে অপরিসীম ক্লান্তি।

অবশ পায়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ধর্মদাস। সামনে দ্বারকার শুকনো খাত। দিনের বেলা প্রখর আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দেয় বালির ছোট ছোট ঢেউগুলো। এখন মুখ লুকিয়েছে অন্ধকারে। উপরে কালো আকাশ। মিটমিট ক'রে জ্বলছে আকাশ-ভরা তারা। তারার-গড়া বৃশ্চিকের দেহটা দপ্‌দপ্ ক'রে জ্বলছে অগ্নিকোণের আকাশে।

বোবা আকাশের গায়ে মারণ-বিষের হুল ফুটিয়ে দিয়েছে তারার বৃশ্চিক। পৃথিবীতেও সে বিষ যেন ঝরে পড়েছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে কৃষ্ণা-রাতের অঙ্গ বেয়ে। কালো আর কালো। বিষের তেজে আকাশ কালো। বিষের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী।

আর এক বিষ দহন ক'রে দিয়েছে ধর্মদাসের সমস্ত চেতনা। লালসার গোপন সাপ অতর্কিতে বেরিয়ে এসেছে ঝাঁপি থেকে। চক্র তুলে ছোবল দিয়েছে ধর্মদাস হাজরার মাথায়।

অস্থিরভাবে ধর্মদাস হেঁটে চলল অজয়ার পাড় ধ'রে। দোকান থেকে দক্ষিণ মুখে। অনেক বছর আগে কপিলার মাকে চিতায় তুলে দিয়ে কপিলাকে বুকে তুলে নিয়েছিল ধর্মদাস। কোনো লোভ, কোনো প্রলোভন তার মনকে বিচলিত করেনি। একমাত্র স্বপ্ন কপিলাকে মানুষ ক'রে তোলা। আর এক সাধ। অকলঙ্ক পবিত্র পরিচ্ছন্ন একটি জীবন। এতদিনের সেই জীবনে আজ কালির দাগ পড়লো। সামনে অজয়া। শুকনো নীরস বালির চিত্ত মেলে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বর্ষার আকুল প্রত্যাশায়। বর্ষার ঢল নামতে এখনো দেরি। মেঘলা-বর্ষার পাগল স্রোত তীব্র গতিতে ব'য়ে যাবে অজয়ার এই বিশুষ্ক খাত দিয়ে।

চমকে উঠলো ধর্মদাস। সামনেই দেউলীর শ্মশান। কপিলার মাকে যেখানে চিতায় তোলা হ'য়েছিল সে-জায়গাটা চলে গেছে অজয়ার-গর্ভে। বালি আর বালি। অজয়ার বুকে স্রোত থাকলে আজ কী হ'ত কে জানে। শিউরে উঠলো ধর্মদাস। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। যম যেন আগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি সে আবার বাড়ীর পথে রওনা দিলে। এই অন্ধকার, এই শ্মশান, এই নিঃসঙ্গ দুর্বল মুহূর্ত বারবারই যেন একটা অতল শূন্যতার দিকে ইশারা করছে!

হন্‌হন্‌ ক'রে হাঁটতে লাগলো ধর্মদাস। আর দেরি করলে হয়তো সে-ইশারা এড়ানো যাবে না।

আচ্ছন্ন যন্ত্রচালিতের মতো দোকানে ফিরেই বেঞ্চির উপর ব'সে পড়লো ধর্মদাস। অবশ, অসাড় দেহটার মধ্যে চলবার মতো আর শক্তি ছিল না।

কতক্ষণ কেটেছে হুঁশ নেই। গ্যাসের আলোটা নিস্তেজ হ'য়ে এসেছে। একঝলক-বাতাস ব'য়ে এলো অজয়ার উপর দিয়ে। অনেকক্ষণ পরে একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে ধর্মদাস। তারপর দোকানের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

বাড়ীর মধ্যে কেমন একটা থমথমে নীরবতা। রোজই এ নীরবতা থাকে। কিন্তু আজ যেন তার রূপ আলাদা। জমাট এই স্তব্ধতা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ধর্মদাসকে। কাসনির পাইলট-ইঞ্জিনের তীব্র আর্তনাদও ভাঙতে পারেনি আজকের এই স্তব্ধতাকে।

ধর্মদাস আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালে দরজার সামনে। অপরাধীর মতো তাকিয়ে রইলো কপিলার দিকে। ভাত বেড়ে রেখে তার পাশেই মাটির উপর ঘুমিয়ে পড়েছে কপিলা। কেরোসিনের ডেমিটা মিটমিট ক'রে জ্বলছে। তার ম্লান আলোর রশ্মিটুকু কাঁপছে কপিলার মুখের উপর। কত রোগা হ'য়ে গেছে মেয়েটা! ধর্মদাসের বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আকুলি-বিকুলি পাক খেতে লাগলো। মেয়েকে নিজের কাছ থেকে সে কত দূরে সরিয়ে দিয়েছে!

ধর্মদাস আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। কপিলার কপালের উপর হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাক দিলে, কপিলা, কপিলা রে—

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলে কপিলা। সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে একবার ধর্মদাসের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালে।

ধর্মদাস অপরাধীর মতো বললে, অনেক রাত হ'য়ে গেইছে। তুই খেয়ে নিয়েছিস মা?

কপিলা মাথা নেড়ে জানালে, না।

ধর্মদাস কোনোরকমে হাতে মুখে একটু জল দিয়ে এসে খেতে বসলে। কপিলা ব'সে রইলো চুপ ক'রে।

খেতে খেতে ধর্মদাস একবার কপিলার দিকে তাকিয়ে তারপর যেন আপনমনেই বললে, এত রাত হ'য়ে গেইছে বুঝতে পারিনি রে, মা!

কপিলা কিছুই বললে না। ধর্মদাস একটু পরে আবার বললে, তোর মায়ের কথা মনে পড়ে কপিলা?

কপিলার চোখ-দুটি মুহূর্তের মধ্যে ছলছল ক'রে উঠলো। হাঁটুতে মুখ ঢেকে অস্ফুটস্বরে শুধু বললে, পড়ে।

ধর্মদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, তোর মাকে যেখানে রেখে এসেছিলাম, সেখানে গেইছিলাম আজ।

কপিলা চোখ মুছে অবাক দৃষ্টিতে তাকালে ধর্মদাসের দিকে। ধর্মদাস তা লক্ষ্য করেনি। আপনমনেই সে বলতে লাগলো, বড়ো ভালো সময়ে চলে গেইছে সে-মানুষটা। অনেক পুণ্যির বল না থাকলে কি অমন যাওয়া কেউ যেতে পারে। তোর মা বড়ো ভালোমানুষ ছিল রে, কপিলা।

কপিলা ছলছল চোখ ঘুরিয়ে নিলে অন্যদিকে। খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের একটুখানি ফালি দেখা যাচ্ছে। পেঁপেগাছটার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কৃষ্ণা-নবমীর পাণ্ডুর চাঁদ।

ধর্মদাস খেয়ে উঠে চলে গেল। এঁটো বাসনগুলো সরিয়ে রেখে কপিলা আস্তে আস্তে চলে গেল নিজের বিছানার দিকে। ধর্মদাস ঘরে ঢুকে দেখলে কপিলা শুয়ে পড়েছে। সস্নেহে সে বললে, তুই ভাত খেলিনে মা?

কপিলা মৃদুস্বরে বললে, খিদে নেই।

ধর্মদাস জোর করতে পারলে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে শুতে গেল।

রাত আর খুব বেশী বাকী নেই। কান্নির শব্দও আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। প্রথম দুই প্রহরের উল্লাস-মাতনের পর কান্নিও হয়তো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। কাছেই কোথায় যেন ডেকে উঠলো একটা পাপিয়া। ধর্মদাস ক্লান্ত, চোখের পাতা বুজে চুপ ক'রে শুয়ে রইলো। সেউলীর মাটি উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। নির্লোভ মনে লালসার কালি লেগেছে। পাচু মল্লিকের কথা মনে পড়েছে। নলরাজার উপাখ্যান। বিষে বিষে নীল হ'য়ে গেছে মাটি, মানুষ, মন। বিষের বাতাস ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিকে।…

ঘুম নেই ধর্মদাস হাজরার চোখে। সেউলীর নিশ্চিন্ত ঘুমের দিনও তো ফুরিয়ে এসেছে। [illegible] পুল শেষ হ'য়ে এলো প্রায়। সেউলীর চোখে শেষপ্রহরের নিশ্চিন্ত ঘুমটুকুও টুটে এসেছে। আর দেরি নেই।

চাঁদের আলোর একফালি এসে পড়েছে বিছানার উপর। ধর্মদাস কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জানালার দিকে।

রাত্রির বিভীষিকা কেটে আবার এলো একটা দিন। [illegible] প্রত্যূষের সূর্যালোকে ঝলমল ক'রে উঠলো পৃথিবী। সেউলী এতক্ষণে আবার কর্মমুখর হ'য়ে উঠলো।

ধর্মদাস বেরিয়ে পড়লো পাচু মল্লিকের দোকানের দিকে। হিসাবপত্র সব শেষ হ'য়ে গেছে। পাচু মল্লিকের কাছে সব বেচে-কিনে সেউলী ছাড়বে সে।

পাচু মল্লিক সবে ঘুম থেকে উঠে একটু চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করছিল। বাড়ী থেকে চা ক'রে নিয়ে এসেছে কার্তিক। ধর্মদাসকে দেখেই পাচু মল্লিকের বুকের ভেতরটা গোপন উল্লাসে কেঁপে উঠলো। সে-ভাবটুকু যথাসম্ভব চেপে রেখে পাচু মল্লিক বললে, এত সকালে যে?

ধর্মদাস বললে, কাল রেতে ভেবে-চিন্তে দেখলাম মল্লিকমশায়—আর থাকবো না সেউলীতে।

কার্তিক অবাক্ হ'য়ে প্রশ্ন করলে, সে কি গো?

পাচু মল্লিক বিব্রতভাবে কার্তিককে বললে, আরে বাপু, বুড়োমানুষ তো। রাগ অভিমান হয়তো কিছু হ'য়েছে। ওটা একটা কথার কথা আর কি। তুই যা দিকি। ঘণ্টা দুয়েক পরে একবার আসিস।

কার্তিক চলে গেল। হাঁপ ছেড়ে পাচু মল্লিক বললে, সব কথা সব লোকের সামনে হওয়া ভালো নয়, কী বলো?

ধর্মদাস সে-সম্বন্ধে নিস্পৃহ থেকে বললে, জমিজমা বাড়ীঘর দোকান—সব আপনি নিতে পারবেন?

তা আর পারবো না কেন?

নগদ দাম মিটিয়ে দেবেন তো সব?

দেবো। কিন্তু তুমি মন ঠিক করেছ তো?

আজ্ঞে, তা করেছি।

পাচু মল্লিক উল্লাস আর চেপে রাখতে পারছে না। ঝুঁকে পড়ে বললে, কবে লেখাপড়া হবে বলো?

এই মাসে। শুকনো গলায় ধর্মদাস বললে, দোকান আর বাড়ীটা দিয়ে যাবো একেবারে চলে যাওয়ার আগে।

আহা, অত ভাবছো কেন? তোমার বাড়ী তোমার ঘর—বেচা ক'রেও তোমার যতদিন খুশি থাকো না বাপু।

আজ্ঞে, তা পারবো না। মেয়ের বন্দোবস্তটা ক'রে এলেই তবে ওই শেষ মাটিটুকু তুলে দেবো আপনার হাতে।

ছলছল ক'রে উঠলো ধর্মদাসের চোখ। পাচু মল্লিক বিব্রতভাবে বললে, এই ভাখো! মায়া এখনো কাটাতে পারোনি, অ্যাঁ?

চোখ মুছে নিলে ধর্মদাস। ধরা গলায় বললে, নিজের মেহনতে একটু একটু ক'রে সবটুকু করেছি, মল্লিকমশায়। তবু আর এখানে থাকতে সাধ নেই আমার।

পাচু মল্লিক আর কথা বাড়ালে না। ধর্মদাস উঠে পড়লে। দোকানের উনুনে এখনো আঁচ দেওয়া হয়নি।

ধর্মদাস চ'লে যাবার পর একটা একটা ক'রে পাঁচটা সিগারেট টেনে শেষ ক'রে ফেললে পাচু মল্লিক। তারপর দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লে কার্তিকের বাড়ীর দিকে।

কার্তিক তখনো বাড়ীতে ফেরেনি। পাচু মল্লিক

Whitex

হোয়াইটেক্সের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মুখশ্রী চিরস্থায়িভাবে আরো উজ্জ্বল আরো সুন্দর হয়ে উঠবে

মনে মনে খুশী হ'য়ে একেবারে দাওয়ায় উঠে গেল। রাণী কাছেই ছিল। বললে, আপনি এখন?

আর বলো কেন? কাত্তিকের সঙ্গে দরকারী কথা ছিল। ভুল ক'রে চ'লে আসতে বলেছি—তাই ভাবলাম দেখাটা ক'রেই আসি। আর তা ছাড়া—সকালবেলা তোমার হাতের চা-টুকু আজ যেন বড়ো ভালো লাগলো। তাই ধীর একটু চায়ের লোভও আছে, হেঁ হেঁ।

রাণী বললে, বসেন, চা ক'রে দিচ্ছি।

পাচু মল্লিক আর একটু হেসে বললে, একটু কড়া হয় যেন, রাণু।

রাণী একটু চমকে তাকালে পাচু মল্লিকের দিকে। মুচকি হেসে বললে, আমার নাম রাণী।

পাচু মল্লিক গলা খাটো ক'রে বললে, জানি। তবে কিনা আমার আবার ওই রাণু নামটিই বেশ পছন্দ হয়, বুঝলে?

রাণী একটু হেসে চ'লে গেল। একটু পরেই এক গেলাস চা এনে পাচু মল্লিকের সামনে রেখে বললে, ভাখেন, কড়া হ'য়েছে কিনা।

যা কড়া মেয়ে তুমি! তোমার চা আবার পরখ ক'রে বলতে হবে নাকি গো?

তাই নাকি? মুচকি হেসে রাণী বললে।

তা ছাড়া কি? কাত্তিকের দাদাবাবুকে দেখছি তো। সে আবার রায়বাবুদের চাকরি নিয়ে এই বেউলীতেই রয়েছে জানো তা?

জানি।

দেখা হয় না তোমার সঙ্গে?

রাণী চুপ ক'রে রইলো। তার মুখখানা কালো হ'য়ে গেছে।

পাচু মল্লিক আড়চোখে রাণীর দিকে একবার তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, যা দেখছি, তাতে আর পাপপুণ্যি ব'লে তারতম্য করবার উপায় থাকছে না, রাণু। এখনকার জগৎ যা হ'য়েছে, তাতে তোমার মতো ভালো মেয়ের কপালে ওই দুঃখভোগই সার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে পাচু মল্লিক। তারপর বললে, তোমার কথা ভাবলে মাঝে মাঝে মনটা বড়ো দ'মে যায়।

রাণী মৃদুস্বরে বললে, কাত্তিকের দাদাবাবু আপনার দোকানকে জানে?

জানে বইকি। সেদিন কাত্তিকের মুখোমুখি প'ড়ে যাওয়ার পর থেকে একটু রাত ক'রে আসে। মানে, কাত্তিক চ'লে আসার পর।

রোজই?

হ্যাঁ, তা প্রায় রোজই।

পান্থ মল্লিক অস্পষ্ট স্বরে বললে কথাগুলো। একের পর এক মিথ্যাকথার রাশি। শ্রীকণ্ঠ গভীর রাতেও রোজ আসেনা আজকাল। পারলে, দুপুরে আসে। নয়তো দু'এক দিন গভীর রাতে। তাও খুব কম।

রাণী আর কোনো প্রশ্ন করলে না। চায়ের গেলাস একেবারে উপুড় ক'রে শেষ চা-টুকু খেয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালে পান্থ মল্লিক। খসতোক্তির ভঙ্গীতে বললে, এমন চা কতদিন পরে খেলাম!

রাণী ঠোঁট টিপে একটু হেসে বললে, বৌদিকে আনা ক'রে নিলেই হয়!

বৌদি! বিড়বিড় ক'রে শব্দটা উচ্চারণ করলে পান্থ মল্লিক। মৃদু হেসে বললে, সে অনেক কথা, রাণু। সময় সুযোগ পেলে একদিন ব'লবো তোমাকে।

রাণী বললে, আচ্ছা।

শুনবে তো তুমি?

শুনবো।

পান্থ মল্লিকের চোখ-দুটো চকচক ক'রে উঠলো। তারই ভেতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছিলো এক কুৎসিত ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। সে-চাউনি রাণী চেনে। তবু সে স'রে গেল না। অবজ্ঞার চিহ্নও কিছু ফুটলো না চোখে মুখে। পান্থ মল্লিকের দিকে সহজভাবে তাকিয়ে বললে, কাত্তিকের সঙ্গে কী যেন কথা ছিল বলছিলেন?

ও, হ্যাঁ। পান্থ মল্লিক সামলে নিয়ে বললে, হ্যাঁ, মানে তা নিয়ে তুমি চিন্তা ক'রো না। আমি যখন হোক বলা-কওয়া সেরে নেবো। তা'হলে চলি, কেমন?

রাণী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। পান্থ মল্লিক ধীরে ধীরে উঠোন পেরিয়ে বড়োরাস্তায় পা দিলে।

বেলা প্রায় সাড়ে ন'টা। এরই মধ্যে রোদের তেজ অনেকখানি বেড়ে উঠেছে। তিনমাথাটার ওপার দাঁড়ালে পান্থ মল্লিক। নজর আটকে গেল একটু দূরে এক জায়গায়। যেখানে কলগ্রাম হতের মাটি-কাটা মজুরেরা নতুন রাস্তায় মাটি ঢালছে।

অবাক হ'য়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো পান্থ মল্লিক। পদ্মিনী আছে কামিনের দলে। ঝুড়ি-ভর্তি মাটি মাথায় ক'রে এনে ঢেলে দিচ্ছে রাস্তায়। শ্রীকণ্ঠ তদারক করছে কুলী-কামিনদের কাজ। একবার পিছন ফিরে তাকালে পান্থ মল্লিক। রাণীদের দাওয়া থেকে দেখা যায় জায়গাটা। কিন্তু রাণী নেই দাওয়ায় কিম্বা উঠোনে।

সেখানে দাঁড়িয়েই কী যেন ভাবলে পান্থ মল্লিক। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো আ'লের পথ ধ'রে।

শ্রীকণ্ঠ খুব মনোযোগের সঙ্গে কাজ তদারক করছিল। পান্থ মল্লিককে দেখেই একগাল হেসে বললে, আসেন আসেন। আপনাদের সড়কটা কেমন তৈরি ক'রে দিচ্ছি তা দ্যাখেন একবার।

পদ্মিনীও তখন সবে এক ঝুড়ি মাটি নিয়ে উপরে উঠেছে। পান্থ মল্লিককে দেখে ফিক্ ক'রে একটু হাসলে।

পান্থ মল্লিক বললে, তুই আবার এ কাজে লাগলি কবে রে?

পদ্মিনী কিছু বললে না। শ্রীকণ্ঠ ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে, চেনেন ওকে, আঁা? খুব নাম-ডাক আছে নাকি শুনেছি?

পান্থ মল্লিক কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, হ্যাঁ, মেয়েটাকে সবাই চেনে বটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে আমার একটু কথা ছিল, শ্রীকণ্ঠবাবু।

শ্রীকণ্ঠের গলা শুকিয়ে গেল। অনেক টাকা বাকী পড়েছে। আমতা আমতা ক'রে বললে, তা বলেন শ্যানে।

পান্থ মল্লিক চাপাস্বরে বললে; কিছু টাকা-পয়সা না হ'লে যে আর চলে না। মাইনে পাননি এখনো?

শ্রীকণ্ঠ ঢোঁক গিলে বললে, আজ্ঞে না। হাতে টাকা এলে কি আর আপনারে কষ্ট ক'রে আসতে হ'ত? মাইনেটা না পাওয়ায় এমন অসুবিধে হেছে যে—

বাধা দিয়ে পান্থ মল্লিক বললে, আহা-হা, সেটা কি আমি বুঝিনে? তবে কিনা সরকারী লাইসেন্স পাওয়া দোকান, ক্যাশের গোলমাল হবার জো নেই। ট্যাক থেকে দিয়ে হিসেবটা আমি অবিশ্যি ঠিক রেখে দিয়েছি।

শ্রীকণ্ঠ এদিক ওদিক তাকিয়ে আর একবার ঢোঁক গিলে বললে, আপনার দয়ার কথা আমি ভুলতে পারবো না, মল্লিকমশায়। আর দু'চারটে দিন দয়া ক'রে একটু চালিয়ে নেন, তারপরই টাকা হাতে পেলে পয়লা আপনার দেনা মিটাতে ছোটা করবো যাইয়া।

পান্নু মল্লিক নিরুপায়ের ভঙ্গীতে বললে, আচ্ছা, তাই-ই হবে। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে তো বটে।

কৃতার্থ হ'য়ে শ্রীকণ্ঠ একটা সিগারেট এগিয়ে দিলে পান্নু মল্লিককে। সিগারেট ধরিয়ে পান্নু মল্লিক বললে, একটা কথা। এখন দু'চারদিন আর নিত্তি-বাটে দোকানে যাবেন না, মশাই। খবর পেলাম, কে নাকি আবার রিপোর্ট ক'রে ব'সে আছে। ঝামেলা আর কাকে বলে!

শ্রীকণ্ঠ অনিচ্ছাসত্বে বললে, আচ্ছা। দোকানটা না বাঁচলে তো সবই গেল।

আপনাদের আর কী? আমার দোকান গেল তো কাগনিতে ঘর পাবেন। যাবে শুধু আমার। বললে পান্নু মল্লিক।

শ্রীকণ্ঠ মাথা নেড়ে সায় দিলে। পান্নু মল্লিক একটু হেসে বললে, বিপদ কেটে গেলে আমি আবার বলবো।

পদ্মিনী একটু দূরেই ছিল। শ্রীকণ্ঠের কাছ থেকে একটু দূরে আসতেই সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে পান্নু মল্লিকের সামনে। মুচকি হেসে বললে, ও মানুষটার সঙ্গে আবার তোমার এত পীরিতি ক্যানে গো বাদবাবু?

থতমত খেয়ে পান্নু মল্লিক বললে, আমার খদ্দের। পাওনা আছে, তাগিদ দিয়ে গেলাম। পীরিতি আবার কিসের রে?

ফিক্‌ ক'রে একটু হেসে পদ্মিনী বললে, কী জানি বাপু। আমার হবের মানুষটাকেও তো খুব পেয়ার পীরিতি করা হ'ত। কেতো ছোঁড়াকে দোকান করতে ট্যাকা দেওয়া হয়েছে শুনি।

তাতে কী হ'য়েছে?

কিছু হয়নি বটে। তবে তোমার নজর আমার চেয়ে কে আর ভালো চেনে বলো?

পান্নু মল্লিক থতমত খেয়ে বললে, এখন দু'পয়সার মুখ কেমন ক'রে দেখবো তাই ভেবেই সময় কাটে, ওসব দিন কি আর আছে রে? নাকি বয়েস আছে?

ঘাড় বেঁকিয়ে মুচকি হেসে পদ্মিনী বললে, তাই নাকি গো?

নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারিসনে? একটা মানুষ কি চিরকাল একই রকম থাকে রে? তা তুই আর যাস না কেন?

পদ্মিনী, বললে, ভালো লাগে না।

ও-পার যাওয়া বন্ধ করেছিস নাকি?

না। বন্ধ করবো ক্যানে!

তাহ'লে দু'চার বোতল ক'রে আবার নিয়ে যাস, কেমন?

মাপ করো বাবু। অনেক মেয়ে আছে সেউলীতে। আর যাকে হয় দিয়ো তোমার কাজ।

পান্নু মল্লিকের কাছে সব-কিছু কেমন জট পাকিয়ে যেতে লাগলো। আশ্চর্য হ'য়ে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে সে বললে, তুই অবাক্‌ করলি পদ্মিনী।

পদ্মিনী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, তুমি কি অবাক্‌ হবার মানুষ বাদবাবু? ঢং ক'রে আবার অবাক্‌ হ'চ্ছ ক্যানে?

তুইও যে ঢং করতে শুরু করলি!

তা হবে। ব'লেই পদ্মিনী মাটির ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে তরতর ক'রে চ'লে গেল নিজের কাজে।

পান্নু মল্লিক হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

কেমন একটা মৃদু গন্ধ এসে লাগছে নাকে। ভিজে-ভিজে নরম মাটির মিষ্টি গন্ধ। সেউলীর নীরস কঠিন মাটির বুক চিরে ফেলেছে কুলীরা। তাল তাল নরম মাটি কেটে তুলছে। সরস নরম মাটি। নির্জীব নিষ্প্রাণ সেউলীর বুকে নতুন জীবনের ইঙ্গিত। ক্রমবায় পুল আর সেউলী-কাটোয়া রোডের ধমনী দিয়ে নতুন রক্তের প্রবাহ আসিবে সেউলীর নির্জীব দেহে। তারপর একে একে কুলীধাওড়া, বাজার, দোকান, মানুষ—নতুন ছবি আঁকা হবে সেউলীর পটে। পুরনো ছবির বিবর্ণ রেখাগুলো মুছে এসেছে প্রায়। কল্পনার দেখা নতুন ছবিখানা পান্নু মল্লিকের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে একাকার হ'য়ে আছে। সেউলীর মাটিতে পত্তন হবে নতুন গঞ্জ-বাজার। একে একে আসবে বিচিত্র মানুষের দল। কোনোমতে শুধু বেঁচে থাকার উদগ্র কামনায় মাতাল নরনারী। শুধু বেঁচে থাকা। তার বেশী নয়। অমৃতের কামনা করবে না। আলোকের জ্যোতির জন্যে প্রার্থনা জানাবেনা তারা। পান্নু মল্লিক তাদের চেনে। মর্মে মর্মে অনুভব করেছে তাদের বেঁচে থাকার নেশাকে। তাদের হাতে হলাহলের পানপাত্র যে তুলে দিতে পারে, সে-ই জয়ী। পান্নু মল্লিক তা জানে।

নতুন রাস্তার ডানদিকে একটু দূরেই ধর্মদাসের তিন-চারখানা জমি। মুগ্ধবিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো পান্নু মল্লিক। রায়বাবুরা খাবা বসানোর আগেই ও-জমি চ'লে আসছে তার হাতে। ও জমির দাম উঠবে তিনগুণ-চারগুণ। হয়তো বা তার চেয়েও বেশী। নতুন সেউলীর নতুন কালের ছবির আর এক চিত্রকর হ'তে চলেছে পান্নু মল্লিক। মদের দোকান দিয়ে শুরু। শেষ কোথায় কে জানে!

বিভোর হ'য়ে ভাবতে ভাবতে কখন যে পানু মল্লিক হাঁটতে শুরু করেছে তা হয়তো তার নিজেরও খেয়াল ছিল না। চমক ভাঙলো দোকানের সামনে এসে। ঘরে ঢুকে চৌকির উপর টান হ'য়ে শুয়ে পড়লে সে। আপনমনে একটু হেসে একটা সিগারেট ধরালে।

সে-রাতে কার্তিককে একটু আগেই ছেড়ে দিলে পানু মল্লিক। মাথার কাছে টাইম-পীসটা টিক্ টিক্ ক'রে বেজে চলেছে। রাত একটা বেজে গেল। রাণী এলো না। পরের দিন সকালে যথারীতি চা দিতে এলো কার্তিক। মুখখানা একটু থমথমে।

পানু মল্লিক মৃদুস্বরে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন ক'রলে, কী হ'য়েছে রে?

কার্তিক বললে, আমার বড়ো অশান্তি যেছে। কাল রেতে ঘরে দিদির জনি দাদাবাবু এয়েছিল।

নিয়ে যেতে চায় তোর দিদিকে? প্রশ্ন করলে পানু মল্লিক।

নিয়ে যাবে কোথায়? গাঁয়ের জমিজমা যা ছিল সব তো বেচে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে এসে ধীরবাবুদের হাতে পায়ে ধ'রে পঁচিশটাকার একটা চাকরি বাগিয়েছে। দেখছি তো ওই [illegible] [illegible]। চাকরের পারা তার ফরমাস খাটে।

পানু মল্লিক এতখানি জানতো না। পাওনা টাকার দুশ্চিন্তা একটুক্ষণের জন্যে তাকে ব্যস্ত ক'রে তুললো। তারপর কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করলে, তোর দিদি তাহ'লে স্বামীর ঘর আর করবেই না?

আমি জানি না। ব'লে কার্তিক বেরিয়ে গেল।

পানু মল্লিক আপনমনে হেসে আবার একটা সিগারেট ধরালে। তারপর গুন্‌গুন্ ক'রে গান ধরলে,

সই লো, আমার হ'ল না বাঁধা বাসা
হ'ল না ভালবাসা
হারাল ভাললাগা
আমি কী করি …।

সেদিনটাও কেটে গেল।

রাত দশটার মধ্যে কার্তিককে বিদায় দিলে পানু মল্লিক। টাইম-পীসটা টিক্ টিক্ ক'রে গুনতে লাগলো প্রতি প্রহরের প্রতিটি মুহূর্ত। রাত বেড়ে চললো। বারোটা প্রায় বাজে। কান খাড়া ক'রে ব'সে ছিল পানু মল্লিক। দরজায় টুক্ টুক্ ক'রে ছোটো শব্দ হ'তেই সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

স্বপ্ন নয়, সত্যিই রাণী এসেছে। গাঢ় খয়েরীরঙের শাড়ীতে আবৃত দেহ। ঘোমটার ভেতর দিয়ে মুখখানা দেখা যাচ্ছে।

পানু মল্লিক অবাক্ হওয়ার ভান ক'রে বললে, তুমি!

রাণী চাপাস্বরে প্রশ্ন করলে, সে লোকটা আজ এয়েছিল?

মানে, শ্রীকণ্ঠ? কই না তো।

রাণী ঘরের ভিতর উঠে এলো। নিজের হাতে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বললে, চমকে গেছেন নাকি?

হ্যাঁ, মানে এত রাতে তুমি একা! কেউ দেখেনি তো?

জানিনে। আর দেখলেই বা। মরা কাকের আবার চমকের ভয় কী?

তাই ব'লে—

আপনি ভয় পেয়েছেন? বাধা দিয়ে বললে রাণী।

না, না, ভয় পাবো কেন? তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'সো—

কোঁচার খুঁট দিয়ে চৌকির একটা পাশ মুছে দিয়ে পানু মল্লিক সাগ্রহে তাকালে রাণীর দিকে। রাণী বসলে না। বললে, আপনার সঙ্গেও আমার কথা আছে।

আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ। আমাদিগের জন্যে আপনি তো অনেক করেছেন।

না, না, কী আর এমন করেছি গো? কার্তিকের চাকরি-বাকরি ছিল না, তিনটে লোকের সংসার নিয়ে একেবারে উপোস করবে, তাই যা একটু করেছি।

রাণী মুচকি হেসে বললে, লোকে কিন্তু অন্যকথা বলে।

অ্যাঁ! কী বলে লোকে? অপ্রতিভ স্বরে প্রশ্ন করলে পানু মল্লিক।

লোকে বলে আমার কথা। আমার জন্যেই নাকি এত করছেন আপনি।— রাণী হাসলে একটু অর্থপূর্ণ হাসি।

বিনয়ভাবে পানু মল্লিক বললে, ছি-ছি, ভাবো দিকি কাণ্ড!

রাণী চাপাস্বরে বললে, মন্দ কী? নিজের মানুষ দাম দেয়নি। আপনার কাছে যদি দাম পাই তো ক্ষতি কী বলেন? পাপ-পুণ্যি মানেন আপনি?

অ্যাঁ? হ্যাঁ, তা মানতে হয় বৈকি।

মানেন! তাচ্ছিল্যের একটুকরো বাঁকানো হাসি ছিটিয়ে রাণী বললে, মেনে কী লাভ? আমি আগে মানা করতাম, এখন আর করিনে।

পান্থ মল্লিক বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইলো রাণীর চোখের দিকে। সে-চোখে আগুন, না কৌতুক, কামনা না প্রতিহিংসা—তা যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না। আমতা আমতা ক'রে বললে, এসব তুমি কী বলছো গো?

রাণী বললে, নষ্ট-মেয়ে ব'লে আমার স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু ভালো থেকে মনের শান্তি তো পাইনি। নষ্ট হ'য়ে দেখি একবার।

তুমি শ্রীকণ্ঠের কাছে যাবে না আর?

না। তার কাছে গেলে সে নিজেই বেচা করবে আমাকে। রূপো দত্তর তাঁবুতে পাঠাবে ব'লে কাল রেতে আমার স্বামী আমাকে আদর করতে গেইছিল।— বলতে বলতে চকচক্ ক'রে উঠলো রাণীর চোখ। ফর্সাহাতে চোখ মুছে নিয়ে হেসে উঠলে সে। পাগলের মতো হাসি। তারপর ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললে, তার চেয়ে কেনা-বেচাটা নিজের হাতেই করিনা ক্যানে?

পান্থ মল্লিক কিছুই বলতে পারলে না। রাণী শাণিত হাসির ছটায় আরও বিহ্বল ক'রে দিলে তাকে। বললে, পারবেন না কেনা করতে?

পান্থ মল্লিকের দৃষ্টি ঘোলাটে হ'য়ে এসেছে। মাথায় ঝিম্ ধরছে একটু একটু ক'রে। চৌকির তলা থেকে তুলে নিয়ে এলো আধ-খাওয়া একটা মদের বোতল। উগ্র ঝাঁঝালো মদের বেশ খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়ে বললে, পারবো। খুব পারবো আমি।

রাণী বললে, কিন্তু শর্ত আছে।

বলো। এগিয়ে এলো পান্থ মল্লিক।

শোনলাম ধম্মো হালদার বাড়ীর দোকানপাট সব নাকি কেনা ক'রে নিচ্ছেন আপনি?

কার কাছে শুনলে?

কাত্তিকের কাছে। ধম্মো হালদা বলেছে তাকে।

হ্যাঁ, কিনছি। সেউলীতে নতুন গঞ্জের পত্তনি করবো আমি।

দোকানটা কাত্তিককে লিখে দিতে হবে। আমি দাম দেবো।

তুমি দাম দেবে?

ক্যানে, আমার ইজ্জতের এতটুকু দাম নেই? সেই দাম দেবো।

পান্থ মল্লিক ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বললে, দাম কী বলছো, রাণু! তোমার জন্যে সব করতে পারি যে।

রাণী বললে, কথার খেলাপ হবে না তো?

না।

কীন হবে না?

না।— এগিয়ে এসে মদের বোতলটা রাণীর মুখের কাছে তুলে ধরলে পান্থ মল্লিক। সাপুড়ে যেমন ক'রে সাপিনীকে সম্মুগ্ধ করে, ঠিক তেমনি ভাবে রাণীর দিকে তাকিয়ে জড়িত স্বরে বললে, খাও একচুমুক।

রাণী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সবুজরঙের বোতলটার দিকে একবার তাকালে। পান্থ মল্লিক বললে, ভয় কী, খেয়েই ভাখোনা একচুমুক।

রাণী চোখ বুজে গলায় ঢেলে দিলে একটু মদ। গলা থেকে সমস্ত অন্ত্রটা যেন জ্ব'লে পুড়ে গেল। মুখ বিকৃত ক'রে রাণী বললে, যদি নেশা ধ'রে যায়?

যাক। আমি তো আছি। আমার দোকান আছে। ভয় কী?

রাণীর মাথা ঝিমঝিম করতে সুরু করেছে। বেঞ্চির উপর ব'সে প'ড়ে সে বললে, পাপ-পুণ্যি আর মানিনে গো। আপনি মদ খাওয়া শিখিয়ে দিলেন আমাকে। প্রাণ ভ'রে মদ খাবো আমি। দেবেন তো?

পান্থ মল্লিক রাণীর কাঁধে হাত রেখে মুখ নামিয়ে বললে, দেবো গো দেবো! কাত্তিককেও দোকান ক'রে দেবো আমি।

রাণী পান্থ মল্লিকের হাত চেপে ধ'রে বললে, তাই দিবেন যেন। ওর বড় শখটুকু পাবি তবে মেটে সাধ।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালে রাণী। দেহ একটু একটু কাঁপছে। চোখের দৃষ্টিতে নেমে এসেছে কেমন একটা বিহ্বলতা। পান্থ মল্লিক তখনো তার হাত ছাড়েনি। রাণী অবশ কণ্ঠে বললে, আজ চলি।

পান্থ মল্লিক তার হাত ছেড়ে দিলে। রাণী আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

মদের বোতলটা তখনো বেঞ্চির উপর প'ড়ে ছিল। পান্থ মল্লিক দরজা থেকে ফিরে এসে বোতলটা লণ্ঠনের সামনে একবার তুলে ধরলে। তারপর বাকী মদটুকু ঢকঢক ক'রে ঢেলে দিলে গলায়। পক্ষিনী হাতছাড়া হ'য়েছে ক্ষতি নেই। যেচে এসে ধরা দিয়েছে রাণী। নাই ব থাক্ রূপ। তবু তাকে দিয়ে অনেক টাকা তোলা যাবে।

শ্রীকণ্ঠের অবস্থা ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল পা মল্লিকের। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লে চৌকির উপর। শ্রীকণ্ঠ রাণীর স্বামী হ'য়েও শেষকালে তার কাছে হেরে গেল।

। ২৮ ।

পাচু মল্লিকের কাছে জমিজমা আর দোকান বিক্রির পাকা কথা দিয়ে যেদিন ফিরে এলো ধর্মদাস, সেইদিনই কার্তিক এসেছিল তার কাছে। ধর্মদাস দৃঢ়সংকল্প। কার্তিক এ-কথা সে-কথার পর বললে, তুমি সেউলী ছেড়ে চ'লে গেলে মানুষের মতো মানুষ আর একজনাও থাকবে না, কাকা।

ধর্মদাস ধরা গলায় বললে, আমার যে দম বন্ধ হ'য়ে এসেছে, কার্তিক। এখানে আর আমি থাকতে পারবো না।

কার্তিক বললে, কপিলার বিয়ে?

দেশে-গাঁয়ে গিয়ে দেখবো।

কার্তিক আর কিছু বললে না। বীরুলাল এখানে নেই। থাকলেও, ধর্মদাস তার সঙ্গে কপিলার বিয়ে দেবে না, সে-কথা কার্তিক জানে।

একটু পরে ধর্মদাস বললে, তুই তো শুনি মল্লিকমশার সামনে তেলেভাজার দোকান খুলেছিস?

না খুললে না-খেয়ে মরতে হ'ত। বললে কার্তিক।

ধর্মদাস একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, ওই মল্লিকমশায় একদিন এই সেউলীর জমিদার হ'য়ে বসবে দেখিস।

কার্তিক কিছুই বললে না। ধর্মদাসের কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কাগনি থেকে চাকরি যাওয়ার পর হাঁস-মুরগী চালানের ব্যবসা নিয়ে পাচু মল্লিক যখন সেউলীতে এসেছিল তখনকার সঙ্গে এখন অনেক তফাত। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গুনে তুলছে। এককথায় কয়েক হাজার টাকা নগদ গুনে দেবার সামর্থ্য রাখে।

কার্তিক চ'লে গেল। ধর্মদাস চুপ ক'রে ব'সে রইলো একই জায়গায়।

বাতাস আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হ'তে আরম্ভ করেছে। একটু একটু হল্কা আসতে সুরু করেছে ময়ূরার ওপর দিয়ে। আষাঢ় এসে গেল প্রায়। তবু আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। প্রখর রোদের তাপে ঝলসে গেছে ঘাস আর মাটি। ময়ূরার বালি খুঁড়েও বোধহয় একবিন্দু জল পাওয়া যাবে না।

কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে কাগনির দিকে তাকিয়ে ব'সে ছিল ধর্মদাস। কপিলা যে কখন এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি।

কপিলা ডাকলে, বাবা।

চমকে ফিরে তাকালে ধর্মদাস।

কপিলা বললে, চান করতে যাবে না?

যাবো।

কপিলা তবু দাঁড়িয়ে রইলো।

ধর্মদাস বললে, কিছু বলবি আর?

কপিলা চোখ একবার তুলে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলে। তারপর মৃদু স্বরে বললে, পাচু মল্লিককে সব-কিছু বেচা ক'রে দিছ?

ধর্মদাস বললে, হুঁ।

আমরা এখেনে থাকবো না?

না।

ক্যানে?

সেউলীকে আমি আর সহ্য করতে পেছি না। দেশে মুদিখানা দোকান করবো।

কপিলা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। মুখ নীচু ক'রে আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

তারপর কয়েকদিন কেটে গেল।

ময়ূরার পুল তৈরি হ'য়ে গেছে। রায়-কোম্পানির ওপর চাপ পড়েছে দ্বিগুণ। দশ-বারো দিনের মধ্যে বাকী রাস্তাটুকু শেষ ক'রে দিতে হবে। তারপরই হবে পুলের উদ্বোধন। দিনরাত মাটি কাটছে কুলীরা। সন্ধ্যের পর থেকে ভোর পর্যন্ত পেট্রোম্যাক্সের আলোয় কাজ চলছে সেখানে।

ধর্মদাস এ ক'দিনে যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে। কপিলাকে কাছে ডেকে সাহস ক'রে একটা কথাও বলতে পারেনি। কপিলাও সংসারের কাজ করে যন্ত্রের মতো। কোনো কাজে ত্রুটি নেই এতটুকু। অথচ কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। মনে মনে ছটফট করে ধর্মদাস। তবু সেই আগের মতো মেয়েকে আর কাছে ডাকতে পারে না।

জমি বিক্রি হ'য়ে গেল। চোখের জল চেপে দলিল তৈরি ক'রে পাচু মল্লিকের হাতে তুলে দিয়ে এলো ধর্মদাস। পাচু মল্লিক টাকা বুঝিয়ে দেবার পর একটু খোসামোদের হাসি হেসে বলেছিল, দুঃখু ক'রো না, হাজরা। কালে কালে সেউলী যা হ'য়ে উঠবে তার মধ্যে তোমার মতো সাধু-সজ্জনের বাস করা এমনিও চলতো না হে। দেশগাঁয়ে আবার নতুন ক'রে বসত করো, সুখে থাকবে। কী বলো?

ধর্মদাস কোনো জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে স'রে গিয়েছিল সেখান থেকে। দুজনেই কাটোয়া থেকে একই বাস্‌-এ ফিরেছে। ধর্মদাস চোরের মতো পাচু মল্লিককে এড়িয়ে বাস্‌-এর পিছনে এককোণে ব'সে চুপ ক'রে সারাটা পথ এসেছে।

বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েই হঠাৎ তার বুক ছাঁৎ ক'রে উঠলো। ঘরে আলো নেই। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ নিঝুম। ধর্মদাস কাঁপাগলায় ডাক দিলে, কপিলা!

কোনো সাড়া নেই। ধর্মদাস ভয়ার্ত স্বরে আবার ডাক দিলে, কপিলা রে!

কপিলা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। নির্বাক পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো দাওয়ায় একটা খুঁটি ধ'রে।

ধর্মদাস অবসন্নের মতো দাওয়ার ওপর ব'সে পড়লে। গুমোট গরম। মাটি থেকে তখনো ভাপ উঠছে। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। সমস্ত বাতাস যেন হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে থ'মে গেছে।

কারও মুখে কোনো কথা নেই। কপিলা একই ভাবে খুঁটিটার গায়ে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই জমাট নীরবতা ধর্মদাস আর সহ্য করতে পারলে না। কাতর স্বরে বললে, কী হ'ল তোর কপিলা?

কিছু হয়নি তো। নিরুত্তাপ কণ্ঠের উত্তর দিলে কপিলা।

ধর্মদাস কাপড়ের খুঁটে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে নির্জীব-স্বরে বললে, দেউলীর মায়া আজ পুরোপুরি কাটিয়ে এলাম।

কপিলা তাও কিছু বললে না। দাওয়া থেকে নেমে কুয়োতলায় চ'লে গেল। এক বালতি জল তুলে রেখে এলো। মৃদুস্বরে বললে, হাত-মুখ ধুয়ে নাও, বাবা।

যেছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে ধর্মদাস।

কপিলা গামছা এনে ধর্মদাসের হাতে দিলে। তার দিকে তাকিয়ে ধর্মদাস করুণস্বরে বললে, তুই একটা কথাও বল্‌বিনে কপিলা? কার মুখ চেয়ে আমি এত করছি তা একবারও ভাবা কর্‌লিনে?

কপিলার ঠোঁট-দুটি কেঁপে কেঁপে উঠলো। হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

ধর্মদাস বললে, সব বেচা-কেনা ক'রে এলাম। শেষ পয়সাটা পর্যন্ত খরচা ক'রেও যদি একটু ভালো ঘরে বরে তোকে দিতে পাই, তাই করবো। বুড়ো বাপের 'পর রাগ ক'রে থাকিস্‌নে, কপিলা।

কপিলা ধরা গলায় বললে, আমার 'পর রাগ ক'রে এমন কাজ তুমি করলে বাবা? তোমার জমি, তোমার দোকান ক্যানে তুমি বেচা-[illegible] দিলে?

কথাটা ব'লেই কপিলা ছুটে চ'লে গেল ঘরের ভিতর। ধর্মদাস শব্দ শুনতে পেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কপিলা। ধর্মদাসের হঠাৎ কী হ'লো তা সে নিজেও হয়তো বুঝতে পারলে না। মেয়েকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে বীরুলাল। ধর্মদাসের হতাশা, ব্যাকুলতা, অসহায়তা—সব মিলে মুহূর্তের মধ্যে যেন আহ্বান ক'রে নিয়ে এলো এক প্রচণ্ড আক্রোশকে। বীরুলালের উপর তীব্র আক্রোশ। নিষ্ফল ক্রোধের আগুনে তার মনটা জ্ব'লে উঠলো দাউদাউ ক'রে। ঠিক সেই সময়ই বাইরে থেকে ডাক দিলে পদ্মিনী। ধর্মদাস দ্রুতপায়ে উঠোন পেরিয়ে চ'লে গেল পদ্মিনীর কাছে। তীব্র ঝাঁজের সঙ্গে বললে, আবার জ্বালাতে এয়েছিস?

পদ্মিনী হতচকিত হ'য়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বললে, তোমার পাওনা সেই টাকা—

কই, দে। কটুকণ্ঠে বললে ধর্মদাস, কাগনির রোজগার?

না। মাটি-বওয়া মেহনতের টাকা। তাও নেওয়া করতে বাধা?

ধর্মদাস নরম হ'য়ে গেল। গলার স্বর নামিয়ে বললে, না, বাধা কী? দে টাকা।

আঁচলের গিঁট থেকে দু'খানা একটাকার নোট বার ক'রে ধর্মদাসের হাতে দিলে পদ্মিনী। তারপর বললে, তুমি নাকি দেউলী ছেড়ে চ'লে যেছো?

হ্যাঁ। আর এখানে থাকতে মন নেই।

শেষকালে সেই মালবাবুকেই সব বেচা করলে দাদা?

আর কী করবো বল্? চীৎকার ক'রে উঠলে ধর্মদাস—অত টাকায় কেনা-বেচায় ক্ষমতা আর কোন্ মানুষটার আছে এখেনে?

পদ্মিনী বললে, ভালো করেছ বাপু। যেন ক'রে সেই সবই একে একে করা হ'ল তবু মেয়েটাকে বিয়ে করালে ন বীরুলালের কাছে।

ধর্মদাস যেন ক্ষেপে গেল। —আমার মেয়ের বি আমি বুঝবো! তোরা সবাই মিলে আমার ভালে না ক'রে ছাড়বিনে?

দায় প'ড়ে গেইছে আমার। আমাকে এমন রাঙা-চো ক'রোনি, দাদা। তোমার কামাই যাইবে।

ধর্মদাস সামলে নিলে নিজেকে। পদ্মিনীর দিবে তাকিয়ে ক্লান্ত স্বরে বললে, যার চরিত্তিরের ঠিক নেই, তা হাতে জেনেশুনে ওই একটা মাস্তর মেয়েকে তুলে দিয়ে বলিস পদ্মিনী?

পদ্মিনী বললে, বয়েসকালের অমন একটা ভুলচুকে অমনভাবে দ্যাখো ক্যানে, দাদা? তোমার কপিলা তাবে মন দেওয়া করেছে, মেয়ের দিকটা ভাবা করবে না?

ধর্মদাস চুপ ক'রে রইলো।

পদ্মিনী গলায় আর একটু সহানুভূতি মিশিয়ে বললে, ভাইভাবের হাতে মেয়েটাকে তুলে দাও দাদা, মেয়ে তোমার সুখিনী হবে।

ধর্মদাস বললে, না।

পদ্মিনী মৃদু হেসে বললে, আওলী ঘরের ছেলে বটে তুমি। এত জেদ অবস্থতি তোমার!

ধর্মদাস বিচলিত হ'ল না। যেমন শান্ত। তবু কঠোর স্বরে বললে, অনেক দেখলাম এই বারোবছরে। এ পাপের রাজ্যিতে একটা মানুষও ভালো থাকবে না রে পদ্মিনী। লোভে ঝাঁঝরা হ'য়ে গেইছে মানুষগুলোর মন। বীরুলালের মনে পাপ ঢুকেছে। যদি কপিলার মনেও একদিন—

বাকীটুকু নিজের মুখে আর উচ্চারণ করতে পারলে না ধর্মদাস। থেমে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ ভীতস্বরে বললে, মেয়েকে এ পাপ-বাতাসের মাঝে ফেলে রাখতে পারবো না রে পদ্মিনী।

পদ্মিনী আর কিছু বললে না। ধর্মদাস ভাঙা গলায় বললে, ঘর যা তুই।

পদ্মিনী মৃদুস্বরে বললে, আমাদিকে তুমি বড়ো অপছন্দ করো, তাই না দাদা?

ধর্মদাস বললে, তার জবাব দিয়ে কী হবে। তুই যেখানে যেছিলি যা বাপু।

পদ্মিনী একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে ভ্রমরার খাতে নেমে গেল। কাগনির নৈশ আমন্ত্রণ এড়াবার মতো মনের জোর সেই [illegible] হারিয়ে ফেলেছে আর তা মনেও নেই।

ধর্মদাস [illegible] রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে দুয়োরতলায় [illegible] চ'লে গেল।

দু'দিন পরের কথা।

বেলা তিনটের পর থেকে আকাশে মেঘ দেখা দিল। ধর্মদাস [illegible] থেকে উঠে বসেছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে [illegible] মতো দিশেহারা হ'য়ে গেল সে। দিনের পর থেকে রোদের তাপে পুড়ে পুড়ে ঝলসে গেছে সব-কিছু। পৃথিবী হয়তো আর সহ্য করতে পারবে না ব'লেই এতদিনে মেঘ এসেছে আকাশে।

ঘণ্টাখানেক যেতে-না-যেতেই গুরু গুরু হ'য়ে গেল। শোঁ শোঁ ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস ব'য়ে আসছে। ধুলোবালি খড়কুটো আর শুকনো পাতায় ছেয়ে গেল দোকানঘর। তারপরেই শুরু হ'ল মুষলধারে বৃষ্টি। ঝাঁপ দুটো বন্ধ ক'রে দিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো ধর্মদাস। অদ্ভুত ভালো লাগছে তার। ছেলেবেলায় এমন বৃষ্টির দিনে কতবার ছুটে বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে! কত বকুনি, কত শাসন উপেক্ষা ক'রে। আজ উদ্যত শাসন নেই। ছেলেবেলার সে-মনটাও তো নেই!

চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে গেছে। ভ্রমরার উপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে আসছে দৈত্যের মতো বেগে। অবাধ্য বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে যেন চুলের মুঠি ধ'রে টেনে ছুটিয়ে আনছে সেই সঙ্গে। তীরের মতো বৃষ্টির ঝাপ্টা এসে ধর্মদাসের গায়ে বিঁধতে লাগলো।

বৃষ্টির ধারায় ঝাপসা হ'য়ে গেছে চারদিক। ভ্রমরার ওপারের রেখাটাও আবছা হ'য়ে গেছে। কাগনির কলরবও যেন চাপা প'ড়ে গেছে বাতাসের ঝড় শব্দের কাছে।

ধর্মদাস সব ভুলে গেছে। দু'চোখ ভ'রে দেখছে বহু-প্রত্যাশিত এই বৃষ্টির সমারোহ। বর্ষার সংকেত এনেছে আজকের মেঘ। আবার কানায় কানায় ফেঁপে উঠবে ভ্রমরা। আহ্লাদে লুটিপাটি হ'য়ে দুরন্ত দামাল বেগে ছুটে যাবে গেরুয়া-জলের পাগল ধারা। ঝলসে-যাওয়া মাটির বুকে আবার উঁকি মারবে কচি কচি ঘাস।

বুকের ভিতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো ধর্মদাসের। বারোবছরের সম্পর্ক বেউলীর সঙ্গে। বারো বছর ধ'রে চোখের সামনে ভ্রমরার ক্ষ্যাপামি দেখেছে সে। ভ্রমরার পাড়েই রেখে যাচ্ছে কপিলার মাকে। এত স্মৃতি, এত অন্তরঙ্গতা বেউলীর সঙ্গে। তবু নিজের হাতেই তো সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হ'ল! আর ক'দিনের মাত্র মায়া। আষাঢ়ের মাঝামাঝি চ'লে যাবার কথা দেওয়া হ'য়েছে পান্থ মল্লিককে।

হঠাৎ মনটা আবার ভারী হ'য়ে উঠলো। দু'পেয়ালা চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে ধর্মদাস কপিলাকে ডাকলে।

বৃষ্টি তখন প্রায় ধ'রে এসেছে। দোকানের বাঁ-দিকে ঢালু জায়গা দিয়ে মাঠের জল কলকল ক'রে নীচের দিকে ব'য়ে চলেছে। কে বলবে দু'ঘণ্টা আগেও এখানে দশহাত মাটি খুঁড়লেও একফোঁটা জল পাওয়া যেতো না!

কপিলা এসে দাঁড়ালো। ধর্মদাস বললে, চা খাবি একটু? তোর জন্যেও জল দিয়েছি।

কপিলা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

ধর্মদাস চা ছেঁকে একটা গেলাস কপিলার হাতে দিয়ে বললে, এই ঠাণ্ডায় বেশ ভালো লাগবে খেয়ে দ্যাখ্।

কপিলা চায়ের গেলাসটা নিয়ে চ'লে যাচ্ছিল। ধর্মদাস বললে, আমার সুমুখে ব'সেই খা। এখন কোনো খদ্দের আসবে না।

কপিলা আঁচল দিয়ে গেলাসটা জড়িয়ে নিলে। ধর্মদাস চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, আর এখেনে মায়া জড়াসনে কপিলা। ক'দিন পরেই তো যেতে হবে! সেই কোন্ ছোটকালে নিজের গাঁ দেখেছিলি। তোর তো মনেও নেই। আবার দেখবি। এই ধোঁয়া, কয়লা, গাড়ী-ঘোড়ার চেয়ে অনেক ভালো। চোখ জুড়িয়ে যায় রে।

কপিলা সবে চায়ে এক চুমুক দিয়েছে। হঠাৎ তার সমস্ত দেহটা যেন কাঠ হ'য়ে গেল। ধর্মদাসের দৃষ্টি আটকে গেল দোকানের দরজায়।

দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলে বীরুলাল।

অস্ফুট স্বরে ধর্মদাস বললে, তুমি!

বীরুলাল একবার তাকালে কপিলার দিকে। তারপর বললে, কাগনি থেকে আসছি। জলের ঝড়ে ওখানে আটক প'ড়ে গেইছিলাম।

ধর্মদাস কী বলবে বুঝতে পারলে না। কপিলার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, ভিতর-বাড়ী যা, কপিলা।

বীরুলালের মুখে হাসি ফুটে উঠলো একটু। বললে, আমি বাঘ-ভালুক নই, হাজরামশায়।

না, না, তা বলবো ক্যানে? বিনয় স্বরে বললে ধর্মদাস।

কপিলা থরথর ক'রে কাঁপছিলো। নিরুপায় ভাবে বীরুলালের দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

বীরুলাল ধর্মদাসের উদ্দেশে বললে, তুমি নাকি নৌকরী ছেড়ে দেছ?

হ্যাঁ।

ক্যানে?

তার কৈফিয়ত তোমাকে দেওয়া করবো আমি?

বীরুলাল আড়চোখে তাকিয়ে একবার অবস্থাটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলে। তারপর নরম স্বরে বললে, কৈফিয়ত চেয়েছে কে গো? তুমি চ'লে যেছ খবর পেলাম তোমাদের নতুন ডাইভারের কাছে। খবর নিতে এয়েছি।

ধর্মদাস হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিল। সেও একটু নরম স্বরে বললে, ঠিকই শুনেছ। দেশের গাঁয়ে চ'লে যাবো আমি।

তোমার মেয়ে?

দিছে আশা পুরো না, যমের পো। তোমার কাছে কপিলার বিয়ে দিলে আগেই দেওয়া করতাম।

বীরুলালের মুখখানা অপমানে কালো হ'য়ে গেল। বললে, কপিলা কিন্তু আমার ঘরই করতে চায়। সেই জন্যে তাকে নিয়ে পালাইছ তুমি?

ধর্মদাস থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। বললে, তুমি চ'লে যাও, যমের পো। আমি কি কৈফিয়ত দিতে থাকবো তোমাকে?

বীরুলাল কঠোর স্বরে বললে, কপিলার মুখের কথা শোনা ক'রে তবে যাবো।

না। কপিলা আসবে না তোমার সুমুখে।

এত দেমাক তোমার, হাজরামশায়?

দেমাক যদি বলো তো তাই। তোমাদিগে আমি ঘেন্না করি।

বীরুলাল চাবুক-খাওয়া জানোয়ারের মতো বীভৎস হ'য়ে উঠলো। কাঁপতে কাঁপতে বললে, ঘেন্না করো?

হ্যাঁ। থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ধর্মদাস বললে, ডাইভারির কাজ ছেড়ে মাঠে লাঙল চষতে পারবে?

না। কোনোদিন পারবো না। বীরুলাল জবাব দিলে।

পারবেনা জানি। যন্তরের চাকর হ'য়ে গেইছ তোমরা। লোভ ছাড়তে পারবে না, লালস ছাড়তে পারবে না—মদ না, মেয়েমানুষ না। কী ছাড়তে পারবে তোমরা? খোলা দোর দিয়ে ও-পারকে একবার তাকাও। ওখেনেও তো যন্তরের দাপট। একটাও মানুষ আছে ওখেনে? বিষের বাতাসে দম আমার বন্ধ হ'য়ে যেছে, যমের পো। আমার মেয়েটাকে তুমি রেহাই দাও, বাবা!

কথা বলতে বলতে গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। চোখ-দুটো লাল হ'য়ে গেছে। পিছনে একটা কাঠের বাক্সে ঠেস দিয়ে হাঁপাতে লাগলো ধর্মদাস।

বীরুলাল ভ্রূক্ষেপও করলে না। বললে, আমার হাত থেকে রেহাই পেলেই তোমার মেয়ে সুখ পাবে?

তীব্র উত্তেজনায় আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল বীরুলাল। তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। কপিলা এসে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মদাস আর্তনাদ ক'রে উঠলে, আবার তুই এলি পোড়ারমুখী?

কপিলা সে-কথায় কোনো জবাব দিলে না। বীরুলালের দিকে তাকিয়ে ধরাগলায় বললে, তুমি আর এসোনা এখেনে। বিয়ে হবে না।

বীরুলাল স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কপিলা ছুটে চ'লে গেল সেখান থেকে।

ধর্মদাস যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার কপিলা শেষপর্যন্ত বাপের মুখ তাকিয়ে মান রেখেছে! বিমূঢ়ের মতো কপিলার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো ধর্মদাস।

অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে তাকালে তখন বীরুলালও ঘরে নেই। আচ্ছন্নের মতো আস্তে আস্তে সোজা হ'য়ে বসলে ধর্মদাস। তার মনে হ'ল, এতক্ষণ ধ'রে যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে এইমাত্র।

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। এক এক ঝলক ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস শুধু ব'য়ে আসছে ভ্রমরার উপর দিয়ে।

বহুদিন পরে একটা শান্তির রাত।

অনেকদিনের জমাট দুঃখের বোঝা হালকা হ'য়ে গেছে আজ। খেতে ব'সে ছেলেমানুষের মতো একের পর এক কথা বলতে লাগলো ধর্মদাস। কপিলার ছেলেবেলার কথা। তার মায়ের কথা।

কপিলার মুখে অনেকদিন পরে হাসি ফুটেছে। বেশী কথা বলছে না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে মজার কথায় হাসছে।

ধর্মদাস বললে, তোর একটা বন্দোবস্ত না করা পর্যন্ত আমার আর শান্তি নেই যে, কপিলা।

কপিলা কেমন এক বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার মুখ নীচু করলে। ধর্মদাস আপন আনন্দে বিভোর। কপিলার চাউনি তার নজরে পড়েনি। আপনমনেই সে বলতে লাগলো, সত্যিকথা বলতে কি, তোর 'পর বড়ো মান হ'য়েছিল আমার। তাইতো জমিজায়গা দেলাম সব বেচা ক'রে। তুই মাথা কুটে রক্ত বইয়ে দিলেও বীরুলালের কাছে তোকে বিয়ে দেতাম না আমি।

কপিলা উঠে চ'লে গেল। আর দুটি ভাত এনে ঢেলে দিলে ধর্মদাসের থালায়। ধর্মদাস আপত্তি করলে না। সব-ক'টি ভাত খেয়ে নিয়ে আবার বলতে সুরু করলে, তুই যদি তাও জোর করতিস তো আমি বোধকরি আত্মহত্যে ক'রে বসতাম। মুখ রেখেছিস আমার।

কপিলা বিবর্ণ দৃষ্টিতে আর একবার তাকালে ধর্মদাসের দিকে। তারপর প্রশান্ত স্বরে বললে, আমার জন্যে তোমাকে আর কষ্ট পেতে হবে না, বাবা।

কাপনি ইয়ার্ডে একখানা পাইলট-ইঞ্জিন বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলো। কপিলা চমকে উঠলো।

ধর্মদাস খেয়ে উঠে গেল। আজ অফুরন্ত স্ফূর্তি তার মনে। এতদিন পরে যেন হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছে আজ।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে এলো ধর্মদাস। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। আগের দিনের প্রবল বৃষ্টির চিহ্ন এখনো লেগে রয়েছে সর্বত্র। এতদিনের আকণ্ঠ তৃষ্ণা মেটাতে পেরে ঠাণ্ডা হ'য়েছে মাটি। চারিদিকে একটা স্নিগ্ধতার স্পর্শ লেগেছে। সারারাত দাপাদাপির পর কাপনি ইয়ার্ডও যেন ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উনুনে আঁচ দিয়ে ধর্মদাস সবে সরঞ্জামগুলো ঠিকঠাক করতে বসেছে। হঠাৎ যেন কার্তিকের ডাক শোনা গেল।

ধর্মদাস বেরিয়ে এলো। দেখতে-পেলে কার্তিককে। ভ্রমরার খাতের বালি মাড়িয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে কার্তিক। ধর্মদাস তার ব্যস্ততা দেখে অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলে, কী হ'ল রে? অমনধারা ছুটছিস ক্যানে?

মনোমত অলঙ্কার...
জুয়েলার্স
লক্ষ্মী ব্রাদার্স
২০৮/৮, রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট মোড়
কলিকাতা ২৯ • ফোন-৪৬-৩৩২৬
১. হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ • কলিকাতা-২৯

কার্তিক হাঁপাতে লাগলো। ধর্মদাস আবার বললে, কী হ'য়েছে, অ্যাঁ?

কার্তিক কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, কপিলা কোথায়?

কোথায় আবার? ঘুমাইছে হয়তো।

কার্তিক অস্ফুট স্বরে বললে, কপিলা আর নেই।

অ্যাঁ, কী বললি? ধর্মদাস আর্তনাদ ক'রে উঠলে। —কোথায় সে?

কার্তিক ধরা গলায় বললে, বোধহয় বিষ খেয়েছে।

ধর্মদাস চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলে। পাগলের মতো ছুটে গেল বাড়ীর ভিতর। কপিলার বিছানা ফাঁকা প'ড়ে আছে। ধর্মদাস আবার ছুটে চ'লে এলো কার্তিকের কাছে। তার হাত ধ'রে মরিয়ার মতো ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, কোথায় দেখলি তাকে? কোথায় বিষ খেয়েছে কপিলা?

কার্তিক ধর্মদাসকে ধ'রে বললে, উতলা হ'য়ো না, কাকা। কাঁদলে তো আর ফিরে পাবে না।

কার্তিকের হাতের বাঁধন ছেড়ে পাগলের মতো ছুটতে লাগলো ধর্মদাস। ভ্রমরার পুলের একটু এপাশে ভীড় জমেছে। ধর্মদাস কপিলার নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে ছুটতে লাগলো।

বালির উপর প'ড়ে আছে কপিলা। বিষের জ্বালায় নীল হ'য়ে গেছে তার নিথর নিস্পন্দ দেহ। ধর্মদাস ভীড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। একটা মর্মভেদী আর্তনাদ ক'রে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো কপিলার শিয়রের কাছে। অবুঝ অন্ধ মমতায় চীৎকার ক'রে কেঁদে বললে, কপিলা, সাড়া দে মা! কথা বল্—

কপিলা বরাবরই কম কথা বলতো। আজ একেবারে নীরব হ'য়ে গেছে। ধর্মদাস তার মাথার উপর মুখ গুঁজে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো।

পুব আকাশে ভোরের সূর্য উঠছে। ভ্রমরার পুলের খিলানে এসে লেগেছে লালচে আলোর রশ্মি। কপিলা তার ডাগর চোখের বিস্ময় নিয়ে আর কোনোদিন তাকিয়ে থাকবে না এই পুলের দিকে।

কার্তিক শক্ত হাতে ধ'রে ধর্মদাসকে তুলে বসালে। বললে, অত উতলা হ'তে নেই, কাকা।

ধর্মদাস দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো। মর্মভেদী কান্নার সে ধ্বনি ভারী ক'রে তুলল মেউলীর বাতাস।

কপিলা সকলকে মুক্তি দিয়ে গেছে! ধর্মদাসকে অসম্মান থেকে বাঁচিয়েছে। বীরুলালকে মুক্তি দিয়ে গেছে অপমান থেকে।

শাহু মল্লিক আর রায়বাবুরা হয়তো নতুন মেউলী গ'ড়ে তুলবে। জন-কোলাহলে মুখর হ'য়ে উঠবে গঞ্জ-মেউলী। ধর্মদাসের হাহাকার তলিয়ে যাবে সে-কোলাহলে। কেউ মনে রাখবে না কপিলাকে!

কার্তিক অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে। সেখানে লোহা আর কংক্রীটের খাঁচছড়ায় বাঁধা পড়েছে কাগনি আর মেউলী।

মেনকাও খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। কপিলার সামনে এসেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ধর্মদাস হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলে মেনকাকে। নিবিড় ক'রে তাকে বুকে চেপে ধ'রে ভাঙা গলায় বললে, কাঁদিস ক্যানে ম্যানকা। ভোমরা-নদীকে তোর কপিলা-দিদি এত ভালবাসতো, সেই ভোমরার কোলে শুয়েই তো ঘুম যেছে রে। দেখছিসনে, কেমন সুখের ঘুম যেছে?

ভ্রমরা-পুলের খিলানে সূর্যের আলো আরও একটু ছড়িয়ে পড়েছে তখন। ধর্মদাস কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কপিলার নিঃসাড় নিস্পন্দ মুখের দিকে। সত্যিই যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে কপিলা।

জীবন্মৃতের যুগ

প্রসূনকুমার দত্ত

প্রকৃতি, অজস্রবার ক্রমবিবর্তনে
হঠাৎ নিরস্ত তুমি এ-কোন্ পর্যায়ে ?
জীবন্মৃতের যুগ ; নির্বহতা নদী :
খেয়াল-প্রসূত এই সৃষ্টি-সম্ভারে
আরো কিছু ঘুরে চলো, অহল্যা অবধি—
শীতল পাষাণ ঢালো বজ্রাহত মনে !

সমস্ত মৃত্যুর পথ ফেলেছি হারিয়ে,
শান্তির মোহানা বন্ধ তবুও জগতে
গ্রহ আর নক্ষত্রের অভিশাপ নিয়ে
আমাকে প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে জানি—
আরেক আগুনে পুড়ে, না-মরার গ্লানি
বুকে নিয়ে, সুধাসিক্ত নীলকণ্ঠ-ব্রতে !

দিনে দিনে বিমর্দিত এ-দুর্মর প্রাণ
এবার নিষ্কল করো, স্নায়ুগুলি ছিঁড়ে
জন্মগত অধিকার—আশা, শান্তি—সব
নিঃস্পন্দে মন্থন কোরে শুকনো, ম্রিয়মাণ
অস্তিত্ব বজায় রাখো এবং শরীরে
মূঢ় অনুভূতি দাও শিথিল, নীরব ।

তারপর চলে যাক্ বর্ষ, বহু দিন—
একে একে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির
পদধ্বনি দূর থেকে দূরতর হোক ;
প্রতিটি যুগের শেষে তোমার বলির
পশুদের শোধ্ কোরে যেন সব ঋণ—
তখন স্থবির আমি, আমি বীতশোক !

আমার কফিনে শুধু তুমি রেখো এঁকে
এ-যুগের ইতিহাস ; কর্ণের রথের
চাকার গভীরতম চিহ্ন মনে রেখে
সে-আল্পনা শেষ কোরো । আমি যেন ফের
কুরুক্ষেত্র, হিমবাহ অতিক্রম ক'রে
বরাহই, উদ্যত থাকি প্রলয়-সাগরে ॥

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জন্য

পরিমল চক্রবর্তী

বৃথা স্বপ্ন রেখে গেলে । মনুষ্যত্ব নিঃসঙ্গ শিমুল
রয়েছে তোমার মনে—মনের বাগানে কতোদিন্
কতো রাত্রি ! নিদ্রাহীন দুইচোখে আর্তির বকুল
ফোটা ফোটা অশ্রু হয়ে ঝরে ঝরে হৃদয়ের বন
কেবলি বাড়িয়ে গেছে ; মমতার শান্তিনিকেতনে

তারপর শত্রু এসে বার বার শূন্যতার মালা
ফেলে গেছে ; মানবিক সভ্যতার শান্ত তপোবনে
এখন হয়েছে শুরু আত্মঘাতী হিংস্রতার পালা ।

বৃথা শান্তি খুঁজে গেলে । আগামীদিনের পৃথিবীকে
আর সেই পৃথিবীর অনাগত মানুষগুলোকে
কেন ভালোবেসে গেলে প্রাণ দিয়ে ? মানুষের মন
এখনো রয়েছে মগ্ন রুদ্ধ অন্ধকারে ; দিকে দিকে
তাইতো এখনো এতো দাবানল ;
প্রেমের আলোকে
বৃথাই সাজালে তুমি এই দৈত্য সভ্যতার মন ।

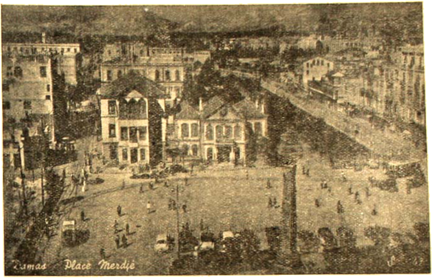

দামাস্কাসের 'মার্জ স্কোয়ার'

এলাম দামাস্কাসে

কুমারেশ ঘোষ

দামাস্কাসের পথগুলি। এখানে-ওখানে সবুজ গাছের ঘন ঝোপ। কানে এলো কুলকুল শব্দ। জলের। আহা, নূপুরের মতোই যেন মিঠে বোল্। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।' প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'লো।

ঠিক, মনে পড়চে বটে, দামাস্কাসেও নদী আছে। নদ-এর ছোট 'নদী'। নদীর ছোট কি? নালা? সেই নালা-ই পড়লো চোখে। পথের গা ঘেঁষে অতি সন্তর্পণে শীর্ণকায়া নালা বয়ে চলেছে। ধারের গাছগুলো সেই নালার জলেই হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে নিজের মুখ দেখে খুশীতে ডগমগ।

উঁচু পাহাড়ী গ্রাম 'অল্ জাবাদানী' (al Zabadani) থেকে নালা-নদী 'বারাদা' এঁকেবেঁকে এসে পড়েচে দামাস্কাসের ধারে। সেখানে এসেই সেটা নাম বদলে ফেলে শহরে নাম নিয়েচে অল্-ফেহা (al-Fayha); শেষে পাঁচ ভাগে ভাগ হ'য়ে ছড়িয়ে গেছে পথের ধারে, গাঁয়ের ধারে, ঝোপের ধারে। পাঞ্জাবের পাঁচ-নদীর পকেট-সংস্করণ।

নদীর জলটুকু পাওয়ায়, দামাস্কাস মরুভূমির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েও, জলজল করচে—উজ্জ্বল, সবুজ।

দামাস্কাসী ব্যারোমিটারের পারা-প্রবরকে রীতিমতো ওঠ্-বোস্ করতে হয়। গরমের চোটে লাফ মারেন তিনি ১০১°F-তে, আবার ঠাণ্ডায় গুড়িসুড়ি মেরে বসেন ৩০°F-এ। শোনা গেল, ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয় নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত। বাকী মাসগুলোয় চাতকপাখীর 'ফটিকজল'-এর কান্না।

শহরের সীমায় এলাম। যেখানে একটু ছায়া, প্রায় সেখানেই রেস্ট্রেন্ট। হাল-ফ্যাশানে সাজানো। টেবিল

চেরার পাতা। অসময়, তাই খদ্দের হয়নি জড়ো। বেলা পড়লে হবে খদ্দেরের আনাগোনা হৈ-হল্লোড়, যেমন বাংলাদেশের গাঁয়ে বিকেলে বৌয়ের হুড়োহুড়িঃ বেলা গেল, জলকে চল্। তেমনি হামাভানে ঠাণ্ডার বাজার জমে, গরম হয়।

ঐ ভাখো, ট্যাক্সির ড্রাইভার করিম হাদাদ্ বললে, হামাসে ('হামাভানের আদুরে নাম) একজিবিশনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

দেখলাম, চেরা কাঠ দিয়ে স্টল তৈরি হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে প্যাভিলিয়ন।

হামাভান শহর।

ঐতিহাসিক। আরব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আস্তানা। রহস্যময়। রোমান্টিক।

গাড়ি ঢুকলো শহরের মধ্যে। কয়েকঘণ্টা আঁকাবাঁকা রুক্ষ পাহাড়ী পথে চলবার পর বাড়িঘর, লোকজন দেখে মনটা যেন শান্ত হ'লো। পেছনের ইরানীরা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো; শুরু হ'লো কলরব।

হাদাদ্ বললে, এই হচ্ছে হামান্ শহর।

নতুন নতুন বিরাট বাড়ী। চওড়া রাস্তা। চমৎকার পায়ে-হাঁটবার ফুটপাথ। এখানে ওখানে পার্ক, বাগান, ছাঁটাই-করা গাছ—ফুলে ভরা। তবে উমায়েদ-যুগের সেই পুরোনো সরু গলিঘুঁজি আজো আছে বহু। তারা যেন ঘাড় গুঁজে আছে বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। সূর্যের আলো ঢোকেনা সেসব গলিতে। ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে পুরোনো আমলের বাড়িগুলো। পরনে ঢোলা পায়জামা, গায়ে আলখাল্লা, মাথায় বড় রুমালের মতো 'কুফিয়া'—তার উপর চাপানো গোল বিঁড়ে 'ইকাল', পায়ে শুঁড়-তোলা লাল নাগরা,—বাদামী রঙের বেদুইন দেখলাম চাক্ষুষ। হাল-ফ্যাশানের কোট-প্যান্ট-পরা আরবও বহু রাস্তাঘাটে। মেয়েরা পূর্ব-প্রথামতোই পর্দানশীন। পথ চলছে, যেন চলন্ত তাঁবু। চোখের কাছে জালি-কাজ, তারই ভিতর দিয়ে ঠিকরে বার হ'য়ে পথে এসে ছড়িয়ে পড়ছে কালো-হরিণ-চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি।

তবে আশ্চর্য লাগলো, যখন দেখা গেল অনেক আরব-কন্যার কালো-তাঁবুটির ঝুল তার হাঁটু পর্যন্ত এসেই থমকে থেমে গেছে। তারপর থেকে পায়ের বুড়ো-আঙুল পর্যন্ত পশ্চিমী জুতো-মোজায় মোড়া। যেন দু'বাঁটের কালো ছাতা—মোড়া, উপুড়-করা, নড়াচড়া করছে স্বাধীনমতো। জোব্বা, জুতো আর বোরখায় খিচুড়ি দু'চোখ দিয়ে চাখবার মতো। মুখ-ঢাকা ভেল্-এ—তবু পুরুষের ভীড় ঠেলে হুইহুই ক'রে চলে আরবী-জেনানা। ঘোমটার মধ্যে ঘোমটা-নাচের আরবী ঢং।

এ-যুগেও হামাভানের রাস্তায় যখন গাড়ি ঘোড়া উট গাধা আর মানুষকে একসঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে চলতে হয়—তখন উমায়েদ-যুগে এই পথচলা বোধকরি আরো মারাত্মক ছিল। রাস্তায় খোলা সরবত আর কাটা ফল এবং সেইসঙ্গে ফলওলার চিৎকার—আমার অপরিচিত নয়! এশিয়ার একচেটিয়া সংস্কৃতি, ঐতিহ্য! নিশ্চয়ই সে-যুগের আরব্য-দিবস-রজনীতেও এই ফল আর সরবত বিক্রির চিৎকার ভেসে বেড়াতো হামাভানের অলিগলির মুখে; তবে বড়বাজার হাঁকের চেঁচানি নেহাতই একেলে।

হঠাৎ হাদাদ্ গাড়ি থামিয়ে দিলো এক গলির মধ্যে। বললোঃ নামো সব।

ঝুড় ঝুড় ক'রে বেরিয়ে এলাম সবাই মোটর থেকে। ইরানীরা আমার মতো লক্ষ্যহীন নয়। পকেট থেকে টাকা বার ক'রে হাদাদের হাতে গুঁজে বটপট ছুটলো বাগদাদ যাবার বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে। সেখান থেকে যাবে তেহরান। অনেক দূরের, দু'তিন দিনের পথ। তাদের দাঁড়ানো সাজে না।

কিন্তু আমি? লক্ষ্যহীন। হামাসে এসেছি লোক দেখতে, দেশ দেখতে, এদিক সেদিক ঘুরতে। হাদাদ্ও বোধকরি আঁচ ক'রে নিয়েছিল, তার এই প্যাসেঞ্জারটি একটি ভ্যাগাবণ্ড!

তাই বললো পাশে একটি গ্যারেজ দেখিয়েঃ এইখানে আমার গাড়ি থাকবে। গ্যারেজ অ্যাটলাস। গাড়ির নম্বর ২০০৭১। আমার নাম করিম হাদাদ্। পাঁচটায় বেরুৎ রওনা হবো। এখন চ'রে বেড়াওগে, ঐ সময় এখানে এসো।— ব'লেই হাত পাতলো, দাও ভাড়ার টাকা।

ভাড়া পাঁচ পাউণ্ড লেবানিজ গুনে দিলাম।

হাদাদ্ বললোঃ থ্যাংক্ ইউ!— নিজের ডান হাতখানা মুখের কাছে কয়েকবার এনে বললোঃ আমি খেতে যাচ্ছি, তুমি পাঁচটায় ঠিক এসো।

জায়গাটা ঠিক চিনতে পারবে তো? হাদাদ্ বললোঃ বলবে, গ্রান মার্শ-এ 'গ্যারেজ অ্যাটলাসে' যাবো। আচ্ছা চলি।

হাদাদের হয়তো খিদে পেয়েছে, আর দাঁড়ালো না সে। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার তো তাড়া নেই।

খিদে? ঐ তো সামনে খাবারের দোকান। ক্লান্তি? পার্কে আছে বেঞ্চ পাতা। ব'সো গিয়ে। কেউ আমার জন্যে ব'সে নেই। কারোর জন্যে ভাবনা নেই।

দামাস্কাসে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য হচ্ছে: উমায়েদ মসজিদ। উমায়েদ-বংশের স্থাপত্য-কীর্তি। তা ছাড়া আছে সুলতান সালিমের মসজিদ আর তেকিয়ে মসজিদ। একেলে দ্রষ্টব্য প্লাস-ভ বানান আর প্লাস-মার্জ দুটোই খোলা সাজানো স্কোয়ার, চারপাশে তার কংক্রীটের হাল-ডিজাইনের পাঁচ-ছ' তলা বাড়ি—কলকাতার এসপ্ল্যানেড আর ডালহৌসি। অ্যাভেন্যু-ফু-দ্য-সায়ে-ও হাল-ফ্যাশানের সাজানো পথ—স্টেশনের রাস্তা। আর পাঁচটা সভ্য শহরের রাস্তার মতোই এ রাস্তাগুলো চকচকে, ফুটপাথগুলো ঝকঝকে, ফাঁকে ফাঁকে ফুলের গাছ-গাছড়া; আর চৌমাথার ট্রাফিক পুলিশ, মোটরের পিঁ পিঁ, প্যাক প্যাক এবং ট্রামের ঠং ঠং।

গ্যারেজ অ্যাটিলাক-এর গলি থেকে বেরিয়ে সামনেই প্লাস মার্জ। বিরাট স্কোয়ার। ঘোড়ার গাড়ি, মোটর-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে স্কোয়ারটার চারধারে। মাঝখানটায় একটুকরো বাগান; তারই মাঝে একটা উঁচু স্তম্ভ। একানি ট্রামগুলো বাগানটার চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে এ-গলি ও-গলির মধ্যে ঢুকে পড়ছে, যার যেথা গন্তব্যস্থান।

খাবার দোকানগুলোর রসালো খাবার সাজানো থরে থরে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। টেবিল চেয়ার সাজানো। মনোহারী দোকানও বিস্তর। মার্কিনী মালে ভর্তি। বিলিতী-ফরাসী মালও যথেষ্ট। মুচীর দোকান, সিগ্রেটের দোকান, ডাক্তারখানা সবই পাশাপাশি। ফুটপাথে কাটা-ফলের দোকান।

একটি ফলের দোকানের পাশে দাঁড়ালাম। নতুন একধরনের ফল। ছোট-ছোট। বিলিতী আমড়ার আকার। খোসা লাল্চে। গায়ে কাঁটা, আনারসের খোসার মতো। খোসা ছাড়ালে ভিতরটার কমলা-রং। রসালো। বরফের চ্যাঙড়া চাপানো ফলগুলোর মাথায়। দোকানটার বেশ ভীড়। দোকানী ফলের খোসা ছাড়িয়ে ঠাণ্ডা ফল বেচচে খদ্দেরদের। নতুন দেশের নতুন ফল—চেখে দেখা দরকার। ফলের মতো দেখতে যখন আর বিনে-পয়সায় দিচ্ছে না—তখন বুঝতে হবে বিষবৃক্ষের ফল নয় ওটি নিশ্চয়ই।-অতএব সিরিয়ান পঁচিশ পিয়াস্তার খর্চ ক'রে একজোড়া বরফ-ভেজানো ঠাণ্ডা ফল কেনা গেল। এক কামড় দিয়ে দেখি টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি। নরম শাঁস। ভিতরে দুটো বিচি। পাশে দু'তিনজন আরব ফল-খদ্দের আমার ফল খাওয়া দেখছিল। তাদের একজন নিজের ফলে কামড় দিয়ে জিগ্যেস করলো আমায়: পার্লে ভু ফ্রাসেঁই?

নো। ঘাড় নাড়লাম।

আংলেই?

ইয়েস।

এবার আসল প্রশ্ন করলো আরব: গুড্ ফ্রুট?

ঘাড় নাড়লাম: ইয়েস ইয়েস!

খুব খুশী। বিদেশী তার স্বদেশী ফলের সুখ্যাতি করছে, খুশী হবার কথাই। সেদিন আমাদের দেশে এসে রুশরা আম খেয়ে খুশী হ'লো—আমরাও কি কম হ'লাম!

কিন্তু আরবী ঐ ফলটি এমন 'আহা-মরি' গোছের কি নয়। তবে নাকি উপকারী। মরুপ্রান্তরে প্রয়োজনীয়।

আরব বুঝিয়ে দিল: ইউ থার্স্টি? ঈট দিস্ ফ্রুট। গুড্।

আমাদের দেশের তালশাঁস, আম, লিচু, কাঁঠাল আনারসের কাছে যদিও ঐ আরবী ফলটি কিছু না—ত তা বলতে যাওয়া অভদ্রতা, দুঃখ দেওয়া। সব দেশেই তা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। তার লোকজন, পথ-ঘা বাড়ি-ঘর, পোশাক-আশাক, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষ খাদ্য-পানীয়, ফল-ফুল, গাছ-গাছড়া, এমনকি আবহাওয়াটু পর্যন্ত নিজস্ব। তা নিয়ে 'তোমার খারাপ আমার ভালে বলবার অধিকার নেই। ভালো না লাগে চলে যা তোমার নিজের দেশের মতো নয় বলেই বিদ্বেষ? তাহ' দেশ দেখা তোমার পক্ষে দুর্দশা; ঘরে বসে সংসার দেখ আর পান থেকে চুন খসলে—শুরু করো প্যানপ্যানানি।

আরবকে জিগ্যেস করলাম: হোয়ার উমায়েদ মস্ক্?

ইউ সি উমায়েদ মস্ক্?

ইয়েস।

কাম্!

আরব তার রুমালে ফলের রসমাখা হাতটা মুছে নি আমাকে নিয়ে চললো একটা ট্রামের স্ট্যাণ্ডে। একখা ট্রাম ছেড়ে দিয়ে আর একখানা আসতেই হাত দেখাবে থামালো ট্রামখানা। আরবী ভাষায় তাকে কী যেন ব' ড্রাইভারের পাশেই ঠেলে তুলে দিয়ে বললো: গো।

ট্রাম ছেড়ে দিল। ধন্যবাদ দেবারও সময় পেলাম ন তাড়াতাড়ি মুখ বার করে হেসে হাত নাড়লাম। আর হাত নাড়লো স্ট্যাণ্ড থেকে।

ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছি। সরু রাস্তা। আঁকাবাঁকা। দু'ধারে দোকান। সরু ফুটপাথ। পথচলার উপযুক্ত নয়। তাই রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে লোকেরা। আলখাল্লা পরা, কুফিয়ার উপর ইকাল চাপানো আরব, সার্ট-প্যান্ট-পরা আরব, বোরখা-পরা আরব মেয়েরা রাস্তার যেখান দিয়ে পারছে পার হচ্ছে। আর তাদের সরাবার জন্যে ট্রামের ঘন ঘন শব্দ—ঠং ঠং ঠং। চীৎপুরের আরবী চেহারা সারা পথটায়।

পকেট থেকে পঞ্চাশ পিয়াস্তার বার ক'রে ড্রাইভারকে দেখালাম : টিকিট্।

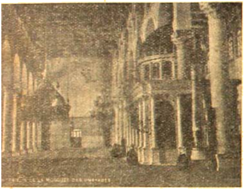

[illegible] মসজিদের অন্দর

ঘাড় নাড়লো ড্রাইভার। চায় না ভাড়া।

কেন? বিদেশী আমি? তাই খাতির? হয়তো। কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাই কোথায়? জানা নেই তো? ক্ষতি নেই। হেসে তার ডান কাঁধটা অল্প নেড়ে দিলাম। হাসলো আরব-ড্রাইভার। প্রেম ভালবাসা আর বন্ধুত্বে মনের ভাষাটুকুই বড়—মুখের ভাষা নয়।

আর খানিকটা গিয়ে একটা বাঁকের মুখে ট্রামটা একেবারে থামিয়ে দিল ড্রাইভার। সামনের গলিটা দেখিয়ে বললো : উমায়েদ মস্ক্।

মার্সি! হেসে ফরাসী ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লাম।

গলি বটে, তবে অদ্ভুত। মার-ক-স্ট্রেইট্। মাথার উপরে বরাবর কাঠের তক্তা দিয়ে ঢাকা। মাঝে মাঝে ফাঁক : মধ্যসূর্যের আলোর সরু সরু ফালি আসবার অনুমতি-পথ! আবছা অন্ধকার। তার দু'ধারে ঠেলাঠেলি দাঁড়িয়ে দোকানের পর দোকান। মেয়ে-পুরুষেরও ঠেলাঠেলি ভীড়। দেশী জিনিসে দোকানগুলো ভর্তি। কার্পেট, কাঠের খেলনা, বাসন, বসন, গহনা, চামড়ার জিনিসপত্তর। সিরিয়ায় ঘরের তৈরি। স্বদেশী বাজার।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। পাথর দিয়ে বাঁধানো পথ। জলে ভেজা। ঠাণ্ডা। মনোরম। খানিকটা যেতেই চোখে পড়লো একটা বিরাট ফটক। খবর নিয়ে জানলাম, উমায়েদ মস্কের দরজা।

একটা আরব ছোকরা জুটে গেল। আশ্চর্য, একটু একটু ইংরিজি জানেও দেখলাম। যুদ্ধের আগে দেশটা ফরাসী শাসনে থাকায় ফরাসী-ফ্যাশানে আর ভাষণে এরা অভ্যস্ত। পথেঘাটে তাই এখনো ফরাসী নামের ছাপ—যদিও দোকানের সাইনবোর্ডগুলোয় টানা-টানা আরবী-হরফ। যুদ্ধের সময় দেশটায় ইয়াঙ্কি-ইংরেজদের জুতোর ধুলো পড়েছিল, সেই সময় তারা পথে ছড়িয়ে দিয়েছিল ইংরেজি-ভাষার বীজ। তবু তখনো সিরিয়ার মাটিতে সে-বীজ শেকড় গাড়তে পারেনি—তবে অনেকেই মনের থলিতে ভ'রে রেখেছে নিজের সামর্থ্যমতো।

ছোকরা বললো : কাম্। আই শো মস্ক্। ওপেন শ্যু হিয়ার।

বেশ, চলো। জুতো খুললাম। ক্যামেরাটি ঝুলতে লাগলো কাঁধেই। চামড়া এখানে বাধা নয়। বাধা পাদুকা। ফটকে এক বুড়ো জুতোর খবরদারি করবার ভার নিলো।

সামনেই খোলা উঠোন, বাঁধানো। পাশেই বিরাট মসজিদ। উমায়েদ-কালীন স্থাপত্য-শিল্পের প্রাচীন সাক্ষী। তবে পরিচয় লজ্জার। দুঃখের। খ্রীষ্টান গির্জাকে গ্রাস ক'রেই এর আসন। এ কলঙ্ক শুধু এ মসজিদের একার নয়। এ কলঙ্কের ভাগী—অল্-আকসা, অল্-আমি, অল্-কবির-এর মসজিদগুলিও। অল্-ওয়ালিদ্ গির্জার যীশুর বেদী ভেঙে দিয়ে স্থাপন করলেন আল্লার বেদী। সে-ইতিহাস বেদনাময়। তাই জন-ব্যাপটিস্টের গির্জা আজ মুসলমানদের একটি বড় তীর্থস্থান। মক্কা-মদিনা-জেরুজালেমের তীর্থ ক'রে মুসলমানরা চতুর্থ তীর্থ শেষ করে দামাস্কাসে এই উমায়েদ-মসজিদে। রক্ত-রাঙানো বেদীতলে মুসলমানরা মন রাঙায় কি ধর্মের তুলিতে? কিন্তু যীশুর দাবিটুকু আজো র'য়ে গেছে উমায়েদ-মসজিদের লিনটেলে। গ্রীকভাষায় খোদাই করা আছে : হে যীশু,

তোমার রাজ্যের বিনাশ নেই ; তোমার রাজ্য বংশ-পরম্পরায় বিরাজ করবে।

বিরাট অট্টালিকা। প্রশস্ত ঘর। সারা ঘরটায় মোটা কার্পেট পাতা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোথাও এককোণে কোনো ধার্মিক আরব চুপ করে বসে হয়তো ধর্মচিন্তা করছেন। একজায়গায় এক মৌলবী কোরান থেকে প'ড়ে শোনাচ্ছেন উপস্থিত শ্রোতাদের। কোথাও বা কয়েকজন ছাত্র মিলে করছে কোরান-চর্চা। কাচের লণ্ঠন ঝোলানো অগুন্তি। পাশে একটা ঘর—গোসলখানা। ভজনার আগে হাত-পা ধোয়ার ব্যবস্থা। ফটো তুললাম কয়েকখানা।

জুতো রাখবার দক্ষিণা ৭৫ পিয়াস্তার বা পনেরো আনা পয়সা গুনে দিয়ে বাইরে এসে জুতোর পা ঢুকোলাম। জানালাম, বড্ড বেশি। জুতো-রক্ষী বুড়ো দাড়ি নেড়ে জানালো, ঐ রেট। অতএব তর্ক করা বৃথা। যস্মিন্ দেশে যথা রেট।

গাইড-ছোকরাও হাত পাতলো। তার মজুরি। এক পাউণ্ড দিতে গেলাম, রাজী নয়। বললো: ইউ 'ম্যারিকান, গিভ ফাইভ পাউণ্ড।

বুঝলাম, ছোকরা আমাকে নিগ্রো ঠাউরেছে। আরো বোঝা গেল, লড়াই-ডলার-পাওয়া নিগ্রো লড়িয়েরা এদের রেটটি নষ্ট ক'রে গেছে। প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে।

বললাম: আই নো 'ম্যারিক্যান। হিন্দি।

তবু আঙুল দেখিয়ে বলে: টু পাউণ্ড গিভ্।

শেষে রফা করলাম দেড় পাউণ্ডে। ছাড়ান পেলাম।

স্ট্রেইট-এর স্বদেশী বাজারে কিছু স্যুভেনির আর ছবি কিনে ট্রাম-রাস্তায় আসা গেল। জুতো-পালিশের বাক্স ঘাড়ে দু'তিনটে ছোকরা প্রায় আমার ঘাড়ে এসে পড়লো, দেখালো আমার জুতো। দরকার ছিল পালিশের—কিন্তু 'ম্যারিকান-রেট চাইলেই তো হয়েছে! হাত নেড়ে জানালাম, নারে বাপু, দরকার নেই।

তবু ছাড়তে চায় না। শেষে সামনে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে করলাম আত্মরক্ষা। পিত্তিরক্ষারও দরকার ছিল। তেষ্টায় গলাও শুকিয়ে গেছে। কিছু কালো-আঙুর আর এক গেলাস বরফ-ঠাণ্ডা লেবুর রস খেয়ে গলাটা সজল হ'লো। কিছু মিষ্টি খাবার কিনে পেট ভরালাম।

দোকানের দেনা মেটাবার জন্যে কিছু খুচরো টাকা হাতে নিয়ে দেখালাম। দোকানী হেসে গুনে নিলো তার প্রাপ্য। ইমানদার দোকানী বেশি নেয়নি। বাকী নোটগুলো মুচড়ে পকেটে ভরলাম। নোট মুচড়ে রাখাই চলন এদেশে। এদেশে কেন, লেবানন তুর্কী গ্রীস ইতালি সর্বত্রই এই নোট-দলন-ব্যবস্থা। অগুন্তি করকমলের পেষণ-আর ঘর্ষণে বেচারা নোটগুলির ঘর্মাক্ত কলেবর। টাকা যে হাতের ময়লা—মাঝ-সমুদ্রের ধারে-ধারের দেশগুলি বুঝেছে যেন মর্মে মর্মে।

এ-গলি সে-গলি ঘুরে ঘুরে খোঁজ পেলাম পোস্ট-অফিসের। বিরাট চওড়া রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড হাল-ফ্যাশানের বাড়ি। রাস্তার ধারে ধারে ফুলের কেয়ারি। পোস্ট-অফিসের সামনে ফুলের বাগান। ছবি-কার্ড কিনে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে লিখলাম চিঠি। ঠিকানা লিখলাম সে-ক'খানার: গড়পার। সেই গলির মধ্যে আমাদের দোতলা লাল বাড়িটা। কাশিপুরে গঙ্গার ধারে বড়বাড়ির তেতলা বাড়িখানা—দূরে ওপারে বেলুড়-মন্দির। বেলগাছিয়ার টালা-পার্কের সামনে 'শনিবারের চিঠি'র গোলাপী রঙের বাড়িটা। প্রেস চলছে ঘটাং-ঘটাং।

ঠিকানা লেখা শেষ হ'লো। হাওয়াই-ডাকে পাঠাবো। কত টিকিট কে জানে! কিন্তু জিগ্যেস করবো কাকে; বাইরে লোকের ভীড় কম। তাই খোঁজকরি নিজে জায়গা ছেড়ে কাউণ্টারের ভিতরে এক টেবিলে জড়ো আরব-ডাকবাবুরা গল্পে মশগুল। দেশের কথাই হ'লো। কাজের-সময়-কাজ-করা ইংরেজের হেপাজতে প্রা দু'শো বছর থেকেও যদি আমরা পারি কাজের সময় আড্ড মারতে, তাহ'লে আড্ডামারা ফরাসী আওতায় থাকা এরা যদি আড্ডা মারতে শেখেই—দোষের কি? চিঠিগু হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম একটা ফোকরের ঘ মাথা গলিয়ে—আরব-বাবুদের কৃপার আশায়। ওদে ডাকবার ভাষা জানিনে। আর যারা জানে, তারা দেখলাম আমারই মতো নির্বাক দর্শক। এক্ষেত্রে আমা পক্ষে 'রা' ছাড়া বিপজ্জনকও তো হ'তে পারে? হ'লে না-হয় বলা যেত, এই যে দাদা, গরীবের দিকে নেকনজর দিন।

পড়লো কৃপাদৃষ্টি কিছু পরেই। কার্ডগুলো এগি দিলাম হাতে। বললাম: পার-আভিওঁ। Par-Avio হাওয়াই-ডাকে। পকেট থেকে বার করলাম মোচড়া নোট। লোকটি ঠিকানা দেখে জিগ্যেস করলো: হিন্দি

বললাম: হুঁ।

হাত থেকে টাকা নিয়ে হিসেব ক'রে টিকিট নিয়ে কা লাগিয়ে রেখে দিল, বাকী পিয়াস্তার গুনে দিল হাতে।

বললাম: মার্সি।

মার্সি! হাসলো লোকটা।

●

জটিরামের কড়চা

অগ্নিমিত্র

। তৈলোপনিষদের ভূমিকা ।

[illegible] তিনবছর যাবৎ আমার অষ্টম কন্যারত্নটি হারমোনিয়মের [illegible] মক্স করিতেছিল। কিন্তু অবাধ্য যন্ত্রটি কিছুতেই পোষ মানিল না। দোকানদার সেই কবে তাহাকে সুরে বাঁধিয়া দিয়াছে, সে সুর হইতে সে একচুলও নড়িবে না। কন্যারত্নও ছাড়িবার পাত্রী নহে। তাহার গলাটিও শিখবীর তক সিং-এর মতো একেবারে বেপরোয়া স্বাধীন। তক সিং পাঠান নবাবকে বেণীর সঙ্গে মাথাটি দিয়াছিল। কন্যারত্ন সুরের সঙ্গে স্বয়ম্বর পর্যন্ত দিল। কিন্তু হারমোনিয়মের মান্য করিল না। ওদিকে গোঁয়ার বাক্সযন্ত্রটিও বাঁকিয়া বসিয়া আছে। তাহার মনিবানীর কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করা তো দূরের কথা, ত্রিসীমানায়ও গেল না। ইহার পরেও আমার কন্যারত্ন যদি কণ্ঠসঙ্গীত চর্চা ছাড়িয়া না দিত, তাহা হইলে কী হইত বলা যায় না। হারমোনিয়ম গেল, আসিল সেতার। এবারে সুরু হইল সেতারের কসরত। শুনিয়াছিলাম, সুর নাকি সাতটি। পরে জানিলাম আরও পাঁচটি নাকি বিকৃত সুর আছে। কিন্তু কন্যারত্নের পিড়িং-পিড়িং শব্দের মধ্যে যখন বারোটি সুর নামতা করিয়া বারো ডজন সুরের আমদানি করিয়া ফেলিল তখন বুঝিলাম, মৌলিক প্রতিভার স্পর্শ পাইলে সুরও আসুরিক পরাক্রম দেখাইতে পারে। যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারও বদল হইয়াছে। গানের মাস্টারটি ছিল হাবারাম। সে যখনই 'অবরোহণে ধাপ্‌পা' শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল তখনই বুঝিয়াছিলাম ছোকরা করিয়া খাইতে পারিবে না। কিন্তু সম্প্রতি সেতারের সঙ্গে যেটির আবির্ভাব ঘটিয়াছে সেটি [illegible] চাণক্য বামুনকেও বোধ হয় সাত ঘাটের জল খাওয়াইতে পারে। প্রথম দিনেই কন্যারত্নকে বুঝাইল, পাঁচবছরের কমে শেখা হয় না। পরের দিন কন্যার গর্ভধারিণীকে বুঝাইয়া ছাড়িল, ওরকম ছাত্রী না পাইলে তাহার ঘরানাগুলি হয়তো কাহাকেও দেওয়ার অবকাশ ঘটিত না। তৃতীয় দিনে একেবারে সরাসরি আমার কাছে আসিল।

হেঁ হেঁ করিয়া বত্রিশ দাঁতের দিব্য বিজুরি সহযোগে বলিল, কী বলব স্যর, এরকম ছাত্রী না পেলে একটা আপসোস থেকে যেত। পাঁচটা বছর হাতে পেলে, আপনার মেয়ের হাত দিয়ে সেতারকে সেরেফ কথা কইয়ে তবে ছাড়বো স্যর, হেঁ হেঁ—।

স্পষ্ট বুঝিলাম, ছোকরা তৈলভাণ্ড হইতে এবারে আমার উপর তেল ঢালিল। তবু চুপ করিয়া রহিলাম। ছোকরা আবার একগাল হাসিয়া বলিল, আপনার মতো গুণী লোকের মেয়ে স্যর, সেটাও দেখতে হবে তো!

সবই বুঝিলাম। তবু শুনিতে বেশ ভালো লাগিতেছিল। ছোকরা কিন্তু ততক্ষণে বেশ গুছাইয়া ফেলিয়াছে। বলিল, আপনিও একটু নজর রাখবেন, স্যর। বেসুরো বেতালা কিছু কানে ঠেকলে ধরে দেবেন। নয়তো সেইটেই হাতে সেঁধে যাবে।

ছোকরার বাহাদুরি আছে বটে! পরের মাস হইতে পাঁচটাকা বেতন বাড়াইয়া লইয়া তবে উঠিল। যাইবার সময়ে হেঁ হেঁ করিতে ভুলিল না। আর আমি? একটি আহাম্মক বনিয়া বসিয়া রহিলাম।

অবশেষে আমিও তেলে গলিয়া গেলাম? আমাকে সঙ্গীতজ্ঞ বানাইয়া ছোকরা এমন চাল মাৎ করিল? যে তৈলশক্তিতে চিটেগুড়ের ব্যবসাদারও ভাতখণ্ডে বনিয়া যায়, তাহার আদি-উৎস সম্বন্ধে ভাবিতে বসিলাম। সেতারের মাস্টার আমাকে আহাম্মক বানাইয়াছে ঠিকই। কিন্তু ছোকরার ক্ষমতার তারিফ না করিয়া তো পারি না। এ সংসারে আখের গুছাইতে কোন্ বুদ্ধিমান কিছু তৈল ঢালেন নাই?

বশিষ্ঠ বলো, বিশ্বামিত্র বলো, ভরদ্বাজ বলো—প্রত্যেকেই তো দেখি তৈলসংহিতায় পারদর্শী ছিলেন। প্রমাণের ছড়াছড়ি আছে। তাঁহারা তো ঋষিব্যক্তি। কিন্তু সোনাদানা, গোধন কিংবা অন্য সম্পত্তির প্রাপ্তিযোগ দেখিলে তাঁহারাও তো তৈলভাণ্ড উপুড় করিতে ছাড়েন নাই। পঞ্চালরাজ সুদাস সোনাদানা, গরুপাল, দাস-দাসীর যে উপঢৌকন ছাড়িয়াছিলেন, তাহাতে মুনিঋষি তো ভালো, দেবতারাও কাবেল হইতেন। সুতরাং ঋগ্বেদে সম্রাট সুদাসের নামে তেলের ছড়াছড়ি [লিপিকারকে বাধ্য হ'য়ে এই কাঠখোট্টা মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হ'য়েছিল। দেখা গেল, রাজা সুদাসের প্রশস্তির কথা অমূলক নয়। ঋক্ ১।১১২।১৯, ১।৪৭।৬, ৩।৩৩ এবং আরও অন্তত সাতটি ক্ষেত্রে ঢালাও প্রশস্তি আছে।—লিপিকার]। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের মতো ডাকসাইটে ঋষিরা যদি পার্থিব সম্পদের জন্যে এত তৈল ব্যয় করিতে পারেন তবে আমার কন্যারত্নের সেতার-মাস্টারের দোষ কী? ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের অত খ্যাতি কেন বলো দিকি বাপু? শুধু ব্রহ্মজ্ঞান? তবে তো কথাই ছিল না। জনক-সভায় ধোঁকা দিয়া বেচারা ভালোমানুষের মেয়ে গার্গীকে হারাইয়া হীরা মুক্তা সোনা, অশ্ব রথ দাসদাসী আর সোমশ্রবা-প্রমত্ত হাজার গোধন পাইয়া যাজ্ঞবল্ক্য কী করিয়াছিলেন? আর সবই নিজে রাখিলেন, শুধু গোরুগুলি অন্যান্য ব্রহ্মবাদীর মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। ব্যস্, যাজ্ঞবল্ক্যের খ্যাতিতে বাতাস মুখর। বিনিপয়সায় অমন হৃষ্টপুষ্ট গাইগুলি পাইলে কে দাতার উদ্দেশ্যে কিছু তেল না ঢালিবে? যাজ্ঞবল্ক্যের এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইল।

তাই বলিতেছিলাম, এ সংসারে আখের গুছাইতে কোন্ বুদ্ধিমান তেল ঢালেন নাই? বেদব্রাহ্মণ নাগালের বাহিরে। আরও পরের কথা বলি। অমন যে মহাকবি কালিদাস, তিনিও কি তৈলপ্রয়োগে কিছু কম্‌তি ছিলেন? রঘুবংশের পোশাক পরাইয়া কোন্ বংশের উদ্দেশ্যে তিনি তৈল প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলো দিকি? স্রেফ গুপ্তবংশের উদ্দেশ্যে। কুমারসম্ভবের কুমার কার্তিকেয়কে যাই বলো বাপু—ওটি বিক্রমাদিত্য-তনয় কুমারগুপ্তেরই মূর্তি। গুপ্তসম্রাট ধনরত্ন দিয়াছেন, প্রাসাদ দিয়াছেন, প্রমোদোদ্যান, যবন-তরুণী মদ্য—যখন যাহা চাই দিতেছেন, তাহার পর কি চুপ করিয়া থাকিবার উপায় ছিল? মহাকবির লেখনী ছুটিল। তৈল-মহিমায় গুপ্তবংশ রঘুবংশের শিরোপা পাইল। যুবরাজ কুমারগুপ্ত একেবারে কুমার কার্তিকেয় বনিয়া গেলেন। মহাকবির কৃতিত্বের পুরস্কার তো হাতে হাতেই মিলিয়াছিল।

কত আর বলিব? বলিতে গেলে, প্রতিটি রাজা-বাদশা আর তার সভাকবির ফিরিস্তি দিতে হয়। রাজা বলেন, আহা, এমন কবি আর হয় না! কবি বলেন, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজের তুলনা কী দিব? ত্রিভুবনে তুলনা নাই। ব্যস্, তেল এদিক হইতেও হইল, ওদিক হইতেও হইল। গোটা ইতিহাসটায় একেবারে তেল-পিচপিচির ছড়াছড়ি। তেলের হোলি-উৎসব লাগিয়াই আছে। তেলের এই অনন্তপ্রবাহে সকলেই ভাসিতেছে। বেদের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত এ-প্রবাহ বহিয়াই চলিয়াছে। এ-প্রবাহ তিস্তা বা দামোদরের মতো নহে যে, শরৎকাল পার না হইতেই শুকাইতে আরম্ভ করিবে। এ প্রবাহে দেব-দেবতা হইতে শুরু করিয়া তুমি আমি পর্যন্ত ভাসিতেছি। শিবঠাকুর বেলপাতায় তুষ্ট হন, ওই বেলপাতাই তাঁহার উপযুক্ত তেল। অফিসের বড়োবাবু 'পুকুরের ইলিশমাছে' খুশী, তাঁহার কাছে তাহাই তেল। এমনকি প্রাণহীন একটা যন্ত্র পর্যন্ত তেল না পাইলে চলে না!

ঘুম আসিতেছে না। শুধু ভাবিতেছি আর

ভাবিতেছি। তৈলের এই মহিমা যদি যুগ-যুগান্ত হইতেই স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে সেতারের মাস্টার আমাকে ভাতখণ্ডে বানাইবে না কেন? এমনি তো তাহার বেতন এককথায় বাড়াইতাম না। পাঁচটি টাকা বাড়াইয়া লইতে যদি দু'চারটি 'ধৈ ধৈ' ব্যয় করিলেই হয়, তবে সে করিবে না কেন? মাস্টার যথার্থ উন্নতিশীল মানুষের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছে। আমিও তাহার বাচনিক তৈলে যথার্থ মানুষের মতোই খুশী হইয়াছি।

অনেক ভাবিলাম। মাস্টারের উপর আগে রাগ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা জাগিতে লাগিল। ছোকরা সত্যই শ্রদ্ধা পাইবার অধিকারী। সে নিজে না ছাড়িলে তাহাকে আমি ছাড়াইব না।

আর একটি পরিকল্পনা মাথায় আসিতেছে। আমি তৈলোপনিষদ লিখিব। জীবজগতে জলের পরেই এমন একটি সর্বশক্তিধারী বস্তুর আস্ত ইতিহাস লিখিব না? দেড় ডজন উপনিষদের মধ্যে তৈলোপনিষদ কেন যে ঋষিরা লিখিয়া যান নাই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা ত্রিকালদর্শী ছিলেন। সম্ভবত ধ্যানযোগে জানিয়াছিলেন, কলিযুগে জটিরাম চাকলাদার এ কার্য সম্পন্ন করিবে। তাই এই গুরু দায়িত্বটি তাঁহারা আমারই ঘাড়ে চাপাইয়া গিয়াছেন। ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মস্তক অবনত হইয়া আসিতেছে। তবু আমি তৈলোপনিষদখানি সেতার-মাস্টারকে উৎসর্গ করিব। সেই ছোকরাই তো আমাকে এত কথা ভাবাইতে পারিল!

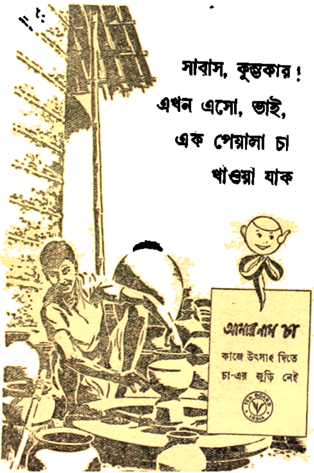

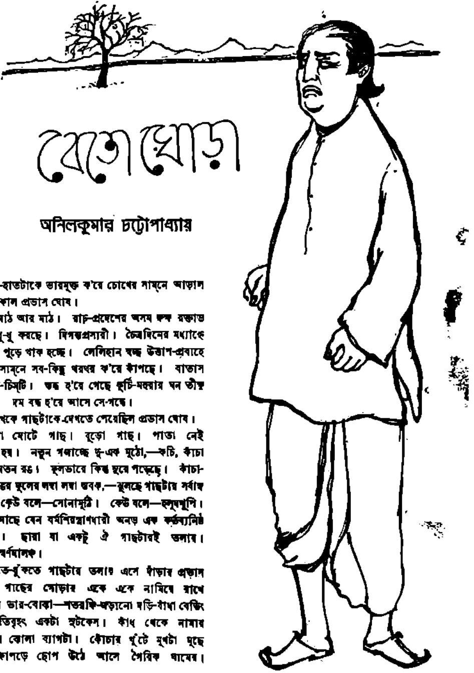

বেতো ঘোড়া

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ডান-হাতটাকে ভারমুক্ত ক'রে চোখের সামনে আড়াল দিয়ে তাকাল প্রভাস ঘোষ।

শুধু মাঠ আর মাঠ। রাঢ়-প্রদেশের অসম রুক্ষ রক্তাভ মাঠ। ধু-ধু করছে। দিগন্তপ্রসারী। চৈত্রদিনের মধ্যাহ্নে খররোদে পুড়ে খাক হচ্ছে। লেলিহান রুদ্র উত্তাপ-প্রবাহে চোখের সামনে সব-কিছু থরথর ক'রে কাঁপছে। বাতাস নেই এক-চিমটি। স্তব্ধ হ'য়ে গেছে ঘুর্টি-মহুয়ার ঘন তীব্র মিষ্টবাস। দম বন্ধ হ'য়ে আসে সে-গন্ধে।

দূর থেকে গাছটাকে দেখতে পেয়েছিল প্রভাস ঘোষ।

একটা মোটে গাছ। বুড়ো গাছ। পাতা নেই বললেই হয়। নতুন গজাচ্ছে দু-এক মুঠো,—কচি, কাঁচা মাংসের মতন রঙ। ফুলভারে কিন্তু নুয়ে পড়েছে। কাঁচা-সোনা রঙের ফুলের লম্বা লম্বা স্তবক,—ঝুলছে গাছটার সর্বাঙ্গ বেয়ে। কেউ বলে—সোনামুঠি। কেউ বলে—হলুদখুপি। দাঁড়িয়ে আছে যেন বর্মশিরস্ত্রাণধারী অনড় এক কর্তব্যনিষ্ঠ মরুপ্রহরী। ছায়া যা একটু ঐ গাছটারই তলায়। রক্তমরুর স্বর্ণপালঙ্ক।

ধুঁকতে-ধুঁকতে গাছটার তলায় এসে দাঁড়ায় প্রভাস ঘোষ। গাছের গোড়ায় একে একে নামিয়ে রাখে দু-হাতের ভার-বোঝা—শতরঞ্চি-জড়ানো দড়ি-বাঁধা বেডিং আর নাতিবৃহৎ একটা সুটকেস। কাঁধ থেকে নামায় পেটমোটা ঝোলা ব্যাগটা। কোঁচায় খুঁটে মুখটা মুছে নেয়। কাপড়ে ছোপ উঠে আসে গৈরিক ঘামের।

তারপর প্রভাস ঘোষ ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ে শুষ্ক মাঠের ওপর। বোঁচকাটাকে কাছে টেনে নিয়ে তার ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দেয় প্রভাস ঘোষ গুঁড়িটার মাথায় ঠেস দিয়ে। মুখ দিয়ে সশব্দে একটা স্বস্তির শ্বাস বার হ'য়ে আসে। পরমতম পরিতৃপ্তির অমৃত-আস্বাদ যেন।

: আঃহ্—!

ওপর থেকে মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান দেখতে হ'লে কী হয়? বয়েস হয়েছে বৈকি প্রভাস ঘোষের। ঠিক কতো, তা হয়তো নিজেও বলতে পারবে না। তবে ষাট তো বটেই।

সকাল থেকে পেটেও প্রায় কিছুই পড়েনি। শুধু এক পেয়ালা গুড়ের চা আর দুটো তেলেভাজা ফুলুরি। কাল সারাটা রাত জেগে কেটেছে। তার ওপর ভোর থেকে সুরু হয়েছে এই হাঁটা-পাড়ি। মাঠের পর মাঠ। একা। তা হাঁটাও বড় কম হয়নি। ক্রোশ-ছয়েক তো হবেই। তার ওপর এই রোদ। মানুষের শরীর তো।…

একাই ফিরতে হচ্ছে প্রভাস ঘোষকে।

এই পথ ধরে ঐ ছ'ক্রোশ দূরের কানাশোল গাঁয়ে দলবল-সমেত মাত্র তিনদিন আগে ওরা যখন পাড়ি দিয়েছিল, তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি প্রভাস ঘোষ যে এত শীগ্‌গির এই পথ একা হেঁটে ওকে আবার ফিরে আসতে হবে। বরং মনে ছিল তখন ঢের অনেক আশা আর নির্ভাবনা। মুছে গেছে সে-সবের সবটুকু। প্রভাস ঘোষ ফিরছে নিঃস্ব, নিঃসহায়, সর্বহারা হ'য়ে।

ওরা—দলের বাকী থেকে গেল পিছনের ঐ কানাশোল গাঁয়ে—সামনে এগিয়ে চলার সাদর হাতছানিতে যারা ফেরার কথা ভাবতেও পারে না—তারা এতক্ষণ কী করছে?…

খাচ্ছে?…

নাঃ, খাওয়া বোধহয় এতক্ষণ হয়ে গেছে। ঘুমোচ্ছে হয়তো রাত-জাগা চোখে—খোড়ো-ঘরের স্নিগ্ধ ছায়ায়—নিশ্চিন্ত প্রশান্ত পরিতৃপ্তিতে।…

প্রভাস ঘোষের বুক ঠেলে বার হয়ে আসে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। বঞ্চিতের নিঃশব্দ হাহাকার। নির্বাসিতের মূক মর্ম-মথন-ধ্বনি।

ওদের সঙ্গে প্রভাস ঘোষের সত্যিই আজ অনেক—অনেক তফাত। যে-তফাত গতরাত আর এই দুপুরে। যে-তফাত মরু আর মাঠকে, জোয়ার আর ভাঁটায়।

একটা বিড়ি ধরায় প্রভাস ঘোষ।

আর মোটে একটা পড়ে রইল পকেটে। শেষ পুঁজি। তারপরেই পুঁজি শেষ।…

মাত্র তিনদিন আগে যে-দলের সঙ্গে এই পথেই যেতে হয়েছিল প্রভাস ঘোষকে, তা কোনও শিকারী-দল নয়, পরিব্রাজক-দলও নয়। নেহাতই যাত্রার দল।

কোলকাতার নামকরা পেশাদার যাত্রাদল 'দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি'।

অনেককালের পুরোনো কুলীন দল। প্রভাস ঘোষেরই মতন পুরোনো। প্রভাস ঘোষের জীবন-মধ্যাহ্নের অনেকগুলো একটানা বছর ঐ-দলে কেটেছে। তারই দৌলতে সেই ক'টা বছরে তদানীন্তন ক্ষুদে-দল 'রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা' পয়লা-নম্বরের অভিজাত দল হ'য়ে উঠেছিল। অধিকারী বৈকুণ্ঠ ভাণ্ডারীর বাড়ি হ'য়েছিল, গাড়ি হ'য়েছিল (অবিশ্যি ঘোড়ার-গাড়ি), হ'য়েছিল বোল্‌বোলাও। আর হ'য়েছিল ঘরের বাইরেও ভাণ্ডারী-কর্তার বারোমেসে বাঁধা দুটি সন্ধ্যা-গৃহিণী।

সেটা ছিল প্রভাস ঘোষের জীবনে স্বর্ণযুগ। জুড়ি ছিলনা তার যাত্রাজগতে। লোকে খেতাব দিয়েছিল—'নট-দিবাকর'। যেমন ছিল চেহারা, তেমনি খ্যাতি, তেমনি আয়। ন'সিকে মণ বালাম-চালের সেই বাজারেই তার মাস-মাইনে উঠেছিল দু'শো টাকারও ওপর। তা ছাড়া 'নজরানা' বা একদল ছেড়ে অন্যদলে যোগ দেবার জন্যে দলের মালিক তাকে কড়কড়ে গুনে দিত কম ক'রেও হাজার-টাকা। তার ওপর আরও ছিল। প্রত্যহ জলপানি বাবদ সাতসিকে, তিন প্যাকেট ট্যাইলার সিগ্রেট, নিখরচায় ধোপা-নাপিত-সাবান-গন্ধতেল, ফরমাস খাটার জন্যে হাতের কাছে হুকুমের অপেক্ষায় তটস্থ দু-দুটো ছোক্‌রা চাকর। পথে বার হ'লে তার জন্যে অধিকারীকে করতে হোতো চলাফেরা-থাকার শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা। এক-পা হেঁটে চলতো না প্রভাস ঘোষ।

আর খাওয়া?…

নটদিবাকরের জন্যে শহর থেকে নিয়ে যাওয়া হোতো কাশ্মিরী বাসমতী চাল, সোনামুগের ডাল, অসময়ের কপি-কড়াইশুঁটি, মাখন, মুর্গী। দলের সঙ্গে সঙ্গে ফিরতো তার জন্যে মেটে-কলসীতে-জিয়োনো কই-মাগুর।

মদ?…

দলে আর গাঁয়ে গাঁয়ে যাত্রার লোক ধরাধরি খোসামোদ করতো দামী 'খাঁটি'র বোতল নিয়ে। বড়

ক'রে কারো বোতল থেকে এক-ঢোক খেলে নিজেকে তারা ভাগ্যবান মনে করতো, বোতলের অবশিষ্টাংশটুকু সম্মান পেতো মহাপ্রসাদের। আরও ছিল হরেকরকম 'অনার'।

সেই প্রভাস ঘোষ আজ হতমান, দলচ্যুত হয়ে চৈত্রের খররোদে হেঁটে ফিরছে একা ছ'ক্রোশ পাড়ি দিয়ে। স্টেশন এখনও আড়াই ক্রোশ। পথে পড়বে শুকনো দামোদরের বিস্তৃত শুধু বালুচড়া। তাও পার হ'তে হবে প্রভাস ঘোষকে হেঁটে,—এই বোঁচকা-বুঁচকি-স্যুটকেস কাঁধে নিয়ে। সেই নটদিবাকর প্রভাস ঘোষই গতরাতে···

মনে পড়তেই শিউরে ওঠে প্রভাস ঘোষ। আপনা থেকেই সজোরে তার চোখ বুজে আসে। প্রভাস ঘোষ ভয় পায় নিজের মন-সঞ্চিত যত স্মৃতিকে।

অবাক কাণ্ড।

চোখ বন্ধ করতেই কিন্তু স্মৃতি আর বিস্মৃতির বন্ধ আগল খুলে যায় হ'য়ে আসে ফেলে-আসা দিনগুলোর চেনা-জানা যত-কিছু। ভিড় ক'রে ঠেলে দাঁড়ায় তারা চারদিক থেকে।

সভয়ে বন্ধ চোখ আবার খুলে ফেলে প্রভাস ঘোষ।

ধোঁয়া।···বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে পাক খাচ্ছে নটদিবাকরের অতীত, তার ইতিহাস। যেন বায়োস্কোপের পর্দার অন্ধকার ফুঁড়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে কত ছবি, কত কথা, কত কাহিনী।···আলো-কালোর বিচিত্র কত হিজিবিজি।···স্পষ্ট। উজ্জ্বল। জীবন্ত। কাছে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।···

কী হবে আর ও-স্বপ্ন দেখে আর ওসব কথা ভেবে?

কাগজের মানুষ দেখা যদি দেয়ই কোনোদিন সত্যিকারের জীবন্ত মানুষের মতন, তবু সে তো সত্যি নয়। সত্যি হ'য়েও আজ কেমন মিথ্যে হ'য়ে গেছে সেদিনের সেই প্রখ্যাত নটদিবাকর প্রভাস-ঘোষ। পড়ে আছে শুধু তার মলিন প্রেতাত্মাটুকু।

হয়তো তাই হয়। তাই হয়তো এ-কালের রেওয়াজ। এই মেকীর দুনিয়ায় কিছু থাকে না, থাকতে পারেনা সত্যি হ'য়ে। রাতে ফ্লাড-লাইটের চোখ-ধাঁধানো আলোয় যে ছিল ত্রিভুবন-ত্রাস রাজা দশানন, দিনের আলোয় রঙ-পোষাকের বাইরে সেই সত্যি-মানুষটাও মিথ্যে হ'য়ে যায় দুষ্ট দর্শকের নজরে। যা সত্যি, যা সত্যস্বরূপ, তাও অবিশ্বাস্যরকম অলীক ঠেকে ওদের রোমাঞ্চ-বাতুলে। তাই হয়তো তেমনি ক'রেই নিত্যরাতের মিথ্যা অভিনয়ে সত্যিকারের প্রভাস ঘোষও আজ মিথ্যে হ'য়ে গেছে সবার কাছে। নিজের কাছেও। তার অস্তিত্ব, তার সুনাম, সম্মান, উপার্জন, বান্ট —সব উবে গেছে। কিছু নেই আজ। কিচ্ছু না।···

পড়ে আছে শুধু মরা বিকৃত লাশটা,—মৌন ইতিহাস।

তাইতো সেই মহামানী, মহাপ্রতিষ্ঠ নটদিবাকর আজ নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা।

কুহু···কুহু···কুহু···

চমকে উঠে মুখ তুলে তাকায় প্রভাস ঘোষ।

একটি অচেনা পাখি এসে বসেছে মাথার কাছে হাতখানেক ওপরেই। ডাকছে।

কালো পাখি, সবুজ ঠোঁট। বসন্তদূত। মধুমাস এসেছে মাটির পৃথিবীতে। গাছ-ভরা ফুলে ফুলে মধু। পাখির মধুকণ্ঠে তার মধুর বন্দনা। মধুঋতু। কিন্তু···

মধুহীন প্রভাস ঘোষের জন্যে নয় এই মধুমাস। বসন্ত আসেনি প্রেত-মানবের জন্যে। প্রভাস ঘোষ আজ বিগত-বসন্ত, বাসী, পুরোনো। ফুল একদিন তারও ফুটেছিল—ঠিক এমনি গুচ্ছে গুচ্ছে—সেই কত যুগ আগে। তারপর কখন এসেছে, কখন চলে গেছে ফুল-ঝরার পালা। এখন শু ফুল-বিরহ। বসন্ত যাদের—ফুলে ফুলে মধুময় ঐশ্বর্য আর যাদের জীবন-ঋতু—তারা আছে অন্যখানে—ঐ দূ কালাশোল গাঁয়ে। প্রভাস ঘোষ তাদের কেউ নয়।···

তাইতো গতরাত থেকে ওদের মধ্যে নটদিবাকর প্রভা ঘোষের আর ঠাঁই হয়নি। তাইতো প্রভাস ঘোষ আ একা, একঘরে। তাইতো ওরা আছে গ্রামলক্ষ্মীর স্নেহচ্ছা আর প্রভাস ঘোষ এই খাঁ-খাঁ মরুপ্রান্তরে।···

চার মিনিটে নাকি ট্রেন ফেল হ'য়েছিল।

আর, একটা রাতে অপমৃত্যু ঘটেছে নটদিবাকরের।

কাল রাতে ওরা প্রভাস ঘোষকে দল থেকে হেঁ দিয়েছে। বোঝাপড়া, হিসেব-নিকেশ তার হ'য়ে গে ওদের সঙ্গে। জীবনের সঙ্গেও। চিত্রগুপ্তের পাকা-খাতা প্রভাস ঘোষ আজ শুধু একটা বাজে-খরচ,—মূল্যহী একমুঠো উদ্বৃত্ত।

বছর তিনেক যাবৎ প্রভাস ঘোষের 'বপ্তি' যাচ্ছিল ডাকতো না কেউ। 'কতো দলে সে নিজেই গিয়েছি উমেদারি করতে। বরাতে জুটেছিল শুধু শুকনো মৌখি অনুকম্পা। নখ-দন্ত-গর্জন-হীন স্থবির পশুরাজকে দে অবাক হ'য়েছে অনেকে, অযাচিত উপদেশও দিয়েছে প্রা সবাই। উপকার করেনি কেউ।···নতুন যুগ। নতুনতে

মানুষের চাহিদা। হাওয়া পাল্টে গেছে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে বৃদ্ধ নটের। সে শুধু আজ কৌতূহলের উপাদান মাত্র। প্রয়োজন ফুরিয়েছে তার। প্রয়োজন ফুরিয়েছে প্রভাস ঘোষের সব-কিছু জরাজীর্ণ পুঁজির। ফুরোয়নি শুধু পেটের মধ্যে আদিম বন্য জানোয়ারটার পাশব দাবি। তাগাদায় তাগাদায় অস্থির উত্যক্ত ক'রে তোলে ঘড়ি-ঘড়ি। ···খিদে।···দুর্বার।···দুঃসহ।···

আপনা হতেই এক-চিল্তে হাসি ফুটে ওঠে প্রভাস ঘোষের ঠোঁটের কোণে।

খিদে আছে। খাবার নেই। কেনার সামর্থ্য নেই। খাবার খাওয়ার মূল যন্ত্রটাও বিকল হ'য়ে গেছে প্রভাস ঘোষের। দাঁত নেই। সেইটাই তো হ'য়েছে তার সবচেয়ে বড় কাল। অন্তত দাঁত থাকলে গতরাতে অমনভাবে তাকে দল থেকে বিদায় নিতে হোতো না।

তবু খিদে আছে। অতীত-দিনের প্রভাস ঘোষের ঐ একটা মাত্র জীবন্ত লক্ষণই পড়ে আছে।···না না, আরো একটা আছে। একটা বদভ্যাস। নেশা।···

ধাপে ধাপে নেমেছে অনেকদূর। 'খাঁটি' থেকে প্রথমে 'কাঁচি'। মানে—দিশী চোলাই। তা থেকে তাড়ি। তাড়ি থেকে গাঁজা। আফিং। ক্রমে গাঁজাটাও ছাড়তে হ'য়েছে। আছে শুধু আফিং। আফিং ছাড়া জোটেই চলেনা। দিনে অন্তত চার আনার। এদিকে সিগ্রেট গিয়ে হ'য়েছে বিড়ি। তাও জোটেনা। ক'দিন 'দান' ছিল। দল থেকেই দুবেলা পেয়েছিল গোটাকয়েক ক'রে বিড়ি। তাতেই খরচটা বেঁচে গিয়েছিল। তারই আর মোটে একটা পড়ে আছে পকেটে। আফিং তো আর ওভাবে মিলবে না।···

বিশ্রী বদ নেশা এই আফিং। একবার ধরলে আর ছাড়ার উপায় নেই। ঘড়ির কাঁটা ধরে রোজ ঠিক সময়টিতে পেটে পড়া চাই-ই। না পেলে, মানুষ অবিশ্যি মরে না। দুর্ভোগ আর যাতনা যা হয়, তা কিন্তু মরণেরও বাড়া।

মানসম্ভ্রম অনেক আগেই গেছে প্রভাস ঘোষের। একটুই আত্মাভিমান পড়ে ছিল,—খিদে যা কোনোদিন জয় করতে পারতো না—তাও গেছে আফিং-এর নেশায়। চুরি, মিছেকথা, ধার, ভিক্ষে, কাঙালপনা—কিছুই বাদ রাখেনি। কালো-মানিকের প্রেমে লাজ-কুল-মান সব-কিছু জলাঞ্জলি গেছে।···

কাল রাতের কাণ্ডটা ঘটলো শুধু অভাব দুখ আর আফিং-এর নেশার বদৌলতে।···

যে-প্রভাস ঘোষকে কেউ ডাকতো না, সেই তাকেই এবার দু'বছর বাদে দয়া ক'রে ঠাঁই দিয়েছিল ঐ 'দি নিউ বয়েজ অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি'। কেন যে ওরা দলে তাকে নিয়েছিল, তা অবিশ্যি প্রভাস ঘোষের অজানা নয়। মাঠ-অঞ্চলের স্থানে স্থানে আজও একদল লোক তার নামটাকে ভোলেনি। বিগতদিনের দিক্পাল যাত্রাভিনেতা নট-দিবাকর প্রভাস ঘোষ সম্পর্কে আজো তাদের মন আর শ্রদ্ধা ফিকে হ'য়ে যায়নি। হয়ত অনেকদিন চাক্ষুষ দেখেনি ব'লেই তাদের স্মৃতিপটে সেদিনের সেই প্রখ্যাত প্রভাস ঘোষের ছবির রঙটা আজো চ'টে যায়নি।

এবারের গাজনের মেলায় 'দি নিউ বয়েজ অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি' পাড়ি জমিয়েছে এই পথে। এ-ধারের গাঁয়ে গাঁয়ে সারা চৈত্রমাস ধ'রে চলে ধর্মরাজতলায় বারোয়ারী গাজন উৎসব। গ্রামীণরা সারা বছর ধরে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে এইক'টা দিনের। ওদের বৈচিত্র্যবিহীন নিস্তরঙ্গ জীবনে বহু-আকাঙ্ক্ষিত মধুলগ্ন। 'দি নিউ বয়েজ অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি'-র অভিনেতৃগোষ্ঠী এবার কিছু কমজোরী। নতুন অধিকারী তরুণ অভিনেতা অচিন্ত্যকুমার দল হাতে নিয়েই কম খরচে বেশী লাভের আশায় ক'জন বেশী দরের অভিনেতাকে ছাড়িয়ে দিয়ে প্রভাস ঘোষকে দলে নিয়েছিল নামমাত্র দক্ষিণায়। ভেবেছিল—এ-অঞ্চলে প্রভাস ঘোষের নামটা ভাঙিয়েই এই একটা মাস দল চালিয়ে লাভের ঝুলিটা ভারী ক'রে নেবে।

দক্ষিণা কম হোক—রাজী হ'য়েছিল প্রভাস ঘোষ। না হ'য়ে উপায়ও ছিল না। আর হপ্তাখানেক তাকে বেকার থাকতে হ'লে অনাহারে অপমৃত্যু ছিল তার অনিবার্য ভবিতব্য। তাই অমন অপমানকর দক্ষিণায় চাকরিও সে সাগ্রহে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। আর একটা আশাও ছিল তার মনে-মনে। অভিনেতার গর্ব—তা সে যেখানকারই অভিনেতা হোক—দর্শক-চোখে অদর্শন মানেই দর্শক-মানসে তার অকালমৃত্যু। প্রভাস ঘোষের অবস্থাও প্রায় তাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান। অকূলে কূল পেলো প্রভাস ঘোষ। মনে-মনে স্থির করলো—কিছুদিন নিয়মিত অভিনয়ের পর হারানো সুনামটুকু সব না হোক, তার অস্তিত্বটুকু সম্পর্কে যাত্রা-দর্শকদের সচেতন ক'রে তুলেই সে অন্য দলে যোগ দেবে। অন্য দলে তখন অপেক্ষাকৃত সাদর ও বর্ধিত দক্ষিণায় আহ্বান দুর্লভ হবে না।

হিসেবে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল দু'পক্ষেরই। নবীন

অধিকারী আর প্রাচীন অভিনেতা দুজনেরই। ভুলটা ধরা পড়তে শুরু হোলো দিনদশেক আগে এ-অঞ্চলে প্রথম অভিনয়-রাতটি হ'তেই।

দেখা গেল—আজকের গ্রামীণরাও আর শুধু দেখেই খুশি হ'তে রাজী নয়। দামের অনুপাতে জিনিসের উৎকর্ষও তারা যাচাই ক'রে নিতে শিখেছে। হাওয়া বদলেছে এখানেও। প্রভাস ঘোষকে নতুন ক'রে দেখে তাদের ঘটলো কল্পস্বর্গ-চ্যুতি। আসরেই তারা তা জানিয়ে দিতে কসুর করলো না। 'নায়েক'-দল বা বায়নাদারেরা আসর ছেড়ে ধেয়ে এলো সাজঘরে। শুনিয়ে গেল অধিকারীকে চোখা-চোখা বাক্যবাণ। কোথাও প্রভাস ঘোষের সামনে, কোথাও বা আড়ালে। আড়ালে যা বলা হোলো, তাও ঠিকই কানে গেল প্রভাস ঘোষের। পৌঁছে দিল অধিকারী-অভিনেতা অচিনকুমার নিজেই,—শানিয়ে বিঁধিয়ে। মরমে ম'রে গেছে প্রভাস ঘোষ প্রতিবারই। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছে।

অবাকও হয়েছে প্রভাস ঘোষ সটান।

আশ্চর্য!…এত শীগ্‌গির এমনভাবে মানুষগুলো বদলে গেল কী ক'রে?…রুচি বদলালো?

বেশির ভাগই সেই একই পালা। সেই প্রভাস ঘোষ। সেই একই ধারায় তার অভিনয়। বয়েস অবিশ্যি তার অনেক বেড়েছে। মেক্‌-আপে তা চাপা দিতেও তো সে কসুর করে না। কণ্ঠ তার আজও আছে তেমনি উদাত্ত। দম অবিশ্যি একটু ক'মে গেছে। দাঁত গিয়ে, উচ্চারণ-অনুপ্রাসে ত্রুটিও যে মাঝে মাঝে হয়না, তা নয়। কিন্তু ঐটুকুতে তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে? মিথ্যা হ'য়ে যাবে প্রভাস ঘোষ—নটদিবাকর?…ঐ সামান্য খুঁতে বাধ্যই হবে দর্শক-অনুরাগীরা?…এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত সম্রাটকে ঐ সামান্য অপরাধে ওরা এমনিভাবে জোর ক'রে মুকুট কেড়ে নিয়ে করতে চাইবে গদীচ্যুত?…

আশ্চর্য!… আশ্চর্য মানুষের মন, মতিগতি আর রুচি।

ঐ তো দলের নবাগত অভিনেতা বিপিনে হাজারী, গদু পণ্ডিত আর, অভিনেতা-অধিকারী অচিনকুমার নিজেও। কী যে সব ঢঙের অ্যাক্টিং-এর ছিরি! না আছে গলা, না আছে পুরুষালী বিক্রম। মিনমিন্ করছে। হাত-পা বেঁকিয়ে, চোখ ঠেরে, ওকী সব বায়োস্কোপে আর্ট আর ন্যাকার্! আগেকার দিন হ'লে ঐ কোয়ালিটিতে কাটা-সৈনিকের পার্টও জুটতো না ওদের অদৃষ্টে। ওরাই আজ গণ্যমান্য কেষ্টবিষ্টু! আসরে নাম হ'তে না হ'তেই হাততালির ফুল-বৃষ্টি বয়ে যায়। সেই দেমাকে মাটিতে পা পড়েনা। যত সব…

কামালপোলে পৌঁছেই প্রভাস ঘোষকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল অচিনকুমার। সবার সামনেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল: না ব'লেও পারিনা। খুব সাবধান কিন্তু এখানে, মাস্টারমশাই!

'মাস্টার' বা 'মাস্টারমশাই' হোলো পেশাদার যাত্রা-দলে পরমতম সম্মানের ডাক। এ-খেতাব যার-তার বরাতে জোটে না। প্রকাশ্যে আজো সবাই প্রভাস ঘোষকে ঐ-খেতাবেই ডাকে। প্রভাস ঘোষ কিন্তু প্রতিবারই চমকে শিউরে ওঠেন ঐ-ডাক কানে গেলেই। মনে হয়—প্রকাশ্য খাতিরের ছলে ওরা সবাই যেন ঐ ব'লে তাঁকে ইচ্ছাকৃত ঠাট্টা ক'রে নিজেদের মধ্যে মজার খোরাক পায়।

শিউরে উঠেছিল প্রভাস ঘোষ। ইঙ্গিতটা বুঝতে তার দেরি হয়নি।

বলেছিল: চেষ্টায় আমি কসুর করবো না।

আশ্বাসে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি অচিনকুমার। আবার বলেছিল: নিজের জন্যে শুধু চেষ্টা করলেই হোলো না। চেষ্টা করবেন যাতে আপনার একার জন্যে চল্লিশটা লোকের মেহনত আর অন্ন মারা না যায়, বুঝলেন?

মুখে জবাব দিতে পারেনি প্রভাস ঘোষ। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল।

তারপরেও অচিনকুমার আবার ছোবল কেটেছিল: চুক্‌ ক'রে ঘাড় নাড়তে কষ্ট হয় না, মাস্টারমশাই। কষ্ট হয়, সানে মার খেয়ে লোকসান দিয়ে সবাইকে কড়কড়ে টাকা 'ঠিকে' গুনে দিতে। কষ্ট হয়, বায়না জোগাড় করতে। এখানেও যদি ঐ বেতো-ঘোড়ার খেল্ দেখান, ব্যস্, একটি পয়সাও না দিয়ে দুইমুখি রাতেই বিদেয় ক'রে দেবে। এখানকার চার-চার দিনের বায়না তো যাবেই ওকম্মো হ'য়ে, এর পরের আট-দশ পালাও অমনি ঐ রিপোর্টে ক্যান্সেল। দয়া ক'রে মনে রাখবেন কথাটা।

মনে-মনে তখন মৃত্যু কামনা করেছিল প্রভাস ঘোষ।

বেতো ঘোড়া!…

নিচু ঘাড় উঁচু ক'রে ওদের দিকে তখন আর তাকাতে পর্যন্ত পারেনি। চোখে না দেখলেও, কানে তার ঠিক এসে পৌঁছেছিল সবার চাপা খুকখুক হাসি।… বেতো ঘোড়া!…

সাজঘরে যাওয়ার ঠিক আগে নিজের আস্তানার কৌটো

ঘুলে আফিং-এর বড়িটি গালে ফেলছিল প্রভাস ঘোষ, ঘরে এসে আবার ঢুকলো অচিন্কুমার।

বিরক্তকণ্ঠে বললো : খাচ্ছেন তো আবার ঐ ছাইপাঁশগুলো? নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! এতো ক'রে মানা করি, কিছুতে যদি আপনার ঐ উরো-স্বভাব পাল্টায়!

বেরোবার মুখেই বাধা। আশু অমঙ্গলের আশঙ্কায় শিউরে উঠলো প্রভাস ঘোষ। যাত্রাদলের চিরন্তন সংস্কার। প্রকাশ্যে আশ্বাস দিতে মিন্‌মিন্ ক'রে শুধু বললো : না না, ও কিছু না। কিছু হবে না।

: আর হবে না। হচ্ছে তো রোজই! বুড়ো হ'লে সত্যিই দেখি মানুষ জানোয়ার হ'য়ে যায়।— গজগজ করতে করতে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল অচিন্কুমার।

পা-দুটো প্রভাস ঘোষের হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেল।··· জানোয়ার!···

সে-রাত্তের অভিনয়ে প্রভাস ঘোষের ছিল ছোট্ট একটা পার্ট।

ঐতিহাসিক পালা। মাঝামাঝি নাগাদ তার দু'সীনের পার্ট। প্রথম রাত্তেই যাতে বায়নাটা ফেস্কে না যায় তাই বোধহয় অচিন্কুমার বুদ্ধি ক'রে সে-রাত্তের জন্যে ঐ পালাটাই ঠিক করেছিল।

অনেকক্ষণ থেকে অনেক কষ্টে সেজেগুজে নিজের জায়গায় খোলা মেক্-আপ বাক্সটার সামনে বসে ছিল প্রভাস ঘোষ। কারো প্রম্পট-প্রদান আর 'ধরতাই' বা 'ক্যাচ-ওয়ার্ড' কেউ কাউকে বলে দেবে না। এমনি পেশাদার যাত্রাদলের অলিখিত নিয়ম। অভিনেতাকে নিজেই সচেতন থাকতে হয়। সীন কেল্ করা মহা অপরাধ। শিল্পীর পক্ষে নিদারুণ গর্হিত অপরাধ। অপমানজনকও। ক্ষমা নেই এ-অপরাধের। সাধারণ সৈনিকটি পর্যন্ত এ-অপরাধে প্রধান অভিনেতাকে অকথ্য বাক্যবাণ শোনাতে পারে। অপরাধী শিল্পীকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয় সে-অপমান। কোনোদিক হ'তে কেউ তাকে দেখাবে না এ-ব্যাপারে এতটুকু সহানুভূতি। উপরন্তু জরিমানাও হ'তে পারে।

সচেতন হ'য়েই বসে ছিল প্রভাস ঘোষ। চেষ্টা করছিল মেজাজটাকে প্রফুল্ল রাখার জন্যে। মনে-মনে আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে তৈরি করছিল ইজ্জতটুকুকে অক্ষুণ্ণ রাখতে। তবু মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়ছিল তার মন। ঝিমিয়ে পড়ছিল উৎসাহ। দুটো কথা বার বার ঘুরে ঘুরে তার কানে বাজছিল—

···বেতো ঘোড়া!···জানোয়ার!···

ভাবতে ভাবতে হয়তো কখন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। হয়তো বা আফিং-এর ঢুলুনিও যোগ দিয়েছিল তার মানসিক অবসাদের সঙ্গে। জেগে উঠলো প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে।

: আপনার সীন্ যে মাস্টারমশাই! যান—যান—

চম্‌কে উঠলো প্রভাস ঘোষ।···সীন্?···কী সর্বনাশ! ···সীন্ কেল্!···

কী বিপদ! নাগরা-জোড়া কোথায় গেল?···

অপেক্ষা করতে পারলো না প্রভাস ঘোষ। জুতোর গাদা থেকে তাড়াতাড়ি দু'পাটি জুতো পায়ে গলিয়ে হোঁচট খেতে খেতে আসরে ছুটলো।

এমন বিশেষ কিছু দেরি হয়নি তার ঢোকায়। তবু দর্শকদের মধ্যে তখন আরম্ভ হ'য়ে গেছে মৃদু গুঞ্জন। আসরে সহ-অভিনেতাদের চোখ থেকে যে-দৃষ্টি ঝ'রে পড়লো তাকে লক্ষ্য ক'রে, আর যাই হোক, তাকে স্বাগত-সম্ভাষ মোটেই বলা যায় না। প্রাণপণে যুঝতে লাগলো প্রভাস ঘোষ, সর্বসামর্থ্যে আরম্ভ করলো অভিনয়। নিমেষে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল দর্শক-গুঞ্জন। জমে উঠলো আসর। হঠাৎ—

ওকী!···আবার কেন উঠছে হাস্যরোল? মৃদুগুঞ্জন ক্রমশঃ উচ্চতর রোল হ'য়ে উঠছে।···ভালো লাগছে না প্রভাস ঘোষের অভিনয়?···ভুল হচ্ছে কিছু?···

অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালো এক সহ-অভিনেতার দিকে। চোখের ইশারা পেয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকালো প্রভাস ঘোষ।···সর্বনাশ! তাড়াতাড়িতে একী কাণ্ড হ'য়েছে!···দুটো নাগরা যে দু'রঙের।···লাল আর বেগুনী।···ছি ছি!···

ভাগ্যক্রমে সীন্টা তখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল।

সাজঘরে ফিরে এলো প্রভাস ঘোষ। সবাই একবার ক'রে তাকালো তার দিকে। মুখে কেউ কিছু বললো না। আশ্চর্য, যাত্রাদলের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় ব্যবহার। প্রভাস ঘোষের মনে হোলো—এর চেয়ে, বাক্যবাণ ছিল অনেক ভালো। ওদের চোখের ঐ নীরব চাহনি—উঃ, ওর সঙ্গে যেন এসে মিশেছে স্তব্ধ সবটুকু উপেক্ষা, উপহাস আর অপমান।···

পরের সীন্টায় অবিশ্যি কোনো ত্রুটি হোলো না। অভিনয় বরং তার ভালোই হোলো সে-দৃশ্যে। তবু থেকে থেকে মৃদু-মৃদু হাসি আর দূরাগত বিদ্রূপ-ধ্বনি ভেসে আসতে লাগলো।

: দুটো জুতো দু'রকমটি কেন হে?

: পাওনাদারে দিছে বটে !

আবার খুক্-খুক্ হাসি। প্রভাস ঘোষের প্রথম দৃশ্যের ক্রটিই হত্যা করলো দ্বিতীয় দৃশ্যের কৃতিত্বটুকুকে।

চূড়ান্ত হোলো খাওয়ার সময়ে।

ঘরে ঢুকতেই ব্যস্ত উচ্চকণ্ঠে রাঁধুনী চিন্তাঠাকুর ফরমায়েস-খাটার ছোকরাটাকে হুকুমজারি করলো: হেই চিনিবাস, ইধারে দেখ্ রে! মোদের মহাবীরটি আইছেন বটে! আসনটি দে-না কেনে ধাঁ করো! মানী জনেরে মান্যটি করিতে শিখিছ নাই?

আহার-রত বহু কণ্ঠে উঠলো উচ্চ হাস্যরোল। প্রভাস ঘোষের মাথাটা ঝুঁকে পড়লো বুকের ওপর।

আসন পেতে কিন্তু প্রভাস ঘোষের দশ মিনিট কেটে গেল।…দুটো শালপাতা। একটা বসবার, একটা খাওয়ার। আধোয়া। শতচ্ছিন্ন।

মিন্‌মিন্ ক'রে প্রভাস ঘোষ ডাকলো: ঠাকুরমশাই!

: আজ্ঞা মাস্টারমশাই!— হাত জোড় ক'রে যেন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলো চিন্তাঠাকুর।

: আর পাতা নেই?

: আজ্ঞা, কেমনটি কয়্যো থাকিবে-কন্, মাস্টারমশাই?— রসিয়ে রসিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলো চিন্তাঠাকুর: যা অ্যাক্টোটি করিছেন আজ আপনারা সব বড় বড় বীর-মহাবীর মিল্যা, ঐ শাল-গাছটিতে পাতা আর একটিও রইল নাই! ঝড়ে ঝড়ে উড়ে গেছে বটে!

আবার উঠলো ওধার থেকে হাসির-রোল।

শেষচেষ্টায় প্রভাস ঘোষ কোনোমতে বললো: কিন্তু এ-পাতায় খাবো কি ক'রে?

ঝটিৎ জবাব দিল চিন্তাঠাকুর: আজ্ঞা, আজ রাতটির মতন উঁইতেই চালায়ো নিন্‌না কেনে, মাস্টারমশাই! কাল সকালটি হইছে কি, অধিকারীরে কয়্যো আপনার জন্যে গঞ্জ হ'তে খাগ্‌ড়াই কাঁসার বগি-থালাটি আনায়্যো রাখিব। আর ইটাও' তো দেখি বাপু; বড়া অন্যায়টি হইছে-মোদের অধিকারিটির—হাঁ। ইমন মানী লোকটি ইত মেহনতটি কয়্যো নিত্যি রাতে তুমাদের চল্লিশটি জনের ইমন উপকারটি করিছে বটে, আর তাঁরে কিনা একটি থালাও কিন্তে দিছ নাই হে!

হাসির অট্টরোল এবার কানে তালা ধরাতে চায়। ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে ওঠে প্রভাস ঘোষের কান-মাথা।

যেতে যেতে ওধার থেকে সেনাপতি কেনারাম পাড়ুই জিজ্ঞাসা করে: ঠাকুর, মাছের মুড়োটা কী হোলো?

: হাই দেখ হে!— যেন প্রশ্নকর্তার অজ্ঞতায় অবাক হ'য়ে জবাব দেয় চিন্তাঠাকুর: শুন হে মোর সেনাপতিটির কথাটি! সিটা যে মোদের মাস্টারমশাইয়ের তরে রেখ্যেছি হে। ইত মেহনতটি করিছেন আজ, তুমাদের চল্লিশটি মাথা রক্ষা করিছেন, মুড়াটি না চিব্যালে বলটি ধরিবেন কেমনে হে?

সারা ঘর থর্‌থর্ ক'রে উঠলো হাসির দমকে। খেতে বসে বার বার নিজের মৃত্যুকামনা করলো প্রভাস ঘোষ। তবু— সেই খাওয়া শেষও ক'রে উঠতেও হোলো।…

শোবার ব্যাপারেও প্রায় তাই।

ওধারের ঘরগুলো পাকা। ওখানে ঠাঁই জোটেনি তার। ওরা সবাই আগে-ভাগে দখল ক'রে নিয়েছে। অগত্যা প্রভাস ঘোষকে ঠাঁই নিতে হ'য়েছে একা এধারে।

ছিল গোয়ালঘর। গরুগুলোকে কোথায় সরিয়ে নিয়েছে। সারা ঘরময় অম্লান চিহ্ন রয়ে গেছে তার। গোবর। খড়। ঘেঁটে-গামলা-ভর্তি দুর্গন্ধ পচা জল। মশা। শ্বাসরোধকারী ভ্যাপ্‌সানি। যে-ধারটা ঈষৎ ফাঁকা, সেখানে দু'আঁটি খড় বিছিয়ে তার ওপর প্রভাস ঘোষ পাতলো তার ছেঁড়া শতরঞ্চির ওপর তেল্‌চিটে বালিশটা।

: আ-ঃ-হ্…

পরম পরিতৃপ্তিতে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দিল প্রভাস ঘোষ।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়লো—রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

ওদের রাত। আর সবার রাত। প্রভাস ঘোষের রাত কবে শেষ হবে গো?…

পরদিন সারাটা দিনই সবাই তটস্থ হ'য়ে রইল। প্রভাস ঘোষ নিজেও। ধীরস্থ-ধীরস্থ অবস্থা।

পালা হবে 'তরণীসেন বধ'। প্রভাস ঘোষকে করতে হবে পালার সবচেয়ে বড় আর শক্ত পার্ট—বিভীষণ। এককালে ঐ-পার্টে নটদিবাকর ছিল অনন্ত। এ-অঞ্চলে তখন বহু জায়গায় ঐ পার্ট ক'রে অজস্র সুনাম কুড়িয়ে গেছে। হয়তো কোনোদিন এই কাদাগোল গাঁয়েও ক'রে থাকবে। ঠিক মনে নেই।

সেই সুনামের জন্যেই প্রভাস ঘোষকে আজ আবার দেখা দিতে হবে ঐ ভূমিকায়। হয়তো 'নায়েক'দের সঙ্গে দলের অমনিই চুক্তি ছিল। হয়তো বা অধিকারী

অচিন্ত্যকুমার চায় প্রভাস ঘোষের সেই সুনাম ভাঙিয়ে আসর মাৎ করতে।

অথচ ভয় সবার সেই প্রভাস ঘোষকে নিয়েই। ভয় প্রভাস ঘোষের নিজেরও।…

নামলো সন্ধ্যা।

ঘরে ঘরে ঘুমকাতুরে মানুষগুলোর কাছে ডাক গেল সাজঘরে হাজির হওয়ার জন্যে।

প্রভাস ঘোষকে অবিশ্যি কেউ ডাকতে গেল না। কারও না। উঠতে হোলো নিজের গরজেই।

আসরে আজ জনসমাগম হয়েছে গতরাতের তিনগুণ। আশপাশের সব-ক'খানা গাঁ যেন ভেঙে পড়েছে।

এসেছে তারা নটদিবাকরের 'বিভীষণ' দেখতে। সেদিনের নটদিবাকরের কৃতিত্বে এদিনের প্রভাস ঘোষ মনে-মনে ভয় আর দুর্ভাবনা সত্ত্বেও খুশি না হ'য়ে পারে না।

হাই উঠলো প্রভাস ঘোষের।

ঘুমকাতুরে হাই নয়। আফিং-এর নেশা জানালো তার রসদের তাগাদা।

বাঁখারিতে টাঙানো জামাটার পকেটে হাত ঢোকালো প্রভাস ঘোষ কৌটোটার জন্যে।…

সাজঘরে হৈ-হৈ কাণ্ড।

প্রভাস ঘোষকে চেনা যায়না। যেন পাগল হ'য়ে গেছে। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা তার আফিং-এর কৌটো।

সবাই জানে, ওটা কার কাণ্ড। প্রভাস ঘোষের নিজেরও তাই অনুমান।

অথচ স্বীকার তো করছেই না অচিন্ত্যকুমার, উল্টে ধমকাচ্ছে।

বলছে: আফিং-খেলা আজ আর আপনার চলবেনা। ঐ কালাচূড় গিলে-গিলেই আপনি রোজ আমার সর্বনাশ করছেন।

করুণতম মিনতি জানায় প্রভাস ঘোষ: না-না, ওতে কিছু হয় না।

: হয়না? কাল রাতের কেলেঙ্কারিটা তবে কেন হ'য়েছিল শুনি? তক্ষুনি মানা করিনি আপনাকে?— ধমকে উঠেছিল অচিন্ত্যকুমার তার অধিকারীর অধিকারে।

: এক-চিমটি দাও, বাবা। এক্টুখানি অন্ততঃ।— আকুতিতে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল প্রভাস ঘোষ।

: না।— দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিল অচিন্ত্যকুমার: আমার দলে থাকতে হ'লে, ও উঞ্ছবৃত্তি ছাড়তে হবে। আফিং আপনাকে আজ খেতে দেওয়া হবে না— হবে না।…

দেওয়া হয়ওনি প্রভাস ঘোষকে আফিং খেতে।

সব আকুতি তার ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল। কিছুতেই প্রভাস ঘোষ ওদের বোঝাতে পারেনি যে, তার সব সামর্থ্য লুকিয়ে থাকে ঐ ছোট্ট কালো-বড়িটির মধ্যে।

সাজতে হোলো। আসরে বারও হ'তে হোলো।

'কালোমানিক' প্রতিশোধ নিতে ভুললো না। দুটো সীন্ শেষ হবার আগেই আসরে কান-পাতা দায় হোলো। যায় বুঝি যাত্রা ভেঙে।

'বিভীষণ' যেন কাদায় ভাসে। প্রাণ নেই। স্ফূর্তি নেই। মেজাজ নেই। পার্ট পর্যন্ত ভুল হ'তে লাগলো প্রতি পদে।

প্রাণপণে যুঝতে লাগলো প্রভাস ঘোষ।

ফল হোলো বিপরীত। উদ্বেগ আর আশঙ্কা যত বাড়তে লাগলো, ততই যেন বেসামাল হ'য়ে পড়তে লাগলো প্রভাস ঘোষ।

বিপদের ওপর বিপদ। দন্তহীন তোবড়া মুখের উচ্চারণকে সামলে রাখতো প্রভাস ঘোষ অভিনয়-কালে ছোট্ট একডেলা মিছরি মুখে রেখে। টুকরোগুলো রাখা ছিল আফিং-এর কৌটোর মধ্যেই। মিছরির সেই টোটকার অভাবে ভাষণও তার হ'তে লাগলো দুর্বোধ্য, বিকৃত।

হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল আসরে।

হাসি…ঠাট্টা…কুকুর-ডাক…হাততালি…চিৎকার…

নায়েব ছুটে এলো। অধিকারীকে শাসিয়ে গেল অকথ্য ভাষায়। তারপরেই…

সীন্ থেকে সাজঘরে ফিরে আসতেই ঘটে গেল কাণ্ডটা।

অচিন্ত্যকুমার বললো: পোশাকটা খুলে ফেলুন, মাস্টার-মশাই।

…পোশাক খুলে ফেলা।…

অভিনেতার চরম শাস্তি আর অপমান। প্রভাস ঘোষ শুনেও যেন শুনতে পেলনা কথাটা। অথবা শুনেও বিশ্বাস করতে পারলোনা নিজের কানকে। মুখে তার জোগালো না একটা কথাও। ফ্যালফ্যাল ক'রে শুধু চেয়ে রইল অচিন্ত্যকুমারের দিকে।

ধমকে উঠলো অচিন্ত্যকুমার: অমন হাঁদার মতন চেয়ে থাকবেন না। খুলুন পোশাক।

: কিন্তু কে করবে এ-পার্ট ?

: আমি। ইচ্ছে হয়, দেখে শিখে নিন—অ্যাক্টিং কাকে বলে। আমারও যেমন! সাধ ক'রে এক বেতো-ঘোড়া পুষতে গিয়েছিলুম।

বেতো ঘোড়া!···

অ্যাক্টিং শিখতে হবে প্রভাস ঘোষকে কালকের ছেলে অচিনকুমারের কাছে ? এই কথা ঐ অতো লোকের সামনে অচিনকুমার তাকে বলতে পারলো ?···

এগিয়ে এলো বেশ-কারী চিনিবাস তার সাজ খুলে নিতে। গায়ে হাত পড়লো।

ঠিক সেইমুহূর্তে প্রভাস ঘোষের সীট-এ ব'সে, তারই বাক্স থেকে মেক্-আপ নিতে নিতে অচিনকুমার ব'লে উঠলো : কাল সকালে উঠেই আপনার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবেন। আমার এটা ধর্মশালাও নয়, পিঁজরে-পোলও নয়। বেতো-ঘোড়া পোষার শখ আমার মিটে গেছে।

বেতো ঘোড়া!···

এতটুকু আটকালো না অচিনকুমারের মুখে ?···বলতে পারলো ?···

হুক···হুক···হুক···

চমকে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো প্রভাস ঘোষ। ব্যাহত হোলো চিন্তাসূত্র।

পাখিটা এখনও ডাকছে। বসে আছে ঠিক একই জায়গায়। ডাকছে, না, ও-ও অজানা ভাষায় ঠাট্টা করছে বেতো-ঘোড়া প্রভাস ঘোষকে ?···বেতো ঘোড়া!···

কী ক'রে অচিনকুমার ঐ কথাগুলো প্রভাস ঘোষকে বলতে পারলো ?

আজ বড় হ'য়েছে, টাকা হ'য়েছে, মালিক হ'য়েছে দলের। সেদিনের সেই অ্যাত্তোটুকু নাচিয়ে-ছোঁড়া 'অনা' আজ নামে ডাঙ্গিয়ে হ'য়েছে 'অচিনকুমার'।···কিন্তু হ'য়েছে কী ক'রে ?···কার দয়ায় অনা আজ বড়-অভিনেতা অচিনকুমার ? ভুলে গেছে সেসব ইতিহাস ?···

নাচতো। আর ফরমাশ খাটতো অনা সেদিন। হাঁ, এই 'বয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা'তেই। পরে হাতবদল হ'য়ে নতুন নামকরণে 'দি নিউ' সামনে, আর পিছনে 'পার্টি' যোগ হ'য়েছে। ও ছিল এই নটবিবাকরেরই খাস ছোকরা। বিছানা পাততো, বিছানা বাঁধতো, তেল মাখাতো, পা টিপতো, রোদে পাড়ি দিতে মাথায় ছাতা ধরতো। কতই বা তখন বয়েস ওর ? বড়জোর দশ-এগারো।···

যাত্রাদলে নাম-করা অভিনেতাদের সবারই থাকে অমন খাস ছোকরা। ওটা 'অনার্' বা সম্মানী।

লোকচক্ষুর সামনে তারা ফাই-ফরমাশ খাটে। সেবা করে। সেবা করে লোকচক্ষুর আড়ালেও। অন্ধকার রাতে-অন্ধ তামস-লীলা। ফোরাচায়। সবাই জানে। যাত্রাদলে চল্‌তি কথা রয়েছে—'সমারীর মধ্যে বাদশার হারেম'। অর্থাৎ—সেকালের বাদশার হারেমের মতন রাতের বেলায় যাত্রার-দলের সমারীর মধ্যে হয়না এমন কোনও অপকর্ম নেই। সবই সম্ভব।

নাঃ, প্রভাস ঘোষের আর যত দোষই থাক্, ও বদভ্যাস কোনোকালে ছিল না।

নারী ?···

নারী অবিশ্যি নটবিবাকরের জীবনে আনাগোনা করেছে অসংখ্য। চিৎপুরে কারো ঘরে পায়ের-ধুলো দিলে তারা ধন্য হোতো। জোর করে টেনে নিয়ে যেতো। মুখাবাধে তো শেষ অবধি···থাক্ সে-কথা।

পথে-পথে আর গাঁয়ে-সহরেও কত সে রোমাঞ্চকর অভিযান, অভিসার আর অভিজ্ঞতা!

আজ সেসব যেন রূপকথা।···

মুছে গেছে প্রায় সবাই।

মনে আছে শুধু তিনজনের কথা। তাদের স্মৃতি ভোলার নয়।

খোশপুরের সেই কাজললতা।

কাজ্‌লা তরুণী। যেন চুম্বকে-গড়া একটা সজীব কামধীপাড়।···

মোহনগড়ের ছোট-বৌরাণী অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণার মতোই শ্রীমতী। সর্বাঙ্গ ঝলমল প্রাচুর্যসম্ভারে। সাত-সাতটা রাতের সেই চুপিসাড়ে নিশিরাতে সাতমহল পার হ'য়ে অভিসার। কত কথা। কত রঙ। কত ছবি-আঁকা!

শেষরাতে—হঠাৎ কী ক'রে যেন টের পেয়ে গেল কর্তারা। হানা দিল পাইক-বরকন্দাজ খাসমহালের বন্ধ দরজার সামনে। পালাবার অন্য পথ ছিল না। তাই খিড়কির খোলা জানলা-পথে দোতলা থেকে লাফ দিয়েছিল পিছনের উলুবনে। ভাঙা একটা বোতলে কাটা হ'য়ে গিয়েছিল পা-টা। রক্তমূল্যে রোমান্সের দেনা শোধ। সে-দাগ আজ আছে প্রভাস ঘোষের পায়ে।···

আর একজন ? সে হোলো···

নাঃ, থাক্। থাক্ আর তার কথা। রূপকথা আবার সত্যি হয় নাকি?…

'অনা'র ভালোই হয়েছিল প্রভাস ঘোষ। নটদিবাকরই প্রথম ওকে দিয়েছিল চরিত্রাভিনয়ের দুর্লভ সুযোগ।

এমনি কোন্ এক গাঁয়ে সে-রাতে পালা হবে 'হরিশ্চন্দ্র'। রোহিতাশ্বের পার্ট করতো যে-ছোকরা, হঠাৎ তার সর্বাঙ্গে হাম বেরুলো।

উপায়?…

ম্যানেজার খাড়া করতে চাইল অন্য একটা ছোকরাকে কোনোরকম জোড়াতালি দিয়ে। সবার বাধা অগ্রাহ্য ক'রে প্রভাস ঘোষই প্রথমে সেই আসরে অনাকে নামিয়েছিল রোহিতাশ্ব ক'রে। তারপর থেকেই ওর প্রমোশান ঘটলো নাচিয়ে থেকে বালক-অভিনেতায়। সেবার যতদিন ও-দলে ছিল প্রভাস ঘোষ, নিজে তালিম দিয়ে তৈরি ক'রে অনাকে নানান পার্টে নামিয়েছে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বালক-কৃষ্ণ, একলব্য, অভিমন্যু, ইলাবন্ত—কত কী। সেই অনা আজ দলেরই অধিকারী হ'য়ে সেই নটদিবাকরকেই…

আচ্ছা, সেটা কোন্ গাঁ, যেখানে নটদিবাকর রোহিতাশ্বের পার্টে প্রথম নামিয়েছিল অনাকে?…

কোন্ গাঁ?…কোন্ জেলা?…কেন মনে পড়ছে না?…

কুক্…কুক্…কুক্…

আবার ডাকছে পাখিটা। চোখ তুলে একদৃষ্টে পাখিটার দিকে তাকিয়ে প্রভাস ঘোষ ভাবতে চেষ্টা করলো সেই গাঁ-টার নাম। হঠাৎ…

চমকে উঠলো প্রভাস ঘোষ। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো—গাছটার গায়ে একজায়গায় একটা কাটা দাগ।. পাখিটা ভয় পেয়ে উড়ে গেল।

কাটা দাগ। অনেক—অনেক দিন আগে—ঐখানটায় ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে কী যেন লিখে রেখেছে কে। ডালটা শুকিয়ে গেছে। লেখাটা আরো স্পষ্ট হ'য়েছে।

প্রভাস ঘোষের সর্বাঙ্গে এক বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল।

মনে পড়েছে!…স্পষ্ট মনে পড়েছে সব কথা!…

হ্যাঁ, এই গ্রামেই। এই কাদাগোলেই অনাকে নটদিবাকর প্রথম সুযোগ দিয়েছিল। আশ্চর্য যোগাযোগ…

ঠিক এমনি দুপুরে সেদিনও দলটা পাড়ি দিচ্ছিল এই মাঠ।

সবাই হেঁটে। শুধু নটদিবাকর প্রভাস ঘোষের জন্যে নায়েকরা পাঠিয়েছিল একটা টাট্টু-ঘোড়া। তার সম্মানী। ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে মাঠ পার হচ্ছিল প্রভাস ঘোষ। পাশে পাশে একহাতে একটি গলায়-দ'ড়ে বেটে-কলসীর মধ্যে জিয়োনো কই-মাগুর আর অন্য হাতে একটা খোলা ছাতা প্রভাস ঘোষের মাথায় ধরে হাঁটছিল অনা। যাত্রাজগতে নটদিবাকর তখন একচ্ছত্র সম্রাট। তাই তার মাথায় থাকতো ছাতার ব্যবস্থা। এক পা হাঁটতো না। তাই ঘোড়ার যোগাড়। আর কলসীতে জিয়োনো মাছও তারই ভোগের জন্যে।

ক্লান্ত দল বিশ্রাম করতে বসেছিল।

এই গাছটার তলাতেই ঠাঁই নিয়েছিল প্রভাস ঘোষ। অনা বাতাস করছিল, পা টিপে দিচ্ছিল। নেহাত বাচ্চা তখন। খেলাচ্ছলে সে-ই তখন ছুরি দিয়ে গাছের ঐ ডালে

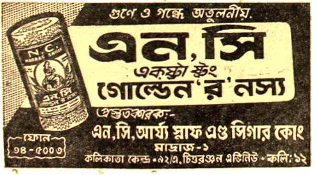
গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়.
এন,সি
একস্ট্রা স্ট্রং
গোল্ডেন 'র' নস্য
প্রস্তুতকারক:-
এন,সি,আর্য্য স্নাফ এণ্ড সিগার কোং
মাদ্রাজ-১
কলিকাতা কেন্দ্র • ৯২/এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ • কলি: ১২
ফোন
৩৪-৫০০৩

খোদাই ক'রে রেখেছিল প্রভাস ঘোষের নামের পাশে তার নিজেরও নামের আড়ম্বর।

সেই গাঁ আজও রয়েছে। রয়েছে সেই মাঠ, সেই হলুদধুলি গাছ, সেই খোদাই, সেই অনা আর সেই নটদিবাকর প্রভাস ঘোষও। সবই আছে। শুধু চাকা ঘুরে গেছে। ওপরের জন নিচে নেমেছে, নিচের জন উঠেছে ওপরে। অনা হ'য়েছে অভিনেতা-অধিকারী অচিনকুমার, আর নটদিবাকর হ'য়েছে একটা অনাবশ্যক জঞ্জাল,—বেতো ঘোড়া।···

নেমকহারাম।···তামাম দুনিয়াটা নেমকহারাম!···ঐ কাদাগোলা-গাঁয়ের সবাই, ঐ অচিনকুমার,—সবাই বেইমান। তা না হ'লে, এমন ব্যবহার ওরা আজ প্রভাস ঘোষের সঙ্গে করতে পারে? বলতে পারে তাকে অমন ক'রে অমন কথা? নটদিবাকরের নিজের হাতে তৈরী ঐ অচিনকুমার—তারই সৃষ্টি···

ঠুক···ঠুক···ঠুক···

আবার এসে বসেছে পাখিটা। ঠিক একই জায়গায়। ঠোকরাচ্ছে খোদাইটার ওপর।

খোদাইয়ের ডানপাশের প্রশাখাটা শুকিয়ে গেছে। অনেককাল আগেই হয়তো। কিন্তু—আশ্চর্য! শুকনো প্রশাখাটার সন্ধিস্থল থেকে বার হয়েছে আর-একটা প্রশাখা। সেটা সবুজ, সতেজ, পত্র-পুষ্প-ভারাবনত। প্রায় ঢেকে ফেলেছে শুকনো প্রশাখাটাকে। আর হয়তো একটা বছরের মধ্যেই পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে।

অত দুঃখের মধ্যেও প্রভাস ঘোষের ঠোঁটের আড়ালে এক-চিমটি দার্শনিক হাসি উঁকি দিতে চায়।

··· ঐ প্রশাখা-দুটো—ঠিক যেন এদেরই প্রতীক। শুকনোটা নটদিবাকর নিজে। সবুজটা অচিনকুমার। ঠিক অমনিভাবেই আর হয়তো একটা বছরের মধ্যেই নটদিবাকরের নিজেরই সৃষ্টিই তাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্নগ্রাস ক'রে ফেলবে।

আচ্ছা, কেন এমন হয়?

স্রষ্টাকে গ্রাস করে ফেলবে তার সৃষ্টি?

একটু মমতা হয় না? দুঃখ নয়? কৃতজ্ঞতাটুকুও নয়?

প্রভাস ঘোষ কি কোনোদিন তার স্রষ্টাকে এমনিভাবে···

চমকে শিউরে উঠলো প্রভাস ঘোষ।

হাঁ হাঁ, সে-ও। প্রভাস ঘোষ যার সৃষ্টি, যার অকুণ্ঠ অপত্যস্নেহে তার যত-কিছু সুযোগ, সম্মান আর প্রতিষ্ঠার কারণ,—সেকালের এই 'রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা'-র অধিকারী সেই বৈকুণ্ঠ ভাণ্ডারীর সে চরম সর্বনাশ করেছিল। সেই মর্মান্তিক আঘাতের পর বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠ ভাণ্ডারী দু'টো মাসও বাঁচেনি।

একমাত্র মেয়ে তার মল্লিকা। ওরা নাকি পরস্পরকে ভালবেসেছিল। তারপর···

প্রভাস ঘোষ হোলো 'নটদিবাকর'। নাম আর অর্থের মোহ তাকে মাতাল করে তুললো। রামধনুর সাতটা রঙে রাঙানো সেই কল্পলোকে আটপৌরে মাটির মেয়ে মল্লিকার আর ঠাঁই হোলো না। ধুলোর উর্বশী সুরাবাঈ এসে ঘূর্ণিঝড় তুললো। সেই ঝড়-দুর্যোগে সমাসন্ন মাতৃত্বের কালে ঘর থেকে পথের ধুলোয় কোথায় ছিটকে গেলো মল্লিকা। কোথায়? কে জানে?

এতটুকু বাধেনি তখন নটদিবাকরের, এতটুকু মমতা বা কৃতজ্ঞতা সেদিন তার মনে জাগেনি সেই কলঙ্কিত পিতা-পুত্রীর জন্যে।

মল্লিকা হ'য়েছিল লোকপ্রিয়া।

এই মল্লিকাই হোলো নটদিবাকরের জীবনে তৃতীয় অবিস্মরণীয়া।···

সবাই জানে অচিনকুমার নাকি সেই মল্লিকারই সন্তান।

নটদিবাকরের নিজের?···

আতঙ্কে শিউরে উঠলো প্রভাস ঘোষ। কিছু বল যায় না।···

দিবাকর অস্ত যাচ্ছে। যাত্রাদলের দিবাকরও।

এবার উঠতে হবে প্রভাস ঘোষকে। যেতে হবে স্টেশনে।

স্টেশন!···

প্রভাস ঘোষের সেই স্টেশন কোথায়? আরও কতদূ সো?···

বেতো-ঘোড়াটা সেই অত পথ পাড়ি দিতে পার তো?···

নতুন প্রয়োগকৌশল

আরও ভালো বস্ত্রসামগ্রী তৈরী করার জন্য, আমাদের হাতের তাঁতের শিল্পীগণ, আধুনিক প্রয়োগ কৌশল কাজে লাগাচ্ছেন। বিভিন্ন রাজ্যে ৩৭২টি রঞ্জকরণ কেন্দ্র ও ৬১টি নমুনা তৈরীর কারখানা ছাড়াও বর্তমানে সুতো রঙ করা, হাতের তাঁতের বস্ত্রসামগ্রীতে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া ও বস্ত্রাদি মসৃণ করার জন্য ৭টি কেন্দ্র রয়েছে।

হাতের তাঁত

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার
একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র

নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড
পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০০৪, বোম্বাই-১

[illegible]

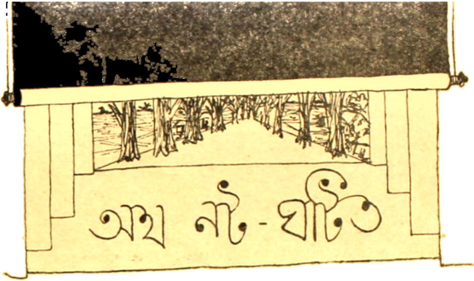

অথ নাট-ঘটিত

সূত্রধার

১১

গত শতাব্দীর নবম দশকে কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে 'ভারতীয় সংগীত-সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সম্পাদক। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বর্ণনা দিচ্ছেন—এখানে জাজিম, ফরাশ, তাকিয়া, গড়গড়া, তাস-পাশাও থাকত, আবার বিলিয়ার্ড-টেবিল, টেবিল-অর্গান, পিয়ানোও স্থান পেতো। জমিদার আসতেন, মস্তো চাকুরে আসতেন, ব্যারিস্টার আসতেন ; চাঁদা বেশি, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের দ্বার কারুর কাছে রুদ্ধ ছিল না। এখানে প্রায়ই গান-বাজনার আসর বসত, বাইরে থেকে কোনো ওস্তাদ কলকাতায় এলে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে তাঁর গান শোনানো হত। মাঝে মাঝে অভিনয়ের আয়োজন হত, আর সভ্যেরা বিশেষভাবে চেষ্টা করতেন যাতে অভিনয়ের মান খুব উঁচুতে ওঠে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' 'অলীকবাবু' এখানে অভিনীত হল। অভিনয়ের সময় বিভিন্ন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠানের সভ্যেরাই নামবেন এইরকম স্থির হল, কিন্তু গোল বাধল স্ত্রী-চরিত্র নিয়ে। প্রতিষ্ঠানে মহিলা-সভ্য নেওয়া হতনা। এইজন্যে কয়েকটি ছেলেকে মাইনে ক'রে রাখা হল, স্ত্রী-ভূমিকা তারাই নেবে। বিলাত-ফেরত সভ্যেরা একটু ব্যাঁকা-ব্যাঁকা উচ্চারণ করেন, তাঁদের উচ্চারণ শুধরে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই সংগীত-সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর তিনি যে কাজে হাত দেন, সমস্ত অন্তর দিয়ে পুরোপুরি ভাবে তা করেন। দুপুরবেলায় এসে একদফা রিহার্সাল দিয়ে যান, সন্ধ্যায় সময় আবার এসে রিহার্সাল আরম্ভ করেন, শেষ ক'রে বাড়ি ফিরতে এক এক দিন রাত্রি একটা-দেড়টা বেজে যেতো।

এই সংগীত-সমাজের জন্যে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'গোড়ায় গলদ'। [ভবিষ্যতে শিশিরকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক অভিনীত হবার সময় নাটকটা পালটে তিনি 'শেষরক্ষা' রাখেন, স্থানে স্থানে পরিবর্তন করেন।] তখনও বই ছাপা হয়নি, রিহার্সাল চলেছে। কথাবার্তায়, হাবভাবে, চালচলনে, গলার স্বরে, শব্দের উচ্চারণে যাতে ঘরোয়া ভাব ফুটে ওঠে

রবীন্দ্রনাথ সেইভাবে শিক্ষা দিতে থাকলেন। এতে রইলেন—

বিনোদ—হেমচন্দ্র বসু মল্লিক
ললিত চাটুয্যে—ব্যারিস্টার কৃষ্ণ চাটুয্যে
চন্দ্রবাবু—ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসু
শিবু ডাক্তার—অটলকুমার সেন

শোনা যায়, অভিনয়কে স্বাভাবিক করবার জন্যে অটলবাবু রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত শিক্ষারও উপরে গেলেন, সামনের দুটো দাঁত তুলে ফেলে বাঁধানো দাঁত পরলেন। শ্রীশ বসু চন্দ্রবাবু সেজেছেন, শেষ দৃশ্যে তাঁর গান আছে—

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো—

কিন্তু শ্রীশবাবু গাইতে পারেন না; তখন চন্দ্রবাবু তাঁর বন্ধুদের বললেন—আপনারা একটু বসুন, রবিবাবুর এখন আসবার কথা আছে, তাঁর গান আপনাদের শোনাব। বলতে বলতেই রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করলেন; চন্দ্রবাবু সকলের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন, তার পর রবীন্দ্রনাথ ওই গানটি ধরলেন।

সংগীত-সমাজেরই তাগিদে রবীন্দ্রনাথ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' লিখলেন। সেই সময় প্রহসন রচিত হত সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ ক'রে। রবীন্দ্রনাথ সে-পথ ছেড়ে দিয়ে তাঁর প্রহসনগুলিতে অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করতে থাকলেন।

সাহিত্য, অভিনয়, নৃত্য, সংগীত, চিত্র এই বিভিন্ন কলার একত্র সমাবেশ হয়েছে নাট্যশালায়। যিনি প্রযোজক হবেন তাঁকে এই সবক'টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে আর প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁর পারদর্শিতা থাকা চাই। শিক্ষিত বাঙালী এইরকমের একজন প্রযোজক পেলেন রবীন্দ্রনাথে। সাধারণ নাট্যশালার দিকে তাকিয়ে তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে; ওইরকমের প্রযোজক গিরিশচন্দ্রও ছিলেন না, অমৃতলাল বসুও নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো নাটক মঞ্চস্থ করেন কালেভদ্রে, আর ঠাকুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া ক'জনের সেখানে প্রবেশাধিকার আছে?

তবে শিক্ষিত রসজ্ঞ বাঙালীকে খুব বেশিদিন নিরাশার মধ্যে থাকতে হল না। তাবীকালের এক প্রযোজক তখন গোকুলে বাড়ছিল, আর সে-গোকুল হল কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট।

এখানে প্রতিবছর বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। ছাত্র শিশিরকুমার ভাদুড়ী কয়েক বছর এই প্রতিযোগিতায় ইংরেজি ও বাংলা আবৃত্তিতে প্রথমস্থান অধিকার করেন। ১৯০৮ সালে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য একটি ফণ্ড স্থাপিত হয়। ইন্স্টিটিউটের সভ্যেরা বছর বছর টিকিট বিক্রি ক'রে নাটক অভিনয় করত, আর উদ্বৃত্ত অর্থ ওই ফণ্ডে দিত। প্রথম বছর 'কুরুক্ষেত্র' অভিনীত হল, আর শিশিরকুমার তাতে অভিমন্যুর ভূমিকায় নামলেন। সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা ও ইন্স্টিটিউটের সভ্যেরা মাঝে মাঝে সেক্স্পীয়রের নাটক অভিনয় করত। শিশিরকুমার *Hamlet*-এ Ghost ও King এই দুই বিভিন্ন অংশে অবতীর্ণ হন। ১৯১০ সালে 'বুদ্ধদেব' নাটকে বুদ্ধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। পরের বছর ওখানে 'চন্দ্রগুপ্ত'র অভিনয় দেশের শিক্ষিত সমাজকে সচকিত করল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ওই নাটক একই সময়ে অভিনীত হচ্ছে; সেখানে দানীবাবু চাণক্য; এখানে এই ভূমিকা নিলেন শিশিরকুমার। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শিশিরকুমার জয়ী হয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন। তবে তিনি ওই চরিত্রের এক নতুন রূপ দিলেন।

এখানে রবীন্দ্রনাথের 'পথের সঞ্চয়' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করি। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে-ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্‌ঘর্ম ব্যাপার দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের 'হ্যামলেট' ও 'ব্রাইড অফ লামার্‌মুর' দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই ঘোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।"

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বলি, শিশিরকুমারের চাণক্যে এই 'অসংযত আতিশয্য' বেশ কিছুটা ছিল।

যাক, এই নাটকের অভিনয়ে সহযোগীরূপে তিনি

'ফাল্গুনী' অভিনয়ে সমরেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনা

পেয়েছিলেন কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীকে। অভিনয়ে নামলেন চন্দ্রগুপ্ত রূপে প্রকাশচন্দ্র বসু, কাত্যায়নের অংশে প্রথমে কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় রাত্রি হতে নরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। তখনকার দিনে জ্ঞানপ্রিয় মিত্র ছিলেন একজন জনপ্রিয় গায়ক, তাঁর ভিক্ষুকের গানে শ্রোতারা মুগ্ধ হল। সম্পাদক ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, অঘোরনাথ ঘোষ। পাত্রপাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ যাতে কালানুযোগী হয় সে-সম্বন্ধে তাঁদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। ইন্‌স্টিটিউটে নাটক-প্রযোজনায় সভ্যদের সব সময় কতকগুলি অলঙ্ঘনীয় বাধার সম্মুখীন হতে হত। প্রথম, উদ্বৃত্ত অংশ ছাত্র-ভাণ্ডারে যাবে, সুতরাং খরচ যথাসম্ভব কম করতে হবে; ইন্‌স্টিটিউটে মেয়ে-সভ্য নেওয়া হয় না (আজও নয়), সুতরাং স্ত্রী-চরিত্র ছাত্রদেরই নিতে হবে; সিন বাইরে থেকে ভাড়া ক'রে আনতে হবে, সুতরাং তাদের রুচির উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এসব অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেদিন শিক্ষিত বাঙালী শিল্পক্ষেত্রে এক নতুনের পদধ্বনি শুনতে পেল। সে-কথায় পরে আসা যাবে; ঠাকুরবাড়ির অভিনয়ে ফিরে যাওয়া যাক।

প্রযোজকের যেসব গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে, পূর্ণমাত্রায় সেসবের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ; তাঁর কয়েকটি সুবিধাও ছিল। সহযোগীরূপে তিনি পেলেন গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও পরে নন্দলাল—এক-একটি দিক্‌পাল। প্রযোজনার অর্থের দিকটা তাঁকে ভাবতে হত না। তবে একবার ভেবেছিলেন, 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের সময়। সেবার টিকিট বিক্রি করা হবে, আর উদ্বৃত্ত অর্থ বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে পাঠানো হবে; কাজেকাজেই খরচ যথাসম্ভব কম করতে হবে।

ইন্দিরা দেবী লিখছেন—

"অবনদাদার মঞ্চ-সজ্জার কথাও উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালের সেই বিলকুল বিদেশী নকল তুলে দিয়ে তার জায়গায় পিছনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন, সেটি এখনও দেওয়া হয়। তার উপর কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটি মাত্র লাল ফুলের উপরে একটি ক্ষীণ চন্দ্ররেখা। রথী মিন্টু ওঁরা টিকিট বিক্রী ক'রে বোধহয় দশ-বারো হাজার টাকা তুলেছিলেন, ঠিক কত আমার মনে নেই, কিন্তু তখনকার পক্ষে বেশ ভারি অঙ্ক। অভিনয়ান্তে যখন আমরা উঠোন ছেড়ে দোতলায় উঠলুম এবং দুইবাড়ির মাঝখানে নাম-সার্থক-করা সাঁকোয় দাঁড়িয়ে আছি তখন রবিকাকাকে লক্ষ্য ক'রে বললুম যে, তোলা টাকাটা যেন ঠিক হাতে গিয়ে পৌঁছয়। তার উত্তরে তিনি 'ফাল্গুনী'র মাঝির একটা কথা উদ্ধৃত করে বললেন,—আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত নয়।"

'ফাল্গুনী'তে রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন অন্ধ বাউল। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এক-একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পিয়ার্সন সাহেবও একটা পার্ট নিয়েছিলেন।

পঁয়ষট্টি বছর ধরে লেখক থিয়েটার দেখে আসছে; আজও বিরাম নেই। তাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এতদিন ধরে তো থিয়েটার দেখছ, কোন্ থিয়েটারের কোন্ অভিনয় তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে? উত্তরে, তাকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে। ১৯১৭ সালে জোড়াসাঁকোতে বিচিত্রা-ভবনে 'ডাকঘর'-এর যে অভিনয়

হয়, আর অবধি কোনো অভিনয়ই তার কাছে পৌঁছতে পারেনি। দোতলায় হল-ঘরের পশ্চিম দিকে এক চালা-ঘর তৈরি হয়েছে; সেইটাই রঙ্গমঞ্চ, আর তা নির্মাণে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল তাঁদের সব কিছু ঢেলে দিয়েছেন। নাটকে গান ছিল না, রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান জুড়ে দিয়েছেন, আর সুর ধরেছেন দিনেন্দ্রনাথ। অভিনয়ে ছিলেন—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ঠাকুরদা
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পিসেমশাই
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মোড়ল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজ-কবিরাজ
অসিতকুমার হালদার—দইওয়ালা
আশামুকুল—অমল

এগারো রাত্রি এই অভিনয় হয়েছিল। একদিন দর্শকদের মধ্যে ছিলেন অ্যানি বেসান্ট, বালগঙ্গাধর টিলক, লাজপৎ রায়, মদনমোহন মালবীয়, মহাত্মা গান্ধী। অভিনয় শেষ হল, মহাত্মাজী আর ওঠেন না; স্তব্ধ হয়ে ব'সে, চোখ দিয়ে টসটস ক'রে জল পড়ছে।

'নটীর পূজা'র অভিনয় হল। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"নন্দলালের মেয়ে গৌরী নটী সেজেছে। ও যখন নটী হয়ে নাচল—সে এক অদ্ভুত নাচ। অমন আর দেখিনি। ড্রপ পড়তেই ভিতরে গেলুম। গৌরীকে বললুম, আজ যে নাচ তুই দেখালি, এই নে বকশিশ; ব'লে রবিকাকার দেওয়া জোব্বা গা থেকে খুলে দিয়ে দিলুম।"

অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"তারপরে আর-একবার দেখেছিলুম যখন 'তপতী' হয়েছিল। অমিতা তপতী সেজে অগ্নিতে প্রবেশ করছে। সেও এক অদ্ভুত রূপ। প্রাণের ভিতরে গিয়ে নাড়া দেয়। আমি 'তপতী'র সমস্ত ছবি এঁকে রেখেছিলুম। পরে যত অভিনয়ই হয়েছে আজকাল, অমন আর দেখলুম না—সে সত্যি কথাই বলব। তাই তো একবার রবিকাকাকে বললুম, করলে কী রবিকাকা, ঘরের পিদিম নিভিয়ে ফেললে এখন বাইরের পিদিম জ্বালিয়ে কী করবে। রবিকাকা বললেন, —তা আর কী করা যায়, চিরকালই কি আর ঘরের পিদিম জ্বলে।"

নাট্যশালার দুজন প্রযোজককে আমি জানি। প্রথম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয়—শিশিরকুমার ভাদুড়ী। এই তালিকায় তৃতীয় জনের প্রতীক্ষায় আছি; সে-কথায় পরে আসা যাবে। প্রথম জনের কথা কিছুটা বললুম, অভিনেতা শিশিরকুমারের কথা অল্পবিস্তর বলেছি; এবার তাঁর প্রযোজনার কথায় আসি।

শিশিরকুমার তখন বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক। একদিন শোনা গেল তিনি কলেজের চাকরি ছেড়ে, এতদিন যেটাকে নেশা ব'লে নিয়ে আসছিলেন সেটাকে পেশা ব'লে গ্রহণ করবেন। পূর্বে যাঁরা শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেছেন তাঁরা উল্লসিত হলেন,-যাঁরা দেখেননি তাঁরা বললেন, 'মনোমোহন গোস্বামী বি.এ.'-তে একবার ঠকেছি, আর না। সত্যি সত্যি শিশিরকুমার একদিন বিদ্যাসাগর কলেজ ছাড়লেন।

সে সময় স্টার, মিনার্ভা, মনোমোহন কোনোটাই ভালো ভাবে চলছে না। ম্যাডান কোম্পানি পাকা ব্যবসাদার; ওৎ পেতে ছিলেন; তখন বাংলা থিয়েটার গ্রাস করতে এগিয়ে এলেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানি নাম দিয়ে তাঁরা একটি থিয়েটার খুললেন। দানীবাবু তখন মনোমোহনে, তাঁকে আনতে গেলেন, তিনি মনোমোহনে শুধু বেতনভোগী অভিনেতা নন, একজন অংশীদার; তিনি এলেন না। স্টার থেকে অপরেশচন্দ্র ও তারাসুন্দরীকে আনবার চেষ্টা হল; তাঁরা সরাসরি অস্বীকার করলেন। ম্যাডান কোম্পানি বললেন—কুছপরোয়া নেই। চতুর্থশ্রেণীর কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী আর এক ঝাঁক সখী নামিয়ে অভিনয় শুরু করলেন। সিন, পাত্রপাত্রীর পরিচ্ছদ যেমনি মূল্যবান তেমনি কুৎসিত। অভিনীত হল একখানি হিন্দী নাটকের বাংলা অনুবাদ—'অপরাধী কে?'। বিজ্ঞাপনের চটকে প্রথম রাত্রে প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য, আমাদের 'সূত্রধার'ও সেই দর্শকদের মধ্যে একজন। 'অপরাধী কে'র -অভিনয় দেখে বাঙালী দর্শক একবাক্যে বলল—যারা ঘরের পয়সা খরচ ক'রে এই বই দেখতে আসে অপরাধী তারাই। তিন-চার রাত্রি অভিনয়ের পর প্রেক্ষাগৃহ একেবারে খালি থাকতে লাগল। ম্যাডান কোম্পানি ভাবলেন, এরকম ক'রে তো চলবে না, নামজাদা বাঙালীকে এঁদের এই বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। অন্য থিয়েটারগুলি থেকে যখন ভাঙানো চলল না, তখন তাঁদের নজর পড়ল থিয়েটারের বাইরে। অভিনেতা হিসেবে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, শেষ অবধি তাঁকে পেলেন, আর নাটক লেখায় পেলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে। মঞ্চস্থ হল তাঁর রচিত 'আলমগীর'। নাম-ভূমিকায় শিশিরকুমার যে কৃতিত্ব দেখালেন তা অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়; তাঁর

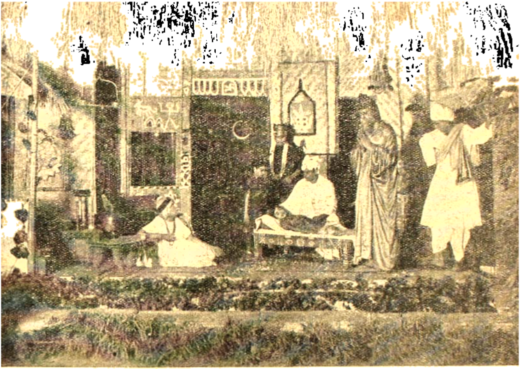

'ডাকঘর' অভিনয়ে গগনেন্দ্রনাথ, সুরূপা দেবী, আশামুকুল, রথীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ

পূর্বকীর্তিকে তিনি অতিক্রম করলেন। কিন্তু শিশিরকুমারকে ঠিক প্রযোজক হিসেবে আমরা এখনও দেখলুম না। আগেকার দলটিকেই তাঁর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। নতুনের মধ্যে এসেছেন একমাত্র তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়; শিশিরকুমার তাঁকে তৈরি করে নিলেন; তাঁর কামবক্সের অভিনয় লোককে আনন্দ দিল। কিন্তু উদিপুরী রূপে দেখা দিয়েছেন কুসুমকুমারী, যিনি আগেকার অভিনয়-রীতি একটুকুও বদলাতে পারেননি। সমস্ত নাটকটা খাপছাড়া হয়ে গেল। এরকম ভাবে নাটক মঞ্চস্থ করাতে শিশিরকুমার খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকলেন।

এ হল ১৯২১ সালের কথা। পরের বছরও কিছুদিন অভিনয় ক'রে শিশিরকুমার ম্যাডানদের থিয়েটার ত্যাগ করলেন। সেখানে এলেন নতুন যুগের আর একজন নট— নির্মলেন্দু লাহিড়ী। মঞ্চস্থ হল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রত্নেশ্বরের মন্দির'। আর কিছুদিন পরে বেঙ্গল থিয়েট্রিক্যাল নাট্যালয়ে তালাচাবি পড়ল।

শিশিরকুমার এবার থিয়েটার ছেড়ে এলেন সিনেমায়। তাজমহল চিত্র-প্রতিষ্ঠানের তিনি হলেন প্রধান অভিনেতা। পর্দায় আত্মপ্রকাশ করল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আঁধারে আলো'। শরৎচন্দ্রের বই এই প্রথম পর্দায় ফুটল; ছবিখানা বিশেষ জনপ্রিয় হল।

শিশিরকুমারকে কিন্তু টানছে নাট্যশালা। তিনি বুঝেছেন পর্দায় একজন শক্তিশালী নটের প্রতিভাস্ফুরণের অবকাশ খুব কমই আছে; পরিচালকই সেখানে সর্বেসর্বা; তাঁরই নির্দেশে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কলের পুতুলের মতো চলতে হবে। শিশিরবাবু সিনেমা ছেড়ে আবার মঞ্চে এলেন, আর তার একটা সুযোগ ঘটল।

কলকাতা ইডেন গার্ডেনে সে সময় মহাসমারোহে এক প্রদর্শনীর আয়োজন হচ্ছিল; প্রদর্শনীতে অভিনয় করবার জন্য শিশিরকুমার নিমন্ত্রিত হলেন। শিশিরকুমার এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে একটি সম্প্রদায় গড়লেন। অভিনেতাদের মধ্যে রইলেন নতুনদের একটি দল—

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ললিতমোহন লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, জীবন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। অভিনেত্রী নিতে হল সাধারণ রঙ্গালয় থেকে। নাটক হিসেবে বেছে নিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা'। তাঁর এ নাটকখানি পূর্বে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। এও শিশিরকুমারের এক দুঃসাহসিকতা। প্রদর্শনীতে রঙ্গমঞ্চ ছোটো, কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করা হয়েছে, কিন্তু অভিনয় অসাধারণ রকমের সাফল্য অর্জন করল। শিশিরকুমার উৎসাহিত হলেন; ভুলে গেলেন সিনেমার কথা; এই দল নিয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন স্থির করলেন। কিন্তু কোন্ সে রঙ্গমঞ্চ?

স্টার থিয়েটার 'কর্ণার্জুন' খুলে আসর জমিয়ে ফেলেছে; সেখানে আগে থেকেই নবীনের অভ্যুদয় হয়েছে। মিনার্ভার বাড়ি পুড়ে গেছে, সে কোনোরকমে অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। মনোমোহন টলমল করছে বটে, কিন্তু তার প্রাণবায়ু তখনও আছে; দানীবাবু 'ললিতাদিত্য' নিয়ে একবার শেষচেষ্টা করছেন।

কলেজ-স্ট্রীট বাজারের সংলগ্ন হ্যারিসন রোডের উপর অ্যালফ্রেড থিয়েটার নামে পার্শীদের এক থিয়েটার ছিল। বহুপূর্বে ক্লাসিক থিয়েটার উঠে যাবার পর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্র্যাণ্ড থিয়েটার নাম দিয়ে সেখানে অভিনয় করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পাড়াটা গুণ্ডাদের আড্ডা ব'লে কুখ্যাত, আর তখন অভিনয় রাত্রি একটা-দুটো অবধি চলে; বাঙালী দর্শক ওখানে আসতে চাইত না; অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে ওখানকার জাল গোটাতে হল। দীর্ঘকাল যাবৎ কোনো বাঙালী সম্প্রদায় সেখানে আস্তানা গাড়ল না। শিশিরকুমার স্থির করলেন ওই কুখ্যাত স্থানেই তাঁর সম্প্রদায়কে নিয়ে অভিনয় আরম্ভ করবেন। প্রথম প্রকাশের তারিখ বিজ্ঞাপিত হল, কিন্তু তিনি আর এক বিপদের সম্মুখীন হলেন যা তিনি পূর্বে কল্পনাও করতে পারেননি। ঠিক এই সময় দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমারের কাছ থেকে স্টার থিয়েটার 'সীতা' নাটকের অভিনয়-স্বত্ব কিনে নিল। এই নাটক নিয়েই শিশিরকুমার মঞ্চে দেখা দেবেন স্থির ছিল। শিশিরকুমার কিন্তু ঘাবড়ালেন না। নির্দিষ্ট দিনে 'বসন্তলীলা' নামে একখানি গীতিনাট্য নিয়ে তাঁর থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন।

ওদিকে মনোমোহন পাঁড়ে 'ললিতাদিত্য'র কিছু করতে না পেরে, মাসিক তিন হাজার টাকা ভাড়ায় তাঁর রঙ্গালয় শিশিরকুমারকে ভাড়া দিলেন।

শিশিরকুমার তাঁর দলবল নিয়ে এখানে এলেন, কিন্তু নাটক কই? যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ইতিপূর্বে কোনো নাটক লেখেননি, তবে শিশিরকুমার বুঝেছিলেন যে তাঁর নাটক লেখবার ক্ষমতা আছে। অল্পসময়ের মধ্যে যোগেশচন্দ্র 'সীতা' নাটক খাড়া করলেন।

পুরানোদের মধ্যে একমাত্র দানীবাবুকে শিশিরকুমার আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দানীবাবু এলেন না। শিশিরবাবু তাঁর নবগঠিত দল নিয়ে যোগেশচন্দ্রের 'সীতা'-মঞ্চস্থ করতে অগ্রসর হলেন। দৃশ্যপট ও সাজপোশাক পরিকল্পনার ভার নিলেন শিল্পী চারু রায়, তাঁর সহকারী রূপে রইলেন রমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সংগীতাচার্য রূপে এলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়; গান রচনা করলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। নৃত্য-পরিকল্পনার ভার দেওয়া হল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর; আবহ-সংগীত পরিচালনা করবেন নৃপেন মজুমদার। নেপথ্যে শিশিরকুমার সাহায্য পেলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীর।

১৯২৪ সালের ৬ই আগস্ট 'সীতা' নাটক নিয়ে মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর নাট্যমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করলেন। [ক্রমশ]

চল্‌তি হাওয়া

কালীচরণ ঘোষ

গোবিন্দ সকালবেলাতেই পরামাণিক বাদলের নিকট মাথাটা আগাইয়া দিয়া বলিল ; চুল বড় হইয়াছে, ছাঁটিয়া ফেলা একান্ত প্রয়োজন।

বাদল বলিল, "বাবু, চুল তো এখনও তেমন বড় হয়নি। আরও দু'হপ্তা বাদে কাটলে ভালো হ'ত।"

গোবিন্দ বুঝিল যে, মাস-মাহিনায় বাদল এক-বারের পরিশ্রম বাঁচাইতে চায়। সুতরাং তাহার জিদ চাপিয়া গেল ; বাদলও আর ওজর আপত্তি না করিয়া কাজে মন দিল।

চঞ্চল স্বভাব ; অন্যান্য বার চুলকাটার সময় যেমন বলে গোবিন্দ, এবারও সেইভাবে বলিল, "তোমার এত দেরি হয় কেন বলো তো ? আমাদের ছোটবেলায় জগদীশ ছিল, সে চিরুনিই ব্যবহার ক'রত না। বাঁ হাতের আঙুলের টিপ দিয়ে চুল ছাঁটত ; শেষকালটা একবার চিরুনি দিয়ে টেনে দিত ; কতক্ষণই বা সময় তাতে লাগত ? তোমাদের চিরুনির ওপর আবার ক্লিপ হ'য়েছে, আর চিরুনিও মাথায় এতবার বুলোতে হয় যে, মাথা আঁচড়াবার কাজ অনেকটা হ'য়ে যায়।"

বাদল বুঝাইয়া দিল যে, তখন 'বাবুয়ানা'র চুলছাঁটা হয়ত সুরু হয় নাই, একটানা কদম (-ফুল) ছাঁট হইলেই স্বচ্ছন্দভাবে চলিয়া যাইত। এখন সে দিন নাই। মাঝে 'কেয়ারি' করিয়া ছোট-বড় করিয়া চুল-কাটা আসিয়াছিল, যখন চিরুনি না হইলে চলিত না ; কাজের সুবিধার জন্য এবং ঘাড়ের চুল অত্যন্ত ছোট করিয়া কাটিবার জন্য ক্লিপ আসিয়াছিল। কিন্তু আবার নূতনতর ফ্যাশান আসিয়াছে, তাহাও শুনাইয়া দিল।

গোবিন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আরও নতুন ! সে আবার কিরকম হে ?"

"কেন, বাবু ! ঘাড়ের ওপর, মাথার চুলের খানিকটা কাবুলীদের মতো ক্ষুর দিয়ে কামিয়ে দিতে হয়। জুল্‌পি খুব লম্বা হবে এবং সরু দু'গোছা চুল কানের পাশে নেমে আসবে—সে এক সিনেমার বাবুর নামে চলছে। আমার সে-নামটা মনে আসছে না।"

গোবিন্দ চুপ করিয়া শুনিল ; পরে বলিল, "এ হ'লে তোমার নানারকম যন্ত্রপাতির দরকার হবে তো ?"

"কাচি, চিরুনি, ক্লিপ ছাড়া চুল ছাঁটতেও ক্ষুর দরকার হ'য়ে পড়েছে। তাতে তত দুঃখ ছিল না ; মুশকিল হ'চ্ছে, সময় লাগে অনেক বেশী। তা ছাড়া একটু ত্রুটি হ'লে আর রক্ষে নেই।"

গোবিন্দ একটু সহানুভূতির সুরে বলিল, "তেমনি চার্জ বাড়িয়ে নেবে ; নিজের লোকসান ক'রে তো আর ফ্যাশানের চুল কেটে বেড়ালে পেট ভরবে না ?"

"একটু বাড়িয়ে নিতেই হয় ; কিন্তু মুশকিল হ'চ্ছে একটু এদিক ওদিক হ'লে ঘরটা মারা যায়। আর এই ফ্যাশান দেখা দিয়েছে ছোট ছেলেদের মধ্যে বেশী।"

কথাটা শুনিয়া গোবিন্দ একটু বিস্মিত হইল। ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তাহ'লে বড়রা আর এদিকে তত মাথা ঘামাচ্ছে না ?"

"ও তো হবে কেন, বাবু? তাঁরা সব সেলুনে গিয়ে ছেঁটে আসেন। আমি বলছি, যে-সব ছোট ছেলেরা সেলুনে যেতে পায় না, আর মায়েদের সামনে যাদের চুল কাটতে হয়, তাদের কথা।"

কথাটা গোবিন্দর কাছে ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রশ্ন করিল, "সে আবার কি হে! তা হ'লে দস্তুরমতো খবরদারির মধ্যে তোমাদের পরীক্ষা দিতে হয়। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলো, এদিকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেষ্টা করো—এই কথা নিয়ে যেন আমার চুলকাটায় দেরি ক'রে দিয়ো না।"

"বাবু, আপনি তো কিছু খবর রাখেন না দেখছি, এক কথায় এতবড় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া বড় কঠিন। যতটা সংক্ষেপে পারি ব'লে দিই।"

বাদল যাহা বলিল তাহাতে বুঝা গেল, প্রামাণিকের ডাক পড়িলে, বাচ্চা ছেলে জিজ্ঞাসা করে, সে 'অমুক ছাঁট' জানে কিনা। যদি 'না' বলে, তাহা হইলে রুজি মারা গেল। 'হাঁ' বলিলে, উত্তর দিতে হয়, সে এরূপ আরও করিয়াছে কিনা। সদুত্তর পাইলে, চুল কাটিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে হয়। তাহার পর তদ্বিরের জন্ম মা বা দিদি কাছে দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন।

"ছেলের মাও তাহ'লে এ-কথা জানে?"

"মা জানবেন না কি বাবু! এসব বিষয়ে মায়েদের উৎসাহ আরও বেশী। ছেলে খবর দিলে, মা এসে জিজ্ঞাসা করবেন, এবং ভালো ক'রে যাচাই ক'রে দেখবেন, আমাকে দিয়ে নতুন ছাঁট চলবে কিনা। তার ওপর যদি একটু এদিক ওদিক হ'য়ে গেল, তো, আর রক্ষে নেই। সে-দরজা চিরদিনের জন্তে বন্ধ; আর তখনকার মতো লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা থাকবে না।"

গোবিন্দর মনের মধ্যে তখন বিন্দুর আদুরে ছেলে অমূল্যর চুল-ছাঁটার কথা মনে পড়িল। অমূল্যর শখ চাপিয়াছে, এবার সে ভালো করিয়া চুল ছাঁটিবে। একদিন পুরাতন নাপিত কৈলাসকে ধরিয়া সে প্রশ্ন করিয়াছিল—নরেনদার মতো চুল ছাঁটিতে পারে কিনা। কৈলাস আশ্চর্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—"সে কিরকম দাদাবাবু?"

অমূল্য নিজ মাথার স্থানে স্থানে হাত দিয়া দেখাইয়া বুঝাইয়াছিল, "এইখানে বারো আনা, এইখানে ছ'আনা, এইখানে দু'আনা, আর এই ঘাড়ের কাছে একেবারে ছোট ছোট।" কৈলাসের শক্তির উপর সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, "পারবে ছাঁটতে?"

কৈলাস ইতস্ততঃ করাতে, বিন্দুকে অমূল্য বাড়ীর ভিতর হইতে ধরিয়া আনিয়া কৈলাসের সম্মুখে হাজির করিল। তাহার সন্দেহ, ছোটমা আসিয়া হুকুম না দিলে কৈলাস তাহার মনের মতো করিয়া চুল ছাঁটিয়া দিবে না। বিন্দু কৈলাসের মুখে সব ব্যাপার শুনিয়া লইল। বিন্দুর উপস্থিতিতে কৈলাস "চুল কাটিতে লাগিল। বিন্দু চোখ টিপিয়া দিল। সে সমস্ত চুল সমান করিয়া কাটিয়া দিল।"

গোবিন্দ সংক্ষেপে বাদলকে গল্পের বিষয় বলিল।

বাদল যাহা বলিল, তাহা ইহার বিপরীত। এখন দাঁড়াইয়াছে, ছেলেমেয়ে অপেক্ষা মায়েদের শখ আরও বেশী এবং তাঁহারাই অধিকাংশ সময় উপস্থিত থাকিয়া চুল-ছাঁটায় যেন কোনও ত্রুটি না হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখেন। ছেলের নিজের মনোযোগ তো আছেই, তাহার উপর যখন মায়ের তত্ত্বাবধান আছে, তখন ছেলে একপ্রকার নিশ্চিন্ত।

বাদল কাজ সারিয়া চলিয়া গেল।

গোবিন্দ বাড়ীর মধ্যে স্ত্রী রেখাকে ডাকিয়া অবস্থাটা সবিস্তারে বলিল। তাহার আশা, রেখার নিকট হইতে তাহার নিজ মতের সমর্থন পাইবে।

রেখা বলিল, "চুল বাহার ক'রে ছাঁটলেই সব ছেলে নষ্ট হ'য়ে যায়, এ কথা আমি মানি না। ঢের ঢের বাহার ক'রে চুল-ছাঁটা ছেলে দেখেছি, যারা পড়াশোনায় খুব ভালো ছেলে। তুমি যেমন ঝাঁকড়-ঝাঁকড়া একরাশ চুল মাথায় ক'রে বেড়াচ্ছ, সেইরকম সবাই থাকলেই সব ছেলে একেবারে বিদ্যাদিগ্‌গজ হ'য়ে উঠবে?"

গোবিন্দর নিকট ইহা কতকটা অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হইল। স্বামী-স্ত্রী দুইজনের এসকল ব্যাপার লইয়া প্রায়ই আলোচনা হয়, আর তাহার ধারণা, রেখা ছেলে-মেয়েকে সাবেকী চালে মানুষ করিতে চায়।

চিন্তার সুরে গোবিন্দ বলিল, "তুমিও তাহ'লে বলতে চাও যে, মায়েরা ছেলেমেয়েদের হাল-ফ্যাশান অনুযায়ী সাজ-পোশাক দিয়ে সায়েব ক'রে তুলুক?"

"সায়েব করবে কি করবে না, সে আলাদা কথা। আমার মনে হয়, এই ফ্যাশান করলেই যে সব খারাপ হয়, তা নয়। অনবরত ছেলেমেয়েদের সাজ-পোশাক নিয়ে বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি করলেই অমনি দেশের ছেলেমেয়েরা সব ভালো হয়ে উঠবে, তা কখনই নয়। চারিদিকে যে হাওয়া বইছে, তার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের চলবার কতকটা স্বাধীনতা না দিলে সদাসর্বদা অশান্তি হবে।"

কথাটা গোবিন্দর মোটেই ভালো লাগিল না, সুতরাং

একটু উষ্মার সুরে বলিল, "প্রচলিত রেওয়াজ দেশের মঙ্গল তো করছেই না, বরঞ্চ ক্রমেই টেনে নীচের দিকে নামাচ্ছে, চোখ খুলে দেখলে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। যখন সব বাপে চায় যে, পোশাক-পরিচ্ছদ সাজগোজ ক'রে সন্তানরা ফিটফাট হয়ে বেড়াক, তখন বুঝতে হবে দেশের অত্যন্ত দুর্দিন।"

কতকটা বাধা দিয়াই রেখা বলিয়াছিল যে, একই কথার পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। কায়দা-করিয়া চুল ছাঁটিলে বা আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিলেই সকলে জাহান্নমে যাইবে, ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না। এটার মধ্যে যে, কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক আছে তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

তাহার উত্তরে গোবিন্দ বলিল, "এ কথাটা স্বীকার করি যে, কার্যকারণ সম্পর্ক ঠিক নির্ভুলভাবে সিভিল বা ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড-এর (Civil and Criminal Procedure Code) ধারা অনুযায়ী প্রমাণকরা খুবই কঠিন। তবে একটা কাজের ফল যদি একই ভাবে এবং ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় তবে বুঝতে হবে, কোথায় একটা বড়রকম গলদ প্রবেশ করেছে।"

রেখার মস্তিষ্কে সব যুক্তি যে প্রবেশ করিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা সহজ হইল না। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, স্বামীর কথার মধ্যে যদিই-বা সত্য কিছু থাকে, তাহার একটা অতিরঞ্জিত সংস্করণ কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। একটু 'ফ্যাশান' করিয়া চুল কাটিলে, একটু নূতনতর ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে, একটু পাউডার ক্রীম প্রভৃতির সাহায্য লইলেই সকল ছেলেমেয়ে মন্দ হইয়া যায়, তাহা সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়।

মুখে বলিল, "অমন একটু-আধটু বয়সকালে সবাই করে, পরে আবার শুধ্‌রে যায়।"

"শুধ্‌রে তো যায়ই না, বয়স বাড়ার সঙ্গে নতুন থেকে আরও নতুন ফ্যাশানের বশীভূত হ'য়ে পড়তে থাকে এবং বহু ক্ষেত্রেই অবস্থার বাইরে চলে যায়। তখন আর পয়সাকড়ি খরচের কথা ভাবতে চায় না, যে কোনও রকমেই হোক স্রোতের সঙ্গে গা ভাসাতেই হবে, তখন টাকাপয়সা কোথা থেকে আসবে, কে জোগাবে সেসব প্রশ্ন গৌণ হ'য়ে পড়ে। আসল কথা, তার সখ মেটানো যে উপায়েই হোক চাই-ই।"

রেখা বলিল, "তোমার সব-তাতেই একটু বাড়াবাড়ি। কোথায় একটু চুল ছাঁটল, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার পয়সার টানাটানি প'ড়ে গেল! এসব নিতান্ত তর্কের জেদ বজায় রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

গোবিন্দ মনে মনে চটিতে আরম্ভ করিয়াছে, কারণ তাহার এত অবান্তর কথা শুনিতে ভালো লাগিতেছিল না। যাহাতে সন্তানের মঙ্গলের পথ নিষ্কণ্টক হয়, ইহা শ্রবণমাত্রেই সকলে বিনাবিচারে সমর্থন করিবে, ইহাই তাহার ধারণা ছিল। এখন সাধারণতঃ-স্বল্পভাষিণী রেখার মুখ হইতে প্রতিবাদ শুনিয়া রীতিমতো বিস্ময় বোধ করিল।

কথায় একটু জোর দিয়াই বলিল, "এসকল বোধ যদি তোমাদের থাকত, তাহ'লে দেশের মঙ্গলই হ'ত। বিলাসের বীজ গাছ হ'য়ে ক্রমেই ডালপাতা, ফুল-ফলে নানা রূপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিলাসীদের সখের সীমা নেই। পোশাক থেকে দেহের নানা প্রসাধনের দিকে মন যায়; সঙ্গে সঙ্গেই হাল্‌কা আমোদ প্রমোদ এসে মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে থাকে। ফ্যাশানের সঙ্গে সিনেমা নাচ তামাশা প্রভৃতি আলাদা আলাদা লোককে আলাদা আলাদা রকমে টানে। তোমাকে সব কথা ব'লে আমি বোঝাতে পারব না। প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের যত হাসি তামাশা রঙ ঢঙ দেখি, তার সকলগুলোর আমি নামও জানি না। তোমার কি চোখ নেই, এসব দেখতে পাও না?"

রেখার মনে এতক্ষণে একটু চিন্তার দাগ পড়িয়াছে। এইবার নরম সুরেই বলিল, "তুমি যা বলছ, এখন বুঝছি তার মধ্যে অনেক সত্যি আছে। বাস্তবিকই চারিদিকে ছেলেমেয়েদের হালচাল দেখলে মনে হয়—এদের সব চিন্তাই দেহের রূপ, পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার, হাল্‌কা চিন্তা, চটুল ব্যবহার ঘিরে বাস করছে। যেন সখের পায়রা, বনের প্রজাপতি। তা হ'লেও এরা সবাই কি খারাপ? এ কথা মেনে নিতে মন চায় না।"

রেখার শেষকথাটায় গোবিন্দও মনে করিল, বর্তমানের ত্রুটি লক্ষ্য করিতে গিয়া, যাহা ভালো আছে তাহাও অতিমাত্রায় উপেক্ষা-করা হইয়াছে। রেখাকে সমর্থনের সুরে বলিল, "সবাই মন্দ এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু হাল্‌কা জীবনের দিকে সখ এত ব্যাপক যে, যতটুকু ভালো সেটা আজ আর নজরে পড়তে চায় না। তা ছাড়া মন্দ জিনিসের ছোঁয়াচ খুব শীগ্‌গিরই অপর জিনিসও নষ্ট ক'রে ফেলে। যারা ভালো হ'তে চেষ্টা করছে তারাও এই প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে না। কাজেই ব্যাপারটা একটু গুরুতর হ'য়ে ওঠে।"

রেখার সাংসারিক কাজের চাপ আছে, সুতরাং এই

আলোচনা বর্তমানে স্থগিত রাখাই তাহার প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল। পুত্র দুলু মাত্র আট পার হইয়া নয়বৎসরে পড়িয়াছে, সে পাড়ায় কেবল সঙ্গীদের নিকট নয়, তাহা অপেক্ষা,অধিকবয়স্কদের নিকট যে শিক্ষা পায়, বাড়ী আসিয়া যেসকল দাবি করে তাহা লইয়া রেখা সময় সময় নিজেকে খুবই বিব্রত মনে করিয়াছে। ছেলেবেলার পথ একটু বড় হইলেই আপনি দূর হইয়া যাইবে: স্নেহশীলা জননীর মতো সেও এই কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। আজ স্বামীর সহিত আলোচনায় যেন তাহার নূতন দৃষ্টি খুলিয়া গেল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে এতটা হার স্বীকার করিয়া লইতে একটু সংকোচ বোধ করিতেছিল।

কথায় কথায় বলিয়া ফেলিল, "এদের দ্বারা ভারী কাজ করা কিভাবে সম্ভব হবে, আমি তো ভেবে পাই না।"

সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ উত্তর দিল, "তাহ'লে তুমি তো দেখছি আমার ওপর দিয়ে যাও। আমারও সেই কথা। যদি একটা-আধটা ছিটকে প'ড়ে ভালো হ'য়ে যায়, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু তারও তো নমুনা অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে বার করতে হয়।"

রেখা প্রশ্ন করিল, "এর উপায় কী, কেমন ক'রে এ হাওয়া ফেরানো যেতে পারে?"

"বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ এবার। ছেলেদের নিন্দে করবার জন্যে আলোচনাটা বেশ মুখরোচক বটে, কিন্তু কার্যে পরিণত করাই সমস্যা। সংক্ষেপতঃ বলা যায়, মা-বাপকে, বিশেষতঃ মাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। বাচ্চাদের মনে যাতে সরল জীবনযাপন করবার রুচি প্রবৃত্তি গ'ড়ে ওঠে, তার জন্যে মাকে সর্বদা চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিই চোখ পাল্টাতেই বড় হ'য়ে ওঠে। তোমার বোধ হয় মনে আছে, যখন অমূল্য পিসতুতো-ভাই নরেনের শিক্ষায় বিড়ি খেতে শিখেছে, উকিল-মামীর বাগানের কচি আম নষ্ট ক'রে জরিমানা দিয়েছে—আর সেই কথা বিনু জানতে পারলে, তখন বলেছিল, 'সে যে এমনি ক'রে চোখের সামনে একটু একটু ক'রে উচ্ছন্ন যাবে, তা সইতে পারব না।'. এই একটু একটু ক'রে উচ্ছন্ন যাবার পথ ধরেছে এখন ছেলেমেয়েরা। যদি শক্ত হ'য়ে প্রথম থেকেই বন্ধ করা যায়, তবে কতকটা রক্ষে হ'তে পারে। আর সে বন্ধ করবে যারা, তাদের মধ্যে গলদ ত্রুটি থাকলে শাসন অত্যন্ত দুর্বল হয়, বিশেষ কোনও ফল হয় না।"

"সন্তানের মঙ্গলের জন্যে মা-বাপ, অভিভাবকদের সতর্ক হওয়া দরকার; তাঁদেরও যথাসম্ভব বিলাস ত্যাগ করা চাই। ছেলেমেয়ে ভালো করতে হ'লে এটুকু সংযম, এই সামান্য ত্যাগ করা খুব বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার মনে করা উচিত নয়" —বললো রেখা।

গোবিন্দ এবার হাসিয়া ফেলিল। বুঝিল, তাহার স্ত্রী একটা সোজা-বেচারা প্রকৃতির লোক, যেমন হাওয়া চলিতেছে, পাড়া-প্রতিবেশী সঙ্গিনীদের কাছে যেমন শুনিয়া থাকে, আশপাশে যা দেখিয়া থাকে তাহারই ফলস্বরূপ প্রথমটা তর্ক আরম্ভ করিয়াছিল—এখন যেন নিজ সন্তানের অমঙ্গল ভাবিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

হাসিয়া বলিল, "যত সহজ মনে ক'রছো, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। শতকরা নব্বইজন বাপ-মা সাধারণতঃ শক্তির বাইরে যে-যার-মতো বিলাসে গা ঢেলে দিয়েছে; তারা হয়ত নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যেই ছেলেমেয়ের মনে বিলাসের বীজ রোপণ ক'রে, আত্মপ্রসাদ লাভ করে বা নিজেকে ঠকায়। তা ছাড়া, আরও বড় কথা, একটা বাড়ীর বাপ মা চেষ্টা করলে কি হবে! এখন বিলাসের স্রোত বইছে চারিদিকে। তাদের সঙ্গে তাল রেখে পা না ফেললে, ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা-তামাসার পাত্র হ'য়ে জর্জরিত হ'য়ে পড়বে। তার মধ্যে ঠিক থাকা বড়দের পক্ষেই সম্ভব নয়, ছোটদের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। আমি তো বলি, এই তর[illegible] রুখবার মতো শক্তি আমাদের কারও নেই। গঙ্গার স্রো[illegible] ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল, বেঁধেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব আপনার জটার মধ্যে। সে লোক এখন তো দেখতে পাই না। সেই অসুরমর্দিনী মহাশক্তি আবার মায়েদের মধ্যে দেখা দিলে, এ হাওয়ার মোড় যদি ফেরাতে পারেন—"

ব্যস্তসমস্ত হইয়া রেখা প্রশ্ন করিল, "তাহ'লে কি কোনও উপায় নেই?"

গোবিন্দ জবাব দিয়াছিল, "সম্ভাবনা কম, তবে কিনা 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি'—হাল ছাড়লে হবে না, চেষ্টা ক'রে যেতে হবে।"

যদি পিতামাতার আলোচনা ছেলেমেয়েদের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ তাহারা অলক্ষ্যে একবার মৃদু হাসিয়া নিজ নিজ কাজে চলিয়া গিয়া থাকিবে।

পূর্বস্মৃতি

শরৎকুমার মিত্র

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

১৮৯৪

বাবা ও আমি ২৮শে অক্টোবর হইতে ৭ই নভেম্বরের মধ্যে রামপুরহাট, বালুচর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকিপুর, গয়া, মুঙ্গের, কাশী ও লক্ষ্ণৌ ঘুরিয়া আসি। বালুচরে একটি [illegible] ঘটনা হয়। আমরা ৺সূর্যকুমার অধিকারীর বাটীতে [illegible]লাম। সূর্যকুমার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এক [illegible]মাতা ছিলেন; পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের (Metropolitan Institution তখন নাম ছিল) সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার কাজ ছিল office work দেখা। বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদা কলেজ পরিদর্শন করিতে যাইতেন। একদিন সূর্যকুমারের একটা কি সামান্য দোষ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাহার পর বাবা তাঁহাকে তাঁহার অর্থশালী মক্কেল ধনপৎ সিংহের এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার করিয়া দেন।

বাবা বালুচরে আছেন শুনিয়া ধনপৎ সিংহের যোগ্য জ্ঞাতিপুত্র লছ্‌মিপৎ সিংহ বাবাকে তাঁহার বাটীতে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। একদিন সকালে বেলা ৮|০টা আন্দাজ যাওয়া হইল। লছ্‌মিপৎ সিংহ তাঁহার বাটীর সব দেখাইয়া (অন্দরমহল সহ) শেষে একটি ঘরের নিকট আসিয়া বলিলেন—"আপনি এই ঘরে চলুন। আপনার ছেলে বাহিরে এইখানে ৫।৭ মিনিট থাকুন।" বাবা বলিলেন—"কেন?" সিংহ বলিলেন—"কারণ আছে।" বাবা, সিংহ ও তাঁহার কর্মচারী ঘরের ভিতর গেলেন। ভিতরে গিয়াই বাবা আমাকে ডাকিলেন। গিয়া দেখি ঘরের মেঝে, দেওয়াল, ছাদ সব পাথরের এবং কার্নিসের বীটের নীচে সারি সারি পাথরে সুন্দর কোঁদা অনেকগুলি ছবি। প্রত্যেকটি আন্দাজ ১ ফুট লম্বা ও ৯।১০ ইঞ্চি চওড়া। ছবিগুলি French cards-এর মতন বড় বড় ছবি। তাহার নীচে চারখানি খুব বড় বড় পাথরে কোঁদা গোপিনীদের বস্ত্রহরণ প্রভৃতি পৌরাণিক ছবি। ছাদে ও মেঝের চক্রাকার দুইটি ঐরূপ ছবি।

আমি যাইতেই সিংহ বলিলেন—"আপনি কি করিলেন", এবং লজ্জায় ঘরের বাহিরে চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বাবা তাঁহাকে বলিলেন—"ইহাতে লজ্জার কি আছে? এরূপ সুন্দর জিনিষ দেখিবে না?" সিংহ বলিলেন—"কিন্তু বাপ-ব্যাটা একসঙ্গে?" বাবা বলিলেন—"তাতে দোষ কি? যত লুকাচুরী ততই কুৎসিতভাব স্ফুরণ হয়। অশ্লীল ভাবিলেই অশ্লীল।"

গয়ায় গিয়া ডাঃ বিনোদচন্দ্র বসুর বাটীতে ছিলাম। তাঁহার পুত্র গগন। বাবা সেখানেই থাকিলেন। পরদিনই আমি এবং আমাদের স্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক (বি. এ ফেল) বুদ্ধগয়া দেখিতে গেলাম। ঠিকা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া অবশ্য যাইতে হইয়াছিল। তখন মোটরকার-এর সৃষ্টি হয় নাই। সেখানে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তি দেখা। মূর্তি—কাঠের উপরে বর্ণের পাত কিন্তু গিয়া দেখি, মন্দিরে চাবি দেওয়া। এই সময় হিন্দু

বৌদ্ধদের ঝগড়ার সূত্রপাত—মন্দিরটি সম্প্রতি কাহাদের সম্পত্তি। পরে এই বিষয়ের তদন্তের ভার পড়ে বাবা ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর।

মন্দিরের রক্ষক এক বিহারী দারবান। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, চাবি দেওয়া কেন, কখন খুলিবে। সে বলিল—"এখন ইহা বৌদ্ধদের অধিকৃত। চাবি বিখ্যাত আনাগারিক (অনাগারিক) ধর্মপালজীর কাছে। তিনি এখানে আসিয়াছেন এই বিবাদের জন্য। তিনি স্নান করিতেছেন।" নিকটেই পুষ্করিণীতে গেলাম। তিনি পোষাক হইতে বুঝিলেন, যে আমরা বাঙালী। তিনি কি একটা ভাষায় কি বলিলেন, বুঝিলাম না। আমি ইংরেজীতে বলিলাম—"আমি গয়া হইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া দেখিতে আসিয়াছি। আমরা কলিকাতাবাসী।" তিনি ঠিক বুঝিলেন না। পরে সংস্কৃতে আস্তে আস্তে বলিলেন—"বাঙ্গালীরা বড় অসভ্য, তাহারা সব অসম্মানসূচক কার্য করে। যথা—অঞ্জলী দিয়া ঠাকুরকে দেখায়, প্রণাম করে না। আমি সেইজন্য বাঙ্গালীদের দেখিতে দিই না।" আমি ত বড় বিপদে পড়িলাম। সব পণ্ড হইবে। ধর্মপাল ত বুঝিলাম, পালি ও সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বড় বোঝেন না। তাঁহাকে বোঝান যায় কি করিয়া যে আমরা অসম্মানসূচক কিছু করিব না। পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, সংস্কৃতে এই কথাটা বুঝাইয়া দিতে। তিনি বলিলেন—"আরে বাপ্‌রে, সংস্কৃত কথা কহা", আমারও সংস্কৃত বিদ্যা চমৎকার। বহু কষ্টে কেঁদে-ককিয়ে এন্ট্রান্স ও এফ. এ.-তে অবশ্যপাঠ্য সংস্কৃতে পাস করিয়াছিলাম, তাহার পর বি. এ.-তে সায়ান্স পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমারই বিপদে পড়িয়া সংস্কৃত বাহির হইল। আবার সেই ধর্মপাল বলিলেন—"বহু বাঙ্গালী দেখিয়াছি এই কয়দিন, সব নাস্তিক।" আমি বলিলাম—"মূঢ়জনাতে।" ধর্মপাল খুব খুশী হইয়া হাসিলেন এবং বলিলেন—"আচ্ছা, তোমরা দেখে এসো, এই চাবি নাও, দেখে যেন চাবি দিয়ে যেও, আমি এখানে ঘাটে বসে আহ্নিক করবো।" যাক, কার্যসিদ্ধি হইল।

পরে আমরা দুজনে দেখে ফিরি। শুনিয়াছিলাম যে (মহামহোপাধ্যায়) মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন যখন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, তখন তিনি লাহোরে একটি বড় পণ্ডিতসভায় নিমন্ত্রিত হন। তখন ডিসেম্বর মাসের শেষ। বরাবর লাহোরে ভয়ানক শীত। সেখানে তাঁহাকে একটা প্রস্তাব বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করায় তিনি অস্বীকার করেন। এ কথা তিনি নিজেই আমার সম্মুখে বলিয়াছেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই প্রত্যূষে আমাদের বাটীতে আসিতেন। বাবা তাঁহার অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পরে সভার শেষে তাঁহাকে পুনরায় বিশেষ অনুরোধ করা হয়, সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে অতি অল্প কথায়। কাশ্মীরের মহারাজা সভাপতি ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় মনে করিয়াছিলেন তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, প্রস্তুত ছিলেন না কিছু বলিতে। কিন্তু কি করেন, তিনি নাকি উঠিয়া গোটা দুই-তিন কথায় ধন্যবাদ দেন এবং সেই প্রয়াসে অতি শীতে (বিশেষতঃ কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে) ঘামিয়া উঠিয়াছিলেন। এই গল্পের শেষ অংশটা শ্রীযশোদানন্দন সরকারের কাছে শোনা। তিনিও প্রতিদিন প্রায় প্রত্যূষে আমাদের বাটীতে আসিতেন। তিনি খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন এবং এম. এ., আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়া ও শেষ পরীক্ষা পাস করিয়া অবশেষে কবিরাজী করিতেন ও সংস্কৃত একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম "মেটিরিয়া মেডিকাধ্যায়ম্"। তাঁহার আর একটি কথা বেশ মনে আছে। যখন 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রথম গবর্ণমেন্ট দিতে আরম্ভ করিলেন এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়কে উক্ত উপাধি দিলেন, তখন তিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আচ্ছা, মহাকাঠ, মহাযবন ইত্যাদি আছে। এ আবার মহা মহা-উপাধ্যায়। কথাটার মানে কি হোলো? মানে কি মহামূর্খ?"

সেখান হইতে বাবা ও আমি কাশী যাই এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীতে ছিলাম। কাশীধামে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন বৈকালে (বেলা ২॥০টা আন্দাজ) বাবাকে ও আমাকে ভাস্করানন্দ স্বামীর কাছে লইয়া যান। তাঁহার কাছে অল্পক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর তিনি আমাকে বলিলেন—"বেটা ইধার আও।" আমি কাছে গিয়া বসিলাম। তিনি আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন—আমাকে তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে। আমি তখন ফর্সা ও হৃষ্টপুষ্ট ছিলাম। আমি মনে করিলাম, তজ্জন্যই বুঝি তাঁহার আমাকে ভাল লাগিয়াছে। পরে তিনি বলিলেন—হিন্দিতে অবশ্য—"তোকে দেখিয়া মনে হইতেছে, তুই বুদ্ধিমান। তোকে পরীক্ষা করি।" এই বলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তুই আমাকে শীঘ্র তিনটা প্রশ্ন কর্, তাহা হইলেই আমি বুঝিব।" আশ্চর্যের বিষয় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কায়স্থেরা কি পৈতা লইতে পারে?" তখন আমি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু ভাবি নাই। তিনি বলিলেন

৮

—"অবশ্য না লওয়াই অন্যায়। উপবীত হওয়ার মানে—আমি সংস্কৃত—পৈতা থাকিলে মনে হইবে, আমি উন্নত—দুষ্কর্ম করিতে দ্বিধা হইবে।" আমি বলিলাম—"কিন্তু উপবীত অনেকেই ত অনেক রকম দুষ্কর্ম করে।" তিনি বলিলেন—"তাহাদের পৈতা লওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু যাহাদের সংযমের ক্ষমতা নাই, তাহারা দুষ্কর্ম যখন না করিয়া থাকিতে পারিবে না, সে সময় যেন পৈতা খুলিয়া রাখে। কারণ, পৈতাটা বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে যে বলে, পৈতা খুলিতে নাই, পৈতায় সাবান দিতে নাই।" তিনি বলিলেন—"বাজে কথা, তবে পৈতার গুরুত্ব বিধায়, খুলিলে আবার গায়ত্রী জপ করা উচিৎ। আবার সাবান পৈতায় দিতে বারণ করে তাহার কারণ এই যে, সাবানে প্রায়ই চর্বি থাকে, তাহা পৈতার মতন শুদ্ধ জিনিষে ছোঁয়ান উচিৎ নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া পৈতাটা ময়লা রাখা উচিৎ নয়। আর এক কথা, গায়ে যেটা মাখা যায় পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে, সেটা পৈতায় দিতে কি দোষ?" তাহার পর তিনি বলিলেন—"একটা প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনেক প্রশ্ন হইয়া গেল। এখন আর একটা প্রশ্ন কর্।" আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলাম—"গায়ত্রী জপ কখন কখন করা উচিৎ?" তিনি বলিলেন—"ঠিক সূর্যোদয়ের সময় ও সূর্যাস্তের সময় অবশ্য কর্তব্য।" আমি বলিলাম—"বলে যে ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়। আর সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় যদি কোন কার্যে লিপ্ত থাকিতে হয়, বা বাড়ীতে না থাকিতে পারা যায়?" তিনি বলিলেন—"তাতে কি? যেখানে যেভাবেই থাক, আসে যায় না। নিতান্ত অসম্ভব না হইলে, যথাসময়ে করাই কর্তব্য, আর ত্রিসন্ধ্যার কথা, আমি মধ্যাহ্নের সময় অবশ্য কর্তব্য মনে করি না। লোকে কোন্ সময় ঠিক মধ্যাহ্ন, জানিবে কি করিয়া?" তাহার পর তিনি তৃতীয় প্রশ্ন করিতে বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বিলাতে পড়িতে গিয়া কিম্বা এখানেও চিকিৎসার জন্য মুর্গি ইত্যাদি যদি খাইতে হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় কেন?" স্বামিজী বলিলেন—"ইহার যুক্তি পাওয়া যায় না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্', 'ঔষধার্থে সুরাপান' এই সমস্ত বচনের সহিত প্রায়শ্চিত্তের সামঞ্জস্য হয় না। শিক্ষার্থে বিদেশে গেলেই দোষ কি? লোভ করিয়া অখাদ্য খাইলে, অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করা উচিৎ। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত শুধু করিলেই হয় না। পাপ করিয়াছি অনুভব হওয়াই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।"

১৮৯৭

১

জানুয়ারী মাসের ১লা বা ২রা প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশী ও বিশেষ বন্ধু শ্রীচারুচন্দ্র বসুর (দেশ খোড়োপ উলুবেড়িয়ার নিকট) বাড়ীতে আসিয়াছি। আমার এক কাকা (বাবার মামাতো ভাই), চারুবাবুর পিসতুতো ভাই, মণিবাবু, চারুবাবু নিজে ও অপর দুইজন—সকলেই আমার চেয়ে ৪।০ বৎসরের বড়—এক মেজে বসিয়া চা খাইতেছেন। আমি চা খাই না, কেবল তাঁহাদের সঙ্গে হুল্লোড় করিতেছিলাম। এমন সময় বাবুর বাবা শ্রীগোপালগোবিন্দ বসু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন—"কিরে মণি, কি হচ্ছে? এত গোল-কিসের?" মণিবাবু বলিলেন—"না মামা, গোল কিছু নয়, আমরা দুর্গেটুনটুনীর বর্তন সব বসে আছি, আর কা কা কচ্ছি। চা আর চাল এই নিয়েই ত জীবন, কিন্তু সবে দু' কাপ চা কাউকেও খেতে দিবে না।" সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। গোপালগোবিন্দবাবু গতিক দেখিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেলেন। ঠিক সেই সময় একজন শিখ গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তিনি প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছেন। চারুবাবু দালালী করিতেন। এই শিখ ভদ্রলোক লাহোরে চারুবাবুর এজেন্ট। তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফার্সি ভাষায় (Persian)—ঠিক বাড়ীতে আসিয়াছেন কিনা। আমরা 'হ্যাঁ' বলায় তিনি বসিলেন, এবং চারুবাবুর খোঁজ করিলেন। চারুবাবু সেই সময় একবার ভিতরে গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন, এবং আমি চা দেওয়ায় খাইলেন। তাহার পর আমাকে বলিলেন—"আপনার হাত দেখি।" দেখাইলাম। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিলেন—"আপনার চারি মাসের মধ্যে বিয়ে হবে। এখান থেকে ঠিক দক্ষিণ দিকে মেয়ে আছে। মেয়ে পরমাসুন্দরী। নিজ ভাষা ছাড়া বিজাতীয় ভাষা দুইটা জানেন এবং খুব বড় ঘরের মেয়ে। আপনার যেখানে সব বিয়ের কথা হচ্ছে, সে সব জায়গায় হবে না।" যাহা বলিয়াছিলেন একেবারে ঠিক। কিন্তু তখন আমার এই মেয়ের সহিত একেবারেই কথা হয় নাই।

এইরকম আশ্চর্য 'প্রেডিক্শান' (ভবিষ্যৎ-বাণী) আমি আরও কয়েকটি দেখিয়াছি। যথা, আমার বাবার মৃত্যু, আমার কনিষ্ঠ পুত্রের মারাত্মক accident (দুর্ঘটনা)।

২

২৫শে এপ্রিল আমার বিবাহ। প্রকাণ্ড ভাবে এই

প্রথম বিবাহ শ্রেণী ভাঙ্গিয়া—অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর মধ্যে। পরে বংশপরিচয় অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল পূর্বেও দু'একটা ওরূপ হইয়াছে। আমার বিবাহ লইয়া একটা হুলস্থূল ব্যাপার হয়। যাঁহারা সমাজসংস্কারক বলিয়া খুব জানান দিতেন, তাঁহারাও ভিতর ভিতর এ বিবাহে আপত্তি করিলেন। বঙ্গজ সমাজের ত কথাই নাই, দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজেও। আমার স্ত্রী তাহার মাসীর কাছেই মানুষ।' কিন্তু টাকী সমাজের আপত্তির জন্য তিনি বিবাহে যোগদান করিতে পারেন নাই। এদিকে একজন সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতা ভিতরে২ খুব আপত্তি করিলেন—তিনি 'কনসেন্ট বিল' (স্যর এন্ড্রু স্কবল)-এর সমর্থক ছিলেন। আমার সহপাঠী এবং খুব পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ লোক যিনি কায়স্থ জাতির ষ্টেটাস ও বিভিন্ন বিভাগের সংমিশ্রণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও এই বিবাহে সভায় আপত্তি করিয়াছিলেন। তখন কায়স্থদের একটি "দল নিবারণী সভা" ছিল। এই সভার নাম ঐরূপ থাকিলেও তাহাদের কনষ্টিটিউশান্ মত জাতীয় সকল বিষয়েই বিবেচনা করিবার অধিকার ছিল। সে বৎসর সভাপতি ছিলেন স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র। এই বিবাহ বিষয় বিবেচনা করিবার অধিবেশনে ভয়ানক গোলযোগ হয় ও অবশেষে কিছু সাব্যস্ত হয় নাই। বাবা এবং খুব নিকট আত্মীয় কয়েকজন বলেন যে বঙ্গজ সমাজ যাহাই হউক না কেন, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশের মেয়ে আনিতেই হইবে। অপর দিকে যখন আমার শ্বশুর মহাশয়, তাঁহার দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি কিন্তু কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে খুব গণ্যমান্য ও বৃদ্ধ অভয়চরণ গুহকে জিজ্ঞাসা করেন, এ বিবাহ তিনি সমর্থন করেন কিনা, তিনি বলেন—"শারদাবাবু বললী. তিনি রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের নাতজামাই, এবং নিজেও নিষ্কলঙ্ক কুল, তখন আপত্তি কিছুই আমার নাই। কিন্তু তুমি দেখিবে, তুমি দক্ষিণ রাঢ়ীয় হইয়া যাইবে। বঙ্গজরা আর তোমাকে স্বশ্রেণী বলিয়া মানিবেন না। এবং তোমার উচ্চ কুলীনত্বও মানিবেন না।" যাহা হউক অবশেষে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এই বিবাহের বহুকাল পরে, ৭ই আগষ্ট ১৯০৪ সালে, যখন আমার খুব নিকট আত্মীয়ের বিয়ে হয়, তখন পাত্রের জ্যেঠা ও বাড়ীর কর্তা বিবাহে আপত্তি করিয়াছিলেন, মেয়ে ভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া। আমি যখন তাঁহাকে গিয়া বলিলাম—"কেন আপত্তি করিতেছেন, অন্য জায়গায় বিবাহ করিতে আপনার ভাইপো কিছুতেই রাজী হইবে না। কিন্তু ডাক্তারী প্রফেসান্-এ অবিবাহিত থাকা কি ভাল?" তিনি বলিলেন —"কেন? বিয়ে না করলে, খারাপ হয়ে যাবে বলছো? আর খারাপ হয়ে গেলে লোকে মেয়েদের দেখাতে তাকে ডাকবে না, এই বলছো?" আমি বলিলাম—"কতকটা ঐ রকমই বটে।" তিনি বলিলেন—"যাক, ভাববার দরকার নেই। অন্য সমাজে বিয়ে হওয়ার চেয়ে সবই ভাল। খারাপ যদি হয়ে যায় মরে গিয়েছে ধরে নেবো।"

এখন কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজে অনেক বিবাহ হইতেছে। কিন্তু উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজে বেশী হয় নাই। আমার মনে আছে, যখন ১৯১৭ সালে অধ্যাপক খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের (উত্তর রাঢ়ীয়) সঙ্গে ৺মতিলাল ঘোষের ভাগিনেয়ীর বিবাহ হয় তখন দিনাজপুরের মহারাজা ৺গিরিজানাথ রায় বিবাহে যোগদান করিতেছিলেন না। কিন্তু আমি যখন বলিলাম—"আপনাকে জানিয়ে এ বিবাহ স্থির করা হয়েছে, আপনি 'কায়স্থ সভা'র সভাপতি হিসাবে আন্তর্গণিক বিয়ে সমর্থন করেছেন, আর যাবেন না কি রকম?" তখন তিনি বলিয়াছিলেন —"আমার কি রকম বাত দেখিতেই পাইতেছেন, নড়িতেই পারিতেছি না।" আমি মহারাজকুমার (অর্থাৎ এখন যিনি মহারাজা) জগদীশনাথকে বিবাহে উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করিলাম। তিনি বলিলেন—"কুমারকে পুণ্যাহের জন্য দিনাজপুরে যেতে হবে, আজ রাত্রে না গেলে বড় অসুবিধা হবে। আমার ম্যানেজার বিয়েতে উপস্থিত হলেই হবে না?" আমি তখন বলিলাম—"তাহা হয় না। এ সকল সামাজিক ব্যাপারে, বিশেষতঃ নূতন ব্যাপারে কর্মচারী গেলে হয় না, অসুবিধা হলেও মহারাজকুমারকে যেতে হবে। কাল সকালে উনি দিনাজপুর যাবেন। আপনি যদি তাতে আপত্তি করেন, আমি প্রচার করে দেবো, যে আপনি সভায় এক কথা বলেন, কার্যে অন্য রকম করেন।" তখন আমার প্রস্তাবই থাকিল।

২

এমন কি ৪ঠা মার্চ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে, যখন আমার খুড়তুতো বোনের বিয়ে হয়, ভাগলপুরের বিখ্যাত উকিল উত্তর রাঢ়ীয় রণজিত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত, তখন পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্র সিংহের পোষ্যপুত্র অরুণচন্দ্র সিংহের ভ্রাতা শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (পরে যিনি হাইকোর্টে Registrar-in-Insolvency হন) বিবাহের সময় উপস্থিত হন নাই। বিবাহের পূর্বে আসিয়াছিলেন। তিনি আমার ভগ্নীপতির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। দিনাজপুরের কুমার শরদিন্দুনারায়ণ

যারাও উপস্থিত হন নাই কোনরকম ওজর করিয়া। তাঁহাকে শ্রীরণজিত সিংহ নিমন্ত্রণ করেন।

দুর্গাপূজার সময় আমরা সপরিবারে দেশে গিয়াছিলাম। সেবারে বাবা অতি সমারোহে দেশে পূজা করেন। তাহার পূর্ববৎসর অতীব সংক্ষেপে পূজা হয়। অর্থাৎ শুধু পূজাই হয়। লোকজন খাওয়ান হয় নাই। মধ্যে চল্লিশ বৎসর পূজা হয় নাই। আমার পিতামহ মস্তবড় পাকা ঠাকুরদালান তৈয়ার করাইয়া একবৎসর মাত্র পূজা তাহাতে করাইয়াছিলেন, তাহার পরবৎসরেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। তখন বাবা শিশু। তাহার পর বাবার অবস্থা ফিরিলেও, আর পূজার কথা মনে হয় নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃপক্ষের মধ্যে বাবা স্বপ্ন দেখেন, যে তাঁহার বাবা মাথার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"ওরে পূজা কর্, আমি কি বৃথাই পাকা ঠাকুরদালান ঘর করিলাম?" সে বৎসর আর পাড়াগাঁয়ে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা সম্ভব হয় নাই। প্রতিমা না করিয়াও পূজা করা যাইতে পারিত। কিন্তু সে গ্রামে পূর্বে, অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার প্রকোপের আগে, সাতখানি প্রতিমা হইত। এবং প্রবাদ আছে যে পুরোহিতেরা পূজার পর পনের দিন, কাঠ না জ্বালাইয়া লুচি জ্বালাইত, সেখানে ঘট দিয়া পূজা করিতে বাবার মন সরিল না। পরবৎসর শুধু পূজাই হইয়াছিল, এবং গ্রামস্থ ও নিকটস্থ গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইয়াছিল। তখন নিমন্ত্রণও পুরোহিতের নামে করা হয়, কারণ ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিমন্ত্রণ লইতেন না। কায়স্থদের তাঁহারা শূদ্রই ধরিতেন। খাওয়ান শুধু লুচি ও চিনি—সবার দেওয়া হইত। তাঁহারা তাহাই এবং দক্ষিণা হিসাবে ।০ চারি আনা লইয়া যাইতেন। পরবৎসর অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃঃ খাওয়ানর পরিবর্তন হয়—তাঁহারা পাত পাড়িয়া বসিয়া খাইয়াছিলেন এবং লুচি ও বেগুন ভাজা, লবণ না দিয়া কুমড়ার ছক্কা ও ছোলার ডাল ও আলুর দম এবং দই ও সন্দেশ খাইয়াছিলেন।

১৮৯৭ সনে গ্রামস্থ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসকলের সকল জাতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ, দই, মিষ্টান্ন সবই খাওয়ান হয়। কিন্তু কোন কোন কৈবর্ত ও বাগদী শুধু নিরামিষই খাইয়াছিল। কলিকাতা বা মফঃস্বলবাসী নিকটাত্মীয় কুটুম্ব অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং প্রায় ২০।২২ জন আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ট্রেনে হরিপালে গিয়া ১০টা নাগাদ পৌঁছিয়াছিলেন। সেখানে বাড়ীর ও ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী থাকিত। তাঁহারা বাড়ী পৌঁছিতে প্রায় ১১টা হইত। তখনই গরম খাবার কচুরী, সিঙ্গাড়া, জিলাপী, মেঠাই, নারিকেল নাড়ু খাইয়াছিলেন। তাহার পর বেলা ১।০টা আন্দাজ ভাত, তরকারী, মাছ, দই, ডাল সন্দেশ, ক্ষীর ও পান্তুয়া খাইয়াছিলেন। দই ও ক্ষীর ছাড়া সবই ঘরে করা। তাঁহারা বেলা ৪।০টা আন্দাজ ফের গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়াছিলেন। কেহ কেহ দিবাভাগে ১টার ট্রেনে কিম্বা বৈকালের ট্রেনে গিয়া সেখানেই রাত্রে থাকিয়া গিয়াছিলেন।

নিমন্ত্রণের প্রথা লইয়াও পরিবর্তন হয়। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণদের পত্র বাবার নামেই বাহির হয়। কিন্তু পুরোহিত গিয়া প্রধান ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ কায়স্থ ও ছেত্রীদের নিমন্ত্রণ লইয়া বেশ একটু গোলযোগ হইল। কলিকাতার প্রথানুযায়ী বাবার নামে ছাপান পত্র লইয়া আমি নিজে সব নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইলাম। প্রথমে বেজুরে গেলাম। সেখানে অনেক কায়স্থ, এবং বেজুর একটু বেশী দূরে। গিয়া সর্বপ্রথম যে ভদ্রলোকের বাড়ী পড়িল, তাঁহারে নিমন্ত্রণ পত্র দিলাম। তিনি বলিলেন—"বৃথা কষ্ট করিয়া আনিয়াছেন। এবং আমাকে দিলে ত হইবে না।" আমি বলিলাম—"সে কি রকম, আপনাকে নিমন্ত্রণ, আপনাকে পত্র দিলে হবে না?" তিনি বলিলেন—"না। আমাদের যে ২ জন-প্রধান আছেন, তাঁহাদের দিলেই হইবে এবং পত্র দিতে হইবে যে আপনি সকলকে লইয়া আসিবেন।" আমি প্রধান কে কে জানিয়া লইয়া তাঁহাদের কাছে গেলাম, প্রথমে যাহাকে পাইলাম, তাঁহাকে পত্র দিলাম। তিনি বলিলেন—"দাখো বাপু এ চলবেনা। এ সবই ভুল হয়েছে। চিঠি অন্য রকম হবে। আর ওকথার মানে নেই যে, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটি মার্জনা করিবেন। পত্র দ্বারাই ত করা চাই। সেই আমাদের অধিকাংশ আর যে এক, দুই বা তিনজন 'প্রধান আছেন তাঁদের একই চিঠি হবে। যারা যাবে তারা কায়স্থ কিনা, তারা পতিত কিনা, কি রকমে তোমরা জানবে। শেষ কথা, মেজোবাবু, আমরা সকলেই তোমাকে জানি, তোমার সঙ্গে প্রতিদিন বেলা ১টা থেকে রাত্রি ৮টা-৯টা অবধি পাশা, দাবা, তাস খেলছি। বিকেলে বেশ পেট ভরে জল, বেল, তরমুজের সরবৎ, নারিকেল নাড়ু খাচ্ছি। তা কি ভুলতে পারি? কিন্তু এখন তোমারে চিনছি না। নিয়ম হচ্ছে, তোমাদের পাইক দিয়ে একখান

চিঠি আমাদের পাঠাবে। পাইকদের আমরা চিনি।" একটু অবাক হইয়া গেলাম। পরে হুড়ায় গেলাম, সেখানেও অনেক কায়স্থ। সেখানেও সেই কথা। সেখানে প্রথমে শান্তনু বিশ্বাসের কাছে গিয়াছিলাম। জানিতাম যে, তিনি একজন প্রধান। তিনি আমাদের আত্মীয়। অথচ তিনিও বলিলেন—"মেজোবাবু, তোমাকে এখন চিনিতেছি না।" শেষে আমাদের গ্রামের নদীর অপর পারে, বলদবাঁধে গেলাম। সেখানেও ঐ কথা। অবশ্য সর্বত্রই সে বৎসরের মতন নিমন্ত্রণ ঐ পত্রেই হইল।

চিন্তা করিয়া মনে হইল, আমাদের দেশের প্রথা ত ভালই। আজকালকার কলিকাতার নিমন্ত্রণ-প্রথা বিষয়ে পরে আরও লিখিব। তৃতীয়তঃ ছেত্রীদের নিমন্ত্রণ করিতে যখন যাইলাম, আর এক ব্যাপার হইল। আমাদের গ্রামে ও তাহার সন্নিকট সকল গ্রামে বা পঞ্চগ্রামে বেশী ছেত্রী নাই এবং তাহাদের সমাজ বলিয়া কিছু নাই; আমাদের গ্রামের সংলগ্ন গ্রাম ভগবতীপুর, সিঙ্গুরে নৈটি এবং হরিপালে কিছু আছে, তন্মধ্যে অবস্থাপন্ন হরিপালের সিংহ-রায় পরিবার ও হরিপালের নিকট চাড়পুরের রায়েরা, যে পরিবারের হরিনাথ রায় হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ হইয়াছিলেন। ভগবতীপুর ও নৈটিতে ব্যক্তিগত সব নিমন্ত্রণ করা হয় ও কোন গোলযোগ হয় নাই। হরিপালে যখন নিমন্ত্রণ করিতে গেলাম, তখন তাঁহাদের এক শরিক বলিলেন—"আপনার পত্রে 'দাস' না দিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কেন?" আমি বলিলাম—"'দাস' লেখা হইবে কেন? আপনারা কি লেখেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"আপনারা শূদ্র, আমরা নই।" আমি বলিলাম—"কায়স্থ ও ছেত্রীরা কি একই মূল থেকে নয়?" এই বলিয়া বলিলাম—"শুনিয়াছি আমারই এক পিসির সিঙ্গুরের এক ছেত্রীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল।" আমি তাঁহাকে সংক্ষেপে আমার পিসির বিবাহের বৃত্তান্ত বলিলাম। কোন এক সম্পন্ন ছেত্রী পরিবার, সিঙ্গুরের বরদাকান্ত রায়চৌধুরীরা যখন এদেশে আসেন, সেই সময়েই আসেন। তাঁহাদের চাষবাসই কার্য ছিল, বরদাবাবুর মতন অন্য ব্যবসা ছিল না। ইনি ক্রমে খুব গরীব হইয়া পড়েন, কিন্তু অধ্যবসায়ের ফলে আবার অবস্থার কতকটা উন্নতি হয় এবং সেকালের হিসাবে রোজগার করেন। কিন্তু তিনি বিবাহ করিতে পারিতেছিলেন না। বরদাবাবুরা বড় লোক, তাঁহারা গরীব ছেলের সঙ্গে মেয়ে দিবেন কেন? অবশেষে বাবার দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতিকন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব হয়। তাহাতে কন্যার পিতা বলেন—"কায়স্থ না হইলে বিবাহ দিতে সাহস হয় না। অনুমান হয় ছেত্রী ও কায়স্থেরা একই মূল, কিন্তু আমরা দরিদ্র, তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলে, যদি আমাকে একঘরে করে?" তাহাতে বর বলে—"হাবি কায়েত।" বিবাহ হয়। সেই অবধি এক সম্প্রদায় হইয়াছে, যাহাদের বলে "হাবি-কায়েত"।

চাড়পুরের রায়েরা কখনও নিমন্ত্রণে আপত্তি করেন নাই এবং জজ হরিনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মদাস রায় বরাবর নবমীর রাত্রে আসিতেন এবং সে রাত্রি থাকিতেন। তিনি একসের মাংস খাইতে পারিতেন। বাবা যদিও আমাদের নিজেদের পূজায় জীববলি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, নবমীর দিন চিরপ্রথানুযায়ী গ্রামের জাগ্রত ৺কালীঠাকরুণের মন্দিরে আমাদের নামে একটা বা ততোধিক পাঠাবলি হইত। সে ত বন্ধ হয় নাই। [ক্রমশঃ]

'পূর্বস্মৃতি'তে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯৩১): চব্বিশ-পরগনা জিলার অন্তর্গত নৈহাটি নিবাসী রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র। সংস্কৃত কলেজে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৭৭ সনে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষকতার কর্ম করেন। পরে আট-বৎসর (১৮৮৬-১৮৯৪) তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এখান হইতে ১৯০০ সনে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যান। এই পদে কার্য করেন ১৯০৮ সন পর্যন্ত। ইহার পর তিনি সরকারী কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন (১৯২১-১৯২৪)। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৭ সনে তাঁহাকে ডি.লিট. উপাধি দেন।

অল্পবয়সেই হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারীরূপে এশিয়াটিক সোসাইটি-পরিচালিত সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষাসমূহের পুঁথি সংগ্রহ, সংকলন প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত হন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সোসাইটি তাঁহার হস্তেই এই ভার অর্পণ করেন। পুঁথি-সংগ্রহ-ব্যপদেশে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকি নেপালেও একাধিকবার গমন করেন। নেপালে প্রাপ্ত একখানি পুঁথি 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই বইখানি বাংলা-সাহিত্যের আদিযুগের সন্ধান দিয়াছে। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদে কয়েকবার বৃত হন। তাঁহার বাংলা-রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট। তৎকৃত কয়েকখানি পুস্তক বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।

আনাগারিকা ([illegible]) ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩): সিংহলে জন্ম। পিতার নাম ডন ক্যারোলিস হেওয়াবিতারণ। বাল্যকালের নাম

ডেভিড হেবাবিতারান। ইউরোপীয় সভ্যতা সিংহলী সমাজে এতই অনুপ্রবিষ্ট হয় যে, সিংহলীরা নিজ নামের পূর্বে কোনো ইউরোপীয় নাম যোগ করিয়া দিতেন, এঁহারও উক্ত নাম। বিখ্যাত থিয়সফিস্ট কর্নেল অলকটের সংস্পর্শে আসিয়া ডেভিড হেবাবিতারান বৌদ্ধধর্মে উদ্বুদ্ধ হন। নিজ বৌদ্ধধর্মেও তিনি নিরতিশয় নিষ্ঠাবান হইয়া উঠেন। এই সময় তিনি 'অনাগারিক ধর্মপাল' নাম গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সনে শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিরূপে ধর্মপাল যোগদান করেন। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা দেখিয়া বহু মার্কিনী নরনারী বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইহার পর তিনি সিংহলে ফিরিয়া আসেন। সিংহলের জাতীয় আন্দোলনেও তিনি যোগ দেন। বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ইহাকেই তিনি কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং এখানকার বৌদ্ধতীর্থগুলির (বুদ্ধগয়া, সারনাথ প্রভৃতি) সংস্কার ও উন্নতিসাধনে তৎপর হন। তিনি মার্কিনী মিস্-ফস্টারের অর্থানুকূল্যে বৌদ্ধতীর্থগুলির সংস্কারসাধন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কলিকাতায় 'মহাবোধি সোসাইটি' নামে বৌদ্ধদলের একটি কেন্দ্রস্থল গঠনেও প্রয়াসী হন। বর্তমানে 'মহাবোধি সোসাইটি' বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-সাহিত্য অনুশীলনের একটি বড়ো কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহার শাখা দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৩৬-১৯০৬): হাওড়া জেলার নারিট গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র। কলিকাতায় স্বীয় পিতৃব্য ঠাকুরদাস চূড়ামণির চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৫ সনে কলিকাতার গবর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি ইংরেজী-চর্চাও শুরু করিয়া দেন। ১৮৭২ সনে তিনি সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ হন। এই পদে ১৮৭৬ সনে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়া, ১৮৯৫ সনে অবসরগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কার্য করেন। সংস্কৃতশিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি 'সংস্কৃত এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সংস্কৃতের বিভিন্ন বিভাগের উপাধি-পরীক্ষা-প্রবর্তনে তিনি সচেষ্ট হন। টোলের সরকারী অর্থসাহায্য-প্রদানেও তাঁহার বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি নিজ গ্রামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ, মীমাংসা-দর্শন এবং কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থাদির তৎকৃত টীকা উল্লেখযোগ্য।

স্কব্‌ল, স্যার্ অ্যান্ড্রু রিচার্ড (জন্ম: ১৮৩১ খ্রী:): বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্। তিনি ভারতবর্ষে সরকারী আইন-বিভাগীয় বহু উচ্চপদে কার্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৬ হইতে ১৮৯১ সন পর্যন্ত বড়লাটের কাউন্সিলের আইন-সদস্য ('Legal Member') ছিলেন। ১৮৯১ সনে বিখ্যাত 'Age of Consent' বিল-এর (যাহা পরে 'সম্মতি আইন' নামে আখ্যাত হইয়াছে) খসড়া তিনি প্রণয়ন করেন। বিলাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি পার্লামেন্টেরও সদস্য হন।

রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যার্ (১৮৪০-১৮৯৯): চব্বিশ-পরগনা জিলার অন্তর্গত রাজারহাট-বিষ্ণুপুর গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র। প্রথমে সদর দেওয়ানী আদালতে এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি দুইবার অস্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতি হন। ১৮৮৩ সনে আদালত অবমাননার দায়ে দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাইকোর্টে যে বিচার হয়, তাহাতে রমেশচন্দ্র বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের পরিবর্তে মুক্তিদানেরই সপক্ষে স্বতন্ত্রভাবে রায় দিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র ১৮৮৬-৮৭ সনে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশনের রিপোর্টে অধিকাংশ সদস্যের মতামত গ্রহণ না করিয়া তিনি এই মর্মে নিজ মন্তব্যলিপি পেশ করেন যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা একইকালে বিলাতে ও ভারতবর্ষে গ্রহণ করিতে হইবে। কংগ্রেস তথা প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পূর্ব হইতে এই অভিমতই প্রচার করিতেছিলেন।

দাতা বলিয়া রমেশচন্দ্রের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি উইল দ্বারা বাহান্ন হাজার টাকা দান করিয়া যান।

জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজা (নাটোর) [১৮৬৮-১৯২৬]: খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমাজসেবী। ১৮৯০ সনে সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি সে-যুগের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে একযোগে কার্য করেন। ১৮৯৭ সনে নাটোরে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান, স্বদেশ-প্রেমিক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কংগ্রেসের বহরমপুর অধিবেশনে (১৯০৩) জগদিন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষা-প্রসারেও তিনি সবিশেষ অবহিত হন। তাঁহার সাহিত্য-চর্চা সুবিদিত। তিনি 'মানসী ও মর্মবাণী' নামক বিখ্যাত মাসিকপত্রিকা দীর্ঘকাল পরিচালনা করেন।

মতিলাল ঘোষ (১২৫২-১৩২১ বঙ্গাব্দ): 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের অনুজ। পত্রিকাখানির সমৃদ্ধিতে মতিলালের কৃতিত্ব অসামান্য। তিনি বঙ্গের চরমপন্থী রাজনৈতিক-দলের অগ্রণীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

ফুলোবাসিতা

অসিত গুপ্ত

সূর্যের আলো হয়ত জায়গাটায় তেমনিভাবে আজও এসে পড়ে, তেমনিভাবে ছায়া ফেলে ফেলে যায়—অনেকদিন আগে ঠিক যেমনটি যেত।

মিশনারী হস্টেলের সামনে দিয়ে, ব্রস্টেলকে পাশে রেখে যে-রাস্তাটা এঁকেবেঁকে একটু এগিয়ে গির্জায় মিশেছে, সেদিনের মতো সেই রাস্তায় আজও অপর্যাপ্তভাবে অভ্র ছড়িয়ে থাকে।

তেমনিভাবেই চকচক করে।

তবু সেদিন আর এদিনে অনেক তফাত।

আজ আর স্মিথের—জন স্মিথের গলা শোনা যায় না সেখানে। প্রার্থনার পর 'ডিসিপ্লিন' সম্বন্ধে উপদেশ শুনে শুনে ছেলেমেয়েদের ক্লান্ত হতে হয় না। তখন লোক বলতে ছিল সাঁওতাল আদিবাসী, ব্যবসা-সন্ধানী নানা প্রদেশের কিছু ভদ্রলোক আর মিশনারীর দল। তখনও দোকান-বাজার এমনি করে মাথা তোলেনি।

পৃথিবীতে যাদের ঠিক-ঠিকানা জানা নেই, কিংবা পরিচয় কলঙ্কে ঢাকা পড়েছে—শুধু তাদেরই নিয়ে আসা হত এখানে—ব্যাপ্টাইজ করে, যথাসম্ভব মাজা-ঘষা করে মানুষ গড়ে তোলবার চেষ্টা চলত। আর, তার-ই জন্যে নিয়ম ও কড়াকড়ির অন্ত ছিল না। স্মিথ-ই সেসব করেছিলেন। যেন এখানকার সকলেই মহাপাপী, ঘোরতর অপরাধী। একমাত্র তিনিই ট্রু ক্রীশ্চিয়ান, মহাপ্রভু যীশুর নির্দেশে এসেছেন পাতকী উদ্ধার করতে—স্মিথের ভাবখানা ছিল এই।

ছেলেমেয়েরাও ছোট থেকে নিজেদের অপরাধী ছাড়া আর কিছু ভাবতে শেখেনি। শাসনের দাপটে সর্বদাই তারা ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকেছে।

সকালের ঘণ্টা বাজলেই সকলকে লাইন-বন্দী হয়ে গির্জায় যেতে হত। সেখানে স্মিথ সাদা পোশাকে, গুরুগম্ভীর মুখে অপেক্ষা করে থাকতেন। বৃদ্ধ রেভারেণ্ড জনসনের সঙ্গে সকলকে গলা মিলিয়ে প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করতে হত।

আর তাই দেখে ভীষণ হাসি পেত ডেবরার। সতেরো-বছরের সুন্দরী মেয়ে।

মিটিমিটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে—লাইনে, ঠিক তার পাশে দাঁড়ানো ছেলেটিকে কনুই দিয়ে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিত সে, দিয়ে মজা পেত।

"আসলে লোকটা মহা ভণ্ড, ঘোর জেন্টেলম্যান ভান ধরে"—জন স্মিথ সম্বন্ধে ফিসফিস করে মন্তব্য করত ডেবরা। তারপর মাথা তুলে দেখত কোনো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে লক্ষ্য করছে কিনা, লক্ষ্য করত চোখের জলে ভক্তি-গদগদ জনসনের সাদা দাড়িটা কতখানি ভেসে গেল।

প্রার্থনা শেষ হলে মিঃ স্মিথের উপদেশ শুরু হত; রোজ এক উপদেশ: "ইফ উই সে দ্যাট উই হ্যাভ নো সিন্, উই ডিসিভ আওয়ার-সেলভ্‌স্ অ্যাণ্ড দি ট্রুথ ইজ্ নট ইন আস, বাই—"

ডেবরা তখন অকারণে মুচকে মুচকে হাসত, সকৌতুকে দেহলতাতে হিল্লোল তুলত।

তার সমান্তরাল দাঁতের শুভ্র হাসি, দেহের ওই অকারণ কাঁপুনিটুকু একজন কিন্তু গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করত—সে পল।

পল জানত যে, ডেবরা তাকে ভালবাসে; কিন্তু কড়া পাহারার বেড়া ডিঙিয়ে তাদের মেলামেশা করার কোনো উপায় ছিল না। করতে তারা ভয় পেত। শাস্তির ভয়টাই ছিল বেশি।

তবু পল একদিন মরিয়া হল।

স্মিথ অদ্ভুত-অদ্ভুত সব নিয়ম তৈরি করেছিলেন। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বিকেলবেলা বেড়াতে বেরোত, তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকত একটা করে মোমবাতি। সন্ধ্যার সময়, ফেরবার পথে সেই বাতিগুলো জ্বালিয়ে সকলকে কোরাসে গান গাইতে-গাইতে আসতে হত। স্মিথ বলতেন, ও-থেকে নাকি ভালো ডিসিপ্লিন শেখা যায়।

এক বিকেলবেলায় রোজকার মতো বেড়াতে গিয়ে সবাই যখন এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছে, সেই সময় পল হঠাৎ ডেবরাকে নিয়ে একপাশে সরে এল। চারদিকের চোখ বাঁচিয়ে একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে বসল ওরা।

—একি করলে বলো তো?— ভয়ে, উত্তেজনায় ডেবরা তখন কাঁপছে। —যদি কেউ দেখে ফেলে?

—ফেলে ফেলবে। আর কতদিন এভাবে আমরা নিজেদের ঠকাব, ডেবরা?— পল বলল।

—তা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি বলো।

পল কোনো উত্তর না দিয়ে চেয়ে রইল ডেবরার মুখের দিকে। ওর টানা-টানা চোখের ওপর উড়ে-পড়া চুলের গুচ্ছটাকে দেখল।

—চলো আমরা এখান থেকে কোথাও চলে যাই যেখানে স্মিথ থাকবে না, শাসনের নামে জীবনের স্বাভাবিক আনন্দকে অহরহ গলা টিপে মারবে না কেউ যাবে?

—কিন্তু যদি ধরা পড়ি?— ডেবরার গলায় উৎকণ্ঠা —তার যে ভীষণ শাস্তি সে তো আমি সহ্য করতে পারব না। ওরা মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে শরীর, হয়ত সব ছেলেমেয়েদের ডেকে গায়ে থুথু দিতে বলবে, হয়ত…না না, তার চেয়ে—

—চুপ।

দূরে পাতায় পাতায় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

এমনি করে একদিন, তারপরে আরও একদিন পালিয়ে গিয়ে ওরা অনেক কথার মালা গাঁথল, স্বপ্ন দেখল অনেক।

ক্রমে ওদের সাহস বেড়ে গিয়েছিল। সময়ের দিকে আর বড় একটা খেয়াল রইল না। সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে ম্যাকিট-হাউসের পেছনদিককার বড় বড় গাছগুলোর ফাঁকে অন্ধকার যখন বেশি করে জমাট বাঁধত, তখনো নানা কথায় ডুবে থাকত ওরা।

—আচ্ছা পল, তোমার বাবাকে মনে পড়ে? মা?

—না। কোথা থেকে এলাম, কেমন করে এলাম কিছুই জানি না। জ্ঞান হয়ে অবধি ওই লোকটাকেই চিনে এসেছি।

পলের দৃষ্টিটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। —কার পাপের ফল বলতে পার, ডেবরা, যার জন্যে আমাদের জীবনটা এমনিভাবে তছনছ হয়ে যাবে? এমনি করে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো দিন যাপন করতে হবে? তুমি হয়ত বলবে—'সিন্স্ অফ দি ফাদার'। কিন্তু কেন? আমার পরিচয় আমি। আমি তো অন্য মানুষের মতো খোলা আকাশের তলায় সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারি। আমি তো অসংকোচে হাসতে পারি, মানুষকে ভালবেসে ধন্য হতে পারি। অন্যের অন্যায়ে লোক আমাকে ঘৃণা করবে কেন, বলো?

পল উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল। উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ডেবরা। তারপর কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল,—স্মিথ লোকটাকে আমার কিরকম যেন মনে হয়। জানো, আমি ওর চোখের তারায় মাঝে মাঝে একটা ক্ষুধার্ত পশুকে দেখেছি। ইভেন, ইভেন পল—

—আচ্ছা, আগের মতো তোমায় আর ভয় করে না, না? যদি আমরা ধরা পড়ি?— পল আবার শান্তকণ্ঠে বলল।

—বেশ মজা হয় তাহলে। প্রেমের জন্যে আমরা এক কীর্তি তৈরি করে যাব। অনেক—অনেক পরে যখন সব নতুন ছেলেমেয়ে আসবে, বলাবলি করবে আমাদের কথা, আমাদের কথা ভেবে তারা মনে সাহস পাবে।

কিন্তু সত্যি-সত্যিই ওরা একদিন ধরা পড়ে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত জায়গা ছেড়ে নড়েনি। কেমন যেন একটা নেশা চেপে গিয়েছিল ওদের। বিপদ সামনে জেনে বেশিরকম মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

ওদের দেখেই মিঃ স্মিথ ফেটে পড়লেন। হাতের বেতটা কয়েকবার শূন্যে আস্ফালন করে উঠল। —ইউ ডার্টি ক্রীচারস্, ইউ ডু নট নো হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান। আই শ্যাল টিচ্ ইউ এ ব্লাডি গুড লেসন।— ঘর কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

পরদিন ওদের বিচার হবে।

শাস্তির পরিমাণ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলল ছেলেমেয়েদের মধ্যে। চারিদিকে হঠাৎ যেন একটা আতঙ্কের হিম পড়ল। সবাই চাপাগলায় ফিসফিস করে কথা বলে, এ ওর নাম ধরে ডাকতে পর্যন্ত সাহস পায় না।

কিন্তু কিছুই করতে হল না পরদিন। ঘনিয়ে-ওঠা উত্তেজনাটা আপনা থেকেই স্তিমিত হয়ে গেল। সমস্যার সহজ সমাধানে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই।

যথানিয়মে সকালের প্রার্থনা-শেষে জন স্মিথ বড় হলঘরটায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দাড়ি নেড়ে হাজির হয়েছিলেন বৃদ্ধ রেভারেণ্ড। উপস্থিত ছিল ছেলেমেয়ের দল। এমন সময় মিস্ দাস ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিল। জেবরা আত্মহত্যা করেছে। বাথরুমের সিলিং-এর সঙ্গে বিছানার চাদর ঝুলিয়ে ফাঁস তৈরি করেছিল।

সারা হলঘরটাতে একবার মাত্র মৃদু গুঞ্জন উঠেই থেমে গেল।

হস্টেলের যে আলাদা ঘরটাতে জেবরাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, সমস্ত ভীড়টা ভেঙে পড়ল সেখানে। স্মিথ ছুটে গেলেন। সাদা আলখাল্লার বড় পকেট থেকে ছোট বাইবেলটা বার করে পড়লেন বৃদ্ধ জনসন।

কিন্তু তবু কোনো শান্তিভঙ্গ হল না। কোথাও একটুও প্রতিবাদের চাঞ্চল্য জাগল না। বরং আরও সতর্ক হল সবাই। ভয়টা আরও বেশি করে চেপে ধরল।

পল ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। নিজে মরে তাকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে গিয়েছিল জেবরা। রোজ বিকেল হলে সার্কিট-হাউসের পেছনটায় সে একলা এসে বসত। অনেক কথা যখন আপনা থেকে ওর মনে ভীড় করে আসত, তখন একসময় হঠাৎ নিজেকেই প্রশ্ন করত পল: জেবরা মরল কেন?

এর জবাব পেয়েছিল অনেকদিন পরে।

দিলীপ বিশ্বাস ওকে সব ব্যাপারটা খুলে বলল। —হ্যাঁ, আমি জানি।— হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল দিলীপ। সব কথা ওর চোখে এসে জমা হল। —আমি অ্যাক্সিডেন্টালি সব শুনে ফেলেছিলাম। সেদিন রাতে, বন্ধ ঘরে মিঃ স্মিথ—হ্যাঁ, জন স্মিথ নিজেই জেবরাকে প্রপোজ করছেন। আর সেকি জঘন্য প্রস্তাব!

—বিশ্বাস, কী বলছ তুমি?— চীৎকার করে উঠল পল।

—ঠিকই বলছি, বন্ধু। লর্ড যেশাসের নামে শপথ করেই বলছি। এতদিন তোমরা যা জেনে এসেছ তা ভুল—একেবারে মিথ্যে। তোমরা জান যে, শাস্তির ভয়ে মরেছে জেবরা, কিন্তু তা নয়, তা নয়। মিঃ স্মিথ বলেছিলেন, সব শাস্তির হাত থেকে তিনিই বাঁচিয়ে দিতে পারেন, যদি জেবরা…কাঁপা গলায় কথাগুলো ব'লে দিলীপ বিশ্বাস স্থিরদৃষ্টিতে পলের দিকে তাকাল। —আরও বলেছিলেন মিঃ স্মিথ— একটু থেমে দিলীপ আবার বলল,—বলেছিলেন, জেবরা যদি রাজী না হয় তাঁর কথায়, তাহলে তিনি জোর খাটাতেও কসুর করবেন না।—অ্যাণ্ড দাট ইজ দি এণ্ড, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড—জেবরার মৃত্যুর আসল কারণটা এই।

কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে পার করে দিয়ে পল ধীরে ধীরে বলল,—তবে তো জেবরা ঠিক-ই বলত। জানো, ওই স্মিথের চোখে ও এক হিংস্র জন্তুর ছায়া দেখতে পেয়েছিল!

পলের চোখে পুরনো স্মৃতির একটুকরো ছায়া নামল। —যাক্, ভালোই হয়েছে, ঠিক-ই করেছে জেবরা। মরে গিয়ে, অসহ্য মৃত্যুর দংশন থেকে বেঁচেছে। কী বলো বিশ্বাস?

—হুঁ। কিন্তু কেন? কেন, বলতে পার, পল? একজনের অন্যায় চাহিদা মেটাতে আরেকজনকে এমনিভাবে মরতে হবে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ কোনোদিন পায়নি।

কামনার আগুনে অনেক নিষ্পাপ জীবন ঝলসে পোড়ার ইতিহাস অনেককালের। তাতে পৃথিবীর কোনোদিন কিছুমাত্র যায়-আসেনি। নিয়তি বজ্র হয়ে নামেনি দুর্বৃত্তের মাথায়।

মহাপ্রভু যীশুর একনিষ্ঠ ভক্ত-সন্তান বলে পরিচিত মিঃ স্মিথ তারপর বহুদিন রাজত্ব করেছিলেন। নিশিদিন সযত্নে ছেলেমেয়েদের উপদেশ দিয়েছিলেন। শুধু একটি ফুল ঝরে গিয়েছিল অবেলায়।

যার নাম জেবরা।

"মে গড ব্লেস হার সোল ইন পীস!"

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেমেয়েরা সবাই সবসময় হাসিখুশী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুশী থাকবে কেমন করে? ময়লা, ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লাজনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।

L/P. 8-R52 [illegible]

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত

বঙ্গদূত

সংগোপনেন বিবৃতিং প্রকরোতি দূতাঃ সর্ব্বেমতস্ত্র পুরজনাহিতমপ্যুপেতাঃ।
কিঞ্চাখিলার্থ কলনায় স্বদেশভূত প্রজ্ঞাময়ং বিতনুতে খলু বঙ্গদূতঃ।

অন্তঅন্তদূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মম অন্বেষণে।
অতএব সাধারণ, সর্ব্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত।

৫ সংখ্যা শনিবার ১২৩৬ সাল ২৫—জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮২৯ সাল ৬—জুন

নূতন ডাকঘর।

গত ২৩মে তারিখে রোজারি ও কোম্পানি কলিকাতার এক আনা মাসুলের ডাকঘরস্থাপনের বিষয়ে আপন সকল কথা প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহারা কলিকাতার মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থানে চিঠী বাঁটিয়া দিবেন একভরি ওজন পর্য্যন্ত এক আনা মাসুল লাগিবে এবং এক অবধি দুইভরি পর্য্যন্ত দুই আনা এবং দিনের মধ্যে তাঁহারা তিনবার চিঠী পাঠাইয়া দিবেন প্রথম বণ্টন প্রাতঃকালে নয়ঘণ্টার সময়ে দ্বিতীয় বণ্টন দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে হইবেক ঐ সাহেব লোকেরা কেবল কলিকাতার মধ্যেই চিঠী প্রেরণ করিতে স্বত্ব করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু কলিকাতার আশপাশ স্থানে যথা উত্তরদিগে চিত্‌পুর কাশীপুর প্রভৃতি চাণক পর্য্যন্ত। পূর্ব্বদিকে দমদমা ও নীলগঞ্জ পর্য্যন্ত। দক্ষিণদিগে বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর ও ভবানীপুর পর্য্যন্ত পশ্চিমদিগে হাবড়া সালিকা শিবপুর পর্য্যন্ত। কলিকাতার মধ্যে দিনে তিনবার তাঁহারা চিঠী প্রেরণ করিবেন এবং দমদমা প্রভৃতি স্থানে দিনে দুইবার, এই রীতির আরম্ভ গত ২জুন সোমবার অবধি হইয়াছে।

উৎপন্ন বুদ্ধির বিপদুদ্ধার।

শাস্ত্রমতে এজগতে সেই ·· কসার।
আসন্ন আপদে যার বুদ্ধি অম্ল ·· পয়।
বিষম বিপদে যেবা নাহয় বিষণ্ণ।
মতিমান্ সেইজন সদা অবিপন্ন।

শ্রুত যে মায়াপুরের নিকটবর্ত্তিনী মণ্ডেশ্বরী নাম্নী এক নদী আছে তাহাতে সর্ব্বদা অধিক জল না থাকাতে নৌকার পার আবশ্যকতা নাই বর্ষাকালে ডোঙ্গা ডিঙ্গিদ্বারা পারাপার হইতে হয় কিন্তু কখন কখন ঐ নদীতে বন্যা আসিয়া থাকে ইহাতে পার হওয়া দুষ্কর, কিয়ৎকাল হইল ঐ নদীতে জল বৃদ্ধিপ্রযুক্ত একব্যক্তি নৌকার অভাবে সন্তরণ দ্বারা মুণ্ডে উচ্চ উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া তুণ্ড বিস্তার পূর্ব্বক মণ্ডেশ্বরী পার হইতেছিল ইতোমধ্যে গম্ভীর নীর বিলাসী কুম্ভীর কতিপয় হস্তান্তরিত হইয়া তৎপশ্চাদ্গামী হইল তদ্দৃষ্টে তীরস্থ লোকেরা ঐ জলস্থ ব্যক্তিকে কহিল যে সাবধান কুম্ভীর পশ্চাৎ যাইতেছে তৎকালে কালস্বরূপ কুম্ভীরের কি করিতে

পারে বিবেচনা করিয়া আস্তে আস্তে মস্তে হস্ত দিয়া পাগড়ী প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া জলমগ্ন হইল তৃতীয় পাগড়ী দেখিয়া মনুষ্যবোধে তৎপশ্চাৎ গমন করিলেক ঐ ব্যক্তি নীর মধ্য পথাবলম্বনে তীর প্রাপ্ত হইল যাহা হউক এরূপ বিপদ্‌কালে ধৈর্য্য ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রাচুর্য্য প্রভৃতিতে অদ্ভুত সুতরাং শাস্ত্রানুসারে ইহাকেই সুবুদ্ধি কহা যায় যথা উৎপন্নমাপদং যস্ত সমাধত্তে স বুদ্ধিমান্।

—

কাশীর টাকশাল।

ইদানী শ্রীশ্রীযুত গবরনরজেনরল বাহাদুরের কৌন্সলীয় সভা হইতে বর্ত্তমান বৎসরের ১৭ মেতে এক ইশ্‌তেহার অর্থাৎ ঘোষণাপত্র এই অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে যে বারাণস নগরের টাঁকশালের স্থগিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব পূর্ব্বোক্ত দিবস হইতে ছয় মাসের পর কোন ব্যক্তি স্বর্ণ রূপ্য ঐ টাঁকশালে মুদ্রার কারণ লইয়া গেলে গ্রহণ করা যাইবেক না এবং পশ্চিম প্রদেশে চলিত মুদ্রার চলন তদবস্থা রাখিবার জন্য এই স্থির হইল যে নিরূপিত দিবসের পর হইতে সকলকে অনুমতি ও ক্ষমতা প্রদান হইবেক যে তাঁহারা স্ব স্ব রূপ্যাদি ফররোখাবাদী টাকা প্রস্তুত নিমিত্ত ১৮২৯ সালের একাদশ আইনের লিখিত নিয়মানুসারে কলিকাতার টাঁকশালে অর্পণ করিতে থাকিবেন।

—

মান্দরাজ।

ব্যক্ত যে মান্দরাজের শ্রীশ্রীমতী বেগম গত বৎসরে তাঁহার এক বাদীকে প্রহার দ্বারা হত্যাকরণ কারণ অপরাধগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ বাদীর কৌন্সলি শ্রীমতীকে মেজ্রাটর দোষারোপে তাঁহার নামে ইণ্ডাইট করিয়াছিলেন সম্প্রতি সেই অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ডীয়াধিপতির আদেশ কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে এমতে অনুমান যে ঐ বেগমের জামিনী বরখাস্তের জন্য এবং শ্রীশ্রীযুতের অপরাধমার্জ্জন সংবাদ বিজ্ঞাপন নিমিত্ত শীঘ্র কোন সুযোগ হইবেক কিম্বা এতদ্বিষয়ের সমাধানার্থে এক স্পিসেয়ল্ কোর্ট নির্দ্ধারিত হইবেক।

—

ইংলণ্ডীয় অধিকারের বর্ষসংখ্যা।

ইংরাজী গত ১৮২৮ সালে ইংলণ্ডীয় রাজার সাম্রাজ্য একসহস্রবৎসর পূর্ণ হইয়াছে বর্ত্তমান বর্ষ এক সহস্র এক বর্ষ যাইতেছে।

—

ফ্রান্সদেশ।

সপাপিষ্ঠ স্ততোধিকঃ।

পূর্ব্বে আমরা বর্ক নামক স্কটলণ্ডের একজন দুর্জ্জনের যে দৌর্জ্জন্য সমাচার প্রকাশ করিয়াছি তাহার তুলনার স্থান আর দেখা যায় নাই এক্ষণে এলেজিন করিয়র নামক ফ্রান্সদেশের সমাচার যাহা গবর্ণমেন্টগেজেটে প্রচার হয় তদ্দ্বারা বোধ হইল যে একজন ধাত্রী যাহাকে শাস্ত্রানুসারে সপ্ত মাতার মধ্যে গণনা করা যায় সেই স্ত্রীলোক বাবষ্টি জন বালককে হত্যা করিয়াছিল তাহার বিশেষ এই যে ফ্রান্স দেশের মধ্যে পেরিস্ নামক স্থানেতে সন ১৬৭০ সালে ঐ ধাত্রী আপন ব্যবসায়েতে সর্ব্ব বিখ্যাতা হইয়াছিল তাহাতে অবিবাহিতা ভ্রষ্টা স্ত্রী সকলের সংগোপনে প্রসব করণের বিশেষ প্রয়োজনাবধানে আপন গৃহে এক সূতিকাগার নির্দ্ধারিত করিয়া তাহাতেই ঐসকল স্ত্রীলোককে প্রসব করাইত তৎ প্রতিবাসী কোন ব্যক্তি ক্রমে জানিতে পারিল যে যত সগর্ভা স্ত্রী ঐস্থানে প্রবিষ্টা হয় প্রায় সকলেরি গর্ভপাত হয় কদাচিৎ কেহ সন্তানসহ সূতিকা গৃহ হইতে বাহিরে আইসে ইহাতে অপত্যহত্যার সন্দেহ জন্মে ঐ ব্যক্তি অনেকের নিকট এই প্রস্তাব করিল ইহাতে সকলের দৃঢ়নিশ্চয় হওয়াতে অপকৃত গোপ্যাগার ঐ গৃহে আছে ইহা কহিয়া সেই সকলে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিল ইহাতে ঐ গোপ্যাধার অনুসন্ধান করত ঐ গৃহমধ্যে এক নিভৃত স্থানেতে বাবষ্টি জন অভিনব বালকের অস্থি বাহির হইল অনন্তর বিচারে এই ব্যভিচারিণীর দুরাচার সপ্রমাণ হওয়াতে তদ্দেশীয় সর্ব্বজনের প্রার্থনা হইল যে ঐ দুষ্টার দুর্দ্দশা হয় অবশেষে তাহাই ঘটিল অর্থাৎ সেইস্থানে এক ফাঁসী কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়া তাহার নীচে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উর্দ্ধভাগে ঐ স্ত্রীকে লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করাতে প্রায় পঞ্চাশ পলের মধ্যে সেই প্রাণ হন্ত্রী ধাত্রীর প্রাণপক্ষী দেহ পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল।

ধুতি-তত্ত্ব

অজিত গাঙ্গুলী

শিবরাম মুখুজ্জে অফিস থেকে বাড়ী ফিরে মুখ কাঁচুমাচু করে গিন্নীকে বললেন,—এ বছরটা রেহাই দাও, হাবুর মা! এ বছরে আমি অপারগ।

মুখুজ্জে-গিন্নী তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়ে সবেমাত্র ঘরে ঢুকেছেন, স্বামীর কথায় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন,—কী রেহাই দেব গা? কিসের কথা বলছ?

শিবরাম ঘামেভেজা পুরনো আধময়লা শার্টটা খুলতে-খুলতে তেমনি কাঁচুমাচু ভাবেই বললেন,—জামাইকে ধুতি দেবার কথা বলছি। আগুন দাম, হাবুর মা,—আগুন দাম। এমনি কোরার দাম-ই শুনলে পিলে চমকায়—আর তো ফাইন ধুতি। তাই বলছিলাম, এ বছরে পুজোর আর জামাইকে ধুতি দিয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া জামাই তো আর নতুন নয়, পুরনো হয়ে গেছে।

চোখ কপালে তুলে মুখুজ্জে-গিন্নী বললেন,—ওমা! এ তুমি বলছ কি! আস্তে আস্তে সবই তো বন্ধ করেছ। মেয়েকে কাপড়-চোপড় দাওনা দু'বছর। তিনটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে, তাদেরও তো পারছ নমো-নমো করে। সস্তার জামা-পেন্টুল কিনে পুজোর বাজার সারলে এ-বছর। আমার কথা নয় বাদই দিলুম, কিন্তু একটা মাত্তর জামাই, তারও পুজোর তত্ত্ব বন্ধ করতে চাও? লোকে শুনলে বলবে কি?

এই কথায় শিবরাম একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন,—লোকে কী বলবে তার ভয়ে, আমার ক্ষমতা না থাকলেও, দিতে হবে? একশো পঁচাত্তর টাকার কেরানী আমি। গোটা সংসার চালিয়ে, ছেলেপুলের ইস্কুল-পাঠশালে সামলে, ডাক্তারের দেনা চুকিয়ে কোত্থেকে জামাই-এর পুজোর তত্ত্ব করব শুনি? তুমি তো বলেই খালাস। বাজারের খবর রাখ? একখানা ফাইন ধুতির দাম জান? লোকে বলবে? লোক আমায় দেবে?—খেতে না পেলে একবস্তা চাল, পরবার একজোড়া কাপড়? জান, এ মাসের ডাক্তারের দেনা দিয়েছি চল্লিশটি টাকা। হাবুর টাইফয়েডে কম টাকা গলেছে? তুমি কি বলতে চাও হাবুর মা, আমি লোকের দেনা না চুকিয়ে, লোকের কাছে মান রাখতে জামাইয়ের তত্ত্ব পাঠাবো? সারা মাস খাব কী? সামনে আবার হাবুর পরীক্ষা আসছে। তারপর ট্যাপাটার চোখ-খারাপ হয়েছে, তাকেও ডাক্তার দেখাতে হবে। জমানো তো নেই দু'পাঁচশো যে তার থেকে ভাঙবো? তা ছাড়া বিনোদ স্যাকরার কাছে তোমার তাগাজোড়া বন্ধক রয়েছে তার দরুনও টাকা দিতে হচ্ছে। এ মাসে তো তার কিস্তীর টাকাও দিতে পারলুম না। জামাইষষ্ঠীতে তো দিয়েছি। নয় এবারের পুজোটা বাদ যাবে। ভগবান দিলে সামনের বছর···

—না না! ওসব কথা শুনতে আমি চাইনা।—ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মুখুজ্জে-গিন্নী। বললেন,—তোমার টাকা না থাকে, আমার হাতে চুড়ি আছে। খুলে দিচ্ছি দু'গাছা। নিয়ে এসো কিনে ভালো দেখে একখানা ধুতি। শিবির মনে দুঃখ হবেনা? সে নিজে পারেনা, তার স্বামীকেও দেওয়া বন্ধ করলে শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাকে খোঁটা দেবেনা? স্বজনের কাছে তার মাথা হেঁট হবেনা? এই নাও দু'গাছা চুড়ি। বিনোদ স্যাকরার কাছে বাঁধা রেখে হোক,

বেচে হোক, ধুতি আনা চাই কাল। মাগো মা! তিনদিন বাদে ষষ্ঠী, এখনও জামাইকে পুজোর তত্ত্ব পাঠাতে পারলুম না। কী পোড়া অদেষ্টই করেছিলুম মা-দুগ্‌গা!— চুড়ি দু'গাছা খুলে চৌকির ওপর রেখে মুখুজ্জে-গিন্নী দুম্ দুম্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শিবরাম মুখুজ্জে কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থেকে চুড়ি-দু'গাছার দিকে তাকালেন ব্যথাভরা চোখে।

২

শ্যামলাল গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছাড়ছে। স্ত্রী শিবানী ঘরে ঢুকল; স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে বলল,—কী হল? অ্যাড্‌ভান্স আজও পেলেনা?

শ্যামলাল ইজিচেয়ারে বসতে বসতে হতাশায় নুয়ে বললো,—নাঃ! কই আর পেলাম। ম্যানেজারকে অনেক সাধ্য-সাধনা করলাম; বলে—'এতদিন কামাই করে চাকরিটাই যে বজায় রয়েছে এই যথেষ্ট, এর ওপর আবার অ্যাড্‌ভান্স চাইছেন?' তুমিই বলো শিবানী, এর পর আর কিছু বলা যায়? আমার ভারী অসুখ করেছিল বলে আপিসের তো আর মাথাব্যথা হয়নি। যাকগে, এ-বছরটা কোনোরকমে চালিয়ে নাও তুমি। আর, হিমীর বরকেও এ-বছরে ধুতি দিয়ে কাজ নেই। অত দাম দিয়ে ধুতি কেনা এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। সংসার চালিয়ে—পিসিমা, ছোট-কাকাকে সাহায্য ক'রে আর কী আছে হাতে যে ভগ্নীপতিকে পুজোর তত্ত্ব পাঠাবো?

শিবানী বলল,—কিন্তু মাত্র দু'বছর হল ঠাকুরঝির বিয়ে হয়েছে। মাথার ওপর বেচারার মা-বাপ কেউ নেই। তুমি দাদা বর্তমান থাকতে তার বরকে একখানা ধুতিও দেবেনা পুজোর সময়, এ কেমন কথা? ঠাকুরঝি ভাববে তার স্বামীর আজ চাকরি-বাকরি নেই বলে কেউ আর আদর-যত্ন করছে না। ও মনে ভারী কষ্ট পাবে।

রেগে উঠে শ্যামলাল বলে,—কষ্ট হলে কী করব বলো? আমি তো চুরি করতে যাবনা? হিমীর এটা বোঝা উচিত যে, একা দাদার ঘাড়েই সংসার।— শ্যামলাল হাতপাখা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে হতাশার সুরে বললো,—নাঃ, মধ্যবিত্তরা সত্যিই আর বাঁচবে না! অর্থনৈতিক চাপে পড়েই পিষে যাবে একদিন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল দুজনেই। কিছু পরে শিবানী বলল,—বেশ। তোমাকে ভাবতে হবে না। ঠাকুরঝির বরকে আমিই দেব একখানা ধুতি।

বিস্মিত হয়ে শ্যামলাল তাকায় শিবানীর দিকে। বলে,—কেমন করে দেবে? টাকা কোথায় পাবে?

শিবানী মুখ টিপে হেসে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে বার করল একখানা ধুতি—মিহি ফিনফিনে, ধোয়া। সেখানা এনে শ্যামলালকে দিতে দিতে বলে,—কালই ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ীতে এখানা পাঠিয়ে দিয়ো। বিস্ময়ের চরমে উঠে শ্যামলাল বলে,—ব্যাপার কি শিবানী? এ ধুতি তুমি পেলে কোথায়?

হেসে শিবানী বলল,—তুমিও তো জামাই। বাবা তোমাকে পাঠিয়েছেন।

একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে শ্যামলাল বলল,—শ্বশুর-মশায়ের এ ভারী অন্যায়। কী দরকার ছিল এ-বছর এসব করবার? তাঁর আর্থিক অবস্থার কথা তো আমি জানি।

শিবানী বলল,—ছাখো, পুজোর সময় যার যত অবস্থাই খারাপ হোক না কেন, সবাই সবাইকে কিছু-না-কিছু দিয়েই থাকে। বিশেষ করে জামাইদের তো বটেই। আমরা যেমন ভাবছি, তত্ত্ব না পাঠালে ঠাকুরঝি কষ্ট পাবে, বাবাও তেমনি ভেবেছে যে তোমাকে অন্ততঃ একখানা ধুতি না দিলে আমি কষ্ট পাব। থাক্ সে-কথা। তুমি কালই বাপু এখানা পাঠিয়ে দিয়ো। পরশুদিন কিন্তু ষষ্ঠী।

শ্যামলাল ধুতিখানা হাতে নিয়ে অস্ফুটে বলল,—যাক্, শ্বশুরমশায়ের দৌলতে তবু এ-বছরের মতো ইজ্জত বাঁচল।

৩

জীবন বসে বসে ভাবছে। ঘরে ঢুকল হিমানী। স্বামীকে অমন মনমরা হয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল,—ব্যাপার কি গো? সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনও যে ঘরে বসে রয়েছ? ক্লাবে গেলেনা?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জীবন বলল,—আর ক্লাব-ট্লাব ভালো লাগছেনা। বেকার হয়ে যে-যন্ত্রণা পাচ্ছি তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, হিমানী।

সান্ত্বনার সুরে হিমানী বলে,—কেন এত ভাবছো গো? ওঁরা তো বলেছেনেই পুজো বাদে আবার তোমাকে কাজ দেবেন। তবে কিসের ভাবনা? আর তো ক'টা দিন আছে।

জীবন মাথা নেড়ে বলে,—না না, সেজন্যে ভাবছি না।

—তবে আবার কী ভাবছ?— হিমানী প্রশ্ন করে।

জীবন ধরা গলায় বলে,—কাল বাদে পরশু পুজো, না পারলাম তোমাকে একখানা শাড়ী কিনে দিতে, না পারলাম খুকীটাকে কিছু দিতে।

হিমানী জীবনের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল,—আমার জন্যে দুঃখ কোরোনা তুমি। শাড়ী আমার অনেক রয়েছে।

জীবন বলে,—কিন্তু অবনী? ও হতভাগার জন্যেই বা কী করতে পারলাম? দিদি মরবার সময় ওকে আমার হাতেই তুলে দিয়ে গেছল, হিমানী। সেই দশবছর বয়স থেকে সে আমার কাছেই আছে। বাউণ্ডুলেই হোক, আর যাই হোক, বাপ-মা-মরা ছেলে তো বটে? কি বছরই ওকে আমি পুজোর সময় ভালো-মন্দ জিনিস দি’। কিন্তু এ-বছরে ওকে কিছু দিতে পারবনা। ভাবলে আমার কান্না পাচ্ছে, হিমানী! চোখের সামনে ঘুর-ঘুর করে ছেলেটা ‘মামা’ ‘মামা’ ক’রে। কি যে করি! পুজোর বাজারে কেউ একটি পয়সাও তো ধার দেবে না। দু’দশ টাকা পেলে, কিছু না হোক, একখানা ধুতিও ওকে দিতাম।

হিমানীর যেন হঠাৎ মনে পড়ল। বললে,—ও হো! ঐ ভাখো, ভুলেই গেছলাম কথায় কথায়। আজ সকালে দাদা তোমার জন্যে চমৎকার একখানা ধুতি পাঠিয়েছে পুজোর তত্ত্ব বলে।

জীবনের চোখ-দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে হিমানীর কথা শুনে। তাড়াতাড়ি বলে,—কই দেখি—দেখি—!

হিমানী সুটকেস থেকে বের করে এনে ধুতিখানা জীবনকে দেয়।

ধুতি দেখে জীবন আনন্দে আটখানা হয়ে যায়। বলে,—কিছু মনে কোরোনা, হিমানী। এ ধুতিখানা আমি অবনীকে দোব। দুঃখ পেয়োনা। চাকরিটা হোক, আমি কিনব এমন ধুতি। লক্ষীটি, এখানা অবনীকে দেবার পারমিশন্‌টা দাও তুমি।

হিমানী বলে,—তা দাও। ও তো আর পর নয়।

খুশিমাখা কণ্ঠে বলে জীবন,—এই না হলে আমার স্ত্রী! তুমি আমার ইজ্জত বাঁচালে, হিমানী! সত্যি, ছোঁড়াটার কাছে মুখ দেখাতে পারতুম না। এখানা পেলে ও ভাববে, মামা ওকে ভালোই বাসে। নইলে বেকার অবস্থায় এত দামী ধুতি কেউ দেয়?

•

সকালবেলায় বসে বসে অবনী ভাবছিল বিমলার কথা। গেলবছরে জল-কলে কিছুদিন চাকরি করেছিল অবনী। তাই বেশী দামী না হলেও, ভালো একখানা শাড়ী সে বিমলাকে উপহার দিয়েছিল। জল-কলের কাজটা তার মাস ছ’য়েক হল ছুটে গেছে। আজ সে বেকার। বিমলাকে তো কিছুই দিতে পারবে না। মামাটার চাকরি থাকলেও, নয় দু’দশ টাকা চেয়েচিন্তে, আর কিছু না হোক, ভালো একজোড়া স্যাণ্ডেলও তাকে কিনে দিতে পারত। বিমলা যখন দেখবে যে তার অবনীদা এ-বছরে কিছুই তো দিলনা, মনে ভারী দুঃখ পাবে,—তা ছাড়া অক্ষম ভেবে তার মতও বদলে ফেলতে পারে। হয়ত এর পর একদিন বলেই বসবে যে, তোমার মতো বেকার লোককে বিয়ে করে কী হ’বে, তার চেয়ে বরনা কি বিশুকেই করব, ওরা তবু রোজগার করে।

ঘন ঘন বিড়িতে টান দেয় অবনী।

—অবনী। অবনী!—

মামার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পায় অবনী। তাড়াতাড়ি বিড়ি ফেলে উঠে পড়ে সাড়া দেয়,—যাই, মামা!

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

জীবন ধুতিখানা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগোতেই অবনী ঘরে ঢুকল।

মৃদু হেসে জীবন বলল,—এই নে রে! এ বছর আর কিছু দিতে পারলুম না তোকে। এই ধুতিখানাই পরিস। আজ মহাষষ্ঠী, আজই পরিস, বুঝলি?

আনন্দে মুখখানা ভরে গেছে অবনীর। মাথা নেড়ে বললে,—আচ্ছা, মামা।

তাড়াতাড়ি সে মামার পায়ের-ধুলো নেয়। মামী দাঁড়িয়ে ছিল, তাকেও প্রণাম করে, তারপর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পরম তৃপ্তির চাহনিতে জীবন চেয়ে থাকে তার গমন-পথের দিকে।

নিজের ঘরে এসে অবনী মনে মনে কি-একটা মতলব আঁটে। ধুতিখানা বাক্সর ওপর রেখে সে এসে বিছানায় শোয়। একটা বিড়ি ধরিয়ে চিন্তাসাগরে ডুব দেয়।

•

সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার কিছু আগে একটা কাগজের মোড়ক হাতে অবনী এসে উঠল তার এক বন্ধু পটলের বাড়ীতে। পটল অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। অবনীকে দেখে বলল,—কী খবর রে অবনী? হাতে ওটা আবার কী?

অবনী বললো,—তোর জন্যেই এনেছি।

—আমার জন্যে?— বিস্মিত হয় পটল।

অবনী প্যাকেটটা খুলতে খুলতে বলে,—এই ধুতিটা ভাখ্, পটলা? কী মোলেম আর সুন্দর!

পটলকে সে ধুতিখানা দেয়।

[illegible]লে,—ভেরি ফাইন তো ? কোথায় পেলি তুই ?

[illegible] বলল,—মামা পুজোয় দিয়েছে।

—ও।—পটল সপ্রশংস চাহনি হানে।

অবনী বলে,—আমি বেকার মানুষ, অত ফাইন ধুতি পরলে লোকে হাসবে। তাই তোকে দিতে এসেছি, ভাই।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে পটল বলল,—সত্যি ?

অবনী বলল,—হ্যাঁ, ভাই। আমার ঘড়ি, আংটি, কালো চশমা সব তোকে বেচেছি। আমার অসময়ে তুই তো ঐভাবে আমার সাহায্য করেছিস। আমার অনুরোধ, এ ধুতিটাও তুই কিনে নে, পটলা। পুজোর বাজার। হাত একদম খালি। কিন্তু পকেটে না থাকলে চলে, তুই বল্ ?

পটল সব শুনে বলল,—হুম্। তাহলে এটা বেচতে এসেছিস ?

অবনী ব্যথাভরা কণ্ঠে বললো,—হ্যাঁ, ভাই। এ-যাত্রা নইলে আর বাঁচবনা।

একটুখানি চুপ করে থেকে পটল বলে,—বেশ, কত দাম চাই তোর ?

অবনী বলল,—ন্যায্য যা হয় তার চেয়ে দু'একটাকা কম দিস ?

অবনী ধুতিখানা দেখে বলল,—এ ধুতির জোড়া কত [illegible]? টাকা চৌত্রিশ আর কত ? তাহলে তোর [illegible]ছে—সতেরো টাকা। ঠিক আছে—পনেরো দিচ্ছি, [illegible]য়ে দে।

আনন্দে আটখানা হয়ে অবনী বলে,—বেশ, তোর কথাই থাক। দে পনেরোটা টাকা।

•

পটলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে অবনী সিধে এসে উঠল বাজারে। যমুনা ভকতের দোকানে তখন বেজায় ভীড়। আলো দিয়ে দোকানখানা খুব সাজিয়েছে যমুনা। হরেক-রকম শাড়ী, ব্লাউজ, ফ্রক, ইজের ঝুলছে।

দোকানে ঢুকে অবনী দোকানদার একজনকে বলল,—ভালো ছাপা-শাড়ী দেখাও তো।

—কত দামের মধ্যে ?—দোকানদার জিজ্ঞাসা করে।

—এই টাকা-পনেরোর মধ্যে হওয়া চাই।— অবনী [illegible]।

কয়েকখানা শাড়ী দেখে তার মধ্যে থেকে একখানা বেছে নিল অবনী। শাড়ীখানার বেশ জৌলুস আছে।

—কত দাম ?

—সাড়ে চোদ্দটাকা।

—ঠিক আছে, দাও এখানা।

•

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চারদিকে বাজছে পুজোর ঢাক।

একটা গলি পেরিয়ে পুরনো একখানা একতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল অবনী, কাপড়ের প্যাকেট হাতে। কড়া নাড়ল বার-দুই। একটু পরে দরজা খুলে দাঁড়ালেন একজন বর্ষীয়সী ভদ্রমহিলা।

—কে ?

—আমি অবনী, মাসিমা।

—ও। এসো বাবা, এসো।

ভেতরে ঢোকে অবনী। দরজা বন্ধ করেন ভদ্রমহিলা। অভাবের সংসার তা দেখেই বোঝা যায়।

অবনীকে ঢুকতে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে একটি আঠারো-উনিশ বছরের যুবতী। পরনের শাড়ীটা পুরনো হলেও, বেশ চকচকেই আছে। মুখে দো বকতে বকতে এগিয়ে এসে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল,—কোথায় ছিলে এ-ক'দিন, অবনীদা ?

—চাকরির চেষ্টায় বাইরে গেছলাম, বিমলা।

—কি হল চাকরির ?

—হবে যাবে পুজোর পর থেকে। টাকা কিছু অ্যাডভান্সও নিয়ে এসেছি।

বিমলার মুখ খুশিতে ভরে ওঠে। বলে,—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, বিমলা। আর সেই টাকা থেকে তোমার জন্যে একখানা শাড়ী নিয়ে এলাম।

—শাড়ী! দেখি—! দেখি—!

দু'চোখে কৌতূহল ফুটিয়ে বিমলা ছোঁ মেরে প্যাকেটটা নিয়ে নিল অবনীর হাত থেকে। ক্ষিপ্রগতিতে প্যাকেট খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ-দুটো তার আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুশিতে সে চীৎকার করে উঠল,—মা—মাগো! দ্যাখো এসে, অবনীদা কী সুন্দর ছাপা-শাড়ী এনেছে আমার জন্যে।

রান্নাঘর থেকে মা এলেন। দেখে বললেন,—বাঃ, চমৎকার!—তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—তবু তুমি আছ বলেই, ও বছরকার দিনে একটু নতুন কাপড় পরতে পায়। নইলে দ্যাখোনা, কী প'রে বেরুচ্ছিল ঠাকুর দেখতে। বিমলী, যা, ও-কাপড়খানা বদলে নতুনখানা প'রে আয়।

—বোসো বাবা, অবনী! আমি একটু চা করে আনি।

মা চলে যেতেই অবনী বিমলার পেছু নিল। ঘরের দরজার কাছে গিয়ে চাপা আবেগের স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—তোমার পছন্দ হয়েছে, বিমলা ?

—খু—উ—ব পছন্দ হয়েছে। আমার অনেকদিনের সাধ ছিল এমনি একখানা ছাপা-শাড়ী পরবার। তুমি আমার সে সাধ মিটিয়েছ।

•

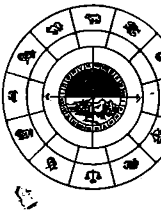

গ্রহ-বিচিত্রা

['বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত পত্রিকা'র
গণিত-জ্যোতিষ বিভাগ হইতে গণনা]

জ্যোতিঃশর্মা

॥ চৈত্র মাসের রাশিফল ॥

মেষ

মাসটি ভালো চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কর্মোপলক্ষে ভ্রমণ হবে। কর্মস্থলে বিভাগ পরিবর্তন হ'য়ে উন্নতি হবার যোগ আছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। গৃহে পুণ্য-উৎসবের যোগ আছে। দৈবানুগ্রহের দ্বার (বৃহস্পতি বা শনি যুক্ত হ'য়ে ভাগ্যে থাকলে) সকল কাজে সাফল্য লাভ হবে। ভূসম্পত্তি হ'তে লাভের যোগ আছে। পিতার উন্নতির যোগ আছে। পরীক্ষা-বিষয়ে সুফল লাভের যোগ আছে।"

নক্ষত্রফল—অশ্বিনী-মেষের ধনলাভ; ভ্রাতা দ্বারা অশান্তি; কর্মস্থলে অশান্তির মধ্য হ'তে সাফল্যলাভ সূচনা করে। ভরণীর—বন্ধু দ্বারা ভাগ্যোন্নতি ও কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠালাভ। কৃত্তিকার—ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত মিত্রতা।

বৃষ

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। কর্মস্থল ভালো চলবে। পিতার উন্নতি সম্ভব। ব্যবসা-সংক্রান্ত-বিষয়ে আর্থিক উন্নতি হবে। পূর্বের অসমাপ্ত কর্ম সমাধানের যোগ আছে। দেশভ্রমণের প্রভাব আছে। কর্মস্থলে আকস্মিক অশান্তির মধ্য হ'তে পদোন্নতির যোগ আছে। দাম্পত্য-জীবন সুখে কাটবে; পূর্বের দাম্পত্য-কলহ থাকলে, তা সহজে মিটে যাবে। ভালবাসা দ্বারা বিবাহিত জীবনের পক্ষে মাসটি শুভ। পারিবারিক ও মানসিক শান্তি থাকবে।

নক্ষত্রফল—কৃত্তিকা-বৃষের ভ্রমণে অশান্তি; আকস্মি বাধার মধ্য হ'তে কর্মপরিচালনার যোগ আছে। রোহিণী—পিতার অশান্তির মধ্য হ'তে উন্নতি হবে। মৃগশিরার—ধনলাভের যোগ আছে।

মিথুন

স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভালো থাকবে না। দুর্ঘটনা প্র[illegible] আকস্মিক অপ্রাপ্তি-ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। মহা[illegible] প্রভৃতি পীড়া হ'তে সতর্ক থাকা আবশ্যক। স্ত্রীর [illegible] ভালো থাকবে। কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হবে। বাধা মধ্য থেকে ভাগ্যোদয় হবে। মাতার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভালে চলবে না। পিতার রোগভোগ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে সন্তানের ভাগ্যোন্নতির যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—মৃগশিরা-মিথুনের একদিকে অর্থলা অন্যদিকে রোগভোগ থাকবে। পিতার স্বাস্থ্য ভালে থাকবে না। আর্দ্রার—ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে। পুনর্বসু—স্বাভাবিক চলবে।

কর্কট

মাসটি ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাক[illegible] কর্মস্থলে বিভাগ-পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। এই বিভা পরিবর্তনে স্থান-পরিবর্তন হ'য়ে অশান্তি সৃষ্টি করবে দাম্পত্য-কলহ বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক উন্নতি যেমন হে তেমনি অযথা ব্যয়ও হবে। মাসের শেষ সপ্তাহ অপেক্ষাকৃ

ভালো চলবে : এই সময়ে আশানুরূপ কর্মসাফল্য লাভ হবে।

নক্ষত্রফল—পুনর্বসু-কর্কটের অপযশ লাভের সম্ভাবনা আছে : বন্ধু দ্বারা ভাগ্যোন্নতির যোগ দেখা যায়। পুষ্যার—শত্রু দ্বারা অশান্তি এবং প্রেম-বিবাহে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। অশ্লেষার—আর্থিক উন্নতি এবং দেশভ্রমণ সূচনা করে।

সিংহ

মাসটি ভালো চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যোন্নতি হবে। শত্রুহানি হবে। সন্তানের উন্নতি হবে। কর্মোন্নতির যোগ আছে। কর্মোপলক্ষে ভ্রমণ হবে। শিক্ষা এবং গবেষণার বৃত্তিতে স্বামী-স্ত্রী কর্মরত থাকলে, উভয়ের উন্নতি হবে। দাম্পত্য-জীবন সুখে চলবে। মাসের শেষ সপ্তাহে পিতার উন্নতি হবে। আর্থিক অবস্থা ভালো চলবে।

নক্ষত্রফল—মঘা-সিংহের সকল দিকে শুভ চলবে। পূর্বফল্গুনীর—অযথা অর্থব্যয় হবে ; সন্তানের উন্নতি হবে। উত্তরফল্গুনীর—মানসিক উদ্বেগ এবং শত্রুর মধ্য হ'তে কৃতকার্যতা লাভ হবে।

কন্যা

স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। দাম্পত্য-কলহ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে। কর্মস্থল ঝগড়া-বিবাদের মধ্য দিয়ে চলবে। সন্তানের হঠকারিতা এবং দত্তের জন্ত লাঞ্ছনা-ভোগের যোগ আছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। পিতার রোগভোগ হবে। মাসের শেষভাগ অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক চলবে।

নক্ষত্রফল—উত্তরফল্গুনী-কন্যার বন্ধু দ্বারা উন্নতি ও পিতার অশান্তি সম্ভব। হস্তার—দাম্পত্য কলহ ; কর্মস্থলে প্রতিষ্ঠালাভ হবে। চিত্রার—সন্তান দ্বারা অশান্তি এবং নিজের বুদ্ধির ভুলে ঝগড়া-বিবাদের সম্ভাবনা।

তুলা

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হবে। বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি হ'বে, বুদ্ধির প্রভাবে সকল কাজে সাফল্যলাভ সম্ভব হবে। সন্তানের উন্নতি হবে। ভ্রাতার উন্নতি হবে। শত্রুবৃদ্ধি হ'বে, পরে দমিত থাকবে। আর্থিক অবস্থা কতকটা ভালো থাকবে।

নক্ষত্রফল—চিত্রা-তুলার স্ত্রী এবং মাতার সঙ্গে কলহ-সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ; কর্মস্থল ভালো চলবে। স্বাতীর—শত্রু দ্বারা প্রতারণা লাভ, অন্যদিকে পারিবারিক শান্তিলাভ হবে। বিশাখার—ভালো চলবে ; পারিবারিক শান্তি থাকবে।

বৃশ্চিক

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি হবে। ধনপ্রাপ্তির যোগ আছে। ভ্রাতার উন্নতি সম্ভব। নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ভ্রমণের যোগ আছে। সন্তানের রোগভোগ দ্বারা অশান্তি-সৃষ্টি সম্ভব। পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি ভালো চলবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। চাকুরিতে কর্মরতা স্ত্রীর কর্মোন্নতির যোগ আছে। মাসের শেষ সপ্তাহে সন্তানের শুভ হবে। গৃহাদি নির্মাণের পক্ষে শুভযোগ আছে।

নক্ষত্রফল—বিশাখার—কর্মস্থলে অধীনস্থ ব্যক্তি দ্বারা কর্মসাফল্য ; আর্থিক উন্নতি হবে। অনুরাধার—স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না ; অর্থলাভ এবং হানি উভয়ই হবে। জ্যেষ্ঠার—আকস্মিক অর্থলাভ, মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ, এবং স্ত্রীর সহিত কলহ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে ; কর্মোন্নতির যোগ আছে।

ধনু

ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ঝগড়া-বিবাদে অর্থহানির যোগ আছে। মানসিক অশান্তি থাকবে। কর্মস্থল সম্পূর্ণ ভালো চলবে না। নানাপ্রকার বাধার মধ্যে কর্মস্থল চলবে। পিতার স্বাস্থ্য ভালো চলবে না।

নক্ষত্রফল—মূলার—আর্থিক উন্নতি। পূর্বাষাঢ়ার—ধনলাভ ; পারিবারিক অশান্তি। উত্তরাষাঢ়ার—শুভ চলবে।

মকর

স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো চলবে না। যাতায়াতে আকস্মিক শারীরিক আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। ঝগড়া-বিবাদ হ'তে সতর্ক থাকা আবশ্যক। আর্থিক উন্নতি কতকটা হবে। কর্মস্থলে সাধারণ অশান্তি সৃষ্টি হ'বে, পরে শুভ হবে। পিতার উন্নতির যোগ আছে। ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব সৃষ্টি হবে ; ভ্রাতার সাহায্যে উন্নতির যোগ আছে। সন্তানের অবস্থা ভালো চলবে।

নক্ষত্র ফল—উত্তরাষাঢ়ার—ভালো চলবে না ; ঝগড়া-বিবাদ হ'তে অশান্তি সৃষ্টি হবে। শ্রবণার—একদিকে অর্থলাভ, অন্যদিকে অযথা অর্থব্যয়। ধনিষ্ঠার—অশুভ ; ঝগড়া-বিবাদ হ'তে অশান্তি সৃষ্টি হবে।

কুম্ভ

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। প্রস্রাব-সংক্রান্ত পীড়াভোগের সম্ভাবনা আছে। অযথা অর্থব্যয় হবে। মোকদ্দমা প্রভৃতি দ্বারা অশান্তি-সৃষ্টির যোগ আছে। আর্থিক উপায় ভালো চলবে। পুত্রকন্যার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে শুভ প্রভাব সৃষ্টি হবে। অগ্রজের উন্নতি হবে। ঝঞ্ঝাটের মধ্য থেকে নিজের কর্মসাফল্য লাভ হবে। একদিকে কর্মসাফল্য লাভ ও আর্থিক উন্নতি, অন্যদিকে মোকদ্দমা-ভয়, অযথা অর্থব্যয় ও রোগভোগ থাকবে।

নক্ষত্র ফল—ধনিষ্ঠা-কুম্ভের ঝগড়া-বিবাদে অর্থক্ষয়। শতভিষার—রোগভোগে অর্থদণ্ড হবে। পূর্বভাদ্রপদের—নানাপ্রকার অশান্তির মধ্যে চলবে।

মীন

স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো চলবে না। পিতার উন্নতি এবং নিজের কর্মোন্নতি হবে। দেশভ্রমণের যোগ আছে। আশানুরূপ কর্মসাফল্য লাভ হবে। আর্থিক উন্নতি হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না। মাসের শেষ সপ্তাহে মানসিক শান্তি এবং কর্মসাফল্য লাভ হবে। সদনুষ্ঠানে অর্থব্যয় দ্বারা প্রতিষ্ঠালাভ হবে। সন্তানের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে।

নক্ষত্র ফল—পূর্বভাদ্রপদ-মীনের কর্মোন্নতির সম্ভাবনা আছে। উত্তরভাদ্রপদের—আকস্মিক ঝঞ্ঝাট বৃদ্ধি হ'য়ে, পরে কমবে। রেবতীর—শুভ চলবে ; সাধারণ ব্যয়ের মধ্যে কর্মসাফল্য লাভ হবে।

দ্রষ্টব্য : রাশিফল সাধারণভাবে বর্ণিত হ'ল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মকালের গ্রহসংস্থানের ফলাফলের উপর নির্ভর ক'রে এই ফল বিচার্য।

ফাল্গুন মাস, ১৩৬৬ সন [ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৬০]

বাং তারিখ	ইং তারিখ	জাতীয় তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১	১৪	২৫	রবি	দ্বিতীয়া	পূর্বফল্গুনী	মধ্যম, রাত্রি ঘ. ১।৮ গতে শুভ	
২	১৫	২৬	সোম	তৃতীয়া	উত্তরফল্গুনী	শুভ	
৩	১৬	২৭	মঙ্গল	চতুর্থী	হস্তা	নিষেধ, রাত্রি ঘ. ১০।২৭ গতে মধ্যম	
৪	১৭	২৮	বুধ	পঞ্চমী	চিত্রা	নিষেধ, ঘ. ৮।২০ গতে মধ্যম	
৫	১৮	২৯	বৃহস্পতি	ষষ্ঠী	স্বাতী	শুভ	বিবাহ
৬	১৯	৩০	শুক্র	সপ্তমী	বিশাখা	নিষেধ, রাত্রি ঘ. ১০।৫৭ গতে শুভ	বিবাহ
৭	২০	১	শনি	অষ্টমী	অনুরাধা	নিষেধ	শাকাষ্টকা শ্রাদ্ধ। ঘ. ৪।১৫ মধ্যে পুণ্যস্নান
৮	২১	২	রবি	নবমী	জ্যেষ্ঠা	নিষেধ	
৯	২২	৩	সোম	দশমী	মূলা	নিষেধ	
১০	২৩	৪	মঙ্গল	একাদশী	পূর্বাষাঢ়া	নিষেধ, ঘ. ৮।৫১ গতে মধ্যম	একাদশীর উপবাস
১১	২৪	৫	বুধ	ত্রয়োদশী	উত্তরাষাঢ়া	নিষেধ	ত্র্যহস্পর্শ
১২	২৫	৬	বৃহস্পতি	চতুর্দশী	শ্রবণা	নিষেধ	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত
১৩	২৬	৭	শুক্র	অমাবস্যা	ধনিষ্ঠা	নিষেধ, রাত্রি ঘ. ১১।৫৪ গতে মধ্যম	অমাবস্যার উপবাস ও নিশিপালন, মহাস্নান

[পরপৃষ্ঠায় অবশিষ্টাংশ]

ফাল্গুন মাস, ১৩৬৬ সন [ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৬০]

[পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ]

ফাঃ তারিখ	ইং তারিখ	আরবী তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১৪	২৭	৮	শনি	প্রতিপদ	শতভিষা	শুভ, রাত্রি ঘ. ১০।৩১ গতে মধ্যম	
১৫	২৮	৯	রবি	দ্বিতীয়া	পূর্বভাদ্রপদ	মধ্যম, ঘ. ১০।৫ গতে শুভ	বিবাহ, অন্নপ্রাশন
১৬	২৯	১০	সোম	তৃতীয়া	উত্তরভাদ্রপদ	শুভ, রাত্রি ঘ. ৯।৩৪ গতে নিষেধ	উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ
		১১	মঙ্গল	চতুর্থী	রেবতী	নিষেধ	বিবাহ
		১২	বুধ	পঞ্চমী	অশ্বিনী	নিষেধ	উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, ষট্‌পঞ্চমীব্রত
	৩	১৩	বৃহস্পতি	ষষ্ঠী	ভরণী	নিষেধ	
	৪	১৪	শুক্র	সপ্তমী	কৃত্তিকা	নিষেধ	বিবাহ
	৫	১৫	শনি	অষ্টমী	রোহিণী	ঘ. ৪।৩৬ গতে রাত্রি ৫।৫০ মধ্যে শুভ	বিবাহ
২২	৬	১৬	রবি	নবমী	মৃগশিরা	নিষেধ	
২৩	৭	১৭	সোম	নবমী	আর্দ্রা	নিষেধ, রাত্রি ঘ. ১।৫০ গতে শুভ	গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ
২৪	৮	১৮	মঙ্গল	দশমী	পুনর্বসু	নিষেধ	
[illegible]	৯	১৯	বুধ	একাদশী	পুষ্যা	নিষেধ, ঘ. ১২।১৯ গতে শুভ	একাদশীর উপবাস। ঘ. ১২।১৯ গতে গোবিন্দদ্বাদশী
২৬	১০	২০	বৃহস্পতি	দ্বাদশী	পুষ্যা	শুভ, প্রাতঃ ঘ. ৬।১৮ গতে নিষেধ	
২৭	১১	২১	শুক্র	ত্রয়োদশী	অশ্লেষা	নিষেধ	অন্নপ্রাশন
২৮	১২	২২	শনি	চতুর্দশী	মঘা	নিষেধ	পূর্ণিমায় নিশিপালন, সায়ং বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)
২৯	১৩	২৩	রবি	পূর্ণিমা	পূর্বফল্গুনী	নিষেধ, ঘ. ৮।৫৩ গতে শুভ	পূর্ণিমায় উপবাস, দোলযাত্রা
৩০	১৪	২৪	সোম	প্রতিপদ	উত্তরফল্গুনী	নিষেধ	সংক্রান্তি। ঘণ্টাকর্ণপূজা

মনে রাখার এই দরকার যে, পঞ্জিকা কেবলমাত্র আমাদের ধর্মকর্মের সময় ও দিন নির্দেশক পুস্তক নয়, পরন্তু উহা আমাদের সমগ্র জীবনের কর্মনির্দেশক পুস্তকও বটে। পঞ্জিকা-নামক পুস্তকখানিতে ধর্মীয়, জ্যোতিষিক ও বৈষয়িক সকলপ্রকার বিবরণ দেওয়া থাকে। অঙ্ক ও জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য ছাড়া পঞ্জিকা-গণনা হয় না। আকাশের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান যথাযথ নিরূপণপূর্বক পঞ্জিকা গণনা করাই বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি। সুতরাং আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে পঞ্জিকা-প্রণেতাদের সম্পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র আমাদের ধর্মকর্মের জন্যই যে পঞ্জিকার প্রয়োজন তাহা নয়; অকূল সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার সময় নাবিকদিগের প্রধান অবলম্বন নৌ-পঞ্জিকা। ঝড়ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, জোয়ার-ভাঁটা, নক্ষত্রের উত্থান-পতন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার পূর্বাহ্নে পঞ্জিকাগণিত গ্রহসংস্থান ও তিথিনক্ষত্র হইতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র আমাদের ভারতে নয়, পৃথিবীর সকল সভ্যদেশসমূহে পঞ্জিকা আছে এবং তাহাদের জ্যোতিষিক গণনা বিজ্ঞান ও শাস্ত্রসম্মত উপায়ে হইতে হয় এবং তাহাদের গণনা-ফলও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে দশ-বিশ প্রকারের তিথি-সংবলিত পঞ্জিকার প্রচলন আছে। তাহাতে এই অবৈজ্ঞানিক ব্যাপক পরিস্থিতি দূরীভূত করিবার জন্যই যেন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার উদ্ভব হইয়াছিল। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ, শাস্ত্রী ও বৈজ্ঞানিকগণের উপদেশানুসারে রচিত এই পঞ্জিকাখানির তিথিনক্ষত্র সম্প্রতি ভারত-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তিথিনক্ষত্রের সহিত মিল হওয়ায়, এই পঞ্জীর বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধি সরকারী স্বীকৃতিও লাভ করিল। সুতরাং বসুধারার চিন্তাশীল পাঠকবর্গও অতঃপর হইতে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে ধর্মকর্ম নির্বাহ করিবেন, এ আশা আমাদের আছে।

নন্দনকাননে পাঁচদিন

নারায়ণ সেন

১৯৬০ সালের ২৮শে জানুয়ারি। ঘড়ির কাঁটা-দুটি ৪-৩০ মিঃ প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। মাঠের মধ্যে ঘোরাঘুরি কোরছে দীর্ঘ ছায়ার সারি। ঠিক এই সময়ে দিনের শেষ বলটি ছোড়া হয়ে গেল এবং সফরের শেষ ব্যাট চালিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বেনো। জয়সীমা পেলেন মেডেন-ওভার আর বেনো শান্ত কোরলেন মেডেন বা 'রাবার'। উত্তেজনা কিন্তু আগেই মাঠ থেকে পালিয়ে গেছে; কারণ ইডেন-উদ্যানের চল্লিশহাজার দর্শকের আন্তরিক উল্লাসের অভিব্যক্তিতে 'সন্ধি'র আনন্দই আছে, নাই দুর্জয়ের উন্মাদনা। তবে তুষ্ট হয়েছে বৈকি তারা। বহুদিন ধরে আশা-আকাঙ্ক্ষার মশলা দিয়ে গড়া হাউই-বাজি আজ পাঁচদিন ধরে নিঃশেষে পুড়লো—যা চোখকে কোরেছে সার্থক, অথচ মনে যা দেহে দেয়নি দাহ।

পুণ্য ২৩শে জানুয়ারিতে ভারতের অধিনায়ক রামচাঁদ সকালে ঘুম থেকে উঠেই কাকে দেখেছিলেন জানি না, কিন্তু সকাল ১০-১৫ মিনিটে রুপোর চাকিটা যখন বেনোকে ভেংচি কাটলো, তখন মনে হোল, সকালের প্রথম দেখা মানুষটি নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে ঐ ক্যাঙারু-রাজ্যের শত্রু ছিল। রামচাঁদ পিঠ চাপড়ে দিলেন বেনোর—ভাবটা এই যে, এতে ঘাবড়াবার কী আছে, চারবার না-হয় আমার কাছে টসে হেরেছোই। যাহোক, খেলা আরম্ভ হবার আগে আর-একটা খুব সামান্য ঘটনা ঘটলো। দুটি শালিকপাখী দুই-প্রান্তের উইকেট-দুটির দুটি 'বেল' দিলো ফেলে। আমার কিন্তু অজানা-আশঙ্কার-ছায়াপাত-দেখা বাঙালী-মন ব্যাপারটিকে সামান্য বোলে গ্রহণ কোরতে পারলো না, তাই যখন 'একে একে নিভিল দেউটি', দিনের শেষে আমি চারপাশটায় তখন একবার খুঁজেছিলাম তাদের। পাইনি। ৭ উইকেটে মাত্র ১৪৮ রান। ভারতের একমাত্র বীর কন্ট্রাক্টার ও তাঁর সতীর্থ পঙ্কজ রায় কিছুটা মুখরক্ষা কোরলেন যথাক্রমে ৩৬ এবং ৩৩ কোরে। তবে সর্বোচ্চ ৩৯ রান কোরলেন—ভারত-ক্রিকেট-'কাব্যে উপেক্ষিতা' গোপীনাথ, তাঁর মনোমুগ্ধকর কয়েকটি 'স্কোয়ারকাট' ও 'লেটকাট' মার মেরে। দিনের শেষে বেনো ফিরলেন শত্রুঞ্জয়-বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের মতো। তবে এইদিন ২য় উইকেট পতনের পর জয়সীমার পরিবর্তে নাদকার্নীকে পাঠানো যে মারাত্মক ভুল হয়েছিল, সে কথা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। যাহোক, পরের দিন ১ ঘন্টার মধ্যে ভারত ইনিংস-শেষ কোরলো ১৯৪ রানে। দেখলাম বোলার দেশাইয়ের নিখুঁত ব্যাটস্‌ম্যানোচিত খেলা।

ছোট্ট দেশাইএর প্রথম বলেই প্রথম স্লিপে ক্যাচ তুললেন গ্রাউট। কীপার কুন্দরম-ও স্প্রীং-এর মতো ডানদিকে মারলেন 'বডি থ্রো'। বলটি ধরতে পারলেন না বটে, কিন্তু তুলে দিলেন কিছুটা, যা রামচাঁদের নাগালে এসেও এলো না। দেশাইএর পরের ওভারের আর একটি চমৎকার ইনসুইং বলে ফ্যাভেল শর্ট-ফাইন-লেগে তুললেন 'ডলি ক্যাচ'। কিন্তু বিশ্বাস-করুন, আমি তিন তিন বার চোখ রগ্‌ড়েও দেখতে পেলাম চৌকশ খেলোয়াড় ও নিপুণ ফিল্ডার, বোরদে ফেলে দিয়েছেন ক্যাচটি। কী একটা কথা বোলতে যাব মনে করে পাশের দিকে তাকাতেই দেখি আমার পার্শ্ববর্তিনীর হাতে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা খোলা। বোলছেন,—দেখছি আজ অশ্লেষা না মঘা।…ওঃ, মাঠের মধ্যে সে কী অবস্থা।…ভাগ্যহীন দেশাই! এদেশে উইকেট পেতে হোলে তোমাকে বল উইকেটে ছোঁয়াতেই হবে। তা না হোলে নৈব নৈব চ।

এবার আসুন দেখা যাক, অস্ট্রেলিয়ার সেরা দুটি হার্ভে-ও'নিলের খেলা, যেখানে কেতাবের সবরকম মারগুলো দুজনের হাতের যত্নে সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু খুব শীঘ্রই হার্ভে আউট হোয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্বল্পস্থিতিতেই প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন যে তিনি কতবড় একজন উঁচুদরের খেলোয়াড়। আর ও'নিল কোরলেন শতাধিক রান। তাঁর রকেট-গতিসম্পন্ন 'ব্যাক্‌ফুটেড অন্ ড্রাইভ', 'স্কোয়ার-কাট', 'হুক', 'গ্লান্স' চোখে দেখা যায়নি, যখন বল বাউণ্ডারির দিকে ছুটেছে। কিন্তু তবুও বোলবো, তাঁর খেলা ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের উইক্‌স্ বা সোবার্সের মতো প্রাণবন্ত ও অভিনন্দন-যোগ্য, কিন্তু ওরেল বা কানহাইয়ের মতো রসঘন নয়। বর্তমানে প্রাণবন্ত কভার-ড্রাইভ অনেকেই মারেন, কিন্তু রসঘন কভার-ড্রাইভ একজনই মারেন—তিনি নীল হার্ভে। নিখুঁত বৈজ্ঞানিক মারের উপর সূক্ষ্ম আর্টের প্রলেপ—

যতক্ষণ তাকেই আমি বলি। যাহোক, পিটার বার্জ-ও ভালো খেললেন। তাঁর মেরিংগুলি খুবই দর্শনীয়।

ভারত যখন ২য় ইনিংসে খেলতে এলো, তাকে অভিমন্যুর মতো সপ্তরথী বেষ্টন করলো—দীর্ঘ আড়াই দিন, ১৩১ রানের ডেফিসিট, লিণ্ডওয়াল-ডেভিডসন-বেনিডের গোলা, অধিনায়ক বেনোর বলের ঘূর্ণি, ফিল্ডিং-এর ক্রৌঞ্চ-ব্যূহ, উইকেটের ক্রমবর্ধমান সজীবতা এবং কিছুদিন আগেকার ব্যাটিং-দুর্বলতার ভয়াবহ ও তিক্ত স্মৃতি। কুন্দরন্ মাত্র তিনটি বল খেলে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন। স্কোরবোর্ড তখনও শূন্য। রায়-কন্ট্র্যাক্টর অ্যাণ্ড কোং কিছুক্ষণের মধ্যে হাত জমিয়ে ফেললেন। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। বেনোর ঘাতাঘাতে তৃতীয় দিনেই কন্ট্র্যাক্টরের পতন হোল। দিনের শেষে দেখি একটা ছেলে ছড়া কাটতে কাটতে যাচ্ছে—"পূর্ব গেলেন পাট—হারাধনের দশটি ছেলে, রইল বাকী আট"।

চতুর্থ দিন। পঙ্কজ রায় ৩৯ রান করে এইমাত্র আউট হয়ে যাওয়াতে গোপীনাথ এসেছেন খেলতে। প্রথম বলটাকেই, লেগে ঘোরাতে যেয়ে, তিনি সোজা আকাশে তুলে দিলেন, যার ঠিক তলাতেই অপেক্ষা করছে উইকেট-রক্ষক গ্রাউটের আকুল হাতখানা। আমার চোখ কিন্তু বলের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উঠে আটকে গেল। দেখলাম—এক-টুকরো কালো মেঘ সূর্যকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখি মেঘটা আস্তে আস্তে সরে গেল। মাঠ ভরে উঠলো নির্মল রবিরশ্মিতে। আর আমার অন্তঃকরণ ভরে উঠলো অজানিত আনন্দে। মাঠে চেয়ে দেখি, অস্ট্রেলিয়ানদের মুখ ভরে উঠেছে সম্ভাব্য জয়ের আনন্দে। জয় তো তাদের হাতের শক্ত মুঠোয়!

সেই শক্ত মুঠো ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গেল বোরদের নীক্‌নেস সর্বশ্রেষ্ঠ আক্রমণাত্মক খেলায়, দলীপসিংজীর ছাত্রশ্রেণীর চমকপ্রদ রানের চটকে, নাদকার্নীর ঝোড়ো-হাওয়ায় এবং 'পাঁচদিনই কোনো না কোনো সময় ব্যাটধারী' জয়সীমার অনবদ্য অবদানে। ২০২ রানে এগিয়ে পাল্টা মুঠো ধরলো ভারত। কিন্তু, অমীমাংসায় মিষ্টি খেয়ে দুজনই করলো 'বন্ধুত্বের সমাপনকে'।

মার্চেন্ট যদি কুন্দরনের মধ্যে 'মুস্তাক আলির ছায়া' দেখেন, ডি. জি. যদি নাদকার্নীকে 'বর্তমানের মানকড়' বোলে অভিহিত করেন, তবে জয়সীমাকে ভারতের 'দ্বিতীয় হাজারে' বোললে, আশা করি পাঠক-পাঠিকা আমাকে ক্ষমা করবেন। দলের বিপদে যে অসামান্য ধৈর্য ও ক্রীড়া-শৈলীর নিদর্শন তিনি রেখেছেন, তাতে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ প্রত্যেকেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর সম্বন্ধে ডেভিডসন মাত্র একটি কথা বোলেছেন—"He is an excellent." বিখ্যাত মাইকেল চার্লটন বোলেছেন—"What he gets, he deserves it; what he deserves, he gets it." ভারতের মুখে একদিকে হিমালয়ের মতো অটল, আবার বোরদে ও কেনীর সহযোগিতায় তাঁর ব্যাট থেকে বেরিয়েছে রানের স্ফুলিঙ্গ। অবশ্য তিনি করেছেন মাত্র ৭৪ রান। কিন্তু এর বিনিময়ে স্বয়ং ব্র্যাডম্যানও বোধহয় তাঁর একটা ২৭৪ রান দিয়ে দেবেন। পৃথিবীর সেরা বোলিং-এর বিরুদ্ধে তাঁর এই সংযম ও সাধনায় স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ভারত কোনোদিনই ভুলবে না। লজ্জাকর পরাজয়ের হাত থেকে সম্মানজনক ড্র, পৃথিবীর যেখানে যখনই হবে, তখনই ভারতের লোকের মনে ভেসে উঠবে অন্যান্য অনেক স্মৃতির সাথে আর একটি মুখ—সে ভারতের বীরসন্তান জয়সীমার।

অস্ট্রেলিয়ার বোলিং এবং ফিল্ডিং যে কিরূপ উন্নত ধরনের, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দলের প্রতিটি খেলোয়াড় যেন অনুভব-শক্তি দিয়ে বুঝতে পারে যে, বল ব্যাটে লেগে কোন্‌দিক দিয়ে ছুটবে। নিখুঁত 'পিক্ আপ' আর 'কুইক থ্রোয়িং'-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত কম যে, মাঝে মাঝে অস্ট্রেলিয়ানদের মেশিন বোলে ভুল হয়।

সর্বশেষে ভারতীয় ফিল্ডিং সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, গতবৎসরে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের বিপক্ষে খেলার তুলনায় আমাদের মান এখন অনেক উন্নত। একটা ঘটনা বলছি। অস্ট্রেলিয়া সবেমাত্র ২য় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছে। এইসময় লেস্ ফ্যাভেল একটি বল সজোরে 'পুল' করে দিলেন 'মিড অন'-এর কাছাকাছি। বলটি বোরদের হাতের নাগালের মধ্যে না থাকায়, তিনি পা দিয়ে বলটির গতি পরিবর্তিত করে দিলেন গোপীনাথের দিকে। আর তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কুন্দরনের হাতে বলটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ব্যস, ম্যাকডোনাল্ড রান-আউট। বোরদের বেনোকে 'কট্ অ্যাণ্ড বোল্ড' করার দৃশ্যটিও ভুলবো না। ভারতের এই অভূতপূর্ব 'টিম-ওয়ার্ক' ভারতের ক্রিকেটে এক নব আবিষ্কার। আশা করি, আগামী মরসুমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই টিম্-ওয়ার্ক পাথেয় করে ভারত এগিয়ে যাবে জয়ের পথে।

নাট্যমহল

মঞ্চলোক

'অনর্থ'

'স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি' গত ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রঙমহল থিয়েটারে তাদের রি-ইউনিয়ন উপলক্ষ্যে একটি নাট্যাভিনয় করে। 'অনর্থ' নাটকটি রচনা করেছেন অধ্যাপক সুনীল মুখোপাধ্যায়। পরিচালক ও প্রধান ভূমিকাভিনেতাও তিনি।

নাটকটি খুব নতুন ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা। আধুনিক সমাজে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ এর উপজীব্য বিষয়। একজন বিবেকবান বৈজ্ঞানিকের, ইচ্ছা সত্ত্বেও, দারিদ্র্যের চাপে সৎ থাকা এ-যুগে কত দুরূহ তারই ইতিবৃত্ত এর প্রথম অঙ্ক। বৈজ্ঞানিক প্রসাদ মিত্র প্রলোভনের ফাঁদে পা দিলেন, তাঁর বাড়ী-গাড়ী টাকাকড়ি সবই হোলো। কিন্তু বিবেক-বিক্রয়ের পয়সায় কেনা স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর মানসিক শান্তি আসে না। আন্তর্জাতিক অসৎ-ব্যবসায়ী-চক্রের অন্যতম মিঃ চৌধুরীর জন্য ডঃ মিত্র নানাবিধ কেমিক্যাল্‌স্‌ বে-আইনীভাবে তৈরি করে দেন। তার নানা অপব্যবহার চলতে থাকে। একদিন সেই অপব্যবহার প্রত্যক্ষভাবে কলুষিত করল ডঃ মিত্রেরই মেয়েকে। এদিকে পুলিশও এই বে-আইনী লেবরেটরির সন্ধান পেয়ে খানতল্লাসিতে এসে উপস্থিত ডঃ মিত্রের বাড়ীতে। ডঃ মিত্র আত্মহত্যার পথে বিবেক-দংশন থেকে রেহাই পেলেন। এই ট্র্যাজিক উপাখ্যানই 'অনর্থ'র বিষয়।

অভিনয়াংশে প্রথমেই নাম করতে হয় ডঃ মিত্রের ভূমিকায় সুনীল মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর আবেগ-গভীর অভিনয় মনকে স্প করে। শেষদিকের কয়েকটি অংশের সামান্য আতিশয্যে বাদ দিলে তাঁর অভিনয়কে নিখুঁত বলা যায়।

ছোট ভূমিকাগুলির মধ্যে নকড়ির ভূমিকায় সুধাং গাঙ্গুলীর অভিনয় অবিস্মরণীয়। তাঁর পূর্ববর্তী বিশি বচনভঙ্গীর স্মৃতি মন থেকে মোছবার নয়। আর তা অভিনয় ফুলুবাবুর ভূমিকায় রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়ের, চৌধুরী ভূমিকায় অজয় মাকের।

নারীচরিত্রগুলির মধ্যে মৃন্ময়িকা দাশগুপ্তার নাম বিশে উল্লেখযোগ্য। সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশে তাঁর ক্ষমতা যথেষ্ট। মিসেস মিত্রের ভূমিকায় পূরবী বসুর অভিনয় একটু বে ঝাঁঝালো, এবং মেক-আপ চরিত্রানুগ নয়। সঙ্গীতমুখ অংশগুলিতে দীপা চক্রবর্তীর কণ্ঠ নাটকের পক্ষে বিশে সহায়ক হয়েছে।

'অনর্থ' নাটকের একটি দৃশ্যে ডঃ প্রসাদ ও ফুলুবাবুর ভূমিকা
অধ্যাপক সুনীল মুখোপাধ্যায় ও রঞ্জিৎ মুখোপ

আবহ-সঙ্গীত দুর্বল। আলোক-সম্পাত খুবই ভালো। দ্বিতীয় অঙ্কের চরিত্র-সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ দৃশ্যের মঞ্চসজ্জা অনেক হালকা করা উচিত ছিল। সেটা না থাকায় —যাতায়াত, চলাফেরা এবং কথোপকথনের দিক থেকে দৃশ্যটি অনাবশ্যকভাবে জটিল হয়ে গেছে।

নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক কম থাকলেও—সম্পাদক, দেশনেতা, কবি প্রভৃতি টাইপ-চরিত্রগুলি সু-অভিনীত।

চিত্রলোক

'দেবী'

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: সত্যজিৎ রায়। কাহিনী: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনা: ওস্তাদ আলি আকবর খান। চিত্রগ্রহণ: সুব্রত মিত্র। সম্পাদনা: দুলাল দত্ত। শিল্প-নির্দেশনা: বংশীচন্দ্র গুপ্ত। ভূমিকা-লিপি: শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান অর্পণ প্রভৃতি।

জন্মার্জিত কুসংস্কারের বিষময় প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিজীবনে কতখানি সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, তারই ওপর ভিত্তি ক'রে রচিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' ধর্মান্ধ মানুষের অন্ধবিশ্বাসের এক বলিষ্ঠ চিত্ররূপ।

কালীর উপাসক এক বৃদ্ধ জমিদার একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন তাঁর ছোটছেলে উমাপ্রসাদের স্ত্রী দয়াময়ী দেবীরূপে তাঁর সামনে আবির্ভূতা। ঘুম থেকে উঠে তিনি অস্থিরচিত্তে ছুটে চললেন পুত্রবধূর কাছে। স্বপ্নের কথা তাকে জানালেন, আর জানালেন বড়ছেলে তারাপ্রসাদ আর তার স্ত্রীকে। স্বপ্নের সত্যতা মনে-প্রাণে মেনে জমিদার প্রণাম করলেন পুত্রবধূকে। পরদিন থেকে দয়াময়ীকে দেবীর আসনে বসানো হল। যথাযোগ্য আচার-অনুষ্ঠানে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে দয়াময়ীর পূজা চলতে লাগল। উমাপ্রসাদ তখন কলকাতায় কলেজের পড়াশুনায় ব্যস্ত। সংসারের এই অভাবনীয় আকস্মিক সংবাদ তাকে পত্রে জানালেন তারাপ্রসাদের স্ত্রী। পত্রপাঠ চলে এল উমাপ্রসাদ। এসে দেখল দেবীর আসনে দয়াময়ী। কুলপুরোহিত তার আরতি করছেন। [illegible] সে অনাস্থা প্রকাশ করল। অলীক দেবত্বে বিশ্বাস করার মতো প্রবৃত্তি বা অভিরুচি তার নেই। প্রচুর তর্ক হল বাবার সঙ্গে। কিন্তু জমিদার আপন বিশ্বাসে অটল ও অনড়। শেষপর্যন্ত উমাপ্রসাদ রাত্রির শেষ যামে দয়াময়ীর কাছে গেল। বললে, ঘাটে নৌকা অপেক্ষা করছে, চলো আমরা পালিয়ে যাই। ক্ষণিকের জন্যে ভেবেছিল দয়াময়ী সংসার-জীবন থেকে বঞ্চনার কথা—আত্মগোপন ক'রে রাতের আঁধারে স্বামীর হাত ধরে পথে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু ঘাটের কূলে এসে তার মতের পরিবর্তন হল। সে যদি সত্যিই দেবী হয়? গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝে স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে ফিরে এল। ক্রমে দেবীর মাহাত্ম্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে যায়। দেবীর চরণামৃত পান ক'রে মৃতপ্রায় একটি শিশু প্রাণ ফিরে পায়। বহুদূর থেকে প্রসাদ পাবার আশায় কাতারে কাতারে লোক আসতে থাকে।

ইতিমধ্যে তারাপ্রসাদের একমাত্র ছেলে খোকা প্রবল জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বংশের পুরাতন কবিরাজমহাশয় প্রত্যাখ্যাত হন। বৃদ্ধ জমিদার দেবীর চরণামৃত ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসায় ভরসা করেন না। তারাপ্রসাদের স্ত্রীর ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও, তাকে দেবীর ভরসায় ফেলে রাখা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেবীর চরণামৃত সেই শিশুকে বাঁচাতে পারল না। বিনাচিকিৎসায় একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবনান্ত ঘটল।

পাগলের মতো মহাকালীর সামনে বসে বিলাপ করতে থাকেন জমিদার। আজীবন তিনি সত্যনিষ্ঠ, ধর্মনিষ্ঠ। কিন্তু আদ্যাশক্তির কাছে তাঁর আজ জিজ্ঞাসা—কোন্ পাপে আজ তিনি শোকদগ্ধ?

সে-জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া গেল। উত্তর দিল উমাপ্রসাদ স্বয়ং। সে বললে, নিষ্ঠুর পাপে আজ তিনি খোকাকে হারিয়েছেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা না দিয়ে খোকাকে তিনি খুন করেছেন।

সে-কথায় মূর্ছিতপ্রায় হয়ে পড়েন জমিদার। উমাপ্রসাদ ছুটে যায় স্ত্রীর কাছে। গিয়ে দেখে তার স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে। পাগলিনী দয়াময়ী ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যায় পথে। উমাপ্রসাদ ছুটতে ছুটতে স্ত্রীর অনুসরণ করে। অনেকদূর গিয়ে দেখে—ঘাসের মাঝে পড়ে আছে দয়াময়ী। তাকে আবেগে কোলে তুলে নেয় উমাপ্রসাদ। একবার চোখ মেলে দেখে, চিরনিদ্রায় কোলে ঢলে পড়ে দয়াময়ী।

প্রভাতকুমারের 'দেবী' বিশ্বের ছোটগল্পের ইতিহাসে

একটি অনবদ্য বাক্য—বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্ধসংস্কারের প্রতি এক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। কিন্তু বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব থাকলেও, পূর্ণাঙ্গ চিত্রের উপযোগী ঘটনার বিস্তার না থাকায় কাহিনী দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। ক্ষেত্রের সুরটি বজায় রাখতে চিত্রনাট্যকারের সংযত প্রয়াস স্থানে স্থানে একঘেয়েমিতে পরিণত হয়েছে এবং গল্পের গতি মন্থর ক'রে তুলেছে। মূল ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাহিনীর কিছু বিস্তারের কথা চিন্তা করলে, মনে হয়, ভালো হত। দয়াময়ীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসবার পর উমাপ্রসাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের আরও কিছু চিত্র গৃহীত হলে, অধিকতর নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উমাপ্রসাদের চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত। তারাপ্রসাদের প্রতি পরিচালকের আর একটু সুবিচার করা উচিত ছিল। গল্পাংশের যথাযোগ্য বিস্তারের অভাবে তারাপ্রসাদের চরিত্র অবহেলিত। কালীমার প্রতি দেবীত্ব আরোপিত হওয়ার পর খোকার ভাবান্তর আকস্মিক। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে শিশুর ভাবান্তরের সূক্ষ্ম প্রয়োগ উচিত ছিল।

কিন্তু তবুও বিশ্ববন্দিত সত্যজিৎ রায় তাঁর নবতম চিত্র 'দেবী'র জন্য ধন্যবাদার্হ। সে-যুগের সমাজব্যবস্থাকে বিদ্রূপ ক'রে প্রভাতকুমার যা লিখেছিলেন, এ যুগেও তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। তাই তাঁর এই বলিষ্ঠ প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন জমিদারের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস অপূর্ব অভিনয় করেছেন। উমাপ্রসাদের চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনবদ্য, বিশেষ ক'রে শেষ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় মর্মস্পর্শী। দয়াময়ীর চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সংযত অভিনয় করেছেন। নবাগত মহম্মদ ইস্রাইল সু-অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকা যথাযথ রূপায়িত।

সঙ্গীত-পরিচালনায় আলি আকবর খান কৃতিত্বের আভাস দিয়েছেন। দু'খানি রামপ্রসাদী গান গৃহীত। আলোকচিত্র প্রথমশ্রেণীর বললেও কম বলা হয়। সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনা প্রশংসনীয়। রূপ-সজ্জাকরের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সত্যজিৎ রায়ের সূক্ষ্ম পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ছবিটির সর্বত্র বিরাজমান।

—

এস. সি. এ প্রোডাকশনের 'হাসপাতাল' দ্রুত সমাপ্তির পথে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর কাহিনী অবলম্বনে প্রেমচাঁদ আঢ্যর প্রযোজনায় 'হাসপাতাল' পরিচালনা করছেন সুশীল মজুমদার। 'চন্দ্রশেখর'-এর পর বাংলা-ছবিতে ভারতের অপরাজেয় চিত্রনট অশোককুমারের নায়কের ভূমিকায় অবতরণ এ-ছবির প্রধান আকর্ষণ। নায়িকারূপে দেখা দেবেন সুচিত্রা সেন। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দেবেন—ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বিশ্বজিৎ, আরতি মজুমদার, কমলা মুখোপাধ্যায়, সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশীল মজুমদার। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন জ্যোতির্ময় রায় এবং সঙ্গীত-পরিচালনায় আছেন অমল মুখোপাধ্যায়।

'দেবী' বাণীচিত্রে ছবি বিশ্বাস

চিত্রকল্প প্রাইভেট লিমিটেডের প্রথম ছবি শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে 'মেঘে ঢাকা তারা'। পরিচালনা করছেন ঋত্বিক ঘটক। সঙ্গীত-পরিচালনায় আছেন সলিল চৌধুরী। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করছেন—সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল চ্যাটার্জী, নিরঞ্জন রায়, গীতা ঘটক, বিজু ভাওয়াল, গীতা দে এবং নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য।

দিলীপ সরকারের প্রযোজনায় এবং প্রবীণ পরিচালক হেমচন্দ্রের পরিচালনায় 'নতুন ফসল' দ্রুত প্রগতির পথে। বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলে স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশে এ-ছবির বহু বহিঃদৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন—কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন—বিশ্বজিৎ, বাণী হাজরা, অমর মল্লিক এবং জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত-শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী।

'দুই কোনে'
ছায়াচিত্রে
জহর রায়

আর একখানি নির্মীয়মাণ ছবির নাম 'অজানা কাহিনী'। প্রযোজনা করছেন অমিয় চৌধুরী। পরিচালনায় আছেন সুনীলবরণ। সুরকার অপরেশ লাহিড়ী সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। প্রধান দুটি ভূমিকা রূপায়িত করছেন অসিতবরণ ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজের ভক্তিমূলক ছবি 'নদের নিমাই' মুক্তির অপেক্ষায় দিন গুনছে। এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন বিমল রায়। নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে দেখা দেবেন অসীমকুমার ও সবিতা বসু। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিয়েছেন—ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, শোভা সেন, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখার্জী ও জহর রায়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জীর প্রযোজনায় একটি ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটির নাম 'তুমি যে আমার'। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে শ্যাম চক্রবর্তী এই ছবিটি পরিচালনা করবেন।

'অগ্রগামী' গোষ্ঠীর পরবর্তী চিত্রনিবেদন তারাশঙ্করের 'কান্না'। রসাবেদনে সমৃদ্ধ এই ছোটগল্পটিকে পূর্ণাঙ্গ চিত্রোপযোগী ক'রে তোলার প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে বলে জানা গেছে। ভূমিকা-লিপি এখনও তৈরি হয়নি। তবে আশা করা যাচ্ছে যে কতকগুলি নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে এই ছবিতে।

নবগঠিত চিত্রপ্রতিষ্ঠান 'ছায়াকথা'র প্রথম প্রচেষ্টা 'জহরী'র মহরৎ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করবেন মণ্টু ব্যানার্জী এবং সুর দেবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁদের দেখা যাবে ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা হলেন—অঞ্জনা ব্যানার্জী, সুনন্দা দেবী, বিশ্বজিৎ, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, সত্য ব্যানার্জী ও ছবি বিশ্বাস।

১৯৫৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে মোট ১০৭টি ছবি কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র-পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়েছে। গতবছর যোগদানকারী চিত্রের মোট সংখ্যা ছিল ৯১। এ-বছরের যোগদানকারী চিত্রের মধ্যে ৬৯টি ডকুমেন্টারি, ১১টি শিশুচিত্র এবং ২৭টি অন্যান্য চিত্র আছে। নির্বাচক-মণ্ডলীতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত।

প্রখ্যাত চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'সেল্‌জনিক গোল্ডেন লরেল ট্রফি' এবং 'সেল্‌জনিক গোল্ডেন লরেল অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায়, ওয়াশিংটনে গিয়ে গ্রহণ করতে পারেননি। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি পারিতোষিক-বিতরণ-অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এম. সি. চাগলা তাঁর পক্ষ হ'তে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ এরিক জনস্টন মিঃ সেল্‌জনিক-আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রীচাগলার হাতে উপহার অর্পণ করেন।

শ্রীরায়ের পূর্বে কেবল স্যার আলেকজেণ্ডার কোর্দা, মাইকেল ব্যালকন, রেনি ক্লেয়ার, ভিত্তোরিয়ো ডি সিকা এবং জাঁ রেনোয়া প্রভৃতি এই ট্রফি লাভ করেছেন।

কথায় কথায়

ইংরেজি নতুন বছরের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন-উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কৃতী ছাত্র-ছাত্রী, বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী বা জ্ঞানসাধক—যাঁরা এই সমাবর্তন-উৎসবে তাঁদের-যোগ্যতা, জ্ঞান বা সাধনার স্বীকৃতি পেলেন তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁদের জীবনযাত্রার পথ সুন্দরতর হোক, তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞানে আমাদের ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হয়ে উঠুক। কিন্তু যাঁরা অকৃতকার্যতার গ্লানি বহন ক'রে পিছনে পড়ে রইলেন তাঁদের উদ্দেশে কোন্ সান্ত্বনাবাণী উচ্চারণ করব? পরীক্ষায় ফেল মানেই তো জীবনসংগ্রামে ফেল নয়।

কোনো একটি সংবাদপত্রে জনৈক লেখক সমাবর্তন প্রসঙ্গে এক সকৌতুক মন্তব্য করেছেন দেখলুম। তাঁর মতে, দেশে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে প্রতিবছর দুটি বিশেষ সময়ে মাত্র আমরা অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠি,—প্রথমবার সমাবর্তনের সময়, দ্বিতীয়বার বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর। মন্তব্যটি কৌতুকের ছলে করা হলেও এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি মর্মান্তিক সত্য। বছরের এই বিশেষ দুটি কালে অকস্মাৎ শিক্ষার মান, শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যর্থতা নিয়ে অনেক লেখালিখি, অনেক উত্তপ্ত আলোচনা আর চিন্তাশীল সমালোচনায় আমরা মুখর হয়ে উঠি, তারপর যথাসময়েই আবহাওয়া জুড়িয়ে আসে। আবার নিস্তরঙ্গ স্রোত ব'য়ে চলে আগের মতো। দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষা-সংকটের মধ্যে এখনও এতখানি নির্লিপ্ততার অবকাশ কি সত্যই আছে? এবারকার সমাবর্তনে বিভিন্ন মনীষিবৃন্দের ভাষণগুলি একটু বিশ্লেষণ ক'রে পড়লে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের দেশে শিক্ষার মানদণ্ড যাই হোক, শিক্ষার মান নেমে গেছে অনেকখানি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ডঃ এলিস এই সমাবর্তনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁর ভাষণে তিনি আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে চিত্রখানি তুলে ধরেছেন তা উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উপযোগী রীতিনীতি আহরণ ক'রে যে শিক্ষামান গ'ড়ে তুলেছে তার আলোচনা-প্রসঙ্গে ডঃ এলিস বলেন, বিদেশীয় শিক্ষারীতিকে নিজের দেশ-কালোপযোগী ক'রে গ্রহণ করা অবশ্যই প্রশংসনীয়, তবে সেই গ্রহণ যেন নির্বিচার দাস-মনোবৃত্তি-সুলভ না হয়।

কিন্তু দেশী-বিদেশী উভয় ক্ষেত্রের চিন্তাশীল [illegible] মুখে যে কথা আমরা এতকাল শুনে আসছি তা মেনে নেবার কতটুকু প্রচেষ্টা হয়েছে সেইটাই এখন চিন্তার বিষয়। প্রা অর্ধশতাব্দী আগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্যবস্থার যে মৌলিক ত্রুটিগুলির উল্লেখ করেছিলেন, আজও সেগুলি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে রয়ে গিয়েছে, এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা বা দুঃ যতই হোক, সততার পরিচয় অন্তত দেওয়া হবে।

উপাচার্য নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত তাঁর ভাষণে গত কয়েক বছরের শিক্ষাধারা সম্বন্ধে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণী দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ছাত্রসমাজের প্রতি সস্নেহ-সহৃদয় যে দৃষ্টিভঙ্গীটুকু ছিল তা স্পর্শ করেছে ছাত্র এবং শিক্ষাবিদ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়। এদেশের ছাত্র সংখ্যার বিরাটতম অংশ জুড়ে আছে মধ্যবিত্ত ঘরে ছেলেমেয়েরা। শ্রীসিদ্ধান্তের বক্তৃতায় প্রকাশ যে, ছাত্র সমাজের উচ্চশিক্ষালাভেচ্ছু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শতক চল্লিশজন পুষ্টিকর খাদ্য পায় না, শতকরা তিরিশ[illegible] দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি এবং কিছুসংখ্যক ক্ষয়রোগের রোগী। [illegible] যদি হয়, তাহলে শিক্ষার মান উন্নত হবে কেমন [illegible] নীরোগ সবল সুস্থ ছাত্র না হলে, জ্ঞান অর্জন [illegible] সামর্থ্যই বা তার কতটুকু?

সস্নেহ সহৃদয় বিবেচনাশীল হৃদয় ভিন্ন দেশের এতবড় একটা সঙ্কট কিছুতেই দূর করা যাবে না। আমরা [illegible] করব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁর ছাত্রদের জ এই সহৃদয় চিত্ত নিয়ে যতটুকু [illegible] দরকার তা ক'

হবেন। প্রতিবছরে এক হতাশ্বাসের বেদনাবিধুর ভাগে যেন নবাবর্তন-উৎসবের প্রাণোজ্জ্বল আনন্দটুকু ন হয়ে না যায়।

—

গত ১৬ই মাঘ বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ হিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। [illegible]র সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে একটি [illegible]্য সংযোগসেতু বিলুপ্ত হয়ে গেল। মৃত্যুকালে ন্দ্রনাথের বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। সদাহাস্যময় প্রবীণ-ক উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয়ের যোগ যাদের ঘটেছে তাঁরা জানেন কী প্রাণময়তা এই প্রবীণ কটির বয়সের প্রাচীনত্বকে একেবারে আড়াল ক'রে খেছিল। উপেন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্যের সেবা রে গেছেন। তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-বে জড়িয়ে আছে 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথের [illegible] বাংলা-সাহিত্যের আধুনিকতম ধারার অন্যতম [illegible] ৺মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তাঁর প্রায় সমবয়সী এই মাতুলের প্রতি। সে-যুগ আর এ-যুগকে, তীত আর বর্তমানকে দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে সেদিনও প্রবীণ-কিশোর বাংলা-সাহিত্যের সাধারণতম লেখকের কাছেও আপনজনের মতো হয়ে ছিলেন।

দেশবাসীর সমবেত নীরব প্রার্থনায় যোগ দিয়ে আমরাও বলি, তাঁর আত্মা প্রশান্তির মাধুর্যে পূর্ণতর হোক।

—

[illegible]সীদের অশান্তির আর শেষ নেই। যুদ্ধের পর থেকে চল্লিশটি মন্ত্রিসভার পতন হল সে-দেশে। নতুন নতুন ব্যক্তি ও দল এগিয়ে আসেন স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি নিয়ে, কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই দিশেহারা হয়ে জটিল আবর্তের মধ্যে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যান। ব্যক্তির এই বারংবার ব্যর্থতার কারণরূপে ফরাসীরা দায়ী করল ফ্রান্সের সংবিধানকে। তাই সেকালের চতুর্থ সাধারণতন্ত্র বাতিল হয়ে গড়ে উঠল পঞ্চম সাধারণতন্ত্র, আর ফরাসী শাসনের পুরোভাগে আনীত হলেন ফ্রান্সের সবচেয়ে শক্তিমান ও জনপ্রিয় নেতা জেনারেল দ্য গল। কিন্তু তাতেও ফ্রান্সের দুর্গতির কোনো কিনারা হল না। বৎসর অতিক্রান্ত হতে-না-হতেই আবার ফ্রান্সে আগুন জ্বলে উঠেছে। জেনারেল দ্য গলকে মুশকিল-আসান ভেবে যাঁরা ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই আবার তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

ফরাসী সঙ্কটের একটিই মাত্র সমাধান আছে। তা হল নিজের গড়া সাম্রাজ্যের ফাঁস থেকে তার স্বেচ্ছামুক্তি। আজকের দিনে সাম্রাজ্য যে সম্পদ নয়, দায় মাত্র, এ শিক্ষা ফ্রান্স তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইংলণ্ডের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। এককালে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ যার অধিকারে ছিল, আজ তার সাম্রাজ্য নেই বললেই হয়, অথচ এত শান্তি ও এত ঐশ্বর্য ইংলণ্ডের কোনোদিনই ছিল না। ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি মানুষ আজ সুখী। শুধু তাই নয়, যেসব দেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইংলণ্ড একসময় শাসন ও শোষণ চালিয়েছিল, আজ সেখানেও তার মিত্রের অভাব নেই। ফ্রান্সকেও আজ বাঁচতে হলে এই একই পথে চলতে হবে। যতদিন না আলজিরিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে সে মুক্তি না দেবে ততদিন পর্যন্ত ফ্রান্সের জীবন ও সম্পদের অপব্যয় কিছুতেই বন্ধ হবে না।

সম্পাদক—[illegible] ভট্টাচার্য
[illegible] প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১, মদন গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬ হইতে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত
ও [illegible] ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত

বসুধারা

বাংলার প্রাণ-প্রবাহ

সম্পাদক
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রন্থনায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
অজিত গুপ্ত

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড চৈত্র, ১৩৬৩ ষষ্ঠ

বসুধারা

বাংলার প্রাণ-প্রবাহ

॥ নববর্ষ সংখ্যা ॥ বৈশাখ, ১৩৬৭

। বহু বিশিষ্ট রচনায় সমৃদ্ধ বসুধারার নববর্ষ-সংখ্যা এক বিশেষ সাহিত্য-মূল্য বহন ক'রে আত্মপ্রকাশ করছে। মননশীল প্রবন্ধ, সংবেদনশীল গল্প, উপন্যাস আর বিভিন্ন রসোজ্জ্বল রম্যরচনায় বসুধারার নববর্ষ-সংখ্যা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মূল্যবান সংযোজন।

॥ প্রবন্ধ ॥

রবীন্দ্রনাথ । বসুধারা । ভারতের মুক্তি-সাধনায় বিপ্লবী বাংলার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ । ইংরেজী সাহিত্যে বাঙালী মহিলা-কবি । ছাতুবাবুর কথা । পূর্বস্মৃতি (পূর্বানুবৃত্তি) । আলবার কামু । শিক্ষক-সমস্যা । রাজগৃহ-স্মৃতি । বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা । সংস্কৃতির ধর্ম । ইতিহাসের স্বাক্ষর । যবন-সন্তানের জন্মরহস্য । লোকসাহিত্যে ভোজন-তত্ত্ব । তেরশ'-ছেষট্টির সাহিত্য-পরিক্রমা ।

লিখেছেন :

অতুলচন্দ্র গুপ্ত । সরসীকুমার সরস্বতী । সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় । সুধাংশুকুমার পাল । যমদত্ত । শরৎচন্দ্র মিত্র । আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত । রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় । হৃষীকেশ দেব । শম্ভু মহারাজ । দক্ষিণারঞ্জন বসু । সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । পরিতোষকুমার চন্দ্র । চিত্তরঞ্জন দেব । অনিল সেনগুপ্ত ।

। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত শিলাইদহের স্মৃতি লিখছেন : **রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ।

॥ একখানি অভিনব সম্পূর্ণ উপন্যাস ॥

। স্বয়ংবরা ।

॥ মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য ॥

॥ বড়ো গল্প ॥

শংকর

॥ ছোটো গল্প ॥

। প্রবোধকুমার সান্যাল । সরোজকুমার রায়চৌধুরী । নরেন্দ্রনাথ মিত্র । জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ।

॥ কবিতা ॥

। কুমুদরঞ্জন মল্লিক । দিনেশ দাস । হরপ্রসাদ মিত্র ।

॥ বিশেষ রচনা ॥

। বনবিহারী মুখোপাধ্যায় । শিলাদিত্য । পরিমল গোস্বামী । অজিতকৃষ্ণ বসু । অরবিন্দ পালিত । অখিল নিয়োগী । অগ্নিমিত্র । নরেন্দ্রনাথ বাগল । চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ।

এ ছাড়া বসুধারার বিভিন্ন জনপ্রিয় বিভাগ :

। পুরাতনী । গ্রহ-বিচিত্রা । আপনি কী বলেন ? । নাটমহল । দেশে বিদেশে । চয়ন । কথায় কথায় ।

এই অভিনব বিশেষ সংখ্যার মূল্য দুই টাকা মাত্র। গ্রাহকগণের পক্ষে বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত মূল্য লাগে না। স্কুল, কলেজ ও সাধারণ পাঠাগারের জন্য সডাক-বার্ষিক মূল্য ১০৲ টাকা।

প্রকাশিত হবে

। শুভ পঁচিশে বৈশাখ ।

বসুধারা কার্যালয়। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

'হায়—গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা!
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে, করিতে পারিনে সেবা।'

রবীন্দ্র-শততম জন্মবর্ষে

বসুধারার শ্রদ্ধাঞ্জলি

বৈশাখ, ১৩৬৭ থেকে বৈশাখ, ১৩৬৮ পর্যন্ত রবীন্দ্র-আবির্ভাবের শততম বর্ষ। এই সমগ্র বর্ষব্যাপী শ্রদ্ধার্ঘ-প্রদানের যে আয়োজন আমরা করেছি, তাতে উপচার সাজাবেন দেশের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য-সাধক-মণ্ডলী। রবীন্দ্র-প্রতিভার এক একটি শাখা নিয়ে প্রতিমাসের বসুধারায় এক বা একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।

॥ লেখক-সূচী ॥

রবীন্দ্র-প্রতিভার নির্বিশেষ আলোচনা
অতুলচন্দ্র গুপ্ত
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শশিভূষণ দাশগুপ্ত

চিত্রবিদ্যা। যামিনী রায়
শান্তিনিকেতন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
ছোটো গল্প। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবন্ধ। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
ছন্দ। প্রবোধচন্দ্র সেন
সংগীত। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
রাজনীতি। শচীন সেন
নাটক। প্রমথনাথ বিশী
ভাষাতত্ত্ব। সুকুমার সেন
উপন্যাস। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সাহিত্য-তত্ত্ব। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
মানবধর্ম। নীহাররঞ্জন রায়
দর্শন। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
নৃত্যনাট্য, অভিনয়। শান্তিদেব ঘোষ
শ্রীনিকেতন। সমীরণ চট্টোপাধ্যায়
কবিতা। হরপ্রসাদ মিত্র

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা এই পর্যায়ে আর একটি আকর্ষণীয় রচনা।

বসুধারা

তৃতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় খণ্ড • ষষ্ঠ সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৬৬

❀ সূচীপত্র ❀

অজয় রায় । প্রকৃতি-দর্শনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ । । ৭৫১
তুলসীদাস সিংহ । পল্লীর বারমাস্যা : চৈত্র । । ৭৫৭
মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ । অবেদন (Anaesthesia) । । ৭৬৪
কুমারেশ ঘোষ । আশ্চর্য আরব । । ৭৭০
শ্রীমাধব রায় । যাত্রা ও নাটক । । ৭৭৬
মানবেন্দ্র পাল । ছদ্মবেশ । । ৭৮১
কালীচরণ ঘোষ । বাংলার বাজেট—১৯৬০-৬১ । । ৭৮৯
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য । চেনাশোনার বাইরে । । ৭৯৪
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় । বৈশালীর দিন । উপন্যাস । । ৮০৪
বাণী রায় । বসন্তে । কবিতা । । ৮৩০
সুশান্ত ঘোষ । হাসপাতাল । কবিতা । । ৮৩০
নচিকেতা ভরদ্বাজ । উত্তীর্ণ । কবিতা । ।-৮৩০
লক্ষ্মীপ্রসাদ বসু । গল্পের মৃত্যু, সিনেমার জন্ম । । ৮৩১
বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী । সিদ্ধের পথে । । ৮৩৬
রূপকলি । মনে মনে । । ৮৪০
শরৎকুমার মিত্র । পূর্বস্মৃতি । । ৮৪৮
অগ্নিমিত্র । নটিরামের কড়চা : আত্মজীবনী । । ৮৫৮
হরদাস । অথ নট-ঘটিত । । ৮৬১
শম্ভুনাথ ঘোষ । নীড় থেকে দিগন্তে । । ৮৭১
পুরাতনী ['সমাচারচন্দ্রিকা' হইতে উদ্ধৃতি] । । ৮৭৭
কৃত্তিবাস । গ্রন্থ-বৃত্তান্ত । । ৮৭৯
শ্রীবর্মা । গ্রহ-বিচিত্রা । । ৮৮১
নারায়ণ সেন । ভারতীয় হকির শীত ও বসন্ত । । ৮৮৬
নাটমহল [চিত্রলোক] । । ৮৮৮
কথায় কথায় । । ৮৯১

—

LIBRA
UNIV

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৬০

বসুধারা

প্রকৃতি-দর্শনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ

অজয় রায়

রোম্যান্টিক রিভাইভেল্‌ যুগের যে কবিকুলের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিভাজ্যোতিষ্কের আকস্মিক আবির্ভাব ইয়োরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কাব্যসাহিত্য ও [illegible]ধারাকে নব জ্যোতিসম্পদে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল, [illegible]র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখেছিলেন; জগৎটা হ'য়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত।" বর্ণনার সহজসরল বৈশিষ্ট্যে, মানবচরিত্র ও আবেগের প্রতি সম্ভ্রম শ্রদ্ধায়, জনানুভূতির মৃদু পেলব প্রস্ফুরণে, কামনাহীন প্রকৃতি-প্রেমে, আত্মার সূক্ষ্মতম ভাবরাজ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে, নিসর্গদৃশ্যের অন্তরে একটি গভীর অর্থোপলব্ধিতে, এবং বৃহত্তর বিস্তৃততর মানবতাবোধে এই কল্পনাময়ী কবিবৃন্দ তাঁদের কাব্যার্ঘ্য সুসজ্জিত ক'রে সুন্দরের পূজা সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন স্থূল চক্ষু দিয়ে নয়, ধী দিয়ে জাগ্র[illegible] চেতনা দিয়ে, আত্মবোধের তীব্র আনন্দানুভূতি দিয়ে। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, গতানুগতিকতার জগদ্দল পাষাণভার তাঁরা দিয়েছিলেন নাড়িয়ে। জীবনের প্রাথমিক অকৃত্রিম সহজ সত্যানুভূতিতে করেছিলেন তাঁরা অমর্ত্য সৌন্দর্যের দ্বারোদ্ঘাটন। কলাকীর্তিতে গ্রীকদের অবিস্মরণীয় গৌরবারোহণের পর যাঁরা কাব্যলক্ষ্মীর পায়ে গৌরবের সবচে

রাঙা-টকটকে আলতাটুকু পরাতে পেরেছিলেন তাঁরা হ'লেন এই রোম্যান্টিক রিভাইভেল্ যুগের কবিবৃন্দ, এবং তাঁদের মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ছিলেন একজন। তাঁরই সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির ওপর দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের কিয়দংশ নিয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথও যুগস্রষ্টা কবি এবং যে-যুগের স্রষ্টা তিনি, সে-যুগকেও বঙ্গসাহিত্যের রোম্যান্টিক রিভাইভল ও পুনর্জাগরণের যুগ ব'লে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রপূর্ব বঙ্গসাহিত্যে রস-রোমান্সের ধারাটি বিশীর্ণ নদী-রেখার মতো বালুস্তরে অবলুপ্ত হ'য়েছিল। কাব্য ছিল প্রচুর, কিন্তু সে-কাব্যের বাক্যাবলী কাব্যগুলিকে ঠিক কাব্য হ'য়ে ওঠার পথে সাহায্য করেনি আদৌ। রসসৃষ্টি ছিল সঙ্কীর্ণ, আত্মানুভূতি বিস্ময়বোধ জরাগ্রস্ত, তাই বিরাটের প্রতিধ্বনি সূক্ষ্ম আত্মার আনিখিল সঞ্চারণ আনন্দসত্তার সর্বাঙ্গীনতা ও নিগূঢ় রহস্যবোধ প্রকাশমান হ'য়ে সেদিনকার কাব্যকে তাদের বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারেনি। তাই তাদের মধ্যে বিশ্বসঙ্গীতের অনুরণন 'রম্যবীণা'র অমর ঝঙ্কারে আমাদের চিত্তলোককে মোহাবিষ্ট ক'রে তুলতে সক্ষম নয়। কেবলমাত্র বিহারীলালের কাব্যেই দেখি—পেয়েছিল একটু রোম্যান্টিক রহস্যচেতনা, নিয়েছিল একটু অন্তরাভিমুখী রসপথগতি; আর কারো নয়। বিহারীলালের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ ঐ রোম্যান্টিক পুনর্জাগরণের কবিকুলের মতো বঙ্গসাহিত্যের মরা গাঙে বান ডাকিয়ে এলেন তাঁর সকল সরসতা সজীবতা প্রাণময়তা নিয়ে, চঞ্চলতা গভীরতা গতিময়তা নিয়ে—যা মুহূর্তকালের মধ্যে নিখিল-চিত্তকে প্রেমানন্দের অমরাবতীতে অবতীর্ণ করিয়ে দিলে।

পোপ, গ্রে, কলিন্স্, বার্ন্স্, টমসনের পরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেমন ইংরেজী সাহিত্যে, তেমনি বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ যেন একটি মূর্তিমান পথপরিবর্তন—একটি নবজাগতিক মোড়-ফের। তবে ওপারে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পাশে সেদিন ছিলেন সমপ্রতিভাধর স্কট, শেলী, কীট্‌স্, কোল্‌রিজ; কিন্তু এপারে ছিলেন আলোর প্লাবন জাগাতে আর কেউ না, ঐ জ্যোতির্বিভাসিত একটি রবি—বঙ্গসাহিত্যে তার একক অনন্ত পরিক্রমা।

দুই কবির মধ্যে সমচিন্তনপ্রণালী ও ভাবগত সাদৃশ্য অবিচ্ছিন্ন বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির ওপর দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে এ-কথা আরো বেশী ক'রে খাটে। নজির উল্লেখে প্রমাণের আগে এই বিস্ময়বোধটুকু প্রকাশের কারণ আছে বলে মনে করি যে, কেমন করে চক্রবালরাশবর্তী প্রকৃতি-সুন্দরীর ললাম সৌন্দর্য কিশোর-কবি রবীন্দ্রনাথকে ভৃত্য-রাজের গণ্ডীঘেরা বাধাবাধ থেকেও আকর্ষণ করে নিয়ে তার অন্তরতম রহস্যটিকে জানার জন্য উন্মুখ ক'রে তুলেছিল। ছেলেবেলায় বাহির জগতে বরাতে যা জুটেছিল তা ভৃত্য-রাজের নির্মম শাসনের ফাঁকে-ফুঁকে ছাদের ওপর থেকে দেখা সৌধকিরিটিনী কলিকাতার শিখরাজের ধূম্রকলঙ্কিত রুক্ষ ধূসরিমা—চিরশ্যামচিহ্নহীন, শান্তিহীন, সান্ত্বনাহীন। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন—"বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা যেমন খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্ব-প্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ, শব্দ, গন্ধ দ্বার-জানালার ফাঁকফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত।" শৈশবের এই শাসনসৃষ্ট দীর্ঘ প্রকৃতি-বিরহই বোধহয় তাঁর প্রকৃতি-মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে এত তীব্র ও গভীর ক'রে তুলেছিল। তাঁর এ প্রকৃতিভোগ যেন দীর্ঘ উপবাসী কাঙালের প্রথম অন্নগ্রহণের মতো। প্রাচীরের রন্ধ্রের ভিতর হ'তে চোখে-পড়া "বাগানপ্রান্তের নারিকেল-শ্রেণী", তারি ফাঁকে "সিংহির বাগান", "পল্লীর একটা পুকুর", তারি ধারে তারা গয়লানীর গোয়ালঘর, আরো দূরে তরুচূড়ায় লীন "কলিকাতা সহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুচিতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও" হ'য়ে যাওয়া দেখে তাঁর সেদিনের অন্তর কতখানি তৃষিত হ'য়ে উঠত তা তিনি প্রকাশ করেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে—"ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্দুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়িগুলিকে কত খেলা কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না"। তারপর শাসনবন্ধন শিথিল হওয়ার কিছুকাল পরে মুক্ত উর্দ্ধ প্রকৃতির রসতোয়ের পরিপূর্ণ পাত্রের সামনে ব'সে এই অনশনক্লিষ্ট আত্মা কেমন ক'রে কত পরিমাণ ভোজ্য নিঃশেষ করেছিল তার খবর পাই তাঁর সমগ্র কাব্যজীবন জু'ড়ে এবং সর্বপ্রথম পাই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আর 'প্রভাত উৎসবে'। সেই সময় হ'তে তাঁর প্রকৃতি-দর্শনের ভঙ্গীটি জানা যায় 'জীবনস্মৃতি'র একটি লাইনেই—"শিশুকাল হইতে কেবল

চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" এই চৈতন্য দিয়া দেখার ফলেই বিশ্বপ্রকৃতির যত জড়বস্তুপুঞ্জও তাঁর মরমী মর্মের কাছে প্রাণময় চেতনারূপে প্রতিভাত হ'য়েছিল। ক্ষুদ্র হ'তে বৃহৎ, তুচ্ছ হ'তে মহৎ সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটি অনাদি অনন্ত সৌন্দর্যস্রোত একটি আনন্দোজ্জ্বল মধুরিমা তাঁর অন্তর্লীন প্রেমাপ্রমুখী বেদনামূর্তিকে এই অনুভূতির মধ্যে জাগ্রত করে তুলেছিল যে—আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি—"বিশ্বচরাচর ঝরিছে আনন্দ হ'তে আনন্দ-নির্ঝর"। তাঁর এই দেখার এবং প্রকাশের ভঙ্গীটি তাঁর সম্পূর্ণ নিজের—যাকে বলা হয় সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্রিক। এক্ষেত্রে রোম্যান্টিক রিভাইভেল্‌ যুগের কবিদের সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোল্লিখিত নিজের মন্তব্য তাঁর নিজের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও ছিলেন প্রকৃতির পূজারী—প্রকৃতির কবি। শেলীর ভাষায়—'Poet of Nature'। কিন্তু বিশ্বকবির মতো তাঁর বাল্য ও কৈশোর কোনো অভিভাবকের নজরবন্ধনের কড়া শাসনের মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল না। কোনো পর্দা কোনো নিষেধ কোনো আড়াল-আবডাল তাঁকে বাহির-বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁর অন্তরসত্তাকে শুষ্কতায় দৈন্যতায় নিষ্পেষিত করেনি। স্থল জল অন্তরীক্ষ ছিল তাঁর সম্মুখে নিরাবরণ—অবারিত। পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র অরণ্য অরণ্যানী এবং উন্মুক্ত রমণীয় প্রকৃতির যতকিছু বিচিত্র লীলার সামনাসামনি বসে তাদের অনবগুণ্ঠিত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে 'Lake poet'-এর অপরিণত জীবনের দিনগুলি কেটেছে। কোনো ছিদ্র কোনো ফাঁকফুকর তাঁকে খুঁজতে হয়নি তার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে—তার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ লাভের জন্যে। তিনি বলেছেন—

"For I, bred up 'mid Nature's luxuries,
Was a spoiled child, and rambling like the wind
As I had done in daily intercourse
With those crystalline rivers, solemn heights,
And mountains ranging like a fowl of the air,
I was ill-tutored for captivity ;"

নির্জনবাসী ঘরাতুর তিনি ছিলেন না, বরং ছিলেন দুরন্ত দাঁড়ী, পর্বতারোহী আর কৌশলী স্কেটার। জ্যোৎস্নারাতে বন্ধুর পর্বতে বরফ ভেঙে চলতে আর 'loud dry wind'-এর মধ্যে দুর্গম পাহাড়চূড়ায় দাঁড়কাকের বাসায় পিছনে লাগতে কী নেশা! এবং এই শরীর-সঞ্চালন আর দুর্দান্ত গতির প্রমত্ততার মাঝেই জাগ্রত হ'য়েছিল তাঁর ভাবকল্পনা ও চৈতন্যবৃত্তি। তিনি বলেছেন—'I grew up fostered alike by beauty and by fear'। প্রকৃতির সৌন্দর্য আর ভয়ের মাঝেই তাঁর মানসহৃদয়ের প্রস্ফুরণ। অন্যের ফাঁদে-পড়া পাখী যখন তিনি ধরে বসেন তখন পাহাড়ে পাহাড়ে কী একটা 'low breathing' তাঁর পিছু নেয়, এবং যখন পরের নৌকার নোঙর খুলে দিয়ে আকাশের প্রদীপ্ত নক্ষত্রদলের নীচে 'elfin pinnace'-কে বেয়ে নিয়ে চলেন তখন একটা 'huge peak' জীবন্ত বস্তুর মতো দীর্ঘপদক্ষেপে হেঁটে হেঁটে চলে তাঁর পিছু পিছু। অন্যদিকে আনন্দের ঢেউও কম ওঠে না। যখন প্রথম কোকিলের ডাক তাঁর কানে বাজে তখন মনে হয় পৃথিবীটা একটা 'unsubstantial faery place', সমস্ত প্রকৃতি 'presences' এবং 'visions'-এ পরিপূর্ণ এবং 'universal earth'-কে মনে হয় একাগ্র কর্মমুখর 'like a sea with triumph and delight, with hope and fear'। এমনকি দশবৎসর বয়সেও দেখা যায় তাঁর প্রকৃতি-উপলব্ধির এই প্রথম অথবা myth-making পর্যায় শান্ততর ও সূক্ষ্মতর চৈতন্যোপলব্ধির দ্বিতীয় পর্যায় দ্বারা বিমিশ্রিত যে পর্যায়ে প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যে—রূপালী মেঘমালিকায়, সূর্যে চন্দ্রে, 'bright fields of water'-এর মধ্যে আনন্দামৃতের পবিত্র তরঙ্গ উদ্বেলিত—সে আনন্দ এত স্পষ্ট প্রকাশমান এত অমৃতস্রোৎসারিত যে সর্বপ্রাকৃতবস্তুকে একটা অদৃষ্টপূর্ব 'gleams' দিয়ে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে এবং সে 'gleams like the flashing of a shield'। এই দুটো পর্যায়ের মধ্য থেকেই গভীরতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় intuition ক্রমোদ্ভিদ্যমান। এইভাবে দেখি ভারতীয় কবির ইন্দ্রিয়স্পর্শ-বিবর্জিত প্রকৃতির গোপন রহস্য দূর থেকে বারে বারে তাঁকে ডাক দিয়েছে বিশ্বজোড়া লিপির অর্থ বোঝার জন্যে, চৈতন্য দিয়ে দেখার জন্যে—আর ইংরেজ কবির আবাল্য ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ প্রকৃতির শোভন পরিবেশ তীব্র আকর্ষণে তাঁর নিগূঢ় গোপন চৈতন্য-প্রবাহটিকে প্রবুদ্ধ করেছে—

"To search the mystic cause of things
And follow nature to her secret springs."

বিশ্বকবির বিপুল অসাধারণত্ব বিরাট প্রতিভাশক্তি বাল্যকাল হ'তেই তাঁর চিত্তকে অসহনীয় চঞ্চলতায় আলোড়িত ক'রে তুলেছিল। বদ্ধাধারে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বিশাল বিপুলকে আবদ্ধ ক'রে রাখলে তার যে বেদনা—তার যে আপনাকে মুক্ত করার বিকীর্ণ করার অবিরাম

প্রয়াস তা দেখা গিয়েছিল কবির গণ্ডীঘেরা বাল্যজীবনেই, এবং বিশেষ করে স্কুল-জীবনেই। স্কুল-জীবনের সকরুণ বিয়োগান্ত পরিণতি 'জীবনস্মৃতি'তেই মেলে। উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কুল-জীবনের পরিণতি ঠিক এমনি সম্পূর্ণ বিফলতায় পরিসমাপ্ত না হ'লেও, ট্র্যাজেডির সুর একটা বরাবরই বেজে বেজে তাঁর তীব্র প্রকৃতি-তৃষ্ণা তথা বিপুল কবিপ্রতিভার অভিজ্ঞ-সংকেত বারে বারে জানিয়ে গেছে। স্কুলের বই-এর চেয়ে প্রকৃতির বই তাঁর কাছে বেশী মূল্যবান, বেদীর উপর দণ্ডায়মান শিক্ষকের চেয়ে প্রকৃতি তাঁর কাছে অভিজ্ঞতর শিক্ষক। সেইজন্য মন তাঁর স্কুল থেকে পুঁথিপত্র ছেড়ে কোথায় যেন ছুটে বেরিয়ে যায়—

"Of College labours, of the Lecture's room
All studded round, as thick as chairs
could stand
With loyal students faithful to their books,
Half-and-half idlers, hardy recusants,
And honest dunces—of important days,
Examinations, when the man was weighed
As in a balance ! of excessive hopes,
Tremblings withal and commendable fears,
Small jealousies, and triumphs good or bad—
Let others that know more speak as
they know
Such glory was but little sought by me,
And little won."

আরো স্পষ্ট করে বলেছেন—

"Not that I slighted books,—that were to lack
All sense,—but other passions in me ruled,
Passions more fervent, making me less prompt
To in-door study than was wise or well,
Or suited to those years."

আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে—

"I did not love,
Judging not ill perhaps, the timid course
Of our scholastic studies ; could have wished
To see the river flow with ampler range
And freer pace :"

অন্যত্র বলেছেন—

"But at that time
Of manners put to school I took small notes,
And all my deeper passions lay elsewhere."

কবিদ্বয়ের এই খাতা-বোঝাই নম্বর-পাওয়া ভালো-ছেলে-না-হওয়ার স্বভাব, বাঁধন-ঘেরা নিয়ম-গড়া বেষ্টনীর মধ্যে পাগলের অতৃপ্তি, অনিয়মকে নিয়ম ক'রে মহাপরিব্যাপ্তির মধ্যে নিজেকে বিস্তীর্ণ করার অদ্ভুত সাধনালাভ দুই কবিকে অপূর্ব সাদৃশ্যে একীভূত করে রেখেছে।

মনের মধ্যে একটি সুপ্ত সত্তা একটি সুপ্ত চৈতন্য কোনো এক অনির্বচনীয় মুহূর্তে শিল্পীর সোনার-কাঠির স্পর্শে জাগরণের প্রতীক্ষায় চিরদিন সঙ্গোপনে অধিবাস করতে থাকে। তারপর কখন একসময়ে হঠাৎ তার প্রস্ফুরণ হয়। যখন প্রস্ফুরণ হয় তখন সে মনকে বলি কবি। তখন গণ্ডী যায় মুছে, সঙ্কীর্ণতা যায় দূরে, অনন্ত বিশ্বপ্রেমে হৃদয়ের প্রতিটি বাহুতন্ত্রী জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, বিশ্বব্যাপী আনন্দোৎসবের সমারোহ চলতে থাকে। আলোচ্য দুই কবির জীবনমন সমমুহূর্তে সমপরিবেশে ঠিক এমনি চৈতন্যসত্তায় উন্মেষিত হওয়ার ঘটনায় অদ্ভুত গৌরবে চিহ্নিত হ'য়ে আছে। গভীর সাদৃশ্য দেখানোর জন্য কবির আত্মলিখিত ঘটনাটা একটু উদ্ধৃত করতে হোলো। তখন কী যেন অব্যক্ত একটা বিষাদবেদনায় মনটা দিনরাত ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাকত। মনের যা আবেগ তা প্রকাশের পথ যেন কোনো এক গুহার মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে ছিল। তখন কবি লিখছেন—

"সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়।

"একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একমুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল, আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইংরেজ কবির জীবনে যখন ঘটনাটা ঘটেছিল তখন তাঁরও মনে কী যেন একটা বেদনা ছিল, স্বকীয় স্বচ্ছন্দগতি যেন তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি নিজের অবস্থাটা তখন প্রকাশ ক'রে বলছেন—"as harassed with the toil of verse much pains and little progress." এই সময় অভ্যাসমতো একদিন যখন তিনি তাঁর Cumberland friend-দের rustics society-র যোগসরের আড্ডা আর dance party থেকে ফিরছেন তখন তিনি বলছেন—

"The morning rose, in memorable pomp,
Glorious as e'er I had beheld—in front,
The sea lay laughing at a distance ; near,
The solid mountains shone,
bright as the clouds;
Grain-tinctured, drenched in empyrean light ;
And in the meadows and the lower grounds
Was all the sweetness of a common dawn—
Dews, vapours, and the melody of birds,
And labours going forth to till the fields."

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন ক'রে গাছের ফাঁকে সূর্য উঠেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঠিক তেমনি ক'রে গাছের ফাঁকে সূর্য উঠেছে। সেই চিরদিনের সূর্যওঠার বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ-হওয়া দুটো জীবন একটি চিরদিনের আনন্দরূপকে খুঁজে পেয়ে কেমন একময় অনুভূতিতে বিভাসিত হ'য়ে উঠেছে! এ যেন বিভিন্ন দুটি তারের একই কনকাঙ্গুলিঘাতে ঐকতানবাদন।

একটি সর্বব্যাপী আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-অভিষিক্ত জীবনবাণীকে শাশ্বত সত্য ও চির অমরত্বের সিংহাসনে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করেছে। "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই ঋষিমন্ত্র তাঁর রক্তে শিরায় অস্থিতে মজ্জায় মিশে আপন অন্তরতম আনন্দময় সত্তা ও চিন্ময় সত্তাকে ঐ সর্বব্যাপী ভূমা অর্থাৎ চিদানন্দ-সত্তার সঙ্গে একই আসনে একই প্রেমে সংযুক্ত মিলিত ক'রে দিয়েছে। যেমন তিনি চর্মচক্ষু দিয়ে নয়, মর্মচক্ষু দিয়ে—বুদ্ধি দিয়ে নয়, ধ্যানযোগে উপলব্ধি করেছেন উপনিষদের এই বাণী—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি", তেমনি ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে নয়—বোধি দিয়ে চৈতন্য দিয়ে তাঁর কাব্যে তিনি নবরূপে উচ্চারিত করেছেন এই ধ্যানমন্ত্র—"ও যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।" এই আনন্দময় মধুরের ইঙ্গিত পান কবি এই প্রকৃতির মধ্যেই। তিনি বলেছেন—

"তোমার ইঙ্গিতখানি দেখিনি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।
যখনি দেখেছি আমি, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত।
বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।"

মরমী কবি ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের জীবনেও এই আনন্দময় সত্তার উপলব্ধি তাঁর কাব্যকে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের কাব্য থেকে পৃথক করেছে। এই উপলব্ধি এবং নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেই তাঁর বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ওয়ার্ডস্বার্থ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে।" তাঁর "জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডস্বার্থীয়"। এই ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থীয় জগৎ হোলো আনন্দরূপের জগৎ। আত্ম সচেতনতার আলোকে তিনি বিশ্বময় আনন্দরূপে আবির্ভাবকে উপলব্ধি করে বলেছেন—"the deep powe of joy we see into life of things" এবং তাঁর এই আনন্দের সর্বব্যাপীত্বের উপলব্ধির খবরও পাই যখন তিনি— "of joy in widest commonalty spread"। "Life o things" বলতে বোঝায় বস্তুপুঞ্জ প্রাণময়, অর্থাৎ কবি চৈতন্যভূমিতে ঘটেছে প্রকৃতির মধ্যেই প্রাণশক্তির প্রস্ফুরণ এই প্রাণশক্তির মধ্যেই তো সেই আনন্দশক্তির বিচ্ছুরণ এই বোধ এই চৈতন্য এই প্রাণই তো আনন্দ। প্রকৃতি যে শুধু মানুষ নিয়ে নয়—মানুষ ছাড়া আর-যা-কিছু তা নিয়েও সুতরাং যে প্রাণধারা এই মানুষের মধ্যে সেই প্রাণই এ বিশ্বপ্রকৃতির সব-কিছুতে তরঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথও এ কথাটাই বলেছেন—

"এ আমারি শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু—সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।"

এই যে আনন্দ, এ বস্তুভোগী জীবনের অলীক আন নয়, এর অপর নাম অমৃত। আনন্দামৃত। মরমী ক

অনুভব করেন এই বিশ্বপ্রাণে প্লাবিত ক'রে সৌন্দর্য ও আনন্দের বর্ণাস্রোতে একটি অপার অমৃতধারা হিল্লোলিত হ'য়ে চলেছে। এ অমৃত ঐ আনন্দ ছাড়া কিছু নয়। ভূমানন্দই এই অমৃত। হৃদয়ে পবনে জলে স্থলে আকাশে অর্ণবে পাহাড়ে পর্বতে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে যে আনন্দরূপের অভিব্যক্তি, সেই আনন্দরূপের সঙ্গে প্রাণসত্তার একাত্মতাই চরম আনন্দ—অক্ষয় অমৃত। ঋষি পিতামহদের আনন্দময় অমৃতমন্ত্রটি—

> "ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
> মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ।
> মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
> মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ। ওঁ"

বিশ্বকবির কণ্ঠে নবরূপে প্রতিধ্বনিত হোলো—"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি"। উষা সিন্ধু ধূলি বনস্পতি সূর্য সবকিছুই মধুক্ষরণ করছে। তাই এ-সবের মাঝখানে জন্মলাভ এত মহাপুণ্যের—

> "কত-যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
> জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধূলামাটির মানুষ।"

এই জন্মেই তো অনন্ত আনন্দ, এই জন্মই তো অক্ষয় স্বর্গবাস—"স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে"। প্রকৃতিতে এই আনন্দনির্ভর এই অমৃতবরণই পরম প্রেম—

> "এইত তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ
> এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ
> এই যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ-'পরে
> এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রধান মিল প্রকৃতির মধ্যে এই আনন্দঘন আবেগানুভূতির উপলব্ধিতে। একই সৌন্দর্যসুধা একই আনন্দমদিরা একই অনুভূতি পানপাত্রের দু'পাশে ব'সে দুজন। বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাণ্ড সৌন্দর্য-সরসীর আনন্দতরঙ্গে তাঁরা যেন বৃন্তের দোলায়িত দুটি রক্তশতদল। প্রকৃতির মাধ্যমে আত্মদর্শনের (self realisation) ধারা তাঁদের একই। ঐ একই আনন্দময় রূপকল্পমায়ায় রবিকবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রাণস্পর্শ সঞ্জীবিত। নিচের ক'টি লাইনের মধ্যে কী পাই—বস্তুজগতের হলাহল? না আনন্দলোকের অমৃত? হ্রদের মধ্য দিয়ে নৌকা বেয়ে যাচ্ছেন; বলছেন—

> " ... the calm
> And dead still water lay upon my mind
> Even with a weight of pleasure, and the sky,
> Never before so beautiful, sank down
> Into my heart, and held me like a dream!"

একটি পবিত্রতর বর্ণনা—

> "It is a beauteous evening calm and free:
> The holy time is quiet as a Nun
> Breathless with adoration; the broad sun
> Is sinking down in its tranquility."

কবির এই যে সন্ধ্যা, এ সন্ধ্যাও সন্ধ্যা নয়। এ সন্ধ্যা তো শুধু দৈনন্দিন তুচ্ছ কর্মাবসানের শ্রান্ত মুহূর্ত নয়। এই tranquillty তো প্রতিদিনের হাট-ভাঙার ক্ষণিক নির্জনতার নেই। এই কলপ্রশম সন্ধ্যা এই মুহূর্ত এই শান্তি যেন কোনো গভীর চৈতন্যের স্তব্ধধ্যানে স্থিত। এ কি সব-কিছুর ওপরে আমাদের কাছে অনির্বচনীয় একটি কিছু বহন করে আনছে না? আনছে না কি আমাদের কাছে অমৃতের ইঙ্গিত? আরো প্রকাশমান হ'য়ে ওঠে এই ক'টা লাইনে—

> "The gentleness of heaven broods o'er the sea:
> Listed the mighty Being is awake,
> And doth with his eternal motion make
> A sound like thunder—everlastingly."

প্রলয়ঙ্কর সমুদ্রের যে কর্ণভেদী তরঙ্গগর্জন, তার মাঝেও কবি দেখেন একটি স্বর্গীয় শান্তি বিস্তৃত হ'য়ে আছে—শুধু সমুদ্রে নয়, প্রকৃতির প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে—প্রাণের পরতে পরতে, এবং তা দেখে কবি বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হ'য়ে বলেন—"Ne'er saw I, never felt, a calm so deep!" বিশ্বের নাট্যশালার সাজঘরে বসে কবি অভিনেত্রী প্রকৃতির অঙ্গাভরণ আর মুখবর্ণানুলিম্পন দেখে শুধু মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকেন না, আপন চৈতন্যসত্তাকে অনুরূপ বর্ণালিম্পনে অনুরঞ্জিত ক'রে অভিনেত্রীর লাস্যলীলায় অন্তঃনিহিত আনন্দরসটি উপভোগ করেন—

> "Thus pleasure is spread through the earth
> In stray gifts to be claimed by whoever
> shall find,
> Thus a rich loving kindness, redundantly kind,
> Moves all nature to gladness and mirth."

সে-চৈতন্যের কাছে অতি তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র কিছুও বৃহত্তের মতো চিরস্থায়ী বোধপ্রাণী হ'য়ে এমন একটা ভাবনাদ্রির শীর্ষদেশের দিকে মনপ্রাণকে টেনে নিয়ে যায়—যার আনন্দ অশ্রুজলের রোমাঞ্চ-শিহরণেও পরিমাপ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে—

> "To me the meanest flower that blows
> can give
> Thoughts that do often lie too deep for tears."

দুই কবির প্রধান সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের মধ্যে দেখতে গেলে এ সামান্য একটু ইঙ্গিত মাত্র।

পল্লীর বারমাস্যা

তুলসীদাস সিংহ

১। চৈত্র ।

ফাল্গুনে যারা হেসেছে তারা চৈত্রেও হাসছে। কিন্তু এ হাসি সে-হাসি নয়। বদলে গেছে হাসিটা। হলুদ হয়ে গেছে বাসন্তী। বাসন্তীর বুকে এখন কার্ত্তিকের স্বপ্ন।

প্রেমের সার্থকতা নিবেদনে—রসের সার্থকতা ব্যাপ্তিতে।

কামের ভস্মস্তূপে জাগে প্রেম। কাম-পাতারা ঝরে গিয়ে ফুটে ওঠে প্রেম-কুসুমরা। ফুটে ওঠে নীল লাল সোনালী বেগ্‌নী হৃদয়ে সবুজ পাপড়ি মেলে মেলে। পাপড়ি নয়—যেন প্রেমলিপি। ছত্রে ছত্রে আত্মনিবেদনের ছন্দ জড়ানো। এ লিপি চোখে পড়ামাত্র লীলারসসম্ভোগ-ব্যাকুলদের বুকে ঢেউ খেলে যায়। খেলে যায় আসঙ্গলিপ্সার ঢেউ। ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা হৃদয়-ছবি-সায়রে। ফলে ফুলের বুকে জাগে ফল। আহুতির বুকে জাগে অমরতা। মৃত্যুর কোল আলো করে হাসে মৃত্যুঞ্জয়রা। ধরা হয়ে ওঠে অমৃতময়।

বৃক্ষে বৃক্ষে নতুন করে জাগে আবার পাতা, জীর্ণবাসের স্থান পূর্ণ করে নববাস। নব-জাগরণের সাড়া পড়ে যায় চারদিকে।

চৈত্র হল এই নব-জাগরণের মাস। অমৃতলাভ করে অমৃতময় হয়ে ওঠার মাস।

লাল-টুকটুকে শাড়ী-পরা হলুদবরণরা এখনও হাসছে। কিন্তু এ হাসি নিবেদনের নয়—গৌরবের। হো-হো নয়, হি-হি নয়, ফিক্‌-ফিক্‌ নয়—আসলে শব্দই নেই মুখে। আছে শুধু রেখা। মুখগুলো হয়ে আছে নীচের দিকে, মুখের কোণগুলো বেড়ে গেছে দু'পাশে একটু করে, চোখগুলো স্থির হয়ে বসে আছে সারাদিন কোলের কচি কচি সোনাদের উপরে। ফুলদের কোলে কোলে উঁকি মারছে ফলের থোকা। ফলদের কোল আলো করে হাসছে কচি পাতারা।

শিমুলরাও হাসছে। হাসছে গোটা অঙ্গটা দিয়েই—অঙ্গে নববাস জড়িয়ে। আবরণের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গাব্‌ড়ারা—শিমুলের ফলরা।

গৌরবের হাসি হাসছে আঁকড়, আকন্দ, চিরুণ কাঁঠাল, ঘেঁটু, কাউররা।

সেই সঙ্গে আবার নতুন করে হাসতে নেমেছে চাকল্ মহুয়া, ডালিম, কামরাঙা, শাল, মুচুকুন্দ, হাঁচিফুলরা।

কিন্তু এরা কি কেউ শুধুমাত্র ফুলই? এরা তো ফুলে ফলে মেশানো। এদের মুখগুলো তো সব নিবেদ গৌরবে মাখামাখি।

চাকল্‌তা তো চাকল্‌তা নয়—কদমফুলের মতে তা কদমফুল কি শুধু ফুলই?

হাঁচিফুল কি শুধু ফুল! পাপড়িদের বুকের ভি গোল হয়ে বসে রয়েছে ঐ যে—ও তবে কি?

ডালিমফুলের মূলেও ঐ তো জেগে রয়েছে আ কলস।

ঝালর ঝুলিয়ে রাখা শালফুল, মুচুকুন্দফুলের মু তাই।

আসল ডুমুর বট—এদের ফুল হয় না নাকি! ঐ হয়েছে। ফুল ফুটে আছে ওদের অন্তরে—বাইরে আছে শুধু ফল।

অর্থাৎ চৈত্রে ফুল মুখ্য নয়—মুখ্য ফল, মুখ্য পাতা।

আর ঐ যে মহুয়া—ওকি ফুল? নাকি শুধু ফুলে মেশানো? ও ফুলও নয়, ফলও নয়, ফুল-ফলও ন মধুভাণ্ড। চৈত্রে ও জাগে শুধু উপচে পড়ার জন্যেই।

কচ বা গর্ভকোষের বুকে বসে থাকে মহুয়ার মধুভাণ্ পাপড়ি আছে বটে ভাণ্ডমুখে, কিন্তু চোখে পড়ার মতো এই-টুকু-টুকু—তাও আবার বাইরের দিকে ছড়ানো ভিতরের দিকেই গোটানো। মহুয়া ফোটে রাত্রে ভোরের হাওয়াটি গায়ে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে ঝরতে

করে দেয় টুপ্ টুপ্ করে। সূর্য দেখলে তো একেবারে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে।

নিজে ও আগাগোড়াই মধুময় কিনা, তাই ও চায় সারা দুনিয়াই মধুময় হয়ে উঠুক। এক বুক মধু নিয়ে রাত জাগে ও—স্বর্গলোক আর পিতৃলোকের দিকে চোখ রেখে ধ্যান করে। ও চায় ওর মধুর ধ্যানে মধুময় হয়ে উঠুক স্বর্গলোক আর পিতৃলোক। মধুময় হয়ে উঠুক রাত্রি। রাত্রির শেষ যামে ও মুখ নামায়—মুখ নামায় বনস্পতিদের মাথায় মাথায়। কামনা করে বনস্পতিরা মধুময় হোক। রাত্রিশেষে জাগে ঊষা—আত্মাহুতি দিয়ে মধুর করে তুলতে চায় ও তখন ঊষাকে। ঊষাকে মধুময় করতে গিয়ে পৃথ্বীর মাটিতে আছাড় খায়—আছাড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে: পৃথিবীর মাটিও মধুময় হোক। ঊষার বুকে জাগে সূর্য—উপ্‌চে পড়ে তখন ও শতধারে। শতধারে উপ্‌চে প'ড়ে মধুময় করে তুলতে চায় সূর্যকে। সূর্যের পর দেখা দেয় গরুর পাল। মহুয়া দেখলেই জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে গরু-বাছুররা। পাগলের মতো ছুটে এসে মস্‌মস্ করে খেতে শুরু করে দেয় তলায়-ঝরে-থাকা মহুয়াদিকে। তাদের রক্তস্মৃতির মধ্যে আলোড়িত হতে হতে ও তখন বলে, গোসমূহ মধুময় হোক। মধু ছাড়া আর কিছুই জানে না যে মহুয়া। কথা বললেই ওদের মুখ দিয়ে তাই বেরিয়ে পড়ে শুধুমাত্র ঐ একটিই কথা: মধু ও মধু ও মধু।

* * *

চোখ বুজলে আজও স্পষ্ট দেখতে পাই—ঝাঁকাঝাঁকা মহুয়ায় ভর্তি ডান-বাঁ দুটো হাতই কোলে নিতে যাওয়ার মতো করে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কেঁও-বাবাজী গাইছেন—

"এসে যে মাধব,
এসো না মাধব,
ধরি তোদের দুটি পায়।"

গাওয়া-শেষে পদটির ব্যাখ্যা করতেন কেঁও-বাবাজী বেশ রসিয়ে রসিয়ে। কিন্তু কান-দুটো আমাদের তো আর ব্যাখ্যার উপরে থাকতো না—থাকতো 'মাবব'এর উপরে। সামনের গোটাদুয়েক দাঁত হারিয়ে যাওয়ার জন্যে কেঁও-বাবাজীর মুখ থেকে 'মাধব' 'মাবব' হয়ে বেরিয়ে আসতো। আমাদের আনন্দ ঐ 'মাবব' শুনেই। তবে ঠিক-ঠিক মনে না থাকলেও, মনে হয় কেঁও-বাবাজী যেন ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চাইতেন—তিনি চাইছেন সেই মাধবকে যে-মাধব ধব ধব করে ধবলী চরায়। মা-ধব অর্থাৎ যা সাদা নয়, মানে কালো গরুটিকে তিনি চাইছেন না।

বসন্ত এলেই ঐ কেঁও-বাবাজীর মুখ থেকে শোনা পদটি বড় বেশী করে করে মনে পড়ে যায়। মনে হয়, পল্লীও যেন আজ কেঁও-বাবাজী হয়ে গিয়ে গাইছে—আমি চাই সেই বসন্তকে যে-বসন্ত ঘরে এসে বসে পড়ে, গায়ের উপরে নয়।

কিন্তু মাধব এলে মা-ধবও আসে—বসন্ত এলে 'বসন্ত'ও আসে। আর বসন্তদের আসার সঙ্গে দলেই আসে দিয়াসীরা, আসে গোয়ালীরা। এই টিকে-নেওয়ার যুগেও আসছে।

মানুষদের মধ্যে বসন্ত রোগ-দেখা দিলে, দিয়াসী বা দৈবজ্ঞরা বাড়ীতে বাড়ীতে এসে মন্ত্র পড়ে গা বেঁধে দিয়ে যায় সকলের। তালাই-বীচিকে মন্ত্রপূত করে দিয়ে যায়। মন্ত্রপূত তালাই-বীচির রস কপালে কপালে টিপের মতো করে পরে সব। ব্যস্, এতেই মা-বসন্তকুমারীর দয়ালাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া যাবে। এ ধারণা বলবৎ না থাকলেও, অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে আজও পল্লীবাসীদের কাছে। টিকে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তালাইয়ের টিকাও নেয় আজও।

আর গরু-বাছুরদের মধ্যে বসন্ত রোগ দেখা দিলে, আসে গোয়ালীরা। দিয়াসীদের মতো তারাও এসে মন্ত্র পড়ে গা বেঁধে দিয়ে যায় গরু-বাছুরদের, মন্ত্রপূত করে দিয়ে যায় সরষেকে। সেই সরষেকে গোয়ালের চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হয়। সেই সঙ্গে গেয়ে দিয়ে যায় বাড়ীতে বাড়ীতে 'কপিলামঙ্গল'।

দিয়াসীদের মতো এরাও আপনা থেকেই এসে দাঁড়ায় দরজায়। 'ডাকাডাকার প্রয়োজন হয় না এদিকে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এ গাঁয়ে গরু-বাছুরদের বসন্ত হয়েছে তা তুমি জানলে কি করে, ভাই—তবে উত্তর পাওয়া যাবে: কোনো জায়গায় বসন্ত আরম্ভ হলে স্বপ্নের মধ্যে আমরা তা দেখতে পাই। আর নিয়ম হল, যদি একবার দেখে ফেলেছি অমুক জায়গায় বসন্ত হয়েছে, তাহলে শত কাজ ফেলেও দৌড়ে আসতে হবে আমাদিকে সে-জায়গায়। বাবার যে ঐরকমই আদেশ দেওয়া আছে আমাদিকে। আর এসে যদি একটিবার ভগবতীর গান গেয়ে দিতে পেরেছি তবে কৈ দেখি বসন্ত কেমন থাকে সে-গাঁয়ে?

এইটিই হল এদের প্রধান বিশেষত্ব। দোষ আর দিই কি করে—করে খেতে হবে তো এদিকেও। বাধ্য হয়েই ওদিকে ওরকম কথা বলতে হয়, এবং মুখে নয়—নাক মুখ চোখ বুজে দিয়েই বলতে হয়। বসন্ত যখন হয় না

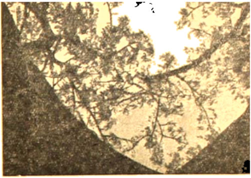

নববাস

গরু-মানুষের তখনও এরা আসে গাঁয়ে গাঁয়ে এবং তখনও এসে কপিলামঙ্গল গেয়ে দিয়ে যায়। ওষুধও বার করে ঝোলা থেকে। তবে তখনকার সে-ওষুধ গরুর ওষুধ নয়—মানুষের ওষুধ। গরুর ওষুধই তো নয় শুধু—আপনার ওষুধ এবং আপনার যে-কোনো রোগের ওষুধই মিলে যাবে এদের কাছ থেকে। এদের কাঁধের ঝুলিগুলো গরু-মানুষের হাজারো-রকম ওষুধপাতি দিয়েই ভরা। একটি নিরেট-অসাধ্য রোগের নাম করে ধরেছিলাম এদের একজনকে: আচ্ছা ভাই, এর কোনো ওষুধ আছে তোমার কাছে? বলতে-না-বলতেই উত্তর দিল সে: নেই আবার বাবু?—আলবৎ আছে। তিন দিন খেলেই দেখবেন সব ফাঁক। কত কত কুমড়োকে অমন বেগুন করে দিয়েছি—কত কত বেগুনকে ছাঁচি-পেঁয়াজ বানিয়ে ছেড়েছি।

বললাম, তা বেশ। কিন্তু যে ওষুধটি তুমি দিবে, সেটির নাম বলতে হবে আমাকে।

বললে: তাতে আর কি হয়েছে, বাবু—বিশ্বাস না হয়, পয়সা দিতে হবেনা আমাকে, শিকড়টা আমি এমনি-এমনিই দিচ্ছি আপনাকে—বড়িগুলো শুধু কিনে নিবেন আপনি বাজারের যে-কোনো দোকান থেকে। এই যে—এই যে দেখছেন শিকড়টি, এর সঙ্গে ন'টি বড়ি মিশিয়ে খেয়ে নিবেন তিন দিনে। বড়িগুলোর নাম হল 'দুধবেরেকেক কামমোহিনী'।

উচিত ছিল আমার নামটা শোনামাত্র হাঁ হয়ে চাওয়া এবং বলা—তোমার কাছে যখন আছে ভাই, তখন তুমি দিয়ে দাও ও-বড়িগুলো। এই নাও সোওয়া পাঁচ আনা।

মাথাটা ভজার দিকে করে নিলাম বড়িগুলোর নাম শুনে। আঁচ করে নিলাম দুধবেরেকেক যখন, তখন নিশ্চয়ই দুধের মতো সাদা হবে বড়িগুলো, আর যেহেতু কামমোহিনী সেহেতু মোহিনীমায়ার মতো কাজ করবে এগুলো।

দোকানদারের কাছে এসে এ নামটি উচ্চারণ করলেই দোকানদার বামাবাড়ীর পথ দেখাবে, এ জানা কথা; সুতরাং আসলটা জানবার জন্যে বললাম, তা ভাই, আছে যখন তোমার কাছে তখন বার করোনা গোটাকয়েক, দেখি।

দেখলাম, হোমিওপ্যাথির দোকান থেকে যোগাড় করা সাদা-সাদা বড়ি।

তা সে যাই হোক—দুধবেরেকেক-কামমোহিনীর কথা আলাদা এবং শিকড়বাকড়ের কথাও আলাদা, কিন্তু গানগুলি ভারী চমৎকার। অতি সহজ কথার মাধ্যমে এরা ভগবতীর মহিমা কীর্তন করে, ভগব কত আদরের ধন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। ভগবতীর কথা আমরা ভুলে যাই না। 'গোয়ালভ যে-দেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ সে-দেশের মানুষদে ভগবতীকে ভুলে যাওয়া মানেই তো সম্পদহারা হওয়

ভগবতী মর্ত্যের নয়, স্বর্গের এক করুণাময়ী মানুষের উপরে দেবতাদের অপার কৃপাবলেই করুণাময়ী ঐ মা-টিকে কপিলা-রূপে মানুষের মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দেবতাদের শত সাধাসাধিতেও কপিলা কিন্তু মর্ত্যে নেমে আসতে রাজী হননি। কেন হননি, দিয়েই গোয়ালীরা কপিলামঙ্গল আরম্ভ করে—

"দেবতারা বলে মাগো মর্ত্যভূমে চল।
মর্ত্যভূমের কথায় কপিলা কাঁদিতে লাগিল।
বর্ষায় ভীষণ দুঃখ পাবো চারিমাস,
বাহিরে বাঘের ডর ঘরে মশা ডাঁশ।
পিছনের দু'পায়ে মোর বেঁধে ছাঁদনদড়ি,
চারিটি বাঁটের দুধ লইবেক কাড়ি।
অল্প করে থোবে বাছুর জিভ করে পাই,
সারারাত্রি মারে লোকে দেখাশোনা নাই।"

এমনিধারা শত দুর্দশার কথা জানালেও দেবতার ছাড়লেন না কপিলাকে। জড়িয়ে বললেন তাঁরা কা যেতেই হবে মর্ত্যে।

দেবতাদের অনুনয়-বিনয়ে ভগবতীর মন গললো শেষপর্যন্ত—নেমে এলেন তিনি স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে।

মর্ত্য পেল স্বর্গের পীযূষধারা। পেল আর-এক মাকে। এ মা পেট ভরায়, ঘর ভরায়—ত্রিভুবন ভরায়। এ মায়ের দৌলতেই মানুষের গায়ে নামে বল, সংসারে নেমে আসে লক্ষ্মীর কৃপা।

সুতরাং—

"গরুর পালন কর মাগো গরু বড় ধন,
গরুতে ভরিয়ে তুলে এ তিন ভুবন।
সুখেতে ভগবতী মাতা থাকেন যার ঘরে,
সে ঘরে ঢুকিতে যম প্রাণভয়ে মরে।
সকালবেলায় দিবে ছড়াঝাঁটি সন্ধ্যাবেলায় বাতি,
তবে কৃপা করিবেন লক্ষ্মী ভগবতী।"

পালন করার সঙ্গে সঙ্গে পালনগুলিও মেনে চলতে হবে ঠিকমতো। কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে, কী কী পালন করতে হবে তাও শোনায় গোয়ালীরা গেয়ে গেয়ে—

"কেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রাখে গোয়ালের কোণে
থাকিতে কপিলা মাতা দুঃখ পায় মনে।
কাঁঠাল খেয়ে কাঁঠালের ভোঁতা গোয়ালে ফেলায়
কাঁঠাল্যা বসন্ত রোগ তার ধরে গরু যায়।
আলতা সিঁদুর প'রে যে জন গোয়ালে প্রবেশে,
ধুলাতে লোটায়ে তার মা গরুধন খসে।
শনি মঙ্গলবার দিনে গোবর বিলায়
আপন বাড়ী ছেড়ে লক্ষ্মী অন্য বাড়ী যায়।
পান খেয়ে পানের পিক্ গোয়ালে ফেলায়
আওশা রোগেতে তার গরুধন যায়।
দুপুরবেলা হলে যদি নারী গোয়াল কাড়ে,
ভগবতীর মুখেতে মা গোবরগন্ধ ছাড়ে।
রবিবার দিনে যেবা মাছপোড়া খায়
ধড়ফড়ে রোগে তার গরু কষ্ট পায়।
রম্ভা খাইয়া খোসা গোয়ালে ফেলায়
তাহার বাছুর মরে দুগ্ধ-পিয়লায়।
জুতা পায়ে দিয়ে যেবা গোয়ালে সিধায়
চামদল বসন্ত রোগ তার ধরে গরুর গায়।
পায়ে আলতা দিয়ে নারী গোয়ালে প্রবেশে
গলকণ্ঠি রোগে তার গরুধন নাশে।
ভাদ্র চৈত্র মাসে যেবা গোয়ালে দেয় মাটি
আশীর্বাদ ধেনুর পাল তার যায় গুটিগুটি।
ভাদ্র মাসে গোয়ালেতে তাল ভেঙে খায়
তালবেতালে তার মাগো গরুধন যায়।
এই সব পালনগুলি করেন যে জন
অনায়াসে করেন কৃপা লক্ষ্মী-নারায়ণ।"

কিন্তু পালন করো বললেই পালন করেনা সবাই। পালনের কথা বললে বাড়ীর বৌ-ঝিরা সব মুখ বাঁকায়, পালনের নামে জ্বর আসে তাদের গায়ে। শাশুড়ীরা তবুও ছাড়েনা বৌ-দিকে কোনোমতেই—

"ছয় বৌকে ডাক দিয়ে কয় লীলাবতী,
ভগবতীর পালন তোমরা কর নিতি নিতি।
…… ……
ছয় বৌয়ের ছয় দিন পালা করে দিল,
প্রথম গোয়াল-কাড়া বড়বৌয়ের হল।
বড়বৌয়ের পালা গেল মেজবৌ এল,
মেজবৌ বলে আমার প্রমাদ ঘটিল।
সেজবৌ বলে আমার গায়ে এল জ্বর,
কাড়িতে নারিব গোয়াল নিকাইব ঘর।"

শাশুড়ী লীলাবতী বৌদের কথা শুনে কপালে হাত রাখলেন। শেষে ছোটবৌকে তিনি ধরলেন—

"ছোটবৌ তুমি গো মা কোলের নন্দন,
তোমা হতে যদি হয় মা গরুর পালন।
…… ……
বৌকে পরিতে দিল দিব্য পাটের শাড়ী,
গোয়াল কাড়িতে দিল সুবর্ণের ঝুড়ি।
হাঁসুলী পাজুলি দিল গলাতে মাদুলী,
ছড়া পাঁচ গড়ি দিল সোনার চাঁপাকলি।"

কিন্তু ছোটবৌ আবার সবচাইতে সরেস—

"ঝম্ ঝম্ শব্দে বৌ গোয়ালে দিল পা,
গোয়ালের গোবর দেখে বৌ কপালে মারে ঘা।
…… ……
সুবুদ্ধি বৌটির শেষে কুবুদ্ধি ঘটিল,
তুলিয়া ঝাঁটার মুড়া গরুকে মারিল।
…… …… ……
ছয় মাসের গর্ভ গাইয়ের খসিয়া পড়িল।
অঝোর নয়নে কপিলা কাঁদিতে লাগিল,
কেঁদে পালে গেল আর ঘরে না ফিরিল।"

সন্ধ্যা হয়ে গেল। সব গরু ফিরে এল পাল থেকে, কিন্তু ভগবতী তবু এল না। অস্থির হয়ে উঠলেন গিন্নী লীলাবতী—

"বজ্র ভাঙিয়া মাগো গিন্নীশিরে পড়ে,
এখন কেন ভগবতী ফিরিল না ঘরে।"

ভগবতীর খোঁজে গিন্নী শেষপর্যন্ত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। খুঁজতে খুঁজতে একজায়গায় এসে দেখতে পেলেন গিন্নী ভগবতীকে—

"এই যে মা ভগবতী আমার প্রাণধন,
তোমায় কিছু বলিল কি মা ঘরের বৌ-জন।"

ভগবতী তখন কাঁদতে কাঁদতে বৌদের শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা বলতে লাগলেন লীলাবতীকে—

"……
…… ……
ছয় বৌ ছয় দিন তোমায় ছয় রঙ্গ করে,
তুলিয়া ঝাঁটায় মুড়া ভাঙ্গিল পাঁজরে।"

সব শুনে গিন্নী কেঁদে ফেললেন। কেঁদে কেঁদে বললেন ভগবতীকে—

"চল মাগো ভগবতী ফিরে চল ঘরে,
সদাই রাখিব তোমা হৃদয়-মাঝারে।
…… …… ……
ছয় বৌয়ের ছয়দিন আমি অবস্থা করিব
হাটুয়া কাটিয়া বৌদের বেঞ্চা বানাব।
কান কাটিয়া বৌদের প্রদীপ গড়িব,
দশটি আঙুল কেটে সল্‌তা পাকাব।
এলোকেশ নিয়ে বৌয়ের চামর ঢুলাব,
বুকের রক্ত নিয়ে তাদের আল্‌পনা দিব।
…… ……
এতগুলি গিন্নীমা বচন কহিল,
পুনরায় ভগবতী ঘরে ফিরে এল।

সেথায় কপিলা গাই হইল যে মুগ্ধ,
এক এক কপিলায় দেয় মা একমণ দুগ্ধ।"

ছেলে, জোয়ান, বুড়ো সবাই জানে গোয়ালীরা যা বলে তা ধাপ্পা, মেয়েরা ছাড়া আর সবাই জানে এরা যে-ওষুধ দেয় তা ফাঁকি, কিন্তু এই এরাই যখন এসে বাড়ীর দরজায় ব'সে ছোট্ট মন্দিরা-দুটি নিয়ে টুনটুন করে গান ধরে—'গরুর পালন করো মা গো, গরু বড় ধন'—তখন এদের উপরে এসে পড়ে সকলেরই শ্রদ্ধাভরা আনত দৃষ্টি। গৃহস্থরা এদিকে আজও সম্মান দেখায় ষোলো-আনাই। জল চাইলে, গুড়জল দেয়। এদের গান শুনবার সময় গিন্নীবান্নীরা কেবল একটু গম্ভীর হয়ে যায়—আর মেয়ে-বৌরা মুখ টিপে টিপে হাসে।

গোয়ালীরা মরতে বসেছে এ-কথা ঠিকই। 'গোয়াল-ভরা গরু' গেছে—এরাও যাচ্ছে। কিন্তু এদের যাওয়াটা ভারী করুণ লাগছে চোখে, এরা সেই "যায় যায়—ফিরে চায়"।

•

আর ওরা—ঐ ওরা কারা যায়!

ঐ-যে কাঁধে কাঁধে সবার হাঁড়ি ঝিঁড়ি তালাই কাঁথা পুঁটলি পোঁটলা, বগলে বগলে কালো-কুচকুচে বাচ্চা, পিছনে পিছনে ছুটছে লাল-কালো দুটো কুকুর—ঐ ওরা কারা?

"ওরাই মায়ের আপন ছেলে।"

তবে ওরা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ওরা আবার ফিরে আসবে।

বাউরীরা—যারা আমাদের ক্ষেতের ফসল ঘরে তুলে দেয় তারা এই চৈত্রে গাঁ ছাড়ে। একসঙ্গে সবাই নয় অবশ্য—অর্ধেক যায়, অর্ধেক থাকে। যারা বাইরে যাওয়ার মতো শক্তসমর্থ নয় এবং যারা বাঁধা মজুর বা মান্দার হয়ে আছে সদাদের ঘরে ঘরে, তারা থাকে—বাকী সব যায়। অত-অত মানুষের কাজ কোথায় এখন গাঁয়ে? মাঠ এখন ফাঁকা, মাঠের ফসল ঘরে বাঁধা পড়ে গেছে—পুকুর-ডোবাও কাটায় না আজকাল-দিনের কোনো বাবু, সুতরাং বাধ্য হয়েই এ সময়টা তাদিকে বাইরে গিয়ে কাটিয়ে আসতে হয় রোজগার করে আনতে হয় সেইসঙ্গে সামনের দু'মাসের খোরাক। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গেলে পর তবে তো আবার আষাঢ় আসবে। সুতরাং ওরা যে যায়—ভালোই করে যাওয়ার সময় তাই ওদের মুখে মুখে ফুটে হাসি—কি পাওয়ার আশার হাসি। আর যেতে যেতে ঐ- ফিরে ফিরে তাকায় তা শুধু ওরাই তাকায় না—যে-ই ঘ ছেড়ে বাইরে যায় সে-ই তাকায়। এদের ভাষায় এর যেখানে যায় তার নাম হল 'নামাল' বা 'পূব'। জিজ্ঞাস করলেই হয় বলবে এরা 'নামাল যাচ্ছি'—না হয় বলবে 'পূবে যাচ্ছি'। শুধু আজ নয়, পুরুষানুক্রমেই ওরা নামা যাচ্ছে।

যাওয়ার আগে একটা দিন ঠিক করে নেয় এরা, তারপ যাওয়ার আয়োজন করে,—আয়োজন-শেষে দল বেঁধে যাত্র শুরু করে।

বাইরে যাওয়ার তো খরচ আছে একটা—ট্রেনে চড়তে হয়, বাসে চড়তে হয়, খেতে হয় পথে পথে,—কাজ ক মিলবে তাইবা কি ঠিক আছে, সুতরাং সংস্থান কিছু চাই-ই ঐ সংস্থানটাই হল আয়োজন। যাওয়ার আগে তাই এর আয়োজনের জন্যে বাবুদের বাড়ীতে বাড়ীতে এ হাত কচ্‌লায়। যারা পাকা বাবু অর্থাৎ একনম্বর ব তারা ঠিক কোপ বুঝে। দশটাকা চাইলে বারোটা

যায় ভরে বেশ সবে সবে। কারণ, নাবাল থেকে ফিরে এলে পর ওদের কাছে গিয়ে হাত পাতলেই তো ওরা হৈ-হৈ করবে এ জানা কথা। আর, একনম্বর বাবুরা টাকা চায় না—ঐ হৈ-হৈ-ই চায়। আষাঢ়ের চাষের সময় মুনিষের চিন্তা করে মরতে হবে না—ডাকলেই মিলে যাবে। সুদটা অবশ্য আসামাত্র দিয়ে দেয় এরা—আসলটা তাক বুঝে বুঝে কেটে নিতে হয়। কেটে নেওয়ার ভয়ে অন্য কারো কাজে যদি বেরোয় তখন অবশ্য চোখ-দুটো রাঙা করে নিয়ে দাঁড়াতে হয় একবার করে এদের সামনে: পাওনাটা আমার সব মিটিয়ে দিয়ে পর যেখানে খুশী কাজ করোগে যাও—বুঝলে! দিন এলে দিন খাওয়া যাদের অভ্যাস তারা পাওনা মিটাবে কোথা থেকে, সুতরাং একনম্বর বাবু নিশ্চিন্ত হয়েই থাকে। এবং দশটাকা চাইলে নিশ্চিন্ত হয়েই বারোটাকা দেয়।

যারা কাঁচা বা দু'নম্বর মহাজন তারাই বেশ পায় একটু। দশটাকা চাইলে পাঁচটাকা ধার করে এরা এবং ধার ক'রে দেওয়ার পরের দিন থেকেই দিন গুনতে শুরু করে দেয় কবে ওরা ফিরবে। আর ফিরে আসামাত্র গিয়ে দাঁড়ায় কালীচরণের দরজায়: কালীচরণ—আমার টাকা।

হেঁ-হেঁ করে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলে কালীচরণ: এবার যাওয়াই বেরুথা হল বাবু, গটাকতক টাকা হইছিল বটে পড়ায়, কিন্তুক তা রোগে পড়ে যাতেই গেল। তা সুদটা নেন—আসলটা শাবন মাসে শুধে দিব।

দু'নম্বর মহাজন লাফিয়ে ওঠে শোনামাত্র: শাবন-টাবন বুঝি না, কেলে—বক্ মার, টাকা ফেল।

পাঁচটাকা দিয়ে পঞ্চাশটাকার ঝাল ঝাড়ে দু'নম্বর মহাজন—ফলে, প্রথম ধাক্কায় সুদটা মিলে, বাকীটা আট আনা, পাঁচ আনা, সাত আনা করে করে মাসের শেষপর্যন্ত মিলে যায়।

দু'নম্বর মহাজনের কাছ থেকে পাওয়া এই ঝালটা অবশ্য গায়ে থাকে না কালীচরণের—কালীচরণের গা বেয়ে কালীচরণের মা বা বৌয়ের গায়ে গিয়ে ওঠে। তারা আবার সেই ঝালটা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় এসে তিন-নম্বর মহাজনের সামনে।

তিন-নম্বর মহাজন হল বাবুদের বাড়ীর মেয়ে-বৌরা। নাবাল যাবার সময় কালীচরণের মাকে এরা টাকা দেয় চারদিক ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে পর—টাকা দেওয়াটা যাতে না কেউ দেখে ফেলে। এবং কালীচরণের মা যখন ফিরে আসে নাবাল থেকে, তখন আবার ঐ চারদিকে তাকিয়ে নিয়েই ফিস্‌ফিস্ করে বলে: ধনীমামী, আমার টাকা!

ধনীমামী তখন গলার ভিতরে সেই ঝালটাকে রেখে ব'লে ওঠে: পা-দুটো ফেলি গো আগে গাঁয়ের মাটিতে ভালো করে, তা বাদে—

সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখটা ডান হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে ব'লে ওঠে তিন-নম্বর মহাজন: হেই গো মামী—আস্তে—

টাকাকড়ি কোথায় পায় বাবুবাড়ীর ঐ মেয়ে-বৌরা? বাবুদের তো সব "এক পয়সা নেই ঝুলিতে—লাফ মারছে ঝুলিতে"। থাকবার মধ্যে আছে শুধু গোটা-দুই ধানের মরাই, আর একটা চালের পুড়ো। বাবুগিন্নীদের পুঁজিও তো ঐ ধানচাল নিয়েই। কর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে উপযুক্ত সময়ে পইলায় মাপে, না-হয় হাব্‌লায় মাপে ধান চাল দিয়ে পয়সা নেয় বাবুগিন্নীরা। পয়সা নিয়ে পুঁজি করে আপন-আপন। সেই পুঁজি ধনীমামীদের কাছে সুদে খাটায়। কর্তাবাবুরা যদি জানে এসব তবে—

তাই এত ঢাকাঢাকি, চাওয়া-চাওয়ি, ফিস্‌ফিস্ তিন-নম্বর মহাজনের। ধনীমামীরাও তা জানে এবং জানে ব'লেই 'হেই গো মামী' বলামাত্র চুপ হয়ে যায়।

তা সে যাই হোক, যেভাবেই হোক, যার কাছ থেকেই হোক আয়োজন জোটে নাবাল-যাত্রীদের এবং তারা ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে সব গাঁ ছেড়ে।

আগে আগে সব সারা-পথটাই যেতো পায়ে হেঁটে। এখন কিন্তু কালের হাওয়া এদের গায়েও লেগেছে। মোটরের পথটা এরা এখন হেঁটে যায় আর ট্রেনের পথটা ট্রেনে চড়ে যায়। ফলে আজকাল কাঁধে হাঁড়ি-বিঁড়ি, কোলে বাচ্চা থাকে বটে এদের, কিন্তু পিছনে লাল-কালো দুটো কুকুর থাকে না। ঐ-রকম দুটো দেখা যাচ্ছে এখন ওদের পিছনে, ও-দুটো ফিরে আসবে তাড়া খেয়ে খানিকদূর গিয়েই।

"আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই,
বুড়ো দাদা মরে গেলে
ডুব্‌ডুবি বাজাই।"

বছরটা এখন বছর নয়—বুড়োদাদু। বুড়িয়ে গিয়ে মরে গেল বছরটা। আর বুড়োদাদু মারা গেলে কাঁদা সাজেনা—ডুব্‌ডুবি বাজিয়ে গাজন গাওয়াই সাজে।

কিন্তু গাজন কি গর্জন? গর্জন থেকে এসেছে কি এই 'গাজন' শব্দটা? যদি গর্জন থেকে এসেছে তবে গর্জনের ক্ষেত্রে গাজনের বহুল প্রয়োগ কৈ? শুনতে পাই না কেন—

গাজন

'মেঘটা গাজন করছে', 'কী গাজন রে বাবা, বাঘটার', 'কী গাজনই না করছে সাপটা' ইত্যাদি? গর্জনকে কাব্যকথায় পাচ্ছি 'গরজন'-এ, চলতি কথায় 'গরজানো'তে এবং গদ্য-বাংলায় 'গজর'-এ ('গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা', 'যত গরজায় তত বর্ষায় না', 'গজর গজর করবি আপনার ঘরে')।"

গাজন কি তবে এসেছে গেজে যাওয়া থেকে, গিজগিজ থেকে? অনেক কিছু একজায়গায় জমায়েত হয়ে একাকার ধারণ করলেই তখন তাকে বলে 'গেজে যাওয়া', 'গিজগিজ করা'। এবং এর প্রয়োগ আমরা প্রতিদিনই প্রায় করি। অনেক মানুষ একজায়গায় জমায়েত হয়ে একাকার ধারণ করলে আমরা, বলি 'লোকে গিজগিজ করছে'। খুঁটি পুঁততে হলে শাবল দিয়ে গর্ত করতে হয় এবং পরে সেই গর্তে খুঁটিটা রেখে, বালি পাথর কাঁকর মাটি ইত্যাদি দিয়ে বেশটি করে গেজে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও অনেক কিছু একসঙ্গে মিশে গেজে উঠে। এই 'গেজে যাওয়া' বা 'গিজগিজ করা' থেকে বেরিয়ে এসেছে 'গাজন'। যেমন—'নাচ' থেকে বেরিয়ে এসেছে 'নাচন' ('কতনাচন নাচাও তোমায় হে মহাকাল', 'ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা')। তেমনি গেজে যাওয়া থেকে বা গিজগিজ থেকে হয়েছে গাজন। চলতি কথায় এই 'গাজন'কে বহুক্ষেত্রে পাওয়া যায়। কথায় কথায় অনেকের মুখ দিয়েই বেরিয়ে পড়ে—'গাজুনে বামুন', 'গাজুনে তরকারি' 'হ্যাগাজন' ইত্যাদি।

যে বামুন সদাসর্বদা গর্জন করে তাকে 'গাজুনে বামুন' বলেনা কিন্তু। গাজুনে বামুন তাকেই বলে যে-বামুন দুর্গাপূজা কালীপূজা শিবপূজাও করে, আবার ওলাইচণ্ডী ধর্মরাজ যমরাজেরও পূজা করে—উঁচুজাতের যজমানও আছে যার নীচুজাতের যজমানও আছে যার। যে তরকারির মধ্যে আলুও আছে পটলও আছে, ঝিঙেও আছে কাঁচাও আছে পুঁইও আছে নটেও আছে, কুমড়োও আছে কচুও আছে—তাই হল 'গাজুনে তরকারি'। আর যে সংকীর্তনের মধ্যে 'হরি বোল হরি বোল হরি বোল'-ও আছে, 'রাধে রা গোবিন্দ'ও আছে, 'রাধাবল্লভরূপে—ও রূপে ভুবন আলো করেছে রে'-ও আছে, 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম—নিতাই গৌ রাধে শ্যাম'-ও আছে—অর্থাৎ মূল গায়ককে অনুসরণ না ক যে সংকীর্তনের মধ্যে যে যা খুশী পদ গাইতে থাকে—সে সংকীর্তনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করেই বলা হয় 'হ্যাগাজন'।

আর এসব দেখেই বলছি, বহু-কিছুর একত্র সমাবেশে নামই হল 'গাজন'। গাজনের ক্ষেত্রে তো তাই দে যায়। গাজনের দেবতা শিবকে যদি ধরি তবে দেখবে আত্মভোলা শিব নিজেকে বহুর মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে মূর্তিমা

'গাজন' হয়ে বসে আছেন। নাথ-সম্প্রদায় এসে যদি বলে, আপনি নাথদের মাথার মণিস্বরূপ নাথমণি, তবে তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিবেন (শিবমণি নাথমণি মহাদেব, একতেশ্বরনাথমণি মহাদেব, বৈদ্যনাথমণি মহাদেব)। যোগী-সম্প্রদায় যদি এসে বলে, আপনি আমাদের মহাযোগী মহেশ্বর—তিনি বলবেন, হাঁ, ঠিকই তো। ধর্ম-সম্প্রদায় যদি বলে, আপনি আমাদের ধর্মঠাকুর—তিনি বলবেন, হাঁ। বৈদিক যদি বলেন, আপনি আমাদের রুদ্রদেবতা—তিনি বলবেন, ঠিকই তো। যদি বলেন, আপনি একপাদেশ্বর—উত্তরে বলবেন, হাঁ। যদি বলেন, আপনি লিঙ্গমূর্তি নন, অগ্নিশিখা—উত্তর হবে—ঠিকই তো। আদিম যুগের টোটেম-পূজকরা যদি এসে বলে, আপনি আমাদের হাতী-ঘোড়া-রূপী ভৈরব—তিনি তা স্বীকার করবেন। লিঙ্গপূজকরা যদি বলে, আপনি আমাদের লিঙ্গদেবতা, তাও তিনি স্বীকার করবেন। শিলাস্তম্ভপূজকরা যদি এসে বলে, আপনি আমাদের শিলাস্তম্ভদেবতা—যেখানটায় রয়েছেন আপনি সেটা মন্দির নয়—শ্মশান, সমাধিক্ষেত্র, আপনি 'মেনহির', তবে তার উত্তরেও তিনি বলবেন, হাঁ। জৈনরা যদি বলে, আপনি আমাদের রূপদেবতা—তিনি বলবেন, ঠিক কথাই তো। বৌদ্ধরা যদি বলে, আপনি আর কারো নন, আমাদেরই দেবতা—তাও বলবেন তিনি, হাঁ। আর আমাদের বাড়ীর কোনো মা গিয়ে যদি তাঁকে বলেন, আপনি দেবতাই নন—মানুষ—আপনি তো আমার জামাই, আমার গৌরীকে বিয়ে করেছেন তো আপনি,—তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠবেন, হ্যাঁ মা, আমি আপনার জামাই-ই বটি, এই-যে আপনার মেয়ে আমার পাশটিতে বসে আছে।

শিবকে ছেড়ে যদি তাঁর ভক্ত বা ভক্ত্যাদের ধরি, তবে সেক্ষেত্রেও দেখবো গাজন লেগে বসে আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় কোনো কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না ভক্ত্যাদের মধ্যে—গোপ ঘোষ বাউরী বাগদী, বামুন ছত্রী কাউকেই আলাদা আলাদা মিলবে না, সবাই হয়ে গেছে এক, হয়ে গেছে একাকার। তারা শুধুমাত্র ভক্ত্যা-ই—আর কিছু নয়।

আর এ উৎসবটিও তো উৎসব নয়—গাজন। শুধু মেশামেশি, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি। বামুন বাগদী বাউরী, সব জাত, সব ধর্ম, সব মত, সব পথ, সব ধারাই এসে মিশে গেছে উৎসবপ্রাঙ্গণে। সৃষ্টি হয়েছে এক মহা-মানব-সমুদ্র।

এই মহামানব-সমুদ্রের যিনি মহাদেব—তাঁর কথা, তাঁর উৎসবের কথা কি এককথায় বলা সম্ভব, না একমুখে বলা সম্ভব। পাঁচটি মুখ এবং চারটি হাত থাকলে তবেই তা বলা সম্ভব, তবেই তা লিখা সম্ভব।

সুতরাং এই মহামানব-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে বাংলা তথা ভারতের মহাদেবের পায়ে শুধুমাত্র মাথা ঠেকিয়ে দিয়েই সরে পড়ছি।

গাজন শেষ মানেই সব শেষ—পুরনোর শেষ, নতুনের শুরু। মধুবাতাসটাও এবার শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু বসুধারা এখনও বয়ছে, এখনও বয়ছে সেই মধুসঙ্গীতটি। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি এখনও—

"মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।"

শেষ

আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

অবেদন (Anaesthesia)

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রোগীর দেহে অপারেশন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন সমস্যা। দেহের রোগদুষ্ট কোনো অংশ কেটে বাদ দিতে হ'লে (amputation) অপারেশনের সে-দৃশ্য ছিল আরও ভয়াবহ। সেইসময় কোনো হাসপাতালে গেলে দেখা যেত, রোগীর হাত-পা স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হ'য়েছে অপারেশন-টেবিলের সঙ্গে। জোয়ান জোয়ান সব ছাত্ররা তাকে চেপে ধ'রে আছে, যাতে সে একটুও নড়তে না পারে। আর ডাক্তার করাত দিয়ে কাটছেন রোগীর দূষিত অঙ্গ। হতভাগ্য রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে, করুণকণ্ঠে আর্তনাদ করছে। কিন্তু সেদিকে ডাক্তারের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, যত তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ করা যায়। যিনি যত তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ করতে পারেন, সার্জন হিসেবে তাঁর সুনাম তত বেশি।

তাই তখন সার্জনদের প্রধান চিন্তা ছিল, রোগীকে এত কষ্ট না দিয়ে কি ক'রে অপারেশন করা যায়। আর রোগী কষ্ট না পেলে একটু বেশি সময় নিয়ে অপারেশন করা যাবে। তাহ'লে অপারেশনে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা আরও বাড়বে।

এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হ'ল, অপারেশনের আগে রোগীর চেতনা হরণ করা। কিন্তু তা করা যাবে কি ক'রে? প্রাচীনকালে চিকিৎসকরা অপারেশনের আগে রোগীকে মাদকদ্রব্য খাইয়ে বেহুঁশ ক'রে রাখতেন। এতে ব্যথা-বেদনার অনুভূতি অনেক কম হ'ত। কিন্তু বড় বড় অপারেশনের সময় এতেও কোনো কাজ হ'ত না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অত্যাশ্চর্য কয়েকটি চেতনাহারী ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেল, আর সেই থেকেই সার্জারিতে এক নূতন যুগের সূচনা হ'ল। কিন্তু এর পেছনে ছিল কয়েকজন কীর্তিমান বিজ্ঞানীর ঐকান্তিক চেষ্টা। তাঁদের অক্লান্ত সাধনা, তাঁদের অসীম ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের কাহিনীই এখন ব'লব।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকায় এক অদ্ভুত পার্টির প্রচলন ছিল, এর নাম ছিল 'ইথার পার্টি'। মার্কিন যুবক-যুবতীরা নিছক স্ফূর্তির উদ্দেশ্যেই এইসব পার্টিতে মিলিত হ'ত। এরা রুমালে ক'রে ইথার নিয়ে শুঁকতো। এর ফলে মদের মতো দেহে উত্তেজনা আসতো, রক্তে উন্মাদনা জাগতো। নেশার ঘোরে যুবক-যুবতীরা উদ্দাম হ'য়ে উঠতো, হুল্লোড় করতো। এতে পার্টি খুব জমে উঠতো। যারা বেশি ইথার শুঁকতো তারা বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে থাকতো। তাদের ব্যথা-বেদনার অনুভূতিও লোপ পেত। পরে ধীরে ধীরে একসময় নেশার ঘোর কেটে যেত। কিন্তু নেশার ঘোরে সে কী ক'রেছে তা কিছুই মনে করতে পারত না।

মার্কিন ডাক্তার ক্রফোর্ড উইলিয়ামসন্ লঙ (১৮১৫—৭৮) জর্জিয়া স্টেটের জেফার্সন গ্রামে প্র্যাকটিস করেন। যুবক লঙ-ও মাঝে মাঝে এইরূপ 'ইথার পার্টি'তে যোগ দিতেন। লঙ ভাবলেন, অপারেশনের আগে রোগীকে ইথার শুঁকিয়ে নিলে কেমন হয়? ইথার শুঁকে রোগী বেহুঁশ হ'য়ে পড়বে অপারেশনের সময় ব্যথা অনুভব করতে পারবে না। পরীক্ষ ক'রে দেখতে দোষ কি?

লঙ-এর একজন রোগী ছিল, তার নাম জেম্‌স ভেন্‌এব্‌ল্‌ এর ঘাড়ের ওপর ছোট ছোট দু'টো টিউমার ছিল। ঠি হ'ল—লঙ এ দু'টো কেটে দেবেন। নির্দিষ্ট দিনে ডেন্‌এব্‌ লঙ-এর চেম্বারে এলেন। লঙ ব'লে ক'রে তাকে ইথা

শুঁকতে রাজী করালেন। সে ইথার শুঁকতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে মনে হ'ল, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। লঙ একটা টিউমার কেটে ফেললেন। রোগী কিছুই টের পেল না, একটুও নড়ল না। সেদিন ৩০শে মার্চ, ১৮৪২ সাল। সার্জারিতে নূতন ইতিহাস রচিত হ'ল, কিন্তু লঙ এর গুরুত্ব ঠিক বুঝতে পারলেন না।

লঙ ছোটখাটো আরও কয়েকটা অপারেশনে ইথার ব্যবহার করলেন। কিন্তু রোগীরা ইথারের ব্যবহার পছন্দ করলেও, সমাজের মাতব্বররা এটা ভালো চোখে দেখলেন না। তাঁরা বললেন, এটা সম্মোহন-বিদ্যার (Mesmerism বা Hypnotism) মতোই গর্হিত কাজ। কাজেই দুর্নামের ভয়ে ডাঃ লঙ অপারেশনের সময় ইথার ব্যবহার করা বন্ধ ক'রে দিলেন।

ইংরেজ বিজ্ঞানী হাম্ফ্রি ডেভি (১৭৭৮—১৮২৯) নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করেন। কোনো কোনো ডাক্তার মনে করতেন যে এই গ্যাস বিষাক্ত। কিন্তু ডেভি তা বিশ্বাস করতেন না। একদিন তিনি এই গ্যাস শুঁকলেন, কয়েক মিনিট ধরে এই গ্যাস শুঁকে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। চেতনাহীন অবস্থায় তিনি মনোরম স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। যখন জ্ঞান হ'ল তখন তিনি হাসতে লাগলেন। এজন্য এই গ্যাসের নাম দেওয়া হ'ল 'হাসির গ্যাস' (Laughing gas)।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেভি বললেন, "As nitrous oxide in its extensive operation appears capable of destroying pain, it may probably be used with advantage during surgical operations in which no great effusion of blood takes place."

আমেরিকার কানেক্টিকাটের হার্টফোর্ডে একজন দাঁতের ডাক্তার ছিলেন, নাম হোরেস ওএল্স (১৮১৫—৪৮)। তাঁর প্রধান চিন্তা, কি ক'রে প্র্যাক্টিস বাড়ানো যায়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। হার্টফোর্ডের ইউনিয়ন-হলে একটা প্রদর্শনী হ'ল। ঘোষণা করা হ'ল, 'হাসির গ্যাস' শুঁকলে কী অবস্থা হয়, তাই এখানে দেখানো হবে।

ওএল্স এই প্রদর্শনীতে এসে দেখলেন, একটা লোক এই গ্যাস শুঁকলো। সে যেন হঠাৎ অসুরের বল পেল, লাফালাফি ছুটোছুটি করতে লাগলো। লাফাতে গিয়ে হোঁচট খেল, কিন্তু ব্যথা পেল ব'লে মনে হ'ল না। এবারে ওএল্স নিজেই এই গ্যাস শুঁকলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি বেহুঁশ হ'য়ে পড়লেন। হুঁশ হওয়ার পরে শুনলেন যে, একঘর লোকের সামনে তিনি মাতলামি করেছেন। অথচ তিনি কি করেছেন তার কিছুই মনে করতে পারলেন না।

ওএল্স বুঝলেন, এই গ্যাস শুঁকলে ব্যথা-বেদনার অনুভূতি লোপ পায়। ভাবলেন, দাঁত তোলার আগে রোগীকে এই গ্যাস শুঁকিয়ে নেবেন। ওএল্স-এর নিজেরই একটা দাঁত খারাপ ছিল; মাঝে মাঝে ব্যথা হ'ত। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর, তিনি এক ডেন্টিস্ট বন্ধুর কাছে গেলেন। ব্যবস্থা হ'ল, তিনি আগে 'হাসির গ্যাস' শুঁকবেন, তারপর দাঁত তোলা হবে। এই ব্যবস্থামতো দাঁত তোলা হ'ল, ওএল্স কিছুই টের পেলেন না। এরপর থেকে ওএল্স দাঁত তোলার উদ্দেশ্যে 'হাসির গ্যাস' ব্যবহার করতে লাগলেন।

ওএল্স বুঝলেন, এই গ্যাসের ব্যবহার ব্যাপকভাবে চালু করতে হ'লে এবং এই আবিষ্কারের উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করতে হ'লে, সার্জনদের সামনে এর গুণাগুণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দিতে হবে। কাজেই তিনি ম্যাসাচুসেট্স সাধারণ হাসপাতালের বড় সার্জন জন কলিন্স ওআরেন-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। স্থির হ'ল, একটি রোগীকে এই গ্যাস শুঁকিয়ে পরে তার দাঁত তোলা হবে।

এই গ্যাস কতটা শোঁকালে রোগী ঠিকমতো অজ্ঞান হবে তা ওএল্স সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। তা ছাড়া এতগুলি ডাক্তার এবং ডাক্তারী ছাত্রের সামনে এই কাজ করতে হচ্ছে ব'লে তিনি খুব নার্ভাস হ'য়ে পড়লেন। রোগী অজ্ঞান হওয়ার আগেই ফরসেপ্স দিয়ে তার দাঁত ধরে টান দিলেন। রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠল। দারুণ হট্টগোল সুরু হ'ল। সবাই টিটকারি দিতে লাগলো। এইভাবে সকলের সামনে অপদস্থ হ'য়ে ওএল্স মাথা নীচু ক'রে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন। নিজের চেম্বারে এসে আর-একটি রোগীকে এই গ্যাস শুঁকিয়ে অজ্ঞান করলেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, সেই রোগীটি মরে গেল। শাস্তির ভয়ে ওএল্স সেই শহর থেকেই পালিয়ে গেলেন। 'হাসির গ্যাস' ব্যবহারের প্রচেষ্টা সেইখানেই শেষ হ'ল।

চার্লস টমাস জ্যাক্সন বোস্টন-এর একজন নামকরা রসায়নবিদ। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে একদিন, তিনি ইথার শুঁকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। এই পরীক্ষার ফলে তিনি বুঝলেন, অপারেশনের আগে চেতনা-হরণের উদ্দেশ্যে ইথার ব্যবহার করা যেতে পারে। এর কয়েক বছর পরে তিনি এ বিষয়ে উইলিয়াম টমাস গ্রীন মর্টন-এর (১৮১৯—৬৮)

সঙ্গে আলোচনা করলেন। মর্টন ছিলেন দাঁতের ডাক্তার। রোগীকে কি ক'রে ইথার শোঁকাতে হবে তাও জ্যাক্‌সন ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর মর্টন একজন রোগীকে ইথার শুঁকিয়ে, পরে তার দাঁত তুললেন। দেখলেন, রোগী একটুও ব্যথা পেলনা।

প্রায় দু'সপ্তাহ পরে ডাঃ ওআরেন একটি অপারেশনে ইথার ব্যবহার ক'রে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রমাণ দেবার সুযোগ ক'রে দিলেন। একটি লোকের ঘাড়ে একটি টিউমার ছিল। স্থির হ'ল, ডাঃ মর্টন প্রথমে ইথার শুঁকিয়ে রোগীকে অজ্ঞান করবেন, তারপর ডাঃ ওআরেন অপারেশন করবেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর। ম্যাসাচুসেট্‌স হাসপাতালের অপারেশন-ঘরে ডাঃ ওআরেন, রোগী এবং সহকারীরা সব অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সময় পার হ'য়ে গেছে, অথচ ডাঃ মর্টন এসে পৌঁছাননি। অনেকেরই সন্দেহ হ'ল, তিনি হয়তো আর আসবেন না। শেষমুহূর্তে ভয় পেয়ে সরে পড়েছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ ডাঃ মর্টন হন্তদন্ত হ'য়ে ঘরে ঢুকলেন। জানা গেল, ইথার শোঁকাবার যন্ত্রটা ঠিক করতেই তাঁর দেরি হচ্ছিল।

ডাঃ মর্টন রোগীকে ইথার শোঁকাতে লাগলেন। সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়লো। তখন ডাঃ মর্টন ডাঃ ওআরেন-এর দিকে ফিরে বললেন, "ডাঃ ওআরেন, আপনার রোগী প্রস্তুত।" অপারেশন সুরু হ'ল। ঘরের চারদিকে শ্বাসরোধী নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টিউমার কেটে বাদ দেওয়ার কাজ শেষ হ'ল। সবাই বুঝলো, রোগী কোনোরূপ ব্যথা-বেদনা অনুভব করেনি। অপারেশন শেষ হওয়ার পরে যখন রোগী জ্ঞান ফিরে পেল, তখন ডাঃ ওআরেন উপস্থিত সকলকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "Gentlemen, this is no humbug."

চারদিকে মর্টন-এর জয়জয়কার সুরু হ'ল। সব হাসপাতালেই ইথারের ব্যবহার চালু হ'য়ে গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জ্যাক্‌সন এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবি ক'রে বসলেন। ফ্রেঞ্চ-অ্যাকাডেমিতে একটা চিঠি লিখে জানালেন, কিভাবে তিনি অজ্ঞান করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এতে মর্টন-এর কথা উল্লেখই করলেন না। খবর পেয়ে মর্টন ফ্রেঞ্চ-অ্যাকাডেমিতে একটা আবেদন পেশ করলেন। এর ফলে মর্টন-এর দাবিও স্বীকৃত হ'ল, কিন্তু অ্যাকাডেমি দুজনকেই এর আবিষ্কর্তা ব'লে ঘোষণা করলেন, আর তাঁদের দু'হাজার ফ্রাঁ পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করলেন। রাগে দুঃখে মর্টন এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন। তাই এ-বিষয়ে আরও তদন্ত করার পরে স্থির হ'ল, ঐ মূল্য দিয়ে একটি সোনার মেডেল এবং একটি সোনার ফ্রেম কেনা হবে, আর তাতে শুধু মর্টন-এর নাম খোদাই করা থাকবে। এবারে মর্টন সন্তুষ্ট হ'লেন। ম্যাসাচুসেট্‌স হাসপাতাল থেকেও একহাজার ডলার পুরস্কার দিয়ে মর্টনকে সম্মানিত করা হ'ল।

মর্টন এবারে পুরস্কারের আশায় মার্কিন সরকারের কাছে আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু এখানেও জ্যাক্‌সন বাদ সাধলেন। তাঁরই শত্রুতার ফলে মর্টনের আবেদন বার বার অগ্রাহ্য হ'তে লাগলো। অনেক বাদানুবাদ অনেক আবেদন-নিবেদনের পরে শেষপর্যন্ত স্থির হ'ল যে, এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য মর্টনকে একলক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। খবরের কাগজে এই খবর বেরুল। তাই দেখে এতদিনে লঙ-এর টনক নড়লো। তিনি ভাবলেন, এ পুরস্কার তো তাঁরই প্রাপ্য। কারণ, মর্টনের আগেই তো তিনি সার্জারিতে ইথার ব্যবহার করেছেন। আর বিলম্ব না ক'রে, তিনি কংগ্রেসের কাছে চিঠি লিখলেন। শুধু তাই নয়, পুরোনো লেজার-বই খুলে এর প্রমাণও দাখিল করলেন। কংগ্রেস মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন, কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারলেন না। লঙ এইভাবে মর্টন-এর দারুণ ক্ষতি করলেন, এটা ঠিক। কিন্তু নিজে যে লাভবান হ'লেন, তা নয়।

যে-সব বিজ্ঞানী এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের কারও পরিণাম সুখের হ'ল না। জ্যাক্‌সন একজন কৃতী বিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু সব দিক থেকে ব্যর্থ হ'য়ে তাঁর মাথা-খারাপ হ'য়ে গেল। শেষে একদিন পাগলা-গারদের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

'হাসির গ্যাস' শুঁকিয়ে অজ্ঞান করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ওএল্‌স। তিনিও কংগ্রেসের কাছে পুরস্কার দাবি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর দাবিও অগ্রাহ্য হয়। এর ফলে তাঁরও মাথা-খারাপ হ'য়ে যায়। প্রকাশ্য রাস্তায় একটি বারবনিতার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার অপরাধে তাঁর জেল হ'ল। জেলের মধ্যেই তিনি একদিন আত্মহত্যা করলেন।

মর্টন-এর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, এই আবিষ্কারের প্রকৃত গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে তিনি দন্ত সংক্রান্ত প্র্যাক্‌টিস সব-কিছু বিসর্জন দেন। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার

জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেন। কিন্তু হায়! জীবনের জুয়াখেলায় তিনি হেরে গেলেন। দারুণ অর্থকষ্টে পড়েও তিনি একলক্ষ ডলার পুরস্কারের আশায় অধীর আগ্রহে দিন গুনছিলেন। কিন্তু সে-আশাও যখন মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল, তখন তাঁর দেহমন একেবারে ভেঙে গেল। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হ'য়ে তিনি মারা গেলেন।

অজ্ঞান করার পদ্ধতির প্রকৃত আবিষ্কারক কে, এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হ'য়েছে। এজন্য জীবিতকালে কেউই এর উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেননি। কিন্তু চিকিৎসকরা এর প্রকৃত গৌরব দিয়েছেন মর্টনকেই। কারণ, তাঁরই চেষ্টায়, অপারেশনে ইথারের ব্যবহার প্রচলিত হয়। আর তাইতেই মানবসমাজের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়। এজন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নামই চিরস্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

এইবার ক্লোরোফর্মের কথা ব'লব। ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হয় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। দেখা গেল, ক্লোরোফর্ম শুঁকলেও প্রথমে নেশা হয়, আর বেশি শুঁকলে মানুষ চেতনা হারায়। আমেরিকায় যেমন 'ইথার পার্টি'র প্রচলন ছিল, ইংল্যাণ্ডে তেমনি 'ক্লোরোফর্ম পার্টি'র খুব প্রচলন হ'ল।

জেম্‌স ইয়ং সিম্‌সন (১৮১১—১৮৭০) এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক এবং ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। তাঁর রোগিণীদের প্রসব-ব্যথা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি ইথার ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ইথার ব্যবহার ক'রে তিনি কতকগুলি অসুবিধা লক্ষ্য করতে লাগলেন। কাজেই ইথারের চেয়ে আরও ভালো কোনো ওষুধ পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করতে লাগলেন। লিভারপুলের একজন কেমিস্ট একদিন তাঁকে ক্লোরোফর্মের কথা বললেন। সিম্‌সন ভাবলেন, ক্লোরোফর্মের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিজেই পরীক্ষা ক'রে দেখবেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় সিম্‌সন তাঁর বাড়িতে খাবার টেবিলে বসলেন, সঙ্গে তাঁর দুই সহকর্মী ডাক্তার কিথ্‌ ও ম্যাথু ডান্‌কান। প্রথমে ডাঃ কিথ্‌ ক্লোরোফর্ম শুঁকলেন। বেশ মিষ্টি গন্ধ, ক্রমশঃ নেশা হ'তে লাগলো। তাই দেখে সিম্‌সন এবং ডান্‌কানও ক্লোরোফর্ম শুঁকতে লাগলেন। ক্রমে তাঁরাও মাতাল হ'য়ে উঠলেন। হাসিঠাট্টায় আনন্দে তাঁরা ক্রমশঃ উদ্দাম হ'য়ে উঠতে লাগলেন। তাঁদের চোখের সামনে টেবিল চেয়ার বাতি লোকজন সব-কিছু ঝাপসা হ'য়ে এল, ইতস্ততঃ দুলতে লাগলো। ধীরে ধীরে চারদিক আঁধার হ'য়ে গেল।

জ্ঞান হওয়ার পরে সিম্‌সন দেখলেন, তিনি মেঝেয় লম্বা হ'য়ে পড়ে আছেন। কিথ্‌ এবং ডান্‌কানেরও একই অবস্থা। সিম্‌সন বুঝলেন, আর একটি উৎকৃষ্ট চেতনাহারী ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সিম্‌সন তাঁর প্র্যাক্‌টিসে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। মাত্র ১১ দিনের মধ্যেই ৫০টি রোগীকে ক্লোরোফর্ম শোঁকালেন। কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটলোনা। এর ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। মহারানী ভিক্টোরিয়া তখন সিম্‌সন-এর চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সপ্তম সন্তান প্রিন্স লিওপোল্ড-এর জন্মের সময়, সিম্‌সন ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করলেন। এর ফলে ক্লোরোফর্ম সম্পর্কে সকলের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকরা, অর্থাৎ পাদরীরা, এটা ভালো চোখে দেখলেন না। তাঁরা বললেন, বাইবেলে আছে যে—"In sorrow thou shalt bring forth children." কাজেই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ ক'রে প্রসব-ব্যথা দূর করা ধর্মবিরুদ্ধ। এই কথা শুনে সিম্‌সন-ও প্রত্যুত্তর করলেন, ঈশ্বর আদমের পাঁজরার হাড় থেকে ঈভকে তৈরি করেন। এ সম্পর্কে বাইবেলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে—"The Lord caused a deep sleep to fall upon Adam." অতএব ঈশ্বর নিজেই চেতনা হরণ ক'রে নিয়ে তারপর প্রথম অপারেশন করেছিলেন। এর জবাবে পাদরীরা আর কিছুই বলতে পারলেন না। অপারেশনে ক্লোরোফর্মের ব্যবহার চালু হ'য়ে গেল।

এর পর থেকে নানা দেশে নূতন নূতন চেতনাহারী ওষুধ সম্পর্কে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগলো। এর ফলে ক্রমে আরও অনেক ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেল। যেমন, ১৮৬৩ সালে কোল্‌টন 'হাসির গ্যাস'-এর ব্যবহার পুনরায় প্রবর্তন করলেন। ১৯৩০ সালে লিক্ সর্বপ্রথম ডাইভিনাইল ইথার ব্যবহার করলেন, আর সেইবছরই হেণ্ডারসন ও লুক্‌হার্ড ব্যবহার করলেন সাইক্লোপ্রোপেন।

এবারে বিভিন্ন চেতনাহারী ওষুধের কার্যকারিতা সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার। সার্জনের দৃষ্টিতে, কোনো রোগীকে চেতনাহারী ওষুধ শোঁকালে, পর পর চারটি অবস্থা দেখা দেয়। দ্বিতীয় অবস্থায় এসে রোগী চেতনা হারায়, তার ব্যথা-বেদনার অনুভূতি লোপ পায়। তৃতীয় অবস্থায় সুষুম্নাকাণ্ডের (spinal cord) ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এজন্য উত্তেজনার অনুভূতি এবং তাতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা লোপ পায়, আর পেশী শিথিল হ'য়ে যায়। অপারেশনের

পক্ষে এইটাই হ'ল সবচেয়ে উপযুক্ত অবস্থা। চতুর্থ অবস্থায় ওষুধটি সুষুম্নাশীর্ষ এবং মস্তিষ্ক অবশ ক'রে দেয়, এর ফলে শ্বাস-বন্ধ হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আর সেরূপ হ'লে মৃত্যু অনিবার্য। এজন্য রোগীর চতুর্থ অবস্থায় পৌঁছানো কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

আদর্শ ওষুধ হ'তে হ'লে, তার কোনো দুর্গন্ধ থাকবে না, আর তা তাড়াতাড়ি এবং সহজেই রোগীকে আবিষ্ট করবে, রোগীর দেহে কোনোরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করবে না। অপারেশনের পরে রোগী তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে পাবে, অথবা কোনোরূপ কষ্ট পাবে না। তা ছাড়া এর বিষক্রিয়া হবে খুব কম এবং দেহের মধ্যে এর কোনো পরিবর্তন হবে না। আর ওষুধটি অপরিবর্তিত অবস্থায় সহজেই দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হবে, দেহের মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে থাকবে না। সবার উপরে ওষুধটি হবে এরূপ শক্তিশালী, যাতে প্রচুর অক্সিজেন সহযোগে এই ওষুধটি প্রয়োগ ক'রেও রোগীর চেতনা হরণ করা যায়।

আমাদের জানা গ্যাসগুলির মধ্যে 'হাসির গ্যাস'কে একটি আদর্শ ওষুধ বলা যায়; কিন্তু এর শক্তি খুব কম। কাজেই ইহা চেতনাহারী ওষুধ হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারেনি।

হাসির গ্যাস, ইথার এবং সাইক্লোপ্রোপেনের বেলায় রোগী দৈবাৎ চতুর্থ অবস্থায় উপনীত হ'লে, প্রথমে শ্বাসক্রিয়া এবং পরে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়। কাজেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটলেও, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া চালিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীকে বাঁচানো যায়। কিন্তু ক্লোরোফর্মের বেলায় প্রথমেই রক্ত-চলাচল এবং পরে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়। কাজেই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করার পরে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটলে, রোগীকে বাঁচাবার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। তা ছাড়া ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করলে, যকৃৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবারও সম্ভাবনা থাকে। এজন্য এখন সার্জারিতে ক্লোরোফর্ম বর্জন করা হ'য়েছে।

ইথারের চেয়ে ভাইভিনাইল ইথার উৎকৃষ্টতর ওষুধ ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়েছে। তা ছাড়া যেখানে ইথার ব্যবহারে শতকরা ৫৭টি ক্ষেত্রে বমির উপসর্গ দেখা দেয়, সেখানে এই ওষুধ ব্যবহার করলে শতকরা মাত্র দুটি ক্ষেত্রে এরূপ উপসর্গ দেখা দেয়।

সার্জনের দৃষ্টিতে সাইক্লোপ্রোপেন হ'ল একটি আদর্শ ওষুধ। এর শক্তি খুব বেশি, অথচ এর বিষক্রিয়া খুব কম। ইহা ফুসফুস দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি অবশোষিত এবং পরিত্যক্ত হয়। আগে অ্যাট্রোপিন বা স্কোপোল্যামিন প্রয়োগ ক'রে, তারপর সাইক্লোপ্রোপেন প্রয়োগ করলে প্রায় অর্ধেক ওষুধেই কাজ হয়। আর আগে অ্যাভার্টিন (Avertin) প্রয়োগ ক'রে, তারপর সাইক্লোপ্রোপেন প্রয়োগ করলে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে বারবিট্যাল ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে, তারপর ইথার এবং নাইট্রাস অক্সাইড মিশ্রণ প্রয়োগ করা হয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেথিডিন ব্যবহার করা হয়।

চেতনা হরণ করার উদ্দেশ্যে আজকাল আর কেউই ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করেন না। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ এখনও মনে করে যে, অপারেশন করতে হ'লেই রোগীকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান ক'রে নেওয়া হয়। তাই তারা বলে, রোগীকে ক্লোরোফর্ম করা হ'য়েছে। এতেই বোঝা যাবে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ আজও কত অজ্ঞ।

আশ্চর্য আরব

দামাস্কাসের 'সুলতান সেলিম মসজিদ'

কুমারেশ ঘোষ

হাতঘড়িতে দেখলাম, তিনটে। আর নয়, এবার ফেরা যাক, গ্যারাজ অ্যান্টিলাকে। হাতড়ে-হাতড়ে পৌঁছনো গেল যথাস্থানে। হাম্মাদের দেখা নেই। হয়তো খাওয়া-দাওয়ার পর একঘুম দিচ্ছে। গ্যারেজে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম গাড়িখানা ঘরের ছাওয়ায় বিশ্রাম-মগ্ন। যাক্, হাওয়া-গাড়ি হাওয়া হয়নি। নিশ্চিন্ত।

গ্যারেজের সামনের ফুটপাথে দু'খানা চেয়ার পাতা। তারই একটাতে বসলাম। নিজে ঘুরে ঘুরে দেখার চাইতে যারা ঘুরচে রাস্তায় তাদেরই দেখি ব'সে ব'সে। যারা মিছিলে থাকে তারা আর কতটুকু দেখে? যারা বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে, তারাই দেখে সবটা।

কাছেই একটা ঠেলা-বাক্স-গাড়িতে একগাদা খোসা-সমেত পেস্তা বিক্রি করছিল একটা আরব; খানিকটা কেনা গেল। দাঁতে চেপে খোসা ভেঙে মুখে ভরচি আর পা নাচাচ্ছি হাল্কা মনে। পায়ের কাছে ফুটপাথে পেস্তার খোসার ছড়াছড়ি। দেখলাম, তবে লজ্জা পেলাম না। এইতো মাত্র ক'দিন আগে দেশ ছেড়েচি; এরই মধ্যে দেশোয়ালি অভ্যেস ছাড়তে হবে? তা ছাড়া আছি তো প্রাচ্য-গণ্ডির মধ্যেই। তার বহু নোংরা-প্রমাণ এই গলিটাতেই ছড়ানো।

দুই থলেতে মাল নিয়ে চলেচে খচ্চর। সেই সঙ্গে আরব পুরুষ, আরব রমণী। ছোট ছেলেরা খেলা করচে, ছুটোছুটি করচে রাস্তায়। আরব হকার হাঁক দিচ্ছে খদ্দেরের আশায়। মোটরের প্যাঁক-প্যাঁক পিঁ-পিঁ আওয়াজ আর সেই সঙ্গে উটের গলায় বাঁধা ঘণ্টার শব্দ টুং-টুং টুং-টুং। আশ্চর্য, সরু গলিটায় মানুষের যেমন চলাচল, উটও তেমনি অচল নয়।

পা নাচাতে-নাচাতে পেস্তা চিবোচ্ছিলাম আর পথের মিছিল দেখছিলাম, হঠাৎ দেখি আমার পাশে দাঁড়িয়ে এক আরব-সুন্দরী। কালো পোশাক। মাথায় কালো ওড়না। আর একটা কালো কাপড়ে নাকের ডগা থেকে মুখ-গলা সব ঢাকা। চোখে পড়লো তার কালো-হরিণ-চোখ আর ছোট্ট গোলাপী কপাল। হায়রে কপাল, মুখচন্দ্র ঢাকা প্রায় কালো-রাহুর গ্রাসে। তড়াং ক'রে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।—লেডি।

তারপর?…

তারপর আরব-সুন্দরী আমাকে তার সঙ্গে যেতে ইসারা করলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পেছন-পেছন চললাম। সে আমাকে এক বিরাট বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। দেখি, একটা ঘরে তাজা গোলাপের মতো কয়েকজন অর্ধনগ্ন সুন্দরী শুয়ে আছে। তারা ছুটে এসে আমাকে ঘিরে ধরলো। আমার মুখের কাছে ধরলো সরাবের পাত্রখানি। আমি সরাব খেয়ে সরবে হৈ-হল্লোড় শুরু করলাম সুন্দরীদের সঙ্গে!…

কেমন? জমচে গল্প? আরব্যোপন্যাসের গল্প। কিন্তু এটি নিছক স্বপ্ন-কাহিনী। কল্পনায় এখানে হাত-পা বাঁধা। কাজেই ঘটলে যেটি জমতো ভালো, ঘটলো না এই পোড়া ভালে।

তবে আরব-সুন্দরী ঐ বেশে এসেছিল ঠিকই এবং কি যেন বললো, বুঝতে পারলাম না। আবার বললো, এবং মেহেদী-মাখা আঙুলে বার করলো একখানা কাগজ। আরবী-লেখা।

হাত নেড়ে, ঠোঁট-উল্টে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে হ'লো। হঠাৎ খেয়াল হ'লো। কাগজখানা নিয়ে দিলাম গ্যারেজের এক আরবকে। তাকে ডাকলাম বাইরে। সে সব বুঝিয়ে দিল আরব-সুন্দরীকে।

কোনো ঠিকানা জানতে এসেছিল সুন্দরী; কোনো ঠিকানায় নিয়ে যেতে আসেনি।

খোওয়রি। আবার সভায় পেস্তার শক্ত খোসা ভাঙতে শুরু করলাম দাঁতে!

হাম্বাদ এলো। দিব্যি চকচকে হয়েছে চেহারাটা। তিলে চুলে তেড়িয় বহরটা দেখবার মতো। বেশ ছেলে-ছুলে এলো। ভরা পেট।

হাম্বাদের সঙ্গে একজন আরব। বন্ধু হয়তো। শান্তসৌম্য চেহারা। বছর চল্লিশ বয়স হবে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল হাম্বাদ। দামাস্কেই এক স্কুলে মাস্টারি করে।

হাম্বাদ তাকে কী সব বললো। বুঝলাম, আমার বিষয়েই। পরে আমাকে বললো: ঘুরে দেখলে সব?

বললাম: দেখলাম যতটা পারলাম।

কেমন দেখলে?

গুড্।

হাম্বাদের সঙ্গী আরবটি হঠাৎ জিগ্যেস করলো: দামাস গুড্?

ইয়েস।

খুব খুশি। ঠিক করলাম আরব মাস্টারটির সঙ্গে একটু আলাপ জমাতে হবে। সময় কাটাতে হবে তো? কিন্তু খবরও পাওয়া যাবে।

জিগ্যেস করলাম: ইউ নো ইংলিশ?

ভেরি লিটল। হাসলো আরব।

বললাম: দামাস্কাস দেখলাম, কিন্তু আরবদের বিষয়ে জানা গেল না।

আরবটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে হাসলো। বললো: কফি খাবে?

বললাম: না, বড্ড গরম।

সরবত?

তা খেতে পারি।

তবে এসো, ঐ কাফেতে গিয়ে বসি।

হাম্বাদকে কী যেন ব'লে, আমাকে নিয়ে সামনের কফিখানায় ঢুকলো। নিজের জন্যে কফি আর আমার জন্যে এক পেয়ালা সরবতী লেবুর রসের অর্ডার দিয়ে একটা টেবিলের পাশে বসালো আমাকে, নিজেও বসলো। বললো, আমাদের বিষয়ে কী শুনতে চাও বলো?

বললাম, তার আগে জিগ্যেস করি তুমি ইংরেজি জানলে কেমন ক'রে? এখানে তো দেখি, শিক্ষিত যারা, তারা ফ্রেঞ্চ বলতে পারে, ইংরেজি নয়।

আবার হাসলো আরব। বললো, কৈ আর বলতে পারি? এক ইংরেজের কাছে এখানে কাজ করেছিলাম কয়েকবছর, তার কাছ থেকেই শিখেছিলাম, আর তাকে শিখিয়েছিলাম আরবী ভাষা।

কফিখানায় আরো কয়েকজন আরব গল্প করছে। উনুনের গনগনে আগুনে কফি সেদ্ধ হচ্ছে ক্রমাগত। দোকানী একটা ছোট কাপে এক কাপ কালো কড়া কফি এবং এক গেলাস লেবুর রস দিয়ে গেল আমাদের অয়েলক্লথ-পাতা টেবিলটায়।

গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলাম: তোমাদের আরবী ভাষা কিন্তু বহুদিনের।

বললো আরব: বহুদিনের তো বটেই, বহুজনেরও। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক এই ভাষায় কথা বলে। এককালে এই ভাষাতেই শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রচার হ'য়েছিল সভ্যজগতে। ইউরোপে এখনো তার জের দেখতে পাবে বহু জায়গায়। এই আরবদেশের উপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা গেছে, কিন্তু আরবী ভাষাকে কেউ নষ্ট করতে পারেনি, এবং আরবরা আরব-ই আছে আজো!

আরব কড়া কফির খানিকটা শুষে নিল কাপ থেকে। বললাম, বেদুইনদের বিষয়ে জানতে চাই। বলবে?

বললো: ওরাও আরব, খাঁটি আরব। মরুভূমিতে বা করতে ভালবাসে। যেখানে একটু ঘাস দেখে সেখানে বসা বাঁধে। ওরা উটের আর ছাগলের লোমের তৈরি তাঁবুতে বাস করে, আর করে ভেড়া-ছাগল-উটের ব্যবসা।

বললাম: তবে যে শুনেছি ওরা লুঠ-পাট করে বেড়ায়

তাও করে, বললো আরবটি: একলা কাউকে বাগে পেলে ছাড়ে না, তবে সবাই কিন্তু ওরকম নয়। ব্যবসা ক বা কোনো হাতের কাজ শেখা ওদের কুষ্ঠিতে লেখা নেই আর দুঃখ-কষ্টও সইতে পারে খুব। ওদের কাছে ক পাওয়া ভাগ্যোয়, খাওয়া বিলাসিতা। খেজুর খেয়েই দি কাটে বেশি। আমাদের দেশের সবুজ জায়গাগুলো হা করবার জন্যে রাজায় রাজায়-বহু যুদ্ধ হয়েছে; কি মরুভূমির বালির জন্যে মাথা ঘামায়নি কেউ। সেখানকা রাজা ঐ বেদুইনরাই। উট, খেজুর, বালি, বেদুইন—এ চার নিয়ে অদ্ভুত এক রাজ্য এই আরবদেশে। এদে আচারবিচার সভ্যতা আরবদের থেকে আলাদা। ব স্বার্থের জন্যে যেটুকু করা দরকার, বেদুইনরা সেইটুকুই ক তার বেশী নয়। বাইরের আইন-কানুন মেনে চলা ওদে ধাতে নেই, ধর্মেরও ধার ধারে না বড়। কোরা

লেখাই আছে, মরুবাসী আরবরা অবিশ্বাসী। কথাটা মিথ্যে নয়।

জিগ্যেস করলাম, শুধু খেজুর খেয়ে একটা জাত বাঁচতে পারে?

বললো: খেজুরটাই প্রধান, তবে দুধ আর উটের মাংসও ব্যবহার করে মুখ বদলাবার জন্যে। ঐ খেজুরের রস পচিয়ে মদ, আঁটি গুঁড়িয়ে উটের খাবার হয়। জল আর খেজুর, বেদুইনদের বড় আদরের জিনিস। এদের খাওয়ায় যেমন বাবুয়ানি নেই, পোশাকেও তাই। লম্বা আলখাল্লা পরনে, মাথায় ওড়না, তাতে দড়ির বেড়ি, পা-জামা ব্যবহার করে না; জুতোও নয়।

আরবটি বলে চললো: বেদুইনদের সম্পত্তি বলতে দুটি, ঘোড়া আর উট। উট না থাকলে ওদের পক্ষে মরুতে বাস করাই অসম্ভব হ'তো। মাল টানার কাজে এবং ব্যবসায় লেনদেন ব্যাপারেও ঐ উট, বিয়েতেও কন্যা-সম্প্রদান করবার সময় বরপণ হিসাবে ঐ উট-ই, জুয়াখেলায় বাজি রাখবে বেদুইন—উট। এককথায় উট-অন্ত-প্রাণ বেদুইনের। জলের অভাব, তাই জল বাঁচিয়ে রাখে ঘোড়া-গরুর জন্যে, নিজে তেষ্টা মেটায় উটের দুধে; খানাপিনায় চলে উটের মাংসের কাবাব। শীতে উটের চামড়া গায়ে দেয়। তাঁবু তৈরি উটের লোমে। উটের গোবরে (গোবরে নয়, উট-বরে) ঘুঁটে ক'রে জ্বালানি হয়, চোনা থেকে হয় মাথায় চুলের টনিক এবং অন্যান্য দাওয়াই। আবার ঘুটি রাখলে নাকি পোকা বসতে পারে না গায়ে।

বললাম, উটের যে অত গুণ জানতাম না তো। শুধু জানতাম মরুতে আরবদের মাল বইবার একমাত্র উপায়, মরুজাহাজ।

হেসে বললে আরব: তার চাইতেও বেশি, উট আল্লার দয়া দান। তারপর যা বললো আরবটি, আশ্চর্য হ'তে হ'লো রীতিমতো। বললো: দারুণ জলকষ্টে পড়লে বেদুইনরা উটের গলার মধ্যে নলি চালিয়ে দিয়ে তার পেটের মধ্যে থেকে বার ক'রে নেয় জল। দু'একদিন আগে যে জল পান করেছে উট, তা ঐভাবে উটকে বমি করিয়ে বার ক'রে নিলে তা সুপেয় না হোক, পেয় অবস্থাতেই থাকে।

হে বাংলার নদী, সব যায় যদি ক্ষতি নেই, তোমরা যেন শুকিয়ো না! তোমরা আছো, তাই আমাদের যত কিছু রস-কষ। তোমরা গেলে আমরাও গেলাম।

বেদুইনদের মধ্যে পয়সাওলা যারা, তারাই পারে ঘোড়া পুষতে।— আরব বলতে লাগলো: আরবী ঘোড়ার মান সারা পৃথিবীতে। ঝোড়ো হাওয়ার মতো ছুটতে পারে। আর তাদের যেমন বুদ্ধি, তেমনি চেহারায় জৌলুষ। প্রভুভক্তিও দেখবার মতো। জলের জন্যে, বেদুইনের তাঁবুতে তার ছেলে যদি চেঁচায় আর বাইরে বাঁধা তার ঘোড়া যদি চিঁ-হিঁ-হিঁ করে, কার কাছে জলের কুঁজো নিয়ে যাবে সে, জানো? ঐ ঘোড়ার মুখের কাছে।

সব শুনে যেন গলা শুকিয়ে যাবার যোগাড়। লেবুর রসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে গলাটা রসিয়ে নিলাম। আরবও কফির কাপে চুমুক দিল। বললো, ঐ জলের জন্যে বেদুইনরা নিজেদের দলের মধ্যে খুনোখুনি করতেও পেছপা নয়, এমন ভয়ংকর। মরুতে জল দুষ্প্রাপ্য হ'তে পারে। রক্ত নয়। ওদের গানেই আছে: হাতে পেলেই শত্রু মারি, নইলে প্রতিবেশীর দাড়ি; নইলে সোজা ঢুকিয়ে দিই ভাইয়ের বুকে তরবারি!

অথচ অতিথি-সৎকারে বেদুইন অন্য মানুষ। একবার যদি কাউকে আশ্রয় দেয়, তার জন্যে প্রাণ দিতেও ভয় পায় না। বেইমানি করা বেদুইনরা জানে না। ভারী ইমানদার। এরা দলপতিকে বলে 'শেখ'। কিন্তু 'শেখ' বললেই মুষড়ে পড়ে না। শেখের চাইতে মান তাদের কম নয়, এ জ্ঞানটি টনটনে থাকে মনে এবং শেখও কোনো আদেশ জারি করবার আগে দলের মাথাওলা লোকদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তবে করে।

বললাম, অনেকটা প্রজাতন্ত্রের মতো ব্যাপার।

অনেকটা তাই-ই, বললো আরব: ঘরের ব্যবস্থাও তাই, যা-ইচ্ছে করা চলে না। সংসারের কর্তা বিয়ে করতে পারে একাধিকটি, কিন্তু বৌয়ের গায়ে হাত তোলা চলবে না। তুলেছো কি, বেদুইন-বৌ চললো অন্য কোনো বেদুইনের তাঁবুতে তার ইচ্ছেমতো। এক-একটি বীরাঙ্গনা। অবশ্য শহরের মেয়েদের মধ্যেও আরবী-ঘোড়ার তেজ অনেক দেখা যায়। অনেকে লড়াইও করেছে, আবার কবিতাও লিখেছে বহু আরব-মেয়ে। নাচ গান বাজনা বক্তৃতাতেও আরব মেয়ে কম যায় না।

বললাম: দামাস্কাসে মেয়েদের মুখ দেখতে পাওয়া কিন্তু ভাগ্যের কথা। অথচ বেরুটে মেয়েদের দেখে যা বুঝলাম, আরব মেয়েরা অপূর্ব সুন্দরী, আমাদের প্রাচ্য-চোখে চমৎকার।

আরব বললো: ঠিকই বলচো। বেরুটের মেয়েরা একেবারে মেমসাহেব, তাই ওদের সৌন্দর্য তুমি সবটাই দেখতে পেয়েছো। কিন্তু এখানে মেয়েদের কাজল-কালো

চোখ দেখে বোঝা শক্ত নয়, এদের মধ্যের হুরীর মতো চেহারাটা অনেকেরই। তারপর হেসে বললো, এবার মাথায় ভেল্, গাউন-পরা শুধু শ্রীচরণই দেখে গেলে, এর পরের বার এসো, দেখবে ঘোমটা-খোলা মুখচন্দ্র। আমাদের কবিরা তো এদের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হেসে বললাম, সে তো চীনে কবিরাও চীনে মেয়েদের রূপে পঞ্চমুখ। তোমাদের রূপবর্ণনাটি কিরূপ জানতে পারলে, বলতে পারি, হাঁ স্বরূপা বটে।

আরব বললো: শোনো তবে, আমাদের মতে সুন্দরী মেয়ের দেহটি হবে বাঁশের মতো, মুখখানি চাঁদের মতো, চুলগুলি রাতের আঁধারের মতো, গাল-দুটি গোলাপী—তাতে একটা কালো ছোট্ট ফোটা—বিউটি-স্পট, চোখ-দুটি হওয়া চাই বন্যহরিণীর চোখের মতো—মৃগনয়না, আর চোখের পাতা হবে ঘুমে ভেঙে আসার মতো, দাঁতগুলি হবে যেন মুক্ত,—আর বুক? যেন ডালিম দুটি! তা ছাড়া নিতম্বিনী হওয়া চাই, আর তার আঙুলগুলির ডগা হবে ছুঁচলো, নখে হিনার রং লাগানো।

বললাম, এ তো বাপু, আমাদের গল্পই করলে!

বললো আরব: তোমরা আমরা আলাদা নাকি? তাদের আদান প্রদান তোমাদের সঙ্গে ছিল না বলতে চাও?

বললাম, ছিল বৈকি। এবং আজো তোমাদের 'আরব্য-রজনী' আমাদের দেশে ছেলে-বুড়োর কাছে আদরের জিনিস।

শুনে ভারি খুশি আরব। বললো: হ্যা, ঐ বইখানি যদি ভালো ক'রে পড়ো, আগেকার আরবদের বিষয়ে বহু জানতে পারবে। পাশ্চাত্য দেশ ঐ একটি মস্ত উপকার করেছে। প্রায় ৫০০ বছর হ'লো আমাদের ঐ বইখানাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ওটির আরবী নাম 'আলফ্-লেলাওয়া-লেলা'। অল্-জাশিয়ারি প্রায় হাজার বছর আগে ঐ বইখানির প্রথম গোড়াপত্তন করেন; একটা পারস্যোপাখ্যান থেকে। তারপর ক্রমে আরো গল্প ওতে যোগ করা হয়। গ্রীক, হিব্রু, মিশরের গল্পও ওতে আছে; তোমাদের ভারতের গল্পও বাদ যায়নি। তবে হারুন-অল্-রসিদের সময়ের মজার এবং প্রেমের কাহিনীগুলো যেমন মধুমাখা, তেমনি মনোহর। কিন্তু আশ্চর্য হবে শুনে, এদেশে ও-বইয়ের তত কদর নেই, যতটা আছে বাইরে।

বললাম, তাই হয়; গেঁয়ো যোগী ভিখ পায়না। কিন্তু বইখানা পড়লে মনে হয়, সেকালের মেয়েদের কোনো দামই ছিল না।

আরব অস্বীকার করলো না। বললো: আরবে শিল্প-কলা, সাহিত্যের উন্নতি দেখা গেছলো বটে, কিন্তু অবনতি হয়েছিল নৈতিক চরিত্রের। পরে ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর ও জিনিসটা বাধা পায়। সেই থেকে মেয়েরা ঘর পায়, বর পায়, সংসার পায়। সেই থেকে মেয়েদের কাজ হ'লো স্বামীর মনোরঞ্জন করা, ছেলে মানুষ করা, সংসার করা। অবসর পেলে সুতো কাটা আর কাপড় বোনা। আর পুরুষদের উপর নির্দেশ হ'লো—ভদ্র ব্যবহার করবে, কুসঙ্গ ছাড়বে, বাজে-কথা বলবে না, ছেঁড়া বা ময়লা পোশাক পরবে না, গোগ্রাসে গিলবে না, অট্টহাসি হাসবে না, মদ্যপান চলবে না। কিন্তু সেসব আর ক'জন লোক মানতে পারে বলো? সাধারণ লোক তবু মেনে চলতো, কিন্তু খলিফ-উজিরের ঘরে ওসব বাধা বাসা বাঁধতে পারেনি। সেখানে নাচ গান আর মদের বন্যা যথারীতি বইতো; পুরুষরা দাড়িতে কলপ লাগিয়ে বাঈজীর নাচের তালে তালে মাথা নাড়তো! দাস-দাসীরও অভাব ছিল না। কালো নিগ্রো থেকে সাদা গ্রীক, স্লাভ, আর্মেনিয়ান বহু দাস-দাসী আসতো চালান হ'য়ে, বিক্রি হ'তো বড়ঘরে।

বড়ঘরের বড় বড় ব্যাপার, আর সব দেশেরই মতো, নোংরামিতে ভর্তি। খোজার আমদানিও ছিল আরবে; তাদের কাজ হ'তো হুজুরদের হারেমে পাহারা দেবার। আশ্চর্য, বহু-নারী-সংসর্গেও পুরুষ সন্তুষ্ট হয়নি সেকালে। তাই দেখা দিয়েছিল একশ্রেণীর বালক, গিলম্যান বলা হ'তো তাদের। সেজেগুজে, সেন্ট-পাউডার মেখে হুজুরের অস্বাভাবিক কামতৃষ্ণা মেটাবার ভার ছিল তাদের। আর অর্থলোভী কবিরা তাদের নিয়ে লিখতো প্রেমের কবিতা এবং তা শুনিয়ে হুজুরের কাছ থেকে আদায় করতো মোটা টাকার বকশিশ।

আরব বলতে লাগলো: একদিকে যেমন নোংরামি, অন্যদিকে সাধারণ ঘরে তেমনি দেখা গেছলো জ্ঞানী-গুণীর আবির্ভাব। হাকিমী ওষুধের যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছিল; হ'য়েছিল অঙ্কশাস্ত্রের, দর্শনের। তোমাদের ভারতের 'সিদ্ধান্ত'র মতে জ্যোতিষচর্চা হ'তো সেসময়ে বাগদাদে, পরে ছড়িয়ে পড়লো সারা আরবে। রসায়নশাস্ত্রেও দেখা গেল আরবদের দান। গ্রীসের টলেমির ভূগোল আরবীতে অনুবাদ করা হ'লো; ইতিহাসের দিকে নজর গেল আরবদের। তা ছাড়া শিল্পকলায় আরব শিক্ষা পেল পারস্য, মিশর, গ্রীসের কাছে। ইউরোপের লোকের লুফে নিল সিরিয়ার সিল্ক।

গান, বাজনা, কবিতার চর্চা হ'তো রীতিমতো। বাজনার মধ্যে কিটার (গীটার) ও উরমুন (অর্গান-জাতীয়) বাদ্যযন্ত্রের রেওয়াজ ছিল খুব।

এসবই প্রায় দেখা গেছলো হারুন-অল-রশিদের কালে এবং আব্বাসিদ রাজাদের আমলে। হারুনের সময়ে মুখারিক নামে এক মস্তবড় গায়ক ছিল। লোকটি ছিল ক্রীতদাস। বাপের মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সুর ক'রে ক'রে লোক ডাকতো মাংস কেনবার জন্যে। একদিন দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল এক বাঈজী। তার গলার স্বর আর সুর শুনে এমনি ভালো লাগলো তার যে, ছেলেটির বাপের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে কিনে নিল তাকে। শেখাতে লাগলো তাকে গান-বাজনা। পরে তার গানের খবর গেল গুণী হারুন-অল-রশিদের কানে। মুখারিককে ডাকিয়ে এনে তার গান শুনে তিনিও হ'লেন মুগ্ধ। বাঈজীর কাছ থেকে কিনে নিলেন গায়ককে। গুণীর আদর জানতেন খলিফ। তাই মুখারিককে এক লক্ষ দিনার দিয়ে মুক্ত করে দেন; সম্মান দেন তাকে তাঁর পাশে বসবার আসন দিয়ে। শোনা যায়, সন্ধ্যায় টাইগ্রীসের ধারে ব'সে যখন মুখারিক গান গাইতো আপনমনে, অমনি বাগদাদের পথে চারিদিকে জ্বলে উঠতো মশালের আলো। কারণ, অন্ধকার পথে মশাল হাতে সবাই বেরিয়ে আসতো ঘর থেকে, এসে বসতো তার চারপাশে—নদীর ধারে, গান শোনবার আশায়।

আরব হঠাৎ থামলো। থামতেই চমক ভাঙলো আমার। দামাস্কাসের এক কফিখানায় ব'সে কখন যে চলে' গেছি আরব্যরজনীর দেশে, সেকালের আরবে, নিজেই বুঝতে পারিনি। বললাম, সত্যিই তুমি অনেক খবর রাখো দেখছি। তোমাকে পাওয়া সৌভাগ্যের।

হাসলো আরব। বললো: তার চাইতে সৌভাগ্য আমার, তোমাকে পেয়েছি আমি, একজন হিন্দিকে। হিন্দিকে আমরা যে কী শ্রদ্ধার চোখে দেখি তা তোমরাও জানো না বোধকরি। এখন যেসব দেশের গলাবাজি শুনচো, তারা তো এই সেদিনের। তাই শৈশবের চাপল্য আর চীৎকার; বার্ধক্যের জ্ঞান বা গাম্ভীর্যের অভাব। সেদিন গেছে বটে—যখন তোমাদের দেশ, আমাদের দেশ, পারস্য, মিসর, চীন জ্বালাতো জ্ঞানের প্রদীপ—আর তাই দেখে চারিদিক থেকে জড়ো হ'তো নতশির জ্ঞানার্থীরা। বিশ্বাস করো, এই আরব-সভ্যতার মধ্যযুগে একদা পাশ্চাত্যের পশ্চিম আকাশকে আলো দিয়েছিল শিল্প-কলা-সঙ্গীত-সাহিত্যের মাধ্যমে। সে-আলোর পরম পরশ প্রথম পেয়েছিল স্পেন। এ আমার গল্প নয়, ইতিহাসের কথা।

কী রকম? কৌতূহল হ'লো।

শোনো তবে বলি, আরব শুরু করলো: প্রায় বারোশো বছর আগে এই দামাস্কাসে উমায়েদ রাজবংশের শেষ হ'লো। দেখা দিল আব্বাসিদ রাজবংশ। শত্রুর রক্তে সিংহাসনটা ধুয়ে না নিলে বোধহয় বিজেতা রাজার জাত যায়, তাই বিজেতা আব্বাসিদ রাজা, উমায়েদ বংশের যাকে পেলো সামনে, খুঁচিয়ে শেষ করলো।

কিন্তু ঐ বংশের একজন ছোকরা, নিশ্চয়ই তার আয়ু তখনো শেষ হয়নি, পালিয়ে বাঁচলো। নাম তার আবদাল রহমান। লম্বাটে, পাতলা ছিপ্‌ছিপে, ধারালো ঠোঁট, জ্বলন্ত চোখ, মাথায় একঝাঁকড়া চুল। দেহে শক্তি, মনে সাহস সম্বল ক'রে তার ছোটভাইকে নিয়ে আবার গিয়ে আশ্রয় নিল আব্বাসিদ রাজার [illegible] নাগালের বাইরে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে এক বেদুইন-তাঁবুতে। কিন্তু রাজরোষ যে কোন্ পথে কোথায় যায়, তা বোঝা দায়।

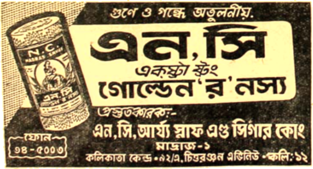

গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়.
এন, সি
একস্ট্রা স্টং
গোল্ডেন 'র' নস্য
প্রস্তুতকারক:-
এন.সি. আর্য্য স্নাফ এণ্ড সিগার কোং
মাদ্রাজ-১
কলিকাতা কেন্দ্র • ৯২/এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ • কলি: ১২
ফোন—
৩৪-৫০০৩

দেখা গেল, আব্বাসিদ রাজার ঘোড়সওয়ার সৈনিকরা এগিয়ে আসচে ঐ তাঁবুর দিকেই। আর দেরি নয়, আব্দাল তার ভাইকে নিয়ে ঝাঁপ দিল এফ্রাইটিসের স্রোতে। ঘোড়সওয়াররা নদীর ধারে এসে থমকে দাঁড়ালো, চেঁচিয়ে অভয় দিলো তাদের—ফিরে এসো, ভয় নেই, কোনো ক্ষতি করবো না তোমাদের। ছোটভাইটির বয়স কম, বুদ্ধিও কম, ভাবলে আশ্বাস দিচ্চে সত্যিই। কাজেই সাঁতরে আবার ফিরে এলো এপারে, এবং তীরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, সেই ভিজে কাপড়েই চলে যেতে হ'লো ভবসাগরের ওপারে।

আব্দাল নির্বিঘ্নে এফ্রাইটিসের ওপারে গিয়ে উঠলো। তারপর নির্বান্ধব ও নিঃসম্বল অবস্থায় হাঁটা সুরু করলো দক্ষিণ-পশ্চিম-মুখো প্যালেস্টাইনে। সেখানে কয়েকজন বন্ধু পাওয়া গেল। আফ্রিকা দিয়ে যাবার সময় সেখানকার শাসনকর্তাটির হাতে জান্ দিতে দিতে বেঁচে গেল কোনো-প্রকারে। শেষে বহু জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বছর পাঁচেক পরে এসে পৌঁছলো স্পেনের দক্ষিণে, এবং সেখানে সে নিজের পরিচয় দিয়ে জড়ো করতে লাগলো সৈন্যসামন্ত। ক্রমে স্পেনের দক্ষিণটা সব জয় করলে আব্দাল, পরে পুরো স্পেনটা। সেখানে স্থাপিত হ'লো উমায়েদ রাজবংশ।

স্পেনে দেহের শক্তির পরিচয় দেবার পর, দিলো তার উদার মনের পরিচয়। কর্ডোভা হ'লো তার রাজধানী। সেখানে নতুন নতুন অট্টালিকা তৈরি হ'লো। তৈরি হ'লো বহু মসজিদ, শহরে দেখা দিল নতুন জল-ব্যবস্থা। সিরিয়া থেকে খেজুরগাছ এনে পোঁতা হ'লো স্পেনে নগরীর পথে পথে। রাজপ্রাসাদটি ছিল দেখবার মতো। চারশো ঘর আর দাসী-বাঁদীতে ভরপুর। কৃষি ও ব্যবসা গড়ে উঠেছিল রীতিমতো। রাজার আয় ছিল বাৎসরিক বাটলক্ষ দিনার। এর তিন-ভাগের এক ভাগ যেত সৈন্য পুষতে, এক ভাগ যেত জনকল্যাণে এবং বাকী এক ভাগ রাজভাণ্ডারে হ'তো জমা।

আব্দাল রহমান মারা গেছলেন তিরাত্তর বছর বয়সে—কিন্তু আরব-সভ্যতার যে আলো তিনি স্পেনে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন, তার কিছু কিছু আভা আজো দেখা যায় সেখানে। প্রায় চল্লিশবছর আগে মাটি খুঁড়ে সেই বিরাট রাজপ্রাসাদের ভগ্নাংশও পাওয়া গেছে, যা আজো দেখবার জিনিস। সে-যুগে কার্ডোভায় ছিল দেড়লক্ষ বাড়ি, সাতশো মসজিদ, তিনশো স্নানাগার। আর শহরের পথগুলো ছিল পাথর দিয়ে বাঁধানো, রাস্তার মোড়ে মোড়ে জ্বলতো আলো। এর সাতশো বছর পরেও লণ্ডনের রাস্তায় তেমন আলো দেখা যায়নি, আর একশো বছর পরেও প্যারিসের রাস্তায় বৃষ্টি হ'লেই কাদা প্যাচ্ প্যাচ্ করতো। এসব ঠাণ্ডা-দেশের লোকের উপর স্পেনের আরবদের ধারণাও ছিল অদ্ভুত ; ওদের গায়ের রং সাদাটে, দেখতে লম্বা-চওড়া, চুল লম্বাটে, মেজাজ ঠাণ্ডা—কারণ ঠাণ্ডার দেশ কিনা।

স্পেনে খলিফ-রাজত্বের সময় তাঁতের আর চামড়ার ব্যবসার খুব উন্নতি হয়। পরে চামড়া-শিল্প এখান থেকে প্রচার হয় মরোক্কোয় এবং আরো পরে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে। সিল্ক মোসলেমরাই স্পেনে আনে প্রথমে। সোনা, রুপো, পিতল, লোহার কাজ এই দামাস্কাস থেকে চালান হ'তো স্পেনে। আঙুর, ডালিম, কমলালেবু, তুলোর চাষ করতে শেখে ইউরোপীয়রা আরবদের কাছ থেকে। তখনকার দিনে স্পেনের বন্দরে আমদানি হ'তো অলিভ-তেল, তুলো আর রপ্তানী হ'তো আরবে কাপড় আর ইউরোপের সাদাবরণ দাস-দাসী। আরব-সরকার স্পেনে চিঠিপত্রের জন্যে ডাকের ব্যবস্থাও করেছিলেন। টাকা হিসেবে ব্যবহার হ'তো সোনার দিনার আর রুপোর দির্হাম। এসব কথা স্পেনের এখন মনে আছে কিনা জানিনে, কিন্তু আরব আমরা, মনে আছে আমাদের। আর যখনই মনে হয়, বুকখানা ফুলে ওঠে গর্বে। পাশ্চাত্যে আরবের এই দান, আজকের আরবদের দেখে বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু বলেচি তো, এসব আমার গল্প নয়, ইতিহাসের কথা।

সব শুনে শেষে বললাম, তোমায় দেখা পেয়ে অনেক কথাই জানলাম, মনে থাকতে থাকতে লিখে রাখবো আমার খাতায়, জানাবো আমার দেশের লোককে, তোমার দেশের কথা।

শুনে আরবের চোখ-মুখ জলজল হ'য়ে উঠলো।

বললো : জানাবে তুমি আমাদের কথা ? জানিয়ো, জানিয়ো। আজ আরব নীরব। তার মাথায় হাত বুলিয়েচে ফরাসী, ইংরেজ। এখন তালে আছে আমেরিকান। ওরা ঘরে বোমা করচে, বাইরে ডলার ছড়াচ্চে। ডলারে, মানে অমরত্বে বশ হয় তো ভালোই, নইলে অস্ত্র তো আছেই। আমাদের প্রাচ্যের শান্তি যদি নষ্ট করে কেউ, তা করবে ঐ পাশ্চাত্য-শান্তি (?)-কামীরাই! প্রকৃত শান্তি আসে অর্থে নয়, আন্তরিকতায়।

●

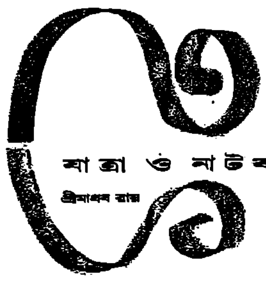

যাত্রা ও নাটক

শ্রীমাধব রায়

বর্তমান বাংলা-নাটকের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণার শেষ নেই। বিভিন্ন জন ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অনেকে বলেন, ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বর্তমান বাংলা-নাটকের সৃষ্টি হয়েছে; আবার কেউ কেউ বলেন, বর্তমান নাটকের স্বরূপ নাট্যসাহিত্যেরই ক্রমবিবর্তনের ফলে সম্ভব হয়েছে। একজনের অভিমত দিয়ে অন্যজনের মতামত ধামাচাপা দিলে কটূক্তির আর শেষ থাকবে না। তবে সমকালীন মানসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রভাব ও পরিচয়ের মাধ্যমে এর অতীত ইতিহাস এবং ক্রমবিবর্তনের ধারায় যুগের রুচি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাব-ভাষা আজ পর্যন্ত বহন করে এসেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মানুষ প্রকাশপিয়াসী। নাটক সেই প্রকাশের অন্যতম বাহন। এই নাটকের তিনটি পর্যায়—নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য। নৃত্ত অর্থাৎ তাললয়াশ্রিত অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র; নৃত্য অর্থাৎ হাবভাবযুক্ত বিবিধ মুদ্রা সহযোগে মূক অভিনয়করণ; পরিশেষে নাট্য অর্থাৎ নৃত্যগীতসহ বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়। এইসব ব্যবস্থায় ব্যক্তির সশরীরে অবস্থান ও প্রকাশকলায় নিয়োজিত থাকতে হয়। হয়তো বা মানুষের অনুকরণ-প্রবৃত্তি থেকে অভিনয়শিল্পের উৎপত্তি। এবং তার উপলক্ষ্য জাতীয় ধর্মোৎসব। কেউ কেউ মনে করেন, যাত্রা-নাটকের উৎপত্তি কথকতা বা পাঁচালী সাহিত্য থেকে। কিন্তু এ কথা মনে করবার কোনো কারণ নাই যে, কথকতা বা পাঁচালীই যাত্রার জনক। এর আঙ্গিকেরও এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নাই, যা কালক্রমে যাত্রার আঙ্গিকে বিবর্তিত হোতে পারে। কথকতার মধ্যে ভক্তিরসের স্ফুরণ ও প্রকাশ হয়তো যাত্রা-সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, কিন্তু তাই ব'লে নাটকীয় পরিস্থিতি বা গতিশীলতার কোনো প্রমাণ এখানে মেলে না। পাঁচালীর মধ্যে গদ্য-সংলাপাংশও কোথাও নাই। তা ছাড়া পাঁচালীর উৎপত্তি নিবদ্ধ-পদ কীর্তনের আদর্শে ও প্রভাবে, তার উপর গুরুত্ব না দিয়ে, স্বতন্ত্রভাবে যাত্রার উৎপত্তির অনুসন্ধান করাই শ্রেয়। উপরন্তু ঠাকুরদাস দাশরথি পাঁচালীর উদ্ভব যাত্রার অনেক পরে এবং এইসকল প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার সংলাপাংশের উল্লেখ কখনও করেননি। বরং বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে পাঁচালী-কথকতায় যে ধারা দেখা যায়, যাত্রার প্রভাব তার উপর পড়াও এমন কিছু বিচিত্র নয়। কেননা প্রাচীন যাত্রা-সাহিত্য এইসময়ে পতনের মুখে। যাত্রা তৎকালীন সমাজে লোকপ্রিয় শিল্প ছিল। জনসাধারণের মনে এর প্রভাব এতবেশী কার্যকরী ছিল যে, উনবিংশ শতাব্দীর কথকতা ও

পাঁচালী কিছু কিছু রীতি ও উপাদান গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি, এবং কীর্তন ও পালাগানের প্রকৃতির সঙ্গে যাত্রার একটা মিল পাওয়া যায়।

আমাদের জাতীয় ধর্মোৎসব উপলক্ষ্য করে যে নাটকাভিনয় হোত তার উদ্দেশ্যও ছিল দেবতার লীলা-মাহাত্ম্যের রূপায়ণ ও মূল্যায়ন। সেই প্রাচীনতম উৎস থেকে প্রথম নাটকের সৃষ্টি এবং পরবর্তীকালে এর কাহিনী, আঙ্গিক ও কলাকৌশলের উন্নতি ঘটানো হয়েছে সে-প্রমাণ বর্তমানের নাট্যসাহিত্য। সকল দেশেই এইরূপ ক্রমানুসারে উন্নতি ঘটে। কিন্তু বাংলা-নাটকে এর আগমন পালাগান বা কীর্তনের মাধ্যমে। এইসব পালাগানের মূল গায়ক গান করবার সময় লীলাকাহিনীর মুখ্যচরিত্রগুলির কথা ও ভাব আমাদের কথকঠাকুরদের মতো উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী ও স্বর-পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করতেন এবং প্রয়োজনবোধে সময় সময় অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করবার জন্যে চরিত্রোপযোগী মুখোস ধারণ করতেন। এই পালাগান যাত্রার নাটকে ও পরে 'থিয়েটারী' নাটকে রূপান্তরিত হয়।

পাশ্চাত্ত্যের একজন পণ্ডিতের মতে, বৈদিকযুগে এক-প্রকার গীতি-নাট্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই বৈদিক নাট্যের ক্রমবিকশিত রূপ যাত্রা। এই নাট্যশৈলীর অনুসরণ ক্ষীণ অবস্থায় চলতে চলতে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র মধ্যে ব্যাপক ও সার্থক হোয়ে ওঠে। কিন্তু জয়দেবের কাব্য বৈদিকযুগের, এ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভিন্নদেশীয় অভিনেয় সাহিত্যের উল্লেখ ছাড়া, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে, যাত্রা-সাহিত্যের নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বাংলা-সাহিত্যের আদি চর্যাপদগুলির মধ্যে বুদ্ধ-নাটকের খোঁজ পাওয়া যায়—

"নাচন্তি বজা গান্তি দেবী।
বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই।"

আবার চৈতন্য-ভাগবতের চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়—

"কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোনো জন।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে প্রাক্-চৈতন্যযুগে যাত্রার কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের অভিনয়ে যাত্রার তার গৌরচন্দ্রিকা, প্রস্তাবনা, ব্যাখ্যা, সংলাপ, নৃত্য ইত্যাদির অস্তিত্ব দেখা যায়। বাংলা কৃষ্ণকীর্তনের গীতাদি এবং সংস্কৃত 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের গদ্য-সংলাপ-রীতির মূল-শৈলীই বাংলা যাত্রা-শৈলীর জনক ব'লে মনে হয়। তবে এ কথা সত্য, প্রাচীন বাংলার সকল সাহিত্যই যে অভিনেয় সে-প্রমাণ প্রাচীন রামায়ণ-গান, বুদ্ধ-নাটক, দানখণ্ড নৃত্য, মনসার গান, ভাসান গান, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি। এইসকল গান শুধুমাত্র সুর-তাল-লয় সহযোগে গাওয়া হোত না, তার সঙ্গে বহু পাত্র-পাত্রীর বিচিত্র ভূমিকা, ভূমিকার উপযোগী মুখোস-ধারণ, নৃত্যগীত প্রভৃতিরও ব্যবহার পাই।

কিন্তু এর দ্বারা কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না যে সুসংবদ্ধ নাট্য-শৈলীর প্রেরণা এইসকল সাহিত্যের উৎস। পৌরাণিক কাহিনীকার ও রামায়ণ-মহাভারতের খণ্ড-আখ্যান মধ্যযুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, সতী বেহুলার মৃতস্বামীর জন্যে শুধুমাত্র মর্মচ্ছেদী আর্তনাদ বা রাম-সীতার ভাগ্যবিড়ম্বনা নাট্যকল্পনাকে উদ্রিক্ত করতে পারেনি। সুতরাং যাত্রার উৎপত্তি-ইতিহাসের উপসংহারে বলা যায় যে, চৈতন্যদেবের কৃষ্ণকীর্তনের প্রবর্তনায় পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তি হিসাবে শুধু গান ও স্বরচিত পদে উপজ সৃষ্টি করতেন। কিন্তু ঢপ-কীর্তনে গায়ক মহাজনপদের স্থানে স্বরচিত পদ সংযোজন করতেন। কীর্তনের পর ঢপ-কীর্তন, এবং ঢপ-কীর্তনের ধারা বেয়ে যাত্রা-সাহিত্যের প্রবর্তন হয়। এই ক্রমবিকশিত যাত্রার রূপ প্রথম গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় দেখতে পাই। গোবিন্দ অধিকারীর পর ব্রজমোহনের যাত্রা এবং তারপর অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, ফণিভূষণ, অহিভূষণ প্রভৃতি আধুনিক যাত্রাওয়ালারা এই ধারার সামান্যমাত্র পরিবর্তন ঘটিয়ে বর্তমান যাত্রা-শৈলীতে এসে থেমেছেন।

যাত্রা-সাহিত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখা যায়, যাত্রার নাটক মূলত গীতপ্রধান। দর্শকদের সঙ্গীতপ্রিয়তা এর কারণ। যাত্রাওয়ালাদের গুণাগুণ বিচার একটি কথায় বেশ পরিষ্কার করে বোঝা যায়। বায়নার পূর্বে প্রশ্ন হোত—"গান কেমন ?" অভিনয়াদির প্রশ্ন পরে।

পূর্বে বলেছি, জাতীয় ধর্মোৎসব উপলক্ষ্য করে নাটকাভিনয় হোত, তাই যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল ধর্মীয়—পৌরাণিক ও অলৌকিক ঘটনার পরিবেশন। পরবর্তী-কালে তা-ও বন্ধ হোয়ে মহাকাব্যের দেবতুল্য চরিত্র বা ইতিহাস-প্রোক্ত শ্রেষ্ঠ রাজা ও বীরদের জীবনচরিত নিয়েই নাটক-রচনা আরম্ভ হয় (সামাজিক যাত্রা-নাটক আরও পরে)। এই সমস্ত বিষয়বস্তুর লক্ষ্য ছিল নীতি-শিক্ষা, উপদেশ, ধর্মভাবের উন্মোচন বা দার্শনিকতা ও কাব্যগুণের প্রকাশ। তাই বহু পুরাতন ও জানা ঘটনার

আত্মপ্রকাশে হয়তো নাটকের কৌতূহল, ঘটনার চমৎকারিত্ব, চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা ইত্যাদি থাকে না। তথাপি সেই বহুজন-পরিচিত কাহিনী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতো ; আনন্দ, দুঃখ-বেদনার সমব্যথী, উপভোগ্য, একই দার্শনিকতার চর্বিতচর্বণ ভাবনা ও জ্ঞানের উল্লাসে নিয়োজিত করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হোত না। "The play was the thing" ছিল যাত্রার নাটকের আসল বস্তু। যাত্রার দর্শকগণ নাটকের রসে বার বার আপ্লুত হোয়ে যেতো। পুরাতন ভাবনার রোমন্থনে তারা ক্লান্ত হোয়ে পড়তো না। ভগবৎলীলা-মাহাত্ম্যে হয়তো তারা নতুন মানসিক খোরাক পাচ্ছে না, কিন্তু ঐ লীলারসের আবেগটুকু বিশ্বাসে ও অনুভবে তাকে বার বার দৃশ্যকাব্যের রূপায়ণে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতো। যাত্রার নাটকে সংগীতে বা সংগীতের গদ্য-ব্যাখ্যা, বিবেকের প্রবেশ-প্রস্থান, একই মানুষের মধ্যে দুই রূপের প্রকাশ, পাপাত্মার পতন ও পুণ্যাত্মার জয়, জন্মান্তরবাদ, পরলোকের সুফল ইত্যাদিতে মানুষ নিজের বিশ্বাসের জগৎ-সংসার দেখতে পায়। আবার তাদের যে-জিনিসে বিশ্বাস করানো হয়েছে তার সমর্থনের সাড়া পাওয়াও কোনো কম কৌতূহল নয়। এমনি করে যাত্রার নাটক বর্তমান নাট্য-সাহিত্যের জটিলতা, কৌতূহল ও ঘটনার চমৎকারিত্ব ছাড়াও জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল।

এই যাত্রার অত্যন্ত সাধারণ জানা ঘটনাও কি করে দীর্ঘকাল ধরে দীর্ঘসময়ের জন্যে (সে-সময় সারারাত্রি ও পরের দিনের কিয়দংশ সময় বা ১২।১৪ ঘণ্টা যাত্রাভিনয় হোত) দর্শকবৃন্দকে আকৃষ্ট করে রাখতো জানতে গেলে, তৎকালীন বাংলাদেশের সহজ-সরল জীবনধারণের রূপটি জানতে হবে। তখন মানুষের জীবনে ও চরিত্রে এত জটিলতা আসেনি। যাত্রার চরিত্রগুলিও তাই জটিলতা সৃষ্টি না ক'রে, ভাবরসে বা ভক্তিরসে আবদ্ধ থাকতো। সীতা-সাবিত্রী-শকুন্তলার সুখদুঃখ এদেশের দর্শকদের কাছে যত আন্তরিক ছিল—'কুলীন-কুলসর্বস্ব', 'বিধবা-বিবাহ', 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', 'একেই কি বলে সভ্যতা' ইত্যাদি নাটকের নানা সামাজিক সমস্যা, 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'পথিক', 'তরঙ্গ'-র আদর্শবাদিতা, 'ডল্স হাউস' বা 'হেডা গ্যাবলার'-এর মনস্তত্ব নিয়ে সেকালের দর্শকবৃন্দ তত মাথা ঘামাতো না। আর হয়ও এমনি। নিজের পরিবেশের বাইরে কোনো মানবগোষ্ঠী তার আগ্রহকে একাত্মবোধে অতখানি মিশিয়ে নিতে পারে না।

সংস্কৃত ও যাত্রার নাটকে রস-রূপের ব্যাখ্যার প্রাবল্য দেখা যায়। এখানে ভাবঘন মুহূর্তগুলোকে তুলে ধরা হয় এবং ভাবের প্রবল বেগে ঘটনার রেশ হারিয়ে যায়। এই মুহূর্তে পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়ে দার্শনিকতা, মানসিক ব্যাখ্যা ও চিন্তা প্রকাশ হোয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশীয় নাটকের পার্থক্য এখানে। পাশ্চাত্যের নাটকে ঘটনার রূপটি প্রথম ও প্রধান। তাই আমরা দেখি যাত্রার নাটকে চরিত্রবিকাশের কোনো অবকাশ প্রায় থাকে না। আপন গতিপথে যাত্রার নাটকের নায়ক-নায়িকার প্রকাশ। এদের জীবনের অভিজ্ঞতা বা ঘটনা-উদ্বুদ্ধ চরিত্রের,উত্থান-পতন দিয়ে সংলাপ তৈরি হয় না। (প্রতিকূল ক্রিয়ার সংঘাত ছাড়াই নাট্যকাহিনীর এই বোধ হয়তো-বা প্রাচ্যের দার্শনিক প্রকৃতিরই পরিচয়।) একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘটনার দৃশ্যরূপ দেওয়াই যাত্রা ও নাটকের প্রকৃতি। কিন্তু দুইয়ের পার্থক্যে যাত্রা ঘটনার গতিতে আনে পাত্র-পাত্রীর প্রকৃতির প্রতিবিম্ব, নাটক তখন পাত্র-পাত্রীর সংঘাতের মাঝখানে চরিত্র-আত্মপ্রকাশের রূপটা তুলে ধরে। স্বভাবতই সেখানে পরিণতির কৌতূহল ও ক্রমটান আছে। যেখানে এসে বাস্তব বিশেষ চরিত্রের ওপর বিরুদ্ধ আঘাত হানছে সেখানে একটা শৃঙ্গ (climax)-সৃষ্টির কারণ ঘটছে। কিন্তু যাত্রার নাটকে একটা আবহমানকালের পরিণতি থাকে, এবং যদিও সংঘাত-সৃষ্টির উপকরণ থাকে তথাপি তার মধ্যে "যথা ধর্ম তথা জয়" ভাবের আত্মপ্রকাশই বেশী। একটা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্যে যে আবিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তার দূরীকরণই যেন এর প্রধান লক্ষ্য।

এইজন্যে বলা যায়, যাত্রার ভাব-ব্যাকুলতা ও দার্শনিকতা নাট্য-চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি নয়। কৃষ্ণ, রাধা বা সখীদের ভাব-ব্যাকুলতা প্রকাশের মাঝখানে চরিত্রের ক্রমগতি লক্ষ্য করা যায় না। এখানে যাত্রাওয়ালার মানসিক সংস্কার ও মনোভাবের প্রকাশ পাত্র-পাত্রীর অন্তরে যতখানি কাজ করে, পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব ভাবধারা ও আত্মপ্রকাশের অবকাশ অতখানি থাকে না। একটা কৃত্রিম ভাবাবেগে চরিত্রগুলি যখন সাকার প্রাপ্ত হয় তখন তাদের ব্যবহারের কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধানের চাইতে একটা সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা বেশী কাজ করে। এই চরিত্রগুলি অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভাব-ভাষার মূর্ত, বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে, রস-মাধুর্যের আস্বাদনও করায় ; কিন্তু চরিত্রবিকাশে সাহায্য করে না। তাই

যাত্রায় নাটকের বাহ্যরূপ আছে; নাটকীয় স্বরূপ প্রকাশ পায় না।

কিন্তু যাত্রা-সাহিত্যে সমাপ্তির মধ্যে নাট্যবস্তুর এক অদ্ভুত শৈলী চোখে পড়ে। সে হচ্ছে, যাত্রা-নাটকের পরিণতি বিয়োগান্ত হোলেও, তার মধ্যে কোথায় এক অভূতপূর্ব ও মহান অর্থের আস্বাদ দর্শকমাত্রই অনুভব করে থাকেন। এখানে নাটকের যবনিকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের শেষ নয়। পরিণতিতে মনের এমন এক জায়গা নাড়া দেওয়ার রীতি যাত্রা-নাটকে আছে, যার পরেও জীবনের এক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। এই মিলনের ইঙ্গিতে বোধ হয় ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্কার, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদির পরিচয়। অভিমন্যুবধ, রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ বা নিমাই-সন্ন্যাস ইত্যাদি যাত্রা-নাটকে দেখি—অভিমন্যু জয়দ্রথের দ্বারা নিহত হোলেও অভিমন্যুর সে-মৃত্যু মৃত্যু নয়, জীবনের লীলা মাত্র; বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের বিচ্ছেদের কারণ অবতার-গ্রহণের জন্যে মর্ত্যে নারায়ণের আবির্ভাব বা নিমাই-এর সন্ন্যাস-গ্রহণের মাঝে বৃহত্তর জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাঁর সংসার-ত্যাগ। বিচ্ছেদের মাঝেও মিলনের এই সুরটি সত্যিই বড় অপূর্ব। অবশ্য এই আঙ্গিক সংস্কৃত নাটক থেকেই যাত্রাওয়ালারা গ্রহণ করেছেন।

আবার সংস্কৃত নাটক ও আধুনিক চলচ্চিত্রের মত যাত্রার নাটকে কোনো দৃশ্যপট নাই। যে নির্দিষ্ট দৃশ্যপট পিছনে রেখে থিয়েটারের নাটক হয়, তার সঙ্গে ঐ নাটকের একটা যোগসূত্র থাকে। দৃশ্যপট ও নাটকের এই সংযোগস্থলকে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু যাত্রার নাটকে এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নাই। এখানে বার বার নাটকের সংযোগস্থল পরিবর্তনের জন্যে নির্দিষ্ট দৃশ্যপটের ব্যবহার সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু যাত্রায় কৃত্রিম দৃশ্যপটের ব্যবহার না থাকলেও, বাস্তবদৃশ্যের যে সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ আছে। বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আমল থেকে যাত্রার একটা সুপরিকল্পিত রূপ আমরা দেখতে পাই। শান্তিপুরে চৈতন্যদেব দানলীলাভিনয়ে স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকার, অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণের, নিত্যানন্দ বড়াই-বুড়ির, শ্রীবাসাদি কতিপয় সখীর, বনমালাকান্তাদি কতিপয় সখার, গৌরীদাস সুবলের এবং নরহরি মধুমঙ্গলের ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাস্তবদৃশ্যসহযোগে ভাগীরথীতীরে এই অভিনয় হয়। ভাগীরথীতে জলবিহার, নদীর তীরে কদম্বশাখাকে অভিনয়-কাজে ব্যবহার করা ও এরই তটভূমিতে কৃষ্ণ-সখাদের গোচারণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার ইত্যাদি বাস্তবদৃশ্য-প্রয়োগের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

মনে হয়, এই রীতিটি তৎকালীন সময়ে খুব বেশী অস্বাভাবিক ছিল না। এমনকি বর্তমানকালে (১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) এই কলকাতায় ৺নবীনচন্দ্র বসু যখন বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় করান তখন তিনি তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে ঐ নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন, এ প্রমাণ আছে। তাঁর বাড়ির সংলগ্ন বাগান ও পুষ্করিণী এই অভিনয়-কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই প্রয়োগ-শিল্প অভিনব সন্দেহ নাই—বলতে কি, নাটকের স্বাভাবিকতা ও ভাবসঞ্চারে যথেষ্ট সাহায্য করে সত্যি; কিন্তু তবু এ প্রথার অচিরে অবসান ঘটেছে এইজন্যে যে দর্শকদের অসুবিধা হয়। আজ যখন দর্শকবৃন্দ একাসনে বসে নাটকের আদ্যোপান্ত দেখে আসে ও রস-গ্রহণে খুব বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হয় না, তখন এইকালে অভিনেতাদের সঙ্গে স্থানত্যাগ করে প্রতিটি বাস্তবদৃশ্যের সাহায্যগ্রহণের জন্যে বোধ হয় প্রায় কোনো দর্শকই রাজী হবেন না। যাই হোক, তৎকালীন সময়ে এই প্রয়োগরীতি যে প্রশংসনীয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে-যাত্রা, খুব বেশীদিনের কথা নয়, গণশিক্ষার বাহন ও ভগবৎপ্রেমের পরিবেষক রূপে আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ ছিল—তার পতনোন্মুখতা বা পত (গ্রামাঞ্চলে আজও এর প্রভাব খুব কম নয়) ঘটলো কেম করে? কারণ আপাতদৃষ্টিতে যা কিছু মনে হয় তার মধে রুচির পরিবর্তন অন্যতম। এই রুচির কারণ অনুসন্ধা করতে গেলে, যাত্রা-শৈলী যুগোপযোগী তো নয়ই, উপর পদাবলীর যে উন্নত ভাবধারা ও দার্শনিকতা যাত্রা-নাটকে সবল ছিল, পরবর্তীকালে সে ভাবপ্রেরণার অনুপস্থিতি এব বৈষ্ণবেতর বিষয়ে যাত্রা-সাহিত্যে কুরুচি, ভাঁড়ামি অশ্লীলতার অনুপ্রবেশের ফলে যাত্রা-নাটক শিক্ষিত সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা নাটক এর নিদর্শন।

যদিও তৎকালীন শিক্ষিত যুবকসমাজ যাত্রার নাট্য প্রয়োগরীতি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি বা কোনো সমর্থ জানায়নি, তৎসত্ত্বে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য থিয়েটারের নাটক খুব বেশী প্রসারলাভ করতে পারেনি তাদের মনে তখন পাশ্চাত্য নাট্যরীতি এবং মঞ্চে ভাবধারা ও প্রভাব প্রকট। তথাপি সীমাবদ্ধ গোষ্ঠির ভেত

থিয়েটারী নাটক অভিনয়াদি হোত। যাত্রা-নাটকের দুর্বলতা ঢাকতে ও নাট্যধর্মের আমদানির জন্যে অবশ্য এই প্রচেষ্টা। অন্যপক্ষে যাত্রার নাটকে না ছিল গল্প, না ছিল চরিত্রের জটিলতা-সৃষ্টি বা জীবন-রহস্যের সুনিপুণ পরিবেশন-ক্ষমতা। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভাবের দরুন, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, শিক্ষিত নাট্যানুরাগিগণ যাত্রা-নাটক অভিনয় করতে থাকে এবং যাত্রার নাটকে থিয়েটারী অভিনয়-শৈলী ও পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে উন্নতিসাধনে চেষ্টা করে। এমনকি থিয়েটারের জন্যে লেখা নাটক 'রত্নাবলী', 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি যাত্রায় অভিনীত হয়। যাত্রার নাটকে প্রধানতঃ সংগীতাংশের পরিমাণ বেশী থাকে। সেই সংগীতাংশ ও অশ্লীলতা কমিয়ে সংলাপ ও নাট্যক্রিয়া বাড়িয়ে দিয়ে থিয়েটারী-নাটকে পরিবর্তন এমন কিছু শক্ত নয়। অন্যপক্ষে মঞ্চোপযোগী নাটক যাত্রার নাটকে অভিনয় করতে হোলে গীতাংশ ও অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যোগ করে দিতে হয়।

এমনি করে বহুদিন পর্যন্ত আমাদের রঙ্গমঞ্চ-জগতে যাত্রা ও থিয়েটারী নাটক পাশাপাশি অভিনয় হোতে থাকে। যাত্রার নাটক সংস্কার করতে গিয়ে হয়তো পাশ্চাত্য-ধারায় নাটকে মনোবিশ্লেষণ ও মানসিক জটিলতা নিয়ে নাটক লেখা ও অভিনয় হোতে লাগলো। কিন্তু নাট্যসাহিত্যের সামগ্রিকভাবে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হোল বলে মনে হয় না। আধুনিক মঞ্চ-সফল নাটকের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করলে এই সত্য বুঝতে কষ্ট হবে না। বস্তুতঃ আমাদের থিয়েটারের নাটক যে যাত্রারই পরিমার্জিত সংস্করণ, আজ পর্যন্ত গান ও কৌতুক-দৃশ্য বর্জন করতে না পারা তার অন্যতম কারণ। তারপর তো যাত্রার দার্শনিক ভাবধারা আছেই। ব্রজমোহন রায়ের আমলে যে দার্শনিকতা—পাত্র-পাত্রীর দীর্ঘ সংলাপে বা গৌরচন্দ্রিকায় ছিল, আজ তা থিয়েটার-নাটকের পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়াংশে ও সংলাপাংশে সূক্ষ্মভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সাবিত্রী ও বেহুলার মৃতপতি কোলে করে গান গাওয়া বা সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর ধর্মপূর্ণ গান এবং থিয়েটার-চলচ্চিত্রে কারণে-অকারণে কমিক-সীনের নামে কুরুচি ও ভাঁড়চরিত্রের অবতারণা যাত্রা-নাটকের পরিমার্জিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাত্রার এই গতি-প্রকৃতি থিয়েটারী নাটকে ভালো কি মন্দ, সে প্রশ্ন নয়; তবে এই পরিপ্রেক্ষিতে আজও আমরা থিয়েটারের মূল্যায়ন করে থাকি।

১৮৭৩ সালে ৭ই ডিসেম্বর, ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যকার মনোমোহনবাবু বলেছিলেন—"গান ছাড়া এদেশে নাট্যাভিনয় হইতে পারে না। কথায় কথায় গান না দিয়া পরিমিত গান থাকা উচিত। কেননা দর্শকগণ গান ও 'সং-রং-ঢং' প্রদর্শন ভালবাসে।"

এই অভিমতের দ্বারা এ-কথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের থিয়েটারী নাটকে আজও পর্যন্ত সেই প্রকৃতি ও প্রভাব বহুলাংশে কাজ করছে। পরিপূর্ণ যাত্রা থেকে আংশিক পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের ধারাটি তৎকালীন 'বঙ্গদর্শন'ও রুচিতে গ্রহণ করতে পারেনি: "ইহাতে সাজ্জা আছে, পেন্টলুন আছে, কোট আছে, তরবারি আছে, সাধুভাষা আছে, বক্তৃতা আছে, চীৎকার আছে, পতন আছে, উত্থান আছে। ইহাতে দেখিবার জিনিষ যথেষ্ট। পূর্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে। তাহাতেই এই নূতন যাত্রাতে বেশভূষায় এত ঝোঁক। সঙ্গীত ও কাব্য-রসের এত অভাব।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, খাঁটি ভারতীয় প্রথায় বাংলা-নাটক আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি বা আমাদের বর্তমান নাট্যসাহিত্যের অনেকাংশে জুড়ে যাত্রার অপ্রত্যক্ষ প্রভাব আছে? *

---

* এই প্রবন্ধ-রচনায় অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল, মন্মথমোহন বসু, A. A. Macdonell ও K. Mantzius প্রভৃতি নাট্য-সমালোচকগণের রচনার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

ছদ্মবেশ

মানবেন্দ্র পাল

সত্যি, মা কী মজার! এমন মা কিন্তু আর কারও হয় না। লক্ষ্মী মা-মণি! সোনা মা-মণি।

মায়ের মুখের ডৌলটি কি শুধু সুন্দর? না। অমন চোখ-দুটি?

তিনতলার নির্জন ঘরে বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়ি
নিজের চোখে সরু করে কাজল টানতে টানতে কতবা
ভেবেছে খুকু,—আহা, অমন চোখ যদি তারও হত!

তার নিজের চোখও যে নিতান্ত কম সুন্দর তা না

কিন্তু মায়ের চোখ-দুটি যেন আরও সুন্দর। চোখের পাতাগুলি বাঁকা বাঁকা ওল্টানো। চোখ বুজলে মনে হয় যেন দুচোখে দুটো ভোমরা বসেছে পাখা মেলে।

মাও চোখে কাজল পরে, সেও পরে। কিন্তু মায়ের চোখে কাজল যেন হেসে ওঠে। আহা অমন চোখ যদি তার হত!

শুধু রঙ কেন? শুধু চোখ কেন? শুধু এক-পিঠ কালো-কুচকুচে চুল কেন? অমন হাসিখুশি মা কার হয়? কী হাসে! অমন করে তো সে হাসতে পারে না।

হয়তো এর কারণ, তার স্কুলের পড়া আছে, দিদিমণির চোখ-রাঙানি আছে, পরীক্ষার পাস-ফেলের সমস্যা আছে; আর মায়ের তো ও-সব হাঙ্গামা নেই। দিব্যি খাওদাও, পান চিবোও, রেডিও শোনো, মাথার ওপর পাখা খুলে সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমোও। কী সুখের জীবন!

তারপর বিকেল হতে-না-হতেই রাহুপিসি, বিলুপিসি আর রেবাপিসিরা আসবে কলেজ থেকে। আর অমনি জমবে আড্ডা। ছোটোকাকাও প্রায়ই যোগ দেয় সেই আড্ডায়। তখন সবাই ভুলেই যায়, তাদের পড়াশোনা আছে। বকেও না কেউ ওদের। যত বকুনি তারই কপালে!

সারা সন্ধে গল্প আর হাসি। সারা দুপুরের যত গল্প জমা হয়েছিল সব বলতে হবে। পিসিরা করে ক্লাসের মেয়েদের গল্প, ছোট্‌কা করে কলেজের ছেলেদের গল্প, আর মা করে পাড়ার বৌদের গল্প। উঃ, এত গল্পও করতে পারে সব! এত হাসতেও পারে!

হাসে তো সবাই, কিন্তু হাসায় একা মা। কেমন একরকম মুখের ভঙ্গি করে মা কথা বলে অমনি পিসিরা হেসে ওঠে। মাও হাসে পিসিরাও হাসে। কিন্তু কই তারা পারুক দিকি মায়ের মতো অমন মুখ রাঙা করে হাসতে!

খুকুর বুক ফুলে ওঠে গর্বে। এমন মা আর কারও হয় না। কী সুখী মা!

তাও আবার মজা কি কম? মা বিলুপিসিকে বলে 'গিন্নি'। বিলুপিসি মাকে বলে 'কর্তা'।

ভাবতে ভাবতে খুকুও হেসে ফেলে খুঁক খুঁক ক'রে। মা বলে—গিন্নি, কলেজ থেকে ফিরতে দেরি কেন? এ তো ভালো কথা নয়।

বিলুপিসি অমনি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে—না কর্তা, কিচ্ছু ভয় নেই। আমি তোমারই। কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

মা চোখ বড়ো বড়ো করে বলে—ঠিক তো।

—হ্যাঁ, ঠিক বলছি কর্তা। ইহজীবনে তুমি ছাড়া আমি দ্বিতীয় কর্তা গ্রহণ করব না।

আবার হাসে খুকু খুঁক—খুঁক—খুঁক। কী মজা। বেশ কর্তা-গিন্নি। সুখে আছে মা।

না, বিলুপিসিটাও বেশ ভালো! রাহুপিসিও বেশ, রেবাপিসিও মন্দ না। ওরা তিনজনেই মাকে ভালবাসে খুব।

কিন্তু খুকুর একটু বাধা ঐখানেই। তার মাকে আর যে কেউ ভালবাসে এটা যেন সহ্য হয় না। তার মা কেবল তারই। মা কেবল ভালবাসবে তাকে আর তার মাকে যদি কেউ ভালবাসে তো সে একা। সেখানে আর কেউ থাকবে না। না, বিলুপিসিও না, রাহুপিসিও না, রেবাপিসি না—ছোট্‌কা তো নয়ই।

বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরে এসে খুকু জল খাওয়া সেরে এইমাত্র প্রসাধন করছিল। মুখখানি ধবধবে ফরসা। তার ওপর সাবান দিয়ে ধুয়েছে এইমাত্র। কপালের ভাঁজে ভাঁজে এখনো সাবানের ফেনা লেগে রয়েছে। তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছল আর-একবার। তারপর মাখল স্নো, তারপর হালকা করে মুখের ওপর বোলালো পাউডারের পাফ। একবার, দুবার, তিনবার। তারপর সরু করে চোখে আঁকল কাজল। দুবার মুখটা ঘুরিয়ে দেখল। না, নিখুঁত ভাবে কাজল পরা হয়েছে।

মাও অমন সুন্দর করে কাজল পরে। কিন্তু মাকে সবচেয়ে সুন্দর মানায় যখন ফরসা ছোট্ট কপালে পরে সিঁদুরের টিপ। সরু সিঁথি ভ'রে দেয় সিঁদুর। সমস্ত মুখখানি যেন প্রতিমার মতো ঝল্‌মল্‌ করে ওঠে।

কবে সে সিঁদুর পরবে অমন করে?

দরোজার খিল খুলে খুকু বেরিয়ে এল। ঢিলে ফ্রক—হাঁটু পর্যন্ত ঝুল, পিঠের ওপর বিনুনি দুলছে। চোখের সামনে আয়না নেই, কিন্তু খুকুর মনে হচ্ছে সে যেন নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। নিখুঁত সুন্দরী একটি মেয়ে চলেছে আর চারিদিক থেকে যেন সবাই দেখছে তাকে। তারা মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু তাদের চোখের ভাষা যেন স্পষ্ট বোঝা যায়।

খুকু মনে মনে ভাবলে, আজ একবার অঞ্জলিদের বাড়ি বেড়াতে গেলে হয়। ঐ তো গলিটুকু পার হলেই তাদের বাড়ি।

অঞ্জলি যে তার খুব বন্ধু তা নয়। কিন্তু ওদের বাড়ি যেতে খুব ভালো লাগে। ভালো লাগে যতটা না অঞ্জলির জন্যে, তার চেয়ে ঢের বেশি অঞ্জলির বাবার জন্যে। গেলেই অমনি আদর করে কাছে টেনে নেয়,—ওমা! আমার সোনার লক্ষ্মী এসেছে!

লক্ষ্মী-টক্ষ্মী শুনতে ভালো লাগেনা। ওসব সেকেলে আদর। অঞ্জলির বাবা যে তার চেহারার প্রশংসা করে এইটিই ভালো লাগে। তাই যেদিন একটু বেশি সাজ-সজ্জা করে—যেদিন নিজেকেই নিজের একটু বেশি ভালো লাগে, সেদিনই ঝুমুর ইচ্ছে হয় একবার অঞ্জলিদের বাড়ি যেতে। সত্যি অঞ্জলির বাবা বেশ ভালো বাবা। অঞ্জলির ভাগ্য ভালো।

মুহূর্তের জন্যে ঝুমুর মনটা কেমন খচ্ খচ্ করে ওঠে। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যে। আবার ঠিক হয়ে যায়। ঝুমু তিনতলা থেকে নেমে আসে। নীচের ঘরে এতক্ষণ নিশ্চয় চায়ের আড্ডা জমেছে। রাঙাপিসি, মিনুপিসি, মেজপিসি এতক্ষণে এসে-মায়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই গল্প জুড়েছে। —হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই তিনতলার সিঁড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছে ওদের হাসি। কী সুখেই আছে ওরা।

নেমে চলেছে ঝুমু সিঁড়ি দিয়ে। সেকালের পুরনো বাড়ি। সিঁড়িগুলো ভেঙে ভেঙে গেছে। দেওয়ালের পলস্তরা খসে পড়েছে কত জায়গায়। অন্ধকার—বড়ো অন্ধকার।

দোতলায় মুখে টানা বারান্দা দক্ষিণে। ওদিকে থাকে পিসিরা। মেজঠাকুমা, ন'ঠাকুমা, ছোটঠাকুমার ঘর। আর এদিকে ছোট্ট একটা ঘর। সিঁড়ির ঘর বলা চলে। ও ঘর নির্জন নিস্তব্ধ। ও ঘরে যে কেউ আছে তা মনে হয় না। বড়ো একটা কেউ যায়না ওদিকে। ঝুমুরও যেতে ইচ্ছে করে না। ছোটোবেলায় বড্ড ভয় করত। কিন্তু এখন এক এক বার যখন কাছেপিঠে কেউ থাকে না তখন এক-আধবার উঁকি মেরে দেখে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

এমনকি ঘরের ভেতরেও ঢুকতে পারে না। কেমন ভয় করে। ভেতরে ঐ যে মানুষ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, ওকে যেন চেনেনা। ও মানুষটা যেন এ জগতের কেউ নয়।

ঝুমু তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসে। পালিয়ে আসে ছুটতে ছুটতে একেবারে মায়ের কাছে। তখনো তার সারা গা কেমন করে। মা জিজ্ঞেস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,—কীরে, কী হয়েছে?

—কিছু হয়নি, মা। এই বলে ঝুমু মায়ের বুকে মুখ লুকোয়।

আজ এই অসময়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ঐ দোতলায় মুখে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ঝুমু। না, এখন কেউ নেই।" একবার দেখে যাবে নাকি সেই লোকটাকে? এখনো কি অন্ধকার ঘরে তেমনি করে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে?

ঝুমু সত্যিসত্যিই এগিয়ে চলল সেই ঘরের দিকে। এরই মধ্যে ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। কেউ এসে সুইচ জেলে দিয়ে যায়নি। একটু পরে মা-ই আসবে। আসবে একা। আলো জ্বালিয়ে দেবে, বিছানা পরিষ্কার করে দেবে —জলখাবার খাইয়ে যাবে। তারপর আসবে আবার খাওয়াতে। হাতে খাবারের থালা। বসে বসে খাওয়াবে। ছেলেমানুষের মতো হাতটা নিয়ে ধুয়ে দেবে। কিন্তু কথা বলবে না। কথা কেউ বলেনা। চুপচাপ খেয়ে যায় মানুষটা। ভালো না লাগলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তখন আবার হাতমুখ ধুইয়ে দেয় মা। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয়। তারপর শুইয়ে দিয়ে মশারি টাঙিয়ে চলে আসে বাইরে। বাইরেই থাকে সুইচ। ইচ্ছে করেই বাইরে সুইচ রাখা হয়েছে। তালাচাবি দিয়ে দেয় মা। মানুষটা থাকে একা ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ। অন্ধকারে এঁটো থালা নিয়ে মা নেমে যায় নীচে।

এসব সময় কেউ কাছে থাকে, মা পছন্দ করে না। এসব সময় ঐ মা কী গম্ভীর! তখন যদি দ্যাখে, কেউ তার পিছু-পিছু এসেছে তা হলে চটে যায়। তাই কেউ যায়না তখন ঐ সময়। কিন্তু ঝুমু দেখেছে। ঝুমু দেখেছে লুকিয়ে-লুকিয়ে অনেকবার। ঘরের ভিতর ঐ নিশ্চল নির্বাক মানুষটির সম্বন্ধে যে তার কৌতূহলের অন্ত নেই।

ধীরে ধীরে ঝুমু এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। ভেজানো দরজা একটু ঠেলতেই খুলে গেল। আবছা অন্ধকার। সেই ঘরে খাটের ওপর বসে আছে মানুষটি দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে। চোখ-দুটি বুজনো। ঘুমোচ্ছে কি কিছু ভাবছে বোঝা গেল না। পিঠ থেকে একটা পাতলা চাদর নেমে এসে পা-দুটি ঢেকে দিয়েছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। নিজে চুল আঁচড়ায় না। স্নান করিয়ে মা-ই চুল আঁচড়ে দিয়েছিল দুপুরবেলা। এবেলা সে-চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

ঝুমু দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। সামনেই দেওয়ালে পুরনো একটা ছবি। প্যান্ট-কোট-পরা—মাথায় কেল্টের

টুপি, হাতে ছড়ি। বসে আছে চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে। সে-ছবির দিকে তাকালে এখনো ঝুমুর বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে। এ মানুষকে সে চোখে দেখেনি। কিন্তু জানে, সে কে। তাই এ ঘরে যখনই আসে, ঐ দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে ও একবার তাকায় ঐ ছবিটার দিকে আর একবার তাকায় এই রক্তমাংসের মানুষটার দিকে। কত তফাত! ছোটোবেলা থেকে তো সে এই মানুষটাকেই দেখে আসছে বরাবর। ছবির মানুষকে দেখতে পায়নি কোনোদিন। কিন্তু মনে হয়েছে, ঐ ছবির মানুষটা তার দিকে কেমনভাবে যেন তাকিয়ে রয়েছে। তাকিয়ে রয়েছে আর মিটিমিটি হাসছে। যেন বলছে—বলো তো আমি কে?

ঝুমুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটা চাপা কান্না বুকের ভিতর দোল খেতে খেতে উঠে আসতে চায়। চোখের কোণ জ্বালা করে ওঠে।

হ্যাঁ, সেই ফেল্টের টুপিটা এখনো টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে ঐ হরিণের শিঙে; সেই ছড়িটাও।

আর কি কেউ কোনোদিন ওগুলো নিয়ে ছবি তুলবে না?

ঝুমু আর দাঁড়াতে পারলনা। চলে আসবার জন্যে চুপি চুপি পা বাড়ালো।

একবার ডাকবে নাকি?

কোনোদিন ডাকেনি। ডাকতে কেমন যেন ভয় করে। কিন্তু আজ তো ওর ভয় করছে না।

ঝুমুর কী খেয়াল হল। জানে, ও-মানুষের কোনো জ্ঞান নেই, চেতনা নেই,—তার ওপর এখন ঘুমোচ্ছে। এখন যদি ডাকে তাহলে শুনতেও পাবে না। একটু ডাকুক-না। একটু—একটি বার! সব মেয়েই তো ডাকে। তার বন্ধু অঞ্জলি তো 'বাবা' 'বাবা' ব'লে অস্থির হয়। 'বাবা' বলে না, বলে 'বাবু'। কী বিশ্রী। ঝুমু ভাবে তার যদি বাবা থাকত—যদি ডাকতে পারত তাহলে খুব মিষ্টি করে ডাকত—'বাবা!'

'বাবা' ছোট দুটি অক্ষর! কিন্তু ঝুমু আজ পর্যন্ত ডাকতে পারল না। আজ যদি চুপি চুপি এই ঘরে একবার ঐ মানুষটাকে—আচ্ছা ঐ মানুষটা না হয় নাই হল, ঐ ছবিটাকেই ডাকে, তা হলে ক্ষতি কী? কেইবা শুনতে আসছে? কেইবা ঠাট্টা করবে?

ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ ঝুমু ডেকে ফেলল—বাবা!

হঠাৎ সেই স্তব্ধ মূর্তি যেন নড়ে উঠল। ঐ যে মুখটা কেমন করছে। কী যেন অসহ্য যন্ত্রণা ভেতরে ভেতরে। ঐ—দুহাত দিয়ে মাথাটা ধরেছে।

ঝুমুর লজ্জা হল—কেমন ভয় হল—কেমন যেন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল। ছুটে চলে গেল নীচে।

নীচে এসে যেন প্রাণ বাঁচল। আড্ডা জমে উঠেছে বেশ। রাঙাপিসি বিনুপিসি মেজপিসি, ছোটকা আর মা। কী সুখেই আছে সব। কলেজ থেকে ফিরে এসে নিজেদের ঘরেও যাবার সময় হয়নি। এমনি আড্ডাধারী। মা খুব হাসছে। ভারি সুন্দর লাগছে। ঘুম থেকে উঠেছে একটু আগে। এখনো চুল বাঁধেনি।

ঝুমু সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই যেন একবার চমকে উঠল। মা তখন উঠে দাঁড়িয়ে চুলগুলো কোনোরকমে একটা খোঁপায় বেঁধে ফেলে কাপড়টা কোমরে জড়িয়ে নিচ্ছে।

—দাঁড়া দেখাচ্ছি।

ঝুমুকে আসতে দেখেও মা থামলে না। ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে চোখের একটু ভঙ্গি করে কোনো-একটি নতুন-বিয়ে-হওয়া অহংকারে ডগোমগো মেয়ের চলা-ফেরার নকল করতে লাগল।

মা যেই খোঁপা বেঁধেছে আর ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েছে—অমনি সেই হাঁটার আর তাকানোর ভঙ্গি দেখেই ঝুমুও ফুকরে না হেসে উঠে পারল না। —ওমা! একেবারে হুবহু নকল করেছে তো সান্যাল-বাড়ির বৌকে! অবাক করলে!

সেই নিঃসংকোচ চলার ভঙ্গি আর হাসির ঠমকে পিসিরা হেসে গড়াগড়ি। —ও বৌদি, থামো থামো। আর নয়। ওরে বাবারে। হাসতে হাসতে পেট গেল!

সত্যি এমন মজার মা এমন সুন্দর মা আর কারও হয় না। মা হাসায়—মা তাদের সঙ্গে লুডো খেলে, মা বকে, মা আবার-আদর করে। হ্যাঁ গো, এখনো মা তাকে কতদিন চুমু খেয়। মা তাকে নিয়ে বেড়াতে যায়। চিড়িয়াখানায় নিয়ে গিয়েছে, সিনেমায় নিয়ে গিয়েছে, আবার পুজোর সময় ঠাকুর দেখাতেও নিয়ে গিয়েছে। অবশ্য যখনই যায় সঙ্গে পিসিরা তো আছেই। পিসিরা মাকে ছাড়তে চায় না, মাও পিসিদের ছাড়েনা।

বুড়ো দাদু থাকেন দোকানে। ভারি ভালোমানুষ। তাঁকেও ঝুমুর খুব ভালো লাগে। কিন্তু বড়ো আশ্চর্য লাগে ঝুমুর, এরা কেউ তার কাছে বাবার কথা বলে না। মাও বলেনা, দাদুও না। পিসিরা তো নয়ই। কিন্তু—

কিন্তু কেন বলে না ?

মনে আছে, ছোটোবেলায় একবার বাবার কথা মাকে জিগেস করেছে। —মা, আমার বাবা বুঝি ঐ লোকটা ?—ঐ ঘরে যে বসে থাকে চুপ করে !

মা বলেছে—ছিঃ ! 'লোকটা' বলতে নেই।

—আচ্ছা, বাবা বেরোয়না কেন ঘর থেকে, কথা বলেনা কেন ? অঞ্জলির বাবা কেমন—

মা গম্ভীর স্বরে বলেছে,—তোমার বাবার অসুখ করেছে যে।

—সে তো কবে থেকে অসুখ লেগেই রয়েছে। ভালো হবে কবে ?

মা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ আদর করেছে চুপচাপ। তারপর বলেছে,—ও অসুখ আর সারবে না।

মনে আছে সেদিন ঝুমুর যেন কেমন কান্না পেয়েছিল। তার বাবা কোনোদিন ভালো হবে না !

—আচ্ছা, আমি রোজ একবার করে বাবার কাছে যাব ?

মা মুখে কোনো কথা বলতে পারেনি। শুধু মাথা নেড়েছে। —না।

—কেন ?

—ছোটোদের যেতে নেই।

কেন যে মা যেতে দিতনা তা আজও বোঝেনা ঝুমু। এদিকে মেয়েরা এই সেদিন পর্যন্ত তাকে বারে বারে খোঁচা দিয়েছে,—হ্যাঁ রে, তোর বাবা নাকি পাগল ?

পাগল ! কথাটা কানে যেতেই ঝুমু কেমন যেন ভয় পেত—শিউরে উঠত। তাড়াতাড়ি বলত,—না না, পাগল কেন হবে,—এমনিই—অসুখ করেছে।

—অসুখ করেছে ! ছাই ! আমরা যেন জানিনা। পাগল হয়ে গেছে। একটা ঘরে বসে থাকে চুপচাপ।

ঝুমু সেদিন তার ছেলেমানুষ মন নিয়েই প্রবল প্রতিবাদ করেছে,—না, কক্ষনো না। পাগল মোটেই নয়। মা নিজে বলেছে, বাবার অসুখ করেছে। বাবা খুব শিগ্‌গির ভালো হয়ে যাবে।

শেষের এই মিথ্যেকথাটুকু আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল ঝুমুর। মেয়েরা কেমন একরকম করে হেসে উঠল। বললে,—দেখা যাবে।

তারপর থেকে আজ কতদিন হয়ে গেল, সত্যি বাবা তো ভালো হলনা। তার বন্ধুরা এ বাড়ি-ও বাড়িতে বেড়াতে যায় কতবার। সেও অঞ্জলিদের বাড়িতে যায়। কিন্তু তার বাড়িতে কেউ আসে না।

একদিন এক বন্ধুর ওপর অভিমান করে বলতে গিয়েছিল সে-কথা। —আমাদের বাড়ি তোরা কি কেউ যাবিনা ?

বন্ধু হেসে উঠে বলেছিল,—বাবাঃ ! তোদের বাড়ি যে পাগল আছে।

সে-রাত্তিরে ঝুমু যখন কিছুতেই ঘুমুতে পারছে না, তখন উঠে গিয়ে মায়ের কাছে শুল। মা আদর করে বললে—কী হয়েছে ?

সব কথা বলতে বলতে ঝুমুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল ; কিন্তু মা কিছুই বললে না। শুধু ওর মুখটা বুকের কাছে চেপে ধরলে।

এরপর থেকে ঝুমুর মনে নতুন একটা ভাবনা জাগল। সত্যিই কি তার বাবা পাগল ?

অবশ্য পাগল সম্বন্ধে ঝুমুর নিজেরও কেমন অদ্ভ ধারণা—তারা লোক ভালো হয় না। কাউকে দেখলেই মারতে কিম্বা কামড়াতে ছুটে আসে।

কিন্তু তার বাবা তো কই কোনোদিন তেমন কিছু করেনি ! সে তো চুপচাপ বসে থাকে ঘরে। একটি কথাও বলে না। মা খাইয়ে দিলে তবে খায়—মা শুইয়ে দিলে তবে শোয়।

এইতো সেবার বিজয়াদশমীর দিন। রাস্তার ধার থেকে ঠাকুর-বিসর্জন দেখে ঝুমু তাড়াতাড়ি ছুটে এল মাকে প্রণাম করতে। —মা !

মা ঘরে নেই। গেল কোথায় এই সন্ধেবেলা ? ও তখনই উঠে গেল। দোতলার সিঁড়ির বাঁকে এসে দেখল, মা ঢুকেছে বাবার ঘরে।

আর কেউ নেই, শুধু মা আর বাবা।

মা প্রণাম করছে বাবাকে। আর বাবা চুপ করে তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে। পুরুষমানুষের অমন কান্না-ভরা চোখ ঝুমু কোনোদিন দেখেনি।

দেখতে দেখতে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মনে হল, এবার পালিয়ে যাবে। নইলে মা দেখলে বকবে এখুনি। ঝুমু ওদিকে যায়, মা পছন্দ করে না।

কিন্তু পালানো হল না। কেমন করে মা দেখে ফেলল। আস্তে আস্তে ডাকল,—ঝুমু !

এমনভাবে ডাকল যেন সে-ডাকে কেউ চমকে না ওঠে।

ঝুমু সে-ডাকের অর্থ বুঝতে পারল না। ভয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আয়, ভেতরে আয়।

ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে বুড়ু ঘরে ঢুকল।

—প্রণাম করো।

বুড়ু সসংকোচে কোনোরকমে প্রণাম করল। কী সুন্দর পা-দুখানি। একটুকু ময়লা নেই। নখগুলি পরিষ্কার করে কাটা। মা-ই কেটে দিয়েছে হবে।

প্রণাম করে উঠে আর বাবার মুখের দিকে তাকায়নি। পালিয়ে এসেছিল নীচে।

বাবা যদি পাগলই হবে তাহলে তাকে তো মারল না, বকল না! একটা কথাও তো বলল না!

তারপর আরও দু'একবার উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছে ও ঘরে। চোখাচোখিও হয়েছে বাবার সঙ্গে। বকেনি, কথা বলেনি। তবু যেন কেমন ভয় করে। পালিয়ে আসে।

ইচ্ছে করে, একদিন সবাই মিলে যদি বাবার ঘরে যায়—মা থাকবে, দাদু থাকবে—আচ্ছা, পিসিমাও না হয় থাকল, ওরা সবাই মিলে তাকে বলবে 'বাবা' বলে ডাকো।

না না, পিসিমা থাকলে হবে না। পিসিমার সামনে কিছুতেই 'বাবা' বলে ডাকতে পারবে না। ও নাম ধরে তো আজ পর্যন্ত কোনোদিন ডাকেনি।

কিন্তু দাদু, মা কি যাবে কোনোদিন তাকে নিয়ে ও ঘরে?

বোধ হয় না।

আজ আর অঞ্জলিদের বাড়ি যাওয়া হল না। মা যা আরম্ভ করেছে! কিছুতেই এ ঘর থেকে বেরনো যায় না। মাকে এত ছেলেমানুষ মনে হয় যেন রাঙাপিসি ঝিনুপিসিরই মতো। অথচ ঐ ঝিনুপিসিকে হতে দেখেছে মা। আজ তারা যেন বন্ধু।

হাসি-মস্‌করা চলল আটটা পর্যন্ত। তারপর আসর ভাঙল। পিসিমা চলে গেল ওপরে। ঘরটা খালি হয়ে গেল।

মা জিজ্ঞেস করলে,—কীরে, আজ যে এত সাজগোজ করেছিস?

বুড়ু বললে,—ভেবেছিলাম, অঞ্জলিদের বাড়ি যাব।

—গেলি না যে?

বুড়ু মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললে,—তুমি যেতে দিলে কই?

—ওমা! শোনো কথা। আমি কখন বেটে বারণ করলাম! তুই নিজেই তো ঠায় বসে রইলি সেই সন্ধে থেকে।

বুড়ু আদরের সুরে বললে,—কী করে যাব বলো। যা মজা করছিলে তুমি!

মা কোনো কথা বললে না, চুপচাপ শুধু বুড়ুর পিঠে হাত বোলাতে লাগল।

—এবার পয়লা জানুয়ারি তুমি কী সাজবে মা?

মা বললে,—পয়লা জানুয়ারি। সে তো এখন ঢের দেরি।

—কোথায় ঢের দেরি? এইতো আর দুটো মাস। কী মজাই হবে সেদিন।

মা বললে,—আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে। এখন যাও একটু পড়ো গে।

এরপর আর অন্য কথা চলে না। বুড়ু উঠে গেল।

শুধু পয়লা জানুয়ারিই নয়—পয়লা বোশেখ, বড়দিন আর ঝুলনপূর্ণিমা। বছরের এই চারটে দিন বড়ো মজার। বুড়ুর মা এই চারদিন নানারকমের সাজ করে। ঝুলনপূর্ণিমায় সাজে কেষ্ট আর ঝিনুপিসি সাজে রাধিকা। তখন ঘরে খিল বন্ধ। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। দর্শক শুধু মেধাপিসি, রাঙাপিসি, ছোটকা আর সে। বুড়ুকেও আগে ঢুকতে দেওয়া হত না। এই গতবছর থেকে অনুমতি পেয়েছে। রাঙাপিসি অভিনয় করতে পারে না, কিন্তু অভিনয় দেখতে ভালবাসে। আর সাজাতে পারে সুন্দর।

—আজ তোমার কী পালা হবে বৌদি?

মা বলে,—মানভঞ্জন।

অমনি সাজ আরম্ভ হয়। মা সাজে কেষ্ট আর ঝিনুপিসি রাধা। রাধা সাজলে যেমন সুন্দর মানায় ঝিনুপিসিকে, কেষ্ট সাজলে তেমন মানায় না মাকে। কারণ মায়ের রং এত ফরসা যে কিছুতেই কেষ্ট বলে মনে হয় না।

তারপর যখন ঝিনুপিসিকে চেয়ারে বসিয়ে মা কেষ্ট সেজে ঝিনুপিসির হাঁটুর ওপর মাথাটা রেখে হাতের বাঁশিটি ঝিনুপিসির দিকে তুলে বলে—

দেহ দেহ দেহ রাই সাধের মুরলী
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি

তখন হঠাৎ ঝিনুপিসি সজোরে বলে ওঠে,—ও বৌদি, তুমি যেন সত্যি চরণের ধূলি নিয়ে বোসো না। বলেই হাসতে হাসতে ঝিনুপিসি লুটিয়ে পড়ে।

মা তখন উঠে প'ড়ে বলে,—উঃ! তুমি একেবারে হোপলেস দিদি। সবেমাত্র ভাবটা এসেছিল—

ঘরে আবার হাসির রোল। রাঙাপিসি হাসতে হাসতে ছটফট করছে—ঝিনুপিসির সাধের ফুলের মুকুট খসে পড়েছে।

এমনি অন্য অন্য বারেও।

বড়দিনের ছুটিতে হয়তো বা শুরু হয় ক্যারিকেচার।

এমন নকল করবে পাড়ার ছেলেমেয়েদের—বিশেষ করে নতুন বৌদের—যে হাসতে হাসতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

পয়লা বৈশাখ মা দেখায় ম্যাজিক।

সেদিন ঠিক সময়ে হঠাৎ ঘর অন্ধকার করে দেবে। খিল বন্ধ। ভেতরে দর্শক মাত্র ক'জন। চুপচাপ। আর দূরে অন্ধকারে মায়ের আবছা মূর্তি। মা নড়ছে না। শুধু দুহাতের ওপর কপাল ঝুঁকিয়ে দিয়ে কী যেন ভাবছে। অনেকদিনের পুরনো কথা—কত জন্ম আগের—আজ যেন সব মনে পড়ছে। চুপচাপ। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটছে। কেমন যেন ভয়-ভয় করছে। মা বলতে আরম্ভ করলে এই সময়। অস্বাভাবিক গম্ভীর গলা।—বন্ধুগণ, এ জন্মে আপনারা আমায় দেখছেন ঘরের বৌ। কিন্তু গতজন্মে ছিল আমার আর এক সত্তা। আমি—আমি ছিলাম রাজনটী। নাম ছিল রত্নাবাঈ। রাজকুমার দীপঙ্কর ভালবাসত আমায়। আমার নাচ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেত। নিজে ছুটে এসে তার গলার মালা পরিয়ে দিত আমার গলায়। আমি কৃতার্থ হতাম।

কিন্তু সামান্য রাজনটীর সঙ্গে রাজপুত্রের এই মিলন রাজরোষের কারণ হল। আমার ওপর এল নির্বাসন দণ্ড। কিন্তু সে দণ্ড আমি মাথা পেতে নিতে পারলাম না। আমি রাজকুমারকে বললাম—একেবারে মরে যাই সেও ভালো, তবু তোমায় না দেখে একটা মুহূর্তও আমি থাকতে পারব না।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমায় মরতে হল। কালিগঙ্গার কালো জল—কী শান্ত—কী শীতল—কী গভীর! আমি সেই জলে আত্মবিসর্জন করলাম।…

সমস্ত ঘরটা থম্‌থম্ করছে। কী আশ্চর্য গলা মায়ের! সত্যি যেন আর-এক যুগের মানুষ।

—হ্যাঁ, এ জন্মে এলাম আর-এক যুগের মানুষ হয়ে আর-এক জায়গায়। কিন্তু সেই নটীর অতৃপ্ত আত্মা আজও আমায় চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় নির্জন মুহূর্তে। আমি নিয়ত শুনতে পাই তার সেই নূপুরধ্বনি!

আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না? শুনুন—ভালো করে শুনুন—ঐ—ঐ বাজছে নূপুর!…

গা শিউরে ওঠে ঝুমুর। সত্যি সত্যি সেই অন্ধকার ঘরে খুব আস্তে অ—নেক—দূর থেকে যেন কার পায়ের নূপুর কেঁপে বেড়াচ্ছে—ঝুম্—ঝুম্—ঝুম্—।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে যায়। তন্ময় হয়ে আছে সব। হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। মা সুইচ অন্ করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে। কিন্তু চোখের কোণে জলের মতো কী যেন চিকচিক করছে।

এতক্ষণে হুঁশ হয় সবার। [illegible]বৌদি! পিসিরা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে।—কী সুন্দর করলে তুমি। কী নূপুরের শব্দ! কী করে মুখে শব্দ করছিলে?

ঝিনুপিসি বললে,—আর গল্পটা কেমন বানালে।

রেবাপিসি বললে,—আহা, ওদের মিলন করিয়ে দিলেই ভালো হত।

এমনি করে বছরের অনেক দিন—বিশেষ করে এই চারটে দিন মা বড়ো অদ্ভুত আনন্দ দেয়।

পয়লা জানুয়ারি মা সাজে পুরুষমানুষ। কখনো মাড়োয়ারী সেজে ঝিনুপিসিকে কীসব ঠাট্টা করে বসে। ঝিনুপিসির মুখ লাল হয়ে যায়। বলে,—আমার বড়ো ভয় করে। ওসব কথা বোলো না।

কখনো সাজে বুড়ো, আর ঝিনুপিসিকে সাজায় তরুণী বৌ। হাসতে হাসতে দাড়ি ছিঁড়ে যায়।

একবার অমনি এক পয়লা জানুয়ারি একটা ঘটনা ঘটেছিল।

ঠিক সন্ধেবেলা। আর একটু রাত্তিরেই মা সাজবে। কী সাজবে কিছু বলেনি। ঝিনুপিসি দোতলা থেকে গুন্‌গুন্ করে গান করতে করতে নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। যেই নীচে নেমেছে অমনি সিঁড়ির পাশ থেকে কে এসে জাপটে ধরেছে। ঝিনুপিসি চমকে ফিরে তাকায়—চোখে গগল্‌স, চুড়িদার পাজাবি পরা, মাথায় গান্ধীক্যাপ, ফরসা এক জোয়ান ভদ্রলোক। অমনি ঝিনুপিসি চেঁচিয়ে উঠেছে প্রাণপণে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় হুলুস্থুল। সেজঠাকুমা, ন'ঠাকুমা ছুটে এলেন,—কী হয়েছে? কী হয়েছে?

চাকরবাকর লাঠি নিয়ে হাঁক পাড়ছে,—কোন্ ধার—কোন্ ধার?

যুবকটি তক্ষুণি ঝিনুপিসিকে ছেড়ে দিয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে এসে হাজির। চশমা খুলে গিয়েছে, টুপি উড়ে গিয়েছে, ফরসা মুখখানা হাসিতে লাল হয়ে উঠেছে।

ঝিনুপিসি সব বুঝতে পেরে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে,—উঃ, কী ঠকান ঠকিয়েছ বৌদি। বাবাঃ।

মা তখনো বসে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে হাসছে। সেজঠাকুমা নীচে এসে মুখ ভার করে বলে গেলেন,—কী যে ছেলেমানুষি কর বৌমা—মোটে ভালো লাগে না।

তা অন্য কারও ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, ঝুমুর ভালো লাগে—খুব ভালো লাগে এসব। এমন মা হয়ন কারও।

লক্ষ্মী মা-মণি! সোনা মা-মণি! মা বড়ো সুখী।

দেখতে দেখতে এল পয়লা আশ্বিন। আজ স্কুল-কলেজ বন্ধ। সকাল থেকে ঝুমুর সময় আর কাটে না

কখন সন্ধে হবে। ঘোরে ফেরে আর মায়ের দিকে তাকায়। মা আজ কারও সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। কী সাজবে তাও কেউ জানে না। মা চুপচাপ সংসারের কাজ করে যাচ্ছে। মাহুপিসি রেবাপিসি এখনও সর্বক্ষণ ঘুরছে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। সবাই তাকাচ্ছে মায়ের দিকে। কিন্তু মাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। আজ যে সন্ধেবেলায় মা সাজবে তা কিছুতেই দেখে বোঝা যায় না।

সময় কাটে কই? কিন্তু তা না কাটুক, যত দেরিতেই হোক না কেন, সন্ধে একসময় হতেই হবে। কিন্তু দোহাই ভগবান, দেখো আজ—অন্তত আজ সন্ধেতে কেউ যেন না এসে পড়ে আমাদের বাড়ি। তা হলেই সব মাটি। মা তাহলে আর কিছুতেই সাজবে না।

শেষ পর্যন্ত সন্ধে হল ঠিক সময়েই। আর বোধহয় এদের সমবেত প্রার্থনাতেই অন্তত এই সন্ধেবেলায় বাইরের কেউ এলনা বেড়াতে।

দর্শকরা—অর্থাৎ রেবাপিসি মাহুপিসি ছোটকা আর সে নিজে বসে আছে চুপ করে। অধৈর্য হয়ে উঠছে। একটু আগে বিনুপিসিকে নিয়ে মা চলে গিয়েছে ওপরে। বুঝতেই পারা যাচ্ছে, পুরুষমানুষ আর-মেয়েমানুষ সাজা হবে আজ। মা পুরুষমানুষ—বিনুপিসি মেয়েমানুষ। কিন্তু কী সাজবে—রাজারানী না সাঁওতাল-সাঁওতালনী কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একেবারে সেজে নামবে। উঃ, কী সাংঘাতিক মুহূর্ত!

ঐ আসছে বোধহয়। কিন্তু ও কার পায়ের শব্দ!

মস্—মস্—মস্…

মাহুপিসিও চমকে উঠেছে।

জুতোর শব্দ দরজার বাইরে এসে থেমে গিয়েছে।

কিন্তু কোনো সাড়া নেই। ভেতরেও সবাই চুপ হয়ে গেছে। কে এল?

ঠক্—ঠক্। দুবার শব্দ কড়া-নাড়ার। মৃদু ভদ্র শব্দ।

মাহুপিসি উঠে গেল তাড়াতাড়ি। দরজা খুলে দিল। সামনেই এক সাহেব আর এক মেম! হ্যাঁ, একেবারে সাহেব। ফরসা ধবধবে রঙ। মাথায় কালো ফেল্টের টুপি—ফুল্‌প্যান্ট শার্ট কোট! হাতে একটা ছড়ি!

আর মেম—ফুটফুটে মেম। একমুখ হাসি।

মা গো মা! কী কাণ্ড! কী সুন্দর লাগছে মাকে। ঠিক একেবারে সাহেব! হাতে আবার জ্বলন্ত সিগারেট!

—মে আই কাম ইন?

চোখের ওপর একটা হাসি ফুটিয়ে সাহেব একবার তাকালো সবার পানে।

মাহুপিসি হেসে বলল,—ইয়েস।

অমনি সাহেব সেই মোটা জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে টিপে নিভিয়ে, মেমের হাতখানা নিজের মুঠোয় নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মার্চ করে।

দুখানা চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল আগে থেকেই। বসল দুজনেই। সাহেব বসল পায়ের ওপর পা তুলে—ডান হাতের ওপর থুতনি রেখে। ছড়িটা রইল চেয়ারে হেলানো। মেম রুমালে মুখ ঢেকে কেবলই হাসছে।

কিন্তু সাহেব হাসছে না। গম্ভীর করছে মুখ। আর তাকিয়ে আছে ঠিক তারই চোখের দিকে।

হঠাৎ খুকু যেন চমকে উঠল। ঠিক এমনিধারা কাকে যেন কোথায় দেখেছে। ঠিক এই পোশাক—ঐরকমের কালো টুপি—কালো প্যান্ট আর ঐ ছড়ি। ঠিক অমনি বসবার ভঙ্গি। কোথায়? কোথায় দেখেছে?

সাহেব ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে মেমের সঙ্গে ইংরিজিতে গল্প জুড়েছে। তারপর হঠাৎ ইংরিজি গান। দুজনে মিলে গাইছে। কী মাথা-নাড়ার ধুম। উঃ,, বিনুপিসিটা কখন লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের সঙ্গে রিহার্সাল দিয়েছে দেখেছ!

তারপর একসময়ে আসর ভাঙল। মা চলে গেল ওপরে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো খুকুও চলল পেছন-পেছন। মাকে আর-একবার দেখবে ঐ পোশাকে। ঠিক যেন কার মতো দেখতে।

দরজা ঠেলে তিনতলার মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল খুকু।

—মা!

মা তখন টাইটা খুলছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

—কী রে, ওপরে চলে এলি যে?

এতক্ষণে খুকু চিনতে পারল এই পোশাকগুলো। হ্যাঁ, ঐ টুপি—ঐ কোট—ঐ প্যান্ট, এমনকি ঐ ছড়িটা।

ছুটে গিয়ে আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরল মাকে।

—এগুলো সব বাবার না?

হঠাৎ যেন কেমন থমকে গেল মা। মুখটা শুকিয়ে গেল। যেন কতবড়ো অপরাধ করে ফেলেছে।

—না না, খুলো না, এখুনি খুলো না। আমার আর-একটু দেখতে দাও। ঠিক আমার বাবা। আমি বাবাকে একটু আদর করি।

এই বলে খুকু যত গভীরভাবে মায়ের বুকে মাথা ঘষতে লাগল ততই যেন তার মনে হতে লাগল কেমন একটা সুখের কান্না তার ভেতর থেকে দলা পাকিয়ে উঠছে।

চোখের জলে টাই ভিজে গেল—বাবার কোট ভিজে গেল। তা যাক, তবু তার বাবা রাগ করবে না। এমনি করে আজকেও তার বাবার বুকে মুখ রেখে আদর খায়।

কিন্তু তার চোখে কি জল পড়ে তখন?

◆

বাংলার বাজেট—১৯৬০-৬১

কালীচরণ ঘোষ

সংক্রামক ব্যাধির বিভীষিকা বিস্তার করিয়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বাজেটগুলি ফেব্রুয়ারি মাসে আসিয়া দেখা দেয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর লোকে বাজেটের নামে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। পরিকল্পনার বোঝা লইয়া ভারত-সরকার শাসনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রতি পরিকল্পনা বাবদ ১০ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন এবং তাহা মিটাইবার জন্য পরের নিকট ভিক্ষা, ঋণ, নোট-ছাপা আর ট্যাক্স হাত মিলাইয়া দেখা দেয়। এই চাপের নীচে করদাতারা পড়িয়া জীবন্মৃত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার নূতন ট্যাক্স চাপাইয়া দেয়; রাজ্য-সরকারের পিছাইয়া থাকিবার কথা নহে। পরিকল্পনার খরচ সঙ্কুলানে তাহার একটা বড় অংশ আছে, সুতরাং তাহারও টাকা চাই। তাহার আবার কেন্দ্রীয় সরকারের মতো টাকা ছাপাইবার ক্ষমতা নাই, কাজেই সমস্তটা ট্যাক্স বসাইয়া আদায় করিতেই হয়। ইহার সম্মিলিত ফলস্বরূপ লোকে বাজেটের নামে আঁতকাইয়া উঠে। বিশেষ প্রয়োজনে 'সীজন' আবার নূতন ট্যাক্স বছরের মাঝেই যে আবির্ভূত না হয়, তাহা নির্ভয়ে বলা যায় না, তবে বৎসরের প্রথমেই (১লা এপ্রিল) যাহা চাপিয়া বসে, তাহার পর আর যাহা আসে তাহা নিতান্ত 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি'।

রেল ও কেন্দ্রীয় বাজেট বড় কথা। ঘরের কথা—বাংলার ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটের বিষয় সামান্য আলোচনা করিলে প্রকৃত অবস্থার একটা আভাস পাওয়া যাইবে।

আলোচ্য বর্ষে জমার হিসাব হইতে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়—

আয় (হাজার টাকার হিসাবে)

	নিট্ (প্রকৃত) ১৯৫৮–৫৯	বাজেট ১৯৫৯–৬০	সংশোধিত ১৯৫৯–৬০	বাজেট ১৯৬০–৬১
রাজস্ব	৮০,৩৮,৭০		৯১,৪৯,৩১	৮৮,১৭,০০
ঋণ হিসাবে প্রাপ্তি	৪০,৬৬,৭৫		৩৯,২৩,১৪	৪১,৩৯,৪০
সরকারী হিসাব সংক্রান্ত (ঋণ, সুদ প্রভৃতি)	১২২,৯৯,৭৯	৯৪,৩০,০৯	২৩৬,৮১,৩১	১৮২,৪৪,২৮
হাতে মজুত	৫,৯৬,৩১	২,২৮,১৩	৮৭,৮৩	৮,০০,৭১
মোট	২৫০,০১,৮৭	২২৮,৭৬,৬৩	৩৬৮,৩৪,৮৯	৩৩০,৩২,৩৯

ব্যয় (হাজার টাকার হিসাবে)

	নিট্ (প্রকৃত) ১৯৫৮–৫৯	বাজেট ১৯৫৯–৬০	সংশোধিত ১৯৫৯–৬০	বাজেট ১৯৬০–৬১
রাজস্ব খাতে	৭৯,৩৪,৪৩	৮২,৩৭,১০	৮৬,৪৪,৩৪	৮৯,২২,৯০
পুঁজি খাতে	২৩,৯২,৫৩	২৬,৭৭,৫৪	২৬,০৬,৫২	৩৩,৯৬,৭৬
ঋণ খাতে	১৪,৭০,৭৬	২৩,২৬,৪১	১৬,৩৯,০৮	২৩,৩৩,৯৯
সরকারী হিসাব সংক্রান্ত (ঋণ, সুদ প্রভৃতি)	১৩১,১৭,৩৯	৯৩,৫৯,৮০	২৩১,৪০,৯৩	১৭৮,৪৪,০৬
জের (হাতে মজুত)	৮৭,৮৩	২,১৭,৮৮	৮,০০,৭১	৫,৩৫,৫৮
মোট	২৫০,০১,৮৭	২২৮,৭৬,৬৩	৩৬৮,৩৪,৮৯	৩৩০,৩২,৩৯

১৯৬০-৬১ সালের মোট হিসাবে প্রায় ২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা যাইতেছে। সাধারণ লোকের পরম সৌভাগ্য যে, নূতন (রাজ্য-) কর ধার্য করা হয় নাই। সে কাজ বড়কর্তা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার একাই হাতে লইয়াছেন।

সাধারণ মানুষের সহিত রাজস্ব খাতের আয়-ব্যয়ের সহিত সম্বন্ধ নিকট; তাহারই সহিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা জড়াইয়া আছে। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

আয়ের হিসাবে মোট ৮৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা দেখানো হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ সাধারণ মানুষ যোগাইয়াছে প্রধানতঃ ট্যাক্সের মাধ্যমে। সাধারণ ব্যবহারের জিনিসটি কিনিতে গেলে বিভিন্ন হারে ট্যাক্স দিতে হয়। ইহা ছুঁচ-রূপে দেখা দিয়া, এখন ইহা বিরাট ফালের আকার ধারণ করিয়াছে। বিভিন্ন ট্যাক্সের খাতে আয় শতকরা ৪৯ ভাগ (৪৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৪ হাজার); তাহার মধ্যে বিক্রয় (ক্রয়) শুল্ক হইতে ১৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। ১৯৫৮-৫৯ সালের পূর্বে বিক্রয়-কর এবং অন্যান্য [যথা—ইলেকট্রিসিটি ট্যাক্স, এন্টারটেনমেন্ট (আমোদ), বাংলার সীমানার মধ্যে মাল আসা, প্রভৃতি] একসঙ্গে প্রকাশ করা হইত। যাহা হউক, এই দুই খাতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৭'৩০ কোটি টাকা, ১৯৫৭-৫৮—১৮'৯৩ কোটি টাকা, ১৯৫৮-৫৯—২০'৮১ কোটি টাকা, ১৯৫৯-৬০—২৫'৬৭ কোটি টাকা এবং ১৯৬০-৬১ সালের হিসাবে ২৫'৯৪ কোটি টাকা আয় হইয়াছে বা হইতেছে। অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ হইতে চারবৎসরে ট্যাক্সের পরিমাণ দেড়গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। (১৯৬০-৬১-র হিসাব নিতান্ত কম করিয়া ধরা হইয়াছে, কারণ ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটে বিক্রয়-কর ১৩'৭০ কোটি ধার্য ছিল, প্রকৃত দাঁড়াইল ১৬'৮২ কোটি টাকা এবং অপরাপর ট্যাক্স ও শুল্ক ৭'৭১ কোটি টাকার স্থলে ৮'৮৪ কোটি টাকা হইল।)

এখানে বলিয়া রাখা যায় যে, বৎসরের বাজেট হইতে প্রকৃত আয় হয় অনেক বেশী; যথা—রাজস্ব খাতে ১৯৫৯-৬০ বরাদ্দ ছিল ৭৯'০৪ কোটি টাকা, কার্যক্ষেত্রে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৯১'৫০ কোটি টাকা। আর ১৯৬০-৬১ সালে দেখানো হইল ৮৮'১৭ কোটি টাকা। মোট ঘাটতি ২'৬৪ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। অপব্যয় যদি না থাকে, তাহা হইলে আলোচ্য বর্ষের শেষে প্রচুর উদ্বৃত্ত দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা।

অপর বড় আয় ভূমি-রাজস্ব ১৯৬০-৬১ সালে ৫'৮০ কোটি টাকা ধরা আছে। ইহার প্রায় সবটাই, শতকরা ৭৮'৮ ভাগ, খাজনা আদায় এবং কিঞ্চিৎ জমিদারি-স্বত্বের ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিয়া যাইবে। এই খাতে ১৯৫৬-৫৭ হইতে ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত সামান্য আয় বাড়িয়াছে। রাজ্য-আবগারী-শুল্ক মোটা টাকা আনিয়া দেয়। ১৯৬০-৬১ সালে ৫'৩৭ কোটি টাকা আয় হইবে। স্ট্যাম্প হইতে কিছুকাল যাবৎ ৩ কোটি টাকা আদায় হইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার নানা আকারে ট্যাক্স আদায় করিয়া তাহার কতকটা অংশ প্রতি রাজ্যে বাঁটিয়া দেয়। প্রধানতঃ লোকসংখ্যার অনুপাতে এই টাকার ভাগাভাগি হইয়া থাকে। ফলে, যখন পশ্চিমবাংলা হইতে টাকা আদায় হয় অনেক বেশী, পাওনার বেলায় তাহা অনেক কম হইয়া যায়। বহু রাজ্যে যেখানে পশ্চিমবাংলার অর্ধেকও আদায় হয় না, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তাহারা মহা আনন্দে 'নেপোয় দই মারা'র মতো বিনা ত্যাগে ঘরে বসিয়া জমিদারির টাকা ভোগ করে।

কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ন্যায্য-পাওনা হিসাবে (১৯৬০-৬১) ১২'৫৬ কোটি টাকা পাইবার কথা। ইহার মধ্যে আয়কর-খাতে ৫'২৪ কোটি এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন-শুল্কের অংশ ৬'০৩ কোটি টাকা। বাকী সম্পত্তি-কর বাবদ ৪৯ লক্ষ এবং রেল-মাশুল বাবদ ৮০ লক্ষ টাকা। ইহারা বাংলা-সরকারের মোট আয়ের ১৪'৩ শতাংশ। প্রতিবৎসর ইহা হ্রাস পাইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'দান' অর্থাৎ তাহাদের নির্দেশে যে টাকা খরচ করিতে হয় তাহা বাংলার মোট আয়ের প্রায় সিকি (২৪'৩%) এবং পরিমাণ ২১'৪৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে নানাবিধ উন্নয়ন কার্যোপলক্ষে ৯'১৫ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট ও আরব্ধ কাজ বাবদ ৪'৫৭ কোটি টাকা ধার্য আছে।

আয়ের ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে। যেখানে চাপ দিলেই ট্যাক্স আদায় হয়, সেইসকল ক্ষেত্রেই বাংলা-সরকারের আয় বাড়িয়াছে। যেসকল বিভাগ সরকারী পরিচালনায় কাজ করে, এমনকি বহু কোটি টাকা মূলধনের ব্যবসায়ে লগ্নী হইয়াছে সেখানেও উল্লেখযোগ্য আয় বাড়ে নাই; কোথাও কোথাও হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং যদি শাসনযন্ত্রকে এক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বলা যায় যে, পরিচালকবৃন্দ নিজেদের 'পাওনা' ভালো করিয়া বুঝিয়াছেন, অন্য কৃতিত্বের কোনও পরিচয় দিতে পারেন নাই।

রাজস্ব খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৮৯'২৩ কোটি টাকা পূর্ববৎসরের ব্যয় অপেক্ষা সামান্য বেশী, ২'৬৮ কোটি টাকা। ইহার প্রধান কারণ, দুর্ভিক্ষ খাতে বরাদ্দ ৩'৮৪ কোটি টাকার স্থলে ৬'১৪ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যকল্পে অন্ন, বস্ত্র, গৃহনির্মাণ ও বীজক্রয় ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে দান করিতে টাকা বেশী পড়িয়া গিয়াছে।

বাংলায় শিক্ষা-বিভাগে খরচ সর্বাপেক্ষা বেশী, ১৩'৭৬ কোটি টাকা ; মোট (রাজস্ব খাতে) ব্যয়ের ১৫'৪ শতাংশ। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা ১৬'৬ ছিল, এবারে হ্রাস পাইয়াছে। একা শিক্ষা-উন্নয়ন (development schemes) পরিকল্পনায় ৯'৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ হইতেছে। শিক্ষা-উন্নয়নে যে 'খিচুড়ি'র উৎপত্তি হইয়াছে, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে সমস্যার পর সমস্যা জমিয়া যে ধূম্রজালের ব্যূহ রচিত হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে অর্থের পরিমাণ নিতান্ত কম বলিয়া মনে হইবে না, ইহাই সান্ত্বনা। বলা বাহুল্য, শিক্ষা (ব্যবস্থা)-বিভাগ সরকারী আয়ের একটি বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। ১৯৫৯-৬০ সালে এই আয় ৪'০৫ কোটি টাকা ছিল এবং আলোচ্য বর্ষে ৪'৬৪ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইহার মধ্যে ৪'২৪ কোটি টাকা দিতেছে। ছাত্রছাত্রীর বেতন বাবদ ২০ লক্ষ এবং 'কিতাব' বিক্রয় করিয়া বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা মুনাফা থাকার কথা।

'পুলিশ' লইবে ৯'০৮ শতাংশ (৮'১০ কোটি টাকা)। ইহাদের বাৎসরিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছে। আর-কয়েকটি বড় খরচের হিসাব নিম্নে সংখ্যা-তালিকায় দেওয়া হইল :

বিভাগ	মোট ব্যয় (হাজার টাকা)
চিকিৎসা	৬,৩০,৬২
কৃষি	৫,১৯,৮০
গৃহ ও রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণ	৫,৭০,১১
জনস্বাস্থ্য	৩,৭৬,১২
(পল্লী-) উন্নয়ন	৩,৫৫,৯৯
শাসন বা পরিচালনা	৩,৫০,৯৮
সেচ, বাঁধ প্রভৃতি	২,০৮,০৫
দুর্ভিক্ষ, বন্যা (-প্রতিরোধ)	২,৯৮,৫০
অতিরিক্ত ব্যয় (অন্ন-ব্যবস্থা)	২,১৬,০৯
ইত্যাদি, ইত্যাদি	

Champion
REGD.

A pen which leaks, clogs and smudges makes writing tedious and tiresome. The CHAMPION pen is an exception.

Manufactured according to the latest precision techniques, it makes writing effortless and pleasurable. Available in a wide range of styles and colours, at prices to suit everyone.

GUJRAT
INDUSTRIES
PRIVATE
LIMITED

Lalji Mansing Bldg., Lohar Chawl,
Bombay-2

স্থানাভাব বশতঃ কোনও বিষয়েরই বিশদ আলোচনা এখন সম্ভব নয়। এত অর্থব্যয়ে বাংলার অধিবাসী কী সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, তাহা পথচারী যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যাইবে। যাঁহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছেন, তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ করা সম্ভব নয়; তাহা না হইলে বলিতে পারা যায়—শান্তি, শৃঙ্খলা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে দেহে প্রাণ ধরিয়া রাখতেই মানুষ প্রাণান্ত হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু 'জালার উপর পালার বাড়ি'—সকল যন্ত্রণার বোধ অধিকতর তীব্র তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। একটি উদাহরণ দিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যখন লোকে নানা অভাবে বিব্রত, তখন রাজ্যপাল বিধান-সভা-পরিষদে বাজেট-সভার উদ্বোধনকালে তাঁহার রাজ্যের নাগরিকদের (২৩।২।৬০) ব্যক্তিগত ত্যাগস্বীকার দ্বারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার সদুপদেশ দিলেন। এই উদাত্ত আহ্বানের পর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে আর কাহারও পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়। ইহার পরই স্বাভাবিক নিয়মে বুঝিতে হয়—তিনি নিশ্চয়ই নিজ আচরণের দ্বারা আদর্শ স্থাপন করিতেছেন, নতুবা এ কথা বলিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই; তাঁহার বাণী বাজেটের পৃষ্ঠায় নিশ্চয়ই প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে—এ আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, কারণ তিনি যাঁহার আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন, তিনি ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরিসীম ত্যাগের দৃষ্টান্ত লোকসমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন।

বাজেট যাহা বলে, তাহা আমাদের সকল আশা-ভরসা ধূলিসাৎ করিয়াছে; তাঁহার সম্পর্কে বাজেটের কয়েক পৃষ্ঠা লোকসমক্ষে উপস্থাপিত না হইলে হয়ত ভালোই হইত। এককথায় বলা যায়, পূর্ব পূর্ব বৎসর হইতে তাঁহার জন্য এক (নয়া) পয়সাও খরচ কম ধরা হয় নাই। নিম্নে সামান্য পরিচয় দেওয়া যাইতেছে, পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন এই দরিদ্র দেশের পক্ষে এই গুরুব্যয় মারাত্মক কিনা:

	১৯৫৮–৫৯ টাকা	১৯৫৯–৬০ টাকা	১৯৬০–৬১ টাকা
রাজ্যপালের বেতন	৬৬,০০০	৬৬,০০০	৬৬,০০০
অতিথি-সৎকার	১,০৩,০১২	৯৪,৩০০	৮৪,০০০
গৃহস্থালির লোকজন :			
সামরিক সেক্রেটারি ও অফিস			
সার্জন (চিকিৎসক ও অফিস)			
রাজবাটীর গালিচা, পর্দা ইঃ			
ফার্নিচার ও কার্পেট	২৮,০১৫		
পর্দা ও তাকিয়ার আবরণ	৫,১১৩		
অপরাপর সরঞ্জাম	৪,৭৫১		
নূতন ফার্নিচার ও কার্পেট	১৫,০৬২		
বিবিধ খরচ (সেক্রেটারির অফিস)	১,৫৩,১০২		
মোটর, লোকজনের পোশাক-পরিচ্ছদ	১,৩৮,৫৮০		
ভ্রমণ-সংক্রান্ত ব্যয়	১,০২,৯৬৫		

১৯৫৯-৬০ সালে যে টাকা বরাদ্দ (estimate) হইয়াছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার অধিক খরচ হইয়াছে; বাহুল্যভয়ে তাহা এখানে দেওয়া হয় নাই। মোট কথা, এক রাজ্যপাল উপলক্ষ্যে কলিকাতা, ব্যারাকপুর, দার্জিলিং প্রভৃতি রাজবাটী বাদে বৎসরে ৬,৫০,৪০০ টাকা ব্যয় হইতেছে।

তাঁহার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবার পর যেখানে তিনি পদার্পণ করেন, সম্ভবতঃ সেখানেও খরচ রাষ্ট্রীয় সরকারী তহবিল হইতে করা হয়। বঙ্গ-বিধান-পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল পরিষদ-কক্ষে প্রশ্ন করেন যে, তিনি বহরমপুরের এস্.ডি.ও.কে ১৯৫৯ সালে ২৭শে অক্টোবর যে পত্র দেন তাহাতে জানিতে চাহিয়াছিলেন, ১৫ই অক্টোবর তারিখে কান্দিতে রাজ্যপালের অবস্থানকালে তাঁহার জন্য কিঞ্চিৎ-ন্যূন ১৫০৲ টাকার যে স্পিরিট্স্ (উত্তেজক-পানীয়) সরবরাহ করা হইয়াছিল এবং পরদিন এস্.ডি.ও. দোকানে যে ঐ টাকা পরিশোধের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, এ সংবাদ মিথ্যা কিনা, এবং যদি মিথ্যা না হয় তবে কোন্ হিসাব হইতে এই টাকা দেওয়া হইয়াছে।

এন্.ডি.ও.র নিকট হইতে উত্তর না পাইয়া শ্রীসান্যাল পরিষদ-কক্ষে স্পীকারকে প্রশ্ন করেন, পরিষদের সভ্য হিসাবে যে-তথ্য তিনি জানিতে চাহিয়াছেন তাহার উত্তর কোন্ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট তিনি প্রত্যাশা করিতে পারেন। কেহ উত্তর দেন নাই। আমাদের বিশ্বাস এবং শ্রীসান্যাল মহাশয়েরও সন্দেহ রহিয়াছে যে হয়ত ভিত্তিহীন সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে এবং অনতিকালের মধ্যেই সরকারী উত্তর হইতে ইহার অলীকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। প্রশ্ন এই, যিনি রাজাসনে আসীন (1) এবং যিনি যখন তাঁহাকে 'ছমড় কোঁড়কে' দু'হাতে অর্থ দিতেছেন—তাঁহার সম্বন্ধে এ-কথা উত্থাপন করিতে শ্রীসান্যালের মতো বিজ্ঞ পারিষদজ্ঞানসম্পন্ন প্রবীণ লোক নিশ্চয়ই একশোবার চিন্তা করিয়াছেন। ইহা সত্য না হইতে পারে, তথাপি এইরূপ কোনও কারণে যদি সামান্য অর্থও ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কিছু নাই হউক—অন্ন, বস্ত্র, বাস, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা লইয়া যাহারা কূলকিনারা খুঁজিয়া পায় না, তাহাদের আর কৃচ্ছ্রসাধনের মূল্যমর্ম নিতান্ত 'পরিহাসবিজল্পিতম্' বলিয়া মনে হয়।

বাজেট করিতে হয়, করা হইয়াছে; যাহারা গড়িয়াছেন, তাঁহারা ভোটের জোরে একদিনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন করিয়া 'হিঁয়াকা মাটি হুঁয়া' করিয়া দিতে পারেন; সাধারণ লোক তাহার জন্যও খরচ জুটাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইবে।

বাজেট করিতে হয়, করা হইয়াছে। ব্যয়ের বহর দেখাইয়া লোককে চমৎকৃত করিবার ইহা এক প্রকৃষ্ট উপায়। টাকার অনুপাতে কাজ কতটা হইয়াছে, তাহা দিয়া বাজেটের ব্যয় বিচার করিতে হয়। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যর্থতা আজ প্রতি অভিভাবককে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। জীবনযুদ্ধের উপযোগী শিক্ষা লাভ করা যায় না বলিয়া ছাত্রমহলে তীব্র অসন্তোষ নানা আকারে ফাটিয়া পড়িতেছে। পুলিশের কর্মদক্ষতা ও তৎপরতার কোনও লক্ষণ নাই; উপরন্তু জনসাধারণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে সে-সম্বন্ধে পুলিশ-প্রধানকে প্রায়ই উপদেশ দিতে হয়। 'পরিকল্পনা' রূপায়িত হইবার পূর্বে যে-বন্যার তাণ্ডব ছিল, আজ বহু শত কোটি টাকা ব্যয়ে বন্যা তাহা অপেক্ষা গুরুতর আকারে দেখা দিতেছে। কৃষির উন্নতির ব্যয় আছে, অন্নাভাব দুর্ভিক্ষকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে; শিল্পের উন্নতি আছে, পরিধানের বস্ত্র নাই; চিকিৎসা-বিভাগে ব্যয় আছে, হাসপাতালে রোগীর দুরবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছে; পল্লী-অঞ্চল জলাভাবে, সংক্রামক মহামারীতে বিপন্ন; যানবাহন-পথঘাটের উন্নতিতে মানুষ প্রাণ হাতে করিয়া ট্রেনে বাসে ট্রামে যাতায়াত করিতে বাধ্য হইতেছে। কোথাও সুখ নাই, বাজেটের আয়-ব্যয় দেখিয়া মনে হয়, যাঁহারা সুখে আছেন—প্রভাব-প্রতিপত্তি যথাযোগ্য প্রয়োগ করিতে পারেন, তাঁহাদের হয়ত কতকটা সুখ-সুবিধা বাড়িয়াছে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের উৎসন্ন যাইবার বহু সুযোগ আসিয়াছে বাজেটের সাহায্যে।

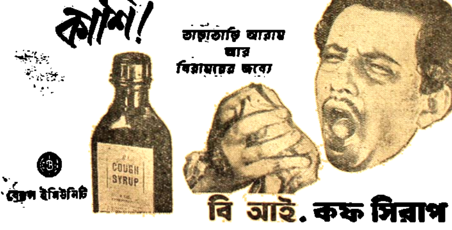

চেনাশোনার বাইরে

অজয়মোহন ভট্টাচার্য

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

বিশে জুন সকালবেলায় পাহাড়ী-দলের কাজ অনেকক্ষণ তদ্বির করে একেবারে অন্যপ্রান্তে দুর্গাপ্রসাদদের দলে গিয়ে কাজ করছি। মির্জাপুর-দল আর রাজেন গুপ্তার দল খুব কাজ করেছে। ওদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আজ থেকে ডিনামাইটের কাজ শুরু হয়ে গেছে। দুটো বাঁকের মাথায় ঝোলা-পুল-মতো করে রেলিং দেওয়া চলছে। আজ জীপটাকে নিয়ে পরীক্ষা চললো। জীপটা দুর্গাপ্রসাদের দলের জায়গা অবধি গেলো। খুব খুশী আমরা সবাই।

যেসব মুরুব্বিরা প্রথমটায় মুখ বেঁকিয়ে পরিহাস উপহাস করেছিলেন এ-ক'দিন, আর তাঁদের দেখা নেই। মনের আনন্দে সবাইকে উৎসাহ দিয়ে ঘুরছি এ-দল ও-দল।

আম্বানা-সাহেবকে দেখলাম মন্ত্রী কেলকর-সাহেব এবং সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসছেন হাসতে হাসতে।

"কেমন কাজ চলছে?"

"চমৎকার !! আশাতীত !!"

"শুনুন, আজ বিকেলে একটা মীটিং করবো।"

"আবার মীটিং ?"

"হ্যাঁ, করতেই হবে। কংগ্রেস-পার্টি-পেপারে আমাদের প্রশংসা করে, খবর বেরিয়েছে। সেটা জানাবো এবং গঠনমূলক কিছু কাজও করবো।"

আমি থমকে ভাবতে লাগলাম।

আম্বানা বুঝে বললো—"আপনি বৃথা চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক সামলে নিতে পারবো। দুর্গাপ্রসাদ প্রভৃতি দু'চারটে লোককে একটু শিক্ষা না দিলে ওরা পরে বড়ো ক্ষতি করতে পারে।"

আমি বাধ্য হয়ে বললাম—"আম্বানা-সাহেব, ক্যাম্পের ডাইরেক্টর আপনি। যা বলবেন হবে। তবে আমি কোনও পার্টির ক্যাম্প বলে আসিওনি, আসতামও না। এখানে কোনও পলিটিক্স চলা উচিত কিনা সে-বিষয়ে আমার মতামত না নিলেও আমি আমার কর্তব্য জানি। আমি কোনওরকম পলিটিক্সে থাকতে সম্পূর্ণ নারাজ। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতবাদ আমি কারুর ওপর চালাবো তো নাই-ই, এমনকি কারুর সঙ্গে আলোচনাও করবো না। আপনাদের মীটিং সার্থক হোক সফল হোক, এই কামনা করি।"

কিন্তু তা হয়নি। যা হয়েছিল তার চেয়ে বিশ্রী পরিস্থিতি আর হতে পারতো না।

আগাগোড়া আম্বানাই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বিষয় ছিল—দেশে ফিরে গিয়ে প্রান্তে প্রান্তে 'শ্রমদান দিবস' উদ্‌যাপন করার ব্যবস্থা করা, যাতে দেশবাসী জানতে পারে এই শিবিরে ছেলেরা এতদিনে কী করেছিল। এর সঙ্গে আম্বানার রীতি অনুযায়ী দুটি উৎকোচ প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হোলো। এক—নেহেরুর স্বাক্ষরিত নিজের ফটোগ্রাফ একখানা করে প্রতি ক্যাম্পারকে উপহার দেবেন, এবং রাষ্ট্রপতি-ভবনে ক্যাম্পারদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হবে।

কে একটি ছেলে প্রশ্ন তুললো—"'শ্রমদান দিবস' পালন কে করবে, কারা করবে, কোন্ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে করবে?"

"অবশ্যই কংগ্রেস"—বললেন আম্বানা।

"অবশ্যই নয়"—বললে বাম্মা।

"অবশ্যই নয়"—বললে দুর্গাপ্রসাদ।

পরে বোঝা গেল গুপ্তা, বাইসারিয়া, মালহোত্রা প্রভৃতি ছেলেদের আগে থেকে কেউ তাতিয়ে রেখেছিলো ঐ সভায় বাম্মা, দুর্গাপ্রসাদ, প্যাটেল, পারিখ প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ জানাতে।

গোল বেধে উঠলো। হঠাৎ আম্বানা ব্যক্তিগতভাবে কী বলে ফেললেন দুর্গাপ্রসাদকে। অমনি একেবারে হৈ-চৈ, প্রায় হাতাহাতি। রক্ষা পায়না দল। দুর্গাপ্রসাদ ও বাম্মা ক্ষুব্ধ হয়ে পর পর অনেকগুলো উত্তপ্ত উক্তি করলো। কথায় ভাষা তখন সীমা ছাড়াতে শুরু করেছে।

আমি ক্ষোভে হতাশায় যেন ভেঙে পড়লাম। কী স্বপ্ন কোথায় তলিয়ে গেল! এখন রক্তারক্তি না হয়। ডাক্তারটা আপন মৌজে শুয়ে আছে; তাকে পাবার জো নেই। হুকসিং উপস্থিত। আমায় ধরেছে। এদিকে নির্মল বলছে—"কিছুতেই না। আপনার নিষেধ যখন মানেনি তখন যাক চুলোয়।"

বুড়ো ক্ষেমচন্দ্র তখন এসে জড়িয়ে ধরে বললে—"এখনও দেখবে এই দৃশ্য? এতো খাটলে, এতো করলে, এখন সব ভেসে যাবে? একি?" ভবানন্দ তখন রুদ্ধস্বরে বললো "বাবা"।

এই ভবানন্দকে আহানা অপমানবিদ্ধ করেছিল। আজ ক্যাম্পের বদনাম হবার সময়ে ওর প্রাণ কেঁদে উঠেছে।

ডাকলাম প্রাণপণ জোরে—"দুর্গাপ্রসাদ, বাবা!"

হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো ওদের।

আহানাকে পাশে টেনে নিয়ে বললাম—"আপনার অসুস্থ শরীর নিয়ে এই মীটিং করা আপনার সাহসের পরিচয় হতে পারে, কিন্তু বিবেচনার পরিচয় নয়। আপনি যান। আরাম করুন। আমি এই মীটিং চালাবো। ওঙ্কা সভাপতি হোন, আমি বক্তৃতা করি। তারপর সকলে বক্তৃতায় সুযোগ পাবে। আমার প্রথম প্রস্তাব যে এখানে একটা পোশাকী পার্লামেন্ট ডাকা হোক। আমি স্পীকার, আহানা সভাপতি। সরকারী দলের মুখপাত্র হোন বাইসাহিব্‌ আর বিপক্ষদলের মুখপাত্র হোন দুর্গাপ্রসাদ। দ্বিতীয় প্রস্তাব—আজ মুশায়রা এবং গানের জলসার ব্যবস্থায় আমারও গান হবে আপনারা অনুমোদন করুন।"

এমন একটা চিৎকার হৈ-হল্লা উঠলো যে, সমস্ত গ্লানি ভেসে গেল।

এর পর, পরের দিন থেকেই Parliamentary Elections-এর ইস্তাহার-প্রচার আরম্ভ হয়ে গেল।

রাত্রের জলসার ব্যবস্থা চললো অতঃপর।

সন্ধ্যার সময়টায় কেমন যেন মনটা ভারি হয়ে এলো। মীটিং-এর উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হয়তো। ভয় হোলো পাছে ভবানন্দ, নির্মল প্রভৃতি আজও এসে ধরে। আজ মন চাইছিলো ডাক্তারকে নিয়ে বসে গল্প করি। কিন্তু কোথায় ডাক্তার!

ক'দিন শ্রীমতীর চিঠি আসেনি। কি জানি ওদের কথা আজ অনেকবার মনে হতে লাগলো। তাই হয়তো মন ভারী। ধাবয়ালা হোটেলটায়, চা নয়, শুধু একা-একা পথচারণা। সেই জলখাবার জায়গাটা, দু'মাইল দূরে। তার নীচের সেই ঢলে-পড়া গাছের ছায়াটুকু। আকাশের বুকে গোধূলির সোনা। ওপারের গ্রামে এখন ঘরে ঘরে উনুন জ্বলছে। বোঝা বোঝা কাঠ নিয়ে পুরুষরা ফিরছে। নারীরা গোধন রক্ষা করছে। মক্কির রুটি সেঁকছে কেউ। সদ্য-আনা পশুর দেহ থেকে চামড়া ছাড়াচ্ছে। এপারে আমার মনে নেমে এসেছে একটা বিষণ্ণতা যার ভাষা নেই।

সহসা মনে পড়ে যায় কাশ্মীরী করীমখানের কথা: "তোমায় ছেড়ে দিলাম; তুমি তো বাঁচবে; কিন্তু রক্ত…" —কেন বার বার কথাটা মনে আসে?

সংস্কার। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত—পালপার্বণ—টোল-চতুষ্পাঠীর বাতাবরণে আবাল্য বর্ধিত। রক্তে সেই অমাবস্যা-পূর্ণিমা, 'মার্জারু অভক্ষ্য' ও মৃতসিদ্ধিযোগের সংস্কার। অন্যদিকে ন্যায়-দর্শন-ব্যাকরণের নিগূঢ় বিচারের ক্ষুরধার বুদ্ধির ছটাও যুগ যুগ ধরে সংক্রামিত, প্রবাহিত এই ধমনীতে। বুঝেও বুঝিনা। যখন যারা এসে ধরে তখন রিয়ালিস্ট ম্যাকবেথও ডাইনীর কথায় সব ভুলে যায়। কেন বার বার আমায় ঐ কাশ্মীরীটার কথায় ফিরে যেতে হচ্ছে।

জোর করে গান ধরি—

"আর রেখোনা আঁধারে আমায় দেখতে দাও
তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও।" …

মাতিয়ে রাখে এই গানগুলি। কিছুদিন ধরে 'দেশ'-এ শ্রীযুক্ত অমলেন্দু দাশগুপ্তের একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ বেরুচ্ছিল 'কবি রবীন্দ্রনাথ'। অমলেন্দুবাবুর সেই প্রবন্ধের উপযুক্ত মর্যাদা একদিন বাংলাদেশের চিন্তাশীল জনসাধারণ দেবেন। কবিকে এই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখার সৎসাহস ও নিষ্ঠার আদর একদিন হবেই। বড়ো কাছাকাছি তাঁকে পেয়েছিলো এই বিংশ শতকের প্রথমার্ধীরা। তাই এখনই তাঁকে বোঝার দায়িত্বকে দায় বলে এড়াতে চায়। কালিদাস নিজের কালে, ভবভূতি নিজের কালে, সেক্সপীয়র মিল্টন প্রভৃতি কেউ নিজের কালে নিজের দেশে পূর্ণরূপে সমাদৃত হননি। বহু পরে শতাব্দীর নিস্তব্ধতার অন্তরাল থেকে ডাক দিয়ে উঠেছে মানুষ অতীতকালকে লক্ষ্য করে। হারানো কবিকে আবার পাওয়া গেছে। তাই হবে রবীন্দ্রনাথের বেলায়। রবীন্দ্রনাথ যাদের গুরুদেব নন, তাঁরা আবিষ্কার করবেন এই কবিমানসকে। এইসব গানের রচয়িতা দার্শনিক-লিখিয়ে নন; তত্ত্বদর্শী, মানবপিপাসার প্রত্যক্ষ সাধক। তাই এ গান গাওয়ার পর মনের ভারসাম্যে দোলা লাগে।

"চা খাবে বাবু?"

সিরথী এসে দাঁড়ালো।

"তোমার দাদার দোকান তো কাছেই। সেইখানেই এসেছিলে বুঝি?"

"হ্যাঁ। চা খাবে? চলো,—তুতা আছে।"

"তাই নাকি! তুতা বুঝি এখন আর তোমায় ছাড়া থাকেনা?"

রাঙা হয়ে বললে—"কোথায়! এইতো সারাদিন পরে ছুটি পেয়ে এলাম। আজ দাদার এখানে নিমন্ত্রণ।"

"সারাদিন খুব খাটলে বুঝি?"

"হ্যাঁ। ডিনামাইটের কাজ; বড়ো জখমী কাজ। অনেকক্ষণ ধরে তুরপুন দিয়ে আর ছেনি দিয়ে লম্বা গর্ত করতে হয়। যদি গর্ত করতে ভুল হয়, বা ঠাসতে গোলমাল হয়, সব বেকার হবে। আজ আমি প্রায় আটটা দেগেছি। একদিনে এতো দাগা আর কখনও হয়নি। কাল প্রায় বারোটা দাগবো।"

"এর জন্য তুমি কি পাবে?"

"কিছু না। সবাই যা পায়। তবে খাতির করে সকলে। ভাখোনা, সেই সিমলা থেকে আনিয়েছে। আমি নৈলে এই কাজ নাকি এতো তাড়াতাড়ি হবেনা। আমি এসেছি বলেই তো ওভারসিয়র আর এঞ্জিনিয়র-সাহেব এতটা ঢিলেঢালা; এতো ছুটি পান। নৈলে ওঁদের চরকি-বাজি ঘুরতে হোতো।"

"অথচ তোমার টাকা নেই!"

"না, বাবু। আমরা চিরকালের গরীব। তুতাই এর মাঝে আমার একটা নেশা। এবার ওকে আমি সিমলায় নিয়ে যাবো ভাবছি।"

খুশী হয়ে বললাম—"তাই যাও, ভাই।"

"চলো তুমি, চা খাবেনা?"

"আজ নয়; যাবার সময় না-হয় একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে যাবো। তুমি যাও ঐ ডাক্তারবাবুকে বরং গিয়ে ডেকে দাও।"

"ও-বাবু বড়ো ভালো লোক। চলে গেলে কত লোকে কাঁদবে। ভালো ভালো ওষুধ দেয়। ডেকে দিচ্ছি।"

চলে গেল।

ডাক্তার এসে বললে—"খচ্চরগুলো জঙ্গলে হারিয়ে গেছে কিনা দেখতে বেরিয়েছিলাম।"

"সত্যি ডাক্তার, আজও খাবার এলোনা। রাতে তো সব খাদ্য ফুরিয়ে যাবে। কাল সকালে কি হবে?"

"চুলোয় যাক খাদ্য। খাদ্যের অভাবের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কে? পানীয় নেই এইটা বড়ো কথা।"

"আমি তো চলে যাবো, ডাক্তার। আজ নয় কাল। যাবার দিন এসে গেল। কিন্তু আমি সত্যিই জানতে চাই এতো করে মদ খেয়ে তোমার আনন্দ কি?"

"একটা ভ্যাপসানি গল্প শুনতে চাও বুঝি? বেশ প্রেম থাকবে, বঞ্চনা থাকবে, কাঁদাকাটা থাকবে। ডাক্তারের গড়ন লিখে ডাক্তারকে এক হীরো করবে।"

"পাহাড়ী বিছুটির চেয়েও sensitive তুমি। ছুঁতে-না-ছুঁতে চুলকানো ধরিয়ে দাও। এসব তোমার জ্যাঠামি।"

"জ্যাঠামি ব'লে মনে হয় যখন ধাঁতের কথা কেউ বলে। তোমার মন আজ উদাস, একা বসে বসে আফিমের নেশায় মেতে আছো…"

"আফিমের নেশা!"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, 'আমি কত প্রকৃতিবিলাসী', 'আমি কতো মানবমনপিয়াসী', 'আমি কতো কি' ভাবছো, আর ভাবছো তাবৎ ধরণীর দুঃখদৈন্য নিরাকরণের ভার তোমায় অর্পিত। প্যানপ্যানে বাঙালী! দাপট কই, দৃপ্তি কই? কেবল আবিলতা!"

"জানো ডাক্তার, আমার মনে হচ্ছে যেন আমার কোনও বিপদ আসছে।"

"সেটা বুঝতে পেরেছি। আর তাই ভাবছি তোমার ফিরে যাওয়া উচিত। তোমার যা রোগ হয়েছে তার নাম Homesickness। প্রেয়সীর মুখচ্ছবি না দেখলে ওর আর শেষ নেই—চলে যাও।"

"আমার বয়স জানো?"

"মানে? বলতে চাও একটা কোনো বয়সের পর শ্রীমতীকে মনে না ধরা তোমার অপরাধ বলে গণ্য নয়, মানে মন থেকে তাড়ানো তোমার অধিকার হয়ে দাঁড়াবে?"

"তা বলছিনা। বলছি যা পাক লাগবার লেগে গেছে। এখন আর হারাই-হারাই ভাব নেই।"

"অহংকার!"

"কিসে বুঝলে অবিবাহিত নারীজুর?"

হাসতে লাগলো ডাক্তার—"বড্ড পাজ ছিলে হে মাস্টার! কিন্তু ভারী মিঠি গান। মনে থাকবে।"

পিছনে পায়ের শব্দ।

সিরথী আর তুতা দু'গেলাস চা এনে দুজনাকে দিলে। দিয়েই চলে গেল তাড়াতাড়ি।

ডাক্তার সেই যে তাকিয়ে রইলো ওদের পানে, মুখ আর ফেরায় না।

"কি হোলো হে, আর যে ফিরতে চাওনা!"

"There's the cause, there's the cause!—কে তোমাদের শেলী না ওয়ার্ডস্বার্থ ?"

"কী cause?"

"তোমার মন কেমন করায়, আমায় গাল পাড়ায়, আমায় যা-তা বলায়।"

"মানে?…না ডাক্তার, নীচতা তোমায় মানায় না! তুস্তা আমার বোনের মতো।"

খুব হাসলে ডাক্তার। "তাই নাকি? কিন্তু তুস্তার কথা আমি মনেই আনিনি। যদিও 'বোনের মতো' ব্যাপারটা আমার 'মনের মতো' নয়, কোথাও। মনস্তাত্ত্বিকরাও ঐ 'মতো'-ধর্মী সম্বন্ধগুলোকে নিয়ে বড়োই নাড়াচাড়া করেছেন।"

বিরক্ত হয়ে বললাম—"[illegible] গেলে নাকি আমার? এইসব কথা শোনাবার উপযুক্ত স্থান কাল পাত্র বটে।"

"সবই relative—স্থান-অস্থান, কাল-অকাল, পাত্র-অপাত্র ভেদাভেদ তো কেবল মনে। খাঁটী—absolute—স্থান বলো, কাল বলো, পাত্র বলো—পাবে কোথায়, পাচ্ছ কোথায়? তবে ঠিক তোমায় ভাবিনি। তবু 'বোনের মতো' কথাটার ন্যাকামি আমায় হাসালো মন্দ নয়।…"

"তবে causeটা কি?"

"তোমার মন আজ কেমন বিরক্ত হয়ে আছে ঠাওর পাচ্ছ তো! গিন্নীর জন্য, বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে বললাম, স্বীকার করলেনা। কিন্তু তুস্তা আর পিরথীকে এই যে একমনে দেখছো, এই যে নয়ন-ভুলোনো যুগলরূপ, এই মন-ভরানো ছবিটি একে দেখেই তোমার মন হু-হু করছে। তোমাদের কবিদের ভাষায় বলা যাক্—"

চোখ মটকে হেসে বললে—"বলবো? ঠাট্টা করবেনা তো?"

"তোমার ঠাট্টা? ঠাট্টার গলায় দড়ি। নীরেট বেরসিক, বাঙালের বেহদ্দ। বলো বলো তোমার কাব্যিক উপমা!"

"বেড়ে লাগছে শুনতে, বলতে চাওয়া…শোনো তোমাদের কাব্যিক ভাষায় বলে—এক শাল ডাকলে অন্য শাল ডাকে, বনে একটা কোকিল জেগে সাড়া দিলে অন্যগুলো সাড়া দেয়; গাছে [illegible] বাতাসে ফুল ফোটালে অন্য ডালেও ফুল ফোটে, বাতাসটা যে একই। তাই তুস্তা-পিরথী ছবির-সম্পূর্ণতা তোমায় বিকল করেছে। 'Zান্তি পারছোনা'—vide তোমাদের সাহিত্য।"

"চলো ফেরা যাক্—কিন্তু সত্যি কেমন স্বাস্থ্যবান সম্পূর্ণ জীবন এই দম্পতীর। প্রকৃতির শোভা যেন।"

"আহা-হো অমৃতং বালভাষিতং আহা কিবা কাব্য রে। এই তুস্তার বয়ঃক্রম ত্রিংশোত্তমতা প্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখবে আধা-বয়সজন পিরথীকে আয়ত্ত করে দিব্য সংসার পাতিয়েছে। 'মেঘমালা ঘেরি তড়িতলতাজন্ম', একটি অঙ্গুরীয়কে অনেকগুলি মণি যেন, একই নাকে অনেকগুলি ব্রণ।"

"পাষণ্ড! বাণীর কমলবনে মত্তহস্তীর মতো দলনে ও পীড়নে, ধ্বংসে ও নাশেই তোমার বিলাস! তুস্তা আবার বিয়ে করবে?"

"করবে গো করবে। তুস্তার মা করেছে, শাশুড়ী করেছে, ও করবেনা কেন? এ-বেলার চোখের কাজল ও-বেলার চোখের জলের মতোই 'সইত্য' চাঁদমোহন—বুঝছনা ক্যাবে। তুস্তার সমাজে নব নব যৌবনশালী পুরুষ-ভজনা যখন অনুমোদিত, তখন বিগতযৌবন পুরুষগ্রহিতা ওর ধর্ম ও রুচিতে আরোপ করে গুলিখোরের মতো কেনা করে থাকবে কেন? যা সত্য তা দেখ-না-দেখ, যা যথার্থ, স্পষ্ট তা দেখবেনা কেন?"

"রাতে খাবে কি?"

"মেগুন।"

"বেগুন!!"

"হ্যাঁ। একটা কুলীকে বলে কয়েক ধামা বেগুন আনাতে সক্ষম হয়েছি। সেই বেগুনের ঝোল এবং ভাত। রুটি হবেনা। কাল ছোলা বন্ধ। কাল ছেলেদের কাজ বন্ধ। ওরা নামাবে স্পোর্টস্-তে। এদিকে চলবে ডিনামাইটের কাজ। কাল যদি রসদ না আসে, তোমায় আমায় আর আম্বানাকে কেটে চড়াতে হবে।"

তন্দ্রা-আর সন্ধ্যা এসে ধরেছে পথেই। "আমাদের মুশায়রা দেখতে কতো লোক আজ এসেছে দূর-দূরান্ত থেকে। গানের বৈঠকি শুনে সব ভেঙে পড়েছে। অথচ আজও আমাদের সাজগোজের কিছু এসে পৌঁছালোনা। লক্ষৌ-ওয়ালাদের মেক-আপ না নিতে পারলে মুশায়রা জমবেনা।"

"আমি কি করবো?"

ডাক্তার বুকনি ছাড়লো—"হর-ফন্-মৌলা-সর্বকার্যে সাধক—দাড়ি-গোঁফ চাই, তাও তুমি পারবে!"

বিরক্ত হয়ে বললাম—"হ্যাঁ, পারবো। যাও তুমি, মেক-আপ-এর ভার আমার।"

রাতে যখন মেক-আপ করিয়ে মুন্সারার ওদের পাঠালাম, ডাক্তার তখন বিস্মিত।

গানের মধ্যে মেকআপরা কলকাতাও অনেকগুলি কর্ণাটক কায়দায় গান গাইলে ;—গলা বেশ তালিমদার, এলেমদার কিন্তু চমকদার নয়। সেটা পরের গলা। রূপা-চাঁদা গলা। যেমন চমক তেমনি ধ্বনি। পদ গাইলো হালকা সুরের কয়েকখানা। চমৎকার না হলেও তরুণের মনে ব্যাকুল গান গাইলে কাথিয়াওয়াড়ের দুলালদাস। শুধু হাতে তালি বাজিয়ে বাজিয়ে গান গেয়ে ছোকরা জমিয়ে ফেললে আসর। কিন্তু আড্ডা থেকে একটি ছেলে গান গাইলে কম্যুনিস্ট লোকসঙ্গীত। ভারতে কম্যুনিস্ট লোকসঙ্গীত একটা বলিষ্ঠ ধারা নিয়েছে। যতই নাক তুলে কথা কওয়া যাক না কেন—এ গানের বলিষ্ঠতা, সন্নিবেশ, অর্থগর্ভতা, এবং সর্বোপরি উন্মাদনা বেশ প্রবীণ। এই গান জোরগলায় গেয়ে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একটা উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা যায়, যেমনটা মুকুন্দদাসের যাত্রার গানগুলি এককালে করেছিলো। তা ব'লে লক্ষ্ণৌয়ের সুরকাজ, কলকাতার কোমল এবং আভিজাত্য পরিপূর্ণ রস, দিল্লীর ঘরানার মান যে পরিবেশিত হয়নি তা নয় ; গজল, ঠুংরি, খেয়াল সবই গাইলো একের পর এক। বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত হোলো। হোতে হোতে রাত, গভীর রাত। পালা শেষ হোলো। আমরা ঘরে শুয়ে পড়লাম।

•

রাতে সেই ঝড়ের উপদ্রব, জানালার ধারে বাতাস শব্দ," জানালার শার্সীতে আঘাত—কিন্তু কোনও কারণ-পাওয়া যায়না।

সকাল হোলো ; তুলসীরাম ডাকছে—"বাবু, চা!"

"এখানেও তোমাকেই চা এনে দিতে হবে, হতভাগা!"

তুলসীরাম হেসে দাঁত বার করে বললে—"বড়ো চমৎকার দিন আজ। দূরের পাহাড়গুলো সব দেখা যায়। আজ যাও জঙ্গলে। আজ নিশ্চয় হরিণ দেখতে পাবে। কস্তুরী ;—আসল। যাও শিকার করে এসো!"

এদিকে লাউডস্পীকার বলছে—"এসো, সবাই এসো। আজ অ্যাথলেটিক মীট। এখুনি দ্বিতীয় থাবয়ালা অলিম্পিক-টর্চ নিয়ে পাহাড় পরিক্রমা করবে। সকলে এসো। টুর্নামেন্ট আরম্ভ হবে এখুনি।"

ওদিকে বিরিজরাজসিং এসে বিছানার ধারে বসে বলছে—"চলুন স্যর, আপনাকে অনেক ক'টা আইটেমে জাজ্ করা হয়েছে। আজ স্পোর্টস্-তে। আজ আর বিছানা নয়, উঠুন।"

খেলার আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে থাবয়ালা-ক্যাম্পের যুবদল।

যখন দওতার সিং বিরাট একটা মশাল হাতে নিয়ে দৌড়চ্ছিল, যখন ছেলেরা পতাকা হাতে নিয়ে কুচ করে চলেছিলো, যখন লাউডস্পীকারে নানা বাদ্য বেজেছিল—সেই জনহীন কান্তার যেন আনন্দে কলরব করে উঠেছিল। তরুণের বল, তরুণের বিদ্রোহ, তরুণের তেজস্বিতা, নির্ভীকতা—তরুণেরই সাজে ; পলাশ আর কোকিল যেমন সাজে আম্রমঞ্জরীর গন্ধের সাথে ; চামেলী আর দোয়েল যেমন সাজে সেফালীর গন্ধের সাথে। আমরা শুধু চেয়ে থাকবো এই ব্যাকুলিত হিল্লোলিত প্লাবন-আনা তারুণ্যের জোয়ারের পানে। কিছু বেদ, কিছু সঙ্গীত ; কিছু বন্দনা, কিছু বঞ্চনা ; এই দোলায় দুলবে চিত্তাধারে ভালো-অভালো-তত্ত্ব-নিয়ামক সমালোচক মনটি। আমার বয়সের বেলাভ[illegible] দাঁড়িয়ে নতুন-সূর্য-উদয় আর দেখবোনা জানি—তা[illegible] ভোরের বাতাসের গন্ধ, ঊষার আঁচল-ঢাকা আলো[illegible] সম্ভাবনা হঠাৎ জাগিয়ে দেয় অনেক-কিছু সুখস্বপ্নকে।

আমি যখন কাকেও বলতে শুনি—"এ যুগটা কী অপদার্থ অকর্মণ্য, এ যুগের ছেলেগুলো কী দায়িত্ব-কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জিত,—আর কিছু না হোক, বেশ বুঝতে পারি বক্তা বিগতযৌবন। আমি নিজেও যখন বলি তখনও মর্মে মর্মে বুঝি "হারিয়ে গেছে সেদিন রাতের তারা"।

তাই এদের দেখতে দেখতে যেমন একটা দিকে আনন্দের বন্যায় উদ্বেল হয়ে উঠলো জীবনপুলিন, অন্যদিকে মনে হোলো থাবয়ালা কর্মভূমির কথা। দশহাজার ফুটের মাথায় জনশূন্য অরণ্য ; ভয়ে ভয়ে লোক আসতোনা। ভালুক আর অজগর ; লেপার্ড আর সাপের আড্ডা। পাইনের দুর্ভেদ্য পর্দা, হাতীও বা ভাঙতে পারেনা। এখানে একদিন মানুষ আসবে, তরুণ মানুষ, সভ্যজগতের জানাবেশী ভাব-বিলাসী মানুষ, কে কবে ভেবেছিল ! কে ভেবেছিল এই বনভূমির কপালে অগ্নিতিলক এঁকে দেবে ধাবমান দওতার সিং, এর গলায় পরিয়ে দেবে দেবদারু-কিশলয়ের মাল্য বোম্বাই-এর পারিষ, এর মাথায় ঘোমটা টেনে দেবে বিবর্ণ[illegible] পতাকার বর্ণিমময় গৌরব, এর সীমন্ত রক্তিম হয়ে উঠবে প্রাণবন্যা প্লাবিত অরুণরাগে। বনভূমিতে বেজে উঠবে গান,

নেচে উঠবে জীবন। খাদয়ালা আমাদের দু'চোখ ভরে দেখছে আজ। গাজেন্দাল গ্রাম দূরে বসে বসে এই আগুন দেখছে কি?

হাই জাম্প, লং জাম্প, পোল ভল্ট, দৌড় সবই হতে লাগলো। আর হতে লাগলো অদ্ভুত কপাটি-খেলা। দলে দলে আটজন। খুব জমেছে। শ্রেষ্ঠদল মরাঠারা। ভারতবর্ষে কপাটি-খেলায় চ্যাম্পিয়ান এই মহারাষ্ট্র, এবং সেই বিজয়ী দলের মধ্যের তিনজনই আছে এই দলে। অদ্ভুত তাদের ক্ষিপ্রতা আর কৌশল।

হঠাৎ একটা ছেলে ছিটকে খাদের মধ্যে পড়ে গেল। চারধার থেকে চিৎকার উঠলো "হায় হায়"। কপাটি-খেলার মতো প্রশস্ত স্থান কোথায় এই ভীমদেহ খাদয়ালার পাহাড়ে? ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারির সামনে একটু জায়গা। সেখানেই চলছিলো পালার পর পালা খেলা। নীচেই সদ্য-কাটা পথ, আর তার তলায় গভীর খাদ গড়িয়ে গেছে।

কী ভাগ্য ছেলেটার পা-জামা একটা বেড়াতারে আটকে যাওয়াতে একনিমেষের ও সময় পায়। সেই সময়টুকুর মধ্যে ও নিচের খাদে পড়েই একটা বরাসগাছের ডাল ধরে ফেলে। বেঁচে গেলো।…

…কিন্তু খেলা বন্ধ হোলোনা।

"না না, বন্ধ নয়, বন্ধ নয়…চালাও…" বিগ্রিজরাজসিং হাঁক পাড়ে। সব ছেলেরা চিৎকার করে—"চালাও ভাই, চালাও।"

কিন্তু করীমখানের সেই বাণী। ক্ষুধিত আছে খাদয়ালা। রক্ত চাই তার। আমার পাপ—আমার এই দুরন্ত জিজ্ঞাসার ফল। সেই কাশ্মীরী-বেদেনীর মুখ দেখেছি। রক্ত নেবে তারা। বিংশ শতাব্দীর নগরপালিত বিদ্যাবুদ্ধি সত্ত্বেও এই সংস্কার বার বার মনের মরচে-পড়া দরজার শব্দ তুলছে। আমার মাথায় সেই যে ধুলোবালির স্নান করিয়ে দিয়ে গেলো, সেই থেকেই মন আমার যেন কেমন ঝিমিয়ে আছে। পদে পদে শঙ্কা। পদে পদে ভয়।

দূরে একটা কোলাহল। অনেকগুলো কুলী কি-একটা বয়ে নিয়ে আসছে। পাহাড়ে গাছ ফেলার সময় এমন শব্দ করে কুলী-গ্যাঙ। আজ ওরা কাজও করছিলো খুব বেগে। বার বার ডিনামাইটের শব্দ, আর গাছ পড়ছে নিচে বিরাট শব্দ করতে করতে। কিন্তু এ সে গোলমাল নয়। কী যেন বয়ে আনছে ওরা।

দুটো ছেলে দৌড়তে দৌড়তে এলো। তাদের চক্ষে আতঙ্ক, ভীতি, ব্যগ্রতা।

"ডাক্তার-সাব, ডাক্তার-সাব!"

"কি গো, কী!"

"জল্‌দি খেলা বন্ধ করে দিন। এখানে চৌকি পেতে একটা বিছানা করুন। একটা ভীষণ…"

"কি? অ্যাক্‌সিডেন্ট?"

"ভীষণ; একটা লোকের সমস্ত মুখটা উড়ে গেছে ডিনামাইটে। ভীষণ রক্ত পড়ছে। চোখ-টোখ সব উড়ে গেছে।"

ডাক্তার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—"তবু শালা বেঁচে আছে? আমায় ডোবাবার মতলব!"

ডুবতে চললো ডাক্তার। ক'পাত্র টানলো জানিনা। আমায় বললে—"ভীড় সামলাও।"

লাউডস্পীকারে বারণ করে দিলাম কেউ যেন ডাক্তারের ঘরের সামনের খালি জায়গায় না আসে। হাতে হাতে ধরে একটা বেড়া করিয়ে দিলাম।

আম্বানা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে এসে বললো—"খেলা বন্ধ করে দিই; কি বলেন?"

"কিছুতেই নয়। পূর্ণ বিক্রমে খেলা চালান। নৈলে এই বেদনা সকলকে পেয়ে বসবে। আর ভীড়ও হবে। ছেলেদের মনের জোর বজায় রাখা এখন আমাদের সবার বড় দায়িত্ব। খেলা চলুক।"

লাউডস্পীকারে আবার খবর দৌড়ুলো—"খেলা চলবে।"

ইতিমধ্যে লোকটাকে নিয়ে কুলীরা এসে পড়লো। ডিনামাইট! ডিনামাইট!…কে লোক? এ লোক কে?

অনর্গল বলে যাচ্ছিলো হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে রথীরাম, বুড়ো সর্দার: "অনেকটা গর্ত করে বেশ সেঁদে-সেঁদে বারুদ ভরা হোলো। পলিতাও খুব কেরামতির সঙ্গে রাখা হোলো। এমনি এগারোটা। তারপর পলিতায় আগুন। দম্ দম্ করে ফাটতে লাগলো পর পর দশটা। কিন্তু বাকী একটা। সেটা কোন্‌টা? কোন্‌টা ফাটেনি? সাধারণতঃ আমরা দশ মিনিট অপেক্ষা করি। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর গিরধী বললে—'বুড্‌ঢা, তোর ভীমরতি হয়েছে। পঁচিশ মিনিটের পরেও মশালা জ্বলবে কি রে? ছেড়ে দে, দেখে আসি।' গিরধীর হাতের গর্ত; তার হাতের ঠাসা। অমন কাজ কারুর হাতের নয়। দেখা গেল একটা ফাটেনি। বারণ করা সত্ত্বেও…"

আমি আর্তকণ্ঠে বলে উঠলাম—"কে? গিরধী নয় তো? গিরধী নয়?"

উদাস দৃষ্টিতে ও চাইলো আমার পানে। তিরস্কারের

ভঙ্গীতে বললো—"থামিয়োনা আমার কথা তুমি। শিখীকে আমি চিনিনা? তুমি চেনো? অমন কাজ কার হাতে? অমন ছেলে ক'টা? গেলো দেখতে। উবু হয়ে যেই দেখছে অমনি একটা বিরাট শব্দ করে ফাটলো—"

আমি বুড়োর ঘাড় দু'হাতে ধরে বললাম—"কে? শিখী?"

কিন্তু দেখে ধরার জো নেই যে! তাই বার বার জিজ্ঞাসা। তা ছাড়া আমি যাইওনি রোগীর ধারে। ভীড়টাই সামলাচ্ছি। কিন্তু আর যেন সহ্য হচ্ছেনা এই ঔৎসুক্য!

ডাক্তার ডাকলো—"মাস্টার, এসো একটু সাহায্য করো।"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই।

কী দৃশ্য!!

কপালের ওপর থেকে খানিকটা চুল অবধি জায়গা দেবে ধ্বসানো ঘা। একটা চোখ সম্পূর্ণ উড়ে গেছে এবং গালটা নেই। ভেতরের দাঁত আর জিভ দেখা যাচ্ছে। অন্য চোখের ওপরের মাংস ঝুলে পড়ে জায়গাটায় একটা মাংসপিণ্ডের ডাল হয়ে গেছে। নাকটা উড়ে গেছে। মুখখানা ঝলসে, ধোঁয়ায়, মাটিতে, রক্তে আর চেনা যায়না। একটুও চেনা যায়না। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। কখনও কোনও সাড়া-শব্দ দেবে এ প্রমাণ নেই।

কিন্তু পাহাড়ের প্রাণ। গিয়েও যায়নি। নাড়ী চলছে। প্রাণের ধারা বইছে। তাই ডাক্তারের কর্তব্য রয়ে গেছে। ডাক্তার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করে যেতে লাগলো।

হঠাৎ পায়ে এসে আছাড় খেয়ে পড়লো তৃপ্তা। অভাগিনী তৃপ্তা।

"ভাই সা—ব—"

ওরে আমি কি করবো রে তৃপ্তা? আমি কি করবো? তোরই মতো আমিও নিরুপায়, অসহায়। "ওঃ, ওঃ— এখন একটু থাম্! সারা জীবন কাঁদতে পাবি। এখন ভাব্ যদি ওকে বাঁচাতে পারি!!"

ধক্ করে উঠলো প্রাণ। বাঁচবে? আর ও বাঁচবে? আর কি ওর কাছে জীবনের কোনও অর্থ থাকবে? দেহের ভেতর প্রাণ ধরে রাখাই কি জীবন? বেঁচে থাকা কি জীবন? প্রাণ আর জীবন কি এক? To exist, to continue to live—এক কি? চোখ নেই, বীভৎস কদাকার মুখ, উপার্জনহীন দীর্ঘ যৌবন, দীর্ঘতর বার্ধক্য পার হয়ে যেতে হবে সমাজের ঘৃণা ও করুণার পাত্র হয়ে, এরই জন্য ডাক্তারের প্রচেষ্টা?

তৃপ্তা ডাক্তারের পায়ে,—"বাঁচাও ওকে ডাক্তার-সাব্, বাঁচাও!"

ডাক্তার চেয়ে থাকে মেয়েটার পানে। হাত ধরে তোলে। ততক্ষণে রোগীর সারা মাথা মুখ ব্যাণ্ডেজে বাঁধা হয়ে গেছে। নাক আর মুখের কাছটায় খালি রেখেছে একটু একটু নিঃশ্বাসের জন্য।

তৃপ্তার হাত ধরে ডাক্তার বলে—"বাঁচাবো? আমি কি জীবন দিই না নিই? কিন্তু তুই বলিস বাঁচাতে? ভারী স্বার্থপর তো। তুই বল্ যে—ও মরুক, মরুক। তুই স্ত্রী, তুই বরং তা বলতে পারিস্। আমি ডাক্তার, আমিই পারিনা। মরণ দেবার পাগলামি করা আমাদের একদম নিষেধ।"

ডাক্তার ঢুকলো তার ঘরে। আর ও জলন্ত আগুনের মতো তরল-বিষ দিয়ে সমস্ত জ্বালা নেবাচ্ছে, ধুয়ে দিচ্ছে।

চিৎকার করে ওঠে তৃপ্তা—"একটিবার দেখতে দাও ওগো, মুখখানা একটিবার দেখতে দাও! ও ডাক্তার-সাব্, তোমায় কোল-জোড়া ছেলে হবে—গোলা-ভরা টাকা হবে…"

বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে ডাক্তার তৃপ্তার প্রায় টুঁটি টিপে ধরে বলে—"চুপ কর্ তুই। নৈলে পুঁতে ফেলবো তোকে। এটা হাসপাতাল। চিৎকার করার জায়গা নয়। আমি শাপ দিই তোর ছেলে হোক, তোর টাকা হোক— তা নৈলে বুঝবিনা কী শাপ দিচ্ছিস।"

আবার ছুটে এসে পড়ে তৃপ্তা আমার পায়ে—"একবার দেখতে দাও মাস্টার-সাব। আমার শিখী! তোমায় কাল চা দিয়েছে, সিগারেট দিয়েছে। কত সুন্দর ওর মুখখানি ছিল—হায় হায় আমার একি হোলো!"

বুড়োটা এসে ততক্ষণ তৃপ্তাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বসেছে। তৃপ্তা সাপের ফণার মতো দুলছে, ছটফট করছে, চাইছে ছুটে গিয়ে শিখীর দেহ জড়িয়ে ধরে।

"তুই কেন এখানে তৃপ্তা? এখানে এলি কি করে?"

"হায় আমার ভাগ্য! কেন এলাম? কেন আমি মরে গেলামনা গাঁয়ে।" ছিট্‌কে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো শিখীর দেহ—"ওগো ওঠো, জাগো; গাঁয়ে ফিরতে হবে; বাসায় যাবো গো; আর তোমায় পথের কাজ করতে দেবোনা—একবার…"

ওকে সরিয়ে নিয়ে গেল হোটেলের মালিকের স্ত্রী আর দু'একটি মেয়ে যারা ওষুধ নিতে এসেছিল। আর কোনো জবাব না পেয়ে ও ডাকতে লাগলো—"ভাই সা—ব্"—

"ভাই সা—ব্"। খাদরালার পাহাড়ের উঁচু পথের বাঁকে-বাঁকে শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেলো।

ডাক্তার হাত ধুচ্ছে সাবান দিয়ে। ছেলেদের খেলা ঘুরে চলেছে। হাসপাতালের প্রাঙ্গণ কলগুঞ্জনে ভরতি। খচ্চরের দল রসদ নিয়ে পৌঁছে গেল সবে। আমি ভাবছি সেই কথা—"ফোস্কা পড়বে রাতে ওদের গায়ে। রক্ত দিয়ে না ধুলে তা সারবেনা। রক্ত চাই…" মনে পড়লো—"তোমার না হোক যে এখন তোমার মর্মের খুব কাছাকাছি…" কেন তখন আমি তৃপ্তার কথা ভাবছিলাম। ওদের দুঃখে আমার সুখ মিলিয়ে দেবার দরকার ছিল কি আমার?

জল ঢালছে কম্পাউণ্ডার ডাক্তারের হাতে। সাবানের ফেনা হচ্ছেনা—পাহাড়ী জল। সাবান-ধোয়া জল। সাদা জল। মনটা অমনি হার্ডওয়াটার-ধোয়া সাদা জল। চেষ্টা করেও ফেনার শুভ্রতা নেই, সাবান-জলের ক্লেদে ভরা।

"কাল তুমি আমায় বলছিলে গিন্নীর কথা বাড়ির কথা ভেবে আমার মন খারাপ…"

"আর বলছিলাম ওঁদের যুগলকে দেখে তোমার মন আরও খারাপ…"

"কিন্তু খারাপ ছিল এই সম্ভাবনার ভবিতব্যের ছায়াপাতে।"

"মানে তুমি আগামী ঘটনাও জানতে পারো? কলির সঞ্জয় না ধৃতরাষ্ট্র?"

"মানে, ক'দিন ধরে কেবল মনটা একটা অন্ধ সংস্কারের আবর্তে জড়িয়ে হাঁফাচ্ছিলো। বার বার তাকে তাড়াচ্ছিলাম সংস্কার বলে। কিন্তু ডাক্তার, সব সংস্কার নয়…"

ডাক্তার বললো—"তা নয়। কিন্তু ওকে পত্রপাঠ জীপে করে সিমলা পাঠাও।"

"বাঁচতে পারে ও?"

"যতক্ষণ না মরে যায় ততক্ষণ ডাক্তার বলে 'বাঁচানো যায়'—তাই বিধি…"

"হায়, যদি বাঁচে, কী সর্বনাশই হবে!"

আমি দেখলাম জীপে করে ওরা নিয়ে গেল—কিন্তু তৃপ্তাকে নিয়ে গেলোনা। জীপে জায়গা নেই; তা ছাড়া সিমলায় গিয়ে কোথায় থাকবে?

এর মধ্যেই ছেলেরা চাঁদার খাতা বার করেছে। তৃপ্তার হাতে তুলে দেওয়া হবে মোটা টাকা। কেন? টাকা কেন? সরকারী হাসপাতাল থেকে ওর চিকিৎসা হবে। আর মরে যায় তো তৃপ্তা পেন্‌শন পাবে; টাকা কেন?

মানুষের মনে সহানুভূতি একটা জ্যোতি; জীবনে অন্ধকার দূর করে।

কিন্তু জ্যোতির তেল টাকা। একটা রূপ নৈলে সহানুভূতি প্রকাশ পায়না। এতোবড়ো ক্যাম্পটার মনে বোবা-ব্যথা ভাষা খুঁজে পেলো টাকায়।

ডাক্তারের মাথায় নেশা চড়েছে। সে গান ধরেছে—

A widow bird sat mourning for her love
Upon a wintry bough;
The frozen wind crept on above
The freezing stream below-o-o-o.

আমি ডাক্তারের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললো—"আমাদের ডাক্তারি কি জানো—consoling the living and consolidating the dead। কেবল জীবন্তকে বলে যাও—আছে আছে, আশা আছে; মকদ্দমার আশা উকিল, পরকালের আশা পুরুত, আর জীবনের আশা ডাক্তার। ধাপ্পাবাজির এতোবড়ো উপকরণ, আয়োজন আর কারসাজি আর নেই…"

আমি বললাম—"ভাবিনি শেষ দিন ক'টায় এমন ধাক্কায় পড়বো। তৃপ্তা আমার কে?"

ডাক্তার বললে—"Friend।"

আমি উদাস কণ্ঠে বললাম—"What is a friend? বন্ধু কি ডাক্তার?"

গ্লাস থেকে একটা চুমুক দিয়ে ডাক্তার বললে—"দুঃখের কারণ; কারণ, এই কারণ থেকেই সুখের জন্ম।"

"বৌদ্ধদর্শন নাকি?"

"জানিনা। তবে এ কথাটা জানি: For a weak and tender soul it is the greatest of misfortunes to have known the greatest happiness!"

"বাঃ, চমৎকার কথাটি তো! কার কথা, ডাক্তার?"

"ঐ তোমাদের শেলী বা কীট্‌স্ হবে।"

"না না—তাদের কথা নয়—বলোনা ডাক্তার—"

"বল্‌জা—ভিক্তরের বাঁতোনেত্ মরে গেলে বলেছেন সম্পূর্ণ মিলনানন্দের বাড়া দুঃখ নেই, মাস্টার। ওর বড়ো দুঃখ নেই। শুনবে কথাটা, শুনবে?—দাঁড়াও, মগজটাকে চাঙ্গা করে নিই। তৃপ্তা কাঁদে, কাঁদে কেন জানো। ভালবেসে মরেছে! কখ্‌খনো ভালবাসবেনা—না—ষ্ট্‌চাব্‌-গিন্নীকেও না—অবশ্য কোনো গিন্নীকেই কোনো কর্তা ভালবাসেনা—তবে কিনা তৃপ্তা গিন্নী এখনও হয়নি—

তৃপ্তা এখনও জীবন নিয়ে খেলা করছিলো, খাঁচা নিয়ে ঘরকন্না এখন সুরু করেনি—"

"জীবন বলতে কী বলো, ডাক্তার? জীবন কী?"

"Life? A tragedy—ঐ বর্নারই উক্তি। বড়ো ঋষি-মনিষি ছিলেন গো—"

"থাক্, কথাটা বলছিলে বলো—"

"বলি! শোনো বালক, শোনো। He who has once had the happiness of perfect intimacy and boundless friendship with another human being has known the divinest of all joys,—a joy that will make him miserable for the remainder of his life. [নিবিড় সখ্যের সুখ একটিবার যার হোলো, আর একটি মানুষকে একটিবারও যে বন্ধুতার সীমাহীন বন্ধনে যে পেলো—সে পেলো চরম সুখ, স্বর্গীয় সুখ—এমন একটা সুখ, যার ফলে জীবনে বাকী ক'টা দিন সে একেবারে মুষড়ে পড়ে থাকবে।]"

"এই সীমাহীন বন্ধুতার বন্ধনে যে আমিও পড়েছি, ডাক্তার—এই খাদয়ালার জঙ্গলে।" আমার কণ্ঠস্বর মৃদু, কিন্তু দৃষ্টি স্থির।

ডাক্তার দুটো চোখ আমার চোখের ওপর রেখে বললে—"বাকী সময়টার জন্য সমবেদনা জানাই, বন্ধু। তুমি একটি শৌখিন হতভাগ্য।"

কখন খাবার সময় হোলো, খাওয়া হোলো, কিছু জানিনা।

খাদয়ালা হোটেলে তৃপ্তার খোঁজে গেলাম। সে নেই, চলে গেছে। সিমলার পথ ধরে অভাগিনী ছুটে চলে গেছে। আমি সংবাদটা শুনে খানিকটা চেয়ে রইলাম শূন্যে। মনে পড়লো—

Man is like vanity: his days are
as a shadow that passeth away.
He asked life of thee and thou gavest it him,
even length of days for ever and ever.

কোথাও পাবে তৃপ্তা তার বেঁচে থাকার সন্ধান। কোথাও পাবে নিয়তির খানিকটা; সে-পথ মহাকাল নিজে ওকে দেখিয়ে দেবেন। আমি শুধু ভাবি এই খাদয়ালার অন্তরে কী বিষই সঞ্চিত ছিল! আমার চিরদিনের মতো বিষাক্ত করে দিল।

ডাক্তারকে তো আর পাবোনা জানতাম।

কিন্তু কাজ থেমে থাকেনা। নিয়তির দুর্ঘটনা সাধারণের চক্ষে একটা দুর্ঘটনা মাত্রই। ডুলী-প্যাডে জখমটা হয়। কোথা থেকে তৃপ্তার ঘটনা এসে যেটুকু আবিলতার সৃষ্টি করেছিল, যথাকালে কাজে কর্মে সবাই তা ভুলে গেল। বেলা তিনটে থেকে আবার ডিনামাইট ফাটার শব্দ সুরু হয়ে গেল। থামানো যাবেনা। কাজ করে যেতে হবে।

কিন্তু বিকেলে আমি যদিও ওদের সঙ্গে বেরুলাম, আমায় ওরা পেলেনা। রাতেও না। গভীর রাতে বারান্দায় বসলাম।

আজ তো জানলার ধারে অশরীরী সেই কান্না নেই। আমি গান করছি গুন্‌গুন্ করে—

"এই কি তোমার খুশী তুমি তাই পরালে মালা…"

বুদ্ধ এসে দাঁড়ালো, তারপর নির্মল, তারপর রাখাল। এবং গানের পর গান। সারারাত রবীন্দ্রনাথের গান।

শেষরাতে বললাম—"না, আর নয়। খাদয়ালা আর নয়। আমি চলে যাবো এবার। বাড়িই আমার ভালো। এখানে আমি থাকবোনা—"

কানে তীক্ষ্ণ শব্দ: "ভাই সা—ব্, একটিবার দেখতে দাও ভাই-সাব্।—"

নির্মল বললে—"আমিও থাকবোনা।"

ভোরের দিকে আম্বানা বিছানার পাশে বসে ডাকছে।

"কি ভাই?"

"উঠুন। এমন সকাল দেখেননি।"

সত্যিই এ কী সকাল! এ কী রূপ!!

দূর-দূরান্তে গিরিশিখরের পর গিরিশিখর ধাপে ধাপে উঠে গেছে। এই দীর্ঘ আঠারো-দিনের অভিজ্ঞতায় এতোগুলি গিরিশিখর কোনোদিন প্রত্যক্ষ করিনি। পাঁচটা ছয় পর্বত দেখেছিলাম একদিন। আজ তা নয়; আট, নয়, দশ—শিখরের পর শিখরে জ্যোতির তরঙ্গ। তীব্র-বিচ্ছুরিত আলোর ঢেউ, যেন সৌন্দর্য দুলে দুলে আকাশপানে উঠে গেছে। বিচিত্র তার বর্ণ, বিচিত্র তার সমাবেশ। অরোরা-বোরিয়ালিস কেমন হয় জানিনা, দেখিনি; কিন্তু এ কি দীপ্তিচ্ছটা, স্বর্ণনিকষিত সম্পদ। কোথাও হলুদ, কোথাও বেগুনী, কোথাও ফিরোজা, কোথাও ধবলা—যেন একটা বৈশিষ্ট্য রেখে ছন্দ রেখে বিস্তারের পর বিস্তারে চলে গেছে দিগন্ত ছাড়িয়ে দিগন্তে, ঊর্ধ্বলোক অতিক্রম করে ঊর্ধ্বতর লোকে। পর্বত নয়, গিরিশ্রেণী নয়; এ যেন সুদূরের ইশারা, এ যেন আরো চলার ইঙ্গিত। "আমি আছি—এখানে নয়—এখান থেকে বহুদূরে—আরও দূরে—আরও দূরে আছি। চলে আয়—পারি তো আয়, দেখবি তো আয়—" তেমনি ডাক। এর বর্ণনা নেই, বেদনা আছে; ভাষা নেই, ব্যথা আছে।

•

আম্বানা কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে নির্বাক বিস্ময়ে দেখছে আর বলছে—"এমন পবিত্র স্থানে এসে আপনাকে পেলাম,

প্রিন্সিপল-সাব্—এ আমার বড় ভাগ্য। এ জায়গায় এসেও বন্ধুত্ব করতে পারলাম না, এতো ছোটো হয়ে গেছে মন। কাল তুজার দুঃখে আপনি যা বিচলিত হয়েছিলেন, দেখে হিংসে হচ্ছিল। আমিও তো পাইনি আমার জীবন-সঙ্গিনী। আমিও তো রিক্ত অভিশপ্ত জীবন যাপন করছি। কিন্তু দেখুন আমার জন্ত একফোঁটা চোখের জল কেউ ফেলবে এমন কিছু করতে পারলাম না। সরলতা যার জীবনে নেই তার কিছু নেই।"

আমি সান্ত্বনা দেবার ভাষা পেলাম না। শুধু বললাম —"এত ভোরে আপনি উঠেছেন যে বড়ো?"

"কাল রাতে ঘুমোইনি। আপনাকে আজই সিমলা পাঠাতে হবে। জানি, আজ আপনাকে যদি পাঠাই, আপনি আর ফিরবেন না। কিন্তু না-পাঠিয়েও উপায় নেই। এতোগুলো লোক ফিরবে। এদের থাকার ব্যবস্থা, রেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে ফেরার ব্যবস্থা, দিল্লীতে ফিরে একটা বিদায়-সভার আয়োজন—সবই করতে হবে। হিমাচল-সরকারের অফিসারদের গিয়ে বলতে হবে শ্রীমতী ইন্দিরার আসার ব্যবস্থা করতে, রাজ্যপালের আসার আগে সেই স্বস্তিফলকটা পাঠাতে—আজ বাইশ, আর ছাব্বিশে ক্যাম্প গোটাতে হবে। আপনি সাহায্য না করলেই নয়।"

"বেশ তো!…"

"বেশ তো নয়। আজ অকপটে বলছি এই চিন্তাতেই আমার ঘুম হয়নি সারারাত। আপনি চলে যাবেন তাতেও ভালো লাগেনি। অথচ কোনও উপায় নেই। আপনি চলে গেলে আমি তো পক্ষহীন হয়ে পড়বোই—আপনার সাধের পার্লামেন্টের উদ্বোধন নিয়ে ছেলেদের মধ্যে বিমর্ষভাব দেখা দেবে—তা ছাড়া সমস্ত ক্যাম্প একসাথে আনন্দহীন নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।"

"এতো করে আমায় বাড়িয়ে তুলবেন না, আস্থানা।"

"ছি ছি, এই ভোরের বাতাসে সূর্যের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে মিথ্যা ছলনা করার অভিসন্ধি শয়তানেরও হয়না। অকপটে সব বলার সময় হয় কৈ। তাইতো আমি শেষ অবধি সব বলতে একা-একা চলে এলাম। জীপ্ আসবে আটটায়, সাড়ে আটটায় ছেড়ে যাবেন। তার আগে জাগিয়ে তুলুন সারা ক্যাম্পকে। নিজহাতে আমি লাউডস্পীকার লাগিয়ে দিচ্ছি।"

সত্যিই ও লাগিয়ে দিলো। আমি গাইতে লাগলাম—

"ডাকিল মোরে জাগার সাথী…"

তারপর সেই অপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনা দিতে লাগলাম। ধীরে ধীরে সারা ক্যাম্প জেগে উঠলো। পাহাড়ের গা বেয়ে এক-দুই-দশ-বারো গুটি গুটি মূর্তি নামতে লাগলো, কারুর গায়ে ওভারকোট, কারুর গায়ে কম্বল। এ কী দৃশ্য, সত্যিই তো এ কি দৃশ্য—সকলেই একেবারে যেন জ্যোতির্মান্ অনাদিপুরুষের মুখোমুখী। কখন এসে দাঁড়িয়েছে খান্না। বললে—"গান-না সেই বাংলা-গানটা—"

আমি জানি কোন্ গান। বললাম বুচ্‌কে—"ধরো, বুচ্—" দুজনায় মিলে গাইতে লাগলাম—"পোহালো পোহালো বিভাবরী", আর তারপরেই—"সাজাবো যতনে কুসুম-রতনে…"

নির্মল জেদ ধরলো—"না। তাহলে আমিও যাবো।"

আমি আস্থানাকে অনুরোধ করলাম। নির্মলও চললো আমার সঙ্গেই।

সারা ক্যাম্প অবাক।

"চললেন?—সেকি! এ-কথা তো ছিলনা। চললেন?"

এ ওধার "চললেন?", ও ওধার "চললেন?"—সকলে যেন আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

তুলসীরাম বিছানাপত্র বেঁধে দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে হলদে দাঁত বার করে হাসছে আর বলছে—"বড়ো তাড়াতাড়ি যাচ্ছো, বাবু। আমি চিনি আর ঘী যোগাড় করেছিলাম।"

তখন ঠিকানা নেবার হুড়োহুড়ি লেগে গেল: ঠিকান দেওয়া, ঠিকানা নেওয়া।

জীপ্ এসে গেল।

আমি ও নির্মল চড়লাম।

জিনিসপত্রও উঠলো।

উঠলোনা ভাণ্ডার।

এমন নেশা করেছে—তাকে আর ডাকার ইচ্ছা নে কারো। শেষ মুহূর্তে বালজী গিয়ে ডাকলে—ও এসে যখ বারান্দায় দাঁড়িয়েছে জীপ্ তখন ছেড়ে দিয়েছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে নাড়তে বললো—"A joy that will make him miserable for th remainder…"

জীপ্ চলে গেল। আর শোনা গেলনা।

খাদরালা পড়ে রইলো পেছনে।

সামনে শুধু সিমলার পথ—

আর কী?

আর গানের কলি—

"যাত্রী আমি ওরে।
কোন্ দিনান্তে পৌঁছব কোন্ ঘরে।
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে
বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে
কে গো আমায় চির দু'নয়নে
অনাদিকাল চাহে আমার তরে।"

বৈশালীর দিন

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীতে গঙ্গার উত্তর-তীরস্থ বিশাল জনপদ বৈশালীতে বিরূঢ়ক নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করত। তার পঞ্চভূমিক প্রাসাদটি জনপদের দক্ষিণ প্রাকারের প্রান্তে নির্জন নীল আকাশের নীচে বড় মনোরম মনে হোত। যে পথিকই এ-পথ দিয়ে যেত, সে একবার এই উচ্চ পীঠিকার মতো প্রাসাদটির দিকে একটু সময়ের জন্যেও অন্তত তাকিয়ে থাকত।

তার আর একটি কারণও হয়তো বা ছিল। শ্রেষ্ঠীর একমাত্র কন্যা পটাচারাকে অনেক সময়ই দেখা যেত অলিন্দে একটি স্তম্ভে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে। পটাচারা রূপবতী। রক্তাধরা, চঞ্চলাক্ষী।

আজও সে দাঁড়িয়ে ছিল। তার আপীন পয়োধরের ওপর নীল কাঁচুলি, তার ওপর হলুদরঙের সূত্রজালিক। তার বিলোল কটাক্ষে থমকে দাঁড়িয়ে গেল উপালী। উপালী ক্রীতদাস। শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদের ছ'টি ক্রীতদাসের ভেতর সবচেয়ে উচ্চদেহী, সবচেয়ে শক্তিমান। উপালীর টানা-টানা চোখ-দুটো ঈষৎ আরক্তিম। রাত্রে মাঝে মাঝে তার সুরাপান অভ্যাস আছে। নগরের নিকৃষ্ট মদিরাগৃহে তাকে রাত্রে দেখা যায়। সে-রাত্রে সে আর কিছু আহার করে না। এসে শুয়ে পড়ে প্রাসাদের নিম্নভূমিতে ক্রীতদাসদের শোবার ঘরে। সবাই ঠিক বুঝতে পারে না। সকলে

জানেও না। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠী বিক্রচক তো জানেই না। জানে শুধু পটাচারা।

শ্রেষ্ঠী বিক্রচকের পুত্র নেই, একমাত্র কন্যা পটাচারা। যৌবনে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় ধৈর্যে বিক্রচক ধীরে ধীরে প্রায় আঠারোটি গুড়ঘর স্থাপন করেছে। তার মালিক সে একা। আঠারোটি গুড়ঘরে যা চিনি তৈরি হয়, তাতে শুধু বৈশালীর নয়, সমগ্র লিচ্ছবিরাজ্যের চিনির অভাব মেটায় বিক্রচক। দাম সম্বন্ধে সে অত্যন্ত লোভীর মতো লাভ করতে কোনোদিনই চায়নি, তাই লিচ্ছবিরাজ তার ব্যবসায়ে কোনো ব্যাঘাত তো করেনই না, বরং ব্যবসায়ী সম্মেলনে তাকে উচ্চ সম্মান দিয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম বিক্রচক ও তার স্ত্রী গৌতমীর খুবই মনোকষ্ট হোত একটি পুত্রের অভাবে। অবশেষে সেই মনোকষ্টের দরুনই হয়তো বা বিক্রচক ভিক্ষুসংঘে গিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ করল। ভগবান তথাগতের শরণ নিয়ে সে প্রাণিহত্যা, চৌর্য, মিথ্যা, সুরা ও মৃষাবাদ থেকে বিরত হয়ে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হোল। কখনো-সখনো বিহারের উপাস্থানশালায় গিয়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতো। বিক্রচক তাই বৈশালীর সবচেয়ে ধার্মিক শ্রেষ্ঠী।

পটাচারাকে পুত্রের মতো পালন করতো বিক্রচক। পটাচারা যা বলত, তাই হোত। যা চাইত, তাই পেত। অত্যন্ত আদরে পটাচারা হোল যেমনি অভিমানী, তেমনি খামখেয়ালী। তার খেয়াল হোল একবার, দু'শ রৌপ্যকাহন দিয়ে একটি সপ্তস্বরা কিনবে বাজাবার জন্যে। এমন সপ্তস্বরা বোধকরি লিচ্ছবির রাজকন্যার গৃহেও আছে কিনা সন্দেহ। তাই হোল। বিক্রচক দু'শ রৌপ্যকাহন দিয়ে সপ্তস্বরা তৈরি করালো মেয়ের জন্যে। সে-সপ্তস্বরার প্রতিটি ঘাটে ঘাটে তিন-চার তোলা সোনার একটি করে পাত মোড়া। সপ্তস্বরা বাজানো শিখল পটাচারা, কিন্তু কি খেয়াল হোল হঠাৎ একেবারে বাজানো বন্ধ করে দিলে। সপ্তস্বরা তোলা রইল।

গৌতমী মাঝে মাঝে মেয়ের খামখেয়ালিপনার জন্যে রাগারাগি করত; বলত বিক্রচককে,—আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটির মাথা খেয়ে দিলে তুমি। এ-মেয়ে তোমাকে শেষ করবে।

বিক্রচক হাসত। বলত,—শাস্তার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তো নিজের সবই শেষ করে দিয়েছি। পটাচারা আর কি শেষ করবে আমার।

গৌতমী আরও রাগত,—হাসি নয়। মেয়েমানুষের এত জেদ ভালো নয়। মেয়ে তোমার বড্ড বেশী জেদী।

বিক্রচক বলত,—জেদ জিনিসটা খুব খারাপ নয়। আমারও অল্পবয়েসে খুব জেদ ছিল, তাইতো এত হাজার-হাজার কাহন করতে পেরেছি। তা ছাড়া মেয়ে কি আমার একার, মেয়ে তোমার নয়?

—আমি শাসন করলে তো তুমি রেগে যাবে।

—রাগব না। তুমি প্রয়োজন হলে শাসন কোরো। তবে অনর্থক শাস্তি দিয়ো না।

—ছাই করব! ও শাসনের বাইরে চলে গেছে।

—তবে বাইরেই যেতে দাও। ভগবান তথাগতের যা ইচ্ছে, তাই হবে।

গৌতমী আর কথা বলে না। হঠাৎ একটি দাসীকে ডেকে জ্বালানী কাঠ না তোলবার জন্যে ভীষণ বকতে সুরু করে। বিক্রচক বোঝে পটাচারার ওপর রাগটা দাসীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে। ওখান থেকে সরে যায়।

এমনি করে বড় হয়ে উঠেছে পটাচারা। নিজের ইচ্ছেকেই সংসারে সবচেয়ে বড় করে দেখেছে। এত বড় করে দেখেছে যে, তার প্রবল ইচ্ছার বেগের কাছে আর-সব-কিছু সে চুরমার করে ফেলতেও বোধহয় দ্বিধা করবে না।

এইটেই হোল তার জীবনের পরবর্তী অনেক অভাবনীয় ঘটনার মূল।

সেদিন অলিন্দে দাঁড়িয়ে সে ইসারায় ডাকল উপালীকে। উপালীর হাতে কয়েকটি উপাধানের ময়লা আবরণ। বোধ হয় পরিষ্কার করতে নিয়ে যাচ্ছিল। পটাচারার কটাক্ষের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল।

তখন নির্জন দুপুর। গৌতমী বিশ্রাম করছে। বিক্রচক বেরিয়েছে কর্মস্থানে। দাসদাসী কেউ বা বিশ্রাম করছে, কেউ বা বৈকালের কাজ আগে সেরে রাখতে ব্যস্ত।

তখন গ্রীষ্মকাল। প্রখর রৌদ্রের তাপে পথে একটি পথিকও দেখা যাচ্ছে না। দুরন্ত গরমে এ-সময়ে কেউই ঘরের বাইরে আসে না। দেখা যায় শুধু মনিবহীন দু-চারটি কুকুর আর গাছের ডালে বা অলিন্দে আলিসায় দু-একটি কাক।

পথের ধারে গভীর পয়নালা থেকে ঠাণ্ডা জল খাচ্ছে একটা কুকুর।

ওপাশেই অবশ্য রয়েছে একটি জলসত্র। প্রপাপালিকা ছোট একটি কুটিরের সামনে বসে আছে কোনো তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত পথিকের আশায়। বিদেশী পথিক ছাড়া এদেশের কেউ এসময়ে পথে বেরোয় না। তবু পথের ধারে ধারে জলসত্র আছে। এ জলসত্র মানুষের জন্যে, তৃষ্ণার্ত কুকুরের জন্যে নয়। তাই কুকুরটা পয়নালার জলে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল পটাচারা।

পটাচারার দীর্ঘায়ত চোখ-দুটি নেচে উঠছিল কিসের এক আনন্দে। আনন্দটা হয়তো বা কোনো কারণবিহীন।

এমন বিনা কারণেও পটাচারা অনেক সময় উল্লসিত হয়ে ওঠে। খিলখিল করে হেসে ওঠে আপনমনে।

এটা ওর স্বভাব।

উপালী অপেক্ষা করে।

পটাচারা তাকে দাঁড়াতে ইসারা করেছে। এ হুকুম অমান্য করবার সাধ্য কার। এ-বাড়ির প্রতিটি দাসদাসী শ্রেষ্ঠিকন্যাকে ভয় করে। ভয় করে তার খেয়ালকে। কখন যে তার কী খেয়াল হবে, কেউ বলতে পারে না। অমান্য করলে সে দাসী বা দাসের বরাতে দুঃখ আছে। হয়তো বা পটাচারা নিজেই হাতের কাছে যা পেল, তাই দিয়ে মেরে বসল। একটি ক্রীতদাসকে একদিন সন্ধ্যায় পটাচারা ভীষণ শাস্তি দিয়েছিল। তাকে দাঁড়াতে বলেছিল, সে বেচারা দাঁড়িয়ে ছিল। পটাচারা তার বাসস্থা পরিবর্তন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠায় ক্রীতদাসটি একটু হেসেছিল।

রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল পটাচারা। ডেকে পাঠাল উপালীকে।

হুকুম করল,—বাঁধো এই জানোয়ারটাকে।

উপালী অলিন্দের একটি স্তম্ভের সঙ্গে তাকে বাঁধল। তারপর হুকুম হোল প্রহারের। নিদারুণ প্রহার।

আরও। আরও। ক্রীতদাসটি তখন জ্ঞান হারিয়েছে।

তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হোল। ক্রীতদাসটির কিছু বলবার নেই। সে ক্রীতদাস, তার জীবন কেনা।

বিক্রচক এসে শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হোল। সে পটাচারাকে ভর্ৎসনা করলো।

বিক্রচক পঞ্চশীলের সাধক। সে এই ধরনের কাজ সমর্থন করতে পারে না।

তবু পটাচারা নির্বিকার। বাবাকে জানিয়ে দিল,—তার অবাধ্য হলে এইরকম হবে।

বিরূঢ়ক বিরক্ত হোল, ক্ষুব্ধ হোল। ক্রীতদাসটিকে ডেকে পাঁচটি রৌপ্যকাহন দিল।

কি আর করবে বিরূঢ়ক। আদরের কন্যা। তাই দাসদাসীদের ডেকে সবাইকে পটাচারার আদেশ যথাসাধ্য পালন করতে বলে দিল।

পটাচারা যখন শুনল, বাবা ক্রীতদাসটিকে পাঁচটি কাহন দিয়েছে, সে উপালীকে ডেকে তার নিদারুণ প্রহারে খুশি হয়ে তাকে বিশটি রৌপ্যকাহন দিল। উপালী সেই রাত্রেই চলে গেল মদিরাগৃহে। যাকে মেরেছিল, তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল মদিরা পান করাবে। তার কাছে এই বলে ক্ষমা চাইবে যে, সে হুকুম পালন করেছে মাত্র। তার কোনো দোষ নেই।

উপালী শক্তিমান। মানুষটি ভালো। একমাত্র উপালী এ বাড়ির কাউকেই ভয় করে না। এমনকি পটাচারাকেও সময় সময় ভয় করে না।

পটাচারা এক দাসীর কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যে উপালী সেই দাসটিকে মদিরাগৃহে নিয়ে গেছে। পরদিন আহারের পর ডেকে পাঠালে উপালীকে নিজের ঘরে।

ভ্রু-দুটো কুঁচকে তাকাল উপালীর দিকে।

উপালী দেখল পটাচারার উন্নত বুকের ওপর হরিৎ-কঞ্চুলী আরও উন্নত হয়ে উঠেছে রাগে অহঙ্কারে।

—তুমি কাল মদিরাগৃহে গিয়েছিলে?

উপালী চোখ নামায়। অকম্পিত সহজ স্বরে বলে,—হ্যাঁ, ভদ্রে।

—তোমার সঙ্গে আর কে গিয়েছিল?

—কিম্বিল।

কিম্বিল ওই দাসটির নাম।

—ওকে সঙ্গে নিয়েছিলে কেন?

উপালী বলে,—দাসদের মদিরাগৃহের বার্তা শ্রেষ্ঠিকন্যার জানতে চাওয়া কি শোভন হবে?

পটাচারা ভালো করে তাকায় উপালীর দিকে। না, তার মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন নেই।

—তোমার কাছ থেকে কি আমায় শোভনতা শিখতে হবে?— পটাচারার কণ্ঠে শ্লেষ।

উপালী সহজ স্বরে বলে,—আপনি আমার কথা একটু ভুল বুঝেছেন। কিম্বিলকে মদিরাগৃহে নিয়ে গিয়েছিলাম স্ফূর্তি করতে। সে স্ফূর্তির ব্যাখ্যা আপনার কাছে আমার না করাই ভালো।

পটাচারার জেদ বাড়ে,—আমি শুনব। তুমি বলো।

উপালী তাকায় পটাচারার দিকে। মনে মনে হাসি পায় ওর। —আপনার কৌতূহল সংযত করলেই ভালো করতেন, ভদ্রে। শুনতে যখন চাইছেন বলি, কিম্বিলকে দু'চষক মদিরা খাওয়াতে ওর জ্ঞান ছিল না। ওকে নিয়ে মদিরাগৃহে এক কিন্নরী তামাসা করতে সুরু করলো।

পটাচারার চোখ-দুটি নরম হয়ে আসে। উপালীর সুগঠিত শরীরের দিকে বার বার তাকায়। সুমিষ্ট স্বরে বলে,—তুমি ক'চষক খেলে উপালী?

—আমি?— একটু হাসে উপালী,—আমি খেয়েছিলাম আট চষক। ওতে আমার কিছু হয়নি। আমিই কিন্নরীটিকে শিখিয়ে কিম্বিলকে নিয়ে আমোদ করছিলাম।

—তারপর কি হোল?

—আর শুনতে চাইবেন না, ভদ্রে।

—বলো তুমি, নির্ভয়ে বলো।

—কিন্নরীটি নৃত্য জানত, তাকে দশটি তাম্রকাহন দিয়ে নৃত্য করিয়েছিলাম। কিম্বিলও তার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগল। তারপর—

উপালী হাসতে লাগল।

পটাচারা বলল,—হাসছ যে। তারপর কি হোল?

—তারপর আর বলতে পারব না।

—বলো, তোমার কোনো ভয় নেই।

—তারপর কিন্নরীটি কিম্বিলকে বিবস্ত্র করে ফেলেছিল।

পটাচারা হেসে উঠল। —ঠিক হয়েছে। তুমি ওকে আবার শাস্তি দিয়েছ। এই নাও, তোমাকে আমি আরও পাঁচকাহন দিচ্ছি।

পটাচারা একটি খোদিত কাষ্ঠনির্মিত ছোট বাক্স থেকে আরও পাঁচটি রৌপ্যকাহন বার করে দিল উপালীকে।

উপালী এবারে একটু অবাক না হয়ে পারল না।

উপালী অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছিল পটাচারার ব্যবহার তার সঙ্গে একেবারে অন্যরকম। অন্য কোনো দাস বা দাসী মনিবকন্যার কাছে এই ধরনের কথা বলতে সাহস পেতো না। সে নিশ্চিত নিদারুণভাবে প্রহৃত হয়ে বিতাড়িত হোত। কিন্তু পটাচারা তাকে বরাবরই অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। কেন এ প্রশ্রয়। ভেবে বিস্মিত হয় উপালী। মাঝে মাঝে এত বেশী প্রশ্রয়ে ভীতও হয়।

পটাচারা বসেছিল কুট্টিমের ওপর। প্রায় আধশোয়া হয়ে ছিল।

তার বসবার ভঙ্গি অতি মনোরম। যে কোনো পুরুষের হৃদয় অস্থির করে তোলবার মতো।

উপালীর শরীরও উষ্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

অসামান্যা রূপবতী পটাচারা। কণ্ঠে মধু ঢেলে বলে,—তুমি বোসো, উপালী।

উপালী একটু ইতস্তত করে পাথরের মেঝের ওপর বসে। সোজা হয়ে বসে।

পটাচারা পাতলা ঈষৎ রক্তাভ ঠোঁট-দুটি ফাঁক করে একটি হাই তোলে। যেন ঘুম-ঘুম ভাব। চোখ-দুটিকে টেনে অতি আয়াসে বলে,—তোমার গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে, উপালী। দুপুরে আমার কাজ থাকে না। ঘুমোনর চেয়ে গল্প শোনা ভালো। তোমার বয়েস কত উপালী?

—বয়েস তেইশ কি চব্বিশ হবে।

—আমার আঠারো।

তুলনাটা উপালীর ভালো লাগে না। চুপ করে থাকে।

পটাচারা বলে,—তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি খুব মূর্খ নও।

উপালী ম্লান হাসে,—আপনার অনুমান কিছুটা ঠিক।

—তুমি কি শৈশবে পাঠ গ্রহণ করতে?

—হ্যাঁ, তক্ষশীলার বিদ্যালয়েও কিছুকাল ছিলাম।

—তবে তোমার এ অবস্থা কেন?

উপালী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।—ভাগ্যই বলতে পারেন। আমার জন্মের পর আমাদের পুরোহিত গণনা করে বলেছিলেন, আমার ভাগ্য ভালো নয়।

—তোমাদের বাড়ি কোথায় ছিল?

—রোহিণী নদীর তীরে কোলি নগরে। কপিলাবস্তুর ওপারে কোলি নগর। সেখানে আমার বাবা সামান্য অধ্যাপকের কাজ করতেন। আমরা ভাইবোন ছিলাম দশটি। তাই অভাব ছিল বড় বেশী।

—তোমার মা ছিলেন?

—না। মা মারা গিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন আর সংসারে এক পিসীমা ছিলেন। আমার বাবার মতো সরল মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। তবে তিনি ছিলেন বড় একরোখা। অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতির। আমাদের ওখানে এক শ্রেষ্ঠী আমার বাবাকে বললেন, তাঁকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হবে একটি বিচারে। বাবা প্রত্যাখ্যান করলেন। শ্রেষ্ঠী ছিলেন ওখানকার সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী মানুষ। তিনি রাগলেন। শুধু রাগলেন না, শত্রুতা সুরু করলেন।

উপালী ম্লান হাসে।—জানেন তো ধনীর শত্রুতা কী মারাত্মক হতে পারে। হোলও তাই। বাবার অধ্যাপনার কাজটি গেল। তখন আমি তক্ষশীলায়। খবর পেয়ে তক্ষশীলা থেকে চলে এলাম। এসে সব শুনে বুঝলাম, বাবা না খেয়ে মরলেও শ্রেষ্ঠীর কাছে আর যাবেন না। আমিই গেলাম শ্রেষ্ঠীর কাছে। তাঁকে অনুনয় করলাম বাবার জন্য। তিনি আমাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তাড়িয়ে দিলেন।

উপালী একটু থেমে বলে,—ধনের অহংকার বড় মারাত্মক, ভদ্রে।

পটাচারা কৌতূহলে উঠে বসেছে। টানা-টানা চোখ-দুটোয় ওর সুগভীর সহানুভূতি। উপালীর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে,—তারপর?

—তারপর দুঃখের পালা। দিনের পর দিন একবেলা খেয়ে কাটতে লাগল। বহু চেষ্টা করেও বাবা অন্য একটা জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারলেন না। নগরে কেউ কোনো সাহায্য তো করলই না, বরং নানা ভাবে শত্রুতাই করতে লাগল। শ্রেষ্ঠীর দাস সবাই। বাবাকে বললুম, এ-নগর ছেড়ে অন্য কোথাও চলুন। বাবা পণ করে বসলেন, তিনি ভিটে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না। তারপর সুরু হোল দারুণ কষ্টের পালা।

উপালী পটাচারার দিকে তাকায়। চোখ-দুটো ওর জ্বলছে।

—একমুঠো তণ্ডুল জোটাতে পারছি না। ভাত না খেয়ে থাকায় যে কী কষ্ট, আপনি ধারণা করতে পারবেন না। দিনের পর দিন চোখের সামনে ছোট ভাইবোনগুলো খিদেয় শুকিয়ে যাচ্ছিল। দিনরাত আমার মাথাটা তখন জ্বলত। আগুন জ্বলত সর্বাঙ্গে!

একদিন রাত্রে আমার ছোট বোনটা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেদিন আর সহ্য করতে পারলাম না। বেরিয়ে পড়লাম পথে। সেই রাত্রেই। পথেই রাত কাটল।

পরদিন সকালে নগরের ব্যবসার স্থানে গিয়ে হাজির হলাম। চুরি করব, ডাকাতি করব, যেমন করে পারি আজ আমাকে কিছু নিয়ে যেতেই হবে বাড়িতে। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে চোখ পড়ল আপনার বাবার দিকে। উনি তখন

বাণিজ্যে গিয়েছিলেন ওখানে। সঙ্গে ছিল পাঁচশ' গরুর গাড়ি।

মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। ওঁকে গিয়ে বললাম, আপনি কি দাস ক্রয় করবেন?

উনি জানালেন, ভালো দাস পেলে উনি কিনতে পারেন।

বললাম, আমাকে কিনুন। বেশী নয়, একশ' সুবর্ণ হলেই আমি রাজী।

উনি রাজী হলেন। উনিশ-বছরের এমন শক্তসমর্থ একটা মানুষ কিনতে আরও বেশী কাহন লাগবার কথা।

আমি বললাম, সুবর্ণ কিন্তু আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। আমার কথা কিছু বলবেন না।

তিনি সুবর্ণ নিয়ে পৌঁছে দিলেন। আমি তখন সাবালক, কাজেই দাস-ক্রয়ের চুক্তিতে স্বাক্ষর করলাম।

উপালী থামল। ওর মুখখানা তখনও রক্তাভ। চোখ-দুটি সজল।

একটা নিশ্বাস ফেলে ক্লান্ত হয়ে বলে,—এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম বলুন? তবু জানলাম, একশ' সুবর্ণে ওদের বেশ দীর্ঘদিন কাটবে। ততদিনে বাবা কিংবা আর কোনো ভাই একটা কিছু করতে পারবে।

পটাচারার চোখ-দুটিতে উত্তেজনা। —সেই শ্রেষ্ঠীকে তুমি ক্ষমা করলে উপালী?

উপালীর স্বর অতি গভীর। —না। ক্ষমা করিনি, ভদ্রে। তার কথা আজও আমার মনে আছে। বুকের ভেতর জ্বলে যায়। সেই জ্বালা কমাবার জন্যেই আমি মদিরাগৃহে যাই। এ জ্বালা কবে যে একেবারে জুড়োবে জানিনে।

পটাচারা তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে উপালীর দিকে।

—তোমার কথায় আমি মুগ্ধ হয়েছি, উপালী।

—উপালী চমকে ওঠে। পটাচারার তন্ময় বিমুগ্ধদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলে,—আমি আপনাদের ক্রীতদাস। এ ছাড়া আমার আর কোনো পরিচয় নেই।

পটাচারা বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলে,—হ্যাঁ, তুমি এক আশ্চর্য পুরুষ। সেইজন্যেই বোধহয় এতদিন তোমাকে অন্য দাসদের মতো করে দেখতে পারিনি। আজ বুঝতে পারছি কেন পারিনি। বাবাও তোমার খুব প্রশংসা করেন, উপালী।

নির্লিপ্ত ভদ্র কণ্ঠে উপালী বলে,—সেটা তাঁর দয়া। আমি জানি, আমি এখন এক নির্গুণ ক্রীতদাস মাত্র।

ঢলে-পড়া সূর্যের বিষণ্ণ আভায় উপালীর মুখখানি আরও বিষণ্ণ মনে হয়।

পটাচারা বলে,—আমার একটা কথা রাখবে উপালী?

উপালী বলে,—আপনি যা হুকুম করবেন, শুনতে আমি বাধ্য।

পটাচারা বলে,—এ আমার হুকুম নয়, আমার অনুরোধ, তুমি আর মদিরা পান কোরো না।

উপালী চুপ করে থাকে।

—আমি জানি, তোমার কষ্টের কথা মনে পড়লে তুমি স্থির থাকতে পারো না। তোমার জ্বালার কথা আমি বুঝি।

উপালী নীরব।

—তোমার জ্বালা যখন অসহ্য হবে, তখন তুমি আমার কাছে এসো। আমি বেদনার অংশ নেব।

উপালী চমকে ওঠে আর একবার। —এ আপনি কী বলছেন ভদ্রে!

—ঠিকই বলছি, তুমি আর মদিরাগৃহে যেয়ো না। বলো, যাবে না?

উপালী চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর অনেক চিন্তার পর বলে,—আমাকে চল্লিশ দিন সময় দিন। তারপর আমি আপনাকে জানাব। এখন আমি উঠি। কাজের সময় হোল।

উপালী চলে যায়।

পটাচারা তেমনি বসে থাকে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে। কী আশ্চর্য পুরুষ এই উপালী!

আজ চল্লিশ দিন। আবার অলিন্দের স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিপ্রহরে উপালীকে ডেকেছে পটাচারা। উপালী দাঁড়িয়ে আছে।

উপালী ভাবছে। ভাবছে, এই চল্লিশ দিন সময় সে যে কারণে নিয়েছিল, তা কি সে জানতে পেরেছে? সে কি জানতে পেরেছে যে পটাচারা তার জ্বালা উপশম করতে সত্যিই পারবে?

আভাস সে পেয়েছে। এই চল্লিশ দিনে সে অনেক আভাস পেয়েছে।

পটাচারা বার বার তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, বার বার তার সঙ্গে অকারণ কথা বলেছে, হেসেছে। এত বেশী কথা বলেছে, এমন অর্থপূর্ণভাবে তাকিয়েছে যে, দাসমহলেও এ নিয়ে একটু কানাকানি শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিরূপক বা গৌতমীর কানে অবশ্য কিছু যায়নি। তারা এ-দিকে একটা নজরও দেয়নি। তাদের বয়েস হয়ে

এসেছে, নিজেদের কাজে নিজেরা ব্যস্ত। বাকী সময়টুকু ভগবান তথাগতের চিন্তায় কাটিয়ে দেয়। বিশেষ করে বিরূঢ়ক ক্রমশঃই সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ছে। বেশির-ভাগ সময়ই সে চৈত্যে শ্রমণ-ভিক্ষুদের সঙ্গে কাটাতে চায়। নিজে একটি বিহার তৈরি করে দেবে বলে বাসনাও আছে, যেমন করেছেন অনাথপিণ্ড চুয়ান্ন কোটি সুবর্ণ-ব্যয়ে একটি অতি মনোরম বিহার।

অত ধন ব্যয় না করতে পারলেও, বেশ মোটা অঙ্কের সুবর্ণ ব্যয় করবে বলে ইচ্ছে হয়েছে। পটাচারার যৌবন সম্বন্ধেও হয়তো বা তার চৈতন্য হোত না, যদি গৌতমী একদিন মনে করিয়ে না দিত যে, কন্যা সুপাত্রে দান করবার সময় এসেছে।

বিরূঢ়কের চৈতন্য হোল, সে পাত্রের সন্ধান শুরু করলো। দু-একটি সন্ধান যে মিলছিল না তা নয়। তবে পাত্রের কুলশীল সম্পদ বিবেচনা করতে করতে সময় কাটছিল।

পটাচারা এই সময়টাতেই উপালীকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে চললো। উপালী তাকে মুগ্ধ করেছে। এখন বুঝতে পারছে পটাচারা যে, অনেক আগে থেকেই সে উপালীর প্রতি আসক্ত। সম্প্রতি তার প্রকাশ হয়েছে মাত্র। পটাচারা যে একটি ক্রীতদাসের সঙ্গে তার আসক্ত হওয়ার কলঙ্কের কথা একবারও ভাবেনি তা নয়। হয়তো বা এতে জীবনে অত্যন্ত গুরুতর কিছুও ঘটতে পারে। তবু সে নিজেকে সংযত করতে পারছে না। দিন যত যাচ্ছে, ততই তার বেশী করে ভালো লাগছে উপালীকে। সংযম-অভ্যাস সে শৈশব থেকেই করেনি, কাজেই সংযম তার পক্ষে অসম্ভব। দিন দিন তার আবেগ আগুনের শিখার মতো বেড়ে উঠছে।

উপালী কিন্তু সংযত। জীবনের সঙ্গে তার সত্যিকারের পরিচয় আছে, তাই সে জানে তার পক্ষে শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রতি আসক্ত হওয়া শুধু অন্যায় নয়, অত্যন্ত ভয়াবহ। সে নিজেকে অত্যন্ত সংযত করে রেখেছে।

এটা আবার পটাচারার খুব খারাপ লাগে। উপালী সময় সময় তাকে যে উপেক্ষা করে এটা তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

একদিন সন্ধ্যায় উপালী যখন পিতলের দীপদণ্ড রেখে বাতি জ্বালাচ্ছিল, চন্দনগন্ধী ধূপ দিচ্ছিল পটাচারার ঘরে, পটাচারা ওকে কাছে ডাকল।

উপালী দাঁড়াল।

—আরও কাছে এসো।

উপালী একটু এগোল।

—আরও কাছে।

উপালী কিন্তু আর এগোল না।

পটাচারা রেগে উঠল। —যা বলছি শোনো।

উপালী হাসল একটু। বলল,—বলুন। শুনছি।

পটাচারা নিজেই ওর কাছে এগিয়ে বললে,—একটা কথা মনে পড়ল বলে ডাকলুম।

—কি?

ফিসফিস করে বলে পটাচারা,—তুমি যখন দীপ জ্বালছিলে, তখন কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমায়।

উপালী কেঁপে ওঠে। সংযত স্বরেই বলে,—মনিব-কন্যার কাছ থেকে একজন ক্রীতদাসের এ-ধরনের কথা শোনা অন্যায়।

বলে তৎক্ষণাৎ উপালী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পটাচারা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর ছোট একটি প্রস্তর-পীঠিকার ওপর বসে। মুখটা ম্লান।

উপালী কেবলই বলে, ক্রীতদাস—ক্রীতদাস। উপালী যে পটাচারার কাছে একটি ক্রীতদাস নয়, এটা কেন সে উপালীকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না। চিন্তায় ডুবে যায় পটাচারা।

কোন্ এক ফাঁকে উপালী আবার ওর ঘরে এসেছে ও টের পায়নি।

—ভদ্রে!

পটাচারা চমকে ওঠে। তাকায়।

উপালী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—আপনি পরমাসুন্দরী। আমার মতো সামান্য এক দাসকে এমন করে প্রলোভন দেখাবেন না।

—প্রলোভন!— পটাচারা তেমনি ম্লান মুখে বসে থাকে।

উপালী আরও একটু সময় দাঁড়ায়। পটাচারার মুখ ম্লান দেখলে ওর যে মোটেই ভালো লাগে না। সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে পটাচারার ম্লান মুখটি মনে জাগে, এটা উপালী অস্বীকার করতে পারে কই? তবু নিজেকে চেপে রেখেছে উপালী।

বলে,—আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করুন।

পটাচারা এই প্রথম গম্ভীর স্বরে বলে,—না, সব অপরাধই আমার। তুমি যাও।

উপালী চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এর পর থেকে পটাচারা উপালীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলেনি। আজ দ্বিপ্রহরে, থাকতে ইঙ্গিত করেছে। উপালী দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পটাচারা কোনো কথা বলছে না।

অবশেষে উপালী বলে,—কিছু বলবেন?

পটাচারা আস্তে আস্তে টেনে টেনে বলে,—আজ তোমারই তো বলবার কথা।

আজ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়েছে।

পটাচারা ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে,—ঘরে এসো।

নীরবে উপালী ঘরের দিকে ওর পেছন পেছন চলে।

পটাচারা ঘরে গিয়ে প্রস্তর-পীঠিকার ওপর বসে।

উপালী দাঁড়িয়ে থাকে। পটাচারা কথা বলে না। উপালী লক্ষ্য করে পটাচারা তার কাছ থেকে কিছু শুনতে উৎসুক। উপালী আস্তে আস্তে বলে,—আপনার কথাই মেনে নিলাম।

—কোন্ কথা?

—মদিরাগৃহে আর আমি যাব না। আপনি কি জানেন, আপনি সেদিন বলবার পর থেকে আর একদিনও মদিরাগৃহে যাইনি।

—জানি।

—কি করে জানলেন? আমি তো আপনাকে বলিনি।

পটাচারা হাসে। অবোধ্য হাসি। —তোমার সব খবর আমি মনে মনে জানতে পারি।

উপালী এ-কথার উত্তর দেয় না।

পটাচারা বলে,—তুমি কিন্তু আমার খবর কিছু জান না।

—কি খবর?

—তুমি কি জান, বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন?

—কোথায়?

—কৌশাম্বির এক শ্রেষ্ঠিপুত্রের সঙ্গে। আমাদের চেয়েও বেশী সম্পদ তাদের। একমাত্র পুত্র।

উপালীর মুখটা মুহূর্তের জন্যে ম্লান হয়ে যায়। সে-মনোভাব চেপে সে বলে,—ভালোই তো।

পটাচারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে,—তুমি ভালো বলছ উপালী? তুমি কি জান সে আমার চেয়েও দেখতে একটু খাটো।

দীর্ঘাঙ্গী পটাচারার দিকে তাকিয়ে উপালী বলে,—তবু সে শ্রেষ্ঠিপুত্র।

—আমি এ-বিয়ে করব না, উপালী। কিছুতেই নয়।

পটাচারা একটুতেই অধৈর্য হয়ে পড়ে।

উপালী স্থির শান্ত ভাবে বলে,—যদিও জিজ্ঞেস করবার অধিকার আমার নেই, তবু জিজ্ঞেস করি, আপনার আপত্তি কিসের?

পটাচারা বলে,—অধিকার তোমার আছে। আছে। কতবার তোমাকে জানাব যে এ-অধিকার তুমি অর্জন করেছ। শোনো—

পটাচারার আবেগে উপালী একটু বিচলিত হয়। মুহূর্তের জন্যে একটু আবেগ যে তারও না আসে তা নয়। কিন্তু নিজেকে ধীরে ধীরে সংযত করে নেয় উপালী।

তবু বলে,—কষ্ট হয় ভেবে যে আপনার বিয়ের পর আমি আমার জীবনের এক পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণীকে হারাব। আপনার দয়া আমার চিরকাল মনে থাকবে, ভদ্রে।

—দয়া! দয়া! উপালী, দয়া আমি তোমাকে কখনও করিনি।

অধৈর্য হয়ে এগিয়ে আসে পটাচারা। দ্বারের অর্গল বন্ধ করে উপালীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে প্রস্তর-পীঠিকার কাছে। পটাচারা কি ক্ষেপে গেল?

—দয়া তোমাকে আমি করিনি, উপালী। তোমার কাছে দয়া চাইছি। তুমি বড় নির্মম, উপালী!

উপালী নিজেকে সংযত রেখেই বলে,—অনেক কথা বুঝেও না-বোঝবার ভান করতে হয়, ভদ্রে।

—না, আর ভানের প্রয়োজন নেই। একি তুমি বোঝনি, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পটাচারা জড়িয়ে ধরে উপালীর দীর্ঘ দেহ।

উপালী ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে,—সংযত হোন, ভদ্রে। আমাকে একটু ভাবতে দিন।

পটাচারা অনুনয় করে,—তুমি আমাকে বাঁচাও উপালী, এ বিয়ে আমি করতে পারব না।

চিন্তিত মুখে উপালী বলে,—আমি কী করতে পারি, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু ভাবতে দিন। একটু ভাববার সময় দিন।

পটাচারার কণ্ঠ ভেঙে এসেছে বলতে বলতে,—আমি আমার মান-সম্ভ্রম সব খুইয়েছি। আমার এত অহঙ্কার, অভিমান সব জলাঞ্জলি দিয়েছি। তুমি কি বোঝ না, উপালী, দিনের পর দিন তোমাকে আমি কত গভীরভাবে ভালবেসেছি? ইচ্ছে হয়, তুমি আমায় মেরে ফেল, না হয় আমায় বাঁচাও। অন্য কোথাও বিয়ে হোলে আমি নিশ্চয় বাঁচব না। নিশ্চয় জেনো।

পটাচারার বয়েস অল্প, সংসারের অভিজ্ঞতা অল্প। নির্মম সংসারের কঠোর দিকটা ও আজও জানে না। তাই উপালীকেই ওর হয়ে চিন্তা করতে হয়। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে উপালী আস্তে আস্তে বলে,—আমি সবই জানি। সবই বুঝি, ভদ্রে। তবু আমায় একটু ভাববার সময় দিন, ভদ্রে। এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা আমার পক্ষে ঠিক হবে না।

পটাচারার চোখ সজল। এ কথা নিশ্চিত যে ও উপালীকে সত্যিই ভালবেসেছে। ভালবাসায় ওর অতি উচ্ছল স্বভাবও যেন অনেক নরম হয়ে এসেছে। খেয়ালিপনা অনেক কমে এসেছে। কিছুদিন হোল পটাচারা একটু শান্ত হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করেছে উপালী।

গৌতমীও লক্ষ্য করছে কন্যার ভাবান্তর। ভেবেছে, বিয়ের জন্যেই মেয়ের এই ভাবান্তর। বিরূঢ়ককে বলেছে, আরও শীঘ্র কোনো পাত্রের সন্ধান করতে।

কৌশাম্বির শ্রেষ্ঠিপুত্র। সব দিক দিয়েই পটাচারার উপযুক্ত। শুধু ছেলেটি মাথায় একটু খাটো। তা হোক। তাতে কি আসে যায়।

এখানেই বিবাহ প্রায় স্থির করে ফেললেন বিরূঢ়ক।

শুনে পটাচারা অস্থির হয়ে উঠল। এই প্রথম ও বুঝল যে, উপালীকে ও কত ভালবাসে। উপালীকে ছেড়ে থাকার কল্পনাও তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপায় কি?

উপালী উপায় ঠিক করুক। সে অত ভাবতে পারবে না।

সেদিন উপালী চলে যায়। পটাচারা আজ যেন খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে। উপালীকে জানিয়েছে তার সব কথা। আর তার কোনো দায়িত্ব নেই।

দিন সাতেক কেটে গেছে। বাড়িতে যেন সোরগোল পড়ে গেছে পটাচারার বিবাহে। সবাই বিবাহের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। কৌশাম্বিতেই বিবাহ স্থির হয়েছে। বিবাহের দিনও স্থির হয়েছে। জ্যৈষ্ঠের শুক্লাসপ্তমীর সন্ধ্যায় বিবাহ। আর দেরি নেই।

বিরূঢ়ক জিনিস কেনায় ব্যস্ত। গৌতমী খুঁটিনাটি প্রয়োজন বলে দিচ্ছে, বিরূঢ়ক প্রতিদিনই কিছু কিছু দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে আনছে। বিরূঢ়ক বেশ খরচ করবে এ-বিয়েতে।

এত আয়োজন এত সোরগোল, কিন্তু পটাচারা শান্ত ম্লান। কারুণ্যের প্রতিমূর্তি যেন পটাচারা। ওর এমন পরিবর্তন সত্যিই অভাবনীয়।

উপালী সবই লক্ষ্য করে। ভয়ে পটাচারার কাছে আসে না।

সেদিন রাত্রে উপালী সকলের শেষে শুতে যাচ্ছিল নিজের ঘরে। অলিন্দ পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে কী ভেবে আবার ফিরল।

পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল পটাচারার ঘরের দিকে। ঘরের কাছে এসে থামল। দ্বারের স্বল্প ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরে পিত্তলদণ্ডের ওপর তখন দীপবর্তিকা জ্বলছে। দীপের আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ক্ষীণ আলোয় ও দেখে, পটাচারা গালে হাত দিয়ে বিষণ্ণমনে বসে আছে কুট্টিমের ওপর।

উপালীর বুকের ভেতরে সত্যিই ভীষণ আলোড়ন আনে ওই দৃশ্য।

ও আজ আবেগে এই প্রথম অস্থির হয়ে ওঠে।

খুব আস্তে দ্বারে আঘাত করে।

পটাচারা ভেতর থেকে কোনো কথা বলে না। আস্তে আস্তে দ্বার খুলে যায়।

আস্তে বলে পটাচারা,—কে?

উপালী ঘরে ঢুকে নিজেই আজ দ্বারের অর্গল দিয়ে দেয়। কপালে ওর চিন্তার রেখা।

পটাচারা ধীরে ধীরে এসে ওর সামনে দাঁড়ায়।

উপালী ওর কাঁধ ধরে বলে,—এই শেষ দেখা করতে এলাম। আমি আজ রাত্রেই এখান থেকে পলায়ন করব।

—কেন?

—তুমি চলে গেলে এ-প্রাসাদে থাকা আমার সম্ভব হবে না। আমি পলায়ন করব। এ রাজ্যে থাকলে আমাকে প্রহরী ধরবে। ক্রীতদাসের পলায়নের অপরাধে বিচার হবে। তাই স্থির করেছি, শ্রাবস্তীর আলবী নগরে যাব। ও নগরটি আমার জানা আছে। ওখানে আমার এক অতিপরিচিত বন্ধু আছে। তক্ষশীলায় আমরা একসঙ্গে পড়তাম।

পটাচারা নীরবে ওর দিকে তাকায়।

উপালী বোঝে। বিষণ্ণমুখে বলে,—তুমি বিয়ে করে সুখী হও, পটাচারা।

এই প্রথম উপালী ওর নাম ধরে ডাকল।

পটাচারা হাসে। —তুমি কি মনে কর, আমার মন বলে কিছু নেই?

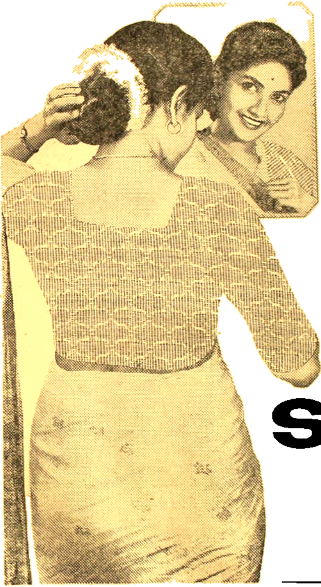

91 BEN

দেখতে অপূর্ব

আর মন

আনন্দে ভরিয়ে দেয়

SRM

লেনোস্

ভয়েলস্

শ্রীরাম মিলস্ লিমিটেড
ফার্গুসন রোড, বোম্বাই-১৩
[illegible]

—যাচ্ছে। কিন্তু মনকে তো মানানো যায়।

—কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানানো যায় না।

—তবে— উপালী একটু চিন্তিত হয়।

পটাচারা কান্নার চেয়েও বিষণ্ণ হাসে। —তবে আর কিছু নয়। এ বিয়ে আমি মেনে নেব না। বিয়ের আগে একটা কিছু আমাকে করতেই হবে।

উপালী জানে, ও অত্যন্ত জেদী। ভয়ে ভয়ে বলে,—কি করবে?

—হয়তো— পটাচারা একটু থেমে বলে,—হয়তো আমার মৃতদেহ দেখতে পাবে বিয়ের আগের দিন।

চমকে ওঠে উপালী। বলে ওঠে,—ছি, ওসব কথা কখনও মনেও এনো না। আমি কি করলে তুমি সুখী হও বলো?

পটাচারা একটু সময় ভাবে। আস্তে আস্তে বলে,—আমি যা বলব, শুনবে?

—সত্যি শুনব।

—তবে শোনো, আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।

আবেগধারা ভীষণভাবে চমকে ওঠে উপালী। —আমার সঙ্গে! কোথায়?

—তুমি যেখানে যাবে, সেখানে।— পটাচারার কণ্ঠস্বর অবিচলিত।

—কিন্তু—

—কিন্তু কি উপালী?

—আমি যাব আলবীতে পালিয়ে। তুমিও আমার সঙ্গে পালাবে?

—হ্যাঁ। তাই যাব।

—আমি তো ধনী নই, পটাচারা। আমি তোমাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব কি?

একটু চিন্তা করে পটাচারা বলে,—এখান থেকে যা নিয়ে যাবো, তাতে বেশ কিছুদিন চলে যাবে।

বিশেষ চিন্তিত উপালীর মুখ। —কিন্তু তারপর?

—তার পর তুমি কি একটা কিছু করতে পারবে না?

—নতুন জায়গায় গিয়ে কী করতে পারব এখন থেকে তো বলতে পারিনে। কী-ই বা করব?

—ব্যবসা কিছু করতে পার। পরে হয়তো তুমিই একজন শ্রেষ্ঠী হতে পারবে।

পটাচারা হাসে।

উপালীও হাসে।

রাত গভীর হয়ে আসছে। প্রাসাদ নিঝুম। বাইরে অন্ধকার। কৃষ্ণাদশমীর রাত্রি। আকাশটাও যেন নিকষ-কালো। উজ্জ্বল তারাগুলো না থাকলে বোঝাই যেত না যে, আকাশ আছে।

পথে কেউ নেই। শুধু মাঝে মাঝে প্রহরীর চৌকির হাঁক শোনা যাচ্ছে।

প্রহরীর হাঁক শুনে পটাচারা বলে,—পথে যদি আমাদের ধরে ফেলে?

উপালী বলে,—সে ভার আমার। অর্থ উৎকোচ দিয়ে বশ করতে হবে প্রহরীকে। লিচ্ছবিরাজ্যের সীমানার ধারে আবার হয়তো ধরবে। তখনও ওই একই ব্যবস্থা করতে হবে।

—কিসে যাবে?

উপালী ভাবতে ভাবতে বলে,—সেসব ব্যবস্থা আমি করব। তুমি কাল শরীর অসুস্থ বলে শুয়ে থাকবে। দুপুরের দিকেই আমরা বেরোব, তাহলে অনেকটা পথ যেতে পারব সন্ধ্যার ভেতর। তারপর সন্ধ্যার পরে যদি চৌকিতে খবর যায়, আমাদের ধরতে পারবে না। রাত্রের অন্ধকারে কোনো প্রহরীই আমাদের খোঁজ পাবে না। ভোরের দিকে আমরা এ-রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারব। অচিরবতী নদী পেরিয়ে কোশলরাজ্যের ভেতর পৌঁছোব।

পটাচারা বলে,—শ্রাবস্তী থেকে কতদূর সে-জায়গা?

উপালী একটু ভেবে বলে,—প্রায় পঁয়ত্রিশ যোজন। তখন নিশ্চিন্তে যাওয়া যাবে। ওদিককার পথঘাট আমি কিছু কিছু চিনি।

পটাচারা উপালীর হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলে,—লিচ্ছবিরাজের তরফ থেকে যদি কোশলরাজকে খবর পাঠায় আমাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে?

উপালী হাসে।—অসম্ভব। কোশলরাজ প্রসেনজিতের সঙ্গে লিচ্ছবিরাজের শত্রুতা আছে। তারা সে-খবর গ্রাহ্য করবে না। এরাও হয়তো খবর দেবে না।

উপালী এবার পটাচারার কোমল পৃষ্ঠদেশের দিকে জড়িয়ে ধরে বলে,—এবার আমি যাই, পটাচারা! কাল প্রস্তুত থেকো।

হঠাৎ পটাচারা ওর বিশাল বক্ষে মুখ রেখে বলে,—আমার যেন একটু ভয়-ভয় করছে।

বক্ষ আরও বিস্তৃত করে উপালী। —ভয় কি? আমি তো আছি।

আস্তে আস্তে পটাচারার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে আসে উপালী।

সে-রাত্রে উপালীর ঘুম হয় না।

পটাচারারও ঘুম হয় না।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই অচিরবতী নদীর তীরে এসে থামল উপালী। উপালী নিজেই গরুর গাড়ি চালাচ্ছিল। অত্যন্ত জোয়ান দুটো বলদ বেছে নিয়েছিল উপালী। খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে তারা। গাড়ির আবরণের ভেতর পটাচারা বসে আছে।

এতক্ষণে গাড়ি থামাল উপালী।

ভেতরে পটাচারা চমকে উঠল, কিছু বিপদ হোল নাকি?

সমস্ত পথটাই পটাচারা ভয়ে ভয়ে আসছিল। ভগবান তথাগতের শরণ নিয়েছিল পটাচারা। জীবনে এই প্রথম সে বুদ্ধের কথা স্মরণ করল। ভগবান দশবলের বরাভয়-শোভিত হাতখানি চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিল পটাচারা।

এতক্ষণ মন শান্ত ছিল। পথে কোনো বিপদ হয়নি। পথ চলতে চলতে একবারও থামেনি উপালী।

পটাচারাও বাইরে মুখ বাড়িয়ে একটা কথাও বলেনি ওর সঙ্গে। উপালীর বারণ ছিল।

এখন হঠাৎ গাড়ি থামতে চমকে উঠল পটাচারা।

উপালী আবরণের ভেতর মুখ বাড়াল। বলল,—অচিরবতী-তীরে এসেছি। তুমি নামবে?

আশ্বস্ত হোল পটাচারা। মুখে হাসি ফুটল,—লিচ্ছবি-রাজ্য পার হয়ে এসেছি?

হেসে বলে উপালী,—হ্যাঁ। তুমি নেমে এসো।

এতক্ষণে গাড়ি থেকে নামে পটাচারা।

নির্জন নদীতীরে জনমানবের সাড়া নেই। নদীর পশ্চিম প্রান্তে সূর্য নেমে এসেছে। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। তীরভূমি বহু যোজন বিস্তারিত। নদীর ওপারে শ্রাবস্তীর আবছা ছায়া চোখে পড়ে। ঘন সবুজ বৃক্ষাকীর্ণ ওপারে দু-একটি বিহারের সুউচ্চ চূড়া চোখে পড়ে। চূড়াগুলি রৌদ্রের শেষ আভায় যেন জ্বলছে। ওর ভেতর কয়েকটি চূড়া বোধহয় স্বর্ণ-নির্মিত।

শান্ত নম্র শ্রাবস্তীকে অচিরবতীর এ-তীর থেকে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

পটাচারা কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

উপালী ওর পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে কী যেন খোঁজে।

আস্তে বলে পটাচারা,—কী দেখছ?

—দেখছি, কোথাও আশ্রয় মেলে কিনা।

উপালীর সন্ধানী চোখ একজায়গায় নিবদ্ধ হয়।

—ওদিকে যেন কয়েকটি কুটির চোখে পড়ছে?

পটাচারা লক্ষ্য করে বলে,—হ্যাঁ।

উপালী বলে,—চলো, ওদিকেই আমাদের যেতে হবে। কোথাও আশ্রয় নিতে হবে রাত্রির জন্যে। নদীতীর খুব নিরাপদ নয়। দস্যুর উপদ্রব থাকতে পারে।

পটাচারা এবারে একটু ভয় পায়।—তাই চলো। একটু নদীর ধারে চলো। হাত-মুখ ধুয়ে নিই। মাথাটা যেন জ্বলছে।

বাইরের রৌদ্রে অনভ্যস্ত পটাচারার কষ্ট হয়েছে। মুখখানি ওর ক্লান্তিতে শুকিয়ে গেছে।

উপালী ওকে নিয়ে নদীর ধারে যায়। স্রোতের জলে হাত-মুখ ধুয়ে নেয় ওরা। ঠাণ্ডা শীতল জল। বেশ আরাম লাগে।

উপালী হেসে বলে,—যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি আমার কে? কি বলবে?

পটাচারা একটু লজ্জিত মুখে হেসে বলে,—বলব 'স্বামী'।

—যদি বলে কোথা থেকে আসছ?

—বলব বাপের-বাড়ি থেকে।

উপালী বলে,—না। বলবে, মহামারীর জন্যে দেশ ছেড়ে চলে এসেছি। লিচ্ছবিরাজ্যে মধ্যে মধ্যে মহামারী হয়। বৈশালীর নাম কোরোনা যেন। বলবে, বৈশালীর কাছে মহাবনের প্রান্তে আমরা থাকতাম। আমি ছিলাম সেখানকার অরণ্য-রক্ষক-সচিব। কাজ ছেড়ে চলে আসছি অন্য কোনো কর্মের আশায়।

পটাচারা হাসে।—তুমি এত বানিয়ে বলতে পার!

উপালীও হাসে।—উপায় নেই। সত্যিকথা বললে বিপদে পড়তে হবে।

পটাচারা নদীর জলে অনেকক্ষণ ধরে মুখ ধোয়।

উপালী তাড়া দেয়,—চলো, আর দেরি কোরো না। সন্ধ্যা হয়ে এলো।

পটাচারা উঠে আসে।

আবার গরুর গাড়ি চালায় উপালী পূর্বদৃষ্ট কুটিরের দিকে।

দেখতে দেখতে ওরা কুটিরের কাছে এসে পড়ে।

উপালী নামে। পটাচারাকে নামতে বারণ করে। এগিয়ে আসে উপালী একটি কুটিরের দিকে।

দ্যাখে, সামনে এক বৃদ্ধা বসে আছে।

এটি একটি জলসত্র বা প্রপা। প্রপাপালিকা এই বৃদ্ধা।

উপালী কাছে আসে।

বৃদ্ধা ভালো করে নজর করে তাকে দ্যাখে।

—কি চাই বাছা? জল চাই?

উপালী বলে,—না। একটু আশ্রয় চাই, মা।

বৃদ্ধা আরও ভালো করে ঠাহর করে,—তুমি কি বিদেশী?

—হ্যাঁ।

—কোন্ রাজ্য থেকে আসছ?

—শিল্পবিরাজ্য। যাব শ্রাবস্তীতে। বড়ই বিপদে পড়েছি। আজ নদী পার হওয়ার কোনো উপায় নেই। আপনার কাছে একটু আশ্রয় চাইছি।

বৃদ্ধা তবু সন্দেহের চোখ নিয়ে তাকায়।

—আমি তো থাকি ওই পাশের কুটিরে। তোমার পরিচয় না পেয়ে আমি কি করে তোমাকে আশ্রয় দিই?

উপালী বোঝে বৃদ্ধা তাকে দস্যু বলে সন্দেহ করছে।

সে বলে,—বেশ, আমি না-হয় বাইরে রাত কাটাব। আমার স্ত্রীকে একটু আশ্রয় দিন।

—স্ত্রী! কই সে?

গরুর গাড়ি দেখিয়ে বলে উপালী,—ওই গাড়ির ভেতরে। ছেলেমানুষ, একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

বৃদ্ধা ওঠে। —ওমা, এতক্ষণ তা বলতে হয়!

বৃদ্ধা নিজে গরুর গাড়ির সামনে গিয়ে পটাচারাকে নামিয়ে নিয়ে আসে।

—ও মাগো! কী সুন্দর বউটি! মুখখানি শুকিয়ে গেছে গা। এসো মা, এসো। তোমার নাম কী?

—পটাচারা।

—বাঃ! কী সুন্দর নাম। এসো—

পটাচারা ওর অলঙ্কার ও স্বর্ণের ছোট কাঠের বাক্সটি হাতে নিয়ে বৃদ্ধার সঙ্গে এগোয়। বৃদ্ধা আগে, তার পেছনে পটাচারা, তার পেছনে উপালী।

কুটিরে ওরা রাত্রির মতো আশ্রয় পায়।

কুটিরে গিয়ে উপালী বৃদ্ধার হাতে দুটি রৌপ্যকাহন দিয়ে বলে,—এটা রাখুন।

ও-মুটো ফেরত দেয় বৃদ্ধা। —তা কখনও হয়! অতিথির কাছ থেকে মূল্য নেব না। তোমরা আজ আমার অতিথি।

উপালী খুশি হয়।

পটাচারা বৃদ্ধার সরলতায় মুগ্ধ হয়।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে?

পটাচারা উপালীর দিকে লজ্জিত দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর বলে,—বছরখানেক।

বৃদ্ধা বলে,—বেশ, বেশ। আমার ছেলে থাকলেও এত বড়টাই হোত। আমার ঘরেও এমন টুকটুকে বউ আসত। কিন্তু এমন হতভাগী আমি, কেউ নেই আমার। কেউ নেই। এই প্রপায় জল পান করে যে যা দু-এক কড়া দেয়, তাইতেই খেয়ে বেঁচে আছি। আর বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? যম কি আমার চোখেও দ্যাখে না।

আবার মুগ্ধ হয় পটাচারা বৃদ্ধার সরলতায়।

আলাপে কথায় সন্ধ্যা কাটে। বৃদ্ধা নিজে অন্নব্যঞ্জন রাঁধে। খেয়েদেয়ে রাতও কাটে।

পরদিন ভোরে উঠে উপালী বাইরে আসে। এইবার যাত্রা করতে হবে।

পটাচারাও উঠে পড়েছে। যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। বৃদ্ধা কিন্তু আপত্তি করে। বার বার বলতে থাকে, আজ দুপুরে খাওয়া সেরে গেলেই হোত। দুপুরে কচি মেয়ে না খেয়ে থাকবে, এ কেমন কথা বাবা!

উপালী হাসে। —তা হোক। শ্রাবস্তীতে পৌঁছে অতিথিশালায় খাওয়া সেরে নেব।

বৃদ্ধা একটু বিরক্ত হয়। —যা ভালো বোঝ করো বাছা, আজকালকার ছেলে সব, বললে তো শুনবে না?

—আপনি তবে আমার একটা কথা রাখুন।— বলে পটাচারা।

—কি?

—এই স্বর্ণটি রেখে দিন। এটি আপনার প্রণামী।— বলে পটাচারা স্বর্ণটি বৃদ্ধার হাতে তুলে দেয়।

বৃদ্ধা এবারে গ্রহণ করে। পটাচারার মুখচুম্বন করে বিদায় দেয়।

ওরা গাড়ি নিয়ে যাত্রা করে। গাড়ি নিয়ে তো পার হওয়া যাবে না। তাই খেয়াঘাটে এসে গাড়ি বলদ-সমেত বিক্রি করবার চেষ্টা করে উপালী।

সস্তা দর দেখে মাঝিরাই এটি কিনতে রাজী হয়ে যায়। পরিবর্তে ওদের বিনামূল্যে পার করে দেয়, কিন্তু রৌপ্যকাহন তাম্রকাহন দাম বাবদ দিয়ে দেয়।

নদী পার হয়ে ওদের হেঁটে পথ চলতে হয়। নদী থেকে জনপদের মধ্যস্থল খানিকটা দূর। ওরা একটু সময় জোরে হেঁটে পৌঁছে যায়। সেখানে জেতবনের ধারে দাঁড়িয়ে উপালী পটাচারাকে অনাথপিণ্ডদের তৈরী

মহাবিহার সেথায়। পটাচারা কখনও শ্রাবস্তীতে আসেনি। বিস্ময়ে চারদিক দেখতে থাকে। বৈশালীর চেয়ে অনেক শান্ত অনেক সুন্দর ভাবে সজ্জিত এই শ্রাবস্তী। পটাচারার বড় ভালো লাগে নগরটি।

পথেঘাটে বুদ্ধের প্রতি অনুরাগের চিহ্ন সুস্পষ্ট। বৈশালীর চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় ছোট-ছোট চৈত্য এখানে। সুন্দর শীতল পরিবেশ। স্থানে স্থানে অশ্বত্থ-বৃক্ষের মনোরম ছায়া। প্রাকারের আশেপাশে কানন। আম্রকাননের সংখ্যাই বেশী।

অতিথিশালার খোঁজ করে উপালী।

জেতবনের কাছাকাছি একটি অতিথিশালায় এসে থামে ওরা। এটিও বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের দান। জেতবনের বিস্তীর্ণ উদ্যানে সুশীতল বাতাসের ছোঁয়ায় পটাচারা ধীর আনন্দে ভরে ওঠে।

কত শান্ত হয়ে গেছে পটাচারা। কে বলবে যে এই সেই রূপগর্বিতা চঞ্চলা, বৈশালীর শ্রেষ্ঠিকন্যা পটাচারা।

অতিথিশালায় একটি গৃহ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। সেখানে নিশ্চিন্ত আরামে বসে ওরা দুজন। সাতদিন এখানে থাকা চলে। তারপর এ অতিথিশালা ত্যাগ করতে হবে।

পটাচারা খুব খুশি। —এখান থেকে আলবী কতদূর?

উপালী কপালের ঘাম মুছে বলে,—প্রায় পঁচিশ যোজন।

—কি করে যাওয়া যাবে অতদূরে?

—হঁ। দূর বটে। মধ্যে আবার একটি কান্তার পার হতে হয়। গরুর গাড়ি করেই যেতে হবে।

হঠাৎ পটাচারা উপালীর কোলে একখানি হাত রেখে বলে,—তার চেয়ে আমরা এখানে যদি থাকি?

উপালী পটাচারার সরল ছেলেমানুষের মতো চোখ-দুটির দিকে তাকায়। একটু ভেবে, একটু হেসে ওর হাতখানা ধরে বলে,—এখানে কি তোমার সবচেয়ে ভালো লাগছে?

—খু-উ-ব।

—এখানে খরচ পড়বে কিছু বেশী। আলবী ছোট নগর। শ্রাবস্তীর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। তাই এখানে সব জিনিসই একটু দুর্মূল্য।

—তা হোক।

উপালী বলে,—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

—তোমার সবই ভেবে দেখা। আমি এখানেই থাকব। তুমি একটি গৃহের সন্ধান করো।

উপালী আবার হাসে। —বেশ তো, তাই-ই করব। তুমি এমনই এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন? তোমার কী এখানে সবচেয়ে ভালো লাগল?

—জেতবন। আর ওই মহাবিহার। ওখানে উপাসনাশালায় মাঝে মাঝে যেতে পারব। ভগবান শাস্তার উপদেশ শুনতে পাব।

—এই সেরেছে! তুমি কি বিহার-বাসিনী হবে নাকি শেষে?

উপালীর ঠাট্টায় পটাচারা রাগ করে না। বলে,—মেয়েদেরতো থাকতে দেয় না।

—দেয়। অবশ্য জেতবনের বিহারে নয়। তীর্থক আনন্দ ভিক্ষুণী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, সেখানে বহু সুবর্ণ দান করেছে অনেক মেয়ে। সবচেয়ে বেশী কে দান করেছে জান?

—কে?

—অম্বপালী। বারবিলাসিনী নর্তকী অম্বপালী। সে এখন ভিক্ষুণী হয়ে অর্হত্ব লাভ করেছে।

—অর্হত্ব লাভ করলে কি হয়?

—আমি ঠিক জানি না। শুনেছি, অর্হত্ব লাভ করলে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত জানা যায়।

—আচ্ছা, আমরা পূর্বজন্মে কী ছিলাম?

উপালী হাসে। —পূর্বজন্মে? তুমি আমার স্ত্রী ছিলে এতে সন্দেহ নেই।

পটাচারাও হেসে ওঠে।

উপালী উঠে পড়ে। —তুমি দোর বন্ধ করে বিশ্রাম করো। আমি সব জিনিস কিনে নিয়ে আসি।

পটাচারা কাঠের বাক্স থেকে ওর হাতে রৌপ্যকাহন দেয় না-গুনে অনেকগুলো।

বাক্স ভর্তি করে এনেছে রৌপ্যকাহন আর স্বর্ণ। তাম্রকাহন বা কড়া একটিও নেই। অলঙ্কারও এনেছে প্রচুর। কিছু গায়ে, কিছু ক্ষৌমবস্ত্রে বাঁধা পেটে গোঁজা।

উপালী উঠে বেরিয়ে যায়। পটাচারা দ্বারে অর্গল দিয়ে বেশ-পরিবর্তন করতে প্রবৃত্ত হয়। সঙ্গে দুটি মোট ছিল। খুব ভারী নয়। উপালীই টেনে এনেছিল। মোট দুটি খোলে পটাচারা। কাপড়-চোপড় সব গোছাতে হবে। সওদা এলে তাকেই আজ সব কাজ করতে হবে। বসে থাকা চলবে না আর।

এ এক অন্য জীবন। কষ্ট আছে। কিন্তু আনন্দ আছে।

পটাচারা একটা নিশ্বাস ফেলে। এতক্ষণে গভীর ভাবে মনে পড়ে বাবার কথা। প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছে সে কি এতবড় আঘাত সইতে পারবে? তা হয়তো পারবে। বেশ বুঝতে পারছে পটাচারা যে, বাবার মুখখানি বেদনায় নীল হয়ে যাবে। ভাববে, অনেক ভাববে, তারপর বিহারে ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে বসবে। তাদের উপদেশ শুনবে। ভগবান বুদ্ধের শরণ নেবে মনেপ্রাণে। বাবা বাঁচবে। বাবা মরবে না।

কিন্তু মা? মায়ের কথা ভাবতেই আঁতকে ওঠে। মা এ আঘাত হয়তো সইতেই পারবে না। শয্যাগ্রহণ করবে। আহার ত্যাগ করবে, দিন দিন কৃশ হয়ে উঠবে। হয়তো বা প্রাণত্যাগ করতেও পারে।

পটাচারা তো জানে, সে বাবা-মায়ের কত আদরের, কত স্নেহের। কতবড় আঘাত সে দিয়ে এলো তাদের! ও জানে কৌশাম্বির সেই শ্রেষ্ঠীর কাছে বাবার জবাব দেবার কিছু থাকবে না।

হয়তো বলবে, পটাচারা মরে গেছে।

তাই যেন বলে। সে মরেই গেছে। আগের পটাচারা মরে গেছে। উপালীর প্রেমে নতুন পটাচারা জন্ম নিয়েছে। এ মেয়ে অনেক শান্ত, অনেক সহনশীল।

মনে মনে এ কথা স্থির জেনেছে ও যে, তাকে বহু কষ্ট সহ্য করতে হবে। উপালীর সঙ্গে তার জীবন সুখে কাটবে এমন কথা ভাবা ঠিক নয়। বাবার কাছে থাকা আর উপালীর কাছে থাকা অনেক তফাত। এ এক অনিশ্চিত জীবন। অনিশ্চিত পরিবেশের জন্যেই মনকে সে প্রস্তুত করে নিয়েছে। তবু উপালীকে ছাড়বার কথা সে কল্পনা করতে পারে না।

উপালীকে সে যে কত ভালবেসেছে তা ভগবান জানেন।

পটাচারার চোখ সজল হয়ে আসে।

জিনিস গোছানো আর হয় না। সব যেমন পড়ে ছিল, তেমনি পড়ে থাকে। অনেকক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে বসে থাকে ও।

বেলা বেড়ে যায়।

উপালী এসে পড়ে। টুকিটাকি কিছু কিছু জিনিস ছাড়াও, শয্যার জন্যে পশমের চাদর নিয়ে এসেছে উপালী। ঘরে ঢুকে সব মোট নামিয়ে ঘাম মোছে উপালী।

এবার গ্রীষ্মের তাপটা বড় বেশী। সর্বাঙ্গ-জ্বলে যাচ্ছে। বার বার ঘাম মুছেও স্বস্তি পায় না উপালী।

পটাচারাকে বলে স্নানাগারে যেতে।

—যাই।— পটাচারা অন্যমনস্ক।

উপালী বলে,—তবে না-হয় আমিই যাই আগে। তুমি বড় অবাধ্য।

কথাটা একটু কঠোরভাবে বলে ফেলেছিল উপালী।

প্রথমদিনেই এমন কর্কশভাবে কথা বলা উপালীর ঠিক হয়নি। কি করবে। রোদে পুড়ে এসে ওর মাথাটা জ্বলছিল। তাই নিজেকে সামলাতে পারেনি।

পটাচারা স্থির নেত্রে তাকায়। এইকি সেই পটাচারা? উপালী কি সেই দাস?

অতি শান্ত গম্ভীর স্বরে পটাচারা বলে,—বেশ, আমিই যাই।

বলে ওঠে ও।

উপালী বুঝতে পেরেছে এতক্ষণে যে, ও একটু অন্যায় করে ফেলেছে। পটাচারার অবাধ্য হওয়া সেদিনও তার পক্ষে অপরাধ ছিল, আজই এতটা এগিয়ে যাওয়া তার কোনোমতেই উচিত হয়নি।

ও পটাচারার ঘাগরার প্রান্ত ধরে টানে।

চোখে ভর্ৎসনার ভাব এনে পটাচারা বলে,—ছি! ছাড়ো—

উপালী উঠে ওর সামনে দাঁড়ায়। রোদে পুড়ে মুখখানা ওর কালো হয়ে গেছে। এখনও কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে।

—একটা কথা শোনো—

পটাচারা গম্ভীর। —এখন কথা শোনবার সময় নেই। অনেক কাজ। আমি স্নান সেরে এলে তবে তুমি যাবে। ততক্ষণে বরং দ্যাখো রন্ধনশালা বন্ধ হয়ে গেল নাকি। আমাদের খাবার তো আনা হয়নি।

সহজ অথচ গম্ভীর স্বরে কথা-কটি বলে ও।

উপালী তাকিয়ে থাকে। বোধহয় ভাবে, এইকি সেই পটাচারা! উদ্ধতযৌবনা রক্তাম্বরা পটাচারা? এই প্রথম উপালীর মনে হয় সে-পটাচারার মৃত্যু হয়েছে। সেই পটাচারাকে উপালী পায়নি।

সে যাকে পেয়েছে সে নিতান্তই এক সাধারণ স্ত্রী।

আবার ঠকেছে উপালী। বেদনায় মুচড়ে উঠল উপালীর বুক। জীবনভর ওর শুধু ঠকবার পালা। ক্রীতদাসের জীবন থেকে কে জানে ও আরও ভয়াবহ কষ্টের জীবনে নেমে এলো কিনা?

দুটি সুদীর্ঘ বছর কেটে গেছে এর পর। পৃথিবীর

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও পরিবর্তন হয়েছে। সে পরিবর্তন কারও কাছে দুঃখের, কারও কাছে সুখের।

শ্রাবস্তীর সকলেরই পরিবর্তন হয়েছে। ভিক্ষুদেরও পরিবর্তন হয়, কেউ ধর্মশীল শিক্ষা করতে করতে মার্গফল লাভ করে। কেউ বা বিদর্শনা লাভ করে ক্রমে অর্হত্বের দিকে এগিয়ে যায়। কেউ বা সবেমাত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সাধনে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে।

স্থির কিছু নেই। স্থির কিছু থাকতে পারে না। বিদর্শনা লাভ করলেই এই সংসারের অনিত্যতার জ্ঞানলাভ করে ভিক্ষুরা। তারা তখন সাংসারিক পরিবর্তনে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। জানে এইটেই স্বাভাবিক। এইটেই নিয়ম।

উপালী তো তা বোঝে না। সাধারণ সংসারের মানুষ কেউই বোঝে না।

উপালীর যে পরিবর্তন হয়েছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সত্যিই এতদিনে উপালী যেন বুঝতে পেরেছে, ওর ভাগ্য এ-জন্মের মতো দুঃখের খাতায় নাম লিখিয়ে এসেছে। এত শোচনীয় দুর্দশা কেন শুধুমাত্র তারই হবে। সংসারে সকলে কি এ-দুঃখের অংশ নিয়ে তার দুঃখ লাঘব করতে পারে না?

অংশ একজন নিয়েছে সে পটাচারা।

এইটেই উপালীর সবচেয়ে বড় বেদনা।

কেন এত অবিচার? কেন এত দুর্ভোগ? সে তো কারও কোনো ক্ষতি করেনি, সে তো বেশী কিছু চায়নি? সে চেয়েছিল ছোট একটু গৃহ আর দিনান্তে একমুঠো ভাত। তাতেই পটাচারাকে সে সুখী করতে পারত।

পটাচারার তুলনা নেই। সর্বস্ব ত্যাগ করেছে তার জন্যে। সর্বস্ব দিয়েছে তাকে। তবু, পটাচারাকে একটু সুখীও করতে পারল না সে? পটাচারা চেয়েছিল বাঁচতে। শুধুমাত্র উপালীর সঙ্গে বেঁচে থাকতে। বাঁচবার অধিকারও তাদের দিল না শ্রাবস্তীর মানুষ?

চোখ-দুটো জ্বালা করে। উপালী ব্যর্থ। একেবারে ব্যর্থ। তার জীবনে সফলতা বলে কোনো কথা নেই।

শেষপর্যন্ত সব অলঙ্কার নিয়ে সে ব্যবসা করতে নেমেছিল। পটাচারা সব অলঙ্কার খুলে দিয়েছিল গা থেকে। একটি কথাও বলেনি। শুধু হেসে বলেছিল তার যাবার সময়,—ভাখো যদি কিছু রোজগার করতে পার। বেশী লোভ কোরো না। মাসান্তে দশটি রৌপ্যকাহনও যদি পাও, আমাদের চলে যাবে। বাড়িটা তো আছে?

হ্যাঁ, বাড়ি একটা আছে। প্রথমেই একটি জায়গা কিনে গৃহ নির্মাণ করেছিল উপালী। ভেবেছিল স্থায়িভাবে বসবাস করবে। তখন কে জানত যে সংসারে উপালীর মতো অভাগা আর দুটি নেই। তবু পটাচারা উপালীকেই ভালবাসে। এইটেই সহ্য করতে পারে না উপালী।

একদিন অসহ্য হয়ে ওঠাতে বলেছিল,—তুমি আমাকে ঘৃণা করো, পটাচারা! আমি হতভাগ্য, ঘৃণার পাত্র। ঘৃণা করে আমাকে বাঁচাও। আমাকে ভালবেসো না। দোহাই তোমার, আমাকে ভালবেসো না!

কেঁদে ফেলেছিল উপালী। পটাচারাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল।

মিষ্টি স্বরে আস্তে আস্তে বলেছিল পটাচারা,—তুমি একটুতেই বড় অধৈর্য হও, উপালী!

ঠিক এই কথাই বলত উপালী পটাচারাকে যখন তারা শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে ছিল। তখন উপালী ছিল শান্ত সংযত, পটাচারা ছিল চঞ্চল ধৈর্যহীন।

কালের কী প্রভাব! তাদের স্বভাবের পরিবর্তন করে দিয়েছে কালের ঘটনাস্রোত।

উপালী তবু শান্ত হতে পেরেছিল কই? বলেছিল,—তুমি কেন আমাকে ভালবেসেছিলে? জানলা, আমি কত হতভাগা!

পটাচারা সস্নেহে ওর মুখখানা তুলে ধরে বলেছিল তেমনি শান্তস্বরে,—সেইজন্যেই তো ভালবেসেছিলাম। ঠিকই করেছিলাম। আমি খুব সুখে আছি, উপালী।

উপালী আর কি-ই বা করতে পারে।

অলঙ্কার বিক্রয়ের সব অর্থ দিয়ে চেষ্টা করেছিল ব্যবসা করবার। প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। অমানুষিক পরিশ্রম করেছিল।

বাধা হয়ে দাঁড়াল এক ধনী শ্রেষ্ঠী। আবার সেই শ্রেষ্ঠী! ও ব্যবসা আরম্ভ করেছিল তুলোর। বিশেষ করে সুতো তৈরি করবার তুলোর। এ ব্যবসা তখন শ্রাবস্তীতে যে শ্রেষ্ঠীর একচেটিয়া ছিল, সে উপালীর ওপর চটলো।

কে এই বিদেশী? তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে নেমেছে তুলোর ব্যবসাতে?

যে দরে তুলো কিনল উপালী, শ্রেষ্ঠী লোকসান দিয়ে তার চেয়ে কম দরে তুলো বেচতে শুরু করল।

উপালী চোখে অন্ধকার দেখল।

গেল সেই শ্রেষ্ঠীর কাছে। তাকে অনুনয় করল ন্যায্য দরে তুলো বিক্রি করতে। শ্রেষ্ঠী তাকে তাড়িয়ে দিল

ক্ষমতা থাকে, সে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিক্রি করুক।

অনেক লোকসান হোল উপালীর। আরও একবার মনে হোল তার, এই শ্রেষ্ঠীরা কী নির্মম! এরা কি মানুষকে বাঁচতে দিতে চায় না?

ক্রমে ক্রমে অলঙ্কারের সব খোয়া গেল এ-ব্যবসায়ে। উপালী রিক্তহস্তে ব্যবসা ছেড়ে আবার ভাবতে বসল কী করা যায়।

ইদানিং পটাচারার শরীর ভালো যাচ্ছে না। একটি দাসী রেখেছে উপালী। কাজ করতে গেলে মাথা ঘোরে পটাচারার। তবু মুখে কিছু বলতে চায় না।

উপালী বোঝে, পটাচারার মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে উপালী সবই বোঝে। কিই-বা করতে পারে ও। একবার বলে,—এমন করে শরীর খারাপ হতে থাকলে আর ক'দিন বাঁচবে বলো তো?

পটাচারা হাসে তবু। —বাঁচব ঠিকই। শরীর কি শুধু আমারই খারাপ হয়েছে? তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?

—রাঁধবার একটা লোক রাখলে ভালো হোত।

—কোনো দরকার নেই। ভাবছি দাসীটাকেও বিদায় করে দোব।

—কেন?

—এমনি।— পটাচারা উপালীর কাছে আসে। ওর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে,—শরীর এখন একটু খারাপ হবে।

উপালী তাকায় ওর মুখের দিকে। —কেন?

—জানি না! তুমি কি বোঝ না?

—কি করে বুঝব?

—বাঃ! তুমি যে কী মানুষ! দিনরাত্রি রোজগারের ভাবনাই ভাবছ। আমার দিকেও তাকাবার অবসর পাও না!

—তা নয়। ইচ্ছে করেই তাকাই না, পটাচারা। তাকালে, তোমার চেহারা দেখলে মন আরও খারাপ হয়। মনে হয়, নিজে হাতে তোমায় মেরে ফেললাম।

—কি যে বলো! আচ্ছা, ছেলে হবে, না মেয়ে হবে বলো তো?

উপালীর মুখ দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। —তাই নাকি?

পটাচারার মুখটা একটু রাঙা হয়ে ওঠে।

উপালী বলে,—তবে তো রাঁধবার লোক একটি রাখতেই হবে।

—না। বরং কিছু জমাবার চেষ্টা করতে হবে। খরচ আছে তো।

—তা আছে। বৈদ্যশালায় গিয়ে খবর নিতে হবে। এ অবস্থায় কী খেলে শরীর ভালো থাকে। তা ছাড়া ধাত্রীর খোঁজ নিয়ে রাখতে হবে।

—তোমায় ছুটোছুটি করতে হবে না। আমাদের যে-দাসীটি আছে, ও সব জানে। ওই সব করবে। ওকে কিছু দিতে হবে।

—ওকে তো ছাড়িয়ে দেবে বলছিলে?

—তাই তো ভাবছি। কি যে করা যায়।

উপালীর মুখও খুব চিন্তিত দেখায়। ও বোঝে, আর দাসী রাখবার মতো অর্থ নেই। ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে শেষপর্যন্ত যে-কয়েকটি স্বর্ণ ছিল, তা বোধহয় নিঃশেষ হয়ে আসছে। ভয়ে উপালী পটাচারাকে কিছু জিজ্ঞেস করে না। যদি বলে, নেই, তখন কি করবে উপালী?

প্রতিদিনই ও এখানে সেখানে গিয়ে কর্মের চেষ্টা করছে। যে-কোনো কর্মের বিনিময়ে যদি কিছু অর্থ পাওয়া যায়। কোথাও মিলছে না।

যে শ্রেষ্ঠী ওকে ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় সর্বস্বান্ত করেছে, গতকাল তার কাছে গিয়েছিল উপালী। বলেছিল, তুলোর ব্যবসায়ে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাই যদি সে কোনো কাজকর্ম দিতে পারে। শ্রেষ্ঠী হেসেছিল; বলেছিল, এক পক্ষকাল পরে আবার দেখা করতে।

ওই একটিমাত্র ভরসা। মান-অপমানকে তুচ্ছ করে তার কাছেই কাজ করতে রাজী হয়েছে উপালী। দরিদ্রের আবার মান কিসের?

পটাচারার কাছে এ খবরটি পেয়ে আরও চিন্তায় পড়ল উপালী। একটা কিছু তো করতেই হবে। পটাচারা সন্তানসম্ভবা। এ সময়ে হাতে কিছু অর্থ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। দাসীটিকেও যেমন করে পারা যায় রাখতেই হবে। আরও বেশী দায়িত্ব পড়ল উপালীর ওপর। সে এখন সন্তানের পিতা হতে চলেছে।

কিন্তু তার সন্তানের পরিচয় কি হবে?

উপালী মনে কোনো উত্তর পায় না। এ কথা সে কি করে অস্বীকার করবে যে, তার সন্তান হবে জারজ। সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না। কোনোমতেই নয়।

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
আর কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা

না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তুপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে। সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেনা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা। আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না কেন...আজই।

সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

L. 287-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

কন্যা যদি হয়, তার বিবাহের জন্য ভীষণ অবস্থায় পড়তে হবে। হয়তো বিবাহ হবেই না। হয়তো বা নর্তকী বা বিলাসিনী হয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

উপালীর কপালে ঘাম দেখা দেয়। পিতা হয়ে তাকে কি চোখের সামনে দেখতে হবে কন্যার সম্ভাব্য পরিণতি!

আর যদি পুত্র হয়? তবে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। পুত্রই হোক। পুত্র হলে সে স্বস্তি পাবে। তৃপ্ত হবে। ঈশ্বর করুন, তার যেন পুত্র হয়।

পটাচারার দিকে তাকায় উপালী।

পটাচারা কি এসব কথা ভেবেছে? ও ছেলেমানুষ, হয়তো এত তলিয়ে ভাবেনি। থাক, না ভাবাই ভালো।

উপালী বলে,—দাসীটিকে বিদায় দিয়ো না। ওকে রাখতেই হবে।

পটাচারা কথা বলে না। ভাবনায় ওর চোখ-দুটো স্তিমিত হয়ে আসে। যেন ঝিমোয় ও।

উপালী কথা পালটায়।—ছেলে হলে কী নাম রাখবে?

—ছেলে হবে বলছ? ছেলে হলেই ভালো।

—কেন?

পটাচারা ভয়ে ভয়ে বলে,—মেয়ে হলে একটু অসুবিধে হবে।

উপালী যেন কিছু জানে না।—কিসের অসুবিধে?

—জানি না।

পটাচারা উপালীর কাছে কথাটা ভাঙতে চায় না।

উপালী বলে,—আমি একটু আগে এই কথাই ভাবছিলাম। ছেলে হলেই মঙ্গল।

—ছেলে হলে নাম রাখব সুমন্ত।

—তা মন্দ নয়। আচ্ছা, ছেলে হলে তোমার পিতাকে খবর পাঠালে মন্দ হয় না।

—কেন?

—তিনি খুশি হতে পারেন।

পটাচারার মুখটা বিষণ্ণ দেখায়।—তা হয়তো হতে পারেন। তাতে লাভ কি?

—লাভ কিছু নয়। তবু জানবেন, তুমি বেঁচে আছ। তোমার সন্তান হয়েছে। তোমার মা-ও হয়তো খুশিখুশি হবেন।

পটাচারা এ কথার আর উত্তর দেয় না।

আস্তে আস্তে বলে,—কাজের কোনো সন্ধান পেলে?

উপালী বোঝে ওর পিতার সম্বন্ধে আলাপ করতে ও চায় না। ও চুপ করে থাকে।

পটাচারা বলে আবার,—যা আছে, তাতে আর বেশীদিন চলবে না।

—কি করি বলো। চেষ্টা তো করছি।

—চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই হবে।

—কিছুই বলা যায় না।

—কোনো সন্ধানও পাওনি?

—পেয়েছি।

—কোথায়?

—তুলোর ব্যবসায়ে যার কাছে হেরে গেলাম, তার ওখানেই একটা কাজের কথা বলেছিলাম। সে আশা দিয়েছে।

পটাচারার মুখখানা আরও ম্লান হয়ে ওঠে।—ওখানে কাজ না করাই ভালো।

—কেন?

—ওরা হাসবে। তোমাকে দিয়ে যা খুশি তাই করাবে।

—লোকটি কিন্তু মন্দ নয়।

—শ্রেষ্ঠীদের তুমি চেনো না। আমি চিনি।

উপালী হাসে।—আমিও চিনি। কিন্তু উপায় কি বলো?

—অন্য কোথাও চেষ্টা করো না-হয়।

—একটা পরিচয়ের সূত্র নিয়ে যেতে হবে তো। আর কারও সঙ্গে তো তেমন পরিচয় নেই। তা ছাড়া অজ্ঞাতকুলশীল কোনো লোককে কেউ কাজ দিতে চায় না। আমি তো সত্যপরিচয় দিতে পারিনে।

—কেন?

—কী আর পরিচয় আছে যে দেবো? নামটাও মিথ্যে বলতে হয়।

—মিথ্যে না-বলাই ভালো।

—মিথ্যে না বললে, যদি জানতে পারে আমি ক্রীতদাস ছিলাম?

পটাচারা চুপ করে থাকে।

উপালী বলে,—আচ্ছা দেখি অন্য কোথাও চেষ্টা করে।

বিকেল হয়ে এসেছে। অদূরে আম্রকাননের ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগে। গবাক্ষের আবরণ উন্মুক্ত করে দেয় উপালী। একটু নিশ্বাস নিতে চায় ভালো করে। ভাবতে ভাবতে ওর হাঁপ ধরে যায়।

পটাচারা গবাক্ষের ফাঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে,—বাবাকে কি খবর দেবে?

উপালীর মনটা তখন আকাশের মতো ফাঁকা। ভাবনার শেষ করে দিতে চায় ও। নির্লিপ্ত স্বরে বলে,—যা ভালো বোঝ, তাই করো।

—আমি আর কি বুঝব?

উপালী কথা বলে না।

গবাক্ষের কাছ থেকে পটাচারার কাছে এগিয়ে আসে। ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

পটাচারা বলে,—কি দেখছ?

—এইটুকুই শান্তি।

—কি?

—তোমার মুখটি যতক্ষণ দেখি, ততক্ষণই একটু শান্তি পাই।

পটাচারা মুখে হাসি আনে।—আমারও তাই।

—তবুও যে কেন ভয় করে বুঝি না।

—ভয়?—পটাচারা ওর বড় বড় চোখ-দুটি তুলে তাকায়,—ভয়ই পাপ। ভয় করতে নেই।

—ঠিক বলেছ।—উপালী ওর কাছে আসে।—ঠিক বলেছ। তুমিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ। তুমি না থাকলে যে আমার জীবনে কী হোত!

পটাচারা শান্ত চোখে তাকায়। কত শান্ত! কত শীতল প্রশান্তি ও-চোখে!

তবুও কি বাঁচতে পারল উপালী? সে প্রেম পেল, কিন্তু প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার মতো দুটো দানা পেল না কেন? দিনের পর দিন দুঃসহ হয়ে উঠছে ক্রমে।

কেটে গেছে কিছুকাল। পটাচারার সন্তান হয়েছে।

খুশি হয়েছে ওরা দুজনেই। পুত্রসন্তান হয়েছে। টুকটুকে মোটাসোটা ছেলে। চোখ-দুটি ভারী শান্ত। ভ্রমরের মতো কালো। সুন্দর। উপালী ভাবে, কী সুন্দর! এমন সুন্দর সৃষ্টি পটাচারার মতো মায়ের পক্ষেই সম্ভব।

—ঠিক তোমার মতো।

পটাচারা ঘাড় নাড়ে। ঠোঁট-দুটি সাদা ফ্যাকাশে। তবু হাসবার চেষ্টা করে বলে,—উঁহু। তোমার মতো।

উপালী বড় বড় অবিন্যস্ত চুল কপাল থেকে সরিয়ে বলে,—ওটা তোমার মনের ভুল। চোখ-দুটো ভালো। কী ঠাণ্ডা! আচ্ছা, ও কি কাঁদতে জানে না?

বাচ্চাটা কাঁদে না বড় একটা। হাত-পা নাড়ে। ঠোঁট নাড়ে। খেলে। খুব খিদে পেলে মুখে একটু একটু শব্দ করে। ভারী মিষ্টি শব্দ! মোটা কান্না নয় কিছুতেই।

পটাচারাও বলে,—সত্যি, কাঁদে না কেন বলো তো?

—তোমার ছেলে কিনা, তাই।

—না, ঠাট্টা নয়। না কাঁদলে ছেলে বলিষ্ঠ হয় না।

—কে বললে?

—ওই দাসী বললে। বললে, মুখে মধু দিয়ো বেশী করে। গা গরম হবে, কাঁদবে।

—মধু খেলে বুঝি গা গরম হয়?

—হ্যাঁ, হয়। খুব শীতে বাবা মধু খেতেন।

—কেন? গরম হবার জন্যে?

—হ্যাঁ গো, সত্যি। মা-ও বলতো।

—তবে না-হয় মধু খাওয়াও।

—আনতে হবে তো।

উপালী একটা ধাক্কা খায় যেন। মধু আনতে হবে! কী দিয়ে আনবে? যা সামান্য ক'টি রুপোর কাহন আছে, তাতে ভাত চলাই কঠিন।

তবু মধু আনতেই হবে। ভাত না-হয় সে খাবে না। শুধু পটাচারাকে বেঁধে দেবে। তবু মধু আনতেই হবে।

বলে,—আনব। আজ বিকেলে বেরোব।

ভয়ে ভয়ে বলে পটাচারা।—কী দিয়ে আনবে?

—যা আছে, তাইতেই হবে।—একটু থেমে উপালী বলে,—কি করি বলো তো, এত চেষ্টা করেও তো কোথাও কোনো কাজ পাচ্ছিনে।

পটাচারা ভাবতে ভাবতে বলে,—আচ্ছা, আমি বলি কি, রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে একবার দেখা করো না-হয়?

—ভয় করে।

—কেন, ভয় কিসের?

—রাজাকে ভয় নয়। ভয় করে, উনি যদি জানতে পারেন, আমি ক্রীতদাস, এক শ্রেষ্ঠিকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে এসে এখানে রয়েছি। উনি হয়তো লিচ্ছবিরাজ্যে খবর দেবেন না, কিন্তু নিজেই শাস্তি দেবেন।

—কেন শাস্তি দেবেন?

—আমাদের বিয়ে হয়নি বলে।

পটাচারা যেন অবাক হয়।—আমাদের বিয়ে হয়নি কে বললে? বিয়ে আবার কাকে বলে?

—এ বিয়ে তো সমাজ মানে না। রাজাও মানবে না। শাস্তি দেবে। কী শাস্তি দেবে জানো?

—কী?

—প্রাণদণ্ড নয়, তবে বেত্রদণ্ড, কারাগার-বাস নিশ্চয়।

পটাচারা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। উপালীর দিকে

আর তাকায় না। না তাকিয়েই কথাটাকে হালকা করে দেবার জন্যে বলে,—আর আমাকে শাস্তি দেবে না?

—না। তোমাকে আশ্রমে পাঠিয়ে দেবে।

—বাঃ! দোষ বুঝি তোমার? দোষ তো সবই আমার। আমি যদি গিয়ে বলি, সব দোষ আমার?

—তবে কি হবে জানিনে। এরকম কখনও এর আগে শুনিনি তো?

পটাচারা বলে,—থাক্ তবে, রাজার কাছে গিয়ে কাজ নেই।

উপালী বলে,—এক কাজ করতে পারি, তীর্থিক অজিত কেশকম্বলের কাছে যেতে পারি।

—সে তোমার কী উপকার করতে পারবে, সে তো তীর্থিক।

—তা বটে।

নিরুপায় হয়ে দুজনের মুখেই আর কথা যোগায় না। পটাচারা ছেলেকে আদর করতে থাকে। উপালী বসে বসে ভাবে। বসে আর কতদিন চলবে? উপালীর সামর্থ্য আছে, শক্তি আছে, তবু কাজ পাচ্ছে না। এ এক আশ্চর্য প্রহসন।

হয়তো পটাচারার কথামতো প্রসেনজিতের কাছে সাহায্য চাইলে, সাহায্য করতেন তিনি। রাজভাণ্ডার থেকে অনেকে এমন সাহায্য পায়। পরিমাণ যাই হোক না কেন, কোনো অভাবগ্রস্ত প্রার্থী প্রসেনজিতের কাছ থেকে ফেরে না। কিছু-না-কিছু নিয়ে ফেরে। ভগবান তথাগতের ভক্ত কোশলরাজ প্রসেনজিৎ। দয়া তাঁর অনেক।

তবু উপালী তাঁর কাছে যেতে সাহস পায় না। ভয় হয়। হতে পারে ভয়টা হয়তো অহেতুক। তবু ভয় হয়। এ কথা ও কি করে ভোলে যে তার পূর্বমনিব শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে নিয়ে সে পালিয়ে এসেছে। এখনও তাকে বিয়ে করেনি।

পটাচারা কিন্তু ভয় পায় না। আশ্চর্য! ও জানে সত্যিকারের বিয়ে ওদের হয়ে গেছে। উপালীর সঙ্গে চলে এসে কিছুমাত্র অন্যায় করেনি। বরং জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ করেছে। ক্ষোভ তো নেই-ই। আনন্দ আছে পটাচারার। উপালী বোঝে না যে এ-আনন্দ পটাচারা কোত্থেকে পায়।

অভাব যতই হোক না কেন, পটাচারার মুখের হাসি মেলায় না।

হাসিও বোধহয় এবার মিলিয়ে গেল। পটাচারাও আর হাসতে পারে না। নিদারুণ অভাবে ক্ষীণ হয়েছে নিজে, তবু হেসেছে। নানা রোগ দেখা দিয়েছে দেহে, তবু হেসেছে। এবারে আর হাসতে পাচ্ছে না।

দুর্দশা কত দুর্বিষহ হতে পারে তা আন্দাজ করতে পারা যায় পটাচারার মুখ দেখে। চেষ্টা করেও আর হাসতে পারে না, যখন ভাবে তার সন্তানের জন্যে দিনান্তে একটু যবচূর্ণ যোগাড় করতে উপালী গলদঘর্ম হয়ে উঠছে। দুধের কথা তো অনেক দূর, একটু যবচূর্ণও যদি জ্বাল দিয়ে না খাওয়াতে পারে, তবে ছেলেটা বাঁচবে কি করে? ছেলের চিন্তায় পটাচারার মুখের হাসি মিলিয়েছে।

নিজের শরীরের কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বছর আড়াই আগে বৈশালীর প্রাসাদে অলিন্দে হেলে হেসে দাঁড়িয়ে যে-পটাচারা যে-কোনো পথিকের আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠত—যার নিটোল যৌবন, ভ্রমরচঞ্চল চোখ যে-কোনো রূপসীর ঈর্ষা জাগাতে পারত, সে আজ মলিনবসনা হতশ্রী একটি দরিদ্র বধূ মাত্র। সেদিনের রক্তাধরা পটাচারা আজ রক্তহীন। মাথা তুলতেও তার কষ্ট হয়।

কি-এক অদ্ভুত শিরঃপীড়ার তীব্র যন্ত্রণায় সে মাঝে মাঝে রাত্রে কাতরায়। উপালী পাশে শুয়ে জেগে থাকে। শুনেও শোনে না।

বৈদ্যশালায় গিয়েছিল। বৈদ্যর পরামর্শমতো খাদ্য খাওয়াতে না পারলে সেখানে গিয়ে লাভ নেই। তাই আর যায়নি। চোখের সামনে পটাচারাকে যন্ত্রণায় কাতরাতে শুনেও চুপ করে শুয়ে থাকে। একটু নড়ে না। নড়তেও ভয় হয়। নড়লে যদি পটাচারা টের পায় সে জেগে আছে, তবে হয়তো ওই কাতরানিটুকুও সে চাপবার চেষ্টা করবে। ওটুকু আরামও পাবে না।

পটাচারা ভাবুক সে ঘুমোচ্ছে। সে নিষ্ঠুর। সে নির্দয়। ভাবুক পটাচারা। তবু যদি তাকে একটু ঘৃণা করতে পারে।

উপালী পাষাণ হয়ে গেছে। বেদনায় বেদনায় মন তার জমাট বেঁধে গেছে। এক আশ্চর্য কঠিন মন নিয়ে সে ঘরে থাকে আজকাল। ঘর থেকে সে চলে যেতেও পারে। হয়তো চলেও যেতো, শুধু পটাচারার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। সে চলে গেলে পটাচারা শান্তিতে মরতে পারবে না। শুধু এইজন্যেই আজ পর্যন্ত সে গৃহে রয়েছে।

আর চলে না। ইদানীং ছেলেটার খিদের চিৎকার বড় বেশী অসহ্য লাগে। পটাচারার মুখও ক্রমে কঠিন

হয়ে আসে। তবু মুখে কিছু বলে না। এক এক সময় ভাবে, তাকে ভিক্ষের বেরোতে হবে।

ভিক্ষে ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে পটাচারা। শ্রেষ্ঠিকন্যার এই হয়তো হবে শেষ পরিণতি। উপায় নেই। ছেলেকে তার বাঁচাতেই হবে। ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে সে সব করতে পারে।

সেদিন সন্ধ্যায় পটাচারা সত্যিই বেরোল পথে। পথে পথে ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে পথের পাশে বৃক্ষের নীচে বসল অনেকবার। তবু ভিক্ষে চাইতে পারল না কিছুতেই। কোনো পথিকের কাছেই ভিক্ষে চাইতে পারল না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গৃহে ফিরে এলো।

ফিরে এসে দোরের সামনেই উপালীর সঙ্গে দেখা।

উপালী ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। —কোথায় গিয়েছিলে?

উপালীর স্বরটা কি কঠোর? উপালী কি তাকে সন্দেহ করছে?

কেঁদে ফেলল পটাচারা। কাঁদতে কাঁদতে টলে পড়ে যাচ্ছিল। উপালী ওকে জড়িয়ে ধরল। আর একটা কথাও বলল না।

অনেক কেঁদে বুকটা একটু হালকা হোল ওর।

এতক্ষণে ও কথা বলতে পারল,—বেরিয়েছিলাম ভিক্ষে করতে। পারলাম না। কিছুতেই চাইতে পারলাম না। মুখে বাধল।

আবার কেঁদে ফেলে পটাচারা।

উপালীর চোখেও জল।

ধরে নিয়ে এল ঘরে। পটাচারাকে জল খাইয়ে সুস্থ করে ধীরে ধীরে বলল উপালী,—শোনো পটাচারা, একটি শেষ উপায়ের কথা তোমাকে বলি।

—বলো।

—তোমাকে বাঁচতে হবে, খোকাকেও বাঁচতে হবে। চলো, তোমাদের তোমার পিতার কাছে নিয়ে যাই। তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন না জানি; তাই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব।

—তোমাকে ছেড়ে—

—না না, পটাচারা। আমার জন্যে ভেবো না। আমি একা ভালোই থাকব। মাঝে মাঝে তোমাদের গিয়ে দেখে আসব বাইরে থেকে। তুমি খোকাকে নিয়ে অলিন্দে দাঁড়াবে। আমি একটু দেখব, আবার চলে যাব। তোমাকে যেমন করে হোক ঠিকানাও আমি জানাব।

—তুমি কি করবে?

—কিছু ঠিক করিনি। একটা কাজ জুটিয়ে নেবো। নয়তো যা-হোক একটা কিছু করা যাবে। আমার জন্যে ভেবো না। খোকা বাঁচুক। তুমি বাঁচ। খোকা বড় হলে, ওকে আমার কথা কিছু বোলো না। শুনলে, ও ওর বাবাকে ঘৃণা করবে। সেটা আমি সইতে পারব না। বোলো ওর বাবা মরে গেছে।

উপালীর কর্কশ গাল বেয়ে জল পড়ে। উপালী কাঁদে।

পটাচারাও কাঁদে।

—আমার সবচেয়ে কষ্ট কি জানো। আমরা হেরে গেলাম।

—না। আমরা জিতলাম। আমাদের এই সন্তান আমাদের জিতিয়ে দিল। তোমার বাবা আর তোমাকে ফিরে দিতে পারবেন না।

ছেলেটার ঠোঁটের কাছে একটা আঙুল রাখে উপালী। খিদের জ্বালায় ছেলেটা আঙুলটা মাড়ি দিয়ে কামড়ায়। উপালী হাসে। ভারী বিষণ্ণ হাসি।

বলে,—যবচূর্ণ এনেছি। ওকে জাল দিয়ে দাও।

পটাচারা আস্তে আস্তে উঠতে চেষ্টা করে।

—থাক্। আমিই জাল দিয়ে দিচ্ছি।

পটাচারা ওকে ধরে ওঠে। ওকে বসায়। বলে,—ত কবে যাবে?

—কালই চলো।

পটাচারা এতকাল পরে রাজী হয়। —তাই চলো।

পরদিন ভোরে উঠে ওরা বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। পটাচারা সঙ্গে কিছুই নিল না। একটা ছেঁড়া গামছা জড়িয়ে নিল ছেলেটাকে। উপালীও সঙ্গে কিছু নেয়নি। সঙ্গে কিছু নেবার উপায় নেই। গরুর গাড়িতে যাওয় যাবে না। অর্থ নেই। হেঁটে যেতে হবে।

শুধু হাতে হাঁটতে সুবিধে হবে, তাই সঙ্গে কি না নেয়াই ভালো।

যাবার আগে নিজের গোছানো সংসারের দি বার বার তাকাতে তাকাতে পটাচারা বললে,—তুমি ফির এসে এসব বিক্রি করে দিয়ো।

উপালী বলে,—বাড়িটাও বিক্রি করে দোব?

—তাতে তোমার কিছুদিন চলবে।

উপালী কথা বলে না। বোধহয় বলতে পারে না। এ ব্যর্থতার সবটুকুই উপালীর। ও জানে, ও নিজে হাতে ওর স্ত্রীপুত্রকে যেখানে রেখে আসবে, সেখানে যাবার মুখ ওর কোনোদিনই থাকবে না। তবু যেতে হবে, তবু ওদের নিয়ে আসতে হবে সেখানে। নিয়তি কী নির্মম!

চলতে চলতে পটাচারার বিশ্রাম করতে হোল দু'চারবার। শরীর ওর অত্যন্ত দুর্বল। যেমন রুগ্ন, তেমনি রক্তহীন।

প্রয়োজন হোলে উপালী ওদের কোলে করে নিয়ে যাবে। উপালীর গায়ে এখনও শক্তি আছে। সব সামর্থ্য ওর শেষ হয়ে যায়নি।

দুপুরের কিছু আগেই ওরা এসে পড়ল অচিরবতী নদীর অপর পারে। পটাচারা স্নান করল। একটু ঠাণ্ডা হোল।

বলল,—দুপুরে একটু বিশ্রাম করলে হোত না?

—না। দু'তিন দণ্ড বিশ্রাম করতে পার। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই আমাদের পৌঁছোতে হবে।

—কত দূর?

—তা পঞ্চাশ যোজন পথ তো হবেই।

পটাচারা ভয় পায়। —একদিনে আমি যেতে পারব তো?

—তা পারবে। না-হয় মাঝপথে কোনো গরুর গাড়ি দেখলে তোমাকে তুলে নিতে অনুরোধ করব। তোমাকে দেখলে হয়তো তাদের দয়া হবে।

—চলো। শোনো, ওই জলসত্রে একবার যাবে, সেই বুড়ী যদি থাকে?

—তা মন্দ নয়। চলো।

ওরা আসবার সময় যে-বৃদ্ধার কাছে রাত্রে আশ্রয় পেয়েছিল, সেই প্রপার দিকে এগোয় নদীর পাড় দিয়ে। ছেলেটাকে কোলে নিয়েছে উপালী।

প্রপার কাছে পৌঁছে ভাখে সেখানে একটি যুবক বসে।

উপালী কাছে এগোয়।

যুবক প্রশ্ন করে,—আপনি জল খাবেন?

উপালী চারদিকে তাকিয়ে বলে,—এখানে যে একটি বৃদ্ধা থাকত, সে কোথায়?

যুবক হাসে। —ম। সে মারা গেছে। এখন আমিই এখানকার প্রপাপালক।

উপালী স্তব্ধ হয়ে থাকে। পটাচারাও একটা কথা বলে না। বলতে পারে না।

ওরা কেঁদে ওখান থেকে।

শীতের দুপুরে নিস্তব্ধ নদীতীরের বিস্তীর্ণ বালুকাময় মাঠে বাতাস বইছে জোরে। বাতাসের শব্দে সেই বৃদ্ধার আক্ষেপ কানে আসে যেন। গভীর নিস্তব্ধ দুপুর।

পটাচারা উপালীর একটা হাত ধরে। ও হাত ঠাণ্ডা।

—কি হোল?

—আমার ভয়-ভয় করছে।

—কেন?

—মনে হচ্ছে যেন সেই বুড়ী আমার পেছন পেছন আসছে। পিঠে নিঃশ্বাস লাগছে।

উপালী পিছনে তাকায়। হাসে। —ও কিছু নয়। শীতের বাতাস। তোমার মনের ভুল।

দুর্বল শরীর নিয়ে পটাচারা পথ চলে উপালীর পাশে পাশে।

অচিরবতী নদী অনেক পেছনে ফেলে ওরা দ্রুতপায়ে চলতে থাকে। পটাচারা মাঝে মাঝে পিছনে পড়ে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার জন্যে বসে পড়ে।

সাদা চোখ-দুটো স্তিমিত হয়ে আসে ওর অপরিসীম দুর্বলতায়। এতটা পথ কি ও যেতে পারবে? পা যে আর চলে না! শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। রুগ্ন বুকখানা হাপরের মতো ওঠে নামে। আবার বসে পড়ে ও।

উপালী কাছে এসে ওর পাশে বসে। ওর কপালে চুল বেয়ে ঘাম ঝরছিল, মুছে দেয় উপালী।

অতি মৃদুস্বরে বলে,—কষ্ট হচ্ছে খুব?

পটাচারা হাঁপাতে হাঁপাতে তাকায় শুধু। কথা বলে না।

—তবে না-হয় এখানে বোসো। দেখি কোনো গাড়ি যদি এ-পথে বৈশালীর দিকে যায়। তবে তার ওপর তোমায় তুলে দোব।

ছেলেটিকে পটাচারার কোলে দেয়।

সময় কাটে। গাড়ি আসবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। কোথায় গাড়ি! তবে কি এখানেই দিনটা কাটাতে হবে? তারপর রাত্রি এলে কোথায় আশ্রয় নেবে ওরা? কে আশ্রয় দেবে?

পটাচারা নিজেই ওঠে।

—উঠলে যে?

—চলো। যেতে পারব।

উপালী ওঠে। ওর হাত ধরে সস্নেহে বলে,—একটু কষ্ট করো। তারপর রাত্রে গিয়ে প্রাসাদে তোমার সেই পুরোনো ঘরে শোবে, প্রাণভরে খাবে, ঘুমোবে।

মীনা কুমারী কামাল আমরোহীর 'পাকিজা' ছবিতে

[illegible]

[illegible] চিত্রতারকা মীনা কুমারী [illegible]

[illegible]

LUX
TOILET SOAP

চিত্র-তারকার
সৌন্দর্য্য
সাবান বিশুদ্ধ
শুভ্র লাক্স

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 43-326 BG

পটাচারার চোখ-দুটোও যেন আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গায়ে একটু শক্তি পায়। আবার পথ চলতে থাকে। পথের কি শেষ নেই? আসবার সময় তো এত সময় লাগেনি। আজ এত সময় লাগছে কেন? সময়টা কি বেড়ে গেছে? কখন ওরা পৌঁছোবে বৈশালীতে?

বিকেলের দিকে এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের কাছে এসে আবার বিশ্রাম করতে বসে ওরা। উপালী কাছাকাছি একটি ছোট জনপদে গিয়ে একটু দুধ নিয়ে আসে একটা মাটির ভাঁড়ে। ছেলেটা ধুঁকছে। ওকে কিছু খাওয়াতে হবে।

অনেকটা দুধ দিয়েছে। বাচ্চা ছেলের নাম করে চেয়ে নিয়ে এসেছে উপালী এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে।

পটাচারার চোখ-দুটো খুশি-খুশি। উপালীরও।

ছেলেটিকে খাইয়ে দুধ উদ্বৃত্ত থাকে। পটাচারা বলল,—তুমি খাও।

উপালী বলে,—তুমি খাও।

দুজনেই দুজনকে খাওয়াতে ব্যস্ত। শেষপর্যন্ত উপালী জোর করে পটাচারাকে খাওয়ায়।

গায়ে একটু জোর পায় ও।

—আর বেশী দূর নয়। এই প্রান্তরটা পেরোলেই বৈশালীর সীমানায় পৌঁছোব।

আশা। শুধু আশা।

বেশ দ্রুত পেরিয়ে আসে ওরা প্রান্তরটা।

সন্ধ্যার কিছু আগেই বৈশালীর ভেতরে ঢুকে পড়ে। উপালী নিজের মুখের অর্ধেক ঢেকে নেয়। যদি কেউ চিনতে পারে?

বৈশালীর ভেতর দিয়ে যতই ওরা প্রাকারের কাছে বিরূঢ়কের প্রাসাদের দিকে এগোতে থাকে, পটাচারার মুখখানি ততই শুকিয়ে যায়। উপালীর গা ঘেঁষে চলতে চলতে একবার বলে ওঠে,—চলো না-হয় ফিরে যাই। দরকার নেই ওখানে গিয়ে।

উপালী গভীরভাবে অন্যমনস্ক ছিল। চমকে উঠে বলে,—কেন?

পটাচারা চোখের জল মোছে। কম্পকণ্ঠে বলবার চেষ্টা করে,—তোমাকে যে আর দেখতে পাব না!

উপালীর নিজের চোখও ভিজে উঠেছে। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে বলে,—আমি আসব। মাঝে মাঝেই আসব। ভালো না-লাগে, আবার না-হয় বেরিয়ে এসো।

—আর কি বেরোতে পারব? তুমি কবে আসবে বলো?

—তা কি ঠিক করে বলা যায়। এক কাজ কোরো, রোজ দুপুরের সময় তুমি যেমন অলিন্দে দাঁড়াতে তেমনি দাঁড়িয়ো, আমি আসব।

প্রাসাদের কাছাকাছি এসে পূর্ব-প্রাকারের পাশে একটা বিরাট গাছের তলায় উপালী বসে পড়ে।

বলে,—এবারে তুমি একা যাও। আমি আর এগোব না।

পটাচারা উপালীর দিকে বার বার তাকায়। ওখান থেকে বিরূঢ়কের প্রাসাদ দেখা যায়। যেতে যেতে পটাচারা বার বার পিছন ফিরে তাকায়।

পটাচারা প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল ভয়ে ভয়ে। সেই প্রাসাদ। এই প্রাসাদে শৈশব থেকে বহুকাল কেটে গেছে। এই প্রাসাদেরই কন্যা সে। প্রাসাদের দ্বারের পাশে এসে দাঁড়ায়। বার বার ভাবছে ভেতরে ঢুকবে কিনা।

শীতের সন্ধ্যারও ওর হাতের তালু ঘামে। শরীর ঝিমঝিম করে। আর যেন দাঁড়াতে পারছে না। ভেতরে গিয়ে যদি শোনে বাবা নেই। মরে গেছে। যদি শোনে মা-ও নেই। কি করবে পটাচারা?

ও কে? কে দ্বারের দিকে আসছে?

অতি মন্থর গতিতে যে হেঁটে আসছে দ্বারের দিকে? ওই তো বিরূঢ়ক।

—বাবা!

পটাচারার মুখ থেকে বেরোয় শব্দটা।

—কে?

বিরূঢ়ক চমকে তাকায়। দ্বারের সামনে এসে পটাচারার দিকে নজর পড়ে। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। বোধহয় বিহারে গিয়েছিল। মুখখানি প্রশান্ত।

পটাচারার দিকে লক্ষ্য করে বলে,—কে?

—বাবা!— পটাচারার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ।

পটাচারার চেহারা দেখে চেনা যায় না। বিরূঢ়ক আরও কাছে আসে, ভালো করে তাকায়। তারপর ধীরে ধীরে পেছন ফিরে বলে,—কে তুমি?

—আমি পটাচারা।

—মিথ্যে কথা। পটাচারা মরে গেছে।

—আমি ফিরে এসেছি, বাবা!

বৃদ্ধের কণ্ঠে অপূর্ব দৃঢ়তা,—আমার কন্যা মরে গেছে। তার ফেরবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

—তোমার দৌহিত্রকে সঙ্গে এনেছি, বাবা। ওকে যে খেতে দিতেও পাচ্ছিনে।

বৃদ্ধ নীরব।

—একটু আশ্রয় নিতে এসেছিলাম, বাবা।

বৃদ্ধের কণ্ঠ অকস্মাৎ বর্শাফলকের মতো পটাচারার বুকে বেঁধে,—আমার এ প্রাসাদে আমার কন্যার আশ্রয় নেই। দৌহিত্রকে রেখে যেতে পার।

পটাচারা বসে পড়ে। ওর পা-দুটো থরথর করে কাঁপছে।

পটাচারার চোখে আর জল নেই। সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা বরফের মতো জমে আসছে।

ক্ষীণ অথচ দৃঢ় ভাবেই ও বলে,—তবে তাই হোক। তোমার দৌহিত্রকে রেখে গেলাম। ওকে মানুষ করে তুলো। বড় হোলে বোলো, ওর মা বাবা মরে গেছে। আমি আর কোনোদিন আসব না।

ছেলেটিকে মাটিতে নামিয়ে পটাচারা বাবার উদ্দেশে প্রণাম করে উঠে পড়ে।

আস্তে আস্তে অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে যায়।

বৃদ্ধ এবার ফেরে। উত্তরীয় দিয়ে চোখ মোছে। ধীর পায়ে এগিয়ে শিশুটিকে বুকে তুলে নেয়। তারপর প্রাসাদের ভেতর ঢুকে পড়ে।

উপালী বৃক্ষের নীচে বসে অপেক্ষা করছে। ভালো করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছে প্রাসাদের দিকে। ওরা ভেতরে গেল কিনা এটা সে জেনে যেতে চায়। কিছুই দেখা যায় না। আজ কি কৃষ্ণাচতুর্দশী?

উপালী উঠে মুখটা অনেকটা ঢেকে ধীরে ধীরে এগোয় খুব সন্তর্পণে।

ওই তো প্রাসাদ, দ্বারের সামনে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না? ওরা কি ভেতরে চলে গেছে?

উপালীর বুকের ভেতরটা শূন্য বোধ হয়।

অতি সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে এগোতে থাকে।

এ কে? পথের একপাশে ঘোমটা মাথায় বসে পড়েছে। কে?

দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায়—পটাচারা। থরথর করে কাঁপছে, বোধহয় ওঠবার শক্তি নেই আর।

উপালী ওর কাছে গিয়ে একটা কথা না বলে ওকে কোলে তুলে অতি দ্রুত সেই বৃক্ষের তলায় চলে আসে। কোলের ওপর ওকে শুইয়ে ওর মুখে হাত দেয়।

পটাচারা একটু শব্দ করে। যন্ত্রণায় চাপা আর্তস্বর।

—খোকা কই?

অতি ক্ষীণ স্বরে বলে পটাচারা,—ওর দাদু নিয়ে গেছে।

—আর তুমি গেলে না কেন?

পটাচারা আবার শব্দ করে। কান্নার শব্দ নয়। এক ভয়াবহ যন্ত্রণার শব্দ।

উপালী একটু ভেবে বলে,—বুঝেছি। তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বুকে দু'হাত চেপে 'উঃ' শব্দ করে ওঠে পটাচারা।

—কি হোল?

—বুকে ভীষণ যন্ত্রণা। নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিনা।

উপালী ভয় পেয়ে যায়। [illegible] দিন হেঁটে এই ভগ্ন-শরীরে পটাচারা বোধহয় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখানে আশ্রয় নিতে যাওয়া বিপজ্জনক। বৈশালীর সীমান্ত পেরিয়ে যেতে হবে।

রাত্রি হয়ে এসেছে। প্রাকারের বাইরে দিয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

পটাচারাকে কাঁধে নিয়ে অতি দ্রুতপায়ে চলতে থাকে উপালী।

জনপদ ছাড়িয়ে সেই প্রান্তর। অন্ধকার বিশাল প্রান্তর। এ প্রান্তর না পেরোলে তো অন্য কোনো জনপদের কোনো গৃহে আশ্রয় মিলবে না।

কাঁধের ওপর পটাচারাকে নিয়ে উপালী খুব জোরে হাঁটতে থাকে।

সুতীব্র শীতের ঠাণ্ডা বাতাসে সর্বাঙ্গ জমে আসছে। খুব দ্রুত চলেছে উপালী। আশ্রয় চাই। একটু আশ্রয়। একটু তাপ। পটাচারাকে বাঁচাতে হবে।

প্রান্তর পার হয়ে এসেছে। ওই দেখা যাচ্ছে অনতিদূরে একটি ছোট জনপদের আলো। এসে গেছে উপালী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পটাচারাকে কাঁধ থেকে নামাতে যায়।

একি! বুকের সমস্ত রক্ত জমাট হয়ে আসছে উপালীর। একি দেখছে সে! পটাচারার সর্বাঙ্গ শক্ত কাঠের মতো হয়ে গেছে।

—পটাচারা!

উপালীর গভীর আর্তনাদ প্রান্তরের শীতল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। মিলিয়ে যায়।

চিৎকার করে ওঠে উপালী, —পটাচারা!

পটাচারা আর কোনোদিন কথা বলবে না! কোনোদিন আর উপালীর মুখের দিকে তাকাবে না!

অন্ধকার প্রান্তরে উপালীর দীর্ঘশ্বাস মিলিয়ে যায় বার বার।

পটাচারার মৃতদেহ কাঁধে রেখে অতি ধীর পায়ে চলতে থাকে উপালী। বিশাল শূন্য ভেদ করে চলেছে। শুধু চলেছে। কিছু ভাবছে না। কিছু দেখছে না। এক শূন্যতায় আবিষ্ট হয়ে চলেছে।

তখনও ভোর হয়নি। অচিরবতী নদীর কিনারায় এসে উপালী দাঁড়ায়। সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পটাচারার মৃতদেহ দু'হাতে ধরে নিজ হাতে অচিরবতী নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

মুহূর্তে দেহটা স্রোতের জলে মিশে যায়।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উপালী। সোজা হয়ে।

নদীর পূর্বপ্রান্ত রক্তিম হয়ে উঠছে। উপালীর আরক্তিম চোখের মতো।

উপালী ধীরে ধীরে ফিরে দাঁড়ায়।

দূরে অচিরবতী নদীতীরে এক ঘন বন লক্ষ্য করে সেইদিকে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে।

●

বসন্তে

বাণী রায়

সুদীর্ঘ চুম্বন এক করি অনুভব
আমার বঞ্চিত ওষ্ঠ-অধরোষ্ঠ ভরে ;
শরীর পাগল হবে,
মন সিক্ত প্রেমে,
সে চুম্বনে দিনে জাগে বসন্ত-উৎসব।
অদেহী চুম্বন এক চৈতালী সন্ধ্যায়
আকাশী জোয়ারে ভাসে নীলের সাগরে ;
বৈশাখী রাত্রির স্বপ্নে আচম্বিতে ঝরে ;
ফাগুন-বাতাসে মেশে ঝাউএর সম্ভার।
প্রবাস হিমেল সিন্ধু পার হয়ে এল,
তাই কি পালকে তার শীতার্ত বেদনা ?
উষ্ণ স্বর্গের বস্তু আমার সাধনা,
স্বর্গের প্রসাদ সে তো এতদিনে পেল !
বিরহবিধুর দিনে প্রণয়ভাবনা
স্বপ্নের চুম্বনে আজ গ'লে মিশে গেল।

হাসপাতাল

সুশান্ত ঘোষ

ঐ ঘণ্টি বাজল
হাসপাতালের—
ভোরবেলার শীতের সঙ্গে
খণ্ডিত মুহূর্তের অবাক সঙ্গীতে
শুয়ে থাকি।

কী বর্ণ দেয়াল ; অলস টেবিলে
শিশিগুলো চোখের বন্ধনে
বিদ্ধ হয়ে কাঁপছে।

দুঃসহী বাতাস আমার রোমে-রোমে
ঢালছে বিষাক্ত সুরা,
গোপন গন্ধ ; উদ্ধত, অস্ফুট।
তপ্ত দারিদ্র্যের আঁচে
দু'হাত আগিয়ে নিয়েছি কতবার।

বেলা গড়িয়ে চলল
হাসপাতালের হলদে দেয়ালে
চৌকো রোদ্দুরের ইশারা,
ট্রামের ঘণ্টার শব্দ, ফলওলার ডাক,
সব তার মূর্ছিত গতি বয়ে
কী নিবিড় নির্জনতা নিয়ে আসছে
[illegible]

উত্তীর্ণ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

কোথায় দুর্বাসা এসো, অভিশাপ দাও যৌবনেরে,
আত্মমগ্ন এ আমাকে চূর্ণ করো নির্মম ধিক্কারে।
সিক্ত চোখে এই রূপ-লাবণ্যের স্মৃতির প্রতিমা
গলিত রৌদ্রের দাহে ভোরের এ ভীরু আকাশেরে
ছিন্নভিন্ন করে দাও। দূরব্যাপ্ত দুঃখের ঝঙ্কারে
বাজাও বাজাও তবে অতন্দ্র এ হৃদয়ের বীণা।
বিষামৃতে পূর্ণ হলে জীবনের পানপাত্র তবে
জীবনকে জানা যায়,—দেখা যায় রহস্যের রূপ।
ক্ষণিকের মুগ্ধ মোহ মুক্ত হয় ভাব-সম্মিলনে।
হে কাল, হে রুদ্র কাল, যন্ত্রণার নিপুণ উৎসবে
আমাকে তাহলে ডাকো, জীবন তো দুঃখেরই স্বরূপ।

সুখ নয়—দুঃখ নয় মুগ্ধ চিত্ত—প্রত্যয়ের পথে
আমার স্বরাজ্য শেষে খুঁজে নিতে হবে এখানেই—
স্বপ্নের ওপারে ; এই রূপময় রাজ্যের সীমায়
রূপাতীত অন্য রূপ—অন্য চাঁদ অপ্সরা আকাশে।
গভীর গৌতম নদী সমুদ্রের বুকে ঢালবেই
হৃদয়ের রূপকথা,—রূপ হবে ব্যাপ্ত মনীষায়
আরো দূর প্রসারিত। এলোমেলো নির্জন বাতাসে
কী এত কথার কান্না, কেন তবু নীলা পান্না রঙ
দু'চোখে কাজল আঁকে, সোনালী এ গৌড়-সারঙ্গ
বাজে কার মৃদু পায়ে—কে আমাকে এত ক'রে ডাকে
কার হাতে যৌবনের রূপকল্প ? রাত্রির প্রভাতে
রহস্যে জানব আমি—পার হব রাত্রির প্রাসাদ—
দাও হে অরণ্য, তবে হে আকাশ—সমুদ্র গভীর,
বিপন্ন ক্ষুধার দিকে আমি আর বাড়াব না হাত।
আঘাতে আঘাতে আমি বারবারই আঙিনে শিশির।

গল্পের মৃত্যু, সিনেমার জন্ম

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতা 'দেবী' ছবিতে প্রকট হয়েছে উগ্ররূপে—সীমাবদ্ধতাই বেশী। সত্যজিৎ সব-কিছু পারেন না, যেমন—নাটক সৃষ্টি করতে; 'দেবী' ছবি দেখে এইটুকু পরিষ্কার বুঝেছি। আমাদের বোঝা যেন ভুল বোঝা হয়, সত্যজিৎ তাঁর পরের ছবিতে আশা করি তা প্রমাণ করে আমাদের আশ্বস্ত করবেন।

বহু প্রত্যাশা নিয়ে 'দেবী' দেখতে গিয়েছিলুম। 'দেবী' প্রভাতকুমারের এবং বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। বিজ্ঞাপনে দেখলুম—'দেবী, সত্যজিৎ রায়ের বলিষ্ঠতম সৃষ্টি'। মনে মনে উল্লসিত হলুম, নিশ্চয় তাই হবে। সত্যজিতের সৃষ্টির দিক-পরিবর্তনও কল্পনা করতে লাগলুম। এবার তিনি নাটক সৃষ্টি করতে চাইছেন। এতদিন তাঁকে জগৎ-দৃশ্যের মহান দর্শকরূপে জেনেছি। বিভূতিভূষণের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা-পৃথিবীর ছবি দেখেছেন। এবার দেখবেন জীবনের নাট্যলীলা। তাই নিয়েছেন প্রভাতকুমারকে। জ্ঞানময় নিরাসক্ত শিল্পী প্রভাতকুমার, 'দেবী' গল্পে আনন্দের দুর্বলতা পর্যন্ত পরিহার করে অতি নির্মম স্রষ্টা হয়েছেন। 'বলিষ্ঠতম' সৃষ্টিতে সত্যজিৎ সেই ট্রাজেডির রূপ ফোটাতে চলেছেন। নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে 'বলিষ্ঠতম' বিশেষণটি নিশ্চয় সত্যজিতেরই দেওয়া। তাঁর রচনার একটি অক্ষরও তাঁর শাসনের বাইরে নয়।

আমার আরো একটি ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ছিল। সত্যজিৎকে কোনো সময় প্রাণহীন বুদ্ধিবাদী ভাবতে পারিনি। আমার বিশ্বাস ছিল, দেশের সর্বাত্মক অনুভূতির রূপ তিনি ধারণা করতে পারেন,—সমস্ত মিলিয়ে যে দেশ আছে, তার আবেগ আতিশয্য বিচার সংস্কার ও কুসংস্কার নিয়ে আমার যে দেশ। অভিব্যক্তির ব্যাপারে সংযত হলেও, রচনাদের মধ্যেও যেন তাঁর ঘন আবেগকে অনুভব করেছি। তিনি দেশের কুসংস্কারকে দেখাবেন, নিশ্চয়।—আবার সংস্কারের সৌন্দর্যও দেখাবেন। তিনি তিক্তকণ্ঠ সংস্কারক হবেন না। মতবক্তার দায়িত্ব তিনি নেবেন কেন? তিনি প্রকাশ করবেন সব-কিছু, ভালো এবং মন্দ, সুন্দর, গভীর যা আছে।

আমি তাই ভেবেছিলুম 'দেবী' গল্পের চিত্ররূপের মধ্যে শক্তিসাধনার উদার মহান এবং ক্ষেত্রবিশেষে 'অশোভন রূপের পটভূমিকা পাব। মহাকালীর নয়নের প্রসন্ন হাসি এবং রক্তাক্ত ওষ্ঠের সর্বনাশের পটভূমিকায় করুণ একটি মানবী-কাহিনী উপস্থাপিত হবে। সত্যজিতের বিজ্ঞাপনের প্রকৃতি দেখে সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেখেছিলুম কোথাও অতি ভীষণ ত্রিনয়ন, কোথাও দেবী-প্রতিমার মতো একটি সুন্দর নারীমুখের একার্ধ গৌর, অপরা
নীলকালো। জীবন ও মৃত্যু, দিবা ও রাত্রি পাশাপাশি।

আমার সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। হোক্‌গে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে একটি আশা ব্যর্থ হয়েছে তাকে 'হোক্‌গে ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ সে আশা ধর্মাবেগমূল
নয়, শিল্পগত। সত্যজিৎ প্রভাতকুমারের শিল্পসৃষ্টিকে সংহা
করেছেন। যদি এই চিত্র আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়—প্রভাতকুমারের সমাধিমূলে দাঁড়িয়ে সত্যজিৎ সে-মাল
গলায় পরবেন।

সত্যজিৎ কর্তৃক বিভূতিভূষণের ব্যবহার সম্বন্ধে এক
কথা উঠেছিল বাংলাদেশে। সেদিন ব্যাপারটি গুরুতর মে
হয়নি। দুজনেই দর্শক, বিভূতিভূষণ এবং বিভূতিভূষণে
মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ। যদি সত্যজিৎ কোথাও সরে গি
থাকেন, বিভূতিভূষণের প্রশান্ত অনুভূতিময় সৃষ্টি তা
বিপর্যস্ত হয়নি। কারণ বিভূতিভূষণ তাঁর রচনায় ম
নিখুঁত অপরিবর্তন কোনো সঙ্কট আনেননি, এনেছিলে
সরল ব্যাপক দুঃখময় ভালবাসার প্রকৃতি। সত্যজিৎ সে
ভাবদৃষ্টি ও রূপদৃষ্টিকে মোটামুটি অনুসরণ করলেই পারবেন
করেছিলেনও তাই। প্রভাতকুমারের ক্ষেত্র কিন্তু ভিন্ন
তাঁর সৃষ্টি তাঁর কর্মের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তা
হস্তক্ষেপ করলে মূল সৃষ্টির প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করা হ
প্রভাতকুমার 'দেবী' গল্পে একটিও অনাবশ্যক কথা বলেননি
প্রতিটি রেখা টেনেছেন প্রয়োজনে। তিনি চরম নাট্যক
একটি ছোটগল্প লিখেছেন। তার সঙ্গে বড়জোর কি
যোগ করা চলে, অত্যন্ত সাবধানে, নাটকীয় কল্পনার সর্
রেখে। কিন্তু বদলানো চলে না। একেবারে নয়।

সত্যজিৎ সেই সাহস দেখিয়েছেন। যদি তার দ্বারা মহত্তর কিছু সৃষ্ট হোত, প্রভাতকুমারের ক্ষতিকে না-হয় মেনে নেওয়া যেত অধিকতর প্রাপ্তির খুশিতে। কিন্তু প্রভাতকুমারের দেবী যে রসানন্দের সৃষ্টি করেছে, সত্যজিতের দেবী তার ধারে-কাছেও যেতে পারেনি। দর্শক যখন হল্ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, অতৃপ্তি অস্বস্তি কিংবা সহাস্য বিরক্তিতে ভরে ছিল তার মন। আমি অসাধারণ দর্শকের কথা বলছি না, সাধারণ দর্শক। তারা গভীর বা মহৎ কিছু পায়নি। রস-নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হয়েছেন পরিচালক।

প্রভাতকুমারের রচনার সঙ্গে সত্যজিতের রচনার আভ্যন্তরীণ পার্থক্যের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। আমি জানি এখনি সত্যজিৎ কিংবা তাঁর পক্ষীয় কেউ সিনেমার স্বাধীনতা দাবি করবেন। কলমে লেখা গল্প আর সেলুলয়েডে ওঠানো ছবি এক জিনিস নয়। তা ছাড়া পনেরো পৃষ্ঠার একটি গল্পকে দশহাজার ফুটের ছবি করতে হচ্ছে। সে কথা ঠিক, কিন্তু এর বিপক্ষে বলা চলে, নিতান্ত গতিহীন ঐ দশহাজার ফুটের অনেকখানি অংশ নির্বাক অভিনয়ে পূর্ণ। সেই চোখে-মুখে ভাবের খেলায় নতুন কাহিনী সংযোজনের প্রয়োজন প্রায় হয়নি। দ্বিতীয়তঃ যেখানে যোজনা করতে হচ্ছে, সেখানে ছবি-কর্তার নিশ্চয় এমন কোনো নৈতিক অধিকার নেই, যার দ্বারা রচনার মূল রসরূপ তিনি পরিবর্তিত করতে পারেন। সত্যজিৎ সম্ভবতঃ কৌশলের সঙ্গে এ ব্যাপারে আত্মসমর্থন করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে এই গল্পের প্লট দিয়েছিলেন, এ কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পর্দায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে—রবীন্দ্রনাথের প্লট, লিখেছেন প্রভাতকুমার, ছবি করেছেন সত্যজিৎ। এককথায় ত্রিবর্গীয় সাধনা। একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি,—একটা বড় ধরনের তুলনাই দেওয়া যাক,—কালিদাস শকুন্তলার প্লট নিয়েছিলেন মহাভারত থেকে; সে কথা কি সত্যজিৎ, যদি তিনি শকুন্তলার ছবি ওঠান (ওঠান না সত্যজিৎবাবু, বড় সুন্দর হয়।), সাড়ম্বরে পর্দায় লিখে দেবেন? রবীন্দ্রনাথ অতি মহৎ লেখক ব'লে কি প্রভাতকুমারের সৃষ্টিগৌরবকে লঘু করব? সাহিত্যে শেষ রূপটিই সবচেয়ে মূল্যবান।

প্রভাতকুমার ও সত্যজিতের দেবীর আভ্যন্তরীণ পার্থক্যের কথা তুলেছিলাম। 'দেবী' গল্পে প্রভাতকুমারের স্পষ্ট-উচ্চারিত কোনো বাণী ছিল না। বেদনা ছিল। শেষ পর্যন্ত বেদনাই চরম বাণী। প্রভাতকুমার—এখানে কোনো মানবী দেবী হতে পারে কিনা—এই গুরুতর প্রশ্নের মধ্যে অবতরণ করেননি। তিনি দেখিয়েছেন দয়াময়ী নামক ষোলো বছরের সুন্দর মেয়েটি দেবী ছিল না। অথচ তার উপর দেবীত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করে নিজের দেবীত্বের প্রতিবাদ করে গেল। তার হচ্ছে ব্যক্তিগত ট্রাজেডি। যদিও ট্রাজেডি-সৃষ্টির পিছনে আছে বাংলাদেশের একশ্রেণীর ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য চোখে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ শাক্ত-সাধনাকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টি 'বিসর্জন'-এর মূল দুর্বলতা আছে রঘুপতির মতো চরিত্রে কোনোপ্রকার মহিমার্পণ করবার মানসিক অসামর্থ্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বিরাগ রঘুপতির বিরুদ্ধে নাটকের মধ্যেই সংগ্রাম করেছে। রবীন্দ্রনাথ যদি 'দেবী' গল্প স্বয়ং লিখতেন তাহলে 'হয়ত' সেই একই ত্রুটি ঘটত। হয়ত রবীন্দ্রনাথ সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন ব'লেই প্লটটি প্রভাতকুমারকে দিয়েছিলেন। কিংবা হয়ত, যেটা বেশী স্বাভাবিক, বিলোবার মতো যথেষ্ট ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের ছিল। সে যাই হোক, প্রভাতকুমার 'দেবী' গল্পে দেখিয়েছেন, নিরপেক্ষ থেকে ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের ট্রাজেডিকে কিভাবে গল্পে ফোটানো যায়। প্রভাতকুমার হিন্দু ছিলেন।

প্রভাতকুমারের গল্পের রসকেন্দ্র-অনুধাবনে অসামর্থ্য সত্যজিতের সৃষ্টিকে নষ্ট করেছে। যদি এটি কাহিনীকারের গৌণ সৃষ্টি হোত, কথা ছিল না। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির (শ্রেষ্ঠতম?) মধ্যে পড়ে, এই গল্পে তিনি ব্যক্তি-ট্রাজেডির এক চরম রূপকে স্পর্শ করেছেন। প্রভাতকুমারের হাতে যা ছিল ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডী (যদিও তাতে আপেক্ষিকভাবে সমাজরূপের প্রাধান্য); সত্যজিতের হাতে তাই হয়েছে কুসংস্কারের কীর্তি। এতেই বিপত্তি। প্রভাতকুমারের এই গল্পে কোনো বৃহৎ ধর্মীয় ট্রাজেডির উপাদান নেই। ধর্মীয় ট্রাজেডির ক্ষেত্র ভিন্ন। ধর্মের খোলস চাপা পড়ে বহু মানুষ রুদ্ধশ্বাস হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বঙ্গের সর্বদেশে দেবী হয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন দৃষ্টান্ত বেশী মিলবে না। বরং যদি সত্যজিৎ দেবদাসী বা ভৈরবী প্রথার উপর ছবি তুলতেন, সেক্ষেত্রে তিনি সংখ্যাগত যাতনাকে অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। যদি বলা হয়, দেবীর দুর্গতির মূলে আছে অন্ধবিশ্বাস, তদুত্তরে বলা যায় সে-অন্ধবিশ্বাস সর্বদেশীয়, এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ, সচেতনভাবে উৎপীড়ক নয় কোনোমতে।

সত্যজিৎ অস্থানে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সংস্কারক হবার প্রলোভনে।

উভয়ের ঘটনা-বিন্যাসের রূপ বিশ্লেষণ করা যাক। প্রভাতকুমারের গল্পের সূচনায় আছে, বিংশতি বৎসরের যুবক উমাপ্রসাদ তার ষোড়শী পত্নী দয়াময়ীর প্রণয়মাদকতায় ভরপুর। ব্যাপারটা দেড়শো বছর আগেকার। উমাপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক মনের; সংস্কৃত ছেড়ে ফার্সী পড়ছে। দয়াময়ীকে নিয়ে তার পশ্চিমে চাকরি করতে যাবার ইচ্ছা, কারণ সেখানে দয়াময়ীকে কাছে পাওয়া যাবে দিনে-রাতে। সত্যজিৎ রায়ের বিশ্বাস নেই ফার্সী-পড়া মডার্নত্বে। সুতরাং প্রভাতকুমারের দেড়শো বছরের প্রাচীন ঘটনা সত্যজিতের হাতে জন্মান্তর হয়েছে। সত্যজিতের উমাপ্রসাদ কলকাতায় ইংরেজি শেখে, রামমোহন রায়ের রেফারেন্স দেয়, বিধবা-বিয়ের পক্ষে বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলি পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে মুখস্থ করে। এসকলই সত্যজিৎকে করতে হয়েছে, কারণ তিনি 'প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের সংঘর্ষে'র মতো বৃহৎ ব্যাপার দেখাতে চান। প্রভাতকুমারে আছে—একদিন উমাপ্রসাদ ও দয়াময়ী প্রভাত পর্যন্ত "পরস্পরের বাহুবন্ধ হইয়া" নিদ্রিত, এমন সময় ঘরের বাহিরে ধর্মোন্মত্ত পিতা কালীকিঙ্করের আগমন এবং কম্পিতকণ্ঠে পুত্রবধূ দয়াময়ীকে স্বয়ং আদ্যাশক্তিরূপে ঘোষণা। স্বামী-স্ত্রী দুজনের নিবিড় প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে প্রভাতকুমারের গল্পে এইভাবে বিচ্ছেদ-দেবীর প্রবেশ। সত্যজিৎ কাহিনীর বিস্তৃতির জন্য এবং উমাপ্রসাদকে আধুনিক মনের প্রতিনিধিত্বে দীক্ষিত করবার জন্য এই ঘটনার আগেই তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে রেখেছেন। সেখানে সে থিয়েটার দেখছে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, এবং ভয়াবহ-রকমের আড়ষ্ট এক শিক্ষকের কাছে জীবনাদর্শের পাঠ নিচ্ছে। আদর্শ মানে কি আড়ষ্টতা?

ওদিকে গ্রামে পূজা চলছে দয়াদেবীর। প্রভাতকুমারের মতে প্রথম তিনদিন দয়াময়ী কেবল কেঁদেছে এবং তিনদিনের পর রাত্রে উমাপ্রসাদ যখন লুকিয়ে তার কাছে হাজির হয়েছে, স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে চোখের জলে ভেসে বলেছে,—আমি দেবী নই, কালী নই, তোমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নই। উমাপ্রসাদ পালিয়ে যাবার কথা বলাতে সাগ্রহে রাজী হয়েছে, কারণ তার বক্তব্য—'এখানে থাকলে আমি মরে যাব, নয়ত পাগল হয়ে যাব।' সত্যজিতের হাতে ব্যাপারটা ভিন্ন। দয়াময়ী 'দেবী' হবার বেশ কিছু পরে বৌদির চিঠি পেয়ে থিয়েটার [illegible] ব্যস্ত উমাপ্রসাদ হাজির হোল বাড়িতে; কাণ্ডকারখানা দেখে সংযতভাবে চেঁচামেচি করল বাপের সঙ্গে, কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই করতে পারল না, কারণ সেই নাটকীয় মুহূর্তে মুমূর্ষু বালককে দেবী-চরণামৃতে বাঁচানোর জয়ঢাক বেজে উঠল প্রবলভাবে। এরপর সত্যজিতের ছবিতে দয়াকে নিয়ে উমাপ্রসাদের পলায়নের মতলব থাকবে, কিন্তু তাতে থাকবে না কাহিনীর দ্বন্দ্ব; কারণ তখন, ঐ মুমূর্ষু বালকের প্রাণলাভের ঘটনার পর থেকে দয়ার নিজের মনেই দ্বিধার সঞ্চার হবে। প্রভাতকুমারের দয়া স্বেচ্ছায় সাগ্রহে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। সত্যজিতের ক্ষেত্রে উৎসাহ-সঞ্চার করতে হয়েছে পলায়নে। প্রভাতকুমারে তাই দয়ার পরবর্তী পলায়ন-প্রত্যাখ্যান গাঢ়বর্ণ, সত্যজিতে লঘুতাময়।

প্রভাতকুমারের গল্পে দয়া চরিত্রের তিন স্তর। প্রথম স্তরে দয়া বধূ। দ্বিতীয় স্তরে বধূ এবং দেবী। তৃতীয় স্তরে শুধু দেবী। মুমূর্ষু বালকের জীবনলাভের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম স্তর বিস্তৃত, যদিও কাহিনীর দিক দিয়ে দয়ার জীবনে ইতিমধ্যে বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে,—সে শ্বশুরের স্বপ্নলব্ধ প্রত্যাদেশ-মতো দেবী হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে বধূ থেকে গেছে ভিতরে ভিতরে; দেবীত্বে অভিষেকের তিন দিন পরেও উমাপ্রসাদের আলিঙ্গনে ও আদরে ধরা দিয়েছে, সাগ্রহে রাজী হয়েছে পলায়নে। মরণাপন্ন বালকের প্রাণলাভ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সুরু। এই ঘটনায় এবং পরবর্তী আরো কয়েকটি ঘটনায় নিজের দেবীত্ব বিষয়ে দয়ার বিশ্বাসের সূচনা। এইখানেই তার আত্মপ্রবঞ্চনার সূত্রপাত। তবু এখনো মানবীত্ব যায়নি। দেবীতে মানবীতে মেশামেশি। পত্নীভাবে নিজেকে স্পর্শ করতে সে যে উমাপ্রসাদকে নিষেধ করেছিল, তা দেবীর স্পর্শভীরু শুচিতার জন্য নয়, তার আশঙ্কা তাতে উমার অকল্যাণ হবে। উমাপ্রসাদ রাগ করতে সে আক্ষেপ করে বলেছিল, তুমিও আমাকে বুঝলে না? এর পর উমা নদীর ঘাট থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল এবং দয়া উঠে এল সেখান থেকে মন্দিরে। দয়ার জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের সুরু হোল। তার জীবনের পথ থেকে তার স্বামী অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। দ্বিধা জাগাতে আর কেউ নেই। দয়া এখন ভক্তের বন্দনায় এবং নিজের ধারণায় নিশ্ছিদ্র দেবী হয়ে উঠল। তার আত্মপ্রবঞ্চনা ক্রমে বেড়ে উঠে তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে গেল, যেখান থেকে সে সগর্বে ঘোষণা করতে পারল, আমি খোকাকে ভালো করে দেব। এইখানে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মতো প্রভাতকুমার ট্রাজেডির গভীরতর

প্রত্যাশা পূরণ করেছেন। প্রথমে একটি সরল মেয়ের উপর দেবীত্বের আরোপ, তার মনের বিপর্যস্ত রূপ, তার প্রতিরোধ-চেষ্টা। তার পরে ভ্রান্তি-সহায়ক আপাত-অনুকূল কয়েকটি ঘটনার সন্নিবেশ (রোগ-নিরাময় ইত্যাদি), তার দ্বারা আত্মপ্রতারণার সূচনা; তারই ক্রমিক ব্যাপ্তি। অবশেষে চরম রূপে অতিস্ফীত অহং-এর উপর নিয়তির অস্ত্রাঘাত। তারপরেই মৃত্যুর হাহাকার। দয়াময়ীর জীবনের সেই অবস্থাটির চিত্রণ প্রভাতকুমারের শিল্প-সাফল্যের দৃষ্টান্ত। খোকার মৃতদেহের সামনে বসে যমরাজকে খোকার আত্মা খোকার শরীরে ফিরিয়ে দিতে আজ্ঞা—পরে মিনতি—ক্রন্দন—প্রার্থনা—এবং তারপরে নিজের দেবীত্বে অবিশ্বাস—নিজের হত্যাকারিণী মূর্তির স্বরূপ বোধ—অনুশোচনা ও আত্মগ্লানির যাতনা—তারপরে আত্মহত্যা। কয়েক ছত্রে প্রভাতকুমার শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টি করেছেন।

দয়ার চরিত্রের এই তিনটি স্তর সম্বন্ধে একেবারেই অবহিত থাকেননি সত্যজিৎ। তাঁর ছবিতে প্রতিবাদের নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান উমাপ্রসাদ খোকার মৃত্যুর পরে 'নাটকীয়' মুহূর্তে বাড়ি ফিরবে, তার পিতাকে প্রায় নিষ্কম্পকণ্ঠে বিচারকের রায় শোনাবে—তুমিই হত্যাকারী, ঘরে ঢুকে দেখবে কাজল-মাখা সুসজ্জিতা পাগলিনী, ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে যাতনায়, একসময়ে দয়াময়ী ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর পথে (যে পথে তাকে উমা একদিন ডাক দিয়েছিল) দারুণ দৌড় দেবে, সিনেমার দর্শকের মনকে মথিত করার চেষ্টায় উমাপ্রসাদ তার সন্ধানে ছুটবে, এবং সবশেষে দেখা যাবে 'ধপাস করিয়া পতিতা' দয়ার কাছে উপস্থিত উমাপ্রসাদ, (পথিমধ্যে দর্শক দেখবে বিসর্জিত দেবী-মূর্তির কাঠামো), উমাপ্রসাদ পত্নীর ঠোঁট-নাড়ানো থেকে বুঝে নেবে দয়ার স্বীকারোক্তি, সে দেবী নয়, তারপর সব শেষ, শান্তিজল। প্রভাতকুমার থেকে সত্যজিৎ দু'কদম এগিয়ে রইলেন। প্রভাতকুমারের দয়া প্রথমদিকে পরিষ্কার বলেছিল, সে দেবী নয়। সত্যজিতের দেবী তা বলতে পারেনি, কারণ তাকে মরবার আগে শব্দহীন ঠোঁট-নাড়ার সাহায্যে সেই কথা বলতে হবে। এটা সিনেমার স্মরণীয় দৃশ্যের প্রয়োজন। আর সত্যজিৎ দয়াময়ীর মতো সুন্দর মেয়েটার গলায় দড়ি দিতে পারেননি। হার্টফেল—অমন মেয়ের চমৎকার পরিণতি, লম্বা দৌড়ের পর।

ফল কি হয়েছে? একটি গল্পের মৃত্যু এবং সিনেমার সৃষ্টি। প্রভাতকুমারের দয়া ছিল রক্তমাংসের মানুষ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সত্যজিতের দয়া প্রথমদিকে রক্তমাংসের, ক্রমে সত্যজিতের। সত্যজিতের দয়া সত্যজিতের শাসনে বাকহারা। সে বাইরে জড় হয়ে বসে থাকবে। ঘরে গিয়ে নাড়াচাড়া করবে স্বামীর চিঠির, টিয়ার গায়ে হাত বুলোবে, দূর থেকে খোকাকে সতৃষ্ণনয়নে দেখবে, অর্থাৎ হিসেবী অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন সব পাবে পরিমিত মাত্রায়, কেবল প্রাণটুকু বাদ। দেবী হয়ে দয়া সত্যই ইঁট-কাঠের দেবী হয়েছিল সত্যজিতের দেবীতে। সত্যজিৎ সবচেয়ে আপত্তিকর মারাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন দয়ার জীবনের শেষ অধ্যায়ের চিত্রণে। তিনি দয়ার মধ্যে অহংকার দেননি (সাসপেন্সে দিয়েছিলেন কি?)। এর দ্বারা তিনি প্রভাতকুমারের অনভিপ্রেত দিকে নিয়ে গেছেন তাঁর ছবিকে। সত্যজিতের হাতে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে নিছক নিষ্ঠুর পীড়নের; ধর্মের গোঁড়ামি কিভাবে একটি মেয়েকে শ্বাসরোধ করে মারল। সত্যজিৎ গলার উপরে পারলে গোঁড়ামির পাঁচটি আঙুল পর্যন্ত দেখাতেন। ট্রাজেডির পরিণতিতে দয়ার ভূমিকাকে তিনি নিতান্ত গৌণ করে দেখিয়েছেন। উমাপ্রসাদ তার শিক্ষকের কাছে দয়ার বিষয়ে করুণ কণ্ঠে বলেছে, সে কি করবে, তাকে যা বোঝানো হচ্ছে সে তাই বুঝছে,—she is only seventeen। সত্যজিতের বোঝা উচিত ছিল সে-যুগে সতেরো যথেষ্ট বয়স; এবং দয়া যেখানে আত্মসমর্পণ করেছে, সে-পরিস্থিতিতে সতেরো বা সাতচল্লিশে কোনো পার্থক্য আসে না। কালীকিঙ্কর, দয়াময়ী সকলেই বিশ্বাসের ও অবস্থার দাস। প্রভাতকুমার সেই জিনিসটি রচনায় ফুটিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন একদিকে শ্বশুরের ধর্ম-বিশ্বাসের অন্ধতা দয়াময়ীকে মেরেছে, অন্যদিকে দয়া নিজেকে মেরেছে নিজে। গল্পে আছে দুটি হত্যা—একটি আত্মার, অন্যটি দেহের। 'মা' 'মা' রব তুলে দয়াময়ীর আত্মাকে গোড়ার দিকে মারতে চেয়েছে দয়ার গুরুজন ও গ্রামবাসী মিলে। প্রথমে বাধা দিলেও, ক্রমশঃ দয়াময়ী সে-হত্যাকে বরণ করে নিয়েছে। নিজের দেবীত্বে বিশ্বাস দয়ার আসল আত্মহত্যা। একে দয়া বুঝতে পারেনি। বুঝল খোকার মৃত্যুর পরে। তখন গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা সম্পূর্ণ করে দিল। ব্যাপারটা ভিতরের এবং বাহিরের। সত্যজিতের ছবিতে মৃত্যুর কারণ সম্পূর্ণ বাইরের। ফলে পীড়নের কষ্টবোধ করেছি, ট্রাজেডির গভীরতা পাইনি।

কালীকিঙ্করের জীবনের ট্রাজেডি সম্বন্ধেও সত্যজিৎ উদাসীন। কালীকিঙ্কর ভ্রান্তবুদ্ধি, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসে ফাঁকি ছিল না। গল্পে দয়ার সামনে তাঁকে প্রণত দেখে যে হাসি আসে তা দুঃখের, ব্যঙ্গের নয়। প্রভাতকুমার প্রহসন সৃষ্টি করতে বসেননি। এইসব ক্ষেত্রে সত্যজিতের ছবি থেকেও হাসি এসেছে, তার চরিত্র ছিল একেবারে ভিন্ন। সে-হাসি সত্যজিতের রচনার গাম্ভীর্যের প্রতি দর্শকের অচেতন সমালোচনা। যে-তারাপ্রসাদ প্রভাতকুমারের গল্পে ছিল পিতৃভক্ত অনুগত পুত্র, সত্যজিতের দৃষ্টিতে সে

হাস্যরসের উপাদান, ভাঁড়-বিশেষ। তাই কালীকিঙ্কর-তারাপ্রসাদের দেবী-ভক্তিতে দর্শকদের হাসির পুরস্কার লাভ করে সত্যজিৎ প্রহসন-রচনায় তাঁর সাফল্য দেখিয়েছেন, ততোধিক নয়। সত্যজিতের অনেক আবেগঘন মুহূর্তে দর্শক মজা বোধ করেছে। সত্যজিৎ অনেক জিনিসের মতো 'অবতার' শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র জানেন না, তাও দেখা গিয়েছে। 'অবতার' শব্দ বাংলায় মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। তাদের বেলায় বলা হয়—দেবী ভর করেছেন, বরং আদ্যাশক্তি আবির্ভূত হয়েছেন, ইত্যাদি। প্রভাতকুমারের রচনাতে তাই পাওয়া যাবে।

সত্যজিতের নাট্যবোধের অভাব আরো ফুটেছে কাহিনীর পরিণতিকালে। প্রভাতকুমারে খোকার মৃত্যু ও দয়ার আত্মহত্যা, এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশী নেই। দেওয়াও চলে না। খোকার মৃত্যুর পরে যখনি দয়া নিজের দেবীত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করল, তখনি তাকে গ্রাস করেছে ভয়াবহতর অন্তর্জ্বালা। অসীম শূন্যতার মধ্যে তার বাধিহীন নিঃসঙ্গ জীবন নিক্ষিপ্ত হয়েছে। দ্রুত আত্মনাশ তার একমাত্র পরিণতি। প্রভাতকুমারে দয়ার অন্তর্দাহের যে-রূপ কয়েক ছত্রেও ফুটেছে,—সত্যজিৎ, মনস্তত্ত্ববাদী সত্যজিৎ, সে বিষয়ে উদাসীন থেকে দয়াকে পাগলিনী বানাবার সস্তা কৌশল নিয়েছেন। দয়াকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতে পারেন না, স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন দরকার। সমস্ত ব্যাপারটাকে তরল করে উমাপ্রসাদ স্ত্রীর কাছে হাজির হয়েছে, যার সমাপ্তি একটি বৃহৎ দৌড়, পতন ও মৃত্যুতে। এমন করতে হয়েছে, তার কারণ ছবিতে মূল ট্র্যাজেডি দয়ার নয়,—সে ধর্মগোঁড়ামির শিকার মাত্র। কালীকিঙ্করেরও নয়,—তিনি দয়ার দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর কারণ-রূপে সকলের প্রত্যক্ষ বিদ্বেষের পাত্র। ট্র্যাজেডি হোল সুন্দরী ষোড়শী পত্নীর প্রণয়ে বঞ্চিত রীতিমতো নায়ক উমাপ্রসাদের।

সত্যজিতের কঠিন সমালোচনা করেছি। যে-কোনো সমালোচনার চেয়ে বড় শিল্পী সত্যজিৎ রায়। আমি তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। কেবল এইটে বুঝেছি তাঁর যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা আছে। তিনি জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা-জোয়ারের উত্তাল রূপ দেখতে পারেন না, অন্ততঃ এখনো পর্যন্ত পারেননি। যা পারেন তাই যথেষ্ট। সে হোল উপর-তলের অপূর্ব দর্শন। সংঘাতময় নাট্যরূপের কী প্রয়োজন, পৃথিবীর আশ্চর্য দৃশ্যরূপ তিনি দেখুন, আমাদের দেখান। দোহাই সত্যজিৎ রায়, বাণী দেবেন না। আমাদের উপদেশ দিতে পৃথিবীতে বক্তৃতাকারী হৃদয়হীন বহু ব্যক্তি আছেন। আপনি শুধু দর্শন করুন। যদি তার দ্বারা জীবনের কোনো অসঙ্গতি প্রকট হয়, এবং মানুষ সংশোধিত হয় (তার দ্বারাই হয়), সেই ভালো। আর একটি কথা, মাঝে মাঝে অভিনেতাদের স্বাধীনতা দেবেন। নিজের মতো করে তাদেরও কিছু বলবার থাকতে পারে। আপনার বিদগ্ধ সংযমের অধিকারী নয় সাহিত্যের সব চরিত্র। কী অপূর্বতা ছিল 'দেবী' ছবির প্রথমাংশে! দেখে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর প্রথমতম সিনেমা-শিল্পীর রচনা দেখছি। নিরাভরণ মৃন্ময়ীর বোধন থেকে বিসর্জন পর্যন্ত। উমা-দয়ার প্রণয়-মাদকতার রূপ। দয়ার ভালবাসার বিস্তার, স্বামী শ্বশুর শিশু ও ধাত্রী পর্যন্ত। সবাই সুন্দর। তারপরে সহসা সব বদলে গেল, বাংলাদেশের অপরূপ আরতির মহিমায় ধরা রইল না স্রষ্টার মন। শেষপর্যন্ত যে নিরপেক্ষ গাম্ভীর্য ছিল প্রভাতকুমারের মধ্যে, তাকেও সম্মান করা হোল না। শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়, আপনাকে বলে রাখি, যদি দ্বিতীয়বার 'দেবী' দেখতে যাই, সে যাব মাটির-দুর্গার প্রাণপ্রতিষ্ঠা থেকে বিজয়া পর্যন্ত অসাধারণ চিত্রাংশটুকু দেখবার জন্য। যাব না মৃত সমস্যার উপর উদ্দীপ্ত অস্ত্রাঘাত দেখতে। দেড়শো বছর আগেকার সামাজিক সমস্যা এখনকার সমস্যা নয়। আর যাদের মধ্যে দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সমস্যা থাকতে পারে, সেই মূর্খরা সত্যজিতের ছবি দেখে না। কেবল মানুষের ব্যক্তিজীবনের সমস্যা সর্বকালের। সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যাকে অবলম্বন করে সেই ব্যক্তির বেদনায় পৌঁছেছেন বলে প্রভাতকুমারের 'দেবী' গল্পের আবেদন চিরন্তন। সত্যজিতের দেবী সেখানে সমস্যার গ্লানিতে আবর্তিত।

সত্যজিৎ রায়, যাঁর উপর আমাদের প্রভূত আশা এবং আন্তরিক দাবি, তিনি যদি জীবনের মহৎ উন্মোচক হওয়ার পরিবর্তে জাতীয় সংস্কারের উপর তুচ্ছ আক্রমণের বাহবার প্রত্যাশী হন, তাহলে অবশ্যই তিনি বাহবা পাবেন সেন্টিমেন্ট-বিরোধী প্রগতিবিলাসীর কাছে, এবং হয়ত, প্রাচ্য কুসংস্কারে শিহরিত-চিত্ত বিদেশবাসীর নিকটে। তখন হয়ত দেবী-কন্যাগণের অলৌকিক পুণ্যচরিতকথায় গদ্গদ-চিত্ত পাশ্চাত্য বিচারকগণ ভারতীয় ধর্মগোঁড়ামির অতি-বাস্তব চিত্র দেখে একটা বৃহৎ রকমের পুরস্কার সত্যজিৎকে দিয়ে ফেলবেন। শুনছি, সত্যজিৎ বিদেশী ফিল্ম-কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছেন। যদি হন, সেক্ষেত্রে সত্যজিতের ছোট পর্দা অনেক ছড়িয়ে সিনেমাস্কোপের ঘরজোড়া পর্দা হয়ে উঠবে। সেখানে অপূর্ব আলোক-সম্পাত হবে আমাদের কোনো অমার্জনীয় দুর্বলতার উপরে।

মহান বাঙালী শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের জীবনের সেই পরিণতি বিলম্বিত হোক, দেবীর কাছে এই প্রার্থনা করি।

সিভকের পথে

বিকাশকান্তি রায়চৌধুরী

ছাউনি-খোলা ছোট্ট জীপ্। ছুটে চলেছে গারো-পাহাড়ের গা ঘেঁষে সোজা সড়ক বেয়ে। নধর তেল-চুকচুকে ভুঁড়ির উপর থেকে পাতলুনের বন্ধনী খসিয়ে তবেই যেন কথা বলবার সুযোগ পেলেন রায় সাহেব।

—খাট-সমস্ত এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে, চাটুজ্যে, কিন্তু পেটে যে সয়না এটা বরাবরই দেখছি। ভুরিভোজনের আওয়াজগুলো শুধু ঘুরপাক খেলেই কথা ছিলনা। কিন্তু তোমার গাড়ীর গতির সাথে পাল্লা দিয়ে ওরাও ঊর্দ্ধমুখে ছুটতে চাইছে, বুঝলে চাটুজ্যে?

চাটুজ্যে কী বুঝলে তা বোধকরি অন্তর্যামীও ঠিক বোঝেননি। গাড়ীর গতিবেগ খাটো করবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলনা। চড়াইয়ের বন্ধুরতা পেরিয়ে উতরাই পথের মাঝ-বরাবর এসেছি—গাড়ীটা সশব্দে একটা আর্তনাদ করেও হিঁচড়ে চললো খানিকটা। বিদ্যুৎবেগে ব্যাক-গিয়ারে পিছু হটে ধাক্কা খেলে একটা ময়নাগাছে। রায় সাহেব গাড়ী থেকে গড়িয়ে পড়েন আর কি।

—আক্কেলটা তো তোমার বেশ দেখছি, চাটুজ্যে! মরি তো চলায় মরি। ব্রেক করে বধ করবে নাকি?

অমিতবিক্রমে হুড্টাকে খাড়া করে নিয়ে তবেই মুখ খুললেন চাটুজ্যে সাহেব,—ভোজ্য পেয় সমুখে রেখে ভোজ্য-বস্তুর বেলাতে যদিও-বা একেবারে নির্ভেজাল বৈষ্ণব সেজে থাকা যায়—পেয়টার বেলায়?

—কখ্খনো না, কখ্খনো না, চাটুজ্যে। রাঙা পানি তো পানি নয়, ও যে অমৃত। বলি, ব্যাপারখানা কি হে? ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে।

—তা কিছুটা ভয় আছে বৈকি। তবে সেটা আমার বা রায় সাহেবের জন্যে নয়।— মুচকি হেসে বললেন চাটুজ্যে সাহেব।

করোনেশন ব্রিজ

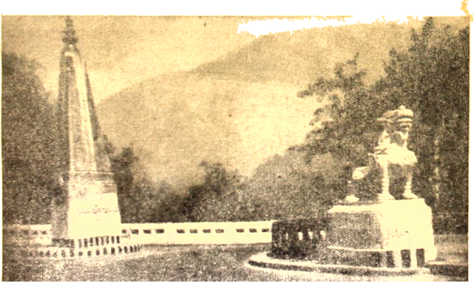

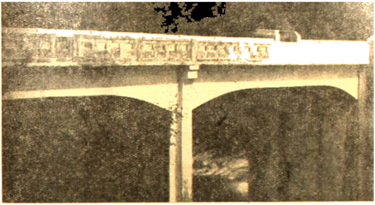

করোনেশন ব্রিজ

বাঘ্ সাহেব কিছুটা রুষ্ট হয়ে বললেন গা ঝাড়া দিয়ে। —এই ভর-সন্ধ্যেতেই আমার বপুখানি নিয়ে টানাটানি সুরু করে দিলে?

—আমি কি আর করছি— নিস্পৃহের ঔদাসীন্য চাটুজ্যে সাহেবের কণ্ঠে: আমার গায়ের মোটা হাড়ে ওদের দাঁতই ভাঙতে পারে। আর রায় সাহেবের তনুতে শ্রী [illegible], মাংসের ওজন তার অনেক কম। দুটো-দুটো পেটের খোরাক তো আর হবেনা।

—দেখলে রায় সাহেব, দেখলে কাণ্ডটা! ভাবছে বাঘ্ [illegible] পেয়ে এখন বন্দুক কাঁধে করে ওকে পাহারা দেবে।— বাঘ্ সাহেবের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠতে থাকে,—দেখেছে তো দেখেছে, হয় দুটো শেয়াল, নয় দুটো শম্বর, বড়জোর দুটো বনবেড়ালই না-হয় হবে। তার জন্যে রাতের ঘুমটাই আমি মাটি করবো!

বাঘ্ সাহেব স্বচ্ছন্দে চোখ দুটো বুজিয়ে দেহটাকে এলিয়ে দিলেন পেছনের গদি-আঁটা রেস্টাতে।

চাটুজ্যে সাহেব অনেকটা নিরুপায়ের মতো পাশের থেকে দোনলা বন্দুকটা তুলে দিলেন আমার হাতে। —[illegible] মেরে দুটো লাফিয়ে পড়লেই বা একটু মুশকিল। বাঁয়ের দিকটাতে একটু নজর রেখো, সাহেব। তা ব'লে [illegible] একচক্ষু হরিণের মতো নয় কিন্তু।

—বাঘ বুঝি?

—হ্যাঁ, চিতে-টিতে [illegible] হবে। তোমার সুঁদরবনের বাঘ এ অঞ্চলে বড় একটা দেখা একবার ঐ পুনাখা পাহাড়ের জঙ্গলটাতে এ যাত্রীটা মারা পড়েছিল পাহাড়ীদের হাতে। দেখেছি।

—রয়াল বেঙ্গল—রাজা বাঘ!— অর্ধনিমিলী সাড়া দিলেন 'বাঘ্ সাহেব। —আমার দি হাতের মুঠোয় গুঁজে দাও, রায় সাহেব। ঘুমে হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেলে, হাতের ওটাকে বেঁধে রেখো। নইলে মরে গেলে ভ যখন সবাই বাঘটাকে নিয়ে করবে নিগ্রহ মেরেছে ব'লে। তা ছাড়া, পরলোকে যেয়ে হলে একটা হাত্তি এক্সপ্ল্যানেশন আমারও যমরাজার সেই খুঁদে কেরানীটা—সেই-যে চি নাকি নামটা—সে আবার ঘুষ না পেলে উ শুনেছি। সব বড়সাহেবদের ঐ এক ব্যাপার। ব' হলো যে, অস্ত্র থাকতেও যখন তার ব্যবহার করে সুইসাইডের চার্জটাই বা ক্লেম করা যাবেনা কেন?

—এ জন্যে যা হোক, ওখানে [illegible] একখানা তোমার জন্যে তৈরি হয়ে আছেই।— বললে [illegible] বেশ একটু জোর দিয়েই। —আর দেরি নয়, বে [illegible] কি বলো রায়সাহেব? এখানে থাকলেই হয়ে গেলুম তারই বা গ্যারান্টি কোথায়?

আশ্চর্য, এইটুকুর মধ্যেই বাঘ্ সাহেবের নাঁ

মূক হয়ে গেছে। নইলে জবাব দিতে কি আর পেছপা হতেন তিনি?

বাঁকের মোড় ঘুরতেই হেড-লাইটের জোরালো আলোয় বেকুব বনে গেল শেয়াল দুটো। বিরাট আকারের সম্বর কি ঐ জাতের যে শিকারটা রাস্তা জুড়ে পড়ে আছে, শেয়াল দুটো তারই গা থেকে মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছিল পরম পরিতৃপ্তিতে।

—ওঃ, শেয়াল!— আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

কাঁচা ঘুম ভেঙে রায় সাহেব অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন,—তাই বলো—শৃগাল! চাটুজ্যে শেয়ালকে বলে বাঘ। বর্ণজ্ঞান নেই, কৌলীন্যের একটা বিচারও কি নেই?

পরিহাসপ্রিয় রায় সাহেবের এটা যে নিছক পরিহাস নয়, সেটা তাঁর রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরা থেকেই স্পষ্ট হলো। অতবড় শিংওয়ালা জানোয়ারটাকে যে শেয়াল দুটো শিকার করেনি, সত্যি যারা শিকার করেছে তারা গা-ঢাকা দিলেও যে খুব খুশীমনে আমাদের আশীর্বাদ করছে না, এ কথা বুঝতে কারও দেরি হয়না; অন্ততঃ সারারাত্রি যারা জঙ্গলে কাটাতে হবে জেনেই পথে নেমেছে তাদের না বোঝার কথা নয়। জীপের সমুখের চাকা দুটো সবেমাত্র শিকারের ঘাড়ে চেপেছে, বিদ্যুৎবেগে রিভলভার উঁচিয়ে চীৎকার করে ওঠেন চাটুজ্যে। লক্ষ্য নির্ভুলের অব্যর্থ সন্ধান ছিল মাথার উপরকার জঙ্গলে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বলে কয়েকজোড়া চোখ।

—গুলী চালাও, রায়—গুলী চালাও!

পলকপাতে গর্জন করে উঠলো আমাদের হাতের অস্ত্র আর তারই সাথে পাহাড়ের জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো মরণাহতের কাতর আর্তনাদ। নলের ডগায় ধূম উদ্গিরণ করে অস্ত্রগুলো যেন সদম্ভে ঘোষণা করলো যে শিকারের জীবনদীপ নিভে গেছে, শুধু আছে দীপ নেভার পরের ধূমচিহ্ন। অন্ধকার রাত্রির বনভূমি মুখর হয়ে উঠলো বিচিত্র কোলাহলে, দূরাগত হিংস্রগর্জন তখন তরঙ্গ তুলেছে বাতাসে।

গাড়ী ছুটে চললো তার গন্তব্যপথে।

রাত-দুপুরে মাল জংশনের দোকানদারদের দোর ঠেলিয়ে যে সের-তিনেক মিষ্টির যোগাড় হলো, তাকে আত্মসাৎ করতে একা রায় সাহেবই যথেষ্ট। পঞ্চপাণ্ডবের জননীর নিতান্ত তাগিদে মধ্যম-পাণ্ডব যতখানি ত্যাগ করতেন অনিচ্ছাসত্বে, তার কিছুটা অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে রায় সাহেবকে করতেই হলো শেষপর্যন্ত।

সিভকের পথে পা বাড়াতেই কলরব করে উঠলেন দোকানদারেরা,—সিভকের পথে পা বাড়িয়োনা, সাহেব। ওসব বন্দুকে টন্দুকে কিছু হবেনা! শিং দিয়ে একেবারে পাতালে সেঁধিয়ে দেবে। আর তা ছাড়া বুনো হাতীর দল বেরিয়েছে। পোষা হাতীদের শিকল ছিঁড়ে দলে ভিড়িয়েছে। সিভকের কলাগাছের লোভে ঐ অঞ্চলেই তো ওরা রাতে আড্ডা গাড়ে বরাবর।

রায় সাহেব চোখ বুজেই জবাব দেন,—দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ো, চাটুজ্যে। চাকরিটাকে বজায় রাখতে হবে তো। সদরের দপ্তরে ঘুষ-ঘাষ দেবার মতো সম্বলটা হাতে থাকা চাই অন্ততঃ।— ধাবমান যন্ত্রযানের একঘেয়ে শব্দটাকে ডুবিয়ে দিয়ে বেড়ে যায় রায় সাহেবের গ[illegible]

—আচ্ছা, রায় সাহেব— চাটুজ্যে বলে,—[illegible] যে জাঁদরেল ভীমসেনটা সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেনা [illegible] নাকি শুধু পেট ভরে খেতো ব'লে।

হেসে ফেললুম।—পেট ভরে খেতে পাওয়াটা তো

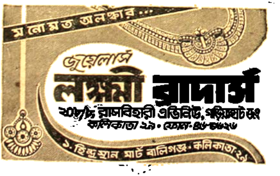
মনোমত অলঙ্কার...
জুয়েলার্স
লক্ষ্মী ব্রাদার্স
২০৮/১ডি রাসবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট মোড়
কলিকাতা ২৯ • ফোন-৪৬-৬৮২৬
১, হিন্দুস্থান মার্ট বালিগঞ্জ • কলিকাতা-২৯

পুণ্যফল, কিন্তু ভারতবর্ষে ওটা বর্তমানে পাপের কোঠায় এসে পড়েছে, কেননা, অপরের ন্যায্য ভাগকে ফাঁকি না দিয়ে পেট ভরাবার মতো ভাগ আমাদের কাছে সহজপ্রাপ্য নয়।

—কিন্তু পেটভরা না পেলে, মৃত্যুটাও তো অবধারিত। তাতে যে আবার আত্মহত্যার পাপ বর্তাবে। দু'দিকেই যখন পাপ তখন ভরা পেটেই পাপটা না-হয় লাগুক। কথায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়। আর রোগা ইঁদুরটি হয়ে স্বর্গবাসের চাইতে হাতী হয়ে নরকে থাকাও ভালো।—শেষটুকু যেন আপন-মনেই বলেন রায় সাহেব।

বেশ যাচ্ছিলুম পাহাড়ের পীচ-বাঁধানো চড়াই ঠেলে। করোনেশন ব্রিজটা পেরুতে যাব, উদ্ধত খুরের ভারী আওয়াজে চমকে দিয়ে ব্রিজের অপর প্রান্তে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো বিরাট আকারের বন্য মহিষ—বরং বলি মহিষাসুর। শিং বাঁকিয়ে বীর পদভরে ব্রিজটাকে কাঁপিয়ে তুলে হঠাৎ তেড়ে এলো—কিন্তু মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ। তারপর পেছু হ'টে আবার যথাস্থানে যেয়ে ফিরে দাঁড়ালো 'যুদ্ধং দেহি' ভঙ্গীতে।

চাটুজ্যে সাহেব আমাকে সাবধান করে দেন,—নিতান্ত গায়ের উপর এসে না-পড়লে, গুলী চালাবে না খবরদার। শিং দিয়ে গাড়ীটাকে গুঁড়িয়ে দিতে না পারুক, ছুঁড়ে ফেলে দেবে ঐখানে—হাজার দেড়েক ফিট নীচুতে।

গাড়ীর হেড-লাইট দুটো ওর মুখের উপর রেখে, গাড়ীটাকে [illegible] পাহাড়ের গা ঘেঁষে রাখতে হলো, যাতে সুমুখের [illegible] পেছু গড়িয়ে আমরা গাড়ীসুদ্ধ না পড়ে যাই পাহাড়-[illegible] ঐ খরস্রোতা তরঙ্গধারায়। মুহূর্তের জন্য বোধহয় হেড-লাইটের আলো ঐ কুৎসিত কালো জানোয়ারটার মুখের উপর থেকে সরে গেছিলো। বিদ্যুৎবেগে মহিষাসুর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো তার শত্রুদের উপর। খট্ খট্ খট্—মহিষাসুরকে থমকে দাঁড়াতে হলো। তীব্র আলোর ছটা ওর মুখে পড়েছে আবার। ক্ষিপ্ত হয়ে মহিষাসুর পা দিয়ে মাটি আঁচড়ায় আর শিং বাঁকিয়ে যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। কখনও বা দু'চার পা তেড়ে আসে, থমকে দাঁড়ায়, পিছু হটে, তারপর মুখ তুলে বুঝে নিতে চায় প্রতিপক্ষের মনোভাব। কী কুৎসিত তেল-চুকচুকে কালো ওর দেহটা। কী বিপুল! দুর্জয় ওর শক্তিভঙ্গী, দুরন্ত ওর প্রতিহিংসা-বোধ, কী শয়তানী ওর চাহনিতে! স্বর্গ-জেতা পৌরাণিক যুগের মহিষাসুরকে স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখলেও এর চাইতে বেশী বিপন্ন বোধ করতুম না নিশ্চয়ই।

—ওর দলবৃদ্ধি হলে আর নিস্তার থাকবেনা, চাটুজ্যে। এগিয়ে আমরাই ওকে আক্রমণ করিনা কেন?— যুক্তি দেন মিঃ রায়।

চাটুজ্যে নীরবে পাশের দেড়হাজার ফুট গভীর খাদটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

একপাল সম্বর কি বাইসন হঠাৎ হুড়মুড় শব্দে গোল বাধালো সুমুখের বনটাতে। শিংওয়ালা কি-একটা জীব একেবারে ছিটকে এসে পড়লো আমাদের সুমুখের পথটাতে—বড়জোর বিশ পঁচিশ হাত দূরে। পলকপাতে সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল ছোট্ট একটা লাফে—তিড়িং। হুড়মুড় করে জানোয়ারের দল ছুটে পালালো ঠিক আমাদের মাথার উপরকার জঙ্গলের বনপথে। দুড়—দুড়—দুড়—পাহাড়ের বুকের হৃৎপিণ্ডটাও যেন ভয়ে কাঁপতে থাকে। আচমকা মহিষাসুর তেড়ে আসছে তার উদ্ধত শির উঁচিয়ে! ছুটে আসছে তীরবেগে—তীরের মতোই সোজা দৃপ্ত ভঙ্গী। আমার বন্দুক আর তার ক্ষুদে সংস্করণ দুটো একসঙ্গে জবাব দিলে—দুদুম-দুড়াম দুম-দুম। থেমে গেল মহিষাসুর—কিন্তু সে শুধু একলহমা। দ্বিগুণতর গতিবেগ নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লে। দুদুম দুড়ুম—মরিয়া হয়ে গুলী চালাই আমরা। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী চলছে। মহিষাসুরের গতিবেগ খাটো হয়ে এসেছে। তবুও সে কি দমে? না, রণে ভঙ্গ দেয়? দেবী দশভূজার সব দিব্য আয়ুধকে ব্যর্থ করে আঘাত হানলো জানোয়ারটা। আপনা থেকে চোখ দুটো বুজে এলো আমার। গাড়ীর সুমুখের চাকা দুটো একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আবার যথাস্থানে চেপে বসলো। তারপর সব নিস্তব্ধ।

মহিষাসুর লুটিয়ে আছে মাটিতে। অজস্র রক্তের ধারা ঝরনার জলের বেগ নিয়ে নিচের পথে এসে লাল জমাট দানা বেঁধে উঠছে। ঘটোৎকচ যেমন একাঘ্নী বুকে নিয়ে কুরুকুল চেপে পড়েছিল—মহিষাসুর তেমনি চেপে পড়েছে আমাদের যাত্রাপথ। কী দুঃসহ প্রতিহিংসা!

বহু পরিশ্রমের পর যখন আবার শুরু হলো আমাদের অগ্রগতি, তখন বন-মোরগের ডাকে বন হচ্ছে প্রতিধ্বনিত।

খোলা হুডটার উপরে মাথা হেলিয়ে রায় সাহেব নিশ্চিন্ত আরামের আমেজে চক্ষু মুদ্রিত করেন: দুগ্‌গা, দুগ্‌গা!

মনে মনে

কৃষ্ণকলি

গায়ের উপর খবরের কাগজখানা উড়ে এসে পড়তেই ঘুমটা ভেঙে গেল বিপিনের। হকার ছেলেটা জানলা দিয়ে হাত গলিয়েই বুঝি এ-বাড়িতে কাগজ দেয়? কায়দাটা ভালো। নিচের ঘরে ঘোরা না গেলেও, আন্দাজে বুঝতে পারা যাচ্ছে বেলা হয়েছে। সানাইওলা এসে গেছে ও-বাড়ি। অবনীশের আজ বৌভাত। বিয়েবাড়িতে সানাই না বাজলে কখনও বিয়ে জমে? মণিমালার সঙ্গে বিপিন এ বিষয়ে একমত। কিন্তু একমত হলে কি হয়, সানাই আনতে কম টাকাটা খরচা হলো না। ও-টাকাটা থাকলে অন্যদিকে খরচ করা যেত। শুধু কি খরচ করায় এমনই সব? না, তাও নয়। যতদিন চাকরি ছিল দু'হাতে খরচ করেছে। কী হবে-না-হবে, ভবিষ্যতের কোনো অন্ধকার দিক কোনোখানে আছে কিনা, কখনও নজরে আসেনি। কিন্তু ভুল করেছে বিপিন। পৃথিবী জুড়ে যেখানে যত আলোর বন্যা সবই ঐ সূর্যের কাছে ধার-করা চাঁদের আলোর মতোই ক্ষণস্থায়ী, অবাস্তব। সূর্য উঠলো তো চাঁদ যেমন অন্ধকার, তেমন টাকা না থাকলো তো সংসারে যেখানে যত ভালবাসা, সব একমুহূর্তে অলীক আর মিথ্যে হয়ে চোখের সামনে ধরা পড়তে এতটুকু দেরি হয় না। পেনশনের পর হতে সে-কথাটা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে বিপিন।

আড়মোড়া ভেঙে বিপিন বিছানার উপর উঠে বসলো। সারারাত সতরঞ্চির উপর শুয়ে থাকার দরুন বাঁ-দিকের পাঁজরাগুলোয় ব্যথা ধরে গেছে। ব্যথা ধরার দোষ নেই।

একটা বিছানা নয় বালিশ নয়, সামান্য একখানা সতরঞ্চি, তাও হরিপদর বাইরের ঘরের তক্তপোশের সতরঞ্চি,—কত লোকের পায়ের ধুলো আর জঞ্জাল যে সেখানে জড়ো হয়ে আছে তারই তো ইয়ত্তা নেই। সেখানে শুয়ে রাত কাটানো যে কী নিদারুণ শাস্তি, সে এক বিপিনই টের পেয়েছে। কিন্তু উপায় কি। মনের কথা বুঝছে কে? ছেলে না, মেয়ে না, এমনকি মণিমালা অবধি আজকাল সোজা অবজ্ঞা করে চলেছে। বিপিন যেন সংসারের একটা অবাস্তব জীব। অপ্রয়োজনীয় প্রাণী। নয়তো বিয়ে-বাড়িতে ভীড় আর বাড়তি লোকজনকে শুতে দিতে হবে, বাড়িতে আর জায়গা নেই, ভারি অভাব—এইসব ধানাই-পানাই সাত-সতেরো কথা ব'লে মণিমালা তাকে সোজা হরিপদর বৈঠকখানা দেখিয়ে দেয়? যদি বিপিন রাজী না হতো আসতে? যদি বলতো, ওর ঘর ও ছাড়বে না—কী হতো? কিছুই হতো না। কিছু করার ক্ষমতা বিপিনেরও আর নেই। তাই মনের সমস্ত ভাবপ্রবণতাকে চেপে এখানে আসতেই হয়েছে। চুপে চুপে যা শেষ হয়ে যায়, তাই ভালো। মিথ্যে চেঁচিয়ে, হাট বাধিয়ে লোকের করুণা আর উপহাসের পাত্র হয়ে লাভ কি?

আর কেউ না থাক্, মণিমালাও যদি আগের মতো থাকতো? ··· নাকের কাছে একটা বিশ্রী মশা ভনভন করে ঘুরছে খালি। হরিপদর ঘরে মশার উৎপাত তো ভীষণ! এত মশা যে এ ঘরে আছে, কৈ, কাল রাতেও তো বুঝতে পারা যায়নি। বোধহয়, সারাদিনের খাটাখাটুনিতে ঘুমটা রাত্রে খুব গাঢ়ই হয়ে থাকবে। অবিশ্যি এই খাটাখাটুনির কথা শুনলে বাড়ির লোক হাসবে। বলবে, বসে থাকা ছাড়া তোমার আবার খাটুনিটা কোথায় হচ্ছে। সত্যিকার খাটাখাটুনি থাকলে কি আর মানুষ এমন চতুর্দিকে চোখ দিতে পারে, না, সামান্য একটু ছলছুতোর গণ্ডগোল পাকিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে? বটেই তো, বিপিনের এখন গণ্ডগোল আর বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কি করতে পারার ক্ষমতা আছে।

না, আর নয়। হরিপদর বাইরের ঘরের ঘড়িও বাড়ি যাবার কথা সরবে জানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু, বাস্তবিক যেতে ইচ্ছে করে না। যেখানে আহ্বান নেই, যেখানে অনুপস্থিতিতে অসম্ভব প্রয়োজনের ব্যস্ততা নেই, সেখানে যেতে কেন যেন মন চায় না। আগে এমন ছিল না বিপিন। কিন্তু আজকাল মনে হয়, বারবারই মনে হয়, ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ওর উপস্থিতির আর কোনো দাম নেই, দরকারও নেই। সংসারটা সমস্ত রকমেই ওকে যেন অবাঞ্ছিত ব'লে আঙুল দেখিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে,—তুমি যাও, তুমি সরে যাও—তুমি জায়গা ছাড়ো।

জায়গা ছেড়ে দিতে হয় না। নতুন যারা আসে, তারা নিজেদের জোরেই নিজেদের জায়গা দখল করে নেয়। এটা কথার কথা নয়, পুঁথির কথাও নয়, নেহাতই সত্য কথা।

বাজারের থলে হাতে হরিপদ বাইরের ঘরে উঁকি মারলো,—বিপিনদার ঘুম ভাঙলো?

—হ্যাঁ, ভাই। ও-বাড়িতে হৈ-হট্টগোলের জ্বালায় তো দু'চোখের পাতা এক করা দায়, সে হিসেবে তোমার ঘরে কাল রাতটা ভালোই কাটলো। তা, দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি এবার বাড়ি যাব, বেলা হয়েছে বেশ।

—এমন কিছু বেলা হয়নি— হরিপদ বাধা দিল,—এককাপ চা খেয়ে যান। আপনার বৌমা চা করছে বোধকরি।

—না হরিপদ, না, বাড়ি যেয়েই চা খাব। আমার আবার অনেক হাঙ্গামের চা খাওয়া, জানই তো।

হরিপদকে আর কথা বলতে না দিয়ে প্রায় ব্যস্ত হয়ে পথে নেমে পড়লো বিপিন। হরিপদর অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে বোঝা যায়নি বেলা কতখানি।

হরিপদর বাড়ি ছাড়িয়েছে কি না, ওদিক থেকে মিন্টু ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়াল,—দাদু, বড়ঘরের আলমারির চাবিটা কোথায় জানেন?

—চাবির কথা আমি কি করে জানবো, ভাই। ও তো তোমার দিদার সম্পত্তি। তা ছাড়া—

বিপিনের মুখের বাকী কথাগুলো শোনার আগেই ছেলেটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল। ছি ছি, সকালবেলাতেই ভারি বিশ্রী মিথ্যেকথাটা বেরিয়ে গেল। ঠিক ইচ্ছে করেও বলেনি বিপিন। মনের অজ্ঞাতসারেই বেরিয়েছে। চাবিটা যে কোথায়, সে-কথা অন্য কেউ না জানলেও বিপিনের নিশ্চয়ই জানার কথা। কিন্তু? একটা ভারি উল্লাস সারা শরীরটায় ছেয়ে যাচ্ছে কেমন। অন্যায় আর অযৌক্তিক কোনো কাজের পরিণতির বুঝি এমনই একটা গোপন উজ্জ্বলতা আছে। যাকে ত্যাগ করা যায় না।

বিয়ের হাঙ্গামে আর লোকজনের ভীড়ে বাড়িতে শোবার জায়গার ঘাটতি হচ্ছে। তবু সবসময়ের জন্যে ছাদে হোক, যেখানে হোক, শুয়ে রাতটা ক'দিনই কোনোমতে কেটেছে। কিন্তু কাল অবনীশ বৌ নিয়ে

ফেরার পর সবচাইতে অসুবিধে ঘটলো। উত্তরপাড়ায় থাকে বড়মেয়ে উমা। বলতে নেই, ওরই তো তিন ছেলে চার মেয়ে। মেজমেয়ে দুর্গার তিন ছেলেমেয়ে। ছোটমেয়ে আবার নতুন বিয়ে হয়েছে, এখনও ষষ্ঠীর বাহনরা আসেননি! তা, না আসাই বা দেরি কত আর?

আপনমনেই হাসলো বিপিন, চাবির কথায় এত আজে-বাজে কথা মনে আসছে কেন? উমা-দুর্গার ছেলেমেয়েরা তো বিপিনের বিছানায় ভাগ বসায়নি কোনোদিনও! ওরা এলে, বড়ঘরের মেঝেতে মস্ত একটা বিছানা পেতে ওদের দিদিমাকে নিয়ে ওরা শোয়। খাটের বিছানার ধারে-কাছেও ওরা ঘেঁষে না। এটা বরং খারাপই লাগে বিপিনের। সবাই আসুক, কাছে বসুক, তা নয়; শুধু দূরেই চলে যাচ্ছে। বিপিনকে ছেড়ে দিচ্ছে। মণিমালাও তেমনই; এখানে এসো না, ওখানে বোসো না—এইভাবে পদে পদে নিষেধ জারি করে করে, বিপিনকে ক্রমাগতই কেমন জঞ্জালের একপাশে রাখতে চায়। সব-কিছু হতে অবলুপ্তি ঘটাতে চায়। কিন্তু কেন? কেন এমন করে ওরা! একদিন এই বিপিনবিহারী হত ছাড়া, দিন চলতো না, সংসার চলতো না, মণিমালার জীবন চলতো না, সে কথা আজ তিন ছেলে রোজগারী হয়েছে ব'লে একবারও মনে আনতে দোষ হয় কি? নয়তো কাল রাতে অবনীশের 'কালরাত্রি' গেছে ব'লে,—আর কেউ নয়—অতবড় বাড়িতে নিজের ঘরে বিপিনেরই জায়গা হলো না। মণিমালার হুকুম,—হরিপদর বৈঠকখানায় আশ্রয় নিতে হবে। সত্যি তো, ছাঁটাই আর বড় বাজের আবর্জনার স্তূপে সে ছাড়া আর কে যাবে? মণিমালা আজকাল ইচ্ছে [illegible]রে বিপিনকে আঘাত দিতে চায়, জানে, বোঝে, তবু ঠুকে ঠুকে আঘাত করে। ছেলেমেয়ে, জামায়ের দোষ কি! উপরতলার যেমন দেখবে, তেমনই তো শিখবে। মণিমালার স্পষ্ট অবহেলা ওদের দুর্বিনীত হওয়ার সাহস জুগিয়েছে। ছোটরা, একদিন যারা মাথা তুলে কথা বলতে সাহস দেখায়নি, আজ তারা ঘাড় উঁচু করে সোজা তাকাতেই কথা বলে। কিন্তু এমন দিন কি কয়েক বছর আগেও ছিল?

না, ছিল না। পরিষ্কার স্পষ্ট মনে আছে। মণিমালাকে যেদিন বিপিন এ-বাড়িতে নিয়ে এল,—সেকি আজকের কথা! প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল। বিপিনের বয়স তখন পঁচিশ, মণিমালা তেরো। দীর্ঘ বারোবছরের ছোট-বড় ওরা। বয়সের ছোট-বড় যতই হোক, প্রেমে ভালবাসায় কোথাও এতটুকু শিথিলতা পড়েনি। গরীবের ঘরের অপূর্ব সুন্দরী দেখে বাবা পুত্রবধূ ক'রে মণিমালাকে এনেছিলেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু পায়নি বিপিন। বাবা বলেছিলেন, দুঃখ কোরো না, তোমার অদৃষ্টের সঙ্গে লক্ষ্মী জুড়ে দিলাম, ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, ধনে পুত্রে তোমার ঘর ভরে উঠবে দু'দিনেই।

বাবার কথা মিথ্যে হয়নি। মণিমালা এ ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী যেন উথলে উঠেছিল। একতলা বাড়ি ছিল, তিনতলা হয়েছে। বিপিনের সাহেববাড়ির চাকরি ধাপে ধাপে বাড়তে বাড়তে শেষ সীমায় অবধি উঠে তবে পেনসন হয়েছে। দু'হাত দিয়ে রোজগারও করেছে যেমন তেমন খরচও করেছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া থেকে ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত, মেয়েদের উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে দেওয়া—সব-কিছু নিজের হাতে নিজের রোজগারে করেছে বিপিন, কেউ সাহায্য করেনি। কেউ পিছন হতে আলো উস্কে দেয়নি।

না, আলো উস্কে দেওয়ার কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না। পিছন হতে জোর না পেলে, উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাবার কেউ না থাকলে বোধহয় একলা-হাতে এত কাজ করতে পারতো না বিপিন। পেয়েছে সে একমাত্র আলো উস্কে দেবার লোকেরই জন্য। সে আর কেউ নয়। সে মণিমালা। আর তার প্রেম।

কিন্তু মণিমালা আর তেমন নেই। ও যেন দিন দিন শুধু সরে যেতেই চায়। যাচ্ছেও। এটা যে আজকাল বিপিনের শুধু মানসিক চিন্তাধারারই ফল, তাও নয়। প্রত্যক্ষ সত্য। ঘরসংসার, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী, বউ-জামাই সবারের মাঝে বিপিন দিন দিন মণিমালার কাছে অবাঞ্ছনীয় জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়। বয়স কি একলা বিপিনেরই বাড়ছে? মণিমালার বাড়ছে না? সংসারের ছোট-বড় সকলের জন্য সব-কিছু উজাড় করে দাও, আপত্তি নেই, শুধু বিপিনের জন্যই যেন কিছু রাখাটা দোষের, প্রয়োজনের অ-ব্যবহারের। অথচ একদিন এমন ছিল, যেদিন বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়েছে কি না, কেঁদেকেটে অভিমান ক'রে অনর্থ বাধিয়ে ছাড়তো মণিমালা। সেই দিন কি আর একবার ফিরে আসে? বোধহয় আসে না। আসতে নেই ব'লেই আসে না। যখনকার যা, না করলে, সেটা অশোভনতার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু কী অশোভন হবে সেইটাই কি সব, আর কিছু নয়? আগের মতো সব-কিছু ফেলে রেখে মণিমালা কাছে আসুক,

খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করুক, ছুটো অভিমান জানাক, বিপিনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করুক,—এ যে ওর সারা অন্তরের কামনা।

কিন্তু যে বোঝবার সে বোঝে কৈ! কাল রাতে বিপিন সবে শুতে আসছে, ঘরের মধ্যে মণিমালা আলমারি খুলে কি-সব বার করছিল, ওকে দেখে তেড়ে এল,—এখানে নয়, এখানে নয়। অবনীশের ঘরে আজ নতুন-বৌমা শুয়েছে। ও আজ এখানেই শোবে। এদিকে বাড়িঘরে তো এতটুকু জায়গা নেই, তা ছাড়া পাঁচজনের মাঝখানে তুমি শুতেও পারনা ব'লে, তোমার বিছানা চাকরকে দিয়ে হরিপদ ঠাকুরপোর বৈঠকখানায় করিয়ে রেখেছি। আজকের মতো সেইখানেই রাতটা কাটাও বাপু!

কথাটা শুনে পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে উঠেছিল বিপিনের। মনে হয়েছিল একটা খুব কঠিন কথা কিছু বলে মণিমালাকে। যে কথা শুনে মণিমালা আঘাত পায়, কাঁদে। ঝরঝরিয়ে কাঁদে বিপিনের সামনে দাঁড়িয়ে। বাড়িটা কার? বিপিনের, না মণিমালার? তাই এ-বাড়িতে সবাইকার জায়গা আছে, শুধু বিপিনেরই নেই। এই রাত-দুপুরে তিনখানা বাড়ি ডিঙিয়ে হরিপদর বৈঠকখানায় তাই ওর শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্য জায়গায় অন্য বিছানায় শুলে যে বিপিনের ঘুম আসে না, সে কি মণিমালা জানে না? অবিশ্যি তখনই কিছু বলতে যাওয়াটা ছেলেমানুষি ছাড়া কিছু নয়। কারণ যুক্তি আর তর্কের জাল ফেললে, বিপিন হারবে ছাড়া জিতবে না। কিন্তু যুক্তি এবং তর্কের বাইরেও একটা জিনিস আছে, সে হচ্ছে হৃদয়বৃত্তি। তাকে অস্বীকার করলে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বাড়িতে ঢুকতে সোরগোল আর চেঁচামেচিটা তীব্র হয়ে কানে বাজলো। কাজের বাড়ি আজ মানিয়েছে বেশ। বিয়েবাড়িতে সানাই না হলে বিয়ে ব'লে মনেই হয় না। অবিশ্যি সবই পয়সার খেলা। বিপিনের যখন বিয়ে হয়েছিল, সানাই তো ভালো, প্রায় কিছু করার মতোই সঙ্গতি ছিলনা বাবার। লোকজনও ভালো করে খাওয়াতে পারেননি। না পারুন, তার জন্য আক্ষেপ করেনি কেউ, কারণ আন্তরিকতার ঘাটতি ছিলনা বাবার দৈন্যের মধ্যে কোথাও। তখনকার দিন একরকম গেছে, আজকাল সব-কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও পাল্টাচ্ছে। অন্তঃসার-শূন্য হচ্ছে। স্বার্থ ছাড়া মানুষ এক পা চলেনা। বাপ-মায়ের কাছে নিজের ছেলেমেয়েরাও [illegible]।

সময়ের মধ্যে বড়ছেলে অখিলেশের সঙ্গে মুখোমুখি,—হ্যাঁ বাবা, ন'মাসীর বাড়ি তো আপনিই গিয়েছিলেন নেমন্তন্ন করতে। এদিকে কী গলদ হয়েছে জানি না, ন'মাসীর এখনও দেখা নেই। মা আমার ওপর রেগে আগুন হয়ে উঠেছেন।

—ন'মাসী আসছেনা ব'লে তোমার উপর আগুন হবার কী আছে ওঁর। সময় হলেই সে আসবে ঠিক।

থমথমে গলায় অখিলেশ বললো,—মা তো বলছেন, যে আপনি নেমন্তন্ন করতে যেয়ে নিশ্চয়ই কিছু তালগোল পাকিয়ে এসেছেন। ত্রুটি না পেলে, অবনীশের বিয়েতে ন'মাসী এখনও না এসে থাকতে পারে? এদিকে আমার হয়েছে সব দিকেই ফ্যাসাদ। সময়ের সময় নেই, অথচ ন'মাসীর হাতে-পায়ে ধরতে এখনই আমার না গেলেই নয়।

কথাগুলো শেষ করেই দ্রুত চলে গেল অখিলেশ। আজকাল সব কাজেই ত্রুটি বেরুচ্ছে। যে কাজই বিপিন করুক, সেটা আর আস্থা বা বিশ্বাসসূচক হয়ে কারো কাছে ধরা দিচ্ছে না। মণিমালার ন'বোনকে নিমন্ত্রণ জানাতে ত্রুটি রাখেনি কোথাও। ঠিক যেভাবে, যেমনভাবে বলতে হয়, সেইভাবেই নিমন্ত্রণ করেছে বিপিন। যদি সে না এসে, গলদের ছুতো ধরে মুখ ফিরিয়ে থাকে, বিপিনের তাহলে করার কি আছে? মণিমালা কি চায় তার বড়লোক বোনকে নিমন্ত্রণ করতে বিপিনের দন্তে তৃণ ধরার প্রয়োজন ছিল?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বাঁকের মুখে থামতে হলো। উমা-দুর্গার ছেলেমেয়েরা সারিবন্দী হয়ে একজনের পিছনে আর-একজন দাঁড়িয়ে মুখে সিটি দিতে দিতে সিঁ[illegible] রেলগাড়ি-রেলগাড়ি খেলছে। খেলছে মানে, নামছে আর সারবন্দী হয়ে উঠছে। দাঁড়াতে হলো। ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা নেই। —ওরে, আস্তে আস্তে নামা-ওঠা কর্ বাবারা, একবার পা পিছলে পড়লে, সিঁড়ি দিয়ে কুমড়ো-গড়ান্ গড়াবি। হাত ভাঙবে, পা ভাঙবে। মুখ-চোখ থেঁতো হবে—

কথা বলতে বলতেই উপরে উঠে গেল। মেজতলার বড়ঘর অতিক্রম করে বাথরুমে ঢোকার আগেই এ-ঘর হতে ছুটে এল মণিমালা। আলুথালু চুলের রাশি, আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, মুখের চেহারা বিশীর্ণ,—হ্যাঁ গো, এ ঘরের আলমারির চাবিটা কোথায় রেখেছ?

মণিমালার কালো মেঘের মতো চুলের রাশির মাঝে

অনেক অজস্র সাদা তারের মতো ঝিকিমিকি উঁকি দিচ্ছে। কাঁটার মতো সরু সিঁথিটা এখন অনেক চওড়া। গালের চামড়া আগের মতো আর টান-টান নেই। শৈথিল্য ও কুঞ্চনের রেখা সেখানে লম্বালম্বি হয়ে পড়েছে। আগেকার পাটি-সাজানো দাঁতগুলো এখন অনেক ফাঁক-ফাঁক, এবড়ো-খেবড়ো। বিপিনের একলারই নয়, বয়স মণিমালারও হয়েছে। সব-কিছু ফেলে তার ছেড়ে যাবার দিন ক্রমশই এগিয়ে আসছে। যে-কোনোদিনই শেষের ঘণ্টা বাজতে পারে। যে-কোনো মুহূর্তে।

—কি গো, হাঁ করে দেখছো কি তাকিয়ে। চাবির কথা জান কিছু?

মণিমালার তাড়ায় সম্বিৎ ফিরলো বিপিনের। স্ত্রীর জমদগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে রসিকতা করলো,—যদি বলি, জানি!

—জান তো, বলো। আমি যে এদিকে হাঁপিয়ে মরছি। সারা বাড়ি তোলপাড় করেও চাবির সন্ধান পাইনি। কাজের বাড়ি। কোথায় কি হারায় কিনা—

—আচ্ছা আচ্ছা, ব্যস্ত হ'য়ো না। বড় আলমারির পেছনের হুকটা একবার ছাখো তো। মনে হচ্ছে, কাল যেন ঐখানে না কোথায় রেখেছিলাম।

সব কথাগুলো শোনার আগেই মণিমালা ঘরের মধ্যে যেন উড়ে চলে গেল। মণিমালা বয়সের তুলনায় এখনও কর্মঠ। সিঁড়ি ভাঙতে, হৈ-চৈ করতে, ছুটোছুটি করতে বিপিন যতখানি ক্লান্তি আর অবসন্নতা বোধ করে, তার সিকির সিকিও যদি মণিমালার মধ্যে থাকতো? থাকলে কী হতো? হয়তো কিছুই হতো না, তবু মনে হতো মণিমালা বিপিনের কাছেই আছে, যেমন একদিন সেই তেরোবছর-বয়সে হতে ছিল,—ঠিক তেমন। এমন করে বয়সের ফাঁক দুজনের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে দুজনকে দু'মেরুর দিকে ঠেলে দিত না।

জলে কাদায় সারা বাড়িটা কেমন নোংরা। ত্রিপল-ঢাকা ছায়া-ছায়া পরিবেশে এখানে বেলা কত বোঝা ভার! ছাদ থেকে উড়িয়া-ঠাকুরের চেঁচানি ভেসে আসছে। বাথরুমে ঢুকতে নজরে পড়লো পাশের ঘরে উমা, দুর্গা, বড়-বৌমা, নতুন খুড়ী, রাঙাপিসী চা খাচ্ছে, সেইসঙ্গে ন'মাসী না-আসার কারণও ব্যাখ্যা করছে। বিপিনকে দেখে উমা উঠে এল,—ও বাবা, ন'মাসী এখনও এলনা যে বড়?

—তা, আমি কি করবো?

—তুমি শুধু অপকর্ম করবে!—কখন যেন পিছন পিছন এ-ঘরে চলে এসেছে মণিমালা। ফিরে চেয়ে দেখতে হলো। গভীর বিরক্তিতে দুই ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছে। মণিমালা তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে আবারও বলছে,—যত রাজ্যের বাজে কাজ ছাড়া কাজের মতো আসল কাজ করেছ কখনও? বেলার বাড়ি তুমিই তো গিয়েছিলে। কেমন করে তাকে আসতে বলেছ শুনি, যে অবনীর বিয়ের দিনও এল না? আজ বৌভাত,—এতখানি বেলা অবধি তার আসার নাম নেই।

—বিকেলে আসবে হয়তো।

—আহা, কথার কী ছিরি শোনো! অবনীর বিয়েতে বেলা আসবে রাত তেরোটার এক পাত নেমন্তন্ন খেতে। কেন, তার ঘরে কি ভাতের অভাব হয়েছে? তোমার বলা হয়নি? বেলাকে বিয়ের দিন থেকে আসতে বলতে?

—বলেছিলুম তো!

—বাবার বলা তো!—মণিমালার কিছু বলার আগেই দুর্গা ঘর থেকে টিপ্পনি কাটল,—সেবার বড়দার বিয়েতে এই নেমন্তন্ন নিয়ে কী কেলেঙ্কারী কাণ্ডই না ঘটলো! শেষ অবধি জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে প্রায় মন-কষাকষি হবার উপক্রম হয়েছিল,—মনে নেই?

পাশ থেকে জয়া ব'লে উঠলো,—এত কথায় দরকার কি বাপু, নেমন্তন্নটা বড়দাকে দিয়ে পাঠালেই তো হতো। হাজার হোক, বাবার বয়স হচ্ছে তো।

জয়ার কথায় কোথাও সমবেদনা বা সহানুভূতির সুর নেই। তীক্ষ্ণ কাটা-কাটা কথায় তাদের অবজ্ঞা প্রকাশ পেল। বিপিনের বয়স হচ্ছে। সম্ভবত বয়সের জন্যই ভীমরতিতে ধরেছে। তাই সবই ভুল হচ্ছে। ভুল, শুধুই ভুল, আর কিছু নয়। ত্রুটিটা শুধু আর নিমন্ত্রণেই নয়, ত্রুটি ঘটছে সর্বত্র।

ঘরের মধ্যে একরাশ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অবনীদের নতুন বৌ-ও রয়েছে। মেয়েটি দেখেছে শ্বশুরকে। এ-বাড়িতে শ্বশুরের পদমর্যাদা দেখে মনে-মনে হয়তো হাসছে, কিম্বা করুণা। হঠাৎ ঘাড়ের শিরটা কেমন যেন শক্ত আর কঠিন হয়ে উঠলো বিপিনের। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে কল খুলে মাথা পেতে দাঁড়াল।

মাথায় পড়া জলটা ঘাড় আর কানের পাশ দিয়ে গরম হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গায়ের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। বিপিনের বয়স হয়েছে, জয়া আজ নতুন করে জানিয়ে দিল।

হঠাৎ কেমন একটা নিরুদ্ধ অভিমানে গলার কাছটা দলা পাকিয়ে উঠলো বিপিনের। দুঃখ ব্যথা আর অভিমানের অভিব্যক্তিটুকু ভাসিয়ে উপর থেকে দেখতে পাওয়া যায় না।

দেখতে পেলে নিশ্চয়ই বয়সের অজুহাত দেখিয়ে উপহাস আর বিদ্রূপ দেখাতে কুণ্ঠিত হতো না কেউ। সব-কিছুই অল্পবয়সের জন্ত সঞ্চিত থাক্। যতদিন নিজের বয়স অল্প ছিল, তখন সেই সঞ্চিত ধন বিপিনও ভোগ করেছে। কিন্তু আর নয়। এবার শুধুই ভুলভ্রান্তি, আর পাততাড়ি গুটোবার পালা!

হুড়মুড় করে সিঁড়ি গড়িয়ে কিছু নিচে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কচিগলায় কে যেন ককিয়ে কেঁদে উঠতেই তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বিপিন। সিঁড়ির নিচে ভীড় করেছে। রেলগাড়ি-রেলগাড়ি খেলতে খেলতে ধাক্কা লেগে ঊষার ছোটছেলেটা পড়ে গিয়েছে। কতটা লাগলো ছেলেটার? হয়তো বেশীই লেগেছে। বরফ দেওয়া উচিত।

ক্ষমতার চাইতেও দ্রুতপায়ে নেমে এল বিপিন সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ি ভাঙতে আজকাল বুকের মধ্যে কেমন ধড়ফড় করে। নিঃশ্বাসের একটা কষ্ট হয়। ঊষার কোল থেকে ব্যথাতুর ছেলেটাকে নিজের কোলে টেনে নিতে গেল বিপিন। ছেলেটা আসলো না, মায়ের কাপড়ের ভাঁজে মুখ লুকালো। ঊষা বাধা দিল,—থাক্‌গে, আপনি যান—

সরে এল বিপিন। নামতে যতটা কষ্ট হয়েছিল, উঠতে যেন তার চাইতেও বেশী। শরীরটা দুর্বল হয়েছে। বিয়ের হাঙ্গামে খাটাখাটুনির জন্ত সে-দুর্বলতা আরও বেড়েছে। হাজার হোক, বয়স তো হচ্ছে। যা অনিবার্য, তা আসবেই। তাকে অস্বীকার করাও একটা দুর্বলতা ছাড়া আর-কিছু নয়।

ঘরে এসে বসতেই অখিলেশের বৌ চা নিয়ে এল,—বাবার আজ দেরি হলো খুব।

—তা হলো। কিন্তু চায়ে কি আবার আজ স্যাকারিন দাওনি বৌমা?

চায়ের কাপ মুখে তুলেই নামিয়ে নিল বিপিন। তিক্ত কটু চা। পঞ্চাশবছরের পরই ডায়াবেটিসে ধরেছে। ভাত, মিষ্টি, দুনিয়ার ভালো-মন্দ সমস্ত সামগ্রী খাওয়া নিষেধ বিপিনের। কাজের বাড়ি এতকিছু রকম-বেরকম আহার্য-বস্তুর মধ্যে বিপিনের রোজের বরাদ্দ সেই টোস্ট আর স্যাকারিন-মিশ্রিত চা। কিন্তু সেই বিলিতী মিষ্টিটুকুও আজ পড়েনি। শ্বশুরের কথায় বৌটি কুণ্ঠিত হলোনা যেন। একটু হেসেই বললো,—নিজের ভাঁড়ারঘরের মিট-সেফে আপনার স্যাকারিন ছিল, বাবা, তা কোথায় যে গেল, আজ পেলুমই না।

—তা বেশ! স্যাকারিনটা ছাড়া আর কিছু হারায়নি তো?

—না, মানে, কাজের বাড়ি তো, হাজার হোক, মানে পাঁচজন···

কথাগুলো বলতে বলতে বৌটি চলে গেল। হাজার হোক, পরের মেয়ে, হয়তো একটু লজ্জাও পেয়ে থাকবে। নিজের লোক হলে এটুকুও হতো না। বলতো, ইচ্ছে হয় খাও, নয়তো খেয়ো না। সামনে খাবার নিয়ে বসে মাথার দিব্যি দিয়ে ভালোটা-মন্দটা খাওয়াবার জন্ত পীড়াপীড়ি করবে, সেই মানুষ কি আর সত্যি সেইরকম আছে?

মুখের চা আর টোস্ট নামিয়ে রেখে উঠে পড়লো বিপিন। আজ যেন কী হয়েছে ওর। সমস্ত কাজ আর কর্মের মধ্যে শুধুই কেমন একটা জ্বালা-ধরা ব্যথা ঘনিয়ে উঠছে বার বার। কিন্তু কেন? এই সংসারের এই মানুষগুলির মাঝে ভালো-মন্দ আর সুখে দুঃখেই তো এতদিন কাটলো। কৈ, আজকের মতো এমন করে এত কথা তো মনে আসেনি কখনও। আজই বা তবে আসছে কেন? কাল রাতে হরিপদর বৈঠকখানায় শোবার জন্তই কি এ অভিব্যক্তির প্রকাশ? হবেও বা। অনেক-কিছু জিনিসই নিজের অজ্ঞাতসারে মনের কোণায় চাপা থাকে। একটু উস্কানি পেলেই সেটা প্রকাশিত হয়। ঠিক ছাই-চাপা আগুনের মতো। বিপিনের যেমন হয়েছে কাল থেকে। অভিমানটা বড়ো হয়ে হয়ে মনের তলায় পাথর চাপা দেওয়া ছিলই। কাল হতে তার প্রকাশ ঘটেছে মাত্র।

—বারান্দায় এমন করে ঘুরপাক খাচ্ছ কেন?—মণিমালা কখন আবার পিছনে এসে ধমক দিতে শুরু করেছে।

মণিমালার কথায় হাসি পেল বিপিনের। বলতে ইচ্ছে করলো যে, বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে কি মণিমালার চোখে কাঁটা বিঁধছে? কিন্তু না, থাক্! কটু কথা বললেই নিজের ক্ষতে প্রলেপ পড়বে না। সুতরাং নিজেকে প্রাণপণে সংযত করলো বিপিন।

বারান্দা ছেড়ে আস্তে আস্তে ছাদে উঠে এল বিপিন। ত্রিপল-ঢাকা ছাদে তিনটে উনুনে পুরোদমে রান্না হচ্ছে। উপরে সূর্যের প্রখর তাপ, ভিতরে উনুনের আগুন মিলিয়ে ছাদের হাওয়া দিয়ে যেন লু ছুটে বেড়াচ্ছে। ভীষণ গরম আর ভিতরের জ্বালা দুই মিলিয়ে বিপিনকে মুহূর্তে কেমন যেন অস্থির করে তুললো। ভিয়ানের কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো তাড়াতাড়ি।

বিরাট বিরাট কড়ায় মাছ ভাজা হচ্ছে। ছাদে অনেকে আছে; কেউ কেউ খাচ্ছে। বিপিনকে দেখে পরিচিত ঠাকুর আপ্যায়ন করলো,—আজ বড়বাবুকে সকাল থেকে দেখতেই পাচ্ছি না।

—এখন তো তবু পাচ্ছ, ঠাকুর—আর দু'দিন পরে একেবারেই পাবে না।

রাঁধুনে-ঠাকুর ক্ষুণ্ণ হলো। —কী যে বলেন বাবু! আপনারা আছেন ব'লেই তো আমরা আছি।— একটা কানাভাঙা খুরিতে দুখানা ভাজা-মাছ নিয়ে এগিয়ে ধরলো ঠাকুর,—গরম আছে; খেয়ে দেখুন বাবু?

—না, থাক্। যখন তখন কিছু খাওয়া আমার নিষেধ, বাবা। ডায়াবেটিসে ভুগছি তো। তা ছাড়া শরীরটাও আজ যেন কেমন—

সব কথাগুলো শেষ করতে পারলো না বিপিন। একটা অনাত্মীয়, কদিনের পরিচিত রাঁধুনে-বামুনের আন্তরিকতা-পূর্ণ স্নেহসিক্ত কথায় ভিতরের সঞ্চিত অবরুদ্ধ ভাবটা যেন শত বাধা ঠেলে উপরদিকে উঠে আসতে চাইছে। এমন ক'রে খাওয়ার জন্ম আন্তরিকভাবে মণিমালা যদি কিছু বলতো, কি, উমা দুর্গা জয়া। অনেকদিন কেউ বলেনি। তবে বলতো একদিন। তখন এত বেশী বলতো যে, মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরতো। মনে হতো, ওদের বলাটা যেন পীড়নেরই পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে। ব্যবহারে আতিশয্য-দোষ ঘটলে সেটা কোনোসময়ই ভালো হয় না, ভালো লাগে না। একদিনের কথা বেশ মনে আছে,—কী নিয়ে যেন মণিমালার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি, শেষে তাই নিয়ে রীতিমতো রাগারাগি। কী যে কারণটা ঘটেছিল, আজ আর ভালো করে মনে পড়ে না। হাজার হোক, সে কি আজকের কথা! অখিলেশও হয়নি তখন। ভাতের থালা ফেলে উঠে গিয়েছিল বিপিন। উনিশ-বিশ হলেই ভাতের উপর রাগ হতো ওর। সেদিন খুব কেঁদেছিল মণিমালা। ছেলেমানুষ ছিল, মনটাও নরম ছিল। কিন্তু নরমই থাক্ আর গরমই থাক্, চোখের জলে সেদিন ভোলেনি বিপিন। আজকের মতো তখন ছিলই না। ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত কঠিনভাবে মেনে চলতো। ওকেও সবাই ভয় করতো, মেনে চলতো।—

কিন্তু এত ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে? একটু আগেও তো ধোঁয়ার লেশও কোথাও ছিল না। ঐ তো দেখা যাচ্ছে ভিয়ানের উপর বড় বড় কড়া চাপিয়ে, হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, গলদঘর্ম রাঁধুনে-ঠাকুর রান্না করছে। সবই তো যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। তবে এত ধোঁয়া এল কোথা থেকে! ধোঁয়াটা শুধু তো চোখেই ঝাপসা ধরাচ্ছে না, কেমন যেন দমটাও বন্ধ করে আনছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা গভীর চাপে ভিতরটা অবসন্ন হয়ে আসছে। আচ্ছা, হঠাৎ এমনই বা হচ্ছে কেন? মণিমালাকে ডাকবে নাকি চেঁচিয়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য, গলায় স্বর বেরুচ্ছে না কেন? আরে, কোথাও কিছু নেই, এত জলই বা এসে পড়লো কোথা থেকে? জল—জল—অথৈ জল। চারিদিকে শুধু জল! উপরে নিচে আশেপাশে—সর্বত্র জল। রাশি রাশি জল। আর তারই ভিতর বিপিন তলিয়ে যাচ্ছে,—হারিয়ে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। নাকে চোখে মুখে অজস্র জল ঢুকে যেয়ে হাঁসফাঁস ঠেকছে, নিঃশ্বাস নিতে বাধছে। বুকটা ধড়ফড় করছে। হ্যাঁ ঠিক, এমনই একবার হয়েছিল বটে বিপিনের। খুব ছোটবেলায়। মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল। ভয়ে আশঙ্কায় মা চেঁচিয়ে কেঁদেছিল, লোকজন ডেকেছিল। চারধার থেকে হৈ-চৈ ক'রে সবাই ছুটে এসে ওকে জলের ভিতর থেকে টেনে তুলেছিল। ঠিক যেন তেমনই হচ্ছে। মা কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কারা যেন গভীর জলের ভিতর থেকে টেনে টেনে তুলছে। ফিস্‌ফিস্ চাপা কণ্ঠের অনেকের গলা পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন কাঁদছে। মা কি? কিন্তু তা কি করে হয়? মায়ের কণ্ঠ যে অনেককাল আগেই বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক বটে, এ মণিমালার গলার স্বর। মণিমালা এমন করে কাঁদছে কেন? বিপিন চোখটা মেলতে চাইলো। কষ্ট হচ্ছে! ধোঁয়া-ধোঁয়া, আবছা অন্ধকার। তবু চোখের পাতাটা টেনেই তুললো। শিয়রে মণিমালাই বটে। হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্রায়,—এখন কেমন লাগছে গো?

—ভালো!— নিজের গলার স্বর নিজের কানেই অদ্ভুত শোনালো বিপিনের।

—আমার কী হয়েছিল বলো তো?

—ডাক্তার তো বললো, ভিতরের একটা দুর্বলতায় মাথা ঘুরে নাকি এমন হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম। তোমায় তো কখনও এমন দেখিনি। তুমিও তো কখনও কিছু বলনি।

এক রাশ উদ্বেগ আর আশঙ্কা ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়লো। এ সেই চিরকালের চিরচেনা অতিপুরাতন মণিমালা। বিপিন কী ভুলই করেছে সারাক্ষণ এই মানুষটিকে বিচার করতে বসে।

চোখ বুজেই অনুভব করছে বিপিন—উমা দুর্গা জয়া অখিলেশ অবনীশ বৌমা সবাই এসেছে। পাকা গিন্নির মতো ধমক দিচ্ছে জয়া,—সরে এসো তোমরা, ভীড় ছাড়ো। ঘরটা ফাঁকা করে দেওয়া দরকার। বাবাকে নিরিবিলি থাকতে দাও। মা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। বাপ্‌রে বাপ্!

হাসি পাচ্ছে বিপিনের। এ সেই জয়া। যে উনিশ থেকে বিশ হলেই ধমক দিত আর চোখ রাঙাত।

একদিন বিপিন দুধ খেতে চায়নি, মেয়ের সে কী রাগ! —না খেয়ে উঠুন তো একবার, দেখি কেমন পারেন।

মেয়ে না হলে বাবার ব্যথা কি কেউ বোঝে? অনেক বোঝের জিনিস ব'লেই তো ওরা রাগ দুঃখ-অভিমান বিরক্তি সব-কিছু নিঃসঙ্কোচে জানায়। ভুল করলে চলবে কেন?

চাপা কলগুঞ্জনটা আস্তে আস্তে থেমে যেতেই বুঝতে পারছে বিপিন, সবাই ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাবার সময় জয়া আর-একবার শাসিয়ে গেল,—মা, বাবাকে খবরদার বিছানা থেকে উঠতে দেবেনা। মনে থাকে যেন।

মাথায় গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মণিমালা। এককোঁটা জল পড়লো কপালের উপর। কাঁপা-কাঁপা বিষণ্ণ গলায় মণিমালা বলছে,—শরীরটা যে তোমার এত খারাপ হয়েছিল, কৈ জানাওনি তো কখনও?

—তুমিও তো জানতে চাওনি।

—আমি জানতে চাইবো, তবে তুমি জানাবে, নয়তো নয়? সংসারের হাজারো ঝঞ্ঝাট ঝামেলা মিটিয়ে তোমার দিকে যদি তেমন না চাইতেই পারি, সেটাকে তুমি অবুঝের মতো হয়ে চুলচেরা বিচার করবে?

তাই তো! বিপিন বড় ভুল করেছে। অন্যায় করেছে। মণিমালার প্রতি অতি তুচ্ছ জিনিস নিয়ে অবিচার করেছে। আর শতসহস্র রকমে নিজের দিকটাই দেখেছে খালি। তুচ্ছ পাওয়া আর না-পাওয়া নিয়ে মিথ্যে মনের মধ্যে অভিমানের পাহাড় বানিয়ে তুলে বৃথাই সারাটা বেলা যাতনা পেয়ে এসেছে। কিন্তু মণিমালা কী পেল-না-পেল, কৈ, তা নিয়ে একবারও ভাবেনি তো। দুজনেই যে এক। একই ব্যথার সাথী। ঝড়ে জলে দুর্ভাগ্যে দুর্বিপাকে একত্র, একই নীড়ে বাসা-বাঁধা দুই পাখী। সারাটা বেলা, সারাটা দিন দুঃখে সুখে একত্রে থেকে, সন্ধ্যাবেলায় ভুল-বোঝাবুঝির জের টানা কিছুতেই উচিত হয়নি। দুজন যদি দুজনকে না ভাবে, দুজনে যদি সমস্ত দোষত্রুটি উপেক্ষা ক'রে দুজনের কথা না ভাবে, তবে ভাববে কে?

মণিমালার কথায় নীরবে হাসলো বিপিন। ভুল-ভাঙার হাসি। —খুব বুঝি ভয় পেয়েছিলে? মনে করেছিলে বুঝি মরেই গেলাম।

—ও-কথা বোলোনা। তুমি ছাড়া আমার আছে কে?

—জানো, আলমারির পিছনের হুকে চাবিটা কে রেখেছিল?

—ভালো হয়ে যাও তারপর বোলো। কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে।

—না না, এখনই শোনো। বলতে ভালো লাগছে, ইচ্ছে করছে! চাবিটা আমিই রেখেছিলাম লুকিয়ে। তোমার সঙ্গে কেমন একটু মজা করতে ইচ্ছে হলো। তুমি খুব ভাববে, ব্যস্ত হবে—আমি দেখবো—এইরকমই একটা ইচ্ছে আর কি।

—আচ্ছা, বেশ করেছ! এখন তোমার কথা থামিয়ে সুস্থ হয়ে একটু ঘুমাও তো?

* * *

বেরোতে হবে? চুল শুকিয়েছে তো?

ভিজে চুল বাঁধা আর চুলের সর্বনাশ ডেকে আনা একই ব্যাপার। ভুলেও কখনও ভিজে চুল বাঁধবেন না কারণ ভিজে চুল বাঁধলে চুলের সৌন্দর্য আর সাবলীলতা দুই-ই নষ্ট হয়ে যায়। যদি মনে করেন যে আপনার চুল শুকোবার আগেই আপনাকে বেরোতে হবে তবে ভাল করে জবাকুসুম তেল দিয়ে চুলের গোড়াগুলিতে মালিশ করুন, তারপর পরিষ্কার করে আঁচড়ে চুল বেঁধে ফেলুন। জবাকুসুম তেল চুলের একটি মস্ত বড় খাদ্য আর এ তেল মেখে জল না ঢাললে কোন ক্ষতি হয়না। এর চমৎকার সুগন্ধ আপনার মন নিশ্চয়ই স্নিগ্ধ আনন্দে ভরিয়ে দেবে। জবাকুসুমের অপূর্ব ভেষজ-গুণাবলী মাথা ও স্নায়ু স্নিগ্ধ করে।

জবাকুসুম

সি. কে. সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-১২

পূর্বস্মৃতি

শরৎকুমার মিত্র

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

১৮৯৮

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ

২২শে জানুয়ারী সূর্যের পূর্ণগ্রাস কলিকাতার নিকট দৃষ্ট হয়। তাহার পূর্বের পূর্ণগ্রাসের কথা আমার স্মরণ নাই। যাইতে বড়ই উৎসুক হইয়া উঠিলাম। কিন্তু ট্রেনে নিতান্তই স্থানাভাব। যদিও ভারতবর্ষের সকল রেল হইতে গাড়ী আনায় ই. আই. আর.। আমি জানিতাম, হাইকোর্টে উকীলদের মধ্যে অনেকেই উৎসুক। আমি অবশেষে কোয়ারলি প্লেস-এ গিয়া ট্রাফিক ম্যানেজার ফ্লিং সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। পূর্বে আলাপ ছিল না। কিন্তু মাথা ঠুকিয়া শেষ চেষ্টা করিলাম। আশ্চর্য হইয়া গেলাম, তিনি আমাকে আদর করিয়া একখানা চেয়ারে বসাইলেন। আমি তাঁহাকে সব কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—"বড় মুস্কিল, কি করা যায়?" আমি বলিলাম —"আমরা সাধারণ ষ্টুডেন্ট, আর আমরা যাইতে পারিব না?" "তুমি একখানা পুরা সেকেণ্ড ক্লাস লইতে পারিবে?" আমি বলিলাম—"হ্যাঁ।" তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, আমি লিলুয়ায় টেলিফোন করিয়া দিতেছি। তুমি গিয়া দ্যাখো, কোন গাড়ী আছে কিনা।" আমি বলিলাম—"সেখানে যদি বলে, তোমার—টেলিফোন?" তিনি বলিলেন—"আচ্ছা দেখি", বলিয়া তিনি তাঁহার এসিষ্ট্যাণ্ট সেরিড্যান সাহেবকে বলিলেন—"এই ছোকরাকে লিলুয়ায় একটা ট্রলি করিয়া পাঠাইয়া দাও। সঙ্গে আমার এক চাপরাসি দাও।" আমি গেলাম। গিয়া Superintendent of Wagons-এর সঙ্গে সব দেখিলাম। দেখি একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আছে। তাহার রং সব প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এবং একটি ঝিলিমিলি ও তাহার কাচ নাই। আমি ফিরিয়া আসিলাম ফ্লিং সাহেবের কাছে। সঙ্গে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিলেন। তিনি রিপোর্ট দিলেন। ফ্লিং সাহেব বলিলেন —"গাড়ীখানি কালকের মধ্যে মেরামত ক'রে দাও, পরশু সকালের ট্রেনে এঁরা যাবেন।" সে সাহেব বলিলেন —"কি ক'রে একদিনে হবে? আজ ত রাত্রি হয়ে গেল।" ফ্লিং সাহেব বলিলেন, "What! This is shameful. একদিনে একটা ঝিলিমিলি করা যায় না? বিশেষতঃ নিজেদের ছুতোর আছে! যে রকম করে হোক কাজচলা গোছ করে দাও।" সে সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা।" তিনি চলিয়া যাইতে, ফ্লিং সাহেব আমাকে বলিলেন—"দ্যাখো, আমি তোমার উপর বড় খুসি হয়েছি। তোমাকে ৯টার সময় যে প্যাসেঞ্জার যায়, তাতে যেতে হচ্ছে, কারণ মাঝে মেল ট্রেন দুটো (তখন মেন লাইনে ঐ দুই মেল ছিল, এবং গ্রাণ্ড কর্ড লাইন তখন হয় নাই)। আমি বক্সার-এ যাচ্ছি। তুমি বক্সার ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব তোমাদের গাড়ী ডাউন পঞ্জাব মেল-এ জুড়ে দিতে।" আমি বলিলাম— "আচ্ছা।"

আমি যখন ফ্লিং সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পার্শ্বের ঘরে আসিয়াছি, দেখিলাম, ফ্লিং সাহেবের এসিষ্ট্যাণ্ট সেরিড্যান সাহেব একখানা চিঠি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া

দিলেন। শেরিড্যান আমাকে বলিয়াছিলেন, শেষ অবধি গাড়ী পাই কিনা তাঁহাকে বলিয়া যাইতে।

শেরিড্যান সাহেবের কাছে বসিয়াই আমি দেখিলাম যে, যে পত্রখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন সাহেব, সেখানা মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। আমি পত্রখানা তুলিয়া লইয়া সাহেবকে বলিলাম, যে পত্রখানা হাইকোর্টের জজ মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বহস্ত। সাহেব বলিলেন—"How the devil am I to know! The letter is written from Narikeldanga—and that is a letter not with printed address—and it has been brought by a cooly-looking fellow." তাহার পর তিনি বলিলেন—"আচ্ছা দেখি—সকালের ট্রেনে মাত্র দুইটি বার্থ রিজার্ভ হইতে বাকী আছে। তাহার একটি দিতেছি, যদিও সেটা অন্যায় হইতেছে।"

তাহার পর আমি শেরিড্যানকে বলিলাম যে বন্দোবস্ত হইয়াছে। এবং দশখানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট বক্সার-এর তৎক্ষণাৎ কিনিলাম। পরে আটখানা টিকিট বিক্রয় করিলাম। আমরা এই কয়জন সেই গাড়ীতে গেলাম :—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (পরে হাইকোর্টের জজ), মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয়, অধ্যাপক হারাণ চন্দ্র ও ডাঃ শরৎ চন্দ্র (উকীল), প্রমথনাথ সেন (উকীল, হাইকোর্ট), চারুচন্দ্র ঘোষ (ব্যারিষ্টার, পরে হাইকোর্টের জজ), বিরাজমোহন মজুমদার (উকীল, হাইকোর্ট), জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু (উকীল, হাইকোর্ট), বসন্তকুমার মিত্র (আমার পিসেমহাশয়ের জামাতা), বসন্তকুমার মিত্র (আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা) এবং আমি।

হাওড়া ষ্টেশনেই দেখিলাম, ভূপেন্দ্রনাথ বসুও (এটর্নি এবং রাজনৈতিক নেতা) সেই ট্রেনে বক্সার যাইতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"এই যে তুইও যাচ্ছিস, ভাল হয়েছে। ভোর চারটায় বক্সার পৌঁছায়, তুই আমাকে তুলিয়া দিস। আমি ফার্ষ্ট ক্লাস-এ আছি।"

বক্সার ষ্টেশন-এ ট্রেন ভোর চারটা আন্দাজ থামিতেই আমি সকলকে নামিতে বলিয়া ভূপেনবাবুকে তুলিতে গেলাম। গিয়া দেখি, একটি লোয়ার বার্থ-এ ভূপেনবাবু ওভারকোট পরিয়া বেশ ঘুমাইতেছেন। এবং সেই বার্থ-এর কাছে একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হিন্দুস্থানী দাঁড়াইয়া আছে। আমি ভূপেনবাবুকে তুলিলাম, তিনি উঠিয়াই বলিলেন—"বক্সার এসে গেল?" এই বলিয়া স্মোকিং ক্যাপ মাথায় দিয়া একটি কেন হাতে লইয়া নামিতে উদ্যত হইলেন, তখন ঐ হিন্দুস্থানীটি বলিল—"ইয়া কেয়া তাজ্জব বাৎ। হামরা মালুম হুয়া কি সাহাব আদমি হায়। হাম্‌ যব্‌ উঠা থা, হাম দেখা কি ইয়ে সাহাব নিদ্‌ যাতা থা, আউর উন্‌কা পাঁয়ের মে পাম্‌ জোড়ী জুতা থী, হাম ওয়াস্তে বৈঠা থা। বৈঠ্‌নেকে থোড়ে বাদ্‌ সাহাব এইসি লাথ্‌ চালায়া যো হাম্‌ পাখানাকে দরওয়াজে পর চলা গিয়া। হমারা মালুম হুয়া কি ইংরাজ আদমি হোগে—লাথ্‌ কে পর তামাম রাৎ হিঁই খাড়া হায় ইয়ে এ আড়মে। ইয়ে, হমারা হিঁই এবসনে বাল্লীকে কল মিল্‌ গিয়া।"

যাক, সকলে মিলিয়া ডুমরাও রাজ্যের দেওয়ান জয়প্রকাশনারায়ণের পুত্র, আমার বন্ধু হরিহরপ্রসাদের বাড়ী চলিলাম। তাঁহার গাড়ী তিনখানা। এবং তিনি নিজে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

হরিজী আমাদের জন্য ভাত, হাতরুটি, খিচুড়ি, মাছ, মাংস, সবই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং গুরুদাসবাবুও তাঁহার দুই পুত্র ভিন্ন সকলেরই চর্ব্য চোষ্য ভোগ হইল। গুরুদাসবাবু নিজে অনেক বেশী টাটকা ফল, ড্রায়েড ফ্রুটস্‌ (কিস্‌মিস্‌, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি) এবং মিষ্টান্ন লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"গ্রহণের দিন, সমাধান করিয়া মাংস প্রভৃতি খাওয়া ব্রাহ্মণের কর্তব্য নয়। শুধু নামে ব্রাহ্মণ হইলে হয় না। কার্যতঃ সংযত ও ধর্মানুরাগী হওয়া উচিৎ। আজকের দিনে সাত্ত্বিক আহার কর্তব্য।" গুরুদাসবাবু টেলিস্কোপ প্রভৃতি যন্ত্রাদিও লইয়া গিয়াছিলেন। বৈকাল ২টা ১৫ মিঃ ৩ সেকেণ্ডে গ্রহণ আরম্ভ হইল। বক্সার-এ সবে মাত্র ১ মিঃ ৩৪ সেঃ পূর্ণগ্রাস ছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সে বিষয়ে আমার কিছু লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

বৈকাল ৪টার আগেই আমরা সকলে ষ্টেশনে ফিরিলাম। হরিজী আমাদের 'see-off' করিতে আসিয়াছিলেন। আমি ষ্টেশনে ফিরিয়া জোর জবরদস্তি বা তোষামোদ করিয়া বা চাপরাশিকে বকশিস্‌ দিয়া, দুইটা ঘরের ভিতর দিয়া গিয়া একটি নিভৃত পিছনের ঘরে স্মিথ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এবং চাপরাশিকে বলিলেন, স্পেশাল মার্চেন্ট ইন্সপেক্টর সতীশনাথ রায়কে ডাকিতে। স্মিথ সাহেব সতীশবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে চুপিচুপি বলিয়া দিলেন—"প্রায় ২০খানা রিজার্ভ ক্যারেজ রহিয়াছে। তুমি এক কাজ কর, এদের গাড়ী ছাড়া সব গাড়ীতে আলো জালাইয়া দাও।

তাহা হইলে তাহারা ভাবিবে, যে তাহাদের গাড়ী কর্ড মেল-এ যোগ হইবে। কিন্তু কর্ড মেল আসিবার আগে তুমি এদের গাড়ী ও এদের কাছের একখানা গাড়ী মেল-এ জুড়িয়া দাও।" সতীন্দ্রবাবু বলিলেন—"আচ্ছা।"

আমাদের গাড়ীতেই কোনপ্রকারে গুরুদাসবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু যাইবেন কথা ছিল। আমাদের গাড়ীর পিছনেই—হাইকোর্টের উকীল প্রেসরী সাহেবের কম্পাকিট-কার ছিল। পাঞ্জাব মেল যথাসময়েই—আন্দাজ ৫টায় আসিল। তাহার আধ ঘণ্টা পূর্বে আমি আর একবার স্কিং সাহেবের কাছে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কারণ সতীন্দ্রবাবুর কাছে শুনিলাম যে একখানা গাড়ীর বেশী মেল-এ জোড়া যাইবে না। কারণ, ডুমরাও-এ এই একখানা সেলুন গাড়ী জোড়া হইবেই। কিন্তু গুরুদাসবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু আমাকে যাইতে দিলেন না। গুরুদাসবাবু বলিলেন—"High-placed officer-দের বিরক্ত করা উচিৎ নয়। আর সাহেবদের কথাই আলাদা। সাহেব যখন বলেছে, ঠিক হবে।" প্রকৃতপক্ষে ভূপেনবাবু আমার হাত ধরিয়া যাওয়া বন্ধ করিলেন। কারণ গুরুদাসবাবু বলা সত্বেও আমি যাইতেছিলাম।

মেল আসিল। আমাদের গাড়ী জোড়া হইল না। তখন গুরুদাসবাবু দেখিলাম রুষ্ট হইয়াছেন—পূর্বে বা পরে যাহা কখনও দেখি নাই। তিনি খবর লইয়া জানিলেন, যে এঞ্জিন-এর কাছে স্পেশাল ট্রাফিক ম্যানেজার সাহেব আছেন। তাঁহাকে বলিলে যদি কোন ব্যবস্থা হয়। গুরুদাসবাবু সেখানে গেলেন। তিনি প্যান্ট্‌লুন, চাপকান-চোগা পরা ও মাথায় পাগড়ী। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। গুরুদাসবাবু সাহেবকে গিয়া বলিলেন—"We were assured our car would be attached to this train. If it be not, I shall be failing in my duty, to the State"... ইত্যাদি। সাহেব কোন কথা শুনিলেন না এবং বলিলেন—"Who are you ? I cannot possibly detach a car and help another. Just see if you can get a sitting accomodation anywhere."—বলিতে বলিতেই মেল ছাড়িয়া দিল। এদিকে আমি সাহেবকে গিয়া বলিলাম—"Do you know who he is ?" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ?" আমি বলিলাম—"হাইকোর্টের জজ।" তখন সাহেবের চক্ষুস্থির। আসিয়া গুরুদাসবাবুর কাছে রূঢ় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গুরুদাসবাবুর তখন স্বাভাবিক ও শান্ত প্রকৃতি। তিনি সাহেবকে বলিলেন—"না, ক্ষমা প্রার্থনা করিবার কোন কারণ নাই, তিনি ব্যক্তি নির্বিশেষে তাঁহার কর্তব্য করিয়াছেন।"

সাহেব তখন বলিলেন, যে বোম্বাই মেল ভোর ৬টায় আসিবে, তাহাতে যেরকমে হউক আমাদের গাড়ী জুড়িয়া দিবেন এবং আমরা যেন ব্যস্ত না হই। তাহার পূর্বে আর একখানা ট্রেন আসিবে, সেটা কিন্তু 'স্লো ট্রেন'। তাহার পরে যে বোম্বাই মেল আসিবে, সেটা আগে পৌঁছিবে।

কিন্তু গুরুদাসবাবুর তাহা মনঃপুত হইল না। তিনি বলিলেন—"যদি আবার কোন কারণে আমাদের গাড়ী না জোড়া হয়, তাহা অপেক্ষা স্লো ট্রেন-এ আমাদের গাড়ী জোড়া হউক।"

তাহাই হইল। সেটা রাত্রি ১২টা আন্দাজ।

তাহাতে এক মজা হইল। গুরুদাসবাবু একখানা থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্ট পাইলেন এবং তাহাতে গেলেন। কেন মিছামিছি আমাদের অসুবিধা বাড়াইবেন। ভূপেনবাবু কিন্তু আমাদের গাড়ীতেই থাকিলেন, বেশ গল্পগুজব হইবে।

ট্রেনখানা প্রত্যূষে আন্দাজ ৬টায় মোকামা পৌঁছিল। সেখানে ভূপেনবাবু, প্রমথবাবু ও চারুচন্দ্র ঘোষ চা ডিম প্রভৃতি খাইতে রেলওয়ে রেষ্টুরেন্টে গেলেন। তাঁহারা আমাকে বলিয়া গেলেন, যে গুরুদাসবাবু না টের পান যে এঁরা রেষ্টুরেন্টে গেছেন।—গুরুদাসবাবুকে আমিই আটকাইতে পারিব। আমি গুরুদাসবাবুর গাড়ীর কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, গুরুদাসবাবু গাড়ীতে আসন পাতিয়া পূজায় বসিয়াছেন এবং এক ফিরিঙ্গি ছোকরা গার্ড উঁহাকে বিরক্ত করিতেছে। সে বলিতেছে—"You must have broken that tinted glass-pane." গুরুদাসবাবু বলিলেন—"Why should I ?" ছোকরা বলিল—"So that you may see the eclipse." গুরুদাস বলিলেন—"You must have to prove that I could possibly go upwards in this car in the up-train and return by this same car and that I was in this car." আমি গিয়া গুরুদাসবাবুকে বলিলাম—"আপনি আবার ওর সঙ্গে তর্ক করছেন কেন ? আমি দেখছি।" আমাকে গুরুদাসবাবু বলিলেন—"না, ওকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে ওর fallacious argument হচ্ছে।" আমি শুনিলাম না, আমি ষ্টেশনমাষ্টার-এর কাছে চলিয়া গেলাম। গুরুদাস সে ছোকরার সঙ্গে আইনের তর্ক করিতে লাগিলেন।

আমি ষ্টেশনমাষ্টার সাহেবকে লইয়া গুরুদাসবাবুর গাড়ীতে আসিলাম। সাহেব বিনা বাক্যব্যয়ে ছোকরাকে ধমকাইয়া বলিলেন—"Why are you vexing this gentleman? You should be suspended." গুরুদাসবাবু সাহেবকে বলিলেন, যে তাঁহার জন্ত এবং কাহারও ভ্রান্ত ধারণার জন্ত শাস্তি দেওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু সাহেব ছোকরাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

মধুপুরে আমাদের ট্রেন প্রায় দুই ঘণ্টা লেট্‌ ও প্রায় বেলা ১টায় পৌছিল, এবং আমাদের-খানিকে সাইডিং-এ রাখিল, কাট্‌ ট্রেনটি দিয়া ষ্টেশনে ঢুকিল। আশুবাবু তৎক্ষণাৎ আমাদের ট্রেন হইতে বহুকষ্টে নামিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—"কেন কষ্ট করিয়া নামিতেছেন, বসি পড়িয়া যান। আর কাট্‌ ট্রেন ত পৌছাইতে পৌছাইতে সন্ধ্যা। তখন ত আর হাইকোর্টে যাইয়া কোন লাভ নাই।" তবুও তিনি নামিলেন। এবং তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী বিরাজবাবু আশুবাবুর বিছানা লইলেন। উভয়ে ছুটিতে২ ষ্টেশনে পৌছিলেন ও কাট্‌ ট্রেনটি ধরিলেন।

দার্জিলিং যাত্রা

১৫ই এপ্রিল, ২রা বৈশাখ, আমার দাদাশ্বশুর দিদিশাশুড়ী ও মামাশাশুড়ীর সহিত আমি ও আমার স্ত্রী দার্জিলিং যাত্রা করি। আমাদের সহিত আমার বড় মামাশ্বশুরের জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যোতিষও গিয়াছিল। এই আমার প্রথম হিমালয় ভ্রমণ।

হিমালয়ের সৌন্দর্য বা দার্জিলিং বিষয়ে আমার লিখিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু দার্জিলিং যাত্রা সম্পর্কে ২।১টা ঘটনা হয়, যাহার বিবরণ বলিব।

যাত্রার প্রারম্ভের কথা। আমার দাদাশ্বশুর যাত্রার দুই একদিন আগে বলিলেন—"আমি হাইকোর্ট হইতে সোজা ষ্টেশনে যাইব, তুমি তোমার মাজননী ও মামণিকে যেরকম বলিয়া দিতেছি ট্রেনে তুলিও।" আমি বলিয়াছিলাম—"পারিব না; কারণ আপনার যা ব্যবস্থা তা আমি পারিব না, আমার হাসি পায়।" ব্যবস্থা এই: —পাল্কি গাড়ীর দরজার কাছে উচু করিয়া তুলিয়া ধরিবে, মহিলা সেই পাল্কিতে উঠিবেন এবং গাড়ী ও পাল্কির দুই পার্শ্বে কাপড় ধরা হইবে। সেইপ্রকার ব্যবস্থা ট্রেনে পাল্কি হইতে উঠিবার সময়। অর্থাৎ যাহাকে "কানাত" বলে। আমি পারিব না বলিতে দাদামণি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন। "তোমরা সব [illegible] কি? ইহাতে দোষের কি, হাসিরই বা কি?" আমি বলিলাম—"এই একটা sensation করিবার মানে কি? কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে একজন বড়ঘরের মেয়ে যাইতেছেন, সকলে চাহিয়া থাকিবেন এবং কেহ খোঁজও লইতে ছাড়িবেন না, কে যাইতেছেন। কিন্তু মাথায় কাপড় দিয়া চলিয়া গেলে কয়জনের নজর পড়িবে?" তাহাতে দাদামণি বলেন—"তোমরা সব সাহেব হইয়া গিয়াছ। তা' ছাড়া তোমাদের respectability-র কোন ধারণা নাই। যাই হোক, তোমাকে কিছু করিতে হইবে না, আমি নিজেই আধ ঘণ্টা আগে কোর্ট হইতে ষ্টেশনে যাইব।"

তখন দার্জিলিং মেল বৈকাল সাড়ে চারটায় ছাড়িত। গীমার পারের সময়ও এই ব্যবস্থা। দার্জিলিং মেল ছাড়িবার কিছু পূর্বে দাদামণির বিশেষ বন্ধু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (আলিপুরের সরকারী উকীল) এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আমার সহপাঠী চারুচন্দ্র ঘোষ (পরে স্যার্) "see-off" করিতে আসেন। দেবেনবাবু আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"একি, তুমি ধুতি পরে? তুমি যাবে না?" আমি বলিলাম—"হ্যা, যাইবার ত কথা।" দেবেনবাবু বলিলেন—"ছিঃ ছিঃ, কোন সম্ভ্রান্ত লোক ধুতি পরিয়া রেলযাত্রা করে না। আর কোট-প্যান্ট পরিয়া না যাইলে কেউ খাতির রাখেনা, রেলওয়ের সাহেব ও চাপরাশিরা ত নয়ই।" আমি বলিলাম—"আমরা ত সকলে ধুতি পরিয়া রেলে যাতায়াত করি। খাতিরের অভাব ত দেখিনা। আর খাতির করিল না-করিল কি যায় আসে তাহাতে।" দাদামণি দেবেন্দ্রবাবুকে বলিলেন—"ওকে কিছু বলিও না। বড় একগুঁয়ে।" তাহার পর আমি বলিলাম—"যখন ধুতি পরিয়া যাতায়াত সম্ভ্রান্ত লোক করেনা, তখন আপনাদের রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্ট-এ আমার যাওয়া উচিৎ নয়। এক কাম করুন, আপনাদের রিজার্ভ কম্পার্টমেন্ট-এর পাশের কম্পার্টমেন্ট-এ যে একটা বার্থ রিজার্ভ আছে, আমি সেইটেতেই যাই।" তাহা কিন্তু হইল না। আমি রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টেই গেলাম। জ্যোতিষ পাশের কম্পার্টমেন্ট-এ গেল। দুর ষ্টেশনে যখন ট্রেন উঠিতেছে, তখন আমার বড় শীত লাগিল। তখন আমি কোট, প্যান্ট ও ওভারকোট পরিলাম।

দার্জিলিং

দার্জিলিং-এ যখন আমরা ছিলাম, তখন কে. জি. গুপ্ত সাহেব (পরে স্যার্) নিকটে একটা বাড়ীতে ছিলেন।

গুপ্ত সাহেবের দাদামণির সহিত খুব ভাব। তাঁহার সহিত তাঁহার ভাগিনের অতুলপ্রসাদ সেনও ছিলেন। কলেজে থার্ড ও সেকেণ্ড ইয়ারে অতুল আমার সহপাঠী ছিল। অতুল ও জ্যোতিষের (দুর্গামোহন দাসের পুত্র এবং স্বনামধন্য চিত্তরঞ্জন দাসের জ্যেঠতুতো ভাই—পরে যিনি এডভোকেট জেনারেল হইয়াছিলেন; এস্. আর্. দাসের সহোদর ভ্রাতা) গলায় গলায় ভাব; তাহারা দুইজনে বরাবর ক্লাসে পাশাপাশি বসিত। তাহাদের আর কাহারও সহিত বিশেষ আলাপ ছিল না, আমি ছাড়া। কিন্তু অতুলের মাতার সহিত দুর্গামোহন দাসের বিবাহের পর অতুল ও জ্যোতিষের অবিচ্ছেদ্য সৌহার্দ্য উবিয়া গেল। উভয়েই বিলাত যায়।

আমরা দলবদ্ধ হইয়াই বৈকালে বেড়াইতে যাইতাম—আমি ও জ্যোতিষ ঘোড়ায় বা পদব্রজে, মাজননী, মামণি ও আমার স্ত্রী ডাণ্ডিতে। একদিন বৈকালে আমার সহিত বেড়াইবার সঙ্গী পাইলাম না। আমি একাই কে. জি. গুপ্ত সাহেবের বাড়ীতে গেলাম, অভিপ্রায় অতুলের সহিত দেখা করা। বাহিরে দারবান বলিল গুপ্ত সাহেব বা তাঁহার স্ত্রী বাড়ী নাই। আমি কিন্তু বাড়ীর ভিতর গানবাজনার আওয়াজ পাওয়ায় দারবানকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দারবান বলিল—"সাহেবের ভাগিনের আসিয়াছে, তিনি ও সাহেবের বড় মেয়ে আছে।" আমি ভিতরে গেলাম এবং ড্রয়িং রুম-এ গেলাম। সেখান হইতেই গানবাজনার আওয়াজ আসিতেছিল। গিয়া দেখি অতুল ম্যাণ্ডোলীন বাজাইতেছে দাঁড়াইয়া এবং গুপ্ত সাহেবের বড় কন্যা পিয়ানো বাজাইতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছেন, অতুল তাঁহার কাঁধের উপর হেলান দিয়া। আমার সহিত তাঁহাদের কিছুক্ষণ কথা হইবার পর আমি আর খানিকক্ষণ বেড়াইয়া সন্ধ্যার কিছু পরে বাড়ী ফিরিলাম। কোথায় গিয়াছিলাম জিজ্ঞাসা করায় আমি দাদামণিকে বলিলাম এবং একটু টিপ্পনী কাটিলাম। দাদামণি হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"তোমার মনটা বড় কু দেখছি। মামাতো বোন ও পিসতুতো ভাই ত, তোমার টিপ্পনী বড় অস্বাভাবিক ও কুৎসিৎ।" আমি বলিলাম—"সামাজিক আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম দৃষ্টিকটু হইয়া থাকে, তাহাতে অস্বাভাবিক বা কুৎসিৎ বলিতেছেন কেন?" তিনি রাগিয়া আর কোন কথাই বলিলেন না।

কিছুদিন পরে দাদামণির একখানা একশ ১০০্ টাকার নোট হারাইয়া যায়—তাঁহার আত্মীয় কয়েকখানি নোট ভাঙাইতে যাইতে যাইতে কি রকমে নোটখানা পড়িয়া যায়। আমি ও জ্যোতিষ ঘোড়ায় চড়িয়া দুইদিকে বাহির হইলাম, যদি ভাগ্যক্রমে নোট পাওয়া যায়। ঘুরিতে ঘুরিতে আমার বেলা ১০টা হইয়া গেল এবং বড় গরম লাগিল, ভাবিলাম, সম্মুখে একটা খুব বড় arbour (কুঞ্জ) ছিল সেখানে একটু বিশ্রাম করি। আরবারটি এত বড় যে ঘোড়ায় চড়িয়া ঢোকা যায়। এবং আমি ঘোড়ায় চড়িয়াই গেলাম। সেখানে দেখি অতুল ও গুপ্ত সাহেবের কন্যা ছাড়া কেহ নাই, তাঁহারা পাশাপাশি বসিয়া আছেন, অতুলের হাত অপরের কোমর জড়াইয়া। আমি দেখিয়াই চলিয়া আসিলাম। একথা আর কাহাকেও বলিলাম না, আমার স্ত্রী ছাড়া। কয়েক মাস পরে একটা ইংরেজী খবরের কাগজে দেখিলাম যে 'Mr. Sen ও Miss Gupta-র Gretna-Green marriage' হইয়াছে। এই বিবাহে উভয়ে বড় অসুখী হইয়া পড়েন শেষজীবনে এবং তাঁহারা একত্রে থাকিতেন না।

পরে যখন ১৯০২ সালে আমি কটকে গিয়া কে. জি. গুপ্ত সাহেবের অতিথি ছিলাম, দেখিলাম গুপ্ত সাহেব ও তাঁহার পত্নী যার তার সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েদের একাকী আলাপ করা পছন্দ করেন না। আমাকে বাড়ীর পরিবারবর্গ হিসাবে মেলামেশা করিতে দিতেন। আমি যদিও আমার নিজের পাচকের রান্না পৃথক খাইতাম—তখন গোঁড়া হিন্দু ছিলাম—আমি গিয়া ডিনার-টেবিলে বসিতাম এবং ড্রয়িং রুম-এও থাকিতাম।

২

আমরা দার্জিলিং থাকিতে থাকিতে ছোটলাট Sir John Woodburn শৈলাবাসের জন্য সেখানে যান। দার্জিলিং-এ তখন ব্যবস্থা ছিল, লাটসাহেব যতদিন থাকিবেন মিলিটারী মার্চেন্ বা সামরিক কুচকাওয়াজ চারিদিকে হইবে এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া lead করিবেন। সে সময় আর কেহ যেখানে মার্চ হইতেছে সেখানে ঘোড়া চড়িয়া যাইতে পারিবে না। তখন 'notorious native-hater' কব সাহেব পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমরা কব সাহেবকে চিনিতাম না। একদিন ঘটনাচক্রে আমি ও জ্যোতিষ ঘোড়ায় চড়িয়া ম্যাকেঞ্জি রোড দিয়া উঠিতেছি আর তাহার উপরের রাস্তা দিয়া মার্চ হইতেছে। কপন-এর কাছে পাহারাওয়ালা বলিল আমাদের ফিরিয়া যাইতে। আমরা কিন্তু তাহা

লাইফবয় যেখানে

স্বাস্থ্যও সেখানে !

আঃ! লাইফবয়ে স্নান করে কি আরাম! আর স্নানের পর শরীরটা কত ঝরঝরে লাগে! আর বাইরের ধুলো ময়লা কার না লাগে—লাইফবয়ের কার্যকরী ফেনা সব ধুলো ময়লা রোগ বীজাণু ধুয়ে দেয় ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে। আজ থেকে আপনার পরিবারের সকলেই লাইফবয়ে স্নান করুন।

L. 16-252 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

করি নাই। ঘোড়ায় চড়িয়াই মাঠটা দেখিতে লাগিলাম। কল্প সাহেব, আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের কাছে আসিতে নিজের টুপি তুলিয়া আমাদের স্যালুট করিলেন। বাড়ী ফিরিয়া এ বিষয়ে গল্প হইল—সকলে আমাকে বিদ্রূপ করিলেন—বলিলেন, স্যালুট করে নাই, সাহেবের বোধ হয় কোন কারণে টুপি খোলার দরকার হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে জ্যোতিষ ও আমি সকালবেলা লাট-সাহেবের শৈলাবাস 'শ্রবারী'র পার্শ্বের রাস্তায় ঘোড়ায়-ট্রট করিয়া যাইতেছিলাম। অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কের সামনে দুই মেম দুইখানা রিক্শায় বেই আসিতেছিলেন, হঠাৎ আমাদের ঘোড়া দুটির রেস করিতে ইচ্ছা গেল। তাহারা গ্যালপিং আরম্ভ করিল। ঐ রিক্শাওয়ালারা ভয় পাইয়া যাওয়ায় রিক্শাগুলি ধারের নিম্নমুখী রাস্তায় খুব দ্রুত যাইতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে রিক্শাগুলির পরস্পর ধাক্কা লাগে।

তাহার আবার কিছুদিন পরে জ্যোতিষ ও আমি ঐ রাস্তায়ই খুব শীঘ্র ট্রট করিয়া আসিতেছিলাম। অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কের সামনে হাবিলদার হাত তুলিয়া আমাদের থামিতে বলিল এবং থামিবার পূর্বেই আমার ঘোড়ার মুখের কাছের লাগাম ধরিল। ধরিতেই আমি হাবিলদারকে এক ঘা চাবুক মারিলাম ও বলিলাম মুখ ধরিবার কি অধিকার তাহার। সে বলিল—"এখানে গ্যালপ করার হুকুম নাই।" আমি বলিলাম—"হুকুম দেখাও।" সে প্রিন্টেড বোর্ড দেখাইল। আমি বলিলাম—"চলো সাহেবকা পাস্।" সে একটা ঘোড়ায় উঠিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল—প্রায় দুই মাইল দূরে। তখন বেলা প্রায় ৯টা। সাহেবের বাড়ী আমরা ঘোড়া হইতে নামিয়া বারান্দায় বেঞ্চে বসিলাম। হাবিলদার খবর দিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সাহেব এক তোয়ালে কোমরে জড়াইয়া বাথরুম-এর পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া বলিলেন—"Why were you galloping there?" আমি বলিলাম—"I do not care to speak to one half-dressed." সাহেব চক্ষু কটমট করিয়া চাহিয়া বলিলেন—"Very well, wait a little." পরে পোষাক পরিয়া আসিয়া তিনি আমাদের ডাইনিং রুম-এ ডাকিলেন এবং চা দিলেন। আমি ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে, আমি চা খাই না এবং জ্যোতিষও বলিল খাইবে না। ডাইনিং টেবিল-এ দুইটি মেম ছিলেন, একটি মধ্যবয়স্কা ও একটি অল্প-বয়স্কা (১৬।১৭ আন্দাজ)। আমি সাহেবের ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছিল?" আমি বলিলাম—"এ বিষয় সরেজমিনে তদন্ত করাই ভাল নয় কি?" সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, আমি চা খাইয়া ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই যাইব।" শীঘ্রই সাহেব, হাবিলদার, আমি ও জ্যোতিষ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলাম। কেন জানি না, সাহেবের ওখান হইতে আসিবার সময় আমাদের অর্থাৎ জ্যোতিষ ও আমার ঘোড়া বদল হইল—যাহা কখনও হয় নাই। সকলে খুব জোরে গ্যালপ করিতে করিতে অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কের সামনে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া সাহেব হাবিলদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দোষ আমরা করিয়াছি। সে বলিল—আমরা জোর গ্যালপ করিতেছিলাম, বারণ সত্ত্বেও। সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্য কি না?" আমি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা এখন সাহেবের বাড়ী হইতে কি ভাবে আসিলাম। সাহেব বলিলেন—"Fast trot." আমি বলিলাম, তাহা হইলে আমরা ঐ ঘটনার সময় "কদম" যাইতেছিলাম। ইত্যবসরে আমার সহপাঠী নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ (পরে Bose Institute-এর) সেখানে আসিল। নগেন পূর্বেও ছিল, যখন আমি হাবিলদারকে চাবুক মারি। নগেন জিজ্ঞাসা করিল তাহার থাকিবার আবশ্যকতা আছে কি? সে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছে। এমন সময় রিক্শায়, পূর্বে বিব্রত হইয়াছিলেন যে দুইটি মেম, তাঁহারা অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্ক হইতে নামিয়া আমাদের কাছে আসিলেন।

হাবিলদার বলিল মেমেদের জিজ্ঞাসা করিতে। মেমেরা বলিলেন যে বোধহয় আমরাই সর্বদা এইখানে জোরে ঘোড়া চড়িয়া ঘুরিয়া থাকি। সাহেব তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা আমাদের সনাক্ত করিতে পারেন কি না। তাঁহারা বলিলেন—"না, কিন্তু ঘোড়া দু'টাকে বেশ চিনিতেছি।" আমি হাসিয়া উঠিলাম এবং বলিলাম—"You are quite at liberty to prosecute the horses." সাহেবও হাসিলেন এবং হাবিলদারকে খুব বকিলেন ও তাহাকে ডিগ্রেড করিয়া চা-বাগানের পুলিস করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে আমার শ্বশুরমহাশয় দার্জিলিং-এ আসিলেন। তিনি তখন ডেপুটী ওপিয়াম এজেন্ট। পনের দিনের ছুটী লইয়া আসিয়াছিলেন। তখন দাদামণির সমস্ত পরিবারই দার্জিলিং-এ। সেবার কলিকাতায় প্রথম প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপূর্ব বৎসর sporadic ছিল। তাই সকলে কলিকাতা হইতে পলাইয়াছিলেন এবং আমরা যে 'হলি লজ'-এ ছিলাম তাহারই নিকটে একটি বড় বাংলা (Assyline Villa) লওয়া হয়।

আমরা ইতিমধ্যে খবর লইয়াছি যে পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টের নাম কল্ম সাহেব।

শ্বশুরমহাশয় আমাদের ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন—"বটে! কল্ম সাহেবের সঙ্গে আমি দেখা করিব। তাহার সহিত আমার অনেকদিনের আলাপ।" বলিয়া হাসিলেন এবং মুঙ্গেরে তাঁহাদের কিরূপে আলাপ হয় ও কিরূপে কল্ম সাহেব জব্দ হইয়াছিলেন তাহা বলিলেন। সে ১৮৭৮-এর আগে। তখন তিনি সাব-ডেপুটী ওপিয়াম এজেন্ট, কিন্তু ভাল সাহেবী ষ্টাইলেই থাকিতেন। তিনি একদিন বৈকালে নিজ বাগানে একখানি বেতের আরাম-কেদারায় শুধু প্যান্ট ও সার্ট পরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। সম্মুখে বাগান, বড় বড় গোলাপ ফুলে ভর্তি। কল্ম সাহেব সামনের রাস্তা দিয়া 'ট্যাণ্ডম্' হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন, দূর হইতে একটি খুব বড় লাল গোলাপ ফুল দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া সহিসকে বলিলেন, গোলাপ ফুলটা তুলিয়া লইয়া আসিতে। সহিস যেই গেট দিয়া ঢোকা, আমার শ্বশুরমহাশয় বলিলেন—"কেয়া মাংতা?" সহিস বলিল—"সাহেব ঐ ফুলটা তুলিয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছে।" শ্বশুরমহাশয় বলিলেন—"তোমরা সাহেবকো আনে বোলো।" সহিস গিয়া বলিতে, সাহেব তখনই গাড়ী হইতে চাবুক হাতে করিয়া নামিয়া গেট-এর ভিতর ঢুকিলেন। আমার শ্বশুর বলিলেন—"What do you want?" সাহেবের একজন নেটিভ-এর স্পর্ধার নিশ্চয় গাত্র জ্বলিতেছিল। সাহেব শ্বশুরমহাশয়ের ফর্সা, লম্বা, সুগঠিত সুন্দর চেহারা দেখিয়া যেন লজ্জিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কি করেন, গেট-এ ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, বলিলেন—"I would like to have that rose." শ্বশুরমহাশয় বলিলেন—"Well, I do not know you. You should not have sent your Syce to take it away at your pleasure." এই বলিয়া ফুলটি তুলিয়া তিনি সাহেবকে দিলেন। সাহেব শুধু "থ্যাঙ্কস্" বলিয়া চলিয়া গেলেন, আলাপ পরিচয় করিলেন না।

তাহার কিছুদিন পরে কল্ম সাহেব রেলে কোথাও টুর-এ যাইতেছিলেন এবং জিনিষপত্র লইয়া একটি কম্পার্টমেন্ট জুড়িয়া ছিলেন। আমার শ্বশুরমহাশয়ও সেই ট্রেনে কোথায় অফিসিয়াল টুর-এ যাইতেছিলেন। তিনি আসিয়া সাহেবকে বলেন একটা বার্থ খালি করিয়া দিতে। সাহেব কথার জবাবই দিলেন না, দরজা আটকাইয়া থাকিলেন। শ্বশুরমহাশয় জোর করিয়া দরজা খুলিয়া বলিলেন, যদি একটা বার্থ খালি করিয়া না দেন তবে, তিনি সাহেবের ট্রাঙ্ক প্ল্যাটফরম-এ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। সাহেব বলেন—"Wait, I am going to speak to the Station Master." ষ্টেশনমাষ্টার আসিয়া শ্বশুরমহাশয়কে দেখিয়া বলিলেন সাহেবকে যে, তিনি সাহেবের কথামত সব কম্পার্টমেন্ট তাঁহাকে দিতে পারেন না এবং শ্বশুরমহাশয়ও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং হাইকোর্টের জজের জামাতা। তখন সাহেব আর কি করেন, একটা বার্থ খালি করিয়া দিলেন। এ ঘটনা জামালপুর ষ্টেশনে রাত্রে হয়।

সাহেব টুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার শ্বশুরমহাশয়ের ভিজিটিংস্ বক্স-এ নিজ কার্ড ফেলিয়া যান। পরে শ্বশুরমহাশয় কার্ড পাঠাইয়া সাহেবের সহিত আলাপ করেন।

সাহেব যখন ফুলটি তুলিয়া লইতে যান, তখন শ্বশুরমহাশয়ের কাছে জ্যোতিষ দাঁড়াইয়া ছিল। কল্ম সাহেব মনে করিয়াছিলেন যে জ্যোতিষ আমার শ্বশুরের ছেলে।

শ্বশুরমহাশয় যখন দার্জিলিং-এ কল্ম সাহেবের সহিত দেখা করিলেন, সাহেবআপনা হইতেই আমার, হাবিলদারের ও মেম দুইটির ঘটনা বলিয়া বলিলেন—"তোমার ছেলের সঙ্গে হৃষ্টপুষ্ট যুবকটি কে ছিল?" তিনি বলিলেন—"আমার জামাতা। অন্যটি আমার ছেলে নয়,—আমার শ্যালক-পুত্র।"

এখন বোঝা গেল মিলিটারী মার্চ করিতে করিতে সাহেব কেন টুপি তুলিয়াছিলেন এবং 'হাবসী'র ব্যাপারে হঠাৎ তাঁহার ব্যবহারের পরিবর্তন কেন ঘটিল।

[ক্রমশঃ]

'পূর্বস্মৃতি'তে উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার (১৮৪৪-১৯১৮): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে (১৮৬৫ সনে) অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া এম.এ. পরীক্ষা পাস করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে কিছুকাল গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৬ ও ১৮৭৭ সনে যথাক্রমে বি.এল. ও অনার্স-ইন-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৬—১৮৭২, এই কয় বৎসর তিনি বহরমপুরে ওকালতি করেন, সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুর কলেজে গণিত ও আইনের অধ্যাপনা-কার্যেও লিপ্ত হন। ১৮৭২ সনে কলিকাতায় ফিরিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৭৮ সনে তিনি 'ঠাকুর-আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'হিন্দু-বিবাহ ও স্ত্রীধন'। পরবৎসর (১৮৭৯) তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন।

১৮৮৮—১৯০৪, এই ষোল বৎসর হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার (১৮৯০—১৮৯২)। এই সময়ে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাপারে গুরুদাসের অনেকখানি হাত ছিল। তিনি আমৃত্যু ইহার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯০২ সনে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ কমিশনের সদস্য হন। কমিশনের রিপোর্টে তিনি উচ্চশিক্ষার অনুকূলে স্বতন্ত্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা প্রসার ও প্রচারকল্পে যে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ গঠিত হয়, তাহার মূলেও তাঁহার উদ্যোগ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সঙ্গে তিনি বরাবর যুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁহার সংযোগে ধন্য হইয়াছে। তাঁহার রচিত পুস্তক: 'জ্ঞান ও কর্ম'; অন্যান্য কয়েকখানি পুস্তক: *The Education Problem in India; A Few Thoughts on Education*।

হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি.এ., এম.এ. ও বি.এল. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন (১৮৯১—১৯১৭)। এই সময়ে তিনি রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) গণিত ও আইনের অধ্যাপনা-কার্যেও লিপ্ত ছিলেন। তিনি কলেজের সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯১৫—১৯১৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (১৯০৮—১৯১২) এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান-বিভাগের কর্মসচিব পদে নিযুক্ত হন ১৯১৭ সনে। তাঁহার রচিত পুস্তক: *An Annotated Edition of Colebrooke's Translation of Bhaskara's Lilavati*।

শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৯০ সনে পদার্থবিদ্যায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ সনে ডি.এল. উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি-কালে (১৮৯৩—১৯০৭), 'ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টস্'-এর ল-রিপোর্টারের কার্য করেন, (১৯০৪—১৯০৭)। ব্যবহারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পরে সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনালের সভাপতি হইয়াছিলেন।

বিরাজমোহন মজুমদার (১৮৬৬—১৯৩৯): প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে রসায়নশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৯০)। ১৮৯৭ সনে বি.এল. পরীক্ষায় পাশ করেন; এই পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা-কার্যে লিপ্ত ছিলেন। ১৮৯৮ সন হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯০৮ সন পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার পদার্থবিদ্যার অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের অধ্যাপক, সহ-অধ্যক্ষ এবং শেষে অধ্যক্ষরূপে কার্য করেন; ১৯১১ সনে সেনেটের এবং ১৯১৩ সনে সিণ্ডিকেটের সদস্য হন।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯—১৯২৪): প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ.এ., বি.এ., এম.এ. (১৮৮০, ইংরেজীতে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয়) এবং বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৩ সনে তিনি অ্যাটর্নির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের তিনি অন্যতম নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। ম্যাকেঞ্জি অ্যাক্টের প্রতিবাদে পদত্যাগকারীদের ('আঠাশ জন') মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদেও বৃত হন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়েন। ১৯০৪ সনে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের যে বাৎসরিক অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান সহকর্মী ছিলেন। ১৯১১ সনে জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। ১৯১৪ সনে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে মূল সভাপতি হন। মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড

রিপোর্টে যে ভারত-শাসন-সংস্কার আয়োজন হয়, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তিনি ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সদস্য হইয়া বিলাতে কয়েকবৎসর অবস্থান করেন। ১৯২২ সনে রাষ্ট্রসংঘের জেনেভা-বৈঠকে তিনি ভারত-সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—৮ই এপ্রিল, ১৯২৩ হইতে ৭ই আগস্ট ১৯২৪ পর্যন্ত। শেষোক্ত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১৮৫৪—১৯২০): যশোহর জিলার বিক্রমকাটিতে জন্ম। যশোহর জিলা স্কুল হইতে (১৮৭১ সনে) প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি.এ. ও বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন যথাক্রমে ১৮৭৬ ও ১৮৭৭ সনে। কিছুকাল কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া পরে আলিপুর জজ-আদালতে আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি দীর্ঘকাল একাদিক্রমে (১৮৮৮—১৯০২) সরকারী উকিল ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য রূপে (১৯১৬—১৯২০) তিনি সমাজের হিতকর বহু বিষয়ের আলোচনায় যোগ দেন। ১৯১৭ সনে বাঁকুড়া জিলার সিমলাপাল গ্রামে যে দুইজন নারীর উপর পুলিস নিপীড়ন চালায়, তাহার প্রতিবাদে তিনি ব্যবস্থা-পরিষদে জোরালো বক্তৃতা দিয়াছিলেন (১৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭) এবং ইহাতে আংশিক ফলও হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনেরও সদস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র: স্যর্ চারুচন্দ্র ঘোষ ও ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

কে. জি. গুপ্ত (কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত), স্যর্ (১৮৫১—১৯২৬): ঢাকা জিলার বিখ্যাত ব্রাহ্ম কালীনারায়ণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র। এদেশে শিক্ষালাভান্তে ১৮৬৯ সনে বিলাত যান। সেখান হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৩ সনে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। বাংলা-সরকারের অধীনে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য করেন। শেষদিকে তিনি ক্রমে রেভিনিউ-বোর্ডের সদস্য, আবগারী কমিশনার ও উড়িষ্যা-বিভাগের কমিশনার হন। এই বিভাগের প্রথম ভারতীয় কমিশনার ছিলেন তাঁহার পূর্বে রমেশচন্দ্র দত্ত। বোর্ডলাট পদের যোগ্য হইয়াও, তিনি ভারতীয় বলিয়া এই পদ পান নাই। এই পদের দাবি এড়াইয়া সরকার তাঁহাকে 'আবগারী'-বিভাগের কর্তা (১৯০৬) করেন, এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা-লাভের জন্য তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠান। যাহা হউক, তিনি ১৯০৭ সনে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সদস্য হইয়া বিলাত গমন করেন। তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি তাঁহার কার্যকুশলতায় মুগ্ধ হন। তিনি, ভারতীয় নৌবল সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য গঠিত, 'একটি কমিটির সদস্য' নিযুক্ত হন। তিনি কমিটির রিপোর্টে স্বতন্ত্রভাবে মতামত লিপিবদ্ধ করেন। নৌ-বিভাগের উচ্চপদে ভারতীয় নিযুক্ত না হইলে এবং নৌবল আগাগোড়া ভারতীয় না হইলে, ভারতবর্ষ যে প্রকৃত আত্মকর্তৃত্ব পাইয়াছে, কখনও ইহা বলা চলিবে না—তিনি মনপ্রাণে এই বিশ্বাস করিতেন।

অতুলপ্রসাদ সেন (১২৭৮—১৩৪১ বঙ্গাব্দ): স্যর্ কে. জি. গুপ্তের ভাগিনেয়। প্রসিদ্ধ কবি, সঙ্গীতকার ও রাজনৈতিক নেতা। অতুলপ্রসাদ প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল ব্যারিস্টারি করেন, পরে তিনি লক্ষ্ণৌ-এ যান এবং তথাকার চীফ-কোর্টে আইন-ব্যবসায় লিপ্ত হন। তিনি লক্ষ্ণৌ-এ স্থায়িভাবে বসবাস করেন। আইন-ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর অর্থোপার্জন হয়। তিনি মুক্তহস্তে অর্থ দান করিতেন। তিনি সাহিত্য-সেবায় তৎপর ছিলেন এবং বিস্তর স্বদেশ-সঙ্গীত ও ভক্তিসঙ্গীতের রচয়িতা। তাঁহার 'কাকলী', 'কয়েকটি গান', 'গীতিগুঞ্জ' শীর্ষক কবিতা-পুস্তকগুলি সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছে। তিনি 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন'-এর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। কাশীধাম হইতে প্রকাশিত 'উত্তরা' মাসিকপত্রের তিনি ছিলেন প্রথম সম্পাদক। শিক্ষাবিস্তারেও তাঁহার সমান আকৃতি দৃষ্ট হইত। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সার্বিক সহায়তা ছিল। রাজনীতিতে তিনি উদারমতাবলম্বী ছিলেন। প্রাদেশিক ও নিখিল-ভারতীয় উদারনৈতিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

দুর্গামোহন দাস (১৮৪১—১৮৯৭): সে-যুগের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ও সমাজ-সংস্কারক। প্রথমে বরিশালে এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। অসবর্ণ-বিবাহ আইন বিষয়ক আন্দোলনে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনকে সহায়তা করেন। তিনি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়া নিজ বিধবা বিমাতার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন এবং নিজেও শেষবয়সে বিধবা-বিবাহ করেন। স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম অগ্রণী।

এস. আর. দাস (সতীশরঞ্জন দাস): দুর্গামোহন দাসের মধ্যম পুত্র। তিনি ব্যারিস্টার রূপে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি অ্যাডভোকেট-জেনারেল হন। বড়লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সদস্যও হইয়াছিলেন।

জ্যোতিষরঞ্জন দাস: বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা ও কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল দুর্গামোহন দাসের কনিষ্ঠ পুত্র। বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাস করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ব্যবহারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি হেতু তিনি রেঙ্গুন হাইকোর্টে বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল এই পদে বৃত ছিলেন।

উড্বার্ণ, স্যর্ জন (১৮৪৩—১৯০২): ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাক্তার ডেভিড উড্বার্ণ এম.ডি.-র পুত্র। চব্বিশ-পরগনা জিলার অন্তর্গত বারাকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বিলাতে শিক্ষাসমাপনান্তে ভারতীয়-সিভিল-সার্ভিস-ভুক্ত হন। এদেশে তিনি বিভিন্ন সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৮ সনে বাংলার ছোটলাট হন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা-সংকোচক 'ম্যাকেঞ্জি বিল' তাঁহার আমলে আইনে পরিণত হয়। ছোটলাট থাকাকালে, ১৯০২ সনের ২১শে নভেম্বর কলিকাতায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ (১৮৭১—১৯৬১): ঢাকা জিলার অন্তর্গত বারদির বিখ্যাত নাগবংশে জন্ম। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৯৫ সনে রসায়নশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ, মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) এবং আগ্রা কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। শেষোক্ত কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন সুদীর্ঘকাল (১৮৯৬—১৯১৬)। ইহার পর কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত হন (১৯১৬—১৯১৮)। ১৯১৯ সন হইতে 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির'-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত থাকিয়া ১৯৩৯ সনে অবসরগ্রহণ করেন। আগ্রা কলেজে থাকাকালীন তিনি উচ্চতর বিজ্ঞান-গবেষণাদি সম্বন্ধে জনসাধারণের নিমিত্ত একখানা বই (১৯১১) ইংরেজীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে বেশিরভাগ সময়ই তিনি বিজ্ঞানে কাটান। তিনি রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে, পদার্থবিজ্ঞানে রেডিও-বিষয়ক গবেষণায় ও ধাতু-উদ্ধারণে, উদ্ভিদবিজ্ঞান, কৃষি, জীববিজ্ঞান এবং শিল্প বিজ্ঞানের প্রয়োগাদি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণা খনিজ ও অন্যবিধ শিল্পোন্নতির পথপ্রদর্শক হইয়াছে।

জটিরামের কড়চা

অগ্নিমিত্র

[পুণ্যশ্লোক ৺জটিরাম চাকলাদার মহাশয়ের রচনার পাণ্ডুলিপিগুলির ভিতর থেকে হঠাৎ একখণ্ড চিরকুট পাওয়া গেছে। তাতে তিনি যা লিখেছেন তা যুক্তিপূর্ণ হ'লেও আমাদের মতো গুণমুগ্ধ ভক্তজনের কাছে খুবই মর্মান্তিক। তিনি লিখেছেন : "আমার গবেষণামূলক এই রচনাগুলির সবই সমসাময়িককালে প্রকাশের জন্য নহে। ইহার মধ্যে অন্তত তিন-চতুর্থাংশ রচনা যেন 'অপ্রকাশিত রচনা' হিসাবে ভবিষ্যৎকালে প্রকাশের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। ভবিষ্যৎকালের সম্পাদকগণের কথা ভাবিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম। উপরন্তু, মোটা বিলাতী কাগজে বন্ধুবান্ধবের কাছে কিছু চিঠিপত্রও লিখিয়া রাখিয়াছি। এমনকি, অর্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী চপলাসুন্দরীকে আদরের সম্বোধনের পরিবর্তে 'কল্যাণীয়াসু' সম্বোধন সহযোগে বেশ কয়েকখানি সাহিত্যগুণসম্পন্ন চিঠিও লিখিয়া রাখিয়াছি। সেগুলি প্রকাশিত করিবার দরকার হইলে, একছত্রও 'এডিট' করিতে হইবে না। বন্ধুবান্ধবেরা অযত্ন করিলেও, চিঠিগুলি যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থাও করা রহিল। প্রত্যেকখানির কপি রাখিয়াছি। ফটোস্ট্যাট কপি করিবার দরকার হইতে পারে বিবেচনা করিয়া কাটাকুটি রাখি নাই। এসব না করিলে, ভবিষ্যতের সম্পাদকেরা বিপদে পড়িতে পারেন ভাবিয়াই করিয়াছি। সম্পাদকেরা লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন, সমস্ত চিঠিগুলিই 'প্রকাশিত চিঠি'র স্টাইল অনুযায়ী লেখা হইয়াছে। প্রকাশিত রচনার চেয়ে অপ্রকাশিত রচনার কদর বেশী। রচনা ফুরাইলে—চিঠি আছে। সুতরাং আমার এই রচনাগুলির সব যেন প্রকাশ না করা হয়। ভবিষ্যৎকালের সম্পাদকমহাশয়েরা বিশেষ-সংখ্যার জন্যে

জন্য নানা দিকে ছোটাছুটি করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, তখনকার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আশা করি তাঁহাদের মুখে হাসি ফুটিবে। ইতি—শ্রীজটিরাম চাকলাদার।”

এই চিরকুটখানি পাওয়ার পর লিপিকারের মানসিক অবস্থা কী হ'তে পারে তা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা আশা করি বুঝবেন। আগে পাওয়া গেলে, সমস্ত রচনাই অপ্রকাশিত রাখা যেত। এখন আর সে উপায় নেই। সুতরাং অত্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে কড়চার সমাপ্তি এই রচনাটির সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা ক'রতে হচ্ছে। চাকলাদার মহাশয়ের অন্যান্য রচনাবলী তাঁরই ইচ্ছানুসারে ভবিষ্যৎকালের সম্পাদক-মহাশয়দের উদ্দেশে শ্রীমতী চপলাসুন্দরী চাকলাদার মহাশয়ার নিকট জমা দিয়ে দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নেই। অজ্ঞানবশত অতি উৎসাহে চাকলাদার মহাশয়ের যে রচনাগুলি এরই মধ্যে প্রকাশ ক'রে ফেলেছি, সেগুলিকে যদি জটিরাম-ভক্তবৃন্দ সমাদরে গ্রহণ ক'রে থাকেন তবেই লিপিকারের অপরাধের বোঝা কিছুটা অন্তত লাঘব হবে। —লিপিকার]

। আত্মজীবনী ।

বড় আশা ছিল, একখানি আত্মজীবনী লিখিব। একপয়সাও পুঁজি না লইয়া মাথার গুণে কেমন করিয়া জান্তব-চর্বির ব্যবসা ধরিয়া শেষে লাখপতি হইয়াছিলাম, কেমন করিয়া সমাজের পাঁচজনের একজন হইয়া এতকাল মালা কুড়াইয়া গেলাম—এসব কাহিনীর আসল কৌশলগুলি প্রকাশ করিবার বড়ো ইচ্ছা ছিল। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, জটিরাম চাকলাদারের আত্মচরিত পড়িয়া সাব-সাধা ছোকরার দল উপকৃত হইবে, অনুপ্রাণিত হইবে। তাহার মধ্যে যেটি আরও চৌকশ সেটি নিশ্চয়ই আমার চেয়েও দু'চার ধাপ অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিবে। যদি তাহা হয় তবে পরলোকে যাইয়াও আমার সান্ত্বনা থাকিবে, দেশের জন্য কিছু করিয়া আসিয়াছি। এই ভাবিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিব যে, অন্তত একটি-দুটি শিষ্যও রাখিয়া গেলাম। এইসব ভাবিয়া আত্মজীবনী লিখিবার বড়ো সাধ হইয়াছিল। ভাষা কিম্বা অন্য দিক পাছে দুর্বল হইয়া যায় তাহার জন্য একটি গরীব লেখক ছোকরাকেও যোগাড় করিয়াছিলাম। শুনিয়াছি, কারবারতো গদীতে বসিতে পারিলে অপরের লেখাকে নিজের নামে চালাইবার যোগ্যতা নাকি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। আমি তাহা করি নাই। আমি শুধু আমার আত্মজীবনী সেই ছোকরাকে দিয়া লিখাইয়া লইব ভাবিয়াছিলাম। আমার হাতে চাকরি আছে। ছোকরাকে চাকরি দিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুই বুঝি হইল না!

আমার মন দমিয়া গিয়াছে। আত্মজীবনী লিখিবার সংকল্প গ্রহণ করিবার পর একপাশ হইতে সমস্ত আত্মজীবনী-গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু পড়িতে যাইয়া এমন মনের অবস্থা হইবে জানিলে কে পড়িত? এ পর্যন্ত যতগুলি আত্মজীবনী পড়িলাম তাহার মধ্যে কদাচিৎ দু'একখানি ছাড়া আর-সবগুলিই আমাকে বিমর্ষ করিয়া দিয়াছে। স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এই জগতে যাহারা দাঁত গজাইবার দিন হইতে দাঁত পড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত এতবড়ো দীর্ঘ জীবনটি নিছক সাধুসন্তের ন্যায় কাটাইয়াছেন—কেবল তাঁহারাই আত্মচরিত রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। যতই পড়িতেছি, ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। সেই সঙ্গে মন বড়ো দমিয়া যাইতেছে। হায়রে, আগে যদি জানিতাম যে আত্মচরিত লিখিবার বাসনা জাগিবে তবে হয়তো চেষ্টা করিয়া একটু রাখঢাক করিয়া চলিতাম। কিন্তু এখন আর উপায় নাই। যেসকল আত্মচরিত পড়িলাম, তাহার প্রায় অধিকাংশেরই চরিত্রকার সৎ, নির্লোভ, নিরাসক্ত, উদারহৃদয়। তাঁহাদের কেহ-বা আমরণ রাজনীতি করিয়াও কোনোদিন ছোট কাজ করেন নাই, কেহ-বা ব্যবসা করিয়া কোটিপতি হইয়াছেন কিন্তু অসৎপথে একটা পয়সাও কোনোদিন পকেটে রাখেন নাই, কেহ-বা সাহিত্যক্ষেত্রে থাকিয়া ঈর্ষাহীন মনে শুধু সরস্বতীর সেবাই করিয়াছেন। তাঁহারা যেমনভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন ঠিক তাহাই অকপটে বলিষ্ঠভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। আত্মচরিতে কেহ তো মিথ্যাকথা লেখেন না। তাঁহারাও লেখেন নাই। কিন্তু আমি কী করিব? হলপ করিয়া এমন কথা বলিতে পারি না যে, জীবনে কোনো অন্যায় করি নাই। আমি চর্বির ঘি বেচিয়া পয়সা করিয়াছি, ইস্কুল চালাইয়া কাজের পুরা হিসাব হেডমাস্টারকেও দিই নাই, অনাথ-আশ্রমের সম্পাদক হিসাবে দায়কতব আসামীর কাঠগড়াতেও উঠিয়া আসিয়াছি। সে যাহাই হ'ক, আমি লিখিতাম। কিন্তু পড়িবে কে আত্মজীবনী মানেই সাধুপ্রকৃতি মানুষের জীবনী। আমার আত্মজীবনী তো কেহ পড়িবে না! ভাবিয়াছিলাম, যেমন করিয়া যাহা করিয়া আজ সমাজের এমন একজন কেউকেটা হইয়াছি, তাহা লিখিয়া সাব-সাধা

গবেষকদের জন্য কিছু রসদ রাখিয়া যাইব। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, গোড়ায় ভুল করিয়াছি। প্রায় প্রত্যেকেই আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—তিনি নির্লোভ, নিরাসক্ত, ঈর্ষা-হিংসা-হীন ছিলেন। তাঁহাদের কাহিনী লোকে পড়ে। কিন্তু আমি যদি লিখি—আমি বরাবর সুযোগ পাইলেই অপরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছি, তাহা হইলে লোকে পড়িবে কেন? তবে কি সেসব বেমালুম চাপিয়া যাইব? ক্ষতি কী? পৃথিবীতে একমাত্র জটিরাম চাকলাদার না-হয় আত্মজীবনীতে দুটি মিথ্যা-কথা লিখিল! তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যাইবে না। এক-কলসী সত্যের মধ্যে জটিরামের একবিন্দু মিথ্যার জল পড়িলে ল্যাক্টোমিটারের আবিষ্কর্তারও সাধ্য নাই তাহা ধরে। তবু বিবেকে বাধিতেছে। আত্মজীবনীকারের অধিকাংশই যখন নিজের সম্বন্ধে নির্ভেজাল সত্যকথা লিখিয়া গিয়াছেন, তখন মিথ্যাকথা দিয়া আমি শুধু শুধু এক ভেজাল সৃষ্টি করি কেন? ঘি-মাখনে ভেজালএক কথা। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনচরিতে ভেজাল দিব?

তাই মনস্থ করিলাম, আত্মজীবনী লিখিব না। যদি পরের জন্মে আগে হইতে খেয়াল থাকে তাহা হইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। দেশী-বিদেশী বহু আত্মজীবনী এযাবৎ পড়িয়া আমার মন দমিয়া গিয়াছে। এত সাধুতার রাজ্যে মিথ্যার আশ্রয় লইতে পারিব না। হয়তো জটিরাম চাকলাদারের আত্মচরিত পড়িয়া দু'চারজনের একটু উপকার হইতে পারিত। কিন্তু না, জটিরাম চাকলাদার আর যাহাই হউক, মিথ্যাকথা লিখিয়া আত্মজীবনীর এই পবিত্র বাতাসকে কলুষিত করিতে পারিবে না।

●

“উমেশ যোগ দর্শন”
(প্রথম খণ্ড)
চারিটি ভাষায়: ইংরাজী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী
(গ্রন্থকার: শ্রীযোগীরাজ উমেশচন্দ্রজী)

UMESH YOGA DARSHAN

যোগ সম্বন্ধে একটি চমৎকার নিবন্ধ, যাহা ব্যাখ্যা কোরেছে কিভাবে হজমীশক্তি, শ্বাসযন্ত্র ও অন্যান্য শারীরিক অঙ্গসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১০৮টি বাস্তব আসনের চিত্রে সম্পূর্ণ। যোগের দ্বারা নেচারোপাথি, ক্রোমোপাথি, সাইকো-থেরাপি ইত্যাদি নিরাময় সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। প্রতিটি গৃহ, হাসপাতাল ও গ্রন্থাগারে যোগ্য স্থান পাবার অধিকারী। মূল্য ১৫৲; ডাকখরচ অতিরিক্ত; ডি. পি. করা হয় না।

যোগাসন চার্ট
আর্ট প্লেজড্ কাগজে ছাপা, যোগাসনের চিত্র সম্বলিত একটি ছবির তালিকাও পাওয়া যায়। ডাকখরচ সহ মূল্য ২·৫০ ন. প. মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিতব্য।

রামতীর্থ ব্রাহ্মী তৈল
পেটেন্ট নং ১
রেজিষ্টার্ড

মরামাস খুস্কি নিবারণ ও চুলওঠা বন্ধ করার জন্য একটি অমূল্য বলকারক। বহু মূল্যবান মৌলিক উপাদান সহযোগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মস্তিষ্কের চলাচল ব্যবস্থা উন্নত করে এবং সুনিদ্রা আনয়ন করে। অঙ্গমর্দনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। সকল ঋতুতে ইহা প্রত্যেকের পক্ষে উপকারী। বড় বোতল ৪৲, ছোট ২৲, সর্বত্র পাওয়া যায়।

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম
দাদার, সেন্ট্রাল রেলওয়ে : বোম্বাই-১৪
টেলিফোন—৬২-৮১১ টেলিগ্রাম “প্রাণায়াম” দাদার : বোম্বাই

অথ নাট-ঘটিত

সূত্রধার

১৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষকে, অমৃতলাল বসুকে প্রযোজক বলতে পারিনি বলে দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু কি ক'রে বলি। 'রাণা প্রতাপ'-এ শক্তসিংহ রূপে অমৃতলাল বসু যে পাগড়ি পরে দেখা দিলেন তার খানিকটা মিল গ্রীক-সৈন্যের শিরস্ত্রাণের সঙ্গে। হিন্দু পশুপতি-বেশে গিরিশচন্দ্র যে পরিচ্ছদ পরলেন ঠিক সেই পোশাকই দেখলুম তাঁর পুত্র দানীবাবুর গায়ে, তিনি মুসলমান নবাব সিরাজদ্দৌলা। একই দিন 'অশোক'-এও চলেছে—'যায়সা ক্যা ত্যায়সা'র-ও চলেছে। আসবাবপত্র সম্বন্ধে সমান ব্যবস্থা; যে-সিংহাসনে অশোক বসেছেন ঠিক সেই সিংহাসনে এসে বসলেন শাজাহান। গুরুগম্ভীর নাটকের মধ্যে হালকা রসের গান ঢুকে জিনিসটার রসভঙ্গ ক'রে দিয়েছে, তাঁদের আসরে বহুবার দেখেছি। এ-সব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা তাঁরা যে বুঝতেন না তা নয়, পয়সার অভাব ছিল তাও বলতে পারিনে, কিন্তু এ-সব মানানসই ক'রে নেবার কথা তাঁদের হয়ত মনেই আসত না।

স্টারে 'কর্ণার্জুন' ও নাট্যমন্দিরে 'সীতা' বাংলা-নাট্যশালায় এক নবযুগের তূর্যধ্বনি করল। নাটক অভিনয়ের একটি সমগ্র সুচারু রূপ দর্শকের চিত্তকে ভরিয়ে দিল। আখ্যানবস্তু নিলেন তাঁরা সেই কবি-যুগলের কাছ থেকে "যাদের বাণী বহু কোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্র ধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিয়াছে"।

অপরেশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র তাঁদের নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরামকে দেবত্ববিগ্রহ অর্পণ করেননি, তাঁদের মানুষ করেছেন, নরোত্তম করেছেন; তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। এ না করলে ও-দুটি নাটকই হত না। কিন্তু কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রত্যেকটাতেই রয়ে গিয়েছে। রামের ভাবপ্রবণতা বড়ো বাড়াবাড়ি হয়েছে, আর বীর কর্ণ নিয়তির দ্বারা বিড়ম্বিত এ কথা সত্য, কিন্তু মনের উপর সর্বগ্রাসী নিয়তিকে সহ্য করা শক্ত। রূপায়ণে দু'জায়গায়ই ভারতীয় শিল্পপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, কিন্তু নাট্যমন্দিরে তা অধিকতর সূক্ষ্ম, অধিকতর

'চিরকুমার সভা'য় রসিকের ভূমিকায় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণ্ডিত। অভিনয়ে শিশিরকুমার অতুলনীয়—a class by himself, তাঁর পর আসেন স্টারের অপরেশ—তিনকড়ি—নরেশ—অহীন্দ্র—দুর্গাদাস। শিশিরকুমারের সঙ্গে রইলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায় প্রভৃতি।

শিশিরকুমার কতকগুলি রুচির অভিনবত্ব আমদানি করলেন যা দর্শককে তৃপ্তি দিল। টিকিট কিনেই দর্শক দেখল তার লেখা বাংলায়। অভিনয় আরম্ভ হতে দেখল ফুটলাইট নেই। সাধারণ অবস্থায় আলো নিচে থেকে এসে তো মানুষের মুখের উপর পড়ে না, পাশ থেকে উপর থেকে আসে; শিশিরকুমার সেই ব্যবস্থাই করলেন। প্রথম যুগে সোনালির জড়ানো রাজপ্রাসাদ অবশ্য দুলতে দুলতে নামত; তার পরে সেট-সিন যখন আরম্ভ হল তখন একটা অঙ্কের শেষ সিনে তা দেওয়া হত; এখন প্রতিটি সিন-ই সেট-সিন; উইংস্ উঠে গেছে। কনসার্টের বিলোপ বহু হয়েছে। শেষ দৃশ্যে এক জনতা আছে। সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। পঞ্চাশ ষাট জন লোক মঞ্চে দেখা দিল,—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ চলছে,—বিভিন্ন ভঙ্গিতে; অলিন্দ নির্মিত হয়েছে, সেখান থেকে অন্তঃপুরচারিণীরাও দেখছেন; মঞ্চের উপর সকলেই অভিনয় করছেন, কেউ ভাষায় কেউ ভাবে।

স্টারে পুরানোদের মধ্যে আছেন একমাত্র অপরেশচন্দ্র; তিনি সম্পূর্ণভাবে নবীনদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের শিল্পরীতিতে সজ্জিত-মঞ্চকে কর্ণ ও অর্জুন রূপে যখন তিনকড়ি চক্রবর্তী ও অহীন্দ্র চৌধুরী প্রবেশ করলেন তখন তাঁদের সুঠাম দেহ, তাঁদের বেশভূষা, দেখে দর্শক মনে মনে বলল—তোমাদেরই তো এতদিন খুঁজছিলুম। শকুনি চরিত্রকে অপরেশচন্দ্র এক নতুন রূপ দিয়েছিলেন, আর নরেশচন্দ্র মিত্র তা অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুললেন। রাজসভায় বহু লোকের মধ্যে দিয়ে বিকর্ণ উপর থেকে নেমে এল, অল্প গোটাকতক কথা বলে চলে গেল; দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নয়নাভিরাম দেহ, তাঁর বাণী, তাঁর চলা, তাঁর চাওয়া, তাঁর অপূর্ব বাচনভঙ্গি দিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বঙ্গ-রঙ্গালয়কে জয় ক'রে নিলেন।

ওদিকে লব-কুশের উক্তি শুনে রাম-বেশী শিশিরকুমার যখন চমকিত হয়ে বললেন,—সেই কণ্ঠস্বর, তখন দর্শকও সঙ্গে সঙ্গে চমকিত হল, আর আজও সেই দুটি কথা তার কানে ঝংকৃত হচ্ছে।

এর কিছু পরে দেখা দিল—স্টারে অপরেশচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ' ও নাট্যমন্দিরে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ'। 'শ্রীকৃষ্ণ' প্রযোজনায় স্টার বহু অর্থ ব্যয় করল, কিন্তু নাটকখানি ছিল কতকগুলি ঘটনার তালিকা, মোটেই তা জমল না। ক্ষীরোদপ্রসাদ বহু নাটক রচনা করেছেন, অধিকাংশই তেমন কিছু নয়, কিন্তু 'নরনারায়ণ'এ তিনি সাফল্যলাভ করলেন আর শিশিরকুমার তা যথাযথ ভাবে প্রযোজনা করলেন।

প্রতি সম্প্রদায় এখন রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করতে উদ্‌গ্রীব। স্টার পেল 'চিরকুমার সভা', নাট্যমন্দির 'শেষরক্ষা'। রবীন্দ্রনাথ এতদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে ছিলেন, এখন তিনি তাদের প্রীতির চক্ষে দেখতে লাগলেন; মাঝে মাঝে তাঁর নাটকের অভিনয় দেখতে আসতেন। 'চিরকুমার সভা'র গানের সুর তুলে নেবার জন্য স্টারের সংগীত-শিক্ষক রাধাচরণ ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতনে গেলেন। ভদ্রলোকের কৃতিত্বে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হলেন; কাছে কোনো বাদ্যযন্ত্র নেই, কখনও রবীন্দ্রনাথ কখনও দিনেন্দ্রনাথ গেয়ে চলেছেন, ভদ্রলোক স্বরলিপি ক'রে যাচ্ছেন। স্টারে

দিনেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে গানের শেষ মহড়া দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ দু'দিন এসে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখে গেলেন। রসিকের ভূমিকায় অপরেশচন্দ্রের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন; অহীন্দ্র চৌধুরীর চন্দ্রবাবুতে তিনি প্রীত হলেন; কিন্তু পূর্ণ-রূপী দুর্গাদাসকে যেই প্রশংসা করা হয়, তিনি চুপ ক'রে থাকেন, শেষে বললেন,—আমি পূর্ণকে খুব লাজুক করেছি। এই প্রসঙ্গে এরপরের এক অভিনয়ের কথায় আসা যাক। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে এক চেয়ারে ব'সে 'গোরা'র অভিনয় দেখলেন; আনন্দময়ী সম্বন্ধে বললেন,—সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মেয়েরা যে এত ভালো অভিনয় করে আমি জানতুম না। এই ভূমিকায় নেমেছিলেন রাজলক্ষ্মী নামে একটি মেয়ে। ভূমেন রায়ের গোরা ভালো হয়নি এই মত কেউ কেউ প্রকাশ করায়, তিনি বললেন,—আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, গোরা আইরিশম্যানের ছেলে, ও খুব ভালো করেছে।

'শেষরক্ষা'র চন্দ্রবাবু শিশিরকুমারের এক সৃষ্টি; এর অভিনয়ের শেষ দৃশ্যে শিশিরকুমার মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন। অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রীত হলেন। শিশিরকুমার তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন; শিশিরকুমার-প্রযোজিত অপরের রচিত নাটকও তিনি দেখে গেছেন, 'সীতা' দেখেছেন, 'রীতিমত নাটক' দেখেছেন।

এর পরে একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'যোগাযোগ'এর অভিনয় দেখতে দেখতে বললেন,—শিশির তো ভালো করবেই, কিন্তু কুমুদিনী করল কে? মেয়েটি তো চমৎকার অভিনয় করে। কুমুদিনীর ভূমিকা নিয়েছিলেন কঙ্কাবতী, তিনি ছিলেন একজন গ্র্যাজুয়েট।

রঙ্গমঞ্চের ভিতরকার অন্তরিক্ষের খবর শুনে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হলেন। 'গোরা' অভিনয়ে ললিতার ভূমিকা নিয়েছিল যে-মেয়েটি সে কালিদাসের 'রঘুবংশম্' থেকে একটি শ্লোক চমৎকার আবৃত্তি করল। মেয়েটি লেখাপড়া কিরকম জানে রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করলেন। আর্ট থিয়েটারের সেক্রেটারি প্রবোধচন্দ্র গুহ জানালেন যে, ওই মেয়েটি টিপসই দিয়ে মাইনে নেয়, তার বর্ণাক্ষর-জ্ঞানও নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ শিশিরকুমার একে একে অভিনয় করতে থাকলেন। 'ষোড়শী'র জীবানন্দে তিনি যা দিয়ে গেলেন, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তা অতুলনীয় হয়ে রইল; এ জীবানন্দ যেন শরৎচন্দ্রের জীবানন্দকে ছাপিয়ে গেল। অমৃতলাল বসু একসময় বলেছিলেন—"'ষোড়শী'র জীবানন্দের মতো wretched

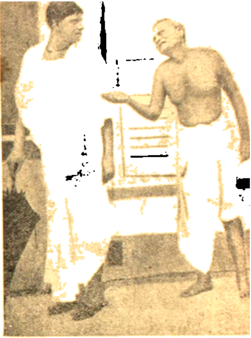

'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় রানীবাবু

part-এ dignity দেওয়া একমাত্র শিশিরেই সম্ভব।" অনেকগুলি পুরানো নাটকের অভিনয় ক'রে অভিনয়ধারাকে তিনি নতুন পথে চালিত করলেন। 'রঘুবীর' তো আগে অভিনীত হয়েছিল, শিশিরকুমার তার এক অনবদ্য রূপ দিলেন; তারাসুন্দরীকে দিয়ে 'জনা'কে কিছু কিছু অদল-বদল ক'রে মঞ্চস্থ করলেন, নিজে প্রবীর। 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ তাঁর এক অতুলনীয় সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদ দেখিনি। তুলনা করতে পারলুম না।

স্টার 'চন্দ্রগুপ্ত'র পুনরভিনয় করল। রানীবাবু আগের দিনের চাণক্য; এখন চন্দ্রগুপ্ত হলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী সেলিউকস, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় অ্যান্টিগোনাস, নরেশচন্দ্র মিত্র কাত্যায়ন, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দ, তিনকড়ি চক্রবর্তী ভিক্ষুক। পোশাক-পরিচ্ছদ কালোপযোগী। 'চন্দ্রগুপ্ত'র এরকম সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আগেও হয়নি, পরেও আর হল না। 'সাজাহান'এ নাম-ভূমিকায় এক নতুন রূপ ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের চমৎকৃত করলেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

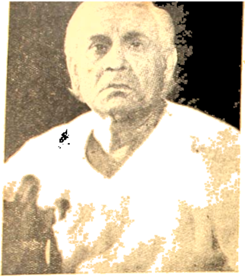

'ষোড়শী' নাটকে জীবানন্দের ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী

অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাস কোনোদিন নাম করেনি। অপরেশচন্দ্র ওই উপন্যাসের এক নাট্যাকৃতি দিলেন; তিনকড়ি চক্রবর্তীর মধুরো দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিল; অহীন্দ্র চৌধুরীর মৃগাঙ্কে দর্শকরা মুগ্ধ হল। এই মৃগাঙ্ক-ভূমিকায় পরে একে একে দেখা দেন দুর্গাদাস ও শিশিরকুমার; তিনজনেরই অভিনয়—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ্; শেষে এই চরিত্রে হাড়ুবাবুও অবতীর্ণ হন।

নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটার বাংলার রঙ্গমঞ্চকে সঞ্জীবিত করল। কিন্তু এই নবজীবনের স্পন্দন বেশিদিন স্থায়ী হল না। কয়েক বছরের মধ্যেই উভয় সম্প্রদায় নিজেদের গুটিয়ে নিল। কিন্তু কেন নিল?

কেউ কেউ বলেছেন, দর্শকের সহৃদয়তার অভাবই এর জন্য দায়ী। কিন্তু কথাটা বিচারসহ নয়। শিশিরকুমারের অভিনয় দেখতে নাট্যমন্দিরের প্রেক্ষাগৃহ রাতের পর রাত জনপূর্ণ হয়েছে। 'চিরকুমার সভা'র অভিনয়ের সময় একদিন মহাদেব দেশাইকে বসাতে হয়েছিল স্টেজের ভিতর থেকে একখানা চেয়ার এনে। প্রেক্ষাগৃহে একখানা চেয়ারও খালি ছিল না। সাধারণত দেখা যায় প্রেক্ষাগৃহ-গ্যালারি থেকে ভরতে থাকে, বেশিদামের আসন অনেক খালি থাকে। 'চিরকুমার সভা'র ব্যাপারটা হল বিপরীত; আস্তে ভরে যেতে থাকল উচ্চদামের আসনগুলি। সাহেব-সুবোরাও আসতে লাগল। তাদের হাতে একখানা ক'রে ইংরেজি সংক্ষিপ্তসার দেবার প্রস্তাব করায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—ও-কাজ করতে যাবেন না, ওরা এ বই-এর রস ঠিক ধরতে পারবে না, ওদের ভাষী বলে কিছু নেই।

নবযুগের প্রচেষ্টাকে দর্শক আনুকূল্য করেছিল। এর মূলে অর্থ নৈতিক কারণই ছিল।

ক্লাসিক থিয়েটার খোলবার আগে স্টারের মাসিক খরচ ছিল সাত-আট শ' টাকা। আর্ট থিয়েটার যখন পুরোদমে চলেছে তখন খরচ দাঁড়িয়েছে মাসে বারো হাজার টাকার উপর। এই চল্লিশ বছরে অভিনয়-দর্শনেচ্ছুর সংখ্যা নিশ্চয় বেড়েছে, শহরবাসীর অপেক্ষাকৃত অর্থ-সচ্ছলতা এসেছে, কিন্তু তা কি ওই হারে? আয় বাড়াবার জন্যে স্টার একসময় সপ্তাহে বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র-শনি-রবি এই পাঁচদিন অভিনয় চালাতে থাকল; কিন্তু অভিনয়-রাত্রির সংখ্যা বাড়ালে কি তদনুপাতে আয়ের মাত্রা বেড়ে যাবে? একটা উদাহরণ দিই। স্টারে এক রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র পুনরভিনয় হল; ওসমান—দানীবাবু,

নরেশচন্দ্র মিত্র

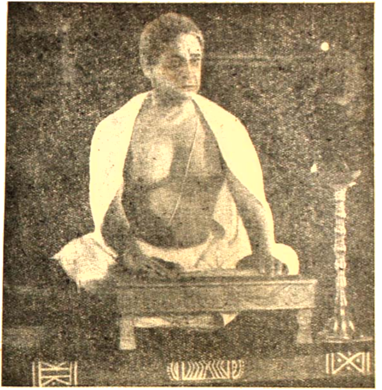

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আয়েষা—তারাসুন্দরী, বিমলা—কুসুমকুমারী। এঁরা এখন ঠিকা হিসেবে কাজ করেন, প্রতি অভিনয়ে দানীবাবু পান এক শ', তারাসুন্দরী এক শ', কুসুমকুমারী পঞ্চাশ টাকা। রয়ালটি হল ত্রিশ টাকা। এই তো হল দু শ' আশি; এরপর আছেন রঙ্গালয়ের বাকী অভিনেতা-অভিনেত্রী, আলোর খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচ, আরও অনেক কিছু। অভিনয় হল এক বে-বারে। বিক্রি হল দু শ' চল্লিশ টাকা। কতদিন এভাবে চলে?

নাট্যমন্দির, আর্ট থিয়েটার উঠল। বন্যাস্রোত ক্ষীণীভূত হয়ে এল; কিন্তু সেই বন্যা পলিমাটি রেখে গেল। নতুন যুগের অভিনেতৃদল [illegible] থিয়েটারে ছড়িয়ে পড়ল। শিশিরবাবুর, অহীন্দ্রবাবুর, দুর্গাদাসবাবুর, নরেশবাবুর অভিনয় আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু জোট বেঁধে এখন আর তাঁরা দেখা দেন না। অভিনেতা শিশিরকুমার অন্তরালে গেলেন না, কিন্তু [illegible] শিশিরকুমার বিদায় নিয়েছেন। এর পরেও 'সীতা' দেখেছি, তা প্রথমদিনের 'সীতা'র কঙ্কাল মাত্র।

আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দির যখন দেখা দিল তখন পুরানো দলের কতক অবসর নিলেন, কতক জুটলেন মিনার্ভায়। পুড়ে যাবার পর নতুন ক'রে যখন ওই রঙ্গালয় নির্মিত হল তখন ওখানে একবার মঞ্চস্থ হল মহাতাপচন্দ্র ঘোষের 'আত্মদর্শন'। এটি একখানি সাংকেতিক নাটক, তবে অতি স্থূলভাবে গ্রথিত; সাধারণ দর্শকের মনঃপূত হল, বিপুল লোকসমাগম হতে থাকল। এর বছর দুই পরে ওই রঙ্গমঞ্চে একবার অমৃতলাল বসুর 'যাজ্ঞসেনী' অভিনীত হল; অমৃতলাল নিজে শিক্ষাদান করেছেন; দানীবাবু ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় নামলেন। কিন্তু তখন নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটার 'জমিয়ে' দিচ্ছে; 'যাজ্ঞসেনী' জমল না।

এর মাঝে একসময় অ্যালফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে নির্মলেন্দু লাহিড়ী মিত্র থিয়েটার খুললেন; মঞ্চস্থ করলেন

'মন্ত্রশক্তি' নাটকে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'শ্রীদুর্গা'; শ্রীদুর্গা—তারাসুন্দরী, কামকলা—কুসুমকুমারী, মহিষাসুর—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। চলল না।

ভবানীপুরে রসা থিয়েটার, কালিকা কিছু সময় নাটক অভিনয় করেছিল, কিন্তু বেশিদিন চলল না।

আর্ট থিয়েটার একসময় মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে স্টার ও মনোমোহন চালাতে লাগল। মনোমোহনে অভিনীত হল অপরেশচন্দ্রের 'রামানুজ'; নাটক-রস তাতে কিছুই নেই, কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি। মন্মথ রায়ের 'চাঁদসদাগর' অভিনীত হল; চাঁদসদাগর—অহীন্দ্র চৌধুরী, বেহুলা—ফণীবালা। বই ভালো, অভিনয়ও হল ভালো, কিন্তু অর্থাগমের দিক দিয়ে কিছুই হল না, তার প্রধান কারণ নাট্যমন্দিরে তখন 'ষোড়শী'র অভিনয় জোর চলেছে। আর্ট থিয়েটার মনোমোহন থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে আবার স্টারে সংহত হল।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ বিডন স্ট্রীটে এসে থেমেছিল, তার কিছু পরে মনোমোহন নাট্যশালার উপর দিয়ে কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের স্টীম-রোলার চলল। বিডন স্ট্রীটে রইল এখন একমাত্র মিনার্ভা থিয়েটার; কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে রঙমহল দেখা দিল, পাশের গলিতে নাট্যনিকেতন।

•

এখন আমরা এসে পড়েছি বর্তমান যুগে। এ যুগের স্মৃতি বহন করছেন এরকম লোক বহু রয়েছেন, সুতরাং এসময়কার ইতিহাস লেখা নিষ্প্রয়োজন। সমগ্র চিত্রটার উপর শুধু একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

এ সময় সিনেমা তার মুখব্যাদান ক'রে নাট্যশালাকে গ্রাস করতে আসছে। অবলুপ্তির হাত হতে নিজেকে রক্ষা করতে থিয়েটারকেও তার ধারার কিছু পরিবর্তন করতে হল। সিনেমা শেষ হয় তিন ঘণ্টার মধ্যে, কিন্তু থিয়েটার পাঁচ ঘণ্টার উপর চলে, দর্শক অতক্ষণ আটকে থাকতে চান না। এখন নাট্যকার তিন ঘণ্টার মতো নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথম শনি ও রবি দু'দিন, পরে শুধু রবিবার দু'বার ক'রে ওইরকম নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকল। মঞ্চে অভিনীত যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাকে অনুসরণ ক'রে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা করলেন সতু সেন। তিন ঘণ্টায় বই শেষ করতে হবে, সুতরাং বিরতির কাল যথাসম্ভব কম করা প্রয়োজন। কয়েকটি রঙ্গালয়ে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের সৃষ্টি হল। কিন্তু এর অসুবিধাও দেখা দিল। এতে মঞ্চের দুই-তৃতীয়াংশ দর্শকের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়; সুতরাং 'সীতা'র 'কর্ণার্জুন'এ রাজসভার যেসব দৃশ্য তা এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চে দেখানো চলে না। তার জন্য ওয়াগন-মঞ্চও তৈরি হল, কিন্তু তা বিশেষ কার্যকর হল না।

এর আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ-বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি এক এক জন মনীষী বিভিন্ন মঞ্চের বহু নাটক লিখে গেছেন। এঁদের অবর্তমানে নাটক-রচনা ব্যক্তিবিশেষে সংহত রইল না, তা ছড়িয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই সাহিত্য এতে লাভবান হল। কেউ কেউ মনে করেন নাটক-রচনার ইতিহাসে এখন থেকে একটা অন্ধকার যুগ এল। এ কথা মেনে নেবার কোনো কারণ নেই। শচীন

সেনগুপ্ত 'সিরাজদ্দৌলা' লিখলেন, আগেকার 'সিরাজদ্দৌলা'র পাশে তা মোটেই নিষ্প্রভ হল না। নাটকটি সু-অভিনীত হল। তাঁর 'গৈরিক পতাকা'ও বেশ জনপ্রিয় হয়। তিনি অনেকগুলি সামাজিক নাটকও রচনা করলেন। 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকে তিনি অস্ত্রের মধ্যে যুদ্ধ আনলেন না; এই নতুন পরীক্ষায় তিনি সাফল্যলাভ করলেন। তাঁর 'তটিনীর বিচার'এ অহীন্দ্র চৌধুরী ভণ্ড ভোলের ভূমিকায় দর্শককে আনন্দ দিলেন।

'কল্যাণীর ঘাট' নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী

মন্মথ রায়ের 'কারাগার' একখানি উচ্চশ্রেণীর পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক নাটক ব'লে পুলিসের কাছ থেকে অভিনয়ের অনুমতি পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কিন্তু অভিনয়কালে পুলিশ দেখল পৌরাণিক কাহিনী এর শুধু মুখোস, এ দিয়ে তো তীব্র রাজদ্রোহিতার প্রচার! বন্ধ কর্, বন্ধ কর্।

অ্যালফ্রেড থিয়েটারে নাট্যভারতী কিছু সময়ের জন্য দেখা দিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' সু-অভিনীত হল। জলধর চট্টোপাধ্যায়ের এক অতি সাধারণ নাটক 'পি-ডবলিউ-ডি' বেশ দাঁড়িয়ে গেল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়-কৃতিত্বে। অন্যত্র অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর অভিনয়-চাতুর্যে জনপ্রিয় ক'রে তুললেন অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাস্টার'। নাট্যনিকেতনে মহেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' সু-অভিনীত হল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রহসনগুলিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্জন ক'রে বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করেছিলেন। বহুকাল পরে এইরকমের একখানি হাস্যোজ্জ্বল নাটিকা দেখা দিল—রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়া যাবে ব'লে বেশ আশা করেছিল, কিন্তু এই প্রতিভাশালী লেখক অল্পবয়সে পৃথিবী ছেড়ে গেলেন। 'ঋণং কৃত্বা' নাটিকায় প্রমথনাথ বিশী বিশুদ্ধ হাস্যরস পরিবেশন করলেন, কিন্তু দু'তিনখানি এইরকম নাটিকা লিখে তিনি হাত গোটালেন। এদিকটা এখন থেকে অন্ধকারে ঢেকে গেল।

মহেন্দ্র গুপ্ত স্টারে প্রতিষ্ঠিত থেকে কয়েক বছর ধরে অনেকগুলি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করলেন। তিনি নিজেই লেখক ও অভিনেতা। স্মরণ ক'রে রাখবার মতো সে-সবে কিছুই ছিল না। একসময় তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র রূপদান ক'রে অভিনয় করেন।

শিশিরকুমার এ-রঙ্গালয় ও-রঙ্গালয় ঘুরে স্থায়িভাবে এলেন নাট্যনিকেতনে। তার নাম রাখলেন, শ্রীরঙ্গম্। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকখানি উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করতে থাকলেন। 'বিজয়া'র রাসবিহারীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় একটু যেন হালকা হ'ল—এতে শরৎচন্দ্রের চক্রী, গূঢ় রাসবিহারীকে পাওয়া গেল না ব'লে কেউ কেউ মনে করেন। শিশিরকুমারের ভ্রাতা বিশ্বনাথ কয়েকখানি নাটকে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন। 'বিপ্রদাস'এ বিশ্বনাথের বিপ্রদাস অবিস্মরণীয়। বিশ্বনাথ অন্যত্র চলে গেলেন, তারপর ওই শক্তিশালী নট অকালে দেহত্যাগ করেন।

এর পর শিশিরকুমারের সম্প্রদায়ে উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যা কমতে থাকল, ফলে প্রেক্ষাগৃহ আর পূর্ণ হয় না। একবার ব্যতিক্রম দেখা গেল নিতাই ভট্টাচার্য রচিত 'মধুসূদন'এর অভিনয়ে। নাটকখানি যেমন হোক, ওই নাটকে শিশিরকুমারের আবৃত্তি যিনি না শুনেছেন, কালিকলমের সাহায্যে তাঁকে তা বোঝানো সম্ভব নয়। রঙমহলেও বনফুলের 'মধুসূদন' অভিনীত হল, শ্রীরঙ্গমের 'মধুসূদন'এর কাছ দিয়েও তা গেল না। শ্রীরঙ্গমের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে চলল, ফলে শিশিরকুমারকে সাধারণ রঙ্গালয় ছেড়ে দিতে হল।

এর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, বাংলার দুর্ভিক্ষে, স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতে, দেশ-বিভাগে বাংলার ইতিহাস দ্রুত বদলাতে থাকল, সঙ্গে সঙ্গে নাটক-লেখার পদ্ধতি তার চিরাচরিত পথ ত্যাগ করল। পৌরাণিক নাটক অচল হয়েছে, রাজনৈতিক নাটকের চাহিদা চলে গিয়েছে, সমাজ-সংস্কার-সম্বন্ধীয় নাটকের আর দরকার নেই। এখন দেখা দিল মানুষের মনকে কেন্দ্র ক'রে সময়োপযোগী বিভিন্ন নাটক। এইসব নাটক অভিনীত হতে থাকল সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে।

নির্মলেন্দু লাহিড়ী

অনেকক্ষেত্রে সেসব অভিনয় উচ্চপর্যায়ে উঠল। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এক নতুন সাড়া জাগাল। এইরকমের একখানি নাটক শিশিরবাবু মঞ্চস্থ করেন তাঁর শ্রীরঙ্গমে; নাটকখানি তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান'; দর্শক এ নাটক নেয়নি। কিছুদিন আগে শিশিরকুমার এক বক্তৃতায় 'দুঃখীর ইমান'কে ও তৎকর্তৃক পরে অভিনীত 'পরিচয়'কে যথার্থ নাটক ব'লে অভিহিত করেছেন। কাব্যের সমঝদার ও নাটকের সমঝদার তাঁর চেয়ে বড়ো হয়ত আর বেশি কেউ ছিল না; তাঁর মত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু দর্শকগণেরও বলবার কিছু আছে। 'দুঃখীর ইমান'-এর কথা ধরা যাক। অর্থনৈতিক সংকট মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিশেষ ক'রে দেখা দিয়েছে। সপ্তাহ ভরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে সে শনিবার কি রবিবার নাট্যশালায় যায় সংসারের জ্বালা হতে একটু জুড়োতে; সেখানেও যদি তিন ঘণ্টা ধরে তাকে শুনতে হয় অন্ন নেই বস্ত্র নেই, আর শুনতে হয় রংপুর জেলার গ্রাম্য 'বাহে' ভাষায় যার বারো আনা সে বোঝে না, তবে তার ধৈর্যচ্যুতির অপরাধ নেওয়া যায় না। 'পরিচয়'এর কথায় আসি। তার নাটকীয় মূল্য শিশিরকুমার বুঝুন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট-বিভাগের অধ্যাপকেরা বুঝুন, কিন্তু সাধারণ দর্শকরা তার থেকে পেল কি? নাটকে এক হিন্দুযুবক হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের কুৎসা ও গালাগালি ক'রে চলেছে; এতেই নাকি তার মনের উদারতা প্রকাশ পাচ্ছে। এই অভিনয় পরিত্যাগ ক'রে দর্শক কোনো নিন্দার কাজ করেনি।

সমালোচক দর্শকগণের পিঠে কশাঘাত ক'রে বলছেন,—শ্রীরঙ্গম্ ছেড়ে দর্শক কিনা জুটেছে স্টারে, রঙমহলে, বিশ্বরূপায়—যেসব জায়গায় দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে চার-পাঁচ শ' রাত্রি ধরে কতকগুলি বাজে নাটকের অভিনয় করানো হচ্ছে! গণিতের একটা অঙ্কের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক; অঙ্কটা সোজা। মনে করা যাক, বিদ্যালয়ের কোনো এক শ্রেণীতে দশজন ছাত্র আছে, একজন খুব ভালো, একশ'র মধ্যে একশ' পাবার মতো, আর বাকি নজন কুড়ি-নম্বর-মার্কা। এই ক্লাসের গড় মান দাঁড়াল আটাশ। অন্য এক ক্লাসে একশ' মার্কার কেউ নেই, নব্বই-আশিও নয়, আছে পাঁচজন ষাট-মার্কা আর বাকী পাঁচজন পঞ্চাশ-মার্কা-ওয়ালা। এখানে গড় মান দাঁড়াচ্ছে পঞ্চান্ন, প্রথমবারের গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। রঙ্গালয়ের ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে ঠিক সেইরকম। শিশিরকুমার একটি বটবৃক্ষ, কিন্তু তাঁর চারদিকে ছিল তৃণদল; সেখানে গড় মান আটাশ। আর অন্য রঙ্গালয়ে প্রথমশ্রেণীর অভিনেতা কেউ নেই বটে, কিন্তু তৃতীয়শ্রেণীর নিচেও কেউ নেই; সুতরাং এসব স্থানে গড় মান অনেক বেশি হল। অভিনয়ে team-work খুব একটা বড়ো কথা; তা ছিল না শ্রীরঙ্গমে; তা রয়েছে স্টারে, রঙমহলে, বিশ্বরূপায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মেনে নিতে হবে যে, যা অভিনয় হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সিনেমার সংলাপ, নাটক নয়; দর্শক পর্দায় two-dimensional-এর বদলে মঞ্চে three-dimensional figure দেখছে,—এইমাত্র তফাত। তবে ভালো কথাও আছে।

ষাট বছর আগে স্টারে অভিনীত 'বিজয়বসন্ত', ক্লাসিকে অভিনীত 'বিদ্যাসুন্দর' (যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'দুটি প্রাণ') দেশের একশ্রেণীর দর্শকের রসপিপাসা মিটিয়েছিল। আজ সাধারণ নাট্যশালাকে অভিনন্দিত করি, ওইসব শ্রেণীর দর্শকদের চাহিদা মেটাতে তারা নিযুক্ত হয়েছে। সেইসব দর্শক যে একেবারে অবলুপ্ত হয়েছে, মোটেই তা নয়। সংখ্যায় কমে গেলেও, তারা আছে, আর এখন তারা তাদের মনের খোরাক পাচ্ছে কতক কতক সিনেমায় প্রদর্শিত নিকৃষ্টশ্রেণীর ফিল্মে।

'রক্তকরবী'তে তৃপ্তি মিত্র ও শম্ভু মিত্র

কেউ কেউ বলছেন সাধারণ রঙ্গালয় আজ আর উচ্চশ্রেণীর নাটক নামাচ্ছে না। উচ্চশ্রেণীর নাটক বলতে কোন্ নাটককে বোঝায়? বঙ্কিমচন্দ্রের শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের নাট্যরূপ এইসব সাধারণ রঙ্গালয়েই অভিনীত হয়েছে; এখানেই অভিনীত হয়েছে 'সাজাহান' 'আলমগীর' 'চন্দ্রগুপ্ত'। এরা কোন্ শ্রেণীর নাটক? উচ্চশ্রেণীর নাটক বলতে যদি শুধু 'গৃহপ্রবেশ' 'রক্তকরবী'র মতো intellectual নাটক বোঝায়, তবে সেসব নাটকও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে; তবে ফলাফলটা কী হয়েছে শুনে মনে মনে হাসুন। আর্ট থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী একদিন স্টারে 'গৃহপ্রবেশ' দেখতে যান; আর [illegible] থেকে ফিরে এসে মনিবকে বললে,—আজ থিয়েটার হবে না, অহীনবাবুর অসুখ করেছে, দিদিমণি বার্লি করছেন, তিনকড়িবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। 'গৃহপ্রবেশ' একজন পাচকের মনের খোরাক যোগাতে পারবে না, এটা অবশ্য জানা কথা, কিন্তু কার পেরেছে? চতুর্থ রাত্রির পর তার সঙ্গে আর-একখানা বই জুড়ে দিতে হল, তাতেও বিশেষ কিছু হল না। কিছুদিন আগে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে শম্ভু মিত্র 'রক্তকরবী' ও 'ছেঁড়া তার'-এর অভিনয় আরম্ভ করলেন। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় 'ছেঁড়া তার' দু'রাত্রি ও 'রক্তকরবী' আট-দশ রাত্রি চলল।

এই 'রক্তকরবী'র অভিনয়ের কথায় আসি। রবীন্দ্রনাথ উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর অভাবে তাঁর এই নাটকখানি কোনোদিন মঞ্চস্থ করেননি। শম্ভু মিত্র সাহস ক'রে ওইখানি বেছে নিলেন। প্রথম যেদিন 'রক্তকরবী'তে শম্ভু মিত্রের কণ্ঠস্বর শুনলুম সেদিন ছ্যাঁৎ ক'রে পঞ্চাশ বছর আগের আর-এক থিয়েটার-কাপ্তেনের কণ্ঠস্বরের আমেজ

গেলুম। ইনি ছিলেন অমৃতলাল মিত্র। এখানে ব'লে নিই, বহু-রূপীকে চারজন নট—তাঁদের কণ্ঠস্বর দিয়ে শ্রোতাকে অভিভূত করেছেন; তাঁরা হলেন—অমৃতলাল মিত্র, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্ভু মিত্র। থাক সে-কথা। আমরা আগে বলেছি—নাটকে সাহিত্য, অভিনয়, সংগীত, নৃত্য ও চিত্রবিদ্যার একত্র সমাবেশ হয়েছে। শম্ভু মিত্র যেভাবে 'রক্তকরবী' ও 'চার অধ্যায়' প্রযোজনা করেছেন সেইরকম কৃতিত্বের সহিত যদি সংগীত-নৃত্য-সমন্বিত কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেন তবে অকুণ্ঠচিত্তে প্রযোজকের তালিকায় দেশবাসী রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমারের পাশে তাঁকে আসন দেবে। তবে আজকাল কেউ কেউ বলছেন যে, অভিনয়ের স্বচ্ছন্দগতিকে গান ব্যাহত করে, সুতরাং নাটকে গান থাকবে না। শম্ভু মিত্র এই মত পোষণ করেন কিনা জানিনে। ওইসব সমালোচকদের প্রশ্ন করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ' কি কোনোদিন অভিনীত হবে না, আর যদি হয় তবে কি গান বাদ দিবে; অর্থাৎ যতীন যখন বলবে—হিমি, সেই গানটা গা তো বোন,—হিমি উত্তরে বলবে—না দাদা, আমার মাথা টিপটিপ্ করছে! গান-বর্জিত 'গৃহপ্রবেশ'এর অভিনয় হবে যতীনের মৃত্যুর চেয়েও মর্মন্তুদ! এ কথা আমাদের কল্পনায় আসত না, যদি না সেদিন গানবিহীন 'অচলায়তন'এর অভিনয় দেখতুম। নাটকের অভিনয়ে গান থাকবে না বোধহয় সেই সম্প্রদায়ই বলে, যাদের দলে গান গাবার লোক নেই।

বহুরূপী ছাড়া আরও কয়েকটি সৌখিন নাট্য-সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে, যারা intellectual নাটক সুষ্ঠুভাবে অভিনয় ক'রে চলেছে; তা উপভোগ করবার মতো দর্শক বাড়ছে; তবে তার সংখ্যা এমন হয়ে দাঁড়ায়নি যাতে কেবলমাত্র তাদের জন্য একটি সাধারণ নাট্যশালা ধারাবাহিক অভিনয় চালিয়ে যেতে পারে। জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলে হয়ত তা এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সে সাহায্য যদিও না আসে, তাতেও আশঙ্কা করবার কিছু নেই। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি এগিয়ে চলেছে, আর তা চলবেও। বাধা-বিপত্তি যতই প্রবল হোক, সে তা অতিক্রম ক'রে আপনাকে প্রকাশ করবে—ফুলকে ফুটিয়ে তুলবে।

সমাপ্ত

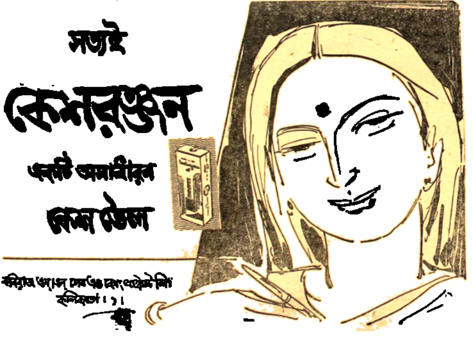

নীড় থেকে দিগন্তে

শম্ভুনাথ ঘোষ

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই ছাতি নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মাঠ ভোলা [illegible] গড়ের মাঠ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। প্রকৃতির এই আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই আমার। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘুরি। ঘুরতে ঘুরতে ভাবি। আর ভাবতে ভাবতে দেখি। ভাবনার শেষ নেই। যেখানেও নেইকো আদি-অন্ত। হারিয়ে ফেলি নিজেকে।

বৃষ্টির ধারা বেড়ে চলেছে। কোথাও একটু দাঁড়ানো যায় কিনা তাই ভাবছি। হঠাৎ পিছন থেকে নরম ঠাণ্ডা একটা কিছুর স্পর্শ দেহের ওপর অনুভব করে শিউরে উঠলাম।

—"ভয় পেলেন নাকি, দাদা?"

আচমকা প্রশ্নে ফিরে তাকালাম। নয়-দশ বছরের একটি ছটফটে ছেলে কখন এসে আমার ছাতির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। একেবারে ভিজে নেয়ে গিয়েছে।

—"তোমার ডান হাতে ওটা কি, খোকা? চকচক করছে। আর বাঁ হাতের পুঁটলিতে কি আছে?"

খোকা হাসল: "এ একটা বঁটি। ঘাস কেটে নিয়ে যাব।"

আমি শুধোলাম: "খোকা, তুমি কি ঘাস কাট?"

খোকা বললে: "খরগোস যে ঘাস খায়। তাইতো ভোর না হতে ছুটে পালিয়ে এসেছি। ঘাস নিয়ে যাব। কচি কচি। নরম নরম। জানেন কেকা যা-তা খায় না।"

বিস্মিত হয়ে বললাম: "কেকা কে, খোকা?"

—"বা রে! তাও জানেন না? আমাদের পোষা খরগোস। ভারী সুন্দর দেখতে। যাবেন আমাদের বাড়ীতে?"

লোভ সামলাতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম: "বাড়ীতে তোমার কে কে আছেন?"

খোকা জবাব দিল: "কেকা আছে। পাখি আছে। চম্পা আছে। চলুন আমাদের বাড়ীতে। সব—সব দেখিয়ে দেব।"

শিশু ভোলানাথ। প্রাণখোলা দিলদার মহেশ্বর। সংসারের জটিল আবর্তে বাধা পড়েনি। ওর সবই সাজে।

খোকাকে খুশী করবার জন্তে আমি বললাম: "যাব ভাই, নিশ্চয়ই যাব। তবে আজ নয়। অন্য একদিন।"

খোকা আহ্লাদে আটখানা। শুধু বললে: "কী মজা, কী মজা! আমি এক্ষুনি গিয়েই দিদিকে বলছি।"

ও চলে গেল। নটরাজের নৃত্যের ভঙ্গীতে। খুশীর হিল্লোল ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

শনিবার রাত তিনটে পর্যন্ত লিখেছি। আইনশাস্ত্রে থিসিস দাখিল করব। সংযুক্ত বিশ্বরাষ্ট্র-গঠন এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সম্পর্কের মূল্যায়ন—এই বিষয় নিয়ে পাঁচবছর ধরে গবেষণা করছি। নূতন ধ্যান-ধারণা, ভাব-ভাবনা আমার সমস্ত চিত্ত ও চেতনাকে অভিভূত করেছে। অন্তর ধ্যানের আসনে বসে আমি স্বপ্ন দেখছি। পূর্ব-পশ্চিমের মিলন হয়েছে। উত্তর হাত মিলিয়েছে দক্ষিণের সঙ্গে। প্রতিযোগিতার অবসান হয়েছে। সবাই বাঁচবে এই মন্ত্রবাণী ধ্বনিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে। নবজীবনের সিংহদ্বার খুলে যাচ্ছে। জ্যোতির্ময় প্রাণপুরুষ জাগছেন। জাগাচ্ছেন সুপ্তিলীনা বসুধাকে।

ভোরের প্রথম পাখীটি ডেকে উঠল। বিছানা থেকেই পূবের আকাশের রূপময় উদয়রাগ দেখলাম। আমার অন্তরদেবতাকে আর্ত প্রার্থনা জানিয়ে বললাম: "প্রভু, এমনি করে আমার মনের আকাশকে তুমি রাঙিয়ে দিয়ো তোমার অমিত প্রসাদে, তোমার অরূপ বিভূতির বিলাসে। তোমার চরণে আমার অসংখ্য কোটি প্রণাম। আমি বড় দুঃখী। আমি খুব ছোট। 'দুঃখী জেনেই কাছে আস; ছোট বলেই ভালবাস'।"

রবিবারের সকাল। শ্রাবণের স্নিগ্ধ রূপশ্রী সকাল। ময়দানে বেড়াচ্ছি। পটভূমিতে আলোকের বিভাস। পুরোভূমিতে আনন্দের প্রকাশ।

সুরেলা মেয়েলী কণ্ঠের আহ্বানে চমকে উঠলাম: "শুনছেন?"

থমকে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখি অদূরে এক-তরুণী। বললাম: "আমায় ডাকছেন?"

সসঙ্কোচে মেয়েটি বললে: "হাঁ, দেখুন, একটু মুশকিলে পড়েছি আমি।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "কি হয়েছে আপনার? কি করতে পারি বলুন?"

—"এক ভদ্রলোককে খুঁজতে এসেছি এখানে। অথচ কোনোদিন তাঁকে দেখিনি।"

—"আশ্চর্য! বহুজনের মধ্যে সেই বিশেষ ব্যক্তিটিকে কেমন করে খুঁজে বার করবেন আপনি?"

—"বহুর মধ্যে বিশিষ্ট তিনি। নইলে অরুণকে বশ করা যার-তার সাধ্য নয়। তাঁকে যে বিশেষ প্রয়োজন আমাদের।"

—"অরুণ কে? তার সঙ্গে ভদ্রলোকের সম্পর্কই বা কি?"

—"অরুণ আমার ছোট ভাই। মাঝে মাঝে ঘাস কাটতে ময়দানে আসে। আমাদের খরগোসের জন্তে। এক বৃষ্টির দিনে ভদ্রলোকের সঙ্গে তার পরিচয়।"

আরও বিস্ময়ের পালা আমার। বললাম: "খরগোস! কী নাম তার?"

—"কেকা।"

—"কেকা!"

হেসে বললাম: "এতক্ষণে চিনলাম আপনাকে।

খোকার দিদি আপনি। ওঃ, প্রথম পরিচয় আমাদের মনে রাখবার মতো। ও বঁটি নিয়ে এসেছে ঘাস কাটতে। উপযুক্ত হাতিয়ার বটে। রীতিমতো ভয় পেয়েছিলাম। ভয় ভাঙলে দেখলাম কখন ওকে ভালবেসে, ফেলেছি। কী ব্যাপার বলুন তো? এই সকালে একলাটি এসেছেন অজানায় আবিষ্কারে।"

তরুণীর ব্যঞ্জনায় আনন্দান্বিত প্রত্যয়ের রূপলেখা ফুটে উঠল। কণ্ঠ ভরে তার উদ্বেগ ও আকুলতা। সে বললে: "আপনি! আর দেরি নয়। এখনি একটিবার আমাদের বাড়ীতে চলুন। পরশু থেকে অরুণের জ্বর। কাল রাত্রে তাপ খুব বেড়েছে। ডিলিরিয়ামের ঘোরে কেবলই বলছে —'আমি ঘাস কাটতে যাব। কেকা খাবে। দাদাকে দেখব। আমার দাদা আসছেনা কেন?' আপনাকে দেখলে অরুণ ভালো হয়ে উঠবে। বাবা আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন। বাতে শয্যাশায়ী না হলে তিনি নিজেই আসতেন।"

খোকার অসুখ। অরুণ রোগশয্যায়। ও আমাকে দেখতে চেয়েছে। এমন একান্ত করে আমাকে এত মূল্য কেউ কোনোদিন দেয়নি। আমি বললাম: "চলুন।"

অরুণ ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করছে। কোর্ট-ফেরত সেদিন অরুণকে দেখতে এলাম। এ বাড়ীতে আমার খাতির বেড়ে গেছে। বিপুল অভ্যর্থনা। রাজার আদর। উদার আপ্যায়ন। চায়ের মজলিসে অরুণের দিদি গীতা চ্যাটার্জি অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল: "ভালবেসে আপন করে নেবার এমন আশ্চর্য ক্ষমতা কোথায় পেলেন, মঙ্গলবাবু? যাদু জানেন নিশ্চয়।"

গৃহস্বামী পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় প্রতিধ্বনি করলেন: "সত্যিকথা বলতে কি, আমিও মশাই, আপনার প্রেমে পড়েছি। বহুরূপী আপনি। পেশা ওকালতি। নেশা সাহিত্য। বিনয়ে বৈষ্ণব। তেজে শাক্ত। কথার আর কথকতার রাশি রাশি ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন। আপনিই আপনার উপমা।"

অপ্রস্তুত হলাম। এরা বলে কি! আমার সহজ সৌজন্যে এরা ভুললো! শুধুমাত্র একটি শিশুর প্রীতির আকর্ষণে নিছক মানবিক কর্তব্যের তাগিদে এদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। এতেই এরা এত খুশী, এত মুগ্ধ।

পার্থসারথিবাবু বললেন: "আপনার রূপই আপনার বাণী। হৃদয় মাঝে আর [illegible] আড়াল নেই। আপনার সময় বা অসময়ও তাই। ভালবাসা আপনার রক্তে। আপনার মর্মে।"

অস্বস্তি বোধ করে বললাম: "আর সহ্য করতে পারছি না। দয়া করে এই প্রশস্তি থামাবেন? আমি জানি এর একতিল যোগ্যতাও আমার নেই।"

কে কাকে থামাবে? অন্তর্মুখী খরস্রোতা ফল্গুধারা। পার্থসারথিবাবু বলে চললেন: "আপনার দিদিদের যেটুকু শুনলাম, ভারী মনোজ্ঞ লাগল। এক পৃথিবী। অখণ্ড অভিন্ন অবিভাজ্য পরিবার। ভাবতেও ভালো লাগে। তবে কি জানেন? এক এক-সময় মনে হয় সবই বুঝি 'ইউটোপিয়া'। 'মিলেনিয়াম' আসবে না কোনোদিন। এক এক দিন দেখি দিগন্তকে রাঙিয়ে বালারুণের বিভা। আবার একসময় মনে হয় ঈশানের পুঞ্জ মেঘ আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শকে ছেয়ে ফেলেছে। সব অন্ধকার।"

কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। এবার বাড়ী ফিরতে হবে। বললাম: "যদি অনুমতি দেন, তাহলে এখন আসি।"

অরুণ বললে: "বা রে, এখন যেতে দেব না। সেই রাত্তিরে খেয়ে-দেয়ে যাবেন।"

গীতাও এই আবদারের সুরে সুর মিলিয়েছে: "কেম জব্দ! দেখি কেমন 'না' বলেন।"

বুঝলাম বিনা ভজিয়ে কাজ হবে না। অরুণের শয্যা পাশে দাঁড়িয়ে ওর মাথার পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম "অরুণ, তুমি অপরূপ! তোমার নেমন্তন্ন আমি নিলাম। তুমি সেরে উঠলে আমরা একসঙ্গে খাব। আসি ভাই!"

ছেলেকে যদি বা পারলাম, বুড়োকে অত সহজে পা কাটিয়ে যেতে পারলাম না। আসার সময়ে আমার হাত দু'খানি ধরে পার্থসারথিবাবু বললেন: "আবার আসবেন মঙ্গলবাবু। বিকেলটা ভালোই কাটলো। এ পাড়ায় নতু এসেছি। এখানে কেউ কারুর সঙ্গে মেলামেশা করে না। ঘর-বর আলাদা দুনিয়া। সেদিন সতেরো-নম্বর বাড়ী তিন-নম্বর ফ্ল্যাটে যখন বিয়ের উৎসব চলেছে ঠিক অন ওপরতলায় তেইশ-নম্বর ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক ভবপারার যা গেলেন করোনারি থ্রম্বসিসে। খবর পেয়ে দেখতে গেলাম গিয়ে দেখি তাজ্জব কাণ্ড। বিয়েবাড়ী থেকে একটি প্রাণী বেরিয়ে এল না। এই তো শহর। জনতা আছে। মানু কই? ভিড় আছে। জমাট ভাব কোথায়? আমি মর গেলে একটিবার দেখতে আসবেন, মশাই।"

অভয় দিয়ে বললাম: "ছেলেমেয়েদের সামনে অমন অলক্ষুণে কথা বলতে নেই। সাধ্য কি আপনাকে ভুলে যাব? নমস্কার—"

কোনোরকমে পালিয়ে এলাম। পার্থসারথিবাবুর কথা ফুরোবে না। ভদ্রলোক পাগল। বদ্ধ পাগল।

শনিবার বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরেছি। আদুরে ভাইপো দেবাশিস বললে: "কাকু, তোমার চিঠি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "কে দিয়ে গেল রে?"

আশিস উত্তর দিলে: "এলগিন রোড থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। নাম বললেন 'অরূপের দিদি'।"

পার্থসারথিবাবু আগামীকাল সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। লাকির জন্মদিন। চ্যাটার্জি-পরিবারের অতিপ্রিয় বিখ্যাত কুকুর। সেন্ট বার্নার্ড গোত্রীয়। পরিবারের একান্তই একজন। অরূপের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। নিমন্ত্রণ রক্ষা করলে প্রীত ও বাধিত হবেন পার্থসারথিবাবু।

পরের দিন যথাসময়ে পার্থসারথিবাবুর বাড়ী এলাম। আমার হাত ধরে অরূপ তার বাবার কাছে নিয়ে গেল। পার্থসারথিবাবু বললেন: "স্বাগতম্, মঙ্গলবাবু। কখন থেকে আমরা আপনার প্রতীক্ষা করছি।"

আমি বললাম: "অরূপ তো বেশ সেরে উঠেছে। আপনি কেমন আছেন?"

পাল্টা প্রশ্ন এল: "কেমন দেখছেন আমাকে?"

রোমান্টিক কবির ভঙ্গীতে বললাম: "ভালো। 'যেদিক-পানে নয়ন মেলি, ভালো সবই ভালো'। কিন্তু আমাদের গৃহলক্ষ্মী কই—আমার সীতা-বহিন?"

সহাস্যে পার্থসারথিবাবু বললেন: "হের হিটলারের অনুগামিনী হয়েছে সীতা-মা। ব্যাক্ টু কিচেন। আজকের প্রতিটি মেনু সে নিজে রান্না করছে। আমি নিষেধ করে বললাম—প্রয়োজন নেই যে, আমাদের খানাটা নষ্ট করিস্নে যেন। সীতা-মা বললে—'খানা মনোমতো না হলে কম্পেনসেশন দেব। আর যদি মুখরোচক হয় কী পুরস্কার দেবে, বাপী?' সাবাস বেটী।"

এমন সময়ে সীতা এল। কলকণ্ঠে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল: "রান্নাঘরে ছিলাম। দেরি হয়ে গেল। কেমন আছেন দাদামণি?"

তারপর বাবাকে উদ্দেশ করে সে বললে: "বাবা, চা তৈরী। নিয়ে আসি?"

পার্থসারথিবাবু সোৎসাহে বললেন: "শুভস্য শীঘ্রম্, মা-মণি। আপনি কী বলেন, মঙ্গলবাবু?"

আমি বললাম: "অমৃতে অরুচি নেই। আদেশ করুন।"

গৃহস্বামী কথা শেষ করতে দিলেন না। নির্দেশাত্মক ভঙ্গী করে বললেন: "আর কথা নয়, শুধু কাজ। একটু জলযোগ করুন। রাত্রে ডিনারের পর আপনার ছুটি।"

লাকিকে নিয়ে অরূপ এ-ঘরে এল। জন্মদিনের জমকালো সাজে সজ্জিত। আনন্দে চঞ্চল হয়ে ঘরময় ঘুরছে। আমি ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। আমার শুভ কামনা জানালাম ওকে।

অরূপ ডাকলে: "লাকি।"

এক লাফে লাকি অরূপের কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ভয় পেয়ে বললাম: "অরূপ, beware of dogs."

পার্থসারথিবাবু আমার ভয়চকিত ভাব লক্ষ্য করে হেসে বললেন: "ভয় নেই মঙ্গলবাবু, ও মানুষ নয় যে কামড়াবে।"

অরূপ বললে: "দাদামণি, একদিন আপনাকে লাকির খেলা দেখাব। কেমন ম্যাজিক শিখেছে।"

আমি বললাম: "বেশ তো, একদিন ম্যাজিক দেখা যাবে। ভালো কথা। সবাইকে দেখলাম, তোমার চম্পাকে তো দেখালে না?"

অরূপ আমার ভুল শুধরে দিয়ে বললে: "আমার নয়। চম্পা দিদিভাই-এর।"

আমি বললাম: "একই কথা। ও তোমাদের সকলের।"

চম্পাকে দেখতে অন্দরমহলে যেতে হল। সুন্দর খাঁচায় বন্দিনী বিহঙ্গী। তার অবাধ গতি সীমিত হয়েছে লৌহপিঞ্জরে। মুক্ত পাখার ঝাপটে সে আকাশকে জানিয়ে তোলে না। যে ময়না ছিল একদিন নিখিল বনভূমির, আজ সে একান্তভাবে সীতা চ্যাটার্জির।

আমাদের সাড়া পেয়ে সীতা কাছে এল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: "কী বুলি শিখেছে তোমার চম্পা?"

সীতা বললে: "চম্পা এখন শিশুটি নেই। ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছে।"

আমার কৌতূহল বাড়ল। হেসে শুধোলাম: "বটে! এ লেডি ইন লাভ!"

সীতা বললে: "মেয়ে আমার বড় হয়েছে। বিয়ে

দিতে না পারলে শান্তি নেই আমার। শুনবেন চম্পার গান? বল তো চম্পা:

ময়না দই খায় না
তাইতে ময়নার বিয়ে হয় না।"

চম্পা ঠোঁট নেড়ে অননুকরণীয় সুরে রীতার প্রতিধ্বনি করলে।

রীতা আবার বললে:

"যদি ময়না দই খেত
তাহলে ময়নার বিয়ে হত।"

এবারেও ময়না নিখুঁত অনুকরণ করলে।

চোখ চেয়ে যে রীতা চ্যাটার্জিকে এতদিন দেখে এসেছি এই মুহূর্তে চোখ বুঁজে তাকে একবারটি দেখবার চেষ্টা করলাম। কী দেখলাম? বসন্তের বন্যাস্রোতে তার মনের সব ক'টি বাতায়ন একই সঙ্গে খুলে গেছে। বৈরাগ্যের হয়েছে অবসান। রাগে অনুরাগে কানায় কানায় ভরে গেছে তার মনোভূমি। বলিষ্ঠ বনস্পতির আশ্রয় চাইছে মঞ্জরিত বল্লরী।

সহজ প্রশ্ন করলাম তাকে: "ময়না নয় দই খায় না। রীতাদেবীর কেন বিয়ে হয় না?"

রীতা জবাব দিলে: "হয়ত বা তার কপালে বর বর নেই, তাই। আমার আবার বিয়ে। বুড়িয়ে গেছি। কবে ফুরিয়ে যাব।"

কুমারী-মনের প্রচ্ছন্ন কামনায় অসহ্য বেদনায় তার। কাউকে যা বলা যায় না। প্রাণস্পর্শী মর্মজ্বালায় মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রীতা চ্যাটার্জি। অনাঘ্রাত কুসুমের মতো। তার সকল রূপযৌবনকে লুটে নিতে আজও এলনা মধুচুরী কোনো মধুপ।

রাত্রে ডিনার-টেবিলে বসে সেই কথাই পার্থসারথিবাবুকে বলেছিলাম: "এবার রীতার বিয়ে দিয়ে দিন।"

পার্থসারথিবাবু বললেন: "মিসেস চ্যাটার্জি বেঁচে থাকলে কবে ও বাস্বীর ঘর করতে চলে যেতো।"

আমি বললাম: "যিনি যাবার তিনি চলে গেছেন। এখন আপনিই ওর মা-বাপ। যা করবার একটু তাড়াতাড়ি করুন। বেলা যে যায়।"

পার্থসারথিবাবু কান্নায় ভেঙে পড়লেন: "কী করব আমি দয়া করে আমাকে বলে দিন, মধুপবাবু। মিসেস চ্যাটার্জি বেঁচে থাকতে একদিনের জন্যেও সংসারের ভাবনা ভাবতে দেননি আমাকে। এ বোঝা আমি সত্যিই বইতে পারছি না।"

১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত
বিচ্ছু বাঁদর বাচ্চু—১৲
১৯৫৮ সালে নিখিল ভারত মুদ্রণ পুরস্কার প্রাপ্ত
পুষির আত্তামা ১'১২
পড়ার বই দেখে
ভয়ে মরে মরে পড়বার
চেষ্টা করেনা এমন শিশুর সংখ্যা
নেহাৎই নগণ্য। তাই পড়াতে
গিয়ে প্রায় প্রতিটি শিশুর পিতামাতাকেই
গলদঘর্ম হতে হয়। খেলতে ভালবাসে না
অথবা গল্প শুনতে চায় না এমন কোন শিশু যে
কোথায় পাওয়া যাবে না এ কথা জোর গলায় বলা যেতে
পারে। আর তাই আমরা শিশুদের সেই পুস্তক-ভীতি ও
খেলতে ভালবাসার সহজাত প্রবৃত্তির দিকে নজর রেখেই
শিশু-সাহিত্যের আসরে নেমেছি।—আমাদের বিশ্বাস
শিশুদের মধ্যে পুস্তক-প্রীতি জাগাতে পারলে তারা
নিজেরাই পড়বার জন্যে এগিয়ে আসবে। সুন্দর
সুন্দর মজার গল্প আর প্রচুর ঝকঝকে ছবিতে
ভরা আমাদের বই শিশুদের মধ্যে
পুস্তক-প্রীতি জাগাতে পারবে
বলেই মনে করি।
সাত বামনের দেশে ৩'০০ : উমনো ঝুমনো ২'০০.
স্বপ্নে পাওয়া দেশ ১'৩৭ : কু কু ঝিক ঝিক ১'২০
হিজিবিজি ১'০০
টাক ডুমা ডুম ২'২০; সোনার পুতুল হীরের
চোখ ১'৮০; আগডুম বাগডুম ১'০০; জীবজন্তুর
মেলা ২'০০; খেলার বই ১'২৫; রূপ সাগরের
ঢেউ ১'২০; স্বপন বুড়োর—পরীর গল্প ১'২৫
—জীবজন্তুর আকারে কাটা—
বুড়ো ভুতুম; গ্যাঙোর গ্যাঙ; উড়ুরি; মিউ মিউ;
ময়ূরপঙ্খী নাও; ইকির মিকির; কলাবতী
প্রতি বইয়ের—'৭৫ নয়া পয়সা মাত্র
আনন্দ বাগচীর—ক্ষেপাত্তর কবিতা ২'০০
আমাদের বই সকল দোকানেই পাওয়া যায়।

আর্ট ইউনিয়ন
ফোন ৫৫৩০৯৬
৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
গ্রাম: 'আর্টইউনিয়ন'
বিক্রয় অফিস: ৮০।৩, মহা[illegible] রোড, কলিঃ ৯

পার্থসারথিবাবুর মুখে আশ্চর্য করুণ অসহায় ভাব ফুটে উঠল। বুঝলাম, কিছু বলবার জন্যে তাঁর মন আকুলিবিকুলি করছে। বলি বলি করে যে-কথা অন্য কাউকে এতদিন তিনি বলতে পারেননি সেই একান্ত গোপনীয় পারিবারিক ব্যথা-বেদনা-বিচ্ছেদের প্রসঙ্গ আজ অকুণ্ঠচিত্তে অন্ততঃ একজনেরও কাছে প্রকাশ করে হাল্‌কা হতে চান। তাঁর মনোভাব আন্দাজ করে বললাম: "আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। দুর্দিনেই মানুষ বন্ধুসঙ্গ কামনা করে।"

পার্থসারথিবাবু জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন। একটু ভয় পেলাম। রীতা বললে: "একটু কোরামিন দিই, বাপী? এবার একটু চুপ করো। আর কথা বোলো না।"

আমাকে উদ্দেশ করে পার্থসারথিবাবু আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন: "আমার সব কথা আজ আপনাকে বলে যেতে হবে, মঙ্গলবাবু। কত ব্যথার অচল পাহাড় এই বুকটার মধ্যে জমা হয়ে আছে। বড় ভার এখানে।"

তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করে আমি বললাম: "আর একদিন শুনব আপনার সব কথা, অকথিত যা-কিছু বাকী আছে আপনার।"

—"কাল পর্যন্ত যে বেঁচে থাকবো এ ভরসা নেই, মঙ্গলবাবু। ভেতরটা একেবারে ফাঁকা।

রীতা-মা'র জন্যে ভালো সম্বন্ধই ঠিক করেছিলাম, মঙ্গলবাবু। আমার নিজের খরচে বিভাসকে জার্মানি পাঠাই। দু'বছর পর্যন্ত সকল খরচপত্র চালিয়ে আসি। একদিন রীতার মুখে শুনলাম বিভাসের মন বাঁধা পড়েছে এক আইরিশ তরুণীর প্রেমে। একই জার্মান অধ্যাপকের অধীনে তারা রিসার্চ করছিল। একখানি এ্যাপ-ফটোও রীতাকে পাঠিয়েছে। আভাসে জানিয়েছে ভারতবর্ষে আর নাও ফিরতে পারে।

কত আশা ছিল বিভাস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে ফিরবে। তারপর এদের বিয়ে দিয়ে আমিও আর-একবার য়ুরোপে পাড়ি দেব। আমার ছাত্রজীবনের চারটি বছরের অবিস্মরণীয় স্মৃতি জড়িয়ে আছে বিলেতের সঙ্গে। অনাবিল আনন্দের সেই দিনগুলি কবে কোথায় হারিয়ে এসেছি। এখন পুঁজি শুধু শুষ্ক স্মৃতি।

কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। রীতা-মা'র কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারি না, মঙ্গলবাবু!

হয়ত বলবেন ভারী ভুল করেছি। এদের বিয়ের পরে বিভাসকে পাঠালে হোত। তাতেই বা অঘটন রুখতো কে, মঙ্গলবাবু? কপাল! আমার দুরদৃষ্ট।

সে শক রীতা-মা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তারপরেও দু'তিনটে ভালো সম্বন্ধ এসেছিল। ও এগোতে দেয়নি। শুধু বলেছিল—'একজনকে মন দিয়ে আরেকজনকে দেহ দিতে পারি না। ব্যভিচারিণী হতে বোলো না, বাপী। তার চেয়ে এই বেশ আছি।'

বিভাসের বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত পুরুষজাতির উপর রীতার মন বিষিয়ে গেছে। নতুন সম্বন্ধ এলেই ও ক্ষেপে যায়।

বেকা, লাবি, চম্পার সঙ্গে ওর ভাব ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। এর পটভূমি যারা জানে না, তারা বুঝতে পারবে না রীতার মনের গতিপ্রকৃতি। এখন মানুষকে ও সবচাইতে বেশী ভয় করে।"

বিদায় নেবার সময়ে রীতার হাত-দু'খানি ধরে আমি বললাম: "বিভাস তোমাকে আঘাত দিয়েছে। তথাপি দাদার এ-কথাটি মনে রেখো, বোন, বিভাসই সকল পুরুষজাতির প্রতিনিধি নয়। ভালোয়-মন্দয় মিলিয়ে তোমার মনের মানুষটিকে একদিন তুমি খুঁজে পাবে, এ বিশ্বাস তোমাকে রাখতেই হবে। মানুষকে ভয় কর ব'লে, তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলে তো চলবে না, বোন। আমি বলি, মন বিছিয়ে দাও। মন কেড়ে নাও, কুড়িয়ে নাও।"

নীরব প্রার্থনার ভঙ্গীতে রীতা চ্যাটার্জি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। যুক্তকরে মুদ্রিতনয়নে অপরূপ মহিমার ছবিতে।

আমার অন্তর্যামীকে নিবেদন করলাম: "এর সকল সংশয় দূর করো, হে ভগবান্। তোমার আলোয় ও পথ দেখুক। ফিরে পাক আশা-সঞ্জীবনী।"

বকুলের আকর্ষণে এ-বাড়ীতে প্রথম এসেছিলাম। জানতাম না, একখানি নতুন দিগন্তের সন্ধান পাব এর ইট-কাঠ-পাথরে।

সমাচারচন্দ্রিকা

সদাসমাচারবৃন্দাংকদর্শিকা, পদার্থচেষ্টা পরমার্থদায়িকা
বিজ্ঞজনেসর্ব্বমনোরঞ্জিকা শ্রীরাজধানীচরণকচন্দ্রিকা

৫৮৫ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ১৬ বৈশাখ ১২৩৮ সাল ইং ১৮৩১ ২৮ এপ্রিল

কস্যচিৎ চন্দ্রিকা পাঠকের একপত্র গত ৯ চৈত্রের চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে ঐ পত্রলেখকের প্রার্থনামতে পতিপ্রাণাসতী ও সতীর সংবাদ যাহা ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরের আইন প্রকাশের পর প্রকাশ হইয়াছে তাহা একদিবসের চন্দ্রিকায় পুনঃ প্রকাশ হইলে ভাল হয় • * • তাহার অভিপ্রায়ানুসারে অদ্যকার চন্দ্রিকায় ১২৩৬ সালের মাঘ মাসাবধি ১২৩০ সালের চৈত্র চৈত্র পর্য্যন্ত যে দুই সহগমন আর ৯ নয় পতিপ্রাণাসতীর সংবাদ চন্দ্রিকা হইতে সংকলন পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান মাসের মধ্যে দুই পতিপ্রাণাসতীর সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে অত আর এক সংবাদ প্রকাশ করা গেল—

হিন্দুকালেজের বিষয়ে আমরা অবগত হইলাম যে গত ১১ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল শনিবার ডাইরেক্টর অর্থাৎ কর্ত্তাধ্যক্ষ দিগের কলেজের অন্তর্ভিন্ন বিবেচনা নিমিত্ত বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে যে যে বিষয় স্থির হইয়াছে তদ্বিবরণের প্রতি লিপি আমরা প্রাপ্ত হইনাই কিন্তু শুনিয়াছি শ্রীযুত ডেরোজু সাহেব নামক একজন টিচর অর্থাৎ শিক্ষককে কর্ম্মহইতে রহিত করিয়াছেন এবং শ্রীমাধব মল্লিক নামক একজন তেলি ছাত্র এক পণ্ডিতকে কটু বলিয়াছিল তজ্জন্য তাহার সমুচিত দণ্ড করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ তেলি পো ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পদে ধরিয়া কহিয়াছে এমত কুকর্ম্ম আর করিবনা অপরাধ মার্জ্জনা কর—

অপর কলেজের ছাত্রের দিগের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হইয়া উঠিল এইকথায় অনেকবিবেচনা হইয়াছিল ঐ ডাইরেক্টর মহাশয়দিগের মধ্যে ডাক্তর উইলসন সাহেব এমত কহিয়াছেন যে বালকেরা যেসকল পুস্তকাদি পাঠকরে তাহাতে কদাচ হিন্দুয়ানি মান্য করিবেনা ইহাতে যাহার যেচ্ছাহয় কালেজে বালক পাঠাইবেন অনিচ্ছাহয় পাঠাইবেননা—

আমরা একণে ডাক্তর উইলসন সাহেবকে ধন্যবাদ করি যেহেতু তিনি অতি দূরদর্শী এবং স্পষ্টবাদী এতদ্দেশীয় দিগের প্রতি তাঁহার দয়া আছে ইহাও বোধ হইল একণে যাঁহারা বালক তথায় পাঠার্থে পাঠাইবেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া বিহিত করিবেন কালেজের ছাত্রদিগকে কিম্বা অধ্যক্ষ মহাশয় দিগ্যে আমরা আর কিছু কহিতে পারিবনা যে কিছু বক্তব্য তাহা বালকের পিত্রাদিকে বলা উচিত হইবেক—

—

শব্দকামধুরাভিধান।

এতন্নগরের বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুত বাবু চৈতন্যচরণ অধিকারী শব্দকামধুরা নামক এক অভিধান গ্রন্থ প্রস্তুত করিতেছেন ঐ গ্রন্থের বিশেষ গত ১৩ বৈশাখের চন্দ্রিকায়

ইস্তেহার পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন গ্রন্থ উত্তম রূপে প্রস্তুত হইবেক ইহাতে আমরা সন্দেহ করিনা যেহেতু অধিকারীবাবু-বিষয়ী লোকবটেন কিন্তু বিজ্ঞতা বিলক্ষণ আছে এবং যে পণ্ডিতত্রয়ের সাহায্যে গ্রন্থ সংগ্রহ হইতেছে তাঁহারা মহা মহোপাধ্যায় এবং ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রের পারদর্শী আমরা ঐ পণ্ডিতত্রয়কে বহুকালাবধি জ্ঞাত আছি অতএব পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিতেছি ঐ গ্রন্থ গ্রহণে মহোপকার বোধ হইবেক—

এবং গ্রন্থ সংগ্রহকারকে আমরা পরামর্শ দিতেছি তিনি ঐ অভিধানের রীতি তাবৎকে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত এক কিম্বা দুই পৃষ্ঠা প্রস্তুত করিয়া অনুষ্ঠান পত্রের সহিত গ্রথিত পূর্ব্বক গ্রাহক দিগের নাম স্বাক্ষর করণার্থে স্থানে২ প্রেরণ করিলে ভাল হয়—

—

পতিপ্রাণা সতী।

এতন্নগরের সিমিলার শ্রীযুত রামকেশব ভট্টাচার্য্যের পত্রে জানা গেল যশোহর জেলার কলারোয়া হোসেনপুর পরগণার মালমপাড়া গ্রাম নিবাসী ৺আনন্দচন্দ্র গোস্বামী বহুদিবসাবধি জ্বর ও কাশ পীড়ায় পীড়িত ছিলেন তাঁহার জীবনাশা নিরাশা বোধ হইলে চিকিৎসকের দিগের অনুমত্যানুসারে গঙ্গাযাত্রা করিলেন তৎকালে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর সহগমন করণের মানসব্যক্ত হইবায় আত্মীয় স্বজন সজ্জনের বারণে নিজবাটীতে শ্রীশ্রী৺ব্রহ্মবিগ্রহ আছেন তাঁহার সেবায় নিযুক্তা হইলেন গোস্বামি জীউ চাকদহের ঘাটে উপনীত হইয়া পঞ্চদিবস বাস করণান্তর ১৭৫২ শকের অর্থাৎ গত ১২৩৭ সালের ১৭ আষাঢ় দিবসে ৬৫।৫।১৭ পঁয়ষট্টি বৎসর পাঁচমাস সতরদিন বয়স্ক হইয়া শ্রীশ্রী৺জাহ্নবীর জলস্থলে অর্থাৎ অর্দ্ধেক শরীর কারণবারিতে অর্দ্ধেক নারায়ণক্ষেত্রে স্থাপন করণ পূর্ব্বক বেলা দুইপ্রহরের পর শ্রীশ্রী৺ প্রাপ্ত হন ঐ তাঁহার সাধ্বী সতী প্রাতঃকালাবধি নিজালয়ে শ্রীশ্রী৺বিগ্রহের শ্রীমন্দিরের দ্বারের সম্মুখে যোগাসনে ধ্যানধারণাপূর্ব্বক বসিয়া ছিলেন অনুমান বেলা আড়াই প্রহরের সময় মূর্চ্ছাপন্না হইয়া ভূমিতে পতিতা হইলেন স্বজনগণ আসিয়া অজ্ঞানাবৃতা দেখিয়া গাত্রোত্থান ও কথা কহাইবার নানাপ্রকারে যত্ন করিলেন পরে মৃত্যুলক্ষণ বোধ হওয়াতে যথাবিধিপূর্ব্বক অন্তর্জল করাণ গেল কিঞ্চিৎ বিলম্বেই মৃত্যু হইল। অনন্তর শব দাহার্থে গঙ্গাতীরে প্রেরিত হইল অপর তাঁহার দিগের পুত্র শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী যথাসাধ্য সমৃদ্ধি করণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিয়াছেন ইতি—

ফোন : ২২-৪৬৮৭

এস, মুখার্জী এণ্ড কোং

[কাগজ ও মুদ্রণের কালি বিক্রেতা]

পি. ২২-৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পরিবেশক :

টিটাগড় পেপার মিল্‌স কোম্পানী লিমিটেড

এবং

হুগলি ইঙ্ক কোম্পানী (প্রাঃ) লিমিটেড

গ্রন্থ বৃত্তান্ত

কৃত্তিবাস

এওলাসের ছেলে সিসিফাস। গ্রীক-পুরাণের খ্যাতনামা নায়ক। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তার মরতে ইচ্ছে নেই। মরার পরেও পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারা যায় এমন এক ফিকির সে বের করলো। সিসিফাস তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, তার মৃতদেহের যেন সৎকার করা না হয়। এরকম অশাস্ত্রীয় ব্যাপারে মৃত্যুর পর সিসিফাসের নরকবাসের শাস্তি হয়। সিসিফাস যমরাজ-এর কাছে দরবার করল—হুজুর, আমার মৃতদেহ সংকার না হওয়ার শাস্তি আমি কেন পাই? দুষ্টা হিসেবমতো পাবে আমার স্ত্রী,—কৃপা করে কিছুদিন নরকবাস থেকে মুক্তি দিলে, স্ত্রীর শাস্তিবিধান করে ফিরে আসতে পারি। যমরাজ দেখলেন, সত্যিই তো, স্ত্রীর অপরাধে স্বামীর শাস্তিবিধান কেন? ছুটি মঞ্জুর হল। কিন্তু সময়মতো সিসিফাস আর নরক-রাজ্যে ফিরে আসে না। মর্ত্য থেকে সিসিফাসকে ধরে আনা হল—আর বেইমানির এক চরম শাস্তি দেওয়া হল তাকে। খাড়াই পাহাড়ের তলা থেকে বিরাট এক পাথরের চাঁই তাকে ঠেলে তুলতে হবে পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে। সিসিফাস অনন্তকাল ধরে সেই পাথরের খণ্ড ঠেলে ঠেলে ওপরে তুলে আনার চেষ্টা করছে—কিন্তু কিছু ওপরে উঠেই তা আবার পিছলে গিয়ে নীচে নেমে আসে। এই চলেছে অনন্তকাল ধরে।

মানুষের জীবনও নাকি এরকম অর্থহীন বৃথা পরিশ্রমের জীবন। যতদিন তার আয়ু ততদিন তার পরিশ্রমের শেষ নেই—সীমা নেই। বৃথা আশা নিয়ে মানুষ একের পর এক নিরাশার স্তর অতিক্রম করে চলে। অনন্তকাল ধরেই এই ধারা। প্রকৃতি তার সহায় নয়—পরিবেশও অনুকূল নয়—এই মর্ত্যজগতে মানুষের আবির্ভাব কি নিরর্থক? মানুষ কি বেআইনীভাবে প্রবেশ করল প্রকৃতির রাজ্যে? মানুষের অস্তিত্বকে এমন এক ভয়াবহ জীবনদর্শন দিয়ে যিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি হলেন আলবেয়ার কামু। কামু অবশ্য এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এক নিরবচ্ছিন্ন আশাবাদের মাধ্যমে। যতদিন জীবন ততদিন কর্মের প্রতি, জীবনের প্রতি মমতা রাখতে হবে—জীবনের মহিমায় নিশ্চিত বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে।

এই কামু বছর দুই আগে সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার পেয়েছেন।

কামুর পিতা ছিলেন সাধারণ কৃষক। আলজিরিয়ার অধিবাসী। ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি নিহত হন। কামুর কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে দারিদ্র্যের মধ্যে। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ নিতে তিনি কার্পণ্য করেননি। প্রাথমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কামু দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর-পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। বিশেষ করে সেন্ট অগাস্টিন ও প্লটিনাসের ওপর তাঁর বিশেষ পড়াশুনা ছিল। ছাত্রজীবনে কামু ভালো স্পোর্টস্‌ম্যানও ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-রুমের বাইরে খেলার মাঠ থেকেও কামু ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক পাঠ সংগ্রহ করেছিলেন। খেলার মাঠের শৃঙ্খলা ও খেলোয়াড়োচিত আচরণ উত্তরজীবনে কাজে লেগেছিল, যখন তিনি দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের প্রতিরোধ-আন্দোলনে তিনি সহজেই নেতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জীবনের 'দায়িত্বকেন্দ্রিক' দিকের একাংশও খেলার মাঠ থেকে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। এক বন্ধুকে চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন—"It was on the playing ground that I learned only lessons in moral ethics."

শিক্ষাজীবন শেষ হবার আগেই কামুকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। পড়া ও কাজ একসঙ্গেই চালাতে হয়। কর্মজীবনে বিচিত্র দিকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। কখনো মোটরগাড়ির পার্টসের সেলস্‌ম্যান, কখনো বা জাহাজের দালালি, পুলিশের দপ্তরে কেরানীগিরি। যৌবনের উষামুহূর্তে অনেক অভিজ্ঞতাই তিনি সঞ্চিত করে রেখেছিলেন।

পড়াশুনো যখন শেষ হল তখন কামু কাজ করছেন L' Equipe নামে আলজেরিয়ার শহরে এক থিয়েটার-কোম্পানিতে। কামু নিজে অভিনয় করতেন। এই কোম্পানি মালরো, জিদ, বেন জনসন, ডস্টয়ভস্কির বই অভিনয় করে বিখ্যাত হয়েছিল। কামুর প্রথম দুটি বই হল প্রবন্ধের। য়ুরোপ ঘুরে এসে কামু সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে তখন কামু জন্মস্থান আলজেরিয়ার শহর ছেড়ে প্যারিসে চলে এলেন। প্যারিসে বসেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দি স্ট্রেঞ্জার' লেখা। এই সময়েই তাঁর প্রধান প্রবন্ধের বই *The Myth of Sisyphus* প্রকাশিত হয়।

ফ্রান্সে জার্মান অধিকারের সময় প্রতিরোধ-সংগ্রামে কামু নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফ্রান্সের কতকগুলি বিখ্যাত পত্রিকা মারফত কামু রাতারাতি খ্যাতনামা হয়ে উঠলেন। যুদ্ধশেষে ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী-মহলে কামুর আসন

সুপ্রতিষ্ঠিত হল। ফ্রান্সের সাহিত্য-জগতের দিক্‌পাল নেতা ব'লেই তিনি স্বীকৃতি পেলেন। *Combat* পত্রিকায় কামু যুদ্ধোত্তর নতুন দর্শন-চিন্তার আসর পাতলেন। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী-মহলে যুদ্ধোত্তর নীতিবোধ—সমাজচেতনা নতুন কথা শোনার সুযোগ পেল। অবশ্যই এ সুর মূলত নৈরাশ্য ও হতাশা দিয়ে সুরু, কিন্তু শেষ হয়েছে অস্থির আশাবাদে—সিসিফাসের পৌরাণিক কাহিনীর রূপকে কামুর দর্শন রূপলাভ করেছে। যুদ্ধের মধ্যে কামু উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই-দুটি ছাড়া দুটো নাটকও রচনা করেছিলেন। যুদ্ধশেষে প্রতিবছরেই কামুর একটা-না-একটা বড় রচনা প্রকাশিত হতে সুরু হল। উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক সমান দক্ষতায় তিনি লিখে যেতেন। কামুর রচনা বুদ্ধিজীবী-মহলে আদর পেল। দর্শনের উচ্চতম শিক্ষা কামু শেষ করেছেন, কামুর প্রতি রচনায় এক গুরুগম্ভীর দার্শনিকের সাক্ষাৎ মেলে। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর ধনতান্ত্রিক যুগের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ববোধের তিনি উপাসক। তাঁর দর্শন প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উজ্জ্বল। কামুর উপন্যাস-নাটকে কোনো মহান ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাব না—পাব তীব্র জিজ্ঞাসামুখর, সমস্যাসঙ্কুল স্বাতন্ত্র্যবাদী নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ। তাদের সমস্যা, জীবন-জিজ্ঞাসা আমাদেরও অস্থির করে তোলে। আমাদের অনেকেরই দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছায়া—পীড়িত মননের হাহাকার কামুর গল্প-নাটকে পাত্র-পাত্রীদের জীবনে দেখতে পাব।

তবু সার্ত্রের অস্তিত্বহীনতার দর্শনে কামু আস্থাবান নন। জীবনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকা বা না-বেঁচে থাকার প্রশ্ন তিনি তোলেননি। নিছক স্বাতন্ত্র্য দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব তিনি মেনে নিয়েছেন বটে, কিন্তু এক নৈরাশ্যবাদে ব্যক্তির সার্থক অস্তিত্ব তিনি মহিমাময় ব'লেই স্বীকার করেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দর্শনে কামু ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর প্রথম রচনা থেকে এই ক্রমাগ্রগতি ধরা পড়ে। তাঁর ব্যক্তিগত দর্শনচিন্তা সমাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক দর্শনে পরিণত হবার প্রয়াস পেয়েছে তাঁর শেষ প্রবন্ধের বই 'দি রিভোল্ট'-এ। 'দি মিথ অব সিসিফাস'-এর পর এ বই কামুর পরিণত দার্শনিক চিন্তার সৃষ্টি। এ বইতে কামু বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক দর্শন-ব্যাখ্যায় বুদ্ধিজীবী-দুর্লভ দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিপ্লবের ব্যাখ্যায় কামু মার্ক্সকে বাতিল করতে চেয়েছেন। মার্ক্সীয় তত্ত্ববিদেরা সহজেই কামুকে বাতিল করতে পারেন হেগেলের প্রসঙ্গ তুলে। অবশ্য এ প্রসঙ্গ নিয়ে তর্কের শেষ হবে না। বর্তমানের সামাজিক পরিবেশে—অর্থনৈতিক কাঠামোর এ ধরনের আলোচনা চক্রাকারে চলতেই থাকবে—যার কেন্দ্রবিন্দু হবেন হেগেল ও মার্ক্স। যুদ্ধোত্তর যুগে ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী-মনে কামুর আলোচনা অনেক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কামু ফ্রান্সের নতুন চিন্তায় কেন্দ্রস্থলে গিয়ে দাঁড়ালেন—দাঁড়ালেন উত্তপ্ত বিতর্কের আসরেও।

ফ্রান্সের বিদগ্ধমহলের একাংশে কামুর প্রতিষ্ঠা বিতর্কেরও ঊর্ধ্বে। কামুর দর্শনচিন্তায় প্রাচুর্য ও পরিণত মননের সততা প্রশংসনীয়—তরুণ বুদ্ধিজীবী-মনে সহজেই চমক লাগাবার মতো বক্তব্যের অভাব কামুর কোনো রচনায় নেই। আধুনিক যুগের দুঃখের দিক কামুর রচনায় মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তবু জীবনের ট্র্যাজিক অংশকেই মেনে নিয়ে সবটুকু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। মানুষের ইচ্ছা তার ভাগ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করুক—কামুর দর্শনে অনেক কথার মধ্যে এক প্রধান বক্তব্য। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে গল্প ও নাটকের থেকে কামুর প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশী।

১৯৫৭ সালের অক্টোবরে কামু নোবেল পুরস্কার পেলেন। নির্বাচক সমিতি ঘোষণা করলেন কামুর রচনা "বর্তমান জগতের পরিবেশে তীব্র মানবিক চেতনা ও মূল্যবোধের আলোকে উজ্জ্বল"। সে-বছর নির্বাচনে কামুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আঁদ্রে মালরো ও কাজানৎজাকিস-এর মতো প্রবীণ সাহিত্যিকেরা। পুরস্কারলাভের ঘোষণা শুনে কামু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন—বিশেষ করে আঁদ্রে মালরোর মতো প্রবীণ সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর প্রতিযোগিতা হোক, এও তাঁর কাম্য ছিল না। শুধু বললেন, নির্বাচক সমিতির সদস্য হলে তিনি মালরোর পক্ষেই ভোট দিতেন। এ কেবল তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয় নয়। কামু সত্যি-সত্যিই যা বিশ্বাস করতেন, সরল ভাবেই-তা স্বীকার করেছেন। শিল্পী ও মানুষ হিসেবে কামুকে যাঁরা জানেন, এ কথা তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন।

পঞ্চাশের কোঠাও কামু পেরোলেন না। সব দুর্ঘটনার মতো তাঁর মৃত্যু আকস্মিক হলেও, এ আকস্মিকের বেদনা ফ্রান্সের সাহিত্য-জগতে রবে, দূর হবে না। কেননা, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে কামু প্রতিভার মধ্যগগনে বিরাজ করছিলেন।

কামুর কয়েকটি বিখ্যাত বইএর তালিকা নীচে দেওয়া হোল :

L' Envers Et L' Endroit **(Essays) : 1937,** *Noces* **(Essays) : 1937,** *L' Etranger* **(Novel) : 1942,** *Le Mythe de Sisyphe* **(Essays) : 1942,** *Le Malentendu* **(Play) : 1944,** *Caligula* **(Play) : 1944,** *Lettere A un Ami Allemand* **(Essays) : 1945,** *La Peste* **(Novel) : 1947,** *Les Justes* **(Play) : 1950,** *L' Homme Revolte* **(Essays) : 1951,** *L' Ete* **(Essays) : 1954,** *La Chute* **(Novel) : 1956,** *L' Exil Et Le Royaume* **(Stories) : 1957.**

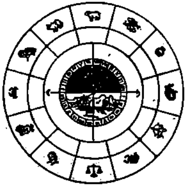

গ্রহ-বিচিত্রা

['বিশ্ব বিজ্ঞান পত্রিকা'র
ফলিত-জ্যোতিষ বিভাগ হইতে গৃহীত]

জ্যোতিষশর্মা

। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের রাশিফল ।

মেষ

মাসটির অধিকাংশ ভালো চলবে; অবশিষ্টাংশ অশান্তি সৃষ্টি করবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। মাঝে মাঝে নিজের বুদ্ধির ভ্রমে কাজের ক্ষতি হবে। কর্মস্থল ভালো চলবে। কর্মোন্নতির যোগ আছে। গৃহে পুণ্য-উৎসব হবে। অগ্রজ এবং জামাতা বা পুত্রবধূ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে। রোগভোগের সম্ভাবনা আছে। সন্তানবতী স্ত্রীর পক্ষে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকার যোগ নেই। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। পিতার উন্নতি হবে। পারিবারিক অবস্থা ভালো চলবে।

নক্ষত্রফল—অশ্বিনী-মেষের আর্থিক উন্নতি এবং কর্মোন্নতির যোগ আছে। অগ্রজের রোগভোগ হ'তে অশান্তি সৃষ্টি হবে। কন্যার দাম্পত্য-কলহ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি করবে। ভরণীর—সকল কাজে সাফল্যলাভ, রোগভোগ এবং আকস্মিক ঝঞ্ঝাটে অশান্তি সৃষ্টি হবে। কৃত্তিকার—অর্থব্যয় অধিক হবে; কর্মস্থল ভালো চলবে।

বৃষ

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে। কর্মস্থলে বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত গোলযোগ থাকবে, তারপর আর্থিক উন্নতি এবং কর্মে সাফল্যলাভ হবে। মাতার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। বন্ধু দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে। আর্থিক উন্নতির পথে বিশেষ বাধা [illegible] পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হবে। বিবাহ-সংক্রান্ত-বিষয়ের সহজে সমাধান হবে। ভূ-সংক্রান্ত-বিষয় বৈশাখের শেষ সপ্তাহ হ'তে ভালো চলবে। পারিবারিক অশান্তি কতকটা কমবে।

নক্ষত্রফল—কৃত্তিকা-বৃষের শুভ—আর্থিক উন্নতি, কর্মে সাফল্যলাভ; কিন্তু বন্ধু দ্বারা অশুভ। রোহিণীর—স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং আকস্মিক অশান্তি সৃষ্টি হবে। মৃগশিরার—স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না; নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাটের মধ্য হ'তে মাসটি অতিবাহিত হবে।

মিথুন

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ভাগ্যলাভে বাধা সৃষ্টি ক'রে, তারপর দৈবানুগ্রহের ন্যায় সকল কাজে সাফল্যলাভ হবে। শিক্ষাবিভাগের কর্মবৃত্তিধারিণী স্ত্রীর কর্মোন্নতি এবং যশ-খ্যাতি বৃদ্ধি হবে। বিবাহ-সংক্রান্ত-বিষয় বিনা-বাধায় সম্পাদিত হবে। শত্রুহানি হ'বে সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হবে। অধ্যাপক, আইনজীবী এবং গবেষকগণের বিশেষ উন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায়ীর পক্ষে মাসটি শুভ। সামরিক এবং পুলিশ-বিভাগের বৃত্তিভোগীর পক্ষে মাসটি শুভ নহে।

নক্ষত্রফল—মৃগশিরা-মিথুনের স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না; কর্মস্থল ভালো চলবে। আর্দ্রার—কর্মোন্নতির যোগ আছে। পুনর্বসুর—আকস্মিক অশান্তি সৃষ্টি হবে; মাসের শেষাংশ ভালো চলবে।

কর্কট

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। রক্তদুষ্ট পীড়া এবং প্রদাহ-জনিত রোগভোগ থাকা সম্ভব। প্রস্রাব-সংক্রান্ত পীড়া-বৃদ্ধির যোগ আছে। কর্মস্থল ভালো চলবে। কর্মোন্নতির যোগ আছে। কর্মোপলক্ষ্যে ভ্রমণের যোগ আছে। ধনস্থানে রাহু থাকায়, মাঝে মাঝে অযথা অর্থহানি সৃষ্টি করবে। শত্রুহানি হ'য়ে কর্মসাফল্য আসবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। বিবাহ-বিষয়ে এই মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বাধা থাকবে, তারপর শুভ হবে।

নক্ষত্রফল—পুনর্বসু-কর্কটের বন্ধু-বিয়োগ-জনিত অশান্তি, অর্থহানি। পুষ্যার—কর্মস্থল ভালো চলবে ; স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না। অশ্লেষার—অর্থহানি, রোগভোগ, অশান্তি সৃষ্টি হবে।

সিংহ

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে। মাঝে মাঝে আকস্মিক রোগভোগ সৃষ্টি হবে। আকস্মিক বাধা সৃষ্টি হ'য়ে কাজের গোলমাল হবে। সন্তানের উন্নতির যোগ আছে। নিজের কর্মস্থল স্বাভাবিক চলবে। বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয় আকস্মিকভাবে ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য-কলহ হবে। ভালবাসায় বিবাহে অশান্তি সৃষ্টি হবে। অন্তরিক্ষ হ'তে অমঙ্গল প্রভাব-বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। পারিবারিক শান্তি বিশেষ থাকবে না।

নক্ষত্রফল—মঘা-সিংহের অর্থহানি, মোকদ্দমা-ভয়। পূর্বফল্গুনীর—কর্মোন্নতির যোগ আছে। উত্তরফল্গুনীর ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে।

কন্যা

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পারিবারিক শান্তি থাকবে। গৃহ-নির্মাণ বা বাসগৃহ উত্তম হবে। বিবাহ-সংক্রান্ত-বিষয়ে কোনো গ্রহদোষে বাধা নেই। ভালবাসা-সম্পর্কিত বিবাহ-সম্বন্ধে শান্তিপূর্ণভাবে হবে। মাতার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। পিতার উন্নতি হবে। নিজের মানসিক শান্তি থাকবে। শত্রু যেমন বৃদ্ধি হবে, তেমনি শত্রুহানিও হবে।

নক্ষত্রফল—উত্তরফল্গুনী-কন্যার অবস্থা পূর্ববৎ, কর্মোন্নতি এবং দাম্পত্য শান্তি থাকবে। হস্তার—মাতার রোগভোগ থাকবে ; অন্যান্য বিষয়ে শুভ চলবে। চিত্রার—বন্ধু দ্বারা অর্থহানি সম্ভব।

তুলা

স্বাস্থ্য ভালো চলবে। সন্তানের আকস্মিক রোগভোগ হবে। আর্থিক উন্নতি হবে। ভ্রাতাভগ্নীর উন্নতি সম্ভব। স্ত্রীর স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে। কর্মস্থল ভালো চলবে। কর্মস্থল-পরিবর্তনের যোগ আছে। পিতার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক চলবে। বিবাহিতা সন্তানবতীগণের পক্ষে মঙ্গল এবং রাহু-কেতুর অশুভ প্রভাব গর্ভস্থ সন্তানের উপর থাকা সম্ভব ; সতর্কভাবে চলাফেরা করা উচিত। ইহা ব্যতীত পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়ের পক্ষে বৈশাখ মাসটি, বৃদ্ধির এবং যেখিতে, কাজের অসুবিধা সৃষ্টি করবে।

নক্ষত্রফল—চিত্রা-তুলার ভ্রাতা হ'তে অশান্তি, সন্তান দ্বারা অর্থহানি সম্ভব। স্বাতীর—কর্মস্থলে অশান্তি। বিশাখার—শত্রুমধ্য হ'তে কর্মসাফল্য এবং ঝগড়া-বিবাদের যোগ আছে।

বৃশ্চিক

স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। আর্থিক উন্নতি হবে। মাতার মৃত্যুতুল্য পীড়াভোগ, পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। গৃহবিবাদ সৃষ্টি হবে। এই মাসটি কর্মস্থলে গোলযোগ এবং অশান্তির মধ্য দিয়ে চলবে। পিতা বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি হ'তে অশান্তি সৃষ্টি হবে। বিবাহ-বিষয়ে শুভ সূচনা করে। দাম্পত্য-জীবন ভালো চলবে। আত্মীয় দ্বারা অর্থলাভের যোগ আছে।

নক্ষত্রফল—বিশাখা-বৃশ্চিকের সন্তানের উন্নতি ; নিজের কতকটা উন্নতির পথে এগিয়ে, পরে স্থগিত থাকবে। অনুরাধার—ভালো চলবে। জ্যেষ্ঠার—মাতার মৃত্যুতুল্য পীড়াভোগ, পারিবারিক অশান্তি থাকবে।

ধনু

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ভ্রাতা দ্বারা অশান্তি-সৃষ্টির যোগ আছে। ভ্রাতার সহিত কলহ অথবা ভ্রাতার রোগভোগ দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি হবে। কর্মস্থল ভালো চলবে। ভাগ্যে রাহু, বৃহস্পতি দৃষ্ট থাকায়, বাধার মধ্য থেকে কর্মোন্নতির সম্ভাবনা আছে। সন্তানের ভাগ্যোন্নতি হবে ; তার দেশভ্রমণের যোগ আছে। গৃহাদি নির্মাণ-বিষয়ে শুভ সূচনা করে। বিবাহ-বিষয়ে গ্রহদোষে কোনো বাধা নেই। দাম্পত্য-জীবন সুখে চলবে। পিতার উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক ও সচ্ছল থাকবে।

নক্ষত্রফল—মূলার—ভ্রাতৃবিরোধ, বন্ধু দ্বারা উন্নতির

যোগ আছে। পূর্বাষাঢ়ায়—আর্থিক উন্নতি, প্রতিবেশী দ্বারা প্রতারিত হবার যোগ আছে। উত্তরাষাঢ়ায়—শুভ চলবে; পারিবারিক শান্তি থাকবে; কর্মোন্নতির যোগ আছে।

মকর

স্বাস্থ্য ভালো চলবে না। আকস্মিক পীড়াভোগের সম্ভাবনা আছে। অযথা অর্থব্যয় হবে। কর্মস্থল ভালো চলবে। সন্তানের অবস্থা ভালো থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। আত্মীয়ের সহিত বিরোধ সৃষ্টি হবার যোগ আছে। চোর অথবা দস্যু দ্বারা অর্থহানি এবং আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। মাসটি বিশেষ ভালো চলবে না।

ন ক্ষ ত্র ফ ল—উত্তরাষাঢ়ায়—মাসটি মোটামুটিভাবে চলবে। শ্রবণায়—আর্থিক অশান্তি, আকস্মিক বিপদের মধ্য হ'তে সাফল্যলাভের যোগ আছে। ধনিষ্ঠায়—ভালো-মন্দ মিশ্র চলবে।

কুম্ভ

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। ঝগড়া-বিবাদ এবং দাম্পত্য অশান্তি সৃষ্টি করবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না। বিবাহ-সংক্রান্ত-বিষয়ে বাধা সৃষ্টি হবে; বাধায় বিবাহ পণ্ড হবার যোগ আছে। আর্থিক উন্নতি হবে। কর্মস্থলে শ্রম-বহুল কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। কাজের মধ্য থেকে প্রতিষ্ঠা হবে। কর্মসাফল্যের জন্য পদোন্নতির যোগও আছে। পিতার উন্নতি হবে। শত্রুহানি হ'য়ে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হবে। সন্তানের অবস্থা ভালো থাকবে।

ন ক্ষ ত্র ফ ল—ধনিষ্ঠা-দ্বয়ের অর্থহানি, দাম্পত্য-কলহ সম্ভব; কর্মস্থল ভালো চলবে। শতভিষায়—মামলা-মোকদ্দমায় অর্থহানি এবং ভালবাসায় বিবাহবিচ্ছেদের যোগ আছে। পূর্বভাদ্রপদের—ভালোমন্দ মিশ্র চলবে।

মীন

স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। শত্রুহানি হ'য়ে, কর্মব্যাপ্তি বৃদ্ধি হবে। আর্থিক উন্নতি হবে। ভাগ্যস্থলে অর্থসম্পদলাভের যোগ আছে। পুত্রকন্যার বিবাহের শুভ প্রস্তাব সৃষ্টি করবে; জামাতার ও অগ্রজের উন্নতি হবে। বিবাহ-বিষয়ে শুভ। প্রেমযোগে কোনো বাধা নেই। সন্তানের পীড়াভোগ সম্ভব। একদিকে অর্থোপার্জন, অন্যদিকে অর্থহানি উভয়ই হবে। মাস শেষে আঘাতপ্রাপ্তির যোগ আছে।

ন ক্ষ ত্র ফ ল—পূর্বভাদ্রপদ এবং উত্তরভাদ্রপদের—শুভ চলবে। রেবতীর—অযথা অর্থহানি এবং মোকদ্দমা-ভয় সূচনা করে।

দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে রাশিফল সাধারণভাবে বর্ণিত হ'ল। জন্মকালের গ্রহসংস্থান এবং দশাকালের সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণিত ফল বিচার্য।

চৈত্র মাস, ১৩৬৬ সন [মার্চ-এপ্রিল, ১৯৬০]

বাং তারিখ	ইং তারিখ	চান্দ্রিক তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১	১৫	২৫	মঙ্গল	দ্বিতীয়া	হস্তা	নিষেধ	
২	১৬	২৬	বুধ	তৃতীয়া	চিত্রা	নিষেধ	
৩	১৭	২৭	বৃহস্পতি	চতুর্থী	স্বাতী	নিষেধ	ত্র্যহস্পর্শ
৪	১৮	২৮	শুক্র	ষষ্ঠী	অনুরাধা	নিষেধ	[illegible]
৫	১৯	২৯	শনি	সপ্তমী	জ্যেষ্ঠা	নিষেধ	[illegible]
৬	২০	৩০	রবি	অষ্টমী	মূলা	শুভ, রাত্র ঘ. ১১।৫৭ গতে নিষেধ	শ্রীশ্রীশীতলাষ্টমী
৭	২১	১	সোম	নবমী	পূর্বাষাঢ়া	নিষেধ	
৮	২২	২	মঙ্গল	দশমী	উত্তরাষাঢ়া	নিষেধ	
৯	২৩	৩	বুধ	একাদশী	শ্রবণা	মধ্যম, অপরাহ্ণ ঘ. ৫।১১ গতে নিষেধ	একাদশীর উপবাস

[পরপৃষ্ঠায় অবশিষ্টাংশ]

চৈত্র মাস, ১৩৬৬ সন [মার্চ-এপ্রিল, ১৯৬০]

[পূর্বপৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ]

বাং তারিখ	ইং তারিখ	ভারতীয় তারিখ	বার	তিথি	নক্ষত্র	যাত্রা	বিবিধ
১০	২৪	৪	বৃহস্পতি	দ্বাদশী	ধনিষ্ঠা	নিষেধ, ঘ. ৩।৩৯ গতে মধ্যম	
১১	২৫	৫	শুক্র	ত্রয়োদশী	শতভিষা	মধ্যম, রাত্র ঘ. ৭।০ গতে শুভ	ঘ. ২।২৫ মধ্যে বারুণীস্নান
১২	২৬	৬	শনি	চতুর্দশী	পূর্বভাদ্রপদ	মধ্যম, ঘ. ১।৩৩ গতে নিষেধ	অমাবস্যার নিশিপালন। মন্বন্তরাস্নান
১৩	২৭	৭	রবি	অমাবস্যা	উত্তরভাদ্রপদ	শুভ	অমাবস্যার উপবাস
১৪	২৮	৮	সোম	প্রতিপদ	রেবতী	নিষেধ, রাত্র ঘ. ৮।৩ গতে শুভ	নন্দাস্নান
১৫	২৯	৯	মঙ্গল	দ্বিতীয়া	অশ্বিনী	নিষেধ	
১৬	৩০	১০	বুধ	তৃতীয়া	ভরণী	শুভ	মন্বন্তরাস্নান
১৭	৩১	১১	বৃহস্পতি	চতুর্থী	কৃত্তিকা	নিষেধ, রাত্র ঘ. ১।৩৫ গতে মধ্যম	
১৮		১২	শুক্র	পঞ্চমী	রোহিণী	মধ্যম, সন্ধ্যা ঘ. ৬।৩৬ গতে শুভ	অন্নপ্রাশন, উপনয়ন
১৯		১৩	শনি	ষষ্ঠী	মৃগশিরা	মধ্যম, রাত্র ঘ. ৮।৫৭ গতে নিষেধ	অশোকষষ্ঠী, শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ
	৩	১৪	রবি	সপ্তমী	মৃগশিরা	শুভ, ঘ. ৭।১২ গতে নিষেধ	শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ
	৪	১৫	সোম	অষ্টমী	আর্দ্রা	নিষেধ	অশোকাষ্টমী, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা
	৫	১৬	মঙ্গল	নবমী	পুনর্বসু	নিষেধ, ঘ. ১২।৫০ গতে শুভ	শ্রীশ্রীরামনবমীব্রত
	৬	১৭	বুধ	দশমী	পুষ্যা	শুভ, ঘ. ৩।৩৮ গতে নিষেধ	শ্রীশ্রীবাসন্তীদেবীর দশমীবিহিত পূজা সমাপন
২৪	৭	১৮	বৃহস্পতি	একাদশী	অশ্লেষা	নিষেধ	শ্রীশ্রীদমনপূজা। উপনয়ন
২৫	৮	১৯	শুক্র	একাদশী	মঘা	নিষেধ	একাদশীর উপবাস
২৬	৯	২০	শনি	ত্রয়োদশী	পূর্বফল্গুনী	নিষেধ	ত্র্যহস্পর্শ। মদনত্রয়োদশী
২৭	১০	২১	রবি	চতুর্দশী	উত্তরফল্গুনী	শুভ	
২৮	১১	২২	সোম	পূর্ণিমা	হস্তা	শুভ, অপঃ ঘ. ৪।৫৫ গতে নিষেধ	পূর্ণিমার উপবাস ও নিশিপালন
২৯	১২	২৩	মঙ্গল	প্রতিপদ	চিত্রা	শুভ, রাত্র ঘ. ১১।৩৫ গতে নিষেধ	নীলপূজা
৩০	১৩	২৪	বুধ	দ্বিতীয়া	স্বাতী	নিষেধ	সংক্রান্তি। চড়কপূজা

পঞ্জিকা কেবলমাত্র আমাদের ধর্মকর্মের দিন ও ক্ষণ নির্ধারক পুস্তক নয়, পরন্তু ইহা আমাদের জীবনের জন্ম-নির্ধারক পুস্তকও বটে। পঞ্জিকা নামক পুস্তকখানিতে আমাদের ধর্মীয়, বৈষয়িক, জ্যোতিষিক ও দৈনন্দিন সকলপ্রকার বিধান দেওয়া থাকে। গণিতের ও জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য ছাড়া পঞ্জিকা-গণনা হয় না। তিথ্যাদি, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান প্রভৃতি নির্ভুলভাবে নিরূপণপূর্বক গণনা করাই বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি। কেবলমাত্র আমাদের ধর্মকর্মের জন্যই যে পঞ্জিকার প্রয়োজন, তাহা নহে; অকূলসমুদ্রে জাহাজ চালাইবার সময় নাবিকদিগের প্রধান অবলম্বন নৌ-পঞ্জিকা। [illegible] উদয়-গমন, বৃষ্টিকাল, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপার এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় পূর্বাভাস পঞ্জিকা-লিখিত গ্রহসংস্থান ও তিথিনক্ষত্র হইতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র আমাদের ভারতে নহে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশসমূহে পঞ্জিকা আছে এবং তাহাদের জ্যোতিষিক গণনা-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আমাদের এই ভারতে দশ-বিশ প্রকারের তিথ্যাদি সম্বলিত পঞ্জিকার প্রচলন আছে। ফলতঃ এই অবৈজ্ঞানিক হাস্যকর পরিস্থিতির মূলোচ্ছেদ করিবার সংকল্প লইয়া বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের উদ্ভব হইয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীর নাবিক-পঞ্জিকার গ্রহস্থানাদির সহিত, এবং সম্প্রতি ভারত-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্জিকার গ্রহস্থান ও তিথিনক্ষত্রের সহিত এই পঞ্জীর সামঞ্জস্য আছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত, জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকগণ এই পঞ্জীর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেন এবং ধর্মকর্মে ব্যবহার করেন। 'বসুধারা'র চিন্তাশীল পাঠকবর্গও [illegible] হইতে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে ধর্মকর্ম নির্বাহ করিবেন, এ আশা আমাদের আছে।

একদা এক বণিক আকবরের রাজসভায় দুইটি অসাধারণ হীরক খণ্ড লইয়া আসিয়াছিলেন। হীরক খণ্ড দুইটির মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে [illegible] উত্তর দিলেন "সতর্কভাবে পরীক্ষা করুন, উভয়ের মূল্যের [illegible] করুন।" হীরক খণ্ড দুইটি [illegible] আকবরের অমাত্যবর্গের মধ্যে অনেকেই উহার সঠিক মূল্য নিরূপণ করিতে পারিলেন না। ইহার পর বীরবলের পালা আসিল, বীরবল, পরীক্ষার্থে একটি [illegible] আনিয়া একটি হীরক খণ্ড উহার উপর [illegible], ইহাতে বীরবল [illegible] এবং হীরক দুইটিকে [illegible] নির্ধারণ করিলেন। যে হীরক খণ্ডটি উপর [illegible] সেটি [illegible], কারণ সেটি [illegible] একটি [illegible] ছিল। ইহাতে বীরবল বলিলেন "পরীক্ষা করুন এবং ফল দেখিয়া বিচার করুন।"

আপনিও আপনার কেশ তৈল কিনিতে এই নীতি অনুসরণ করিতে পারেন, "পরীক্ষা করুন এবং ফল দেখিয়া বিচার করুন।"

লোমা

[illegible] কালো রাখে

[illegible] এজেন্টস্: [illegible] — ১
এজেন্টস্: [illegible] — ২

কলিকাতার এজেন্ট: শান্তি [illegible] এণ্ড কোং ১১৯, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১।

ভারতীয় হকির শীত ও বসন্ত

নারায়ণ সেন

দীর্ঘ আটবছর পরে আবার কোলকাতার ময়দানে উড়েছিল বারোটি নিশান। ২৩শে ফেব্রুয়ারির পড়ন্ত বিকেলে বারোটা নিশান দেখবার মতো বেঁধে নিল কোলকাতার দর্শককে। ১৯৮০ সালের ভারতীয় হকি-প্রতিযোগিতায় ওরা যেন কেমন হাওয়ায় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে উড়ছিল। এমনকি বৈকাল ৫টায় ভূতপূর্ব অলিম্পিক-অধিনায়ক জয়পাল সিং যখন বিজয়ী সার্ভিসেস দলের অধিনায়ক ভোলার হাতে তুলে দিলেন রঙ্গস্বামী কাপ, তখনও। ওরা হতভম্ব হয়ে গেছে ভারতীয় হকি-স্টিকের মহাপতন দেখে। সামনেই সাদা গ্যালারিতে বসে আছেন আসন্ন অলিম্পিকের নির্বাচন-কমিটির হোমরা-চোমরারা। তাঁদের মধ্যে আছেন পদ্মবিভূষণ ধ্যানচাঁদ, মহাগুরু কিষেনলাল। সেদিনের বসন্তের মলয়ানিলেও তাঁদেরকে মাথাটা একটু বেশীই ঘামাতে হয়েছিল বৈকি। বিশ্বজয়ী হকির সেকেন্দার শাহের আয়ুধে আজ এত মরিচা কেন? অদূরে মস্কোর স্টেডিয়ামে আজ অনেক শত্রুই শাণিত তরবারি হয়ে দণ্ডায়মান। প্রতীক্ষারত পাকিস্তান, জার্মান, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম আর ইংলণ্ড।

জয়পাল সিং তাঁর ভাষণে জানালেন—"বর্তমান ও অতীতের খেলার মধ্যে প্রধান পার্থক্য যেটা আমার চোখে পড়ছে, তা হোল আজকের খেলোয়াড়দের গোল করার অক্ষমতা।" ১৯২৮ সালের আমস্টার্ডাম-অলিম্পিক অধিনায়ক মহানুভব। তাই অন্য দোষত্রুটির কথা ইচ্ছে করেই উল্লেখ করেননি। কিন্তু এটা তো সত্যি, আজ ভারতের কোনো খেলোয়াড়ই প্রতিটি শর্ট কর্নারে বলে বলে গোল করতে পারেন না, যেমনটি পারতেন বিগতদিনের টপসেল, কেন্টিস প্রমুখেরা। ইয়াকুব-বুড়ি-গুরদিয়াল সিং—এঁদের খেলার কোথায় সেই দুর্জয় অনমনীয়তা? আর বালকিষেন সিং এবং ফেন্টন তো অতীতের ছায়ামাত্র। রক্ষণভাগে যদি কারুর নাম করতে হয়, তবে তা [illegible]-হাফ ক্রডিয়াস-এর। শত্রুর আক্রমণ-মুখে আজও তিনি অটল হিমাচল। কিন্তু দলের মধ্যমণি সেন্টার-হাফ ভারত এখনও পায়নি। লালশাহ বোখারী, কেশব দত্ত, আখতারহুসেন-দের আজ ফিরিয়ে আনা নিরর্থক (কারণ সময় হত্যা করেছে এঁদের সামর্থ্যকে), তাই-না অ্যান্টিক, অজিত সিং হয়েছেন বনপ্রান্তের নির্বাসম্রাট।

এবারের জাতীয় হকি-খেলায় ফরোয়ার্ডদের অনেকেরই খেলা দেখলাম। এঁরা দ্রুতগতিসম্পন্ন, এঁদের পারস্পরিক বোঝাপড়াও চমৎকার। পিটার-হরিপাল-মনোরঞ্জন-ভোলা বা কালেব-গুরমেল-সৈয়দ আলী অথবা রাজবীরলাল-বলবীর উমর—এঁদের স্টিকের কাঠটা হয়েছে শক্ত, কিন্তু পালিশটা গেছে চটে। এঁদের পায়ের 'গুলি' শক্ত হয়েছে জোরে ছুটে ছুটে, কিন্তু দরকার হয়ে পড়েছে পাওয়ার-দেওয়া চশমার (অন্ততঃ 'ডি'-এর মধ্যে)। শক্তির আবাহনে কলাদেবীকে দিয়েছেন এঁরা বিসর্জন। তাইতো আজ ধ্যানচাঁদ-বাবু-কিষেনলাল দুঃখে ক্রিয়মাণ, আর মাঠের বাতাস হা-হা করে: স্কুপিং কোথায়! ওপারের [illegible]-নীতির চীৎকার করে: কোথায় 'কাজ', কোথায় মহত্ত্ব দাও। আলোর মেঘগুলো বিদ্রোহ জানায়: আমরা এ খেলা দেখবো না, দেখতে চাইনা।

ওরা দেখেছে ধ্যানচাঁদের স্টিকে বল লেগে থাকতো আঠার মতো, কিষেনলাল লাইন ধরে বল নিয়ে দৌড়তেন স্টিক-ওয়ার্কের ভোজবাজি দেখাতে দেখাতে, স্বল্পপরিসর স্থানে কে. ডি. সিং (বাবু) সাত-আটজন বিপক্ষের খেলোয়াড়দের কাটাতেন সাবলীলভাবে, আর সার্কেলের মধ্যে যে-কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে ফ্লিপিং স্টিক দিয়ে কামানের গোলা ছোটাতেন অভ্রান্ত লক্ষ্যে। কতজনেরই বা নাম করবো। ১৯২৮ থেকে ভারত তো হকির একচ্ছত্র অধিপতি। কত অ্যালেন-সৌকত আলী-পিনিগার-জাফর এলো, কত এরলম্যান সি-ক্লাকেন-অ্যানক্লেন গেল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষরে। কিন্তু তাঁদের স্টিকের যে যাদু কোনো শত্রুই বুঝতে পারলো না কোনোদিন, তাই কিনা আজ ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে। স্টিক-ওয়ার্কের পাট তুলে দিয়ে ভারতীয় হকি উন্মাদের মতো জোরাজুরির দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রাণোজ্জ্বল বসন্ত ভারতীয় হকির উদ্যান থেকে নিয়েছে বিদায়, সেখানে এসেছে আজ রুক্ষ শীতের ঊষরতা।

ক্রিকেট সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে যেমন্ ব্র্যাডম্যানের নাম আগে এসে যায়, হকিতে তেমনি ধ্যানচাঁদের। তা ছাড়া, আরম্যান-হরিপাল-কার্নেল সিং বা 'আজকের বলবীর'-এর খেলা দেখলে অনেক দুঃখে ধ্যানচাঁদের কথা বার বার মনে পড়ে। ১৯৪৯ সাল। '৪৮-এর সদ্য লণ্ডন প্রত্যাগত অলিম্পিক-বিজয়ী-দলের সঙ্গে ধ্যানচাঁদ-একাদশের খেলা। ওদিকে বাঘা-বাঘা রথী-মহারথীরা—জ্যানসেন-বাবু-কিষেণলাল-জেন্টল-ক্লডিয়াস-কেশব দত্ত, আর এদিকে ধ্যানচাঁদ একাই একশো। খেলা চলছে; হঠাৎ দেখা গেল ধ্যানচাঁদ একটি বল স্টিকে করে ধরে বিদ্যুৎগতিতে দু'বার ঘুরিয়ে ঠেলে দিয়েছেন, আর বিপক্ষের দুজন খেলোয়াড় সেদিকে ধরবার জন্য তীব্রগতিতে অনুসরণ করলো। কিন্তু কোথায় বল? মিনিটখানেকের জন্য মাঠের প্রতিটি ঘাসও স্তব্ধ হয়ে রইলো। পরে দেখা গেল ধ্যানচাঁদ এগিয়ে আসছেন, বল তাঁর স্টিকে। এ অবশ্য একমাত্র ধ্যানচাঁদের পক্ষেই সম্ভব। কিছুক্ষণ পরেই একটা শর্ট-কর্নার থেকে ধ্যানচাঁদ একটা গোল করলেন, যেটা তিনি নিজেই 'ডেড্‌স্টপ' করে নিজেই হিট্ করেছিলেন। হ্যাঁ, আজও কোনো খেলোয়াড় ঐরকমটি করতে পারলো না। আর একবার সিলোন মিলিটারি একাদশের সঙ্গে খেলা হচ্ছে ইউ. পি. মিলিটারি একাদশের। সেদিন ধ্যানচাঁদ একটি বল দূরে-দূরেই স্টিকে করে নিয়ে গেলেন, এমন সময় এগিয়ে এলো সিলোনের ব্যাক, তীব্রভাবে। তিনি বলটি তাঁর মাথা টপ্‌কিয়ে দিয়ে আবার স্টিকের উপরই বলটা ধরলেন। না, একবারও বল মাটি ছুঁলো না। ঐ অবস্থায় বলটি গোলে 'পুশ' করে দিলেন। ধ্যানচাঁদ ইনিই। সোজা-স্টিক আর রিভার্স-স্টিকের মাঝখানে সাদা বলটাকে রেখে, সর্পিল গতিতে এগিয়ে এসে, সার্কেলের মধ্যে ব্যাটটি তোলেন শুধু একবার, আর তারপরেই সেন্টারে শুরু হয় 'বুলি' আবার নতুন ক'রে।

আমাদের বর্তমানের পুরোভাগের ভরসা শুধু উধম সিং। এবারের খেলায় তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। কিন্তু কয়েকদিন আগেকার জার্মানি-সফরে একমাত্র তিনিই পেয়েছেন উচ্চ প্রশংসা। রাইট-আউট কালেব সত্যই প্রশংসনীয়। প্রবীণ ভোলার চেয়ে নবীন সৈয়দ আলী সুযোগ পেলেই খুশি হবো। রাইট-ইন্ পিটার বা লেফট্-ইন্ অরোরা যোগে কিছু করবেন বলে আশা রাখি। কিন্তু আমাদের সম্ভাব্য সেন্টার-ফরোয়ার্ড বলবীর (বড়) বা আরম্যান, কেউই আমাদের মাভৈঃ দেননি। আজকের বলবীরের খেলা দেখলে সেক্সপীয়র 'জুলিয়াস সীজার'-এর লাইনটা পুনরাবৃত্তি করতেন—"হোয়াট্ এ গ্রেট ফল্ ওয়াজ দেয়ার।"

কালেব-বলবীর-উধম, উন্নত করো তোমাদের খেলার ধারা। অতীতের গৌরবময় দক্ষতা নতুন করে আয়ত্ত করো নতুন মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে। রোমের সম্রাট সিংহাসন থেকে নেমে আসুন তোমাদের স্টিক বদলে দেবার আদেশ দিতে, কারণ তোমাদের স্টিক নাকি যাদুমাখা। যেমনটি হয়েছিল বার্লিন স্টেডিয়ামে। ওরা ধ্যানচাঁদকে যেমন নিজের স্টিকে খেলতে দিলো না। আর মনে আছে তো, ইটালির তরুণীটি ধ্যানচাঁদকে অভিনন্দন জানিয়েছিল—"তুমি একটি দেবদূত"। মনে রেখো, তোমরা সেই দেবদূতেরই উত্তরসূরীরা। তাই তোমাদের ক্রীড়াশৈলীকে যেন রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামের প্রতিটি ধূলিকণা জানায় উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন।

নাটমহল

চিত্রলোক

বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত 'মুখর মাটি' বিজন দাশের পরিচালনায় সমাপ্তির পথে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন আলি আকবর খান। এই ছবিতে অনেকগুলি নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভূমিকা-লিপিতে আছেন—জ্ঞানেশ মুখার্জী, সাধনা রায়চৌধুরী, অলক চ্যাটার্জী, শেখর চ্যাটার্জী, সুজাতা সারখেল, বিভূতি মুখার্জী, দীপা দাস ও দীপিকা ভট্টাচার্য।

অভিনেত্রী প্রণতি ভট্টাচার্য চিত্র-প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের হয়ে প্রতিভা বসুর 'মধ্যরাতের তারা' পরিচালনা করবেন পিনাকী মুখার্জী। সঙ্গীত-পরিচালনায় আছেন হেমন্ত মুখার্জী। বোম্বাই-এর জনপ্রিয় নায়ক কিশোরকুমারকে এই ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন—ছবি বিশ্বাস, সুনন্দা ব্যানার্জী, অসিত ভট্টাচার্য, রেণুকা রায়, জীবেন বসু প্রভৃতি।

সুলতা পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন 'মিস্টার ও মিসেস চৌধুরী'। প্রযোজনা ও পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে দেবব্রত দত্ত ও অসীম পাল। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কীর্তনকলানিধি রথীন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রচুর ভূমিকা-সংবলিত এই ছবিটিতে যাঁদের দেখা যাবে, তাঁরা হলেন—রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলা পাল, শুক্লা দাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নবগোপাল লাহিড়ী, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, হরিধন ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। শৈলেশ দে রচিত রসমধুর একটি মিলনান্তক কাহিনী 'মিস্টার ও মিসেস চৌধুরী'। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে।

বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 'শহরের ইতিকথা'র কাজ চিত্ত হালদারের পরিচালনায় অগ্রগতির পথে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন—মালা সিন্‌হা, উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, কাজরী গুহ, বাণী হাজরা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

কয়েকজন কলাকুশলী নিয়ে গঠিত একটি পরিচালক-গোষ্ঠীর নাম 'অগ্রদূত'। এঁরা 'জরাসন্ধ'-বিরচিত, বহুপঠিত কাহিনী 'তামসী'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন। ছবিটির নামকরণ হয়েছে 'বিষকন্যা'। ভূমিকা-লিপি এখনও অসম্পূর্ণ। সঙ্গীত-পরিচালনায় আছেন গোপেন মল্লিক। হেমন্ত মুখার্জী, মান্না দে ও মানবেন্দ্র মুখার্জীর কণ্ঠের কয়েকটি গানের রেকর্ডিং হয়েছে।

আর একখানি নির্মীয়মাণ ছবির নাম 'আমার বাঁধিছ ঘর'। রচনা ও পরিচালনায় আছেন কনক মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন—সন্ধ্যারাণী, তপতী ঘোষ,

ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার প্রভৃতি। ভি. বালসারার সঙ্গীত-পরিচালনায় কয়েকটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন হেমন্ত মুখার্জী, গীতা দত্ত ও সন্ধ্যা মুখার্জী।

'অগ্রদূত' গোষ্ঠীর আগামী প্রচেষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তরায়ণ'। নায়করূপে উত্তমকুমারকে দেখা যাবে ব'লে জানা গেছে।

'কালচক্র' একটি রহস্যঘন কাহিনী। রত্নদীপ ফিল্মস্-এর হয়ে নবাগত পরিচালক শচীন অধিকারী এই ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, গোপেন মুখোপাধ্যায়, নমিতা সিন্‌হা প্রভৃতি ভূমিকা-লিপিতে থাকবেন ব'লে আশা করা যায়।

সুবোধ ঘোষ রচিত 'গরল অমিয় ভেল' অবলম্বনে যে ছবিটি নির্মীয়মাণ, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'শিলাদিদি'। সম্ভবত এই ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী ও নির্মলকুমারকে একত্রে দেখা যাবে। প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে রূপ দেবেন রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়; সঙ্গে থাকবেন নমিতা সিন্‌হা ও অনুভা গুপ্তা। সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন দাশগুপ্ত। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুবীর হাজরা।

রামকৃষ্ণ ফিল্মস্-এর প্রথম নিবেদন—সামাজিক চিত্র 'সেবা'। চিত্র-সম্পাদক ভোলা আঢ্য এই ছবিখানি পরিচালনা করছেন। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃপ্তি মিত্র দুই শক্তিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী এই চিত্রের প্রধান আকর্ষণ।

বিশিষ্ট-ভূমিকা-সংবলিত [illegible] পিকচার্সের 'অজানা কাহিনী' মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবিগুলির অন্যতম। এ ছবির

'মেঘে ঢাকা তারা' বাণীচিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী

আকর্ষণীয় ভূমিকা-লিপিতে আছেন—ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, রবীন মজুমদার, শিশির মিত্র, মিহির মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সমীর মজুমদার, বেচু সিংহ, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সাধনা রায়-চৌধুরী, নমিতা সিন্‌হা, চিত্রা মণ্ডল ও অপর্ণা দেবী। অমিয় চৌধুরী প্রযোজিত 'অজানা কাহিনী' পরিচালনা করেছেন সুনীলবরণ এবং সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন অমরেশ লাহিড়ী।

বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত মঞ্চ-সফল নাটক 'ক্ষুধা'র চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত। পরিচালনায় আছেন 'পঞ্চমিত্র' নামে একটি গোষ্ঠী এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ। মানসীর চরিত্রে রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন—নরেশ মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, তরুণকুমার, সন্তোষ সিংহ, সুনন্দা দেবী ও কমলা মুখোপাধ্যায়।

তরুণ পরিচালক-গোষ্ঠী 'যাত্রিক'এর পরবর্তী ছবিটির

'মেঘে ঢাকা তারা' কথাচিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

নাম 'বত্তিটুকু থাক্'। স্ত্রী-চরিত্র-প্রধান এই ছবিটির নায়িকা সুচিত্রা সেন। মিতালি ফিল্মস্ পরিবেশিত '[illegible] থাক্'-এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

বিবিধ সংবাদ

আগামী ৪ঠা মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত কান্-এ ত্রয়োদশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রায় বিশ্বের ঊনত্রিশটি দেশ এই উৎসবে যোগদান করবে। ভারতের পক্ষ থেকে বিমল রায় পরিচালিত 'সুজাতা' এবং 'অগ্রগামী'-পরিচালিত 'হেডমাস্টার' কান্-এ প্রদর্শিত হবে।

কেন্দ্রীয় বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একখানি জীবনী-চিত্র প্রস্তুত করার ভার দেওয়া হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের ওপর। এই ছবিটি তেরোটি বিভিন্ন ভাষায় নির্মিত হবে এবং রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত হবে।

[illegible]নেতা পিকচার্সের পক্ষে অসিত সেন যে-ছবিটি পরিচালনা করবেন, তার নাম 'স্বরলিপি'। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী যথাক্রমে এ ছবির নায়ক ও নায়িকা। 'স্বরলিপি'র চিত্রনাট্য লিখছেন ঋত্বিক ঘটক।

মাদ্রাজের এ. ডি. এম. প্রোডাকশন্স্ 'অগ্নিপরীক্ষা'র হিন্দী চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। উত্তমকুমারকে নায়ক ক'রেই ছবিটি প্রস্তুতের পরিকল্পনা হচ্ছে।

বিভক্ত-বাংলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর এক পরিবারের হাসিকান্নার আলেখ্য সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি'। শিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলী এই কাহিনিটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন। প্রধান ভূমিকায় উত্তমকুমারের নাম ঘোষিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের 'শুন বরনারী' অজয় করের পরিচালনায় দ্রুত প্রগতির পথে। নায়ক-নায়িকার চরিত্র রূপায়িত করছেন যথাক্রমে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক মুঠো আকাশ' নাটকটি চিত্রে রূপায়িত হবে ব'লে জানা গেছে। পরিচালনা করবেন তরুণ রায়, এবং পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন 'ছায়ালোক'। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করবেন তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায় এবং উক্ত নাটকের মঞ্চ-শিল্পীগণের অধিকাংশ।

বিমল মিত্রের 'বেনারসী' অরূপ গুহঠাকুরতার প্রযোজনায় রুপালী পর্দায় প্রতিফলিত হবে। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন রুমা দেবী। রাঁচির উপকণ্ঠে মুরিতে শীঘ্রই বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হবে।

কথায় কথায়

"স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদিসৃষ্টির যজ্ঞাহুতি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যা-গণনার-অতীত প্রত্যূষে ;
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ ;
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্যবিস্মৃতির স্তরে স্তরে।" —রবীন্দ্রনাথ

চৈত্রের অশোক-পলাশে ছড়িয়ে পড়েছে বিদায়ী বর্ষের অনুরাগ। কত আনন্দ-বেদনা, কত আশা-নিরাশার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে আর-একটি বছর মিলিয়ে যেতে চলেছে মহাকালের অসীমতায়। কত আবেগমথিত মুহূর্ত, কত ব্যর্থতার হতাশ্বাস, খণ্ড বিক্ষিপ্ত কত অজস্র অনুভূতি হারিয়ে যাচ্ছে জড় অতীতের বর্জিত শস্যরাশির মধ্যে। মহাকালের খেয়া এসে পৌঁছে গেছে চৈত্রশেষের ঘাটে। বর্ষশেষ।

শত শত ভাঙা ইতিহাসের বিস্মৃতির স্তরে স্তূপ বাড়ল আর একটুখানি। তেরশো ছেষট্টির পালা শেষ। সব হিসেব যদি না-ও চুকে থাকে, তবু তাকে যেতে হবে। নিত্যনবীনা ধরিত্রী তাকে বিদায়ের ইশারা জানিয়েছে। অশোক-পলাশের রক্তরাগে তাই বিদায়ী বর্ষ-সূর্যের শেষ রক্তরাগ।

আর একদিকে নতুন জীবনের আয়োজন। আগামী বছর তার ঊষা-কিরণের আভাস পাঠিয়েছে কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায়। সেখানে অরুণালোকের প্রথম উদ্ভাসে মুক্ত মানবের নবতম গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্বনি উঠেছে।

বর্ষশেষ আর বর্ষারম্ভের এই সন্ধিলগ্নে শেষ প্রণাম জানাই বিদায়ী বর্ষকে। কামনা করি, আমাদের অপূর্ণতা যেন নববর্ষের নতুন পথে পূর্ণতার সন্ধান পায়। আমাদের ত্রুটি, আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের দৈন্য যেন নিঃশেষিত হয়ে মিলিয়ে যায় নতুন সূর্যের নতুন উজ্জ্বল পথপ্রান্ত থেকে।

—

সারা ভারত জুড়ে আসন্ন রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আগামী বৈশাখ থেকে পরবর্তী বৈশাখ (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত রবীন্দ্র-আবির্ভাবের এই শততম বৎসরে মহামনীষীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী একটি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। এ প্রসঙ্গে দেশের খ্যাতনামা বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গের সাগ্রহ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রতিমাসেই এক একটি সারগর্ভ আলোচনা থাকবে 'বসুধারা'র পৃষ্ঠায়। আগামী বৈশাখ থেকে পরবর্তী বৈশাখ পর্যন্ত আমাদের এই বিশেষ কর্মসূচীতে সহযোগিতার জন্য আমরা সুধিবর্গের সহযোগিতা আরো বেশী ক'রে প্রত্যাশা করি।

—

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর শোক মুছতে না মুছতেই আর একটি শোকাবহ ঘটনা ঘ'টে গেল। গত ১২ই মার্চ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মৃত্যুতে দেশের উপরে আবার শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আচার্য ক্ষিতিমোহন ছিলেন আমরণ জ্ঞানযোগী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও, এই নিরলস জ্ঞানতপস্বীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষামূলক সমগ্র কর্মকাণ্ডে অন্তরতম পার্ষদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে আচার্য ক্ষিতিমোহনের যে দান র'য়ে গেল, তা অসামান্য। নিরলস কর্মজীবনের শেষে আচার্য মহাপ্রশান্তির ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হয়েছেন। তাঁর আত্মা অনন্ত স্বর্গে অমৃতময় বিশ্রাম লাভ করুক!

—

গত ১৮ই মার্চ তারিখে বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় ৮১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন।

'পরশুরাম' রূপে সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীবসুর আবির্ভাব বিস্ময়কর। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি নিয়ে তিনি প্রথম এসেছিলেন সাহিত্য-ক্ষেত্রে। তারপর 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' একে একে আলোড়ন আনল বাংলা-সাহিত্যে। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) বাংলা সাহিত্যের সার্থক হাস্যরসকে যে পর্যায়ে এনে দিয়েছিলেন তার পর থেকে কাজ শুরু করলেন পরশুরাম। পরশুরামের হাতে কুঠার ছিল না; কুঠারের বদলে বিচি

সব রকম তুলি [illegible] সাহিত্যের হিউমরিস্ট[illegible] শ্রেষ্ঠতম কুশলী [illegible] পরশুরামের। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] হাস্যরস একশ্রেণীর। পরশুরামের হাস্যরস মননশীলতা লাভ করেছে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে। তিনি যে বিচিত্র মানুষগুলিকে ছেড়েছেন, [illegible] মননশীলতার [illegible] তৈরী বাস্তবতায় এক [illegible] নিখুঁত সম্পূর্ণতা, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, রুচির উন্নত মান, [illegible] হাস্যরসকে চিরায়ত (classic) হাস্যরসের পর্যায়ে তুলে দিয়েছে। এই প্রতিভাশালী সাহিত্যিক নীরোগ, সুস্থ সবল ভাবে আরও অনেক আয়ুর অধিকারী হোন, এই আমাদের কামনা।

—

'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসখানি সাম্প্রতিক বাংলা-সাহি[illegible] চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রচরিত্রের ব্যক্তিটি ছিলেন বাংলা-গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা। তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিল সমসাময়িক কালের এক আলোচ্য বিষয়। উপন্যাসখানির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এই উপন্যাসের লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাঁর এই উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তির জন্যে সম্প্রতি 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। শ্রীবিশীর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবকের এই সম্মানপ্রাপ্তির সংবাদ আমাদের বিশেষ আনন্দ দান করেছে। দেশবাসী মাত্রেই এ সংবাদে প্রীত হবেন।

—

শোনা যায়, বৃন্দাবন থেকে অনেক বৈষ্ণ[illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়কে একটি কলম উপহার[illegible] অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তিনি যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে কিছু লেখেন। সে যাই হোক, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের মতো অশীতিপর বৃদ্ধের লেখনী থেকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন' নামক যে অমূল্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তা বাংলা-সাহিত্যের এক সম্পদ হয়ে [illegible]। এই গ্রন্থখানির জন্যে শ্রীনাথও সম্প্রতি রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। আমরা এই বৃদ্ধ [illegible] নীরোগ, সুস্থ দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি। তাঁর [illegible]কে বাংলা-সাহিত্য যেন অধিকতর সমৃদ্ধ হয়।

—

[illegible] বেরুবাড়ি আবার এক বৃহৎ ও সুদূরপ্রসারী সংকটের সৃষ্টি করেছে। গতবছর ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তানের দাবি অনুসারে ভারত-সরকার পাক-সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে বেরুবাড়ি ইউনিয়নের একটি অংশ ও কুচবিহারের কয়েকটি ছিট-তালুক পাকিস্তানকে দিয়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারত-সরকারের ঐ [illegible] সেদিন দেশব্যাপী দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। সংসদে, জনসভায়, সংবাদপত্রে সর্বত্র [illegible] কাজের তীব্র সমালোচনা হয়েছিল, এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধান-সভায় সর্বসম্মতিক্রমে [illegible] চুক্তির ঐ অংশটুকুর বিরোধিতা করা হয়েছিল। [illegible] এই প্রতিবাদে রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সংবিধানের [illegible]৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিষয়টির আইনগত মীমাংসার উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের শরণ নেন। কারণ সংবিধানের ধারা অনুসারে, কোনো অঙ্গরাজ্যের কোনো অংশ সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের বিধান-সভার অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তরিত হ'তে পারে না।

সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, ভারতের কোনো অংশ অন্য রাষ্ট্রকে দিয়ে দেওয়ার অনুমতি সংসদ দিতে পারে না, এবং সংসদের অনুমতি ব্যতিরেকে মন্ত্রিসভার কোনো কাজও আইনসিদ্ধ হ'তে পারে না। অতএব বর্তমান সংবিধান পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত-সরকার আইনসম্মতভাবে পাকিস্তানকে বেরুবাড়ি দিতে পারেন না। এ সম্পর্কে একজন বিচারপতি বলেছেন—"আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতে পারি, সংবিধানের ৩(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুসারে দেশের [illegible] অংশই বিদেশী রাষ্ট্রের হাতে আইনসিদ্ধভাবে হস্তান্তরিত হইতে পারে না।"

সারা দেশ থেকে এই ধ্বনি উঠা দরকার যে—নেহরুকে আমরা কম ভালবাসি না, কিন্তু ভারতকে ভালবাসি তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং তাঁর অঙ্গচ্ছেদের কোনো চেষ্টা তিনি যেন না করেন।

—

আর এক দারুণ অন্যায় হয়েছে, এক নরহত্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অকারণ প্রশ্রয় দিয়ে। গণতন্ত্রের প্রাণ হ'ল আইনের মর্যাদা, যে মর্যাদার কাছে রাষ্ট্রের প্রধান শাসকেরা উচ্চশিরও অবনত হ'তে দ্বিধা বোধ করবে না। স্মরণ: "Laws grind the poor and rich men rule the laws"—এ ধারণা একবারও যদি দেশের সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্রয়লাভের সুযোগ পায় তাহলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা তার সবটুকু আত্মিক শক্তিই হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু কমাণ্ডার নানাবতীকে রক্ষা করতে গিয়ে ভারত-সরকার আজ সেই সর্বনাশের পথেই পা বাড়িয়েছেন। নানাবতীর জন্যে সরকারী তহবিল থেকে দশহাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জীবনে এর চেয়ে দুর্দিন খুব কমই কল্পনা করা যেতে পারে।